"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

৮ম বর্ষ ঃ ২য় খণ্ড

শুক্রবার, ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৭৫—শুক্রবার, ৮ কার্তিক, ১৩৭৫

Friday, 2nd August, 1968 — Friday, 25th October, 1968.

লেখক … **বিষয় ও পৃষ্ঠা**

॥ শ ॥

॥ স ॥

॥ হ ॥

॥ ক্ষ ॥

৮ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 9th August, 1968. শুক্রবার, ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭৫ 40 Paise,

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

সাহিত্যে অশ্লীলতা

সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার যদিও নির্দিষ্ট কোন সীমা নাই তথাপি, অশ্লীল সাহিত্য যে কি এবং শ্লীলতা যে কোন সাহিত্যের মধ্যে যথাযথ রক্ষিত হয় তা আমাদের অননুমেয় নয়। বাস্তবের যথাযথ নগ্ন চরিত্র এবং ঘটনার সমাবেশই অশ্লীল সাহিত্যের নিদর্শন। আর বাস্তবের ঘটনা ও চরিত্রকে কল্পনার রঙে সুন্দরভাবে প্রকাশ করাই প্রকৃত সাহিত্যের উদাহরণ। অশ্লীল সাহিত্য পাঠকের মনকে বাস্তবের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সীমিত করে এবং বহির্দৃষ্টি সংকুচিত করে। এ বিষয়ে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে—তথাকথিত সাহিত্য অনুরাগীরা যাঁরা শুধু সময় কাটাবার জন্যে সাহিত্য পাঠ করেন অর্থাৎ যাঁদের সাহিত্য পাঠের সহজাত প্রবৃত্তি নেই তাঁরা অশ্লীল বলে পরিচিত বই পড়ে হয়ত বলবেন যে এর মধ্যে অশ্লীলতা কোথায়? এ ঘটনা তো যথার্থ সত্য এবং এরূপ ঘটনা তো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অহরহ ঘটে চলেছে। আর তা গল্পাকারে প্রকাশিত হয়েছে বলেই কি তা অশ্লীল? আমি এই সকল সাহিত্য অনুরাগীদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার কথা স্মরণ করতে বলি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় লিখেছেন :—

"ঘটে যা তা সব সত্য নয়।
কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

অর্থাৎ কবি ও সাহিত্যিকগণই সত্যদ্রষ্টা। তাঁরা যা রচনা করবেন তা যুগ যুগ ধরে মানুষের জীবনে আদর্শ হয়ে থাকবে। তবেই তো তিনি সাহিত্যিক। তার মধ্যে কতখানি বাস্তব ও কতখানি কল্পনা তা পাঠকের বিচার্য নহে। পাঠকের বিচার্য এইটে হবে, তা মানুষের জীবনে কোন একটি আদর্শের প্রতি নির্দেশ করছে কিনা।

কোন এক অখ্যাত যুগে মহাকবি বাল্মীকি তাঁর কল্পনার রঙে যে রামায়ণ রচনা করেছিলেন এবং রামের যে চরিত্র অংকন করেছেন তা বহু শত বর্ষ অতিক্রম করে আজও মানুষের জীবনে আদর্শরূপে বিরাজ করছে। কিন্তু বাস্তবে কোন রামের চরিত্র ছিল কিনা এবং থাকলে 'রামায়ণের রামের চরিত্রের সংগে তার সাদৃশ কতটুকু তা আমরা চিন্তা করি না। কবি তাঁর কল্পনার রঙে যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে।

তাই সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা আমরা সহজে বুঝতে পারি যে বাস্তবের যথাযথ নগ্ন চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশই সাহিত্য নয়। তা আখ্যানমাত্র। এইরূপ গ্রন্থকে কখনই আমরা সাহিত্যের মর্যাদা দিতে পারি না। তাতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের নগ্নতা প্রকাশ পায়। এ ধরনের সাহিত্য একান্ত বর্জনীয়। সাহিত্যের এই অশ্লীলতা দূর করার দায়িত্ব একাধারে যেমন সাহিত্যিকের অন্যদিকে তেমনি পাঠকেরও। পাঠকেরা তাঁদের অবসর ও চিত্তবিনোদনের জন্য এই ধরণের কু-সাহিত্য পাঠে বিরত থাকুন এবং উন্নত মনন ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিন। এর ফলেই সাহিত্যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার হবে। অন্যথায় সুফলের আশা কম।

মহাদেবকুমার ভুঞা
ইন্দা, খড়্গপুর।

(২)

আপনাদের পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে (তাং ২৬ জুলাই '৬৮) 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' প্রসঙ্গে শ্রীকল্যাণ সিংহের মতামত সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করার অনুমতি চাইছি।

চন্দ্রমুখী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কল্যাণবাবু জানিয়েছেন 'দেহ-বেসাতির কোন স্পষ্ট ছবি লেখক দেন নি। যদি সে রকম ছবি থাকতো উপন্যাসখানি অপাঠ্য হয়ে দাঁড়াতো। আমি বলি একেবারেই নয়। চন্দ্রমুখীর দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত আরো অধিক প্রকট হতো, তাকে আরো স্পষ্ট করে চেনা যেতো।" আমার মনে হয় শালীনতার বেড়া না ডিঙিয়ে শরৎবাবু চন্দ্রমুখীর যে চরিত্র এঁকেছেন তা সর্বকালের পাঠকদের সব সময় ভালো লাগবে। কিন্তু কল্যাণবাবু এবং তাঁর সমমতের পাঠকদের এই ধরণের লেখা হয়তো কোন কালেই পছন্দ হবে না। তাঁরা চান সব কিছু বিশদভাবে। কল্যাণবাবু আরো বলতে চেয়েছেন "আজকের পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে উপন্যাসখানা Physchological Analysis হয়ে উঠতো।" সাধারণ একজন পাঠক হিসাবে আমার ধারণা চন্দ্রমুখীর চরিত্রমাধ্যমে লেখক বলতে চেয়েছেন 'মানুষের কর্ম ছোট হয়, কিন্তু মানুষ ছোট হয় না।" তিনি নিছক Physchological Analysis করতে চান নি। পত্রলেখক এই বিষয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষ করে সে দেশের পরিবেশ, সমাজ ও পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির বিচারেই লেখা হয়ে থাকে। স্বীকার করি, আপাতদৃষ্টিতে অশ্লীল মনে হলেও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনেক রচনা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে অনেক উঁচু আসন গ্রহণ করে আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে যা থাকবে, আমাদের বাংলা সাহিত্যেও তাই থাকতে হবে, এইরকম কোন গোঁড়ামি অর্থহীন মনে হয়। কল্যাণবাবু বলতে চেয়েছেন "সাহিত্যে যা স্বাভাবিক তা প্রয়োজন বোধে দুঃসাহসী হয়ে থাবা উঁচিয়ে বাহিরে এসেছে।" কিন্তু তা বলে সেই দুঃসাহসী প্রয়োজন বোধটা যেন শালীনতার বেড়া না ডিঙিয়ে যায়।

কল্যাণবাবু হয়ত আমাকে বিকৃত মন বলবেন কারণ তাঁর বক্তব্য "সাহিত্যের ব্যাকরণ এবং জীবনের ব্যাকরণের পার্থক্য খুঁজে বেড়ায়, মিল খুঁজে পাওয়া সেমনের আওতায় বাইরে থাকে।" কল্যাণবাবু যাই ভাবুন, আমি বলবো যা বাস্তব তাকে সাহিত্যের সুন্দর সাবলীল ভাষায়, শালীনতার বেড়া না ডিঙিয়েও বলা যায়। তিনি অমর বসু মহাশয়কে উপদেশ দিয়েছেন "অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি অকারণে বিচারকের আসনে বসেন, সেটা বোধহয় নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। অমরবাবু বোধহয় চান আজকের সাহিত্যে 'পাখী সব করে রব' যুগের একটা Continuity থাকবে।"

আমার মনে হয় অমরবাবু বিচারকের আসনে বসেন নি, তিনি শুধু নিজের মতামত জানিয়েছেন। যেহেতু কল্যাণবাবু তাঁর সংগে একমত নন সেইজন্যই তিনি অনভিজ্ঞ? অদ্ভুত যুক্তি।

শেষে অনুরোধ করবো কল্যাণবাবু যেন রাগ না করেন, তাঁর প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই, আমি নিজের ব্যক্তিগত মতামত জানিয়েছি।

শংকর সিংহ
বারোনি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বারোনি।

দামিনী প্রসংগে

অমৃতের ১২শ সংখ্যায় শ্রীসুবোধ বসুর "দামিনী" নামক গল্পটি পড়লাম। লেখক এই গল্পে একটি ভুল লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "কয়লা খনির রোপ-ওয়েতে দোদুল্যমান কয়লা ভরা লোহার ঝুড়ি চোখে পড়ে খনির অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে।" কিন্তু আমি জানি রোপ-ওয়েতে কখনো কয়লা যায় না, রোপ-ওয়েতে কেবলমাত্র বালি যায়।

চিত্রপর্ণা দাশগুপ্ত
ঝরিয়া (ধানবাদ)।

অমৃত

সম্পাদকীয়

দুই দেশের কবি

বাইশে শ্রাবণ কবির প্রয়াণ দিবস। এই দিনটিকে আমরা স্মরণ-দিবস বলেই মানি। কারণ, কবির মৃত্যু নেই, তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে অনন্তকাল বেঁচে থাকেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্য নিতানূতন পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও এ-যুগের মানুষের ব্যবধান কম নয়। কিন্তু এই কবিকে অস্বীকার করে বাংলাভাষায় কোনো সাহিত্য রচনা বা সংস্কৃতিচর্চা অসম্ভব। বাংলাদেশ যখন বিভক্ত হল, তখন অধিকাংশ বাংলাভাষী পড়ে গেলেন পূর্ববাংলায়, সরকারী ভাষায় যার নাম পূর্ব পাকিস্তান। যে-বিরোধ ও বিদ্বেষের আবহাওয়ায় দেশ ভাগ হয়েছিল, তাতে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা যা দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টাও সে-সময়ে অবান্তর বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দেখা গেল সেই ঝড়ো মেঘ কেটে যেতে বেশি সময় লাগল না। তার কারণ, ভাষার ও সংস্কৃতির বন্ধন রাজনীতিক বিরোধ বা সামাজিক বিরোধের চেয়ে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম।

পূর্ববাংলার মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী সংস্কৃতির উদ্গাতারূপেই গণ্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় যাঁরা পাকিস্তানে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রয়েছেন তাঁদের ভাষা বাংলা নয়। এমনকি কোনো ভৌগোলিক সন্নিহিতিও নেই তাঁদের অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ববাংলার, যার দ্বারা এদের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হতে পারত।

এই কারণে প্রথম থেকেই সেই উর্দুভাষী শাসকরা বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের ওপর বিশেষ নজর রেখেছে যাতে তারা "হিন্দু" বাংলার সংস্কৃতির খপ্পরে না পড়েন। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, এমনকি নজরুল ইসলাম সম্পর্কেও সেই শাসকগোষ্ঠীর বিরূপতা ছিল। নজরুলের কবিতার অনেক সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা শব্দ তাঁরা পরিবর্তন করে দিয়েছেন পূর্ববাংলার পাঠকদের পাক-সংস্কৃতিতে আচলামতি রাখার জন্য।

পূর্ববাংলার অধিবাসীরা অবশ্য এই ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাভাষা ও বাংলা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করেছেন আক্ষরিক অর্থেই বুকের রক্ত দিয়ে। তাঁদের সংগ্রামের ফলে আজ পূর্ববাংলায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মধুসূদন প্রমুখ কবি বাঙালীর প্রাণের কবি রূপে বন্দিত ও নন্দিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি পূর্ববাংলার মানুষের অনুরাগের আরও কারণ এই যে তাঁর কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের অনেকটাই তিনি কাটিয়েছেন পূর্ববাংলার নদীতীরে, শিলাইদা, সাজাদপুরে। জমিদারীর কাজের সূত্রে তাঁকে সেখানে থাকতে হত। সেই সময়ে তিনি বাংলার গ্রামকে গভীরভাবে জেনেছেন এবং দেখেছেন। তাঁর গল্পগুচ্ছের কাহিনীর সূত্র পাওয়া যায় পূর্ববাংলার গ্রাম-জীবনের আলেখ্যে, যা কবির তুলিতে এমন সুন্দরভাবে ফুটেছে। বাংলার শ্যামল প্রকৃতির যে অফুরন্ত বর্ণনা কবির রচনায় উদ্ভাসিত তারও প্রেরণা, আমরা বলতে পারি, পূর্ববাংলার নদীতীর, আকাশ আর প্রান্তরে নিহিত ছিল।

পূর্ববাংলার অধিবাসীরা গত বৎসর বাইশে শ্রাবণ শিলাইদা কুঠিবাড়িতে কবির স্মরণোৎসব সাড়ম্বরে উদ্যাপন করেছিলেন। দূর-দূরান্তর থেকে কবি সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষ এসেছিলেন শিলাইদার কবিতীর্থে। তাঁদের দাবীতেই শিলাইদার কুঠিবাড়ি সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে, সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের বাড়িটি নিতান্ত অবহেলিত অবস্থায় আছে এবং এমন সব কাজে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে যা কবির স্মৃতির মর্যাদা রক্ষা করে না। পূর্ববাংলার রবীন্দ্র-অনুরাগীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত করি আমাদেরও প্রতিবাদ। কারণ, রবীন্দ্রনাথ দুই দেশেরই কবি।

সাজাদপুরে কুঠিবাড়ি সংরক্ষণ প্রতীকী অর্থে কবির প্রতি সম্মান দেখানো। সব দেশেই মহৎ ব্যক্তিদের স্মৃতিকে সযত্নে লালন করা হয়। সাজাদপুর-শিলাইদার প্রতি ধূলিকণায় এই মহান শিল্পীর সৃজনকর্মের স্মৃতি বিজড়িত। পাঠকদের কৌতূহল জাগাবার জন্য প্রসঙ্গত ছিন্নপত্রাবলীর একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাক। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন সাজাদপুর থেকে ১৮৯৫-এর ২ জুলাই তারিখে : "কাল থেকে সাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে উঠে এসেছি। যা মনে করেছিলুম তাই। বেশ লাগছে। মাথার উপরে ছাদটা অনেক উঁচুতে এবং দুই পাশে দুই খোলা বারান্দা থাকাতে আকাশের অজস্র আলো আমার মাথার উপরে বর্ষণ হতে থাকে—এবং সেই আলোতে লিখতে পড়তে এবং বসে বসে ভাবতে ভারী মধুর লাগে।" আরও অজস্র বর্ণনা আছে যা থেকে বোঝা যায়, কবির সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে সাজাদপুরের আকাশ ও মাটির কত নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

সাজাদপুরে কবির স্মৃতিরক্ষার জন্য পূর্ববাংলার অধিবাসীরা যে-দাবী জানিয়েছেন, তার প্রতি ভারত ও পাকিস্তানের সকল বাংলাভাষীরই আছে পূর্ণ সমর্থন। কবি নিজে এ-ধরণের স্মৃতিপূজার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেননি সত্য, কিন্তু উত্তরকালের মানুষের কাছে কবির স্মৃতিপূত প্রতিটি স্থান, প্রতিটি বস্তু পরম মূল্যবান। বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসে এই মহান কবির প্রতি দুই বাংলার কৃতজ্ঞ উচ্চারণ আকাশ-বাতাস মন্দ্রিত করুক। কবি অবিনশ্বর।

অভিযুক্ত কাহিনী

অতিথি

আরসাকিন কল্‌ড্‌ওয়েল

[TOBACCO ROAD-এর বিখ্যাত লেখক আরসাকিন কলডওয়েলের পিতামহের গল্প কথনের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। পথে তাঁকে দেখলে লোক জড়ো হয়ে যেত গল্প শোনার জন্য। আরসাকিন পিতামহের কাছ থেকে বংশসূত্রে এই দৈব প্রসাদ লাভ করে ছেন। তাঁর পিতা ধর্মযাজক, জননী ছিলেন শিক্ষিকা। আরসাকিন এতাবং তিনবার বিবাহ করেছেন। মানবিক চরিত্র এবং দুঃখ ও বেদনার বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণে আধুনিক মার্কিণ সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা। আরসাকিন নিরন্তর সর্বত্র পরিভ্রমণ করে সাধারণ মানুষের হৃদস্পন্দন স্বকর্ণে শুনেছেন। জনগণের বিচিত্র জীবনধারা তিনি অনুভব করেছেন। আরসাকিন অসংখ্য গল্প রচনা করেছেন লোকচরিত্র নিয়ে এবং সেই সব গল্প অতিশয় বলিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী. তাঁর কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয়েছে।]

আমরা নিজেরা ভিন্ন আর কেউই অবশ্য জানতো না, এক শুভদিনে লরা এবং আমার বিবাহ একরকম স্থির হয়ে আছে। লরার তখন মাত্র সতের বছর বয়স, আমি তার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো এবং এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে এত বেশী আলোচনা করেছি যে লরার মা এই ব্যাপারে অর্থাৎ আমাদের বিয়ের কথা নিয়ে ভাববারও সময় পাননি।

অবশ্য সর্বাগ্রে আমাকে রিচমন্ড বা ওয়াশিংটন বা বাল্টিমোর কোথাও গিয়ে একটা ভালো রকমের চাকরী জোগাড় করতে হবে এবং আমাদের দুজনের উপযুক্ত যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে হবে। লরা এবং আমি এক রকম নিশ্চিতভাবেই জানি আমাদের বড় জোর দুই কিংবা তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে। লরার বোর্ডিং স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক পড়াশোনা সবে শেষ হয়েছে।

জুন মাসের মাঝামাঝি গ্রীষ্মের অবকাশে স্কুল বন্ধ হওয়ার পর লরা বাড়ি ফিরে আসা অবধি আমাদের দিনগুলি যেভাবে কাটছে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। লরা বাড়ি এসেছে মাত্র এক সপ্তাহ কি বড়জোর দিন দশেক হবে। আমি প্রতি রাত্রে ওদের বাড়ি গেছি, আর রবিবার ত' বটেই।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের পর লরাদের বাগানের পীচফল পাকতে আরম্ভ করে। ওদের বাগিচাটা মাত্র মাইল দুয়েকের মধ্যে। আমরা তাই প্রতি রবিবার বিকেলে সেখানে যেতাম। গাছের তলায় বসতাম, আর পীচ খেতাম। নয়ত মাঠে যেতাম, হ্যাট ভর্তি ফল নিয়ে, তারপর নদীর তীরে বসে ফলগুলি খেতাম।

এর পরের বুধবার দিন আমার খুড়োর সঙ্গে অন্য এক দেশে যেতে হল। রবিবার অনেক রাত্রে ফিরে সোজাসুজি শুয়ে পড়লাম, যাতে ঠিক পরদিন ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠেই লরার সঙ্গে দেখা করতে পারি। খুড়োমশাই-এর সঙ্গে কার্য উপলক্ষে বাইরে যাওয়ার সময় আমি লরাকে বলে গিয়েছিলাম যে রবিবার রাত্রে নিশ্চিত ফিরে আসব এবং সকালেই তোমাদের এখানে এসে সারাদিনটা কাটিয়ে যাব। বিকেল বেলা আমরা মতলব করলাম যে বাগিচায় গিয়ে সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকব।

দুই

পরদিন সকালে লরাদের বাড়ি যখন গেলাম তখন ও বারান্দায় খাটানো দোলনায় দুলছিল। আমি সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে কেউ আমাদের দেখে ফেলার আগেই ওকে তাড়াতাড়ি একটা চুমু খাওয়ার তালে ছিলাম, কিন্তু লরার কাছে পৌঁছানোর আগেই পরদা ঠেলে একটি অচেনা মেয়ে এসে দাঁড়াল।

এই মেয়েটিকে আগে কখনও দেখিনি, লরাও কিছু বলেনি যে কেউ আসবার কথা আছে। মেয়েটি এমনই অপরূপা, এমনই রূপলাবণ্যময়ী যে কি যে বলা উচিত তা মনে এল না। আমি বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, লরা মেয়েটির কোমরে হাত জড়িয়ে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ঠিক কি যে অতিরিক্ত বস্তু তা স্থির করতে পারিনি, হয়ত তার পোষাক-পরিচ্ছদ—মেয়েটির সঙ্গে লরার এত পার্থক্য যে তার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। লরার পোষাকও ঠিক ওরই মত, কিন্তু এমনভাবে সেই পোষাকটা ও পরেছে যে তার ফলে আমার পা টলমল করতে থাকে। আমার মাথাটা হাল্কা হয়ে গেল এবং আমার হাত-পা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য অসাড় হয়ে রইল। এমনই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিছলাম যে লরা যখন ওর নাম বলল তখন তার পদবীটা আমি যেন শুনতেই পেলাম না। যখন লরা ওকে দ্রুসীলা বলে ডাকল তখন আমি তার কাছে গেলাম। আর নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভরে ওর নামটা জপ করতে থাকি। এর আগে আর দ্রুসীলা নামটা কখনও শুনিনি। মেয়েটা এমনই সুন্দর, আর তার চোখদুটি এমন চমৎকার নীল-নীল আর অঙ্গের পোষাকটা এমন মসৃণ হয়ে বসেছে যে কি যে বলব আর কি যে করব তা আমার মনে এল না। আমি অবশ্য ওর করমর্দন করলাম, তারপর দোলনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমি ওদের মাঝখানটিতে গিয়ে বসলাম, আর হাত দুটি এমন ভঙ্গীতে রাখলাম যা আগে আর কখনো করিনি।

লরাই বলল, জানো দ্রুসীলা আমার রুমমেট। আমরা দুজনে এক সঙ্গেই থাকি সর্বদা। আমার হাতটা ওর আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা করে লরা।

আমি একেবারে চুপচাপ। মুখে কোনো কথা নেই। আমি কোথায় রবিবার পর্যন্ত সারা সপ্তাহটা লরার সঙ্গে একত্রে

কাটাবো ঠিক করে আছি এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে এই বান্ধবীর আবির্ভাব। তাই শুধু যে মেয়েটির এই আগমন মনে মনে অতিশয় অপছন্দ করেছি তা নয়, এইভাবে মেয়েটিকে বাড়িতে ডেকে আনায় লরার কান্ডজ্ঞানের অভাব দেখে হতাশ হয়েছি। কিন্তু তবু প্রথম যখন পর্দার ভেতর থেকে ওর আকস্মিক আবির্ভাব হয়েছিল সেই সময় ওকে যেমনটি দেখাছিল সেই ছবি কিছুতেই আমার মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না।

দ্রুসীলা কলকল করতে করতে বলে, লরা আমকে আপনার কথা অনেক বলেছে—তারপর আমার দিকে একটু ঘেঁষে এসে বলল—কিন্তু জানেন, অর্ধেকও বলেনি। আমি মনে মনে আপনাকে হাই-স্কুলের ছাত্রের মত দেখতে হবে মনে করেছিলাম, এখন দেখছি আপনি একেবারে কলেজ বয়সের মত।

লরা এ কথা শুনে হেসে আমার গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল।

লরা বলল, দ্রু। আমি কিন্তু তোমাকে দিয়ে, প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি ববকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে না। যদি একান্ত কারো সঙ্গে কথা বলতে চাও তাহলে ববকেই না হয় বলি তোমার জন্য ওর কোনো একটা বন্ধু জোগাড় করে আনুক।

আমি এইবার সোজা হয়ে বসে একবার লরা আর একবার দ্রু-র দিকে তাকাই। আমি এখানে এসে অবধি ভেবেছি লরা আর একটা ছেলেকে কেন আমন্ত্রণ করে আনেনি দ্রু-র জন্য।

আমার দিকে সলজ্জ ভঙ্গীতে চোখ রেখে দ্রু বলল, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, আমি যা পেয়েছি তাই নিয়েই খুশি। তোমাদের দুটিকে নিয়েই আমার আনন্দ।

ওরা দুজনেই খিল খিল করে হেসে উঠে অন্য কি সব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে থাকে।

আমি দুজনের মাঝখানটিতে নীরবে বসে বসে ভাবি দ্রু-র জন্য আর একটি কোনো ছেলেকে ডাকা ঠিক হবে কি হবে না।

আমি কনুইটা নামিয়ে হেঁট হয়ে হাটুর ওপর দেখছি আর ওরা আমার পিছনে ফিস্‌ফিস করছে, লরা আমার কাঁধের ওপর আলতো ভর দিয়েছে আর দ্রুসীলা ওর পা দুটো আমার দিকে শক্ত করে ঠেলে লরার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। আমি ভাবছি, রবিবার থেকে এক সপ্তাহের কথা, তার ভেতর লরা আর আমি একত্রে বাগিচায় গিয়ে সারাটি দিন একা একা কাটাতে পারতাম।

।।তিন।।

ডিনার শেষ হতেই আমরা বাগিচার দিকে রওনা হলাম। লরা সর্বাগ্রে চলল, এক-রকম দৌড়েই বলা চলে। এমনভাবে চলছে যে আমাদেরও তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে দৌড়োতে হচ্ছে—আমার কিন্তু দৌড়বার ইচ্ছে করছিল না, যতটা পারি পিছিয়ে পড়েছিলাম। দ্রুসীলা সারাক্ষণ আমার দুচার পা আগে ছিল।

আমরা পাহাড়ের ওপরটায় পৌঁছোতেই লরা সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে চারপাশে তাকাল। আমরা তিনজনেই নীরবে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকি—লরার মা তাকে ডাকছেন। কি যে বলছেন তা শুনিনি।

দ্রুসীলা বলল, কি চাইছেন উনি, লরা?

লরা বলল, আমাকে ফিরে যেতে হবে ভাই, মাকে শহরে নিয়ে যাওয়ার কথা। তারপর একটু দম নিয়ে বলে, বিকেলে কোথায় যেন যাবে, আমাকেই ড্রাইভ করতে হবে। আমাকে যেতে হবে দেখছি, তা তুমি আর বব বাগিচায় চলে যাও, আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। আমি যতটা তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। হয়ত ঘন্টাখানেক লাগবে—আমি যত শীগ্‌গীর সম্ভব আসব।

আর একটুও অপেক্ষা না করে ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে ছুটল। দ্রুসীলা আর আমি কয়েক মিনিট ধরে ওকে লক্ষ্য করি।

যেতে যেতে পিছন ফিরে লরা বলল—সব পীচগুলি যেন শেষ কোরো না, আমার জন্য দুচারটি রেখে দিও। আমি এখনই ফিরব।

আমরা পথটা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে পাহাড়ের নীচে নেমে বাগিচার গেটের দিকে চললাম। দিনটা বেশ গরম। ক্যারোলিনায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে গ্রীষ্মকালে যেমন বরাবর হয়ে থাকে সেইরকম।

দ্রুসীলা আমার দিকে না তাকিয়েই বলে, এখন নিশ্চয়ই ভারী খারাপ লাগবে আপনার।

আমি লরার কথা চিন্তা করতে থাকি, মুখে বলি, কেন?

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে দ্রু বলে, কেন, লরা নেই তাই ফাঁকা ফাঁকা লাগবে— আর ভদ্রতার খাতিরে আমার সঙ্গে মিঠে ব্যবহার করতে হবে।

আমার দিকে চোখ মেলে দ্রু যে ঠিক কি করেছিল তা বলতে পারবো না, চোখ কটকায় নি, কিন্তু সে চোখে যে কি বস্তু ছিল তা আমি সেদিন বুঝতে পারিনি।

আমি বেশ গম্ভীর গলায় বললাম, বারে তা কেন? অন্য কেউ হলে হয়ত তাই মনে হত, তবে তোমার কথা আলাদা।

দ্রুসীলা ততক্ষণে দৌড়ে এগিয়ে গেছে, আমার কথাগুলি তার কানে পৌঁছোয় নি। আমিও দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরে কথাগুলি আবার শোনাবার কথা ভাবলাম। ও লরার বন্ধু, তাই ওর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা দরকার। ওর উপস্থিতি যে আমি পছন্দ করি না এই মনোভাব যেন না জাগে। আমি এগিয়ে ওকে ধরবার চেষ্টা করি।

বাগিচার গেটে ও আমার চেয়ে আগে পৌঁছোল এবং আমি ভেতরে প্রবেশ করার আগেই ও তার ভেতর চলে গেল।

আমি চীৎকার করে বলি, দ্রুসীলা দাঁড়াও, সবচেয়ে ভালো ভালো পীচ যেখানটায় আছে আমি দেখিয়ে দেব—।

দ্রুসীলা হেসে বলে ওঠে, সব পীচই সমান, সুস্বাদু আর রসে ভরা। এর মধ্যে একটা সর্বাগ্রে চেখে দেখা যাক।

এই কথা বলে দ্রুসীলা হাত বাড়িয়ে একটা সূর্যপক্ক রক্তাভ পীচ হাতের কাছের ডাল থেকে পেড়ে নেয়।

আমি বাগিচার এই অংশ থেকে একশ গজ দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে বললাম, ঐদিকটায় সবচেয়ে ভালো ভালো ফল— চলো ওখান থেকে দুএকটা পেড়ে দিই।

দ্রুসীলা গেটের কাছ থেকে যা দু একটা ফল আহরণ করেছিল তাই খেতে খেতে আমার পিছু পিছু আসতে থাকে।

আমি গাছ থেকে একটি সর্বোত্তম ফল পেড়ে নিয়ে বলি, এই নাও, এটা খেয়ে দেখো। বাজী রেখে বলতে পারি এটা তোমার ভালো লাগবে। এটা হল লরার সবচেয়ে প্রিয় গাছ।

আমার দেওয়া ফলটায় একটা কামড় দিয়ে দ্রুসীলা গাছের নীচে এগিয়ে এসে [illegible]।—

সে হাসতে হাসতে বলে, ওঃ এ যে দেখছি রস ঝরছে,—এই বলে হাসতে হাসতে নিজের গালে আঙুল ঘসতে থাকে. তারপর আবার বলে—আচ্ছা এর খোসাটা এমন কেন?

আমি বললাম, সব ভালো জাতের পীচের গা-টা খস্‌খসে। যেগুলিতে তেমন খস্‌খসে ভাব নেই সেইসব ফল তেমন সুস্বাদু নয়।

কিছুক্ষণের জন্য গাছের তলায় আমরা দুজনে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াই। দুই-জনেই পীচ খাচ্ছি।

হঠাৎ দ্রুসীলা বলে উঠল, আমার মাথার দিকে নির্দেশ করে,—বারে! ঠিক ঐখানটায় কী সুন্দর একটা পীচ ঝুলছে!

আমার মাথার ওপরকার ওর দেখা সেই পীচটা আমি খুঁজে বার করার আগেই ও ডালটা নামিয়ে ফলটার কাছে পৌঁছেচে। আমি পীচটা পেড়ে দেওয়ার জন্য এগিয়েছি এমন সময় হঠাৎ ওর হাতের পীচটা মাটিতে ফেলে দিয়ে হাউ-মাউ করে উঠল।

আমি তৎক্ষণাৎ বুঝেছি ব্যাপারটা কি হয়েছে।

দ্রুসীলাকে মৌমাছি কামড়েছে।

আমি বললাম, দ্রুসীলা চলো তাড়া-তাড়ি বাড়ি ফিরে যাই. ঐ জায়গাটা যা হয় কিছু একটা ওষুধপত্র লাগিয়ে দিতে হবে, তা নইলে যন্ত্রণা কমবে না।

আমি গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম. কিন্তু পিছন ফিরে ও আসছে কিনা দেখতে গিয়ে দেখি যে ও গাছের তলায় বসে পড়েছে। আমি আবার দৌড়ে ওর কাছটিতে গেলাম।

বললাম, ব্যাপার কি দ্রুসীলা? তুমি বাড়ি ফিরবে না?

সে বলল, আমি পারছি না। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। ওর চোখ দিয়ে জল গাড়িয়ে পড়ছে। আবার বলল, বড় কন্‌কন্ করছে।

আমি অনুনয় করে বলি, কিন্তু আমরা এখানে কি করব? ওটা ফুলে উঠবে আর যন্ত্রণাও এইখানে থাকলে ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে অতি করুণ গলায় দ্রু বলল, বব যাহয় একটা কিছু করতে পারো না? কোনোরকমে একটু কমিয়ে দিতে পারো না?—আমাকে এইবার তুমি বলল।

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে মনে এল যে অনেক আগে আমাকে যখন সাপে কামড়েছিল তখন একজন বুড়ো নিগ্রো সমস্ত বিষাক্ত চাস্ত চষে বার করে দিয়ে

তার ওপর তামাকের রস দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল।

আমার কাছে অবশ্য তামাক নেই, তবে বিষটা টেনে বার করতে পারি।—মৌমাছির কামড়ের যে বিষ সেটাও হয়ত সাপের বিষের মত চুষে বার করে দেওয়া যায়।

আমি হাঁটু মুড়ে ওর পাশটিতে বসে পড়ি, তারপর মৌমাছিটা কোথায় কামড়েছে জানতে চাই।

কাঁধের পাশটা দেখিয়ে দিয়ে দ্রুসীলা বলল, এইখানটায়, কোথায় ফুলেছে দেখতে পারছো না?

আমি বললাম তোমার জামার হাতা গোটাতে হবে। তা না যদি করো তাহলে মৌমাছির কামড়ের ঠিক জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারছি না।

জামার হাতাটা গুটিয়ে, দ্রুসীলা ওর বুকের ওপরকার জামাটা যে পিন দিয়ে আটকানো ছিল সেটা খুলে ফেলল। তারপর জামাটা কাঁধের পাশ থেকে অনেকখানি সরিয়ে বলল, এই যে, এইখানে। দেখতে পাচ্ছ?

আমি আঙুল দিয়ে জায়গাটার মাংস টিপে ধরলাম, তারপর খুঁজে বার করলাম মৌমাছির হুলটা ঠিক যেখানটায় ফুটে আছে সেই জায়গাটা। তারপর ঝুঁকে পড়ে সেই ফুলন্ত জায়গাটায় মুখ দিয়ে প্রাণ-পণে চুষে বিষ বার করতে লাগলাম, চুষি আর মুখের বিষটা মাটিতে ফেলে দিই।

এইভাবে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল কাটল। আমি যতটা সম্ভব বিষ চুষে চুষে টেনে নিলাম।

আমার প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার যোগাড়, একটু দম নিয়ে বলি, দ্রুসীলা, এখন কেমন বোধ করছ? আগের মতই কি কষ্ট হচ্ছে?

দ্রুসীলা আমার সেই ঝুঁকে পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, না, এখন আর তেমন যন্ত্রণা নেই। তবে তুমি বরং আরো একটু বিষ চুষে নাও, হয়ত তাহলে আর ফুলে উঠবে না।

আমি আবার নীচু হয়ে প্রাণপণে চুষতে থাকি। দ্রুসীলা এখন চিৎ হয়ে পড়েছে, আমার একটা হাত ওর মাথার তলায়। তার-পর সহসা মৌমাছি দংশনের কথা আমি একেবারে যেন ভুলে গেলাম। ওর শরীরের সেই অনাবৃত অংশে আমার ঠোঁট একেবারে চেপে বসেছে, আর আমার হাত ওর কাঁধের সেই খোলা জায়গাটা পেষণ করছে। আমিও ওর মুখখানা দেখতে পাচ্ছি না। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে দ্রুসীলা আর ওর মাথাটা ঘুরে

এসে আমার মাথায় ঠেকছে। ওর মুখ দেখতে না পেলেও আমি অনুভব করি যে, ওর হাতদুটি আমাকে প্রাণপণে চেপে ধরেছে, যেন হাত ছেড়ে দিলেই মাটিতে পড়ে যাবে, সেই ভয়।

কতক্ষণ যে এইভাবে আমরা দুজনে পড়েছিলাম মাটিতে তা বলতে পারি না, তবে এটুকু মনে আছে যে, মৌমাছির কামড় যত চুষেছি ততই তার কথা ভুলে গেছি। কিছুই যেন মনে নেই আর। আমি বিষটা মুখ থেকে ফেলে দিতেও ভুলে গেছি। আর যে জায়গাটায় মৌমাছি কামড়েছিল তার চেয়ে অনেক দূরে আমার মুখ চলে গেছে আর আমি উন্মত্তের মতো ওর অঙ্গে চুম্বন বর্ষণ করছি।

আমি বুঝেছিলাম যে, মৌমাছি দংশনের স্মৃতি ওর মন থেকেও মুছে গেছে, আর কোনো যন্ত্রণা নেই ওর শরীরে। কেন না ওর গাল আমার গালের সঙ্গে চেপে বসেছে এবং সেও আকুল হয়ে আমাকে চুমা খাচ্ছে।

ওর মুখে পীচের রস লেগে, আর যখন আমাদের দুজনের মুখ একত্রিত হয়েছে তখনই তা অনুভব করেছি। তারপর আমার ঠোঁট দুটি ওর ঠোঁটের ওপর চেপে বসেছে, আর আমাদের দুজনের হাত দুজনকে যতদূর সম্ভব চেপে ধরে জড়িয়ে আছে। অঙ্গে অঙ্গে সে কি উদ্দাম জোয়ার, নিবিড় অন্তরঙ্গতার আশ্রয়ে দুজনে বিভোর হয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পরে মনে হল আমরা দুজনে অনেকক্ষণ ধরে বাগিচায় একত্রে রয়েছি। পীচ গাছের অন্তরালে সূর্যাস্ত হচ্ছে। আমাদের শরীর স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছে, হিম পড়তে সুরু করেছে। আমাদের সারা অঙ্গে পীচের রস মাখামাখি, কিন্তু তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই।

দ্রুসীলা বলল, বব্, আমরা এইবার যাই চলো। বেশ দেরী হয়ে গেছে।

আমি ওঠার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু ওর নড়বার নাম নেই।

আমি শান্তগলায় প্রশ্ন করি, দ্রুসীলা, তোমরা কোথায় থাকো?

দ্রুসীলা তাদের ঠিকানা বলল। আমি চোখ বুজিয়ে বারবার রাস্তার নামটা আউড়ে মুখস্থ করার চেষ্টা করি। যতক্ষণ না নামটা কিছুতেই ভুলবো না মনে হল ততক্ষণ ঐভাবে জপ করে চললাম—দ্রুসীলার বাড়ির নম্বর এবং ঠিকানা।

।।চার।।

যখন আমরা উঠলাম ততক্ষণে আকাশে তারা উঠেছে। আমরা মাঠ ধরে বাড়ির পথে ফিরতে থাকি।

আর অন্ধকার বলে সেই সংকীর্ণ পথে আমরা দুজনে দুজনের হাত গলায় জড়িয়ে চলি। যখন পাহাড়ের ওপর উঠলাম তখন ওকে আমার হাত দিয়ে তুলে ধরে একেবারে পাহাড়ের তলা পর্যন্ত নিয়ে এলাম। দ্রুসীলা আমার গলা জড়িয়ে মুখখানা আমার মুখের ওপর চেপে রাখল এবং প্রায় বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত আমরা দুজনে এইভাবেই এলাম। যতক্ষণ বাড়ি নজরে পড়ে নি, আমরাও দুজনে দুজনকে ছাড়তে পারি নি।

লরা আমাদের জন্য বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। আমরা সিঁড়িতে পা দিতেই ও দৌড়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এল।

উৎকণ্ঠিত লরা প্রশ্ন করে, তোমরা দুজনে এতক্ষণ ছিলে কোথায়? কিছু হয়েছে নাকি, কোনো বিপদ-টিপদ হয় নি ত'?

আমি বললাম, দ্রুসীলকে মৌমাছি কামড়েছিল।

দ্রুসীলা বলল, তবে এখন আর তেমন যন্ত্রণা নেই।

আমি বারান্দার ভিতরে দোলনার কাছে এগিয়ে গিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করি।

লরা বলছিল, শহর থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গেল, তাই ভাবলাম বাগিচায় আর গিয়ে কাজ নেই, এখানেই অপেক্ষা করি। যদি জানতাম তোমাদের এত দেরী হবে তাহলে আমিও বাগিচায় গিয়ে তোমাদের সঙ্গে একত্রে ফিরতাম।

আমি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বাড়ি ফেরার জন্য উঠলাম। লরা গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার জন্য সঙ্গে এল, বলল, আমাকে অমন পালিয়ে আসতে হল বলে আমার ভারী খারাপ লাগছে। আমার জন্য সারাদিন তোমাকে দ্রুকে সামলাতে হল। লক্ষ্মীটি কিছু মনে করো না। তবে ত'ও কাল সকালেই চলে যাবে, তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি এস বব্।

আমি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করি, দ্রু কি কালই যাচ্ছে নাকি? তাহলে ওকে ত' বিদায় সম্ভাষণ জানান উচিত।

আমি বারান্দায় দৌড়ে গেলাম। দ্রুসীলা দোলনায় বসেছিল। কিন্তু দ্রুসীলা ততক্ষণে বাড়ির ভেতর চলে গেছে।

আমি লরাকে বললাম, দ্রুসীলাকে বলো যে আমি বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম ও কিন্তু তার আগেই ভেতরে চলে গেছে বারান্দা ছেড়ে।

লরা আমার হাতটা টিপে বলল, গুড নাইট বব্।

আমি গেটটা খুলে বেরিয়ে পড়লাম। বললাম, গুড নাইট!

লরা কয়েক মিনিট গেটে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বাড়ির পথে হনহনিয়ে এগিয়ে যাই। বাড়ি পৌঁছানোর পর মনে পড়ল লরাকে বিদায় চুম্বন জানানো হয় নি।

ওপরে আমার ঘরে উঠতে উঠতে লরার ওপর আমার রাগ হল, কেন সে দ্রুসীলাকে এইভাবে আমন্ত্রণ করে এনেছে। দ্রুসীলার ওপর রাগ হল, কেন তাকে আমার ভালো লেগে গেল। কেন লরার চেয়ে অনেক অনেক ভালো লাগল দ্রুসীলাকে! আমি মন থেকে সমস্ত ঘটনাটা মুছে ফেলার চেষ্টা করি। কিন্তু আমি অনুভব করি যে, লরাকে যতখানি ভালোবাসি তার চেয়ে অনেক বেশী ভালো লেগেছে দ্রুসীলাকে।

কালির দোয়াতটা খুঁজে নিয়েই আমি লিখতে বসি—

প্রিয়তমে দ্রুসীলা। আমি একটা কাজের সন্ধানে বাল্টিমোর যাচ্ছি। ওখানে পৌঁছেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি জানি ওখানে থাকতে আমার ভালো লাগবে, কারণ—

আমার কলম থেমে গেল, আমি অবাক হয়ে ভাবি, যা আমি বলতে চাই তা কি করে একটা ছোট্ট চিঠিতে লিখব, কেমন করে তা লেখা যাবে!

—[illegible] চৌধুরী অনূদিত

বনান্তরে

বীরেন্দ্র দত্ত
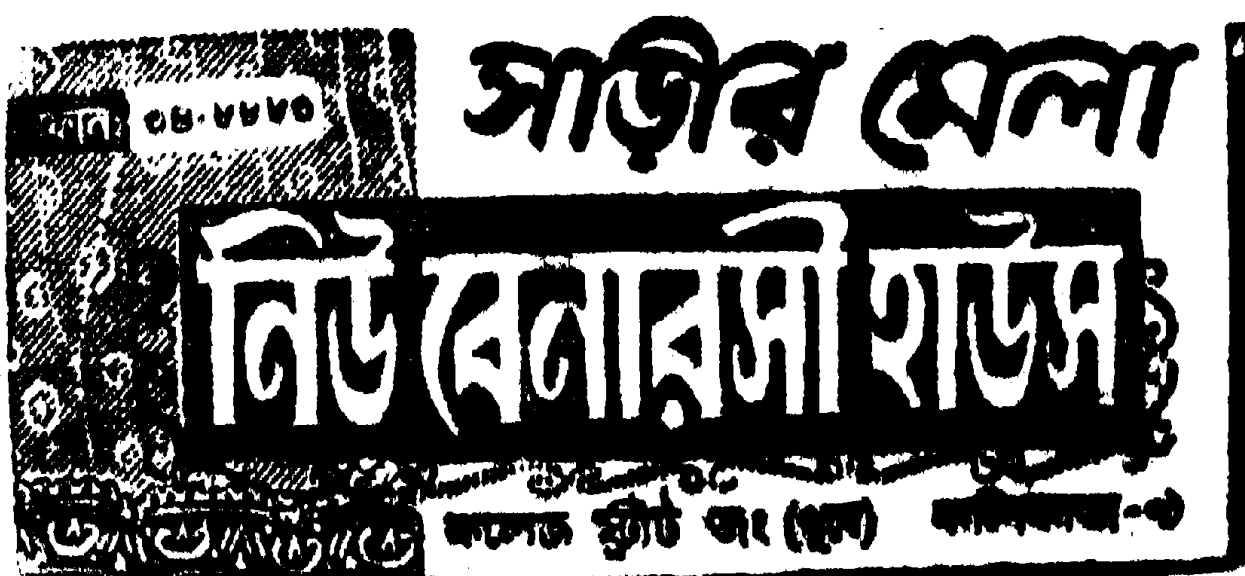
'কি ব্যাপার! তুমি এখানে!' দীর্ঘ দু'মাস পরে শাশ্বতীর সঙ্গে এমন হঠাৎ দেখা। তাই জয়ন্ত একটু বা অবাক হয়েই বলল।

জয়ন্তর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল শাশ্বতী। মুখে-চোখে হাসি উচ্ছল। জয়ন্তর চোখে চোখ রেখে বলল, 'এটাকে কি বলবেন? এ্যাক্সিডেন্ট না ইন্সিডেন্ট?'

'মানে!' জয়ন্ত বিস্ময় আর কৌতুকে ভুরু ঈষৎ কোঁচকালো।

'বাঃ, আপনি একদিন বলেছিলেন না, ছন্দমত একটা মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়াটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, ইন্সিডেন্ট? এরই মধ্যে ভুলে গেলেন!' শাশ্বতী মুখের ভাব চতুর করল।

জয়ন্ত হেসে উঠল, 'সব কিছু মনে রাখ দেখছি!'

'আপত্তি আছে?'

জয়ন্ত আর কথা বাড়াল না। কলেজে পড়তে ঢুকে শাশ্বতী নানাভাবে ঘুরিয়ে কথা বলতে শিখেছে। তাই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'এমন সময় হাওড়া স্টেশনে!'

'মামা-মামীমা, মামাতো ভাইবোনদের সব সী অফ করতে এসেছি।'

'তা হলে এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে? প্লাটফর্ম তো ওদিকে!'

'বেশ আপনি! আপনাকে দেখেই তো এলাম!' একটু থামল শাশ্বতী। জয়ন্তকে দেখল। 'আজ অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছেন বুঝি? বৌদি কোথায়? অফিসে?'

'তা ছাড়া আর কোথায়-যাবে।'

'আপনি কি রিপোর্টের সন্ধানে স্টেশনে? পেয়েছেন কিছু?'

'এই মাত্র পেলাম।'

'কি?'

'তোমাকে।'

'আমি কি রিপোর্ট?' শাশ্বতী একটু বেশী হাসতে লাগল।

'অত্যন্ত কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট।' জয়ন্ত অল্প হেসে শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

মুখ চোখে সহজ উদাসীন ভাব এনে শাশ্বতী কি একটা বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। স্টেশনের মাইকে ট্রেন ছাড়ার ঘোষণা শুনল। হাতঘড়ির সঙ্গে স্টেশনের ঘড়ি মিলিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে চলুন স্টেশনের ভেতরে। সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। খুব মজার হবে।'

'তুমি যাও। বলেছি তো, পরিচিত লোকজন আমার ভাল লাগে না।' জয়ন্ত ভিতরে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল।

'ওঃ, সেই পুরনো যুক্তি!' নিজের মধ্যেই যেন বিড় বিড় করে শব্দগুলি উচ্চারণ করল শাশ্বতী। 'বেশ, আপনি কিন্তু এখানেই অপেক্ষা করবেন। আমি ওদের তুলে দিয়েই আসছি।'

'দেরী হবে?' জয়ন্তর গলা নিরাসক্ত।

'ট্রেন ছাড়তে যতটুকু সময় লাগে।' শাশ্বতী আবার হাতঘড়ি দেখল।

'আমি একটু স্টেশনটা ঘুরতে পারি। এসে আমাকে না পেলে অপেক্ষা কোরো।'

'আমি কিন্তু ঠিক আসব। যাবেন না যেন!' বলেই জয়ন্তর দিকে পিছন করে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে যাবার গেটের দিকে এগুতে লাগল।

জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে। পর পর কয়েকটা টান দিতে দিতে শাশ্বতীর চলে যাওয়া দেখল। ডান দিকের কাঁধে চকলেট রং-এর চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়েছে শাশ্বতী। হরিণের চামড়ার মত ছাপা শাড়ি আর রং-মেলানো জামা পরনে। অল্প-চুলের ঝোলানো বেণীটাকে দূর থেকে লম্বা দেখাচ্ছে। কোমরের কাছে কিছু অংশ অনাবৃত। কলেজে ঢুকে শাশ্বতী অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছে। স্টেশনের এত লোকের মধ্যে শাশ্বতীকে যতদূর দেখা যায়, দেখছে জয়ন্ত। মাঝে মাঝে দৃষ্টির আড়াল হতে হতে শাশ্বতী একসময়ে হারিয়ে গেল।

জয়ন্তর কাছে হঠাৎ চারপাশ শূন্য মনে হল। যেন বা শাশ্বতীর সঙ্গে দেখা না হলে এরকম অনুভূতি মনের মধ্যে জমত না। কি ভেবে পিছনে থামের গায়ে গোল করে বসানো বেঞ্চটায় বসে পড়ল। হাতের সিগারেটের শেষ অংশে টান দিয়ে ফেলে দিল। চারপাশে চোখ বুলোল। গম গম করছে হাওড়া স্টেশন। এ স্টেশন লোকজন, দেশ-বিদেশ—পৃথিবীর সমস্ত কিছুর বিচ্ছিন্নতা মুছে দেয়। বিচিত্র এর লোকজন, বিচ্ছিন্ন এদের উদ্দেশ্য। জয়ন্তর মনে হল, সেই বিচিত্র বিচ্ছিন্নতাকে এই স্টেশন কি এক সেতু দিয়ে নষ্ট করে দেয়। জয়ন্তকেও? হয়ত তাই। তাই তো বিনা কারণে এখানে মাঝে মাঝে চলে আসে। ট্রেন আসা-যাওয়ার শব্দ, যাত্রীদের অন্তহীন যাতায়াত, ব্যস্ততা, কোলাহল, অপরিচিত ভিড়—সব কিছুর মধ্যে জয়ন্তর শূন্যতাবোধ বুঝি বা এক সেতুর সন্ধান করে। তাই সংসার, পরিচিত বন্ধু, লোকজন, নিজের কর্মব্যস্ততা সরিয়ে কখন কখন এখানে একা চলে আসে। রাস্তায় একা একা কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। বাইরে মেঘ করেছে। স্টেশনের ভিতরের আলোয় যেন সিমেন্টের রং মেশানো। জয়ন্ত কফি কর্ণারের দিকে এগোল। শাশ্বতী নিশ্চয়ই এখনি আসবে না। মনের মধ্যে বিড় বিড় করল জয়ন্ত। সেই শাশ্বতী! ভাস্বতীর ফ্রক-পরা বোন। ছাত্রজীবনের শেষ ধাপে ভাস্বতীর সঙ্গে প্রণয় ছিল জয়ন্তর। রক্ষণশীল বাড়ির কেউ তা জানত না। এমন কি জয়ন্ত মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি গেলেও বুঝতে পারেনি, সন্দেহ করেনি। শাশ্বতী জানত। সেই শাশ্বতী! ভাস্বতীর একেবারে উল্টো—চেহারায়, স্বভাবে দুদিকেই! ভালোবাসার মধ্যে ভাস্বতী নিখুঁত করে অঙ্ক কষত; মনটাকে হিসেবের খাতা করেছিল। বিবাহিত জীবনে একটি মেয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব। এসবের মধ্যেই কবে থেকে যেন জয়ন্তর মধ্যে চাপা বিরক্তি। ক্লান্তি, একঘেয়েমি এক কঠিন বিচ্ছিন্নতা রচনা করেছিল।

ভাস্বতীর সঙ্গে বিয়ে হয়নি। বাড়ির পছন্দ-করা বিয়েতে ভাস্বতী এখন কত সুখী! অঙ্ক মিলে গেছে তার। জয়ন্তরও বিয়ে হয়েছে। ভেবেছিল বাড়ির পছন্দ-করা-মেয়ে রেবাকে বিয়ে করে সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মুছে ফেলবে। পারেনি। বরং আরো ক্লান্ত, নির্জীব, জড় হয়ে উঠেছে জয়ন্ত ভিতরে-ভিতরে। রেবাও বুঝি অফিসের কাজে ব্যস্ত থেকে, সংসারজীবনে একটিও সন্তান না চেয়ে, একা থাকার বিলাসে সেই বিচ্ছিন্নতা সহজ করে নিয়েছে। শুধু স্বামী তার থাকলেই হল। বিচ্ছিন্নতা সে বোঝে না। এরই মধ্যে হঠাৎ রাস্তায় শাশ্বতীর সঙ্গে একদিন দেখা। কলেজে বি এস-সি পড়ছে। সঙ্গে রেবা ছিল সেদিন। ভাস্বতীর বোন, এই বলে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল জয়ন্ত। শাশ্বতী বড় চতুর। সে সমস্ত এড়িয়ে অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল রেবার সঙ্গে। রেবারও ভাল লেগেছিল শাশ্বতীকে।

সেই শাশ্বতী! জয়ন্ত কফি কর্ণারের তারের জাল দেওয়া বড় দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। এরই সামনে লক্ষ্যহীনভাবে পায়চারি করতে করতে কথাগুলি ভাবছিল। শাশ্বতী এখন কত পরিচিত তাদের। রেবা দুপুরে অফিস বেরিয়ে যায়। সেই নিঃসঙ্গ দুপুরে শাশ্বতী কলেজ-ফেরত বা কলেজের ফাঁকে এসেছে। আপন হয়ে গেছে অনেক। সেই ফ্রক-পরা শাশ্বতী এখনো জানে না, কি ভয়ংকর আকর্ষণে সে জয়ন্তকে ধরে রেখেছে এতদিন, ধরে রাখতে পারে! শাশ্বতীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে আজ। কি করবে এখন সে? স্টেশনে আসা তার উদ্দেশ্যহীন। এ সময়ে শাশ্বতীর সঙ্গে অফুরন্ত কথা বলে, ওর চলা, বলা হাসির কাছাকাছি থেকে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে কিছুক্ষণ। জয়ন্ত নিজের মনে মনেই অসহায়ভাবে হাসল। ঘুরতে ঘুরতে কখন যেন পাবলিক টেলিফোনগুলির কেবিনের সামনে এসে গেছে।

এখন কাউকে কি টেলিফোন করার আছে? মাঝে মাঝে শাশ্বতীকে টেলিফোন করে নিজের ফ্ল্যাট থেকে। এখন তো শাশ্বতী এখানে! তবে? পত্রিকা অফিসে করবে? হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল, অফিসে ফোন করে দিই, আজ আমি বৌবাজারের মিটিংটার রিপোর্ট আনতে পারব না। অন্য কাউকে যেন পাঠায়। তাতে জয়ন্তর লাভ কি? শাশ্বতীকে নিয়ে ঘুরতে পারবে জয়ন্ত। বেশ কিছুক্ষণ গল্প করতে পারবে। প্রতিদিন একটু একটু করে জয়ন্ত শীতল হয়ে পড়ছে। তেত্রিশ বছরের ক্লান্ত, শীতল জয়ন্ত কুড়ি বছরের এক কুমারীর আশ্রয়ে কিছু সময় কাটাতে চায়। কোন উত্তেজনার আগ্রহে নয়, নিষ্পাপ পবিত্র একটি মেয়ের সান্নিধ্যে নিজের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতাকে কিছুক্ষণ ভুলে থাকতে চায়।

কথাটা ফোনে একদিন শাশ্বতীকে বলেছিল। শাশ্বতী রিসিভার মুখে হেসে কুটি হয়ে গিয়েছিল। ফোনের সামনে হাসলে শাশ্বতী কি রকম দেখায়! জয়ন্ত একটি ফোনের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজার কাচের মধ্য দিয়ে জয়ন্ত দেখল, একটি মেয়ে রিসিভার কানে ধরল। ঠোঁট নেড়ে বলল, 'হ্যালো।'

'কে শাশ্বতী?'

'হ্যাঁ, কি খবর আপনার? হঠাৎ ফোন করছেন কেন?'

'এমনি।'

'এমনি!' শাশ্বতী চুপ। 'বৌদি এখন ঘরে নেই বুঝি?' হাসছে শাশ্বতী।

'তোমার গলার স্বর ফোনে কিন্তু খুব ভাল আসে। জান তো?'

'বাঃ, আমি জানব কি করে! আমি তো নিজের গলা শুনছি না।'

জয়ন্ত চুপ করে থাকল। শাশ্বতী হাসছে। হাসুক। জয়ন্ত এ হাসিকে কোন কথা বলে বাধা দিতে চাইছে না।

'বারে, কথা বলুন।'

'সেদিন ট্যাক্সি করে দিগ্বিজয়ের পর কেমন আছ?'

'মোটেই ভাল না।'

'সেকি? অসুস্থ?'

'মোটেই না।'

'তবে?'

'কাল তো পরীক্ষা। সেদিন সন্ধ্যে থেকে আজ পর্যন্ত পড়ায় মনই বসাতে পারছি না।'

জয়ন্তর ভাল লাগল কথাটা শুনতে।

শাশ্বতীকে বড় আপন মনে হল। চুপ করে রইল।

'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?' খুক খুক করে হাসতে লাগল শাশ্বতী। 'আগে তো কতদিন একা একা ঘুরেছি আপনার সঙ্গে, বুঝতেই পারিনি অনেক কিছু। আমি তখন খুব বোকা ছিলাম, তাই না?' হেসে চলেছে শাশ্বতী। 'সেদিন কিন্তু কি যেন ধরতে পেরেছি, আচ্ছা, কি বলুন তো?' শাশ্বতীর কথাগুলো হাসিতে ভাসছে। 'আপনি কেমন যেন। আপনি কিছুই বলেননি, অথচ এমন একটা অস্বস্তিতে ফেলেছেন আমাকে। কি সব আজে-বাজে ভাবছি। আমি কোনদিন ভাবিই নি, আমি এরকম হবো। বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি কি ভীষণ শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি; অথচ এখন কিছুই ভাবতে পারছি না। কি যে হয়েছে আমার!'

কি হয়েছে শাশ্বতীর? মুখের চেহারা এখন কিরকম? হাসছে শাশ্বতী। হাসতে থাকুক অবিরল। আরো আরো। সাজানো বেলফুলের কুঁড়ির মত দাঁতগুলো রিসিভারের মুখে ভাসছে, বড় বড় চোখের সেই পাপহীন শৈশব রিসিভারের চারপাশে জড়িয়ে আছে। শাশ্বতী কথা বলতে পারছে না। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে নিজের মধ্যেই। রিসিভার বুকের উপর উপুড় করা। জয়ন্ত শাশ্বতীর বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছে এবার। সমুদ্রের অজস্র ছোট ছোট ঢেউ-এর শব্দ। তীরে আছড়ে পড়া জলের নিঃশব্দে গড়িয়ে আসার শব্দ যেন শাশ্বতীর নিঃশ্বাসে। রিসিভার উপচে পড়ছে শাশ্বতীর হাসিতে। কিন্তু আশ্চর্য! জয়ন্তর মধ্যে কোন কোলাহল নেই! কি শান্ত কঠিন শীতলতায় সে শাশ্বতীর কণ্ঠস্বর, হাসি, শব্দরেখা গ্রহণ করে চলেছে!

'আপনার লোক কি ফোন করছেন?'

'এ্যাঁ' জয়ন্ত সচেতন হল। পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

'একটু বলুন না, তাড়াতাড়ি সারতে।' ভদ্রলোকটি জয়ন্তর দিকে তাকালেন। জয়ন্ত অপ্রস্তুত হয়ে কেবিনের দিকে তাকাল। একটি মেয়ে রিসিভার মুখে ধরে হাসিতে গড়িয়ে পড়ছে।

'আপনিই বলুন।' জয়ন্ত আর দাঁড়াল না। ধীর পায়ে ফোনের কেবিনের কাছ থেকে সরে এল।

কি ভাবছিল সে? জয়ন্ত সিগারেট ধরাল। শাশ্বতীর সঙ্গে দেখা হলেই আজ কাল কোথায় যেন জয়ন্তর সব ভুল হয়ে যেতে থাকে। কেউ জানে না তা। শাশ্বতীও না। জয়ন্তও বুঝি ভুলের কারণ খুঁজে পায় না। শুধু বোঝে, আজকাল শাশ্বতীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে, ওকে পাশে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে জয়ন্তর মধ্যে সব কিছু যেন মৃদু ভূকম্পনের মত কাঁপতে থাকে। শাশ্বতী ওকে উত্তেজিত করে না, আশ্রয় দেয়। জয়ন্ত সত্যি কেমন ভীরু হয়ে গেছে। প্রতিদিন বেঁচে থাকার, সংসারজীবনে, রেবার কাছে, অফিসের কাজকর্মের মধ্যে, ভালবাসায়—সব জায়গায় সেই ভীতি। শাশ্বতী তাকে ভালবাসায় কিছু দেয় নি, রেবার সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপনে সে কিছু পায় না। প্রতিটি মুহূর্তকে প্রেমহীনতা গ্রাস করে নিচ্ছে যেন। সংসার, জীবন, প্রেম, মানুষ, এমন কি নিজের কাছ থেকেও কোথায় যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রেবা এখনি সন্তান চায় না। অফিসের দায়িত্ব, একক জীবনের বিলাসের মোহ তার অনেক। সন্তান কি বিবাহিত জীবনের বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দেয়? শাশ্বতীর অস্তিত্ব কি তার বিচ্ছিন্নতাকে মুছে দিতে পারে? জয়ন্ত এই মুহূর্তে জটিল ভাবনার এক বর্ণহীন শূন্যতায় ভাসতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে এদিকে বুকিং অফিসের সামনে এসে গেছে জয়ন্ত। থমকে দাঁড়াল। ওর চারপাশে ট্রেনযাত্রীর একটানা স্রোত। কেউ কারোর কথা কানে রাখছে না। এমন তালগোল পাকানো ভিড়ের প্রত্যেকটি মানুষকে একা, নিঃসঙ্গ মনে হ'ল হঠাৎ। জলের স্থির গতি ঘূর্ণির মধ্যে পাক খাচ্ছে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন পাতা, খড়কুটো। কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারছে না। মাঝখানে জলের গর্ত—স্থির, শূন্য অবধারিত। তার মধ্যে সব কিছু অসহায়-ভাবে ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোন অস্তিত্বের মিলন নেই। আবার বিচ্ছিন্নতা।

অন্যমনস্ক জয়ন্ত দুদিকের যাত্রীর ধাক্কা খেতেই এপাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। ঠেস দিল দেয়ালে। একটানা সিগারেট টানল কিছুক্ষণ। একসময়ে হাতঘড়ি দেখল। এতক্ষণে শাশ্বতী এসে দাঁড়িয়ে আছে হয়ত। থাক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে। জয়ন্তর জন্যে শাশ্বতী উৎকণ্ঠিত, ভীত হয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছে। কি রকম দেখায় সেই প্রতীক্ষার দৃশ্য—জয়ন্তর দেখতে ভাল লাগবে। দূরে থেকে লুকিয়ে দেখবে জয়ন্ত। আস্তে আস্তে পা বাড়াল। সামান্য একটু দূরে একটি ছেলে একটি মেয়ে কাঁধ ঠেকিয়ে গল্প করতে করতে হাঁটছে। জয়ন্ত সেদিকে তাকিয়ে ধীর পায়ে এগোল। মেয়েটি কি যেন বলছে, আর হাসতে হাসতে ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছে।

'কি দেখছ?' জয়ন্ত বলল।

'দেখছি, আমার পাশে থাকলে আপনাকে কিরকম দেখায়।'

'বাঃ শাশ্বতী, তোমার বুদ্ধি খুব ঝকঝকে হয়েছে।'

'তাতে কি?' শাশ্বতী চতুর চোখে তাকাল।

'তুমি খুব সুন্দর হয়ে উঠেছ।'

'যখন ফ্রক পরতাম, তখনকার থেকেও!' শাশ্বতী খিল খিল করে হেসে উঠল। শাশ্বতীকে ওর বাড়ি পেঁছে দেওয়ার পথে একটা আবছা অন্ধকার গলিতে ঢুকছে তখন।

'ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরলে বড় জবুথবু মনে হ'ত। এখন কত বড় হয়ে গেছ। চেহারায় কি স্মার্ট।'

'খুব কি সুন্দর!' ভুরু কুঁচকে শাশ্বতী বয়স্কের ভান মুখে চোখে আনল।

আহ্ শাশ্বতী! কথা বললে তোমাকে কেন নিষ্পাপ মনে হয় বল তো? মনে মনে বলে জয়ন্ত লাইট পোস্টের টিমটিমে আলোয় শাশ্বতীর দিকে তাকাল। শাশ্বতী ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

জয়ন্ত শাশ্বতীকে এই মুহূর্তে আরো কিছু কথা বলতে চাইছে। স্মিত হেসে বলল, 'গলিটায় এখনি কোন লোক নেই, তাতে আবার আবছা অন্ধকার। বেশী সাহস দিও না।' ভিতরে জয়ন্ত উত্তেজনাহীন, ঠাণ্ডা।

শাশ্বতী গোল গোল চোখ পাকিয়ে তাকাল জয়ন্তর দিকে। নীচের পাতলা ঠোঁটে একটা চপল ভঙ্গি এনে হাত দিয়ে ছেলেমানুষের মতন জয়ন্তর পিঠে একটা কিল মারল।

জয়ন্ত একটু বেশী হাসল। কিছুক্ষণ কোন কথা বলছে না দুজনে। একটু পরে জয়ন্ত শুনল, শাশ্বতী নিজের মনের মত কি একটা গান গুন গুন করে গাইছে। জয়ন্ত কম্পিত আলো-ছায়া-মাখা শাশ্বতীকে মাঝে মাঝে দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল। শাশ্বতী ওর কাছে বড় সুন্দর এক খেলা। বড় মনোরম, প্রীতিকর। খেলায় শাশ্বতী

মাঝে মাঝে ওকে হারিয়ে দেয়। আর তখনি জয়ন্ত নিজের মধ্যে জিতে যায়। এ ছাড়া এ খেলায় কোন হারজিত নেই। শুধু খেলা। শাশ্বতীকে শুধু দেখা, কথা বলা, ওকে অনর্গল কথা বলার জন্যে বিরক্ত করা, হাসিয়ে দেওয়া। এ এক খেলা, প্রত্যক্ষ কোন হারজিত নেই। প্রতিদিনের সময়ের অস্তিত্বের একটা আশ্রয় তৈরী করা। প্রণয়ের স্মৃতিতে এ খেলা নেই, বিবাহিত জীবনে এ খেলা নেই, বন্ধুদের আড্ডায় এ খেলা নেই, প্রতিদিনের বাঁচার নিয়মে এ খেলা নেই। কোথাও নেই। এ এক অদ্ভুত খেলা। জয়ন্তকে সব সময়েই জাগিয়ে রাখে, উত্তেজিত করে না। নতুন করে বিচ্ছিন্নতা তৈরী হতে দেয় না, বরং সমস্ত বিচ্ছিন্নতার সুতোয় মাঝে মাঝে টান দেয়।

'কি ব্যাপার! এত ডাকছি শুনতেই পাচ্ছেন না যে!' সামনে শাশ্বতী।

জয়ন্তর অন্যমনস্কতা সরে গেল। শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হ'ল।

'কি এত ভাবতে ভাবতে ঘুরছেন? ইস্, আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি!'

জয়ন্ত সহজ হ'ল। 'কোথায় যাবে বলো।'

'যেখানে নিয়ে যাবেন। তবে গা হাত একটু ধুতে হবে। এই গরমে সকাল থেকে টানা প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাশ করতে হয়েছে।' দু' কাঁধ পিঠ ঈষৎ টান টান করে শাশ্বতী অস্বস্তি প্রকাশ করল।

'চল একটু কফি খাওয়া যাক। তারপর যাওয়া যাবে।'

'কোথায়? আপনার ফ্ল্যাটে?'

শাশ্বতী খুব সহজেই বুঝতে পেরেছে তো! জয়ন্ত শাশ্বতীর চতুর চোখ দেখল। চোখের সরু কাজল অনেক অস্পষ্ট হয়ে গেছে। 'আপত্তি আছে নাকি?'

'আপত্তি নয়, লোভ। আপনাকে পাশের ঘরে তাড়িয়ে আমি তাহলে টেনে একটা ঘুম দিতে পারি। এ সময়ে বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছে না।' শাশ্বতী কফি কর্নারের দিকে পা বাড়াল।

জয়ন্ত শাশ্বতীর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

তারের জাল-ঢাকা ভাঁজ-করা দরজা টেনে খুলল জয়ন্ত। শাশ্বতী ভিতরে এসে নীচু গলায় বলল, 'বেশিক্ষণ বসব না কিন্তু। বরং বাইরে কিছুটা বেড়িয়ে ফেরা যাবে।'

জয়ন্ত শুনেও কোন উত্তর দিল না। চারপাশ চোখ বুলিয়ে নিল। কোন টেবিলই দুজনের বসার মতন খালি নেই দেখে শাশ্বতী হতাশ হয়ে জয়ন্তর দিকে তাকাল। জয়ন্ত চোখের ইশারায় দূরে কোণের টেবিলটার কাছে যেতে বলল। এইমাত্র দুটি অবাঙালী চেয়ার ছেড়েছে। ওরা দুজন চেয়ারে বসল। তৃতীয় চেয়ারটিতে আর একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন। উঠে যেতেই শাশ্বতী বলল, 'আজ আপনার ঘাড় ভাঙব কিন্তু।'

জয়ন্ত বসেই একটা নতুন সিগারেট ধরাচ্ছিল। শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'খুব ক্ষিধে পেয়েছে তো? যা খাবে খাও। তবে দোহাই, আমাকে তোমার খাদ্য বাছতে বোলো না।'

আগের কয়েকটা ঘটনা মনে পড়তেই দুজনে শব্দ করে হেসে উঠল।

শাশ্বতী এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'বেয়ারা এখন ওদিকে ব্যস্ত। এর মধ্যে ব্যাগটা গুছিয়ে নি।' কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা টেবিলে রেখে জোর করে রাখা বইখাতা বের করে ঠিক করতে বসল।

জয়ন্ত সিগারেট টানতে টানতে শাশ্বতীর মুখ, চেহারা দেখতে লাগল। বড় বড় গোল চোখ, মোটা টানা ভুরু, পাতলা ঠোঁট। গাল ঈষৎ ভেঙে যাওয়ায় শাশ্বতীর যেন মুখশ্রী সুন্দর হয়েছে আরো। কপাল বড় বলে সব সময়েই বড় করে টিপ পরে শাশ্বতী। সামনের দিকে গলার কাছে উঁচু হাড় দুটোর ঠিক মাঝখানে কণ্ঠনালীর ওপর সেই কালো তিলটা। বুকের পরিচ্ছন্ন চামড়ার মধ্যে ঐ ফাঁকে তিলটা স্থির। জয়ন্তর কোন আসক্তি নেই। শুধু দেখার ভঙ্গিতেই শাশ্বতীকে দেখতে লাগল।

মাথায় একটা ভার অনুভব করল জয়ন্ত। আজকাল রাত্রে ঘুম হয় না জয়ন্তর। রেবা এসবের কিছুই জানে না। নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। আর জয়ন্তকে গভীর রাত্রে উঠে বালিশের তলা থেকে স্লিপিং পিল খেতে হয় সন্তর্পণে। কাল কয়েকটা বেশী খেয়েছিল। শেষ রাতে আসা ঘুম বেলায় ভাঙলেও সেই আড়ষ্টতার সবটা কাটেনি। স্টেশনে চলে এসেছিল নিজেকে অপরিচিত ভিড়ের মধ্যে সহজ করতে। এখন অনেকটা কেটে গেছে। তবু মাথার ভার যায় নি। শাশ্বতী সঙ্গে থাকলে কি যাবে? জয়ন্ত শাশ্বতীকে আরও স্পষ্ট করে দেখল। শাশ্বতী সঙ্গে থাকলে অনেক স্মৃতি তৈরী হয়, অনেক কথা অনেক দৃশ্য মাথার মধ্যে রচিত হতে থাকে। বুকের মধ্যে অকারণ শব্দ দ্রুত হয়। এ একটা অসুখ। শাশ্বতী ওকে কখনো চিঠি দিলে যে রকম শব্দ হয় বুকের, যেমন ভয় জমে ওঠে মনের মধ্যে, সে রকম এক নিথর অসুখ জয়ন্তর মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে।

জয়ন্ত শাশ্বতীকে মাঝে মাঝেই চিঠি লিখতে বলে। দেয় না। যা অলস আর আত্মসুখী শাশ্বতী! তবু একদিন সন্ধ্যায় ওদের বাড়ি থেকে রেবার সঙ্গে গল্প করে ফেরার সময় রেবার সামনেই অতি অলক্ষ্যে একটা শাদা কাগজের টুকরো হাতে দিয়েছিল। শাশ্বতীর চিঠি! কি লিখেছে, লিখতে পারে, কেমন করে সম্বোধন করেছে, এসব ভাবতে ভাবতেই তেত্রিশ বছরের ক্লান্ত জয়ন্ত, বিবাহিত জয়ন্ত, শীতল বিচ্ছিন্ন নিরাসক্ত জয়ন্ত কেমন অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কেঁপেছিল। কিন্তু চিঠি হারিয়ে ফেলায় সে চিঠি পড়া হয়নি। হারিয়ে যেতে শাশ্বতী রেগে গিয়েছিল প্রথমে। পরে এখানে-ওখানে একসঙ্গে কয়েকবার বেড়াতে বেরিয়ে চিঠিতে কি লিখেছিল শাশ্বতী কিছু কিছু বলেছিল জয়ন্তকে। শাশ্বতী নিজের নাম গোপন করে লিখেছিল 'মঞ্জু'। জয়ন্ত ওকে সব সময় সুন্দর করে দেখে, সুন্দর বলে। তাই মঞ্জু নামটা গোপনে নিজের মত করে বেছে নিয়েছিল শাশ্বতী।

কখনো কখনো ঘরে একা থাকলে, সেই অস্বস্তির অসুখটা ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চাইলে জয়ন্ত সারা ঘরময় পুরনো চিঠিটা খুঁজে বেড়িয়েছে। কেন যেন মনে হয়েছে, সে চিঠির অনেক কথা শাশ্বতী গোপন করেছে, বলতে চায়নি, বা হয়ত ভুলে গেছে, অথবা কি লিখেছে নিজেই জানে না।

সে চিঠির মত শাশ্বতী এখন রহস্যময় আপন। কাছে থাকলে অনর্গল কথা বলে, হাসে, পোশাক সুন্দর করে পরে এসে জয়ন্তকে তৃপ্তি দেয়। শাশ্বতীর বয়স কত? নতুন করে ভাবতে ইচ্ছে করছে জয়ন্তর। উনিশ-কুড়ি? শাশ্বতীকে দেখল। খাবারের অর্ডার দিচ্ছে বেয়ারাকে। অগোছালো বেণীটাকে বুকের ওপর ফেলেছে। হঠাৎ অনেক কম মনে হল ওর বয়স।

'এবার কথা বলুন।' শাশ্বতী জয়ন্তর দিকে তাকাল। জয়ন্ত ওকে দেখছে বুঝতে পেরে দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন শাসনের ইঙ্গিত করে হেসে ফেলল।

শাশ্বতী হাসলেই আদর করতে ইচ্ছে করে, চুমু খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কে যেন ভিতর থেকে জয়ন্তকে কঠিন শীতলতায় ধরে রাখে। বড় স্পৃহাহীন হয়ে পড়েছে জয়ন্ত। এ আর এক অসুখ। কবে থেকে এ অসুখ দেখা দিয়েছে? শাশ্বতীকে ভালবাসার পর থেকে? রেবাকে বিয়ে করে? নাকি সংসারে জড়িয়ে গিয়ে? এরা সব বুঝি বিষয়সুখ!

'কি এত ভাবছেন?' শাশ্বতী টেবিলের ওপর রাখা ডান হাতের মুঠি নেড়ে বলল।

'কিছু না।' জয়ন্ত সোজা হয়ে বসল।

'আপনি যে কি বুঝি না। দাড়ি কামান নি কেন? চুল উস্কোখুস্কো। তার ওপর বাতাসে মাথাটাকে তো বনবাদাড় করে দিয়েছে। সঙ্গে একটা চিরুনী রাখবেন!' শাশ্বতী কৃত্রিম শাসনের সুরে বলল।

জয়ন্ত ওর কথা বলার ভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। কতদিন পাশাপাশি হেঁটে গল্প করেছে, ট্যাক্‌সি করে ঘুরেছে, অবসর সময়ে ঘরে বসে ওকে দেখতে দেখতে ওর অফুরন্ত গল্প, কথা শুনেছে। এই জন্যেই তো এখন কফি কর্নারে বসেছে জয়ন্ত। বড় ছেলেমানুষ শাশ্বতী। মুখে চোখে চেহারায়, স্বভাবে কি পাপহীন সারল্য, পবিত্রতা! আর এটাই জয়ন্তর কাছে ভয়ংকর মনে হয়: জয়ন্ত ভিতরে ভয় পায়।

'আহা! কি এত দেখবার আছে?' শাশ্বতী ঠোঁট ফোলালো। হঠাৎ। জিভ বের করে সলজ্জ একটা ভঙ্গি করল।

'তুমি বড় পবিত্র শাশ্বতী। তার ওপর এত চতুরতা শিখেছ। ফ্রক ছেড়ে যখন সদ্য শাড়ি পরতে, কিরকম যেন আড়ষ্ট লাগত। কলেজে ঢুকে একেবারে নতুন হয়ে গেছ। আমি সেই নতুনকে দেখি।'

শাশ্বতী চোখ ছোট করল। 'বাজে কথা ছাড়ুন তো!' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বেয়ারা সাজানো প্লেট নিয়ে সামনে দাঁড়াতেই থেমে গেল।

কফি কর্নার থেকে বেরিয়ে ওরা স্টেশনের গাড়ি-বারান্দার নীচে এসে

দাঁড়াল। একটু আগে পর্যন্ত ওরা দু'জন তেমন কোন কথা বলেনি। ভরপেট খেয়ে শাশ্বতী এক ধরনের আরামে ক্লান্তিবোধ করছিল। জয়ন্ত কিছু ভাবছে। অন্যমনস্ক ভেবে ওর দিকে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হেসেছে শাশ্বতী, কথা বলে ওর ভাবনায় বাধা দেয়নি।

কফি কর্নারের মধ্যে বসে থেকে একটুও বুঝতে পারেনি, এমন মেঘ করেছে। একটু বা ঝমঝমে বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। অগোচরে চারপাশ সন্ধ্যার মায়ায় ঢেকে গেছে। অথচ এখন ঠা-ঠা দুপুর। দেড়টাও বাজেনি। চারপাশের ধূসর সিক্ত অন্ধকার স্টেশনের আলোগুলিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। শূন্যে কোন স্বচ্ছতা নেই। সারা আকাশটা একটু আগে যে কালো মেঘে মলিন ছিল, একটু আগের বৃষ্টি তাকে কেটে যেন শাদা ধবধবে চাদর করে দিয়েছে।

জয়ন্ত শাশ্বতীর পাশে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল। শাশ্বতীর দিকে তাকাতেই ও জয়ন্তকে দেখল। শাশ্বতীর চোখে-মুখে হাসি, কেমন-মজা ভাব। জয়ন্ত শাশ্বতীর চোখের দিকে তাকাল। কালো তারার চারপাশের শাদা অংশটার সঙ্গে এখনকার আকাশের মিল আছে। বড় পবিত্র, পরিষ্কার।

'আর তাকিয়ে কি হবে? ট্যাক্সি ধরুন।'

'চল।'

ট্যাক্সিতে আরাম করে বসেছে শাশ্বতী। হাওড়ার ব্রীজের মাঝখানে আসতেই শাশ্বতী বলল, 'আমি কিন্তু গিয়েই আগে গা ধুয়ে নেব।'

'ভালই তো।'

'এই দুপুরে জল পাওয়া যাবে তো?'

'কত গ্যালন?'

শাশ্বতী চোখ পাকাল।

বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে। আকাশে আবার কিছু কালো মেঘ। ট্যাক্সি গঙ্গার ধার ধরে চলেছে। শাশ্বতী বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ জয়ন্ত। দিকে ফিরে বলল, 'ইস, আপনাকে একটা মজার স্বপ্নের কথা বলা হয়নি!'

জয়ন্ত সিগারেটটা মুখ থেকে সরিয়ে শাশ্বতীর দিকে তাকাল।

'কদিন আগে একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'কি?' জয়ন্ত কৌতুক বোধ করল। রাস্তা না পাওয়ায় হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল। ঝাঁকানিতে শাশ্বতী যেন জয়ন্তর একটু কাছে সরে এল। কাঁধে কাঁধ লেগে আছে। বাইরে সূক্ষ্ম বৃষ্টির গুঁড়ো মেশানো হাওয়া বইছে জোরে। শাশ্বতীর কপালের শুকনো চুল জয়ন্তর মুখ-চোখ মাঝে মাঝে ঢেকে দিচ্ছে।

শাশ্বতী সামনের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে জয়ন্তকে দেখল। 'একদিন যেন আপনি আমাদের বাড়ি এসেছেন। আপনি শোবার ঘরের তক্তপোষে বসে। আমি মায়ের পাশে। আপনারই গা ঘেঁষে বসে আছে ছোট ভাই পিকুটা। গল্প করছে আপনার সঙ্গে। আমি কথা বলছি মাঝে মাঝে।' বলতে বলতে থামল। হাসল। গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে।

'হাসছ কেন? বল।' জয়ন্ত শুনতে চাইছে। কথার খেলা বড় ভাল লাগছে জয়ন্তর। মাঝে মাঝে বড় ঝিমিয়ে পড়ে। একটা অসুখ ওকে চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আগে ভাস্বতী কাছে থাকলেও এমন অসুখে জড়িয়ে পড়ত। রেবার সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপনে সেই ঝিমোনো বেড়েছে। অনিদ্রা, অনিচ্ছা, ক্লান্তি, বিরক্তি—সব কিছু জড়িয়ে এক জটিল স্থবিরতা রচনা করেছে ওর মধ্যে, শাশ্বতী সেখানে এক অস্থিরতা আনে। সেই অস্থিরতাই হয়ত সমস্ত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সেতু রচনা করতে চায়। শাশ্বতীর মুখ-চোখ, চেহারা পাপহীন চতুরতায় বিশুদ্ধ। পৃথিবীর প্রথম আলো, প্রথম অন্ধকার, প্রথম বাতাস, প্রথম শব্দের মত এই পাপহীনতা ভয়ংকর। জয়ন্তর মধ্যে তা আগুন ধরিয়ে দেয়। সে আগুনের আভায় বড় সুন্দর তুমি শাশ্বতী, বড় আপন।

'নাহ্ আমি বলব না। আপনি শুনছেন না!'

চমক ভাঙল জয়ন্তর। 'না, না, আমি শুনছি, তুমি বল।'

'কি বলেছি বলুন তো।'

'ওই তো পিকু গল্প করছে আমার সঙ্গে!'

'সত্যিই শোনেন নি তাহলে। যান, আমি কিছুতেই বলব না।'

'এবার শুনব। সত্যি বল', শাশ্বতীর একটা হাতের মুঠি নিজের হাতে নিল।

শাশ্বতী জয়ন্তর বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল। 'পিকু তো আপনার গা ঘেঁষে আপনার সঙ্গে কথা বলছে। আমার ইচ্ছে করছে পিকুকে ওখান থেকে সরিয়ে আপনার খুব কাছে গিয়ে বসি। গল্প করি। আমি বার বার যেতে চাইছি, মা কিছুতেই যেতে দেবে না। আপনার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করছে, আবার ভীষণ ভয় করছে। মা আমাকে যেই ধরছে, অমনি ভয়ে আমি যেন ছোট হয়ে যাচ্ছি। এই ভয়ের মধ্যেই কখন যেন আমার ঘুম ভেঙে গেল।'

'ভাল স্বপ্ন তো?'

শাশ্বতী স্বপ্ন বলার ঝোঁকে ছিল। বলল, 'জানেন, মায়েরা না, সব সময় শুধু উপদেশ দেবে, কত সব বোঝাবে। আর সাবধান করবে। আমি যে বড় হয়েছি, আমার যে একটা ভাল লাগার ইচ্ছে আছে, বুঝবেই না।'

জয়ন্ত কথা শেষ হতেই হো হো করে হেসে উঠল। ট্যাক্সি ড্রাইভার একবার আর্শির মধ্য দিয়ে ওদের দেখল।

'আপনি হাসছেন? যান।' বলেই শাশ্বতী একটু ধারের দিকে সরে গেল। ডান হাতের মুঠি জয়ন্তর মুঠোর মধ্যে।

'হাসছি কেন জান?'

শাশ্বতী ওর দিকে তাকাল।

'স্বপ্নে যাকে দেখেছ, সে আমি, না আর কেউ?'

শাশ্বতী চোখ পাকাল। কি ভেবে হেসে ফেলল। 'ওহ, আর একটা ছেলের কথা আপনাকে বলা হয়নি বুঝি।'

'কই, না তো!'

শাশ্বতীকে ছেলেমানুষের মতন নিজের কথা বলায় পেয়ে বসেছে। 'আমাদের এক দূরসম্পর্কের কি রকম আত্মীয় হয় যেন। তাদের বাড়ি গেলেই কেবল আমার সঙ্গে কথা বলবে। আমাকে কত কি খাওয়ায়, আমার কাজ করে দেয়। এমন রাগ ধরে।'

'তাতে কি?'

'একদিন আমাকে কি বলেছে জানেন?'

'কি?'

'তুমি কেবল নিতেই জান, দিতে জান না। কি বোকা বোকা কথা বলুন তো?'

'তোমার ন্যায্য দাম দিতে চাইছে তা হলে।'

'কি জানি আমি এসব বুঝি না।'

সত্যিই শাশ্বতী এসব বোঝে না। জয়ন্ত শাশ্বতীর পোষাক সমেত ওকে দেখল। হরিণীর উৎসুক স্বচ্ছ চোখে সত্যি কোথাও পাপ নেই। জয়ন্ত শয়তানের মত কথা বলল। 'এখন বোধহয় কিছু কিছু বোঝ। আমার সঙ্গে মিশছ তো।'

শাশ্বতী বাইরের দিক মুখ ঘোরাল।

বাইরে হাওয়া নেই। তবে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। চারপাশের নরম ঘাসের বুকে সমবেত বৃষ্টির ফোঁটাগুলির পতনে বিজ-বিজ শব্দ। জয়ন্তর তরঙ্গস্নাত পুরীর বালিঢাকা তীরভূমি মনে পড়ল। রেবাকে না বলে একাই একদিন পুরী গিয়েছিল। বালি সিক্ত করে ঢেউ নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিক্ত বালির বুকে অদ্ভুত এক বিজ-বিজ শব্দ শুনেছে জয়ন্ত। শাশ্বতী কাছে থাকলে সে রকম শব্দ বুঝি ওর বুক থেকে উঠতে থাকে। এখন সবুজ ঘাসে বৃষ্টির সেই শব্দ।

শাশ্বতী বাইরে বৃষ্টির মধ্যে হাত বাড়িয়ে দিল। পাকা ন্যাসপাতির মতন গায়ের রং শাশ্বতীর। হাতের মধ্যে নৃত্যের ভঙ্গিমা জড়িয়ে আছে। নাচ শিখলে ভাল করতে শাশ্বতী।

'ইস, কি বৃষ্টি বলুন তো? আজ আর একটা দিগ্বিজয় করলে কেমন হয়?'

'দিগ্বিজয়' শব্দটা জয়ন্তই ব্যবহার করেছে। শাশ্বতীর সঙ্গে ট্যাক্সিতে বা হাঁটাপথে দীর্ঘ সময় কাটালে শব্দটা বার বার মনে বাজতে থাকে। এখন শাশ্বতীর গলায় বড় ভাল লাগল। 'ভাল তো। চল, গঙ্গার ধার দিয়ে যাবে?'

'তাই।'

গাড়ি রেড রোড ধরেছিল। জয়ন্ত ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিল।

শাশ্বতীর ডান হাত এখনো জয়ন্তর হাতের মুঠোয়। অনেক কাছে শাশ্বতী। অথচ জয়ন্ত ভিতরে যেন কেঁপে উঠতে পারছে না। স্পৃহাহীন শরীরের এমন অসম্মান কবে থেকে যেন জয়ন্তকে কঠিন করে দিয়েছে। কেন? বিবাহ? রেবা? ভাস্বতী? নাকি শরীরের এই নিয়ম,

বিষয়-সুখের এই পরিণতি ?—এমন ক্লান্ত, বিকল্প, উত্তেজনাহীন, নীরক্ত, ঠান্ডা হয়ে যাওয়া। শাশ্বতীরও ক্ষমতা নেই ? অথচ জয়ন্ত শাশ্বতীর মধ্যেই বেঁচে থাকার মন্ত্র খুঁজছে। শাশ্বতীও কি ভুল ?

শাশ্বতীকে নিয়ে আসক্তিহীন দিগ্বিজয়বাসনায় কি তুমুল হয়ে উঠেছিল সেদিন।

'আজ আমাদের সত্যিই দিগ্বিজয় কিন্তু।'

'কেন ?' শাশ্বতী বলেছিল।

'দেখলে না, সারা কলকাতায় আজ সন্ধ্যে থেকে ট্যাক্সি ধর্মঘট। কেউ একটি ট্যাক্সি পাচ্ছে না। আর আমরা দুজনে কেমন একটানা ট্যাক্সিতে সারা কলকাতা ঘুরছি। আজ আমার বড় প্রয়োজন ছিল।' ভিক্ষুকের মত গলা জয়ন্তর।

'আজ যদি না বেরুতাম ?'

'মদ খেতে হ'ত।'

'মা কিন্তু আজ সত্যি বারণ করছিল বেরুতে। না বেরুলে বেশ জব্দ হতেন তো ? বৌদির কাছে একজন মাতাল কেমন বকুনি খেত।'

'খুব কথা শিখেছ দেখছি।' জয়ন্ত হাতটা হাতের মধ্যে নিয়েছিল।

'ইস, আপনার হাত কি ঠান্ডা।'

'ভয়ে।'

'কিসের ভয়।' বোকার মতন প্রশ্ন করেছিল শাশ্বতী।

'তোমাকে। তুমি কাছে থাকলে।'

'যান।'

'সত্যি! আমি শুধু তোমাকেই ভয় পাই।'

কি ভেবে শাশ্বতী সেদিন অনেকক্ষণ চুপ করে গিয়েছিল। হঠাৎ চুপ করে গেলে জয়ন্তর মনে হয়, শাশ্বতীর বুঝি গোপনে বয়স বাড়ছে। শাশ্বতী ওর সেই হৃদয়ের শব্দে বয়স বাড়ার ভার অনুভব করে হয়ত। জয়ন্ত নিশ্চুপ। শাশ্বতীর কপালের চুলে জয়ন্তর নাক, মুখ-চোখ জড়িয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ওর কাঁধ জয়ন্তর কাঁধে ধাক্কা খাচ্ছিল। শাশ্বতী হাত সরায়নি। এই হাত জয়ন্তর কাছে এক এক সময়ের আশ্রয় বুঝি। 'শাশ্বতী, তোমার হাতে একটা চুমু খাব ?' ফিস ফিস করে সেদিন ট্যাক্সির অন্ধকারের মধ্যে বলেছিল জয়ন্ত।

শাশ্বতী মৃদু হেসে হাত সরিয়ে নিয়েছিল। জানালার ধারে সরে গিয়ে বসেছিল একসময়ে।

'দিগ্বিজয় শব্দটা আবার উচ্চারণ করে জয়ন্ত শাশ্বতীর দিকে তাকাল। বৃষ্টির মধ্যে চোখ রেখে শাশ্বতী বুঝি দুচোখ স্বচ্ছ করছে। নীরব শাশ্বতী। ওর হাতের মুঠি থেকে কখন হাত সরিয়ে নিয়েছে। আরামে হেলান দিয়েছে পিছনের গদিতে। একটু বোধহয় অন্যমনস্ক। কণ্ঠনালীর খাঁজের মধ্যে সেই স্থির তিলটা চোখে পড়ল। বুকের কাপড় সরে গেছে শাশ্বতীর। জয়ন্ত পবিত্র চেহারার মধ্যে কিশোরী শাশ্বতীর সেই বুদ্ধিহীন, চাতুর্যহীন সরল রেখাগুলি দেখতে চাইল। সন্তর্পণে খুঁজতে লাগল। আর খুঁজতে খুঁজতে অনুভব করল, সে উত্তেজিত না হয়েও কখন যেন ভিতরে অসীম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। পাশে শাশ্বতী। কি ঝকঝকে শাশ্বতী!

জয়ন্ত আচ্ছন্নের মত শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। জয়ন্ত যেন শাশ্বতীর শরীর থেকে সেই অদ্ভুত গন্ধটা পেল। ট্যাক্সিতে, সিনেমায়, রাস্তায়—যখনি শাশ্বতী পাশে থেকেছে, এক রহস্যময় গন্ধে জয়ন্তর নিজেকে আচ্ছন্ন মনে হয়েছে। মৃগনাভির গন্ধের মত। শাশ্বতী কি সত্যি হরিণী ? 'হরিণী বলিছে—শুন হরিণারে। এই বন ছাড়ি তুই চল বনান্তরে।' বিড় বিড় করল জয়ন্ত। কবে যেন প্রাচীন চর্যাগীতিতে পংক্তিটা পড়েছিল! বনান্তরে নিয়ে যাবে শাশ্বতী ? ডাকছ ? তোমার কথা শুনলে, তোমার দেখা পেলেই সেই ডাক শুনি শাশ্বতী। আর কি যেন মনে হয় তখন। আমার সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। রেবাকে ভুলে যাই, ভাস্বতীর কথা প্রত্যন্তেও বিষয় হয়ে ওঠে। বিবাহ, প্রয়োজন, সন্তান, সংসার, আত্মীয়স্বজন—সব অতি অগোচরে যেন বিষয়সুখ হয়ে ওঠে। মিথ্যে অলীক হয়ে যায়। আমি শক্তিধর হই।

'বাবু কিধার যায়েগা ?'

সম্বিৎ ফিরে এল জয়ন্তর। শাশ্বতীর দিকে আচমকা তাকাল। আকাশের কালো মেঘে চারপাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে আরো। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে থেমে গেছে কখন।

জয়ন্ত আর একবার শাশ্বতীর দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'রেসকোর্সের চারপাশ একবার ঘুরিয়ে ভবানীপুর চলুন।'

ট্যাক্সির মধ্যে শেষের দিকে রাস্তাটুকু শাশ্বতী কেন যেন চুপ করে ছিল। জয়ন্তর ফ্ল্যাটে পা দিতেই প্রচুর কথায় মুখর হয়ে উঠল নিমেষের মধ্যে। রেবা এখন অফিসে। অফিস থেকে আজ আর ফিরবে না। সহকর্মীদের সঙ্গে কোথায় যেন যাবে। ফ্ল্যাটে এখন থাকবার মধ্যে জয়ন্তর অল্পবয়সী চাকর তারক। এই ঠান্ডা বাতাসে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল তারক। দরজায় ধাক্কা মেরে মেরে তার ঘুম ভাঙাল জয়ন্ত।

'কি করে ঘুমোচ্ছিস ?' জয়ন্ত ঈষৎ ধমক দিল।

চোখ কচলাচ্ছে তারক। ঘুম-জড়ানো চোখে তাকাল।

'দরজায় খিল দিয়ে দে।' বলে জয়ন্ত ওর ঘরে চলে এল। পিছনে পিছনে শাশ্বতী।

'বাথরুমে গা ধোয়ার জল আছে ? সাবান তোয়ালে সব গোছানো আছে তো ?'

তারক সামনে এসে দাঁড়াল। ঘাড় নাড়ল। আছে।

'যা, আর তোকে দরকার নেই। ঘুমিয়ে পড়।'

তারকের চলে যাওয়া দেখে বোঝা গেল, সে শুধু এই কথাটুকু শোনার জন্যেই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

শাশ্বতী অনেকক্ষণ ধরে গা ধুলো। সুগন্ধি সাবানের গন্ধ গায়ে মেখে, কাপড়-চোপড় জড়িয়ে যখন ঘরে ঢুকলো, তখন জয়ন্ত জামা-কাপড় বদলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরেছে। ওর ঘরের মেঝেয় দাড়ি কামাতে বসেছে। 'দাড়িটা কামিয়ে নিলাম। সময় পেলাম যখন।'

'কি ভাগ্য।'

জয়ন্তর দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গিয়েছিল। দাড়ি কামানোর বাক্সটা গুছোচ্ছিল। শাশ্বতীর কথায় মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল। অবাক চোখে কয়েক মুহূর্ত শাশ্বতীকে দেখল। এতক্ষণ পরে থাকা শাড়ি জামাই জড়িয়েছে গায়ে। কিন্তু জয়ন্তর মনে হল এক পরিচ্ছন্ন শুভ্রতায়, পৃথিবীর প্রথম দিনের মত এত নির্মল আলোয় শাশ্বতীকে কোনদিন দেখেনি, আর দেখবেও না বোধহয় কোনদিন। মুখে-চোখে কোথাও এতটুকু মলিনতা নেই। সেই প্রথম আলো। দুর্গম অরণ্যের সেই নিষ্কলুষ হরিণী। এই হরিণী যেন সমস্ত অঘটন ঘটাতে পারে, ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে। 'চল বনান্তরে।' জয়ন্তর নিজের মধ্যে কেঁপে উঠল।

শাশ্বতী দৃষ্টি দিয়ে ধমক দিল। 'আপনি ওভাবে দেখবেন না তো! আজ কি প্রথম দেখছেন আমাকে ?' খিল খিল করে হেসে উঠল শাশ্বতী। আলমারীর লম্বা কাচের সামনে দাঁড়িয়ে অল্প প্রসাধন সেরে নিল দ্রুত হাতে। রেবার সঙ্গে ও পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে বৌদির আত্মীয়তা পাতিয়েছে। তাই রেবার প্রসাধন দ্রব্যে সম্ভবত ও একটা অধিকার বোধ করে। কোথায় কি থাকে জানে।

'কাপড়টা অনেকক্ষণ পরে আছি, একটু সেন্ট লাগিয়ে নি, কি বলুন ?' নিজে নিজেই বলে রেবার সেন্টের শিশিটা কোত্থেকে যেন বের করল। ছেলেমানুষের মতন বুকের আঁচলে শিশির মুখ চেপে সেন্ট লাগাল। কাপড়ে গোলাকার ভিজে দাগ স্পষ্ট হ'ল।

জয়ন্ত দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখে শাশ্বতীর প্রসাধনচর্চা দেখছিল। সেন্ট লাগানোর চিহ্ন আর কণ্ঠনালীর সেই ছোট খাঁজের তিলটা একসঙ্গে চোখে পড়ল।

'এখন আপনি কি করবেন ?'

'তুমি কি ঘুমোতে চাও ?'

'তা ছাড়া আর কি করার আছে ?'

'বেশ তো, আমি ও ঘরে যাচ্ছি। তুমি একটু শুয়ে নাও। বিকেল হলে যাবে।'

'আপনার তো রাত্রে ঘুম হয় না। এখন বরং একটু ঘুমিয়ে নিন না কেন ?' রহস্যজনকভাবে শাশ্বতী হাসল। দৃষ্টি স্থির রেখে জয়ন্তকে দেখতে লাগল।

জয়ন্ত হাসল। ওর মুখে-চোখে সরলতা আস্বাদ করতে চাইল।

'বৌদি কখন ফিরছেন ?'

'বোধহয় আজ আসবে না।'

'আপনি বিকেলে কি করবেন ?'

'কি আবার। একটা মিটিং-এর রিপোর্ট দিতে হবে অফিসে।'

'বেশ আছেন।' শাশ্বতী এতক্ষণ খাটের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এবার বিছানায় উঠে একটা কোণে বসল।

কি ভেবে কথাটা বলল, জয়ন্ত বুঝতে পারল না। জয়ন্ত একটু দূরে মেঝেয় পাতা ইজিচেয়ারটায় বসতে যাবে, থমকে দাঁড়াল। রেডিও থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বিছানার গায়ে টেলিফোনটার চোখ বুলোল। এ ঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার মাঝখানের দরজার কাছে এগিয়ে এল। দরজা খুলে ওঘরে ঢুকল। এটা জয়ন্তর ঘর। সব কিছু তছনছ করা। রেবার নিপুণ হাতের গোছানো মুহূর্তে মুছে যায়। রেবা ভীষণ রাগ করে। সারা ঘরময় পোড়া সিগারেট ছড়ানো। চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে বই-এর জঞ্জাল। দু'তিনটে অ্যাসট্রে উপুড় করা। জামা-কাপড় তক্তপোষের নীচে স্তূপ করা। অথচ আজ সকালে অফিস যাবার আগে রেবা কি নিখুঁত করে গুছিয়েছিল! জয়ন্ত হাসল। রেবার হিসেব মত এত সহজ হওয়া জয়ন্তর কেন যেন পোষায় না। এ ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল। আবার শাশ্বতীর সামনে এল।

'একটু বরং গল্প করি। তারপর যখন ভাল লাগবে না, ঘুম পাবে, হাই উঠবে, তখনি না হয় একটু শুয়ে নেব।'

শাশ্বতী হাসল। 'তাই, আপনি বসুন।'

'আচ্ছা শাশ্বতী, রেবাকে তো 'তুমি' বলো। আমাকে বলতে পার না?' জয়ন্ত হাসল। কিছু একটা বলা দরকার। বলে ফেলল হঠাৎ।

শাশ্বতী একটু অবাক হ'ল। 'উহ, এই 'তুমি' বলা নিয়ে আর কথা তুলবেন না তো! বিষয়টাই কেমন বোকা বোকা লাগে!'

'মানে! বলতে চাইছ, আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা হতে চাইছি!' বলে হো-হো করে হেসে উঠল জয়ন্ত। 'আমি কিন্তু এমনি বলতে চাইছিলাম।'

'প্রেমিক হতে বুঝি ভয় পান?'

'তুমি খুব চালাক হয়েছ শাশ্বতী। কেমন নির্বিবাদে কথাগুলো বলছ আমাকে।'

'আচ্ছা বেশ, আর বলব না।' শাশ্বতী কৃত্রিম অভিমানের ভান করল।

জয়ন্ত নিখুঁতভাবে তা লক্ষ্য করল। শাশ্বতী কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে কেমন বড় হয়ে যায়। বয়স বাড়িয়ে ফেলে। 'অ্যাডাল্ট' কিন্তু বয়সের সঙ্গে ভিতরের স্বভাব আর মনের ওমন অমিল রাখতে পারে কি করে? বয়স হয়েছে, অথচ কথায় সেই কিশোরীর সারল্য, শিশুর পবিত্রতা, প্রথম যৌবনের নিষ্পাপ অধিকার চেতনা।

শাশ্বতী মাথা নীচু করে পায়ের নখে আঙুল বোলাচ্ছিল। জয়ন্তকে চুপ করে থাকতে দেখে আড়চোখে একবার দেখল। জয়ন্ত মুচকি হাসছে। চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার জয়ন্তর দিকে তাকাল। এখনো হাসছে আর শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে আছে। জয়ন্তকে অনেক পরিষ্কার মনে হল শাশ্বতীর। 'কি দেখছেন?'

'এমনি।' জয়ন্ত নিস্পৃহকণ্ঠে বলে সিগারেটটায় টান দিল।

চোর কোথাকার! মনে মনে বলল শাশ্বতী। হাসতে হাসতে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

জয়ন্ত বুঝতে পারল, শাশ্বতী নিজের মনে কিছু ভাবছে। ভাবুক। জয়ন্ত দেখতে চায়। শাশ্বতী কথা বললে, হাসলে, চুপ করে থাকলে কখনো সুন্দর, কখনো গম্ভীর মনে হয়। চতুর স্বভাবটা স্পষ্ট ধরা পড়ে। জয়ন্ত মাঝে মাঝে ওকে আজেবাজে কথা বলে, ছেলেমানুষের মতন অকারণ বেশী কথা বলে শাশ্বতীকে দেখতে চায়, অনুভব করতে চায়। এতে যদি বা ওর একাকীত্ব কাটে, রাত্রির অনিদ্রায় একটু আরাম হয়। বাঁচা বড় প্রয়োজন। সমস্ত একঘেয়েমি থেকে, ঝিমুনি থেকে বাঁচা। শাশ্বতী সেই বাঁচার মন্ত্র। সেই বেঁচে মরার বিচ্ছিন্নতায়, পৃথিবীর সবকিছু—সমাজ, বিবাহ, গতানুগতিক হয়ে ওঠার বিবাক্ততে হয়ত শাশ্বতী একটা সেতু, একটা পথ বা পথের পাশের সেই সুগন্ধ গোলাপ। শাশ্বতী সেই হরিণী—যে হরিণকে বনান্তরে নিয়ে যেতে চায়। বড় মনোরম সে-বনান্তর। শাশ্বতীর মধ্যেই কি সেই বন, বনান্তর? হয়ত তাই। অনেকক্ষণ বাদে আবার সেই সাবানের গন্ধ, একটু আগে বুকের আঁচলে নেওয়া সেণ্টের গন্ধ, বুঝিবা মৃগনাভির গন্ধ নাকে এল। জয়ন্ত বনান্তরে যাবে। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে শাশ্বতী?

'এভাবে চুপ করে বসে থাকার চেয়ে ঘুমোন ভাল।' শাশ্বতী হাসতে হাসতে বলল।

'নাঃ, তুমি ঘুমোও, আমি ও-ঘরে যাই। দুচোখ বড় জ্বালা করছে।' জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। বাইরে এখন বৃষ্টি নেমেছে:

শাশ্বতী পাশেই ফোনের রিসিভারে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তাই যান।'

জয়ন্ত এ-ঘরে চলে এল। মাঝের দরজা ভেজিয়ে দিল। বর্ষার দিনে এ-ঘরটা একটু বেশী অন্ধকার থাকে। আলো না জ্বেলে জয়ন্ত ওর চেয়ারে এসে বসল। দুপুরে কোনদিনই ঘুম হয় না জয়ন্তর। অনিদ্রায় সারাদিনরাত দুচোখ জড়িয়ে থাকে। স্লিপিং পিল খেয়ে ভোররাতে যা একটু ঘুম হয়। এখন মাথার মধ্যে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে যেন। কি এক অস্বস্তি। এখনি বোধহয় স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমোতে হবে ওকে।

জয়ন্ত সিগারেট ধরাল। হেলান দিয়ে মাথাটা চেয়ারের ওপর রাখল। ঘাড় থেকে ঈষৎ আরামের প্রবাহ মাথার মধ্যে বইতে শুরু করেছে যেন। তবু শাশ্বতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে যে জটিল অস্বস্তি মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে, তা থামছে না। এ-যন্ত্রণা যেন বহুদিন অনাস্বাদিত ছিল। শাশ্বতী তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। আহ্, শাশ্বতী, তুমি কত ভাল, কত বুদ্ধিমতী, কি চতুর! ভালবাসা তোমার মনের মধ্যে গড়ে তুলেছ। ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি! তোমার মধ্যে সেই কিশোর কাল থেকে নিজের মত করে ভালবাসা লালিত হতে দেখেছি। অনুভব করেছি তোমার মুখে-চোখে। পর পর সাজানো বেলফুলের কুঁড়ির মত দাঁত, ঈষৎ ভাঙা গাল, গোল গোল চোখ, শোলার পাতের মতন পাতলা ঠোঁট, সেই কণ্ঠনালীর কাছে স্থির একটা তিল... আহ্ শাশ্বতী, একটা যদি চুমু খাই, তুমি চিঠিতে নাকি তোমার নাম লিখেছিলে মঞ্জু, যদি সেই চুমুতে তুমি সুন্দর হয়ে ওঠ, তুমি যদি হাসতে থাক অনবরত উড়ন্ত প্রজাপতির মত, ভাসমান মেঘের মত, বৃষ্টির শব্দের মত, তুমি যদি বর্ষার সুস্নাত পরিচ্ছন্ন তৃণ হয়ে যাও আহ্, শাশ্বতী, তোমার ঠোঁটে কি প্রথম পতিত শিশিরের গন্ধ! আহ্, শাশ্বতী, তুমি হৃদয়ের প্রতিটি শব্দে তোমার লক্ষ্মীর মত পা ফেলে ফেলে ছুটতে থাকো, সেই মাজা সোনার মত পা, পায়ের ডিম—যা একটু আগে গা ধুয়ে এলে চোরের মতন দেখেছি, সেই পায়ে পায়ে যদি দামালপনা আমার বুক থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিনিয়ত গড়াতে থাকে..., তাহলে আহ্ শাশ্বতী, আমি তৃণ হয়ে যাব, শরতের মেঘ হবো, বৃষ্টির শব্দ হবো, আমি ভীষণ শক্তি পাব। যত দিকের বিচ্ছিন্নতা আছে, সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে বিচ্ছিন্নতা শূন্যে মিলিয়ে দেব। আমি পবিত্র হবো। তোমার মত পবিত্র, বিশুদ্ধ, পাপহীন।

জয়ন্ত ভিতরের অস্বস্তিতে তীব্র ঝাঁকানি খেল। হাই উঠল পর পর দুবার। দুচোখে অস্বস্তি। অনিদ্রা ছিল দুচোখের পাতায়। এখন তন্দ্রার আড়ষ্টতা, অস্বস্তি। এ যেন জয়ন্তকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে! জয়ন্ত ক্রমশ চারপাশের বৃষ্টির শব্দ দূরাগত হতে শুনল। চারপাশ নিস্তব্ধ। সারা ঘর বুঝি অন্ধকার, কালো নিথর হয়ে গেল।

খট্ খট্ করে ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের শব্দ হচ্ছে জয়ন্তর সামনে। চারপাশ লোকে লোকারণ্য। জয়ন্ত রেসকোর্সের সবচেয়ে সেরা এক নতুন ঘোড়ায় নতুন করে বাজি ধরেছে আজ। অনেকদিন পরে জয়ন্ত তার খেলায় নেমেছে। মদ খাওয়ার দরকার হয়নি। এতটুকু উত্তেজিত নয়। ঠান্ডা মাথায় জয়ন্ত ঐ শাদা তেজী ঘোড়াটায় বাজি ধরেছে। ঘোড়াটা অনেক ঘোড়ার মধ্যে ছুটছে জোরে। আরো জোরে, আরও, আরও...। চারপাশে হাততালি। প্রথম হয়ে গেল ঘোড়াটা আর সকলকে হারিয়ে। এবার ঘোড়াটা একা দৌড়চ্ছে। জেতা ঘোড়া জয়ন্ত নিজে ধরতে চায়! পারছে না। কিছুতেই না। হঠাৎ জয়ন্ত নিজেকে দেখল ওর ঘরের মধ্যে। ঘোড়াটা তার ঘরে। মাঝের দরজা দিয়ে কেবল এ-ঘর ও-ঘর দৌড়চ্ছে। কি হাঁফাচ্ছে ঘোড়াটা। হিস্ হিস্ শব্দ হচ্ছে চারপাশে। জয়ন্ত এবার ধরে ফেলবে। কি আশ্চর্য! ঘোড়াটা হঠাৎ হরিণ হয়ে গেল! জয়ন্ত এবার ভয় পেল। গহন অরণ্যের হরিণের চোখ বড় নিষ্পাপ, সপ্রতিভ, বড় উৎসুক। জয়ন্তকে দেখেই হরিণটা তীরবেগে দৌড়তে আরম্ভ করল। খটা...খট্, খটা...খট..

তন্দ্রা ছুটে গেল জয়ন্তর। চকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হল।

মাঝের দরজায় কেউ শিকলটা টক টক করে নাড়ছে।

'কে?'

'আমি। খুলুন।' শাশ্বতীর গলা।

'খোলা আছে।' বলে জয়ন্ত দরজার সামনে বসে কপাট খুলে দিল।

'সত্যি ঘুমোচ্ছেন নাকি?' শাশ্বতী হাসছে।

'নাহ্', জয়ন্ত যেন লজ্জা পেল।

'আমি জানি আপনি কিছুতেই ঘুমোতে পারবেন না।'

'কেন?'

'এমনি।' একটু হাসল। 'ও-ঘরে বসে কি হবে? আসুন, তাস খেলি। সময় কাটবে ভাল।'

জয়ন্ত হাসল। 'তাস পাবে কোথায়?'

'আলমারীর মাথায় খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছি।' শাশ্বতী আর কোন কথা না বলে বিছানায় তাস ছড়িয়ে বসল।

জয়ন্ত এগিয়ে এসে শাশ্বতীর সামনে মুখোমুখি বসে পড়ল। দেখল শাশ্বতীকে বাইরে মেঘের গুম গুম শব্দ। চারপাশে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাতের ঝুমঝুমি। জয়ন্ত একটা সিগারেট ধরাল। শেষ কাঠিটা জেলে খালি বাকসটা দালানে ছুঁড়ল। এক সময়ে কয়েকটা তাস হাতে নিল জয়ন্ত। ভিতরে বড় অস্বস্তি, অথচ এক কঠিন শীতলতা। জয়ন্ত এসব থেকে বাঁচতে চায়। শাশ্বতীকে মুখর করে তোলা যাক। জয়ন্ত ভাবল। বড় ঝিমুনি আসছে, বড় ক্লান্তি, বড় অবসন্নতা।

'কি খেলবে বল? ব্রিজ?'

'নাহ্।'

'ব্রে!'

'ভাল লাগে না।'

'ফিস?'

'এখন ওটাও খেলতে ইচ্ছে করছে না।'

'তাহলে ফ্ল্যাশ।'

'আমি জানিই না। তাছাড়া খেলাটা খুব খারাপ কিন্তু!'

জয়ন্ত হাসল। শাশ্বতীর মুখ-চোখে নিহিত শৈশবের ভীতি ওকে বড় খুশি করছে। 'তাহলে তো টোয়েণ্টি-নাইন খেলাতে হয়।'

'সেই ভাল। দুজনে চার হাতের খেলা খেলব। কেমন মজার হবে না?' শাশ্বতী তাস গোছাতে বসল।

জয়ন্ত দমে গেল। শাশ্বতী খেলাটা মেনে নিতেই মুহূর্তে কেমন নিরুৎসাহ উত্তেজনাহীন হয়ে পড়ল। শাশ্বতীর দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'তোমার ও-খেলা থাক। যে খেলায় রহস্য আছে, ভয়ংকর গোপনতা আছে, সেই খেলা খেলব এস।'

'সে আবার কি?' শাশ্বতীর চোখে-মুখে বিস্ময় উপচে পড়ছে।

'ফ্লাশ! তিন তাসের খেলা। দারুণ ইন্টারেস্টিং।' জয়ন্তর কণ্ঠস্বর উল্লসিত।

'আমি জানি না যে!'

'ঐ জন্যেই তো এই খেলাটা দারুণ অ্যাট্রাকটিভ। যা তুমি জান না, অথচ আমি জানি, আমি তোমাকে শেখাতে পারি!'

'যান, বাজে বকবেন না তো!'

শব্দ করে হেসে উঠল জয়ন্ত। সামনে তিনটে তাস উল্টো পিঠ করে পাশাপাশি রাখল। তিনটে তাসের পরিচয় ঠিক করেনি আগে। ধর এটা তুমি, এটা আমি আর মাঝেরটা সময়। আবার হাসতে লাগল। এই তিনটে তাস কি, আমরা কেউ জানি না। সময়ও না। কারণ সময়কেও উল্টো তাসে বসিয়েছি।'

মনোমত খেলার আনন্দে জয়ন্ত অনেক কথা বলছে। 'আমি, তুমি, সময়—আমরা কেউ কাউকে যেমন চিনি না, তেমনি নিজেরা নিজেদেরও চিনি না। অথচ দেখ এই তিনটি তাস না থাকলে গোটা খেলাটা তৈরি হয় না। কি চমৎকার জড়ানো ব্যাপারটা, তাই না?' শাশ্বতীর দিকে তাকাল।

শাশ্বতী অবাক হয়ে জয়ন্তকে দেখছে। জয়ন্তকে যেন নতুন মনে হচ্ছে। কিছু না বলে স্মিত হেসে আবার উপুড়-করা তাস-গুলোর দিকে তাকাল।

'আমার তো মনে হয়, কোন কিছু জটিল, গোপন হলে ভিতরটা কেমন ভয়ংকর নড়ে ওঠে। সবকিছু তুমুল হয়ে ওঠে!'

'আমি বুঝিই না। বাদ দিন।' বলেই শাশ্বতী উল্টো করে রাখা একটা তাসে হাত দিল।

'আহ্, সময়কে এভাবে স্পর্শ কোরো না। বড় বিরক্তিকর। এত বোরিং, মনাটনাস।' জয়ন্ত হঠাৎ শাশ্বতীর হাতটা ধরল। 'আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি, বস। এমন গোপন রহস্য, ভাল লাগছে না? আমার তো রোমাঞ্চ লাগছে।' অনর্গল হাসছে জয়ন্ত।

শাশ্বতী তবু হাত সরাতে কোন উৎসাহ দেখাল না। জয়ন্তকে দেখল। কৃত্রিম রাগের ভঙ্গিতে বলল, 'হাত ছাড়ুন।'

'কি করবে?'

'পালাব।'

'সত্যি!'

'সত্যি।'

'পালাও তো দেখি!' জয়ন্তর মধ্যে সেই দীর্ঘদিনের জমা শীতলতা শাশ্বতীকে যেন ছেড়ে দিতে বলল। ঈষৎ ঝাঁকানি দিয়ে হাত ছেড়ে দিল।

মুহূর্তে ছিটকে সরে গেল শাশ্বতী জয়ন্তর কাছ থেকে। 'আমি কিন্তু খেলব না।'

আমি তো তা-ই চাইছি। তুমি কিছুতেই খেলবে না। অথচ আমি খেলা চাই। মনে মনে বিড় বিড় করল জয়ন্ত। শাশ্বতীর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল।

'দেখছেন কি?'

'তোমাকে।'

'বাব্বা! কতবার দেখবেন?' শাশ্বতী জড়ো করা দু' হাঁটুর আড়ালে বুক লুকিয়ে শাড়ির প্রান্তে পা ঢাকল।

'শাশ্বতী, তুমি হরিণী হয়ে গেছ।'

'যান, কাব্য করবেন না তো!'

জয়ন্ত হেসে উঠল। শাশ্বতীও। জয়ন্ত উঠে এগোবার মত নিষ্ফল ভঙ্গি করতেই শাশ্বতী তাড়িতে খাটের উপর উঠে দাঁড়াল। দ্রুত পায়ে সরে এল এ-কোণে। জয়ন্ত কৌতুক করার জন্যে সত্যি উঠে দাঁড়াল। শাশ্বতী আবার এ-পাশে সরে এল।

'আমাকে নীচে নামতে দিন। আমি বাইরে চলে যাই।' হাসছে শাশ্বতী।

জয়ন্তর দেখতে বড় ভাল লাগছে শাশ্বতীকে। কথা বলার সময় শাশ্বতীর বুক ঈষৎ নামে। হাসলে শাশ্বতীর হৃদয়ের শব্দ বাড়ে, বক্ষ স্ফীত হয়ে ওঠে শ্বাস-প্রশ্বাসের পতন দ্রুত হয়। আহ্ শাশ্বতী,

তুমি হাসতে থাকো। সারা ঘরময় দৌড়ও। বাইরে বেরিও না। বড় প্রকাশ্য মনে হয় সেখানে। ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাক। এই দেখ আমি এগোচ্ছি।

এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল জয়ন্ত।

শাশ্বতী বাইরে যাবে ভেবে ছিটকে আলমারীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। জয়ন্ত বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে শাশ্বতীর পা ছুঁতে চাইল। শাশ্বতী প্রচুর হাসতে হাসতে মেঝেয় লাফিয়ে পড়ল। 'খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু।' বলতে বলতে শাশ্বতী ওপাশে সরে যেতে থাকল। ধাক্কা খেল মেঝেয় পাতা ইজিচেয়ারটায়। ডিঙিয়ে শাশ্বতী দূরে কোণে গিয়ে আশ্রয় নিল।

শাশ্বতীকে দেখে জয়ন্ত একভাবে তাকিয়ে থাকল। ঘরের সব দরজা-জানলা বন্ধ করে একবার একটা চড়ুই পাখিকে সারা ঘরময় তাড়া দিয়েছিল জয়ন্ত। শাশ্বতী কাঁপছে। বুক উঠছে নামছে। নাসারন্ধ্র স্ফীত হচ্ছে। দুচোখ ভরা কৌতুক খেলার কৌতূহল। জয়ন্তর বারবার চড়ুই পাখিটাকে মনে পড়ল। আর দৌড়লে শাশ্বতী যেন হরিণী হয়ে যায়। জয়ন্ত কি ভেবে দ্রুত কয়েক পা শাশ্বতীর দিকে এগিয়ে গেল। জয়ন্তর পাশ দিয়ে পালাতে গিয়ে জয়ন্তর স্পর্শের মধ্যে এসে গেল শাশ্বতী। শাশ্বতীর নীচের ঠোঁটে দ্রুত আঙুল ছুঁইয়ে সরিয়ে নিল। শাশ্বতী সরে এসে আবার খাটের উপর উঠল। অফুরন্ত হাসছে।

আহ্ শাশ্বতী এ তুমি কোথায় আমায় নিয়ে চলেছ? বনান্তরে? তুমি কি হরিণী? এই সময় তোমায় হরিণীর মতন মনে হচ্ছে। বিশ্বাস করো শাশ্বতী তুমি বিশ্বাস করো. সত্যি বিশ্বাস করো...

শাশ্বতী আবার পালাবার জন্যে খাটের নীচে নেমে পড়ল। খাটের পায়ে ধাক্কা খেতেই 'উহ্' শব্দ করে সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। 'আপনি সত্যি এগোবেন না কিন্তু!'

আমি তোমাকে একবার শুধু স্পর্শ করব শাশ্বতী। জয়ন্তর মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল। এগিয়ে এসে শাশ্বতীর মুখমণ্ডল ডান হাতের মুঠোর মধ্যে নিল। শাশ্বতীর ঠোঁট শীতল সাপের দেহ মনে হল। ঠোঁটে আঙুল বুলোতেই শাশ্বতী খাটের ও-কোণে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

'দেখুন কেমন পালিয়ে এলাম ধরতে পারলেন না তো?'

জয়ন্ত তা-ই চাইছিল। শাশ্বতী পালিয়ে যাক। ধরলেই তো হেরে যাবে জয়ন্ত। খেলা শেষ হয়ে যাবে। 'আমি কিন্তু ধরতে পারি।'

'ইস্, ধরুন তো!' হাঁপাচ্ছে শাশ্বতী। বুকের ওপর আঁচল নেই।

জয়ন্ত শাশ্বতীর সামনে এসে ওর হাত ধরল। শাশ্বতী আর খেলতে পারছে না। ক্লান্ত। অনর্গল হাসছে। শাশ্বতী তোমাকে একটা চুমু খাব?

শাশ্বতী জয়ন্তর বুকের সামনে দাঁড়িয়ে। হাসতে হাসতে জয়ন্তর চওড়া বুকে মাথা রাখল। হাসি থেমে গেছে। সেই চড়ুই পাখিটার মত কাঁপছে শাশ্বতী। চারপাশ নিথর। বাইরে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ছে। শূন্যময় পরিবেশ সংখ্যাতীত বৃষ্টির শব্দে প্লাবিত। জয়ন্ত শাশ্বতীর মুখমণ্ডল দৃষ্টির সামনে ধরল। দুচোখ নিদ্রিত শাশ্বতীর। কপালের ওপর চুলের সীমারেখা বরাবর চকচকে বালির মত স্বেদ। এমন শান্তির আশ্রয় জয়ন্ত অনেকদিন দেখেনি। জয়ন্ত এখনো ভিতরে এত শীতল কেন? তবে শীতলতা সেই অস্বাচ্ছন্দ্যকে ঢাকতে পারছে না। জয়ন্তর অস্বস্তি তীব্র হতেই মাথার মধ্যে কি যেন ধাক্কা খেল। শাশ্বতীকে আদর করতে লাগল জয়ন্ত। নাক, চোখ কপাল, ঈষৎ ভাঙা গাল চিবুক ঠোঁটে চুমু খেতে লাগল। কণ্ঠনালীর খাঁজের সেই শান্ত স্থির তিলের ওপর মুখ লুকোল জয়ন্ত। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।

বুকের মধ্যে শাশ্বতীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটু পরেই সম্বিত ফিরে এল জয়ন্তর। জয়ন্তর বুকের মধ্যে শাশ্বতীর মুখমণ্ডল যেন নিদ্রিত। আলমারীর আর্শির দিকে শাশ্বতী পিছন করা। জয়ন্ত আর্শির দিকে তাকাল। শাশ্বতীর অনাবৃত পিঠে আস্তে আস্তে হাত বোলাল। সিক্ত 'মাহ বালির মত নরম কাঁধ পিঠ। আবরণহীন নিতম্ব জানু, পায়ের পাতা চোখে পড়ল। সারা শরীর কি পবিত্র! সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত নিয়ত পরিচ্ছন্ন। আহ্ শাশ্বতী তুমি সত্যি সুন্দর, তুমি বড় সুন্দর। শুধু মুখ নয়, তোমার সারা শরীর কত পবিত্র, নিষ্পাপ। জয়ন্ত শাশ্বতীর বসনহীন শরীরের দিকে চোখ ফেরাল। সাবানের গন্ধ বুকের কাপড় ভেদ করে সেই সেন্টের গন্ধও বুঝি তাকে স্পর্শ করেছে। যেন বা মৃগনাভির গন্ধ চারপাশে। শাশ্বতী তুমি হরিণী। সত্যি তুমি হরিণী। জয়ন্ত উৎকর্ণ হল। একটু আগে সশব্দে বৃষ্টির মধ্যে হরিণের পদশব্দ ছিল। 'স্বর্গগামী মৃগক্ষুর দেখা নাহি যায়।' আবার বিড় বিড় করল জয়ন্ত। শাশ্বতী বড় ক্লান্ত। জয়ন্ত শাশ্বতীকে বিছানায় সযত্নে রাখল।

কতোক্ষণ পরে খেয়াল নেই, তন্দ্রার জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল জয়ন্ত। বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। পাশে শাশ্বতী নেই। কানে ফোনের রিং বাজার শব্দ আসছে। তাকিয়ে দেখল, শাশ্বতী কখন উঠে আলমারীর আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে পোষাকে পরিচ্ছন্ন হয়েছে। প্রসাধন শেষ করে এনেছে। তাকাচ্ছে না জয়ন্তর দিকে।

ক্রিং...ক্রিং..., ক্রিং...ক্রিং...। নিয়মিত যতিপতনের মধ্যে ফোন বেজে চলেছে। শাশ্বতী প্রসাধন করতে করতে একবার দূরে ফোনের রিসিভারে দিকে, পরে জয়ন্তর দিকে তাকাল। জয়ন্তর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। দুজনেই স্মিত হাসল।

জয়ন্তর উঠতে ইচ্ছে করছে না। বেজে যাক।

'আমি কিন্তু ফোন করব।' অফিসে বেরুবার মুখে রেবা বলল।

'কখন?'

'দুপুর গড়িয়ে এলে।'

জয়ন্ত নীরব।

'তুমি থাকবে তো?'

'থাকলে ধরব।'

'ফোন করে আমি তোমায় জানিয়ে দেব, কবে ফিরব। তোমার অসুবিধে হবে না তো?'

'না, এমন আর কি? তারক তো আছে।'

বেরিয়ে গিয়েও বলেছিল, 'ফোন ধোরো। আমি করব কিন্তু।'

ফোন একভাবে বেজে চলেছে। রেবা জানে, জয়ন্তকে এইভাবে ফোন করতে হয়। ঘুমোলে জয়ন্তর জ্ঞান থাকে না। জয়ন্ত, ফোনের দিকে তাকাল। শাশ্বতীকে দেখল।

'চলি।' শাশ্বতী নিচু গলায় বলল। একটু ঘষা কাগজের মত খস-খস করল গলা। কাঁধে সেই পরিচিত ভঙ্গিতে ব্যাগ ঝুলিয়েছে।

বাইরে বেরুল শাশ্বতী। জুতোর শব্দ করতে করতে দালানে পা রাখছে শাশ্বতী। নির্বিকার উদাসীন ভঙ্গি। একটু আগে জয়ন্তর নিক্ষেপ করা খালি দেশলাই-এর বাক্সটা পায়ে ঠেলে ঠেলে কিছুটা নিয়ে গেল শাশ্বতী। জয়ন্তর কানে আসছে সে শব্দ।

ফোন এখনো বেজে চলেছে। জয়ন্ত চুপ করে পড়ে রইল বিছানায়। শাশ্বতীর জুতোর শব্দ, ফোনের রিং একসঙ্গে ভাসতে ভাসতে একসময়ে মিলিয়ে গেল।

চারপাশ নির্জন। ঘরে ছাই রং অন্ধকার। জয়ন্ত চারকোণা ঘরের সিক্ত অন্ধকার, এক শূন্যের মধ্যে ভাসতে লাগল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আবু সয়ীদ আইয়ুব

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ
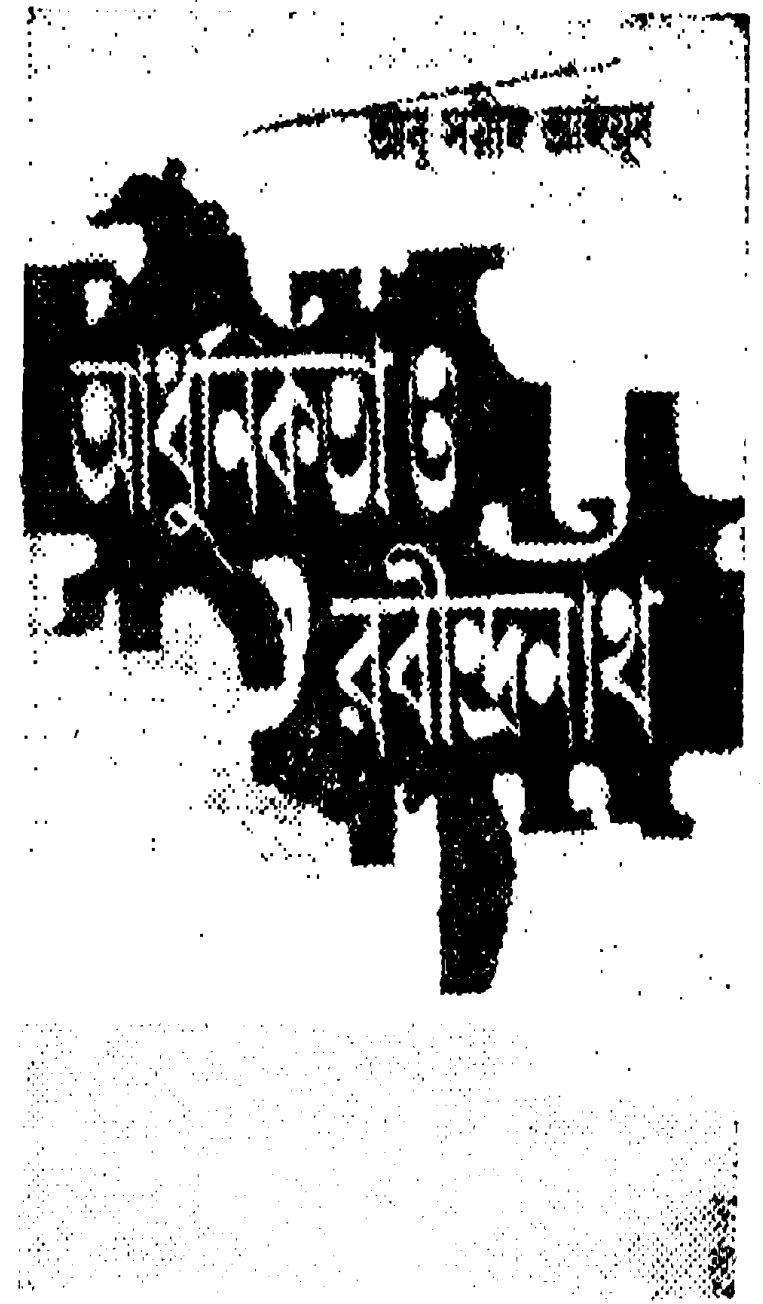
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি অন্তহীন। বিভিন্ন দিকে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। মহাসাগরের মত সেই মহৎ সৃষ্টির সামগ্রিক আলোচনা সহজ-সাধ্য নয়, তাই আংশিক বিচারে অনেক সময় যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। একথা অবশ্যই সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে মানুষে মাত্রেরই রুচি ভিন্ন, মত ভিন্ন এবং দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। এই পার্থক্যটুকু না থাকলে কোনো মানুষেরই বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হয়।

ইদানীংকালে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্রনাথের নব-মূল্যায়ন শুরু হয়েছে এবং এই মূল্যায়ন রবীন্দ্র-চরিত্র এবং সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে করা হচ্ছে। অবশ্য এই জাতীয় বিশ্লেষণে বিনীত মননের প্রয়োজন সর্বাধিক, কারণ সমালোচকের ঔদ্ধত্য অনেক সময় বক্তব্যের তীব্রতা হ্রাস করে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব দীর্ঘকাল বঙ্গ-ভারতীর সাধনায় ব্রতী। আজ তিনি পরিণত বয়সে উপনীত, যুক্তিসিদ্ধ মননের তিনি অধিকারী। তাঁর 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র-আলোচনা গ্রন্থ। লেখক পূর্বাভাষে বলেছেন যে, তাঁর আলোচনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। আধুনিক সাহিত্যের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনি দুটি বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করে নিয়েছেন—এক কাব্যদেহের প্রতি একাগ্র মনোনিবেশ এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—জাগতিক অমঙ্গল (ইভিল) বিষয়ে চেতনার অত্যাধিক্য।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'ইভিল'কে অশুভ বলেছেন—এই অশুভ বা অমঙ্গল সচেতন আধুনিকত্ব : "জগৎ ও জীবন বিষয়ে আনন্দ, আগ্রহ শ্রদ্ধা, বিস্ময় এমনকি কৌতূহল পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গা জুড়েছে বোরডম, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, বিবমিষা—।"

আইয়ুব সাহেব অবশ্য স্বীকার করেছেন যে এতদসত্ত্বেও এ-যুগে সৎ এবং মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক মানুষ সম্পর্কে বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ এরিক ফ্রোম তাঁর 'এসকেপ ফ্রম ফ্রিডম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

> "By losing his fixed place in a closed World man loses the answer to the meaning of his life; the result is that doubt has befallen him concerning himself and the aim of life. He is threatened by powerful Supra-personal forces, capital and the market. His relationship to his fellowmen, with everyone a potential competitor, has become hostile and estranged; he is free—that is, he is alone, isolated, threatened from all sides.—Paradise is lost for good, the individual stands alone and face the World—" (ERICH FROMM in Escape From Freedom)—

আইয়ুব সাহেব বলেছেন—"এতৎসত্ত্বেও আধুনিককালে সৎ-সাহিত্য রচিত হয়েছে, মহৎ সাহিত্যেরও অভাব ঘটেনি।" অভাব যে ঘটেনি তার হেতু মানুষ যুক্তিহীন নয়, মানুষ ইনটেলেকট্ নির্ভর, সব মানুষ নির্জ্ঞান মানসিকতার দাস নয়। আধুনিক সাহিত্য মাত্রেই ঘৃণার পাঁচালী নয় একথা বলেছেন লেখক। লেখকের অভিযোগ আধুনিক সাহিত্যের পূর্বোক্ত দুই ধারার বিপক্ষে।

তিনি বারবার বলেছেন সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য তাঁর আলোচ্য নয়, রবীন্দ্র-কাব্যের যেটুকু আলোচনা করেছেন "তা থেকেও অনেক কিছু বাদ পড়েছে"। কাব্যগ্রন্থের অ্যানাটমি নিয়ে তিনি যে নাড়াচাড়া করেনি এ তাঁর পরিচ্ছন্ন মনের পরিচায়ক। অ্যানাটমির বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে অপরিহার্য কিন্তু কাব্য-বিচারে নয়। তাই তিনি কাব্যদেহের লাবণ্য নিয়ে মুগ্ধ। রবীন্দ্র-কাব্যে অমঙ্গল চেতনা কিভাবে কখন সংকুচিত, কখন সম্প্রসারিত হয়েছে এবং 'শেষ পর্বের কাব্য রচনায় কত গভীর ও পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে' লেখক তা স্পষ্ট করে তোলার প্রয়াসী হয়েছেন এই আলোচনা গ্রন্থে এবং সেই সঙ্গে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বিশ্ব-নিরীক্ষা ও জীবনবোধ কেমন করে পর্যায়-ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিণত হয়েছে"।

লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মহিমা নিয়ে সাধারণত যে সব সমালোচনা বা আপত্তি, মাঝে মাঝে উঠেছে 'ভাবগত' এবং 'ভাষাগত' সেইসব আপত্তির কথা স্মরণে রেখে এই গ্রন্থটি লিখেছেন।

আবু সয়ীদ আইয়ুবের পরিচয় হয়ত অনেকের তেমন জানা নেই। কারণ, তাঁর কলম বহু-প্রসবিনী নয় এবং তিনি তথাকথিত জনপ্রিয় সাহিত্যের জনক নন। তাই এই গ্রন্থ থেকে সামান্য উদ্ধৃতি-দান করলে বোধকরি তাঁর যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া যাবে—

"গীতাঞ্জলি আমি প্রথম পাঠ করি উর্দু ভাষায়—তখনো বাংলা পড়তে বা বলতে শিখিনি। ইংরাজী গীতাঞ্জলির

নতুন আলোকে রবীন্দ্রনাথ

চমৎকার অনুবাদ করেছিলেন নেয়াজ ফতেহপুরী ; যতদূর জানি ঐ অনুবাদ থেকেই উর্দু গদ্য-কবিতার (নসর-শায়েরীর) সূত্রপাত। কহকশান নামক মাসিকের পাদ-পূরণরূপে ব্যবহৃত এই কবিতাগুলি পড়তে পড়তে চোখে জল আসতো যে অতিশয় আনাড়ি কিন্তু নিঃসন্দেহে আন্তরিক পাঠকের বয়স তেরো, সে তখন মনে-প্রাণে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, পরকালের ভয়ে পুণ্যকর্মে যত্নশীল, পাপবোধে ঈষৎ পীড়িত। বছর তিনেক পর অপেক্ষাকৃত পরিণত রুচি ও বুদ্ধি নিয়ে ইংরেজি গীতাঞ্জলি পড়লাম। পড়ে আরো মুগ্ধ হলাম, কতবার যে আবেগকম্প্র কণ্ঠে আবৃত্তি করলাম তার ইয়ত্তা নেই। স্মরণ-শক্তি নিতান্ত ভোঁতা না হলে আজও তার অধিকাংশ কবিতা মুখস্থ থাকত। কিন্তু ততোদিনে আমি বার্ট্রান্ড রাসেল প্রভৃতির পাঁচ-সাতখানা গণপাঠ্য দার্শনিক পুস্তক হস্তগত ক'রে হয়ে উঠেছি ঘোরতর নাস্তিক এমনকি নাস্তিক্যপ্রচারের মিশনারি উৎসাহ নিয়ে বড়োদের সঙ্গে তর্ক করতে সর্বদা উদ্যত। সহিষ্ণুরা সাক্ষাতে ক্ষমা করে-ছিলেন ; অসহিষ্ণুদের কাছে প্রচণ্ড ধমক খেয়েছিলাম যতবার, ধর্মবিশ্বাসের অসারতা বিষয়ে আমার প্রত্যয় ততবার নতুন ক'রে বল পেয়েছিলো।"

এই মানসিকতা সত্ত্বেও আইয়ুব সাহেবের গীতাঞ্জলি পাঠ ব্যর্থ হয়নি। তিনি মূল বাংলা ভাষার গীতাঞ্জলি পাঠের সংকল্প নিয়ে সেদিন সেই ভাষার চর্চায় লেগে গিয়েছিলেন, 'যে-ভাষা আজ আমার মাতৃভাষার চেয়ে অনেক বেশী প্রিয়।'

প্রকৃতপক্ষে আইয়ুব সাহেবের এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা যে কোনো জাত-বাঙালী সাহিত্যিকেরও ঈর্ষার বস্তু। তাঁর ভাষা মধুর, স্বচ্ছ, সরল এবং সরস।

লেখকের সংকল্প এইভাবে সিদ্ধিলাভ করেছে কিন্তু তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি বলেছেন—

"প্রশ্নটি হ'ল—যে ঈশ্বরকে আমি কায়মনোবাক্যে অলীক বলে জানি, সেই ঈশ্বর-ভাবে ভরপুর কাব্যে মন কেন সাড়া দেয়? আমি পেশাদারী নিস্তাপ সাহিত্যিক বিচার বা ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কথা বলছি না যার দৌলতে আমরা দূরতম মানসিক ও হার্দিক ব্যবধান অনায়াসে পার হয়ে দূরতম যুগ, সংস্কৃতি ও মেজাজের শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য রায়দান ক'রে থাকি। আমি বলছি কাব্যের সেই সংরক্ত আবেদনের কথা যাতে সমস্ত মন-প্রাণ মুচড়ে ওঠে। প্রশ্নের উত্তর পাইনি সেদিন। আজো তার উত্তর খুঁজছি।"

এবং লেখক 'কিছুক্ষণের জন্য পাঠককেও সেই খোঁজার শরিক করে' নেওয়ার প্রয়াস করেছেন।

আইয়ুব সাহেব 'অমঙ্গল বোধ ও আধুনিক কবিতা', 'অমঙ্গল বোধ ও রবীন্দ্রনাথ' (পৃষ্ঠা ৪৩ থেকে ১৫৭) বিস্তারিতভাবে এবং পরিশেষে 'শ্রেয়োনীতি ও সাহিত্য নীতি', 'কবিতার ভাষা' এবং 'অন্তিম পর্বের কবিতা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলা-বাহুল্য, যে অমঙ্গল বোধ ও রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক আলোচনায় প্রাক-মানসী রচনা, মানসী ও সোনার তরী, চিত্রা ও কল্পনা, ক্ষণিকা ও নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি পর্ব, বলাকা, এবং শেষ পর্বের কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এক হিসাবে স্বল্প পরিসরে রবীন্দ্রকাব্যধারার মূল তত্ত্বকে লেখক এই গ্রন্থে ধরবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিত্যই নতুন; রোমান্টিকের দৃষ্টিতে তিনি রোমান্টিক, ঈশ্বর-প্রেমিক মানুষের কাছে তিনি ভক্তিমান ঈশ্বরানুগ্রহ প্রার্থী, আবার আধুনিকের দৃষ্টিতে তিনি আধুনিক। শেষ পর্বে পৌঁছে তাই প্রশ্ন ওঠে—কে তুমি? সেই চিরন্তন প্রশ্ন কে তুমি? নেতি নেতি করে অগ্রসর হয়ে তাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে হয় সেই একটি বিন্দুতে—সেই বিস্ময় যা সৃষ্টির প্রথম দিনে মনে জেগেছিল কে তুমি? রবীন্দ্র কবি-মানসের ক্রমবিকাশ আইয়ুব সাহেব যে দিক থেকে আলোচনা করেছেন তা অভিনবত্বের জন্য শুধু নয়, সাহসিকতার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথমেই বলেছি সকল মানুষের মতামত একরকম হয় না, হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আইয়ুব সাহেবেরও সকল মতই যে সকলে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারবেন তা মনে হয় না। কিন্তু সমগ্র রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপ্ত উষ্ণ মানবিকতার বিশ্লেষণে যে সাহসিকতার পরিচয় আছে তা বাংলা সাহিত্যে সর্বদা সুলভ নয়। রবীন্দ্রনাথ যে একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এবং ইদানীংকালের খর্ব-মানসিকতার যুগের সমগোত্র নন, আইয়ুব সাহেব তাঁর বক্তব্য পরিবেশনে সে কথা বিস্মৃত হন নি, এই কারণে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

—অভয়ংকর

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (আলোচনা)—আবু সয়ীদ আইয়ুব। প্রকাশক : ভারবি : ২৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২, দাম আট টাকা মাত্র।

ভারতীয় সাহিত্য

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মোৎসব ॥

গত ২০ জুলাই কৃষ্ণনগরে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ১০৭তম জন্মোৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নদীয়ার জেলা শাসক অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিজেন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের' ছাত্রীরা। অনন্তপ্রসাদ রায়, মোহিত রায় প্রমুখ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আলোচনায় যোগদান করেন। বিকেলে টাউন হলে কবির আবক্ষ-মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।

রামপ্রসাদ জন্ম-জয়ন্তী ॥

২৮ জুলাই সাধক রামপ্রসাদের জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই উপলক্ষে সকাল ৮-৪৫ মিঃ রামপ্রসাদের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং তারপর উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁর সাধনা ও মহান জীবনী আলোচনায় বিভিন্ন বক্তা যোগদান করেন। কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে ও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন এক যুক্ত বিবৃতিতে এই অনুষ্ঠান সার্থক করে তুলবার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।

পাকিস্থানে রবীন্দ্র বাসভবনের দুরবস্থা ॥

সাজাদপুর রবীন্দ্র জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করছে। কবি-জীবনের একটি উল্লেখ্য সময় সাজাদপুরের কাচারি বাড়িতে কেটেছে। এক অর্থে সাজাদপুর কবিতীর্থ। পাকিস্থান সরকার রবীন্দ্র স্মৃতি-বিজড়িত এই কাচারি বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থা করেন নি। পাক সরকারের এই আচরণে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী মানুষেরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সমগ্র ভারতে চলেছে বিক্ষোভের প্রবাহ।

গত ৩১ জুলাই ভারতীয় সংসদেও এই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। অধ্যাপক সমর গুহ এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব তুলে বলেন—"সাজাদপুরের এই কাচারি বাড়িতেই কবিগুরু তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করেন। এই কাচারি বাড়িটি সংরক্ষণে পাকিস্থান সরকার চরম ঔদাসিন্যের পরিচয় দিয়েছেন। কবি এই কাচারি বাড়ির একটি ঘরে বসে পড়াশুনা করতেন। এই ঘরটি এখন 'প্রস্রাবখানা' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর একটি ঘরকে ব্যবহার করা হচ্ছে 'ডাকবাংলো হিসেবে'। অধ্যাপক গুহ তাঁর ভাষণে পাকিস্থানের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রকাশিত প্রতিবাদ সদস্যদের পাঠ করে শোনান। তিনি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করবার জন্য

আবেদন জানান। অধিকাংশ সদস্যই শ্রীগুহকে সমর্থন করেন।

বিতর্কে যোগদান করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন— "এ খুবই দুঃখের যে, কাচারি বাড়ি পাক সরকার এই কাজে ব্যবহার করছেন। এই বাড়িটি শুধু গুরুদেবের স্মৃতি-চিহ্নই বহন করছে না, এই ঘর অবনীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে।" রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি আরও বলেন—"রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একজন 'মহাকবি'—কিন্তু 'মহাকবি'র চেয়েও তিনি আরও বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন মহামানব। তাঁকে কেবল ভারতীয় বলে দাবী করা আমাদের পক্ষে সংগত হবে না—কেন না, তিনি হলেন সমগ্র পৃথিবীর কবি। ভারতীয় ঐতিহ্যের তিনিই হলেন যথার্থ প্রতীক।" তিনি এ ব্যাপারে যথাসাধ্য করবেন বলে সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দেন।

গুরুদয়াল সিং-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ।।

সমকালীন পাঞ্জাবী লেখকদের মধ্যে গুরুদয়াল সিং একটি বিশেষ পরিচিত নাম। গল্প, উপন্যাস এবং বিশেষভাবে শিশু সাহিত্য রচনায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৩৩ সালের ১০ জানুয়ারী অমৃতসরের জৈতু গ্রামে এক দরিদ্র শ্রমিক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। অর্থাভাবে তাঁর পক্ষে স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবী ভাষায় এম-এ পাশ করেন। বর্তমানে তিনি জলন্ধরের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ভাষা থেকে তিনি ৮টি গ্রন্থ পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে আছে শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ'। অবশ্য গ্রন্থটির অনুবাদ তিনি মূল বাংলা থেকে করেন নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো—'মরাহিদাজিওয়া', 'আণ্ডোই', 'অপরাঘর', 'সাগিফাউল'। এ পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাব সরকারের তিনটি পুরস্কার লাভ করেছেন। এ বছর সিমলায় সর্বভারতীয় লেখকদের শিশু সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে যে আলোচনা সভা বসে, তাতে তিনিও যোগদান করেন। সেখানে 'অমৃতে'র প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সময় সমকালীন সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা হলে তিনি যা বলেন, তা প্রশ্নোত্তর আকারেই এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন—সাহিত্য সম্মেলনের কি কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে?

উত্তর—নিশ্চয়ই আছে। কারণ এই ধরণের সম্মেলনই পরস্পরকে জানবার সুযোগ এনে দেয়। ভাবের আদান-প্রদান ঘটে এবং এর মাধ্যমে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করি। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ, তার রীতিনীতি সম্বন্ধেও কিছু জানবার সুযোগ এই সম্মেলনের মাধ্যমেই লাভ করি।
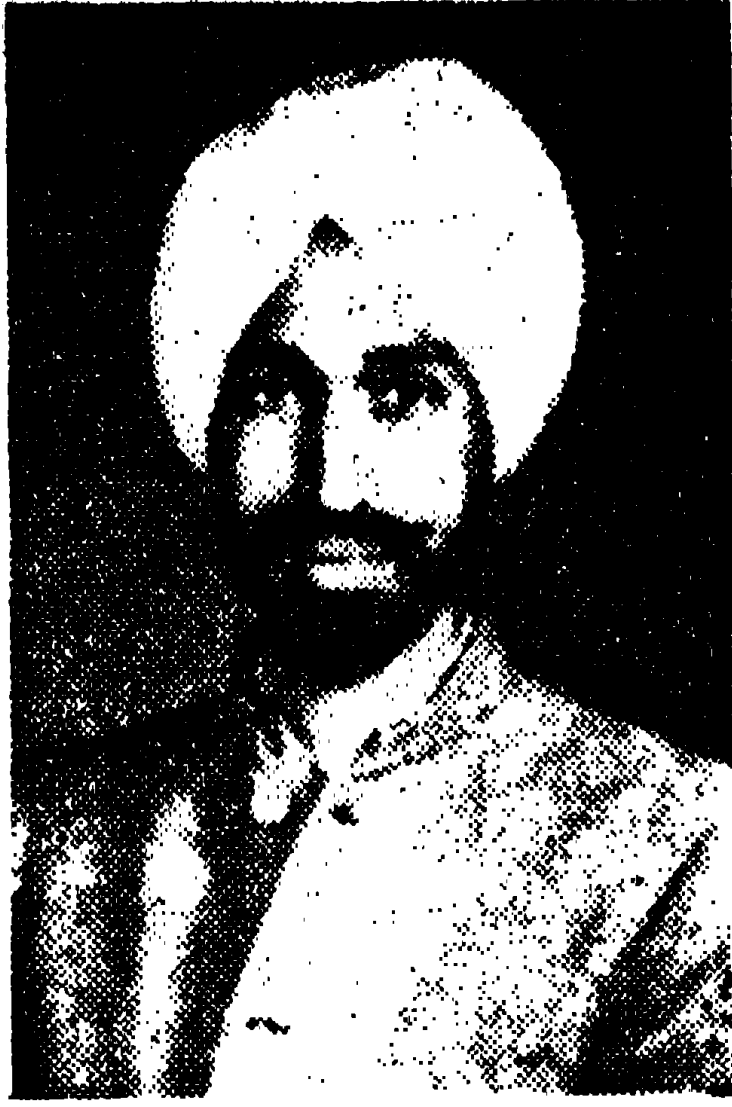
গুরুদয়াল সিং

প্রশ্ন—সাহিত্যের অনুবাদ সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?

উত্তর—অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় একটি সাহিত্য কর্ম। এ কখনই সম্ভব হবে না যে, আমরা একই সঙ্গে পৃথিবীর সব কটি ভাষা শিখবো। অথচ সেই সব দেশের সাহিত্য পাঠ না করলে, সেই দেশের মানুষ এবং তার রীতিনীতি সম্বন্ধে জানবার কোনও উপায় নেই। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে আজ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। আমরা ইংরেজি বা আমেরিকান সাহিত্য সম্বন্ধে যত জানি, তার একাংশও আমাদের প্রতিবেশী সাহিত্য সম্বন্ধে জানি না। এর চেয়ে পরিতাপের আর কি আছে? যাঁরা সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন বা ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন, তাঁদের কাছে ভারতের চেয়ে অন্য কোনও দেশ বড় বলে মনে হয়।

প্রশ্ন—কোন কোন পাঞ্জাবী লেখকের লেখা আপনার ভাল লাগে?

উত্তর—ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কুলবন্ত সিং, সন্তোষ সিং ধির, অজিত কাউর, যশবন্ত কামাল এবং কবিদের মধ্যে হরভাজন সিং, সুরেন্দ্র গিল, এস এস মিশ্র, মোহন সিং প্রমুখের রচনা আমার ভাল লাগে।

প্রশ্ন—রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

উত্তর—রবীন্দ্রনাথকে আমি ভারতীয় লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি। তিনি ছিলেন জনগণের লেখক। তাঁর ছোট গল্পই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে। কেবল ছোটগল্প রচনা করলেও তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম বলে বিবেচিত হতেন।

প্রশ্ন—সমাজ গঠনে লেখকদের কি কোন ভূমিকা আছে?

উত্তর—নিশ্চয়ই আছে। সমাজের অভ্যন্তরে যে সব ঘাত-প্রতিঘাত, তা সমাজ দেহে ফুটে উঠবার আগেই লেখকের রচনায় ধরা পড়ে। পাঠক এই লেখা পড়ে সচেতন হয়। লেখকের দায়িত্ব সমাজ গঠনে তাই নগণ্য নয়।

বিদেশী সাহিত্য

কোপার্নিকাসের রচনাবলী ।।

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার জনক হিসেবে কোপার্নিকাসের নাম আজ পৃথিবীখ্যাত। প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে তিনি নক্ষত্রমণ্ডল সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে তাঁর পঞ্চম জন্মশতবার্ষিকী এবং ৫০০তম জন্ম-দিবস পালিত হবে। এই উপলক্ষে 'পোলিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস' কোপার্নিকাসের রচনাবলীর প্রকাশ ও সম্পাদনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও গবেষক তার সদস্যরূপে নিযুক্ত। তাঁরা সকলেই দিনরাত পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করে চলেছেন, যাতে এই মহাবিজ্ঞানীর কোনো রচনাই অপ্রকাশিত না থাকে।

এখন পূর্ণোদ্যমে কাজ চলছে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য রেভলিউসানিবাস'-এর ওপর। মূল ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে পোলিশ অনুবাদসহ এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হবে। অনুবাদের কাজ সমাপ্তপ্রায়, তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এ পর্যন্ত তার যে সকল পোলিশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেসবের তুলনায় গ্রন্থটিকে অধিকতর মূল্যানুগ এবং প্রামাণ্য করে তোলাই কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায়। 'দ্য রেভলিউসানিবাস'-এর মূল পাণ্ডুলিপি বর্তমানে ক্রকোর 'জ্যাগেলোনিয়ান পাঠাগারে' রক্ষিত আছে। সম্পাদকমণ্ডলী এখন আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষে প্রয়োজনীয় অংশসমূহের পুনর্বিন্যাসের কথাও ভাবছেন। আবশ্যকীয় স্থলে উপযুক্ত টীকা-টিপ্পনী সংযুক্ত হবে।

এই রচনাবলীতে থাকবে জ্যোতির্বিদ্যা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও চিঠিপত্রের সম্পূর্ণ সংগ্রহ। তাছাড়া থাকবে—সমসাময়িকদের ওপর কোপার্নিকাসের ব্যক্তিত্ব ও কর্মাবলীর প্রভাব ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের প্রয়াস। এমন কি, তাঁর বৈপ্লবিক আবিষ্কার ও সিদ্ধান্তসমূহ কিভাবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের সহায়তা করবে—তারও আলোচনা করা হচ্ছে।

তাছাড়া এই পরিকল্পনার পাশাপাশি চলবে আরেকটি ধারাবাহিক গ্রন্থমালার প্রকাশ। এই সিরিজের পুস্তক-পুস্তিকা-সমূহে কোপার্নিকাসের ব্যক্তিত্ব ও আবিষ্কারের আলোচনা—এবং তার পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

মায়াকোভস্কির জনপ্রিয়তা ॥

অন্তর্মুখী কবিতা রচনার জন্যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় মায়াকোভস্কি একজন বিতর্কিত পুরুষ। অনেক সময় মনে হয়, তাঁর জনপ্রিয়তা বুঝি শলোখভ প্রমুখ সাহিত্যিকদের তুলনায় নিম্নমুখী। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে অন্য কথাই প্রমাণিত হয়। মার্কিনী দুনিয়ায় তাঁর লেখার অনুবাদ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে তো বটে।

গত জুলাই মাসে তাঁর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র। কেবল প্রদর্শনী, বক্তৃতা, আলোচনা ও সভা-সমিতির মধ্যেই এদিনটি সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ, নতুন সংস্করণ, জীবনীগ্রন্থ, স্মৃতিমূলক রচনার সঙ্কলন, আলোচনা-সমালোচনার গ্রন্থ।

সোভিয়েতের একটি প্রকাশনী সংস্থা—খুদোঝেসৎ ভেনিয়া লিটারেচুরা পাবলিশিং হাউস—মায়াকোভস্কির দীর্ঘ কবিতা "ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন"-এর একটি সচিত্র শোভন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া প্রকাশিত হয়েছে আরো দুটো কাব্য-সংকলন—(১) পোয়েমস, (২) লিরিকস। প্রথম সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয়েছে "লাইব্রেরী অব সোভিয়েত পোয়েট্রি" সিরিজে, আর দ্বিতীয়টি 'ট্রেজার্স' অব লিরিক্যাল পোয়েট্রি' গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে।

'দেৎস্কায়া' প্রকাশনী সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে—'মায়াকোভস্কি টু চিলড্রেন' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ। এর ভূমিকা লিখেছেন লিও কাসিল, এবং নানা রঙের ছবি এঁকেছেন জুভেনালি কোরোভিন। এই উপলক্ষে অনেক স্মারকগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির নাম—'মায়াকোভস্কি টুর্স দি ইউনিয়ন'। লেখক প্যাভেল ল্যাভাত এককালে মায়াকোভস্কির সঙ্গে দেশের বহু স্থানে ঘুরেছেন এবং বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সহযাত্রী ও অনুগামী ছিলেন। কবির ককেসিয়া বসবাসের অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর ওপর লেখা—'মায়াকোভস্কি ইন রেমিনিসেন্সেস অব রিলেটিভস অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডস' নামে একটি সঙ্কলন গ্রন্থও বেরিয়েছে।

সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের চোখে মায়াকোভস্কি কিরূপ জনপ্রিয়—তা বোঝা যায়—'মায়াকোভস্কি ইন রিকালেকশনস অব কনটেমপরারিজ" গ্রন্থ পাঠে। এটি আসলে সঙ্কলন গ্রন্থ। পাঁচ বছর আগে তার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল সংক্ষিপ্ত আকারে। বর্তমানে তা আয়তনে ও উপাদানে সুসম্পূর্ণ হয়ে দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আলেকজান্ডার আব্রামভ মায়াকোভস্কির কবিতার ওপর একটি প্রবন্ধের বই লিখেছেন।

গত জানুয়ারী মাসের একটি হিসেব থেকে জানা যায়, এ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে মায়াকোভস্কির বই ছাপা হয়েছে ৮৩৪ বার এবং চৌষট্টিটি ভাষায়। বিদেশী ভাষায় প্রকাশনালয় থেকে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মুদ্রণসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার। আর দীর্ঘ কবিতা 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন'—এই একই সময়ে ছাপা হয়েছে ২৮টি ভাষায় ৮৮-বার। এর মোট মুদ্রণসংখ্যা বত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কপি।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

চতুরঙ্গ [মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪] —সম্পাদক হুমায়ুন কবির ।। ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩।। এক টাকা কুড়ি পয়সা।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকাগুলির মধ্যে চতুরঙ্গের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এ সংখ্যায় একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন হুমায়ুন কবির। তাছাড়া প্রবন্ধ-নিবন্ধ গল্প-কবিতা লিখেছেন—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলচন্দ্র সরকার, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচ্যুত গোস্বামী, মৃগাঙ্ক রায় ও দিব্যেন্দু পালিত। কয়েকটি বিদেশী লেখার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

●

একক [সর্ব ভারতীয় কবিতা সংখ্যা]—সম্পাদক শুদ্ধসত্ত্ব বসু ।। ৪৬/১, হালদার পাড়া রোড, কলকাতা ২৬। দু'টাকা।

মৌলিক কবিতা লেখার সঙ্গে উপযুক্ত অনুবাদ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা চিরকালই অনুভূত হয়ে আসছে। একক এদিক থেকে প্রশংসনীয় উদ্যম নিয়েছেন। হিন্দী, তামিল, তেলেগু, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, আসামী, নেপালী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত কবিতার ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বেশির ভাগ কবিতারই অনুবাদ করেছেন—সুজাতা প্রিয়ংবদা এবং অসীমকৃষ্ণ দত্ত। সর্ব ভারতীয় কবিতা সম্পর্কে প্রভাকর মাচওয়ের লেখা একটি ইংরেজী নিবন্ধ সংখ্যাটির মূল্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

●

সারস্বত (১ম সংখ্যা) সম্পাদকঃ দিলীপকুমার গুপ্ত, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, ৬ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা-১। দামঃ ১-৫০ টাকা।

বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা তেমন বেশি না হলেও সিরিয়স কাগজ নিতান্তই কম। অন্তত মাসিক পত্র-পত্রিকা তো বটেই। তাই তারিফী চালের কোন নতুন কাগজের আবির্ভাব সব সময়েই বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করে। সেদিক থেকে দিলীপকুমার গুপ্ত ও অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'সারস্বত' কাগজটি ইতিমধ্যেই সাহিত্যানুরাগীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে এমন ঝকঝকে তকতকে ছাপাই-বাঁধাইঅলা কাগজ চলতি পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে সত্যিই ভিন্ন জাতের বলে মনে হয়।

কিছুদিন আগে সারস্বত-এর প্রথম সংখ্যাটি বেরিয়েছে। কাগজটি সাহিত্য প্রধান হলেও চিত্র, ভাস্কর্য, সংগীত থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্পরূপই এর আলোচ্য বিষয়। এ সংখ্যায় লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, অমিয় চক্রবর্তী, নির্মল মৈত্র, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, মহিম রুদ্র, এবং আরো অনেকে।

●

কালক্রম (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) — সম্পাদকঃ পুষ্কর দাশগুপ্ত। ৪২, গড়পার রোড কলকাতা-৯। দাম—এক টাকা।

বাংলাদেশের অসংখ্য লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ভিড়ে 'কালক্রম'-এর ১ম সংখ্যা লেখার ভারে চোখে পড়ে সহজেই। এ-সংখ্যায় ফরাসী উপন্যাস ও পল ক্লোদেল সম্পর্কে একাধিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কবিতা ও গল্প লিখেছেন রত্নেশ্বর হাজরা, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অতীন্দ্রিয় পাঠক, মৃণাল বসু চৌধুরী, তপনলাল ধর, কালীকৃষ্ণ গুহ, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার দাস ও আশিস ঘোষ। প্রবন্ধ লিখেছেন রমানাথ রায়, বিকাশ সেন। ছ'টি ফরাসী ও জার্মান কবিতার অনুবাদ করেছেন ফাদার সি মিংয়ো ও সুকুমার ঘোষ।

●

ফাল্গুনী [প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]—সম্পাদক স্বরাজ সিংহ।। দাম : একটাকা।

এ সংখ্যায় লিখেছেন পিনাকেশ সরকার, গৌরী মুখোপাধ্যায়, জীতেন্দ্রনাথ সরকার, প্রবীর মজুমদার, তপন চক্রবর্তী, প্রদীপ চক্রবর্তী, সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

একটু ভূমিকা আছে।

রূপপুর ওখান থেকে পাঁচ মাইলের কাছাকাছি। কিন্তু রাণীচকের পাশে আছে হাইওয়ে, রাণীচক বাজার জায়গা। সময়ের আলোর সে রাঙা। ওদিকে রূপপুর বিল-খাল জলজঙ্গলের আদিম পৃথিবীতে ভিন্ন আলোর রঙে রাঙা—সে-রঙ গাছের কোটরে যেসব ধূসর পাখির বাসা, তাদের মত কিছু বিবর্ণ, কিছু অমসৃণ মনে হয়।

লীলা ওই রূপপুরের মেয়ে।

রূপপুরে চাষাভুষো জেলেবাগ্দীদেরই বসবাস বেশি। তাদের মধ্যে দুচারঘর ভদ্রলোক কোন পুরুষে এসে জুটেছিল হঠাৎ। কিছু বামুন আর একঘর কায়স্থ। বোঝা যায় বামুন ভদ্রলোকেরা এসেছিলেন যজমানের ভক্তির টানে। কিন্তু লীলার ঠাকুর্দার বাবা?

রামকান্ত ঘোষমশাই ছিলেন আসলে গোমস্তা। রাণীচকের জমিদার তাঁকে স্নেহের দান যা দিয়েছিলেন, চতুর গোমস্তা অর্জন করেছিলেন তার তিনচারগুন বেশি।

তিন পুরুষে সে বিশাল সম্পত্তির যতখানি টিঁকে ছিল, এ যুগে হেসেখেলে সেজেগুজে দিন কাটানোর পক্ষে তা অপর্যাপ্ত।

মজার কথা, এ তিনপুরুষে একটির বেশি সন্তান কারুর বাঁচেনি। অবশ্যি পুত্রসন্তান তারা। কেবল প্রাণকান্তের বেলায় টিঁকে গেল একটি মেয়ে। লীলা। লীলার জন্মের পরই প্রাণকান্ত মারা যান। চারপাশে সরল চাষা-ভুষো মানুষ—রূপপুর একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত; সুতরাং লীলার মা কুমুদিনীর পক্ষে যথেষ্ট সম্পত্তি রাখার বিপদ ছিল না।

সচরাচর এসব ক্ষেত্রে অবশ্য লীলার সঙ্গে যার বিয়ে হবে, তার ঘরজামাই হবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। সত্যচরণ প্রাণকান্তের বন্ধুর ছেলে। সেজন্যেও নয়। এটা একরকম লীলার নিজের জেদ—সত্যকে ঘরজামাই হতে হয়নি। উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে দিন চলে যাচ্ছিল লীলার। কুমুদিনী বড় খুঁতখুতে মেয়ে। তাছাড়া লীলা যে জলজঙ্গলের পরিবেশে মানুষ তাতে তার মধ্যে বেড়ে উঠেছিল একটা উদ্দাম স্বাধীনতার বোধ। বামুন পরিবারের সুবাদে একটা পাঠশালাও চলছিল রূপপুরে। লীলা সেখানে লেখাপড়া শিখছিল। কিন্তু প্রায়ই তাকে খুঁজে আনতে হয়েছে দূর খড়ের বনে বা জলার পাশ থেকে—বাগ্দী মেয়েদের সঙ্গে সারা গায়ে কাদা মেখে ঘুরছে। একেবারে গেছো মেয়ে যাকে বলে—যেমন দুরন্ত, তেমনি বন্য। তার স্বাধীনতার বোধকে কুমুদিনী ক্রমশ ভয় করতে শিখেছিল। একদিন তো লীলা বনকরবীর বিষাক্ত ফল খেয়ে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করতে বসেছিল! রাণীচকে হাসপাতাল না থাকলে কী হত বলা যায় না। আর একদিন......

রঘুপণ্ডিতমশাই ঘাসের বনে গাড়ু হাতে কুকর্ম করতে বসেছেন, মাথার ওপর মস্তো শেওড়াগাছ। কিন্তু যেখানেই বসছেন, পরক্ষণে উঠে পড়তে হচ্ছে বেচারাকে—চারপাশ থেকে ছুটে আসছে দলে দলে ছিনে জোঁক—এ অঞ্চলের যা বৈশিষ্ট্য।

পণ্ডিতমশাই যাচ্ছেতাই গালাগালি করে-ছিলেন জোঁকগুলোকে। পরিশেষে তাঁর পিতৃপুরুষদেরও একচোট নিলেন, কারণ কী সুখে তাঁরা এ বুনো দেশে বসতি করেছিলেন এসে।

হঠাৎ মাথার উপর খিলখিল করে হাসি। পেত্নী নাকি? শিউরে উঠে রঘু-পণ্ডিত উপরের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন।

হ্যাঁ, পেত্নীই। আলুথালু চুল, অগোছাল কাপড়, ফুলোফুলো গাল রাঙা চোখ—অথচ দারুণ হাসির ঘটা হাততালি দিয়ে!

পরক্ষণে পণ্ডিতমশাইও হাসলেন। অ্যাঁ, লীলারাণী। আরে, তুই গাছের মধ্যে কী করছিস? কী সর্বনাশ!

আঠারো বছরের দুরন্ত যৌবন সেদিন মনের কী একটা দুঃখে শেওড়া গাছ থেকে মৃত্যুর গলা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল। রঘু-পণ্ডিত বিচক্ষণ মানুষ। টের পেতে দেরী হয়নি। লীলারাণীর মাথার উপরের ডালে বাঁধা দড়িটি তাঁর চোখ এড়ায়নি।

কুমুদিনীর কাছে অবশ্যি কথাটা বলেননি তিনি। বলেও কোন লাভ হত না। কুমুদিনী মেয়ের সম্পর্কে আর মাথা ঘামাতে চাইত না। জমির ফসল আর টাকাকড়ির যখ তাকে ক্রমশ যেন এক অন্ধকার বিবরে পৌঁছে দিয়েছিল। সেখানে বসে পেটের মেয়েকেও তার বড় অচেনা মনে হত।

পণ্ডিত বলেছিলেন, আর দেরী কোরো না কুমুদ। অবিলম্বে মেয়েকে পাত্রস্থ করো। একটি ভাল পাত্র আমার সন্ধানে আছে। বাপের অবস্থা একসময় ভালোই ছিল, এখন অবশ্যি তদ্রূপ নেই। তবে......

কুমুদিনী বলেছিল, কে?

মহিমের ছেলে।

কোন মহিম?

বন্যা

[উপন্যাস]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
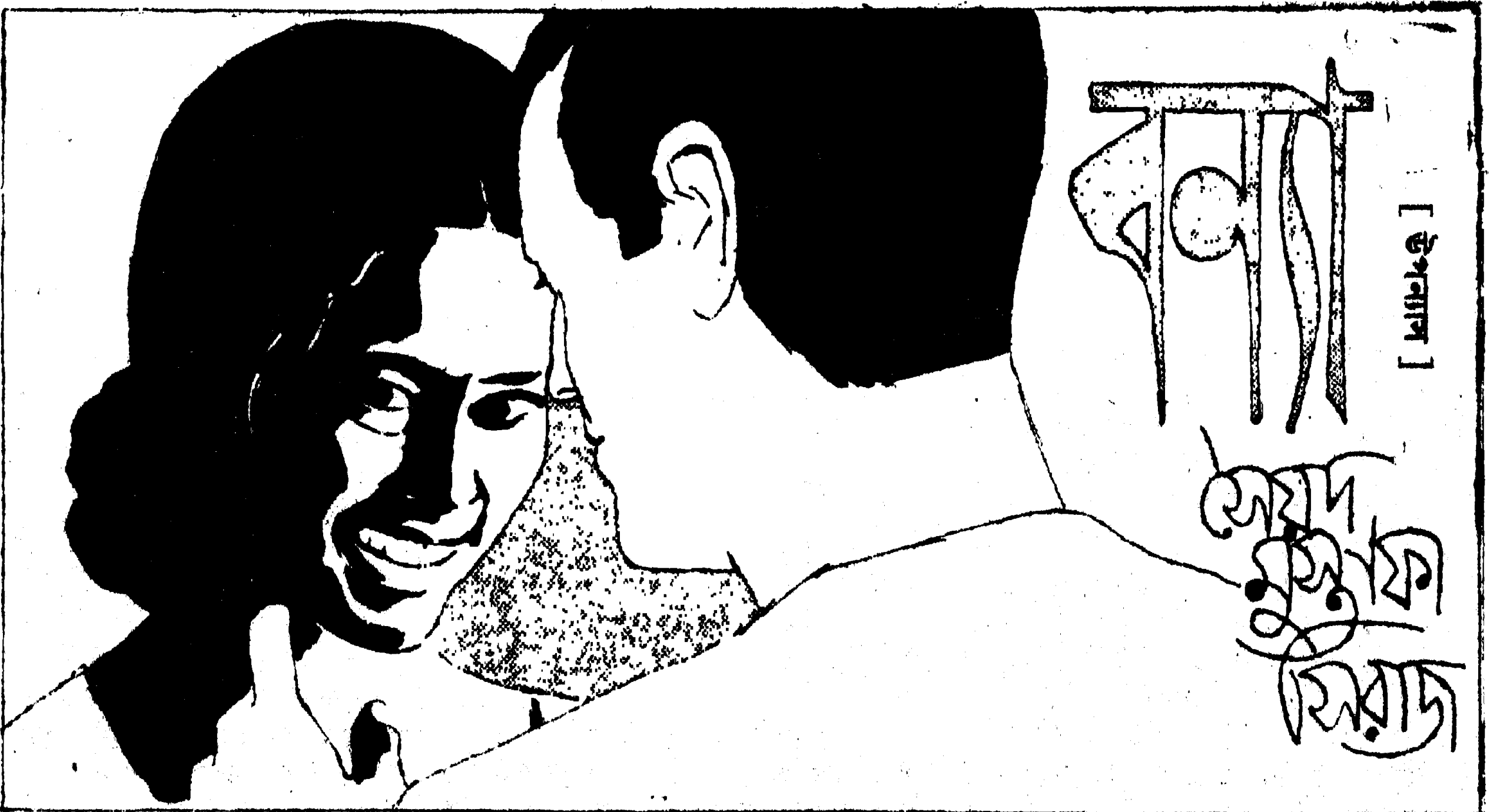
কেন, রাণীচকের মহিম। প্রাণের বন্ধু জীবনের কথা মনে পড়ছে না তোমার?

ও। কুমুদিনী বলেছিল। বেশ তো আপনি ব্যবস্থা করুন। তবে আগে মেয়েকে শুধোন।

পণ্ডিত অবাক হননি। লীলাকে তাঁর বেশ চেনা আছে। জনান্তিকে ডেকে লীলাকে বলেছিলেন—হ্যাঁ রে মা, একটা কথা বলছিলাম......

লীলা ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল, ও আমি জানি। বিয়ের কথা তো?

রঘুপণ্ডিত শাস্ত্রে এবং জীবনে যা জানতেন, নারীর মন দেবতাদেরও অগোচর। লীলা খুব সহজেই মত দিয়েছিল। কিন্তু রক্ষে করো বাবা, ঘরজামাই-টামাই চাইনে। এ ছন্নছাড়া জঙ্গল থেকে পালাতে পারলে বাঁচি!

বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর কিন্তু একেবারে বদলে গেল লীলা। সে-লীলা আর এ-লীলায় তফাৎ আকাশ-পাতাল। শালবনের দুরন্ত পাহাড়ী নদীটি সমতল পৃথিবীর সভ্য পরিবেশে এসে শান্ত হয়ে উঠল—নিশ্চল গভীরতা তার অস্তিত্বে ছিল ভিন্ন এক লাবণ্য।

পুরনো লীলার কথা সত্যচরণ কিছু জানে; কিছু জানে না। ও সব নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। পৃথিবীর কোন কিছুতেই তার মাথাব্যথা নেই। খায়দায়, নাকডাকিয়ে ঘুমোয়। বরং বিয়ে করার পর সে ক্রমশ আরও আলসে হয়ে উঠছিল।

মধ্যে মধ্যে লীলা বলেছে, তাকে রূপপুরে শাশুড়ীর কাছে যেতে। বলেছে, একা মানুষ, বয়স হয়েছে মার। দেখাশোনা করার মত নিজের লোক নেই। তুমি যোগাযোগটা রাখো।

সত্য বলেছে, আর তুমি?

আমি? লীলা একটু হেসেছে। বলেছে, আমি কী করব? রূপপুরে যেতে আমার ভালো লাগে না। বছরে একবার লক্ষ্মী-পুজোর সময় যাই, ওই যথেষ্ট।

সত্য জানে, শাশুড়ী মারা গেলে লীলা অঢেল সম্পত্তির মালিক হবে। এ জানাটার বিশেষ তাৎপর্য কিছু নেই তার কাছে। যেমন করে সে নিজের ঘরবাড়িকে জানে, মাঠঘাট চেনে, চেনে মাথার ওপর আকাশকে —তেমনি জানার বেশি কিছু নয় মোটে। লীলার অনেক টাকা হবে। হবে তো হবে, তাতে মাথা ঘামানোর কী আছে। কী আছে নানারকম স্বপ্ন দেখার? সত্যর কাছে এটা একটা নিশ্চিন্ত স্বাভাবিকতা। আর মধ্যে-মাঝে কোন রাতে লীলা যখন ওকে জড়িয়ে ধরে থেকেছে, হঠাৎ চমকে উঠে সত্য ভেবেছে, আরে তাইতো! আমি একটা মেয়ের কাছে শুয়ে আছি।

যেন খাবার সামনে রেখে অন্যমনস্ক হয়েছিল। সত্য তখন গোগ্রাসে গপ গপ করে খাওয়ার মত হুটোপুটি ব্যস্ততায় লীলার দেহের দিকে হাত বাড়িয়েছে।

নিতান্ত আহার না করে উপায় নেই—অন্তত একবারও শরীরে না কিছু দিলে নয়, সেইরকম।

লীলা যেন সেটা বুঝতে পেরেছে। তার উপর ঝুঁকে, অন্ধকারে তার চোখ খুঁজে বলেছে—আমাকে তোমার ভালো লাগে না তাই না?

সত্য অকপটে বলেছে—আরে, কী বলছ? ভালো লাগে না মানে? প্রায় পাগল হয়ে যাই আনন্দে।

লীলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুয়েছে। শরীর ফিরিয়ে থেকেছে অন্যদিকে। সত্যর কী ভালো লাগে, কিসের আনন্দে সে পাগল হয়, তা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠেছে মনের আবছায়ায়। ক্ষোভে দুঃখে রাগে সে মনে মনে ছটফট করেছে। উঃ, একটা নিতান্ত জানোয়ার নিয়ে তার ঘর করা।

নাকি উদরসর্বস্ব শিশু? যে সর্বক্ষণ খেলায় বিভোল থাকে, খেতে ডাকলে কিছুক্ষণের মত খেলা ভুলে যায় মাত্র! যতক্ষণ খায়, প্রাণভরেই খায়—কোন ফাঁকি নেই তাতে। এবং তাই যেন মাঝে মাঝে বড় মমতায় লীলা আপ্লুত হয়ে ওঠে। তার মনে হয়, সে নিজেও যেন কী অপরাধ করে চলেছে—কোথাও কীভাবে বড় ফাঁকি দিচ্ছে নিজের সংসারকে, নিজের স্বামীকে।

সাবিত্রীর মত অনুগামিনী হতে লীলা পারে না। কারণ যমকেই খুঁজে পায় না সে, সাবিত্রী যেমন পেয়েছিল। আর সে মরণপণ সহনশীলতা, সে সাধনার শক্তি—যা বুঝি মাতাপিতাগুরুর আশীর্বাদেই মেয়েরা চিরদিন লাভ করে, লীলার কি তা আছে?

বড় জোর কুমুদিনী বলেছিল, স্বামীকে মাথায় রাখতে হয় মেয়েদের। জীবনে একবার মাত্র এসেছিল জামাইবাড়ি। গত চৈত্রে। যাবার সময় বলে গিয়েছিল, সতু, খুব ছেলেমানুষ এখনও, বুঝেশুঝে চলিস। ওর যেমন কেউ নেই তুই ছাড়া, আমারও তাই। তবে আমার আর কদিন বাছা? ইচ্ছে ছিল তোকে......

ইচ্ছেটা হঠাৎ চোখের জলে চাপা পড়েছিল। লীলা অবাক হয়েছিল কিন্তু! কুমুদিনী—তার মা, তাহলে কাঁদিতেও জানে? তারও চোখে জল নামে একটা পদার্থ আছে? হাড়কিপটে দজ্জাল বদমেজাজী কুমুদিনীর ভয়ে সারা রূপপুর তটস্থ থেকেছে।

কিন্তু কী ইচ্ছে ছিল তার মেয়ের জন্যে? আর কোনদিন জানার উপায় রইল না।

(৬)

রূপপুরে বেশ কিছুদিন কাটাতে হল ওদের। সেই সময় যা ঘটবার তা ঘটে গেল। পরে দুজনে পরস্পর এত অবাক হয়ে ভেবেছিল—কেমন করে হল? ফোঁড়া উঠেছিল, টেরও পায় নি!

ধানের মরাই, গোয়ালভরা গরু-বাছুর, পুকুরভরা মাছ—তাছাড়া আম-কাঁঠালনারকোলের বাগানও আছে কয়েকটা। কীভাবে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে-ছিল কুমুদিনী, কে জানে! সত্য যেমন, তেমনি লীলা যেন অথৈ সমুদ্রে গিয়ে ভাসছিল।

কিন্তু মেয়েদের যেন কী আছে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে লীলা রীতিমত দ্বিতীয় কুমুদিনী সাজবার চেষ্টা করছিল।

প্রথমেই সে রাতদুপুরে কুমুদিনীর ঘরের দোর বন্ধ করে একটা শাবল হাতে নিয়ে-ছিল। সত্যকে বলেছিল, মেঝেটা খুঁড়তে হবে।

সত্য অবাক। কেন?

মা নগদ টাকা-পয়সাগুলো নিশ্চয় এখানে পুঁতেছে।

সত্য মাথা চুলকে বলেছিল, তাই তো!

তাইতো-টাইতো রাখো দিকি। লীলা ধমকাল। পুঁতে না রাখলে গেল কোথায়?

সত্য বলল, ভারী আশ্চর্য মানুষ! অমন কঠিন অসুখে পড়েছেন, তা খবরও দিলেন না একবারটি।

লীলা চোখ পাকিয়ে বলল, খবর দিলে তুমি যেন বাঁচাতে! নাও, এসো, শাবল নাও। নয়তো আমি নিজেই......

রক্ষে করো। সত্য শাবলটা নিয়ে এলোমেলো খুঁড়তে থাকল মেঝে। কঠিন কংক্রিটে বিচ্ছিরি শব্দ উঠছিল রাতদুপুরে। এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, অসম্ভব! এ মেঝেয় কিছু পোঁতা থাকতেই পারে না। তুমি লোহার আলমারিটা খুঁজেছ ভালো করে?

খুঁজেছি।

কিছু নেই?

একগাদা অলংকার আছে। হয়ত বন্ধকী জিনিস।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে সত্য বলল, সিন্দুক দেখেছ?

লীলা চিন্তিত মুখে বলল, সিন্দুক তো দলিল-দস্তাবেজ ভরতি আছে।

সত্য ওর হাত ধরে টানল। চল, খুঁজে দেখি।

দুটো মস্তো সিন্দুকভরতি রাজ্যের পুরনো কাগজপত্র, কিছু বিবর্ণ পোষাক-আসাক—তারপর একটা হাতবাক্সো মিলল। রুদ্ধশ্বাসে উত্তেজনা চেপে চাবির গোছা খুঁজে চাবি মিলিয়ে অবশেষে খুলতে পারল সেটা।

নাঃ, চোখধাঁধানো যক্ষলাগা গুপ্তধনের জেল্লা কোথায়? হাজারখানেক রুপোর টাকা। মোহর আছে গোটা আষ্টেক। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ইতিমধ্যে আরও গোটা তিনেক মিলেছিল। কিন্তু গেল কোথায় নোটের বাণ্ডিল? সব দরজার চাবি ছিল হরু কৈবর্তের হাতে। হরু ওদের আদ্যিকালের চাকর। চাকর নয় ঠিক—যাকে বলে সরকার। যেখানে-যেখানে খবর দেবার, সেই দিয়েছিল যথাসময়ে। লীলা রাগে ফেটে পড়ল। ওই হতচ্ছাড়া লোকটাই সর্বনাশ করেছে তাহলে। কেন সে মায়ের অসুখের খবর দেয় নি? বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওই পাপিষ্ঠ ডাকাতটার একটা কুমতলব ছিল এর পেছনে।

সকালে হরুকে তলব করল লীলা। হরু সাদা থানের ফতুয়া গায়ে কাঁধে গামছা আর হাতে রুপোর পাতবাঁধানো তেলচকচকে লাঠি হাতে প্রণাম ঠুকতে এসে। তার দু চোখে জল। লীলা কিছু বলবার আগেই সে কেঁদে ফেলল ভেউ ভেউ করে।... আহা, মরবার সময়ও হাত ধরে মিনতি করলাম, মাঠাকরুণ, দিদিকে

একবারটি নিয়ে আসি। হুকুম হলেই তিন রাত্তিরের পথ চক্ষের পলকে উড়ে যাবে লোক। তা, মা আমার, কথাটি কইলেন না গো। যদি বা কইলেন, বললেন—থাক্। আমি বাঁচব।...মাথা নেড়ে শোক সামলে হরু ফের বলল, বুঝতে পারেন নি, বুঝলেন গো দিদি, আদতে বুঝতেই পারেন নি, শমন শিয়রে দাঁড়িয়েছে। কপালে করাঘাত করে থামল হরু।

সেই একই কথা বারবার। একই ভাষ্য। লীলা কী করবে, বুঝে উঠতে পারল না। শুধু বলল, আচ্ছা হরুদা, টাকা পয়সা তো কিছুই পাচ্ছি না কোথাও? তোমাকে কিছু বলে যায় নি?

তীব্রভাবে মাথা নেড়ে ফের আগের কথাগুলো আওড়ে গেল যথারীতি। গতিক দেখে সত্য বলল, ছেড়ে দাও। যা হবার হয়েছে। যা আছে এই যথেষ্ট।

সত্য পালাবার পথ খুঁজছিল যেন। বাপস্, যার কিছু নেই সে ভালো আছে। ধনসম্পদ রাখা কি কম ঝক্কিকার! সর্বক্ষণ ভয়-ভাবনা উদ্বেগে তটস্থ হয়ে থাকো—খেতে শুতে সুখ নেই, নিশ্চিন্ত ঘুমুনো যায় না। শুধু সতর্ক থাকা আর পাহারা দেওয়া। রক্ষে করো বাবা।

সত্য ভাবছিল, এর কোন মানে হয় না। যারা লেখাপড়া শিখে চাকরী করে তারা একরকম সুখেই আছে বলতে হয়। সে সুযোগ পেলে একটা চাকরীই খুঁজে নেবে বরং। ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দেওয়া হয় নি। তাতে ক্ষতি নেই। হাটুকাকা বেঁচে-বর্তে থাকলে মিলেই যাবে একটা।

সত্যর মনে হয়, একটা সুদিন তার জীবনে আসছে। সে লীলার ধনসম্পদের দিকে আশান্বিত নয়। তার সুদিন হাটু-বাবুর কারখানাকে কেন্দ্র করেই আসবে যেন।

কিন্তু ওদিকে সুখেন যদি সত্যি সত্যি রাণীচকে ছাপাখানা খোলে,...

লাফিয়ে উঠেছিল সত্য। লীলাকে বলেছিল, শোন। সুখেনের খবর নিলে হত একবার। আমরা যে এখানে রয়েছি, ও জানে না।

লীলা তখনই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তাই তো! সুখেন...সুখেনকে সে ভুলে গিয়েছিল। আঃ, এ ভুলের দুঃখ ঢাকবার সান্ত্বনা নেই। সে বলল, হ্যাঁ গো, তুমিও ওর সঙ্গে ছাপাখানা চালাবে? খুব বড় ছাপাখানা! যত টাকা লাগে, আমি দেব। তুমি আজই একবার যাও বহরপুর। ওকে বলে এস। লীলা আরও বলল, বরং রাণীচকে কেন, ওখানেই চালাবে ছাপাখানা। পাড়াগাঁয়ে আবার ওসব চলে নাকি! আর জানো, পাড়াগাঁয়ে আমার থাকতেই ইচ্ছে করছে না আর। ওকে বলো, ওখানে বাড়িটাড়ি পাওয়া যায় নাকি, দেখে দিক।

সত্য সব শুনে বলল, তারপর কী করবে? এখানের জমিজমা কে দেখবে? তাছাড়া রাণীচকে আমারও তো পৈতৃক কিছু রয়েছে!

লীলা বলল, বেচে দিলেও চলবে!

সত্য আঁতকে উঠে বলল, সর্বনাশ! একেবারে মূলশুদ্ধ উপড়ে যাবার মতলব?

লীলা কোন জবাব দিল না কথাটার।

একটু ভেবে নিয়ে সত্য বলল, তা মন্দ বলোনি। আমার এ সব ঝঞ্ঝাট সত্যি বলতে কী, মোটেও সয় না—সে তো তুমি ভালোই জানো লীলা। খুব বেঁচে যাবো, সত্যি। টাকা যা পাবো ব্যাঙ্কে জমা রাখব। ব্যবসা আশা করি ভালই চলবে। লেখা-পড়া আজকাল যত বাড়ছে, ছাপার কাজও তত বাড়ছে। সুখেন ঠিক পথই ধরেছে।

রানীচক থেকে আসবার সময় সাইকেলটা আনা হয় নি। গোরুর গাড়ি চেপে এসেছিল দুজনে। সুতরাং ফের গরুর গাড়ির আয়োজন করা যেত অন্তত রাণীচক অব্দি। কিন্তু সত্য পায়ে হেঁটেই গেল। মোটে মাইল পাঁচেক মেঠো পথ। বর্ষায় জলকাদা হবে ভীষণ। তবু হাঁটতেই ভাল লাগল তার।

সত্য আরও কিছুক্ষণ ভাবতে চেয়েছিল। কারণ তিন মাস ধরে যা গজিয়েছে, তার একটা বিহিত করা দরকার।

পাঁচ মাইল জলকাদার পথে সেটা অবশ্য তার মত মানুষের পক্ষে বেশ কঠিন ব্যাপার। বারবার জুতো খুলে হাতে নেওয়া, কাপড় সামলানো, পিছলে আছাড় খাবার ভয়—পথটা তাকে একবারও ভাববার সময় দিচ্ছিল না।

সামনে একটা খাল পড়ে। তার ওপার থেকে মাঠ ক্রমশ উঁচু হয়ে মিশেছে দিগন্তে। তার ওদিকে রাণীচক। ইঁটভাটার চিমনিটা অস্পষ্ট দেখা যায়।

খালটা পেরিয়ে ওপারে একটা বটগাছ। তার গুঁড়িতে বসল সত্য। বেশ ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল সে। বিড়ি জেবলে টানতে থাকল।

কী করতে যাচ্ছে সে? লীলাকে পরীক্ষা করতে চায় একবার? নিজের দৃষ্টির সত্যাসত্য বিচার করতে চায়?

...সুখেনকে বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করা হয় নি। খুব তাড়াহুড়ো বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। মা-বাবা নেই—আছে শুধু দিদি। অনেক দূরের এক গ্রামে তার বিয়ে হয়েছে। সেই মাথার উপর থেকে সব সামলে নিয়েছিল।

তারপর সুখেনকে নেমন্তন্ন করার কথাটা যেন ভুলেই গিয়েছিল সে। দুটি বছর ধরে বহুবার সুখেনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, সুখেন বলেছে—কই সতু, তোর বউ দেখালি নে? লীলাকে নিয়ে কতবার সিনেমা দেখতে গেছে সে—তবু সুখেনের ওদিকে যাওয়া হয় নি। সুখেনকে—সুখেনের চোখ দুটোকে কেমন অবিশ্বাসী কেমন যেন ভীতিজনক মনে হত তার। যেন এড়িয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল লীলাকে।

লীলার চোখেও একটা কিছু নিশ্চিত ছিল। আছে একটা কিছু ভীতিপ্রদ। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। গা শিরশির করে।

শেষ অব্দি সুখেনই জেদ করে চলে এসেছিল ওর বাড়ি। ওর বৌ দেখতে। একটা শাড়ি একটা জামা আর প্যাকেট-ভরতি প্রসাধন-দ্রব্য উপহার এনেছিল সুখেন।

সে রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সত্যর। সুখেনের পাশেই সে শুয়েছিল বাইরের ঘরে। অমরের বোন কুন্তীকে ডেকে এনে লীলা শুয়েছিল নিজের ঘরে।

সত্য দেখেছিল, সুখেন তার পাশে নেই। হয়ত বাইরে বেরিয়েছে পেচ্ছাব করতে কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন? বালিশের পাশে টর্চটা নেই। পায়খানা গেল নাকি? খাওয়া-দাওয়া বেশ জোর হয়েছে। সুতরাং এ কর্মও স্বাভাবিক।

বিয়ের পর স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরী হয়েছে বাড়িতে। টিউবওয়েল বসানোর ইচ্ছে ছিল কুয়ো আছে বলে সেটায় গরজ কম। সত্য বিড়ি জেবলেছে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জ্যোৎস্নার রাত। তবে আকাশে কিছু মেঘ ছিল। কাকজ্যোৎস্না যাকে বলে।

ল্যাট্রিনটা আছে বাড়ির ভিতরের অংশে। সত্য দাঁড়িয়েছিল বাইরের দিকের বারান্দায়। হঠাৎ তার মনে হল সামনের হাইওয়ের উপর দুটো ছায়ামূর্তি। সে বারান্দা থেকে নেমে ডেকেছিল—কে?

আমি! ভারী গলায় সাড়া এসেছিল সুখেনের।

ওখানে কি করছিস?

পায়খানা পেয়েছিল।

কাছে এসে সত্য বলেছিল, আমাকে ডাকলেই পারতিস। বাড়িতে ল্যাট্রিন থাকতে মাঠে কেন? আজকাল সাপখোপ বেরোয় বড্ড।

টর্চ জেবলে সুখেন বলেছিল, আলো নিয়েছি সঙ্গে।

হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সত্য চারপাশে যেন অকারণ আলোর ঝলক ছড়িয়ে দিচ্ছিল এলোমেলো। সুখেন সেটা কেড়ে নিয়ে বলেছিল, পুকুরঘাটে যাবো। পথ দেখিয়ে দে।

......ছায়ামূর্তি একটা ছিল, না দুটো?

নাঃ, চোখের ভুল। একটাই। আরেকটা বুঝি তার ছায়া—যখন মেঘ সরে জ্যোৎস্না ফুটেছিল মুহূর্তকাল।

ঘাটের পথ দেখিয়ে সত্য লীলার ঘরের দিকে চলে এসেছিল। দরজা ভেতর থেকে যথারীতি বন্ধ। চুপচাপ ফের দেশলাই জেবলে বিড়ি ধরিয়েছিল সে। আর জ্বলন্ত কাঠিটা দরজার সামনে পড়বার সময়—ফের যেন চোখের ভুল, সত্য দেখেছিল—ভেজা পায়ের ছাপ, তখনও জল চকচক করছে।

চোখের ভুল?

আবছায়ায় ঢাকা বারান্দায় হঠাৎ ঝুঁকে সেই পায়ের ছাপের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে হাতটা তুলে নিয়েছিল সত্য। যেন কী ছোঁয়া ছুঁতে যাচ্ছিল সে।

শেষ পা বাড়িয়ে দিয়েছিল। পায়ের তলায় পায়ের জল নিঃশব্দে কী কৈফিয়ৎ দিল, সে বুঝতে পারে নি। কিছু বুঝি বলতে চাইছিল। কিন্তু পুরনো কথা—যা বার বার নতুন হয়ে ফোটে।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছিল। চেষ্টা করেও আর ঘুমোতে পারে নি। লীলা বড়লোকের মেয়ে—তার মত গরীব মানুষের গলায় তাকে ঝুলিয়ে দেবার সাধ হল কেন ওদের—সত্য তবু স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না। নাকি বুঝেছিল? এই দু-তিন মাস সে যেন যাত্রাদলের রাজা সেজে কাটিয়েছে রঙভরা মুখ নিয়ে।

(৭)

তারপর সন্ধ্যায় সত্য ফিরে আসছিল রূপপুরের দিকে। পশ্চিমের আকাশে ঘন মেঘের স্তবক এত উজ্জ্বল লাল হয়ে উঠেছে—যেন বলির মুণ্ডুকাটা এক দল মোষ। কোথাও কালো, কোথাও সিঁদুরে, কোথাও খুনখারাপি রক্ত। বড় বীভৎস আর ভয়ঙ্কর লাগে দেখতে। আর দিনের শেষে সবুজ গাছপালার গায়ে ধুঁয়োর মত কুয়াশার ঘননীল আচ্ছন্নতা জমেছে। দূরে ও কাছে ব্যাঙ ডাকছিল। সোনাগদি ডাকছিল অদ্ভুত শব্দ করে। শেষ পাখির ঝাঁক ফিরে যাচ্ছিল বাঁশবনের দিকে। মাঠে কোথাও কোন লোক নেই। জমিগুলো জলে ভরে আছে। এবার চাষবাস ভালই হবে।

চাষবাসের কথা সত্য কোনদিন ভাবে না, যদিও তার কিছু সামান্য জমি আছে। কিন্তু বৃষ্টি হলে সে চাষাদের মতই খুশি হয়। মাঠের সীমান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে।

আজ সে অন্যরকম চোখে দেখছিল তার চারপাশের পৃথিবীকে। ওই রক্তাক্ত মেঘের বীভৎসতা, পচা মাটির আঁশটে গন্ধ- আর চারপাশে ক্রমশ অন্ধকার নেমে আসছে, যেন বড় সর্বনেশে এক আড়াল তুলে দেওয়া হচ্ছে, কেমন গা ছমছম করছিল তার। পারবে তো শেষ অব্দি?

লীলা এক দল মেয়েকে নিয়ে জমিয়ে রেখেছিল উঠোন। সত্যকে বাড়ি ঢুকতে দেখে সে গ্রাহ্য করল না। একবার মুখ তুলে দেখেই ফের জের টানল। এ লীলা রূপপুরের লীলা।

সত্য টিউবওয়েলের কাছে গেল। নিবিষ্ট মনে হাত-পা ধুল। গায়ের জামা খুলে ফেলল। তারপর বারান্দায় চেয়ার টেনে বসল। সুখেনের কাছে যাওয়া হয় নি, কেন হয় নি—তার কৈফিয়ৎটা যা দেবে, তা ফের শানাচ্ছিল মনে মনে। সুযোগ খুঁজছিল সে। বোমাটা তাতাচ্ছিল।

ঘন্টার মা একে একে হেরিকেনগুলো জেবলে দিয়ে গেল। হরু একবার এসে এদিক-ওদিক ঘুরে, সত্যর দিকে চেয়ে প্রণাম করে, ফের বেরিয়ে গেল কোথাও। রাখাল ছেলেটি গোয়ালে গরু বেঁধে এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়েছিল। বাসিনী ঝি তার হাতের তেলোয় তেল ঢেলে দিয়ে বলল, গোয়ালে ধুঁয়ো বেশি করে দিস নে কেন রে? মশার কামড়ে ওরা সারা রাত ছটফট করে।

রাখালটা বলল, ছটফট করে, তুমি বুঝি শুনতে পাও? ঘুমোও তো ব্যাঙের মত নাক ডাকিয়ে।

ব্যাঙের তুলনা দিলে অভ্যাসমত একটা হইচই বাধবার কথা। কিন্তু বাসিনীর মেজাজ আজকাল নরম। গিন্নীঠাকরুণের শোক এখনও সামলে উঠতে পারে নি কিম্বা নতুন গিন্নী লীলারাণীর আমলে অনেক বেশি অধিকার মিলেছে। বাসিনীর হাতে ভাঁড়ারঘরের চাবি। বাসিনী আজকাল বড় বেশি পান খাচ্ছে। ঠোঁট দুটো পিকে প্যাচ-পেচে সব সময়। আর ওর কাপড়ের যা ছিরি হয়েছে পানের ছোপে। এমন কি বালিশটারও। মুখে পান রেখে রাত কাটাচ্ছে বাসিনী। নগদ পয়সা-কড়ির সুবিধে নেই—পানদোক্তা আনতে কুমুঠো চাল অনায়াসে খরচ করতে পারে। তিলে-পাড়ার ওদিকে বরজ আছে পানের। মকু শেখ মাথায় ঝাঁকা নিয়ে উঠোনেই ঢুকতে অভ্যস্ত চিরদিন। আগে স্বয়ং কুমুদিনীর মাপা চালে পান কেনা যেত। এখন তো লীলারাণীর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বাসিনী ইচ্ছেমত কেনে।

তাই বাসিনীর -শুধু বাসিনীর কেন, চাকর-বাকর অন্যান্য লোকজনদের সবারই সুখ। সাধে কি আর ঘন্টার মা বুড়ো গিন্নীর জন্যে চোখের জলটা মুছে শ্বাস টেনে বলে, আহা, এ্যাদ্দিনে এ বাড়িতে সুয্যির আলো এল গো!

তবে একটা ব্যাপার থেকে গেল। টিঁকল।

যে রাজ্যে পুরুষ নেই, মেয়েরাই কর্ত্রী, তার নাম ছিল প্রমীলা রাজ্য। ওরা ভেবেছিল মুনিব বদল হয়ে এবার পুরুষের রাজা হবার কথা। জামাই সত্যচরণ কেমন লোক হবে কে জানে। কিন্তু শেষ অব্দি দেখা গেল, লীলারাণীই রাণী। সত্যচরণ রাজা হতে পারল না। হয়ত ইচ্ছে নেই, নয়ত বৌর কেনা চাকর। ওই ঘন্টার মত।

এ বাড়ির চাকর পুরুষগুলো বড় অদ্ভুত। বাড়ি ঢোকে নিঃশব্দে। মুখ খোলে কম। পুতুলের মত এদিকে-ওদিকে কী সব করে বেড়ায়—সেটা সত্যি সত্যি কোন কাজ, না কিছু খুঁজে বেড়ানো—বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা মুশকিল। যেমন এসেছিল, তেমনি চলে যায়। চোখ তুলে তাকালে মনে
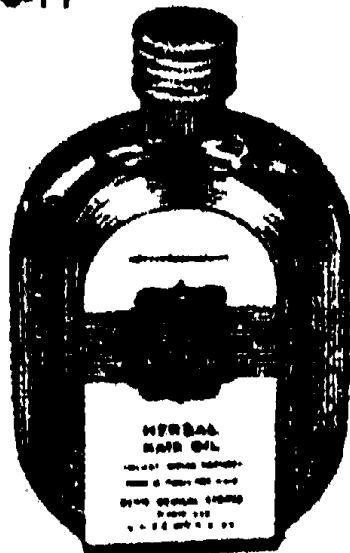
হয়......যা মনে হয়, তা ঝিয়া মুখ ফুটে নিঃসংকোচে বলে, বলদ! বলে, তখন থেকে বলছি কথাটা, বুঝতেই পারে না বলদটা। আর বাসিনী তো বাঘিনীর মত হাঁকরায়, বলি ওরে বলদা, ওরে মুখপোড়া, রাধু কবরেজের বাড়ি গিয়েছিলি?

কথাটা ঘন্টাকে বলা। ঘন্টা একটা গরিলার মত মানুষ। কালচে চামড়া গায়ের, ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল, থ্যাবড়া নাক— তার ওপর হাত দুটো বেজায় লম্বা। যখন হেঁটে যায়, মাটিতে ধুপ ধুপ শব্দ ওঠে।

আঁতুড়ঘর থেকে ওকে শেয়ালে চুরি করেছিল নাকি। ঘন্টার মা বলে, তখন এ রূপপুরে আরও জঙ্গুলে গেরাম ছিল। ঘরের চারপাশে বনবাদাড়। আঁতুড়ের গা-লাগা বাঁশের বন আর নাটা ঝোপ। শেয়ালের দোষ নেই বাছারা!...তবে কথাটা হচ্ছে কি না, বোঝলেন গো জামাইদাদা, মা ভগবতীই এসেছিলেন আদতে।

মা ভগবতীর কী উদ্দেশ্য ছিল কে জানে. ঘন্টার কাজ গোয়ালে দুধ দোহাবার— সে মা ভগবতীদের গোপনে যা শোষণ করে, তাতে গায়ে কাঁটা দিত নাকি কুমুদিনীর। স্বয়ং কুমুদিনী দরজায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। তবু ঘন্টা চিমসে পেট নিয়ে গোয়ালে ঢুকে বেরিয়ে আসবার সময় পেটকে ঢাক করে ফেলেছে! গাভীর তলপেটের নীচে দৃষ্টি পৌঁছানো সহজ কথা নয় কুমুদিনীর পক্ষে। কারুর পক্ষেই নয়।

তাই ঘন্টার স্বাস্থ্যটি অসম্ভব ভালো। আর, এখন তার বিশেষ সুদিন এসে গেছে। এ সংসার এখন তার কাছে দুধের সংসার।

আর লীলার কাছে?

পায়ের কাছে হেরিকেন জ্বলছিল। সত্য লীলার নতুন সংসারকে খুঁটিয়ে দেখবার বা জানবার চেষ্টা করছিল। কাকেও ধাক্কা দিতে হলে তার দাঁড়ানোর জায়গাটাও বুঝে নিতে হয়। পড়ে যাবে, না সামলে নেবে, পরখ করতে হয়।

নাঃ, পড়ে যাবে না লীলা। ওর আশে-পাশে কোন গহবর নেই। শুধু ঝাঁকুনি লেগে হয়ত বা বিরক্ত হবে মাত্র; নয়ত সরে যাবে একটু তফাতে। পাল্টা আক্রমণ করতেও পিছপা হবে না।

সত্য ভীষণ ঘামছিল।

কী অদ্ভুত আচরণ লীলার। লোকটা যে জলকাদা ভেঙে এতখানি পথ ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ঢুকল, তার দিকে এতটুকু লক্ষ্য নেই। বামুনবাড়ির মেয়ে লতা শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরেছে, একশো মুখে সেখানের গল্প করে চলেছে, লীলা হাঁ করে শুনছে। বাড়িভরা ভাশুর-দেওর-ননদ লতার। শ্বশুর রেলে চাকরী করেন। খুড়োশ্বশুর ব্যবসা করছেন। স্বামী এখনও বেকার— তবে শীগগীর বাবার পাশে ওই রেলেই কাজ পেয়ে যাবার আশা আছে।...তদ্দিন, লতা বলছিল, তদ্দিন অবিশ্যি একটু হেনস্থা সয়ে থাকতেই হবে।

লতা লীলার চেয়ে সুন্দর। হেরিকেনের আলোয় ওর মুখটা দেখা যাচ্ছিল। হার চিকচিক করছিল গলায়। লীলা ইতিমধ্যে হারটা একবারে হাতে নেড়ে দেখে নিয়েছে। বলেছে, ভরি-দুই সোনা হবে। নাকি?

লতা বলেছে, কে জানে। আচ্ছা লীলাদি, আপনি কিছু পরেন না কেন?

লীলা হাসছিল। জবাব দেয় নি।

সত্যর সংসারে লীলা দারুণ সেজে-গুজে থাকত। সব সময় গা-ভরতি গয়না, মুখে প্রসাধন, সিঁথিভরা সিঁদুর, ঝকঝকে শাড়ি। পান থেকে চুন খসে নি। আর রূপ-পুরে এসে যেন বা মায়ের শোকে এত শৈথিল্য তার সাজসজ্জায়।

আসলে সময় পায় না। পাচ্ছে না এখনও। সংসারটা গুছিয়ে হাতের মুঠোয় আনতে দেরী আছে কিছু।

সত্যর এই ধারণা।

এতক্ষণে লীলা উঠল। মেয়েগুলো কিলবিল করে চলে গেল। সত্য তখন অন্য একটা কথা ভাবছিল। লীলা ইচ্ছে করে লতার সঙ্গে (অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গেও) আলাপ করিয়ে দিতে পারত। যত পাড়াগাঁ হোক, এটুকু সচরাচর ঘটে থাকে। প্রথাও আছে। লীলা কিন্তু কোনদিনই করে নি। এমন কি বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলার সময়ও নয়। লীলা কি সত্যকে অন্য মেয়ের ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না? তার মানে লীলা তাকে যথার্থ ভালবাসে?

আপন মনে খিক-খিক করে হেসে ফেলল সত্য।

লীলা পাশে এসে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে বলল, বাব্বাঃ; সব ছিনে জোঁকের মত সেই বিকেল থেকে লেগেছিল। ছাড়বার নাম নেই!

এটা নিছক কৈফিয়ৎ। সত্য বুঝতে পেরে হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বলল, আমি এসেছি ঠিক সওয়া সাতটায়। এখন সাড়ে আট।

ইতিমধ্যে রূপপুরে প্রগাঢ় অন্ধকার নেমেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। তক্ষক ডাকছে। ব্যাঙ ডাকছে। উঠোনের এক কোণে চাকর-মুনিশদের পাত পড়েছে। ও বারান্দায় হেরিকেন ঝুলিয়ে দিয়েছে ঘন্টার মা। বাসিনীই ভাত বাড়ছে। বাইরের লোকের জন্যে যা রাঁধতে হয়, সেই রাঁধে। মনিবদের অন্ন মনিবরা নিজেই প্রস্তুত করেন। এই আদ্যিকালের প্রথা। ভিতরে-বাইরে উনুনও সেজন্যে পৃথক আছে।

কিন্তু যা ভেবেছিল সত্য, লীলা সুখেনের কথা জিগ্যেস করবে, করল না মোটেও। হয়ত এ এক লীলা লীলারাণীর। এ-লীলা সে গত দু-তিনটি মাস খেলছে হয়ত। কোনদিনই যেচে পড়ে সুখেনের কথা তো জিগ্যেস করে নি। লীলা বলল, রান্না করি নি। শরীর ভাল নেই। একটু দুধ খেলেই চলে যাবে আমার। তুমি?

সত্য নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিল, খেয়ে এসেছি।

লীলা একটু হাসল। সে তো দুপুরে বাড়ি খাওয়া দুপুরবেলা। এখন কি আর তা পেটে আছে? বরং লক্ষ্মীটি...লীলা একটু ঘন হয়ে দাঁড়াল কাছে...বরং চিঁড়ে আর দুধ খেয়ে নাও রাতটুকু। এখানে এসে কী যে হয়েছে, রান্নাবান্না, একটুও ভাল লাগে না।

কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে ঠিক নয়। আজ লীলাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আলস্যের আভাস ওর সর্বাঙ্গে। কিছু কি ঘটেছে সত্যর যাবার পর? সত্য বলল, ঠিক আছে। সে যা হয় করা যাবে। তুমি যা খাবে, খেয়ে এস। জরুরী কথা আছে।

পাগল! লীলা বলল।...তুমি খাবে না, আমি খাবো কী?

লোকগুলো চলে না গেলে বোমা ফাটানো যাবে না। অবশ্য বাসিনী ওদিকের ঘরে শোবে। ঘন্টার মা বাড়ি চলে যাবে। কেবল ঘন্টা শোবে সদর দরজার লাগোয়া খুপরিটায়। বাইরের ঘরে—যেখানে অতিথি অভ্যাগতদের থাকবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে হরু শোয়।

তাহলেও কোন অসুবিধে নেই সত্যর পক্ষে। কেউ শোনে তো শুনবে। রূপপুরের সঙ্গে যখন সম্পর্ক ছেদ করার মতলব, তখন ওসব শোনাশুনি জানাজানি গ্রাহ্যও করে না সত্য। তাছাড়া, তাতে যদি লীলার কলঙ্ক রটে তো রটুক। সেও একটা বড় শাস্তি।

তবু ঈষৎ দ্বিধা লাগে। মনে হয়, একটা সুন্দর শান্ত অব্যাহত সংসারযাত্রা নাড়া দিতে চলেছে সে। বরং নিঃশব্দে চলে যাওয়াই ভালো ছিল না কি?

সত্য বলল, আমি খাবো না।

লীলা হাত ধরে টানল এবার। কেন? রাগ করেছ, এতক্ষণ আসি নি বলে? দেখ, অবুঝের মত কথা বলো না। বাড়িভরা মেয়েরা রয়েছে, তুমি আসামাত্র ওদের ফেলে চলে আসব—ওরা সব কী ভাববে বল তো? আর, এ বাড়ি ঘর-সংসার আমার না তোমার? বাড়ির মালিক বাড়ি আসবে। ঝি-চাকরকে হুকুম করবে। না তো পরের মত চুপচাপ বসে থাকা। কী মানুষ তুমি!

কত লীলা জানো তুমি লীলারাণী! সত্য মনে মনে বলল। জবাব দিল না লীলার কথার।

লীলা বলল, কই, ওঠো। ছিঃ, ওরা কী ভাববে!

এবার সত্য একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আছে। ঘরে চল আগে।

হেরিকেনের আলোয় লীলার মুখটা হঠাৎ কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। ভ্রু কুঁচকে সে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত সত্যর চোখের দিকে— নিষ্পলক। তারপর সেই চমক সামলে নিয়ে হেসে ফেলল সে। বলল, এমনভাবে বললে যে গা শিউরে উঠেছে শুনে। না জানি কী সাংঘাতিক কথা যেন। সুখেনবাবুর ব্যাপার তো?

সত্য ঘাড় নাড়ল।

বেশ তো। সে বিছানায় শুয়ে শুনব। তবে একটা কথা—তুমি যাবার পর আমার কিন্তু অমা রকম ইচ্ছে হয়ে গেছে। ওঠো, খেয়ে নেবে আগে। তারপর সব বলব।

সত্য মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সুখেনের কাছে যাই নি।

লীলা কিন্তু মোটেও চমকাল না। বলল, ভালো করেছ। কিন্তু ছিলে কোথায় সারাটি দিন?...আর তাহলে খাওয়াও নিশ্চয় জোটে নি। কী অদ্ভুত মানুষ!

বলেই সত্যকে আর কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে সে হনহন করে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ওখান থেকে তার গলা শোনা গেল—বাসিনী, একটু পরে খাবে তুমি। ভাঁড়ারঘর খোল দিকি।......

সেকেলে বিরাট পালঙেক শুয়ে কখন চোখ ভরে ঘুম নেমেছিল সত্যর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বৃষ্টি পড়ছে অবিরল-ধারায়। মুখের উপর হেরিকেন ধরে দাঁড়িয়ে আছে লীলা। বৃষ্টিভেজা কাপড়-চোপড়, মুখে বৃষ্টির ফোঁটা, কিছু চুলও ভিজেছে—অবশ্য পিঠের দিকে একটা গামছা চাপানো আছে। লীলা তাকে ডাকছিল।

সত্য উঠে বসল ধড়মড় করে।

লীলা বলল, চল। রান্না হয়ে গেছে। আলুভাতে করেছি। ঘি মাখিয়ে খাবে। রাতদুপুরে আর কী করব বলো!

সত্য হঠাৎ ওর হাতটা ধরল। একটু ঝুঁকে, বদ্ধোন্মাদ মানুষের মত লাল কোটরগত চোখ, তীব্র চাহনি, কাঁপানো ঠোঁট—সে কী একটা বলবার চেষ্টা করল। এবং সেই সময় বাইরে একটা তীব্র চিৎকার—সম্ভবত ঘন্টার কন্ঠস্বর, চোর চোর... হরুর গলাও শোনা যাচ্ছিল। বাসিনী ঘন্টার মা—ওদিকে জনাকয় অন্য গ্রামের মজুর মরশুমী চাষাবাদের জন্যে এ-বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে, তারাও—এত প্রচন্ড হট্টগোল শুরু করেছে যে সত্যকে লাফ দিয়ে নামতে হল বিছানা থেকে।

গ্রামের লোক জাগতে দেরী হয় নি। কিন্তু চোরের পাত্তা নেই। ঘন্টা দিব্যি কেটে বলল, আমি দেখেছি স্বচক্ষে। পাঁচিল বেয়ে উঠছিল।

হয়ত চোর। হয়ত চোখের ভুল।

লীলা বলল, যাইহোক, এবার শীগগীর একটা বন্দুকের জন্য দরখাস্ত করো। যে জংলী গ্রাম, চোর-ডাকাতে কেটে রেখে যাবে কোনদিন।

হরু শাসাচ্ছিল ঘন্টাকে। শালা মামদোটার এক বিচ্ছিরি অভ্যেস। যখন-তখন রাতদুপুরে চেঁচামেচি করবে। দিলে সুখের ঘুমটা নষ্ট করে!

শেষে জানা গেল, ঘন্টা এর আগেও অনেকবার এমন করেছে। রাখালের সেই পালে বাঘ পড়ার গল্প একেবারে। শেষ অব্দি সত্যি সত্যি চোর-ডাকাত এলে তখন হয়ত কেউ এদিকে ছুটে আসবে না।

না আসুক। লীলা ফের বলল। একটা বন্দুক হলেই চলবে আমাদের। কালই তুমি ব্যবস্থা করো।

সত্য জবাব দিল না। লীলা তাহলে হঠাৎ মত বদলেছে?

ঘন্টার মা ওদিকে হরুকে বোঝাচ্ছে, বাছার আসলে ওটা স্বপ্নদোষ, বুঝলে হরুদা?

বাসিনী লীলার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। লীলা বাসিনীকে লুকিয়ে সত্যর দিকে চোখ টিপে হাসছিল। স্বপ্নদোষের কথায় নির্দোষ হাসি। সত্যর মন সেদিকে নেই। চোর-কান্ডের সমারোহ শেষ হলে সে ফের মূল ভাবনায় চলে গেছে। ব্যাটা চোরও যেন নিয়তির হাতের যন্ত্র। মুখের কথা ফুটতে দিল না।

বাসিনী জামাইবাবুকে শুনিয়েই ফিস-ফিস করে অন্য একটা কথা বলছিল। ঘন্টার মায়ের সম্পর্কে। মদন নাপিতের সঙ্গে ওর একটা পুরনো 'নটাঘটা' রয়েছে। ঘন্টাও নাকি সেটা জানে। ও'ৎ পেতে পড়ে থাকে ছোঁড়া। আর মদনের যখন যাবার সময় হয়, তখনই চেঁচিয়ে ওঠে। বাসিনী বলছিল, দু' চক্ষের কিরে, আমি দেখেছি বরাবর। বলি নে কাকেও। এ্যাদ্দিনে বললাম। তা ছোঁড়াটার মজা দেখ দিদিঠাকরান, এটা একটা মস্করা নয়? বলো তুমি!

লীলা বলল না। সরে এল ওখান থেকে। সত্যকে ডাকল, চলো। নাকি এ বারান্দায় পাত পেড়ে দিই! থাক্ আর কাদায় নেমে কাজ নেই।

সত্য গোঁ ধরে বলল, কিন্তু আমি বলেছি তো, খাবো না কিছু।

কী বলছ যা-তা! লীলা কাঁদোকাঁদো মুখে বলল। এতক্ষণ রান্না করলাম...

তুমি খেয়ে নাও।

লক্ষ্মীটি, এবারের মত ক্ষমা করো—যদি কোন দোষ করে থাকি।

সত্য স্থির দাঁড়িয়ে বলল, লীলা, কেলেঙ্কারী করো না। আমার খিদে নেই।

তুমি সারাদিন কিছু খাও নি। খিদে আবার নেই?

শরীর খারাপ। খেতে ইচ্ছে নেই।

বাসিনী একটা কিছু অনুমান করছিল অদূরে দাঁড়িয়ে। এবার বলল, শরীর খারাপ থাকলে তো তাই বটে জামাইদাদা। তবে দিদিঠাকরানকে উপোস করাবেন কেন? একমুঠো মুখে দিয়ে নিন।

সত্য বলল, তা কেন? ও থাক্ না।

জিভ কেটে বাসিনী বলল, এ মা। সে কি হয় নাকি গো?

সত্য জবাব দিল, যদি আমার ওলাওটা হয় তো ও কি করবে?

এরা দুটিতে জবাব শুনে কাঠ। পরক্ষণে সত্য হনহন করে গিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর বাসিনী চাপা স্বরে বলল, কি হয়েছে? ঝগড়া করেছ নাকি?

লীলা জবাব দিল না। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর রান্নাঘরের শেকল তুলে দিয়ে নিঃশব্দে চলে এল উঠোন পেরিয়ে।

সত্য বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে বিড়ি টানছিল। লীলা দরজা বন্ধ করে মেঝেয় ধুপ করে শুয়ে পড়ল। সত্য উঠে বলল, নীচে কেন? তোমার খাট-পালংক পড়ে রয়েছে, নীচে শোবার কী দরকার?

জবাব না পেয়ে উঠে এল সে। দু হাতে লীলাকে তুলে বিছানায় এনে শুইয়ে দিল। বলল, যে কথা বলতে বাধা পড়ে, সেকথা বলতে নেই। তাই বলতেও আমি চাই নে। কিন্তু তুমি কি এখানেই থাকবার মতলব করেছ নাকি? রাণীচক যাবে না?

লীলা উপুড় হয়ে শুল। জবাব দিল, না। স্পষ্টত সে কাঁদছিল। কাঁদা স্বাভাবিক তো বটেই।

সত্য বলল, তাহলে আমি?

তোমার খুশি।

ও। আচ্ছা।

দ্রুত আলনা থেকে জামাটা নিয়ে পরল সত্য। বালিশের নীচেটা খুঁজে ঘড়ি বের করে হাতে বাঁধল। রুমাল জড়াতেও ভুলল না। বাকসোয় তার কিছু কাপড়-চোপড় আছে—লীলারও আছে। বলল, বাক্সোর চাবি দাও। কাপড় নেবো।

নিঃশব্দে চাবি ছুঁড়ে দিল লীলা আঁচল থেকে খুলে।

পারল? সত্য চমকে উঠছিল প্রতি মুহূর্তে। ভেবেছিল স্বামী-স্ত্রীর জীবনে একটা চরম জায়গা থাকে, থাকে একটা চরম সময়—যখন উভয় পক্ষই নড়ে ওঠে। আঘাতে বেদনায় জর্জর হয়ে শেষে ফের একাকার হয়ে ওঠে।

হল না।

ক্ষিপ্র হাতে কাপড় বের করতে গিয়ে হঠাৎ ক্ষেপে গেল সত্য। থাক্। কী হবে?

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে। লীলা মুখ তুলেও দেখল না। আর বৃষ্টি ঝরছিল ঝিরঝির করে। আকাশ কালো হয়ে ছিল মেঘে। ঝিঁঝি ডাকছিল। তক্ষক ডাকছিল। ব্যাঙ ডাকছিল। অন্ধকার রূপ-পুরের কাদায় ভরা পিছল পথে টলতে টলতে সত্য রাণীচকের দিকে এগোল।

(ক্রমশ)

দেশে বিদেশে

ভারত-মার্কিন আলোচনা

পাকিস্থানকে রাশিয়ার সামরিক সাহায্য দেওয়া নিয়ে যখন এদেশে সংশয় ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, সেই সময় নয়াদিল্লীতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়ে গেল।

এটা অনেকেই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন, যদিও একথা ঠিক যে এই বৈঠকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নীতির প্রশ্ন আলোচিত হয়নি। কারণ, প্রথমত, ঐ বৈঠক নীতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্যে ডাকা হয়নি; দ্বিতীয়ত, এখনো এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়নি যখন রাশিয়া সম্পর্কে ভারতের নীতির পরিবর্তন দরকার হতে পারে তাছাড়া, এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল পাকিস্থানকে রাশিয়ার অস্ত্র সাহায্য দেবার কথা জানাজানি হবার আগে। নানা কারণে পেছতে পেছতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঠিক সেই সময় যখন রাশিয়ার মতিগতি সম্পর্কে একটা সংশয়িত বিতর্ক চলছে, এই মাত্র।

তাহলেও যোগাযোগটা লক্ষণীয়। এবং পরে জানা গেছে রুশ অস্ত্র সাহায্যের প্রশ্নটি বৈঠকে উত্থাপিত হয়েছিল। কি আলোচনা হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি, তবে ভারত মার্কিন প্রতিনিধি দলের কাছে এ সম্পর্কে তার উদ্বেগের কথা জানায়।

ভারতের এই উদ্বেগ অকারণ নয়। গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দরাজ হাতে পাকিস্থানকে আধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করে এসেছে। এর ফলে পাকিস্থানের মনোভাব ক্রমেই আরো বেশি জঙ্গী হয়ে উঠেছে যার পরিণতি ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে। এ ছাড়া পাকিস্থান গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য পেয়েছে চীনের কাছ থেকেও। এখন যদি রাশিয়াও তাকে আধুনিক ও উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে আরম্ভ করে, তাহলে তার জঙ্গী মনোভাব আরো কঠোর হতে বাধ্য এবং তার ফল ভোগ করতে হবে একমাত্র ভারতকেই। ১৯৬৫ সালের অভিজ্ঞতার পর রাশিয়ার সিদ্ধান্তে ভারত তাই স্বভাবতই নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

প্রকাশ, এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় প্রতিনিধি দল জানান যে, ভারত বর্তমানে প্রতিরক্ষার জন্যে যে হারে খরচা করছে সেই হার বজায় রাখা তার পক্ষে একান্ত দরকার। মার্কিন প্রতিনিধি দল নাকি ভারতের এই বক্তব্যের সারবত্তা মেনে নিয়েছেন।

যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে এই বৈঠক থেকে একটা সুফল ফলতে পারে। এই বৈঠক যখন আরম্ভ হয় তার কিছুদিন আগে মার্কিন কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেন্টে-টিভস প্রেসিডেন্ট জনসনের বৈদেশিক সাহায্য বিল অনুমোদন করেন এই শর্তে যে, যদি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো দেশ নিজের সম্পদ খরচা করে অন্য দেশ থেকে সমরাস্ত্র ক্রয় করে, তাহলে সেই পরিমাণ অর্থ মার্কিন

সাহায্য থেকে বাদ দিতে হবে। এই নিয়েও ভারতে যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার হয়। এই উদ্বেগ আরো বাড়ে, প্রথমে **নিউইয়র্ক টাইমস** ও পরে **বাল্টিমোর সান** কাগজের দুটি রিপোর্টে। তাতে বলা হয়েছে যে, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে কি কি অস্ত্র কিনছে তার তালিকা আমেরিকাকে পেশ করতে বলা হয়েছে। এটা ভারতের পক্ষে খুবই বিব্রতকর এবং এর মধ্যে এই ধারণা অন্তর্নিহিত যে, ভারত তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্যে ব্যয় করছে। এখন যদি দিল্লী বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি দল ভারতের সামরিক ব্যয়ের যাথার্থ্য স্বীকার করে থাকেন, তাহলে একটি অপ্রয়োজনীয় ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটতে পারে।

দিল্লী বৈঠক ২৬ জুন থেকে তিনদিন চলেছিল। এতে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ নিকোলাস কাটজেনবাক এবং ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবলীরাম ভগত।

গত ৩১ জুলাই লোকসভায় এই আলোচনা সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগত জানান, এই বৈঠকের প্রস্তাব আসে আমেরিকার তরফ থেকেই, কেননা আমেরিকা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক প্রশ্নে ভারতের মনোভাব জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তিনি বলেন, "আমরা ভারত ও আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করেছি এবং এই আশা প্রকাশ করেছি যে, এই সম্পর্ক ভবিষ্যতেও ঘনিষ্ঠ থাকবে। মার্কিন প্রতিনিধি দল আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যসূচী সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

শ্রীভগত আরো বলেন, "আলোচনা খোলাখুলি, ঘরোয়া ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা মনে করি এই আলোচনার ফলে উভয় পক্ষই পরস্পরের মনোভাব আরো ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, ভারত ও পাকিস্থানের সম্পর্ক এবং চীন, এই তিনটি বিষয়ও বিশদভাবে আলোচিত হয়। ভারত জানায় যে, পাকিস্থানে আমেরিকার অব্যাহত অস্ত্র সাহায্য এই উপমহাদেশে উত্তেজনা জীইয়ে রাখার অন্যতম কারণ। এই অস্ত্র পাকিস্থান সরাসরি আমেরিকার কাছ থেকেই কিনে থাকুক কি 'ন্যাটো' দেশগুলির মাধ্যমেই সংগ্রহ করে থাকুক, ব্যাপারটা একই রকম দাঁড়াচ্ছে। কারণ এইসব অস্ত্র সবই মার্কিনী, এবং সেগুলি ব্যবহারের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হল ভারত।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার চীন-নীতি নিয়ে আলোচনা হয়। সম্প্রতি মার্কিন খবরের কাগজে এই মর্মে গবেষণা বেরিয়েছে যে, আমেরিকা চীন সম্পর্কে তার নীতি পরিবর্তন করতে পারে। এই গবেষণার উৎস হচ্ছে আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিভিন্ন প্রার্থীদের উক্তি। কয়েকজন প্রার্থী স্পষ্টই মন্তব্য করেছেন যে, চীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক উদারতর করার সময় এসেছে। যদি এঁদের মধ্যে কেউ আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হন তাহলে কি হবে, ভারতীয় প্রতিনিধি দল বৈঠকে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। মার্কিন পক্ষ এ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। ১ আগস্ট শ্রীভগত রাজ্যসভায় জানিয়েছেন, "আমরা এখন চীন সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাবের কথা আরো ভালোভাবে জানতে পেরেছি।"

আরেকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয় ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। ১৯৭১ সালে বৃটেন এই এলাকা থেকে তার প্রতিরক্ষার হাত গুটিয়ে নিলে পরে এই এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তা কিভাবে রক্ষিত হতে পারে এ নিয়ে উভয় পক্ষই তাঁদের মত প্রকাশ করেন। একটি আন্তর্জাতিক গ্যারাণ্টির কথা উঠেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সংশয়ও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, রাশিয়ার সমর্থন এবং চীনের ওপর বাধাবাধকতা ছাড়া কোনো গ্যারাণ্টি কার্যকর করা মুস্কিল।

এই ধরনের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এই প্রথম, এবং প্রথম বৈঠকের সাফল্য দেখে আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে আরো বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই কূটনৈতিক কথোপকথনের ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবার সুযোগ রয়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া-পশ্চিম জার্মাণ সীমান্তে চেক রক্ষীসেনারা দিবারাত্র সীমান্তের ওপর কড়া নজর রাখছে। অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যাতে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যই এই সতর্কতা। —ইউ পি আই ফটো

নতুন 'কনফ্রণ্টাস'

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে 'কনফ্রণ্টেশন' বা মুখোমুখি মোকাবিলা চলছিল, ডাঃ সুকর্ণের পতনের পর তার অবসান হয়েছিল। কিন্তু এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক নতুন কনফ্রণ্টেশনের সূত্রপাত হয়েছে, মালয়েশিয়া ও ফিলিপিনের মধ্যে।

বিরোধের কারণ হল মালয়েশিয়ার অঙ্গরাজ্য সাবা। ১৯৬৩ সালে যখন মালয়েশিয়া গঠিত হয় তখনই সাবার ও ফিলিপিন্স দাবী জানিয়েছিল এবং এ নিয়ে দু' দেশের মধ্যে যথেষ্ট উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিল। এই নিয়েই এখন আবার বিরোধ দানা পাকিয়ে উঠেছে। বিরোধ মীমাংসার জন্যে সম্প্রতি ব্যাঙ্ককে দু' দেশের মধ্যে যে আলোচনা ডাকা হয়েছিল, তা ব্যর্থ হয়। তার পরেই ফিলিপিন্স মালয়েশিয়া থেকে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত করে। ফলে মালয়েশিয়াও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

এখন খবর পাওয়া যাচ্ছে, ফিলিপিন্স সশস্ত্র বাহিনী তাদের দশ লক্ষ রিজার্ভ সৈন্যকে তলব করে নির্দেশ জারী করেছে।

দক্ষিণ ফিলিপিন্সের অধিবাসীদের মতো সাবার অধিবাসীরাও হচ্ছে সুলু মুস্লিম। এরা এখন তাদের "দীর্ঘকাল ধরে হারানো এলাকা" উদ্ধারের জন্যে জেহাদের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্যে তারা ব্রুনেইর বিদ্রোহী নেতা জেনারেল আবাং কিফলিকে অনুরোধ করেছে বলে জানা গেছে। তাদের বক্তব্য সুলু সুলতান গত শতাব্দীতে সাবা বৃটিশের কাছে কেবল লীজ দিয়েছিলেন, পুরোপুরি দিয়ে দেননি। সুতরাং বৃটিশ চলে যাবার পর ঐ এলাকা ফিরে পাবার অধিকার তাদের আছে।

ম্যাকনামারার বদান্যতা!

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

রবার্ট ম্যাকনামারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব ছিলেন। সেখান থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ওরফে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

তিনি সেদিন ঘোষণা করেছেন যে, ২রা আগস্ট থেকে বিশ্বব্যাঙ্কের সুদের হার সিকি শতাংশ বাড়িয়ে বছরে ৬·৫ শতাংশ করা হবে। বিশ্বব্যাঙ্ক যে ঋণ দেন তার জন্য তারা এর আগে আর কখনও এত চড়া হারে সুদ দাবী করেন নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গঠিত এই বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সদস্য হচ্ছে পৃথিবীর ১০৯টি রাষ্ট্র। এই ব্যাঙ্কের মারফৎ পৃথিবীর সচ্ছল রাষ্ট্রগুলির টাকা খাটে। সেই টাকা বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ঋণ হিসাবে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে বিলি করেন।

বিশ্ব-ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্ত পৃথিবীর দরিদ্র, অধমর্ণ দেশগুলিকে গুরুতররূপে আঘাত করবে। বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের মারফৎ যে পরিমাণ অর্থ কর্জ দেওয়া হয় তার ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে, খাতক দেশগুলিকে বছরে প্রায় কুড়ি লক্ষ ডলার বেশী সুদ গুনতে হবে।

ভারতবর্ষকে বর্তমান বছরে বিশ্ব-ব্যাঙ্ককে আসল ও সুদ বাবদ যে টাকা দিতে হবে তার পরিমাণ হচ্ছে, আসল—২৫৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, সুদ ১৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। এই অঙ্ক থেকে বোঝা যাবে, বিশ্বব্যাঙ্কের সুদ বৃদ্ধির চাপ ভারতের উপর কতখানি পড়বে।

ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ম্যাকনামারা বলেছেন যে, সুদের হার বাড়াবার প্রয়োজন হচ্ছে, এটা দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে ব্যাঙ্কের আমানত জোগাড় করার খরচ এত বেড়ে গেছে যে, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

গত ডিসেম্বরেই বিশ্বব্যাঙ্কের সুদের হার এক দফা বাড়িয়ে শতকরা সওয়া ছয় করা হয়েছিল। ব্যাঙ্কের পরিচালক পরিষদের কয়েকটি সদস্যরাষ্ট্র সে-সময়েই ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা সাড়ে ছয় করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

পৃথিবীর স্বচ্ছল দেশগুলি দরিদ্র দেশগুলির অবস্থার উন্নয়নের জন্য 'সাহায্য' দেওয়ার কথা প্রায়শই জোরগলায় বলে থাকে। বিশ্বব্যাঙ্কের সুদের হার বৃদ্ধি এইসব ঘোষণার অসারতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের বৈদেশিক ঋণের সমস্যা ও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সমস্যাটিকে অনেক কঠিনতর করে তুলবে।

ঠিক এই সময়েই ওয়াশিংটন থেকে সংবাদ এসেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিনেটে যে বৈদেশিক সাহায্য বিল গৃহীত হয়েছে তাতে মোট মাত্র ১৯৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার সাহায্য অনুমোদন করা হয়েছে। মার্কিন বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ গত ২০ বছরের মধ্যে এত কম আর কখনও হয় নি।

স্পষ্টতই ভিয়েতনাম যুদ্ধের খরচ যোগাতে গিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বৈষয়িক সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার ধাক্কা সামলাবার জন্য তাকে এইভাবে বৈদেশিক সাহায্যের কর্মসূচী ছাঁটাই করতে হচ্ছে। মার্কিন অর্থসাহায্যের বৃহত্তম গ্রহীতাদের অন্যতম ভারতবর্ষের উপর এই ছাঁটাইয়ের প্রতিক্রিয়া যে বড় করেই দেখা দেবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সবচেয়ে বড় আশঙ্কা যেখানে দেখা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে, বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সুদের হার বৃদ্ধি যে এখানেই থামবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আন্তর্জাতিক মূলধনের বাজার এখনও তেজী, সেখানে বাড়তির কোন লক্ষণ নেই। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক যদি অপেক্ষাকৃত সহজ শর্তে মূলধন সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে তাঁদের হয়ত আবার সুদের হার বাড়াতে হতে পারে।

বিশ্বব্যাঙ্কের পরিচালকরা সম্প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, ব্যাঙ্কের সুদের চড়া হার উন্নতিকামী দেশগুলির পক্ষে গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি করবে। কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে প্রতিকার কিছুই করতে পারছেন না। কেননা, পশ্চিমের যেসব দেশ থেকে বিশ্ব-ব্যাঙ্ককে আমানত সংগ্রহ করতে হয়, তারা ব্যাঙ্কের সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে রাজী নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বিনা সুদে দীর্ঘমেয়াদী পরিশোধযোগ্য ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বিত্তশালী পশ্চিমী দেশগুলি সেই সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাঁদা না দেওয়ায় এই সংস্থার ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত।

এই অবস্থায় স্বভাবতই পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে প্রশ্ন উঠবে যে, বিশ্বব্যাঙ্ক যদি দরিদ্র দেশগুলির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাবার মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে থাকে, এই ব্যাঙ্ক যদি পশ্চিমী পুঁজিপতিদের পুঁজি খাটাবার একটা সংস্থায় পর্যবসিত হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাঙ্কটিকে এভাবে জীইয়ে রাখার প্রয়োজন কি।

পরবর্তী আর একটা সংবাদে প্রকাশ যে, বিশ্ব-ব্যাঙ্কের পরিচালকরা ব্যাঙ্কের আয় থেকে সাড়ে সাত কোটি ডলার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাকে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত সংস্থার শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে আবার কিছুটা অর্থের সংস্থান করবে। কিন্তু এই সংস্থার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন বছরের চাঁদা বাবদ যে ৪৮ কোটি ডলার পাওয়ার আশা ছিল সেটা এখন মার্কিন বৈদেশিক সাহায্যের কর্মসূচী ছাঁটাই করার ফলে অনিশ্চিত হয়ে গেছে।

রাজধানীর ইতিকথা

বিনা ভাড়ার, মুফতে এয়ার কণ্ডিশনড ইম্পালা থেকে ফার্নিচার বিছানাপত্র পর্যন্ত। সেবা আর হুকুম তামিলের জন্য শত-সহস্র কর্মচারী! সুতরাং কোন বুদ্ধিমান লোক পাঁচ হাজার টাকার এই সরকারী পুরুত ঠাকুরের চাকরি অপছন্দ করবেন?

বছর দশেক আগেকার কথা। সবে দিল্লী এসেছি। আমার মনে হৃদয়ে তখন অগাধ ভক্তি। কোন একজন এম পি, মিনিস্টার বা গভর্ণর দেখলেই আমার হৃদয়-গঙ্গায় ভক্তির প্লাবন দেখা দিত। নিত্যকার মত সেদিনও পন্থজীর বাড়ীতে বসে আছি। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের ছ'নম্বর কিং এডওয়ার্ড রোডের বাড়ীর বাঁ-দিকের ঘরে বসে পন্থজীর দক্ষিণহস্ত জানকীবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি। চা খাচ্ছি, সিগরেট ফুঁকছি। ইতিমধ্যে টেলিফোন বেজে উঠল।

জানকীবাবু বল্লেন, ইয়েস প্লীজ? কে? গভর্ণর অফ—?

অপারেটরের কথা আমি শুনতে পেলাম না। তবে জানকীবাবুর কথায় বুঝলাম কোথাকার গভর্ণর।

'কি বাবুজির সঙ্গে কথা বলাবেন? একটু ধরুন।'

জানকীবাবু রিসিভার নামিয়ে রেখে পন্থজীর ঘরে গেলেন। এক মিনিট পর ফিরে এসে রিসিভার তুলে নিলেন, 'বাবুজি জানতে চাইলেন কি কথা বলতে চান।'

জানকীবাবু কান পেতে শুনে নিলেন গভর্ণর সাহেবের প্রয়োজনের কথা, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঐসব আলোচনার জন্য আপনি পরশু দিল্লী আসবেন? একটু ধরুন।'

জানকীবাবু আবার রিসিভার নামিয়ে পন্থজীর ঘরে গেলেন, ফিরে এলেন। 'বাবুজি বল্লেন, ওর জন্য আপনার দিল্লী আসার দরকার নেই। বাবুজি যা বলার তা করবেন।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! গভর্ণর অত দূর থেকে ট্রাঙ্ক-কল করলেন অথচ পন্থজী কথা বল্লেন না? দিল্লী আসার অনুমতি পেলেন না? পন্থজী ওঁর সঙ্গে আলোচনা করতেও রাজী হলেন না। লাটসাহেব জানকীবাবুর কাছ থেকে পন্থজীর আদেশ জেনে নিলেন।

মনে মনে বড় আঘাত পেলাম লাটসাহেবের দুর্গতি দেখে। ক্রমে ক্রমে দেখলাম প্রায় সব লাটসাহেবই প্রথমে এসে সেলাম দিতেন জানকীবাবুকে, তাঁরই ঘরে বসে আড্ডা দিতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর কেউ বিগ্রহের দর্শন পেতেন দু-চার মিনিটের জন্য, কেউ পেতেন না। অধিকাংশই হেডপাণ্ডা জানকীবাবু বা পন্থজীর কোনো না কোনো আত্মীয়স্বজনকে তোয়াজ করেই ফিরে যেতেন রাষ্ট্রপতি ভবনের অতিথিশালায়।

পরবর্তীকালে শাস্ত্রীজী যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন অধিকাংশ মহামান্য রাজ্যপালকেই ঐ ছেঁড়া তাঁবুর অফিস ঘরের ভাঙা চেয়ারে বসে আড্ডা দিতে দেখেছি পাণ্ডাদের সঙ্গে। মুহূর্তের জন্য বিগ্রহ দর্শন হলেই মহামান্যের দল ছত্রিশ পাটি দন্ত বিকশিত করে হেঃ-হেঃ করতেন। লক্ষ্য করতাম এক নম্বর মতিলাল নেহরু প্লেসের ঐ বাড়ীতে প্রায় কোন রাজ্যপালই রাষ্ট্রপতি ভবনের গাড়ী চড়ে ঢুকতেন না। গেটের বাইরে গাড়ী থেকে নেমে পড়তেন।। গাড়ী জনপথের প্রশস্ত ফুটপাথের পাশে পার্ক করা থাকত। এ-ডি-সি? পন্থজী-শাস্ত্রীজীর বাড়ীতে এ-ডি-সি?

কয়েকটি রাজ্যে খিচুড়িফ্রন্টের অপ্রত্যাশিত জন্ম, আকস্মিক মৃত্যু ও বার্ধক্য-প্রপীড়িত কংগ্রেসের স্রোতিষ্বন্দ্বের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়েছে। এই ক'টি রাজ্যের রাজ্যপালরা নেহাতই ভাগ্যবান। তুঙ্গী-বৃহস্পতি এদের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা করেছে। তবে এমন দিন তো চিরকাল থাকবে না, থাকতে পারে না। এক মাঘে তো শীত হয় না, ফুরিয়ে যায় না। অন্যান্য রাজ্যপালদের মত এঁরাও আবার রাজভবনের সম্মানিত বন্দী হবেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মত বিদগ্ধ নেতা ও মনীষীরা রাজ্যপাল হয়েছিলেন। তারপর আমরা পেয়েছি শ্রীশ্রীপ্রকাশ, ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির মত পরম গুণী জ্ঞানী, আদর্শবান পুরুষদের। অতীত দিনের সেসব স্মৃতি রোমন্থন করে আজ অনেক রাজ্যের রাজভবনগুলোর দিকে তাকালে দুঃখ হয়। সবাইয়ের কথা বলছি না, তবে মোটামুটিভাবে রাজ্যপালদের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে ভারতবর্ষের রাহুর দশা চলছে।

রাজধানীর ইতিকথা

উমেদারী করে রাজ্যপালের

চাকরি জোগাড় করলে যে,
আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হয়,

সে খবর দিল্লীর অনেকেই জানেন

নিমাই ভট্টাচার্য

ডাক্তাররা যখন মিক্সচারের প্রেসক্রিপসন করেন, তখন তাতে একটু রঙীন সিরাপ মিশিয়ে দেবার কথাও লেখেন। সিরাপ ঔষধ নয়, ওষুধটাকে একটু আকর্ষণীয় করে রোগীর মনোরঞ্জন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে মিক্সচারের সিরাপ হচ্ছেন রাজ্যপাল। সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর দু-চারজন উদ্বৃত্ত জুনিয়র অফিসারকে এ-ডি-সি রূপে আশেপাশে নিয়ে রাজ্যপালের দল সরকারী পুরুত ঠাকুরের কাজ করে বেড়ান। মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বেতনের এই পুরুত ঠাকুরের দল শুধু হিতোপদেশ বিতরণ করেই দিনগত পাপক্ষয় করেন। অবশ্য সবাই নয়। এই পাঁচ হাজার টাকা মাইনের পুরুত ঠাকুরের চাকরি করেও ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষা ও দেশের অসংখ্য যক্ষ্মারোগীদের কল্যাণে যা করেছেন, অন্তত পশ্চিমবাংলার মানুষ তা কোনদিন ভুলতে পারবে না। শ্রী শ্রীপ্রকাশ ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা-আদর্শ প্রচারে যা করেছেন, তারও তুলনা বিরল। আরো অনেকে অনেক কিছু করেছেন।

তবে মোটামুটিভাবে একথা সর্বজনস্বীকৃত যে রাজ্যপালদের মান বড় নেমে গেছে। পার্লামেণ্ট থেকে শুরু করে গণ্ডগ্রামের চায়ের দোকানে পর্যন্ত লাটসাহেবদের নিয়ে রসিকতা করা হচ্ছে। ঠাট্টা, রসিকতা করবে না কেন? উমেদারী করে রাজ্যপালের চাকরি জোগাড় করলে যে আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হয়, সে খবর দিল্লীর অনেকেই জানেন। পন্থজী, শাস্ত্রীজি বা আজকাল নেতাদের বাড়ীতে যাঁদের যাতায়াত আছে, তাঁরা এসব দুর্লভ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন। স্বচক্ষে দেখেছেন নেতাদের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেণ্ট, প্রাইভেট সেক্রেটারীদের সঙ্গে অনেক রাজ্যপালের মস্করা। আমি তো প্রথম প্রথম ভাবতাম এঁরা সবাই ক্লাসফ্রেন্ড।

সোস্যালিস্ট ভারতবর্ষে বেয়ারা-চাপরাশী, ক্লার্ক আর কিছু কিছু নীচুতলার অফিসার রিটায়ার করেন কিন্তু উপর তলার? ওঁরা রিটায়ার করলে আমরা কি দেশ চালাতে পারব? তিন হাজার টাকার চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর পাবলিক সেক্টর এণ্টারপ্রাইজের চেয়ারম্যান বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর হতে সবাই পছন্দ করেন না। ইদানীংকালে অনেকে তাই বোধ হয় রাজ্যপাল হওয়াই বেশী পছন্দ করছেন। পছন্দ করবেন না কেন? ঝুট-ঝামেলা? দায় বা দায়িত্ব? কিছু না। বিনা ভাড়ায় প্রাসাদ, মুফতে এয়ার-কণ্ডিশণ্ড ইমপালা থেকে ফার্ণিচার বিছানাপত্র পর্যন্ত। সেবা আর হুকুম তামিলের জন্য শত-সহস্র কর্মচারী। সুতরাং কোন বুদ্ধিমান লোক পাঁচ হাজার টাকার এই সরকারী পুরুত ঠাকুরের চাকরি অপছন্দ করবেন? কেউ না।

এইত কিছুকাল আগে এমনি একজন ব্যক্তি তিন হাজার টাকার মাইনের চাকরি থেকে রিটায়ার করলেন। চাকুরি-জীবনে সম্ভাব্য সব সম্মান পেয়েছেন, স্বদেশে ও বিদেশে। তবুও আশা কি মেটে? রিটায়ার করার পরও দিল্লী ছাড়লেন না। স্যুট-টাই ছেড়ে র-সিল্কের গলাবন্ধ কোট আর প্যাণ্টলুন ধরলেন। শুরু করলেন সান্ধ্য অভিযান। এম-পি আর মিনিস্টারের পাশে ঘুরঘুর করতে লাগলেন। কি ব্যাপার? কি আবার ব্যাপার? বেশী কিছু না। এই রাজ্যসভার একটা মেম্বার হওয়া আর কি। এত দিনের দেশসেবার অভিজ্ঞতা তো নষ্ট করা যায় না, পার্লামেণ্টের মেম্বার হলে কিছু কাজে লাগান যায়। টোপ ফেললেন কয়েক জায়গায়, দেশসেবার আইডিয়া ছড়ালেন আরো অনেক জায়গায়। কিন্তু পার্লামেন্টের মেম্বার হওয়া খোকার হাতের মোয়া নয়। তাও আবার রাজ্যসভার! জল-কাদা ভেঙে মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দেওয়া নেই পোস্টার-হ্যাণ্ডবিল বিতরণের প্রয়োজন নেই খদ্দর পরে বকবক করার দরকার নেই এবং সর্বোপরি হাজার-হাজার কি লাখ টাকা ব্যয় করার ঝামেলা নেই। স্রেফ একটা নমিনেশন! হলো না। দাদাকে কেউ পার্লামেন্টে আনতে চাইলেন না। অথচ দাদা পার্লামেন্টে এলে দেশের চেহারা কি এমন থাকত? সব পাল্টে যেত। বিলকুল পাল্টে যেত। ভারতবর্ষ সত্যি সত্যিই সোনার ভারতবর্ষ হতো, সুজলাং সুফলাং হতো। আমাদের অদৃষ্ট খারাপ। ভারতবর্ষের অদৃষ্ট খারাপ। তাই দাদা পার্লামেন্টে আসতে পারলেন না।

তবে?

তবে আবার কি? দাদা কি রাগ করে হাল ছেড়ে দেবার লোক? মোটেও না। কাজ বাগাবার বেলায় রাগ করলে চলে? দাদা পাঁচ হাজার টাকা মাইনের সরকারী পুরুতের চাকরি পেয়েছেন।

•

দাদা আর আমাদের চাকরি দেবার চাইতে কজন সত্যিকার শ্রদ্ধাভাজন ভারতবাসীকে রাজ্যপাল করা যায় না? পঞ্চান্নটি কোটি মানুষের এই দেশে কি ভাল মানুষ ফুরিয়ে গেছে?

রাতের শহর

রতনবাবুর ঘাট। সর্বপাপঘ্ন শ্মশান। শ্মশানের শেষে খোলা চাতাল, ঘাট-সিঁড়ি—তারপর কলকাতার বিশাল বুকের ব্যথা নিয়ে বয়ে যাচ্ছে তরলা গঙ্গা। ওপারে, রাতের আবছা পর্দার ভেতর দিয়ে চোখ চালিয়ে দিলে ফুটে ওঠে দ্বাদশ শিব মন্দির—বালী ব্রিজের ওপর দিয়ে দু একটি হেড্‌লাইট ইতস্তত ছুটে যায়। আপনা থেকেই দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার—গোছের একটা ক্ষ্যাপা উদাসভাব মনের মধ্যে চাউরে ওঠে।

কমল একটু ঘন হয়ে আমার পাশে বসল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ফিসফিসে গলায় বলল, 'একটু বড়ো তামাক চলবে নাকি?' আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে প্যাকেটের অবশিষ্ট পাঁচটা চার্মিনারের তামাক কিছুটা করে ঠুকে ঠুকে ফেলে দিয়ে প্যান্টের হিপ্‌-পকেট থেকে একটি পাউচ বের করল। তারপর সেই পাউচ থেকে মিহিন করে গুঁড়োনো কিছু গাঁজা নিয়ে ধীরে ধীরে সিগ্রেটগুলির খালি অংশে ভরে একটি আমাকে এগিয়ে দিল। প্রসাদীর মতো এক-বার কপালে ঠেকিয়ে পেল্লায় টানে গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া ছাড়ছি হঠাৎ কানে এল জোরে জোরে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠের ওঠানামা। ভালো করে ঠাউরে দেখি, ডানদিকে, ঘাট্‌লার একেবারে শেষ সিঁড়িতে বসে একটি বৃদ্ধ নিজের মনে বিড়্‌বিড়িয়ে শ্লোক আউড়ে যাচ্ছে আর বার বার দু হাত কচলে কচলে ধুয়ে ফেলছে। একবার হাত ধোয়া হলে অনেকক্ষণ উদ্বিগ্নভাবে আঙুলগুলো চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। তার-পর, সজোরে মাথা নেড়ে আবার জলের ভেতর দুহাত ডুবিয়ে দিচ্ছে। তারই সঙ্গে একটানা চলছে মন্ত্রোচ্চারণ। অদ্ভুত লাগছিল তার ব্যাপার-স্যাপার। আমার বিমূঢ় ভাবের নাগাল পেয়ে কমল খ্যাক্‌ করে হেসে ফেলে বলল, 'বুঝলেন গুপ্তবাবু, ব্যাটা বোধহয় বিস্তর পাপ করেছিল যৌবনে, এখন প্রক্ষা-লনের চেষ্টা চলছে।' ও আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল; থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ঠিক বসছে না মনটা। চলো ব্রজেনের কাছে গিয়ে একটু গান শোনা যাক।'

বীরভূমে আধ্‌কাপের দলে ছিল ব্রজেন। পঞ্চাশের আকালে গাঁ ছেড়ে কলকাতায় এসেছিল। বরানগরের কাছে এক চটকলে বেশ কিছুকাল দিন-মজুরী করার পর ছাঁটাই হয়ে যায়। দু-চার মাস বেকার অবস্থায় থাকতে থাকতে শরীর যখন একেবারে কাহিল, ঠিক সেই সময়েই জঘন্য অসুখটা দেহে বাসা বাঁধে। তারপর দ্রুত ছড়িয়ে যায় কানের লতিতে, নাকের ডগায়, হাত-পায়ের আঙুলে—এককথায় সারা শরীরে। এখন সর্বাঙ্গ দগ্‌দগে ঘায়ের ওপরে ছেঁড়া, নোংরা কাপড়ের পট্টি জড়িয়ে শ্মশানের একপাশে সারা রাত শুয়ে থাকে, বৃষ্টি হলে শ্মশান-বাবুর ঘরের ঘেরা বারান্দায়। চুল্লিতে লগি ঠেলতে ঠেলতে ক্লান্ত হলে ডোমেরা তার পাশে গিয়ে বসে, কখনো কখনো তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায় কৌতূহলী শ্মশান-বন্ধুরা। ব্রজেনকে কমল একটি স্পেশাল সিগ্রেট এগিয়ে দিয়ে বলে, 'ভালো মতন একটা গাও দিকি ব্রজেনভাই।' সিগ্রেট্‌টি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বনেত্রে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বিনা ভূমিকায় [illegible] খোলে, 'এই [illegible]

ফুল ফুটেছে কত শত কে জানে, আমার অনুরাগের বাগানে।' বার তিনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চরণ দু'টি গাইতে গাইতে ওর গলার সব কটা দরজা জানালা খুলে যায়। ঘন অন্ধকারের বুকে মুক্তোফলের মতো সুরের দানাগুলো ছিটকে বেরোতে থাকে। অন্ততঃ বার তিনেক প্রেমগুঞ্জরিতে সহজিয়া শুনেছি জয়দেব-কেন্দুলিতে, কিন্তু, যখনই শুনি, মনে হয় ব্রজেনের গলার জবাব নেই। শ্মশান, চুল্লি বা একপাশে ডাঁই করে রাখা শুকনো কাঠগুলি পর্যন্ত খুশিতে ডগমগ করে ওঠে যেন।

একটু আলস্য আছে ব্রজেনের। সহজে গাইতে চায় না, কিন্তু একবার শুরু করলে থামাথামির পাট বড়ো একটা নেই। কখনো কখনো মনে হয়, ওর হাতে যদি একটা দোতারা থাকত। একেবারে বুঁদ হয়ে যেন জলে গলা অব্দি ডুবিয়ে গান শুনছি. হঠাৎ প্রচণ্ড এলোমেলো কান্নার শব্দে এত কষ্টে তৈরী করা মেজাজ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। চেয়ে দেখি, শ্মশানের চাতালের দিকে একপাশে এক ভদ্রলোক আপন মনে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে চলেছেন। তার পাশে শীতল-পাটিতে মোড়া একটি শিশুর শব দুহাতে আগলে একটি অশ্রুমুখ-যুবক মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আর, ঠিক তারই হাত দুয়েক পেছনে, মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আহত প্রাণীর মত গোঙাতে গোঙাতে ছট্‌ফট্‌ করছে আরেকটি যুবক। দু'একজন শ্মশান-বন্ধু তাকে শান্ত করার চেষ্টায় অসফল হয়ে এক কোণে সরে এল। কমল ব্রজেনের পাশেই বসে রইল, আমি এক ঝটকায় উঠে পড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

একটি মাঝারি সাইজের গর্ত খুঁড়ে বাঁধন-ছাদন খুলে খুব সতর্কতার সংগে ভদ্রলোক মৃত শিশুটিকে কোলে নিলেন। বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে মুখের দিকে অপলক চেয়ে থেকে ওর ছোট্ট কপালে চুমু খেলেন। তারপর, ধীরে ধীরে, দেহটি গহ্বরের ভেতরে শুইয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিতে যাবেন, অমনি সেই শায়িত যুবকটি স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে একরাশ টফি-লজেন্স গর্তে ছড়িয়ে দিয়ে আবার বুক ভাঙা কান্নায় গড়িয়ে পড়ল। ভদ্রলোক এতক্ষণ অসামান্য সংযমে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। একটি বড়ো জলের ফোঁটা তাঁর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তে যাবে, পাশ থেকে একজন প্রৌঢ় হঠাৎ তাঁর হাত ধরে বললেন, 'দেখবেন, গর্তের ভেতরে পড়ে না যেন। আত্মার অকল্যাণ হবে।' ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে, শার্টের শিলডে চোখ মুছে নিয়ে পিছিয়ে এলেন।

গৃহী বলতে যা বোঝায়, তা একেবারেই নই, তবু কেমন ভিজে গেল মন-মেজাজ। কমলকে বিরক্ত না করে আবার নদীর ঘাটলায় এসে বসলাম। উদাসীন চোখে দেখতে লাগলাম—ছপাছপ্‌ জল ভেঙে এক দঙ্গল মেছো-সালতি গেল, একটি লঞ্চ গেল। লঞ্চটি সাজানো-গোছানো, তবলার চাঁটির শব্দ আসছে, ইয়ার বন্ধু-বান্ধব ফূর্তি-কার্তা করতে বেরিয়েছে আর কী। বুড়ো বটের মতো পিঠময় জটার শিকড় নামিয়ে গত দশ-বারো বছর এই শ্মশানে থিতু হয়ে বসে আছেন যে পাওহারি বাবা, তিনি কল্কের লাল নেতি ভিজিয়ে আবার উঠে এলেন। নেড়ি পাগ্‌লী তার বেওয়ারিশ বাচ্চাকে নিয়ে চুক্‌চুক্‌ করে বেশ কিছুটা জল খেয়ে আমার উপস্থিতি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে বুকের আঁচল নামিয়ে ফুসফুস ভরে হাওয়া টানতে লাগল। রাত ঘন হয়ে আসতে দূরের শিব মন্দিরের ছায়া-ত্রিশূলের ওপরে একটা আধ-খাওয়া চাঁদ কোত্থেকে ভেসে এল। চাঁদের আলোয় আমার পাপ-পুণ্য বোধ কেমন ঘুলিয়ে যায়। বাজারের বাঁ পাশের বেশ্যা-পল্লী ছুঁয়ে বহুবার আমি জ্যোৎস্নাকে গির্জার মন্দিরে চলে যেতে দেখেছি। এক-পাশে একটি রোঁয়া ওঠা কুকুর, আর এক-পাশে টিংটিঙে বাচ্চা—দুজনেরই গলা জড়িয়ে ধরে নেড়ি কেমন নিশ্চিন্তে চুপচাপ বসে আছে।

ওখান থেকে উঠে একটু এগোতেই দেখি, বুড়ো নিধে ডোম কাঠের সিঁদুর কৌটো, লাল চেলি, ওড়না আর শঙ্খমালা বুকে জড়ো করে ধ্যানী বুদ্ধের প্রথায় বসে আছে।

—নিশানাথ

প্রবাসী বাঙালী

আশীষ বসু

অফিসের কাজে একবার দিল্লী যেতে গিয়ে, বেশ মনে আছে আমাকে চাল-কুমড়োর বড়ি, পাটালী গুড়, চিঁড়ে আমসত্ত্ব এবং আরও যেন কি কি সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছিল। লোদী হোটেলে, তখন ছিল লোদী হোস্টেল, আমার কামরার নম্বর জানিয়ে খানকয়েক উড়ো চিঠি অর্থাৎ উঠে যাওয়া প্লেনের ডাকের চিঠি ছেড়ে আমি কালকা-মেলে দম নিতে নিতে গিয়ে দিল্লী পৌঁছেছি। কিন্তু তার আগেই দিল্লীপ্রবাসী কয়েকটি বাঙালী পরিবারে পৌঁছে গিয়েছে আমার চিঠিগুলি। হোটেলে বসেই যথারীতি প্যাকেটগুলি বিলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণও পেলাম, একবার আমাদের বাড়ী যদি দয়া করে আসেন। কোথায় থাকি? এই তো বিনয়নগরে, কেউ বা রামকৃষ্ণপুরমে, কেউ বা আর কোথাও। হিসেব করে দেখলাম কমপক্ষে পঁচিশটি টাকা ট্যাক্সি ভাড়া বেরিয়ে যাবে তিন বাড়ী চা খেতে, আর সময়? হিসাব নাই করলাম। তার চেয়ে জনপথের কো-অপারেটিভ কফি হাউসের ধূমায়িত কফি সহযোগে পকৌড়া সেবন অনেক অনেক সুহজসাধ্য। কিন্তু প্রবাসী বাঙালীদের এই যে আকুতি এর সুর মনের মধ্যে লেগে রইল।

আসলে প্রবাসী বাঙালীরাও বাঙালী এবং অনেকাংশে বাঙলা দেশের বাঙালীর চেয়েও বোধ করি বেশী বাঙালী। প্রবাসে বাঙালীপাড়ায় যে নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বকিছু রীতি-নিয়ম, আচার-অনুষ্ঠান মেনে দুর্গাপুজো হয়ে থাকে তা বোধহয় কলকাতার অনেক পুজোতেই হয় না। বিশেষ করে বারোয়ারী পুজোতে তো নয়ই।

বোধ হয় দেশ থেকে দূরে থাকার জন্যেই দেশের প্রতি, দেশের সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের এই টান।

মেয়ের বিয়ে দিতে ছেলে খুঁজতে কলকাতার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকেই চিঠি লিখতে হয়। মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়েও মোটা টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া করে সমাজ ডেকে খাওয়াতে হবে কলকাতায় বসেই। ছেলে বড় হলেও তাকে কাজ খুঁজতে পাঠাতে হবে কলকাতায়। আজকাল অবশ্য যথেষ্ট সংখ্যায় মেডিকেল, ইঞ্জি-নীয়ারিং কলেজ বাইরে হয়ে যাওয়ায় লেখাপড়া শেখাতে আর প্রবাসীদের ছেলে-দের কলকাতায় পাঠাবার দরকার হয় না।

এত আত্মীয়তা যেন একই পরিবারের মানুষ। পড়শীদের মধ্যে এমন ভাবটি একমাত্র প্রবাসী বাঙালীদের পক্ষেই সম্ভব। কলকাতায় পাশের ফ্ল্যাটের মানুষের সঙ্গে অনেকটা ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের মতো ব্যবহার দেখতেই আমরা বেশী অভ্যস্ত।

রান্না করা তরকারী এ-বাড়ী ও-বাড়ী চালাচালি করার প্রথাটা এখনো প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মধ্যেই টিঁকে আছে। ও-পাড়ার কাকীমার অসুখ করলে তার বাড়ীর সকলকে এ বাড়ীর জ্যাঠাইমার বাড়ীতে এক বেলার জন্য খেতে বলার মতো সাহসও একমাত্র তাদেরই আছে। কলকাতায় এ ব্যাপার অভাবনীয়। এমন কি চিনির সংকট যেভাবে চলছে তাতে কল-কাতায় কারো বাড়ীতে গিয়ে এক কাপ চা খেতেও এখন বেশ সংকোচ হয়।

বাংলা বই ও পত্র-পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠকসমাজও বোধ করি প্রবাসী বাঙালীরাই। এদেরই ড্রইংরুমে দেখেছি শুধু পেঙ্গুইন সিরিজের ইংরাজী ক্লাসিকস বা চলতি উপন্যাসই নয় বাংলা উপন্যাস এমন কি অধুনা প্রকাশিত স্বল্প-খ্যাত ঔপন্যাসিকের রচনাও বুক-শেলফে সযত্নে রক্ষিত আছে। ভালো শোনা না গেলেও কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার প্রয়াসে প্রবাসী বাঙালী শ্রোতা তার রেডিওর চাবি সমানেই ঘুরিয়ে থাকেন।

আমার এক বন্ধুর বিয়ে হয়েছিল রাঁচীতে। শুনেছি বিয়ের পর শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে সাত দিন তাকে সেজে-গুজে ড্রইংরুমে বসে থাকতে হয়েছিল। এই সাত দিন নাকি সারা শহরের প্রায় সমস্ত বাঙালী পরিবার দলে দলে কনে দেখার মতো এসে তাকে দেখে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম মন্দ লাগে নি। পরে একদিন নাকি সে বিদ্রোহ করে। বিকেলে মোরাবাদী হিলসে বেড়াতে যাবে শুনে তার শ্বশুর-মশাই জিভ কেটে বললেন, সেকি আজ যে হিমাপিড়ি থেকে করুণাবাবুরা সব আসবেন বিকেলে, তুমি বরং কাল যেও। সেই কাল আর আসে নি। দিন তিনেক বাদে ছুটি ফুরোতে সে ম্লানমুখে কলকাতায় ফিরে এসেছিল।

প্রবাসী বাঙালীরা অনেকেই চাকুরী-জীবি, কিছু ব্যবসায়ী। ডাক্তার উকিল, শিক্ষক হিসাবে একদিন বাঙালী সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীবাবুর জন্য বিশেষ সম্মান ছিল সারা ভারতে। আজ পট-পরিবর্তন হয়েছে। তাই বিদেশে বাঙালী উকিল, শিক্ষক এখন মুষ্টিমেয়। ডাক্তারীতেও অন্যেরা ক্রমেই এগিয়ে আসছেন।

জীবিকা অর্জনের তাগিদে যে বাঙালী পরিবার একদিন বাংলাদেশ ছেড়েছিল আজ সেই জীবিকার লড়াইয়ের অন্যান্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে তার বিরোধ ঘটছে, আর তাই নিয়েই চলছে নানারকম আন্দোলন।

এককালে প্রবাসী বাঙালীর আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। তাই নিছক অর্থনৈতিক কারণেই বহু বাঙালী পরিবার বংশানুক্রমে প্রবাসেই থেকে গেছেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা এখন ইতিহাস পরীক্ষার উত্তর হিন্দীতে লেখে। অনেকেই হিন্দীমেশানো বাংলা বলে। তং কোরো না, ছুপ্টি, মতলব্ ইত্যাদি শব্দ প্রবাসী বাঙালীর বাংলা কথায় প্রায়ই শোনা যায়।

পুজোর ছুটিতে যেমন কলকাতার বাঙালী বাংলাদেশের বাইরে বেড়াতে যায়, তেমনি ট্রেনের কামরাভর্তি বাঙালীবাবু বিদেশ থেকে দেশে ফেরেন। আগরতলায় থাকেন আমার এক বন্ধু। তিনি বলে-ছিলেন, পুজোর সময় আগরতলা থেকে যে প্লেন কলকাতায় আসে তার টিকিট নাকি দু' মাস আগেই রিজার্ভ করা থাকে।

যে প্রবাসী বাঙালী পুজোয় কলকাতায় আসতে পারলেন না তিনি তার নিজের জায়গাতেই পুজোর আনন্দে মেতে থাকেন। কলকাতার কুমোরটুলীর প্রতিমা রেলে চড়ে সেখানেই পৌঁছে গেছে পঞ্চমী-ষষ্ঠীতে। নতুন জামা-কাপড় পরে ছেলেরা সেখানেও ভীড় জমাচ্ছে পুজামণ্ডপে। আর কল-কাতায় যা হয় না সেই শখের থিয়েটারের রিহার্সাল তখন চলছে পুরোদমে, বিজয়ার পরেই যা হবে মঞ্চস্থ। বিজয়ার দিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে শুভেচ্ছা সফরে বেরোনোর যে ধুম বাংলাদেশের বাইরে দেখেছি কলকাতায় তার ভগ্নাংশও চোখে পড়ে না।

তবে একথাও ঠিক যে এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে বাংলাদেশের বাইরেও। যে আন্তরিকতার বন্ধনে একদিন এই প্রবাসী বাঙালী পরিবারগুলি বাঁধা ছিল সে বাঁধন আজ শিথিল হয়েছে। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যেও আজ অনেক সংকীর্ণতা বাসা বেঁধেছে।

প্রবাসী বাঙালী ছেলেমেয়েরা এখনও দেখেছি খুব সহজেই নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করে। প্রেমও হয়তো দানা বাঁধে, কিন্তু হাত ধরে সখাকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব। ছোট শহর। এখানে যে সবাই সবাইকে চেনে। কলকাতায় নিজের পাড়ার গণ্ডীটুকু পার হলেই কে কার তোয়াক্কা করে! আলো-আঁধারে মেশা লেকের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চত্বর আছে কলকাতায়। কিন্তু এমন প্রশস্ত স্থান প্রবাসে কোথায়!

তস্যতস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]
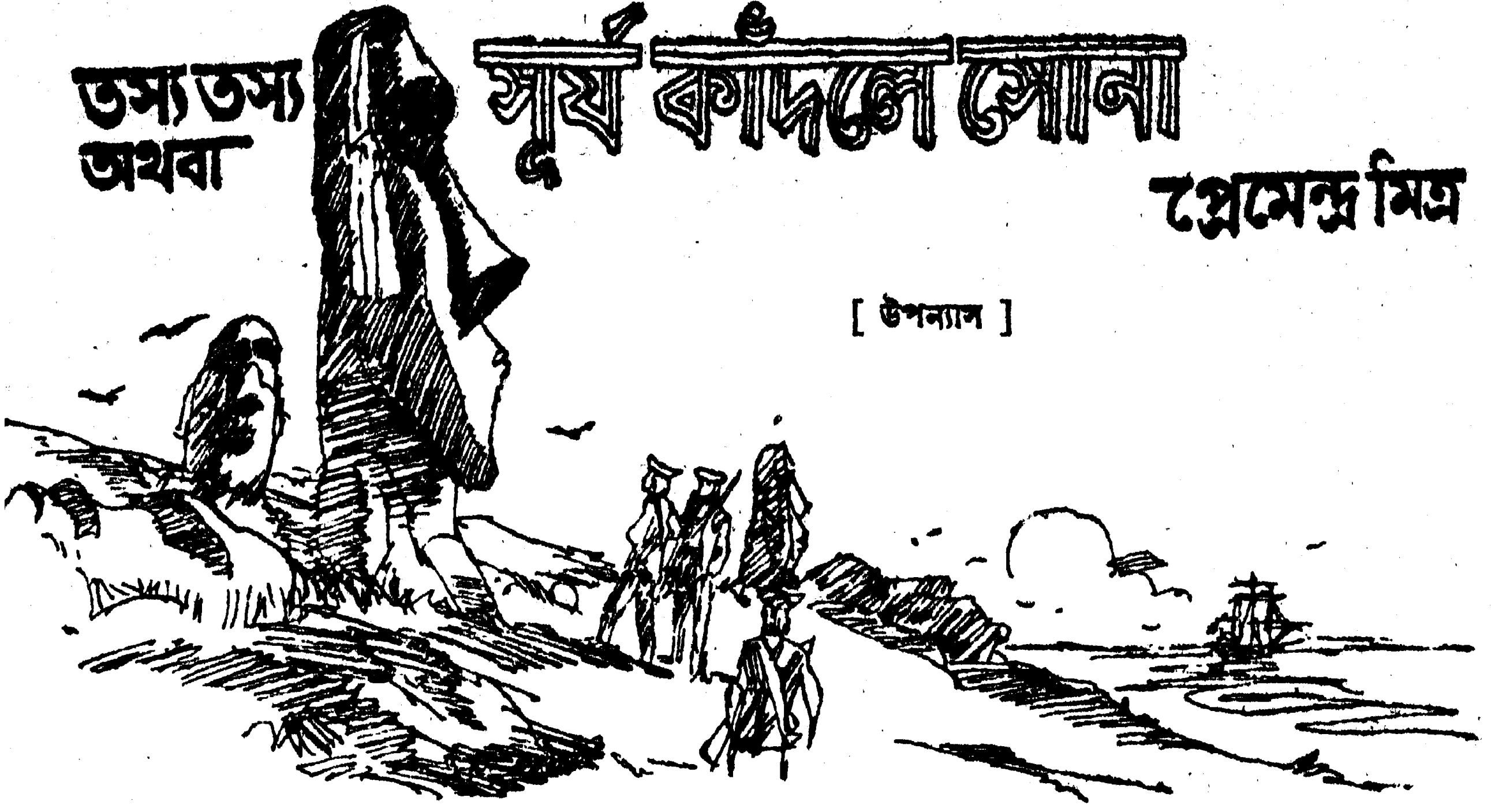
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অশ্বক্ষুর-ধ্বনি মানে কি?

তার মানে ত হুয়াসকারের আহ্বানে তাঁর পতাকাতলে সমবেত পেরুর শৃঙ্খল-মোচনের বাহিনী নয়। নিশাবসানের তরল অন্ধকারে কুজকো শহরের দিগ্বিদিকে যা তাভানতিনসুয়ুর শংকিত হৃদস্পন্দনের মত শোনা যাচ্ছে, তা ত এসপানিওল রিসালার আগমনবার্তা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ একমাত্র বিদেশী শত্রু সওয়ারের নির্ভুল ইঙ্গিতই দেয়।

হঠাৎ এই মুহূর্তে এসপানিওল সওয়ার সৈনিক কি কাকসামালকা থেকেই কুজকোতে আসছে? কেন?

কি হয়েছে তাহলে আতাহুয়ালপার? হুয়াসকারই বা কোথায়? কয়া কি তাঁকে মুক্ত করতে পারেনি?

দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠেন গানাদো। নির্ভুলভাবে সযত্নে সাজানো যেসব চাল অনিবার্যভাবে সাফল্যের শিখরে গিয়ে পৌঁছে দেবে ধরে রেখেছিলেন, তার মধ্যে কোনো একটা অপ্রত্যাশিতভাব ব্যর্থ হয়ে গেছে।

কোন্ চালটা বিফল হয়েছে? কোথায়? কাকসামালকায়, না কুজকোতে?

এসপানিওল সওয়ারবাহিনীর এই আকস্মিক হানা দেওয়ায় মনে হচ্ছে কাকসামালকাতেই কোনো কিছু ঘটেছে যা তাঁর হিসেবের বাইরে।

এসপানিওল সওয়ারবাহিনী এবার সূর্যবরণ প্রান্তরে এসে পৌঁছে গেছে। আতঙ্কবিহ্বল জনতা দিশাহারা হয়ে ঠেলাঠেলি করছে নিজেদের মধ্যে।

পারলে গানাদো একবার উঠে দাঁড়াতেন। জনতার মধ্যে একজন হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখতেন এসপানিওল রিসালায় কারা এসেছে আর কে তাদের নায়ক।

কিন্তু তার উপায় নেই। জনসমুদ্রে অস্থির দোলা লেগেছে সত্যিই কিন্তু তাঁর চারিধারে একটা নিস্তরঙ্গ বেষ্টনী। তাঁকে ঘিরে যারা পাহারা দিচ্ছে, প্রাণ দিয়েও সে-বেষ্টনী তারা রক্ষা করবার চেষ্টা করবে।

তবু নিষ্পন্দ নিথর হয়ে বসে থাকা অসহ্য মনে হয় গানাদোর। একবার ইচ্ছা হয় হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠে বিহ্বল-ব্যাকুল এই জনসমুদ্র আর এক বিদ্যুৎ-বিস্ময়ে উত্তাল করে তুলবেন।

কিন্তু তার লগ্ন পার হয়ে গেছে। এখন তো শুধু নিরর্থক আত্মঘাতী মূঢ়তা। নির্মম দুর্ধর্ষ এসপানিওল বাহিনীর সামনে আকুল দিশাহারা ল্লামার পালের মত পলাতক এই নিরস্ত্র নিরুপায় ভয়ার্ত জনতাকে কোনো অলৌকিক আবির্ভাব দিয়েও এখনই আর সংহত করা যাবে না।

চারিদিকের তীব্র উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার আলোড়নের মধ্যে মহার্ঘ পোশাকে শবদেহের মতই নিষ্পন্দ হয়ে থাকেন গানাদো। তাঁকে ঘিরে উদ্যত বল্লম নিয়ে পাহারা দেয় তাঁর মর্যাদা রক্ষায় জীবনপণ-করা প্রহরীরা।

তারা অবশ্য জানে যে, মহামহিম সূর্য-সম্ভব ভূতপূর্ব ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাকের মরদেহই তারা পাহারা দিচ্ছে।

হ্যাঁ, এই অবিশ্বাস্য গোপন আশ্রয়ই খুঁজে নিয়েছিলেন গানাদো রাজপুরোহিত ভিলিয়াক উমুর গভীর অভিসন্ধি অনুমান করে কয়াকে যেদিন পরম অভিজ্ঞান দিয়ে সৌসায় পাঠান, সেইদিনই।

কয়ার কাছে বিদায় নিয়ে কাকসামালকা থেকে সোনা-বরদার হয়ে যারা এসেছিল, তাদের জন্যে বরাদ্দ অতিথিশালায় গানাদো ফিরে যাননি। বার হবারও চেষ্টা করেননি কুজকো নগর থেকে। সে-চেষ্টা করলে রাজ-পুরোহিতের প্রহরীদের প্রখর দৃষ্টি এড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হত না। প্রহরীরা রাজ-পুরোহিতের কঠোর নির্দেশে প্রাণের দায়ে কুজকো শহরেও তাঁকে তন্নতন্ন করে খোঁজার ত্রুটি করেনি। তবু যাদুবলে তাদের শিকার যে কুজকো থেকে অদৃশ্য হয়েছে বলে তাদের মনে হয়েছে, তার কারণ গানাদো প্রথম দিন থেকেই ভূতপূর্ব ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাকের জন্যে বরাদ্দ প্রাসাদেই আত্মগোপন করেছেন। পেরুবাসীর রীতিনীতি সংস্কার জেনে এ-ফন্দি তিনি ভেবে রেখেছিলেন গোড়া থেকেই। বিশেষ একটি-দুটি উৎসব ছাড়া মৃত ইংকাদের প্রেত-প্রাসাদে কড়াকড়ি কোনো পাহারা থাকে না। থাকার প্রয়োজনও নেই। প্রেত-প্রাসাদে সাধ করে কেউ ঢুকতে বা সেখান থেকে যত মূল্যবানই হোক কোনো ঐশ্বর্য চুরি করতে চাইবে তাভানতিনসুয়ুতে এ-ব্যাপার কল্পনাতীত। জীবিত ইংকার চেয়ে মৃতের মর্যাদা পেরুবাসীদের কাছে বেশী বই কম নয়। এ প্রেত-প্রাসাদে যেসব প্রহরী আর অনুচর থাকে, তাদের আসল কাজ মৃত ইংকাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি মৃত্যুতেও যে অক্ষুণ্ণ অম্লান তারই প্রমাণ-স্বরূপ সাজসজ্জার ঘটা দেখানো। দরকার হলে নিজেদের পরম প্রভুর মর্যাদা রক্ষার জন্যে তারা সত্যিই প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু সেরকম কোনো প্রয়োজন কখনো হয় না বললেই চলে।

প্রেত-প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ নেহাৎ আনুষ্ঠানিক বলেই গানাদোর সেখানে লুকিয়ে থাকবার কোনো অসুবিধে হয়নি। প্রহরী ও অনুচরেরা কল্পনাই করতে

পারেনি যে, মৃত ইংকা নরেশের শবদেহের কাল্পনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে তারা সত্যিই জীবিত কারুর পরিচর্যা করছে। হুয়াইনা কাপাকের আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যে নৈবেদ্য হিসাবে তারা অপর্যাপ্ত খাদ্য পানীয় প্রতিদিন যথাবিধি তাঁর শবদেহের সামনে ধরে দিয়েছে। পরের দিন সে আহার্য সরিয়ে নিয়ে যাবার সময় তা থেকে যৎসামান্য খোয়া গিয়েছে কিনা লক্ষ্যই করেনি। রাত্রে ভিকুনার পশমে বোনা সুকোমল রাজশয্যা পেতে ইংকা নরেশের শয়নমন্দিরের দ্বার যখন তারা বন্ধ করে চলে গেছে প্রেত-প্রাসাদের বাইরে নেহাৎ নিয়মরক্ষার পাহারা দিতে তখন কেউ যে সে-শয্যা সত্যিই ব্যবহার করতে পারে, তা তাদের স্বপ্নেরও অগোচর।

এই প্রেত-প্রাসাদেই রাজপুরোহিতের প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গানাদো দিন গুনেছেন রেইমি উৎসবের জন্যে। প্রহরীদের নিজেদের মধ্যেকার আলাপ আড়াল থেকে যতটা তিনি শুনেছেন, তাতে লক্ষণ সব শুভই বলে মনে হয়েছে। কয়া সোসা যাবার পথে ধরা পড়লে কুজকো নগরে একটা সাড়া পড়ে যেত নিশ্চয়ই। প্রেত-প্রাসাদের প্রহরী-দের আলাপে তার আভাস পাওয়া যেত। সেরকম কিছু যখন পাওয়া যায়নি, তখন কয়া সোসার পৌঁছে হুয়াসকারের সাক্ষাৎ নিশ্চয় পেয়েছে বুঝেছিলেন গানাদো। হুয়াসকারের একবার সাক্ষাৎ পেলে আর ভাবনার কিছু নেই। উত্তরায়নের প্রথম লগ্নে না হোক, চৌসির উৎসবের মধ্যে তাঁর বাহিনী নিয়ে হুয়াসকার এসে পড়বেনই কুজকো শহরে। আতাহুয়ালপাও তখন কাক্সামালকা থেকে কুজকোর দিকে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছেন। যে মহান লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা মিলিত হচ্ছেন, তারই সমর্থনে সমস্ত পেরুর দূরদুরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা যেখানে সমবেত হয়েছে, সূর্যবরণের সেই পবিত্র বিশাল পার্বত্য-প্রান্তরে অলৌকিক এক দৈববাণী শোনা যাবে। শোনা যাবে যেন পূর্বতন ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাকের শবদেহের সংরক্ষিত মূর্তির মুখে। গানাদো জানতেন উত্তেজিত ধর্মপ্রাণ জনতা সন্দেহ করবে না সে-দৈববাণীর যাথার্থ্য প্রশ্ন করবে না তা নিয়ে। গভীর অন্ধবিশ্বাসে দেশ ও জাতির পরম কলঙ্ক মোচনের আকুলতায় নির্বিচারে মেনে নেবে সে বাণী। তারপর দেশপ্রেমের আবেগের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের আন্তরিকতা মিলে যে প্রচণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি হবে, তার সামনে কোথায় দাঁড়াবে মুষ্টিমেয় ক'টা বিদেশী শত্রু!

সেই পরম মুহূর্তের জন্যেই তৈরী হয়েছিলেন গানাদো।

কিন্তু তার বদলে কোথা দিয়ে এ কি হয়ে গেল!

তাঁর চারিপাশ থেকে জনতা যেভাবে ব্যাকুল হয়ে ছুটে পালাচ্ছে, তাতে এসপানি-ওল সওয়ারেরা এদিকেই আসছে বুঝতে পারেন গানাদো। ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর দূরে নয়, রিসালা এখন ধীরে সুস্থে অগ্রসর হচ্ছে।

মৃত ইংকা নরেশের সুসজ্জিত অলঙ্কার-ভূষিত শবদেহ হয়ে গানাদো সোনার সিংহাসনে নিস্পন্দ জড়ের মতই হেলান দিয়ে আছেন। মুখে তাঁর মৃত্যু-মুখোস আঁটা! মাথায় উষ্ণীষস্বরূপ নানারঙের 'ল্লাণ্টু' একটু সরে এসেছে কপালের ওপর, আর কপালের রাজশক্তির প্রতীক ঝালর-দেওয়া রক্তিম 'বোরলা' নেমে এসে চোখদুটোকে চাপা দিয়েছে অনেকখানি।

'ল্লাণ্টু' ও 'বোরলা'-র এ-স্থানচ্যুতি একেবারে দৈবাৎ নয়, অলক্ষ্যে তাতে গানাদো সাহায্য করেছেন, চোখের জন্যে কাটা মৃত্যু-মুখোশের ফোকর দিয়ে অস্পষ্টভাবেও একটু দেখবার সুযোগের জন্যে।

'বোরলা' রক্তরাঙা ঝালরের ভেতর দিয়ে গানাদো এসপানিওল সওয়ারদের নেতৃ-স্থানীয় দুজনকে তাঁর চারিধারের বেষ্টনীর কাছে ঘোড়া থামাতে দেখেন।

একজন তার মধ্যে তাঁর পরিচিত। মাকিয়াভেলী থেকে চুরি-করা বিদ্যে জাহির করে যে কাক্সামালকার প্রথম মন্ত্রণাসভায় পিজারোকে শয়তানী পরামর্শ দিয়েছিল, সেই জুয়ান দে হেরাদা।

কিন্তু হেরাদার পাশে ওই সওয়ারটি কে?

ঘোড়ার পিঠে বসে পিছু ফিরে পেছনে কি যেন দেখছে বলে তার মুখটা গানাদোর বেয়াড়াভাবে হেলানো ও অনড় মুখের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে পড়ছে না, কিন্তু ঘোড়ায় ও মালিকের সাজের বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটা হেঁজি-পেঁজি নয়।

হেরাদার হাঁক এবার শোনা যায়,—এই কে তোরা? কোথায় তোদের রাজ-পুরোহিত ভিলিয়াক উমু?

জবাব মেলে না কোনো। গানাদোকে হুয়াইনা কাপাকের শবদেহ হিসেবে যারা পাহারা দিচ্ছে তারা ছাড়া জবাব দেবারও কেউ নেই। প্রহরীরা ভিলিয়াক উমু নামটা ঠিকমত শুনলে হয়ত কিছু বলার চেষ্টা করতে পারত, কিন্তু হেরাদার বিকৃত উচ্চারণে সে নাম তাদের বোধগম্য হয় না।

জবাব না পেয়ে গরম হয়ে ওঠে হেরাদা। দাঁত খিঁচিয়ে চীৎকার করে ওঠে,—বোবা সেজেছে সব! জিভগুলো কেটে সত্যি বোবা বানিয়ে দিচ্ছি।

হেরাদা কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ারটা প্রায় খুলতেই যাচ্ছে এমন সময় পেছন থেকে যে এসে তাকে বাধা দেয় সেও গানাদোর চেনা। দোভাষী ফেলিপিলিও।

মানুষ হিসেবে ফেলিপিলিও হেরাদারই যোগ্য সহচর। তবে আপাতত সে উচিত প্রশ্নই করে।

একটু হেসে বলে,—কাদের জিভ কাটতে যাচ্ছেন, এদের?

হ্যাঁ, যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব নেই।—হেরাদা ক্রুদ্ধ স্বরে বলে—আর স্পর্ধা দেখেছ হতভাগাগুলোর। আর সবাই তবু ভয়ে পালাচ্ছে আর এরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে গ্যাঁট হয়ে। হাতে আবার উঁচোনো বল্লম।

দোভাষী ফেলিপিলিও এবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝায়। লোকগুলো যে স্পর্ধা দেখাচ্ছে নয়, ভূতপূর্ব ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাক-এর পবিত্র শবদেহ পাহারা দিতে ওখানে এদেশের চিরকালের সংস্কার মেনে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফেলিপিলিওর এই বিবরণের মধ্যেই দ্বিতীয় সওয়ার নায়ক পেছন থেকে সামনে মুখ ফেরায়।

সচকিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান গানাদো। অসামান্য সংযম না থাকলে সেই মুহূর্তে ভেতরের চাঞ্চল্য চাপতে না পেরে হয়ত ধরাই পড়ে যেতেন।

আর যাকে-ই হোক ঠিক সেই মুহূর্তে কুজকো শহরের সেই সূর্যবরণ প্রান্তরে এই মানুষটিকে এসপানিওল সওয়ারদের অন্যতম নায়ক হিসেবে দেখবার কথা গানাদো কল্পনাও করেননি।

মানুষটি আর কেউ নয় মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস কোনোকালে সোরা-বিয়া নামে যে নেহাৎ নীচ ইতর জুয়াড়ী বলে পরিচিত ছিল—আর গানাদোর জীবনে একাধিকবার যে অশুভ গ্রহের মত চরম দুর্ভাগ্যের দূত হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দিয়েছে।

মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস ফেলি-পিলিওকে তার ব্যাখ্যা শেষ করতে দেয় না। অধৈর্যভরে তাতে বাধা দিয়ে বলে,—এ দেশের মর্কটগুলোর শাস্ত্রকথা শুনতে এখানে আসিনি। রাজ-পুরোহিত ভিলিয়াক উমু-র খবর পেয়েছ কিছু? আছে সে এখানে?

না, এখানে নেই,—জানায় ফিলিপিলিও, —মনে হচ্ছে কুজকো শহরেই নেই।

কি করে জানলে?—সন্দিগ্ধ চড়া গলায় প্রশ্ন করে মার্কুইস দে সোলিস—মন্তর পড়ে নাকি? তুমি ত আমাদের সঙ্গেই এলে!

হ্যাঁ, আপনাদের সঙ্গেই এসেছি—বলে ফিলিপিলিও, কিন্তু রাজপুরোহিতকে আপনাদের চেয়ে একটু বেশী চিনি। কুজকো শহরে থাকলে তিনি ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেলে সবার আগে ছুটে এসে এখানে হাজিরা দিতেন।

বটে! ব্যঙ্গের সুরে বলে হেরাদা, হুঁশিয়ার মানুষ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আজ এদের কি এক মস্ত জংলী পরব। এই পরবের দিনেও রাজ-পুরোহিতের এখানে না থাকাটা কি রকম!

হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। স্বীকার করে ফিলিপিলিও, তারপর জানায় যে কোরিকান্তার ছোট-খাটো পুরোহিতদের কাউকে ধরে এখন খবর না নিলে নয়।

কিন্তু যাকে আমরা চাই, তার খোঁজ দিতে পারবে ওরা!—হিংস্রভাবে প্রশ্ন করে মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

অনেক চেনা অনেক জানা

—ছোট্ট জালটা নিয়ে এ-পুকুর সে-পুকুর তোলপাড় করা ওর রোজকার অভ্যাস। পাড়া-পড়শীর নালিশের অন্ত নেই। কিন্তু দস্যি মেয়েটাকে নিয়ে পারবার জো আছে।

কথা না বলে মুখে বিজ্ঞের হাসি ছড়াই। মনে মনে ভাবি মহৎ ট্রাডিশনের বোঝা ওর কাঁধে। তাই দিনে অন্তত একবার পুকুরে পুকুরে জাল না পাতলে ও স্থির থাকতে পারে না। ওর শিরায় শিরায় আদিম গেঁয়ো রক্ত নেচে বেড়ায়। তাই মেয়েটা বড় দামাল।

—কত বোঝাই, কারো কথা শোনে না। আর আমরা তো ক্ষেতখামার নিয়েই ব্যস্ত। মাঠেঘাটেই কাটে অষ্ট প্রহর। মা-কাকিমাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। মেয়েকে নিয়ে চিন্তার অন্ত নেই।

ওদের চিন্তাকাতর মুখগুলি দেখছিলাম। আর বেদম হাসি পাচ্ছিল। হাসছিলামও। অবশ্য মনে মনে। একান্ত সংগোপনে। ওকে সাবাশ জানাচ্ছিলাম। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতেই হবে। এটুকু ওর প্রাপ্য। তাই কার্পণ্য করে লাভ নেই। কিন্তু হাসির স্বচ্ছ আভায় হঠাৎ ধরা পড়ে গেলাম।

—এই দেখ, আপনি হাসছেন। হাসবারই কথা। আমরাও হাসতে পারলে খুশি হতাম। হাজার হোক মেয়ে তো, মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে যায়।

ওদের মুখগুলি কেমন উজ্জ্বল দেখায়। ভাল লাগে। সংগে সংগে আমার চিন্তারও প্রসার ঘটে। আমি গোড়া থেকেই এর মধ্যে চিরকেলে বাঙলাদেশের গ্রামের মেয়ের মিষ্টি স্বাদ পাচ্ছিলাম। কথা শুনতে শুনতে তাই কিছুটা বুঁদ হয়ে গেছি।

শহুরে মেয়েদের দস্যিপনা হারিয়ে গেছে। সাজগোজের আড়ালে আসল রূপও চাপা পড়েছে। ভাবতে ভাল লাগলো যে, গ্রামের কোথাও এরকম সহজ-স্বচ্ছ-স্বাভাবিক মেয়ের অস্তিত্ব আছে; আমি যার মুখোমুখি।

মেয়েটার বুনো ভাবটা কল্পনায় আনতে চেষ্টা করি। নিজের অজান্তেই ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি স্পষ্ট হয়।

—আপনার হলো কি? নিজে নিজে এত হাসতে লেগেছেন?

সোজাসুজি উত্তর দিতে পারি না। যে-মেয়েটাকে নিয়ে ওরা চিন্তায় কূলকিনারা পাচ্ছে না, সে-ই আমাকে অলক্ষ্যে হাসাচ্ছে। আনন্দে আমি টইটম্বুর।

একগাদা কসমেটিক, টপলেশ-ব্যাকলেশ-শ্লীভলেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর শাড়ির বাহারে বাঙালী মেয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। শহরের চোখ-ধাঁধানো নিয়ন-শোভায় যেমন গ্রামের কথা কল্পনা করা যায় না, এমনকি গ্রামের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ জাগে, তেমনি সাজ-পোশাকে বাহারী মেয়ে দেখতে দেখতে গ্রামের মেয়ের স্বাভাবিক রূপ আর সহজ ব্যবহারও ভুলে যাবার উপক্রম। এমন দিন হয়তো খুব একটা বিলম্বিত নয়, যখন সবাই সাজ-পোশাকে নিজেদের হারিয়ে ফেলবে। সেদিনের কথা সত্যি কল্পনায় আনা যায় না। শেষের সেই ভয়ংকর দিনের কথা আপাতত থাক। গ্রাম এখনও আছে। যদিও শহরের সংগে জোর কদম লড়াই হচ্ছে। তবু এখানে এসে এরকম মেয়ে পাওয়া যায়। যাদের কথা দুদিন পরে কাহিনী হয়ে যাবে।

—সেই দুপুরে বেরিয়েছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। সন্ধ্যাও হবো-হবো করছে। তবু সেই দস্যি মেয়ের দেখা নেই। আজ যেন আরো বাড়াবাড়ি করছে।

বাড়াবাড়ি করুক ক্ষতি নেই। কিন্তু এখনও যে স্বভাবসুলভ চঞ্চলতায় মাখামাখি হয়ে টিঁকে আছে, এই তো যথেষ্ট। যখন থাকবে না, তখন হা-পিত্যেশ করে পুরনো স্মৃতি জাবর কাটতে হবে। এরকম একটি মেয়ের কথা কতদিন ভেবেছি, আজ যখন খোঁজ

পেয়েছি, তখন তাকে না দেখে নড়নচড়ন নেই। তার দাস্যপনাই এখন আমার সমস্ত আমেজ। তাই একটু দেরী করেই ফিরুক। দেখলে তো ঘোর অনেকটা ফিকে হয়ে যাবে। চোখ বুজে ওর ধ্যান করছি।

—এই যে মা-লক্ষ্মী এলেন।

ঘোরলাগা চোখটা ভাল করে কচলে নিই। টান-টান হয়ে বসি। ছোট্ট জালটি হাতে ধরা, কোমরে একটি মাটির কলস, কাদাজলে মাখামাখি হয়ে একটা মেয়ে উঠোনে দাঁড়িয়েছে। সবাই অসন্তুষ্ট। ওর মুখে কিন্তু মিষ্টি হাসির রেশটি গোপন নেই। সকলের সব কথার মাঝে আমি দুচোখে ওকে প্রাণপণে ধরে রাখার চেষ্টা করছি,—অনেকটা যেন গিলছি।

—তা আজ কোন্ কোন্ পুকুরে জাল ফেলা হয়েছিল? এখুনি নালিশ শুনতে শুনতে কানের পোকা নড়ে যাবার উপক্রম হবে।
—কলসীটা উবু কর না দেখি কি কি মাছ পেলি।

—মেয়ের মুখে বাক্য সরে না, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। এ-কথায় ও একটু নড়েচড়ে কাঁখের কলসীটা উঠোনে উবু করে ঢেলে দিল। গোটাকয়েক ছোটখাটো মাছ এদিক-ওদিক লাফাতে লাগলো। জালটা রেখে দিয়ে তেমনি চুপচাপ চলে গেল। চোখের সামনে থেকে যেন সব আলো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইলাম। সকলেই প্রায় কোন-না-কোন মন্তব্য করেছে। একমাত্র আমিই চুপচাপ। আমার উদ্দেশ্য আরো গভীরে। ওকে দিয়েই গ্রামবাংলার প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া হৃৎস্পন্দন নতুন করে আবিষ্কার করবো। এজন্য আমাকে অনেক ঘুরতে হয়েছে। অবশেষে পেয়ে যেতেই খালি শুনে যাচ্ছি। তারপর সশরীরে হাজির হতে কেবল চোখের সাধ মিটিয়ে নিচ্ছি।

শ্যামলা রঙের ছিপছিপে মেয়েটি গ্রামবাংলার সেই মহৎ ট্রাডিশান বয়ে চলেছে। জলকাদা মেখে, পুকুরে পুকুরে জাল ফেলে। সকলেই বকুনি দেয়। কারো কথা শোনে না। আবার একবার ওকে দেখার আশায় অস্থির হয়ে পড়েছি।

—এবার যাবে গা ধুতে আর জল আনতে। সেখানেও ঘণ্টা-দেড়েক কাটাবে।

মনটা উৎফুল্ল হলো। যাক, এখুনি তাহলে আসবে। এবার ওর সঙ্গ ধরতে হবে। ওকে ধরেই গ্রামবাংলার পরিচয় আবার নতুন করে পেতে হবে।

খুব বেশি দেরী হলো না। আবার সে এসে উঠোনে দাঁড়ালো চান করে জল আনতে চলেছে। পোশাক-আশাক তেমনি আছে। কেবল বুকে একটা গামছা জড়ানো। কাঁখে এবারও যথারীতি কলসী।

—বেশি দেরী করো না, মা-লক্ষ্মী।

ও কিন্তু পূর্বেকার মতোই নির্বিকার। মুখে রা নেই। কেবল মিটিমিটি হাসে। আমি এবার নিজের তাগিদেই ওকে ধরে বসি, আমি ভাই, তোমার সঙ্গে ঘাটে যাবো।

ও অবাক হয়ে তাকায়। শহরের বিজ্ঞাপন আমার সর্বাঙ্গে। ওর মনে জিজ্ঞাসা, নাইতে নয়, জল আনতে নয়, তবে আমার সঙ্গ কেন? আমার জামা-কাপড়েই যেন ভীষণ আপত্তি। তাই মুখটা কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন আভাসে নতুন রূপ নিলো। রূপে রূপে যে তফাৎ বেশ উপভোগ করছি। ভাবলাম, এটুকুই আমার লাভের পর উপরি। যেন অনেকটা ফেলত না পেরেই আমাকে বারান্দা থেকে নেমে আসতে ইশারা করে এগিয়ে চললো।

চটপট নেমে এসে ওকে অনুসরণ করি। এতক্ষণ ঠায় বসে বসে ভেবেছি, শহর থেকে এসেছি তাই ওর কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে একদম বিরক্তিতে ঘেমে উঠবো। ও কিন্তু সেদিক দিয়ে গেল না। অথচ পাড়াগাঁয়ে ঘোরা আমার অভ্যাস। সেখানকার মেয়েদের চরিত্রও তাই জানা। শহরের কথা ওরা হাঁ করে গেলে। এর সম্বন্ধে আমার ধারণা অবশ্য সব সময়ই স্বতন্ত্র। শুরু থেকেই পরিচয়-রীতির সুর বড় বেসুরো।

মেয়েটি একমনে পথ চলছে। কোন কথা নেই। পাশে যে আমি আছি সে সম্বন্ধেও খুব একটা হেলদোল আছে বলে মনে হয় না। মনের হাসিটি গোপন রেখে ওর পেছন পেছন আকন্দের বেড়ার ধার দিয়ে শুকনো পাতা পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে চলি। মাথার উপরে শেষ-বেলার আলোয় পাখিদের ঘরে ফেরার চঞ্চলতা অনুভব করি। মনটা উদাস হয়ে যায়। নিঃসীম একটা বেদনা বুকের ভেতর তিরতির করে ওঠে। মেয়েটি অনেকদিনই হারিয়ে গেছে। এসবও সে পথের যাত্রী। এই মেয়েটির দৌলতেই হয়তো এ-গাঁয়ের সবকিছু ভীষণ ব্যতিক্রম মনে হচ্ছিল।

—সাঁতার জান, গামছা দিয়ে মাছ ধরতে?

খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। একমনে গ্রাম আর ওকে—একজনকে আর একজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলাম। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে কাটা কাটা কথায় ও নীরবতা ভাঙে। সরাসরি কাজের কথায় আসে। প্রশ্ন করেই সোজাসুজি চলতে শুরু করেছে। কোথাও থামেনি। আমার উত্তরটা যে নঞর্থক তা যেন জেনেই গেছে। তাই এই অবহেলা আর এতটা অবজ্ঞা। একটু আহত হলে খুব একটা না ঘাবড়ে উত্তর দিই, ও-দুটোয় আমি রীতিমত অভ্যস্ত। শহরে থাকায় হয়তো অনেকটা বদলেছি কিন্তু অভ্যেসটা পুরোপুরি মায়া কাটাতে পারিনি।

হঠাৎ ও একটুকরো হাসে। বনপথের উজ্জ্বলতা বাড়ে। আমার দিকে তাকায়। এরকম উত্তর আশা করেনি। ভেবেছিল, শহরের মেয়ে সাজতে গুজতেই ভালবাসে, ওরা আবার এসব জানবে কি করে। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ও বললো, এসব জানলে কোত্থেকে?

সহজ উত্তরটা জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল। চেপে পাশ কাটালাম জানি।

কিছুটা দর বাড়ানোর জন্যই অবশ্য এরকম ছোট্ট উত্তর। কিন্তু কিছু ফল হলো না। কৌতূহলে উপচে না উঠে শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন গলায় সে জানালো, জামা-কাপড় হালকা করে একটা গামছা নিয়ে এলে পারতে। জলে অনেকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করা যেত।

আমি দেখতে এসেছি গাঁয়ের মেয়েরা আজো চানের ঘাটে কতটা জল ছিটিয়ে চান করে। চানের শেষে কলসী কাঁখে নিয়ে কথা বলতে বলতে পথ মুখর করে আজো তেমনিভাবে ঘরে ফিরে যায় কিনা। সেসব ওকে জানতে দিই না, তোমাদের আর কেউ আসবে না? নাকি ঘাটের জল তুমি একাই তোলপাড় করবে?

—দু'-একজন অবশ্য আসবে। তবে কিছু ঠিক নেই।

—দেখি যদি ওদের কাছ থেকে একটা গামছার ব্যবস্থা হয়। তবে না-হয় তোমার সঙ্গে নেমে পড়বো।

ও খুশি হয়। হয়তো নিজের মনেই ঘাট তোলপাড় করার নতুন কিছু প্ল্যান ভাঁজছে। ততক্ষণে আমরা ঘাটে এসে গেছি।

আরো দুটি সমবয়সী মেয়ে আগে থেকেই সেখানে হাজির। তাদের জামা-কাপড়ের হালও আমার সঙ্গীর মতোই। পুকুরে পুকুরে জাল ফেলায় ওরা বোধহয় সঙ্গী ছিল। দিনের শেষে স্নানেও তাই। বুঝতে পারি দস্যিপনায় ওরা এ-গাঁয়ের "থ্রি মাস্কেটিয়ার্স"। ওদের দেখে আমার সঙ্গী আনন্দে হাততালি দেয়। ওরাও সমান হাততালি দেয়। আগন্তুক আমাকে দেখেও ওদের আনন্দ বিন্দুমাত্র কমে না। তিনজন প্রায় একসঙ্গে ঝপাং করে লাফিয়ে পড়লো। আমার দিকে মনোযোগ দেবার অবসর তখন আর নেই। আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ওদের দেখছি।

ওদের দাপাদাপি আর মাতামাতিতে জল তখন উত্তাল। সাঁতারে, ডুব-সাঁতারে ঘাটের জল অস্থির। এরই মধ্যে আবার 'চোর-চোর' খেলা শুরু হয়ে গেল। তখন একজন ছাড়া আর দু'জনের মাথা জলের উপর ভাসতে দেখা যাচ্ছে কদাচিৎ। তখন শুধু জলে ডুবে থাকায় দমের পরীক্ষা হচ্ছে।

অনেকে ঘাটে জল নিতে আসছে। ওদের অস্থিরতায় বিরক্ত হচ্ছে। কিন্তু অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে মনে হলো। তাই ওদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে সবাই।

পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। কিরকম নেশা ধরে যাচ্ছে। আদিম রক্তের ঢল নেমেছে আমার শিরা-উপশিরা জাঁকিয়ে। পারিপার্শ্বিক ভুলে যাচ্ছি। আমার সমগ্র দৃষ্টি জুড়ে তখন সেই উথাল-পাথাল ঘাট আর দামাল মেয়ে তিনটি। ওদের দাপাদাপির আর বিরাম নেই। একঠায় দাঁড়িয়ে পায়ে ঝিম ধরে যাচ্ছে। একটু এপাশ-ওপাশ করলাম। রক্ত যেন চনচনিয়ে উঠলো। একটু পরেই আমিও ওদের সঙ্গে 'চোর-চোর' খেলায় জলে মত্ততার বান ডাকিয়ে দিলাম।

ঝোঁকের বশে গামছা দিয়ে দু'-একটা মাছও ধরলাম। আবার ছেড়ে দিলাম। তবে যত না মাছ তার চেয়ে বেশি ব্যাঙ।

চান সেরে উপরে উঠে এলাম। সবার কাঁখে কলসী। তখন চারদিকে অন্ধকার হতে শুরু করেছে। ভিজে কাপড় মুড়িশুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলি। আমি যে এভাবে জলে নামবো, তা ছিল ওদের ধারণার বাইরে। তাই সঙ্গী মেয়েটি বিস্ময় প্রকাশ করলো, এরকমভাবে জামা-কাপড় নষ্ট করলে, বাড়ীতে কি বলবে?

—কি আর বলবে। সবাই বুঝবে যে আমিও তোমার মত দস্যি। আর দীর্ঘদিন শহরে কাটিয়েও এই দস্যিপনাকে ভুলতে পারিনি। খুশির বন্যা তখন আমার মনে বাঁধ ভেঙেছে।

—সবাই মনে করবে এই দস্যি মেয়েটার সঙ্গে মিশেই এই ভালো মেয়েটাও দস্যি হয়ে গেল। খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো মেয়েটি।

বাড়ী ফিরে এলাম। উঠোনে পা দিতেই মায়ের ব্যাকুল স্বর কানে এলো, এই দস্যি মেয়ে নিয়ে আমি কি করবো? তারপর দু'-জনের একই হাল দেখে সকলের চক্ষুস্থির।

আমি শুধু মনে মনে ভাবি, এরকম দস্যি মেয়েরাই মহৎ প্রীতিজ্ঞান বয়ে নিয়ে চলে। এরা নিজেদের রাস্তা নিজেরাই করে নেয়। অপরকে চিন্তায় ফেলতে ভালবাসে কিন্তু নিজেরা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে না।

ওর মুখটা বৃষ্টিধোয়া যুঁই ফুলের মত মিষ্টি লাগছিল।

—প্রমীলা

আলোকচিত্র : মানসরঞ্জন কুন্ডুচৌধুরী

কপালে সিঁদুরের টিপ

অসমীয়া লোকসাহিত্যের বিহুগীত, বনগীত, বারমাসীগীত সুদূর অতীত থেকে মুখে মুখে প্রচলিত। বিহুগীত বা বন-গীতের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই। যদিও বিহুগীতে প্রকৃতির এবং অসমীয়া সমাজজীবনের প্রতিফলন পড়ে। এই সব গীতের মধ্যেই অসমীয়া কাব্যসাহিত্যের জন্ম। অনাদিকাল থেকে মুখে মুখে গেয়ে যাওয়া এই গীতগুলির অর্থ ও ছন্দের মাধুর্যে ভাবের সুন্দর ব্যঞ্জনায় চমৎকৃত হতে হয়। বৈশাখ মাসের আরম্ভে রঙ্গালী বিহুর উৎসব উপলক্ষে এই গীত নৃত্যের সঙ্গে গাওয়া হয়—সহজ সরল ভাষায়। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে প্রকৃতির বুকে চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতির চঞ্চলতাই মানুষকে চঞ্চল করে তোলে। কৃষিজীবী লোকেরাও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নৃত্যগীতের মধ্যে নতুন বৎসরকে আহ্বান করে। বিহুর বাতাস যৌবনের বাতাস, বিহুর আনন্দ মিলনের আনন্দ, বিহুর পরিবেশ প্রীতির পরিবেশ। এইজন্য বিহুর আগমনে অসমীয়া যুবক-যুবতীর সবুজ মনে প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা উপচে পড়ে। তাদের সুখ, দুঃখ, মিলন, বিচ্ছেদের নিখুঁত চিত্রও তাই পাওয়া যায় বিহুগীতে। এই গীতগুলির প্রধান সুর হল প্রণয়। যৌবনের উদ্দাম বাসনা, মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমের আকুলতার সম্যক প্রকাশ বিহুগীতে। জাতিকুল ত্যাগ করে ঈপ্সিত জনকে লাভ করার বাসনা এই গীতের মধ্যে স্পষ্ট। বিহুর সঙ্গে অসমীয়া নারীর ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ। যুগে যুগে অসমীয়া নারীরা জননীরূপে, জায়ারূপে, বিহুর আয়োজন সম্পূর্ণ করে আসছে। তাঁদের কাপড়ে নানারকম পৌরাণিক চিত্র বুনন করে অসমীয়া নারীরা প্রিয়-পরিজনকে উপহার দেয়। চোখের ঘুম চোখেই মিলিয়ে যায়, তবু মেয়েরা তাঁত বুনে যায়। রাঙালী বিহুর আগমনে, বৌ কথা কও পাখির ডাকে, কোকিলের কুহুরবে, কেয়া ফুল ও কপৌ ফুলের (আসামের এক জাতীয় ফুল) সৌরভে অসমীয়া যুবক-যুবতীরা আনন্দে নেচে ওঠে। তারা পরম আনন্দে গান গায়—

"আকৈকে চেনেহর মুগারে মহুরা,
তাতোকৈ চেনেহর মাকু
তাতোকৈ চেনেহর বহাগর বিহুটি,
নে পাতি কেনেকৈ থাকু?"

আমার অত্যন্ত স্নেহের তাঁতে বোনা মুগার সুতো, তার থেকেও স্নেহের মাকু, তার থেকেও স্নেহের বৈশাখের বিহু উৎসব, সেই উৎসব পালন না করে আমরা কি করে থাকবো?

আমাদের দুর্গোৎসবের মত অসমীয়ারা সকলেই নতুন জামা-কাপড় প্রিয়-পরিজনের মধ্যে আদান-প্রদান করে এবং বিহু

উৎসব উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বাড়ি যাওয়া-আসা করে গুরুজনদের প্রণাম ও ছোটদের স্নেহ জানায়। বাড়িতে বাড়িতে পিঠে এবং নানারকম খাবার করে একে অন্যকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। শহরের শিক্ষিত লোকের ছেলে-মেয়েরা বাইরে নৃত্য-গীতের জন্য বের হয় না। গ্রামের বালক-বালিকারা, যুবক-যুবতীরা প্রায় সকলেই সমস্ত দিন নৃত্যগীতের মধ্যে বিহু উৎসব পালন করে। ঢোল বাঁশীর সুরে বিহু পাগলা মন অজানা আনন্দে অধীর হয়ে পড়ে। তাই ওরা গায়—

"ঘর তো নবহে মন ও সমনীয়া,
পথার তো নবহে মন,
কমোয়া তুলাবোর যেনেকৈ উড়িছে,
তেনেকৈ উড়িবর মন।"

ওগো সখি! আমার ঘরেও মন বসছে না, ক্ষেতেও মন বসছে না। যেমনি করে পেঁজা তুলোগুলি উড়ে যায়, তেমনি আমার উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

"তোমালৈ চাঁওতে জপনা দিওতে,
বিন্ধিলে অঘেয়া হুলে,
তোমার মন গলে আমার মন গলে,
'ক করিব কলিতা কুলে?"

বাঁশের দুয়ারে খিল তুলতে গিয়ে তোমায় দেখে আমার বুকে যেন অসহ হুল ফুটছে। যদি তোমার আমার মনের মিল হয় তা হলে সমাজের লোকে কি করতে পারবে?

"তুমি করি যাবা বোয়নী দায়নী,
মই বাই যাম হাল,
তুমি লগাই যবা বিহুরে গামোছা,
মই পাতি দিম শাল।"

তুমি সর্বদা ধান রোয়া, ধান কাটা করে যাবে, আমি ক্ষেতে হাল বাইব। তুমি তাঁতে জামা-কাপড় বুনবে আর আমি তাঁত বোনার যন্ত্রপাতি তৈরী করে দেব।

বিহুর আগমনে নানারকম ফুলের গয়না পরে প্রেমিকা প্রেমিকের কাছে যাচ্ছে আর আনন্দে গাইছে—

"মই খোঁপাতে পিন্ধিম বিজুলির ফুল,
কানত পাদুমর কেরু,
ডিঙিত পিন্ধিম ফুলের হার ভরি,
হাতত মৃণালর খারু।"

ওগো প্রিয়, আমি খোঁপায় বিজলীর ফুল পরে, কানে পদ্মের কানফুল পরবো, গলা ভরে ফুলের হার আর হাতে মৃণালের বালা পরবো। প্রিয়র সঙ্গে মিলিত হয়ে আজ প্রিয়ার সব সাজ সার্থক হয়ে উঠবে।

বনগীতগুলিও প্রধানত বিহু উৎসবেই গাওয়া হয়। এই গীতগুলিও ভালভাবে উপলব্ধি করলে দেখতে পাওয়া যায় কিছু কিছু গীতের বর্ণনার মধ্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার সুন্দর। মনের সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্য রূপ-লাবণ্য যোগ দিয়ে মনের অনুভূতি প্রকাশ করাই বনগীতের বৈশিষ্ট্য।

"পানীত জিক্ মিকায় পানীরে পরুয়া,
ফুলত জিক্ মিকায় পাহি,
চেনাই জিক্ মিকায় দু' গালর তেজেরে,
মুখত মিচিকিয়া হাহি।"

জলের ভিতরে পিঁপড়ের ঝিকমিক আর ফুলের পাপড়ির ঝিকমিকের সঙ্গে একটি রূপসী প্রিয়ার স্মিত মধুর হাসির বর্ণনা অতি সুন্দর একখানি ছবির মত মনে হয়।

"দলনীর ওপরে ঐ কি চড়াই উড়িলে
দেখো রঙ্গা রঙ্গা ঠোঁট,
চেনাই বগিতরা সোনর পিলিপ মরা,
কপালত সেন্দুরর ফোঁট"

[illegible] পাখিটির উড়ে যাওয়া দেখে,

কপালে সিঁদুরের টিপ থাকা একটি সোনালি রংয়ের রূপসীর ছবি কল্পনা করা—এই গানটিতে একটি নিপুণ কাব্য চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়।

যৌবনের মধুবনে যুবক-যুবতীর মনে প্রীতির ভাব জেগে ওঠা অতি স্বাভাবিক। অসমীয়া যুবক সখিকে ডেকে বলছে—

"এনে কাঠ চিত কিয় হুলা লাহরী,
পিরীতি নকরা কিয়?
ব্রহ্মা ইন্দ্রদেবে পিরীতি করিছে,
তুমি কোন জগতের জীয়?"

সখি এত নিষ্ঠুরা কেন হলে? কেন প্রেম করতে চাও না? ব্রহ্মা ইন্দ্রদেবও তো প্রেম করে। তুমি কোন জগতের জীব হলে?

এমনি মধুময় বিহুর বাতাসে আনন্দ রসের সৃষ্টি-করা এই লোকসংগীতগুলি অসমীয়া লোকসাহিত্যে মূল্যবান সম্পদ হয়ে চিরকাল থেকে যাবে।

—বেলা দাশগুপ্ত

পশ্চিম জার্মানীর সাররুকেন প্রদেশের হেলগা মীজের বয়স এখন ৩১ বছর। গত টোকিও অলিম্পিকে (১৯৬৪) অসিচালনায় রৌপ্য-পদক বিজয়িনী হয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন; শ্রীমতী হেলগার অসিচালন কুশলতায় তাঁর দেশ দলগত বিভাগেও ব্রোঞ্জ-পদক জয়ের সম্মান অর্জন করেছিল।

এবার মেক্সিকো সিটিতে আয়োজিত উনবিংশ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানেও স্বদেশের প্রতিনিধি দলে স্থান দেওয়া একরকম সুনিশ্চিত।

তিনিও নতুন উদ্যমে অনুশীলন করছেন।

[উপন্যাস]

আমি কান পেতে রই

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৩৭ ।।

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। ধতী সুরবালা প্রৌঢ়া হয়েছে; সে াঢ়ত্ব বার্ধক্যে এসে পেঁাচেছে একদা স্তারিণী, মতি, রাজাবাবু, নানু— কাতার জীবন—সেসব এখন স্মৃতি-ামন্থনের বস্তু। সে যেন কতকালকার থা, কোন্ পূর্বজন্মের। আজকাল যেন ল করে মনেও পড়ে না, গোলমাল হয়ে য় সন তিথি তারিখ।

ইতিমধ্যে সুরবালার জীবন পালটেছে, সনধারা পালটেছে, বাসস্থান পালটেছে— ই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে তার দৃষ্টি-গীও। একই জায়গায় একই ছকে বাঁধা বন যাপন করতে করতে সেদিনের বালা কখন বিদায় নিয়েছে, তা বৃদ্ধা রবালা বুঝতেও পারে না। সে যে একটু র্থপর, একটু অবিবেচক, এমন কি টু কৃপণও হয়ে পড়েছে, তাও খবর খে না সে।...প্রথম জীবনের সেসব স্বপ্ন, সাধনা, আদর্শ ও আবেগ সুদূরে তির মেঘলা দিগন্তে মিলিয়ে গেছে নই নিজের তাতে অবাক লাগে না— লে হয়ত চমকে উঠত, হয়ত দুঃখিতও ।

কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে র্বকাল। নতুন দুটো বাড়ি বিক্রী করে য় টাকা জমা করে দিয়েছে সরকারের ছ। সে টাকা ছাড়াও আরও দিয়েছে শ্য। সুদ কম—আরও কম, কিন্তু বেশী দ যেসব জায়গায় টাকা খাটানো যায়— ব জায়গায় জমা রাখতে সাহস হয় নি বালার। কিরণও বারণ করেছে। চারকে ট্রাস্টী করবার জেদও তার। ভা ল আইনের ফাঁকিতে পরবর্তী াইংরা মূলধন তুলে নিয়ে উড়িয়ে দেবে চ। ঠাকুর কিছুই করতে পারবে না। ঠাকুরের এত গরজই বা কি?

পুরনো — ওর নিজের রোজগারের টাকায় কেনা বাড়িটা বিক্রী করে নি। তবে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাও করে নি। এখানের বড় বন্ধন ছিল মা—মা তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে যখন—অভিমান করেই হয়ত, কতকটা ইচ্ছে করেই—তখন আর এখানে কোন পিছুটান রাখতে রাজী হয় নি সে। শ্যাম-বাবু নয়, কিরণের পরিচিত আর এক অ্যাটর্ণীকে দিয়ে পাকা দানপত্র করে দিয়েছে নানুর ছেলের নামে। শুধু একটি শর্ত আছে—সুরবালা যতদিন বাঁচবে—এক-খানা ঘর ভোগ-দখল করতে পারবে। দান-পত্রে সে শর্তের উল্লেখ নেই, শর্তাধীন দানপত্র নাকি অনেক সময় গ্রাহ্য হয় না— নানু তার তখনও নাবালক ছেলের হয়ে পাল্টা একটা অঙ্গীকারনামা রেজেস্ট্রী করে দিয়েছে। গণেশের জন্যে এ কাজ ফেলে রেখে লাভ নেই, সুরবালা ভাল করেই ভেবে দেখেছিল সেদিন। কোন্ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে এখানে বিষয়ের বন্ধন রেখে যেতে পারবে না। যদি সত্যিই কোন দিন গণেশ তেমন নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে— তার কাছেই যেতে পারবে। সে যতদিন আছে, ভাইকে একমুঠো তার কিশোরী-মোহনের প্রসাদ দিতে পারবে। তাছাড়া, যে ঘরে তার দখল রইল—তেমন দরকার পড়লে সে ঘরে তার ভাইও থাকতে পারবে। তবে গণেশ আর আসবে না—সুরবালা জানে। এলেও, সেই স্ত্রীলোকটাকে নিয়ে যদি কোন দিন এখানে বাসা বাঁধবার সামর্থ হয় তবেই আসবে। কিম্বা সে যদি মরে যায়— দিশাহারা অবলম্বন-হারা হয়ে হয়ত কোন দিন ভগ্নদেহে ভগ্নমনে ফিরে আসতে পারে—সে ক্ষেত্রে তো বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

না, মধ্যে অল্প কয়েকটা দিন ছাড়া সে ঘর ব্যবহার করার দরকার হয় নি সুরোর। গণেশ দেশে ফিরেছিল ঠিকই— তবে নিরাশ্রয় হয়ে ফেরে নি। সেখানেও সুরবালার অনুমানই অভ্রান্ত হয়েছে— সার্কাসের মালিকানা আর সাজ-সরঞ্জাম বিক্রী করে মোটা টাকা নিয়েই দেশে ফিরেছে। একটা বাড়ি ভাড়া করে থেকে বরানগর না শ্যামনগর কোথায় একটা জমি কিনে সেও একটা ঠাকুরবাড়ি করেছে। হিমিকে নিয়েই বাস করে সেখানে। বৃন্দাবনে গিয়ে দিদির সঙ্গে দেখাও করে এসেছে—কিন্তু সেও মোটা প্রণামী দিয়ে বড়মানুষীই দেখিয়ে এসেছে—প্রার্থী হয় নি। ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠার সময় দিদিকে আসতে লিখেছিল—সুরবালা আসে নি। এদিকে আসার আর তার প্রয়োজন নেই— ইচ্ছেও নেই। তীর্থ করতে বার-কতক হাওড়া দিয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে— কিন্তু তবু কলকাতায় থাকার ইচ্ছে হয় নি। বন্ধন বলতে, মায়া বলতে যা কিছু ছিল নানুর ওপরই—সে যতদিন বেঁচে ছিল, এদিকে এলে আগে চিঠি দিত, নানু এসে হাওড়া স্টেশনে দেখা করত। নানু অবশ্য অনেকবার চেষ্টা করেছে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে—নানু নাকি শেষেরদিকে ঘরবাসীই হয়েছিল—কিন্তু তাও যায় নি সুরবালা। কলকাতা তার জীবনের স্বর্গ। জীবনের স্বপ্নলোক—সে স্মৃতিতেই থাক, আর তাকে দেখে দরকার নেই।

তার এই বাড়ি লিখে দেওয়াতে নানু ঘোর আপত্তি করেছিল, আড় হয়ে পড়ে-ছিল বলতে গেলে বাধা দিতে—কিন্তু সুরবালা ওর আপত্তিতে কান দেয় নি। বলেছিল, 'তোমার জননী আমার মায়ের হুকুম! আমি কি করব বলো! মায়ের কাছে আমার কত ঋণ তা তো তুমি জানো নানুদা, তোমার কাছে তো কথাই নেই— এত স্নেহ মা-বাবা ছাড়া কারও কাছ থেকে পাই নি,—এই এক ঢিলে যদি দুই পাখী মরে, সেই চেষ্টা আর কি! বুঝছ না?...... অবশ্য এটা ঠাট্টা করে বলছি, এতে তোমার কি মায়ের ঋণ শোধ হল ভাবব—এমন বেইমান আমি নই—এত বেয়াদবিও নেই আমার—তবু, সামান্য সুদ কিছু শোধ করে যাই না?...টাকা নয় — মায়ের হুকুম তামিলই সেই সুদ।'

তারপর বলে, 'সত্যি কথা বলতে কি, ও বাড়ি মায়ের জন্যেই কেনা আরও। ওটা মায়েরই বাড়ি ধরো। তাঁর বাড়ি, তিনি তোমাকে দিচ্ছেন—তুমিও তাঁকে মা জননী বলতে—তবে আর এত কিন্তু হচ্ছ কেন?'

অগত্যা নানুকে রাজী হতে হয়েছিল। তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলেছিল, 'তুই গুছিয়ে বলতে পারিস মাইরি, লেখাপড়া শিখে ব্যারিস্টার কি কৌসুলী হলে তারক পালিতের অন্ন হত না। কেমন সব জলবৎ তরলং করে ছেড়ে দিস!...হুঁ, তাহলে বুড়ির মনে এই ছিল শেষ পর্যন্ত! বেটি কি পাজী দেখেছ!...এমন জানলে মরবার সময় ফুটডাস্ট একটু বেশী করে নিয়ে নিতুম!...যাঃ, জননীর স্নেহের দান মাথায় করেই নিলুম। লোকে বলবে এই লোভেই পড়ে থাকত—এই তো? মরুকগে, বলে বললই বা!'...

নানুও আর নেই। তার ছেলে এখন ঐ বাড়িতেই বাস করে। বিয়ে-থা করেছে। কোথায় যেন কী একটা ভাল চাকরিও করে। সেও অনেকবার লিখেছে পিসীমাকে. এসে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যেতে তার সংসারে — সুরবালার মন সরে নি। বরং সে নানুর লিখে দেওয়া সেই অঙ্গীকার-নামা আর ঐ ঘরের চাবি নানুর ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছে। লিখেও দিয়েছে পরিষ্কার যে, তার জীবদ্দশাতেও ও ঘরের ওপর কোন দাবী-দাওয়া রইল না আর।

তবে একবার এসেছিল অবশ্য। ক'দিন ছিলও ঐ ঘরে।

সেই প্রথম আর সে-ই শেষ।

সেও অবশ্য গোড়ার দিকেই. মা মরবার বছর দুই পরেই।

মতির অসুখের খবর পেয়েই এসেছিল। ঋণ শোধ করতে। বাকদত্ত ছিল সে —একবার নয়, বারবার প্রতিজ্ঞা করেছিল যে—মরণকালে সে মতিকে দেখবে, সেবা করবে। সেকথা সে ভোলে নি। মায়েরও শেষ আদেশ—'মতিকে দেখিস।' গুরুঋণ মাতৃঋণ—তা ছাড়াও কিছু ছিল—স্নেহের ঋণ। যা-ই করুক মতি, মতি যে তাকে ভালবাসে তা সুরোও জানত।

খবর দিয়েছিল অবশ্য নানুই। মতির খবর দেবার অবস্থা ছিল না। যারা তার আশপাশে ছিল—আত্মীয়স্বজন তারা তো দেবেই না। তাদের ভয় শেসকালে সেবা-শুশ্রূষা করে যদি বিষয় সম্পত্তি সব লিখিয়ে নেয়! মতি নাকি বলেছিল অনেক-বার যে, 'তাকে একটা খবর দে, সুরো আমার ধাত জানে—সে যেমন সেবা করবে. তেমন কেউ পারবে না।.. সে পয়সার লোভে বসে নেই রে—পয়সার লোভ থাকলে আমার চেয়ে ঢের বেশী রোজগার করতে পারত।'

কিন্তু এসব 'ছেঁদো' কথায় তারা—মানে বোনপো-বোনঝির দল বিশ্বাস করে নি। রক্তের তেজ থাকতে অমন অনেকেরই টাকা-পয়সায় অনাসক্তি থাকে—বয়স বাড়লেই বুঝতে পারে ও জিনিসের কদর। এক কালে পয়সায় লোভ ছিল না বলে এখনও থাকবে না—একথা তারা মানতে রাজী নয়। বিশেষ মতির সম্পত্তির পরিমাণ বিপুল. যে একবার পয়সা নেড়েছে ঘেঁটেছে- এর মর্ম জানে—এতখানি সম্পত্তি দেখলে তার লোভ হতে বাধ্য।

নানুর চিঠি পেয়েই সুরবালা ছুটে এসেছিল অবশ্য দ্বিধা করে নি দেরি করে নি। সেই সময়েই নানুর বাড়ি অর্থাৎ তার প্রাক্তন বাড়ির ঘরখানা কাজে এসেছিল। সেই খানেই মালপত্র নামিয়ে স্নান-আহ্নিক সেরে গিয়েছিল মতিকে দেখতে। তারপর অবশ্য আর ফেলে আসতে পারে নি। সেবারের বাতের মতোও নয়—আরও খারাপ অবস্থা। ছেঁড়া চিরকুট ময়লা বিছানায় পড়ে আছে. সেই অবস্থাতেই অসাড়ে প্রাকৃতিক ক্রিয়া-গুলো হয়ে যাচ্ছে তা সাফ করার কোন লোক নেই. গায়ে শুকিয়ে থাকছে মল। সরকারী আইনে নাকি মতির সম্পত্তি কারও পাবার কথা নয়, উইল করে না গেলে সরকারেই চলে যাবে সব। কী সে আইন তা মতি জানে না—সত্যি কি মিথ্যে, সম্ভবত ওর বোনঝিরাই বলেছে ওকে। ফলে মতি তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়েছে বোনঝিদের আর বোনপোদের। সেই অধিকারে তারা এসে চেপেচুপে বসেছে। তাদের অবস্থাও খারাপ নয়, মতির বোনেরও দুখানা বাড়ি কলকাতায়। বিস্তর গয়না আর কোম্পানির কাগজ। তবে সে মতির বিষয়ের কাছে কিছু নয়। মতির যে এত আছে—তা আত্মীয়রাও জানত না। প্রথম প্রথম দূর সম্পর্কের যারা এই শহরেই থাকে—তারাও যাতায়াত শুরু করেছিল কিন্তু উইল করা হয়ে গেছে শুনে আর কেউ আসে না। যারা এসে গেড়ে বসেছে, তাদের হৈ-হল্লা আমোদ-স্ফূর্তির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরঘর তালা বন্ধ, পূজারীকে মাইনে দেয় নি—সে আর আসে না। পাড়ার যারা কিছু কিছু সাহায্য পেত. আসা-যাওয়া খোঁজ-খবর করত, তাড়া খেয়ে তারাও আসা বন্ধ করেছে। ফলে মতি এখন নিজের ঐশ্বর্যের অন্ধকূপে বন্দী।

বাড়িতে বিস্তর নগদ টাকা ছিল—অবিশ্বাস্য রকমের মোটা অঙ্ক তার—তা নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রথম প্রথম একটু সন্দেহ অবিশ্বাস মনকষাকষি দেখা দিলেও পরে মিটিয়ে নিয়েছে ভাগাভাগি করে। প্রত্যেকেই এত পেয়েছে যে, কেউ কারও চেয়ে কম পেয়েছে কিনা তাও অত হিসেব করার প্রয়োজন বোধ করে নি। মদ-মাংস খাওয়া-দাওয়ার হুল্লোড় চলেছে বাড়িতে. সর্বদাই যেন উৎসব লেগে আছে—শুধু যার এই সমস্ত. সে-ই পড়ে আছে ময়লা মেঝে, দীন ভিখারীর অধম শয্যায়।... অন্তিম শয়নেই শুয়েছে এবার. তা দেখেই বুঝতে পারল সুরো—এযাত্রা আর ওঠার আশা নেই। রোগ নয়—যমেই ধরেছে। অবশ্য বয়সও হয়েছে ঢের, আশির কাছা-কাছি হল কিম্বা আরও বেশী। আর বেঁচেও লাভ নেই, যাওয়াই ভাল। ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে মানুষ ভোগ করার জন্যেই। ভোগের সহস্র উপাদান যখন চারিদিকে সাজানো থাকে. অথচ ভগবান সেই সম্ভোগের শক্তিটা কেড়ে নেন—তখন অকারণ শুধু নয়—দুঃসহ হয়ে ওঠে। বড় করুণ সে অবস্থাটা। বড় বিড়ম্বনাময়।

তবু, যে মানুষটা চিরকাল শরীরে খেটে পয়সা রোজগার করে এই বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করল, বুড়ো বয়স অবধি যে অবসর নেয় নি, আরাম করে নি—তার এই শেষ সময়টায় একটু আরাম, একটু স্বাচ্ছন্দ্য একটু শান্তির ব্যবস্থা করা যায় না? এ কুবেরের ভাণ্ডারে কতটুকু কমতি হত তাতে?

সুরবালাকে দেখে পুরনো ঝি-রাঁধুনীর দল সজল চোখে এসে ঘিরে ধরল। তাদের মুখ থেকেই সে শুনল ব্যাপারটা। বাকীটা নিজের চোখেই দেখল। মার্বেল পাথরের মেঝে বিবর্ণ হয়ে গেছে মতির ঘরে। বিছানাটা থেকে—এবং সম্ভবত মতির গা থেকেও—এমন দুর্গন্ধ আসছে যে, দরজার বাইরে দাঁড়ালেই গা-বমি করে ওঠে। বিছানাটা যে কতকাল বদলানো হয় নি তা কে জানে, তোশক এমন কি নিচের গদি পর্যন্ত প্রাকৃতিক কারণে বারবার ভিজে ভিজে দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে, তার তুলো-গুলো সুদ্ধ খারাপ হয়ে গেছে। আর তেমনি মতিরও দুর্দশা. ইদানীং শাড়ি ছেড়ে থান ধুতি পরত মতি—তাও একখানা পরনে নেই. সম্ভবত পেট ভাঙবার অজুহাতেই—একটা ছেঁড়া অয়েল ক্লথের ওপর পড়ে আছে সে. ওপরে খানিকটা ন্যাকড়া চাপা।

সুরোকে দেখে চিঁচিঁ করে উঠল মতি, 'এসেছিস মা, দ্যাখ দ্যাখ, আমার দুর্দশাটা। কত বলি ওদের, বলি যে তোদের কিছু করতে হবে না—শুধু দয়া করে তাকে খবরটা দে, ব্যাগতা করছি তোদের কাছে। সে তিন সত্যি করে গেছে, বাক্যিদত্ত আমার কাছে—মরবার কালে দেখবে। তা সে খবরটাও কেউ দেয় না। এক পয়সার পোস্ট কার্ট লেখবারও লোক নেই একটা। গিরির সঙ্গে বুঝি নানু ছেলের দেখা হয়েছিল. তেতর বাড়িতেই নাকি চেনা ওদের—গিরির মুখে শুনে বলেছে, আমি তাকে খবর দিচ্ছি। মাসির জন্যেই তার কলকাতার বাসা রাখা—এমন অবস্থা শুনলে সে সব ফেলে ছুটে আসবে।...আহা, ছেলেটার ভাল হোক জয়-জয়কার হোক, গতর ভাল থাক—রাজ্যেশ্বর ব্যাটা হোক—তবু তো তোকে খবরটা দিলে। সে-ই দিয়েছে নিশ্চয়—নইলে তুই-বা কার কাছে খবরটা পাবি।'

বেশী কথাও বলতে পারে না, দুর্বল শরীর—একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে থাকে. হাঁ করে এদিক-ওদিক তাকায়, এক ফোঁটা জলের জন্যে। ঝিয়েরা বুঝতেও পারে না। সুরোই ছুটে গিয়ে এক ঢোক জল দেয় মুখে। তাও একটা গেলাস পর্যন্ত নেই। একটা খোলা পেতলের ঘটিতে করে খানিকটা জল রাখা আছে মাথার শিয়রে।

'দেখলি, দেখলি — দ্যাখ।.. ওরা বুঝতেও পারে না। আরও ঐ ডাইনী-গুলোর ভয়ে নিজেদের আখেরের চিন্তেয় কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছে।...তাই তো বলি একশোবার ঐ শকুনগুলোকে যে—খবর দে, সে তোদের পয়সার পিত্যেশী হয়ে বসে নেই। দরকার হয় সে নিজেই খরচ করে আমার সেবা করবে—তেমন মেয়ে নয় সে। তার তেজ চিরকাল—পয়সার লোভে লাথি মেরে চলেছে সে জীবন-ভোর। নইলে আজ তার পয়সা থাকত কে। এমন ডবল সম্পত্তি সে করতে পারত. কলকাতার মাথা মাথা লোক টাকার আণ্ডিল এনে সেধেছে।...আর এই সম্পত্তিই তো সে নিতে পারত। সে যদি আমার কাছে এসে থাকত, তাহলে কি তোদের পুঁছতুম নাকি! সে আমার পেটের মেয়ের বাড়া।... তোকেও সেইকালে বলেছিলুম সুরো—তুই আমার মেয়ের মতো থাক. এই অতুল ঐশ্বর্য্য তাহলে তোরই হত। একটা কেন

দশটা ঠাকুরবাড়ি কর না। তা শুনলি নি তো!'

সুরো এ সব কথার উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করল না, কাজে লেগে গেল। যামুন-দিকে বললে দু-হাঁড়ি জল গরম করতে, গিরিকে বলল দারোয়ানকে দিয়ে ডাক্তারি তুলো আর পাউডার আনাতে, ফর্সা কাপড় বিছানার চাদর ওয়াড় সব বার করে আনতে।

গিরি কথাটা শুনেও কিন্তু নড়ল না, বিপন্ন মুখে একবার মতির দিকে আর একবার সুরোর দিকে চাইতে লাগল।

'কী হল---কথা শুনতে পাও 'ন? হাঁ করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ কি? এত-দিনের মনিব তোমাদের তা বেশ তো অবস্থায় ফেলে রেখেছ, পথের ভিখিরীও এর চেয়ে ভাল থাকে। অনা ভিখিরিরা তাদের দেখে অসুখে-বিসুখে। এ তারও অধম। তা এখন আর কিছু না পারো, শরীরটাই নাড়ো!'

'কী করব দিদিমণি', এতক্ষণে 'গরি মুখ খোলে, 'যা বলছ সব লেহ্য কথা মানছি। এমন দুর্দশায় ফেলে রাখা মানুষের কাজ নয়। কিন্তুক কি করব—চাবি তো সব আঁচলে বেঁধে বসে আছে তেনারা, চাইতে গেলে তেড়ে আসে, মুখ-খামাটি দেয়। বলে, ঘাটের মড়া, ও তো আজ নয়, কাল যাবেই---ওর জন্যে অনর্থক পয়সা খরচ করে কি হবে?'

'সবটা তো ওদের দোষ নয় 'গরি, তোমরা পুরনো লোক, সাফ সুতরো করেও তো রাখতে পারতে। যাক গে—ঐ ওপরে কারা আছে, বলো গে আমার নাম করে যে আলমারির চাবি দিতে---নয়ত নিজেরা কেউ এসে চাদর কাপড় ওয়াড় সব বার করে দিতে।'

পরোয়ানা আর আদালতের পেয়াদা নিয়ে নায়েবরা যেভাবে প্রজা উচ্ছেদ করতে যায়---কতকটা সেই ভাবেই গিরি চলে গেল ডিগ্রি জারি করতে।......

সুরবালার আগমন সংবাদ বোধ হয় এর মধ্যেই পেঁছে থাকবে। তাই গিরিকে দিয়ে জবাব পাঠাতে সাহস হল না---জন-দুই মানুষ নিজেরাই নেমে এল। তার একজন পুরুষ, বছর চল্লিশ বয়স হবে—দুই চোখ লাল, পাও ঈষৎ বেএক্তিয়ার—সম্ভবত নেশা করেছে; আর একটি মধ্য-বয়সী স্ত্রীলোক, গহনা ও শাড়ির বাহারে চিনতেও পারল—মতির বোনঝি। সর্বদাই একগা গয়না পরে থাকা তার একটা রোগ।

কথা কইল মেয়েছেলেটিই। বলল, 'কে তা বাছা তুমি, এসে হুকুম পাঠাচ্ছ ঝি-চাকরকে দিয়ে! বলি সহবৎ জানো না? আমরা গে এনার আপ্তজন, আপনার লোক—ওয়ারিশ। কী করতে হবে না হবে আমরা জানি না—তুমি এসে লম্বা লম্বা কথা বলে আমাদের শেখাবে! আস্পদা তো কম নয়। এধারে ফোঁটা-তেলকের খুব ঘটা দেখছি—মড়ার গন্ধ পেয়ে শকুনের মতো ছুটে আসছ কেন?'

নিমেষে অবস্থাটা বুঝে নিল সুরো। এতদিনে আরও চিনেছে সে জগৎটাকে। বৃন্দাবনে গিয়েও অনেক কিছু শিখেছে। সে একেবারেই সপ্তমে গলা চড়িয়ে জবাব দিল, 'আমি শকুন হয়ে ছুটে আসি নি। শকুন তাড়াতে এসেছি। মড়া তো এখনও হয় নি—প্রাণটা এখনও ধুক ধুক করছে।... আমি কে তা তোমরা বেশ জানো আমি তোমাকে চিনতে পারছি, তোমারও না চেনবার কথা নয়। এ বাড়িতেও আমাকে নতুন দেখছ না। ওয়ারিশের অধিকার মরবার পরে, তার আগে না। এখন থেকে মালিক হয়ে বসার কোন হক নেই তোমাদের।...শোন, এই একটা মুমূর্ষু রুগীর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেজিয়া করতে চাই নে—তবে এও জেনে রেখো, এখনও আমি একটা খবর পাঠালে এই কলকাতা শহরের দশ-বারোটা বাঘা বাঘা উকীল ব্যারিস্টার অ্যাটর্ণী ছুটে আসবে। ইচ্ছে করলে পুলিশ ডেকে তোমাদের উৎখাত শুধু নয়—ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে—ঐ উইল পাল্টে এখনও যথাসর্বস্ব নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারি। সে প্রবৃত্তি আমার নেই--থাকলে এক পয়সাও তোমরা পেতে না। তোমরাই ভোগ-দখল করো, উড়িয়ে দাও মদ খেয়ে, ভালবাসার লোকদের ডেকে বিলিয়ে দাও—তোমার তো সে ব্যায়রামও আছে শুনেছি—সে মরুক গে, যা খুশি করো। তবে যার জিনিস, কষ্ট করে রোজগার করা, তার সেবা হবে না চিকিচ্ছে হবে না—এতটা আমি বরদাস্ত করতে রাজী নই। আলমারির চাবি দাও, কোথায় কি থাকে তা আমি জানি, দরকার মতো বার করে নেব। আর বড় ডাক্তার ডাকব, তার ফীও তোমাদের দিতে হবে, ওষুধের দাম। নইলে সিন্দুকের চাবিও ছেড়ে দিতে হবে—যেটা তোমাদের অভিরুচি!'

শুধু মতির বোনঝিই নয়—ওর যে তথাকথিত বরাট এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল—সেও যেন একটু চমকে উঠল। সত্য কথা জোর দিয়ে বললে—তা সে যে-ই বলুক না কেন—লোকে সমীহ করে একটু। ভয়ও পায়। খুব ঝানু বদমাইশ ছাড়া তার ওপর গলা চড়াতে সাহস করে না। এরা ততটা ঝানু নয় কেউই। মেয়েটা পয়সার ঘরে জন্মেছে, পুরুষটা রক্ষিতার পয়সায় নেশা-ভাঙ করে।

বোনঝি—ডালিম বুঝি ওর নাম—রীতি-মতো থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বলে, 'আমরা কি আর কিছু করছি না। ডাক্তার এলে দিয়ে গেছে তাই—।...বলে, বাঁচবে না এ যাত্তারায়। বেথা চেষ্টা।...তা পেত্যয় না হয়, ডাকো না যাকে খুশি। ষোলটা টাকা—তার বেশি তো নয়, তাতে কেউ মরে যাবে না।'

এই বলে চাবির রিং থেকে আলমারির চাবিটা বেছে খুলে নিয়ে ঠং করে ফেলে দেয়, তারপর গজগজ করতে করতে বরের কনুই ধরে টেনে নিয়ে যায়, 'লোকে কথায় বলে মার চেয়ে ব্যেথিনা তারে বলে ডান!... আমাদের চেয়ে উনি আপনার লোক হলেন। তেজ দ্যাখো না, সর্বস্ব খুইয়ে বোষ্টমী সেজেছে, তবু অংখার যায় না। অমনি কল-কাতা সুদ্দু উকীল ব্যালেষ্টার ছুটে আসছে ওর রূপযৌবনের লোভে।...এত যদি টান তো ছেড়ে গিয়েছিলি কেন? কৈ, কোনদিন তো দেখলুম না একখানা পোস্টকার্ট লিখে উদ্দিশ নিতে। আজ একেবারে মুখের সামনে এসে তাই সোয়াগ উথলে উঠল। ঢং দেখে আর বাঁচিনি। বলে না—মা না বিয়োল, বিয়োল মাসী—ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়া-পিতি-বেশী। এ হয়েছে তাই!'

সুরবালা এ সবে কান দেয় না। ততক্ষণে গরম জল এসে গেছে। কাপড় ভিজিয়ে ভিজিয়ে আস্তে আস্তে গা থেকে ময়লা ছাড়ায় সে। কতদিন ধরে শুকিয়ে আছে, সহজে যায় না। তবু ধৈর্য ধরে বসে বসে পরিষ্কার করে। বিছানা পালটায়, ভাল কাপড় বার ক'রে পরায়। ধরে বসিয়ে গায়ে ভাল করে পাউডার মাখিয়ে দেয়। তারপর নিজে ঘরের মেঝে ভাল ক'রে ঘষে ঘষে মুছে সাফ ক'রে আর একবার স্নান করে আসে।

খবর পেয়ে নানুও এসেছিল দেখা করতে। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, গিরি গিয়ে ডেকে আনল। সুরোর এখন জোর বেড়েছে। সেই সঙ্গে সাহসও। নানুকে দিয়েই ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। রাজা বাবুকে দেখতেন নীলরতন বাবু ইন্দুবাবু—নাম দুটো মনে ছিল; ও'রা নাকি ভাল ডাক্তার। নানুকে বলল ঐ দুজনের যাকে হোক ডাকতে। আরও বলল, 'তুমি একটু অমনি সঙ্গে থেকে ওষুধ পত্তরেরও ব্যবস্থা করো—এখানে কাকে বলব, কে আনবে না আনবে! দরকার হয়, টাকাও তোমাকেই দিতে হবে এখন—আমার সঙ্গে অবশ্য আছে, যদি পারো প্যাঁটরা খুলো নিতে তো—'

চিঁ-চিঁ ক'রেই মতি বাধা দেয়। বলে, 'ওরে না না। তার দরকার হবে না। শোন্, ওরা জানে না—ঐ শ্যাল-কুকুরগুলো—ঠাকুরের সিংহাসনের তলায় একটা চোরা দেরাজ—আছে, তার চাবি থাকে আমার গুরু-দেবের ছবির পেছনে আটকানো। সেই দেরাজে কিছু টাকা অছে, একশো টাকার নোট আর গিনি, তুই তো পুজো করতে যাবি—বার ক'রে নিস। আমি ওদের কারুক্কে বলি নি, তোর পিত্যেশেই ছিলুম। ঐ থেকে এখন খরচ কর। যা থাকে—বিশেষ গিনি কখানা—আমি মরবার পর তেও ঠাকুরের পেন্নামী বলে নিয়ে যাস।'

'থাক মাসী, তোমার চিকিচ্ছে তো আগে হোক। পরের কথা পরে।'

বড় ডাক্তার এসেও অবশ্য কোন আশা দিতে পারেন না। বিশেষ রোগ কিছু নয়—বয়সটাই আসল অসুখ। গ্রহণী আছে অবশ্য—থাকে 'গিরিনী অম্বন্তী' বলে—তা সে আর এবয়সে সারা সম্ভবও নয়। পুরোনো শরীর বলেই টিকে আছে এখনও, তবে আর বেশী দিন নয়।...এমনি টুকটাক রোগিণীকে সান্ত্বনা দেবার মতো ওষুধ দেওয়া যেতে পারে—খুব একটা কাজ কিছু হবে না তাতে। এখন একটু তাকতে আর তোয়াজে রাখা—এই। যা খেতে টেকে চায়—একটু

আধটু দেওয়াই ভাল, কারণ এখানের খাওয়া শেষ হয়ে আসছে এবার।

ডাক্তার নানুকেই বলে গিয়েছিলেন, নানু সুরোকে বলল। চেষ্টা সত্ত্বেও চোখের জল চাপতে পারে না সুরো। বরং যত চেষ্টা করে সামলাবার তত আরও বেশী জল এসে পড়ে। অনেকক্ষণ পরে মুখচোখ ভাল ক'রে মুছে চোখে জল দিয়ে গেলেও—ওর মুখের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারে মতি, বলে, 'কোন আশা নেই আর—বলে গেল তো? সে আমি জানি। তুই ঢাকবার চেষ্টা করলে কি হবে। আমি নিজেই যে বুঝতে পারছি। অনেকদিন যমরাজাকে ফাঁকি দিয়ে চালাচ্ছি, এবার টুঁটি টিপে ধরেছে আর কি। এবার আর চালাকি চলছে না। আর বয়েসটাই কি কম হ'ল। বাঁচার আর দরকারও নেই। এমন পরের মুখচাওয়া অথব্ব অক্ষ্যাম হয়ে পড়ে থাকার চাইতে সহমানে সরে পড়াই ভাল.... যাই হোক, তবু তুই চোখের জল ফেলেছিস—এতেই আমার তৃপ্তি রে! তবু একজনও আমার জন্যে চোখের জল ফেলল—চোখে দেখে গেলুম—এই দেখেই খানিকটা শান্তি। পেটে ধরি নি অবিশ্যি, কিন্তু ধরলেও তারা কী অবতার হ'ত কে জানে! এখন তুই থাকতে যেতে পারি তবেই তো, যদি বেশী দিন গোড় পেতে থাকি—তাহলে তো সে-টুকুও হবে না। তুই বা আর কতকাল থাকবি! ঠাকুর সেবা ফেলে—।'

'না মাসী, আমি থাকব। তোমার শেষ সময়ে আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাবো না—যদি নিজে প্রাণে বেঁচে থাকি অবিশ্যি—তুমি দেখে নিও। আমার ঠাকুরও তা বুঝবেন। তোমার মধ্যে দিয়েই তিনি সেবা নেবেন।'

'আঃ!' আনন্দে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে মতির, 'এই টুকুই শান্তি। অনেকদিন হরিনাম করেছি—পয়সার জন্যেই হোক আর যা ই হোক, তারই এইটুকু ফল দিলেন ভগবান!'

দু'তিন দিন পরে একদিন হঠাৎ ইশারা ক'রে আরও কাছে ডাকল মতি। কানের কাছে মুখ আনতে চুপিচুপি বলল, 'একটা ভাল উকীল কাউকে ডাক না—উইলটা পাল্টে তোর নামে ক'রে দিয়ে যাই?'

'না মাসী, ছিঃ! সবাই ভাববে ঐ জন্যেই মরণকালে ছুটে এসেছি। শেষে তুমিও হয়ত তাই ভাববে। না, ওতে আমার দরকার নেই। তোমার দৌলতেই আমার যা কিছু—তোমার সেবা করব—এ তো আমারই পুন্যি। এর মধ্যে আর টাকা পয়সা জড়িও না। আর গোচ্ছার টাক নিয়ে আমিই বা কি করব? আমারই বা কে আছে।'

'কেন, তোর ঠাকুর আছেন! সে তবু একটা সৎ কাজে লাগবে। আমি বেঁচে থাকতেই ঠাকুরঘরে তালা পড়েছে—আমরা গেলে কি হবে তা তো বুঝতেই পারছি!'

'ঠাকুরের সেবা একরকম ক'রে চলেই যাবে আমার। বেশী টাকার ব্যবস্থা না থাকাই ভাল। বৃন্দাবনেও তো এই দু'তিন বছর কাটল, দেখলুমও ঢের। যেখানে বেশী টাকা সেখানেই বেশী নোংরামি, হ্যাংলামি। টাকার গন্ধ পেলেই বাজে লোক ছুটে যাবে, ঠাকুরের নামে থাকলেই কি ঠাকুর পাবে মনে করো? সেও সেবাইৎরা ফুর্তি করে ওড়াবে। আমি যে ক'দিন আছি ভাল আছি—সেই ক'দিনই ঠাকুরের সেবা। তারপর—তবু, যদি বেশী মধু না থাকে, যারা আসবে সেবা করতে ঠাকুরের জন্যেই আসবে। নইলে ঐ—গো-ভাগাড়ে মড়া ফেলার অবস্থা সর্বক্ষেত্রেই।'

চুপ ক'রে যায় মতি। মানে শান্তি পায় না। এক এক সময় বলে, 'এর চেয়ে যদি কোন হাসপাতালে দিয়ে যেতুম রে—তারা আমাকে দেখত। এ কী ভূতভোজনে গেল, আমার এত কষ্টের টাকা!'

'মাসী টাকার কথা তো জীবনভোর চিন্তা করলে, এখন আর কেন! যে খুশি নিক গে, যা-খুশি হোক গে। এখন ভগবানের কথা ভাবো—তোমার গোবিন্দের কথা।'

'তা বটে!' চুপ ক'রে যায় অগত্যা। তবে কথাটা যে মনঃপূত হয় না—তাও বুঝতে পারে সুরো।

একদিন বলে, 'সুরো, একখানা গান শোনাবি মা, কেত্তন? কতকাল যে নিজে গাই নি—কি গান শুনি নি। বোনটা গাইত সে মরে গেল। যদি গান শিখিয়ে যেত—তবু বংশের ধারাটা থাকত। নিজে রোজগার করলে টাকার দামও বুঝতে পারত।'

সেই টাকা! ঘুরে ফিরে মন একই জায়গায় এসে আটকে যায়।

হাসে সুরবালা মনে মনে—কিন্তু কিছু বলে না।

জিজ্ঞাসা করে, 'দোয়ার বাজনদারদের কি খবর দোব—যদি কেউ খালি থাকে—? রীতিমতো গান শুনবে—না এমনি?'

'না না—ওরে বাপ্‌রে, সে মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করবে। এমনি গা তুই, পাশে বসে। আর শোন, মনে হচ্ছে আর চার পাঁচ দিনের বেশী নেই—মনটার মধ্যে কে যেন বলছে তাই—যদি শেষের দিকে বুলি হরে যায়, কথা না কইতে পারি, একেবারেই শেষ সময়ে—তুই যদি পারিস—একখানা গানই শোনাস। এই আমি বলে দিয়ে গেলুম। শুধু শুধু নাম শোনাতে যাস নি, ও তারক বেম্ম না কি বলে—ও আমার বিচ্ছিরি লাগে। এতকাল গান গেয়ে এলুম রাজ্যের লোককে শোনা-লুম—গান শুনতে শুনতেই যেন যেতে পারি।...কানে ঠিক পেঁছিবে। আমার মড়া-টাও নড়ে উঠবে কেত্তনের আওয়াজ পেলে। আর যদি পারিস—সেই সময় বরং দোয়ার বাজনদারদের খবর দিস, তারা যেন গান গাইতে গাইতে নিয়ে যায়।...ভাগ্যিস তাদের যা দেবার হাতে তুলে দিয়ে দিয়েছিলুম, শক্ত থাকতে থাকতেই—নইলে এ চামারগুলো এক পয়সা দিত না।'

সে সব সাধই সুরো পুরিয়ে ছিল ওর। সেদিনও পাশে বসে গান গেয়েছিল। 'মান' পালায় মতির নাম ছিল সবচেয়ে বেশী, বসে বসে দু তিনটে সেই পদ গেয়ে-ছিল—যেগুলো বেশী প্রিয় মাসীর। মৃত্যুর দিনও, যখন থেকে নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে—বসে বসে গান শুনিয়েছে। মাথুর পালার গান। শ্রাদ্ধ বাসরে গাইতে পারবে না, এরা কি রকম আয়োজন করবে তা কে জানে—আর করলেও, সুরো আবার দোয়ার বাজনদার নিয়ে রীতিমত পেশাদার গান গাইবে না, এটাও ঠিক, পরবেও না গাইতে। এ বাড়িতেও আর ঢুকবে না। এক দোর দিয়ে মড়া বেরোবে। অন্য দোর দিয়ে সেও বেরিয়ে যাবে।

এইতেই তাই, ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের অন্ত ছিল না।

'এসব আবার কি অনাচ্ছিষ্টি কান্ড! বোষ্টুমীর কি সব উল্টো! এসময় কোথায় তারক বেম্ম নাম শোনাবে, না এই সময় টইচৈ ক'রে কেত্তন গাইতে বসল!..... গান-বাজনা ফুর্তির কি এই সময় না...যার বেপরীত্ত হয় তার কি সব বেপরীত্য...

তারা অবশ্য তাদের কর্তব্য পালনে ত্রুটি করে নি। মুখে গঙ্গাজলও দিয়েছিল, কানের কাছে চিৎকার করে তারকব্রহ্ম নামও শুনিয়েছিল। কিন্তু সুরো জানে যে যদি তখনও কোন চৈতন্য থেকে থাকে মাসির তো, সে ওর গানই শুনেছে—সে নাম নয়।......

মৃত্যুর পর গরদের কাপড় পরিয়ে তিলকসেবা ক'রে, তুলসীপাতা জপের মালা দিয়ে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে সদ্য কেনা পালঙ্কে তুলে দিয়েছিল সুরো। মতির টাকা অবশ্য, সেই ঠাকুর ঘরের চোরা-দেরাজে রাখা টাকা। এ টাকা সে রেখে যাবে না এর পয়সাও—এদের জন্যে। যে কখানা গিনি ছিল দোয়ার বাজনদারদের হাতে দিয়ে বলে দিলে, 'তোমরা একদিন কোন ঠাকুরবাড়িতে মোচ্ছব দিও মাসির নামে, বরানগরের দিকে কি খড়দয়—যেখানে ভাল ব্যবস্থা হয়—বাকী যা থাকবে, সমান ভাগ করে নিও। ভাল ক'রে গান গাইতে গাইতে নিয়ে যাও, দাঁড়িয়ে থেকে পুড়িয়ে বাড়ি ফিরো—এদের বিশ্বাস নেই। আর তোমরাই তো মাসীর আসল সন্তান—তোমরা শ্রদ্ধায় জল ঢাললে তার আত্মা জুড়োবে।'

সেও সঙ্গে ছিল অবশ্য। এই প্রথম সে হেঁটে গেল নিমতলা পর্যন্ত। হাঁটা অভ্যাস হয়েছে বৃন্দাবনে গিয়ে, তবু সে পিছিয়ে পড়েছিল—গিরি ছিল তাই পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা, রাজাবাবু, মা—বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই নিমতলা ঘাটের সঙ্গে। শেষ প্রিয় ব্যক্তিটিকেও পেঁছে দিয়ে গেল। মায়ের মতোই ছিল মতি, তাকে শেষ যাত্রায় রওনা ক'রে দিয়ে কর্তব্যেরও ইতি টেনে দিল—অন্তত এখানকার মতো এখানে আর না। এই শহরে এই শেষ অঙ্ক তার।

পরের দিনই বৃন্দাবনে যাবে সে। নানুকে বলে রেখেছে, সে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে।

(ক্রমশঃ)

এল এস ডি

মানব সান্যাল

লাইসারজিক অ্যাসিড ডাইথিলামাইড। সংক্ষিপ্ত নাম এল-এস-ডি। মার্কিন জগতে প্রচণ্ড ঝড় তুলেছে। একদিকে গেল গেল রব। ধর্ম গেল, নীতি গেল। ছেলে-মেয়েরা বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এল-এস-ডির আখড়ায়। কালোবাজার ফেঁপে উঠেছে এল-এস-ডির কল্যাণে। চড়া দামে কালোবাজারে বিকোচ্ছে এল-এস-ডি। অভিনেতা অভিনেত্রী কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ভীড় করছে কালিফোর্নিয়ার কালোবাজারে। এল-এস-ডির নেশায় নাকি পাগল হয়ে উঠেছে সারা মার্কিন দুনিয়া। ইউরোপেও সে ঝড়ের হাওয়া এসে লেগেছে। সরকারী বিধি-নিষেধের কড়া প্রহরা এড়িয়ে এল-এস-ডির হাটে জোর কেনা-বেচা চলেছে। আমাদের এই বাংলাদেশেও এল-এস-ডির আমদানী শুরু হয়েছে। গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায় এল-এস-ডি ক্রমশঃ বেশ আসর জাঁকিয়ে বসছে।

আবার ইউরোপ, আমেরিকার কালোবাজারেই আরও একদল মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এল-এস-ডির সন্ধানে। কিন্তু এঁরা এল-এস-ডির নেশায় বুঁদ হওয়ার আনন্দে পাগল হতে চান না। আমেরিকা এবং ইউরোপে একদল চিকিৎসক এবং মনস্তত্ত্ববিদ এল-এস-ডি নিয়ে এক বিচিত্র গবেষণা শুরু করেছেন। সরকারী আইনে যেহেতু এল-এস-ডি সহজলোভ্য নয় সেজন্য এই গবেষকের দল কালোবাজারেই ছুটছেন এল-এস-ডি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

শুধু আমাদের দেশে কেন, মার্কিন দুনিয়াতেও ভ্রান্ত প্রচারের কল্যাণে সাধারণ মানুষের ধারণা এল-এস-ডি একধরনের মাদক দ্রব্য। গাঁজা, আফিম বা চরস জাতীয় কোনও নেশার উপকরণ মাত্র।

অথচ এল-এস-ডি বা ঐ জাতীয় দ্রব্যগুলি যে ওষুধ হিসাবে মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে—আমরা অনেকেই সে খবর রাখি না।

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ তিমথি লিয়ারী—যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ এল-এস-ডি সম্বন্ধে গবেষণা চালাচ্ছেন—তাঁর মতে, এল-এস-ডি মানুষকে এমন একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী ওষুধের সন্ধান দিয়েছে যা শুধু মানসিক রোগের চিকিৎসার ইতিহাসেই যে যুগান্তর এনেছে তাই নয়, মানুষের সামনে এক অত্যাশ্চর্য এবং অভিনব অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের জগৎকে উন্মোচিত করে দিয়েছে।

ডাঃ লিয়ারী মানুষের দেহ-মনের ওপর এল-এস-ডির প্রভাব পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই দেড়শো বারের বেশী এল-এস-ডি সেবন করেছেন। তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ এবং বক্তৃতায় এল-এস-ডির কার্যকারিতা এবং শক্তি সম্বন্ধে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত করেছেন। মানুষের দেহ মনের ওপর এল-এস-ডি কি অত্যাশ্চর্য প্রভাব সৃষ্টি করে তা বোঝাতে গিয়ে একজন এল-এস-ডি সেবীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন।

"আমি যেন রক্ত এবং রেথার এক অবিরাম প্রবাহে ভেসে চললাম। আমার মস্তিষ্কে এমন কতকগুলি আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে লাগল যা আমার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব। এক অবিশ্বাস্য আবেগ আমার মনে যে তীব্র উল্লাস সৃষ্টি করত তার ফলে আমার দেহে নতুন নতুন সংবেদনের জন্ম হতে লাগল। এক অনাস্বাদিত জীবনের প্রবাহ যেন বন্যার মত আমার স্নায়ুতন্ত্রে ভেঙে পড়ল। আমার চারপাশের মানুষগুলো যেন নানা বিচিত্র রঙের প্রতিরূপ হয়ে আমার চোখের সামনে ধরা দিতে লাগল। আমার বন্ধুর মুখটা প্রতি মিনিটে শতাধিকবার পরিবর্তিত হয়ে কখনও শিশু, কখনও দৈত্য, কখনও দেব-দেবী, কখনও বা সন্ন্যাসীর মুখ হয়ে আমার চোখের ওপর ভেসে উঠতে লাগল। ইতিহাসখ্যাত বীরের দল দেব-দেবী, পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রখ্যাত চরিত্রেরা আমার চোখের সামনে উন্মাদের মত নৃত্য করতে লাগল। কয়েক ঘণ্টা ধরে আমি এক আশ্চর্য বিজ্ঞানের জগতে বিচরণ করতে লাগলাম, যাকে আমার জীবনের গভীরতম ধর্মীয় কিংবা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বলা যেতে পারে।"

ডাঃ লিয়ারী দীর্ঘদিনের গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এল-এস-ডি বা ঐ জাতীয় ওষুধগুলি অত্যধিক মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তিদের পানাভ্যাস দূর করতে পারে, বিকৃত যৌন-অভ্যাস থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে এবং অস্বাভাবিক মানসিকতার রোগে যারা ভুগছে তাদের সুস্থ করে তুলতে পারে। এল-এস-ডি যে শুধু ব্যক্তিমানুষের জীবনে এক নতুন আনন্দলোকের দুয়ার খুলে দিয়েছে তাই নয়, মানুষের অবচেতনার গভীরতম স্তরে লুক্কায়িত কমপ্লেক্সগুলিকে চেতনার স্তরে বার করে এনে এই ওষুধ অবচেতন স্তরের কমপ্লেক্স থেকে উদ্ভূত মানসিক বিকার, অস্বাভাবিকতা এবং বাতুলতার অসুখকে নিরাময় করে মানুষকে আবার তাই স্বাভাবিক মানসিক ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে।

ডাঃ লিয়ারীর মত অনেক মনস্তত্ত্ববিদ মনে করেন যে, এল-এস-ডির মধ্যে চিকিৎসকরা এমন এক হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছেন, যার সাহায্যে মানসিক রোগের বিরুদ্ধে মানুষের দীর্ঘদিনের লড়াই-এর অবসান ঘটবে।

এল-এস-ডি সেবন করলে মানুষ সাময়িকভাবে সিজোফ্রেনিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সিজোফ্রেনিয়া নামক মানসিক বাতুলতার রোগের মূল লক্ষণ হল সমগ্র ব্যক্তিত্বের মন্থর অবনতি, রোগী ক্রমশঃই বহির্বাস্তব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বাস্তব পরিবেশের প্রতি একেবারে উদাসীন হয়ে পড়ে এবং এক কাল্পনিক বা মনগড়া জগতের ঐকান্তিক অধিবাসী হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন অতিপ্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্বন্ধেও তার খেয়াল থাকে না। সে আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে। নিজের দেহ সম্বন্ধেও তার হুঁশ থাকে না। এসব রোগীদের নানা বিচিত্র অমূল প্রত্যক্ষ (হলোসিনেশন) ঘটে, তারা নানারকম কাল্পনিক শব্দ শোনে। এই অবস্থায় রোগী অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে—বাস্তব পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে যার কোন অর্থই বোঝা যায় না।

এল এস ডির প্রভাবেও মানুষ সিজোফ্রেনিয়াগ্রস্ত রোগীর মত আচরণ করে। সম্প্রতি নিউর্গানির নিউরো-সাইকিয়াট্রিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকরা স্বাভাবিক মানুষের ওপর এল এস ডির প্রভাব প্রত্যক্ষ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সিজোফ্রেনিয়াগ্রস্ত রোগীদের মস্তিষ্কে যে সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এল এস ডির প্রভাবে স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্কে সেই একই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

এই গবেষকরা প্রশ্ন তুলেছেন—যদি এল-এস-ডি জাতীয় ওষুধগুলি মানসিক বিকৃতি এবং বাতুলতার উপসর্গগুলি কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়—তবে তার প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কার করাই বা সম্ভব হবে না কেন? আর এমন কোন মৌলিক ওষুধই বা আবিষ্কার করা যাবে না কেন—যা মানসিক বাতুলতাগ্রস্ত রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে সক্ষম হবে?

একাধিক দুঃসাহসী গবেষক বার বার এল এস ডি খেয়ে নিজেদের দেহ-মনের ওপর এর প্রভাব পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা নিজেরাই সাময়িকভাবে সিজোফ্রেনিয়াকে রূপান্তরিত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে উন্মাদের জগতে প্রবেশ করে সেই জগতের রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করছেন।

এল-এস-ডি গ্রহণের সংগে সংগে দেহে-মনে অকস্মাৎ যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়—অনেকেই তা সহ্য করতে পারে না। কারও কারও মনে হয় যেন বড় বড় হিংস্র মাকড়সা পিছনে ধাওয়া করেছে। তারা পাগলের মত ছুটে বেড়ায়। একজন মহিলা তো এল-এস-ডির পান করার সংগে সংগে নিজেকে সাপ মনে করে নিজের হাতের ওপর দাঁত দিয়ে ছোবল মারতে শুরু করেন। এই আকস্মিক প্রতিক্রিয়ার পর এল-এস-ডি সেবীর ব্যক্তিত্বের মন্থর অবনতি ঘটতে থাকে। তার নানারকম অমূল প্রত্যক্ষ ঘটতে থাকে। সে তার বহির্বাস্তবকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে শৈশব অবস্থায় ফিরে যায়।

এই অবস্থায় তাকে তার নিজের ছবি আঁকতে বললে সে পাঁচ বছরের আগেই শিশুর মত কুমড়োর মত মাথা, মাথার দুপাশে বড় বড় কান, মোটা পেট, সরু সরু পা-ওয়ালা মানুষের ছবি এঁকে বসে। এই অবস্থায় তার যে সব অমূল-প্রত্যক্ষ ঘটতে থাকে তার ফলে তার চোখের সামনে শৈশবকালের নানা প্রতিরূপ (ইমেজ) ভেসে ওঠে। অবচেতনার গভীরতম স্তরে লুক্কায়িত আশৈশব কমপ্লেক্সগুলি চেতনার স্তরে ভেসে ওঠার ফলে রোগী এই সব কমপেক্স থেকে উদ্ভূত মানসিক বিকৃতি এবং অস্বাভাবিকতা থেকে মুক্তি পায়।

ভিয়েনার দুজন বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হান্স্ হফ্ এবং ডাঃ ও আর্নল্ড ইতিমধ্যে আরও এক নাটকীয় ঘোষণা করেছেন। তাঁরা সিজোফ্রেনিয়াগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য এক প্রকার সিরাম আবিষ্কারের চেষ্টায় গবেষণারত আছেন, তাঁদের মতে—যে সব ওষুধে এল এস ডি মিশ্রিত থাকে সেগুলি মস্তিষ্কের সেই বিশেষ অংশগুলিকে আক্রমণ করে যেগুলি সিজোফ্রেনিয়া রোগেও আক্রান্ত হয়। যদি এমন কোন বিপরীত ওষুধ আবিষ্কার করা যায়, যা এল এস ডির বিষক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারে, তবে সেই ওষুধের সাহায্যে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসাও সম্ভব হবে।

অনেক ইউরোপীয় এবং মার্কিন বৈজ্ঞানিক অবশ্য এ ধরণের গবেষণা সম্পর্কে সন্দেহ এবং অনীহা প্রকাশ করেছেন।

জনৈক মনো-বৈজ্ঞানিকের মতে যে কোন মনস্তত্ত্ববিদেরই উচিত অবচেতনার জগতকে অতি সাবধানে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্মোচিত করা। চোরের মত কৃত্রিম উপায়ে দরজা ভেঙে জোর করে অবচেতনার জগতে প্রবেশের কোন অধিকারই তাঁদের নেই।

যাঁরা এল এস ডির কার্যকারিতায় বিশ্বাস রাখেন তাঁরা প্রত্যুত্তরে বলেন—যখন মানসিক চিকিৎসার চালু পদ্ধতিগুলি রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ হয়, তখন অবশ্যই নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এল-এস-ডি মানসিক চিকিৎসার এক নতুন পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এল-এস-ডি এবং ঐ জাতীয় ওষুধগুলিকে অমূল প্রত্যক্ষসৃষ্টিকারী বলা যেতে পারে। এই ওষুধগুলির প্রভাবে যে সব অমূল প্রত্যক্ষ ঘটে তার ফলে চোখের সামনে নানা বিচিত্র এবং অদৃষ্টপূর্ব প্রতিরূপ ভেসে ওঠে।

ওষুধগুলির মধ্যে এল-এস-ডি-২৫, মেসক্যালিন এবং সিলোকাইবিন সর্বাধিক পরিচিত। ওষুধগুলি বড়ির আকারে, তরল আকারে কিংবা ইনজেক্শনের মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে। অনেক সময় চিনির ডেলার সংগে এগুলি মিশিয়ে রাখা হয়। চা, কিংবা কফির মধ্যে সেই চিনির ডেলা ফেলে দিয়ে তা পান করা হয়। ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এল-এস-ডি-২৫এর প্রভাব দশ থেকে বার ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে।

যতদূর জানা গিয়েছে—এল এস ডি জাতীয় ওষুধগুলি কোন মাদক দ্রব্য নয়, কিংবা এই ওষুধ গ্রহণ করলে নেশাখোরে পরিণত হওয়ার বিপদ নেই। এক ফোঁটা খাঁটি এল এস ডি যে কোন মানুষকে এক অত্যাশ্চর্য ভিশনের জগতে ডুবিয়ে দিতে পারে। এল-এস-ডি এত শক্তিশালী যে একটি পুকুরের জলে এক পাউন্ড এল এস ডি

মিশিয়ে দিলে একটা বড় শহরের সব লোককে সম্মোহিত করে ফেলা যায়।

এল এস ডির বৈশিষ্ট্য হল—যখন এর প্রভাব শেষ হয়ে যায়, তখন দেহ-মন থেকেও এর সব নিদর্শন নিঃশেষ হয়ে যায়।

এল এস ডি সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে একটি আইনগত অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কিছুকাল আগে থালিডোমাইড নামক ওষুধ ব্যবহারের ফলে গর্ভবতী নারীদের বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্মদানের যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে—তার ফলে নতুন ওষুধ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারী আইনের কড়াকড়ি আরও বেড়ে গিয়েছে। ফলে গবেষকরা এই সব ওষুধ সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট বেগ পাচ্ছেন এবং কালোবাজারীদের দয়ার ওপর তাঁদের নির্ভর করতে হচ্ছে।

সম্প্রতি প্রখ্যাত অভিনেতা ক্যারি গ্র্যান্ট তাঁর নিজে মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এল এস ডির সাফল্য সম্বন্ধে যে তথ্য প্রচার করেছেন তার ফলে অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এল এস ডি বা ঐ জাতীয় ওষুধ সেবনের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। ফলে এই ওষুধ কালোবাজারেও ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে—এবং এর দাম বেড়েই চলেছে।

এল এস ডি মানুষের ওপর কিভাবে কাজ করে তা বোঝাতে গিয়ে ডাঃ লিয়ারী বলছেন—মানুষের মস্তিষ্ক প্রায় দশ মিলিয়ন স্নায়ুকোষ দিয়ে গঠিত। এরা প্রত্যেকেই কোন না কোন সংবেদন গ্রহণে সক্ষম। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে এই স্নায়ুকোষগুলির শতকরা একভাগও উজ্জীবিত হয় না। ব্যাপারটা এখন আমরা একটা বৃহৎ ঘরের মধ্যে আছি—যেখানে লক্ষ লক্ষ বাল্‌ব্‌ সাজানো আছে—অথচ তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি মাত্র জ্বালানো হচ্ছে।

যখন এল এস ডি গ্রহণ করা হয়, তখন এই ওষুধের প্রভাবে মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ অব্যবহৃত, অনুদ্দীপ্ত স্নায়ুকোষ অকস্মাৎ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। কি করে যে এমন ঘটে, তা এখনও স্পষ্ট বোঝা যায়নি। কিন্তু এর বিস্ময়কর ফলগুলি প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। এর ফলে পারিপার্শ্বিক বস্তুজগতের সবকিছু প্রচণ্ডভাবে সম্প্রসারিত হয়ে যায়। যা আগে শুধুমাত্র আনন্দ দিত—এখন তা তীব্র উল্লাসের সৃষ্টি করে। সবকিছুই সম্প্রসারণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। সঙ্গীতের মধ্যে আরও বেশী কিছু শুনি, কবিতার মধ্যে আর বেশী কিছু দেখি। যে সৌন্দর্যানুভূতি আগে কখনও ঘটেনি, এখন সেগুলি অপূর্ব আবেগের সৃষ্টি করে। এর কারণ হল—মস্তিষ্কের অব্যবহৃত মস্তিষ্কগুলি উজ্জীবিত হয়ে সংবেদন সৃষ্টি করতে থাকে।

প্রশ্ন হচ্ছে—শুধু চোখের সামনে নানা প্রকারের বিচিত্র প্রতিরূপ এবং ছবির সৃষ্টি করেই কি এল-এস-ডির ভূমিকা শেষ হয়ে যায়? মানুষের কাছে কি এর কোন বাস্তব মূল্য নেই?

ডাঃ লিয়ারী এল এস ডির বিস্ময়কর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন—এই ওষুধ মানুষের মনকে প্রচণ্ডভাবে সম্প্রসারিত করে। এর প্রভাবে মানুষ সর্বপ্রথম তার মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ অব্যবহৃত স্নায়ুকোষগুলির পরিপূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ পায়। ফলে মানুষ আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে জানতে পারে এবং জীবনকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে। দৃশ্য, শব্দ, অনুভূতি—সবকিছুই আমাদের মধ্যে তীব্র উল্লাসের সৃষ্টি করে। আমরা স্বাভাবিক আনন্দের জগত থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আরও এক ঊর্ধ্বলোকে প্রবেশ করি যা আনন্দের থেকেও বেশী কিছুর সন্ধান আমাদের দেয়।

সম্প্রতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা এল এস ডির কার্যকারিতার যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন।

যেমন কালিফোর্ণিয়াতে ছিয়ানব্বই জন রোগীকে এল এস ডি প্রয়োগ করে একে একে প্রশ্ন করা হয়েছিল—আপনারা এল এস ডি গ্রহণের পর কেমন ছিলেন? এল এস ডির প্রভাব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনারা কি অবস্থায় আছেন?

এই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে ডাঃ ম্যানফোর্ড এস উঙ্গার কর্তৃক সম্পাদিত Psychedilic Drug Therapy নামক গ্রন্থে। প্রতি দশজনের মধ্যে আটজন নিম্নলিখিত উত্তরগুলি দিয়েছে।

"মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব আরও গভীরভাবে অনুধাবন করেছি।"

"মানুষের সুখ ও মঙ্গলের প্রতি আরও গভীর আগ্রহ অনুভব করছি।"

শতকরা প্রায় আটজন উত্তর দেন—

"আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।"

শতকরা ৮৯ জন বলেন—"এটি এক মহাসৌন্দর্যের উপলব্ধি।"

ডাঃ কে এস ডিটম্যান এ বিষয় লস্‌-এঞ্জেলসে যে গবেষণা চালাচ্ছেন তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে জার্ণাল অব নার্ভাস অ্যান্ড মেন্টাল ডিজিজেস পত্রিকায়। এই বিবরণ অনুসারে প্রায় শতকরা পঞ্চাশজনের বেশী উত্তর দিয়েছেন—এল এস ডি সেবন তাঁদের জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শতকরা চল্লিশজন উত্তর দিয়েছে এল-এস-ডি দেহ-মনকে অধিকতর ক্ষমতা দিয়েছে। মানুষের সংগে আচার-ব্যবহারে তাঁরা আরও অধিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছেন, এবং সংগীত, কলা ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁরা আরও অধিকতর উৎসাহ এবং আকর্ষণ অনুভব করছেন।

ডাঃ লিয়ারী এবং তাঁর সহকারী ডাঃ অ্যালপার্ট সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছেন।। তাঁদের অপরাধ তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে চুক্তিভংগ করে কলেজের ছাত্রদের ওপর এল এস ডি সংক্রান্ত পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের গবেষণাগার গড়ে তুলেছেন এবং পরীক্ষার যেসব ফল পেয়েছেন তা বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

এল এস ডির প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত যে সব উত্তর তাঁরা প্রকাশ করেছেন—তাতে এল এস ডির আশ্চর্য কার্যকারিতা প্রমাণিত হচ্ছে। 'আমার জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনেছে", "নিজের সম্বন্ধে এমন কিছু জেনেছি যা আগে কোনদিনই জানতে পারিনি।", "এক ঐশ্বরিক উপলব্ধি হয়েছে" "আমি বুঝতে পারছি আগে কত বোকা ছিলাম"—ইত্যাদি উত্তরগুলি নিশ্চয়ই এল এস ডিকে গাঁজা, আফিম বা চরস জাতীয় মাদকদ্রব্য থেকে আরও কিছু ওপরে স্থান করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

ডাঃ লিয়ারীর মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জেগেছিল এল-এস-ডি গ্রহণের ফলে যে সব অভিজ্ঞতাগুলির সৃষ্টি হয় তা কি শুধু সাময়িক নেশাগ্রস্ত অবস্থার ফল, না এর ফলে মানুষের জীবনে চিরদিনের মত এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়?

অবশ্যই এই প্রশ্নের সমাধানের ওপর তাঁর গবেষণার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছিল। ডাঃ লিয়ারী এবং তাঁর সহকারী ডাঃ অ্যালপার্ট ম্যাসাচুসেটের কনকর্ড নামক স্থানে এক কারাকর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত বত্রিশজন দাগী অপরাধীর ওপর এল-এস-ডি প্রয়োগ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, এল-এস-ডি গ্রহণের ফলে তারা কয়েক ঘণ্টার জন্য যে সব অমূল্য প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা তাদের চরিত্রে কোন স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে পারে কিনা।

বত্রিশজন কয়েদীকে এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কয়েকবার এল-এস-ডি সেবন করানো হয়।

পরে যখন এরা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তখন এরা এমন আচার-আচরণ কিম্বা মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে, যার ফলে মনে হয় যেন তারা ধর্মজীবনে দীক্ষা নিয়েছে।

অনেকেই বলে—এই প্রথম তারা বুঝতে পারছে—অপরাধমূলক জীবনের কোন অর্থই হয় না।

পরবর্তীকালে আরও বিস্ময়কর সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার দশ মাস পরেও এদের মধ্যে চব্বিশজন কোন অপরাধমূলক কাজের জন্য শাস্তি পায়নি।

মাত্র পাঁচজন রাস্তায় মাতলামি করার জন্য কিংবা রাস্তায় বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর জন্য সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার হয়েছে। অথচ সাধারণত এই ধরনের সাংঘাতিক অপরাধীরা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কিছুদিনের পর কোন অপরাধমূলক কাজের জন্যে আবার জেলে ফিরে আসে।

কিন্তু এই বত্রিশজন কয়েদীর অধিকাংশ জেলের বাইরে অনিশ্চিত এবং বেকার জীবনের মধ্যেও স্বাভাবিক জীবন বরণ করে নিয়ে বাঁচতে চাইছে।

নেশাখোরদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও এল-এস-ডি বিস্ময়কর ফল দেখিয়েছে। যারা মানসিক বাতুলতায় ভোগে তারা স্মৃতির চারিদিকে এমন একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তোলে যার ফলে তারা অতীতের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা, ভয় এবং আবেগগুলির মুখোমুখি হওয়ার সমস্যা থেকে রেহাই পায়। নেশাখোরেরা ঠিক এই কারণেই মদের নেশায় ডুবে থাকে।

এল-এস-ডি স্মৃতির চারদিকে গড়া এই দেওয়াল ভেঙে ফেলে রোগীকে তার সমস্যা এবং যন্ত্রণাগুলির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। বহুদিনের লুকিয়ে রাখা ভয় এবং আবেগগুলোর সম্মুখীন হয়ে যে আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

বছর চারেক আগে একজন নেশাখোরকে অচেতন অবস্থায় একটা হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। লোকটি খুব ভাল, চাকরী করত কিন্তু পরবর্তীকালে সে মদের নেশায় এমনই উন্মত্ত হয়ে পড়ে যে সে চাকরী-বাকরী ছেড়ে দিয়ে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতে থাকে।

ডাঃ আব্রাম হফার লোকটিকে তাঁর গবেষণাগারে নিয়ে এসে তার ওপরে এল-এস-ডি প্রয়োগ করেন। ফল বিস্ময়কর। এল-এস-ডি'র চিকিৎসায় সে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে এবং একটি ব্যবসায় সংগঠনের অংশীদার হিসাবে যথেষ্ট উপার্জন করছে। কানাডার দুজন ডাক্তার যৌন-অপরাধীদের ওপর এল-এস-ডি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর ফল পেয়েছেন। এদের অনেকের ক্ষেত্রেই মানসিক চিকিৎসার স্বাভাবিক পদ্ধতিগুলি ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এল-এস-ডি গ্রহণের পর এদের অনেকেরই যৌনজীবন আবার স্বাভাবিক খাতে বইতে শুরু করেছে।

এল-এস-ডি ব্যবহারের দ্বারা মানসিক চিকিৎসার এক চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন প্রখ্যাত অভিনেতা ক্যারি গ্রান্ট। ক্যারি গ্রান্ট একাধিকবার এল-এস-ডি গ্রহণ করে দাবী করছেন তাঁর নবজন্ম হয়েছে।

একজন বন্ধুর কাছে ক্যারি গ্রান্টের স্বীকারোক্তি—"তুমি সত্যিই ভাগ্যবান। তোমার জন্ম হয়েছে ১৯৩৫ সালে। আর আমি পঞ্চান্ন বছর বয়সের আগে জন্মগ্রহণই করিনি।"

ক্যারি গ্রান্ট দাবী করছেন—এল-এস-ডি তাঁকে এক সম্পূর্ণ নতুন মানুষে রূপান্তরিত করেছে।

এল-এস-ডি যে একটি নিরাপদ ওষুধ তা নিশ্চয়ই কেউ মানতে চাইবেন না। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করলে এল-এস-ডি বিপদের কারণ হতে পারে। কিন্তু এরকম বিপদের সম্ভাবনা অন্যান্য বহু ওষুধেই আছে। এমন কি অ্যাসপিরিনের মত নির্দোষ ওষুধও আমেরিকাতে প্রতি বছর গড়ে দুশোজন লোকের মৃত্যুর কারণ হয়।

ডাঃ লিয়ারী তাই একদিকে যেমন এল-এস-ডি'র অপব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, অপরদিকে তেমনই দাবী করছেন—এল-এস-ডি মানুষের জীবনে যে গভীরতা, বিস্ময় এবং গৌরবের সন্ধান দিয়েছে এর আগে কখনও মানুষ স্বপ্নেও তার সন্ধান পায়নি।

এল-এস-ডি মানুষের জীবনে এক নব-দিগন্তের সূচনা করেছে। আরও এক মহত্তর জীবনের দ্বারপ্রান্তে আমাদের পৌঁছে দিয়েছে।

জীবনের এই পরম লগ্নকে নিশ্চয়ই আমরা হেলায় হারিয়ে যেতে দিতে পারি না। এল-এস-ডি'র আর এক নাম হোল—সঞ্জীবনী।

শিশির নিয়োগী
দীনেন ঘোষ

জল-জল-জল

'জল' কথাটা সরল হলেও এবং 'জলের মত সহজ' বলে অনেককিছুকে উড়িয়ে দিলেও পানীয় জলসরবরাহটা ঠিক অতটা সরলতার পর্যায়ে পড়ে না। নিত্য অপরিহার্য এই জলের পরিশোধনের এবং সরবরাহের ইতিহাস কিন্তু আমাদের অনেকেরই অজানা। অজানা সেইসব প্রচেষ্টা ও সাধনার কথা যার মাধ্যমে ধাপে ধাপে উন্নত হয়েছে প্রযুক্তিবিদ্যা, জলকে রূপ দিয়েছে পানীয় জলের।

আপনার মনে হয়ত সন্দেহ ধূমায়িত হচ্ছে, ভাবছেন সামান্য জলের ব্যাপারে প্রযুক্তিবিদ্যার অবতারণা করা আর 'মশা মারতে কামান দাগা' একই কথা। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হয়ত প্রশ্ন করবেন 'মশাই, প্রযুক্তিবিদ্যা না কিসব গালভরা নাম ত বলছেন, সে আর ক'দিনের? পানীয় জলের ব্যবহার ত মান্ধাতার আমল থেকে।' প্রসঙ্গক্রমে আপনি হয়ত উল্লেখ করবেন রামায়ণ-মহাভারত বা তারও আগের বেদ উপনিষদ যুগের কথা। বলবেন, 'তখন ত আজকের প্রযুক্তিবিদ্যাও ছিল না আর পানীয় জলের জন্য এমন হাহাকারও ছিল না।' আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু ভাবুন ত সেইসব দিনের কথা। পানীয় জলের নির্মলতার ও অপরিহার্যতার কথা স্মরণ রেখে তখনকার লোকেরা জলকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন। পরিশোধনের পরিবর্তে তাঁরা প্রকৃতি প্রদত্ত জলকে নির্মল রাখতেন ও পানীয় হিসাবে গ্রহণ করতেন। কিন্তু আজকের দিনে সেটা কি সম্ভব? এই আমাদের গঙ্গানদী এবং তার ওপর নির্ভরশীল কলকাতার কথাই ধরুন না। আমরা হিন্দুরা গঙ্গাকে ভক্তি করি ঠিকই, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণই সংস্কার। এর পবিত্রতা রক্ষার পরিবর্তে এই শহরের যাবতীয় আবর্জনা ও কলকারখানার ময়লা প্রতিনিয়ত বিসর্জন দিচ্ছি এর বক্ষে। তাছাড়া আছে নদীর জল পরিবহন ক্ষমতার হ্রাসে উদ্ভূত পলিমাটী ও লবণের প্রাদুর্ভাব। যতই ভক্তি করুন না কেন ভাবতে পারেন আপনি পরিশ্রুত না করে এই গঙ্গাজল খাবার কথা? অবশ্য গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্যে যদি না আপনি খুব অধীর হয়ে থাকেন।

জলের কথা বলতে গেলে এর প্রাপ্তিস্থানের কথাই আগে বলা প্রয়োজন। আপনারা জানেন আমাদের এই পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ সমুদ্রবেষ্টিত। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিরাট জলরাশিকে পানীয় জলের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। কারণ, বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রাদুর্ভাব। সমুদ্র ছাড়া অন্যান্য সমস্তপ্রকার জলের মূল হল মেঘ। নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুরই বলুন বা মাটির নিচের নলকূপের জলই বলুন প্রধানত বারিপাত বা তুষারপাত থেকেই এসেছে। জলের গুণাগুণ কিন্তু নির্ভর করে কিভাবে সেই জল সঞ্চিত হয়েছে তার ওপর। মৃত্তিকাতলের গভীরে সঞ্চিত জলের দূষিত হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম, তবে সেক্ষেত্রে জলে ভূগর্ভস্থ নানাপ্রকার রাসায়নিক সংমিশ্রণের সম্ভাবনা বেশী। অপরপক্ষে পুকুর বা ডোবার স্বল্প আয়তনের বদ্ধ জল সহজেই দূষিত হতে পারে।

অপরিশোধিত জলের কোন ভাণ্ডারকে পরিশ্রুত করে আমরা পানীয় জল তৈরী করব সেটা নির্ভর করে একাধিক কারণের ওপর। যেমন প্রয়োজনমত জলের সংস্থান, জলের গুণগত মান, পরিশ্রুত করবার খরচ, জলভাণ্ডারের অবস্থান প্রভৃতি।

অপরিশোধিত জলের প্রাপ্তিস্থানে সঞ্চিত জলের পরিমাণ এমন হওয়া দরকার যেন সরবরাহের জন্য কোন সময় অভাব বোধ করতে না হয়। আপনারা হয়ত শুনে অবাক হবেন যে, এখন গ্রীষ্মকালে গঙ্গায় যা জল বয়ে যায়, আর ৩০ বছর বাদে বৃহত্তর কলকাতার পানীয় জলের জন্য তার সবটাই দরকার হবে। অর্থাৎ অগস্ত্যের মত আমরাও গঙ্গাকে সেদিন গণ্ডূষে পান করতে পারব। আপনারা হয়ত ফরাক্কা প্রকল্পের নাম শুনে থাকবেন। এই প্রকল্পে বাঁধের সাহায্যে পদ্মার কিছুটা জল ভাগীরথীতে এনে গঙ্গায় জলের পরিমাণ বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে গঙ্গার জলে লবণ ও পলির পরিমাণ কমাতে সাহায্য করবে।

জলের মান এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে স্বল্প আয়াসেই পানীয় জলে রূপান্তর ঘটান যায়। জৈব এবং অজৈব পদার্থের তারতম্যই জলের গুণগত মান নিরূপণ করে। যেসব পদার্থ মানুষের শরীরের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদেরই সাধারণতঃ দূষিত পদার্থ বলে। জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারদের দায়িত্ব হল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জলকে এইসব দূষিত পদার্থমুক্ত করে

পাম্প স্টেশন
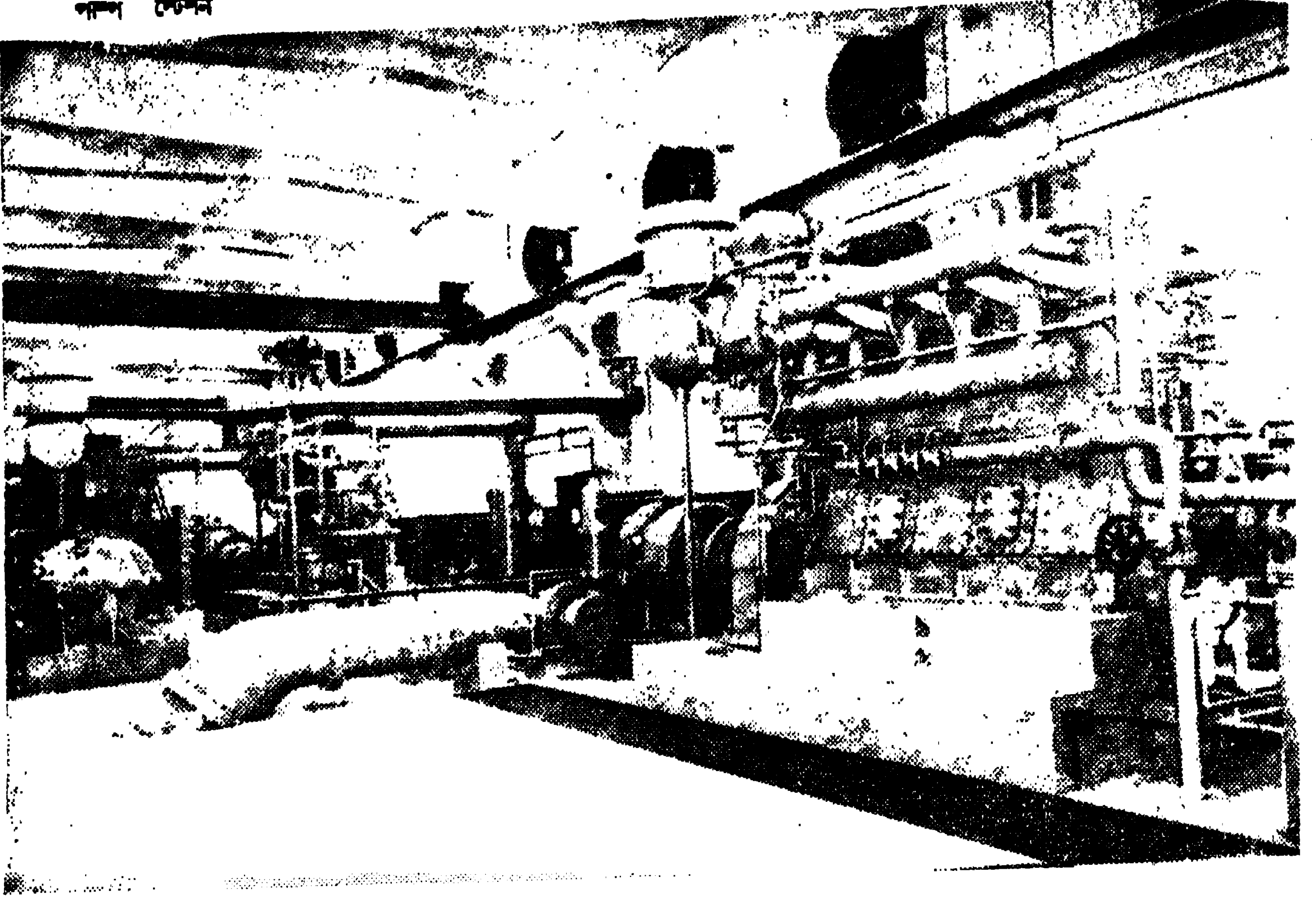
স্বাস্থ্যকর উপায়ে সরবরাহ করা। জৈব পদার্থের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন প্রকার বীজাণু, শ্যাওলা প্রভৃতি। অজৈব পদার্থ বলতে বুঝায় ধাতব পদার্থ, রাসায়নিক দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার লবণ, পলি প্রভৃতি।

উপরোক্ত গুণসমন্বিত একাধিক জলভাণ্ডার থাকলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ের ভাণ্ডারটিকেই পরিশোধনের জন্য ঠিক করতে হবে। এ-ব্যাপারে জলভাণ্ডারের অবস্থান এবং শহর থেকে জলভাণ্ডারের দূরত্ব গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রাকৃতিক জলসম্পদের অসম বণ্টন অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করে। কোথাওবা নদী, হ্রদ বা ভূগর্ভস্থ জল সবকিছুই পর্যাপ্ত। আবার কোথাও বা দিগন্তবিস্তৃত রুক্ষতা নিয়ে প্রকৃতি নিষ্করুণ। ভূগর্ভস্থ জলও হয়তবা কঠিন শিলার দ্বারা আচ্ছাদিত। এসব ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যেখানে কয়েকশত মাইল দূরবর্তী ভাণ্ডার থেকে পাইপের সাহায্যে জলকে আনান হচ্ছে পরিশ্রুত করবার জন্য। সমুদ্রতীরবর্তী অনেক শহরের একটা বড় সমস্যা প্রাকৃতিক সুপেয় জলের অভাব। সুতরাং অনন্যোপায় মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সমুদ্র থেকেই পানীয় জলের সংস্থান করবার চেষ্টা করেছে। মোটকথা জল মানুষের চাই-ই। এপর্যন্ত বহু জিনিষেরই বিকল্প তৈরি হয়েছে এবং অদূরভবিষ্যতে হয়তবা আমরা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যেরও বিকল্প আবিষ্কার করব। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জলের বিকল্প অচিন্তনীয়।

যাই হোক এত গেল প্রাকৃতিক জলভাণ্ডারের সমস্যার কথা। আসল কথা হল পানীয় জল সরবরাহের জন্য আমাদের একটা প্রাকৃতিক জলভাণ্ডার দরকার—যা থেকে আমরা পর্যাপ্ত জল সংগ্রহ করতে পারি।

দেখা যাচ্ছে জল সরবরাহের ব্যাপারে প্রাকৃতিক জলকে আমরা সাধারণত দুইভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন নদী, হ্রদ প্রভৃতি ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের জল এবং ভূগর্ভস্থ জল। আগেই বলেছি ভূগর্ভস্থ জলে জৈব পদার্থ এবং দূষিত হবার সম্ভাবনা কম থাকায় একে পরিশোধন না করেই গ্রহণ করা চলে। অবশ্য সবসময় সেটা সম্ভব না'ও হতে পারে। অপরপক্ষে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের জলে (নদী, হ্রদ প্রভৃতি) দূষিত পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় পরিশোধন সবসময়েই দরকার।

জল পরিশোধনের ব্যাপারে আপনাদের অনেকেরই হয়তবা ধারণা জলকে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে তারপর সরবরাহ করা। প্রকৃতপক্ষে পরিশোধনাগারে জলকে কিন্তু একেবারেই ফুটান হয় না। জল পরিশোধনকেন্দ্রক এর বিভিন্ন অংশের ভূমিকা অনুযায়ী কয়েকটি অংশে বিভক্ত : জল-সংগ্রাহক কেন্দ্র, রাসায়নিক সংমিশ্রক, ময়লা পৃথকীকরণ, পরিশ্রুতকরণ, বীজাণু মুক্তায়ন ও পরীক্ষাগার।

প্রাকৃতিক জলভাণ্ডার থেকে জলকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিশোধনের জন্য প্রথমেই দরকার জল-সংগ্রাহক কেন্দ্রের। সংগ্রাহক কেন্দ্রের গঠন নির্ভর করে জলভাণ্ডারের বৈশিষ্ট্য এবং পরিশোধনাগারের বিভিন্ন অংশের অবস্থিতির ওপর। সাধারণভাবে সংগ্রাহক কেন্দ্রের দুটি অংশ। প্রথমটি অপরিশোধিত জলপরিবাহী নল এবং তাকে ধারণ করবার ও জল তুলবার সাহায্যকারী কাঠামো বা জেটী এবং দ্বিতীয়টি জল-উত্তোলক যন্ত্রপাতি বা পাম্প, যার কাজ হল প্রাকৃতিক ভাণ্ডার থেকে জল তুলে পরিশোধনাগারের বিভিন্ন অংশে পাঠিয়ে দেওয়া। অবস্থাবিশেষে জলসংগ্রাহক কেন্দ্রের গঠনভঙ্গিমা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন ধরুন এমন একটা অবস্থা যেখানে পরিশোধনাগারের অন্যান্য অংশের তুলনায় প্রাকৃতিক জলভাণ্ডারটির অবস্থিতি অনেকটা উঁচুতে। এক্ষেত্রে জল-উত্তোলক যন্ত্রপাতির পরিবর্তে জলাধার থেকে পরিশোধনাগার পর্যন্ত একটি জলবাহী নলই যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সংগ্রাহক কেন্দ্রের কাজ হল প্রাকৃতিক জলাধার থেকে জলকে পরিশোধনাগারের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেওয়া।

অপরিশোধিত জল যোগান পাবার পরই তাকে পরিশ্রুত করবার দায়িত্ব কিন্তু পরিশোধনাগারের অন্যান্য অংশের। পরিশোধন করবার একটা সাধারণ নিয়মাবলী থাকলেও অবস্থাবিশেষে এই নিয়মের কিন্তু তারতম্য

ত পারে। জলকে কতটা পরিশ্রুত করা তা যেমন নির্ভর করে আমরা কিভাবে জল ব্যবহার করব তার ওপর ঠিক নই কি উপায়ে পরিশ্রুত করব নির্ভর অপরিশোধিত জলের গুণগত মানের র। যেমন, ধরুন আমাদের প্রাকৃতিক ভাণ্ডারটি একটি হ্রদ। এর কাচের মত চ্ছকার জলে তলদেশ পর্যন্ত দৃশ্যমান। রাং এই জলকে পরিশ্রুত করবার সময় শোধনাগারের প্রাথমিক ময়লা পৃথকী- পদ্ধতিটি অনায়াসেই বাদ দেওয়া যেতে র। যেটা সম্ভব হত না আমাদের গংগা- র বেলায়। আপাতস্বচ্ছ এই মন- ানো জলকে কিন্তু তাবলে পরিশ্রুত না পান করবার কথা চিন্তা করবেন না। শ, হয়ত ওতে রয়েছে অস্বাস্থ্যকর নানা- ার জলে দ্রবণীয় রাসায়নিক লবণ এবং বদ্রব্য, হয়তবা মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে শ্য শত্রু মারাত্মক রোগের বীজাণু। তরাং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে কে? ায়ে এল প্রযুক্তিবিদ্যা সেবাব্রতীর কায় তার সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় দিয়ে। পরিশোধনাগারের বিভিন্ন শের মধ্য দিয়ে বয়ে চলল সেই বেগবতী ধারা মৃত্যুকে পিছনে ফেলে জীবনের ী নিয়ে।

জলে পলি বা অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ লে তাকে প্রথমত ময়লা পৃথকীকরণ তিতে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। বন্ধ অবস্থায় জলকে আটকে রাখলে পক্ষাকৃত ভারী পদার্থগুলি তলানি পড়ে ং সময়ের সংগে জল ক্রমাগত পরিষ্কার আসে। দ্রবণীয় এবং অতিসূক্ষ্ম ার্থগুলি কিন্তু এই উপায়ে পৃথক করা না। এর জন্য দরকার বিশেষ পদ্ধতিতে সায়নিক সংমিশ্রণ যাতে দ্রবণীয় পদার্থ- লিকে রূপান্তর ঘটিয়ে অদ্রবণীয় করে থক করা হয়। এত কাণ্ড করার পরেও ন্তু অতিসূক্ষ্ম পদার্থগুলি জলের মধ্যে সমান অবস্থায় থেকে যায়। এই প্রক্রিয়ায় শকিছু অজৈব পদার্থ এবং কিছু পরিমাণ ব পদার্থ কমিয়ে ফেলা গেলেও চিরশত্রু াগ সৃষ্টিকারী বীজাণুরা কিন্তু প্রায় রাপদই থেকে যায়। সুতরাং জলকে এবার ানা হয় পরিশোধনাগারের তৃতীয় পর্যায়ে িশ্রুতকরণের জন্য।

পরিশ্রুতকরণ বা ছাঁকন প্রক্রিয়ার নামে াপনারা হয়তবা অবাক হচ্ছেন, ভাবছেন, অদৃশ্য যেসব বীজাণু, যাদের অনুবীক্ষণ ন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না, তাদের জন্য ছাঁকনী? এই জলকে দিয়েই বা আর একটু ল্লভাবে জলের অতিসূক্ষ্ম পদার্থ এবং ীবাণু দিয়ে বীজাণু ছাঁকা হয়। সূক্ষ্মাতি- ূক্ষ্ম ওই ছাঁকনী যাতে আপনা থেকেই তৈরী হতে পারে তার আনুষঙ্গিক বস্থা করে দেন জনস্বাস্থ্য ইঞ্জি- নীয়াররা। আগের দুটি পদ্ধতির দ্বারা আপাত পরিষ্কার জলকে এবার নিয়ে আসা হয় বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী একটি স্তরবিন্যাস করা বালুকা বিছানার ওপর। দুই হাত গভীর এই বালির বিছানাটি কয়েকটি স্তরে সাজান থাকে। ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত স্তরগুলি মোটামুটি এই রকম—মিহিবালি, সরুবালি, মাঝারী বালি, মোটা বালি এবং নুড়ী। সবচেয়ে নিচের থাকে পরিশ্রুত জল বের হবার জন্য ছোট ছোট নালা। জল এই বালির স্তরগুলি ভেদ করে পরিশ্রুত হয়ে নালা দিয়ে বের হয়ে আসে। স্থূলদৃষ্টিতে এই বালুকা- স্তরই হল ছাঁকনী। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানেন এটা শুধু কাঠামো। এই কাঠামোর ওপরেই গড়ে উঠবে সেই সূক্ষ্মাতি- সূক্ষ্ম জৈবজালি—যা পথরোধ করে দাঁড়াবে বীজাণু এবং অতিসূক্ষ্ম পদার্থগুলির। এই জৈবজালি কিন্তু একদিনেই তৈরী হয় না। জলের নিম্নগতিতে প্রথমে বালির ওপর জমা হয় সূক্ষ্ম পদার্থ তার ওপর অতিসূক্ষ্ম পদার্থ এবং সবচেয়ে ওপরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ময়লা ও বীজাণুর আস্তরণ। এই আস্তরণই প্রকৃতপক্ষে বীজাণু ও অতিসূক্ষ্ম পদার্থকে জল থেকে পৃথক করে পরিশ্রুত করে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমার 'জল দিয়ে জল ছাঁকার' উক্তিটি একেবারে অর্থহীন নয়। এই পদ্ধতিটিকে আমরা 'ধীর বালুর ছাঁকনী' পদ্ধতি বলে থাকি। এর সাহায্যে আমরা খুব উচুমানের জল পেলেও পদ্ধতির অপেক্ষাকৃত গতিহীনতার জন্যই এইরকম নামকরণ। এই প্রক্রিয়ায় পরিশ্রুত জলে দূষিত পদার্থ প্রায় থাকে না বললেই চলে।

আগেকার পদ্ধতির ধীরগতি এবং অধিক জায়গা লাগার জন্য আরও একপ্রকার ছাঁকন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। একে বলা হয় দ্রুতপাত ফিলটার। এতে স্তরবিন্যাস মোটামুটি একইরকম হলেও বালির দানা অপেক্ষাকৃত মোটা থাকে। বালুকাস্তরের ওপর জলের গভীরতা বেশী থাকায় এবং নিয়মিত বালুকাস্তরকে পরিষ্কার করার জন্য জৈব-জালি ঠিকমত তৈরী হতে না দেওয়ার জল খুব দ্রুত পরিশ্রুত হয়ে বেরিয়ে আসে। এই পদ্ধতিতে পরিশ্রুত করবার আগে জলে ফিটকারি মিশিয়ে ময়লাকে তাড়াতাড়ি থিতিয়ে পড়তে সাহায্য করা হয়। এই থিতানো ময়লাই বালির ওপর জমা হয়ে জলকে পরিশ্রুত করতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতির জল আগের পদ্ধতির মত অত উঁচুমানের হয় না।

পরিশ্রুতকরণ বা ছাঁকন প্রক্রিয়ার জলের গুণগত মান বহুল পরিমাণে উন্নত হলেও কিছুপরিমাণ রোগজীবাণু কিন্তু থেকে যেতে পারে। জলকে সম্পূর্ণরূপে বিপ- ন্মুক্ত করতে হলে ঐ সামান্য পরিমাণ রোগ- বীজাণুকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। সুতরাং সংগ্রামী মানুষের সংগ্রাম অব্যা- হত রইল। পরবর্তী পর্যায়ে জলকে আনা হয় বীজাণু-মুক্তায়ন কক্ষে। জলকে বীজাণু- মুক্ত করা হয় সাধারণতঃ ক্লোরিনের সাহায্যে। আপনাদের নিশ্চয় অজানা নয় এবং ব্যব- হারিক জীবনেও দেখে থাকবেন বীজাণু- নাশক হিসেবে ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার। ব্লিচিং পাউডারের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্লোরিন—যা বীজাণুমুক্ত করতে সাহায্য করে। পরিশোধনাগারে আমরা বীজাণু- মুক্তায়নের জন্য লিকুইড বা গ্যাসীয় ক্লোরিন ব্যবহার করে থাকি। সম্পূর্ণরূপে বীজাণু- মুক্ত করতে যে পরিমাণ ক্লোরিন লাগা উচিত প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে একটু বেশীই মেশান হয়ে থাকে কারণ উদ্বৃত্ত ক্লোরিন জল- সরবরাহের সময় জলকে বীজাণুমুক্ত রাখতে
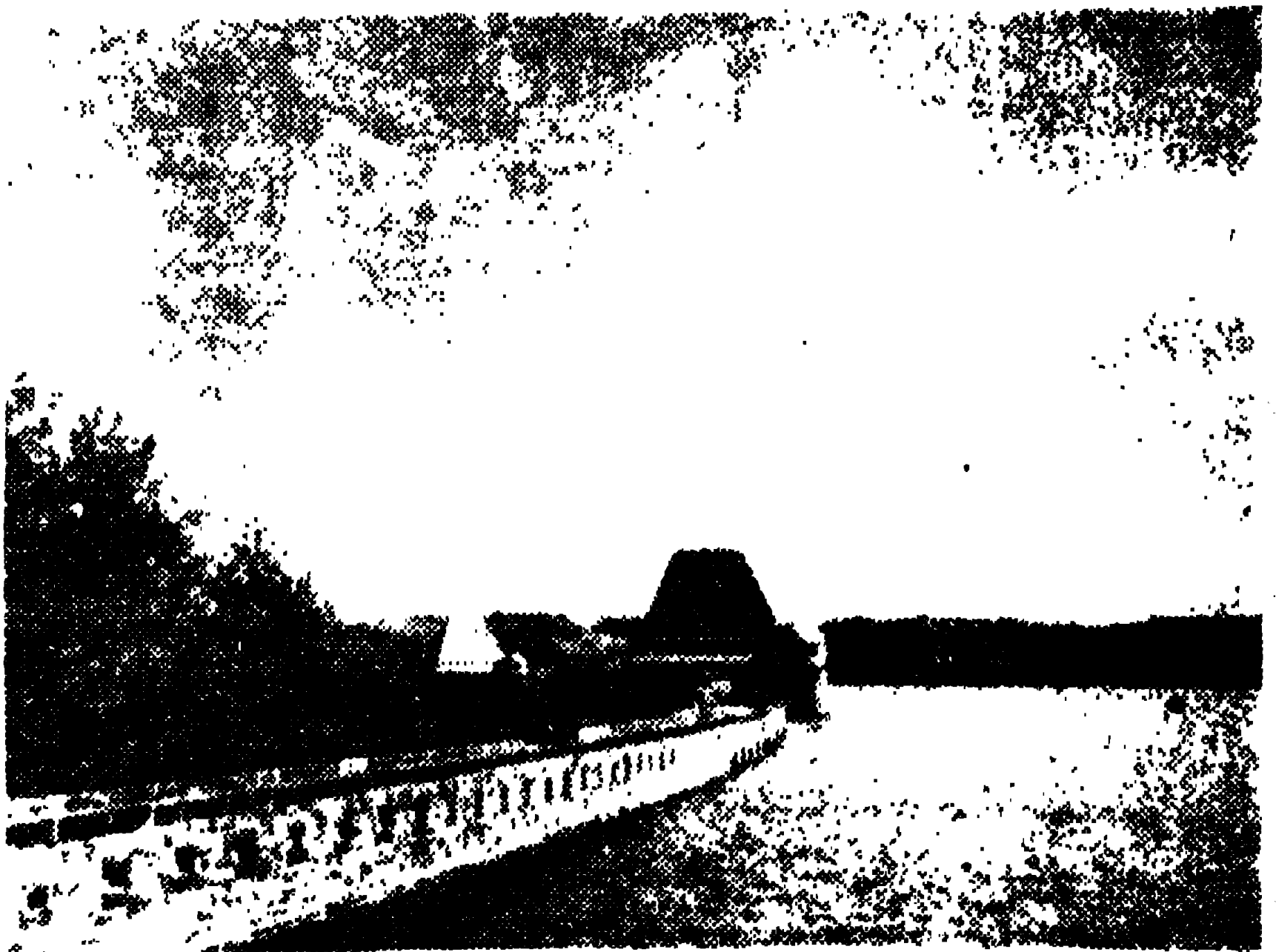
প্রাকৃতিক জলভাণ্ডার

সাহায্য করে। জলে ক্লোরিন মেশাবার যন্ত্রকে বলা হয় 'ক্লোরোনম'। এছাড়াও জলকে বীজাণুমুক্ত করবার উন্নততর পদ্ধতি রয়েছে। অতি-বেগুনী রশ্মি পদ্ধতি এদের অন্যতম।

প্রতিটি পর্যায়ে জলের গুণগত মান এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পরীক্ষাগার রাখা হয়। পরীক্ষাগারের কাজ হল প্রতিটি পর্যায়ের জলকে পরীক্ষা করে দেখা যে পরিশোধিত জল তার মানে পৌঁছেচে কিনা এবং না পৌঁছে থাকলে কি করতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া।

বীজাণুমুক্তায়নের পর জলকে পরিশোধনাগারে ফেলে রাখলে ত চলবে না। তাকে পৌঁছে দিতে হবে আপনারই দ্বারে। সুতরাং চাই সুষ্ঠু জলসরবরাহ ব্যবস্থা। পরিশ্রুত জলকে পাম্প করে দেওয়া হয় উঁচু জলাধারে। তারপর সেখান থেকে পাইপের সাহায্যে সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন অঞ্চলে।

পানীয় জলকে আপনার ঘরে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত চলেছে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের অংশীদার জলসরবরাহ সংস্থার প্রতিটি মানুষ যারা দিবারাত্র আপনার সেবায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে।

ওপরে যে তথ্য পরিবেশন করা হল তার কোনটাই আপনার অজানা নয় তবে ঠিক এভাবে চিন্তা করবার অবকাশ হয়ত আপনার মেলে না। ঠিক এভাবে চিন্তা করলে আমরা হয়ত আরও একটু হিসাবী হতাম, জল নষ্ট হতে দেখলে এর পিছনের ইতিহাসের কথা মনে করে তার প্রতিকার করতাম। বুঝতে পারছি এজাতীয় কথায় আপনার মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে, ভাবছেন 'যে জিনিষ ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না তার আবার নষ্ট।' একথা ঠিক, প্রয়োজন অনুপাতে আমাদের সরবরাহ অত্যন্ত কম, মাথাপিছু মাত্র ২০ গ্যালন। কর্পোরেশনের হিসাবে একথা বললেও আপনি যে এটুকুও পাচ্ছেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তার কারণ অনেক-কিছু চুরির মত জলচুরির ইতিহাসও আপনার অজানা নয়। আপনার টানাটানির সংসারে জলের অনটন আরও বাড়িয়ে হয়ত বা আপনারই প্রতিবেশী বেশ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা হয়ত সবাই জানেন কিন্তু প্রতিকারে আপনাদের বড় আলস্য। সি-এম-ডব্লিউ-এস-এ'র সম্প্রতি এক সমীক্ষায় এই জাতীয় বহু জলচুরির রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

আধুনিক যুগে অনেকসময় জল সরবরাহের পরিমাণকে জীবনযাত্রার মানের সূচক হিসাবে দেখা হয়। পাশ্চাত্য দেশের বহু শহরে জল সরবরাহের পরিমাণ মাথাপিছু ১৫০ গ্যালনেরও বেশী। সুতরাং

রিজার্ভার
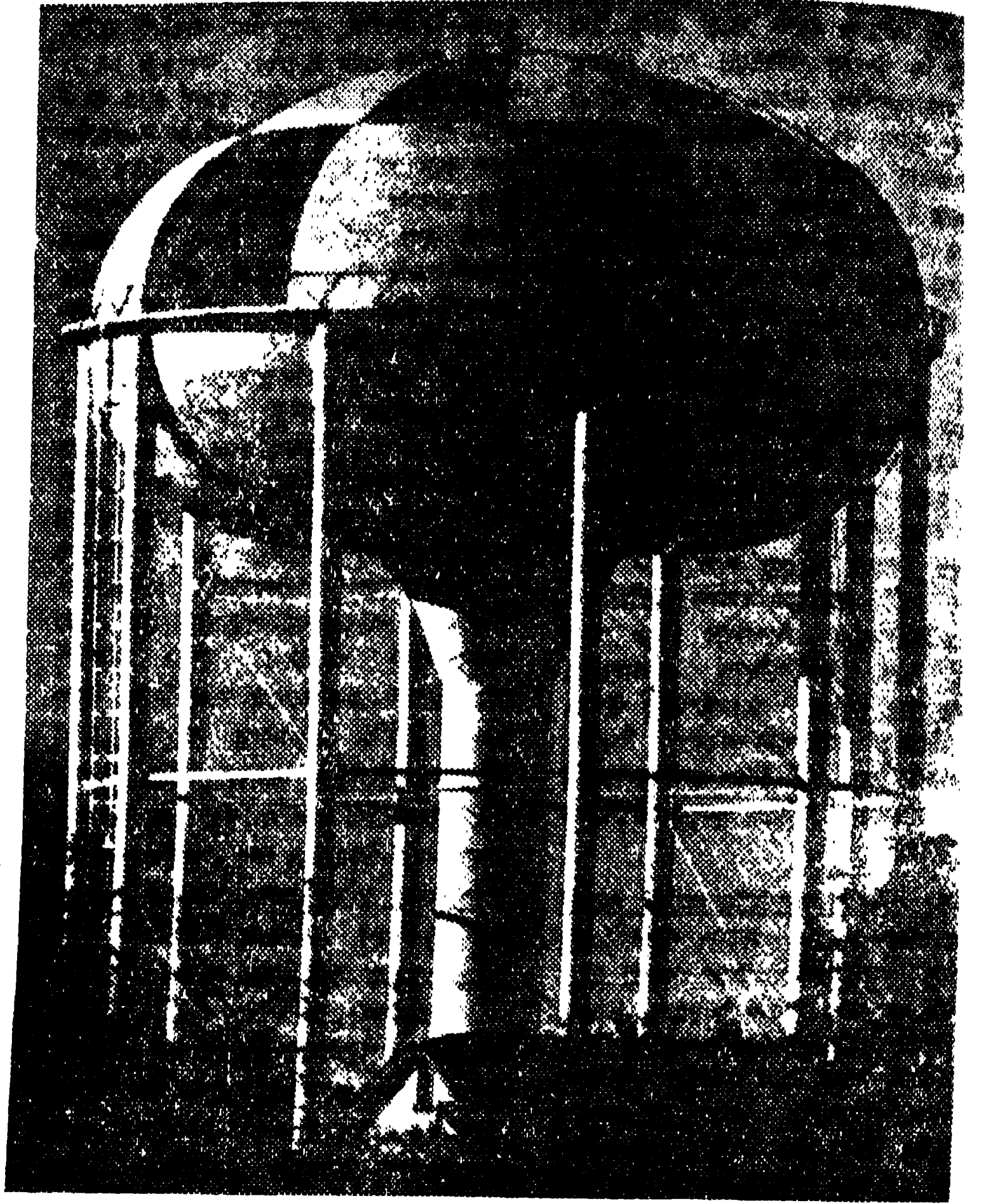
বুঝতেই পারছেন সেদিক থেকে আমরা কত পিছনে পড়ে আছি।

পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় ১৯৫৯ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ডঃ এবেল ওলম্যানের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ দলকে কলকাতায় জলসরবরাহ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য পাঠান। সমীক্ষার পর তাঁরা যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে অবিলম্বে জলসরবরাহের উন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়। তাঁরা আরও বলেন, বর্তমানে ত্রুটিপূর্ণ জলসরবরাহ ব্যবস্থার জন্যই কলকাতা কলেরা মহামারীর কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। এটা শুধু বাঙলা তথা ভারতেরই নয় সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই আতঙ্কের কথা। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষজ্ঞ দল এবং সি-এম-পি-ও এবিষয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরীর কাজে হাত লাগান। ইমিধ্যেই সি-এম-পি-ও বৃহত্তর কলকাতায় জলসরবরাহের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেছেন। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য 'ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার এণ্ড স্যানিটেশন অর্থরিটি' নামে ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে একটি সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

কথায় বলে সব ভাল যার শেষ ভাল। ইতিহাস বলে সম্রাট নীরো নাকি রোমকে পুড়িয়ে তার সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ নরনারীর আর্তনাদ তার হৃদয়ে নাকি অপূর্ব সুখানুভূতি জাগিয়েছিল। জানি না, তার কতটা সত্যি। তবে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এককালীন রাজধানী, ভারতের বৃহত্তম বন্দর কলকাতার দীন থেকে দীনতম অবস্থা। স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে যার অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে। পরিকল্পনা শেষে এখন প্রশ্ন উঠেছে এর বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব কার? প্রাদেশিক সরকারের ক্ষীয়মাণ রাজকোষ এই বিপুল ব্যয়ভার বহনে অক্ষম। বিদেশী বিশেষজ্ঞরা যখন একে বিশ্বের সমস্যা বলে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে রাজী তখন কেন্দ্রীয় সরকার একে জাতীয় সমস্যা বলতেও নারাজ।

কবি কোলরিজ তাঁর 'অ্যানসিয়াণ্ট মেরিনার' কবিতায় বন্ধ নাবিকের মুখে এক ফোঁটা পানীয় জলের জন্য যে হাহাকার শুনিয়েছিলেন তা সত্যিই মর্মস্পর্শী। দিগন্তবিস্তৃত লবণাক্ত জলের মাঝে কয়েক ফোঁটা পানীয় জলের জন্য তাদের আকুলতা আকাশে-বাতাসে যে করুণ সুর তুলেছিল আজও তা মিলিয়ে যায় নি। সুপেয় জলের অভাব আজও পৃথিবীর নানা দেশের অন্যতম প্রধান ভাবনা। দুর্ভাগা নাবিকদের মত এই সব দেশের লোকেরা এখনও কেবলমাত্র পানীয় জল পেলেই খুশী। 'অবাক জলপানের' তৃষ্ণার্ত লোকটির মতই এরা অজ্ঞ। জল থেকে যে কত রোগ ছড়ায় তা এদের জানা নেই। এখনও অনেক ক্ষেত্রেই এদেরকে জানার মত শিক্ষা দেওয়াও সম্ভব হয় নি। 'অবাক জলপানের' পাগলা বিজ্ঞানীর মত বোঝাতে শুরু করলে শ্রোতার ধৈর্য বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। সাধারণ কথায় পানীয় জলের নাড়ি-নক্ষত্র বোঝাতে পারলেই ফল পাওয়া সম্ভব। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটলেই জানা যায় কি করে জলের সঙ্গে রোগের সম্পর্ক ধরা পড়েছে, আর বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে জল থেকে রোগাক্রমণের সম্ভাবনাকে কমান হয়েছে।

বহুরূপী-জল

দীপ্তিময় দে

...জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ... অনেক আগে থেকেই মানুষের ধারণা ... যে, নোংরা জল থেকে অনেক রোগ ...য়ে পড়ে। ফন লিউকেনহক নামে এক ... বিজ্ঞানীই প্রথম জলে নানা জীবাণুর ...ান পান। এতে মানুষের ঐ ধারণা ...ও বদ্ধমূল হল। বিজ্ঞানী ডারউইন, ...তুর এবং কক প্রভৃতির ঐতিহাসিক ...ষণায় প্রমাণিত হয়েছিল জলের নানা ...নের জীবাণুর সঙ্গে বিভিন্ন রোগের ...ড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এসব তথ্য ...ণিত হওয়ার অনেক আগেই ডঃ জন ... লণ্ডনের এক ভয়াবহ এশিয়াটিক ...রার প্রাদুর্ভাব জল থেকে হয়েছে বলে ... দিয়েছিলেন। লণ্ডনের ব্রড স্ট্রীট ...াকার একটি কুয়োর ২৫০ গজ ব্যাসার্ধের ...া দশ দিনে এই রোগে ৫২১ জন লোক ...া যায়। তিনি অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেন ... ঐ কুয়োতে পয়ঃপ্রণালীর নোংরা জলের ...মিশ্রণ ঘটেছে। জীবাণুতত্ত্ব সম্বন্ধে ...রোপুরি ওয়াকিবহাল না হয়েও অনু-...নের উপর ভিত্তি করেই তিনি এই মত ...য়েছিলেন।

এর পরে ক্রমে ক্রমে টাইফয়েড ...(১৮৮০), কলেরা (১৮৮৪), আমাশয় ...(১৮৯৮) এবং প্যারাটাইফয়েড (১৯০০) ...াদি রোগ বিস্তারের সঠিক কারণগুলি ...বিষ্কৃত হয়। দেখা যায়, যে সব জীবাণু ... রোগগুলির জন্য দায়ী সেগুলি ঐ রোগের রোগীদের মলমূত্রে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই পয়ঃপ্রণালীর জল পানীয় জলের সঙ্গে মিশে গেলে এই সব রোগ ছাড়াও অন্যান্য আন্ত্রিক রোগও ছড়িয়ে পড়ে।

পানীয় জল থেকে যে কলের ছড়িয়ে পড়ে ডাঃ জন স্নো-র এই আবিষ্কার এবং নানা জীবাণুর সাহায্যে বিভিন্ন রোগ বিস্তারে পানীয় জল কতটা দায়ী এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও বিশেষ করে জীবাণুতত্ত্ববিদরা চিন্তিত হলেন। সেই কারণে তাঁরা পানীয় ও পয়ঃপ্রণালীর জল সম্বন্ধে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। এর ফলে জানা গিয়েছিল পয়ঃপ্রণালীর জলে বা পয়ঃপ্রণালীর জল মিশে দূষিত হওয়া জলে প্রচুর জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। এমনকি প্রাকৃতিক উৎসগুলি থেকে পাওয়া জলেও কিছু কিছু জীবিত জীবাণু রয়েছে। সাধারণ ভাবে, মানুষের মলমূত্র বহনকারী পয়ঃপ্রণালীর জলে যে জল হয় তাতে রোগউৎপাদনকারী জীবাণুর প্রাচুর্য দেখা যায়।

এই সব তথ্য জানার পর প্রধান যে তিনটি সমস্যা দেখা দিল তা হচ্ছে (১) কি উপায়ে জলে এই সব রোগজীবাণুর উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়, (২) কি করে পানীয় জলে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যায় ও (৩) দূষিত জলকে জীবাণুমুক্ত করে পানীয় জলে রূপান্তরিত করার পন্থা আবিষ্কার।

সাধারণ লোকের কাছে প্রথম সমস্যাটির সমাধান আপাতদৃষ্টিতে খুবই সহজ মনে হয়। কেননা চেনা-জানা রোগজীবাণুগুলির উপস্থিতি বা অনুপস্থিত নির্ণয় করলেই এ সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু জীবাণুতত্ত্ববিদদের কাছে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। প্রথমত অনেক সময় দেখা যায় যে চেনা-জানা অনেক ক্ষতিকর জীবাণুর সঙ্গে সম্পূর্ণ নির্দোষ নানা ধরনের জীবাণুর এত আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে যে অনেক ক্ষেত্রেই এদের তফাৎ বোঝা খুবই শক্ত। দ্বিতীয়ত সুস্থ সবল মানুষের মলমূত্রেও কোটি কোটি নির্দোষ জীবাণুর সন্ধান মেলে। কোন নির্দিষ্ট জনসংখ্যায় বিশেষ কোন রোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা সাধারণভাবে কমই থাকে। তাই এই জনসংখ্যার জন্য তৈরী পয়ঃপ্রণালীর ময়লা জলে ঐ রোগের জীবাণু তুলনামূলকভাবে খুবই কম থাকে। হাজার হাজার সুস্থ লোকের ব্যবহৃত ময়লা জল যখন পয়ঃপ্রণালীতে এই অল্প পরিমাণ রোগজীবাণুপূর্ণ ময়লা জলের সঙ্গে মেশে যায় তখন তা থেকে ক্ষতিকর রোগজীবাণুগুলিকে খুঁজে বের করা আর খড়ের গাদা থেকে সূঁচের খোঁজ করা একই কথা।

এই সব কারণে জলে বিশেষ বিশেষ রোগজীবাণুর সন্ধান করে পানীয় জল হিসেবে তার যোগ্যতা বিবেচনা করা মুস্কিল। এই তথ্য জানার পর উপায়

উদ্ভাবনের চেষ্টা চলল যাতে জীবাণুতত্ত্বের উপর নির্ভর করে পানীয় জলের বিশুদ্ধতার একটা মাপকাঠি স্থির করা যায়। গত পঞ্চাশ বছর ধরে এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। পুরোপুরি সন্তোষজনক কোন মাপকাঠি স্থির না করা গেলেও, এ বিষয়ে যা কাজ হয়েছে তা ব্যর্থ হয় নি। এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণার ফলে জানা তথ্যকে ভিত্তি করে আমেরিকার জনস্বাস্থ্য সংস্থা জল পরীক্ষার একটি সন্তোষজনক নিয়মাবলী প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয় সমস্যা হল পানীয় জলে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা। এ ব্যাপারে অনেক উন্নতি হয়েছে। মানুষের দেহনির্গত রোগজীবাণু পয়ঃপ্রণালীর জলে বাসা বাঁধে। বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই বিপদ থেকে সাবধান হতে শিখেছে। উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে ময়লা জল নিষ্কাশন করে পরিশ্রুত করার পর তা লোকালয়ের বাইরে এমনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় যাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। তবে এ ব্যাপারে এখনও আশানুযায়ী সাফল্য অর্জন করা যায় নি। কেননা পয়ঃপ্রণালীর জল পরিশ্রুত করায় অনেক সময় ত্রুটি থেকে যায়। এ ব্যাপারে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব নেই, অভাব হচ্ছে সামাজিক উদ্যমের প্রয়োজনীয় অর্থের ও তত্ত্বাবধানের।

তৃতীয়ত রোগজীবাণুমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য সবরকমের বৈজ্ঞানিক কৌশল আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। প্রমাণ হিসেবে দেখান যেতে পারে যে সব ঘন বসতিপূর্ণ লোকালয়ে উপযুক্তভাবে পরিশ্রুত করার পর পানীয় জল সরবরাহ করা হয় সে সব জায়গায় জল থেকে ছড়িয়ে পড়ে এরকম আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব নেই বললেই চলে। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত জলের উৎস দেখে নেওয়া, এই জলের সংরক্ষণ, জলের ময়লা ও কিছু কিছু রোগজীবাণু দূর করার জন্য ফিলট্রেশনের বন্দোবস্ত, জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ ও জীবাণুমুক্ত পাইপের সাহায্যে পানীয় জল গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এত চেষ্টা করা সত্ত্বেও একথা জোর করে বলা যায় না যে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের সব চেষ্টাই সফলতা লাভ করে। সময় সময় সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও উপযুক্ত অর্থসংস্থানের অভাবই নির্দোষ পানীয় জল সরবরাহের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

জল না পেলে মানুষের চলে না। তাই জল সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। জল সরবরাহের প্রতি স্তরে তীক্ষ্ম নজর রাখতে হবে যাতে রোগজীবাণুকে জল থেকে দূরে রাখা যায়। কয়েকটি জায়গায় পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। দেশের সব জায়গায় জীবাণুমুক্ত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করার সঙ্গে জনসাধারণকে এ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। উপযুক্তভাবে পরিশ্রুত নয় অথবা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পানীয় জলে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটলে নানা ধরনের আন্ত্রিক রোগ ছড়িয়ে পড়ে। জলে যে সব ক্ষতিকর জীবাণু সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এনটেরিক ব্যাসিলি। মানুষের অন্ত্রে এই জীবাণু পাওয়া যায়। এই জাতীয় জীবাণুর মধ্যে রয়েছে এস্চেরিসিয়া, এরোব্যাকটর, সেরাটিয়া, প্রোটেনস, প্যারাকোলোব্যাকট্রাম, স্যালমোনেলা ও শিগেল্লা। শেষ তিন জাতের বীজাণু রোগ ছড়াতে ওস্তাদ। অন্য জাতের উল্লেখযোগ্য জীবাণুর মধ্যে আছে ভিবরিও কমা—যা কলেরার কারণ। এছাড়া ক্ষতিকারক জীবাণুর মধ্যে রয়েছে মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকুলোসিস, ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস, লেপটোসপিরা ইকটেরোহেমারেজিন, ইনফেকটস হেপাটাইটিস ভাইরাস এবং পোলিওমাইলিটিস ভাইরাস। এনটেরিক ব্যাসিলি গোষ্ঠীর মধ্যে কোলিফরম জাতীয় নির্দোষ জীবাণুর সন্ধানও জলে মেলে। জল থেকে সাধারণত যে সব রোগ ছড়ায় তাদের সম্বন্ধে সকলেরই মোটামুটি খানিকটা ধারণা থাকা উচিত। এদের মধ্যে রয়েছে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি, অ্যামাবিক ডিসেন্ট্রি, এশিয়াটিক কলেরা ও সাধারণ পেটের গোলমাল ইত্যাদি।

১৮৫৬ সালে উইলিয়াম নামে একজন বিজ্ঞানী জানান যে, টাইফয়েড সংক্রামক রোগ এবং পানীয় জল মানুষের মলমূত্রে দূষিত হয়ে এই রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবার্থ নামে অপর এক বিজ্ঞানী ১৮৮০ সালে স্যালমোনেল্লা টাইফোসা নামে এক জীবাণু আবিষ্কার করেন। পানীয় জলে এই জীবাণুর অস্তিত্বই টাইফয়েডের কারণ।

দেখা গেছে পরিশ্রুত জলসরবরাহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই রোগের আক্রমণ অনেক কমে আসে। খাদ্যনালী দিয়ে এই রোগের জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এর পরে জীবাণুগুলি অন্ত্রে ঢুকে পড়ে ও রক্তে মিশে যায়। রোগের প্রথম অবস্থায় অন্ত্রের গায়ে ক্ষতের সন্ধান পাওয়া যায় এবং আন্ত্রিক গ্রন্থিতে, প্লীহায় এবং যকৃতে রোগের জীবাণু পাওয়া যায়। রোগ একটু জেঁকে বসলে দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকে মলমূত্রেও এই রোগের জীবাণুর সন্ধান মেলে।

অনেক সময় এই জীবাণু গলব্লা মূত্রাশয়ের মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং সপ্তাহ, দু-এক মাস এমন কি জীবনের মত ওখানে থেকে যেতে যদিও এ অবস্থায় থাকাকালীন জীবাণুগুলি আশ্রয়দাতার তেমন ক্ষতি করে না কিন্তু এই ধরনের লো মলমূত্র থেকে টাইফয়েড ছড়াবার সম্ থাকে। কিছু দিন অন্তর এদের মলে রোগজীবাণুর সন্ধান মেলে। কোন সময়ে টাইফয়েডে ভুগেছে এরকম শরীর পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত করা শক্ত, এমন কি, অসম্ভব বললেও অ করা হয় না। দেখা গেছে যাঁরা এই ভুগেছেন, সুস্থ হয়ে ওঠার পরও মধ্যে শতকরা ০·৫ থেকে ১১·৬ পর্যন্ত লোক রোগ ছড়াতে পারে।

অতীতে অনেক কাল ধরে আমে জল থেকে সংক্রামক টাইফয়েড সঞ্চার করত। ১৯০০ সালে মার্কিন রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ছিল ৭,৬০,০০ জন। হিসেব করে দেখা গিয়েছিল যে লোকসংখ্যার মধ্যে ৩,৫০,০০০ জন ফয়েডের কবলে পড়েছিলেন এবং হানির সংখ্যা ছিল ৩৭,৩৭৯। অর্থাৎ সময়ে প্রতি এক লক্ষ লোকের টাইফয়েড রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৬০ ও মৃত্যুর হার ছিল ৪৬। জল সরব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ৩·৮ এবং ০·৪-এতে।

টাইফয়েডের জীবাণুবহনকারী লোদের মলমূত্র থেকে পয়ঃপ্রণালীর জলে টাইফয়েডের জীবাণু প্রবেশের সু পায়। তাই যদি কোন কারণে পানীয় পয়ঃপ্রণালীর নোংরা জলে মিশে যায় তাহলে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সং ব্যাধি প্রতিরোধের চেষ্টায় আমে অনেক এগিয়ে আছে। তাই আমে রিকার লোকসংখ্যায় প্রতি এক লোক প্রতি টাইফয়েডের জীবাণুবহন সংখ্যা মাত্র ৪০ থেকে ৫০। এ ক সমগ্রভাবে আমাদের দেশের খুব নির্ভর সংখ্যাতত্ত্ব পাওয়া যায় না। কিছু এলাকায় যে সব অনুসন্ধান চালান হ তাতে জানা যায় যে, আমেরিকার মত দেশের তুলনায় আমরা টাইফয়েড দূর কাজে অনেক পিছিয়ে আছি। আশা দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমে আস সাথে সাথেই জীবাণুবহনকারী লো সংখ্যাও কমে আসবে। অ্যামিস ও নামে দুজন বিজ্ঞানীর মতে ১৯৪০ আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশে জীব বহনকারী লোকের সংখ্যা ছিল ২৫০০ ১৯৮০ সালের মধ্যে ঐ সংখ্যা কমে ২০০-তে।

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমেরিকা উন্নত দেশ। গত পঞ্চাশ বছরের পরিসং থেকে এর পরিচয় মিলবে। দেখা গেছে সময়ের মধ্যে জল থেকে যেসব রোগ উৎপত্তি হয় তা কেবল ছোট শহরগু মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা ওদেশের

হরে জলসরবরাহ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান সন্তোষজনক। ১৯২০ থেকে ১৯৩৬ র্যন্ত আমেরিকার শতকরা ৫২ জন ছোট ছোট শহরে বাস করত। এই মধ্যে আমেরিকায় দূষিত জলের যে ৪৭৪টি মহামারী দেখা দিয়েছিল তকরা ৪২ ভাগ সীমাবদ্ধ ছিল দশ র কম লোকসতির এই শহর-হ। ৫,০০,০০০-এর বেশী জন-শহরগুলিতে ঐ সময়ে জল থেকে রোগ হয় নি।

নেক ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও টা আশার আলো এই যে টাইফয়েডের পানীয় জলে অথবা পয়ঃপ্রণালীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না বেশীক্ষণ বাঁচতে পারে না। গরম চেয়ে শীতের দিনে এরা বেশী সময় থাকতে পারে। খানিকটা এই কারণে ও বসন্তের প্রথম দিকে জল থেকে ড ছড়িয়ে পড়ার নজীর পাওয়া

পর বলতে হয় প্যারাটাইফয়েডের একে টাইফয়েডের ছোটভাই বলা এ রোগের আক্রমণ টাইফয়েডের মত নয়। ১৮৯৬ সালে এই রোগের র পাওয়া ধরা পড়ে। চিকিৎসকরা টিভাবে এই রোগের জীবাণুর তিনটি বিভাগ করেছেন। এরা হচ্ছে স্যাল-প্যারাটাইফি, স্যালমোনেল্লা স্কট-এবং স্যালমোনেল্লা হারসফেলডি। ক যথাক্রমে এ, বি, সি নামে তিন প্যারাটাইফয়েড হতে পারে।

৯৮ সালে সিগা নামে একজন জীবাণুতত্ত্ববিদ জাপানে এক রোগের মহামারী সম্বন্ধে গবেষণা সময় ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির জীবাণু ডিসেনটেরিয়্যাক আবিষ্কার করেন। রোগের আক্রমণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই গোলমাল, তলপেটে ব্যথা, রক্ত বা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। র প্রকারভেদের উপর রোগাক্রমণের নির্ভর করে। এই রোগের জীবাণুও নালীর মধ্য দিয়ে দেহে প্রবেশ করে রোগাক্রান্তদের মলে জীবাণু পাওয়া খাবার জিনিস বা জলের মাধ্যমে এই সংক্রামিত হয়। ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি মারীর আকারে কদাচিৎ দেখা দেয়। রোগের তীব্রতা না থাকলেও অনেকেই গে ভোগেন। এসব ক্ষেত্রে এগুলিকে পেটের গোলমাল বলে ধরে নেওয়া গরমের দেশেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব জুন, জুলাই এবং অগাস্ট মাসে মণের সম্ভাবনা সর্বাধিক। পোর্টো-তে বছরে শতকরা ৬০ জন লোক এই ভোগে। আমেরিকায় জলসরবরাহ র অনেক উন্নতি হওয়ায় এ রোগের অনেক কমেছে। এমন কি ১৯৪৫ আমেরিকার ৩৮টি রাজ্যের হিসেবে যায় যে, এ রোগে আক্রান্ত ৩৩,৪৯৫ মধ্যে ৪০০ জন মারা গিয়েছিলেন।

জল থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন আর একটি রোগ অ্যামাবিক ডিসেন্ট্রি। সাধারণত যাকে আমাশয় বলা হয়। এ রোগের কবলে পড়েন নি এমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে কমই আছেন। ১৮৭৫ সালে লস্ক্ নামে একজন বিজ্ঞানী এক মরণাপন্ন আমাশয় রোগীর মলে এবং আন্ত্রিক ক্ষতে এই রোগের জীবাণু এন্ডঅ্যামিবা হিস্টোলিটিকা আবিষ্কার করেন। ১৮৯৪ সালে কুন্স এবং পাসকেল নামে দুজন বিজ্ঞানী বেড়ালের অন্ত্রনালীতে এই রোগের জীবাণুর প্রবেশ ঘটিয়ে আমাশয় রোগের সৃষ্টি করেন। পানীয় জল এবং খাদ্যের সঙ্গে এই রোগের জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং অন্ত্রনালীতে বাসা বাঁধে ও ক্ষতের সৃষ্টি করে। এর পর জ্বালা-যন্ত্রণাও দেখা দেয়। আস্তে আস্তে শরীরের অন্যান্য জায়গাতেও জীবাণুগুলি ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে যকৃতে এই জীবাণুর আক্রমণে আশংকাজনক ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ রোগের আক্রমণের পর সুস্থ হয়ে উঠছে এরকম বেশ কিছু লোক রোগছড়ানর ব্যাপারে দায়ী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই জীবাণুগুলি আপাত-দৃষ্টিতে এদের কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অন্ত্রনালীতে স্থায়ীভাবে রয়ে যায় এবং শরীরে রোগের কোন উপসর্গও লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এসব লোকেদের থেকে রোগ ছড়ায়। এই রোগের জীবাণুর দেহ-নিঃসৃত রসে এদের চারদিকে এক রক্ষা-কারী দেওয়ালের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় এরা ভেজা মাটিতে, ভেজা মলে এবং নোংরা জলে অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। একে জীবাণুর 'সিসটিক' অবস্থা বলা হয়। সাধারণত পানীয় জল ক্ষতিকর জীবাণুমুক্ত করার জন্য যে পরিমাণ ক্লোরিন দেওয়া হয় তাতে এই সিসট ধ্বংস করা যায় না। এর জন্য সুপারক্লোরিনেশন বা অতিরিক্ত ক্লোরিন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। জল ফিল্টার করার সময়ও বালির ছাঁকনিতে সিসট আটকে যায়।

আগে ভাবা হত আমাশয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ। কিন্তু দেখা গেছে রোগের জীবাণুবহনকারী লোক যে অঞ্চলেই থাকুক না কেন সেখানেই এ রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। আমেরিকায় এরকম লোকের সংখ্যা শতকরা ১০ জন, গরম দেশ-গুলিতে ঐ সংখ্যা প্রায় শতকরা ৫০ জনের বেশী। ১৯৩৩ সালে চিকাগো শহরে আন্তর্জাতিক মেলা উপলক্ষে আগত দর্শকদের এ রোগের কবলে পড়তে হয়েছিল। দুটি বিখ্যাত হোটেলে ত্রুটিপূর্ণ পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থার দরুণ এ রোগের জীবাণুবহনকারী দর্শকদের থেকে পানীয় জল দূষিত হয়েছিল। ঐ সময়ে ১৪০৯ জন রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন এবং ৯৮জন প্রাণ হারান। এছাড়াও কতজন যে মৃদু আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন তার কোন হিসেব পাওয়া যায় না।

ভয়াবহতার দিক থেকে এশিয়াটিক কলেরার সঙ্গে অন্য রোগের তুলনা চলে না। জল থেকে এ রোগ ঝড়ের মত ছড়িয়ে পড়ে—প্রাণহানিরও সীমা-সংখ্যা থাকে না। মরণকামড় দিয়ে জনপদ থেকে আবার হঠাৎই এ রোগ মিলিয়ে যায়। সাধারণত মানুষের দেহের বাইরে এ রোগের জীবাণু ভিবরিও কমা বেশীক্ষণ জীবিত থাকে না। এ রোগে কেউ অনেকদিন ধরে ভোগে না বা আরোগ্যলাভের পর জীবাণু বহন করে না। সেই কারণে যে-সব অঞ্চলে ঘন ঘন এ রোগের প্রকোপ দেখা দেয় না সেখানে রোগাক্রমণের পর পুরোপুরি ভাবেই এ-রোগ মিলিয়ে যায়।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সবকটি কলেরা মহামারীর উৎপত্তি হয়েছে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং চীনদেশের ইউনান নদীর অববাহিকায়। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরেই এই অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে কলেরার প্রকোপের নজীর আছে। চলাচল ব্যবস্থার সুবিধা না থাকায় ১৮১৭ সাল পর্যন্ত কলেরার এই উৎপত্তিস্থান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। ইউরোপে প্রথম কলেরার প্রাদুর্ভাব হয় ১৮৩১ সালে—মহামারীর আকার দেখা দেয় ১৮৩২ থেকে ১৮৩৩, ১৮৪৬ থেকে ১৮৬২ এবং ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৫ সালে এবং শেষোক্ত সময়ে আমেরিকাতেও কলেরা দেখা দেয়। অবশ্য ১৯১১ সালের পর আমেরিকায় আর কলেরা হয়নি।

প্রতি বছরই এই দুটি উৎপত্তিস্থান থেকে কলেরা দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। জাপান ও ফিলিপাইন সহ উপকূলের কাছাকাছি দ্বীপগুলিতে এবং স্থলপথে এশিয়ার উপর দিয়ে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে যোগা-যোগরক্ষাকারী পথের ধারের অঞ্চলগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৯৪৭ সালে ঈজিপ্টে কলেরা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে অক্টোবরের ভেতর ৭৩০০জন কলেরায় আক্রান্ত হয় আর প্রাণ হারায় ৩২০০জন। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে কোরিয়ায় ১২০০জন কলেরার কবলে পড়ে এর মধ্যে জীবনহানির সংখ্যা ৬৫০। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে অন্যান্য মহাদেশে যাতায়াতকারী যাত্রীদের উপর কোয়ারান্টাইন আইনের উপযুক্ত প্রয়োগের

ফলে বর্তমানে এ-রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারছে না।

কক্ নামে একজন বিজ্ঞানী ১৮৮৩ সালে কলেরার জীবাণু ভিবরিও কমা আবিষ্কার করেন। দেহে এই জীবাণু অনুপ্রবেশ করার এক থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগীর মল এবং বমি থেকে এই রোগ ছড়ায়। জিও নামে এক বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, রোগ থেকে সেরে ওঠার দু সপ্তাহ পরে শতকরা ৯৮টি ক্ষেত্রে রোগীর মলে জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায় না। তিন বা চার সপ্তাহ পরে রোগীর মলে জীবাণু পাওয়া যায় না বললেই চলে।

বেশীর ভাগ কলেরা মহামারীর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে দূষিত জলই প্রধানত এর মূলে রয়েছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর হামবুর্গ শহরে কলেরার আক্রমণের বিবরণ পড়লেই জানা যাবে কলেরার হাত থেকে বাঁচতে হলে পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা থাকা কতটা প্রয়োজনীয়। জার্মানীর দুটি শহর হামবুর্গ ও আলটনার মধ্যে কয়েক মাইল জুড়ে কেবল রাজনৈতিক ছাড়া প্রাকৃতিক ব্যবধান কিছুই ছিল না। দুটি শহরেরই পানীয় জলের উৎস ছিল পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এলবি নদীর জল। ১৮৯২ সালের আগেই অ্যালটনায় জল পরিশ্রুত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু হামবুর্গ শহরে সে ব্যবস্থা ছিল না। এ্যালটনা শহরের জন্য এলবি নদীর যে জায়গা থেকে জল নেওয়া হত তার খানিকটা আগেই নদীর জলে হামবুর্গ শহরের পয়ঃপ্রণালীর জল ফেলে দেওয়া হত। তাই হামবুর্গ শহরের তুলনায় এ্যালটনা শহর নদী থেকে যে অপরিশ্রুত জল পেত তার মান ছিল অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু পরিশ্রুত করার ব্যবস্থা থাকায় এ্যালটনার কোন অসুবিধায় পড়তে হত না। ১৮৯২ সালে হামবুর্গে কলেরার মহামারী দেখা দেওয়ার পর এলবি নদীর জল কলেরার জীবাণুতে দূষিত হয়ে যায়। পুরোন নথিপত্র থেকে জানা যায় এই মহামারীর সময়ে হামবুর্গ ও অ্যালটনার জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬,৪০,০০০ ও ১,৪৩,০০০জন। কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৮৬০৫ ও ৩২৮জন। অ্যালটনার কলেরা আক্রমণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংক্রমণ এসেছিল হামবুর্গ শহর থেকে। দুই শহরের সীমান্তনির্ধারণকারী একটি রাস্তার দুদিককার বাড়ীগুলিতেও রোগাক্রমণের সংখ্যার যথেষ্ট তফাৎ ছিল। হামবুর্গের দিককার প্রতিটি বাড়ীতেই একাধিক কলেরা রোগী ছিল অথচ অ্যালটনার বাড়ীগুলিতে রোগাক্রমণ ছিল না বললেই হয়।

কলেরার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলেও পানীয় জল থেকে ছড়িয়ে পড়া রোগের মধ্যে পেটের গোলমাল অন্যতম। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত খুব সাবধানতা অবলম্বন না করলে এই রোগকে এড়িয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। অনেক সময় কোন বিশেষ উৎস থেকে পানীয় জল সরবরাহ করার দরুন এ রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ রোগের আক্রমণ বিক্ষিপ্ত। রোগের সঠিক কারণ প্রায়ই জানা যায় না। অবশ্য কারণগুলি সব সময় এক নয়। খাবার জিনিস থেকেও আক্রমণ আসতে পারে। কিন্তু যদি জানা যায় খাবার জিনিস থেকে আক্রমণ আসেনি তবে জল সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। কেননা অনেক সময় এই রোগের মহামারী আরও ভয়াবহ মহামারীর আগমন নির্দেশ করে। যেমন ১৯২৮ সালে নিউইয়র্ক রাজ্যের অন্তর্গত অলিয়নে টাইফয়েড মহামারীর প্রাদুর্ভাব হওয়ায় কয়েক মাস এবং কয়েক সপ্তাহ আগে দুবার এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তেমন কোন তথ্যভিত্তিক প্রমাণ না থাকলেও অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন জল থেকে টিউবারকুলোসিস ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই রোগের জীবাণু মাইকোব্যাক্টিরিয়াস টিউবারকুলোসিস খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে দেহে প্রবেশ করে রোগ ছড়াতে পারে। এসব ক্ষেত্রে রোগীর মলে জীবাণু পাওয়া যায়।

সংক্রামক হেপাটাইটিস রোগেরও উৎপত্তি জল থেকে। এক ধরণের ভাইরাসকে এ রোগের কারণ বলা হয়।

সংক্রামক জনডিসের (ভেলস ডিজিস—যাকে বাংলায় ন্যাবা রোগ বলা হয়) কারণ স্পাইরোচেটিস জাতীয় জীবাণু। রোগাক্রমণের কয়েক সপ্তাহ পরে মূত্রে এ রোগের জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। রোগজীবাণু কি করে শরীরে প্রবেশ করে তা সঠিক জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয় জমে থাকা নোংরা জলের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।

পোলিওমাইলিটিস রোগের ভাইরাস পয়ঃপ্রণালীর জলে পাওয়া যায়। তবে এই জীবাণু কি করে শরীরে প্রবেশ করে তা অজানা রয়েছে।

জলের সাহায্যে পশুদের মধ্যে অ্যানথ্র্যাকস রোগ ছড়িয়ে পড়ার নজীর পাওয়া যায়। নদীর জল একবার অ্যানথ্র্যাকস ব্যাসিলির দ্বারা দূষিত হলে অনেক দূর পর্যন্ত সংক্রমণ বয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই দেখা যায় সংক্রমণের উৎস থেকে অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও পশুরা নদীর জল পান করে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

মানুষের ক্ষেত্রেও খাদ্যনালী দিয়ে জীবা অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু রোগাক্রমণ কম যে পানীয় জল এ-ব্যাপারে ক দায়ী তা সঠিক নির্ণয় করা যায় না।

কিছু কিছু রোগ জলে বসবাসর অ্যানিম্যাল প্যারাসাইটস (পর জীবাণু) থেকে ছড়িয়ে পড়ে। এরাও খ নালীর পথেই মানুষের শরীরে ঢো সাধারণতঃ এরা জলে ভেসে বেড়ায়। কিছু প্যারাসাইটস আবার জলজ প্রাণী দেহে আশ্রয় নেয়। এছাড়া আরও ক জাতের প্যারাসাইটস আছে যেগ জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা-চলা অথবা করার সময় মানুষের চামড়া ফুঁড়ে প্রবেশ করে রোগের উৎপত্তি করে।

উল্লেখযোগ্য যে সব প্যারাসাই জলকে আশ্রয় করে রোগ ছড়ায় তাদের রয়েছে, ব্লাড ফ্লুকস—পানীয়, জল সংক্র শামুক ও মাছ থেকে মানুষের দেহে প্র করে রোগ ছড়ায়। লাং ফ্লুকস—সংক্রা কাঁকড়া কাঁচা খেলে বা যে জলে এগ পাওয়া যায় তা পান করলে রোগাক্রম সম্ভাবনা থাকে। ইনটেসটাইনাল ফ্লুকা এই প্যারাসাইটে দূষিত জলে যেসব সব্জি জন্মে সেগুলি কাঁচা খেলে রো কবলে পড়ার সম্ভাবনা। ফিস টেপওয়া —সংক্রমিত কাঁচা মাছ থেকে। অ্যাসকা বা ইলেওয়ার্মস—দূষিত জলে থাকে। ওয়ারমস—যে জলে সাইক্লপস নামে ধরণের প্যারাসাইটস থাকে সেই জল করলে এর আক্রমণের কবলে পড়তে এছাড়া হুপওয়ারম এবং হুকওয়ারম আক্রমণ পানীয় জল থেকে অথবা দূ জলে স্নান করলেও হতে পারে।

অগুন্তি কারণে জল দূষিত হয় তা থেকে যে নানা রোগ ছড়িয়ে একথা জানতে পেরে বৈজ্ঞানিকরা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেননি। দূ জলের সঙ্গে নানা সংক্রামক রোগের স আঁচ করার সঙ্গে সঙ্গেই জল পরি করার উপায় উদ্ভাবনে তাঁরা লেগে ছিলেন। এর পর আস্তে আস্তে জলে রোগজীবাণুর অবস্থানের সঙ্গে মান মধ্যে সংক্রামিত রোগের সম্পর্ক প্রমাণিত হওয়ায় পরিশ্রুত জলসরবর উন্নতি ঘটতে থাকে। বর্তমানে উন্নত গুলিতে এর এত উন্নতি হয়েছে যে পা জল থেকে রোগাক্রমণের সম্ভাবনা দেশে নেই বললেই চলে। আমাদের উন্নতিশীল দেশগুলিতে এখনও জনীয় অর্থসংস্থানের ও সচেত অভাবে নির্দোষ জলসরবরাহের ব্য আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করা যায় তবে উন্নত দেশগুলির নজীর দেখে জোর গলায় বলা যায় যে প্রয়োজ বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল আজ মান করায়ত্ত। তাকে কাজে লাগাবর উপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি পারলেই মানুষ জল থেকে আসা থেকে চিরদিনের মত রেহাই পাবে।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

শিল্পী বসন্তকুমার গাঙ্গুলী

গত ২৫ জুলাই ৭৪ বছর বয়সে প্রবীণ শিল্পী বসন্তকুমার গাঙ্গুলী দেহত্যাগ করলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারী বাগবাজারে তাঁর জন্ম হয়। শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করে পরে তিনি সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার্থে যোগদান করেন। শিক্ষালাভ কালেই বহু প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের স্নেহ ও প্রশংসাও তিনি পেয়েছিলেন। আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ হওয়ার পর ১৯২১ সালে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে ইউরোপে গেলেন। ১৯২৫ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত ফ্রান্সে ম'সিয়ে বুশের অধীনে শিল্প শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে তিনি আর্ট স্কুলেই শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। প্রতিকৃতি শিল্পী হিসেবে তাঁর সমকক্ষ শিল্পী বিশেষ নেই। বসন্তবাবুর মৃত্যুতে শিল্পকলার এই দিকটা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। আধুনিক চিত্রকলা একদিকে শিল্প জগতের নতুন দুয়ার খুলে দিলেও এর প্রভাবে অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষতিও হয়েছে—বিশেষ করে আমাদের দেশে। তার মধ্যে ভাল প্রতিকৃতি শিল্পীর অভাব প্রধানতম। কারণ রিপ্রেজেণ্টেশন যেখানে যথেষ্ট সমাদৃত নয় সেখানে রিপ্রেজেণ্টেশনাল কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। পরিহাসপ্রিয় বসন্তবাবু নিজেই একদা পরিহাস করে বলেছিলেন যে আর্ট স্কুল কলেজ হয়ে যাবার পর আমরা ড্রয়িং তুলে দিয়েছি। অতিশয়োক্তি হলেও এর মধ্যে অ্যাকাডেমিক ট্রেণিং-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত পরিষ্কারভাবেই করা হয়েছিল।

শিক্ষক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং বহু ছাত্র তৈরী করে গিয়েছিলেন। অবসর গ্রহণের পরও তিনি ছবির কাজ ছাড়েন নি। শিল্পীরা অবশ্য সাধারণতঃ তা ছাড়তে পারেন না। সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি তিনি করে গিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দিল্লীর ললিতকলা ভবন ও রাষ্ট্রপতি ভবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজে হাত দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁর মৃত্যুতে এই কাজগুলি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিশেষ সৌখীন মানুষ ছিলেন। নিজের সাজ-সজ্জা চলা-ফেরার দিকে তাঁর একটা বিশেষ ধরণের নজর ছিল। হাট্টা-তামাসা মুখে প্রায় লেগেই থাকত। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র তিন কন্যা, আত্মীয়স্বজন ও বহু বন্ধু-বান্ধব রেখে গিয়েছেন। তাঁদের যুগের শিল্পীদের মধ্যে অতুল বসু, যামিনী রায় প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া বিশেষ কেউ আর রইলেন না।

এই যুগের শিল্পীদের এবং বিশেষ করে বসন্তবাবুর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র-প্রদর্শনী হওয়া উচিত। আশা করি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস এ বিষয়ে উদ্যোগী হবেন।

●

জার্মাণ মহিলা শিল্পী শ্রীমতী শ্রীবাস্তব স্বদেশে কিছুকাল শিল্প শিক্ষা করেছিলেন। বর্তমানে তিনি সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা করছেন। ম্যাক্সমুলার ভবনে তাঁর কারুশিল্পের কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া গেল। প্রধানত রঙীন পেপার কাট ছবি, কাপড়ের তৈরী মুখোশ বা জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি এবং কাপড় ও কাগজের তৈরী ঝোলানো ডেকরেশনের কাজ। শ্রীমতী শ্রীবাস্তবের পেপার কাটগুলি প্রধানত জার্মাণ লোক-কাহিনীর চিত্ররূপ যেন কতকটা উচ্চশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে করা। শিশুদের আনন্দ বর্ধনই তাঁর কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ-ধরণের হাতের কাজে শিশুরা যাতে উৎসাহ পায় সেটাই তাঁর উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে ম্যাক্সমুলার ভবনে যে শিশুদের কারু-শিল্পের ক্লাস খোলা হয়েছে, শ্রীমতী শ্রীবাস্তব সেখানে তাদের এ ধরণের হাতের কাজ শেখান। তাঁর ধারণা এদেশে নাকি লোকেদের রং সম্বন্ধে সচেতনতার একান্ত অভাব। তিনি তাই এখানকার ছেলে-মেয়েদের বর্ণপরিচয় করাতে বদ্ধপরিকর হতে চান। শ্রীমতী শ্রীবাস্তব বেশী দিন এদেশে আসেন নি। কলকাতা শহরের বিভিন্ন স্থান তাঁর দেখা শেষ হয়েছে কিনা জানি না। বোধ হয় হয় নি। সম্ভবতঃ সেই জন্যেই চট করে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছনো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তবু খটকা লাগে। জেট চড়া দুনিয়া ঘোরা মুসাফির-দের চোখেও যেখানে ভারতবর্ষের রঙের বাহার এড়ায় না সেখানে ম্যাক্সমুলার ভবনের শ্রীমতী শ্রীবাস্তবের শিল্পীর চোখে সেটা ধরা পড়ল না কেন?

●

বর্তমান সপ্তাহে ম্যাক্সমুলার ভবনে একটি অপেশাদার শিল্পীগোষ্ঠির চিত্র-প্রদর্শনী হচ্ছে। এ'দের অধিকাংশই কল-কাতার বিদেশিনী গৃহকর্ত্রী—একান্ত অবসর বিনোদনের জন্যে শ্রীমতী সরকারের পরিচালনায় একটি শিল্পচর্চার ক্লাবে চিত্র-বিদ্যা চর্চা করে থাকেন। যদিও এ'রা এ'দের কাজকর্ম খুব একটা গভীরভাবে কাউকে গ্রহণ করতে বলেন না, তবু কারো কারো কাজে, অপেশাদার শিল্পকর্ম হলেও অনেক-খানি মনোযোগিতার লক্ষণ দেখে ভাল লাগল। ফুলের কতকগুলি স্টাডি, কিছু নিসর্গ দৃশ্য, কয়েকটি সুদৃশ্য স্টিল লাইফ, সাধু-সন্ন্যাসী, উপজাতির নৃত্য, গির্জা, গ্রামের মেয়ে প্রভৃতি অনেক কিছুই এ'রা ধরে ধরে আঁকতে চেষ্টা করেছেন। কতক-গুলি কাজ তার মধ্যে ভালই হয়েছে। তবে প্রতিকৃতির কাজে আরো কিছুটা দক্ষতা দেখতে পেলে ভাল লাগত। তবু অপেশাদার এবং অবসরকালীন শিল্পচর্চার কাজের নমুনা হিসাবে এ'দের এই সামান্য প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য বলেই মনে হল। —চিত্ররসিক

সকলই স্বপ্নদৃষ্টি কলকাতারই ॥

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

বুকের ভিতর বাঁকানো কাঁটার ছায়া
যত দূরে চোখ চলে চৈত্রের পাতা
উড়ে যায় ধুলো বাঙলার মাঠে মায়া –
সকলই স্বপ্নে খুলে দেয় কলকাতা।

এই শহরের স্নায়ুশিরাউপশিরা
রৌদ্র পোড়ায় রাস্তার দাবদাহে
কাঁচের বাড়িতে জ্বলে কাঁচকাটা হীরা
অস্তসূর্যে—নগরীর উদ্বাহে।

সকলই স্বপ্নদৃষ্টি কলকাতারই।
শ্রাবণে কখন বৃষ্টির বানে ভাসে
মাঠ নয়, একি ভেসে যায় ঘরবাড়ি!
জলজমা পথে নিরুপায় ট্রামগাড়ি;

আবার সস্তা কমলালেবুর মাসে
আসে অঘ্রাণ দুপুরের ফাঁকা বাসে।

যাকে আমি কখনও ডাকিনি ::

জয়ন্তী রায়

যাকে আমি কখনও ডাকিনি,
তবু সে আমায় যেন নির্জনে গভীর ডেকে গেছে
পিপাসায় বুক চিরে নীল-শূন্যে চিলের মতন।
আমার হৃদয় খুঁড়ে বারবার প্রাণের অংকুর খুঁজে নিতে
আপন কক্ষের বৃত্তে নিত্য অভিসারী।
দুপুরের রোদের ডানায় হঠাৎ উন্মনা মন
আকাশের সীমারেখা মাপে;
সমুদ্র-সৈকতে ঢেউ অসম্ভব দূরে যেতে বলে।
ক্রমশ কাছের কূলে তরঙ্গের দুরন্ত আক্ষেপ :
জোয়ারের কলোচ্ছ্বাসে কী বলে সে—কী বলে আমাকে—
যাকে আমি কখনও ডাকিনি,
সে কেন নির্জন-নীল অরণ্যের গভীর ছায়ায়
আমার হৃদয় নিয়ে জলছবি আঁকে;
কৃষ্ণচূড়া, পলাশে, অশোকে
হৃদয়ের রক্তরাগ অনায়াসে দুহাতে ছড়ায়
দিগন্তের চক্রবালে কী কবিতা লিখে রেখে যায়।
যাকে আমি কখনও ডাকিনি,
সে কেন তৃষ্ণায় বুক চিরে
ডেকে যায় নীল-শূন্যে চিলের মতন।

ক্লোদ শাবরো পরিচালিত Les Biches-এর একটি দৃশ্য

বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

সৈকত ভট্টাচার্য

এবার বার্লিন ফেস্টিভ্যালে কি হবে?

ক্লোকে, ওভারহাওজেন ও কান ফেস্টিভ্যালে এবার যা ঘটেছে, তার পুনরাবৃত্তি বার্লিনেও হতে পারে — সে-আশংকা অনেকেরই ছিল। বার্লিন ফেস্টিভ্যালের ডাইরেক্টর ডক্টর বাওয়ারকে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের সাংবাদিক সম্মেলনে সে-বিষয়ে নানা প্রশ্ন করা হয়। ডক্টর বাওয়ার বিভিন্ন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "এবার বার্লিনে অনেক সুন্দর ছবি দেখানো হবে। আমার বিশ্বাস, কান্ ফেস্টিভ্যাল যে-কারণে মধ্যপথে বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা ওভারহাওজেন ফেস্টিভ্যালে যা ঘটেছে, তার সম্ভাবনা বার্লিনে নেই। কোনপ্রকার ইজম্‌কে প্রশ্রয় দেওয়া বার্লিন ফেস্টিভ্যালের ধর্ম নয়। এই ফেস্টিভ্যাল বরাবরই তরুণ চিত্র-পরিচালকদের প্ল্যাটফর্ম। আমরা দু' বছর আগে ব্রাজিলের তরুণ চলচ্চিত্রকারদের সুযোগ দিয়েছি আর এবার উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হলো ইয়ং ক্যানাডিয়ান ফিল্ম।"

কংগ্রেস হলে ক্যানাডার এর্লি গেম দিয়ে এবারের বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন হয় ২১ জুন। ক্যানাডার অন্য ছবিটি হলো **এ গ্রেট বিগ থিং।** দুটো ছবিরই নায়ক ঠিক স্বাভাবিক নয়, অনেকটা হিপি-ধর্মী—লম্বা চুল, ময়লা পোষাক, কিছুটা মানসিক রোগগ্রস্ত। দুটো ছবিরই মান সাধারণ পর্যায়ের।

দ্বিতীয় দিন দেখানো হয় বৃটেনের ছবি আন্দ্রে ভাইদা পরিচালিত **দি গেট টু প্যারাডাইস।** ছবিটি নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। ভাইদার কাছ থেকে অনেক বেশী প্রত্যাশা ছিল।

আরেকজন বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক যিনি এবার সবাইকে নিরাশ করেছেন, তিনি হলেন জাঁলুক গোদার। গোদার আধুনিক সিনেমার নতুন ভাবধারার প্রবর্তক এবং সেই কারণে তিনি এখন ইওরোপের সবচেয়ে বেশী কন্ট্রোভার্সাল। এবার বার্লিনে তাঁর ছবির প্রদর্শনীর আগে যেরকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, বোধ করি আর কারো ক্ষেত্রে তা হয়নি। কিন্তু তিনি সবাইকে নিরাশ করেছেন। তাঁর ছবি দেখে মনে হলো যেন কোন পাগল মুভি ক্যামেরা নিয়ে যা খুশি তাই করছে। **ভারতের ৫৫ মিনিটের ডকুমেণ্টারী** ইণ্ডিয়া '৬৭ ফিচার বিভাগে প্রতিযোগিতা করে। গতবারের মত এবারও ভারতের কোন ফিচার ফিল্ম ছিল না। শুনলাম 'কেদার রাজা' ও 'মাটির মানুষ' স্ক্রীনিং কমিটি কর্তৃক বাতিল হয়ে যায়।

"ইণ্ডিয়া '৬৭" কোন কোন সমালোচকের মোটামুটি ভাল লেগেছে, তবে অধিকাংশেরই লাগেনি। অনেক সমালোচকেরই অভিমত ভারতের মত একটা বিশাল দেশের সবকিছু দেখানো ৫৫ মিনিট অত্যন্ত কম সময় এবং পরিচালক সুখদেব যদি সবকিছু না দেখিয়ে কয়েকটা বিশেষ ঘটনা বেছে নিতেন, তাহলে ভাল করতেন। টাগেসম্পিগেল লিখেছে—"ভারতের অনেক কিছুই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু কলকাতার রাস্তায় লোক ঘুমনো অথবা বেনারসের গঙ্গায় মৃতদেহ ভেসে যাওয়া দেখান হয়নি।"

"ইণ্ডিয়া '৬৭ একটি বলিষ্ঠ ছবি, তবে ঘটনার স্রোতে চিন্তাশক্তি হারিয়ে যাবার যোগাড়" লিখেছে দি ভেল্ট।

জনৈক আমেরিকান সাংবাদিক ছবিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন, ইট ইজ অ্যান

এক্‌সেলেণ্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইওর কান্ট্রি। ইণ্ডিয়া '৬৭ পুরস্কার পাবে সে-আশা করিনি : একটা ডকুমেণ্টারী ছবির পক্ষে ফিচার ফিল্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এ'টে ওঠা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। তবে ছবিটি যদি ছে'টেকেটে শর্ট ফিল্ম শাখায় প্রতিযোগিতা করত, তাহলে ভাল হত।

ভারতীয় ছবির কোনপ্রকার পাব্লিসিটি জার্মেনীতে নেই বলে এখানকার জনসাধারণ বা চিত্রসমালোচকরা ভারতীয় ছবি দেখা বা লেখার ব্যাপারে কোনপ্রকার উৎসাহ বোধ করে না। ইণ্ডিয়া '৬৭-এর সাংবাদিক সম্মেলনে সবশুদ্ধ সাতজন উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে মাত্র তিনজন ছিলেন বিদেশী। অন্যান্য ছবির ক্ষেত্রে প্রদর্শনীর একদিন আগে সাংবাদিকদের 'সিনপ্‌সিস' বিলি করা হয়। কিন্তু ইণ্ডিয়া '৬৭-এর বেলায় সাইক্লোস্টাইল-করা কপি পরদিন সাংবাদিক সম্মেলনের সময় বিলি করার ব্যবস্থা হয়।

এবার ফেস্টিভ্যালের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে পুরস্কৃত হয় জা ত্রেয়েল পরিচালিত সুইডেনের ছবি **ওলে ডোলে ডোফ**।

গোল্ডেন বেয়ার ছাড়াও ছবিটি ইউনিক্রিট, ইন্টারফিল্ম ও ওসিস পুরস্কার পায়। এই ছবির মাধ্যমে পরিচালক সুইডেনের শিক্ষা ব্যবস্থার শূন্যতা, প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সংঘাতকে নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন।

ছবির শেষ দৃশ্যের সঙ্গে হয়ত অনেকে একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু ছবিটির প্রতিটি দৃশ্যে পরিচালকের যে গভীর আন্তরিকতা ও মমতাবোধ ছড়িয়ে আছে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

গতবার বার্লিনে এই পরিচালকেরই **হিয়ার ইজ ইওর লাইফ** বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল এবং চিকাগো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে পুরস্কৃত হয়। প্রায় একই সময়ে তাঁর স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি **ডেট ইন মারসূলেণ্ড** ওভারহাওজেনে গ্রাঁপ্রি পায়।

শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে সিলভার বেয়ার পান তরুণ স্পেনিশ পরিচালক কার্লস সাউরা। ছবির নাম **পিপারমেণ্ট ফ্রাপে**। '৬৬ সনে ইনি বার্লিনে **দি হাণ্ট** ছবির জন্য সিলভার বেয়ার পেয়েছিলেন। এবার

ওরনার হেরৎসগ পরিচালিত 'সাইন অফ লাইফ' বিশেষ পুরস্কার পায়।

সুইডিশ চিত্র 'ওলে ডোলে ডোফ' চিত্রের একটি দৃশ্য।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দুজনেই ফরাসী। **দি ম্যান হু লাইজ** ছবিতে নায়ক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান জাঁ লুই ত্রেকোয়া ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান স্টেফান আঁড্রু, ক্লোদ শাবরো পরিচালিত Les Biches ছবিতে অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয়ের জন্য।

একটি কবিতার ছন্দে আঁকা মনোরম চিত্র। ছবিটির কোথায়ও কোন ছন্দপতন নেই। একের পর এক দৃশ্য মনে হয় যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি। ছবিটির বিন্যাসে শাবরোর বিশ্ববিখ্যাত ছবি লোকুজানকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিশেষ পুরস্কার হিসাবে একটি সিলভার বেয়ার পায় পশ্চিম জার্মানীর ছবি **সাইন অফ লাইফ**। ছবিটির পরিচালক হলেন জার্মেনীর সর্বকনিষ্ঠ পরিচালক ভেরনার হেরৎসগ্।

আরেকটি সিলভার বেয়ার পায় ইতালির ছবি **সামথিং লাইক লাভ**।

স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির জন্য গোল্ডেন বেয়ার পায় **পোর্ট্রেট ওরসন ওয়েলস**। সিলভার বেয়ার পায় যুগোশ্লাভ চিত্র **ক্রেক**। বিশেষ পুরস্কার হিসাবে আরেকটি সিলভার বেয়ার পায় হল্যাণ্ডের ছবি 'টাচ'। ইউনিক্রিট পুরস্কার পায় ওলে ডোলে ডোফ, ফিফরেসসি ও সিডালফ পুরস্কার পায় ইনোসেন্স উইদাওট প্রোটেকশন ❁

গোখেল মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্প সংরক্ষণ সমিতির সভায় ভাষণ দিচ্ছেন বিকাশ রায় এবং উত্তমকুমার। ফটো : অমৃত

বাঙালীর ঐতিহ্য ও যাত্রা

ঐতিহ্য নিয়ে বাঙালীর গর্বের অন্ত নেই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "আমরা বাঙালী" শীর্ষক কবিতায় বাঙালীর হাজারো ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে বাঙালীর জয়গান গেয়েছেন। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের এত গর্ব, আমরা কি যথার্থই তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল? যে কীর্তন গান বাউল গান, কবি গান, যে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, বাঁকুড়ার পিতলের খেলনা প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন মূর্ত হয়ে উঠেছে, আমরা তাদের উন্নতি তো দূরের কথা, তাদের রক্ষাকল্পে আজ পর্যন্ত কতদূর কি করেছি, তার হিসাব দিতে পারি কি?

এক, কীর্তন গানের কথাই বলি: প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্য যুগে বৈষ্ণবধর্ম-প্লাবিত বঙ্গে জন্মগ্রহণ করে বৈষ্ণব-পদাবলী ও কীর্তন গান। বলা বাহুল্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন উপলক্ষে গীত হয় বলেই এই বিশেষ গানগুলি সাধারণত কীর্তন গান নামে পরিচিত। আমাদের বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এই কীর্তন গান। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই কীর্তন গানে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। এই সেদিনও শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজীকে শ্রীখোল, করতাল ও মন্দিরাসহযোগে কীর্তন গান করতে করতে ভাবাকুল হতে দেখেছি। এই কীর্তন গান বাঙালীর সংগীত-প্রতিভার এক বিশেষ পরিচয় বহন করে। ধর্ম থেকে উৎপত্তি হলেও রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা গানগুলির বিষয়বস্তু এবং পূর্বরাগ রসোদ্গার, সম্ভোগ, বিরহ ভাবসম্মিলন প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে গানগুলি রচিত। বিষয়বস্তু-জাত ভাব অনুযায়ী হয় প্রতিটি গানের সুর এবং বিশুদ্ধ তাল-লয়-সহযোগে গাইবার সময়ে কীর্তনীয়া অর্থাৎ গায়ক গানের মূলকথার মাঝে মাঝে যোজনা করেন 'আখর' অর্থাৎ গীতাতিরিক্ত শব্দ গানের মাধুর্য বৃদ্ধির জন্যে। মূল গানের কথা আছে : না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে। কীর্তনীরা আখর জুড়লেন : কৃষ্ণবিলাসিত অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে—কৃষ্ণ বিলাস করে গেছে, এই রাধাঅঙ্গ পোড়ায়ো না গো ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এই যে কীর্তন গান, যার তান ও ভাষা অপরূপ, যা বিশুদ্ধ সুর-তান-লয়ে গঠিত, তার প্রচার ও প্রসারের জন্যে আমরা কোনদিন কতটুকু সচেষ্ট হয়েছি? আমরা এইমাত্র জানি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁর পরিবারস্থ মেয়েদের নিয়ে ব্রজমাধুরী সংঘ স্থাপনা করেছিলেন এই কীর্তনের সুষ্ঠু প্রচারের জন্যে। কিন্তু সম্যক উৎসাহের অভাবে এই সংঘ আজ বিস্মৃতপ্রায়। এক আকাশবাণীর কলিকাতা শাখায় নিয়মিতভাবে কয়েকটি কীর্তনের অধিবেশন ছাড়া আজ কীর্তন গান শুধু শোনা যায় শ্রাদ্ধবাসরে এবং কুঞ্জোৎসবে। কিন্তু কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সংগীত-সম্মেলনের আসরে আজ কীর্তনের কোনো স্থান নেই। আমরা যে-আগ্রহ নিয়ে খেয়াল, ঠুংরী, ভজন শুনি, কীর্তন শুনতে আমাদের সে-উৎসাহ কোথায়? পরের ঠাকুর ফেলে ঘরের কুকুরকে মাথায় রাখতে বলি না, কিন্তু গেঁয়ো যোগী বলেই কি কীর্তনকে আমরা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে পরাঙ্মুখ হব? কীর্তন গানেরও ঠাট, ঘরানা প্রভৃতি আছে এবং প্রাজ্ঞ অনুশীলনের দ্বারা কীর্তন গানকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে সু-

অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত **মেঘ ও রৌদ্র** চিত্রে হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বরূপ দত্ত।
ফটো : অমৃত
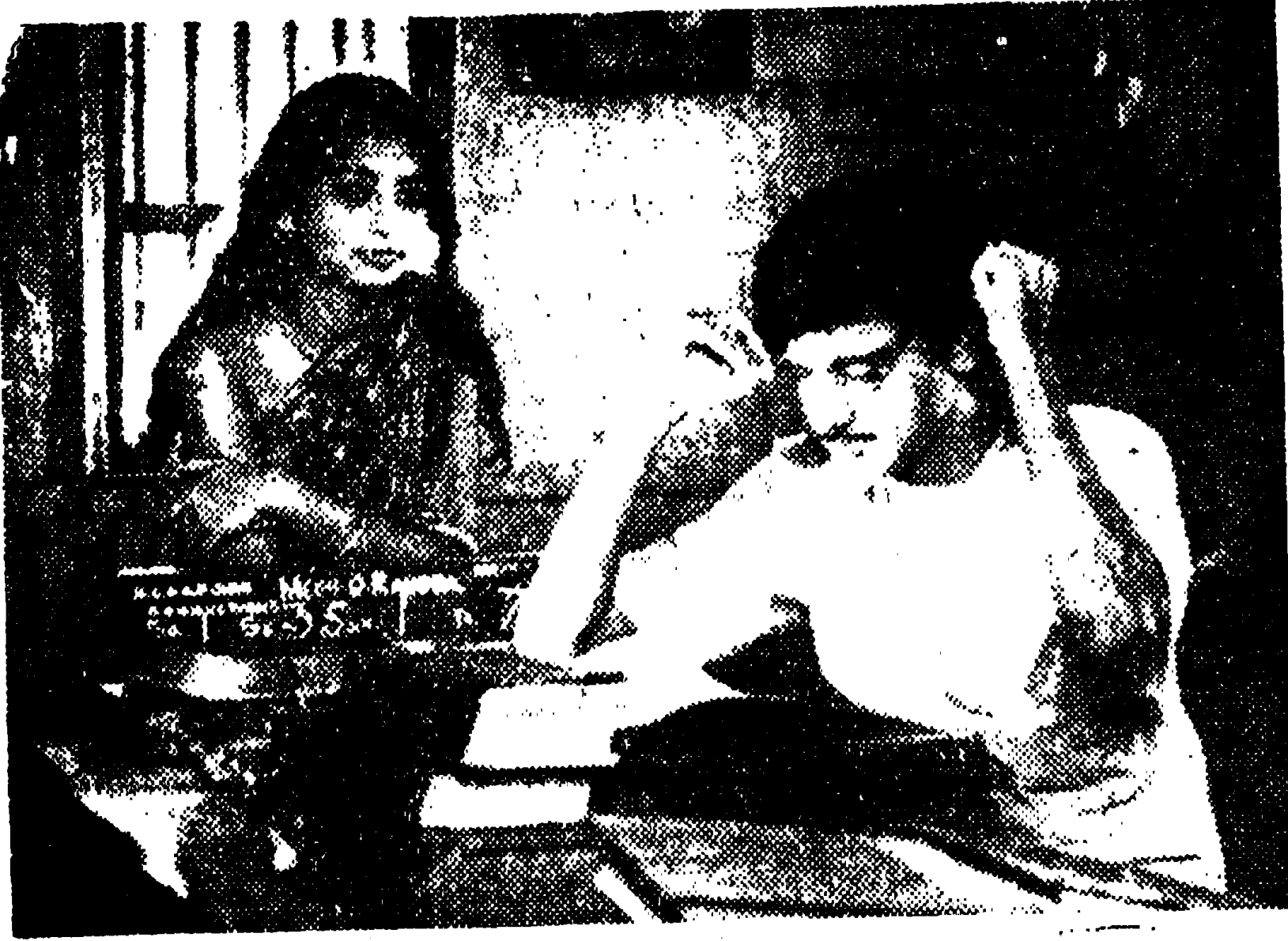
প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, এ-বিশ্বাস আমরা দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।

কীর্তনের মতো অবহেলিত বাঙালীর সংস্কৃতির আর একটি বাহন হচ্ছে যাত্রা। প্রমোদের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলবার এত বড়ো হাতিয়ার ইংরেজের আগমনের আগে বাঙলাদেশে আর একটিও ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণোক্ত সংশিক্ষামূলক কাহিনীগুলি অবলম্বন করেই যাত্রার পালাগুলি রচিত হত। এই পালাগান শোনবার জন্যে দশখানা গ্রামের লোকে ভেঙে পড়ত ছেলে-বুড়ো-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে। সে-যুগে এমন অন্নচিন্তা চমৎকার ছিল না এবং নিত্যকার জীবন-ধারণের জন্যে নিত্যনতুন অভাবের সৃষ্টি করে তারই পূরণের চেষ্টায় এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাছুটিও ছিল না। তাই সে-যুগে ছিল মানুষের হাতে অখন্ড অবসর। নিশ্চিন্ত মনে পরিবারের সবক'টি লোক যাত্রার আসরে জড়ো হয়ে আট-দশ-বারো ঘণ্টা ধরে যাত্রা শুনে অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করত এবং সঙ্গে সঙ্গে পালা-বর্ণিত পৌরাণিক চরিত্রগুলির সংস্পর্শে এসে নিজেদের জ্ঞানের পরিধির ঘটাত বিস্তৃতি ও পাপ-পুণ্য ভালো-মন্দের আদর্শকে করত মজবুদ।

বাঙালী যেদিন থেকে বাঙালী, সম্ভবত সেইদিন থেকেই তার জীবনে এসেছে কৃষ্ণ-যাত্রা। স্বয়ং মহাপ্রভু এই কৃষ্ণযাত্রায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মুঘল রাজত্বে সুবে বাঙলা দিল্লী-শাসিত হলেও যাত্রাভিনয়কে পরিত্যাগ করেনি। কিন্তু ইংরেজ যখন বাণিজ্যের বেসাতি নিয়ে শহর কলকাতার পত্তন করল এবং এখানে তাদের সমাজ-জীবনের অঙ্গ হিসাবে পাকাপোক্ত থিয়েটার আমদানি করল, তখন শহুরে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজকে থিয়েটারের নেশা পেয়ে বসল। শহুরে বাঙালী সাময়িকভাবে তার নিজস্ব যাত্রার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সভ্য-সমাজে যাত্রা অপাংক্তেয় হয়ে যাবার আশঙ্কায় যাত্রার অধিকারীমশাইয়েরা যাত্রার ঢং পাল্টে ফেললেন। মথুর শা মশাই তো খোলাখুলি তাঁর দলের নামই রাখলেন—থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি। অর্থাৎ যাত্রাভিনয়ে এতদিন যাবৎ যে-সংগীতের প্রাধান্য চলে আসছিল, তাকে গৌণ ভূমিকা দিয়ে এখন থেকে থিয়েটারের অনুসরণে এবং অনুকরণে অভিনয়াংশের দিকে জোর দেওয়া হল। যাত্রার অভিনয়স্থলের চার কোণে উকিলের চাপকানের মতো হলুদ, জরদা বা গেরুয়া রঙের পোশাক-পরা, 'জুড়ী' নামধারী ভদ্র-লোকেরা অন্তর্হিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐখানেই সারি-দিয়ে-বসা সেই গাইয়ে ভদ্রলোকদের দল, যাঁদের সামগ্রিক নাম ছিল—দোহার। জুড়ীরা ছিলেন মূল গায়েন, আর দোহারেরা ছিলেন তাঁদের ধুয়াধারী বা সহকারী। ধরুন, পালা হচ্ছে—কুরুক্ষেত্র। শ্রীকৃষ্ণকে সারথি নিয়ে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আত্মীয় ও গুরুজন নিধন এবং লোকক্ষয় হবার আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়ে সখাকে বললেন—যুদ্ধ করব না, আমার হাত-পা কাঁপছে। এইটুকু সংলাপ হতেই একজন জুড়ি দাঁড়িয়ে উঠে অর্জুনের বক্তব্যকে সভাস্থলে পেশ করলেন গানের মাধ্যমে।

"সখা, উচিত কি হয়?
প্রণমি যাঁদের নিতি
আরাধ্য সেই গুরুকুলে
নির্বধিব, প্রাণে এ কি সয়?"

একই গানের ভিন্ন ভিন্ন কলি ধরে চারজন জুড়ীই তান, বিস্তার, করতপ প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁদের গুণপনার পরিচয় দিতেন; এমনকি, সেই সুরকেই প্রকাশ করতেন বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, কর্ণেট, তবলা বা মৃদঙ্গবাদকেরাও। আর এই গানেরই সমবেত পুনরুক্তি ধ্বনিত হত দোহারদের কণ্ঠে। উপস্থিত মুগ্ধ শ্রোতাদের ভিতর থেকে উঠত খুশির বাহবাধ্বনি। এইভাবেই যাত্রাপালায় সে-যুগে ছিল গানের প্রাধান্য।

থিয়েটারের অনুসরণে যাত্রাভিনয় যখন শুরু হল, তখন জুড়ী-দোহার বার্জত হয়ে তার কিছুটা স্থলাভিষিক্ত হয়ে এল প্রতিটি যাত্রা-নাটকে 'বিবেক'-এর ভূমিকা। এই 'বিবেক' প্রকাশ করত বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মনের ভাব গানের ভাষায়। এই প্রথাই চলে আসছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত। তবে যাত্রা-নাটকের বিষয়-বস্তু মাত্র পৌরাণিকের মধ্যে সীমা-বদ্ধ না থেকে পরবর্তীকালের ভক্ত ও সাধু জীবনী, বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি থেকে শুরু করে নানা ঐতিহাসিক কাহিনী, এমনকি বিজয়-বসন্ত গোছের কাল্পনিক দেশীয় রাজ্যের কাহিনী থেকেও সংগৃহীত হচ্ছিল। পূর্ববঙ্গে মুকুন্দ দাস তাঁর 'মাতৃপূজা' প্রভৃতি যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে স্বাদেশিকতা প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন পুরো-দমে।

কিন্তু কালক্রমে যাত্রাভিনয়ের এ-রূপেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সবাক চিত্রের প্রতি জন-সাধারণের আসক্তি আমাদের থিয়েটারের উপস্থাপনা রীতিতে যেমন বৈপ্লবিক পরি-বর্তন আমদানি করেছে, যাত্রাভিনয় ধারাতেও তেমনি এনেছে বৈদ্যুতিক গতি ও চমকের সৃষ্টি। বর্তমানে যাত্রাভিনয়ের আসরে প্রথমে দেখা যায় একটি একক বা দ্বৈত নৃত্য। এর-পরে শুরু হয় আসল নাটক, তাতে থাকে প্রেম, স্বদেশানুরাগ, প্রতিহিংসা, নারীর সতীত্ব, বন্ধু, আশ্রিত, আশ্রয়দাতা, ভাই মু

…ীয়ের জন্যে আত্মোৎসর্গ এবং হাসির …াক। বিষয়বস্তু প্রায়ই বাঙলাদেশের …না নবাবী আমলকে আশ্রয় করে কিছুটা …তিহাসিক এবং বেশীর ভাগ কাল্পনিক …দানের সংমিশ্রণ। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র …াই আজকের যাত্রা-নাটকের আদর্শ।

…থিয়েটার, সবাক চিত্র প্রভৃতির প্রতি-…দ্বতাও আমাদের যাত্রার অবলুপ্তি …তে পারেনি, এ-কথা সত্য। কিন্তু এ-ও …ন সত্য যে, যাত্রা আজ জাতিচ্যুত হয়ে …টি আবর্তের মধ্যে ঘুরে মরছে। যে-যাত্রার …ত ছিল, বাঙালীর নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ …চয় বহন করে দেশে-বিদেশে জয়পতাকা …ীন করা, সেই যাত্রা আজ স্বরাজ্যেও …ধ সমাজকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা … না। এর কারণ, পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা-…তে আজ শিক্ষিত প্রতিভাধরের একান্ত …ব। দুঃখের বিষয়, শিশিরকুমার নাট্য-… থেকে অবসরগ্রহণের পরে বুঝেছিলেন … বাঙালীর নাট্য-প্রতিভার একমাত্র …ষ্ট্যপূর্ণ বিকাশের পথ হচ্ছে—…ভিনয়। কিন্তু তাঁর পরে আজ পর্যন্ত …র কোন নাট্য-প্রতিভাধরের সাক্ষাৎ …নি, যিনি আমাদের নিজস্ব যাত্রাকে …য় তাঁর মস্তিষ্ককে কিছু ঘর্মাক্ত …ছেন। এবং যতদিন না এমন কোনো …তভাধরের আবির্ভাব ঘটেছে, যিনি …ীরথের মতো যাত্রাপ্রবাহকে নতুন খাদে …য়ে তাকে বিদগ্ধজনগ্রাহ্য করে তুলতে …ছেন, ততদিন যাত্রাজগৎকে মফস্বল ও …লিয়ারী অঞ্চলে আসর সরগরম রেখে …জেকে কৃতার্থ জ্ঞান করতে হবে। এখানে …থ্য যে, যাত্রাশিল্প সংঘ দুস্থ শিল্পীদের …হায্য করে নিশ্চয়ই একটি প্রয়োজনীয় …কার্য করছেন; কিন্তু এই লোকনাট্য-…ল্পের উন্নতিকল্পে তাঁরা কোন পথে …গ্রসর হন, তা আমরা সোৎসুকচিত্তে লক্ষ্য …রব।

চিত্র-সমালোচনা

(১) শাগির্দ (হিন্দী)ঃ সুবোধ মুখার্জি প্রাডাকসন্স-এর নিবেদন; ৪,৫৬৯·৫৭ …টার দীর্ঘ এবং ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; …যোজনা ঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়; পরি-…চালনা ঃ সমীর গাঙ্গুলী; কাহিনী ঃ সুবোধ …মুখোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ঃ নির্মল দে; …সংলাপ ঃ বিশ্বামিত্র আদিল ও গুলজার; …সংগীত-পরিচালনা ঃ লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল; …গীতরচনা ঃ মজরু সুলতানপুরী; চিত্রগ্রহণ-…পরিচালনা ঃ এন ভি শ্রীনিবাস; চিত্রগ্রহণ ঃ …মুনীর খাঁ; শব্দানুলেখন ঃ কুলদীপ সিং; …সংগীতানুলেখন ঃ মীনু কাত্রাক; শব্দ-…পুনর্যোজনা ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-…নির্দেশনা ঃ শান্তি দাস; সম্পাদনা ঃ ভি কে …নায়েক; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত ঃ লতা মঙ্গেশ-…কর, মোহাম্মদ রফি ও মান্না দে; রূপায়ণ ঃ …সায়রা বানু, অচলা সচদেব [illegible] দত্ত, জয়

মুখার্জি, আই এস জোহর, নাজির হোসেন, মদনপুরী, অসিত সেন প্রভৃতি। দীনেশ পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২ আগস্ট থেকে সোসাইটি, মেনকা, প্রভাত, মিত্রা, ছায়া, রূপালী, ইণ্টালী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

শাগির্দ—এই ফারসী কথাটির বাঙলা প্রতিশব্দ হচ্ছে—শাগরেদ অর্থাৎ চেলা। অধ্যাপক ব্রিজমোহন অগ্নিহোত্রী (আই এস জোহর) তাঁর শাগরেদ রমেশকে (জয় মুখার্জি) শিখিয়েছিলেন ঃ জীবনে যদি উন্নতিবিধান করতে হয়, তাহলে নারীসঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে। এবং এই কাজে সহায়তা করবার জন্যে অধ্যাপক দাড়িগোঁফ তো রেখেইছিলেন, তার ওপর পরেছিলেন চোখে এক কালো চশমা। কিন্তু গুরুর উপদেশবাণী মেনে চলা শাগরেদ রমেশের পক্ষে বেশী দিন সম্ভব হল না। প্রকৃতির কোলে বেড়ে-ওঠা, বন্য কুসুমেরই মতো সুন্দরী তরুণী পুনম্ ওর চোখের সামনে এসে দাঁড়াতেই ওর সকল প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল। গুরুর কাছে গিয়ে নিজের অক্ষমতার কথা স্বীকার করে শিষ্য রমেশ বেশ জোরের সঙ্গেই বললে ঃ পুনম্-এর মতো স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে চোখে দেখলে আপনার জীবন-দর্শনও অকেজো হয়ে যাবে। বস্তুত হোলোও তাই। বেচারা প্রৌঢ় ব্রিজমোহন! পুনম্‌কে দেখে ওরও মাথা গেল ঘুরে; ও ভুলে গেল যে, ও প্রৌঢ়; গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে চোখের গগল্‌স্ খুলে ফেলে ও সাজতে চাইল স্রেফ যুবক—হতে চাইল রমেশের প্রতি-দ্বন্দ্বী। কিন্তু আসল যৌবনের সঙ্গে মেকি যৌবন পারবে কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে? কাজেই শেষপর্যন্ত প্রেমের পাঠে শিষ্যকে গুরু বলে মেনে নিয়ে অধ্যাপক ব্রিজমোহন শিষ্যকে পথ ছেড়ে দিয়ে সসম্মানে সরে দাঁড়াল।

ইস্টম্যান কালারে তোলা সুদীর্ঘ এই

রঙীন চিত্রটিকে প্রধানত হাস্য-কৌতুকের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে দর্শক উপভোগ্যতার ক্ষেত্রে ছবিখানি যে মোটের উপর সার্থকতা লাভ করেছে, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কৌতুকময় দৃশ্যগুলিকে অতিসহজেই আকর্ষণীয় করে তুলেছেন অধ্যাপক ব্রিজমোহনের ভূমিকায় আই এস জোহর এবং তাঁর বিদ্রোহী শিষ্য রমেশ বেশে রোমান্টিক নায়ক জয় মুখার্জি। প্রকৃতির পরিবেশে লালিতা, নায়িকা পুনম্-রূপে সায়রা বানু বেশ স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন। অপরাপর ভূমিকায় অচলা সচদেব, নাজির হোসেন, অসিত সেন, মদনপুরী প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কি বহির্দৃশ্য, কি অন্তর্দৃশ্য—সর্বত্র রঙীন চিত্রগ্রহণে সার্থকতালাভ করেছেন শ্রীনিবাস ও মুনীর খাঁ। সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা উচ্চাঙ্গের। প্রকৃতির কোলে লালিতা তরুণী পুনম্-এর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনার দোষেই কিনা জানি না, সায়রা বানুকে কিন্তু বহুস্থলেই যথেষ্ট সুন্দরী বলে মনে হয়নি।

হাল্কা কৌতুকাশ্রয়ী চিত্র বলে 'শাগির্দ' সাধারণ দর্শকের কাছে পরম উপভোগ্য হবে।

(২) গ্রাঁ প্রী (ইংরাজী)ঃ মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার-এর নিবেদন জন ফ্র্যাঙ্কেনহিমার চিত্র; প্রযোজনা ঃ এডওয়ার্ড লুইস; পরিচালনা ঃ জন ফ্র্যাঙ্কেনহিমার; কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঃ রবার্ট অ্যালান আর্থার; সংগীত-পরিচালনা ঃ ম্যরিস জারে; রূপায়ণে ঃ জেমস গার্নার, ভেস মন্দান্ড, ব্রায়ান বেডফোর্ড, অ্যান্টনিও সাবাটো, তোসিরো মিফুন, ইভা মারী সেন্ট, জেসিকা ওয়াল্টার, ফ্রাঁসোয়া হার্ডি প্রভৃতি। মেট্রো কালারে রঞ্জিত সুপারপ্যানাভিশনে তোলা ছবিখানি গেল ২ আগস্ট শুক্রবার থেকে জ্যোতি সিনেমায় দেখানো হচ্ছে।

ফাস্ট্ টু কাইট চিত্রে মোরিলিন ডোভন ও স্যাড ইভেরেট

মোটার দৌড় প্রতিযোগিতাকে অবলম্বন করে এমন একখানি উত্তেজক, শ্বাস-নিরোধকারী অথচ মানবিক আবেদনে ভরা সার্থক চিত্র পৃথিবীর চলচ্চিত্র-জগতে এর আগে কোনোদিন তোলা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এবং নিঃসংশয়ে বলতে পারি, অদূরভবিষ্যতে আর কোনোদিন তোলা হবে বলেও মনে হয় না।

ইটালীর মোনাকো, বেলজিয়মের স্পা ফ্রাঙ্কোরচ্যাম্পস্, জার্মানীর নুর্বুরগ্রীঙ, ফ্রান্সের ক্লার্মণ্ট ফেরান্ড, হল্যাণ্ডের জাণ্ডভুর্ট, ইংলণ্ডের ব্র্যান্ডস্ হ্যাচ এবং পুনরায় ইটালীর মোঞ্জা—এতগুলি জায়গায় 'গ্রাঁ প্রী' মোটর রেসিং-এর দৃশ্য তোলা হয়েছে চার-জন মোটরচালক ও তাদের প্রোমোটারদের (প্রবর্ধকদের) মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখাবার জন্যে; এদের পেছনে আছে নারী, যাদের মধ্যে কেউ বা মোটর-রেস থেকে তার প্রিয়তমকে সরিয়ে আনতে চায়, আবার কেউ বা তার প্রিয়তমকে বিজয়ী দেখতে চায়। আশ্চর্য অভিনয় করেছেন অভিজ্ঞ মোটর-চালক সার্তির ভূমিকায় মোন্টান্ড, আদর্শ সংযত অভিনয়ের নিদর্শন দেখিয়েছেন স্কট স্টডার্ডএর ভূমিকায় ব্রায়ান বেডফোর্ড জটিল মনস্তত্ত্বের স্বাক্ষর বহন করেছে স্কটের স্ত্রী প্যাটের ভূমিকায় জেসিকা ওয়াল্টারের অভিনয়, বেপরোয়া চালক নিনো বার্লিনিকে মূর্ত করে তুলেছেন অ্যান্টনিও স্যাবাটো পিট অ্যারন-এর বলিষ্ঠ রূপারোপ করেছেন জেমস গার্নার এবং লুই ফ্রেডারিক-শন-এর মমতা-কোমল প্রকাশিত হয়েছে ইভা মারী সেন্ট-এর সহৃদয় অভিনয়ের মাধ্যমে।

ছবিটিতে বিস্ময়কর ভূমিকা গ্র… করেছেন এর চিত্রগ্রহণকারীরা। কি অ… কৌশলে এঁরা যে দৃশ্যের পর দৃশ্য গ্র… করেছেন, তা কল্পনাও করা যায় না।—… প্রতিটি দৃশ্য এমনই লোমহর্ষক। … আশ্চর্য সম্পাদনা-কৌশল! একসঙ্গে তি… দৃশ্য থেকে শুরু করে তিরিশটি পর্য… দৃশ্য দেখানো হয়েছে ছবির গতিকে রকে… মতো দ্রুত করবার জন্যে। টেম্পো বাড়া… জন্যে শব্দের এমন বিচিত্র প্রয়োগও ক… দেখা যায়।

মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার নিবেদিত … ফ্র্যাঙ্কেনহিমার পরিচালিত 'গ্রাঁ প্রী'র ম… বিচিত্র আবেদনের চিত্র কদাচিৎ দেখা য…

নান্দীকর

বিদেশী ছবির খব

কয়েকটা স্প্যানিশ ছবি

মিওয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মা… থাকে। পথে একদিন এক ট্যুরিস্ট তর… জীন এর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। কটা… খুশীর জোয়ারে পরিচয়ের দাঁড় ধরে … চলে আনন্দের টানে। আনন্দে উচ্ছল জ… কখন যেন মিওয়েলের মনে স্থান করে … তার অজান্তে। প্রথম ভালবাসার খুশি… মিওয়েল মাতোয়ারা। তারপর এক… পরদেশী বান্ধবী বিষাদে মন ডুবিয়ে …

য়। প্রথম ভালবাসার স্বাদ তখনও র সারা দেহমন জুড়ে। জীন্ এর তিতে পরিবর্তন আসে তার মনে। ত চেষ্টা করে অতীতের কাঁটাকে। র এই প্রেমের কাহিনী নিয়ে ভোলা কন্ অ্যামোর' ছবির পরিচালক া মন্তালিও। প্রধান চরিত্রদুটিতে প্যাটি সেপার্ড ও এনরিক দা।

রা লাজ্গোর নতুন ছবিটার নাম হল রিজম্ এসন্ গ্রান ইভেন্তো"। প্রদেশের ছোট্ট এক গ্রামের এক মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি এল তার এই আন্তর্জাতিক টুরিস্ট স্পট করে হবে। মতলব ঠিক করলেন। ওপর-নির্দেশ চাই। সেক্রেটারীকে নিয়ে লেন কস্তাদেলসোল্-এ যেখানে থ কর্মচারীদের সভা হবে। উনি নিজের প্ল্যান সাবমিট করবেন। লার সাহায্য চাইতে গিয়েই নানা বিপত্তি এসে হাজির। সব শেষে কিছুই। এ হাসির ছবির প্রধান মার্তিনেজ সোরিয়ার অনবদা।

দ্রোর দুঃখজনক কাহিনীকে নতুন বলার প্রয়োজন নেই। সবারই তা কিন্তু নবীন পরিচালক রোমিরো ফেদ্রোর সে ব্যথাবিধুর জীবনকে বে উপস্থাপিত করেছেন পর্দায়। র পটভূমিকায় গত শতাব্দীর শেষ-সময় জুড়ে এ কাহিনীর বিস্তার। শ্রেণীর কৃষিবিপ্লব এ ছবির প্রধান ভাগ। ধূ ধূ মাঠ, রিক্ত নিঃস্ব ী। খাদ্যাভাব, বস্ত্র, শিক্ষা সমস্যা নিয়ে এক নিপীড়িত নির্যাতিত কাহিনী। প্রধান চরিত্রকটিতে আছেন বেনক্রেস, সিমন অ্যান্দ্রু, জেমস ক। ছবির নাম "ফেড্রা ওয়েস্ট।"

টাকে কমেডিও বলা যেতে পারে ট্র্যাজি-কমেডিও বললে কোন ক্ষতি স্ত্রী পরস্পরের অনুরক্ত এই সন্দেহে স্ত্রীকে জব্দ করার জন্য মতলব আঁটে। চরিত্র তাকে যত বেশী না সন্দেহবাদী তার চাইতে তাকে জব্দ করার তার বেশী। সবশেষে স্ত্রীকে জব্দ গিয়ে নিজেই নিজের ফাঁদে ধরা সে এক কলেঙ্কারীর সৃষ্টি। স্ত্রীই বাঝে স্বামীকে। এ ছবির পরিচালক ক মারিয় ফক'। প্রধান চরিত্রগুলিতে ন সুইডেনের ইনগ্রিড থুলিন, ফ্রান্সের গোলেং, ইতালীর গ্যাব্রিয়েল স্তু, আলফ্রেদোলান্দা। ছবির নাম ডায়বলো বাজো লা আলমোহাদা'।

বারের মার দে প্লাটা উৎসবে স্পেনের বটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল তা হল ড্রিমস অফ আগস্ট'। পরিচালক ল পিকাদোর দ্বিতীয় ছবি এটা। প্রথম ছবি 'লা তারা ফুলা' দেশে-শ বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে। মা মেয়ে অ্যানা, প্রেমিক কার্লোস এদের তিনজনকে নিয়ে এক ত্রিমুখী সংকটের চরম মুহূর্তে নিয়ে এ ছবি। উন্মাদ ইসাবেল প্রেমিক জুলিওর সংগে শেষ অব্দি থাকতে পারে নি। মেয়ে অ্যানার মনকেও সে বিষাক্ত করে তুলেছে। অ্যানা আর কার্লোস-এর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির শেষ আগস্টের কোন গোধূলিতে হবে নিশ্চয়ই। ছবির শেষ এখানে।

প্যারিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রযোজকদের সংস্থা থেকে সরকারীভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে যে আগামী ভেনিস উৎসব বর্জন করছে পাঁচটি দেশ এই অজুহাতে যে ছবির প্রদর্শনীকালীন তার নিরাপত্তা রক্ষা, শৈল্পিক বিচার ঠিকমত হওয়ার কোন গ্যারান্টি উৎসব কর্তৃপক্ষ দিতে পারছে না। যে পাঁচটি দেশ বর্জন করছে সেগুলি হল—সুইডেন, ইতালী, ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

নতুন চেক্ শিশুচিত্র 'লা কিং ফর জিরকা' পরিচালনা করবেন রাদিম্ দ্রেক্। ইনি এর আগে আরও একখানি ছোটদের জন্য ছবি করেছিলেন—সেটির নাম 'টোনা অ্যান্ড টু লার্সস্ট্যান্'। ছবিটি খুব সুন্দর হয়েছিল। মিলান সিমেক ও রাদিমের সহযোগিতায় এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে। গট্ওয়ালডয়া' ফিল্ম স্টুডিওতে ছবির কাজ শুরু হবে শিগ্গির। ছবির প্রধান চরিত্র জিরকার ভূমিকায় থাকছে মার্টিন মাসার আর অন্যান্য চরিত্রে থাকবে জোসেফ বিভ্রা, রাদ্রোশ্লাভ ব্রজভাতি ও অ্যানা ব্রেজকোভা।

গত বার্লিন উৎসবে নাকি গদারের 'উইক এন্ড' কারোরই খুব একটা ভাল লাগেনি। এবারে আবার যে ছবি করবেন স্থির করেছেন, পূর্বাহ্নেই তার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। তাঁর নতুন ছবির নাম 'ওয়ান প্লাস ওয়ান'। ব্রিটেনের সবচাইতে অখ্যাত গাইয়ে দল 'রোলিং স্টোনস' এ ছবিতে একটা প্রধান ভূমিকা নেবে। গদারের হঠাৎ এদের পছন্দ হল কেন সেটাই অনেকের জিজ্ঞাসা।

মঞ্চাভিনয়

'দুরন্ত চড়াই'-এর বহির্দৃশ্যে সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপ রায়

মানবতার খাতিরে ও কেয়াকুঞ্জ

ইদানীংকালে 'শুভময়' প্রযোজিত 'ফেরা' নাটকটির সামগ্রিক উপস্থাপনা নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ সংযোজন। নাটকটির অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য পরিচালকের সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য ঠিক তেমনই উল্লেখযোগ্য এর দলগত অভিনয় সৌকর্য। 'শুভময়'-এর শিল্পী সদস্যরা এবারও প্রমাণ করলেন আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার এতটুকু অভাব না রেখে, দু'ঘণ্টার জন্য দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধের মত কিভাবে ধরে রাখা যায়। দীর্ঘ পাঁচ রাত্রি 'ফেরা' অভি-নয়ের পর 'মানবতার খাতিরে' এবং 'কেয়া-কুঞ্জ' এই দু'টি একাংকিকা নিয়ে এ'রা পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থিত হলেন। প্রথমটি ব্যংগ রসাশ্রিত কৌতুক নাটক বলা যেতে পারে এবং দ্বিতীয়টি একেবারেই বিয়োগান্ত। ভিন্ন রসের এবং ভিন্ন সুরের দু'টি নাটকই—কি অভিনয়ে, কি উপ-স্থাপনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ত্রুটী যে একেবারেই ছিল না তা নয় তবে নাটক দু'টিরই গতি ছিল অত্যন্ত সাবলীল আর যথার্থ নাটকীয়। হাসি এবং কান্নার এমন যুগপৎ সমন্বয় সচরাচর চোখে পড়ে না। যদিও 'টিম ওয়ার্ক' খুবই উচ্চস্তরের তবু নাটক দু'টির মুখ্য চরিত্রাভিনেতার তুলনায় মাঝে মাঝে অন্য সকলকেই ম্লান মনে হচ্ছিল অর্থাৎ দ্বিগুণ সজীবতা এনে সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার সাধনায় সবাইকে মগ্ন থাকতে হবে। তবেই সার্থক হ'বে পরিচালকের পরিশ্রম আর আন্তরিক চেষ্টা। নাটক দু'টির বিভিন্ন চরিত্রে দর্শকদের বিশেষ অভিনন্দন লাভ করেছেন পবিত্র চট্টো-পাধ্যায়, শৈলেন দাস, অরুণ মজুমদার, প্রবীর রাহা, ইন্দুমাধব দে এবং কাজল মুখার্জি। 'কেয়াকুঞ্জ' নাটকে দিলীপ ভট্টা-চার্যের চরিত্রটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। জয়দেব ভাদুড়ী, অর্ধেন্দু দাস, কুমার দে এবং রণজিত গাংগুলী-র চরিত্ররূপায়ণ নিতান্তই গতানুগতিক। চরিত্রগুলি জীবন্ত হ'তে গেলে যে পরিমাণ সজীবতার প্রয়োজন তার অভাব সহজেই ধরা পড়েছে। অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে তবেই ত্রুটী ধরা পড়বে নইলে দলগত অভিনয় নৈপুণ্যের কাছে সবকিছু তলিয়ে গেছে। আংগিকের কাজ অবশ্যই প্রশংসনীয়। প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশক হিসেবে জ্যোতি-প্রকাশ অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি এবং বাচনভংগী সত্যিই অতুলনীয়। 'শুভময়'-এর শিল্পীদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং আন্তরিকতা আরও একটু দৃঢ়তর হ'লে অতি অল্পকালের মধ্যেই এটি একটি প্রথম শ্রেণীর নাট্যদল হিসেবে পরিগণিত হ'বে।

'ফেরা'—বন্ধ

'শুভময়' নাট্যসংস্থার সম্পাদক শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে জানাচ্ছেন যে, রতনকুমার ঘোষ রচিত 'ফেরা' নাটকটির অভিনয় অনিবার্য কারণেই তাঁরা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 'ফেরা'-র নিয়মিত অভিনয়ের একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও নাট্যকারের সংগে চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নীতিগত কয়েকটি অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সংস্থার কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট নাটকটির ভবিষ্যৎ অভিনয়ের জন্য স্থিরিকৃত দিনগুলি একেবারেই বাতিল ক'রে দিয়েছেন।

শেষরক্ষা

আগামী ৯ই আগস্ট গান্ধারের ব… বার্ষিক উৎসব সন্ধ্যা ৭টায় গোখেল স্কুলে… 'সরলা মেমোরিয়াল হলে' অনুষ্ঠিত হবে… রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষরক্ষা' নাটক… অভিনীত হবে। অংশগ্রহণ করছেন অশো… মিত্র, নিমু ভৌমিক, ভবরূপ ভট্টাচার্য… অচিন্ত্য চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ মুখার্জি, শৈলে… মৈত্র, অলোকা বসু, গীতা চক্রবর্তী, গে… রায় প্রভৃতি।

ভারতীয় লোকনাট্য উৎসব

গত ৭ জুলাই থেকে ১০ জু… পর্যন্ত কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে যাত্রাশি… সংঘের উদ্যোগে এক লোকনাট্য উৎসব … গেল। উৎসবের শেষদিনে সংঘ সম্পা… সংঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসংগে বর্ত… বাংলা যাত্রা জগতের দুরবস্থার … উল্লেখ করে বাঙালীর এই প্রাচীন কলা… টিকিয়ে রাখার জন্য সকলকে … যোগিতার হাত নিয়ে এগিয়ে আ… অনুরোধ জানালেন। উৎসবের অনুষ্ঠা… সূচীতে ছিল এই লোক-শিল্পটির স্ব… বোঝার মত চারটি নাটক। ব্রজেন দে র… 'সোনাই দীঘি', 'বাঙালী', 'মেঘে … রবি' ও শম্ভু বাগ রচিত 'ঘুম ভাঙার গা… অভিনয় সৌকর্য, উপস্থাপনার দী… পরিবেশন কুশলতা সব মিলিয়ে চারদি… ঐ অনুষ্ঠান প্রত্যেকের হৃদয়কে আ… কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছিল। দর্শ…

লল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের উদ্যোগে মঞ্জুলিকা দাস এবং শান্তিলতা বোসের পরিচালনায় নৃত্যানুষ্ঠানে আয়েষা চৌধুরী, মধুশ্রী দাস, বিশাখা গুপ্তরায়, মঞ্জুষা মুখোপাধ্যায়, রঞ্জনা চৌধুরী ও সোনু।

পক্ষ থেকে ডেপুটি মেয়র শিবন্ন দুঃস্থ শিল্পী গোরীশঙকর স্ত্রীর হাতে সতেরশ টাকা তুলে ঘ তাদের এই চারদিনের অনুমধ্য দিয়ে শুধু এক মহান কর্তব্যই রেনীন ভারতীয় লোকনাট্য শিল্পের াগাযোগ ঘটিয়েছেন জনসাধারণের। । এই চারটি নাটকে যাঁরা অভিনয়ে য়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, পঞ্চু সেন, চ্যাটার্জী, সুজিত পাঠক, ভোলা জ্যোৎস্না দত্ত, পুতুল দত্ত, বেলা তপনকুমার, শিব ভট্টাচার্য, ননী ই হালদার, তিনকড়ি ভট্টাচার্য, াহা প্রভৃতি।

কুর অবৈতনিক গীতিনাট্য সমাজ

পুকুর অবৈতনিক গীতিনাট্য উত্তর কলকাতার অন্যতম প্রাচীন স্থা। প্রায় একশ বছর পূর্বে এই সংস্থা সুদীর্ঘকালব্যাপী নাটক গীতাভিনয়ের পরিবেশনে । নাট্যমহলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার এই সংস্থার অভিনীত সাধু গীতিনাট্যের পঞ্চাশ রজনীর রিবেশনার পর সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা াক ডাঃ অমূল্য মুখোপাধ্যায়ের ংস্থার কর্মসূচীর সাময়িক বিরতি প্রতি নিয়মিত অভিনয়ের মাধ্যমে ন সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার কল্পনা সম্ভ্রান্ত পল্লীবাসী ও পরপরিচালকের পুত্র বিজয় মুখোঅক্রান্ত প্রচেষ্টায় গৃহীত হয়েছে। ক্ষা সংস্থার আগামী নাট্যোপহার নাটকের শুভমহরৎ অনুষ্ঠান াট্যরসিক বৃন্দের উপস্থিতিতে হয়। চন্ডীদাসের চরিত্রে নীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং রামীর ভূমিকায় সুনীতি দাস অভিনয় করেন। নাট্যপরিচালনা ও সুরারোপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যথাক্রমে গোকুলকৃষ্ণ মুখার্জি এবং গোপাল গোস্বামী।

রংগসভার নতুন নাটক
নিহত কুলীন

সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমিকায় পীযূষ বসু রচিত 'নিহত কুলীন' নাটকটি ৯ই আগস্ট সন্ধ্যা সাতটায় পরিবেশন করছেন রংগসভা।

অভিনয় করছেন দিলীপ রায়, পীযূষ বসু, ভোলা বসু, পান্না দত্ত, চন্দন রায়, তাপস সাহা, অচিন্ত্য মজুমদার, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি তালুকদার ইত্যাদি।

গোর্কির নাটক

আগামী ১২ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ মিনার্ভা থিয়েটারে গোর্কির জন্মশত-বার্ষিক উপলক্ষ্যে 'লোকমঞ্চের' সদস্য কর্তৃক গোর্কির এনিমি নাটকের ভাবানুসারে সুনীল দত্ত রচিত "দান:" শ্রীনিমাই চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনীত হবে।

শেষ থেকে শুরু

গত ২২ জুলাই রবীন্দ্রসদনে কলকাতা হাইকোর্টের ১০৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি এন সিংহ। এই উপলক্ষে হাইকোর্টের কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শেষ থেকে শুরু" নাটকটি প্রভূত সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করে নাটকটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলেন সর্বশ্রী দীপক রায়, সৌরেন মুখোপাধ্যায়, কালিময় মৈত্র, বিশ্বেশ্বর চন্দ্র, অরুণ বসু, মাস্টার গৌতম ও আরতি দাস প্রভৃতি নাটকটি পরিচালনা করেন সৌরেন মুখোপাধ্যায়।

উপনিবেশ

"পথিক" সম্প্রদায় আগামী ১৯ আগস্ট 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে পরিবেশন করবেন 'উপনিবেশ' নাটক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে এটি নাট্যরূপ দিয়েছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্বেতছায়া
ঝিঁঝি পোকার কান্না

জলঢাকার 'নতুন আওয়াজ' নাট্যগোষ্ঠী এবার যে দুটি নাটক পরিবেশন করতে চলেছেন তাদের নাম হোল 'শ্বেতছায়া' ও 'ঝিঁঝি পোকার কান্না'। আগামী ২৪,

চিরদিনের চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও কমল মিত্র

২৫ আগস্ট সংস্থার প্রথম বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নাটক দুটি অভিনীত হবে।

দমকল

সম্প্রতি জে কে স্টীলের স্পোর্টিং লাইব্রেরীর শিল্পী সদস্যরা 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করলেন শৈলেন গুহ নিয়োগীর হাস্যমধুর 'দমকল'। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ে শিল্পীরা নাটকটিকে প্রতিটি মুহূর্তে প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছিলেন। খোকন মজুমদারের নির্দেশনায় পরিচ্ছন্নতার ছাপ আছে। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিয়েছিলেন অসিত সান্যাল, অলোকময় ঘোষ, সনৎ লাহিড়ী, গোপী ঘোষ, তন্ময় সেন, দিলীপ সরকার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রতন চক্রবর্তী, যূথিকা ভট্টাচার্য, অলোকা গঙ্গোপাধ্যায়, পান্নালাল নন্দী।

পাহাড়ী ফুল

'নবনট্'র শিল্পীবৃন্দ কিছুদিন আগে শৈলেন গুহ নিয়োগীর 'পাহাড়ী ফুল' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে। সামগ্রিক অভিনয়ে শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠা ভাষা পেয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় চক্রবর্তী, সৌকত আলি, তমাল রায়চৌধুরী, অতনু রায়, কল্যাণ চৌধুরী, জয়দেব সরকার, দীনেশ মিত্র, অরবিন্দ চক্রবর্তী, শিল্পী সেনগুপ্ত, অমিতাভ দত্ত, প্রসূন রায়চৌধুরী, বীণা সেন, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষ্ণচূড়ার রঙ লাল

'কল্পলোক' নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে সুধাংশু দাশগুপ্তের "কৃষ্ণচূড়ার রঙ লাল নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। মনস্তত্ত্বমূলক এই নাটকটি অভিনীত হয়েছে একটি মাত্র সেটে। নাট্য-কৌতূহল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। নাটকের বক্তব্য অভিনয়ে যেমন সুস্পষ্ট হয়েছে, আঙ্গিক পরিকল্পনায়ও তা চিহ্নিত। দুলাল দত্ত নাট্যনির্দেশনায় স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত শিল্পভাবনার পরিচয় রেখেছেন। আদিনাথ পাল, রঘুনাথ চক্রবর্তী, শীলা মান্না অভিনয়ে দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন।

উত্তর দরবারীর প্রযোজনায় "আগ্নেয়গিরি"

উত্তর দরবারীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় জন স্টেইনবেকের "দি মুন ইজ ডাউন" অনুপ্রাণিত আগ্নেয়গিরি। যুদ্ধে দেশ দখল এবং তার প্রতিরোধ সংগ্রাম নিয়ে নাটকের কাহিনী। নাটক—অমর গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথম অভিনয় ২১ আগস্ট বুধবার।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে আলোকচিত্রশিল্পী ধীরেন দে

প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী ধীরেন দে হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে গত ৬ই জুলাই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ধরাধাম পরিত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

বাংলা চিত্রশিল্পের আদি যুগে যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে—আজ সে যাত্রা যদিও স্তব্ধ নয়—তবুও বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা মন্থর।

১৯২১ সালে ম্যাডান থিয়েটার্সের চতুর্থ নির্বাক ছবি 'নল দময়ন্তী'তে তিনি যোগদান করেন সহকারী ক্যামেরাম্যানরূপে। কলকাতায় তিনি যুক্ত ছিলেন ম্যাডান থিয়েটার্স, পরে তাজমহল কোম্পানী এবং তার পরে অরোরা করপোরেশনের সঙ্গে। অরোরা তিনি যোগ দেন নিউ থিয়েটার্সে। কর্মবহুল জীবন সারা ভারত জুড়ে।

বাইরের ছবিও অনেক করেছেন। সম্প্রতি কাজ করেছেন 'পাগল ঠাকুর ছিন্নমস্তা' ছবিতে। মৃত্যুর দুদিন তিনি শ্যুটিং করেছেন হিরন্ময় সেন চালিত 'বালক গদাধর' ছবিতে।

সদাহাস্যময়, নির্বিরোধী, ধীরেন দে কাজ করেছেন বহু ছবিতে। তাঁর শেষ নির্বাক ছবি সবাক ছবির সংখ্যাও তাঁর কম নয়। ৯০।৯৫ খানা। বাসবদত্তা, জননী, অশোক, দেবযানী, কমলে শান্তি, বন্দেমাতরম, মন্দির, অলকানন্দা, শহর থেকে দূরে, মনে সন্ধি, কবি, ছেলে কার, জন্মতিথি জনপ্রিয় ছবিগুলি তারই নিদর্শন।

সুরদাস সংগীত সম্মেলন

মিউজিক লাভার্স আয়োজিত সুরদাস সংগীত সম্মেলনের চতুর্থ উচ্চাঙ্গ সংগীত আসর বসছে আগামী সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কোলকাতার প্রেক্ষাগৃহে। চারদিনের এই সংগীত টিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সম্পাদক শ্রীস্বদেশ সান্যাল তালিকাটি সাজিয়েছেন ভারতের শিল্পীবৃন্দের নামে, পাশাপাশি স্থানীয় গুণী শিল্পীরাও। সম্মেলনে দিনের সারারাতব্যাপী অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তোলার জন্য ভারতের প্রখ্যাত দুই সেতার শিল্পীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। শিল্পী হলেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ ওস্তাদ আবদুল হালিম জাফর খাঁ। বিভিন্ন আসরে অংশগ্রহণকারী পন্ডিত বিনায়করাও পটবর্ধন, দস্তুর, গোপীনাথ গোস্বামী জার্কিন দারুওয়ালা, চিন্ময় দবীর খান, জামিল হায়দার ঘোস, বন্দনা সেন, মালবশ্রী পন্ডিত শান্তাপ্রসাদ, কানাই দত্ত, উস্রা খান, মানিক দাস ও সাগির প্রভৃতি।

বৈতানিকের বিংশ বর্ষপূর্তি

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করল। দীর্ঘ এই পরিসরের মধ্যে বৈতানিক তার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রযোজনায় স্থাপিত হয়েছে 'টেগোর ইনস্টিটিউট' — রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পঠন-পাঠনের জন্য। স্থাপিত হয়েছে অঙ্গন — রবীন্দ্র-নির্দিষ্ট ডিপ্লোমা দেওয়ার সংগীত বৈতানিকের পরিচালনায় কেবলমাত্র বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'রবীন্দ্র ৭ম বর্ষ শুরু হয়েছে। এছাড়াও

বৈতানিক চালিয়ে যাচ্ছে। ইতি-
ন্দ্রনাথের উপর কয়েকটি গবেষণা-
শিত হয়েছে।

বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে
১১ই আগস্ট থেকে ১৫ই আগস্ট
চদিনব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনু-
আয়োজন করা হয়েছে। রবীন্দ্র-
বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায়
করবেন সর্বশ্রী ডঃ সুধাংশু-
ন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শান্তিকুমার দাশ-
ভূদেব চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যো-
রেশ মিত্র, শৈলজারঞ্জন মজুমদার,
রায়চৌধুরী প্রভৃতি। বিভিন্ন
ভাপতিত্ব করবেন উপাচার্য ডঃ
সেন, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়,
মিত্র এবং ভূপতি মজুমদার।
ান উদ্বোধন করবেন শ্রীসৌমেন্দ্র-
।

রতলায় বন্যাদুর্গত মানুষদের
সাহায্যার্থে বিচিত্রানুষ্ঠান

ত ২৭ ও ২৮শে জুলাই আগর-
ত্রিপুরার বন্যাদুর্গত মানুষদের
আগরতলার ন্যাশানালিস্ট
অর্গানাইজেশন আয়োজিত একটি
ানে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পী
টার্জি, ভুলু চৌধুরী, সঙ্গীত
ারী কল্পনা চক্রবর্তী, সাধন মৈত্র,
ত্র প্রভৃতি যোগদান করেন। ঐ
প্রাপ্ত সমস্ত টাকা ত্রিপুরার
ত্রাণ তহবিলে দিয়ে দেওয়া হয়।
মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ তার
একটি চা-চক্রে শিল্পীদের এই
জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

ুকর চক্রের মিলন উৎসব

০ জুলাই, চন্দননগর যাদুকর
গণ দীঘাতে এই মিলন উৎসবের
করেছিলেন। সংস্থার সম্পাদক
ঘোষ ও আমোদপ্রমোদ সম্পাদক
বর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই
বটি সার্থক হয়ে ওঠে। যাদু-
অংশগ্রহণ করেন ভারতের সর্ব-
কর দি গ্রেট সুশীল, কাশীনাথ
বকুমার, এস মান্না ও যাদুকর
এদের এই উৎসবটি সত্যই
ং অতুলনীয়।

গীত বিদ্যালয়-এর উদ্বোধন

মধ্য কলকাতায় (৪০, সার্পেন-
, কলকাতা-১৪) একটি নতুন
বদ্যালয়ের উদ্বোধন করলেন
শ্রীমন্মথ ঘোষ" "ঊষা
বদ্যালয়' এটি প্রধানত উচ্চাঙ্গ
ক্ষার আয়োজন করলেও রবীন্দ্র
াদি শেখাবার ব্যবস্থা আছে।
ছ নানাবিধ যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষার

অন্ধগায়ক শ্রীদিলীপ ঘোষ এই
ালয়ের অধ্যক্ষতা করছেন।

রবীন্দ্রসম্মেলন

৬ই জুলাই গোপাল জীউ সংঘের সভ্যেরা চতুর্থ বর্ষ রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে দৌলতরাম নোপানী বিদ্যালয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটির বৈচিত্র্য এবং রুচিশীল পরিবেশ উপস্থিত দর্শক-বৃন্দকে মুগ্ধ করে তোলে। সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে। এছাড়া আবৃত্তিতে শ্রীপ্রদীপ ঘোষের সুদীপ্ত কন্ঠস্বরে এবং সমবেত যন্ত্রসংগীতে হবি রিদম্ অর্কেস্ট্রা অনুষ্ঠানটিতে রবীন্দ্রসংস্কৃতির স্বর্গলোক গড়ে তোলে, এঁদের সুরুচির আরও যথেষ্ট পরিচয় পাই অনুষ্ঠানটির চিত্তাকর্ষক পুস্তিকাটির কল্পনা বৈচিত্র্যের প্রকাশভঙ্গী দেখে। অনুষ্ঠানটির সুযোগ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সংঘের সম্পাদক শ্রীঅজিত রায়।

সায়ান্স ফিকশ্যান সিনে ক্লাব-এর উদ্যোগে "ফ্যাণ্টাস্টিক ভয়েজ"

৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় বহু প্রতীক্ষিত "ফ্যান্টাস্টিক ভয়েজ" ফিল্মটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী হবে গ্লোব সিনেমায়। কলকাতায় এই বিস্ময়কর রঙীন সায়ান্স ফিকশ্যান ফিল্মটির প্রথম প্রদর্শনীটি সংরক্ষিত রাখা হয়েছে কেবলমাত্র ক্লাব সদস্যদের জন্য। বহু ব্যয়ে নির্মিত এই ছবিতে দেখা যাবে এক অত্যাশ্চর্য অভিযানের দৃশ্য। বিশেষ প্রক্রিয়ায় আগে থেকেই ছোট করে নেওয়া একটি ডুবোজাহাজকে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকসহ ধমনীর রক্ত প্রবাহের মধ্যে ইনজেকশন মারফৎ প্রবেশ করানো হবে মগজের ভিতরে গিয়ে টিউমার আরোগ্যের জন্য। বোম্বাইতে প্রদর্শনীকালে ছবিটি চিকিৎসক মহলে বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

১১ আগস্ট রবিবার সকালে প্রাচী সিনেমায় দেখানো হবে এডগার অ্যালান-পোর রঙীন ফ্যানটাসি কাহিনী "দি র‍্যাভেন।"

গেল ১৪ জুলাই রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা কেমিক্যালের ক্যানটিন হলে। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বার্ষিক চাঁদার হার বাড়িয়ে ছ'টাকার পরিবর্তে আট টাকা করার এবং গত দু বছরে ক্লাবে প্রদর্শিত কিছু উল্লেখযোগ্য ফিল্ম আবার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দুটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ফিল্ম নির্বাচন সম্পর্কে ক্লাব প্রেসিডেন্ট সত্যজিৎ রায়ের শ্রম ও নিষ্ঠা সম্পর্কে বহু চিত্তাকর্ষক তথ্য পরিবেশন করেন ক্লাব সম্পাদক অদ্রীশ বর্ধন। পরিশেষে ক্যালকাটা কেমিক্যালের ডিরেক্টর জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় ক্লাবের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও প্রগতিশীল মনোভাবের জন্য।

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে রাশিয়ান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী :

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী কয়েকটি রুশ চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী ব্যবস্থা করেছেন :
৬ই আগস্ট, সন্ধ্যা ৬-৩০টায় অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস্-এ 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' ও 'ব্যালাড অব এ সোলজার'।

১১ই আগস্ট, বেলা ১০-৩০-এ ছায়া সিনেমায় 'ডন কুইক্সোট'।

১৮ই আগস্ট, বেলা ১০-৩০-এ ছায়া সিনেমায় 'সর্স'।

জলসা

ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেল

ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেলের ত্রি-সন্ধ্যা ও একটি প্রভাতী আসর শুধুমাত্র বৈচিত্র্যপ্রধানই ছিল না, আকর্ষণীয় সৌন্দর্য-ব্যঞ্জিত অনুষ্ঠানও ছিল। এ-অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ছিল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রবীণ এবং উদীয়মান প্রতিভাধর তরুণ শিল্পীদের কলকাতার সংগীত-রসিক-সমাজে উপস্থাপন। উদ্যোক্তাদের উদ্যম সার্থক, রসতৃপ্ত শ্রোতৃবৃন্দের প্রসন্নতাই তার প্রমাণ।

অবিস্মরণীয় দুটি অনুষ্ঠান হোল বেনারসের তরুণ শিল্পী বিরজু মহারাজের কথক নৃত্য ও কুমার গন্ধর্বের কণ্ঠসংগীত। এ-দুটি অনুষ্ঠান সারা সম্মেলনের মধ্যমণির মত ঝলমল করেছে।

কুমার গন্ধর্ব শুরু করেন স্ব-সৃষ্ট রাগ মালবতী দিয়ে। এ-রাগ বিলাবল ঠাটের অন্তর্ভুক্ত। কুমার গন্ধর্ব সংগীতজ্ঞ মহলের বহুবিতর্কিত শিল্পী। এবারও তাঁর গান, মতানৈক্যের সৃষ্টি যে করেনি, তা নয়; কিন্তু রসোপভোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই অনুভবই ঘটেছে যে, এ-গান সকল বিচার-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। গান শুরু হওয়ার পূর্বাভাষী গুঞ্জনেই সারা প্রেক্ষাগৃহ যেন সুরমাধুর্যে ভরে উঠল। শিল্পীর ধ্যানকেন্দ্রী রাগ-আহ্বান মৃদু ও ধীরগতি ক্রমবিস্তার ও স্বরশ্রুতির ললিত-মধুর ব্যাকুলতা, শ্রোতাদের মনকেও এই অনুভবদীন ধূলিমলিন জগতের থেকে অনেক দূরে পৌঁছে দিয়ে অন্তরে যেন একটা ঊর্ধ্বমুখী আকৃতির শিখা জ্বালিয়ে দেয়। যা পাওয়া যায় না অথবা পেলেও যাকে রাখা যায় না, সেই অ-ধরার জন্য একটা ছায়া-দুরাশা।—মধুর উদাত্ত কণ্ঠ, কখনও চুপিচুপি বলার মৃদুতা, কখনও অন্ত-হীন আবেগের আছড়ে-পড়া বেদনার আকুল কান্নার ভাষা যেন সংগীতলক্ষ্মীর চরণে আত্মনিবেদন করেছিল। দ্বিতীয় রাগ 'শাওনী'। এ-রাগের রূপায়ণে হয়ত স্বচ্ছতার অভাব ছিল। কারণ, 'কল্যাণ' ও 'কাফী' প্রচলিত দুই ঠাটের কোনোটির অন্তর্ভুক্তই এ-রাগকে করা যায় না। যদিবা ধরা যায় 'বেহাগ' অঙ্গে তাও কষ্টকল্পিত। মহারাষ্ট্রীয় ঢঙের কম্পিত গমকের চাঞ্চল্য হয়ত শান্তভাবকে কিছু বিচলিত করেছে কিন্তু সামগ্রিক সৌন্দর্য অথবা সাংগীতিক পরিভাষায় যাকে বলে 'অনুরঞ্জক গুণ', তা ব্যাহত হয়নি। এ যেন এক রংবাহারের বিচিত্র সমাহার। কখনও বসন্ত, কখনও ভাটিয়ার, কখনও বা সোহিনীর আবেগে সুরের আকাশকে মাতিয়ে তুলেছে।

শাওনীর পর মহারাষ্ট্রীয় লোকসংগীতের আঙ্গিকে একটি সংগীত পরিবেশন করে মীরাবাঈর ভজন দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলেন। সারা অনুষ্ঠানে কখনও ওঁকারনাথের বিনতি, কখনও আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের সূক্ষ্ম স্পন্দময় মাধুরী হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত অমর শিল্পীদের স্মৃতিকে উদ্বেল করে তুলেছিল। কুমার গন্ধর্বজীর খেয়ালেই ত আরাধনার ভাবটি তার নিজস্ব শুচিতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, এরপর আলাদা করে ভজন গেয়ে একই ভাবের পুনরাবৃত্তি, অথবা তার গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ণ না করলেই বোধহয় এ-অনুষ্ঠান সুন্দরতর হয়ে উঠতে পারত। সগীরুদ্দিনের রসসমৃদ্ধ সারেঙ্গী সঙ্গত এ-অনুষ্ঠানের আকর্ষণ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করেছে।

মিউজিক সার্কেলে বিরজু মহা

বিরজু মহারাজের কথক নৃত্য এ-আসরের
রসোত্তীর্ণ অনুষ্ঠানই নয়, এই অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তর
ঐতিহ্যমণ্ডিত এই নৃত্যের, বিষয়-গৌরব, সংগীত-মঞ্জরীর
কোমলতা ও কাব্যময় ঐশ্বর্যের এক সৌন্দর্য-লোকে
উন্মোচিত হয়।

ভারতের অন্যান্য সকল শিল্পের মত হিন্দু নৃ
আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বিজড়িত। কথক-নৃ
ব্যতিক্রম নয়।

এই ভাব-মর্যাদার সঙ্গে কথকের ছন্দবিভব,
আখ্যান-বর্ণনের বিচিত্র সমাবেশই এ-নৃত্যের আকর্ষণ।
মোগল-যুগের বিলাস-পরায়ণ চিত্তচাঞ্চল্যের দরুন এ-নৃ
দরবার নৃত্যে পরিণত হয়েছিল। বিপরীতমুখী তরঙ্গে
কিছুটা উন্নতি ঘটলেও ব্রিটিশ আমলে আবার নৃত্যের
প্রায় লুপ্ত হয়ে পড়ল। সেই সময় কথক-বিশারদ
শিল্পী বিন্দাদীনের একক চেষ্টার বৈপ্লবিক শক্তিতে
যেন সকল বাধা অতিক্রম করে স্বস্থানে সগৌরবে প্রতি
এই বিন্দাদীন ঘরানার সুযোগ্য সাধক-শিল্পী তরু
মহারাজ নৃত্যের এই ভাবৈশ্বর্যের দিকটি সম্বন্ধে
অবহিত করেছেন। ইদানীং কালের কথক-নৃত্যশিল্পীরা
লয়ের চর্কিবাজীতে, চক্রধারের চোখধাঁধানো চক্রে মনাকে
ধাঁধায় ঘুরিয়ে শ্রান্ত করে এবং ঘুঙুরের কর্ণবিদা
কথক-নৃত্যকে প্রায় ভীতির বস্তু করে তুলেছেন—

বরজু মহারাজের সহজ-সুন্দর, ললিত-মাধুর্য বিভিন্ন ভাব-বন্যাসের চিত্রসৌন্দর্য, প্রতি পদক্ষেপের সুকুমার ব্যঞ্জনা কথকের ন্তর্নিহিত রসের ধারাটি স্বতোৎসারিত করে রসিক দর্শকচিত্ত প্লাবিত করেছে। ঘুঙুর ও বোলের ছন্দ এক হয়ে উঠে যেন থা বলে উঠল কবিতার ভাষায়। এই নৃত্যের সঙ্গে কখনও তিন-ালের, কখনও একতাল, কখনও ঝাঁপতাল, কখনও বা ধামার ঙ্গের ছন্দে শিল্পীর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছেন কিষণ হারাজ। নাচের সঙ্গতে বিরজু মহারাজের মধুর কণ্ঠের ঠুংরী প্রত্যাশিত বলেই বোধহয় এত আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ ভারতের তরুণ শিল্পী চিত্তিবাবুর বীণু এই ম্মেলনের অন্যতম বৈচিত্র্য। ইনি বাজালেন উত্তর ভারতের াগেশ্রী' ঢঙে দক্ষিণ ভারতীয় নটকুঞ্জরী, চক্রবাকম (উত্তর ারতের আহির ভৈঁরো), মধ্যমাবতী (হিন্দুস্থানী মধুমাধবী ারং)। চিত্তিবাবুর বাদনশৈলীতে উত্তর ভারতের সরোদ ও তার বিশেষ রবিশঙ্করী ছাপ যথেষ্ট আছে।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় পলঘাট মানি ও কিষণ হারাজের মৃদঙ্গ তবলার যুগলবন্দী প্রথম থেকে শেষ অবধি াতাদের নিবিষ্টচিত্ত করে রেখেছে। এঁরা বাজালেন "আদি" াল। উত্তর ভারতীয় ত্রিতাল ছন্দে। মৃদঙ্গ ও তবলা, ভারতের ুই প্রান্তের দুই তালবাদ্য, শিল্পীরাও তাই। কিন্তু প্রকৃতিগত ার্থক্য সত্ত্বেও রসসৃষ্টিতে কোন বাধা ঘটেনি। পালঘাট মানির খনও দৃপ্ত, কখনও মৃদু স্বরবৈচিত্র্য, বোলের সমন্বয় ও শিল্প-ম্মত পরিবেশনায় পাণ্ডিত্য ও পরিশীলিত সৌন্দর্য ব্যক্ত। ষণ মহারাজের শক্তিমান ঠেকা, বাজের ওজন ও গাম্ভীর্য, দীর্ঘ ধার দক্ষিণ ভারতীয় ঢঙের ছাঁচে বোল-বিস্তারের তাৎক্ষণিক নাকুশলতায় তরুণোচ্ছল শিল্পীমন যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। বে উভয় শিল্পীই সাধারণভাবে কোন রচনার ওপর বাজালে -অনুষ্ঠান আরো উপভোগ্য হোত।

সেতারে বলরাম পাঠকের "যোগশেষ" সুপরিবেশিত। ন্ত রানাডের বেহালায় দক্ষিণ ভারতীয় শ্রুতিসমন্বিত টভৈঁরো" স্বল্প-পরিসরের মধ্যে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। রাধিকা-াহন মৈত্র বাজালেন 'ছায়া'। স্বচ্ছ রাগরূপ শিল্পীর স্বকীয় দনশৈলীতে পরিস্ফুট তবে সময়াভাববশত বা যে-কোন কারণেই াক ঝালার অঙ্গ আকস্মিকভাবে দ্রুতলয়ে বাড়িয়ে শেষ করতে া।

পণ্ডিত যশরাজের মিয়া কি মল্লার সুরেলা কণ্ঠের যথাযথ াবিশ্লেষণ এবং নিখাদের জোর ছাড়া আকর্ষণীয় বিশেষ কিছু ল না। এম আর গৌতমের প্রধান আকর্ষণ তাঁর সামঞ্জস্যবোধ। তলা জোয়ারীর কণ্ঠে সুরের প্রাচুর্য ও সূক্ষ্মতা খেয়ালের য় ঠুংরীকেই অধিকতর আকর্ষণীয় করেছে। হাফেজ আমেদের রকী আভিজাত্য পরিবেশনশৈলীতে স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত লও অনুষ্ঠান শ্রোতাদের পুরোপুরি প্রসন্নতা আদায় করতে রেনি। সিদ্ধেশ্বরী দেবী 'আপন স্বরূপে আপনি ধন্য' ছিলেন।

মনোরম অনুষ্ঠান

আমেরিকায় উদয়শঙ্করের ভারতীয় নৃত্য উদ্দীপিত করেছিল দেশের জিনা লালীকে। তারই ফলশ্রুতি বর্তমানের সুবিখ্যাতা মেরিকান কথক নৃত্যশিল্পী জিনা লালী। আগামী ৯ই আগস্ট ন্দ্রসদনে জিনা লালীর কথক নৃত্য দেখবার সুযোগ পাবেন কাতার কলারসিকরা। পূর্ণদাস বাউলের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। লার মৃত্তিকাজাত লোকসংগীত তিনি সাগরপারে বয়ে নিয়ে য় পাশ্চাত্যের অভিনন্দনমাল্য নিয়ে এসেছেন। পূর্ণদাস বাউল সম্প্রদায় তাঁদের লোকসংগীতগাথা উপহার দিচ্ছেন। প্রাচ্য ও ীচ্যের এই মিলনোৎসব আনন্দের হবে বলেই আশা করি।

শ্রীমতী জিনা লালী

প্লেয়ার্স ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে গৌরাঙ্গ দেব

প্লেয়ার্স ইউনিয়ন

প্লেয়ার্স ইউনিয়নের বার্ষিক উৎসবে খ্যাতনামা জনপ্রিয় ও উদীয়মান তরুণ শিল্পিবৃন্দের সমাবেশ মহাজাতি সদনকে আনন্দমুখর করে তুলেছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং শীর্ষ-স্থানীয় অন্যান্য শিল্পীরা আপনাপন পরিবেশন-কুশলতায় শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছেন।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন শ্রীগৌরাঙ্গ দেব। গীটারে গান ছাড়াও রাগ-সংগীতের ভিত্তিতে কিছু রচনা, সুরমাধুর্যে এবং কল্পনার রঙিন ছোঁয়ায় তরুণ শিল্পীর প্রগতিশীল মনটিকে ব্যক্ত করেছে। বালসারা এবং অন্যান্য আবহসংগীতের অর্কেস্ট্রার অঙ্গ হিসাবেও এঁর বাজনা উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে। একক বাদনেও এঁর দক্ষতা আমাদের আশান্বিত করেছে। ইনি খ্যাতনামা চলচ্চিত্রশিল্পী উমাশশীর পুত্র।

—চিত্রাঙ্গদা

তপশ্চর্য্যা

কমল ভট্টাচার্য

মারডেকা সফরে যেতেই হবে! যেমন করেই হোক তাতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হ'লো আর দেশের মর্যাদা থাকলো কিংবা থকলো তাতে কি এসে যায়? জানি না এ যাওয়ার পেছনে সরকারের হয়তো কোন নির্দেশ থাকতে পারে। তা না হলে সরকার সব জেনেশুনেও এই বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের সময়ও বিদেশে দল পাঠানোর অনুমতি দেবেন কেন? মনে হয়, সরকারের অবস্থা 'সাপের ছুঁচো গেলার' মত। বিদেশের সংগে সম্পর্ক রাখার, সৌজন্য রাখার একান্তই প্রয়োজন : নইলে মান থাকে না। তাই দল পাঠাতে হয় বিদেশে। মারডেকা সফরের ব্যাপারেও এই একই কথা বলা যেতে পারে।

মারডেকা সফরে ভারত যে আমন্ত্রিত হবে, এ চিন্তার মধ্যে কি কোন কিন্তু ছিল? তবে জেনে-শুনেও আমরা প্রস্তুত হইনি কেন? এই পনের দিনের প্রস্তুতিই কি ভারতের পক্ষে যথেষ্ট? কথাটা যত বলা সহজ কাজে তা দেখান তত সহজ নয়। ভিন্ন ভিন্ন রুচির খেলা, নানান 'টেকনিকে' দলগুলি জমাট হয়ে আছে। কারুর সংগে কারুর মিল নেই। এই অবস্থায় দলের সব খেলোয়াড়রা একজোট হয়ে ম্যাজিকের মত কাজ হাসিল করবে কি করে? এর জন্যে সময়ের প্রয়োজন। অথচ আমরা সময় দিয়েছি মাত্র পনের দিন। সব ব্যবস্থাই আছে। সুখ-সুবিধার কথাগুলোও আমরা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছি। তাই বলছিলাম এমন হাস্যাস্পদ অবস্থায় ভরতীয় দল পাঠানোর প্রয়োজন কি? সৌজন্য রক্ষার ব্যাপারে আমরা অনেক সময় বাইরের দল আনাই এবং পাল্টা সফরের ব্যবস্থাও করি। তাই এই খেলার ব্যাপারে আমাদের পাকা-পাকি কোন বন্দোবস্ত থাকা ভালো। আজকের রাম, শ্যাম, যদুদের দিয়ে নয়। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তরুণ খেলোয়াড়দের গড়া-পেটার কাজে মেহনৎ দেওয়াই ভালো। অর্থাৎ ষোল থেকে কুড়ি বছরের ছেলেরাই এই ট্রেণিং-এর সুযোগ পাবে। এই ট্রেণিং-এ থাকবে বাছাই করা কুড়িজন খেলোয়াড়। এক-আধদিন নয়। বরাবরের জন্য এই ট্রেণিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে অর্থব্যয় হবে, অনুশীলনের মাঠের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভালো শিক্ষকেরও প্রয়োজন হবে। এবং এই গোটা দলটাই থাকবে মিলিটারীর তত্ত্বাবধানে। শুধু ফুটবল খেলা নয়, বলে সুট করে গোল দেওয়া নয়, মিলিটারীর আইন-কানুন সব কিছু রপ্ত করতে হবে। এই প্রসংগে গত-বারের বিশ্ব-কাপে উত্তর কোরিয়ার অভাবনীয় সাফল্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। তাদের সাফল্যের পেছনে ছিল কঠোর তপস্যা, ছিল আন্তরিক প্রচেষ্টা।

শারীরিক গঠনে খাটো, আঁটো-সাঁটো চেহারাগুলো ইংলণ্ডের ফুটবল মাঠে যে ভেল্কী দেখিয়ে এলো—তা কি ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ দর্শকের একজনও কল্পনা করতে পেরেছিল? না কি ভাবতে পেরেছিল—বিশ্বের ঝানু ঝানু, চুলে পাক-ধরা মুখে পাইপ গোঁজা সমালোচকের দল? না কেউই পারেনি। তাই যখন বিশ্ব-কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়, উত্তর কোরিয়ার নাম প্রতি-যোগী হিসেবে গণ্য করা হয়, একথা বিশ্ববাসী জেনে প্রথমে অবাক হয়, পরে চমক ভাঙে ; প্রাণখোলা হাসিতে মুখ চেপে বলে—ঐ বেঁটে বেঁটে লোকগুলো খেলবে বিশ্বকাপে? এও শুনতে হলো?

—ওরা ভেবেছে কি? ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে না-কি উত্তর কোরিয়া? ফুটবলে দু'টো সট্ করতে পারলেই যদি বিশ্বকাপে জেতা যায়—তাহলে তো হয়েই যেত।

—আরে ছোঃ! বেঁটে বামুনে চাঁদ ধর চায় আর-কি? কত মত, কত অভিমত, ব্যংগ, কত বিদ্রূপ দিকে দিকে ছড়ি পড়ল। সব দেশের পক্ষে-বিপক্ষে লোকেই হার-জিতের বাজী রাখল। উত্তর কোরিয়ার ভাগ্যে শূন্য। সংবাদ প্রকাশিত হলো ইংলণ্ডের প্রখ্যাত ফু সমালোচকের উক্তি—

'উত্তর কোরিয়া বিপক্ষ দলকে এ গোলও দিতে পারবে না।'

প্রতিযোগিতা শুরু হলো। সক চোখের সামনে শিহরিত করা খেলা উত্তর কোরিয়া গৌরবের হারকে বরণ ক প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল। এ তো দূরের কথা, তিন-তিনটে গোল ক দুর্ধর্ষ পর্তুগালের বিরুদ্ধে। বে বামুনের দল বিশ্বকাপ জিততে পা সত্যি কিন্তু প্রথম আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রতিভার স্বাক্ষর তারা রেখে গেছে-যেমন চমকপ্রদ, যেমন গৌরবের, তে বিরাট সম্ভাবনায় সুনিশ্চিত ইঙ্গিত।

কিন্তু কি করে এ খেলা সম্ভব হ উদ্যমই একমাত্র মূল। এ উদ্যম যেমন পক্ষের তেমনই খেলোয়াড়দের। পাঁচ ধরে কি বজ্র-কঠোর তপস্যা! খেলাই খেলাই জ্ঞান। খেলা ছাড়া অন্য কোন নেই। চামড়ার গোল বলটাকে কত-ভাবে তিনটে কাঠি বাঁধা কাঠামোর দিয়ে গলিয়ে দেওয়া যায় শুধু সেই সিগারেট খাওয়া বন্ধ। মদ ছোঁওয়া না। বাড়ীর ভাবনা? মিথ্যে মনকে দেওয়া। সময় নষ্ট করা। সরকার দু'হাত বাড়িয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে শীলনরত খেলোয়াড়দের পরিবার সামান্যতম অসুবিধা দূর করার সরকারের সে কী উৎকন্ঠা! তাই তো সম্ভব হলো—উত্তর কোরিয়ার পক্ষে ভূমিকা নেওয়া। খেলোয়াড় আর কর্তৃপ এই দুই পক্ষের প্রচেষ্টার কি অপূর্ব কাঞ্চন যোগ ; শুনেও সুখ। কিন্তু আমা দেশে কি এ চেষ্টা চিরদিনই স্বপ্ন থাকবে—বাস্তবে কি রূপ পাবে না নিশ্চয়ই পাবে। যদি কি খেলোয়াড় এব কর্তৃপক্ষের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব থাকে।

লিডসের হেডিংলি মাঠে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলায় আর জে ইনভেরারিটি অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ইলিংওয়ার্থের বল বাউন্ডারীতে পাঠিয়েছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

পঞ্চম দিন (জুলাই ৩০) :

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৩১২ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ২৩০ রান তুলেছিল—জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩২৬ রানের থেকে ৯৬ রান কম।

লিডসের হেডিংলি মাঠে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬৮ সালের ৪র্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি—খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে। ইংল্যান্ড যদি শেষ ৫ম টেস্ট খেলায় জয়লাভও করে তাহলে ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজ ড্র যাবে; কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার হাতেই কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' খেতাব থেকে যাবে। কারণ গত ১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ১-০ খেলায় (ড্র ৪) ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে 'এ্যাসেজ' জয়ী হয়েছিল এবং পরবর্তী দুটি টেস্ট সিরিজের (১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৮) ফলাফল অমীমাংসিত।

আলোচ্য চতুর্থ টেস্টে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার নিয়মিত অধিনায়ক কলিন কাউড্রে এবং বিল লরি দৈহিক অপটুতার কারণে যোগদান করেননি। ফলে ইংল্যান্ড দল পরিচালনা করেছিলেন টম গ্রেভনী এবং অস্ট্রেলিয়া দল ব্যারী জার্মান।

টসে জয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করতে নেমে গোড়াতেই ধাক্কা খায়—১০ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে যায়। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে রেডপাথ এবং কাউপার সে ধাক্কা সামলে নিয়ে দলের ৯৪ রান সংগ্রহ করেন। রেডপাথের দুর্ভাগ্য তিনি অল্পের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি ৯২ রানের মাথায় ইলিংওয়ার্থের বলে বোল্ড আউট হন। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ৫টা উইকেট পড়ে ২৫৮ রান উঠেছিল। স্কোরবোর্ডে অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল—লাঞ্চের সময় ৭৫ (১ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৭০ (৩ উইকেটে)।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩১৫ রানের মাথায় শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের বাকি ৫ উইকেটে ৫৭ রান যোগ করেছিল। এইদিনে ডেরেক আন্ডারউড একাই ৩টে উইকেট পান। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায়—২৭·৪ ওভার, মেডেন ১৩ এবং ৪১ রানে ৪ উইঃ। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৬৩ রান তুলেছিল। ইংল্যান্ডের খেলার গোড়াপত্তন খুবই ভাল হয়েছিল—প্রথম উইকেটের জুটিতে এডরিচ এবং প্রাইদ্য দলের ১২৩ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩০২ রানের মাথায় শেষ হয়—অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের থেকে মাত্র ১৩ রান কম।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ৫ম উইকেট পড়ে ২১৫ রানের মাথায়। ২২১ রানের মাথায় ৮ম এবং ৯ম উইকেট পড়লে অবস্থা

ংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট

া : ৩১৫ রান (আয়ান রেডপাথ আয়ান চ্যাপেল ৬৫ এবং ডগ টার্স ৪২ রান। আন্ডারউড ৪১ ৪ এবং স্নো ৯৮ রানে ৩ উইঃ) ২ রান (আয়ান চ্যাপেল ৮১, টার্স ৫৬ এবং আয়ান রেডপাথ রান। ইলিংওয়ার্থ ৮৭ রানে ৬ কট)

: ৩০২ রান (রোজার প্রাইদ্য ৬৪, এডরিচ ৬২ এবং কেন ব্যারিংটন রান। এ্যালান কনোলী ৭২ রানে ইকেট)

রান (৪ উইকেটে। এডরিচ ৬৫ ব্যারিংটন নট আউট ৪৬ রান)

(জুলাই ২৫) :

লিয়া প্রথম ইনিংসের ৫ উইকেট ৮ রান সংগ্রহ করে।

ন (জুলাই ২৬) :

লিয়ার প্রথম ইনিংস ৩১৫ রানের হলে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের খুইয়ে ১৬৩ রান সংগ্রহ

া (জুলাই ২৭) :

ন্ডের প্রথম ইনিংস ৩০২ রানের হয়। অস্ট্রেলিয়া ১৩ রানে হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের ২টি ইয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে।

(জুলাই ২৯) :

লিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় (৬ উইকেটে) দাঁড়ায়।

খুবই খারাপ দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত ১০ম উইকেটের জুটিতে ব্রাউন এবং আন্ডারউড দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৬১ রান যোগ করে খেলার চেহারা অনেকটা ভাল করেন। আন্ডারউড শেষ পর্যন্ত ৪৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া দুটো উইকেট খুইয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে ১০৫ রানে অগ্রগামী হয়।

চতুর্থ দিনে বৃষ্টির দরুণ নির্দিষ্ট সময়ে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি এবং আলোর অভাবে আধ ঘন্টা আগে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এইদিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২৮৩ রান (৬ উইকেটে) দাঁড়ায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ওয়াল্টার্স এবং চ্যাপেল ১২৫ মিনিটে ৭৯ রান যোগ করেন। এইদিন অস্ট্রেলিয়ার গদাইলস্করী চালের ব্যাটিং দেখে দর্শকরা খুবই বিরক্ত হন।

পঞ্চম দিনে ৩১২ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। যেখানে ৫টা উইকেট পড়ে এক সময় তাদের ২৮১ রাণ ছিল সেখানে ৩১২ রানের মাথায় ইনিংস শেষ। শেষ চারটে উইকেটে মাত্র ২৯ রান উঠেছিল। পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৫৫ মিনিট স্থায়ী ছিল।

ইংল্যান্ড যখন দ্বিতীয় ইনিংসের দান হাতে পায় তখন খেলা ভাঙ্গতে ২৯৫ মিনিট সময় বাকি ছিল। অপরদিকে ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ৩২৬ রানের। খেলার শেষ পঞ্চম দিনে চতুর্থ ইনিংসের খেলায় এই ২৯৫ মিনিট সময়ে এত রান সংগ্রহ করা মুখের কথা নয়। স্বদেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের চতুর্থ ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান করে জয়লাভের নজির—২৬৩ রান (৯ উইকেটে), ওভাল, ১৯০২। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের জয়লাভের আশা তার অতি বড় গোঁড়া সমর্থকও করেন নি। ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত ২৬৫ মিনিটে ৪ উইঃ খুইয়ে ২৩০ রান তুলেছিল। খেলার অবস্থা দেখে ইংল্যান্ড অতিরিক্ত আধ ঘন্টা খেলার দাবি ছেড়ে দেয়।

লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৬১ (১ উইকেটে)—অস্ট্রেলিয়ার থেকে তখনও ২৬৪ রানের পিছনে। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ১৮৯ (৪ উইকেটে)।

মেক্সিকো অলিম্পিক

মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৮জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় হকি দল গঠন করা হয়েছে। সংবাদে জানা গেছে, মেক্সিকোতে এই ভারতীয় হকি দল পাঠাতে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের ৩ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এই টাকা গৌরী সেনের তহবিল থেকে তাঁরা পাবেন না। ভারত সরকার বলে দিয়েছেন, বিমানে যাওয়া আসার যে খরচ পড়বে তাঁরা তার অর্ধেক বহন করবেন। বাকি টাকা ভারতীয় হকি ফেডারেশনকে সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলে যে ১৮জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের সংশ্লিষ্ট হকি এসোসিয়েশনের কাছে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের নির্দেশ গেছে —নির্বাচিত খেলোয়াড় পিছু ১১,০০০ টাকা দিতে হবে। বর্তমান ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলে রেলওয়ের পাঁচজন খেলোয়াড় নির্বাচিত হওয়াতে রেলওয়ে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে ৫৫,০০০ টাকার তাগাদা গেছে। গত টোকিও অলিম্পিক গেমসে রেলওয়ে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডকে তাঁদের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের জন্যে ২২,০০০ টাকা দিতে হয়েছিল। এবার রেলওয়ে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড এই ৫৫,০০০ টাকার বিরাট চেহারা দেখে রেলওয়ে বোর্ডের কাছে তাগাদার নোটিশটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এভাবে টাকা সংগ্রহ না করে থেকে 'অলিম্পিক ডাক টিকিট' বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করলে দুটি উদ্দেশ্য পূর্ণ হত—অর্থ সংগ্রহ এবং অলিম্পিক গেমস সম্পর্কে বহুল প্রচার।

বিভিন্ন এসোসিয়েশন মারফৎ নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মাথা গুণে এইভাবে খরচের টাকা সংগ্রহের নীতি ঠিক নয়। একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করে একমাত্র তারই মারফৎ অর্থ সংগ্রহ করলে খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অক্ষুন্ন থাকবে। অর্থ সংগ্রহের উৎস হবে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার, দেশের শিল্পগোষ্ঠী, ডাকটিকিট, প্রদর্শনী খেলা এবং অলিম্পিক দিবস পালন।

ফুটবলের হালচাল

১৯৬৭ সালের অমীমাংসিত আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলার আসর পুনরায় বসানো আর গেল না; এদিকে বছর ফুরিয়ে গেছে। ফুটবল খেলার অতি গোঁড়া সমর্থকদের মাথা থেকেও ১৯৬৭ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলার উত্তেজনা নেমে গেছে। ১৯৬৭ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলেছিল মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। এই খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছিল। বছর ফুরিয়ে যাওয়াতে খেলাটি তামাদি হয়ে গেছে। এখন দুই দলের কোন একদল খেলতে রাজী না হলে আইনের ভয় দেখিয়ে তাদের খেলায় নামাতে পারা যাবে না। সুতরাং পিঠে হাত বুলিয়ে তাদের রাজী করাতে হবে। শেষপর্যন্ত যদি কোন দল খেলতে রাজী না হয় তাহলে কি দলকেই যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হবে খেলা পরিত্যক্ত হবে? যদি উভয় যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয় তাহলে বেঙ্গল ক্লাব উপর্যুপরি তিনবার (১৯ ৬৭) আই এফ এ শীল্ড জয়ের গৌরব করবে, যা তারা এখনও করতে পারে কিন্তু আই এফ এ কর্তৃপক্ষ ১৯৬৭ সা আই এফ এ শীল্ড খেলার ব্যাপারে আর মুখ খুলতে রাজী নন—মুখে দিয়ে রেখেছেন। এখন তাঁরা ১৯৬৮ সা প্রথম বিভাগের লীগ এবং আই এফ এ খেলা নিয়ে ত্রাহি ডাক ছাড়ছেন। বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগি এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি—মাঝ থেমে আছে। কথা আছে, প্রথম বিভা লীগ তালিকার প্রথম চারটি দল 'সুপার লীগ' খেলা হবে। কিন্তু প্রতি দলের ১৪টি করে ম্যাচ খেলার সেখানে ইস্টবেঙ্গল দলের ১০টি, মহামে স্পোর্টিং দলের ৯টি এবং মোহনবাগা ৮টি খেলা হয়েছে। লীগ তালিকার অবস্থা দেখে বলা যায় 'সুপার লীগ' চারটি দলের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবা এবং মহামেডান স্পোর্টিং থাকবেই। স্থান নিয়ে উয়াড়ী এবং এরিয়ান্সের জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। উয়াড়ীর খেলা বাকি (মোহনবাগানের সঙ্গে। অপরদিকে এরিয়ান্সের দুটো খেলা এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে।

মালয়েশিয়ার কোয়ালালামপুরে ১৯ সালের একাদশ বার্ষিক মারদেকা ফু প্রতিযোগিতার আসর বসছে ৯ই আগ ভারতবর্ষকে নিয়ে মোট ১২টি দেশ এবছ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। দিন ধরে লীগ-কাম নকআউট প্রথায় হবে—দুটি গ্রুপে। ভারতবর্ষের পড়েছে 'বি' গ্রুপে। গত বছরের বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়া খেলবে 'এ' এবং ব্রহ্মদেশ 'বি' গ্রুপে।

ভারতবর্ষ গত বছর 'এ' গ্রুপে ৩য় স্থান পাওয়াতে নকআউট প উঠতে পারেনি। যোগ্যতার ক্রমপ তালিকায় ভারতবর্ষ ৮ম স্থান পেয়ে ভারতবর্ষের কি শোচনীয় ব্যর্থতা! ভারতবর্ষের ফুটবল খেলার কর্তাদের হয়নি—দু'কানকাটার মত সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়ে রাস্তার মাঝপথে হাঁটে ৯ই আগস্ট মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগি উদ্বোধন অথচ ৫ই আগস্ট তারি ভারতীয় ফুটবল দল গঠন করা হয়নি। কর্তব্যজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনার এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন দেশে নেই।

বন্ধুত্বের সমীক্ষা

জম্মু ও কাশ্মীর
হিমাচল প্রদেশ
পাঞ্জাব
হরিয়াণা
দিল্লী
উত্তর প্রদেশ
রাজস্থান
বিহার
নাগাল্যাণ্ড
আসাম
মনিপুর
ত্রিপুরা
পশ্চিমবঙ্গ
গুজরাট
মধ্য প্রদেশ
উড়িষ্যা
মহারাষ্ট্র
মহীশূর
অন্ধ্র প্রদেশ
গোয়া
GOA
কেরালা
মাদ্রাজ

বন
ফেডারেল
রিপাব্লিক
অব জার্মাণী
বার্লিন

উল্লেখযোগ্য ভারত-জার্মাণ সহযোগীতা

- ২০৪টি মূলধনী এবং কারিগরী সাহায্য প্রকল্প
- ৩৫০টি যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগীতা
- ৭টি ম্যাক্স ম্যুলার ভবন (সাংস্কৃতিক কেন্দ্র)
- ৩টি কারিগরী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
- ২১ জন অধ্যাপক (ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে)
- ১২ জন স্বেচ্ছাসেবক (জার্মাণ ভলানটিয়ার সার্ভিস)
- ৩টি কৃষি প্রকল্প
- TV নয়াদিল্লীতে টি. ভি. ষ্টুডিও
- DAAD জার্মাণ শিক্ষা-বিনিময় সংস্থা (ডি.এ.এ.ডি)
- মাদ্রাজে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্ টেকনোলজি (আই. আই. টি)

ভারত ও জার্মানী—প্রগতির পথে সহযোগী

৮ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 16th August, 1968. শুক্রবার, ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৭৫ **40 Paise.**

সূচীপত্র

জাতীয় শিক্ষানীতি

অমৃতের ১০ই শ্রাবণের 'দেশে-বিদেশে' বিভাগে এবং ১৭ই শ্রাবণের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কীয় আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। খুবই লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের মত একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে অনেক টালবাহানার পর জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্পর্কীয় একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করাতে পারল। কিন্তু শিক্ষা-কমিশন যে সময়-সীমা ঠিক করেছিলেন, এবং জাতীয় আয়ের যে ছয় শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, পূর্বোক্ত প্রস্তাবে তা কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। কারণ এই প্রস্তাব অনুমোদন তো কতকটা মর্যাদার লড়াইয়ে মুখরাখা মাত্র। সকলেই জানেন যে, ডঃ ত্রিগুণা সেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের সময় বলেছিলেন যে, জাতীয় শিক্ষা-নীতি ও পরিকল্পনা চালু করতে না পারলে তিনি পদত্যাগ করবেন। অবশ্য অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের জেদ বজায় থাকলো, জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের ব্যাপারে। যেসব কারণে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অসাম্য ও অরাজকতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, তা দূর করার কোন ব্যবস্থা উক্ত প্রস্তাবে নেই। সুতরাং দেশ ও জাতি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

শিক্ষা বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত প্রস্তাবে রাজ্য সরকারগুলি সম্মতি না দিলে কোন কার্যকরী ফল পাওয়া যাবে না। রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ আর্থিক সামর্থ্যের কথাও চিন্তা করবেন। এমতাবস্থায় সংবিধান সংশোধন করে শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বর্তাবে। আজ যখন দেশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম, তখনই আমরা জাতীয় সংহতির কথা বলছি এবং বক্তৃতায় প্লাবন আনছি। কিন্তু শিক্ষায় সংহতি না আনলে জাতীয় সংহতি শুধুমাত্র ফাঁকা বুলি থেকে যাবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংহতি ও একাত্মতা আনতে হলে দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়স্তর থেকে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে একই নিয়মে ও একই পরিকল্পনার মাধ্যমে

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের হায়ার সেকেন্ডারী বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত শিক্ষক সব সময়ে থাকেন না। তার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন শিক্ষকদের অনাকর্ষণীয় বেতনের হার এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ে পড়াতে মনস্তাত্ত্বিক অনীহা। দ্বিতীয় কারণটি সকলে মেনে নিতে পারবেন না। আকর্ষণীয় বেতনের হার হলে এবং বর্তমানে যেমন কমপক্ষে ৭।৮ মাস মাধ্যমিক শিক্ষকদের মাহিনা বাকী পড়ে আছে, সরকারী সাহায্য নিয়মিত না আসায়, (খুবই লজ্জার কথা সন্দেহ নেই), তা না হয়ে, যদি প্রতি মাসের গোড়ায় মাহিনা ও ভাতা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে, এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার অন্তত তৃতীয় শ্রেণীর কলেজ গ্রন্থাগারের সমতুল্য হয়, তবে কোন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিই বিদ্যালয়ে পড়াতে অগৌরব বোধ করবেন না।

বিনোদবিহারী দাস এম-এ, বি-টি,
প্রধান শিক্ষক, পাথরপ্রতিমা উচ্চ বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

।। ২ ।।

১৭ শ্রাবণ, সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এ 'জাতীয় শিক্ষা নীতি'র ওপর সম্পাদকীয় পড়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। শিক্ষার নামে দেশব্যাপী যে প্রহসন চলেছে তা সত্যি পীড়াদায়ক। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন, এতে তাদের সমূহ বিপদ দেখতে পাচ্ছি। তাদের বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎও পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারে ঢাকা। এ-ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ঔদাসীন্যেরও কোন ক্ষমা নেই। ওপরমহলে মাঝে মাঝেই নানা পরিকল্পনা, পরে প্রস্তাব এবং সবশেষে ব্যয়ের পরিমাণে 'কল্লোল' আর 'কোলাহল' দুইই। স্কুলে দশটি ক্লাস। কলেজে উঠে যে কোন ছাত্রছাত্রীকে 'ইন্টারমিডিয়েট' পড়তে হতো। কিন্তু এখন কোন স্কুলে দশটি ক্লাস আবার কোথাও বা এগারোটি। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে প্রি-য়ুনিভার্সিটি কোর্স তিন-চার মাসের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীকে শেষ করতে হয়। এতে তাদের মনে 'শিক্ষাতঙ্ক' দেখা দেয়। এবং এটাই স্বাভাবিক। কোন স্কুলে এগারো ক্লাস থাকলে বহুমুখী বিদ্যালয়রূপে এর কণ্ঠে একটা 'লকেট' দুললেও সমীক্ষাশেষে মনে হয় সে লকেটটি খাঁটি সোনার নয়, গিল্টির। অনাকর্ষণীয় বেতনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব তো আছেই, এর ওপর প্রায় শিক্ষায়তনই এক-একটি স্কুলে

শিক্ষক যদি বা শিক্ষাকে ব্রতরূপে গ্রহণ করে এখানে আসেন, তিনি বিদ্যাদান বা বিদ্যার্জনের সুযোগ-সুবিধে পান না। কূটনীতির ঘেরাটোপে তিনি হন দিশেহারা। আর এছাড়া শিক্ষামন্ত্রক বা শিক্ষা-অধিকর্তার তুঘলকীয় খামখেয়াল তো লেগেই আছে। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বেচ্ছাচারেরও কোন অভাব নেই। ফি-বছর পাঠ্যপুস্তক পাল্টাচ্ছে। এদের যোগ্যতা সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের গোষ্ঠিচেতনা সুবিচারে পরাঙমুখ।

দেশের সর্বত্রই যখন রাজনীতি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা থাকবে না, ভাবা যায় না। ভারত-চেতনা আজ কেবল বক্তৃতায় এবং পুঁথিতে। মানুষের সংস্কারে এর লেশমাত্র নেই।

সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনের শিক্ষাবিষয়ে যে দশ দফা প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে তা শিক্ষা-দপ্তরের অব্যবস্থিত চিত্ততারই প্রকাশ। বহুমুখী বিদ্যায়তনগুলি বর্তমানে নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন। এর ওপর আবার এগারো ক্লাসকে বারো ক্লাসে রূপান্তর করা যে কী পরিমাণ কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল তা সহজেই অনুমেয়। একে তো রাজ্য সরকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন যথাসময়ে দিতে অক্ষম, তদুপরি আরো চাপ সৃষ্টি যেন 'দশ-ব্যাপী শিক্ষাচক্রকে অকেজো ও পঙ্গু করে দেওয়া! সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীরা কি সরকারের হাতে খেলার পুতুল? না, পরীক্ষা-নিরীক্ষার বস্তু?

তাই ওপরমহলের কর্তাব্যক্তিদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন শিক্ষাকে 'রাজনৈতিক যুযুৎসু' হিসাবে গ্রহণ না করেন। পরিবর্তন ভালো, যদি সেটা সুফল আনে। ব্রিটিশ আমলে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তাকে যথাযথ রেখে শিক্ষক ও শিক্ষার উন্নতি-কল্পে সকল পরিকল্পনা বাঞ্ছনীয় এবং এদের সার্থক রূপায়ণ দরকার। রাষ্ট্র যদি জীবন-ভিত্তিক হয় তবে শিক্ষামন্ত্রীর চিন্তার গতি জীবনমুখীন হওয়া উচিত। যদি এ না হয় তবে ভাবীকাল হবে ভাবনার বিষয়। সবশেষে আপনার কথা উল্লেখ করে মুক্ত-কণ্ঠে বলবো—"শুধুমাত্র ওপরের দিকে শিক্ষার উৎকর্ষ (!) নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে চলবে না। সর্বজনীন শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার অবৈতনিক চরিত্র বজায় রাখার জন্যও তাকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী সে বিষয়ে কি কিছু ভাবছেন?"

অরবিন্দ চৌধুরী,

অমৃত

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার একুশ বছর

১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট যে-শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সে এখন একুশ বছরের যুবক। পুরোপুরি সাবালক এবং আগামী নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকারী। শুধু প্রতীকী অর্থে নয়, ব্যবহারিক অর্থে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পূর্ণতা পাবার উপযোগী। তার পরীক্ষার কাল চলে গেছে। ভুলভ্রান্তি যদি কিছু হয়ে থাকে তাও এবার সংশোধন করবার সময়। একুশ বছর একটি জাতির জীবনে কম সময় নয়। এর মধ্যেই জাতি তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সুযোগ পায়।

এবারের স্বাধীনতা দিবস সেকারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। একই কারণে ভারতবর্ষ অবিভক্ত ও অখণ্ড অবস্থায় স্বাধীনতার আস্বাদ পায় নি। উপনিবেশ উচ্ছেদের সংগ্রামে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ছিল একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। ভারতকে দিয়েই শুধু হয় যুদ্ধোত্তর যুগের উপনিবেশ উচ্ছেদের পালা। ভারতের প্রতি প্রত্যাশাও কম ছিল না সারা দুনিয়ার।
বৃটিশ শাসন ছিল শোষণের এক ইতিহাস। শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল নামমাত্র। কৃষিভিত্তিক এক অনগ্রসর অর্থনীতির বোঝা দিয়ে গিয়েছিল তারা আমাদের। শিল্পের প্রসার ছিল সামান্য। তদুপরি একটি অখণ্ড অর্থনীতির দেশকে কেটে দুটুকরো করে দিয়ে বলা হল, এখন থেকে তোমাদের বিষয়-আশয় তোমরাই দেখো।

সেই ভগ্নদশা নিয়েই ভারতবর্ষের যাত্রা শুরু। ইতিমধ্যে ভারতের দুজন প্রধানমন্ত্রী লোকান্তরিত হয়েছেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনজন। তার মধ্যে একজন লোকান্তরিত। তৃতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাল এখন চলছে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানাদিক দিয়ে চেষ্টা করে গেছেন। পররাষ্ট্রনীতিতেও বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল ভারতবর্ষ তাঁর সময়েই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পথও গ্রহণ করা হয়েছিল তাঁর সময়েই।

আজ একুশ বছরের স্বাধীনতার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করতে গেলে দেখা যাবে যে, আমাদের প্রত্যাশা যা ছিল তার অনেকখানিই রয়ে গেছে অপূর্ণ। উদ্দেশ্য সাধু হওয়া সত্ত্বেও সমাজ-কাঠামোর মৌলিক কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় নি। প্রথমে মনে হয়েছিল শিল্পোন্নয়ন ঘটাতে পারলেই আমাদের অনগ্রসরতার শিকড় উৎপাটন সম্ভব হবে। তিনটি পরিকল্পনার পর দেখা গেল, জনসংখ্যা বাড়ছে, অথচ তাদের মুখে খাদ্য জোগান দেবার মত রসদ নেই ঘরে। কৃষির অবহেলা এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকতম নিরক্ষরতা এর কারণ। তার ফলে আমরা না পারলাম শিল্পের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে, না পারলাম দেশের মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে।

একটি সাবালক স্বাধীন দেশের পক্ষে এ কথা বলা খুবই বেদনার এবং দুঃখের। অন্যদিকে জগতের হালচাল দেখলেও এমন কোনো আত্মপ্রসাদ আমরা অনুভব করি না। খুব বেশি বন্ধু নেই আমাদের। এমন কি যে রাশিয়ার উপর অনেকখানি ভরসা আমাদের এবং আমাদের আপদে-বিপদে অনেক সাহায্য করে আসছে সেও এখন পাক-ভারত উপমহাদেশে একটা শক্তির সমতা রাখার পক্ষপাতী। চীন ও পাকিস্থানের শত্রুতার ফলে ভারতবর্ষকে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের মাত্রা বাড়াতে হয়েছে। একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে সামরিক খাতে যত বেশি ব্যয় হবে তত তার টান পড়বে অন্যদিকে। অথচ আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক সজাগ থাকা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আত্মরক্ষায় অসমর্থ হলে একটি দেশের কী অবস্থা হয় তা গত বৎসর ইস্রায়েল-আরব বিরোধে আরবদের বিশেষ করে মিশরের অবস্থা থেকেই বোঝা যায়। ভারতবাসী কোনো বিরোধী শক্তির কাছে আত্মমর্যাদা সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় সম্মান বিসর্জন দিতে পারে না।

স্বাধীনতা দিবসে এই সংকল্পই আজ প্রধান। সংগে সংগে আমাদের একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আত্মনির্ভরশীলতাই একটি জাতিকে প্রকৃত মর্যাদার অধিকারী করে। অন্য কোনো দেশের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা নিশ্চয়ই আমাদের কাম্য, কিন্তু নিজের শক্তি ও সামর্থ্যই একটি জাতির স্বাধীন মর্যাদার চূড়ান্ত মাপকাঠি। ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ, তার জনসংখ্যা বিপুল, তার ভৌগোলিক অবস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। এই সব কারণেই ভারতের কর্মপন্থা, তার ভবিষ্যৎ এবং তার শাসন-কাঠামোর দিকে দুনিয়ার মানুষের নজর। একটি প্রাচীন ও বৃহৎ জাতির দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। আমাদের যত ব্যর্থতা, যত ত্রুটি, যত অক্ষমতাই থাকুক না কেন, এই স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আমাদের করতে হবে পালন। একুশ বছর আগে স্বাধীনতার জন্মলগ্নে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল দেশের সাধারণ মানুষকে, তার চোখের অশ্রু মোছার সেই সংকল্প এখনও পূরণ হয় নি। এখনও মানুষের জীবনে আছে মানুষের-তৈরী বঞ্চনা, আছে অর্থনৈতিক [illegible] সাবালকত্বপ্রাপ্ত স্বাধীনতার কাছে এই প্রত্যাশা পূরণের দাবী কি খুবই বেশি?

রাজনীতিতে এ বিপর্যয় আগে ছিল না

মহেন্দ্র চক্রবর্তী

পশ্চিম বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, স্বাধীনতা লাভের পর গোড়ার দিকে এমন অবস্থা ছিল না। এতো দলাদলি, আদর্শের সংঘাতের ফলে রাজনৈতিক পার্টিগুলি এতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়নি। রাজনৈতিক নেতারা মুখে যাই বলুন না কেন, আসলে দেখা গেছে, কয়েকটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্বের লড়াই-এর ফলে পার্টি দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে। ফলে দক্ষিণ ও বামপন্থী পার্টি-গুলির সংখ্যা এখন বাড়তে বাড়তে এখন এই রাজ্যে প্রায় কুড়িটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে, কংগ্রেসের বিকল্প কোন পার্টি বা প্ল্যাটফর্ম আজও সৃষ্টি না হওয়ায় রাজনীতির ধারাটা মোটা-মুটিভাবে একদল ঘেঁষা হয়ে রয়েছে। অবশ্য বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসের পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যুক্তফ্রন্টের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর ফল খুব সুখপ্রদ হয়নি। আট-নয় মাসের মধ্যে সেই সরকারের অবসান ঘটলো; এরপর দলত্যাগীদের নিয়ে যে সরকার গঠিত হয়েছিল, তাদের রাজনৈতিক পার্টি বলা চলে না।

অতীতের ইতিহাসের দিকে যদি একটু তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে, ১৯৪৭ সালের পর কিছু সংখ্যক বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা ও কর্মী সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে কৃষক-মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করেছিলেন। সেদিন নতুন একটা মাত্র পার্টি গঠিত হলে কি হয়, এর প্রভাব রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছিল। সে সময় কেউ ভাবতেই পারেনি যে, রফি আমেদ কিদোয়াই বা কৃপালনীজীর মত নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করতে পারেন। অবশ্য রফি সাহেব নেহেরুজীর হস্তক্ষেপের ফলে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ত্যাগ করেননি। তবে কৃপালনীজী বেরিয়ে গিয়েছেন। তিনি

ভারতের রাজনীতির দিকে তাকালে আর একটা কথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে, সে রাজনৈতিক দলেই হোক বা জনসাধারণের মধ্যেই হোক না কেন—সর্বত্রই ব্যক্তিত্বের এক বিরাট ভূমিকা আছে। নেহেরুজীর মত নেতার জন্য কংগ্রেসের ভেতরে এতদিন বড় ফাটল চোখে পড়েনি। কিন্তু যেদিন নেহেরুজী চলে গেলেন, তারপর থেকেই কংগ্রেসের মধ্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিকটরূপে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করেছে। আজ সর্বত্র সব রাজ্যেই কংগ্রেস ভেঙে খন্ড বিখন্ডিত হয়ে গেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিগুলির দিকে সাধারণ লোকের বিশেষ যে দৃষ্টি ছিল, তা বলা যায় না। কিন্তু প্রশাসনিক দক্ষতা লাভের পর থেকে কোন কোন রাজ্যে যখন দেখা গেল, কংগ্রেস নেতারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন এবং জনসাধারণ অবহেলিত হচ্ছে, তখন থেকেই রাস্তাঘাটে কংগ্রেসের নিন্দা কানে ভেসে আসতে সুরু করে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে কিংবা তার কিছু আগে সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যেই বলতেন, কংগ্রেসের টিকিটে যিনি বা যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তিনি বা তাঁরাই আমাদের সমর্থন পাবেন।

কিন্তু তারপর যতই দিন এগিয়ে যেতে থাকে, ততই দেখা যায়, কিছু কিছু নেতা ও কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। অতঃপর এতদিন যা দেখা যায়নি, বিভিন্ন রাজ্যে অফিসিয়াল গ্রুপের সংগে অন্য দলের বাদ-বিসম্বাদ সুরু হচ্ছে।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি তখন ভাগ হয়নি। রনদিভের সে সময় প্রাধান্য; অবশ্য স্বর্গত অজয় ঘোষ পার্টির সকল দলের নিকট সমাদৃত। শ্রী পি সি যোশী, রাজ-নীতি থেকে অন্তর্ধান করেছেন। সন্ত্রাসের রাজত্বের মধ্য দিয়ে শোষিত মানুষের অধিকার কায়েম করা যাবে—এই নীতি নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা লাভের

দিলেন। সংঘাত লাগলো সরকারের সংগে। আর ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে নেতাজীর আদর্শ নিয়ে মতভেদ দেখা দিলো। কেউ বললেন, নেতাজী মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্য নেতারা তা মানেন না। ফলে তাঁরাও হলেন দ্বিখন্ডিত।

স্বাধীনতা লাভের পর স্বর্গত শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দু মহাসভার সংগে সকল সংশ্রব ছিন্ন করে জনসংঘ নাম দিয়ে নতুন দল গঠন করলেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে বাংলা দেশে এই দলের কোন প্রভাব না পড়লেও উত্তর ভারতে এর আধিপত্য স্বীকৃত হলো। কিন্তু স্বর্গত মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর ফলে বাংলা দেশে এই দলের কোন দিনই বিশেষ দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

শ্রীরাজাগোপালাচারী কংগ্রেস ত্যাগ করার পর কি করা যায় চিন্তা করে বেশ কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিলেন। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের কিছু আগে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হলো স্বতন্ত্র দল। ভারতের অন্যান্য প্রান্তে এই দলের প্রভাব থাকলেও বাংলা-দেশ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, এই দলকে স্বীকার করে নিতে পারেনি।

ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি কিছুদিন পরে রনদিভের নীতি পরিত্যাগ করে যখন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তারপর থেকেই ভারতীয় রাজ-নীতিতে এক নতুন পরিবর্তন এলো। ততদিনে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে কিছু কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। কম্যু-নিস্ট পার্টির জঙ্গী মানুষেরা গ্রামের ও শিল্পাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে ভোটের প্রার্থনা জানানো সুরু করার ফলে কংগ্রেস প্রমাদ গুনতে সুরু করলেন। তথাপি সে সময়েও জনপ্রীতি হ্রাস পেলেও সংখ্যাধিক্যের বলে কংগ্রেস বিভিন্ন রাজ্যে ও

ইতিমধ্যে হয় আঞ্চলিক দাবী নিয়ে অথবা আদর্শের পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন রাজ্যে ছোট ছোট কয়েকটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে সুরু করলো। যেমন দক্ষিণ ভারতে ডি এম কে, বিহারে ঝাড়খন্ড পার্টি, বাংলা দেশে পুরুলিয়ায় লোকসেবক সংঘ, দার্জিলিং-এর গোর্খা লীগ। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে তখন পর্যন্ত এই সকল পার্টি কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে ছাপ রাখার মত কোন দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারেননি।

চীন ভারত আক্রমণ করার সংগে সংগে ভারতের রাজনীতিতে বিস্ফোরণ দেখা দিলো। সে সময় কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রাশিয়ার সংগে চীনের মত-পার্থক্যের কথা শোনা যেতে লাগল। স্ট্যালিন তখন গত হয়েছেন। রাশিয়া বা চীনের নীতি—এই দুই শিবিরের মধ্যে ভারতীয় কম্যুনিস্টরা নিজেদের ভাগ করে ফেললেন। এই মত-পার্থক্য এতো প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, বাস্তবে দেখা গেলো কম্যুনিস্ট পার্টি দুটো ভাগে শুধু ভাগ হয়ে গেছে, তাই নয়, একে অপরকে প্রকাশ্যে গালিগালাজ করতে সুরু করে দিয়েছে।

সমগ্র ভারতের রাজনীতিতে গত কুড়ি বছরে যে পরিবর্তন এসেছে, তার বেশী ছাপ পড়েছে পশ্চিমবংগের ওপর। এখানে অন্যান্য রাজ্যের মত কৃষক-মজদুর প্রজা পার্টি উঠে গিয়ে প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছে। একদল আবার গঠন করেছেন, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি। ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক। কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে যাঁরা ডাংগে-পন্থী, তাঁদের বলা হয় দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি। আর অন্য অংশের নাম বাম কম্যুনিস্ট পার্টি। কংগ্রেস থেকে কিছু নেতা ও কর্মী বেরিয়ে এসে গড়ে তুললেন বাংলা কংগ্রেস। তাঁরা কিছুদিনের জন্য সর্বভারতীয় ক্রান্তি দলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা অতি সাময়িক। বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে আবার ভাগ হয়েছে। কেউ কেউ যোগ দিয়েছেন লোকদলে; আর অন্য দলের নাম হয়েছে বাংলা জাতীয় পার্টি। পি ডি এফ—কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার জন্য দায়ী যে সকল লোক, তাঁরা আবার গঠন করেছিলেন আই-এন-ডি-এফ।

এ ছাড়াও কংগ্রেস বিরোধী দল হিসেবে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার, বলশেভিক পার্টি, আর-সি-পি-আই, অনেকদিন ধরেই এই রাজ্যে তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এ'রা ছাড়া দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দল তো আছেই।

বিগত কয়েকটা নির্বাচনে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি

সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলেন। এবং সরকার গঠনের দায়িত্ব পান। কিন্তু তাঁরা শেষ-পর্যন্ত সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছেন কিনা, তা দেশবাসীই বিচার করবেন। তবে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির এক অংশ আবার দেখা যাচ্ছে উগ্রপন্থা গ্রহণের দিকে ঔৎসুক্য দেখাচ্ছেন। তাঁরা নকসাল-পন্থী নামে প্রখ্যাত। সংশ্লিষ্ট পার্টি অবশ্য তাঁদের বিতাড়িত করেছেন। তবে তাঁদের প্রভাব যে পার্টির সাধারণ কর্মীকে নানা-দিক থেকে চিন্তিত করেনি, তা বলা যায় না।

যাহোক, এখন পশ্চিমবংগে কংগ্রেসের বাড়ীতে আত্মকলহ এবং কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি সংখ্যার দিক থেকে অসংখ্য। অথচ স্থায়ী সরকার গঠিত না হলে এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে যাবে। এটাই আজকের দিনে অনেকের বিনিদ্র রজনী যাপনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের রপ্তানী

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পর বিগত একুশ বছরের চেষ্টায় ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের যে বেশ কিছুটা বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে তা সম্প্রতিকালের রপ্তানি বাণিজ্যের পণ্যতালিকা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। পাট, চা, সুতিকাপড়, মশলা, তামাক, চামড়া প্রভৃতি কাঁচা মাল ও বাগিচাপণ্যের প্রাধান্য আগের মতো থাকলেও বহির্বিশ্বে ভারতীয় শিল্প-পণ্যের চাহিদা এখন উপেক্ষণীয় নয়।

গত বছর কলকাতার একটি কারখানা জাপান, বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পশ্চিম জার্মানির টেন্ডারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছ থেকে আট কোটি টাকার রেল ওয়াগন সরবরাহের অর্ডার সংগ্রহে সমর্থ হয়। অনুরূপভাবে আর একটি কোম্পানী জাপান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিউজিল্যান্ডের কাছ থেকে ক্রেন সরবরাহের অর্ডার পায়। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ভারত ২ কোটি টাকার ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে, আর ১৯৬৮ সালের জুন মাসে করে ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্য। তার আগে, মে মাসে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। তুরস্ক ভারত থেকে রেল লাইন কিনছে, কেনিয়া অর্ডার দিয়েছে রেল ওয়াগনের; সুদান, ঘানা ও পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকে অনুরূপ বহু অর্ডার আসছে। ইরানে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্যের চাহিদা ১৯৬৬-৬৭ সালের তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা, ইউরোপ—সর্বত্র ভারতীয় শিল্প-পণ্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। গত এক বছরে ভারতীয় শিল্প-পণ্যের রপ্তানি শতকরা ২০০ ভাগেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ওয়াকিবহাল মহল ও অর্থনীতিবিদদের অভিমত, ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারের মন্দাই শিল্পপণ্যের অকস্মাৎ রপ্তানি বৃদ্ধির প্রধান কারণ। সুতরাং অর্থনৈতিক মন্দার অভিশাপ ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে বলতে হবে। ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিলের আশা, রপ্তানির এই হার অব্যাহত থাকলে চলতি বছরে ভারত ৬৫ কোটি টাকার ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উন্নতি ও রপ্তানি বৃদ্ধির পথে বাধা অনেক। বহু শিল্পকে এখনও বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। কোন কোন শিল্পকে আমদানি করতে হয় তার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রায় ৭৫ শতাংশ। ফলে ডিভ্যালুয়েশনের পর ঐসব শিল্পকে কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় প্রায় ৬০ শতাংশ বেড়ে গেছে। কিন্তু পণ্যের দাম সেই অনুপাতে বাড়ানো সম্ভব হয়নি। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপারে দ্বিতীয় অসুবিধা হ'ল সরকারী মহলের দীর্ঘসূত্রতা। টাকা আদায়, পাওনার

অনেক ব্যবসায়ী ওসব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে স্বদেশের বাজারের চাহিদা মিটিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চান। শুধু আভ্যন্তরীণ বাজারে বর্তমান মন্দাই ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ব্যবসায়ীদের বাইরের বাজারের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করেছে। এ ব্যাপারে তৃতীয় অসুবিধা হল পণ্যবাহী জাহাজের অভাব। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যারিব দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় শিল্পপণ্যের যথেষ্ট চাহিদা থাকলেও জাহাজের অভাবে তা সবটুকু পূরণ করা সম্ভব হয় না। আর একটি বড় অসুবিধা হল তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার অভাব। ভারতীয় শিল্পপতিরা এই জন্য সামান্যই অর্থ ব্যয় করে থাকেন। ফলে সাধারণ ক্রেতার মনোরঞ্জনকারী কোন নতুন ডিজাইনের সামগ্রী অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ বাজারে ছাড়লেই ভারতকে পিছু হটতে হয়। যেমন টেবিল ফ্যানের বাজার ভারতের একসময় ভালই ছিল, কিন্তু জাপান, হংকং প্রভৃতি দেশগুলি অনেক সুন্দর টেবিল ফ্যান বাজারে ছাড়ায় ভারত এ ব্যাপারে পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অসাধুতা। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের বহু অফিস আছে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় তার জন্য। তবু বহুক্ষেত্রে আগে পাঠানো নমুনার সঙ্গে পরে পাঠানো পণ্যের আশমান-জমিন মানগত পার্থক্য ধরা পড়েছে। রাশিয়া একবার এই অভিযোগে জাহাজ বোঝাই জুতো ফেরত পাঠিয়ে দেয়। উল্লেখিত সমস্যাগুলির দিকে সংশ্লিষ্ট [illegible]

বাজার যে বহুগুণ সম্প্রসারিত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জুতো রপ্তানি করে ভারত ১৯৬৭ সালে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এই শিল্পে হংকং, চীন, সিঙ্গাপুর ভারতের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও সারা ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় ভারত সহজেই তার জুতোর বাজার সম্প্রসারিত করতে পারে।

ভারতের তামাক রপ্তানিও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাঁচা তামাক ছাড়াও সিগারেট, চুরুট, বিড়ি, নস্যি প্রভৃতি তামাকজাত পণ্য পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশে চালান যায়। তামাকের সেরা সোনালি রঙের ভার্জিনিয়া তামাক হয় অন্ধ্রপ্রদেশে, চুরুটের তামাক মাদ্রাজে, বিড়ির তামাক মহারাষ্ট্রে, আর হুকার তামাক বাঙলা ও বিহারে। তামাক রপ্তানি ক'রে ভারত ১৯৬৬-৬৭ সালে ১৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে।

ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি খেলার ব্যাট বল প্রভৃতি সরঞ্জাম, টেনিস ও ব্যাডমিন্টন খেলার র‍্যাকেট, জাল প্রভৃতি উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভারত বেশ এগিয়ে ছিল। এই শিল্পগুলি প্রথম ধাক্কা খায় ডিভ্যালুয়েশনের পর। খেলার সরঞ্জাম শিল্পে সরকারী আনুকূল্য হ্রাস পায়, কাঁচামাল ও মজুরির দরও অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এই রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্থান। খেলার সরঞ্জাম শিল্পের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার না হ'লে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাজারটি হয়ত সম্পূর্ণরূপে ভারতের হাতছাড়া হয়ে পাকিস্থানের দখলে চলে যাবে।

ভারতের প্রায় একচেটিয়া খনিজপণ্য মাইকার রপ্তানি বাণিজ্যও এখন নানা সংকটের সম্মুখীন! বিশ্বের বাজারে মাইকার চাহিদার প্রায় ৮০ শতাংশ এখনও ভারত পূরণ করে থাকে, তবু ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে মোট আয়ের মাত্র দেড় শতাংশ আসে মাইকা থেকে। তার কারণ নানা বিকল্প উদ্ভাবিত হওয়ায় মাইকার চাহিদা কমে যাচ্ছে। তাছাড়া আফ্রিকা ও ব্রেজিলের মাইকা বিশ্বের বাজারে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে। যুক্তরাষ্ট্রে মাইকার বাজারের বেশি অংশ ভারতের হাতছাড়া হয়ে ব্রেজিলের দখলে চলে গেছে। ১৯৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র ব্রেজিলের কাছ থেকে ১৬ লক্ষ ডলার দাম দিয়ে কেনে ১৫ লক্ষ পাউন্ড মাইকা, আর ভারতের কাছ থেকে ১২ লক্ষ ডলার দাম দিয়ে কেনে ৯ লক্ষ পাউন্ড মাইকা। দামের ব্যাপারেও ব্রেজিলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব লক্ষণীয়। এসবের জন্য ১৯৬২-৬৩ সালে যেখানে ভারতীয় ব্লক মাইকার রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৪ লক্ষ পাউন্ড, ১৯৬৫-৬৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৩১ লক্ষ পাউন্ড। অপর দিকে আবার মাইকা স্ক্র্যাপের চালান দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬২-৬২ সালে মাইকা স্ক্র্যাপ রপ্তানি হয় ১৯,৩০০ টন, ১৯৬৫-৬৬ সালে হয় ৩২ হাজার টন। তার কারণ ঐ স্ক্র্যাপ [illegible]

মাইকা উৎপাদন করছে। ইতিমধ্যে পূর্ব ইউরোপে মাইকার চালান বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬২-৬৩ সালে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার মাইকা চালান যায়, আর '৬৫-'৬৬ সালে চালান যায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার। তবু ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারত পূর্ব বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ কম মাইকা বিদেশে চালান দেয়। ঐ বছর মাইকা রপ্তানি থেকে ভারতের মোট ১৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা আয় হয়। মাইকা রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ভারতকে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার রূপান্তর অনুসারে সমগ্র শিল্পটিকে ঢেলে সাজতে হবে।

ভারতের আর একটি বৃহৎ শিল্প যা আন্তর্জাতিক বাজারে গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তা হল বস্ত্রশিল্প। পৃথিবীর সর্বত্র ভারতীয় সূতিকাপড়ের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৬৬ সালের প্রথম ছয় মাসে বিদেশের বাজারে সূতিকাপড় বেচে ভারত ৬ কোটি ৪৬ লক্ষ ডলার উপার্জন করেছিল, ১৯৬৭ সালের প্রথম ছয় মাসে সেই উপার্জন নেমে আসে ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ডলারে। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে সূতিকাপড় রপ্তানিতে ভারতের আয় ২৯·৪ শতাংশ হ্রাস পায়। ভারতের সূতিকাপড়ের রপ্তানি যে কিভাবে হ্রাস পাচ্ছে তা কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই বুঝতে পারা যাবে। ১৯৬৬ সালের প্রথম ছয় মাসে নেপালে ভারতীয় সূতিবস্ত্র যায় ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গ মিটার; ১৯৬৭ সালের প্রথম ছয় মাসে তা হ্রাস পেয়ে হয় ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গ মিটার। উল্লেখিত সময়ের ব্যবধানে বৃটেনে রপ্তানি হ্রাস পায় ৬ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গ মিটার থেকে ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ২০ হাজার বর্গ মিটারে। নেপাল বাদে সমগ্র এশিয়ায় রপ্তানি হ্রাস পায় ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গ মিটার থেকে ৩ কোটি ৮ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গ মিটারে। সুতোর কাপড়ের মতো সুতোর রপ্তানিও আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। '৬৬ থেকে '৬৭ সালের মধ্যে সুতো বিক্রি থেকে আয় কমেছে ৭৭ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার থেকে ৪৬ লক্ষ ২০ হাজার ডলারে। হোসিয়ারি পণ্য থেকেও আয় ১৫ লক্ষ ডলার থেকে কমে ৬০ হাজার ডলার হয়েছে।

ভারতের রপ্তানি তালিকায় সূতিবস্ত্রের স্থান তৃতীয় পাট ও চা'র পরেই। এদেশের মোট রপ্তানির এক-দশমাংশ হল সূতিবস্ত্র। তৃতীয় যোজনাকালে সূতিবস্ত্র বেচে ভারতের আয় হয় ৬৮ কোটি ডলার অর্থাৎ বছরে গড়ে ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। কিন্তু ১৯৬৪ সাল থেকে এই হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। '৬৪ সালে আয় হয় ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার, '৬৫ সালে ৯ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, '৬৬ সালে ৮ কোটি ডলার। বস্ত্র ব্যবসায়ে এই সংকটের তিনটি বড় কারণ। প্রথমতঃ গত কয়েক বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তুলোর উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং তার ফলে তুলোর দাম বাড়ে; দ্বিতীয়ত, মূল্যমান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে উৎপাদন বাড়েনি। তৃতীয়ত, উল্লেখিত দুটি কারণে ভারতীয় বস্ত্রের দাম বাড়লেও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কাপড়ের দাম এখন পড়তির মুখে। কাপড়ের আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী এখন হংকং, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্থান, তুরস্ক, পর্তুগাল, স্পেন, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ব্রেজিল ও সর্বোপরি জাপান। ডিভ্যালুয়েশনে ভারতের বস্ত্রশিল্পের কোন সুবিধা হয়নি। কারণ ডিভ্যালুয়েশনের এক বছরের মধ্যে ভারতে তুলোর দাম বেড়েছে ২৩ শতাংশ ও শ্রমিকের মজুরি গড়ে ১১ শতাংশ, যার ফলে কাপড়ের উৎপাদন-মূল্য বাড়ে কিঞ্চিদধিক ১৩ শতাংশ। আবার অন্যান্য দেশে ঐ সময়ে তুলোর উৎপাদন বাড়াতে তার দাম পড়ে যায়, আর কলকারখানা আধুনিকীকরণের ফলে উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় কাপড়ের দাম এখন অন্যান্য দেশের তুলনায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বেশী হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে যে পিছু হটতে হবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে? ভারতকে এই সংকটের সমাধান করতে হবে উল্লেখিত সমস্যাগুলির সমাধান করে। প্রথমত তুলোর উৎপাদন যথাসাধ্য বাড়াতে হবে, এবং এ ব্যাপারে ভারতের সম্ভাবনা সীমাহীন। কারণ একর প্রতি তুলো উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রায় সবার নীচে। দ্বিতীয়ত যন্ত্রপাতিগুলি আধুনিকীকরণের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, তবেই শ্রমিককে উপযুক্ত মজুরি দিয়েও উৎপাদনব্যয় আয়ত্তের মধ্যে রাখা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত উন্নত দেশগুলির ক্রেতাদের রুচি পরিবর্তনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রয়োজনীয় রূপান্তর ঘটাতে হবে।

ভাল জিনিষের যে ক্রেতার অভাব নেই তা নিউইয়র্কে ১৯৬৪-৬৫ সালের বিশ্ব মেলায় ও ১৯৬৭ সালে কানাডার এক্সপো '৬৭ প্রদর্শনীতে প্রমাণিত হয়েছে। নিউইয়র্ক মেলায় কাঞ্জিভরম, বেনারসি, কইম্বাতোর প্রভৃতি শাড়ী প্রদর্শিত হওয়ার পর আমেরিকার সৌখিন মহলের মেয়েদের সান্ধ্যপোষাক হিসাবে শাড়ী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। চুড়িদার-কুর্তা ও পায়জামাও পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কানাডার প্রদর্শনীতে ভারতের সিল্ক বেনারসি বাটিক প্রভৃতির জনপ্রিয়তা আরও বাড়ে। ছেলেরা ব্যাপকভাবে চুড়িদার, সিল্কের টাই প্রভৃতি কেনে। মেলাতে সাড়ে তিন মাসে ৫ লক্ষ ডলার মূল্যের সৌখিন সামগ্রী বিক্রি হয়। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রদর্শনী ও সৌখিন বাজারে ভারতীয় শাড়ী ও পোষাকের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হ'ল এদেশের বস্ত্রশিল্পী ও দর্জিদের অনন্য দক্ষতা।

বিশ্বপ্রদর্শনীগুলিতে ভারতের কারুশিল্পও বিশেষ সমাদর লাভ করে। কেরলে হাতীর দাঁত ও মোষের সিং-এর তৈরি নানা ধরনের পুতুল ও মূর্তি, দক্ষিণ ভারত ও জয়পুরে নির্মিত ধাতুর সামগ্রী, কাশ্মীরে তৈরি নক্সাকাটা কাঠের নানা বস্তু, উড়িষ্যার কুটিরশিল্প, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল প্রভৃতি অনিন্দ্যসুন্দর সৌখিন সামগ্রীগুলি আজ পৃথিবীর দেশে দেশে অভিজাত গৃহগুলির শোভা বর্ধন করছে। এই সব শিল্পেরও বহু সমস্যা আছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কাঁচামালের অভাব। যেমন সিংহল থেকে শাঁখ, আফ্রিকা থেকে হাতীর দাঁত প্রায় জলের দরে পাওয়া যায় অথচ তা আনার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। আফ্রিকায় হস্তি-হস্তিণী দুয়েরই বড় বড় দাঁত হয় এবং সে মহাদেশে হাতীর দাঁতের কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প নেই। তাই আফ্রিকার হাতীর দাঁত হংকঙে বিক্রি হয় কুড়ি পঁচিশ টাকা পাউন্ড দরে। অথচ ভারতে এক পাউন্ড হাতীর দাঁতের দাম পঁচাত্তর আশি টাকা। সরকার একটু তৎপর হলেই কুটির শিল্পীদের বহু সমস্যার সমাধান হতে পারে।

রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পণ্য হল চা। এই বাগিচাশিল্পটিতে ১৯০ কোটি টাকার মূলধন নিয়োজিত আছে, এবং পৃথিবীর ৯২টি দেশে চা বিক্রি করে ভারত ১৯৬৬ সালে ৯৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। ভারতের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ১২ শতাংশ আসে চা থেকে।

বস্ত্রশিল্পের মতো এই বৃহৎ শিল্পটিও এখন সংকটের সম্মুখীন এবং সংকটের কারণ প্রায় একই। ১৯৬৪ সালে ভারত ২১ কোটি ৫ লক্ষ কেজি চা বিদেশে রপ্তানি করে; ১৯৬৫ সালে করে ১৯ কোটি ৪ লক্ষ কেজি; '৬৬ সালে ১৮ কোটি ৯ লক্ষ কেজি। এই থেকেই বোঝা যাবে, চায়ের বাজারেও আমাদের কেমন বছরে বছরে গুটিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে ১৯৬৫ সালে সিংহল ভারতকে চা রপ্তানিতে ছাড়িয়ে যায় ও ভারতকে তার বরাবরের প্রথম স্থান থেকে সাময়িকভাবে অপসারিত করে। পরের বছর ভারত আবার তার হৃত আসন ফিরে পায়, কিন্তু তার রপ্তানি পূর্ব বছর থেকে কমই থাকে।

এর কারণ কি? কেন সিংহল ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলি চায়ের বাজারে অপেক্ষাকৃত নবাগত হয়েও ভারতকে কোণঠাসা করে ফেলছে? এই প্রশ্নের উত্তরে চা উৎপাদকদের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুসারে ভারত তার চায়ের দাম কমাতে পারছে না। এ ব্যাপারে তাঁদের আরও বলার কথা হল, চায়ের উৎপাদন ব্যয়ের প্রায় ৭০ শতাংশ চা উৎপাদকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেমন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিপুল করের বোঝা, শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন, সারের দাম, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, পরিবহন প্রভৃতির ব্যয়,

স্বল্পমূল্যে রেশন সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত খরচ প্রভৃতি। চালের বাজারদর যাই হক না কেন, শ্রমিকদের চাল সরবরাহ করতে হবে সাড়ে সতের টাকা মণ দরে। চা মালিকদের বক্তব্য, চা-বাগানের নিজস্ব খরচের জন্য এখন এক কিলো চায়ের উৎপাদন ব্যয় দাঁড়ায় সাড়ে চার টাকা। তারপর যখন এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের কৃষিকর ও কেন্দ্রীয় সরকারের একসাইজ ডিউটি, সেস ও একসপোর্ট ডিউটি সংযুক্ত হয় তখন এক কিলো চায়ের দাম দাঁড়ায় সাড়ে ছয় টাকা। তারপর প্যাকিং খরচ, জাহাজ ভাড়া ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করে চা যখন লণ্ডনের বাজারে পৌঁছায় তখন তার দাম দাঁড়ায় সাড়ে সাত টাকা। অন্যান্য দেশের চায়ের দামের তুলনায় এ দাম অনেক বেশী। অত্যধিক করের বোঝা ভারতীয় চায়ের দাম এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে ডিভ্যালুয়েশনেও তার কোন প্রতিকার হয়নি। তারপর বিদেশী মালিকানাধীন চা-বাগানগুলিতে যে অতিরিক্ত কর চাপানো হয়েছে সেটাও অবাঞ্ছনীয়। ভারতের চা-বাগানগুলির অর্ধেক এখনও বিদেশী মালিকানাধীন। অতিরিক্ত করের বোঝা এই বাগিচাগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পথ বিঘ্নিত করেছে। বিভিন্ন দেশের অবিশ্রান্ত সরবরাহের ফলে আন্তর্জাতিক চায়ের বাজারে এখন এমন একটা অবস্থা এসেছে যে ভারতের পক্ষে আর অতিরিক্ত চা রপ্তানি করা সম্ভব নয়। সুতরাং চায়ের দাম কমিয়েই ভারতকে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলা করতে হবে।

নানা বাধা-বিপত্তি ও বিপর্যয় সত্ত্বেও বরাবরের মতো আজও ভারতের রপ্তানি তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে বাংলার পাট। ভারতের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার শতকরা ২৩ ভাগ আসে পাট থেকে। দেশ বিভাগের ফলে পাটশিল্পই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শতকরা ৭৯ ভাগ পাটক্ষেত চলে যায় ভারতের বাইরে। ফলে ভারতের পাটকলগুলি তাদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কাঁচা মালের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু অনতিবিলম্বেই এই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটানো হয় এদেশে পাট ও মেস্তার চাষ বাড়িয়ে। দেশ বিভাগের সময় ভারতে পাট ও মেস্তার চাষ হত সাড়ে ছয় লক্ষ একর জমিতে এবং উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ বেল। ১৯৬১-৬২ সালে পাট ও মেস্তা চাষ হয় ৩২ লক্ষ একর জমিতে এবং উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮১ লক্ষ বেল। ১৯৪৭ সালে পাট-কলগুলির উৎপাদন ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০ লক্ষ ২৬ হাজার টন ও ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টন। ১৯৬৫ সালে উৎপাদন ও রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টন ও ৯ লক্ষ ২১ হাজার টন।

কিন্তু তাহলেও পাটশিল্পের অবস্থা ভাল নয়। কারণ ১৯৬১-৬২ সালে ৮১ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়ে থাকলেও গত পাঁচ বছরে পাট উৎপন্নের গড় হার মাত্র ৭০ লক্ষ বেল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই এর প্রধান কারণ। ইতিমধ্যে পাকিস্থানও আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক পাটের বাজারে ভারতীয় পাটের পরিমাণ ছিল ৮২·০৯ শতাংশ; ১৯৬৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৫৮·৫ শতাংশ। অপর দিকে ঐ সময়ের ব্যবধানে পাকিস্থানের ভাগ মাত্র ৬·৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩·৫ শতাংশ হয়। অপর দিকে নানা বিকল্পও পাটের স্থান গ্রহণ করে পাটের বাজার সঙ্কীর্ণ করে দিচ্ছে। পাকিস্থান ও বিকল্প ব্যবস্থার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ভারতের পাটশিল্পকে দাঁড়াতে হলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিদেশের বাজারে পাটজাত পণ্যের মূল্য হ্রাসের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। পাটের ব্যাগ সস্তায় পেলে তবেই বিদেশী ক্রেতারা কাপড়, কাগজ বা প্লাস্টিকের ব্যাগ বর্জন করে তা কিনবে। পাকিস্থানের পাটের চেয়ে ভারতের পাটের মানগত উচ্চতা ভারতীয় পাটের একটা বড় সুবিধা। পাকিস্থানের পাট-কলগুলি শুধু স্যাকিং উৎপাদনে সমর্থ এবং স্যাকিং-এর বাজারেই তারা ভারতকে বড় ঘা দিয়েছে। কিন্তু হেসিয়ান-এর বাজার এখনও ভারতের প্রায় একচেটিয়া। কার্পেট প্রভৃতি সৌখিন দ্রব্য তৈরিতেও ভারতীয় পাট আদর্শ। ১৯৬৬ সালে শুধু কার্পেট ব্যাকিং রপ্তানি করে ভারত ৫২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। পাটের উপর গুরু-করভার ভারত সরকার লাঘব করেছেন, কিন্তু তাতেই পাটশিল্প বাঁচবে না। পাটশিল্পকে বাঁচতে হবে উৎপাদনে বৈচিত্র্য এনে ও উৎপন্ন সামগ্রীগুলির মূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করে।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হল। এ পড়ে এমন ধারণা যেন কারও না হয় যে, বিশ্বের বাজারে বেশ একটা বড় রকমের অনুপ্রবেশ ভারতীয় পণ্য করতে পেরেছে। সমগ্র বিশ্বের রপ্তানিবাণিজ্যের মোট পরিমাণ এখন ১৩৫ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। অথচ ভারতের রপ্তানি সবে ১১৩০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। যেদিন ভারতের রপ্তানি ১৩৫০ কোটি টাকা অতিক্রম করবে সেই দিন বিশ্বের রপ্তানিতে ভারতের অংশ হবে শতভাগের এক ভাগ মাত্র। চতুর্থ যোজনার শেষে, ১৯৭০-৭১ সালে ভারতীয় রপ্তানির লক্ষ্য আছে ১৬৫০ কোটি টাকা। কিন্তু ঐ লক্ষ্যের ধারে কাছেও যে আগামী তিন বছরে পৌঁছানো যাবে না তা বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রতি বছর অনূন ১০০ কোটি টাকার রপ্তানি বাড়াতে হবে।

কিমোনো

অভিযুক্ত

কাহিনী

[১৯০৫-এ নর্দাম্পটনসায়ারে জন্ম। একজন কিষাণ শ্রমিকের পৌত্র বেটস এবং তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি উদ্যান ও কৃষিক্ষেত্র রচনার প্রেরণা লাভ করেছেন। এসকোর্ডের কেন্ট অঞ্চলে তাঁর উদ্যানটি সবিশেষ প্রশংসিত। একটি প্রাথমিক গ্রামার স্কুলে লেখা-পড়া শিখেছেন। কুড়ি বছর বয়সেই কেরাণী-গিরি এবং সাংবাদিকতা করেছেন, তারপর থেকে লেখাই তাঁর জীবিকা। যুদ্ধের সময় এইচ, ই (এই নামে খ্যাতি) আর, এ, এফ বাহিনীতে যোগদান করেন। ফ্লাইং-অফিসার এক্স এই ছদ্মনামে কয়েকটি বিমান-যুদ্ধের কাহিনী লিখে প্রচন্ড খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর ছোট গল্প এবং উপন্যাস বর্তমান ইংরাজী-সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেছে।]

এইচ, ই, বেটস

(এক)

১৯১১-র আগস্ট মাসের সেকেন্ড স্যাটারডে, সেদিন আমি লন্ডনে এলাম কারেস অ্যান্ড কোম্পানীতে চাকরী-সূত্রে ইন্টারভিউ দিতে। তখন আমার বয়স ঠিক পঁচিশ। সেবার গরমও প্রচন্ড, একেবারে গ্রীষ্মের দেশের মত।

তখনকার দিনে উত্তরাঞ্চল থেকে একটা ট্রেণ সকাল দশটা নাগাদ সেন্ট পানক্রাসে আসত। আমি নটিংহাম থেকে সেই ট্রেণে এলাম। আমি লগেজ ঘরে আমার জিনিস-পত্র রেখে বাসে চড়ে শহরে গেলাম। লন্ডনের গরম ভীষণ তীব্র। সাদা ধূলোয় ভরা, ঘোড়ার নাদিতে পূর্ণ-গরম। আমার পরিধানে আমার সর্বোত্তম পোষাক, একটা ধূম্র সার্জের সুট। গরম যেন সেই সুটের ভেতর থেকে আমার বুকে ছুরি চালাচ্ছে।

কারেস এ্যান্ড কোম্পানী চমৎকার। ইলেকট্রিক্যাল ইন্‌জিনিয়ারদের কোম্পানী। ও'দের বিজ্ঞাপিত একটি পদের প্রার্থী হয়ে আবেদন করেছিলাম। কর্তার পুত্র আলেক-জান্ডার কারেস আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর ব্যবহার মধুর। নটিংহাম সম্পর্কে অনেক কথা হল। আমি ও'কে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্রনসনদের চেনেন কিনা। ব্রণসনরা খুব বিখ্যাত পরিবার এবং ধর্ম-পরায়ণ। উনি কিন্তু চিনতে পারলেন না। তখন অবশ্য উৎসাহের মাথায় আমার খেয়াল হয়নি যে কারেসরা ইহুদী, খৃষ্টান পরিবার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার কথা তাঁদের নয়। কিছুক্ষণ পরে, উনি আমাকে হুইস্কি এবং সোডায় আপ্যায়িত করতে চাইলেন। আমি অবশ্য সবিনয়ে প্রত্যাখান করলাম। আমি একটু অন্যভাবে মানুষ, তা ছাড়া ব্রনসনরা এসব পছন্দ করতেন না। পরিশেষে মিঃ কারেস জানতে চাইলেন যে, সপ্তাহান্তে আমি লন্ডনে থাকব কিনা। আমি থাকব এই কথা বলায়, তিনি আমাকে সোমবার সকালে আবার আসতে বললেন। আমি বুঝলাম চাকরীটা হয়ে গেল এবং উৎসাহের অনন্দে করমর্দন করার সময় আমার হাত কাঁপতে লাগল।

ঠিক বারোটার একটু আগে কারেস অ্যান্ড কোম্পানী থেকে বেরিয়ে এলাম। ও'দের অফিসটা চীপ-সাইডের কাছে, রাস্তাটার নাম ভুলে গেছি। শুধু, কি প্রচন্ড গরম ছিল সেদিন তা মনে আছে। সেই প্রখর তপ্তদিনটি অতিশয় অ-ইংরাজ-সুলভ তা এখনো ভাবি। আমি স্থির করলাম সোজা পানক্রাসে গিয়ে আমার ব্যাগ নিয়ে ব্রনসনরা আমাকে যে হোটেলে থাকার কথা বলে দিয়েছেন সেইখানে যাবো। এতই গরম বোধ হচ্ছিল যে কিছু খাওয়ার বাসনা ছিল না। শুধু ভাবলাম একখানা ঘর যদি পাই, তারপর স্নান করে নিতে পারলেই যথেষ্ট হবে। পরে না হয় খাওয়া যাবে। পশ্চিম অঞ্চলে গিয়ে সব একরকম ঠিক হয়ে যাবে।

ব্রনসনরা আমাকে হোটেলের ঠিক জায়গাটা মুখে বলে এবং ছবি এঁকে এমন-ভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, স্টেশন থেকে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে ঠিক কোন্ রাস্তায় যেতে হবে তা যেন নটিংহামের পথের মতই সরল মনে হয়েছিল। আমি পূব দিকে গিয়ে তারপর উত্তরে গেলাম,—গিয়ে বাঁ দিকে একটু গিয়ে ডাইনের মোড় নিলাম এবং শেষ পর্যন্ত হোটেলটা ঠিক যেখানে থাকা উচিৎ, সেইখানে পৌঁছলাম। কিন্তু সেখানে কোনো হোটেল নেই। আমার বিশ্বাস হল না যে ভুল হয়েছে। আমি একটু এদিক-ওদিক ঘুরে ঠিক সেই আগের জায়গাতেই ফিরে আসি। পথ পাছে হারিয়ে ফেলি এই ভয়। শেষ পর্যন্ত একটা রুটি-ওলা ছোকরাকে প্রশ্ন করলাম, মিডহোপ স্ট্রীট কোথায় জানো? সে বলতে পারল না। আরো দু-একজনকে প্রশ্ন করলাম, তারাও বলতে পারল না। আরো স্পষ্ট করে বললাম—ওয়েডস হোটেল। তাতেও ফল হল না। শেষে একজন বল্লেন, প্যানক্রাসে চলে যান, সেখানে গিয়ে বরং খোঁজ করুন। আমি তাই করলাম।

প্রায় দুটো বেজে গেল, তখন আমি বুঝলাম পথ হারিয়েছি। এদিকে অসহ্য গরম। দু-একটা হোটেল চোখে পড়ল, কিন্তু সেগুলি একটু নিম্ন স্তরের, এদিকে আমি ক্লান্ত এবং মরীয়া হয়ে পড়েছি।

অবশেষে, একটু ছায়া দেখে আমার ব্যাগটা নামিয়ে রেখে মুখটা মুছে নিই। আমার সারা অঙ্গে বিশ্রী ঘাম। আমাকে অতিশয় বেয়াড়া দেখাচ্ছে। ব্রনসনরা হোটেল সম্পর্কে এত সুনিশ্চিত যে আমি ফিরে গেলে ও'রা নিশ্চয়ই হোটেলটা কেমন লাগল তা জানতে চাইবেন। হিলডাও ঠিক জানতে চাইবে। কারণ, কারেস কোম্পানীর এই চাকরীটা পাওয়ার পর হিলডা আর আমি এই হোটেলটিতেই হনিমুন যাপন করতে আসব।

পরিশেষে আমার ব্যাগটা উঠিয়ে নিলাম। পথের ওধারে একটা মিষ্টির দোকান এবং

কাফে, সেখানে বরফ পাওয়া যায়। আমি সেখানে চলে গেলাম, ভাবলাম একটু কিছু খাওয়া যাক।

কাফেতে একজন বিশালাকৃতি স্ত্রীলোক আইস-ক্রীম তৈরীর কল নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। কিছু একটা যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। আমি তা সহজেই বুঝলাম। সবই আমার অদৃষ্ট।

আমি বললাম, আইসক্রীম নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না, চাওয়া বৃথা!

—আপনি যদি একটু অপেক্ষা করতে পারেন, তাহলে পাবেন।

—কতক্ষণ?

—এই যন্ত্রটা ঠিক করতে পারলেই হবে। এটা হঠাৎ বিকল হয়ে গেছে।

আমি বল্লাম—বেশ! তাহলে কি আমি একটু বসব? আপনার আপত্তি নেই ত?

তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করায় আমি চায়ের টেবিলে কনুই রেখে বসে পড়লাম। ঐ একটিই টেবিল। স্ত্রীলোকটি সেইভাবেই কলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। মোটা-সোটা স্ত্রীলোক, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, বেশ ভারিক্কি চেহারা। দোকান-ঘরটি বেশ গুমোট, জানলা দিয়ে পীতাভ সূর্যালোক ঘরটিতে এসে পড়ছে।

আমি বললাম—আমার মনে হয় মিড-হোপ স্ট্রীটটা কোথায় আপনার হয়ত জানা নেই।

মিডহোপ স্ট্রীট! তিনি জিভটা বার করে একটু ভাবতে লাগলেন। বল্লেন, মিডহোপ স্ট্রীট! আমার ত' জানা উচিত!

—আমি আবার বলি, কিংবা ওয়েড হোটেল?

ওয়েডস হোটেল?—এইবার জিভটা দাঁত দিয়ে আটকালেন। দাঁতগুলি সুন্দর। বেশ সাদা। তারপর বল্লেন, না, পারলাম না। হেরে গেলাম। আচ্ছা! আমার মেয়ে নিশ্চয়ই বলতে পারবে। ওকেই না-হয় ডাকি!

তিনি উঠে গিয়ে দোকানের পিছন দিকে মেয়েকে ডাকতে যাবেন এমন সময় মেয়ে স্বয়ং এসে হাজির হল। আমাকে ওখানে দেখে সে যেন একটু বিস্মিত মনে হল।

—ও এই যে ব্র্যাণ্ডি এসে গেছ দেখছি! ভদ্রলোক ওয়েডস হোটেল খুঁজছেন, জানো?

আমি বললাম—আমি বোধহয় পথ হারিয়েছি।

মেয়েটিও দাঁতের ওপর জিভ ঘষে চিন্তা করতে থাকে, ওয়েডস হোটেল! জননীর মত এরও দাঁতগুলি চমৎকার আর ভারী শাদা। সে বলল, ওয়েডস হোটেল! কোথায় যেন দেখেছি।

আমি বল্লাম—মিডহোপ স্ট্রীট!

—মিডহোপ স্ট্রীট!

না, মেয়েটিও কিছু মনে করতে পারে না। তার পরিধানে একটি কিমোনো জাতীয় পোষাক, ঝলঝলে জরদা রঙের ফুলে তার চারধারে। আমার একটু বাড়াবাড়ি মনে হল। তখনকার কালের পক্ষে অন্তত দুঃসাহসিক। এখন অবশ্য তা মনে হয় না। আর সেই কিমোনো এমনই রঙদার এবং ঝলঝলে যে আমি সেদিক থেকে চোখ আর ফেরাতে পারি না। আমি অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম, কিন্তু সেই অস্বাচ্ছন্দ্যর মধ্যে একটু আনন্দও ছিল, প্রায় উত্তেজক অস্বচ্ছন্দতা। মনে আছে, ভাবছিলাম এ একরকম পোষাক না পরার সামিল। অন্তত আধা-উলঙ্গ ভঙ্গী। কিমোনোর কাঁধ নেই, তার হাতা নেই, ঝোলা সেমিজের মতো গায়ে ঝুলছে—একখণ্ড পাতলা আবরণ দেহে জড়ানো। সহসা যখন নীচু হয়ে আইসক্রীম ফ্রীজারের শেষ স্ক্রুটা লাগাচ্ছে, তখন সেই কিমোনো খসে নেমে গেল এবং আমি ওর অনাবৃত দেহসৌষ্ঠব স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

ঠিক সেই সময় একটা ব্যাপার ঘটে গেল। ওর মাথার চুল ভেঙে কাঁধে এসে পড়ল—তখনকার দিনে বড়ো চুল রাখাই রীতি ছিল। সেকালের মেয়েদের কাছে এই রকম দীর্ঘ কেশরাশি গর্বের বস্তু ছিল। কিন্তু সেইকালের মাপ-কাঠিতেও ওর চুলটা কিছু বেশীই ছিল।

এমন সুদীর্ঘ কেশভার আমি এর আগে আর কখনও দেখিনি। ঘন-কালো তুলার দড়ির মতো, যখন সে ফ্রীজারের ওপর নত হয়ে পড়েছে তখন সেই চুলের শেষ প্রান্ত একেবারে নীচে এসে পড়ছে, বরফের গায়ে এসে লাগছে।

মেয়েটি লজ্জিত ভঙ্গীতে বল্ল, ছি-ছি! আমার চুলগুলি এমন গোলমাল করে—

আমি বল্লাম,—না, না,—ওতে কি হয়েছে! তবে আজকের দিনটা আমার কাছে বোধহয় অশুভ। এই আর কি!

মেয়েটি বল্ল, আহা!

ওর মা বলল, আপনি কি একটু চা খাবেন? যা দেখছি, বরফ দেওয়া হয়ত হয়ে উঠবে না। কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন।

মেয়েটি বলল, সেই ভালো মা, একটু বরং চা তৈরী করো! আপনার চা খেতে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে—কেমন?

আমি বললাম, খুবই ভালো হবে। সেই বেশ।

স্ত্রীলোকটি দোকানের পিছন দিকে গেলেন চায়ের ব্যবস্থা করতে। মেয়েটি আর আমি দুজনে দোকানে তখন একা। আমরা দুজনেই ফ্রীজারটা দেখছি। আমার কেমন লাগছিল। একটা অদ্ভুত মনোভঙ্গী। অস্থিরতাও ছিল মনে। মেয়েটি তার কিমোনোটাকে টাইট করে নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করল না। সুতরাং সেই পোষাকটি হালকা ভাবে গায়ে পড়ে আছে, আর আমি ওর নগ্ন কাঁধ এবং মাঝে মাঝে খোলা স্তন-দুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওর গাত্রবর্ণ অতিশয় শুভ্র, আর ও যখন আরো একটু বেশী নীচু হয়ে যন্ত্রটা ঠিক করার চেষ্টা করছিল তখন আমি যা দেখতে পেলাম

তাতে বুঝলাম ওর কিমোনোর নীচে আর কোনোরকম অন্তর্বাস নেই।

মেয়েটি আমাকে বলল, আপনি আমার কিমোনোটার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখছি। আপনার কি এই কিমোনোটা ভালো লেগেছে?

আমি বললাম, ভারী সুন্দর! জিনিষটা বেশ ভালো জাতের কাপড়ে তৈরী।

—হাঁ, খুবই ভালো কাপড়। দেখুন না! হাত দিয়ে দেখুন! দেখুন ভালো করে।

আমি হাত দিয়ে সেটা অনুভব করলাম। যে কোনো কারণেই হোক, হয়ত খাওয়া হয়নি বলে, আমার বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে। মেয়েটিও তা ঠিক বুঝতে পেরেছে। ও সবই জানে নিশ্চয়ই। অতি মধুর এবং কোমল গলায় ও বলে, জিনিসটা সুন্দর। হাত দিয়ে ভালো করে দেখুন। আমি নিজের হাতে বানিয়েছে।—প্রায় যেন আমন্ত্রণের ভংগীতেই কথাগুলি বলল, ওর মধ্যে কেমন একটা বৈদ্যুতিক আকর্ষণী শক্তি ছিল। আমি যান্ত্রিক ভংগীতে শুনে যাই। যে মুহূর্তে ও আমাকে কিমোনোর কাপড়টা অনুভব করতে বলেছে, সেই মুহূর্তে থেকে আমি অসহায়, পংগু হয়ে গেছি। বাহ্য-চৈতন্য লোপ পেয়েছে। জরদা আর সবুজ রঙের ফুল ও পাতাওলা ঐ কিমোনোর মাকড়সার জালে আমি জড়িয়ে পড়েছি, একান্ত অসহায় ভাবে দিশেহারা হয়ে জড়িয়ে পড়েছি।

মেয়েটি বলে, আপনি কি অনেকদিন লণ্ডনে আছেন? না শুধু আজই এসেছেন?

—সোমবার পর্যন্ত আছি।

—আপনি বোধহয় হোটেলে ঘর আগে থেকে বুক করে রেখেছেন?

—না আগেভাগে কিছু করিনি, তবে একজনারা খুব জোর সুপারিশ করেছিলেন!

—ওঃ তাই নাকি!

এই পর্যন্ত! "ওঃ তাই নাকি!" কিন্তু তার ভেতর একটা পাগল করার সুর ছিল। এ যেন এক প্রচ্ছন্ন ইংগিত, উদ্দাম কামনায় ভরা একটা আকুল আত্ম-নিবেদন। গোপন আমন্ত্রণ।

আমি বললাম, সবই ঠিক চলছিল, কিন্তু আমি শেষটায় পথ হারালাম।

—ও!

—একটা ইণ্টারভিউ দিতে এসেছিলাম। চাকরীও পেয়ে গেছি। অন্তত আমার ত' মনে হয় হয়ে যাবে।

—এ ত' নিশ্চয়ই ভাগ্যের কথা! আশা-করি চাকরীটা ভালো?

আমি বললাম, হাঁ, কারেস কোম্পানীর চাকরী। শহরের কারেস অ্যাণ্ড কোং।

সে বলে উঠল, বলেন কি? কারেস অ্যাণ্ড কোং? কারেস কোম্পানী?

—হাঁ, আপনি ওদের জানেন নাকি!

—জানি? নিশ্চয়ই জানি। সবাই জানে। এ আপনার মহাভাগ্য বলতে হবে।

সত্যি এই কথা শুনে আমি বেশ তৃপ্ত হলাম। ও দেখছি কারেস কোম্পানীর কথা জানে। ও জানে এটা একটা ভালো অফিস। আমার মনে হয় আমার এতো খুশী হওয়ার কারণ ব্রনসনদের মনোভংগী কারেস কোম্পানীর অনুকূলে ছিল না বলে। ওটা একটা নামমাত্র। ওদের কথার মধ্যে যথেষ্ট শীতলতা ছিল। আমার মনে হল ওরা অবশ্য চাকরী হোক এটা চান, কিন্তু না হলেও ওদের বুক-ফাটতো না। ওরা একেবারে এতটুকু উৎসাহ প্রকাশ করেনি।

মেয়েটি আবার বলল,—কারেস অ্যাণ্ড কোং! এ সত্যি মহা সৌভাগ্য বলতে হবে।

এমন সময় স্ত্রীলোকটি চায়ের সর-ঞ্জাম নিয়ে এসে বললেন, এর সংগে কিছু খাবেন নাকি?

আমি বললাম, আমার সকাল থেকে খাওয়াই হয়নি।

—ও, তাই আপনাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি একটু স্যাণ্ডউইচ করে আনি। তাহলে হবে ত'!

—ধন্যবাদ।

স্ত্রীলোকটি স্যাণ্ডউইচ করে আনার জন্য চলে গেলেন। আমি এবং মেয়েটি দুজনে আবার একা হয়ে পড়লাম।

মেয়েটি বলল, আপনি হোটেলে ঘর বুক করে রেখেছেন বলছেন।

আমি বললাম, না না, আমি ত' বুক করিনি।

—ও আমি ভেবেছিলাম, আপনি যেন বললেন—বুক করা আছে। আমারই দোষ। তাহলে বুক করেননি ত'?

—না, কেন?

—আমরা এখানে লোক রাখার ব্যবস্থা করেছি। এই কাফের ওপরতলায় ঘর, অবশ্য তেমন মাঝামাঝি অঞ্চল এটা নয়। তবে, আমরা তেমন বেশী চার্জও করি না।

ব্রনসনদের কথা মনে পড়ল। আমি বললাম, হয়ত হোটেলে যাওয়াই উচিত।

মেয়েটি বলল, আমাদের চার্জ তিন সিলিং ছ পেন্স। তেমন বেশী কি?

—না-না, মোটেই নয়।

মেয়েটি বলল, ওপরে চলুন না, ঘরটা দেখবেন? আসুন ওপরে আসুন!

- চলুন তাহলে!

—দেখুনই না একবার! খেয়ে ত' ফেলবো না।

মেয়েটি দোকানের পিছনের দরজা খুলল আর এক মুহূর্তের মধ্যেই আমি ওপরতলায় ওঠার সিঁড়িতে উঠলাম ওর পিছু পিছু। মেয়েটির পায়ে মোজা নেই। ওর সেই নগ্ন পা-দুটি সুগঠিত এবং বেশ দৃঢ় আর ধবধবে শাদা। ঘরটি কাফের ঠিক উপরেই। তিন সিলিং ছ' পেন্সের পক্ষে বেশ ভালো ঘরই বলতে হবে। ঘরের দেয়ালে নতুন ওয়াল-পেপার সাঁটা হয়েছে। রূপালি রঙ। বিছানাটি ধবধবে শাদা পরিষ্কার এবং ঘরটি বেশ ঠান্ডা মনে হল।

সহসা মনে হল আবার এই গরমে বাইরে বেরিয়ে হোটেল খোঁজার চেষ্টা করা নিছক বোকামী। বিশেষত এখন যেখানে আছি সেখানে যখন থাকা যায়, তখন কি প্রয়োজন ওয়েড হোটেলের?

মেয়েটি প্রশ্ন করে, কি মনে হয় আপনার?

—বেশ পছন্দ হচ্ছে!

মেয়েটি বিছানার ওপর বসে পড়ল। কিমোনো পায়ের হাঁটুর ওপর গুটিয়ে উঠেছে, দু-পায়ের মাঝে যেখানটায় ফাঁক হয়ে পড়েছে, সেখান থেকে ওর উরুদেশ বেশ দেখা যায়। সুদৃঢ়, সুডৌল, সুন্দর, শুভ্র এবং কিমোনোর ছায়ায় মৃদুভাবে তা মিলিয়ে গেছে। তখনকার কালে দীর্ঘ স্কার্ট পরাই ফ্যাসন ছিল, তাই এর আগে কখনও রমণীর পায়ের এতখানি অনাবৃত অংশ দেখিনি। হিলডা আর আমার মধ্যে শুধু

চুম্বন বিনিময় ছাড়া আর কিছুই হয়নি। নারীদেহ সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল সীমিত। হিলডা আর আমি খালি গল্প করেছি, তার মধ্যে কিছুই ছিল না। হিলডা সর্বদাই অবশ্য বলত আমার জন্যই সে তার সর্বকিছু সংরক্ষণ করবে।

মেয়েটি হাঁটু ঘষতে থাকে। আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি ওর কিমোনোর ভেতর কিছু পরা নেই।

মেয়েটি বলল, আমি অবশ্য জোর করতে চাই না, তবে আপনি থাকুন এই আমার ইচ্ছা। আপনিই হবেন আমাদের প্রথম বোর্ডার।

সহসা বাইরের রাস্তা থেকে একটা উত্তপ্ত বায়ুতরঙ্গ ঘরে ভেসে এল। দিনের প্রথম ভাগের সেই তীক্ষ্ম, তীব্র, ধূলি-ধূসরিত রুক্ষ, রূঢ় উত্তাপ। আমি বললাম,

—বেশ আমি থাকব।

—ওঃ লক্ষ্মী, সোনা ছেলে।

মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গীতে এমন একটা আন্তরিকতা এবং সারল্য ছিল যে আমি যে কি করব ভেবে পাই না। সেখানে সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে শুধু যে উত্তাপ তা নয়, আমি সেই মেয়েটির দেহের উষ্ণ স্পর্শ পেলাম। মধুর এবং তীব্র, স্বেদ এবং সুগন্ধি মিশ্রিত একটা মিষ্টি সুবাস। আমার হৃদয়ে উঠল উত্তাল তুফান।

এরপর মেয়েটি সহসা উঠে কিমোনোটা টান-টোন করে হাঁটু এবং উরুর ওপর হাত দিয়ে নামিয়ে দেয়।

সে বলল, আমার বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন। তাই আমরা জীবিকার জন্য এইসব ব্যবস্থা করেছি। আপনাকে দিয়ে সুরু—

যাই হোক সমস্ত ব্যাপারটা এতই ভালো যে যেন বিশ্বাসের বাইরে।

।। দুই ।।

আমি তাই জানতাম। তবে এ বিষয়ে পরে যখন সময় আসবে তখন আরো বলব।

সেই দিন সন্ধ্যা প্রায় ছটার সময় আমি আবার নীচে নেমে এলাম। চা-পান করেছি, আমার জিনিসপত্র খুলে গুছিয়েছি এবং একটু বিশ্রাম করে নিয়েছি। এখনও আবহাওয়া তেমন শীতল হয় নি, তবে আমার অনেক ভালো লাগছে। আমি যে এইখানে থেকে গেলাম তার জন্য আমি খুশি।

মেয়েটির নাম ব্রাণ্ডি, সে কাউন্টারের পিছনে বসে। মেয়েটির পরিধানে এখন আর কিমানো নেই, তার পরিবর্তে শাদা একটা ফ্রক, তার ধারে কালো বর্ডার। আমি একটু হতাশ হলাম। মনে হয়, ও তা বুঝেছে, কারণ ওর দিকে আমি তাকাতে ও একটু নড়ে-চড়ে বসল। আমিও খুশি হলাম ওর এই অঙ্গবিভঙ্গে। ওর ঠোঁট দুটি এমন লাল টক্‌টকে। যেন জ্বলজ্বল করছে। অবশ্য দুপুরে এলোমেলো অবস্থায় ওকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল।

সে প্রশ্ন করে, বেরোচ্ছেন নাকি?

আমি বললাম, হাঁ, একটু পশ্চিমাঞ্চলে যাবো মনে করেছি। কারেস কোম্পানীর ব্যাপারটি নিয়ে একটু আনন্দ করার বাসনা।

—আনন্দ? একা একা? একা আবার আনন্দ কি?

—তা কি করব? আমি যে একা! আমার আর কে আছে?

—ভাগ্যবান পুরুষ!

আমি বুঝলাম সেই মুহূর্তে ও কি বলতে চায়, তাই প্রায় ঠাট্টার ভঙ্গীতেই বললাম, তুমিও বরং চলে এসো না, দুজনে একত্র যাওয়া যাক।

—আমি?

বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে মেয়েটি প্রশ্ন করে, আমি? না না আপনি ঠাট্টা করছেন, আমি? আমাকে বলছেন?

আমি বললাম, না না, ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি, চলো না আমার সঙ্গে।

মেয়েটি উঠে পড়ল। বলল, কতক্ষণ দাঁড়াতে পারো? বেশী দেরী হবে না, পোশাকটা পাল্টে নিয়ে মাকে বলেই চলে আসব।

আমি বললাম—না না, তাড়া নেই। তুমি সব সেরে এসো।

মেয়েটি দৌড়ে ওপরে উঠল।

এতক্ষণ বলিনি, মেয়েটির বয়স কত। কিমোনো পরা অবস্থায় মনে হচ্ছিল কুড়ি। শাদা পোশাকেও প্রায় সেই রকমই। বরং আরো একটু কম মনে হয়। কিন্তু যখন পোশাক পাল্টিয়ে নেমে এল তখন মনে হল ছাব্বিশ কি সাতাশ। বেশ বড়-সড় এবং বাড়ন্ত গড়ন। এখন ও একটি ঝকমকে হলদে রঙের পোশাক পরেছে, পেছনে একটি কালো চওড়া পটি দেওয়া। পোশাকটি এমনই চকচকে যে আমার একটু অস্বস্তি বোধ হল। তা ছাড়া পোশাকটি ভীষণ আঁট-সাঁট। আর নিম্নাঙ্গের স্কার্ট এমনই সূক্ষ্ম কাপড়ের যে আমি তার দেহের প্রতিটি রেখা দেখতে পাচ্ছি। বুকের ওপর বডিসটা টাইট হয়ে ওর সুবিশাল বক্ষোদেশে চেপে বসেছে। ওর টুপিটা কেমন ছিল ভুলে গেছি, আমার বরং সেটি কিঞ্চিৎ বেমানান মনে হয়েছিল—যাই হোক ও শেষে সেই টুপি খুলে নিল।

মেয়েটি প্রশ্ন করে, কোন দিকে যাওয়া যাবে?

আমি বললাম, পশ্চিমাঞ্চলে কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নিই, তারপর এক জায়গায় বসে গান টান শোনা যাবে।

—গান? গান একটু একঘেয়ে হবে না?

—তাহলে না হয় অভিনয়?

মেয়েটি বলল, আমি বলি কি পশ্চিমে না গিয়ে বরং ইস্ট-এণ্ডে যাওয়া যাক। ওখানে অনেক মজা হবে। ইহুদীরা কিভাবে থাকে দেখতে পাবেন। আপনি ত' ইহুদীদের কারবারে কাজ করবেন। ওদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হওয়া ভালো। না হয় কিছু ইহুদী-খানা খাওয়া যাবে। আমার দু-একটা ভালো জায়গা জানা আছে।

আমরা ইস্ট-এণ্ডের বাসই ধরলাম।

(শেষাংশ আগামী সংখ্যায়)

ইন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত

অমিলে ছন্দ

সুনীল গুহ

ঘুম নেই। এই নিরিবিলি দুপুরে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভালো হত মনে করে খাওয়া দাওয়ার পরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় মণিকা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা করে এবং অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় পড়ে থেকে থেকে অবশেষে বিরক্ত-বোধের সঙ্গে উঠে আসতে হল আবার। এসে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রোদভরা দুপুরের বাইরেটাকে দেখতে লাগল। খানিক বাদে তা-ও ভালো লাগল না আর। রোদের তাপটা যেন অদৃশ্য আগুনের মত এসে গায়ে লাগছে। ক্লান্তিতে গোটা শরীরে একটা অচলভাব। সেখান থেকে ফিরে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে ঢকঢক করে গিলে গলা বুক ভিজিয়ে নিল। গ্লাসটা নিঃশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল পিপাসা মেটেনি। মিটবেও না বোধহয়। মনে হয় পিপাসাটা যেন ওর বুক জুড়ে ক্রমাগত ছটফট করে মরছে। গলা শুকিয়ে শেষ অবধি ও নিজেও বোধহয় মরবে।

বৈশাখের দুপুর। গনগনে আঁচের মতই রোদের তাপ। বাইরেটা যেন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার উপক্রম। জানালার ধারে উত্তপ্ত হাওয়ার আভাস। জানালাটা বন্ধ করে দিতে চাইল। কিন্তু পারল না। মন বলল, না থাক। খোলাই থাক ওটা। খানিকটা অন্য-মনস্কভাবেই এসে দাঁড়ালো ড্রেসিং টেবিল-টার সামনে। নিজেকে আয়নায় ফেলে দেখার সাধ। তারপর পাউডারের কৌটোটা তুলে নিয়ে ঘাড়ে গলায় ছিটিয়ে দিতে লাগল।

আবার পিপাসাবোধ। আর সে পিপাসা যেন গলা আর বুকের ভিতরে সমানভাবে ছড়িয়ে গেল। আবার ফিরল। জল খেলো। খেয়ে মনে হল, এখনো মেটেনি। বুকের ভিতরটা যেন শুকনো কাঠ হয়ে রয়েছে।

ব্রতীন চিঠি দিয়েছে। খামের মাথা ছিঁড়ে খোলা হয়নি এখনো। যেমন এসেছে তেমনই রেখে দিয়েছে। খামের পিঠে যেখানে প্রাপকের ঠিকানা, তারই বাঁ দিকের কোণে প্রেরকের ঠিকানাটাও লেখা রয়েছে। তাছাড়া হাতের লেখাটা ত আজকের নয়, অনেকদিনের চেনা। অতএব বুঝতে যখন পারা গেছে, তখন খুলে আর লাভ নেই কোন। কেননা তিন বছর ধরে চিঠির বয়ান ত একরকমই হচ্ছে। নতুনত্ব কিছু নেই। বুঝতে পারছে ও সবই। দুজনের মাঝখানে দুস্তর ফারাকের মধ্যে একটা সংযোগ রাখার অছিলা মাত্র।

ঘরের বাইরে অদূরে সজনে গাছের ডালে বসে একটা কাক অবিশ্রান্ত সুরে ডেকে চলেছে। আর এই উত্তপ্ত দুপুরে তা যেন বড় বেশী কর্কশ বলে বোধ হচ্ছিল।

চিঠি লিখে লিখে এখনো হয়রান হয়নি ব্রতীন। ও ভেবেছিল চিঠি লিখতে লিখতে আর উত্তর না পেতে পেতে শেষপর্যন্ত নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবে সে। রাগে ও দুঃখে চিঠি লেখা বন্ধ করে দেবে। বছর তিনেক আগে ত শেষ কথাটি শেষবারের মতই বলা হয়ে গেছে। তারপর সব ঝামেলা এড়িয়ে চলে এসেছে এখানে। প্রথম প্রথম চিঠিপত্রের উত্তর দিয়েছে ও। ব্রতীনের চিঠির জন্য অপেক্ষা করেছে। ব্রতীন চিঠি দিয়েছে। ও তা খুলে পড়েছে। পড়তে পড়তে অবশেষে একসময় মনে

মনে মিলিয়ে দেখেছে যে, একই কথা বার বার লিখছে ব্রতীন। সবুর করো, ধৈর্য ধরো। কিন্তু শেষপর্যন্ত ধৈর্য আর থাকে নি। অবশ্য তারপরে দারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়েছে কয়েকটা দিন। এখন আর তেমন অসুবিধে বোধ হয় না। ব্রতীন কিন্তু হাল ছাড়ে নি। এখনো লিখেই চলেছে।

এখানকার এই নিঃসঙ্গতা ও সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। বুকভরা অভিমান নিয়ে চলে এসেছে এখানে। কোন দ্বিধা করেনি, কোন সংকোচের বাধায় থেমে যায়নি মুহূর্তের জন্যও। রুবিদি পত্রমারফৎ ডেকেছিলেন, 'আয়, চলে আয় এখানে, আমার কাছে, ব্যবস্থা একটা কিছু হবেই। উপেক্ষা করেনি ও সে ডাক। সাড়া দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। আর আসতে আসতেই কাজ জুটে গিয়েছিল। আর সেই থেকে ও স্বেচ্ছায় রুবিদিকে স্থানীয় অভিভাবক হিসেবে মনে মনে গ্রহণ করেছিল। যদিও প্রায়ই রুবিদিকে একটি অস্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয়, তবু ওর মনের সঙ্গে বেশ মিলে যায়।

—'কার চিঠি রে?' চিঠি আসতে দেখলেই রুবিদি এরকম একটা প্রশ্ন করেন। এখনো করেন, তখনো করতেন।

—'আমাদের কলকাতার বাড়ি থেকে এসেছে।' বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে উত্তর দেয় ও।

—'তা ভালো, বিয়ে না হওয়া মেয়েদের চিঠি আসতে দেখলেই আমার কেমন যেন ভয় করে।'

—'কিসের ভয় রুবিদি?' বুঝেও খানিকটা অবুঝের মত প্রশ্ন তুলে ও তাকিয়ে থাকে রুবিদির দিকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে রুবিদি বলেন, 'জানি না বাবা, আর তোরাই বা অত দিয়ে দরকার কী?'

ওর আর কথা বাড়াবার সুযোগ থাকে না। চুপ করে যায়। আর সেটাকে মন্দের ভালো বলে ধরে নেয় ও। কেননা, কথায় কথা বাড়ে, এবং সেভাবে ধরা পড়ে যাবার যথেষ্ট ভয় আছে। তাই এ নিয়ে কথা যত কম হয় ততই মঙ্গল।

কিছু নয়, তবু তাই নিয়ে এত ভয়। আজ অবশ্য কিছু আর সত্যি নয়, কিন্তু একদিন এ সবই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচিত হয়েছিল। সে সম্পদের স্বপ্ন আজ নেই। পরিবর্তে এক মহাশূন্যতা যেন ওর চারিদিকে ঘিরে রয়েছে। এখন শুধু মনে মনে স্মৃতির আঁচড় কাটা। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিকে অন্ধকার থেকে টেনে তোলার চেষ্টা।

ভয় অবশ্য রুবিদিকে নিয়ে কোনদিকেই কম নয়। চোখমুখ দেখে তিনি কখন যে কী ভেবে বসেন তার ঠিক নেই।

ঘুম আসে কিনা আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে ইচ্ছে হয় মনে। ইচ্ছে করেই রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করল না। দরজাটা অবশ্য বন্ধ করাই রয়েছে। বালিশে মাথা রাখতে গিয়ে অনুভব করল, বিছানাটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। গা' রাখতে অসুবিধে হচ্ছিল, তবু শুয়েই রইল।

তবু ঘুম এলো না। আসবে না যে সেটা একরকম জানাই ছিল। আর ঘুমুতে গিয়ে যদি ঘুম না আসে তাহলে এমন সব অসংলগ্ন চিন্তা ওর মাথাটাকে জড়িয়ে ধরে যে, শেষ অবধি ও বেশ অবসন্ন বোধ করে তখন। দিনে অথবা রাত্রে যখনই হোক ঘুমের সময় ঘুম দরকার। এই ঘুমের মধ্যে নিজের উদ্বেগ থেকে নিজেকে একটু আড়ালে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তা যেন আর কিছুতেই হবার নয়। কেননা শয়নে জাগরণে কেবল সেই ব্রতীনকেই মনে পড়ে। অথচ এই ব্রতীনকে ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মন থেকে সরিয়ে দিতে চায়। স্মৃতির দেয়াল থেকে ঘষে ঘষে তুলে ফেলতে চায় সেই উজ্জ্বল দাগটা।

—'আমার ভয় করে ব্রতীনদা, কী যে হবে শেষপর্যন্ত আমাদের!' যেদিন শেষ কথাটি শেষবারের মত ও বলে এসেছিল ব্রতীনকে, সেদিন এমনি করেই আসল কথাটা তুলেছিল ও।

—'কী আবার হবে, বিয়েটা হয়ে যাবে।' হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিল ব্রতীন।

বিয়ে! হ্যাঁ, বিয়ে। শুনে যেন বুকের ভিতরটা চনচন করে উঠেছিল। আর সেই-সঙ্গে অনাস্বাদিত একটা শিহরণ যেন বিদ্যুৎ-ঝিলিকের মত ছড়িয়ে গিয়েছিল ওর সর্বাঙ্গে।

—'কিন্তু......।' কিন্তু যেন কি। মনের কথাটা যেন মুখ ফুটে তেমন করে বলা যায় না। তাই পারল না ও কিছু বলতে। টেনে টেনে বাড়াতে পারেনি যে কথা শুনতে সাধ সে কথাটাকে। তবু অনেকসময় বাদে অনেক কষ্টে আবার বলেছিল, 'কই, আমি ত কোন ভরসা পাচ্ছি না।'

—'ভরসা'! অবাক হয়েছিল ব্রতীন। যেন না শোনা কোন কথা জীবনে এই প্রথম শুনল। শুনে তাকিয়ে থেকেছিল ওর মুখের দিকে। সেই বোবা দৃষ্টিটা অনেকসময় ধরে অবিচল থেকেছিল ওর মুখের উপর। আবার একসময় তার দৃষ্টির সামনে থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিতে নিতে ও বলেছিল,—'হ্যাঁ, নিজেকে বড় বেশী নিঃসঙ্গ লাগছে কিনা, তাই ভরসাটাকে এত বেশী করে খুঁজছি।'

হেসেছিল ব্রতীন। একটা অস্বাভাবিক হাসি। তেমনি হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'তুমি কি আমার কাছ থেকে মুচলেকা আদায় করতে চাইছ?'

না গো না, তুমি এমন করে ছোট ভেবো না আমাকে। মনের ভিতরে এ কথাটাই উথলে উঠেছিল। কিন্তু মুখ ফুটে আর বলল না। কেননা ব্রতীনের কথাগুলি বড় বেশী রুক্ষ লাগছিল। সুরটাও ছিল দারুণ অস্বাভাবিক।

তারপর একসময় নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, 'একেবারে এমন করে ভাবলে তুমি কথাটাকে?'

—'জ্ঞানী গুণীরা বলেন, মেয়েরা বিচিত্র-রূপিণী, তোমাকে যেন আজ সেরকমই মনে হচ্ছে।'

চমকে উঠেছিল ও। কী আশ্চর্য, ব্রতীন কি এ রকমেরই এক সাংঘাতিক মানুষ! কাটা কাটা কথায় ওকে যেন ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে চাইছে। একবার অতিকষ্টে ব্রতীনের মুখের ওপর দৃষ্টিটা তুলে ধরেছিল। তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকেনি ও ব্রতীনের মুখোমুখি। ধীর পদক্ষেপে সরে এসেছিল ব্রতীনের সামনে থেকে।

নিজের ব্যক্তিত্বের গোপন কোণে সেদিনই প্রথম কুয়াশা জমে উঠেছিল। নিজের ভিতরে একটা ঘৃণারও উদ্ভব হয়েছিল সেদিন। নিজের কানে যে তীক্ষ্ন বিদ্রুপভরা কথা ও শুনেছে, তার যদি শত-ভাগের একভাগও সত্য হয় তাহলে ব্রতীনকে ভুলে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো পথ।

সেই থেকেই সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার বাসনাটা ওর মনকে আঁকড়ে ধরেছিল। হ্যাঁ, ওর এই অবস্থাটাকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার সঙ্গেই তুলনা করে ও। সমুদ্রেই ঝাঁপ দিয়েছে। ব্রতীনকে ছাড়তে হল বলে, ছেড়েছে আত্মীয়, স্বজন, ঘর বাড়ি সব। অকূল সমুদ্রের সীমা নেই জেনেও অসীমের বুকে ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেকে। কলকাতার কেউ অবশ্য বুঝতে পারে নি যে, কেন এমন করে ও কলকাতা ছেড়ে রুবিদির ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেল। সবাই জানল, বিয়েতে ওর সম্মতি নেই বলে চলে গেল চাকরীর খোঁজে। অবশ্য ও নিজেই সবাইকে সেভাবে বুঝিয়েছে! কিন্তু ব্রতীনও কি তাই বুঝেছে? বোধ হয় তা নয়। এটা যে ওর শুধু চাকরীর জন্য চলে আসা সেটা আর যে-ই হোক ব্রতীনের মনে করা উচিত নয়। এসেও যা দু' চারখানা চিঠি দিয়েছে ব্রতীনকে, তাতেও স্পষ্ট করেই সব বলা হয়েছে।

আর ব্রতীনও সেই থেকে চিঠি দিয়ে যাচ্ছে। একই কথা বার বার লিখে চলেছে. ......'এমন করে কেন যে আমার কাছ থেকে চলে গেলে সেটা আমার কাছে এখনো একটা রহস্য, এত সাধারণ ব্যাপারটাকে এত অসাধারণভাবে গ্রহণ করবে সেটা বুঝি নি, আমাকে ভুল বুঝো না, এখনো আমি তোমাকেই মনে করে রেখেছি, সময় হলেই সব ব্যবস্থা পাকা করে নেব।'

ব্রতীনের এ চিঠিগুলি পড়লেই ওর কেন যেন হাসি পায়। ধৈর্য ধরতেও অনুরোধ করে। সেটাও এক হাস্যকর কথা! কিসের ধৈর্য, কেন ধৈর্য, অযথা কথা বাড়িয়ে আর কোন লাভ নেই।

গরম পড়েছে। বেশ গরম। বাইরে উত্তাপ। ঘরে গুমোট। বাতাস যেন আর নিঃশ্বাস ফেলতে চাইছে না। যা-ও দু' এক ফোঁটা বাতাস ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে আসছে, তা-ও মুখে করে নিয়ে আসছে আগুনের হল্কা। অতএব সবটাতেই এক অসহনীয় অবস্থা। ঘুম কি এতে আসবে? আসবে না।

এ সময়ে এ অবস্থায় প্রায়ই ওর মনে হয় চাকরীটা যদি ওর দুপুরে হত। তা হলে দুপুরের এই নিঃসঙ্গতা অযথা চিন্তার দায়, উত্তাপের বাহুল্য,—এগুলো কিছুই ওকে স্পর্শ করতে পারত না।

খাওয়াদাওয়ার পরে রুবিদি একবার আসেন। এসে খানিকসময় বসে দু' চারটে কথা বলেন। তারপর ঘুম আসে তাঁর। তিনি চলে যান। সেই থেকে বিকেল অবধি ওকে এই নিদারুণ নিঃসঙ্গতা ভোগ করতে হয়।

একবার মনে হল ব্রতীনের চিঠিটা খোলা যাক। দেখাই যাক না কী আছে ওতে! নতুন কিছু অবশ্য নেই। সেটা ও না দেখেও বলতে পারে। তবু পুরনো কথা-গুলিই আবার পড়া যাক না। ক্ষতি ত নেই। এমনিতেই ত সময় কাটছে না।

কিন্তু ব্রতীন কেন চিঠি লেখে? তারই বা কী দরকার এত তোষামোদের? এখন ত আর তার সামনে কোন বাধা নেই, অতঃপর সময় হলে দেখেশুনে একটা বিয়ে করলেই ঝামেলা চুকে যাবে। বালিশের নিচে হাত দিয়ে দেখল, চিঠি ভর্তি খামটা রয়েছে ঠিক। তবু ওটা খুলল না। মনটা সেই আগের মতই অনমনীয়।

আবার মন জুড়ে এসে হাজির হলেন রুবিদি। কী আশ্চর্য মানুষ এই রুবিদি। মুখ ফুটে নিজের কথা নিজে কিছুই বলেন না। কিন্তু ও সুনীতিদির মুখে সব শুনেছে। প্রথম জীবনে রুবিদিও প্রেমে পড়েছিলেন। তখন আসামে থাকতেন তিনি। সে কাহিনীটি সুনীতিদি রুবিদির মুখেই শুনেছিলেন। রুবিদির সেই ভালোবাসার পুরুষের অনেকগুলি চিঠিও নাকি সুনীতিদিকে দেখিয়েছিলেন রুবিদি। শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে ওর মতই রুবিদি চলে এসেছিলেন এখানে। সেই থেকেই পুরুষ-মানুষের উপর রুবিদির একটা রাগ।

তাই সম্ভবত রুবিদির চোখে এক সাবধানী দৃষ্টি সব সময়ের জন্য লেগেই রয়েছে। ও লক্ষ্য করেছে এ সব, অনেক দিনের অনেক অভিজ্ঞতা যেন তাঁর চোখে মুখে স্পষ্ট। মনে হয় যেন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক পথঘাট মাড়িয়ে অবশেষে এখানে এই এতদূরে এসে হাজির হয়েছেন

তিনি। এবং এখন ওকে একজন অভিজ্ঞের মত সাবধান করে দিতে চাইছেন।

তবে ও রুবিদির বক্তব্যকে অনেকখানি সমর্থন করে। সেই যে রুবিদি বলেছিলেন, 'পুরুষের মনে প্রেম ট্রেম বলে কিছু নেই, আসলে ওটা ওদের কাছে একটা খেলা মাত্র।'

—'তাই নাকি?'

—'তা ছাড়া আবার কি, খেলা খেলা খেলে, তারপর সরে পড়ে।'

ও ভেবেছিল, রুবিদি বোধহয় মন উজার করে এই নিজের গল্পটা ওর কাছে সবিস্তারে বলবেন। কিন্তু না, রুবিদি সেদিক দিয়ে গেলেন না। তিনি আবার বললেন, 'মন বলেও কিছু নেই ওদের।'

তা বটে। অবাক হয়েছিল ও। রুবিদির মুখের দিকে তাকাতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল ওর। তবু একবার তাকিয়ে দেখেছিল তাঁর মুখখানা।

তারপর রুবিদি আবার বলেছিলেন, 'তাকাচ্ছিস কী, ওরা ত জানে না কী নিয়ে খেলা করে ওরা, মোক্ষম কখনো কখনো মেয়েরাও চালতে জানে।'

অনেক সময় ও নিজেও এই নিয়ে অনেক রকম ভাবনা ভেবেছে। ভেবে ভেবে শেষ অবধি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে যে, রুবিদির কথাই ঠিক। মনে মনে রুবিদিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছে। যেন ঠিক জায়গায় এসে পড়েছে বলে ঠিক ধারণার বশবর্তী হতে পেরেছে।

ব্রতীন আবার চিঠি লিখেছে। অনবরত চিঠি লিখে চলেছে। লিখুক। ও কোন চিঠি লিখবে না। কেন, কী দরকার অসত্যকে দীর্ঘ করে, যা সত্য নয়, যা শুধু প্রতীক্ষার জন্য অনুরোধ জানানো, তাকে আর এই দেওয়া নেওয়ার মাঝখানে রেখে ক্ষতবিক্ষত করে লাভ নেই।

দুপুরে ও কিছুতেই একটু ঘুমিয়ে নিতে পারল না। বিকেল পড়ে আসতে আসতে তাই দেহে একরকমের অবসন্নতাবোধ হতে লাগল। রুবিদির সঙ্গে তাই বেড়াতে বেরুলো একটু। বেরোয় এমনি মাঝে মাঝে। বিশেষ করে এই গরমের দিনগুলিতে বিকেলের দিকে মনটা আর কিছুতেই ঘরে থাকতে চায় না। তাই বেরিয়ে পড়ে বাইরের খোলা হাওয়ায়।

মন্দ লাগছিল না। আধা পাড়াগেঁয়ে শহরের লাল সুড়কির পথ ধরে পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা। ও ভাবছিল, এমন বড় একটা দেখা যায় না। এরকমের ব্যথা দুজনের বুকে চাপা রয়েছে নির্বিঘ্নে। কেউ কাউকে বলছে না বটে, একসঙ্গে দেখা হয়ে গেল ঠিক। অথচ বুকের ভিতরের সেই শক্ত বরফের চাঙা গলছে না কারুরই।

হাঁটতে হাঁটতে রুবিদি বললেন,—'বাইরের হাওয়াটা কি সুন্দর, নারে?'

—'হ্যাঁ, বেশ লাগছে।'

—'তবু ত একটু বাইরে এসে বাঁচা গেল, আর যদি কোন পুরুষের দাসী হতুম, তাহলে কি পারতুম বাইরের খোলা হাওয়ায় এমন ছুটে আসতে?'

ও হাসে। ঘুরে ফিরে রুবিদির সেই এক কথা। কী যে বিচিত্র মানুষ এই রুবিদি! মাঝে মাঝে ওর মনে হয় যদি রুবিদির বুক চিরে দেখা যেত, তাহলে বোধহয় দেখা যেত ব্যর্থ প্রেমের একটা ছবি রয়েছে সেখানে।

একদিন রুবিদি ওকে ডেকে বলেছিলেন, 'কি-রে প্রেম-ট্রেম করেছিস কখনো?'

ওর মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল; বলেছিল,—'দূর দূর, কি যে বলেন আপনি।'

—'না, এমনি বললুম, মেয়েরা ত আবার মোমের মত গলে যেতে ভালোবাসে কিনা, আর পুরুষদেরও তাতেই আনন্দ।'

সেদিনও একবার রুবিদির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল ও। অদ্ভুত সমস্ত কথা শোনা যায় তাঁর মুখে। খুব সাহস আর অনেক অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন সত্য কথাগুলি এরকম প্রাঞ্জল ভাষায় কখনো বলা যায় না।

ওরা হাঁটছিল পাশাপাশি। সন্ধ্যা নেমে আসার উপক্রম হয়েছে। শুরু হয়েছে পাখিদের কল-কাকলী, নীড়ে ফেরার তাড়া। কিন্তু ওর মনটা ভালো লাগছিল না। রুবিদি না বললে ও ঘরে ফেরার প্রস্তাবটা করতে চায় না। ওর যেন মনে হচ্ছিল, কি একটা ভুলের দরুন ওর ঘরের ভিতর কি একটা যেন দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। যেন চাপা দিয়ে এসেছে কোন জীবকে। যেটা এখন দম আটকে আসার তাড়নায় ছটফট করছে। ক্রমাগত যেন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছিল ও। নিজেরও যেন দম আটকে আসছে।

বালিশের নিচে চাপা দেওয়া রয়েছে ব্রতীনের চিঠিটা। যেটা খোলা হয়নি, পড়া হয়নি, শুধু অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে, ব্রতীন লিখেছে ওকে। মনে পড়ল ব্রতীনের করুণ মুখখানা আজ তিন বছর দেখা নেই। তিন বছর। অবশ্য এ-নিয়ে ওর দুঃখ করার কিছু নেই, কেননা, ব্রতীনের উপর রাগ করে ও নিজেই এই নির্বাসন বেছে নিয়েছে।

আর কোনদিন ও ফিরে যাবে না, এ-ও ঠিক। তবু মনের মধ্যে যে স্মৃতির বোঝাটা রয়েছে তাকে ত মুছে ফেলতে পারছে না কিছুতেই। কেবলি মনে পড়ে, কেবলি অশান্ত করে তোলে। কলকাতার গঙ্গার ধারে বসে একদিন ব্রতীন বলেছিল, 'প্রেম হচ্ছে এক উচ্চশ্রেণীর কবিতা, যে কবিতা অবশ্য কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তা' মনের মণিকোঠায় রক্ষিত থাকে, কখনো তা ছন্দের আকারে পরিণতি লাভ করে, কখনো সে পরিণতি লাভ করে না, অর্থাৎ ছন্দের নাগাল পায় না, তাই বলে সেটা যে কবিতা নয়, এটা বলা যায় না।'

ও তখন ঠাট্টার সুরে বলে উঠেছিল,—'হে কবি, তুমি তোমার এই মনোজ্ঞ অভিভাষণের জন্য আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করে এবার থামো।'

ওর মনে হল, ওর জীবনে ভালোবাসাটা পরিণতি লাভ করেনি বটে, কিন্তু অমিল ছন্দের স্মৃতিটা ব্যাপক হয়ে রয়েছে।

রাতের মুখোমুখি ওরা ফিরে এলো। ঘরে ঢুকেই মণিকা বন্ধ করে দিল দরজা। তারপর বালিশের তলা থেকে বার করে নিল ব্রতীনের চিঠি। কাল এসেছে চিঠি। আজ সারাদিন কেটে যাওয়ার পরে এখন খামের মাথা ছিঁড়ল, ভিতর থেকে চিঠিটা টেনে বার করে পড়তে লাগল।

'......অনেকদিন তোমার কোন সাড়া পাচ্ছি না, আমারও ধৈর্যের একটা সীমা আছে। তুমি আমার সঙ্গে কথা না বললে আমিই বা তোমার সঙ্গে বার-বার কথা বলার চেষ্টা করি কেন, যদি তোমার জিদ নিয়ে তুমি অবিচল থাক, তা হলে আমারও জিদ শুরু হল, এই আমার শেষ কথা...।'

হাত পায়ের শক্তি ধীরে ধীরে কমে আসছিল। চিঠিটা ভালো করে শেষ করার আগেই দু-চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল ওর। ঘরের ভিতরকার নৈঃশব্দটা যেন একটা দৈত্যের মত ওর গলা টিপে ধরতে উদ্যত হয়েছিল। কেন, কেন ব্রতীন চিঠি লেখা বন্ধ করবে, না, আর পারছি না, এখনই আমি চিঠি লিখব, কাল সকালের ডাকেই রওনা হবে চিঠি, না, আমার কোন জিদ নেই,—ব্রতীন তুমি চিঠি লেখা বন্ধ করে আমাকে একেবারে নিঃসঙ্গ করে দিও না। মনে মনে কথাগুলি আউড়ে বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারতের চৌদ্দটি সরকারী ভাষার কোথায় কি যে রচিত হচ্ছে তা জানা সহজ নয়। ভারতের এতগুলি ভাষা শেখার চেয়ে য়ুরোপের কটি দেশের ভাষা শেখা হয়ত সহজ। কিন্তু আমরা জাতীয় সংযোগের কথা চিন্তা করি। সারা ভারতকে অখন্ড হিন্দুস্থান হিসাবে ভাবার প্রয়াস করি, তাই সবাগ্রে প্রয়োজন সবক'টি ভাষাগোষ্ঠীর সারস্বতকর্মের যথাযথ সংবাদ সম্পর্কে অবহিত থাকা। পারস্পরিক সংযোগ এবং মানসিকতার ঐক্য বজায় রাখার প্রয়োজনে ভারতের সকল অঞ্চলের সাহিত্যকারদের চিন্তার ফসল সকল শিক্ষিত ভারতীয়ের সম্পত্তি। কোনো একটি বিশেষ অঞ্চল নয়, সমগ্র ভারতের সাহিত্যসেবী আমাদের আত্মীয়, এই মনোভাব কিন্তু আজো গড়ে ওঠেনি।

কতকটা এই মৈত্রীর সন্ধানে অল ইন্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্স বা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রাইটার্স কনফারেন্স বা পোয়েটস্ কনফারেন্স দুই সর্বভারতীয় সভা সাফল্য-মন্ডিত হলেও, একশ্রেণীর বাঙালী সাহিত্যিক নৈবেদ্যের কলা-মুলার অংশ না পেয়ে কিছু কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করেছেন তাও আমরা দেখেছি। কিন্তু হাতি যখন বাজারের পথে চলে যায়, তখন তার আশেপাশে অনেক ক্ষুদ্র জানোয়ার কলরবের সোরগোল তুলে প্রতিবাদ জানায়। হাতির যাত্রাপথে অবশ্য বিঘ্ন ঘটে না। এইসব সভা-সম্মেলনের ক্ষেত্রেও তাই, বিরোধিতা হবে, সবাই সব-কিছু প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেন না, তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকাও উচিত নয়। সর্বভারতীয় লেখকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং সেই সঙ্গে তাঁদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' নামক দৈনিকের রবি-বাসরীয় সংখ্যায় নিয়মিতভাবে হিন্দি লেখকদের বিস্তারিত পরিচয় লিখছেন বিখ্যাত লেখক প্রভাকর মাচাওয়ে। এইসব প্রবন্ধে বিখ্যাত লেখকদের জীবনীপ্রসঙ্গ, সাহিত্যকর্ম ইত্যাদির সঙ্গে একখানি বৃহৎ আয়তনের ছবিও ছাপা হয়। (দুঃখের বিষয় বাঙলাদেশের কোনো ইংরাজী দৈনিকে বাঙালী লেখকদের সম্পর্কে এমন আলোচনা প্রকাশিত হয় না. এই দেশে জীবিত স্বদেশী লেখক সম্পর্কে কোনোরকম প্রচার যেন অবাঞ্ছনীয়)। আমাদের দেশের উৎসাহী পাঠকদের উচিত এই বিষয়ে তাঁদের দাবী জানানো।

সর্বভারতীয় লেখকবৃন্দ কি চিন্তা করেন, কি ধারায় রচিত হয় বিভিন্ন অঞ্চলের কবিতা ও কাহিনী, তা জানা আজ বিশেষ প্রয়োজন বিশেষতঃ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে। আমরা লক্ষ্য করেছি, বাঙলার বাইরে বাঙলা সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের যেমন সম্মান আছে, আবার তেমনই ঈর্ষা আছে। বাঙালী সাহিত্যিকদের কর্মকান্ডের সঙ্গে বাঙলার বাইরের সাহিত্যিকরা তেমন ওয়াকিবহাল নন। সুখের বিষয় কয়েকজন উৎসাহী অবাঙালী লেখক আছেন, যাঁরা বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁরা বাঙলা শিখেছেন বাঙালী লেখকদের মূল রচনা পাঠের উদ্দেশ্যে। সম্ভব ক্ষেত্রে তাঁরা বাঙলা কবিতা এবং গল্প অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করছেন। এই সংবাদ নিঃসন্দেহে আশার কথা।

কিন্তু আজকের প্রসঙ্গ মূলতঃ এই হলেও মুখ্যতঃ ভিন্ন। একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার নাম 'টেলস্ ফ্রম মডার্ন ইন্ডিয়া'। এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন কে নটবর সিং। তিনি একটি ভূমিকাও লিখেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন নিউ ইয়র্কের ম্যাকমিলন কোম্পানী।

এই পর্যন্ত সংবাদটি শুভ। নটবর সিং-এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই নাকি প্রথম খন্ড, এরপর আরো খন্ড প্রকাশিত হবে মার্কিন পাঠকদের সঙ্গে ভারতীয় লেখকদের পরিচয় সাধন করা হল এই প্রকাশনের উদ্দেশ্য। নটবর সিং ভূমিকায় বলেছেন, ইতিপূর্বে কয়েকটি ভারতীয় গল্পের সঞ্চয়ন প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেইগুলি আঞ্চলিক গল্পের সংকলন, যথা, বাঙলা, হিন্দি ইত্যাদি, কিন্তু সর্বভারতীয় গল্প-লেখকদের গল্প-সংকলন আর প্রকাশিত হয়নি। তাঁর এই উক্তি সত্য নয়। সর্বভারতীয় গল্পের একাধিক সঞ্চয়ন-গ্রন্থ আমরা দেখেছি, তবে তার সংগ্রহ অনেক সময় খাপছাড়া। কোথাও শুধুমাত্র মৃত লেখকদের রচনা সংকলিত হয়েছে, কোথাও মৃতের সঙ্গে দু-একজন

আধুনিক ভারতীয় গল্প

জীবিত সাহিত্যিকেরও দর্শন পাওয়া যায়। তবে এইসব সংকলন অনেক সময় উপযুক্ত রচনা নির্বাচন করে বিশ্বের দরবারে হাজির করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ, যেন তেন প্রকারেণ গল্পগুলি নির্বাচিত হয়েছে এবং তার পিছনে কিঞ্চিৎ তদ্বির ও উমেদারীও আছে। এইসব স্থলে সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা হল যদি আঞ্চলিক ভাষায় কোনো গল্প-সংকলন থাকে, সেইখান থেকে গল্প নির্বাচন করা। বাঙলা ভাষায় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সর্বজন-শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকরা কয়েকখানি গল্প-সংকলন সম্পাদনা করেছেন। নরেন্দ্র দেব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতি কবিরাও কয়েকখানি কবিতা-গ্রন্থ সংকলন করেছেন। অন্য আঞ্চলিক ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ থাকা সম্ভব। নির্বাচনের পক্ষে সেই ব্যবস্থা সর্বোত্তম।

নটবর সিং বলেছেন, আঞ্চলিক ভাষায় গল্প-সংগ্রহে সেইসব অঞ্চলের ভাষায় লিখিত গল্প আছে কিন্তু ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভারতীয় লেখকদের গল্প নেই। ইংরাজী ভাষায় যেসব ভারতীয় লেখক গল্প লিখে থাকেন, তাঁদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া আর সকলের গল্পই বর্তমান ভারতীয় গল্প-সাহিত্যের নিরিখে অপাঠ্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই বাঙলাদেশের স্কুল-ম্যাগাজিনেও তার চেয়ে উচ্চমানের গল্প প্রকাশিত হয়। এই সংগে আর এক বিতর্ক ওঠে, ইঙ্গ-ভারতীয় ইংরাজী ভাষানবীশ লেখকরা কি আধুনিক ভারতের মানসিকতার উপযুক্ত প্রতিনিধি? এইসব কারণে, নটবর সিং-এর এই সঞ্চয়নটি মূল্যহীন মনে হয়েছে। তাঁর গ্রন্থে অবশ্য ইঙ্গ-ভারতীয় লেখকদের মধ্যে মুলকরাজ আনন্দ, রাজা রাও, আর কে নারায়ণ, খুসবন্ত সিং ও শান্তা রামারাও-এর গল্প সংকলিত হয়েছে। ভবানী ভট্টাচার্য, বেগম আতিয়া হোসেন, সুধীন ঘোষ প্রভৃতি লেখকের কথা সম্পাদকের মনে জাগেনি। এই সংগ্রহের কুড়িটি গল্পের মধ্যে নয়টি এই ইঙ্গ-ভারতীয়দের রচিত, আর বাকী রচনা তের-জন ভারতীয় লেখকের। তার মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং প্রেমচন্দ। রবীন্দ্র-নাথের গল্প ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত, শরৎ-চন্দ্রের এবং প্রেমচন্দের গল্পও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রচিত। এইসব গল্পকে কি আধুনিক ভারতীয় গল্প বলা যায়?

আধুনিক তামিল গল্পের এই সংগ্রহের প্রতিনিধি হলেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। তাঁর গল্পটি প্রাচীন রীতির এবং অনেক নীতিকথায় পরিপূর্ণ। পাপ এবং অনু-তাপের এই জাতীয় গল্প আঠার শতকে প্রচলিত ছিল। গল্পের শেষে—

> He is now a samiar or ascetic, who conducts the school in the Mariamman Temple".

এই গ্রন্থের ইঙ্গ-ভারতীয় গল্পগুলির মধ্যে ডঃ মুলকরাজ আনন্দের 'দি বারবারস ট্রেড ইউনিয়ন' অন্ততঃ অর্ধ-ডজন সংকলন-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। দুটি ক্ষুরে গল্প আছে আর কে নারায়ণ, রাজা রাও এবং খুসবন্ত সিং-এর। শান্তা রামারাও রচিত 'হুকেয়ারস' গল্পটি চমৎকার। তথাপি এইসব গল্পের য়ুরোপীয় জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গল্পগুলি পাঠযোগ্য মাত্র, গল্পের মধ্যে হৃদয়গ্রাহীতা বা আশ্চর্য চমক কোথাও নাই। বৈচিত্র্য নাই, বৈশিষ্ট্য নাই। মানবিক স্পর্শে কোনো গল্প অন্তরকে স্পর্শ করে না। আর কে নারায়ণের রচনা অবশ্য উপভোগ্য বলা চলে। ইঙ্গ-ভারতীয় লেখকদের মধ্যে নারায়ণের রচনা সর্বদাই উপভোগ্য। রাজা রাও-এর ভাষা অতিশয় সরল।

এইসব লেখক ছাড়া মারাঠী লেখক পি বি ভাবে, উর্দু লেখক কিষণচন্দর, মালায়ালাম লেখক তাজাকি শিবশঙ্কর পিল্লাই এবং তেলেগু লেখক পদ্মরাজুর গল্পও আছে। নটবর সিং-এর প্রচেষ্টা অবশ্য প্রশংসনীয়।

—অভয়ঙ্কর

TALES FROM MODERN INDIA —Edited with Introduction and notes by K. NATAWAR SINGH: The MacMillan Company, N. York—Price 6 Dollars and 95 cents only. (274 Pages).

ভারতীয় সাহিত্য

রবীন্দ্র ভবন রক্ষার দাবীতে মৌন মিছিল ॥

গত ২২শে শ্রাবণ, রবীন্দ্র-তিরোভাব দিবসে কলকাতায় একটি বিরাট মৌন মিছিল বের হয়। এই মিছিলটি পাক-ডেপুটি হাই-কমিশনার অফিসে গিয়ে পূর্ববাংলায় সাজাদপুরের রবীন্দ্রভবনটি রক্ষার জন্য দাবী জানায়।

মিছিলটির শুরু হয় উত্তর কলকাতার রবীন্দ্রকানন থেকে। মিছিলকারীদের রবীন্দ্রনাথের কিছু উধৃতি লিখিত পোস্টার বহন করে নিয়ে যেতে দেখা যায়। পাকিস্তান ডেপুটি হাই-কমিশনের অফিসের সামনে গেলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। তখন মিছিল থেকে একদল প্রতিনিধি কমি-শনের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে স্মারক-লিপিটি দিয়ে আসেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন—সুহৃদ রুদ্র, বীজেশচন্দ্র সেন, অমল সরকার ও ভি বালসারা। সবিতাব্রত দত্তও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

পাক ডেপুটি হাই-কমিশনারের হাতে যে-স্মারকলিপিটি পেশ করা হয়, তাতে লেখা ছিল—"পূর্ব পাকিস্তানের সাজাদপুরে অবস্থিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহাসিক বাসভবনটি দুর্ভাগ্যবশত অব-হেলায় বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে বলিয়া আপনার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত আমাদের এই স্মারকপত্র। আমরা এ-কথা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, দুই বাংলার মধ্যে প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাহা আরও সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের চাইতে আপনারাও কোন অংশে কম নন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী বাসভবনটি এবং স্মৃতিবিজড়িত জিনিসপত্রগুলি যদি ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের জন-সাধারণের মতই পূর্ব পাকিস্তানবাসীরাও ব্যথিত ও মর্মাহত হইবেন। এই সকল কারণে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ জন-সাধারণের এই মনোভাব আপনার সরকারকে জানাইবেন।"

এই প্রতিবাদ মিছিলটি রবীন্দ্রমেলার উদ্যোগে আয়োজিত হয়।

রবীন্দ্র-স্মরণ সভা ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ২৭-তম মৃত্যু-দিবস গত ২২শে শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য। ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন— "কবিগুরুর স্নেহ এবং আশীর্বাদ এই প্রতিষ্ঠানকে পথচলার এবং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার আলো দেখাবে।"

সকালে ছাত্র-ছাত্রীরা আশ্রম-প্রাঙ্গণে বৈতালিক গান পরিবেশন করেন। রবীন্দ্র-ভবনে কবিগুরুর জীবন ও রচনাবলীর এক প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়।

রাজিয়া সাজ্জাদ জাফরির সংগে ॥

শ্রীমতী রাজিয়া সাজ্জাদ জাফরি সাম্প্রতিক উর্দু সাহিত্যের একটি খুবই পরিচিত নাম। ১৯১৭ সালে রাজস্থানের

অন্তর্গত আজমীরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তা ছিল খুবই রক্ষণশীল। মুসলমান ধর্ম বা সাহিত্য-বিষয়ক কোনও গ্রন্থ ছাড়া তাঁর আর কিছু পড়বার সুযোগ-সুবিধা ছিল না। কিন্তু ১৫ বছর বয়সের সময়েই তাঁর চিন্তার জগতে একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থটি পাঠ করার পর এক নতুন চেতনা-বোধ তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে। প্রখ্যাত লেখক সর্দার জাফরির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এটিও তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরবর্তীকালে রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনে যোগদানের মৌল প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন এখান থেকেই। এপর্যন্ত তাঁর 'সাব্রেসাব', 'কাঁটে', 'সুমন' নামে তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে দুই শতাধিক ছোটগল্প এবং অগণিত প্রবন্ধ। ছোটদের জন্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'নেহরু কা ভাতিজা' এবং 'গালিব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ সালে তিনি 'সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার' লাভ করেন। অনুবাদক হিসেবেও তাঁর পরিচিতি সর্বজনবিদিত। 'অমৃত'র প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। এই সময় তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা হলে তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন, তা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রশ্ন—কবি-সম্মেলনের কি কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে?

উত্তর—নিশ্চয়ই আছে। আমি শুধু কবি-সম্মেলনে বিশ্বাস করি না, কবিতার আন্দোলনেও বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন—কারও কারও ধারণা কবিতার অনুবাদ হয় না। আপনি কি মনে করেন?

উত্তর—অনুবাদ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহিত্যকর্ম। তবে এ-কথাও ঠিক—কবিতার অনুবাদ একটি খুব দুরূহ কাজ। ভাল কাব্যিক অনুবাদের জন্য এক বিশেষ ধরনের প্রতিভা প্রয়োজন। আমি নিজে প্রায় ২০টি গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করেছি। এর জন্য যে কি ভীষণ পরিশ্রম ও নিষ্ঠা প্রয়োজন, তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। বর্তমানে ভারতীয় ভাষাগুলির অনুবাদ দরকার। এক্ষেত্রে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির আদর্শ অনুসরণ করা যেতে পারে—অর্থাৎ 'ইনডাইরেক্ট' অনুবাদ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ভাষায় ইংরেজি অনুবাদ হলে, তা থেকে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা সহজতর হবে। ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কেও আমাদের একশ্রেণীর লোকের একটা যেন অনীহা আছে, আবার কেউ কেউ ইংরেজি অনুবাদের নাম নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। আমার মনে হয়, এ-প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা নয়, তাদেরই মানদণ্ডে এটি বিচার করা উচিত।

প্রশ্ন—সমাজগঠনে লেখকদের কি কোনও ভূমিকা আছে?

উত্তর—বিরাট ভূমিকা আছে। আর এই কারণেই আমার মনে হয়, সাহিত্য-সম্মেলন বা কবি-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কবি এবং লেখকরা বিভিন্ন সম্মেলনে মিলিত হয়ে সাহিত্য ও শিল্প-বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। যাঁরা মনে করেন, সম্মেলন সাহিত্যকে কোনও সাহায্য করে না, তাঁরা একটা জিনিস ভুলে যান যে, লেখক বা শিল্পীদের কেউ-ই স্বয়ম্ভু নন।

প্রশ্ন—বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

উত্তর—ভারতবর্ষের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সাহিত্য হল বাংলা। সত্যি কথা বলতে কি বাংলাতে প্রথম বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য অনেক পরে তা গ্রহণ করে।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রদর্শনী ॥

গত ১১ অগাস্ট উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের ১১০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। উৎসব উপলক্ষে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে এমন কিছু গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়, যা সত্যিই অভিনব। উৎসাহীদের প্রদর্শনীটি ভালো লাগবে বলে আশা করা যায়।

'হাওড়া বার্তা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা দিবস ॥

গত ৯ আগস্ট 'হাওড়া বার্তা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ বিজয় ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে বহু গুণীজনের সমাগম ঘটে। উৎসব উপলক্ষে একটি পুস্তক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ।

বিদেশী সাহিত্য

সাদা কালোর সমস্যা ॥

সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের সর্বাধিক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় পাশ্চাত্য সাহিত্যে। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে অবশ্য নির্ণীত হয় বিষয়ীর তারল্য এবং গাম্ভীর্য।

সম্প্রতিকালে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গনির্বিশেষে নিগ্রো-জীবনের নানাদিক নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ায় গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে প্রচুর। বেশির ভাগ লেখকই অবশ্য গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন কালো মানুষদের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনাকে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে রবার্ট কোলের 'ডেড অ্যান্ড স্কুল' নামে একটি উপন্যাস। এতে কোন নিগ্রো ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার মৌল সমস্যাটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এর আগেও তিনি 'চিলড্রেন অব ক্রাইসিস' নামে একটি সমস্যামূলক উপন্যাস লিখে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক একটি কৃষ্ণাঙ্গ দম্পতির মনোবেদনার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই দম্পতি চান, তাঁদের ছেলেমেয়েরা য়ুরোপীয় বিদ্যালয়ের উন্নত পরিবেশে মানুষ হোক। কিন্তু প্রচলিত প্রথা অনুসারে তা সম্ভব নয়। বর্ণভেদের প্রচ্ছন্ন সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে সকলেরই সমাজবিবেক পর্যন্ত বিপর্যস্ত। লেখকের সহানুভূতির স্পর্শে প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। উপন্যাস শিল্পকৌশলের দিক থেকেও পাঠকমহলে প্রশংসিত।

নতুন ধরনের উপন্যাস ॥

বয়সের দিক থেকে প্রৌঢ় হলেও পশ্চিম জার্মানীর লেখক উলফগ্যাং হিলডেশিমার-এর প্রথম উপন্যাস 'টাইনসেট' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। মাত্র তিন বছরের মধ্যে পৃথিবীর বহু ভাষায় উপন্যাসটি অনূদিত হয়েছে।

সম্প্রতি হামবুর্গে তাঁর নতুন উপন্যাস 'মেনুয়া'র পাণ্ডুলিপি পাঠের একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বহু সমালোচক তার ভালোমন্দ উভয় দিক নিয়েই আলোচনা করেন।

'মেনুয়া' অবশ্য কোন লোকের নাম নয় —একটি জায়গার নাম। এর নায়ক এক উদ্বাস্তু। তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পর্যায়ক্রমে এবং সাংকেতিকতার আশ্রয়ে। উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। লেখক যখন সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী বর্ণনা করে প্রত্যেক অনুসরণকারীর প্রোটোটাইপ হিসেবে কোনো বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করেন, তখন প্রায় একই সময়ে তিনি বোঝাতে চান যে, কিভাবে এই লোকগুলিই আবার শক্তিশালী আধিপত্যের অধীনে এসে ভৃত্যের মতো কাজ করে।

হিলডেসিমারের জন্ম হয় ১৯১৬ সালের হামবুর্গ শহরে। বহু বছর তিনি সুইজারল্যাণ্ডে কাটিয়েছেন। লেখক এ-উপন্যাসের নায়ক, তার অনুসরণকারী ও আমাদের সময়কে যারা তাড়া করে ফিরছে, তাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

স্প্লেনডিড্ পেপার ॥

অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী রচনা করতে গিয়েও পাশ্চাত্য লেখকেরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের দিকেও অঙ্গুলি সংকেত করে থাকেন। যেমন—প্রেম, বিবাহ, ডাইভোর্স, আত্মহত্যার চেষ্টা মদ্যপানের অভ্যাস, নারী আসক্তি প্রভৃতি ঘটনা প্রায়শ উপন্যাসের মতো মনোরম বলে বোধ হয়।

সম্প্রতি অ্যালেন অ্যানড্রুস লিখেছেন উইনস্টন চার্চিলের কাকা মোরটন ফ্রিওয়েনের একটি জীবনবৃত্তান্ত। লেখক অত্যন্ত সরস ভাষায় ফ্রিওয়েনের জীবনের অপ্রকাশ্য কাহিনী বলে গেছেন।

একজন প্রখ্যাত রাজনীতিকের বংশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি সুখ সৌভাগ্য, আনন্দ ও উপযুক্ত সম্মানজনক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে ছিলেন।

বইটির চাহিদা এখন ঊর্ধ্বমুখী।

প্রথম যৌবনের দিনগুলি ॥

তারুণ্যের মনোরম সঙ্গীত চিরকাল মানুষের মনে রমনীয়তার আস্বাদ নিয়ে আসে। গল্পে, উপন্যাসে, স্মৃতিচারণায় এই সময়ের উত্তাপ প্রায়শ রহস্যময়তার আবরণ সৃষ্টি করে। সম্প্রতি রিচার্ড ব্র্যাডফোর্ড—'রেড স্কাই অ্যাট মর্ণিং' উপন্যাসে প্রথম যৌবনের স্বপ্নময়তাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

এই উপন্যাসের নায়ক জোশ মার্নল্ড-এর বয়স সতের বছর। প্রথম যৌবনের আলো তার চোখে-মুখে, কিন্তু চতুর্দিকে দুরন্ত সময়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বাজনা বাজছে সর্বত্র। তার বাবা কাজ করেন নৌবিভাগের স্বেচ্ছাবাহিনীতে। তার মা তাদের দক্ষিণের বসবাস ছেড়ে চলে যান কোরাজোন স্যাগ্রাডোতে। এই শহরটি নিউ মেক্সিকোর পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত।

কিন্তু এখানে এসে সুখে থাকতে পারেননি তার মা। এখানকার অধিকাংশ মানুষ আদিবাসী, পথঘাট নোংরা। সেজন্যে তিনি সর্বদাই তাদের এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু জোশের জীবনে তখন যৌবন নেমে আসছে জোয়ারের বেগে কোনো মেয়েকে ভালোবাসার প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করে সে মনে মনে। তবু সাহস হয় না এখানকার আদিবাসী যুবতীদের সঙ্গে প্রেম করতে। ঘটনাক্রমে সে হাক ফিন আর হোল্ডেন কলফিল্ডকে পছন্দ করে। এবং একই সঙ্গে উপলব্ধি করে কৈশোরের সঙ্গে প্রচলিত সমাজবিবেক ও মানুষীয়ানার কোনো যোগ নেই।

উপন্যাসটির লেখক ব্র্যাডফোর্ডের বয়স এখন মাত্র ছত্রিশ বছর। মনে হয়, লেখকের তারুণ্য নায়কের ওপরে আরোপ করা হয়েছে। সংলাপ ও ভাষা ব্যবহারে উপন্যাসটি আঞ্চলিকতাগন্ধী।

সুলভ উপন্যাস ॥

আজকাল সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার ও মধ্যযুগীয় চরিত্রের খোঁজ-খবর পাওয়া যায় বটতলামার্কা উপন্যাসের 'কাহিনী-বিন্যাসে'। এককালে বেশ কিছুসংখ্যক সৎ, সরল, খল, ভয়াবহ, মানবীয় এবং দানবীয় চরিত্র মিলে এক-একটি বিচিত্র উপন্যাস গড়ে তুলতো। এখন আর তেমন নির্ভেজাল অপরাধী কিংবা সৎ মানুষের সন্ধান মেলে না।

তবু নাথানিয়েল বেঞ্চলে তাঁর স্বভাব-সুলভ অতিকল্পনায় সেরূপ কিছু মানুষের সন্ধান দিতে পেরেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'ওয়েলকাম টু জানাডু'তে এক অদ্ভুত ধরনের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। কাহিনী গঠনের দিক থেকেও উপন্যাসটি পুরোনোপন্থী। যুবক-ভীত মেয়েদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার স্বন্দ্ব আমদানি করে তিনি উপন্যাসটির আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করেছেন।

লেখক বেঞ্চলের বয়স এখন বায়ান্ন বছর। তাঁর পিতা রবার্ট বেঞ্চলে ছিলেন একজন হিউমারিস্ট। তিনি নিজেও একজন সফল কমিক-ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত।

ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গ ॥

ভিয়েৎনাম সম্পর্কে পৃথিবীর সব দেশেই বহু বই লেখা হয়েছে। কেউ লিখেছেন পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। কিন্তু প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে বই লেখা হয়েছে খুবই কম। অনেকক্ষেত্রে ঘটনা অতিরঞ্জিত এবং প্রায়শ মূলবিষয়ের সঙ্গে সংযোগ-হীন।

সম্প্রতি কার্ডিন্যাল প্রেস 'ভিয়েতনাম' নামে একটি তথ্যাশ্রয়ী গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। লেখক উত্তর ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট হো চি মিন। সমালোচকদের কেউ কেউ গ্রন্থটিকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করেন।

ভিয়েতনাম স্টাডিজ ও অন্যান্য পুস্তক-পত্রিকা থেকে তথ্যসংগ্রহ করে বইটিকে পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য করার চেষ্টা হয়েছে।

নতুন বই

কান্ত-পদ-লিপি : কথা—রজনীকান্ত সেন। স্বরলিপি—নলিনীকান্ত সরকার। প্রকাশক —শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী।

খেয়াল ভেঙে রাগসংগীত এবং রাগ-সংগীত থেকে আধুনিক সংগীতধারার উদ্গাতা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। গানের বন্যায় বাংলা দেশকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন যখন তখন তারই কিছু পরে বাংলা গানের আর একটি ধারা রবীন্দ্রানুগামী হয়েও রবিপ্রভাব মুক্ত প্রকাশভঙ্গীর এক মৌলিক ও অন্তরস্পর্শ আবেদনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই ধারাটি প্রবহমান রেখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল ইসলাম। গত একশত বছরের বাংলা গানের সংগে সমৃদ্ধিময় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল এ'দেরই সম্মিলিত অবদানে। এ'দের প্রায় সকলের গানের একাধিক পুস্তক ও স্বরলিপি আছে রেকর্ডের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু কান্ত-কবির কান্তকোমল পদ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও একমাত্র স্বল্প কয়েকজনের স্মরণে ছাড়া, কোন লিখিত স্বরলিপি বা অন্য কোন প্রামাণ্য উৎস ছিল না যা কালের সীমা পার হয়েও কবির সৃষ্টিকে অমর করে রাখতে পারে?

শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত সরকার এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। কারণ তরুণ বয়স থেকেই তিনি কান্ত-কবির গান বহু আসরে শুনেছেন, বহু লোকের কাছে শিখেছেন এবং ওঁর নিজের ভাষায় 'গানগুলির সুরের শুদ্ধতা সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় ছিল না। কারণ বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন আসরে বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠে ঐ একই সুরে গান-গুলি শুনতাম।'—

সম্প্রতি নলিনীবাবু তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্চিত এবং বহু পরিশ্রম-চয়িত সংগীতগুচ্ছের একটি স্বরলিপিপুস্তক **'কান্ত-পদ-লিপি'** প্রকাশ করে বিদগ্ধ রসিকসমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

বাংলা গানের অনুসন্ধানী শিল্পীরা এই পুস্তক থেকে রজনীকান্তর গান ও সুর সংগ্রহ করে কবির সুললিত ভক্তি ও আবেগ মধুর গীতিকাব্যগুলি ভাবীকালের দরবারে পৌঁছে দেবার সুযোগ পাবেন। গ্রামোফোন কোম্পানীও শক্তিমান শিল্পীদের দ্বারা তাঁদের মূল্যবান সংগীতসঞ্চয়ের সীমা প্রসারিত করে কান্ত-কবির রচনার প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন এই আশাই আমরা রাখব।

অনেক গান লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে কিন্তু গানের স্রষ্টার নাম যাঁরা গান করেন, তাঁদেরও হয়ত জানা নেই। নলিনী-বাবুর মতে 'রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-কবিদের গানের মতই রজনীকান্ত সেনের ভক্তিসংগীতগুলি এককালে সমগ্র বাংলাদেশ কলরণিত করে তুলেছিল...কান্ত-কবির ভক্তিসংগীতগুলিকে বাংলা ভজন বললে অত্যুক্তি হয় না।'—এ সম্বন্ধে মত-দ্বৈধত নিশ্চয় থাকবে না।

অনুগায়ক গোপালচন্দ্র সেনের প্রাণ-ঢালা আবেগোচ্ছল গায়কী কান্ত-কবির গানের মর্মভাবকে প্রকাশ করত বলে সেই আঙ্গিকই এই স্বরলিপিগুলিতে গৃহীত হয়েছে। কবির বহু হাসির গান শ্রীসরকার বহু আসরে গেয়ে সেকালের সংগীতরসিক সমাজে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এই পুস্তকে ভক্তিগীতি ছাড়া দুটি হাসির গানও আছে। আর একটি বিষয়ের প্রতি শ্রীসরকার আলোকপাত করেছেন, সেটি হলো "গানগুলির স্বরলিপি করতে বসে বাণী, কল্যাণী প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে অজস্র ছাপার ভুল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কবির প্রতি এই অবিচার চলেছে দীর্ঘকাল ধরে, বছরের পর বছর ধরে সংস্করণের পর সংস্করণে। আরও দুঃখের কথা, যাঁরা এখন গ্রন্থাবলী আকারে সমস্ত গ্রন্থগুলি একত্র প্রকাশ করছেন, তাঁরাও ঐ ভুল পাঠগুলি নির্বিচারে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে চলেছেন।'

এ অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তবে বলতে হবে, কান্ত-পদ-লিপির শুধুমাত্র শিল্প-মূল্য নয় একটি ঐতিহাসিক মূল্যও আছে।

সন্ধ্যা সেন

তিন ভুবনের রঙ : [উপন্যাস]—সুধী-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়।। চতুষ্পর্ণা প্রকাশনী ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯।। পাঁচ টাকা।

চমকে ওঠার মতো কয়েকটি নিটোল মুহূর্ত আছে এ উপন্যাসে। তার প্রধান নারীচরিত্র কুন্তলা এবং পুরুষচরিত্র সাধন। দূরপাল্লায় রেল-ভ্রমণের সময় লেখক এর কাহিনীটি শুনেছেন এক-মহিলা সহযাত্রীর মুখ থেকে—যার শরীর ভয়ংকর রকমের ফর্সা, শাড়ীর রঙ বসবার আসনের সংগে একাকার এবং ক্লান্তি, বিষাদ ও উত্তেজনায় পরিবেশানুগ।

কুন্তলা ছিল ধনী বাপের সুন্দরী ও যুবতী মেয়ে। তার প্রতিবেশী সমবয়স্ক যুবক সাধন প্রথম যৌবনের প্রেম ও ভীরুতার সঙ্গে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করতে চেয়েছিলো কুন্তলার কাছে। কুন্তলা তাকে ভালো না বাসলেও প্রশ্রয় দিতো। সাধন তার নামে গল্প লিখতে শুরু করলো আবেগের বশে। এসবের প্রতি কুন্তলার আসক্তি ছিলো না এতটুকু। সে বিয়ে করলো অন্য একজন যুবককে—যার অর্থ এবং প্রতিপত্তি ঈর্ষণীয়।

বিয়ের পর কুন্তলা প্রথম স্বামীর সম্পদের মধ্যে নিজেকে অসহায় ও অকিঞ্চিৎকর মনে করলো। তখন তার মনে পড়ে সাধনের কথা। সাধন তখন জীবন-রক্ষার তাগিদে নানা জায়গায় ট্যুইশনি করে বেড়ায়। গল্পটল্প লেখার কথাও তার মনে আসে না। কুন্তলা তাকে ধরে নিয়ে এলো পথ থেকে এবং তার বিলুপ্তপ্রায় সাহিত্য-সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুললো নানাভাবে। সাধনের লেখা গল্প-উপন্যাস ছাপা হতে লাগলো কুন্তলার নামে। সাধন অবশ্য বঞ্চিত হলো না। সে তার প্রচুর অর্থ ও সুন্দর শরীর দিতে লাগলো বিনিময়ে।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে সাধনের মনে দেখা দিলো গভীর অতৃপ্তি। সে নিজের লেখাকে এভাবে দিনের পর দিন অপরের নামে প্রকাশ করে সুখ পেলো না। সে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হতে চাইলো। অনুসূয়া নামে একজন শিক্ষিকাকে এসময়ে ভালোবেসে ফেললো। কিন্তু তাকে বিয়ে করে সুখী হলো না। কুন্তলাও জ্বলতে লাগলো স্বসৃষ্ট মানসিক জটিলতায়

উপন্যাসটির পরিবেশ সৃষ্টিতে লেখক বহু জায়গায় মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তবে গল্পের সূত্রপাত অত্যন্ত দুর্বল এবং অবিশ্বাস্য—সমাপ্তি দ্রুত ও আকস্মিক।

কফি হাউসের সেই লোকটা : [অনুভব কবিতা পুস্তিকা ১১]—শিশির ভট্টাচার্য।। অনুভব প্রকাশনী ১৯ পার্সিভিয়া টেরেস কলকাতা-২৯।। প্রাপ্তিস্থান : বর্ণালী ৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯।। পঞ্চাশ পয়সা।

শিশির ভট্টাচার্য কবিতা লিখেছেন খুব কম। এই পুস্তিকায় তাঁর দশটি সুন্দর কবিতা ছাপা হয়েছে। কলকাতার পথঘাট অনেকগুলি কবিতার মধ্যে ছায়া ফেলেছে, কিন্তু কোনোপ্রকার ক্লান্তি কিংবা জটিলতা নেই। কয়েকটি কবিতা বিদেশের পটভূমিতে লেখা। লেখক জীবিকার প্রয়োজনে একাধিকবার বিদেশে গিয়েছেন। ইটালী, ফ্রান্স, রোম এবং বৃটেনের কিছু কিছু স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের স্মৃতি সেই প্রসংগে তার কবিতায় জায়গা করে নিয়েছে। পুস্তিকাটি সম্পাদনা করেছেন গোরাংগ ভৌমিক।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

মুক্ত মেঘ [বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫]—সম্পাদক তুহিনকান্তি দাশ।। সিঙ্গতলা লেন, মালদা।। পঞ্চাশ পয়সা।

উত্তরবংগ থেকে প্রকাশিত কবিতায় ত্রৈমাসিক হিসেবে 'মুক্ত মেঘ' কিছুটা স্বাতন্ত্র-সৃষ্টিতে প্রয়াসী। এ সংখ্যায় লিখে-ছেন আলোক সরকার, গোরাংগ ভৌমিক, তুহিনকান্তি দাশ, সামশুল হক এবং আরো কয়েকজন।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরে ধীরে একটি সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। এই কাল-ব্যাধি তাঁর মরদেহকে বেশী ক্লেশ দেয় নি, কারণ রোগভোগের মেয়াদ আরো দীর্ঘতর হতে পারত। মাত্র আটচল্লিশ বছরে মৃত্যু নিদারুণ শোকাবহ। এই বছরটি সাহিত্যসেবকদের কাছে দুর্বৎসর। প্রবীণ ও নবীন অনেক সাহিত্যসাধক এই ১৩৭৫ সালে লোকান্তরিত হলেন। যাঁরা বয়সে প্রবীণ তাঁদের জন্য দুঃখবোধ করলেও, যাঁরা নবীন তাঁদের মৃত্যু আমাদের বেশী অভিভূত করে।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রিয়দর্শন, মধুর স্বভাব, সদাহাস্যময় পুরুষ। তাঁর মুখে কখনো কারো নিন্দা শোনা যেত না। প্রবীণের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল এবং সমবয়সীদের প্রতি প্রীতিময়। তাই তাঁর উপস্থিতিতে সকলে প্রসন্ন হত। আত্মপ্রচারে তাঁর কুণ্ঠা ছিল, তাই কখনো তাঁর মুখে নিজের কথা শোনা যেত না। একদিন তিনি বললেন—এইবার চাকরীটা ছেড়ে দিলাম। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর কিছু পরেই স্বরাজ চাকরী ছেড়ে দেয়। কারণ যে প্রতিষ্ঠানে স্বরাজ যুক্ত ছিল, সেটি ডাঃ রায়ের কর্তৃত্বাধীন ছিল এবং তিনি বোধ হয় ডাঃ রায়ের স্নেহভাজন ছিল। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বলেছিলেন—এইবার থেকে পুরোপুরি সাহিত্য করব, হোল-টাইমার। চলে যাবে এক রকম। চলে যায়, প্রচুর পরিশ্রম করে লিখতে লাগলেন তিনি। তাঁর এই কয় বছরের রচনায় নতুন চিন্তার পরিচয় ছিল। তাঁর লেখা 'পঙ্কজা', 'বেগম', 'এক ছিল কন্যা', 'আলোর অরণ্য', 'গোপী সংবাদ', 'দুপুর গড়িয়ে বিকেল', 'অমৃত সমান', 'আঁধি' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শেষ উপন্যাসটি 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। কিছু অপ্রকাশিত রচনা ছড়ানো আছে এদিকে-সেদিকে সেইগুলিও প্রকাশিত হবে—তারপর, আর সব কিছুর মতো অকৃতজ্ঞ সংসার আরো অনেক মানুষের মত এই মানুষটিকেও ক্রমে ভুলে যাবে। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠা, সারল্য এবং অধ্যবসায় যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন হয়ত সহজে বিস্মৃত হবেন না।

১৯৬১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস—'নূতন স্বাদ'। সেই উপন্যাসটির কথারম্ভে তিনি কয়েকটি কথা লিখেছিলেন, আজ বার বার সেই কথাগুলিই মনে জাগছে। লেখকের যন্ত্রণা-ক্ষুব্ধ মনের অভিব্যক্তি এই কয় লাইনে—

"দুটো কথা—সংশয় আর বিশ্বাস।

সংসারে বড় যন্ত্রণা। বড় জ্বালা। বর্তমান যুগে ও দেশে কিছু সংশয়ী অথচ চিন্তাশীল মানুষ দেখা যাচ্ছে। তারা বলে, বর্তমান যুগটাই নাকি যন্ত্রণা আর বেদনার যুগ। সর্বত্রই যন্ত্রণা আর বেদনা। সেই বড় কবি, সেই বড় সাহিত্যিক, যার লেখায় এই যুগ-যন্ত্রণা আর বেদনা ফুটে উঠেছে।

এর মূল কোথায়?

অনেক দিন ভেবেছি। ভেবে মনে হয়েছে, মূল হচ্ছে সংশয়। সংশয় যেখানে, সেখানে বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যেখানে সেখানে সংশয় নেই। দুটো এক সঙ্গে থাকতে পারে না।

সংশয় যন্ত্রণা-বেদনাই শুধু নয়। সংশয়ে সন্দেহ আসে, মানুষে মানুষে, দেশে দেশে। সংশয়ে আসে অবিশ্বাসের জ্বালা আর দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, ঈর্ষা। তারপর লোভ আর কামনা। পরিণতি ভয়াবহ সংঘর্ষে।

আর বিশ্বাস আনছে শান্তি—।... বিশ্বাসে খারাপ মানুষ ভালো হয়। মানুষ দেবতা হয়, কিন্তু তাও যদি সংশয়ী মন না মানে?"

এই প্রশ্নের জবাব কোথায়? এ-যুগের মানুষের মনে সংশয় আছে, বিভ্রান্তি আছে, বিশ্বাস নেই। সেই বিশ্বাস থাকলে মানুষ দেবতা হয় এই চিন্তা ছিল স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

এই মৃত্যুতে স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোগযন্ত্রণার অবসান হল। কিন্তু যন্ত্রণা জেগে রইল তার পরিবারবর্গ এবং বন্ধুজনের মনে। 'ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক' শীর্ষক একটি নিবন্ধে অমৃতের পৃষ্ঠায় 'অভয়ঙ্কর' (১৪ই আষাঢ়, ১৩৭৫) নাম উল্লেখ না করে যে সাহিত্যিকের কথা লিখেছিলেন, নিঃসন্দেহে 'হাসপাতালে কঠিন রোগশয্যায় শায়িত' সেই সাহিত্যিক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মন্তব্যের আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—

"অতি সম্প্রতি একজন শক্তিমান কথা-সাহিত্যিক হাসপাতালে কঠিন রোগশয্যায় শায়িত। এই লেখকের গল্প ও উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে।...এখন এই লেখকের চিকিৎসার ব্যয়ভার, পরিবার পোষণের ভার কে গ্রহণ করবে?"

এই প্রশ্ন আজ আরো নিদারুণ। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আটটি সন্তান, স্ত্রী এবং অন্যান্য পোষ্যদের দুর্গত অবস্থার কথা মনে জাগছে, কোনো আশার আলোক দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশ রণক্লান্ত, তবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি এই বাংলাদেশে করুণাময় মানুষের নিশ্চয়ই অভাব হবে না। মৃত্যু-সংবাদ অতিশয় নিদারুণ কিন্তু তার পিছনে যে আরো নিদারুণ সংবাদ আছে সে কথা জানানোর জন্যই এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি।

বিয়ের উলটো পুরাণ

ভারতে নবাগতদের বলনাচ

উপনিবেশ পত্তন কিম্বা ভাগ্যান্বেষণে দলে দলে দেশান্তর যাত্রাটা সর্বদেশে সর্বকালে প্রারম্ভে পুরুষপ্রধান। তাই কোন এক দেশে যখন অন্য কোন দেশের লোকেরা দলে দলে এসে বসবাস শুরু করতে থাকে তখন সেই নবাগতদের সমাজে স্বভাবতই নারীরা দুর্লভ হয়ে পড়েন। তার প্রতিক্রিয়ায় পুরুষদের মধ্যে প্রণয় প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, সেকালের দিনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ কিম্বা ক্ষেত্রবিশেষে সেই বহুজনঈপ্সিতাদের নানাজনে অনুগ্রহ বিতরণ দেখা দেয়। আমাদের দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ও পরবর্তী রাজত্বকালে ইংরেজ সমাজের কাহিনী যারা পড়েছেন তারা ঐ সম্পর্কে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর কথা জানেন।

আঠার শতকে যখন গ্রেট বৃটেন থেকে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ পৌঁছতে ছ মাস লেগে যেত এবং যে সব ইংরেজ কর্মচারী সেখানে যেতেন তারা দীর্ঘকালের জন্যেই যেতেন। তাই তাদের জীবন ও যৌবন সমস্যাটা ছিল রীতিমত জটিল। সুতরাং ইংলন্ডে কোম্পানীর কর্তারা সিদ্ধান্ত নেন, "যেহেতু সাধারণ তরুণীদের পক্ষে বেশি সংখ্যায় ইংলন্ড থেকে জাহাজ ভাড়া দিয়ে ভারতে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই আমরা আমাদের সৈনিকদের সে দেশের মেয়েদের বিয়ে করতে সর্বপ্রকারে উৎসাহ দেবো।"—ভবিষ্যৎ ভারতের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজ গড়ে ওঠার সেইটাই প্রথম উল্লেখ্য সিদ্ধান্ত।

ইতিমধ্যে অবশ্য অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে। ইংরেজরা প্রভু ও প্রদেশীয়রা ভৃত্যে পরিণত হল। ইংরেজ কর্মচারীদের অনেকে নবাবের মত ঐশ্বর্যশালী হয়ে দেশে অবসর গ্রহণ করতে থাকে। সাধারণ ইংরেজ কর্মচারীরাও খুদে নবাবে পরিণত হতে লাগল। ভারতে ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতাপ, ঐশ্বর্য ও বিলাসের কথা বিলেতে বিস্ময় সৃষ্টি করে। সেইসব কথা শুনে, কিছুটা অজানার আকর্ষণেও বটে, ইংলন্ড থেকে বহু 'স্পেকুলেটিভ', অর্থাৎ অনেক হিসেব করে সুযোগ সন্ধানী মেয়ে ভারতে পাড়ি দিল। ফলে ভারতে ইংরেজ সমাজের হাওয়া গেল বদলে। আর নেটিভ রমণী নয়, অন্তত তাদের বিয়ে করা নয়, ইংলন্ড থেকে সদ্যাগতা এমন কি কয়েক খেপ পতি-পরিবর্তন করা শ্বেতাঙ্গিনী পত্নী লাভই ইজ্জতের, বিশেষ করে পদোন্নতির পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে যে বিয়ের বিজ্ঞাপন দেখে ইউরোপীয়দের এত পরিহাস, তার প্রবর্তক কিন্তু তারাই। সেই সময় শ্বেতাঙ্গিনী সঙ্গিনী লাভের আশায় ক্যালকাটা গেজেটে যে ধরনের বিজ্ঞাপন বেরুত তার একটি উদাহরণ : ভদ্রবংশজাত, সুদর্শন এক যুবক সারা জীবনের জন্যে একটি সৌজন্যপূর্ণা সঙ্গিনী ও সৌহার্দ্যপূর্ণা সহচরী অভিলাষী. ...তাই এতদ্দ্বারা সে একটি সুন্দরী ও তরুণীর সুশ্রী পাণীর প্রার্থী।' বিজ্ঞাপনগুলির শুধু ভাষাই নয়, বানানও সাবেকী।

ইংলন্ড থেকে নবপর্যায়ে যে 'স্পেকুলেটিভ' বিবাহপ্রার্থিণী জাহাজযোগে বোম্বাই পৌঁছাতেন তাদের নিয়ে সেকালের দিনে অনেক ছড়া ছবি লেখা ও আঁকা হয়েছে। 'বৃটিশ সোশ্যাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া' নামে বইতে লোড ফকল্যান্ডের লেখা একটি বিবরণ :

"ইংলন্ড থেকে তরুণী বোম্বাই মালের

(কার্গো) জাহাজ (যদি আমি সাহস করে শব্দটি ব্যবহার করতে পারি) এসে পৌঁছোনো ছিল "শীতকালে" অন্যতম চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে তাদের বয়স, উচ্চতা, গড়ন, মুখশ্রী, পোষাক-আসাক ও আচার-আচরণ কিছুদিনের মত আলাপের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠতো।"

দস্তুর অনুযায়ী তাদের জাহাজ পেঁাছোনোর প্রথম রাত্রে জাহাজের কাপ্টেন একটি বল নাচের আয়োজন করতেন। সেই নাচে সুবেশ ইংরাজ তরুণেরা সদলে হাজির হতো এবং সেখানে তরুণী বিশেষের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটতো।

টমাস হুড নামে এক ব্যক্তি ভারত গমনেচ্ছু এক তরুণী সম্পর্কে একটি ছড়ায় লিখেছেন, 'তার মন ও প্যাটরা দুই পরিপূর্ণ। টুপি এবং মনও তৈরী। সাঁটা অন্তর্বাস তৈরী করেছেন শ্রীমতী বেল, রিভার্তো নামে দোকানের সেরা বুট ও জুতো কেনা হয়েছে। পোষাক তৈরী হয়েছে ডুসে।'

My heart is full—my
    trunks as well
My mind and Caps
    made up,
My Corsets shap'd by
    Mrs. Bell,
Are promised ere I Sup;
With boots and shoes,
    Rivarto best,
And dresses by Duce
And a special licence
    in my chest —
I am going to Bombay!

কিম্বা অ্যালিপ চিমের 'দি ডেস অব ইস্ত' নামে বইটির মিস এরাবেলা গ্রীনের কথা ধরুন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের বিয়ের বাজারে কদর বাড়াবার জন্যে বহুং তালিম দেওয়ার পর তার পিতা-মাতা তাকে জাহাজে তোলার আগে তার ইতি-কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। প্রত্যুৎপন্না এরাবেলা উত্তর দিল:

I do believe entirely in
The Civil Service ranks:
The best are worth
    a deal of tin,
And none exactly blanks.
But I do believe that
    marrying
An 'acting' man fudge;
And do not fancy
    anything
Below a Pucka Judge.

সিভিল সার্ভিসের করিৎকর্মাদের যারা বিয়ের ফাঁসে বাঁধতে পারতেন তাঁদের

সম্পর্কে বিদ্রূপের আর অন্ত থাকতো না। এরাবেলার অত তালিম সত্ত্বেও ভাগ্যে কোন 'সিভিল সার্ভেন্ট' জুটলো না। তাই তার জাহাজের টিকিট হয়েছে। তার দফাটি রফা হয়েছে শুনে অন্য আইবুড়ীরা খুব খুশি:

The passages are booked
They Sail, & other spins
are glad
To see her goose is cooked.

ভারতে এসে স্বামী সংগ্রহের প্রয়োজনে ইংলন্ডের তাজা রূপলাবণ্য ধরে রাখবার জন্যে প্রসাধনকলার (আর্ট) আপ্রাণ প্রয়োগ বাহুল্য নিয়ে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে একজন লিখেছেন:

Pale faded stuff, by time
grown faint.
Will brighten up through
'art'
A Britain gives their
faces paint
For sale at Indian Mart.

এমন কি ১৯৩৬ সালে জনৈকা বিবাহ-ব্যর্থ-তরুণী সম্পর্কে এক কবি ব্যঙ্গ করে লিখেছেন:

Now sail the Chargrimed
fishing fleet
Yo ho, my girls, yo ho!
Back to Putney and
Byfleet
Poor girls, you were too
slow!
Your Bond Street beauty
sadly worn!
Through drinking Cocktails
night & morn
With moonlight picnics
until down
What ho! my girls what ho!

উলটো পুরাণ

ভারত স্বাধীন হওয়ার পাঁচ-ছ বছর পরে গত পঞ্চাশ দশকের মধ্যে হঠাৎ হাওয়ার উলটো বওয়া সুরু হলো। বৃটেনের প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে রটে গেল যে বৃটেনে অসংখ্য কাজ লোকের জন্যে খালি পড়ে আছে। মুটে-মজুর, কেরাণী, মাস্টারী, ডাক্তারী, কারিগরী নানা জাতের অসংখ্য কাজ। নিরক্ষর, অর্ধ নিরক্ষর, শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ যে যাবে তারই কাজ জুটে যাবে। শুধু তাই নয় অন্তত আইনের চোখে তারা বৃটেনের পূর্ণ-নাগরিকত্ব পাবে। জাতীয় চিকিৎসা সংস্থায় বিনা মূল্যে সেরা চিকিৎসা পাবে, বেকার থাকলে ভাতা পাবে, বার্ধক্যে পেনসন পাবে, যে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে, ভোটাধিকার পাবে।—অতএব পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হংকং, মালয়, সিংহল, আফ্রিকার নানা দেশ, বিশেষ করে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান থেকে হাজারে হাজারে লোক বৃটেনে হাজির হতে লাগলো। ১৯৬২ সালে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইন গৃহীত হবার আগে পর্যন্ত সেই বৃটেন পাড়ি দেওয়াটা অপ্রতিহত ছিল। কিন্তু ততদিনে বৃটেন কালা আদমীর সংখ্যা দাঁড়িয়ে গেছে ১০ লক্ষের ওপর, সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা দুজন। পূর্বোক্ত আইনে বহিরাগমন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কিন্তু বন্ধ হয়নি।

আমেরিকায় প্রথম ঔপনিবেশিকদের মত, ভারতবর্ষে প্রথম ইংরাজ সমাজের মত বৃটেনে অধুনা বসবাসকারী কৃষ্ণাঙ্গদের একটা বৃহৎ সামাজিক সমস্যা হচ্ছে তাদের পুরুষের অনুপাতে মেয়ের সংখ্যা কম। তবে সব সমাজের মধ্যে সেটা সমান নয়। যেমন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আগত নিগ্রোদের মধ্যে নয়। কারণ তাদের মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদের ভাষাও মুখ্যত ইংরাজি। তাই তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান-সমান। ধর্ম ও জীবনধারায় তারা আমাদের তুলনায় ইংরাজদের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছিও। তাই তাদের সঙ্গে তারা অনেক সহজে মিশেও যায়। মুস্কিল হচ্ছে প্রায় লাখ তিনেক ভারতীয় ও পৌনে দু লাখ মত পাকিস্থানীর। ভারতীয়দের মধ্যে সম্ভবত একক সম্প্রদায় হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে শিখেরা। শিখেরা এদেশে সাধারণত স্থায়ীভাবে অন্তত দীর্ঘকাল বসবাস করবে বলেই আসে। তাই তারা প্রথম থেকেই পরিবার-পরিজনদের নিয়ে আসবার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে। তাদের সংঘবদ্ধতাও নিবিড়। অতএব তারা এক-একটা অঞ্চল বিশেষে বাস করে। মহল্লার পর মহল্লা বাড়ী কিনে নেয়। নিজেদের দোকান-পাট বসায়, সিনেমা চালায়, গুরুদ্বার গড়ে তোলে। বহিরাগতদের বিরুদ্ধে এদেশে মাঝে মাঝে যে উত্তেজনা দেখা যায়, ঠিক ঐ সব কারণেই প্রধানত তাদের কেন্দ্র করেই হয়। তবু আনুপাতিক হারে নারীর সমস্যা কম হলে যে সামাজিক সমস্যা দেখা দেয় সেটা তাদের মধ্যে কম।

সমস্যাটা জটিলতর অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। সেই সব সম্প্রদায়ের মেয়েরা যে আসেন না তা নয়। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ বিবাহিতা। ছাত্রী হিসাবে যারা আসেন তাঁরা সমাজের উঁচু স্তরের। ইদানীং যে সব লোকেরা স্রেফ চাকুরীবাকরীর উদ্দেশ্যে এসেছেন বা আসছেন তাঁদের পাত্তা দেওয়ার পাত্রী তাঁরা নন। তবে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ কিম্বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হলে আলাদা কথা, আর আলাদা ডাক্তার হলে। সেকালে ভারতে ইংরাজ মহলে সিভিল সার্ভেন্টরা যেমন দুর্লভ ও সর্বজনকাম্য বলে বিবেচিত হতো, ইদানীং ইংলন্ডে ভারতীয় ডাক্তার কিম্বা ডাক্তারীর ছাত্ররা অনেকটা তেমনি সবাইকে টেক্কা মেরে চলেন। —সাধারণ ভারতীয় তরুণরা এই অবহেলার এই বলে উত্তর দেয় যে সুন্দরী মেয়ে দেশ থেকে আসে না, যারা আসে তাদের তাতে দরকার নেই। এই ব্যাপক পরিহাসের পেছনে আছে হয়তো এদেশের স্কার্ট পরিহিতাদের দেখে দেখে শাড়ী পরিহিতাদের তাদের আর চোখেই লাগে না। দ্বিতীয়ত সুন্দরীদের হয়তো সত্যিই আগেই বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা বোধহয় শাড়ীর ওপর স্নোবুট, লম্বা ভারী কোট, হাতে থলে ও ছাতা সবশুদ্ধ তেমন খোলতাই হয় না প্রায়ই।

দেশে একটা ধারণা এখনো আছে যে কোন ভারতীয় ছেলে এদেশে এলেই এদেশের মেয়েরা তাদের লুফে নেয়। অতীতে যখন বাছাই করা মেধাবী ছাত্ররা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে আসতো কিম্বা ধনীর দুলালেরা ব্যারিস্টারি পড়তে কিম্বা পড়ার নাম করে বিলাতে পাড়ি দিত তখন হয়তো বা তার মধ্যে কিছুটা সত্যি ছিল। কিন্তু বর্তমানে সাধারণ কাজ-কর্ম করে যে সব ছেলেরা এদেশে বসবাস করছে কিম্বা নৈশ বিদ্যায়তনে পড়াশোনা করে তাদের সম্পর্কে সেকথা বলা চলে না। একজন ইংরেজ ছেলের স্বাস্থ্য স্বাচ্ছল্য ও আলাপ-আচরণ (যা যথেষ্ট পরিমাণে রপ্ত করতে পারলে তবে একজন ইংরাজ তরুণীর হৃদয় হরণ সম্ভব) তুচ্ছ করে একজন ভিনদেশীর ভিন্ন সংস্কৃতির ও বর্ণের লোকের সঙ্গে অনিশ্চিৎ জীবনযাত্রায় বাধা পড়তে অত সহজে রাজি হবে কেন এ দেশের মেয়ে?

তবু একথা সত্যি যে গত দেড়শ বছরের মধ্যে যত ভারতীয় মেয়ে পুরুষ ইউরোপীয়দের বিয়ে করে, তা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে কিম্বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে, হয়তো বা অসবর্ণ বিয়ের চেয়ে বহু হাজার গুণ বেশি। এই তাজ্জব ঘটনার মধ্যে শুধু ভারতের একজাতিত্বের দুর্বলতার পরিচয় কিম্বা একই দেশের মধ্যে আমরা পরস্পরের কতদূরে তাই প্রকাশ পায় না, আরো পাঁচটা জিনিষ বোঝা যায়। প্রথমত, মানুষ দেশান্তরে গেলে সামাজিক বন্ধন সংস্কার শিথিল হয়ে যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শিথিল হয় প্রধানত আমাদের। কারণ ইউরোপীয়রা তো তাদের দেশেই থাকে। এখন কথা হচ্ছে ইউরোপীয়রা এক্ষেত্রে প্রধানত মেয়েরা উপরোক্ত পার্থক্যগুলি সত্ত্বেও কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেদের বিয়ে করে কেন? অন্তত আমাদের আন্তপ্রাদেশিক কিম্বা অন্তসম্প্রদায় বিয়ের চেয়ে ইউরোপীয়দের সঙ্গে বিয়ের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বেশি কেন?

তার প্রথম উত্তর আমরা যাই বলি না কেন শিল্পোন্নত ইউরোপ ব্যক্তিগতভাবে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সংস্কার মুক্ত। দ্বিতীয়ত এদের জীবনটা প্রধানত ব্যক্তি-কেন্দ্রীক। অর্থাৎ সাবালকত্বের সঙ্গে সঙ্গেই ওরা স্বতন্ত্র জীবনযাপন করে। সে জীবন অনেক সময়েই নিঃসঙ্গ। প্রবাসী ভারতীয় তরুণরাও নিঃসঙ্গ, সুতরাং দুই নিঃসঙ্গীর দেখা হলে তা সহজেই বন্ধুত্ব ও প্রেমে পরিণত হয়। ইংলন্ডে ইউরোপের অন্যান্য

পাকিস্থানী ছাত্র রাজবীরের সঙ্গে বিবাহ হয় লন্ডনে নারী কর্মী জসবীর সিং-এর। এই বিবাহ আয়োজন করেন জসবীরের মা। রাজবীর ছবি দেখেই পাত্রী মুগ্ধ হয়েছিলেন।

দেশ থেকে যে সব মেয়েরা কয়েক মাসের জন্যে ভাষা শিক্ষা করতে আসে তাদের সম্পর্কে কথাটা আরো প্রযোজ্য। যুদ্ধের পর ইউরোপে, বিশেষ করে জার্মাণীতে পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়াতে জার্মাণ মেয়েরা বহু বিদেশীকে, বিশেষ করে ভারতীয়দের বিয়ে করেছে। বর্তমানে কলকাতায় বিদেশী বউদের মধ্যে জার্মাণরাই বোধহয় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখানে আরো দুটি বিষয় উল্লেখ বোধহয় প্রাসঙ্গিক হবে। এক, ইউরোপের মেয়েরা সম্ভবত পুরুষদের চেয়ে কম বর্ণ-সচেতন এবং আমাদের ছেলেরাও বিপরীত অর্থে তাই। অর্থাৎ ইউরোপীয় মেয়েরা যেমন প্রেমিকের গাত্র-বর্ণকে তেমন গ্রাহ্য করে না আমাদের ছেলেরা তেমনি অনেক সময় শ্বেতাঙ্গিণী-দের সম্বন্ধে দীনমনা। অর্থাৎ তাদের জন্যে তারা সব করতে পারে, দাসে পরিণত হতে পারে। ঠিক সে জিনিষটা একটা ইউরোপীয় ছেলের কাছে পাওয়া শক্ত। এটাও ইউ-রোপীয় মেয়েদের ভারতীয় ছেলেদের প্রতি আকর্ষণের একটা কারণ হতে পারে।

ভারতীয় মেয়েরা হয়তো শুনে খুশি হবেন যে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় মেয়েদের কদরও রীতিমত বর্ধিষ্ণু। সেই আকর্ষণের আবার একটা বড় কারণ তাদের বর্ণাঢ্য পরিচ্ছদ। শাড়ী পরিহিতা স্ত্রী ও ইউরোপীয় স্বামী সম্প্রতি আর মোটেই বিরল দর্শন নয়।

কিন্তু আন্তর্মহাদেশীয় বিয়ের দ্বারা তো আর বিপুল সংখ্যক দেশান্তরীর বিয়ের প্রয়োজন মিটতে পারে না। সুতরাং সেকেলে ভারতে ইংরেজদের মতই একালে ইংলন্ডে ভারতীয়দের দেশ থেকে পত্নী আনার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। অবশ্য তার জন্যে জাহাজ বোঝাই ভারতীয় তরুণীরা এসে সাউদামটনে, কিম্বা লিভারপুলে নামছে না। পাত্রেরাই দেশের কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে উত্তর পাচ্ছে। তারপর নিজেরা কিম্বা বাড়ীর লোকেরা বিয়ের কথাবার্তা চালাচ্ছে। সব ঠিকঠাক হলে পাত্র ছুটি নিয়ে দেশে পাড়ি দিচ্ছে। বউ নিয়ে ফিরে আসছে। বিববাহিতা স্ত্রীর সম্পর্কে তো বটেই বাগদত্তা সম্পর্কেও 'ইমিগ্রেশান অ্যাক্ট' অচল। এয়ার টিকিট নামে হাজার তিনেক টাকার একটি বরপণ ইদানীং চালু হচ্ছে। কয়েকটি আরব এয়ার লাইন আবার ছাঁটাই দরে এয়ার টিকিট চালু করে ব্যাপারটা স্বল্পআয়ীরও আয়ত্তসাধ্য করে তুলেছে। কম ভাড়ায় বারোয়ারী চার্টার্ড প্লেনও চালু হচ্ছে।

কাগজে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনগুলি সাবেকী ধরনেরই। তবে কোথাও কোথাও পাত্ররা নিজেদের প্রগতিশীলতার পরিচয় দেন 'বর্ণান্তরে আপত্তি নেই।'

তবে পাকিস্থানীদের সুবিধেটা আরেকটু বেশি। ইসলামী মতানুযায়ী দুই পক্ষ মোল্লা সাক্ষী রেখে কথা দিলেই বিয়ে হয়ে যায়। লণ্ডন কিম্বা ব্রেডফোর্ড করাচী কিম্বা ঢাকায় হাজার হাজার মাইল ব্যবধানে দুই পরিবার বিয়ের ঠিক করছে। তারপর দুই প্রান্তে দুই মোল্লা সাক্ষী রেখে পাত্র-পাত্রীরা ট্রাংককলযোগে পরস্পরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে। তারপর স্বামী গিয়ে স্ত্রী নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরছে, নয় স্ত্রীকে প্লেনে তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্বামী বর্ণনা ও ফটোগ্রাফ মিলিয়ে তাকে বিমান বন্দর থেকে সংগ্রহ করে আনছে। ইমিগ্রেশান অ্যাক্টের জাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি বৃটেনের ন্যাশনাল ম্যারেজ গাই-ডেনস কাউন্সিলের পত্রিকায় ঐ ট্রাংককল বিয়ের ওপর এক দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছে! শুধু ট্রাংককলের বিয়েই নয় পুষ্পক রথের বিয়ে নিয়েও এদেশে অনেকের চোখ কপালে উঠছে!

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

না পারলে ওরা শুধু নয়, কুজকো শহরের কেউ রেহাই পাবে!—হেরাদা যেন মনে মনে ভাবী উৎপীড়নটা কল্পনাতেই উপভোগ করে বলে—এ শহরের একটা মানুষকে তাহলে আস্ত রাখব না। খোঁজ না দিতে পারার শাস্তি একটি করে অঙ্গ। জ্যান্ত মানুষ কেউ পার পাবে না!

কিন্তু যাকে খুঁজছেন,—মৃদু প্রতিবাদের ছলে একটু রহস্য করে ফিলিপিলিও—সেই যে এখনো বেঁচে আছে তারই বা ঠিক কি!

মরে গিয়ে থাকলে,—পৈশাচিক আক্রোশের সঙ্গে বলে মার্কুইস দে সোলিস,—কবর খুঁড়েও তার লাশ আমি টেনে বার করব। জ্যান্ত বা মড়া যাই হোক আমার হাত থেকে তার নিস্তার নেই। চলো এখন, রাজ-পুরোহিতের জায়গায় কাকে পাওয়া যায় দেখি।

কোরিকান্তার অন্য ছোটোখাটো পুরোহিতের খোঁজে ঘোড়া চালিয়ে এবার এগিয়ে যেতে যেতে মার্কুইস দে সোলিস হঠাৎ পিছু ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—সোনার সিংহাসনে বসানো ও বাসি পচা মড়াটা কার বললে যেন—কোন বাঁদির বাচ্চার?

বাঁদির বাচ্চার নয়,—এসপানিওলদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে-দেওয়া দেশের দুষমন বিভীষণ হলেও ফিলিপিলিওর গলার স্বর একটু তেতোই শোনায়,—ও পবিত্র শবদেহ কুজকো থেকে কুইটোর যিনি অধীশ্বর ছিলেন ইংকাশ্রেষ্ঠ সেই হুয়াইনা কাপ,ক-এর।

হুঁ, গলায় যেন ভক্তি-ভক্তি ভাব পাচ্ছি! —বিদ্রূপ করে বলে মার্কুইস—তোমাদের রাজা-গজা যাই হোক, আমার কাছে সব বাঁদির বাচ্চা। এখান থেকে ফেরবার সময় ও লাশটা তলোয়ারের খোঁচায় টেনে ফেলে দিয়ে সিংহাসনটা সঙ্গে নিয়ে যাব। ওটা নিরেট সোনা মনে হচ্ছে।

নিরেট সোনার সিংহাসনে হুয়াইনা কাপাকের শব সেজে নিস্পন্দ গানাদোর কানে প্রত্যেকটা কথা যেন গলানো সিসের মত গিয়ে পড়ে।

অপ্রত্যাশিত বিশ্রীগোছের কিছু একটা যে হয়ে গেছে এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না গানাদোর।

মার্কুইসরূপী সোরাবিয়া সঙ্গী হিসেবে হেরাদাকে নিয়ে তাঁরই খোঁজে যে এসেছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

শুধু নিজেদের মর্জিতে সোরাবিয়ার সওয়ারবাহিনী নিয়ে কাক্সামালকা থেকে কুজকোয় আসা সম্ভব নয়। সেনাপতি পিজারোর অনুমতি ত বটেই সমর্থন জানানো আদেশও এই দুই মাণিকজোড় পাষণ্ড পেয়েছে নিশ্চয়।

তাঁকেই বিশেষ করে খুঁজতে আসার কারণ কি? সোনা বরদার হয়ে তাঁর কাক্সামালকা থেকে পালানো কি ধরা পড়েছে?

শুধু সেটুকু ধরা পড়লেও এমন কিছু সর্বনাশ হবে না। যেখানে যে চাকা ঘোরাবার গানাদো যথোচিত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এখন তাঁর পেছনে ধাওয়া করে এমনকি গ্রেপ্তার করেও পেরুর বিদ্রোহের দাবানল নেভানো যাবে না।

সোসা থেকে হুয়াসকার আর কাক্সামালকা থেকে আতাহুয়ালপা একবার রওনা হতে পারলে আর ভাবনা নেই।

কিন্তু আতাহুয়ালপার সঙ্গে তাঁর চক্রান্ত যদি ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ত সবকিছুই ব্যর্থ।

না, তা কখনোই হয়নি মনে মনে বিচার করে ধারণা হয় গানাদোর। আতাহুয়ালপাকে যেটুকু চিনেছেন, তাতে তিনি কুটিল ক্রূর স্বার্থপর দাম্ভিক সবকিছু হতে পারেন কিন্তু সম্রাটোচিত মর্যাদাবোধে তি[illegible] পৃথিবীর কোনো নৃপতির চেয়ে কম য[illegible] না। যারা তাঁকে বন্দী করে রেখেছে, তাদে[র] চেয়ে তিনি অনেক ওপরের স্তরের মানুষ ইংকা রক্তের স্বাভাবিক আভিজাত্যে তি[নি] এ পার্বত্য রাজ্যের তুষারমৌলী উত্তু[ঙ্গ] শিখরের মতই স্বতন্ত্র ও অসাধারণ। আতাহুয়ালপা সুতরাং কোনো কারণে নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙবেন না রাজত্ব ফিরে পাওয়ার প্রলোভনে কিংবা চর[ম] উৎপীড়ন আর মৃত্যুভয়েও কোনো গোপ[ন] কথা বার হবে না তাঁর মুখ থেকে আর আতাহুয়ালপা ছাড়া এ বিদ্রোহে গোপন আয়োজনের কথা বিন্দুবিসর্গ যে জানে এমন কাউকে গানাদো কাক্স[া]মালকায় রেখে আসেননি। এ ষড়যন্ত্রের অ[ন্য] একজন মাত্র অংশীদার পাউলকো টো[পা] তাঁর সঙ্গেই কুজকোতে এসেছে। এখা[নে] রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভমুর হাতে ধ[রা] পড়ে সে হয়ত উৎপীড়নে কিছু কিছু গো[পন] কথা প্রকাশ করে ফেলেছে। পাউলকো টোপার পক্ষে যা প্রকাশ করা সম্ভব, রাজপুরোহিতের কাছে নতুন কিছু ন[য়]। তিনি ইতিমধ্যে গানাদোর কাছেই তার বে[শ] কিছু জেনেছেন। যা জেনেছেন, সে খ[বর] কিন্তু কাক্সামালকায় পৌঁছে দেবার জ[ন্য] রাজপুরোহিত একটুও ব্যস্ত হবেন [না] সন্দেহ। এ ধরনের গুপ্ত ষড়যন্ত্র [illegible] দেওয়ায় ঝুঁকি ত' কম নয়। তার উপ[illegible]

প্রমাণ না দিতে পারলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাছাড়া এখান থেকে খবর পাঠালেও ইতিমধ্যেই কাক্‌সামালকা থেকে তার জবাবে এসপানিওল রিসালা কুজকোয় এসে হানা দেওয়া সম্ভব নয়।

আতাহুয়ালপার কাছ থেকে গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়নি যেমন ধরে নেওয়া যেতে পারে, রাজপুরোহিতের কাছ থেকেও কোনো খবর কাক্‌সামালকায় যায়নি এ-কথাও বিশ্বাস করতে পারা যায় তেমনি।

ষড়যন্ত্র প্রকাশ না পাওয়ার আর একটা প্রমাণ এই বলে গানাদোর মনে হয় যে, এরকম একটা সর্বনাশা কিছুর আঁচ পেলে পিজারো কুজকো পর্যন্ত শুধু সোরাবিয়া আর হেরাদার নেতৃত্বে ছোট একটা রিসালা পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন না।

সোরাবিয়ার আর হেরাদার আলাপে শুধু তাঁর নামটাই তাহলে প্রধান হয়ে উঠত না অতখানি।

গানাদোই তাহলে কাক্‌সামালকা থেকে এসপানিওল রিসালার কুজকো অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য বলে বোঝা যাচ্ছে। এসপানিওলদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যদি প্রকাশ না হয়ে থাকে,—হয়নি বলেই নিশ্চিত ধরে নেওয়া যেতে পারে—তাহলে তাঁর এতবড় সম্মান পাওয়ার কারণ কি?

শুধু পলাতক একজন এসপানিওল সৈনিকের জন্যে এত মাথাব্যথা পিজারোর হতে পারে না যে, তাকে ধরতে ছোটখাটো একটা সওয়ার দল পাঠাবেন।

সে সওয়ার দলের নায়ক আবার সোরাবিয়া।

সোরাবিয়া কোথা থেকে এসে কি করে এ বাহিনীর নায়ক হয়, সেইটেই ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না গানাদো।

মেদেলিন শহরের যমপুরীর মত কারাগার থেকে পালিয়ে আসবার পর আর কোনোদিন সোরাবিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা সত্যি ছিল না। সোরাবিয়ার হাতেই ভাগ্যের চক্রান্তে কাপিতান সানসেদোর সঙ্গে সেবার ধরা পড়েছিলেন বটে, তারই ঘুষ আর প্রতিপত্তির দরুন চালানও হয়েছিলেন অমন জীবন্ত কবরে। কিন্তু সেখান থেকে প্রায় অলৌকিকভাবে উদ্ধার-পাবার পর সোরাবিয়ার জগৎ চিরকালের মত ছেড়ে আসতে পেরেছেন বলেই ধারণা করেছিলেন।

সোরাবিয়া ত আর তখন যেমন-তেমন কেউ নয়, দস্তুরমত মার্কুইস গঞ্জালেস দে সালিস। গানাদো আর সানসেদোর কারাগার থেকে পালাবার খবর পেয়ে রাগে যত আগুনই সে হোক, গানাদোকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আর উৎসাহ তার না থাকবারই কথা। অভিজাতদের একজন হিসেবে এসপানিয়ার আমিরী ফেলে একটা হাঘরে খেয়ো কুকুরের মত তাড়া-খেয়ে-ফেরা গোলামের পিছনে সে ছুটে মরবে কেন? আক্রোশ তার ছিল, সে গোলামের বিরুদ্ধে তা' ত মিটেই গেছে। যদিবা কিছু অবশিষ্ট থাকে এমন নিশ্চয় নয় যে এসপানিয়ার ঐশ্বর্য বিলাস প্রতিপত্তি সব বিসর্জন দিয়ে এই অজানা বিপদের রাজ্যে পাড়ি দেওয়াতে পারে!

এত জায়গা থাকতে এই 'সূর্য কাঁদলে সোনা'-র দেশেই সোরাবিয়ার আসাটা একটু বেশী অদ্ভুত লাগে গানাদোর। গানাদোর সন্ধানেই সোরাবিয়া সবকিছু ছেড়ে বেরিয়েছে এই অসম্ভব ব্যাপারও যদি সত্য হয়, তাহলেও ঠিক এই রাজ্যেই সে আসে কেমন করে? গানাদো যে এখানে এসেছেন তা ত' তার কোনমতেই জানবার কথা নয়।

গানাদো অনেক কিছুই ভাবেন কিন্তু এক হিসেবে যে নিয়তি সোরাবিয়ার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ থেকে তাঁর জীবনে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের অভিশাপ এনেছে, সেই নিয়তিই যে সোরাবিয়াকে নাটকের শেষ অঙ্কের জন্যে তার নিজের অগোচরে এই দুর্গম ইংকা সাম্রাজ্যে এনে ফেলেছে সেইটুকু ঠিক কল্পনা করতে পারেন না।

কেমন করে আর পারবেন? পিজারোর জাহাজে সেভিলের বন্দর ছাড়বার পর তাঁর ও কাপিতান সানসেদোর পিছু নিয়ে সোরাবিয়া যে কতদূর পর্যন্ত ধাওয়া করেছে, তা গানাদো জানেন না। সেই অনুসরণের পথেই মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিসরূপী সোরাবিয়ার হঠাৎ এসপানিয়া আর যে নিরাপদ মনে হয়নি, মান সম্ভ্রম ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েও নিজের দেশ থেকে কিছুদিনের জন্যে নিরুদ্দেশ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে যে মনে হয়েছে, এ খবরও গানাদো পাননি।

কর্ডোভার ঘাটে কর্টেজের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হবার পরই সোরাবিয়া শুধু কর্ডোভা কি নিজের নতুন আস্তানার শহর মেদেলিন নয় এসপানিয়াই ত্যাগ করবার ব্যবস্থা করেছে।

এসপানিয়া সে চিরকালের জন্যে ছাড়েনি। কিছুকাল বাইরে কোথাও কাটিয়ে কর্টেজের সন্দেহে তার সম্বন্ধে বেয়াড়া প্রশ্ন যদি কিছু ওঠে সেটা থিতিয়ে দেবার সময় দিতে চেয়েছে।

আর সব জায়গা থাকতে তার পেরুতে আসাটা একেবারে আকস্মিক অবশ্য নয়। কর্টেজের নিজের রাজ্য মেক্‌সিকো যাবার কথা ভাবাই যায় না। ফার্ণানডিনা হিসপানিওলা এমনকি পানামায় পর্যন্ত বড় চেনাশোনার ভিড় বেড়ে গেছে। গা ঢাকা দিয়ে কিছুকাল থাকবার পক্ষে সেগুলো খুব প্রশস্ত নয়।

এসব রাজ্য ছেড়ে দিলে বাকি থাকে অজানা দুর্গম রহস্যময় এক সোনায় মোড়া কিংবদন্তীর দেশ।

সোরাবিয়া বেপরোয়া হয়ে সেখানেই পাড়ি দিয়েছে। অজ্ঞাতবাসকে অজ্ঞাতবাস, তারই সঙ্গে ভাগ্য একটু সদয় হলে সেখান থেকে সোনার কাঁড়িও নিয়ে আসা যেতে পারে।

ভাগ্য যে তার ওপর সদয় টাম্বেজ বন্দরে জাহাজ থেকে নামবার পরই তার যেন প্রমাণ পেয়েছে। ভাগ্য অনুকূল না হলে ওখানেই গাল্লিয়েথোর সঙ্গে দেখা হবে কেন?

গাল্লিয়েথোর বিবরণ শুনতে শুনতেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সোরাবিয়া। দুনিয়ার আর সবাই ভুল করতে পারে কিন্তু পেরুর আদি দেবতা ভীরাকোচার নতুন অবতারের রহস্য যে কি, সে-বিষয়ে তার ধারণা একেবারে অভ্রান্ত হতে বাধ্য।

ভাগ্য যেন এ নতুন রাজ্যে তার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির চাবিকাঠি নিজে থেকে তার হাতে তুলে দিয়েছে।

এসপানিওল সেনাপতি পিজারোর কাছে এ রহস্য ভেদের বাহাদুরী দেখাতে পারলে একমুহূর্তে তার কদর বেড়ে যাবে।

বাহাদুরী দেখাতে যে সে পারবে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ সোরাবিয়ার নিজের মনে তখন নেই। তলোয়ার চালাবার কৌশলের একটি নমুনার কথা শুনেই সে চিনে ফেলেছে ভীরাকোচার অবতারকে! এ দেশের মর্কটগুলোর ত' নয়ই, একটি মাত্র লোকের ছাড়া এসপানিওল বাহিনীরও কারুর তলোয়ারের কাজের অমন সূক্ষ্ম কেরামতি নেই, যাতে যেখানে খুশি ওই চিকে-র দাগ দেওয়া যায়।

কথায় কথায় গানাদো নামে এক ত্রিয়ানার বেদে এসপানিওল বাহিনীতে আছে জেনে আর উত্তেজনা চেপে রাখতে পারেনি সোরাবিয়া। সেইদিনই গাল্লিয়েথোকে নিয়ে রওনা হয়েছে কাক্‌সামালকার উদ্দেশে।

কাক্‌সামালকায় যখন সে গিয়ে পৌঁছেছে, গানাদো তখন সেখান থেকে নিরুদ্দেশ। পিজারো তার নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত হয়েছেন কিন্তু খুব বেশী গুরুত্ব ব্যাপারটায় দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি।

মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিসরূপী সোরাবিয়া কাক্‌সামালকায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যা বলেছে, তা পিজারো বিশ্বাসই করতে পারেননি প্রথমে।

গানাদো, মানে ওই সামান্য বেদেটা অমন আশ্চর্য কেউ? তার বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় অবশ্য আগে অনেকবার পেয়ে মনে মনে তারিফ করতে বাধ্য হয়েছেন। সত্যি কথা বলতে গেলে আতাহুয়ালপার কাছ থেকে সোনার কাঁড়ি আদায় করবার ফন্দি নিজের মাথা থেকে সেই বার করেছিল। লোকটাকে কেন তাঁর বরাবর যেন চেনা-চেনা লেগেছে, তা ঠিক মনে করতে না পারলেও, তার কয়েকটা পরামর্শের জন্যে তার প্রতি একটু কৃতজ্ঞই বোধ করেছেন।

সেই গানাদো তলোয়ারের খেলায় এসপানিয়ার কিংবদন্তীর বীর 'এল সীড'-এর মত অদ্বিতীয়? সে-ই ভীরাকোচার অবতার সেজে এসপানিওল সৈনিকদের জব্দ করে মুখে কলঙ্ক-চিহ্ন দেগে দেয়? কেন?

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

নাগাভূমিতে হত্যা

"জেনারেল" কাইটো সেমা ছিলেন বিদ্রোহীদের মধ্যে বিদ্রোহী। দশ বছর আগে যেসব বিদ্রোহী নাগা কোহিমা শহর অবরোধ করে চমকের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের নেতা ছিলেন এই কাইটো। ১৯৬১ সালে এই কাইটোই পাকিস্থানে দলবল নিয়ে গিয়েছিলেন স্বাধীন নাগাভূমি আন্দোলনে সেদেশের সমর্থন ও সাহায্য সংগ্রহ করার জন্য। সেখান থেকে তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন নির্বাসিত নাগা নেতা ফিজোর সঙ্গে দেখা করতে।

সেদিন কাইটো ছিলেন বিদ্রোহীদের তথাকথিত "ফেডারেল গভর্ণমেন্ট"-এর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। প্রকৃতপক্ষে, এই সেনাবাহিনী তাঁরই হাতে তৈরী। তাঁর ভাই কুখাতো সুখাই ছিলেন "ফেডারেল গভর্ণমেন্ট"-এর "প্রধানমন্ত্রী"।

গত ৩ আগস্ট তারিখে সেই "জেনারেল" কাইটো যখন কোহিমায় আততায়ীর গুলীতে বিদ্ধ হলেন তখন "ফেডারেল গভর্ণমেন্টের" সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে গেছে। তিনি বিদ্রোহী সরকারের বাইরে আর একটি পাল্টা সরকার গঠন করেছেন।

কোহিমার রাস্তায় তিনি যখন হাঁটছিলেন তখন অজ্ঞাত আততায়ী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী করল। পরের দিন কোহিমার সামরিক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হল। মরার সময় তাঁর বয়স অনুমান ৪০ বছরের কম হয়েছিল।

নাগাভূমিতে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এই প্রথম ঘটল না। এর আগে, বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে বিদ্রোহী নাগারা সাথারি নামে এক ব্যক্তির মাথা কেটে নিয়েছিল। ১৯৬১ সালে খুন করা হয়েছিল ডাঃ ইমকংলিবা আওকে। প্রধানত এই ডাঃ আওয়ের চেষ্টাতেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পৃথক রাজ্য হিসাবে "নাগাল্যান্ড" গঠিত হয়েছে। যাঁরা স্বাধীন, সার্বভৌম নাগারাজ্য স্থাপনের আন্দোলন করছিলেন তাঁরা স্বভাবতই ডাঃ আওয়ের এই চেষ্টাকে সেকনজরে দেখেন নি। তাঁদেরই হাতে প্রাণ গিয়েছিল ডাঃ ইমকংলিবা আওয়ের।

কিন্তু "জেনারেল" কাইটোকে প্রাণ দিতে হল কেন? কে তাঁকে হত্যা করল? এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় নি। তবে, যে পরিস্থিতিতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তাতে তার একটা বোধগম্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এটা জানা ছিল যে, নীতিগত প্রশ্নে গত বছর দয়েক ধরে কাইটোর সঙ্গে অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের গুরুতর মতভেদ হচ্ছিল। প্রশ্নটা দেখা দিয়েছিল চীনের সাহায্য নেওয়ার সম্পর্কে। বিদ্রোহী নাগাদের একাংশ যেভাবে ক্রমেই বেশী করে চীনের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছিলেন সেটা কাইটোর পছন্দ হচ্ছিল না। এই মতভেদের দরুণেই তিনি "ফেডারেল গভর্ণমেন্টে"র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে পাল্টা সরকার গঠন করেন। এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি স্বাধীন নাগারাজ্যের দাবী ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে এই দাবী আদায় করার জন্য চীনা সমর্থন ও চীনা অস্ত্রের উপর নির্ভর করার বিরোধী ছিলেন সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কয়েক দিন আগে তিনি ফেডারেল গভর্ণমেন্টের সেনাবাহিনীর অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক 'জেনারেল' জুহেতোকে বন্দী করেছিলেন।

এই সব ঘটনা থেকে একটা অনুমান করা সম্ভব যে, কাইটোর হত্যার মধ্য দিয়ে ফেরারী নাগাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একদিকে যখন খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, চীনারা নাগাদের ভারতের বিরুধে ভিয়েতনামের ধরনের গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করার উস্কানি দিচ্ছেন, চীনে একটি প্রবাসী নাগা সরকার গঠনের পরামর্শ দিচ্ছেন এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও চৈনিক 'পরামর্শদাতা' ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করার আশ্বাস দিচ্ছেন তখন অন্যদিকে খবর হচ্ছে, নির্বাচিত নেতা ফিজো ও তাঁর কয়েকজন অনুগামী মনে করছেন যে, প্রকাশ্যে চীনের সাহায্য নিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হতে গেলে বিদ্রোহী নাগারা পশ্চিমী সূত্র থেকে যেসব সহায়তা পাচ্ছে সেগুলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্পষ্টতই চীনের সাহায্য নেওয়া সম্পর্কে ফেরারী নাগা নেতারা এখন একটা উভয় সংকটের মধ্যে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অধিকতর চরমপন্থী তাঁদেরই হাতে সম্ভবত কাইটোকে প্রাণ দিতে হল।

কাইটোর এই শোচনীয় মৃত্যুর জের সম্ভবত সহজে মিটবে না। তিনি ছিলেন সেমা নাগা। নাগাদের মধ্যে ৩০টির বেশী গোষ্ঠী আছে। তাঁদের মধ্যে সেমারা সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও তাঁরা খুবই তেজস্বী। আর বিদ্রোহী নাগা নেতৃত্বের মধ্যে যাঁরা চরমপন্থী তাঁরা সাধারণত অঙ্গামি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কাইটোর এই হত্যাকাণ্ডে সেমা আর অঙ্গামিদের মধ্যে

একটা উপজাতীয় লড়াই বেধে গেলে আশ্চর্যের বিষয় হবে না।

এই শোকাবহ মৃত্যুর জন্যই হোক অথবা অন্য যে কারণেই হোক, কোহিমার প্রতিষ্ঠিত সরকার মৃত কাইটোর সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা দেখিয়েছেন। যে মানুষ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, যিনি সেই বিদ্রোহে পাকিস্থানের সাহায্য নিতেও কুণ্ঠিত হন নি মৃত্যুর পর তাঁকে বলতে গেলে প্রায় সরকারী মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শুধু যে ভারতীয় সামরিক হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়েছে তাই নয়, তাঁর মৃতদেহ তাঁর স্বগ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টার দেওয়া হয়েছে. মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় নাগাভূমির মুখ্যমন্ত্রী নিজে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে কাইটোর এই হত্যার তাৎপর্য কি? পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রলাল সিং রাজ্যসভায় জানিয়েছেন, নাগাভূমিতে ভারত সরকারের নীতির কোন পরিবর্তন হবে না। তিনি বলেছেন যে, ভারত সরকার নাগা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন এবং অস্ত্র-সম্বরণ চুক্তি লঙ্ঘন করার কোন ইচ্ছা তাঁদের নেই। কয়েকজন সদস্য এই বলে অভিযোগ করেছিলেন যে, নাগাভূমিতে পরিস্থিতির অবনতি হওয়া সত্ত্বেও সরকার অস্ত্রসম্বরণ করার ও অলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পুরনো নীতি অনুসরণ করেছেন। শ্রীসিং বলেছেন যে, সরকার আইন ও শৃংখলা বজায় রাখতে, অস্ত্রসম্বরণ চুক্তি যাতে মেনে চলা হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে ও অপরাধীদের শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর।

অস্ত্রসম্বরণ চুক্তি বলবৎ থাকাতেই বিদ্রোহী নাগারা বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসছে, জায়গায় জায়গায় ঘাঁটি করেছে। এই অস্ত্রসম্বরণ চুক্তির মধ্যেই খাস কোহিমায় রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের রক্ত-স্রোত বয়ে গেল। সুতরাং ভারত সরকারের পক্ষে আর কতকাল হাত গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব হবে বোঝা যাচ্ছে না। অস্ত্রসম্বরণ চুক্তির বর্তমান মেয়াদ আগামী অক্টোবরে শেষ হবে। তার মধ্যে নাগাভূমির রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান না হলে (যার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না) ভারত সরকার হয়ত চুক্তির মেয়াদ আর বাড়াতে সম্মত হবেন না। যদি না হন তাহলে নাগাভূমির মাটি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠবে।

"লাল পঞ্চশীল"

চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্রাটিশ্লাভায় ছয় রাষ্ট্রের কম্যুনিষ্ট নেতাদের সম্মেলনের পর যে ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে তাকে কেউ কেউ 'লাল পঞ্চশীল' বলে অভিহিত করেছেন।

এই ঘোষণাপত্রের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশটি হল এই যে, সম্মেলনে যোগদান-কারী রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজেদের মধ্যে সর্বাংগীন সহযোগিতা দৃঢ়তর করার ইচ্ছা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে, এই সহযোগিতা হবে সমতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ভ্রাতৃসুলভ পারস্পরিক সহায়তা ও সংহতির ভিত্তিতে।

এই ঘোষণাপত্রের আর একটি অংশে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গঠনের সাধারণ নিয়মগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে এবং শ্রমিক শ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাটিকে দৃঢ় করতে গিয়ে প্রত্যেক দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিই

মাওকে আম খাওয়ানো (সংবাদ)
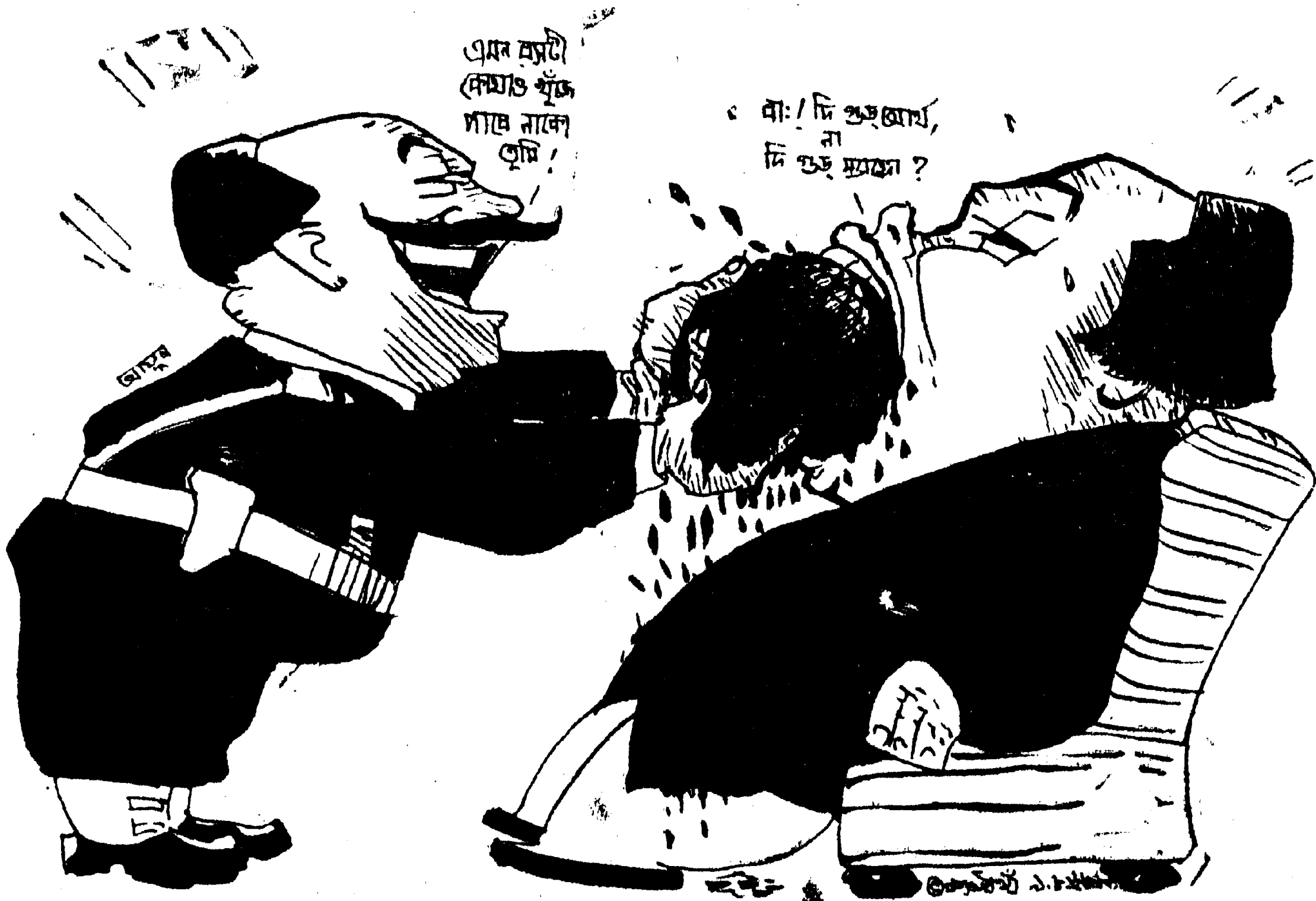
তার নিজের দেশের বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করবে।

এই দুটি স্বীকৃতিই আজকের চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে আশ্বাসজনক। সমাজতন্ত্রের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত না হয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া যদি তার নিজের দেশের অবস্থা অনুযায়ী অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে ভিন্ন পথে চলে তাহলে তার সমাজতান্ত্রিক প্রতিবেশীরা তার সেই ভিন্ন পথে চলার স্বাধীনতা মেনে নেবে এবং তার নির্বাচিত পথ থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না—সোভিয়েট রাশিয়া ও তার অনুগামী অন্যান্য দেশগুলির এই আশ্বাস চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন কম্যুনিস্ট নেতা আলেকজান্ডার ডুবচেক তাঁর দেশের মানুষের সামনে একটি বিরাট জয় হিসাবে তুলে ধরতে পারবেন।

কেননা, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই সোভিয়েট রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া ও পূর্ব জার্মানীর নেতারা ওয়ারসতে মিলিত হয়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে যে পত্র দিয়েছিলেন তা থেকে এই রকম একটা ধারণা করা সম্ভব ছিল যে, চেকোশ্লোভাকিয়া যদি তার ভুল সংশোধন না করে তাহলে তার উপর বলপ্রয়োগ করা হতে পারে। সুস্পষ্টভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে দাবী করা হয়েছিল যে, সেখানকার সংবাদপত্র ও বেতার মারফৎ 'সমাজতন্ত্র-বিরোধী' যে প্রচার চলছে তা বন্ধ করতে হবে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য সেদেশে রুশ সৈন্য মোতায়েন রাখার অধিকার দিতে হবে ইত্যাদি। এই সব দাবীর সঙ্গে সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তে রুশ সৈনাদের বৃহত্তম মহড়া শুরু হয়ে যাওয়ায় অবস্থাটা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ব্র্যাটিশ্লাভার ঘোষণার পর সেই উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে। এই স্বস্তিটুকু ক্রয় করার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়াকে কতখানি মূল্য দিতে হয়েছে সেটা পরিষ্কার হতে অবশ্য আরও কিছু সময় লাগবে।

*

উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা শ্রীচন্দ্রভান সিং বলেছেন, আগামী আসন্ন অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনে সেখানে কংগ্রেস ৭৫ লাখ টাকা খরচ করবে। জনসঙ্ঘের তরফ থেকে বলা হয়েছে, তাঁরা খরচ করবেন এক কোটি টাকা।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

শ্রীঝা'র সতক বাণী

বড় প্ল্যান না হ'লে বড় ধরণের বৈষয়িক উন্নয়ন সম্ভব নয়, এই মর্মে অর্থনীতিবিদদের একাংশের মনে যে ধারণা আছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর শ্রীএল কে ঝা সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তা ভ্রান্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেন, গোড়া থেকেই ব্যাপকভাবে সম্পদ বিনিয়োগের কোন দরকার নেই। কারণ অতীতে যে বিনিয়োগ করা হয়েছে তার থেকে ফল পাওয়া যাবে। অবশ্য সম্পদ সংস্থানের যে দরকার নেই তা নয়, কিন্তু সেটা পরের দিকে এবং উৎপাদন যত বাড়বে সেই অনুপাতে করা যেতে পারে।

শ্রীঝা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিদাম্বরম চেট্টিয়ার স্মারক বক্তৃতামালার শেষ ভাষণ দিচ্ছিলেন।

শ্রীঝা বলেন, তিনি উৎপাদনের যোগান এবং উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে কোন যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের পক্ষপাতী নন। কারণ ওভারহেড ক্যাপিটাল হিসাবে যথেষ্ট বিনিয়োগ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে যা অল্প-মেয়াদী ফল দেবে না। তাছাড়া ইঞ্জিনীয়ারিং ও মূলধনী দ্রব্য শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার অনেকখানিই অব্যবহৃত রয়েছে। তার ওপর অনেক রাজ্যে ব্যবহারের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। এ সবের অর্থ হচ্ছে আগামী কয়েক বছর অল্প মূলধন বরাদ্দে উচ্চতর উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অন্তত এই ধারণার কোন যুক্তি নেই যে, বেশি সম্পদ কাজে লাগাতে না পারলে উচ্চতর বিকাশের হার অর্জন করা সম্ভব নয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের মতে, এই ধারণা নিয়ে বসে না থেকে বরং পরিকল্পনার কার্যসূচীর সঠিক পুনর্বিন্যাস করার দিকেই নজর দেওয়া উচিত।

শ্রীঝা চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষির ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ বিকাশের হারকে অত্যাধিক হলেও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। কিন্তু তিনি বলেন, শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নিয়ে একটা দুরূহ সমস্যা দেখা দিয়েছে। মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলে অর্থনীতি কখনই আত্মনির্ভর হ'তে পারবে না কিংবা বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া উপযুক্ত বিকাশের হার অব্যাহত রাখতে পারবে না। কাজেই আসল প্রশ্ন হ'ল কি ধরণের মূলধনী দ্রব্য এবং কতখানি উৎপাদন ক্ষমতা তৈরী করতে হবে।

তিনি বলেন, সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত উৎপাদনের মোট পরিমাণ তার চাইতে কম হওয়া উচিত, কারণ সম্পূর্ণ সঞ্চয় মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের জন্যেই ব্যয় করা যেতে পারে না। আর মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের অত্যাধিক ব্যয় মেটানোর জন্যে যে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো যাবে তা-ও সম্ভব নয়। যদি কোন কিছু না ভেবেই মূলধনী খাতে ব্যয় বাড়ানো হয় তাহলে উৎপাদনের ক্ষমতা অলস পড়ে থাকবে আর ঐ ব্যয়ের চাপে ভোগ্য পণ্যের দাম বাড়বে।

শ্রীঝা চান, যে কাঁচামাল দেশের ভেতরেই পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতেই উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো উচিত। দেশের বাইরে থেকে কাঁচামাল আমদানী করে জিনিস তৈরী করার অনেক বিপদ ও অসুবিধা আছে, কারণ এর অর্থ হ'ল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে থাকা যদি বৈদেশিক মুদ্রায় ঘাটতি দেখা দেয় তাহ'লে কেবল উৎপাদনই ব্যাহত হবে না বেকার সমস্যাও বাড়বে।

শ্রীঝা মনে করেন, অন্তত চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরগুলিতে, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও পরিবহনের ক্ষেত্রে খুব সতর্কভাবে বিনিয়োগ করা উচিত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আগের মতোই বর্ধিত বরাদ্দ বাঞ্ছনীয়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৮)

সুতরাং যা ঘটবার ঘটে গেল বলতে হয়।

আর রাণীচকে ফিরে সত্য নিজের মুখেই এত সব রটিয়েছে যে ভাবতে অবাক লাগে। ওরা বেচারা সত্যর মত ভালোমানুষ পেয়ে একটা ছেনাল গছিয়ে দিয়েছিল। তাই তো! নতুবা অমন বড় ঘর অত জোতজমা—একমাত্তর কন্যারত্ন,— তাকে কিনা মহিমের ছেলের মত পাত্রে সমর্পণ, যার কুড়েমিরও তুলনা নেই আর গেরস্থালির ক্ষেত্রে যাকে বলে—'ভাঁড়ে মা ভবানী'!

তবে সত্যচরণ ভীষণ বোকা! লোকে তার বোকামির জন্যে জনান্তিকে গালমন্দ করছিল। বৌ ছেনাল তো হয়েছে কী। অমন সম্পত্তি ধনসম্পদ পায়ে ঠেলে পালিয়ে আসে কাপুরুষের মত? ছেনাল বৌ শায়েস্তা করা খুব একটা কঠিন কাজ বলে লোকে মনে করে না। অহল্যাদের পাথর করা খুব কঠিন কাজ কি?

হাটুবাবু প্রায় মারতে আসেন আর কি! হ্যাঁরে হারামজাদা, গলায় দড়ি জোটে না তোর? তুই না ভদ্রসন্তান, লেখাপড়া জানিস?

সত্য বোকার মত তাকাল শুধু।

ঠিক আছে। হাটুবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, আমার সঙ্গে আজই চল সদরে।

সত্য ফের হাঁ করে তাকাল।

ঠুকে দিয়ে আসি চল্‌ এক নম্বর। আদালত থেকে পেয়াদা পাঠিয়ে দেবে, মাগীর চুলের মুঠি ধরে রেখে যাবে তোর বাড়ি।

নলিনাক্ষ সম্পর্কে সত্যর জ্ঞাতিভাই। সে জিভ কেটে বলল, ছিঃ হাটুকা, হাজার হোক, ভদ্রলোকের বাড়ির বৌঝি।...

তুই থাম্‌ তো নলেন! হাটুবাবু গর্জালেন। ভদ্দরলোক! আজকাল ভদ্দরলোক কোথায় আছে রে! যা না গঙ্গা পেরিয়ে বহরমপুর। দেখে আয় ভদ্দরলোকের ভদ্দর মেয়েদের পোষাক-আষাক কথার ছিরি! এ হল কলির শেষ পা! অঘাট ঘাট হচ্ছে, ঘাট হচ্ছে অঘাট; জাতবেজাত মানামানি নেই, বামুন-শুদ্দুর এক ঘাটে জল খাচ্ছে। যে গেলাসে তুই চা খাচ্ছিস, সেই গেলাসে আধ মিনিট আগে মোছলমানে মুখ দিয়ে গেছে। অতএব..

এ সব তুলকালাম ও শলাপরামর্শ সামলে নিতে দেরী হল না সত্যর। এমন কি লোকজন নিয়ে গিয়ে জোর করে লীলাকে ধরে (অবশ্যি রাত্রিকালে) আনবার চেষ্টাও সে করল না। অবশেষে হাইওয়ের পাশে বাজারের এক প্রান্তে একটা চায়ের দোকান খুলে বসল।

বন্ধু-বান্ধব সত্যর বরাবর কম ছিল। এ সুযোগে কিন্তু তাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে গেল। তারা প্রথম-প্রথম এসে ঠাট্টা করত—কী রে সতু, ব্যাটা কায়েতের পো, কলম ঠুকে প্যাঁচ পয়জার কর্বি, তা নয় শেষে গেলাসে ছাকনী ঠুকছিস। শালা মরেছে রে!

সত্য শুধু হাসে নিঃশব্দে।

বিয়েতে তো অনেক টাকা পেয়েছিলি, কী হল সেগুলো? একটা বড়সড় ব্যবসা তো অনায়াসেই খুলতে পারতিস সতু!

সত্য রহস্যময় ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকে।

কত পেয়েছিলি যেন, দশ হাজার না কত?

সত্য আঙুল দিয়ে দেখায় নিঃশব্দে। সাত হাজার।

কী হল সে টাকা?

সত্য শুধু বলে, আছে।

টাকার অঙ্ক অবশ্যি এখন অত নেই। হাজার চারে ঠেকেছে। শয়তান সুখেনকে ধার দিয়েছিল বার কয়। প্রায় হাজার দুইয়ের বেশি—সঠিক হিসেব করা কঠিন এখন। লীলাকে লুকিয়ে দিয়েছিল। নোটবইতেও টোকা নেই। বাকী হাজারখানেক দু বছরে খরচ করেছে নিজের কাজে। এসব ব্যাপারে লীলা কখনও মাথা ঘামায় নি। আসলে, সত্যর মনে হয়—ও তো সংসারী মেয়ে ছিল না। ওর মন ছিল অন্যদিকে।

চায়ের দোকান খুলতেও সামান্য কিছু টাকা তুলতে হয়েছে ব্যাংক থেকে। সখের দোকান! কিন্তু সব থাকতে, এই বাজে কারবারে কেন তার এত ঝোঁক পড়ে গেল, সত্য নিজেই বোঝে নি। শুধু বুঝতে পারে, বেশ লাগে। চারপাশে চেনা-অচেনা মানুষের আড্ডা। ভীড়ের মধ্যে দিনটা ভালই কাটে। কত গল্প শোনে—কত সব বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে পারে—সেটা জানা হয়। এছাড়া আর কী?

বন্যা

[উপন্যাস]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
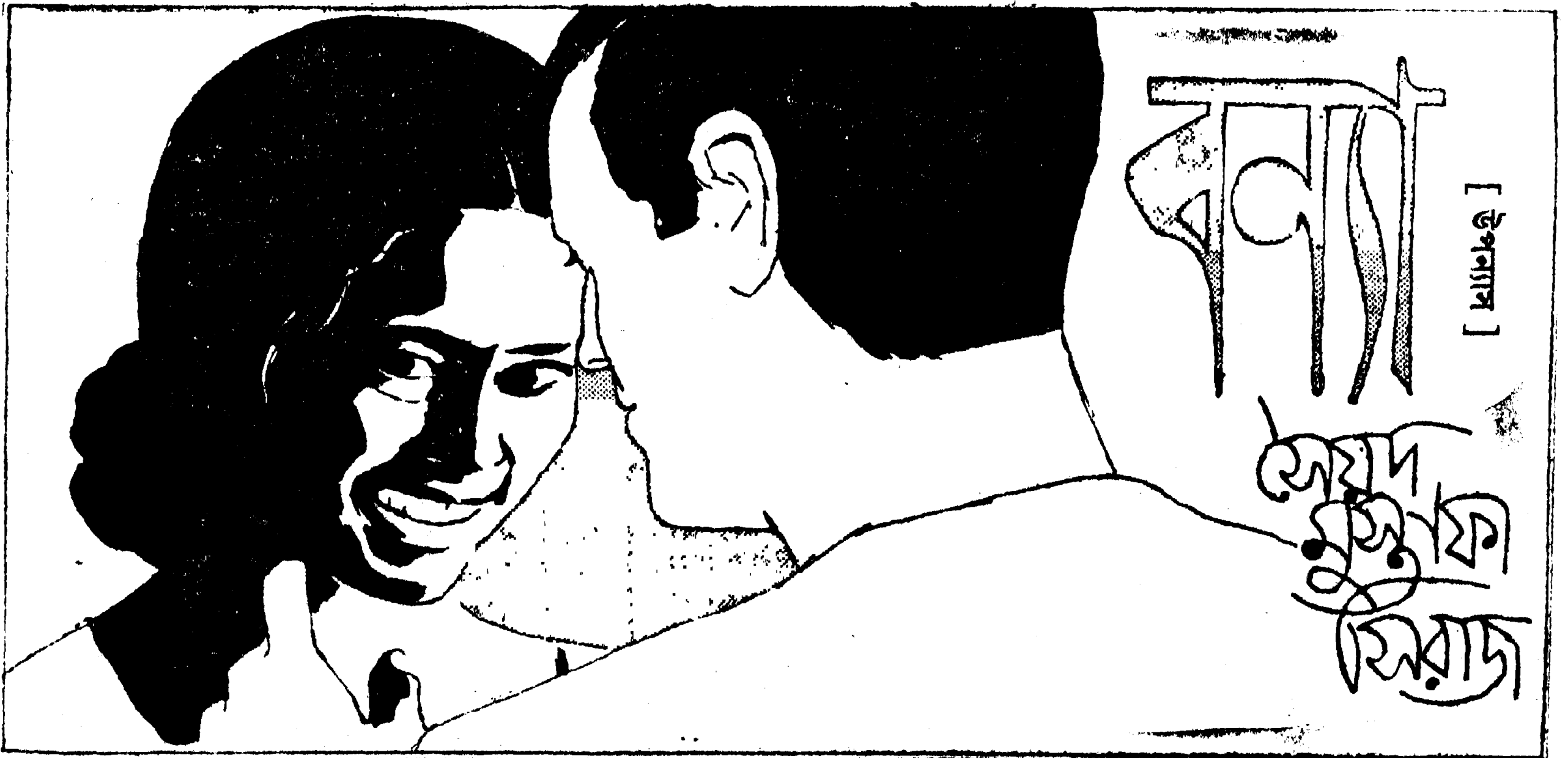
যাতায়াতের পথে মানুষ একবার এসে বসে যায়। কত নতুন মুখ! হাইওয়েতে আজকাল কত গাড়ির আনাগোনা হয়। কোনটা সামনের মেহগিনি গাছের ছায়ায় থেমে যায়। বেরিয়ে আসে সুন্দরী মেয়েরা! অপ্সরাদের মত। কী নিটোল নগ্ন বাহু, মনোরম চাহনি, উজ্জ্বল গ্রীবা! পাছার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে সত্য। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত মনে পড়ে যায় লীলার দেহের কথা। হয়ত এমন সাজলে, নগর-বাসিনী হলে, লীলা এদের চেয়েও সুন্দরী হত!

আর লীলাও, তো ইচ্ছে করলে এখন শহরে বাড়ি করতে পারে। কিনতেও পারে এমন একটা সবুজ রঙের মোটরগাড়ি। তারপর ধরা যাক্, মেসেঞ্জোর বাঁধ দেখতে বা দূর পাহাড় অঞ্চলে তার কোমরের ব্যথা সারাতে যেতে পারে রুদ্রেশ্বরের থানে—সেই গাড়ি চেপে! তার নরম গদীতে বসে থাকতেও পারে শয়তান সুখেনটা! হয়ত সত্যকে দেখেছিল আসতে আসতে—থামাল গাড়ি। নামল। জুতোর শব্দে কাঁপল পীচের পথ। বুকও কি কাঁপবে না সত্যর?...হুম্! লীলার কী কেনার আছে এখানে?...ঘাড় ঘুরিয়ে খোঁজে সত্য। আছে, আছে। সুখেনের জন্যে সিগ্রেট। কিম্বা গাড়ির জন্যে পেট্রোল। কী তরঙ্গ তুলে হাঁটছে লীলা!... আঃ আঃ!

যেন লীলার সেই ব্যথাটার মত ব্যথা নাভির নীচে। সত্য আনমনে ককায়, আঃ আঃ!

বুলু বলে, কী হল মামা? পেট ব্যথা?

মাথা নাড়ে সত্য।

তুমি শুয়ে পড় বেঞ্চে। নাকি বাড়ি যাবে? বুলু এগিয়ে আসে। আমি বসছি মামা।

চা করতে পারবি?

খুব পারব।

তাই বস্ বাবা। আমি ঝোঁকটা একটু সামলে নিই।

বেঞ্চে দুপুরের পত্রপল্লবঘন মেহগিনির ছায়া ঘন হয়েছে। সে শোয় হাত পা ছড়িয়ে। ডাকে, বুলু খদ্দেরকে চা দিয়ে একবার আয় দিকি।

যাচ্ছি মামা।

সঙ্গীটিও বেশ জুটেছে। নিবারণ মাস্টারমশায়ের দশ বছরের ছেলে বুলু। মাস্টারমশায় বলতেন, বুলুর কপালে লেখাপড়া নেই। খালি টোটো ঘুরে বেড়ানো। ও ব্যাটা নির্ঘাৎ জুতো সেলাই করবে ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে। মরতে দাও আমায়—তারপর দেখো।

ক্লাস সেভেনে অবশ্যি উঠেছিল কোন-গতিকে। হঠাৎ মাস্টারমশাই সত্যি সত্যি মারে গেলেন। সুতরাং এই দশা স্বভাবত হয়েছে।

আরো গোটাচার ভাইবোন রয়েছে ওর! মা একরকম ঝি-গিরি করে বাঁচছে। ছেলে-মেয়েদের আরো দুটো স্কুল ছেড়ে দিয়েছে একে একে। আর দুটো হাঁটি-হাঁটি পা-পা।

বুলু, দেখ তো বাবা, চুল পেকেছে নাকি! সত্য আরামে চোখ বুজে বলে।

বুলু সত্যি সত্যি চুল খোঁজে। তারপর বলে—নাঃ, নেই!

পাকে নি? সত্য চোখ বুজে হাসে। আটাশে চুল পাকবার কথা না। অথচ কেবলই সেরকম মনে হয়। প্রতি রাতে শোবার আগে মনে হয়, সকালে উঠে দেখবে সে সারা মাথা সাদা হয়ে গেছে। চামড়া হয়েছে গাছের বাকল, সে লাঠি খুঁজবে। মহিমের সেই ময়ূরমুখো সাখের লাঠিটা।

এমনি দুপুরে জায়গাটা বেশ নির্জন হয়ে ওঠে কোনদিন। কোন গাড়িও আসে না হাইওয়েতে। বড় বড় গাছগুলো ঝিমোয় নিঃশব্দে—বাতাসের সাড়া নেই। চারপাশের ঘন সবুজ রঙের ওপর হঠাৎ যেন জমে ওঠে ছায়া। পাখি ডাকে। ছায়া আরও ঘন হয়।

চোখ কচলায় সত্য। মনে মনে স্থির করে—শীগগীর চশমা নিতে হবে তাকে। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকা বড় দরকার মনে হয় কেন!

খুব সাবধানে পা ফেলে আস্তে আস্তে সে হাঁটে। কথা বলে কম। কিন্তু রোজ সকালে দাড়ি কামাতে ভোলে না। হাতের কাছেই সেলুন খুলেছে বনমালী। ধোওয়া ইস্তিরি করা জামাকাপড় পরেই চা ছাঁকে—চায়ের দাগ না লাগবার দিকে সে ভারী সাবধানী। আর স্নানের সময় অবিকল লীলার মত অনেকক্ষণ ধরে গায়ে সুগন্ধ সাবান মাখে। চুলে শ্যাম্পু করে।

আর রান্নার জন্যে রেখেছে যমুনাকে। খবর শুনে দিদি নিজে সঙ্গে করে এনে-ছিল ওকে। তার ভাসুরের মেয়ে। মা-বাবা ছেলেবেলায় মারা গেছে। এতদিন দিদির সংসারেই ছিল।

কিশোরী হয়ে উঠেছে যমুনা। এখানে এসেই শাড়ি পেয়েছে। বাড়ির পাশেই দোকান খুলেছে সত্য। কিন্তু যমুনার জন্যে সে হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ফাঁক পেলেই বাড়ি ঘুরে যায়। দেখে যমুনা জানালার কাছে পা ছড়িয়ে বসে বই পড়ছে। নয়ত সেলাই করছে।

নাঃ, ঘর ভাঙে নি সত্যর। ভাঙতে পারে নি লীলা। ঘরে ঝাঁটা পড়ে। উঠোনে পড়ে। ঘরদোর ঝকঝকে তকতকে হয়ে থাকে আগের মত। থরেথরে ফুলও ফোটে। গাঁদা হরগৌরী জবা। ঝি এসে কাজ করে দিয়ে যায়। হাতের কাছে যা চাওয়া যায়, ঠিকঠিক মেলে।

সুতরাং সত্যর জীবনে বাইরের দেখবার মত ব্যাপারগুলো একই চলেছে। কেবল সে নিজে যেন বদলে যাচ্ছে—খুব ভিতর থেকে।

এক লোলচর্ম অথর্ব বৃদ্ধ মানুষ—যার দু চোখে অসম্ভব জ্যোতি, সত্যর মাংস ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল। সত্য মাঝে মাঝে ভয়ে চমকে উঠছিল—ও কে? তার বড় বড় নখ, বিশৃংখল চুল, গা-ভরতি লোম, দাড়ি-গোঁফ-ঢাকা মুখবিবর তায় হাঁ করে খাদ্য গেলে।

দোকানে বুলু ঘুমোয় রাত্রিবেলা। বাইরে বেঞ্চে শুয়ে থাকে চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে অভা, অভয় সংগোপ। সন্ন্যেসী-দের মত চেহারা। গাঁজার যম। আর সত্য

আজকাল বাড়িতেই শোয়। যমুনা একা থাকবে কি করে?

একদিন দুপুরবেলাতে পাশের ঘরে যমুনা ভয় পেয়ে ডাকছিল সত্যকে। সত্যর অনিদ্রা। সে হুড়মুড় করে বেরিয়েছিল দরজা খুলে। কী হল, কী হল যমুনা?

যমুনা কাঁচুমাচু মুখে বলল, জানালায় কে যেন দাঁড়িয়েছিল। ডাকছিল আমাকে:

চিনতে পেরেছ?

না।

জানালা বন্ধ করে দাও।

পরক্ষণে সত্যর মনে হয়েছিল, যা গরম পড়েছে! তায় অসম্ভব মশা। মশারির মধ্যে শুতে হয়। সে বলেছিল, ঠিক আছে, আমি আসছি।

সেই থেকে একঘরে শোওয়া। যমুনা যুবতী হচ্ছে। গ্রামের লম্পট ছেলেদের শ্যেন দৃষ্টি তার ওপর রয়েছে—এটা স্বাভাবিক।

পাশাপাশি মেঝেয় শিয়রে জানালা—দুটো মশারি। যমুনা নির্ভয়ে ঘুমোয়। সত্যর অনিদ্রা।

এবং হঠাৎ কোন রাতে সত্য হেরিকেনের দম বাড়িয়ে দেয়। আস্তে আস্তে—অতি সন্তর্পণে যমুনার মশারিটা তুলে একটুখানি দেখে নেয়। জামদুটো সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আছে যমুনার। গরমের জন্যে জামার বুক খুলে শোয় সে। সত্য দেখে।... যমুনা কে তার? তার সঙ্গে সত্যর এতটুকু রক্তের সম্পর্ক নেই। ও সত্যকে মামা বলে ডাকে। কেন ডাকবে?...সত্যর এ রকম মনে হয়। সব যুক্তিহীন ঠেকে।

অথর্ব এক বৃদ্ধের মাংস ঠেলে ওঠা দোলা—ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গ নিয়ে সত্য দাঁতে দাঁত চাপে। আস্তে আস্তে সাবধানে হাত বাড়ায়। প্রথমে আঙুলে ছোঁয় হাঁটুর কাছটা। ক্রমশ আঙুলে চাপ বাড়ে। যমুনার ঘুম বড় গাঢ়—তার মনে হয়। সে ভাবে, অতি সহজেই একটা কিছু করা যেতে পারে।

কিন্তু কিছু ঘটে না।

হয়ত ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরে যমুনা। কিম্বা সত্যর ক্লান্তি লাগে। বিড়ি খেতে ইচ্ছে করে। সরে এসে বাইরে বেরোয়।

তারপর প্রচণ্ড দুঃখ তার বুকে ভেঙে যায়। যমুনার জন্যে মায়া লাগে। বাৎসল্যে পূর্ণ মন নিয়ে সত্য ভাবে, আচ্ছা, আমিও তো বাবা হতে পারতাম ওর, কিম্বা কারুর, কিম্বা কলঙ্কিনী পাপিষ্ঠা ওই লীলারাণীর গর্ভজাত কোন কন্যার!...

কালই বহরমপুরে যাবে সত্য। কিনে আনবে একটা সুন্দর শাড়ি। কিছু প্রসাধন-দ্রব্য। যমুনার ফ্রকগোটা খুব বাজে আর পুরনো। নতুন একটা কিনে দিতে হবে।

সত্যিসত্যি কেনা হয়ে গেল সেগুলো। তারপর সত্য যখন খেতে বসেছে, যমুনা সামনে বসে একটু হেসে বলে উঠল—আচ্ছা মামা, আপনি রাত্তিরে আলো জেলে কী দেখেন বিছানায়?

চমকে উঠেছিল সত্য। গলায় ভাত আটকেছিল তক্ষুনি। খুব গম্ভীর হয়ে বলল, কার বিছানায়?

অক্লেশে যমুনা জবাব দিল, সত্যি। বড্ড ছারপোকা হয়ে গেছে। শহরে গেলে মনে করে বিষ এনো দিকি!

তখন সত্য হাসল হো হো করে। বলল, ছারপোকার জন্যে?

নয়তো কি আমার জন্যে? যমুনা চোখ পাকিয়ে বলল।

সর্বনাশ! মেয়ে যে তলে তলে পেকে লাল টুকটুকে হয়ে গেছে রে বাবা! সত্য খাওয়া ছেড়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কেবল হাসছিল। শেষে বলল, তবে আমার জন্যে!

যান্। আপনি খাবেন কোন দুঃখে!

সত্যর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কেন তোর মামীমার জন্যে দুঃখ নেই বুঝি?

যমুনা বলল, ছাই মামীমা! অমন মামীমা থাকলেও যা না থাকলেও তাই। কী কষ্টটা পাচ্ছেন শুনি!

সত্য রসিকতা করল, কষ্ট একটা আছে তুমি বুঝবে না এখন।

কখন বুঝব?

বয়স হোক, তারপর।

সত্য এমন বিচ্ছিরি ভঙ্গীতে কথাটা বলল যে যমুনা লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরাল। বলল, যান! আপনি অসভ্য।

খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গলায় যেন কাঁটা বিঁধেছে কখন। এত খারাপ লাগে সব! এত বিচ্ছিরি! কেন এমনি করে একটা আড়াল খুঁজছে। জঘন্য কারচুপির ফিসফিস শব্দ শুনছে সকল রোমকূপে! সত্যর মনে হল, সে অজ্ঞাতে একটা নোংরা জায়গায় হাঁটছে, শহরের এক-পাশের সেই আবর্জনা ফেলবার মাঠটার মত একটা দুর্গন্ধ মাঠ—অথচ ঠিক ওখানে যেমন রয়েছে, তেমনি সুন্দর সবুজ গাছপালার মরশুমী ফুলের শোভা ইতস্তত! শহরের ওই মাঠটায় একটা গাধাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে। সত্য মনে মনে বলছিল, আমি, আমিই শালা সেই গর্দভটা!

পান খাবেন না?

দাও! জরদা দিয়েছ নাকি?

খুলে দেখুন, দিয়েছি। মজায় জরদা। কখনও খাননি। ভিরমি খাবেন।

কী জরদা দেবে আর যমুনা? মাথামুন্ডু আর নতুন করে ঘুরবে কতটুকু—ওটা ঘুরেই আছে।

যমুনা দ্রুত যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলে গেছে, এর নাম মামা বশকরা জরদা। সত্য কাঠ। সত্য পাথর। নরকের দরজা হুট করে খুলে গেল। সামনে আগুন, গায়ে আঁচ লাগে। তখন সে ছটফট করে উঠল। আঃ এখন তাকে অনায়াসে একটিমাত্র মেয়ে বাঁচাতে পারত। সে লীলা।

(৯)

ইতিমধ্যে ধূসর মাঠগুলো সবুজ রঙে ঢেকে গেছে। রূপপুর এখন রূপসী। সমতল নাবাল এলাকা। পথ বলতে তেমন কিছু নেই। ওরা বলে জহর—দুপাশে নিশিন্দা ফণীমনসা আর চোরাগাছের ঝোপ, কোনরকমে একখানা গোগাড়ি চলতে পারে। চাকার দুটো দাগ দেখেই বোঝা যায় এটা পথ। নয়ত পোড়ো জমির মত সবটাই ঘাসে ঢাকা। অনুমানুষের—বিশেষ করে শহুরেদের পক্ষে হাঁটা বেশ বিরক্তিকর। জুতো খুলেও রেহাই নেই। হাঁটুঅব্দি না গুটিয়ে নিলে চোরকাঁটার কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বে।

আর সাইকেল নিয়ে যে আসে, তাকে

পাশের জমির চাষারা বড় বড় হলুদ দাঁতে হেসে বলে, বল হরি, হরি বোল। পরক্ষণেই ম্রাঠকাঁপানো শব্দ। হা হা হা হা হা।

অনেক কষ্টে খাল-কাঁদরগুলো পেরিয়েছে সুখেন। সামনে বুঝি ওটাই রূপপুর। বিকেলের নরম আলোয় শরতকালের গ্রাম-বাংলা শান্ত অবোধ মেয়ের মত নীরবে হাসছে। বড় সহজে তার সর্বনাশ করা যায়।

মড়ার মত কাঁধে সাইকেল বইতে হচ্ছে। তাকে— যা দেখে চাষারা হরিধ্বনি দিয়ে হেসেছে; তবু মনটা প্রফুল্ল। হাঁটুঅব্দি প্যান্ট গুটিয়েছে সুখেন। ঠোঁটে সিগ্রেট, কাঁধে সাইকেল। মোজাভরা জুতো সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে আটকে রেখেছে। পকেটে ট্র্যানজিস্টার। গতিক বুঝে চাবি বন্ধ করে রেখেছিল।

অই মান্যবর বাবু মশায়ের শরীল বাজছে হে! আহা বাবুমশায় বাজছেন......

না রে ধনপতি উটা রেড্ডো!

উঁহু, টেনজিসটার।

কিনবি একটা? কত দাম লাগে রে?

মণ চারেক ধান। আমি কিনব হে, ধান উঠুক।

শালা! বাজাবার মত মানানসই ঘর আছে তোর?

কেনে? লাঙলের যোয়ালে ঝুলিয়ে দোব।

ফের সেই উদ্দাম হাসি হা হা হা হা হা!

চাষীরা আজকাল সুখেই আছে। জমি আছে। ধান ফলে। ধানের দর দিনে দিনে আগুন হচ্ছে। ......অদ্ভুত একটা লোভ সুখেনের মনে গরগর করে উঠছিল হুলো বেড়ালের মতো। লীলা তো এখন অনেক জমির মালিক।

গাঁয়ে ঢোকার মুখে কিছু শুকনো পথ পাওয়া গেল। দুপাশে উঁচু ঢিবির ওপর বসতি। ঘন নীল ধুঁয়ো গাছপালা ঘিরে জমছে ক্রমান্বয়ে। অন্য ঝোপঝাড় দুপাশে। বাঁশের বনে পাখিগুলো চিৎকার করছে দলবেঁধে। সজিনাগাছের লেজঝোলা পাখিটা হঠাৎ এতো ভালো লাগল সুখেনের —কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল থেমে।

পথের পাশে যে ঝোপগুলো, সেখানে একটি দুটি করে মেয়েরা এসে দাঁড়াচ্ছিল। কারুর হাতে নাকটা ঢাকা, কারুর হাত তলপেটে মৃদু আঘাত করছিল। নোংরা আর দুর্গন্ধে সুখেনের বমি এসে গেল। ওরা এখানে কেন এমন করে দাঁড়িয়ে আছে, সে টের পেয়েছে।

কিন্তু মেয়েগুলোর চেহারা ভারি সুন্দর তো। বনকুসুম—যাকে বলে। কী নিটোল স্বাস্থ্য, কী প্রশান্ত চাহনি! বড় সহজে হয়ত সর্বনাশ করা যায়।

বাবুমশাই, কার বাড়ি যাবেন গো? উঁচুতে উঠোন থেকে এক বুড়ো প্রশ্ন করল।

ঘোষমশাইদের বাড়ি। কোনদিকে যাবো?

সোজা গিয়ে বারোয়ারীতলা বটগাছ, সিথান থেকে ডাইনে ঘুরে একতলা পাকা-বাড়ি দেখবেন...

বুঝেছি।

সুখেন উৎসাহে সাইকেল ঠেলতে থাকল। যাক, সত্যিসত্যি এসে পৌঁছল তাহলে। আর একটুও উদ্বেগ নেই। বাপস্, রাণীচকে সত্যকে এড়িয়ে আসতে অনেকখানি জলকাদা ভাঙতে হয়েছে তাকে। জামা-প্যান্ট নোংরা হয়ে গেছে। যাক্। ব্যাগে আরও রয়েছে। নির্বিবাদে দুটি দিন অন্তত কাটাবেই সে। প্রেস গোল্লায় যাক, এদিকে পুষিয়ে নেবে সব লোকসান।

নির্জন লাগে গ্রামটা। বড় সুন্দর লাগে। পাখপাখালির ডাক চারপাশে। চোখ-জুড়োনো গাছপালা। কুয়াশার রহস্য। লীলা। পটের ছবি লীলা—সরল অবোধ আর প্রশান্ত।

কোথাও তাহলে এখনও অপরিমিত সুখ আর সৌন্দর্য জমা হয়েছিল হাতের আড়ালে। পৃথিবী আর ভয়ঙ্কর মনে হয় না। এত ভালো লাগে সব।

হঠাৎ সুখেনের মনে হয়েছে সে পাপী। তার হাত পাপের হাত। তার চলার পায়ে পাপের কণ্ঠস্বর ফুটেছে।

এ ঢেউ প্রশমিত হলে, সে মনে মনে বলল, আমি সৎ হয়ে বাঁচতেও পারি! শুধু লীলা—লীলা যদি তাকে করুণা করে।

বুকভরা আবেগ নিয়ে সুখেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাল। সে ছাড়া কেউ জানল না এই মৃদু ভীরু কম্পিত ঘণ্টার ধ্বনিতে একটা কাকুতি ছিল।

(১০)

কিন্তু প্রথমেই ভড়কে গিয়েছিল সুখেন।

থ্যাবড়া নাক বীভৎস কদাকার একটি লোক গরিলার মতো দুলতে দুলতে এসে বাইরের ঘরটা খুলে দিয়েছিল। ঘরে সেকেলে একটা মস্তো তক্তাপোষ, গুটিকয় হাতলভাঙা চেয়ার আর ততোধিক জীর্ণ একটা টেবিল —যা অজস্র কালির ছোপে কুৎসিত।

শূন্য তক্তাপোষে একটা কম্বল পেতে দিয়ে লোকটা বড় বড় দাঁত বের করে বলেছিল, চান করবেন নাকি অবেলায়?

নাঃ। সুখেন মাথা নেড়েছিল। সাইকেলটা বারান্দার নীচে রয়েছে। নিজেকেই তুলে আনতে হবে নাকি? ব্যাপার কী লীলার? চিঠি লিখে ডেকে এনেছে, তারপর এই অভ্যর্থনার ছিরি?

বড় এক বাল্তি জলও এসে গেল একসময়। হেরিকেন এল। হাতমুখ ধুয়ে জামাপ্যান্ট ছেড়ে ধুতিপাঞ্জাবি পরে নিল সুখেন। তখন চা, একথালা মুড়ি আর নারকেল নাড়ুও এসে গেল। কিন্তু লীলা এল না।

ক্ষিদে পেয়েছিল পনের মাইল সাইকেল ঠেলে। কিন্তু খেল না কিছুই—কেবল চা। চা খেতে খেতে সে লক্ষ্য করল, সেই গরিলাটা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল সুখেনের। সে বলল, নাম কী তোমার?

আজ্ঞে, ভালোনাম শুনবেন, না ডাকনাম?

সে আবার কী? সুখেন হাসবার চেষ্টা করল। দুটোই শোনা যাক্, বলো।

আজ্ঞে, ভালো নাম মহেশ্বর। লোকে ডাকে ঘণ্টা বলে।

ঘণ্টা? ঘণ্টা কেন? সুখেন তার ভয়ের ...কটার সংগে ভাব জমাতে চাইছিল।

ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুরের পুজোর দিন আমার মষ্ঠি কিনা। ... ঘণ্টা জানাল।

ও। তা হ্যাঁ হে ঘণ্টা, এবার চাষবাস ...া বেশ ভালোই না কি?

খুব, খুব ভালো। এমন আবাদ আজ্ঞে ...বিশবচ্ছর হয়নি ইদিকে।

তুমি কি বরাবর এ বাড়িতে রয়েছ?

আজ্ঞে, জন্মোকাল হতে।

তাহলে তো তুমি বাড়িরই লোক।

তা তো বটেই।

তোমাদের জমিজমা দেখাশোনা করে কে?

হরু কৈবর্ত। বলে এদিক ওদিক দেখে ...য়ে ঘণ্টা ফের বলল, লোকটা ভাল না। ...ঝলেন দাদাবাবু।

দাদাবাবু শুনে আশ্বস্ত হয়ে সুখেন ...লল, কেন?

বোঝলেন না? মালিক হচ্ছেন গে মেয়ে-...নুষ। সম্পত্তিও বিস্তর। শালা দুহাতে ...রে দাদাবাবু। ধান ওঠবার সময় ওর ত ...পায়াবারো।...... লালা এসেছিল ...খে—কোঁৎ করে গিলে ঘণ্টা ফের বলতে ...কল, তবে ইবারে সেটি হচ্ছে না বাবা। ...দিমণি নিজেই সব দেখাশুনা কচ্ছেন।

দিদিমণি—মানে, লীলা? বল কী!

ঘণ্টা হাত নেড়ে বলল, আজ্ঞে, অবাক ...বার কিছু নাই। উনি ছেলেবেলা থেকে ...ঠেঘাটে ঘুরেছে। ওনার পক্ষে কাজটা ...ঠিন লয় দাদাবাবু। কপালের দুর্ভোগ, ...ড়েছিলেন এক বাজে লোকের হাতে...তা ...লাকটা কী বুদ্ধি দেখুন, লক্ষ্মী পায়ে ...ঠেলে পালালে গো। নাঃ, দিদিমণির এট্টু-...নও দোষ নাই। বোঝেন তো প্রকিত ...থাটা, বড়লোকের বড় আদুরে মেয়ে— ...নিয়ে নিতে হয় বৈকি। পারলে না যে, ...হয়ে গেল সে। না কী বলেন?

সুখেন মাথা নেড়ে সায় দিল।

ভিতর থেকে ডাক এল, বলি অ ঘণ্টা, এদিকপানে একবার আসবি না?

না, লীলা নয়, বাসিনী ডাকছে। ঘণ্টা উঠল।

কী প্রচন্ড মশা! এরই মধ্যে ভনভন শন-শন শব্দ উঠছে। পা'দুটো ঝুলিয়ে বসেছিল সুখেন। তুলতে বাধ্য হল। বাইরে ঘন অন্ধকার নেমেছে ততক্ষণে। জোনাকি উড়ছে। ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। কোথাও কোন লোক নেই। কোন শব্দ নেই।

আছে। কদাচিৎ কাছে বা দূরে হঠাৎ প্রচন্ড গর্জন করে কেউ ডেকে উঠছিল, দুর্বোধ্য জান্তব একটা চিৎকার মাত্র। সুখেন এক অবাস্তব জগতে এসে পড়েছে।

ফের ঘণ্টা এলে ওই চিৎকার কিসের জানতে চাইলে সে। ঘণ্টা বলল যে, গয়লার বিল-জঙ্গল থেকে গরুমোষ চরিয়ে বাড়ি ফিরছে। বাড়ি ঢোকার আগে আলো দেখাতে বলছে তারা। যতক্ষণ বাইরে ছিল, তখন চোখ দুটোই আলো। এবার ঘরে কিন্তু সত্যিকার আলো চাই-ই একটা।

সুখেন ম্লান হেসে মন্তব্য করল, আলো! কিন্তু ডাক শুনে বোঝা যায় না। যেন বাঘ ডাকছে!

ঘণ্টা বলল, বুনোদেশের ডাক দাদাবাবু —ওইরকমই হয়।

লীলার ছবি বদলে যাচ্ছিল সুখেনের চোখে। সেদিন রাণীচকের বন্ধুপত্নী সে-লীলা ছিল মোহময়ী সরলা এক বধূ—হয়ত বা স্বামীর কাছে অতৃপ্ত—তাই হঠাৎ মনে হবে, এত কামার্ত! হ্যাঁ, লীলাকে দেহ-সর্বস্বা এক কামাতুরা সাধারণ মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল তার। এমন মেয়ে সে জীবনে অজস্র দেখেছে, ভোগ করেছে। খুব সহজে এরা হাতের কাছের সেরা জিনিসটি প্রেমাস্পদকে দান করে বসে। তাদের বোকামি দেখে হাসিও পায়।

কিন্তু লীলা যেন তা নয়। ওই জান্তব গর্জনে আলো ডাকবার মধ্যে লীলার রক্তের একটা সহজাত সম্পর্ক আছে। সুখেন বুঝতে পারছিল, লীলা সহজ হতে পারে, কিন্তু ভয়ঙ্করও। এই গ্রামীণ রাত্রিটার মত—যখন মাথার উপর উজ্জ্বল স্পষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ, নীচে আরণ্য-আদিম অন্ধকার।

ঘণ্টা বলল, এখন খাবেন না পরে, দিদিমণি জানতে চাইলেন।

সুখেন শুকনো হাসছিল। এরই মধ্যে খাও নাকি তোমরা! সবে সাড়ে সাত বাজছে।

আজ্ঞে, আটটার মধ্যেই সব নিশুতি। বোঝেন তো, নিতান্ত গন্ডগেরাম।

অসুবিধে না হলে পরেই খাবো।

ঘণ্টা চলে গেলে সুখেন একটু লোভার্ত হল। খাবার সময়, সেবার যেমন করেছিল লীলা অবশ্যই সামনে থাকবে। সেই অবসরে বুঝি তার কথা জানাবে।

কিন্তু যদি তখনও সামনে না আসে সে? লীলা কি লজ্জা পাচ্ছে? এ তো তার একান্তই নিজের সংসার নিজের ঘর। সে মালিক সর্বকিছুর। কিসের লজ্জা তাহলে?

তা ঠিক নয়। আসলে লীলার সময় হয় নি এখনও। আসবে সে, যখন সুখেন শোবে। (এখানেই শুতে দেবে নাকি, এই ঘরে? মশারি দেবে তো?) বিছানার পাশ ঘেঁষে বসে, রাত গভীর হলে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, সে তার কথা বলবে।

কী কথা আছে লীলার?

দুরদুরু বুকে সুখেন বসে থাকল। একটা হাতপাখার দরকার ছিল তার। বড্ড গরম লাগছে। তার ওপর মশা।

ক্ষোভে-দুঃখে অভিমানে সে ক্রমশ অস্থির হচ্ছিল। কখনও ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবছিল, এখনই চলে যাবে সাইকেলটা ঠেলে ফের পনের মাইল। জলকাদার পথ ভাঙতে কষ্ট হবে না তার। সে পুরুষ, এটা লীলার আরো ভালোভাবে বোঝা উচিত ছিল।

ঘণ্টা না, বাসিনী এসে ডাকল এক সময়।......আসুন গো দাদাবাবু, খাবেন আসুন।

গম্ভীর থমথমে মুখে সুখেন উঠল। বলল, সাইকেলটা ওখানে আছে...

বাসিনী উঁকি মেরে দেখে নিয়ে বলল, হতছাড়া ঘণ্টাটাকে যে কী বলব! আক্কেল আছে এতটুকু। বলি অ রে ঘণ্টে, অই ঘেণ্টু।

হাসতে হল দুঃখের মধ্যেও। হাসি-মুখেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করল সুখেন।

(ক্রমশ)

রাতের শহর

হাওড়া ব্রীজ

আমি খাস কলকাতার বাসিন্দা। জন্ম, বড়ো হওয়া, লেখা-পড়া সবই কলকাতার একটি ছোটো অঞ্চলকে কেন্দ্র করে,। জীবিকার অমোঘ টানে প্রথম এই প্রতিদিনের চেনা বৃত্ত থেকে বহুদূরে উত্তরবাংলার জলপাইগুড়িতে কলকাতার ওপর বহু অভিমান আর দুঃখ নিয়ে আমাকে চলে যেতে হয়েছিল। ছুটি-ছাটার মাঝে মাঝে পুরোনো প্রণয়িণীর মতো কলকাতার টানে ফিরে আসি। গাড়ী বর্ধমান পেরোনোর পর থেকে বুকের একরকম তোলপাড় কিছুতেই বন্ধ হতে চায় না।

গত ছুটিতে দার্জিলিং মেল-এ না চেপে প্যাসেঞ্জারে আসছিলাম। আমার ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল আমার ছোটবেলার দুই বন্ধু ও বহু সুকৃতি-দুষ্কৃতির সঙ্গী অরূপ আর শ্যামল। ফাঁকা গাড়ীতে নির্ঝঞ্ঝাট আসতে পারব ভেবে প্যাসেঞ্জারে উঠেছিলাম। রাত্তির দশটা নাগাদ কলকাতা পৌঁছনোর কথা। কিন্তু চালের খুচরো চোরাকারবারীদের দৌরাত্ম্যে প্রায় ঘণ্টা চারেক লেট্ হয়ে গেল। যখন পৌঁছলুম মধ্যরাত্রি। খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড, অথচ রেলওয়ে ক্যাণ্টিন, রেস্তোরাঁ সব বন্ধ। ওয়েটিংরুমে ইতিমধ্যে প্রায় চালানী মাছের মতো কাতারে কাতারে লোক এ-ওর শরীরে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। জন-মানিষ্যিতে থই থই, ছুঁচ গলার জায়গা নেই। এমনি টায়ার্ড লাগছিল খুব, তার চনচন করে পেট জ্বলছে, তিনজন বিমূঢ়ভাবে এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। শেষে অরূপ বলে উঠল, 'চঃ, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি তো—তারপর যা হোক একটা কিছু করা যাবে।'

তিনজন টুকটুক করে স্টেশন ছেড়ে বাইরের গাড়ীবারান্দার নিচে এসে দাঁড়ালাম। এখানে ওখানে দুচারটে লাল নীল নিয়নের রিবন জ্বলছে, তাছাড়া চারপাশের পরিবেশ রাতের কালো জলে ধুয়ে মুছে একসা। আকাশে মেঘও জমেছে বিস্তর—একফোঁটা হাওয়া কোনোখানে নেই। গাড়ী-বারান্দার এককোণে একটি কুকুর ও একটি লোক প্রায় জড়াজড়ি করে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। পাশে বসে ঝিমুচ্ছে ইয়া জোব্বা-জাব্বা পরা দুটি তিব্বতী। একজনের গলায় তিনচার লহরী পুঁতির মালা।

তিনজনই শ্যামবাজারের কাছাকাছি থাকি। দু-তিনটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝরাত্তির—এই অজুহাতে এমন অসম্ভব ভাড়া চাইল যে মেজাজ খিঁচড়ে গেল। শ্যামল মরীয়া হয়ে বলল, এখন বাড়ী ফেরা-টেরার চিন্তা বাদ দে। ঘুমেরও তো দফা নিকেশ। আয়, ইদিক উদিক একটু ঘোরা-ফেরা করা যাক, সকালের ফার্স্ট বাসে যাওয়া যাবে'খন।' বাড়ি ফেরার সব পথই যখন বন্ধ, তখন এই মন্দের ভালো। রাস্তা পেরিয়ে ধীরে ধীরে তিনজন হাওড়া ব্রীজের ওপর দিয়ে পা চালিয়ে দিলাম। সমস্ত ব্রিজের হাড়-হাড্ডি খাঁচাটা একটা অতিকায় আহত জানোয়ারের মত ধুঁকছে। অমন রুপোলী শরীরে বিষ-নীল রং ছড়িয়ে পড়েছে। যেন বেঁধে ফেলা হয়েছে এমুড়ো থেকে ওমুড়ো বিরাট রসি দিয়ে—নড়াচড়ার, টুঁ পর্যন্ত করার ক্ষমতা নেই, নিষ্ফল আক্রোশে এখানে ওখানে আলোর বড়ো বড়ো লালচে চোখগুলি সাংঘাতিক জ্বলছে। একবার ছাড়া পেলে লৌহকঠিন সহস্র বাহু দিয়ে আকাশের ভারী কালো পর্দা ছিঁড়ে খুঁড়ে যেন একাকার করে দেবে।

তিনজন গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। খুব অসহায় লাগছিল নিজেদের। সিগ্রেট ধরাতে চেয়ে দেশলাই-এর গোলাপী আলোয় আড়চোখে এক-লহমা ওদের মুখের দিকে চাইলাম—যেন দুজনেরই ধাঁ করে

একচোটে বেশ খানিকটা বয়স বেড়ে গেছে। রেলিং-এর ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে অরূপ এবং থুতনিতে হাতের তালুর ঠেস দিয়ে শ্যামল দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামলের মণিবন্ধের রেডিয়ম-ঘড়িতে ছোটো বড়ো কাঁটা দুটি একটি সম্পূর্ণ ত্রিভুজ রচনা করেছে—অর্থাৎ রাত তিনটে। হঠাৎ, একটা ঝাঁকুনি খেয়ে টানটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অরূপ জিজ্ঞাসা করলো, দ্যাখ দিকিন, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কার পকেটে কতো আছে? আমার পকেট থেকে পাওয়া গেল কুল্যে পাঁচ টাকা আর কিছু রেজগী, শ্যামলের কাছে দু-টাকার একটি লাল নোট, আর অরূপের পকেটে সাত-আট টাকা। 'ওতেই হবে, চলে আয়।' আর কোন কথা না বলে অরূপ হনহনিয়ে হাঁটা ধরল। প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ পায়ে কোন প্রশ্ন না করে আমরা স্প্যানিয়েলের মতো অনুসরণ করতে লাগলাম। ব্রীজটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানকার ঢালু জমি দিয়ে অরূপ তরতর করে নীচে নামতে লাগল। পেছন পেছন আমরাও।

দু-চারটে ঝুপ্‌রি মাফিক মুলিবাঁশের দরজা দিয়ে তৈরী একান্ত অস্থায়ী আস্তানা। গঙ্গার পার ঘেঁষে চারপাশে রীতিমতো জমজমাট এক আন্ডারগ্রাউন্ড রাতের শহর। কুপি জেলে সেই টিমটিমে আলোয় দু-চারজন লোক চা তৈরী করছে। কে একজন সুর করে সাপখেলানো সুরে কি সব পড়ছে. চারপাশে উবু হয়ে বসে আছে একদল নানা বয়সের লোক। একধারে ধুনি জ্বলছে। ছোটো করে যাগ-যজ্ঞ হচ্ছে বোধহয়। চিড়্‌চিড়্ শব্দে কাঠ পুড়ছে। আর একপাশে খুব মৌজ করে গাঁজা টানছে একদল দেহাতি মানুষ। সাইক্লিক অর্ডারে কল্‌কে ঘুরে যাচ্ছে এ-হাত থেকে ও-হাতে, ব্রহ্মাণ্ড ফেটে যাবে, এ্যায়সা টান লাগাচ্ছে এক এক জন। অদ্ভুত প্রশান্তি ওদের চোখেমুখে, যেন পাথরে কুঁদে তোলা কয়েকটি মূর্তি সার সার বসে আছে। ছপাছপ লগি মেরে নৌকো বা শালতি আসছে দুচারটে। টর্চ জ্বালিয়ে এধার ও ধার আলো ফেলছে ভেতরের লোকজন। অন্ধকারে শরীর মিশিয়ে পার থেকে নৌকোয় সেঁধিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বাদে দু-একটি বান্ডিল হাতে নিয়ে ফিরে আসছে কোনো রহস্যময় চেহারার লোক। পুরো চোরাই চালানদারি চলছে বলে মনে হয়। কয়েকটি ছোটখাটো তাবু এধার ওধার ছিটিয়ে পড়ে আছে।

তন্ময় হয়ে আমার এই নতুন আবিষ্কৃত রাজ্য দেখছিলাম, হঠাৎ পাঁজরে কনুই-এর এক খোঁচায় চটকা ভেঙে তাকিয়ে দেখি, শ্যামল, অরূপ দুজনেই বেশ একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। অরূপ চাপা গলায় বলল, "ইডিয়টের মতো কি দেখছিস ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ওধারটায় চল।"

তিনজনে খোদ হাওড়া ব্রীজের নীচে ঢুকে পড়লাম। দু-চারটে কাঠ-খড়-লগি পুড়ছে। ব্রীজের তলপেটে অদ্ভুত জোলো জোলো আলোর চঞ্চল রং কাঁপছে। ভালো করে চেয়ে দেখি, প্রায় জন্মদিনের পোষাক-পরা কয়েকজন সাধু জমিয়ে তাসের জুয়ো খেলছে। আর একটা ব্যাচ্ কিছু দূরে বসে কড়ি খেলছে—খুব হৈ-চৈ সেখানে। অরূপ বলল, "শ্যাম্‌লো, কড়ি না তাস রে?" 'তাস'—আর দ্বিতীয় শব্দটি উচ্চারণ না করে শ্যামল এক সাধুবাবার গা ঘেঁষে নিবিষ্টভাবে তার হাতের তাস দেখতে লাগল। আমি আর অরূপও এধারে ওধারে বসে পড়লাম। অরূপ ও শ্যামলের চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর আর কোথাও কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমি বরাবরই একটু ঘরকুনো আর ভেতো টাইপের ছিলাম। ওরা দুজনেই ছোটবেলা থেকে পয়লা নম্বরের বিচ্ছু। কলেজে পড়ার সময় থেকে তো যাকে বলে একেবারে উচ্ছন্নে যাওয়া, তাই গেছে। একটা লক্ষবার দাগানো ম্যাপের মতো ওরা কলকাতার প্রতিটি পথ-ঘাট থেকে শুরু করে বৈধ-অবৈধ, সিদ্ধ-নিষিদ্ধ সমস্ত রকম ব্যাপার জেনেশুনে তুখোড় বাউন্ডুলে হয়ে উঠেছে। শ্যামলকে এসব বিষয়ে যদি ট্যালেনটেড্ বলা যায়, অরূপ এক-কথায় জিনিয়াস। ওর যা আবিষ্কারের দক্ষতা বিদেশে জন্মালে কলম্বাস, নিদেন-পক্ষে একজন ছোটোখাটো মার্কোপোলো হতে পারতো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলুড়েদের পটিয়ে-পাটিয়ে শ্যামল ও অরূপ দলে ভীড়ে গেল। আমি চুপচাপ বসে দেখছি অরূপের পিঙ্গল চোখের সতর্ক চলাফেরা একবার তাস অপরবার সাধুদের চোখে, কখনও তার শ্যামলের প্রতি মৃদু চোখটিপুনী। তিন তাসের খেলা—তাই ডিলের খসখস আর স্লাইস্ত না দেখে দেখার লিপ্সা না হয় গ্যালপ বাজীর পয়সায় ঢ্যংঢ্যাং ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। পর পর হারতে হারতে ক্রমশ থমথমে হয়ে আসছে শ্যামলের মুখ—অরূপ দু-একটা ছোটো দান পেয়েও খুব কিছু সুবিধে করতে পারছে না। একবার মোটা বাজী হেরে বীতরাগ গলায় শ্যামল বলল, "আক্কল্ সে কুছ নহি হোতা হ্যায়।" একটি টকটকে লাল বসনেই চেহারার সাধু পরম ঔদাস্যে প্যাকেট ছুঁড়ে দিল ওর দিকে, একটু প্রশ্রয়ের গলায় বলল, "ঠিক হ্যায়, কিজিয়ে আপ্।" তবু খুব একটা কিছু সুবিধে হল না। দুজনেই ফোঁৎ হয়ে আমার দিকে করুণ ছলোছলো চোখে তাকাতে লাগল। মমতাপরায়ণ হয়ে বুকপকেট থেকে পাঁচ টাকার নোটটি বের করতে যাচ্ছি, হঠাৎ একজন সাধু ভাঙা-গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগ্ যাও সব—জলপুলিশ।' চকচকে পেতলের প্লেট আঁটা বেল্ট আর জ্বলন্ত তিন ব্যাটারির টর্চ নাচাতে নাচাতে তিনজন জলপুলিশ দ্রুত-পায়ে এই নিষিদ্ধ আস্তানার দিকে আসছিল। একমুহূর্তে খেলুড়েরা ভোঁ-ভোঁ। আমরা তিনজন তাড়াতাড়ি পা-চালিয়ে যজ্ঞের আখড়ার কাছে এসে দাঁড়ালাম। বাতাসের দমক জেগেছে তখন, নানা জাতীয় ফুলের মিশেল দেয়া গন্ধ এসে নাকে ঢুকতেই ঘুরে দেখি, ছোটো ছোটো ডিঙিতে করে রাজ্যের ফুল নিয়ে ডাঙার ভিড়ছে দূর দূর গাঁয়ের ফুলের ব্যাপারীরা। রাত তখন জোলো হয়ে আসছে। আর একটু পরেই আসবে পাইকার-ফড়িয়ার দল—শুরু হবে ফুলের নীলাম।

—নিশানাথ

অঙ্গনা ।।

খেটে খাওয়া জীবন

একজন উপমা দিলেন, রাজহাঁস নীর বর্জন করে ক্ষীর গ্রহণ করে। শহুরে জীবনে আমরাও সেই রাজহাঁস। কেবল সুখ নিয়েই ব্যস্ত। মাথা ঘামাই, দেহ খাটাই না। সুখের ভাগ পেলেই খুশি। অথচ যে কঠোর শ্রমের বিনিময়ে এই সুখ তা আমাদের জীবন থেকে মুছে দিয়েছি।

তিনি থামলেন। মনে মনে ভাবি, সত্যি, পরিশ্রমী জীবনের ধার আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এটা অবশ্যই শহরবাসের ফল। এবং সভ্যতার অগ্রগতিও এজন্য দায়ী। সংকীর্ণ সীমায় বাস করে দেহ চালনার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য এই সংকীর্ণ সীমা ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। সমস্ত জাতটাই আজ ধিকৃত হচ্ছে জন্ম শ্রম-বিমুখ বলে।

দু'মিনিট গালে হাত দিয়ে দার্শনিক চিন্তায় ডুবে যেতে আমাদের মন্দ লাগে না। সময়টাকে বাড়িয়ে কয়েকগুণ করলেও না। যতকিছু আপত্তি কেবল গায়ে-গতরে মেহনত করতে। এই রোগ এখন প্রায় সর্বজনীন। সবাই দার্শনিক হতে চাইছে—দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য মাথা ঘামাতে চাইছে। এরকম সদিচ্ছাকে স্বাগত জানাবে সবাই। কিন্তু মেহনতের কাজগুলো কারা করবে? সে এক মস্ত চিন্তা।

বড় বড় বা সাংঘাতিক ধরনের পরিশ্রমের কথা বাদ দিলেও যে সাধারণ পরিশ্রমের অভ্যাসগুলো আমাদের একসময় ছিল এখন আর তাও অবশিষ্ট নেই। শহরের কথা বাদ দিলে গ্রামের মেয়েদের কথা আসে। কিন্তু ধান ভানা, মুড়ি ভাজা, চিঁড়ে ভাজা, ধান সেদ্ধ করা—এসব কাজ একান্তভাবে মেয়েদের। গ্রামের অনেক মেয়েই আজ আর এগুলি করতে চায় না। ধান থেকে চাল করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অবশ্য নিয়েছে যন্ত্রযুগ। তবু মুড়ি ভাজা, চিঁড়ে ভাজা এখনো হাতের কাজ। এজন্য কোন যন্ত্র আজো এগিয়ে আসেনি। ভবিষ্যতে হয়তো যন্ত্রের প্রসাদে পরিশ্রম লাঘব হবে। অধিকাংশ বাড়িতেই আজকাল এসব কাজ করে দিয়ে যায় বাইরের লোক। এবং অর্থের বিনিময়ে। তাতেও কোন আপত্তি নেই। কালে কালে এরাও লোপ পাবে। তাই আগে থেকেই যন্ত্রদানবের কৃপা প্রত্যাশা করে রাখা ভাল।

সাজ-পোশাক আর ফ্যাশানের বাহার শহরের নিয়ন আলোয় আর সীমাবদ্ধ নেই। দূর মফস্বলেও তার প্রতাপ প্রচন্ড। সবাই এতে ভুলেছে। তাই পরিশ্রমের কাজগুলি একে একে ছাড়ছে। সে সময়টুকু সংসারের কাজের ফাঁকে ব্যস্ত থাকছে আধুনিকতার পরিচর্যায়। তাই পরিশ্রমের প্যাট আস্তে আস্তে উঠছে। দুদিন পরে হয়তো সব ফর্সা হয়ে যাবে।

এত আপশোষ, এত চোখের জল শুধু শ্রমবিমুখতার জন্যে নয়। এর পেছনে রয়েছে আরো অনেক বড় কারণ। এককালে কুটির-শিল্পের জন্য আমাদের খুব নামডাক ছিল। আর এতে মেয়েদের অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যন্ত্রযুগ এসে আমাদের সেখান থেকে হটিয়ে দিয়েছে। নিশ্চিন্ত বিলাসে অলস স্রোতে আমরা গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। কখন যে নাক ডাকাতে শুরু করেছিলাম খেয়াল নেই। তারপর ঘুম যখন ভাঙলো তখন দেখি, কি তাজ্জব ব্যাপার, সবই যে ভুলে বসে আছি। শিবের বদলে এখন বাঁদর গড়ি। আগের শিল্পকাজ দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না, এগুলি আমরা করেছি। এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য।

ইদানীং অবশ্য অনেক চেষ্টা-চরিত্র হচ্ছে সে-সব শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য। কিন্তু সে স্বাদগন্ধ আর নেই। অনেকের নিশ্চয়ই কষ্ট হয়, কাজটা এভাবে না ভুললেই হতো। তখনকার দিনে এ-থেকেই এক-একটা পরিবার চলতো। আজ যদি তা বজায় রাখা যেত তবে আর্থিক সংকটে ত্রাণের অনেক সুরাহা হতো। এ বেদনা রাখবার জায়গা নেই। প্রকাশেরও ভাষা নেই। এ বেদনাও সেজন্যই। আশংকার মেঘ জমে মনের কোণে, যদি

ত্যি একদিন সব ভুলে যাই! আর ভুলবার সম্ভাবনাও খুব
পষ্ট হচ্ছে।

পরিশ্রমের সব পাট যখন আমরা চুকিয়ে ফেলছি তখন
কবার ফিরে তাকালে কেমন হয় আদিবাসী জীবনের দিকে?
ুব বেশিদূর যেতে হবে না। আমাদের হাতের কাছেই
াঁওতালদের বাস। মুঠোভরা জীবনকে ওরা তেমনি অবিকৃত
রখেই চলেছে। অথচ পরিবর্তনের হাজার জানালা সেখানে
ালে ধরা হয়েছে। পরিবর্তনকে তারা মেনে নিচ্ছে নিজের
ীবনের স্বাভাবিক ছন্দস্পন্দের বিনিময়ে নয়। বরং তার সঙ্গে
ামঞ্জস্যবিধান করে। তাই আজও দেখা যাবে, সাঁওতাল রমণী
াল টকটকে জবা ফুলটি খোঁপায় গুঁজে নির্বিকারে পথ
াঁটছে। কোথাও তার কোন দ্বিধা বা জড়তা নেই। আটোসাটো
াঁধনে শাড়ির বিন্যাস আগাগোড়া একই আছে। দেশে
ৃসমেটিকের আলোড়ন নিয়ে মাথা ঘামানোর অন্ত নেই। অনেকের
াথাও ব্যথা হয়ে গেল এত বেশি ভাবতে ভাবতে। কিন্তু সেসবে
াদের আকর্ষণের খুব একটা হুল্লোড় দেখা যায় না। রূপকে
ারা স্বাভাবিকভাবেই মেজেঘষে অপরূপ করে। এজন্য নানা
ালেপ প্রয়োজন হয় না। আভরণের মধ্যে ফুলকেই তারা বেছে
নয়েছে। তাও আমাদের সাজবার একান্ত অনুপযোগী ফুল।
্যবু তারা অপরূপ।

সাজানো গোছানো ঘর। তকতকে নিকানো উঠোন। ছোট্ট
ালের ছোট্ট বাড়ি। সুন্দর আলপনায় বাড়িঘর চিত্র-বিচিত্র।
কাথাও বেমানান নয়। বরং শিল্পবোধ তাদের বড় প্রখর। চেয়ার,
টেবিল প্রভৃতি আধুনিক জীবনের ব্যয়বহুল বাহুল্য তাদের
ীবনে এখনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই প্রাণখোলা
াসিতে আমন্ত্রণ জানায়, দাওয়ার এক কোণে আসন নিতে।
একদন্ড বসলে প্রাণ জুড়িয়ে আসে। মনে হয় পুরোপুরি একটা
দশী আবহাওয়ায় আছি। এই আন্তরিকতার সবটাই অকৃত্রিম।
কাথাও কৃত্রিমতা নেই। আসলে পুরনো সেই জীবনধারাকে
াহমান রেখেই ওরা পরিবর্তনের স্রোতকে ধরতে চাইছে। তাই
ওরা এত অপরিবর্তনীয়।

পৃথিবীর আদি জীবন রস নিয়ে ওরা বেঁচে আছে। তাই
পরিশ্রমী শক্তি ওদের মজ্জায় মজ্জায়। জীবনে আনন্দ যেমন তাদের
এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তেমনি পরিশ্রম। সারাদিন কঠোর পরি-
শ্রমের পর যৌথ জীবনে তাদের আনন্দের বান ডেকে যায়।
নাচে, গানে তখন ওরা কঠোর রুক্ষ জীবনটাকে পুরোপুরি
ভুলে যায়। পরিশ্রমে যেমন ওরা ধ্যানমগ্ন, আনন্দস্ফূর্তিতে
তেমনি ওরা বাহ্যজ্ঞানশূন্য। এই ওদের জীবন।

তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ আদিবাসী জীবনের মনোরম
দিকটি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। সহজ-সুন্দর জীবনের
সেই সুরটি অবিকৃতভাবে তারা এখনো বজায় রেখে চলেছে।
যন্ত্রযুগের দাপটের মধ্যেও এটা তাদের বিরাট জয়।

আদিবাসী জীবনে রমণীর স্থান পুরুষের চেয়ে অনেকখানি
মর্যাদার। কোন কোন আদিবাসী সমাজে স্ত্রীকে স্বামীর ভরণ-
পোষণের দায়িত্ব নিতে হয়। তাই এরা কঠোর পরিশ্রমী।
সাঁওতাল রমণীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। পরিশ্রম তাদের জীবনের
সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা। তাই দেখা যাবে গভীর রাত পর্যন্ত
আনন্দের আসরে রাত কাটিয়েও প্রয়োজনের তাগিদে খুব
ভোরেই ওরা উঠে পড়ে। বেশি রাত্রি জাগার অছিলায় সারা-
দিনটা মাটি করার বুদ্ধি বোধহয় ওরা এখনো আয়ত্ত করে
উঠতে পারেনি।

ছল-চাতুরী না করে স্রেফ খেটে ওরা জীবনের সুখ
উপভোগ করতে চায়। তাই ভোরে উঠে যে যার কাজে বেরিয়ে
পড়ে। সাঁওতাল মেয়েদের একটা বড় জীবিকা মাছ ধরা। ছোট্ট
একটা জাল নিয়ে পুকুরে পুকুরে থেই দিয়ে এরা মাছ সংগ্রহ
করে। তারপর ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি করে। একসময়ে আমাদের
জেলে রমণীদের ঠিক এরকমভাবে দেখা যেত মাছ বেচতে।
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মাছ বেচতে সেদিন তাদের জুড়ি ছিল না।
আজ ক্রমশ তারা দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে যাচ্ছে। সে ধারা অব্যাহত
রেখে এগিয়ে আসছে আদিবাসী রমণী। পাড়ায় পাড়ায় পল্লীর
পথে সাড়া জাগিয়ে সে মাছ নিয়ে হাঁক দিয়ে যায়। নীরব পল্লী
গমগম করে ওঠে। কুলবধূরা দর-দাম করে, মাছ কেনে। সাঁওতাল
রমণীর মাছ ধরা সার্থক হয়।

ধানক্ষেতের কাজে সাঁওতাল রমণীর ভূমিকা বিরাট।
হালচাষই শুধু তারা করে না। তার পরের সব কাজেই তাদের
একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে দেখা যায়। ফসল লাগানো
থেকে শুরু করে ফসল তোলা পর্যন্ত তাদের কোন বিরাম নেই।
গানের তালে তালে ওরা ফসল লাগায় আর ধান্যলক্ষ্মীর

আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। তারপর ওদের সেই প্রার্থনা যখন মঞ্জুর হয় তখন রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। সাঁওতাল মেয়ের কালো মুখ হাসিতে আলো হয়ে ওঠে। ওরা দল বেঁধে কাস্তে হাতে ক্ষেতে নেমে পড়ে। এবার ওদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মঙ্গলগীত। আঁটি আঁটি ধান জড়ো করে। সব ধান কাটা হয়ে গেলে গৃহস্থের খামারে আবার এক নতুন কাজে ওদের ডাক পড়ে। এবার ধান ঝাড়াই ধান মাড়াই। হুঁশহাঁশ শব্দে শুরু করে ওরা ধান ঝাড়াই। ধান মাড়াই হলে সেই ধানে ওরা গৃহস্থের মরাই ভরে দেয়, খড় খাদা দেয়। নিজের প্রাপ্য তুলে নিয়ে হাসিমুখেই বাড়ি গিয়ে আনন্দ-উৎসবে মত্ত হয়। নাচের তালে মুখর হয়, গানে উৎকল্প হয়।

ধান তোলার কাজে সাঁওতাল পুরুষদের ভূমিকা খুব একটা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। বরং এতে মেয়েরাই বড় অংশ নেয়। এ যেমন একরকম দিন-মজুরের তেমনি আছে আবার রাজমিস্ত্রির সহযোগী বা জোগারের কাজ। এর দিনমজুরীও নির্দিষ্ট। আর এই দিনমজুরীতে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি অংশ নেয়। রাজমিস্ত্রির হাতের কাছে এরা জুগিয়ে দেয় ইট, বালি, সিমেন্ট, মাথায় নিয়ে ছাদ ঢালাইয়ের সরঞ্জাম। লাইন দিয়ে তালে তালে ছাদ ঢালাই করে। পাথর-বালি-সিমেন্টের কড়াটা এ মাথা থেকে ও মাথা আর এমনি করে পৌঁছে যায় জায়গায়। দেখতে বেশ ভাল লাগে। দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে দুদন্ড। তবে ইদানীং কংক্রীটের কাজের বাহুল্য হওয়ায় ওদের একটা বড় ক্ষতি হয়েছে, তা হলো এখন আর ছাদ পেটাতে হয় না। চুন-সুরকির ছাদ ওরা পিটিয়ে মজবুত করতো এককালে। তখন গলায় গুনগুনিয়ে উঠতো গানের সুর। এখন সে সুযোগ ওদের আর নেই। বাবুরা আজকাল কংক্রিটের ঢালাই পছন্দ করেন। ওদের কষ্ট কেউ বোঝে না। বেদনায় সাঁওতাল মেয়ের মুখের কালো নিবিড় হয়।

ঝকঝকে সাজানো-গোছানো বাড়িতে সাঁওতাল দম্পতির বাস। বাড়ির সামনে যে জায়গাটুকু পড়ে থাকে তাও সে অবহেলায় নষ্ট হতে দিতে রাজী নয়। সেই জায়গাটুকু কোদাল দিয়ে ভাল করে কুপিয়ে নানা শস্যের বীজ লাগায়। ফুলের শখ তার থাকলেও বাগান করে জায়গাটা সে নষ্ট করতে রাজী নয়। বরং এতে শুধু দুটো পয়সা আসবে। সংসারের খাওয়া-পরার সমস্যারও অনেকখানি সুরাহা হবে।

তারপর সময় মত সেই ছোট্ট জায়গাটা লাউ, কুমড়ো, কাঁকুড়, শশায় ঝলমলিয়ে ওঠে। তখন আবার তার কাজ বাড়ে। রোজ সকালে এসব জিনিষ নিয়ে সওদা করতে যেতে হয় দূর গাঁয়ের পথে অথবা হাটে। যে-কোন হাটের দিন গাঁ থেকে এরা দল বেঁধে বেরোয়। সে এক মনোরম দৃশ্য। মাথায় ঝাঁকা, কাঁখে ছেলে—সার সার সাঁওতাল রমণী চলেছে। দূর থেকে দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

নিজের সওদা বেচে সংসারের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিষপত্র কেনাকাটা করে হাট থেকে দল বেঁধেই ফিরে আসে। এমনি করেই বয়ে চলে ওদের জীবনস্রোত। এরই ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চলে ওদের জীবনে আনন্দের প্রস্রবণ।

শহুরে নাগরিক জীবনের স্ব-রূপ বলে কিছু নেই। বিভিন্ন প্রভাবে তা রোজই বদলে যাচ্ছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে এখানে কিছু নেই। সহজ-স্বাভাবিকতাও এখানে দুর্লভ। কিন্তু আদিবাসী জীবনে আজো সহজ-স্বচ্ছন্দ গতিবেগ বয়ে চলেছে।

এক-একবার মনে হয়, এত পরিবর্তনেও আদিবাসী জীবন কেমন সহজভাবে বয়ে চলেছে। এ কি করে সম্ভব? অনেক ভেবে উত্তর পাই, জীবনের আদিম শর্তকে এরা ভুলে যায়নি। সুখ এরা কামনা করে কিন্তু পরিশ্রমকে অস্বীকার করে না। বরং পরিশ্রমকেই সুখের উৎস বলে মেনে নিয়েছে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে। তাই এরা আজও সুখী। সুখের জন্য হাহাকার করে মরে না। কারণ, জীবনেই এরা তার সন্ধান পেয়েছে।

—প্রমীলা

আলোকচিত্র : মানসরঞ্জন কুণ্ডু চৌধুরী

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

আর কাঁদিস না

অনেক মায়েদেরই অভিযোগ করতে শোনা যায় যে, তার শিশু বড় কাঁদুনে। কিন্তু শিশুরা যে অকারণে কাঁদে না একথা তারা বুঝতে চায় না। কোন অসুবিধা হলেই কান্নার সহায়তায় তারা তা প্রকাশ করে। যত সহজে সে কান্নার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তত সহজেই তাকে শান্ত করা যায়। যে শিশু শান্ত তার কথা অবশ্য আলাদা।

শিশু সাধারণতঃ দুই রকম প্রকৃতির হয়—হোমিওপ্যাথির ভাষায় বলতে গেলে "পালসেটিলা টাইপ" ও "ক্যালকেরিয়া টাইপ"। অর্থাৎ গরম ধাতের ও ঠাণ্ডা ধাতের শিশু। গরম ধাতের শিশুরা প্রকৃতির কোলে, আলোহাওয়ার মধ্যে ভালো থাকে। কোন সর্দিকাশি বা অসুখে আক্রান্ত হয় না। আর একধরণের শিশু ঠিক এর বিপরীত। বাহিরের বাতাস লাগলেই ঠাণ্ডা লাগে ও সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হয়। শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে যদি শিশুর ধাত মায়েরা বুঝে নিতে পারেন, তাহলে শিশুর কান্না সহজেই কমানো যাবে।

কিছুদিন আগে সামনের বাড়ীতে এসেছে দুটি নবাগত সন্তান "হাসি" আর "খুসী"। ওদের দুজনের মা'-মণিই প্রথম সন্তানের জননী। দুজনের মা-মণিকেই দেখি কি ভীষণভাবে বিব্রত বোধ করছে, নিজেদের দুটি ফুটফুটে সন্তানকে নিয়ে। ইচ্ছা হয় বলি কান্নার কারণটা তোমরা আগে একবার নিরূপণ কর—দেখবে সন্তান মানুষ করা কত সহজ হয়ে যাবে। একদিন বলেও ফেলেছিলাম। প্রথমে ওরা আমার কথায় কর্ণপাত করতে চায়নি—কিছুটা যে উপেক্ষা করছে একথাও বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ ওদের ধারণা বদলেছে। দুজনেই দেখি এখন সাজের সময় পায়, বিশ্রাম নেয় শিশু ঘুমানোর সময়। সন্তানদের নিয়ে হিমসিম খাওয়ার ভাবটা কিছুটা গেছে কমে। স্বাস্থ্যও কিছুটা উজ্জ্বল হয়েছে।

চিরদিন শুনে এসেছি "মা হওয়া কি মুখের কথা—শুধু প্রসব করলেই হয় না মাতা"। কথাটা পুরনো হলেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সুসন্তান গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব মায়েদেরই হাতে। কিন্তু আধুনিকতা মেয়েদের অনেক সুকোমল প্রবৃত্তি কেড়ে নিয়েছে—যাদের আছে এই সুকোমল প্রবৃত্তি তাদেরও অনেক সময় আর্থিক পরিস্থিতির চাপে ঘরের বাহিরে চলে যেতে হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক বাচ্চার অবহেলিত হয়, বঞ্চিত হয় মায়ের বুকঢালা স্নেহ থেকে। সেজন্য অনেক সময় তারা কাঁদে, বায়না করে ও রাগী হয়ে যায়। শিশু হলো গৃহের সম্পদ, দেশের সম্পদ, তাদের রাগী বা বিশ্রী

কারখানায় কাজ করেও বিদেশী এই মহিলা নিজের শিশুকে কেন মনের মত গড়ে তুলেছেন। এর জন্য চাই পরিচ্ছন্ন মন এবং স্নেহময় হৃদয়।

বের হওয়া যে কত ক্ষতিকর তা কারোরই অজানা নয়। রা সাধারণত মাকে কাছ-ছাড়া করতে চায় না। কিন্তু নেক মায়েরা স্বামীর সঙ্গিনী। স্বামীকে সাহচর্য দিতে তারা অনেক সময়েই সন্তানকে কিছুটা অবহেলা করে। ফলে শিশুরা কাঁদে। মায়েদের সে বিষয়ে সচেতন হওয়া জন।

এছাড়া শিশুরা কাঁদে ক্ষিদের সময়, গরম হলে, জল সায়, বিছানা ভিজে গেলে। যদি কিছুটা আগ্রহী হয়ে সে া লক্ষ্য রাখা যায় তাহলে শিশুর কান্না সহজে কমে যায়। মায়েরা শঙ্কিত হৃদয় নিয়ে সব সময় ভাবেন বুঝি শিশুর ঠান্ডা লাগল। তাই শিশুর পরিয়ে দেয় মোটা বা গরমের জামা, জানলা বন্ধ রাখে ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য। যারা গরম ধাতের শিশু তারা কষ্ট পায় এই পরিবেশে। তাদের কান্না অস্থির করে তোলে সবাইকে।

কোন কোন শিশু স্নানের পর বা গা-মোছার পর ঘরের র যেতে চায়। তখন তারা কান্নার সানাই বাজায়। যদি বাহিরে গেলে শান্ত হয় তবে, প্রয়োজন কি কাঁদানোর? র প্রকৃতি অনুসারে স্নান, খাওয়া, ঘুমানো ইত্যাদির যদি চার্ট তৈরী করে নেওয়া যায় তাহলে মা ও সন্তান দুজনেই ন্দ থাকবে। অযথা কান্না ব্যস্ত করে তুলবে না কাউকে।

অবশ্য শিশুদের কয়েকটা কান্না আছে যা অভিজ্ঞেরাই ত পারেন। সেগুলোর জন্য বাড়ীর বর্ষীয়সীরা আছেন, আছেন শিশুবিশেষজ্ঞ। যে কান্নার কারণ ধরা যায় না তার জন্য এ'দের কাছে যেতেই হবে।

শিশু সুন্দর কিন্তু পরিচ্ছন্নতা তাদের আরো ফুটফুটে করে তোলে। শিশুরাও খুব খুশী হয়ে ওঠে যত্নে। প্রস্রাব, মলত্যাগ এইসবের জন্য ভালো অভ্যাস করাতে হয়। কারণ বাচ্চা বয়সে তাদের সহজে এসব শেখানো যায়। শিশু ঘুম থেকে উঠলে, প্রস্রাব, মলত্যাগের পর তাকে গরম জলে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুখের ভিতর ভালো করে পরিষ্কার করে দিতে হয়। সবাই পাউডার পছন্দ করেন না, যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরা পাউডার মাখিয়ে কাজল অবশ্যই পরিয়ে দেবেন। কাজল উপকারী ও শিশুর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। দামী জামা পরানোর চেয়ে নরম কাপড়ের পাতলা ও হাল্কা জামা শিশুকে পরানো ভালো। শিশুর জামায়, কাঁধে বোতাম হলে সুবিধা অনেক। তবে শিশুর জামা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। খাওয়া, ঘুমানো এসবের সময় বেঁধে দিলে মায়েরা বিশ্রামের সময় পায়। শিশুকে তিনঘণ্টা অন্তর খাওয়ানো উচিত। কারণ খাবার পরিপাক করতে ওদের তিনঘণ্টা সময় লাগে। ঘন ঘন খাওয়ালে শিশু দুধ হজম করতে পারে না। ফলে বমি করে ও মাঝে মাঝে পেট ব্যথাও করে; তাই তারা কাঁদে। বাচ্চারা কথা বলতে না পারায়, কঠিন হয়ে পড়ে তাদের কান্নার কারণ কি? সেজন্য খাওয়ার ব্যাপারে মায়েদের বিশেষভাবে নজর দেওয়া কর্তব্য।

শিশুকে দিনে ৫।৬ বার বেশ পরিবর্তন করে দিতে হয়—এতে তারা আরাম পায়। তাদের ছোট্ট দুখানি হাতকে ভালো করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হয়, কারণ তারা মুখে হাত দেয় অনবরত। শিশুর বিছানা, বালিশ, রৌদ্রে দিয়ে পরিষ্কার ও নরম করে রাখতে হয়। আধুনিককালে ছেঁড়া কাপড় বা কাঁথা ব্যবহার করতে অনেকে পছন্দ করেন না। কিন্তু শিশুর নরম গায়ে পুরনো জিনিস যথেষ্ট আরাম দেয়। আর্থিক প্রসঙ্গ সেক্ষেত্রে এড়িয়ে চলাই ভালো।

[উপন্যাস]

আমি কান পেতে রই

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৩৮ ।।

কলকাতা থেকে কর্তব্যের শেষ বন্ধন কেটে চলে এল সুরবালা চিরদিনের মতো। ওখানকার দেনাপাওনা চুকিয়ে দিয়ে এল। ঋণ সব শেষ হল না—হবার নয়, তবু যতটা সম্ভব উশুল দিয়ে এল, ওর ভাষায় 'সুদটা' জমা করে দিলে। অপারগ হিসেবেই মহাজনের খাতায় তিনশূন্য পড়ল হয়ত—তবু এ-জন্মের মতো একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল এটা ঠিক।

কিন্তু ঋণ আর কর্তব্য কি শুধু কলকাতাতেই ?

আরও একটি ঋণ কি দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে জমা হচ্ছে না এখানেও ? বেড়েই যাচ্ছে না ক্রমাগত ? তার কি চুক্তি হবে কোনদিন ? কিছুও কি শোধ করতে পারবে ? নিদেন সুদ ?

মনে হওয়ার সংগে সংগে নিজেই ঘাড় নাড়ে সুরবালা।

সে শোধ হবার নয়। এই বিপুল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েই তাকে একদিন কলকাতার মতো এই পৃথিবী থেকেও বিদায় নিতে হবে। আর সে-বোঝা খুব হালকাও নয়—তা সুরবালার চেয়ে কেউ বেশী জানে না।

দিনে-দিনে মাসে-মাসে বৎসরে-বৎসরে সুরবালার রূপান্তর ঘটেছে। সে-পরিবর্তনের দৈনন্দিন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সজাগ না থাকলেও, অনেকদিন পরপর নিজের দিকে চেয়ে, নিজের মনের চেহারাটা দেখতে পেয়ে নিজের কথায় বার্তায় আচরণে চমকে উঠেছে বৈকি। সবটা না হলেও সে-পরিবর্তনের খানিকটাকে স্বীকারও করে নিতে হয়েছে। রূপ-যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে মনের সেই দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, লোভহীনতা, আদর্শবাদও কোথায় মিলিয়ে গেছে। বেশী লেখাপড়া না জানলেও চারু দা রাজাবাবু আরও পাঁচটা ভদ্র শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে এসে, বিস্তর বই পড়ে পড়ে যে বিদগ্ধ সংস্কৃত মনটি গড়ে উঠেছিল, তারও আর চিহ্ন নেই কোথাও। এই পুরাতন তীর্থে জমে-ওঠা যুগ-যুগান্তের মালিন্য আর গ্রাম্যতা তার ছাপ ফেলেছে ওর মনে, ওর প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়। যে-অর্থ সে দু'পায়ে ঠেলে চলে এসেছিল একদিন, সেই অর্থ সম্বন্ধেই আজ ওর লোলুপতার শেষ নেই। আজ যেন জীবনকে সে নতুন করে আঁকড়ে ধরতে চায়. চায় সে জীবন থেকে যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আদায় করে নিতে, সুখ ও বিলাস সম্ভোগ করতে।

কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে ভাবে সুরবালা—এই তিল-তিল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, এই সুদীর্ঘ একঘেয়ে জীবন, এই তুচ্ছ তুচ্ছ দুঃখ আর সুখের সংঘাত, এ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জীবনসংগ্রাম ওর মধ্যে একটা বিপুল পরিবর্তন আনলে কৈ কিরণকে তো স্পর্শ করতে পারেনি। তো তেমনিই আছে। তেমনিই সর্বঅবস্থ অবিচল, মিতভাষী, তেমনিই অত তেমনিই আজ্ঞাবহ—ওর সুখ-দুঃখ খেয়ালখুশির মুখাপেক্ষী।

অথচ কিরণও কম জ্বলেনি। বরং সে জ্বলছে। সুরবালা তো তার জ্বলা করে দিয়েই এখানে এসেছে বলতে গেলে নিরুত্তাপ নিস্তরঙ্গ নিরুদ্বেগ জীবনযা করতে; কিন্তু কিরণের তো দহনের শুরু, সূত্রপাত। সে-জ্বালার কিছুটা বুঝ পারে বৈকি সুরবালা। হয়ত প্রথমটা বোঝেনি, বুঝলে উপায় ছিল না ব বোঝেনি, বুঝতে চায়নি। নিজের প্রয়োজন শুধু চিন্তা করেছে। স্বার্থপর আজ হ সে, আজ যে স্বার্থপরতাটা চোখে পড় সেটা নিতান্তই তুচ্ছ, সামান্য—স্বার্থ তখনও ছিল সুরবালা, ঘোর স্বার্থপর।

কিন্তু কিরণও তো প্রতিবাদ করে নিঃশব্দে জ্বলেছে। তিলে তিলে পলে প তুষের আগুনের মতো দীর্ঘায়ত সে-দহ ক্রিয়া। তেমনিই যন্ত্রণাদায়ক, তেম মর্মান্তিক, নিষ্ঠুর। তবে নিজেই পু কিরণ—স্বেচ্ছায়, বিনা কাতরোক্তিতে। পু সেটা পাশের লোককে কখনও জানতে দেয় একটু একটু করে পুড়ে ছাই হয়ে গে একদা—সে-ছাইও কারুর চোখে পড়ে যে দিনরাত পাশে পাশে ছিল, প্রতি মুহূর্তের সঙ্গিনী যে—সে-ও টের পা পাশের মানুষটা কেমন করে জ্বলেপ ভস্মাবশেষে পরিণত হয়েছে।...

বুঝেছে হয়ত অনেকদিন পরে। বি তখন আর প্রতিকারের পথ ছিল না। ত আর কোনমতেই সেই ভস্মমুষ্টির ম থেকে মানুষটাকে ফিরে পাওয়া যায় বাঁচিয়ে তোলা যায় না। তার দহন দাহনের পালা শেষ হয়ে গেছে কবে, হয়ে যাওয়া অংগারের মতো আকারটা শ আছে, অবয়বটা নেই।

হয়ত সুরবালা এতটা ভাবেনি। এতা যে এইভাবে একটা মানুষ নিঃশব্দে জ্ব পারে, সে-ধারণাও ছিল না তার। প্রথম য ওকে অবলম্বন করে তখন—তখন প্রয়োজনটাই মনে ছিল, সেইটেই ত প্রকট। এই লোকটার কথা চিন্তা করলে কাজ চলে না। তখন ভেবেছিল দুদিন সে-ই ছেড়ে দেবে, নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন কাছে ফিরে গিয়ে আবার পরিচিত অভ্য জীবনের খেই ধরতে পারবে। সে-ই স্বক্ষেত্র। কোন মানুষ বিনাস্বার্থে আম এমনভাবে পড়ে থাকতে পারে না। হয় করে সে তার প্রাপ্য আদায় করে—নয় সরে যায়। অন্যত্র যায় নিজের প্রয়ো মেটাতে। কে জানে, মুখে যা-ই বলুক, হ সে প্রাপ্য জোর করেই আদায় করবে, যন্ত্রমানব একদিন রক্তমাংসের অস্তি পুনরুজ্জীবিত হবে—এইটেই ভেবে রে ছিল, আশঙ্কাও হয়ত নয়, আশাই করে

।। হয়ত সেরকম ঘটনা ঘটলে বাধাও সে।...সাধারণ মানুষের মাপেই সে ও দেখেছিল। কিরণ যে এতখানি গ, অনন্য, তা সে ভাবেনি।

বালার অন্যায়?

ই উচিত ছিল ছেড়ে দেওয়া?

হয়ত হবে। সুরবালাও বহুদিন পরে । নিয়েছে। মেনে নিতে বাধ্য অপরাধী বিবেক অপরিসীম কুণ্ঠার ভার দিয়েছে ওকে। কিন্তু সুরবালা —সে তো কিরণের মতো যন্ত্র নয়। দূরে প্রবাসে নির্বান্ধব জীবনযাত্রার মাত্র সঙ্গীকে—বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য অবলম্বনকে ছাড়তে পারেনি। এই ভ-যাওয়া বিগতযৌবন জীবনেও যে ঙ্গর সমস্ত জীবন, সমস্ত সত্তা— া-পরকাল বর্তমান-ভবিষ্যৎ—অর্ঘ্য পূজো দিয়ে গেছে, নিঃশব্দে সঁপে সমস্ত বাসনা-কামনা, সুখসম্ভোগ —সে ভক্তের সেই পূজার ডালি রবলিদান প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি।

। মানুষই বুঝি পারে না। যে পারে ধ নয়।

ণ মানুষ নয় বলেই পেরেছে এতটা

বালা এতকাল পরেও, এই যুগ পাশাপাশি থেকেও যেন চিনতে মানুষটাকে। সত্যিই কি ওর মধ্যে কেউ নেই? প্রাণ অনুভূতি হৃদয়— মানুষের যা-যা থাকে—আবেগ স্ভোগেচ্ছা, এমনকি যেটা সবচেয়ে ঈর্ষা ও উষ্মা—কিছুই কি নেই? মন পারে কি করে মানুষ? এমন হয়?

বাসা?

বালার তো ধারণা, সে-ও রাজা- ভালবেসেছিল, উন্মত্তের মতো, ভালবেসেছিল, সর্বস্ব উজাড় ।।

সেও কি এ ভালবাসার কাছে কিঞ্চিৎকর বলে মনে হয় না?

জানে. কিছুই বুঝতে পারে না

সেই থেকেই বৃন্দাবনে থেকে স্তারিণীর মৃত্যুর সময় একবার এসেছিল সেই, সে-সময়ও দেশে ন, শ্রাদ্ধশান্তি চোকার পর একবার রই অনুরোধে দু'দিনের জন্যে মাত্র। শোকার্ত সুরবালাকে ছেড়ে ছিল না, খুব পীড়াপীড়িতেই খোলা দুটি দিনের বেশী মতির মৃত্যুর সময় সুরবালাই নি ওকে, কোথায় থাকবে কি-না— বিধা হবে বলে। মতির বাড়িতে ও অপমানেরও একটা ভয় ছিল মির মধ্যে কিরণকে টেনে আনতে ।

র বা কয়েকবার এদিকে এসেছে, সঙ্গে—তীর্থ করতে। দেশের দিকে যায়নি। দু'-একবার তাও আসেনি— সুরবালা পরিচিত অন্য লোকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। বিশেষ বেদিকে দেরি হবার কথা, যেমন রামেশ্বরের দিকে, কি কেদার-বদরী—সে-সব যাত্রায় ওকে সঙ্গে নেয়নি—অতোদিন দুজনেরই অনুপস্থিত থাকা ঠিক হবে না বলে।

বিষয়সম্পত্তি স্ত্রী-পুত্র—যেসব আকর্ষণ মানুষের কাছে সর্বাধিক—কিছুই টানতে পারেনি কিরণকে। এক-আধবার অবশ্য যেতে হয়েছে, বৈষয়িক প্রয়োজনে, যেসব কাজ নিজে উপস্থিত না থাকলে কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়, সেইসব কাজে গিয়েছিল, কিন্তু কাজ সারা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছে। ছেলে-মেয়েরা মানুষ হয়েছে বস্তুত অনাথ পিতৃহীনের মতোই—কর্মচারীদের ভরসায়। স্ত্রী সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে, মাছও খেয়েছে এইমাত্র। সধবার আর কোন সাধ-আহ্লাদ, গৌরব আনন্দ বলতে কিছু ছিল না তার। স্বামী নেয় না—এক কেত্তন-উলীর খপ্পরে পড়ে তার সঙ্গেই বাস করছে। ফিরেও তাকায় না'—এ-কথা তো আত্মীয়মহলে অবশ্যই প্রচার হয়েছে। সকলেই কৃপাদৃষ্টিতে দেখে—আত্মীয়া-কুটুম্বিনীরা। সেজন্যে কোথাও যায় না বিভা, কোন কর্মবাড়িতে তো নয়ই—এমনকি কোন শোকের বাড়িতেও নয়। মেয়েরা মেয়েদের চেনে, শ্রাদ্ধবাসরই হোক, আর সদ্য-মৃতের শোকাচ্ছন্নতার মধ্যেই হোক, কৌতূহলই তাদের প্রবল, সহানুভূতির ছলে শত প্রশ্ন ও সহস্র বক্তব্য তাকে বিঁধবে। সেই ভয়েই কোথাও যায় না আরও। এমনকি নিজের ভাইঝির বিয়েতেও যায়নি—ভাজকে লিখে পাঠিয়েছে যে. "আমার মন্দ বরাতের ছায়াও না কাহারও জীবনে লাগে, আমার নিঃশ্বাস পর্যন্ত না কোন মেয়েকে স্পর্শ করে। আমি তাহাকে এইখান হইতেই আশীর্বাদ করিতেছি, এ-পোড়ারমুখ আর তাহার দেখিয়া কাজ নাই।"...

এই এত কালের মধ্যে মাত্র দুবার কিরণ দেশে গিয়ে থেকেছে কয়েকদিন করে।

প্রথম গিয়েছিল মেয়ের বিয়েতে, কুড়ি-পঁচিশ দিন থাকতে হয়েছিল প্রায়। তাও পাত্র দেখা, সম্বন্ধ ঠিক করা—ওর পুরনো নায়েবই করেছে। খোঁজ-খবর নেওয়া, দেনা-পাওনা ঠিক করা—অর্থাৎ বিবাহ স্থির করার কাজটা করেছেন ওর জাঠতুতো বড় ভাই। কিরণ গিয়েছে একেবারে আশীর্বাদের আগে। তারপর অবশ্য আর পালাতে পারেনি। বিয়ের বাজার, নিমন্ত্রণ—সবের মধ্যেই থাকতে হয়েছে। বিয়ের পরও, আটদিনের মাথায় জোড়ে ফেরা, সুবচনী-সত্যনারায়ণ প্রভৃতি মিটিয়ে তবে আসতে পেরেছে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও কোন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেনি কিরণ। যা করতে হবে তা বিনা প্রতিবাদে, বিনা-বিরক্তিতে করেছে। আত্মীয়-স্বজনের সরব এবং স্ত্রীর নীরব বা স্বল্পরব অনুযোগ স্মিতহাস্যে নিরুত্তরে শুনে গেছে। উত্তর দেয়নি, দোষ খণ্ডনের চেষ্টাও করেনি। স্ত্রীর কাছে এর আগেই ক্ষমা প্রার্থনা করে গেছে, নতুন করে উত্তর দেবার প্রয়োজনও হয়নি।

বিভার কাছে অবশ্য কোনদিনই গোপন করেনি কিছু; নিজের দোষ ঢাকবার কি লাঘব করবার কিম্বা কতকটা দায়িত্ব বিভার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেনি। অনেকদিন আগে, সেই প্রথমবার বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ই—দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল একটা। লিখেছিল—"তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার কোন মুখ নাই। তোমারও ক্ষমা করার কোন কারণ দেখি না। তুমি আমাকে অভিসম্পাৎ করিলে তাহা প্রাপ্য বলিয়াই মাথা পাতিয়া লইব। মোহ বলো, নেশা বলো—যা বলিবে বলো, আমি কিন্তু জানি ইহাই আমার ভাগ্যলিপি। এ-আকর্ষণে বাধা দিবার শক্তি নাই, এ-বন্ধন ছিন্ন করা অসম্ভব। এখন তো নয়ই, কোন কালেই যে আমাকে ফিরিয়া পাইবে—এ-আশা করিও না। দুর্ভাগ্য তোমার তো বটেই—আমারও কম নয়। তোমার মতো স্ত্রী লাভ বহু ভাগ্যের কথা, সেই স্ত্রীকে জানিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া হারানো—ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি আছে। আমি জ্ঞানপাপী, আমার তরফে কোন কৈফিয়ৎই নাই। এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো,—যাহাতে সত্বর আমার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে বৈধব্যের দুঃখ পাইবে সত্য, কিন্তু নিরন্তর লজ্জা ও অপমানের হাত হইতে অব্যাহতি ঘটিবে।"

সেই প্রথম আর সেই শেষ। এরপর বহু চিঠি লিখেছিল বিভা, বহু চেষ্টা করেছিল

'নেশা কাটাবার', 'বন্ধন ছিন্ন করার'—সেসব চিঠির এই অভিযোগ অনুযোগ অংশগুলোর কোন জবাব পায়নি কখনও। সামনাসামনি সাক্ষাতের সময়ও কখনও কোন কথা বলেনি কিরণ। চুপ করেই থেকেছে সমস্তক্ষণ। পাষাণ প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে মাথাই ফেটেছে, প্রাচীরে দাগ লাগেনি।...

আর একবার গিয়েছিল ছেলের বিয়েতে।

কিরণের অনুরোধেই সুরেন বি-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে নায়েবমশাই তার জন্যে পাত্রী দেখে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেন। কাছাকাছির মধ্যেই, আর এক জমিদারের মেয়ে। শ্বশুর বহুদর্শী বিচক্ষণ—কিন্তু ধূর্ত বা নীচ নন, অর্থলোলুপও নন। তাঁকে নিজের বাবার আমল থেকেই জানত কিরণ—কিরণের চেয়ে বয়সে বড়, দাদা বলে এসেছে বরাবর। তাঁরই মেয়ে, মেয়েও পছন্দ-সই, সামান্য একটু বাংলা লেখাপড়াও জানে—বাড়িতে যতটা শেখা সম্ভব। এ-সম্বন্ধ ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই মনে করেছে কিরণ। সেই সময় এসে—আরও একটি কাজ সেরে গেছে সে, দানপত্র করে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ছেলেকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। স্ত্রীকে দিয়েছে কোম্পানীর কাগজ আর নগদ টাকা যাকিছু ছিল—যদি ভবিষ্যতে ছেলে কোনদিন অনাদর করে, যাতে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে সে। ছেলে প্রথমটায় এত দায়িত্ব নিতে রাজী হয়নি, যথেষ্ট প্রতিবাদ করেছিল। কিরণ ছেলের হাতে ধরে মিনতি করে রাজী করিয়েছে। পুরনো কর্মচারীরাও স্বীকার করেছে যে, এই ব্যবস্থাই ভাল, একটা সই করানোর জন্যে এক-এক সময় দরকারী কাজ আটকে যায়, বহু ক্ষতিও হয় অনেক সময়। বাবুমশাই ফিরবেন না যখন স্থির, তখন আর মিছিমিছি ওঁকে জড়িয়ে রেখে লাভ নেই।

অদ্ভুত সম্পর্ক ওদের, এক-এক সময় সুরবালারই হাসি পেয়ে যায়।

এক ঘরে, পাশাপাশি থাকে। দুই শয্যার মধ্যে দু'হাতের মতো ব্যবধান। তা-ও থাকে না এক-এক সময়। অসুখ-বিসুখ করলে একটা বিছানা এগিয়ে আসে আর একটার কাছে। তেমন বাড়াবাড়ি হলে এক শয্যাতেও শুতে বাধা নেই। কারও কাছেই কারও লজ্জা নেই। সুরবালার তো নেই-ই। অল্প বয়সে কখনও বিশেষ অসুখ করেনি বলে সামান্য অসুখেই কাতর হয়ে পড়ে সে। সে-সময় তাকে শৌচকর্ম থেকে স্নান পর্যন্ত সবই করিয়ে দিতে হয়। কিরণকেই করতে হয় সে-সব। ঝিয়ের সেবা পছন্দ হয় না সুরোর, তার নাকি গা-ঘিনঘিন করে। তাছাড়া, তার ঠিক কি প্রয়োজন কখন—তা কিরণকে বলতে হয় না, সে নিজেই বুঝে করে। মাইনের লোকের কাছ থেকে এতটা আশা করা যায় না।

অর্থাৎ নিবিড় আত্মিকযোগ—দু'জনের সঙ্গে দু'জনের। একাত্ম বললেও বেশী বলা হয় না। সুরবালা একদিনও পারে না কিরণকে ছেড়ে থাকতে, নানান অসুবিধা বোধ করে। চোখে যেন অন্ধকার দেখে। নির্ভর করতে করতে অভ্যাসটা স্বভাবের অঙ্গীভূত হয়েছে। 'ওগো কিরণবাবু-উ, বলি শুনছ, একবার ইদিকে এসো। ঐ দ্যাখো কি সব বলছে মিস্তিরী।' কিম্বা, 'এই যে গোয়ালা এসেছে, কী সব হিসেবের কথা বলছে, বুঝে নাও বাপু!' এই ধরনের কথা দিনরাতই বলতে হয়। ফরমাশ বললে ভুল বলা হবে, নির্ভরতাই।

কিন্তু তবু সে-আত্মার যোগ দৈহিক যোগে পৌঁছয়নি একদিনও। দেহের কোন স্থানেই হাত দিতে বাধা নেই, দিতে হয়েছেও বারবার, তবু সে-স্পর্শ কখনও কামাতুর হয়ে ওঠেনি। সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ করেনি কিরণ, একদিন—এক মুহূর্তের জন্যেও। করলেও সুরবালা হয়ত বরদাস্ত করত না। কিন্তু ও-তরফ থেকে আভাসে ইঙ্গিতেও কোনদিন সে-ঈপ্সা প্রকাশ না পাওয়াতে এক বিচিত্র কারণে যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণই হয়েছে সুরো। প্রত্যাখ্যান করার দৃঢ়তা দেখানোর সুযোগ না পাওয়ার জন্যেই বোধহয়। কে জানে।

হয়ত বা আরও গূঢ় কোন কারণ ছিল মনের অবচেতনে—যা অনুমান করতেও সাহস হয়নি সুরবালার।

সুরেনের বিয়ের বছর চার-পাঁচ পরে সুরবালা এক সময় কিরণকে ধরে পড়ল, 'বিভাকে নিয়ে এসো এখানে।... আর কিছু না হোক, এতবড় একটা তীর্থে আসবে না একবার?'

প্রস্তাবটা এতই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত যে, কিরণের অবিচল ধৈর্যও নড়ে উঠল একবার, অবাক হয়ে সুরবালার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তার মানে? হঠাৎ?'

কিরণের সপ্রশ্ন স্থির দৃষ্টির ওপর চোখ রাখতে পারল না সুরো, মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'না, হঠাৎ ঠিক নয়। কথাটা ভাবছি অনেকদিন থেকেই। তার কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই। ...গতজন্মে কার কি কেড়ে নিয়েছিলুম, তাই এ জন্মে বাড়াভাতে ছাই পড়ল। আবার এ জন্মে যা করে গেলুম—যদি জন্মাতে হয়, কেঁদে কেঁদে দিন যাবে। মেয়েছেলের স্বামী কেড়ে নেওয়ার মতো পাপ হয় না। অথচ—রাধারাণী জানেন, ঠিক কেড়ে নিতে চাইনি আমি, পাকেচক্রে হয়ে গেল তাই—।'

ঈষৎ একটু হাসির রেখা কি দেখা গেল কিরণের দুই ঠোঁটের খাঁজে? ...গেলেও অত লক্ষ্য করল না সুরবালা।

কিরণ বলল, 'কিন্তু সে স্বামী আজ আর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে।'

'না না, ধাঃ! তা কেন! মানুষটাকে কাছে পেলেও তো একটু শান্তি হয় বেচারীর... তা ছাড়া, চোখে দেখে যেত যে—যা ভাবছে, যা ভেবেছে এতকাল—তা নয়।'

'তা আর হয় না। সে তুমি আমি কেউই বোঝাতে পারব না। তাছাড়া স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক এমনই—শুধু কাছে পাওয়াতে কারুরই মন ওঠে না। সে বরং আরও অসহ্য বোধ হয়।'...

কিন্তু সুরো এসব যুক্তি শুনতে চায় না। নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে। এত করে কোনদিনই কিরণকে কিছু বলতে হয় নি, ওর ইচ্ছাই কিরণের পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু এই একটা ব্যাপারে কিন্তু কিছুতেই রাজী করানো যায় না তাকে। সে বলে, 'তুমি বোঝ না, আরও অশান্তি হবে, তার জ্বালার ওপর জ্বালা বাড়বে। তার ওপর অনেক অবিচার করেছি, আবার তাকে আরও বেশী কষ্ট দিতে এখানে টেনে আনতে চাই না।'

উলটো বোঝে সুরবালা—সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ের মতোই, রাগ করে বলে, 'কে তোমাকে অবিচার করতে বলেছিল! তবে দণ্ডাতেই বা গেলে কেন! আমি তো তোমাকে বার বার বলেছি—তার কাছে, তাদের কাছে ফিরে যেতে—! তুমিই তো কান দাও নি সে কথায়। তখন তো একেবারে ভালবাসায় অন্ধ হয়েছিলে! এখন আমার দুষছ কেন?

এ কথার উত্তর হয় না। কিরণ সে চেষ্টাও করল না। যেমন চিরদিন চুপ করে থাকে, সেদিনও তেমনি রইল। বললে অনেক কথাই বলা যেতে পারত, কিন্তু সুরবালা তা বুঝবে না, বিশ্বাসও করতে পারবে না: অতীত ঘটনার অপ্রীতিকর তথ্য মানুষ ভুলে যায়। যার ক্ষতি হয় সে মনে রাখে—যার ভুললেই শান্তি, সে মনে রাখবে কেন? তাই অনর্থক তর্কের সৃষ্টি করে—এই এতকাল পরে অশান্তি বাড়াতে চায় না কিরণ।......

শেষ পর্যন্ত সুরবালাই একখানা চিঠি লেখে সুরেনকে। অতি অবশ্য অবশ্য যেন মাকে নিয়ে একবার বৃন্দাবন ঘুরে যায়। এত বড় তীর্থ—মাকে করিয়ে নিয়ে যাওয়া তার উচিত। কোন অসুবিধাই হবে না, এখানে কাছাকাছি আরও যেসব দেখবার জায়গা আছে, মথুরা গোকুল কাম্যবন ডাকর—সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে সুরবালা। এর মধ্যে যেন কোন 'দুষ্য' কি মন্দ উদ্দেশ্য আছে না ভাবে তার মা।... চিঠির শেষে, স্বামীর কাছে স্ত্রীর যে জোর করেই আসা উচিত—আকারে ইঙ্গিতে তাও জানিয়ে দেয়।

চিঠি লেখার কথা কিরণ টের পেয়েছিল। বাধা দেয়নি—বৃথা জেনেই দেয়নি—কিন্তু অস্বস্তি বোধ করেছিল। আসবে তো নাই-ই, মিছিমিছি আরও খানিকটা বিরূপতার সৃষ্টি হবে সেখানে, আরও খানিকটা জ্বালা।

কিন্তু উত্তর এল অপ্রত্যাশিত। এতটা বোধহয় সুরেনও আশা করেনি। সুরেন বেশ বিনীত ও ভদ্রভাষাতেই জবাব দিয়েছে, তার এ সময় কোন মতেই আসার উপায় নেই। তবে মার খুব ইচ্ছা আছে, মথুরা বৃন্দাবন ঘোরার—বাবা যদি কোনরকমে একটু সময় করে এসে নিয়ে যেতে পারেন তো মায়ের সে সাধ পূর্ণ হতে পারে। বাবার সম্মতি পেলে সে কিছু টাকাও পাঠিয়ে দেবে রাহাখরচ বাবদ।

যথাসর্বস্বই তাদের লিখে দিয়ে এসেছিল কিরণ, কিছুই নিয়ে আসেনি। তবে সেটা তাদের বিশ্বাস করার কথা নয়। বরং তাদের এইটেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বেশ খানিকটা মোটা টাকাই সরিয়ে রেখেছে সে সুরবালার জন্যে, অথবা তাকে দিয়েই দিয়েছে। তবু কর্তব্য হিসেবেই সুরেন প্রতি বছর পুজোর সময় দুশো টাকা করে পাঠায়—'বস্ত্রাদি বাবদ যৎসামান্য পাঠাইলাম, দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন।' কুপনে লেখা থাকে। যদিও সে বিলক্ষণ জানে যে, কেউ এদিকে এলে কিরণের জন্যে ভাল ফরাসডাঙ্গার ধুতি পাঠাতে তার মায়ের ভুল হয় না কখনও। জামা কাপড় সম্বন্ধে বরাবরই কিরণের শৌখিনতা আছে একটু—সেটা বিভা আজও ভোলে নি।...

এর পর আর কিরণের উপায় রইল না কোন—দেশে যাওয়া ছাড়া। তার তখনও যথেষ্ট আপত্তি ছিল, কিন্তু সুরবালা কোন কথাই শুনল না, মহা অশান্তি শুরু করে দিল।

'তুমি কী গো! কিছুই তো করলে না—বিয়ে করা বৌ তো তোমার! এখন এই তীর্থ করার ইচ্ছেটাও তার পোরাবে না! এত সুযোগ সুবিধে থাকা সত্ত্বেও—?'

একথার উত্তরেও অনেক কথা বলা চলত। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে অবহেলার জন্যে কিরণই ষোল আনা দায়ী কিনা—এ প্রশ্নও তোলা যেতে পারত—কিন্তু কিরণ বৃথা জেনেই সে চেষ্টা করল না, একটু হাসল শুধু। নিরুপায় মানুষ যখন ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়, তখন যে হাসি হাসে—সেই হাসি।

অবশ্য বিভার ইচ্ছাটা যে ঠিক ষোল আনা তীর্থ করার নয়—সুরবালাও তা বুঝেছিল। অনেক দিনের অনেক কৌতূহল তার, বহু বিনিদ্র রজনীর অমীমাংসিত সংশয়-কল্পনাই তাকে টেনে আনছে এই অপমানের জায়গাতে। অপরাধিনীরই মাথা হেঁট করে যাওয়ার কথা, অথবা সরে যাওয়ার কথা—সে জায়গায় সে-ই আসতে রাজী হয়েছে এতখানি মাথা নিচু করে—শুধু সম্পর্কটা সে নিজের চোখে দেখে যেতে চায় বলেই। হয়ত তাতে জ্বালা বাড়বে আরও, তবু একতরফা কল্পনায় আর ছটফট করতে হবে না—দিবারাত্র অনুমানের বিষে জ্বলতে হবে না—এই একটা সান্ত্বনা।

সুরবালাও সেইভাবে তৈরী হল। নিজের জিনিসপত্র বিছানা হরিনামের মালা গুরুদেবের ছবি আগেই সরিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল. রাজাবাবুর ছবিটাও ঝেড়ে মুছে গুরুদেবের ছবির পাশে সাজিয়ে রেখেছিল। বিভা আসতে বড় ঘরখানায়—কিরণের বিছানার পাশে—নিজে হাতে পরিপাটি করে বিভার বিছানা পেতে দিলে, তার কাপড় জামা ওঘরের আলনায় সাজিয়ে গুছিয়ে দিলে। ঝিকে বললে, ওপরের কল-ঘরেই বিভারও চানের জল দিতে। ঝি-পূজারীদের আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল—কি কথা বলতে হবে বা হবে না, কীভাবে বলতে হবে। কিরণবাবু ওর ব্যক্তিগত সেবা যেগুলো করেন—সেগুলো যেন এই কদিন আর তাঁর ওপরই বরাত দিয়ে বসে না থাকে, তারাই যেন করে দেয় একটু হুঁশ করে—বার বার সতর্ক করে দিলে তাদের।

অভ্যর্থনা, আদর-আপ্যায়ন-আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হল না। অকারণে ক্ষমা চেয়ে নাটক করার কোন চেষ্টাও করল না সুরবালা। এসব প্রসঙ্গই তুলল না। ওর তরফ থেকে কোন বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎই যখন নেই—তখন মিছিমিছি নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কোন লাভ নেই—গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

বৃন্দাবনে যা যা দ্রষ্টব্য আছে—সুরবালা নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখাল। পাণ্ডাকে সঙ্গে দিয়ে এক্কা-টাঙ্গার ব্যবস্থা করে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গোবর্ধন গোকুল মথুরা ছাড়াও কাম্যবন, ভাণ্ডীরবন প্রভৃতি দেখতে পাঠাল। দাণ্ডজী দর্শন করিয়ে আনার কথাও বলে দিল ব্রজবাসীকে। তারপর, ওদিকের পালা শেষ করে ফিরে এলে কিরণকে চেপে ধরল, 'কদিন একটু বিশ্রাম করুক—তুমি ওকে এই যাত্রাতেই পুষ্করটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।... পুষ্কর আর অমনি সেই সঙ্গে জয়পুরে আসল গোবিন্দজী দর্শন করিয়ে দাও।'

কিরণ একবার একটু ভুরু কোঁচকাল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। বিভার অবস্থা সে জানে, বুঝেছেও—শুধু সুরবালাকে কী করে বোঝাবে সেইটেই ভেবে পাচ্ছে না।

তখনকার মতো চুপ করে রইল বিভাও। কিন্তু কিরণ কি একটা কাজে অন্যত্র চলে যেতে সে বলল, 'পুষ্কর যাবো না বলতে নেই—কিন্তু এ যাত্রা থাক ভাই। আমি বাড়ি যাবো। তুমি যা হয় করে সেই ব্যবস্থাই একটা করে দাও—আজকালের মধ্যে। উনি—ও'র সময় না হয়, কাউকে দিয়ে বড় লাইনের গাড়িতে চাপিয়ে দাও, সেখানে খোকাকে তার করে দিলে সে-ই এসে নামিয়ে নেবে।'

'সে কি!' চমকে উঠল সুরবালা। প্রথম প্রথম অনেক আশঙ্কাই ছিল, কিন্তু—মনে যা-ই থাক—এই কদিনে কোন বিরূপতারই চিহ্ন দেখা যায় নি বিভার কথা-বার্তায় বা ব্যবহারে। তাই একটু নিশ্চিন্তই হয়েছিল শেষের দিকে—অবস্থাটা ও মেনে নিয়েছে ভেবে।

সে তাই আবারও একটু যেন বিহ্বল-ভাবেই বলল, 'সে কি! এরই মধ্যে কি!

এতদূরের পথ এলে—দু' একটা মাস থেকে যাবে না!... এরই মধ্যে বাড়ি যাবার এত তাড়া কেন?'

বিভা বলল, 'না ভাই, নাতি ফেলে এসেছি, মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে রয়েছে। বৌমা আবারও অন্তঃসত্ত্বা, বাড়িতে তো কেউ নেই আর, দু'জনেই ছেলেমানুষ, আমার আর বেশীদিন বাইরে থাকা উচিতও নয়।'

কারণটা বুঝতে পারে না সুরবালা কিছুতেই। এর মধ্যে এমন কি ঘটল? সে নিজের আচরণের হিসাবটাই মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করে আগে—এই গত কদিনের, কিন্তু সেখানেও কিছু খুঁজে পায় না। সে তার জ্ঞানমতো যথেষ্টই সতর্ক আছে। বিদ্বেষ ও বিরূপতার মূল কারণটা যা থাকার তা তো আছেই, তার ওপর নতুন করে কোন বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে—এমন ঘটনার কথাই তো মনে পড়ছে না। কিরণকে সে আটকে রেখেছে বা কিরণ তার প্রেমে বন্দী—এ ধরনের কোন বিশ্বাস যাতে গড়ে উঠতে না পারে—সেই চেষ্টাই তো করেছে সে প্রাণপণে।...

সে পীড়াপীড়ি করে খুব বিভাকে—আর কিছুদিন থাকার জন্যে, কিরণকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, 'তুমি একটু বলো, তুমি না বললে থাকবে কেন?' অনুযোগ করে, 'তুমি নিশ্চয় এমন ভাব দেখিয়েছ যে ওর থাকাটা তোমার পছন্দ নয়—তাই চলে যেতে চাইছে।'

কিরণ তার নিজস্ব বিচিত্র হাসি হাসে শুধু, বলে, 'ও থাকবে না আমি জানি। থাকা সম্ভব নয়। তুমি যে কেন সেটা বুঝছ না—সেইটেই আমার বুদ্ধির অগোচর। এত বোঝ আর এইটে বোঝ না?'

তবু জেদ করে সুরবালা, 'ও যদি তাই ধরে বসে থাকত, তাহলে আসবেই বা কেন। ...না না, তুমি একটু বলো, তাহলেই থাকবে। এতকাল পরে তোমার সঙ্গে এল—তোমার কাছে, দুটো মাসও থাকবে না? আর কি এমন সুযোগ হবে?'

আবারও হাসে কিরণ, ক্লিষ্ট হাসি। কথা কয় না।......

সুরবালার অনুরোধে ও মিনতিতে আরও ছ' সাতটা দিন থাকে বিভা কিন্তু তার বেশী কিছুতেই থাকতে রাজী হয় না। জোর করে ধরে রাখার মতো কোন কারণও নেই, ঝুলন বা দোল বা অন্নকূট সামনে এমন কোন পালপার্বণও নেই—যে উপলক্ষে আটকে রাখে। অগত্যা ওর যাওয়ার ব্যবস্থাই করে দিতে হয়। কিরণেরই যাওয়া উচিত সঙ্গে, সে-ই এনেছে সে-ই পৌঁছে দেবে, সে রকম কথাও ছিল—কিন্তু কে জানে কেন বিভা সেদিক দিয়ে যায় না, কেবলই বলে 'আমাকে বড় লাইনের গাড়িতে কেউ তুলে দিয়ে এলেই হবে। মেয়ে গাড়িতে তুলে দেবে, ভয় কি? বেশ চলে যাব এখন—!'

অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাও করতে হয় না।

পাশের একটি কুঞ্জ থেকে কয়েকজন কলকাতা যাচ্ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও তিন-চারজন মহিলা আছেন—সুরবালা বলে সেই সঙ্গেই পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিল।

যাওয়ার দিন সকালে সুরবালা আর থাকতে পারল না, এক কাণ্ড করে বসল। সকালের লাড়ুভোগ সরিয়ে পুজারী রান্না করতে চলে গেছে, ঝিও ভেতরে ব্যস্ত, কিরণ গেছে বাজারে—মন্দিরের বাইরের সংকীর্ণ দালান বা বারান্দায় ওরা দুটি প্রাণী। সুরবালা তার আহ্নিক পুজোর সরঞ্জাম এনে বসেছে, বিভার আহ্নিক সবে শেষ হয়েছে—সেই সময়টায়। সুরবালা খপ্‌ করে ওর একটা হাত ধরে বললে, 'আমি যা-ই হই, ঠাকুরের সামনে, ঠাকুরের মন্দিরে বসে; হাতে এখনও জপের মালা—মিথ্যে বলতে পারবে না। ঠিক করে বলো দিকি, কেন এমনভাবে দড়ি-ছেঁড়া হয়ে চলে যাচ্ছ? ছেলের বৌ পোয়াতি, তা জেনেই তো এসেছিলে। আমার সংস্পর্শই যদি অসহ্য—তাহলে এলেই বা কেন! আর তাও, মানুষটা এখানে আটকে আছে সত্যি কথা—কিন্তু আমার সঙ্গে আজ অবধি কোন দূষ্য সম্পর্ক হয়নি—এই আমার বিগ্রহের সামনে বসে বলছি।... তুমি সতী-লক্ষ্মী তোমাকেও ছুঁয়ে আছি; গলায় জপের মালা।... আর তুমি নিজেও তো দেখে গেলে। তুমিও কি কিছু বুঝতে পারো নি?'

'পেরেছি বৈকি। পেরেছি বলে তো চলে যাচ্ছি, থাকতে পারছি না।' ধীর শান্তভাবে বলে বিভা, 'ঠাকুরদালান না হলেও বা হাতে জপের মালা না থাকলেও মিথ্যে বলতুম না। কথাগুলো আমারও শুনিয়ে যাওয়া দরকার। আমার সর্বনাশ করেছ সেটা আমি এতদিনে মেনে নিয়েছিলুম, মেনে নিয়েছিলুম বলেই এখানে আসতে রাজী হয়েছি। দেখতে চেয়েছিলুম যে আমার কি নেই যা তোমার আছে—যা আমি দিতে পারি নি বলে আমাকে ত্যাগ করে তোমার কাছে পড়ে আছেন।... এসে এই দেখব জানলে কখনই আসতুম না। ও'র যে সর্বনাশ করেছ তার ক্ষমা নেই আমার কাছে। আমাকে দগ্ধেছ—সে সয়েছি, মেয়েদের অনেক সয় কিন্তু ও'র এই দগ্ধানি সহ্য করতে পারছি না। তোমাকে নিয়ে সুখে আছেন শান্তিতে আছেন জানলেও আমার কষ্ট হত—তবু তার মধ্যে একটা সান্ত্বনা পেতুম, এত অসহ্য হত না। এ তুমি কি করলে! এমন মানুষটাকে জন্তু করে ছেড়ে দিলে!'

বলতে বলতে বোধকরি বহুদিনের প্রায়-বিস্মৃত ক্ষতগুলোই রক্তক্ষরা হয়ে উঠল আবার। প্রতিকারহীন অবিচারের সহস্র অনুযোগ মাথা কুটতে লাগল আত্ম-সম্মানবোধের কঠিন প্রাচীরে। আবেগে, নৈরাশ্যে প্রত্যাখ্যাত স্বামীপ্রেমের বেদনায় গলা বুজে এল বিভার। তবু অমানুষিক চেষ্টায় আত্মসম্বরণই করল আবার, কণ্ঠস্বর শ্রুতিগম্য করে তুলল অল্পক্ষণের মধ্যেই, 'কেন এমন করে ধরে রাখলে তাহলে, আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে! আজ আর ও'র জ্বলবারও হয়ত শক্তি নেই আর—কিন্তু কী জ্বালায় জ্বলেছেন সেটা তুমি না বুঝলেও, আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝেছি। ছিঃ ছিঃ! কী করেছিল মানুষটা তোমার যে—তুমি এতবড় সর্বনাশ করলে!... আমি যে ও'র দিকে চাইতে পর্যন্ত পারছি না! চাকর করে রেখেছ—বিনামাইনের চাকর—তাতেও কিছু বলতুম না, যদি বুঝতুম যে তার বদলে, নিজের জীবনের বদলে—তোমাকে সে অন্তত পেয়েছে!'

তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'না ভাই, সত্যি কথা শুনতে চেয়েছিলে, সত্যি কথাই বললুম; আমার যে অনিষ্ট করেছ তা আমি হয়ত মাপ করে যেতুম—কিন্তু ও'কে যে কষ্টটা দিলে, অত-বড় মহাপ্রাণ মানুষটাকে শেষ করে দিলে—না পেলে নিজে, না পেতে দিলে অপরকে—এর ক্ষমা নেই, অন্তত আমার কাছে।...থাক! এই যে কদিন আছি প্রতিটি মুহূর্ত বিছের কামড়ের জ্বালা সহ্য করে আছি। অহরহ বুকের মধ্যেটায় যে কি হচ্ছে তা তুমি বুঝবে না, তুমি পাষাণ, সেটুকু বোধশক্তি থাকলে ঐ মানুষকে নিয়ে তুমি এ খেলা খেলতে পারতে না!'

অসাড় শিথিল হাতখানা আপনিই খসে পড়ে বিভার হাত থেকে। সুগৌর, তখনও-সুন্দর মুখে কে যেন নিবিড় কালি লেপে দেয়। আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে নেয় সুরবালা, নিতে বাধ্য হয়।...

আসলে একটা বড় হিসেবেই ভুল হয়ে গেছে তার। সে চিরদিনই সংসারের বাইরে বাইরে থেকেছে—বাবা মা আর তাকে নিয়ে যে সংসার তা আর পাঁচটা গৃহস্থবাড়ির মতো নয়, তা থেকে ঠিক সংসারের ধারণা করা যায় না। বাকী জীবনও তো কাটল একেবারে সংসারের বাইরেই। মেয়েদের, বিশেষ গৃহস্থঘরের বিবাহিতা মেয়েদের চোখে কত সহজে কত জিনিস ধরা পড়ে—সেই ধারণাটাই সে করতে পারে নি।

আর সেই একই কারণে বিভার চিন্তার সূত্রটা খুঁজে পায় নি, মনের গতিটা ধরতে পারে নি; কার্যকারণের হিসেবটাও মেলাতে পারেনি তাই।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)
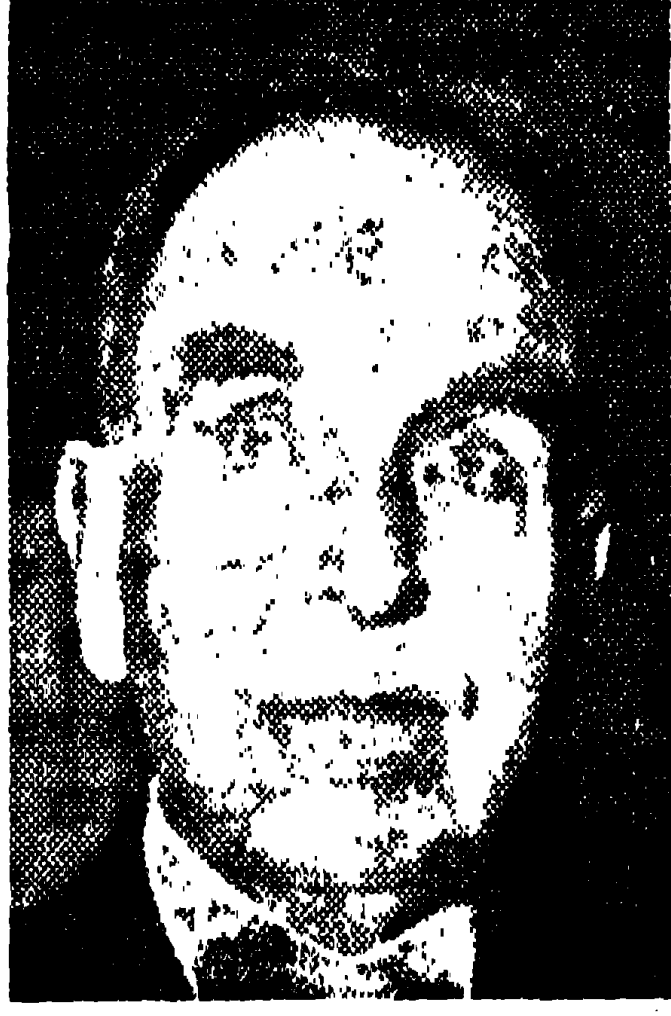
অটো হান স্মরণে

বিজ্ঞানের কথা

পারমাণবিক যুগের অন্যতম পথিকৃৎ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক অটো হান জার্মেনীর গোয়েটিন্‌জেনে মারা গেছেন কয়েক সপ্তাহ আগে। বিশ্বের একজন সেরা পরমাণু বিজ্ঞানীকে আমরা হারালাম।

প্রায় ৮৯ বছর আগে ১৮৭৯ সালে জার্মেনীর ফ্রাংকফুর্টে অটো হানের জন্ম। মন্ট্রিলে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের অধীনে তিনি শিক্ষাগ্রহণ ও গবেষণা করেন। রাদারফোর্ডের পথ অনুসরণ করেই হান পরমাণু কেন্দ্রীনের (নিউক্লিয়াস) গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন।

পরমাণু-বিজ্ঞানী অটো হানের বৈজ্ঞানিক জীবনের কথা স্মরণ করতে গেলে পরমাণুশক্তি বিকাশের ইতিহাস বিবৃত করতে হয়। কারণ যাঁদের প্রতিভার স্পর্শে পরমাণু শক্তির স্বর্ণদ্বার খুলে যায়, তাঁদের অন্যতম ছিলেন অটো হান। বিশ শতকের চতুর্থ দশকে বিশ্বের সমগ্র বিজ্ঞানীমহল ইউরেনিয়াম সংক্রান্ত গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৪ সালে ইতালীতে এনরিকো ফের্মি ইউরেনিয়াম মৌলকে নিউট্রন কণিকার দ্বারা অভিঘাত করেন। তার ফলে 'নেপচুনিয়াম' নামে একটি নতুন মৌলের সন্ধান পেয়েছেন বলে ফের্মি ঘোষণা করেন। কিন্তু ফের্মির এই আবিষ্কারের সংগে সকল বিজ্ঞানী একমত হতে পারলেন না। জার্মান বিজ্ঞানী ইডা নোডাক জানালেন, নিউট্রন অভিঘাতের দ্বারা ফের্মি যা পেয়েছেন তা হচ্ছে ইউরেনিয়ামের ভগ্নাংশ, কোন নতুন মৌল নয়। ফ্রান্সে মাদাম কুরীর ইরিন জোলিও কুরী-ও বললেন, নিউট্রন অভিঘাতেরই ফলে নতুন মৌল সৃষ্টির চেয়ে জানা মৌল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

জার্মেনীতে হান এবং লিজে মাইটনার এবিষয়ে কোন মন্তব্য না প্রকাশ করে নিজেরা যাচাই করে দেখার চেষ্টা করলেন। তাঁরা ইউরেনিয়াম পরমাণুকে মন্থরগতি নিউট্রন দিয়ে অভিঘাত করলেন। অভিঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম থেকে সৃষ্ট পদার্থগুলো তাঁরা পরীক্ষা করলেন। ফের্মির মতো তাঁরাও একটি অজানা মৌলের সন্ধান পেলেন। এর দ্বারা ফের্মির পর্যবেক্ষণ সমর্থিত হল। কিন্তু অভিঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম পরমাণুর কি দশা ঘটল সে ব্যাপারটা তখন বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেল।

২৩৮ পারমাণবিক ভারের ইউরেনিয়ামকে অভিঘাত করে ফের্মি তা থেকে যে কয়টি মৌলের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক মৌলের সন্ধান পান হান এবং মাইটনার তাঁদের পর্যবেক্ষণে। এর রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় তাঁরা কয়েক বছর ধরে ইউরেনিয়াম অভিঘাত সংক্রান্ত গবেষণায় নিমগ্ন রইলেন। এই সময় স্ট্রাসমান এসে তাঁদের সংগে গবেষণায় যোগ দিলেন।

অনেকদিন পর্যন্ত তাঁদের ধারণা ছিল, অভিঘাতের ফলে সৃষ্ট মৌলগুলো হচ্ছে ইউরেনিয়াম — উত্তর মৌল (ট্রানস্‌-ইউরেনিয়াম এলিমেন্ট)। ফের্মি ২৩৮ ভারের ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে অভিঘাত করে ৯৩ সংখ্যক মৌলের সৃষ্টি করে-ছিলেন। হান, মাইটনার এবং স্ট্রাসমান বললেন, কেবলমাত্র ৯৩ সংখ্যক মৌলই তাঁরা সৃষ্টি করেন নি সেই সঙ্গে ৯৪, ৯৫ এবং সম্ভবত আরও কয়েকটি ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌল সৃষ্ট করতে পেরেছেন।

১৯৩৮ সালে তাঁরা জানতে পারলেন প্যারীতে ফ্রেডরিক এবং ইরিন জোলিও কুরী ইউরেনিয়াম-উপজাত এমন একটি নতুন মৌলের সন্ধান পেয়েছেন যার ধর্ম ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌলের সাধারণ ধর্মের সঙ্গে তেমন মেলে না। এই বিষয়টি নিজেরা যাচাই করে দেখার জন্যে হান, মাইটনার এবং স্ট্রাসমান মনস্থ করলেন, তাঁরা জোলিও কুরীর পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করবেন। এই সময় জার্মেনীতে নাৎসীদের ইহুদী বিরোধী নিপীড়নের দরুন মাইটনার স্বদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন।

হান এবং স্ট্রাসমান জার্মেনীতে থেকে তাঁদের গবেষণা চালিয়ে গেলেন। তাঁরা যখন জোলিও কুরীর পরীক্ষা পুনরাবৃত্তি করলেন, তখন এমন একটি মৌলের সন্ধান পেলেন যার রাসায়নিক ধর্ম রেডিয়ামের মতো। তাঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন, এটি রেডিয়াম-ই।

ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌল থেকে তাঁরা এই রেডিয়ামকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বেরিয়ামের সাহায্যে পৃথক করার চেষ্টা করেন। বেরিয়ামের রাসায়নিক ধর্ম অনেকটা রেডিয়ামের মতো। যখন এই দুটি ধাতু অন্যান্য মৌলের সঙ্গে কোন তরল পদার্থে থাকে, তখন রেডিয়ামকে টেনে নিয়ে বেরিয়াম তরলের তলদেশে অধঃক্ষিপ্ত হয়। তারপর তরল পদার্থ থেকে এই দুটিকে বার করে নিয়ে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায়। হান এবং স্ট্রাসমান এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেন। অভিঘাতের দ্বারা ইউরেনিয়াম উপজাত পদার্থগুলোর সঙ্গে কিছু পরিমাণ বেরিয়াম তাঁরা মিশিয়ে দিলেন। কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও তা থেকে কোন রেডিয়াম তাঁরা পৃথক করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা উপসংহারে এলেন—ইউরেনিয়ামকে নিউট্রনের দ্বারা অভিঘাতের ফলে বেরিয়ামই সৃষ্টি হয়েছে, তাই বেরিয়াম ছাড়া অন্য কিছু পৃথক করা যাচ্ছে না।

কিন্তু ইউরেনিয়াম থেকে কিভাবে বেরিয়াম সৃষ্টি হতে পারে, সেটা অদ্ভুত বলে মনে হল। কারণ ইউরেনিয়াম পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ৯২ এবং বেরিয়ামের ক্রমাঙ্ক ৫৬। হান এবং স্ট্রাসমান তাঁদের এই অদ্ভুত আবিষ্কারের রহস্য ভেদ করতে না পেরে সুইডেনে মাইটনারের কাছে ব্যাপারটা লিখে পাঠালেন। মাইটনার বিষয়টি অনুধাবন করে বুঝতে পারলেন আসল ব্যাপার কি ঘটেছে। তিনি বললেন, কিছু সংখ্যক ইউরেনিয়াম পরমাণু প্রায় সমান দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। কেন্দ্রীনের গঠন সম্বন্ধে বোর-এর নিয়ম অনুসারে পরমাণুর এইরকম দুভাগে বিভক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

লিজে মাইটনার এবং তাঁর ভাইপো অটো ফ্রিশ এই ব্যাপারটি গভীরভাবে অনুধাবন করে জানালেন, ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন দিয়ে অভিঘাতের ফলে প্রকৃতপক্ষে ইউরেনিয়ামের ভাঙন ঘটেছে। তার একটি অংশ হচ্ছে বেরিয়াম এবং অপর অংশটিকে স্বল্পকালের মধ্যে সনাক্ত করা গেল বিরল গ্যাস ক্রিপটন বলে। ক্রিপটনের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ৩৬। তাহলে ৫৬ ও ৩৬ যোগ করলে দাঁড়ায় ৯২, যা হল ইউরেনিয়ামের ক্রমাঙ্ক।

মাইটনার এবং ফ্রিশ এই ঘটনার সংজ্ঞা দিলেন 'ইউরেনিয়াম বিভাজন' (ইউরেনিয়াম ফিসন)। পরে জানা গেল, এই বিভাজনের ফলে আইনস্টাইনের বস্তু-শক্তি রূপান্তরের সূত্র অনুযায়ী ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে বিপুল শক্তি মুক্ত হয়। এইভাবে হান, মাইটনার এবং স্ট্রাসমানের গবেষণায় বিপুল শক্তিভান্ডার উন্মোচনের এক নতুন উপায় আবিষ্কৃত হল—যে শক্তি আজ 'পরমাণু-শক্তি' (অ্যাটমিক এনার্জি) নামে সুবিদিত। এর কিছুদিন পরে ফের্মি জার্মেনীতে সম্পাদিত হান এবং স্ট্রাসমানের পরীক্ষাটি পুনঃ সম্পাদন করে দেখেন এবং একইরকম ফল লাভ করেন। এর দ্বারা ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রীনের প্রত্যাশিত বিভাজন সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হল।

এর পরবর্তী ইতিহাস আজ আমাদের সকলেরই প্রায় জানা। ফের্মির দুজন সহকর্মী সিলার্ড এবং ভিগনার এই নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আইনস্টাইন জার্মান বিজ্ঞানীদের এই অতিগুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। আইনস্টাইনের পত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে রুজভেল্ট পরমাণু-শক্তি করায়ত্তের জন্যে উদ্যোগী হন। তারপর ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের টেনিস কোর্টে ফের্মি এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রথম ইউরেনিয়াম-পাইলে শৃঙ্খলক্রিয়া (চেন-রিয়্যাকসান) সম্পাদনে সক্ষম হন এবং সেদিন থেকে মানুষের কাছে পরমাণু-শক্তির স্বর্ণদ্বার খুলে যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মানুষের করায়ত্ত এই অমিত শক্তি প্রথম নিয়োজিত হল মারণাস্ত্র নির্মাণে। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের এক রাত্রিতে নিউ মেক্সিকোর আলামগর্দোর বিজন প্রান্তরে প্রথম পরীক্ষামূলক পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ঘটল এবং তারপর আগস্টের প্রথম সপ্তাহে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহরের ওপর পরমাণু বোমা নিক্ষিপ্ত হল। সেই মারণযজ্ঞের কাহিনী যখন প্রকাশিত হয় তখন সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ে শঙ্কিত ও বিমূঢ় হয়ে যায়। এরপর এই অমিত শক্তির প্রয়োগ আমরা দেখেছি নানা শান্তিপূর্ণ কাজে।

পরমাণু-শক্তি বিকাশের এই ইতিবৃত্ত থেকে অটো হানের অনন্যসাধারণ গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আর এরই স্বীকৃতিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৫ সালে তাঁকে রসায়নশাস্ত্রে ১৯৪৪ সালের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক হান ছিলেন মনেপ্রাণে শান্তিবাদী। পরমাণু-বোমার ভয়াবহ পরিণতি উপলব্ধি করে ১৯৫৭ সালে তিনি এবং আরও সতেরোজন বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানী পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধকরণের জন্যে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আবেদন জানান। তাঁদের এই মানবতার আবেদনে শক্তিমদমত্ত রাষ্ট্রপ্রধানেরা সাড়া দেন নি। কিন্তু বিশ্বের শান্তিকামী সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধাভরে এই মহান আবেদনের কথা আজও স্মরণ করে। তাই ১৯৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণুশক্তি কমিশন যখন অটো হান, লিজে মাইটনার এবং ফ্রিজ স্ট্রাসমানকে যৌথভাবে এনরিকো ফের্মি 'শান্তির জন্যে পরমাণু' (অ্যাটম ফর পিস) পুরস্কার প্রদান করেন, তখন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষমাত্রই পরম আনন্দিত হয়েছিলেন। আর আজও তেমনি মানবদরদী মহান বিজ্ঞানী অটো হানের তিরোধানে বিজ্ঞানানুরাগী সকল মানুষ গভীর বেদনা বোধ করছেন। সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমরা এই শান্তিবাদী মহান বিজ্ঞানীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সীতারামের বাঙলা

হেমচন্দ্র ঘোষ

আঠার শতকের প্রথম ভাগ। বাঙলার দুর্যোগপূর্ণ রাজনীতি অসহনীয় অস্থিরতায় মানুষকে যেন মৃতকল্প করে তুলেছে। মোগল দেশ জয় করেছে বটে কিন্তু শাসনদণ্ড তখনও তারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। দেশব্যাপী অরাজকতা। পাঠানশক্তি পরাজিত কিন্তু নির্বীর্য নয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের সামরিক ঘাঁটি বিলুপ্ত তো হয়নি বরং বেশ জোরদার ছিল। দস্যু তস্করের উপদ্রবে মানুষ জর্জরিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে তারা দেশটাকে যেন ভাগ করে নিয়েছিল। তখনকার দিনে বাংলার সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল মগ আর ফিরিঙ্গী। যারা দুর্বৃত্ত এমন পর্তুগীজদের বোম্বাইতে থাকতে দেওয়া হত না। এই-সব বিতাড়িত পর্তুগীজরা বাংলায় আশ্রয় নিতো। তাদের লোকে বোলতো বোম্বেটে বা জলদস্যু। তাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছিল সন্দীপে। সন্দীপ ছিল স্বর্ণদ্বীপ। বোম্বেটেদের 'হারমাদ' নদীবহুল বাংলার বুকে ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি কোরলো। কবিকঙ্কন লিখেছেন—"রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারমাদের ডরে।" বাঙলার ব্যবসাবাণিজ্য সীমিত হয়ে পড়লো। নদী আর খাল প্রত্যেক গ্রাম ও গঞ্জের সংযোগ রক্ষা কোরতো বটে কিন্তু হারমাদের ভয়ে সেগুলো ক্রমে ক্রমে জনবিরল হয়ে পড়ল। জলদস্যুতায় ফিরিঙ্গীদের তুলনায় তখন আর কেউ ছিল না। এদের দমন করা একরকম দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে আবার যোগ দিল আরাকানী মগ। নৃশংসতায় উভয়েই সমান। মোগলও মগ দমন করতে পারল না। এই সময় অশিক্ষিত ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বেড়েই গেলো। গ্রামের মধ্যে দল [illegible] এই [illegible] হাতে কত গুরুজন আক্রান্ত হলেন। এই সামাজিক পরিস্থিতি [illegible] যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী করে দিল তার ইয়ত্তা নেই। অনেকে আবার আত্মহত্যা করে সামাজিক নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করলেন।

এইকালে অধঃপতিত সামাজিক জীবনের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। আবির্ভূত হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। বৈষ্ণব ধর্ম তার উদারতা, নিষ্ঠা প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করে তুলে মোহমুগ্ধ করল। নতুনের সন্ধানে তারা যেন পাগল হয়ে উঠল। গাঙ্গেয় উপকূলে শ্রীগৌরাঙ্গ হলেন মহাপ্রভু। কিন্তু বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল নদনদীতে বিচ্ছিন্ন দেশটাতে নাম প্রচারের বিঘ্ন ঘটল। শাসনহীন দেশে তার সম্ভাব্য বহু কারণও ছিল। এই বিস্তৃত ভূভাগ এটাকে বোলতো মোগল সাম্রাজ্যের নওয়ারা মহল। একজন ফৌজদারের অধীন। ঢাকায় তখন বাংলার রাজধানী। ওরংজীব-মাতুল সায়েস্তা খাঁ শাসনকর্তা—নবাব। বিজয়ী মোগলদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন পাঠানশক্তির অভ্যুত্থান বারবার পরাজিত পর্যুদস্ত। তবুও সায়েস্তা খাঁ ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত।

—উজির সাহেব! 'নওয়ারা মহলটা দেখছি মোগলদের নাগালের বাহিরে চলে গেছে!

উজিরসাহেব নীরব।

—মগ ফিরিঙ্গীরা তো শাসন মানছেই না! এদের উৎপাতে তো লোকজন সব গাঁ ছাড়া। বাংলার গ্রামগুলিতে দেখবেন উজিরসাহেব বিশুষ্ক কঙ্কালের রাশিকৃত জঞ্জাল তারা যেন মোগলশক্তিকে বিদ্রূপ করছে!

সায়েস্তা খাঁ আরও গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

—নওয়ারার অপদার্থ ফৌজদারকে এক্ষুনি বরখাস্তের হুকুম পাঠিয়ে দিন—এক্ষুনি!

নকিব নবাবের সম্মুখে নিয়ে এল এক যুবককে—পরিপুষ্ট সুন্দর দেহ—বাহু আজানুলম্বিত।

নবাব যুবকটির দিকে তাকালেন—তাঁর মনে এক গভীর রেখাপাত কোরলো।

—নবাবের হুকুম পেলে এই বান্দা মগ ফিরিঙ্গী এদের বাঙলা দেশ থেকে উৎখাত করতে সক্ষম হবে। আর করিম খাঁ সেও দুর্দমনীয় শত্রু নয়।

নবাবের সম্মতি নিয়ে সীতারাম দেশে ফিরলো।

সাতৈর একটা বিরাট পরগণা—নামেমাত্র মোগল শাসনে। সেটা করিম খাঁর পূর্ণ দখলে। দুর্ধর্ষ আফগান নসিব খাঁ তার—সেনাপতি।

—যুদ্ধবিগ্রহের আশা পরিত্যাগ করেছি, নসিব খাঁ! বাঙলায় পাঠানের পুনরুত্থান এখন যেন দিবাস্বপ্ন। প্রৌঢ়ত্বের সীমা-রেখায় আমার সকল শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। দেহ আর মন দুর্বলতায় ভরা—আর চলছে না।

—কিন্তু সীতারাম যে সাতৈর আক্রমণ করতে আসছে, এটা বোধহয় নবাব সাহেবের অজ্ঞাত নেই!

করিম খাঁ কোন উত্তর দিলেন না—চিন্তাগ্রস্ত।

—সীতারাম—অবশ্য তাকে একটা মূষিক বলেই মনে করি!

নসিবের মুখের ওপর কড়া দৃষ্টি রেখে গম্ভীরভাবে করিম খাঁ বললেন—

—না-না—শত্রুকে কখন ছোট করে দেখবেন না নসিব খাঁ! যুদ্ধের এটা নীতি নয়! প্রস্তুতির কোন ত্রুটি রাখবেন না। এর-পর সীতারাম সাতৈর আক্রমণ করলো সেটা অতি অতর্কিতে। এই যুদ্ধে করিম খাঁ পরাজিত ও নিহত। হরিহরনগরে সীতারামের বিজয় উৎসব। মায়ের আশীর্বাণী সীতারামের মনটাকে ভরে তুললো। আশী-

বাঁদী খাঁ খাঁয়ের নিকট হতে সীতারাম গ্রহণ কোরলো।

এখন ঢাকায় হলো সীতারামের আমন্ত্রণ।

সায়েস্তা খাঁ হৃষ্টচিত্তে বললেন—মজদী আর সাতৈর এ দটোর ভার তোমায় দেওয়া হলো সীতারাম।

সীতারাম কুর্ণিশ করে সম্মতি জানালো।

ঢাকায় বুড়িগঙ্গা।

সারি সারি অসংখ্য নৌকো ঘাটে জড় হয়েছে। দেশবিদেশে বিবিধ পণ্য নিয়ে তারা চলে যাবে। মাঝিরা নিশ্চিন্ত মনে সহরের গল্পে মশগুল। পড়ন্ত সূর্য তার সোনালি কিরণে ঝিনুকী স্রোতের ওপর একটানা নেচে নেচে চলেছে। ঘাটের পাশে এক সুবৃহৎ অশ্বত্থ গাছ। সীতারাম এসে দাঁড়াল। উন্মুক্ত আকাশ—বিবিধ বলাকা ঝাঁক বেঁধে পাক খেয়ে দৃষ্টির বহির্ভূত দিগন্তের কোলে ছুটে চলেছে। এই ছোট পাখীগুলো তাদের গতি তো বাধাহীন, তারাও তো স্বাধীন—সীতারামের চিন্তাধারা তাকে ব্যাকুল করে তুলল। দেশের সর্বত্র অশান্তি, অরাজকতা—স্বাধীন রাজ্য গঠন করা তো অসম্ভব নয়।

—আপনি সীতারাম রায়?

সীতারাম অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকাল। এতবড় অস্বাভাবিক দেহ তার নজরে তো আর কখন পড়েনি।

—আমি রামরূপ। নবাবী ফৌজে ঠাঁই মিলল না তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

এর পর থেকে রামরূপ সীতারামের সাথী হল।

—স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা আমার স্বপ্ন। মোগলের দাসত্ব আমার যেন কণ্ঠরোধ করে দিচ্ছে।

রামরূপ সীতারামের মুখের দিকে তাকাল।

—সেনাবাহিনী সংগঠনের সমস্ত দায়িত্ব তোমার ওপর রামরূপ। অবশ্য বক্তার খাঁ এখন দস্যু নয়—সে হবে তোমার সহকারী।

কামান সংগ্রহ হলো—গোলাগুলি প্রচুর সংগ্রহ হল। সীতারামের সৈন্য এখন ভীষণ শক্তিশালী—অপরাজেয়। স্বাধীন রাজ্য যে সীতারামের স্বপ্ন। ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাপ সীতারামের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীষণ শঙ্কাকুল হয়ে পড়লো। এ সময়ে বাংলার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদে। কুলি খাঁ নবাব। মুর্শিদাবাদ থেকে নওয়ারা মহল শাসনে মাথা দুরূহ হয়ে পড়ল। তোরাপ সীতারামকে দমন করতে বদ্ধপরিকর।

—কামান কটা কেড়ে নিলেই তো তার শক্তি ফুরিয়ে যাবে। কি বলেন?

—কিন্তু সেগুলো তো মধুমতীর এ পারে নয়, ফৌজদার সাহেব।

—এটা তো একটা তুড়ির কাজ বলে মনে হয় পীর খাঁ।

নবাবী ফৌজ ছাউনি গাড়লো বারাসীয়ার তীরে। ফৌজের অধিনায়ক তোরাপ। পীর খাঁ পশ্চাদভাগে। দিনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে উঠল—ঘোরতর যুদ্ধ। বারাসীয়ার জল যেন সিঁদুরের মত রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। রামরূপের প্রচণ্ড আক্রমণে নবাবী ফৌজ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তোরাপ নিহত—পীর খাঁ অদৃশ্য।

—সেনাপতি। তোরাপ নিহত।

রামরূপ বিস্মিত দৃষ্টিতে সেনানীর মুখের দিকে তাকাল।

গম্ভীর স্বরে রামরূপ বলল—

—মহারাজার হুকুমের যে ব্যতিক্রম ঘটলো দেখছি।

—ভুল। সেনাপতি এটা ভুলে ঘটে গেছে। তোরাপকে পীর খাঁ বলে আমরা ভুল করেছি।

সীতারামকে তখন খবর দেওয়া হল। তোরাপের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে সীতারাম—মনটা বিষাদে ভরা।

—তোরাপ। বন্ধু। তোমায় বিদায়, তোমায় সেলাম।

মুর্শিদাবাদে তোরাপের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল। কুলি খাঁ অসন্তুষ্ট হলেন না বটে কিন্তু এই খবর দিল্লীর দরবারে যে একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করবে এই আশঙ্কায় তিনি ভীত, সন্ত্রস্ত। সীতারাম ছিল নবাবের অতি প্রিয় কিন্তু তার ঔদ্ধত্য তার স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনের দুরাকাঙ্ক্ষা কুলি খাঁকে দূর করতেই হবে, নইলে তাঁর স্বস্তি নেই—শান্তি নেই। তাঁর বাংলার মসনদ হবে টলটলায়মান—পদ্মপাতার ওপর টলটলে এক ফোঁটা জলের মত। তাই নবাবকে হতে হল অতি কঠোর—নির্মম, নিষ্ঠুর।

সমগ্র ভূষণা এখন সীতারামের দখলে। বিজয়গৌরবে রাজধানী মহম্মদপুর উৎসব-মুখর হয়ে উঠল। রাজধানী অতি সুন্দর-ভাবে সাজান—সুরক্ষিতও বটে। তিনদিকে মধুমতী বহিঃআক্রমণ প্রতিহত করছে। অপরদিকে বিস্তৃত জলাশয়—অতিক্রম করা সহজ নয়—প্রায় দুঃসাধ্য। রাজ্য এখন নিষ্কণ্টক—সর্বত্র শান্তি। ভূষণা শিল্প-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠেছে।

"বনাত, মখমল পটু, ভূষণাই খাসা
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা।"

এই ভূষণা—বাঙলার গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি গাথা—সীতারামের লীলাভূমি পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির পাদপীঠ—সেই ভূষণা কালক্রমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। সর্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া বাংলার প্রাণকেন্দ্র গ্রামগুলোকে জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত করল। এই কালব্যাধির বীজ প্রথম দেখা দিল সীতারামের সাধের রাজধানী এই মহম্মদপুরে।

রাজধর্ম রাজ্য গঠনের প্রধান সহায়ক। তাই ভূষণার দিকে দিকে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। শ্রীরণরঙ্গিণীর মন্দির সেকালের স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। সীতারামের আরাধ্য দেবী এই শ্রীরণরঙ্গিণী।

"শ্রীরণরঙ্গিনী মাই সীতারাম যাকে পাই
হইল দেখো রাজা রাজেশ্বর।"

রাজ্যের সর্বত্র সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধিতে ভরা।

এই ভূষণা সেটা কিন্তু একটা বিরাট ভাটী দেশ। দুরন্ত নদীগুলো এই দেশটাকে দুস্তর করে রেখেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবধারা এখানে প্রচারের কোনই সুবিধা ছিল না। বহু কষ্টে বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণি যাদবেন্দ্র মহম্মদপুরে উপস্থিত হলেন। রণরঙ্গিণীর মন্দিরে ভীষণ ভীড় জমে গেছে। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী দেখতে বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। সুগৌর সুপুষ্ট তনু, অর্ধ প্রস্ফুটিত পদ্ম-পলাশ নয়ন, ধীর সুমিষ্ট ভাষণে সাম্য ও শান্তির বাণী প্রচার করলেন।

"ধাওয়া ধাই আইল লোক দেখিবার তরে
রূপ দেখি নয়ন ফিরাইতে কেহ নারে।"

সংবাদ পেয়ে সীতারাম এলেন।

"সংবাদ শুনিয়া আইল রাজা সীতারাম
যাদবেন্দ্র গান করে হরেকৃষ্ণ নাম।"

—শক্তির সাধক যারা বৈষ্ণব ধর্মের কোমলতা নিয়ে কেমন করে তারা রাজধর্ম পালন করবে, ঠাকুর।

যাদবেন্দ্র রাজার মুখের দিকে তাকালেন।

—কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করাই তো ধর্ম।

যাদবেন্দ্র এর পর রয়ে গেলেন ভূষণায়। তাঁর কথামত কৃষ্ণজীর মন্দির হল প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণজীর মূর্তি নাকি অপূর্ব—অপরূপ ভাস্কর্যের পূর্ণ বিকাশ। মূর্তিটি সুন্দর—সত্যি নাকি অতি সুন্দর। সীতারামের বৃহত্তর সংগঠনের প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতির কথা কুলি খাঁর কর্ণগোচর হল।

—বক্স আলি তোমাকে এবার ভূষণায় যেতে হবে।

বক্স আলি নীরব। নবাবের মুখের দিকে একবার শুধু তাকাল।
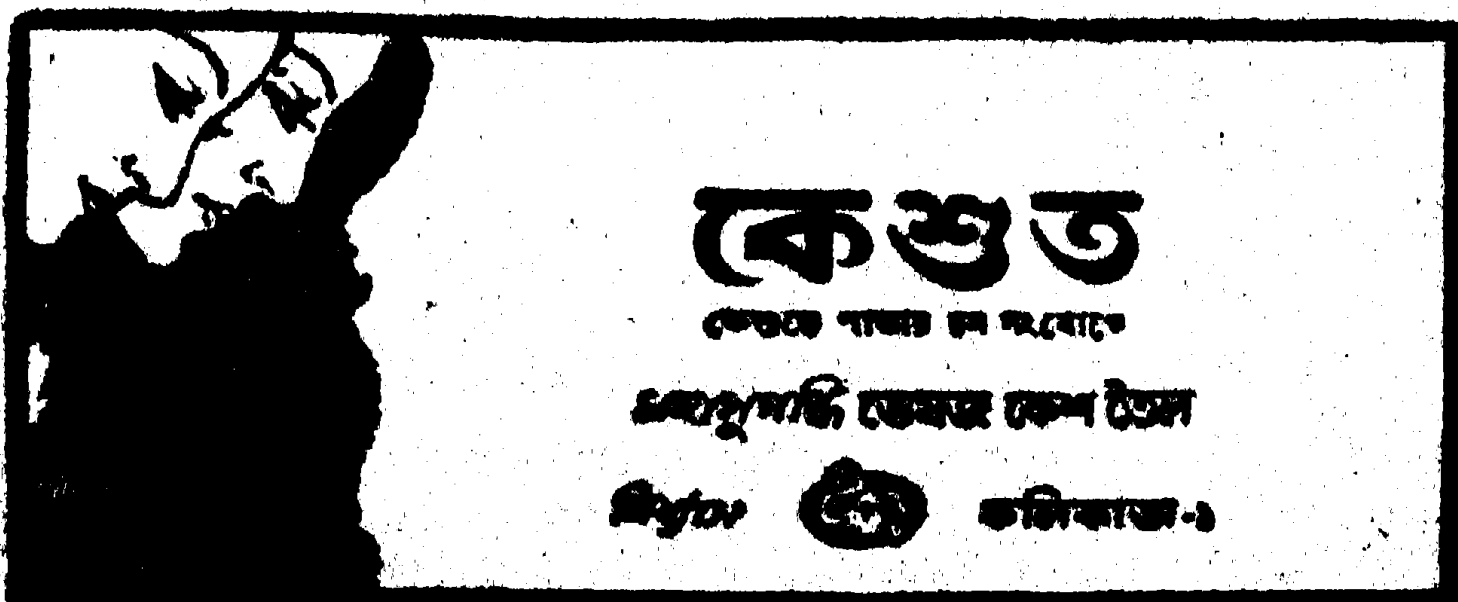
—তুমি বেগমের জননীপতি—আমার বিশেষ আস্থাভাজন। তুমিই একমাত্র লোক যে নাকি সীতারামকে দমন করতে সক্ষম হবে।

বক্‌স আলি তখনও নীরব। রাজধানীর এমন সহজ জীবন, এমন আরাম—এসব ছেড়ে তাকে যেতে হবে সাপ আর বাঘের দেশে! তার অন্তরাত্মা যেন শুকিয়ে গেল। তাকে আবার লড়তে হবে সীতারামের বিরুদ্ধে! সীতারাম সে কি আর সহজ শত্রু নাকি?

নবাব গম্ভীর স্বরে বললে—এক্ষুনি প্রস্তুত হও। নবাবী ফৌজকে জমিদাররা সব সাহায্য করবে—পরোয়ানা চলে গেছে।

বক্‌স আলির সঙ্গে যুক্ত হল পরাক্রান্ত জমিদার সংগ্রাম সিং। কিন্তু অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও। নবাবী পরোয়ানা অমান্য করার শক্তি তার নেই, নইলে জমিদারী বাজেয়াপ্ত হবে—তার দৈহিক নিগ্রহের অন্ত থাকবে না। সংগ্রাম সিং-এর মনটা কিন্তু চাপা বিদ্রোহে ভরে উঠল। ভবানন্দের মতো তাকে দেশ-দ্রোহিতার ছাপ—কলঙ্ক টীকা তার বংশ-ললাটে চিরতরে বহন করতে হবে।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সংগ্রাম সিং ভূষণার দিকে রওনা হল। নাটোর বাহিনীর পরিচালক—দয়ারাম। দয়ারামের পৌঁছুতে একটু দেরী হয়ে গেল। শীতকাল—কনকনে শীত। দয়ারামের বজরা চলেছে। মাঝিরা কিন্তু আর এগুতে চাইছে না।

—হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—আর এগুনো যাচ্ছে না, কর্তা।

বৃদ্ধ মাঝির মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে দয়ারাম বলল,

—এটা কোন গাঁ?

—গন্ধখালি হুজুর!

—এইখানে ভেড়াবে? কিন্তু এখানকার লোকেরা?

—হুজুর! এরা সব ক্ষত্রিয়—তারা সব ডাকাত!

দয়ারামের হুকুম নিয়ে গন্ধখালিতে বজরা ভিড়ল।

সুসজ্জিত বজরা দেখে—গাঁয়ের লোক ঘাটের ধারে জড় হয়েছে।

—তোমরা কারা?

গাঁয়ের মোড়ল সুজিত সিং এগিয়ে এলো।

—আমরা তো এ গাঁয়ের লোক। বজরা দেখে ভাবলাম—একজন কেউ-কেটা বুঝি এলেন! মশায়ের নাম?

—আমি নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম!

—রাজার সঙ্গে লড়তে বুঝি?

দয়ারাম চুপ করে রইলো।

—এই সেদিন নবাবী ফৌজ দাঁতে কুটো নিয়ে পালিয়ে গেল, জানেন না? রাজাকে হারানো অত সহজ হবে না—অন্ততঃ যতদিন সেনাপতি রামরূপ বেঁচে আছে।

—কেন?

—একটা দৈব বর আছে কর্তা! রণ-রঙ্গিণী মায়ের কৃপা। রামরূপকে হারানো শিবেরও অসাধ্য।

দয়ারাম সুজিতের সঙ্গে গুপ্তহত্যার ব্যবস্থা পাকা করে ফেললো। সুজিত সিং ইনাম পাবে একটা জমিদারী। সে তাই অতি উৎসাহী হয়ে উঠলো।

অতি প্রত্যুষে রামরূপ শয্যা ত্যাগ করে দুর্গের বাহিরে এলো। দুর্গপ্রাকারের সামনে মহামায়ার মন্দির। চত্বরটা একেবারে কুয়াশায় ভরে গেছে। কুয়াশার অন্ধকারে কাছের লোকও যেন ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। রামরূপ দুহাত তুলে মহামায়ার উদ্দেশে প্রণাম করলো।

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাত থেকে উপর্যুপরি প্রচণ্ড শূলাঘাত। রামরূপ পড়ে গেল।

—দেখনো গোবে, নিঃশ্বাসটা বইছে কিনা?

গোবিন্দ সিং নাকের কাছে হাত দিল।

—নাঃ একটুও না! হ্যাঁরে, যেন একটু একটু পড়ছে রে!

—তাহলে আরও দুচার ঘা দিয়ে দে! —কি জানি যদি বেঁচে ওঠে।

রামরূপের বিচ্ছিন্ন মুণ্ড দয়ারাম মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিল।

প্রথম যুদ্ধেই বক্‌স আলির পরাজয় হল। নবাবী ফৌজ সঙ্ঘবদ্ধতা হারিয়ে ব্যাপকভাবে পলায়ন শুরু করে দিল। সংগ্রাম সিং বক্‌স আলির সঙ্গে পলাতক। মধুমতীর তীরে গর্জে উঠল সীতারামের কামান—কেঁপে উঠল দূরে বনানীর বৃক্ষলতা, ধূসর রণক্ষেত্র ভরে উঠল নবাবী ফৌজের শবদেহে। বঙ্গ সৈন্যের রণহুঙ্কার গগনবিদারী উল্লাসে মুখরিত হয়ে উঠল। রামরূপের মৃত্যু হয়েছে, তার কৃতিত্বে ছেদ পড়ে গেছে।

এই তো সুযোগ। দয়ারাম ফৌজ নিয়ে এল দুর্গাভ্যন্তরে। রাজা তখন প্রমোদ কক্ষে। সংবাদ পেয়ে সীতারাম ছুটে এলেন। অস্ত্রাগারে কোন অস্ত্রই নেই। রাজবাড়ীর বাহিরে আসা মাত্রই সীতারাম বন্দী হলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ সীতারাম—তাকে পাঠান হল মুর্শিদাবাদে। সারা রাজ্যে চলল লুঠতরাজ। আতঙ্কিত নগরবাসী মহম্মদপুর ছেড়ে পালিয়ে গেল। স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ ঘটল। দয়ারাম অতি খুশী।

রাণী কমলা রাজসাগরে আত্মবিসর্জন দিয়ে সতীত্ব বজায় রাখলেন। ছোট রাণী সাহসভয়ে পালিয়ে গেলেন কলকাতায়।

ছবিনা এক মুসলমান কন্যা। রাজ-বাড়ীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। মহম্মদপুরে ছবিনার পুকুর—এখনও তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি।

—ভূষণার রাণীর এই মোহরটা তার শেষ প্রণামী, কৃষ্ণজীর মন্দিরে দিয়ে দিল ছবিনা!

ছবিনা কেঁদে ফেললো। মন্দিরে তো মূর্তি নেই রাণীমা। সে তো চুরী হয়ে গেছে।

গোবিন্দপুরে গোলপাতার ঘরে ভূষণার রাণী। কোম্পানীর পাটোয়ার রামনাথের আশ্রয়ে। তাদের থাকতে হবে এখন অজ্ঞাত-বাসে, রামনাথের ছিল এই নির্দেশ কিন্তু এ কথাটা আর চাপা রইল না।

কোম্পানীর গোয়েন্দারা সারা শহর তোলপাড় করে দিল।

হুগলীর ফৌজদার নাসির—পেয়ণ-নীতিবিশারদ। কোম্পানীর অবহেলার অজুহাত—তাদের দণ্ড হল মোটা জরিমানা। ফৌজদার কুলি খাঁ ভয়ে অস্থির। কর্মচারী সাহেব রায়—পাকা শয়তান। তাকে বরকন্দাজ দিয়ে কোলকাতায় পাঠাল। ১৭১৪ সালের ৪ঠা মার্চ সকালে রামনাথের গোলপাতার ঘর বরকন্দাজরা ঘিরে ফেলল।

এরকম যে একটা ঘটবে রাণী কিন্তু তা আগের থেকেই অনুমান করেছিলেন।

রাণীর ঝি কুসুম—সে একটু এগিয়ে এল।

—আপনারা কে? এখানে কেন?

সাহেব রায় উত্তর দিল—

—কেন? এখন তোমরা আমার বন্দী।

এনছাইন স্মিথ উল্লাসে চীৎকার করে উঠল—হুররে।

যে পৃথিবী প্রেমময়ী ।।

দীপকরঞ্জন বসু

খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়
বর্ষার প্রবাহের একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ—
দ্রব্যের দাম আবার বাড়লো।
আমার স্মরণে যখন
আত্মপ্রবঞ্চনায় সম্পূর্ণ নীরব,
শিবের ত্রিশূলটা তখন
হঠাৎ যেন নেচে উঠলো।
পথ-চলতি মানুষের ঠোঁটগুলি সব তামাটে,
পুরোনো কবিতার মতো দেখতে—
কী বিশ্রী! নিরাভরণ চৈত্রের প্রকৃতি
নগ্ন নারীর রূপের মতোই চোখ-ধাঁধানো;
প্রায় অন্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।
অভাবী পৃথিবীতে
অন্নের জন্যে তীব্র হাহাকার,
অন্নের জন্যেই যত হানাহানি।
এই ভয়ংকর পরিবেশে
প্রেমকে আমরা কী করে বাঁচাবো?
আর প্রেম না বাঁচলে
তোমার আমার বা আর সকলের
বেঁচে থাকাটাই যে বিড়ম্বনা!
তাই নিদারুণ নিষ্করুণ এই চৈত্রকে
আমরা স্থায়ী হতে দিতে পারি না;
বিশুষ্কযৌবনা চৈত্রের এই বীভৎস
নগ্নতা আমাদের অসহ্য।
নতুন নতুন ফসলের রূপসজ্জায়
শস্যশ্যামলা পৃথিবীকে
আমরা চোখভরে দেখতে চাই,—
সেই পৃথিবী যে-পৃথিবী
হাস্যময়ী, লাস্যময়ী এবং প্রেমময়ী।

নীলবনান্তরেখা ।।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

এখানে দুজন, তবু মনে হয় একা
হাহাকারে কাঁপে সরোবরে কালো জল
বাতাস হঠাৎ হয়ে ওঠে চঞ্চল
পিছনে মুগ্ধ নীলবনান্তরেখা।

দুজনে বসেছে তরুবীথিকার কাছে
এতদিন ধরে যত্নলালিত স্মৃতি
দুহাতে সাজানো, যত প্রার্থনা আছে
কবিতার থেকে প্রিয় কিছু উদ্ধৃতি।

পৃথিবীর শেষ প্রেমিকপ্রেমিকা আজ
বসে আছে মুখোমুখি,
নেপথ্যে বাজে ধীর লয়ে এস্রাজ
গভীর দুঃখে দুখী।

হৃদয়ে সাজানো স্তরে স্তরে বহুকথা
যে কথা যাবে না বলা,
তার চেয়ে ভালো ক্ষণিকের নীরবতা
জোনাকির মতো জ্বলা।

এখানে দুজন, তবু দুইজনে একা
সবকিছু পেয়ে কেঁপে ওঠে কালো জল
প্রিয় নীরবতা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল
ভালোবাসা জানে নীলবনান্তরেখা।

স্কাই হোটেল থেকে

অদ্রীশ বর্ধন
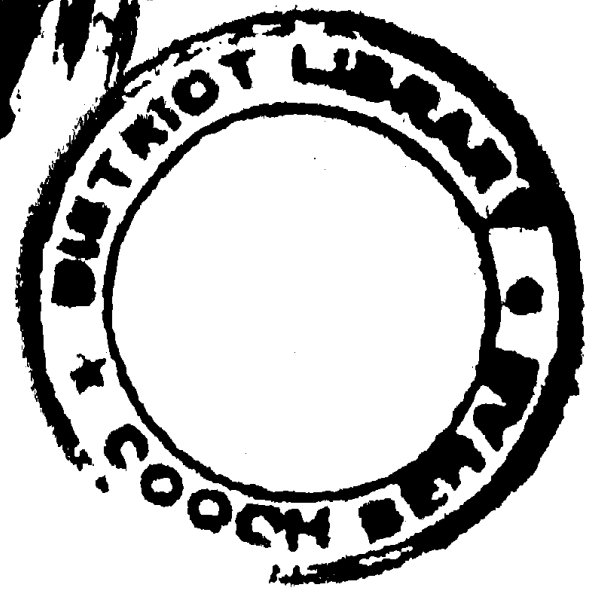
জল্পনা-কল্পনার শুরু ১৯২৫ সাল নাগাদ।

এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে পাড়ি দেওয়ার সময়ে মাঝপথে জিরোনোর নেওয়ার স্টেশন তৈরী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন বৈজ্ঞানিকরা। সে সময়ে অবশ্য গ্রহে গ্রহে পাড়ি জমানোর উপযুক্ত স্পেশাল রকেট তো দূরের কথা, আতসবাজীর রকেট ছাড়া আর কোনো রকেটযানই ছিল না। এ সম্বন্ধে সাধারণ লোকেরাও কোনো ধারণা ছিল না।

টনক নড়ল ১৯৪৮ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই। জার্মান সমর-গবেষণার ফলাফল যাচাই করতে বসে সচকিত হলেন মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। 'আকাশে ঝোলানো প্ল্যাটফর্ম' সামরিক কাজে লাগানো যায় কিনা, অদ্ভুত এই বিষয় নিয়ে আরম্ভ হল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল খবরের কাগজে। জনাকয়েক সম্পাদক শ্লেষভরে জানতে চাইলেন, প্ল্যাটফর্মগুলো কি আকাশ থেকে পেরেক মেরে ঝুলিয়ে রাখা হবে? চাঁদ যেভাবে আকাশে 'ঝোলে' সেই একই প্রাকৃতিক নিয়মে নকল উপগ্রহও যে শূন্যে 'ঝুলতে' পারে, এ তথ্য প্রথম প্রথম তাঁরা ভাবতেই পারলেন না।

কেশ কয়েক বছর গেল। ১৯৫০-৬০ সাল নাগাদ পুরো ছেড়ে ... পরিষ্কার হয়ে এল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে। একটির পর একটি রকেট আবিষ্কৃত হতে লাগল। প্রতিটির গতিবেগ আগেরটির চাইতে বেশী। মানুষের গড়া উপগ্রহকে শূন্যে তুলে দেওয়ার জন্যে যে প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন বাহনের দরকার, তা যে আর নিছক আকাশ-কুসুম কল্পনা নয়, এমন ধারণাও দেখা দিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। অবশেষে সত্যি সত্যিই একদিন রকেটে উৎক্ষিপ্ত কয়েকটা ভারী ভারী যন্ত্রপাতি মহাশূন্যে গিয়ে আর ফিরে এল না পৃথিবীর বুকে।

গ্রহান্তরে যাত্রার পথে সেই হল মানুষের প্রথম পদক্ষেপ।

এর পরেও বহু বছর গেছে, তবেই না মানুষ থাকার মত বড় বড় মহাকাশ-স্টেশন বানানো হয়েছে মহাশূন্যে। রকেট করে টুকরো-টাকরো অংশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেঘের ওপারে। তারপর তা একে-একে জোড়া লাগিয়ে তৈরী হয়েছে বিশাল ভাসমান স্টেশন। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পৃথিবীর চারদিকে মহাশূন্যে আবর্তন করেছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মানমন্দির, আবহাওয়া-বিশারদের গবেষণাগার, এমন কি সামরিক দপ্তরের অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই মারাত্মক ঘাঁটি। সেকালের সাবমেরিনে নাবিকরা যেমন গাদাগাদি করে কষ্টেসৃষ্টে থাকত, ঠিক তেমনিভাবে এক একটা স্টেশনে বিশজন পর্যন্ত মহাকাশচারীকে থাকতে দেখা গেছে। আজ আমাদের সুপরিসর আকাশ-কলোনীতে স্থানাভাব নেই। সেদিনের তুলনায় আজকের কলোনীকে কুঁড়েঘরের তুলনায় আকাশচুম্বী প্রাসাদই বলা চলে।

পৃথিবী ছাড়িয়েই মহাকাশ ভ্রামণিকরা সবার আগে যে স্টেশনটি দেখতে পান, তার নাম স্পেশ স্টেশন নাম্বার ওয়ান। পৃথিবী থেকে ফেরী-রকেটে এখানে পৌঁছে মঙ্গল-গ্রহ বা শুক্রগ্রহে যাওয়ার বড় মহাকাশপোতে ওঠেন তাঁরা।

স্পেশ স্টেশন নাম্বার ওয়ান পৃথিবীর নিকটতম উপগ্রহ। উচ্চতা মাত্র তিনশ মাইল। কাজেই এত কাছে থেকে পৃথিবীকে বেশ খুঁটিয়ে দেখা যায়। কিন্তু গোটা গ্রহটাকে পুরোপুরি দেখতে হলে আরো দূরের স্টেশনে যাওয়া দরকার। সুতরাং, সব উপ-গ্রহের সেরা উপগ্রহ, দশ হাজার মাইল দূরের 'স্কাই হোটেলে' পাড়ি জমানো যাক।

রকেট-বিজ্ঞান এত উন্নতি করার পরেও আজও কিন্তু অনেকের ধারণা মহাশূন্যে ভাসমান স্কাই-হোটেলে লাভ এক পয়সাও হয় না। লোকসানই হয়। ধারণাটা একেবারেই ভ্রান্ত। কেননা স্কাই-হোটেলে লোকসান তো হয়ই না, বরং বেশটা রোজগার হয় এবং তার পথ অনেক। স্কাই-হোটেল এখন আর পৃথিবীর মুখাপেক্ষী হয়ে নেই। সব কটা উপগ্রহের বাসিন্দাই ছুটি উপভোগ করতে ছুটে আসেন স্কাই-হোটেলে। কেননা, ছুটি

উপভোগের জন্যে পৃথিবীতে যাওয়ার চা... স্কাই-হোটেলের চেয়ে খরচ পড়ে নাম... এ ছাড়াও, স্কাই-হোটেল বড় আকা... রাস্তার স্টেশনও বটে।

হোটেলের মোট দুটি অংশ। এ... অংশে মাধ্যাকর্ষণ আছে, অপরটিতে ... রকেটে বসে দূরে থেকেই দেখা যাবে ... বিচিত্র দৃশ্য। যেন একটা শনিগ্রহের ... নামতে চলেছে রকেট-যান। মহাশূন্যে ভা... বিরাট একটা বল, চারদিকে ঘিরে র... একটা রিং। কিন্তু কোথাও ছুঁয়ে ... বলটা স্থির, কিন্তু রিংটা ঘুরছে খুব ... ধীরে।

স্থির এই বলটার ওপরেই রকেট না... থাকবে পাইলট। তখনি দেখা যাবে, বিশাল সেই বল। তুলনায় অত বড় রকেটা... পিঁপড়ের মতই পুঁচকে মনে হবে। তা... বলের এয়ার-লকের সঙ্গে রকেটের এ... লক মিলে গেলেই শুরু হবে রকেট ... স্কাই-হোটেলে নামবার পালা। ভারী ... পড়বে আরোহীরা। কেননা, মাধ্যা... এখানে একেবারেই শূন্য, এক-কথায় ... বলা যায় জিরো গ্র্যাভিটি। জিরো গ্র্যাভি... গিয়ে প্রথম প্রথম যাত্রীদের বেজায় নাজে... হতে হয়। হোটেলের কর্মচারীরা ... সাহায্য করে প্রত্যেককেই। তবে অস্বস্তি... হলেও এ অভিজ্ঞতার মজাও আছে।

স্কাই-হোটেল সত্যিই বিস্ময়কর হো... এ হোটেলে দুরকম জগতে থা... অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এক জ... মাধ্যাকর্ষণ আছে, আরেক জগতে ... দুটো ভিন্নধর্মী জগতই একসঙ্গে র... স্কাই-হোটেলের মধ্যে।

বেশীর ভাগ লোকই এখানে অ... জিরো-গ্র্যাভিটিতে থেকে হুল্লোড় কর... কিন্তু স্নান করা বা খাওয়ার সময়ে ও... না-থাকা জিনিসটা খুব আনন্দদায়ক ... ওজন না থাকায় অনেকে ঘুমোতেই পা... না; তন্দ্রা এলেই আঁৎকে ওঠেন, ভাবেন ... তলিয়ে যাচ্ছেন কোথাও।

এই সব কারণেই দুরকম ব্যবস্থাই ... হয়েছে স্কাই-হোটেলে। মাঝখানের ব... আছে জিমনাসিয়াম আর সেই বি... সুইমিং পুল। সুইমিং পুলের বর্ণনা ... হলে মনে হবে যেন ফ্যাক্ট নয়, ফ্যানটাসি...

বাইরের রিংটায় আছে শোবার ... লাউঞ্জ আর রেস্তোরাঁ। রিংটা কেন্দ্র ঘু... চলেছে; ফলে সৃষ্টি হচ্ছে কেন্দ্রাতিগ শ... যে শক্তি ভেতরের সব জিনিসকেই বা... ছুঁড়ে দিতে চাইছে। তাই ভেতরে ... থাকেন, তাঁরা মোটামুটি একটা ওজন ... ভব করেন। যদিও সে ওজন এমন ... বেশী নয়। রিংয়ের একদম বাইরের দেও... ঘেঁসে দাঁড়ালে যা ওজন হবে, তা পৃথি... ওজনের অর্ধেক।

তা ছাড়াও, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষ... সঙ্গে এখানকার মাধ্যাকর্ষণের আরো এ...

লক্ষ্য করা যায়। রিংয়ের মধ্যে 'ওপর' সব সময়ে রিং-য়ের কেন্দ্রের দিকটাই য়—যে কেন্দ্রের অদৃশ্য অক্ষকে র ঘুরছে স্কাই-হোটেল। এখানকার সমান্তরাল নয়, ঢালু। ফ্রেমের ভেতর থাকে। রিং-য়ের এদিকের প্রান্তে য় বলের মধ্যে দিয়ে ওদিকের প্রান্ত ত দেখা সম্ভব হলে চোখে পড়ত এক চব দৃশ্য। দেখা যেত, বিপরীত দিকের রা মাথা এদিক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাবে। এ যেন একটা মোটরগাড়ীর কায় ফোঁপরা চাকা। চাকা ঘুরেই হু—আর ফাঁপা গহ্বরে প্রতিটি মানুষ াগে কেন্দ্রের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে হ।

এক বালতি জল নিয়ে বন্ বন্ করে লে জল যেমন পড়ে যায় না এও তেমনি। রিংটা ঘুরপাক খাওয়ার ফলে রকার মানুষগুলো সেঁটে যায় রিংয়ের দেওয়ালে।

রিংয়ের সবচাইতে বড় ঘরটার নাম রুম। স্কাইরুমে গেলে এই উদ্ভট দৃশ্য টি দেখা যাবে, তেমনটি আর কোথাও না। খেতে বসে মনে হবে যেন মস্ত বাটির একদম নীচে রয়েছে র টেবিলটা। চারদিকের ঢালু মেঝে ধীরে উঠে গেছে ওপরে। ঢালু হওয়া ও এখানে-সেখানে টেবিল পেতে দিব্বি রয়েছেন যাত্রীরা। কেউ পড়ে যাচ্ছেন না, স্বস্তিও বোধ করছেন না। যত অস্বস্তি যিনি দেখছেন, তাঁরই। এর আঁৎকে উঠতে হবে যখন যাবে হাতে ট্রে নিয়ে স্বচ্ছন্দ- পা ফেলে এগিয়ে আসছে ার। ঠিক যেন খাড়া দেওয়ালে মানুষ- টাকি হাঁটছে, নিজে তো পড়ছেই না, কি গেলাশের পানীয়ও ছলকে উঠছে যতই এগিয়ে আসতে থাকবে সে, ততই াবিক মনে হবে তাকে। টেবিলের কাছে দাঁড়ালে তার কোনো অস্বাভাবিকতাই যাবে না।

হোটেলের অধিকাংশ বাসিন্দাই অর্ধেক কাটান জিরো গ্র্যাভিটি অর্থাৎ বলের —বাকী সময় ওজন যেখানে আছে ৎ রিংয়ের মধ্যে। বাচ্ছাদের কথা অবশ্য দা। ওজন নেই, এমন মজাদার জায়গা তাদের সরানোই মুস্কিল। রকমারি র ঢালাও ব্যবস্থা সেখানে। তেষ্টা একরকম প্লাস্টিক থলি কিনতে য় যায়। মুখে লাগিয়ে থলি টিপলেই মেটে। কিন্তু এই থলি নিয়েই খেলা করে দেয় বাচ্ছারা। মুখে না লাগিয়েই টিপলেই ফোয়ারার মত জল বেরিয়ে সেই আকারেই তা ভাসতে থাকে শূন্যে। তারপর দুলতে দুলতে ... ভাসতে কোনো এক দিকের দেওয়ালে ঠেকে আস্তে আস্তে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে ... ঠিক যেন একটা স্লো-মুভিং সিনেমা-দৃশ্য!

হাওয়া ভরা লিফটে চড়ে রিং থেকে বলের দিকে আসার সময়ে আরো মজার খোরাক পাওয়া যায়। কেন্দ্রাতিগ শক্তি যতই কমতে থাকে, ওজনও তত কমতে থাকে। বলে পেঁছোনোর পর যাত্রীরা নিরাবলম্ব- ভাবে শূন্যে ভাসতে থাকে।

এই ধরনের বিস্তর কলকব্জায় ভর্তি গোটা হোটেলটা। হোটেল ইঞ্জিনীয়ার নবা- গতদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখিয়ে দেন। বাতাসশোধক যন্ত্র দেখে অনেকের তাক লেগে যায়। নিঃশ্বেস ফেললে যে কার্বন- ডাইঅক্সাইড বেরোয়, এখানে তা আবার কার্বন আর অক্সিজেনে ভেঙে ফেলা হয়। ফলে, মজুত অক্সিজেন নষ্ট হয় সামান্যই।

তাপনিয়ন্ত্রক অ্যাপারেটাসটাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। মহাকাশে ভাসমান যে কোনো বস্তুর যে দিকটা সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে, সেদিকের তাপমাত্রা তিন- চারশ ফারেনহিট পর্যন্ত উঠে যায়। আবার, সূর্যের বিপরীত দিকের তাপমাত্রা হিমাঙ্কেরও শ-দুয়েক ডিগ্রী নীচে নেমে যায়। তাপের সমতা রাখার জন্যে হোটেলের ডবল-দেওয়ালের মাঝের ফাঁপা অংশের বাতাস চলাচল করতে থাকে।

ডানা মেলে শূন্যে ওড়বার সখ মিটানোরও বন্দোবস্ত আছে স্কাই-হোটেলের বলরুমে। বিশেষ কিছু নয়, গোড়ালি আর কব্জিতে ডানা দুটো স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে নিলেই হল। তারপর আকাশে ওড়া নেহাতই ছেলেমানুষী। মাথায় শক্ত মেট্যাল হেলমেটটা কিন্তু কেউ সখ করে পরে না—পরে প্রাণের দায়ে। প্রথম প্রথম আকাশে ওড়ার প্রবল উৎসাহে ছাদে কি দেওয়ালে গোঁৎ খেয়ে যাতে মাথা না ফাটে, তাই এই সতর্কতা।

বলরুমের মধ্যেই নকল আকাশ দেখা যায়। সবই আলোর কারসাজি। সুইচ টিপলেই ঝলমল করে নীলাকাশ, আর পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ। অবিকল পৃথিবীর মতই।

ডানা নেড়ে ওড়ার কায়দা রপ্ত হয়ে গেলেই শুরু হবে ফুটবল [illegible] খেলোয়াড়দের [illegible] এক দৃশ্য বটে। [illegible] পেছনে শূন্যপথে তাড়া করার ছবি [illegible] অনেকেই পৃথিবীতে বসে টেলিভিশনে দেখেছেন।

স্কাই-হোটেলের সবচাইতে আকর্ষণীয় হল সুইমিং পুল যা পৃথিবীতে কখনই সম্ভব নয়।

সুইমিং পুলে হাজির হলে দেখা যাবে প্রায় ষাট ফুট ব্যাসের একটা বিশাল গোলা- কার কক্ষ। কক্ষের প্রায় সবটাই জলে ভর্তি। শুধু জলে ভর্তি বললে ঠিক বলা হবে না, 'এক ফোঁটা' জলে ভর্তি। 'এক ফোঁটা' জল যে কত বড় হতে পারে, তা এখানে এলেই দেখা যাবে। গোলাকার দেওয়াল ঘিরে অনেকেই সাঁতার দিচ্ছে। কিন্তু তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাজ্জব হতে হবে ঠিক মাঝের লোকদের দেখে। 'এক ফোঁটা' জলের ঠিক কেন্দ্রে কয়েকজন মেয়েপুরুষ দিব্যি হাসিঠাট্টা জুড়ে দিয়েছেন, এমন কি কয়েকজন ঠোঙা থেকে খাবার বার করেও চিবুচ্ছেন!

...ব এই দৃশ্যের রহস্য ভেদ করতে হলে জলের মধ্যে ডুব দিতে হবে—বিশ ফুট আন্দাজ সাঁতার দেওয়ার পর কেন্দ্রে পেঁছোনোর আগেই হঠাৎ দেখা যাবে জল আর নেই। অর্থাৎ, প্রায় ফুট দশেক ব্যাসের একটা ফাঁপা বুদবুদ!

সত্যিকারের বুদবুদ। বুদবুদের মধ্যে তাজা বাতাস। নিঃশ্বেস নিতে কোনো অসুবিধে নেই। তবে ধূমপান করা নিষেধ। বুদবুদের ঠিক কেন্দ্রে শূন্যে ভাসমান ক্ষুদে বাতাসশোধক যন্ত্রটার কাজ তাতে বেড়ে যায়।

উদ্ভট হলেও বুদবুদের মধ্যে রহস্য কিছুই নেই। যেখানে ওজন আছে, সেখানেই 'ওপর' বলে একটা দিক আছে। বুদবুদ সেই জায়গাতেই জল ছেড়ে 'ওপরে' লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু যেখানে ওজন নেই, 'ওপর' নেই, সেখানে বুদবুদকে জলের মধ্যেই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় বন্দী হয়ে থাকতে হয়।

সাঁতার কেটে শ্রান্ত হলে বলের অবজারভেশন লাউঞ্জে বসে থাকলেই হল। দেখা যাবে সবুজ পৃথিবী আর অগণিত নক্ষত্র। অপরূপ সেই দৃশ্য। কিন্তু এ দৃশ্য

দান ইত্যাদি

৩, সেণ্ট চার্লস স্কোয়ার, লণ্ডন, ডব্লু ১০ (মূলত প্রিভল-মার্জল- গোয়া, ভারত হইতে)-এর শ্রীতি এন আলাবনী ভারতের জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ১০০১ পাঃ (এক হাজার এক পাউণ্ড মাত্র) সহৃদয়তার সহিত দান করিয়াছেন। ইউ কে-তে ভারতের প্রাক্তন হাই-কমিশনার মহামান্য ডঃ জীবরাজ মেহতার নিকট এই দান দেওয়া হইয়াছিল। প্রয়োজন যথার্থ হইলে ও জনসাধারণের জন্য সত্য কার্য বলিয়া দাতা কর্তৃক বিবেচিত হইলে অনুরূপ সাহায্য ও অতিরিক্ত সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া যাইতে পারে, যেমন তিনি অতীতেও দিয়াছেন।

দেখার জন্যে ঘুরন্ত রিংয়ে না যাওয়াই ভাল। অন্তরীক্ষ-পটের ঘুরপাক খাওয়ার বেগে নিজেরই মাথা ঘুরতে পারে।

দশ হাজার মাইল দূর থেকে দেখা যাবে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। গোটা পৃথিবীটা আস্তে আস্তে ঘুরছে চোখের সামনে। মেরু অঞ্চল ছাড়া সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ন ঘন্টায় নিজ কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করবে স্কাই-হোটেল। ন ঘন্টা অন্তর কুয়াশার মত আবহমন্ডলের আড়াল থেকে লাফিয়ে উঠবে সূর্য। প্রথমে নখের কণার মত এককণালি আলো এসে পড়বে পৃথিবীর বুকে... দ্রুত সারা পৃথিবী সমুজ্জ্বল থালায় পরিণত হবে, আবার সেই একই বেগে তা অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। সমস্ত দৃশ্যটাই ঘটবে মাত্র ন ঘন্টার মধ্যে। চাঁদের বুকে এই দৃশ্যই দেখতে সময় লাগে এক মাস, পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা হয়ে আবার পূর্ণিমা।

অবজারভেশন জানালায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে একঘেয়ে লাগলে টেলিস্কোপে চোখ দিলেই হল। একলাফে পৃথিবী এগিয়ে আসবে—মনে হবে যেন, মাত্র দশ মাইল নীচেই দেখা যাচ্ছে ঘুরন্ত পৃথিবী। মেঘ না থাকলে অনেক কিছুই চোখে পড়বে। বড় বড় বাড়ী, শহর ইত্যাদি স্পষ্ট দেখা যাবে। তবে কেউ যদি বলে বসেন যে, তিনি লোকজনও দেখেছেন, তবে তা বিশ্বাস না করাই উচিত। কেননা, মাত্র কয়েক মাইল ওপরকার স্যাটেলাইট ছাড়া এত খুঁটিনাটি কারোরই চোখে পড়ে না।

স্কাই-কোটেল থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরের কক্ষপথে পৃথিবীকে আবর্তন করছে মহাকাশের সবচাইতে বড় হাসপাতাল 'স্পেশ-ক্রশ-ফোর'। কম পাওয়ারের রকেটে চড়ে স্কাই-হোটেল থেকেই স্পেশ-ক্রশ-ফোর'রে যাওয়া যায়। এ হাসপাতালের অধিকাংশ রুগীরই হার্টের অসুখ। পৃথিবীর জোরালো মাধ্যাকর্ষণের ফলে হার্টের ওপর দারুণ চাপ পড়ে—জোরে জোরে রক্ত পাম্প করতে হয়। কিন্তু স্পেশ-ক্রশ-ফোর'রে মাধ্যাকর্ষণ একেবারে নেই বললেই চলে; সুতরাং ওজনও সেই পরিমাণে অনেক কম। তাই কমজোরী হৃদযন্ত্রও এখানে এসে সবল হয়ে ওঠে। রুগীদের অবশ্য ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে আসতে হয় পৃথিবীর বাইরে।

স্পেশ-ক্রশ-ফোর যেন একটা অতিকায় উড়ন্ত চাকতি। অক্ষরেখা বরাবর আস্তে আস্তে ঘুরপাক খাওয়ার ফলে কিনারার কাছে যে মাধ্যাকর্ষণের সৃষ্টি—তা পৃথিবীর ওপরকার মাধ্যাকর্ষণের সমান। কিন্তু যতই কেন্দ্রের দিকে আসা যায়, ততই ঘুরপাকের বেগও কমতে থাকে; সেই অনুপাতে সিনথেটিক গ্র্যাভিটিও কমতে থাকে। একেবারে কেন্দ্রে পৌঁছোলে আর কোনো ওজনই থাকে না।

নতুন রুগীদের রাখা হয় অক্ষরেখার কাছে। পৃথিবীর ওপর রুগীদের যা ওজন, এখানে রাখলে সে ওজনের দশ ভাগের ন' ভাগই আর থাকে না। দারুণ হাল্কা হয়ে যাওয়ার ফলে হার্টের ওপর চাপ কমে যায়। ধীরে ধীরে হৃদযন্ত্র সবল হয়ে উঠতে থাকে, আর একটু একটু করে রুগীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অক্ষরেখা থেকে দূরে। অনেক রুগীদের হার্ট এত খারাপ থাকে যে পৃথিবীতে আর ফিরে যেতে পারে না। তাই বাকী জীবনটা তারা চাঁদেই কাটিয়ে দেয়। সেখানে ওজন খুব কম। পৃথিবীতে যা ওজন, তার ছ'ভাগের মাত্র এক ভাগ নিয়েই দিব্বি হইচই করে থাকা যায়।

হার্ট কেস ছাড়াও পোলিও কেসেও হাসপাতালের সুনাম আছে। পোলিওয়ে ভুগে অথবা দুর্ঘটনার দরুন যারা পা হারায়, পৃথিবীর ওপর তাদেরকে ফেলা হয় অকেজোর দলে। কিন্তু মহাকাশে তাদের কাজের অভাব নেই। মহাশূন্যের বহু স্টেশনে অমনি অনেক কর্মীর অবিশ্বাস্য তৎপরতা দেখে অবাক হতে হয়।

সম্প্রতি সাংঘাতিকভাবে দগ্ধ রুগীদেরও চিকিৎসা শুরু হয়েছে হাসপাতালে। রুগীকে জিরো-গ্র্যাভিটি রুমে ভাসিয়ে রাখা হয়, পোড়া ক্ষতও চটপট সেরে আসে ড্রেসিং ছাড়াই।

স্কাই-হোটেলের অবজারভেশন জানলা থেকে এমনি হাসপাতাল আরো দেখা যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, মহাশূন্য বিজয় করতে মানুষ আজ পর্যন্ত যা খরচ করেছে, তার প্রায় সবটাই উঠে এসেছে হোটেল আর হাসপাতালগুলো চালু হওয়ার পর। চোখে পড়বে আরো অনেক ঘূর্ণায়মান ছোট-বড় স্টেশন। কখন-সখনো অন্ধকার পৃথিবীর বুক থেকে লাফিয়ে উঠতে দেখা যাবে এক-আধটা আলোকবিন্দুকে। তীরবেগে ওপরে উঠে যাওয়ার বেগ থেকেই বুঝে নিতে হবে যাত্রা শুরু হল আন্তগ্রহ রকেট-যানের। দুশ মাইল পর্যন্ত প্রদীপ্ত থাকবে স্ফুলিঙ্গটি, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে উঠতে এই দুশ মাইল প্রচুর এনার্জি ব্যয় করতে হবে রকেটটিকে। তারপর লক্ষ লক্ষ মাইল পথ পাড়ি দি... পাওয়ায় খরচ হবে নামমাত্র। কারণ ... শূন্যে তো আর গ্র্যাভিটি নেই—গ্র্যা... কাটানোর জন্যে শক্তি খরচেরও দরকার ...

স্কাই-হোটেল আর পৃথিবীর ... দেখতে পাওয়া যাবে বড় বড় স্পেশ ল্যা... টরী। পৃথিবীতে যেসব এক্সপেরি... কল্পনকালেও করা সম্ভব নয়, তা এ... সম্ভব। বিস্তর অর্থব্যয় করেও মাইলের... মাইলব্যাপী 'পারফেক্ট ভ্যাকুম' পৃথি... পাওয়া যাবে না। কিন্তু মহাশূন্যে ... জন্যে কানাকড়িও খরচ করতে হয় না।

দেখা যাবে আবহাওয়া ল্যাবোরেটরী... যার দৌলতে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় আব... হাওয়া কি রকম যাবে—তা সকলেই জানতে... পারে। ভবিষ্যদবাণীর দশ ভাগের ন'ভাগই... মিলে যায়। কিন্তু ঐ বাকী এক ভাগের... জন্যেই ভাবনার অন্ত নেই বৈজ্ঞানিকদের।

সবচাইতে চোখ ধাঁধানো হল জ্যোতি... র্বিজ্ঞানীর মানমন্দির। বিরাট বিরাট ভাস... মান আয়নাগুলোর ব্যাস শত শত ফুট... পৃথিবীর আবহমন্ডল, ধোঁয়াশা, কুয়াশা আর... মেঘের বাইরে থাকার ফলে কোটি কোটি... আলোকবর্ষের প্রান্ত পর্যন্ত ধরা পড়ে যায়... তাদের যান্ত্রিক চোখে।

এতগুলো স্টেশনকে নীচে দেখে সবার... ওপরে আছি ভাবলে ভুল হবে। কেননা... মানুষের গড়া দূরতম ক্ষুদে চাঁদটিও স্কাই-... হোটেল থেকেও বারো হাজার মাইল দূরে... এরকম নকল চাঁদের মোট সংখ্যা তিন... দূরপাল্লার রেডিও আর টেলিভিশনের জন্যে... এদের সৃষ্টি।

পৃথিবী থেকে এই বাইশ হাজার মাইল... দূরে এসেও কিন্তু চাঁদ এখনও দশগু... পথ দূরে। তারও অনেক দূরে মঙ্গল অথ... বুধ। অত দূরে থেকেও তারা আমাদে... প্রতিবেশী। মানুষের কলোনী আজ এ... গ্রহেও ছড়িয়েছে।

আকাশ-কলোনী থেকে ফিরে এসে স... সময়ে খেয়াল রাখা দরকার যে, এটা স্কা... হোটেল নয়, পৃথিবী। মনে রাখতে হ... এখানে ওজন বলে একটা জিনিস আ... কাজেই স্কাই-হোটেলে যে খেলা আনন্দে... খোরাক, এখানে তা মৃত্যুর কারণও হ... পারে। এক লাফে সবকটা সিঁড়ির ধা... পেরিয়ে নামতে গিয়ে অনেককেই হাত-... ভেঙে আক্কেল সেলামী গুনতে হয়েছে।

সবশেষে একটা কথা না বললেই ন... স্কাই-হোটেলে গেলে কোপ্তা-কাবাব মিল... না, এ ধারণা একেবারেই ভুল। প্রথম যু... মহাকাশচারীরাই ভিটামিন বড়ি আর ... দিয়ে ছোট্ট করা খাবার খেতে বাধ্য হ... কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। স্যুপ থে... শুরু করে সুরুয়া পর্যন্ত সব খাবারে... আয়োজন রাখা হয়েছে আকাশ-কলো... স্কাই-হোটেলে।

বর্ষায় কলকাতায়

অজিত চক্রবর্তী

আচমকা আকাশ যেন ভেঙে পড়ল। একই সঙ্গে গর্জন, বর্ষণ এবং বিদ্যুৎ ঝল-সানি। মধ্যাহ্নের কলকাতা কালো অন্ধকারে ঢেকে গেল।

ছুটতে ছুটতে আশ্রয় নিলাম একটা ইঁট বার-করা দোতলা বাড়ির বারান্দায়। দেখতে দেখতে পাশে ভিড় করলেন আমারই মত কয়েকজন দিশেহারা পথিক, দুটো ষাঁড় এবং একটা ছাগল। লাগাতার (একটানা কথাটা সেকেলে) বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বিকট শব্দে বাজ পড়ছে আর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে—তার মধ্যে গরু, ছাগল আর মানুষের বিচিত্র সহঅবস্থান।

দেখতে দেখতে নারকেলডাঙা মেন রোড ডুবে গেল। অন্য দিকে খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বাড়ির বাসিন্দারা উচ্চকণ্ঠে হাসছেন আর চিৎকার করে কথা কইছেন। বাইরের মানুষগুলো বৃষ্টির ঝিলমুটে ছাট হজম করে হাঁ করে ভিতরের দিকে চেয়ে আছেন, কিন্তু ভিতরের লোকগুলোর বাইরের দিকে তাকানোর ফুরসত নেই।

রাস্তায় জল জমছে! রাস্তায় জল আরও বেড়েছে। গোটা চারেক মোটর গাড়ি খোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা টেম্পো, একটা লরি আর একটা স্টেটবাস তার সঙ্গী হল।

লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা ছোকরাদের একটা দল হঠাৎ ভিজতে ভিজতে জলে ডোবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল। থেমে থাকা গাড়ি-গুলোর একটার কাছে গিয়ে ও'দের একজন জিজ্ঞেস করল : ঠেলতে হবে স্যার?

শুনতে পেলাম মোটরগাড়ির ভেতর থেকে একজন বললেন, হ্যাঁ। অপর পক্ষ জানতে চাইলেন, কত লাগবে?—দশ টাকা। শুনেই ভদ্রলোক যেন আঁতকে উঠলেন, দ-শ-টা-কা? না ব্রাদার, পাঁচ টাকা নাও। বেশ কিছুক্ষণ দর কষাকষির পর লুঙ্গি-ওয়ালারা রাজী হলেন। সুরু হল গাড়ি ঠেলা।

পাশের এক ভদ্রলোক বললেন, এবার-কার বর্ষায় এই হল নতুন ইন্ডাস্ট্রি, যা বহু-লাংশে বেকারত্ব ঘোচাতে পারে। আর একজন বললেন, আগেও এ ট্রেড ছিল, এবার জাতে উঠেছে। আগে কুলি মজুরেরা ঠেলত, এবার নবাবপুত্তুরেরা ময়দানে নেমেছেন।

জানলায় দুটো কচি পা দেখা গেল। জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক বালিকা, তার পেছনে তার দিদি-বৌদি গোছের কেউ মেয়েটাকে ধরে আছেন। মেয়েটা হঠাৎ আনন্দে অধীর হয়ে চিৎকার করে উঠল, দ্যাখ, কত বড় চৌবাচ্চা। মা, দেখ, কত বড় চৌবাচ্চা।

বিরাট চৌবাচ্চার উপর দিয়ে তখন চুয়াল্লিশ নম্বরের একটা প্রাইভেট বাস দুরন্ত মোটরলঞ্চের মত হটফট করে ছুটে যাচ্ছে। মেয়েটার মা ততক্ষণে আর একটা বাচ্চাকে জানলায় তুলে দিয়েছেন। সে বললে, বাচ্চু, বোকা, ওই দ্যাখ দীঘা।

সহ-অবস্থান ডিপোর কয়েকজন কোমর-সাঁতার কেটে চুয়াল্লিশে উঠেছিলেন। প্রতি-দানে বাস থেকে এক সিক্তবসনা নারী নেমে এলেন। কয়েক জোড়া চোখের লেহন কাটিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন, তারপর জোর করে কড়া নাড়লেন। মনে হল, ম্যাজিক দেখছি। দরজাটা খুলে গেল; তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে থেকে শোনা গেল, ভদ্রমহিলা বাইরের আমাদের ভালবেসে ভিতরের ওদের বলছেন, বাইরে ও'রা কাকভেজা ভিজছেন, ভেতরে ডেকে বসালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হত?

এবার চাপা কণ্ঠে কি যেন বলাবলি হল, তারপরই দরজা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, আপনারা ভেতরে আসুন।

গরু আর ছাগলটাকে বাইরে রেখে আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

বাচ্চা-বাচ্চা আর মেয়েরা সব আরও ভেতরে চলে গেছেন। বাইরের লোকের হাত থেকে ঘর আগলাবার জন্যে রয়ে গেছেন শুধু বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমরা ভাঙা বেঞ্চ আর চেয়ারগুলো দখল করতেই তিনি গল্প জুড়ে দিলেন।

"এখনকার ছেলে-ছোকরাদের লাইফ নেই। এই যে রাস্তা ডুবে গেছে দেখছেন, আমরা কি করতাম জানেন? নৌকো বার করতাম আর সারা নারকেলডাঙা চষে বেড়াতাম। বর্ষাকালে রাস্তা ভেসে না গেলে মন ভরত না। একবার রাস্তা আর কিছুতেই ভোবে না। রাত্তিরে জোর বৃষ্টি এল। কয়েক বন্ধুতে বেরিয়ে পড়লাম। চৌধুরী-বাড়ির দারোয়ানের চৌকিটা বাইরে ছিল। আমার এক বন্ধু পরমেশ সরকার, না; সে আর বেঁচে নেই, করল কি, জানেন? খাটটা দিয়ে ড্রেনের মুখ আটকে দিলে। সারা রাত্তির জল ফেলে চড়কডাঙা থেকে ফুল-বাগান অবধি আমরা মাছ ধরলুম। খাটের কথা খেয়ালই ছিল না। সকালে উঠে দেখি রাস্তাগুলো নদী আর বাড়ীর উঠোন পুকুরে পরিণত হয়েছে। সেকালে নৌকো করে আমরা বেলেঘাটা-মানিকতলা-শেয়ালদা করেছি। আর এখন বৃষ্টি হলে? আপনারা শুধু ভিজতে জানেন?"

আমাদের মধ্যে একজন প্রায়-বৃদ্ধ। তিনি বললেন, আর বলেন কেন? সে স্পিরিট কি আর আছে? ঠনঠনে আর বাগবাজারে আমরা কি নৌকোয় কম চড়েছি? একবার তো এনা-মেলের হাঁড়ি ধার করে সব এক-একজন এক-একটা কাণ্ডই করে ফেললাম। কিন্তু সেদিন আর নেই। আমার অমন ডাকসাইটে দাদা এখন বৃষ্টি পড়লেই তাঁকে জ্বরেতে ধরে। বাড়িতে দাদা এখন শয্যা নিয়েছেন, সেই সঙ্গে তাঁর আদুরে কুট্টি নাতি-নাতনী আর তাদের সমবয়েসি এক ঝিয়ের, কি বলব মশাই, সিমপ্যাথেটিক ফিবার হয়েছে। তখন ছিল জল মানে জাল, বঁড়শি আর নৌকো আর এখন ফ্লু, বিছানা আর আহা-উহু।

চোঙা প্যান্ট-পরা একজন তরুণ আত্ম-পক্ষ সমর্থন করে বললেন, চেষ্টা করেছিলাম স্যার, একটা রবারের নৌকো কিনতে। ইম-পোরটেড, পেয়েও গেছলাম একটা। দাম হাঁকিয়ে বসলে পাঁচশ টাকা। নইলে দেখতেন সব খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়ে একটা কাণ্ড করে ফেলতাম।

আর একজন বললেন, তবে 'ফান' আমরাও এঞ্জয় করি। সেদিন আমাদের ওখানে সবাই দল বেঁধে এক-এক করে ঠেলায় করে বাসে উঠেছি। একটা বাচ্চাকে মুটের ঝাঁকায় করে স্কুলে পেঁছে দেওয়া হয়েছে।

সর্ব কনিষ্ঠটি বললেন, কিন্তু, দাদু, যত লাইফের কথাই বলুন কে কেন, আপনাদের আমলে রিয়েল লাইফ যাকে বলে তা ছিল না। বিষ্টি পড়লেই বা কি আর না পড়লেই বা কি, মেয়েরা তো অন্তঃপুরেই থাকতেন। এখন বৃষ্টি হলে কো-এডুকেশন অফিস-গুলো আর বন্ধই হতে চায় না। বিশ্বাস করুন, এবারকার বিষ্টির জন্যে আমাদের অফিসে দু-দুটো বিয়ে প্রিম্যাচিওরলি ম্যাচিওর করেছে।

গল্প আরও অনেকক্ষণ চলল। খাওয়ার গল্প উঠতেই অনাসৃষ্টি বৃষ্টি থেমে গেল। বর্ষায় অপর্যাপ্ত ইলিশ আর কৈ-এর আত্ম-সমর্পণ আর কর্তন-রন্ধন-ভক্ষণ পর্ব প্রায় অনুচ্চারিত অকথিতই থেকে গেল। আমরা একে-একে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

গরু-ছাগলকে ফেলে পথে নামলাম। হাঁটু-পেরুনো জল, যাব কি করে? ফুল-প্যান্টকে গুটিয়ে হাফপ্যান্ট করলাম, সঙ্গে যে রেশন ব্যাগটি ছিল, তার মধ্যে জুতো-জোড়া ভর্তি করলাম।

কোন্ দিকে যাব? ফুলবাগান রাজা-বাজার দু'দিকেই শুধু জল আর জল। চুয়াল্লিশ চলেছে এর মধ্য দিয়েই দাপটের সঙ্গে। তবে ভিতরে চুঁ মারার জো নেই, জমজমাট, ন স্থানং তিলং ধারণম্।

ভেবে-চিন্তে শেয়ালদার দিকেই চললাম। খানিকটা গিয়ে রেলব্রিজের কাছে পৌঁছতেই মনে হল জল আরও বেশি। তাহলে কি করব? একজন পরামর্শ দিলেন, চলুন, রেললাইন ধরে চলুন।

একটু পরেই রেলরক্ষী বাহিনীর রক্ষকদের চোখে পড়তেই বন্দুকধারী পুলিশ এগিয়ে এল। নেহী, ইধারসে জানা মনা হ্যায়। অনুনয়, বিনয়ে কিছু কাজ হবে না বুঝে উলটা হাঁটা সুরু করলাম। উলটা-ডাঙার দিকে কয়েকজন আমাকে অনুসরণ করে চললেন।

পথে কোন বাধা নেই। জল-বন্দী হবার ভয়ও নেই কোথায়ও। রেল-লাইনগুলো যেন দ্বীপ। চারি দিকে জল, শুধু মাঝখানে এই একটুকু জায়গায় জলের গন্ধও নেই। আবার জুতো পরে নিলাম।

গুরুদাস মার্কেট, মানিকতলা জংসন আনন্দলোক, তারপর উল্টাডাঙা রেলস্টেশন একটা অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়ল। এব শিল্পী-দম্পতি, ও'দের চিনি আমি, সঙ্গে চারজন ছাত্র-ছাত্রী। ভদ্রলোক স্টেশনে পৌঁছেই কাঁধের ঝোলা থেকে একগাদা জুতো বার করলেন। তারপর আবার সকলে ভদ্রলোক হলেন।

ট্রেন আসতেই উঠে পড়লাম। টিকি আগেই কেটেছিলাম। বাসে পনর পয়সা ট্রেনে কুড়ি পয়সা। গোটা ট্রেনটাই ফাঁকা টান-টান হয়ে ভিজে জামা-কাপড় নিয়ে শুয়ে পড়লাম। সেই একই পথে শেয়ালদা পৌঁছলাম।

এবার বাস। আবার সেই একই পথ রাজাবাজার, মানিকতলা, উল্টাডাঙা তারপর শ্যামবাজার। নারকেলডাঙা-উল্টাডাঙার লোকের বাগবাজারে আসতে হ এখনও নৌকোই সবচেয়ে ভাল। কি নৌকো কোথায় পাব? পূর্ব বাঙলায় অনে যাত্রী নিয়ে গয়নার নৌকো চলে শুনেছি কলকাতার যদি তাতে জাত যায়, মনে ম ভাবলাম, মোটর লঞ্চ সার্ভিস চালু করা কেমন হয়? নিউকাট ক্যানাল তো এখন বন্ধ হয় নি। —অ

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(১০৪)

বীর হাম্বীর

বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজা হাম্বীর মল্ল। গৌড়াধিপতি সোলেমানের পুত্র দাউদ খাঁ-কে যুদ্ধে পরাভূত করে 'বীর হাম্বীর' নামে পরিচিত।

প্রথম বয়সে হাম্বীর অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিল। দস্যুতা করতেও তার বাধত না। 'দস্যুকর্ম করে সদা লৈয়া দস্যুগণ।'

গোস্বামী-গ্রন্থ নিয়ে বৃন্দাবন থেকে আসছে শ্রীনিবাস, সঙ্গে শ্যামানন্দ আব নরোত্তম। গ্রন্থগুলি রয়েছে কাঠের সিন্দুকে, গরুর গাড়িতে চাপানো। বনপথ দিয়ে যাচ্ছে, যে-পথ দিয়ে শ্রীচৈতন্য গিয়েছিলেন, সনাতন গিয়েছিল—সে-পথে যেতে কী আনন্দ!

সর্বত্র ধ্বনি উঠল—এক মহাজন বহু ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে নীলাচলে যাচ্ছে।

হাম্বীরের রাজধানী বনবিষ্ণুপুরের কাছাকাছি এসে পেঁছুল গাড়ি। রাজার গুপ্তচরেরা সংবাদ পেয়ে দস্যুদের জানাল। দস্যুরা গণকের কাছে গোনাতে গেল— —লুণ্ঠনের মত সামগ্রী কিছু আছে কিনা। গণক বললে, অমূল্য সম্পদ আছে সিন্দুকে। সুযোগ ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

দস্যুরা রাজাকে খবর দিল। কোন এক মহাজন গাড়ি ভরে ধনরত্ন নিয়ে যাচ্ছে।

এর আবার কথা কী। হাম্বীর উল্লসিত হয়ে উঠল : এখুনি সাজগোছ করে বেরিয়ে পড়ো। অর্থসহ সমস্ত গাড়িটাই এখানে নিয়ে এস। আর দেখ, শুধু ভয়ই দেখাবে, কাউকে প্রাণে মারবে না।

তামড়গ্রাম, মালিয়াড়া ও রঘুনাথপুর অতিক্রম করে শ্রীনিবাস আর তার সঙ্গীরা গোপালপুর এসে পেঁচেছে। কৃষ্ণকথামুখে অর্ধেক রাত কাটিয়ে ঘুমিয়েছে, দস্যুরা এসে চড়াও হল। রাজার আদেশ মতো কারু গায়ে হস্তক্ষেপ করল না, সিন্দুক-সমেত গাড়ি নিয়ে বনে প্রবেশ করল। শেষপর্যন্ত সমস্ত নিয়ে হাজির করল রাজসমীপে।

অপহরণের খবর পেয়ে বন-বিষ্ণুপুরের লোকেরা বিক্ষুব্ধ হল। ধনী মহাজন তার সম্ভার নিয়ে জগন্নাথদর্শনে নীলাচলে চলেছে, তার উপর বলদর্পী রাজার এ কী দৌরাত্ম্য! এ-পাপিষ্ঠকে কে উদ্ধার করবে? যে প্রভু নদীয়া-বিহারে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি তো নীলাচলে সংগোপিত হয়েছেন, তবে এ-দুরাচারের কী করে ত্রাণ হবে : 'সে প্রভু হইলা নীলাচলে সংগোপন। এবে কে করিবে হেন দুষ্টের তারণ।।' কেউ-কেউ বললে, বলা যায় না। দুষ্টের দুর্বুদ্ধিমোচনের জন্যে ভক্তকে দিয়েই প্রভু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিচ্ছেন। কে জানে হয়তো এই পাপ-দেশেই তেমন কোনো ভক্তের শুভাগমন হবে।

প্রকাণ্ড সিন্দুক দেখে হাম্বীর পুলকিত হল। কত না জানি মহামূল্য ধনরত্ন রয়েছে লুকোনো। দস্যুদের প্রচুর প্রশংসা করল হাম্বীর, বসন-ভূষণ দিয়ে পরিতৃপ্ত করল। পরে নির্জনে নিজে গেল সিন্দুক খুলতে।

গণককে ডেকে পাঠাল।

কী জানি কী ব্যাপার, গণক ত্রস্ত হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

তুমি এমন অদ্ভুত গণনা কী করে করলে?

গণনা ঠিক হয়নি?

আশ্চর্য ঠিক হয়েছে। হাম্বীর উল্লসিত হয়ে উঠল : সিন্দুকের মধ্যে অমূল্য সব গ্রন্থ। তুমি যে বলেছিলে গাড়িতে অমূল্য সম্পদ আছে, সত্যিই তাই। তোমার কোনো গণনাই কোনোদিন মিথ্যে হয়নি। যতই গ্রন্থগুলি দেখছি, স্পর্শ করছি, ততই আমার চিত্ত চঞ্চল হচ্ছে এ কী অনন্য সম্পদ আমি লুণ্ঠন করে এনেছি। এখন বলো যার গ্রন্থ তাকে আমি কোথায় পাব?

রাজমহিষী সুলক্ষণাও এল গ্রন্থ দেখতে। গ্রন্থ দেখে সেও অভিভূত হল। বললে, এখন এগুলোকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করো।

ব্যবস্থার ত্রুটি হল না। কিন্তু এ আমার কী হল? হাম্বীরের চোখে ঘুম নেই। কেবলই ভাবতে লাগল, ভক্তকৃপার কথা শুনেছি, আমার বেলায় এ যে দেখছি গ্রন্থ-কৃপা।

এদিকে গ্রন্থ হারিয়ে শ্রীনিবাস পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। এদের যে কোনো প্রতিলিপি নেই, এদের যে কোনো বিকল্প হয় না। যেমন করে হোক এদের উদ্ধার করতেই হবে, নইলে জীবনধারণই অর্থহীন।

নরোত্তম আর শ্যামানন্দকে ফিরে যেতে বলে শ্রীনিবাস গ্রন্থসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। ভাবল দস্যুতার প্রতিকারে রাজদ্বারে গিয়ে দাঁড়ালে ক্ষতি কী। রাজা কি শুধু দস্যুদেরই রাজা, সর্বস্বান্ত প্রজার রাজা নয়?

খুঁজতে-খুঁজতে দেউলি গ্রামে এসে পেঁছুল শ্রীনিবাস। উঠল কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। সেখানে কথায়-কথায় শুনতে পেল মল্লপাটের রাজা বীর হাম্বীর দুই গাড়ি ধন লুট করে এনেছে। আর, শোনো মজা, দস্যুবৃত্তি থাকলে কী হবে, রাজা আবার ভাগবত শোনে।

ভাগবত শোনে, কোথায়?

কেন, রাজসভায়। ব্যাস চক্রবর্তী পাঠ করে। অনেকে শোনে।

তুমি শুনেছ?

শুনেছি বৈকি!

আমাকে তবে শোনাও একদিন। রাজসভায় নিয়ে চলো।

শ্রীনিবাস যখন রাজসভায় এসে দাঁড়াল, বীর হাম্বীরের মনে ডাক দিল এই অপূর্ব-সুন্দর পুরুষ নিশ্চয়ই ঈশ্বরপ্রেরিত। নইলে মন-প্রাণ এর চরণে আত্মসমর্পণ করতে ছোটে কেন?

বীর হাম্বীর সম্মানিত আসন দিল আগন্তুককে।

কে রাজা, কে পাঠক, সমস্ত সভার অধিপতি শ্রীনিবাস। রূপে তেজে সম্ভ্রম-গাম্ভীর্যে অপরূপ। হয়তো ইনিই গ্রন্থরত্নের অধিকারী।

পাঠশেষে রাজপণ্ডিতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অনুযোগ করল শ্রীনিবাস। ব্যাস চক্রবর্তী প্রথমে রুষ্ট হল বটে কিন্তু শ্রীনিবাসের শান্ত যুক্তির কাছে সে রোষ স্থায়ী হল না। রাজা বললে, আমাদের

আপনি কিছু শোনান। যদি ভ্রমরগীতা পাঠ করেন তো কৃতার্থ হই।

শ্রীনিবাস ভ্রমরগীতা পাঠ করে শোনাল। রাজা তো আর্দ্র হলই, দুষ্ট পাঠকও আর্ত হয়ে উঠল।

আপনি কী উপলক্ষে এসেছেন এখানে? বিনয়ের বীর হাম্বীর জিজ্ঞেস করল শ্রীনিবাসকে।

তখন শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত বললে রাজাকে। গোস্বামীদের গ্রন্থ প্রকাশ করতে গৌড়ে আসছিলাম, আসছিলাম বৃন্দাবন থেকে, গোপালপুরে মধ্যরাত্রিতে বিশ্রাম করছিলাম, দস্যু এসে গ্রন্থ-সম্পুট হরণ করে নিল। বলুন আমি এখন কী করি, কোথায় যাই, কী করলে কোথায় আবার গ্রন্থের দেখা মেলে? মনে শান্তি নেই, ভাবলাম ভাগবত-পাঠ শুনে যদি কিছু শান্তি পাই তাই এসেছি এখানে।

বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। বললে, প্রভু, আমিই সেই দস্যু। আমার সমস্ত পাপভার আপনার চরণে এনে রাখছি, আমাকে মার্জনা করুন। সমস্ত গ্রন্থ অটুট আছে, যত্নে রক্ষিত আছে, আমাকে আপনি রক্ষা করুন।

পুরীর অভ্যন্তরে গিয়ে গ্রন্থ দেখতে পেয়ে শ্রীনিবাসের আনন্দ আর ধরে না। সন্দেহ কী, গ্রন্থই সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়েছে।

রানী সুলক্ষণাও আচার্যের পায়ে প্রণত হল।

বীর হাম্বীর বললে, আমাকে পায়ে স্থান দিলেন কিনা বলুন।

শ্রীনিবাস বললে, তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পায়ে সমর্পণ করে দিলাম। সেই পাদপদ্মই নিরন্তর চিন্তা করো।

আর কী করব? ব্যাকুল হল রাজা।

নিজেকে সর্বক্ষণ অপরাধী জ্ঞান করে নামসংকীর্তন করবে। আগে তোমাকে গোস্বামীদের গ্রন্থাস্বাদ করাই, পরে তোমাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দেব।

গ্রন্থ-চুরির কথা বৃন্দাবনে জানানো হয়েছে, এখন প্রাপ্তির কথাটাও জানাতে হয়।

রাজা বললে, সেই সঙ্গে এই দস্যুর উদ্ধারের কথাটাও জানিয়ে দেবেন। আর বলবেন, গোস্বামীরা যেন কৃপা করেন আমাকে।

গ্রন্থ-শকট বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেওয়া হল, খেতুরিতেও লোক গেল নরোত্তমকে খবর দিতে। শ্রীনিবাস বললে, এবার তবে আমিও যাজিগ্রামে ফিরে যাই।

রাজা বললে, আমার তবে কী হবে?

শ্রীনিবাস বললে, আরো কিছুকাল অপেক্ষা করুন। গ্রন্থাস্বাদের ফলে রঙ ধরুক।

রাজার প্রেরিত লোক মারফত জীব গোস্বামী হাম্বীরের কাছে চিঠি পাঠাল। শ্রী যে বৃন্দাবনের অনুরোধ দিয়ে ... গোস্বামী-প্রভু তাকে চৈতন্যভক্ত বলে ... করেছেন। রাজার আনন্দ আর ধরে না। সঙ্গে-সঙ্গে নেমে আসে অন্তরে নির্ঝর। আমি কি চৈতন্যভক্ত?

শ্রীনিবাস ফের বৃন্দাবনে গেল। ব্যাস কিছুতেই তার সঙ্গ ছাড়ছে না। সেও বৃন্দাবনের যাত্রী হল। বৃন্দাবনে পৌঁছে ব্যাস জীব গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিতে চাইল। জীব গোস্বামী বললেন, না, আমার কাছে নয়, দীক্ষা নেবে শ্রীনিবাসের কাছে।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে এল। সঙ্গে ব্যাস ছাড়া আরো দুজন—রামচন্দ্র আর শ্যামানন্দ। নতুন দুজনের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হল হাম্বীরের। শ্যামানন্দ উৎকলে যাবে, সম্ভার-সামগ্রী সাজিয়ে দিল রাজা। ভক্তসেবায় উন্মাদিত হয়ে উঠল।

শ্রীনিবাস দেখল, রাজার ভক্তিগ্রন্থে অধিকার জন্মেছে। ফল গাঢ়-পক্ব হয়েছে। বললে, এবার আপনাকে দীক্ষা দেব।

আষাঢ়ী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় শ্রীনিবাস হাম্বীরকে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিল। বললে, জীব গোস্বামী তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমার নতুন নাম রেখেছেন।

কী নাম?

নাম চৈতন্যদাস।

রানী সুলক্ষণাও দীক্ষা নিল।

বীর হাম্বীরের ছেলের নাম ধাড়ি-হাম্বীর। সেও দীক্ষিত হল।

জীব গোস্বামী তাকেও নতুন নাম দিলেন—গোপালদাস। চৈতন্যদাসের পুত্র গোপালদাস।

সমগ্র মল্লরাজবংশ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হল।

পিতা-পুত্র চৈতন্যদাস আর গোপালদাস দুজনেই পদকর্তা হয়ে উঠল। রানী সুলক্ষণা দেখল বীর হাম্বীর স্বপ্নাবেশে শ্রীনিবাসের প্রশস্তিমূলক পাঠ মনে রচনা করে মুখে আবৃত্তি করে চলেছে। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল সুলক্ষণা।

গ্রন্থকৃপা আর কাকে বলে। দর্শনে-স্পর্শনেই চিত্তের পরিবর্তন আর আস্বাদনেই একেবারে ক্রান্তদর্শন।

রাজার মত ব্যাসাচার্যও সবংশে শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা নিল। দীক্ষা নিল কৃষ্ণবল্লভ। বিষ্ণুপুরের আরো অনেকে।

বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাসের জন্যে বাড়ি করে দিল হাম্বীর। কিন্তু শ্রীনিবাসকে বাঁধতে পারল না। রাজা বললে, তবে আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। তাতেও রাজি নয় শ্রীনিবাস। রাজা রাজধানী ছেড়ে থাকলে রাজ্য চলবে কী করে?

শেষে খেতুরি-উৎসবের পর নবদ্বীপ-শান্তিপুর ভ্রমণ করে শ্রীনিবাস যখন নরোত্তম ও রামচন্দ্রসহ যাজিগ্রামে ফিরে এল তখন বীর হাম্বীর সেখানে এসে উপস্থিত হল। গ্রামের বাইরে অশ্ব-গজ-পদাতিকের সমারোহ ছেড়ে রেখে কয়েকজন নিরীহ লোক নিয়ে রাজা গুরুর চরণে বহুবিধ রত্নালঙ্কার সমর্পণ করল, নরোত্তম আর রামচন্দ্রকেও প্রণতি জানাল। রাজার এই প্রথম নরোত্তম-মিলন।

তীর্থযাত্রীর মত সর্বত্র ভ্রমণ করে রাজা বৈষ্ণব মহাজনদের আশীর্বাদ কুড়োল। রাজার সঙ্গে রানীও এসেছে। গুরুপত্নীকে দিয়েছে অনেক বস্ত্রালঙ্কার।

রানী চতুর্দোলায় এসেছে, চতুর্দোলায়ই চলে গেল, রাজা কিন্তু গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত গেল পদব্রজে। পরে যথাযুক্ত যানে আরোহণ করল।

বৈষ্ণবতাই বীর হাম্বীরকে যথার্থ বীর্যে মণ্ডিত করেছে। সে ভিতরে প্রেমার্দ্র ভক্ত কিন্তু বাইরে সুকঠিন সম্রাট। সে প্রেমে ভক্তবৎসল, যুদ্ধে শত্রুঞ্জয়। বৈষ্ণবতাই তাকে যথার্থ ন্যায়ে-নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে রাধিকাবিগ্রহ পাঠাচ্ছেন, ভক্তবৃন্দ কণ্টকনগরে পৌঁছুলে বীর হাম্বীর গোপনে তাদের সহস্র-মুদ্রা পাঠিয়ে দিল। শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহেও সে কম খরচ করেনি।

বৃন্দাবনের অনুকরণে বিষ্ণুপুরে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নির্মাণ করল রাজা তাল তমাল ভাণ্ডির বন স্থাপন করল স্থাপন করল যমুনা ও কালিন্দী বাঁধ মথুরা, দ্বারকা, গোকুল নামে জনপদ গিরি-গোবর্ধনের অনুকরণে এক মন্দির-নির্মাণ সুরু করল, শেষ করতে পারেনি তাই লোকে এখন রাসমঞ্চ বলে। সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন বীর হাম্বীরেরই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীনিবাসের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বীর হাম্বীর চলেছে যাজিগ্রামে। পথে বৃষভানুপুরে এক ব্রাহ্মণের ঘরে রাত কাটায় দেখে সেখানে সুন্দর মদনমোহনের বিগ্রহ। দেখে রাজার খুব লোভ হয় এবং যাজিগ্রাম থেকে ফেরবার সময় ঐ বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসে। ব্রাহ্মণ দারুণ শোকে মুহ্যমান হলে মদনমোহন তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, দিবাভাগে বিষ্ণুপুরে এবং নিশা-কালে বৃষভানুপুরে তোমার আলয়ে থাকব।

মল্লবংশের শেষ রাজা চৈতন্যসিংহ নানাকারণে ঋণগ্রস্ত হলে মদনমোহনের স্বপ্নাদেশ হল—আমার বিগ্রহ তুমি বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে বাঁধা রেখে টাকা সংগ্রহ করে ঋণমুক্ত হও।

লক্ষাধিক টাকায় শ্রীবিগ্রহ গোকুল মিত্রের বাড়িতে আবদ্ধ রইল। সেই থেকে মদনমোহন বাগবাজারে অধিষ্ঠান করছেন।

মাধুর জাফরী এবং জোহরা সেগাল—জেমস আইভরীর দি গুরু চিত্রে।

আবশ্যিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ৭ আগস্ট বুধবার এক আদেশবলে এ রাজ্যের সকল চিত্রগৃহে বাৎসরিক প্রদর্শনী সংখ্যার অন্তত শতকরা কুড়ি ভাগ (২০ শতাংশ) পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত ছবির জন্যে সংরক্ষিত রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনেমা (রেগুলেসন্স) অ্যাক্ট, ১৯৫৪-র শর্তাবলী অনুযায়ীই রাজ্য সরকার এই আদেশ জারী করেছেন। রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, এই রাজ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির স্বার্থেই একটি ন্যূনতম সময়ের জন্যে এই রাজ্যে নির্মিত চিত্রের প্রদর্শনীকে আবশ্যিক করতে হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই রাজ্যে প্রস্তুত অন্তত একশোখানি ছবি, যার মধ্যে চল্লিশখানি সম্প্রতিকালে নির্মিত—আজ পর্যন্ত মুক্তির কোনো সুযোগ পায় নি। কাজেই এত ছবি হাতে থাকতে সরকারী আদেশ পালনে কোনো চিত্রগৃহেরই কোনো রকম অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার কথা নয়। অবশ্য এ রাজ্যে প্রস্তুত ছবির লভ্যতা, স্থানীয় অবস্থা বা কোনো অদৃষ্টপূর্ব অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে এই আদেশকে আবশ্যকমত শিথিল করবার নির্দেশ বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।

বহুকাল ধরে বহুবিধ আবেদন-নিবেদনের পরে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এ-রাজ্যের মুমূর্ষু চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি-বিধান তথা সংরক্ষণের প্রয়াসে একটিও অঙ্গুলি হেলন করেছেন, এর জন্যে তাঁদের আমরা প্রথমেই সাধুবাদ জানাই। বাস্তবিকই ভাববার কথা যে, পশ্চিমবঙ্গের ৩২১টি চিত্রগৃহের মধ্যে মাত্র ১৪টিতে শুধু বাংলা ছবি দেখানো হয়ে থাকে—এই তথ্যটি অবশ্য পরিবেশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্প সংরক্ষণ সমিতি দ্বারা। উদ্বোধনের দিন থেকে শুরু করে আজ

পর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলা ছবি দেখিয়ে আসছে, এমন একটিও চিত্রগৃহের নাম কিন্তু আমাদের জানা নেই। কাজেই মাত্র বাংলা ছবি দেখিয়ে থাকে, এমন তেত্রিশটি চিত্রগৃহ পশ্চিমবঙ্গে আছে শুনে আমরা যেমন চমৎকৃত, তেমনই উৎসুক ঐ বিশেষ-ভাবে চিহ্নিত ছবিঘরগুলির নাম জানবার জন্যে। আবার যখন কিছু দিন আগে প্রদর্শকদের তরফ থেকে সাধারণের অবগতির জন্যে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের ১৫৪টি স্টেশনের সর্বত্রই (অর্থাৎ যেখানেই চিত্রগৃহ আছে, সেখানেই) নিয়মিতভাবে বাংলা ছবি দেখানো হয়ে থাকে, তখনও বিজ্ঞাপনদাতাদের রহস্যপ্রিয়তায় কৌতুক অনুভব করে জানতে ইচ্ছা হয়েছিল, বাংলা ছবির এই 'নিয়মিত প্রদর্শনী' কথাটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই যদি বাংলা ছবি নিয়মিতভাবে দেখানো হয়ে থাকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের এই নতুন আদেশের নিশ্চয়ই কোনো আবশ্যকতা ছিল না। আজ একদিকে বাঙালী যেমন ধীরে ধীরে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়ে পড়েছে, অপর দিকে সে জীবনের নানাক্ষেত্রে নিজের মাতৃভাষার ব্যবহারও ভুলে যাচ্ছে। সে 'বিপ্লবের জয় হোক' বলে না, বলে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'এক নাগাড়' কথাটা শুধু লেখে না, লেখে 'লাগাতার' ধর্মঘট। বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাভাষা নিজ রাজ্যে বঙ্গভাষাভাষীর কাছেই স্থান পাচ্ছে না, হিন্দী ছবি প্রবল বিক্রমে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় সর্বাঙ্গে অনুপ্রবেশ করে বাঙালীকে তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে প্রায় তার অজান্তেই ত্যাগ করাতে সক্ষম হয়েছে। কচি-কচি ছেলে-মেয়ের মুখে রবীন্দ্রসংগীত শোনা যায় না, শুনতে পাই : মুঝে খুশ্‌তা মিল গয়া। দেখতে পাই, বাঁকুড়া শহরের —যেখানে শতকরা ১ ভাগও অবাঙালীর বাস নেই, সেখানকার দুটি মাত্র চিত্রগৃহের মধ্যে একটিতে বারো মাস তিরিশ দিনের মধ্যে একটি দিনও বাংলা ছবি দেখানো হয় না।

এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্প সংরক্ষণ সমিতির দাবী হচ্ছে প্রতি অঞ্চলে সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যার আনুপাতিক ভিত্তিতে সেই অঞ্চলে অবস্থিত চিত্রগৃহে শতকরা ৩০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বাংলা ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। বাৎসরিক প্রদর্শনী সংখ্যার ২০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নির্মিত ছবিগুলির জন্যে সংরক্ষিত রাখার যে-নির্দেশ রাজ্য সরকার সম্প্রতি দিলেন, তা একদিকে এই দাবীর তুলনায় যেমন অকিঞ্চিৎকর, অন্য দিকে আবার এই রাজ্যের যেসব অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগেরও কম, সেইসব অঞ্চলেও সংরক্ষণ সমিতির কোনো রকম দাবী না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত ছবি দেখাবার জন্যে অপরাপর অঞ্চলের সঙ্গে ঢালাওভাবে ২০ শতাংশ প্রদর্শনী সংরক্ষিত রাখবার আদেশ দিয়ে ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের এই রাজ্যে নির্মিত ছবি দেখবার সুযোগ করে দিয়েছেন। বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের বাঙালীর সংস্কৃতির অন্যতম বাহক চলচ্চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কিন্তু কিছু লোকের মনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই আদেশের ফলশ্রুতি সম্পর্কে একটি আশঙ্কা জেগেছে। তাঁরা বলছেন, এত দিন যেসব চিত্রগৃহ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কিংবা বছরের অধিকাংশ সময়েই বাংলা ছবি দেখিয়ে আসছিল, তারা এই সরকারী আদেশের বলে বাংলা ছবির প্রদর্শনীকে বাৎসরিক প্রদর্শনী সংখ্যার ২০ শতাংশ-এর মধ্যে যদি সীমিত রাখবার প্রয়াস পায়, তাহলে উল্টো বিপত্তি দেখা দেবে না ত? মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই আদেশের মধ্যে স্থিতাবস্থা বা 'স্ট্যাটাসকো' বজায় রাখার কথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখিত থাকা প্রয়োজন ছিল।

চিত্র-সমালোচনা

রক্তরেখা (বাংলা) : সরস্বতী চিত্রম্-এর নিবেদন; ৩,৫৮·২১ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ : প্রযোজনা : স্নেহেন্দুবিকাশ গোপ; কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : উমাপ্রসাদ মৈত্র ; সঙ্গীত পরিচালনা : নচিকেতা ঘোষ; গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত; শব্দানুলেখন : সুনীল ঘোষ; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ : শিল্প নির্দেশনা : সুধীর খান; সম্পাদনা : রমেশ যোশী; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, চিত্রা সেন, অমর রায়, সবিতাব্রত দত্ত এবং অজিত চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণ : শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, দ্বিজু ভাওয়াল, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অমিত দে, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়া চৌধুরী, লোলিতা চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, বেবী গুপ্তা প্রভৃতি। মুভীমারা প্রাইভেট লিমিটেড এবং ইম্পিস ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ৯ আগস্ট শুক্রবার থেকে রূপবাণী, ভারতী, অরুণা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করেছে।

শেষ বাংলা ছবি দেখেছিলুম "পরিশোধ" উজ্জ্বলা চিত্রগৃহে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ পুরো সাড়ে পাঁচ মাস আগে। চিত্রগৃহের কর্মীদের একশো দিনব্যাপী ধর্মঘট এবং তারই অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতির কলকাতা শহরে বাংলা ছবির মুক্তিদাত্রী চিত্রগৃহগুলির মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে এতকাল নতুন বাংলা ছবির মুক্তি বন্ধ ছিল। সম্প্রতি রূপবাণী, অরুণা ও ভারতী 'চেন'-এর কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ সমিতির সঙ্গে নতুন ছবির মুক্তি সম্বন্ধে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় তাঁরা সরস্বতী চিত্রম্ নিবেদিত নতুন ছবি 'রক্তরেখা'কে চিত্রপ্রিয়দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

একটি নারীহত্যার রহস্যের সমাধানকে আশ্রয় করে 'রক্তরেখা'র কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। এবং এরই সঙ্গে আছে অনুসন্ধানকারী গোয়েন্দা সমীর সামন্তের সঙ্গে নিহত নারী শীলার ভগ্নী লীনা বসুর একটি মধুর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠা। কিন্তু এই সোজা অপরাধমূলক গোয়েন্দা চিত্রটিকে রূপায়িত করতে গিয়ে বিগত বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা জ্ঞাপক দৃশ্যাবলীকে বেশীর ভাগ 'ডিউপিং-এর সাহায্যে দেখানো হয়েছে কাহিনীর নায়ক গোয়েন্দা সমীর সামন্তকে আফিম ও কোকেনের চোরাকারবারী এবং পাপকার্যের নায়ক প্রোফেসর সামন্তের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ধর্মামূলক ত্যাগ করবার সময়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করানোর সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ে নাট-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (হোটেল মালিক), সবিতাব্রত দত্ত (দুর্বৃত্ত দলভুক্ত 'মাধু'), দ্বিজু ভাওয়াল (মৃত শীলার প্রেমিক জয়ন্ত), লোলিতা চট্টোপাধ্যায় (প্রোঃ সামন্তের কন্যা শান্তা), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (সামন্তের প্রধান অনুচর), শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (নায়ক সমীর)।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগেও আশ্চর্য দৈন্য পরিস্ফুট। আলোক-চিত্র গ্রহণে দৈন্যতার ছাপ বিশেষ করে চোখে পড়ে। বহু দৃশ্যে সংলাপ সহজে শ্রুতিগোচর হয় না। নচিকেতা ঘোষকৃত সুরযোজনা একখানি মাত্র গানকে উপভোগ্য করে তুলতে পেরেছে এবং সেটা হচ্ছে : ওগো চাঁদ ঘুমালে কী?

দো কলিয়াঁ (হিন্দী) : এ ভি এম প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৪,৭৭০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : এ ভি মায়াপ্পা; পরিচালনা : কৃষ্ণন পঞ্জু; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : জাবর, এন সীতারামন্; সংলাপ : পণ্ডিত মুখরাম শর্মা; সঙ্গীত পরিচালনা : রবি; গীত রচনা : সাহির লুধিয়ানী ; চিত্রগ্রহণ : মারুতি রাও ; শব্দানুলেখন : সি ভি বিশ্বনাথন ; সঙ্গীতানুলেখন : মিনু কাত্রাক ও মঙ্গেশ দেশাই ; শিল্পনির্দেশনা : এ কে শেখর ; সম্পাদনা : পাঞ্জাবী এবং আর বিঠ্ঠল; নৃত্য পরিচালনা : এ কে চোপরা ও কে তঙ্গপ্পন; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে ও মহম্মদ রফী; রূপায়ণ : বিশ্বজিৎ, মেহমুদ, ওমপ্রকাশ, হীরালাল, উমেশ শর্মা, মালা সিংহ, নিগার সুলতানা, মনোরমা, গীতাঞ্জলী, ভারতী, শবনম, সুজাতা বেবী সোনিয়া। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ৯ আগস্ট, শুক্রবার থেকে রূপসী, বসুশ্রী, বীণা, লোটাস, গণেশ, খান্না, পার্ক শো-হাউস এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

দুটি বিষয়ে দক্ষিণ ভারতীয় কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালকদের প্রতিভা অনন্যসাধারণ; এক : চিত্রকাহিনীকে নানাভাবে আবর্তিত করে তাকে ক্লান্তিকরভাবে দীর্ঘায়িত করা এবং দুই : বোম্বাইয়ে নির্মিত তথাকথিত রোমান্টিক ছবিগুলির ছককে অনুসরণ করেও ছবির মধ্যে নানাবিধ শিল্প-কৌশলের সাহায্যে চমকপ্রদ পারিপাট্যের সৃষ্টি করা। এই অসাধারণত্ব ইণ্ডিয়ান ক্যামেরায় রঙীন সুদীর্ঘ এ ভি এম

চিত্র 'দো কলিয়া'র কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার সীতারামন্ ও পরিচালক কৃষ্ণন পঞ্জুর মধ্যেও বর্তমান। নইলে যে কাহিনী অনায়াসেই আট থেকে দশ রীলের ভিতরে বিধৃত করা যেত, তাকেই তাঁরা কাহিনীকে নানাভাবে ঘুরপাক খাইয়ে সতেরো রীল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে দ্বিধাগ্রস্ত হতেন। নায়ক শেখর ও নায়িকা কিরণের মধ্যে প্রেম ও বিবাহ অনায়াসে দু'রীলের মধ্যেই সম্পন্ন হতে পারত, জবরদস্তী শাশুড়ী কমলার কৃপায় ওদের মধ্যে বিচ্ছেদও ঘটছে আরও দু'রীল লাগত এবং শেখর-কিরণের দুই যমজ মেয়ে গঙ্গা-যমুনার সম্মিলিত চেষ্টায় ওদের পুনর্মিলন ঘটতে ছবির বাকী অংশ ব্যয়িত হত। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয়েরা দশ রীলের মধ্যে ছবি শেষ হয়ে যাবে, এ যেন কল্পনাই করতে পারেন না। কাজেই 'দো কলিয়া'কে সতেরো রীল দীর্ঘ হতে হয়েছে। অবশ্য এই দৈর্ঘ্য হয়ত হিন্দী ছবির সাধারণ দর্শককে খুশীই করবে।

ছবির অভিনয়াংশে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করবে গঙ্গা-যমুনার দ্বৈত-ভূমিকায় বেবী সোনিয়ার অত্যাশ্চর্য নাট্যনৈপুণ্য। প্রথমে গঙ্গা ও যমুনার চরিত্রবৈচিত্র্য এবং পরে গঙ্গা-যমুনার একত্র আগ্রহ, ভীতি ও করুণা উদ্রেকের প্রয়াসকে কুমারী সোনিয়া অবলীলাক্রমে প্রকাশিত করেছেন। এর পরে নায়িকা কিরণ বেশে মালা সিংহ চরিত্রটির আনন্দ ও বেদনাকে মূর্ত করে তুলেছেন। হিন্দী ছবির নায়ক বিশ্বজিৎ নিজেকে বহু পূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ছবিতে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। নায়িকার পিতার ভূমিকায় ওমপ্রকাশ সিরিও-কমিক অভিনয়ের চূড়ান্ত করেছেন। আর মেহমুদ! শেখরের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু মহেশের চরিত্রটি তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অভিনয়ের গুণে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। নৃত্যশিক্ষিকা এবং শেখরের প্রেমাকাঙ্ক্ষী মেনকার ভূমিকায় গীতাঞ্জলীর অভিনয়ে সূক্ষ্মতার অভাব দেখা যায়। বরং তার ছলা-কলা ও চাতুরীপূর্ণ মা মধুমতী বেশে মনোরমার অভিনয় ঢের সাবলীল। নায়িকার কর্তৃত্বাভিমানিনী মা কমলার ভূমিকায় নিগার সুলতানা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ করেছেন অবলীলাক্রমে। অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় মোটের উপর ভালই।

ছবির কলাকৌশলে বিভিন্ন বিভাগে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে গঙ্গা ও যমুনার দ্বৈত ভূমিকায় একই শিল্পীর অবতরণকে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে। শিল্প নির্দেশকের কাজও প্রশংসনীয়। কিন্তু গানের সুরে বিশেষ কোন অভিনবত্বের নিদর্শন দেখাতে পারেন নি সংগীত পরিচালক রবি।

এ ভি এম-এর 'দো কলিয়া' বেবী সোনিয়ার অভিনয়গুণে ও সংলাপের চমৎকারিত্বে দর্শকসাধারণকে খুশী করবার ক্ষমতা রাখে।

ফ্যান্টাস্টিক ভয়েজ (ইংরেজী) ঃ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স-এর নিবেদন; ৭৭৬·৩৭ মিটার দীর্ঘ এবং ১২ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা সাল ডেভিড; পরিচালনা ঃ রিচার্ড ফ্লিশার; চিত্রকাহিনী ঃ হ্যারি ক্লীনার; চিত্রোপযোগীকরণ ঃ ডেভিড ডানকান; সংগীত পরিচালনা ঃ লিওনার্ড রোজেনম্যান; রূপায়ণ ঃ স্টিফেন বয়েড, র‍্যাকেল ওয়েল্‌চ, এডমণ্ড ওব্রায়েন, ডোনাল্ড প্লেজেন্স, আর্থার ও কোনেল, উইলিয়ম রেডফীল্ড এবং আর্থার কেনেডি। গেল ৮ আগস্ট, বৃহস্পতিবার বিশেষ প্রদর্শনীর পরে শুক্রবার থেকে স্থানীয় প্যারাডাইস সিনেমায় সাধারণ প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।

চলচ্চিত্রজগতে মানুষের কল্পনাশক্তি কতদূরে প্রসারিত হতে পারে, তার একটি উজ্জ্বলতম নিদর্শন হচ্ছে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স নিবেদিত "ফ্যান্টাস্টিক ভয়েজ"; এর কাহিনীকার হ্যারি ক্লীনার, জানা হয়, জুল্‌স্ ভার্ণ এবং এইচ, জি, ওয়েল্‌সকেও এ-বিষয়ে পরাস্ত করেছেন। তিনি বহির্বিশ্ব ত্যাগ করে আমাদের মানব দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে নিয়ে গেছেন। সেও এক আশ্চর্য জগৎ!

একজন চেক বৈজ্ঞানিক যুক্তরাষ্ট্রের শস্ত্র সেনাবিভাগে নিরাপত্তার কাজে লাগে, এমন একটি বিশেষ গোপন বৈজ্ঞানিক সূত্র (ফর্মুলা) বহন করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু পথের মধ্যেই ঘটল বিপদ। মোটর দুর্ঘটনায় বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কের গভীরে লাগল আঘাত; মস্তিষ্কের শোণিত কোষের মধ্যে গেল চাপ বেঁধে—যাকে বলে সেরেব্রাল থ্রম্বসিস। সাধারণ শল্যচিকিৎসা দ্বারা এ-ক্ষত সারাবার নয়—মস্তিষ্কের এত গভীরে যে, বাইরে থেকে অপারেশন করতে গেলে আহতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। স্থির হল, অপারেশন করতে হবে ভিতর থেকে। তখন "সি-এম ডি-এফ" (কম্বাইণ্ড মিনিয়েচার ডেটারেণ্ট ফোর্সেস)-এর সাহায্য নেওয়া হল। একটি বিয়াল্লিশ ফুট দীর্ঘ পরীক্ষামূলক পারমাণবিক সাবমেরিনে দুজন চালক, দুজন শল্যচিকিৎসক, একজন বৈদ্যুতিক গলনকারী (রুবি লেসার) এবং একজন মহিলা সহায়ককে ঢোকানো হল। এদের ঐ সাবমেরিন সমেত ক্রমে ক্রমে ছোট করে শেষ পর্যন্ত একটি বীজাণুর আকারে পরিণত করা হল এবং একটি হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের সাহায্যে রোগীর গলদেশস্থ প্রধান ধমনীতে প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হল। তার পর শুরু হল রক্তস্রোতবাহিত সাবমেরিনে চেপে বৈজ্ঞানিকদের অভিযান। শেষ পর্যন্ত এদের অভীষ্ট সিদ্ধ হল কিনা, মস্তিষ্কের থ্রম্বসিস ক্ষত চিকিৎসিত হল কিনা, তার উত্তর দিয়েছে ছবির রোমাঞ্চকর দৃশ্যগুলি।

এই কাল্পনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ছবিখানিকে সর্বাংশ দিয়ে যথাসম্ভব বিশ্বাস্য করে তোলবার জন্যে যে অসম্ভব আয়োজন করেছেন এর নির্মাতারা, তার তুলনা নেই। যে-ভাবে অপারেশন থিয়েটার, মিনিয়েচারাইজেসন স্টেজ, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, মনুষ্য দেহের অভ্যন্তরভাগ ইত্যাদিকে বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেওয়া হয়েছে, তার জন্যে প্রযোজক সল ডেভিড, পরিচালক রিচার্ড ফ্লিশার, শিল্পনির্দেশকদ্বয় জ্যাক মার্টিন স্মিথ ও ডেল হেনিসি এবং শিল্পবিষয়ক বিশেষ পরামর্শদাতা হার্পার গফ উচ্চ-প্রশংসালাভের যোগ্য।

সায়েন্স-ফিকশন সিনে ক্লাব সদস্যদের জন্যে এমন একখানি ছবির প্রাক্-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে একটি গৌরবময় ইতিহাস রচনা করলেন। —নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

বি, কে, প্রোডাক্‌সন্সের নবতম নিবেদন 'শুক-সারী'-র চিত্রগ্রহণ সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে চিত্ররূপায়িত এই ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পীযূষ বসু। এক গ্রাম্য সংগীত-শিল্পীর শিল্পসাধনা এবং তার ভাবাবেগময় গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ গ্রাম্য পটভূমিকায় ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। গ্রাম্য সংগীত-

শিল্পীর বিচিত্র চরিত্রটি চিত্ররূপায়িত করেছেন উত্তমকুমার এবং তার স্ত্রীর কঠিন ভূমিকাটিতে প্রাণসঞ্চার করেছেন অঞ্জনা ভৌমিক। অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় আছেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সুখেন দাস, অমর মল্লিক, প্রতিমা চক্রবর্তী, সাধনা রায় চৌধুরী, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

'শুক সারী' হবে এক নূতন স্বাদের সঙ্গীতরসপ্রধান ছবি। ছবিখানিতে প্রায় ২১খানি ছোট-বড় গান থাকবে। গানগুলি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, লীনা ঘটক, দেবী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং গানগুলি রচনা ক'রছেন মোহিনী চৌধুরী ও মুকুল দত্ত। সংগীত পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্র সম্পাদনায় আছেন অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিখানির একমাত্র পরিবেশক।

আর ডি প্রোডাকসন্সের রঙিন ছবি **'অভিলাষ'** আগামী মাসে মুক্তিলাভ করছে। অমিত বসু পরিচালিত এ ছবিতে রূপদান করেছেন নন্দা, সঞ্জয়, রেহমান, কাশীনাথ, সুলোচনা, আগা, তুনতুন ও জনি হুইস্কী। রাহুলদেব বর্মন ছবিটির সুরকার।

রাজেন্দ্রকুমার এবং ববিতা অভিনীত **'অঞ্জনা'** ছবিটির সংগীতগ্রহণ সম্প্রতি ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরীতে করেন সংগীত-পরিচালক লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল। ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন লতা মুঙ্গেশকর এবং মহম্মদ রফি। মোহনকুমার ছবিটির পরিচালক।

রক্তরেখায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও বিজয়া চৌধুরী

কাসানোভা ৭০ চিত্রে মারিসা মেল ও মার্সেল্লো মাস্ত্রোয়ানি

মঞ্চাভিনয়

অভিজ্ঞান

'বহুমুখী' সম্প্রদায় সম্প্রতি উপেন্দ্রনাথ গোপাধ্যায় রচিত 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসের াট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছেন 'বিশ্বরূপা'র ঞ্চে। নাট্যরূপ দিয়েছেন সুধামাধব চট্টো-াধ্যায়। বহুকাল পূর্বে রচিত এই াহিনীর যে অন্তর্নিহিত আবেদন তা াজকের বাস্তবচেতনাসমৃদ্ধ সাহিত্যে খুব বশী আছে বলে মনে হয় না। যে পট-ূমিকায় এই উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে তাও াজ বোধহয় পুরাতনের জীর্ণতায় ম্লান। াই কাহিনীগত স্বাতন্ত্র্য ও বিষয়বস্তুগত ভিনবত্বে এ নাটক দর্শকমনে কোন ালোড়ন তুলতে পারে নি। শিল্পীদের ংঘবদ্ধ অভিনয়ের সংহতির জন্য প্রযো-জনাটির নৈপুণ্য নাট্যানুরাগীকে মুগ্ধ করেছে। এ বিষয়ে নাট্যনির্দেশক সুধন রকার প্রশংসার দাবী রাখেন। তিনি এমন য়েকটি মুহূর্ত নাটকে এনেছিলেন যার ন্য নাটক অনেক পরিমাণে গতিশক্তি হাতে পেরেছিল।

প্রতিটি শিল্পীই চরিত্র উপলব্ধি করে আন্তরিকভাবে অভিনয় করবার চেষ্টা করেছেন। যাঁদের অভিনয় দর্শককে প্রথম আকৃষ্ট করেছে তাঁরা হোলেন অনল সরকার, অম্বিকা ভট্টাচার্য, অজিত মুখার্জি, হীরেন মুখার্জি, সন্তোষ রায়, কল্পনা ভট্টাচার্য, সুতপা ভট্টাচার্য। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সমীর মজুমদার, প্রভাস চট্টোপাধ্যায়, শঙ্করনারায়ণ, পশুপতি দে, নী সরখেল, নীলকণ্ঠ ব্যানার্জি, অজন্তা চৌধুরী।

দর্পণ-এর রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয়

সম্প্রতি দর্পণ নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের চতু-বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতাপ মারিয়াল মঞ্চে দুটি রবীন্দ্রনাট্য পরি-ন করলেন —পোস্টমাস্টার ও বশীকরণ। ন্দ্রনাথের ছোটগল্প পোস্টমাস্টারের নাট্যরূপ দিয়েছেন অগ্নিমিত্র। নাট্য-া অত্যন্ত সাবলীল এবং হৃদয়গ্রাহী। ভনয়ে রতনের ভূমিকায় কুমারী উমা হর চরিত্রসৃষ্টি দর্শকদের অভিভূত র। নাটকে গ্রাম্য কিশোরী রতনের যে ত্র সৃষ্টি করা হয়েছে উমা তার সঙ্গে াত্ম হয়ে গেছে। পোস্টমাস্টার চরিত্রে ঘোষের অভিনয় দর্শকমনে বিশেষভাবে াপাত করে। অন্যান্য চরিত্রে অশোক াক, নিমাই দাস এবং সুদাম রাহা সু-ভনয় করেন। শ্যামলী দাশগুপ্তের গয়-নী চরিত্রে অভিনয় অতি সুন্দর লেগেছে। তীয় নাটক বশীকরণ হাস্যরসাত্মক, এক ার এই নাটকের শিল্পীরা সারাক্ষণ কদের হাসিয়েছেন। অন্নদা, আশু এবং মোহিনী চরিত্রে যথাক্রমে অশোক বসাক, ঘোষ এবং শ্যামলী দাশগুপ্তের অভিনয় বন্ত এবং উচ্চাঙ্গের সন্দেহ নেই। ওয়ার্ক উত্তম। রাধাচরণের ভূমিকায় ন চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং ারণে জড়তা দেখা যায়। বাড়ীওয়ালা ে অজিত সেনের অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। দুটি নাটকেরই সঙ্গীতাংশ সুন্দর। বশীকরণে উমা গুহের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতটি চমৎকার। আলোক-সম্পাত অপেক্ষাকৃত ভালো হবার অবকাশ ছিল, উভয় নাটকই পরিচালনা করেন অজিত সেন এবং ক্ষেত্র অনুযায়ী অপূর্ব নাটরস সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। নাট্য নির্দেশনার ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা ও মুন্সীয়ানার ছাপ স্পষ্ট।

সাইকো হুইপ

সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে 'বাসবর ইউথ অ্যাসোসিয়েশনে'র শিল্পীরা 'সাইকো হুইপে'র সার্থক মঞ্চরূপ পরিবেশন করে রহস্য নাটকের প্রযোজনায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। রঞ্জিত বসু রচিত এই নাটকটির কাহিনীর সঙ্গে যদিও 'চেস এ ক্রুকেড স্যাডো'র কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তাহোলেও নাট্যকার অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক চিন্তার আভাস দিয়েছেন। কাহিনীটির মধ্যে সংঘাত একালীন মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই মুখর হয়ে উঠেছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নাট্যনির্দেশনায় ও প্রতিটি শিল্পীর আন্তরিক চরিত্রচিত্রনে নাটকটি প্রথম থেকে দর্শককে কৌতূহলী করে রাখে। নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দেন—সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ ঘটক, রবীন সান্যাল, কিঙ্কর রায়, সন্তোষ মজুমদার, অজয় চট্টোপাধ্যায়, সেবা দত্ত, শ্রীলেখা দত্ত।

বন্দর

কিছুদিন আগে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কলেজ স্ট্রীট শাখার কর্মিবৃন্দ 'স্টার' থিয়েটারে অভিনয় করলেন 'বন্দর' নাটক। অভিনয়ে ও আঙ্গিকে এ নাট্য-প্রযোজনা দর্শককে তৃপ্তি দিয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দেন—দীপক মজুমদার, অনিল দত্ত, অমর মুখোপাধ্যায়, রূপচাঁদ বড়াল, শিশির দাস, গোবিন্দলাল সাহা, মধুসূদন গোস্বামী, মোহনলাল মণ্ডল, অশোক দাশগুপ্ত, অজন্তা চৌধুরী, প্রতিমা পাল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্বেষার 'অতিথি' মঞ্চাভিনয়

১৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'অন্বেষা'-র প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'অতিথি'র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হল রাজাবাজারস্থ প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে। নাট্যরূপ ও নির্দেশনা স্বদেশ বসুর। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন সুধাশ্রী ভট্টাচার্য, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, শেলী বসু, প্রণতা নন্দী, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ রায়, স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, নিমাই দে ও গঙ্গাপদ বসু।

লৌহকপাট

মেখলীগঞ্জের প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'কালিন্দী'র শিল্পীরা সম্প্রতি 'লৌহকপাট' নাটকটি সার্থকভাবে পরিবেশন করেছেন স্থানীয় 'মনোমোহন নাট্যমঞ্চে'। কয়েকটি চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন দিলীপ সিংহ (বদর মুন্সী), সুবোধ চক্রবর্তী (ফকির), গীতা দাস (কুট্টি বিবি)। অন্যান্য সবাই চরিত্রানুযায়ী সুঅভিনয় করেন।

দো কলিয়া চিত্রে ওমপ্রকাশ, মালা সিন্‌হা এবং নিগার সুলতানা

বিবিধ সংবাদ

যাত্রা শিল্পী সংঘের লোকনাট্যাভিনয়

মহাজাতি সদনে ১৫ই আগস্ট বৃহস্পতিবার জন্মাষ্টমীর দিন রাত ১০টা (সারা রাত ব্রজেন দে'র 'বাঙালী' ও গোপাল রায়চৌধুরীর 'রামপ্রসাদ' অভি হচ্ছে। ফণী বিদ্যাবিনোদ, দিলীপ চ পাধ্যায়, পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, দে বন্দ্যোপাধ্যায়, তপনকুমার, সুজিত ভোলা পাল, তারা ভট্টাচার্য, শিব চার্য, গুরুদাস ধাড়া, খোকন বিশ মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, ফণী ভট্টা অনাদি চক্রবর্তী, গৌর অধিকারী, আ দাস, মহাদেব ঘোষ, জহর রায়, বি নাথ চৌধুরী, জ্যোৎস্না দত্ত, বী ঘোষ, শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, সীমা সরক শ্যামলী, বুলারাণী প্রভৃতি শিল্পীরা অ নয়ে অংশ গ্রহণ করবেন।

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইন্ডিয়া

অন্যান্য বছরের মত ইউথ পাপে থিয়েটার এবারেও শিশুদের জন্য আস ২৪ ও ২৫ আগস্ট সেন্ট লরেন্স হাইস্ক আবৃত্তি, রচনা লেখা ও অংকন প্র যোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। ৫ থেকে বছরের যে কোন ছেলেমেয়েরা প্রতিযো তায় নাম দিতে পারেন।

উদ্যোক্তারা জানান, বিজয়ী ছে মেয়েরা ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ তারিখে রবী সরোবর মঞ্চে ইউথ পাপেট থিয়েটারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাদের রচনা ও আ পরিবেশন করার সুযোগ পাবে। তা তারা যথারীতি পুরস্কার ও প্রশং পাবে। প্রবেশপত্র প্রায় সকল স্কুলে প হয়েছে। ১৬ আগস্ট জমা দেবার শেষ ধার্য হয়েছে।

সস্ত্রীক কিষণ
মহারাজ

জলসা

রীতাম্বরা

রবীন্দ্র সদনে সঙ্গীত শ্যামলা পরিবেশিত "রীতাম্বরা" গত কয়েক দিনের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বই ছিল এই নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য। আত্মা অথবা ব্রহ্ম—তথা সৃষ্টিসত্তার ঊর্ধ্বতম চেতনার উপলব্ধির বেদনা সংগ্রাম ও আনন্দের চিত্রই এই নৃত্যনাট্যের পরিবেশিতব্য বস্তু। সৃষ্টির পূর্বে গতিহীন স্থান-কালহীন নির্বিকার ব্রহ্মের অখণ্ড অধিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। সেই এক এবং অদ্বিতীয়মের বহু হবার বাসনাই সৃষ্টির কারণ। এই বর্ণসম্ভারসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির উৎস হলেন সেই নির্গুণ, নিরঞ্জন ব্রহ্ম। সেই একের বহু হবার বাসনাতেই সসাগরা ধরিত্রী ছয় ঋতু, রাগরাগিনী, জড় ও চেতন বস্তুর এই অভিনব সমাবেশ এবং সৃষ্টির ধারাকে প্রবহমান রাখবার উদ্দেশ্যেই অর্ধনারীশ্বর তথা দ্বৈতসত্তার অবতারণা। প্রথম যুগে শান্তি আনন্দ, রং ও রসের উৎসবে পৃথিবীটাই হয়ে উঠল স্বর্গ। কিন্তু এতবড় পূর্ণতায়ও মানুষের তৃপ্তি নেই। আত্মধ্বংসী আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের মত্ততা তাকে পেয়ে বসল। এই অবিদ্যা বা মায়ার প্রলোভনে বিজ্ঞান তথা তাৎক্ষণিক সুখসাধনের উদ্ভব? কিন্তু এই ক্ষণভঙ্গুর আনন্দ আত্মাকে শান্তি দিতে পারে না—তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হাহাকার, অনটনের নিষ্ঠুর আক্রমণ, অসন্তোষের বিষে সৃষ্টি টলমল। বাসনা-তাড়িত, ক্ষুব্ধ বহির্মুখী মানুষ তখন অন্তর্লোকে শাশ্বত কল্যাণ-বুদ্ধির আলোয় সুরু করে আপনাকে জানার তপস্যা; তার ফলে "সোঽহং ব্রহ্মের" উপলব্ধি এবং অন্তরাত্মার চেতনার আলোয় তার মহৎ রূপান্তর।

এই দর্শনভিত্তিক কাহিনীকে নৃত্যে, গানে সংলাপে দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত করার দায়িত্ব সঙ্গীত শ্যামলার শিল্পীরা মোটের ওপর বেশ সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন বলা যায়। প্রকৃতির রূপ ও ভাব শ্রীমতী মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরীর নৃত্য ও অভিনয়ে সুবিশেষিত। শ্রীমতী রায়চৌধুরী নৃত্যশিল্পীসুলভ তন্বী এবং লঘুছন্দী দেহের অধিকারিণী না হলেও তার ছন্দরূপায়ণ এবং ভাববিস্তারে প্রাঞ্জলতা ও সুষমার দৈন্য ছিল না। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে শিবশঙ্করণ, চেতন তেওয়ারী, নরেশকুমার তাদের নৃত্যে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নৃত্যের ভাষায় ছয় ঋতুর আবির্ভাব ও তিরোভাবের পরিকল্পনাটি কাব্যময়। সজ্জাপরিকল্পনা ভাবোপযোগী তবে কোন কোন শিল্পীর সজ্জায় অধিকতর শালীনতার অবকাশ ছিল।

বিজ্ঞানগর্বী মানব ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব উদয়শঙ্করের 'লেবার ও মেশিনে'র আঙ্গিককে মনে করিয়ে দিয়েছে বারবার। ভারত-নাট্যমের আঙ্গিক অধিকাংশ নৃত্যরচনার কেন্দ্রবিন্দু করে মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্যে যোগদানকারী শিল্পীরা সকলেই ঠিক নৃত্যশিল্পী নন, কিন্তু তাঁদের কাজ চালাবার উপযোগী করে গড়ে নিয়ে নৃত্য বস্তুকে সামগ্রিক সার্থকতায় পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব অবশ্যই শ্রীমতী রায়চৌধুরীর প্রাপ্য। সঙ্গীত পরিচালনায় রাগসঙ্গীতের শুদ্ধ, সুন্দর ব্যঞ্জনায় বিষয়বস্তুর উপযুক্ত পটভূমিকা রচনা করেছেন শ্রীরবি রায়চৌধুরী। তবে কিছু রাগ ঠিক উপযুক্ত ভাবের আধারে পরিবেশিত নয়। কিন্তু রবি কিচলু ও সোম তেওয়ারীর পরিশীলিত কণ্ঠে মার্গ-সঙ্গীতগুচ্ছ সত্যিই উপভোগ্য বস্তু হয়ে উঠেছিল। এ সব ছাড়াও সিনেমাস্কোপ, মুহুর্মুহু আলোকের বর্ণপরিবর্তন, মঞ্চজুড়ে প্রকৃতির রূপরচনা ইত্যাদি চমকপ্রদ উপাদানের সমাবেশ সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে বেশ জমজমাট করে তুলেছিল। সোম তেওয়ারীর কণ্ঠে নেপথ্যচারী বিষয়বর্ণন নাট্যভাবকে পরিস্ফুট করে তুলতে সাহায্য করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রথম থেকে শেষ অবধি রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরের উপস্থিতিতে শিল্পীরা প্রচুর উৎসাহিত হয়েছেন।

সেতারে নবাগতা তরুণ শিল্পী

জলসাঘরের জলসায় এক নবীন সেতারবাদিকার দেখা পাওয়া গেল। শ্রীমতী সবিতা মহারাজ, খ্যাতনামা প্রবীণা শিল্পী শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কন্যা এবং সুবিখ্যাত তবলাবাদক বেনারসের কিষণ মহারাজের পত্নী। ইনি শিক্ষালাভ করেছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং লালমণি মিশ্রের কাছে।

শ্রীমতী মহারাজ 'পূরিয়া কল্যাণ' রাগে আলাপ, জোড়, ঝালা এবং গৎ বাজিয়ে শোনালেন। আলাপ-পদ্ধতি সুবিন্যস্ত—মাঝে যদি বা কিছু অসংবদ্ধতা থেকে থাকে তাকে গুছিয়ে আনবার মত

[illegible] ও [illegible] অভাব ঘটেনি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাজাতে হলে একেবারে [illegible] কারিগরী [illegible] [illegible] [illegible] নিজস্ব [illegible] দেখানো সম্ভব নয়। [illegible] [illegible] হয়ে উঠেছিল সেতার অনুসারী [illegible]। তবে [illegible] মহারাজের আত্মবিশ্বাস, দক্ষিণ হস্তের বাজ ও বাজনার মেজাজ উপস্থিত গুণীজনের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন আদায় করে নিতে পেরেছে।

এর পরে কণ্ঠসংগীতের অনুষ্ঠানে ছিলেন আগ্রা ঘরানার শিল্পী বিজয় কিচলু ও রবি কিচলু। রাগ মালকোষ। এই ঘরানার রূপদী রীতিতে "তোম্-নোম্" ইত্যাদিতে সংক্ষিপ্ত আলাপের পর গান ধরলেন মধ্যলয়ে। এ পদ্ধতিতে অনেকেই গেয়ে থাকেন আলাপের পর বিলম্বিতের একঘেয়েমো এড়াবার জন্য।

রবি কিচলুর দরাজ ও গম্ভীর কণ্ঠে গমকের অনুরণন এবং বিজয় কিচলুর সূক্ষ্ম কণ্ঠের সুরেলা সাপট সুশৃংখল বিস্তার একক এবং যুগ্মভাবে উপভোগ্য হয়ে রাগমূর্তি রচনা করেছে। আর একটি বৈশিষ্ট্য হোল "পগ ঘুঙরু বাঁধ মীরা নাচিরে"—গোয়ালিয়র ঘরানার শিল্পীরা ভজনের সংগে গেয়ে থাকেন। এঁরা গাইলেন খেয়ালের সংগে। তবলাসংগতে তরুণ শিল্পী শ্রীপ্রকাশ মহারাজ তাঁর প্রতিশ্রুতিপূর্ণ রেওয়াজের স্বাক্ষর রেখেছেন।

কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের মনোজ্ঞ আসর

কিছুদিন আগে সাউথ সিঁথির এক সংগীতাসরে শ্রীরবীন ঘোষের 'বেহালা' বাদনে শিল্পীর অধ্যবসায়জাত দ্রুত অগ্রগতি আমাদের আনন্দ দিয়েছে। বর্ষার পটভূমিকার সংগে মিলিয়ে ইনি আলাপ বাজালেন "মিঞা কি মল্লার" রাগে। গৎ বাজালেন "কিরবাণী"তে।

সীমিত পরিসরের মধ্যে আলাপের বাঁধন সুগ্রথিত। গতের সংগে শিল্পীর সুরেলা ছড়, বলিষ্ঠ তান ও তেহাই ইত্যাদি আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মৌলিক চিন্তাধারার নিদর্শন ছিল প্রচুর যা আগের বাজনায় শোনা যায়নি। দাক্ষিণ ভারতীয় রাগে উত্তর ভারতের অলংকৃত ঐশ্বর্য রাগের মনোহারিত্ব বৃদ্ধি করেছে। তবে অনুষ্ঠানটির দৈর্ঘ্য আর একটু কম হলে বাজনা ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠত। তবলাসংগতে বিশ্বনাথ বোসের সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীঅনিল বোস বোল ও রেলায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অনুষ্ঠান প্রারম্ভে শ্রী[illegible]নাথ দাসের শুদ্ধ কল্যাণ সুপরিবেশিত।

রাগসংগীতে আরতী মুখোপাধ্যায়

জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায় আধুনিক গানের শিল্পী হয়েও রবীন্দ্রসংগীতের ভাববিস্তুর যথাযথ রূপায়ণে সংগীতরসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার নতুন এবং সমৃদ্ধতর বিকাশ ঘটেছে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রামোফোন কোম্পানীর একটি ই, পি রেকর্ডের চারখানি রাগসংগীতে।

আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ স্বভাবতঃই মধুর এবং উচ্চগ্রামী। গায়নশৈলীরও একটি মৌলিক আবেদন আছে। এর সংগে মিলেছে অতুলনীয় সারেংগীবাদক মহম্মদ সগীরুদ্দীনের নিকট নিয়মিত রাগসংগীত-শিক্ষা এবং স্বকীয় অনুশীলনীজাত পরিমার্জিত শুদ্ধ স্বরপ্রয়োগ। প্রতিটি গানই গীতিকাব্যের সীমার মধ্যে রাগাভাসের চকিত ইসারায় এক রসসমৃদ্ধ অনুভবের সৃষ্টি করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। "বহুপথ ভেঙে" এবং "নয়নে নয়ন রেখে" ভৈরবী ও পিলুর কখনও উদাস কখনও মধুর রসের স্পর্শে যেমন রঙিন হয়ে উঠেছে তেমনই চিত্তকর্ষী হয়েছে "ও দরদীয়া" ছন্দের উচ্ছলনৃত্য। শুদ্ধ হংসধ্বনি রাগভিত্তিতে পরিবেশিত "আজ জাগে সুরতরংগ" তানসৌকর্যে সরগমের সুস্পষ্ট পর্দায় কণ্ঠ সঞ্চালন এবং লয়দক্ষতায় উচ্চাংগসংগীতের পর্যায়ে স্থান করে নেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। শ্রীমতী মুখার্জির ধৈবত গন্ধারের শুদ্ধ শ্রুতি মুগ্ধ না করে পারে না।

এই চারটি সুন্দর গানের অনেকখানি কৃতিত্ব সুরকার ও সংগীত-পরিচালক মহম্মদ সগীরুদ্দীনের প্রাপ্য তিনি ছাড়াও যাঁরা কথা ও সুররচনায় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন রবি প্রশান্ত ও ভবেশ গুপ্ত।

রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ডে চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীতের তরুণতর শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তার সম্প্রতি প্রকাশিত এইচ, এম, ভি লেবেলের রেকর্ডে দুটি রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতাদের অবশ্যই আনন্দ দেবে। গান দুটি হোল "আমি কেমন করিয়া জানাব" এবং "এই শ্রাবণের বুকের ভিতর"। পরিশীলিত কণ্ঠে উপযুক্ত ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত চেনা সুরে গাওয়া দুটি গানে শিল্পীর নিষ্ঠা ও শিক্ষার স্বাক্ষর সুপরিলক্ষিত। আর একটি আকর্ষণ হোল গান দুটি শোনামাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ বলে ভুল হয়. কিন্তু একটু মন দিয়ে শুনলে শিল্পীর আপন বৈশিষ্ট্যও অনুভব করা যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ভক্ত সংখ্যা অগণিত। অতএব গানটি জনপ্রিয় হবার এটিও একটি আকর্ষণীয় কারণ হয়ে উঠতে পারে।

ঘণ্টাটি কার গলায় [illegible] ?

অজয় বসু

মনের মতো ফরোয়ার্ড নাই। হাতের
হু যাঁরা রয়েছেন তাঁরা তেমন উপযুক্ত
—মারদেকা ফুটবল উপলক্ষে ভারতীয়
গড়ার ঠিক আগেই নির্বাচকমণ্ডলীর
ন সদস্য এবং দলের মুখ্য প্রশিক্ষক
তীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক
ামধন্য শ্রীশৈলেন মান্না) সখেদে এবং
ামকণ্ঠে বাস্তব পরিস্থিতিটা স্মরণ করে-
লেন।

যে উপলব্ধি সাচ্চা, ও'দের, আমাদের,
টবল অনুরাগী দর্শকদের, সকলেরই,
ার মারপ্যাঁচে বা বিনি কথার ঘেরাটোপে
ই উপলব্ধিকে আর ঢেকে না রেখে সত্যকে
রা খোলাখুলি প্রকাশ করে দিয়েছেন।

এ সত্য অবশ্য এতদিন অপ্রকাশ ছিল
। সমালোচক, সাংবাদিকদের কলমের
গায় এ সত্য প্রায় প্রতিদিন পাঠকদের ও
মুখো সাধারণ দর্শকদের দৃষ্টির সামনে
সছিল। তবে লেখনীতে এবং দর্শকদের
চকিত কণ্ঠে যে ধ্বনি ছিল এত দিন
াচ্চার, প্রশিক্ষক ও নির্বাচকদের ভাষায় তা
জ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। পুরানো মতটা
াং যেন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আদায়
াতে পেয়েছে আজ।

কিন্তু ও'দের এই স্বতঃস্ফূর্ত গলা-
জীর কারণ কি? হঠাৎ এক অপ্রিয় সত্য-
বণের সূত্রে প্রশিক্ষক ও নির্বাচকেরা কি
হকই 'স্টান্ট' জাগাতে চাইছেন? না, তাঁরা
রই নিয়েছেন যে, মারদেকা ফুটবলের
াসন্ন অনুষ্ঠানে আগের আগেরবারের মতো
ারও ভারত সুবিধে করতে পারবে না।
াই আগে-ভাগে এক জুৎসই কৈফিয়তের
রো তুলে সমালোচকদের মুখে চাবিকাঠি
াটার নতুন ফিকির খুঁজছেন।

শুধু 'স্টান্ট' জাগানোই যদি উদ্দেশ্য
় তাহলে মানতেই হবে যে ও'রা কিছুটা
ফল হয়েছেন। কারণ, ও'দের কথা শুনে
উ কেউ ইতিমধ্যে বিশ্বাস করতে চাইছেন
। মুখ্য প্রশিক্ষক আর নির্বাচকেরা খাঁটি
াটি সত্যকেই পুরোপুরি প্রকাশ করে
য়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি ও'রা পুরো
ত্যকে প্রকাশ করেছেন? করেন নি।

তেমন ফরোয়ার্ড নেই, এ উপলব্ধি যেমন সত্য, তেমনি সত্য জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের হাল যাঁরা ধরে আছেন তাঁদের দক্ষতা ও সফলতা প্রশ্নাতীত নয়। প্রশ্ন তাই, তেমন ফরোয়ার্ড না হয় নেই, কিন্তু তেমন প্রশিক্ষক আছেন তো? যাঁরা হাতে-কলমে তেমন ফরোয়ার্ড গড়তে পারেন?

শিখারা কিস্সু নয়, যে গুরু মুখে মুখে এই কথা প্রচার করেন তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতিতেও যে কিস্সু কাজের নিশানা নেই, একথাটিও গুরুর মুখের ওপর স্বচ্ছন্দে ছুঁড়ে দেওয়া যেতে পারে না কি? কথাটি ছুঁড়ে দিয়েই আমি বলতে চাই যে, মুখ্য প্রশিক্ষক আর নির্বাচকেরা স্টান্ট জাগাতে আজ যে অভিমত প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন তাতে আধখানা সত্যের মর্যাদা রক্ষা পেয়েছে। বাকী আধখানাকে ও'রা ঢেকে রেখেছেন নিজেদের কৃতকর্মের মুখ ঢাকতে। বাকী আধখানা সত্য এই যে, ভারতীয় দলের শিক্ষাভার নিয়ে যাঁরা প্রশিক্ষক সেজে রয়েছেন তাঁরাও ওই অকেজো ফরোয়ার্ডদের মতোই নির্গুণ। মাস্টার ভাল না হলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশমার্ক পাবার আশাই বা কোথায়!

যে নির্বাচকেরা আজ অপরাধের ঘণ্টাটিকে সোৎসাহে ফরোয়ার্ডদের গলায় ঝুলিয়ে দিতে চাইছেন, তাঁরাই বা ফরোয়ার্ডদের খেলার ধার বাড়াতে কোন কার্যকর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন? অথবা যাঁদের খেলায় কিঞ্চিৎ ধার আছে এমন ফরোয়ার্ডদের আবিষ্কার করে নিতে কতোটা উদাম দেখিয়েছেন? কিছুই তাঁরা করেন নি। উল্টে যাঁদের ধার নেই ভবিষ্যতে যাঁদের খেলা ধারালো হয়ে উঠতে পারবে না, যাঁদের প্রাপ্য ঝাড়াই, ছাঁটাই হয়ে যাওয়াই, বছর বছর তাঁদের বেছেই দলভারী করে নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করেছেন। অথচ এরাই আজ ফরোয়ার্ডদের দুষছেন। ভারী সৎসাহস ও'দের! খেলোয়াড়দের মুখ খোলার রাস্তা নেই। তাই নিজেদের আয়নার সামনে না ধরে ও'রা কতকগুলি নির্বাক, নিরীহ মানুষকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ভাবি, কবে আমরা ওই জায়গাটাতে যাঁদের থাকা উচিত তাঁদেরই ধরে-বেঁধে নিয়ে আসতে পারবো।

আরও কথা, জাতীয় দলের বিদেশ সফরের ঠিক আগে দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রশ্ন তুলে দলের খেলোয়াড়দের মুণ্ডকাণ্ডে ঝুলিয়ে দেওয়াও নির্বাচক ও প্রশিক্ষকের পক্ষে সুরুচির পরিচায়ক নয়। তাঁরা নিজেরা যে কমপ্লেক্সে ভুগছেন, এই পরিচয়েই তা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। মুখ্য প্রশিক্ষক ও নির্বাচকদের কমপ্লেক্স যখন এতো বেশী তখন খেলোয়াড়দের পিঠ চাপড়ে অনুপ্রাণিত করবেন কে? এর চেয়ে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনাটিকে বাতিল করে দেওয়াই কি শ্রেয় বিবেচিত হোতো না? হারের আগে হেরে যাওয়ার ভয়ে কুঁকড়ে যাঁরা নানা রকমের অজুহাত দেখাতে উৎসাহিত হয়, তাঁদের নিজেদের কাঁধ ও বুক, কোনোটিই চওড়া নয়। তাঁদের পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে যাঁরা খেলবেন তাঁরাই যে সাহসে ভর করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন, এমন নিশ্চয়তাই বা কোথায়!

তবে এতো কথা বলার পরও আসল কথা কিন্তু থেকেই গেল। আসল কথা এই যে, পুরোভাগের বেহিসেবী ও ভোঁতা খেলাই হলো আজ ভারতীয় দলের চলার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ফরোয়ার্ডরা দ্রুত রাস্তা চিনে গোলের নাগালে পৌঁছতে পারছেন না। আর না হয় নাগালে পৌঁছেও স্থির সটে লক্ষ্য ভেদ করতে পারছেন না। ঘাটতি দক্ষতার। দায়িত্ববোধের।

হারজিতের আসরে জেতার পুঁজি সঞ্চয়ের ভার যাঁদের ওপর তাঁদের দায়িত্ব পালনের নমুনা যদি এই হয় তাহলে কোন্ মূলধন বিনিয়োগে ভারতীয় ফুটবল আন্তর্জাতিক আসরে বায় এশীয় ফুটবলের সীমিত সঙ্কুচিত মাঠে নৈকষ্য কুলীনের ভূমিকা নিতে পারবে?

সাধারণ হিসেবে একটি ফুটবল দলে এগারোজন খেলোয়াড় দুভাগে বিভক্ত হয়ে মূলতঃ দু ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এক ভাগ রক্ষণব্যূহ আগলান। অন্য ভাগ বিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করতে এগোন নিজেদের আক্রমণ গড়ে, হাতের হাতিয়ারে আরও শান দিয়ে।

দমদম বিমান ঘাঁটিতে কর্মকর্তা এবং রেফারীসহ কোয়ালালামপুরগামী ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়বৃন্দ

একটি শাখার মূল কাজ বাধা দেওয়া, অন্য পক্ষকে ঠেকানো, তাঁদের গঠনমূলক প্রয়াসকে তচনচ্ করে দেওয়া। অন্য শাখার কাজ ঠিক উল্টো। তাঁরা ভাঙেন না গড়েন। সামনে সাজানো বিপক্ষের বাধা, সেই বন্ধন ছিঁড়ে তাঁরা এগিয়ে যান।

এই বাঁধন ছেঁড়ার কাজটি কিন্তু অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাই দরকার পড়ে বাড়তি মূলধনের—সৃজনধর্মী ক্রীড়া-নিপুণতার। যে তরকিব আয়ত্তে না থাকলে রক্ষণভাগের যদিও বা চলে, পুরোভাগের খেলোয়াড়দের কিন্তু তা বিনে এতোটুকু চলার উপায় নেই। আমাদের দেশে আজকাল কোচিংয়ের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অনুশীলনেরও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু শিক্ষাগেহে সৃজনধর্মী প্রকরণের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরোভাগের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত দক্ষতা বাড়াবার ওপর জোর দেওয়া হয় কিনা কে জানে!

ক্যাম্প থেকে ফেরা নামী নামী খেলোয়াড়দের দিনের পর দিন খতিয়ে দেখেও বোঝা যায় না যে সৃজনধর্মীতাব প্রভাবে তাঁরা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছেন। ঘাটতি কোথায়? শুধু কি খেলোয়াড়েরই না শিক্ষণ ব্যবস্থাও এর জন্যে দায়ী? অপরাধের ঘণ্টা কাকে বাদ দিয়ে কার গলায় ঝোলাবো?

ফরোয়ার্ডেরা নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়া করেন। বিপক্ষের ছায়া এড়িয়ে 'ওয়াল পাসিংয়েও' তাঁরা বেশ রপ্ত। কিন্তু যেই গোল লক্ষ্য করে স্থির সট নেবার অথবা ড্রিবলিংয়ে বা বল পায়ে আচমকা গতি বাড়িয়ে বিপক্ষের একজনকে কাটিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাবার ডাক পড়লো অমনি তাঁরা যেন অনিশ্চয়তার গোলকধাঁধায় ঘুরতে লাগলেন। মাঠ যখন ছোট হয়ে আসে, বিপক্ষের রক্ষণব্যূহের সংকুচিত বাঁধন যখন আরও আটোসাটো হয়ে পড়ে, তখনই এই অবস্থা চরমে ওঠে।

শুধু বল পাস করে তখন আর বিপক্ষের বাধাকে এলোমেলো করে দেওয়া যায় না। কারণ বিপক্ষের রথীরাও তখন কাছাকাছি, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রক্ষণ ব্যবস্থার ফাঁক-ফোকরগুলিকে আগলে নেন। তাই ফরোয়ার্ডদের লোক টানতে হয় কাছে। যেহেতু একজনকে টানতে পারলেই রক্ষণব্যূহের অন্য এক জায়গায় আলগা পড়ার সম্ভাবনা। ড্রিবলিংয়ের ধারে বাধা কেটে নতুন করে ওপক্ষের রক্ষণব্যূহকে ফাঁক করে দিতে হয়। এ সব কাজ বুদ্ধি, গতি ও রীতিমতো দক্ষতা সাপেক্ষ। শুধু বল ঠেলাঠেলি করে পাসিংয়ে যন্ত্রবৎ নিখুঁতত্ব অর্জন করা যেতে পারে: কিন্তু জীবন্ত খেলায় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা সামাল দেবার মন্ত্র যন্ত্রও জানে না। জানে সক্রিয় মস্তিষ্ক।

আমার প্রস্তাব তাই, ভারতীয় ফুটবলারদের মস্তিষ্কের ধার বাড়াবার জন্যে শিক্ষাভূমিতে সাধনা করা হোক্। মস্তিষ্ক সক্রিয় হলেই দেহ সচল হবে, গতি তৎপরতার পুঁজি বাড়বে। তখন ফুটবলের প্রথাপ্রকরণও সহজেই অধিগত করা যাবে। এবং তা করা সম্ভবপর হলে নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদেরও কপাল চাপড়ে বলতে হবে না যে, তেমন ফরোয়ার্ড একজনও নেই! না থাকার আক্ষেপ নিশ্চয় হবে সেই দিনই, তার আগে নয়।

মস্তিষ্ক আর খেলার ধার কি করে বাড়তে পারে তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে প্রশিক্ষক, নির্বাচক ও ক্রীড়া সংগঠকদের। আজ যাঁরা আমাদের ফুটবলের প্রশাসনিক কাঠামোয় রাজা উজীর সেজে বসে আছেন, তাঁরা যদি উপায় বাৎলাতে না পারেন তাহলে তাঁদের সরে গিয়ে অন্যদের জন্যে পথ করে দেওয়া উচিত।

উচিত, বলছি বটে, কিন্তু এও জানি যে এই উচিত কাজে হাত পড়ার আশা খুবই ক্ষীণ। কারণ, উচিত কাজে হাত পড়লেই অনেকের মোড়লী করার অধিকার বেহাত হয়ে যাবে। ছোট ছোট স্বার্থের পেছনে যাঁরা অহোরাত্র ঘুরে বেড়ান তাঁরা হঠাৎ সে অধিকার হারাতে চাইবেনই বা কেন? তাঁরা চাইবেন অন্যের নাকের ডগায় ছড়ি ঘুরিয়ে নিজেদের গায়ে বাতাস লাগাতে।

তাই আজ জাতীয় ফুটবল দলের প্রশিক্ষক ও নির্বাচকেরা খেলোয়াড়দের দুয়ো দিয়ে নিজেদের দোষ ঢাকতে চান। ছড়ি ঘোরাবার লোকের কোনো অভাব নেই। অভাব, সত্যিকারের কাজে হাল ধরা লোকের। সে অভাব যতোদিন না মিটবে ততোদিন ভারতীয় ফুটবলের ভাঙা কপালে জোড়াও লাগছে না।

দমদম বিমান ঘাঁটিতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে কাপ বিজয়ী এরিয়ান্স ক্লাবের খেলোয়াড়বৃন্দ

খেলাধুলা

দর্শক

ণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে ফুটবল কাপ

াগাতে আয়োজিত 'ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে কাপ' প্রতিযোগিতার ফাইনালে ন্স ক্লাব ২—০ গোলে গত বছরের জয়ী আসাম পুলিশ একাদশ দলকে ত করার সূত্রে কলকাতার ফুটবল দের পক্ষে এই কাপ জয়ের প্রথম লাভ করেছে। দেবী দত্ত বিজয়ী দুটি গোলই দেন—খেলার ১৭ এবং ৩১ মিনিটের মাথায়। এরিয়ান্স য়ার্টার ফাইনালে আসাম রাইফেলস ২—০ গোলে এবং সেমিফাইনালে র প্রখ্যাত লিডার্স ক্লাবকে ১—১ ১ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ।

ই এফ এ শীল্ড (১৯৬৮)

৬৮ সালের আই এফ এ শীল্ড গিতায় ৩২টি দল নিয়ে খেলার তৈরী হয়েছে। আই এফ এ-র পক্ষ ঘাষণা করা হয়েছে, আগামী ২৩শে প্রতিযোগিতা শুরু হবে এবং সেপ্টেম্বর ফাইনাল খেলা হবে। আই । এই ঘোষণার মধ্যে জনসাধারণের শী আস্থা নেই। 'মা আঁচালে নেই'—এই রকমের মনোভাবই জন-সাধারণ আই এফ এ সম্পর্কে পোষণ করে থাকেন। ১৯৬৭ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালের চূড়ান্ত মীমাংসা আজও হয়নি—মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের ফাইনাল খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছিল। সুতরাং পুনরায় এই দুই দলের খেলার ব্যবস্থা করে অথবা উভয় দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করে প্রতিযোগিতার একটা ফয়সালা করা যেত। কিন্তু এই দুইয়ের কোনটাই হয়নি। গত ২১ বছরে (১৯৪৭-৬৭) আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়ার নজির আরও আছে।

১৯৬৮ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় বাংলার বাইরের দলের সংখ্যা ১০টি— আর্টিলারী সেন্টার (হায়দরাবাদ), কটক কমবাইন্ড, ৫৮ নং গোর্খা ট্রেনিং সেন্টার (দেরাদুন), হরিয়ানা এফ এ, আর্মি অর্ডিন্যান্স কোর (ত্রিমুলখেরী), বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (পাঞ্জাব), মহীন্দর এন্ড মহীন্দর (বোম্বাই), জামসেদপুর ফুটবল এসোসিয়েশন, এ এস সি সাউথ (বাঙ্গালোর) এবং মধ্যপ্রদেশ ফুটবল এসোসিয়েশন। প্রথম রাউন্ডে খেলবে ৮টি দল। সরাসরি তৃতীয় রাউন্ডে খেলবে এই চারটি দল— মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং এবং পাঞ্জাবের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। এই চারটি দল যদি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় জয়ী হয় তাহলে একদিকের সেমিফাইনালে খেলবে ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং এবং অপরদিকের সেমিফাইনালে মোহনবাগান এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৬৮ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ফিরতি খেলার ব্যবস্থা নেই। তবে কাটছাট করে একটি বিকল্প ব্যবস্থা হয়েছে—লীগ তালিকার প্রথম চারটি দল নিয়ে ফিরতি লীগ খেলা—যার গালভরা নাম 'সুপার লীগ' খেলা। বর্তমানের লীগ তালিকার মাথার দিকের প্রথম চারটি দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্স 'সুপার লীগে' খেলবে। এই চারটি দলের চৌদ্দটি করে খেলা পূর্ণ না হলেও বর্তমান পয়েন্টের জোরেই তারা সুপার লীগে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

আই এফ এ শীল্ড খেলার শেষে প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ নির্ধারণের

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন প্রখ্যাত ভারতীয় এ্যাথলীট পারভিন-কুমারকে ১৯৬৭ সালের 'অর্জুন' পুরস্কার বিতরণ করছেন। ৮ই আগস্ট তারিখে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের মোট ১৫জন খেলোয়াড় এইভাবে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে অর্জুন পুরস্কার লাভ করেছেন।

জন্যে এই চারটি দল নিয়ে সুপার লীগ খেলা হওয়ার কথা আছে। যদি কোন কারণে তা না হয় তাহলে জনসাধারণের আক্ষেপ করার কি আছে—এ রকম ব্যাপার তো তাদের গা সওয়া হয়ে গেছে।

ব্রায়ান স্ট্যাথাম

ল্যাংকসায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক জন ব্রায়ান (জর্জ) স্ট্যাথাম কাউন্টি ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিচ্ছেন। ১৯৬৮ সালের কাউন্টি খেলাই তাঁর শেষ খেলা।

ব্রায়ান স্ট্যাথাম ইংল্যান্ডের পক্ষে ৭০টি টেস্ট ম্যাচ খেলে ২৫২টি উইকেট পেয়েছেন (গড় ২৪-৮২)। টেস্ট ক্রিকেটে মোট উইকেট পাওয়ার তালিকায় তাঁর স্থান দ্বিতীয়—ইংলন্ডের ফ্রেডী ট্রুম্যানের ৩০৭ উইকেটের পরই তাঁর ২৫২টি উইকেটের স্থান। এই তালিকার তৃতীয় স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো— ৬৩টি খেলায় ২৪৮ উইকেট (গড় ২৭-০৩)। টেস্ট ক্রিকেটে স্ট্যাথামের বোলিং পরিসংখ্যানঃ খেলা ৭০, বল ১৬০২৬, মেডেন ৫৯০ এবং ৬২৫৭ রানে ২৫২টি উইকেট। এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন ৯ বার এবং একটা খেলায় ১০ বা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন একবার। ক্রীড়াচাতুর্যের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৬৬ সালে সরকারী সি বি ই খেতাবে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। স্ট্যাথাম তাঁর শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওভালে।

কাউড্রের ১০০ টেস্ট ম্যাচ

মাইকেল কলিন কাউড্রে (ইংল্যান্ড)

গত জুলাই মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট খেলার সূত্রে যে ১০০টি টেস্ট ক্রিকেট খেলার দুর্লভ গৌরব লাভ করেন সে খবর আজ কোন ক্রিকেট অনুরাগীর অজানা নেই। ইংল্যান্ড এবং ভারতবর্ষ সমেত বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রগুলিতে কাউড্রের এই কৃতিত্ব ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। কারণ একজন খেলোয়াড়ের জীবনে ১০০টি টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলার নজির এই প্রথম। এই উপলক্ষে কাউড্রে স্বদেশে বিপুলভাবে সম্বার্ধনা লাভও করেছেন। কিন্তু কষ্টিপাথরে তাঁর এই ১০০টি টেস্ট ম্যাচ পরীক্ষা করলে কিছু খাদ বের হবে। কাউড্রের ১০০টি টেস্ট খেলা প্রসঙ্গে আজ যাঁরা আপত্তি তুলেছেন তাঁদের যুক্তি উড়িয়ে দেওয়ার নয়। তাঁদের বক্তব্য, কাউড্রে যে ১০০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন তার মধ্যে আছে সরকারী টেস্ট ৯৭টি এবং বে-সরকারী টেস্ট ৩টি। কাউড্রে তাঁর এই তিনটি বে-সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৬৫ সালে। যে ক্ষেত্রে বে-সরকারী টেস্ট খেলার গুরুত্ব অনেক কম এবং টেস্ট ক্রিকেট বলতে শুধু সরকারী টেস্ট খেলা নির্দেশ করে, সেক্ষেত্রে কোন খেলোয়াড়ের সরকারী এবং বে-সরকারী টেস্ট খেলার পরিসংখ্যান একত্র করে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর সাফল্য হিসাবে প্রচার করা নিশ্চয় সঙ্গত নয়। এ প্রসঙ্গে ইংরেজি ভাষায় বহুপ্রচলিত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য আছে—'দিস ইজ নট ক্রিকেট'। সময় অনিয়মে যেমন বিরুদ্ধ আচরণ, অশোভন নীতিবিরুদ্ধ কাজ সম্পর্কে প্রতিবাদ, অতৃপ্তি এবং অসন্তোষ জানাতে ইংরেজ জাতি এই বাক্যটির আশ্রয় নিয়ে থাকে। কাউড্রের টেস্ট ক্রিকেট খেলার হিসাব খাস ইংল্যান্ড থেকে যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তার প্রতিবাদে 'দিস ইজ নট ক্রিকেট' বলাই যথেষ্ট হবে।

কলিন কাউড্রের ১০০টি টেস্ট খেলার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৬৫ সালের তিনটি বে-সরকারী টেস্ট খেলা যোগ করা নিয়েই আপত্তি উঠেছে। এই আপত্তির কারণ যুক্তিপূর্ণ। দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ গোষ্ঠী ত্যাগ করায় তাদের ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সদস্য পদটি খারিজ হয়ে যায়। সুতরাং ১৯৬১ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে সব টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলছে সে সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের কোন সরকারী স্বীকৃতি না থাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার এ সব টেস্ট খেলাগুলি বে-সরকারী টেস্ট খেলা হিসাবে গণ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৬০ সালের পরবর্তী টেস্ট ক্রিকেট খেলাগুলি সম্পর্কে ক্রিকেট খেলার দুই প্রখ্যাত প্রামাণ্য গ্রন্থপঞ্জী 'উইসডেন' এবং 'প্লেফেয়ার ক্রিকেট এ্যানুয়েলে'র ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'উইসডেন' দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৬০ সালের পরবর্তী টেস্ট ক্রিকেট খেলাগুলি সরকারী মর্যাদায় স্থান দিয়েছে। তারা এই যুক্তি দেখিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ভবিষ্যতে এম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সদস্য পদ লাভ ক... তাদের ১৯৬০ সালের পরবর্তী বে-সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলাগুলি হয়ত সরকারী টেস্ট খেলা হিসাবে অনুমোদন করিয়ে নি... পারবে। অর্থাৎ 'উইসডেন' প্রথম থে... সম্পূর্ণ অনুমানের উপর কাজ করে চলে...

অপরদিকে 'প্লেফেয়ার ক্রিকেট এ্যানুয়েল' দুরকম ভূমিকা নিয়েছে। ১৯৬১ ... থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যে-সব দেশের সঙ্গে ... ক্রিকেট খেলেছিল সেগুলি 'প্লেফেয়ার ক্রিকেট এ্যানুয়েল' কর্তৃপক্ষ সরকারী ... খেলা হিসাবে স্বীকার করেন নি। এ সম্প... এক যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে তাঁরা ... ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত বা... বোলিং প্রভৃতি পরিসংখ্যানের সঙ্গে দ... আফ্রিকার টেস্ট খেলার ফলাফল ... করেন নি। কিন্তু ১৯৬৬ সালের সংস্ক... থেকে তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকার ১... সালের পরবর্তী বে-সরকারী টেস্ট খে... গুলিকে সরকারী টেস্ট খেলার ফলাফ... সঙ্গে একত্র করে পরিবেশন করছেন। তাঁদের পূর্ব নীতি পরিবর্তনের কারণই ঘটেনি। এভাবে ডিগবাজী খা... অবশ্য একটা কারণ আছে—দক্ষিণ আ... সম্পর্কে তাঁদের শ্বেতাঙ্গ প্রীতি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | ২য় খণ্ড

অমৃত

১৬শ সংখ্যা | মূল্য ৪০ পয়সা

Friday. 23rd August, 1968. শুক্রবার, ৭ই ভাদ্র, ১৩৭৫ · 40 Paise.

সূচীপত্র

'দামিনী' প্রসঙ্গে

অমৃতের ১৪শ সংখ্যায় সুবোধ বসুর দামিনী গল্প প্রসঙ্গে শ্রীমতী ত্রিপর্ণা দাসগুপ্তা লিখিত চিঠিখানা পড়ে খুবই অবাক লাগল। আমার মনে হয় পত্রলেখিকা ঝরিয়া অঞ্চলের দু'একটি কোলিয়ারী দেখেই তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। বহু কোলিয়ারীতেই রোপওয়েতে কয়লা আসা-যাওয়া করে। প্রসঙ্গক্রমে হাজারীবাগ জেলার কারগালী, বোকারো ইত্যাদি কোলিয়ারীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কারগালী কোল ওয়াশারি থেকে ৮।১০ মাইল দূরে অবস্থিত বোকারো থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে ওয়াসড্ কোল রোপওয়ের দ্বারাই পাঠান হয়।

অমলেন্দু ঘোষদস্তিদার
কলিকাতা—৩২

(২)

অমৃতের ১৪শ সংখ্যায় দামিনী গল্পের প্রতিবাদ পত্রে শ্রীমতী ত্রিপর্ণা দাশগুপ্তা জানিয়েছেন যে, কয়লা খনির রোপওয়েতে কখনো কয়লা যায় না, রোপওয়েতে কেবলমাত্র বালি যায়। কিন্তু তাঁর জানাটা খুবই ভুল। অর্থাৎ রোপওয়েতেও কয়লা যায়। বিশ্বাস না হলে পালামৌ জেলায় বারওয়াডি কয়লা খনিতে গেলে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা নিরসন হবে।

অপূর্বকুমার ভদ্র
অশ্বিনীকুমার রায়
গোমো (ধানবাদ)

'সুন্দরবনে বন কতটা' প্রসঙ্গে

গত ১৭ই শ্রাবণ ৭৫ (১ম খন্ড) সংখ্যায় 'সুন্দরবনে বন কতটা?' পড়লাম। এজন্য আর্যদেব ও আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। চির-উপেক্ষিত, বহু সমস্যায় জর্জরিত সুন্দরবন অঞ্চলের দিকে যে আপনাদের নজর পড়েছে তাতে আমরা আশান্বিত ও আনন্দিত হচ্ছি। সুন্দরবন অঞ্চল বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। অথচ সরকারের এদিকে কোন দৃষ্টি নেই। এমন কি পরিকল্পনার মধ্যেও এর স্থান হচ্ছে না। কিন্তু এখানকার দরিদ্র মানুষের, কৃষির ও কৃষকের, জেলেদের উন্নতি না ঘটালে সমস্ত রাজ্যেরই সমূহ ক্ষতি।

সরকারের প্রশাসন দপ্তরের গাফিলতি, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সংযোগের অভাব দপ্তরগুলোর পারস্পরিক দায়-দায়িত্বের অভাব এবং পারস্পরিক দায়-দায়িত্বের দ্বন্দ্বে দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন অতিবাহিত করছে। শুধু তাই নয়, হাজার হাজার বিঘা জমির আবাদ নষ্ট হচ্ছে। (এবারের বর্ষাতেও তা হয়েছে) —কঠোর শ্রমের পাকা ফসল চাষীরা পারছে না গোলায় তুলতে। অথচ সুন্দরবন অঞ্চলকে পশ্চিমবাংলার শস্য-ভান্ডারও বলা চলে। এখানে সোনা ফলে অতি সহজে। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে এই ফসলকে বাঁচাবার জন্য কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে না। চির-উপেক্ষিত, শিল্পে অবহেলিত বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত এই সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়ন ঘটাতে আজ পর্যন্ত কোন সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি।

সুন্দরবনের মাছের সুনাম আছে, কিন্তু এখানকার জেলেদের কথা কি কেউ ভাবেন। তারা কিভাবে বেঁচে থাকে তা কি সরকার খোঁজ করেন! অথচ মাঝখান থেকে ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ করছেন।

এখানকার মৌলে ও বাউলেদের বাঘের মুখে প্রাণ হারানোর কথা আর্যদেব বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন—বাঘের মুখে প্রাণ হারানোর অনেক খবর হয়ত অপ্রকাশিত থেকে যায়। আমাদের অনুরোধ ঐ খবর কেন অপ্রকাশিত থাকে তার উপর আমাদের আলোকপাত করান। এখানকার দরিদ্র মানুষ কোনও রকমে বেঁচে থাকবার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে যে দুর্বিসহ লড়াই করছে তার শতাংশের একাংশ খবরও হয়তো শাসকশ্রেণী (সেই সঙ্গে শহরবাসীরাও) রাখেন না। এখানকার দরিদ্র মানুষদের জীবিকার তাগিদে বাধ্য হয়ে বনে যেতে হয়—মোম, মধু, মাছ ও কাঠ সংগ্রহে। সংসার প্রতিপালনের জন্য মানুষখেকো বাঘের রাজত্বে না গিয়ে তাদের বিকল্প কোন পথও নেই। এর মধ্যে যাঁরা (বেশিরভাগই) চুরি করে বনে যায় (যেতে বাধ্য হয়) তাদের মধ্যে যারা বাঘের হাতে প্রাণ দেয় তাদের খবরই অপ্রকাশিত থাকে।

এই সব সমস্যার কথা সংশ্লিষ্ট মহলে জানানো হয়ে থাকে। তদবির তদারকও কম হয় না। মহলের মহাশয় ব্যক্তিরা কিন্তু বেমালুম ঘাপটি মেরে বসে থাকেন, এখনও আছেন। আমাদের সরকার ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের কথার খেলাপ হয় না। তেমনি আচার-আচরণ ও নীতিরও পরিবর্তন হয় না সহজে। সরকার তাই আমাদের কথা কানে তোলেন না। তাচ্ছিল্য, ঔদাসীন্য অবশ্য আমাদের সরকারের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকারের প্রায় প্রতিটি দপ্তরেই তাঁরই অবস্থার চূড়ান্ত চিত্র নজরে পড়ে সকলের আগে।

এখানকার মানুষগুলির দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যাগুলির কথা কখন কখন কোন কোন দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে। কিন্তু কখনই গুরুত্ব দিয়ে বিস্তারিতভাবে সুন্দরবনের চাষী ও জেলেদের কথা, হাজার হাজার গরীব মানুষগুলির কথা এবং সুন্দরবন অঞ্চলের বহুবিধ সমস্যার কথা কোন পত্র-পত্রিকাতেই পরিবেশিত হয় না। তাই আশাকরি আপনারা আপনাদের বহুল প্রচারিত অমৃত পত্রিকা মারফৎ এখানকার সমস্যার কথা বিস্তারিতভাবে (গুরুত্বসহকারে) পরিবেশন করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবেন।

মাখনলাল ঘোষ
ক্যানিং টাউন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

'জাতীয় শিক্ষানীতি' প্রসঙ্গে

অবশেষে দীর্ঘ বিশ বছর পরে স্বাধীন ভারতে সমগ্র দেশের জন্যে জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হলো। বৃটিশ আমলে ১৯১৩ সালে একবার জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর এধরনের ব্যাপক জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাব হয় নি। শিক্ষানীতি নিয়ে স্বাধীন ভারতে নানা আলোচনা, নানা কমিশন কমিটি গঠিত হয়েছিল। যাই হোক পরিশেষে এধরনের এক সাধু প্রচেষ্টা যে জন্ম নিলো তা সত্যিই আনন্দের। এর জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুণা সেন সুধী-সমাজের অভিনন্দন লাভ করবেন।

এই শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

এতে স্কুলের স্তর হায়ার সেকেন্ডারী স্তর সমেত বারো বছর হচ্ছে। বর্তমানের চেয়ে এক বছর অতিরিক্ত পড়তে হবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পড়াশুনা বিদ্যালয়েই হবে। এর জন্য সার্থক শিক্ষিত শিক্ষক দরকার। এখনই বহু একাদশ শ্রেণীর স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষকের বড় অভাব। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। অনেক নিম্নমানের শিক্ষককে দিয়ে এগার ক্লাসের পড়ানো চলছে। শিক্ষার মান যাতে না নেমে যায় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির ক্ষমতা লোপ করতে হবে। পরিচালন কমিটিগুলি দলা-দলিতে পূর্ণ। তাই যাঁরা দলে ভারী তাঁরা তাঁদের পছন্দমত অচল শিক্ষককে সচল করে নিয়োগ করে থাকেন। শিক্ষা পর্ষদের স্বহস্তে এ ভার নেওয়া উচিত।

মাধ্যমিক স্তরে ত্রিভাষা সূত্র প্রবর্তিত হবে। ফলে অহিন্দী ভাষা এলাকার ছাত্রকে মাতৃভাষা হিন্দী ও ইংরাজী—এই তিনটি ভাষা শিখতে হবে। ভাষা শিখতেই প্রচুর সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হবে। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের সিলেবাস হাল্কা করা দরকার।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার কমে যাবে বলে মনে হয়। তিনটি ভাষা শেখার পর আবার সংস্কৃত পড়তে অনেকেই চাইবে না। সংস্কৃত শিক্ষা একপেশে হয়ে যাবে।

বিদ্যালয়গুলিকে আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম, পাঠাগার, খেলাধুলোর সার্থক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

এ প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণে অর্থের অভাব যেন না হয়।

বিদ্যুৎকুমার চট্টোপাধ্যায়,
আমতা, হাওড়া।

অমৃত

সম্পাদকীয়

এশিয়ার উন্নয়নে সহযোগিতা

পৃথিবীতে দুই ধরনের রাষ্ট্র আছে। এক শ্রেণীর রাষ্ট্র বিজ্ঞানে উন্নত, সচ্ছল এবং সব দিক দিয়ে অগ্রসর। অন্য শ্রেণীর রাষ্ট্র সবেমাত্র উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তারা এখনও দরিদ্র, জনবহুল এবং অনেক বিষয়ে উন্নত দেশগুলির ওপর নির্ভরশীল। ভারতবর্ষ, বলাবাহুল্য, শেষোক্ত শ্রেণীতে পড়ে এবং আরও বহু রাষ্ট্র প্রধানত এশিয়া ও আফ্রিকার এ বিষয়ে ভারতের সহযাত্রী।

নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নতির সমস্যা বিষয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনকে সংক্ষেপে বলা হয় কাস্টাশিয়া সম্মেলন। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান উপরের দিকেই। ভারতের জনসংখ্যা আর তার ভৌগোলিক অবস্থান এই দেশকে নানা দিক দিয়ে গুরুত্ব দিয়েছে আন্তর্জাতিক জগতে। এশিয়ার অন্য বৃহৎ দেশ চীনের সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের কোনো যোগাযোগ নেই। জাপান এশিয়ার হলেও বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সে-দেশ পাশ্চাত্যের উন্নত দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সুতরাং বৃহৎ অথচ উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে এশিয়ার উন্নয়নে ভারতের ভূমিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এই সম্মেলনে ভারতের যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ ডি আর গ্যাডগিল একটি সঙ্গত প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করার ফলে গত পনেরো বছরে ভারত বহু সংখ্যক শিক্ষিত ও দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার, প্রয়োগবিদ, যন্ত্রী ইত্যাদি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশ তাদের উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য থেকে বিশেষজ্ঞ আমদানী না করে এ বিষয়ে ভারতের কুশলীদের সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রস্তাবটি খুবই সময়োপযোগী এবং এশিয়ার উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি বাস্তব নিদর্শন।

এই প্রস্তাবের সূত্র ধরেই ইরাণের শিক্ষামন্ত্রী প্রস্তাব করেছেন যে, এশিয়ার উন্নয়নের জন্য এশিয়ার মগজকেই ভালভাবে ব্যবহার করা হক। আমরা জানি এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশের তরুণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক প্রতি বৎসর হাজারে হাজারে চলে যাচ্ছেন ইউরোপে, আমেরিকায় অর্থের ও সুযোগের সন্ধানে। উন্নয়নশীল দেশগুলির এমন সামর্থ নেই যা দিয়ে শিক্ষিত বিজ্ঞানী যন্ত্রী ও কুশলী প্রয়োগবিদদের সকলের জন্য উপযুক্ত জীবিকার সংস্থান করতে পারে। অথচ এদের প্রতিভাকে কাজে লাগাবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী এশিয়াবই। যদি এমন ব্যবস্থা করা হয় যে, এশিয়ার দেশগুলি নিজেদের প্রয়োজনের জন্য পাশ্চাত্যের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাহায্য না নিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা তা করতে পারে তাহলে জাতীয় উন্নয়নের পথে একটি বৃহৎ প্রতিবন্ধক দূর হয়ে যাবে।

আত্মনির্ভরশীলতা ছাড়া জাতীয় উন্নয়নও অর্থহীন। পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীলতার দরুণ অর্থাভাবে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কারণেও এশিয়ার উন্নয়ন নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এশিয়ার দেশগুলির উচিত হবে নিজেদের সহযোগিতার গণ্ডী প্রসারিত করে এ বিষয়ে স্বনির্ভরশীল হয়ে ওঠা। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে এশিয়ার মধ্যে উন্নত দেশ জাপানও এশিয়ার জাতীয় উন্নয়নে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করবে, এ আশা করা যায়।

এশিয়ার অধিকাংশ দেশ কৃষিপ্রধান এবং এই কৃষিকর্ম আদিম পদ্ধতিতেই বেশীর ভাগ হয়ে থাকে। কৃষির উন্নয়ন তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন এশিয়ার স্বনির্ভরশীলতা অর্জনের পক্ষে অপরিহার্য। কাস্টাশিয়া সম্মেলনে এই সুপারিশও করা হয়েছে যে, বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিজ্ঞান গবেষণার জন্য এশিয়ার দেশগুলোতে অধিক ব্যয় ও সুযোগ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আভ্যন্তরীণ গবেষণার সুযোগ যত বাড়বে প্রত্যেক দেশে তত বেশী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে তাদের রাজনীতিতে সায় দিতে হবে এবং তাদের প্রয়োজন গলাধঃকরণ করে অযথা বহু অর্থ ব্যয় করতে হবে এই গরীব দেশগুলিকে।

কাস্টাশিয়া সম্মেলন এশিয়ার এই সমস্যাগুলো উচ্চারণ করে খুবই সময়োপযোগী কাজ করেছে। এশিয়ার অধিকাংশ দেশের অবস্থা ভাল নয়। জনসংখ্যা বাড়ছে, সে অনুপাতে খদ্যোৎপাদন বাড়াবার কোন উৎসাহ নেই। বিজ্ঞানের প্রয়োগও খুব সীমাবদ্ধ এবং সর্বোপরি রয়েছে সীমাহীন দারিদ্র্য। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের বাস এই ভূখণ্ডে এবং এখানেই বঞ্চনার ইতিহাস সবচেয়ে মর্মান্তিক। রাষ্ট্রসংঘ উন্নত দেশগুলোকে অনুরোধ করেছিল অনুন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য তাদের জাতীয় আয়ের মাত্র এক শতাংশ বরাদ্দ করতে। সে আবেদন ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার গরীব রাষ্ট্রগুলিকে এখন একজোট হয়ে পরস্পরকে সাহায্য করতেই এগিয়ে আসতে হবে।

কিমোনো
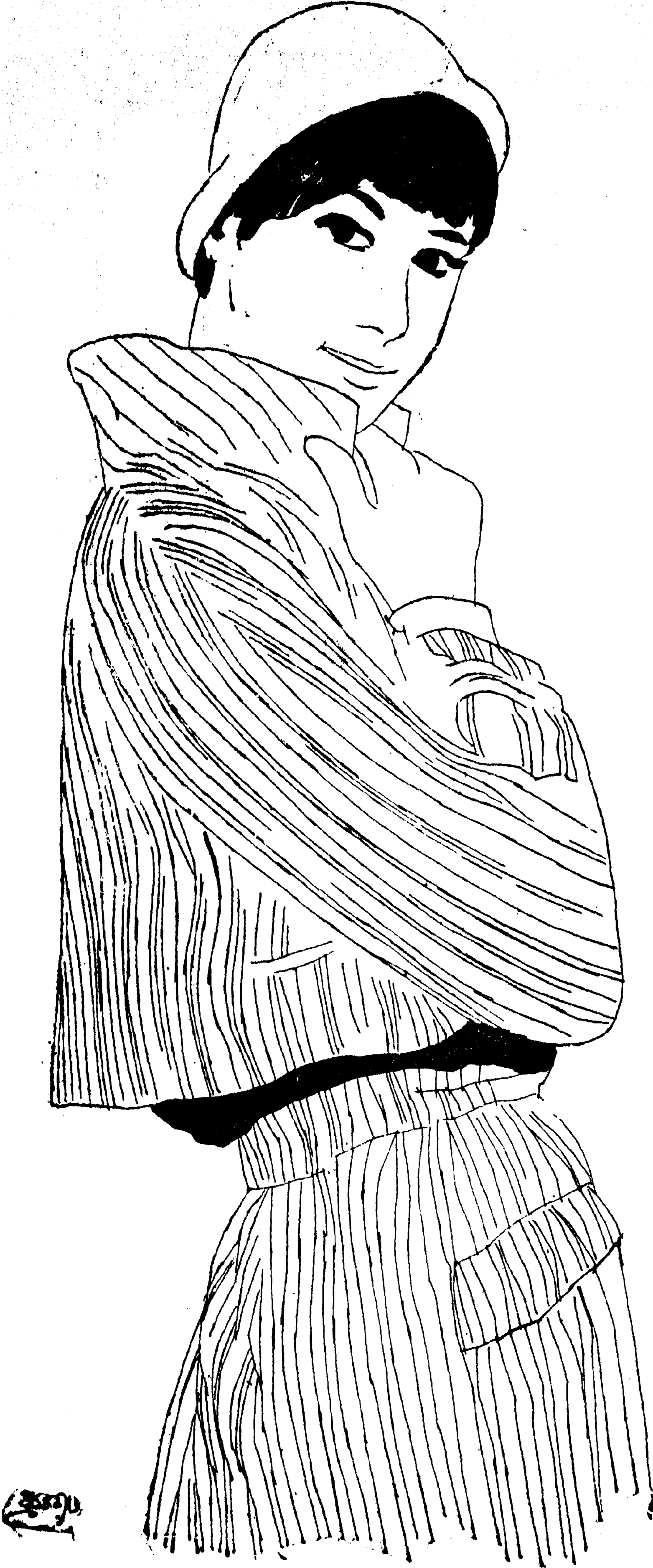
এইচ ই বেটস

মাইল এনড্‌ রোডে আমরা খেলাম। আমার অবশ্য তেমন ভালো লাগল না। খাবারের গন্ধটা তেমন সুন্দর নয়। অতিরিক্ত রকমের মশলা দেওয়া গরগরে রান্না, খেতেও কেমন অদ্ভুত। কিন্তু ব্রাণ্ডির খুব ভালো লাগল। শেষে ও বলল যে তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। চলো কোথাও গিয়ে একটু পান করা যাক, আমার একটা জানা জায়গা আছে, সেখানে শস্তায় চমৎকার মদ পাওয়া যায়।

সুতরাং আমরা দুজনে ঐ রেস্তোরাঁ থেকে অন্যত্র গেলাম। সেখানে কিছু চীজ এবং এক বোতল মদ নেওয়া হল, মদটার নাম বোধহয় আসতি। জায়গাটা ইতালীয়ান-দের আস্তানা। ভীষণ গুমোট গরম দিন, সবাই প্রাণভরে মদ খাচ্ছে আর হাতপাখা দিয়ে নিজে নিজে হাওয়া খাচ্ছে উত্তাপ নিবারণের প্রয়াসে। মদ্যপানের পর আমার কেমন অদ্ভুত বোধ হতে লাগল, আমি অভ্যস্ত ছিলাম না, আর কি যে করছি তা বুঝিনি। চীজ বেশ লবণাক্ত, তার ফলে আমার তৃষ্ণা বেড়ে যাচ্ছিল। আমি অচেতনভাবে মদ্যপান করে চলেছি এবং আমার ঠোঁট দিয়ে একটি দুটি অক্ষর উচ্চারিত হচ্ছে, কেমন

বৃত্তাকারে এবং লঘুভাবে। আমি ব্র্যাণ্ডির দিকে তাকিয়ে ওর কিমোনোর কথা ভাবছি— আর সেও আমার দিকে তাকাচ্ছে। এ এক-রকম দৃষ্টি বিনিময়ের খেলা। এ যেন চোখে চোখে আলাপচার। দুজনে দুজনকে পোড়াচ্ছি, পরিশেষে ও স্তব্ধতা ভেঙে প্রশ্ন করে :

—তোমার নাম কি, তা ত' বলোনি।

আমি বললাম—আর্থার, আর্থার লসন।

—আ র থা র

এমনভাবে কথাটি উচ্চারণ করল যে আমার বুকে আগুন জ্বলে গেল। আমি কিছুই বলতে পারলাম না, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। সেই মুহূর্তেই আমাদের এই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে একটা নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। এই অন্তরঙ্গতা আমার এবং হিলদার মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার চেয়ে অনেক সুদূরপ্রসারী।

তারপর মেনু কার্ডের পিছনদিকে কি একটায় হঠাৎ চোখ পড়ে যাওয়ায় ও উল্লাস-ভরে চেঁচিয়ে উঠল :

—ও একটা সার্কাস এসেছে। চলো যাওয়া যাক। আর্থার আমাকে নিয়ে চলো।

সুতরাং আমরা দুজনে সেখানে গেলাম। সেই রঙ্গশালার নাম আমার আজ আর মনে নেই। প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি পুরুষ ও নারীর পাখিমার্কা মুখ আর দাড়ি ভিন্ন আর একটিমাত্র কথা আমার স্মরণে আছে। শো'র মাঝামাঝি কালে একটা ট্রাপিজের খেলা ছিল। একটি মেয়ে দোল খাচ্ছিল এদিকে-ওদিকে, মাঝে ডিগবাজিও খাচ্ছিল ট্রাপিজের ওপর, আর দর্শকদের উত্তেজনা বৃদ্ধির মানসে বাজনা বাজছিল। সহসা মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল—আমি আর পারছি না। এই বলে সে পড়ে গেল। সে একেবারে এসে স্টলে পড়ল, আর দর্শকবৃন্দের অর্ধাংশ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, ফলে একটা তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি হল। আতঙ্কে সবাই অস্থির।

—ও, আর্থার, আমাকে বাইরে নিয়ে চলো। ব্র্যাণ্ডি কাতর হয়ে বলে ওঠে।

আমরা তখনই বেরিয়ে পড়ি। তখনকার কালে মেয়েরা এখনকার চেয়ে অনেক সহজে ও বেশী করে মূর্ছা যেত। আমার মনে হল, ব্র্যাণ্ডিরও সেই অবস্থা হবে। পথে বেরিয়ে আসার পরে ও আমার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরল।

আমি বললাম, একটা গাড়ি ধরে চলো বাড়ি ফেরা যাক।

ও বলল, তার আগে, কিছু একটু পান করা প্রয়োজন।

আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিছলাম। একটা প্রকাশ্য স্থানে আমরা এক গ্লাস করে পোর্ট খেলাম। তখন প্রায় দশটা হবে। একটু বিশ্রাম করার পর এবং পোর্ট পেটে যাওয়ার ফলে একটু পরেই ব্র্যাণ্ডির চোখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে এল।

এর একটু পরেই আমরা একটা গাড়ি নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলাম। ও বলল, আমি তোমার কাঁধে মাথা রাখি একটু।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও বলল, এই বেশ। আমাকে বেশ জোর করে ধরে রাখো। গাড়ির ভেতরটা এতই গরম যে আমি অতিকষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম এবং ওর মুখটা যে উত্তপ্ত এবং সিক্ত হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারলাম।

আমি বললাম, তোমার গা-টা কত গরম।

ও বলল যে তার পরিচ্ছদের জন্যই এই উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে। ভেলভেটের কোট বড়ই গরম।

ব্র্যাণ্ডি বলল, বাড়ি পৌঁছেই জামাটা আগে ছেড়ে ফেলব, তারপর একটু কিছু পান করা যাবে। আইসক্রিমে লেমনেড খুব চমৎকার হবে।

গাড়ির ভেতর আমি ওর চুলের দিকে তাকালাম। আশ্চর্যরকমের ঘন কৃষ্ণবর্ণের চুল। আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সেই কেশপাশ সুরঞ্জিত, আর সেই সুগন্ধ উগ্র এবং উত্তেজক। তবে, সবচেয়ে ভালো লাগল চুলের সেই ঘন কালো রঙ আর চাকচিক্য।

আমি জানতে চাই, তোমার নাম ব্র্যাণ্ডি কেন? ব্র্যাণ্ডি মানে ত ফরসা। তুমি ত' ফরসা নও, তোমার রঙ মলিন।

সে বলে উঠল, কি করে জানলে যে আমার ভেতরটা ফরসা নয়? এরপর আমি আর কথাটি বলতে পারি না। এই একটি-মাত্র কথার মধ্যে যা আছে, তার মাইল-খানেকের মধ্যেও এর আগে কখনও কোনো-দিন কোনও রমণীর সঙ্গে আলাপাচারে পৌঁছাতে পারিনি। আমি একেবারে মৃত-কল্প, আমার বুক ধুক্‌ধুক্‌ করতে থাকে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলাম।

গাড়ি থেকে আমি যান্ত্রিক গতিতে নামলাম। দোকানে নেমেই ও সোজা ওপরে

উঠে গেল। ও যা বলেছিল সেই কথাটি বারবার আমার মনে পড়তে থাকে। একটা উদ্দাম এবং মধুর উত্তেজনার আবেশে আমার অন্তর ভরপুর হয়ে ওঠে। নীচে দোকানঘর অন্ধকারে ঢাকা। আমি আর ওর জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। ও কখন নামবে কে জানে। আমি নিঃশব্দে ওপরে উঠে গেলাম ওকে দেখতে।

ও নেমে আসছিল, আমি সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে ওকে দেখতে পেলাম। ওর অঙ্গে সেই কিমোনো, আর খালি পা।

ও কোমল গলায় বলল, তুমি কোনখানে? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তারপর এক সেকেন্ডের মধ্যে এসে আমার অঙ্গস্পর্শ করল।

তারপর মৃদুগলায় বলল, মা তোমার বিছানাটা করেছে কিনা চলো দেখে আসি।

ও আমার শোবার ঘরের দিকে চলল। আমিও পিছু নিলাম। বিছানার ওপর ও ঝুঁকে পড়ল। আমার বুকটা দারুণ আকুল হয়ে উঠেছিল। ওর জন্য আমার অন্তরে কামনার আর অবধি ছিল না। ব্র্যাণ্ডি হাত দিয়ে বিছানার চাদরের ভাঁজ মসৃণ করে দেয়, আর তাই ওর সেই কিমোনো দেহে আর আটক রইল না, সেটা খুলে পড়ল।

ও আবার আমার দিকে ফিরতে সেই অন্ধকারেই আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি ওর কিমোনোর নীচে কিছুই আর পরা নেই। একেবারে নিরাবরণ।

।। তিন ।।

এরপর সোমবার দিন কারেস অ্যান্ড কোম্পানীর সঙ্গে আবার দেখা করলাম, আর সেইদিন বিকালে নটিংহামে ফিরে গেলাম। চাকরীটা হয়ে গেল।

আশ্চর্যের বিষয়, কারণটা কি তা বলতে পারবো না, আমার কিন্তু আর কোনো উত্তেজনা নেই। আমি কেবল ব্র্যাণ্ডির কথা ভাবতে থাকি। হিলডা ব্রনসনের সঙ্গে আমি যে বাগদত্ত একথা ভাবতে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করি, সেইসঙ্গে কিঞ্চিৎ বিবেক-দংশন। আমার এই অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কিন্তু কোনো বিবেকই ছিল না। আমি একেবারে উদ্দাম এবং উত্তেজিত হয়ে পড়লাম, একেবারে মরীয়া হয়ে উঠলাম।

ব্র্যাণ্ডি আমার জীবনের প্রথমতমা নারী যার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ঘটেছে, আর সেই অন্তরঙ্গতা আমাকে ভেঙেচুরে দিয়েছে। প্রেম এবং নারী সম্পর্কে আমার সকল মূল্যবোধ একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল। আমি শনিবার রাতে এবং রবিবারও ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে একত্রে শয়ন করেছি আর তার প্রতি-ক্রিয়া আমার অন্তরে জাগিয়েছে এক উদগ্র আকুলতা।

হিলডার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে এসব কিছুই আমি জানতে পারিনি আগে। এর কাছাকাছিও পৌঁছয় নি কোনোদিন। এই ব্যাপারের দেহগত দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আমি এইসব কথা বলছি না এবং সমগ্র ঘটনার আবেগময় অভিব্যক্তিও ফলাও করে বলছি না সমগ্র ঘটনাটি প্রকাশের অভিপ্রায়ে। আমি বলতে চাই যে আমার অন্তরে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। মহা বিপ্লব। এই বিপ্লব ঘটিয়েছে ঐ কিমোনো আর তার অন্তরে যে নারীদেহ ঢাকা ছিল সেই দেহের দাহ।

আর ব্যাপারটি যখন বিপ্লব তখন আমার সমগ্র জীবনে রূপান্তর ঘটে গেল, আর এখনই তার যে বিরাট প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল তা স্পষ্ট করে বলে রাখা প্রয়োজন।

আমি জানতাম, এখনই হিলডার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করা দরকার। আমি কিন্তু তা করিনি। কারেস কোম্পানীর চাকরীটা আমি পেয়ে যাওয়ায় সে এত খুশী হয়েছিল যে তাকে এইসময় কিছু বলা চরম নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক হত। ছোট শিশুর হাত থেকে পুতুল কেড়ে নেওয়ার মতো। আমি তাকে কিছু বলিনি।

একমাস পরে আমাদের বিয়ে হল। আমার মন লাগছিল না—আমি যেন সেই-খানে ছিলাম না। সর্বক্ষণ আমি ব্র্যাণ্ডির কথা ভেবেছি এবং মনে মনে তার সঙ্গেই প্রেম-লীলা করেছি। সেপ্টেম্বরে বোর্নমাউথে হনিমুন যাপন করলাম। কারেস অ্যান্ড কোম্পানী অতি ভদ্র, তার ফলে সেপ্টেম্বরের পঁচিশ তারিখের আগে আমাকে কাজে যোগ দিতে হয়নি।

আমি বলেছি 'কাজ', ব্রনসনরা সর্বদাই বলতেন কথাটা। গোড়া থেকেই আমার লন্ডনে কাজ করতে যাওয়া এবং হিলডাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা ও'রা সুনজরে দেখেন নি। আমার নিজের বাপ-মা নেই। কিন্তু হিলডা ও'দের একমাত্র সন্তান। তার ফলে আমার মনে হয়েছিল হিলডার ওপর একটু অতিরিক্ত আদর ছিল। ও'রা তাকে একটা উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হিলডা ছাড়া যেন আমার আর কোনো কিছু কাজ নেই।

ওরা আমাকে বলতে লাগলেন আমার কি করা উচিত, কোথায় আমার থাকা উচিত এইসব। আর শেষে মিসেস ব্রনসন বললেন, সবাই মিলে লন্ডনে গিয়ে দেখেশুনে একটা বাসা ঠিক করা যাক। আমি কিন্তু এ প্রস্তাবে বাধা দিলাম। তারপর হিলডা কাঁদতে লাগল, একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। এর ফলে ব্রনসন কর্তা বললেন তাঁর ধারণা হয়েছে আমি একটু অবিবেচক। হিলডার অভ্যাস-মাফিক একটা বাসযোগ্য জায়গা দেখেশুনে দেওয়ার চেষ্টাই মিসেস ব্রনসন করছিলেন। উনি আরও বললেন ঈশ্বর আমাদের পথ-প্রদর্শক হবেন। ও'দের জীবনে ঈশ্বরই সর্বদা পথ-প্রদর্শক। আমরা যেন ঈশ্বরের চরণে ভক্তি রাখি। কিন্তু আমি একটি বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প ছিলাম যে আমাদের যদি ফ্ল্যাটে থাকতেই হয়, তাহলে সেই ফ্ল্যাটটি অন্তত ব্রনসন ঠিক করে দেবেন না। আমি নিজে তা পছন্দ করে নেব। কারণ, তখনও আমি জানতাম সম্ভব হলে কোথায় আমার থাকার বাসনা।

পরিশেষে আমি একাই লন্ডনে গেলাম। আমি হিলডাকে বোঝালাম, হিলডা বোঝালো তার মাকে। আমার মনে হয়, তার মা বোঝালেন কর্তাকে। যাই হোক আমি লন্ডনে ফিরে গেলাম। যদি পাওয়া যায় তাহলে সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং দিয়ে একটা ফ্ল্যাট

নেব স্থির করলাম। সেইসময় প্রায় সেপ্টে-ম্বরের বিশ তারিখ।

আমি সোজা সেন্ট প্যানক্রাস থেকে ব্ল্যাণ্ডির কাছে গেলাম। সেদিনটা ভারী চমৎকার। নীল এবং কোমল। শুধুমাত্র বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে যেন বেদনাদায়ক। আমি যখন দোকানে ঢুকলাম তখন ব্ল্যাণ্ডি বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমরা প্রায় ধাক্কা খাচ্ছিলাম।

—আ র থা র।

এমনভাবে উচ্চারণ করল কথাকটি যে আমি আনন্দে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

ওর অঙ্গে একটা ধূসর রঙের টাইট পোষাক আর মাথায় একটা হরিদ্রাভ পঁচকে হ্যাট। ও বলল—আর্থার! আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তুমি ঠিক সময় এসে ধরেছ। মা-ই বরং যাক, আমি থাকি। ও আর্থার!

ওর মা এসে পিছনের দরজায় দাঁড়ায়, আর এক মিনিটের মধ্যে ব্ল্যাণ্ডি ওর পোষাক ও মাথার হ্যাটটি খুলে ফেলল আর আমাদের দুটিকে দোকানে একা রেখে ওর পরিবর্তে মা-ই চলে গেল।

আমরা সোজা উপরে উঠে গেলাম। কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নেই, কোনো প্রশ্ন নেই, কথা নেই, কোনো মতামত নেওয়া-নেয়ী নেই। আমরা দুজনের আকর্ষণে নিবিড় আবেগের বশে যন্ত্রবৎ ওপরে উঠে গেলাম। দুজনের প্রতি দুজনের কি প্রগাঢ় অনুরাগ। তারপর আমাদের দুই অঙ্গ এক হয়ে গেল—সম্পূর্ণ মিলন এবং আর সব। কে একজন দোকানে এসে অনেকক্ষণ ঘণ্টা বাজাল, আমরা তখন ওপরে আত্মহারা। ঘণ্টার প্রচণ্ড আওয়াজে আমাদের চিত্তে কোনো সাড়া জাগাতে পারে না। আমরা তখন শুধু দুজনের জন্য দুজনে আছি। বহির্জগতের কিছু নেই, আমাদের বাহ্যচৈতন্য লুপ্ত। আমার কাছে সেই মুহূর্তে ব্ল্যাণ্ডিকে ঐশ্বর্য-ময়ী, পরিপূর্ণা অথচ মধুররসে ভরা নারী বলে মনে হয়েছে। ও যেন একটি সুপক্ক ফল, নরম, রসে ভরা আর কামনায় ভরপুর। ওর পাশে হিলডা যেন একটা ডিমের অন্তঃ-সারহীন আবরণমাত্র।

সেই রাতটা এবং তার পরদিনও আমি হার্টম্যানদের ওখানেই রয়ে গেলাম। কারেসের চাকরীতে যোগ দিতে এখনও তিনদিন বাকী। তারপর আরো এক রাত্রি। হিলডাকে টেলিগ্রাম পাঠালাম—আটকে গেছি। আগামীকাল ফিরব। নিশ্চিত।

আমি কিন্তু আর ফিরে যাইনি। আমি বাঁধা পড়ে গেছি। হৃদয় মন সব কিছু নিয়ে ব্ল্যাণ্ডি হার্টম্যানের কাছে বাঁধা পড়েছি। এখান থেকে বেরোবার আর পথ নেই। কোনো উপায় নেই। আমি এমনই বিভোর হয়ে গিছলাম যে আমার এই দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের দ্বিতীয় দিনের আগে হার্টম্যান নামটাই একেবারে লক্ষ্য করিনি।

আমি ব্ল্যাণ্ডিকে বললাম : আমি এখানেই থাকব, খাবো আর তোমার সঙ্গে শোবো, তুমি কি আমাকে চাও?

—আর্থার। আর্থার। ও আকুল হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, হা ভগবান! ওই নাম ওভাবে উচ্চারণ কোরো না, আমি সইতে পারি না। আমার নামের পুনরাবৃত্তি সয় না। আমার চিত্তে একটা উদ্দাম আকুলতা জাগিয়ে তোলে।

কিছুকাল পরে আমি বললাম, তোমাকে কিছু বলতে চাই। ও বলল, অন্য একটা মেয়ের কথা? আমাকে বলতে হবে না। আমিও অন্য পুরুষের কথা বলতে পারি।

আমি তবু বলি, শোনো, আমি বিবাহিত।

এরপর আমি হিলডার কথা বললাম।

ব্র্যাণ্ডি বলল, তাতে কিছুই এসে যায় না। কি পার্থক্য ঘটে অবিবাহিত হলে? তুমি একটি পাষন্ড হতে পারো কিন্তু তাতে কি এমন এসে যায় বলো?

এরপর, যেহেতু কিছুতেই কিছু এসে যায় না ওর কাছে, আমারই বা কি এমন এসে যাবার দায়। কামনার কাছে বিবেক নেই। আমি যখন হিলডা এবং ব্রনসনদের কথা ভাবি তখন মনে হয় যেন তপ্ত খোলায় একটা পাত্র বসানো আছে। আমার এতটুকু বিবেক দংশন ছিল না। আমি একটি জীবন থেকে অন্য জীবনে প্রবেশ করলাম, যেমন একটি ঘর থেকে লোকে অন্য ঘরে যায়।

একমাত্র অসুবিধা কারেস অ্যান্ড কোং। আমি বাড়ি না ফিরলে হিলডা ওখানেই খোঁজখবর করবে।

প্রকৃতপক্ষে আর সব অসুবিধার মত এই অসুবিধাটুকুও দূরীভূত হল অতি সহজেই। আমি সেখানেও আর গেলাম না।

।। চার ।।

যুদ্ধ না লাগা পর্যন্ত ব্র্যাণ্ডিদের কাছেই থেকে গেলাম। আর একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলাম। তখনকার দিনে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের এত ছড়াছড়ি ছিল না। তারপর যেই যুদ্ধ লাগল, আমি যুদ্ধে যোগ দিলাম।

একপক্ষে এ একরকম বিশ্রান্তি। কামনা অনেক দূর পর্যন্ত যায় এবং কামনার কোনোরকম প্রতিনিবৃত্তি নেই, যত পাওয়া যায় আগ্রহ তত বাড়ে। আমি এই শান্ত জীবনধারায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তা বলে ব্র্যাণ্ডিতে ক্লান্তি আসেনি। সেই যে প্রথমদিন সবুজ এবং জরদা রঙের কিমোনো পরা অবস্থায় যেমনটি দেখেছিলাম সে তেমনই দুর্দমনীয় আকর্ষণীয় হয়ে আছে। শুধু কামনার, নিরন্তর অভিব্যক্তি এবং প্রচুর উপভোগে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার মানসিকতার একটা বিকৃতি ঘটেছিল এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।

যুদ্ধ আমাকে সেই বিশ্রামের সুযোগ এনে দিয়েছে। আমি আমার প্রথমবারের ছুটিতে যখন যুদ্ধ থেকে ঘরে এলাম তখন আমার মনে হয় এই আমার সর্বোত্তম পাওনা। ব্র্যাণ্ডি এবং আমি আমাদের সেই প্রত্তন অন্তরঙ্গতার গভীরে অবগাহন করলাম—সে অনৈসর্গিক আনন্দ। তুলনাবিহীন অসহ্য পুলকের জোয়ারে গা ভাসালাম।

সেই অবস্থাটা প্রায় মারাত্মক। এখন যখন তখনকার কথা চিন্তা করি তখন আমার মনে হয়, মারাত্মক অবস্থাই দাঁড়িয়েছিল। একজন রমণী দেবতার নৈবেদ্য থেকে প্রসাদ গ্রহণ করে বেঁচে থাকবে এবং একজন মানুষ যখন অনুপস্থিত তখন সে কোনোরকম আহার্যই গ্রহণ করবে না, এমন চিন্তা করা চলে না। আমিও এই ব্যাপারে বিবেচক হওয়ার চেষ্টা করছি। আমি ব্র্যাণ্ডিকে দোষ দিই না। আমাদের দুজনের মধ্যে যে নিবিড় পুলকের উদ্ভব হয়েছিল, অপরাধ তার। এই পুলকের পরিণতি মারাত্মক না হয়ে পারে না।

যখন বিপর্যয় ঘটেছিল তার আগে আমি যে তার কথা ভাবিনি কেন এই ভেবে আমি অবাক হই। তবে বোধহয়, আমি যদি বুঝতেই পারতাম যে একটা বিপর্যয় ঘটবে তাহলে সেটিকে আর বিপর্যয় বলা চলত না। কি জানি আমি এত জানি না। শুধু জানি, ১৯১৭ খৃস্টাব্দে একসময় ঘরে ফিরলাম একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে, দেখলাম, ব্র্যাণ্ডি তখন অপর একজন পুরুষকে নিয়ে আছে।

আমার সব সময় মনে জাগে, সেইদিন আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলাম তখন মিসেস হার্টম্যান কি ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। মিসেস হার্টম্যান স্থিতধী এবং শক্তপ্রকৃতির রমণী, তাঁর পক্ষে আতঙ্কিত হয়ে পড়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ। দুএক মিনিটের পর আমি ওপরে গেলাম, আর আমার সেই শয়নকক্ষে একটি অপরিচিত ব্যক্তি তার ওয়েস্ট কোটের বোতামগুলো আটকাচ্ছিল। ব্র্যাণ্ডি ঠিক সেইখানে নেই। তবে আমি বুঝলাম।

আমি একেবারে ক্ষেপে খুন। কিন্তু এই ক্ষেপামি বেশীক্ষণ টিঁকল না, ব্র্যাণ্ডি এসে সব ভেঙে চুরমার করে দিল। ব্র্যাণ্ডি একটি কামোন্মাদিনী তরুণী, তার কাছে কামনার তাড়না ক্ষুধার তাড়নার মত প্রবল। ক্ষিধের মুখে রুটি যেমন, তেমনই তার কামনার অনলে পুরুষের প্রয়োজন। সেই কথা সে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সে আরো একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্র্যাণ্ডি মনে করিয়ে দিল যে সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়।

আমি উত্তেজিত হয়ে বলি, কিন্তু একটা নৈতিক নিষ্ঠা!

ব্র্যাণ্ডি বলল, ওসব জানি না। আমি বাপু পারি না। এসব আমার কাছে একটা চুমো খাওয়ার সামিল। লক্ষ্মী সোনা, রাগ কোরো না—আমি যা সেইভাবেই যদি আমাকে গ্রহণ করতে না পারো, তাহলে আমাকে তোমার নেওয়ার কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই।

পরিশেষে আমার রাগ ও বরফ করে গলিয়ে দিল, বলল, আমাদের সম্পর্ক আর সব সম্পর্কের চেয়ে পৃথক নয় কি? আমি বিশ্বাস করি। ব্র্যাণ্ডিও তার কথার প্রমাণ প্রয়োগ করে। আর আমিও যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাই আঁকড়ে বসে রইলাম।

কিন্তু যুদ্ধান্তে যখন পুরোপুরি অবসর নিয়ে ঘরে ফিরলাম তখন দেখি অবস্থা আরো শোচনীয়। তখন একাধিক পুরুষ আসতে শুরু করেছে। ওরা দোকানে আসে, কেউ হয়ত মিষ্টি-ব্যবসায়ীদের ভ্রাম্যমাণ কর্মচারী, কেউ-বা যুদ্ধফেরৎ সৈনিক, তাদের কারো কারো গাড়ি আছে। আমার উপস্থিতিতেই তারা এসে হাজির হতে লাগল।

আমি সব জানতে পারলাম। এইবার কিছু আর বললাম না। আমি অন্য এক পথ ধরলাম। আমি চাকরী বা ব্রনসনদের ভাষায় আমার এপয়েন্টমেন্ট ছেড়ে দিলাম।

ব্র্যাণ্ডি বলল—কিন্তু চাকরীটা ছাড়লে কেন?

আমি বললাম—আর বাঁধা চাকরী ভালো লাগে না, আমি এইখানেই কাজ করবো। দোকানটার উন্নতি করব, এতে অনেক লাভ হবে, দুপয়সা হবে।

—কিন্তু তার খরচ জোগাবে কে?

—আমিই দেব সব।

হিলডাকে বিয়ে করার ঠিক আগে ব্যাঙ্কে আমার প্রায় দেড়শ পাউন্ড জমা ছিল। আমি সেই টাকা লন্ডন ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার করে এনেছিলাম, পুরো টাকাটাই ছিল। আমি টাকাটা তুলে নিয়ে ১৯১৯-এর গ্রীষ্মকালে প্রায় আশী পাউন্ড খরচ করে হার্টম্যানদের দোকানের নবকলেবর করে দিলাম। ব্র্যাণ্ডি খুশী হল। সে নিজে দাঁড়িয়ে অলঙ্করণ দেখাশোনা করল, কোথায় কি রঙ দেওয়া হবে স্থির করল, দোকানের এবং কাফের রঙ হল সবুজ আর জরদা।

আমি বললাম—তোমার সেই কিমোনোর মত, মনে আছে সেই পুরনো কিমোনোটা?

—ও আর্থার। সেটা আজো আছে।

আমি বললাম—সেই কিমোনোটা একবার পরো না।

ও ওপরে উঠে গিয়ে সেই পুরাতন কিমোনোটা পরে নেমে এল। এক মিনিটের মধ্যে আমি ওর পিছু নিলাম। সেই পুরাতন দিনের মত। এই কিমোনো আবার আমাদের দুজনকে এক করল।

আমি বললাম—আচ্ছা, সত্যি করে বলোত প্রথম যেদিন দোকানে এসেছিলাম তোমার ঐ কিমোনোর ভেতর আর কিছুই পরা ছিল না, নয়?

সে বলল—না, আর কিছু ছিল না ভেতরে, স্নান করে উঠে, কোনোরকমে জামাটা গায়ে গলিয়ে নিয়েছিলাম।

আমি বললাম—হা ভগবান! আমাকে একটা চুমো দাও।

ব্র্যাণ্ডি আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো দেয় আর আমি ওকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি।

এখন ওর দেহ ভারী হয়েছে, শরীরও পুরু হয়েছে অনেক—তবু সে আজো সুন্দরী।

আমি ত' এইটুকুই চেয়েছিলাম। আমি এতেই বেশ খুশি।

এরপর আর এক কান্ড ঘটল। দোকানে রোজ অনেককেই ঘোরাফেরা করতে দেখতাম। আমাকে দেখলেই তারা সুট করে পালাত। আর একদিন ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে দেখি একজন একেবারে বসবার ঘরে বসে আছে।

একটু বয়স্ক লোক। মাথার চুল ছোট ছোট করে কদমছাঁট ছাঁটা।

আমি বললাম, হ্যালো—তোমার আবার কি হল! দোকানে অপরিচিত কাউকে ঘুর-ফির করতে দেখলে আমি এমনই বলতাম।

সে বলল, আমার কিছুই হয়নি। আমি এখন কিছু খাবো!

আমি বললাম, তা তুমি কে? কি পরিচয়?

সে বলল, আমার নাম হার্টম্যান।

আমি ওর চুলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এ ব্র্যাণ্ডির বাবা। এক মিনিটেই বুঝে নিলাম লোকটা জেলফেরৎ।

কেন জানি না, অন্য পুরুষের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডির ঘনিষ্ঠতার চেয়ে এই ব্যাপারটায় আমি একটা আঘাত পেলাম। অসন্তোষের প্রশ্নটা ব্র্যাণ্ডি এবং আমি দুজনে লড়াই করে মীমাংসা করতে পারি—কিন্তু বাড়িতে এক-জন দাগী আসামী নিয়ে বসবাস করা অন্য ব্যাপার।

ব্র্যাণ্ডি বলল, লক্ষ্মী সোনা, ভুল বুঝো না, বাবা কিন্তু দাগী আসামী নন। উনি গোলা লোক, সহজেই অন্যদের কথায় ভুলে গিয়ে কাজ করে বসেন। ও'র ওপর তুমি সদয় থেকো।

হয়ত আমি নরম ছিলাম। হয়ত আমার আর কিছু করার ছিল না। এ বাড়ি আমার নয়। লোকটাও আমার বাবা নয়। ব্র্যাণ্ডি আমার স্ত্রী নয়। ওকে থাকতে দেওয়া ছাড়া আমার আর কি করার আছে!

সেই বছর গ্রীষ্মকালে নতুন কাফেতে বেশ লাভ হল। কোনো কোনো সপ্তাহে দশ এগারো পাউন্ড পর্যন্ত লাভ হত। হার্টম্যান বাড়ি এসেছিল মে মাসে। জুলাই মাসে অবস্থার অবনতি হল। গ্রীষ্মকালের শুরু, সুতরাং অনেক ভালো হওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের লাভ হয় এমনকি পাঁচ পাউন্ডে নেমে গেল। ব্র্যাণ্ডি আর ওর মা বলে, ওরা ঠিক বুঝতে পারছে না।

আমি কিন্তু বুঝেছিলাম। কিংবা অনেক পরেই বুঝেছিলাম। এর মূলে হার্টম্যান। ওযে শুধু আমার পিছনে লেগে আছে তা নয়, ও দোকানের টাকা চুরি করছে। দোকানের কষ্টার্জিত অর্থ হার্টম্যান মদ খেয়ে ওড়াচ্ছে।

আমি ওকে হটিয়ে দিতে চাই। কিন্তু ব্র্যাণ্ডি আর তার মা কিছুতেই শুনবে না। আমি চীৎকার করে বলি, লোকটা একটা আস্ত স্কাউণ্ড্রেল।

ব্র্যাণ্ডি বলল, কিন্তু আমার বাবা।

এই হল সূত্রপাত। এই তারিখ থেকে আমাদের মধ্যে একটা মনান্তর এবং বিরোধী-তার সূত্রপাত। এরপর আর কিছুতেই আগের মত হল না। ব্র্যাণ্ডিকে এখন একটা সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর বেশ্যার মত মনে হত। তবে ঐ বুড়ো লোকটার কথা, আমার নির্বুদ্ধিতা আমাকে ভীষণ উত্তেজিত করল এবং শেষ পর্যন্ত তার ফলে একেবারে পূর্ণ-চ্ছেদ ঘটে গেল।

হয়ত তৃতীয় শ্রেণীর বেশ্যা কথাটি লেখা ঠিক হল না। হয়ত লিখতাম না, কিন্তু আজ এইখানে বসে ভাবছি যে সেদিন আমার সমস্ত স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিছল।

যেটা আমার শোবার ঘর ছিল সেটা এখন বসার ঘরে পরিবর্তিত। ঘরটা রং করানো উচিত ছিল, কিন্তু সাত আট বছর তার উপর হাত পড়ে নি।

আমার বয়স এখন পঞ্চাশ, ব্র্যাণ্ডির বয়সও প্রায় পঞ্চাশ। ও কোথায় বেরিয়েছে। কোথায় তা ভেবে লাভ নেই। কামনা আজো ওর কাছে জলখাবারের মত। ওর কাছে এসব কিছু নয়, আমিও আর জানতে চাই না কোথায় যায়। কিন্তু যাই হোক—আর এইটাই সবচেয়ে খারাপ—ওর প্রতি আমার প্রীতি আজো সমানভাবে জাগ্রত আছে। কিন্তু আজ আর আমার অনু-শোচনার অন্ত নাই। কোনো রাগ নয়, কোনো আবেগ নয়। আমি ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারি নি। ভাবাবেগের দিক থেকে ও অনেক দিন আমাকে পেরিয়ে গেছে।

মিসেস হার্টম্যান মারা গেছেন। আমি তার জন্য দুঃখিত। মহিলাটিকে ভাল লাগত। সব সময় ঠিক বিশ্বাস করা যেত না বটে, তবে মনে হয় আমাকেও একটু ভাল চোখে দেখতেন মিসেস হার্টম্যান। মিঃ হার্টম্যান এখনও ঘুর ঘুর করছে। টাকাকড়ি চাবী বন্ধ থাকে, তবু তা চুরি হয়। আমি কিছুতেই হাতে-নাতে ধরতে পারি না। আমিই যেন এখন এক বন্দী-শালায় আছি, এমন বন্দীশালা যা হার্টম্যান কোনদিন দেখে নি। এ বাঁধন ব্র্যাণ্ডির প্রতি আমার সেই বিপর্যয়কারী প্রথম অনুরাগের প্রতিক্রিয়া, এর থেকে পালানোর পথ নেই। আমাকে একেবারে বেঁধে রেখেছে, আমি জানি কোনদিনই এখান থেকে মুক্তি পাবার উপায় নেই।

গত রজনীতে পালাবার একটা সুযোগ হয়েছিল। আমি জানি, আমি মুক্ত পুরুষ। আমি ব্র্যাণ্ডিকে বিবাহ করি নি। যে কোন সময়ে চলে যেতে পারি, আর কোনদিন ফিরতে হবে না। কিন্তু তা অন্য ব্যাপার।

হিলডা আমাকে আহবান করেছিল। আমি দোকানে ছিলাম। একাই ছিলাম সন্ধ্যা তখন ছ'টা হবে।

খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। দোকানে এখন তেমন খদ্দের না থাকলেও আমি সান্ধ্য দৈনিক নিতাম এই জেলাটার অবনতি ঘটেছে, সেই সঙ্গে কাফেরও অবনতি হয়েছে। আমরা আর তেমন খরিদ্দার পাই না। আমি যখ সংবাদপত্র পড়ছি তখন বেতার চলছিল ছ'টার সময় ড্যান্স ব্যান্ড শেষ হল। এর ঠিক পরেই কে আমার নাম ঘোষণা করল–

'পঁচিশ বছর আগে শেষ সংবাদ পাওয়া গিছল, লন্ডন থেকে যে আর্থার লসনের, তিনি কি অনুগ্রহ করে এখনই নটিংহাম হাসপাতালে আসতে পারেন সেখানে তাঁর স্ত্রী হিলডা লসন মৃত্যুশয্যায় শায়িত।'

এই সব। আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ বা এই ঘোষণা শোনে নি। কেউ একথা আমাকে বলে নি। আমার এইখানে হার্টম্যান নামেই পরিচিতি। যেন কোন কিছুই ঘটে নি।

কিন্তু এ ত আমি। আমি ত ঘোষণা শুনে একেবারে স্তম্ভিত। যেন আমার মাথায় কি আঘাত করল। আমি যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক সেখানেই যেন পড়ে যাব—প্রায় মরে গিছলাম।

একটু পরে সামলে নিয়ে ওপরে বসার ঘরে গেলাম। কি যে করছি তা বুঝি নি। আমি যেন চেতনা হারিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি, আমি ভাবতে থাকি। এক মিনিট পরে আমি ঠান্ডা হলাম। যাওয়ার কোন মানে হয় না। ব্র্যাণ্ডি হলে কথা ছিল, কিন্তু হিলডা নয়। কিন্তু আমি তার সামনে দাঁড়াতে পারি নি। আমি কি করব তা ভাবি নি, কি করা উচিত ছিল তাই ভাবছি।

১৯১১-র সেই গরম দিনটির কথা ভাবি। সেই কারেস কোম্পানীর কাজটার কথা, কাজটা পেয়ে কত খুশি হয়েছিলাম। হিলডার কথা ভাবি। তাকে না জানি এখন কেমন দেখতে। এই পঁচিশ বছর কিভাবে কাটিয়েছে কে জানে। কত না জানি কষ্ট পেয়েছে। পরিশেষে, ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে সেই বিপর্যয়কারী অসহ্য পুলকের কথা ভাবি। আর তার সেই কিমোনো। হার্টম্যানের সেই আইসক্রিম ফ্রিজারটা যদি সেদিন খারাপ হয়ে না যেত আর ব্র্যাণ্ডি যদি তখনকার কালের অন্য মেয়েদের মত পোশাক পরে থাকত? তাহলে?

এই ভাবতে ভাবতে, এই চিন্তা মাথায় নিয়ে, আমি সেইখানে বসে ছোট ছেলের মত কাঁদতে থাকি।

—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত

উপন্যাস

কেয়াপাতার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

ভাল করে সকাল হয়নি এখনও; স্টিমারের গতি হঠাৎ মন্থর হয়ে এল।

উনিশ শ চল্লিশের অকটোবর। বারো বছরের বিনু বাঙলা মাস আর সালও জানে। আশ্বিন, তেরশ সাতচল্লিশ।

এত ভোরে রোদ ওঠে নি। উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম তিনদিক আবছা অন্ধকারে মলিন; তার ওপর পাতলা নরম সিল্কের মতন কুয়াশা। শুধু পুব দিকটায় আলো আলো একটু আভা ফুটেছে। বাতাস বইছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, কখনও পুবে-পশ্চিমে আড়াআড়ি। শরতের বাতাস—এলোমেলো, ঝিরঝিরে, সুখদায়ক। তার গায়ে হিমের আমেজ মাখানো।

মস্ত জলপোকার মতন স্টিমারটা এতক্ষণ যেন হাত-পা ছুঁড়ে এলোপাথাড়ি সাঁতার কাটছিল; এখন গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

গতি কমে এসেছিল; ইঞ্জিনের ধকধকানিও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। দু-ধারের বড় বড় চাকাদুটো আগের মতন গর্জন করে জল কাটছে না; আলতোভাবে নদীকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে যাচ্ছে।

এই ভোরবেলাতেই ফাঁকে ফাঁকে শঙ্খচিল বেরিয়ে পড়েছে। গলায় সাদা বর্ডার দেওয়া খয়েরি রঙের পাখিগুলো স্টিমারটাকে ঘিরে সমানে চক্কর দিচ্ছে; তাদের চোখ কিন্তু জলের দিকে। মাছের রুপোলি শরীর দেখতে পেলেই হয়; সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ দিয়ে পড়ছে; মুহূর্তে বাঁকানো ঠোঁটে শিকার বিঁধে উঠে আসছে। আর আছে বকেরা; তাদেরও ধ্যান-জ্ঞান মাছেরই দিকে।

জলের ধার ঘেঁষে ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। একপাশে তার বাবা অবনীমোহন; আরেক পাশে দুই দিদি—সুধা আর সুনীতি। মা আসেন নি; এত ভোরে ওঠা তাঁর বারণ। চিরদিনই মা অসুস্থ, রুগ্ন। ভোরের ঠাণ্ডা জলো-হাওয়া লাগালে শরীর আরো খারাপ হবে, তাই কেবিনে শুয়ে আছেন।

অবনীমোহনের বয়স পঞ্চাশের মতন। বেশ লম্বা, সুপুরুষ। মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর বড় বড় দূরমনস্ক চোখ। এত বয়সেও গায়ের রঙ উজ্জ্বল। চামড়া টান-টান, একটি ভাঁজও তার ওপর পড়ে নি। চুল উস্কখুস্ক, সাদায়-কালোয় মেশানো। সাদার ভাগটা অবশ্য কম, তবু ঐ রঙটা তাঁর চেহারায় নতুন মহিমা এনে দিয়েছে।

সুনীতির বয়স একুশ, সুধার আঠারো। দুজনের চেহারার ছাঁচ এক রকম। ভুরু এত সুন্দর আর সরু, মনে হয় খুব যত্ন করে তুলি দিয়ে আঁকা। সুনীতি ফর্সা না, শ্যামাঙ্গী। কচিপাতার কোমল আভার মতন কি যেন তার গায়ে মাখানো। সুধার রঙ টকটকে, তার দিকে তাকিয়ে পাকাধানের কথা মনে পড়ে যায়। দু-জনেরই হাত-পা-আঙুল, সবেতেই দীঘল টান। পানপাতার মতন মুখ, থাক-থাক কোঁচকানো চুল, ছোট্ট কপাল আর সরু চিবুকে মনোরম একটি ভাঁজ। দুজনের চোখই টানা-টানা, আয়ত। সুনীতির কুচকুচে কালো মণিদুটো যেন ছায়াচ্ছন্ন সরোবর। সুধার চোখের মণি কালো নয়, নীলচে।

সুনীতির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়, সে বয়স-সচেতন। এর মধ্যেই চেহারায় গম্ভীর ভাব এনে ফেলেছে। সুধা কিন্তু একেবারে উল্টো—নিয়ত ছটফটে, চঞ্চল। গাম্ভীর্য বলে কোন শব্দ তার হাজার মাইলের ভেতরে নেই। অকারণ ছটফটানি আর ছেলেমানুষি সব সময় তাকে ঘিরে আছে।

দু-চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে বিনু। স্টিমারটা এখন যেখানে সেখান থেকে নদীর একটা তীর খুব কাছে : আধ মাইলের মধ্যে। গাছপালা, সবুজ বনানী, ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা বাড়িঘর চোখে পড়ছে। অন্য পাড়টা অনেক দূরে, ধু-ধু, দুর্বল রেখায় আঁকা জলছবির মতন অস্পষ্ট।

নদীর ঠিক মাঝখানটায় ঝাপসা কুয়াশার ভেতর অসংখ্য কালো-কালো বিন্দু বিচিত্র সংকেতের মতন ছড়িয়ে আছে। মা বলেছেন ওগুলো জেলেডিঙি। সারা রাত নদীময় ঘুরে ঘুরে ওরা নাকি ইলিশমাছ ধরে। দূর-দূরান্তের ডিঙিগুলোই না, ছইঅলা অনেক নৌকো লক্ষ্যহীনের মতন কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে। স্টিমার যত আস্তেই চলুক, নদী তোলপাড় করে উঁচু-উঁচু পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ উঠছে। আর নৌকোগুলো মাতালের মতন অনবরত টলছে।

নদী জুড়ে আরেকটা দৃশ্য চোখে পড়ছিল। চাপ চাপ ঝাঁক ঝাঁক কচুরিপানা বেগুনি ফুলের বাহার ফুটিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

বিনুরাই শুধু না, প্রায় সব যাত্রীই রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে স্টিমারের এদিকটা অনেকখানি কাত হয়ে গেছে।

যাত্রীরা সবাই প্রায় কথা বলছিল। কে যেন গলা চড়িয়ে কাকে ডাকল, কেউ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সরু করে শিস দিচ্ছে, হঠাৎ উচ্ছ্বাসে কেউ এক কলি গেয়ে উঠল। টুকরো টুকরো কথা, গান, শিসের আওয়াজ—মিলে-মিশে একাকার হয়ে মৃদু গুঞ্জনের মতন অনেকক্ষণ ধরে বিনুর কানে বেজে চলেছে। বাবা আর দিদিরাও কি যেন বলাবলি করছিল, বিনু বুঝতে পারছিল না। সে শুধু তাকিয়ে আছে; অসীম বিস্ময় ছাড়া তার আশে-পাশে আর কিছুই নেই এখন।

নদী বলতে বিনুর অভিজ্ঞতায় কলকাতার বড় গঙ্গাই শেষ কথা; হাওড়া-পুলের ওপর দাঁড়িয়ে যতবার গেরুয়া রঙের প্রবাহটি দেখেছে ততবারই সে অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এই পারাপারহীন

জলরাশির দৃশ্য তাকে যেন বিহ্বল করে ফেলেছে।

এক সময় অবনীমোহনের ডাক শোনা গেল, 'বিনু—'

বিনু সাড়া দিল না। দু চোখ মেলে যেমন দেখছিল, দেখতে লাগল।

অবনীমোহন আবার ডাকলেন। নদীর দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্কের মতন সাড়া দিল বিনু, 'কী বলছ?'

'আমরা এসে গেছি। ঐ যে দেখতে পাচ্ছিস, মনে হচ্ছে ওটাই রাজদিয়ার স্টিমার-ঘাটা। ওখানে আমাদের নামতে হবে।' অবনীমোহন সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন।

অবনীমোহনের আঙুল যেদিকে বিনুর চোখ এবার সেদিকে ঘুরে গেল। এখনও বেশ খানিকটা দূরে; তবু নিশ্চল জেটি, দু-তিনটে গাধাবোট, লোকজনের চলাফেরায় বড়-সড় একটা গঞ্জের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিনুর ছোট্ট বুকের ভেতর সিরসিরিয়ে আনন্দের ঢেউ খেলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রাজদিয়ায় আসা হল তাহলে। কতকাল ধরে মা'র মুখে ঐ জায়গাটার কথা শুনে আসছে সে; রাজদিয়ায় আসার ইচ্ছা তার অনেক দিনের।

ওধার থেকে বড়দি সুনীতি বলল, 'এক্ষুণি স্টিমার জেটিঘাটে ভিড়বে। চলো বাবা, কেবিনে গিয়ে মালপত্তর গুছিয়ে নিই।'

অবনীমোহন বললেন, 'তাড়া কি, রাজদিয়াই তো লাস্ট স্টেশন। ওখানে গিয়ে স্টিমারটা নিশ্চয় বেশ কয়েক ঘণ্টা পড়ে থাকবে। ধীরে-সুস্থে লটবহর গুছোলেও চলবে।'

ছোটদি সুধা ব্যস্তগলায় বলল, 'দাদু আমাদের নিতে স্টিমারঘাটে আসবেন তো?'

অবনীমোহন বললেন, 'নিশ্চয়ই আসবেন।'

'তোমার চিঠি দাদু পেয়েছেন?'

'পাওয়া উচিত। আজ কী বার?'

মনে মনে হিসাব করে সুধা বলল, 'বুধবার।'

অবনীমোহন বললেন, 'গেল বুধবারে জি-পি-ও'তে গিয়ে ডাকে দিয়েছি; সাত দিনে চিঠিটা কি আর আড়াই শ'-তিন শ' মাইল রাস্তা পেরুতে পারে নি?'

সুধা বলল, 'আরেকটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কীরে?'

'আমাদের তো কাল পৌঁছুবার কথা ছিল; স্টিমার চড়ায় আটকে গিয়েছিল বলে আজ এলাম। তোমার চিঠি যদি পেয়েই থাকেন দাদু, কাল এসে ঘুরে গেছেন। আজ কি আর জেটিঘাটে আসবেন।'

'আসবেন রে, আসবেন।'

সুধাটা চিরদিনের ভীতু। তার খুঁত-খুঁতুনি কাটল না, 'দাদু না এলে কি যে হবে! তুমি তো আগের কখনও এখানে আসো নি; রাজদিয়ার রাস্তাঘাট কিছুই চেন না।'

অবনীমোহন হেসে ফেললেন, 'তোকে অতশত ভাবতে হবে না। দাদু আসবেনই, দেখে নিস। আর যদি না-ই আসেন, ঠিকানা তো জানি। খুঁজে ঠিক বার করে ফেলব। তাছাড়া আমি না চিনি, তোর মা চেনে। বারকয়েক সে এখানে এসেছে।'

সুধা আর কিছু বলল না। মুখ দেখে মনে হল না, খুব ভরসা হয়েছে।

এদিকে স্টিমারটা জেটিঘাটের দিকে যত এগিয়ে চলেছে যাত্রীদের ব্যস্ততা, ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। আগের সেই মৃদু অস্পষ্ট গুঞ্জনটা কোলাহলের রূপ নিয়েছে। ধুপধাপ শব্দ, বাক্স-প্যাটরা টানাটানির আওয়াজ, চেঁচামেচি, চিৎকার—নিমেষে চারদিক চকিত হয়ে উঠল।

বিনু ভাবছিল পরশু দিন এই সময়টা তারা ছিল কলকাতায় — ভবানীপুরের বাড়ীতে। দুপুর থেকে মালপত্র বাঁধাছাঁদা, গোছগাছ আরম্ভ হয়েছিল। তারপর সন্ধ্যে-বেলা শিয়ালদা গিয়ে ঢাকা মেল ধরেছে। কাল সকালে এসেছিল গোয়ালন্দে। সেখান থেকে এই স্টিমারটায় পাড়ি জমিয়েছে। কাল রাত্তিরেই তাদের রাজদিয়া পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু বিপদ বাধিয়েছিল নদীর একটা চড়া; আট দশ ঘণ্টার মতন স্টিমারটাকে আটকে রেখেছিল।

সেকি আজকের কথা! খুব ছেলেবেলায় যেটাকে বলা যায় চেতনার প্রত্যুষ—সেই তখন থেকে রাজদিয়ার নাম শুনে আসছে বিনু।

বিনুর জন্ম কলকাতায়। পুবে বেলেঘাটা, পশ্চিমে বড় গঙ্গা, উত্তরে বাগবাজার, দক্ষিণে টালিগঞ্জ—কলকাতার চার সীমার ভেতর এত মজা, এত চমক, এত ঘটনার মেলা সাজানো যে যুগযুগান্ত কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু অবনীমোহন মানুষটা স্বভাব-যাযাবর: কোথাও যদি দুটো দিন পা পেতে বসেন। হাতে ক'টা দিন কালতু এসে গেল তো সংসার তুলে নিয়ে পাড়ি দিলেন রাজপুতনায় কি সৌরাষ্ট্রে, মগধে অথবা কোশলে। বারো বছরের ছোট্ট জীবনে অনেক দেশ দেখেছে বিনু। ছোট নাগপুরের বনভূমি, দার্জিলিঙ পাহাড়, কাশীর গঙ্গার ঘাট, প্রয়াগে কুম্ভমেলা, অজন্তার গুহায় খোদাই-করা চমৎকার চমৎকার সব মূর্তি এবং আরো কত কি। কিন্তু এত কাছের রাজদিয়াটাই শুধু দেখা হয় নি। অথচ কত আগেই না তারা এখানে আসতে পারত!

পুজোর সময়টা প্রতি বছর কলকাতায় দাদুর চিঠি যায়, তাঁর ইচ্ছা একবার অন্তত বিনুরা রাজদিয়ায় বেড়াতে আসুক। চিঠি এলেই মা বলতেন, 'চলো না, এবার ওখানে ঘুরে আসি। প্রতি বছর যেতে লিখছেন।' বাবা বলতেন, 'এ বছরটা থাক; গিরিডিতে একটা বাড়ি ঠিক করে ফেলেছি; আসছে বার না হয় রাজদিয়া যাওয়া যাবে।' মায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এত ক্ষীণ যে, বাবার ওপর দাগ কাটতে পারত না; দ্বিতীয়বার তিনি আর এ ব্যাপারে অনুরোধ করতেন না।

প্রতিবছর মায়ের রাজদিয়া-মুখি মনটাকে অবনীমোহন এক রকম জোর করে অমরকণ্টকে, নৈনিতালে কিংবা মধুপুরের দিকে ফিরিয়ে দিতেন। এবার কি খেয়াল হয়েছে, টিকিট কেটে ঘর-সংসার নিয়ে

ঢাকা-মেলে গিয়ে উঠেছেন। বাবা হয়ত ভেবে থাকবেন, বৃদ্ধ মানুষটি বার-বার অনুরোধ করছেন অথচ একবারও যাওয়া হচ্ছে না—এটা উচিত না। অনুচিত তো বটেই, অন্যায়ও।

বিনু শুনেছে, দাদুর সঙ্গে সম্পর্কটা খুব কাছের নয়; মায়ের কি রকম মামা হন। কিন্তু কে বলবে তিনি আপনজন নন।

বারো বছরের বিনু ক্লাস সেভেনে পড়ে। অনেক কিছু বুঝতে পারে সে; তার অনুভবের সীমা বহুদূর বিস্তৃত। দাদুর চিঠি সে পড়েছে। সেগুলোতে যে আন্তরিকতা যে স্নেহপূর্ণ মাধুর্যের সুরটি থাকে বিনুকে তা অভিভূত করেছে। কোন দিন দাদুকে দ্যাখে নি বিনু তবু মনে হয়েছে তাঁর মতন মমতাময় মধুর মানুষ জগতে খুব বেশি নেই। রাজদিয়া বার বার তাকে গোপনে হাতছানি দিয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল। সূর্যটা কোথায় লুকিয়ে ছিল; জলের তলায় কোন অজানা রহস্যময় দেশ থেকে যেন হঠাৎ লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। নরম সাদা রেশমের মতন যে কুয়াশার চাদরটা আকাশ এবং নদীকে আবছাভাবে ঢেকে রেখেছিল এখন আর তা নেই। নদী জুড়ে কত যে ঢেউ: সোনার টোপর মাথায় দিয়ে তারা টলমল করে চলেছে। আকাশটা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে; আশ্বিনের অগাধ অসীম নীলাকাশ।

নীলাকাশ কি আগে আর দ্যাখে নি বিনু? কলকাতার আকাশ অবশ্য বারো-মাস ধুলোয় ঢাকা, ধোঁয়ায় মাখা। কিন্তু বাবার সঙ্গে যখন বাইরে বেড়াতে গেছে নির্মল আকাশ কতবার তার চোখে পড়েছে। শিলং পাহাড়ের মাথায় যে আকাশ, লছমনঝোলায় যে আকাশ কিংবা চেরাপুঞ্জিতে যে আকাশ—সবই তো মনোরম। কিন্তু এখানকার মতনটি আগে আর কখনও দ্যাখেনি বিনু। আকাশ যে উজ্জ্বল, এত ঝকমকে, নীলকান্তমণির মতন এমন দীপ্তিময়—কে জানত। তার গায়ে থোকা থোকা ভারহীন সাদা মেঘ জমে আছে। শরৎকালটা যেন তার সব-টুকু বিস্ময় নিয়ে বিনুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিশাল রাজহাঁসের মতন ভাসতে ভাসতে আর দুলতে দুলতে গম্ভীর বাঁশি বাজিয়ে স্টিমারটা একসময় জেটিঘাটে ভিড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালি জেলার মাল্লারা বিচিত্র সুর করে মোটা মোটা কাছি ছুঁড়ে দিল। জেটিতে আরেক দল মাল্লা তৈরীই ছিল; কাছি লুফে মুহূর্তে লোহার থামে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আস্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। বাঁধাছাঁদা হলে খালাসিরা কাঠের ভারী গ্যাংওয়ে ফেলে জেটির সঙ্গে স্টিমারটাকে জুড়ে দিল।

জেটিঘাটে অনেক মানুষ: গাদাগাদি করে উদ্গ্রীব দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখ এদিকে। এই স্টিমারে যারা এল, খুব সম্ভব তাদের নিতে এসেছে ওরা।

স্টিমারটা জেটিতে ভিড়বার আগে থেকেই চাঞ্চল্য শুরু হয়েছিল; এখন সেটা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে। রেলিঙের কাছে

যে ভিড়টা ছিল, দ্রুত পাতলা হয়ে ডেকে, কেবিনে আর বাঙ্কে ছড়িয়ে পড়েছে। ওদিকে জেটি থেকে একদল হিন্দুস্থানী কুলী বর্গীর মতন হানা দিয়েছে। একটু পর কুলীদের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে যাত্রী মিছিল গ্যাংওয়ে বেয়ে জেটির দিকে নামতে লাগল।

বিনুরা কিন্তু এখনও রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি আসতে পাড়টা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জেটিঘাটের ডান-দিকে নৌকোঘাটা; ছইঅলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কত যে নৌকো লগি পুঁতে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। এক সঙ্গে এত নৌকো আর এত বড় বড় নৌকো আগে আর কখনও দ্যাখেনি বিনু। ওপরে উঁচু বাঁধের মতন রাস্তায় চেরা বাঁশের বেড়া আর টিনের চালের অগুনতি দোকান। কিসের দোকান বোঝা যাচ্ছে না। লোকজন, কদাচিৎ এক-আধটা সাইকেল চোখে পড়ছে।

সুধা অস্থির হয়ে উঠল, 'সবাই নেমে গেল বাবা, আমরা স্টিমারে পড়ে থাকব নাকি?'

'থাকতে চাইলেও দেবে না রে।' অবনীমোহন হাসলেন, 'একটু দাঁড়া; হুড়োহুড়িটা কমুক। তারপর নামব।'

স্টিমার ফাঁকা হয়ে এলে বিনুদের নিয়ে কেবিনে ফিরলেন অবনীমোহন। সুরমা নিজের বিছানায় বসে আছেন; চোখ দুটি জানালার বাইরে ফেরানো। কখন তাঁর ঘুম ভেঙেছে টের পাওয়া যায় নি।

সুরমা, সুধা-সুনীতি আর বিনুর মা। বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ; এক আধ বছর বেশিও হতে পারে। তিনি যে সুধা-সুনীতির মা, বলে দিতে হয় না। পান-পাতার মতন অবিকল সেই মুখ, সেই রকম টানা-টানা চোখ, থাক থাক কোঁচকানো চুল, ছুঁচলো চিবুকে তেমনি ভাঁজ। নিজের চেহারার নিজের সুষমার সবটুকুই অকাতরে তিনি মেয়েদের দিয়ে দিয়েছেন; আলাদা করে কিছুই রাখেন নি। একটা জিনিসই শুধু তাঁর নেই যা সুধা-সুনীতির আছে; সেটা স্বাস্থ্য।

জ্ঞান হবার পর থেকে মাকে কোনদিন সম্পূর্ণ সুস্থ দ্যাখে নি বিনু। সারাদিনই প্রায় শুয়ে থাকেন। হাঁটাহাঁটি, সংসারের কাজকর্ম—সব বারণ। কথা বলতে কষ্ট হয়; এক-আধটু যা-ও বলেন তা ফিস-ফিসিয়ে, আধফোটা গলায়। গায়ে মাংস নেই; হাত-পা-কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। রোগা দুর্বল শরীরে রেখাময় শিথিল চামড়া। গায়ের রঙ এক সময় ছিল পাকা সোনা; এখন মোমের মতন ফ্যাকাশে। চোখের কোলে রক্তের লেশ নেই; কাগজের মতন তা সাদা। দৃষ্টি কেমন যেন ক্লান্ত, দীপ্তিহীন। তাকিয়ে থাকতেও তাঁর বুঝি কষ্ট হয়। সুরমাকে ঘিরে জীবনের এতটুকু লাবণ্যও আর ঝলমল করে না; তাঁর সব আলো সব আভা নিভে গেছে।

বিনু শুনেছে, তার জন্মের এক বছর পর একটা ভাই হয়েছিল। দু-মাসের বেশি সে বাঁচে নি; নিজেও মরেছে মাকেও মেরে রেখে গেছে। অনেক দিন ভুলবার জন্যই বোধ হয় মায়ের ওপর গাঢ় মলিন ছায়া অনড়।

স্ত্রীকে ভাল করে দেখে নিয়ে অবনী-মোহন বললেন, 'এ কি!'

'কী বলছ!' জানালার বাইরে থেকে চোখ দুটি ভেতরে নিয়ে এলেন সুরমা।

'মুখটুখ ধুয়েছ দেখছি; জল পেলে কোথায়?'

কেবিনে জলের ব্যবস্থা নেই। সে জন্য অনেকটা ঘুরে ইঞ্জিন ঘরের কাছে যেতে হয়। সুরমা জানালেন সেখান থেকেই হাত মুখ ধুয়ে এসেছেন।

ভর্ৎসনার সুরে অবনীমোহন বললেন, 'একা একা অতটা রাস্তা তোমার যাওয়া উচিত হয় নি। দুর্বল শরীর; পড়ে টড়ে গেলে এক কাণ্ডই হত।'

সুরমা বললেন, 'আজ আমার শরীর খুব ভাল লাগছে। জানো, এতখানি গেছি এতখানি এসেছি, কিন্তু একটুও হাঁপাই নি।'

অর্ধেক আনন্দের সঙ্গে অর্ধেক বিস্ময় মিশিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'সত্যি বলছ!'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'যাক, পা দিতে না দিতেই রাজদিয়া টনিকের কাজ শুরু করে দিয়েছে। তোমার স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য কত জায়গায় নিয়ে গেছি; কিছুই হয় নি। রাজদিয়া যদি তোমাকে আগের মতন সুস্থ করে দ্যায়, বুঝব এমন জায়গা ভূমণ্ডলে নেই।'

সুরমা বোধ হয় অবনীমোহনের কথা শুনতে পেলেন না। আপন মনে বললেন, 'কত কাল পর এখানে এলাম; কি ভাল যে লাগছে!' তাঁর ছায়াচ্ছন্ন ক্লান্ত চোখে একটু-খানি আলো যেন ফুটি ফুটি করছে।

ধীরে সুস্থে জিনিসপত্র গুছিয়ে দুটো কুলী ঠিক করলেন; তাদের জিম্মায় সে-সব দিয়ে অবনীমোহন স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, 'অনেকখানি যেতে হবে; তোমার হাত ধরে নিয়ে যাই।'

সুরমা বললেন, 'হাত ধরতে হবে না; আমি এমনিই যেতে পারব।'

'ঠিক পারবে তো?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।'

আগে আগে সুরমা চললেন, তারপর সুধা-সুনীতি, একেবারে শেষে অবনীমোহন আর বিনু।

একটু পর গ্যাঙওয়ে পেরিয়ে সবাই জেটিতে এসে পড়ল। জেটিঘাটের ভিড় এখন অনেক হাল্কা হয়ে গেছে; দু-চারটে উৎসুক মুখ শুধু এদিক-সেদিক ছড়ানো। বিনু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। যে অল্প ক'টি লোক এখনও রয়েছে তার ভেতর কোন মানুষটি দাদু, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আদৌ তিনি এসেছেন কিনা, কে জানে।

বেশি দূর যেতে হল না। জেটিঘাটের মাঝামাঝি আসতেই চোখে পড়ল, একজন বৃদ্ধ উন্মুখ হয়ে প্রতিটি যাত্রীকে লক্ষ্য করছেন। তাঁর পাশে সাত আট বছরের ছোট একটি মেয়ে।

বুড়ো মানুষটির গায়ের রঙ কালো। মাঝারি চেহারা; মাথাটা বকের পাখার মতন ধবধবে। মুখময় তিন চারদিনের জমানো দাড়ি। এত বয়সেও মেরুদণ্ড একেবারে সোজা। দু চোখ স্নেহের রসে যেন ভাসো-ভাসো—এখন অবশ্য কিছুটা উৎকণ্ঠিত। চুলের রং বদল, শরীরে কিছু ভার নামানো আর চামড়ায় এলোমেলো আঁচড় কাটা ছাড়া সময় তেমন কিছুই করে উঠতে পারেনি। এত বয়সেও শরীর বেশ শক্তই আছে; স্বাস্থ্যের ভিত রীতিমত মজবুত। বৃদ্ধকে ঘিরে এমন এক সরলতা মাখানো যাতে মনে হয় তাঁর বয়স্ক দেহের ভেতর চিরকালের এক শিশুর বাস। পরনে খাটো ধুতি, খদ্দরের ফতুয়া, পায়ে লাল ক্যাম্বিসের জুতো।

ছোট মেয়েটির চুল কোঁকড়া কোঁকড়া; নাকটি বোঁচাই হবে; ফুলো ফুলো নরম লালচে গাল। রুপোর কাজললতার মতন চোখে কালো মণি দুটো টলটল করছে; একটু নাড়া দিলেই টুপ করে ঝরে পড়বে। নীল ফ্রক লাল জুতোয়, মনে হয়, মোমের পুতুলটি।

সুরমা খুব আস্তে আস্তে পা ফেল-ছিলেন। যেতে যেতে বৃদ্ধটির কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন; একটুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঝুঁকে পা ছুঁলেন।

বৃদ্ধের চোখ আলো হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সুরমাকে তুলে চিবুকে হাত রেখে বললেন, 'আমার রমু না?'

'হ্যাঁ, মামা।' সুরমা মাথা নাড়লেন।

বিনু এই প্রথম জানতে পারল, একটা আদরের নাম আছে মায়ের—রমু।

বৃদ্ধ বললেন, 'আসতে পারলি তবে! কত বছর ধরে চিঠি লিখছি!' তাঁর স্বরে ক্ষোভ এবং অনুযোগ মেশানো।

'কী করব বল—' সুরমা বললেন, 'কত রকম ঝামেলা—'

'ঝামেলা তো হিল্লীদিল্লী যাস কী করে? এখানে আসতেই যত কষ্ট!'

অস্ফুট গলায় সুরমা কি একটা উত্তর দিলেন; কেউ শুনতে পেল না।

বৃদ্ধ বললেন, 'কতকাল পর তোকে দেখলাম। সেই বিয়ের সময় শেষ দেখা; তখন তুই একেবারে ছেলেমানুষ। ক' বছর বয়েসে যেন বিয়ে হয়েছিল তোর?'

লাজুক সুরে সুরমা বললেন, 'সতের।'

বৃদ্ধ বললেন, 'সে কি আজকের কথা! তুই নিজে এসে না বললে চিনতেও পারতাম না। মুখের আদল-টাদল, চেহারা—কত বদলে গেছে।'

সুরমা হাসলেন।

বৃদ্ধ আবার বললেন, 'স্টিমার থেকে কত লোক নেমে গেল, কিন্তু কেউ আমার কাছে দাঁড়াচ্ছে না; এত লোকের ভিড়ে কে যে আমার রমু বুঝতে পারছি না। একবার তো ভাবলাম, তোরা এবারও এলি না।' বলতে বলতে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন যেন, 'তোর চেহারার এ কি হাল হয়েছে!'

সুরমা মলিন হাসলেন, 'ক' বছর ধরে সমানে ভুগছি। ছোট ছেলেটা হবার পর

থেকে শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। নিজেও সে বাঁচলে না, আমাকেও জন্মের মতন পঙ্গু করে রেখে গেল।'

'ইস্, কি স্বাস্থ্য ছিল আর কি দাঁড়িয়েছে! ক'খানা শুকনো হাড় ছাড়া কিছুই নেই। তা বাপু, এই যে এলে, শরীর-টরীর সারিয়ে নাও। তারপর যাবার কথা মুখে আনবে।'

সুরমা কিছু বললেন না; মৃদু একটু হাসি তাঁর মুখে আবছাভাবে লেগে রইল।

বিনু বুঝে ফেলেছে, এই বুড়ো মানুষটিই তার দাদু। চিঠি পড়ে পড়ে দাদুর নামটা সে জেনেছে—হেমনাথ মিত্র।

হেমনাথ হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ঐ দেখ, কি ভুলো মন আমার! মেয়েকে নিয়েই মেতে আছি। অবনীমোহন কোথায়? আমার দাদা আর দিদিভাইরা?'

অবনীমোহন সামনে এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন। হেমনাথ বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা, শতায়ু হও।'

অবনীমোহন বললেন, 'আপনার শরীর কেমন আছে মামাবাবু?'

'খুব ভাল; অসুখ-বিসুখ আমার কাছে বড় একটা ঘেঁষে না। লাস্ট টেন ইয়ারসে দু-বার মোটে জ্বর হয়েছিল। তার আগে কিছু হয়েছিল কিনা, মনে নেই। সে যাক, তোমরা কেমন আছ, বল!'

'আমরা খুব খারাপ নেই তবে আপনার ভাগনীকে নিয়েই পড়েছি বিপদে।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না।

হেমনাথ বললেন, 'রাস্তায় আসতে কষ্ট টষ্ট হয়নি তো?'

'ট্রেনে ভালই এসেছিলাম। তবে স্টিমার চড়ায় ঠেকে যাওয়াতে ঘণ্টা কয়েক আটকে থাকতে হয়েছিল।'

হেমনাথ বললেন, 'কালও একবার স্টিমারঘাটে এসেছিলাম, চড়ায় আটকাবার কথা শুনে গেছি। সুজনগঞ্জের ভাটিতে ক' বছর ধরে মস্ত চর পড়ছে; প্রায়ই স্টিমার ওখানে আটকে যায়।'

একটু কি ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'মামীমা কেমন আছেন?'

সুরমা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তাঁর স্বভাবের রঙ মৃদু; খুব আস্তে আধফোটা আধবোজা গলায় কথা বলেন। নিজের দুর্বল শরীর, ক্ষীণ জীবনী শক্তি, সব ভুলে গিয়ে এখন প্রায় চেঁচামেচিই করে উঠলেন, 'তাইতো, মামীমাকে দেখতে পাচ্ছি না! স্টিমারঘাটে এল না যে? শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?'

'না; ভালই আছে' হেমনাথ বললেন, 'তোরা আসবি, তাই ভোরবেলা উঠেই রান্নাবান্না নিয়ে মেতেছে।' বলতে বলতে হঠাৎ কি লক্ষ্য করে বললেন, 'এ কি অবনী!'

হেমনাথের স্বরে বিস্ময় ছিল। অবাক হয়ে অবনীমোহন বললেন, 'আজ্ঞে—'

'তোমার চুল এর ভেতরেই পাকতে শুরু করেছে দেখছি। এটা কি রকম হল!'

'আজ্ঞে, পঞ্চাশ বছর পেরুতে চললাম—'

'উঁহু-উঁহু, যত বয়েসই হোক বাপ-খুড়ো মামা-জেঠা—গুরুজনরা বেঁচে থাকতে ছেলেমেয়েদের চুল পাকতে নেই।'

অবনীমোহন নিঃশব্দে হাসলেন; আর সবাইও হেসে উঠল।

হেমনাথ কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সুরমা বলে উঠলেন, 'মামা, তুমি কিন্তু মেয়ে-জামাই পেয়ে সব ভুলে গেছ। তোমার দাদা আর দিদিভাইরা—'

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'তাইতো, তাইতো। কোথায় ওরা?'

সুধা আর সুনীতি এগিয়ে এসে প্রায় একই সঙ্গে প্রণাম করল। পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াতেই আঙুলের ডগায় দুজনের মুখ তুলে ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন হেমনাথ। তারপর মুগ্ধ গলায় বললেন, 'বাঃ! বাঃ! তুমি নিশ্চয়ই সুধাদিদি আর তুমি সুনীতিদিদি!'

হেমনাথ ঠিক ঠিক চিনতে পেরেছেন। বাইশ-চব্বিশ বছর দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না, তবে চিঠিপত্রে ভাগনীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। নিজের সন্তানদের কে কি রকম দেখতে হয়েছে, কার স্বভাব কেমন, পড়া-শোনায় কে ভাল, কে মন্দ—সব কথা মামাকে জানান চাই সুরমার।

সুধা বলল, 'হ্যাঁ, আমি সুধাই।'

সুনীতি বলল, 'আমিও সুনীতিই। কিন্তু চিনলেন কেমন করে?'

হেমনাথ বললেন, 'সে একটা মন্তর আছে, তাই দিয়ে চিনে ফেলেছি।' আঙুলের প্রান্তে চিবুক ধরাই ছিল। হঠাৎ মুখ চোখে দুর্ভাবনার রেখা ফুটিয়ে হেমনাথ বললেন, 'তোমরা এসেছ; এর চাইতে আনন্দের আর কিছু নেই। কিন্তু দিদিভাইরা একটা মুশকিলে ফেলে দিলে যে!'

'কী মুশকিল দাদু?' সুনীতিকে ঈষৎ উদ্বিগ্ন দেখাল।

'তোমরা হলে দু'জন; আর ঘরে আছেন একজন। এই তিনজনের ভেতর এখন কাকে যে পাটরাণী করি! শেষ পর্যন্ত একটা গৃহযুদ্ধ না বেধে যায়!'

সুনীতি কিছু বলল না; মুখ টিপে হাসতে লাগল।

সুধা কিন্তু ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'বুড়ো থুত্থুরে; আবদার কত! আপনার পাটরাণী হতে আমার বয়ে গেছে!'

আমুদে গলায় হেমনাথ বললেন, 'বুড়ো বলে দাগা দিলে ভাই!'

কল কল করে সুধা কি বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ভিড় ঠেলে বিনু হেমনাথের পা ছুঁল। চকিত হেমনাথ বললেন, 'কে রে? কে রে? পরক্ষণেই চওড়া বিশাল একখানা বুকের ভেতর ধরা পড়ে গেল বিনু।

সুরমা বললেন, 'ও তোমার দাদাভাই মামা। সবার সঙ্গে কথা বলছ, গল্প করছ, ওর দিকে একবারও তাকাচ্ছ না। এ কি সহ্য হয়? তাই নিজেই আলাপ-টালাপ করে নিতে এগিয়ে এসেছে। হিংসের একখানা পুঁটুলি।'

'তাই তো, তাই তো। ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। সবার আগে দাদাভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করা উচিত ছিল।' বুকের ভেতর থেকে বার করে এনে বিনুকে দু-হাতে ওপরে তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন হেমনাথ।

যেভাবে হেমনাথ ঘোরাচ্ছেন-ফেরাচ্ছেন তাতে বিনুর মনে হল, এই বয়সেও মানুষটি যুবকের মতন শক্তিমান।

হেমনাথ বললেন, 'দাদাভাইয়ের নামটা যেন কী?'

সুরমা বললেন, 'বিনু।'

বিনু গম্ভীর গলায় বলল, 'বিনয়কুমার বসু।'

'ঠিক ঠিক; হেলাফেলা করে ন্যাড়া-বোঁচা একটা নাম বলে দিলেই হল! তার সঙ্গে গয়না-টয়নাগুলো জুড়ে দিতে হবে না?' বলে বিনুর দিকে তাকালেন হেমনাথ। কৌতুকে তাঁর চোখ ঝকমক করছে। বললেন, 'আমার ইচ্ছে, নামটা একেবারে জেনারেলোসিমো বিনয়কুমার বসু হোক। কি, পছন্দ তো?'

জেনরেলোসিমো শব্দটা বিনুর অজানা। তবু মনে হল, ওটার মধ্যে ঠাট্টা আছে। সে লজ্জা পেয়ে গেল।

হেমনাথ আবার বললেন, 'দাদাভাইকে তো বীরপুরুষের মতন দেখতে; বাঘ মারতে পারো?'

বিনু উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সুধা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঘ! জানো দাদু সেবার ছোটনাগপুরে খরগোশ দেখে ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।'

ছোটদিটা চিরকালের বিভীষণ। ঠিক সময়টিতে শত্রুতা করবার জন্য সে যেন ওঁত পেতেই আছে। বিনুর ইচ্ছা হল, সুধার বেণী ধরে কষে টান লাগিয়ে দেয়। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে সদিচ্ছাটাকে এই মুহূর্তে কাজে লাগানো গেল না। পারলে অবশ্য সুধাকে ভস্মই করে ফেলত। কটমট করে একবার তাকিয়েই আপাতত বিনুকে সন্তুষ্ট থাকতে হল।

হেমনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ ক্লাসে পড়?'

বিনু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মনে হল, প্যান্ট ধরে কে টানছে। টানটা অনেকক্ষণ থেকেই অবশ্য টের পাওয়া যাচ্ছিল, বিনু খেয়াল করে নি। নীচের দিকে তাকাতেই দেখতে পাওয়া গেল। সেই মেয়েটা—কোঁকড়া কোঁকড়া যার চুল, লালচে ফুলো ফুলো গাল, রুপোর কাজল-লতার মতন চোখ—ছোট্ট মুঠিতে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে তার প্যান্টের তলার দিকটা ধরে আছে।

চোখাচোখি হতেই মেয়েটা আরো জোরে টান লাগাল। ফিসফিসিয়ে বলল, 'নামো, নামো বলছি।'

হেমনাথ বোধ হয় লক্ষ্য করেছিলেন। স্বরে টান দিয়ে বললেন, 'ওরে হিংসুটি; দাদাকে নামতে বলা হচ্ছে!'

আগের মতন সুর করে মেয়েটা এবার হেমনাথকে বলল, 'ওকে নামিয়ে দাও, শিগ্‌গির নামিয়ে দাও—'

হেমনাথ বললেন, 'কেন, নামাব কেন?'

বিনুর প্যান্ট ধরে মেয়েটা টানছিলই। বলল, 'আমি তোমার কোলে উঠব।'

'ওরে বদমাস মেয়ে, আমার কোলটা একেবারে মৌরুসীপাট্টা করে নিয়েছে!'

মেয়েটা কী বুঝল, সে-ই জানে। জোরে জোরে চুল ঝাঁকিয়ে সমানে বলতে লাগল, 'নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও—'

সুধা-সুনীতি-সুরমা - অবনীমোহন সবাই সকৌতুকে দেখছিলেন। সুরমা বললেন, 'মেয়েটা কে গো মামা; এতক্ষণ খেয়াল করিনি—একেবারে জাপানী পুতুল। আর কেমন পুট পুট কথা বলছে!'

'ওর নাম ঝিনুক।' হেমনাথ বললেন, 'ভবতোষকে তোর মনে আছে?'

'কোন ভবতোষ?'

'লাহিড়ী-বাড়ীর ভবতোষ; রাজেন লাহিড়ীর ছেলে!'

চোখ কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করলেন সুরমা। স্মৃতির ঝাঁপি খুলতে পারলেন কিনা, বোঝা গেল না। অনিশ্চিতভাবে বললেন, 'নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে; মুখটা মনে করতে পারছি না। কতকাল আগে রাজদিয়াতে এসেছিলাম, সে কি আজকের কথা!'

হেমনাথ বললেন, 'ঝিনুক ভবতোষের মেয়ে।'

সুরমা কোমলগলায় ডাকলেন, 'এসো ঝিনুক, আমার কাছে এসো।'

'তোমার কাছে যাবো না।' জেদী স্বরে বায়না জুড়ে দিল ঝিনুক, 'আমি দাদুর কোলে উঠব; দাদুর কোলে উঠব।'

এই মনোরম ছেলেমানুষির খেলাটা আরো কিছুক্ষণ হয়ত চলত। কিন্তু তার আগেই হিন্দুস্থানী কুলীরা চেঁচিয়ে উঠল, 'চলিয়ে বাবুজী, বহুত দের হো যাতা—' সুরমারা হেমনাথকে দেখে দাঁড়িয়ে যেতে কুলীরাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল; এখন তারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। হেমনাথ যেন এতক্ষণে স্থান-কাল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন, 'ঐ দ্যাখো জেটিঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প জুড়ে দিয়েছি। চলো-চলো—' আস্তে আস্তে তিনি বিনুকে নামিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডটা ঘটল; লাফ দিয়ে ঝিনুক তাঁর কোলটি দখল করে বসল। তারপর বিজয়িনীর মতন সগর্বে একবার বিনুর দিকে তাকাল।

বিনুর ইচ্ছা হল, পা ধরে টেনে মেয়েটাকে নামিয়ে দ্যায়। আবছাভাবে মনে হল, দাদুকে খুব সহজে দখল করা যাবে না—তার আগে ঝিনুকের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ আছে।

ঝিনুককে কোলে নিয়েই চলতে শুরু করলেন হেমনাথ। বিরক্ত গলায় বললেন, 'তোকে নিয়ে আর পারি না ঝিনুক—' হেমনাথের বিরক্তি যে স্নেহেরই আরেক নাম তা বলে দিতে হয় না।

হেমনাথ আগে আগে চলেছেন। সুরমারা তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

যেতে যেতে হেমনাথ পেছন ফিরলেন। আলতো করে ডাকলেন, 'রমু—'

'কী বলছ মামা?' সুরমা উৎসুক চোখে তাকালেন।

'এই ঝিনুকটা, বুঝলি—' গাঢ় বিষাদময় স্বরে হেমনাথ বললেন, 'বড় দুঃখী রে, বড় দুঃখী—'

সুরমার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটল। বললেন, 'দুঃখী! কেন?'

খুব আস্তে আস্তে হেমনাথ বললেন, 'পরে বলব। এসেছিস যখন সবই জানতে পারবি।'

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

বারো বছরের বিনু 'দুঃখী' শব্দটা জানে। চকিতে সে একবার ঝিনুককে দেখে নিল।

(ক্রমশঃ)

রাতের শহর

বজবজ থেকে বালি

অঘ্রাণের নিশুতি রাত। কুয়াশা এত ঘন, নিবিড় হয়ে আছে, যেন করাত দিয়ে দুখানা করে কাটা যায়। বজবজ থেকে বালি পর্যন্ত প্রসারিত গঙ্গার বুকে ত্রয়োদশী শুক্লপক্ষের আলো সেই পুরু জালের ভেতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে নামছে। জলে আসন্ন ভরা কোটালের টান—তেমনভাবে কান পাতলে ঝুপঝাপ পাড়ভাঙার হঠাৎ হঠাৎ শব্দ শোনা যায়। বাতাসবিহীন চারপাশ ভূতগ্রস্ত, থমথমে। যতদূর দেখা যায়, লাল নীল সবুজ আলো দু তীর থেকে জানিয়ে দিচ্ছে, এটা পোর্টের এলাকা। ভৌতিক রুপোলী আলোয় চোখে পড়ে, এধারে ওধারে অভিভাবকের হালছাড়া শিশুর মতো দু'চারটে ডিঙি নৌকো ইচ্ছে-মাফিক ভেসে বেড়াচ্ছে। বহুদূর থেকে নির্বাসনের পালা শেষ করে দীর্ঘ সিটি বাজাতে বাজাতে কদাচিৎ এক একটি হোয়াইট লাইনার জাহাজ মাঝদরিয়ায় কিম্ভূত চেহারায় জেগে ওঠে। এঞ্জিন-ঘরের মাথা থেকে ছুটে আসা সুতীব্র সার্চলাইটের আলো গঙ্গার বুক তোলপাড় করে তোলে।

ডেকের ওপর রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তিগুলি ক্রমশ অবয়ব পেতে থাকে।

ঘাটলার এক পাশে, তীর থেকে নামা বটের ঝুরির আড়ালে এতক্ষণ সারা শরীর ঢেকে বিশ্রাম করছিল তিনটি স্পীডবোট: জাহাজটি আর একটু এগোতেই হঠাৎ বোটগুলি প্রায় টর্পেডোর গতিতে ছুটে যায়। দু'ধারে নীল জল ভয়ংকর আহত হয়ে ফুঁসে উঠতে থাকে। তারপর, মধ্যরাতকে সচকিত করে অনবরত বন্দুক দাগার শব্দ শোনা যায়। বোটগুলি জাহাজ ঘিরে ফেলে। সংকুল গতিতে সরীসৃপের মতো একদল লোক জাহাজে ওঠে। হাল্লা, কয়েক রাউন্ড গুলি ও পরিত্রাহি আর্তনাদে রাতের জমাট নৈঃশব্দ ছিঁড়ে খান খান হয়ে যায়। বারুদের ধোঁয়া কুয়াশাকে আরও নিবিড় করে তোলে। স্পীডবোটের ধুরন্ধর দুর্বৃত্তেরা লহমার মধ্যে বেঁধে ফেলে দামি বিলিতি মদের নেশায় চুর কাপ্তানকে। সেকেন্ড-মেট ও কেবিন বয়েরা তাদের ধূমায়মান নলের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে ত্রস্ত ডাইনিং রুমের দিকে পালাতে থাকে। আর, এই সুযোগে মাল-গুদামের তালা ভেঙে কারগো-কাম-প্যাসেঞ্জার জাহাজের মেশিন টুলস, চিনির বড়ো বড়ো বস্তা ও হাজারো রকমের বয়ে আনা জিনিসপত্র ঝুপঝাপ কাদের দক্ষ হাত অবলীলায় ঠিক তাকমাফিক ছুঁড়ে দিতে থাকে স্পীডবোটগুলির ওপরে। জাহাজের সমস্ত আলো একযোগে নিভে যায়। আসবাবপত্র ভাঙার ও কাচ গুঁড়িয়ে যাওয়ার ঝনঝন শব্দ জাগে। দু' চারটে লাশও বুঝি ডেকে, করিডোরে, কেবিনে উষ্ণ রক্ত ঢালতে ঢালতে নীল হয়ে যায়। ঠিক যেভাবে বোম্বেটেরা জাহাজে উঠেছিল, লুণ্ঠন সমাপ্ত হলে আবার সেভাবেই নেমে পড়ে। ভারী মালে টলমাটাল বোটগুলি হঠাৎ গর্জে উঠে একযোগে গঙ্গার অন্য এক সীমান্তে মিলিয়ে যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা আরও ঘন হয়ে এলে দেখা যায়, চেনে বাঁধা এক অতিকায় ম্যামথের মতো জাহাজের বিরাট শরীর একটি ধূসর ল্যান্ডস্কেপ রচনা করে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। সব শেষ হয়ে গেলে লুণ্ঠিত পোর্ট থেকে কার অনভ্যস্ত কাঁপা কাঁপা হাত অনবরত এস-ও-এস্ পাঠাতে থাকে। পোর্টের কোনো প্রকোষ্ঠে বিপদ-বাঞ্জক লাল আলো বার বার অসম্ভব ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে ওঠে। তারও বেশ কিছুক্ষণ পরে রেসকিউ পার্টির সরকারী লঞ্চগুলি ঐ হতভাগ্য জাহাজ অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। পরের দিন প্রভাতী সংবাদপত্রে বোল্ড টাইপে ছাপা হয় 'বজবজ থেকে বালির মধ্যে কলকাতার পোর্ট এলাকায় গত এক বছর যাবত কোটি টাকার মত মাল লুণ্ঠিত হয়েছে। বিদেশী জাহাজে নিয়ে আসা জিনিস-পত্রের অপহৃত হওয়ার ফলে লক্ষ টাকার মতো মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটেছে।'

সব খবর বাইরে বেরোয় না। বহু অলিখিত, প্রমাণবিহীন ঘটনা উত্তুরে বাতাসের হাওয়ায় হাওয়ায় কিংবদন্তী হয়ে এখনো বজবজ, বালির পুরোনো মেছুরে আর মাঝিদের মুখ থেকে মুখে ফেরে। দীর্ঘ আড়াইশো বছর ধরে নির্বিচারে লুটপাট, হত্যাকান্ড এক ব্যাপক এলাকা জুড়ে ধারা-বাহিক ইতিহাসের বিস্তৃত, রক্তমাখা স্মৃতি হয়ে পড়ে আছে।

বালি ব্রিজ থেকে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটলে একটি প্রবীণ মহানিমগাছের নীচে অতি সামান্য আসবাবপত্র সমেত একটি চায়ের দোকানের হদিশ আপনি পেয়ে যাবেন। দোকানের তদারকী করে একজন অবাঙালী, সাধারণভাবে এখানকার ক্রেতা মুটে-মজুর জেলে আর বন্দরের মাল খালাস করা কুলী-কামিনেরা। এ এক অদ্ভুত আস্তানা। দিনে বিক্রি হয় বিড়ি, সস্তা সিগ্রেট, নাড়কোলের পাফ আর চা। মহানিমের গুঁড়ি ঘেঁষে অন্ধকার যতো ফুঁসে উঠতে থাকে, কান্ডে ডালপালায় একটু একটু করে ছড়িয়ে যায়, শরীরে রাতের আলকাতরা মেখে হঠাৎ দুচারজন লোক ত্রস্ত পায়ে ঢোকে, মালিকের সঙ্গে ফিস্‌ফাস্ কথা বলে। তারপর দোকান-ঘরের পেছনের এক চোরা-কুঠুরীতে

বিভিন্ন আকারের পুলিন্দা জিম্মা রেখে দোকানীকে আড়ালে নিয়ে হাতে কিছু টাকা-পয়সা গুঁজে দিয়ে একমুহূর্তে স্রেফ বে-পাত্তা হয়ে যায়। বিভিন্ন চরিত্রের ও রহস্যময় জীবিকার লোকেরা আসে যত আর একটু বাড়লে। দোকানের মেঝের ওপরে পরিপাটি করে বিছানো একটি মাদুর সরিয়ে মালিকের সাহায্যকারী একটি চটপটে যুবক গুপ্ত গহ্বর থেকে বের করে আনে অ্যান্টি আর কারবাইডের চোলাই ভর্তি ফুটবল ব্লাডারগুলি। কখনো দেড়গুণ দুগুণ দামে বিক্রি করে দিশী ভাঁটিখানার মদ। দক্ষ হাতে চাপাটি সেঁকা হয়। বেশী জ্বাল দেয়া মাংসের গন্ধে চারপাশ ম-ম করে।

এইসব মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধাঁচের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক যৌবনের অভ্যেস কাটাতে না পেরে এখানে প্রায় প্রতিদিন সবার জটলা বাঁচিয়ে এক কোণে বসে চুপচাপ নেশা করেন। নেশা জমে এলে কাউকে বিরক্ত না করে দোকান থেকে বেরিয়ে গিয়ে অনেকদিন ধরে মাটির মধ্যে গাঁথা একটি ভাঙা, মরচে ধরা ক্যাপস্টানের ওপরে গিয়ে বসেন। মেজাজ শরীফ থাকলে গলা ছেড়ে শ্যামাসঙ্গীত গান। প্রচণ্ড জল ঝড়ে স্কুটারটি দাওয়ার এক কোণে রেখে একদিন এখানে বেশ কিছুক্ষণের জন্য আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে একটু ইতস্তত করে দোকানীকে ডেকে একটা দু' নম্বর ফাইল হুকুম করলাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার পাশেই বসেছিলেন। এমনিই বাইরে প্রচণ্ড বাদল, বেশ একটু মাত্রাধিক্য হয়ে গিয়েছিল তাঁর। মাঝে মাঝে ভাবলেশহীন চোখে আমার মুখের দিকে চাইছিলেন, আবার সেকালে নিবিষ্ট হচ্ছিলেন। নেশার ঝোঁকে অপরিচয়ের প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে উঠে কখন দুজনে দিল খুলে গপ্পো-গুজবে মেতে গেছি, খেয়াল নেই। সেই ভদ্রলোকের মুখে সেই দুর্যোগময়ী রাত্রে শুনেছিলাম বজবজ-বাসির গঙ্গাবক্ষের ওপর ডাকাতি ও খুনের গা-ছমছমে নানা লিজেন্ড। সত্য মিথ্যে যাচাই করার ক্ষমতা আমার ছিল না—দোকানের এক কোণে রাখা প্রচুর ধূম-উদ্গীরণকারী লণ্ঠনের কম্প্র স্তিমিত আলো বাইরের দুর্যোগ ও গাছের পাতায় পাতায় ঝড়ের ঝটপটানির শব্দের সঙ্গে বৃদ্ধের গমগমে কণ্ঠস্বর ঘন বুনুনিতে গেঁথে আমার আচ্ছন্ন চেতনাকে ভীষণভাবে দুলিয়ে দিচ্ছিল।

পূর্ববাংলার গ্রাম-গঞ্জ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে পোর্তুগীজ আর হার্মাদী জল-দস্যুরা তাদের শেষ মরণ কামড়ে আঁকড়ে ধরেছিল ভাগীরথীর দুপারের নরম মাটি। সরস্বতী নদী বেয়ে দেবানন্দপুর হয়ে ব্যান্ডেল পর্যন্ত চারপাশের গ্রাম এইসব বোম্বেটেদের মশালের আলোয় সমস্ত রাত রক্তলোচন হয়ে থাকত। ঠিক এভাবেই এরা হানা দিত বাঁশ-বজবজের গঙ্গায়। নদীর মাঝ-বুকে অতর্কিতে লড়াই বেধে যেতো চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্র ও দ্রুতযান তাদের ছিপ্‌ছিপে পোতগুলির সঙ্গে কখনো মোগল বাদশাহের নানা সম্ভারে বোঝাই জাহাজ, কখনো বা ফরাসী ও ইংরেজ অর্ণবপোতগুলির। ঘন ঘন তোপ দাগার শব্দে শিউরে উঠত ভাগীরথীর দুধার—গ্রাম শহরের ওপর পোর্তুগিজ আর হার্মাদীদের কংকালশোভিত পতাকা লুঠ-তরাজ, খুনখারাবি আর ধর্ষণের গভীর অভিশাপ নিয়ে নেমে আসতো।

এমনি কোন সর্বনাশের আগুন বুকে করে দেগঙ্গার কৃষকের ঘরের মেয়ে কাঞ্চন বানের জলে এঘাটায় ওঘাটায় ভাসতে ভাসতে কখন নারী জলদস্যু কাঞ্চন ডাকাতনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তার জার ও সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল বজবজের এক পাঞ্জাবী নম্বরের লেঠেল। সালতি ডিঙি ছিপ মিলিয়ে প্রায় দেড়শো জলযানের মালিকানা ছিল কাঞ্চনের। আগুনের ফুলকি-পারা তার রূপে বহু যুবক-প্রৌঢ় মুগ্ধ পতঙ্গের মতো নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এমনও প্রবাদ আছে প্রতি রাত্রে কাঞ্চন এক একটি সর্বাঙ্গশোভন পুরুষকে তার শয্যা-সঙ্গী করতো এবং নেহাতই তার কৃপা না পেলে তাদের অনেকেরই দেহ মাছের আহার হয়ে কোন না কোনদিন জলের অতলে তলিয়ে যেতো। একবার সদাগরী জাহাজ থেকে ছোঁড়া গোলার আঘাতে তার ডান হাত উড়ে যায়, কিন্তু বাঁ হাতেই সে নির্ভুল তাগ করতে পারতো শত্রুর খুলির চাঁদমারি, অব্যর্থ ছুঁড়তে পারতো অতিকায় আকবের বল্লম। তাকে নিয়ে গান বাঁধত, ছড়া কাটত সাতহাটের মানুষ।

বিস্মৃত ইতিহাসের একটির পর একটি পর্ব বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার নেশাচ্ছন্ন কানে গেঁথে দিচ্ছিলেন। অবলীলায় স্থান-কাল-পাত্র সব কিছু মিলেমিশে আমাকে যেন একটি টাইম মেশিনে চাপিয়ে আঠারো শতক থেকে একাল পর্যন্ত সময়ের ব্যাপ্তির গোলক চক্কর খাইয়ে আনছিল। পোর্ট এলাকাকে ঘিরে যে বিরাট অন্ধকার ছেয়ে আছে তার যবনিকা তুলে দেয়ার মানসে যে কজন তরুণ রিপোর্টার প্রাণ হাতে করে রাতের পর রাত ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে মর্মান্তিক সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছেন তাঁদের অসীম সাহসের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। তাঁরাই সভ্য কলকাতার মধ্যবিত্ত মানুষের সকালের চায়ের টেবিলে এ খবর পৌঁছে দিয়েছেন যে, এক বছরের মধ্যে রাত্রের পর্দায় গা ঢেকে জাহাজের মাল খালাশ বা ডেলিভারির কাজে নিযুক্ত নৌকো-গুলি কমসেকম চল্লিশ পঁয়তাল্লিশবার বোম্বেটেদের আক্রমণের শিকার হয়ে পড়েছে। মাঝিসমেত নৌকোগুলির অস্তিত্ব পর্যন্ত কোন পাত্তা নেই। বন্দর এলাকার এই কালো যবনিকার পেছনে নিশ্চয়ই অনেক সুসংবদ্ধ দল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দিনের বেলা এরা বড়বাজার, খিদিরপুর, মেটেবুরুজ আর ধর্মতলায় বৈধ-অবৈধ নানা ব্যবসা চালায় আর রাতে তাদের তর্জনীর হেলনে বাদুড়ের ডানার মতো ঝাঁক মেলে নামে গঙ্গার বুক জুড়ে লুণ্ঠনের তাণ্ডব।।

জল কমে এলে ধীরে ধীরে দোকানের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। মেঘ একেবারে কেটে গেছে, ভিজে রাস্তা চাঁদের আলোয় থৈথৈ করছে। স্কুটারটা কোনক্রমে স্টার্ট দিয়ে একটু ঢাল ধরে গঙ্গার তীর বেয়ে এগোতে লাগলাম। ধু ধু আদিগন্ত নদীর ওপর শুক্লা রাতের মায়াজাল তখন শুরু হয়ে গেছে। মাঝদরিয়ার চাঁদের আলোর একটি লম্বালম্বি প্রতিফলন দেখে হঠাৎ চমকে উঠলাম। কেমন নিশ্চিত মনে হল, দেগঙ্গার কৃষক-ঘরের মেয়ে কাঞ্চন, ডাকসাইটে নারী জলদস্যু কাঞ্চন ডাকাতনী অন্ধকারের বুক ভেঙে এক জ্যোৎস্নার বল্লম হাতে টান টান দাঁড়িয়ে আছে।

—নিশানাথ

অবহেলিত প্রতিভা

বিগত শতকের খুব কম সংখ্যক সমালোচক ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের মত অসামান্য বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, খুব কম সম্পাদকই হ্যারিসের মত নতুন প্রতিভা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। প্রতিভার পরিচয় যেখানে পেয়েছেন সেখানেই ছুটেছেন হ্যারিস, তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পঁচাত্তর বছর বয়সে নীসের ইংলিশ সিমেট্রির কবরশালায় ফ্রাঙ্কের মরদেহকে কবরস্থ করা হয়েছে, এখন তিনি প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত। যে সব অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তি বিশিষ্ট মানুষকে তিনি জীবদ্দশায় আক্রমণ করেছেন তাঁরা ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের খ্যাতিকে কলঙ্কিত করেছেন, ফ্রাঙ্কের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন।

যাঁদের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির মূলে ফ্রাঙ্কের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল তাঁরাও ফ্রাঙ্ককে প্রশংসা করলেও আঘাত হানতে ছাড়েন নি।

ফ্রাঙ্ককে কেউ বলেছেন জার্মান- অভিমুখী, কেউ বলেছেন তিনি ইহুদী-বিদ্বেষী (অথচ তিনি মোটেই জার্মান প্রেমিক বা ইহুদী বিদ্বেষী ছিলেন না)। কেউ বলেছেন, ফ্রাঙ্ক পর্ণোগ্রাফার, অর্থাৎ খিস্তি সাহিত্য লেখক। ফ্রাঙ্ক ব্যক্তি বিশেষের সামগ্রিক জীবন নিয়ে চর্চা করেছেন এবং সেকস এবং যৌন মিলন সম্পর্কে ওয়াল্ট হুইটম্যান এবং ডি এচ লরেন্সের ভঙ্গীতেই যে আলোচনা করেছেন, তা সারগর্ভ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

ফ্রাঙ্ক নিজেই কিন্তু নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন। সেই কথা বিস্তারিতভাবে মিঃ ই মেরিল রুট লিখেছেন তাঁর প্রশংসা-মণ্ডিত জীবনীগ্রন্থে। ফ্রাঙ্কের চরিত্রে আকর্ষণ ছিল এবং কিছু পরিমাণে দোষও ছিল। ফ্রাঙ্ক আকৃতিতে নাতিদীর্ঘ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলেন। দেহে ছিল অমিত প্রাণশক্তি এবং নিজের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। ফ্রাঙ্কের ছিল তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, কালো গোঁফ এবং পোষাক-পরিচ্ছদ নাকি 'কোয়াইট রাইট' ছিল না। এই সব নিয়ে তাঁকে একজন সফল জুয়াড়ি বা রেসের মাঠের দালাল বলে মনে হত। এর ওপর গলার আওয়াজ ছিল মোটা, মনে হত যেন চটকলের ভোঁ বাজছে। মানুষকে মুগ্ধ করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল ফ্রাঙ্কের কিন্তু তা বিপরীত পথে, এবং সর্বদাই এই ধারণার উদ্রেক হয়েছে যে উনি মোটেই একজন প্রকৃত ভদ্রলোক নন।

বর্তমান কালটিতে এমন একজন শ্রদ্ধাশীল জীবনীকারের প্রয়োজন ছিল কিন্তু তার অভাবে যিনি ভিকটোরীয় সাহিত্যের সোনালী সূর্যাস্তে (গোল্ডেন সানসেট) এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে এবং সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত ও অবহেলিত অবস্থায়।

তরুণ সম্পাদক হিসাবে ফ্রাঙ্কের অনন্য সাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় সম্পর্কে দ্বিমত নেই। 'ইভনিং নিউজ' পত্রিকাটি তিনি বড় করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তার সাফল্যের পথে সহায়ক হয়েছিলেন। তারপর আট বছর কাল ধরে প্রভাবশালী পত্রিকা 'দি ফর্টনাইটলি রিভ্যু' সম্পাদনা করেছেন। তার পর 'দি সাটার্ডে রিভ্যু' (ইংরেজী সংস্করণ এই নামে আমেরিকান সংস্করণ আজো প্রকাশিত হয়)। এই শেষোক্ত পত্রিকার মালিকানা তিনি কিনে নিয়েছিলেন।

যখন 'ফর্টনাইটলি'র সম্পাদক তখন ফ্রাঙ্কের বয়স মাত্র একত্রিশ। সেই পত্রিকার তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। ফ্রাঙ্ক যথেষ্ট পরিমাণে এড্রিনালিন প্রয়োগ করে সেই মুমূর্ষু পত্রিকাটিকে সঞ্জীবিত করেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ফ্রাঙ্কের প্রতি অনেকে আকৃষ্ট হয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তিনি প্রবীণ অথচ তখনও এক প্রচণ্ড প্রাণশক্তিসম্পন্ন মানুষ কার্লাইলের প্রশংসায় ধন্য হয়েছিলেন।

প্রতি মাসে সাহিত্য বিষয়ে তিনি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা দান করেছেন আর মাঝে মাঝে নিজে প্রবন্ধ এবং সমালোচনা লিখেছেন। পত্রিকার ডাইরেকটরবৃন্দ ছিলেন অতিশয় সতর্ক প্রকৃতির। ওয়ালটার পেটার, সুইনবার্ন এবং অসকার ওয়াইলডের পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রের ভূমিকা পর্যন্ত তাঁরা সহ্য করেছেন, কিন্তু একটি মাত্র কবিতার সম্মান মূল্য পঞ্চাশ পাউণ্ড তাঁদের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। নিজের পকেট থেকে অর্থ দিয়ে লেখকদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও তাঁরা সমর্থন করেন নি। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আট বছর কাল অতিক্রম করে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন এবং 'দি স্যাটারডে রিভ্যু'র মালিকানা ক্রয় করলেন। এইখানেই বিপদ ঘটল। বুয়র ওয়ারের তিনি ভীষণ বিরোধী ছিলেন। জেমসন রেডের পর আফ্রিকা থেকে প্রাপ্ত যে সব রিপোর্ট তিনি প্রকাশ করেন তাতে সিসিল রোডস ভীষণ অসন্তুষ্ট হন, এবং তিনি একজন লর্ডকে

পাঠালেন পত্রিকাটি কিনে নেওয়ার জন্য কথাবার্তা বলার জন্য; অবশেষে হ্যারিস চল্লিশ হাজার পাউণ্ড পেলেন। এ একরকম 'হাস মানি' বা মুখে হাত চাপা দেওয়ার দাম। স্যাটারডে রিভ্যুর যা দাম এ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। এই ফ্রাঙ্কের উল্লেখযোগ্য শেষতম সম্পাদকীয় কর্মভার, এবং এরপর থেকে ধীরে ধীরে তিনি বিস্মৃতির সাগরে বিলীন হয়েছেন। তাঁর যে সাহিত্যিক মর্যাদা ছিল তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রবলদের সঙ্গে তিনি শত্রুতা করেছেন, বৃথা অকিঞ্চিৎকর এবং অ-জনপ্রিয় কাজের মুরুব্বিয়ানা করেছেন, ফলে সমগ্র ভিকটোরীয় ইংলণ্ড এই ভুইফোঁড় এবং অবাঞ্ছিত মানুষটিকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে। এ ছাড়া খুব কম সংখ্যক সম্পাদকেরই খ্যাতি শেষ পর্যন্ত টি'কে থাকে। মিঃ রুটের মতে সম্পাদকরা হলেন সাহিত্যিক কবরশালার রক্ষক—তিনি বলেছেন—

> "The Editors are keepers of literary grave yards; only remembered for the names carved in the tomb-stones."

হ্যারিসের শত্রু সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। অসকার ওয়াইলডের ঘটনায় তিনি একজন অসকার সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত হলেন। ফ্রাঙ্কের বন্ধু দলের মধ্যে অসকারকে সর্বশ্রেষ্ঠ রসিক বন্ধু বলতেন। অসকারের সঙ্গে সর্বত্র মেলামেশা করেছেন, যে সব প্রাসাদ মালায় অসকার নিমন্ত্রিত হয়েছেন সেই সব বাড়িতেও ফ্রাঙ্ক আমন্ত্রিত হয়েছেন, অসকার অবশ্য বলেছিলেন—

> "Frank Harris is invited to the best houses — once".

ওয়াইলডকে ফ্রাঙ্ক হ্যারিস এক বিরাট প্রতিভা মনে করতেন। স্বাভাবিক মনো-ভঙ্গীর ফলে যে সব দলিল প্রমাণ অসকারের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছিল যৌন-বিকারের দায়ে সেইগুলি তিনি উপেক্ষা করেছেন। এরপর তিনি বললেন যে এমা গোল্ডম্যান হল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা এবং ট্রটস্কিকে প্রশংসা করলেন।

এই মানুষটি কোনোদিনই বেড়ার দক্ষিণ ভাগে দাঁড়াতে পারেন নি। বার্নার্ড শ' ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের নিম্নলিখিত 'এপিটাফ' (স্মারকবাক্য) রচনা করেছিলেনঃ

> "Here lies a man of letters who hated cruelty and injustice and bad art and never spared them in his own interests — R I P.

এই সব অপরাধের ওপর আছে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ আত্মজীবনী "মাই লাইফ অ্যাণ্ড লাভস"। এ বই পাঠ করলে মিঃ রুটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস আজকাল আর খুব কম পাঠকই পড়ে থাকেন—তাই জীবনীকারের মতে লেখক ও সমালোচক হিসাবে ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব অনেকের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হবে। ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের স্টাইল ছিল তীক্ষ্ণ এবং প্রযুক্ত বাক্যাবলী কখনও একঘেয়ে লাগত না। বরং তাব ভাষার মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল এবং তা অলঙ্কার বহুল।

বৃদ্ধ কার্লাইলের সঙ্গে দেখা করতে গিছলেন ফ্রাঙ্ক হ্যারিস। তিনি ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের নামও জানতেন না—কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে কার্লাইল হ্যারিসের চোখে আদর্শ পুরুষ, বিশেষত তাঁর মার্কিন বাসের কালটির জন্য, তাই হ্যারিস বলল—

> "Sir, you have long been to me a living voice; yet you have been an abstraction".

এই বিমূর্ত মানুষটিকে রক্ত-মাংসের আকৃতিতে দেখতে এসেছেন হ্যারিস।

কার্লাইলের ভালো লাগল হ্যারিসকে স্পষ্ট ভাষণ সত্ত্বেও। তিনি একটি চিঠি দিলেন তাঁর বন্ধুকে, সেই চিঠিতেই সুরু হল হ্যারিসের নব-জীবন। কার্লাইল লিখলেন—

> "I expect more considerable things from this youngman than from any I have met since Emerson".

মিঃ রুটের এই গ্রন্থের আঙ্গিকটি অতি বিস্তারিত। তবে তিনি কবি ও প্রবন্ধকার, তাই তাঁর উচ্ছ্বাসকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বেচারী ফ্রাঙ্ক হ্যারিস! তাঁর চারিত্রিক সদগুণের বদলে চারিত্রিক ত্রুটির জন্য আজো কিছু লোকে তাঁকে মনে রেখেছে। জাগতিক অমরত্ব তাঁর অখ্যাতির দ্বারা আজো বজায় আছে। তাঁর 'শেক্সপীয়ার দি ম্যান' হয়ত সাহিত্য-রসিকরা ভুলে যাবেন, কিন্তু মনে রাখবেন তাঁর 'বার্নার্ড শ'র কুলিখিত জীবনী এবং রোমাঞ্চকর আত্মজীবনী। তার এই সব গ্রন্থ চিরদিনই 'পর্নোগ্রাফিক' বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। হ্যারিসের এই দুর্ভাগ্য।

মিঃ রুটের গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান এবং সমকালীন সাহিত্য ইতিহাস হিসাবে পঠনীয়।

—অভয়ঙ্কর

FRANK HARRIS — By E. MERRILL ROOT, Published by THE ODESSEY PRESS. N. YORK Price $3.50 cents only.

ভারতীয় সাহিত্য

বীরবল শতবার্ষিকী ॥

গত ১০ই আগস্ট ছিল বীরবলের জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি দিবস। ঐ দিন পি ই এন, পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে বিড়লা আকাদমী অব হাউস এণ্ড কালচার প্রেক্ষাগৃহে তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্য করবার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর অবর্তমানে শ্রীঅন্নদা-শঙ্কর রায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক কৃতিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সভায় অন্যান্য যাঁরা প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে ভাষণ দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, শ্রীমতী চিত্রিতা দেব ও শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ বিশেষ উল্লেখ্য।

শঙ্কর কুরুপের কবিতার অনুবাদ ॥

মালয়ালম কবি শ্রীশঙ্কর কুরুপ কয়েক বছর আগেও কেরালার বাইরে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভের পরেই তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অথচ কেরলে তিনি "মহাকবি" সম্মানে ভূষিত। শ্রীকুরুপ সম্বন্ধে বাইরের লোকরা যে খুব বেশী জানেন না, তার কারণ শ্রীকুরুপের কোনও কোনও অনুবাদ এতদিন ছিল না। সম্প্রতি এই অভাব কিছুটা দূরীভূত হয়েছে। তাঁর একটি গ্রন্থ হিন্দি এবং ইংরেজিতে অনূদিত হয়। ইংরেজিতে তাঁর গ্রন্থগুলির অনুবাদ করেন শ্রীভি ভি মেনন।

১৯০১ খৃঃ শ্রীকুরুপ জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয় জীবন থেকেই তিনি কাব্য রচনা শুরু করেন এবং এখনও পর্যন্ত সমানভাবে সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন। তাঁর কাব্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন প্রথম যুগ ছিল সংকেতধর্মী কবিতার যুগ। দ্বিতীয় যুগে তিনি গান্ধিজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। তাঁর কাব্য জীবনের তৃতীয় যুগকে বলা হয় বিদ্রোহের যুগ। কিন্তু সর্বোপরি তিনি হলেন মানবতাবাদী কবি।

শ্রীমেনন অনুবাদের সময়ে শ্রীকুরুপের অনেক কবিতা বর্জন করেছেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, একমাত্র যে কবিতাগুলি অনুবাদযোগ্য তাই গ্রহণ করা হয়েছে। অনুবাদ যে মূলের প্রতি সব সময়ে সুবিচার করে, তা বলা যায় না। তবু অনুবাদ ছাড়া কোনও পথ নেই। অনূদিত গ্রন্থের প্রথম

কবিতার নাম "আজ ও আগামীকাল।" কবিতাটি মৃত্যু বিষয়ক। কবিতা হিসেবে এটি তেমন উল্লেখ্য নয়। তবে এতে এমন কিছু সংকেতধর্মিতা আছে, যা অভিনব।

সূর্যমুখী কবিতাটি শ্রীকুরুপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এতে তিনি প্রকৃতি এবং প্রেমকে সাংকেতিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। সূর্যের জন্য সূর্যমুখীর প্রেম অপরিসীম। তার পরিপূর্ণতার মুহূর্তে সহসা দক্ষিণ হাওয়া এসে তাকে করে গেল আলোড়িত। তার মৃত্যু নিকট অনুমান করে সূর্যমুখী ফুল বলছে—

> এবং তারপর আমার মুখ দেখে
> সে নিশ্চিত সহসা বিবর্ণ হয়ে উঠবে।
> এবং ক্রমশঃ তার চোখ আচ্ছন্ন করে—
> নীলবর্ণ মেঘমালা
> নিশ্চিত দুঃখ করে বলবে—
> হায় আমি কি সেই উজ্জ্বল ফুলটিকে
> দেখিনি?
> আমরা কি পরস্পরকে ভালবাসিনি?

এই ইংরেজি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটি শ্রীকুরুপের পরিচিতির ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করবে বলে আশা করি।

শরৎ-প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ॥

শরৎ-সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে হাওড়ার বিশিষ্ট সাহিত্য প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-প্রয়াসীর উদ্যোগে একটি শরৎ-প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিষয়—"শরৎ সাহিত্যে আধুনিকতা" যোগাযোগ কেন্দ্র—সাধারণ সম্পাদক সাহিত্য-প্রয়াসী, ৪৫, রাদের দাস লেন, হাওড়া—২ (ফোন ঃ ৬৭-৩৯৯৭)। নিয়মাবলীর জন্য উত্তরপত্র সহ যোগাযোগ করতে হবে।

নজরুল সন্ধ্যা ॥

আগামী ২০ আগস্ট, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গোলপার্ক স্থিত বালিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইন্সস্টিটিউটে অগ্নিবীণার উদ্যোগে নজরুল সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হবে। এতে অংশ গ্রহণ করবেন সর্বশ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিতা বিশ্বাস কল্যাণী কাজী প্রমুখ। যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করবেন কাজী অনিরুদ্ধ। কাজী নজরুল ইসলামের বিপ্লবী জীবন অবলম্বনে নাটক 'অগ্নিবীণা' অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হবে। নাটকটি রচনা করেছেন ডঃ রমা চৌধুরী।

অবনীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী ॥

গত ১৫ই আগস্ট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবনীন্দ্র পরিষদ ও রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির যুগ্ম উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীভূপতি মজুমদার সভাপতিত্ব করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন।

এই উৎসব উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছে "বিচিত্রা ভবনে"। এই প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করবেন শিল্পগুরুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরূপা দেবী। এই প্রদর্শনীটি আগামী ২১শে আগস্ট পর্যন্ত প্রদর্শিত হবে।

বিদেশী সাহিত্য

রেমঁ রাদিকের উপন্যাস ॥

বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষদের অনেকেই সম্ভবতঃ রেমঁ রাদিগের নাম জানেন। ফরাসী সাহিত্যে এক সময়ে তাঁকে নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিশেষতঃ তাঁর উপন্যাসের প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কাহিনীকথনের রীতি-নীতি অপ্রত্যাশিত পথে প্রকাশিত। তাঁর সবচাইতে বড় সমর্থক হলেন জাঁ ককতো এবং অপর কয়েকজন সাহিত্যিক।

সম্প্রতি 'দি ডেভিল অব দি ফ্লেস' নামে রাদিগের একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। তার নায়ক ষোল বছর বয়সের একজন বিদ্যালয়ের ছাত্র। এক রহস্যময়ী বিবাহিতা ও সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং এই পরিচয় ক্রমে দুরন্ত ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়।

লেখক তার এই অকালবসন্তের বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন পর্যায়ক্রমে। প্রেমের প্রথম আবির্ভাবে সে হাবুডুবু খেতে থাকে। তার সমস্ত কাজকর্ম ও দায়িত্ববোধ নষ্ট হয়ে যায়। কামনার দারুণ মোহ তাকে পেয়ে বসে। মা, বাপ, ভাই বোন কারোর প্রতিই সে আর তেমন আগ্রহ বোধ করে না।

অবশেষে সে ভাবতে শুরু করে, এই রহস্যময়ী তরুণীকে ছাড়াই তার জীবন চলে যেতে পারে এমন কি তার প্রেমও তেমন কোন সাংঘাতিক বিষয় নয়। কিন্তু কোনো প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে আসবার মতো মনোবল সে খুঁজে পায় না। বরং শেষ পর্যন্ত সে পুনরায় ভাবতে শুরু করে যে এই তরুণীকে হারালে তার চরম ক্ষতি হবে।

সমালোচকেরা বইটি পড়ে আদৌ খুশী হন নি। ককতোপন্থী সাহিত্যিকেরা অবশ্য এই উপন্যাসটিকে একটি অসাধারণ যুগোত্তীর্ণ সৃষ্টি বলে অভিহিত করছেন। বাকি সকল সমালোচকের মুখেই এক কথা, রাদিগে এ উপন্যাসে কোনো মৌলিকত্ব দেখতে পারেন নি।

ম্যাকসিম গোর্কির শিল্পব্যক্তিত্ব ॥

এই বছরে ম্যাকসিম গোর্কির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কমবেশী বই প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এফ এম বোরাস-এর লেখা—"ম্যাকসিম গোর্কি, দি রাইটার ঃ অ্যান ইন্টারপ্রিটেশন" নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

এই গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথাক্রমে—(১) চিন্তন ও দৃষ্টিকোণ (২) ছোটগল্প (৩) উপন্যাস, (৪) স্মৃতিকথা ও (৫) নাটক। তা ছাড়া, প্রারম্ভিক একটি অধ্যায়ে ম্যাকসিম গোর্কির শিল্পসত্তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

প্রবন্ধকার সমাজতাত্ত্বিকের মনোভাব নিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন—কিভাবে ও কিরূপ বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গোর্কির সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর উৎসমূল জীবন সম্পর্কে আবদ্ধ।

গোর্কির মানবিক প্রত্যয়বোধ যে সকল রূপক কিম্বা কিংবদন্তীর আশ্রয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে,—লেখক আলোচনার মাধ্যমে তাও পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন।

সাহিত্যিকদের করের বোঝা ॥

জনপ্রিয় হওয়ার নানা ফ্যাসাদ। দেশের নানাশ্রেণীর মানুষ যেমন তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি সতর্ক হয়ে ওঠে সরকারী কর্মচারীরা। বৃটেনের লেখকরা এখন সেই ভয়ে আর কেউ তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হতে চান না। কোন একটি উপন্যাস লিখে কেউ একটু মান-মর্যাদার সঙ্গে অর্থ-বিত্তের মুখ দেখলেই আয়কর বিভাগের লোকেরা মোটা করের বোঝা চাপিয়ে দেন। কিন্তু তারপর? যদি পরের বই মার খায়! তা হলেও রেহাই নেই। আবেদন-নিবেদন করেও প্রমাণ করা শক্ত যে, এখন তাঁর বইয়ের বিক্রয়সংখ্যা কমে গেছে—আয় নেই, কাজেই আয়করও থাকা উচিত নয়।

এখন সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন বাঘা বাঘা প্রকাশকের দল। তাঁরা বইয়ের ব্যবসা করেন। কাজেই সহজেই বুঝতে পারেন, কাকে কোন কায়দায় হাতে রাখা যাবে। অনেকে সাহিত্যিকদের শর্ত-সাপেক্ষে টাকা দাদন দিয়ে থাকেন—ভবিষ্যতে বিশেষ সুবিধে লাভের আশায়।

যেমন কনস্টিলেশন ইনভেস্টমেন্টস নামে একটি নামী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হ্যারল্ড পিন্টার এবং তাঁর স্ত্রী ভিভিয়েন মার্চেন্টের আগামী দশ বছরের সমস্ত লেখার প্রকাশ-স্বত্ব কিনে নিয়েছেন প্রায় পঁচাশি লক্ষ টাকার বিনিময়ে।

বুকার বুকস্ কিনেছেন আগাথা ক্রিস্টির সমস্ত বইয়ের নিয়ন্ত্রণ অধিকার। আয়ান ফ্লেমিংয়ের কপিরাইটও তাঁরা কিনে নিয়েছেন মোটা টাকা দিয়ে।

নতুন বই

NIVEDITA COMMEMORATION VOLUME—Edited by AMIYA KUMAR MOZUMDAR, Published by Vivekananda Janmotsava Samiti, 18-1, Sahitya Parishad Street, Calcutta-6 Price—Rs 20/- only.

'লোকমাতা' নামে অভিষিক্ত করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। জনগণের জননী এই লোকমাতা ভারতের মানুষের কল্যাণকামনায় তাঁর আত্মত্যাগ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই মহিয়সী মহিলা ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলার নর-নারীকে নতুন দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীঅরবিন্দ, গোখেল, তিলক, মহাত্মা শিশির-কুমার ঘোষ প্রভৃতি মনীষীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে বাঙালীর ও ভারতের সংস্কৃতিকে তিনি পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদল যখন অজান্তায় গিয়েছিলেন তার প্রেরণা যুগিয়ে-ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। কিন্তু সবচেয়ে যেটা স্মরণীয় তা হলো স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর গোপন অবদান। এই আইরিশ দুহিতা ভারতের মানসকন্যা, তাই ভারতের স্বাধী-নতা সংগ্রামে তাঁর গোপন অবদান। এই আইরিশ দুহিতা ভারতের মানস-কন্যা, তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ছিল অন্তরঙ্গ সংযোগ। ভারতের শিল্প, ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভারতীয় ইতিহাসের মৌলিক বিশ্লেষণ এবং ভারতের বিপ্লববাদে তাঁর ভূমিকা চির-স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বিদেশিনী মহিলা ঊনিশ শতকের ভারতীয় রেনেসাঁসের কালে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তার পরিমাপ সম্ভব নয়। তাঁর প্রচেষ্টায় ফলে ভারতীয় শিল্প পাশ্চাত্যখণ্ডে সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করেছে। ভারত আবার

জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক এই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য।

নিবেদিতা কমিমরেশ্যন ভল্যুমে নিবেদিতার জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখেছেন বর্তমানকালের চিন্তা-নায়করা। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ লিখেছেন—সিস্টার নিবেদিতা ও ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁস। বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, 'স্যোস্যাল অ্যান্ড পোলিটিক্যাল আইডিয়াল অব সিস্টার নিবেদিতা', প্রণবরঞ্জন ঘোষ লিখেছেন—কালী-দি ভীসান অব নিবেদিতা, দেবজ্যোতি বর্মণ লিখেছেন, সিস্টার নিবেদিতা অ্যান্ড ইণ্ডিয়ান রেভোলিউসান এবং সম্পাদক লিখেছেন 'দি কোয়েস্ট অব ফিলসফি-নিবেদিতা'। এছাড়া ডাঃ জন নরসো, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এন ভট্টাচার্য, আর্চি বাহম, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বান্তনা দাশগুপ্তা, স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ, ভি ভি পেনডসে, ভেংকটাবারী, জে সি ভট্টাচার্য, প্রীতিভূষণ চ্যাটার্জি, রাখহরি চ্যাটার্জি, রমা চৌধুরী, শ্রীবাস্তব, এস বি মুখার্জি, ডি পি চট্টোপাধ্যায়, জে সি দত্ত, মুকুন্দবিহারী মিশ্র ও শংকরীপ্রসাদ বসুর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। ভগিনী নিবেদিতার বহুবর্ণ চিত্রটি প্রমোদ-কুমার চট্টোপাধ্যায় অংকিত। এছাড়া আরো প্রায় বারোখানি মূল্যবান চিত্র এই গ্রন্থের সম্পদ। ভারতের পুনরুজ্জীবনে যাঁরা সহায়তা করেছেন লোকমাতা তাঁদের অন্যতমা একথা সকলেই জানেন কিন্তু এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে তাঁর চরিত্রের বহুমুখী প্রকাশ এবং তাঁর অন্তর্মুখী স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও বাঁধাই অনুপম।

দন্তপ্রলয় ও অন্যান্য নাটিকা ঃ

[একাঙ্ক সংকলন]—পরিমল গোস্বামী॥ ইমপ্রেসিও ৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলকাতা-৬।। তিন টাকা

অত্যন্ত সিরিয়াস বিষয়কে পরিহাসের ভঙ্গিতে যে-কয়জন বাঙালি সাহিত্যিক স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীপরিমল গোস্বামীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই সংকলনে তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং বহুবার পূর্ব-অভিনীত সাতটি নাটিকা—যথাক্রমে দন্তপ্রলয়, হেমলতার বিবাহ, রঙিন ফানুস, সরষের তেল, প্রায়শ্চিত্ত, বীরবাহুর ঈর্ষা ও শ্মশান-নাট্য—সংকলিত হয়েছে। এদের মধ্যে 'দন্তপ্রলয়' ছাড়া অন্য নাটিকাগুলির কোনোটিই মুদ্রিত অবস্থায় পনেরো-ষোল পৃষ্ঠার বেশি নয়।

এই নাটিকাগুলির আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো লেখকের পরিমিতি বোধ। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ যে-সকল ঘটনা এবং ভাব-সংঘাতের মুখোমুখি হয়—তারই সংগতি-সূত্রে লেখক তির্যক পরিহাসের উপাদান আবিষ্কার করেছেন। নিছক নাটারস সৃষ্টির জন্য তিনি ঘটনা-সংযোগ করেননি—বিকল্পে তাঁর হাস্যরসের ভেতরে রয়েছে কোনো না কোনো প্রকার নির্দিষ্ট বক্তব্য, যা নাটক শেষ হবার পরেও দর্শক এবং পাঠককে বহুক্ষণ ভাবায় এবং গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

ভিয়েৎকং ঃ(আলোচনা) ডগলাস পাইক লিখিত এবং ভূদেব ভট্টাচার্য অনূদিত। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী। কলিকাতা-বারো। দাম একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সংগঠন ও কলা-কৌশল সংক্রান্ত এই গ্রন্থটি ডগলাস পাইকের মূল-গ্রন্থের সংক্ষেপিত সংস্করণ। ভিয়েৎকং গ্রন্থটিতে যেসব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা সাধারণ পাঠকের জন্য, সুতরাং জটিল বিষয়কে যথাসাধ্য সহজ এবং সুখপাঠ্য করার প্রয়াস করা রয়েছে। এ-কালের ধর্ম। ডগলাস পাইক ভিয়েৎকং-এর সঙ্গে তার আগের কালের ভিয়েৎমিন এবং কম্যুনিস্ট চীনের বিপ্লবের সঙ্গে তার আগের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। চীনাদের জয়লাভের মূলে ছিল তাদের রণ-কৌশল, ভিয়েৎনামের সাফল্যের হেতু তার সংগ্রামী মনোভাব আর ভিয়েৎকং-এর সাফল্যের মূলে আছে তার অনন্যসাধারণ সংগঠন শক্তি। ভিয়েৎমিন উত্তরাধিকার পরিচ্ছেদে তিনি গেরিলা যুদ্ধ এবং ভিয়েৎমিন ও ভিয়েৎকং সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। এই সূত্রে তিনি দিয়েমী আমলের অবস্থা, জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্ট গঠন, সংগঠন রচনা, কম্যুনিস্ট ভূমিকা, প্রভৃতি পরিচ্ছেদে অতিশয় মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কালি ও কলম (শ্রাবন)—সম্পাদক ঃ বিমল মিত্র। প্রকাশ ভবন। ১৫ বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা—বার।

লিখেছেন বিমানবিহারী মজুমদার, বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, ফণিভূষণ আচার্য, জরাসন্ধ, রেণুকা দেবী, যজ্ঞেশ্বর রায়, প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, বিমল মিত্র, ঋদ্মর চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

একাল ঃ সম্পাদক—শিব ভট্টাচার্য, একাল কার্যালয়, গৌহাটি—১১ থেকে প্রকাশিত।

ছোট গল্পের কাগজের সংখ্যা এমনিতেই বড়ো কম। তায় বাংলাদেশের বাইরে থেকে প্রকাশিত গল্প পত্রিকার কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই হোঁচট খেতে হয়, সহজে কোন নাম মনে আসে না। তবে একেবারে শূন্য তা বলছি না। গৌহাটি থেকেই বেরোয় 'একাল' নামে একটি ছিমছাম গল্প পত্রিকা। সম্প্রতি বেরিয়েছে এদের দ্বিতীয় সংখ্যা। গল্প লিখেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুভাষ কর্মকার, দীপক সরকার, উদয়ন ভৌমিক ও ভবেন্দ্র সাইকিয়া। শিব ভট্টাচার্যের আলোচনাটি প্রচেষ্টা হিসেবে প্রশংসনীয়।

সারস্বত [প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৫]—সম্পাদক অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা—৬। একটাকা

সম্প্রতিকালে প্রকাশিত বাংলা মননশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে সারস্বত আঙ্গিক শোভনতা ও রচনা-বৈশিষ্ট্যে পাঠকপাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ সংখ্যায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা স্থান পেয়েছে। অশোক ভট্টাচার্য লিখিত ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর, গৌরীনাথ শাস্ত্রীর ইউরোপে সংস্কৃত চর্চা প্রসারের ভূমিকা, প্রবাসজীবন চৌধুরীর রবীন্দ্র জীবনসাধনায় মৃত্যু, প্রভাতকুমার গোস্বামীর প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গান, তরুণ সান্যালের একটি প্রবন্ধ ও হারাণচন্দ্র নিয়োগীর ইতিহাস ঃ একটি প্রাচীন ভারতীয় চেতনা প্রভৃতি আলোচনা উল্লেখযোগ্য। অরুণাচল বসু কয়েকটি রুশ কবিতার অনুবাদ করেছেন।

সাম্প্রতিক ঃ সম্পাদক—কাননকুমার ভৌমিক, ৩৬ ডি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ২৬। দাম এক টাকা।

বছরখানেক ধরে কয়েকজন তরুণতর কবি 'ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন' চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদেরই মুখপত্র হল সাম্প্রতিক। সম্প্রতি বেরিয়েছে এদের নবম সংকলন। লিখেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, দীপেন রায়, প্রভাত চৌধুরী, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, কাননকুমার ভৌমিক, চন্ডী মন্ডল, অঞ্জন কর, শিশির সামন্ত, সুকোমল রায়চৌধুরী, তুষারকান্তি রায়চৌধুরী ও রবীন সুর।

লোকশ্রুতি (তৃতীয় সংকলন)—সম্পাদক আশুতোষ ভট্টাচার্য। ৩২ বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা-৩৪। এক টাকা।

সমকালীন সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণের মধ্যেই কোনো দেশের সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে না। তার জন্যে সেই দেশের অতীত ও ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। 'লোকশ্রুতি' এদিক থেকে সেই মহৎ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তার উদ্দেশ্য কেবল বিগতকালের সাহিত্য সম্পর্কে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ নয়, বর্তমান সময়ের মধ্যেও যে নাগরিক সংস্কৃতি বহির্ভূত বিস্তৃত লোকজীবন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে, তারও স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। লোকশ্রুতির এ সংখ্যাটিতে ধাঁধা সম্পর্কে কয়েকটি সুন্দর আলোচনা আছে। সম্পাদকীয় প্রশংসার্হ।

মফস্বলে এমন

মিহির আচার্য

এর পরেই তাঁর স্টেশন। নামতে হবে। এখন সুরেশ্বর কেমন যেন ঘরে-ফেরার আবেগ বোধ করছেন। কিশোর বয়েসের মতো। দীর্ঘ এই ট্রেন-যাত্রা, গতকাল রাতে ট্রেনে চেপেছেন, এখন ঘড়িতে বিকেল ফিরছে। দূরত্ব লাফিয়ে লাফিয়ে এখন [illegible] [illegible] মতো সীমায় এসে গেছে। মনের বৃহত্তর জগৎটাও কেমন ছোট্ট হয়ে একটা ঘর-নামক আবেগের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে।

অথচ বাইরে থাকতে এই ধরনের আবেগ তাঁকে কখনো ব্যস্ত করে নি। বরং গ্রামে ফেরার নামেই তাঁর প্রকাণ্ড শৈথিল্য এবং অনিচ্ছা ছিল।

সুরেশ্বরের নিজস্ব একটা ঘর হয়েছে। সংসার-সম্মান-প্রতিপত্তি। যেখানে তাঁর প্রভুত্বের একটা গৌরব রয়েছে। এ সকল অর্জিত বস্তু সব সময় কাঁধে করে ঘোরা যায় না। অথচ এ সকল পরিচয় ছাড়া সুরেশ্বরের আর আলাদা কী অস্তিত্ব আছে!

বহুকাল যাবৎ গ্রামের এর বন্ধু তাকে বার বার লিখছে—এসো, এখানে থেকে যাও কিছুদিন। কিন্তু ব্যস্ত মানুষ সুরেশ্বরের যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। তাছাড়া ওরা কী খবর রাখে, সুরেশ্বর আজ এই শহরেরই নয়, সারা বাঙলার, বাংলার বাইরে আসাম, উড়িষ্যা, যুক্ত প্রদেশ এবং সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। প্রতি মাসে তাঁর অনূদিত গল্পগুলি পাঠকমনে কী উন্মাদনা আনে, তার নূন্যতমও সংবাদ কী এরা রাখে।

সুরেশ্বর হাসলেন। পাহাড় থেকে যেমন নিম্ন ভূভাগকে দেখায় তেমনি করুণা মেশানো ছিল তাঁর হাসিতে। খ্যাতি চুনি-পান্না-খচিত একটা রাজকীয় পোশাক, এছাড়া মানুষ বাঁচে কী করে। তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এ খ্যাতি নেই। ভালো উকিল বা ভালো ডাক্তার একটা ব্যবসায়িক পেশা ছাড়া কিছু নয়। ব্যবসা, আবার বিদগ্ধ হাসলেন সুরেশ্বর : 'আমি সৃজনী প্রতিভার কথা বলছি।'

সুরেশ্বর এবার গম্ভীর হলেন। বোধ-হয় পার্শ্ববর্তী সহযাত্রী তাঁকে লক্ষ্য করছেন। এই গাম্ভীর্য সুরেশ্বরের স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সাহিত্য-সংসারেও তাঁর এই গাম্ভীর্যের প্রতি একটা

কটাক্ষ আছে।' সুরেশ্বরের সেইটেই অহংকার। শিল্পকর্ম যে নিয়েো-লেখা নয়, এই গুরুত্বপূর্ণ মনোভাবটুকু তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান। বস্তুত, বাজারে এটা প্রচার হয়ে গেছে : সুরেশ্বরবাবু তাঁর মুখের মতোই গম্ভীর এবং একেক সময় প্রকাশকের অনুযোগ তাঁকে শুনতে হয় বইকি : 'আপনি বড় কঠিন করে লেখেন।' সুরেশ্বর মনে মনে পুলকিত হন, গুণ-গ্রাহীরা স্তবের মতো বলেন : 'আপনার রচনায় চিন্তা আছে।' এটা যে কত বড় প্রশংসা, একথা সুরেশ্বর ছাড়া আর কে বুঝবে।

ট্রেনটা একটা তীব্র হুইশল দিল।

সুরেশ্বরের চিন্তাগুলো ঝাঁকুনি খেয়ে থিতিয়ে গেল।

জানালার বাইরে ডিসটান্ট সিগনালের ওপর চোখ ফিরল। গাড়ির গতি কমে আসছে। ট্রেন এক্ষুনিই স্টেশনে পা দেবে। স্টেশনের গেটের বাইরে বাঁধনো সেই ইঁদারা, আর সেই অশোক গাছটা।

হঠাৎ একটা দুস্তর লজ্জা সুরেশ্বরকে প্রথম প্রেমে-পড়া যুবকের মতো গ্রাস করল। বোধহয় খ্যাতির এই বিশাল চূড়া নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে অতিথিসুলভ একটা অস্থির কুণ্ঠা রয়েছে।

সুরেশ্বর এখন নিজেকে স্রষ্টা নয়, তাঁর রচিত মনস্তাত্ত্বিক একটা চরিত্রের আদলে দেখছেন।

সুরেশ্বর দুর্বলতা কাটাতে সিগারেট ধরালেন।

সুরেশ্বর সহসা নিঃসঙ্গতার বেদনা বোধ করলেন।

'আমি ক্রমশ বড় একা পড়ে যাচ্ছি। একা, একা, একা।'

ট্রেন থেমেছে।

যাত্রী ও কুলির ব্যস্ততা। প্ল্যাটফরম জনতার ঘামের গন্ধে গঞ্জ হয়ে পড়েছে।

সুরেশ্বর সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে এলেন।

কাঁচাপাকা চুল ময়লা দাড়ি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মানুষটা হলদে দাঁতের প্রদর্শনী করে হনহনিয়ে সুরেশ্বরের দিকে ধাবমান। তিনিই বন্ধুর ছোট কাকা।

একদিন এদেরই প্রতিবেশী ছিলেন সুরেশ্বর। তখন বাবা বেঁচে। সে অনেক-কালের কথা। মনে হোত একই সংসার। তখন এরা ছিল যেন অনেক কাছাকাছি। এদের বাড়ীরই ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব। তার থেকেই সুরেশ্বরের যাতায়াত ছিল সে বাড়ীতে।

'তুই একটুও বদলাস নি সুরো।' ছোটোকাকা।

সু-রো! ডাকটা যেন কৈশোরের খোলা মাঠের বুকের উপর দিয়ে পাতলা বাতাসের মতো হেঁটে এল। মনে হল শেষ বিকেলে মহিষের পিঠে চড়ে সাঁওতাল-বালক বাঁশি বাজাতে বাজাতে ফিরছে। অকস্মাৎ কান্না পেল সুরেশ্বরের।

'ছোটোকাকা!'

'হ্যাঁ।'

'তুমি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছ।'

ছোটোকাকা বললেন, 'বুড়ো না হলে বেঁচে আছি প্রমাণ হত কী করে? কিন্তু তুই এই চল্লিশেই চুলগুলোকে বাদামি করলি কী করে?'

[illegible] চাইলেন। [illegible] পাতে [illegible] তুলগুলো [illegible] মাঝে [illegible] ছোটো-কাকা [illegible] আর [illegible] মধ্যে [illegible] পায়ের [illegible] পড়েছে। [illegible] ম্যাজিক [illegible]

সুরেশ্বর ছোটোকাকাকে নত হয়ে প্রণাম করলেন।

'থাক থাক। এখন চলো। তোমার বেডিংটা আমার হাতে দাও। দূর, এর জন্যে আবার কুলি করা কেন। চলো।'

'সুশান্ত এখন এখানে নেই। বাইরে গেছে। যাই হোক তোমার কোন অসুবিধা হবে না।' —ছোট কাকার কথা শুনে মনটা কেমন করে উঠল সুরেশ্বরের। যাই হোক এখন আর ফেরার উপায় নেই।

স্টেশনের বাইরে পা দিতে সাইকেল রিকশাটা এগিয়ে এল।

বেডিং সুটকেশ রিকশায় [illegible] হল।

ছোটোকাকা ব্যস্ত হয়ে কাকে ডাকলেন। ষোল-সতেরো বছরের অপরিচিত মেয়েটিকে দেখে বিস্মিত হবার পালা সুরেশ্বরের। অস্ফুটে বললেন, আশ্চর্য! বাঙলাদেশে কেউ এইভাবে ইউরোপের আকাশকে ধরে রাখতে পারে।- মেটে চোখের তারায় আলো পড়লে যেমন দেখায় তেমন চোখ, পাতলা গোলাপী ঠোঁট, আর তরোয়ালের মতো কৃশ ধারালো শরীরে অপূর্ব কঠিনতা।

সুরেশ্বর স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে রইলেন।

ছোটোকাকা বললেন, 'হীরার সঙ্গে বাড়ি চলে যা। আমি ডাক্তারখানা হয়ে যাচ্ছি।'

'হীরা!'

'কেন? হীরাকে চিনতে পারছিস নে। এক যুগ পরে এলি। ওকে বোধহয় জন্মের সময় একবার দেখেছিস।'

রিকশা ছুটে চলল।

রিকশার গতির সঙ্গে সুরেশ্বরের অস্তিত্ব দুলছে। পলাতক স্মৃতিকে ধরবার চেষ্টা করছেন সুরেশ্বর। ভীষণ এলোমেলো হয়ে পড়ছে।

হীরা, হীরক। মাঃ কিছু মনে পড়ছে না। আর রিকশার গতির সঙ্গে স্মৃতিহীন সুরেশ্বর নিজেকে আশ্রয়হীন আগন্তুক বোধ করছেন।

হীরা শক্ত হয়ে বসে আছে। যদি ও একটু কথা বলত তাহলে হয়তো সুরেশ্বরের অন্ধকার স্মৃতি আলোর আশ্রয় পেত। সুরেশ্বরের একবার মনে হল হীরা বড় অহংকারী। সুরেশ্বরের চোখের অনাদ্যন্ত বিস্ময়ের সামনে তাকে উদ্ধত দেখাচ্ছিল। বোধহয় সুরেশ্বরের দৃষ্টির মুগ্ধতাই হীরাকে অধিক সচেতন করেছে।

সুরেশ্বরের পলকের মনে হল ওরা সম্পর্কে দুটো আলাদা পক্ষ। যেন প্রথম দৃষ্টিতেই উভয়কে দ্বৈরথের আহ্বান জানাচ্ছে। সুরেশ্বরের শিল্পীঅহংকার এই মেয়েটির অহংকারের পাষাণে আহত হয়।

সুরেশ্বরের চিন্তাগুলো ভয়ংকর এলোমেলো হয়ে পড়ে। 'আমার ভাবনাগুলো কেমন যেন বিচিত্র স্বাদে ভেসে যাচ্ছে।' এই জাতীয় আবেগের সঙ্গে তাঁর ঘরে-ফেরায় আকৃতির কোনো যোগ নেই। নিছক খাপছাড়া। যেন একটা ক্লাসিক রচনার শরীরে আধুনিক রোমান্টিকতাকে ছড়িয়ে দেয়া

সুরেশ্বর বললেন, 'তোমাকে আমি এই প্রথম দেখলাম।'

হীরা বলল, 'আমিও।'

'হয়তো নিয়মিত আসা-যাওয়া থাকলে এই সংখ্যরে পড়তে হত না।' সুরেশ্বর হাসতে চেষ্টা করলেন।

'সংশয়!'

'নয়?'

'কী জানি, আপনার কথা বুঝতে পারি নে।'

'ভিড়ের মধ্যে থাকলে এর চেয়েও বড় ভুল হতে পারত।'

হীরা সামনের দিকে চেয়ে রইল। ওর গোলাপী মুখ, গ্রীবা, জল রেখার পাতা দূরে পাইনবনের বিদেশী [illegible] আসছে।

'আপনার গল্প আমি আগেই পড়ি— আমার কলেজের বন্ধুরা পত্রিকায় আপনার গল্প বেরুলেই কেড়ে নিয়ে যায়।'

সুরেশ্বর এবার সাহস সঞ্চয় করলেন। বললেন, 'আমার গল্প বোঝার বয়েস কী তোমার হয়েছে?'

'বা, কেন? আমি বাঙলায় অনার্স নিয়ে পড়ছি।'

'আর-একটু মনের বয়েস দরকার।'

'তাহলে গল্পের জন্যে কোন্ বয়সী পাঠকের জন্যে লিখে দেন দি কেন?'

সুরেশ্বর হা-হা করে হাসলেন।

হীরা গম্ভীর হয়ে বলল, 'হাসছেন যে?'

'না। আর হাসব না। বাড়িতে আর কে পড়ে?'

'আর কেউ না।'

'ভাগ্যিস। একবার অন্য কেউ পড়লে বাড়িতে পত্রিকা নেয়াই বন্ধ হয়ে যেত।'

হীরা হাসল। 'সত্যি বলেছেন। অনেক সময় লুকিয়ে পড়তে হয়।'

সুরেশ্বর বললেন, 'আমি কী করে জানব তুমি আমার লেখা পড়ো? এবার থেকে সাবধান হয়ে লিখতে হবে।'

'কেন?'

'বা, আমার একটা দায়িত্ব নেই।'

'আপনি চেষ্টা করেও পারবেন না।'

'কেন?'

'আমাদের বাঙলার অধ্যাপক বীরেন-বাবু একদিন বলছিলেন আপনার লেখায় একটা বিশেষ মনোভঙ্গি কাজ করে। তার বাইরে আপনি যান না।'

'মনোভঙ্গি!'

'হ্যাঁ। একটা জটিল মনোভঙ্গি। মানুষের মনের অন্ধকার ইচ্ছাগুলো নিয়ে আপনি খেলা করেন।'

'খেলা!'

'সাপুড়ে যেমন সাপ নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে।'

'তার মানে সাপের হাতেই আমার মৃত্যু, এই তো?'

'এই যে এবার নামুন। আমরা এসে গেছি।'

আধুনিক রোমান্টিকতার পরোক্ষতারা ছুটে গিয়ে এবার ছাই-ছাই বাড়িটা কৈশোরের আবেগকে জাগিয়ে দিচ্ছে। এই বাড়ি, তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন এখানে নিরাবরণ হয়ে আছে।

জ্যাঠামশায় বললেন, 'পথে অনেক কষ্ট হয়েছে। যাও; ভেতরে যাও। দোতলায় তোমার জন্য ঘরটা খুলে দেয়া হয়েছে। হীরা তোমাকে নিয়ে যাবে।'

জেঠিমা কাকিমা সম্ভবত রান্নার ঘরে ব্যস্ত। ছোটোরা বোধহয় ইস্কুলে।

দোতলায় নিঃশব্দে উঠে এলেন সুরেশ্বর।

হীরা বলল, 'বারান্দার ও কোণে জল রাখা আছে। হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি চা নিয়ে আসছি।'

সুরেশ্বর জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওপারে বহুদূরে তীররেখা দেখা যাচ্ছে। একটা স্টীমার। হেঁটে নদী পার হয়ে সেই তারা নিয়ে স্টীমারটা ছুঁয়ে আসা যায়। কল্যাণী বারবার বলেছিল : পৌঁছেই চিঠি দিও।' সুরেশ্বর ক্লান্তি বোধ করলেন। এবং আশ্চর্য নিশ্চয়। এই ঘরে তাঁকে রাত কাটাতে হবে। তার অর্থ এই বাড়ি তাঁকে নির্দিষ্ট সীমানায় আটকে রাখতে চায়। কেন কিছু বদলায় নি, সব নিয়ম মতো সাজানো রয়েছে। সুরো-সুরো-সুরো। বাবা খোকন বলে ডাকছেন। 'আমি এখানে কখনোই সুরেশ্বর হতে পারব না।'

'আপনার চা। বা, এখনো জামা-কাপড় ছাড়েন নি?'

'হ্যাঁ। এই যে।' সুরেশ্বর হাসলেন : 'আমি ভেবেছিলাম রান্নার ঘরে জমিয়ে বসে চা খাব।'

হীরা হাসল। 'তা আজ আর হবে না।'

'কেন?'

'আপনি পারবেন না।'

সুরেশ্বর অবাক হলেন।

'মা বললেন : আপনি ক্লান্ত হয়ে এসেছেন। নীচে নামতে কষ্ট হবে।'

'তাই আমাকে এই দোতলায় নির্বাসন?'

'না।'

'এ তোমার ষড়যন্ত্র।'

'ষড়যন্ত্র!' হীরার নাকের ডগায় ঘাম।

সুরেশ্বর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। একটা জটিল অংক না-পারার দুর্ভাবনা ও আগ্রহ হীরাকে থমথমে করে তুলেছে। ষ-ড়-য-ন্ত্র—শব্দটা আবার স্বগত উচ্চারণ করলেন সুরেশ্বর। একটা ঘন অচেনা নেশার উত্তেজনায় যেন আবিষ্ট হয়ে পড়লেন সুরেশ্বর।

হীরা হাসল। 'গল্প লিখে লিখে আপনার আলাপগুলো পর্যন্ত মুখস্ত হয়ে গেছে।'

'তাই বুঝি?' সুরেশ্বর চায়ে দীর্ঘ চুমুক দিলেন।

'হ্যাঁ। আপনি ঠিকই ধরেছেন। মা বলেছিলেন নীচে নিয়ে আসতে। আমিই বারণ করলাম। আপনার পুরোনো অভ্যেস ভাঙতে যাবেন কেন?'

সুরেশ্বর বললেন, 'আমি আগেই বুঝেছি। আমাকে অতিথির সম্মান দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা।'

হীরা বলল, 'কী [illegible] আপনি কাছে [illegible] বলবে এমন প্রমাণ তো পাই নি। বাবা না-লিখলে আপনি আসতেন না।'

'এখানে হীরা আছে জানলে আগেই আসতাম।' নিজের চাপা কণ্ঠস্বরে সুরেশ্বর কেমন অবাক হয়ে গেল।

হীরা চায়ের কাপ প্লেট সংগ্রহ করে নীচে নামতে উদ্যত হল।

'দরকার হলে ডাকবেন।'

সুরেশ্বর এবার সিগারেট ধরালেন। মাথাটা কেমন ভারি লাগছে। বোধহয় ট্রেনের ধকলের জন্যে। সুরেশ্বর জানালার দিকে উঠে এলেন। এবং হঠাৎ জানালার বাঁ-দিকের পাল্লাটার উপর চোখ পড়তে মন্ত্রের মতো অভিভূত হয়ে গেলেন। আশ্চর্য, কিশোর বয়েসের একটা দুর্দান্ত স্বাক্ষর ছুরি দিয়ে কেটে-কেটে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে : 'সুরেশ্বর।' সুরেশ্বর অন্যমনস্ক খোদাইয়ের ওপর আঙুল বুলোতে লাগলেন। 'আমি যেন আটকে পড়ছি একটা প্রাচীন আবেগের মধ্যে...' সুরেশ্বর আবার ভাবলেন : কৈশোরেই কী তাঁর জীবনের ছাঁচটুকু নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আত্মপ্রেমের দর্পণে মুখ দেখে দেখে তাঁর জীবন কাটবে। সুরেশ্বর, সংসারে তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় কী? 'আমার নাম' সুরেশ্বর অস্ফুটে বলল : সু-রে-শ্ব-র। 'আমার সাহিত্যজীবন নিছক আত্মপ্রেম ছাড়া কিছু নয়। আমি, আমি, আমি...' সুরেশ্বর সংযত হল, কে জানে কেউ শুনে ফেলল নাকি। এ একটা অন্ধ স্বার্থপরতা, সুরেশ্বর স্বীকার করেন। কিন্তু এই বৃত্তের বাইরে তিনি বিচরণ করতে পারেন না। না-কি এইটেই তাঁর মনোভঙ্গি।

সুরেশ্বর সিগারেট ফেলে দিলেন। এটা তাঁর স্বভাবের একটা নির্বোধ প্রবৃত্তি। সংসারকে ব্যক্তিগত অধিকারের সীমায় এনে উপভোগ করতে না-পারলে তাঁর তৃপ্তি নেই। 'কল্যাণী, আমার। আমার ছেলেমেয়ে, আমার। আমার সাহিত্য, আ-মা-র। এবং...' সুরেশ্বর [illegible]।

আবার [illegible] ঘট-পারে [illegible] সেরে [illegible] জন্তু, [illegible] সুরেশ্বরকে আনন্দিত করার। [illegible] খাঁচায় [illegible] মধ্যে [illegible] করতে লাগলেন।

বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল, [illegible] তাকে রাতের আহারের জন্য নীচে [illegible] আসতে হল।

জ্যাঠামশায়, [illegible] আলাপটুকু সুরেশ্বরের। জেঠিমা [illegible] সুরেশ্বরের খাওয়া দেখছিলেন।

'হ্যাঁরে সুরো, কলকাতায় [illegible] তোরা দু'বেলা পেট পুরে খাড় [illegible] পারিস নে। কী দুঃখে লেখার [illegible]।'

সুরেশ্বর হাসলেন।

জ্যাঠামশায় বললেন, 'তুমি তো জীবনে ট্রেনে চাপলে না। কী করে জানবে শহরের দুঃখের কথা?'

জেঠিমা বললেন, 'আমি [illegible] যাব সুরোর সঙ্গে। দেখি তোমায় [illegible] চলে কী করে?'

সুরেশ্বর বললেন, 'তাই চলুন জেঠিমা।'

এখন রাত্রি। বাইরের [illegible] মুছে গেছে। এই নির্জন ঘরে সুরেশ্বর পরিপূর্ণ একা। একটু আগে সুটকেস খুলে [illegible]

বোতলটা বের করে গ্লাসের জলে নিয়মিত পরিমাণ ঢেলে নিয়েছেন। এখনো পাত্র শেষ হয়নি। আঙুলের ফাঁকে দামি সিগারেটের হাল্কা সুবাস। একটা উত্তেজনা বোধ করছেন সুরেশ্বর। চোখ জ্বলজ্বল করছে। আর একটা বিচিত্র স্বাদে তাঁর চৈতন্য অবগাহন করছে। একটা পুরনো স্মৃতি। তখনো কল্যাণী তাঁর স্ত্রী হয়নি। এক অকাল বর্ষণের রাত্রিতে কলকাতা ডুবে গেলে বাধ্য হয়ে সে-রাত্রি সুরেশ্বরকে কল্যাণীদের গড়িয়ার বাড়িতে আটকা পড়তে হয়। ছাদের ছোট্ট ঘরে সুরেশ্বরের রাত্রিবাস নির্দিষ্ট হয়। নিজের হাতে বিছানার চাদর পালটে, মাথার কাছে জলের গ্লাস রেখে নীচে যাবার আগে সুরেশ্বরের উত্তেজিত-আদরে কিছুক্ষণ ধরা দিয়ে কল্যাণী ঠোঁট মুছে গম্ভীর হয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সেদিন সারা রাত্রি চোখে ঘুম আসে নি একটি অসম্ভব আকাংক্ষার টানাপোড়েনে : কল্যাণী নিশ্চয়ই আসবে!

আশ্চর্য, সুরেশ্বরকে এবার অধিকতর গম্ভীর এবং চিন্তান্বিত দেখালো : ইচ্ছেগুলো বড় নির্বোধ শিশুর মতো। অথচ, মনের কোন্ স্তর থেকে বাঁধভাঙা ঢলের মতো ইচ্ছাগুলো ছাপিয়ে থইথই করে ওঠে। নাকি, বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখে নিজের ইচ্ছাগুলোকে বানাতে ভালো লাগে। নাঃ কল্যাণী সে-রাত্রে আসে নি। আসা উচিত হত না। কেন? সামাজিক-মন? সামাজিক-মনের শাসন কী স্রষ্টা মানে?

সুরেশ্বর সিগারেট ফেলে দিলেন।

'আমার একটু মানসিক-স্বাধীনতা চাই। সে-স্বাধীনতার হিসেব সামাজিক-মনের সঙ্গে রফা করে নয়। তাহলে শিল্পী-সত্তার মৃত্যু।' সুরেশ্বরের মুখ বাতির আলোকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে : 'এ বিশেষ সুবিধে না পেলে শিল্পী হলাম কেন?'

সুরেশ্বর আলো নিবিয়ে দিয়ে শয্যায় গড়িয়ে পড়লেন। ঘুম আসছে না, তবু জেগে থাকতে ভালো লাগবে। ক্লান্তি আর খরচেতনায় দুলছে অস্তিত্ব।

পরদিন নানান জায়গায় ঘুরে অনেক বেলায় বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে উঠে এলেন সুরেশ্বর। একটা বিরক্তির উত্তেজনা আর অবরুদ্ধ ক্রোধ তাঁকে স্তব্ধ করে রাখল। হাতের কাছে কাজ না-পেয়ে একটা অস্থিরতা তাঁকে তীক্ষ্ণ করে তুলল। সব শেষ হয়ে গেল, কী যেন পাচ্ছেন না, কী যেন...। তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল : ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে। অথচ, ঘরের কুঁজোয় জল রয়েছে। কুঁজোটা কী হেঁটে আসবে তাঁর ঠোঁটের নাগালে। 'না, জল নয়, আমি এক কাপ চা খেতে চাই'—তাহলে কী সুরেশ্বরকে চেঁচাতে হবে। কেন, তাঁর প্রয়োজনের হিসেব নেবার অবসর কী কারুর নেই! তাহলে বিস্ময়ের সঙ্গেই এ বাড়ির সমস্ত সম্পর্ক চুকে-বুকে গেল!

সুরেশ্বরের ক্রোধ গোমরাতে লাগল। না, দরকার নেই। তাঁর কোনো কিছুরই দরকার নেই। নিষ্ফল ক্রোধ গজে' গজে'

জল হল। সুরেশ্বর এবার হতাশায় দীর্ণ হলেন।

চোখে হাত চাপা দিয়ে কতক্ষণ পড়ে ছিলেন সুরেশ্বর। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন তিনি। বাইরের রোদটা ফিকে হয়ে চাঁপা ফুলের রঙ ধরেছে। ঝালরের মতো হাওয়া কাঁপছে। বোধহয় পায়ের শব্দে জেগে উঠলেন সুরেশ্বর।

'আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে চলে যাচ্ছিলাম।' হেসে বলল হীরা।

সুরেশ্বরের মুখের অন্ধকার রেখা কঠিন হয়ে এল, হিংসার মতো প্রদাহ তাঁর চেতনাকে খরতর করে তুলল। কেমন মোটা গলায় বললেন, 'তবু ভালো আমি মরে গেছি এটা ভাবো নি।'

'বা, মরে যাবেন কেন!' হীরা এক-পা এগিয়ে এল : 'মা চা করছেন। নিয়ে আসি।'

'না। দরকার নেই।'

'তাহলে মাকে বারণ করে দিই।'

'যা ইচ্ছে করো।'

হীরা কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বোকার মতো সুরেশ্বরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল।

সুরেশ্বর ডাকলেন : 'আমাকে এক গ্লাস জল দাও।'

হীরা তাড়াতাড়ি জল গড়িয়ে দিল।

'আপনাকে কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছে। শরীর খারাপ?'

সুরেশ্বর বললেন, 'অসুস্থ হলে তুমি কী করবে?'

হীরা বলল, 'কেন? সেবা করতে পারিনে বুঝি?'

'বিশ্বাস হয় না।'

হীরা সুরেশ্বরের মাথার কাছে এগিয়ে এল। 'কপালে ভিক্স লাগিয়ে মালিশ করে দেবো?'

সুরেশ্বর বললেন, 'ও আমার হয়। কিছু না। তুমি একটু আমার কাছে বোসো।'

'আপনার বুঝি প্রায়ই মাথা ধরে।'

'প্রায়ই নয়, কখনোসখনো। যেমন এখন।'

হীরা বলল, 'আপনার মাথাধরাটাও আপনার কথা শুনে চলে।'

সুরেশ্বর বললেন, 'মনে হচ্ছে ঠাট্টা করছ?'

'আঃ ছাড়ুন।' হীরা কিলুনি ছাড়িয়ে নিল।

সুরেশ্বরের মনে হল এবার সত্যিই তাঁর মাথার ভেতরটা ভার ভার মনে হচ্ছে। নিশ্বাস যেন চাপ-ধরা।

'আচ্ছা' সুরেশ্বর দার্শনিক হবার সুবিধে নিলেন : 'তোমার কী মনে হয় না সংসারে এমন কতকগুলো সুন্দর দৃশ্য আছে যা দেখলে মানুষের এক ধরনের অস্বাচ্ছন্দ্য অস্বস্তি বোধ হয়?'

হীরা বলল, 'আমি ধাঁধার উত্তর দিতে পারি নে।' তারপর হঠাৎ ভেবে : 'পেয়েছি। আছে। যেমন বাঘ।'

'বাঘ?' হো-হো করে হেসে উঠলেন সুরেশ্বর : 'দারুণ বলেছ। উইলিয়াম বেক সেই কারণেই টাইগারের ওপর অমন কবিতা লিখে যেতে পেরেছেন।'

'তাহলে আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি?'

'হ্যাঁ। আনাড়ীর মার।' সুরেশ্বর হাসলেন। 'কিন্তু আমি অন্য জিনিস ভাবছিলাম। এমন কিছু সুন্দর পরিস্থিতি আছে যা আমাদের উদ্বিগ্ন করে, বুকের ভেতরে হাহাকার এনে দেয়। তোমার কখনো মনে হয়নি?'

'না তো।'

'মনের ব্যবসায়ীরা বলেন, তার দুটো কারণ আছে। প্রকাশ্য আর অপ্রকাশ্য ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব।'

হীরা বলল, 'বা-বা।'

সুরেশ্বর বললেন, 'কোনো দন্তহীন বৃদ্ধাকে ডাঁসা পেয়ারা খেতে দেখলে কেমন লাগে? কারুর চোখে পড়লেই বৃদ্ধ তাঁর লজ্জা নিয়ে লুকোবার চেষ্টায় কেমন অপরাধী হয়ে পড়েন।'

হীরা হাসি চাপতে চাপতে বলল, 'আপনি আজ সত্যিই অসুস্থ। নইলে যে-সব চিন্তা করে চলেছেন...'

'কী জানি, আমি গুছিয়ে বলতে পারছি নে—'

'কী করে পারবেন? না ভেবে গল্প লিখতে বসলে এইভাবেই পাঠককে ঠকাবেন।'

'তাই দেখছি।'

'আপনি একটু বসুন চা নিয়ে আসছি।'

'আচ্ছা।'

সুরেশ্বর সিগারেট ধরালেন।

'আমি ওকে কী বোঝাতে চাইছি?' সুরেশ্বর নিজেকেই প্রশ্ন করলেন : 'খুব কী ছেলেখেলা হয়ে যাচ্ছে না আহাম্মকের মতো। এই এক ফোঁটা মেয়ের সামনে এমন বীরপণা কেন!'

সামাজিক-মন? আবার ভাবলেন সুরেশ্বর : কিন্তু কোনো প্রত্যয়ই তাঁকে আশ্রয় দিতে পারছে না। 'শিশুর মতো আমি অসুখ-অসুখ খেলায় মেতে উঠেছি', সুরেশ্বর চিন্তিত হলেন। এ একটা অসুখ, প্রিয় অসুখ! অনেক সময় লিখতে বসে লেখাটা যতক্ষণ না কায়দা করতে পারা যাচ্ছে ততক্ষণ জেদ বাড়তে থাকে। তারপর অনেক ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের পর লেখাটা যখন কায়দায় এসে যায় তখন অধিকারবোধের গৌরব। 'আমি সবকিছু এইভাবে আয়ত্ত করতে চাই, আমার-আমার-আমার।'

হীরা চা নিয়ে এল।

'বিকেলে বাড়িতে বসে কী করবেন? চলুন না বাঁধরোড ধরে ঘুরে আসি?'

'সত্যি যাবে?'

'বা, যাব না কেন? আপনি রেডি হয়ে নিন। আমি তৈরি হচ্ছি।'

সুরেশ্বর দ্রুত চা খেয়ে নিলেন। তাঁর মনে অনাস্বাদিত মানসিক স্বাধীনতার হাওয়া বইছে। আশ্চর্য, এই বেরোনোর প্রস্তাবটা তিনিই করতে পারতেন, ইচ্ছেও ছিল। পারেন নি। নিজের মানসিক জটে কেমন জড়িয়ে পড়ছেন। আর, একটা সংশয়-আশংকা তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলছে। যেন বাইরে কোথা থেকে একটা অভিভাবক-মন তাঁকে সতর্ক পাহারা দিচ্ছে। বস্তুত সর্বক্ষণ একটা ভাবাতুর আচ্ছন্নতা তাঁকে গ্রাস করে রয়েছে। মধুর, একধরনের অসুখের মতো। মনে পড়ল : অনেক কাজ জমে গেছে। ধারাবাহিক উপন্যাসের মাসিক কিস্তি দু' একদিনের মধ্যে পাঠাতে হবে। দু নম্বর সাহিত্য - সংখ্যার - গল্পটিও তাড়াতাড়ি পাঠানোর দরকার।

রাস্তা দিয়ে একটা নধর মোরগ হাতে ঝুলিয়ে আনতে যেমন একধরনের অহংকার এবং লজ্জার আবেগ মিশ্রিত হয়ে থাকে তেমনি বাঁধ রোডে উঠে হীরার পাশে হাঁটতে হাঁটতে সুরেশ্বরের সে জাতীয় মিশ্র অনুভূতি বোধ হল।

শাদা সিলকের শাড়িতে হীরার দেহের কঠোর-কোমল রেখাগুলো যেন রুপোর জলের মতো তরল হয়ে নামছে। চুলের খোঁপাটা উঁচু করে বাঁধার জন্যে হীরার শাদা ঘাড়টা গর্বিত রাজহংসের মতো দেখাচ্ছে। উচ্ছ্বসিত হওয়ায় গায়ের পোশাক এলোমেলো খুশিতে দিগ্-ভ্রান্ত। পশ্চিম পারে গাছগাছালির আড়ালে ছেঁড়াছেঁড়া সূর্যাস্ত। সুরেশ্বরের চৈতন্য সুবাসিত হয়ে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে কী বল-ছিল হীরা, রাক্ষুসী হাওয়া ওরা শব্দ-গুলোকে লেহন করে নিল, আশ্চর্য শাদা দাঁতগুলো শুধু ঝিকিয়ে উঠল।

বাঁধের দুধারে হকারসদের ফালিফালি দোকান। দোকান-পাট ছাড়িয়ে ডানদিকে কালেকট্রি। কৃষ্ণচূড়ার গাছে লালের আগুন। বাঁ-দিকে দিগন্তবিসারী মাঠের শ্যামল, আর-একটু উঁকি দিলে মহানন্দার শান্ত প্রবীণ জলরাশি।

আবার দুরারোগ্য ব্যাধির মতো কৈশোর সুরেশ্বরকে গ্রাস করল। সমস্ত চেতনা এখন টালমাটাল নৌকোর মতো শংকা এবং প্রত্যয়শূন্যতায় নির্ভরহীন। শক্ত মুঠো দিয়ে কিছু আঁকড়াবার চেষ্টা করছেন সুরেশ্বর। অই মাঠের শ্যামলিম, কৃষ্ণচূড়ার লোহিত—আলোর অন্ধকারের পায়ে নৃত্যরতা নূপুরের মতো যেন চেতনায় ঝমঝমিয়ে উঠল। এবং মাতৃহীন বেদনার মতো নিজেকে অসহায়, অনাথ বোধ হল। 'নাঃ আমি কৈশোরের বেড়া ভেঙে দিগন্তে বেরিয়ে পড়েছি, অনেক দীর্ঘ ধুসর পথ অতিক্রম করে চলেছি, খিলহীন দিগন্ত। আমার

স্বাধীনতাগুলোই আমাকে বিপদজনক পরিস্থিতির মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে,।'

সুরেশ্বরের গলার ভেতর শুকিয়ে এল।

একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে ধমক খেয়ে লুকিয়ে ফেলতে হল।

'সুরেশ্বর, না?'

ইস্কুলের পন্ডিতমশায়। মোটা চাঁদির চশমা। গায়ে উড়ুনী। নীচের ক্লাশে একবার পন্ডিতমশায় সুরেশ্বরকে মাতৃভাষায় ফেল করিয়ে দিয়েছিলেন।

'মাস্টারমশায় ভালো আছেন?' সুরেশ্বর নত হয়ে পদধূলি নিলেন।

'দ্যাখ এখনো ঠিক চিনতে পেরেছি।' পিতৃস্নেহে দন্তহীন হাসলেন পন্ডিতমশায়। 'একদিন যাস আমার বাড়িতে।'

'যাব।'

'যাস।' পন্ডিতমশায় চলে গেলেন।

সুরেশ্বর জানেন কোনোদিন যাবেন না পন্ডিতমশায়ের বাড়িতে। মহানন্দার পরপারে তখন দিনান্তের চিতায় দীর্ঘদিন দাউ দাউ করে জ্বলছে। 'জগৎ-পারাবারে শিশুরা করে খেলা' একটা গানের ধুয়ার মতো সুরেশ্বরের মস্তিষ্ক আবৃত্ত হতে লাগল। বালিভূমি পার হয়ে তিরতির জলধারায় নেমে গেছে হীরা। সুরেশ্বর দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালেন। এতক্ষণপর মনে পড়ল : হীরা সারা পথ একটি কথাও বলেনি। আশ্চর্য, ব্যাপারটা সুরেশ্বরের লক্ষ্য পড়ে নি। বোধহয় কৈশোরের অনুবন্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল বলে হীরার অস্তিত্ব চেতনায় ছিল না।

হঠাৎ একটা সর্বগ্রাসী শূন্যতায় বুকের ভেতরটা হা হা করে উঠল। কী একটা, কী যেন একটা......

এক ফোঁটা জল কোথা থেকে এসে কপালের ওপর পড়ল। আবার এক ফোঁটা। আকাশপানে তাকালেন সুরেশ্বর। পশ্চিমে একটুকরো মেঘ গোধূলির রঙে বিচিত্র বেগুনী হয়ে উঠেছে। না-কি মহিষের পিঠের মতো।

হীরা দৌড়াতে-দৌড়াতে এল।

'মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে।'

'চলো। ফেরা যাক।'

একটু পরে বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে নামল।

হীরা বলল, 'ভালোই হল। চলুন আমাদের লাইব্রেরি দেখবেন।'

ছোট্ট লাইব্রেরিটা সরকারি-উদ্যমে বড় হয়েছে। দেয়ালে প্রতিকৃতি। আলমারিতে সাজানো কেতাবের স্তবক।

ঘুরে ঘুরে দেখলেন সুরেশ্বর। তারপর লম্বা টেবিলের কোণে চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। অন্যমনস্কে বিলিতি জার্নাল ওল্টাচ্ছিলেন।

'সুরেশ্বরদা! আপনি!'

তরুণ ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে স্মৃতি-উদ্ধার করবার বিফল প্রয়াস করলেন সুরেশ্বর।

'আমি সুদীপ্ত, চিনতে পারছেন না? 'ডাকঘর' নাটকে আমার অমলের অভিনয় দেখে আপনি আমাকে পুরস্কার দিয়েছিলেন?

'সু-দীপ্ত।'

'আপনি অনেক মোটা হয়েছেন। দূরের থেকে চিনতে পারিনি।'

সুরেশ্বর স্মিত হাসলেন।

'কী করছ এখন?

'বহরমপুরে কলেজে পড়ছি।'

'বহরমপুর।'

'আমার মামা চাকরি করেন—'

'ও।'

সুদীপ্ত বলল, 'ভালোই হল। আমার এই খাতায় একটা কিছু লিখে দিন।'

'এইতো মুশকিলে ফেললে—' সুরেশ্বর কান পেতে হলঘরে একটা গুঞ্জন লক্ষ্য করলেন, হীরা অদূরে বই-এর আলমারির দিকে, সুরেশ্বর মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। আলোর তার বেয়ে মুক্তোর মতো জল গড়িয়ে পড়ছে। সুরেশ্বর কলম হাতে তুলে নিলেন, একটু ভাববার ভান করে লিখলেন: "আমি কিছু দিতে চাই, নহিলে জীবনে জীবনে যোগ হবে কী করিয়া," তারপর স্বাক্ষর করে দিলেন।

সুদীপ্ত হাসল। 'রবীন্দ্রনাথ?'

সুরেশ্বর সিগারেটের প্যাকেট বার করতে গিয়ে রেখে দিলেন। তারপর বই-এর আলমারিগুলোর দিকে হেঁটে গেলেন, হীরার পিছনে দাঁড়ালেন একসময়।

হীরা আঙুল দিয়ে দেখাল: আপনার বই।'

সুরেশ্বর দেখলেন। হাসলেন।

হীরা বারান্দার দিকে বেরিয়ে এল।

সুরেশ্বর এবার সিগারেট ধরাতে পেরে স্বস্তি বোধ করলেন।

'বৃষ্টি শিগ্‌গির ধরবে বলে মনে হচ্ছে না—' হীরা বলল।

সুরেশ্বর বললেন, 'তাই তো। রিক্‌শা-টিকশা পাওয়া যাবে না। ওই যে যাচ্ছে। এই এই রিক্‌শা—'

হীরা বলল, 'না বিচ্ছিরি লাগে জবুথবু হয়ে রিকশায় যেতে।'

কিন্তু রিকশা ইতিমধ্যেই গেটে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুরেশ্বর বললেন, 'চলো। এসে পড়েছে যখন।'

হীরা বলল, 'আপনি যান। আমি পরে যাব হেঁটে।'

'আরে, চলো।'

হীরা গজগজ করতে-করতে রিকশায় উঠল।

রিকশাঅলা প্যাকেটের মতো মুড়ে দিল সওয়ারীদের। রিকশা ছুটল। সামনের পরদার একটা কোণ হাতির কানের মতো পত্‌পত্‌ করে নড়ছে। পায়ের দিকে জলের ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে। চোখে-মুখে গুঁড়োগুঁড়ো জল আলপিনের মতো বিঁধছে। পিছনের খন্ড পরদাটা উচ্ছৃংখল ওড়বার চেষ্টায় জুঁই-ফুলের মতো ঝিরিঝিরি জল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

'কী লাভ্ হল রিকশায় চেপে? ভিজে যাচ্ছি...' চোখের ওপর লেপটে-যাওয়া চুল সরিয়ে বলল হীরা।

সুরেশ্বর কিছু বললেন না। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। সুরেশ্বর ঘাড় ফিরিয়ে চোখ রাখলেন বিব্রত হীরার দিকে। জামার ওপরে বৃত্তাকার ওর শাদা কাঁধে ভিজে জবার গন্ধ। 'একেবারে ভিজে গেছ' সুরেশ্বর ওর খোলা কাঁধে হাত রাখলেন, আর মোমের মতো নরম ত্বকে আঙুলি রেখে সুরেশ্বরের মনে হল মানুষের ত্বক কী এমন নরম হতে পারে।

'উঃ আপনার হাত কী গরম, নিশ্চয়ই জ্বর হয়েছে...'

সুরেশ্বর জড়ানো স্বরে কী বললেন।

'উঃ সুড়সুড়ি লাগছে।' হীরা মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করল: 'কী বললেন?'

সুরেশ্বর মন্ত্রোচ্চারণের মতো বললেন, 'তোমার দেহটা মনে হচ্ছে গভীর কুয়োর জলের মতো—'

'এই তো। বানাতে শুরু করলেন।'

'না না। সত্যি বলছি। জানো, ঠান্ডদেহ মেয়েদের হৃদয় খুব উষ্ণ হয়।'

'যা। কেবল বাজে কথা।'

সুরেশ্বর একটু ঝুঁকে পড়ে ডান বাহুর আড়ষ্টতা কাটাবার জন্যে উদাত্ত করে দিলেন। হীরার বাম মণিবন্ধের মোটা বলয়ের ওপর সুরেশ্বরের আঙুলগুলি শিখার মতো কাঁপছিল। রিকশায় এবড়োখেবড়ো গতির সঙ্গে সুরেশ্বরের মুখটা সাপের ফণার মতো দুলছিল। পথের ঢালু হীরাকে সুরেশ্বরের শরীরের সকাশে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। কৃষ্ণচূড়ার অন্ধকার ছায়া থেকে বৃষ্টির লাউ-ডগা সাপগুলো শব্দ করে পতিত হচ্ছিল। আর্ত হাওয়ায় হঠাৎ এক নক্ষত্রস্খলনের দাহের মতো হীরার সর্বশরীর ঝিমঝিম করে উঠল।

রিকশা অন্ধকারের খাদ ঠেলে এবার বাঁধের ওপর ওঠবার চেষ্টায় চালক গাড়ি থেকে নেমে পড়লে হঠাৎ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির নীচে রজ্জুবন্ধন ছিঁড়ে কঠিন পায়ে বেরিয়ে এল হীরা: 'আমি হেঁটেই যাচ্ছি। আপনি রিকশা করে চলে যান।'

অন্ধকার দিগন্ত ভেদ করে রাত্রির ট্রেন ছুটে চলেছে। এখনো গাড়িতে ভিড় জমে ওঠেনি। সম্ভবত পরের স্টেশনে হবে।

সুরেশ্বর এবার পকেট থেকে হীরার চিঠিটা বের করলেন। শিরোনামায় সম্বোধন নেই, অন্তে স্বাক্ষরও নেই। বাতির আলোকে সুরেশ্বরের মুখে দার্শনিকতার ছায়া।

"এমন কিছু দৃশ্য আছে পৃথিবীতে যা দূরের থেকে দেখতে হয়, কাছে টেনে আনলেই নোঙরা হয়ে ওঠে, আমি আগে বুঝিনি।

"আমি কেমন করে ভুলে গিয়েছিলাম আপনি আমাদের পরিবারের নন, কোনো-দিনও ছিলেন না, তাই পারিবারিক কোনো দায়িত্ববোধ আপনার কাছে প্রত্যাশা করা মিথ্যা।

"হয়তো এইভাবেই আপনাকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয় এবং আপনার নিজস্ব মুডের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করে নিতে হয়। এগুলি আপনার রচনার কৌশল হতে পারে, এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনার মনোযোগ প্রার্থী। সেইটে এই: আপনার কাছে যেটা খেলা অন্যের কাছে সেটা মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

"তাই আমার ছোট্ট একটি অনুরোধ: আপনার আগামী কোনো রচনায় আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন না। কারণ, সে-অপমান সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন হবে।......

প্যারিসের বিপ্লবী ছাত্রছাত্রীর দল

সাগর পারের চিঠি

দিলীপ মালাকার

প্যারিস।

অনেক কাল আগে এক জার্মান বন্ধু বলেছিল, এ-কালের দূরত্ব সময় বা মাইলের হিসেবে মাপা উচিত নয়। দূরত্ব আর বাধা নয় একালের মানুষের কাছে। যা অন্তরায় তা হল টাকা। টাকার বিনিময়ে যে কোনো দূরত্ব আজ-কাল নিমেষের মধ্যে পেঁছন যায়। ছোটবেলায় শুনেছি বিলেত হল সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। কয়েক মাস লাগত। তারও আগে শোনা যেত, কালাপানি পার হলে কেউ ফিরে আসত না। সমুদ্র-যাত্রা মানেই অজানা জগতের উদ্দেশ্যে যাত্রা। অজানা কোনো জগতের অভিমুখে অনিশ্চিত যাত্রার মতনই তখন মনে করত অনেকে। এখন যেমন মনে করছে মহাকাশচারীরা। স্পুটনিক-রকেটে চড়ে মহাকাশচারীরা চন্দ্র, মঙ্গল, শুক্র গ্রহের অভিমুখে যাত্রার উদ্দেশ্যে এখন তোড়জোড় করছে।

এমন একদিন ছিল যখন জার্মানীর ফ্রাংকফুর্ট থেকে প্যারিস পেঁছতে পনর-বিশ দিন লাগত। সেও খুব বেশী দিনের কথা নয়। রেলপথ চালু হওয়ার আগে তাই ছিল। এখনও রেলপথে ফ্রাংকফুর্ট থেকে প্যারিস পেঁছতে প্রায় আঠার ঘণ্টা লাগে। ফ্রাংকফুর্ট বিমান বন্দরে বিকেলে বিমানে চড়ে বেল্ট-টেল্ট এঁটে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছি। ঠাণ্ডা সরবৎ দিয়ে গেল এয়ার-হোস্টেস। কাগজটা তখনও শেষ করতে পারি নি। বোধ হয় মিনিট ত্রিশেক কেটেছে। পাইলট জানাল, 'আমরা প্যারিস পেঁছে গেছি।' শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা পেঁছতে বোধ হয় তার চেয়ে বেশী সময় লাগে। আমাদের প্লেনটার পেঁছনর সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সে জায়গায় লাগল ত্রিশ মিনিট। ওরা হাতে কিছু সময় রাখে ঠিক সময়ে পেঁছবে বলে। আবার নির্ধারিত সময়ের আগে পেঁছেচে বলে বিমান বন্দরের ওপর প্রায় সাত-আট মিনিট চক্কর মারতে লাগল প্লেনটা। ফ্রাংকফুর্ট থেকে প্যারিসের মাটি ছুঁতে লাগল মাত্র চল্লিশ মিনিট।

প্যারিসের ওর্লি বিমান বন্দর শুধু বিমান অবতরণ আর বন্দর ছেড়ে চলে যাবার স্টেশন নয়। যেন ছোট-খাট স্বপ্নপুরী। একটা ছিমছাম খুদে শহর বললে বেশী বলা হবে না। বছর পনর আগে পুরোনো বিমান বন্দরের বাড়ীটা ছিল দোতলা। তার জায়গায় নির্মিত হয়েছে আটতলার বিরাট অট্টালিকা। অট্টালিকার তলা দিয়ে গেছে সুড়ঙ্গপথ। সেখানে চলেছে শত-সহস্র মোটর। তার ওপর দিয়ে বিমানের 'রানওয়ে'। বিমান নামছে আর উঠছে। বিমান বন্দরের চৌহদ্দির মধ্যে দুটো বড় হোটেল। শ'-চারেক ঘর। চারটে রেস্তোরাঁ। চারটে কাফে-বার। ছোটখাট ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। পোশাক, প্রসাধন, বই-সংবাদপত্র, মনোহারি দোকানের সংখ্যা গুনে বলা মুশকিল। ছোটখাট নয়, বেশ বড় গোছের পোস্ট অফিস। দুটো ব্যাংক, সাংবাদিকদের জন্যে মিটিং ঘর। আর ভি আই পি'দের জন্যে গোটা পনর সাজানো ঘর। আর যারা ফরাসী সরকারের রাজ-অতিথি হয়ে আসে—যেমন কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি—তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে একটি একতলার বাড়ী। সে এক এলাহি ব্যাপার।

ওর্লি বিমান বন্দরে কোনো 'ট্রানজিট' যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার জন্যে রয়েছে পলিক্লিনিক। শিশুদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। যাদের হাতে সময় আছে তাদের জন্য রয়েছে সিনেমা হল। টেলিভিশান দেখার ঘর। তিন তলার বারান্দায় রয়েছে ছোটখাট ফোয়ারা, তার পাশে রয়েছে পাতিহাঁস, বক আরও কয়েকটা আফ্রিকান পাখি। সেখানে শিশু যাত্রীদের কৌতূহলী ভীড়।

নেশার নেশা দেশ ভ্রমণের নেশার খপ্পরে পড়লে বিমান বন্দরগুলো মনে হবে নিজেরই একান্ত ড্রইং-রুম। তাই মাঝে মাঝে বিমান বন্দরে ভ্রমণের স্বাদ মেটাতে আসি। মনটা তখন পাল্লা দিয়ে উড়ছিল জেট-বিমানগুলোর সঙ্গে দূরে অনেক দূরে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাস্টমস্ পুলিশের জেরা শুনতে হল। জেরার পর বেস্টনি পেরিয়ে পা দিতেই কাঁধে ঝাঁকানি দিল স্টেফান্।

কি রে! আমাদের দিকে না তাকিয়ে উদাস মনে পালাচ্ছিলি কেন?

পালাব কেন? হাঁটছিলাম।

দেশে গিয়ে সব ভুলে গেছিস মনে হচ্ছে। বঁজুর, বঁসোয়ার কিছুই বললি না।

হঠাৎ একটা সর্বগ্রাসী শূন্যতায় বুকের ভেতরটা হা হা করে উঠল। কী একটা, কী যেন একটা......

এক ফোঁটা জল কোথা থেকে এসে কপালের ওপর পড়ল। আবার এক ফোঁটা। আকাশপানে তাকালেন সুরেশ্বর। পশ্চিমে একটুকরো মেঘ গোধূলির রঙে বিচিত্র বেগুনী হয়ে উঠেছে। না-কি মহিষের পিঠের মতো।

হীরা দৌড়াতে-দৌড়াতে এল।

'মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে।'

'চলো। ফেরা যাক।'

একটু পরে বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে নামল।

হীরা বলল, 'ভালোই হল। চলুন আমাদের লাইব্রেরি দেখবেন।'

ছোট্ট লাইব্রেরিটা সরকারি-উদ্যমে বড় হয়েছে। দেয়ালে প্রতিকৃতি। আলমারিতে সাজানো কেতাবের স্তবক।

ঘুরে ঘুরে দেখলেন সুরেশ্বর। তারপর লম্বা টেবিলের কোণে চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। অন্যমনস্কে বিলাতি জার্নাল ওল্টাচ্ছিলেন।

'সুরেশ্বরদা! আপনি!'

তরুণ ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে স্মৃতি-উদ্ধার করবার বিফল প্রয়াস করলেন সুরেশ্বর।

'আমি সুদীপ্ত, চিনতে পারছেন না? 'ডাকঘর' নাটকে আমার অমলের অভিনয় দেখে আপনি আমাকে পুরস্কার দিয়েছিলেন?

'সু-দীপ্ত।'

'আপনি অনেক মোটা হয়েছেন। দূরের থেকে চিনতে পারিনি।'

সুরেশ্বর স্মিত হাসলেন।

'কী করছ এখন?

'বহরমপুরে কলেজে পড়ছি।'

'বহরমপুর।'

'আমার মামা চাকরি করেন—'

'ও।'

সুদীপ্ত বলল, 'ভালোই হল। আমার এই খাতায় একটা কিছু লিখে দিন।'

'এইতো মুশকিলে ফেললে—' সুরেশ্বর কান পেতে হলঘরে একটা গুঞ্জন লক্ষ্য করলেন, হীরা অদূরে বই-এর আলমারির দিকে, সুরেশ্বর মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। আলোর তার বেয়ে মুক্তোর মতো জল গড়িয়ে পড়ছে। সুরেশ্বর কলম হাতে তুলে নিলেন, একটু ভাববার ভান করে লিখলেন: "আমি কিছু দিতে চাই, নহিলে জীবনে জীবনে যোগ হবে কী করিয়া," তারপর স্বাক্ষর করে দিলেন।

সুদীপ্ত হাসল। 'রবীন্দ্রনাথ?'

সুরেশ্বর সিগারেটের প্যাকেট বার করতে গিয়ে রেখে দিলেন। তারপর বই-এর আলমারিগুলোর দিকে হেঁটে গেলেন, হীরার পিছনে দাঁড়ালেন একসময়।

হীরা আঙুল দিয়ে দেখাল: আপনার বই।'

সুরেশ্বর দেখলেন। হাসলেন।

হীরা বারান্দার দিকে বেরিয়ে এল।

সুরেশ্বর এবার সিগারেট ধরাতে পেরে স্বস্তি বোধ করলেন।

'বৃষ্টি শিগ্‌গির ধরবে বলে মনে হচ্ছে না—' হীরা বলল।

সুরেশ্বর বললেন, 'তাই তো। রিক্‌শা-টিকশা পাওয়া যাবে না। ওই যে যাচ্ছে। এই এই রিক্‌শা—'

হীরা বলল, 'না বিচ্ছিরি লাগে জবুথবু হয়ে রিকশায় যেতে।'

কিন্তু রিকশা ইতিমধ্যেই গেটে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুরেশ্বর বললেন, 'চলো। এসে পড়েছে যখন।'

হীরা বলল, 'আপনি যান। আমি পরে যাব হেঁটে।'

'আরে, চলো।'

হীরা গজগজ করতে-করতে রিকশায় উঠল।

রিকশাঅলা প্যাকেটের মতো মুড়ে দিল সওয়ারীদের। রিকশা ছুটল। সামনের পরদার একটা কোণ হাতির কানের মতো পত্‌পত্‌ করে নড়ছে। পায়ের দিকে জলের ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে। চোখে-মুখে গুঁড়োগুঁড়ো জল আলপিনের মতো বিঁধছে। পিছনের খণ্ড পরদাটা উচ্ছৃংখল ওড়বার চেষ্টায় জুঁই-ফুলের মতো ঝিরিঝিরি জল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

'কী লাভ্ হল রিকশায় চেপে? ভিজে যাচ্ছি...' চোখের ওপর লেপটে-যাওয়া চুল সরিয়ে বলল হীরা।

সুরেশ্বর কিছু বললেন না। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। সুরেশ্বর ঘাড় ফিরিয়ে চোখ রাখলেন বিব্রত হীরার দিকে। জামার ওপরে বৃত্তাকার ওর শাদা কাঁধে ভিজে জবার গন্ধ। 'একেবারে ভিজে গেছ' সুরেশ্বর ওর খোলা কাঁধে হাত রাখলেন, আর মোমের মতো নরম ত্বকে আঙুলি রেখে সুরেশ্বরের মনে হল মানুষের ত্বক কী এমন নরম হতে পারে।

'উঃ আপনার হাত কী গরম, নিশ্চয়ই জ্বর হয়েছে...'

সুরেশ্বর জড়ানো স্বরে কী বললেন।

'উঃ সুড়সুড়ি লাগছে।' হীরা মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করল: 'কী বললেন?'

সুরেশ্বর মন্ত্রোচ্চারণের মতো বললেন, 'তোমার দেহটা মনে হচ্ছে গভীর কুয়োর জলের মতো—'

'এই তো। বানাতে শুরু করলেন।'

'না না। সত্যি বলছি। জানো, ঠান্ডদেহ মেয়েদের হৃদয় খুব উষ্ণ হয়।'

'যা। কেবল বাজে কথা।'

সুরেশ্বর একটু ঝুঁকে পড়ে ডান বাহুর আড়ষ্টতা কাটাবার জন্যে উদাত্ত করে দিলেন। হীরার বাম মণিবন্ধের মোটা বলয়ের ওপর সুরেশ্বরের আঙুলগুলি শিখার মতো কাঁপছিল। রিকশার এবড়োখেবড়ো গতির সঙ্গে সুরেশ্বরের মুখটা সাপের ফণার মতো দুলছিল। পথের ঢালু হীরাকে সুরেশ্বরের শরীরের সকাশে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। কৃষ্ণচূড়ার অন্ধকার ছায়া থেকে বৃষ্টির লাউ-ডগা সাপগুলো শব্দ করে পতিত হচ্ছিল। আর্ত হাওয়ায় হঠাৎ এক নক্ষত্রস্খলনের দাহের মতো হীরার সর্বশরীর ঝিমঝিম করে উঠল।

রিকশা অন্ধকারের খাদ ঠেলে এবার বাঁধের ওপর ওঠবার চেষ্টায় চালক গাড়ি থেকে নেমে পড়লে হঠাৎ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির নীচে রজ্জুবন্ধন ছিঁড়ে কঠিন পায়ে বেরিয়ে এল হীরা: 'আমি হেঁটেই যাচ্ছি। আপনি রিকশা করে চলে যান।'

অন্ধকার দিগন্ত ভেদ করে রাত্রির ট্রেন ছুটে চলেছে। এখনো গাড়িতে ভিড় জমে ওঠেনি। সম্ভবত পরের স্টেশনে হবে।

সুরেশ্বর এবার পকেট থেকে হীরার চিঠিটা বের করলেন। শিরোনামায় সম্বোধন নেই, অন্তে স্বাক্ষরও নেই। বাতির আলোকে সুরেশ্বরের মুখে দার্শনিকতার ছায়া।

"এমন কিছু দৃশ্য আছে পৃথিবীতে যা দূরের থেকে দেখতে হয়, কাছে টেনে আনলেই নোঙরা হয়ে ওঠে, আমি আগে বুঝিনি।

"আমি কেমন করে ভুলে গিয়েছিলাম আপনি আমাদের পরিবারের নন, কোনো-দিনও ছিলেন না, তাই পারিবারিক কোনো দায়িত্ববোধ আপনার কাছে প্রত্যাশা করা মিথ্যা।

"হয়তো এইভাবেই আপনাকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয় এবং আপনার নিজস্ব মুক্তের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করে নিতে হয়। এগুলি আপনার রচনার কৌশল হতে পারে, এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনার মনোযোগ প্রার্থী। সেইটে এই: আপনার কাছে যেটা খেলা অন্যের কাছে সেটা মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

"তাই আমার ছোট্ট একটি অনুরোধ: আপনার আগামী কোনো রচনায় আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন না। কারণ, সে-অপমান সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন হবে।......

প্যারিসের বিপ্লবী ছাত্রছাত্রীর দল

সাগর পারের চিঠি

দিলীপ মালাকার

প্যারিস।

অনেক কাল আগে এক জার্মান বন্ধু বলেছিল, এ-কালের দূরত্ব সময় বা মাইলের হিসেবে মাপা উচিত নয়। দূরত্ব আর বাধা নয় একালের মানুষের কাছে। যা অন্তরায় তা হল টাকা। টাকার বিনিময়ে যে কোনো দূরত্ব আজ-কাল নিমেষের মধ্যে পেঁছন যায়। ছোটবেলায় শুনেছি বিলেত হল সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। কয়েক মাস লাগত। তারও আগে শোনা যেত, কালাপানি পার হলে কেউ ফিরে আসত না। সমুদ্র-যাত্রা মানেই অজানা জগতের উদ্দেশ্যে যাত্রা। অজানা কোনো জগতের অভিমুখে অনিশ্চিত যাত্রার মতনই তখন মনে করত অনেকে। এখন যেমন মনে করছে মহাকাশ-চারীরা। স্পুটনিক-রকেটে চড়ে মহাকাশ-চারীরা চন্দ্র, মঙ্গল, শুক্র গ্রহের অভিমুখে যাত্রার উদ্দেশ্যে এখন তোড়জোড় করছে।

এমন একদিন ছিল যখন জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্যারিস পেঁছতে পনর-বিশ দিন লাগত। সেও খুব বেশী দিনের কথা নয়। রেলপথ চালু হওয়ার আগে তাই ছিল। এখনও রেলপথে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্যারিস পেঁছতে প্রায় আঠার ঘণ্টা লাগে। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমান বন্দরে বিকেলে বিমানে চড়ে বেল্ট-টেল্ট এঁটে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছি। ঠাণ্ডা সরবৎ দিয়ে গেল এয়ার-হোস্টেস। কাগজটা তখনও শেষ করতে পারি নি। বোধ হয় মিনিট ত্রিশেক কেটেছে। পাইলট জানাল, 'আমরা প্যারিস পেঁছে গেছি।' শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা পেঁছতে বোধ হয় তার চেয়ে বেশী সময় লাগে। আমাদের প্লেনটার পেঁছনর সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সে জায়গায় লাগল ত্রিশ মিনিট। ওরা হাতে কিছু সময় রাখে ঠিক সময়ে পেঁছবে বলে। আবার নির্ধারিত সময়ের আগে পেঁছেচে বলে বিমান বন্দরের ওপর প্রায় সাত-আট মিনিট চক্কর মারতে লাগল প্লেনটা। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্যারিসের মাটি ছুঁতে লাগল মাত্র চল্লিশ মিনিট।

প্যারিসের ওর্লি বিমান বন্দর শুধু বিমান অবতরণ আর বন্দর ছেড়ে চলে যাবার স্টেশন নয়। যেন ছোট-খাট স্বপ্নপুরী। একটা ছিমছাম খুদে শহর বললে বেশী বলা হবে না। বছর পনর আগে পুরোনো বিমান বন্দরের বাড়ীটা ছিল দোতলা। তার জায়গায় নির্মিত হয়েছে আটতলার বিরাট অট্টালিকা। অট্টালিকার তলা দিয়ে গেছে সুড়ঙ্গপথ। সেখানে চলেছে শত-সহস্র মোটর। তার ওপর দিয়ে বিমানের 'রানওয়ে'। বিমান নামছে আর উঠছে। বিমান বন্দরের চৌহদ্দির মধ্যে দুটো বড় হোটেল। শ'-চারেক ঘর। চারটে রেস্তোরাঁ। চারটে কাফে-বার। ছোটখাট ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। পোশাক, প্রসাধন, বই-সংবাদপত্র, মনোহারি দোকানের সংখ্যা গুনে বলা মুশকিল। ছোটখাট নয়, বেশ বড় গোছের পোস্ট অফিস। দুটো ব্যাঙ্ক. সাংবাদিকদের জন্যে মিটিং ঘর। আর ভি আই পি'দের জন্যে গোটা পনর সাজানো ঘর। আর যারা ফরাসী সরকারের রাজ-অতিথি হয়ে আসে—যেমন কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি—তাদের অভ্যর্থনার জন্যে একটি একতলার বাড়ী। সে এক এলাহি ব্যাপার।

ওর্লি বিমান বন্দরে কোনো 'ট্রানজিট' যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার জন্যে রয়েছে পলিক্লিনিক। শিশুদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। যাদের হাতে সময় আছে তাদের জন্য রয়েছে সিনেমা হল। টেলি-ভিশান দেখার ঘর। তিন তলার বারান্দায় রয়েছে ছোটখাট ফোয়ারা, তার পাশে রয়েছে পাতিহাঁস, বক আরও কয়েকটা আফ্রিকান পাখি। সেখানে শিশু যাত্রীদের কৌতূহলী ভীড়।

নেশার নেশা দেশ ভ্রমণের নেশায় খপ্পরে পড়লে বিমান বন্দরগুলো মনে হবে নিজেরই একান্ত ড্রইং-রুম। তাই মাঝে মাঝে বিমান বন্দরে ভ্রমণের স্বাদ মেটাতে আসি। মনটা তখন পাল্লা দিয়ে উড়ছিল জেট-বিমানগুলোর সঙ্গে দূরে অনেক দূরে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাস্টমস্ পুলিশের জেরা শুনতে হল। জেরার পর বেস্টনি পেরিয়ে পা দিতেই কাঁধে ঝাঁকানি দিল স্টেফান্।

কি রে! আমাদের দিকে না তাকিয়ে উদাস মনে পালাচ্ছিলি কেন?

পালাব কেন? হাঁটছিলাম।

দেশে গিয়ে সব ভুলে গেছিস মনে হচ্ছে। বঁজুর, বঁসোয়ার কিছুই বললি না।

কেমন আছিস বল? এই যে, পরিচয় করিয়ে দি.........আমার বান্ধবী মিশেল্।

এতক্ষণে চেতনা ফিরে এসেছে। বলতে ভুলে গেছি আমার সহপাঠি বন্ধু স্টেফানকে জানিয়েছিলাম আমার আগমন বার্তা। সেই ভরসায় সে এসেছে আমায় তার গাড়ীতে তুলে নিতে। ফরাসী ছাত্র-বিপ্লবের জের তখনও কাটেনি। তখনও খুচ-খাচ ধর্মঘট চলছিল প্যারিসে। ট্যাক্সি চালকরা তখনও কাজে যোগ দেয় নি।

ওর্লি বিমান বন্দরে এলেই যাত্রীর ভীড়ে হারিয়ে যেতে হয়। তিন মিনিট অন্তর একটি করে বিমান ওড়ে আর নামে। একদল আকাশে ওড়ে, আর একদল মর্তের ওর্লি বন্দরে নামে। অসংখ্য যাত্রীর সংখ্যা। ছাত্র-বিপ্লবোত্তর ওর্লি বিমান বন্দরটা ফাঁকা-ফাঁকা দেখলাম। একটা থমথমে ভাব। গন্ড-গোলের ভয়ে বিদেশী ট্যুরিস্টরা প্যারিস দেখা কমিয়ে দিয়েছে।

ওর্লি বিমান বন্দর ত্যাগ করে ফরাসী-দের 'অটো-রুট' (আমাদের ভি আই পি রোড) ধরে বাড়ীর দিকে এগুতে লাগলাম। ঘন্টায় একশো কিলোমিটার গতিতে চলল গাড়ী। গাড়ীর গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে পুরোনো প্যারিস দেখতে দেখতে স্টেফানের বান্ধবী মিশেলের কথা ভাবছিলাম। হাসি-খুসি, যৌবনের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার দেহের ঝলকানিতে। কিন্তু মনে মনে ভাব-ছিলাম হায়! হতভাগিনী মিশেল। স্টেফানকে জিজ্ঞাসা না করে তার বান্ধবী মিশেলকেই বলে ফেললাম।

—স্টেফানের সঙ্গে বন্ধুত্ব কত দিনের?

—বন্ধুত্ব বেশী দিনের নয়। তবে আলাপ অনেক দিনের। মানে এই মাস-দুয়েকের।

আমি বললাম, মাস দুয়েকের আলাপেই বন্ধুত্ব? আপনাদের বন্ধুত্ব যেন চিরকালের জন্যে টিঁকে থাকে। প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হোক।

স্টেফানকে যারা চেনে, তারা জানে স্টেফানের বান্ধবীদের ঘনিষ্ঠতার আয়ু চিরকালীন নয়। সবচেয়ে পুরোনো হলে আট মাস। তারপর একটা ওলটপালট হবেই। স্টেফানের বৈশিষ্ট্য ওখানেই। স্টেফান দর্শন বলে—বান্ধবী যত দিন বান্ধবী তত-দিনই ভাল লাগে। তার মধ্যে প্রীতির ভাব থাকে। যেই পুরোনো হয়ে গেল তখনই তার মধ্যে থেকে ফুটে বেরোয় গিন্নি-গিন্নি ভাব। উঠতে বসতে উপদেশ। ওখানে যেও না, ওটা খেয়ো না। হিসেব দাও, নিকেশ দাও। হিসেব-নিকেশের মধ্যে স্টেফান নেই। সে স্বাধীন। চিরকালই স্বাধীন থাকতে চায় স্টেফান। বছর আটেকের মধ্যে আমি আজ পর্যন্ত কোনো বান্ধবীকে দেখলাম না স্টেফানকে বেঁধে রাখতে পেরেছে। জানি না সেটা তার বান্ধবীদের বাঁধবার টেকনিকের দোষ না বাঁধন দড়ি ছেঁড়ার কৌশল জানা স্টেফানের কেরামতি।

ওর্লি বিমান বন্দরে পৌঁছে এবং সেখান থেকে তার গাড়ী করে 'অটো রুট' ধরে প্যারিস পৌঁছবার পথে স্টেফানের সঙ্গে খুব বেশী কথা হয় নি। কূটনৈতিক জগতে 'প্রোটোকল'-এর নিয়মকানুন বজায় রেখে যতখানি সংক্ষেপে সম্ভব ভদ্র অথচ অল্প কথায় কাজ সারছিলাম এতক্ষণ। তার কারণ এই নয় যে, আমি 'প্রোটোকল' সার্ভি-সের আজ্ঞানুবাহক হয়ে গেছি। প্রায় আধ-বেলা বিশ্রামহীন চড়া চড়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাধ্য হয়ে গা এলিয়ে বিশ্রাম করছিলাম। কথা কম বলছিলাম। মিশেল অপরিচিতা মহিলা বলে 'প্রোটোকল' মাফিক ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই কথা বলছিলাম। মিশেল যদি না থাকত এবং স্টেফান যদি একলা থাকত তাহলে কথা না বলে গাড়ীতে ঘুমোতাম, বন্ধুর সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার কোন 'প্রোটোকলের' বালাই নেই। সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতা। আমার ভাবনার ছেদ টেনে স্টেফানই বরং বললে—আমি ভেবেছিলাম, তুই বুঝি আর প্যারিসে আসবি না। দেশে গিয়ে খাঁটি হিন্দু বনে গেছিস।

ভারতীয়দের ফরাসীরা বলে হিন্দু। জার্মানী বা ইতালিতেও তাই। ওটা ব্যাক-রণের ভুল। যাই হোক, যা চলে আসছে অনেক কাল ধরে তার পরিবর্তন এখনই সম্ভব নয়। সময় সাপেক্ষ। স্টেফান আবার বলে,—প্যারিসে যে মিএগা কয়েক বছর কাটিয়েছে তার পক্ষে প্যারিস ভোলা অসম্ভব। বারে বারে তাকে আসতেই হবে। তোকেও তাই আসতে হয়েছে। না এসে থাকতে পারবি না।

কথাটা মিথ্যা নয়। বেশ কয়েক বছর প্যারিসে বসবাস করলে মায়াবিনী প্যারিসের মায়ায় পড়তেই হবে। উপায় নেই।

বাড়ীর কাছে পৌঁছেই স্টেফান বলল—তোকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তুই আজ বিশ্রাম কর। কাল বরং প্যারিসে ছাত্র-বিপ্লবের কথা শোনাব। এখনও কয়েকটা কলেজ বিপ্লবী ছাত্রদের অধীনে রয়েছে। সেখানে তোকে কাল নিয়ে যাব। কাল শনিবার আমার ছুটির দিন। কাল বরং কথা হবে। আজ চলি। বিদায়।

বিদায় নিলাম ওদের দুজনের কাছ থেকে। প্যারিসে তখন থমথমে ভাব। ছাত্র-বিপ্লব শেষ হয়েছে। ইলেকশান পর্ব শুরু হয়েছে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকা 'সরবন্'এর চারধারে তখন পুলিশ ঘেরাও। প্রায় তিন সপ্তাহ 'সরবন্' অধিকার করে বসে ছিল ছাত্ররা। তারা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। সরবন্ পাড়ায় দেখলাম মোড়ে মোড়ে জনতার জটলা। ইলেকশানে কি হবে। রাজনীতি চর্চা হচ্ছে।

পরের দিন ছাত্র-বিপ্লব দেখতে বেরো-লাম। বন্ধুদের সঙ্গে গেলাম আর্ট কলেজে। ছাত্রপাড়ায় আর্ট কলেজ আর মেডিক্যাল কলেজ পাশাপাশি। দুটো কলেজ তখন এখনও বিপ্লবী ছাত্রদের দখলে। আর্ট কলেজের ছাতের ওপর তখন উড়ছে লাল পতাকার পাশে কালো পতাকা। লাল পতাকা হল বিপ্লবের প্রতীক আর কালো সন্ত্রাস-বাদের।

আর্ট কলেজের [illegible] হল ঘরে চল-ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। আর্ট চর্চার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল রাজনীতি চর্চা। এক ঘরে দেখলাম ছাত্ররা পোস্টার ছাপছে। মেয়েরা মিনি-স্কার্ট ছেড়ে ট্রাউজার পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদল ছাত্রছাত্রী বন বেধে ওখানেই পড়াশোনার, খাওয়া-দাওয়া-শোয়া করছে। [illegible] দেয়ালে-দেয়ালে মাও-সে-তুং-এর ছবি। মাও-সে-তুং-এর বাণী। তার পাশে ঝুলছে চে গুয়েভরা ও ট্রটস্কির ছবি। [illegible] আমায় বোঝাল, এ সংগ্রাম শুধু ছাত্রদের নয়, সমগ্র ফ্রান্সের। শুধু ছাত্র সমাজের [illegible]তিকল্পে তাদের দাবী নয়। একালের [illegible] সমাজনীতির পরিবর্তন না হলে [illegible] কোন শ্রমিকের উন্নতি সম্ভব নয়।

আর্ট কলেজের লনে কয়েকটি ছাত্রী শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। গেটের সামনে একদল ছাত্র পথচারীর কাছ থেকে চাঁদা তুলছে। কলেজ প্রাঙ্গণে অনেকগুলো কাউন্টার। একটিতে রয়েছে সংবাদ সরবরাহ বিভাগ। সাংবাদিকদের সংবাদ দেওয়া তাদের কাজ। আরেকটাতে রয়েছে ভলান্টিয়ার্স জোগাড়ের কেন্দ্র। মাইকে বাজছে নানান রকমের সংগীত। ওখানে বিক্রি হচ্ছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা, চে গুয়েভরা, রেজিশ দব্রে, মাও-সে-তুং-এর বই ইত্যাদি।

বন্ধুদের নিয়ে সামনের কাফেতে ঢুক-লাম। কাফের খদ্দেররা সবই প্রায় আর্ট কলেজের বিপ্লবী ছাত্রছাত্রী। তাদের আলো-চনা চলছে সংগ্রাম স্থায়ী হতে পারে কিভাবে। তখন চলছিল নির্বাচন পর্ব। নির্বাচনে তাদের কোন আস্থা বা আগ্রহ দেখিনি। তাদের মতে নির্বাচনে ফরাসী সমাজের পরিবর্তন অসম্ভব। সমাজে পরিবর্তন আনতে হলে চাই বিপ্লব। সেই বিপ্লব-সাধনায় মগ্ন একালের তরুণ ফরাসী সমাজ।

কাফেতে আমাদের টেবিলের পাশে একদল গরম-গরম আলোচনা করছিল। তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতেই একজন ব্যাগ থেকে ছোট লাল বই বের করল (মাও-সে-তুং-এর লাল-বাণীর বই)। পাতা উল্টে সে গড়গড় করে বলে গেল কোন [illegible] কোন পথ গ্রহণ করতে হয়। আমরা কৌতূ-হল সংবরণ করতে না পেরে পাশের টেবিলের 'বিপ্লবী'দের জিজ্ঞাসা করলাম তারা কেমন করে দ্যগল পন্থীদের হারাবে তা কী সম্ভব? কারণ তখন নির্বাচন প্রস্তুতি চলছে। তাদের উত্তরে বোঝা গেল যে, তারা নির্বাচনে দ্যগল সরকারকে কাবু করতে পারবে না। তারা চায় বিপ্লব। তাদের ধারণা, সে বিপ্লবে শ্রমিক সমাজ এগিয়ে আসবে। এটুকু বুঝলাম যে, তারা আদর্শ-বাদী। বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন চায়। কিন্তু রাজনৈতিক [illegible]

সম্ভব নয়। তাদের একজন বলল, আসুন না কাল আমাদের ঘরোয়া বৈঠকে। সেখানে দেখবেন, সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীরা কেমন করে সংগ্রাম চালায়। তাদের সঙ্গে আলাপ করে অনেক নতুন কথা জানতে পারবেন। ওদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। স্টেফান আমায় জানাল, ওসব রাজনীতি চর্চায় সে নেই। তাকে এখনই মিশেলের খোঁজে বেরুতে হবে। আমাকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হল।

আর্ট কলেজ থেকে বেশী দূরে যেতে হল না। মিনিট পাঁচেকের পথ স্যাঁ জারমাঁ দ্য প্রে। এ পাড়ায় সাহিত্যিক-শিল্পীদের আড্ডা জমে। কাফেগুলোতে উঠতি কবি, লেখক, আর্টিস্টদের ভীড় লেগেই আছে। খ্যাতনামা হলে তখন আর তাদের বেশী দেখা যায় না এ পাড়ার কাফেতে। তারা তখন বুর্জোয়া। বুর্জোয়া কাফে-রেস্তোরাঁয় আড্ডা জমায়। স্যাঁ জারমাঁ দ্য প্রের খ্যাতনামা কাফে দো মাগোতে অপেক্ষা করছিল মিশেল। স্টেফানকে পেয়ে সে যেন হাতে স্বর্গ পেল। কারণ মেয়েরা কোনো কাফেতে একলা বসে থাকতে চায় না। একা বসে থাকলেই ক্ষুধার্ত চোখের দৃষ্টি পড়বে। অনেক সময়ে কোনো কোনো ছোকরা আবার বাড়াবাড়িও করে থাকে। আমাকে দেখে মিশেলের রাগ যেন ফেটে পড়ল।

—স্টেফানের না হয় সময় জ্ঞান নেই, আপনি তো সময় মতো আসতে পারতেন।

আসল কথাটা চাপা দিয়ে স্টেফানকে বাঁচাতে গিয়ে আমায় মিথ্যা কথা বলতে হল। সব দোষ চাপালাম গাড়ীর ওপর। এই অসময়ে এত গাড়ীর ভীড় যে গাড়ী চালান দায়। তার চেয়ে পায়ে হেঁটে এলে অনেক আগে পৌঁছতে পারতাম।

এতসবের মধ্যেও দেখলাম স্টেফানের কোনো ভ্রূক্ষেপও নেই। সে নির্বিকার বোম্-ভোলা শিব। তার মানে এই নয় যে, সে সাধু-সন্ন্যাসী, পার্থিব জিনিসের ওপর তার মায়া নেই। সবই আছে পুরোপুরি। তবে মেয়েদের ব্যাপারে তার নির্লিপ্ত ভাব [illegible]। কোনো বান্ধবী তাকে ত্যাগ করলে বা সে ত্যাগ করলে তার কাছ থেকে কোনো দিন হা-হুতাশ বা আক্ষেপ করতে দেখি নি। বরং ওর মুখে শুনেছি, আঃ বাঁচা গেল। বেশ কদিন নাক ডেকে ঘুমোনো যাবে। নতুন পোশাক পরে আনন্দ পাবার মতনই তার কাছে নতুন বান্ধবীরা। পোশাক পুরোনো হলে যেমন মায়া কমে যায়, তাকে অযত্নে আলমারিতে তুলে রাখতে হয় অথবা অন্য কাজে ব্যবহার করতে হয় তেমনি স্টেফানের মনোভাব তার বান্ধবীদের প্রতি। ওর হৃদয় আছে কিন্তু দয়া-মায়ার বালাই কিছু নেই। সে খামখেয়ালি। কখনো মেট্রোর ধারে দাঁড়ান মাতাল-ভিখারিকে হয়ত কয়েক টাকাই দিয়ে দিল। কিন্তু [illegible] বেরুলে, একটি [illegible]। আর বান্ধবীদের [illegible]। তা সত্ত্বেও কিন্তু তার বান্ধবীর ভীড় কম

নয়। তারা তাকে টেলিফোনে বিরক্ত করে বলে অফিসে সে বারণ করে দিয়েছে কোনো নারীকণ্ঠ তাকে ডাকলেই যেন বলে দেওয়া হয় সে কাজে ব্যস্ত বা বাইরে গেছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাফে থেকে উঠতে হল। রাত এগিয়ে চলেছে। খানা খাওয়ার সময় হয়েছে। ডিনারে যেতে হবে। তাড়া দিল মিশেল। কাছেই এক রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম। আমরা মেনু দেখে সস্তায় খাবার বাছছি এমন সময় মিশেল গেল 'টয়লেটে' হাত-মুখ ধুতে। এই ফাঁকে স্টেফানকে জিজ্ঞাসা করলাম মিশেল সম্পর্কে। উত্তরে সে জানাল যে, মাস ছয়েক আগে এক পার্টিতে আলাপ। মিশেলই নাকি তাকে বলে যে সেও একই অফিসে চাকরি করে। স্টেফানকে কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে বিরাট অফিসে মেয়ের মিছিলের মধ্যে মিশেলকে চেনা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু মিশেলের নজর ছিল তার প্রতি। যাই হোক, সেই থেকে তাদের বন্ধুত্ব।

স্টেফান আমাকে বাধা দিয়ে বলল,—বন্ধুত্বকে প্রণয় বলে ভুল বুঝিস না। মিশেল হয়ত তাই ভেবেছে। তবে মেয়েটা ভাল। অত সরল মেয়ে আমার ভাল লাগে না। কথায় কথায় ফ্যাঁচ করে কেঁদে ফেলে।

আমাদের কথা শেষ না হতেই মিশেল টেবিলে এসে উপস্থিত। মিশেল—আলোচনা থামিয়ে আমরা ডিনারের আলোচনায় মেতে গেলাম। ডিনার শেষ হতেই মিশেল প্রস্তাব করল ক্যাবারেতে গিয়ে গান শোনা যাক। প্রস্তাবটা ভাল বলে আমরা মেনে নিলাম।

ক্যাবারে যাওয়াও এক সমস্যা। ল্যাটিন কোয়ার্টারে ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাবারেতে যাওয়া হবে না পিগাল পাড়ায় ন্যাংটো মেয়েদের নাচ দেখা হবে, এই নিয়ে অনেকক্ষণ গবেষণা হল। যখন কোনো মীমাংসা পাওয়া যাচ্ছিল না তখন আমি 'টস' করার প্রস্তাব করলাম। 'টস'এ ঠিক হল ল্যাটিন কোয়ার্টারের ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাবারে। মিশেল খুসী। কিন্তু স্টেফান নয়। স্টেফান বলে—

কাবারে অ্যান্তেলেকচুয়াল? সে দ্য লা বার্ব। অ' ম অম্যার্দ। ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাবারে? দাড়িওয়ালাদের ব্যাপার। ওরা আমার ঘেন্না ধরিয়ে দেয়।

পিগাল পাড়ায় বেশ নাচ-টাচ দেখা যেত। তা নয় যত সব। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্টেফানকে যেতে হল ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাবারেতে। ঘণ্টা দেড়েক সেখানে কবি গান শুনে স্টেফান ঝিমুচ্ছিল দেখে আমরা উঠে পড়লাম। রাত তখন দুটো।

ইউরোপীয় মতে তখন আর রাত নেই। দিন সুরু হয়েছে। যদিও সূর্য ওঠেনি। আমরা 'বন নুই' শুভরাত্রি বলে যে যার বাড়ির দিকে এগুলাম।

পরের দিন বিকেলে নির্ধারিত সময়ে গেছি আর্ট কলেজের পাড়ার সেই কাফেতে। ওখানেই দেখা হল ছাত্র-বিপ্লবীদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার বেরোলাম। সে একদল বটে। এদের কেউ আর্ট কলেজের ছাত্র, কেউ আর্কিটেক্ট, একজন ডাক্তার। জ' পিয়ের-এর গাড়ী চড়লাম। জ' পিয়ের

'আরবানিস্ট' অর্থাৎ নগর স্থাপনায় বিশেষজ্ঞ। তার গাড়ীতে উঠল ক্রেয়ার নামে একটি মেয়ে। ক্রেয়ার 'সোস্যাল সাইকোলজিস্ট'। একটি কারখানার শ্রমিকদের সম্বন্ধে গবেষণামূলক কাজ করে ক্রেয়ার। সেও বিপ্লব চায়। চায় সামাজিক বিপ্লব। অন্য গাড়ীতে ছিল আরও জনাচারেক। তাদের পরিচয় পরে দেওয়া যাবে। গাড়ী চালাতে চালাতে জঁ পিয়ের বলল—জানেন মশাই, বিপ্লবটা হয়েও হল না। অর্থাৎ আমরা যেমনভাবে চেয়েছিলাম তেমনটি হল না। কিছু ফল অবশ্য পাওয়া গেছে। তবে আমরা চেয়েছিলাম, এই ঘুণ ধরা সমাজকে উল্টে দিতে নতুন এক সমাজ—দেশ গড়তাম আমরা যুবকরা। সে সমাজে কেউ অভুক্ত থাকত না। এত অবিচার থাকত না। আবার আমরা লড়ব। সে লড়াই-এ আমরা জিতবই।

আমি বললাম, কেন? বিপ্লবে অনেক পরিবর্তন দেখছি প্যারিসে। আরও হয়ত হবে।

আমার কথায় বাধা দিয়ে ক্রেয়ার বলে উঠল, ছাই পরিবর্তন হয়েছে। এ পরিবর্তন আমরা চাই নি। আমরা চাই আমূল পরিবর্তন। এই দেখুন না, ফ্রান্সের কয়েকটা জেলায় প্রচুর ফল হয়েছে। তার মধ্যে এত বেশী 'পিচ' ফল হয়েছে যে, এখানকার ব্যবসায়ীরা বেচতে বাজার পাচ্ছে না। কম দামে বেচবে না। বরং ফেলে দেবে বলে জানিয়েছে। এটা কি অবিচার নয়? ফ্রান্সে কত দরিদ্র রয়েছে, তাদের মধ্যে বিলিয়ে দাও নইলে আফ্রিকায় কত শিশু ফল খেতে পায় না, তাদের দিয়ে দাও। তা নয় নষ্ট করে ফেল। এরই নাম বুর্জোয়া ঘুণে ধরা সমাজ।

আমি চুপ করে ওদের কথা শুনছিলাম। ততক্ষণে প্যারিস ছাড়িয়ে গেছি। ওর্লি এয়ারপোর্টও ছাড়িয়ে গেছি। প্যারিস থেকে আমরা এখন প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে চলে এসেছি। সামনেই একটা ছোট গ্রাম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে গ্রাম। গ্রামের গীর্জার পাশেই আমাদের গাড়ী থামিয়ে একটা ছোট বাড়ীতে ঢুকলাম। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে, বাড়ীর ভেতরটা এত সুন্দর। বাড়ীর মালিক এক মহিলা। মহিলার বয়স বছর বত্রিশ হবে। তার স্বামী আর্টিস্ট, বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। বছর তের-চোদ্দর একটি মেয়ে এসে আমাদের নিয়ে গেল একতলার এক বিরাট ঘরে। সেখানে ছবির ছড়াছড়ি। পরে শুনলাম ভদ্রমহিলা এককালে ছিলেন শিল্পীর মডেল। মেয়েটি তারই তবে তার বর্তমান স্বামী ক্রোদের নয়। ভদ্রমহিলার চেহারার মধ্যে এখনও মডেল-মডেল ভাব ফুটে ওঠে। এককালে তিনি ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। যাই হোক এদের বাড়ীতে চেরি ফল খেতে খেতে ক্রোদের মুখে বিপ্লব কাহিনী শুনছিলাম। ক্রোদ বলছিল, প্যারিসে যা সম্ভব, এইসব গন্ডগ্রামে সম্ভব নয়। এরা এইসব বিপ্লব-টিপ্লবের ধার ধারে না। তবে হ্যাঁ, দরকার হলে ওরা খেতে দেবে, থাকতে দেবে, যদি দরকার হয়।

ওর মুখে বিপ্লবের কাহিনী শোনা শেষ না হতেই আবার গাড়ীতে উঠতে হল অনির্দিষ্ট জায়গার উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে আরও দশ কিলোমিটার দূরে এক নিঝুম ছোট্ট শহরে উপস্থিত হলাম। গাড়ী ঘোড়ার কোনো শব্দ নেই। বাগান থেকে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। ফাঁকা জায়গা বলে একটু ঠান্ডাও লাগছে। অপরিচিত এক বাড়ীতে ঢুকলাম। বাড়ীটা একেবারে নতুন। কিন্তু পুরোটাই কাঠের। বাড়ীর যিনি মালিক, তিনি বাড়ীর এঞ্জিনীয়ার, আর্কিটেক্ট ইত্যাদি। জাপানী প্রথায় বাড়ীটা বানিয়েছেন মঁঃ মোনে। মোনের বয়স বেশী নয়। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করেন। তার বাড়ীতেই ছাত্র-বিপ্লবীদের ঘরোয়া আড্ডা জমেছে। আড্ডায় জমায়েৎ তখন জনা পনর হবে। আমরা গিয়ে সংখ্যা আরও বাড়ালাম।

জঁ পিয়ের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে তার বৈপ্লবিক কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত হয়েছিল। ক্রেয়ার আমায় আলাপ করিয়ে দিলে উপস্থিত যুব ও প্রাক্তন বিপ্লবীদের সঙ্গে। গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হল। বাড়ীর গিন্নি ছুটলেন খাবার ও পানীয় আনতে। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল ক্রেয়ার।

মরিস ও ফ্রাঁসোয়াজ নিজে থেকেই এগিয়ে এলো আলাপ করতে। মরিস বলল, — জানেন এই ফ্রাঁসোয়াজ হল ক্যাপিটালিস্ট। এক আর্ট গ্যালারিতে চাকরী করে। লাখ-লাখ টাকার ছবি বেচে। আর আমি হলাম প্রোলেটারিয়েট আর্কিটেক্ট। বাড়ী বানানর নক্সা পরিকল্পনা সব করে দিই আমরা। কিন্তু বাড়ী করার মতন পয়সা থাকে না। এমন ক্যাপিটালিস্ট মেয়েকে কী বিয়ে করা চলে? এই জন্যেই ওকে আমি বিয়ে করব না।

ওর কথা শুনে ফ্রাঁসোয়াজ মুচকি হাসল। ফ্রাঁসোয়াজের মুচকি হাসি দেখে মরিসের বিপ্লব ঘটাবার বুদ্ধি গজগজ করতে লাগল। তা দেখে আমার ভয়

বাড়ল। কি জানি ওই সুন্দর ড্রইংরুমে আবার বিপ্লবের তাণ্ডব নৃত্য শুরু না হয়। মরিসের বক্তব্য—

মে-জুন মাসে ছাত্র বিপ্লবের সময়ে যখন পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যূহ রচিত হয়েছিল তখন সেই রাস্তায় আলাপ হয় ফ্রাঁসোয়াজের সংগে। ফ্রাঁসোয়াজ ক্যাপিটালিস্ট হতে পারে কিন্তু তরুণী মন ছাত্র বিপ্লবে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে সম্মুখ সমরে। সেই থেকে আলাপ। সেই থেকে প্রণয়। ভালবাসাও বলতে পারেন।

আমাদের আলোচনাটা যখন বেশ ঘন হয়ে জমে উঠেছিল তখন এসে জোটে মার্তিন নামে একটি মেয়ে। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী। ছাত্র বিপ্লবের সময়ে প্রায় পনেরো দিন সে কাটিয়েছিল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভবন 'সরবন'-এ। 'সরবন' তখন ছাত্রদের অধিকারে। সেখানে ছাত্ররা পড়াশোনা, বক্তৃতা, গান-বাজনা থেকে আরম্ভ করে খাওয়া-শোয়াও করেছে। সে এক এলাহি ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার ছাত্রদের সংগে পুলিশের সংঘর্ষ প্রায়ই হত। যারা আহত হত তাদের আনা হত 'সরবন' ভবনে। সেখানে মেডিক্যাল ছাত্র-ছাত্রী ও ডাক্তাররা চিকিৎসা করত। মার্তিন ছিল সেই চিকিৎসক দলে।

মার্তিন আমায় বলছিল, দেখছেন না এখানে কেমন জোড়া-জোড়া বসে আছে বা শুয়ে আছে। এদের অধিকাংশই বিপ্লব করতে গিয়ে ভালবাসার বন্ধনে আটকে যায়। ছেলেদের সংগে মেয়েরাও লড়াই-এর মাঠে নেমেছিল। দেখেছি কোন ছেলে আহত হয়ে ফিরেছে, তার বান্ধবী তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে কাতর করে তুলেছে।

আমি বললাম—সেদিন আর্ট কলেজে যাবার সময়ে সেন্ নদী পার হওয়ার সময়ে পুলের নিচে দেয়ালে লেখা দেখলাম বড় বড় হরফে, যতই প্রেম করি ততই বিপ্লব করার ইচ্ছা জাগে। যতই বিপ্লব করি ততই প্রেম করার ইচ্ছা জাগে। লেখাগুলো দেখে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। প্রেম করে আবার বিপ্লব হয় কি করে!

মার্তিন আমায় জানাল যা, তা নয়। ত্র বিপ্লবের সময়ে সরবন ভবনে যেমন অনেক ভাল জিনিস দেখে আমার মনে গেঁথে দিয়েছে তেমনি অনেক দৃশ্য দেখে ণায় মনকে ভরে তুলেছে। একদল অবিবাহিত ছাত্রছাত্রীর শিশু সন্তানদের দেখা-শোনার ভার নিয়েছিল ফ্রাঁসোয়াজ নামে একটি মেয়ে। সে নিজের হাতে তাদের ওয়ান থেকে চান করান এমন কি সে নিজে বাড়ীতে গিয়ে শিশুদের জামা-কাপড় কেচে আনত। সে মেয়েটা সত্যিকারের বিপ্লবী কর্মী কিন্তু অনেক ছেলেদের দেখেছি তারা বখামী করত। একদিন রাতে বড় হল ঘরে বেঞ্চির ওপর সবে শুয়েছি, একটু দূরে একটা মেয়ে বলে উঠল, দিন পনেরো হল সঙ্গম হয় নি। আজ হলে ভাল হত। খানিক বাদে একটা ছেলে এসে সেই মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গেল হলঘরের কোণায়। কিছুক্ষণ পরে একটা অস্ফুট শব্দ ভেসে এলো কোণা থেকে।

মার্তিন আরও বলে চলল — ছাত্র বিপ্লবের সময় আমি জাতপাত, শ্রেণী-সমাজের কোন বাদ-বিচার দেখি নি। সব ছেলে-মেয়েই যেন কোন সেনা বাহিনীর সৈনিক। কে কোন সমাজ থেকে এসেছে, কোন দেশ থেকে এ নিয়ে কোন আলোচনা করতে কাউকে দেখি নি। একটা সাম্যবাদ ভাব বজায় ছিল সর্বত্র। কিছু বখাটে ছেলে বাদে অধিকাংশই আদর্শবাদ নিয়ে আলোচনা করেছে। তারা ভেবেছে কি করে নতুন এবং সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা যায়। মেয়েরা বেশী সংখ্যায় এগিয়ে আসে এই বিপ্লবে এই জন্যে যে, মেয়েরা সাধারণত অনেক দিক দিয়েই বঞ্চিত। সমাজ-রাষ্ট্র ছাড়া পার্থিব অনেক ব্যাপারে তারা পুরুষদের চেয়ে বঞ্চিত বলেই তারা এই বিপ্লবে সাড়া দেয়। তারা চায় পুরুষের মতনই সত্যিকারের সমান অধিকার। যেমন ধরুন ক্যাথলিক সমাজে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ এখনও ধর্মীয় মতে বেআইনী। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই নিয়মের পরিবর্তন দরকার। মেয়েরা এই সব কারণে চায় সত্যিকারের স্বাধীনতা। তাই তারা বিপ্লবী।

সেদিন বৈপ্লবিক আলোচনায় রাত ভোর হবার জোগাড় হয়েছিল। পরের দিন অফিস আছে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের সে জমাট আড্ডা ত্যাগ করতে হল। আমরা যেমন গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলাম, তেমনি ড্রইং রুমের কোণে কোণে প্রেমিকের দল গুঞ্জন করছিল। তাদের তেমন ইচ্ছে ছিল না অমন আনন্দ-মুখর সময়টা নষ্ট করে উঠে পড়তে। গৃহস্বামী মুখে না বললেও তার ইসারা-ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল যে, রাত অনেক হয়েছে। কাল অফিস। সুতরাং সুবোধ বালকের মতন বাড়ী যাও।

পরের দিন গেছি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক পাড়ায়। এ পাড়ায় অনেকগুলো বিজ্ঞান পরিষদ। এখানেই আমার পুরোনো ইন্সটিট্যুট অফ জিওগ্রাফি। কৌতূহল সামলাতে না পেরে উঁকি দেওয়ার পরিবর্তে আমার পুরোনো ইন্সটিট্যুটে ঢুকে পড়লাম। ভেতরে গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড। ছাত্ররা ইন্সটিট্যুট দখল করে বসে আছে। দেয়ালে দেয়ালে প্রাচীর-পত্র। বিপ্লবের বাণী। আমার এক পুরোনো সহপাঠিকে দেখলাম। সে আমায় দেখে চেঁচিয়ে উঠল, এখানে কি করছিস? আমি বললাম, তোদের বিপ্লব দেখতে এসেছি।

চল্, চল, বাইরে চল্। কাফেতে বসা যাক।

আমার বন্ধু এদুয়ার এখন লেকচারার। প্যারিস থেকে সাত কিলোমিটার দূরে নানত্যার নামে এক শহরতলীর ছোট্ট শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ভবন খোলা হয়েছে বছর তিনেক হল। সেই নানত্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে পড়ায় সে। এদুয়ার বলে—কাল আসিস আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেখবি বিপ্লব, কাকে বলে। ওখানেই তো ছাত্র অসন্তোষ প্রথমে শুরু হয়। ওখানকার ছাত্ররা গণ্ডগোল করলে পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ বাধে। সেই বিরোধের আগুন যখন প্যারিসে ছড়িয়ে পড়ে তখনই তো ছাত্র বিপ্লবের আগুন জ্বলে। ছাত্ররা শুধু কোন রাজনৈতিক দলের উস্কানীতে তেতে ওঠে নি। ওদের অভাব-অভিযোগ জমা হয়েছে অনেক কাল ধরে। একালের ছাত্ররা সবাই বখাটে নয়। অনেকে প্রচুর পড়াশোনা করে। তারা মনে করে যে, এভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। এ যুগের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। তাছাড়া শিক্ষা লাভ করে, ডিগ্রী নিলেই তো চলবে না। তাদের চাই উপযুক্ত কর্মসংস্থান। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও কর্মসংস্থান নিয়েই তো সরকারের সঙ্গে ওদের বিরোধ। বিদ্রোহী ছাত্ররা বলছে যে, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে শিক্ষা সংস্কার ও কর্মসংস্থানের সুরাহা হওয়া সম্ভব নয়। তাই চাই বিপ্লব। কাল বরং আসিস নানত্যার-এ, সেখানে তুই নিজের চোখে দেখবি আর যে সব ছাত্রছাত্রী বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দোব।

পরের দিন দুপুরে গেলাম নানত্যারে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে। বাড়ীর ভেতরে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। মাও সে-তুং, ট্রটস্কি,

চে গুয়েভারা, ফিডেল কাস্ট্রো, হার্বার্ট মার্কিউজ ইত্যাদির বাণী লেপটে আছে চারধারে। তাদের ছবিও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে পৌঁছে আমার আরও পুরোনো জনাচারেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। তারা এখন অধ্যাপক। একটা হলঘরে দেখলাম মিটিং হচ্ছে। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের মিটিং। সে জানাল, ও হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষক মিলিত মিটিং।

সভাকক্ষে ঘন্টাখানেক বসে মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলাম ওদের আলোচনা। ছাত্ররা যা বলছে শিক্ষকরা তা মন দিয়ে শুনছে। আবার শিক্ষকরা যা বলছে ছাত্ররাও তা মন দিয়ে শুনছে। পরস্পরের মধ্যে রয়েছে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য ভাব। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এখনই হয়ত সম্ভব নয়। তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলবে না। যে সব বিভাগে ছাত্র সংখ্যা বেশী কিন্তু অধ্যাপক সংখ্যা কম সে সব বিভাগে নতুন অধ্যাপক আনতে হবে। এমন অনেক জিনিস নিয়ে ছাত্রদের অনর্থক সময় নষ্ট করতে হয় যে, সেই বিষয় অনায়াসে সংক্ষেপে সারা চলে। তাহলে সময় বাঁচবে। তারপর ডিগ্রী নিয়ে যেন বসে থাকতে না হয় সে দিকে দৃষ্টি দেবে কে? সমাজ না রাষ্ট্র। এই নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হয়। সে আলোচনা শেষ হতে ঘণ্টা পাঁচেক লেগেছিল। আমি ততক্ষণে দুজন ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে বিপ্লবী অবরুদ্ধ নানত্যার বিশ্ববিদ্যালয় ভবন দেখতে বেরিয়েছি। বিপ্লবী ছাত্র-ছাত্রীরা আমায় বিভিন্ন বিভাগে ঘুরিয়ে দেখাল। প্রায় হলে চলেছে তর্কযুদ্ধ ও বৈঠক। সবার মুখে গাম্ভীর্যের ভাব। নানত্যার তখনও ছাত্রদের অধিকারে। অধ্যাপকরা ওই বিপ্লবের মধ্যে ছাত্রদের সঙ্গে মিলেমিশে পরীক্ষাও নিচ্ছে দেখলাম। ক্লাশ নেই বটে কিন্তু পরীক্ষা বন্ধ নেই।

একটি ছাত্র বলছিল, একালের তরুণ সমাজকে সরকার ও সমাজ একেবারে পাত্তাই দিতে চায় না। আমাদের যে অভাব-অভিযোগ থাকতে পারে তা ওরা ভাবে না মোটেই। অন্যায়-অবিচারের সীমা থাকা চাই। তার বাইরে গেলেই বিদ্রোহ। হলও তাই। দেখুন না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশী। তাদের অনেকেই বুর্জোয়া পরিবারের। অনেকে বেশ ধনী ঘরের। এ সব মেয়েরাও বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। এটা শুধু রাজনৈতিক ব্যাপার নয়। বামপন্থী দল বা কম্যুনিস্টরা প্রথমে আমাদের পাত্তা দিতে চায় নি। কারখানার শ্রমিকরাও ধর্মঘটের কথা ভাবে নি। তরুণ শ্রমিকরা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে। তারপর তাদের দেখাদেখি ধর্মঘটে যোগ দেয় বয়স্ক শ্রমিক। তারপর এগিয়ে আসে বামপন্থী দল ও কম্যুনিস্টরা। আগে আসে নি। নানত্যার-এর সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমে আলোচনা বৈঠক ডেকে ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করে গত বছরে। তারপর এ বছরের গোড়ায়। তাদের আলোচনা বৈঠকের কথা যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন সবাই জানাল যে সবাই মিলে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাবে যাতে তাদের দাবী বিবেচনা করা হয়। কর্তৃপক্ষ ওসব না করে পুলিশ ডাকে। ব্যস তারপর লড়াই বেধে যায়। একালের ছাত্র সমাজকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে কিছু করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রীক পরিবর্তন চাই। নইলে অসম্ভব। একথা বলেছেন আমেরিকান দার্শনিক হার্বার্ট মারকিউজ। মারকিউজের বই-পত্তর সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের অনেক সাহায্য করেছে।

অবশ্য চে গুয়েভারা, ফিডেল কাস্ট্রো, মাও সে-তুং, এদের বইপত্তর তো আছেই, তাছাড়া বেরুচ্ছে বামপন্থী নেতাদের বই-পত্তর।

হার্বার্ট মারকিউজ-এর জন্ম হয় ১৮৯৮ সালে বার্লিনে এক সম্ভ্রান্ত ইহুদী পরিবারে। ছাত্রাবস্থায় মাত্র কুড়ি বছর বয়সে জার্মান সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯১৮ সালে কার্ল লাইবনিখটের হত্যার পর তিনি সোস্যালিস্ট পার্টি ছেড়ে দিয়ে বার্লিন ত্যাগ করে দক্ষিণ জার্মানীতে চলে যান। তখন জার্মানীর রাজনৈতিক আকাশ পরিচ্ছন্ন নয়। ১৯২৭ সালে জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে ওদের পত্রিকা 'গেজেলশাফট'-এর দর্শন বিভাগের সম্পাদনা করেন। এই সময়ে তিনি অধ্যয়নও করছিলেন। প্রখ্যাত দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারের অধীনে গবেষণা করেন হেগেল দর্শন সম্পর্কে। তার ওপর তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী পান ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

এর কিছুকাল পরেই প্রবেশ হল হিটলারের। হিটলারী অত্যাচার শুরু হতেই মারকিউজ জার্মানী ত্যাগ করে কিছু দিন কাটালেন সুইজারল্যাণ্ডে আর প্যারিসে। এর মধ্যে তিনি কয়েকবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও গেছেন। ১৯৩৪ সালে প্যারিসে এসে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 'একোল নরমাল সুপিরিয়র' পরিষদে দর্শন পড়াতে শুরু করেন। এই সময়ে তিনি রাষ্ট্র দর্শনের ওপর লিখতে শুরু করেন। ইউরোপের আকাশ তখন প্রাক-যুদ্ধকালীন সংকটে ছেয়ে ফেলেছে। তাই ১৯৩৬ সালে মারকিউজ ইউরোপ ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানে প্রথমে গিয়ে নিউইয়র্ক ও পরে শিকাগো ইত্যাদি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। বছর কয়েক ধরে তিনি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সান ডিয়াগো অঞ্চলে পড়াচ্ছেন ও সেখানেই বাস করছেন। প্রকৃতির পূজারী মারকিউজ হৈ-হট্টগোল একেবারেই পছন্দ করেন না।

তিনি বলেন যে, একালের শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী সমাজ একনায়কত্বের আরেক নাম। সবাই ভাবে বেশ আছে। পরিবর্তন দরকার এটা সবাই বোঝে কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে বলতে সাহস করে না। একালের সমাজ ও রাষ্ট্রের গলদ কোথায় এবং সে সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেছেন তার বই 'ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান' (১৯৬৪)। তারও আগে আরও কয়েকটা বই লিখেছেন যেমন, 'সোভিয়েট মার্কস্-ইজম' (১৯৫২) ও 'অ্যারোস অ্যাণ্ড ফিলসফি' (১৯৫৫)।

মারকিউজ তাঁর নতুন দর্শনে মার্কস ও ফ্রয়েডের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কার্ল মার্কস-এর আমলে একশ বছর আগে সমাজের যে অবস্থা ছিল সে অনুযায়ী তিনি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখন সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা ও অর্থনীতিতে অনেক উন্নতি হয়েছে। শিল্পোন্নত দেশে উন্নত সমাজের একটু দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে নরককুণ্ড। একালের শ্রমিকরা হয়ত গাড়ী চড়েন কিন্তু তাঁরা শিক্ষিত সমাজেই রয়ে গেলেন। তাঁদের কোন পরিবর্তন হল না। বরং সমাজে কতিপয় ব্যক্তির বিলাসিতা ও বিলাস দ্রব্যের জন্যে একালের শ্রমিকরা পণ্য উৎপন্ন করে চলেছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কিম্বা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র কোথাও সত্যিকারের স্বাধীনতা নেই। দুই শিবিরের অত্যাধিক প্রচার কার্যের শিকার হয়েছে একালের মানুষ। এই সমাজের পরিবর্তন চাই। তার জন্যে প্রয়োজন হলে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করতে হলেও তাই করা উচিত।

ফ্রয়েডকে তিনি ব্যবহার করেছেন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে। মনোবিজ্ঞানী বা দার্শনিক হিসেবে নয়। তিনি বলেছেন যে একালের সমাজে যৌন স্বাধীনতা থাকা উচিত, যৌন সম্পর্কে একটু উদারনৈতিক নীতি অবলম্বন করা উচিত, উপরন্তু জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি-ব্যবস্থাও চালু করা উচিত।

হার্বার্ট মারকিউজের বইগুলো এখন শুধু প্যারিসে নয় ইউরোপের প্রায় সব রাজধানীতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

দার্শনিক হার্বার্ট মারকিউজ

দেশে বিদেশে

যুদ্ধবর্জন চুক্তির প্রস্তাব

স্বাধীনতার ২১তম বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লার মঞ্চ থেকে ভাষণ দেবার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পাকিস্থানের কাছে আবার একটি যুদ্ধবর্জন চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "শ্রীনেহরু ও শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী উভয়েই পাকিস্থানের সংগে যুদ্ধবর্জন চুক্তি স্বাক্ষর করতে চেয়েছিলেন। "আমি আবার পাকিস্থানের কাছে এই প্রস্তাব করছি এবং তাদের এটি বিবেচনা করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি।"

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, এ-ছাড়া ভারত বা পাকিস্থান কারো মঙ্গল হবে না। "দুর্ভাগ্যবশতঃ, পাকিস্থানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ পাকিস্থান বরাবরই আমাদের সীমান্তে উত্তেজনা বজায় রাখতে চেয়েছে।" এর ফলে পাকিস্থানকেও যেমন ভারতকেও তেমনি বাধ্য হয়েই প্রতিরক্ষার জন্যে খরচা বাড়িয়ে যেতে হচ্ছে। আর তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে বৈষয়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে।

উভয় দেশের নিজের স্বার্থেই, প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার, এবং এর জন্যে পাকিস্থান যদি চায় তাহলে ভারত তার সংগে যুদ্ধ-বর্জন চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর এই প্রস্তাব নিশ্চয়ই সদিচ্ছা থেকে উদ্ভূত এবং তা হয়ত সেইভাবেই গৃহীত হ'ত যদি না ইতিমধ্যে দু'টি ব্যাপার ঘটে যেত। একটি, পাকিস্থানের প্রতি রাশিয়ার অস্ত্র সাহায্য। প্রধানমন্ত্রী যদিও বলেছেন এই সাহায্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই, তবু এই ব্যাপার নিয়ে এদেশে যে হৈ-চৈ হয়ে গেল তার পর প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাব আতঙ্কিতের উক্তি বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়টি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিংয়ের একটি বক্তৃতা। ১৪ আগস্ট প্রতিরক্ষা দপ্তর সম্পর্কে সংসদের ঘরোয়া উপদেষ্টা কমিটির সভায় শ্রীসিং মন্তব্য করেন যে, চীন এবং পাকিস্থানের কাছ থেকে যে বিপদ রয়েছে সেটা আর নিছক গবেষণার বিষয় নয়, "অত্যন্ত বাস্তব ও গুরুতর।"

তিনি বলেন, পাকিস্থান চীন ও কয়েকটি 'নেটো' শক্তির কাছ থেকে বেশি বেশি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে তার যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি সে এই-ভাবে পুষিয়ে নিতে চায়। একই সংগে পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারও চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই বিশ্লেষণের পরের দিনই প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে যুদ্ধ-বর্জন চুক্তির প্রস্তাব করায় (যে প্রস্তাব পাকিস্থান অতীতে কয়েকবার প্রত্যাখ্যান করেছে) সদিচ্ছার চাইতে এর আতঙ্কের দিকটাই সবচেয়ে প্রথমে লোকের চোখে পড়বে। অন্তত তা যে পাকিস্থানের মন গলানো দূরে থাকুক তার মনোভাব আরো কঠিন করে তুলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এখন রুশ, চীন ও মার্কিন এই তিন সূত্র থেকে সে অস্ত্র সম্ভার পাচ্ছে।

স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রীদয়াভাই প্যাটেল রাজ্যসভায় যে মন্তব্য করেছেন আমরাও সেই মন্তব্যই করতে চাই : এই প্রস্তাবের পেছনে সদিচ্ছা যত গভীরই থাকুক, এই সময়ে এটা করা ঠিক হয়নি।

বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা এবং এশিয়া

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যাকে এশিয়ার উন্নয়নের কাজে কিভাবে আরো ভালোভাবে লাগানো যায় সে সম্পর্কে একটি সম্মেলন ডাকা হয়েছিল নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংগঠনের উদ্যোগে। বারো দিনের ঐ সম্মেলনে ২৬টি দেশ যোগ দিয়েছিল।

গত ১২ আগস্ট সম্মেলন শেষ হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে ইউনেস্কোর ডিরেক্টর-জেনারেল ম' র‍্যনে মাহো বারোদিনের আলোচনার ভিত্তিতে যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় সেগুলি ব্যাখ্যা করেন।

ম' মাহো বলেন, এশিয়ার অনেক দেশই আজকে এমন একটা স্তরে এসেছে যেখানে তারা সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানকে প্রোথিত করার জন্যে উৎসুক এবং করতে সক্ষম। এমন কি তার উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতি ঘটাতেও ইচ্ছুক।

উন্নয়নের কাজে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করবার আগে যে সর্তগুলি পূরণ করা দরকার সে সম্পর্কেও প্রতিনিধিগণ একমত হয়েছেন। এই সর্তগুলিই সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যা সংক্রান্ত।

এটাও সকলে অনুভব করেন যে, উন্নয়ন-মুখী কারিগরী বিদ্যা এমন হওয়া উচিত যাতে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও সহজে তা ব্যবহার করতে পারে। এজন্যে একটা "কার্যকর সাক্ষরতা" অভিযান চালানোর পক্ষে সকলে রায় দেন।

একটি জাতীয় বিজ্ঞান নীতি রচনার ওপরেও জোর দেওয়া হয় যা অগ্রাধিকার ও প্রয়োগের সম্ভাব্যতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

কয়েকজন বক্তা সম্মেলনে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, যদি বিজ্ঞান সমাজ-দেহে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ না করে এবং যদি বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষকে একই সংগে প্রভাবিত না করে তাহ'লে "বৈপরীত্য মূলক অবস্থার" সৃষ্টি হবে। এটাও সকলেই স্বীকার করেন।

আরেকটি সর্বসম্মত অভিমত হ'ল, উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রদান। ম' মাহো বলেন, ইউনেস্কোর অধীনে এই কাজের জন্যে কতগুলি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু টাকার অভাবে ভালোভাবে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ম' মাহো বলেন, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার প্রসারের জন্যে তিনটি স্তরে সহ-যোগিতা বিস্তৃত হওয়া উচিত—জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক।

তিনি জানান, সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সামনে পেশ করা হবে এবং বিভিন্ন কমিশনের মাধ্যমে সেগুলি রূপায়ণের চেষ্টা করা হবে।

চেক-পূর্ব জার্মাণ আলোচনা

ব্রাতিস্লাভা ঘোষণার পর মস্কো-চেক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আপাতত অবসান হ'লেও পূর্ব জার্মানীর সংগে চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্পর্ক কিছুটা ধূমায়িত হয়ে উঠেছে।

এর কারণ, খুব সংক্ষেপে, এই : পূর্ব জার্মান সরকারের আশংকা চেকোশ্লোভা-কিয়ায় গণতন্ত্রীকরণের অভিযান যদি চলতেই থাকে, যদি সংবাদপত্রের, বক্তব্যের ও জমা-য়েতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে তার প্রভাব পূর্ব জার্মানীকে বিশেষভাবে স্পর্শ করবে। কারণ, পূর্ব জার্মানীতে দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে একটা বিক্ষুব্ধ জনমত ইতিমধ্যেই রয়েছে।

এই বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যে পূর্ব-জার্মানীর কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মিঃ ওয়াল্টার উলব্রিখট চেক পার্টি নেতা আলেকজান্ডার ডুবচেকের সংগে কার্লোভি ভারিতে আলোচনায় মিলিত হন। উলব্রিখট এটা পরিষ্কার জানতে চেয়েছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়া আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে নিজের পথ নিজে বেছে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিনা। মিঃ ডুবচেক পরিষ্কার-ভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

এদিকে পশ্চিম জার্মানীর ফ্রী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা ওয়াল্টার শীলের প্রাগ সফর নিয়েও মিঃ উলব্রিখট উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মিঃ শীল গত মাসে চেকোশ্লোভাকিয়া সফরে গিয়েছিলেন। মিঃ উলব্রিখটের আশংকা চেক সরকার পশ্চিম জার্মানীর সংগে একটা বোঝা-পড়ায় আসতে চান। মিঃ উলব্রিখট তাঁর আলোচনায় এই প্রসংগ উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মিঃ ডুবচেক তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারেননি।

প্রকৃতপক্ষে গোটা বৈঠকে চেক প্রতিনিধিদল এমন বিষয়ের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন যা চেক ব্যাপারে পূর্ব-জার্মানীর হস্তক্ষেপ সূচিত করবে না। মিঃ উলব্রিখটকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনেই কার্লোভি ভারি থেকে ফিরে যেতে হয়েছে। এমনকি ব্রাতিস্লাভা ঘোষণা সম্পর্কেও দুপক্ষ একমত হ'তে পারেননি। উলব্রিখট মনে করেন. এই ঘোষণায় দ্বারা স্বাক্ষরকারী সবগুলি দেশের ওপরেই (সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া) কম্যুনিস্ট শিবিরের সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু মিঃ ডুবচেক মনে করেন, এর দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার নিজের পথে সমাজবাদের যাবার অধিকার স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার একুশ বছর পরে

গত দুই দশকে স্বাধীন ভারতবর্ষ তার বৈষয়িক উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছে? স্বাধীনতা লাভের ২১ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে স্বভাবতই গত সপ্তাহে দেশের মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। খাদ্যাভাব, মন্দা ও বেকারির তাড়নায় তাড়িত মানুষ নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে হয়ত প্রশ্নটির বিশেষ আশাব্যঞ্জক উত্তর পান নি। তুলনামূলক পরিসংখ্যান বিচারেও একথা বলা যায় না যে, বৈষয়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, দেশবাসীদের জীবনের মান উন্নত করতে, ভারতবর্ষ আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে পাকিস্থানে মাথাপিছু অর্থনৈতিক বিকাশের গড় বার্ষিক হার ছিল ২·৯ শতাংশ আর সে স্থানে ভারতবর্ষের হার (১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে) ছিল মাত্র শতকরা ১·৪। ব্রাজিলে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে মাথাপিছু অর্থনৈতিক বিকাশের গড় বার্ষিক হার ছিল শতকরা ২·৮, একই সময়ে জাপানের হার ছিল ৯·১ শতাংশ। ১৯৬২-৬৩ সালের যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় ঐ বছর পাকিস্থানে মাথাপিছু খাদ্যের যোগান ছিল ২০৮০ ক্যালরি আর ১৯৬১-৬২ সালে ভারতীয়দের জন্য মাথাপিছু খাদ্যের যোগান ছিল মাত্র ২০০০ ক্যালরি।

এই সব ব্যর্থতার জন্যই ভারতবর্ষের বৈষয়িক অগ্রগতির সাফল্যের দিকগুলি স্বাধীনতার ২১ বৎসর পূর্তির দিনে বিশেষ নজরে আসছে না। কিন্তু সতর্ক পর্যবেক্ষকরা সাফল্যের দিকগুলিও লক্ষ্য করেছেন। এমনি একজন পর্যবেক্ষক হচ্ছেন আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজির অর্থনীতির অধ্যাপক ম্যাকস এফ মিলিকাম। তিনি গত এপ্রিল মাসের "ফরেন অ্যাফেয়ার্স" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের মধ্যে ভারতীয় অগ্রগতির বৈশিষ্ট-

গুলি অল্প কথায় খুব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সেই প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

১৯৫১ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় বিকাশের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, ভারতবর্ষের কৌশল মোটামুটি সফল হয়েছে। কৃষির উৎপাদন গড়ে শতকরা ৩ হারে বেড়েছে। খাদ্যশস্যের ফলন বেড়ে প্রায় দেড়গুণ হয়েছে (১৯৬৪-৬৫ সালে মোট ফলন হয়েছে ৮ কোটি ৯০ লক্ষ টন)। সেই তুলনায় বৃটিশ ভারতে (যার আকার আজকের ভারতবর্ষের চেয়ে বড় ছিল) শতাব্দীর প্রথমার্ধে কার্যত একটা স্তরে স্থির হয়েছিল। (বিঘা পিছু) ফলন বৃদ্ধির হার হতাশাজনক। মোট ফলনে যে বৃদ্ধি হয়েছে তার একটা বড় অংশই হয়েছে চাষের জমি বাড়াবার ফলে। চাষের জমি বাড়াবার সম্ভাবনা এখন প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কৃষি নীতি সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ না হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষি প্রথম অর্ধ শতাব্দীর ধারাকে বদলে দিতে সমর্থ হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কৃষির অগ্রগতির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে কিছু বেশী রাখা সম্ভব হয়েছে।

শিল্পে সাফল্য আরও অনেক বেশী নাটকীয়। চোদ্দ বছরে শিল্পে উৎপাদনের সূচক সংখ্যা বেড়ে আড়াই গুণ হয়েছে। ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বেড়েছে মূলধনী পণ্য ও মধ্যবর্তী পণ্যের চেয়ে কম হারে। কয়লার উৎপাদন বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে, ইস্পাতের উৎপাদন বেড়ে ১৫ লক্ষ টনের জায়গায় ৬০ লক্ষ টন হয়েছে, বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বেড়ে ছয়গুণ হয়েছে এবং কার্যত একেবারে শূন্য থেকে একটা সমৃদ্ধিশালী যন্ত্রশিল্প গড়ে তোলা হয়েছে। ভোগ্য-পণ্যের ক্ষেত্রে সাইকেল ও সেলাই কলের চাহিদা ১৯৬৫ সালের মধ্যে পুরোপুরি-ভাবে দেশের ভিতরকার উৎপাদন থেকেই মেটান সম্ভব হয়েছে। অথচ আলোচ্য সময়ের আগে এই চাহিদার অনেকখানিই মেটাতে হত আমদানীর দ্বারা। এই সমস্তই করা হয়েছে একটা আর্থিক স্থায়িত্বের মধ্যে—যা একটা অল্পোন্নত দেশের কাছে খুবই অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে মূল্যমান অনেকখানি পড়ে গিয়েছিল। অথচ ঐ সময়টাই ছিল আমাদের পক্ষে কোরিয়ার যুদ্ধজাত মুদ্রাস্ফীতির কাল। চোদ্দ বছরে ভারতবর্ষে পাইকারী মূল্য বেড়েছে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ। ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এবং এই যুদ্ধের ফলে দেশরক্ষার ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশী হওয়া সত্ত্বেও এটা সম্ভব হয়েছে। সরকারী ঘাটতি খুব নিম্নস্তরে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল, কেন্দ্র, রাজ্যগুলি ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি থেকে যে ট্যাকস সংগ্রহ করা হয় তার পরিমাণ আলোচ্য সময়ের সূচনায় যে কোন মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ ছিল সেখানে ঐ সময়ের শেষে সেই ট্যাকসের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪ ভাগ। সঞ্চয় ও লগ্নীর পরিমাণ জাতীয় আয়ের একটা অংশ থেকে তিন বা চার শতাংশ বেড়েছে।

এই রেকর্ডে বৈদেশিক বাণিজ্য একটি দুর্বল স্থান। প্রথম দুই পরিকল্পনার কালে রপ্তানী বাবদ আয় একটা প্রায় অপরিবর্তিত স্তরের উপরে-নীচে ওঠা-নামা করেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার চার বছর ধরে বছরে ৫ শতাংশ হারে যে রপ্তানী বৃদ্ধি হয়েছে সেটা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং সেটাও অংশতঃ সম্ভবপর হয়েছে পূর্ব ইয়োরোপে রপ্তানী দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে। উন্নয়নের প্রয়োজনের চাপে আমদানী বেড়েছে আরও দ্রুত হারে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে রপ্তানীর চেয়ে আমদানী গড়ে ৫০ শতাংশ (মূল্যের হিসাবে) বেশী হয়েছে। এই সমগ্র সময়ের মধ্যে রপ্তানী মারফৎ আয়ের দ্বারা সেইসব আমদানীর খরচ যোগান সম্ভব হয় নি যেগুলি অর্থনীতিকে চালু রাখার জন্য কাঁচা মাল ও ভোগ্যপণ্য বাবদ আমদানী করতে হয়। বহির্বাণিজ্যে যে ঘাটতি হয়েছে তার প্রায় সবটাই কারখানা সম্প্রসারণ ও যন্ত্রপাতির দরুণ। যদিও অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ বিলাসদ্রব্য ও অপ্রয়োজনীয় ভোগের দ্রব্যাদি খুব নিম্নস্তরে সীমাবদ্ধ রাখতে সমর্থ হয়েছে।

উন্নয়নের পরিকল্পনাকাররা আমদানীর প্রয়োজন ক্রমাগত ঘাটতি করে দেখিয়েছেন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়াতেই বৈদেশিক মুদ্রার গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। এই সঙ্কটের পরিণামে আম-দানী লাইসেন্স ও বৈদেশিক বিনিময়মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের একটা বিস্তারিত ও কতক পরিমাণে জটিল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতিটা এই সময়ের গোড়ার দিকে মেটান হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা। এই সময়ের শেষের দিকে বৈদেশিক মুদ্রার এই সঞ্চয় অনেকটা ফুরিয়ে এলে ঐ ঘাটতি মেটান হয়েছিল ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা। এই বৈদেশিক সাহায্যের অর্ধেকের কিছু বেশী এসেছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এবং বাকীটা এসেছে পশ্চিম ইউরোপ, সোভিয়েট ইউনিয়ন, জাপান ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে। এই সাহায্যের একটা মস্ত অংশই এসেছিল অপেক্ষাকৃত স্বল্প-মেয়াদের ঋণের আকারে। ১৯৬৫ সাল নাগাদ এই সকল ঋণের দরুণ সুদ ও আসল পরিশোধের বোঝাটা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছিল যেখানে মোট সাহায্য আর নীট সাহায্যের মধ্যে পার্থক্যটা বেশ বড় হয়ে উঠেছিল।

অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে, গোল-যোগপূর্ণ গত কয়েক বছরের আগে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য সমাজ-কল্যাণ ও শিল্পের খাতে লক্ষণীয় ছিল, বিশেষ করে মূলধনী দ্রব্য ও ভারী শিল্পে এই সাফল্য লক্ষণীয় ছিল। পরিকল্পনাকার এই সকল বিষয়ে অগ্রাধিকার আরোপ করেছিলেন। কৃষিতে ভারতের সাফল্য বেশ কতকটা হলেও যথেষ্ট নয়, আর্থিক পরিচালনায় সাফল্য প্রশংসনীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় ঘাটতি ক্রমশঃ যেভাবে বাড়ছে সেদিক থেকে ভারতের রেকর্ড হতাশাজনক। সামগ্রিক বিকাশের রেকর্ড যে কতখানি লক্ষণীয় সেটা প্রায়ই ভাল করে বোঝা হয় না। তবে একথাও অবশ্যই বলতে হবে যে, এই হার ভারতীয়দের নিজেদের দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে তুলনায় ও বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন থেকে মুক্ত হওয়ার দিক থেকে হতাশা-জনক।

কবিতার জন্য ॥ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

একদিন সমস্ত জীবন
দিয়েছি তোমাকে:
একদিন সমস্ত হৃদয়
তোমাকেই ডাকে।

আকাশে নক্ষত্র নীড়ে
বনে নদীতীরে
নির্মল নিখিলে
একদিন ছুঁয়েছিল হাত
যৌবন বলয়।

এখন সমস্ত ক্ষণ
হাড় অস্থি রক্তের ভিতরে
ভগ্ন প্রাসাদের শিলাপটে
বিলুপ্ত হৃদয় অন্বেষণ ।।

একজন মানুষ পেলে ॥

তুলসী মুখোপাধ্যায়

একজন মানুষের মতো মানুষ পেলে
আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দেব
কবিতা ছেড়ে ফুলের বাগান করব
কিংবা মন দেব বিবাহে
একজন মানুষের মতো মানুষ দেখলে
আমি ছুটে গিয়ে জানু পেতে বলব
প্রভু! আপনি!
এই দ্যাখুন, কোন্ মর্মের মন্ত্রকে
আমি রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে আছি
আপনার জন্য, কেবল আপনার জন্য প্রভু
গোটা পৃথিবী আমি হা-হা করে দৌড়িয়েছি
হৃৎপিণ্ড কাটিয়ে একেকটি শব্দে ডাক করেছি আপনাকে।

একজন মানুষের মতো মানুষ পেলে
আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দেব
কবিতা ছেড়ে যেমন খুশী বড় হয়ে বাঁচব।

ডস্যতস্য অথবা সূর্য্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পিজারোর 'কেন?' প্রশ্নের ভালোরকম জবাবই দিয়েছে সোরাবিয়া।

গানাদোর শয়তানীর অকাট্য প্রমাণ হিসেবে জানিয়েছে যে গানাদো আসলে পলাতক এক ক্রীতদাস। মেক্সিকো থেকে স্পেনের যাত্রী এক জাহাজে হিড্যালগো সেজে যাবার সময় সোরাবিয়া তার ছদ্ম পরিচয় ধরে ফেলার পর থেকেই সে নিরুদ্দেশ। পানামাতে একবার ধরা পড়তে পড়তে সে পালিয়ে বেঁচেছে। এসপানিয়ার ফেরারী গোলাম বলেই সব এসপানিওল-এর ওপর তার রাগ। সুযোগ পেলেই সে তাই এসপানিওলদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। শয়তানের সাকরেদটা বেদে বলে নিজের পরিচয় দিলেও সত্যিই জাত-বেদে নয়। সোরাবিয়া বেদেদের বড় ঘাঁটি ত্রিয়ানায় খোঁজ নিয়ে তা জেনেছে। কোথা থেকে তলোয়ারের খেলা সে অবশ্য আশ্চর্য-রকম শিখেছে। খোদ শয়তান-ই তাকে শিখিয়েছে হয়ত। নইলে তলোয়ারের সূক্ষ্ম কলার অমন আশ্চর্য কেরামতি মানুষের হাতে সম্ভব নয়। ইচ্ছে করলে সে যুঝি খেলতে খেলতে তলোয়ারের ডগায় শত্রুর মুখে নিজের নামও লিখে দিতে পারে। আর তলোয়ারের কাজ থেকেই সোরাবিয়া তাকে চিনেছে।

গানাদো যত বড় ওস্তাদই হোক সাপের ওপরেও সেউল আছে। সোরাবিয়াকে বেকায়দার একবার পেয়ে সে হাত ফস্কে পালিয়েছিল। কিন্তু সুযোগের বার আর নয়। তলোয়ারের ডগায় নাম লেখার কসরং সোরাবিয়া সাধবার চেষ্টা করে নি, কিন্তু এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করার কেরামতিতে তার জুড়ি হয় দেখতে চায়।

পিজারো ধৈর্য ধরে এত সব আস্ফালন শুনেছেন তার কারণ মনে মনে তখনও তিনি বেশ একটু বিভ্রান্ত। গানাদো সম্বন্ধে কি ধারণা তিনি করবেন তা তখনো ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিসকে গণ্যমান্য হিড্যালগো বলেই তিনি অবশ্য ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এরকম লোকের কথাও একেবারে নির্বিচারে বিশ্বাস করা যায় কি? মার্কুইস-এরও ত ভুল হতে পারে!

মার্কুইসকে এর আগে পিজারো কখনো দেখেন নি। নামটাও কখনো শুনেছেন কিনা প্রথমে ঠিক মনে করতে পারেন নি। নাম না শোনা অবশ্য আশ্চর্য কিছু নয়। পিজারো ত আর কর্টেজ-এর মত নিজেই খানদানী ঘরের ছেলে নয়। আদি পরিচয় ত তাঁর শুয়োরের রাখাল। জারজ সন্তান যাকে বলে তাও। বড় ঘরোয়ানাদের কোনো খবরই তিনি রাখেন না।

মার্কুইস-এর চালচলন আর আত্মপরিচয় দেওয়া থেকেই পিজারো তাকে বিশ্বাস করেছেন। তা ছাড়া সেভিলে নেমে দেনার দায়ে বন্দী হবার পর সম্রাটের আদেশে মুক্ত হয়ে টোলাডোতে রাজদরবারে নিজের আর্জি পেশ করতে গিয়ে এইরকম একটা নাম যেন শুনেছিলেন বলে পরে মনে পড়েছে। টোলাডোর রাজদরবারে এইরকম নামের কেউ যেন তাঁর সেভিল-এ বন্দী থাকার কথা প্রথম জানিয়েছিল।

মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিসই সেই লোক কিনা পিজারো অবশ্য জিজ্ঞেস করেন নি। মার্কুইস হিসেবে সোরাবিয়া নিজের গরজেই তা চেপে গেছে।

মার্কুইস হিসেবে সমীহ করলেও তার সব কথা নির্ভুল বলে পিজারো যেমন মনে করেন নি তেমনি কতকগুলো ইঙ্গিত যে তার আশ্চর্যরকম মিলে গেছে তাও অস্বীকার করতে পারেন নি নিজের মনে।

গানাদোই আতাহুয়ালপার কাছ থেকে সোনার পাহাড় আদায় করবার ফন্দি ভেবে বার করেছিল ঠিকই কিন্তু তার পক্ষে সে সোনার এতটুকু বখরা দাবী না করা বেশ একটু অবিশ্বাস্য।

নিজের পরিচয় যা সে দিয়েছে তা সত্যি হলে সোনার লোভ এভাবে তার ত্যাগ করার কথা ত ভাবাই যায় না।

যদি কোনো কারণে সে মারা পড়ে থাকে ইতিমধ্যে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তাও ত একদিক দিয়ে অসম্ভব বলেই মনে হয়। অসুখে বিসুখে দুর্ঘটনায় কিংবা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে দু' একজন এসপানিওল সৈনিক মাঝে মাঝে মারা যায় না এমন নয়। কিন্তু তাদের মৃতদেহ ত গায়েব হয়ে যায় না এমন ভোজবাজিতে? নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে তা একেবারে গোপনও থাকে না সিপাই মহলে। তা জানাজানি হয়ে যায়ই কোনো না কোনো দলের মধ্যে। গানাদোর সঙ্গে কারুর সে রকম মারাত্মক কেন ছোটখাটো ঝগড়ার কথাও কেউ জানে না!

নিজেদের মধ্যে মারামারিতে না হয়ে এদেশের কারুর হাতে তার নিহত হওয়াও বিশ্বাসের অযোগ্য। এরকম ঘটনা এ পর্যন্ত ঘটেনি। রহস্যময় 'ভীরাকোচার' অবতারের কাছে যাদের চরম লাঞ্ছনা হয়েছে তারাও কেউ প্রাণে মারা যায় নি। গেলেও তাদের লাশগুলো অদৃশ্য হত না নিশ্চয়!

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে গানাদোর কাক্সামালকা থেকে অন্তর্ধানের পর থেকেই ভীরাকোচার অবতারের নামে যে উপদ্রব এসপানিওল সৈনিকদের ওপর হচ্ছিল তা একেবারে থেমে গেছে। একটা সেরকম ঘটনাও তার পর আর ঘটে নি।

মার্কুইস-এর সন্দেহ তাই একেবারে ভুল বলে উড়িয়ে দেবার নয়।

কিন্তু গানাদো সত্যিই যদি অমন সাংঘাতিক মানুষ হয় তাহলে এখন তার সন্ধান কি করে পাওয়া যাবে? কাক্সামালকা শহরে সে নেই এ শহর ছেড়ে কোথাও সে গেছে এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না।

মার্কুইসরূপী সোরাবিয়া এ রহস্যও ভেদ করেছে। নানারকম প্রশ্ন করে সে জেনেছে যে কাক্সামালকা থেকে একমাত্র সোনাবরদার দল ছাড়া বাইরে যাবার সুবিধে কেউ পায় নি। সোনাবরদার দলের সবাই পেরুর লোক। কিন্তু তাদের সাজ-পোশাক দেখবার পর এই ছদ্মবেশেই যে গানাদো সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে এ বিষয়ে মার্কুইস-এর আর সন্দেহ থাকে নি।

পিজারোকে নিজের ধারণার কথা এবার জোরের সঙ্গে জানিয়েছে মার্কুইস। পিজারোর কাছে ছোট একটা রিসালা নিয়ে কুজকো শহরে গিয়ে গানাদোকে ধরবার অনুমতিও সে আদায় করেছে।

পিজারো দোভাষী হিসাবে ফিলি-পিলিও আর এ রাজ্যের অভিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে হেরাদাকে মার্কুইস-এর সঙ্গে দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে ফিলিপিলিওর হাতে রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভমুকে নিজের শিলমোহর মারা আদেশও দিয়েছেন সোনাবরদার দলে যারা যারা আছে সকলকে মার্কুইস-এর হাতে সমর্পণ করবার জন্যে।

মার্কুইসরূপী সোরাবিয়া অত ব্যস্ত হয়ে তাই প্রথমে রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভমু-র খোঁজ করেছে।

তাঁকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত জন দুই অধস্তন পুরোহিতকে সে পাকড়াও করবার ব্যবস্থা করলে।

তারা নেহাৎ তাঁবেদার। সত্যি কিছুই জানে না। রাজপুরোহিত কয়েকদিন আগে খুব তাড়াহুড়ো করে সৌসা গেছেন এই খবরটুকুই তারা দিতে পারলে।

টাম্বেজ বন্দরে পা দেওয়ার পর থেকে কাক্সামালকা হয়ে কুজকো পর্যন্ত আসার মধ্যে মার্কুইসরূপী সোরাবিয়া এ রাজ্যের হালচাল যতখানি সম্ভব জেনে নিয়েছে।

সৌসা যে একটা কারাদুর্গ, কাক্সা-মালকায় যে বন্দী তারই বড় বৈমাত্র ভাই ভূতপূর্ব ইংকা হুয়াসকার যে সেখানে বন্দী হয়ে আছে সে খবর তার অজানা নয়।

ভিলিয়াক ভমুর শশব্যস্ত হয়ে সেখানে হঠাৎ যাওয়া বেশ একটু সন্দেহজনক মনে হল তার। রেইমির মত এ রাজ্যের প্রধান উৎসবের প্রথম লগ্নেও সেখান থেকে না এসে পৌঁছোনো আরো?

এর ভেতরেও সেই শয়তান গানাদোর কোনো কারসাজি থাকা অসম্ভব নয় বলেই তার সন্দেহ হল।

গানাদোকে অবিলম্বে খুঁজে বার করা তাই একান্ত দরকার। তাঁবেদার পুরোহিত-দের কাছে খবর নিয়ে যা সে জানল তাও বেশ একটু গোলমেলে।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভমু নিজেই নাকি এবারের সোনাবরদার দলের সকলকে বন্দী করে গেছেন।

শুধু তাদের একজনকে নাকি পাওয়া যায় নি।

কাকে পাওয়া যায় নি?

তাঁবেদার পুরোহিতরা তার নামধাম পরিচয় কিছু জানে না। শুধু রাজ-পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করবার সময় যারা তাকে দেখেছিল ও পরে কোরিকাঞ্চার অতিথিশালায় তাকে বন্দী করতে গেছল রাজপুরোহিতের আদেশে—তারা খানিকটা বর্ণনা দিতে পারল তার চেহারার।

সোরাবিয়ার পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট।

খোঁজ যার পাওয়া যায় নি সে যে গানাদো ছাড়া আর কেউ নয় এবিষয়ে সন্দেহ আর তার রইল না।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভমুও যে কোনো কারণেই হোক গানাদোর শত্রু হয়েছেন বুঝল সোরাবিয়া। এই কুজকো শহর থেকে রাজপুরোহিতের তীক্ষ্ণ সজাগ পাহারা এড়িয়ে তাহলে গানাদো গেল কোথায়!

আবার কাক্সামালকার দিকে সে যেতে পারে?

না, তা সম্ভব নয়। জোর গলায় জানালে চেলা পুরোহিতেরা।

তাহলে সৌসার দিকে?

না তাও নয়। কুজকো থেকে বার হবার প্রায় অগম্য যে পথ আছে তাও ভিলিয়াক ভমুর আদেশে এমনভাবে কড়া পাহারা দেওয়া হচ্ছে যে একটা মাছিরও সাধ্য নেই তার ভেতর দিয়ে গলে যাবার।

তাহলে গানাদো এই কুজকোতেই আছে নিশ্চয়।

তাও অসম্ভব। ভয়ে ভয়ে নিবেদন করলে কোরিকাঞ্চার তাঁবেদারেরা, এক এক করে এ শহরের প্রত্যেকটি মানুষের হিসেব নেওয়া হয়েছে, যার বাইরে থেকে তীর্থযাত্রী হিসাবে যারা এসেছে তাদেরও।

সে লোকটা কি তাহলে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবার মন্ত্র জানে!—তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করলে সোরাবিয়া।

তাই জানে বোধহয়। —এবারও সসম্ভ্রমে জানালে ছোট পুরোহিতেরা।

তাহলে হাওয়া শুষে নেবার মন্ত্র আমিও জানি।—হিংস্রভাবে বললে সোরাবিয়া।—একটা দরকারী কাজ আগে সেরে আসি তারপর গানাদোকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না আমি দেখছি।

সঙ্গী হেরাদাকে সে শুধু রিসালার অর্ধেক সওয়ার দিয়ে পাঠালে সৌসায় গিয়ে রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভমুর খবর নিতে।

কি দরকারী কাজটা সোরাবিয়া আগে সারতে চায় সেটা বোঝা গেল খানিক বাদেই।

কোরিকাঞ্চার ছোট মোহান্তদের সঙ্গে আলাপ সেরে ফিলিপিলিওকে সঙ্গে নিয়ে বাছাই জন পাঁচেক সওয়ার সেপাই নিয়ে সোরাবিয়া ব্যস্ত হয়ে ফিরে এল সূর্যবরণ প্রান্তরের মাঝখানে মৃত ইংকা হুয়াইনা কাপাকের শব-সভা যেখানে সাজানো হয়েছিল সেইখানে।

কিন্তু কোথায় সেখানে ইংকাশ্রেষ্ঠ হুয়াইনা কাপাকের শব-সভা। রেইমীর উৎসব গেছে পন্ড হয়ে। বেলা বেড়ে সূর্য তখন পুবের আকাশে অনেক ওপরে উঠে এসেছে। হানাদার এসপানিওলদের ভয়ে সমস্ত সূর্যবরণ প্রান্তরই ফাঁকা। হুয়াইনা কাপাকের শব-সভার কোনো চিহ্ন সেখানে নেই।

কোথায় গেল সে সব?—চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেছে সোরাবিয়া।

কি সব, কোথায় গেল?—বুঝেও না বোঝার ভান করেছে ফিলিপিলিও।

সেই সোনার সিংহাসন আর দামী দামী আসবাবপত্রগুলো যার একটা মড়াকে যার মাঝে বসিয়ে রেখেছিল।—এত করে বোঝাতে হবার জন্যেই মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছে সোরাবিয়ার।

সেগুলো যেখানকার সেখানেই নিয়ে গেছে।—ফিলিপিলিও ওইটুকুই জানিয়েছে উত্তরে।

সেই যেখানটা কোথায় জানতে চাইছি! —খিঁচিয়ে উঠেছে সোরাবিয়া! ধমক দিয়ে বলেছে,—নিয়ে চলো সেখানে।

ফিলিপিলিও মিছেই এসপানিওলদের সঙ্গ এতদিন করে নি। দেশের কুলাঙ্গার হলেও মানসম্ভ্রম সব একেবারে পায়ে লুটিয়ে দিয়ে বিদেশীদের গোলাম সে হয়নি। নিজের প্যাঁচাল ধারালো বুদ্ধিতে এই বিদেশীদের দম্ভ আর আস্ফালনের যোগ্য জবাব সে দিতে শিখেছে।

বাইরে অত্যন্ত বিনীত চেহারা ফুটিয়ে মোলায়েম গলায় সে তার অক্ষমতা জানিয়েছে। বলেছে যে কোথায় সে সব সরানো হয়েছে তা তার জানা নেই।

না জানো ত জিজ্ঞেস করো এই বাঁদির বাচ্চাদের কাউকে! —হুকুম করেছে সোরাবিয়া।

জিজ্ঞেস কাকে করব? —যেন হতাশ হয়ে বলেছে ফিলিপিলিও,—আমাদের একশ হাত দূর থেকে দেখলে এঁরা পালাচ্ছে। যদি বা কাউকে ধরতে পারা যায় সে কি কিছু বলতে পারবে! ইংকাদের প্রেত প্রাসাদ ত একটা নয়—! বেশীর ভাগই তার আবার এমন লুকোন যে নিজস্ব অনুচরেরা ছাড়া তার সন্ধান কেউ জানে না। এক ভিলিয়াক ভমুর নিজের গোপন 'কিপু'র গোছায় ছাড়া কোথাও তাদের হদিস মেলবার নয়। ভিলিয়াক ভমু ত আবার এখানে নেই।

তোর বক্তৃতা শুনতে এখানে আসি নি বেইমান মর্কট!—সোরাবিয়া প্রচণ্ড এক চড় মেরেছে ফিলিপিলিওর গালে। তার পর হিংস্রভাবে বলেছে,—যেমন করে পারিস সে জায়গার হদিস জোগাড় কর। সে সিংহাসন আমার চাই।

যে আজ্ঞে মার্কুইস! —সসম্ভ্রমে বলেছে ফিলিপিলিও। (ক্রমশঃ)

মানুষ খেকো মেছো বেড়াল

বিশ্বনাথ বসু

একি ভৌতিক কান্ড? জানোয়ারগুলি কি অশরীরী শয়তান। অলক্ষ্যে তাদের বেপরোয়া কার্যকলাপ বিস্ময়কর। গৃহস্থ-ঘরের ছোট ছোট বাচ্চাদের জীবন তো আর কোনদিক দিয়েই নিরাপদ নয়। ইতিমধ্যেই কয়েকটি শিশু সন্ধ্যায় অন্ধকারে বাপ-মায়ের অসতর্ক মুহূর্তে ঘর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি তাদের। পায়ের চিহ্নে প্রমাণ মেলে অপহরণকারীরা চতুষ্পদ প্রাণী। স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন পল্লীবাসীদের ধারণা—তারা শেয়ালও নয়—বাঘও নয়। তবে তারা কোন জাতীয় বন্যজন্তু? প্রশ্নটা শুধু গ্রাম-বাসীদেরই নয়—তাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া মাতাঠাকরুণও প্রশ্নটা রাখলেন অভিজ্ঞ শিকারী কালীপদ নাথের কাছে।

দীর্ঘস্থায়ী ম্যালেরিয়ার দাপটে ও বছর বছর কলেরা মহামারীতে গ্রাম উজাড় হয়ে যাবার মত। বহু বংশ নির্বংশ হয়েছে, বহু পরিবার গ্রামছাড়া হয়েছে প্রাণের দায়ে। অবিভক্ত বাংলার যশোহর জেলার অভিশপ্ত এই গন্ডগ্রামটির সর্বনাশ একদিনের নয়—দীর্ঘ দিনের। তাই পাড়াটি যেন আজ খাঁ-খাঁ করছে। যে কয়টি গৃহস্থ এখনও ভিটের মায়ায় গ্রামে টিকে আছে—জঙ্গলও যেন পেয়ে বসেছে তাদের, ঘিরে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে চারদিক থেকে।

জঙ্গলই জানোয়ারের আশ্রয়। তাই সাপ, বাঘ, শুয়োর কোন কিছুরই অভাব নেই ক্ষয়িষ্ণু এই বীজরামপুর গ্রামে। গরু-বাছুর মারা পড়ে হামেশা। তার উপর ইদানীং রহস্যজনক এই প্রাণীগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। স্থানীয় বন্দুকওয়ালা দু-চারজন আছে। শিকারী নেই কেউ। তাই প্রতিকারও হয়নি এতদিন।

মা-দুর্গার মতই রূপবতী মধ্যবয়সী শিক্ষিতা বিধবা মহিলা তিনি। দান, ধ্যান, দয়া দাক্ষিণ্য সর্বগুণে সবটুকু শ্রদ্ধা জয় করে তিনি আজ সবারই 'মা-ঠাকরুণ'। অসীম সাহস ও মনোবলের অধিকারিণী। তাইতো মহিলা হয়েও একাকিনী তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে চোর, ডাকাত ও বন্যজন্তু অধ্যুষিত এই গ্রামে স্বজনহীন স্বামীর ভিটেয় টিকে থাকা।

শিশুহত্যা ছাড়াও গত চারদিনে চারটি গরু মারা পড়েছে গ্রামে। থানার চৌকিদাররাও বাঘের ভয়ে রাতে চৌকি দিতে নারাজ। স্থানীয় মণিরামপুর থানার দারোগার কাছ থেকে জরুরী আহ্বান পেয়ে কালীপদ নাথ বন্দুক ও টর্চসহ অবিলম্বে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

বীজরামপুরে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মা-ঠাকরুণের বড় গরুটিই মারা পড়েছে এবার। চিহ্ন দেখে বোঝা গেল চিতাবাঘের কান্ড, এবং তারা তিন-চারটি হবে। মড়িটিকে তার দিয়ে শক্ত করে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে শিকারী প্রায় রাত দেড়টা পর্যন্ত নিকটবর্তী অন্য একটি গাছে অপেক্ষা করলেন। বাঘ এলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ টর্চের আলো গাছের পাতায় বাধা পাওয়ায় বন্দুক নিশানা করা সম্ভব হোল না। আলো দেখে বাঘ পালাল। পরদিন লোকজন দিয়ে জঙ্গল খেদান হোল। বাঘ বেরুল না—বোঝা গেল দূরে সরে গেছে। দুপুরে আহার বিশ্রাম সেরে শিকারী আবার গাছে গিয়ে বসলেন।

বেলা পড়ে এসেছে। শিকারী বন্দুক প্রস্তুত রেখে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন। বাঘের তো কোন সাড়া নেই। তবে এখনও দিনের আলো আছে—দেখা যাক কি হয়!

'মিউ' 'মিউ' 'মিউ'। শিকারী আড়-চোখে তাকিয়ে দেখেন দুটি গৃহপালিত বেড়াল ধীরে ধীরে ডাকতে ডাকতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। শিকারীর দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বাঘের মাসী বিড়াল। কাজেই মাসীর ডাকে বাঘ ভয় পাবে না নিশ্চয়ই। শিকারী সবেমাত্র বাঘ বেড়ালের পারস্পরিক মধুর সম্পর্কের কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন—এমন সময় পেছনের কোন একটি ঝোপের আড়াল থেকে 'বোনপো' দুটি আচমকা বেরিয়ে এসে আঁক আঁক শব্দে দুই মাসীকে করলো তাড়া। মাসীরা দেখলে দৌড়ে এদের সঙ্গে তো পেরে ওঠা যাবে না, তাই বুদ্ধি খাটিয়ে তড়াক করে একটি গাছের কিছুটা উপরে উঠেই গোঁফ পাকিয়ে, মুখ খিঁচিয়ে, লেজ ফুলিয়ে রেগে কুঁদে রুখে দাঁড়াল। বাঘ দুটি ক্ষীণ-জীবী ক্ষুদ্রদেহী মাসীদের এইরূপ অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধ স্পর্ধা দেখে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোকার মত পিট-পিট করে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু, তাদের লেজের অগ্রভাগের আন্দোলন তখনও থামেনি। 'হয়ত রাগে—নয়ত ভয়ে', ভাবছেন অপেক্ষারত কালীপদ নাথ। ব্যাপারটা তো বেশ কৌতুককর ও উপভোগ্য বটে। কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগ তো ছাড়া উচিত নয়। দোনলা বন্দুক হাতে। গোধূলী লগ্নে অব্যর্থ লক্ষ্যে সগর্জনে দুটি গুলি দুজনকেই উপহার দিলেন শিকারী। পূর্ব-বঙ্গীয় কেঁদো বাঘ—দুটিই ভূতলশায়ী হোল।

বাঘ যখন আরো আছে সন্দেহ হচ্ছে তখন গরুটিকে তো এখনও বাঘের টোপ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সিদ্ধান্ত ঠিক রেখে শিকারী সত্বর রাতের আহারের ব্যবস্থা করতে বললেন।

বাঘ মারা পড়াতেও পল্লীবাসীরা কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তাদের শিশুদের নিরাপত্তার জন্য ঘর-সন্ধানী সেই ভৌতিক জন্তুগুলি নিধনের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা সেই দিকেই তাদের আগ্রহ বেশী। দল বেঁধে গ্রামের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা এসে মা-ঠাকরুণকে অনুরোধ করে গেলেন যাতে শিকারী মশায় এর একটা বিহিত কিছু করেন। ভগবান তাকে দীর্ঘায়ু করবেন।

"গ্রামে যখন মড়ক লাগত, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই লোকে মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতে ফেলত। এইরূপভাবেই ছয়-সাত বছরের একটি বালকের মৃতদেহ মাঠের দক্ষিণ দিকে পোঁতা ছিল। স্থানটি আমার বাড়ীর ছাদ থেকে দেখা যায়। একদিন আমি স্বচক্ষে দেখেছি—চার-পাঁচটি বাঘের মত প্রাণী সেই বালকের মৃতদেহটি তুলে খাচ্ছে। প্রাণীগুলির ছাইয়ে রঙের দেহের উপর গাঢ় কালো রঙের ছোপ ছোপ দাগ। কালীপদবাবু, ওগুলি কোন প্রাণী? গ্রামের বর্তমানের আতঙ্কের কারণ শিশু-হনন-কারী প্রাণীগুলিই বা কি জাতীয় ও কোথা থেকে আসে?" গভীর কৌতূহল ও উদ্বেগের সঙ্গেই ভদ্রমহিলা প্রশ্নটি করলেন শিকারীর কাছে।

"প্রশ্নটি আপনার শুনে রাখলাম। পরিস্থিতির সঙ্গে আমি নিজে একটু পরিচিত হই—তারপর উত্তর দেব" বললেন কালীপদ নাথ।

রাতের আহার সন্ধ্যায় সেরে শিকারী বৈঠকখানা বাড়ীর সামনে ফাঁকা মাঠে একটু পায়চারী করছেন। এখুনি তো বাঘের আশায় রাতের প্রতীক্ষায় গিয়ে বসতে হবে। সসঙ্কোচে লাঠি ভর দিয়ে পাড়ার এক বৃদ্ধ ধীরে ধীরে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। "বিষয়টির কিছু হদিস করতে পারলেন, শিকারী মশাই?" জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। "কোন বিষয়টি?" "ঐ যে ঐ অপদেবতাদের আনাগোনা? আমি জানতাম—শিকারীবাবু, আমি জানতাম। ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানা, শাঁখিনী, পেত্নী, কালভৈরবী—সব অপদেবতাদেরই আদ্দি-কালের আস্তানা হচ্ছে ঐ 'রাজার ঢিবি'। মহাপাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত অভিশপ্ত ঐ 'রাজার ঢিবি'—কবে কার পাপে ধ্বংস হয়েছিল কেউ জানে না। আমার বাপ, ঠাকুরদারাও কেউ তার কোন হদিস দিতে পারেনি। কিন্তু যেদিন থেকে 'রাজার ঢিবি'র ওদিককার বিষাক্ত হাওয়া মোড় নিল লোকালয়ের দিকে সেদিন থেকে গ্রামকে গ্রাম মহামারীতে উজাড় হতে লাগলো। অনেকেই তো অকালে 'শেষ হয়ে গিয়েছে। তবু সেই মারীর হাত থেকে আমার মত অথর্ব বৃদ্ধ যে কেন বেঁচে রইল সারা জীবনের শোক-তাপে দগ্ধ হয়ে তা একমাত্র স্বয়ং ভগবানই জানেন।" একটি বুকভরা চাপা দীর্ঘশ্বাসে যেন শেষের কথা কয়টি বললেন, যষ্ঠি-নির্ভর অশীতিপর বৃদ্ধ।

'অদৃশ্য শিশুহন্তা', 'শেয়ালও নয়—বাঘও নয়', অথচ 'বাঘের মত', 'অপদেবতা-দের আস্তানা', 'রাজার ঢিবি'—ইত্যাদি কথাগুলি যেন জটিলভাবে ঘুরপাক খেতে লাগল শিকারীর মাথায়।

আজ শিকারীর টর্চ লাইটটি বন্দুকের সঙ্গে ফিট করা। জরুরী প্রয়োজনে নিশানা করতে এতেই বেশী সুবিধা হবে। শিকারীর সঙ্গে আজ গ্রামের একজন সাহসী যুবা—নাম রাধাচরণ কাপালী। শক্তিশালী—বলিষ্ঠ দেহ—ঠিক যেন কাপালিকের মতই চেহারা তার। নিজেকে নিজেই পরিহাস করে কালীপদবাবু মনে মনে ভাবলেন—"যাক, বাঁচা গেল। বন্দুককে ভয় না করলেও সঙ্গী কাপালিকের ভয়ে হয়ত অপদেবতারা আমার দিকে ঘেঁসতে সাহস পাবে না।"

দুজনে নিঃশব্দে বৃক্ষশাখায় বসে। মরা গরুটি পচে উঠেছে। তীব্র দুর্গন্ধ। শিকার নেশায় শিকারীরা সব কিছুই সহ্য করতে পারে। শকুনের ঝটপটানী গাছের মাথায়। রবাহূত তারা দিনেই এসে জড়ো হয়েছে। কিন্তু শিকারীর পাহারার ব্যবস্থায় মড়ি ছুঁতে পারেনি।

রাতের প্রথম প্রহর গড়িয়ে চলেছে—কোন সাড়া নেই। অপরাহ্নের দুটি গুলির শব্দ হয়ত বাঘকে সন্ত্রস্ত করেছে—তাই এলাকা ছেড়ে হয়ত চলে গিয়েছে তারা। শিকারী চিন্তামগ্ন। মন তাঁর আশা-নিরাশায় দুলছে।

চিন্তার একাগ্রতা বাধা পেল দূরবর্তী শব্দে। শিকারী উৎকর্ণ। ঠিকই ধরেছেন তিনি। শুকনো পাতায় শব্দ তুলে কোন জানোয়ার যেন এগিয়ে আসছে নির্দিষ্ট দিকে—মচ্ মচ্ মচ্। বাঘের প্রকৃতিগত সতর্কতা নেই এই চলার ভঙ্গীতে। এ চলা যেন একরোখা। কি ব্যাপার? শব্দ যত স্পষ্টতর হচ্ছে ততই বোঝা যাচ্ছে—জঙ্গলের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থেকে যেন একসঙ্গে কয়েকটি জানোয়ার মৃত গরুটির দিকে এগিয়ে আসছে।
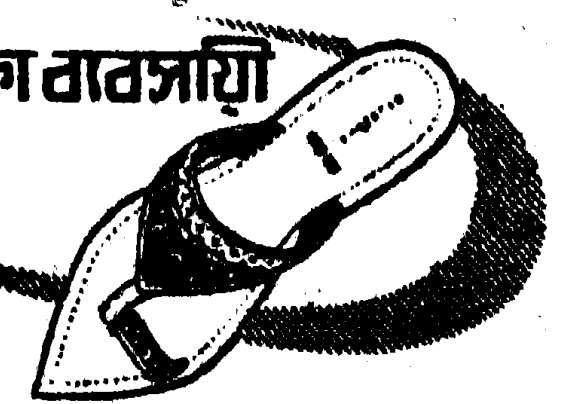
গভীর অন্ধকারে ঢাকা জঙ্গল এলাকা। একটু পরেই অদূরবর্তী দুর্গন্ধময় পচা মড়িটিকে নিয়ে একপাল বন্য-পশুর যেন হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। বাঘ তো নয় নিশ্চয়ই। তবে এরা কারা? দাঁতের টানে চামড়া ছেঁড়ার শব্দ হচ্ছে—চট-চট-চট। ভোজ্যবস্তু নিয়ে পারস্পরিক কাড়া-কাড়ির মধ্যেও কিন্তু বিন্দুমাত্র গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না তাদের। শিকারী বিস্ময়বিমূঢ়। এদিকে শিকার-সঙ্গী কাপালী আঙুলের খোঁচায় ইশারা দিচ্ছে আলো জ্বালতে। হয়ত ভয় পাচ্ছে সে। কিন্তু, শিকারী ভাবছেন—"বাঘ তো নয়ই বোঝা যাচ্ছে—তবে আলো জেললে আর কি হবে?"

মড়ির ভোজে এখন হয়ত বাঘ উপস্থিত নেই; কিন্তু তার আগমন সঙ্কেত পৌঁছল দূরাগত শৃগালধ্বনিতে—ফেউ...

ফেউ...ফ্যাঃ...ফেউ...ফ্যাঃ।" মধ্যে মধ্যে ক্ষণিকের বিরতি। আবার সুরু। নির্ভুল ইংগত। শিকারী বিব্রত। তাঁর ঝামেলা বাড়লো। কারণ দূরাগত মান্যবর অতিথি-দের আহ্বান—না রবাহূত এই অনধিকার প্রবেশকারী চ্যাংড়াদের আপ্যায়ন? কি করণীয় তার? অন্ধকারের অদৃশ্যেরা বিন্দু-মাত্র ডিগ্নিফায়েড প্রাণী নয় বোঝা যাচ্ছে। তা না হোক—কিন্তু এরা কারা? সন্দেহ নিরসনের জন্য আলো জ্বালার প্রবল ইচ্ছাকে শিকারী সংযত করে রেখেছেন মড়ির আসল মালিকের আগমন প্রত্যাশায়। তিনি ইতিমধ্যে হয়ত এসেও পড়েছেন অনেক নিকটে। পেছনে লাগা ফেউটি ক্রমাগত সরবে সে দূরত্বের সঠিক ইংগত দিচ্ছে।

শিকারীর অভ্যস্থ শ্রবণেন্দ্রীয় শব্দটি ঠিকই ধরে নিয়েছে—খচ খচ খচ—বিরাম, পুনরায় খচ-খচ-খচ—বিরাম। এবার আর ফেউ-এর দরকার নেই। শুকনো পাতার শব্দই দূরত্বের হদিস দিচ্ছে শিকারীকে। কিন্তু, শিকারীর সতর্ক কান বলছে—শব্দ তো একটি বাঘের দুজোড়া পায়ের বলে মনে হচ্ছে না। আগে পিছে অগ্রসরমান একজোড়া বাঘের চারজোড়া পায়ের শব্দ মনে হয়। এ জংগলের সব কিছুই কি অদ্ভুত—ভৌতিক?

এবার বোধহয় মরা গরুর গন্ধ নাকে ঢুকেছে, অনধিকার প্রবেশকারীদের সাড়াও হয়ত কানে গিয়েছে। তাই গলায় বিরক্তি

ব্যঞ্জক গর-গর শব্দে হুঁশিয়ারী দিচ্ছে ব্যাঘ্র-দম্পতি। চলার শব্দের, লয়ও বেড়েছে তাদের। শিকারীর মনযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ওদিকে। ইতিমধ্যে এদিকে কি হোল? হুল্লোড়বাজ বালখিল্যের দল যেন যাদু মন্ত্রে নীরব ও নিঃশব্দ হয়ে গেছে।

ক্ষিধের জ্বালায় একটি বাঘ তো মড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে। অন্যটি গেল কোথায়? একি? শিকারীরা যে গাছে বসে আছেন, সেই গাছেরই গোড়ায় নখের আঁচড় ও উত্তেজিত গলার গর্‌গর্‌ শব্দ। ঘটনাটা কি? বাঘ গাছে উঠ্‌ছে—না গাছের ছালে নখ শানাচ্ছে? কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না অন্ধকারে। বাঘের মতলব বুঝ্‌তে না পারলেও শিকারী এদিকে কিন্তু মর্মান্তিক ভাবে অনুভব করছেন যে, চরম আতঙ্কে রাধা কাপালী আলো জ্বালার জরুরী তাগিদে তীক্ষ্ন নখের মারাত্মক চিমটিতে তাঁর দক্ষিণ উরুটি বোধহয় ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে।

গাছের নীচেরটিকে তো গুলী করার অসুবিধা আছে—পাতায় আলো আটকাবে। তীব্র আলো নিক্ষিপ্ত হোল অদূরবর্তী মরা গরুর উপর। কি অদ্ভুত ব্যাপার? গরুর চামড়াটি ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। উন্মুক্ত রক্ত-মাংসের বীভৎস চেহারা নিয়ে সেটি পড়ে আছে সামনে—আর তার উপর নিবিষ্ট মনে ভোজনরত একটি বিরাট কেঁদো বাঘ। টর্চের আলোয় প্রতিফলিত চোখ তার আগুনের মত জ্বলছে।

নিশানা করতে অসুবিধা হোল না। রাতের বন কাঁপিয়ে শিকারীর হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। বাঘ লুটিয়ে পড়ল মড়ির বুকে। অন্যটি প্রাণভয়ে পালাল মাঠের দিকে।

পর মুহূর্তেই শিকারীর পেছনের জঙ্গলে মৃদু খস্‌-খস্‌ শব্দ—যেন কোন জানোয়ার সন্তর্পণে সরে যাচ্ছে। শিকারী তাড়াতাড়ি ঘুরে বসে লাইট ফেললেন সেই দিকে। চোরের মত পালাতে যাচ্ছিল। বন্দুকের দ্বিতীয় গুলিতে ঘুরে পড়লো সেটিও। আরো কয়েকটি লুকিয়ে ছিল। হুড়মুড় করে জঙ্গল ভেঙে পালাল। গাছ থেকে নেমে শিকারী এগিয়ে গেলেন। পাটকাঠির মশাল জ্বেলে গ্রামের লোকজনও এসে পড়লেন। চিতাটি লম্বায় প্রায় সাড়ে সাত ফুট ছিল।

গুলিবিদ্ধ বিশেষ জাতীয় দ্বিতীয় জন্তুটি প্রায় পাঁচ ফুট ছিল। মোষের মত গায়ের রং। বুক ও পেটের নীচের দিকের রং অফ্‌ হোয়াইট। গায়ে কালো গুলছোপ সাজান। মাথার উপর দিয়ে ঘাড়ের দিকে কালো লাইন নেমে গেছে। গোল ও বড় মাথা। বেড়ালের আকৃতি। পায়ের থাবার চেটো ছোট, আঙুল লম্বা, নখ বেটে। গুলীর আঘাতে দাঁত-কপাটি লেগে স্পট্‌-ডেথ্‌ হয়েছে। মরা গরুর একটি টুকরো এখনও তার মুখে দাঁতের ফাঁকে। চামারদের মত নিখুঁতভাবে গরুর চামড়াটি ছাড়ানো। এতক্ষণে কাজ বোঝা গেল।

চারদিকে কৌতূহলী দর্শকের ভীড়। শিকারী কিছুতেই প্রাণীটিকে সনাক্ত করতে পারলেন না। ভদ্রমহিলাটি যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা মিলছে। কিন্তু মুস্কিল বেঁধেছে শ্রেণী নিয়ে। এরাই শিশু-হনন-কারী কিনা বোঝা গেল না। শিকারী দ্বিধাগ্রস্ত ও লজ্জিত। গ্রামবাসীরাও উদ্বিগ্ন।

যাই হোক, এ-যাত্রায় কিছু করা গেল না। পরে খবর পেলে আবার আসবেন—মা-ঠাকরুণকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিছুটা মানসিক অস্বস্তি নিয়েই শিকারী গ্রামে ফিরে এলেন। 'রাজার ঢিবির' রহস্য শিকারীকে কৌতূহলী করে রাখলো।

কয়েকদিন পরে খবর পেয়ে প্রায় জন-পঞ্চাশেক দুর্ধর্ষ গ্রাম্য শিকারী নিয়ে কালীপদ নাথ উপস্থিত হলেন এসে বীজ-রামপুর গ্রামে। দলে এবার তারণ সর্দার, মহাদেব সর্দার, পঞ্চা দাস প্রমুখ দক্ষ শিকারীরাও আছে, কোপের হাতে (দেশীয় অস্ত্রাদি নিক্ষেপে) যারা ওস্তাদ। শিকারের সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে এবার ঘোনা, বল্লম প্রভৃতি দেশীয় অস্ত্রাদি ছাড়াও চল্লিশ-পঞ্চাশ গাছা শুয়োর-ধরা দড়া-জালও সঙ্গে আছে। অপদেবতাদের আস্তানা 'রাজার ঢিবি'র দিকেই অভিযান করা হবে এই হচ্ছে মুখ্য শিকারী কালীপদ নাথের এবারকার পরিকল্পনা।

প্রোগ্রাম মাফিক খুব ভোরেই অনু-সন্ধানকারীদল বেরিয়ে পড়েছে জঙ্গলের বিভিন্ন দিকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দল ফিরে এসে খবর দিল—"জঙ্গলে একদল বুনোশুয়োর এসে ঢুকেছে ভোর রাতে।" "ঢুকেছেই যখন ধরে ফেল"। নির্দেশ দিলেন কালীপদবাবু। দড়াজাল নিয়ে তারা রওনা হয়ে গেল। দু'তিনজন প্রৌঢ় শিকারী নদীর চর বরাবর বহুদূর পর্যন্ত ঘুরে রাজার ঢিবির খবর নিয়ে এল। তাদের খবরের জন্যই শিকারী উৎসুক ছিলেন। অতি আস্তে আস্তে যেন যুদ্ধক্ষেত্রের শত্রু-শিবিরের খবর এনেছে এইভাবে অনুসন্ধানের ফলাফল বিবৃত করলো তারা।

দক্ষিণ, পূর্বে নদী, উত্তরে বিল, পশ্চিমেও একটি মরা নদী—এই চৌহদ্দি নিয়ে নদীর ত্রিমোহনা সংলগ্ন টাঁকটি—বেতবন, হাজিবন, নলবনে ঢাকা পঞ্চাশ-ষাট বিঘার জমি; মাঝখানে বিশ-পঁচিশ হাত উচু একটি ঢিবি—ঐ জঙ্গলে জানোয়ার চলাচল করে—মজা নদীর চরের বালিতে তার পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে।

ইতিমধ্যে দড়া-জাল নিয়ে শুয়োর ধরার দল ফিরে এল—সঙ্গে বাঁশে ঝোলানো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাতটি জ্যান্ত দাঁতাল শুয়োর। চার-পায়ে দড়ি বেঁধে খুঁটি পুঁতে ফেলে রাখা হোল। তাদের চীৎকারে পাড়ার লোক অস্থির।

দেরী না করে সদলবলে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে কালীপদ নাথ পৌঁছলেন এসে ত্রিমোহনা অঞ্চলে। বিশাল জঙ্গল পরি-বেষ্টিত রহস্যেঘেরা রাজার ঢিবি সামনে। কয়েকজন দক্ষ সহচর নিয়ে শিকারী পর্য-বেক্ষণে বেরিয়ে গেলেন। মজা নদীর বালুতে পরিষ্কার পায়ের ছাপ রেখে কতকগুলি জানোয়ার জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। সতর্ক বিশ্লেষণে বোঝা গেল বাঘ বা লেপার্ডের থাবার তুলনায় এদের থাবার কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যে জন্তুটি সেদিন শিকারীর গুলীতে নিহত হয়েছিল তার থাবার সংগে মিল থাকলেও এরাই শিশু-হননকারী কুখ্যাত প্রাণীগোষ্ঠী কিনা এই মুহূর্তে তা জোর করে বলা যাচ্ছে না। তবে সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে।

এদেরই পায়ের ছাপ অনুসরণ করে শিকারীরা জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। সোজা দাঁড়িয়ে অগ্রসর হবার উপায় নেই এমনই ঠাসা জঙ্গল। বেতের শীষে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। ইতস্তত শামুকভাঙ্গা কেউটে সাপের খোলস দেখা যাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে অতি কষ্টে তাঁরা ঢিবির পাদদেশে পৌঁছলেন। চারিদিকের অবস্থা দেখে শরীর তাঁদের শিউরে উঠলো। মনে হল তাঁরা যেন শ্মশান-পুরীতে এসে পৌঁছেছেন। শুয়োর, সজারু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির হাড় ছড়ান চারিদিকে। কতকগুলি শিশুর কঙ্কাল ও মাথার খুলিও ইতস্তত পড়ে আছে। এই সেই অপহৃত হতভাগারা। এ যে সেই কুখ্যাত প্রাণীগুলির আবাসস্থল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। অসংখ্য সজারুর কাটায় পা দেবার উপায় নেই। হান্টিং বুট পায়ে থাকায় কালীপদবাবুর অসুবিধা হচ্ছে না—কিন্তু সহকারী শিকারীদের কষ্টের একশেষ।

এইভাবে কাটায় ভরা ঠাসা জঙ্গলে জানোয়ার খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। অগত্যা শিকারীরা ফাকায় বেরিয়ে এলেন। পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করে কালীপদবাবু সবাইকে কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন।

নদীর কূল বরাবর তিন দিক থেকে শুয়োর ধরা দড়াজালে রাজার ঢিবির জঙ্গল ঘিরে ফেলা হোল। জঙ্গলের কিনার থেকে কয়েক ফুট দূরে দিয়ে জালের বেষ্টনী। বেষ্টনীর প্রতি কোণায় বল্লমধারী শক্তিশালী শিকারী কয়েকজন দাঁড়িয়ে। জালের একদিক খোলা। সেই দিকে দশ-বারো মাইল দীর্ঘ বিস্তৃত যশোহরের বিখ্যাত হরিণার বিল।

এবার মুখ্য শিকারীর নির্দেশে বিলের দিক থেকে জঙ্গলে আগুন দেওয়া হোল। ফাঁকা হাওয়ার গুণে দেখতে দেখতে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

আদিকালের বিভীষিকার আস্তানা রাজার ঢিবি জ্বলছে। পাশের সব গ্রাম ভেঙে লোক ছুটছে ত্রিমোহনার দিকে। কিন্তু সেই সঙ্গে সাহেব-মেমেরা ওরা কারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে এদিকে?

কালীপদ নাথ বিস্মিত। সদর থেকে এস-পি, ডি-এম সহ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন

সাহেব ও মেম এসে উপস্থিত। এঁরা পিগ-হান্টিং-এ বেরিয়েছিলেন। তখন বৃটিশ আমল। কলকাতার শিকারী মহল কালীপদ-বাবুর পরিচিত। জেলার এস-পি, ডি-এম-এর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল যথেষ্ট। জঙ্গলবাদাল গ্রামে তাঁর খোঁজে এসে খবর পেয়ে মোটরে সবাই ছুটেছেন বীজয়রাম-পুরের দিকে। গৃহস্থবাড়ীর আঙ্গিনায় একটি দুটি নয়—সাত-সাতটি অত বড় বুনো শুয়োর চার পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে গর্জন করছে দেখে সাহেব-মেমদের তো চক্ষুস্থির। খবর শুনে ও আকাশ ধোঁয়াচ্ছন্ন দেখে তাঁরাও ছুটলেন রাজার ঢিবিতে।

জঙ্গল পুড়ে শেষ হয়ে এল—জানোয়ার বেরোয় না। তারণ সর্দার অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে এগিয়ে গেল ঢিবির দিকে। কালীপদবাবু এদিকে আগন্তুকদের সঙ্গে ভদ্রতাসূচক আলাপে ব্যস্ত।

হঠাৎ ঢিবির দিক থেকে তিনবার বাঁশির শব্দ হোল। কালীপদবাবুর ব্যবস্থাপনায় ইঙ্গিত ইসারায় ঠিক যেন মিলিটারী কায়দা। ছুটলেন তিনি অবিলম্বে শব্দ লক্ষ্য করে। বংশীবাদক তারণ সর্দার দেখালে—ঢিবির নীচে জটিল অলিগলি সমন্বিত বিরাট গুহা—বোধহয় কয়েক বিঘা জমি নিয়ে ছড়িয়ে আছে। ঝড়-জলের ভয় নেই—বেশ পাকা-পোক্ত ব্যবস্থায় বন্যজন্তুর নিরাপদ আস্তানা। চারদিকে ছড়ানো কয়েকটি গুহা-মুখ। গুহামুখের ধুলোয় জানোয়ার চলা-চলের চিহ্ন।

খবর রটতেই শিকারী ও দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। সবাই সতর্ক ও সন্ত্রস্ত। মুখ্য-শিকারীর হাতে রাইফেল। তারণ সর্দার ও অন্য একজনের হাতে ডবল ব্যারেল শট-গান। অন্যান্যদের হাতে বিভিন্ন রকমের দেশীয় অস্ত্রাদি।

জালের বেষ্টনীর তিন দিকে দণ্ডায়মান পাহারাদার-শিকারীদের হুঁসিয়ার করে দেওয়া হোল। বিলের দিক থেকেও সরিয়ে দেওয়া হোল লোকজন। জানোয়ার ঐ দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে গুলী ছোঁড়ার দরকার হতে পারে। অন্যদিকে ছুটলে জালে পড়বে।

একটি তীক্ষ্ণাগ্র আলযুক্ত ত্রিমুখী বীর-বাঁধা হাতে সাহসী পঞ্চারাম ঢালী ঢিবির চাতুতে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। সতর্ক দৃষ্টি তার পাশের একটি গুহামুখের দিকে নিবদ্ধ। সহসা একটি জানোয়ারের মুখ বেরুল। একটু উঁচু থেকে পঞ্চারাম লক্ষ্য করছে। ভাবছে, বুক পর্যন্ত বেরুলেই বীর-বাঁধা চালাবে। জানোয়ারের দেহটি আর একটু বেরুনোর ঝোঁক দিতেই শিকারী আর তুলেছে। সতর্ক জীব, বুঝতে পেরে ধড়ফড়িয়ে পেছুবার চেষ্টা করতেই পঞ্চারাম বিদ্যুৎবেগে পাঁজড়ে বীর-বাঁধা মেরে তাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলল। অতি শক্তিশালী প্রাণী—রাখা দায়। ঘটনাটি তারণ সর্দারের নজর এড়ায়নি। দৌড়ে গিয়ে বন্দুকের এক গুলীতে তাকে শেষ করে গর্তথেকে টেনে বের করল। নরমাংস খেয়ে খেয়ে চেহারা ও স্বভাব হয়েছে এদের অতি হিংস্র।

গুহার নীচে আরো জানোয়ার আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই বিরাট ঢিবির ভিতর থেকে তাদের বের করার কি উপায় করা যায়?

উপায় উদ্ভাবন করলেন মুখ্য শিকারী নিজে। তাঁর নির্দেশে গ্রাম থেকে কয়েকটি কোদাল ও এক ঝুড়ি শুকনো লঙ্কা এলো। গুহার কয়েকটি গলিপথের উপরদিক থেকে ঝপাঝপ কোদালের কোপে মাটি সরিয়ে গর্ত খোঁড়া হোল। পরে ঐ একঝুড়ি শুকনো লঙ্কা কিছু কিছু করে সবকয়টি গর্তমুখে ঢুকিয়ে পাট-কাঠির আগুন দেওয়া হোল।

চারদিক ফাঁকা। প্রবল হাওয়ার চাপে পোড়া লংকার কড়া ধোঁয়া ছড়িয়ে গেল গুহার অভ্যন্তরের অলিগলিতে।

পল্লীবাসীর চিরদিনের দুঃস্বপ্ন এই ভুতুড়ে 'রাজার ঢিবি'। শক্ত ওঝার বড় কড়া দাওয়াই পড়েছে এবার সেই ভূতদের বিরুদ্ধে। আর যায় কোথায়? ছিটকে বেরিয়ে এসে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলো তারা যে যেদিকে পারে।

হরিনার বিলের দিকে জাল পাতা নেই—সম্পূর্ণ খোলা। সেদিকে পাহারা দিচ্ছে বন্দুকধারী শিকারীরা। পোড়া লঙ্কার ধোঁয়ার ঝাঁঝে চোখের জ্বালায় দৃষ্টি ঝাপসা। দড়া-জাল নজরে পড়েনি তাদের। বিষাক্ত গ্যাসের হাত থেকে বাঁচবার আশায় এ গলি সে গলির ভিতর থেকে পাগলের মত বেরিয়ে আট-নয়টি জানোয়ার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে জালে জড়িয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত তারা শিকারীদের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হোল।

চারদিক লোকে লোকারণ্য। রাজার-ঢিবির পতন ঘটেছে। সবার আনন্দ আর ধরে না। সাহেব-মেমদেরও বিস্ময়ের সীমা নেই। কি জানোয়ার এগুলি? প্রশ্নটি 'রাজার ঢিবি' বিজেতা শিকারী কালীপদ-বাবুর মনেও।

সাহেব মেমেরা কৌতূহলবশতঃ দুটি জানোয়ার সঙ্গে নিয়ে গেলেন কলকাতায় প্রাণী-বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে।

দশ-বারোদিন পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে কলকাতার খবর কালীপদ নাথের হাতে এল। জীব-বিজ্ঞানীদের অভিমতে জানোয়ারগুলি হচ্ছে—"ম্যান-ইটিং ফিসিং ক্যাট"—মানুষখেকো মেছো বেড়াল।

ফিসিং ক্যাট সাধারণত আকারে ছোট হয়। এরা প্রধানত মাছ খেয়েই জীবন ধারণ করে। তবে সুবিধা সুযোগমত হাঁস, মুরগী ভেড়া, ছাগল, কুকুর ও ক্ষীণজীবী অন্যান্য বন্যপ্রাণীতেও এদের অরুচি নেই। তবে মানব-শিশু ধরে খাবার ঘটনা ইতিপূর্বে এ-অঞ্চলে আর কখনও শোনা যায়নি। সব-চাইতে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে—বীজয়রাম-পুরের প্রাণীগুলির অস্বাভাবিক বৃহৎ আকৃতি ও ভয়ঙ্কর হিংস্রতা। সেইজন্যই বোধহয় এদের গোষ্ঠীবদ্ধ আবাসস্থল রাজার ঢিবিতে কখনও শুয়োর বা চিতাবাঘ বাস করবার সাহস পেত না।

তাছাড়া পর্যবেক্ষণে আরো লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে এদের একক-শক্তিতে শিশুর ধরার ক্ষমতা থাকলেও ভেড়া, ছাগল, কুকুর শুয়োর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভারী ও শক্তি-শালী প্রাণীগুলিকে তারা দলবদ্ধভাবে শূন্যভরে বহন করে তাদের আস্তানায় নিয়ে যেত। সেইজন্য মাটির উপরে শিকার টেনে নিয়ে যাবার দাগ কখন দেখা যায়নি, বা, শিকার ধরে বাইরে কোন জঙ্গলে বসে খেয়েছে এমন কোন প্রমাণ মেলেনি। অবশ্য মড়কে মৃত নরদেহ বা বাঘের শিকার মাঁড়ের উপর ভোজনরত অবস্থায় এদের দেখা পাওয়া গেছে।

খাদ্যের গুণে ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে যে জীব-জন্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি-গত পরিবর্তন ঘটে আলোচ্য বর্তমান জীব-গুলি হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বোঝা যায় বীজয়রামপুরে মহামারীর সময় মৃত নরমাংস সহজলভ্য হওয়ায় প্রাণীগুলির স্ব-রুচির পরিবর্তন ঘটে ও ক্রমে ক্রমে তারা নরখাদকে পরিণত হয়। এর আগে তারা হরিনার বিলে মাছ ধরেই খেত।

সুন্দরবনেও ফিসিং ক্যাট আছে। তবে আকারে ছোট। জোয়ারের সময় সুন্দরবনের নদী-নালায় যখন স্রোতের চাপে কূলের ধারে মাছ ভেসে আসে তখন চরে নিঃশব্দে বসে থেকে ধূর্ত ফিসিং-ক্যাট আচমকা থাবার চপেটাঘাতে মাছকে ছিটকে ডাঙ্গায় নিক্ষেপ করে ধরে খায়।

দি রয়্যাল ন্যাচারাল হিস্টরীতে উল্লেখ আছে ফিসিং-ক্যাট নাকি ভারতীয় জলা-ভূমির বড় বড় শামুক খেতেও অভ্যস্ত। এরা যে সর্বভুক ও নরশিশুলোলুপ তারও উল্লেখ দেখা যায়। ফিসিং-ক্যাটের আক্রমণে চিতাবাঘের নিহত হবারও দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু তার মাংস স্পর্শ করেনি সে। পূর্ণ বয়স্ক ফিসিং-ক্যাটের দৈর্ঘ দেওয়া আছে ৪১½ ইঞ্চি, উচ্চতা প্রায় ১৫ ইঞ্চি। কিন্তু বীজয়রামপুরে নিহত বড়টির দৈর্ঘ্য ছিল পাঁচ ফুট। এথেকেই প্রমাণ হয়—দীর্ঘদিন নরমাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত থাকার দরুণ তাদের আকৃতিতেও কি অস্বাভাবিক পরিবর্তনই না ঘটেছিল।

এই প্রাণী হিমালয়ের পশ্চিমমুখী পাদদেশ থেকে সুরু করে দক্ষিণ চীন, নেপাল, বার্মা, সুমাত্রা ও বোর্ণিও বাদে মালয়, ফরমোসা প্রভৃতি দেশ ও বাংলা দেশের জলাভূমিতে প্রচুর বাস করে।

অংগনা

আগ্রহী চেতনা

আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সারা আমেরিকা তোলপাড়। রাজনীতির আসর এখন বেশ সরগরম। এ ব্যাপারে একটা সুফল লক্ষণীয় যে, আমেরিকান নারীসমাজ রাজনীতির একচেটিয়া অধিকার আর পুরুষদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। সচেতন নাগরিক হিসেবে ভোটদাতা, প্রচারক বা ভোট সংক্রান্ত কর্মচারী-রূপে মেয়েরা আরো অধিকসংখ্যায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন। রিপাব্লিকান ন্যাশনাল কমিটির অ্যাসিস্টান্ট চেয়ারম্যান ও মহিলা বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীমতী মেরী ক্রুকস এ প্রসংগে বলেছেন, আমি জোর করেই বলতে পারি অন্যান্যবারের তুলনায় এবারের নির্বাচনে আমেরিকার নারীসমাজ রাজনীতির ক্ষেত্রে আরো সক্রিয় হবেন।

আরো উল্লেখযোগ্য যে, এই নির্বাচনে পুরুষ ভোটারদের তুলনায় নারী ভোটারদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বেশি হতে পারে। গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থায় তাদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণের বিষয়টি তাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তবে বিশেষজ্ঞদের অভিমত, মহিলাদের স্বতন্ত্র ভোট বলে কিছু থাকবে না। ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং মহিলা শাখার ডিরেক্টর শ্রীমতী মার্গারেট প্রাইস বলেছেন, মহিলারা এখন নিজেদের ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে সমান আগ্রহী। পুরুষ ভোটারদের মত নারী ভোটারদের মধ্যেও মতামত সম্পর্কে বিস্তর পার্থক্য থাকে। পরিবারের পুরুষ ভোটারদের মতামত সর্বদাই তাদের প্রভাবিত নাও করতে পারে।

রাজনৈতিক প্রচার অভিযানে মহিলারা নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা সপ্রমাণ করেছেন। এ সম্পর্কে বিজ্ঞজনের মত, মহিলাদের এই অভিযান সফল হয় না ওয়াশিংটনের সদর দপ্তরে। সফল হয় সদর রাস্তায়, যেখানে চলে সাধারণ মানুষ। মাটির কাছাকাছি যারা থাকে সেই মানুষের মন তাদের জয় করতে হয়।

নেতৃস্থানীয় জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, মহিলারা কোন আগ্রহ না নিলে, কাজকর্ম না করলে আমাদের দুটি রাজনৈতিক দলই অচল হয়ে পড়বে। নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলকে কাজকর্মের সুবিধার জন্য ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি অঞ্চলের শতকরা নিরানব্বুই জন কর্মীই হচ্ছে মহিলা।

প্রচার অভিযানকে সফল করে তুলতে হলে প্রত্যেকটি কাজই নিখুঁতভাবে করতে হয়। প্রচারপত্র বিলি, টেলিফোন সার্ভিস পরিচালনা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে রেজিস্টার্ড ও সম্ভাব্য ভোটারদের তালিকা প্রণয়ন ও বাঞ্ছিত প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ প্রভৃতি কাজে স্কুল-কলেজের মেয়েরা থেকে সবাই অংশ নেয়। ভোটদাতাদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া ও তাদের শিশুদের সাময়িক দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে মহিলা কর্মীরা বহন করেন। প্রচারাভিযানের জন্য পুস্তিকা প্রণয়ন, বক্তৃতা রচনা ও অর্থসংগ্রহে তাঁরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। কোন কোন মহিলা প্রার্থীর পক্ষে সংগঠন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ভোটারদের শিক্ষাদানে মহিলাদের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। সারা বছর ধরেই এই কাজ চলে। বিভিন্ন দল এ সম্পর্কে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারা মহিলাদের কাছে দলীয় নীতি, বিভিন্ন সমস্যা ও নির্বাচন প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ করেন। এ ব্যাপারে দল ছাড়াও লীগ অব উইমেন ভোটার্স নামক সংস্থাও সক্রিয় অংশ নেয়। এটি গোষ্ঠী ও দল নিরপেক্ষ সংস্থা। রাজনৈতিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তারপর হাত ছোট হতে হতে একেবারে হাতকাটা জামার প্রচলন হল। অনেকে অবশ্য এই জামা ব্যবহার না করায় 'ফ্যাসান' জগতে পিছিয়ে পড়েছেন।

শহরে যেন এবার ফ্যাসানের ঢেউ লেগে গেছে। 'চোলী' এলো; 'কাঁচুলী' এলো। এই সব জামার ফ্যাসান বোম্বাই, রাজস্থান থেকে কলকাতায় আমদানী। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা এ ধরণটি গ্রহণ করলেন তার কারণ বোধ করি এ জামায় বিলিতি ধাঁজ কিছু ছিল না; আমাদের ভারতেরই নিজস্ব ফ্যাসান। এ সময় পথে-ঘাটে, কর্মস্থলে, স্কুল-কলেজে, বাঙালী মেয়ে সাজ-পোষাকে সুরুচিরই পরিচয় দিলেন। আড়ম্বরবর্জিত – মানানসই শাড়ী-জামায়, আধুনিকাদের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুললেন।

কিন্তু ফ্যাসান কি দাঁড়িয়ে থাকে? আধুনিকাদের মধ্যে যাঁরা আরও অগ্রগতি, তাঁদের দৃষ্টি আরও অনেক এগিয়ে চলেছে। তাদের নজর আজ শুধু মুখশ্রীতেই আবদ্ধ নেই; শরীরের গঠনেও নৈপুণ্য আসা চাই, সেদিকে কড়া নজর এলো। স্থূলদেহ আর চোখে পড়ে না।

হাতা ছোট হতে হতে কাঁধের ওপর এক ইঞ্চি ফালিতে এসে দাঁড়াল। ঘাড়ের নীচের জামার লাইন তাল ফেলে পিঠের মাঝামাঝি এলো। সুন্দর কটিদেশ উন্মুক্ত করে জামার নীচের লাইনটি উর্ধে উঠে, পিঠের এক ইঞ্চির সঙ্গে মিলে গেল।

'চোলী', 'কাঁচুলী' ব্যবহার যখন প্রথম শুরু হয়, নকল শুধু জামার হাতারই ছিল। পিঠ সম্পূর্ণ আবৃত থাকত। এখন 'চোলী' 'কাঁচুলী'র অবিকল নকল শুরু হল। অর্থাৎ হাতা এক থাকলেও পিঠে কোনো কাপড়ই রইল না। জামাটি ধরে রাখবার জন্য গলার কাটের সঙ্গে রঙীন সুতোর দড়ি জুড়ে, সেই দড়ির একটি ফাঁস দেওয়া হল গলার কাছে, আর একটি ফাঁস দেওয়া হল পিঠের মাঝামাঝি। এই বেশটি [illegible] এবং [illegible]র ধনী-গরীব সকলেরই। এইটির [illegible] হল।

ক্লাবে, সান্ধ্য[illegible] আরও অভিনব বেশ চোখে পড়ে। চোলীর হাতা নেই; [illegible] একটি ফালি। পিঠ সম্পূর্ণ অনাবৃত; আরও দুটি ফালির [illegible] পিঠের মাঝামাঝি একটি 'বো' বাঁধা।

আরও যা দেখা যায় তাতে মনে হবে বুঝি সেই শতাধিক বৎসর আগে ফিরে গেছি। শুধু তফাৎ এই যে, এখন আর পর্দার বালাই নেই। শাড়ীটি এমন সুন্দর আঁটসাঁট, সুনিপুণভাবে পরা, দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। বাঁ হাতটির ওপর শাড়ী ঝুলে পড়ে হাতটিকে সম্পূর্ণ আবৃত করা। আবার পিঠের অর্ধেক ও ডান হাত, কাঁধ সম্পূর্ণ অনাবৃত।

মাথায় অতি প্রকাণ্ড খোঁপা; ছিপছিপে সুনিপুণ গড়নটি, চোখে-মুখে শিল্পীর নিপুণ তুলির টানে আসল মুখটি নিজের মনের মত করে রূপান্তরিত করা, আজকের আধুনিকাদের বেশ; এরা যেটি ভাল বোঝেন, করে যান। কোন বাধাই মানেন না।

তবে একথা বলতেই হবে, এ বেশ আজ শুধু বাঙালী আধুনিকার বেশ নয়। আজ সারা ভারতের আধুনিকার বেশ এই। এক্ষেত্রে ভারতে আজ প্রদেশ বিভেদ নেই। সকলের এক মত, এক প্রাণ।

আজ একে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এর পর? ফ্যাসানের চাকা ত থেমে নেই! এ তো ঘুরেই চলেছে। আবার যেন সেই পুরাতনের দিকে দৃষ্টি প্রসারণ দেখতে পাই?

—মীরা চৌধুরী

আলোকচিত্র ঃ সুকুমার রায়

বন্যা

[উপন্যাস]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আগের ঘটনা

[যৌবনে প্রায় সব পুরুষই মেয়েদের [illegible]। [illegible] নিয়ে [illegible] বড়লোকের একমাত্র মেয়ে লীলাকে। রূপপুরের [illegible] [illegible] হয়েছিল সে। লীলা স্বাধীন, জেদী, সুন্দরী। সত্যকে নিয়ে লীলা কি সুখী ছিল? বোধহয় না। তবু সহজভাবেই চলছিল ওদের জীবন। কিন্তু সর্বনাশা বন্যা যেন অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। এক দুপুরে [illegible] সুখেনের সঙ্গে তা ঝাঁপিয়ে পড়ল এ বাড়িতে, লীলার মনে। [illegible] কল-কল্লোলে সেও যেন ভেসে যাবে। এ-এক আশ্চর্য অনুভূতি। [illegible] সত্যিই সুখেনের কাছে বাঁধবন্দী হল লীলা। এক অজানা [illegible] বাইশ বছরের মেয়ে লীলা আশ্বস্ত। বেচারি সত্য!

দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল। সত্য আর লীলা মুখোমুখি [illegible]। সত্যর বুকের ভিতরে দারুণ ক্ষোভ আর চাপা অভিমান। অতঃ সেই [illegible] ছেড়ে গেল রূপপুর। ছাড়াছাড়ি।

ফিরে এল সে রাণীচকে। খুলল চায়ের দোকান। [illegible] [illegible]। [illegible] সত্যর চোখে ভাসে লীলার মুখ। যন্ত্রণা।

ছন্নছাড়া সত্যর জীবনে এবার এল যমুনা। রান্নাবান্নার জন্য তাকে [illegible] হয়েছে। যমুনা নবযুবতী। সেও এক রাতের ঘটনা। যমুনাকে ঘিরে নিজের [illegible] প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সত্য, যমুনা কে তার?

এদিকে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সুখেন এল লীলার বাড়ি: রূপপুরে। বাইরের ঘরে অপেক্ষা করে সুখেন লীলার জন্যে। তখনো দেখা মিলল না তার। ভয়ংকর অস্থিরতা। সেও এক রাত। এরপর—]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১১)

সে রাতে রাণীচকে সত্যও কম অস্থির নয়।

বিকেলে দোকানে যাবার সময় দেখে গেছে, যমুনা দারুণ সেজেছে। পূর্ণ যুবতীর মত তার দেহে খেলছে এক অপার্থিব আলো। নিজের বয়সকে মাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে সে।

সত্য ভাবছিল, সইয়ে নিতে হয় অল্প করে—তারপর হয়ত সবই সহজ হয়ে ওঠে। মানুষ যা কিছু বলুক, যত ভালই করুক, আসলে পৃথিবীজোড়া যা চলছে চিরদিন, তার যত ভদ্র নামই দেওয়া হোক, তা নিতান্ত কামলীলা। কাম থেকেই ভোগ। জীবনে শুধু ওই একটি চিৎকার—ক্ষুধা ক্ষুধা! ক্ষুধার জন্য ভোগ। রাক্ষস হয়ে পৃথিবী পেয়েছি। পৃথিবী গিলবো।

কী রে সতু, খিক-খিক করে হাসছিস কেন আপন মনে? পিনাকী বলছিল।

ও কিছু না।

বল না বাবা, ঝেড়ে ফেল। আমরাও খানিক হাসি।

হাসির কথা নয় রে।

তবে যে হাসলি?

হাসলাম।

পিনাকী ভেংচি কেটে বলেছিল, হাসলাম! তাহলে কথাটা কিসের?

ও একটা উড়ো কথা।

কাকেও বলা যায় না। অথচ সবাই জানে। আর তাছাড়া তুমি শালা পিনাকী মুখুয্যে, কোন ঘাটে জল খাচ্ছ, তা কারুর জানতে বাকী নেই। সত্য মনে মনে বলছিল।

...শুনলে তুমি বলবে, মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম—ঋষি বিশ্বামিত্রও টলেছিলেন—তা ওহে পিনাকী, তোমার মুখের আদল স্বর্ণকার-পাড়ায় কেন? ঘরে তোমার ঘর আলোকরা বৌ, টসটসে যৌবন, তবু তুমি কেন? জগদীশ স্যাকরাও কি জানে না, তার কনিষ্ঠা কন্যার প্রকৃত বাবা কোন মহাজন? ...যা দিন-কাল পড়েছে! জগদীশ নিজেকে সইয়ে নিতে পেরেছে। এখন সে ও নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আর পরিতোষ রায়? অন্নদা মজুমদার? হরিবিলাস, মঙ্গলা, সাধুচরণ?...ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যায়। চিরকাল এই চলেছে—আবহমানকাল ধরে আমরা যে যার ঘরে, সুযোগ পেলেই সিঁদ কাটছি। আর কেন তবে ঢাকগুড়-গুড় নাকসিঁটকানো, আইন-কানুন আদালত ছাইপাশ। তুলে নাও দাদারা, বেঁচে যাই হাঁফ ছেড়ে। যার যাকে ভালো লাগে, বেছে নিক।

সতু, তুই পাগল হবি রে! কী বিড়বিড় করছিস? রোডবাবু তারক সরকার এসে বলেছিল।

উড়ো কথা। একই জবাব ছিল সত্যর। সে আবার কী!

সত্য ঠোঁটে চুক-চুক শব্দ করে বলেছিল, আহা, সেদিন কি হবে?

নির্ঘাৎ বৌয়ের শোকে সত্যটা পাগল হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। লোকে আজ-কাল বলাবলি করতে শুরু করেছে।

তারপর সকাল-সকাল ফিরে গেছে সত্য। দোকানে বুলুর মা বুলুর জন্যে ভাত বয়ে এনেছিল, বুলু খেতে বসেছে। হেরি-কেনের চারপাশে পোকা থিকথিক করছে। বুলুর মা যত্ন করে সেগুলো টিপে মারছে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

যাবার সময় একপলক দৃশ্যটা দেখে সত্যর হঠাৎ খুব ভালো লেগেছিল।

সত্য বাড়ি ঢুকে দেখল আলোর সামনে বসে কী বই পড়ে শোনাচ্ছে চাঁপা ঝিকে।

কী বই ওটা? সত্য প্রশ্ন করল।

যমুনা সলজ্জ তাকিয়ে বন্ধ করল বইটা। বলল, একটা মাসিকপত্রিকা।

অত মোটা? হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাল সত্য।

শারদীয় সংখ্যা একটু মোটাই হয়।

বিস্মিত সত্য ওর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি লেখাপড়া কদ্দুর জানো যমুনা?

যমুনা মুখ নামিয়ে বলল, ক্লাস ফাইভ অব্দি পড়েছিলাম। তারপর...

আর পড়ার ইচ্ছা করে?

যমুনাও বিস্মিত চোখে তাকাল।

বল না, ইচ্ছে করে না কি?

করে তো পড়াবেন? মেয়েদের স্কুল আছে এখানে?

সত্য বলল, আছে। কালই দেখবো'খন। তা কথাটা আগে বলতে হয়।

যমুনা বাঁকা ঠোঁটে বলল, বললে ভর্তি করে দিতেন? কিন্তু তাহলে ঘরকন্না দেখত কে?

চাঁপা সামনে রয়েছে দেখে সত্য সামলে নিল। বলল, সে দেখা যাবে।

চাঁপা উঠে দাঁড়াল এবার। বলল, অ বদমায়েসি, যাই বা হল বাবা-কাকা, বাবা-[illegible] তুমিও তো বটে। তোমার [illegible]

পরকাল ওখন ওনার হাতে! সবকিছু দেখবেন বৈকি।

চাঁপা চলে গেলে সত্য আর যমুনা জোর হাসল একচোট। যমুনার হাসিটাই বেশি। তার চোখে জল এসে গিয়েছিল।...ও বলে কী! বাবা-কাকা...

সত্যর হাসি নিভেছে। বলল, বাবাকাকা না তো কী?

যমুনা অপ্রতিভ কণ্ঠে জবাব দিল, যান, ফাজলেমির জায়গা পান না আর।

কেন যমুনা, ফাজলেমি বলছ কেন?

কেন আপনি তা জানেন না যেন?

কতকটা হার মেনে সত্য বলল, আমাকে মামা বলো, তাই না যমুনা?

বলতাম, আর বলব না। তাও যদি বা বলি, সে বাইরের লোকের সামনে।

কী বলবে?

জানি নে যান! বই নিয়ে ঘরে ঢুকল।

সত্য পিছন-পিছন গিয়ে বলল, জবাব দাও যমুনা।

যমুনা অন্ধকার থেকে জবাব দিল, নাম ধরে ডাকব। রাগ করবেন?

সত্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ক'মুহূর্ত। তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কই, কী খেতে দেবে দাও, খিদে পেয়েছে।

যমুনা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একটুও নড়ে না।

কী হল? এস।

তবু তার সাড়া নেই।

একটা কিছু অনুমান করে সত্য এগিয়ে গেল তার কাছে। তারপর তার দু'কাঁধ ধরে মুখটা আলোর দিকে ঘুরিয়ে দিল। পরমুহূর্তে সে অবাক হয়ে বলল, কাঁদছ? যমুনা, তুমি কাঁদছ? কেন? সত্য বার-বার তার কাঁধ'দুটো নাড়া দিতে থাকল। কেন, কেন কাঁদছ যমুনা?...আজ তুমি আমাকে কী দেবে বলেছিলে, সে তো তোমারই বলা যমুনা—আমি তো কোন জেদ করিনি! খেতে-পরতে দিচ্ছি বলে বুঝি এই বিচ্ছিরি দাবী থাকবে আমার, তাই ভেবেছ! ছিঃ লক্ষ্মীটি, কথা শোন। এই আমি নাক-কান মলছি—আর কক্ষনো তোমার দিকে কু-দৃষ্টে তাকাবো না—তুমি ভয় পেয়ো না, কেমন?

তবু পাপিষ্ঠ সত্যচরণ বলতে পারল না আমি তোমার বাবার মত, তুমি আমার মেয়ে যমুনা—এবং বলতে যে পারল না, তা সে নিজেই লক্ষ্য করল।

অবশ্য তা অনেক—অনেক পরে। আলাদা ঘরে শুয়ে যখন একটার পর একটা বিড়ি টানছিল ক্রমান্বয়ে।

আর যমুনা: বুঝি বা একলা থাকার ভয়ে, বুঝি প্রচন্ড ভ্যাপসা গরমে দরজা-জানালা বন্ধকরা ঘরে পুরু মশারির মধ্যে সেও ঘুমোতে পারছিল না।

(১২)

বড় ঘরের লম্বা বারান্দায় বসে খাচ্ছিল সুখেন। বাসিনী পরিবেশন করছিল। আর একটু তফাতে লীলা একটা মোড়ায় বসেছে কর্তাঠাকুরাণীর মত। তার মাথায় একটুখানি ঘোমটা।

পোকামাকড়ের জন্যে হ্যারিকেনটা দূরে রাখা হয়েছে। তার অল্প আলোয় চেষ্টা করেও সুখেন লীলার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না।

কথা অবশ্য বলছিল দুজনে। অকাজের নানা এলোমেলো কথা। কিন্তু সুখেন উসখুস করছিল। আড়চোখে লীলাকে দেখছিল সে। সামনে বাসিনী, ওখানে ঘণ্টা আর আরও সব কারা বসে রয়েছে। অন্য কথা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না সে।

লীলা খুব শান্তস্বরে আস্তে আস্তে কথা বলছিল। জমির কথা, বানবন্যার কথা। পাঁকাল মাছ। পাঁকাল মাছের পেটে এখন অবশ্য ডিম নেই আর। পাওয়া যায় কদাচিৎ। তবে রাণীচক বাজার জায়গা—রোজ মেছুনীরা নানারকম মাছ নিয়ে আসে। কিন্তু রুই-কাতলা তো মাছের সেরা লীলার তিনটে পুকুর আছে। মাছ আর ঠাসা। যেটা সুখেন খাচ্ছে, তার ওজন ছি

সাড়ে সাত সের। আধেকটা পড়শীদের বলিয়ে দিয়েছে। অত কে খাবে?

সুখেনও তার নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলছিল একই স্বরে। প্রেস একটা কিনেছে অবশ্যি। কিন্তু নগদ দামে নয়। কিস্তিতে। মফস্বল শহরে তো ফ্ল্যাট-মেশিনের কাজ বেশি একটা হয় না। ট্রেডলেই চলত। একটা ঝকমারি হয়ে গেছে। তবে সরকারী কাজের চেষ্টায় আছে। পেলে ফ্ল্যাটের সুরাহা হয়। আবার সেদিকেও বিপদ আছে। মধ্যে মধ্যে ওটা খারাপ হয়ে যায়। মেরামত করতে মোটা টাকা খসে পড়ে তার। সরকারী কাজ নিয়ে শেষে তেমন একটা কিছু ঘটে গেলে দারুণ লোকসান খেতে হবে।

লীলা বলল, একা মানুষ, তায় মেয়ে। লোকে গ্রাহ্য করে না মোটে। বিলের ওদিকে কিছু জমি আর জলকর নিয়ে কুতুবপুরের মুসলমানদের সঙ্গে ঝামেলা চলছে। আমরা আবাদ করলে ওরা লাঙ্গল-মই চালিয়ে ফের ধান পোঁতে। তখন ফের আমাদের লোকেরা তা নষ্ট করে দেয়।.. এই বলে লীলা খিলখিল করে হেসে উঠল।

সুখেন বলল, সম্পত্তি রাখার বড় ঝঞ্ঝাট। ভাগ্যিস আমি জমি-জায়গাওলা লোক নই! তুমি হয়েছ, তুমি বুঝছ!

লীলা কেমন হাসল।...ঝঞ্ঝাটে সুখ আছে। কারুর কাছে তো হাত পাততে হয় না!

সুখেন ঢক-ঢক করে জল খেয়ে উঠে পড়ল।

ওকি? উঠলে যে? বস। বাসিনী, পায়েস দে।

সর্বনাশ। পেটে আর তিল ধারণের জায়গা নেই যে!

খাবে না তাহলে?

নাঃ।

ঘন্টা, ওকে হাত ধোবার জায়গাটা দেখিয়ে দে। আলো নে সঙ্গে। আছাড় খাবে।

হাতমুখ ধুয়ে সুখেন ভাবছিল, এবার কী করা উচিত। লীলা বারান্দা থেকে বলল, এই ঘরে তোমার বিছানা দেওয়া হয়েছে।

যাক, বাড়ির ভিতরে আশ্রয় মিলেছে তাহলে। সুখেন সিগ্রেট ধরিয়ে আকাশ দেখতে থাকল।

লীলা বলল, হিম পড়ছে—বারান্দায় এস।

বারান্দায় এখন দুজনে একা। সুখেন একটা চেয়ারে বসল। তারপর বলল, এখানে এসে অব্দি আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেছি লীলা? সত্যি, ভাবতেই পারছিনে, তুমি সেই রাণীচকের......

লীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শোও গে য্যাও। রাত হয়েছে।

সুখেন ঠোঁট কামড়াল। মরীয়া হয়ে বলল, আমাকে ডেকেছ কেন, এখনও জানতে পারলাম না কিন্তু।

সে হবে'খন। বলে লীলা উঠোনে নামল। বাসিনী, দুধটা জ্বাল দিয়ে রেখো আরেকবার। সকালে চা হবে—তখন দুধ পাবো কোথায়?

বাসিনী বলল, উনোনেই তো চাপিয়ে রেখেছি। তা, দাদাবাবু একটু দুধও খাবেন না নাকি?

খাবে না। পায়েস খেল না তো! লীলা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, নাকি খাবে?

সুখেন শুনে না শোনার ভান করে বলল, কী?

দুধ?

নাঃ।

টেবিলে জল ঢাকা দেওয়া আছে, দেখো। হাতপাখা...ঘন্টার মা, পাখা দিয়েছ তো বিছানায়?

ঘন্টার মা শুয়ে পড়েছিল। হয়ত ঘুমের ঘোরেই বলল, দিয়েছি।

বিছানায় শুয়ে অস্থির সুখেন তবু সারাটি রাত প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করছিল লীলার। দরজা সে ভেজিয়ে রেখেছিল মাত্র। একটু শব্দেই সে চমকে উঠছিল। অজস্র সিগ্রেট খাচ্ছিল। তবু লীলার কোন সাড়া নেই।

কেবল পুরনো তক্তাপোষের, যেন মগজের মধ্যে ঘুণপোকার কুরে কুরে খাওয়া গভীর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

না, আছে। সময়ের শব্দ। মাথার নীচে বালিশের তলায় হাতঘড়িটায় নিরবচ্ছিন্ন টিক টিক টিক টিক টিক...ধারাবাহিক।

আর জানালার ওধারে গাছের পাতা থেকে বুঝি শিশির ঝরে পড়ার শব্দ টুপ টাপ টুপ টাপ টুপ টাপ...অন্তহীন।

সুখেন নিজের মড়ার শিয়রে বসে রাত কাটাচ্ছিল। লীলা—সেই কামার্ত নাগরী ব্যাভিচারিণী যুবতী এখন যখের খপ্পরে পড়ে গেছে হয়ত। সম্পদের সনাতন যখ তার দেহকে, তার দেহের সকল ইচ্ছা ও তৃষ্ণাসমেত বলি দিয়ে হাতের মুঠোয় নিয়েছে আত্মাটা। চারপাশে সে বলির রক্ত ছাড়া কিছু নেই।

আর হতবীর্য ক্ষুধার্ত একটা নেড়ীকুত্তা মহাবলির হাঁড়িকাঠের চারপাশে ছড়ানো রক্ত শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুখেন নিজেকে গাল দিচ্ছিল, কুকুর, আমি শালা একটা নিতান্ত কুকুর। আমার একটা শিক্ষা পাওয়ার দরকার ছিল।

সত্যর মত ভালো ছেলে নিরীহ সং-স্বামী, কম দুঃখে লীলাকে ত্যাগ করে পালায় নি! সত্যর দুঃখটা যেন বুঝতে পারছে সে—সুখেনের মনে হচ্ছিল একথা।

ক্রমশঃ

উপদেশ

দুর্লভ চক্রবর্তী

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, এমন কী জিনিস আছে যা নিজে শুনতে ভালো লাগে না, কিন্তু অন্যকে শোনাতে ভালো লাগে, তবে আমি নির্ভয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করব এই লেখাটির শিরোনামের দিকে। সত্যি, আট বছরের বালকই বলুন, আর আশি বছরের বৃদ্ধই বলুন, উপদেশ শুনতে কেউই পছন্দ করেন না। অথচ সুযোগ পেলে সকলেই অন্যকে তা শুনিয়ে থাকেন।

উপদেশের একটি সুপ্রাচীন উদাহরণ পাওয়া যাবে বাইবেলে, যেখানে ঈশ্বর প্রথম মানব আদমকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু সকলেই জানেন, আদম সে পরামর্শে কান দেন নি। —কেন জানেন? নেহাৎই সেটা এই কারণে যে উপদেশ শোনা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। আদমের পর থেকে তার বংশধরদের মধ্যে কেউই কখনো পরের কথায় কান দেয় নি। আর তা দেয় নি বলেই মনুষ্য সমাজের ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে এবম্প্রকার।

ধরুন মহাবীর সেকেন্দার শাহের কথা। তার শিক্ষাগুরু ছিলেন মহামতি আরিস্টটল। শিল্প-সাহিত্য ও দর্শনের বিষয়ে যেমন, তেমনি যুক্তিসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তাতেও তিনি ছিলেন দিকপাল পণ্ডিত। তাঁর ছাত্র সেকেন্দার, অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারকে নিশ্চয়ই তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন বিস্তর—সৎচিন্তা আর সৎকর্মের জন্যে। কিন্তু আলেকজাণ্ডার কি তাঁর উপদেশে কান দিয়েছিলেন? দিলে তিনি নিশ্চয়ই যুদ্ধপিপাসায় মত্ত হয়ে ছুটে বেরোতেন না দিগবিজয়ে, আর ইতিহাসের গতিও অন্য খাতে বইত।

কিম্বা ধরা যাক একালের কথাই। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নানা সমস্যাই ঘনিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, আর মহামান্য পোপ প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রবল পক্ষের কাছে উপদেশ দিয়ে সুসমাচার পাঠান। কিন্তু তাঁরা কি সেই সব বদান্য উপদেশ কানে তোলেন? এ প্রশ্নের জবাবে দুঃখের সঙ্গেই জানাতে হয়—না, প্রায় সকলেই পোপের উপদেশ মাথায় ঠেকিয়ে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখেন এবং অকুতোভয়ে নিজের কাজ করে চলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উপদেশ দেওয়া এবং উপদেশ না শোনা দুটোই মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। মানব চরিত্রের এই যে পরস্পর-বিরোধিতা এর সব থেকে ভালো উদাহরণ পাওয়া যাবে সাহিত্যে—কেন না এক হিসেবে বলা যায়, সাহিত্য হল মানব-চরিত্রের ল্যাবরেটারি। অর্থাৎ জীবনে যা সময় সাপেক্ষ একটা গোটা জীবন ধরে প্রতিদিন বেঁচে বেঁচে যা দেখতে হয়, তা সাহিত্যে মাস কয়েকের মধ্যেই লিখে ফেলা যায় এবং ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই তা পড়াও যায়। তাছাড়া জীবনে যা ঘটে না কিন্তু ঘটতে পারে। সে সব সম্ভাবনাও আমদানি করা যায় সাহিত্যে, আর চতুর্দিকের কার্য-কারণগুলিকে কমিয়ে বাড়িয়ে কন্ট্রোলও করা যায়—যা করা যায় ল্যাবরেটারিতে। কাজেই মানুষের আসল স্বভাবের তত্ত্ব তালাশ নিতে গেলে উঁকি দিতে হবে সাহিত্যের দরবারে। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমরা কী দেখি? ধরা যাক রামায়ণের কথা। সীতাকে হরণ করে আনার পর রাবণকে উপদেশ দিয়েছিলেন বিভীষণ ফেরৎ দেবার জন্যে। রাবণ তাঁর পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছিলেন, উপরন্তু লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। কিন্তু সেই রাবণই তাঁর মৃত্যু সময়ে কী করেছিলেন? রামকে কি তিনি নিজেই দেননি রাজনীতির বিষয়ে বেশ নাতিহ্রস্ব একটি লেকচার?

আবার ধরুন মহাভারতের দৃষ্টান্ত। ভীষ্ম মহাভারতের একটি প্রধান চরিত্র। তাঁর নাবালক ভাই, ভাইয়ের ছেলে আর নাতিদের আমলে বহুদিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বলতে গেলে কুরু রাজ্যের অধীশ্বর, তার প্রধান শাসনকর্তা। অথচ তিনি কখনো সিংহাসনে বসেন নি, সংসারও করেন নি। তাঁর বীরত্ব, ত্যাগ এবং প্রাজ্ঞতা তুলনাহীন বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। তিনি সুযোগ পেলেই দুর্যোধনকে সুপরামর্শ দিতেন। আর শেষ সময়ে তো গোটা অনুশাসন পর্ব ধরেই নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। কিন্তু দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় তিনি কৌরব-সভায় নিষ্ক্রিয়ভাবে নতশিরে বসে ছিলেন কেন, কেনই বা তিনি গিয়েছিলেন বিরাট রাজার গোধন অপহরণ করতে? ভীষ্মের চরিত্রের সঙ্গে এ দুটি ঘটনাকে ঠিক মেলানো যায় না। এবং তা যায় না বলেই, আমি সবিনয়ে নিবেদন করব, ভীষ্ম এমন জীবন্ত মানুষ। না হলে তিনি হয়তো হতেন দেবোপম চরিত্র, প্রায় বিদুরের মতো, কিন্তু বিদুরের মতোই হতেন নাকি মানুষ হিসেবে কিছুটা নিষ্প্রভ!

এ থেকেই উপদেশ বিষয়ে একটা নতুন সূত্র পাওয়া যাচ্ছে তাহলে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, উপদেশ হল সেই বস্তু যা সামনে থাকে একটা আদর্শের মতো। সেখানে যে পৌঁছানো যাবে তার কোনো কথা নেই—বরং, তা যাবে না এইটেই বলা যায় প্রায় সাধারণ সত্য, কিন্তু সুদূরের সেই নিরিখটা সামনে থাকে বলেই মানুষ এগিয়ে চলতে পারে। ধরুন, এ লেখাটার গোড়ায় যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি সেই আদমের উদাহরণ। ঈশ্বরের উপদেশ কানে না তুলে আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল, এ একটা মস্ত বড় কথা। কিন্তু তার চেয়েও কি বড় কথা এটা নয় যে, ঈশ্বরের উপদেশ বুকে নিয়ে মানুষই আবার চেষ্টা করে যাচ্ছে স্বর্গের অধিকারকে ফিরে পাবার?

অবিশ্যি এ সব হল খুবই গূঢ় স্তরের কথা। সাধারণ মানুষ এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। ছোট বড় সব রকম উপদেশ শুনলেই চটে যায় সব রকম মানুষ এবং তার ফলও হয় তদনুরূপ।

যেমন হয়েছিল হ-বাবুর বেলায়। তিনি প্রৌঢ় মানুষ, অধ্যাপক। কর্মজীবনের অভ্যাস বশে যুবক দেখলেই লেকচার, অর্থাৎ কিনা উপদেশ দিয়ে থাকেন। একবার শীতকালের এক সন্ধ্যায় জনৈক উঠতি যুবককে ফিনফিনে একটি আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরোতে দেখে তিনি তাকে র‍্যাপার নিতে বলেছিলেন। তার জবাবে যুবকটি যেতে যেতে পিছন ফিরে তাঁকে বলেছিল 'মশাই কি তেলের এজেন্ট, নাকি নিজেরই ঘানির ব্যবসা আছে? তেল যদি বেশি হয়ে থাকে তো নিজের চরকাতেই দিন না!'

এ ঘটনার মর‍্যাল বোধ করি এই যে, উপদেশ জিনিসটি ভালো, কিন্তু অপাত্রে উপদেশ দিলে পাল্টা উপদেশ শুনতে হয়।

অপরাজিতা

এলা গুহ

পাহাড় দেখতে দেখতে ক্লান্তি ধরলে রীণা একবার স্টেশনে ঘুরে আসে। এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস। প্রায় এখানে আসার পর থেকেই। এই মফস্বল শহরে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। ভেবেছিল, পড়াশোনা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেবে। খুব বেশি অসুবিধা হলে বসে বসে পাহাড় দেখবে আর লিখবে। সময় তাতেই একরকম কেটে যাবে।

কিন্তু পাহাড় এখন তার মনে চেপে বসেছে। দু' পাশের পাহাড় যেন তাকে পিষে ফেলছে। প্রতিমুহূর্তে একটা ভয়ানক অস্বস্তি তার মনে দাপাদাপি করে বেড়ায়। আর তখনি সে বেরিয়ে পড়ে। স্টেশনের ছোট্ট প্লাটফর্মটা আনমনে পায়চারি করে। ট্রেণ আসা, যাত্রীদের ব্যস্ত ওঠানামা দেখতে দেখতে সময়টা নেহাৎ মন্দ কাটে না, তারপর গার্ডের সবুজ নিশানের সংকেত পেয়ে

হুইশিল বাজিয়ে হেলেদুলে বেগবান গতিতে ট্রেনটা ছুটে চলে। নিজের ব্যথায় আরো বেদনাতুর হয়ে রীণা ফিরে আসে। ফেলে-আসা জীবনের কথা টুকরো টুকরো হয়ে ছায়াছবির মত ওর সামনে ভেসে বেড়ায়।

সেবার কলেজে সরস্বতী পুজোর সমস্ত দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিয়েছিল রীণা আর অঞ্জন। দুজনেই ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। পড়াশোনায় সুনামও যথেষ্ট।

পুজোর পর সবাই বাড়ি ফিরছে। রীণা গেটের কাছে আসতেই অঞ্জন হো হো করে হেসে ওঠে. ইস, এত বেশি কাজ করেছেন যে, মুখে তার চিহ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরছেন?

—কেন? মুখে কি হয়েছে? রীণা ডাগর চোখ মেলে প্রশ্ন করে।

—না, এমন কিছু নয়। নিন মুখটা মুছে ফেলুন। পকেট থেকে রুমালটা বের করে এগিয়ে দেয় অঞ্জন।

—আমার রুমাল আছে। গম্ভীর হয়ে মুখটা মুছে ফেলে রীণা।

—এই এখানে আছে। বলে অঞ্জন নিজেই মুছে দিল।

রীণা অপ্রস্তুতের একশেষ।

বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে বসে ওর কথাই ভাবছিল রীণা। এতদিন চোখে চোখ রেখে হাল্কা হাসির মাঝে একই কলেজের ছাত্রছাত্রীর পরিচয়ের সীমাটুকুই তাদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আজ কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল। যেন এক ঝলক দুরন্ত হাওয়া হঠাৎ মনে দোলা লাগিয়ে আবার সরে গেল। কি সুন্দর ওর হাসি আর কপাল মুছিয়ে দেওয়ার ভঙ্গি। রীণা মনে মনে লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে এমনি করে ওদের পরিচয় গভীর অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়।

অঞ্জনকে মনে ধরে রীণার বাবা অনাদি-বাবুর। আবার ওদিকে রীণাকে বাড়ির বউ করার জন্য ব্যাকুল হন অঞ্জনের বাবা শেখর-বাবু। উভয়েই উভয়ের বাড়িতে বিশেষ ঘনিষ্ঠ। মনে তাদের অনেক সাধ, অনেক কল্পনা।

রীণা এম, এস-সি পাশ করেছে। বসে আছে বাড়িতে। এমনি সময় অঞ্জন এক সন্ধ্যায় রীণাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। হাতে ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষার রেজাল্ট।

চাঁদনী রাতে সেতার নিয়ে বসে কি সুর তুলবে ভাবছিল রীণা। এমন সময় তার সামনে কি যেন এসে পড়লো। উঠিয়ে দেখে দুটি গন্ধরাজ শক্ত সুতোয় বাঁধা। ভারি মিষ্টি গন্ধ। এদিক-ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ে পেছনে দাঁড়িয়ে অঞ্জন মুচকি হাসছে।

—চোর কোথাকার। এমন ভয় পেয়েছি। কতক্ষণ এসেছ?

—এসেছি অনেকক্ষণ। রীণার দু কাঁধে হাত রাখে অঞ্জন।

পরীক্ষায় পাশ করলাম। এবার একটা চাকরি দেখতে হবে।

—তারপর? রীণা অঞ্জনের আরো ঘনিষ্ঠ হয়।

—বিলেতে পাড়ি জমাব ভাবছি। কিন্তু ততদিন তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তো?

—তোমার পথ চেয়েই আমি বসে আছি কতদিনে না মিলনের মহালগন আসে। মিষ্টি হাসে রীণা।

অঞ্জন রীণাকে গভীর আবেশে বুকের মাঝে টেনে নেয়।

অঞ্জনের বাবা এদিকে স্থির করেন বিলেত যাবার আগেই ছেলের বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলবেন। সেই অনুযায়ী তিনি কথা বলেন অনাদিবাবুর সঙ্গে। দিনক্ষণ ঠিক হয়। আশীর্বাদ হয়ে যায়। কিন্তু সেদিন থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন রীণার মা। তিন দিনের দিন তিনি সকলের মায়া কাটান।

অনাদিবাবু ভেঙে পড়েন, রীণাও নির্বাক। শেখরবাবু ও অঞ্জনের মা এসে ওদের সান্ত্বনা দেন। শেখরবাবু অনাদি-বাবুকে শান্ত করে বলেন, বুঝতে পারি, আপনি এখন ক্লান্ত। কিন্তু জেনে রাখুন, অঞ্জন আমার যেমন আপনারও তেমনি। ওর উপর সম্পূর্ণ দাবী রইলো আপনার। ও বিলেত থেকে ঘুরে এলেই আমি নিজে এসে মাকে নিয়ে যাব।

অঞ্জনের বিলেত যাবার পর তিন বছর কেটে যায়। কিন্তু ওদের সম্পর্কে কোথাও ভাটা পড়ে নি। কত সুন্দর করে দুজন দুজনকে চিঠি দিয়েছে। একজনের মনের কথা আর একজনকে জানিয়েছে। অঞ্জন মাঝে মাঝে ঠাট্টা করেছে রীণাকে, চলে এসো না এখানে।

রীণাও দুষ্টুমিভরা হাসিতে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে, হ্যাঁ, কাছে গিয়ে ভবিষ্যৎটি নষ্ট করি আর কি?

ইতিমধ্যে অনাদিবাবু শিলংয়ে বদলী হলেন। রীণা শিলংয়ের কথা অঞ্জনকে জানায় কিন্তু কোন জবাব নেই।

রীণা পুরনো চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করে আর ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্টায়। ব্যগ্র হয়ে সুপ্রিয়র কাছে চিঠি লেখে রীণা। জবাবে সুপ্রিয় জানায়, অঞ্জন ইতিমধ্যে একবার কলকাতা ঘুরে গেছে। রীণার খোঁজ করে-ছিল, কিন্তু সুপ্রিয় জানাতে পারে নি। আবার তাকে চলে যেতে হয়েছে বছর দুয়েকের জন্যে।

রীণা নির্বাক। সে ভাবে, অঞ্জন হয়ত ধরে নিয়েছে রীণা চিরাচরিত নারী চরিত্র। প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। অনাদিবাবু ব্যস্ত হন, অঞ্জনের খবর কিছু পেলি মা? রীণা সুপ্রিয়র চিঠি দেখায়।

মনে মনে নিজেকে অপরাধী ভাবেন অনাদিবাবু। কলকাতা ছাড়ার আগে অঞ্জনের বাবার সঙ্গে দেখা করে ঠিকানা না জানিয়ে আসায়ই এই বিপর্যয়। তিনি অঞ্জন রোধের চেষ্টা করেন। রীণা বাদ সাধে।

ভগ্নহৃদয় অনাদিবাবু মারা যান।

এবার রীণা প্রাণপণ চেষ্টা চালায় অঞ্জনকে ভুলতে। স্কুলে চাকরি নেয়। শনি ও রবিবার বাড়িতে মেয়েদের সেতার শেখায়। এ কাগজে সে কাগজে লেখা পাঠায়। ছাপা হয়। প্রশংসা। বুকের ভার অনেকটা হাল্কা হয়। তারপর এই বদলির

নিয়ে আসে। কতকগুলো বছর পেরিয়ে যায়।

অতীত স্মৃতির জাবর কাটতে কাটতে আজও আনমনে স্টেশনের পথে হাঁটছে রীণা। ওয়েটিং রুমে এক সুন্দরী মহিলাকে দেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় সে।

—আপনি বুঝি এই ট্রেনেই এলেন?

—না, আমরা অপেক্ষা করছি পরের ট্রেনের জন্যে। মিষ্টি হাসে মেয়েটি।

—আমি এখানকার কলেজে পড়াই। কাছেই আমার কোয়ার্টার। যদি আপত্তি না থাকে চলুন না কিছুক্ষণ বসে আলাপ করা যাবে।

—তা মন্দ নয়। তার আগে আপনাকে আমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

পাশেই স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। মুখটা ঢাকা থাকায় ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

—অঞ্জন, এর সঙ্গে এইমাত্র পরিচয় হলো। ইনি বলছেন বাকী সময়টা ওঁর কোয়ার্টারে কাটিয়ে আসতে।

ভদ্রলোক মুখ থেকে কাগজটা সরিয়ে সিধে হয়ে বসেন।

রীণা অবাক। অঞ্জন বিস্মিত।

দুজনের কেউ অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। কাছে দাঁড়িয়ে সেই সদ্যপরিচিত মেয়েটি।

—রীণা। অঞ্জন গভীর স্বরে ডাক দেয়।

—অঞ্জন। রীণার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ মনে হয়। কুলির পিঠে মালপত্র চাপিয়ে রীণাকে অঞ্জন কোয়ার্টারের পথ দেখাতে বলে। — রীণা এসো।

রীণা সদ্যপরিচিত মেয়েটির এই নামসাদৃশ্যে আর একবার চমকায়।

—তোমাকে ভুলতে পারি নি বলেই ওর এই নাম। অঞ্জনকে কি রকম করুণ দেখায়।

নতুন পরিচিত রীণা এবার নিজে থেকেই বলে, আপনার কথা ওর কাছে অনেক শুনেছি। আমার দেশ বোম্বে। লণ্ডনেই পড়াশোনা করেছি। আমার মেরিণা নামকে রীণা করে অঞ্জন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছে। কথা বলতে বলতে ওরা ততক্ষণে কোয়ার্টারে পৌঁছে গেছে। অঞ্জনই আবার কথা বলে, তোমার লেখা কাগজে পড়েছি। কিন্তু ঠিকানা খুঁজে পাই নি। আর আমার মা-বাবাও কলকাতার বাইরে আছেন দীর্ঘদিন। তাই তোমার সঙ্গে আমার সব যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আজ আবার ভগবানের দয়ায় আমাদের দেখা হল।

রীণা ম্লান হাসে। নতুন রীণাকে ভাল করে দেখে। অঞ্জন টেবিলের ওপর স্ট্যাণ্ডটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই বেরিয়ে পড়ে সুতোয় বাঁধা দুটো গন্ধরাজ ফুল। বিস্মিত অঞ্জন কোনক্রমে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে আসে রীণার কাছে। সে অঞ্জনকে ধরতে যায়। তার আগেই গভীর আবেগে রীণাকে বুকে টেনে নিয়েছে অঞ্জন। রীণা গভীর স্বস্তিতে মাথা রাখে অঞ্জনের বুকে।

বারান্দা থেকে ওদের মিলন দৃশ্য উপভোগ করে মেরিনা।

রাজধানীর ইতিকথা

নিমাই ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা পড়লে, মাঠে-য়দানে নেতাদের (কংগ্রেস-অকংগ্রেসী) ষণ শ্নুনলে, পাড়ার রকে বা মোড়ের চায়ের কানের বা অফিসে বা লোক্যাল ট্রেনের মরায় কানটাকে একটু সতর্ক করলেই শ্চিম বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মাতৃসুলভ মনোভাবের অনেক খবর পাওয়া বে। এই বিমাতৃসুলভ মনোভাবের কারণ ম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন, ঙালীর মাথায় শ্নুধ্নু ব্রেন আছে বলে ন্টার দাবিয়ে রাখতে চায়। কেউ বলেন, ঙালীরা বেশী পলিটিক্স করে, আন্দোলন রে বলে সেন্টার বাঙালীকে শ্নুকিয়ে রতে চায়। আবার কেউ বলেন, ই ক্যাপিটালিস্টদের চক্রান্ত। আরো নেকে অনেক কথা বলেন। দ্নু'চারজন বশ্য বলেন, শ্নুধ্নু লীডারের ভাবের জন্য বাংলাদেশের এই দ্নুর্গতি। কিন্ত সুভাষ বোস বা শ্যামাপ্রসাদ, দেখতেন ন্টার বাপ বাপ বলে...।

এই মুনিদের মতামত নিয়ে বাদানুবাদ রার প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় সরকার যে ংলাদেশের প্রতি বিশেষ সদয় নয়, একথা র্জনবিদিত। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় ঠতে-বসতে দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশ ধায় ও কেমন করে অবহেলিত হচ্ছে। ন্তু আমাদের দ্নুর্ভাগ্য, সাড়ে তিন কোটি ঙালীর দ্নুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের নেতারা সব খবর রাখেন না বা জানেন না বা জানতে ন না।

একথা সবাই জানেন ও বিশ্বাস করেন য, আমেরিকা বা রাশিয়ার মত ভারতের অপরিসীম ঐশ্বর্য নেই। ভারত সরকারেরও র্থ ও সামর্থ্যের একটা সীমা আছে এবং মস্ত রাজ্যই তাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের ন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বদাই বিব্রত রে। সমস্ত দেশ জুড়ে এমন চাহিদা ও য়োজন যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের ত্তেক কোন রাজ্যই পুরোপুরি সুখী বা ন্তুষ্ট নয়। সুতরাং যে যা নিয়ে পারে আর ক!

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা-য়সা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধে নবার কতকগুলো রীতিনীতি কায়দা আছে। নানা পরিকল্পনার জন্য নিত্য-নৈমি-ত্তিক বিভিন্ন রাজ্যের অফিসারদের মিটিং চ্ছে দিল্লীতে। এইরকম একাধিক মিটিং-এর পর ওদের সিদ্ধান্তে শীলমোহর াগাবার পর মন্ত্রীপর্যায়ের মিটিং য়। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর অফি-সার পর্যায়ের মিটিং-এ যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মন্ত্রীদের মিটিং-এ তার বিশেষ কোন রদবদল হয় না বললেই চলে।

অফিসার পর্যায়ের মিটিং-এ পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি আসেন না বললেই চলে। যদিও বা কেউ মর্নিং ক্যারাভেল ফ্লাইটে এলেন তো মিটিং-এ একটা সাইক্লোস্টাইলড্ রিপোর্ট রিডিং পড়েই তিনি বেঙ্গলী মার্কেট থেকে দু' বাকস শোন-হালুয়া আর চাঁদনী থেকে কয়েক জোড়া নাগরা কিনেই কোনমতে হাঁপাতে হাঁপাতে ইভনিং ক্যারাভেল ধরে কলকাতা ফিরে যান। মন্ত্রীপর্যায়ের মিটিং-এ মন্ত্রীমহোদয়ের পোঁ ধরে ডজন ডজন অফি-সার দিল্লী আসেন। ছায়ার মত মন্ত্রীকে অনুসরণ করেন। দেশপ্রেমের ঠেলায় বঙ্গ-ভবনের ড্রইংরুম গরম করে তোলেন এবং অনারেবল মিনিস্টার অফিসারদের অনু-প্রেরণায় হয়ত একটা গরম বক্তৃতাও করেন। কিন্তু ততক্ষণে সব ফক্কা!

অন্যসব রাজ্য সরকার সবসময় খরচ করে অফিসার-পর্যায়ের মিটিং-এ অফিসার পাঠান না। কিন্তু দিল্লীবাসী লিয়াজোঁ অফিসার এইসব মিটিং-এ রাজ্যের দাবী জানান। পশ্চিমবাংলার প্রথম লিয়াজোঁ অফিসারকে কোন কাজ দেওয়া হতো না। লিয়াজোঁ অফিসারকে কাজ দিলে রাইটার্স বিল্ডিংসের অফিসারদের ক্যারাভেল চড়া যে বন্ধ হয়! পরবর্তীকালে বাংলা সরকারের দু' নম্বর ও শেষ লিয়াজোঁ অফিসার যিনি এলেন, তিনি মাসে দু'তিনবার করে ক্যারা-ভেলে উড়ে আসা-যাওয়া করতেন এবং একাদি-ক্রমে আট-ন' দিনের বেশী কোনবার থাকতেন না। কেন? তা জানি না। তবে কানাঘুষো শুনেছি, দশ দিনের বেশী থাকলে দৈনিক রাহাখরচ—ডেইলি এ্যালাওন্স—পাওয়া যায় না।

মহামান্য রাজ্যপাল ধর্মবীর নাকি এই ভদ্রলোকের কর্মনৈপুণ্যে খুশী হয়ে বলেছেন, অনেক কাজ করেছেন, আর দিল্লী যেতে হবে না।

একবার দিল্লী এসে অন্যান্য রাজ্যের লিয়াজোঁ অফিসারদের দেখে যান তাঁরা কি করেন। সারাদিন সরকারী দপ্তরে ঘুরে তাঁরা রাজ্যের নানা কাজকর্ম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ত্বরান্বিত ও সুবিধা-জনক করার তদ্বির করেন। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের এম-পি'দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং প্রয়োজনবোধে এম-পিদের দ্বারা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। আর বাংলাদেশ?

প্রত্যেক রাজ্য থেকেই দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা দপ্তরের জন্য অফিসার পাঠান হয়। এইসব অফিসাররা নানাভাবে ঐ রাজ্যকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। বাংলা-দেশ থেকে যাঁরা এখানে এসেছেন তাঁদের অনেকেই সাহায্যের পরিবর্তে বিরূপ মনো-ভাব দেখিয়ে নিরপেক্ষতার ধ্বজা উড়ান। কেন্দ্রের কোন এক প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে একজন বাঙালী অফিসার বাংলাদেশের যে সর্বনাশ করেছেন, সেকথা তৎকালীন মন্ত্রিমন্ডলী ভুলতে পারবেন না। যেসব বাঙালী মন্ত্রী দিল্লীর তখৎ-এ-তাউস ধন্য করেছেন, তাঁরা বাংলাদেশের জন্য কতটা করেছেন আর অন্য রাজ্যের মন্ত্রীরা তাঁদের রাজ্যের জন্য কি করছেন, তা জানতে হলে একবার পাঞ্জাব বা হরিয়ানা বা গুজরাট বা মহারাষ্ট্র বা মাদ্রাজ ঘুরে আসুন। অবশ্য একথা সত্য যে এসব রাজ্য যে-আশ্চর্যজনক উন্নতি করেছে তার জন্য এই রাজ্যের মন্ত্রী ও অফিসাররা সমানভাবে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। প্রতাপ সিং কায়রন, চ্যবন, কামরাজ কিংবা মোরারজীর পরামর্শে বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীমন্ডলী যে কিভাবে নিজের নিজের রাজ্যের চেহারা পাল্টে দিয়েছেন তা দেখলে
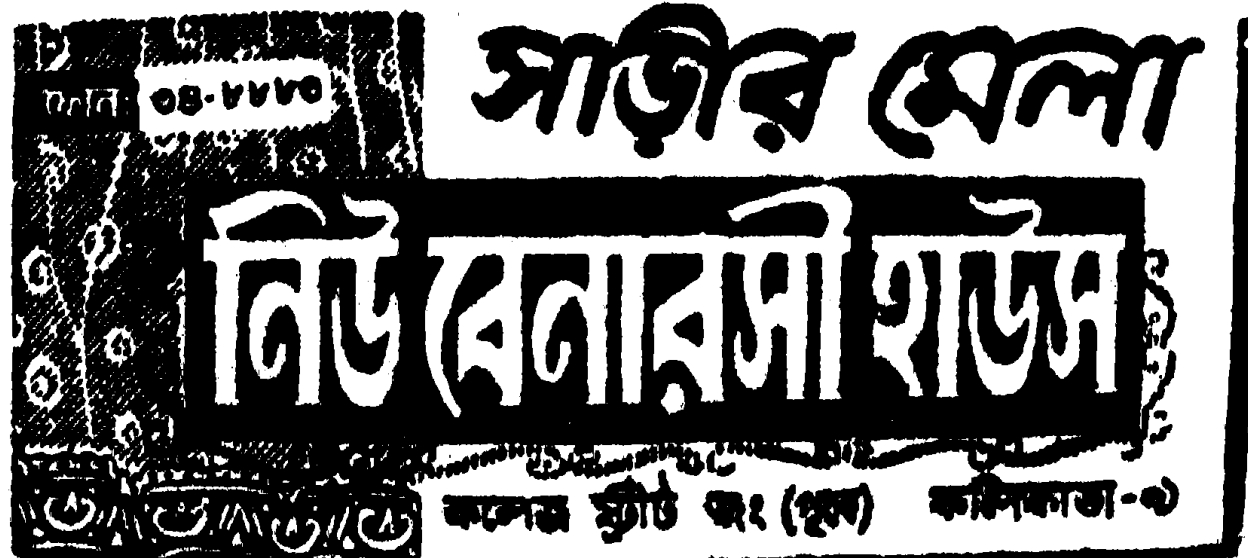
বাংলাদেশের ভূতপূর্ব অনেক মন্ত্রী ও রাইটার্স বিল্ডিংস-এর অফিসারদের মনে অস্বস্তি জাগবে। বাংলাদেশে কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে আর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়াই মহারাষ্ট্রে প্রতি সপ্তাহে এক একটা নতুন কারখানার উদ্বোধন হচ্ছে। বৃহৎ শিল্পপতিদের কারখানা নয়, সমবায় সমিতির মালিকানায় এইসব কারখানা তৈরী হচ্ছে।

যাই হোক দিল্লীর কর্তাদের কাছ থেকে কাজ আদায়ের সবচাইতে বড় ও শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা। অথচ আশ্চর্য বাংলাদেশের নেতারা ময়দানে গলাবাজি করতে জানেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে ড্রইংরুমে প্রেস কনফারেন্স করে বীরত্ব প্রচার করতে পারেন কিন্তু একজোট হয়ে বাঙালী ও বাংলাদেশের কল্যাণে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন না।

দিল্লীতে একটু ঘোরাফেরা করলেই জানতে পারবেন, দেখতে পারবেন মহারাষ্ট্রের কোন পরিকল্পনা বা বিশেষ কোন কল্যাণমূলক কাজের জন্য সেই রাজ্যের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধান প্রধান বিরোধী নেতা সকলেই হাসিমুখে একসঙ্গে কাজ করছেন। গুজরাটের জন্য দেখবেন কংগ্রেস আর স্বতন্ত্র আর মহাগুজরাট জনতা পার্টির নেতারা একসঙ্গে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কেন্দ্রের কাছে দাবী জানাচ্ছেন ও আদায় করছেন। রাজ্যের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে 'ন্যায্য' দাবী আদায়ের জন্য সব রাজ্যের এম-পি'ই একসঙ্গে কাজ করেন। উড়িষ্যা ভবন, মধ্যপ্রদেশ ভবন, আসাম ভবন বা অন্য যে কোন ভবনে যান, দেখতে পাবেন সর্বদলীয় এম-পি'রা মিলেছেন, আলাপ-আলোচনা করছেন, সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তারপর দল বেঁধে চলেছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে।

এ দৃশ্য শুধু দেখতে পাবেন না বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। দশ বছর দিল্লীতে আছি। মনে পড়ে না বাংলাদেশের সমস্ত এমপি'কে একসঙ্গে দেখেছি। বোধহয় একবার ডাঃ রায় সবার সঙ্গে মিলেছিলেন কিন্তু তাও ঠিক মনে পড়ছে না। প্রফুল্লচন্দ্র সেন আসা-যাওয়া করতেন। কদাচিৎ কখনও অতুল্য ঘোষ 'মশাই'এর লনে কংগ্রেসী এম-পি'দের সঙ্গে একটু-আধটু কথাবার্তা বলতেন কিন্তু অকংগ্রেসী? কক্ষনো না। অজয় মুখোপাধ্যায় এসেছেন। বঙ্গভবনে সতরঞ্চি বিছিয়ে ইউনাইটেড ফ্রন্টের এম-পি'দের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু কংগ্রেসী এম-পি? না। আর ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের সাজান বাগান এত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল যে তিনি কিছু করতেই পারলেন না।

আর দিল্লীবাসী পশ্চিমবাংলার এম-পি'রা? ইন্দিরা - চ্যবন - মোরারজীর বাড়ীর সামাজিক অনুষ্ঠানে হীরেন মুখার্জিকে দেখা যায়, দীনেশ সিং-এর ডিনারে ভূপেশ গুপ্তকে পাবেন কিন্তু অতুল্য ঘোষের বাড়ীতে! নৈব, নৈব, চ। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্মদিন যখন অতুল্য ঘোষের ক্যানিং লেনের বাড়ীতে উদযাপিত হয়েছে, ভূপেশ গুপ্তকে নেমতন্ন করা হয়েছে, কিন্তু বাংলার কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময়? কল্পনাতীত। ভূপেশ গুপ্ত, হীরেন মুখার্জি, এন সি চ্যাটার্জি বা অন্য কোন অকংগ্রেসী এম-পি'র বাড়ীতে ভূত দেখতে পাবেন কিন্তু কংগ্রেসী এম-পি দেখতে পাবেন না। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে, যে যুগে কোসিগিন-জনসনের দেখা হচ্ছে, বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সেই যুগে অতুল্য ঘোষ-হীরেন মুখার্জি একসঙ্গে বসে বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন না, একসঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে দাবী জানাতে পারেন না।

বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে যতদিন এ বিচ্ছিন্নতা থাকবে, যতদিন অপরকে শ্র[illegible] করতে পারবেন না, ততদিন ময়দানে বক্তৃ[illegible] দেওয়া যাবে, প্রেস কনফারেন্স করা য[illegible] কিন্তু কেন্দ্রের কাছ থেকে 'ন্যায্য' দা[illegible] আদায় করার স্বপ্ন সুদূরপরাহত। কথ[illegible] বলে, মিসফরচুন নেভার কামস অ্যালোন

[উপন্যাস]

আমি কান পেতে রই

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

।। পুরাবৃত্তের ইতিকথা ।।

এইখানেই এ কাহিনীর শেষ। এই পর্যন্তই বলেছিলেন সুরোদি। এর পরে আর বলবার মতো কিছু ছিল না। অন্তত তখন ছিল না। আর দেখাও হয়নি তাঁর সঙ্গে। তার পরে কি হয়েছে জানি না। লিখলে সবটাই বানিয়ে লিখতে হয়। কী লাভই বা সে চেষ্টা করে? ওঁদের জীবনেরও তো বলতে গেলে ঐখানেই শেষ। ওর পরে আর কীই বা ঘটা সম্ভব ওঁদের জীবনে—যা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে? সে জীবনে ঘটনা বলতে কিছু নেই, প্রতি-দিনকার এক ছাঁচে ঢালা জীবনযাত্রা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যের অনুবর্তন। কোথাও কোন বৈচিত্র্য নেই, পরিবর্তন নেই—তেমন কোন আশাও নেই। চমকপ্রদ আর কিছু, বলবার মতো আর কিছুই ঘটবে না ওঁদের জীবনে।... এক মৃত্যু, দুজনের একজন আগে যাবেন, তা সেও তো অতি সাধারণ, অবশ্যম্ভাবী। বলবার মতো তাতেই বা কি থাকতে পারে?

না, কাহিনী বলতে আর কিছু নেই।

তবে সুরোদি এই প্রসঙ্গে আরও গোটাকতক কথা বলেছিলেন—যাকে 'অফ দা রেকর্ড'স' বলে—জনান্তিকে বলার মতোই। কিরণবাবু তখন ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলেন বলেই বলবার সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু প্রাসঙ্গিক বলে মনে হওয়াতে সেগুলোও এখানে লিখছি।

কিরণবাবুর কথাই বেশী অবশ্য। আসলে নিজের আচরণের একটা কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে বোধহয় অনেকদিন ধরেই ছটফট করছিলেন, এতদিন শোনবার লোক ছিল না—মানে শুনতে চাইবার লোক। সেদিন এই প্রসঙ্গ ওঠায় আমাকে বলে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

বিভার কথাই বলছিলেন। সেইদিনই শেষ হল তাঁর কাহিনী। অনেক রাত হয়ে গেছে তখন। বিভার কথাও তার আগে বলা শেষ হয়ে গেছে—তার নিজের বলা ঐ কথা-গুলো সুদ্ধ। বলতে বলতে লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে—আর বোধহয় কিরণবাবুর জন্যে দুঃখে—গলা বুজে এসেছিল তাঁর। কিন্তু এই পরের কথাগুলো যখন বলেন আমাকে, তখন সামলে নিয়েছেন অনেকটা। সামলে নিয়েছেন বলেই বোধহয় বলতে পারলেন। বুদ্ধিমতী মহিলা—বুঝেছিলেন যে এ প্রশ্ন আমার মনেও উঠবে, উঠেছে হয়ত তখনই—ভবিষ্যৎ কালেও, যদি সত্যিই এ কাহিনী লেখা হয়, আরও অনেকের মনেই উঠবে। সেই জন্যেই আরও বলেছিলেন।

'সেদিন যে বিভাকে কোন উত্তর দিতে পারি নি—তার মানে এ নয় যে, আমার কিছু বলবার ছিল না। সত্যি সত্যিই আমি একটা পাষাণীর মতোই আচরণ করেছি, নিজের দিকটাই শুধু দেখেছি, ওর দিকটা নয়।... কিন্তু, কথাটা যে ঠিক তা নয়, আমাকে কতকটা নিরুপায় হয়েই ও কাজ করতে হয়েছিল—সে কথা বিভাকে বলে সেদিন কোন লাভ হত না, সে বুঝত না।... কেউই বুঝত না হয়ত। শুধু ও বোঝে, —আমাদের কিরণবাবু। হয়ত তুই বুঝতে পারিস—বইটই লিখতে শুরু করেছিস, মানুষের মনের কথা তো তোদের বোঝবার কথা।... তবে এ এমনই একটা জিনিস—আমিই বোঝাতে পারব কিনা সন্দেহ। স্বার্থপর তো বটেই, সবটা জড়িয়ে দেখলেও —স্বার্থপরের মতোই কাজটা হয়েছে—কিন্তু লোকে যতটা ভাবে ততটা নয়।'

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে জপ করলেন সুরোদি, তারপর বললেন, 'ঠিক ধরে রাখব বলেও ওকে ধরে রাখিনি। চিরদিন রাখব তো না-ইই, বেশীদিনও রাখব না, এই কথাই মনে ছিল। কিন্তু আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, এই করতে করতে —মানে ঠিক একদিন একদিন কি, তা নয়, তোকে বলছি কথার কথা—এই শিগ্‌গিরই ছাড়ব, এই কটা মাস বাদে—এমনিই ভেবেছি। আবার সেই কটা মাস পরেও ভেবেছি আর দুটো মাস পরে ঠিক পাঠিয়ে দেব—এমনি করেই মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে গেছে। ছাড়া আর হয়ে ওঠে নি। আসলে এখানে এসে একেবারে আতান্তরে পড়েছিলুম। গুরুবাক্য অমান্য করে এসেছিলুম, মার নিষেধ শুনি নি, তখনও যৌবন ছিল তো—অল্প বয়সের অহংকারে মনে করেছিলুম—খুব থাকতে পারব একলা, ঠাকুর তো রইলেনই, ওঁর সেবা করব ওঁকে নিয়েই থাকব—উনিই দেখবেন। বিশেষ তীর্থস্থান, সাধনভজনের জায়গা—ভয়টা কি?

'কথাটা কি—কলকাতাতেই চিরদিন মানুষ, কটা লোকই বা দেখেছি, কীই বা চিনি জগৎটাকে! এখানে এসে মানুষের যে চেহারা দেখলুম—তাতেই ভয় হয়ে গেল বড্ড রে! না না, চোরডাকাতের কথা বলছি না, সে ভয় তো ছিলই, আজও আছে—সে আর কিরণবাবু থেকেই বা কি করতে পারত—এ অন্য ভয়। তীর্থস্থান আমার মাথায় থাকুন, ব্রজধামের নিন্দে করছি না, ব্রজবাসীদেরও না—এখানকার মানুষ কারা, যাদের সঙ্গে লীলা করতে আমার গোবিন্দ এসেছিলেন—তারা লোক খারাপ নয়, তাদের জন্যেই বলতে গেলে টিকে ছিলুম সেদিন—টিকে থাকতে পেরেছিলুম।... তবে ঐ মোহান্তরা, ওঁদের ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ!'

বলেই সামলে নিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, 'অবিশ্যি সবাই নয়, জপের মালা হাতে—তিনকালও নয়, সাড়ে তিন কাল গিয়ে আধ কাল ঠেকেছে—মিছে কথা বলব কেন, সাধুসন্তও আছেন বৈকি, মোহান্তদের মধ্যেও কি সবাই খারাপ, তাও না—আর, কী জানিস, বলাও শক্ত, রাধামাধব গোস্বামীকে দেখেছি, খুব নামডাক, একলাখী গোঁসাই নাম তাঁর—এক লাখের ওপর নাকি শিষ্য—কিন্তু তাঁকেও দেখেছি রাত নটার পর আলো হাতে লাঠি হাতে চাকররা তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এক শেঠানী শিষ্যার কাছে, সেইখানেই নাকি নিত্য সেবা নিতে যেতেন তিনি। এখনও নাকি যান নিয়মিত। এখন বোধহয় নব্বুই বছর বয়স হল, আমি যখন থেকে দেখছি তখনও তাঁর বয়স কম না—কিন্তু কি করবেন, শিষ্যার গুরুসেবা করার সাধ, দীর্ঘদিন ধরে যাচ্ছেন, আগে যেতেন শোকাতাপা সদ্যবিধবা শেঠানীকে উপদেশ দিতে, সান্ত্বনা দিতে, আগলাতে—অল্প বয়স অনেক পয়সা সে শেঠানীর—এখন যাচ্ছেন অভ্যেসে।... তার মধ্যে যে অসৎ কিছু ছিল সেদিনও—তাই বা বলি কি করে, সে বয়স কি সেদিনই তাঁর ছিল?... তবে কতকগুলি মোহান্ত—নমস্কার তাঁদের। সেদিন তোর ঐ লেখাটায় দেখছিলাম না, কী একটা ইংরিজী কথা তুলে দিয়েছিস,—ইংরিজী বুঝিনি তবে তার বাংলা যেটা করে দিয়েছিস ভারী ভাল লেগেছিল সেটা—যে গির্জের যত কাছে আসে, ততই ভগবান থেকে দূরে সরে যায়। খুব খাঁটি কথা!'

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মালা ঘোরাবার পর বললেন, 'মার নিষেধ, মাসীর নিষেধ তখন ভাল লাগে নি, দর্পভরে বলে এসে-

ছিলুম; ভগবানকে নিয়ে থাকব, তাঁর সেবা করব, তাঁকে সন্তানরূপে পাব—এই চিন্তাই মনে ছিল। এখানে এসে কী সব দেখলুম. মন্দিরে মন্দিরে কেচ্ছা, কুঞ্জে কুঞ্জে বেলেল্লাগিরি—কান পাতা যায় না এমন সব কীর্তি! এই বারান্দায় বসে বসেই কত কি দেখেছি। জয় রাধে, কিশোরীমোহন তো সবই জানেন, রাগ করবেন না। কটি বড় বড় মোহান্ত সেবাইৎ ছিলেন. নামকরা গুরুও সব এক একজন—যা পেছনে লেগেছিলেন আমার—সে অবস্থা আজ তোকে বোঝাতে পারব না। তুই ভুল বুঝিস নি ভাই—আবারও বলছি, অনেক সাধুও দেখেছি এখানে, যথার্থ সাধক—সর্বত্যাগী বৈরাগী; এখানে এক—লোকে ঠাট্টা করে বলে বুঝি বেশ্যা তপস্বিনী এয়েছে বৃন্দাবন—তা তেমনি এক এককালের ডাকসাইটে মেয়েমানুষকেও দেখেছি। বারো মাস কুটকুটে খাটো শুই পরে থাকেন, লক্ষ নাম জপ না করে মুখে জল দেন না—সামনে কেউ একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করলেই কেঁদে ভাসিয়ে দেন। আর তা-ই বা কেন, আমার গুরুদেবও তো এখানেই থাকতেন — আনন্দদাদাকেও দেখেছি। এক বাউল আসত মাধুকরী করতে. তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি — তার পায়ের ধুলো পড়লে নরক স্বর্গ হয়ে যাবে এক নিমেষে, এমন সহজ শুদ্ধাভক্তি তাঁর — আবার এদেরও দেখলুম — এই বড় বড় নামকরা গোসাঁইদের। কামিনী আর কাঞ্চন—যে দুটির ওপর আসক্তি বাইরে রেখে ব্রজে আসার কথা—সেই দুটিতেই এ'দের সমান টান, বিষয় আর মেয়েছেলে—এই দুইয়ের জন্যেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমা মায় লাঠালাঠি, খুনোখুনি পর্যন্ত—কী না চলত এখানে! আমার পেছনেও লাগল—একজন নয়—এমনি চার-পাঁচজন। এধারে তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, কিন্তু আমার ব্যাপারে সব যেন এক কাট্ঠা হয়ে গেল।'

বলতে বলতে — বোধ করি পুরনো দিনের সেই সব দুঃস্বপ্ন দেখা দিনগুলো মনে পড়েই—শিউরে উঠলেন সুরোদি, আলোর সেই অস্পষ্ট আড়ালেও সেটা টের পেলুম।

একটু থেমে দিদি আবার বললেন, 'সে যে কী দিন কেটেছে, তোকে বোঝাতে পারব না। এক এক সময় মনে হয়েছে আর বুঝি পারলুম না। গুম খুন করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল একজন, বলেছিল চিহ্ন পর্যন্ত পাবে না কেউ—এমনভাবেই সরিয়ে দেবে। ওদের নাকি সব মাটির নিচে গারদখানার মতো ঘর থাকত, বেশী ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে সেইখানে নিয়ে গিয়ে চাকর-বাকর লেঠেল-বরকন্দাজ দিয়ে বেইজ্জৎ করাত। আমাকেও সেই সব ভয় দেখাত।.. গুণে তো ঘাটও নেই, আমাদের চোখের সামনেই দেখেছি ভীড়ের মধ্যে থেকে অল্প বয়সী বৌ-ঝি উধাও হয়ে যেতে—দ্যাখ দ্যাখ—আর দ্যাখ!...তা যা বলছিলুম বিপদ কি আর এক রকমের। আমার পূজুরী ছেলে—তখন শোভারাম আসে নি, এ বেশ চৌকস—সে আর ঝি তো ভয়ে কাজ ছেড়ে চলে যায়. তাদের সুদ্ধ নানা রকম ভয় দেখাত—এমন দিন গেছে শুধু অন্ন ঘি ছিটিয়ে নিবেদন করা হয়েছে, বলি এই খাও ঠাকুর, যেমন তোমার ব্যবস্থা তেমনি খেতে হবে। রাত্রে শুধু একটু ভুরা চিনি—আর কিছু জোটে নি। ওরা ভরসা করে বাজারে বেরোতে পারত না—আমি কিরণবাবুকে যেতে দিতুম না। ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা দিন-রাত।

'অবস্থা শুনে আমার ব্রজবাসী পাণ্ডা যোগাযোগ করলেন। তিনিই হাট-বাজার পৌঁছে দিতে লাগলেন— তা তাঁর ওপরও কী টাইশ।...শেষে ব্রজবাসী ঠাকুরই গিয়ে আনন্দদাদাকে খবর দিতে — তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন দু-তিনটি গোয়ালা এসে শুতে লাগল কুঞ্জের এই উঠোনে, তারা নাকি নামকরা লেঠেল সব, তাদের নামে সকলে ভয় পায়। আনন্দদাদা বললেন এ নিয়ে থানা-পুলিশ করেও কোন লাভ হবে না। এখানে কেন মথুরায় গিয়ে পুলিশের বড় সাহেবকে জানালেও হবে না. সব নাকি হাতের মুঠোয় এদের। অনেক থানাদার নাকি মাস মাস মাইনে খাবার মত টাকা নেয় এদের কাছ থেকে। তাছাড়া, এ তো সব শাসানি, এর আর নালিশ মোকদ্দমা কি. সাক্ষীসাবুদই বা কোথায়। উড়ো কথা বই তো নয়. কেউ তো এক কলম লিখে শাসায় নি।...তাও, ঐ লেঠেলগুলো শুয়ে থাকত,—তা সত্ত্বেও এক একদিন রাত দুপুরে সদর দরজায় দমাদম লাথি পড়ত একদিন বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবারও চেষ্টা করেছিল। পাড়ার লোক সব ভয়ে কাঁটা—জনপ্রাণীও বেরোত না কেউ. ভয়ে।

বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেলেন সুরোদি, — সম্ভবত ক্লান্তিতেই। কিন্তু মনের মধ্যে হাতড়ে সেদিনকার হারিয়ে যাওয়া কথাগুলোর খেই ধরবার চেষ্টা করছেন। একটু পরে মালটাকে কপালে ঠেকিয়ে থলির মধ্যে পুরে বললেন, 'শুধু কি ভয় দেখানো! লোভও কি কম দেখিয়েছে ওরা? কেউ বলে দু হাজার দোব, কেউ বলে পাঁচহাজার।...সোনায় গয়নায় গা মুড়ে দেবে, হীরে-জহরতে অরুচি ধরিয়ে দেবে—এই সব চার ফেলত। দূতগুলিও ছিল সব তেমনি—ঘুঁটেউলী ঘুঁটে দিতে এসেছে, কাঠওলা কাঠের বোঝা নিয়ে—ফুলউলী ফুল দেয়, এ ছাড়া তো কাউকে ঢুকতে দিতুম না—তারাই এসে কথায় কথায় এটা-ওটা কথার ফাঁকে ফাঁকে বলে যেত. ইশারা-ইঙ্গিতে। আমি হাসতুম মনে মনে। টাকাতেই যদি ভুলব তো এ ফকীরাবাদে মরতে এলুম কেন! সেখানে আমার কি অভাব ছিল টাকার? তা সে যাই হোক,—আরও ... জন্যেই কিরণবাবুকে ছাড়তে পারি নি। বুঝেছি অন্যায় বুঝেছি খুব অবিচার হচ্ছে, সতীলক্ষ্মীর চোখের জলের ... আসছে জন্মে দশগুণে চোখের জলে শোধ করতে হবে—তবু পারি নি। যখনই মনে হয়েছে আমি একা, কেউ নেই—এ শত্রুপুরীর মধ্যে আমি একটা মেয়েছেলে শুধু—পূজুরী বলো, ঐ আহীরগুলো বলো সবাই তো নতুন, অচেনা, কার মনে কী আছে তা কে জানে—তখনই যেন হাত পা ভেঙে এসেছে, বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেছে। তখনই মনকে বুঝিয়েছি অ্যাদ্দিন

যখন গেল তখন আর কটা দিন যাক না—দু মাস চার মাস যাক আরও—তখন জোর করেই পাঠিয়ে দেব।'

তারপর একটু মুচকি হেসে বলেছেন, 'মুখে যতই বলি ভগবান ভরসা, বলার সময়ই কিন্তু মনে মনে একটা মানুষকে উপলক্ষ ঠিক করে রাখি। মানুষের মধ্যেই ভগবান—আমাদের শাস্ত্রেও তাই বলে, সেই জন্যেই ভগবান লীলা করতে মানুষের রূপ ধরেন—আমাদেরও গুরু ধরতে হয়।... আমার বাবা আবার যেখানকার সেবক ছিলেন—ঐ তো বললুম তোকে ঘোষপাড়া—কাঁচড়াপাড়ার কাছে, গঙ্গার ধারে—যাস না একবার,—সেখানে গুরু গোবিন্দ এক ধরা হয়। ও'রা বলেন 'মানুষ', মানুষ মানে গুরু, মানুষ মানে ভগবান। চণ্ডীদাসের পদে আছে সবার উপরে মানুষ সত্য—সে ঐ মানুষই, ও'রা বলেন কর্তা। যে কর্তা, সে-ই মানুষ, সে-ই ভগবান।... তাই আমিও এই মানুষটাকে ছাড়তে পারি নি শুধু ভগবানের ভরসায়। ভগবান দেখবেন—এই বিশ্বাসই থাকা উচিত, থাকেও কারও কারও—কিন্তু আমি পারি নি রাখতে।...তারপর — এমনি করে যখন বছরের পর বছর কেটেছে, পাঁচ-ছ বছর হয়ে গেছে, তখন আর ছাড়া সম্ভব ছিল না। হাতে এখনও মালা রয়েছে—মিছে কথা বলতে পারব না—তখন কিরণবাবুর সঙ্গ আমার অব্যেস হয়ে গেছে, স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে—তখন আর ওকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না।'......

আর একটু থেমে, কেমন যেন লজ্জা লজ্জা গলায় বলেছিলেন, আসল অন্যায় ঐখানটাতেই হয়েছে। বিভা বলেছিল মহৎপ্রাণ মানুষ—ঠিকই, তবু মনে হয় কিরণবাবু আরও বড়। কত যে বড় তা বিভাও বোঝে নি। আজ, তোকে সব কথাই যখন বলতে বসেছি এও গোপন করব না—আজ আমার আপসোসের শেষ থাকে না যখন কথাগুলো ভাবতে বসি। অত বড় একটা লোকের জীবন মাটি করে দিলুম, সেই সঙ্গে নিজেও মাটি হলুম। না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে।

'আসল কথা কি জানিস—অহঙ্কার। ইহজীবনটা অহঙ্কারেই মাটি হয়ে গেলুম। দর্পহারী কিশোরীমোহন পদে পদে সে অহঙ্কার ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন—তবু শিক্ষা হয় নি। বায়নাইয়ের অহঙ্কার ছিল, রাজাবাবুকে দিয়ে সেটা ভাঙলেন; গলার অহঙ্কার ছিল—এক ঢিলে দুই পাখী মেরে তাও ভেঙে দিলেন; এই তো বেঁচে রয়েছি, এমন কিছু অক্ষ্যাম হয়েও পড়িনি, অথচ আজ আর—আমি যে এককালে গাইয়ে ছিলুম—সেকথা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব না। গুন গুন করে গাইতুম তাও ছেড়ে দিয়েছি—গাইতে গেলে গলায় তিন রকম আওয়াজ বেরোয় এক-এক সময়-নিজেরই কানে লাগে। শেষে এই সতীগিন্নি—সেই অহঙ্কারেই অত বড় দিব্যিটা গালা, ওকে দিয়েও গালালো। অথচ আজ—এই নিত্যি দুবেলা ভগবানের কাছে জানাচ্ছি যে, মুক্তি নয় আবার জন্মই দিও—কিন্তু বৈষ্ণবরা যে কারণে জন্ম চায় সে কারণে আমি চাই না। আমি চাই এ জন্মের দেনা আসছে জন্মে যাতে কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে যেতে পারি, ইহজন্মে ওর যে ক্ষতি করলুম, যে দুঃখ দিলুম—সামনের জন্মে যেন প্রাণভরে ভালবেসে, ওর সেবা করে এই ক্ষতি পূরণ করতে পারি! না, রাজাবাবু নয়—তাঁকে ঢের দিয়েছি, ইহজন্মের যা কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিস সব তাঁকে দিয়েছি—রূপ যৌবন ভালবাসা—আমার এত সাধের, এত সাধনার জিনিস আমার গান—সব দিয়েছি। আবার কেন? না রাজাবাবু আর নয়—সামনের জীবনে শুধু এ থাকবে—এই কিরণবাবু। শুনবি—ঐ রাজাবাবুর ছবিটা আমি যমুনায় দিতে চেয়েছিলুম—কিরণবাবু দিতে দেয় নি, বলেছে, না, ও'র জন্যে যখন এতই করলে—তখন একেবারে শেষ করে দিও—চিতেয় নিয়ে উঠো।...তা আমিও বুঝেছি, বলেছি, মন্দ নয়, যেটুকু বাকী আছে, শেষ হয় তাহলেই।......

'অহঙ্কার বৈকি! এই অহঙ্কারেই মাকে আঘাত দিয়েছি, মাসীকে আঘাত দিয়েছি। অথচ কোনটাই তো রাখতে পারি নি। ঠাকুরকেই কি পেলুম? কৈ, সে বিশ্বাস—সে ভালবাসা কৈ? তাঁকে তো কই আজও সন্তানরূপে ভাবতে পারি না, কান্তরূপেও না। যখন সে ভাবে চিন্তা করি, কিরণকে দেখি। এখনও রাস্তা দিয়ে ফুটফুটে ছেলে যেতে দেখলে হাহাকার করে ওঠে মন। পয়সার লোভ তাই বা গেছে কোথায়? মিছিমিছি কতকগুলো লোক-দেখানো ভড়ং করেছি শুধু। পয়সা ঠেলে চলে এসেছি—বাহবা কুড়োবার লোভে। এখনও তো সব যক্ষির মতো আগলে রাখি—কি করে একটা আধলা বাঁচাবো তার চিন্তা করি।...শুনবি মজা? সেই যে গয়না দুটো রেখেছিলুম—কিরণবাবুর ছেলে আর মেয়েকে দোব বলে—সে দুটোও প্রাণ ধরে দিতে পারি নি তাদের বিয়ের সময়। সেই যে প্রথমে এসেই লুকিয়ে রেখেছিলুম চোর-ডাকাতের ভয়ে এই ঘরের দেওয়ালের মধ্যে চোরা বাক্সয়—এখনও আছে। এই তোকে বলতে বলতে মনে পড়ল—ভুল? দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না বলেই ভুল, নইলে এত কথা মনে থাকে, ওটাই বা ভুলব কেন?...এবার সুরেনকে একবার আসতে লিখব অতি অবিশ্যি করে—এলে বুঝিয়ে দোব। নইলে হয়ত ঐখানেই পড়ে থাকবে, কেউ জানতেও পারবে না।'

একটু যেন দম নেবার জন্যেই থামলেন একবার। কিন্তু পরে যখন কথার খেই ধরলেন আবার, গলাটা খুব স্নিগ্ধ শোনাল, 'ঐ একটা সান্ত্বনা ভগবান দিয়েছেন আমায়। সুরেন খুব ভাল হয়েছে। এক-আধবার এসেওছে, যখন চিঠি লিখে বড়মা বলে সম্বোধন করে। এই একটা নিশ্চিন্তি মনে হয় এখন—যতদিন সুরেন থাকবে আমার কিশোরীমোহনের সেবা বন্ধ হবে না।'

বলতে বলতেই আবার সেই আগেকার আত্মবিশ্লেষণের ভঙ্গীতে ফিরে যান, কিন্তু তার জন্যেই কি খুব একটা মাথা-ব্যথা আছে? ঠাকুরের জন্যে? মিছে কথা। সেও 'আমি'। আমি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছি,

সেই সেবা না বন্ধ হয়। এত যদি প্রেম তো ঠাকুরকে পেলুম না কেন—তিনি সব ভুলিয়ে আমার মন ভরিয়ে এলেন না কেন? আসলে সব মিথ্যে—এতদিন একটা-না-একটা মিথ্যে অহমিকার পেছনেই ছুটেছি। কিছুই পেলুম না, পাবার কথাও নয়। গর্তের ব্যাঙ নিজেকে হাতী বলে ভেবে এলুম চিরকাল, ভগবানকে হাসালুম, লোক হাসালুম।...যদি সত্যিই আমাকে নিয়ে বই লিখিস কোনদিন—এ কথাগুলো লিখিয়ে দিস। আমার মতো আর কোন বোকা যাতে এমনি মিথ্যে মরীচিকার পেছনে, ফাঁকো অহমিকার পেছনে ঘুরে নিজের সর্বনাশ না করে, তার চেয়ে বড় কথা—অপরের সর্বনাশ না করে বসে।...কী সর্বনাশটাই না করলুম বল দিকি!...দু-দুটো প্রাণ নষ্ট হল—ওদের সংসারটাই তো ভেঙে দিলুম বলতে গেলে। বাপ থাকতে ছেলেমেয়ে দুটো অনাথের মত মানুষ হল....ছেলে যে মাপ করেছে আমাকে, বিভাও যে এখনও আমার খোঁজ নেয়—এ তো তাদের মহত্ত্ব।...রাধে রাধে! ...নেঃ, তোকে উজাড় করে দিলুম মনের সব কথা। ভালই হল, বোঝা নেমে গেল। খ্রেস্তানদের শুনেছি কারও কাছে নিজের পাপের কথা শোনালে সে পাপ স্খালন হয়—অন্তত সে কাজটা তো হয়ে রইল।

সুরোদির এ শেষ কথাটা অবশ্য রাখা যায় নি। ঐ কথাগুলো—তাঁর জীবনের এই সার-সত্য-উপলব্ধি — বলতে গেলে তাঁর জীবনদর্শন, আমি এ উপন্যাসের মধ্যে কোথাও ঢোকিয়ে দিতে পারি নি। পারতুম, যদি এ বই আরও টানা যেত—যদি সুরোদির মৃত্যু পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু সে জীবনী হলে অনায়াসে হতে পারত—উপন্যাস আর টানা যায় না। তার মাল-মশলা ফুরিয়ে গেছে।

উপন্যাসের মধ্যে দেওয়া গেল না বলেই কথাগুলো—ঠিক যেমন দিদি বলেছিলেন—সেইভাবে এখানে তুলে দিলুম। আর কিছু না হোক, করুণবাবু আর সুরোদি সম্বন্ধে যে কৌতূহলটা উপন্যাসে সম্পূর্ণ মেটে নি—সেটা এ থেকে মিটতে পারে।

।। উপসংহার ।।

এর অনেক বছর বাদে—এই উপন্যাস লেখা শুরু হওয়ারও বেশ কিছুদিন পরে—গত ১৯৬৬-সালের মে মাসে, এক সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে একবার বৃন্দাবন গিয়েছিলুম। তখন আর সুরোদির বেঁচে থাকার কথা নয়; নেই তাও জানি, এমন কি সুরেন বেঁচে আছে কিনা তা-ই সন্দেহ—তবু একবার কুঞ্জটা ঘুরে আসার আগ্রহ দমন করতে পারি নি।

কিসের কৌতূহল, ঠিক কি দেখতে চাই—কি দেখার আশা রাখি—কিছুই জানি না। অত ভেবেও দেখি নি। আগে থাকতেও ভাবা ছিল না কিছু। শুধু বৃন্দাবনে পৌঁছবার পর থেকেই কে যেন অদম্য বলে ঠেলতে লাগল আমাকে—কী যেন অদৃশ্য অথচ অমোঘ আকর্ষণ। শুধুই কি কৌতূহল, না তার সঙ্গে কিছু ভাবপ্রবণতা, কিছুটা বাল্য কৈশোরের স্মৃতি—কিছুটা নস্ট্যালজিয়া?......

সে যাই হোক, প্রথম দিনই একটা সুযোগ মিলে গেল। সাহিত্যিক বন্ধু যাঁরা এক জায়গায় উঠেছিলুম—তাঁরা স্থির করলেন সেই দিনই বিকেলে মোটামুটি দর্শনগুলো সেরে ফেলবেন। আর যেহেতু তাঁদের মধ্যে আমিই যা বার কতক বৃন্দাবনে গিয়েছি—সেই হেতু আমার ওপরই ভার পড়ল দর্শনের ভ্রমণসূচী তৈরী করার, রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গে দরদস্তুর করার এবং কতকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ারও।......

রিক্সার ব্যবস্থা পরে, হাতের কাছে যেগুলো সেগুলো হেঁটেই সেরে ফেলব, এই স্থির করে বেরিয়ে পড়লুম। ঠিক হল—গোবিন্দজী, রঙ্গজী, ব্রহ্মকুণ্ড, কৃষ্ণচন্দ্র অর্থাৎ লালাবাবুর মন্দির এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমাধি, ও সাক্ষীগোপালের পরিত্যক্ত মন্দির (এবার গিয়ে দেখলুম প্রায় সমভূমি হয়ে গেছে ভেঙে—অমন সুন্দর মন্দিরটি—) যা কাছাকাছির মধ্যে একটা চক্রে পাই—দর্শন করে ঐখান থেকে রিক্সা করব—রাধারমণ, মদনমোহন গোপীনাথ, বঙ্কুবিহারী, রাধাবল্লভ শাহজীর মন্দির, নিধুবন, নিকুঞ্জবন প্রভৃতি দেখে নেব। অবশ্য বেরোতে বেরোতে সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছিল, সবগুলো আর হয়ে ওঠে নি সেদিন—তবে বেশির ভাগই হয়েছিল। হয় নি বোধ হয় নিকুঞ্জবন শুধু।

এই হেঁটে যাওয়ার প্রস্তাবের মধ্যে আমার একটু মতলব ছিল। গোবিন্দজী দর্শন করে শেঠেদের মন্দির অর্থাৎ শ্রীরঙ্গজীকে দর্শন করে পাশের পরিচিত গলি ধরলুম আমি, যেটা ব্রহ্মকুণ্ডের পাশ দিয়ে গিয়ে সেই বিশেষ রাস্তাটিতে পড়েছে। পড়েছে একেবারে সুরোদির কুঞ্জের প্রায় সামনা-সামনি। সেইখানে এসে বন্ধুদের খুলেই বললুম, 'আমার এখানে একটি দর্শন আছে, আপনারা তাতে ইন্টারেস্টেড হবেন না — অখ্যাত সামান্য মন্দির, তবে আমার একটা ব্যক্তিগত স্মৃতি জড়ানো আছে বলেই আমি যেতে চাই; আপনারা ততক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র আর গোপেশ্বর দর্শন করে আসুন—আমি এইখানেই আছি।'

পথ ভুল হবার কোন কারণ নেই, কারণ সেখান থেকে কয়েক পা গেলেই লালাবাবুর মন্দির, মন্দিরের পিছনটা এখান থেকে সোজা নাক-বরাবর। তার পাশ দিয়ে গোপেশ্বরের রাস্তা। ওঁদের আটকে রাখতে চাইলুম না এই জন্যে যে, অকারণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলে অসহিষ্ণু হয়ে পড়তেন—নানা রকম প্রশ্নও বর্ষিত হত—'এখানে কি' 'কিসের এত আগ্রহ' ইত্যাদি। নিজের মত করে দেখার সময় পেতুম না, ততক্ষণ আর ওঁদের দাঁড় করিয়েই বা রাখা যায়। তাছাড়া সময়াভাবের জন্যে তাগাদা দিচ্ছি—আমিই যদি খামকা এক জায়গায় দেরি করি—ওঁরা কি ভাববেন?...এ তবু, ওঁদের ঐ দু জায়গায় দর্শন সেরে ফিরে আসার মধ্যে অনেকটা সময় পাব।

বন্ধুরা এগিয়ে গেলে আমি কুঞ্জের সামনে এসে দাঁড়ালুম। ঐ তো ওপরের সেই বারান্দা, যেখানে আমাদের নৈশ আসর বসত। সেই দিকেই আগে নজর পড়া স্বাভাবিক। দেখলুম ওপরের দুটো ঘরেরই দোর জানলা বন্ধ, বাইরে সেই পাখীর খাঁচাটা টাঙ্গানো থাকত যাতে—সেই লোহার মুখ বাঁকানো শিকটা এখনও ঝুলছে। তবে বারান্দাতে স্থান বিশেষ নেই বললেই হয়—বস্তা কতে করে কি সব স্তূপাকার করা হয়েছে — সম্ভবত ঘুঁটে কিম্বা ছোবড়া—ঐ জাতীয় কোন জিনিস। গুলও হতে পারে—তবে বস্তাগুলো তত কালো নয়, কয়লাজাত কোন বস্তু হলে তার চিহ্ন থাকত। হয় কোন গদি-ছেঁড়া বা গদির জন্যে আনা ছোবড়া—কিম্বা ঘুঁটেই। নিচের ঘরেরও, রাস্তার দিকের একটা জানলার ওপরে একটা পাল্লা আধখোলা—আর সব বন্ধ। সদর দরজাও বন্ধ। হয়ত বর্তমান গৃহস্বামী বা পূজারীরা ঘুমোচ্ছে তখনও—ওদেশে শেষ-বৈশাখের অপরাহ্ণ বেলা পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায় ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, ঘুমের সময় একেবারে যায় নি।

ফিরেই আসছিলুম, কি মনে হতে গিয়ে বিল্লীটা ঘোরালুম। বিল্লী খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গেই, ঠেলা দিতে কপাটও খুলল। অর্থাৎ খিল দেওয়া নেই, তার মানে ঠাকুর এবং তাঁর সেবকরা উঠে পড়েছেন।

সেই সরু পথ, সামনে উঠোন পেরিয়ে মন্দির, তার সামনে সঙ্কীর্ণ রক, তার ওপরে সেই ফুলকাটা পাথরের খিলেন। তুলসী-মঞ্চটিও তেমনি আছে, নেই শুধু হলদে চিনে-কলকের গাছটা। বোধ হয় মরেই গেছে, কম দিন তো হল না।...বাঁদিকে সেই কুয়াতলাটা — যেখানে প্রথম দেখা হয় সুরোদির সঙ্গে। সেই কপিকলে গলানো দড়ি, তাতে লোহার ডোল বাঁধা তেমনি, কপিকলের কাঠ দুটো নিচে পড়ে আছে। আর পড়ে আছে একটা পেতলের ভারী এদেশী লোটা, কুয়াতলার চারদিকের পাথরের নিচু বেষ্টনীর গায়ে ঠেকে কাৎ হয়ে। লোটা, ডোল, দড়ি—সবই শুকনো,

য়াতলাও বোধ হয় বহুক্ষণ কারও জল তোলার দরকার হয় নি।

কিন্তু মানুষ কোথায়?

কুঞ্জবাসীরা?

এদিক-ওদিক চেয়ে ভয়ে ভয়ে একটু গোলুম। বাঁ হাতি নিচের ঘরের দরজায় লা দেওয়া—যে ঘরে রোজ থাকত, দিকেও একটা জানলার একখানা পাল্লা খোলা—কিন্তু গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে াহস হল না। কেউ কোথাও নেই, একা কেছি—তার ওপর উঁকিঝুঁকি মারতে খলে কেউ যদি চোর বলে ধরে! আমাদের ভার্থনা সমিতির সম্পাদক বিশ্বম্ভরবাবু নেছি উকীল, সেই যা একটু ভরসা— কন্তু সে তো পরের কথা, আগেই তো মার-ধার হয়ে যাবে একচোট, সন্দেহ মাত্রেন!

একবার একটু গলা খাঁকারি দিলুম। জোরীজী বলে ডাকলুম একবার। প্রথমটা াস্তে ডেকেছিলুম, পরে আরও বার-দুই বশ জোরেই ডাকলুম—কিন্তু কোন সাড়া পলুম না। সেই নিদাঘ অপরাহ্ণের তপ্ত াবহাওয়ায় খাঁ খাঁ করতে লাগল নিস্তব্ধ নহীন কুঞ্জটা।......

অতঃপর ফিরে যাওয়াই উচিত, কিন্তু ভতরে ঢুকে কুঞ্জস্বামীকে দর্শন না করে ফরতেও মন চাইল না। সুরোদির অত াদরের, অত সাধের কিশোরীমোহন। মামারও টান খুব কম নয়—বহুদিন মারতির ঘড়ি বাজিয়েছি এইখানে দাঁড়িয়ে— ক্ষহীন দিনের প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা কটেছে শোভারামের নিপুণ হাতের সেবা দখে।

ঠাকুর উঠেছেন এতক্ষণে, ঝারাও সরানো য়েছে নিশ্চয়, কে জানে বৈকালীও হয়ে গছে কিনা। ঠাকুর যে উঠেছেন তার প্রমাণ ভতরের কাঠের কপাট খোলা — বাইরে শকের কপাট টানা শুধু, যেমন এখানকার নয়ম। লোকজন যখন কেউ থাকে না— বশেষ এই বিকেলের দিকে—শিকবসানো রজাটাই দেওয়া থাকে, যার গরজ সে শকের ফাঁক দিয়ে দেখে যায়।

আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে এগিয়ে গলুম। জুতো আগেই খুলেছি—ওদিকে। ালানেও উঠলুম সসংকোচে। আর একবার াকলুম 'পুজারীজী' বলে—কোন ফল হল া। তখন শিকের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারলুম। াকুর ঘরে একটা প্রদীপও নেই, সামান্য যা আলো বাইরে থেকে শিকের মধ্যে দিয়ে াচ্ছে, তা আমার বপুতেই অনেকখানি ঢকে গেছে আবার; তবু তাতেই—শিকের াকে চোখ লাগিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর চোখ সয়ে যেতে দর্শনও হল। সেই কিশোরীমোহন, সেই চূড়া সেই বাঁশী। বাঁশীর সেই ঠেকো। সামনে নিচের ধাপে গোপাল এবং কয়েকটা পট, সুরোদির গুরু-দেবের ছবি—যেমন তখনও ছিল। তবে আমার যতদূর মনে হচ্ছে আগে অষ্টধাতুর রাধারাণী ছিলেন—এখন দেখলুম শ্বেত পাথরের। কে জানে, সে মূর্তি চুরি গেছে কিম্বা ভেঙে গেছে কিনা। অথবা আমারই ভুল, বরাবরই হয়ত পাথরের ছিল।......

দর্শন শেষ করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। সবই ঠিক আছে — কেবল মানুষই নেই। ভেতরে রান্নার হলে যাবার যে দরজাটা সেটায় একটা শেকল-তোলা মাত্র—চাবি-তালা কিছু নেই। অথচ ঐ মহলেই যাবতীয় বাসনপত্র, ভাঁড়ার প্রভৃতির ঐখানেই থাকার কথা। ওখান দিয়ে মন্দিরেও আসা যায়, ঠাকুরের গহনাপত্রও অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে কেউ এসে। কে জানে, হয়ত সে দিকের দোরে তালা দেওয়া আছে একটা।...ঠাকুরদালান থেকে বারমহলের ওপরের ঘরটাও যতদূর দেখা গেল—বন্ধ। তালা দেওয়া কিনা এখান থেকে দেখা গেল না।

ঠাকুর আছেন, কুঞ্জও আছে—কিন্তু সেবাইৎ পুজারী কোথায় গেল?

সম্ভবত পুজারীই একজন আছে, সে অন্য কোন কুঞ্জে গেছে সেখানকার কুঞ্জবাসীর ঘুম ভাঙাতে। এই এক জায়গার মাইনেতে বোধ হয় তার চলে না। হয়ত সেবাইৎ পক্ষের কেউই নেই এখানে। মূল্যবানও কিছু নেই। তাই চাবি দেওয়ার কথাটা পুজারীর মনে পড়ে নি। কিন্তু এই তো লোটাটা পড়ে আছে, ডোলটাও। ঠাকুরঘরে ঠাকুরের মুকুট বাঁশী, রাধারাণীর হাতের বালা— হয়ত ভেতর মহলে এমনি অবহেলায় কিছু বাসনও পড়ে আছে। তবে কি আজ-কাল ব্রজধামে চুরি-ডাকাতি হয় না, রাতা-রাতি সবাই সাধু হয়ে গেছে?......

কিন্তু সে যাই হোক, আমার বেশীক্ষণ থাকতে সাহস হল না। পুজারী বা আর কেউ যদি এসে পড়ে—ঠিক চোর ভাববে। বানরের ভয়ে সদরে আবার বিল্লী লাগিয়ে এসেছি। বন্ধ বাড়ির মধ্যে একটা অপরিচিত লোক—কী মতলবে এসেছে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

তবু, যেতে গিয়েও একবার তাকিয়ে দেখলুম। এই বাঁধানো উঠোন, ঠাকুর-দালান—সুরোদি পরিহাস করে যাকে নাট-মন্দির বলতেন, আসলে যা আড়াই হাত চওড়া রক ছাড়া কিছু নয়—ঝকঝক করত পরিষ্কার, নিত্য দুবেলা ধোওয়া-মোছা হত। ঠাকুরঘরেও—না নজরে পড়ল—তথৈবচ অবস্থা। বেশ যতদূর সম্ভব মলিন বিবর্ণ, রুপোর মুকুট পালিশের অভাবে কল-ঙ্কিত, একটা নিয়মরক্ষার মত প্রদীপও জ্বলছে না, ঝারায় তো কোন চিহ্নও দেখলুম না। ঝারা সকাল বৈকালীও দিতে হয়—সেই জন্যেই সম্ভবত দুটোই বাদ গেছে। শিকের খাঁচার মধ্যে নিরুপায় নিঃসঙ্গ কিশোরীমোহন অসহায় অবস্থায় সামনের ফাঁকা বাড়িটার দিকে চেয়ে বসে আছেন—সম্ভবত কবে কে দয়া করে এই বিগ্রহ জলে ভাসিয়ে দিয়ে ঠাকুর সেবার এই অভিনয়ের পালা শেষ করে দেবে, তাঁরও অব্যাহতি মিলবে—এই প্রতীক্ষায়।......

ছায়াছবির মত ভেসে ভেসে গেল দৃশ্যগুলো।

ঐখানে, দালানের বাঁ পাশে, পুঁথির বোঝা জপের মালা প্রভৃতি নামিয়ে ঈষৎ ধূর্ত চোখ মেলে সুরোদি বসে চা খাচ্ছেন। ধাক্কা দেওয়া মিহিজেরর ধুতির চুনোট-করা কোঁচার প্রান্তটা কোমরে গুঁজে কিরণবাবু নিঃশব্দে এসে চা দিয়ে যাচ্ছেন, দিনে পাঁচ-বার আরতির ঘড়ি বাজছে—সুরোদি নিজে বাজাচ্ছেন, রাত্রে কিরণবাবু উবুড় হয়ে পড়ে টেবিল-ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোতে খাতা লিখছেন, আফিংয়ের ধোঁয়াতে ঢুলু-ঢুলু চোখে বারান্দায় বসে মালা জপছেন দিদি, সেই ম্যালিশের গন্ধ—

কিন্তু সে সবই স্বপ্ন-কথা।

বহুদিনের বহু যুগের কথা।

তারা কেউই নেই আর। তাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, তাদের বাসনা কামনা, তাদের প্রেম আবেগ অহঙ্কার ক্ষোভ—তাদের আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা — সবশুদ্ধ কোথায়, জীবন পরিণামের কোন সুদূর দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। এই ঠাকুর প্রতিষ্ঠার পেছনে যে মর্মান্তিক ব্যথা ছিল আর ঐকান্তিক আশা—তারও এতটুকু ইতিহাস লেখা নেই কোথাও। যে সেবাইৎ আছেন—আজকের ব্যয়বাহুল্যের দিনে সেদিনের বাঁধা নগণ্য আয়ে ঠাকুরের সেবাই হয়ত ভালভাবে চলে না—তাঁর অর্থাৎ সে সেবাইতের ভরণপোষণ আরাম তো দূরের কথা। সেদিনের জমিদারীও আর নেই যে তাঁরা বাড়ি থেকে এনে আরও কিছু টাকা ঢালবেন। সুতরাং ঠাকুরকে তাঁর ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কি?

হায় সুরোদি! সেদিন যদি জানতে, যদি আজকের এই পরিণাম দেখতে পেতে!......

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিবাস্বপ্ন দেখার আর সময় নেই। চোর বলে ধরা পড়বার ভয় তো আছেই — ওধারেও ওরা বোধহয় এতক্ষণে ঘুরে এসে আমাকে না দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছেন।

তবু একবার শেষ চেষ্টা করলুম। কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে একটু গলা চড়িয়ে হাঁক দিলুম, 'বাড়িতে কেউ নেই?'

এইবার অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল। এতক্ষণ ওদিকে ডাকাডাকি করেছি কোন প্রতিধ্বনি শুনিনি — এখন বোধহয় কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁক দেবার ফলেই—পাথর-বাঁধানো গভীর পাতকুয়ার অতল থেকে একটা প্রতিধ্বনি উঠল—'নেই, নেই, নেই!'

এই শূন্য জনহীন কুঞ্জে সেই প্রায়-অপ্রাকৃত প্রতিধ্বনি—কেমন যেন গা-শিউরে উঠল।

আর কে জানে কেন — এই বুড়ো বয়সেও দুই চোখ জ্বালা করে জল এসে গেল। চোখের জলেই এ-বাড়িতে প্রথম আসা, চোখের জলেই শেষ।......

দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়লুম আবার।

ভাগ্যিস, তখনও বন্ধুরা ওদিক থেকে ফেরেন নি, যমুনা পুলিনের দিকে গিয়ে পড়েছেন বোধহয়। নইলে কি মনে করতেন!

—শেষ—

প্রদর্শনী পরিক্রমা

শিল্পী আর কবির চিন্তাধারার সাযুজ্য সব সময় ঘটে না। কিন্তু কখনো কখনো এমনটা ঘটতে দেখা যায়। এদেশে এ-ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল। তাই নীরদ মজুমদার যখন শান্তি বসুর কবিতার বইয়ের চিত্রালঙ্করণে হাত দেন তখন সেটা উল্লেখযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। এঁদের দুজনের মধ্যেই ভারতের প্রাচীন আত্মার সন্ধানের সুচিন্তিত প্রচেষ্টা রয়েছে। তারই কাব্যরূপ প্রকাশ পেয়েছে "মায়া-মহামায়া" কাব্যগ্রন্থে (প্রকাশক "জাতায়" : মূল্য দশ টাকা) আর চিত্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে নীরদ মজুমদারের কুড়ি-খানি ড্রইং ও একটি বহুবর্ণ চিত্রে। শ্রীমজুমদার আরো এক-পা এগিয়ে বইটির একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুচিন্তিত ভূমিকাও লিখেছেন। কাব্যের উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিল্পীর উদ্দেশ্যের হদিসও এতে হয়ত কতকটা মিলতে পারে।

শিল্পী : সুনীল দাস

মূল রেখাচিত্র ও পেন্টিং-এর একটি সুন্দর প্রদর্শনী গত ৬ই আগস্ট থেকে সপ্তাহকাল আকাদমিতে হয়ে গেল। শ্রীমজুমদারের ফিগারগুলির সরল পেলব রূপ, নিখুঁত মুন্সিয়ানার ছাপ আবার পরিষ্কার ভাবে দেখা গেল। বইয়ের ১৪ পৃষ্ঠার কালীমূর্তি ২২, ৩১, ৩৩, ৫১ ও ৫৯ পৃষ্ঠার ছবিগুলির ছন্দ নিঃসন্দেহে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সংগ্রাহকদের কাছে বইটি মূল্যবান রূপে বিবেচিত হবে বলে আশা করা যায়। মুদ্রণ পারিপাট্যেও বইটি বিশেষভাবে সমাদৃত হবার দাবি রাখে।

স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্মী রাখালচন্দ্র দাস কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ৩ থেকে ৯ আগস্ট তাঁর একাদশতম চিত্রপ্রদর্শনী করলেন। শ্রীদাস প্যাস্টেল মাধ্যমের একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর চব্বিশখানি প্যাস্টেলে এবারেও তাঁর আগের রীতির দর্শন পাওয়া গেল। কতক-গুলি সুদর্শন নিসর্গ দৃশ্য, শহরতলী ও গ্রামের চিত্র মনোহারিত্বের গুণে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে "লাইট অ্যান্ড স্যাডো" (১০) "রিফ্লেকসান" (১১) "সানি আফটারনুন" (১৪) "ভিলেজ ইন মর্নিং" (১৬) "মেন অ্যাট ওয়ার্ক" (২০) এসব ছবির নাম করা যায়। কিন্তু সঙ্গীতের ওপর আধুনিক রীতির ডেকরেট-ধর্মী

যে ছবিগুলি তিনি উপস্থিত করেছেন, রং বা ডিজাইনের দিক থেকে সেগুলি তত উল্লেখযোগ্য হয়নি। নতুন পরীক্ষা হিসেবেই এগুলি প্রদর্শিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে উপস্থিত করলেই ভাল হত বলে মনে হয়।

●

প্রতি বছর জন্মাষ্টমীর দিনের মত এবারেও রবীন্দ্র-ভারতীর গ্যালারীতে অবনীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথের চব্বিশখানি ছবির একটি সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন হল। শিল্প-জীবনের গোড়ার দিকের আঁকা মিনিয়েচার ধরনে কৃষ্ণ-লীলার ছবি থেকে শুরু করে শেষজীবনের পাখী, শেয়াল পারাবতের রঙীন সমারোহ কিছুটা দেখতে পাওয়া গেল। আরব্য-রজনী সিরিজের নিখুঁত ওয়াশের কাজ এবং শাজাদপুরের নিসর্গ দৃশ্যাবলী এবারকার প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ। মখদুম সাহেবের কবর এবং পদ্মার একটি অপূর্ব দৃশ্য নিসর্গশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কাজের বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি খুলে দেয়। বছর দুয়েকের মধ্যেই তাঁর শতবার্ষিকী উদযাপিত হবে। এর মধ্যে তাঁর ছবিগুলির স্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হবে কি? শোনা গেল ছবিগুলি সংরক্ষণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাঁর একটি প্রামাণ্য জীবনী ছবির ক্যাটালগ এবং যথাসম্ভব বেশী ছবি নিয়ে একটি ভাল অ্যালবামের অভাব এখনো পূর্ণ হয়নি। তবে কিছু ছোট পোস্টকার্ড তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে এটুকু আশার কথা।

●

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবনে আশুতোষ শিল্প সংগ্রহশালায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে ৭ থেকে ৯ আগস্ট একটি নতুন ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন হল। মোগল যুগের জীবনযাত্রার ওপর ছবি, প্রিন্ট এবং পোষাক-আসাক ও কিছু বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্তুর নিদর্শন নিয়ে সেই যুগটিকে ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরবার একটা প্রচেষ্টা দেখা গেল। ছবির মাধ্যমে মোগল দরবার, প্রাসাদ এবং বাদশাহী হারেমের জীবন, খেলা-ধুলা, সঙ্গীত, সাজ-পোষাক ও গহনা, যুদ্ধবিগ্রহ, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। সে যুগের রাজা-বাদশা ছাড়া অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি, হস্তলিপির কতকগুলি সুন্দর নিদর্শন, ধাতুর কাজ ইত্যাদি নিয়ে প্রদর্শনীটি সর্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

●

জার্মানীর পুস্তক প্রকাশন প্রতিযোগিতায় নিয়ম অনুযায়ী যে বইয়ের চেহারার সৌন্দর্যের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং যার ছাপা, বাঁধাই, কভার ইত্যাদি সবচেয়ে মনোরম তাকেই সবচেয়ে সুন্দর বই বলা হয়ে থাকে। মোটামুটি বইটি যদি রূপের দিক দিয়ে ভাল বিবেচিত হয়, তবে ছোট-খাট আঙ্গিকের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা হয়ে থাকে।

১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতায় যে বইগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর বলে বিবেচিত হয়েছে সেগুলি এবং আরো কতকগুলি বই নিয়ে ম্যাক্সমুলার ভবনে ১২ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত একটি সুন্দর পুস্তক প্রদর্শনী হচ্ছে। বহু রকমের অক্ষর-বিন্যাস ও চিত্র-বিন্যাসের নিদর্শন ও ছাপার উৎকৃষ্ট নিদর্শন এখানে দেখা যাবে। বিশেষ আকর্ষণীয় পুস্তক হিসেবে ভ্যাটিকান কাউন্সিল, দুটি মধ্যযুগীয় বইয়ের হুবহু মুদ্রণ, বিখ্যাত জার্মান শিল্পীদের আঁকা ছবির রিপ্রোডাকশনের বই, স্থাপত্য ও কারুশিল্পের ওপর বিভিন্ন বই, শিশুদের কয়েকটি বইয়ের কথা বলা চলে। এছাড়া পেপার-ব্যাক, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় জার্মান সাহিত্যের অনুবাদ ইংরেজী অনুবাদ প্রভৃতি পুস্তক-প্রেমিকদের আগ্রহ ও কৌতূহলের খোরাক হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রদর্শনীর সজ্জা ও পরিকল্পনার জন্য লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ প্রশংসার দাবি করতে পারেন।

●

তরুণ শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনের জন্যে সাধারণ গ্যালারি ছাড়াও মাঝে মাঝে কোন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক স্ব-গৃহে বন্ধু-বান্ধব আমন্ত্রণ করে কোন শিল্পীর ছবির ছোট ছোট প্রদর্শনী করে থাকেন। ১৭ থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত ৩৩২ নম্বর বোধপুর পার্কে শ্রীসমীর দাশগুপ্তের ফ্ল্যাটে সুনীল দাসের এই রকম একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। ঘরোয়া পরিবেশে প্রায় খান-কুড়ির কাছাকাছি জল-রং-এর ছবির চেহারা কমার্শিয়াল গ্যালারি থেকে অন্যরকম লাগল। সুনীল দাসের এই ছবিগুলির মধ্যে তাঁর নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ এবং অশান্ত একটা শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। সাপ, তীর, হুক প্রভৃতি কতকগুলি প্রতীক তিনি একান্ত ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করেছেন। সুনীল দাসের ছবিতে সব সময় নিছক নয়ন-তৃপ্তিকর করার চেষ্টা থাকে না। সেদিক দিয়ে এগুলিকে তার কোঠায় ফেলা যায় না। কোথাও মুখ বা মুখাকৃতির আভাস, কোথাও একটা অদ্ভুত রসের রূপকথার রাজ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা কোথাও বা সামান্য একটু ধূসর প্যাটার্নের ওপর বিশেষ মুড তৈরীর চেষ্টা দেখা যায়। শিল্পী ও দর্শকের বোঝাপড়া হয়ত সব ক্ষেত্রে খুব ভালভাবে হয় না, কিন্তু তা না হলেও ছবির সামনে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে বোধহয় সব ক্ষেত্রে থাকা যায় বলে মনে হয় না।

চিত্ররসিক

ফারেব চিত্রে দেবকুমার এবং ফরিয়াজ

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র সমালোচনা

এ কাউন্টেস ফ্রম হংকং (ইংরাজী) : ইউনাইটেড আর্টিস্ট-এর নিবেদন ; ৩,০০১·৩৭ মিটার দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ ; প্রযোজনা : জেরোম এপস্টিন ; রচনা, পরিচালনা ও সঙ্গীত-পরিচালনা : চার্লস চ্যাপলিন ; রূপায়ণ : সোফিয়া লোরেন, টিপি হেড্রেন, মার্গারেট রাদারফোর্ড, জেরাল্ডইন চ্যাপলিন, মার্লন ব্রান্ডো, সিডনি চ্যাপলিন, প্যাট্রিক কার্গিল প্রভৃতি। ইউনিভার্সাল-এর পরিবেশনায় ২২-এ আগস্ট, বৃহস্পতিবার থেকে এলিট সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

চার্লি চ্যাপলিন—পৃথিবীর চলচ্চিত্র-জগতে একটি অবিস্মরণীয় নাম। বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রারম্ভ ভাগেই দু' বা তিন রীলের 'কী স্টোন কমেডি' সিরিজের চিত্রাবলীতে আবির্ভূত হয়ে যিনি মানুষের মনকে অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন এবং 'দি কিড', 'সার্কাস', 'গোল্ড রাশ', 'সিটি লাইট্স্', 'মডার্ণ টাইম্স্' 'দি গ্রেট ডিক্টেটর', 'মোসিয়ে ভাদু' ও 'লাইম লাইট' ছবির মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে নিজের আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছেন, সেই চার্লি চ্যাপলিন দীর্ঘ বারো বছর নিষ্ক্রিয় থাকবার পরে পরিচালনা করেছেন 'এ কাউন্টেস ফ্রম হংকং'। এতদিন চার্লি চ্যাপলিন পরিচালিত ছবি মাত্রই চার্লিকে নায়ক রূপে নিয়ে রচিত হ'ত। কিন্তু আলোচ্য ছবিতে সেই ঢিলে প্যান্ট পরা, ছোট্ট বাটারফ্লাই-গোঁফওলা, মাথা-উঁচু জুতো পায়ে, বেতের টপ্‌হ্যাট মাথায়, বাঁকা ছড়ি হাতে আজন্ম ভবঘুরে, বেচারা লোকটিকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না ; এমন কি আলোচ্য ছবিটি আদৌ নায়কপ্রধানই নয়, সম্পূর্ণরূপে নায়িকাপ্রধান। এবং সেই নায়িকা হচ্ছেন সোফিয়া লোরেন। এবং তাঁর বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় আছেন মার্লন ব্র্যান্ডো। ছবিটি একটি রোমান্টিক কমেডি এবং এর ভিতরে চ্যাপলিন-রীতির হাস্যোদ্রেককারী পরিস্থিতিও আছে বেশ কয়েক স্থানে। কিন্তু তবুও বলব, চার্লি চ্যাপলিনের ছবি বলতে আমরা এতদিন ধ'রে যা বুঝে এসেছি, 'এ কাউন্টেস ফ্রম্ হংকং' সে জাতের ছবি নয়। পরিচালক চ্যাপলিন এ ছবির মাধ্যমে ভিন্নরূপে দেখা দিয়েছেন।

হংকং শহরের বন্দরে জাহাজের প্রমোদকক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে পলাতকা নাটাশার সঙ্গে আমেরিকান অ্যামবাসাডার ওগডেনের প্রথম পরিচয় হয়। এর পরে ওগডেন নাটাশাকে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে জাহাজের কেবিনে লুক্কায়িত অবস্থায়। হতচকিত ওগডেনকে নাটাশা বলে, সে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যেতে চায়। তা কি ক'রে হবে? কিন্তু নাটাশা নাছোড়বান্দা—ওগডেনের মতো অতো বড়ো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি তাকে এইটুকু সাহায্য করতে পারবে না? সুন্দরী নাটাশার মিনতি ওগডেনকে স্পর্শ করল। কিন্তু তাকে সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। প্রথমেই সে ধরা পড়ল ওগডেনের সচিব হার্ভের কাছে। পরে নৃত্যোৎসবে যোগ দিতে গিয়ে নাটাশার এক পুরনো বন্ধু তাকে জাহাজে দেখে বিস্মিত হ'ল। একজন রুগ্না বৃদ্ধার দেখাশুনা করবার চাকরী নিয়ে সে চলেছে, এই মিথ্যা

হাই দিয়ে সে সে-যাত্রা বেঁচে গেল। কিন্তু ম জাহাজ যতই নিউইয়র্কের কাছাকাছি তে লাগল। অ্যামবাসাডার ওগডেন ততই রত বোধ করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত হাজের ক্যাপ্টেনের সহায়তায় হাজমন মে এক জাহাজযাত্রীর সঙ্গে তার বিবাহ য়ে তিনি নাটাশার মার্কিন নাগরিকত্ব ভের উপায় করলেন। কিন্তু যখন ওগ-নের স্ত্রী মারির আবির্ভাব ঘটল, তখন বস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। সকল মস্যার সমাধান হয়ে কেমন ক'রে শেষ বধি ওগডেন ও নাটাশার মিলন সম্ভব ল, তাই নিয়েই ছবির শেষাংশ রচিত।

ওগডেন রূপী ব্র্যান্ডো ও নাটাশা-শিনী লোরেন যখন পরস্পরের সামনে রবে উপবিষ্ট, লোরেন অক্ষরপরিচয়হীনা য়েও একখানি বইয়ের প্রতি নিবিষ্ট চিত্ত, থন আমরা প্রথম চ্যাপলিনীয় কৌতুক রিবেশের সম্মুখীন হই। এর পরে যখন ক একজন ব্যক্তি দরজায় করাঘাত করেন, ার নাটাশা নিজেকে লুকোতে ব্যস্ত হয়ে ঠে, আরও পরে যখন সকলে 'সমুদ্র-পীড়ায়' আক্রান্ত হয়ে বমন চেষ্টায় ছুটো-ছুটি করতে থাকে এবং সবশেষে ব্র্যান্ডোর স্ত্রীর আবির্ভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে খন নাটাশা সাঁতারু বেশে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, খন চ্যাপলিনীয় প্রতিভা সুস্পষ্ট হয়ে ঠবার অবকাশ পায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে াপলিন—পরিচালক চার্লস্ চ্যাপলিন এই ছবিটিতে তাঁর চিরাচরিত পেটফাটানো াসির ভিতর দিয়ে বঞ্চিত জীবনকে রূপা-য়ত করবার রীতি থেকে সরে এসেছেন।

বিদেশী ছবির খবর

একজন প্রযোজক

হলিউডে যেমন সিসিল বি ডি-মিল সব স্পেক্টাক্যুলার ছবির জন্য খ্যাত, এশিয়ার তেমনি রান রান শ হংকং এর চিত্রজগতের অন্যতম সিসিল বি ডি-মিল। বছরে তাঁর প্রোডাকশন ছত্রিশটি কাহিনী-চিত্র—এগুলি সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার চারদিকে ছড়ান প্রায় দেড় শ হলে দেখান হয়, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই হল-গুলির মালিকও 'শ নিজে। তাঁর 'দি ভারমিলিয়ন ডোর' লন্ডনের ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারে মুক্তি পেয়েছিল। এঁর বেশীর ভাগ ছবিই চীনের উপকথা, গল্প-মালা অবলম্বনে তৈরী। অবশ্য, সম্প্রতি 'বন্ড' গোছের কিছু ছবিও তৈরী করেছেন। গোয়েন্দা ছবির বাজার দেখে পর পর 'দি পয়জন রোজ', 'দি গোল্ডেন বুদ্ধ' 'অ্যাঞ্জেল উইথ দি আয়রণ ফিস্টস্' ছবি কটা করলেন। প্রতিটাই বক্স অফিসে একবারে যাকে বলে 'হিট ছবি'।

কিন্তু আজ রান রান যে অবস্থায় ১৯২১ সালে যখন চার ভাই মিলে সাংহাই-এর এক থিয়েটারে অভিনয় শুরু করলেন তখন কল্পনাও হয়ত করেন নি এমন পরিণতির। দাদা রুনজির লেখা নাটক নিয়ে প্রথম ছবি তুললেন রান রান। ১৯২৪ সাল নাগাদ তিনি চলে গেলেন সিঙ্গাপুর, কিছুদিনের মধ্যেই জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ

আদমী চিত্রে দিলীপকুমার এবং মনোজকুমার

যাবার তখন তাকে বাধ্য হয়ে সিঙ্গাপুর ছাড়তে হল। আমেরিকান ছবি পরিবেশনার কাজ নিয়ে চলল কিছুদিন।

তারপর এল ১৯৫৭, রান রান কিছু অভিনেতা নিয়ে চলে গেলেন হংকং, ছবি তুলতে শুরু করলেন ওখানে। ভাই রুনমে রইল সিঙ্গাপুরে তাঁর ছবি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে। হংকং এ এসেই প্রথমে তিনি 'স্টার সিস্টেম'কে ভেঙে ফেলতে চাইলেন। চিত্র প্রযোজনার অনেক ব্যাপারেই কোন কোন পক্ষের একাধিপত্য তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না, সেগুলোকে সমূলে বিনাশ করলেন প্রথমে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নিজের স্টুডিওতেই (শ মুভি সিটি) দিন কাটান ছবি করে।

রান রান মনে করেন ছবি জনপ্রিয় করতে কাহিনীর গুরুত্ব খুব বেশী। চিরা-চরিত ফর্মুলাই অবশ্য তার জন্য তিনি সর্বদাই বেছে নেন তা নয়। কিছুদিন আগে চীন-জাপান যুদ্ধের পটভূমিকায় একজন তরুণী গায়িকার জীবন, তার সমস্যা, সংকট, প্রেম, ভালবাসাকে চিত্রায়িত করে-ছিলেন 'দি ব্লু এ্যান্ড দি ব্ল্যাক' ছবিতে। এ ছবি তাঁকে এশিয়ান চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কারও এনে দিয়েছিল। শ'য়ের ছবির কারখানায় যে সব অভিনেত্রীরা আছেন তাদের কেউই তথাকথিত সুন্দরী নন। মুখটা সুন্দর হলেই হল, দেহের মাপ যাই-ই হোক ক্ষতি নেই।

রান রান-এর ছবির দর্শক বেশীর ভাগ চীনা। তাঁর মতে চীনারা নাকি পর্দায় 'মেয়েদের দেখতে খুব পছন্দ করে। ভাগ্য-হত দুঃখের জীবন তারা দেখতে চায়, তবে সব শেষে তারা যেন আবার সব সমস্যার সমাধান করে বেরিয়ে আসতে পারে এটাও তাদের কাম্য।' রান রান দর্শকদের এ মোটিভকে খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগান বলেই তাঁর ছবির বাজার এত ভাল। উনি বলেন—'আমরা নিশ্চয়ই আশা করব না যে দর্শকরা পয়সা দিয়ে শুধুমাত্র দুঃখ দেখতে আসবেন! সাধারণ দর্শক পয়সার বিনিময়ে ঐ অল্প সময়টুকু আনন্দ করতেই তো আসে, কাজেই তাদের কথা ভাবা দরকার।' কথাটা অনেকের পক্ষেই পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া অসম্ভব কিন্তু সিনেমা যখন ব্যবসাভিত্তিক শিল্প তখন রান রানের এ মত একবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

দিবারাত্রির কাব্য চিত্রে স্বপন রায়
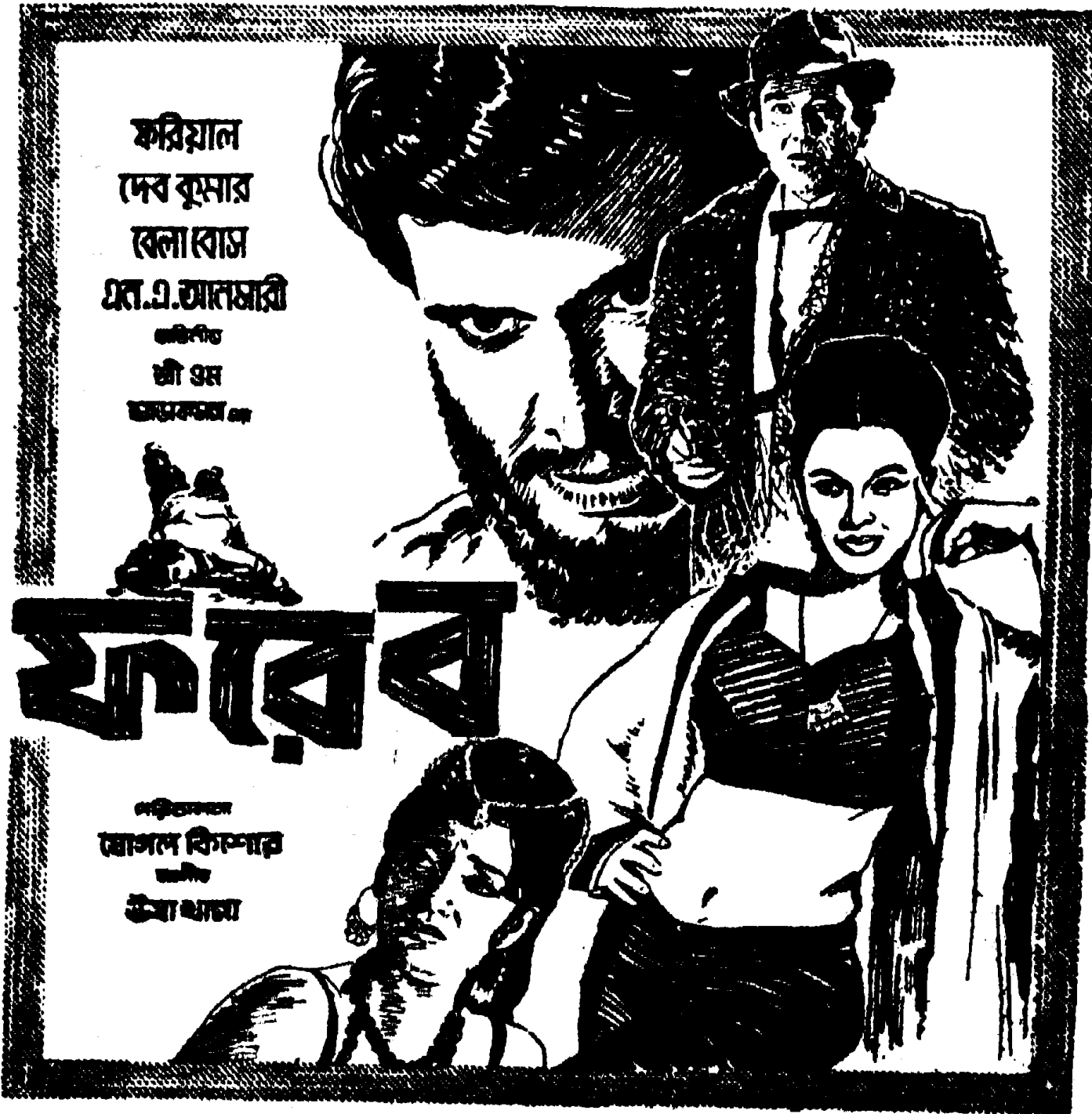
রান রানের এই ব্যবসায়ের অন্যতম গুপ্ত চাবিকাঠি হল উনি যেখানে সিনেম ঘর তৈরী করেন সেখানে চারপাশে তা সঙ্গে আনুষঙ্গিক দোকান বাজারও তৈর করেন, ফলে সাধারণ দর্শকের মন পাও যায় সহজেই। অবশ্য সম্প্রতি চীনের তথা কথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব নাকি রান রানে সাম্রাজ্যে হামলা চালাচ্ছে। বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত এখনও তিনি হননি বটে কিন্ত আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে চীনের এ সাংস্কৃতিক বিপ্লব শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তিনি বলছেন, 'ওরা ছবিে যত পার্টি ফর্মুলাকে ব্যবহার করে চাইছে সে ছবি তত মার খাচ্ছে। আ তাতে আমাদেরই সুবিধে। এমন কি ও যদি হংকং-এর সাতটি সিনেমায় ছ চালিয়ে প্রতিযোগিতায় নামে তবুও হে যাবে ওরা, পারবে না, ভাল ছবি বলতে যা বোঝায়, দর্শকরা যা চায়, তা তে আমাদের হাতে।'

রান রানের নতুন ছবি সম্প্রতি যে মুক্তি পেল সেটি হচ্ছে **সন অফ দি এম প্রেস অফ দি ল্যান্ড অফ মেনি পারফিউম রিটার্ণস টু দি ল্যান্ড অফ মিস্টি ক্লাউডস ফর দি ফরটি ফোরথ টাইম যতদূর জানা যায় সিনেমার ইতিহাসে এটা সব চাইতে বড় নাম। এশিয়ার ডি-মি পারতপক্ষে হলিউডের ডি-মিলের চাইতে কমতি কিসে!**

ট্রডিও থেকে

চলচ্চিত্র শিল্প সংরক্ষণ সমিতির ১৩ লাই থেকে লাগাতার পিকেটিং-এর ফলে জ অবধি মাত্র একখানা ছবির মুখ ধা গেল পর্দায়। সংরক্ষণ সমিতির ঢেউ লগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় ফ্লোরগুলোর য়ে আছাড় খাচ্ছে এখনও, কাজেই অল য়ায়েট ইন দি স্টুডিও ফ্রন্ট। কাজ প্রায় ধ। চারদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ব। সারাটা দুপুর সারা টালিগঞ্জ ঘুরে মাস আগের সেই প্রাণ-চাঞ্চল্য আর জে পেলাম না কোথাও। রাধা ফিল্ম ডিওর গেটে তো তালাই ঝুলছে। লকাটা মুভিটোন!—তাও বন্ধ। কোন জ নেই! আর করবেনই বা কে? সবাই া এখন ছবি রিলিজের ব্যাপার নিয়ে া চিন্তায় পড়েছেন। টেকনিসিয়ান ডিওর জানলা গলে ভেতরে ঢুকে থলাম দুটো ফ্লোরই খোলা। আর্ট রেকশনের লোকরা কাজ করছে টুকটাক। াগামী এক সপ্তাহের মধ্যেও কোন কাজ রু হচ্ছে না।

যে দুটোয় কাজ হচ্ছে তা হল এন-টির ক ও দু নম্বর স্টুডিওয়। এক নম্বরে চ্ছে গীতাঞ্জলি-চিত্রদীপ পিকচার্সের হগীর'। হিন্দী ছবি। আর দু নম্বরে ন্দ্র কাপুর প্রোডাকশনের 'মেঘ ও রৌদ্র'। নম্বরে ইণ্ডিয়া ফিল্ম লাবরেটারীর সের সামনে গিয়ে দেখি দেয়ালে গুলো সুদৃশ্য পোস্টার পড়েছে। স্টার লিপি পড়ে মনে হল সংরক্ষণ িতির পক্ষ থেকে ওগুলো আঁটা হয়েছে।

মার্চে সিনেমাকর্মীদের আন্দোলনের য় থেকেই টালিগঞ্জের শিল্পী মহলে টা শিবির হয়। এতদিন উভয় পক্ষই ডা লড়াই চালাচ্ছিলেন নিজেদের মধ্যে। শ্চমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি তৈরীর গ সঙ্গে শিবিরের ফাটল বিরাট আকার ণ করল। এতদিন সবাই জানতেন নমার মধ্যে ছোটখাট ভুল বোঝাবুঝি লেও দলাদলির মত ঘৃণ্যতা এ রাজ্যে । কিন্তু দেখা গেল—না, তাও আছে। ক অপরের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল। র মধ্যে কোন দল সত্যিই পশ্চিম লার চলচ্চিত্র শিল্পকে সুসংরক্ষিত তে চান বা কোন দল বেশী দরদী সে না তুলে বলা যায় বাংলার চিত্র ল্পকে বাঁচানোই যদি দু দলের মূল চ্ছ হয়ে থাকে তাহলে কি দুহাত লয়ে এগিয়ে আসা যায় না? আজকের লা চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে হলে সিনেমা ী ও কলাকুশলীদের যেমন দুবেলা দু-টো খেয়ে বাঁচার দাবীতে লড়াই করা কার, তেমনি দরকার পরিবেশক র্শকের মধ্যে ছবি রিলিজের ব্যাপার য় দুর্নীতির অবসান। কর্মচারী শিল্পী াকুশলী ছাড়া যেমন প্রযোজক পরি-শক প্রদর্শক চক্র অচল আবার উল্টো ক থেকে এরাও অচল। সুতরাং এগিয়ে আসা দরকার দুদিকেরই। চিত্রগৃহের মালিকরা যখন কোন আপোষ রফায় আসতে গররাজি তখন নিজেদের মধ্যে ছোটখাট ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি করলে তাতে প্রতিপক্ষেরই সুবিধে নয় কি? ভয় হয় রাহুগ্রস্ত এ বাংলা শিল্পের রাহু-মোচন হবে তো? কবে? —না, হবেই না?

মঞ্চাভিনয়

মানুষের অধিকারে : মিনার্ভা থিয়েটারে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ-এর নিবেদন; রচনা, পরিচালনা ও সংগীত-পরিকল্পনা : উৎপল দত্ত; আলোক-সম্পাত : তাপস সেন; দৃশ্যসজ্জা : নির্মল গুহরায়; রূপায়ণ : উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল ঘোষ, শম্ভু ভট্টাচার্য, সীমা বক্‌সী, শঙ্করী রায়চৌধুরী, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আজ পৃথিবীর দিকে দিকে, ঘরে-বাইরে মানুষ অনবরতই যা প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হচ্ছে, তাকে কবির ভাষায় বলা চলে : হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব। রাজনীতির দ্বন্দ্ব, ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব, ধনসম্পত্তি-রাজ্যলাভের দ্বন্দ্ব, শ্বেত-অশ্বেতের দ্বন্দ্ব—ছোটবড়ো কত রকমের দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের আর শেষ নেই। পৃথিবীর সাধারণ, শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ বিভীষিকার মধ্যে বাস করছে। দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্বের মনোভাব মাত্রই ঘৃণ্য। তবে মনে হয়, ওরই মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব; মানুষ মানুষকে মাত্র তার কৃষ্ণকায়ের জন্যে ঘৃণা করবে, এ-কথা আজকের দিনে যেন ভাবাই যায় না। অথচ রোডেশিয়া, সাউথ আফ্রিকার স্বৈরাচারী উদ্ধত নায়ক স্মিথের বর্ণবিদ্বেষের তুলনা নেই এবং স্ট্যাচু অব লিবার্টি শোভিত, ব্যক্তি-স্বাধীনতার লীলা-ক্ষেত্র বলে বর্ণিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ওয়াশিংটন, জেফার্সন, এব্রাহাম লিঙ্কন প্রভৃতি প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বাণীকে ধুলোয়

আদ্যাশক্তি মহামায়া চিত্রে গুরুদাস, লিলি চক্রবর্তী এবং অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
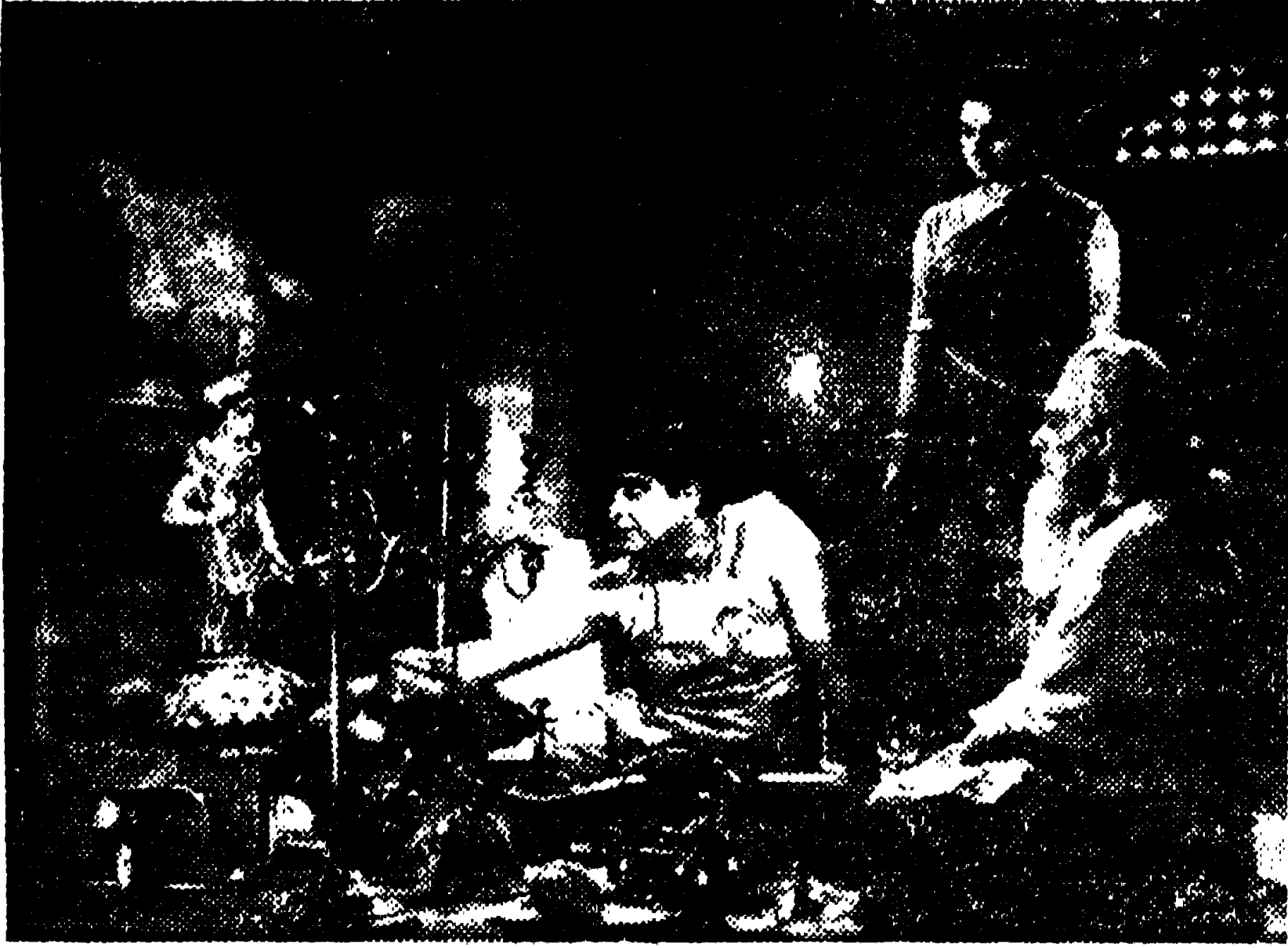
লুটিয়ে দিয়ে আজও কি বীভৎস নিগ্রো-নিগ্রহের পাশবিক উন্মত্ততা! অথচ শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীরা আমেরিকায় ঔপনিবেশিক মাত্র, তার বেশী নয়; মাত্র শ'চারেক বছর ওদের ওখানে বাস। আসলে আমেরিকার ভূখণ্ড হচ্ছে রেড ইণ্ডিয়ানদেরই পিতৃভূমি; শ্বেতাঙ্গরা প্রধানত আগ্নেয়াস্ত্রের বলে ওদের হটিয়ে দিয়ে ও জমি কেড়ে নিয়ে নিজেদের ওখানে কায়েমীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ওদেব এই উন্মত্ত বর্ণবিদ্বেষেরই বলি হতে হয়েছে রবার্ট ও জন কেনেডিকে, মার্টিন লুথার কিংকে। স্বজাতিপ্রীতির চেয়ে মানবিকতাবোধ যে ঢের বড়ো কথা, ঢের বেশী কাম্য, এ-কথা বর্ণবিদ্বেষের বিষে জর্জরিত অনেক শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীই যেন ভুলেই গেছে। প্রতিটি মার্কিন নাগরিকের স্বচ্ছন্দ সভ্য জীবনযাপনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনেট প্রদত্ত এই 'সিভিল রাইটস্' আইনের অস্তিত্বের কথা তারা স্বীকারই করতে চায় না।

এত কথা প্রস্তাবনাস্বরূপ লিখতে হল এই কারণে যে, মিনার্ভা থিয়েটারে লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ অভিনীত এবং উৎপল দত্ত বিরচিত ও পরিচালিত 'মানুষের অধিকারে' নাটকটি হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীদের উন্মত্ত বর্ণবিদ্বেষের একটি তীব্র, সোচ্চার প্রতিবাদ।

একটি চলন্ত মালগাড়ীতে একদল নিগ্রো ছেলে একদল শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে মারামারি করেছে—এই সংবাদে অ্যালাবামার শ্বেতাঙ্গসমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; কী, এত বড়ো আস্পর্ধা, নিগ্রো নিগার হয়ে শ্বেতকায় ছেলেদের গায়ে হাত তোলা! অমনি কৃষ্ণাঙ্গদের দলপতি তরুণ যুবক হেউড প্যাটার্সনের বিরুদ্ধে নারীধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হোল। আসামী পক্ষের কৌঁসুলী হয়ে এলেন নিউইয়র্ক থেকে মানবপ্রেমী ইহুদী ব্যারিস্টার লিবোভিটস। তিনি অ্যালাবামার আদালতে শত বিদ্রুপবাণ সহ্য করেও তাঁর সুচিন্তিত যুক্তিতর্কের দ্বারা ও সাক্ষীদের জেরার বলে স্পষ্ট প্রমাণ করে দিলেন, মামলাটি সাজানো ও ভিত্তিহীন। কিন্তু অ্যালাবামার আদালত লিবোভিটস-এর প্রদর্শিত যুক্তি উপেক্ষা করে প্যাটার্সনকে নারীধর্ষণের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

মূল নাটকটিতে দুটি মাত্র দৃশ্য: এক গ্রাম্য স্টেশন এবং দুই, আদালত। এই আদালতের দৃশ্যটিই নাটকের পঁচাত্তর শতাংশ জুড়ে আছে। আদালতের দৃশ্যেই বারংবার ফিরে না এসে মাঝে লিবোভিটস-এর সাময়িক বাসস্থান এবং অভিযোগকারী-দের কৌঁসুলী নাইট-এর চেম্বার প্রভৃতির ঘটনাবলী দেখিয়ে নাটকে আরও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা যেত কিনা, সে-প্রশ্ন না তুলেও বলব, নাটকটি এত বেশী বক্তৃতামূলক ও প্রচারধর্মী না হলে আর্টের মর্যাদা রক্ষায় সহায়ক হত। আর একটি কথা। স্তবের মধ্যে কুচযুগের উল্লেখ ছিল বলে বাগ্দেবী কালিদাসকে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন

অভিনেতৃ সংঘের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রীমতী মলিনা দেবী সিনেমা-কর্মী সংস্থা বি, এম, পি, এ, ইউ-এর প্রতিনিধির হাতে দশ হাজার টাকার চেক অর্পণ করেন। চিত্রে মলিনা দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মৃণাল মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে। ফটো : অমৃত

ন্তু বর্তমান সাহিত্যে ঐ কুচযুগ মর্দনের ন্যে হাত নিশপিশ করার কথাও সঙ্কোচে লিপিবন্ধ হতে দেখছি। অবশ্য লীল-অশ্লীল ও রুচিবোধ আজকের দিনে ত্যন্ত ব্যক্তিগত কথা। কাজেই উৎপল ত্তর বর্তমান নাটকটিকে অশ্লীলতা-ষদুষ্ট করা যাবে কিনা জানি না ; কিন্তু শে জননী-জায়া-কন্যাকে নিয়ে এই ট্যাভিনয় দেখার সাহস আমাদের নেই, কথা নির্দ্বিধায় বলব।

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের গ্রুপ অ্যাক্‌টিং সমবেত অভিনয়ের দক্ষ কারুকার্য মনে ভীর রেখাপাত করে। সকলেই যোগ্যতার শে অভিনয় করেছেন, এ-কথা বলার রও বলব মানবপ্রেমী কৌঁসুলী লিবো-টস্‌-এর ভূমিকাটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে পল দত্তর নাট্যনৈপুণ্য গুণে। নাইট, হেউড টার্সন, ভিক্‌টোরিয়া প্রাইস ও রুবি সেরূপে যথাক্রমে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ল ঘোষ, সীমা বক্‌সী ও শঙ্করী রায়-ধুরী ভূমিকাগুলিতে প্রাণসঞ্চার করেছেন।

অভিনেতা বিশ্বজিৎ বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরের হাতে দশ হাজার এক টাকার একটি চেক অর্পণ করেন।
ফটো : অমৃত

অপরাপর ভূমিকায় পলাশ দাস (হিল), শম্ভু ভট্টাচার্য (স্টীভ), সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্যালাহান), সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মার্থা), নরেন পাইন (কার্টার) প্রভৃতির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

নাটকের দৃশ্যরচনায়—বিশেষ করে আদালত-দৃশ্যটির উপস্থাপনায় নির্মল গুহ-রায় তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন। প্রস্তাবনা ও স্টেশনদৃশ্যে তাপস সেনের আলোকসম্পাত কৌশলের জাজ্বল্যমান নিদর্শন দেখা গেল। আবহসংগীত পরিবেশনে সময়োপযোগী মার্কিনী পরিবেশ সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

রঙমহলে 'নহবত'-এর বর্ধমান জনপ্রিয়তা :

আশ্চর্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে রঙমহলের বর্তমান নাটক 'নহবত'। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, পরিচালিত এবং অভিনীত এই নাটকটি দর্শককে ক্ষণে ক্ষণে হাসিকান্নার দোলায় দোলাতে থাকে। আবার করে দেখতে গিয়ে দেখলুম, নাটকটিতে কোথাও কোথাও যে আলগা বুনোন ছিল, সে-সব জায়গায় অদলবদল করে রসকে আরও ঘন এবং সমস্ত নাটকটিকে অধিকতর উপভোগ্য করে তোলা হয়েছে। পূর্বেরই মতো নাটকের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছেন কেয়া বা কাসুন্দীর ভূমিকাভিনেত্রী আরতি ভট্টাচার্য; এই শ্রীমতী তরুণীর স্বচ্ছন্দ প্রাণোচ্ছল অভিনয় দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এ'র সংগে রঙমহলের প্রথিতযশা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি তো আছেনই।

পরিবার চিত্রে নন্দা এবং জিতেন্দ্র

বায়েন

সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জের রবীন্দ্র ভবনে অভিনীত হোল জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বায়েন' নাটক। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন 'মিলনী'গোষ্ঠী। প্রতিটি শিল্পীর

আন্তরিকতা সামগ্রিকভাবে নাটপ্রযোজনাটিকে সার্থক করে তোলে। যাঁরা সুন্দর অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন তাঁরা হোলেন দীপিকা সরকার, কুবের ঘোষ, সুকুমার সিংহ, শান্তি দেবী, বিনয় মিশ্র, রাধেশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস রায়। নাট্যনির্দেশনায় বিশ্বেশ্বর লালার নিষ্ঠা প্রশংসার দাবী রাখে।

বিবিধ সংবাদ

কহ্লার গোষ্ঠীর বাৎসরিক উৎসব

গত ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছ' টার আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস হলে অন্যতম অগ্রণী—রবীন্দ্র সংগীত সংস্থা কহ্লার শিল্পী-গোষ্ঠীর দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে কবিগুরুর 'শাপমোচন' নৃত্য-নাট্য অভিনীত হয়। রবীন্দ্র সংগীতে প্রত্যেক শিল্পী তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উপস্থিত দর্শকমন্ডলীর প্রশংসাভাজন হন। নৃত্যাংশে একমাত্র সত্যপাল (পরিচালক) ছাড়া আর কারোর অভিনয় উন্নতমানের হয়নি। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন—সর্বশ্রী অনীতা চট্টোপাধ্যায়, সবিতা ঘোষ, এনা দাসগুপ্তা, আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ ঘোষ, বিশ্বনাথ সেনগুপ্তা ও সৌম্যেন্দু গুহ এবং আরো কয়েকজন।

গ্রামোফোন কোম্পানীতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বর্ধিত এল পি রেকর্ডে 'কবি'—আসন্ন পুজোয়

সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ হতে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। দমদমে এবার পুজোপলক্ষে তাঁর 'কবি' নাটক এল পি রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে। টেপধৃত নাটকটি শুনে তিনি অত্যন্ত খুসী হয়েছেন। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে আছেন সেই সব জনপ্রিয় শিল্পীরা 'কবি'কে যাঁরা মঞ্চে সার্থকোজ্জ্বল করে তুলেছেন। রবীন মজুমদার, অনুভা গুপ্তা, সত্য বন্দোপাধ্যায় ও আর সবাই। পুজোর পর 'কবি'—ঘরে ঘরে বাজবে বলে রেকর্ড কোং আশা করেন।

ওয়েল্ট এন্ড স্কুল প্রযোজিত 'ক্ষীরের পুতুল'

গত ১৭ আগষ্ট, শনিবার রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে ওয়েস্ট এন্ড স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পটির নাট্যরূপ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। গল্পটির নাট্যরূপ দেন শ্রীমতী ঝর্ণা বিশ্বাস। তিনি পরিচালিকাও বটে। সহ-পরিচালনায় ছিলেন শ্রীমতী শুক্লা মজুমদার। চার থেকে বারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এই নাটকে অভিনয় করে দর্শকমন্ডলীকে মুগ্ধ করে। দুয়োরাণীর ভূমিকায় রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী, সুয়োরাণী ভূমিকায় মালবিকা চক্রবর্তী, রাজা ও বানরের ভূমিকায় যথাক্রমে বিমল মুখার্জি ও সমর মোদক অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। পার্শ্বচরিত্রে মন্ত্রীর ভূমিকায় নূপুর বিশ্বাস দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে। অভিনব মঞ্চসজ্জায় নাটকটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছিল। মঞ্চসজ্জায় ছিলেন শ্রীমতী অঞ্জনা ঘোষ, শ্রীমতী ছন্দা ঘোষদস্তিদার ও শ্রীমতী কণিকা কর। আবহ-সংগীতে মন্টু ব্যানার্জির বেহালা ও খোকন সেনগুপ্তের বাঁশী অবশ্য প্রশংসনীয়।

সুরগীতির বাৎসরিক ফলাফল

এলাহাবাদ প্রয়াগ সংগীত সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত কলকাতার সুরগীতি বালিকা সংগীতালয়ের ১৭৬৭ সালের 'সংগীত প্রভাকর' পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আটজন ডিস্টিংশন ও নয়জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

নবোদয় সংঘের বিচিত্রানুষ্ঠান

নবোদয় সংঘের অষ্টম বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো গত ১৪ আগষ্ট '৬৮ মহাজাতি সদন প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানের শুরুতে গীতিমালঞ্চ সংস্থা পরিবেশন করেন "ঋতুরঙ্গ"। এরপর অনুষ্ঠিত হয় প্রখ্যাত শিল্পী সমন্বয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান। অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সেন, পিন্টু ভট্টাচার্য, বনশ্রী সেনগুপ্ত এবং কৌতুক গীতি শিল্পী শ্রীঅমল বসু। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন নর্থ ক্যালকাটা মিউজিক ক্লাব। তবলা সংগত করেন শ্রীতরুণ দাস।

এই দৃষ্টান্ত পথ দেখাক

শঙ্করবিজয় মিত্র

খেলাধুলোর জগতে ভারত বিশ্বমানের র্যায়ে আজও পৌঁছাতে পারল না। এক-ত্র হকি ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে আমাদের থা উঁচু করে দাঁড়াবার মত কিছু নেই। াথলেটিকসে এতকালের মধ্যে নরম্যান চার্ড ও মিলখা সিং ছাড়া বিশ্ব পর্যায়ে র কারো দর্শন পাওয়া গেল না। খেলা-লার উন্নয়নের জন্যে অনেক কিছু করা চ্ছ, প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে বলে ার শোনা গেলেও আসলে আমরা বিশেষ সর হতে পারিনি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছর পরের অবস্থাতেও আশাব্যঞ্জক তি চোখে পড়ে না। পঞ্চাশ কোটি ষের বাসভূমি ভারতবর্ষ শারীরিক র্থ্যের প্রতিযোগিতায় এত পেছনে পড়ে ছ যে, ভাবতে বিস্ময় লাগে। যথার্থ তারিকতা, বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ থাকলে কোন দেশ যে থানি অগ্রসর হতে পারে তার একটি ন্ত উদাহরণ এখানে উত্থাপন করছি। ছোট্ট একটি দেশ নাম পূর্ব জার্মানী। পৌনে দু' কোটি জনসংখ্যা নিয়ে জার্মানী খেলাধুলোর জগতে একটি ণ্ট স্থান করে নিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচন্ড আঘাতে ন্ত জার্মানী দুভাগে বিভক্ত হয়ে ও পশ্চিম জার্মানী গড়ে ওঠে বিভক্ত তর বুকে ভারত ও পাকিস্থানের ধ্বংসপ্রাপ্ত জার্মানী যে দ্রুতগতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার তুলনা এক-জাপান ছাড়া আর কোথাও মেলে না। সম্পদ ও সামর্থ্যে পূর্ব ও পশ্চিম নীই আজ সমগ্র বিশ্বের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ করেছে। খেলাধুলোর ঃ তাদের অগ্রগতি বিস্ময়কর। দ্ধোত্তর কালে ১৯৫২ সালে হেল-ওলিম্পিকে পশ্চিম জার্মানীর বির্ভাব ঘটে। তখনো পূর্ব কে দেখা যায় নি, ক্রীড়াজগতে তার শক্তিসঞ্চয় তখনো সম্পূর্ণ হয়নি। এর পরের পনের বছরে পূর্ব জার্মানী খেলাধুলোর ক্ষেত্রে যে শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয় করেছে তা সত্যই প্রশংসাজনক। মাঝারি পাল্লার দৌড়ে সিগফ্রিড ভ্যালেন্টাইন, ম্যানফেড মাট্সোয়েস্কি এবং জার্গন মে, সন্তরণে ফ্র্যাংক উইল্যান্ড ও স্কুলার আকিমাইল প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে এই সময়ের মধ্যে। ইনগ্রিড গুলোবিন রোম ও টোকিও ওলিম্পিকে ডাইভিং'এ তিন-তিনটি স্বর্ণপদক জয় করেন, কারিন বালজার টোকিওতে অনুষ্ঠিত ওলিম্পিকে ৮০ মিটার হার্ডলে স্বর্ণপদক পান। ১৯৬৬ সালে পূর্ব জার্মানী সমগ্র ইউ-রোপে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে রোয়িং'এ বিশ্ব পর্যায়ে স্থান পায় এবং এ্যাথ-লেটিকস ও সাঁতারে ইউরোপীয় চ্যাম্পি-য়নসিপের প্রতিযোগিতায় সেরা প্রতি-যোগীর আসন দখল করে। বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় এ্যাথলেটিকস প্রতি-যোগিতায় পূর্ব জার্মানী আটখানা স্বর্ণ, তিনখানা রৌপ্য ও তিনখানা ব্রোঞ্জ পদক; রোয়িংয়ে (যুগোশ্লাভিয়ায়) তিনখানা স্বর্ণপদক ও দুখানা ব্রোঞ্জ পদক এবং সাঁতারে (ইউ-ট্রেস্টে) চারখানা স্বর্ণ, ছখানা রৌপ্য ও পাঁচখানা ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। বুদাপেস্টের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন-সিপ প্রতিযোগিতায় পূর্ব জার্মানী সোবি-য়েৎ রাশিয়ার একাধিপত্যে ফাটল ধরায়। সোবিয়েৎ রাশিয়া এই প্রতিযোগিতায় মাত্র ছ'খানা স্বর্ণপদক অর্জনে সমর্থ হয়। পূর্ব জার্মানীর ক্রীড়াশিক্ষকরা তাদের শিক্ষণ পদ্ধতির সাফল্যে অবশ্যই গৌরব বোধ করতে পারে।

ক্রীড়াজগতে পূর্ব জার্মানীর এই বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সুপরি-কল্পিত উপায়ে সরকার ও ক্রীড়াবিদদের সমবেত প্রচেষ্টায়। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দান ও অবি-রাম প্রচারের মাধ্যমে ছোট-বড় সকল খেলোয়াড়, এ্যাথলিট, সাঁতারু প্রভৃতিকে উৎসাহ ও সুবিন্যস্ত ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থার সাহায্যে এই অগ্রগতি সম্ভবপর হয়েছে। স্পোর্টসের কেন্দ্রীয় পরিচালক সংস্থা জার্মান জিমনাস্টিকস ও স্পোর্টস ফেডারেশন (ডি টি এস বি) সকল প্রকার ক্রীড়াতে সর্বা-ধিক সংখ্যক তরুণকে অংশ গ্রহণে উৎ-সাহিত করে। এর ফলে দেশের মোট জন-সংখ্যার শতকরা এগারজনই কোন না কোন ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করে। অর্থাৎ দেশের এক কোটি সত্তর লক্ষ অধিবাসীর প্রতি দশজনের মধ্যে একজনেরও বেশি খেলা-ধুলোয় যোগ দেয়। দেশের ক্রীড়া বিভাগের বিকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের সুনাম ও মর্যাদা তুলে ধরার লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে ডি টি এস বি পরি-চালিত। তাই দেশের সামর্থ্যবান সকল তরুণকে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং জাতীয় বা আন্তর্জাতীয় পর্যায়ে যে সকল এ্যাথ-লিট সাফল্য অর্জন করে তাদের 'মাস্টার অফ স্পোর্টস' খেতাবে ভূষিত করা হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে এই মর্যাদা আসে এবং দেশের রাজনৈতিক নেতা এইভাবে স্পোর্টসম্যানদের উৎসাহান্বিত করেন।

স্কুলে পড়ার সময় তাদের প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় এবং বিশেষ ক্রীড়া-সামর্থ্য পরিলক্ষিত হলে তরুণদের জন্যে নির্দিষ্ট স্পোর্টস স্কুলে তাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এই ধরনের প্রায় কুড়িটি বিদ্যালয় রয়েছে। এই শিক্ষালয়গুলিতে যে সকল তরুণ যোগ্যতার পরিচয় দেয় তাদের জার্মান ইউনিভার্সিটি অফ ফিজিক্যাল কালচারে ভর্তি করা হয়। লিপজিকে এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। শরীর চর্চার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর উন্নয়ন মান ও সুনাম সারা ইউরোপে

সুপরিচিত। প্রতিভাধর তরুণদের খেলাধুলোর বিভিন্ন বিভাগে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা এখানে করা হয় বলেই বহু তরুণ দেশের সুনাম বাড়াবার জন্যে শরীরচর্চা বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা করে। পঁয়ত্রিশ একর জমি নিয়ে এর অবস্থিতি, তার মধ্যে প্রায় বার একর জমির উপর গৃহাদি নির্মিত হয়েছে। প্রারম্ভকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিল মাত্র ৮০ জন এবং শিক্ষক ও শিক্ষিকা ছিলেন তের জন। আজ এখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা হচ্ছেন তিনশো এবং ছাত্রছাত্রী রয়েছে চব্বিশশো জন।

ডি টি এস বি ব্যাপকভাবে দেশের বিভিন্ন সংস্থার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং সকল স্থান থেকেই ক্রীড়া-প্রতিভা আহরণ করে। দেশের যুব-সংস্থা, নারী সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সংগেও ডি টি এস বি যোগসূত্র বজায় রাখে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকেই প্রধান উপাদান সংগৃহীত হয়। ডি টি এস বি বর্তমানে ছ' বছরের নিম্নবয়স্ক প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিশু, ছ' থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের চার লক্ষ কিশোর ও চৌদ্দ থেকে আঠার বছর বয়সের আড়াই লক্ষ তরুণের শিক্ষণ ব্যবস্থা করে থাকে। বিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলি ছ' থেকে চৌদ্দ বছর স্তরের সাত লক্ষ ও চৌদ্দ থেকে আঠার বছর বয়সের সোয়া লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ক্রীড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করে। সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে নিয়মিত ভাবে নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। পর্যায়ক্রমে ব্যাপকভাবে এই প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। এত সুশৃংখল ও সুপরিকল্পিত ভাবে এই প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয় যে সারা দেশের প্রায় প্রতিটি শিশুর মনে ক্রীড়ার প্রতি একটা আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়ার কাজটা আনন্দ ও উৎসাহের সংগে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতাগুলির একটা মোটামুটি হিসেবে দেখা যায় যে, ছ' থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের চৌদ্দ লক্ষ চব্বিশ হাজার এবং চৌদ্দ থেকে আঠার বছর বয়ঃক্রমের ছ' লক্ষ চুয়ান্ন হাজার প্রতিযোগী যোগদান করেছিলেন। এইসব প্রতিযোগিতার সরকারী রেকর্ডগুলিকে স্থানীয় আঞ্চলিক ও জাতীয় ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাছাড়া সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিসনে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থাও আছে। ১৯৬৫ সালে শীতকালীন ক্রীড়াগুলিতেও ছেচল্লিশ হাজারের অধিক স্কুল ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেন।

দেশের যেসব সুসন্তান অতীতে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন সেই সব মহান পূর্বসূরীদের নাম তুলে ধরা হয় তরুণদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে। নেপোলিয়ানের সময় পূর্ব জার্মানী ছিল প্রুশিয়া। নেপোলিয়ানের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রুশিয়ার যুদ্ধের সময় ফ্রেডারিক লুডুইক জ্যান তরুণদের এই বলে উদ্বুদ্ধ করতেন যে মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষায় শারীরিক শক্তিই শ্রেষ্ঠ গুণ। তিনিই আধুনিক জিমনাস্টিকের প্রবর্তক। তাই তাঁর নামে পূর্ব-জার্মানীর সেরা স্টেডিয়ামটির নামকরণ করা হয়েছে। পূর্ব বার্লিনে অবস্থিত এই স্টেডিয়ামটিতে ষাট হাজার দর্শকের বসবার স্থান আছে। স্পোর্টসে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে যে মেডাল দেওয়া হয় তারও নামকরণ হয়েছে জ্যানের নামানুসরণে। জার্মানীর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিক ফোয়েবেল (১৭৭২-১৮৪৮) ব্যাড ব্লাঙ্কেনবুর্গে ১৮৪০ সালে জার্মানীর প্রথম কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত করেন। তাঁর নামাঙ্কিত এই সংস্থাটিতে পূর্ব-জার্মান কর্তৃপক্ষ তাই একটি স্পোর্টস স্কুল স্থাপন করেন, আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে। এই বিদ্যালয়ে স্পোর্টসম্যান, অফিসিয়াল ও ট্রেণারদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

তাছাড়া যে সকল তরুণ খেলাধুলোয় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের জন্য সকলপ্রকার সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে। স্কুলে পড়তে পড়তে কিংবা স্কুলের পাঠ সাংগ করার সংগেই তারা তাদের পছন্দমত খেলাধুলোয় আত্মনিয়োগ করে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পারে। এ এস কে ভোরওয়ার্স, এস সি লিপজিগ, ডাইনামো ড্রেসডেন, ডাইনামো বার্লিন প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান ক্লাবগুলি খেলাধুলোয় বিভিন্ন বিভাগে তরুণদের জন্যে নানা সুযোগ সুবিধে করে দিয়ে থাকে। পূর্ব জার্মানীর জিমন্যাস্টিক ও স্পোর্টস হলের সংখ্যাও প্রচুর। ১৯৬৫ সালে এর সংখ্যা ছিল ৪৪১০টি। ১৯৬১ সালের ৩২১২ থেকে বেড়ে এই সংখ্যায় পৌঁছেছে। সুইমিং পুলের সংখ্যাও ১৯৬১ সালের ৫৮৫টি থেকে বেড়ে ১৯৬৫ সালে ১১৬৬টি দাঁড়ায়। খেলাধুলোর সুযোগ-সুবিধা এই হারেই বেড়ে চলেছে। এই সকল ক্লাব তরুণদের শিক্ষণের জন্যে সেরা শিক্ষকদের সমাবেশ ঘটায়। শহরাঞ্চলের বাইরে থেকে যে সকল শিক্ষার্থী আসে তারা এই সকল শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে স্ব-স্ব ক্রীড়াধারার উন্নতি ঘটাতে সমর্থ হয়। তাছাড়া এইভাবে ক্লাবগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্যে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে তোলে। গত ১৯৬৪ সালের বিশ্ব ওলিম্পিকে পূর্ব জার্মানীর যে সকল প্রতিযোগী যোগ দেয় তার অর্ধেকেরও বেশি এইসকল ক্লাব থেকেই বেড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে প্রতিযোগীদের যে সময় ব্যয় করতে হয়, তার জন্যে তাদের কোন চিন্তার কারণ থাকে না। তাদের এই শিক্ষার জন্যে যে সময় বা অর্থের প্রয়োজন সবই সরকার ব্যবস্থা করে দেন।

এই ব্যবস্থাপনার ফলে এক দশকের মধ্যে পূর্ব জার্মানী বিশ্ব-পর্যায়ে এক বিশিষ্ট প্রতিযোগীর স্থান দখল করেছে। মাটুসোয়েস্কি ৮০০ মিটার পাল্লায় ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ানসিপ অর্জন করেন এবং গত বছর কিয়েভের অনষ্ঠানে আট এবং পনেরো শো মিটার উভয় দূরত্বেই প্রথম হন। কারিন বাল্জার মহিলা এ্যাথলিটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব পান এবং হার্ডল রেসে বিশ্ব প্রতিযোগির পর্যায়ে নিজের স্থান করে নেন। ১৯৬৪ সালে বিশ্ব ওলিম্পিকে তিনিই প্রথম পূর্ব-জার্মানীর জন্য প্রথম স্বর্ণ-পদক এনে দেন। অন্যান্য সেরা এ্যাথলীটদের মধ্যে আরও যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য—তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দশ হাজার মিটার দৌড়বীর জুয়ার্জেন হাসে, পোলভল্টার উলফ গ্যাঙ্গ নর্ভুইক ও ভ্রমণবীর ভিয়েটার লিন্ডনার। এরা সকলেই বর্তমান বছরের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ান।

সাঁতারের উন্নয়নেও পূর্ব জার্মানীর ব্যবস্থাপনা অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ব্যাপক ও সুবিন্যস্ত। সাঁতারে আটচল্লিশ হাজার প্রতিযোগী নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। এদের প্রায় অর্ধাংশ চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে। সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক রোনাল্ড ম্যাটহেস গত বছর পিঠ সাঁতারের তিনটি বিষয়ে বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন। তিনি এক ওলিম্পিক জয়ের আশা করছেন। ৪×১০০ মিটার মেডলে রিলেতে পূর্ব জার্মানীর দল বিশ্ব রেকর্ড গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন তা রোনাল্ড অন্যতম সদস্য ছিলেন। এছাড়া মার্টিনা গ্রুনার্ট (শত মিটার ফ্রি স্টাইল) ফ্যাঙ্ক উইল্যান্ড (৪০০ মিঃ ফ্রি-স্টাই ও মেডলি রিলে) ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয় খেতাবের অধিকারী।

ফুটবল পূর্ব জার্মানীর সবচেয়ে খেলা। দেশে প্রায় আঠার হাজার ফু টিম আছে এবং তাতে প্রায় চার লক্ষ খে য়াড় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। ১৯৬৪ ওলিম্পিকে পূর্ব জার্মানী ফুটবলে তৃ স্থান অধিকার করে। ১৯৬৮ সালে অ ভাল ফলাফলের জন্যে জোর প্রস্তুতি নে হয়েছে। হকিতে পূর্ব জার্মানী বি প্রথম সারির ছ'টি দলের মধ্যে স্থান পেয়ে ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো ওলিম্প প্রস্তুতি হিসেবে গত বছর পূর্ব জার্মা হকি দল ভারত পর্যটন করে গেছে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলার মধ্যে ভা বিরুদ্ধে একটি জয়লাভ করেছে ও 'ড্র' হয়েছে।

পূর্ব জার্মানীর এই সাফল্য ভারতের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। একই সময়ে স্বাধীন ভারত ও পূ জার্মানী স্বাধীনভাবে দেশকে সমুন্নত বার পথে অগ্রসর হয়েছে। মাত্র এক সত্তর লক্ষ অধিবাসীর দেশ হলেও স কল্পিত ও সংকল্পবদ্ধ পন্থায় জার্মানী যে উন্নতি করেছে প্রায় কোটি অধিবাসীর বিশাল দেশ ভা তার তুলনায় কিছুই করতে পারে নি ব্যর্থতার প্রতিকারের উপায় অ আমরা এই ছোট্ট দেশটির দৃষ্টান্ত কি করতে পারি না?
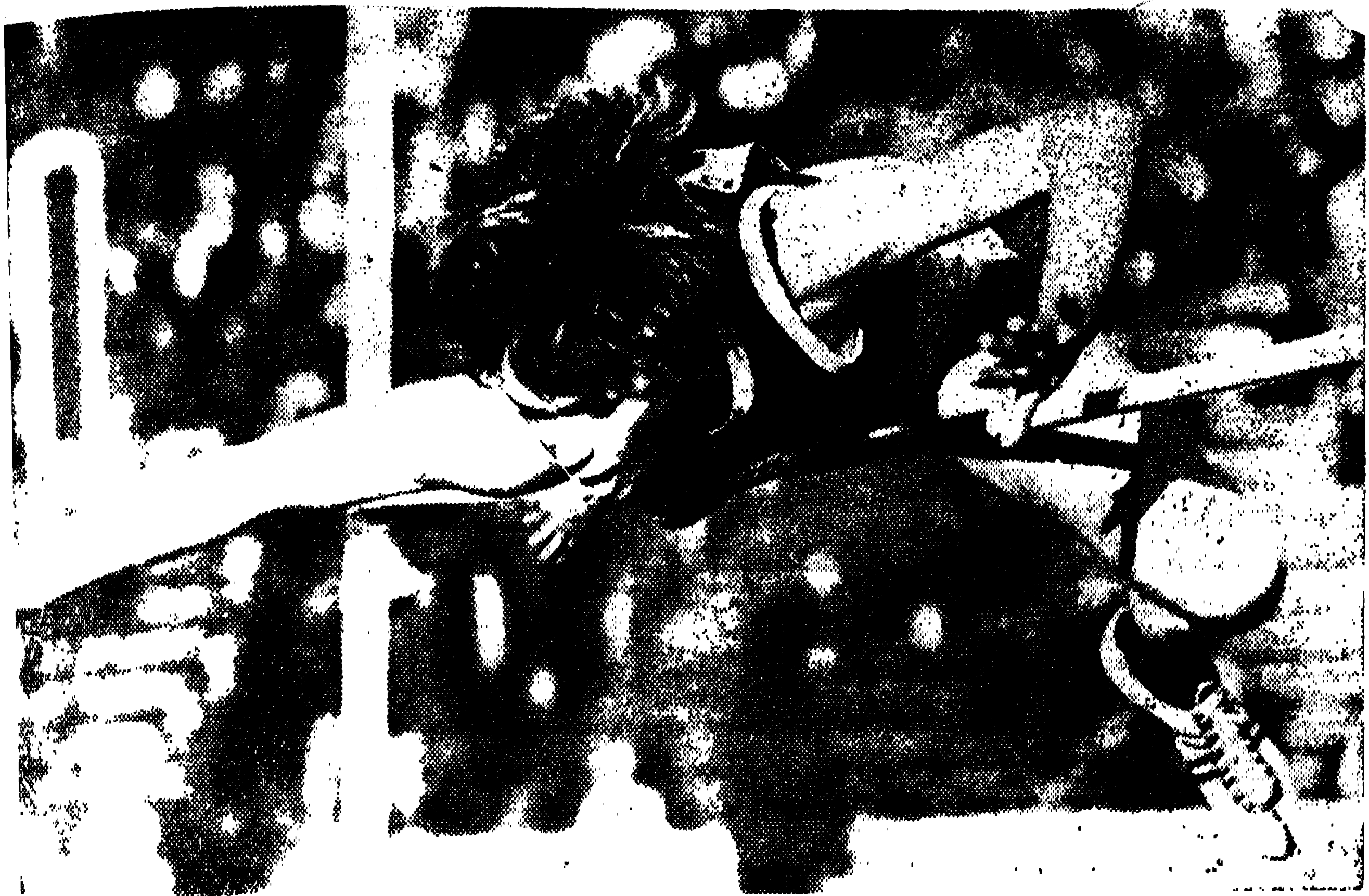
সম্প্রতি সোফিয়ার (বুলগেরিয়া) আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ১৭ বছরের স্কুল-ছাত্রী কুমারী রিটা স্মিড (পূর্ব জার্মানী) হাই-জাম্পে ৬ ফিট ১½ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। কারণ মহিলাদের হাই-জাম্পে রুমানিয়ার আইওল্যান্ডা বালাস প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরেকর্ড (৬ ফিট ৩¼ ইঞ্চি) এবং অলিম্পিক রেকর্ডের (৬ ফিট ২¾ ইঞ্চি) নীচে কুমারী স্মিডের এই ৬ ফিট ১½ ইঞ্চি উচ্চতা স্থান পেয়েছে।

খেলাধুলা

দর্শক

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কোয়ালালামপুরে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা দিবসের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ...দশ বার্ষিকী মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা গত ৯ই আগস্ট থেকে আরম্ভ হয়। এ বছরের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষকে নিয়ে ১২টি দেশ যোগদান করেছে। ...বছরের যুগ্ম-বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়া ... ব্রহ্মদেশ যথাক্রমে 'এ' এবং 'বি' ...পে খেলে। ভারতবর্ষের খেলা পড়ে ...বিভাগে। রেলওয়ে দলের খেলোয়াড় ... ঘোষের নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল ... স্থান পেয়েছিলেন বাংলার ১১জন, ...রের ২ জন এবং একজন করে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, পাঞ্জাব এবং কেরালার খেলোয়াড়। ভারতবর্ষের উদ্বোধনী খেলা ...ই ভাল হয়নি—তারা প্রথম খেলাতেই ... গোলে মালয়েশিয়ার কাছে হেরে ... অথচ ভারতবর্ষ প্রথমার্ধের খেলায় ... গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয় ... ভারতবর্ষ ৩—২ গোলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধের ... দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ২—১ গোলে ... ছিল। ভারতবর্ষ বনাম হংকংয়ের ... ১—১ গোলে ড্র যায়। প্রথমার্ধের ... হংকং ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। ...বর্ষ বহু সুযোগ নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত খেলার ৭০ মিনিটের মাথায় গোলটি শোধ দেয়। ভারতবর্ষ তার চতুর্থ খেলায় ৩—১ গোলে গত বছরের যুগ্ম-বিজয়ী ব্রহ্মদেশকে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এই দুই দলের প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ছিল। এ বছরের প্রতিযোগিতায় ব্রহ্মদেশের প্রথম পরাজয়। ভারতবর্ষ তার শেষ লীগ খেলায় তাইল্যান্ডের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে ০-১ গোলে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। ভারতবর্ষ প্রথমার্ধের ৩৬ মিনিটের মাথায় গোল খায় এবং একাধিক গোল দেওয়ার সুযোগ পেয়েও গোল শোধ দিতে পারেনি। ভারতবর্ষের বিপক্ষে তাইল্যান্ডের এই জয় প্রতিযোগিতায় তাদের একমাত্র জয়। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে চরম ব্যর্থতার পরিচয়।

লীগ খেলার সূত্রে 'এ' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ইন্দোনেশিয়া (৮ পয়েন্ট) এবং রানার্স-আপ হয়েছে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া (৭ পয়েন্ট)। অপরদিকে 'বি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মালয়েশিয়া (৮ পয়েন্ট) এবং রানার্স-আপ ব্রহ্মদেশ (৬ পয়েন্ট)। এই চারটি দলের মধ্যে লীগের খেলায় পরাজয় স্বীকার করেনি একমাত্র মালয়েশিয়া (জয় ৩ ও ড্র ২)। অপর তিনটি দলের খেলার ফলাফল : ইন্দোনেশিয়া—জয় ৪ ও হার ১ (অস্ট্রেলিয়ার কাছে), পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া—জয় ৩, ড্র ১ ও হার ১ (জাপানের কাছে) এবং ব্রহ্মদেশ—জয় ২, ড্র ২ এবং হার ১ (ভারতবর্ষের কাছে)। লীগের খেলায় সর্বাধিক গোল দেওয়ার রেকর্ড—তাইওয়ানের বিপক্ষে ইন্দোনেশিয়ার ১০—১ গোলে জয়।

সেমি-ফাইনাল খেলা

ইন্দোনেশিয়া বনাম ব্রহ্মদেশ
মালয়েশিয়া বনাম পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া

অলিম্পিক হকি প্রসঙ্গ

পাঞ্জাবের পৃথিপাল সিং এবং বাংলার গুরুবক্স সিং মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় হকি দলের যুগ্ম-অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। তবে মর্যাদার ক্ষেত্রে পৃথিপাল সিংয়ের স্থান প্রথম। মেক্সিকো অলিম্পিকগামী ভারতীয় হকি দলের ম্যানেজার পদলাভ করেছেন সার্ভিসেস স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের মেজর জেনারেল ডি এস কালহা। খেলোয়াড়দের
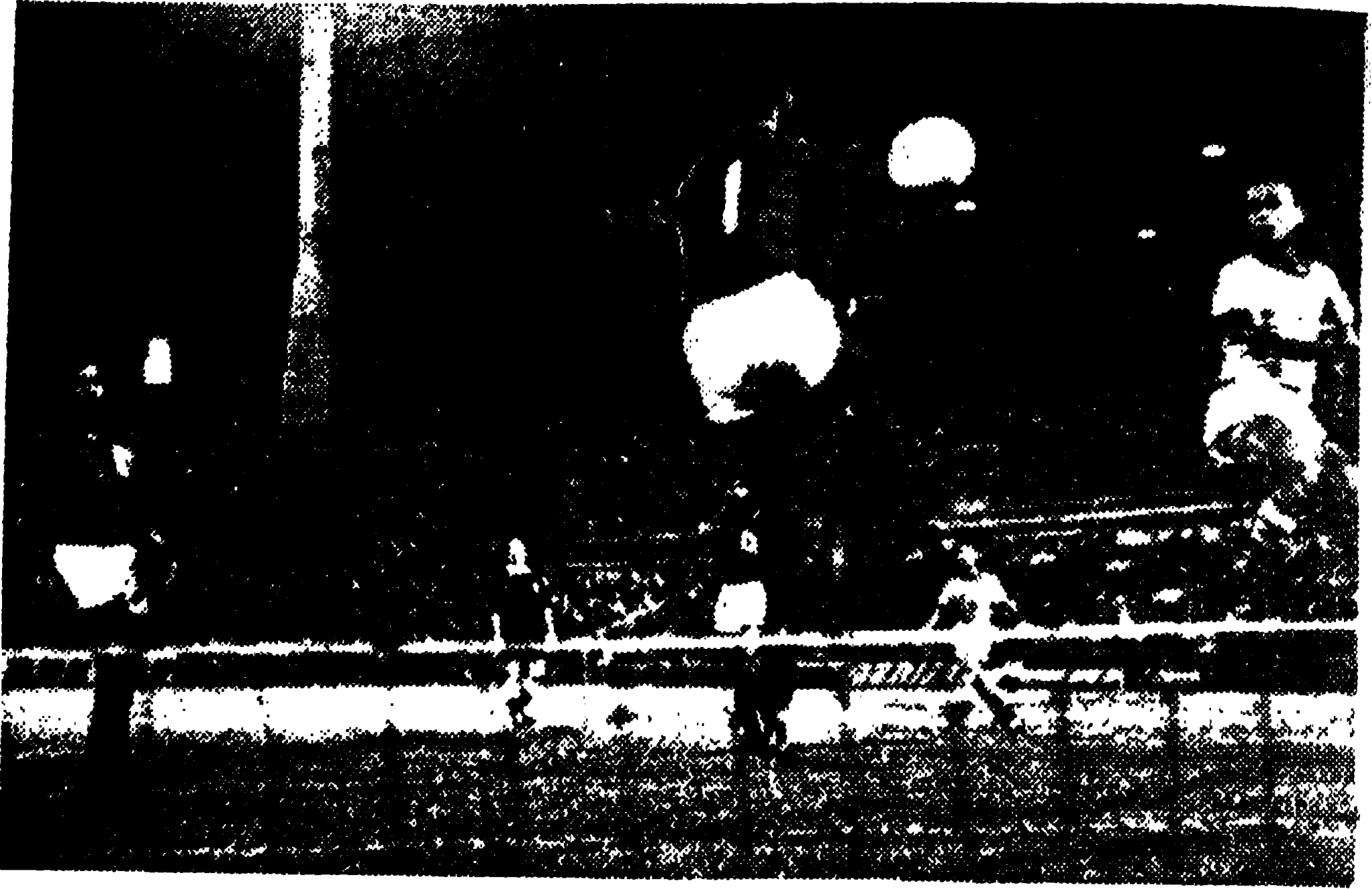
কোয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভিয়েৎনামের বিপক্ষে ভারতবর্ষের গোলরক্ষক মুস্তাফা শূন্যে লাফিয়ে একটি শক্ত বল ধরেছেন। এই খেলায় ভারতবর্ষ ৩-২ গোলে জয়ী হয়।

শিক্ষা-দিক্ষা দেওয়ার ভার পেয়েছেন বালকিষেণ সিং। পৃথিবপাল সিং ইতিপূর্বে রোম এবং টোকিও অলিম্পিকে খেলেছিলেন। ১৯৬৬ সালে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত আন্তাজার্তিক হকি প্রতিযোগিতায় তিনি ভারতীয় হকি দল পরিচালনা করেছিলেন। হকি খেলায় তাঁর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৬১ সালে অর্জুন পুরস্কার এবং পদ্মশ্রী খেতাব দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করা হয়। পৃথ্বীপাল সিংয়ের বয়স ৩৫ এবং গুরুবক্স সিংয়ের বয়স ৩২ বছর।

মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের সাফল্য সম্পর্কে অভিমত দিতে গিয়ে ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক 'বাবু' (কে ডি সিং) বলেছেন, তরুণ এবং প্রবীণ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত এই ভারতীয় হকি দলটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ হকি দল, তবে আমাদের মনে রাখতে হবে—অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স এবং বৃটেন আমাদের মতই প্রায় সমান শক্তিশালী হকি দল আজ গঠন করতে পারে। সুতরাং আমরা নিশ্চয় জয়লাভ করবো এ কথা আজ আর আমরা বলতে পারি না। তবে জয়লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৬৮ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা সরকারীভাবে আগামী ২৩শে আগস্ট আরম্ভ হলেও ৪ঠা সেপ্টেম্বরের আগে কলকাতার নামকরা ফুটবল দল—ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলা হবে না। এ পর্যন্ত ঠিক আছে যে, মোহনবাগান তার প্রথম ম্যাচ খেলবে ৫ই সেপ্টেম্বর এবং ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের প্রথম খেলা পড়েছে ৬ই সেপ্টেম্বর। কলকাতার এই তিনটি দল এবং পঞ্জাবের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সরাসরি তৃতীয় রাউন্ড থেকে খেলবে ; সুতরাং আগস্ট মাসে আই এফ এ শীল্ড খেলা জমছে না।

উল্লেখযোগ্য জয়

ক্যালকাটা এফ সি (ফাইনাল ১৭ বার) ;
জয় ৯ বার : ১৮৯৬, ১৯০০, ১৯০৩, ১৯০৪, ১৯০৬, ১৯১৫, ১৯২২-২৪ উপর্যুপরি ৩ বার)।

ইস্টবেঙ্গল (ফাইনাল ১৬ বার) :
জয় ৯ **বার :** ১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯-৫১ (উপর্যুপরি ৩ বার), ১৯৫৮, ১৯৬১ (যুগ্মবিজয়ী), ১৯৬৫-৬৬

মোহনবাগান (ফাইনাল ১৯ বার) :
জয় ৮ বার : ১৯১১, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫৪, ১৯৫৬ ও ১৯৬০-৬২ (উপর্যুপরি ৩ বার, তবে ১৯৬১ সালে যুগ্ম-বিজয়ী)।

খেলা পরিত্যক্ত **:** ১৯৫২ (বঃ রাজস্থান), ১৯৫৯, ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ (বঃ ইস্টবেঙ্গল)

রয়েল আইরিশ রাইফেল্স (ফাইনাল ৫ বার) **:**
জয় ৫ বার : ১৮৯৩-৯৪, ১৯০১ ও ১৯১২-১৩।

উপর্যুপরি পাঁচবার ফাইনাল খেলা

ইস্টবেঙ্গল (১৯৪২-৪৭) :
জয় ২ বার : ১৯৪৩ ও ১৯৪৫
দ্রষ্টব্য : ১৯৪৬ সালে খেলা হয়নি

ক্যালকাটা এফ সি (১৯০৩-৭) :
জয় ৩ **বার :** ১৯০৩-৪ ও ১৯০

মোহনবাগান (১৯৫৮-৬২) :
জয় ৩ বার : ১৯৬০-৬২
খেলা পরিত্যক্ত : ১৯৫৯।

উপর্যুপরি ৩ বার শীল্ড জয়

(১) **গর্ডন হাইল্যান্ডার্স** (১৯
(২) **ক্যালকাটা এফ সি** (১৯২
(৩) **শেরউড ফরেস্টার্স** (১৯২
(৪) **ইস্টবেঙ্গল** (১৯৪৯-৫১)
(৫) **মোহনবাগান** (১৯৬০-৬২)

দ্রষ্টব্য : ১৯৬১ সালে মোহ যুগ্ম-বিজয়ী হলেও আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী তাদের উপর্যুপরি শীল্ড বিজয়ী বলা যায়।

ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহ এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার একটি ভূমিকা আছে। প্রাচীনত্বের দিক ডুরান্ড এবং রোভার্স প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ডের স্থান। ডুরান্ড সালে, রোভার্স ১৮৯১ সালে এবং এ শীল্ড খেলা ১৮৯৩ সালে আর তবে ডুরান্ড এবং রোভার্স কাপ যোগিতায় দীর্ঘদিন কেবল সামরি ছাড়া আর কোন দলের—এমনকি রোপীয়ান দলেরও যোগদানের ছিল না। আই এফ এ শীল্ড প্রা তায় এ রকমের কোন বাধা-নিষেধ বলেই প্রথম থেকেই তার সার জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 6th. Sept. 1968. শুক্রবার, ২১শে ভাদ্র, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

'এল এস ডি' প্রসঙ্গে

শ্রীমানব স্যান্যালের লেখা এল, এস, ডি প্রবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ। এই তিন অক্ষরের শব্দটি আজ সারা বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এল, এস, ডি'র Brand Imag এত নিম্নগামী যে, সাধারণ লোক এটাকে গাঁজা, ভাঙ্গ এই পর্যায়ে ফেলেন, লেখকের প্রবন্ধে আশা করি তাঁদের ভুল কিছুটা ভাঙবে। এই প্রসঙ্গে অলডুস হ্যাক্সলের বিবৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'Drug that shape men's mind' প্রবন্ধটিতে তিনি এল, এস, ডি প্রসঙ্গে এবং এই জাতীয় অন্যান্য Mind changer drug' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি যখন প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তখন ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই সব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। তিনি বলেছেন,

"It lowers the barrier between Concious and Subconcious and permits the patient to look more deeply and Understandingly in to the reces of his own mind. The deepening of self knowledge takes against a back ground of Visionary and even mystical experience.."

তিনি আরও বলেছেন, এই Mind Changer drug সমূহ একদিন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়বে, সেদিন বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে এর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। হয় তাঁরা এই ওষুধের কার্যকলাপ পুরোপুরি অস্বীকার করে যাবেন, সেক্ষেত্রে মানুষের মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি যা হাক্সলের মতে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আছে তা ধর্মীয় সংস্থাগুলির বাইরে আধ্যাত্মিক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পৃথকভাবে কাজ করে যাবে।

অথবা তাঁরা একটা মধ্যস্থতায় আসবেন। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব হবে তিনি নিজেও সে বিষয়ে কোন পূর্বাভাষ দিয়ে যেতে পারেন নি।

শচীন সেনগুপ্ত
জামসেদপুর--৩।

'ভারতীয় সাহিত্য' বিষয়ে

বর্তমান সংখ্যা (শুক্রবার, ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৭৫) "অমৃতে" ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে আলোচনায় বিখ্যাত উর্দু লেখিকা রাজিয়া সাজ্জাদ সম্পর্কে কিছু ভুল খবর রয়েছে। আবার কিছু উল্লেখযোগ্য খবর বাদও পড়েছে।

লেখিকার নাম হচ্ছে—রাজিয়া সাজ্জাদ জাহীর। "জাফরি" নয়। তাঁর স্বামীর নামও সর্দার জাফরি নয়। সর্দার জাফরি বিখ্যাত উর্দু কবি ও বোম্বে সিনেমার গীতিকার; রাজিয়ার স্বামী হচ্ছেন—বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক সাজ্জাদ জাহীর। তিনি পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক ছিলেন এবং বহু বছর পাকিস্তান জেলে আটক ছিলেন। বর্তমানে ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক বা অন্য কোন বিশিষ্ট পদাধিকারী। তিনি উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন বিচারক ও বিচার-মন্ত্রী আলী জাহীরের ছোট ভাই। দুই জাহীর ভাই-ই নেহরুর ঘনিষ্ঠতা ও সস্নেহ সহযোগিতা লাভে ধন্য হয়েছেন।

বাসুদেব চৌধুরী
কলি—৪।

'রবীন্দ্রসংগীত' প্রসঙ্গে

গত সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীশ্রীকান্ত রায়-চৌধুরী মহাশয়ের চিঠিটি পাঠ করে মনে হল বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-সংগীতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি কিছুটা হতাশ হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবিকই এই হতাশার কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে কিনা এবিষয়ে প্রশ্ন জাগে।

আজ থেকে বিশবৎসর পূর্বেও রবীন্দ্র-সংগীত কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর বিদগ্ধ মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল একথা সকলেই অবহিত আছেন। তখন চলচ্চিত্রেও রবীন্দ্রসংগীতের প্রয়োগ এতোটা ছিল না। অথচ বর্তমানে ঘরে ঘরে রবীন্দ্রসংগীত যেভাবে আদৃত হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা। দুঃখ হয়, রবীন্দ্রনাথ জীবদ্দশায় তাঁর গানের এই আদর দেখে যেতে পারেন নি। পূর্বের প্রায় অচলায়তন অবস্থা থেকে মুক্তির এই নিদর্শনকে নির্দ্বিধায় উৎসাহব্যঞ্জক বলব।

বর্তমানে রবীন্দ্র-সংগীতে বিকৃতি এসেছে বা তার মান নিম্নমুখী হয়েছে একথা জোর করে বলা যায় না। একথা সত্য যে কথার উচ্চারণের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুব সজাগ ছিলেন। হ্রস্ব দীর্ঘের উচ্চারণ এবং প্রত্যেক শব্দের পৃথক ও স্পষ্ট উচ্চারণ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি প্রখর ছিল। কিন্তু বর্তমানে গায়কেরা এ ব্যাপারে তেমন সচেতন নন, বা তাঁরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেন না একথাও হয়তো সত্য নয়। বরং বলতে পারি, উচ্চারণে বিকৃতি আগে যে পরিমাণ পরিলক্ষিত হতো এখন সে বিকৃতি অনেকাংশে কম দেখা যায়। একসময় ইনিয়ে বিনিয়ে ও আধো আধো উচ্চারণে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার রেওয়াজ ছিল। এই বিকৃতি গায়নভঙ্গী সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই খর্ব করে একথা সকলেই স্বীকার করবেন আশা করি। এই পীড়াদায়ক ব্যাধির নিরাময় হয়তো পুরোপুরি হয়নি, তবু প্রকোপ বর্তমানে অনেকটা কমেছে এটা আনন্দের কথা।

স্বরলিপির হুবহু অনুসৃতি হয় না বলে সুরে বিকৃতি এসেছে একথা যাঁরা মনে করেন তাঁদের জানা উচিত সত্যিকারের সঙ্গীত প্রকাশই যেখানে উদ্দেশ্য, স্বরলিপির হুবহু অনুসরণ সেখানে কখনই সম্ভবপর নয়। বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম খোঁচ-খাঁচ ও মীড়ের কাজ যেখানে অধিক। স্বরলিপি কেবলমাত্র সঙ্গীতের কাঠামোকেই ব্যক্ত করে। সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত মাধুর্য বা দ্যুতি প্রকাশে তা ব্যর্থ ও অসমর্থ। অনুবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন স্বরলিপি সম্পর্কেও সেই কথা প্রযোজ্য। স্বরলিপি যেন কাশ্মীরী শালের উল্টোপিঠ। তার সোজাদিকের সূক্ষ্ম কারিগরী প্রকাশের ভার গায়কের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভাল। গায়ক বাক্ ধ্বনি ও ভাবাবেগের সহজ সমন্বয়ে ও স্বকীয়তায় তা ব্যক্ত করবেন।

জীবিতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সংগীত সম্পর্কে অনেক প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল একথা হয়তো সকলেরই জানা আছে। তবু বিশ্বাস না হারিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন,—"সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙ্গালীরা, শোকে-দুঃখে, সুখে আনন্দে, আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই—যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতে হবে।" (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—রাণী চন্দ)। আজকে রবীন্দ্র-সংগীতের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় তাঁর সে বিশ্বাস ভিত্তিহীন ছিল না।

তপন সে[illegible]
কদমকু[illegible]
পাটনা—

প্রতিবাদ

অমৃতের ৮ম বর্ষ ২য় খণ্ড ১[illegible] সংখ্যায় "মঞ্চাভিনয়" সংবাদ প্রসঙ্গে দেখলা[illegible] শ্রীরামপুরের 'উদয় সংঘের' প্রযোজ[illegible] "মাকড়সা" নামে নাটকটি অভিনীত হয়ে[illegible] নাটকটির বিষয়বস্তুর উল্লেখ এবং চরি[illegible] লিপিও আমার চোখে পড়েছে। সব চে[illegible] আশ্চর্য হয়েছি নাটকের রচয়িতার না[illegible] জনৈক ভদ্রলোক শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যা[illegible] নাম দেখে। কারণ—নাটকটি বিভূতিবা[illegible] লেখা নয়। নাটকটি আমার লেখা। একাধি[illegible] বার কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে নাটক[illegible] প্রচারিত হয়েছে। ১৩৭১ সালে ক[illegible] ভৌমিক সম্পাদিত 'স্বদেশ' পত্রিকার প[illegible] সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হয়।

এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আক[illegible] করি। অনুগ্রহ করে আগামী অমৃত সংখ[illegible] আমার প্রতিবাদ প্রকাশ করবেন।

নরেশচন্দ্র চক্রব[illegible]
কলিকাতা-১২

অমৃত সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষার হরফ বদল

বাংলা শুধু এই পশ্চিমবঙ্গের ভাষাই নয়। পূর্ব পাকিস্থানের ভাষাও বাংলা। ত্রিপুরা এবং আসামেও বহু বাংলাভাষী আছেন। বিভিন্ন জায়গার এবং ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী হলেও মাতৃভাষা বাংলা বলে সমস্ত বঙ্গভাষীদের একটা আত্মিক যোগ রয়েছে। রাজনৈতিক কারণে ব্যবধান দুস্তর হলেও তা অস্বীকার করা যায় না।

পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালীরা বাংলাভাষার জন্য অনেক ত্যাগস্বীকার করেছেন। বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁদের অনেকে প্রাণ দিয়েছেন। ইতিহাস তার সাক্ষী। তার ফলে পাকিস্থানে বাংলা রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্থানের ডাকটিকিটে, মুদ্রায়, এয়ার লাইনসে সর্বত্রই উর্দুর পাশে বাংলাভাষা জ্বল জ্বল করে। তা যখন দেখি তখন বাঙালী হিসেবে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত হই। ভাষার টান কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

অথচ এই বাংলাভাষার জন্যই পাকিস্থানের উর্দুভাষী শাসক সম্প্রদায় পূর্ব পাকিস্থানের অধিবাসীদের ঘোরতর সন্দেহের চোখে দেখেন। পশ্চিম ও পূর্ববাংলার ভাষা এক হওয়ায় তাঁদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাঁদের ভয় এই যে, রক্ত জলের চেয়ে ঘন এই তত্ত্বানুযায়ী দুই বাংলার বাঙালীরা ধর্মীয় বন্ধন ডিঙিয়ে পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসতে পারে।

এই ভ্রান্ত আশঙ্কা এবং ভেদবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে পাকিস্থানের উর্দুভাষী শাসকরা নানাভাবে বাংলাভাষাকে বদলে অন্যরকমের করার চেষ্টায় লিপ্ত। আগে অবিভক্ত ভারতে মুসলীম লীগ রাজনীতির যুগে উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িকরা আরবী-ফারসী শব্দবহুল এক ধরনের বাংলা লিখত। তাতে রাজনীতির সুবিধা হত হয়তো কিন্তু বাংলাভাষীরা সে বাংলা বুঝতে পারত না। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর সেই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অকেজো হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালী মুসলমান লেখকরা প্রচলিত বাংলাকেই সাহিত্যের ও সাংবাদিকতার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন

বাংলাভাষার নিজস্ব কতকগুলো ব্যবহার পদ্ধতি আছে। তার বর্ণমালা বা ব্যাকরণ সংস্কৃতের ধাঁচে হলেও তার উচ্চারণ ও প্রয়োগ বাংলাভাষার নিজস্ব। সংস্কৃতকে আঁকড়ে রাখতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। তবে কোনো সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত ও সহজবোধ্য হলে তাকে বর্জন করারও কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

পূর্ব পাকিস্থানে শাসকশ্রেণীর লোকেরা একবার চেষ্টা করেছিলেন উর্দু হরফে বাংলাভাষা ব্যবহারের। (যেমন ভারতবর্ষে অনেক সময় প্রস্তাব ওঠে নাগরী হরফে সব ভাষা ব্যবহারের।) যুক্তিটা এই যে, তাতে নাকি অ-বাংলাভাষীরাও বাংলা বুঝতে পারবেন এবং বাঙালীরা উর্দু বুঝতে পারবেন। আসলে বাংলাভাষাকে তার মাতৃপরিচয় ভুলিয়ে বিজাতীয় পোশাক পরানোই এর উদ্দেশ্য।

পূর্ববাংলার সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, ছাত্র সকলেই ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল বর্ণমালা সংস্কারের নামে বাংলা বর্ণমালা থেকে ঙ, ণ, ষ, ও, ঐ—এই কয়টি হরফ বাদ দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের বিষয়টি ভাষাতাত্ত্বিকরা অনেকদিন থেকেই চিন্তা করছেন। হয়তো কিছু কিছু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও আছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি নিছক ভাষার আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্য নিয়েই এই কাজটি করেছেন? না কি বৃহত্তর সংস্কারের এটি একটি ধাপ মাত্র?

বাংলাভাষার প্রখ্যাত মনীষী শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা মহোদয় তাড়াহুড়া করে বর্ণমালা সংস্কারের বিরোধী। তিনি জীবিত থাকতে তাঁর মতামত উপেক্ষা করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত হয়নি। সংবাদে জানা গেছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপকরা ডঃ এম আবদুল হাই, ডঃ এনামুল হক, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী প্রমুখ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন।

আকস্মিকভাবে বর্ণমালা সংস্কার হয় না। এর জন্য প্রস্তুতি দরকার, বিশেষজ্ঞদের মতামতও প্রয়োজনীয়। তা না করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলা বর্ণমালার অঙ্গহানি করতে যাচ্ছেন, একে সহজভাবে গ্রহণ করা যায় না। সন্দেহের আরও কারণ এই যে, বাংলাভাষাকে উর্দুর লেজুড়ে পরিণত করার জন্য পাকিস্থান সরকার বহুদিন থেকেই চেষ্টা করে আসছেন। বর্ণমালা সংস্কার যে সেই কর্তাব্যক্তিদের কোনো গূঢ় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে হচ্ছে না, তার প্রমাণ কি?

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে প্রতিবাদ উঠেছে। হয়তো তা আন্দোলনে পরিণত হবে। ভাষা নিয়ে রাজনীতি যে কোনো জাতির পক্ষে ক্ষতি ও ক্ষোভের কারণ। ভারতবর্ষেও হিন্দী নিয়ে এই রাজনীতি চলছে। পূর্ববাংলার অধিবাসীরা মাতৃভাষার সম্মান আদায় করেছেন বুকের রক্তের বিনিময়ে। তাকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা সব সময়েই প্রস্তুত। দুই বাংলার ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রটুকু বিনষ্ট করার জন্য যখনই শাসকশক্তি চেষ্টা করবে তখনি তার বিরুদ্ধে জাগ্রত প্রতিবাদ ওঠা উচিত সীমান্তের এপার এবং ওপার থেকে। বলা বাহুল্য রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে নয়, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের কাছ থেকেই আসা উচিত এই প্রতিবাদ। বাংলা উভয় দেশের মানুষেরই মাতৃভাষা।

রাত তখন দশটা

দেবল দেববর্মা

ধারাবাহিক রহস্য কাহিনী

আগের ঘটনা

[দিকনগরের পেপার মিলের অপারেটর মিস তরঙ্গমালা রাতে খুন হয়েছে। আর এতে জড়িয়ে পড়েছে সুদামডি কোলিয়ারির মাইনিং সারভেয়ার নিখিলেশ সেন। সে অ্যারেস্টেড। তরঙ্গার সঙ্গে ছিল ওর ভালোবাসা, শুধু বিয়ে করাই বাকি। কেসের ভার নিয়েছে সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল। শচীদুলাল সরকার ওর সহকারী।

রাজীব ঘরে বসে খুনের কথাটাই ভাবছিল। এমন সময় নিখিলেশের বন্ধু শশাংক ভট্টাচার্য এল ওর বাড়ি। পাঠিয়েছে স্বয়ং এস-ডি-পি-ও সাহেব। রাজীব তার কাছ থেকেও খুনের বিবরণ শুনল। শশাংক জানাল তরঙ্গার খুনের ব্যাপারে নিখিলেশ নির্দোষ। একসময় শশাংক চলে গেল।

এদিকে পোস্টমর্টম রিপোর্ট তখনো রাজীব পায়নি। উদ্বিগ্ন। রিপোর্টের জন্যে পাঠাল শচীদুলালকে। সেও ফিরে এল কিছুক্ষণ বাদে, সঙ্গে এল দিকনগর থানার ও-সি। রাজীবকে এবার বেরিয়ে পড়তে হল সরেজমিন তদন্তে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— দুই —

মর্গের কাছে যখন পৌঁছল রাজীব, তখন সন্ধ্যার কালো ছায়া ঘন হতে শুরু করেছে। আর একটু পরেই মহকুমা শহরটা অন্ধকারের পুরু একটা চাদরের আড়ালে গুটিসুটি হয়ে বসবে। কিছুদিন আগে শহরে বৈদ্যুতিক আলো এসেছে বলেই বাঁচোয়া, নইলে সন্ধ্যের পরই যেন দুপুর রাত। এখানে-সেখানে টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো প্রাগৈতিহাসিক মসী-কৃষ্ণ অন্ধকারের ছিটেফোঁটা দূর করতেও হিমসিম খেয়ে যায়।

লাশঘরটা শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে। সাইকেল রিকশ থেকে নামল রাজীব। শচী-দুলাল পিছু পিছু চলেছে। ওকে আসতে দেখে দিকনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সুব্রত সরকার প্রায় ছুটে এল।

রাজীব সান্যাল হেসে বলল, 'কি সুব্রত, হত্যাকাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ তো? এবার ঠ্যালা সামলাও—'

সুব্রত সরকারকে উদ্বিগ্ন দেখাল। সামনে কপালের উপর ঝুঁকে-পড়া চুলগুলি পিছনে ঠেলে দিয়ে সে বলল, 'আমি কিন্তু সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এসেছি রাজীবদা। হত্যাকাণ্ডই বলুন আর লংকাকাণ্ডই বলুন, সব দায়িত্ব কিন্তু এখন আপনার। ইনভেস্টিগেশন শুরু করবেন আপনি। আমি এখন অন্তরালে।'

সুব্রতর বয়স বেশী নয়। সাতাশ-আঠাশ কিংবা বড় জোর ত্রিশ হতে পারে। কাজেকর্মে উৎসাহী ছোকরা। রাজীব জানে দিকনগরে প্রথম এসে ও ভারী মুষড়ে পড়েছিল। নসুরাপুরে যেদিন রাজীবের সঙ্গে প্রথম আলাপ, সেদিন সখেদে বলেছিল সুব্রত, কি জায়গায় এসে পড়লাম বলুন তো! এদিকে সেদিকে, যেদিকেই তাকাই শুধু কোলিয়ারীর চানখ, আর ধু ধু মাঠ।

রাজীব ওকে বলেছিল, 'ঘাবড়াও মাত্। জায়গাটা তেপান্তর হলেও থানাটা বড়। এত অল্পবয়সে এসব থানার চার্জ সাধারণত কেউ পায় না। এখানে সুনাম রাখতে পারলেই শহর অঞ্চলে বদলী হয়ে যাবে। সুতরাং ক্যারি অন মাই ফ্রেণ্ড।'

তারপরেও আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে সুব্রতর সঙ্গে। ইদানীং তাকে বেশ চনমনে আর তাজা মনে হয়েছিল রাজীবের। সম্ভবত দিকনগরে গিয়ে প্রথম যে দিকহারা এবং অস্থির ভাব পেয়ে বসেছিল সুব্রতকে, তা এখন বেমালুম নিখোঁজ। সুব্রত সরকার মন মানিয়ে ফেলেছে।

আজ কিন্তু বেশ বিমর্ষ এবং কিঞ্চিৎ চিন্তিত দেখাল সুব্রতকে। মনে মনে রাজীব হাসল। পোড় খাওয়া দারোগা হতে সুব্রতর এখনও ঢের দেরী। একটা মার্ডার কেস হাতে পড়তেই সুব্রত সরকার যেন দিক-ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

ফিস ফিস করে সুব্রত বলল, 'ডেড-বডি কি এখনই দেখবেন রাজীবদা? আপনার জন্যই চেরাফাড়া এখনও শুরু করেনি।'

রাজীব সান্যাল ঠোঁটে একটা সিগারেট নিল। সুব্রতকে একটা দিয়ে বলল, 'কিঞ্চিৎ ধূমপান কর হে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে নিই। তারপর মর্গে ঢুকব।'

লাইটার টিপে আলো জ্বালল রাজীব। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল, 'গতকাল কৃষ্ণা-চতুর্দশী ছিল, তাই না সুব্রত?'

'কি জানি রাজীবদা। তিথিনক্ষত্র কোনকালে খোঁজ করিনি। তবে অন্ধকার দেখে মনে হচ্ছে আজ বোধহয় অমাবস্যা।'

'ভরা অমাবস্যা।' রাজীব সান্যাল ঘোষণা করল। 'কি ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখেছ? মর্গের এদিকটায় কারা যেন ভূত দেখেছিল না শচীদুলাল?'

শচীদুলাল ঘাড় নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ স্যার। আমাদের রামশরণ ওঝা নিজে চোখে দেখেছিল।'

'কি দেখেছিল বললে না। ধবধবে শাদা কাপড় আর খড়ম পায়ে কোন ব্রহ্মদৈত্য না মিশমিশে কালো রং আর ঝাঁকড়া চুলের মামদো ভূত?' রাজীব সান্যাল রহস্য করে হাসল।

ইতিমধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। মর্গের পিছনে খানিকটা প'ড়ো জমি। এদিকে-সেদিকে গাছগাছালি, ঝোপঝাপ। পশ্চিম দিকে হাত কুড়ি গেলেই প্রকান্ড একটা নিমগাছ। জোনাকীর দল অন্ধকার রাতে গাছটার চারপাশে নানা জ্যামিতিক নকসার কাজ গড়ছে আবার ভাঙছে।

সুব্রত বলল, 'একটা কথা বলছি রাজীবদা। খুনীকে বোধহয় আমি ধরে ফেলেছি। হি ইজ নাউ আন্ডার অ্যারেস্ট। লক-আপে রেখেছি ছোকরাকে।'

'সত্যি?' রাজীব সান্যাল বিস্ময় প্রকাশ করল। 'তাহলে আমার কাজ তো তুমি করেই রেখেছ সুব্রত। আপিসের বড়-সাহেবের মত এবার একটা দস্তখৎ দিলেই হয়। কিন্তু, তুমি কি খুব সিওর?'

'সিওর মানে? দস্তুর মত প্রমাণ আছে রাজীবদা। মেয়েটার জামার মধ্যে একটা চিঠি পাওয়া গেছে। ওর এক লাভার মানে প্রেমিকের লেখা। রাত দশটায় ওয়েস্ট সুদামডি কোলিয়ারীতে যাবার রাস্তার মোড়ে ছোঁড়াটা ওর সঙ্গে দেখা করবে লিখেছিল। কি মজা দেখুন। দেখা-সাক্ষাৎ করবার আর সময় পেলে না। রাত দশটায় রাস্তার মোড়ে যুবতী মেয়েটার সঙ্গে সে দেখা করবে। এবং সেখান থেকেই খানিকটা দূরে মেয়েটার ডেড-বডি পাওয়া গেল পরদিন সকালে। এর পরও কি বলবেন কুকাজটা অন্য কারো? ...'

'তা বলছি না সুব্রত। কিন্তু মার্ডারের পিছনে একটা মোটিভ থাকা চাই। কোন কারণ নেই অথচ একজন আর একজনকে হত্যা করল। এমন তো হতে পারে না, বা সচরাচর হয় না।' রাজীব ধীরে ধীরে বলল।

'মোটিভ নেই কেন বলছেন?' সুব্রত প্রতিবাদ করল। 'এমন কি অসম্ভব রাজীবদা যে ইদানীং ওদের সম্পর্কটা যথেষ্ট ভালো ছিল না। মনে করুন না কেন, মেয়েটা ওকে ঠিক আর সহ্য করতে পারছিল না। অন্য কারো প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এবং সে কারণেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে—'

রাজীব সান্যাল হাসল। 'তুমি যদি ওকে বাতিল প্রেমিক বলে প্রমাণ করতে পার, তাহলে অবশ্য খানিকটা মোটিভ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাহলেও—' রাজীব সান্যাল হঠাৎ যেন কি ভাবতে শুরু করল।

মর্গের বারান্দায় পাঁচ ছ' জন লোক প্রায় ছায়ামূর্তির মত নিঃশব্দে বসে রয়েছে। সম্ভবত দিকনগর পেপার মিলেই কাজ করে ওরা। কিংবা মৃতা তরঙ্গমালার আত্মীয়স্বজন। ডেড-বডি ফেরৎ পেলে ওরা দাহ করবার ব্যবস্থা করবে, পোস্টমর্টেম চুকে গেলেই হয়। এবং সম্ভবত সেজন্যই অপেক্ষা করছে।

রাজীব সান্যাল বলল, 'তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব সুব্রত। চল ডেড-বডিটা একবার দেখে আসি। বেশী দেরী করলে হরেন ডাক্তার আবার আমাদের মুন্ডুপাত করবে।'

ঘরে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়াল রাজীব সান্যাল। নিহত তরঙ্গমালা মজুমদারের দেহটা এককোণে পড়ে রয়েছে, কাল সন্ধ্যাবেলাতেও কিংবা এমন সময় এই দেহে কত তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আজই সব

শেষ। স্থির, নিস্পন্দ দেহ। কোন তরঙ্গের সৃষ্টি হবে না।

'আর একটা কথা বলছিলাম রাজীবদা', সুব্রত সরকার ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল। 'ডেড-বডির গায়ের অলংকার-টলংকার সব ঠিক ছিল। যারা সনাক্ত করেছে ওকে, তারা বলেছে এর বেশী গয়নাগাটি তরঙ্গমালা মজুমদার কোনদিন পরে টরে নি।'

রাজীব মৃদু হাসল। 'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ এটা মার্ডার ফর গেইনস নয়। মেয়েটাকে মেরে ওর গয়নাগাটিগুলো কেড়ে নেবার কোন উদ্দেশ্য খুনীর ছিল না।'

'ঠিক তাই।' সুব্রত সরকার যোগ করল।

তরঙ্গমালার দেহের দিকে চেয়ে কি যেন লক্ষ্য করল রাজীব। বলল, 'কামিনী আর কাঞ্চন দুটো আলাদা কথা, তাই না সুব্রত? আমাদের খুনীর কামিনীর দিকে নজর থাকলেও কাঞ্চনে কোন আসক্তি ছিল না, কি বল?'

সুব্রত কিছু বলবার আগেই হরেন ডাক্তার এসে ঘরে ঢুকল। রাজীব সান্যালের দিকে চেয়ে বলল হরেন, 'ডেড-বডি দেখেছেন নাকি?'

'কোথায় দেখলাম? এই তো সবে ঘরে পা দিয়েছি। তাছাড়া আপনার সহযোগিতা ব্যতীত—!' রাজীব সান্যাল একটু তোয়াজ করবার ভঙ্গিতে হাসল।

হরেন ডাক্তারের নির্দেশে লাস-ঘরের ডোম মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিল। গলার কাছে নজর পড়তেই শিউরে উঠল রাজীব সান্যাল। ঘাড়ের কাছে এবং গলার নীচে কালসিটে পড়ার মত দুটো আঙুলের দাগ। সম্ভবত একটা রুমাল-টুমাল কিংবা টুকরো কাপড় হাতে জড়িয়ে তরঙ্গমালার গলা টিপে ধরা হয়েছিল। সেই কারণেই আঙুলের আকারে দাগ তেমন স্পষ্ট হতে পারেনি।

রাজীব গম্ভীর হয়ে বলল, 'স্ট্র্যাংগুলেশন কেস বলে মনে হচ্ছে। গলার কাছে নখের একটা আঁচড়ের মত কি যেন ওটা?'

হরেন ডাক্তার জবাব দিল, 'ওটা অ্যাব্রেসন, সি-আই-ডি ইন্সপেকটর। মার্কস অফ অ্যাব্রেসন। থ্রটলিং অর্থাৎ গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে কাউকে মারা হলে গলায় বা ঘাড়ের কাছে এমনি দাগ দেখতে পাওয়া খুবই স্বাভাবিক।'

কি ভেবে রাজীব বলল, 'শুধু স্ট্র্যাংগুলেশন? গলা টিপে মেয়েটাকে মারা হয়েছে? আর কিছু—'

গতকাল রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। তরঙ্গের জামাকাপড় জলে কাদায় একাকার কিন্তু কাপড়ের দিকে চেয়ে যেন সন্দেহ হল রাজীবের। হরেন ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাতেই ডাক্তার হাসল। রহস্যময় হাসি।

ডাক্তার বলল, 'স্ট্র্যাংগুলেশনটা নিঃসন্দেহে পরের ব্যাপার। দেহের অনেক স্থানেই দাগ আর আঁচড়। স্ক্র্যাচ, ব্রুইস এবং অ্যাব্রেশন কোনোটাই বাদ নেই। অটোপসী হয়ে যাক। একটু ধৈর্য ধরুন না ইন্সপেকটর!'

সুব্রতর সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়াল রাজীব। লাশঘরের লালবাড়ীটা থেকে নেমে মাঠে এসে পা দিল। মাথার উপর নক্ষত্র-

খচিত আকাশের চাঁদোয়া। মেঘদৈত্য সব কোন নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছে। ফুলঝুরির রোশনাইয়ের মত তারাগুলি আকাশের বুকে লেগে আছে। কাছেই নিমগাছটার চারপাশে জোনাকীর দল কেমন ঝিলমিল পরিবেশ রচনা করেছে। কঠিন জ্যামিতিক নানা চিহ্ন। তৈরী হচ্ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে রাজীব সান্যাল বলল 'সুব্রত তোমার সঙ্গে বাকী কথাগুলো সেরে নিই। কোন বাসে দিকনগর ফিরবে ঠিক করেছ?'

'বাস হোক, ট্রাক হোক—কিছু একটা পেয়ে যাব। লাস্ট বাসটা রাত আটটায়।'

'দিকনগর পৌঁছবে কখন?'

'ঘন্টাখানেকের বেশী সময় নেয় না। রাত্রিবেলায় পথঘাট ফাঁকা। বাস তো ঝড়ের মত ছোটে। আর সেই পাঞ্জাবী ড্রাইভার থাকলে তো রক্ষা নেই। ভয় শুধু বোম্বাই টাকগুলোকে।' সুব্রত থামল।

'কাল সকালেই দিকনগর যাচ্ছি, সাড়ে ছটা নাগাদ পৌঁছে যাব। তুমি কিন্তু রেডি থেকো। হাতে অনেক কাজ আমাদের।'

'অত ভোরে বাস কষ্ট আপনার?'

'বাস নয়। সাহেবের সঙ্গে দেখা করে জিপটা চেয়ে নেব। অত ভোরে না গেলে তো কাজ হবে না সুব্রত!'

রাজীব সান্যাল সিগারেটে একটা টান দিল। ধোঁয়া বেরিয়ে এল মুখ থেকে। নাসারন্ধ্র দিয়েও নির্গত হল কিছু ধূম। রাজীব বলল, 'প্লেস অফ অকারেন্সে তুমি তেমন কিছু ক্লু পেয়েছ সুব্রত? পায়ের দাগ-টাগ লক্ষ্য করেছিলে? কজন লোক ছিল বলে কিছু আন্দাজ হয়েছে তোমার?'

সুব্রত হতাশ ভঙ্গি করল। 'কাল রাত-দুপুর থেকে কি বৃষ্টি ভাবতে পারেন। এদিকে কি তেমন বৃষ্টি হয়নি নাকি? জলের তোড়ে পায়ের দাগ-টাগ সব ধুয়ে-মুছে একাকার। আপনি কাল গেলেই দেখতে পাবেন অবস্থাটা।'

রাজীব সান্যাল আন্দাজ করেছিল। স্বয়ং বিধাতা যেন খুনীর সহায়। খুনের ঘণ্টা দেড় দুই পরেই তাহলে বৃষ্টি নেমেছিল? এবং সে বৃষ্টি ভোর হবার পরও ক্ষান্ত হয়নি। সুতরাং পায়ের দাগ টাগ, ধস্তাধস্তির চিহ্ন-টিহ্ন সব সোপাট।

'এফ আই আর থানায় এসে কে করেছিল?'

'দিকনগর পেপার মিলের একজন কেরাণী।'

'মৃতদেহ কি সেই প্রথম আবিষ্কার করে?'

সুব্রত সরকার মাথা নাড়ল। 'মৃতদেহটা প্রথম দেখে একটা বিলাসপুরী কুলি। ঝোপের মধ্যে ডেড-বডি আবিষ্কার করে সে প্রায় চীৎকার শুরু করে দেয়।'

'ওখানে সে কেমন করে গেল?'

'সকাল বেলায় প্রাতঃকৃত্য সেরে নেবার উদ্দেশ্যেই গিয়েছিল বলেছে।'

'তারপর?'

'ওর চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে ছুটে আসে। পরে দিকনগর পেপার মিলের সেই কেরাণী ভদ্রলোক ওকে সঙ্গে করে নিয়ে থানায় খবর দেন।'

হরেন ডাক্তারকে মর্গের বারান্দায় দেখা গেল। সম্ভবত রাজীব সান্যালের সঙ্গে কিছু কথা বলবে ডাক্তার। অন্ধকারে ডাক্তারের শাদা প্যান্ট-জামা আর মুখের সিগারেটের জ্বলন্ত অগ্নিবিন্দুটুকু ছাড়া প্রায় সবই অদৃশ্য।

এগিয়ে গিয়ে সুব্রত বলল, 'পোস্ট-মর্টেম হয়ে গেল আপনার?'

'আর একটু দেরী আছে। কাটা-ফাড়া ডোমটা সেরে দিক। এ ব্যাপারে ওদের সাহায্য ভিন্ন উপায় নেই।' মাঠের উপর নেমে এল ডাক্তার। মর্গের মধ্যে মৃত তরঙ্গ-মালার দেহে ডোম এখন ছুরি টানছে।

রাজীব সান্যাল গলা নামিয়ে বলল 'আমার মনে হচ্ছে কিছু বলবেন আপনি।'

'ধরেছেন ঠিকই। ভাবলাম আপনাকে আর কষ্ট দেব না। দু-একটা খবর দিলেই এখনকার মত শান্ত হবেন। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টটা না হয় পরে দেখবেন।' হরেন ডাক্তার আয়েস করে ধূমপান করছিল।

রাজীব বলল, 'বেশ তো। কি শোনাবেন বলে ফেলুন চটপট। সি-আই-ডিদের চোখ আর কান সবসময় খোলা আছে।'

'তাই নাকি?' হরেন ডাক্তার হাসল। একটু থেমে ডাক্তার মুখ খুলল, 'বডি থেকে রাইগার মর্টিস চলে যেতে শুরু হয়েছে। চোখের ঢাকনা, চোয়াল এবং মুখের পেশীগুলো আগেই নরম দেখেছি। এখন ঘাড় আর পিছন দিকটাও নরম মনে হচ্ছে। কাজেই রাইগার মর্টিস ইজ ডিস-অ্যাপিয়ারিং—'

রাজীব সান্যাল বলল, 'এখন ঘড়িতে কটা শচী?'

'সাড়ে ছটার বেশী স্যার।' শচীদুলাল জবাব দিল।

হরেন ডাক্তারের দিকে তাকাল রাজীব। বলল, 'সুতরাং ধরে নিতে পারি যে দশটা সাড়ে দশটার সময় তরঙ্গমালা খুন হয়।'

'অনুমান সঠিক হওয়াই সম্ভব। আর ঘণ্টা তিনের মধ্যেই রাইগার মর্টিস পুরো-পুরি চলে যাবে। কাজেই মৃত্যুর সময় বলতে ডাক্তারকে ঐ কথাই বলতে হবে।'

রাজীব সান্যাল আরো কিছু শোনবার জন্য সাগ্রহে তাকিয়েছিল। ওর মুখের দিকে চেয়ে হরেন বলল, 'আপনার সন্দেহ ঠিকই ইন্সপেক্টর। মৃত্যুর আগে মেয়েটা অল্প [illegible] একটা [illegible]

কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল ওকে। সম্ভবত গলা টিপে ধরবার সময় ওর শরীরে বাধা দেবার মত কোন শক্তিই অবশিষ্ট ছিল না।'

রাজীব সান্যাল সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আনফরচুনেট গার্ল। আচ্ছা আমি চলি এখন। নমস্কার ডাক্তারবাবু। আবার দেখা হবে।'

সুব্রত ওর সঙ্গে খানিকটা পথ হাঁটল। রাজীব বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি আবার কেন মিছিমিছি আসছ সুব্রত। তোমার হাতে এখনও অনেক কাজ। ডেড-বডি রিটার্ন করতে হবে। আবার ফিরে যেতে হবে দিকনগরে।'

'কাল সকালে কিন্তু আমি আপনার জন্য থানার গেটে দাঁড়িয়ে থাকব।'

রাজীব সান্যাল হাসল। সুব্রতকে পিছনে রেখে রাজীব সান্যাল হাঁটতে শুরু করেছিল। হঠাৎ কি মনে পড়তে ঘুরে দাঁড়াল রাজীব। কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি শশাংক ভটচায্ নামে কোন লোককে চেন সুব্রত?'

'আগে চিনতাম না রাজীবদা। আজই দেখা হয়েছে লোকটার সঙ্গে। ওয়েস্ট সুদামডি কোলিয়ারীতে নিখিলেশ সেনকে অ্যারেস্ট করতে গিয়ে আলাপ হল। শশাংক ভটচায্ নিখিলেশ সেনের খুব বন্ধু রাজীবদা। যাকে বলে বুজুম ফ্রেন্ড। দুজনে নাকি হরিহর আত্মা। একই বাড়ীতে থাকে।'

'নিখিলেশকে তুমি অ্যারেস্ট করবে শুনে ও কি বলল?'

'আজেবাজে বক্তৃতা দিচ্ছিল। ওসব কোন কাজের কথা নয় রাজীবদা। আমি যখন বললাম মৃতার জামার মধ্যে আমি একটা চিঠি পেয়েছি এবং সে চিঠিখানা নিখিলেশ সেনের লেখা, তখনই মিইয়ে গেল একেবারে। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে বলুন?' সুব্রতর মুখখানা আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাল।

'চিঠিখানা তোমার কাছে আছে সুব্রত?'

'কাছে তো নেই রাজীবদা। কিন্তু আপনি দিকনগরে গেলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।'

'ঠিক আছে।' রাজীব সান্যাল বিদায় নেবার জন্য তৈরী হল। যাবার আগে নির্দেশ দিল রাজীব, 'খুনের জায়গাটা থেকে কিছু দূরে একজন ওয়াচার রেখে দিও। প্লেন ড্রেসে লোকটা শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে। ওখানে কেউ আসে কিনা লক্ষ্য করে তোমাকে যেন জানায়। আর—'

'আর কি রাজীবদা?'

'ডেড-বডির মাথার চুল কয়েকটা রেখে দিও। পরে কাজে লাগতে পারে।'

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রাজীব সান্যাল হতাশ বোধ করল। এখন অনেকখানি পথ হাঁটতে হবে। শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে লাশঘরটা। এদিকে সাধারণত কেউ আসে না। সাইকেল রিকশ এ পথে প্রায় দুর্লভ। দিনেমানে যদি বা মেলে, রাতেভিতে ডুমুরের ফুলের মত, তা অসম্ভব প্রত্যাশা।

অমলেন্দু বলল, 'আপনি বরং দাঁড়ান

স্যার। আমি একটা রিকশা-টিকশা ডেকে আনি।

'কোথায় কতদূরে গিয়ে রিকশা পাবে। হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগবে তোমার। তার চেয়ে চল দুজনেই হাঁটা দিই। বুদ্ধি করে যদি সাইকেলটা আনতে শচী তাহলে এরং একটা কাজ হত।' রাজীব দুঃখ করল।

প্রায় সিকি মাইল হাঁটিতে হল দু-জনকে। শালধরটা শহরের শেষে কেন, বরং শহরের বাইরে বললেই ভাল বোঝাবে। এতক্ষণ পরে পথে লোকজন দেখা গেল। দোকান-পাট রাস্তায় মানুষজন, বেচা-কেনা....খরিদ্দারের সঙ্গে কোথাও দর কষাকষি চলছে।

এক চক্ষু লণ্ঠনের ম্লান আলো ফেলে দ্রুত কি যেন এগিয়ে আসছে। রাজীব বুঝতে পারল একটা রিকশা ছাড়া আর কিছু নয়। এখন খালি থাকলেই নিশ্চিন্ত।

সৌভাগ্য নিশ্চয়ই। কারণ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা-দুটো বিশ্রাম চাইছে। যেখানে হোক একটু পা ছড়িয়ে বসতে পারলেই হয়। হাত বাড়িয়ে রিকশটা থামাল শচীদুলাল। দুজনে উঠে বসল আসনে।

বাড়ী ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে বসল রাজীব। একটা কাগজ নিয়ে খসখস করে কি সব লিখল। লেখা শেষ করে হঠাৎ যেন চিন্তিত দেখাল রাজীবকে। কি যেন একটা জায়গায় এসে কলমটা ঠেকে যাচ্ছে। এক-কোণে চেয়ারে বসে শচীদুলাল আপন মনে কাজ করছিল। আড়চোখে রাজীবকে দেখে আবার মনোযোগী হল সে। প্রশ্ন করলে ভীষণ বিরক্ত হবে রাজীব সান্যাল। মুখ চোখ দিয়ে ক্রোধ ফেটে বেরুবে। রাগের সে প্রকাশ শচী আগে দেখেছে। সুতরাং নিজের চরকায় তেল দিয়ে যাওয়াই যুক্তি-যুক্ত।

মিনিট তিন-চার পরে রাজীব সান্যাল সিগারেট ধরাল। লাইটারটা এক পাশে সরিয়ে রেখে ওকে ডাকল কাছে। বলল, 'সামনে চেয়ারটা নিয়ে বস শচী। তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করি।'

কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখল শচীদুলাল। চেয়ার টেনে এনে রাজীব সান্যালের মুখোমুখী বসল সে।

'শশাংক ভটচায্যিকে কি মনে হল তোমার শচী?'

'বেশ ভালো লোক স্যার। বন্ধুর বিপদের সময় গা ঢাকা দিয়ে বসে নেই। তাকে সাহায্য করবার জন্য ছুটোছুটি করছে।'

'তরঙ্গার সঙ্গে শশাংক ভটচাযের আলাপ-পরিচয় ছিল। একথা সে নিজে মুখে স্বীকার করেছে। মথুরাপুর দর্পণে ওর গল্পটল্প বেরুলে তরঙ্গাকে সে পড়তে দিত। সুতরাং এমন কথা ভাবতে দোষ কি যে, শশাংক মনে মনে তরঙ্গের সান্নিধ্য কামনা করত। ওকে ভালবাসত।'

'কিন্তু স্যার, মেয়েটি যে ওকে পছন্দ করত এমন কোনো প্রমাণ তো এখনও—'

রাজীব সান্যাল হাসল। 'তদন্তই হল না। তার প্রমাণ কোথায় পাবে? এখন তো শুধু অনুমান চলছে শচী। অবশ্য ঠিকমত বিশ্লেষণ করতে পারলে অনুমানও ঠিক হয়।'

শচীদুলাল বলল, 'আপনি কি শশাংক ভটচায্যিকে সন্দেহ করেন স্যার?'

'সন্দেহ করিনি, তবে সন্দেহ করতে দোষ কি, এই কথাটা ভাবছি। তুমি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প পড়নি শচী? দুটি পুরুষ একটি মেয়ে, কিংবা দুটি মেয়ে একটি পুরুষ। ব্যর্থ প্রেমিক অনেক সময় মরীয়া হয়ে ওঠে শচী। ক্ষেপে উঠলে অবশ্য মেয়েরাও সাংঘাতিক—।'

শচীদুলাল লজ্জিত ভঙ্গিতে অন্যদিকে তাকাল।

রাজীব বলল, 'কয়েকদিন আগে কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল। একটি যুবক আর একটি মেয়ে উভয়ে প্রেমে পড়ে। বেশ কিছু-দিন দুজনের ভাব-ভালবাসা চলল। তারপর কোন কারণে মেয়েটি তার প্রেমিকের উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় যুবক প্রায় পাগল। এবং অন্তর্দাহে ক্ষিপ্ত যুবক মনে মনে এক ফন্দী আঁটল।'

বাধা দিয়ে শচী বলল—'খবরের কাগজে বেরিয়েছিল স্যার?' রাজীব সান্যাল ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'এই তো, মাস-দুই আগের ব্যাপার। কলকাতায় কোন পাড়ায় যেন ঘটনা। আমার ঠিক মনে নেই।'

'তারপর স্যার?'

'মেয়েটিকে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করতে বলল, যুবক। বাতিল প্রেমিকের সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখা করতে দোষ কি? এই ভেবে মেয়েটি এসে দাঁড়াল সেই স্থানে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চীৎকারে যন্ত্রণায় দু-হাতে মুখ ঢেকে সেখানেই বসে পড়ল সে। ছেলেটি তার প্রেমিকার সুন্দর মুখে নাইট্রিক অ্যাসিড ছিটিয়ে দিয়েছে।'

'এ কাহিনীর সংগে বিচার করলে কিন্তু নিখিলেশ সেনকেই খুনী বলে ধরে নিতে হয়।' শচীদুলাল থামল।

'সুব্রতর বক্তব্য তাই।' রাজীব সান্যাল শুরু করল, 'সুব্রত বলতে চায় যে নিখিলেশের সংগে তরঙ্গ-মালার কোন কারণে মন কষাকষি শুরু হয়ে থাকবে। হয়ত তরঙ্গ ওকে আর সহ্য করতে পারছিল না। এমনও অসম্ভব নয় যে, তরঙ্গের মন অন্য কোথাও বাঁধা পড়েছিল। ফলে নিখিলেশের সংগে ছাড়া-ছাড়ি বা প্রেমের সম্পর্কের ইতি অবশ্য-ম্ভাবী। কিন্তু নিখিলেশ হয়তো এই মানসিক বিচ্যুতির জন্য প্রস্তুত নয়। সুতরাং তরঙ্গের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সে ক্ষেপে উঠল। এতদিন তরঙ্গের সঙ্গে প্রেমের তরঙ্গে ওঠানামা করে নিস্তরঙ্গ জীবন মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব!'

শচীদুলাল বলল 'খুবই সম্ভব স্যার যে তারপরই নিখিলেশ তরঙ্গাকে চিঠি লিখল। রাত দশটায় ওরেস্ট সুদামডি কোলিয়ারীতে যাবার রাস্তার মোড়ে সে তরঙ্গের সঙ্গে মিলিত হবে।'

রাজীব বলল, 'এক্জাক্টলি, সুব্রতর বক্তব্য ঠিক তাই। বাতিল প্রেমিক সেই নির্জন রাস্তার মোড়ে তার প্রেমিকার উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। সে ভাবতেই পারেনি যে, তার লেখা চিঠিটা তরঙ্গমালা জামার মধ্যে নিয়ে আসবে। আর চিঠিটাই হল আসল প্রমাণ। নইলে নিখিলেশ সেনকে সন্দেহ করবার মত অন্য কোন সূত্র তো আমাদের হাতে নেই?'

শচীদুলাল হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল। সমর্থন জানাল রাজীবকে।

চোখ বন্ধ করে রাজীব সান্যাল আবার কি যেন চিন্তা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে প্রায় বিড়বিড় করে বলল রাজীব, 'চিঠিটাই হল ক্রাক্স অফ দি প্রবলেম। সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে ওরই অভ্যন্তরে। বুঝলে শচীদুলাল?'

দেওয়াল ঘড়িতে শব্দ করে নটা বাজল। রাজীব সান্যাল চোখ খুলে তাকাল। দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। একটু আগেই ভারী পায়ের শব্দ শুনেছে রাজীব। সম্ভবত বুট পায়ে কোন সিপাই এসে দাঁড়িয়ে আছে।

শচীদুলাল দরজা খুলে নিয়ে এল ওকে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে সুব্রত। চশমাটা নাকের উপর বসিয়ে রিপোর্টটার উপর ঝুঁকে পড়ল রাজীব। হরেন ডাক্তার পরিষ্কার লিখেছে 'ডেথ—অ্যাশফ্যাক্সিয়া', কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্টটার একস্থানে এসে চোখদুটি স্থির হল রাজীবের। খুনী লোকটা কি মাটির উপর সজোরে ফেলে দিয়েছিল তরঙ্গকে? এবং তারপর—?'

চশমা খুলে টেবিলের উপর রাখল রাজীব। শচীদুলাল তার মুখের দিকে চেয়ে। রিপোর্টে কি লিখেছে হরেন ডাক্তার, তারই কিছু টুকরো অংশ শুনতে চায় শচী।

কিন্তু রাজীব সান্যাল পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা একপাশে সরিয়ে রাখল। বলল, 'শশাংক ভটচাজের গায়ে কি রকম জোর আছে তোমার মনে হয় শচী?'

'কোলিয়ারীর ওভারম্যান স্যার। আট-ঘন্টা ডিউটি দেয়, আন্ডারগ্রাউণ্ডে। শক্তি-সামর্থ্য নিশ্চয়ই আছে দেহে।'

রাজীব সান্যালের চোখদুটি উজ্জ্বল দেখাল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রাজীব। বলল, 'কাল খুব সকালেই দিকনগর যেতে হবে। তুমি সাড়ে পাঁচটার মধ্যে চলে এস এখানে।'

জানালার ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশটাকে দেখছিল রাজীব। অনন্ত আকাশ, সংখ্যাহীন নক্ষত্ররাশি,...গ্রহ-উপগ্রহ ...দুধের মত শাদা বিস্তীর্ণ ছায়াপথ।... অন্ধকার মানেই রহস্য। কালো রাত নিঃসন্দেহে রহস্যময়ী।

শচীদুলাল যাবার জন্য তৈরী। হঠাৎ রাজীব বলে উঠল, 'খুনী লোকটা যথেষ্ট বলশালী, এ-কথাটা মনে রেখো শচী।

(ক্রমশঃ)

হাসির মজলিস

কণ্ডাক্টর—বার বছরের কম ছেলেমেয়েরাই কেবল হাফটিকিটে যেতে পারে। তোমার বয়স কত খোকা?

ছেলেটি—দশ।

কণ্ডাক্টর—বার হবে কখন?

ছেলেটি—যত তাড়াতাড়ি আমি এই ট্রেন থেকে নামতে পারব!

●

শিক্ষক—রাজনীতিবিদ কে?

ছাত্র— যারা বক্তৃতা করে।

শিক্ষক—আমিও তো বক্তৃতা করি। আমি কি রাজনীতিবিদ?

ছাত্র— যারা ভাল বক্তৃতা করে, তারাই রাজনীতিবিদ।

●

ভদ্রলোক—আরে মশাই আমার পকেটে হাত দিচ্ছেন কেন?

পকেটমার—আরে দেখুন, আমি কি ভুলো মানুষ। ঠিক আপনার প্যাণ্টের মতই একটা প্যাণ্ট আমি সম্প্রতি করিয়েছি কিনা!

●

—প্রেমে ভাগ্যবান ব্যক্তি কে?

—যে অবিবাহিত।

●

স্বর্গ আর নরক নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছিল। ঐ সভায় হাজির ছিলেন মার্ক টোয়েন। তিনি নিশ্চুপ। হঠাৎ একজন মহিলার নজর পড়ল তাঁর দিকে।

—আরে মশাই আপনি চুপচাপ কেন?

টোয়েন—আমি চুপ করে আছি, কারণ উভয় জায়গাতেই আমার বন্ধুরা আছেন কিনা!

স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। স্ত্রী গিয়ে পুলিশকে খবর দিলেন। পুলিশ জানতে চাইল কবে তাঁর সঙ্গে স্বামীর শেষ দেখা হয়েছে।

মহিলা জানালেন—৪২ বছর আগে।

পুলিশ—এতদিন পরে আপনি বলছেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

মহিলা—কারণ আমার সব টাকা ফুরিয়ে গেছে।

●

—তোমায় যে বেশ হাসিখুশি দেখছি, কোন সুখবর আছে নাকি?

—নিশ্চয়। আমার স্বামীর একটা দারুণ অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। তাই তিনি ছুটি পেয়েছেন, আর প্রায় এক মাস ধরে তাঁকে সারাদিন দেখতে পাচ্ছি।

●

নিদারুণ তর্ক বেধেছে দুই বন্ধুতে। একজন বলছিল শহরের সমস্ত হাসপাতালেই সে ছিল। এই গাঁজাখুরি কথায় কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।

এক বন্ধু সামনা-সামনি বলেই বসল : এসব গুলতাপ্পি এখানে ছাড়িস না।

—কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি!

—না মোটেই না! তুমি কি মাতৃমঙ্গল সেবাসদনে ছিলে?

—হ্যাঁ সেখানেই যে আমার জন্ম।
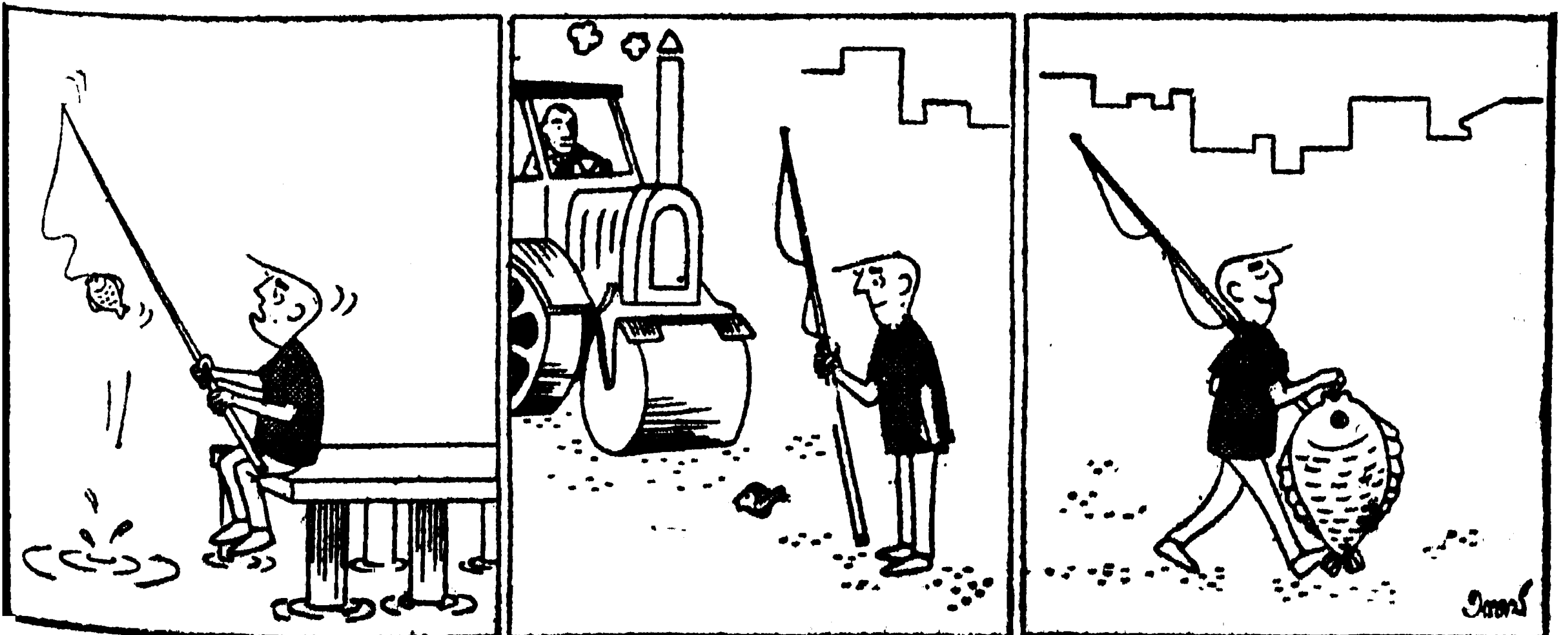
বাসের মধ্যে এক ভদ্রলোক ধূমপান করছিলেন।

কণ্ডাক্টর—দেখুন বাসের মধ্যে ধূমপান নিষেধ। আপনার সামনেই লেখা রয়েছে—'নো স্মোকিং'।

যাত্রী—সে অবশ্য ঠিকই। কিন্তু ওদিকে দেখুন পরিষ্কার লেখা রয়েছে 'পানামা—না টানলে আপনার জীবনই বৃথা!'

●

নতুন সদস্য—ক্লাবে টেলিফোন নেই কেন?

ম্যানেজার—কারণ ক্লাবের সব সদস্যই বিবাহিত।

●

বহুকাল বাদে অনিমেষ আর নিখিলেশের দেখা।

নিখিলেশ—আমার স্ত্রী, আমার এক উপকারী বন্ধুর সঙ্গে চলে গেছে।

অনিমেষ—এতদিন পরে দেখা। খবরটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

নিখিলেশ—মন খারাপ করবার কি আছে।

অনিমেষ—তোমার সেই উপকারী বন্ধু নিশ্চয়ই তোমার থেকে দেখতে সুন্দর।

নিখিলেশ—তাকে আমি দেখিনি কোনদিন।

এক গ্রামের দুই বন্ধু কলকাতায় চাকরি করতে এসেছিল। কিছুকাল বাদে একজন দেশে যাচ্ছে। অপর বন্ধু তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলল : "এই টাকাটা ভাই, আমার স্ত্রীকে দিও। দেখো বাড়ীর অন্য কেউ যেন জানতে না পারে। খুব সাবধান।"

বন্ধু—"অত সাবধান করবার কি আছে। কেউ টের পাবে না। এমন কি যাকে দিতে বলছ সেও না।"

●

—ঘোড়া এবং গাধার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

—গাধা।

—কেন?

—গাধা পিটোলে তবে ঘোড়া হয়।

●

অর্থনীতির অধ্যাপক—অপ্রত্যক্ষ করের একটি উদাহরণ দাও?

ছাত্র—কুকুরের ওপর ট্যাক্স, স্যার।

অধ্যাপক—কি করে?

ছাত্র—কুকুরকে এই ট্যাক্স দিতে হয় না।

●

শিক্ষক—তোমার দেরী কেন?

ছাত্র—আমি আসবার আগেই ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে সেই জন্যে স্যার!

কে কী কেন কেন ?
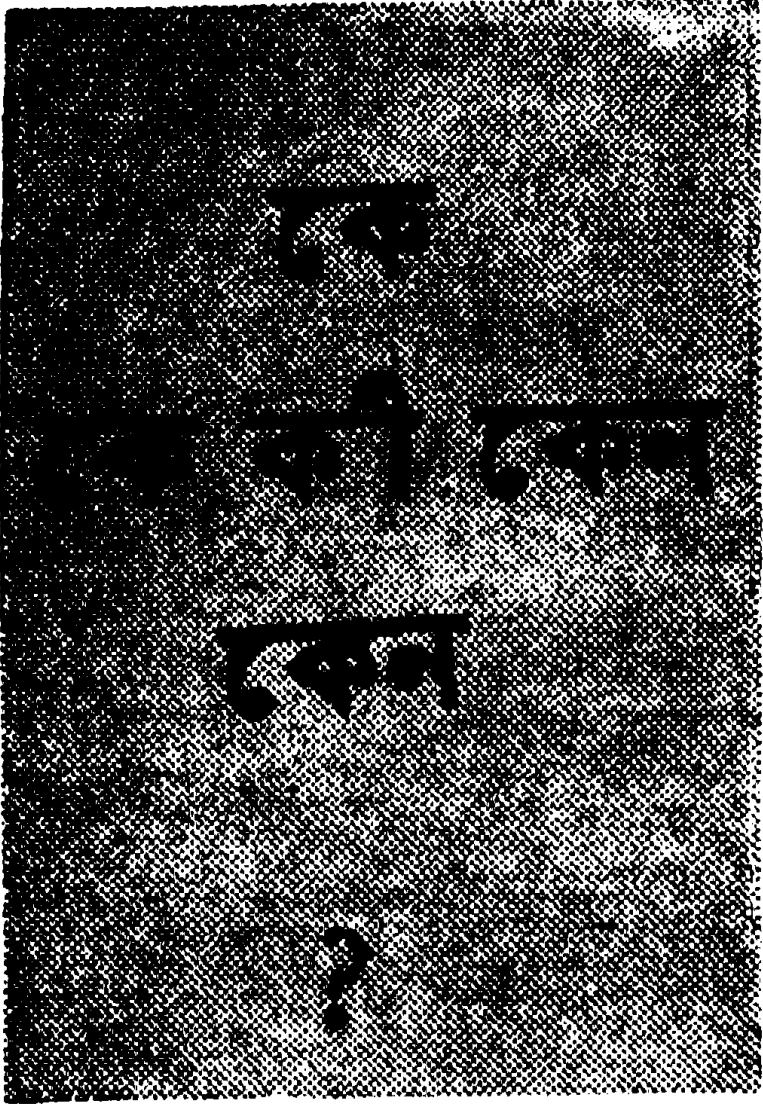
- লণ্ডনের সেণ্ট পল গীর্জার পরিকল্পক কে?
- কোন পাখী পেছন দিকে দৌড়ায়?
- স্যাণ্ডউইচ ম্যান কাকে বলে?
- এই ছবিগুলি কে কে এঁকেছিলেন—মোনা লিসা, ব্লু বয়, লাফিং ক্যাভেলিয়ার, সিস্টিন ম্যাডোনা, লাস্ট সাপার?
- পৃথিবীর বৃহত্তম পাঁচটি তৈলক্ষেত্র?
- সুয়েজ খালের পরিকল্পনাকারী কে?
- বিড়াল জাতীয় প্রাণীর মধ্যে বৃহত্তম কোনটি?
- কোন পাখীর লাথি খেয়ে মানুষ মারা যেতে পারে?
- মৎসগন্ধা কে?
- স্বামীর মৃত্যুর পরেও কোন্ রমণী বিধবা হন নি?
- বাংলার অক্সফোর্ড, সমুদ্রের বধূ, সোনার অন্তঃপুর, নির্জনতম দ্বীপ—কি?
- ইংরেজিতে এল, এস, ডি, চিহ্নের অর্থ কি?
- দ্রুত কি?—এরোপ্লেন না বুলেট? আলোর তরঙ্গ না বিদ্যুৎ তরঙ্গ? টেলিফোনে সংবাদ—বিদ্যুতে সংবাদ?
- মানুষ এবং কুকুরের মধ্যে কার দাঁতের সংখ্যা বেশী?

- উচ্চতার ক্রম অনুসারে এশিয়ার পাঁচটি পর্বতের নাম।
- সিংহল থেকে হংকং যেতে কোন্ কোন্ দেশ অতিক্রম করতে হবে।
- তুরস্ক, বার্মা, ইরান এবং থাইল্যাণ্ডের মত আয়তনে কোনটি বড়।
- আফ্রিকার দীর্ঘতম নদী;
- এশিয়ার বৃহত্তম শহর;
- শব্দ এবং আলো—কার গতি দ্রুত?
- রেডিও অ্যাকটিভ কি?
- স্যার হাম্ফ্রে ডেভিস কি আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন?
- পিগমেলিয়ান কার লেখা?
- ভিটামিন বি১ এবং ভিটামিন সি-র অন্য নাম কি?

এর উত্তর তৈরী করুন
এবং
পরের সংখ্যায় দেওয়া
উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিন

নতুন জুতো

প্রভাত দেবসরকার

ঘরের মধ্যে গন্ধটা কেমন যেন, নিঃশ্বাস বুঝি ভারি হয়ে ওঠে।

শুভেন্দু বাদে ওরা সবাই আঃ করে নিঃশ্বাস টানলো। তিন মেয়ে, দুই ছেলে আর শুভেন্দুর স্ত্রী মালতী। শুভেন্দু চোখ নামালে. কেমন লজ্জা করল. মনে হল. একা এলেই ভাল হতো। একসঙ্গে দঙ্গল বেঁধে—ছি!

শুভেন্দুর মনোভাবটা যেন মালতী বুঝতে পারে: ছেলেমেয়েদের চোখ ইশারায় বারণ করে, মুখে অমন শব্দ করতে নেই এসবখানে! গন্ধটা বুঝি নাক দিয়ে বুকের ভেতরই চলে গেছে—মালতী বার করে দিতে চায়. শুভেন্দুর মত সহজ ভাবে নিঃশ্বাস নিতে চায়, দেখাতে চায় ছেলেমেয়ের মত ছেলেমানুষ সে নয়, স্থান-কালের হিসেব তারও আছে। কিন্তু ছেলেমেয়ে সঙ্গে থাকায় শুভেন্দুর মত তারও কি লজ্জা হচ্ছে? পায়ের তলায় রঙিন কার্পেটটা পা দুটোকে যেন টেনে টেনে চুবিয়ে দিচ্ছে।

সেই কিন্তু ছেলেমেয়েরা খুশিতে নানারূপ শব্দ করে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বুঝি লজ্জায় পড়ে, পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ঘরের মধ্যে গন্ধটা বড় বিভ্রান্তিকর! পরিচিত কোন গন্ধের সঙ্গে [illegible] যুঁই—বেলী? আতর? গন্ধ তেল? না কোনটাই না। অগুরু? চন্দন? ল্যাভেন্ডার? খস্‌খস্‌? না, তাও নয় যেন। আন্দাজ করতে মাথা গুলিয়ে ওঠে। শুভেন্দুর মনে হয় সব মিলিয়ে একটা গন্ধের সিন্‌থেটিক। চুলোয় যাকগে. অত মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই! কিন্তু ছেলে-মেয়েগুলো যা কান্ড করছে—

আঃ কি ঠান্ডা! না মা?

মালতী চোখ টিপে মেয়েকে শাসন করলে। তাও কি মানে. না. শোনে! হঠাৎ খুশিতে উচ্ছল হয়ে বড় মেয়ে বললে, বরফের মত না রে মণি?

আশেপাশে কজনকে সামলাবে, নিজের মনে অপ্রস্তুত হয়ে মালতী বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাইলে। শুভেন্দু এগিয়ে গেছে যেন এ দলের সে কেউ নয়. মনে মনে বিড়বিড় করছে, যত সব! কি মুশকিল সঙ্গে এনে এদের!

বড়ছেলে বললে, দুর-র এয়ার-কন্ডিশান!

এবার মালতী চাপা গলায় বললে, আচ্ছা হয়েছে, চুপ-প-প কর সব!

তারপর প্রায় ছুটে গিয়ে ছেলেমেয়ে-গুলো গদি-আঁটা চেয়ারে বসে পড়ল। মালতী মুখে সাবধান করবার আগে চকিতে মনে পড়ল, অনেকদিন আগে তাকে অমনি একখানা ভেলভেটের গদি-আঁটা চেয়ারে সাজিয়ে-গুজিয়ে বসান হয়েছিল, চারপাশে মেয়েদের কি ভিড় ছিল, কত আনন্দ, কত গর্ব যেন—মানিয়েওছিল, সবাই বলেছিল, নতুন বউ আলো করে আছে—

কি যেন নামটা, যার ওপর সেদিন মালতীকে সন্ধ্যে থেকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল? (দুর্গা প্রতিমার মত) মনে পড়েও মনে পড়তে চায় না, বেশ নামটা, নতুন বউকে বসাবার আসনটা—ডেকরেটরগা সব জিনিসের সঙ্গে আগেভাগে পৌঁছে দেয় বৌভাতের দিন? বাড়ীর কুচোকাচা ছেলে-মেয়ে যার ওপর অনেকবার বসে উঠে পড়ে তাড়া খেয়ে? ঠিক তার ঐ ছেলেমেয়েদের মত হাত-পা ছড়িয়ে দেয়—

স্নোন্-ন--ন! কে জানে কথাটা মনে পড়ে হারান জিনিস খুঁজে পাওয়ার মত মালতী সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলো কিনা। শুভেন্দু পিছন ফিরে কেমন করে চাইলে যেন!

কিন্তু এখানেও সেই স্রোন সাজান আছে বসবার জন্যে। একটা নয়, পর পর অনেকগুলো, সারবন্দি। কত বসবে, বসুক না!

মালতীর মনে হলো, বসলেও ও আসনে তার ছেলেমেয়েগুলোকে একেবারেই

মানায়নি। কেমন যেন নাই দেওয়ার মত মনে হচ্ছে।

এখনি যদি কেউ এসে হাত ধরে কি তাড়া দিয়ে ওদের তুলে দেয়? কথাটা মনে হতে মালতী স্বামীকে খুঁজলে। আচ্ছা লোক, কেমন দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! কাছে থাকতে পারেন না? লজ্জা করে?

ছেলেমেয়েদের পাশে বসে নিজেকে সংগ্রহ করে মালতী যেন মনে মনে স্বামীকে ধমক দিলে, নিজের ছেলেমেয়ে না? তা হলে এখানে এসেছিলে কেন? অত যদি মান—

থ্রোন! মানে কি? অনেকদিন নতুন বউ-বসান আসনটার নাম বা মানে জানতো না মালতী। এই সেদিন জেনেছে, বড় ছেলে মণ্টু না, বড় মেয়ে বলেছিল, থ্রোন মানে সিংহাসন, রাজ-আসন!

কি কাণ্ড, সেই সিংহাসনে সব নতুন-বউকে একদিন বসতেই হয়! কথাটা মনে পড়তে অনেকদিন পরে কেমন যেন পুলক সঞ্চার হচ্ছে মনে—মালতী একদিন সিংহাসনে বসেছিল! ভেলভেটের গদি-আঁটা—

আঃ! দেহটা যেন পালকের মত হালকা মনে হচ্ছে, অনেকদিন যেন বসে এমন আরাম বোধ করেনি মালতী। বাড়ীতে চেয়ারের নামে বা পিঁড়ির নামে কাঠের আসনগুলো কি শক্ত—দুবেলা ছেলেমেয়েরা অভিযোগ করে, চেয়ারে বসা যায় না, কাপড় ছিঁড়ে যায়, পিছনে চিমটি কাটে। অনেক-দিনের কথা, কোন্ নীলাম থেকে শুভেন্দু খান তিনেক চেয়ার আর একটা টেবিল কিনে এনেছিল—ঘরের আসবাব বলতে ঐ, তাও বহু ব্যবহারে ঢিলে-ঢালা হয়ে গেছে, যেমন টেবিল তেমনি চেয়ার, বসতে ইচ্ছে করে না! মালতীর অনেকদিনের শখ, এমনি সব সুন্দর সুন্দর, আরামদায়ক জিনিসপত্র দিয়ে ঘর সাজায়—বন্ধু বা বান্ধবী বা আত্মীয়স্বজন এলে হাত ধরে ঘরে এনে বসায়, মন জুড়িয়ে যায়। তা নয় চেয়ারে বসলে উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। বলে' বলে' শুভেন্দুকে পারেনি, ঐ পুরনো জিনিস জোড়াতালি দিয়ে চলছে! (আর শুভেন্দু পারবে কি করে, থাকতে-খেতে সব পয়সা ফুরিয়ে যায়, শখ করবে কি দিয়ে? বেচারা!) বেশ বোঝা যায় ছেলেমেয়েদেরও খুব আরাম হয়েছে গদি-আঁটা, কুশন-দেওয়া চেয়ারে বসে, বড় মেয়ে বড় ছেলের চোখ-মুখের ভাব কেমন হয়ে গেছে! আরাম? সুখ? আনন্দ?

ছোট ছেলের হাঁটুতে চাপ দিয়ে মালতী বারণ করলে, এই অমন করে না! চুপ করে বসতে পার না?

চেয়ারে বসে দুলতে বুঝি মালতীরও ইচ্ছে হয়, কি কোমল লঘু স্পর্শ! —ছোট-বেলায় দোলনায় দোল-খাওয়ার মত ভারহীন মনে হয় দেহটা!

না, সংযত হওয়া উচিত। তা ছাড়া চেয়ারে বসতে আসেনি, দোকানের কেউ লক্ষ্য করলে কি ভাববে, মনে করবে কখনো সোফা-কুশনে বসেনি, একেবারে—

বেশ শক্ত হয়ে ওঠে মালতী। আরাম ভাবটা কেটে গিয়ে অস্বস্তি বোধ হয়। মনে হয় কেমন যেন বোকার মত তারা ক'জন একধারে বসে আছে, কেউ তাদের দেখছে না, কিছু বলছে না, যেন চুপি চুপি কোন নেমন্তন্ন বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে!

এতক্ষণে যেন মালতীর খেয়াল হলো, তারা ছাড়া আরো অনেক নারীপুরুষ ছেলেমেয়ে আছে ঘরটার মধ্যে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, গন্ধ-গন্ধ ঘরটায় শব্দ-স্পর্শ কেমন যেন ছবির রঙের মত হয়ে আছে। কত রকমের ছবি, কত বিচিত্র সুন্দর বেশ-বাসের মানুষ-জন, ছেলে-মেয়ে, হাসি-খুশি।

মনে মনে খুব যেন অবাক হয়ে যায় মালতী। সকলেই তার মত এখানে ছেলে-মেয়ের জুতো কিনতে এসেছে? জুতো কেনবার জন্যে দোকানে এত ভিড়? কি আশ্চর্য, অবাক কাণ্ড যেন এমন কখনো মালতী চোখে দেখেনি, মনে ভাবেনি, কানেও বুঝি শোনেনি! জুতোর দোকানে এত ভিড়!

তারপর কেমন যেন নিজেকে অসহায় বোধ হয় মালতীর। এই ভিড়ে কি করে সে প্রয়োজনীয় বস্তুটি সংগ্রহ করবে? দোকানের কেউ যেন তাদের দেখেও দেখছে না! ঐ তো সামনের বউটি আর তার স্বামী আশেপাশে জুতোর পাহাড় জমিয়ে ফেলেছে, এক জোড়ার জায়গায় পাঁচজোড়া এসে পড়ছে, একটুখানি মুখ বাঁকানর যা অপেক্ষা! তারপর আরো আছে আশেপাশে, সবাইকে দোকানের লোকজন দেখছে, খুশি করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে—

মালতী ছেলেমেয়েকে সামনে অস্ফুটে বললে, এই! এই-ই-ই?

কাকে ডাকলে যেন মালতী ভুলে গেছে দোকানের কর্মচারী একজন ছুটে এসে সামনে দাঁড়াতে মালতী ভারি অপ্রস্তুত বোধ করলে। কেমন সপ্রতিভ, সুন্দর ফিট

…টে লোকটি তার স্বামীর চেয়ে অনেক যেন—

সম্মুখে দণ্ডায়মান সেলসম্যানটি সহাস্যে জিজ্ঞেস করলে, বলুন কি দেব?

মালতী চোখ তুলতে পারে না, কেমন লজ্জা বোধ হয়, কি দেবে না দেবে যেন তার বলবার নয়, শুভেন্দু বলবে।

বলুন দয়া করে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটি যেন দুলছে, চড়ুই পাখির মত চাঞ্চল্য সারা দেহে, চোখেমুখে, বড় অস্থির যেন।

মুখ তুলে কিছু বলবার আগে, লোকটি ছুটে আর একদিকে চলে গেল। আবার কে ডাকলো যেন।

এবার মালতীর রাগ হলো। এ আবার কোন্ ধরনের দোকানদারী—একজন খদ্দেরকে দেখতে না দেখতে আর একজনের কাছে ছুটে যাওয়া? না কি, তারা জিনিস কিনতে আসেনি? মালতী মুখ তুলে ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। শুভেন্দু কি এখনো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে? হাঁ করে কি দেখছে? স্ত্রীপুত্রপরিবারকে এমনি আতান্তরে ফেলে সে কি মজা করছে?

বড় মেয়ে বললে, মা ওকে কিছু বললে না?

কি বলবো? বলতে তর সইলো, ছুটে চলে গেল! ঝকমারি এখানে জুতো কিনতে আসা! বেশ বিরক্তির সঙ্গে মালতী বললে।

বড় মেয়ে আর কিছু বললে না, আরগুলো ভয় পেয়ে গেল, মা যদি উঠে চলে যায়? জুতো কেনা না হয়? ওরা সবাই মিলে চোখ ফিরিয়ে বাবাকে খুঁজলে, কোথায় তাদের বাবা জুতো কিনতে এসে লুকিয়ে রইল? ডাকবে নাকি সবাই মিলে চেঁচিয়ে বাবা বলে?

রাগে মালতী গুম হয়ে গেছে। কি আক্কেল বিবেচনা শুভেন্দুর! আরো যেন তাকে অপ্রস্তুতে ফেলেছে। এই জন্যে মালতী তখন বলেছিল, কি দরকার অতদূরে গিয়ে, পাড়ার দোকান থেকে কিনলেই হয়?

শুভেন্দু শোনেনি। বেশ জোর দিয়ে আপত্তি করে বলেছিল, সব চোর! ধর্মতলায় চল, অনেক সস্তা পাবে, মনের মতও জিনিস হবে!

কিন্তু তা বলে এই দোকান জুতোর, মালতী কল্পনাও করেনি কখনো, দেখেওনি কোনদিন! নাম-শোনা গ্রান্ড হোটেলের কল্পিত রূপের সঙ্গে মেলে যেন!

এখানে আসার কত যুক্তি শুভেন্দুর: একসঙ্গে অত জোড়া জুতো কিনবে, দেখে শুনে নেবে না? সেই তো একই রকম ফ্যাশান পাড়ার দোকানে।

নিমরাজী মালতী বলেছিল, তা হলে তুমিই যাও ওদের নিয়ে, আমার আর যাবার দরকার নেই।

তা হয় না। শুভেন্দু স্ত্রীকে রেহাই দেয়নি। মালতী তখন বোঝেনি, এখন যেন বুঝছে, সে সঙ্গে না এলে ছেলেমেয়েদের সামলাবে কে? স্ত্রীকে নতুন জুতোর দোকান দেখানর কি, বেড়াতে নিয়ে আসার ইচ্ছে শুভেন্দুর ছিল না, পাঁচটি অপোগণ্ডোকে দেখাশোনার উদ্দেশ্য প্রকারান্তরে!

ছেলেদের জুতো কেনার নামে মালতী মেতে উঠেছিল। শুভেন্দুর আগ্রহটাকে অকৃত্রিম অনুরাগ মনে করেছিল। আহা বেচারা রাতদিন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকে, চলুক না সঙ্গে একটু, তবু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আসবে—পাঁচটা জিনিস দেখে শুনে আসবে! মালতীও খুশি হয়েছিল, স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিল, যেন খাঁচার পাখিটাকে আদর করে বাইরে আনা হয়েছে!

পাড়া দিয়ে আসবার সময় বড়ছেলেই প্রথমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, বাবা! ঐ দেখ।

পাড়ার একটি চেনা দোকান। ছেলের কথায় কেন জানি না মালতী বেশ অপ্রস্তুত বোধ করেছিল। পরিচিত জুতোর দোকানকে যেন তারা ফাঁকি দিচ্ছে, চিরকালের জানা-

শোনা সম্বন্ধের বিচ্ছেদ করছে, অবহেলা করছে—

শুভেন্দু বললে, না, ওখানে নয়!

বড় মেয়ে সব জানে, পাকা, বললে, ধর্মতলায় যাচ্ছি না জুতো কিনতে। সেখানে কত ভাল ভাল জুতো পাওয়া যায়!

শুভেন্দু মাথা নিচু করে বললে, তাড়াতাড়ি চলে এস সব।

বড়ছেলে বললে, এ দোকানের জুতোও ভাল। আমার সেই জুতোটা কদ্দিন গেল না মা?

ছোট মেয়ে বললে, একদম ফ্যাশান নেই নারে দিদি? যত সব পুরনো জুতো—সেকেলে নারে দিদি?

পুরনো এই জুতোর দোকানের সামনে থেকে সরে যেতে পারলে যেন বাঁচে। মালতী তাড়া দিলে, আয় আয়, বকবক করিস নি।

শুভেন্দু ততক্ষণে ঘাড় গুঁজে মাথা নিচু করে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এখুনি পিছন থেকে দোকানের লোকটা ডাকবে, আসুন না বাবু : কি নেবেন?

আশ্চর্য, এই ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ঘরে না-জানা সুবাসের মধ্যে নানা সংস্পর্শে নিঃশব্দ খুশির অভিব্যক্তির মাঝখানে স্বামীর প্রতি বিরূপতায় মালতীর বার বার পাড়ার জুতোর দোকানের ছবিটা চোখের ওপর ভেসে উঠতে লাগল। তারা যখন আসে দোকানে একটিও খদ্দের ছিল না, শো-কেসে জুতোগুলো কেমন যেন জুলজুল করে পথের দিকে চেয়েছিল। দোকানের সাইন বোর্ডটাও কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে, একটা মস্ত বুট জুতো আঁকা আছে!

এতদিন শুভেন্দুই বলত, ও দোকানের জুতো খুব টেঁকসই। বরাবর ছেলে-মেয়েদের জুতো সে ওখান থেকেই এনেছে। অনেক দিনের পুরনো দোকান, শুভেন্দুদের আত্মীয়-স্বজন সবাই ওদের ক্লায়েন্ট!

বেশ জানাশোনা, দোকানে ঢুকলে আর কিছু বলতে হত না। ঠিকমত জুতো ঠিকমত পায়ে ফিট করে দিয়ে বুড়ো দোকানদার বলত, একটু হেঁটে দেখুন। ব্যস, এই জোড়া নিয়ে নিন!

শেষ যে-বার ছেলে-মেয়েদের জুতো কেনা হয় মালতী সঙ্গে গিয়েছিল, বুঝেছিল ঐ দোকানের জুতো তাদের পছন্দ নয়, কেবল বাপের ভয়ে পাগুলো সব বাড়িয়ে দিয়েছে।

তাও তো দেখতে দেখতে দু' বছর হয়ে গেল। কারও পায়ে আর জুতো আস্ত নেই। অনেক দিন থেকেই নতুন জুতোর বায়না আরম্ভ হয়েছে, মুচি ডেকে জোড়া-তালি দিয়ে চলারও অযোগ্য হয়ে গেছে।

কথাটা মালতীকেই বলতে হয়। ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড়, জুতো, কার কি প্রয়োজন, মালতী স্বামীর কানে এক সময় তুলে দেয়। তারপর কদিন অন্তর অন্তর তার পুনরুল্লেখ করতে হয়। প্রথমটা তো শুভেন্দু উড়িয়ে দেয়, কি কানেই করে না, তারপর যদি শোনে রেগে-মেগে একশা করে ছাড়ে : অ্যাঁ! এর মধ্যে জুতো? এই সেদিন কেনা হল না?

সেদিন মানে এক বছরেরও বেশি। সেই জন্যে এবার পুজোর সময় ওদের কারও জুতো হল না, নয়?

অত হিসেব শুভেন্দুর নেই। সোজা-সুজি বলে বসবে, জুতোফুতো হবে না। মুচি দিয়ে সারিয়ে নিও। যত সব বড় মানষী!

যদি সারান আর না যায়? সে তর্ক মালতী স্বামীর সঙ্গে করে না। তাছাড়া খালি পায়ে তো আর ছেলে-মেয়েরা স্কুল-পাঠশালে যেতে পারে না!

কিন্তু তাতেও শুভেন্দুর তর্ক, রাগা-রাগি, আমরা কত জুতো পায়ে দিয়ে স্কুলে গেছি? খালি পায়ে গেলেই বা।

জুতো কেনা নয়, একটা পর্ব। বিয়ে থেকে ছেলেমেয়ে হওয়া থেকে মালতী দেখে আসছে। মাথা ফাটাফাটি, তর্কাতর্কি এক কাণ্ড!

সেই কেনা হবে, কিন্তু সেই বাক-বিতণ্ডা, মারামারি যত অনুরোধ কেনবার

ময়। শুভেন্দু কেমন পাগলের মত হয়ে যাবে!

এবারেও হয়েছিল, কিন্তু উগ্রতাটা বোধহয় অতটা ছিল না। যদিও এক কথায় য়, তবু তার তীব্রতা যেন মনে রাখবার য়। প্রয়োজনটা শুভেন্দু নিজে থেকেই রেছে। একদিন ছোট ছেলেকে খালি পায় াইরে যেতে দেখে শুভেন্দু বেশ ধমক দিয়ে বললে, খালি পায়ে বেরোচ্ছিস যে ড়া জুতো পরে যা!

ঘরে দাঁড়িয়ে বেশ স্পষ্ট গলায় ছেলে বললে, জুতো ছিঁড়ে গেছে!

ছিঁড়ে গেছে! পরা যায় না? সারাসনি কেন?

না। ছোট ছেলে আর দাঁড়াল না। তার কি, খালি পায়েই সে হাঁটাহাঁটি করবে! রাস্তা-ঘাটে যাবে!

কিন্তু মুখে বললেও খালি পায় ছেলে-মেয়ের চলাফেরাটা বড় চোখে লাগে শুভেন্দুর। কোথায় যেন সম্মানে বাধে।

তাছাড়া এ শহর, এখানে খাও না খাও, জুতোটা ঠিক পায়ে দেওয়া চাই—জুতো পায়ে দিলে তবে যেন মানুষটা সম্পূর্ণ, তার সাজগোজটাও! জুতো ছাড়া শহরের মানুষ কল্পনা করা যায় না।

সেল্সম্যান লোকটি আবার এসে দাঁড়াল, তেমনি অমায়িকভাবে বললে, বলুন?

মালতী চোখ তুলে লোকটিকে যেন

কর্মচারীরা চাইলে, তাদের দিকে নজর দেওয়া তার কর্তব্য, এমনি হেলা-ফেলা করা উচিত নয়!

কিন্তু সেই অস্থির লোকটি, মুখ মিষ্টি তবু, বলুন?

মালতী যেন একটু ব্যাজার হয়ে বললে, বলছি তো এদের জুতো!

কি জুতো? লোকটি অপেক্ষা করে, কোন্ স্টাইল?

তা তো মালতী জানে না। জুতো জুতো, স্টাইল আবার কি?

ছেলে-মেয়ের দিকে চেয়ে বললে, বল না তোদের কি চাই?

আশ্চর্য, ছেলে-মেয়েরা কথাই বলে না, তারা লোকটির কেতাদুরস্ত ব্যবহারে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে।

বলুন? বলুন? মুহূর্তে লোকটি সামনে থেকে আবার সরে গেল।

মালতী ছেলে-মেয়েদের ভর্ৎসনা করে বললে, সব বোবা হয়ে গেছ! কেন কি জুতো চাই মুখে বলতে পার না? এদিকে আসবার সময় তো—

কথার মাঝখানে নিঃশ্বাস ফেলে মালতী যেন বেঁচে গেল। শুভেন্দু এসে ছেলে-মেয়ের এক পাশে বসল।

শুভেন্দু জিজ্ঞেস করলে, কি হল? কি রে চুপ করে আছিস সব, জুতো দেখিস নি?

ছোট মেয়ে আস্তে আস্তে বললে, জুতো দেখায়ই নি!

সে কি! শুভেন্দু ঘাড় কাৎ করে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা যেন জানতে চাইলে।

মালতী কেমন গম্ভীর, নিরুত্তর! যেন বলে বোঝান যায় না এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে! হঠাৎ শুভেন্দুর মনে হয়, কেউ কি কোন অপমান করলে নাকি? এত গম্ভীর মালতীকে কোনদিন মনে হয় নি তো!

আত্মসচেতনায় শুভেন্দু চেঁচিয়ে ডাকলে, মিস্টার! এই মিস্টার!

মালতী আয়ত চোখ দুটো তুলে স্বামীকে যেন বারণ করতে চাইলে, দরকার নেই অত চেঁচাবার! ঠিক আসবেখন!

তবু শুভেন্দু ক্ষান্ত হল না, হাঁকা-হাঁকি ডাকাডাকি করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, দু-তিনজন কর্মচারীরা ছুটে এল।

বেশ রাগ এবং প্রভুত্বসহকারে শুভেন্দু বললে, এদের পায়ের জুতো দেখান।

সেই এক প্রশ্ন, কি জুতো, কোন জুতো?

গম্ভীর হয়ে শুভেন্দু বললে, লেটেস্ট ফ্যাশান নিয়ে আসুন না।

বাপকে পেয়ে ছেলে-মেয়েগুলোর যেন বোল ফুটেছে, সাহস হয়েছে। ছোট মেয়ে কলকণ্ঠে বললে, কাগজে কেমন সুন্দর সুন্দর ফ্যাশান বেরিয়েছে, না রে দিদি?

মন্টু মাতব্বরি করে বললে, মেয়েদের আর ছেলেদের আলাদা কিন্তু!

কর্মচারীটি হেসে পিছন ফিরল। ছেলে-মেয়েরা কাগজে বিজ্ঞাপিত জুতোর সর্বাধুনিক ফ্যাশান নিয়ে আলোচনা করতে লাগল—বেশ নামগুলো দিয়েছে জুতোর, অত নাম কখনো মনে থাকে? জুতোরও নাম হয়েছে আজকাল!

মালতী কিন্তু তেমনি গম্ভীর। এখন শুভেন্দুর উপস্থিতিতে অসহায় ভাবটা দূর হলেও সে যেন বোঝাতে চায় এভাবে তাদের দোকানের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে সরে থাকা শুভেন্দুর অন্যায় হয়েছে। আর এ দোকানে আসাই উচিত হয় নি। বড়লোকদের কাণ্ড-কারখানা, যত সব!

শুভেন্দু ঘাড় কাৎ করে বললে, কি ব্যাপার?

নিম্নস্বরে মালতী বললে, কি আবার!

কথা বলছো না যে? স্ত্রীর গাম্ভীর্যের কারণটা যেন শুভেন্দু বুঝতে পারে।

কথা বলবার জায়গা? রাগত ভাবটা যেন আরও প্রকাশ হয় মালতীর।

শুভেন্দু চুপ করে গেল; সত্যিই তো জুতোর দোকানে এসে কার রাগ হল, না হলো, কেউ জানতে চায় নাকি? আর মালতী যদি কোন কারণে রেগেও থাকে প্রকাশ করবে নাকি?

কিন্তু একথা তো মালতী জিজ্ঞেস করতে পারে, হঠাৎ শুভেন্দু তাদের ভিড়ের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়েছিল? জুতোর দোকানে অত কি দেখছিল?

না, মালতী জিজ্ঞেস করলেও সত্যি কথাটা বোধ হয় শুভেন্দু বলতে পারবে না, তার গলায় যেন বাধবে।

দোকানে ঢোকবার মুখেই বিজন-কুমারকে সস্ত্রীক শুভেন্দু দেখেছিল। চিনতে কিছু দেরী হয় নি, ভাবতে কিছু সময় পায় নি। এই সেদিনও বিজন তাদের সঙ্গে চাকরি করতে এসেছিল, তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় যেন কি করছিল। মস্ত বড়লোক, ওদের আবার ভাবনা!

এক নিমেষে শুভেন্দু বিজনকুমারের আপাদ-মস্তক দেখে নিয়েছিল, স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি যেন ঠিকরে পড়ছে, সঙ্গে মহিলাটিও তদ্রূপ। বেশ বোঝা যায় চাকরি-করা সাধারণ লোক নয় এখন বিজনরা।

কিছুতেই শুভেন্দু বুঝতে পারে নি, বিজনকে দেখে হঠাৎ তার অত সঙ্কোচ বা

হীনমন্যতা হয়েছিল কেন, কেন সে নিজেকে আড়ালে সরিয়ে নিয়েছিল, কেন সে নিজেকে মাপে ছোট মনে করেছিল। যেন ডুবে গিয়ে পাতালে পেঁছে গেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে, বাইরের আলো-বাতাসের জন্যে ছটফট করছে! আশ্চর্য, কি যে অস্বস্তি সস্ত্রীক বিজনকুমারকে একই দোকানে সওদা করতে দেখে! চিনলেও অস্বস্তি না চিনলেও অস্বস্তি! দূর থেকে দেখে একটা থামের আড়ালে সরে দাঁড়িয়েছিল শুভেন্দু, যেন কত মনোযোগ দিয়ে পরিপাটি করে দোকান সাজানোর কৌশলটা দেখছে, রুচিসম্মত শিল্পগুণসমন্বিত—কে বলবে জুতোর দোকান, যেন চারুকলার মেলা!

তবু বুঝি নিজেকে লুকনো যায় না; বড় বেশি আত্মসচেতন হয়ে ওঠে শুভেন্দু,—মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সচেতনতা জাগে। মনের অস্বস্তিকর হীনমন্যতার ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দিতে শুভেন্দু বললে, আমার এক বন্ধুকে দেখলুম স্ত্রীকে নিয়ে জুতো কিনতে এসেছে! খুব বড়লোক—

বলেই কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করলে শুভেন্দু, বড়লোক বলে স্ত্রীর কাছে পরিচয় দেবার কি আছে? বন্ধু বললেই তো যথেষ্ট!

তারপর আবার সহজ হবার চেষ্টায় বললে, এখানে সবাই আসে! কি দোকান একটা করেছে, নয়?

মালতী উত্তর দিলে না। দোকান দেখে সে কম অবাক হয় নি। ঠান্ডা ঘরে গদি-আঁটা ভেলভেটের চেয়ারে গা ছড়িয়ে বসে অদ্ভুত একটা আরাম মনকে যেন খোঁচা দেয় যেন! আলোগুলো এমন করে ঢাকা, জুতোগুলো এমন করে সাজান যেন লোভাতুর না হয়ে আর উপায় নেই—একটা স্মিত হাস্যময়তা ঘরময় ছোটাছুটি করছে যেন!

মালতীও বুঝি দোকানে পা দিয়ে বুঝতে পেরেছিল, তাদের মত লোকের এসব দোকানে জুতো কিনতে ঢোকা উচিতই হয় নি। এখানে তারা অভ্যর্থিত বা অভিপ্রেত নয়। পাড়ার দোকানে ক্রেতা হিসেবে তাদের যে খাতির এখানে তার সিকিও সে দেখতে পায় নি। বড়লোকের উৎসব বাড়িতে বহু কুটুম্বের সমারোহের মধ্যে রবাহূত কোন লোভীজনের মত ... নয়নে প্রতীক্ষমান!

অনেকবার রাগ হয়েছে মালতীর, বিরক্ত বোধ করেছে মনে মনে, শুভেন্দুর বুদ্ধিকে দোষারোপ করেছে — ... কিনতে হবে বলে কি শেষ পর্যন্ত ... এই কি জুতোর দোকান! না, কাণ্ডজ্ঞান ...

সঙ্গে সঙ্গে এ ভয়টা মালতীর বদ্ধমূল হয়েছে, যত বড় দোকান ... জিনিসের দর। পাড়ার দোকানের ... না হয়ত সে কি বলেছে।

গন্ধটা থেকে থেকে ... নাকে লাগছে ছেলে-মেয়েগুলো ... চাওয়া-চাওয়ি করলে, মালতী মুখ ...

শুভেন্দুর যেন খেয়াল ... এখনো ছেলেমেয়ের জুতো নিয়ে ...

আঃ করছে কি? নাকি ... করছে না?

শুভেন্দু উঠে সশব্দে ... যেতে মালতী বাধা দিলে, আঃ ... আসছে তো!

আসছে মানে! আধ ঘন্টার ওপর ... গেল এখনো দেখা নেই! কেন আমরা পয়সা দেব না? বেশ গরম হয়ে ... শুভেন্দু।

বাপের হঠাৎ রাগে ছেলেমেয়েরা ... পেয়ে যায়। তাদের কোন ধারণা ... পর্যন্ত বোধহয় তাদের জুতোই কেন ... না। মা তো গোড়া থেকে ওই, এবং ... মা করছেন—

চেঁচামেচিতে টাই-পরা এক ... এগিয়ে এল, মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে ... পাশে একটু কাৎ হয়ে বললে, এক ... আমিই দিচ্ছি। বল খোকাখুকু ... কেমন জুতো চাই? এই দেখ—

বলেই পাশের তাক থেকে একটা ... বই নিয়ে শুভেন্দুর ছেলেমেয়ের ... মেলে ধরলে, নাও-ও, এবার পছন্দ ... দিকি!

ততক্ষণে সেলস্‌ম্যানটি পাঁচ... জুতো নিয়ে হাজির হল। টাই-পরা ... কোনরকম উত্তেজনা বা উষ্মা প্রকাশ না ... সহকর্মীকে বললে, বোস, তুমি এঁদের ...

তেমনি রাগতভাবে শুভেন্দু বল... অনেকক্ষণ বসে আছি!

টাই-পরা লোকটি স্মিতহাস্যে বল... আর দেরী হবে না। বোস, প্লিজ অ্যাটেন্ড ...

আশ্চর্য, শুভেন্দু এত রাগ করলে ... এঁরা তা একেবারেই গায়ে মাখলে না! ... দোষ স্বীকার ক'রে কেমন স্বচ্ছন্দে নিজ... নিজের কাজ করছে, যেন কিছু হয়নি ... দোকানের ভেতর ছবি-ছবি ভাবটা ... ফিরে এল।

মালতী কেমন চুপ হয়ে গেছে; মনে ... কেমন যেন অপরাধী বোধ করছে। ... বুঝতে পারছে, আশপাশের ক্রেতা ... শুভেন্দুর অধৈর্য হয়ে চেঁচামেচি ... পছন্দ করেনি—শিষ্টাচারে বেধেছে!

এই তো সামনের ক্রেতার দলটা এমন-ভাবে তাদের দিকে চেয়েছিল যেন শুভেন্দু ওদেরই কিছু বলেছে, সেজন্য জন্য ওদেরই জবাবদিহি করেছে! অন্যের কথায় এমন-ভাবে চেয়ে থাকা কেন? এত আগ্রহই বা কেন? কেমন যেন—

দেখে মালতীর খুব রাগ হ'য়েছিল, মন করেছিল বলে, আপনাদের কি, অমন-ভাবে চেয়ে আছেন কেন? আপনারা যেমন বসে আছেন তেমনি বসে থাকুন না, আমাদের কথায় অত আগ্রহ কেন? জুতো কিনতে আপনারা এসেছেন, আমরাও এসেছি!

হ্যাঁ, জুতো কিনতেই সবাই এসেছে, কেউ বসে থাকতে বা আড্ডা দিতে এখানে আসেনি। তবু ভেলভেটের গদিতে বসে কার্পেটে পা রেখে মালতীর মনে হয়েছিল, তাদের মত কেউ এখানে নিছক প্রয়োজনে জুতো কিনতে আসেনি। তারা ছাড়া আর যারা এসেছে, বা এসে সওদা করে চলে যাচ্ছে, বেড়ানো-খুশিতে যেন ঘুরে যাচ্ছে। জুতো কেনাটা ওদের খুব দরকার নয়—মেলা দেখতে, মজা দেখতে, কি বেড়াতে মানুষ যেমন আসে, তেমনি! এসবখানে ওদের নিত্য আসা-যাওয়া, তাই কত সহজ, স্বাভাবিক, মানানসই মনে হয়।

মালতী ঠিকই বুঝেছিল, মুখচোখের অমন ভাব ক'রে ওরা তাদের ভৎর্সনা ক'রতে চেয়েছিল। মনের তাচ্ছিল্যের ভাবটা প্রকাশ ক'রে যেন বলতে চেয়েছিল—ভারি দামের জুতো, তার আবার এত তম্বি!

ওই পরিস্থিতিটা যেন আরো বেড়ে গিয়েছিল, আরো লজ্জা আরো সংকোচ মালতী বোধ করেছিল শুভেন্দুর রাগারাগির জন্য। চেঁচামেচি না ক'রে চলে গেলেই হ'ত, জুতোর দোকান কি কলকাতায় এই একটা নাকি! কথাটা বড় মর্মান্তিকভাবে মালতীর মনে হল, যেচে মান!

ছি ছি, শুভেন্দু একটা বিশ্রী কাণ্ড ক'রে ফেলেছে!

ছেলেমেয়েদের জুতোগুলো দেখেশুনে পছন্দ ক'রে দেবার ইচ্ছেও আর মালতীর নেই। এখন যা হোক ওরাই পছন্দ করে নিক, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে!

শুভেন্দু বললে, কই, তুমি কিছু বললো না কোনটা পছন্দ?

আমি আবার কি বলবো? ওরা পরবে ওরাই পছন্দ করুক! মালতী কেমন যেন আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাবে বললে।

শুভেন্দু তবু পেড়াপিড়ি ক'রলে, ওদের আবার পছন্দ! না না, তুমি দেখে দাও—

ছোট মেয়ের জন্যে পছন্দ-করা জুতো-জোড়াটা মালতীর কোলের ওপর ফেলে দিল।

জুতোর বাক্সটা হাত দিয়ে তুলে আড়-চোখে চেয়ে মালতী যেন চমকে উঠলো, এত দাম? এতটুকু জুতোর—

শুভেন্দু স্ত্রীকে কিছু বলবার আগে সেলসম্যানটি বললে, নতুন ফ্যাশান একেবারে—

দাম শুনে স্ত্রীর মত মনে মনে চমকালেও শুভেন্দু মুখে সেটা প্রকাশ করলে না, এমন ভাব করলে যেন ছেলেমেয়ের জুতোর দাম নিয়ে তার দুর্ভাবনা নেই, বললে, ফ্যাশান-ট্যাশান বাদ দিন, ছোট মেয়ে এখন ওদের শক্ত মজবুত জুতো দরকার! যা দেখাচ্ছেন ওর মধ্যে কতটুকু জোদার আছে?—

সেলসম্যান স্বীকার করলে, জোদার নেই বলেই ফ্যাশান হয়েছে। তবু জুতোটা আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা!

শুভেন্দু মেয়েকে জিজ্ঞেস ক'রলে, কিরে বুলা, তোর পছন্দ হয়েছে? নীরবে বুলা মাথা নাড়লে, মানে তার পছন্দ হয়েছে। তার জুতো-কেনা অভিজ্ঞতায় এমন জুতো সে কোনদিন দেখেনি তাদের পাড়ার দোকানে।

বেশ মাতব্বরি চালে শুভেন্দু বললে, আচ্ছা থাক এটা।

মালতী কিছু বললে না। তার মনে হল, দাম বেশি জেনেশুনেই শুভেন্দু এখানে এসেছে, ছেলেমেয়ের জুতো কেনা নয় মরণ-পণ যেন!

মালতী বুঝে ফেলেছে, এখন শুভেন্দুকে কিছু বলা বৃথা। আর এসব দোকানে জুতো কিনতে এসে দরকষাকষি করা শোভন নয়, দাম জিজ্ঞেস করাও অনুচিত, কেননা দামের কথাটা জুতোর গায়ে লেখাই আছে স্পষ্ট করে!

হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে মালতী। দৃষ্টিটা কেমন শূন্য হয়ে সুসজ্জিত দোকান-ঘরময় ঘোরাঘুরি করে। যেন সিনেমা, কি থিয়েটার দেখতে সারে সারে সব বসে পড়েছে, পায়ের কাছে জুতো না দেখলে মনেই হয় না যে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর উদ্দেশ্য কেবল মনোমত, পছন্দমত জুতা-কেনা! এত সাজগোজ, চাকচিক্য সবই এই—

মালতীর চোখদুটো যেন আটকে যায়, মনটা শির শির করে : পায়ে জুতো পরাবার নামে অদূরে ঐ যুবতীর হাঁটুর কাপড় কত-খানি তুলেছে, লোকটি যেন পদসেবা ক'রছে!

তারপর কি মনে ক'রে মালতী নিজের পায়ের কাপড় টেনে টেনে নামিয়ে দিলে—মেয়েদের ফ্রকপরা উন্মুক্ত পদযুগলের দিকে চেয়ে দেখলে। না, কোন তুলনাই হয় না, কি রোগা কাঠিকাঠি পা তার মেয়েদের—তেমনি আবার পায়ের জুতোগুলো—

সেলসম্যান লোকটি তখনো যুবতী মেয়েটির পদসেবা করছে যেন। অনেকগুলো জুতোর বাক্স খোলা হয়ে গেছে, হেসেহেসে লোকটি যুবতীর চরণযুগলে হাত রেখে কি যেন বলছে, মেয়েটিও যেন কি, জুতো কিনতে এসে অত কিসের মাখামাখি!

এবার বুঝি মনটা কর কর করে মালতীর। ওই তো যুবতীর পায়ের জুতো জোড়াটা, দেখলে তো মনে হয় নতুন, এর মধ্যে আবার নতুন জুতো কেনবার তাড়া কেন? বাই নাকি, না, জুতো-কেনার নাম ক'রে পদশোভা দেখান?

ইস-স লজ্জা করে না পায়ের ওপর কাপড় অতখানি তুলতে?

আর একটু হ'লে—

মালতী তড়াক ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, যেন তারই পায়ের কাপড় কেউ তুলছে অসৎ উদ্দেশ্যে! সারা দেহ শির-শির করছে!

একি এর মধ্যে উঠে পড়লে? শুভেন্দু তখন ছেলেমেয়ের জুতো-কেনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দু জোড়া হয়েছে, আর তিন-জোড়া হ'লে তবে রেহাই। দর-দামে কিছুতে

সামঞ্জস্য হ'চ্ছে না। লোকটি যেন মজা পেয়েছে, বেছে বেছে যত দামী জুতো এনে জড় ক'রছে!

ব্যস্ত, বিব্রত শুভেন্দু বললে, বস বস। জুতোগুলো দেখ না—

কিন্তু বসে আর দেখতে ইচ্ছে করে না মালতীর। এখানে বুঝি কেউ শুভেন্দুর মত অত দেখেশুনে জুতো কিনছে না। জুতোর নামেই মনোনয়ন হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কত জন এল গেল, জোড়ে বিজোড়ে দলে দলে. কিন্তু তারা যেন সেই অনন্তকাল ধরে বসে আছে, দীন প্রার্থীর মত।

আর শুভেন্দু যেন কি, বুঝছে না তার ছেলেমেয়ে পরিবারের দিকে দোকানের ক্রেতা বিক্রেতা সবারই সকৌতুক দৃষ্টি পড়েছে! যেমন তাদের বেশ-বাস, তেমনি তাদের হাব-ভাব!

নিজের পায়ের জুতো জোড়াটা যেন লুকিয়ে ফেলতে পারলে মালতী বাঁচে—সস্তা দামের শ্লিপার, তাও ছেঁড়া, তালি-দেওয়া। ছিঃ এ পরে কেউ এসব দোকানে আসে? শুভেন্দুর জুতো জোড়াটা আরো করুণ, আরো হীন অবস্থা—ডান পায়ের কড়ে আঙুলটা চামড়া ভেদ ক'রে কচ্ছপের মুখের মত বেরিয়ে আছে— কালো রঙ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। এত হীনমন্যতায়ও মালতীর মনে মনে হাসি পেল, ওই জুতো জোড়াটা কিনে একদিন শুভেন্দু কি গর্ব বোধ করেছিল, যেন ইতিপূর্বে তার মত কেউ অত দামী জুতো আর কেনেনি। নতুন জুতো নিয়ে কি আদিখ্যেতা ক'দিন শুভেন্দু করেছিল! বিয়ের পর থেকে মালতী দেখে আসছে জুতো কেনা যেন শুভেন্দুর কাছে এক পর্ব! নিজের জন্যে শুভেন্দু কিছুতে জুতো কিনতে চায় না, যেন জুতো কিনলে তার সংসার অচল হয়ে যাবে, কারো মুখে আর ডান হাত উঠবে না। এক একদিন মালতী রাগ ক'রে বলেছে, ছেঁড়া জুতো পায়ে দেওয়া যাদের অভ্যেস তারা কখনো নতুন জুতো কিনতে পারে!

যাদের মানে, শুভেন্দুর বাবাও অমনি করতেন। পরের ফেলে-দেওয়া জুতো সেরে-সুরে ব্যবহার করতেন। সংসারের সব দুঃখ, ঐ জুতোর বেলায় যত টানাটানি পড়তো, লাঠালাঠি বাধতো, রাগারাগি হ'তো।

মালতী বড়ছেলের পাশে চেয়ারে বসল। ছেলের কানে কানে কি যেন বললে, তারপর এমনভাবে ছেলেমেয়ের নতুন জুতো-পরা পাগুলোর দিকে চেয়ে রইল যেন ওর চেয়ে সুন্দর দর্শনীয় বস্তু জীবনে সে আর কখনো দেখেনি, এত আনন্দও বুঝি আর কিছুতে পায়নি। ছেলেমেয়ের জুতো কেনবার আগে অনেক ভেবেছে, কিন্তু সে-ভাবনার যেন কোন মানে নেই এখন।

শুভেন্দু লক্ষ্য ক'রে বললে, এই সঙ্গে তোমার এক জোড়া কিনে নাও না?

আহা বড় উদার, বড় দরাজ শুভেন্দু। মালতী স্বামীর কথা শুনে মনে মনে কেমন যেন কৌতুক বোধ করে। এ কথাটা কিন্তু কোনদিন নিজে থেকে শুভেন্দু বলেনি। গত পনের বছরে বুঝি কোনদিন চেয়েও দেখেনি মালতীর পায়ে জুতো আছে কি নেই। সেই কবে ফুলশয্যায় তত্ত্বের সঙ্গে বাপের বাড়ী থেকে তার জন্যে এক জোড়া চপ্পল জুতো এসেছিল, তারপর আর নিজস্ব বলে কিছু হয়নি—বড় মেয়ে বড় হ'য়ে মায়ের জুতো পরার অভাব মিটিয়েছে, নয়তো কোনদিন পুজোর বাজারের গোলমালে নিজের জন্যে শস্তা দরের একজোড়া স্যান্ডেল কিনেছে। আর জুতোর তার দরকারই বা কি? বাড়ীর মধ্যে জুতো পায়ে দিয়ে কি করবে? যাচ্ছেই বা কোথায়?

সামনে একটি নতুন বউ এসে বসল। মালতী আড়চোখে চেয়ে দেখলে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই পায়ে ঝকঝকে জুতো, তবু তারা জুতো কিনতে এসেছে। স্বামীটির কি আগ্রহ স্ত্রীকে নতুন জুতো কিনে দেবার, নিজেই বাছাবাছি আরম্ভ করেছে। মালতীর লজ্জা করে। কোন স্বামী স্ত্রীর জুতো নিয়ে চোখের সামনে মুখের সামনে অমনি করে নাড়ানাড়ি করে? স্ত্রীর জুতোটা চেটে দেখবে নাকি? আদিখ্যেতা!
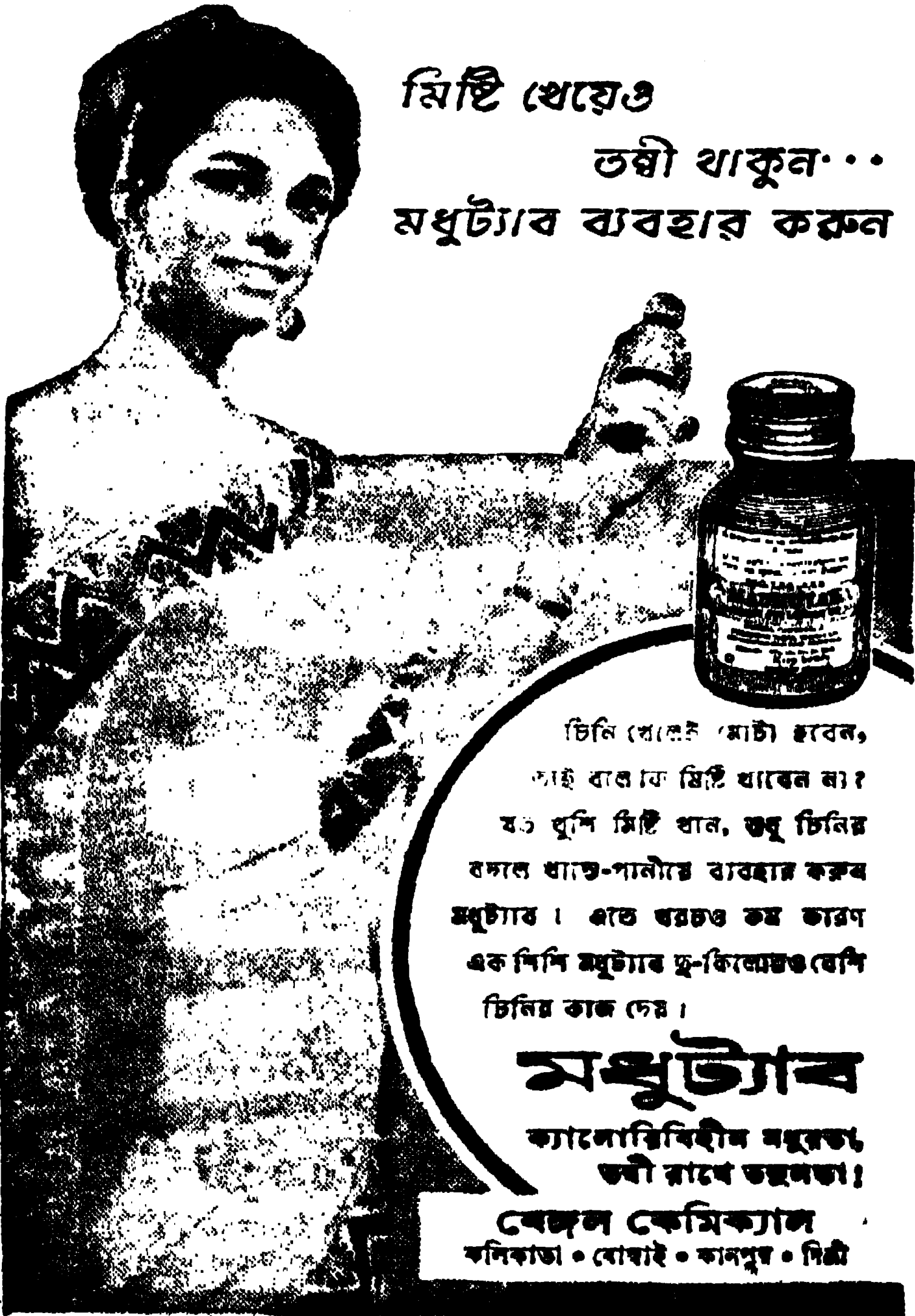
শুভেন্দু কিন্তু আবার বললে, এদের সঙ্গে তোমারও একজোড়া কিনে নাও! তোমার শ্লিপারটা—

মালতী বললে, তার আগে তোমার এক-জোড়া কেনো দেখি!

আজ শুভেন্দু বড় উদার, হেসে বললে, তোমার হোক, তারপর আমার হবে।

এবার আর আড়চোখে না, স্পষ্ট মালতী দেখলে, সামনের বউটির পায়ে নতুন জুতো পরিয়ে স্বামীটি অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে, যেন দৃষ্টির জিভ দিয়ে চেখে চেখে দেখছে জুতোটাকে।

কিন্তু? তারপর মালতী শুভেন্দু দুজনেই চুপ। বোধহয় বুঝতে পারে, পরস্পরকে জুতো পরানর শখটা আপাতত মুলতুবি রাখতে হবে। সঙ্গে যা টাকা আছে, তাতে কোনরকমে হয়তো ছেলেমেয়েদের জুতোই হবে। সামর্থ্যের সঙ্গে সোহাগের সম্পর্কটা উভয়েরই বোঝা হয়ে গেছে অনেক-দিন। এ লুকোচুরি তারা জানে।

হঠাৎ মন্টু বললে, বাবা, আমি এখন জুতো নেব না, পুজোর সময় নেব। আমার জুতোটা বেশ শক্ত আছে।

অমনি বড় মেয়ে রেবা বললে, আমারও চাই না, আমার জুতোও গোটা আছে, নয় মা?

স্বামী-স্ত্রী অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে যেন জানতে চায় হঠাৎ বড় দুটো ছেলে-মেয়ে এমন কথা বলছে কেন, নাকি তারা বাপ-মার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে?

শুভেন্দু তাড়া দিয়ে বললে, না, না তোমরা কিনে নাও।

মালতীও তাই বলতে চায়, তোমাদের অত ভাববার দরকার নেই। সত্যি, ছেলে-মেয়ের কথায় স্বামী-স্ত্রী ভারি লজ্জায় পড়ে। ছেলেমেয়েরাও বুঝেছে তাদের জুতো পেলে বাবা-মা'র জুতো হ'বে না. হ'তে পারে না—তাদের বাবার অত পয়সা নেই একসংগে সপরিবারের জুতো কেনার। সুতরাং—

আরো লজ্জায় ফেলালে. বড় ছেলে যখন বললে, আমার বদলে তোমার হোক না মা!

তক্ষণি বড় মেয়েও একসুরে বললে, বাবা, আমার বদলে তোমার জুতো কেনো না।

কিন্তু তাছাড়া উপায়ই বা কী? এক-সংগে সব ক'টি পায়ের পরিচ্ছদ শুভেন্দুর সাধ্যাতীত। মনে মনে অনেকবার শুভেন্দু হিসেব ক'রেছে, বকেয়া মাগগি ভাতার কটা টাকা আর সংসার খরচের দুদশ টাকা এই তো তার পুঁজি! শস্তা দোকান হলে হয়তো হয়, কিন্তু এসবখানে কিছুতে নয়।

অব আশ্চর্য, রাজি হবে না হবে ক'রে সেই বড় দুটি ছেলে-মেয়ের বদলে শুভেন্দু মালতী নিজেদের জন্যে জুতো কিনে ফেললে। নতুন জুতো পায়ে দেওয়ার লোভে সব লজ্জা, সব দুঃখ, সব বিবেচনা যেন কোথায় ভেসে গেল। নির্লজ্জের মত জুতো-জোড়া পায়ে চমৎকার মানান নিয়ে স্বচ্ছন্দে অলাপও করলে। নতুন জুতোর জন্যে মানুষ বুঝি চরম স্বার্থপর হতে পারে! স্নেহ, মায়া, মমতা বুঝি কিছুই নয়!

সেই গন্ধটা যেন এখানেও আছে, নাকি সংগে সংগে এসেছে? মালতী উঠে আলো জেলে দেখলে। না, ঘরে নতুন কিছু নেই, সেই পুরনো বিবর্ণ ঘর পা-মোড়া, হাত-মোড়া কুকুর-কুন্ডলীর মত!

না, ভুল হবার নয়, সেই গন্ধ হুবহু! বার বার নিশ্বাস নিয়ে মালতী পরখ করলে। কিন্তু তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সংগে এমন করে গন্ধটা জড়িয়ে আছে কেন? জুতোর দোকানে যে জামা-কাপড় পরে গিয়েছিল সেগুলো তো কখন সে ছেড়ে ফেলেছে! পা-হাত-পাও তো ধুয়ে ফেলেছে বাড়ী আসার সংগে সংগে। তাহ'লে? তবে কেন এমনিভাবে জবালাতন হচ্ছে, কিছুতে ঘুমুতে পারছে না? গন্ধের মাদকতা নয়, কেমন যেন বিরক্তিকর গন্ধটা! সেই থেকে—

শুভেন্দু যেন কি, মাঝে মাঝে এমন কান্ড করে বসে. যেন কত বড়লোক, কত বড়-মানুষী যেন সে করতে পারে ইচ্ছে করলে। কি দরকার ছিল জুতো কিনতে একেবারে অতদূরে ঠেলে যাবার? আর গিয়েছিল বলেই এমনি একটা কান্ড করতে হবে! পাড়ার দোকান হ'লে সবারই পায়ে জুতো উঠতো! ছি, ছি, ছেলেমেয়ের জুতো না কিনে নিজেদের জন্যে জুতো কিনে আনলে? বড়-মানষী না ছাই! স্বার্থপর! বড় রাগ হয় শুভেন্দুর ওপর। লোকটা একেবারে অবিবেচক, ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত ক'রে নিজের ভাল-খাওয়া ভাল-পরার লোভ ষোল আনা! অনেকবার মালতী আপত্তি করেছিল, না না, ওরা বললেই অমনি হ'লো নাকি! ছেলেমানুষ ওদের কথার কি মূল্য আছে?

এমনিতে ছেলেমেয়ের কোন কথাই শুভেন্দু শোনে না, আজ কেমন শুনলে! নির্লজ্জ!

না, ভুল করেছে মালতী, বড়-ছেলের পায়ের জুতোর বদলে নিজের পায়ে জুতো দিয়েছে। মুখে বললেও মালতী ঠিক জানে জুতো না-নেওয়ার ইচ্ছে ওদের মুখের কথা! নিজের ছেলেবেলার কথা কি মালতী ভুলে গেছে? তার বাবা-মা'ও তো এমনি ভাঙচুর ক'রে তার ভাইবোনদের জামা-কাপড় জুতোর ব্যবস্থা করতেন। একসংগে সব জিনিষ সবার কখনো হ'তো না। কত কান্না কত অভিমান, কত মনোকষ্ট যে হ'তো তখন! রেবা-মন্টু যতই বলুক, পরে নেব, এখন না, মালতী জানে ওরা মনে খুবই কষ্ট পেয়েছে যখন সত্যিই ওদের জুতো হয়নি। না, এ জুতো কখনো মালতী ওদের সামনে পরতে পারবে না, মরে গেলেও না! ছেলে-মেয়েকে বঞ্চিত করে—

হঠাৎ মালতীর চোখটা আটকে যায়, একি তার জুতোর বাক্সটা রেবা নিজের মাথার কাছে নিয়ে শুয়েছে কেন? জুতো, জুতোর জায়গায় না রেখে বিছানার মধ্যে এনেছে কেন? জুতো না হওয়ার শোক—

মালতীর চোখ ফেটে বুঝি জল বেরিয়ে আসে। ইচ্ছে করে জুতোর বাক্সটা ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বুঝতে পারে গন্ধটা এতক্ষণ এই জন্যে নাকের কাছে ঘুর-ঘুর ক'রছে।......

শুভেন্দুরেও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল! মালতীর আলো নেবানর শব্দে সে জেগে উঠলো। আজকাল, অবশ্য চোখে ঘুম আসা বা ঘুম ছুটে যাওয়ার কোন ঠিকঠিকানা নেই, তবু আজ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় শুভেন্দুর কেমন যেন শূন্য মনে হল, কেমন যেন ফাঁকা লাগল।

শুভেন্দু খাটের ওপর থেকে অস্ফুটে বললে, জেগে আছ নাকি?

হ্যাঁ কেন? কেমন যেন বিরক্তিমাখা সুর মালতীর।

[illegible] তাই জিজ্ঞেস করছি! আমিও জেগে উঠলাম! স্ত্রীর বিরক্তির কারণটা বোধহয় অসময়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ায়, শুভেন্দু ভাবলে।

কি ভেবে মালতী বললে, জাগবার কি দরকার, ঘুমোও না!

অন্ধকার ঘরে খাটের ওপর শুয়ে যেন জেগে শুভেন্দু বললে, সেকথা আমিও তোমাকে বলতে পারি—তুমি জেগে আছ কেন?

ঘুম আসছে না যে! কেমন যেন নিরুপায় কণ্ঠস্বর মালতীর। রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে গিয়ে বেচারী বড় মুশকিলে পড়েছে।

শুভেন্দু বললে, এখানে উঠে এস না।

মালতী রাজী হ'লো না, তারপর দুজনেই জেগে থাকে সারারাত ধরে! কিন্তু এখন ঘুমের ওষুধ কি, স্বামী-স্ত্রী কেউ-ই বুঝি ভাবতে পারে না। ঘুম আর আসবে না উভয়েরই জানা কথা।

সন্তানগর্বে গর্বিত শুভেন্দু বললে, ছেলে-মেয়ে দুটো কেমন চালাক হয়েছে দেখলে তো, কিছুতে নিজেদের জন্যে জুতো নিলে না! পাছে—

কথাটা কেমন শুভেন্দুর জড়িয়ে গেল, শেষ হ'লো না। মালতী কোন সাড়া করলে না। শুভেন্দু ভেবে পেলে না সে যখন মন্টু বা রেবার মত ছেলেমানুষ ছিল তখন এমনি বড় মানুষের মত স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল কিনা।

শুভেন্দু গদগদ কন্ঠে বললে, খুব বুঝদার নয়?

মালতী তেমনি নিরুত্তর।

শুভেন্দু বললে, আসছে মাসে আমি ওদের দুজনেরই জুতো কিনে দেব, একটা টাকা পাবার কথা হ'চ্ছে!

এবার মালতী বিরক্ত হল, বললে, চুপ কর দিকি, রাতদুপুরে কি বক্‌বক্‌ আরম্ভ করলে? ঘুমুতে দাও!

শুভেন্দু চুপ করে গেল, হায় কে কাকে ঘুমুতে দেবে! মালতী কি মনে করেছে শুভেন্দু জানে না আজ রাত দুপুরে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণ কি! নিশ্চয়ই জানে।

তারপর অনেক কথা শুভেন্দুর মনে হল। বার বার নিজেকে কেমন যেন কুণ্ঠিত, পরাজিত মনে হল। শেষপর্যন্ত ছেলে-মেয়েরাও তার অবস্থার কথা বুঝে ফেলেছে! তাকে দয়া করেছে! এতদিন মালতী করতো, এবার ছেলেমেয়েরাও—

হঠাৎ হাতটা যেন অসাড় হয়ে গেল। মন্টুর মাথায় হাত দিতে গিয়ে হাতটা যেন আর কিছুতে লাগল। বেশ জোরে। তারপর স্পর্শ করে শুভেন্দু বুঝতে পারে তার জুতোর বাক্‌সটা মাথার কাছে নিয়ে মন্টু শুয়েছে, যেন জুতোজোড়াটা তারই জন্যে কেনা হ'য়েছে! অমন বুদ্ধিমান, বুঝদার ছেলে কেমন অবোধ হ'য়ে গেছে। শুভেন্দুর ভারি কষ্ট হ'লো, জুতোর বাক্‌সটা তুলে সরিয়ে রাখলে—না, এ নির্বুদ্ধিতা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ঘোরেও হওয়া উচিত নয়!

মাথার কাছে নতুন জুতো নিয়ে ঘুমিয়ে থাকার অভিজ্ঞতা শুভেন্দুর আছে। ছোট-বেলায় তারা নতুন জুতো পেয়ে বড় সমাদরে মাথার কাছে, বুকের কাছে ধরে রাখতো, ক'দিন যেন জুতোঅন্ত প্রাণ হ'য়ে যেত। নতুন জুতোর গন্ধ বড় ভাল লাগতো। গুরু-জনরা হাসাহাসি করতেন।

কিন্তু সে নিজের জুতো. বাবা-কাকার জুতো নিয়ে কখনো মাথার কাছে রেখে ঘুমোয়নি শুভেন্দু! অত বোকা শুভেন্দু ছিল না। শুভেন্দু মালতীকে কথাটা বললে, তোমার ছেলের কান্ড দেখেছ, কখন আমার জুতোটা মাথার কাছে নিয়ে শুয়েছে!

মালতীর সাড়া পাওয়া গেল না। সে দেখা তার অনেক আগেই হয়ে গেছে। রেবাও ঐ কান্ড করেছে।

শুভেন্দু বললে, আমরাও ছেলেবেলায় অমনি নতুন জুতো মাথার কাছে নিয়ে শুতুম, পাছে কেউ নিয়ে নেয়। কি মায়া ছিল নতুন জুতোর ওপর!

মালতী অস্ফুটে বললে, ওদেরও ওই ভয় বোধহয়!

দুজনে দুজনকে দেখে অবাক হয়ে গেল। মালতী ঢুকছিল, শুভেন্দু বেরুচ্ছিল। সেই জুতোর দোকান, কিন্তু সময়টা ভিন্ন।

শুভেন্দু জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার! তুমি এখানে?

কি বলবে যেন ভাবতে না পেরে মালতী বললে, জুতোটা বড় পায়ে লাগছিল। তাই—

তাই কি, বদলাতে এসেছ? ঠান্ডাঘরের বাইরেটা বড় গরম।

না, ফেরৎ দেব! বেশ সপ্রতিভ যেন মালতীর কন্ঠস্বর এবার।

তার মানে! ওরা কোন জিনিষ একবার বিক্রী হ'লে আর ফেরৎ নেয় না! শুভেন্দু বললে।

মালতী বললে, না নিলে বদলে রেবার জন্যে জুতো কিনে নিয়ে যাব। তুমি যা ক'রেছ আমিও তাই ক'রবো!

ধরা পড়ে শুভেন্দু হেসে বললে, কে বললে আমি বদলে মন্টুর জন্যে জুতো নিয়েছি? দেখবে? এই দেখ—

মালতীর অত দেখবার সময় নেই, সে তাড়াতাড়ি জুতোর দোকানে ঢুকে গেল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কোর্ট-কাছারি

আমেরিকার যত পাবলিক স্কুল আছে তার প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বাইবেলের কয়েকটি স্তবক প্রতিদিন আবৃত্তি করিয়ে তবে সে-দিনের পাঠ সুরু হত। ১৯৬৩-র গ্রীষ্মের ছুটির পর আবার যখন স্কুল খুলে গেল তখন থেকে বাইবেলের অংশ পাঠ বন্ধ হয়ে গেল। পাবলিক স্কুলের কোনো কোনো অধ্যক্ষ ছাত্রদের কাছে এই বিস্ময়কর পরিবর্তনের হেতু বর্ণনা করেছিলেন। কারণটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই বছর জুন মাসেই সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত করেছেন যে এইভাবে বাইবেল থেকে আবৃত্তি করাটা গঠনতন্ত্র বিরোধী, সুতরাং বে-আইনী। তাই একটা প্রাচীন প্রথার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পত্তি ঘটল। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট এইভাবে ইনকাম ট্যাক্স আইনকে বে-আইনী ঘোষণা করেছেন। কারণ সে আইন গঠনতন্ত্র বিরোধী।

অবশ্য মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট তার বিশিষ্টতার জন্য যেমন মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তেমনই পৃথিবীর অন্য দেশেও সুপ্রীম কোর্টগুলি একটা বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বয়স তেমন বেশী না হলেও ইতিমধ্যেই অসামান্য মর্যাদার অধিকারী হয়েছে।

আমেরিকার গঠনতন্ত্র যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা সবাই প্রায় বিশিষ্ট আইনজ্ঞ কিন্তু সেই গঠনতন্ত্রে সুপ্রীম কোর্টকে কিঞ্চিৎ অবহেলা করা হয়েছিল, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৭৮৯ সালের জুডিসিয়ারী অ্যাক্ট দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণতন্ত্রের আইন-সংক্রান্ত গঠন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হল এবং দীর্ঘকালের ব্যবধানে তার অনেক খুঁটি-নাটি এবং বহুবিষয়ক পরিচ্ছেদ বেড়ে উঠলেও মৌলিক প্রকৃতি ঠিক আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই সুপ্রীম কোর্ট দীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে নিন্দিত হয়েছে। কেউ বলেছে যে, এই আদালত ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার যন্ত্র মাত্র, আবার অন্যপক্ষ বলেছে যে সুপ্রীম কোর্ট কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্রের একটা হাতিয়ার। যুক্তরাষ্ট্রের বিধানমণ্ডলীর অধিবেশনের মধ্যে এমন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি যেখানে সুপ্রীম কোর্টকে নিন্দা না করা হয়েছে। একাধিক বিচারককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করবার দাবী জানানো হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে।

কনস্টিটিউশন্যাল লইয়ার বা সাংগঠনিক আইনবিদ হিসাবে মার্কিন ব্যবহারজীবী লিও ফেফারের প্রচণ্ড খ্যাতি। ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আমেরিকায় রাষ্ট্র বনাম চার্চ সংক্রান্ত বিরোধে তিনি একজন অধিকারী-ব্যক্তি। সুপ্রীম কোর্টের এই আইনবিদ এবং সুলেখক লিও ফেফার লিখেছেন "দিস অনারেবল কোর্ট"—মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। আদালত মানুষের অধিকার, আচার-রীতিনীতি প্রভৃতির রক্ষক। তাই আদালতের ইতিহাস এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর মতই মনোরম।

ভারতবর্ষের গঠনতন্ত্রের অনেকখানি মার্কিন সংগঠনের অনুসারে রচিত। তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজনে লিও ফেফারের আইন আদালত সংক্রান্ত এই গ্রন্থটি শুধু যাঁরা আইন অভিজ্ঞ তাঁরা নন, আইন সম্পর্কে যাঁদের আগ্রহ আছে এবং সমসাময়িক কালের স্বাধীন জগতে আইন কিভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এই বিষয়ে যাঁদের জ্ঞানার্জনের বাসনা আছে—'দিস অনারেবল কোর্ট' তাঁদের কাছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিচারপতি হলেন জন মার্শাল। তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ীর সন্তান এবং ওয়াশিংটনের মনোনীত। তিনি অবশ্য বিচারপতি হতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। কিন্তু জন মার্শাল চীফ জাস্টিস হতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিয়োগের কাহিনী একরকম ভাগ্যের ব্যাপার। তিনি সুপ্রীম-কোর্টকে যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মার্শাল চৌত্রিশ বছর বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আদালতের অনেক বিস্ময়কর সংস্কার তাঁর চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। আদালতের অর্ধেকের ওপর সিদ্ধান্ত মার্শালের নিজের রচনা। আদালতের যখন শৈশব সেই গঠনের প্রথম যুগে মার্শাল অতিশয় দৃঢ়তার সঙ্গে আদালতের তরফ থেকে কথা বলে তাকে শক্তি ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মার্শাল পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে তেমন সতর্ক ছিলেন না। তাঁর পোষাকের দৈন্য ঢাকার জন্য বিচারশালার পোষাক তিনি বাধ্য হয়ে বেশীক্ষণ পরতেন। রিচমণ্ডের এক বাজারে তিনি ঘুরছিলেন, এক ভদ্রলোক তাঁকে চিনতে না পেরে মুটে মনে করে একটি টার্কী (মুরগী জাতীয় পাখী) কিনে সামান্য পয়সা দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে বললেন। জন মার্শাল, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাসটিস, হাতে সেই টার্কী পাখি ঝুলিয়ে তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত মনিবের পিছনে চললেন। আমাদের দেশের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পর্কে প্রচলিত এই-জাতীয় কাহিনীটি এই সূত্রে মনে পড়ে। মার্শালের সরল মনোভংগী তাঁর সহযোগী-

দের সংগে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ইতিহাসে একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল—যখন উইলিয়াম র‍্যানডলফ হার্স্ট স্পেনের সংগে যুদ্ধ ঘোষণা করেন সেই সময়ে।

এই সময় এমন কতকগুলি সমস্যা দেখা দেয় যা কল্পনাতীত ছিল। তার মধ্যে একটি হল থিয়োডোর রুজভেল্টের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া, আরেকটি হল আমেরিকা কর্তৃক উপনিবেশ অধিকার। এই দুই প্রশ্নে আমেরিকার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, ফলে দুটি সমস্যাই বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠল। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট চঞ্চল হয়ে ওঠে। দেশে উপনিবেশবাদ এবং আদালতের মর্যাদা রক্ষাই সর্বপ্রধান বিচার্য হয়ে দাঁড়ায়।

মার্কিনরা প্রথম গুলী ছোঁড়ার সময় শপথ নিয়ে বলেছিলেন কোনো উপনিবেশ বিজয়ের বাসনা নেই। স্পেনীয় অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে কিউবার, পিউয়েরতো রিকোর এবং পরে ফিলিপিনের জনগণকে ত্রাণ করাই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল। ম্যাক কিনলে বললেন :

"Forcible annexation can not be thought of. That by our code of morality, would be criminal aggression."

অর্থ না থাকলে তাকে অস্বীকার করা সহজ, যার টাকা নেই সে ত' তালুক লিখে দিতে পারে, কিন্তু যার আছে। ১৯০০ খৃস্টাব্দের নির্বাচনে রিপাবলিক্যানরা আওয়াজ তুলল—"ম্যানিফেস্ট ডেসর্টিন—ডোণ্ট হল ডাউন দি ফ্ল্যাগ।"

কিউবা, পিউয়েরতো রিকো এবং ফিলিপিনকে যুক্তরাষ্ট্রে সংযুক্ত করা এক ব্যাপার—কিন্তু গোল বাঁধল অন্যদিকে। কিউবার চিনি বিনা ডিউটিতে দেশে আনতে হবে, সেটা সুগার ট্রাস্টের স্বার্থের পরিপন্থী। সুপ্রীম কোর্ট শেষপর্যন্ত এই বিভ্রান্তির পরিস্থিতির একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।

এই গ্রন্থটির 'রক্তহীন বিপ্লব' নামক অধ্যায়'টি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। নীয়ার বনাম মিনেসোটা মামলায় বিচারপতি হিউজেস প্রকাশভঙ্গীর স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা যুগান্তকারি সিদ্ধান্ত দান করেন। সংবাদপত্রে একটি আইনের বিশেষ সমালোচনা হচ্ছিল, তার নামকরণ করা হয়েছিল 'নিউজ পেপার গ্যাগ ল'। এই আইনের দ্বারা আদালত বিবেচনা করলে অশ্লীল, কলঙ্ক-কাহিনী, এবং মানহানিসূচক রচনা সম্বলিত সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের প্রকাশ বন্ধ করতে পারেন। 'মিনাপোলিসের' 'দি স্যাটারডে প্রেস' নামক একটি পত্রিকায় পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল যে একজন ইহুদী গুণ্ডা সমস্ত জুয়ার আড্ডা চোরাই মদের আড্ডা, এবং ফাটকাবাজির আড্ডা নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রধান সরকারি কর্মচারী, পুলিশের কর্তা, পাবলিক প্রসিকিউটার প্রভৃতি সবাই ঘুষ প্রভাবে তাঁদের কর্তব্যকর্মে অবহেলা করছেন। পাবলিক প্রসিকিউটার "গ্যাগ ল" প্রয়োগ করে পত্রিকাটিকে দমন করার আদেশ প্রার্থনা করে সফল হলেন। বিচারে বলা হল গত দু' মাসের সমস্ত জোগাড় করে ধ্বংস করা হোক, এবং পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হল। সুপ্রীম কোর্ট কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নাকচ করলেন, এবং অভিমত দিলেন যে, এই আইন সংবিধান-বিরোধী। কদাচিৎ, যুদ্ধের সময় যখন সরকার জাহাজ চলাচল সংবাদ গোপন রাখতে চান, তখন কোনো সংবাদ প্রকাশ করলে তা অপরাধ হতে পারে, নইলে ফ্রীডম অব দি প্রেস সম্পর্কে সংগঠনে যে গ্যারাণ্টি দেওয়া আছে তার দ্বারা সংবাদপত্রের উপর কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা চলে না। মানহানি-সূচক কোনো প্রবন্ধ ছাপা হলে রাষ্ট্র তখন ক্রিমিন্যাল লাইবেল ল' প্রয়োগ করতে পারেন।

আর একটি মামলার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের শ্রম-সংক্রান্ত বিরোধের সংগে এই মামলার তুলনা করা যায়। ১৯৩৪-এ কংগ্রেসে একটি রেলরোড রিটায়ারমেণ্ট অ্যাক্ট পাশ হয়। অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীদের পেনসন দান করা এই আইনের উদ্দেশ্য। একটা বাধ্যতামূলক বীমার দ্বারা এই ব্যবস্থা চালু রাখা হয় এবং চাকুরীর মোট কালসীমার পরিমাপে পেনসন দান করা হয়। মিঃ রবার্টস পাঁচ-চার এই সংখ্যাধিক্যে রায় দিলেন রেলরোডের কর্মীদের এইভাবে বাধ্যতামূলক পেনসন দানের ব্যবস্থাকে আইনসিদ্ধ করার অধিকার কংগ্রেসের নেই। মিঃ হিউজেস এবং তার আর তিনজন সহকর্মী যাঁরা রবার্টসের মত সমর্থন করেননি, তাঁরা অত্যন্ত কড়া নোট দিলেন। রবার্টস লিখেছিলেন—

"The fundamental consideration which supports this type of legislation is that industry should take care of its human wastage, whether that is due to accident or age."

১৯৩৫-এর ৬ই মে সুপ্রীম কোর্ট রেলরোড রিটায়ারমেণ্ট কেসে তাঁদের অভিমত দান করেন। আইনের কলেজে শাদা-কালো ছাত্র নিয়ে যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট অভিমত দিয়েছেন—

"The racial segregation in law schools is by its very nature inequalty."

এবং এই সিদ্ধান্ত শুধু ল' স্কুল বা কলেজ নয় অন্যত্রও সমভাবে প্রযোজ্য। বর্ণ-বৈষম্য সম্পর্কে অনেকগুলি চমকপ্রদ মামলার উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস হিসাবে এই গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

—অভয়ঙ্কর

THIS HONORABLE COURT:— By Leo Pfeffer: Published by — Academic International: Calcutta-9. Price Rupees Ten only.

ভারতীয় সাহিত্য

তারাশঙ্করের সম্মান লাভ ॥

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়। গত ২৪ আগস্ট শনিবার মহাজাতি সদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এই বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। সাহিত্যরসিক মাত্রেই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নতুন সম্মানলাভে খুশি হবেন।

পরলোকে ডঃ রাধাকমল মুখার্জী ॥

গত ২৩ আগস্ট বিকেল ৪টা ২৫ মিনিটের সময় উত্তর প্রদেশের লখনৌ শহরে ডঃ রাধাকমল মুখার্জি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। উত্তরপ্রদেশ ললিতকলা আকাদমির এক সভায় পৌরোহিত্য করবার সময় তিনি হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে যান। সংগে সংগেই চিকিৎসক ডাকা হয়। চিকিৎসক এসেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ডঃ রাধাকমল মুখার্জির মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূর্ণ হবার নয়। বাংলার বাইরে যে সকল বাঙালী নিরলস সাধনায় বাংলার গৌরব উজ্জ্বল করেছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজনীতির অধ্যাপকরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রবীন্দ্র পরিষদে'র সংগেও তিনি গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারত এবং ভারতের বাইরেও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ পেয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করেন। সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং সাহিত্য বিষয়ে প্রায় চল্লিশখানির উপর তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম জীবনে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অধ্যাপনা করেন। এক সময়ে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি উপাচার্য ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি উত্তরপ্রদেশ ললিতকলা আকাদমির সভাপতিরূপে কাজ করেন। আমরা তাঁর লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশ্যে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সাম্প্রতিক তেলুগু উপন্যাস ॥

উপন্যাস প্রায় প্রতিটি ভারতীয় ভাষায় খুব বেশি প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি উপন্যাস স্থায়িত্ব লাভ করে। তেলুগু উপন্যাসের গত বছরের ইতিহাসটিও

প্রায় অনুরূপ। প্রায় শতাধিক উপন্যাস এই বছরে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র কয়েকটি উপন্যাসই যে স্থায়িত্ব লাভ করবে, সে বিষয়ে বোধ করি অনেকেই একমত হবেন।

উল্লেখ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথমেই শ্রীউন্নাভা লক্ষ্মীনারায়ণ রচিত 'মালাপল্লী' উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করতে হয়। এর পরেই নাম করতে হয় শ্রীবিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের 'ভেয়ি পেদগলু' উপন্যাসটির। শ্রীসত্যনারায়ণ গত বছর যুগান্তর পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীআদিভিবাপিরাজুর 'নারায়ণ রাও', শ্রীনরি নরসিংহ শাস্ত্রীর 'রুদ্রমা দেবী', শ্রীটি গোপীচাঁদের 'আশামর্ধিনী জীবিতা যাত্রা', শ্রীজি ভি কৃষ্ণরাওয়ের 'কীলুবোমালু', শ্রীবুতচিবাবুর 'চিভরকু মিগিলেভু' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি সার্থকতার দাবী করতে পারে। এছাড়াও ইতস্তত আরো কিছু কিছু উপন্যাস লিখিত হয়েছে।

সুকান্ত জন্মোৎসব ॥

গত ১৭ আগস্ট, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ হলে উল্টাডাঙ্গা লাইব্রেরীর উদ্যোগে সুকান্ত জন্মোৎসব পালিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীনৃপতি চক্রবর্তী। সুকান্তের জীবন ও কাব্যসাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন গোলাম কুদ্দুস ও অনন্নাশঙ্কর ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সুকান্তের কবিতা থেকে আবৃত্তি এবং রাণার নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়।

ভারতে সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি ॥

গত ২৮শে আগস্ট ভারতীয় সংসদে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীকে কে শাহ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, ১৯৬৭ সালে ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৭০১টি বেড়েছে এবং প্রচার সংখ্যা বেড়েছে দু লক্ষ।

সাময়িকপত্রগুলির সংখ্যা ১৯৬৭ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২,১৬৩। এর সঙ্গে সংবাদপত্রগুলি যুক্ত হয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১,৬৭৮। ১৯৬৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ১০,৯৭৭। এই বৎসরে প্রকাশিত মোট সংবাদপত্রের সংখ্যা ১৯৬৬ সালের তুলনায় ৭-৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬২ সালের তুলনায় বৃদ্ধির হার ২৫-৯ শতাংশ।

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির প্রচার সংখ্যা সর্বোচ্চ—সাড়ে পঞ্চান্ন লক্ষ। এরপর হিন্দির—৪৯-১৯ লক্ষ তামিলের—২৪-৯ লক্ষ, মালয়ালমের—১৬-৭ লক্ষ, গুজরাটির—১৫-৩ লক্ষ, মারাঠির—১৩-৬ লক্ষ এবং বাংলার ১২-৩ লক্ষ।

শ্রীশাহের ভাষণ থেকে আরও একটি তথ্য জানা গেছে। তা হল, মহারাষ্ট্রেই [illegible] পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি উত্তরপ্রদেশে। পশ্চিমবঙ্গে সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের সংখ্যা হল ১০৫০: এছাড়াও জানা গেছে যে হিমাচল প্রদেশ, নাগাভূমি এবং পণ্ডিচেরী থেকে কোনও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় না। সংস্কৃত ভাষায় ভারতে কোনও দৈনিক নেই।

রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হিসেবে সারা ভারতে মোট ৭৬টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ৩৫টি প্রকাশ করেন। এর প্রচার সংখ্যা ৩৩ হাজার ৮৭৫। কম্যুনিস্ট পার্টি ২৯টি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এগুলির প্রচার সংখ্যা ৬৫ হাজার ৬৫১। প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল প্রকাশ করেন ৪টি। এ ছাড়াও ছোটখাট রাজনৈতিক দলগুলিও ২।১টি সংবাদপত্র প্রকাশ করে থাকেন।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যুগোশ্লাভ ভাষায় প্রবন্ধ ॥

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যুগোশ্লাভ গেজেট পত্রিকায় একটি খুবই উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে অতি সাম্প্রতিক সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধটি লিখেছেন টি কুলর্নাভিচ।

বিদেশী সাহিত্য

স্টিফান জর্জের জন্মশতবার্ষিকী ॥

অবিভক্ত জার্মানীর প্রখ্যাত কবি স্টিফান জর্জ আজ থেকে একশ বছর আগে রাইন নদীর তীরবর্তী বিনজেন-এর নিকটবর্তী বুদেশেইম-এ ১৮৬৮ সালের ১২ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান বছরে পশ্চিম জার্মানীর বহুস্থানে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, শব্দের নিপুণ ব্যবহার কবিতাকে ভিন্ন রসাস্বাদে প্রাণিত করে। একটি কবিতার প্রারম্ভিক পংক্তিতে তিনি লিখেছেন—"দি সিয়ার্স ওয়ার্ড ইজ কমন টু বাট ফিউ"—মুষ্টিমেয় যে কয়জন কবি শব্দকে স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় ব্যবহার করতে পারেন—তাঁদের মধ্যে স্টিফান জর্জের নাম জার্মানভাষী জনসাধারণের কাছে একটি পরম বিস্ময়ের মতো কাজ করে। জার্মান লিরিক কবিতার সমগ্র প্রবাহকে তিনিই প্রথম বিশিষ্ট প্রবণতায় নিয়ন্ত্রিত করেন। বলা যায়, তিনিই তার প্রবর্তক এবং পুরোহিত।

অবশ্য আজ তাঁর প্রতীক-আশ্রয়ী লিরিক কবিতাগুলি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় নয়।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন উৎসাহী পাঠকের কাছেই সেসব কবিতা অর্থপূর্ণ। স্টিফান জর্জ নিজেকে দেখেছিলেন ধ্রুপদী সাহিত্যের অধস্তন ধারক ও বাহকরূপে। তিনি নিজের সময় ও কালের দাবীকে অস্বীকার করে গ্রহণ করেছিলেন শৃংখলার কঠোর আনুগত্য এবং আঙ্গিকের প্রাধান্য, সেবা ও উৎসর্গের আদর্শ, এবং যুগের আপেক্ষিকতাবোধ। তিনি ছিলেন ধর্মীয় বন্ধন এবং সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের একজন প্রান্তবাদী পুরুষ। এই বিশ্বের প্রদর্শক ও উদ্গাতা হবার আকাঙ্ক্ষা তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের চারদিকে গড়ে তুলেছিলেন বন্ধু-বান্ধবদের একটি শক্তিশালী চক্র। তাঁদের অনেকেই ছিলেন সে সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। স্টাফেনবার্গ ১৯৪৪ সালে হিটলারের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন।

জর্জ মারা যান ১৯৩৩ সালে। কিন্তু সে মৃত্যু সুখের ছিল না। অনিবার্য কারণে তাঁকে সেই সময় সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যেতে হয়। শত্রুর ভয়ে তাঁর মৃতদেহ প্রকাশ্যে কবরস্থ করা যায়নি। কয়েকজন বন্ধু রাত্রি বেলার অন্ধকারে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

লি তা-চাও'এর জীবনী ॥

পাঠকের ক্রমপরিবর্তনশীল চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে পাশ্চাত্য প্রকাশকেরা প্রায় প্রত্যহ নিত্যনতুন বই প্রকাশ করে চলেছেন। যেমন, সস্তা উপন্যাস, পরীক্ষামূলক কাহিনী, মাতালের জীবনস্মৃতি, সং ও সাধুর জীবনকাহিনী, রাজনৈতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, হাল আমলের সিনেমা ফ্যাসান, হলিউডের উপকাহিনী, হিপ্পিদের উৎপাত, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রভৃতি। সম্প্রতি হার্বার্ড ইউনিভার্সিটি প্রকাশ করেছেন "লি তা-চাও অ্যান্ড দি অরিজিনস অব চাইনিস মার্ক্সিজম"। লেখক মরিস মিজনার।

প্রেম ও জীবনদর্শন ॥

স্বদেশে লাঞ্ছিত এবং বিদেশে নিন্দিত হলেও হিপিদের একটা ধর্মবোধ এবং নিজস্ব জীবনদর্শন আছে। প্রেমের গভীর আসক্তি তাদের কর্মপ্রেরণার উৎসমূলে বিরাজমান। যাঁরা তাদের সেই তরুণপ্রেমের উত্তাপ উপলব্ধি করতে চান, তাঁরা এই বাপে-খেদানো, মা-মরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশলেই বুঝতে পারবেন অনেক বড়ো বড়ো রথী-মহারথী পর্যন্ত কিভাবে হিপি দর্শনে অনুরক্ত হয়ে পড়ছেন।

সম্প্রতি হিপিদের সম্পর্কে তিনটি বই বেরিয়েছে। তাদের নাম—(১) উই আর দি পিপল আওয়ার পেরেন্টস ওয়ারনড আস এগেনস্ট : লেখক—হোফম্যান (২) জেরুসেলেম লাভ দি লভ জেনারেশন : সম্পাদক—লিওনার্ড উলফে (৩) দি এরোটিক অ্যাডভেঞ্চার : লেখক—স্টেটসনার। এই তিনটি বইয়ের আলোচ্য বিষয় হলো হিপি কার্যকলাপের সাম্প্রতিক অভিব্যক্তি। ভালোবাসা তাদের ধর্মসাধনার একটি বড় অঙ্গ। তারা দল বেঁধে নানা স্থানে যায়, মানুষকে জ্বালাতন করে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মরে, নোংরা ইনজেকসন থেকে তাদের সেরাম হেপাটাইটিস হয়, মাঝে মাঝে ভীষণ রকম ধ্যানে নিমগ্ন থাকে এবং নিজেরা উলঙ্গ হয়ে অপরের লজ্জার কারণ হয়ে ওঠে।

ভারতীয় লোকাচার সম্পর্কে তাদের গভীর আগ্রহ। হিপিরা স্বভাবের দিক থেকে অত্যন্ত নির্বিকার, উদাসীন এবং প্রেমপ্রবণ। উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থে তাদের সম্পর্কে প্রচুর চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন স্টিভ লেভিস নামে একজন কবি ও সম্পাদকের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বয়সের দিক থেকে খুবই তরুণ। 'অ্যাবাকল' নামে একটি কাগজ তিনি সম্পাদনা করে থাকেন। হিপিদের মতে, তিনি আবির্ভূত পুরুষ। তাঁর উপদেশ হলো : 'তুমি তোমার অচেতন সত্তায় ডুব দিয়ে দেখো সেখানে কত বিস্ময় ছড়িয়ে রয়েছে। দেখতে পাবে সেখানে মস্ত বড় একটি থাম ও তোমার ব্যক্তিত্বের মতো একটি বৃক্ষের শেকড়।'

হিপি আদর্শের একটি জীবন্ত প্রতীক হলো, পঁচিশ বছর বয়স্কা যুবতী মেয়ে সান্দ্রা। এক সময়ে তার মনে একটি বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, একটি কালো ছেলের মা হওয়া তার একান্ত কর্তব্য। তৎক্ষণাৎ সে নিউইয়র্ক থেকে একটি নিগ্রো যুবককে ধরে এনে তার মনোবাসনা পূর্ণ করে। অবশ্য আইনসম্মতভাবে সে বিবাহিতা নয়। এখন সান্দ্রা ও তার মেয়ে অন্য একজন হিপির সঙ্গে সুখেই দিন কাটাচ্ছে।

হিপি সমাজে জাতিভেদ না থাকলেও প্রকার ভেদ আছে। বই তিনটি পড়ে জানা যায়, হিপি আছে অনেক রকম। যেমন—লম্বা চুলের হিপি, বেঁটে চুলের হিপি, যোগী এবং ভণ্ড হিপি, সং ও অসং প্রভৃতি নানাপ্রকার হিপি এখন পাশ্চাত্য দুনিয়ার অনেক শহরে আসর জমিয়ে বসেছে।

কিন্তু তাদের এই মত পার্থক্যও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ আনেনি। তাহলে কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তারা পরস্পরের নিকট আত্মীয়? সেই শক্তির অপর নাম, নেশা। নানারকম অদ্ভুত ধরনের নেশায় তারা সকলেই আসক্ত। গাঁজা, ভাঙ, মদ, চন্ডু, চরস প্রভৃতি যখন যা পায়—তাই তারা একসঙ্গে বসে সেবন করে। তাছাড়া প্রেমের ব্যাপারেও তারা উদার। ভোগ্যবস্তুর সমবন্টনে তারা সর্বাধিক বিশ্বাসী। উলফ-এর মতে, একটি গভীর কর্মকাণ্ডের তারা অংশীদার এই বোধ তাদের : [illegible] ও [illegible]

নতুন বই

এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী

(কিশোর উপন্যাস)—এরিখ কাস্টনার। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

নয়েস্টাডট থেকে এমিল টিশবাইন বাচ্ছিল বার্লিনে তার দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে। এই তার প্রথম ভ্রমণ। ডানপিটে কিন্তু লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী সে। বার্লিন যাওয়ার পথে ট্রেনে আলাপ হোল মিঃ গ্রুন্ড আইসের সঙ্গে। বার্লিনে নামার আগেই এমিল দেখল তার টাকা নেই, মিঃ গ্রুন্ড আইসও নিপাত্তা। নেমে পড়ল ট্রেন থেকে। ধাওয়া করল মিঃ গ্রুন্ড আইসকে। তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। এই সময়ে আলাপ হোল গুস্টভের সঙ্গে। সে ডেকে নিয়ে এল আরো অনেক ছেলেকে। তারা একটি পরিকল্পনা রচনা করল। আর সেইমত পাহারায় রাখল মিঃ গ্রুন্ড আইসকে। গ্রুন্ড আইস তখন এক হোটেলে। হোটেল থেকে সে বেরিয়ে দেখল শতাধিক ছেলে রয়েছে তাকে ঘিরে। বিব্রত এবং হতচকিত গ্রুন্ড আইস ঢুকল এক ব্যাঙ্কে। সেখানে এক বিচিত্র উপায়ে ছেলেরা তাকে ধরে ফেলল পুলিশ এল। মিঃ গ্রুন্ড আইস যে একজন দাগী আসামী তার প্রমাণ মিলল। এমিল পেল পঞ্চাশ পাউন্ড পুরস্কার। এক দারুণ রোমাঞ্চকর কাহিনী এমিলের গোয়েন্দা কাহিনী। এই কাহিনীটি এদেশের কিশোর পাঠকদের আকৃষ্ট করবে। রঙিন ছবি, রেখাচিত্র এবং মনোরম প্রচ্ছদ গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সুন্দর অনুবাদ করেছেন শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

মহাপ্রণাম (কবিতা)—নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য। গ্রন্থালোক। ৭ অ্যান্টনী বাগান লেন, কলকাতা-৯। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দেশবরেণ্য নেতা এবং মনীষীদের নিয়ে লেখা বত্রিশটি কবিতার এই সংকলন ছোট ছেলে-মেয়েদের বেশ উপযোগী। কবিতাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিসরে চরিত্রচিত্রণ ঘটেছে সুন্দরভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ প্রসঙ্গ (জীবন ও বাণী)—অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১০।১দি শ্রীমোহন লেন, কলকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের আশ্চর্য জীবন-কথা এবং বাণী সংকলিত হয়েছে চারটি ছোট ছোট পুস্তিকায়। ধর্মপিপাসুরা এর থেকে অনেকখানি [illegible] [illegible] এবং [illegible]

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

ক্রান্তিক [শ্রাবণ ১৩৭৫]—সম্পাদক সুনীল জানা ও বলরাম বসাক। ৭৩, সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। একটাকা

ইদানীং বাংলা গল্প কবিতার ক্ষেত্রে মোড় ফেরার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সকলেই অবশ্য সংশয়ের মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। ক্রান্তিকের এ সংখ্যাটিতে শব্দ-গল্প লিখেছেন সুব্রত সেনগুপ্ত, আশিষ ঘোষ, নীরেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন। ছোট-গল্পের সঙ্গে কবিতা, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে সম্পর্ক বিষয়ে কয়েকটি আলোচনা স্থান পেয়েছে।

সংকলিকা (প্রবন্ধ সংকলন)—সম্পাদক : সঞ্জীবকুমার বসু। ১০, হেস্টিংস স্ট্রীট। কলকাতা—১। দাম দুটাকা।

পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলনের স্মারক পত্র সংকলিকা কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমাবেশে মূল্যবান হয়ে উঠেছে: সংকলনটিতে প্রবীণ সাহিত্য সেবীদের সঙ্গে একালের প্রবন্ধ স্থান পাওয়ায় স্মারক গ্রন্থটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে' শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (উপন্যাসের নতুন সংজ্ঞা নির্ণয়), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যের নবরাগিণী), আশুতোষ ভট্টাচার্য (প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ), রমা চৌধুরী (প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা) নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (সমালোচনা ও সমালোচকের আদর্শ), নারায়ণ চৌধুরী (বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভূমিকা), দক্ষিণারঞ্জন বসু (বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সুষ্ঠু ইতিহাস চাই), ভবানী মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যে শ্লীল ও অশ্লীল), উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (প্রবন্ধকারের মৌলিকতা), সঞ্জীবকুমার বসু (রামরাম বসু), দেবকুমার চক্রবর্তী (সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমন্বয় প্রত্নতত্ত্ব), সুশীল রায় (প্রবন্ধ নয়), অমলকৃষ্ণ গুপ্ত (আত্মগৌরবী প্রবন্ধ : ল্যাম ও স্মিথ), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ) হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্তমান পরিস্থিতিতে সাহিত্যিকের কর্তব্য), ভবতোষ দত্ত (ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য রচনা) এবং রমা বসু (বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ) লিখিত আলোচনাগুলি যথেষ্ট মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়।

সপ্তদ্বীপা [জুলাই ১৯৬৮]—সম্পাদক রবীন দত্ত। এ ১২৪, কঙ্করবাগ কলোনী পাটনা-১। পঞ্চাশ পয়সা।

পাটনা থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালীদের একমাত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে সপ্তদ্বীপা স্থানীয়ভাবে বিশেষ জনপ্রিয়। এ সংখ্যায় লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সন্তোষচন্দ্র সরকার, চণ্ডী মুখোপাধ্যায়, দাশরথি সেনগুপ্ত, জীবন সরকার, দিলীপকুমার মিত্র, গুণচরণ সামন্ত ও রবীন দত্ত।

পঞ্চতন্ত্র [প্রথম সংকলন]—সম্পাদক উৎপল দাশগুপ্ত। ১০।১, চক্রবেড়িয়া রোড, কলকাতা-২৫। একটাকা।

পঞ্চতন্ত্র গল্প ও গল্পবিষয়ক আলোচনায় নতুন ত্রৈমাসিক। মূলতঃ তরুণতর গল্পকাররাই পত্রিকারটির উদ্যোক্তা ও লেখক। বয়স্কদের মধ্যে কমলকুমার মজুমদারের বিখ্যাত গল্প 'মল্লিকাবাহার' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। দুটো আলোচনা লিখেছেন সুবিনয় মুস্তফী এবং কৌশিকী লাহিড়ী।

কণ্ঠস্বর [প্রমথ চৌধুরী সংখ্যা]—সম্পাদক সত্য বন্দবাস। ৪৯।এল।৭, নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলকাতা-১১। পঁচিশ পয়সা।

সংবাদ সাময়িকীর আকারে প্রকাশিত কণ্ঠস্বরের এ সংখ্যায় কয়েকজন তরুণ কবি কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে দুটো আলোচনা লিখেছেন দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী ও জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কেয়াপাতার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

[উপন্যাস]

আগের ঘটনা

[ঊনিশ শ চল্লিশের অক্টোবর। কলকাতার ছেলে বিনু দুই দিদি আর মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে পূর্ববাঙলার রাজদিয়ার দাদু হেমনাথের বাড়িতে। বিশ বছর বাদে বিনুর মা সুরমা এলেন রাজদিয়ায়। আশ্চর্য মানুষ এই হেমনাথ। গ্রামের নানান ঝামেলা তাঁর মাথায়।

সবে এসেছেন সুরমারা। গল্পগুজব শুরু হল। হেমনাথও শরিক। এমন সময় কেতুপুরের বাবার ডাক এলো। কেতুপুরের মজিদ মিঞার সঙ্গে চরবেহুলার নবু গাজীর দাঙ্গার ফয়সালা করতে উঠে পড়লেন হেমনাথ। বারো বছরের বিনুরও ইচ্ছে সে যায় দাদুর সঙ্গে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। তিন ।।

হেমনাথদের নৌকো ধান বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলে স্নেহলতা বললেন, 'ঘরে এসো মানিকেরা—' বলে পা বাড়িয়ে দিলেন।

স্নেহলতার পিছু পিছু সবাই সামনের পুবদুয়ারী বড় ঘরখানায় এল। ঘাড় ফিরিয়ে বিনু একবার দেখে নিল হিরণ যুগল আর করিম ফীটন থেকে মালপত্র নামিয়ে ওদিকের একটা ঘরে নিয়ে রাখছে।

স্নেহলতার গলা আবার শোনা গেল, 'এখন আর কোন কথা না। উঠোনে জল দেওয়া আছে। হাত-পা ধুয়ে আগে কিছু খেয়ে নাও। ধনেদের মুখ খিদেয় একেবারে শুকিয়ে গেছে।

খানিক আগে আরেকবার 'ধন' বলেছিলেন স্নেহলতা, এবারও বললেন। কথায় কথায় ঐ শব্দটা বলা বোধহয় তাঁর অভ্যাস। ফিক করে বিনু হেসে ফেলল।

হাসিটা কানে গিয়েছিল। স্নেহলতা শুধোলেন, 'হাসলে যে দাদা!'

বিনু লজ্জা পেয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

সুরমা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, তুমি 'ধন' বলেছ মামী, সেই জন্যে।

স্নেহলতা সস্নেহে হাসলেন। বললেন, 'শুধু ধন নাকি, আরো কত কি বলি শুনবে না। তখন কত হাসতে পারো, দেখব।'

যাই হোক, একটু পর হাত-মুখ ধুয়ে এসে সবাই খেতে বসল। অবনীমোহন, সুধা, সুনীতি, বিনু, সেই পুতুল পুতুল মেয়েটা—ঝিনুক। ফীটন থেকে বাক্স-টাক্স তোলা হয়ে গিয়েছিল। হিরণকেও ডেকে এনে বসিয়ে দিলেন স্নেহলতা। সুরমা অবশ্য বসলেন না।

অবনীমোহন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সকাল থেকে কিছুই তো খাও নি; তুমিও বসে পড়।'

কলকাতায় স্বামী এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেতে বসে যান সুরমা। খাবার-দাবার মাঝখানে সাজানো থাকে। দরকার মতন সবাই চামচে করে তুলে নেয়। কলকাতার রীতি আলাদা। কিন্তু এখানে কেউ কিছু ভাবতে পারে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে এই ছোট্ট রক্ষণশীল জগতে স্বামীর সঙ্গে খেতে বসা নিন্দনীয়।

অবনীমোহন যে এভাবে ডেকে বসবেন, সুরমার পক্ষে তা ছিল অভাবনীয়। তিনি লজ্জা পেয়ে গেলেন।

স্নেহলতাও বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুই বসে পড়।'

মৃদু স্বরে সুরমা বললেন, 'আমি পরে খাব'খন।'

অবনীমোহন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'পরে-টরে না। অসুস্থ শরীর, ডাক্তার না তোমায় বলে দিয়েছে সকালবেলা সাতটার ভেতর খেয়ে নিতে। অনিয়ম করলে—'

বিব্রত সুরমা চাপা গলায় ধমক দিলেন, 'আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তুমি খেয়ে নাও তো।'

অবনীমোহন আর কিছু বললেন না।

স্নেহলতা এবং শিবানী ফুলকাটা কাঁসার থালায় পাতলা চিড়ে, মুচ্ছি গুড় আর পাতক্ষীর সাজিয়ে সবাইকে দিতে লাগলেন। বড় বড় জামবাটি ভর্তি করে ঘন আটালো দুধও দিলেন।

খেতে খেতে হঠাৎ হিরণ বলল, 'কি ঠাকুমা, ঠকাবার মতলব নাকি?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন স্নেহলতা, 'ঠকাব!'

'হু'—হিরণ ঘাড় কাত করল, 'গাড়ি থেকে রসগোল্লার হাঁড়ি আর কলার কাঁদি নামিয়ে তোমার হাতে দিলাম না? সে সব কোথায়?'

'তাই তো'—তাড়াতাড়ি জিভ কেটে স্নেহলতা উঠে পড়লেন। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ওধারের কোন একটা ঘর থেকে রসগোল্লা আর কলা নিয়ে এসে সবার পাতে পাতে দিতে লাগলেন।

বড়দের চারটে করে রসগোল্লা আর দুটো করে কলা দিয়েছেন স্নেহলতা। বিনুকে দিয়েছেন দুটো রসগোল্লা আর একটা কলা। ঝিনুকের ভাগে পড়েছে আরো কম—কলা আধখানা, রসগোল্লা একটা।

বিনুর ঠিক পাশেই ঝিনুক খেতে বসেছিল। আড়ে আড়ে একবার বিনুর পাতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল সে, আমি আধখানা কলা খাব না, একটা রসগোল্লা খাব না।'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'কটা খাবি?'

'গোটা কলা খাব, দুটো রসগোল্লা খাব—'

'তোর পেট ভাল না ঝিনুক, সহ্য করতে পারবি না। নিজেও কষ্ট পাবি, আমাকেও জ্বালিয়ে মারবি।'

হাত-পা ছোঁড়া থামায় নি ঝিনুক। ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে বলতে লাগল, 'ওকে কেন দিলে তা হলে? কেন দিলে ওকে?'

স্নেহলতা অবাক, 'কাকে রে, কাকে?'

আঙুল দিয়ে বিনুকে দেখিয়ে দিল ঝিনুক, 'ওকে।'

'পেট ভর্তি তোমার বিষ; ছেলেটা বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই হিংসে আরম্ভ করে দিয়েছ?'

সুরমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'দাও মামী, ঝিনুক যা চাইছে দাও—'

স্নেহলতা বললেন, 'তুই কি ওকে মেরে ফেলতে বলিস রমু!'

'তার মানে!'

'পরশু দিন ওর বাপ এখানে দিয়ে গেছে। আসা থেকে খালি খাচ্ছেই, খাচ্ছেই। কাল সারারাত পেটের ব্যথায় [illegible] পারে নি; আমাদের ঘুমোতে দ্যায় নি।

খাওয়ার একটু টান না দিলে—বুঝলি না পরের দায়িত্ব—'

সন্দেহ সুরে সুরমা বললেন, 'ছেলে-মানুষ, বায়না করছে। এখন তো নাও পরে না হয় দিও না।'

কি আর করা; ঝিনুকের দাবী অনুযায়ী রসগোল্লা আর কলা তার পাতে তুলে দিতে হল।

একটু নীরবতা।

হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে সুরমা বললেন, 'আচ্ছা মামী—'

'কী বলছিস?' মুখ ফিরিয়ে স্নেহলতা সাড়া দিলেন।

'ঝিনুকের বাবা ওকে তোমার কাছে দিয়ে গেছে, বললে না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ওর মাকে নিয়ে ওর বাপ ঢাকায় গেছে।'

'ঢাকায় কী?'

'ঝিনুকের মামাবাড়ি'

সুরমা অবাক। বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'মামাবাড়িতে গেল, মেয়েটাকে নিয়ে গেল না?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন স্নেহলতা। বিষণ্ণ সুরে বললেন, 'না।'

'কেন?'

কি যেন ভর করে বসল স্নেহলতার ওপর। নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝি বা ফিস-ফিসিয়ে বললেন, 'ওর বাপ চিরকালের মতন ওর মাকে রেখে আসতে গেছে।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ, বড় অশান্তি হচ্ছিল বাড়িতে। তার চাইতে ভাল হয়েছে—'

অবনীমোহন, সুধা, সুনীতি—সবাই চকিত হয়ে ঝিনুকের দিকে তাকাল। যে মেয়ে খাওয়া নিয়ে এত বায়না করছিল, এখন আর সে খাচ্ছে না। ঝিনুকের চোখের তারা স্থির; টল টল করছে। নিষ্পলক সে স্নেহলতার দিকে তাকিয়ে আছে। ছোট্ট মুখটার পাতলা ঠোঁট দুটো থর থর করছে।

সুরমা বললেন, 'তোমার কাছে যে রেখে গেছে, ওদের বাড়িতে আর কেউ নেই?'

'না। কাকা জ্যাঠা ঠাকুমা ঠাকুর্দা, কেউ বলতে কেউ না। থাকার ভেতর বাপ-মা আর ঐ একটা মেয়ে। তাও—'

এই সময় হিরণ ডেকে উঠল, 'ঠাকুমা—'

হিরণের স্বরে এমন এক তরঙ্গ ছিল, স্নেহলতা চমকে উঠলেন।

খুব আস্তে হিরণ আবার বলল, 'ঝিনুকের সামনে এ সব কথা বল কেন? বুঝবার মতন বয়েস ওর হয়েছে। মুখ-চোখের চেহারা দেখেছ মেয়েটার?'

চকিতে একবার ঝিনুককে দেখে নিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'আমারই অন্যায় হয়ে গেছে। থাক, ওসব কথা থাক—'

সবার চোখ ঝিনুকের দিকে। বিনুও তাকে দেখছিল। দেখতে দেখতে দাদুর কথাগুলো মনে পড়ছিল। স্টিমারঘাটে দাদু বলেছিলেন, ঝিনুক খুব দুঃখী।

যাই হোক, এরপর আর কোন কথা হল না। এক সময় নিঃশব্দে খাওয়ার পাট চুকল।

পুবের দিকের সেই প্রকাণ্ড বড় ঘরখানায় একেবারে তক্তপোষ পাতা। ইতস্তত দু-চারখানা চেয়ারও ছড়িয়ে আছে। খাওয়া-দাওয়ার পর অবনীমোহন সুধা আর হিরণ এখানেই আসর বসালেন। সুনীতি আর সুরমা স্নেহলতা শিবানীর সঙ্গে ভেতর দিকে রান্নাঘরে চলে গেলেন। ঝিনুকও তাঁদের সঙ্গে গেল। সুরমা এখনও খান নি; রান্নাঘরে মামী আর মাসির সঙ্গে কথা বলতে বলতে খাবেন। বিনু হিরণদের কাছেই থেকে গেল।

অবনীমোহন, সুধা আর হিরণ গল্প জুড়ে দিলেন। নিমেষে মশগুলও হয়ে গেলেন। অবনীমোহন আর সুধা পূর্ব-বাঙলার এই ভূখণ্ডটি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছে। বিপুল উৎসাহে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে হিরণ।

কিছুক্ষণ বসে বসে তাদের কথা শুনল বিনু; তারপর দূরমনস্কের মতন জানালার বাইরে তাকাল। এখান থেকে আদিগন্ত সেই ধানবন চোখে পড়ছে আর দেখা যাচ্ছে আশ্বিনের টলোমলো অথৈ অগাধ জল। আকাশের একটি টুকরোও দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। সারা বর্ষা বৃষ্টিতে ধুয়ে ধুয়ে আকাশ এখন আশ্চর্য নীল; সেখানে ভারহীন সাদা মেঘেরা ভেলা ভাসিয়ে রেখেছে। দূর আকাশ, অফুরন্ত জল আর শরতের মেঘদল যেন অবিরাম হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে।

আড়ে আড়ে একবার হিরণদের আসরটা দেখে নিল বিনু; সবাই মশগুল হয়ে আছে। সুযোগটা হাতছাড়া করা সমীচীন নয়; পায়ে পায়ে সুধাদের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ল বিনু।

শালিকের মতন চঞ্চল পায়ে কিছুক্ষণ উঠোনে ঘুরল বিনু। দোলমঞ্চ দেখল, রাস-মঞ্চ দেখল। পালা-সাজানো খড়ের স্তূপ দেখল। আর দেখল সারি সারি ধানের ডোল (গোলা)। কাটন দুটো এখন আর

ওরা বোধহয় চলে গেছে। তারপর ... ভাঙাতে কিসের একটা স্রোত তাকে ... বাগানটার দিকে ভাসিয়ে ... গেল।

... আগে এখান দিয়েই এসেছিল ... জায়গাটা তার চেনা। চারদিকে আম-... জামগাছ, লিচুগাছ, কামরাঙা গাছ— ... এক পায়ে দাঁড়িয়ে। বাগানটা ছায়াচ্ছন্ন। ... ভিজে ভিজে। গাছ-গাছালির ... ফাঁকে পাখিদের চেঁচামেচি আর ... ঝাপটানোর শব্দ। ভিজে মাটির গন্ধ, ... খেতের গন্ধ, ফুলের গন্ধ—সব ... যেন ঘুম এসে যায়।

... পাশ দিয়ে, লতাপাতার ধার ... ফাঁক দিয়ে নেশাগ্রস্তের ... ঘুরে বেড়াতে লাগল বিনু। কতক্ষণ ... ঘুরে বেড়িয়েছিল মনে নেই। এক সময় ... কানে ভেসে এল।

... সামনের দিকে তাকাল বিনু, ... দেখতে পেল না।

... ডাকটা শোনা গেল, 'ছুটো-বাবু—ছুটোবাবু—'

... তাকাতে তাকাতে বিনু ... দেখতে পেল। ... পচা পাটের স্তূপের ... সেই লোকটা বসে আছে। লোক না ... বলাই উচিত।

... আসার সময় এখানেই ... দেখেছিল বিনু, পরে টানাটানি ... মালপত্র নামাতে দেখেছে; নামও ... একজনের নাম যুগল, অন্যজনের ... কে যুগল কে করিম, জানা ...।

... করিম হোক, এখন এক-... পচা পাটের গা থেকে আঁশ ... । আরেকজনকে দেখা গেল না।

চোখাচোখি হতেই সে হাতছানি দিল। ... বিনু কাছে এগিয়ে এল। বলল, ... কেন?'

ছোকরার বয়েস কুড়ি একুশের মধ্যে। ... চওড়া হাড়, মোটা মোটা আঙুল, ... বুক, সরু কোমর—সবই তার বলি-... ষ্ঠতার প্রতীক। গায়ের রঙ রোদে পুড়ে ... তামাটে। চুলগুলো খাড়া খাড়া, ... —তেলে-জলে অথবা চিরুনিতে ... তাদের বশ মানানো যাবে এমন ... নেহাতই দুরাশা। পরনে ভিজে ... একটুকরো টেনি; কোমরের ... কোনরকমে জড়ানো। এছাড়া আর ... কিছুই নেই। বড় বড় ড্যাবড্যাবে দুটো ... সরলতায় মাখা।

... পাটির সবগুলো দাঁত মেলে দিয়ে ... ছোকরা। বলল, 'আপনেরা কইলকাতা ... (থেকে) আইলেন?'

স্টিমারে আসতে আসতে বাঙলাদেশের ... প্রান্তের আঞ্চলিক ভাষা শুনেছে বিনু; ... উচ্চারণগুলি লক্ষ করেছে। যা ... শুনেছে তার সিকিও বোঝে নি। তবে সব মিলিয়ে তার খুব মজা লেগেছে; ভালও লেগেছে। সেটা খুব সম্ভব নতুনত্বের জন্য ... বৈচিত্র্যের জন্য।

ছোকরা যা বলল, প্রথমটা বুঝতে পারল না বিনু। অনেকটা অনুমানের ওপর ভরসা করে বলল, 'কলকাতার কথা বলছ?'

'হ।' ছোকরা মাথা নাড়াল, 'কইলকাতা অনেক দূরে, না?'

এবার বুঝতে পারল বিনু। বলল, 'হ্যাঁ।'

'কয়দিন লাগে যাইতে?'

মনে মনে হিসেব করে বিনু বলল, 'একদিনের মত।'

'যাইতে হইলে ইস্টিমারে চড়ন লাগে?'

'হ্যাঁ।'

'রেলগাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

ছোকরার চোখ চকচক করতে লাগল, 'জানেন আমি কুনোদিন রেলগাড়ি দেখি নাই।'

করুণাই হল বিনুর; বিজ্ঞ, 'রেল-গাড়ি দেখ নি! কেন, তোমাদের এখানে রেলগাড়ি নেই?'

'এইখানে নাই। আছে সেই ঢাকার শহরে। আমি কুনোদিন ঢাকায় যাই নাই।'

একটু চুপচাপ। তারপর ছোকরা আবার শুরু করল, 'আইচ্ছা ছুটোবাবু—'

'কী বলছ?'

'কইলকাতা তো মেলা শহর, না?'

এবারও আন্দাজে বুঝে নিল বিনু। বলল, 'হ্যাঁ।'

'কত বড় কয়েন দেখি।' ছোকরা সাগ্রহে শুধলো, 'আমাগো রাইজদা আপনে দেখছেন?'

'রাইজদা' অর্থাৎ রাজদিয়া। বিনু বলল, সবটা দেখিনি; আসতে আসতে যেটুকু পড়েছে দেখেছি।'

ছোকরা বলল, 'এই ধারে আর কতটুক; উইধারে এইর ডাবল তিন ডাবল আছে। আইচ্ছা, কয়টা 'রাইজদা' একলগে (এক-সঙ্গে) করলে একটা কইলকাতা হয়?'

নাক কুঁচকে তাচ্ছিল্যের সুরে বিনু বলল, 'হাজার হাজার।'

চোখ দুটো গোল হয়ে গেল ছোকরার। অবাক বিস্ময়ে বলল, 'কয়েন কী!'

ছোকরা 'আপনি' 'আপনি' করছে। এত মর্যাদা দিয়ে আগে আর কেউ তার সঙ্গে কথা বলে নি। মনে মনে নিজেকে রীতিমত বিশিষ্ট আর সম্মানিত মনে হচ্ছে। বিনু বলল, একবার গিয়ে দেখে এসো না।'

'কইলকাতা যাওনের সাইধ্য (সাধ্য) কি আমাগো আছে?' মুখখানা ভারি বিমর্ষ হয়ে গেল ছোকরার।

বিনু এবার কিছু বলল না।

ছোকরা আবার বলল, 'কইলকাতায় অনেক গাড়ি ঘুড়া, না?'

বিনু বলল, 'অনেক।'

'মেলা মানুষ, শুনছি মাইনষের মাথা মাইনষে খায়। রাস্তাগুলান নাকি দিনরাইত ঘইষা মাইজা ঝকঝাইকা (ঝকঝকে) কইরা রাখে। একখান ধুলা কুনোখানে পইড়া নাই। রাইতগুলি নাকি বাত্তিতে বাত্তিতে (আলোয় আলোয়) দিন হইয়া যায়। সত্য ছুটোবাবু?'

পূর্ববাঙলার সুদূর অভ্যন্তরে এই

জ্যোতিরাতে একটি গ্রাম্য যুবকের কল্প-লোকে কলকাতা স্বর্গ হয়ে আছে। তার কল্পনা কতদূর আর পৌঁছতে পারে। সগর্বে বিনু তার চাইতে হাজার গুণ মনোরম আর বিস্ময়কর করে কলকাতার এমন এক বর্ণনা দিল যাতে ছোকরা একেবারে হাঁ হয়ে গেল।

বিস্ময়ের ঘোর কিছু কমে এলে ছোকরা বলল, 'আহা রে, এমুন দ্যাশ চৌখে দেখতে পাইলাম না।'

হঠাৎ বিনুর একটা কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'তখন তোমরা দুজন এখানে কাজ করছিলে না?'

'হ। আমি আর করিমা।'

করিমা অর্থে করিম। বিনু বলল, 'তোমার নাম তা হলে যুগল।'

ছোকরা অবাক হয়ে বলল, 'আমার নাম কেমনে জানলেন ছুটোবাবু?'

'তখন ঘোড়ার গাড়ি থেকে তোমরা বাক্সটাক্স নামাচ্ছিলে, কে যেন তোমাদের নাম ধরে ডাকছিল। সেই থেকে জেনেছি।'

যুগল বলল, 'অ।'

বিনু শুধলো, 'করিমকে তো দেখছি না।'

'অগো (ওদের) বাড়িত গেছে, দুফারে (দুপুরে) আইব।'

একটু ভেবে বিনু কি বলতে যাবে, সেই সময় হঠাৎ ঘুরে পুকুরের দিকে তাকাল যুগল। দেখেই বোঝা যায় তার চোখ-মুখ এবং স্নায়ু প্রখর হয়ে উঠেছে। স্থির দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে? অমন করে ছুটছ কেন?'

যুগলের উত্তর দেবার সময় নেই; সে ফিরেও তাকাল না। ছুটতে ছুটতে ঝপাং করে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিছু পিছু বিনুও ছুটে এসেছিল; পুকুর ধারে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছুটে আসতে আসতে মনে হয়েছিল পুকুরের ওপারে ধানবন; কাছাকাছি আসতে বিনু দেখতে পেল তার তিন দিকেই ধানের খেত। প্রকাণ্ড মাছের মতন জল কেটে কেটে কোণাকুণি পুকুর পাড়ি দিয়ে নিমেষে ওপারে চলে গেল যুগল। তারপর ধানখেতের ভেতর ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ কোথায় অদৃশ্য হয়ে রইল।

ভয়ে বুকের ভেতরটা ঢিব-ঢিব করতে লাগল বিনুর। যুগল ডুবে গেল নাকি? যদি আর সে না ওঠে? বিনু একবার ভাবল, ধানখেতে গিয়ে যুগলকে বার করে। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, সে সাঁতার জানে না। সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

ভয়ে আর উদ্বেগে কতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে ছিল, মনে নেই। একসময় ধান-খেতের ফাঁকে যুগলের মাথা ভেসে উঠল। যুগলকে দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে ভয়টা কাটল বিনুর, নাঃ, ডুবে যায় নি। অনেকক্ষণ পর জোরে জোরে বুকের ভেতর শ্বাস টানতে লাগল সে।

বিনু একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। দেখতে পেল, ধানখেত থেকে কি একটা যেন বুকের মধ্য দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে যুগল। একটু পর পুকুর পেরিয়ে পাড়ে এসে উঠল সে, তারপর জল থেকে মস্ত বড়গোলাকার খাঁচার মতন একটা কি তুলে আনল। সরু সরু কাঠি ফাঁক ফাঁক করে বেঁধে খাঁচাটা তৈরী। এমন জিনিস আগে আর দ্যাখে নি বিনু। সে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

যুগল বলল, 'চাই।'

'কী হয় এটা দিয়ে?'

'ভিতরে তাকাইয়া দ্যাখেন ছুটোবাবু।'

প্রথমটা লক্ষ্য করে নি বিনু। যুগলের কথামত তাকাতেই খুশিতে তার চোখ চকচকিয়ে উঠল। 'চাই'য়ের ভেতরটা মাছে বোঝাই, রোদ লেগে রুপোলি আঁশগুলো ঝলকে উঠছে।

বিনু প্রায় লাফ দিয়েই উঠল, 'ইস, কত মাছ!'

'এই মাছ দেইখ্যাই ক'ন (বলেন) কত মাছ! আইতেন বষ্যাকালে (বর্ষার সময়), দেখতেন মাছ কারে কয়! বলতে বলতে কি এক কৌশলে 'চাই'য়ের পেছন দিকটা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলো ঝুপ ঝুপ করে মাটিতে পড়ে লাফাতে লাগল। নানা রকমের মাছ। বেশিরভাগই বিনুর চেনা—রুই, কালবোস, বড় বড় সরপুঁটি, গোলসা ট্যাংরা আর বেলে—এদের চিনতে পারল সে। বাদ বাকি অচেনা। মাছ বার করা হয়ে গিয়েছিল। যুগল বলল, 'ছুটোবা... আপনে এট্টু মাছগুলোর কাছে খাড়া... (দাঁড়ান); দেইখেন চিল-টিলে আবার ছোঁ... নিয়া না যায়।'

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথা... যাবে?'

'ধানখ্যাতে (ধানখেতে); চাই... আবার পাইতা রাইখা আসি।' মাছ... ফাঁদের পেছন দিকটা তাড়াতাড়ি আটকে... দিয়ে জলে গিয়ে নামল যুগল, নিমেষে... ভেতর ধানবনে সেটা রেখে ফিরে এ... তারপর সেখানে পচা পাট স্তূপাকার হ... আছে সেখান থেকে একটা বড় গামছা এ... মাছগুলো বেঁধে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চ... ছুটোবাবু—'

'কোথায়?'

'মাছগুলা ভিতরে দিয়া আসি।'

দুজনে বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

বিনু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাছ ধ... সাঁতার কাটা ইত্যাদি ইত্যাদি কর্মকুশলত... যুগল তাকে জয় করে নিয়েছে।

পাশ থেকে যুগলকে একবার দে... নিয়ে বিনু বলল, 'তুমি তো খুব সাঁত... কাটতে পার!'

'হু—' মাথাটা অনেকখানি হেলি... যুগল বলল, তা পারি। আমারে পুহৈ... (পুকুর) পার হইতে দেখলেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'এই রকম তিনটা পুকৈর আমি এ... ডুবে পার হইয়া যাইতে পারি। ইস্টিমা... কইরা যে নদী দিয়া আইলেন—'

'হ্যাঁ—'

'সাইতরা (সাঁতরে) ঐ নদীটা যে ক... বার এপার-ওপার হইছি, হিসাব ন... ছুটোবাবু।'

আগে মুগ্ধ হয়েছিল, এবার একেবা... ভক্তই হয়ে পড়ল বিনু। তোষামোদের সু... বলল, 'আমাকে একটু সাঁতার শিখি... দেবে?'

যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল যুগল... বিস্ময়ে তার চোখ গোলাকার হয়ে গেল... সাঁতার জানে না, এমন মানুষ জীবনে এ... বোধহয় প্রথম দেখল সে। বলল, 'আপ... সাতর (সাঁতার) জানেন না ছুটোবাবু!'

চোখ নামিয়ে বিনু খুব আস্তে ক... বলল, 'না।' লজ্জায় সে মাথা তুল... পারছিল না।

কলকাতায় থাকে বলে বিনুর খুব গর্ব... তার ধারণা, পৃথিবীর সব কিছু জেনে বা... আছে। কিন্তু একটি গেঁয়ো ছেলের কা... যে পরাজয় মানতে হবে তা কে জানতো...

আবার হাঁটতে শুরু করল যুগল... বলল, 'আমাগো এইখানে কুলের পুলাটা... (কোলের ছেলেটাও) সাতর দিতে পারে... ডর নাই; দুই চাইর দিনের ভিতর সাত... শিখাইয়া মাছ-ধরা শিখাইয়া আপনে... চালাক কইরা দিমু।'

বিনু গম্ভীর হয়ে গেল। যুগলের কা... থেকে চালাক হবার পাঠ নিতে হবে, এ... খানি মেনে নিতে সে রাজী না। বলল... 'আমি বোকা না!'

যুগল বলল, 'সে তো জানিই ছোটোবাবু—'

একটু পর তারা ভেতর-বাড়িতে এসে পড়ল। যুগল ডাকল, ঠাকুরমা একটু বাইরে আসেন দেখি—'

রান্নাঘর থেকে স্নেহলতা বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছু পিছু শিবানী, সুরমা, সুনীতি আর ঝিনুকও এল।

ততক্ষণে গামছা খুলে মাছগুলো ঢেলে ফেলেছে যুগল। সুনীতি সবিস্ময়ে বলল, এত মাছ কোথায় পেলে?'

দু-পাটির সবগুলো দাঁত বার করে হাসল যুগল, 'ধরলাম।'

বিপুল উৎসাহে হাত-পা নেড়ে যুগলের মাছধরার পদ্ধতি বর্ণনা করতে লাগল বিনু।

স্নেহলতা সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'একেবারে মেছো রাশি। দিন-রাত খালি মাছই ধরছে। আর ধরতেও পারে; মাছ যেন ওর গায়ে লেগে উঠে আসে।'

কার উদ্দেশে বলা, সবাই বুঝতে পারল। মাছ দেখে সুরমা খুব খুশী। বললেন, 'ছেলেটা কে গো মামী?'

স্নেহলতা সংক্ষেপে পরিচয় দিলেন। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে পার্কাস বলে ভুঁইমালীদের একটা গ্রাম আছে, যুগলদের বাড়ি সেইখানে। তবে বাড়ির সঙ্গে বাপ-মা ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই হয়। দশ বছর বয়েসে হেমনাথ তাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে যুগল এ বাড়িরই ছেলে; ক্বচিৎ কখনো বাড়ি যায়। একবেলা যায় তো, ওবেলা ফিরে আসে। এখানে থেকে থেকে বাপ-মার কাছে ওর মনই বসে না।

উঠোনে মাছগুলো লাফালাফি করছে, ওঘর থেকে সুধা দেখতে পেয়েছিল। উর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটে এল। চোখ বড় করে বলল, 'কত মাছ রে—'

একটু পর অবনীমোহন আর হিরণও এল। মাছ দেখে সবাই আনন্দিত। জল-বাংলার রুপোলি ফসল সকলকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে।

স্নেহলতা যুগলের দিকে ফিরে বললেন, 'দিন-রাত তো মাছরাঙার মত মাছের পেছনে লেগে রয়েছ। পাট তোলা হয়েছে?'

যুগল একগাল হেসে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'না।'

'উনি কেতুপুর থেকে এসে যদি দ্যাখেন পাগাড়ে পাট পড়ে আছে, মাছ খাওয়াবেখন।'

'ঠাকুরদা আসনের আগেই পাট তুইলা ফেলামু।' বলেই ছুট লাগাল যুগল। উঠোনের আধাআধি গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বিনুকে ডাকল, 'আসবেন নাকি ছুটোবাবু?'

যুগলের সঙ্গ মোটামুটি ভালই লাগছিল, বিনু এগিয়ে গেল।

অবনীমোহন বললেন, 'দুজনের বেশ ভাব হয়ে গেছে দেখছি।'

সুরমা হাসলেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে। মাছ ধরার কায়দা দেখিয়ে যুগল বিনুকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছে।'

যাই হোক বার-বাড়ির সেই বাগানে এসে পচা পাটের স্তূপের ভেতর বসে পড়ল যুগল, একটু দূরে একটা গাছের মোটা শিকড়ের ওপর বসল বিনু।

হাতের কৌশলে অতি দ্রুত পচা পাট থেকে আঁশ আর শোলা বার করে দুধারে রাখতে লাগল; সেই সঙ্গে চলল গল্প।

যাদুকর যেমন ঝাঁপির ভেতর থেকে একের পর এক অচেনা বিস্ময় তুলে এনে চমকে দেয়, তেমনি কথায় কথায় নিজের তাবত গুণ জাহির করতে লাগল যুগল। বিনা পালে শুধু একখানা বৈঠার ভরসায় নৌকো নিয়ে বর্ষার নদী পেরিয়ে যেতে পারে; পায়ে দড়ি না বেঁধে চক্ষের পলকে তিরিশ চল্লিশ হাত নারকেল গাছের মাথায় উঠতে পারে। রাতের পর রাত কৃষ্ণলীলা আর রয়ানির আসরে গান গেয়েও তার গলা ভাঙে না।

যত শুনছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল বিনু। গানের কথায় বিস্ময়টা তার শীর্ষ-বিন্দুতে পৌঁছল। বলল, 'তুমি গাইতেও পার?'

'না পারি কী? সব পারি।' যুগল দাঁত বার করে বলতে লাগল, 'আমার গান শোনলে মাইনষে (মানুষে) মোহিত হইয়া যায়।'

'তাই নাকি?'

আশ্বাসের সুরে যুগল বলল, 'শুনামু ছুটোবাবু, আপনেরে একদিন আমার গান শুনাইয়া দিমু। তখন বুঝবেন, যুগইলা মিছা কয় নাই।'

শরতের বাতাস এলোমেলো বয়ে চলেছে—কখনো ঝড়ের মতন সাঁই-সাঁই, ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, কখনও ঝিরঝিরে সুখস্পর্শে ঘুম এসে যায়। স্টিমারে আসতে আসতে মনে হয়েছিল, আকাশময় কে এক অদৃশ্য ধুনুরি পেঁজা তুলো ছড়িয়ে রেখেছে। কখন যে রঙ বদলে মেঘ-গুলো কালো হয়ে গেছে, বিনুরা লক্ষ্য করে নি। ধীরে ধীরে বাতি নিভে এলে যেমন হয় সেইরকম রোদটা কখন যেন দীপ্তি হারিয়ে উজ্জ্বলতা হারিয়ে মলিন হয়ে গেছে।

গল্প করতে করতে পুকুরের ওপারে তাকাল বিনু। ধানবনে। ঢেউ তুলে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। দু-চারটে নৌকোও চোখে পড়ছে, ধানখেত সিঁথির মতন চিরে তারা কোথায় পাড়ি জমিয়েছে কে জানে।

হঠাৎ বিনু বলল, 'আচ্ছা. এই দিকটায় ধানখেত আর জল ছাড়া কি কিছুই নেই?'

যুগল বলল, 'আছে তো।'

'কী?'

যুগল এবার যা বলল তা এইরকম। ধু-ধু এই জলরাশি আর ধানের অরণ্যের ভেতর দ্বীপের মতন একেকটা কৃষাণ গ্রাম মাথা তুলে আছে। আরো জানাল, সেই আষাঢ় মাস থেকে কার্তিকের শেষাশেষি পর্যন্ত গ্রামগুলো একখানা সমুদ্রের ওপর যেন ভাসতে থাকে। তারপর মাঠের জল সরে গেলে কয়েকটা মাস নিশ্চিন্ত।

বিনু শুধলো, 'ঐ জল কি করে যাবে?'

'যাইব বৈকি। এইর মধ্যেই টান ধরছে—'

যুগল বলতে লাগল, 'আশ্বিনের শ্যাষাশেষি দেখবেন, জল কত কইমা গেছে। অঘ্রাণ মাসে চাইরদিক শুকনা খটখইটা (খটখটে) হইয়া যাইব।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে বিনু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'চারদিক তো জলে ডুবে আছে, ওখানে লোকে যায় কি করে?'

'নায়ে (নৌকোয়) কইরা।' যুগল বলতে লাগল, 'দুই চাইর দিন থাকেন, বুঝতে পারবেন নৌকাই এইখানকার মাইনষের (মানুষের) হাত-পাও। নৌকা ছাড়া এই জলের দ্যাশে কোনখানে যাওনের উপায় নাই।'

একটু ভেবে বিনু বলল, 'এই দিকে গ্রাম ছাড়া আর কী আছে?'

'বড় বড় গঞ্জ।'

'গঞ্জ কী?'

'বাজার আর কি; যেখানে কিকিকিনি হয়। কি একেকখান গঞ্জ ছুটোবাবু— দিন-রাইত মাইনষের চিল্লাচিল্লিতে গম-গম করে। দেলভোগ,, মোহনগঞ্জ, মীরপুর, ইমামগঞ্জ— যেখানেই যান, এক অবস্থা।'

ইনামগঞ্জ নামটা বিনুর চেনা-চেনা লাগল। কিন্তু কোথায় কার কাছে শুনেছে, এই মুহূর্তে কিছুতেই মনে করতে পারল না।

যুগল থামে নি, 'পূজা আসতে আছে ছুটোবাবু, মোহনগঞ্জে, মীরপুরে, দেল-ভোগে রাইতের পর রাইত যাত্রাগান হইব। এমনে তো মানুষ ধরে না, তখন সারা রাজ্য একেবারে ভাইঙ্গা পড়ব।'

বিনু বলল, 'জানো, আমি কখনও যাত্রা দেখিনি।'

বরদানের ভঙ্গিতে যুগল বলল, 'তার লেইগা কি, আমি আপনেরে দেখাইয়া আনুম। কয়টা আর দিন, পূজা তো আইসাই পড়ছে।'

ঝিনু বলল, 'কথা দিলে, নিয়ে যেতে হবে কিন্তু—'

'যামু-যামু-যামু—'

বিনু আর কিছু বলল না। স্বপ্নলোকের রহস্যময় সংকেতের মত দিগন্তের ওপার থেকে দেলভোগ, মীরপুর, ইনামগঞ্জ, এই বিচিত্র নামগুলি আর যাত্রাগানের আসর তাকে যেন বার বার ইসারা করতে লাগল।

*

রান্নাবান্না শেষ হতে হতে দুপুর পেরিয়ে গেল, তখনও হেমনাথ ফিরলেন না।

সবার চান হয়ে গিয়েছিল সুরমা, সুধা, সুনীতি, ঝিনুক বাড়িতেই তোলা জলে চান সেরেছে। অবনীমোহন, বিনু আর হিরণ গিয়েছিল পুকুরে। সঙ্গে যুগলও ছিল। আজ থেকেই যুগলের কাছে সাঁতারের প্রথম পাঠ নিতে শুরু করেছে বিনু।

নতুন জায়গা নতুন জল বলে বেশিক্ষণ পুকুরে হুটোপাটি করতে দেননি অবনীমোহন। সেজন্য মুখখানা ভারী হয়ে আছে বিনুর।

যাই হোক রান্নাঘরে আসন পেতে থালা সাজিয়ে স্নেহলতা খেতে ডাকলেন।

অবনীমোহন বললেন, 'মামাবাবুর জন্যে আরেকটু অপেক্ষা করি। তারপর না হয়—'

'অপেক্ষা করে লাভ নেই বাবা। হয়ত আজ ফিরবেনই না।'

'এ রকম হয় নাকি?'

স্নেহলতা হাসলেন, 'প্রায়ই হয়, একেকদিন যান, ফেরেন দু-তিন দিন পর। ওঁর আশায় বসে থাকলে উপোষ দিতে হবে।'

অগত্যা কি আর করা, খেতে বসতে হল।

ওবেলার মতন এবারও মাছের ভাগ নিয়ে বায়না ধরল ঝিনুক, এবং কেঁদে কেটে সব কিছু বিনুর সমান সমান আদায় করে ছাড়ল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রামের সুযোগ মিলল না। তার আগেই রাজদিয়ার এপাড়া-ওপাড়া থেকে দলে দলে মানুষ আসতে লাগল। তারা স্নেহলতাকে ছেঁকে ধরল। মেয়ে-জামাই দেখাও, নাতি-নাতনী দেখাও।

স্নেহলতা সবার সঙ্গে অবনীমোহনদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদের কেউ প্রণাম করে, কেউ প্রণাম নিয়ে পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে করে বিদায় নিল। যাবার আগে সবাই নিমন্ত্রণ করে গেল, তাদের বাড়ি অন্তত একদিন করে যেতে হবেই।

অবনীমোহন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন 'শুধু আমাদের দেখবার জন্যে এত লোক এসেছে!

স্নেহলতা হাসলেন, 'হ্যাঁ। এখানে কারো বাড়িতে লোকজন এলে রাজ্যের মানুষ ছুটে আসে। এক বাড়িতে উৎসব লাগলে সারা রাজদিয়ায় উৎসব লেগে যায়; কোন বাড়িতে কেউ মরলে-টরলে সবার মন খারাপ হয়ে যায়।'

'চমৎকার জায়গা তো। অথচ কলকাতার—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন অবনীমোহন। তুলনামূলকভাবে কলকাতার নামে এক উদাসীন আত্মকেন্দ্রিক নরনারীর কথা তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছিল।

স্নেহলতা মনে করিয়ে দিলেন, 'কলকাতার কথা কী বলছিলে অবনী?'

অবনীমোহনের দূরমনস্কতা কেটে গেল। বললেন 'পাড়া দূরে থাক; এক বাড়িতে তিন ভাড়াটে থাকলে একজনের নাম আরেক জনের জানতে হয়ত বছর কেটে যায়।'

'বল কি অবনী!'

অবনীমোহন হাসলেন।

স্নেহলতা বললেন, 'ওখানকার লোক থাকে কি করে? আমি হলে দম বন্ধ হয়ে মরে যেতুম। সেদিক থেকে রাজদিয়ায় আমরা বেশ আছি।'

লোকজনের ভিড় কাটতে কাটতে বেলা পড়ে এসেছিল। আকাশে এখন মেঘও আছে, রোদও আছে—বেলা-শেষের নরম সোনালী রোদ। খানিক আগে ঝির ঝির করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে; এখন ছাঁটটা জোরালো না। কদমফুলের রেণুর মত বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো ইলসেগুঁড়ি উড়ছে।

অবনীমোহনেরা সেই পুবদুয়ারী ঘরটায় আবার আসর জমিয়ে বসেছেন। এ বাড়িতে কেউ চা খায় না, অথচ অবনীমোহনের দু'বেলা চা না হলে পৃথিবী অন্ধকার। কাজেই কলকাতার এই চা-চাতকদের জন্য খেয়ে উঠেই রাজদিয়ার বাজার থেকে চা নিয়ে এসেছে হিরণ।

পেয়ালায় ধূমায়িত সোনালী তরল সামনে সাজিয়ে গল্প হচ্ছিল। ওবেলা অবনীমোহন, সুধা আর হিরণ ছিল শুধু; এ বেলা সুনীতি, সুরমা, বিনু, ঝিনুক, স্নেহলতা এমন কি শিবানীও এসে যোগ দিয়েছেন।

এলোমেলো অসংলগ্ন নানা কথার পর হিরণের প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

অবনীমোহন শুধোলেন, 'তুমি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড় হিরণ?'

হিরণ বলল 'ঢাকা।'

'তা হলে তো ঢাকাতেই থাকতে হয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি হস্টেলে থাকি।'

'পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছ বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ছুটি শেষ হলেই ফির যাব।' একটু থেমে হিরণ বলল 'ছুটিছাটা পেলেই আমি বাড়ি চলে আসি। ঢাকা তো কতক্ষণের পথ; স্টিমারে ঘণ্টা পাঁচেক লাগে।'

অবনীমোহন বললেন, 'তোমার কোন ইয়ার যেন?'

'ফিফথ ইয়ার।'

'এম, এ-তে বি, এ-র মতনই রেজাল্ট হবে তো?'

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ সুধার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। পরিপূর্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সুধা তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্ত। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে সলজ্জ সুরে হিরণ বলল, 'দেখি—'

অবনীমোহন কি বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে ঝুম-ঝুম বাজনার মত শব্দ ভেসে এল; তার সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের খট-খট আওয়াজ।

সবাই একসঙ্গে জানলার বাইরে তাকাল। বিনুরা দেখতে পেল সেই চমৎকার ফীটনটা আবার ফিরে এসেছে; এটায় করেই ওরা স্টিমারঘাট থেকে এখানে এসেছিল।

সোজা উঠোনের মাঝখানে এসে গাড়িটা থামল। স্নেহলতা উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। বললেন, 'ভবতোষ মনে হচ্ছে—'

ঠিক সেই সময় ফীটনের ভেতর থেকে যিনি নামলেন তাঁকে যুবকও বলা যায় না, আবার প্রৌঢ়ও না। দুয়ের মাঝামাঝি তাঁর বয়েস থমকে আছে।

ঝিনুক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে—' তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠোনের দিকে ছুটল। [ক্রমশঃ]

রাজধানীর ইতিকথা

নিমাই ভট্টাচার্য

বাংলাদেশ মাত্র দু' টুকরো হলো কিন্তু বাঙালীর অদৃষ্ট টুকরো টুকরো হলো। একটু ভদ্রভাবে, একটু মানুষের মত বাঁচবার জন্য বাঙালীর ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ীরা কি না করেছে? আজও কি না করছে? বাঙালীর ছেলেমেয়েরা চক্ষুলজ্জার ভয়ে নাকি জীবনসংগ্রামে ব্যর্থ হয়। যাঁরা মাঠে-ময়দানে এসব বক্তৃতা করেন তাঁদের মত আমার মাথায় শুধু ব্রেন নেই। তবে জানি বহুভাবে বি-এ—এম-এ পাশ করা সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা ভদ্রভাবে বাঁচবার জন্য সরকারী বাসে কন্ডাক্টর হয়েছে, পিছনের সীটে রোমিও-জুলিয়েট আর স্টিয়ারিং-এর সামনে মা কালীর ফটো নিয়ে ট্যাক্সি চালাচ্ছে—পৃথিবীতে তার তুলনা বিরল।

একজন নয়, দুজন নয়, হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ বাঙালীর ছেলেমেয়েরা আভিজাত্য, ঔদ্ধত্য, চক্ষুলজ্জার মুখে ছাই দিয়ে জীবন-সংগ্রাম করে চলেছে। সবাই একথা জানেন, দেখেন কিন্তু তবুও বাঙালীর বদনাম গেল না।

কেন বাংলা দেশের নতুন হকার সমাজ? তরুণ বন্দী শিক্ষিত বাঙালীর ছেলেমেয়েরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ছিটকাপড় বা রেডিমেড জামাকাপড় বিক্রী করছে। সমাজ যাদের সমালোচনা করার দাবী রাখে, সরকার যাদের শাসন করার দাবী জানায় কিন্তু যাদের পেটের আগুন নেভাবার ক্ষমতা নেই, তাদের বদনাম করার অধিকার কে দিল?

জানি না। তবে জানি বাঙলাদেশের শহরে-নগরে যে লক্ষ লক্ষ হকার ছড়িয়ে রয়েছেন তাদের চোখের জলের ইতিহাস। অশিক্ষিত ভোজপুরী কনস্টেবল, কোনো কোনো কান্ডজ্ঞানহীন সাব-ইন্সপেক্টর আর একদল বর্বর গুন্ডার অত্যাচারে বাঙলাদেশের হকার সমাজ জর্জরিত। আর পলিটিক্যাল নেতারা? মাঝে মাঝে দুপুরে রোদ্দুরে রাইটার্স বিল্ডিংস ঘুরিয়ে আনছেন ইনক্লাব জিন্দাবাদ' গাইতে গাইতে। ব্যাস! এর চাইতে বড় সেবা বাঙলাদেশের নেতারা কি করবেন?

এবার আসুন দিল্লী। নিউ দিল্লী, ওল্ড দিল্লী—যেখানে খুশী আসুন। ভি-আই-পি হকার দেখে যান।

বাঙলাদেশের মত পাঞ্জাবও দু'টুকরো হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ পাঞ্জাবী-সিন্ধী-পাঠান ছিন্নমূলের দল দিল্লীতে এসে ভীড় করলেন। দেখতে দেখতে সারা শহরের অলিতে-গলিতে রাস্তা-ঘাটে হকারের ভীড় হলো। শৌখীন সম্ভ্রান্ত কনটপ্লেসও বাদ পড়ল না। কনট প্লেসের চারপাশের সব বড় বড় রাস্তার ধারে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠল হকার্স কর্নার। কলকাতার মত দিল্লীতে, নতুন দিল্লীতে খোলা জায়গার অভাব সেকালে একেবারেই ছিল না। এখনও নেই। তাইতো যে যেখানে পারল ভাঙা ইট-কাঠ দিয়ে এক একটা দোকান তৈরী করে বসল।

কলকাতা বা বাঙলাদেশের হকারদের নিয়ে কর্তৃপক্ষ যেভাবে ছিনিমিনি খেলেছেন, খেলছেন এবং ভবিষ্যতেও খেলবেন দিল্লীতে তা সম্ভব হয়নি। দিল্লীর একটি হকারের কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস বা দুঃসাহস দিল্লীর কনস্টেবল, সাব-ইন্সপেক্টর তো দূরের কথা, ইন্সপেক্টর জেনারেল বা মেয়রেরও নেই। কলকাতার পুলিশ অবসর বিনোদনের জন্য হকার বিতাড়ন অভিযান করে। একটা সাব-ইন্সপেক্টর আর চার-পাঁচজন কনস্টেবল কলেজ স্ট্রীট-শিয়ালদহের মোড় খালি করে দিতে পারে কিন্তু দিল্লীতে? কল্পনাতীত। দিল্লীর হকার সমাজের উপর হামলা বা গুন্ডাবাজী করলে শঠে শাঠ্যং......

তাইতো দিল্লীর প্রতিটি হকারের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ডজন ডজন নতুন নতুন মার্কেট তৈরী করা হয়েছে ও হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও হবে। কনটপ্লেসের কিছু কিছু বড় বড় দোকান বাদ দিলে দিল্লী ও নিউ দিল্লীর প্রায় দোকান-বাজারই হকারদের সৃষ্টি। বাঙলাদেশের হকাররা খেতে পান না আর দিল্লীর অতীত ও বর্তমানের হকাররা লাখ লাখ টাকার মালিক! বিশ্বাস হয় না? একবার আসুন, দেখে যান। জনপথ, আরউইন রোড, পাঁচকুইয়া, শঙ্করের মার্কেট বা লাজপত রায় মার্কেট বা লাজপত নগর মার্কেট বা আজমল খান মার্কেটের দোকানীদের দেখুন। ভাল করে দেখুন। প্রায় সবাই নিজের বাড়ীতেই থাকেন। কারুর একতলা, কারুর বা তিনতলা; কারুর একটা, কারুর বা একাধিক। হবে না কেন? নামমাত্র ভাড়ায় সরকারী বাজারে দোকান-গুদাম। অনেক মার্কেটে দোকানের উপরেই দোকানীর থাকবার ফ্ল্যাট। সবই নামমাত্র ভাড়ায়। বাঙলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য হাতবদল হচ্ছে। এখানে? না বললেই চলে। টাকার অভাবে দিল্লীর এইসব ছোটখাট ব্যবসাদারদের দোকান বন্ধ হয় না। এরা নিজেদের মধ্যে ব্যাঙ্ক গড়ে তুলেছে এবং ব্যবসার প্রয়োজনে সেই ব্যাঙ্ক থেকে বিনা সুদে বা সামান্য সুদে টাকা পাওয়া যায়। তাইতো দু'পাঁচ বা দশ হাজার টাকার অভাবের জন্য দিল্লীতে এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতবদল কক্ষনো হয় না।

কুড়ি বছর আগে যারা লালকেল্লার সামনে চায়ের ফিরিওয়ালা ছিল, আজ তাদের অনেকেই দু'তিন লাখ টাকার বাড়ী বানিয়েছে, জিমখানা ক্লাবে গিয়ে হুইস্কী খায়, অশোকা হোটেলের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটে। একজন দুজন নয়, এমনি হাজার হাজার কি হয়ত লক্ষ লোক পাওয়া যাবে দিল্লীতে। আর কলকাতায়? সে দুঃখের কথা, সে ব্যর্থতার ইতিহাস তো সবার জানা।

একটু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাঙলাদেশের হকার সমস্যার মোকাবিলা করলে অসংখ্য বাঙালীর ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বইতে পারত। গড়িয়াহাট টালিগঞ্জ বেহালা, এসপ্লানেড, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার বা পাইকপাড়ায় কি সরকার দিল্লীর মত বড় বড় মার্কেট তৈরী করে অসংখ্য সাধারণ বাঙালী ব্যবসাদারদের হিল্লে করতে পারতেন না? এসপ্লানেডের মোড়ে যে হকার্স কর্নার সরকারী কৃপায় গড়ে উঠেছে, তা দেখে কেউ বলবেন না সৌন্দর্য নগরী জয়পুর বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারদের কীর্তি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগের অকর্মণ্যতার নিদর্শন এই হকার্স কর্নার বিশ শতকের লজ্জা। কর্তার দল বছর বছর বিলেত-আমেরিকা ঘুরছেন, প্রতি সপ্তাহে 'ছল্লী-দিল্লী' ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এত কিছু দেখেও এই অভিভাবকের দল সামান্যতম শিক্ষালাভ করতে পারেন না?

দেশে বিদেশে

রুশ নেতৃত্ব ?

প্রেসিডেন্ট লুডভিক স্বোবোদার নেতৃত্বে যখন সাতজন চেক নেতার এক প্রতিনিধিদল মস্কোয় রুশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন, তখন প্রাগের রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য প্রচারপত্র ছড়ানো হচ্ছিল।

এইরকম একটি প্রচারপত্রে লেখা ছিল : "আমরা হাঁটু ভেঙে বসে নেই।"

সারা গত সপ্তাহ ধরে চেকোশ্লোভাকিয়ার সাধারণ মানুষ নানা প্রকারে ও ভঙ্গিতে কেবল একটি কথাই বলছিল : "রাশিয়ানরা ভেবেছিল আমরা এতদিনে তাদের সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে পড়ব। কিন্তু তা হয়নি। চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ প্রতিরোধ করে চলেছে, এবং করে যাবেও।"

নয়াদিল্লীতে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত এক সাংবাদিক বৈঠকে সগর্বে ঘোষণা করলেন : "রাশিয়ানরা একজনও কুইসলিংকে খুঁজে পায়নি।"

'ক্লাডচি' বা 'বিশ্বাসঘাতক' যে ছিল না তা নয়। বিলাক, কোলডার, ইন্দ্রা প্রমুখ রক্ষণশীল নেতারা রাশিয়ানদের সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন। তার ওপর ছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নভোতনি, যাঁকে একসময় মনে হয়েছিল রাশিয়ানরা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এবং পাঁচটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী নিয়ে একযোগে চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পরেও, "প্রতিক্রিয়াশীল, শোধনবাদী" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত স্বোবোদা ও ডুবচেকের সঙ্গেই আপস রফায় আসতে হচ্ছে। এই একটি ব্যাপার থেকে বোঝা যাবে যে, ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরী আর ১৯৬৮ সালের চেকোশ্লোভাকিয়া এক নয়। ১৯৫৬ সালে একজন য়ানোস কাদার পাওয়া গিয়েছিল, ১৯৬৮ সালে একজনও পাওয়া যায়নি।

রুশ নেতৃত্বের ব্যর্থতার এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

এই ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্যে রুশ নেতৃবৃন্দ যা করলেন তা আরো অন্তঃসারশূন্য।

তাঁরা চেক নেতাদের মস্কোয় নিয়ে এলেন আলোচনার জন্যে। এতে তাঁরা একটা আত্মশ্লাঘা বোধ করতে পারেন যে, চেক নেতৃবৃন্দ অবশেষে মস্কোয় আসতে রাজী হয়েছেন। এর আগে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার জন্যে তাঁরা মস্কোয় যেতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু দুনিয়া জানে এই আত্মশ্লাঘা কতখানি অর্থহীন। কারণ চেক নেতাদের মস্কোয় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বন্দুকের নলের মুখে। এবং বন্দুকের নলের মুখে আলোচনার পর যে চুক্তি সম্পাদিত [illegible]

২৩ থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত ক্রেমলিনে উভয় প্রতিনিধি দলের মধ্যে আলোচনা চলে, এবং তার পর যে যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয় তাতে বলা হয়, গত জানুয়ারী ও মে মাসে চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশনে যে সংস্কারমূলক ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয়েছিল রাশিয়া সেগুলি সমর্থন করে। রুশ নেতৃবৃন্দ এ কথাও জানান যে, পারস্পরিক সম্মান, সমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব, স্বাধীনতা ও সমাজবাদী সংহতির ভিত্তিতে তাঁরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

চেক নেতৃবৃন্দও তাঁদের পক্ষ থেকে এই আশ্বাস দেন যে, সমাজবাদী শক্তির স্বার্থে তাঁরা পার্টি ও রাষ্ট্রের কাজকর্মকে পরিচালিত করবেন।

সেই সঙ্গে এটাও স্থির হয় যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে পঞ্চ রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী সরিয়ে আনা হবে।

এই শেষের কথাটি ছাড়া মস্কো বিবৃতিতে এমন কোনো কথা ছিল না যা এর আগে ব্রাতিশ্লাভা ঘোষণার মধ্যে ছিল না, কিংবা স্বোবোদা ও ডুবচেক এমন কোনো প্রতিশ্রুতি মস্কোয় দেননি যা তাঁরা ব্রাতিশ্লাভায় দেন নি। সুতরাং মস্কো ঘোষণা রাশিয়ার পক্ষে মুখরক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। এবং কি বিব্রতকর চেষ্টা!

নিজের জন্যে এই বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করার পেছনে রাশিয়ার আর যে কারণই থেকে থাকুক, একটা বড় কারণ যে রুশ নেতৃত্বের অন্তঃসারশূন্যতা, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। তা যদি না হ'ত তাহলে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে তাঁরা এই হঠকারিতা থেকে বিরত হতেন।

হঠকারিতা ছাড়া আর কোনোভাবে রাশিয়ার এই কাজের ব্যাখ্যা করা যায় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া যদি নিজের কোনো ইমেজ গড়ে তুলে থাকে তবে সেই ইমেজ এই একটি কাজের দ্বারা ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। রুশ নেতৃবৃন্দ প্রমাণ করলেন যে, পুঁজিবাদী আমেরিকার সঙ্গে সমাজবাদী রাশিয়ার চরিত্রগত কোনো তফাৎ নেই। অন্য রাষ্ট্রের ওপর হস্তক্ষেপ করার জন্যে আমেরিকা যেসব যুক্তি দিয়ে থাকে, ক্ষুদ্র চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় রাশিয়াও ঠিক সেই যুক্তি দিয়েছে। অর্থাৎ নিজের নিজের প্রতিরক্ষার স্বার্থরক্ষা।

রাশিয়ার বক্তব্য হল, চেক নেতারা যদি রাশিয়ার প্রত্যক্ষ বশ্যতা থেকে বেরিয়ে যেতে চান, যদি তাঁদের সংস্কারবাদী কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন তাহলে সমাজবাদী প্রতিরক্ষা অবস্থা বিপন্ন হয়ে উঠবে। এই প্রবণতা যখন সীমাবদ্ধভাবে হাঙ্গেরীতে দেখা দিয়েছিল, তখন রাশিয়া এই কথাই বলেছিল। এই প্রবণতা যদি আজকে পূর্ব জার্মানীতে কিংবা পোল্যান্ডে কিংবা বুলগেরিয়ায় দেখা দেয় তাহলেও রাশিয়া একই কথা বলবে। কিন্তু খোদ রাশিয়ায় যখন সংস্কারের দাবী ওঠে এবং সেই দাবী যখন সেখানকার নেতারা মেনে নেন তখন সমাজবাদী প্রতিরক্ষার স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় না! অর্থাৎ দাঁড়াচ্ছে যে, সমাজবাদী প্রতিরক্ষার স্বার্থ বলতে রাশিয়ারই প্রতিরক্ষার স্বার্থ। সেটাই সব, রাশিয়াই প্রধান, বাকী যে রাষ্ট্রগুলি

তার আওতায় রয়েছে সেগুলি তারই বাফার হিসেবে কাজ করছে। এই বাফার যদি নষ্ট হবার উপক্রম হয় তাহলে রাশিয়া তা কঠোর হাতে পুনর্গঠন করতে দ্বিধা করবে না।

আমরা জানি না রাশিয়া কেন ধরে নিয়েছে তার স্বার্থই সমাজবাদী আদর্শের স্বার্থ এবং তার বাইরে আর যেসব সমাজবাদী রাষ্ট্র সেগুলি তার স্বার্থের বেদীমূলে বরাবরই বলিপ্রদত্ত থাকবে। কিন্তু এই যুক্তি আশ্চর্যজনকভাবে আমেরিকার ভিয়েৎনাম যুদ্ধের যুক্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমেরিকাও বলছে সে ভিয়েৎনামে গেছে স্বাধীন দুনিয়ার অর্থাৎ তার নিজের প্রতিরক্ষার স্বার্থরক্ষা করার জন্যে। এবং গিয়েছে সেখানকার এমন একদল লোকের আহ্বানে যারা স্পষ্টতই সেখানে সংখ্যালঘু। আর রাশিয়াও বলছে তারা চেকোশ্লোভাকিয়ায় ঢুকেছে চেক নেতাদের আহ্বানে, যে নেতাদের নাম সে ঘোষণা করেনি এবং যে নেতাদের পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কি চমৎকার!

আর যাই হোক, এরপর রাশিয়ার আর পরম নীতিবাদীর মতো একথা বলার মুখ রইল না যে আমেরিকা ভিয়েৎনামে অন্যায় যুদ্ধ লড়ছে, কিংবা যদি অন্য কোনো রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করে তবে সে হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। ইতিহাসের এক বিচিত্র খেয়ালে দুনিয়ার বৃহত্তম পুঁজিবাদী আর সমাজবাদী রাষ্ট্র একই পথ ধরে চলেছে।

এই কৃতকর্মের জন্যে বর্তমান রুশ নেতৃবৃন্দ যদি এখন অনুতপ্ত হয়ে থাকেন, তাহলেও নিজেদের সৃষ্ট এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হবে না; কারণ স্বোবোদা ও ডুবচেক মস্কো থেকে ফিরে আসার পর চেক জাতীয় পরিষদ মস্কোচুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে। এর উত্তরে যদি রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার টুঁটি আরো কঠিনভাবে চেপে ধরতে চায় তাহলে তার সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপই সে আরো ভালোভাবে প্রকাশ করবে, এবং যে ঐক্যের নামে সে এটা করবে সেই ঐক্যেই তখন আরো গভীর ভাঙন ধরবে।

আর যদি সে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রত্যাখ্যান নীরবে হজম করে যায় তাহলে বর্তমান নেতৃত্ব নিজেদের আরো অপদার্থ বলে প্রমাণ করবে, এবং তখন তাদের গদী বজায় রাখাই হবে মুশকিল।

হলদিয়া তৈল শোধনাগার

হুমায়ুন কবীর যখন ভারত সরকারের তৈল দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়ায় একটি তৈল শোধনাগার স্থাপনের কথা চলছে। তাঁর কথায় এরকম একটা আশা দেখা দিয়েছিল যে, ১৯৬৮ সালের শেষে এই শোধনাগার চালু হবে। কিন্তু যে হারে এই প্রস্তাবিত শোধনাগারের কাজ চলছে তাতে মনে হচ্ছে, ১৯৭১ সালের আগে এই শোধনাগার চালু হবে না।

ইতিমধ্যে, ১৯৬৭ সালের ২৯শে জুলাই ও ১৩ই অক্টোবর তিনটি চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন কয়েকটি ফরাসী কোম্পানী ও একটি রুমানিয়ান সংস্থার সঙ্গে কারখানা নির্মাণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ঋণ সংস্থান সম্পর্কে বোঝাপড়া করেছেন। কিন্তু খবরে জানা যায় যে, হলদিয়ায় এখন পর্যন্ত একটিও যন্ত্র এসে পৌঁছয় নি।

ভারত সরকারের রসায়ন ও তৈল দপ্তরের সদ্য-পদত্যাগী মন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতা গত ২২শে এপ্রিল তারিখে পার্লামেন্টে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, দেশে পেট্রলজাত পদার্থের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় হলদিয়াতে একটি তৈল শোধনাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। ২৪শে জুলাই তারিখে শ্রীমেহতা যখন বেতার বক্তৃতা দিলেন তখনও তিনি পরিষ্কার করে বলতে পারলেন না হলদিয়ায় তৈল শোধনাগার তৈরীর কাজ কবে শেষ হবে।

হলদিয়ার তৈল শোধনাগার ও তৎসংশ্লিষ্ট রাসায়নিক শিল্প কারখানাগুলো গড়ে ওঠার উপর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা অনেকখানি নির্ভর করছে। অথচ সেই কাজটা বারবার এরকম পিছিয়ে যাচ্ছে কেন তা বোঝা যাচ্ছে না। হলদিয়া রিফাইনারি প্রজেক্টের একজন জেনারেল ম্যানেজার ইতিমধ্যে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর দপ্তর দিল্লীতে, কলকাতায় নয়।

খবর নিয়ে জানা গেল, হলদিয়া তৈল শোধনাগারের জন্য পাঁশকুড়া থেকে দুর্গাচক পর্যন্ত যে রেললাইন বসাবার কথা সেটা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। সম্পূর্ণ হতে হতে বর্তমান বছর কাবার হয়ে যাবে। সিমেন্টেশন কোম্পানী হলদিয়ার মাটি পরীক্ষা করে দেখছেন। হলদিয়ায় মাটি ভরাট করার কাজের ভার দেওয়া হয়েছে পোর্ট কমিশনার্সকে। কিন্তু তাঁদের কাজও খুব মন্থরগতিতে চলছে বলে জানা গেছে।

●

হলদিয়ার তৈল শোধনাগার স্থাপনের কাজ বিলম্বিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে আর একটি কারখানা স্থাপনের কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। সেটা হচ্ছে দুর্গাপুরে সার কারখানা। ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এই রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। ৮৩০ একর জমির উপর এই কারখানায় প্রতিদিন এক হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার তৈরী হবে। এই কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি দিচ্ছে ইটালির মন্টিকাটিনি সংস্থা।

দুর্গাপুরের এই সার কারখানা তৈরী করতে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং আধুনিকতম প্রয়োগবিদ্যার সাহায্যে এই কারখানা তৈরী করা হবে।

এই প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার আর হাসান বলেছেন যে, ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই কারখানা তৈরীর কাজ শেষ হবে। তিনি বলেছেন, "এটা আমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ", কিন্তু তাঁর আশা আছে যে, তাঁরা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সমর্থ হবেন।

এই কারখানার জন্য প্রধান যে কাঁচা মালের দরকার হবে সেটা হচ্ছে ন্যাপথা। বছরে ১,৭৬,০০০ মেট্রিক টন ন্যাপথার প্রয়োজন হবে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন দুর্গাপুরের কাছে রাজবাঁধস্থিত তাঁদের ডিপো থেকে এই ন্যাপথা সরবরাহ করবেন।

দুর্গাপুরের সার কারখানায় প্রায় দুই হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা আছে।

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং পোপের বাণী

বাইবেলে আছে, মানুষ ভগবানের প্রতিবিম্ব। অতএব এই ভগবানের রাজ্যে মানুষের আগমন কোন কৃত্রিম উপায়ে প্রতিরুদ্ধ করার অর্থ ভগবানের ইচ্ছার বিরোধিতা করা। তাই ভগবানে অবিচল আস্থাশীল সকল ক্যাথলিককে মহামান্য পোপ ষষ্ঠ পল, দীর্ঘ চিন্তা ও বিচার-বিবেচনার পর নির্দেশ দিয়েছেন, জন্ম নিরোধের জন্য কোন কৃত্রিম পন্থা যেন অবলম্বনে না করা হয়।

পোপ ষষ্ঠ পলের এই কঠোর নির্দেশ, দুই হাজার বছরের খৃষ্টীয় সভ্যতার অগ্রগতি ও তজ্জনিত বিবিধ সমস্যার প্রতি এই যাজকীয় ঔদাসীন্য সাড়ে তিনশ' বছর আগের আর এক পোপ পল, পঞ্চম পলের অন্ধ নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যিনি ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিওর উপর হুকুম জারী করে বলেছিলেন—পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, এতবড় অধর্মের কথা যেন আর তাঁর মুখ থেকে না বেরোয়। বাইবেলে আছে, পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্য ভগবান চন্দ্র সূর্যের সৃষ্টি করেছেন, আর তারা ঘুরে ঘুরে পৃথিবীকে আলো দেয়। বাইবেলে প্রচারিত ভগবানের এতবড় মহিমার কথা মিথ্যা হয়ে যায় গ্যালিলিওর আবিষ্কারে। তাই গ্যালিলিওর অধর্মীয় ঔদ্ধত্য সেদিন ক্ষমা করতে পারেন নি, এই বিশ্বে ভগবৎ চিন্তার অবধায়ক পোপ পঞ্চম পল।

অতি সম্প্রতি পুনর্বিচার হয়েছে গ্যালিলিওর, এবং সাড়ে তিনশ' বছর বাদে ঐ যুগান্তকারী মহাবিজ্ঞানীকে ঈশ্বর-বিরোধী আচরণের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন রোমের ধর্মকর্তারা। এমনিভাবে, হয়ত শতাব্দীকাল পরে, আর এক পুণ্যদর্শন মহামান্য পোপ স্বীকার করবেন, পোপ ষষ্ঠ পলের ফরমান অভ্রান্ত ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে জন্মবিস্ফোরণের যে সর্বনাশা মহাপ্রলয় ঘটে যাবে এই ক্ষুদ্র গ্রহের বুকে, তারপর আজকের ভুল সংশোধনের কোন উপায় থাকবে কি?

নোয়া'র কালের মহাপ্রলয়ের মতো জনস্রোতের এক বিশ্ববিধ্বংসী প্রলয় এগিয়ে আসছে এই শতাব্দীরই অবশিষ্ট তিন দশকের মধ্যে, যার দুর্নিবার অগ্রগতি প্রতিরোধে আজই বিশ্বের সর্বশক্তি নিয়োজিত না হ'লে, আকাশঢাকা পঙ্গপালের মতো তা নিশ্চিহ্ন করে দেবে ধরনীর সব শ্যামলিমা। আর এমন অবস্থা হবে এই পৃথিবীর যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার স্থানটুকুও সকলের জুটবে না।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর শুরুতে এই পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল পঁচিশ কোটি। তা দ্বিগুণ হয়ে পঞ্চাশ কোটি, অর্থাৎ বর্তমান ভারতের লোকসংখ্যার সমান হতে সময় লাগে ষোল'শ বছর। ১৮৬৯ সালে যখন প্রথম ভ্যাটিকান কাউন্সিলের বৈঠক ডাকা হয় তখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা শতকোটি অতিক্রম করেছে। তারপর পৃথিবীর লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ক্যাথলিকদের কিছু করণীয় আছে কিনা তা বিচার বিবেচনার উদ্দেশ্যে পোপ ত্রয়োবিংশ জন যখন পাঁচ বছর আগে দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলের আহ্বান জানান তখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ৩১০ কোটি। আর তার পাঁচ বছর পরে, ভ্যাটিকান কাউন্সিল নিযুক্ত ৫৬-সদস্য কমিশনের পর্যালোচনা অগ্রাহ্য করে মহামান্য পোপ ষষ্ঠ পল যখন প্রজনন নিরোধে কৃত্রিম পন্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধে রায় দিলেন তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা হয়েছে সাড়ে তিন'শ কোটি! আর এই জন-তরঙ্গ রোধের কোন ব্যাপক ব্যবস্থা যদি ইতিমধ্যে অবলম্বিত না হয় তবে বিশ শতকের শেষে বিশ্বের লোকসংখ্যা হবে ৭০০ কোটি।

কৃষিবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ সংখ্যাবিদ সকলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বিজ্ঞানের যতোই উন্নতি হোক, উচ্চ ফলনশীল খাদ্যশস্যের বীজ ছড়িয়ে ফলনবৃদ্ধির যত চেষ্টাই হক, আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে এই পৃথিবীতে আরও সাড়ে তিনশ' কোটি লোকের খাদ্যসংস্থান কিছুতেই করা সম্ভব হবে না। কারণ এখনই পৃথিবীতে যে সাড়ে তিন'শ কোটি লোক বাস করে তাদের মধ্যে অন্ততঃ এক শ কোটি লোক অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায় এবং প্রায় সমসংখ্যক লোক অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে। এর পরেও আছে আশ্রয়-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা ও পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য অগণিত প্রয়োজন।

সম্প্রতি ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ এস চন্দ্রশেখরের সঙ্গে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট জনসনের ভারতে জন-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। সেই আলোচনাকালে ডঃ চন্দ্রশেখর ভারতের জনবৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলেন, ভারতে প্রতিদিন ৫৫ হাজার শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, যার মানে হল—প্রতি দেড় সেকেন্ড অন্তর একটি মানবশিশুর দায়িত্ব নিতে হচ্ছে ভারতকে। প্রতি বছর এক কোটি তিরিশ লক্ষ হারে লোক বাড়ছে ভারতে, যে লোকসংখ্যা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যার সমান। ডঃ চন্দ্রশেখর প্রেসিডেন্ট জনসনকে বলেন, শুধু এই অতিরিক্ত লোকসংখ্যাকে ঠিকমতো মানুষ করে তুলতে হ'লে ভারতের প্রতি বছর দরকার হবে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ২৬ হাজার স্কুল, ৩ লক্ষ ৭২ হাজার শিক্ষক, ২৬ লক্ষ গৃহ, ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ মিটার কাপড়, ১ কোটি ২৫ লক্ষ কুইন্টাল খাদ্য ও ৪৩ লক্ষ ৩০ হাজার কাজ।

১৯৫০—৬৫ সালের হিসাবে দেখা যায়, পনেরো বছরে ভারতের খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে তিন শতাংশ হারে আর লোকসংখ্যা বেড়েছে আড়াই শতাংশ হারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির এই সামান্য আধিক্যও বিগত দুই বছরের খরা ও প্লাবনে লোপ পায়। ফলে ভারতের জনগণের একটি বিরাট অংশকে এখন বিদেশ থেকে আমদানি করা খাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করতে হচ্ছে। কিন্তু বাইরের এই খাদ্য জাহাজ বোঝাই হয়ে আর কতদিন আসবে? পৃথিবীর সব দেশের

লোকই যে এইভাবে বা আরও দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।

ক্যাথলিকদের দেশ লাতিন আমেরিকার কথাই ধরা যাক। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র বাদে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সব দেশকে মিলিতভাবে লাতিন আমেরিকা বলা হয়। এখন লাতিন আমেরিকার লোকসংখ্যা ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ। এরা প্রায় ভারতীয়দের মতোই দরিদ্র ও পুষ্টিহীনতায় দুর্বল। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার মধ্যে লাতিন আমেরিকাতেই এখন লোকবৃদ্ধি ঘটছে সবচেয়ে দ্রুত হারে। এই বৃদ্ধির হার যদি অব্যাহত থাকে, তা'হলে ত্রিশ বছর বাদে লাতিন আমেরিকার লোকসংখ্যা হবে ৬৩ কোটি ৮০ লক্ষ, অর্থাৎ বর্তমান লোকসংখ্যার দ্বিগুণের বেশী। এই কোটি কোটি উদ্বৃত্ত মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'তে পারে এমন অতিরিক্ত ফসল কোথায় ফলে? যে-সব দেশে ফলে তাদেরও লোকসংখ্যা যে বন্যার জলের মতো তর তর ক'রে বাড়ছে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বর্তমান পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিতে যে-সব শিশু জন্মায় তার অর্ধেক ছয় বছর বয়স হওয়ার আগেই মারা যায়। আফ্রিকার অনেক দেশে, যেমন লিবিয়ায়, একটি মায়ের অন্তত পাঁচটি সন্তান হ'লে তবে সে আশা করতে পারে যে অন্তত একটি সন্তান পনেরো বছর বাঁচবে। লাতিন আমেরিকার ব্রেজিলে একশত ভূমিষ্ঠ শিশুর ৪৮টি জন্মের প্রথম বছরেই মারা যায়, আর ৫৩ শতাংশ মারা যায় চার বছর বয়স হওয়ার আগে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৪০ শতাংশ শিশু জন্মের চার বছরের মধ্যে মারা যায়। নানারকম সংক্রামক রোগ এই সব মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ, কিন্তু প্রকৃত কারণ তাদের পুষ্টিহীনতা। পুষ্টির অভাবে অনুন্নত দেশগুলির শিশুরা জন্মের পর কয়েক বছর এমন দুর্বল থাকে যে, হাম, হুপিং কফ, জলবসন্ত প্রভৃতি রোগও তাদের মৃত্যুর কারণ হয়। যারা বেঁচে থাকে তাদেরও কোন বাড়বৃদ্ধি হয় না, বুদ্ধি অপরিণত থাকে। জীর্ণ ভঙ্গুর দেহ নিয়ে তারা সমাজের ভার হয়ে বেঁচে থাকে। এ-ভিটামিনের অভাবে দৃষ্টিহীনতা ভারত ও পাকিস্থানের একটি বড় সমস্যা।

এ-সবের জন্যই পৃথিবীর সব দেশে, এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতেও পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টি এত গুরুত্ব লাভ করেছে। সব দায়িত্বশীল ব্যক্তিই এ-ব্যাপারে একমত যে, সন্তানকে সকল দিক থেকে রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক ক'রে গ'ড়ে তুলতে হ'লে তাদের সংখ্যা অবশ্যই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ক্যাথলিকরাও এ ব্যাপারে ভিন্নমত নন, কিন্তু তাঁদের আপত্তি এজন্য কোন কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করাতে। তাঁরা বলেন, পুত্রার্থেই দাম্পত্য-জীবন এটি সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত ব্যবস্থা। ঈশ্বরের সৃষ্টি-ধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্যই নরনারীর মিলন, আর সে প্রয়োজন সাধিত হ'লেই দম্পতিকে সংযত হ'তে হবে। ঈশ্বর মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন, সংযম দিয়েছেন, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছেন, সেগুলিকে মানুষ যথাযথ প্রয়োগে বিরত থাকবে কেন? বিধাতা নারীকে সন্তানের জন্মদাত্রী ক'রে সৃষ্টি করেছেন, তার ক্ষমতা কৃত্রিম পদ্ধতিতে লোপ ক'রে তাকে ভোগের সামগ্রীতে রূপান্তরিত করার মতো ঈশ্বর-বিরোধী আচরণ ও জঘন্য পাপ আর কি থাকতে পারে?

তত্ত্বকথা আরও বাড়ানো যায়, বলাও হয়েছে অনেক। কিন্তু তাতে যে কাজ হয় না—এ অভিজ্ঞতা এতদিনে সকলেরই হয়েছে, ক্যাথলিকরাও তার ব্যতিক্রম নন। আর সংযম বলতে কি বোঝায়? বছরের মধ্যে তিন শ' চৌষট্টি দিন সংযত থাকলেও ত অবশিষ্ট একদিনের জন্য একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'তে পারে, তার প্রতিকার কি? উচ্চশিক্ষিত, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণ—এমন ব্যক্তিকেও প্রায় বছর বছর নিতান্ত অসহায়ের মতো একটির পর একটি নবজাতককে কোলে তুলে নিতে দেখা যায়। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে রবার্ট কেনেডি যখন আততায়ীর গুলীতে প্রাণ হারালেন, তখন তিনি দশটি ভূমিষ্ঠ ও একটি গর্ভস্থ সন্তানের পিতা। অমন একজন উচ্চশিক্ষিত ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্যনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ক্যাথলিক যাজকদের যে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি, তা নিশ্চয়ই বিশ্বের অবশিষ্ট পঞ্চাশ কোটি ক্যাথলিকের কাছে আশা করা সঙ্গত হবে না।

এটা ক্যাথলিকরাও বুঝতে পেরেছেন। তাই বহু ক্যাথলিক শিক্ষক, চিকিৎসক, নারী আন্দোলনের নেত্রী ও ধর্মযাজক মহামান্য পোপ ও সমগ্র ক্যাথলিক দুনিয়াকে নতুন ক'রে সমগ্র বিষয়টি ভাবতে বলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত ক্যাথলিক চিকিৎসক ও জন্ম-নিরোধক সেব্য বড়ির অন্যতম উদ্ভাবক ডঃ রক 'দি টাইম হ্যাজ কাম' গ্রন্থে সমগ্র বিষয়টির পর্যালোচনা ক'রে ক্যাথলিক দুনিয়ায় আলোড়ন আনেন। সেই আন্দোলনে সাড়া দিয়েই পরলোকগত পোপ ত্রয়োবিংশ জন ১৯৬৩ সালে দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউ-

স্পিসের আহবান জানায়। ক্যাথলিক ধর্ম-জগতে ভ্যাটিকান কাউন্সিলের আহ্বান বৌদ্ধদের মহাসঙ্গীতি আহ্বানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ভ্যাটিকান কাউন্সিল আহূত হয়েছিল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলে পরিবার নিয়ন্ত্রণে ক্যাথলিকদের কিছু করণীয় আছে কিনা তা বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব ৫৬-সদস্য বিশিষ্ট এক যাজক কমিশনের উপর অর্পণ করা হয়।

ঐ কমিশন পাঁচ বছর ধ'রে বিচার-বিবেচনার পর পোপ ষষ্ঠ পলের কাছে যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তার প্রত্যেকটি সুপারিশ অগ্রাহ্য ক'রে পোপ তাঁর ফরমান জারী করেছেন ১৯৩০ সালে পোপ একাদশ পায়াস তাঁর 'ক্রিশ্চিয়ান ম্যারেজ' সম্পর্কিত ঘোষণায় বলেছিলেন—

> Since the conjugal act is destined primarily by Nature for the begetting of children, those who in exercising it deliberately frustrate its natural power and purpose sin against nature... Any use whatsoever of matrimony exercized in such a way that the act is deliberately frustrated in its natural power to generate life is an offence against the law of God and of Nature and those who indulge in such are branded with the guilt of a great sin
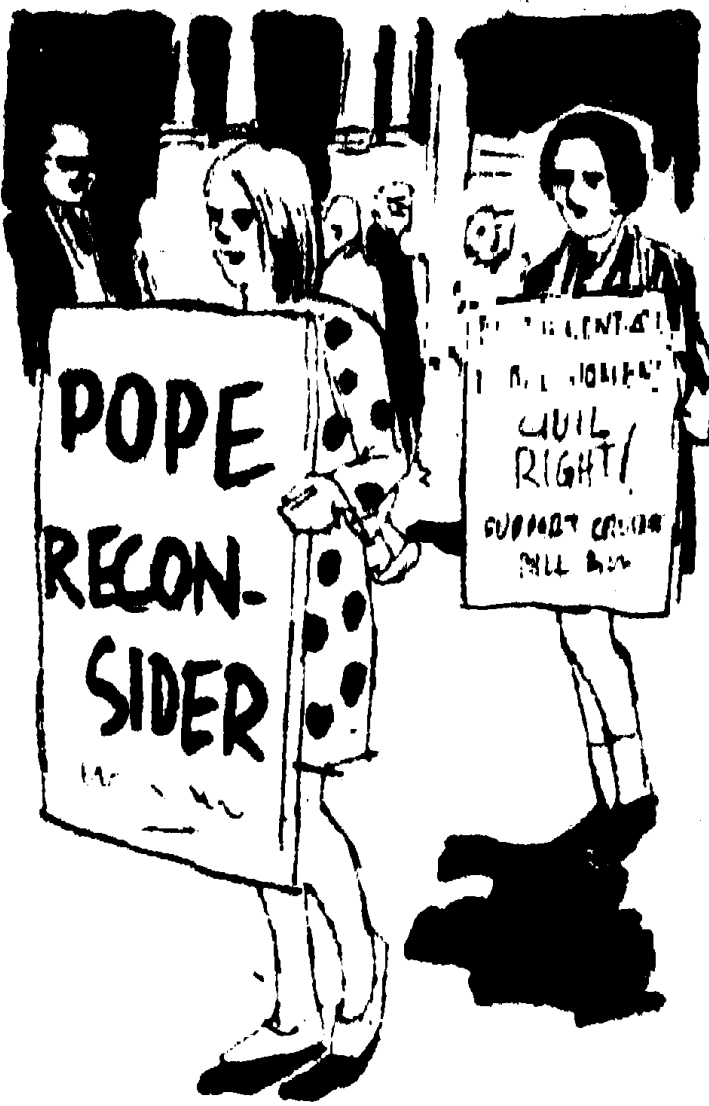
POPE RECON-SIDER

CIVIL RIGHT!

দুর্ভাগ্যের কথা আটত্রিশ বছর বাদে পোপ পল এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

মহামান্য পোপের পক্ষে অবশ্য নতুন কিছু বলা সম্ভবও ছিল না। কারণ বিপরীত কথা বললেও তিনি ক্যাথলিক জগতের একটি বিরাট অংশের সমালোচনার সম্মুখীন হতেন, এবং সে সমালোচনা করতেন তাঁরা যাঁরা তাঁর প্রতি অধিক অনুগত তাঁরা। আর ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক রীতি-নীতির মতো নমনীয় নয় যে, যুগের দাবীতে বা জনমতের চাপে তা পরিবর্তিত হবে। কঠোর রক্ষণশীলতাই ধর্মের প্রাণশক্তি তাই সে ভাঙতে পারে কিন্তু তার নোয়ানো চলে না। তাই বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে যে পোপ আশাতীত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন ক্যাথলিক ধর্মের একটি মৌল প্রশ্নে তিনি ধর্ম-সংরক্ষকের কঠোর রক্ষণশীল, অনুভূতিহীন মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। এর জন্য যে তাঁকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হবে এ তিনি জানতেন, কিন্তু মহামান্য পোপের সম্মুখে দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না।

যাঁরা পোপের সমালোচনায় মুখর তাঁদের প্রধান যুক্তি হ'ল জনবিস্ফোরণ, অর্থনীতি, মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন, সমাজে নারীর পরিবর্তিত ভূমিকা প্রভৃতি কোন কিছু সম্বন্ধেই পোপ চিন্তা করেননি। নারী সম্বন্ধে সম্রাট নেপোলিয়ন ১৮০৪ সালে বলেছিলেন—

> Woman is given to man to bear children, she is ... his property, as the tree is the gardener's.

দেড়শ' বছর বাদেও নারী সম্বন্ধে এই ধরনের ধারণা মহামান্য পোপকে প্রভাবিত করেছে। ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী মার্কিন লেখিকা শার্লোট বিংহাম এই বিষয়টির উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ ক'রে বলেছেন, ভ্যাটিকানের বিচারে 'ফিমেল' ও 'উয়োম্যান' এখনও 'চাইল্ড বার্থ' ও 'সেবার' সমার্থক। জন্মনিয়ন্ত্রণ স্বীকৃতি পেলে নারী পুরুষের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হবে—এই চিন্তা ভ্যাটিকানকে পীড়িত করেছে, কিন্তু অবাঞ্ছিত সন্তান বহনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলে নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা বাড়বে—এ চিন্তা ভ্যাটিকানের মনে স্থান পায়নি। নিউইয়র্কের সেন্ট প্যাট্রিক্স গীর্জার সামনে নারীরা মিছিল ক'রে গিয়ে ধ্বনি তুলেছেন—পোপ পুনর্বিবেচনা করুন, আজকের দিনে জন্মনিয়ন্ত্রণ সকল নারীর মৌলিক অধিকার।

যে-সব ক্যাথলিক ধর্মযাজক পোপের মত পরিবর্তন আশা করেছিলেন, তাঁরা নিরাশ হয়ে বলেছেন, অনেক মধ্যপথ অবলম্বনের সুযোগ পোপের ছিল। গর্ভপাত ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে পৃথক চোখে দেখলেই তার মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কোন কোন পদ্ধতি অনুমোদন করা সম্ভব হ'ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৭২ জন ক্যাথলিক যাজক তো স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, রোমের ধর্মযাজকের ফরমান আমেরিকায় প্রযোজ্য হবে না। সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক যাজক রেভাঃ হানস কুং বলেছেন, এতে আর একবার প্রমাণ হ'ল যে, পোপেরা সর্বদা নির্ভুল নন।

দায়িত্বশীল ক্যাথলিক পিতামাতারা পোপের অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে অনেকদিন আগে থেকেই বিবিধ জন্ম-নিয়ন্ত্রক পদ্ধতির সাহায্য নিচ্ছেন। সুতরাং পোপের সর্বশেষ ঘোষণায় তাঁরা প্রভাবিত হবেন না। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। এতে ক্ষতি হ'ল সেই কোটি কোটি দরিদ্র, অশিক্ষিত, অজ্ঞ নরনারীর, রাষ্ট্রীয় সহযোগ

ছাড়া যাদের এ ব্যাপারে কিছুই করা সম্ভব না। পোপের ঘোষণা ইউরোপ ও আমেরিকার অন্ততঃ পঁচিশটি ক্যাথলিক রাষ্ট্রের শাসক-দের আর একবার হাত-পা বেঁধে দিল। ভারত জাপান প্রভৃতি দেশে আজ যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যাপক জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অভিযান শুরু হয়েছে, সেটা দূর ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না স্পেন, পর্তুগাল, ইতালী বা আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, চিলি, মেক্সিকো প্রভৃতি ক্যাথলিক দেশগুলিতে।

তবু আশার কথা যে, এ ব্যাপারে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের উদ্যোগ ব্যাহত হয়নি। মহামান্য পোপের ঘোষণার পরের দিনই জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এক সভায় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলির দ্রুত উন্নয়নের কর্মসূচীর অংশ হিসাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। আমেরিকা মহাদেশের রাষ্ট্র-সংস্থা ও-এ-এস-এর সেক্রেটারী-জেনারেল গালো প্লাজাও ঘোষণা করেছেন, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে লাতিন আমেরিকার জনগণের দৃষ্টি উন্মোচনের কাজ বন্ধ হবে না।

ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা যাই থাকুক, পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল বিশ্বাসের মানুষের এ উপলব্ধি ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে যে, ভগবানের সৃষ্টি এই বিশ্ব ও তার জীবকুলের নিরাপত্তার জন্যই জন-প্লাবন প্রতিরোধ করা দরকার।

মোহ-অজগর ॥

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

মূঢ় জানীহি ধনসুখতৃষ্ণাং
ইহলোকসিদ্ধিং কথং বিতৃষ্ণাম্
আনয়েবিত্তে তব মতি যান্তাং
প্রাপ্তাধিকং কুরু প্রত্যাশাম্।

মিথ্যা যে সত্য অনিত্য নিত্য—
কে ন জানন্তি সেই মায়াতত্ত্ব?
তারি মাঝে সঙ্গতি-স্বার্থের মওকা—
তরিতে ভবার্ণবে সেই হবে নৌকা।

ধনজনযৌবন-গর্বের স্বর্গে
চলৎ স্খলিতপদে সব অপবর্গে
পরিহরি' কভু হয় সংসার-যাত্রা—
হারাব' কী ইহলোক ভ্রান্তির মাত্রা?

কান্তাপুত্রগৃহানুরক্তঃ
কোঽপি ন তেষাম্ বর্জনে শক্তঃ।
এর চেয়ে সত্য আর কোন্ তত্ত্ব,
পরোক্ষ তথ্যে কেন হ'ব মত্ত?

অঙ্গং গলিতং — শুভ্র এ মুণ্ড
দন্তবিহীনং হয় যদি তুণ্ড,
কেশকৃষ্ণায়নে যৌবন-ভাস্যং
কৃত্রিম দন্তে কৃত্রিম হাস্যম্।

কুঞ্চিতলোচনে মৎসরদৃষ্টি,
রুদ্ধ অন্তরে হিংসার সৃষ্টি,
গুপ্ত কন্দরে কৃত-চক্রান্ত
যদ্যপি নাহি হয়, সে যে মহাভ্রান্ত।

জাগ্রতচিত্তে ভবিষ্যমন্ত্রী—
—উদ্যমী হও যদি জনগণ যন্ত্রী,
বঞ্চনা জাল পাত দিগন্তবিস্তার—
হস্তে তোমার তবে কারো নাই নিস্তার।

মা কুরু লিখনং মা কুরু পঠনং
আরভ নেত্রং সোমরস কারণং
পশ্চাদ্ধাবতু সিনেমানেত্রীং
'ছলাকলা'-নিপুণাং বিশ্ববিজেত্রীম্।

যাবজ্জীবনং তাবজ্জননং
তাবৎ রমণী-অঙ্কে শয়নম্
অন্নং নাস্তি সন্ততি বৃদ্ধি—
কেন তার চিন্তা—সেই তার সিদ্ধি।

কামং ক্রোধং লোভং মোহং
পরিহরি সাজিব কী সংসারে শুধু সং?
রিপুদল রসায়নে অর্জিত বিত্ত
হও সবে আগুয়ান নির্ভর চিত্ত।

অবাধ্য চক্ষু ইক্ষণে ঝলমল
নিষিদ্ধ ভুঞ্জনে অবিরাম চঞ্চল
দুনিয়াকে দিয়ে যাও বেমালুম ধাপ্পা—
বেঁচে থাক, আহা, শুধু লারে লারে লাপ্পা!

যাবৎ তরুণো তরুণী রক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবৎ স্মৃতিসুখাসক্তঃ
'পরমে ব্রহ্মণি' মুলতুবী থাক না—
যতদিন পার, মেল ফুর্তির পাখনা।

বিপুল এ বিশ্বে শক্তির দম্ভ—
মায়া তারা বনিয়াদ মোহ তার স্তম্ভ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
কস্যাপি নাস্তি ইথং শোকঃ।

উজ্জ্বল জীবনের উদ্দাম ছন্দ
স্তম্ভিত হবে কেন এই প্রাণ-স্পন্দন?
উল্টো কথা যে কেন বলে মোহ-মুদ্গর-
নিরবধি জড়ায়ে ধর মোহ-অজগর!

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কি করছেন এখন গানাদো? কোথায় এখন তিনি?

আর কোথাও নয় হুয়াইনা কাপাকের প্রেতপ্রাসাদেই তখনও তিনি আছেন। আছেন নিজের ইচ্ছাতেই। কোনো কিছুরই সঠিক খবর না পেয়ে এ অবস্থায় কি তাঁর করা উচিত তখনও স্থির করে উঠতে পারেন নি বলেই প্রেতপ্রাসাদ ছেড়ে বার হতে তিনি দেরী করেছেন।

আগেই প্রেতপ্রাসাদ থেকে বার হওয়া খুব কঠিন হয়ত তাঁর পক্ষে হত না।

এসপানিওল সওয়ারদের চড়াও হওয়ার দরুণ সূর্যবরণ প্রান্তর ফাঁকা হয়ে যাবার পরও হুয়াইনা কাপাকের রক্ষীরা কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করেছে।

রেইমীর উৎসবের সারা সপ্তাহের মধ্যে ইংকা নরেশের রাজবেশে সজ্জিত শবদেহ সূর্যবরণ প্রান্তর থেকে সরাবার কোনো নজির তাদের ইতিহাসে নেই বলেই তারা যে কোনো মুহূর্তে বিদেশী শত্রুরা সব লুটপাট করতে পারে বুঝেও শব-সভা ভেঙে প্রেতপ্রাসাদে ফির যেতে প্রথমটা চায় নি। কিন্তু কোথায় তার উৎসব!

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক উমুর দেখা নেই।

রেইমীর উৎসবের যারা প্রধান পান্ডা কোরিকাঞ্চার সেই ছোট বড় পুরোহিতদেরও প্রান্তর ছেড়ে চলে যেতে দেখবার পর আর দ্বিধা না করে ইংকা নরেশের শবদেহের সঙ্গে শব-সভার আর সব উপকরণ সাজসজ্জা প্রেতপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা [illegible]।

গানাদো ইচ্ছে করলে সে সময়ে হয়ত নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন।

কিন্তু ব্যাপারটা নিঃশব্দে সারা যেত না। হুয়াইনা কাপাকের নব জাগরণের কোনো তাৎপর্যও দেওয়া যেত না সে ঘটনায়। অস্বাভাবিক যে চাঞ্চল্য তাতে সৃষ্টি হত তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির তা বাধা হতে পারত।

গানাদো তাই শবদেহের মতই নিথর নিস্পন্দ হয়ে হুয়াইনা কাপাকের রক্ষীদের তাঁকে ভক্তিভরে বয়ে নিয়ে যেতে দিয়েছেন।

নিথর নিস্পন্দ তিনি তখন অবশ্য শুধু দেহে। মনের ভেতরটা তাঁর তুফানের সমুদ্রের চেয়ে অস্থির।

ঘটনা কোথায় কি ঘটেছে তার বিন্দুমাত্র আভাস না পাওয়ার জন্যেই তাঁর উদ্বেগ দুর্ভাবনা আরো বেশী। সত্যি কথা বলতে গেলে সব কিছুই এখন তাঁর কাছে হেঁয়ালি।

কাক্সামালকা থেকে সোরাবিয়ার এসপানিওল সওয়ার দল নিয়ে কুজকো পর্যন্ত হানা দেওয়ার লক্ষ্য যে তিনি একটু বুঝলেও কেমন করে এমনসব যোগাযোগ সম্ভব হল তা তিনি ভেবে পান নি।

সোসার খবরের জন্যেই তাঁর আকুলতা উদ্বেগ সবচেয়ে বেশী।

কি হয়েছে সোসায়?

যেখান থেকে একটা বিস্ফোরণ সমস্ত পেরুকে কাঁপিয়ে তুলবে সে সোসা হঠাৎ যেন পেরুর মানচিত্র থেকেই মুছে গেছে।

একটা সামান্য সাড়াশব্দও সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক উমু ব্যস্ত হয়ে সেখানে ছুটেছেন। সে ছোটার কারণটা অতি স্পষ্ট।

গানাদোকে ধরতে না পেরে আর 'কয়া'রও কোনো সন্ধান না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি সোসা ছুটে গেছেন হুয়াসকারকে মুক্ত করার সমস্ত আয়োজন পন্ড করার জন্যে।

কিন্তু কয়া যদি সেখানে পৌঁছোতে পেরে থাকে তাহলে রাজপুরোহিতের সাধ্য কি যে গানাদোর সাজানো চাল এক চুল এদিক ওদিক করেন।

কয়া অবশ্য যদি বিফল হয়ে থাকে.....

ভাবতেই শিউরে ওঠেন গানাদো।

কিন্তু কয়া বা ভিলিয়াক উমু একজন ত' সফল হবেই। হয় মুক্ত হুয়াসকার না হয় সাফল্যগর্বিত ভিলিয়াক উমুকে ত দেখা যাবে কুজকোর সূর্যবরণ প্রান্তরে রেইমী উৎসবের প্রথম শুভ লগ্নে!

রেইমী উৎসবের প্রথম দিনের সূর্য পশ্চিমে ডুবতে চলেছে তবু সোসা থেকে দুপক্ষের কারুরই কোনো বার্তা এসে পৌঁছয় নি।

কি এমন সোসায় ঘটে থাকতে পারে যা সেখানকার এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক নীরবতা সম্ভব করে তুলেছে?

কয়ার ভাবনাতেই সবচেয়ে কাতর হয়ে ওঠেন গানাদো।

কন্যাশ্রমের অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের আড়ালে সূর্যসেবিকারূপে বাইরের সংসারের সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ পরিচয় যার হয়নি সেই অবলা অসহায় সদ্যকৈশোর পার হওয়া একটি

তাকে তিনি অসাধ্যসাধন করতে পাঠিয়েছেন।

না পাঠিয়ে অবশ্য উপায় ছিল না।

কিন্তু ব্যর্থ যদি সে হয়ে থাকে তাহলে যে অবস্থা তার হয়েছে তা অত্যন্ত শোচনীয় বললেও কিছুই বলা হয় না।

সে অবস্থা যদি তার হয়ে থাকে তাহলে প্রতিকারে কিছুই অবশ্য করা গানাদোর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু নিশ্চেষ্ট নির্বিকার হয়ে এই কুজকো শহরে আটকে থাকার যন্ত্রণা যে অসহ্য।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবার আগেই প্রেতপ্রাসাদের প্রহরীরা ইংকা নরেশের শবদেহের সমস্ত পরিচর্যার ব্যবস্থা করে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। একজন প্রহরীর রাত্রের জন্যও এ প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত থাকবার কথা। কিন্তু এ নিয়ম নিষ্প্রয়োজন বলেই আর পালিত হয় না।

গানাদো প্রেতপ্রাসাদ থেকে বার হবার জন্যে তৈরী হয়েছেন। তৈরী হবার আর কি আছে? এ প্রেতপ্রাসাদে লটবহর নিয়ে ত আর ঢুকতে পারেন নি। কাক্সামালকা থেকে বার হবার সময়ই এসপানিওল সৈনিকের ধরাচূড়ার সংগে খাপেভরা তলোয়ারও সেখানে ফেলে আসতে হয়েছে।

সংগে যা নিতে পেরেছিলেন তা একটা ছোরা আর তার চেয়েও যা দামী সেই এক-প্রান্তে ফুটো করা পাথরের ছোট গোলা পরানো আশ্চর্য দড়ির অস্ত্র. 'বোলাস'।

এই প্রেতপ্রাসাদে গোপনে আশ্রয় নেবার সময়ে পেরুবাসীর সাধারণ পোষাক বাদে সেই 'বোলাস' আর ছোরাটাই সংগে এনে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। সেই লুকোনো সম্বল বার করে এনে বাইরে যাবার জন্যে ইংকা নরেশের রাজবেশ ছেড়ে সাধারণ পোষাক পরতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন গানাদো।

বাইরে কিসের একটা গন্ডগোল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রেতপ্রাসাদের এ এলাকা একান্ত নির্জন ও নিস্তব্ধ। এ দেশের কেউ এ এলাকার পবিত্র নির্জনতা ও স্তব্ধতা সহজে ভংগ করে না।

এ ধরনের অস্বাভাবিক গোলমালে তাই বিস্মিত হয়ে গুপ্ত ছিদ্রপথে গানাদো বাইরে কি হচ্ছে দেখতে গেছেন।

যা দেখেছেন তাতে একটু অস্বস্তিই বোধ করেছেন।

এ সেই এসপানিওল সওয়ারদের নিরীহ নিরস্ত্র কুজকোবাসীদের তাড়া করে প্রথম প্রেতপ্রাসাদের খোঁজ পাওয়ার ঘটনা।

তখনও সন্ধ্যা ভালো করে নামেনি।

বাইরের আলো ম্লান হয়ে এলেও তারই মধ্যে এসপানিওল সওয়ারেরা যে একজন কুজকোবাসীকে ধরে পাহাড়ের গায়ে বসানো প্রেতপ্রাসাদের দরজার রহস্য জানবার চেষ্টা করছে তা তিনি বুঝেছেন।

কুজকোবাসীর কাছে কিছু জানতে না পারলেও নিজেদের কৌতূহলে ও লুঠের লোভে সওয়ার সৈনিকরা দরজার ওধারে কি আছে সন্ধান করবার চেষ্টা করতে পারে বলে গানাদোর সন্দেহ হয়েছে।

সাধারণ এদেশী পোষাক তখন পরা হয়ে গিয়েছিল। লুটেরা সওয়াররা হয়ত তখনই হানা দিতে পারে। পোষাক বদলাবার সময় সুতরাং আর নেই। সে ঝক্কি না নিয়ে গানাদো যা পরেছিলেন তারই ওপর ইংকা নরেশের শবদেহের রাজবেশ তাড়াতাড়ি চাপিয়ে রাজপালঙ্কে গিয়ে মমির মত শয্যা নিয়েছেন।

সেপাইরা যদি কোনো কারণে সন্দেহ করে ইংকার শবদেহের রহস্য ধরে ফেলে, তাহলে সে চরম সংকটে ব্যবহারের জন্যে হুয়াইনা কাপাকেরই মণিমাণিক্যখচিত তরোয়ালটা শুধু লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন শয্যার ভেতরে।

সওয়ার সেপাইরা শেষপর্যন্ত সাহস করে অবশ্য পাহাড়ের গায়ে বসানো রহস্যময় দরজা ঠেলে ভেতরে যেতে সাহস করে নি। কিছুক্ষণ বাদে বাইরে তাদের গোলমাল থেমে গেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেও গানাদো তবু নিশ্চিন্ত হয়ে প্রেতপ্রাসাদ ছেড়ে তখনই বার হওয়া সমীচীন মনে করেন নি।

সওয়ার সৈনিকদের ভয়েই যে তিনি বার হতে দ্বিধা করেছেন তা নয়। দরকার হলে একসংগে ওরকম কয়েকজন সওয়ারের মওড়া নেবার ক্ষমতা তিনি রাখেন।

কিন্তু এখন তাঁর যা উদ্দেশ্য তা সিদ্ধ করতে হলে সবার আগে দরকার সম্পূর্ণ গোপনতা।

বীরত্ব দেখাতে গিয়ে তাঁর পরিচয় জানাজানি হয়ে গেলে তিনি যা করতে চান তার সব আশা এখানেই নির্মূল হয়ে যাবে।

ভীরুর মতই অতি সাবধানে সওয়ার সৈনিকদের চোখে পড়বার বিপদ সম্পূর্ণ কেটে যাবার জন্যে ধৈর্য ধরে তিনি অপেক্ষা করেন। লুঠের নেশায় মত্ত এইসব পাষণ্ড এসপানিওলদের কোনো বিশ্বাস নেই। এক-বার ভয় পেয়ে এ অঞ্চল ছেড়ে গেলেও

আবার দল ভারী করে খেয়ালের মাথায় এখানে হানা দিতে তারা আসতে পারে!

তখন তাদের সামনে পড়তে পানালো চান না।

একটু বেশী রাত হবার জন্যে তাই তিনি অপেক্ষা করলেন। রাতের অন্ধকারে সব দিক দিয়েই তাঁর সুবিধে।

শুধু যে এসপানিওল সেনারা তখন পাহারা আর সুরা নিয়ে মেতে থাকবে তা নয়, আঁধারে আঁধারে কুজকো ছেড়ে সৌসার পথে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়াও তাঁর পক্ষে সহজ হবে।

পানালো যা আশা করে অপেক্ষা করেছেন ঘটনা ঘটেছে ঠিক তার বিপরীত।

রাত গভীর হলে প্রেতপ্রাসাদ ছেড়ে বার হওয়া তাঁর পক্ষে নিরাপদ হবে ভেবেছিলেন পানালো।

সেই অনুমানে রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হবার পর প্রেতপ্রাসাদের দরজা তিনি যখন খুলতে যাচ্ছেন হঠাৎ সেই মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠেছে চারিধারের নিস্তব্ধ অন্ধকার প্রান্তর লুব্ধ হিংস্র সওয়ার সৈনিকদের চিৎকারে আর ঘোড়ার পায়ের শব্দে। সেই সঙ্গে বহু মশালের কম্পিত শিখার আলো ঈষৎ খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে যেন ভয়ঙ্কর কোন অশুভ সম্ভাবনার ছায়া কাঁপিয়েছে ভেতরের দেয়ালে। (ক্রমশঃ)
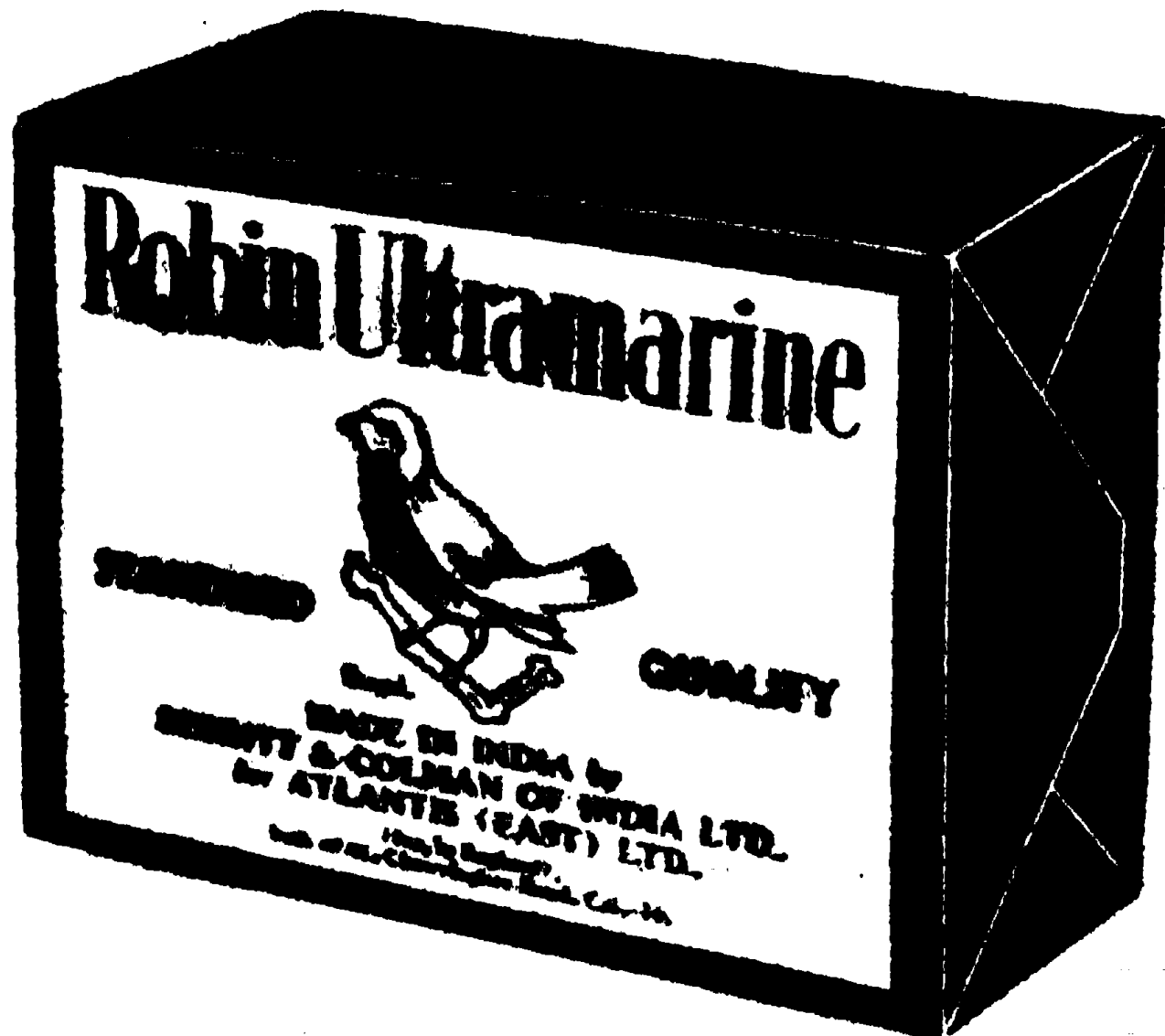
অঙ্গনা / পাহাড়ী কন্যা

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। আর স্বপ্নে ঠিক হাজির হয়েছি সেই ভাবনার রাজ্যে। অনেক নীচু থেকে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের রাজ্যে পৌঁছুতে পেরে তখন আমার সে কি আনন্দ। প্রাথমিক আনন্দের ঘোরে গোটা পাহাড়ী এলাকা এক মুহূর্তে চষে ফেলবো মনে করেছিলাম। কিন্তু চড়াই-উৎরাই করতে করতেই পা ধরে এলো, বেশ কিছুটা হাঁপিয়ে পড়লাম। রাস্তার ধারে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছি একটু জিরিয়ে নেবার মতলবে।

এতক্ষণ লোকজনের প্রতি বিশেষ নজর ছিল না। পাহাড়ের পথঘাট নিয়েই তন্ময়। এবার একটু স্থির হয়ে দাঁড়াতেই দেখি গায়ে চাদর জড়ানো সুন্দর একটি মেয়ে আমার দিকেই আসছে। মেয়েটি বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে, পাহাড়ী দেশে আমি আগন্তুক। সাহায্যের মনোভাব মেয়েটির চালচলনে অত্যন্ত স্পষ্ট। আমি আরো বেশি উৎসাহিত হলাম।

সে কাছে এসেই অতি বিনীত ভঙ্গিতে বললো, আপনি বুঝি পাহাড় দেখতে এসেছেন? অ এখানে দাঁড়িয়ে কেন, আসুন আমার সঙ্গে। এই পাহাড়ী রাজ্যে আপনি আমাদের অতিথি। আপনার দায়িত্ব আমার উপর পড়েছে। চলুন ঘুরে ঘুরে সব দেখা যাক।

কথায় কথায় জানতে পারলাম স্থানীয় এস-ডি-ও অফিসের টাইপিস্ট। তা ছাড়া সে পড়াশোনাও করে। সম্প্রতি এখানে একটি কলেজ হয়েছে। সেই কলেজে মেয়েটি সাহিত্যের ছাত্রী। মা-বাবা তার সমস্ত খরচ কুলিয়ে উঠতে পারে না। তাই সে চাকুরি নিয়েছে। আরো জানা গেল যে, বহু মেয়েই এরকমভাবে পড়াশোনা করছে। কলেজেও বেশ সুবিধা আছে। দিনের বেলা অনেকেই কাজকর্ম করে তাই এখানে কলেজ বসে সন্ধ্যে বেলায়। এতে অনেকে পড়ার সুযোগ পায়। তারপর মেয়েটি অনুযোগের স্বরে জানায়, আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা সুবিধের নয়, এতদিন আমাদের এদিকে নজর ছিল না। বর্তমানে সরকারী সাহায্যে কেউ কেউ নিজেদের অনেকটা স্বাবলম্বী করতে পেরেছে।

পরিচয়ের গোড়া থেকেই মেয়েটির [illegible] অভিজ্ঞতা [illegible]

গিয়েছিলাম। এবারে মর্মোদ্ধার করতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। ওদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহে সত্যি খুশি হই। আচমকা এরকম একটা সুযোগ না মিললে হয়তো অনেক কিছুই অজানা রয়ে যেত।

মেয়েটির সঙ্গে হাঁটছি। গল্পচ্ছলে সে নিজেদের সমাজের অনেক কথা আমাকে জানাচ্ছিল। আমিও কৌতূহলভরে শুনছি। পাহাড়ী উপজাতির অনেকেই মাতৃ-প্রধান জাতি। তাই সংসার চালানোর যাবতীয় ঝামেলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদেরই বইতে হয়। পুরুষেরা অনেকটা এগিয়ে এসেছে আজকাল। তবু জীবিকার প্রশ্নে মেয়েরা অগ্রাধিকার পায়।

হঠাৎ আমার নজর স্থির হলো কয়েকজন মহিলাকে কেন্দ্র করে। একসঙ্গে তারা চলেছে. সকলের পিঠে বেশ বড়সড় একটা ঝুড়ি ভর্তি কাঠ। আমায় কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখেই মেয়েটি বললো, অনেক দূরে দূরে বন থেকে এই কাঠ এরা নিয়ে আসে। এগুলো জ্বালানী কাঠ। এখানে কয়লার ব্যবহার কম। কাঠই এখানে প্রধান জ্বালানী। এরা এই কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে বিক্রির জন্য। এভাবেই এরা নিজেদের সংসার চালায়। কাঠ বিক্রি করে সেই পয়সায় সওদা সেরে সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ি ফেরে। শুধু কাঠ বিক্রি নয়, এভাবেই তারা সওদা করে ফেরে পল্লীতে পল্লীতে এবং হাটে বাজারে।

পাহাড়ী দেশে হাট এক অপরূপ দৃশ্য। সকাল থেকে সার বেঁধে মেয়েরা নানা পণ্যসামগ্রী নিয়ে এসে জড়ো হয়। তারপর শুরু হয় বিক্রির ধুম। সব ব্যাপারেই মেয়েরা প্রধান। আনাজ-তরকারি থেকে শুরু করে হরিণের মাংস পর্যন্ত সবকিছুর ব্যাপারী মেয়ে। হাটবার ছাড়া এমনি দিনেও ওরা মাংস বেচে ঘুরে ঘুরে। আবার কখনো নিয়ে আসে ঝুড়ি বোঝাই কমলালেবু। এমনিভাবে চলে ওদের নির্দিষ্ট জীবিকায় অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ।

মেয়েটির স্বর ঈষৎ ভারী শোনায়। চমকে তাকাই। আমার দিকে চোখ পড়তেই ও সহজ হওয়ার চেষ্টা করে। বুঝতে পারি, অনেক অভিমান লুকিয়ে আছে এই চোখের কোণে। ওরা মনে করে অনেক সুযোগ-বঞ্চিত হয়ে বেঁচে আছে ওরা। কিন্তু যতদূর জানি স্বাধীনতার পর ওদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে বিস্তর। আর এব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থা মোটামুটি পর্যাপ্তও। তবে কেন এই অভিযোগ?

চিন্তাটা বেশিদূর চালাতে পারলাম না। মেয়েটি আবার মুখর হলো। পাহাড় আমাদের কল্পনার সামগ্রী। এখানে এলে সবাই মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। কিন্তু এজীবন কোথাও কোথাও এমন কষ্টকর যে কল্পনাতীত। পরিশ্রমের বিনিময়ে এরা জীবনকে সহজ আনন্দে গ্রহণ করেছে। পাহাড়ে পানীয় জলের ভীষণ অভাব। তাই খাবার জলের জন্য এদের কষ্ট স্বীকার করতে হয় অনেক। দূর দুরান্ত তোলপাড় করে ফেলে এরজন্য। তারপর কোথাও সন্ধান পেলেই হলো, দলে দলে সবাই সেখানে গিয়ে ভিড় করে। সে দৃশ্যও বেশ মনোরম।

আমরা জল আনি কলসী কাঁখে। এটাই আমাদের চিরাচরিত নিয়ম। এরা কিন্তু কলসী কখনো কাঁখে করে না। জল ভর্তি কলসী এরা ঝুড়িতে করে নিয়ে আসে। অনেক দূরের পথ থেকে জল নিয়ে আসে। কিন্তু অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর এরা ক্লান্তির কাছে মাথা নোয়াতে রাজী নয়। তাই পথের ক্লান্তি উপেক্ষা করে ঘরে ফেরার পথে এরা সবাই মিলে গান ধরে। ভর্তি কলসীর জল চলকে ওঠে। রক্তে যেন উন্মাদনা জাগে। পা চলে দ্রুত। এসময় ঘর ছেড়ে থাকতে মন মানে না। কলস ভর্তি জল আর মন ভর্তি আনন্দ নিয়ে ডেরায় ফিরে ওরা আনন্দের তুফান তুলবে। হারিয়ে যাবে আদিম জীবনের অস্বচ্ছ গভীরতায়।

মেয়েটি তখনও আমার সঙ্গে। সবকিছু দেখিয়ে-শুনিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সে স্বেচ্ছায় নিয়েছে। আর আমি আনন্দে ডগমগ হয়ে সব ঘুরে দেখছি। হাঁটতে হাঁটতে যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ছি তখন এক-আধবার জিরিয়ে নেবার জন্য কোথাও একটু থামছি।

বেলা পড়ে এসেছে। বেশ একটু শীত শীত করছিল। সঙ্গী মেয়েটি তা বুঝতে পেরে আমাকে আমন্ত্রণ জানালো ওদের বাড়িতে। এরকম অপ্রত্যাশিত সঙ্গলাভ এবং সর্বোপরি এই আমন্ত্রণের আন্তরিকতায় আমি বেশ কিছুটা অভিভূত। বেশ খুশি মনেই ওর সঙ্গে চলেছি। বেশ খানিকটা রাস্তা পার হয়ে এসে দাঁড়ালাম একটা ঢিবি মতন জায়গায়। মেয়েটি আঙুলে দিয়ে নীচে দেখালো ওদের বসতি। ওখান থেকে ছোটখাট একটা পাহাড়ী বস্তির রূপ প্রত্যক্ষ করে আরো অবাক লাগলো। ঠিক যেন সুদক্ষ চিত্রকরের আঁকা একটি সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ। তাড়াতাড়ি নীচে নামছি। মেয়েটি আমার হাত ধরে নামতে সাহায্য করলো। টিনের ছাউনি দেওয়া ছোট্ট ঘরটায় এসে ততক্ষণে পেঁৗছে গেছি। সাজানো গোছানো ছিমছাম পরিবেশ। ওর মা মধুর হাসিতে আমাকে আপ্যায়ন করলেন।

একটু পরেই তিনি চা নিয়ে আবার ঢুকলেন। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে তখন আমার শীত অনেকটা কমে গেছে। চায়ের পরে দিলেন তাম্বুল। কাঁচা সুপারি সম্বন্ধে আগেই সতর্ক ছিলাম। পান খেয়ে দু-একবার পিক ফেলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। এদের সরল আতিথেয়তায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

কিন্তু পাহাড়ের অধিবাসীদের সম্বন্ধে তখনো আমার অনেক কিছু জানার বাকি। তাই ব্যস্ত হই। কিন্তু চোখের সামনে তখন আর এক বিস্ময়কর দৃশ্য। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক বৃদ্ধা এসে উঠোনে তার ঝুড়িটা রাখলেন। দেখেই বুঝতে পারা যায় তার বয়েস আশী পেরিয়ে গেছে। তবু তাকে বেরুতে হয় উদরান্নের সংস্থানের জন্য।

মেয়েটির কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম। সে জানাল, বৃদ্ধা ওর ঠাকুরমা। ওদের অবস্থা খুব খারাপ। তাই এই বৃদ্ধাকেও

চেষ্টা করতে হয় কিছু উপার্জনের। সে আরো জানাল যে, এ শুধু তাদের কথা নয়, প্রায় বাড়িতেই একরকম অবস্থা। সবাইকে খেটে খেতে হয়। কারো বসে থাকার উপায় নেই। বয়স এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কারণ, বাঁচার আর কোন রাস্তা নেই।

পাহাড়ে এসে আমাদের কত না আনন্দ। কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাপন রীতিমত কষ্টকর। বরং বলা চলে যে হাজারো প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেই এরা বেঁচে আছে। কিন্তু সংগ্রামের জটিল পরিস্থিতিতেও এরা হার মানেনি। তাই সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও নাচ-গানে এরা জীবনকে ভরিয়ে দিতে জানে।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এবার আমি উঠবো। সেরকম তোড়জোড় করছি। বন্ধুর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বন্ধু বললো, আজ আমার কলেজ নেই। গানের আসরে যাওয়া যা'ক চল। সে আমন্ত্রণকে ফেরাতে পারলাম না। এসে হাজির হলাম গানের আসরে।

সে একটা ছোটখাটো মজলিস বললেই হয়। পাহাড়ের এক ধারে অনেক ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে বসে গাইছে। উজ্জ্বল চাঁদনী রাতে খোলা আকাশের নীচেই বসেছে মজলিশ। এরই মধ্যে কয়েকজন মেয়ের সাজগোজ আমার দৃষ্টি কেড়েছে। তাদের পোশাক অনেকের তুলনায় বেশ ফিটফাট। সেইসঙ্গে আছে অলঙ্কার। গলায় ভিক্টোরিয়ার আমলের টাকার হারেও তারা অন্যদের তুলনায় পৃথক। গহনার এই প্রচলন পার্বত্য কন্যাদের মধ্যে খুব বেশি। এদিয়ে তারা হয়তো পুরোনো দিনের বেশ অনুভব করে।

গানের আসর ভাঙ্গতে সেদিন কিছু দেরী হলো। এরকম গানের আসর নাকি ওদের প্রায়ই বসে। ওদের গান আমার ভাল লেগেছে। সমান ভাল লেগেছে ওই মেয়েদের গয়না—যা কিনা ক্রমেই হারিয়ে যাওয়া অতীতকে ধরে রাখার চেষ্টা বলে আমার মনে হয়। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো ওদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। শোনা ছিল, তরুলতা পর্বত থেকে রস আহরণ করে বেঁচে থাকে। এখানে এসে দেখলাম কথাটা এখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য।

ঘুম ভাঙ্গালো। চোখ মেলে দেখি সকালের রোদ জানালা দিয়ে ঘরে লুটোচ্ছে।

ফটো : মানসরঞ্জন কুণ্ডু চৌধুরী —প্রমীলা

জানবাজারের অলকা

রাতের শহর

একটা বিষিয়ে ওঠা নেশার মতো আমাকে পেয়ে বসেছিল অলকা। জানবাজারের অলকা।

আমার বাড়ী পূর্ববাংলার ফরিদপুরে। সেখানকার ঈশান স্কুলে পড়ার সময় খুব মাখামাখি হয়েছিল ট্যাপাখোলার হাট-বাবুর ছেলে পরভেজের সঙ্গে। দীর্ঘ পনের বছর পর, এম-এ পড়ার সময় ঘটনাচক্রে আবার সেই কৈশোর-সুহৃদের সঙ্গে দেখা। পরভেজ তখন ইসলামিক হিস্ট্রি নিয়ে পড়ছে। নতুন করে আলাপ হওয়ার পর স্মৃতির সুড়ঙ্গ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুজনেই সেই প্রায়-বিস্মৃত পুরোনো সম্পর্কের যখন হদিশ পেয়ে গেলাম, পরভেজের আনন্দ তখন রোখে কে? ওর চোখ-মুখ পদ্মাপারের ইলিশের মতো চকচক করে উঠেছিল—দুই গৌর, বলিষ্ঠ হাত সাঁড়াশি হয়ে আমার রুগ্ন শরীর পিষে ফেলেছিল।

ওর আন্তরিক আমন্ত্রণে দিন-দুয়েক পরই জানবাজারে গেলাম। সেখানে মামাবাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করে পরভেজ। দোতলা বাড়ীর ছাদের ওপর একটি ঘর—চিলে-কোঠাও বলা যেতে পারে। পরভেজের থাকা শোয়া পড়ার আস্তানা। অবশ্য পায়চারির জন্য হাট হাট ক'রে খোলা বড়ো ছাদ—সন্ধেবেলায় বাতাস দিলে যেন ময়দান ছুটে আসে। সন্ধ্যায় বেড়াতে এসে পরভেজের অনুরোধ-উপরোধে কখনো রাতটা কাটিয়ে যেতাম। মাঝ রাত্তিরে চারপাশের জলরঙা অন্ধকারে ফুলের মতো ফুটে উঠতো পরভেজের উদাত্ত গলা, 'নিশীথ রাতের প্রাণ'।

আর প্রায় একই সঙ্গে, পেছনের বাড়ীর দোতলার লম্বা গরাদ-দেয়া জানালায় পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াত একটি যুবতী। ছাদের আলসের এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখেছি, কি উৎকর্ণ ভাবে পরভেজের গানের প্রতিটি শব্দের জন্য সে তার শ্রবণ মেলে দিত। ঝাঁপিয়ে পড়া খোলা চুলের সিল্যুটে তার মুখের আদল ঠিক বোঝা যেত না—গান শেষ হয়ে গেলেও অনেকক্ষণ ভূতগ্রস্থের মতো দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের এক কোণে ঝোলানো বড়ো আয়নার কাছে গিয়ে একটি মৃদু শক্তির বাল্ব জেলে দিত।

আমি চুরি করে দেখতাম, কিছুতেই সামলাতে পারতাম না নিজেকে। নম্র আলোর রঙীন কুয়াশায় সে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে মুখে ক্রিম ঘষতো, ব্লাউজ-বডিজ খুলে সযত্নে পাট করে আলনায় রাখতো, একসময় তার সারা শরীর পেঁচিয়ে থাকা শাড়ীটি গোড়ালির কাছে ঝুপ করে পড়ে যেত। আবক্ষ নগ্ন, আয়নার সামনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত নিজেকে, সতেজ দেহ-ভঙ্গিমায় নানা অপরূপ মুদ্রা তুলে। সনাক্ত শেষ হলে শায়ার ফাঁস খুলে বুকের ওপর তুলে শায়াটি বাঁধতো। শুধু দেখা যেত রাজহাঁসের গ্রীবার মত দুটি উন্মুক্ত বাহু, পিঠ ও কন্ঠমূলের পুরন্ত ভাঁজ, আর হাঁটুর নীচ থেকে পদতল পর্যন্ত দুটি সতেজ পা। মন্ত্রচালিতের পায়ে সারা ঘর সে হেঁটে বেড়াত, হয়তো গুন-গুন গান গাইত ও অবাধ্য এলোমেলো চুলের বন্যাকে দুই বিব্রত হাতে বেনীর শাসনে নিয়ে আসত। পরভেজ যখন ঘুমের সাতলীপ জলের তলে চলে গেছে, উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দুই জ্বলে যাওয়া চোখ টান টান মেলে আততায়ীর মতো সতর্কতায় লক্ষ্য করতাম, মন্থর পায়চারির ছন্দে ছন্দে শায়ার নরম আবরণের ভেতর থেকে কিভাবে জাগ দিয়ে উঠছে যুবতীর বিপুলা নিতম্বের সুঠাম ব্যাপ্তি, চরুকটান গড়ন, উজ্জ্বল বাতিদানের মত গলা। ঐ দোলানির পরতে পরতে আমার দৃষ্টি ফাঁদ হয়ে জড়িয়ে যেত।

জব্বর নেশা ধরে গেল আমার। প্রায় প্রতি সন্ধেতেই চলে আসতাম পরভেজের বাড়ী। ছল-ছুতোয় রাত কাটিয়ে যেতাম। আর, রাত ঘন হলেই লঘু পায়ে এসে দাঁড়াতাম আলসের নির্দিষ্ট কোণটিতে। লেখা-পড়া মাথায় উঠেছিল, দিন-রাত এক আশ্চর্য প্রদাহে ঝাঁঝরা হয়ে আসছিল শরীর। পরভেজ কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিল। এবং ধরে ফেলার পর থেকেই আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কের স্বাভাবিকতায় অনিবার্যভাবে ধ্বস্ নেমে এলো, নিজের থেকে কখনোই আমাকে আর আসতে বলত না। কারণ, এটা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ওর সঙ্গে সময় কাটানোর দুর্লভ আনন্দ পাওয়ার জন্য আমি জানবাজারের এই ছাদে রাতের পর রাত দাঁড়িয়ে থাকি না। অবশেষে, একরাতে ঘুম ভেঙে পরভেজ আমাকে যথারীতি দন্ডায়মান দেখে ছমছমে

গলার ভাঙ্গা, যা প্রায় বন্দুকের মতো শোনালো। ‘যরে আয়’। একটু লজ্জিত হয়ে ওর পিছু পিছু ঘরে গিয়ে বসলাম। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে দু-চারটে হুস-হুস টান মেরে পরভেজ একসময় বলল, ‘তুই গরীব রে অমিত। আমার বলতে খারাপ লাগছে, তোর-ও শুনতে খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু না বলে উপায় নেই। তুই আর কোনদিন আসিস না।’

আমি তখন কান্ডাকান্ডজ্ঞানহীন। পরভেজের ওপর দুর্জয় অভিমান বুকে নিয়ে ঐ নিশুতি রাত্রেই ওর কোন অনুরোধ না শুনে দু লাফে সিঁড়ি টপকে নিচের দরজা খুলে গলিতে এসে পা দিলাম। পাছে পরভেজ পেছনে আসে, দ্রুত পা চালিয়ে এ-পথ ও গলি হেঁটে বাস-গুমটির খোপের নিচে দাঁড়িয়ে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

পরের দিনটা বাড়ীতে বসেই কাবার করলাম। তার পরের দিনও কিন্তু অষ্ট-প্রহর সারা বুক আঁচড়ে খিমচে খেতে লাগল এক অদৃশ্য বজ্রকীট, সারারাত ধরে কাছের জোড়-গীর্জার ঘণ্টা কামানের গোলা দাগতে লাগল কানে। তৃতীয় দিন আর নিজেকে আটকে রাখতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, সূর্য ডোবার আগেই যদি পরভেজদের বাড়ীতে পৌঁছতে না পারি, সমস্ত কলকাতা শহর নীলাম হয়ে যাবে। দামি ব্লেডে দাড়ি কামিয়ে, বিলিতি আফটার শেভিং লোশনে মুখ ধুয়ে, পরনে ভেনি-সিয়ান ব্লু টি-সার্ট চাপিয়ে সন্ধে পড়তে না পড়তে জানবাজারের দিকে রওনা দিলাম।

অসম্ভব লাকি বলতে হবে নিজেকে, বাস-স্টপে নেমেই দেখি, ওপারের ফুটে একটা ঢ্যাঙা দো-আঁশলা চেহারার ছোকরার সঙ্গে আমার ঈপ্সিতা হেসে হেসে গল্প করছে। ছেলেটির বদখত চোয়াড়ে ভঙ্গীতে হাত-পা নাড়া আমার কাছে খুবই বেটপ ঠেকছিল। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তা ক্রশ করে ওদের হাত দশেক দূরে এসে দাঁড়ালাম। স্থানকালপাত্র ভুলে কতক্ষণ হাবার মত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, খেয়াল নেই। আমার খুব কাছ ঘেঁষে একটি গাড়ী এসে সশব্দে থামতেই খেয়াল হল, সঙ্গীবিহীনা পর-ভেজের প্রতিবেশিনী ঠায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ হঠাৎ চঞ্চল চোখ ঘুরিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে।

ট্রামের তারে দোল খেতে খেতে রাত নেমে আসছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল। সামান্য দূরত্বে দুজনেই এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছি যেন পা থেকে শিকড় গজিয়েছে। পথচারীরা কেউ কেউ কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। আমার আপাদ-মস্তক ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠছিল, দারুণ তৃষ্ণায় গলার টাকরা পর্যন্ত শুকিয়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিল। এক সময় সম্মোহিতের মতো এক-পা দু-পা করে মেয়েটির পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালাম।

ওর কোন ভাব-বৈকল্য নেই। ঠোঁটে [illegible] শাড়ীর [illegible] [illegible] কিছু বুঝতে পারলাম না। দুচোখে প্রাণপণে দেখছিলাম। বলা যায় দৃষ্টি দিয়ে ওর সমস্ত সুষমা চেটেপুটে খেয়ে ফেলছিলাম।

সজীব সৃষ্টিময় জেল-মাসের পুরোপুরি একটি প্রতিভা। নীল ক্যানভাসের ওপর যেন দুরন্ত স্ট্রোক তুলেছে লাল রঙে মাখানো ব্রাশ—নীল শাড়ীর উর্ধ্বাংশ থেকে লাল রক্তের মতো বেরিয়ে আসা কাঁচুলি ব্লাউজে ঠাসা বাঁ দিকের স্তন নিঃশ্বাসের দমকে দমকে ভাইব্রেট করছে। অপূর্ব কলায় জড়ানো শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে নির্ভুল ফুটে উঠেছে প্রসারিত দুই জানু ও উদ্বেল নিতম্বের বিভঙ্গ। ডিমেলা মুখে, অধরের ওপরে, চিবুকে পোখরাজের দানার মতো কিছু ঘামের বিন্দু। চোখের পাতায় হাল্কা সবুজ শেড, ঠোঁটে উগ্র ম্যাজেন্টার প্রলেপ, মাথায় পালকী ছাঁদের খুকো কেশ।

বহুক্ষণ বুকের শিরশিরেনি ব্যগ্র ঠোঁটে চেপে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে ইয়ার-বন্ধুদের শেখানো মতো যান্ত্রিক গলায় ওর কানের কাছে মুখ এনে বললাম, ‘যাবেন?’ মোটেই ভয় না পেয়ে চকিত দৃষ্টি হেনে মাথা দুলিয়ে মেয়েটি ওপরের পাটির দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। সে কি মারাত্মক হাসি, যার ঢেউয়ে, ইথারের প্রবল চাপে পৃথিবীর তাবৎ আনব্রেকেবল্ কাঁচ গুঁড়িয়ে তছনছ হয়ে যেতে পারে! বিড়ম্বিত হওয়া দূরে থাক, ওর হাসি তখন আমার সারা বুকে শিকারী হটেনটটের সাহস জুগিয়ে দিয়েছে। মাতাল গলায় বললাম, ‘চলুন না।’

সাহসীরাই পৃথিবী ভোগ করে—এই আপ্তবাক্যে সাড়া দিয়ে মেয়েটি সম্মতি-সূচকভাবে মাথা নাড়াল। একটি সচল ট্যাক্সি থামিয়ে দুজনে উঠে বসলাম। প্রচন্ড বেগে গাড়ী ছুটছে। অস্থির দোলানিতে ওর একেবারে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে ময়াল সাপের রীতিতে ডান হাত দিয়ে ওকে প্রায় বুকের ওপর টেনে গ্রীবার ভাঁজে তৃষ্ণার্ত চিবুক পেতে দিলাম। ওর সারা শরীর থেকে ভুটানি মদের মতো ঝাঁঝালো গন্ধ আসছিল। আমার হাত ওকে ঘিরে ক্রমশ চঞ্চল লোভী হয়ে দারুণভাবে ওঠানামা করছিল। মেয়েটি চাপা ঠোঁটে ইতিমধ্যে ড্রাইভারকে কখন বলেছে—‘কসবা’, ট্যাক্সি অবলীলায় পেরিয়ে যাচ্ছে মহেশ সরকারের রাস্তা, বাঁক নিয়ে প্লাজা রোড, বেনেপুকুর। পার্ক সার্কাস প্রদক্ষিণ করে তিলজলা, রাইফেল রোড বেয়ে বেদিয়াডাঙা। আমার হাতদুটো সাঁড়াশি হয়ে মেয়েটিকে ততক্ষণে জড়িয়ে ধরেছে, ওর কপালে, গালে, কন্ঠায়, আধ-খোলা বুকে বৃষ্টির আবেগে নেমে আসছে আমার চুম্বন। উত্তেজনায় দমবন্ধ হয়ে আসার মুহূর্তে জিজ্ঞেস করলাম ‘তোমার নাম কি?’ চোখ বুজে যুবতী উত্তর দিল, ‘আমাকে সবাই চেনে। আমি জানবাজারের অলকা।’ বলেই হঠাৎ একটি অন্ধকার বাঁকের মুখো-মুখি এসে ও চীৎকার করে উঠল, ‘মেরে ফেলল, মেরে ফেলল, কে আছেন...বাঁচান... বাঁচান!’ আমি বৈদ্যুতিক চাবুক খাওয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠলাম।

[illegible] দুই [illegible] [illegible] [illegible]। তাদের [illegible] [illegible] [illegible] টেনে বের করল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], নিজের কানে বিশ্বাস [illegible] [illegible] না। ওর কথার মর্মার্থ—[illegible] [illegible] [illegible] কাজ ছিল। এমনিই দেরি হয়ে যাচ্ছিল, ট্যাক্সি পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। আমিও ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বহুক্ষণ পর একটি ট্যাক্সি পেয়ে ওকে লিফ্‌ট্ দেয়ার প্রস্তাব করি, কারণ ওকে নাকি বলেছিলাম, আমার কোন অসুবিধে হবে না, কসবা পেরিয়ে যাদব-পুরের দিকে যাবো। আমার চেহারা পোশাকে আশ্বস্ত হয়ে ও আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিন্তু ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকেই নানা ছলছুতোয় আমি ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা করছিলাম।

দুজন ব্যক্তির একজন আমার কলার ধরে টানতে টানতে একটি লাইটপোস্টের নিচে নিয়ে আসে। অবাক হয়ে দেখলাম, এ সেই ঢ্যাঙা দো-আঁশলা চেহারার ছোকরা, যাকে আমি জানবাজারের বাস-স্টপের ও ফুটে প্রথম সন্ধের মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতে দেখেছি। কিছু বলার আগেই দুজনে মিলে প্রচন্ড পেটানো শুরু করলো আমাকে, এক মুহূর্তে চশমা ভেঙে জামা-কাপড় ছিঁড়ে অঝোর কিল ঘুঁষি লাথির বৃষ্টিতে মুখ থুবড়ে পড়লাম অ্যাসফাল্ট ঢাকা পথের ওপর। ইতিমধ্যে ছিনতাই হয়ে গেছে আমার রোলেক্স রিস্টওয়াচ, কলম, টাকাকড়ি এককথায় আমার সর্বস্ব। মুখ গুঁজে শুয়ে থাকতে থাকতে কষ বেয়ে রক্তের ঢল গল-গলিয়ে নামছিল। আচ্ছন্ন, অনুতপ্ত অবস্থায় শুনলাম ট্যাক্সি স্টার্ট দিচ্ছে। কোনরকমে মাথা সামান্য উঁচিয়ে আধবোজা চোখ মেলে দেখি, আমার সেই জানবাজারের অলকা খিলখিল হাসতে হাসতে লোকদুটির সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠছে। —নিশানাথ

অভিমত কাহিনী

[১৯২৩-এ লং বীচে জন্ম। ব্রুকলীন শহরে লেখাপড়া করেছেন। ১৯৪৩-এ হার্ভার্ডে পাঠ শেষ হওয়ার পর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। 'দি নেকেড অ্যান্ড দি ডেড', 'দি ডীয়ার পার্ক' প্রভৃতি উপন্যাসের বলিষ্ঠ বিষয়বস্তুর জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন।]

তাসের মিনার

নরমান মেইলর

(শেষাংশ)

এক রাত্রে হেইস ইউরিকোকে বলল, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

সেই ভালোবাসা এতই গভীর যে, তার জন্য ও আবার নতুন করে সেনাদলে নাম লিখিয়ে জাপানী শহরে আরও এক বছর থেকে যাবে।

কথাগুলি পার্চমেণ্টের দেওয়াল ভেদ করে আমার কানে এসে পেঁাছাল। আমিই ওকে পরদিন প্রাতে এই বিষয়ে প্রশ্ন করতাম যদি না ও নিজে থেকেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করত। সমস্ত কথা বলে ও আমাকে বলল,

—আমি ওকে এইসব কথা বললাম। একেবারে নির্জলা মিথ্যা কথা।

—বারে, কেন তুমি মিথ্যা বলতে গেলে?

—আমি তোমাকে একটা উপদেশ দিই শোনো, জেনে রাখো কথাটা। মেয়ে-মানুষের কাছে সব সময় মিছে কথা বলবে। ওদের ক্রমে কাছে টানবে, একেবারে নিবিড় করে টানবে। তবে একটা কৌশল শিখে রাখো, নিজে তার একবর্ণও বিশ্বাস করবে না। বুঝলে হে নিকলসন, এসব শিখে নাও।

—না, কিছুই বুঝিনি।

—মেয়েমানুষকে হাতে রাখার এই একমাত্র উপায়। আমি এখন ইউরিকোকে এক আঙুলে তুলে নাচাতে পারি। মেয়ে-মানুষ বশে রাখা সোজা কর্ম নয়, বুঝলে!

এরপর একরকম জোর করেই ওদের রতিক্রীড়ার বিস্তারিত বর্ণনা শোনাতে

থাকে। ওর নিজের দেহের সমস্ত শাঁস ও উজাড় করে দিয়েছে।

ইউরিকোর সঙ্গে যখন কথা বলেছিলাম তখন আমার বিশ্বাস ওর মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। ওর মুখের ওপর ইউরিকোর পাতলা হাত, বুকের ওপর ইউরিকোর উত্তপ্ত দেহ, বাইরে কাঁচের জানলায় শীতল কুয়াশা এসে পড়ছে, সেই মুহূর্তে আরও এক বছরের জন্য সেনাদলে নামটা নতুন করে লেখানোর বাসনা হয়েছিল—ইউরিকোর পাতলা আঙুলগুলি ঐভাবেই মুখের ওপর বরাবর থাকুক তা চেয়েছিল হেইস—সম্ভব হলে এই মুহূর্তটা অক্ষয় হয়ে থাক, স্তব্ধ হয়ে জমে থাক। গত রজনীতে সবকিছুই সম্ভব মনে হয়েছিল। মনে মনে এইটুকু ওর বিশ্বাস ছিল, এই অন্তর থেকে সে চেয়েছিল। মনে মনে দেখতে পেয়েছিল ভোর না হতেই ছুটেছে নতুন করে আর এক বছরের জন্য নাম লেখাতে।

তার পরিবর্তে সকালে উঠে সামনেই দেখতে পেল আমাকে। দেখল আমার সামরিক পোশাকের একঘেয়ে জলপাই রঙ। তখন মনে হয়েছে যা সম্ভব মনে করেছিল গত রজনীতে, আজ প্রভাতের আলোয় তা অসম্ভব। ওর প্রকৃতির পরিধির মধ্যে তা পড়ে না।

পরদিন রাত্রে আবার যখন ইউরিকোর কাছে গেল হেইস, তখন সে চুরচুরে মাতাল। তখন ওর মেজাজ গম্ভীর এবং মুখে কথা নেই। ইউরিকো ওর কাছে তখন একটা অস্তিত্বহীন পদার্থ মাত্র।

আমার মনে হয়, ইউরিকোও বুঝতে পেরেছিল একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে। ও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, মাঝে মাঝে জাপানী ভাষাতেই মিনিকোর সঙ্গে কথা বলছে আর এক ফাঁকে এক ঝিলিক হেইসকে দেখে নিচ্ছে, লক্ষ্য রাখছে ওর মেজাজটার পরিবর্তন ঘটছে কিনা। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে এমনই পরিস্ফুট যে, সে একটু ভীরু ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে, তুমি আর এক বছর নাম লেখাচ্ছ নাকি?

হেইস ওর দিকে তাকায়। মাথা নাড়তে থাকে, তারপর সামান্য হেসে বলল, না ইউরিকো, আমি দেশে ফিরে যাবো। আর এক মাসের ভেতর বাড়ি যাওয়ার কথা। আমি নতুন করে আর নাম লেখাবো না!

ইউরিকো মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকাল। তারপর মুখটা ঘোরালো হেইসের হাতে একটা চিমটি কাটার উদ্দেশ্যে।

আহত কণ্ঠে তীক্ষ্ম স্বরে ইউরিকো বলে, হেইস-সান, তুমি আমাকে বিয়ে করবে না? ইয়েস।

হেইস ওকে ঠেলে দেয়, তারপর বলে ওঠে, আমি তোমাকে বিয়ে করবো না! দূর হও। কত লোকের সঙ্গে যে শোও রোজ তার ঠিকানা আছে? তুমি একটা স্কিবি মেয়ে! (স্কিবি—মার্কিন অপভাষা, অর্থাৎ ঘৃণিত বেশ্যা)

দীর্ঘশ্বাস টানে ইউরিকো। ওর চোখটা এক মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইউরিকো গলা জড়িয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বলে, ইয়েস, ইউ ম্যারী স্কিবি গার্ল! আমেরিকান সোলজার ম্যারী স্কিবি-গার্ল। (হ্যাঁ, তুমি এই স্কিবি মেয়েকেই বিয়ে করবে, মার্কিন সেনারা ত' অনেকে স্কিবি মেয়েকেই বিয়ে করেছে।)

এইবার ইউরিকোকে সজোরে ঠেলে দেয় হেইস, ফলে ওর শরীরে আঘাত লাগে। সে বলে, তুমি চুলোয় যাও।

ইউরিকোও চটে উঠেছে, সে একটু রঙ্গভরেই বলে—আমেরিকান সোলজার ম্যারী স্কিবি গার্ল।

হেইসকে আর কখনও এমন খেপে উঠতে দেখিনি। আমার ভয় হয়, হেইস সব সইছে চুপ করে এবং মোটেই গলা ফাটাচ্ছে না—

হঠাৎ ও বলে ওঠে, ম্যারী ইউ? তোমাকে বিয়ে—?

আমার মনে হল হেইসের উত্তেজনার কারণটা হয়ত এই যে, এই চিন্তাটাই ওর নিজের মাথায় প্রথম এসেছিল, এখন সেই কথাটির প্রতিধ্বনি শুনতে হচ্ছে ওর মুখ থেকে, যে একজন সাধারণ বেশ্যা মাত্র। তার মুখ থেকে এ-কথা শোনা যায় না। এ অসহ্য।

হেইস ওর বোতলটা তুলে নিয়ে তার থেকেই খানিকটা মদ্যপান করে নেয়। তারপর ইউরিকোকে বলে, এইবার তুমি আর আমি 'স্কিবি' করতে যাবো, বুঝলে? এই হল সোজা কথা।

দৃঢ় গলায় ইউরিকো বলে, নো স্কিবি টু-নাইট। আজ আর ওসব নয়।

—বলো কি? নো স্কিবি টু-নাইট! তার মানে? তোমাকে আজ এই রাত্রেই 'স্কিবি' করতেই হবে। তুমি একটা সাধারণ 'জোরো'—একেবারে তিন নম্বরের বেশ্যা ছাড়া আর কি?

ইউরিকো পিছন ফিরে বসে। ওর ছোট্ট মাথাটি সামনের দিকে অবনত করে বলে, আই, ফার্স্ট-ক্লাশ গেইসা। আমি একজন প্রথম শ্রেণীর গেইসা-নর্তকী।

কথাগুলি এতই নীচু গলায় উচ্চারিত হল যে, আমরা কেউ যেন তার কথাগুলি শুনতেই পেলাম না।

হেইস ওকে এরপর মেরে বসল। আমি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। একটি ঘুঁষি মেরে ও আমাকে ঠেলে ফেলে দিল। ইউরিকো ঘর থেকে পালায়, আর তার পিছন পিছন হেইস একটা খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ছুটতে থাকে।

একবার ওকে ধরতে পেরে ওর কিমোনোটা এক টানে আধখানা ছিঁড়ে ফেলল। আর একবার ধরে ফেলে যেটুকু বাকি ছিল, সেইটুকু ছিঁড়ে টুকরো করে দিল।

পরিশেষে সেই দুর্ভাগা নারী ইউরিকোকে ও আটকে ফেলে। সে তখন কাঁদছে। তার দেহটা সম্পূর্ণ নগ্ন। ছোট ছোট শুভ্র দুটি স্তন পদ্ম-কোরকের মত দেখাচ্ছে। তখন সেই ঘরে প্রায় জন-বারো মেয়ে আর প্রায় সমান সংখ্যক সৈন্যদল এই করুণ ও অপরূপ দৃশ্যের নীরব দর্শক।

হেইস ইউরিকোর খোঁপাটা চেপে ধরেছে, তারপর সেটা টেনে খুলে ফেলল। শূন্যে ওর দেহটা একটু আন্দোলিত করে মাটিতে ফেলে দিল। সেনারা সবাই হাসছে আর মেয়েরা এই দৃশ্য দেখে আতংকে চীৎকার করছে। আমি ওকে জোর করে টেনে রাস্তায় বের করে নিয়ে এলাম।

ইউরিকো হিস্টিরিয়া রোগিণীর মত করুণ কান্নায় আকুল হয়ে উঠেছে। পথ থেকে সেই কান্না কানে ভেসে আসে। অশ্রু-ভরা বেদনায় রাত্রি যেন শিহরিত।

আমি হেইসকে টেনে এনে কোনো রকমে খাটে শুইয়ে দিলাম। আর তখনই গভীর নেশায় অচৈতন্য মাতালের ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল হেইস।

সকালে ঘুম ভাঙতে তার মনটার আলোড়ন জেগেছে। মাথার যন্ত্রণার মধ্য থেকে স্মরণ হয় বিগত রজনীর বিফল রতি-ক্রীড়ার কথা, তাই নিজের পাশবিকতায় অনুশোচনা জাগে তার মনে।

আমাকে বলে, জানো, নিকলসন, মেয়েটা ভালোই। বুঝলে হে, মেয়েটা সত্যি ভালো। আমার ওরকম ব্যবহার করাটা উচিত হয়নি। কি বলো?

আমি বললাম, তুমি ইউরিকোর কিমোনোটা একেবারে ছিঁড়ে দু' ফালা করে দিয়েছ!

ও গম্ভীর গলায় বলে, হাঁ রে ভাই, আর একটা নতুন কিনে দিতে হবে। একটা ভালো কিমোনো কিনে দেব।

সেদিনটা বড়ো খারাপ গেল। যারাই খাবার নিতে এল লাইন ধরে, তারা সবাই ঘটনাটা জেনেছে বোঝা গেল। আর হেইসকে সবাই মিলে এই নিয়ে পরিহাস করে। তার আর শেষ নেই।

ব্যাপারটা আরো জানা গেল যে, আমরা চলে আসার পর ইউরিকোর প্রবল জ্বর এসেছে। তাকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। আর অন্য সব মেয়ে বেশ আতংকিত হয়ে উঠেছে।

অন্তত সেই রাতের মত গেইসা-বাড়ির সমস্ত কাজ-কারবার একেবারে বন্ধ হয়ে গিছল।

হেইসের একজন বন্ধু বলল, তুমি প্রকাশ্য স্থানে মেয়েটার কুৎসিত অপমান করেছ। কিভাবে যে ওরা চালায়—কি যে ওদের জীবন!

হেইস আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি ওকে একটা ভালো দেখে কিমোনো কিনে দেব। বুঝলে নিকলসন—।

সেদিন সকালটা ও কি কি জিনিস কালোবাজারে বিক্রী করা যাবে তা নির্বাচন করে সরিয়ে রাখল। টিনের খাবার এই-ভাবে সরিয়ে বিক্রী করা হয়ে থাকে। ভালো দরের একটা কিমোনো কিনতে অনেক টাকার দরকার। হেইসকে এককাঁড়ি টাকা সংগ্রহ করতে হবে।

হেইসের চিন্তা হয়েছে যে জিনিসপত্র বেশী সরালে ভাঁড়ার আবার খালি হয়ে পড়বে।

সেইদিন বিকালটা কাটল টানা মাল বাজারে বিক্রী করে পয়সা জোগাড় করতে। আর রাতের ডিনারের সময় আমরা দু'জন রাঁধুনি অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

হেইস অতি দ্রুত সাজ-পোশাক পালটিয়ে নেয়। আমাকে বলল, চলো নিকলসন, তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

এরপর আমাকে একরকম টেনে নিয়ে চলল। এক বোতল মদ কেনার জন্যও একটু দাঁড়ায় না।

গেইসা হাউসের সেই সন্ধ্যায় আমরা দু'জনে প্রথমতম মক্কেল। বন্ধ বাড়ি-উলির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে চড়া গলায় হেইস বলে ওঠে, মামা-সান, কোথায়? ইউরিকো কোথায়?

মামা-সান নীরবে ওপর তলার দিকে ইঙ্গিত করল। তার মুখভঙ্গী উদ্বেগা-কুল। হেইসের অবশ্য সেসব লক্ষ্য করার মত সময় বা মন নেই। সে তখন লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে। তারপর ইউরিকোর ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

ইউরিকোকে ভারি মিষ্টি এবং নম্র দেখাচ্ছিল। হেইসের উপহারসামগ্রী সে অবনত হয়ে বেশ শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করল। মাথাটা একেবারে মাটিতে নুইয়ে দেয়।

তার ব্যবহার বেশ ভদ্র, নম্র, ভব্য, আর তবু সেদিন সে যেন দূরের মানুষ। বেশ দূরের মানুষ। আমাদের দু'জনকে মদ্য পরিবেশনে যে-ধরনের ভব্যতা প্রকাশ করল, তার চিরাচরিত রীতির তা ব্যতি-ক্রম।

কয়েক মিনিট পরে মিমিকো এই ঘরে এল। তার মুখে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার ছাপ। তবু, সেই যা হোক, আমাদের সঙ্গে কথা বলে। ইউরিকো অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। যেন কিছুক্ষণ তার মুখে কোনো কথা নেই।

যখন মিমিকোর কথা বলা শেষ হল, তখন ইউরিকো কথা বলতে শুরু করল; সে তার ভাঙা-ভাঙা ইংরাজী জাপানী এবং হাত-পা নেড়ে অঙ্গভঙ্গী-সহকারে বুঝিয়ে দিল যে আর দু' সপ্তাহের মধ্যে সে অন্যত্র চলে যাবে।

কথাগুলি সে আবেগহীন ভঙ্গীতে বলে গেল।

হেইস প্রশ্ন করে, চলে যাবে? কোথায় আবার যাবে?

বিষাদভরা হাসি হেসে ইউরিকো জানায়, সে অনেক দূরে—অনেক দূরের পথে পাড়ি দিতে হবে।

হেইস নিজের মাথার টুপিটায় আঙুল বোলায়। ইউরিকো গেইসা-বাড়ির আশ্রয় ছেড়ে দিচ্ছে?

হাঁ, চিরজীবনের মত। এসব ছেড়ে সে চলে যাবে।

—তাহলে বুঝি বিয়ে হবে? নিশ্চয়ই বিয়ের ঠিক হয়েছে।

না, বিয়ে করতে যাচ্ছে না। সে অপ-মানিত হয়েছে। মর্যাদাহীনা মানহারা মানবীকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হবে না।

হেইস তার টুপিটা দোমড়ায়, মোচড়ায়। ও, বুঝেছি, তোমার একজন 'মুসুমে' (ভালোবাসার পাত্র) আছে না? তুমি তোমার মুসুমের সঙ্গে চলে যাবে?

—না, কোনো 'মুসুমে' নেই। হেইস ওর জীবনে একমাত্র 'মুসুমে'।

—বেশ, তাহলে যাবে কোথায় শুনি?

ইউরিকো দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে-কথা ইউরিকো ওকে বলতে পারবে না। তবে সে আশা করে যে, হেইসরা চলে যাওয়ার আগেই যখন সে চলে যাচ্ছে, তখন হেইস অন্তত পরের সপ্তাহগুলিতে একটু ঘন ঘন ওকে দেখতে আসে।

হেইস এইবার চীৎকার করে বলে, আলো জ্বালা; বলি যাচ্ছো কোথায়?

এই সময় মিমিকো কান্না শুরু করল। সে হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকে। মুখে হাত চাপা দিয়ে মাথাটা সরিয়ে কাঁদে মিমিকো। ইউরিকো উঠে পড়ে তাকে প্রবোধ দিয়ে ভোলানোর চেষ্টা করে।

ইউরিকো মিমিকোর মাথায় হাত বুলোয়, আর মিমিকোর সঙ্গে একযোগে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

হেইস আবার ওকে প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছো তুমি? বলো না? ইউরিকো শুধু কাঁধ নাড়ে।

এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলল। হেইস কেবল ছটফট করে আর ইউরিকো ম্লান হাসি হাসে।

হেইস অনুনয় করে, ইউরিকো বিষণ্ণ মুখে বসে থাকে। অবশেষে আমরা যখন উঠে চলে আসছি, তখন ইউরিকোই কথাটা ভেঙে বলল।

দু' সপ্তাহ পরে, রবিবার দুপুরে দুটোয়, ইউরিকো ওর ঘরে প্রবেশ করবে,

এবং সেইখানেই সে হারি-কিরি (আত্ম-হনন) করবে। সে অপমানিত হয়েছে, তাই এখন আর অন্য কোনো পথ নেই, এই হারি-কিরিই একমাত্র পথ।

হেইস-সান অতি সহৃদয় ব্যক্তি, তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তাঁর এই সহৃদয়তার বিনিময়ে ইউরিকোর মণিরত্নের মত উজ্জ্বল কয়েক ফোঁটা চোখের জল উপযুক্ত কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। কিন্তু ত্রুটি স্বীকারে অমর্যাদার কলঙ্ক মুছে যায় না। তাই তাকে বাধ্য হয়ে হারি-কিরি করতে হবে।

মিমিকো আবার কাঁদতে শুরু করে।

হেইস ঘোঁত-ঘোঁত করে বলে ওঠে, তার মানে, দু' সপ্তাহ পরে তুমি আত্ম-হত্যা করবে?

—হাঁ, হেইস-সান, তাই করতে হবে।

হাতদুটো শূন্যে উত্তোলন করে হেইস চেঁচিয়ে ওঠে—ইট'স ক্লাপ, ইট'স অল ক্লাপ—(ক্লাপ—মার্কিন অপভাষা, অর্থ—অনেকটা বাংলা 'গল্প' কথাটির মত।) যতসব বাজে ভাঁওতা —

ইউরিকো জবাবে বলে—ইয়েস-ক্লাপ-ক্লাপ!

—তুমি ভাঁওতা দিচ্ছ ইউরিকো, এ একেবারে ফাঁকা গল্প!

—হ্যাঁ, হেইস্-সান-ক্লাপ-ক্লাপ!

দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে হেইস হেসে উঠে বলে—চলো নিকলসন এখান থেকে যাই। ইউরিকো, মিনিটখানেক

অন্তত আমাকে প্রায় বোকা বানিয়ে রেখেছিলে—
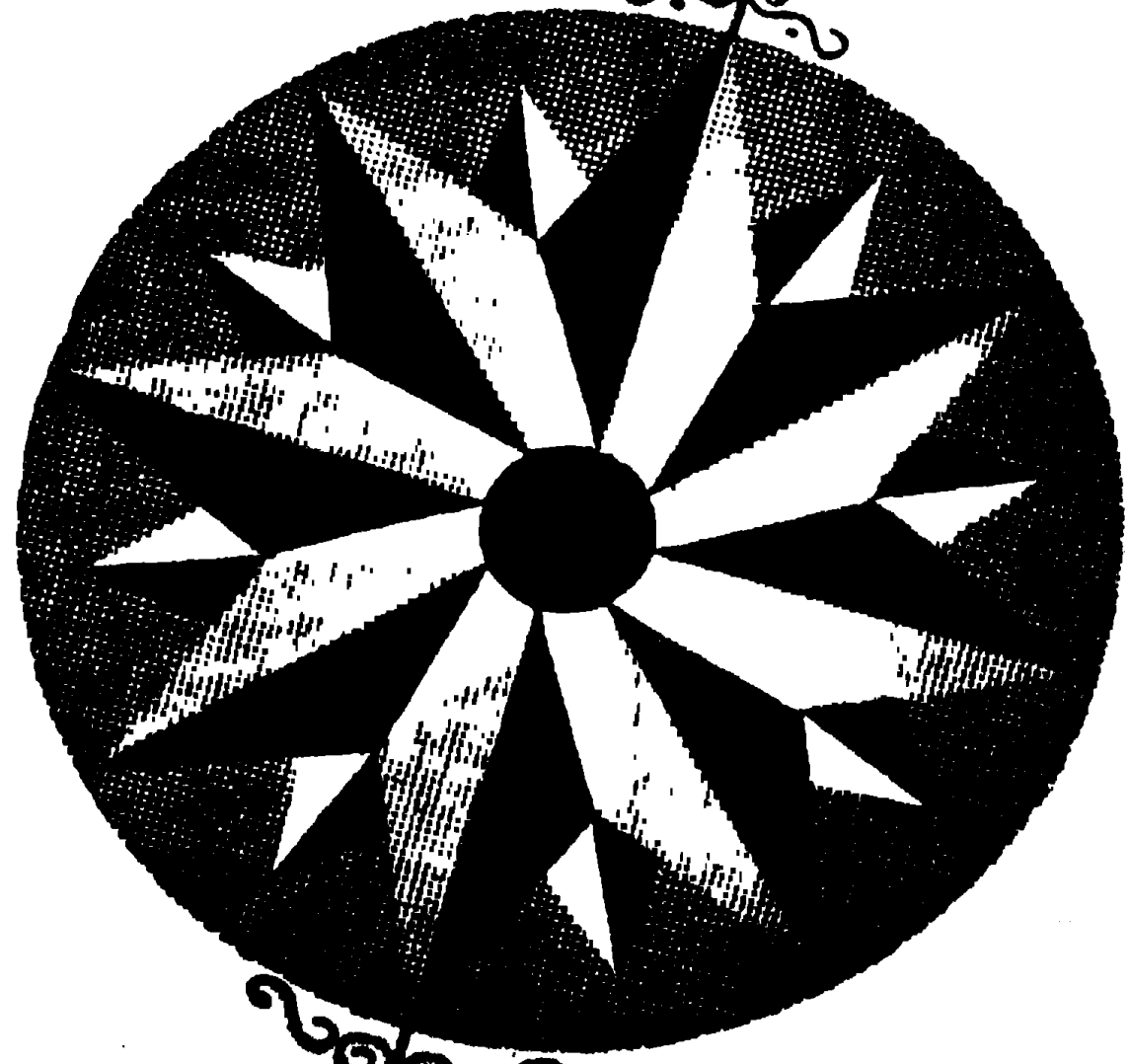
ইউরিকো জবাব না দিয়ে সসম্ভ্রমে মাথা নত করে।

এর পরবর্তী সপ্তাহে হেইস ওকে তিনবার দেখতে গেল। ইউরিকোর কোনো পরিবর্তন নেই। কোনো ভাবান্তর নেই। সে সেইরকমই আছে। সে বেশ শান্ত, ব্যবহারে বন্ধুভাবাপন্ন, আর অনেকখানি নিস্পৃহ এবং নিরাসক্ত।

আর প্রতিরাত্রে আমার মাথায় মুখ রেখে মিমিকো কেঁদেছে। যতদূর সম্ভব হেইস সমস্ত সহ্য করে গেল। তারপর সপ্তাহের শেষে কথাটা আবার তুলল—ইউরিকো, তুমি আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিলে—বলো মারো নি? ইউরিকো?

ইউরিকো অনুনয় করে বলে, হেইস-সান এই প্রসঙ্গ আর তুলো না দয়া করে।

অবশ্য ইউরিকোর দিক থেকে এই ভঙ্গিটুকু রূঢ় বলা যায়।

হেইসের মনে অকারণে বেদনা দেওয়ার বাসনা তার ছিল না। সে যেটুকু কথা বলত তা হেইসের জন্য তার অন্তরে একটা সুগভীর অনুভূতি ছিল তাই, তাই, সপ্তাহের যে কটি দিন অবশিষ্ট ছিল তার মধ্যে যতটুকু বেশী করে সম্ভব প্রাণভরে ও হেইসকে দেখতে চায়।

গভীর নৈরাশ্যে আকুল হয়ে হেইস বলে ওঠে, দেখো, এইবার কিন্তু......এসব কথা......বাদ দাও। বুঝলে, একথা আর নয়?

—হ্যাঁ, হেইস-সান, নো মোর টক্—টক আর বেশী কথা নয়।

সে আমাদের বলল এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করবে না। সে বুঝেছিল যে ব্যাপারটি হেইসকে কতখানি আহত করেছে।

গেইসা-বাড়িতে মৃত্যু একটা অপ্রীতিকর আলোচ্য বিষয়। এটা হল ফুর্তির জায়গা। চিত্ত-বিনোদনের প্রয়োজনে এখানে লোকজন আসে। এখন থেকে চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টাই করবে ইউরিকো। সে আমাদের কাছে অনুনয় করে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। যদি মাঝে মাঝে ওর নিজের অদৃষ্টের কথা মনে পড়ার ফলে ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, তাহলে আমরা যেন শুধু সেই ত্রুটি মার্জনা করি।

সেদিন সকালে আমরা যখন স্কুল-বাড়িতে ফিরছি, তখন হেইস একেবারে শান্ত। সারাদিন সে অতি দ্রুততালে কাজ করেছে। রন্ধন ব্যাপারে ওর নির্দেশ আমি যথাযথ পালন করছি না বলে কয়েকবার আমাকে ধমক দিয়েছে।

সেই রাত্রে আমরা আমাদের ব্যারাকে ঘুমোলাম। প্রত্যূষে ও আমাকে জাগিয়ে তুলে দিল।

বলল, দেখ নিকলসন। আমি ঘুমোতে পারছি না, সারারাত চোখে ঘুম নেই। তোমার কি মনে হয় আমাদের পাগলী সুন্দরীর কথাগুলি সত্যি। ও কি পরিহাস করছে না?

আমার চোখ পরিষ্কার। আমি নিজেই ভালো করে ঘুমোতে পারিনি। আমি বললাম, কি জানি ভাই। আমার তো মনে হয় না যে ও সত্যি সত্যি কিছু একটা করবে!

ও শপথ করে বলে, আমিও জানি ও সত্যি সত্যি বলছে না।

আমি একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলি, হ্যাঁ, তাই হবে।

তারপর আবার দেশলাইটা নিভিয়ে দিয়ে বলি, তবে কি জানো হেইস! একটা কথা আমি কিন্তু ভাবছি। জানো তো, এসব প্রাচ্য দেশের মেজাজ একেবারে অন্য রকমের। ওরিয়েন্টাল মাইন্ড যাকে বলে!

—ওরিয়েন্টাল মাইন্ড! যত সব গাঁজা! জানো নিকলসন, বেশ্যার আবার মন! বেশ্যা বেশ্যাই,—ও সব দেশেই সমান। সর্বত্র এক ভাব। আমি বলছি তোমাকে ও আমাদের নাচাচ্ছে।

—তোমার তাই মনে হয়? তা তুমি যখন বলছ!

—আমি এ বিষয়ে ওর কাছে কোনো কথাই ওঠাবো না। এ প্রসঙ্গ তুলবোই না।

দ্বিতীয় সপ্তাহভোর হেইস ওর প্রতিশ্রুতি পালন করল। একাধিকবার প্রশ্নটা তুলতে গিয়েও জোর করে আবার চুপ হয়ে গেছে। ব্যাপারটি অবশ্য বিশেষ ক্লেশদায়ক।

যত দিন যায়, মিমিকো আরও প্রবলভাবে এবং আরো বেশী করে কাঁদতে থাকে।

হেইসের মুখের দিকে তাকিয়ে ইউরিকোর চোখ জলে ভরে আসে। নিবিড় অনুরাগে সে হেইসকে চুমা খায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর বোধহয় মনের জোর প্রয়োগ করে একটু খুশি-খুশি ভাব মনে আনার চেষ্টা করে।

একদিন আমাদের চমকিত করে দিল, কোথা থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করে আমাদের মাথায় চুলের সঙ্গে বুনে দেয়। দিনের পর দিন কেটে যায়, সপ্তাহ অতিক্রান্ত।

আমি অপেক্ষায় ছিলাম, আমাদের কোম্পানীর আর সবাই ঘটনাটা জানুক।

কিন্তু হেইস এই প্রসঙ্গে কোনো কথা বলে না। আর গেইসারা ত' একেবারে চুপ-চাপ। তথাপি, এটা বোঝা যায় যে গেইসা-বাড়ির আবহাওয়া একেবারে অন্যরকম। গেইসারা ইউরিকোর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা-শীল, এবং সে চলে যাওয়ার সময় তার পোষাকটা স্পর্শ করে সম্ভ্রমভরে।

শনিবার কিন্তু হেইস আর সহ্য করতে পারে না। সে একরকম জোর জানিয়ে বলে রাত্তিরটায় আর গেইসা-বাড়ি থেকে কাজ নেই। ইউরিকোকে টেনে নিয়ে এল বারান্দায় যেখানে আমরা জুতো পরি সেইখানে। ইউরিকো যখন হাঁটুমুড়ে বসে আমাদের জুতার ফিতা বেঁধে দিচ্ছে। ও তখন তার মুখখানি হাত দিয়ে তুলে ধরে বলে, কাল আমাকে কাজ করতে হবে, ডিউটি আছে, সোমবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

উদাসভঙ্গীতে হাসল ইউরিকো, তারপর আবার জুতার ফিতা বাঁধতে থাকে।

হেইস বলে, ইউরিকো, আমি বলছি সোমবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

ইউরিকো বলল, নো, হেইস-সান। বেটার টুমরো। নো হিয়ার মনডে। না হেইস-সান। কালই বরং এসো, সোমবার আর এখানে থাকব না। কালই বরং দুটোর আগে এসো।

—হেইস বলে ওঠে, ইউরিকো! কাল আমার ডিউটি আছে। তাই ত' তোমাকে বলেছি সোমবার দেখা করব।

সে বলে, গুডবাই নাউ। এখনই বিদায় জানিয়ে নাও। আর দেখা হবে না। আমাদের দুজনের গালে চুমা দিয়ে বলে—গুড-বাই নিক-সান। গুড-বাই হেইস-সান।

ওর চোখের কোণে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। হেইসের গায়ের জ্যাকেটটার ওপর আঙুল বুলিয়ে ও দৌড়ে ওপরে পালাল।

সেই রাতে হেইস আর আমি এক বিন্দু ঘুমাতে পারলাম না। আমার খাটের ধারে এসে নীরবে কিছুক্ষণ বসে, অনেক পরে বলল, কি তোমার মনে হয়—?

—জানি না।

ও দিব্যি গেলে বলে, আমিও জানি না।

একটা বোতল থেকে মদ ঢেলে খেয়ে যায়, কিন্তু কোনো ফল হয় না। বেশ টনটনে জ্ঞান।

ও বলল, আমি যদি কাল ওখানে যাই তাহলে আমি একটি গাধা।

—যা ভালো বোঝো তাই করো।

ও আবার জোর গলায় দিব্যি গালে, গাল পাড়ে।

সকালটা গড়িয়ে যায়। বিলম্বিত সকাল। হেইস অতিশয় তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নেয়, কোনো কাজ ফেলে রাখে না। সাড়ে এগারোটায় খানায় আহ্বান জানায়। আর একটার মধ্যে জাপানী কে-পি-রা বাসনপত্র পরিষ্কার করে ফেলল।

জাপানী কে-পি'দের মধ্যে একজন মধ্যবয়সীকে হাঁক দিয়ে ডাকে হেইস।—এই কোতো, শোন্!

লোকটা আগে রেস্তোরাঁর কাজ করত, ইংরাজী ভালো বলতে পারে। হেইস প্রশ্ন করে, এই কোটো, হারিকিরি জানো?

কোতো একটু হাসে। সে অতি নম্র এবং শান্তভাবে কথা বলে। সে বলল, ও হারি-কিরি? ওটা একটা ন্যাশন্যাল কাসটম আমাদের। জাপানীদের প্রাচীন ঐতিহ্য।

হেইস আমাকে বলল, চলো! তাড়াতাড়ি নাও। ডিনারের কাজ শুরু করতে তিনটা বাজবে। হাতে টাইম আছে। আমি যখন ওর ঘরে গেলাম, দেখি ও পোষাক পাল্টাচ্ছে। রাত্রে সেগুলি ঠিকমত টাঙিয়ে রাখেনি, তাই সেগুলি একটু কুঁকড়ে দুমড়ে গেছে।

ও আমাকে প্রশ্ন করে, এখন কটা বেজেছে?

আমি বললাম, একটা বেজে পনের মিনিট!

—চলো, তাড়াতাড়ি চলো।

গেইসা বাড়ি পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পথটা ও প্রায় দৌড়ে গেল। আমাকেও ওর পিছু পিছু দৌড়াতে হয়। বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি, বাড়িটা নিস্তব্ধ। বারান্দায় কেউ নেই। যে ঘরটায় সবাই বসে দাঁড়ায়, যেটা অভ্যর্থনা-কক্ষ, সেখানেও কেউ বসে নেই।

হেইস আর আমি শূন্য নৈঃশব্দ্যের মত দাঁড়িয়ে থাকি।

হেইস চীৎকার ডাকে—ই-উ-রি-কো।

সিঁড়িতে ওর পদধ্বনি শোনা গেল।

একটি শ্বেতশুভ্র কিমোনোতে সেজেছে ইউরিকো, অঙ্গে কোনো অলঙ্কার নেই, মুখে কোনো প্রসাধন নেই। মেকাপবিহীন আকৃতিতে ইউরিকোকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

সে মৃদু গলায় বলে, তুমি এসেছ শেষ-পর্যন্ত।

এই বলে সে হেইসকে আবেগভরে চুমা খায়।

তারপর বলে, বাই-বাই। আই গো আপ স্টেয়ারস হেইস-সান। আমি এখন ওপরে যাই, বিদায়।

ও তার হাতটা ধরে বলে ওঠে, ইউরিকো, এ করা চলবে না।

ইউরিকো হেইসের হাত থেকে মুক্ত লাভের চেষ্টা করে আর হেইস তাকে আরো জোরে উন্মত্তের মতো চেপে ধরে। বলে, আমি তোমাকে যেতে দেব না। ইউরিকো, এ তোমাকে বন্ধ করতেই হবে। ইটস ক্লাপ। এ একেবারে বাজে ভাঁওতা।

ইউরিকো বলে, ক্লাপ্-ক্লাপ্!

তারপর সহসা সে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

চারদিক থেকে আমরা শুনতে থাকি, ক্লাপ-ক্লাপ। ক্লাপ-ক্লাপ। ক্লাপ-ক্লাপ।

হেসে গড়িয়ে পড়ে এবাড়ির সবকটি গেইসা ঘরে এসে ঢুকল। আমাদের ঘিরে ধরে ওরা সবাই মিলে একপাল হাঁসের মত বলতে থাকে, ক্লাপ-ক্লাপ।

ইউরিকো আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। মিমিকো আমাদের লক্ষ্য করে হাসছে। সবাই মিলে হাসছে। হেইস দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, চলো আমরা পালাই এখান থেকে।

আমরা পথে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু গেইসারা আমাদের অনুসরণ করে। আমরা যখন শহরের দিকে ফিরছি, গেইসারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের পিছনে মার্চ করে আসছে। ওদের কিমোনো বহুবর্ণ রঙে রঞ্জিত। সূর্যালোকে ওদের চুল ঝলকিত। শহরের লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর হাসে। আমরা শিবিরে ফিরছি। গেইসারা আমাদের পিছন পিছন আসছে। তারা আমাদের প্রতি অপমানসূচক কথা বলছে ইংরাজীতে-জাপানীতে আর অঙ্গ-ভঙ্গীতে। আর তাদের সেই বিভিন্ন কণ্ঠ-স্বরের মাঝে, মার্চের সুর হিসাবে মাঝে ধুয়া ধ্বনিত হচ্ছে—'ক্লাপ-ক্লাপ, ক্লাপ-ক্লাপ।'

এক সপ্তাহ পরে হেইস আর আমি আর একবার গেইসা বাড়ি গিছলাম, শেষ-বারের মত ওদের সঙ্গে দেখা করতে। দেশে ফেরার আগে শেষ দেখা। আমাদের বেশ ভদ্রভাবেই ওরা অভ্যর্থনা করে বসালো, কিন্তু ইউরিকো বা মিমিকো কেউই আমাদের সঙ্গে শুতে রাজী হল না। ওরা প্রস্তাব করলো সেই তের বছরের প্রাক্তন-কুমারী সুসিকোকে ভাড়া নিতে।

(লেখক মিঃ নর্মান মেইলর তাঁর 'তাসের মিনার' নামক কাহিনীটি উৎসর্গ করেছেন ভানস্-ব্যুরজালির নামে। ব্যুরজালির কথিত ঘটনার ওপর ভিত্তি করে মেইলর এই কাহিনীটি লিখেছেন।)

—শ্রীইন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত

বিজ্ঞানের কথা

ভারতের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থার রজত জয়ন্তী

স্বাধীনতা লাভের পর বিশ বছর আমরা অতিক্রম করে এলুম। স্বাধীনতা অর্জনের সংগে সংগে আমাদের জাতীয় সরকার দেশের সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহার এবং জনগণের সমৃদ্ধিসাধনের জন্যে বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্যে বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বিদেশী শাসকবর্গও এটা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই আজ থেকে ২৫ বছর আগে ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থা (কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ডঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর এই সংস্থার প্রথম অধিকর্তা নিযুক্ত হন।

বিদেশী শাসনকালে এই সংস্থা যতখানি গুরুত্ব লাভ করেছিল, তার চেয়ে বহুগুণ গুরুত্ব লাভ করেছে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে। এই সংস্থার উদ্যোগে দেশের নানা প্রান্তে বহু জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয় এবং দেশের সম্পদকে সদ্ব্যবহারের জন্যে ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান চলতে থাকে। গত বিশ বছরে এই সব জাতীয় গবেষণাগারে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং তার ফলে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। সম্প্রতি এই সংস্থার রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হল। এই উপলক্ষে দেশের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার ক্ষেত্রে এই সংস্থার ভূমিকার কথা আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দেশে শিল্পোন্নয়ন এবং অর্থনীতিক প্রগতির জন্যে বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক গবেষণা একান্ত প্রয়োজনীয়। সেদিকে দৃষ্টি রেখে জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে গবেষণা কাজ নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়। দেশজ সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে এই গবেষণাগারগুলিতে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং দেশের অবস্থা অনুযায়ী প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবনের ফলে এদেশে অনেকগুলি প্রধান প্রধান শিল্পের সূত্রপাত হয়েছে। দিল্লীতে জাতীয় পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ এবং কার্বনজাত দ্রব্য সম্পর্কে যে মূল্যবান কাজ হয়েছে তা দেশের শিল্পোন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। পুণায় জাতীয় রসায়ন গবেষণাগারে ভিটামিন—সি, ব্যাকটিরিয়াল ডায়াসটেজ, আয়ন-এক্সচেঞ্জ রজন এবং রঞ্জকদ্রব্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে এবং শিল্পক্ষেত্রে তার ফললাভ করা গেছে। জিয়েলগোরার কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারে এবং জামশেদপুরে জাতীয় ধাতুশিল্প গবেষণাগারে আকরিক, খনিজদ্রব্য এবং কয়লা সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার ফলে এদেশের লোহ ও ইস্পাত এবং ধাতুশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি উদ্ভাবন, উপকরণের সদ্ব্যবহার এবং ডিজাইন প্রস্তুতের কাজে প্রভূত সহায়তা হয়েছে। চুনাপাথর এবং লোহার আকর সম্পর্কে জাতীয় ধাতুশিল্প গবেষণাগারে যেসব গবেষণা হয়েছে তা লোহশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান।

মহাকাশযাত্রায় জোঁকদের শিক্ষাদান

কলকাতার কাছে যাদবপুরে কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগারে উদ্ভাবিত অপ্‌টিক্যাল গ্লাস এবং ফোম গ্লাসের খ্যাতি আজ সুবিদিত। এই দুটি বিশেষ ধরনের কাচের প্রস্তুত প্রণালী একান্ত গোপনীয়। যে সব বিদেশী রাষ্ট্র এই কাচ প্রস্তুত করেন তাঁরা এ সম্পর্কে একটি কথাও প্রকাশ করেন না। যাদবপুরের গবেষণাগারে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ব্যাপক গবেষণার দ্বারা এই দুটি কাচের প্রস্তুত-প্রণালী নিজেরা উদ্ভাবন করেছেন। তাঁদের এই কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।

অপ্‌টিক্যাল গ্লাস হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের কাচ যা অনুবীক্ষণযন্ত্র, দূরবীন, ক্যামেরা, রেঞ্জ ফাইণ্ডার ইত্যাদির লেন্স ও প্রিজমের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। স্বাধীনতা লাভের আগে এই কাচ বৃটিশ যুক্তরাজ্য থেকে আমদানী করা হত। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই কাচের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এদেশে এই কাচ প্রস্তুত করা সম্পর্কে চেষ্টা চলতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে, এই কাচের প্রস্তুতি-প্রণালী সম্পর্কে কারও কাছ থেকে কিছু জানবার উপায় নেই। তাই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গোড়া থেকেই সবকিছু অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। এই কাচ প্রস্তুতের সাফল্য নির্ভর করে সামগ্রিক প্রস্তুত-প্রণালীর খুঁটিনাটি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং সুনিয়ন্ত্রণের ওপর। যাদবপুরের গবেষণাগারে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কাঁচা মাল পরীক্ষা থেকে শুরু করে ডিজাইন প্রস্তুত এবং কাচ নির্মাণের সামগ্রিক প্রণালী নিজেরাই উদ্ভাবন করেন। তাঁরা প্রথমে একটি পাইলট প্ল্যান্ট গড়ে এই কাচ প্রস্তুত করেন। তাঁদের অনন্য-সাফল্যে ভারত সরকার এবং পরিকল্পনা কমিশন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই কাচ প্রস্তুতের দায়িত্ব তাঁদেরই ওপর অর্পণ করেন। ভারতে অপ্‌টিক্যাল গ্লাসের বর্তমান চাহিদা বছরে ২-৩ টন। কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার ভারতের এই চাহিদা মিটিয়ে থাকেন এবং বর্তমানে প্রায় সবরকম অপটিক্যাল গ্লাস (বিশেষ বিশেষ

কাজের জন্যে বিশেষ ধরনের কাঁচ প্রয়োজন হয়) প্রস্তুত করছেন।

ফোম গ্লাস হচ্ছে একরকম হাল্কা ওজনের তাপ-অন্তরক উপকরণ। মূলত এটি হচ্ছে ১৫ থেকে ১৮ গুণ সম্প্রসারিত কাঁচ এবং দেখতে অনেকটা মৌচাকের মত। এই কাঁচ যেমন দৃঢ় ও শক্ত তেমনি হাল্কা ও তাপ-অন্তরক। এই কাঁচ গৃহনির্মাণ, শৈত্যাতপনিয়ন্ত্রণ এবং কোল্ড স্টোরেজ শিল্পে এবং ঠাণ্ডা ও গরম পাইপ ও ট্যাঙ্কের অন্তরক হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কর্ক ও অন্যান্য অন্তরক উপকরণের তুলনায় এই ফোম গ্লাস উৎকৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফোম গ্লাস প্রস্তুত হয়, কিন্তু এর প্রস্তুত-প্রণালী একান্ত গোপনে রাখা হয়। যাদবপুরের গবেষণাগারে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বিদেশী মালের সমতুল ফোম গ্লাস প্রস্তুত করতে সমর্থ হন। তাঁরা যে প্রস্তুত-প্রণালী উদ্ভাবন করেছেন তা বোম্বাইয়ের টেকনি গ্লাস লিঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফোম গ্লাস প্রস্তুতের জন্যে লিজ হিসাবে সরবরাহ করেছেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এদেশে ফোম গ্লাসের চাহিদা পূরণ করছেন।

এ ছাড়া, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে স্থাপিত অন্যান্য গবেষণাগারেও বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে যার ফল নানা শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য গবেষণার কথা বলছি। হায়দ্রাবাদে আঞ্চলিক গবেষণাগারে তুলাবীজ এবং তার উপজাত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার সম্পর্কে যে অনুসন্ধান পরিচালিত হয় তার ফলে এদেশে তুলাবীজ চূর্ণ করার শিল্প এবং উপজাত দ্রব্য সদ্ব্যবহারের শিল্প গড়ে উঠেছে। ধানবাদে কেন্দ্রীয় খনিবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রে গবেষণার ফলে এদেশে অগ্নিরোধক যন্ত্রপাতি ও মোটর প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এখানে দেশজ উপাদান থেকে বিস্ফোরকদ্রব্য পরীক্ষার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে বিদেশ থেকে বিস্ফোরক আমদানীর ক্ষেত্রে বাৎসরিক প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সাশ্রয় হয়েছে। মহীশূরে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তিবিজ্ঞান গবেষণাগারে শিশুদের খাদ্য হিসাবে মোষের দুধ ব্যবহার সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালান হয় তার ফলশ্রুতি হচ্ছে আজকাল বাজারে প্রচলিত আমুল বেবি ফুড।

শিল্পক্ষেত্রে যেসব গবেষণা কাজে লাগান গেছে তার কথাই আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। এবং শিল্পক্ষেত্রে গবেষণার ফল প্রয়োগই হল বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অনগ্রসর দেশে গবেষণার ফল শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগের পথে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের সংগে গবেষণার ফল সদ্ব্যবহারের সম্পর্ক [illegible]

গো-জাতির পূর্বপুরুষ আরোষ

শিল্পোন্নয়ন হবে ততই এই সব গবেষণার ফল প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। কিন্তু সেই সংগে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক ও ফলিতবিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে বিষয়ে গবেষণার ফল আশু শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্ভাবনা নেই সে বিষয়ে গবেষণা পরিচালনের গুরুত্ব তেমন নেই। আমদানী-রপ্তানী ইত্যাদি অর্থনীতিক বিষয়গুলি এবং দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কি কি জিনিস প্রস্তুতের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী তা বিবেচনা করে গবেষণার পরিকল্পনা রচিত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। এ বিষয়ে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গত ২৫ বছরে তাঁরা যেভাবে দেশের শিল্পোন্নয়ন ও জনগণের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রয়োজন আরও বেশী। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ভেষজ ও রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির জন্যে আমাদের যাতে পরমুখাপেক্ষী না হতে হয় সেদিকে তাঁরা আরও গভীর দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। আমাদের দেশে সম্পদ ও উপকরণের অভাব নেই, অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানকর্মীরও অভাব নেই। যা প্রয়োজন তা হল দেশজ উপাদানগুলিকে কিভাবে কাজে লাগান যায় সে বিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান এবং সেদিকেই প্রেরণা দান করতে হবে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থাকে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের উন্নত দেশগুলি যেভাবে শিল্পোন্নয়ন ও জন-গণের সমৃদ্ধিসাধন করছেন আমাদেরও সেই পথে অগ্রসর হতে হবে। আমরা চিরদিন তাঁদের পিছনে পড়ে থাকতে পারি না। রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থার প্রদর্শনীতে আমরা দেশের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যে আশাপ্রদ চিত্র দেখতে পেয়েছি তার চেয়েও উজ্জ্বলতর চিত্রের পরিচয় পেতে চাই আগামী দিনে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্যা

[উপন্যাস]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আগের ঘটনা

[সত্য বিয়ে করে লীলাকে। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে লীলা স্বাধীন, জেদী, সুন্দরী। কিন্তু সত্যকে নিয়ে হয়তো সে সুখী ছিল না। এক দুপুরে সত্যর বাল্যবন্ধু সুখেন এল ওদের বাড়ি। লীলা বন্দী হল সুখেনের কাছে।

সত্যর চোখে কিছুই এড়ায় নি। অন্য এক রাতে ক্ষতবিক্ষত সত্য আর লীলার সংসারে ঝড় উঠল। রূপপুর ছাড়ল সত্য।

ফিরে এল রানীচক। ঘরে এল যমুনা। রান্নাবান্নার জন্যেই তাকে রেখেছে সত্য। সে নবযুবতী। এক রাতে যমুনার মুখোমুখী সত্য। রক্তে আগুনের ছোঁয়া।

এদিকে সুখেন এল লীলার বাড়ি রূপপুরে। রাত কাটাল। পরদিন সকাল: সুখেনের প্রেস কিনল লীলা। সত্যর মনে তখন দুটো বাঘের খেলা। লীলা আর যমুনা। শেষ পর্যন্ত যমুনাই ভাসিয়ে নিল সত্যকে। রাতে বিয়ের প্রস্তাব।

ওদিকে সময় ঘুরল। ঘনিষ্ঠ হল লীলা আর সুখেন। এক রাতে বনের মধ্যে ওরা বড় বেশি ঘনিষ্ঠ হল।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৯)

যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল সত্য। মুখ তুলে সাইনবোর্ডটা দেখছিল। ...লীলা প্রেস! ভিতরে যন্ত্রের শব্দ আর একফালি করিডোরের শেষ প্রান্তে টেবিলে কে নিবিষ্টমনে কাজ করছে।

সুখেন! লীলা তাহলে এখানে বাড়িও কিনেছে হয়ত। রূপপুরে সব বেচে দেয়নি তো?

সত্য রাস্তার বিপরীতে রেস্তোরাটায় ঢুকল। বেশ পরিচ্ছন্ন রেস্তোরা। এমন একটা খোলা যায় না রানীচকে? আজকাল রানীচকের পসার বেড়েছে। নিত্যিনতুন আপিস বসছে। ইলেকট্রিক এসে যাচ্ছে শীগগীর। ইটভাটার পাশে টালির কারখানা খুলেছে হাটুবাবু। বাজারে মাড়োয়ারীরা চড়া দরে জায়গা কিনছে। দোকানপাট অনেক বেড়ে গেল দেখতে দেখতে। সিনেমা হলেরও জায়গা কিনতে এসেছিল আজিমগঞ্জের কোন জৈন ব্যবসায়ী। পঞ্চায়েত তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। এলাকাকে ফতুর করে ছাড়বে না ওরা?

তবে এমন ঝকঝকে রেস্তোরা একটা খোলা যায়। সামনে একফালি ফুলের বাগান থাকবে। একেবারে হালফ্যাশনের ঢঙে। অনেক জায়গায় এমন দেখেছে সত্য।

যেখানে বসেছে, সোজা প্রেসটা দেখা যায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সত্য ভাবছিল, শয়তানটাকে এখানে ডাকলে ক্ষতি কী? ওর সঙ্গে তো কোন ঝগড়া হয়নি!

কিন্তু কথা বলবে তো সুখেন?

সত্য বয়কে ডাকল। খোকা, একটা কথা শুনবে?

কী? সিগারেট আনতে হবে?

নাঃ। ওই প্রেসের লোকটাকে একবারটি ডেকে দাও না ভাই!

বয়টা ইতস্তত করছিল। মালিকের কানে গিয়েছিল কথাটা। সে ধমক দিয়ে বলল, যা না। ভদ্রলোক বলছেন!

ও চলে গেলে মালিক সত্যকে বলল, চেনেন নাকি সুখেনবাবুকে?

সত্য শিশুর মত সরল হাসল।

খুব সাবধান মশাই, খুব সাংঘাতিক চীজ। একটা নিরীহ গ্রামের মেয়েকে—মেয়েটার নাকি প্রচুর পয়সা আছে—তা মশাই, তাকে পটিয়ে একটা বাজে প্রেস গছিয়ে ফেলেছে। রোজই মিস্ত্রী আসছে স্ক্রু টাইট দিতে...আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে জানেন, যা দুচারটে কাজ হয়—সবই ওর পকেটে যায়। প্রেস যার, তারই থাকল—মাঝখান থেকে একরাশ টাকা মেরে বড়লোক হল!... অবশ্যি ওকে তো আজ নতুন চিনি না। জুয়াড়ীর হাতের টাকা—আসতে যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ।

সত্য কৌতূহল চেপে বলল, মেয়েটি এখানেই থাকে নাকি?

সে জানিনে। মালিক দাঁতে পানের কুচি সাফ করতে করতে জবাব দিল।... মধ্যে মাঝে কোত্থেকে রিকসো চেপে আসে দেখি। চলে যায়। কে বলছিল, বাড়ি খুঁজছে এখানে। কিনবে।

সত্য কী বলতে যাচ্ছিল, বয়টা ফিরে এসেছে সেই সময়। সুখেনবাবু বলল, কে ডাকছে, এখানেই পাঠিয়ে দাও। হাতে কাজ আছে, ব্যস্ত।

না, নামটা বলেনি সত্য। ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু যাওয়া কি ঠিক হবে? যদি ঠিক তখনই হঠাৎ লীলা এসে হাজির হয়!

থাক্। সত্য চায়ের দাম দিয়ে উঠেছিল। বয়টাকে বখশিস দিতেও ভোলেনি। তারপর সোজা রেডিওর দোকান। রেডিও না হলে তার চায়ের দোকান মানায় না। তাছাড়া যমুনার সাধ।

একবার দোকানে একবার বাড়ি—এই করে বাজানো যাবে। তাহলে ট্রানজিস্টার চাই।

ট্রানজিস্টারটা কিনে লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে সত্য কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়াল। যমুনা আসতে চেয়েছিল। আনলে ভালো হত।

লীলা প্রেসের সামনে দিয়ে কয়েকবার আসাযাওয়া করল সে। সুখেনের মুখোমুখি হল না।

এক সময় অস্থির সত্য, ক্লান্ত আর উত্তেজিত সে সোজা ঢুকে পড়েছে প্রেসে। তারপর চলে এসেছে সুখেনের মুখোমুখি। সুখেন মুখ তুলে দেখে নামাল। বলল, আয়, বোস। তোর সঙ্গে কথা ছিল, সময় পাইনি যেতে।

সত্য শীতের দুপুরে চাদরমুড়ি দিয়ে ঘামছিল।

(২০)

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সুখেন বলল, তুই আসবি, আমি জানতাম।

সত্য কষ্ট করে হাসল।...আর আমিও জানতাম, তুই আমার কাছে যাবিনে।

যেতাম। কিন্তু যাবার মুখ ছিল না রে।

কেন? তোর তো কোন দোষ নেই।

তুই স্বীকার করিস?

করি।

স্বীকার করিস, লীলা আসলে একটা গেরস্থ বেশ্যা?

সত্য চমকে উঠে সুখেনের দিকে তাকাল। অভিনয় করছে না তো চতুর শয়তানটা?

তোর বৌ—তাকে বেশ্যা বলছি, রাগ করছিস হয়ত সতু।

না, রাগ করিনি। বল্। তবে অন্তর থেকে বললে আরও খুশি হব।

[illegible] মেয়ের হাতে [illegible]

যা হয়, তাই হয়েছে। পৃথিবীটা আস্ত গিলে খেতে চাইবে। বুঝলি?

তুই ওকে চুষে নিঃস্ব করে ফেলছিস তো! নে, চুটিয়ে চুষে নে। সত্য হা-হা করে হাসল।...ব্লাডার ফাঁসিয়ে দে মাগীর!

সুখেনও হাসল। তারপর বলল, তোর বৌ, আইনত ধর্মপত্নী। নৈলে আরও কিছু বেফাঁস বলতাম।

সত্য শুয়োরের মত মুখ উঁচু করে শ্বাস টানছিল। বলল, বল্, যা খুশি। আমার সঙ্গে আর তো কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু এখনও ও তোর স্ত্রী। মাইন্ড দ্যাট!

ওকে আমি ত্যাগ করব।

মুখের কথায় তো কিছু এসে যায় না সতু, আইন আছে কেন?

ও মামলা করবে? খোরপোষের দাবী করবে?

তা করতে পারে বৈকি।

তুই বুদ্ধি দিবি নিশ্চয়?

সুখেন আঙুল মটকে বলল, নাঃ। ওর মুরুব্বী আছে এখানে। শঙ্কর ভট্টাচার্যের নাম শুনিস নি? নামকরা উকিল? লীলার বাবার বন্ধুলোক।

ও। সত্য চুপ করে গেল।

ধর, যদি সত্যিসত্যি ও মামলা করে, তুই শালা আমায় জড়াবিনে তো?

জড়াবো।

কী বলবি? তোর বৌর সতীত্ব নষ্ট করেছি?

কতকটা তাই। বলব, অবৈধ প্রেম আছে সুখেন রায়ের সঙ্গে।

সুখেন সিগ্রেট এগিয়ে দিল, যা খুশি বলিস বাবা। আমি শালা দু কানকাটা লোক। চালচুলো নেই। মলেও কেউ কাঁদছে না।...চা খাবি?

নাঃ।

খা না বাবা! অমন করছিস কেন? বন্ধুত্ব পুরুষের সঙ্গে পুরুষেরই হয়। আর সে বন্ধুত্ব সহজে ভাঙে না। কে একটা লীলা না ইয়ে, তার জন্যে পুরুষ হয়ে মাথা ঘামানোর কিছু দেখি না! অমন অজস্র লীলা আমি দেখেছি!...তা হ্যাঁ রে সতু, তুই তো বাবা বেশ একটা বাচ্চামত পরী পেয়ে গেছিস দেখছিলাম। কোথায় জোটালি? খাসা জিনিস, মাইরি!

বেল্লো কোথাকার! ও আমার ভাগ্নী।

যাঃ শালা। ভাগ্নীর কোমর জড়িয়ে কেউ সিনেমা দেখে না। স্বচক্ষে দেখেছি।

সত্য হাসল মাত্র।

লোক এল। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর সুখেন একবার ভিতরে উঠে গেল। ফিরে এল। ফের দুজনে একা। সুখেন বলল, আচ্ছা সতু, লীলা যদি তোর কাছে যেতে চায়, নিবি?...অবশ্য, তুই স্বেচ্ছায় ওকে ছেড়ে এসেছিলি রূপপুরে। কিন্তু ধর, যদি এখন ফিরে যেতে চায়?

এ্যাদ্দিন তো যায় নি! লোকও পাঠায় নি।

তবু এখন যদি নিজে থেকে ফিরে যায়?

নেয় না।

তা ঠিকই। ডাঁসা পেয়ারায় দাঁত বসিয়ে আছো, লীলাতে মন ভরবে কেন?

একটু পরেই সত্য উঠে পড়ল। কেন এখানে ঢুকেছিল, বুঝতে পারছিল না সে। বাইরে বেরিয়ে মন খুব কটু হয়ে গেল তার। তবে এটা ঠিকই, সুখেন লীলাকে—যা ভেবেছিল, ভালবাসে না আদতে, ওকে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করতে চায়। করুক। তাই করুক। জীবন অবশ্য খুব ছোট—শিক্ষা পেতে পেতেই দিন ফুরিয়ে যায়।

রাস্তায় নেমে যখন সে হাঁটতে শুরু করেছে, পিছনে একটা রিকশো এসে থেমেছিল। লীলা।

লীলা দেখতে পায় নি সত্যকে। সত্যও লীলাকে দেখে নি।

সত্য ট্রানজিস্টারের চাবি ঘুরিয়ে গান শুনতে শুনতে খেয়া পেরোল। এতক্ষণে খুব তৃপ্তির ভাব এসেছে মনে। কাকেও যেন ভীষণ ছোট করা হয়েছে—তার শত্রুকে!

বাড়ি ফিরে কদিন ওই আশ্চর্য যন্ত্রটা বুকে নিয়ে কাটাল সত্য। যমুনা হাত ছোঁয়ালেই সে বলে, দেখো, নষ্ট করে ফেলো না। যমুনা ব্যাজার হয়।

শেষে রাগ মানাতে হয় সত্যকেই। তখন যমুনাও উপুড় হয়ে মাথার কাছে রেখে গান শোনে। পা নাচায়। সত্য পাশে বসে বলে, পাশের সেন্টারে হিন্দী গান আছে।

যমুনা ঘাড় ফিরিয়ে ওর বসে-থাকা দেখে বলে, এই সাবধান!

সাবধান হয়েই আছে সত্য। যমুনার ছোট্ট জঠর ওকে ভাবায়। এই যমুনাকে কোন একদিন মা হতেই হবে। কী হবে তখন? খুব কষ্ট হবে—আহা, কাঁচ জঠরের নরম মাংসে বিষের ফোঁড়ার মত আরেকটা মানুষ পৃথিবীতে এসে সত্তুর মত ধাঁধার ফাঁদে আটকে যাবে।

যমুনার জন্যে মমতা, যমুনার কোন একদিন হলেও-হতে-পারে — ছেলের জন্যে মমতা—সত্য ভেবে অস্থির হয়।

সে কানের পাশে মুখ এনে বলে, যমুনা, একটা কথা বলে দিই, কক্ষনো ছেলের মা হতে চাইবিনে।

যমুনা হাত-পা ছুঁড়ে কপট ক্রোধে চেঁচায়।

সত্য ফের বলে, তুই বিয়ে করতে চাস নে যমুনা। তার চেয়ে মরা ভালো রে।

যমুনা অবাক হয়। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। সত্যমামা কী পাগল হয়ে যাচ্ছে তাহলে?

কখনও মধ্যরাতে সে শোনে বারান্দায় সত্য হাঁটছে। খসখস শব্দ হচ্ছে। সে ডাকে, কী হল মামা?

কিছু না তুই ঘুমো।

সত্য ছটফট করে। নিজের দেহের মধ্যে প্রতিটি কোষে ক্যান্সারের জ্বালা। অজস্র ক্ষুধার্ত ইঁদুর মাংসে ছুটোছুটি করছে।

কাম! ভয়ংকর মারাত্মক সর্বনেশে এক শত্রুকে তার মধ্যে কে ঢুকিয়ে দিয়েছে! উপড়ে দিতে পারে না সমূলে? বিষের গাছটাকে?

কেউ পেরেছিল? ঋষি বিশ্বামিত্রও না। ব্রহ্মাও কন্যা সন্ধ্যার পিছনে ছুটে-ছিলেন!

অথচ সবাই কেমন হাসিমুখে ঘর-সংসার করছে চারপাশে। এমনি করে পৃথিবী বেঁচে আছে আবহমান কাল। বেঁচে থাকবে। কামকে ধিক্কার দেবে এবং ভালবাসবে।

ভোর হয়ে আসছে। যমুনা দরজা খুলেছে সবে। ভোরে উঠে পড়তে বসা অভ্যাস তার। চাঁপা এলে তখন বই ফেলে ঘরের কাজে ব্যস্ত হবে।

দরজা খুলে যমুনা দেখল, সত্য সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সারাটি রাত সত্য এই বন্ধ দরজার সামনে বাঘের মত ছটফট করে ঘুরেছে!

পরক্ষণে সত্য তাকে দু হাতে ধরে ফেলেছে। উন্মূল সদ্যকাটা গাছ যেমন করে মানুষের উপর পড়ে যায়! ওরা দুজনে বাসি শয্যায় আছড়ে পড়ল।

এক সময় সত্য উঠল। সরে আসবার আগে সে দেখল, যমুনার নগ্ন শরীর—বাহু, বুক, জানু কেমন ধূসর হয়ে গেছে। কাঁচ অর্জুনের উজ্জ্বল সোনালী গুঁড়ির মত মসৃণ ওই প্রত্যঙ্গগুলোর উপর কুয়াসার মৃদু আচ্ছন্নতা—এত খারাপ লাগল সত্যর। যমুনার দেহ ঘিরে এখন সহজেই গজিয়ে উঠবে উঁইপোকার ঢিবি। নাকের পাশের মোটা তিলে ঘটে যাবে হঠাৎ বুঝি বিস্ফোরণ। চুল হবে আগাছার ঝাড়। আর হাঁটুর নীচে পুরনো একটা দাগে, অবিকল গাছের গায়ে যেমন উদ্ভট একটা পাতার অঙ্কুর গজায়, তেমনি একটা অঙ্কুর জেগে উঠবে—পারিজাত যা হতে পারত, হয়ত হবে বিষাক্ত কবরী!

দুঃস্বপ্নের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল সত্য। পালিয়ে যাচ্ছিল তাড়া-খাওয়া ভীত খরগোসের মত। ভোরের আলোয় সে হাইওয়েতে অনেক দূরে হেঁটে গেল।

(২১)

মেয়ে বলেই হয়ত মানিয়ে নিল, সইল। সত্যর এই ধারণা। এবং শীত পুরোপুরি জাঁকিয়ে আসবার আগেই যমুনা আগের চেয়ে বাইরে-বাইরে অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছিল যেন। জনান্তিকে ওর নাম ধরে ডাকছিল সে। সব জড়তা দূর হয়ে গেছে যমুনার। সে যখন-তখন সত্যর অত্যাচার হাসিমুখে সয়। প্রতিবাদ করে না। অভ্যাস!

কেবল স্কুলটা ছেড়ে দিল, এই অস্বস্তি লাগে সত্যর! কী হবে লেখাপড়া শিখে?

ঠিকই। যমুনা তো আর চাকরী করতে যাচ্ছে না কোথাও। সত্য আর বিয়ে করবে না—করবার পথও নেই। আইনে অন্তরায় আছে।

দিদি এসেছিল ইতিমধ্যে। খুব খুশি হয়ে গেছে। বলে গেছে, শীগগীর নিজের একটা হিল্লে করে নে সতু। যমুনার ভবিষ্যৎ তোর হাতে। এই ক' মাসেই ভীষণ চোখে-ধরা হয়ে উঠেছে। সামনে বচ্ছর দেখে-শুনে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আহা, বাবা-মা নেই, তুই তো ওর সব এখন।

সতু নিজের হিল্লে কী করবে! সে হেসেছে। বলেছে, ও মামলা করবে শুনে-ছিলাম। এখনও করল না তো!

কে? দিদি বলেছিল, ছেড়ে দে খানকীর কথা। তুই একটা ঠুকে দে না!

তাই দেব ভাবছি।

দেরী করিস নে। কী সব আইন হয়েছে আজকাল!

দিদি দুজনকে বিস্তর উপদেশ দিয়ে চলে গেছে।

মাঘে জমির ফসল নিয়ে ব্যস্ত ছিল সত্য। চায়ের দোকান ছেলেমানুষ বুলুর হাতে—চলছে ভালই। ফাল্গুনে হাইওয়ের পাশে শিমুলের ফুল ফুটল। বাতাসে এল উষ্ণতা। পৃথিবীতে শুধু নয়, সত্যর মনে হচ্ছিল, এতদিনে তারও একটা বসন্ত-কাল এসে গেল। যমুনা আরও সুন্দর হয়েছে। ভীষণ সাজে। ভীষণ ভালবাসা দিয়ে পাগল করে দেয় সত্যকে। গিন্নীর মতই শাসন-তর্জনও কম করে না।

আর তখনই এল আদালতের সমন।

লীলা এতদিনে সত্যি সত্যি মামলা করল তাহলে ডিভোর্সের দরখাস্ত একে-বারে—খোরপোষের দাবী নয়। আর কী লজ্জা, সত্যচরণ তার নাবালিকা ভাগ্নীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত— সতীসাধ্বী লীলারাণীর পক্ষে প্রত্যক্ষে সেই ঘৃণ্য জীবনযাপন সহ্য করা সম্ভব কি না, হুজুর বাহাদুর বিচার করুন। এরূপ লম্পট স্বামীর নিকট থেকে সে অব্যাহতি চায়।

কিন্তু কী সর্বনাশ, লীলা অন্য একটা আগুন জ্বালিয়ে দিল যে। রাণীচকে যারা যমুনা ও সত্যর সম্পর্ক ও আচরণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল, তারা স্বভাবত নেচে উঠল। রটল যা রটা উচিত। সত্য হোক মিথ্যে হোক, খবর ছড়ালে তা রক্তবীজ হয়ে ওঠে।

লোকের কাছে উত্যক্ত হয়ে চাঁপাও শেষ অব্দি নাকি সুরে বলেছে, হবে। অনেক কাণ্ড তো দেখেছি দুজনের—মনে খটকা লেগেছে বৈকি।

চাঁপা বাড়ি ছাড়ল সত্যর ভয়ে। হাওয়ার গতি ফিরেছে। লীলা যাবার পর যমুনার আবির্ভাব—অথচ লোকের সময় জ্ঞানের ভীষণ অভাব দেখা গেল। হারাম-জাদা সতুটা নাকি নিরীহ ভালোমানুষ! মিছেমিছি বৌটাকে তাড়িয়েছিল অপবাদ দিয়ে! আসলে এই কচিগাছে বাসা বাঁধবার মতলব ছিল মাথার। নরকেও কি ওর ঠাঁই হবে!

হয়ত একেই বলে জনমত [illegible] মন-মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শান্তি মোল্লার দিদি সুভদ্রা আর তার স্বামী প্রবোধ। প্রবোধ তহশীলদারী চাকরী করে। মামলার তদ্বির সেই করবে।

রাণীচকে সত্যর শত্রু কেউ ছিল না। তবু দেখা গেল, সাক্ষী এখান থেকেও পেয়েছে লীলা। শঙ্কর উকিলের স্থায়ী মক্কেল এখানে কম নেই। তাই হয়ত এটা সম্ভব হল।

পিনাকী মুখুয্যে সাক্ষী। আর সাক্ষী চাঁপা—চাঁপা ঝি। টাকা চিরকালই অসম্ভবকে সম্ভব করে।

হাটুবাবুর কাছে গিয়েছিল সত্য। হাটুবাবু নাক সিঁটকে বলেছেন, ছিঃ, এ কি শুনছি!

সত্য ক্ষোভে-দুঃখে সরে এসেছে সেখান থেকে।

আসলে লীলা রাণীচকের লোকের মনের কথাটি—দীর্ঘদিন যা তারা গোপনে রাখছিল—স্পষ্ট বলে ফেলেছে। মৌচাকে ঢিল পড়েছে।

সত্য বলল, এই আমার গ্রাম, এই আমার দেশ! যমুনা, আমরা কলকাতা চলে যাব। অসহ্য লাগছে আমাকে। নিঃশ্বাস নিতে ঘেন্না হচ্ছে। সব শালা পচে গেছে এখানে। যাবে তো আমার সঙ্গে?

যমুনা বড় বড় চোখে তাকাল মাত্র। জবাব দিল না।

সত্যি যমুনা, পৃথিবীতে আর একটি মাত্র জায়গার আছে দরজা খোলা। যেখানে কেউ কাকেও চেনে না, কেউ কারুর দিকে চেয়ে দেখে না। জানো যমুনা, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বেশ কয়েক মাস কলকাতায় ছিলাম! বাবা ফিরিয়ে এনে-ছিলেন। আমার এক মেশোমশাই থাকেন শ্যামবাজারে। জানো?

যমুনা জানে না।

শতমুখে কলকাতার গল্প করে সত্য-চরণ হাঁফিয়ে ওঠে। হঠাৎ অসম্ভব সুন্দর মনে হয়, ওই দীর্ঘ বিলম্বিত হাইওয়ের একটুকু অংশ—তার ছোট্ট দোকানটা, যাতায়াতের পথের ধারে অনেক অচেনা মুখ। অনেক সত্য-মিথ্যা গল্প।

আজকাল পিনাকী আর আসে না দোকানে। আসবার মুখ নেই। তবে চেনা মানুষ অনেক আসে। তারা সত্যর মামলার খবর জানতে চায়। আফশোষ করে। সত্য কানে নেয় না। যেদিকে তাকায় মনে হয়, কাঠগড়ায় লীলা দাঁড়িয়ে আছে।

এ ছবি চোখের পর্দায় মোছে না। যখনই যমুনার কাছে যায়, আদর করতে হাত বাড়ায়, তখনই লীলা দূরে থেকে কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে বলে ওঠে. ধর্মাবতার, আমার স্বামী অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত। ধর্মা-বতার, সে কন্যাতুল্য আত্মীয়ার সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকে।

কী হল? যমুনা বলে।

আসছি।

বসন্তের রাত্রে হাইওয়েতে সত্য হাঁটে। অনেক দূরে হেঁটে যায়।

(ক্রমশঃ)

চলচ্চিত্র শিল্পী, সংগীত শিল্পী এবং কলাকুশলীরা বন্যার্ত সাহায্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলকাতার পথ পরিক্রমা করেন। চিত্রে সুচিত্রা মিত্র, সাগর সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ইলা বসু, উৎপলা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তা বসুরায়।

ফটো : অমৃত

চিত্র সমালোচনা

প্রেক্ষাগৃহ

বাঘিনী (বাঙলা) : এস, এম ফিল্মস -এর নিবেদন; ৪,১৫২·২৯ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ : প্রযোজনা : শরদিন্দু সিংহ : পরিচালনা : বিজয় বসু; কাহিনী : সমরেশ বসু; চিত্রনাট্য : [illegible] সেন ও বিজয় বসু : সঙ্গীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় : গীত-রচনা : মুকুল দত্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু; চিত্রগ্রহণ : দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়: শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত এবং ইন্দু অধিকারী; সঙ্গীতানুলেখন : [illegible] চিটনীস ; আবহ সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ-পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প নির্দেশনা : কার্তিক বসু; সম্পাদনা : রবীন দাস; নেপথ্য-সঙ্গীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, রুমা গুহ-ঠাকুরতা, মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নৃত্য-পরিকল্পনা : প্রভাত ঘোষ; রূপায়ণ : সন্ধ্যা রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, শর্মিতা বিশ্বাস, ছায়া দেবী, বাসবী নন্দী, তপতী ঘোষ, অপর্ণা দেবী, রেণুকা রায়, রাখী বিশ্বাস (অতিথি), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, তরুণকুমার, মিহির ভট্টাচার্য, মমতাজ আহমেদ, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, সুখেন দাস, মৃণাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ৩০ আগস্ট, শুক্রবার থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

একদিন যে মহাপ্রাণ যুবক পল্লীবাসী জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচাবার সংকল্প নিয়ে হাজার লোকের মিছিলের পুরোভাগে থেকে পুলিশের গুলী ও লাঠির সামনে হাসিমুখে বুক পেতে দিত, সেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় চিরঞ্জীব বাঁড়ুজ্যে মদ চোলাইয়ের নোংরা কারবারে নেমে আবগারী পুলিশের তাড়া খেয়ে শেয়াল-কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এই দেখে গাঁয়ের মেয়ে দুর্গা একদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের বাপ রোজগারের জন্যে ঐ মদ চোলাই করবার রাস্তা ধরে-ছিল বলে তার কাছ থেকে কম গঞ্জনা খায়নি। কিন্তু বাপের মৃত্যুর পর যেদিন সে বুঝল, মাথার ওপর কোনো আশ্রয় না থাকায় তার মতো রূপ-যৌবনসম্পন্না মেয়ের

পক্ষে সংভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা রীতিমতো দুষ্কর, সেদিন সে তার চিরো দা'রই দলে ভিড়ে পড়াই নিরাপদ জ্ঞান করল। শিগগিরই গুড় আর মশলা মিশিয়ে মদ চোলাই করতে ও তল্লাটে দুর্গার জুড়ি রইল না। অক্রুর দে, সনাতন ও কার্তিকের ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়ল। দুর্গার সহায়তায় চিরঞ্জীবের জম-জমাট। কিন্তু বাদ সাধল বলাই সান্যাল, ও অঞ্চলের নব-নিযুক্ত আবগারী দারোগা। ভদ্রলোক বে-আইনী মদের চোলাইকারী ও চালানদারদের শায়েস্তা করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু চিরঞ্জীবের মতো একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছেলে কেন এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হ'ল, তা বলাই সান্যাল ভেবেই পাননা; শুধু তাই নয়। দুর্গার মতো একটা জঘন্য ডাকসাইটে বাঘিনীর সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠতা কিসের, তা নিয়েও তার কম মাথা-ব্যথা নয়। বলাই সান্যালের বিদুষী স্ত্রী মলিনা অথচ কি অবস্থায় প'ড়ে মানুষ কুপথে যায়, তা' অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গেই বুঝতে পারেন এবং দুর্গা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে ভালোবাসা জন্মানো যে দুষ্য তাও স্বীকার করেন না। এই মলিনারই সদুপদেশ একদিন চিরঞ্জীব মাথা পেতে নিয়েছিল এবং সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সে তার অনুচরদের সংজীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় মন দিয়েছিল। কিন্তু চিরোদার অজ্ঞাতেই তাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে বামাল নিয়ে পালাতে গিয়ে দুর্গা ধরা পড়ল এমন লোকের হাতে, যে বামাল ছেড়ে দিয়ে দুর্গার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে একটুও ইতস্তত করেনি। নিজের ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে দুর্গা তার বুকে বসিয়ে দিল ছুরির সমস্ত ফলাখানা। দুর্গা জেলে গেল তার চিরোদা'কে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে।

সমরেশ বসু রচিত "বাঘিনী" উপন্যাসের উপরে কথিত চিত্রকাহিনীটি যে গতানুগতিকতা দোষদুষ্ট নয়, একথা বলাই বাহুল্য। যে-অবস্থার মধ্যে চিরঞ্জীব ও দুর্গা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এবং ক্রমেই দু'জনে একটি অসামাজিক কাজের শরিক হয়ে পরস্পরের সান্নিধ্যে

পিতা পুত্র / স্বরূপ দত্ত ও অনুভা ফটো : অমৃ

আসতে বাধ্য হয়েছে, তাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেখানো হয়েছে। চিরঞ্জীব ও দুর্গার মধ্যে ভালোবাসার যে ফল্গুধারা প্রায় দু'জনেরই অগোচরে জন্মলাভ ক'রে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, চলচ্চিত্রকার অতি নিপুণ হাতে তার প্লেটনিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন একেবারে সমাপ্তি দৃশ্যের আগে পর্যন্ত; জেল-ফটকে দেখা করতে এসে চিরঞ্জীব দুর্গার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিল—এই ছেলেখেলার বিবাহ-দৃশ্য দেখাবার শিশু-সুলভ প্রলোভন ত্যাগ করতে পারলেই ভালো হ'ত।

ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে—এর সামগ্রিক অভিনয়।

ছোট-বড় নির্বিশেষে প্রতিটি ভূমিকা এমন নিখুঁত ভাবে অভিনীত হ'তে কচিৎ দেখা যায়। নায়ক চিরঞ্জীব ও নায়িকা দুর্গাবেশে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় তাঁদের অভিনয়-নৈপুণ্য দ্বারা চরিত্র-দুটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। দুঁদে আবগারী দারোগা বলাই সান্যালের চরিত্র-চিত্রণে বিকাশ রায় তাঁর বহু-পরীক্ষিত দক্ষতার আর একটি নিদর্শন উপস্থিত করেছেন। সংবেদনশীল বিদুষী মলিনা দর্শক সহানুভূতি লাভ করে রুমা গুহ-ঠাকুরতার দরদী অভিনয়গুণে। যেখানে চিরঞ্জীব ও দুর্গার অকলঙ্ক ভালোবাসার গভীরতাকে মলিনা তার সঙ্কীর্ণচেতা স্বামীর কাছে উচ্ছ্বসিত আবেগে ব্যক্ত করতে গিয়ে সহসা আবিষ্কার করল, তার স্বামী তিলমাত্র অভিভূত না হয়ে স্থান ত্যাগ ক'রেছে, তখন তার বেদনার্ত চাউনি মনে রাখবার মতো। চিরঞ্জীবের সর্বংসহা মায়ের চরিত্রটি ছায়া দেবীর সংযত অভিনয়ের মাধ্যমে সুপরিস্ফুট। অপরাপর ভূমিকায় জহর রায় (বাঁকা), অজয় গাঙ্গুলী (জটা), রবি ঘোষ (ভোলা), ভানু ব
পাধ্যায় (কেষ্ট), দুর্গাদাস বন্দ্যোপা
(নারায়ণ হাতে ব্রাহ্মণ), শমিতা বি
(বীণা), শান্তি চট্টোপাধ্যায় (অক্রুর
বাসবী নন্দী ও তপতী ঘোষ (বড়দি
সুশীলা—দুই অনূঢ়া যুবতী), স
দাস (গুলি), তরুণকুমার (ড্রাইভার ব
মিহির ভট্টাচার্য (শ্রীধর দা'), মম
আহমেদ (অখিলবাবু), মৃণাল মুখোপ
(কাশেম), রেণুকা রায় (মাতিনী), অ
দেবী (চোরাই চালানকারী যাত্রী),
বিশ্বাস (নর্তকী) প্রভৃতি সকলেই
সু-অভিনয় করেছেন, এ-কথা আগেই
হয়েছে।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বি
একটি উচ্চমান রক্ষার প্রয়াস পরিল
হয়। ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল নির্বাচ
শটের কম্পোজিসনে কাহিনী বৈচিত্র্যের
আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সু
ছবিটির গতি কোথাও শ্লথ হ'তে
দেওয়া ও ঘটনানুযায়ী টেম্পো সৃষ্টির
সম্পাদকের কাঁচির সুব্যবহার দেখা
ছবির সঙ্গীতাংশও দর্শকসাধারণের
যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এর দু'খানি
বাউল, টপ্পাজাতীয় জনপ্রিয় সুরসমৃ
সঙ্গীত। আবহসঙ্গীত কাহিনীর বি
ঘটনার গুরুত্বকে বর্ধিত করেছে।

এস, এম, ফিল্মস-এর 'বা
বিষয়-বৈচিত্র্যের অভিনবত্বে, অভি
সামগ্রিক উৎকর্ষে ও সঙ্গীতের মা
জনপ্রিয় হবার দাবি রাখে।

ঝুক গয়া আসমান (হিন্দী) :
ডি, বনসাল প্রোডাকসন্স-এর নিন্দ
৪,৭০১·০০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৭ র
সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : আর ডি বনসা
রমেশ লাম্বা; পরিচালনা : লেখ ট্যা

...নী ও চিত্রনাট্য : ওঙ্কার সাহেব ; ...ক : প্রয়াগ রাজ ; সংগীত পরিচালনা ...কর জয়কিষণ ; গীত রচনা : ...ন্দ্র, হসরৎ জয়পুরী ও বিহারী ; ...গ্রহণ-পরিচালনা : দ্বারকা দিবেচা ; ...গ্রহণ : কে রমণলাল ; কোলাসংলগ্ন ...গ্রহণ : বাবুভাই উদেশী ; শব্দানু... : এস ভামবুরী ; সংগীতানুলেখন : ...কাত্রাক ; শব্দপুনর্যোজনা : মঙ্গেশ ...ট ; শিল্প নির্দেশনা : শান্তি দাস ; ...চালনা : প্রাণ মেহেরা ; নৃত্য পরি... : সুরেশ ভাট ও হার্মান ; নেপথ্য সংগীত : মোহাম্মদ রফী, লতা ...শকর এবং আশা ভোঁসলে ; রূপায়ণ : ...রা বানু, পারভীন চৌধুরী, দুর্গা ...টে, সুলোচনা, মধুমতী, রাজেন্দ্র..., রাজেন্দ্রনাথ, প্রেম চোপরা, ডেভিড ...গিরদার, রণধীর, কৃষণ ধাওয়ান ...দীপ রাজ প্রভৃতি। আর ডি বি...ন্ড কোম্পানীর পরিবেশনায় গেল ৩০ ...ষ্ট, শুক্রবার থেকে লোটাস, রূপবাণী ...তী, উত্তরা, উজ্জ্বলা, অমুলা, প্রেস ...এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ ...ছে।

...ইসমান কলার রঙীন হিন্দী চলচ্চিত্র ...কে গায়ে আসমান" সম্পর্কে প্রথমেই ...বার কথা এই যে, বাঙলা দেশে বহু ...শংসিত ও জনপ্রিয় বাংলা ছবির স্বনাম... প্রযোজক আর ডি বনশলের হিন্দী ...চিত্র-জগতে এইটিই হচ্ছে প্রথম ...দান এবং সানন্দে ঘোষণা করছি, এই ...ম ছবি মারফতই তিনি হিন্দি ছবির ...র সাধারণের সামনে কলা-কৌশল এবং ...ভোগ্যতার দিক দিয়ে এমন একটি ...বদ্য উপহার উপস্থাপিত করেছেন যে ...ন্দী চলচ্চিত্র-জগতে সাফল্যমণ্ডিত প্রযো... রূপে তিনি প্রথম সারিতে সম্মানের ...সন লাভ করবেন।

"ঝুক গায়া আসমান"-এর কাহিনী ...নন্ত রোমান্টিক হলেও এর মধ্যে এক ...কে যেমন আছে রূপকথার মিষ্টি ছোঁয়া, ...দিকে তেমনই আছে আমাদের বর্তমান ...জ ব্যবস্থায় শিল্পপতিদের কর্তব্যের ...ও একটি সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত। কাহিনীর ...হৎ দার্জিলিংয়ে ট্যুরিস্ট গাইড সঞ্জয়ের ...দেয় ছিল নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরী—...-সুলভ ছিল তার প্রকৃতি। ছুটি ...উপভোগ-করতে-আসা মেয়ে প্রিয়াকে সে ...ভালোবেসে ফেলল এবং জানল, প্রিয়াও ...কে মন দিয়ে ফেলেছে। সেই প্রিয়াকে ...কলকাতাগামী এরোপ্লেনে তুলে দিয়ে ...জীপ গাড়ি করে ফেরবার সময়ে সে এক ...ঘটনায় পড়ল।—এইখানে শুরু হল ...রূপকথা। এক নব-নিযুক্ত যমদূত ভুল ...রে তার আত্মাকে দেহচ্যুত করে পর... লোকে নিয়ে গিয়ে হাজির হল। চিত্র...গুপ্তের কাছে ভুল ধরা পড়তে আদেশ ...ল তার আত্মাকে তার মৃতদেহের মধ্যে ...নঃ-প্রবিষ্ট করে দেবার জন্যে। কিন্তু যখন ...দেখা গেল, তার মৃতদেহকে ইতিমধ্যেই ভস্মীভূত করা হয়েছে, তখন স্বর্গদূত ... ... এমন ... মৃতদেহ

শিল্পপতির দেহের মধ্যে তার আত্মাকে প্রবিষ্ট হতে পরামর্শ দিলেন, যার বহি-রঙ্গের সঙ্গে তার দেহের হুবহু সাদৃশ্য আছে। শিল্পপতি টি কে সাক্সেনা তাঁর দুরভিসন্ধি ভাই প্রেমের হাত থেকে গুলী খেয়েও বেঁচে উঠলেন; কিন্তু তাঁর প্রকৃতি গেল সম্পূর্ণ বদলে। স্বভাব-কৃপণ টি কে হয়ে উঠলেন সদাশয়, সুমধুর ব্যবহারযুক্ত কর্তব্যপরায়ণ। পার্সোন্যাল সেক্রেটারী গীতার সঙ্গে টি কে-র নাকি গোপনে বিবাহ পর্যন্ত হয়েছিল, তার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টায় এই পুনর্জন্মলব্ধ টি, কে—যে আসলে হচ্ছে টি কে-র দেহে সঞ্জয়ের আত্মা—বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং শেষপর্যন্ত প্রচুর টাকার বিনিময়ে তার কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনপত্র আদায় করলেন। সঞ্জয়ের আত্মা তখনও প্রিয়ার প্রেম প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রিয়া তাকে ধনী টি কে মনে করে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, যে টি কে তার কোম্পানীর দুর্নীতিপরায়ণ ম্যানেজার ও প্রিয়ার বাবা শঙ্করলালকে মিথ্যা অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করাচ্ছে। শেষ-পর্যন্ত টি, কের দেহধারী সঞ্জয় যখন তার ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করল, নিজের বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সকল কর্মীকে অংশী-দার করে নিল, তখন তার ভাই স্বার্থান্ধ প্রেম নিজের খুনের বোঝা সরল প্রিয়ার ওপর চাপিয়ে ধরা পড়বার পরে দাদাকে করল সরাসরি আক্রমণ। দৈহিক দ্বন্দ্বে প্রেম যখন টি, কে-র দেহধারী সঞ্জয়ের কাছে পরাজিতপ্রায়, তখন পুলিশ এসে প্রেমকে করল গ্রেপ্তার এবং সঞ্জয়ের সঙ্গে মিলন হল প্রিয়ার।

কাহিনীর আরম্ভভাগ কৌতুকপ্রদ ও বৈচিত্র্যময়। প্রেম যদি যথার্থ হয়, তাহলে প্রেমিক বা প্রেমিকা একে অপরের জন্যে হাসতে হাসতে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে—একটি সুপরিকল্পিত কৌতুক সাহায্যে এই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে কাহিনীকার দেখিয়েছেন, কোনো ব্যক্তি যদি শিশুর মতো সরলচিত্ত, স্বর্গীয় প্রেমে মহিমান্বিত ও সদাচরণের গুরু, তাহলে সেই ব্যক্তির কাছে—সেই স্বর্গীয় আত্মার অধিকারীর কাছে স্বর্গও নত হয়ে অভিনন্দন জানায়।—এই হচ্ছে ঝুক গায়া আসমান'-এর মূল কথা। এবং আমাদের প্রদত্ত কাহিনীর চুম্বক পাঠ করে নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন যে, এই কাহিনীটির মধ্যেও প্রচুর নতুনত্ব বর্তমান।

অভিনয়ে নায়ক সঞ্জয় (টি-কে দেহধারী সঞ্জয়সমেত উভয় অবস্থায়) সঞ্জয় ও নায়িকা প্রিয়ারূপে রাজেন্দ্রকুমার ও সায়রা বানু বাচনে ও ভঙ্গীতে দর্শকমাত্রেরই মন হরণ করেছেন। তাঁদের অভিনয়ের মধ্যে হাল্কা হাসি জাগাবার সুযোগও যেমন আছে, চোখকে অশ্রুসজল করবার মুহূর্তও তেমনই আছে। ছবির শেষাংশে উৎকণ্ঠা ও শিহরণ জাগানোর সুদীর্ঘ সময়টিতে রাজেন্দ্রকুমার বাস্তব অভিনয়ের চূড়ান্ত দেখিয়েছেন। নায়ক ... সুখ-দুঃখের বন্ধু হনুমানের ভূমিকায় রাজেন্দ্রনাথ ছবির হাল্কা অংশটিকে নিপুণভাবে জমাট করে রেখেছেন। টি-কে-র অনুগৃহীত পার্সোন্যাল সেক্রেটারী গীতার বেশে পারভীন চৌধুরী এবং স্বার্থান্ধ ভাই প্রেমরূপে প্রেম চোপরা চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় দুর্গা খোটে (দাদিমা), জাগীরদার (শঙ্করলাল), মধুমতী (নর্তকী), ডেভিড (স্বর্গদূত) প্রভৃতির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে সর্বোচ্চ মানরক্ষা বিষয়ে একটি অসাধারণ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। পরিচয়লিপি থেকে শুরু করে শেষপর্যন্ত ইস্টম্যান কলারের এমন নয়নাভিরাম বর্ণের সমারোহ দেখা যায় না। দৃশ্যসজ্জা ও অন্যান্য কর্মীরা এমন কাল্পনিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যাকে অদৃষ্টপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হবে না। সায়রা বানু নিশ্চয়ই সুন্দরী, তবুও বলব, আলোকচিত্র গ্রহণ কৌশলে ও সুনির্বাচিত পরিচ্ছদের ব্যবহারে তাঁকে এমন আশ্চর্য-সুন্দর দেখিয়েছে যে, তাঁকে দেখবার জন্যেই যদি দর্শকেরা দুবার ছবিটি দেখেন, তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। ছবির দুখানি গানই সুরারোপিত সুন্দর-ভাবে সুরসমৃদ্ধ সংগীত এবং সুন্দরভাবে পরিস্থিতি বুঝে রেকর্ড-করা। আবহ-সংগীতও ঘটনার আবহসৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত ছবিখানির প্রতিটি দৃশ্যপরিকল্পনায় শিল্পনির্দেশকের নিদর্শন পরিস্ফুট এবং সম্পাদকের দক্ষতাই ছবির কোনো অংশকে ক্লান্তিকরের পর্যায়ে আসতে দেয়নি।

আর ডি বনশলের প্রথম হিন্দী চিত্র-প্রয়াস 'ঝুক গায়া আসমান' কাহিনীর অভিনবত্বে, শিল্পকৌশলের অনন্যতায় এবং জনমনোহারিত্বে একটি স্মরণীয় সৃষ্টি-রূপে অভিনন্দিত হবে।

(৩) মেরে হমদম মেরে দোস্ত (হিন্দী) : কেবলজিৎ প্রোডাকসন্স এর নিবেদন ; ৪,৪৭৮·৭৩ মিটার দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ ; প্রযোজনা : কেবলকুমার ; পরি-চালনা : অমরকুমার ; কাহিনী : নর্মদা কুমারী ; চিত্রনাট্য : কেবলকুমার ; সংলাপ : রাজেন্দ্রসিং বেদী ; সংগীত-পরিচালনা : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল ; গীতরচনা : মজরু সুলতানপুরী ; চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : কে বৈকুণ্ঠ ; চিত্রগ্রহণ : ডি কেশব ; শব্দানুলেখন : যশোবন্ত মেহতা ; সংগীতানুলেখন : মীনু কাত্রাক ; শব্দ-পুনর্যোজনা : রবীন চট্টোপাধ্যায় ; শিল্প-নির্দেশনা : সুধেন্দু রায় ; সম্পাদনা : হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ; নৃত্য-পরিকল্পনা : পি এল রাজ ; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : লতা মঙ্গেশকর ও মোহাম্মেদ রফি ; রূপায়ণ : শর্মিলা ঠাকুর, মমতাজ, অচলা সচদেব, নিগার সুলতানা, সুলোচনা, মেহমুদ, ধর্মেন্দ্র, রেহমান, সন্তোষকুমার, ওমপ্রকাশ প্রভৃতি। অমরজ্যোতি ... প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ৩০ আগস্ট, শুক্রবার থেকে জ্যোতি, জনতা, ম্যাজেস্টিক,
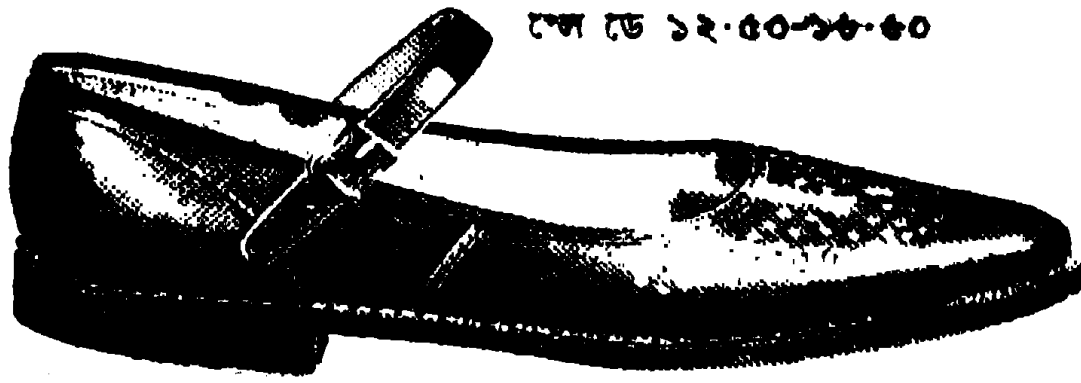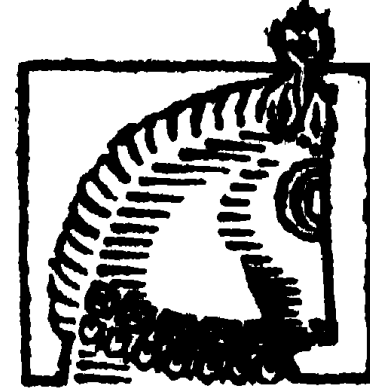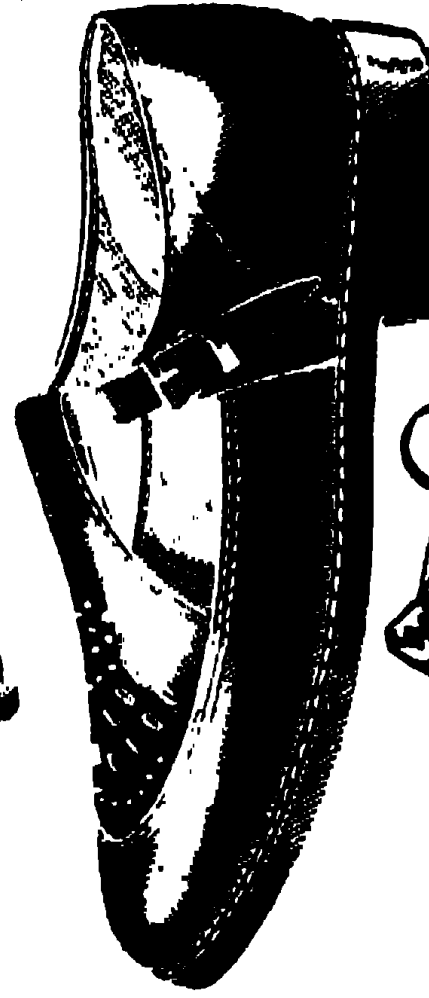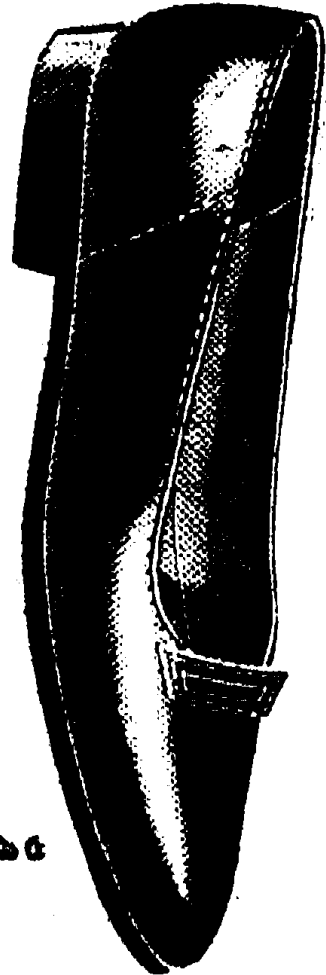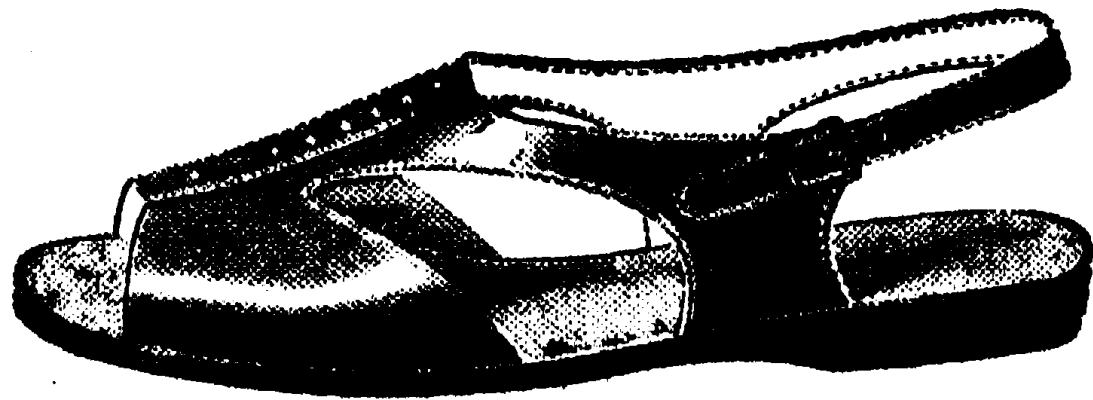
...রা, প্রভাত, পূর্ণশ্রী, পূরবী এবং ...াপর চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

'মেরে হমদম মেরে দোস্ত' হচ্ছে ...ট রোমান্টিক কাহিনী। সাধারণ হিন্দী ...ত দেখা যায়, নায়ক-নায়িকার ...ধাবন করছে। এখানে আছে তার ...ক্রম—এখানে নায়িকা নায়কের জন্যে ...য়িত। বিধবার হৃদয়বান, সংবুদ্ধি-...ণ সন্তান সুনীল কোনো বিশেষ ...ণে ধনীদের ঘৃণা করে জেনেও অগাধ ...র অধিকারিণী সুন্দরী অনীতা ...লকেই তার জীবনের দোসররূপে ...না করে এবং এর জন্যে প্রথমে সে ...কে আশ্রয়হীনা দারিদ্ররূপে পরিচিত ... এবং পরে যখন আসল কথা গোপন ... না, তখন চাচা মেলারামের সহায়তায় ...বিরাট পার্টিতে সকলের সামনে ...লের সংগে তার আসন্ন বিবাহের কথা ...ণা করায়। কিন্তু অনীতার ম্যানেজার ...ত এই ব্যাপারে রুষ্ট হয় এবং ...তার বাবা বিশ্বনাথ যে তাঁর স্ত্রীর ... অনুরক্ত হবার সন্দেহে সুনীলের ...হরিরামকে হত্যা করবার অপরাধে ... খাটছেন এবং অনীতার মা এক ঘৃণ্য ...ন যাপন করছেন, এই কথা প্রকাশ করে ...ল এবং অনীতার মধ্যে বিরোধের ...ষ্ট করে। অজিতের মনোগত ইচ্ছা ছিল, ...তাকে বিবাহ করে ওর বিশাল ...ত্তির মালিক হওয়া। এই কারণেই ...তার বাবা বিশ্বনাথ জেল থেকে মুক্ত ...র সংগে সংগে অজিত তাকে হত্যা ...। দৈবক্রমে হত্যার অপরাধে সুনীল ...চযুক্ত হয়। কাদের চেষ্টায় এবং কার ...য়তায় প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়ে অজিত ...রাধী বলে সাব্যস্ত হয় এবং সুনীল-...তার মিলন সম্ভব হয়, তাই নিয়েই ...র শেষ উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যগুলি রচিত ...ছে।

...হিন্দী ছবির রোমান্টিক নায়করূপে ...ন্দ্রের কলাকুশলতা দর্শকদের কাছে ...ন্ত সুপরিচিত। এ-ছবিতেও তার ...নোরকম ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। এর ...প্ত অংগসজ্জায় সুসজ্জিতা শর্মিলাকেও ...রা বহু হিন্দী ছবির প্রেমিকা নায়িকা-...প যেমনটি দেখতে পাই, আলোচ্য ...তে আমরা তেমনটিই দেখেছি। এবং ...ার (ছবি বহুদূর অগ্রসর হবার পরে ... শেষ পর্যায়ে জানা যায় নীনা ...তার ছোট বোন) ভূমিকায় মমতাজ ...তার একজন দরদী বান্ধবী এবং ...জতের হাতের ক্রীড়নক—এই উভয়রূপেই ...জের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; দুর্বৃত্ত ...রবেষ্টিত সুনীলকে সাবধান ও রক্ষা ...ার উদ্দেশ্যে তাঁর নৃত্যটি যথার্থই ...ভোগ্য ও কৌতূহলসঞ্চারী। চাচা মেলারাম বেশে ওমপ্রকাশ একটি সুন্দর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় রেহমান (অজিত), স্নেহলতা (সুনীলের ভগ্নী), নিগার সুলতানা (অনীতার মা), অচলা সচদেব (সুনীলের মা), সন্তোষ-কুমার (রমেশ) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বিপরীতমুখী দুই ট্রেনের একটির কামরা থেকে অপরটির কামরায় খুন হওয়ার দৃশ্য দেখানোর মধ্যে চিত্র-গ্রহণ ও সম্পাদনার কৃতিত্ব লক্ষ্যণীয়। ছবির গানগুলি সুগীত হলেও সম্ভবত রেকর্ডিং বা রি-রেকর্ডিংয়ে তারতম্যের জন্যে সুখশ্রাব্য হতে পারেনি।

কেবলজিৎ প্রোডাকসন্স-এর রঙীন ছবি 'মেরে হমদম মেরে দোস্ত' রোমান্টিক হিন্দী ছবি হিসাবে জনপ্রিয় হবে।

—নান্দীকর

বিবিধ সংবাদ

ডাচ কাহিনীচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন :

১ সেপ্টেম্বর, সকাল ৮-৪৫ মিনিটে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে সোসাইটি সিনেমায় হল্যান্ডের কাহিনীচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন নেদারল্যান্ড সরকারের নয়াদিল্লীস্থ ভারতীয় দূতা-বাসের সাংস্কৃতিক বিষয়, সংবাদপত্র ও তথ্যপরিবেশন বিভাগের নয়াদিল্লীস্থ প্রধান সচিব মিঃ জে জি দি ইয়ং। ফেডা-রেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়ার স্টাডি সার্কেলের সচিব ডঃ গুরুদাস ভট্টা-চার্যের আহ্বানে মিঃ দি ইয়ং কলকাতার ফিল্ম সোসাইটির সভ্যবৃন্দের আগ্রহ এবং উৎসাহকে ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁদের দেশে কাহিনীচিত্র নির্মাণে পরিচালকদের সাম্প্রতিক আত্মনিয়োগের কথা উল্লেখ করেন ও বর্তমান উৎসবে প্রদর্শিত তিন-খানি কাহিনীচিত্র দেখে প্রতিটি দর্শককে
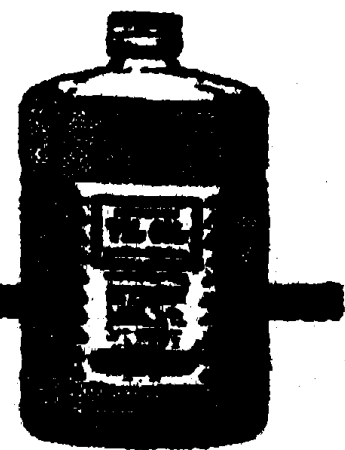
তাঁর মতামত জানাতে অনুরোধ করে প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। তিনি ছাড়া কলকাতাস্থ কনস্যাল জেনারেল মিঃ ধরেন-সেন, ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের অরূপ প্রামাণিক ও সিনে ক্লাবের সভাপতি বিঝাও সময়োচিত বক্তৃতা দেন।

সুরবিতানে 'শ্রীশ্রীচণ্ডীগীতস্তোত্রম্'

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজো উপলক্ষে আসন্ন মহা-ষষ্ঠী উষারাগ প্রারম্ভে দক্ষিণ-কলিকাতার কলকাতার অন্যতম বিশিষ্ট সংগীতালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সুরবিতান খিদির-পুরে ৮৩, মনসাতলা লেনে এঁদের নিজস্ব ভবনে বেতারখ্যাত বাণীকুমার রচিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডীগীতস্তোত্রম্' শীর্ষক ভক্তি-মূলক সংগীতালেখ্য পরিবেশন করেছেন। এতে সুরসংযোজনা করেছেন সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা স্বনামধন্য পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা ও পরি-চালনা করেছেন তাঁর পূর্বতন বিশিষ্ট ছাত্র ও সংস্থার অধ্যক্ষ সুখ্যাত সংগীত-শিল্পী রবীন্দ্র বসু। পরিচালনায় সহ-যোগিতা করেছেন উদীয়মান শিল্পী প্রভাত-ভূষণ।

রক্তে বোয়া ধান

পি অ্যান্ড টি'র অডিট অ্যান্ড অ্যাকা-উন্টস রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে রবীন ভট্টাচার্যের 'রক্তে বোয়া ধান' সম্প্রতি মঞ্চস্থ হয়।

সুষ্ঠু পরিচালনা ও টিম ওয়ার্কে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয়। এরই মধ্যে সবুজ সিং-এর চরিত্রে অসীম মজুমদারের প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শকদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। এ ছাড়া কেশার ভূমিকায় স্বর্ণ রায় ও দীন-দয়ালের ভূমিকায় সন্তোষ নন্দনের অভিনয় আকর্ষণীয় হয়। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন রবীন দত্ত, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি দাস, সুশান্ত চৌধুরী বিক্রম নাথ ও হরিসসাধন সরকার।

নাটকটির পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন শ্রীশচীন চক্রবর্তী।

গীতাঞ্জলি

'গীতাঞ্জলি' সংগীত শিক্ষায়তন আয়ো-জিত প্রথম বার্ষিক সংগীত প্রতিযোগিতার ফল। কণ্ঠসংগীত : ধ্রুপদ—'খ' : অরুণা বসু; 'ক'—স্নিগ্ধা কুণ্ডু, বাণী দাস; খেয়াল—'ক' : বাণী দাস, স্নিগ্ধা কুণ্ডু, দেবশ্রী মুখার্জী; রবীন্দ্রসংগীত—'খ' : পূরবী দত্ত, স্বর্ণা রায়চৌধুরী, অরুণা বসু ও অভিজিৎ মজুমদার, কল্যাণ মজুমদার, অধীরচন্দ্র দাস; 'ক'—শিখা ব্যানার্জি পলি ভট্টাচার্য, সুমিতা চক্রবর্তী; ভজন—'খ' : অরুণা বসু, কল্যাণ মৈত্র; 'ক'—বাণী দাস, সুস্মিতা চক্রবর্তী, দেবশ্রী মুখার্জি; রাগ-প্রধান—'খ' : অসীমা সান্যাল, অরুণা বসু; 'ক'—বাণী দাস, কুমকুম ব্যানার্জী; আধুনিক 'খ' : দীপালী সেন, কল্পনা মৈত্র ও শেখ দীন মহম্মদ, কাজল হালদার; 'ক'—গীতাঞ্জলি সেন, বাণী দাস, শিখা দে। গীটার : রবীন্দ্রসংগীত—'খ' : মিনতি দত্ত, ভক্তি

'রক্তে বোয়া ধান' নাটকের একটি দৃশ্য

সেন, মীরা বিশ্বাস ও প্রদীপকুমার সরকার, বিশ্বনাথ দে, অসিতকুমার রায়; 'ক' : সন্ধ্যা মিত্র, মমতা সামন্ত ও অমিত ব্যানার্জি, শিবনাথ সাহা; পাশ্চাত্য—'খ' : মনোজিৎ দে, গৌরপ্রসাদ নন্দী; 'ক' : অমিত ব্যানার্জি ও মমতা সামন্ত; আধুনিক—'খ' : মিনতি দে ও প্রদীপকুমার সরকার, বিশ্বনাথ দে; 'ক' : মমতা সামন্ত ও অমিত ব্যানার্জি।

আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় শিয়ালদহস্থ নেতাজী সুভাষ ইন্স-টিটিউট মঞ্চে পুরস্কার প্রদান করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্র শ্যামবাজারস্থ ৩বি, ললিত মিত্র লেন (কলিকাতা—৪)-এ ৯ ও ১০ই সেপ্টেম্বর বেলা ৪—৭ টার মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

বিশ্বযুব উৎসবে ভারতীয় মূকাভিনয়

সোফিয়ার নবম বিশ্বযুব উৎসবে এই প্রথম ভারতীয় মূকাভিনয় পরিবেশিত হয়। মূকাভিনয় পরিবেশন করেন ভারতের মূকা-ভিনয়ের পথিকৃত শ্রীযোগেশ দত্ত। তাঁর মূকাভিনয় সকলের কাছে সমাদর লাভ করে। বিশ্বযুব উৎসবের অনুষ্ঠানে শ্রীদত্তকে ভার-তীয় মূকাভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলতে বলা হয়। শ্রীদত্ত বলেন, 'ভারতীয় মূকা-ভিনয় অতি প্রাচীন। তার প্রমাণ ভরত-মুনির নাট্যশাস্ত্র ও কথাকলি এবং ভারত-নাট্যম নৃত্য। আমরা সেই পুরাতন শিল্পের পুনঃ উত্থান করছি। তবে আগে মূকাভিনয় ব্যবহার হত নাটক ও নৃত্যের প্রয়োজনে। একক ভাবে পূর্ণাঙ্গ মূকাভিনয় আমাদের দেশে খুব অল্প কয়েক বছর শুরু হয়েছে। এই শিল্প আপনাদের কাছে সমাদর লাভ করেছে বলে, আমি আমার দেশবাসীর তরফ থেকে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।' বিশ্বযুব উৎসবের শেষে শ্রীদত্ত বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, রাশিয়া, সমরখন্দ, তাসখন্দ ও আরও অনেক জায়গায় বিশেষ আমন্ত্রণে মূকাভিনয় পরিবেশন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

বন্যার্তদের সাহায্যে যাদুকর চক্র

আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার, সকাল ৮টায় সময় কালিঘাট থেকে চন্দননগর পর্যন্ত যাদুকর চক্রের সভ্যগণ বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য পথ সংগ্রহে বের হবেন। যাদু সাহায্যের জন্য এই প্রথম অবতীর্ণ পথসংগ্রহে। এতে অংশ গ্রহণ করবেন কর আর পি বোস, জি পি অধিকারী, ভট্টাচার্য শশাঙ্ক ব্যানার্জি, তারক দে বোস, জটীরাম দাস, দীপক ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, প্রসন্ন কুমার, কে কুমার, পাণ্ডে, শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় দাশ, অনাদি দত্ত, ভি, এম, ঘোষ যাদুকর দি গ্রেট সুশীল।

রাজপুরে দত্ত-বাটীতে জন্মাষ্টমী

গত ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই আগস্ট পুর দত্ত-বাটীর উদ্যোগে শ্রীশ্রীজ উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী এক যাত্রা আয়োজন করা হয়। অংশ গ্রহণ কর আর্য অপেরা ও ভবানীপুর আদি কৃষ্ণলীলা সমাজ। অভিনীত হয় বাঙ্গালী, নিষ্পত্তি ও কৃষ্ণ-সুদামা। শিল্পী আপন বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপ প্রশংসা অর্জন করেন। বাঙ্গালী অ দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার দত্ত ও শ্রীমতী শোভা দত্ত।

ফাল্গুনীর মেঘদূত নৃত্যনাট্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর তথ্য উদ্যোগে অভিতাভ দাশগুপ্তের পরি ফাল্গুনীর মেঘদূত নৃত্যনাট্য আগ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৫টায় তথ্য কেন্দ্র গৃহে অনুষ্ঠিত হবে। নৃত্যে বিরহি প্রিয়ার ভূমিকায় রূপদান করবেন ফ গুপ্ত। যক্ষ—এস এন শঙ্করণ। স কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, কার্তিক ঘোষ। মেঘ-দাশগুপ্ত। বিরহিনীর গান গাইবে দাশগুপ্ত অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় বসু। সহযোগিতায় থাকবেন ইন্দ্র ও কৃষ্ণকলি ঘোষ। সংগীতাংশে অসীম সেন, অভিতাভ দাশগুপ্ত

বিশ্বযুব উৎসবে জনৈক ফরাসী সঙ্গে যোগেশ দত্ত।

সোনাইদিঘি যাত্রানুষ্ঠানে যোগদানের প্রাক্কালে নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র বিশ্বরূপার কর্ণধার রাসবিহারী সরকার কর্তৃক সংবর্ধিত হচ্ছেন। নরেশচন্দ্রের দক্ষিণে প্রবীণ নট-নাট্যকার ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ এবং শ্রীসরকারের পিছনে রয়েছেন যাত্রাশিল্পী সংঘের সম্পাদক শিব ভট্টাচার্য।

পালী। সংগীত পরিচালক তরুণ পালী। সহযোগিতায় বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

ার আসরে নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র :

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদানের পূর্বে রেশচন্দ্র মিত্র পরলোকগত তিনকড়ি চক্র-র্তী, ভুজঙ্গভূষণ রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী ভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীর সঙ্গে ভবানী-রে সৌখীন যাত্রাভিনেতারূপে প্রচুর াতিলাভ করেছিলেন। পরে মিনার্ভা য়েটার, আর্ট থিয়েটার, নাট্যমন্দির প্রভৃতি গমঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে শের শিখরে আরোহণ করবার পরে তিনি ধারণ রঙ্গমঞ্চের নিয়মিত আসর থেকে বসর গ্রহণ করেন। মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে াচিত্রে নট ও পরিচালকরূপেও তিনি সর্ব-ন স্বীকৃতি লাভ করেন। নিয়মিত অভি-য়ের আসর থেকে অবসর গ্রহণের পরে তিনি খনও কখনও বিশেষ অনুরুদ্ধ হয়ে রঙ্গ-ঞ্চে আত্মপ্রকাশ করলেও দীর্ঘ পঞ্চাশ রের মধ্যে কখনও কোনো যাত্রাপালায় াগদান করেননি। কিন্তু এতদিন পরে ংবাদিক ও বিশ্বরূপার প্রচারসচিব সাত-ড়ি পালের বিশেষ আগ্রহে তিনি তাঁর াবনের আসর যাত্রাভিনয়ে যোগ দিয়ে-লেন গেল ২০ ও ২১ আগস্ট বিশ্বরূপা গমঞ্চে অভিনীত বিখ্যাত যাত্রানাটক োনাই দিঘী'তে প্রতাপ রুদ্রের ভূমিকায়। ার জীবনসায়াহ্নের এই স্মরণীয় ক্ষণটিকে ্মৃতিকর করবার জন্যে বিশ্বরূপার র্ণধার রাসবিহারী সরকার তাঁকে বিশেষ-াবে সংবর্ধিত করেন। যাত্রাশিল্পসংঘের ভাপতি ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ ও সম্পাদক ব ভট্টাচার্য এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ য়ে নটশেখরকে আন্তরিক অভিনন্দন াপন করেন। বলাবাহুল্য, নটশেখরের াগদানে 'সোনাইদিঘী' অভিনয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল এবং কি শিল্পগত, কি ব্যবসায়গত সাফল্যের দিক দিয়ে অভাব-নীয় হয়ে উঠেছিল।

জনযুদ্ধ

কলকাতার অন্যতম প্রগতিশীল নাট্য-সংস্থা 'পথিক' আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর বিশ্বরূপায় (শনিবার) তাঁদের পূর্ব অভি-নীত বলিষ্ঠ দুঃসাহসিক নাটক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনযুদ্ধ' পুনরভিনয় করতে চলেছেন। নাটকটির নির্দেশনায় আছেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। আলোকসম্পাতে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয় শুরু দুপুরে।

বিচিত্রার প্রযোজনায় কঙ্কাল ও বৈকুন্ঠের খাতা

নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাট্যানুষ্ঠানের এক-মাত্র প্রতিষ্ঠান 'বিচিত্রিতা' শেষ-রক্ষার অভা-বনীয় সাফল্যের পর দুটি বিচিত্র রসের একাঙ্ক নিয়ে উপস্থিত হবেন আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে। একটি নাটক রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রহসন 'বৈকুন্ঠের খাতা' ও অন্যটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলৌকিক কাহিনী 'কঙ্কাল' (নাট্যরূপ—বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ)। বিভিন্ন ভূমি-কায় অভিনয় করবেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীরণ রায়চৌধুরী, দীপক সেনগুপ্ত, পাঁচু ধর, মানস মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত শঙ্কর, মলয় দাস, প্রফুল্ল ভোস এবং কনকচাঁপার ভূমিকায়—রীণা চৌধুরী। দুটি নাটকই অভিনীত হবে প্রফুল্ল ভোসের নির্দেশনায়।

শিশু-স্বর্গ

মহাজাতি সদনে রবিবার (৮ই সেপ্টেম্বর) সকাল ন' টায় শিশু-স্বর্গের নিয়মিত অনুষ্ঠানে, সংগীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী দয়া বিশ্বাস ও শুভেন্দু বিশ্বাস এবং গৌতম মিত্র ও দীপক মজুমদার, মুকাভিনয় করবেন শ্রীঅধীর ঘোষ। এ ছাড়া সেদিন স্বপন বুড়ো রচিত নাটক 'নিবেদিতা' পরি-বেশন করবেন কৃষ্টি আসর (হাওড়া)।

ক্যালকাটা ইয়োথ কয়ারের বন্যার্তদের সাহায্য অনুষ্ঠান

ক্যালকাটা ইয়োথ কয়ার ইতিপূর্বে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে বহুবার বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে এসেছেন। এরাই আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন বন্যার্ত তহবিলের সাহায্যের জন্য। অনুষ্ঠানে বিক্রয়লব্ধ ও আহরিত সব অর্থই বন্যাত্রাণে দেওয়া হবে এবং সংস্থার সদস্যারা সক্রিয় ভাবে বন্যা-পীড়িত এলাকায় কাজের জন্য এগিয়ে যাবেন।

সংগীত পরিষদের উদ্বোধন

সম্প্রতি সিঁথিতে সংগীত পরিষদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন প্রসঙ্গে সংগীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী এক সুচিন্তিত ভাষণে বলেন যে সাহিত্য শিল্প ও সংগীত এই তিনের মিলনেই প্রকৃতভাবে মানুষ আত্মিক উপলব্ধির দিকে এগোতে পারে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রসারকল্পে ও রুচি গঠনে শ্রোতাদের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেন। পরিষদ সম্প্রতি একটি সংগীত শিক্ষালয় স্থাপন করেছেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীতরুণ ভট্টাচার্য পরি-ষদের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। সর্বশেষে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী শুদ্ধ কল্যাণ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে খেয়াল পরি-বেশন করেন। তাঁর পুত্র শ্রীমানস চক্রবর্তী তাঁর সঙ্গে কন্ঠে সহযোগিতা করেন। তব-লায় সঙ্গত করেন শ্রীবলরাম মুখোপাধ্যায়।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দকে সভাপতি, শ্রীতারা-পদ চক্রবর্তীকে প্রধান উপদেষ্টা এবং অরুণ ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণা বসুকে যথাক্রমে অধ্যক্ষ ও সম্পাদিকা করে পরিষদের একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছে।

গোর্কি-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নাটকাভিনয়

গত ১৯ আগস্ট শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের দিবা ও নৈশ বিভাগের ছাত্রদের

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির অনুষ্ঠানে উত্তমকুমার, তন্ময় চট্টোপাধ্যায় এবং উত্তমকুমারের পুত্র গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

উদ্যোগে প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে মহান রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ বিমলেন্দু ধর এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য। জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রচিত ও পরিচালিত 'গোর্কি' নাটক। গোর্কির কিশোর-জীবনের কাহিনী অবলম্বনে লেখা এই নাটকটি জয়পুরিয়া কলেজের নৈশ বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রদের উদ্যোগে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন অধ্যাপক সমীরকুমার সরকার, সজল দাস, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, বরুণকুমার দাস, অসিত বসাক এবং শৈবাল বসুর অভিনয়ও দর্শকদের মনে রেখাপাত করে।

গোর্কি-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জয়পুরিয়া কলেজের দিবা বিভাগের ছাত্ররা সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'।

কীর্তনশ্রী বীণা ঘোষ

গত ১৫ আগস্ট শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে ৪১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 'রাজকৃষ্ণ ভবন' সংগীতসাধিকা কীর্তনশ্রী কুমারী বীণা ঘোষ দীর্ঘ ৪ ঘণ্টাব্যাপী শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালা-কীর্তন ও নাম-কীর্তন পরিবেশন করে অগণিত ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যেকের অন্তরে এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি করেছিলেন। পরিশেষে ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যেক সংগীতসাধিকার সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করেন।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা

বাটানগর ৭ সেপ্টেম্বর (শনিবার) সন্ধ্যা ৬টার বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে উক্ত ক্লাবের সৌজন্যে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা 'রাবণ বধ' নৃত্যনাট্য, 'পুতুল বিয়ে' নৃত্যনাট্য, পল্লী ও উচ্চাঙ্গ নৃত্য প্রদর্শিত হবে। যন্ত্রসংগীতের মূর্ছনায় শ্রীঅরবিন্দ মিত্র। সহকারী নৃত্য-পরিচালনয় অংশ নিবেন—শ্রীঅনুপশংকর ও শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা। ব্যবস্থাপনায়—স্বপকুমার দাস।

'লোক নাট্যোৎসব'

কলকাতার বিশিষ্ট নাট্য প্রতিষ্ঠান গিরিশ নাট্য সংসদ এবার মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী নাটক নবভাবে অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঐতিহ্যমণ্ডিত মদনমোহন মন্দিরে এই অভিনয় হবে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও দুর্গেশনন্দিনী নাটসদুটির নবরূপায়ণে নাট্য উপদেষ্টা রায়সাহেব মনমোহন ঘোষের কুশলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠবে। নাটকদুটি পরিচালনা করবেন শ্রীসতীশ দত্ত ও শ্রীধীরেন চক্রবর্তী অংশগ্রহণ করছেন সংসদের কুশলী শিল্পীদের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে সংসদের যথেষ্ট সুনাম আছে। আশা করা যায় এই দুইখানি নাটকের অভিনয় দর্শকজনকে বিমুগ্ধ করতে সক্ষম হবে।

উপনিবেশ-এর বিশেষ অনুষ্ঠান

কলকাতার অন্যতম শক্তিশালী ও প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'পথিক' তাঁদের পূর্ব অভিনীত নাটক 'উপনিবেশ'-এর এক বিশেষ অনুষ্ঠান করছেন আগামী ১৯ আগস্ট, বিশ্বরূপা মঞ্চে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। উপনিবেশ-এর কাহিনীকার সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত এই উপন্যাস। সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে গড়া ছোট ছোট উপনিবেশ চিরস্থায়ী নয়—সেখানকার অসভ্য চাষী-মজুর লোকগুলোও বিপ্লবের আগুন জ্বালাতে পারে তারই সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে এখানে। নাট্যরূপ দিয়েছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো নির্দেশনায় আছেন প্রখ্যাত নট বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোকসম্পাতে বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়াংশে সু মিত্র, কৃষ্ণ রায়চৌধুরী, মণি শ্রীমানী, মুখোঃ, বিমলনাথ বন্দ্যোঃ, ইলাবন্ত গোপাল দে, জয়ন্ত মতিলাল, ক রবীন, প্রণব, সুশীল, পঙ্কজ, সান্ত্বনা ঘোষ, সবিতা বন্দ্যোঃ হালদার প্রভৃতি।

ইউথ্ পাপেট্ থিয়েটার, ইন্ডিয়া :
ইউথ্ পাপেট্ থিয়েটার এবা বার্ষিক অনুষ্ঠান পালন করছে আস সেপ্টেম্বর '৬৮ রবীন্দ্র সরোবর হলে। এবারের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চারমূর্তি' নাটক ও নাটকের নবতম অবদান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও লেডি রাণু যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথি অলংকৃত করবেন।

নিখিল ভারত যাদুকর সম্মেলন :
ইন্ডিয়া ম্যাজিক সার্কেলের এবং যাদুকর শ্রীওম্ প্রকাশের সং কলকাতায় কোন একটি বিশিষ্ট ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যাদুকরদে সমাবেশে অষ্টাদশ নিখিল ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রবে কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য। অংশগ্র যাদুকররা সার্কেল সভাপতি শ্রীও ৭২নং কটন ষ্ট্রীটে যোগাযোগ করবে

নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

নেতাজী সুভাষ ইন্স্টিটিউট জিত একাংক নাট্য প্রতিযোগিতার সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে:—

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—'করবী' অভিন 'প্র
" পরিচালক—জ্যোতি রায়।
" অভিনেতা—নৃপেন দেব।
" নাট্যকার—জীবন সরকার (নাটক—
শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—রাণু সরকা

'শ্রীরামপুর চিত্তরঞ্জন অ্যা ক্লাব' পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ নাট্য যোগিতার ফলাফলঃ—

শ্রেষ্ঠ সংস্থা : নান্দনিক, শ্রেষ্ঠ সংস্থা : রঙ্গশ্রী, শ্রেষ্ঠ পরি রমেন লাহিড়ী, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মহম্মদ আলী, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সাহা, শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী — মুখোপাধ্যায়।

প্রতিযোগিতা

বেহালার 'অহীন্দ্রম' সম্প্রদায় পূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাট্যপ্রতিযে আয়োজন করেছেন। প্রতিযোগিতার দানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়ে সেপ্টেম্বর। যোগাযোগের ঠি 'অহীন্দ্রম', ১৮ সৌরীন রায় রোড, কলি-৩৪।

দি ফ্যানটম

কমল ভট্টাচার্য

কথাটা প্রবাদের মত। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ মাথায় চড়ালেই বিপক্ষ দলের কাঁপুনি সুরু হয়। কেন জানেন? ওদের খেলার ধাত আলাদা—জাত আলাদা! জাড়িয়ে খেলোয়াড় বলতে অস্ট্রেলিয়া। খেলায় চমক সৃষ্টি করতেও তারা। তাই ইংল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়ার কদর সবচেয়ে বেশী। আর প্রবাদের কথাটা ইংল্যান্ডের মানুষদের মুখেই বেশী ফেরে।

কিন্তু লড়তে বা খেলায় চমক সৃষ্টি করতে অস্ট্রেলিয়ার আলাদা কোন প্রস্তুতি নেই। তাদের মাটি শক্ত। সেই মাটিতেই সোনা ফলে। ব্যাট ধরলেই খেলোয়াড়।

গ্রামে, শহরের রাস্তা-ঘাটের আনাচে-কানাচে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের জন্ম। ছেলে-পুলেদের সোরগোল হুড়োহুড়ি। হাফ-প্যান্ট এবং খালি পায়ে ছেলের দল ক্রিকেট খেলে বেড়ায়। ব্যাট নেই ত চ্যালা কাঠই সই। উইকেট নেই ত কেরোসিনের টিনে অথবা গাছের গুঁড়িতে খড়ির দাগ কেটে উইকেটের কাজ চলে। বলা বাহুল্য, অস্ট্রেলিয়ার বিগ্ ক্রিকেটের খোরাক এদের কাছ থেকেই আসে বেশী।

ক্রিকেটের তীর্থভূমি ইংল্যান্ডের মানুষেরাই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের জাতে তুলেছেন—সম্মান দিয়েছেন—কদর বাড়িয়েছেন। ইংল্যান্ডের কাছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা ঈর্ষার বস্তু। আড়ালে ইংল্যান্ড ক্রিকেট গুণগ্রাহীরা বলেন, অস্ট্রেলিয়ানরা ঈশ্বরের কৃপাধন্য। ঈশ্বর তাদের সহায়। নইলে এত আকচাক, এত প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ানরা বারবার তাদের ধোঁকা দেয় কি করে? ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা কখনও সখনও তাদের নাগাল পেলেও তারা কপাল জোরে ম্যাচ জিতে কলা দেখিয়ে সরে পড়ে। এ প্রমাণ অনেক আছে। আজও ঘটলো।

ইংল্যান্ড 'এ্যাসেজ' পুনরুদ্ধার করতে এবার যে মৌকা পেয়েছিল তা বোধকরি বারবার আসবে না। তারা যে এবারে অঘটন ঘটাবে তা বুঝতে কারও বাকি ছিল কি? কিন্তু বিধি বাম। দুর্ঘটনা ইংল্যান্ডের ভাগ্যেই ঘটলো। বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডকে পরাস্ত করল। সে অবস্থা ইংল্যান্ড সামলাতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তী দুটি টেস্ট খেলা বৃষ্টির জন্যে বিঘ্নিত হয়। এবং সে অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া দলেরই অসুবিধায় পড়ার কথা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। অর্থাৎ অতি বৃষ্টির ফলে খেলা আর হয়ে ওঠেনি। 'এ্যাসেজ' অস্ট্রেলিয়ার হাতেই থেকে গেল, যে 'এ্যাসেজ' নিয়ে কত খুনোখুনি, কত রেষারেষি আর তার মীমাংসা কত সহজভাবে হয়ে গেল!

জয় হল অস্ট্রেলিয়ার। জয়মাল্য পরলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরি। বিল লরির এটা অভাবনীয় জয়, একথা অবশ্য বলতে হবে। তাই বলছিলাম, ভাল খেলোয়াড় হলেই হবে না। চতুর অধিনায়ক হলেই কাজ হাসিল হয় না। অদৃষ্ট সহায় থাকলে অনেক অসাধ্য সাধনও হয়। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরি অদৃষ্ট জোরেই টেস্ট ম্যাচ জিতে 'এ্যাসেজ' অক্ষুন্ন রাখলেন।

অধিনায়ক হিসেবে বিল লরির যে খুব হাতযশ আছে সে কথা কি আর খুলে বলতে হবে। ববি সিম্পসনের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর হঠাৎ এই গুরু দায়িত্বের বোঝা এসে পড়ে বিল লরির ওপর। গত বছরের কথা তখনও ভারতীয়দের সঙ্গে দুটি টেস্ট ম্যাচ বাকি। লরি কিন্তু কাজ হাসিল করলেন সহজেই দুটি টেস্ট ম্যাচ জিতে। অর্থাৎ দুটি ম্যাচই অস্ট্রেলিয়ার কাছে ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। অধিনায়ক লরিকে তেমন মাথা ঘামাতে হয়নি। তারপরেই ইংল্যান্ড সফরে বিল লরি পেলেন বিজয়-মুকুট। এত সহজে এবং এত নির্বিবাদে অস্ট্রেলিয়ার কোন অধিনায়ক ইংল্যান্ড থেকে এ্যাসেজ বয়ে আনতে পারেনি। তাই বলছিলাম, বিধাতা লরির ওপর তুষ্ট। আজকের নয়, বরাবরই বিধাতার কৃপাদৃষ্টি লরি পেয়েছেন। অন্ততঃ ১৯৬১ সালে বটেই। সেই বছরেই ছিল লরির টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম আবির্ভাব। ইংল্যান্ডে লরির প্রথম সফর। এই সফরে কিন্তু লরির টেস্ট ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে।

সফরের আগে লরির একটি খেলা দেখেই কর্তৃপক্ষরা তাকে ইংল্যান্ড সফরে দলভুক্ত করেন। মাত্র ১২ রাণে একটি সহজ ক্যাচ তুললেও লরির সেদিন ২৬৬ রাণ চোখ চেয়ে দেখার মত ছিল।

খেলাটি ছিল ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে নিউ সাউথ ওয়েলসের। সিডনীতে এই খেলায় ভিক্টোরিয়ার পক্ষে খেলে ১৯৬১ সালের ইংল্যান্ড সফর পাকা করে নেন।

আগেই বলেছি লরির অস্ট্রেলিয়া দলে টেস্ট ম্যাচে কোন জায়গা ছিল না। দলের নির্ভরযোগ্য ওপনিং ব্যাটসম্যান ছিলেন ববি সিম্পসন এবং ম্যাকডোনাল্ড।

সফরের সুরুতেই অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান ওনীল, হার্ভে এবং বার্জ সেঞ্চুরী করলেন। লরির সুযোগ আসে সারের বিপক্ষে। চার ঘণ্টা খেলে তিনি রান করলেন ১৬৫। কাট, হুক আর ড্রাইভ সট্ মেরে লরি সেদিন সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত খেলোয়াড় ডেনিশ কমটন লরির খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন—"ব্রাডম্যানের পর এত ভাল হুক সট মারতে আর কাউকে দেখিনি।" সে ম্যাচে সারের টেস্ট বোলার টনি লককেই লরি সবচেয়ে বেশী মেরে খেলেছিলেন।

ওভালে সারের বিপক্ষে সেঞ্চুরী করার পর লর্ডসে এম, সি, সি'র বিরুদ্ধে লরি ১০৪ রান করেন। আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৪ রান করে নট আউট থাকেন।

এজব্যাসটন [illegible] রান প্রশংসা করার মত। এই [illegible] কর্তৃপক্ষরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ম্যাকডোনাল্ড এবং সিম্পসনের প্রথম জুটির মধ্যে লরির নাম রাখা অসঙ্গত হবে না।

কথাটা যে অযৌক্তিক নয় সেটা লরি প্রমাণ করলেন লর্ডস টেস্টে। দুর্ধর্ষ ট্রুম্যান এবং স্ট্যাথামের জোরাল বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলে তিনি ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে তাঁর স্থান পাকা করে নেন। লরির স্বাবলীল এবং সংযমী খেলা দেখে ইংল্যান্ডের দর্শকমহল সেদিন প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পাকা ছ'ঘণ্টা খেলেন তিনি। রান করেন ১৩০। এই নিয়ে তিনি পাঁচটি সেঞ্চুরী করেন। এবং দু' মাসের মধ্যেই হাজার রান পূর্ণ করেন। তাঁর মোট রান ছিল ২,০১৯। অ্যাভারেজ ৬১·১৮ (প্রথম শ্রেণী ম্যাচে)। এবং পাঁচটি টেস্টে তাঁর মোট রাণ ছিল ৪২০ (৫২-৫০ এ্যাভারেজ); তিনি দুটো টেস্ট সেঞ্চুরী করেন। আটচল্লিশ সালে ব্র্যাডম্যান ২,৪২৮ রান করেন। তিপান্ন সালে ২,০৪১ রান করেন নীল হার্ভে।

ওল্ড ট্রাফোর্ডের টেস্টে লরির ১০২ রান দেখে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন পেস বোলার ডবলিউ, জি, বাওয়েস বলেন—"লরির মধ্যে ফাস্ট বোলিং খেলার যে দক্ষতা আছে তা তিনি খুব কম খেলোয়াড়ের খেলায় দেখেছেন।" লর্ডস টেস্টে লরির ১৩০ রানও সবাইকে মুগ্ধ করে।

শেষ টেস্ট ম্যাচ প্রসঙ্গে লরি বলেন: "সফরের শেষে দেশে ফিরলে আমার বন্ধুবান্ধবেরা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে লর্ডস মাঠের ১৩০ রান করার কথা জানতে চান। কিন্তু আমার তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলা ছিল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের টেস্টটি। শনিবার শেষ প্রহরে ব্যাট করতে নেমে আমি আর সিম্পসন ৬৩ রান করে নট আউট থাকি। রবিবার বিশ্রাম। 'এ্যাসেজ' লড়াইয়ে দু'-পক্ষই খুব ব্যস্ত। এমন অবস্থায় খেলোয়াড়দের চোখে ঘুম না আসার কথা। কিন্তু আমাদের খেলোয়াড়েরা ছুটির দিন গলফ্ খেলে কাটিয়ে দেন। আমিও বাইরে বাইরে ঘুরে কাটিয়েছি। যথারীতি খেলা হয় সোমবার। আমার এবং সিম্পসনের জুটির রান দাঁড়ায় ১১৩। একটা শক্ত ক্যাচ লুফলেন ফ্রেডি ট্রুম্যান। তাহলেও ভাল খেলার জন্যে সে খেলায় আমরা ৫৪ রানে জিতেছিলাম। থ্রিলিং খেলা ছিল সেইটাই। সেদিন আমরা মরণপণ করে লড়াই করেছিলাম।"

ইংল্যান্ডের দর্শকরা লরিকে 'ক্রিকেট মেশিন' বলে থাকেন। সে প্রসঙ্গে লরি বলেন—"আমি মনে করি আমার চেয়ে

ক্রিকেট কেউ ভালবাসে না। কিন্তু তা প্রমাণ করতে না পারার জন্যে আমি দুঃখিত। ক্রিকেট খেলার মধ্যে মজার ব্যাপার যতই থাকুক না কেন তার চেয়ে বেশী রয়েছে গুরুদায়িত্ব। আর সে দায়িত্ব পালনে আমরা বদ্ধপরিকর। কেননা ইনিংসের গোড়াপত্তন ভাল না হলে দলের ভাল কিছু তেই হওয়া সম্ভব নয়।” পরিহাসছলে লরি আরও বলেন—“মাঠে নামবার সময় আমার একমাত্র চিন্তা থাকে কি করে রান বাড়াব। তাই মাঠে নামতে বিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে “হ্যালো” বলে সম্বোধন করতেও ইচ্ছে হয় না। অনেকে ব্যাট হাতে নেমেই মধুর সম্ভাষণ জানাতে ভোলেন না। অস্ট্রেলিয়ান উইকেটকীপার গ্রাউট তাঁর বইয়ে লিখেছেন—যাঁরা মাঠে নেমে ‘হ্যালো’ বলে সম্বোধন করেন, আসরে তাঁরা কিন্তু নার্ভাস। মুখ খোলেন মনের দুর্বলতা কাটাবার জন্যেই।”

১৯৬১ ও ১৯৬৮ সালের খেলায় লরির জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচিত হয়ে রইল। খেলোয়াড় জীবনের প্রথম সংগ্রাম লরিকে এনে দিয়েছিল বিরাট স্বীকৃতি। সে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন উইসডেনের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে স্থান পেয়ে। আর ১৯৬৮ সালে পেলেন দলনায়ক হিসেবে বীরোচিত সম্মান। ‘এ্যাসেজ’ রক্ষা করে স্বদেশে ফিরে গেলেন মাথা উঁচু করে। দেশের গুণগ্রাহীরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে সাদর অভ্যর্থনা করবেন। সবাই আজ একবাক্যে স্বীকার করবেন লরিই বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ন্যাটা ওপনিং ব্যাটসম্যান।

ছ’ ফুট দু’ ইঞ্চি লম্বা লরির শরীরের কাঠামটা খুব শক্ত। দেখতে শুনতেও বেশ। খাড়া লম্বা নাক এবং চোয়ালটা নীচের দিকে। অনেকের মধ্যে লরিকে চিনে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। স্টেডিয়ামের শেষ সারি থেকেও আঙুল বাড়িয়ে দর্শকরা লরির নিক্ নেম ধরে ডাকে। আদর করে ডাকে—‘দি ফ্যানটম্’।

১৯৩৭ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারী মেলবোর্নের থর্নবি শহরে লরির জন্ম। ন’ বছর বয়সেই লরির ক্রিকেটের হাতেখড়ি। বাড়িতে বড় ধরনের ক্রিকেটার কেউ ছিলেন না। স্কুলের খেলায় তাঁর ক্রিকেটের হাতেখড়ি। স্কুলে তিন বছর খেলেন। ডিস্ট্রিক্ট খেলায় আট মরশুম খেলার পর লরি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার সুযোগ পান। উনিশ বছর তখনও পূর্ণ হয়নি। লরি বড় ম্যাচে খেললেন ভিক্টোরিয়ার হয়ে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। পরের মরশুম (১৯৫৬-৫৭) থেকে লরি ভিক্টোরিয়ার নিয়মিত খেলোয়াড়দের তালিকায় স্থান পান। পরবর্তী মরশুমের শেষ দিকে লরি হঠাৎ দল থেকে বাদ পড়েন। ১৯৫৮-৫৯ সালের মরশুমে লরি ভিক্টোরিয়ার হয়ে সফররত এম, সি, সির বিরুদ্ধে ফিরতি খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। এর পর থেকে আর কোনদিন তাঁকে খেলায় বাদ পড়তে হয়নি।

খেলাধুলা

দর্শক

বেসিল ডি'ওলিভিয়েরা
বোল্ড এম সি সি

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া
পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যান্ড : ৪৯৪ **রান** (জন এডরিচ ১৬৪, বেসিল ডি' ওলিভিয়েরা ১৫৮ এবং টম গ্রেভনী ৬৩ রান। ম্যালেট ৮৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮১ **রান** (কলিন কাউড্রে ৩৫ রান। কনোলী ৬৫ রানে ৪ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া : ৩২৪ রান (বিল লরী ১৩৫ আয়ান রেডপাথ ৬৭ এবং ম্যালেট নট আউট ৪৩ রান। স্নো ৬৭ রানে ৩ এবং ব্রাউন ৬৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ১২৫ রান (ইনভেরারিটি ৫৬ রান। আন্ডারউড ৫০ রানে ৭ উইকেট)

ওভালে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের **২২৬ রানে** জয়-লাভের ফলে এই দুই দেশের ১৯৬৮ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজটি অমীমাংসিত থেকে গেল। এই ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১৫৯ রানে জয়ী হয়ে ১—০ খেলায় অগ্রগামী ছিল। ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। বর্তমানে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ এবং টেস্ট খেলার ফলাফল এইরকম দাঁড়িয়েছে : টেস্ট সিরিজ ৪৯—অস্ট্রেলিয়ার 'রবার' জয় ২২, ইংল্যান্ডের 'রাবার' জয় ২১ এবং সিরিজ ড্র ৬। টেস্ট খেলা ২০৩—অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮০, ইংল্যান্ডের জয় ৬৬ এবং খেলা ড্র ৫৭। অস্ট্রেলিয়া দুই বিষয়েই অগ্রগামী।

১৯৬৬ এবং ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজ ড্র যাওয়ার ফলে অস্ট্রেলিয়ার হাতেই কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' খেতাব থেকে গেল। অস্ট্রেলিয়া শেষ 'এ্যাসেজ' খেতাব পেয়েছে ১৯৬৪ সালে ১—০ খেলায় (ড্র ৪) জয়ী হয়ে।

ওভালের আলোচ্য পঞ্চম টেস্টে ইংল্যান্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নেয়। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ১৮০ (৩ উইকেটে)। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২৭২ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়। ওপনিং ব্যাটসম্যান জন এডরিচ ১৩০ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪৯৪ রানের মাথায় শেষ হয়। জন এডরিচ এইদিনে আরও ১৮ রান করার সূত্রে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২,০০০ রান পূর্ণ করেন। এডরিচ দলের ৩৫৯ রানের মাথায় ব্যক্তিগত ১৬৪ রান করে আউট হন। তিনি ৪৫১ মিনিট খেলে তাঁর ১৬৪ রানে ২০টা বাউন্ডারী করেছিলেন। এডরিচের এই সেঞ্চুরীটি তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৬ষ্ঠ সেঞ্চুরী, অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪র্থ। আলোচ্য প্রথম ইনিংসের খেলায় এডরিচ এবং ওলিভিয়েরা ৫ম উইকেটের জুটিতে ১৪৫ মিনিট সময়ে দলের ১২১ রান তুলে দেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি ৭১ মিনিটের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে **২৬৪ রান** (৭ উইকেটে) দাঁড়ায়। 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও তাদের ৩১ রানের প্রয়োজন ছিল। দলের অধিনায়ক বিল লরী ১৩৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে রেডপাথ (৬৭ রান) এবং লরী দলের ১২৯ রান তুলেছিলেন।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩২৪ রানের মাথায় শেষ হয়। লরী ১৩৫ রানে আউট হন এবং ম্যালেট ৪৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। ম্যালেটের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার গুণেই অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত 'ফলো-অন' করার লজ্জা থেকে অব্যাহতি পায়। ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তাড়াতাড়ি রান তুলতে গিয়ে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের ৪টে উইকেট পড়ে ১০৭ রান উঠেছিল। আর ১৮১ রানের মাথায় তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। খেলার এই অবস্থায় জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৩৫২ রানের প্রয়োজন হয়। হাতে জমা ছিল ৩৯৫ মিনিট সময়। চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৩ রান তুলেছিল।

পঞ্চম দিনে খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ৭ মিনিট আগে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ১২৫ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ২২৬ রানে জয়ী হয়। ন্যাটা বোলার ডেরেক আন্ডারউডের মারাত্মক বোলিংয়েই অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের এই কাহিল দশা। আন্ডারউড ৫০ রানে ৭টা উইকেট পান। ঝড়-বৃষ্টির ফলে পঞ্চম দিনের খেলার অনেকটা সময় মাঠে মারা যায়। একসময় দেখা গেল খেলা ভাঙতে মাত্র ৭৫ মিনিট বাকি এবং তখনও অস্ট্রেলিয়ার হাতে ৫টা উইকেট জমা। ইংল্যান্ড ৪৫ মিনিট ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন অস্ট্রেলিয়ার দুর্গ ভেদ করতে পারলো না তখন ইংল্যান্ডের জয়ের আশা তাদের অতি বড় গোঁড়া সমর্থকরাও ত্যাগ করলেন। এমন সময় আন্ডারউড এবং বেসিল ডি'ওলিভিয়েরা একটা করে উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দৃঢ়তায় যে আঘাত দিলেন তাতেই খেলার গতি ঘুরে যায়। এর পর মোক্ষম আঘাত করেন আন্ডারউড একাই।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া
টেস্ট খেলার ফলাফল
১৮৭৭ (মার্চ ১৫) থেকে
১৯৬৮ (আগস্ট ২৭)

স্থান	খেলা	ইংল্যান্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	খেলা ড্র
ইংল্যান্ড	৯৬	২৬	২৫	৪৫
অস্ট্রেলিয়া	১০৭	৪০	৫৫	১২
মোট :	২০৩	৬৬	৮০	৫৭

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

স্থান	সিরিজ	ইংল্যান্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	সিরিজ ড্র
ইংল্যান্ড	২৪	১২	১০	২
অস্ট্রেলিয়া	২৫	৯	১২	৪
মোট :	৪৯	২১	২২	৬

ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন বেসিল ডি ওলিভিয়েরা (ইংল্যান্ড)—খেলা **২, ইনিংস** ৪, নট আউট ১ বার, মোট রান ২৬৫ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৫৮ এবং গড় ৮৮·৩৩। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন ইংল্যান্ডের জন এডরিচ—খেলা ৫, ইনিংস ৯, নট আউট ০, মোট রান ৫৫৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৬৪ এবং গড় ৬১·৫৫। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ব্যাটিংয়ে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন বিল লরী (খেলা ৪, ইনিংস ৭, নট আউট ১ বার, মোট রান ২৭০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩৫ এবং গড় ৪৫·০০)। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বাধিক

মোট রান করেছেন চ্যাপেল (মোট ৩৪৮ রান এবং গড় ৪৩·৫০)।

বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উভয় দলের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন ডেরেক আণ্ডারউড—৩০২ রানে ২০ উইকেট (গড় ১৫·১০)। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে প্রথম স্থান পেয়েছেন কনোলী—৫৯১ রানে ২৩ উইকেট (গড় ২৫·৬৯)।

ক্রিকেটের অপমৃত্যু

আগামী শীতের মরশুমে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর উপলক্ষে ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে এম সি সি দল গঠন করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বেসিল ডি' ওলিভিয়েরাকে এই দলে নির্বাচিত না করে এম সি সি কর্তৃপক্ষ তাঁদের নীচতার পরিচয়ে সারা সভ্যজগতে ইংরেজ জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। বেসিল ডি' ওলিভিয়েরা একজন খ্যাতনামা চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড়। অশ্বেতকায় খেলোয়াড় হয়েও তিনি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এক ডজন টেস্ট ম্যাচ খেলে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সদ্যসমাপ্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের মূলে ছিল এই তিনজন খেলোয়াড়ের অবদান—জন এডরিচের ১৬৪ রান, বেসিল ডি' ওলিভিয়েরার ১৫৮ রান এবং ২য় ইনিংসে ডেরেক আণ্ডারউডের ৫০ রানে ৭ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ড এই পঞ্চম টেস্টের জয়লাভের জোরেই শেষ পর্যন্ত টেস্ট সিরিজের ফলাফল অমীমাংসিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের গত তিন বছরের টেস্ট খেলার হিসাব নিলে দেখা যাবে, দলের অতি সংকটকালে এই ওলিভিয়েরাই একাধিকবার পরিত্রাতার সার্থক ভূমিকা নিয়ে জাতীয় খেলায় ইংল্যাণ্ডের মুখ রক্ষা করেছেন। সুতরাং ইংল্যাণ্ড টেস্ট দলে ওলিভিয়েরার অবদান এম সি সি কর্তৃপক্ষ এত সহজে ভুলে গিয়ে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

বেসিল ডি' ওলিভিয়েরার ইংল্যাণ্ড দলে স্থান না-পাওয়া প্রসঙ্গে এম সি সি-র চেয়ারম্যান ডগ ইনসোল এবং সেক্রেটারী চার্লি গ্রিফিথ যে বিবৃতি দিয়েছেন তা শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেওয়ার সামিল। চেয়ারম্যান ডগ ইনসোল বলেছেন, আমাদের ধারণা ভাল খেলোয়াড় নিয়েই দল গঠন করা হয়েছে। সেক্রেটারী গ্রিফিথের বিবৃতিতে আছে—এম সি সি-র এই দল গঠন সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কোন পূর্ব সর্ত ছিল না। কিভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করা যায় সেই দিকটা বিচার করে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা হয়েছে।

আমাদের জিজ্ঞাসা, ওলিভিয়েরার তুলনায় ইংল্যাণ্ডের যদি ভাল খেলোয়াড় থেকেই থাকে তাহলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম টেস্ট খেলায় ওলিভিয়েরার ডাক পড়ল কেন? তাঁকে তো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সদ্যসমাপ্ত ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় স্থান দিয়ে পরবর্তী তিনটি টেস্ট খেলায় দলভুক্ত করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রবাদ বাক্যটির কথা মনে পড়ছে 'গরজ বড় বালাই'। সেক্রেটারী চার্লস গ্রিফিথ বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এম সি সি দল সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কোন পূর্ব সর্ত ছিল না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকামী এম সি সি দলে বেসিল ডি' ওলিভিয়েরার দলভুক্তি সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের যে হুঁসিয়ারী ছিল সে কথা এখানে বেমালুম তিনি চেপে গেছেন। ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট লীগ এবং ইংল্যাণ্ডের টেস্ট খেলায় ওলিভিয়েরার বিশেষ সাফল্য যে ১৯৬৮ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তাঁর এম সি সি দলে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলছে তা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার লক্ষ্য করেন। তখন (১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে) দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাদের দেশে অশ্বেতকায় খেলোয়াড় সম্পর্কে সরকারী নীতির প্রতি এম সি সি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এম সি সি দলে ওলিভিয়েরাকে নির্বাচন করার বিপদ কোথায় তা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রিকেট ইংল্যাণ্ডের জাতীয় খেলা এবং ইংলিশ ক্রিকেট খেলার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এই এম সি সি। সুতরাং দল নির্বাচন ব্যাপারে এম সি সি-র উপর দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের এই খবরদারি ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ মাথা পেতে নেয়নি। এই নিয়ে সারা ইংল্যাণ্ডে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। সরকার মহল জনমতকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই এম সি সি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের এই আচরণকে কটাক্ষ করে জনৈক সমালোচক বলেছিলেন "এম সি সি-র মানসম্ভ্রম এখন বেসিল ডি' ওলিভিয়েরার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেই এখন থেকে খারাপ খেলে যান তবেই এম সি সি-র মুখ রক্ষা হবে—কারণ তখন আর তাঁকে দলভুক্ত করার প্রশ্ন থাকবে না।"

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সদ্যসমাপ্ত ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে ওলিভিয়েরাকে মাত্র দুটি টেস্টে (১ম এবং ৫ম) দলভুক্ত করা হয়েছিল। এই দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলেই ওলিভিয়েরা উভয় দলের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেন—খেলা ২, ইনিংস ৪, নট আউট ১ বার, মোট রান ২৬৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৫৮ এবং গড় ৮৮·৩৩। এম সি সি কর্তৃপক্ষ ওলিভিয়েরার কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাওয়া সম্পর্কে মতামত চেয়ে তাঁর সম্মতিও পেয়েছিলেন। এতদূর এগিয়ে কোন শক্তিশালী মহলের কলকাঠির নাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত এম সি সি কর্তৃপক্ষ ওলিভিয়েরাকে দলভুক্ত করলেন না তা জানবার জন্যে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ শুধু উদগ্রীবই হননি, সারা দেশে প্রচণ্ড প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভের ঝড় তুলেছেন। ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রগুলিতে অসংখ্য চিঠি-পত্র মারফৎ এ বিষয়ে জনমত প্রকাশ করা হয়েছে। সকলেই এম সি সি-র কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীকে নীতি-ভ্রষ্ট এবং অসাধুতার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। পাঠকরা আগামী দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের বিবরণ বয়কট করার পরামর্শও সংবাদপত্রগুলিকে দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর উপলক্ষে এম সি সি দল গঠনের সময় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা কিভাবে ভোট দিয়েছেন তা প্রকাশ করতে 'ডেইলী মেল' সংবাদপত্রের ক্রিকেট সমীক্ষক আলেক্স ব্যানিস্টার এম সি সি কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

বন্ধুত্বের সমীক্ষা

উল্লেখযোগ্য ভারত-জার্মাণ সহযোগীতা

- ২০৪টি মূলধনী এবং কারিগরী সাহায্য প্রকল্প
- ৩৫০টি যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগীতা
- ৭টি ম্যাক্স ম্যুলার ভবন (সাংস্কৃতিকেন্দ্র)
- ৩টি কারিগরী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
- ২১ জন অধ্যাপক (ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে)
- ৯২ জন স্বেচ্ছাসেবক (জার্মাণ ভলানটিয়ার সার্ভিস)
- ৩টি কৃষি প্রকল্প
- নয়াদিল্লীতে টি. ভি. ষ্টুডিও
- জার্মাণ শিক্ষা-বিনিময় সংস্থা (ডি.এ.এ.ডি)
- মাদ্রাজে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব্‌ টেকনোলজি (আই. আই. টি)

ভারত ও জার্মানী—প্রগতির পথে সহযোগী

৮ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৯শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 13th Sept. 1968. শুক্রবার, ২৮শে ভাদ্র, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

নজরুলের নামে ডাকটিকিট

'অমৃতে' পত্রিকার গত ১৪ই ভাদ্রের সংখ্যায় শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, কেন ভারত গভর্ণমেন্ট কবি নজরুল ইসলামের সম্মানার্থে ডাকটিকিট প্রকাশ করেননি এবং অনুমান করেছেন যে কবি বাঙ্গালী বলেই ভারত গভর্ণমেন্টের ঐ কর্তব্যচ্যুতি ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে জানানো দরকার যে ভারত গভর্ণমেন্টের প্রকাশনা সংস্থা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট শ্রীবসুধা চক্রবর্তীকে দিয়ে কবির ইংরেজী জীবনী লিখিয়ে ছেপে বার করেছেন এবং সেটি বর্তমানে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। কবির গত জন্মদিনে এ সংবাদ সবিস্তারে দেশের সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীচক্রবর্তীই ঐ বাংলা জীবনী রচনার ভার পেয়েছেন। কয়েক মাসের মধ্যে সব অনুবাদই প্রকাশিত হবে। কাজেই ভারত গভর্ণমেন্ট কবি নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকীর্তি পরিচিত করার জন্য কিছু করেননি, এ' কথা বলা যায় না। ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় স্বর্গত বা অবসরপ্রাপ্ত গুণীজনের সম্মানার্থে; নজরুল এখনই সে পর্যায়ে এসে গেছেন বলে মনে করবার কী কারণ আছে? ভারত গভর্ণমেন্ট বহু বাঙ্গালী গুণীজনের সম্মানার্থে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এখনই ডাকটিকিট প্রকাশ করা শোভন হবে, এমন কথা কেউ বলবেন না। পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট কবি নজরুলের নামে ডাকটিকিট বের করেছেন, কারণ সে দেশ কবির সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত। কাজেই তাঁকে সম্মান দেখাবার বিশেষ আয়োজন তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সংগত। কবি নজরুলের জন্য যা করা দরকার সবই করা হয়েছে, এমন দাবী কেউ করবেন না। তাঁর একটি বাসস্থান নির্মাণের জন্য জমি দিতে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে তাঁরা অযথা বিলম্ব করছেন। তবু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যেটুকু করেছেন, তা স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি।

ওয়াকেবহাল,
কলকাতা—২৯

মদ্যপান প্রসঙ্গে

গান্ধিজীর আদর্শ প্রচারে বাহুল্য এবং তাঁর আদর্শের বিপরীত ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠান প্রায় নিয়তই চলছে। এর একটি হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত মদপান। রাজধানীতে বিদেশী অতিথির আগমন লেগেই আছে। তাই মদেরও সেখানে ঢালাও ব্যবস্থা। কোন অতিথি-সম্বর্ধনাই মদ ছাড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ সম্বন্ধে বিদেশীদের নিশ্চয়ই কোনরকম পূর্ব আরোপিত সর্ত নেই। তবুও মদ না হলে সেখানে কোন অনুষ্ঠানই জমে না। বিদেশী অতিথি সম্বর্ধনার কথা বাদ দিলেও নানা ব্যক্তিগত আয়োজনেও মদের বাহুল্য সত্যি বেদনাদায়ক। খোদ রাজধানীতেই এরকম কান্ড। অথচ সারা দেশের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে রাজধানী। সমস্ত দেশের নীতি নির্ধারিত হয় এখান থেকে। কয়েকটি প্রদেশেও মাদকদ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে এবং বাপুজীর মাদকদ্রব্যবিরোধী আদর্শ রূপায়ণে অনেকেই উন্মুখ। সেক্ষেত্রে রাজধানীর যদি এই হাল হয়, তাহলে বাপুজীর আদর্শ রূপায়িত হবে কিভাবে?

অনিল কর,
কলকাতা—৩৬

'জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পোপ পল' সম্পর্কে

অমৃতের আঠার সংখ্যায় যোগনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং পোপের বাণী' পড়ে মনে হলো, আমরা এক মহা অনিশ্চয়তার মধ্যে বেঁচে আছি।

পৃথিবীর জনসংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে। আমাদের নিজেদের দেশ থেকেই সেকথা যথেষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি। লেখকের হিসেব মত, গত পনেরো বছরে খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে তিন শতাংশ হারে আর লোকসংখ্যা বেড়েছে আড়াই শতাংশ হারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যোৎপাদনের এই সামান্যতম ব্যবধান নিয়ে আমরা চলেছি। তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো আছেই। এই গত দু' বছরে যেমন গেল। কোনমতেই বর্তমান জনসংখ্যাকে খাদ্যে সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে মনে রাখতে হবে, বর্তমান জনসংখ্যা কোনসময়েই স্থিতিশীল নয়,—তা রোজই বেড়ে চলেছে। এবং বেশ আতঙ্কজনক হারে। এত কথার পর কেউ যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে ওকালতি করেন তবে তাকে করুণা করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় থাকে না।

শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই লোকসংখ্যার এই স্ফীতি রীতিমত চিন্তার কারণ। আমরা যখন সুখী ও উজ্জ্ব[ল] ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল তখন জনসংখ[্যা] কালো ছায়া বিরাট পক্ষ বিস্তার করে ভাবনার মাঝখানে দুঃস্বপ্ন আনে। সচে[তন] হয়ে তখন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়া[বার] চেষ্টা করি, আর জানতে পারি যে, ... শতকের শেষে পৃথিবীর সর্বমোট লোকসং[খ্যা] হবে সাতশো কোটি। অথচ খৃ[ষ্ট] শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর লোকসং[খ্যা] ছিল মাত্র পঁচিশ কোটি। আজ সেই সং[খ্যা] বাড়তে বাড়তে কোথায় পৌঁচেছে ভা[বলে] শিউরে উঠতে হয়। একমাত্র ভারতেই ... নবজাতকের সংখ্যা নাকি পঞ্চান্ন হাজার।

তাই মানবজাতিকে শুধু কথায় উজ্জ্ব[ল] ভবিষ্যতের স্বপ্ন না দেখিয়ে তার উ[পায়] বাৎলে দিতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণই হচ্ছে বর্ধমান জনসংখ্যারোধের একমাত্র উ[পায়]। বিশেষভাবে, অনুন্নত দেশগুলির ... এছাড়া গত্যন্তর নেই। এই তালি[কায়] আমাদের দেশ ছাড়াও বিশ্বের অনেক ... পড়ে।

অথচ মজার ব্যাপার, মহামান্য ... পল জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে এক... মান জারী করেছেন। তিনি বলে[ছেন] জন্মনিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত বে-আইনী ... এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল ... এখুনি নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তিনি কি ভেবে এরকম একটি হুকুমনামা ... করলেন তা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। একটা ব্যাখ্যা হয়তো এই যে, শাস্ত্রে ... নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মানবজাতির প্রগতি ও শা[স্ত্রের] বিধানের মধ্যে কোনটা টিঁকবে। সাময়িক[ভাবে] শাস্ত্রের বিধান জয়যুক্ত হলেও সত্য একদিন স্বীকৃতি পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন হয়েছিল গ্যালি[লিওর বেলায়।] শাস্ত্রমতে, পৃথিবীর সৌন্দর্যের জন্য সূর্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান[ী] গ্যালিলিও একথার বিরোধিতা করলেন অমনি তদানীন্তন পোপের ... এসে পড়লো তাঁর উপর। মৃত্যুর প[র] আজ অবশ্য তিনি সেই কোপ থেকে ... পেয়েছেন এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক ধারণাই ... যুক্ত হয়েছে।

আজ যখন পৃথিবীর বাস্তব চিত্র ... পলের সামনে রয়েছে তখন তিনি ... এরকম মানব স্বার্থবিরোধী কথা বলে[ন] ...

শরৎকুমার
কলকাতা

সম্পাদকীয়

ুজোর বাজার

এবারের পুজো মাসের শেষদিকে পড়েছে। তাই মাসের গোড়া থেকেই শহরে ও অন্যত্র পুজোর প্রস্তুতি চলেছে। ঘাটে ভিড় বাড়ছে এবং দোকানীরা তাঁদের পসরা সাজিয়ে অপেক্ষা করছেন পুজোর বাজারের ক্রেতাদের জন্য। বের সঙ্গে মানুষের মনের আনন্দ জড়িত। এই আনন্দের প্রকাশ ঘটে সাজ-পোশাকে, দেওয়া-নেওয়ায় এবং আত্মীয়স্বজনের গমে।

বাঙালীর জীবনে এই উৎসব সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত। একে শুধুমাত্র ধর্মের গন্ডীতে আবদ্ধ রাখা যায় না। যথার্থভাবেই বলা যায় শরৎকালের উৎসব। উৎসবের সঙ্গে জড়িত আছে অর্থনীতি। চরম আর্থিক সংকটের দিনে বের আলো স্বভাবতই আশানুরূপ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে না। বন্যার জন্য বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আর্ত মানুষের য় ভরপুর। পুজোর সময়ে এ-সমস্তই আমাদের মনে রাখতে হবে।

অথচ এই সময়ের দিকে তাকিয়ে সবাই আশায় দিন গোনে। উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের হাতে দুটো বাড়তি া আসার সম্ভাবনা। কিন্তু এবারে বাংলাদেশের অর্থনীতি এমনিতেই বিপর্যস্ত। মন্দার কারণে এত কলকারখানা হয়েছিল যে, বহু কর্মীই হয়তো বাড়তি অর্থলাভের সুযোগ থেকে হবেন বঞ্চিত। অন্যদিকে কর্ম-সংস্থানের অভাবে রের সংখ্যা বাড়ছে। সুতরাং পুজোর বাজার করবে কী করে গৃহস্থ মানুষের তা নিয়ে দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সত্ত্বেও সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র কেনার সময় হল পুজোর প্রাক্কালে। ছেলেমেয়েরা নতুন পোশাক। ঘরের গৃহিণীও আশা করে থাকবেন নতুন শাড়ির জন্য। বাঙালীর ঘরে এই সময়ে কন্যারা আসেন লয়ে। এই সামাজিক রীতিনীতি নিয়েই তো উৎসব। সময় বদল হলেও তার পরিবর্তন হয় না। উৎসবের দিনে সবাই আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে পেতে। সারা বৎসরের কর্মব্যস্ততা ও দৈনন্দিন ক্লান্তির পর উৎসবের অবকাশে মানুষ কদিন পা ছড়িয়ে একটু আরামে আলস্যে, একটু বেহিসেবীপনায় গা ভাসাতে চায়। এই আশঙ্কা স্বাভাবিক। মনের এই ন্দটুকু না পেলে মানুষ কাজেও উৎসাহ পায় না।

তাই সব দুর্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশে আবার পুজোর হাওয়ায় চারিদিকে আনন্দ কলরব শোনা যাচ্ছে। পুজোর রেও শুরু হয়েছে লোক সমাগম। কলকাতা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে পুজোর পসরায় বিপণি বোঝাই। জামা, জুতো, ড় থেকে শুরু করে টুকিটাকি সব পণ্যেরই চাহিদা হবে এখন। এখন কিনলে পাঁচ রকমের জিনিসের মধ্যে বাছাই করা ব হয়, দেখেশুনে কিনতে পারলে একটু সস্তাও পাওয়া যায়। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সহযোগিতাতেই পুজোর রের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত। যাদের সম্বল সামান্য, সেই ফেরিঅলা হকাররাও ফুটপাতে দোকান সাজিয়ে বসেছে। যাঁরা পী, যাঁরা প্রতিমা নির্মাণ করেন, তাঁদেরও ব্যস্ততার অন্ত নেই। এই মহা-উৎসবের সময়ে তাঁদেরও চাহিদা সর্বত্র। রাত্র পরিশ্রম করে তাঁরা অপরূপ শিল্পকর্ম তৈরী করছেন। মানুষের মনের শ্রেষ্ঠ উপচার নিবেদিত হবে সেই প্রতিমার প্রতিষ্ঠার পর।

এই সময়ে লেখকশিল্পীরা তাঁদের সৃজনকর্মে পান নতুন উদ্দীপনা। বাংলাদেশে পুজোর বাজার সাহিত্যেরও র। অবকাশযাপনের সঙ্গী হিসেবে শারদীয় সাহিত্য সংকলন শিক্ষিত বাঙালীর কাছে অপরিহার্য। শত শত শারদ লন প্রকাশিত হয় এই সময়ে। রূপে বর্ণে স্বাদে তার বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা পাঠকদের মন আকর্ষণ করে। লেখকরা প্রচুর খন এই সময়ে, শিল্পীরা রূপ দেন সেই কল্পনার। তার সঙ্গে অর্থনীতির সূত্রে জড়িত থাকেন কাগজবিক্রেতা, মুদ্রক, ই-কর্মী ইত্যাদি অনেকেই। একেও আমরা পুজোর বাজারের একটি রমণীয় অঙ্গরূপেই গ্রহণ করতে পারি।

আর দু' সপ্তাহের মধ্যেই উৎসবের লগ্ন উপস্থিত হবে। শরতের যে সোনালী রোদ, নীল আকাশ আর শিউলি লর চিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তা' কিন্তু এখনও তেমন আনন্দ উল্লাসে তার আগমন-বার্তা ঘোষণা করেনি। গুমোট ম শহরবাসীরা অতিষ্ঠ। আকাশ মুখ ভার করে আছে। ঠিক ভাদ্রের চালটুকু বজায় রেখেই চলেছে প্রকৃতি। হয়তো শ্বিন এলে প্রকৃতির রূপ বদল স্পষ্টতর ও কোমলতর হবে। শিশিরের ছোঁয়া লাগবে ঘাসের ওপরে। সকালের রোদ দেখলেই পড়বে আগমনীর গান ঃ 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা আমার কত কেঁদেছে।'

বাঙালীর কাছে এই সুর এক অনন্য আস্বাদন। স্নেহপ্রীতি ও মমতার এমন অনাবিল প্রকাশ পৃথিবীর সাহিত্যে বেশি নেই। আমরা সেই সুন্দরের আগমন প্রতীক্ষায় আছি।

রাত তখন দশটা

আগের ঘটনা

দিকনগরের পেপার মিলের অপারেটর মিস তরঙ্গমালা এক রাতে খুন হয়। এ
জড়িয়ে পড়ে তারই প্রেমিক নিখিলেশ সেন। এখন অ্যারেস্টেড। কেসের ভার প
সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যালের উপর। শচীদুলাল ওর সহকারী। নি
লেশের বন্ধু হল শশাংক ভট্টাচার্য। তরঙ্গরও পরিচিত সে।

সরেজমিন তদন্তে পরদিন সন্ধ্যে নাগাদ মর্গে এসে পৌঁছল রাজীব, শচীদুল
এবং দিকনগর থানার ও-সি সুব্রত সরকার। লাশ দেখল সবাই। তরঙ্গর ঘাড়ের কা
ও গলার নিচে দেখা গেল আঙুলের দাগ। আর ওর জামার ভেতরে আগেই পাও
গেছে নিখিলেশের চিঠি। লাশ দেখে একসময় বিদায় নেয় রাজীব, শচীদুলাল। ত
রাত। পরদিন সকালেই ওদের আবার যেতে হবে দিকনগর।

ধারাবাহিক রহস্য কাহিনী

দেবল দেববর্মা

কিন্তু নগর—নগর কই হে সুব্রত? এর নাম নগর নাকি?'

সুব্রত হেসে জবাব দিল, 'যে দেশে যেমন দস্তুর রাজীবদা। এই কোলিয়ারী মুল্লুকে এর চেয়ে ভালো নগর আপনি কি করে আশা করবেন। নগর বলতে এই। পাকা ঘরবাড়ী রয়েছে এতগুলো...একটা পেপার মিল। আর হ্যাঁ, একটা সিনেমা হলও হয়েছে। অবশ্য ইঁট গেঁথে 'সিমেন্টিং করে বসবার আসন তৈরী করেছে মালিকরা। তাদেরও উপায় নেই। কাঠের চেয়ার ভাংগলে আর কত জোগাবে?'

'পেপার মিলের ম্যানেজারের সংগে তোমার আলাপ আছে সুব্রত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সুদর্শন চক্রবর্তী ভারী অমায়িক মানুষ। বছর পঁয়ত্রিশের মত বয়স হবে। বিলেতে চার বছর কাটিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। পেপার টেকনোলজিতে ভালো ডিগ্রী আছে। নইলে এই কম বয়সে কি আর একটা মিলের ম্যানেজারী পান?'

'এখানে কতদিন এসেছেন উনি?'

'বছর দুই হবে। এর আগে কলকাতার কাছেই একটা পেপার মিলে ছিলেন। কিন্তু সেটা জুনিয়র পোস্ট। ম্যানেজারী পেতেই ওটা ছেড়ে দিয়ে এখানে লেগে গেলেন। আর পেপার মিলের ম্যানেজার মানে রীতিমত রাজাউজীর ব্যক্তি। সর্বে-সর্বা কিংবা দন্ডমুন্ডের কর্তা বলুন, সবই উনি—।'

শচীদুলালের দিকে চেয়ে বলল রাজীব, 'তুমি জীপের কাছেই থাক শচী। আমি সুব্রতর সংগে থানায় বসে একটু কথা বলছি।'

ইংগিতটা শচীদুলাল বুঝল। ইন্স-পেক্টর গোপনে কিছু বলবে সুব্রতকে। শচীদুলালকে তার মধ্যে আসতে নিষেধ করছে।

সুব্রতর সংগে রাজীব সান্যাল গিয়ে থানায় ঢুকল। ছোট্ট একটা ঘরে সুব্রত আলাদাভাবে বসে। বেশ সাজানো-গোছানো ঘরখানা। টেবিলের উপর মোটা কাঁচ। তার নীচে সুইজারল্যান্ড কিংবা অমনি কোন দেশের নিসর্গচিত্র। কয়েকটা পেপার ওয়েট। দেওয়ালে একপাশে সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার, অন্যপাশে একটি ক্রাইম চার্ট। টেবিলে একটা দিনপঞ্জী।

ভৃত্য এসে চা রেখে গেল।

এক চুমুক পান করে রাজীব বলল, 'ভারী সুন্দর চা হে সুব্রত। ফিরে এসে আর এক কাপ কিন্তু চাই।'

'নিশ্চয়ই', সুব্রতর মুখটা কিঞ্চিৎ গর্বিত দেখাল। সে বলল, 'চা আমার একটা বিলাসিতা রাজীবদা। বেশ দামী পাতা ছাড়া আমার মুখে রোচে না। গত পাঁচ বছর ধরে আমি কলকাতার একটি দোকান থেকে চা আনিয়ে খাচ্ছি। মাঝে মধ্যে হঠাৎ ফুরিয়ে গেলে ভীষণ মুস্কিল হয়। যত-দিন না কলকাতায় কেউ যাচ্ছে ততদিন প্রায় চা না খেয়েই থাকি। অন্য কোথাও গেলে চা খাই। কিন্তু ঐ পর্যন্তই,—মন ভরে না।'

রাজীব সান্যাল প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করল। 'তোমাকে একটা কথা বলছিলাম সুব্রত। তরঙ্গমালার জিনিষপত্রগুলো আমাদের একটু দেখতে হবে। ওর আত্মীয়-স্বজনরা দুঃসংবাদ পেয়ে কেউ এসেছেন নাকি?'

'ওর মা আর এক দাদা এসেছেন শুনেছি। সম্ভবত আজ বিকেলের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যাবেন তাঁরা। বোধহয় তরঙ্গর জিনিষপত্র ওদের সঙ্গেই যাবে।'

রাজীব সান্যাল কয়েক সেকেন্ড কি চিন্তা করল। বলল, 'এখনই একজন লোক পাঠাও তুমি। তরংগের বাক্স-প্যাঁটরায় অন্তত চাবি দিয়ে আসুক। আমাদের পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ হলে সেগুলো ওরা নিয়ে যেতে পার-বেন।'

সুব্রত বলল, 'এখনই ব্যবস্থা করছি রাজীবদা।'

'আর একটা কাজও করতে হবে তোমাকে।' রাজীব সান্যাল চিন্তিত মুখে বলল, 'নিখিলেশ সেনের ঘরটা একবার সার্চ করতে হবে, তরংগের লেখা চিঠি-পত্রগুলো চাই। আর কিছু যদি পাওয়া যায় তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

সুব্রত সরকার প্রশ্ন করল, 'সার্চের সময় আপনিও যাবেন তো?'

'চেষ্টা করব। হ্যাঁ, নিখিলেশ সেন এখন কোথায়?'

'থানার লক আপে। এখুনি ওকে মথুরাপুরে পাঠাতে হবে। এস ডি ও-র কোর্টে ফার্স্ট আওয়ারেই হাজির করা দরকার।'

রাজীব বলল, 'হাজির করা মানে আবার সময় চেয়ে নেওয়া তো? কোর্টকে একবার ছুঁইয়ে রাখা।'

'তাছাড়া আবার কি? পুলিশের তরফ থেকে প্রার্থনা করা হবে নিখিলেশ সেনকে এখন জেল রক্ষণাবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন। নাহলে তদন্তের সমূহ ক্ষতি।'

রাজীব সান্যাল হেসে বলল, 'আমার মনে হয় তুমি কাজটা ঠিক করনি সুব্রত। নিখিলেশ সেনকে অ্যারেস্ট না করলেই ভাল করতে।'

যেন সাপ দেখার মত চমকে উঠল সুব্রত। 'বলেন কি রাজীবদা? তরংগ-মালার কাছে ওর লেখা একটা চিঠি পাওয়া গেল। চিঠি লিখে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ওকে আসতে বলেছিল নিখিলেশ। এবং সেই নির্ধারিত সময়ে তরংগমালা খুন হল। পরদিন তার ডেড বডি পাওয়া গেল সুদামডির মোড়ের কাছেই। এর পরেও ওকে অ্যারেস্ট না করলে লোকে কি বলত? না, ওপরওয়ালা শুনত?'

রাজীব সান্যালকে চিন্তিত মনে হল। সে বলল, 'চূড়ান্ত তদন্ত তো এখনও হয় নি। তদন্তের সময় আসামীকে ছেড়ে রাখলে অনেক সময় ভালো ফলও পাওয়া যায়। তাছাড়া—।'

'তাছাড়া কি রাজীবদা?'

'শুধু চিঠিটা থেকে নিখিলেশকে অভিযুক্ত করা এবং খুনের চার্জ প্রমাণ করা যায় না। আর নিখিলেশ তার পক্ষ সমর্থনে কি বলবে তাও তুমি আঁচ করতে পারছ না। সুতরাং আরো প্রমাণ চাই।'

ঘড়িতে সাড়ে সাতটার মত দেখে রাজীব সান্যাল উঠে দাঁড়াল। বাইরে রোদ [illegible] বেড়েছে। পথে লোকজনের চলাচল [illegible] চেয়ে বেশী। মাল বোঝাই মস্ত একটা [illegible] রাস্তা কাঁপিয়ে দানবের গতিতে দ্রুত [illegible] হল। দূরে দূরে প্রায় ফাঁকা প্রান্তরের উপর মদমত্ত অসুরের ভঙ্গীতে কোলিয়ারীর চানখ সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে [illegible] লার ঘরের চিমনীর নালী বেয়ে [illegible] ধোঁয়া অশাসনে উড়ু উড়ু [illegible] মত হেথা সেথা ভাসছে।

সুব্রত বলল, 'রাজীবদা, আসল [illegible] কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন।'

'কি বলো তো?' রাজীব [illegible] তাকাল।

'নিখিলেশ সেনের চিঠিটা। [illegible] করে বলতে পারি রাজীবদা, এই [illegible] কোর্টে দাখিল করলে আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছুই বলতে পারবে না—।'

'কিন্তু ওকে জেলে রেখে [illegible] কিছু লাভ হবে না সুব্রত। বরং [illegible] করতে দিলে নতুন তথ্য [illegible] পারতে। সুতরাং—।' রাজীব [illegible] হাসল।

'সে যাক গে। আপনি ওর [illegible] দেখবেন রাজীবদা?'

'তাড়াতাড়ি কিছু ছিল না [illegible] যখন বলছ, নিয়ে এস।'

রাজীব সান্যাল চেয়ার থেকে [illegible] জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। [illegible] প্রাংগণে বেশ সুন্দর বাগান [illegible] এরা। বেশ বড় সাইজের [illegible] জিনিয়া আরো কি সব ফুল [illegible] আলো করে রেখেছে। মনে [illegible] করল রাজীব। সুব্রতর সাড়া [illegible]

'চিঠিখানা এনেছি রাজীবদা' [illegible] বলল।

জানালা থেকে একটু সরে এসে [illegible] ঘুরে দাঁড়াল। সুব্রত সরকারের [illegible] একটা নীল রঙের কাগজ। [illegible] গোছে কাগজটা ধরে আছে সুব্রত। মুখে রহস্যের হাসি, চোখে বিজয়ীর [illegible]

'তরঙ্গমালার জামার মধ্যে [illegible] লুকোনো ছিল। নিখিলেশ যদি [illegible] জানত, তাহলে টান মেরে [illegible] এটা। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের [illegible] সুব্রত সহাস্যে কথা শেষ করল।

চিঠিটা হাতে নিল রাজীব। [illegible] সুন্দর নীল রঙের কাগজটা। [illegible] এনে গন্ধ শুঁকতে চেষ্টা করল [illegible] পর চিঠির বক্তব্যের উপর দৃষ্টিপাত [illegible] নিখিলেশের হাতের লেখা। বেশ [illegible] গোটা গোটা হস্তাক্ষর। কালিটা [illegible] সবুজ নয়। ঠিক কালো [illegible] কালিমা লক্ষ্য করবার মত।

অল্প কয়েক লাইনের চিঠি। একজন [illegible] কোন একটা স্থানে দেখা করতে [illegible] জন্য এর চেয়ে বেশী লেখার প্রয়োজন না। তবু চিঠির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা

অভিমানের সুর সহজেই ধরা পড়ে। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হবার কারণ সেটাও হওয়া সম্ভব।

চিঠিতে তারিখ নেই, কোথা থেকে লিখছে তারও কোন হদিশ নেই। অক্ষর-গুলির উপর চোখ দুটি স্থির করল রাজীব সান্যাল। নিখিলেশ লিখেছে—

আমার মিষ্টি,

তোমার সংগে আমি একমত হতে পারছি না। আমার মনে হয় এ ব্যাপারটা তোমার আর একবার ভেবে দেখা উচিত। ভালো করে চিন্তা করলে তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে।

মনে আছে মিষ্টি, যেদিন তোমার সংগে প্রথম আলাপ হল। সেদিন সমস্ত পথ ট্রেনে আমরা দুজনে দুজনকে দেখেছি। কিন্তু কেউ কারো সংগে কথা বলতে পারিনি। অথচ বুকের মধ্যে দুজনেরই কথা বলবার কি অদম্য ইচ্ছে। আবার মথুরাপুর স্টেশনে নেমেই সব ভাবনার ইতি। বহু কষ্টে টাক্সি জোগাড় করে যখন তোমাকে লিফট্ দিতে চাইলাম, তখন তুমি একমুখ হেসে এগিয়ে এলে। আমার মনে হল এমন মিষ্টি হাসি আমি কোথাও দেখিনি। হয়তো এমন হাসি কোন মেয়ের ঠোঁটে এর আগে কখনও ফোটেনি।

কাল তোমার নাইট ডিউটি আছে জানলাম। রাত দশটার সময় সুদামডির মোড়ে আমি অপেক্ষা করব। মনে হয় এর মধ্যে তুমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখবে। এবং হয়তো আমার প্রস্তাবে রাজী হবে। কথা আছে মিষ্টি,—একটু অপেক্ষা ক'রো।

অনেক ভালবাসা, অনেক শুভ-কামনা রইল।

ইতি
তোমারই
নিখিলেশ

চিঠিটা আর একবার পড়ল রাজীব সান্যাল। কমা, পূর্ণচ্ছেদ সব কিছু ভালো করে লক্ষ্য করল। একটু পরে ঠাট্টাতরল কণ্ঠে বলল রাজীব, 'এ চিঠিটা কোন এক মিষ্টিকে লেখা। তরঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক কি?'

'আমি খোঁজ নিয়েছি রাজীবদা। তরঙ্গ মানেই মিষ্টি—।'

'ও। মিষ্টি বুঝি ওর ডাক—'

সুব্রত সরকার কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা হতাশ ভঙ্গি করে বলল, 'রাজীবদা কিছু বুঝতে চাইছেন না।'

হাসল রাজীব সান্যাল। বলল, 'ঠাট্টা করছিলাম হে সুব্রত। বুঝতে আমি অনেক আগেই পেরেছি। মিষ্টি নামটা পোশাকীও নয়, ডাক নামও নয়। ওটা নিতান্তই ব্যক্তি-গত দান।' একটু থেমে যোগ করল, রাজীব 'কানে কানে বললে ও নাম আরো মিষ্টি শোনাবে সুব্রত।'

সুব্রত সরকার কৌতুক করল 'রাজীবদা কি খুন ছেড়ে এখন নাম নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করবেন নাকি?'

'নাম কি কম মজার হয় সুব্রত? বিশেষ করে এমনি ভালবাসার সম্বোধন। নিখি-লেশ তরঙ্গকে ডাকত মিষ্টি বলে। এ শব্দে তো আমাদেরই মিষ্টি লাগছে। কিন্তু আমি এক ভদ্রলোককে জানি। তিনি একজনকে কি নামে ডাকতেন জানো?—'

—'কি নামে আবার?'

খুব গম্ভীর মুখ করে রাজীব বলল, 'দুষ্টু।' পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকতাম তখন। মাঝে মাঝে কানে আসত, ভদ্রলোক বল-ছেন—দুষ্টু এটা দিয়ে যাও, ওটা দিয়ে গেলে না। অনেকদিন ভেবে ভেবে পরে নামের রহস্যটা শুনলাম। দুষ্টু ওর স্ত্রীর নাম। মানে ওই নামে ডাকেন বৌকে। কি সুব্রত, নামটা বেশ ইন্টারেস্টিং না?'

সুব্রত শব্দ করে হাসল। 'রাজীবদার দেখছি নানারকম সংগ্রহ। কিন্তু আটটা বাজতে আর বেশী দেরী নেই। জায়গাটা দেখতে যাবেন না এবার?'

চিঠিটা সুব্রতর হাতে ফেরৎ দিল রাজীব, বলল, 'ঘটনাস্থল কতদূর হবে সুব্রত? জীপ নিয়ে যাওয়া যাবে?'

'জীপ নিয়েই তো যেতে হবে। আধ-মাইলের বেশী হবে এখান থেকে। পেপার মিলের উত্তর দিকে জায়গাটা।'

রাজীব সান্যাল জীপে এসে উঠল। শচীদুলাল এতক্ষণ জীপের কাছে পায়-চারী করছিল। কাছাকাছি বড় গাছটাছ নেই। থাকলে শচীদুলাল তার স্নিগ্ধ-ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াত। একটু আরাম পেত।

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কোমরটা সামান্য টনটন করছে। ওর দিকে চেয়ে রাজীব সান্যাল ঈষৎ হাসল।

সুব্রত বলল, 'শচীবাবু থানার মধ্যে গিয়ে বসলেই পারতেন।'

রাজীব সান্যাল তির্যক দৃষ্টিতে দেখল শচীকে। সুব্রতকে বলল, 'রহস্য নিয়ে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি তাই জানবার জন্য শচী অস্থির হয়ে উঠেছে।'

প্রতিবাদ করে শচীদুলাল জবাব দিল, 'আজ্ঞে না স্যার। আমি সে কথা চিন্তা করছি না।'

রাজীব আবার হাসল, 'আত্মবঞ্চনা করে কোন লাভ নেই শচী।' যারা ধূমপান করে, সিগারেট অনেকক্ষণ না টানলে তাদের রীতিমত কষ্ট হয়। পেটের ভিতর আকু-পাকু করে। তুমি রহস্যের কারবারী—সি আই ডি দারোগা। রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ, অথচ স্বাদ পাচ্ছ না। এর চেয়ে কষ্টের আর কি হতে পারে?'

জীপ স্টার্ট নিল। ঘর-ঘর শব্দ। বাতাসে মবিল আর পোড়া তেলের বিশ্রী গন্ধ। পথের ওপাশে দশ-বারোজন লোক সাগ্রহে জীপটাকে লক্ষ্য করছে। একটা চপ-ফুলুরীর দোকানে কয়েকজন খরিদ্দার নিজেদের মধ্যে কি সব কথা বলাবলি করছে।

'সুব্রত, তরঙ্গকে তুমি আগে কখনও দেখেছিলে?' রাজীব হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'দেখেছিলাম রাজীবদা। কাজে-কর্মে মিলের মধ্যে অনেকবার যেতে হয়েছে। ম্যানেজারের ঘরে তরঙ্গকে কয়েকবার আসতে দেখেছি। বাইরে থেকে টেলিফোন এলে তরঙ্গ ছুটে এসে খবর দিত। দরকার মনে করলে ম্যানেজার লাইন তুলে [illegible] বলত। নইলে তরঙ্গ নির্দেশমত অন্য কারো কাছে পাঠিয়ে দিত লাইনটা।'

'তরঙ্গ দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল [illegible] না সুব্রত?'

'সুন্দরী মানে?' সুব্রত সরকার [illegible] যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

রাজীব বলল, 'সুন্দরী বলতে তুমি [illegible] বুঝেছ তাই বলবে। এই ধরো—গায়ের [illegible] বেশ ফর্সা। চোখ দুটি কালো আয়ত [illegible] আকাশে উড়ন্ত চিলের ডানার মত [illegible] জোড়া ভ্রূ। ঘন কৃষ্ণ কেশদাম বেশ [illegible] ফাঁপা।......'

সুব্রত বলল, 'এভাবে তরঙ্গমালার রূপ বর্ণনা করতে পারব না রাজীবদা। তরঙ্গর গায়ের রং হয়ত ফর্সা, কিন্তু সে গৌরবর্ণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। [illegible] কালো তো বটেই এবং বেশ বড়ো [illegible] ভুরু দুটো চিলের ডানার মত কিনা [illegible] জানিনে। শুধু একটা কথা [illegible] বলতে পারি।'

'কি কথা সুব্রত?'

'তরঙ্গমালাকে একবার দেখলেই [illegible] দেখতে ইচ্ছে করবে।'

'সর্বনাশ!' রাজীব জিভ বের করে [illegible] চুক-চুক শব্দ করল, 'এমন বেফাঁস কথা শচীদুলালের সামনে বলে ফেললে? [illegible] কানে গেলে কি অনর্থ হবে ভাবো [illegible]'

শচীদুলাল মুখ ফিরিয়ে [illegible] চেয়ে রইল। সম্ভবত সে হাসছিল।

সুব্রত শুধু করল, 'সে নয় [illegible] রাজীবদা। তরঙ্গকে [illegible] আপনিও আমার সঙ্গে একমত হতেন। [illegible] মধ্যে একটা শান্ত সৌন্দর্য একটা [illegible] শ্রী এমনভাবে ছিল, যে ওকে দেখে [illegible] না হয়ে বোধ হয় উপায় ছিল না।'

দিকনগরের বাজার অঞ্চলের মধ্য দিয়ে জীপ চলছিল। দুপাশে ঘরবাড়ী। কোনটা খড়ো চাল, কোনটা পাকা দালান। [illegible] দুপাশে দোকান-পশরা। পথ চলতি [illegible] জন, দোকানের খদ্দের প্রায় প্রত্যেকেই [illegible] গাড়ীটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে।

রাজীব সান্যাল নিজেই গাড়ী চালিয়ে এসেছে। সুব্রত তার পাশে বসে। পিছনে শচীদুলাল রয়েছে।

'খুনের পর এখানকার অবস্থাটা কেমন সুব্রত?' রাজীব প্রশ্ন করল।

'অবস্থা আর কি? এখন সবাই খুনের আলোচনা। লোকে খানিকটা [illegible] পেয়েছে রাজীবদা। এসব অঞ্চলে খুন-[illegible] অবশ্য খুব অপরিচিত নয়। কিন্তু উদ্ভিন্ন একটি সুশ্রী যুবতী এমন নির্মমভাবে [illegible] পড়েছে জেনে সাধারণ লোকের মনটা খানিকটা ভেঙে গিয়েছে। তবে নিখিলেশকে অ্যারেস্ট করায় কিছুটা কাজ হ[illegible]

চিঠির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই বেশ রটে গিয়েছে। প্রমাণ না হলেও সাধারণ লোকে মনে করে যে, এই নৃশংস অপকর্ম আর কারো নয়, নিখিলেশ সেনেরই।'

'চিঠিটার ব্যাপারে নিখিলেশকে কোন প্রশ্ন করোনি তুমি?'

'করেছিলাম রাজীবদা। কিন্তু নিখিলেশ লোকটি খুব ঘুঘু লোক। পুলিশের কাছে মুখ খুলতে বা কোন স্টেটমেন্ট দিতে সে রাজী নয়। তার যা কিছু বলবার সে উকীলের মাধ্যমে কোর্টে জানাবে।'

রাজীব সান্যালকে চিন্তিত মনে হল। গাড়ীর কাঁচের মধ্য দিয়ে সে সাপের মত আঁকাবাঁকা পীচঢালা চওড়া পথটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ সুব্রত প্রায় চীৎকার করে ঘোষণা করল, 'আস্তে করুন রাজীবদা, এবার তো আমরা চলে এসেছি। এই তো সুদামডি কোলিয়াড়ীর মোড়।'

ধীরে ধীরে জীপটা থামল। ওয়েস্ট সুদামডি কোলিয়ারী যাবার পথটা বাঁদিকে বেঁকেছে। এটাও পীচের রাস্তা। তবে এত চওড়া নয়। দুটো গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে। মোড়ের উপর প্রকান্ড এক ঝুরিনামা বটগাছ। গাছের ঘন ছায়ায় গাড়ীটাকে রেখে রাজীব সান্যাল নামল।

এখানটায় বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া। বটগাছের স্নিগ্ধ ছায়ায়, গাড়ীর ভিতরের গুমোট আকার বিরক্তিটুকু মুহূর্তে উবে গেল। পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজীব সান্যাল জায়গাটা নিরীক্ষণ করল। মোটামুটি নির্জনই বলা চলে। ঘরবাড়ী, বসতি সবই আছে। তবে তা কাছাকাছি, বা সংঘবদ্ধ নয়। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

'পেপার মিলের গেটটা এখান থেকে কত দূরে?' রাজীব সুব্রতকে বলল।

'দূর কোথায়? মিনিট তিন-চার হাঁটলেই রাস্তাটা বেঁকেছে। মিলের নর্থ গেটটা ঐ বাঁকের মুখে। এদিকটায় যারা থাকে তারা নর্থ গেট দিয়েই কাজে ঢোকে।'

'এদিকে লোকবসতি কই তেমন?'

'মিলের নিজস্ব এরিয়াটা অনেক বড় রাজীবদা। বহু লোকই মিলের মধ্যে বাস করে। কোম্পানী কিছু কিছু কোয়ার্টার করিয়েছিল। কিন্তু এখন আর ওতে কুলোচ্ছে না। লোকজন বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে কোয়ার্টার বাড়ছে না।'

'তাহলে তারা থাকছে কোথায়?'

'যে যেখানে পাচ্ছে। দিকনগরে এসে বাড়ীভাড়া মেলা অবশ্য দুঃসাধ্য। তবু কিছু কিছু নতুন বাড়ী হচ্ছে আজকাল। কোম্পানীকে ভাড়া দিতে অনেকেই রাজী।'

'তরঙ্গমালা কোন্ বাড়ীটায় থাকত সুব্রত?'

'এখান থেকে দেখতে পাবেন না রাজীবদা। একটা গাছের আড়াল পড়েছে। মিনিট ছয় সাতের রাস্তা। ধীরে সুস্থে গেলে বড় জোর দশ মিনিট।'

রাজীব সান্যাল মাটির উপর অনেকক্ষণ ধরে কি লক্ষ্য করছিল। খানিকটা হেঁটে গেল রাজীব, আবার পিছিয়ে এল। হতাশ একটা ভঙ্গি করে বলল, 'না, হল না সুব্রত। চল ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক এবার।'

সুদামডি যাবার পথ ধরে বিশ-পঁচিশ হাত গিয়ে সুব্রত থামল। পীচের পথ থেকে সরু পায়েহাঁটা একটা পথ ঢালু অসমান জমিতে নেমেছে। ঐ পথটা ধরে নেমে এল সুব্রত। মিনিট দুই হাঁটতেই কয়েকটা ঝোপ, আগাছার জঙ্গল, ছোটখাটো গাছগাছালি চোখে পড়ল। বেশ ফাঁকা মত খানিকটা জায়গা একদিকে। চারপাশে ঝোপ-ঝাপের ভীড়। সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সুব্রত বলল, 'ডেড বডিটা ওখানে পড়েছিল রাজীবদা।'

সকলকে পিছনে রেখে রাজীব এগিয়ে এল এবার। লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে দাঁড়াল সেই ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে। তার পিছু পিছু সুব্রত এবং শচীদুলাল।

মাথা তুলে একবার দেখল রাজীব। শরতের প্রসন্ন নীল আকাশে উজ্জ্বল রোদের আসর বসেছে। একখন্ড পেঁজা তুলোর আকারের শাদা মেঘ অলস গতিতে এক কোণ থেকে অন্য কোণে ভেসে যাচ্ছে। ডানা মেলে একটা নিঃসঙ্গ বক নীল আকাশের গায়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য সুন্দর একটি চিত্রপটের সৃষ্টি করল।

এখানে সেখানে জল জমে আছে। মাটি ভিজে, স্যাঁতসেঁতে। গত দু-এক দিনে কি প্রচন্ড বৃষ্টিই না হয়েছে জায়গাটায়। সুব্রত ঠিকই বলেছিল। বৃষ্টিতে 'ক্লু'-টু সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে।

এদিক সেদিক তাকিয়ে রাজীব বলল, 'এখানে একটা ইটের পাঁজা ছিল সুব্রত।'

বিস্মিত হয়ে সুব্রত জবাব দিল, 'তা কেমন করে জানলেন?'

রাজীব সান্যাল শচীদুলালের দিকে চেয়ে হাসল। 'এ আর এমন কি শক্ত শচী। চারপাশে ঝোপঝাড়, আগাছার জঙ্গল। অথচ মাঝখানের খানিকটা জায়গায় শুধু নরম ঘাস। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ মাটির সঙ্গে ইটের গুঁড়ো লেগে রয়েছে। প্রচন্ড বৃষ্টিতে অবশ্য সব ধুয়ে-মুছে একাকার। নইলে বালির মত ঝুরঝুরে ইটগুঁড়ো তোমার জুতো-টুতোয় লেগে যেত এতক্ষণ।' কথা শেষ করে রাজীব সান্যাল খুব মনোযোগী হয়ে জায়গাটা পর্যবেক্ষণ শুরু করল।

সুব্রত সরকার কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল তাকে। ফস করে সে বলে উঠল, 'নীচু হয়ে ঝুঁকে কি খুঁজছেন রাজীবদা? ঝোপেঝাড়ে চট করে যাবেন না। ময়লা-টয়লা রয়েছে হয়ত।'

তেমনি বেতের মত নত হয়ে রাজীব সান্যাল খুঁজছিলো। পয়সা টয়সা হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন খোঁজে। এদিকে সেদিকে সর্বত্র তার নজর যাচ্ছিল। খুঁজতে খুঁজতে মুখ তুলে একবার চাইল রাজীব। বলল, 'বাল্যকালে একটা কবিতা পড়েছিলাম সুব্রত। হয়ত ঠিক মনে নেই সবটা। তবু তোমাকে বলছি।'

'কি কবিতা রাজীবদা?'

'মনে হচ্ছে কবিতাটা এইরকম।
যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখো ভাই
পেলেও পাইতে পার—'

হঠাৎ কবিতা শেষ করে শিকারী বিড়ালের মত রাজীব সান্যাল কি যেন লক্ষ্য করতে লাগল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল রাজীব। ঝোপের মধ্য থেকে ধুলো কাদায় মাখা একটা রুমাল তুলে উঁচু করে ধরল। শচীদুলাল এগিয়ে এসে বলল, 'কি পেলেন স্যর? রুমাল?'

রুমালটা ওর হাতে দিল রাজীব সান্যাল। বলল, 'তোমার কাছে রেখে দাও শচী। মথুরাপুরে গিয়ে এর ব্যবস্থা করব।'

সুব্রতর দিকে চেয়ে হাসল রাজীব সান্যাল।—'কাজ শেষ সুব্রত। চলো এবার তরঙ্গমালার মেসে যাই।'

ঘড়িতে নটার বেশী। রোদ আরো উজ্জ্বল। বটগাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়াল ওরা। অনেকগুলি সন্তানের জননীর মত বটগাছের নানা ডালপালা পথিকজনকে সস্নেহ প্রশ্রয় জানাচ্ছে। এতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা ঘেমে উঠেছে রাজীব। জামার নীচের গেঞ্জিটা নিশ্চয়ই ভিজে জবজবে। সুব্রতর মুখটা টকটকে লাল দেখাচ্ছে। মনে মনে নিশ্চয় ক্ষেপে উঠেছে সুব্রত। শচীদুলালকেও খুব খুশী মনে হচ্ছে না।

কিন্তু রাজীব সান্যালের মনের গোপন প্রকোষ্ঠে অন্য একটি চিন্তা ধীরে ধীরে দানা বাঁধল। ঐ কথাটাই বারবার ভাবছিল রাজীব। রুমালটা কুড়িয়ে পাবার একটু আগে অন্য একটি বস্তুও পেয়েছে সে। খুব ছোট্ট একটি জিনিস। চট করে তুলে নিয়েছে বলে শচীদুলাল বা সুব্রত কারো নজরে পড়ে নি। এবং ইচ্ছে করেই ওদের কোন কথা বলেনি রাজীব।

পকেটে হাত দিয়ে ক্ষুদ্র বস্তুটি আর একবার অনুভব করল রাজীব। গোলাকৃতি ছোট্ট জিনিসটি। উজ্জ্বল সবুজ রং। ফুল-প্যান্টের কোমরের কাছে লাগানো থাকে এটি। সকলের অলক্ষ্যে বস্তুটি আর একবার দেখল রাজীব।

অন্য কিছু নয়,—প্যান্টের বোতাম একটি।

রাজীব সান্যালকে বর্ষার মেঘ থমকানো সন্ধ্যার মত থমথমে দেখাল।

(ক্রমশঃ)

হাসির মজলিস

দিগম্বরবাবু অনেকদিন পরে বন্ধু স্বয়ম্ভুকে দেখা পেয়ে বললেন—গোটা দশেক টাকা ধার দিতে পারেন?

স্বয়ম্ভু—হ্যাঁ, পারি।

দিগম্বর—তবে আপনি আমাকে দশ টাকা ধার দিচ্ছেন। ওর থেকে পাঁচ টাকা এখন আমাকে দিন।

স্বয়ম্ভু—দিচ্ছি। সবটা এখন দরকার নেই বুঝি?

দিগম্বর—না, তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াবে, আপনি আমার কাছে পাঁচ টাকা পাবেন, আমি আপনার কাছে পাবো পাঁচ টাকা। দুদিকই তাহলে সমান হয়ে যাবে।

●

নববিবাহিত বন্ধুর কাছে জানতে চাইলাম—বিয়ে করতে গেলে মোটামুটি কত খরচ পড়তে পারে?

বন্ধু—খুব বেশী নয়। অল্পের ওপর দিয়ে গেলে হাজার আটেক। এবং তারপর থেকে তোমার জীবনের যাবতীয় উপার্জন।

●

ফোলিও ব্যাগ হাতে নিয়ে রীতিমত ছুটছিলেন যেন ভদ্রলোক। হঠাৎ এক অ-চেনা মাতালের সঙ্গে তাঁর দেখা।

মাতালটি ব্যস্তসমস্তভাবে ভদ্রলোককে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে জানতে চাইল—কটা বাজে।

ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় জানালেন।

বিস্মিত মাতাল বলল—কি ব্যাপার বলুন তো মশাই, সমস্ত দিন কতজনকে একই প্রশ্ন করছি। কিন্তু উত্তর হচ্ছে নানারকম।

●

শিল্পী অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বাড়ীটার ছবি আঁকছিলেন। কখন যে বাড়ীর কর্তা তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা তিনি দেখতেই পাননি।

কর্তা—এই ছবি দিয়ে কি করবেন?

শিল্পী—প্রদর্শনীতে পাঠাব।

কর্তা—নিশ্চয়, অনেক লোক এটা দেখবে?

শিল্পী—কয়েক হাজার লোক তো দেখবেই।

কর্তা—দয়া করে ছবিটার গায়ে লিখে দেবেন—'এই বাড়ী বিক্রয় হইবে।'

ডাক্তার—আপনি হুইস্কির সঙ্গে গরম জল মিশিয়ে খাবেন। তা না হলে হুইস্কি খাওয়া বন্ধ করুন।

ভদ্রলোক—গরম জল কোথায় পাব? হুইস্কির জন্যে আমার স্ত্রী কিছুতেই গরম জল করে দেবেন না।

ডাক্তার—বলবেন, দাঁড়ি কামাবার জন্যে দরকার।

কয়েকদিন পরে ডাক্তারের সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রীর দেখা। ডাক্তার জানতে চাইলেন তার স্বামী কেমন আছেন।

স্ত্রী—তিনি এখন বদ্ধ পাগল। দশ মিনিট অন্তর অন্তর দাঁড়ি কামান।

●

শিক্ষিকা জানতে চাইলেন 'শ্'-এর মত উচ্চারণ হয় এমন একটি শব্দ বল।

একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দিদি, বেলুন।

শিক্ষিকা—বেলুন? বেলুনে আবার 'শ্' শব্দ কোথায়?

ছাত্রী—কেন যখন বেলুন থেকে হাওয়া বেরোয়।

●

মানসিক রোগের ডাক্তারের চেম্বারে অপেক্ষা করছিলেন ভদ্রলোক।

ডাক্তার—আপনি কি করেন?

ভদ্রলোক—আমি একজন ডাক্তার। মানসিক রোগের চিকিৎসা করি।

ডাক্তার—তবে আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন? নিজেই তো নিজের চিকিৎসা করতে পারেন?

ভদ্রলোক—তা তো নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু আমার কি যে বোশ!

●

শিক্ষক—পাখীর দৃষ্টিশক্তি যে তীক্ষ্ম, তা তোমরা নিশ্চয় জানো?

ছাত্র—হ্যাঁ, স্যার জানি।

শিক্ষক—কি করে জানলে?

ছাত্র—কারণ, কোন পাখীকে কখনও চশমা চোখে দেখিনি!

কে কী কেন ?
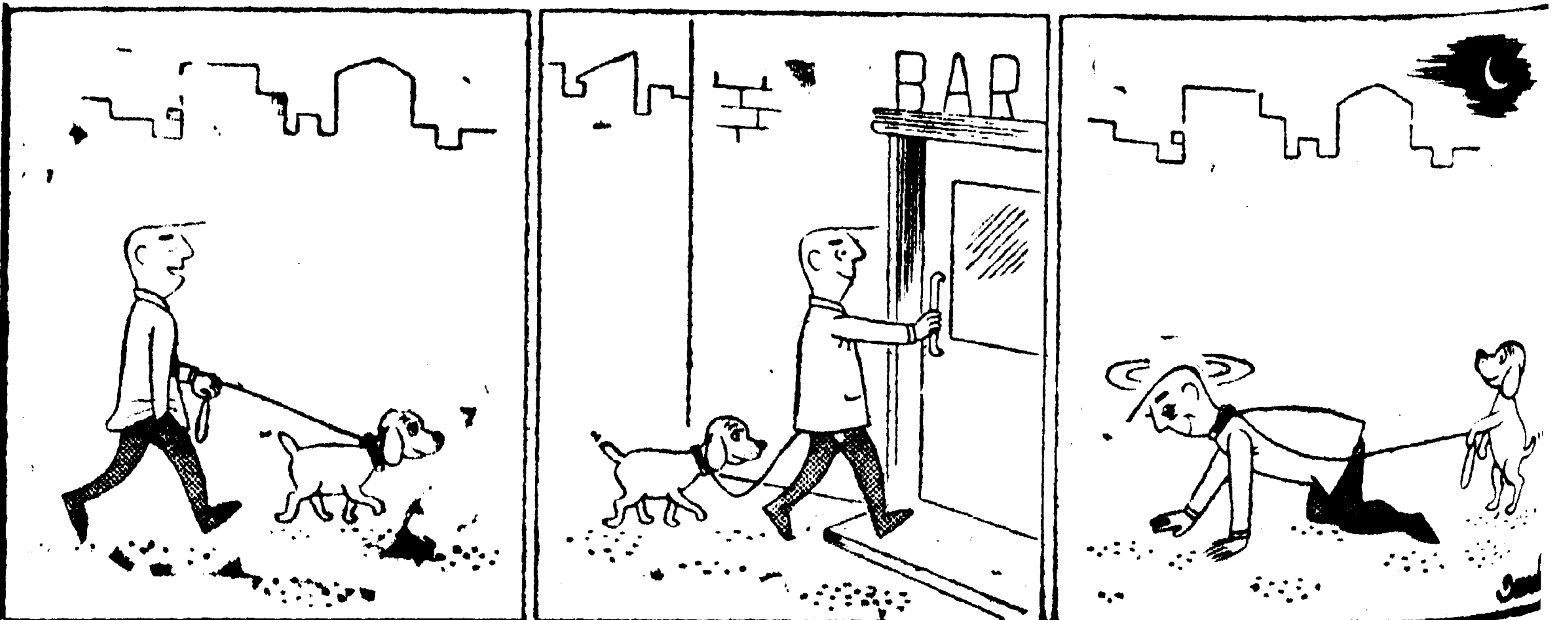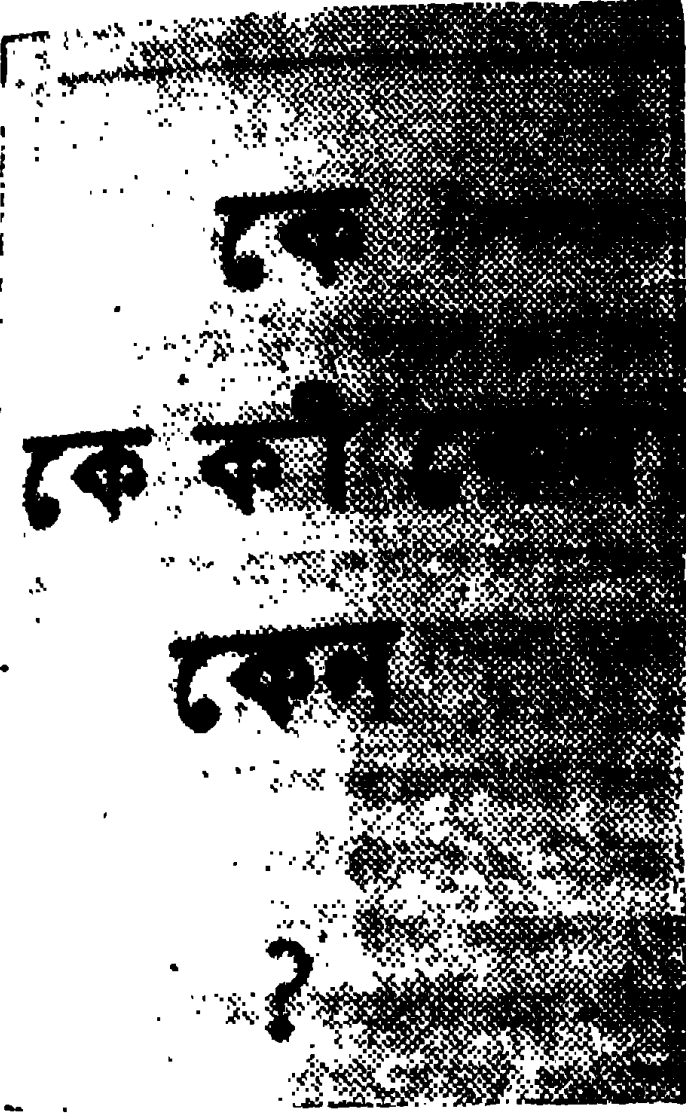
- পৃথিবীর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ—ইউরোপের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ।
- পৃথিবীর সব থেকে কর্মব্যস্ত রেলওয়ে জংসন— ক্ল্যাপহ্যাম জংসন। ঘণ্টায় শতাধিক ট্রেন যাতায়াত করে।
- শ্রেষ্ঠ কফি উৎপাদক দেশ;—ব্রেজিল।
- আলডুস হাক্সলির প্রকাশের ক্রম অনুযায়ী প্রথম সাতটি উপন্যাস;—ক্রোম ইয়েলো, অ্যান্টিক হে, দোজ ব্যারেণ লীভস, পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট, ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড, আইলেস ইন গাজা এবং আফটার মেনি এ সামার।

বিবাহ : একটি রোমাণ্স; যার প্রথম পরিচ্ছেদেই নায়কের মৃত্যু।

- 'বার্থ অফ এ নেশান' এবং 'ইনটলারেন্স' চিত্র দুটির পরিচালক;—ডেভিড ওয়াক গ্রিফিথ।
- ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল,—ক্রিমিয়া যুদ্ধে এই বৃটিশ রমণী যুদ্ধে আহতদের সেবার জন্য এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন।
- গিলবার্ট এবং শুলিভান নাম দুটি সংগীতের কোন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য স্মরণ্য;—অপেরা।
- প্রথম কোন ব্যক্তি চার মিনিটের মধ্যে এক মাইল অতিক্রম করেছিলেন;—রোজার ব্যানিস্টার (১৯৫৪ খৃঃ ৩ মিঃ ৫৯·৪ সেঃ)।

- একটি জামা-কাপড়ের বিজ্ঞাপন লিখে পাঠান হয় কাগজের অফিসে। এগারটি জিনিসের নাম ছিল সেখানে। পরদিন ছাপা হয়ে সেগুলি এইভাবে প্রকাশিত হোল :

　　নেলী ব্লাক টুর ইজ রীক্স
　　লোটা কোলে পুরো পাঞ্জা ক্রল
　　ডেয়ে বীর বুধ শান্তি বান শাখা
　　শংকা ঙ্গা ন্বা উক্ল।।।।।।

—কি নাম এইভাবে ছাপা হয়ে গেল বিজ্ঞাপনদাতা এবং পাঠক উভয়ের কাছে সেটি বিস্ময়ের!

আসলে ছিল :

—ধনেখালী, শান্তিপুরী, টাঙ্গাইল, কোয়েম্বাটুর, বাঙ্গালোর, ঢাকাই, মুর্শিদাবাদী, মটকা, ব্লক, ব্লাউজ, বালুচরী।

গত সংখ্যার উত্তর—পর পর সাজান আছে

- মাউন্ট এভারেস্ট (২৯,০২৮ ফিট); গডউইন-অস্টিন (২৮,২৫০ ফিট); কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,১৪৬ ফিট); লোৎসে (২৭,৮৯০ ফিট) এবং মাকালু (২৭,৭৯০ ফিট)।
- ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েৎনাম এবং চীন।
- ইরাণ (৬২৮,০০০ বর্গমাইল)।
- নীলনদ (৪,১৬০ মাইল)।
- টোকিও (জাপান)।
- আলো।
- পরমাণু শক্তিকেন্দ্র থেকে প্রেরিত রশ্মি। ইউরেনিয়াম এবং এবং রেডিয়াম উভয়ই রেডিও অ্যাকটিভ উপাদান।
- সেফটি ল্যাম্প ১৮১৬ খৃঃ।
- জর্জ বার্ণাড শ।
- স্যর ক্রিস্টোফার রেন।
- হ্যামিংবার্ড।
- সামনে এবং পেছনে বিজ্ঞাপনের বোর্ড নিয়ে যায় যে লোক।
- লিওনার্দো দা ভিঞ্চি; গেইনবরো; এফ হলস; র‍্যাফায়েল; লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।
- ইরাণ; পলসেটি (রুমানিয়া); যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চল); বাকু এবং ইরাক।
- ফার্ডিনান্ড দ্য লেসেপস নামে ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার।
- সিংহ।
- উটপাখী।
- অপর নাম সত্যবতী। ব্যাসদেবের জননী। শান্তনুর স্ত্রী। চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য সত্যবতীর দুই পুত্র।
- মন্দোদরী।
- নবদ্বীপ; গ্রেট বৃটেন; কনস্টান্টিনোপল এবং ট্রিগটাস দাউকাসহা।
- তিনটি ল্যাটিন শব্দ : লিবারে—পাউন্ড; শলিডি—শিলিং এবং দেনারি—পেন্স।
- বুলেট; একই গতি; বিদ্যুতে।
- কুকুরের ৪২টি দাঁত।

১৯৬২-র আসামীরা ?

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

১৬৯২-র অকটোবর মাসে ভারতের [illegible]কে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ঠিক যে কি হয়েছিল, কার কত ইঞ্চি অপরাধ, তার পরিমাপ করবেন আগামী দিনের ঐতিহাসিকরা। কারণ ঝড় থামবার অনেক পরে আকাশ যখন পরিষ্কার, তখনই সম্ভব ধীরে সুস্থে, সব দিক বিচার-বিবেচনা। এশিয়ার দুটি বৃহত্তম রাষ্ট্রের সংঘর্ষ, এটা একটা গুরুতর ঘটনা, না মাত্র [illegible]র গ্রাস, অর্থাৎ একটা লঘু পরিহাস [illegible] তার সঠিক বিচার করবে।

১৯৬২-র যুদ্ধ লঘু কিংবা গুরু তার বিচারে সময় লাগতে পারে কিন্তু এই কথা অস্বীকার করার নেই যে, ১৯৬২-তে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। ভারতের এই পরাজয় ভারতবাসীর কাছে, [illegible] স্বদেশ সচেতন ভারতবাসীর কাছে একটা নিদারুণ দুঃখকর অভিজ্ঞতা।

"What exactly happened in NEFA in 1962 and why?"

এ বিষয়ে তাই সুষ্ঠু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। [illegible] এখনই যথেষ্ট পরিমাণে সুলভ। [illegible] ইতিমধ্যে দুচারখানি গ্রন্থ লিখেছেন। অনেক রকম কাহিনী এ পর্যন্ত [illegible] হয়েছে। হেণ্ডারসন-ব্রুকসের রিপোর্ট আজো অবশ্য প্রকাশিত হয়নি, [illegible] পার্লামেন্টে মন্ত্রী চৌহান এই রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্ত সার পেশ করেছেন।

মিঃ জি এস ভার্গব একজন [illegible] সাংবাদিক তাঁর 'দি ব্যাটল অব নেফা' [illegible]ক গ্রন্থে তিনি সাংবাদিকদের দৃষ্টি[illegible]তে যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থার অনেক [illegible] এবং সেই বিষয়ে মন্তব্য পরিবেশন [illegible]রেছেন।

জেনারেল কোল 'দি আনটোল্ড স্টোরী' [illegible]য়েছেন মুখ্যতঃ আত্মপক্ষ সমর্থনে। ১৯৬২-র ঘটনাবলীর তিনি একজন নায়ক। [illegible] নাটকে তাঁর ভূমিকা ভালো মত অভি[illegible] হয়নি এমন মন্তব্য এবং তথ্যাদি [illegible]কাশিত হওয়ার পর তিনি কলম ধরেছেন। গ্রন্থটিতে কিছু তথ্য পরিবেশিত [illegible]য়েছে।

'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সাম[illegible] পর্যবেক্ষক এই কাহিনীর অপর দিক [illegible] করেছেন। সেইগুলি কিন্তু পুস্তক[illegible]কারে প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই, না হয়ে থাকলে, অবিলম্বে তা প্রকাশিত হওয়া উচিত।

এই নাটকের আর এক প্রধান ভূমিকা ছিল কৃষ্ণ মেননের। তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এক রকম খতম হয়ে গেছে ১৯৬২-র পর। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি আজ আর আগেকার শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত নেই। তিনি অবশ্য আজ পর্যন্ত আত্মপক্ষ সমর্থনেই হোক, কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে কিছু বলেন নি। যদিচ তিনি সুলেখক তবু কোনো গ্রন্থ লেখেন নি। বিখ্যাত রাজনৈতিক মন্তব্য লেখক মাইকেল বীচারের সংগে কৃষ্ণ মেননের কিছু কথাবার্তা হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং বীচারের গ্রন্থটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হবে।

মিঃ ঘেরা একজন সরকারী কর্মচারী তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন ওরিয়েন্ট লংম্যান। এই গ্রন্থটিতেও অনেক রকম নতুন তথ্য পরিবেশিত হবে।

১৯৬২-র ইতিহাস তাই ক্রমবর্ধমান। দিন দিন হয়ত প্রকাশিত হবে অনেক নতুন খবর, নতুন তথ্য।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'দি গিলটি মেন অব ১৯৬২—' গ্রন্থটির লেখক শ্রীডি আর মানকেকর। শ্রীমানকেকর একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সাংবাদিক এবং টাইমস সমর সংবাদদাতার কাজ অতীতে করেছেন। সামরিক তথ্য এবং রণকৌশলের খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল এবং ভারতবর্ষের সামরিক নীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি তথ্যনিষ্ঠ। ১৯৬৫-র পাকিস্তান যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমানকেকর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ সাংবাদিক তাই ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যেসব গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ত ঘূর্ণায়মান তিনি তাদের মনের কথাও জানেন—।

শ্রীমানকেকর দল ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ সাংবাদিক তাই তিনি কারো বিরোধী নন, কারো সম্পর্কে তাঁর বিদ্বেষ বা ঘৃণা নেই। তাই তিনি একটা যুক্তিসংগত বিশ্লেষণের ও বিচারের মনোভঙ্গী নিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

শ্রীমানকেকর ভারতের সমকালীন কয়েকজন নেতা এবং সমরকর্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে তাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। এই অপরাধ শুধু সেই সব সমকালীন নেতা এবং সমরকর্তাদের নয় সমগ্র দেশবাসীর। কারণ, আমাদের দেশবাসী আজো সবকিছু মাথা পেতে নেয়, কোনো কিছু তলিয়ে দেখে না।

শ্রীমানকেকর চারটি মুখ্য প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। চীন ভারতের পক্ষে এত বড় একটা সমস্যা হয়ে উঠবে এই সম্ভাবনার কথা কি নেহরু ভাবতে পারেন নি। আণবিক এবং পরমাণবিক যুগে যুদ্ধ একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার মনে করে তিনি কি স্বদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শিথিল করেছিলেন?

তিনি কি চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ-সংক্রান্ত ব্যাপারটির উপযুক্ত পরিচালনা করতে পারেন নি এবং ১৯৬০-তে এই সমস্যা সমাধানের একটি সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছেন?

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের শুরু থেকে যখন সীমানার লড়াই আরম্ভ হয়েছে রণকৌশল সম্পর্কিত ক্ষীণ ধারণার ফলে তিনি কি তার সুষ্ঠু পরিচালনা করতে পারেন নি?

শ্রীমানকেকর, জহরলাল নেহরুকে উপরোক্ত সব কটি অভিযোগের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। গ্রন্থটিতে বিষয়গুলিকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার গুরুত্ব অবশ্য পরিমাণ হিসাবে অনেক বেশী।

ভারতের তিব্বত-নীতির কথা উঠেছে এবং বলা হয়েছে পঞ্চশীলের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তা চীনকে উপহার দেওয়া হয়েছে - কিন্তু পরিস্থিতি এমনই জটিল হয়েছিল যে তিব্বত-নীতি গ্রহণ করা ভিন্ন ভারতের আর পথ ছিল না। দুঃখের বিষয় ভারত সরকার যখন যা করেন, তা ভালোই হোক আর মন্দ হোক, জনসাধারণকে সুস্পষ্টভাবে তা জানাবার কোনো ব্যবস্থা করেন না। ফলে সাধারণের এইসব বিষয়ে একটা আবছা ধারণা সৃষ্টি হয়।

১৯৪৭-এর পর এশিয়ায় দুটি মহাদেশে দুরকম পরিবর্তন ঘটেছে ভারত বিভক্ত হয়েছে, আগে ছিল যুক্ত এবং চীন আগে ছিল বিচ্ছিন্ন হয়েছে সংযুক্ত। এই ব্যাপারটি থেকে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ ছিল সেই সুযোগ আমরা নিইনি।

মানকেকর এই গ্রন্থে যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে একটি তথ্যনির্ভর বিবরণ দিয়েছেন। নেহরুর যে মন্তব্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয় তার ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। নেফা অঞ্চলের ঢোলা যখন ঘেরাও করা হয়, তখন অবশ্য ভারতীয় জনমতের চাপ প্রচণ্ড ছিল। ভারত সরকার ভেবেছিলেন, চীন লাডাকে যাই করুক ম্যাকমোহন লাইন হয়ত পার হওয়ার চেষ্টা করবে না, কারণ, একবার চৌ-এন-লাই চীনের এই অঞ্চলের অধিকার ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন। তাই কর্তারা ভেবেছিলেন লাডাকে অবস্থা খারাপ হলেও নেফায় দেখে নেব। যেন ইংরেজী কিপিং কাচা অংক সুরু। নেফায় চীনারা আসছিল না তাই বলা সহজ ছিল যে আমরা বাধা দিয়ে আটকে রেখেছি।

যখন চীনারা সেই কল্পিত বাধার প্রাচীর ঠেলে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল তখন নেতাদের পক্ষে দাড়ি চুলকান ছাড়া আর কিছু করার অবস্থা ছিল না। তারা পাল্টা মেপে ভুল বিবৃতি দিয়েছেন, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। তাই ঠিক হল অবিলম্বে যুদ্ধ শুরু কর, সেনা নায়করা বললেন—হুজুর আমরা যে এখনও তৈরী নই, সাজ-সজ্জা নেই, কোনো হাতিয়ার নেই লড়ব কি সে?

কর্তারা বললেন,—আরে ভাই লড়াই শুরু করো!

শ্রীমানকেকর যা বলেছেন তার অনেকখানি আগেও অনেকে বলেছেন, অনেক কথা এতদিনে পাঁচজনের জানা হয়ে গেছে, কিন্তু মানকেকর যে রকম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন তা আর আগে বলা হয়নি।

ভারতবর্ষের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, কেন? কার দোষে? তার জবাব দিয়েছেন শ্রীমানকেকর। *

—অভয়ঙ্কর

* THE GUILTY MEN OF 1962 By Sri D. R. MANKEKAR. Published by Tulsinath Enterprise — Bombay.

ভারতীয় সাহিত্য

একালের তামিল উপন্যাস ॥

তামিল ভাষার ইতিহাস সুপ্রাচীন হলেও তামিল উপন্যাসের ইতিহাস কিন্তু খুবই অল্প দিনের। সাধারণত শ্রীবেদান্যকম পিল্লাইকে প্রথম তামিল উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে তাঁর রচিত উপন্যাসটির মধ্যে আধুনিক জীবনযাত্রার তেমন পরিচয় ছিল না। রচনারীতির দিক থেকেও তাঁর উপন্যাস ছিল প্রাচীনপন্থী। আধুনিক উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে শ্রীবি আর রাজম আয়ার এবং শ্রীএ মাধাভিয়ার নাম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। রহস্যকাহিনী নিয়ে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন শ্রীজে আর রঙ্গরাজু। মহিলা উপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রীমতী ভি এম কোথানায়কি অম্মলের।

ত্রিশের দশকে তামিল উপন্যাসের একটি নতুন দিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময় বেশ কিছু সংখ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্র-পত্রিকাগুলিই বিশেষভাবে নতুন ধরনের উপন্যাস রচয়িতাদের উৎসাহিত করতে থাকে। শ্রীকাল্কি কৃষ্ণমূর্তি'র 'কলভানিন কথালি', 'ত্যাগভূমি' এবং 'পয়মন করডু' উপন্যাসগুলি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এছাড়াও ওঁর রোমান্সধর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাস 'পোথিপম কনভু' তামিল সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। শ্রীকে এম ভেংকটারমণের 'কনডন অরু দেশভক্তন' একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে লেখক এই উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। তরুণতর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রীঅখিলম, শ্রীটি এন কুমারস্বামী শ্রীরাজমকৃষ্ণন প্রমুখ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। শ্রীশংকর রাম ইদানিং খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর উপন্যাসের বাচনভঙ্গী ও সুগভীর বাস্তবতাই এর মুখ্য কারণ।

প্রগতিশীল লেখকরাও কিছু কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর লেখা শ্রী আর এম নলপেরুমলের 'কাল্লফুল ইরাম' উপন্যাসটির। এছাড়াও আরও কয়েকজন ঔপন্যাসিক প্রগতিশীল ভাবধারায় উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তামিল উপন্যাসের বর্তমানকালে খুব একটা বৈচিত্র্য না থাকলেও একেবারে অবহেলা করা যায় না।

অরবিন্দের রচনার হিন্দি অনুবাদ।

অরবিন্দের রচনার সঙ্গে পরিচিত পাঠকমাত্রেই জানেন যে, তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য প্রকাশিত, তা খুবই দুর্গত। সম্প্রতি তাঁর রচনার হিন্দি অনুবাদের প্রচেষ্টা চলছে। প্রথম অনুদিত খণ্ড এই মাসেই প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সপ্তাহ ॥

গত ৮—১৪ আগষ্ট শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। বিভি কারণেই এবারের অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। এবার কয়েকটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল 'রবীন্দ্রনাথ ও শিশু সাহিত্য', 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী' 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা' এছাড়াও রবীন্দ্র কাব্যপ্রকৃতির উপর এক বিশেষ ভাষণ দেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীশম্ভু মিত্র। 'রবীন্দ্রনাট্যে আধুনিকতা' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক চিত্রকলা' বিষয়ে যথাক্রমে ভাষণ দেন শ্রীসুশোভন সরকার ও শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

১০ আগস্ট সকালে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় উত্তীর্ণোত্তর সার্টিফিকেট ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও নবীনচন্দ্রের সাক্ষাতের সেই দিনটি ॥

আজ থেকে ৭১ বছর আগের কথা। তখন প্রখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন রানাঘাটের সব-ডিভিসনাল অফিসর। এই সময় রবীন্দ্রনাথ একবার রানাঘাটে গিয়েছিলেন। তখন নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর সেখানে সাক্ষাৎ হয়। সেই দিনটিকে স্মরণ করবার উদ্দেশ্যে গত ২ সেপ্টেম্বর রানাঘাটের 'রবীন্দ্রভবন সমিতি' একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে শহরের বহু গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন বক্তা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

গ্রন্থ প্রদর্শনী ॥

আজ থেকে ৭৫ বৎসর আগে আমেরিকার চিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবার উদ্দেশে অদ্বৈত আশ্রম এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। এই গ্রন্থ প্রদর্শনীতে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং বেদান্ত গ্রন্থ। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত এবং অনূদিত এইসব গ্রন্থের প্রদর্শনীটি গত ১১ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে প্রদর্শিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রদর্শনীটি জনসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

বীরবল শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান ॥

বীরবলের জন্মশত বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বিশ্বভারতী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মধ্যে বীরবল রচিত গ্রন্থমালার প্রদর্শনীটি খুবই উল্লেখ্য হয়। এই গ্রন্থ প্রদর্শনীতে বীরবলের গ্রন্থ ছাড়াও, তাঁর রচনার পাণ্ডুলিপি এবং বিভিন্ন ছবি ছিল। বিশ্বভারতীর প্রকাশনা বিভাগ বীরবলের গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এতে এমন আটটি গল্প সংকলিত হয়েছে, যা এর আগে বীরবলের কোনও সংকলনেই ছিল না। তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহের ও নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-সপ্তাহ' উপলক্ষে একটি বিশেষ আলোচনা সভারও ব্যবস্থা করা হয়।

বিদেশী সাহিত্য

ফ্রাঁসোয়া সাগার উপন্যাস ॥

ফরাসী মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ফ্রাঁসোয়া সাগার নাম বিশেষভাবে পরিচিত। তরুণ বয়সে বেশ কিছুসংখ্যক গল্প-উপন্যাস লিখে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ফরাসী সাহিত্যজগতে যৌবন ও যৌনতার বাড়াবাড়িতে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

সম্প্রতি তাঁর সপ্তম উপন্যাস 'হার্টস গার্ড' প্রকাশিত হয়েছে। এখনো তাঁর লেখার ভঙ্গি যথেষ্ট সতেজ, তারুণ্যের উত্তেজনায় মুখর এবং অতিকল্পিত কাহিনী বিস্তারে বিচিত্র পথগামী।

এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হল একজন মহিলা চিত্রনাট্যকার। নানাজনের সঙ্গে সেই সূত্রে তাকে প্রেম বিনিময় করতে হয়। একদিন সে তার এক সঙ্গীকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় পথে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। তাতে একজন কুড়ি বছর

বয়সের ছেলে আহত হয়। মহিলাটি বিবেকের তাড়নায় তার চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

কিন্তু সুস্থ হবার সময় জানা গেল, সেই প্রৌঢ়া মহিলাটির সঙ্গে ছেলেটি ভয়ংকর প্রেমে পড়ে গেছে। প্রথম দিকে, প্রেমের ব্যাপারে অবশ্য মহিলাটির বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ছেলেটা তখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মহিলাটিও নিজের দিক থেকে পিছু হটে যাবার পাত্রী নয়। তার প্রেম ক্রমশ শরীরকে আশ্রয় করে ফুটে উঠবার সংকল্পে উদ্দাম হয়ে উঠলো। আর সেই মুহূর্তে জানা গেলো, ছেলেটি একটি নপুংসক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তাকে ত্যাগ করাও একটি কঠিন ব্যাপার। সেই থেকে ছেলেটি তার প্রহরী হিসেবে কাজ করতে লাগলো।

বেশ কয়েকটি নরহত্যা, জিঘাংসা প্রভৃতি ঘটনার অদ্ভুত সমবায়ে উপন্যাসটি আকর্ষণীয়।

মার্কিনী সাহিত্যে নিগ্রো জীবন ॥

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক শেষ পর্যন্ত মানবসমাজের কথাই বলতে হয় সাহিত্যে। জীবনধর্মের সজীব প্রকাশের মধ্য দিয়েই সাহিত্য আপন সার্থকতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। মার্কিনী সাহিত্যের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম নেই।

১৬১৯ সালে এই দেশে প্রথম নিগ্রো ক্রীতদাস প্রথার উদ্ভব হয়। শ্বেতাঙ্গদের কাজে সহায়তা করার জনাই তাদের ধরে নিয়ে আসা হতো আফ্রিকার উপকূল থেকে। আঠারো শতক পর্যন্ত নিগ্রোসমাজের কোনো ব্যাপক প্রতিফলন মার্কিনী সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় না। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে গল্প-উপন্যাসে নিগ্রো চরিত্রের সন্ধান মিলতে থাকে। ১৮২১ সালে ঔপন্যাসিক কুপার তাঁর 'গুপ্তচর' উপন্যাসে একজন প্রভুভক্ত নিগ্রোর চরিত্র অঙ্কন করেন। এবং তার তিন বছর পরে নিগ্রো দাসব্যবসায়ের ওপর কটাক্ষপাত করে লিখলেন আর একটি উপন্যাস। ১৮৫২ সালে 'টমকাকার কেবিন' উপন্যাস প্রকাশিত হলে সারা পৃথিবীর মানুষ এই নিগৃহীত কালো মানুষদের সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে ওঠে। এই সময়ে নিগ্রো জীবনকে কেন্দ্র করে যাঁরা উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাঁদের মধ্যে টমসন নেলসন পেগ, ফেনিশের উইলসন, জোয়েল চান্দালার হ্যারিস, টমাস ডিকসন প্রমুখ ঔপন্যাসিকের নাম স্মরণীয়। তবু এই সমস্যাটির সার্থক দিকনির্দেশ করতে পারেন নি কেউ। তার জন্যে বিশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। বিশ শতকে যাঁরা নিগ্রোসমস্যাকে মানবতার আলোকে বিচার করেন তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন মার্ক টোয়েন এবং পরবর্তীকালে উইলিয়াম ফকনার। মিসিসিপি নদীর চিরন্তন আকর্ষণ মার্ক টোয়েনের জীবনকে আবেগময় করে তুলেছিল। তাঁর নিগ্রো চরিত্র টম' নিজেকে শ্বেতাঙ্গ কল্পনা করে অন্য নিগ্রোকে 'নিগার' শব্দ করে। মনে হয়, টোয়েন যেন এই চরিত্রটির সংলাপের মধ্য দিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলছেন।

উইলিয়াম ফকনার শাদাকালোর প্রভেদ মানতে চান নি কখনো। সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের একটি সুস্পষ্ট মানদণ্ডে তিনি মানুষকে দেখতে চেয়েছিলেন।

এমনি আরো বহু বিষয়ের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় সেমুর এল গ্রস এবং জন এডওয়ার্ড হার্ডি সম্পাদিত "ইমেজেস অব দি নিগ্রো ইন আমেরিকান লাইফ" গ্রন্থে। বইটি প্রকাশ করেছেন ইউনিভার্সিটি অব চিকাগো প্রেস।

পাণ্ডুলিপির খবর ॥

কিছুদিন আগেকার খবরে প্রকাশ, হেমিংওয়ের পাণ্ডুলিপি হারিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী প্যারিসে আসার পথে। এর ফলে, হেমিংওয়ের কৈশোর যৌবনের সমস্ত অপ্রকাশিত রচনাই নষ্ট হয়ে যায়।

সম্প্রতি আরো কয়েকটি চমকপ্রদ ঘটনার খবর জানা গেছে।

আরব্য রজনীর প্রখ্যাত লেখক স্যার রিচার্ড বার্টন যৌনব্যাপারে বেশ কিছুকাল গবেষণা চালিয়েছিলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি নিজে শুদ্ধ চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। যৌন-সম্পর্কিত ঘটনায় তাঁর অস্বাভাবিক কৌতূহল ছিল। তাঁর স্ত্রী ইসাবেল ছিলেন অত্যন্ত গ্রাম্যপ্রকৃতির রক্ষণশীল মহিলা। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বার্টনের সমস্ত দিনলিপি এবং যৌনসংক্রান্ত রচনাবলীর সমস্ত পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দেন। সমস্ত এইসব রচনায় পারিবারিক জীবনসংক্রান্ত বহু গোপন কার্যকলাপের বিবরণ ছিল, যা প্রকাশ হলে সামাজিক দিক থেকে ইসাবেলাকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হতো।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কাফকার কথা। জীবনের শেষ দিনগুলিতে কাফকা নিজের লেখা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। মারা যাবার আগে সে জন্যেই তিনি তাঁর যাবতীয় পাণ্ডুলিপি আগুনে পুড়িয়ে দেন। তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রড না থাকলে আধুনিক সাহিত্যে হয়তো কাফকার নাম অনুচ্চারিতই থেকে যেতো।

কবি ও শিল্পী রসেটি খুবই ভালোবাসতেন তাঁর স্ত্রী লিজিকে। ১৮৬২ সালে লিজি মারা গেলে রসেটি ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে চামড়ায় বাঁধানো একটি কাব্যগ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি কফিনের সঙ্গে দিয়ে দেন। কিন্তু সাত বছর বাদে রসেটি সেই বইটির একান্ত প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। সরকারী অনুমতি নিয়ে সেই কফিন খোলা হল। কিন্তু হায়! বাঁধানো ঠিক থাকলেও ভেতরের পাণ্ডুলিপি তখন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।

রসেটির সেই বইটি চিরকালের জন্য অপ্রকাশিত রয়ে গেল।

নতুন বই

মাঠ থেকে বলছি : অজয় বসু। প্রকাশক : রূপরেখা, ১২৪।১এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা—৪। দাম : ৪-৫০।

দেশে দেশে ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে কত মনোরম সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমাদের দেশে এরকম ক্রীড়া-সাহিত্য বিশেষ সৃষ্টি হয়নি। অথচ ফুটবল-ক্রিকেটে আমরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে থাকি। তবে সৌভাগ্যে কথা যে, এতদিনের অবহেলিত এই বিষয়ে যাঁরা মনোযোগী হয়ে ইতিমধ্যেই রসিকজনের প্রশংসাভাজন হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ক্রীড়া-সাংবাদিক অজয় বসু অন্যতম।

ক্রিকেটের কৌলীন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করলেও আমাদের ঘরের ছেলেদের খেলা ফুটবল এতদিন বিশেষ কোন সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেনি। অজয় বসুর ক্রিকেট আলোচনার মত ফুটবল আলোচনাও যথেষ্ট শ্রীমণ্ডিত এবং প্রাণবন্ত হয়েছে। সম্প্রতি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'মাঠ থেকে বলছি' প্রসঙ্গেই এসব কথার অবতারণা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি ভারতীয় ফুটবলের মূল্যায়নের প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি কোথাও নির্বিকার দর্শক নন, নিরপেক্ষ এবং সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে ফুটবল ও ময়দানী আবহাওয়ার প্রাঞ্জল চিত্র পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

প্রশংসায় তিনি অকৃপণ, আবার সমালোচনায় কঠোর। খেলোয়াড়ের অখেলোয়াড়ী মনোভাবের নিন্দায় তাঁর লেখনী ক্ষুরধার। আবার যখনি প্রত্যাশিত বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন তখনি উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। ওঠা-নামা বিবর্জিত প্রাণহীন খেলায় কর্মকর্তাদের দল রাখার মনোভাবকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। কলকাতা ফুটবল মাঠ সেই পিকেটিংকে তিনি তাই প্রাপ্য মর্যাদা দিতে ভুল করেন নি।

যদিও তিনি মুখ্যত কলকাতার ফুটবল আসরেই আলোচনা-সমালোচনা সীমিত রেখেছেন তবুও বিদেশী দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের খেলার কথাও পাঠকদের শুনিয়েছেন। তাই অনুরাগী মাত্রেই অজয় বসুর 'মাঠ থেকে বলছি' পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন।

সুখ-অসুখ (উপন্যাস) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অনন্য প্রকাশনী। সিগনেট বুক শপ। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২ দাম ছয় টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মূলত কবি হিসাবেই পরিচিত। পঞ্চাশের দশকের এই কবি বর্তমানে গদ্যের দিকে নজর দিয়েছেন। 'সুখ-অসুখ' উপন্যাসটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের ম্যাজিস্ট্রেট উদার হৃদয় স্বামী রজত, তার স্ত্রী মালতী, মালতীর পূর্ব প্রেমিক বর্তমানে অধ্যাপক অরুণ এই ত্রয়ীর গোপনতম ভালবাসার বস্তুই উপন্যাসটির কেন্দ্রভূমি। বহু চরিত্র ও নানা স্থান গ্রন্থের পরিবেশ রচনা করেছে। কোন নিটোল কাহিনী বর্ণনে ঘটনা ও গতানুগতিক চরিত্র চিত্রণে নয়, উপন্যাসটির প্রধান কথা হল মানুষের জীবন ও নর-নারীর প্রেমের সম্পর্কে স্থায়ী মূল্যায়ন কিভাবে হয়—এ সবের রহস্যময়, জটিল অন্বেষণ। বলা যায়, সুখ-অসুখ' উপন্যাসটি এক তরুণ লেখকের আধুনিক জীবন ও আন্তরিক প্রেমভাবনার সংমিশ্রিত ভাষ্য।

আর্তি (কাব্যগ্রন্থ)—বাবলু সরকার। প্রকাশক : বিমলেন্দু সরকার, ২২এ, অমৃত ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ২৬। দু'টাকা।...

বাবলু সরকার কবিতা লেখেন সামাজিক পটভূমিকাকে মান্য করে। তরুণতম কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতায় কিছু কিছু স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। দুঃখের মধ্যেও তিনি আশাবাদী।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কালি ও কলম : বিমল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম : ৭৫ পয়সা।

'কালি ও কলম' দ্বিতীয় বর্ষে যাত্রা শুরু করেছে। পত্রিকাটির ক্রমিক জনপ্রিয়তার উল্লেখ তাই বাহুল্য। পূর্বাপর সংখ্যার মত এটিও নানাবিধ লেখায় সমৃদ্ধ। রম্যরচনা লিখেছেন ডঃ লীলা মৈত্র, গল্প লিখেছেন বর্ষা বন্দ্যোপাধ্যায়, মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ ভট্টাচার্য, জরাসন্ধ ও বিমল মিত্রের ধারাবাহিক উপন্যাস আর সেইসঙ্গে আছে পুলিনবিহারী সেন, দেবনারায়ণ গুপ্ত এবং বিনয় ঘোষের তথ্যপূর্ণ রচনা।

ভাস্কর (দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা)—সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত ।। ৫৪ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট কলকাতা ৩ ।। এক টাকা।

পরলোকগত তরুণ কবি নিরঞ্জন আচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ সংখ্যায় কয়েকজন কবি কবিতা লিখেছেন। তা ছাড়া অন্যান্য লেখাও আছে। লিখেছেন স্বামী অভেদানন্দ, বেলা চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শংকর রায়, ধীরেন্দ্র দত্ত, দীনেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায় অরুণ চক্রবর্তী, প্রভাতকুমার দাস এবং আরো কয়েকজন। মুদ্রণ পরিপাট্য এবং আঙ্গিকশোভনতার দিক থেকে পত্রিকাটি পাঠক মহলে পরিচিত।

বিচিন্তা-ভারতী : নন্দদুলাল চক্রবর্তী, ৭১এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা—১। দাম— একটাকা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র বিচিন্তা-ভারতীর রবীন্দ্র সংখ্যাটি নানাদিক থেকেই আকর্ষণীয় করে তুলবার চেষ্টা হয়েছে। তবে সম্পাদনার দিকে আরেকটু কড়া নজর রাখলে ভালো হয়। এ সংখ্যায় লিখেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বাণী রায়, বারি দেবী, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা দেবী, বেলা দে এবং আরো অনেকে।

এষা (২য় বর্ষ : ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা) সম্পাদক : বিমলচন্দ্র ঘোষ, ১, মদন ভট্টাচার্য লেন, কলকাতা-২৬, দাম এক টাকা।

চলতি পত্র-পত্রিকার ভিড়ে হারিয়ে যায় না এমন গুটিকয়েক কাগজের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'এষা' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। বক্তব্যের গভীরতায় ও সুস্থ জীবনদর্শনের গুণে এই কাগজটি সকলেরই প্রশংসা পাবে।

চতুর্থ সংখ্যায় 'এষার মুকুরে' রচনাটি খুবই উল্লেখযোগ্য। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'রস ও রসিক', নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ', পরমানন্দ সরস্বতীর 'উত্তর মীমাংসা' এবং চণ্ডী মণ্ডলের গল্প, বিমলচন্দ্র ঘোষ, আলোক সরকার, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, নবনীতা সেনের কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫) সম্পাদক : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলকাতা-৭। দাম এক টাকা।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপদ চক্রবর্তী, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, নীরদবরণ চক্রবর্তী, রবিলোচন দে, হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু মিত্র এবং আরো কয়েকজনের প্রবন্ধ আলোচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান সংখ্যাটি।

ভাণ্ডার (সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা)—সম্পাদক : দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পি-১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস (এক্সটেনশন), কলকাতা-১২। দাম এক টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র 'ভাণ্ডার' পত্রিকা সম্প্রতি পঞ্চাশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয়েছে। এই ঐতিহ্যসম্পন্ন পত্রিকাটিতে এক সময় রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে বাঙলাদেশের বিশিষ্ট উপলক্ষে 'ভাণ্ডারে'র পরিচালকবর্গ আবার সেইভাবেই কাগজ পরিচালনার চেষ্টা করছেন। সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় লিখেছেন —প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, মণীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, হিরণ ঘোষ, রাখাল দত্ত, উমা মুখোপাধ্যায়। ভাণ্ডারের পুরনো সংখ্যা থেকে যাঁদের রচনার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চাঁদের হাট

মানব সান্যাল

সামনের অশ্বত্থ গাছটার ডালে রোজই ঠিক একই সময় কাকটা উড়ে এসে বসে। শোওয়ার ঘরের বড় দেওয়াল-ঘড়িটাতে সময় মিলিয়ে দেখেছে চন্দনা। দশটা পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে বাঁধা। কাকটার এই আশ্চর্য সময়নিষ্ঠা দেখে অবাক হয় চন্দনা। চিত্তপ্রিয় তো রোজই ঠিক দশটার সময় অফিসে বার হওয়ার জন্যে তাড়ায় তাড়ায় চন্দনাকে অস্থির করে তোলে। কিন্তু কাকটার কাছে হেরে যায় চিত্তপ্রিয়। একদিনও দশটায় অফিসে বার হতে পারে না। চিত্তপ্রিয় বাড়ী থেকে বার হওয়ার আগেই কাকটা উড়ে এসে অশ্বত্থ গাছের ডালে বসে পড়ে। রান্নাঘরে বসেই কাকটাকে দেখতে পায় চন্দনা। চিত্তপ্রিয় হয়তো তখন সবে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ইঁদারার পাড়ে বসে মুখ ধুচ্ছে।

চন্দনা হাততালি দিয়ে হেসে উঠে বলে—এই শুনছো, আজও তুমি লেট্।

চিত্তপ্রিয় দু-একদিন ওকে চ্যালেঞ্জ করে হেরে গিয়েছে। ঘরের দেওয়াল-ঘড়ির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে চন্দনাকে জিগ্যেস করেছে—তুমি হাত গুনতে জান নাকি গো? রান্নাঘরে বসেই কি করে বুঝলে আমি লেট্?

চন্দনা গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলে—ওটা আমার সিক্রেট। তোমাকে বলব কেন?

চিত্তপ্রিয় বাড়ী থেকে পথে বার হয়ে সাইকেলে উঠে বেশ জোরে কয়েকবার ঘণ্টি বাজায়। একবার পিছন ফিরে চন্দনার দিকে চেয়ে হঠাৎ সাইকেলের গতিটা বাড়িয়ে দেয়। রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় চিত্তপ্রিয়। চন্দনা তখনও জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কাকটা তখন অশ্বত্থ গাছের ডালে ডালে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

চন্দনার হাতে আর কিই বা কাজ আছে? বাসি কাপড়গুলো ধুয়ে ফেলতে আর টুকিটাকি দু-একটা কাজ সারতে কতক্ষণই বা লাগবে? অলস দুপুরের চিন্তায় মন ভারী হয়ে ওঠে।

বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে। হঠাৎ আকাশ জুড়ে কালো মেঘ জমতে থাকে। ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে জলের ঝাপটা এসে লাগে চোখে-মুখে। ভিজে মাটিতে সোঁদা গন্ধ ওঠে। অশ্বত্থ গাছের চকচকে পাতা থেকে টুপ টুপ করে জলের বিন্দু ঝরে পড়ে। উঠানে এসে দাঁড়ায় চন্দনা। বৃষ্টি-স্নানের আনন্দে সারাদিনের ভ্যাপসা গরমে ক্লান্ত, দেহ জুড়ে একটা স্নিগ্ধতার আবে

হঠাৎ হাত-পাগুলো শিথিল হয়ে অবেলায় দু-চোখ জুড়ে ঘুম নেমে চায়। আর সেই মুহূর্তে একটা গোপন বাসনার জন্ম হয় চন্দনার মধ্যে। সেই বাসনাকে বুকের মধ্যে রাখতে পারে না চন্দনা। শিরায় রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ে বাসনার ঝরনা-ধারা। মনে হয় চিত্তপ্রিয় য এই মুহূর্তে বাড়ি ফিরে এসে ওকে মধ্যে টেনে নিয়ে ওর স্নিগ্ধ, শান্ত শরীরটাতে ভালবাসার আগুনে ছড়ি আর ভিজে মাটির সোঁদা-গন্ধ-ও বিকেলের ছায়াচ্ছন্ন আকাশের নী

চিত্তপ্রিয়র বুকের নীচে সৃষ্টির প্রথম আনন্দে উর্বরা ধরিত্রীর সংগে মিলেমিশে একাকার হয়ে হারিয়ে যেত। পরক্ষণেই হাসি পায় চন্দনার। চিত্তপ্রিয়র হিসেব-করা ভালবাসার রাতের অন্ধকার নামতে এখনও যে অনেক দেরী।

চন্দনা আজ সকাল থেকেই একটা পচা-ভ্যাপসা গরমে হাঁপিয়ে উঠছে। অশ্বত্থ গাছের স্থির, নিষ্কম্প হলুদ রঙের পাতা-গুলোর দিকে চেয়ে খুব জোরে নিঃশ্বাস টানল চন্দনা। নাঃ, বুক ভরে বাতাস নিতে পারছে না। বুকের মধ্যে চাপ ধরছে। এতক্ষণ উনুনের পাড়ে বসে সারা শরীর ঘামে ভিজে জ্যাব্‌জ্যাব্‌ করছে। ব্লাউজটা ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। ব্লাউজের নীচে অন্তর্বাস নেই। ঘামে-ভেজা পাতলা শাদা ব্লাউজটা বুকে-পিঠে লেপ্‌টে মিশে গেছে। ফরসা বুকের লালচে আভার ওপরে স্তন-বৃন্তকে ঘিরে কালো বলয়-রেখা ফুটে উঠেছে। এখনও সারাটা দুপুর বাকী। এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছে চন্দনা। হাত-পাগুলো জ্বালা করছে। মাথার চুলগুলো ঘামের সংগে লেপ্‌টে মাথাটাকে অসম্ভব ভারী করে তুলেছে। হঠাৎ বুকে-পিঠে, মাথার চুলের ফাঁকে ফাঁকে চুলকুনি উঠল। মনে হচ্ছে অতকগুলো অদৃশ্য পোকা যেন সারা শরীর জুড়ে কুট্‌ কুট্‌ করে কামড়াচ্ছে।

ব্লাউজটাকে একটানে খুলে ফেলল চন্দনা। তারপর বুকের দিকে চেয়েই লজ্জা পেল। কণ্ঠটা যেখানে বুকের সংগে মিশেছে—সেই ভরন্ত বুকের ঢালুতে চিত্তপ্রিয়র দাঁতের মৃদু কামড়ের লাল দাগ গোল হয়ে ফুটে উঠেছে। আর সেই লাল দাগের ওপরে কয়েকটা ঘামাচি লাল লুলের কুঁড়ির মত টস্‌টস্‌ করছে। চিত্তপ্রিয়টা ভারী অসভ্য। ভালবাসার রাতের হিসেবে তার এতটুকুও ভুল নেই। কিন্তু যেদিন ওর হিসেবে ভালবাসার রাত আসবে, দস্যুর মত হামলা শুরু করবে চন্দনার দেহের ওপর। ভারী স্বার্থপর এই অসভ্য লোকটা। চন্দনার নিজের জীবনে যেন কোনদিনই ভালবাসার রাত আসবে না। ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ সবই যেন চিত্তপ্রিয়র হিসেবের চাকায় ঘুরবে। নিজের ষোল আনা বুঝে নেবে এই স্বার্থপর লোকটা, কাল রাতে চন্দনার এত ঘুম পেয়েছিল। ভারী চোখ দুটো ও কিছুতেই খুলে রাখতে পারছিল না। চিত্তপ্রিয় ওকে জোর করে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছিল। কাল রাতে চিত্তপ্রিয়র ভালবাসায় চন্দনার এতটুকুও সুখ ছিল না। ওর পরিশ্রান্ত, ঘামে-ভেজা লোমশ বুকের মধ্যে চন্দনার অনিচ্ছুক দেহটা একটা আশ্চর্য অপরিচিত পুরুষ-দেহের গন্ধে ঘুলিয়ে উঠেছিল। চন্দনা জোর করে চিত্তপ্রিয়র আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চেয়েছিল। আর সেই মুহূর্তে চিত্তপ্রিয়, ওর বুকে দাঁতের কামড় বসিয়ে দিয়ে জোরে করে ওর দেহটাকে সেই হিসেব-করা প্রেমের অনুর্বর কামনার আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল।

ঘরের মধ্যে বড় বেশী তীক্ষ্ণ, তপ্ত আলো। এ আলোয় দেহের আরাম নেই, চোখের সুখ নেই। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে মেঝেটা জলে ভিজিয়ে অন্ধকার ঘরের সেই ঠান্ডা, ভিজে মেঝের ওপর আদুরে-গায়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কাকটা যে এখনও অশ্বত্থ গাছের ডালে ডালে নেচে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে হলুদ পাতাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে পড়ছে। চন্দনার চোখ দুটো কাকটাকে খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ একটা পত্রবিহীন মরা ডালের ওপরে কাকটাকে দেখা গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক চাইছে। মাঝে মাঝে ডানা-দুটো মেলে দু'পাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঠোঁট দিয়ে বুকের ওপর ঠুকরে ঠুকরে কি যেন খুঁটে খাচ্ছে। ঘড়ির দিকে চাইল চন্দনা। দশটা বশ। কাকটার উড়ে যাওয়ার সময় হল। চন্দনা রোজকার মত সময় গুনতে লাগল এক-দুই-তিন-চার...... ....

আজ ঠিক উনপঞ্চাশের মাথায় কাকটা ডানা ঝাপটিয়ে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পর গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে ইস্কুল-বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে মিলিয়ে গেল। কাকটার উপর খুব রাগ হল চন্দনার। আজ বড় তাড়াতাড়ি কাজ ফুরিয়ে গেল। এখন কি করবে চন্দনা? ধড়াস করে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে মেঝের ওপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল চন্দনা। এখন সে সম্পূর্ণ একা। সেই বিকেলের আগে মানুষের দেখা মিলবে না। বাগ্দি মেয়ে এঁটো বাসন মাজতে আসবে সেই দুপুর গড়িয়ে। আরও পরে আসবে গয়লা-বৌ দুধের ঘটি হাতে করে। নিজেকে দারুণ অসহায় মনে হচ্ছে চন্দনার। হঠাৎ মনুদার কথা মনে পড়ল। একটা আশ্চর্য ভয় ঘিরে ধরল চন্দনাকে। যদি কোনদিন নিঃসঙ্গ দুপুরে মনুদা হঠাৎ বাইরের দরজার কড়া নাড়ে। বিয়ের আগে ভয় দেখিয়েছিল মনুদা। চন্দনার স্বামীর কাছে মনুদাকে লেখা ওর সব চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেবে। মনুদাকে বিয়ে করেছে চন্দনা। চন্দনাকে শান্তিতে স্বামীর ঘর করতে দেবে না মনুদা। চন্দনা মনুদার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল। কিন্তু মনুদা ওর কান্নায় ভোলেনি। ওর কাছে দাম চেয়েছিল। চন্দনা দারুণ ভয় পেয়ে মনুদার হাত থেকে রেহাই চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দাম দিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে চন্দনাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল মনুদা। চন্দনার ভীরু পাখীর মত থর-থর-কাঁপা দেহটাতে জড়ানো শাড়িটা ধরে টান দিতে গিয়ে ওর জল-ভরা চোখ দুটোর দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মনুদা।

তারপর আশ্চর্য উদাসীন, নিস্পৃহ গলায় ওকে বলেছিল—'নাঃ কি হবে তোমার জীবনটাকে নষ্ট করে। যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। স্বামীর ঘরে গিয়ে মনের সুখে সংসার কর।'

সেদিন মনুদার জন্যে ওর বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হয়েছিল। কৃতজ্ঞ চন্দনা মনুদার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়ে-ছিল। কিন্তু আজও নিশ্চিন্ত হতে পারে না চন্দনা। গতবার বাপের বাড়ী গিয়ে ছোট বোন সুমনার কাছে শুনেছিল—মনুদা আজও বিয়ে করেনি। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্‌ ফিস্‌ করে সুমনা বলে-ছিল—জানিস দিদি, তোর মনুদার সংগে আমার বিয়ের কথা-বার্ত্তা হচ্ছে।

কথাটা বলেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠে-ছিল সুমনা। মনুদা আজও বিয়ে করেনি শুনে চন্দনার বুকের মধ্যে একটা আশ্চর্য সুখের সমুদ্র উথলে উঠেছিল। মনুদা তাকে আজও ভালবাসে। তার ভালবাসার স্মৃতিকে আজও বুকের মধ্যে ধরে রেখেছে মনুদা। কথাগুলো ভাবতে কি আশ্চর্য সুখ!

তারপরেই সুমনার ফিস্‌-ফিস্‌ কথা-গুলো শুনে আর সুমনার লাজুক চোখের তারায় ওর বুকের সুখের পায়রার প্রতিচ্ছবি দেখে চন্দনার বুকটা যেন অনেকদিনের সঞ্চিত এক গোপন ঐশ্বর্যকে হারিয়ে ফেলার বেদনায় টনটন্‌ করে উঠেছিল।

সুমনার সেই সুখকে হিংসে করেছিল চন্দনা। সেদিন মায়ের সংগে খেতে বসে মাকে অনেক করে বুঝিয়েছিল চন্দনা। মনুদার মত একজন স্কুল-মাস্টারের সংগে বিয়ে দিয়ে সুমনার জীবনটাকে নষ্ট করা

যে এক বড় ভুল হবে—থাকে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়েছিল চন্দনা।

চন্দনার সেই সুখের স্বর্গের আজও পতন ঘটেনি। মন্দার সংগে শেষ পর্যন্ত সুমনার বিয়ে হয়নি। মন্দা আজও অবিবাহিত।

কিন্তু এই সুখের সংগে কোথায় যেন একটা ভয় মিশে থাকে চন্দনার বুকের মধ্যে। মন্দা যদি কোনদিন ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। ওর পাওনা-মূল্য দাবী করে। মন্দাকে কি ফিরিয়ে দিতে পারবে চন্দনা? সংগে সংগে চিত্তপ্রিয়কে মনে পড়ে। একটা আশ্চর্য ভাবনা মনের মধ্যে উঁকি মারে। চিত্তপ্রিয়র সংগে বিয়ে হয়ে ও কি সুখী হয়েছে? মন্দার সংগে কলকাতার সেই ঝোড়ো হাওয়ার দুপুর আর বিকেলগুলোর কথা ভেবে এই গ্রামের বিষণ্ণ দুপুর আর বিকেলের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো যেন বুকের মধ্যে ভারী হয়ে দুলে পড়ে।

বিয়ের পর চিত্তপ্রিয় ওকে ইনিয়ে-বিনিয়ে কি সুন্দর সব গ্রামের গল্প শুনিয়েছিল। কলকাতার মেয়ে চন্দনার মনের আকাশে চাঁদেরহাটের শ্যামল বনছায়া, পাকা ধানের হরিৎ ক্ষেত, ধুলো-ভরা মেঠো পথ, জলঙ্গী নদীর চিকচিকে বালির চর, গাছ-গাছালির বুনো গন্ধ—আরও কত আশ্চর্য কল্পনার তারাফুল ফুটে উঠেছিল। পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার রোদ্দুর গায়ে মেখে চিত্তপ্রিয়র হাত ধরে জলঙ্গী নদীর রুপালী বালির চরে ছোটাছুটি করার স্বপ্ন দেখেছিল চন্দনা। চিত্তপ্রিয় এক অপরিচিত, নোতুন জগতের নেশা ধরিয়েছিল ওর চোখে। বি-ডি-ও-গৃহিণী গাঁয়ে পা দেওয়ার সংগে সংগে নাকি চাঁদের হাটের বৌ-ঝিরা ভেঙে পড়বে অভ্যর্থনা জানাতে। চাঁদের হাটের বি-ডি-ও চিত্তপ্রিয় রায় তো ঐ অঞ্চলের রাজা। চন্দনা হবে রাণী।

তবুও চিত্তপ্রিয়কে প্রশ্ন করেছিল চন্দনা—তুমি অফিসে বার হয়ে গেলে আমি সারাটা দুপুর বাড়িতে বসে একা একা কি করব?

চিত্তপ্রিয় চটপট উত্তর দিয়েছিলো—সে ব্যবস্থা করিনি ভাবছ? গাঁয়ে শীগ্‌গিরই মেয়েদের হাই-ইস্কুল হচ্ছে। গভর্ণমেন্টকে অনেক লেখা-লেখি করে বিল্ডিং গ্রান্ট আদায় করেছি। মাস ছয়েকের মধ্যে ইস্কুল চালু হয়ে যাবে। তোমাকে ইস্কুলের হেড-মিস্ট্রেস করে দেব। এম এ পাশ মেয়ে বিয়ে করেছি কি ঘরে বসিয়ে রাখার জন্যে!

চিত্তপ্রিয় ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ঈষৎ হেসেছিল। সেই হাসিটা কি স্নিগ্ধ, পবিত্র মনে হয়েছিল চন্দনার।

কিন্তু চাঁদের হাটে গৃহপ্রবেশের দিন থেকে আজ পর্যন্ত চিত্তপ্রিয়র একটা কথার সংগেও মিল খুঁজে পায়নি চন্দনা। গাঁয়ের লোকে ওদের রাণীকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি। গাঁয়ে মেয়েদের হাইস্কুল চালু হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে তিনজন হেড-মিস্ট্রেস এলো আর গেল। কিন্তু চিত্তপ্রিয় তার এম-এ পাশ বৌকে হেডমিস্ট্রেস করা প্রতিশ্রুতিটা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। এক দিন কথাটা নিজেই তুলেছিল চন্দনা। ও কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল চিত্তপ্রিয়—পাগল হয়েছ? স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়ে নিজের বৌকে হেডমিস্ট্রেস করে শেষপর্যন্ত বদনামের ভাগী হয়ে মরি আর কি? কাদের নিয়ে আমাকে চাকরী করতে হয় বোঝ না তো? পাজির পাঝাড়া এদিকের অধ্যক্ষ আর অঞ্চল-প্রধানগুলো। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে খালি-পায়ে ধুলো মেখে এমন নিরীহ মুখ করে বি-ডি-ও সাহেবের কাছে এসে দরবার করবে যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু ব্যাটারা মিটমিটে শয়তান সুযোগ পেলেই বি-ডি-ও'র পেছনে কাঠি দিতে ওস্তাদ।

চন্দনা আর কোন কথা বলেনি। কত সহজে প্রতিশ্রুতিগুলো ভুলে গিয়েছে চিত্তপ্রিয়। কত পূর্ণিমার রাত এলো আর গেল চন্দনার স্বপ্ন আর সম্ভব হল না। হারি-কেনের মিটমিটে আলোয় চিত্তপ্রিয়র হাঁ-করা ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে পূর্ণিমার রাতগুলো ভোর হল।

চন্দনা আজকাল আর পথে বার হয় না। সারাটা বিকেল বারান্দায় বসে আকাশের বুকে ঘূর্ণায়মান উড়ন্ত চিল আর অশ্বত্থ গাছের ডালে ডালে বাসায়-ফেরা কা

পাখীদের সংখ্যা গোনে। একসময় বিকেলের ছায়া ঘন হয়। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অস্তায়মান সূর্যের আলোয় লাল আভা ফুটে উঠে। দূরে হিজল-জাম-জারুলে বনের ছায়া ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যায়। চন্দনা তখনও আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে। ওর চোখের ওপরে একটা জ্বলজ্বলে তারা আকাশের বুকে ফুটে ওঠে। অন্ধকারে আকাশ ছেয়ে যায়। হালকা মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঁকি মারে। একটা একটা করে তারা ফুটতে থাকে ধূসর কালচে আকাশের বুকে। চাঁদ আর তারার অস্পষ্ট আবছা আলোয় অশ্বত্থ গাছের মাথায় জমে-ওঠা অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। পাতাগুলো বাতাসের দোলায় শিরশির করে কাঁপে। চন্দনার মনের আকাশেও একে একে কল্পনার তারাগুলো ফুটে উঠতে থাকে। সেই কল্পনার জগতে চিত্তপ্রিয়র মুখ হারিয়ে যায়। তার নিজের গড়া সেই স্বতন্ত্র জগতে তার মা-বাবা, ভাই-বোন, কলেজের বান্ধবী আর অধ্যাপকের দল ইউনিভার্সিটির সেই লাজুক, মুখ-চোরা প্রেমিক ছেলেটা, যার নাম সুজিত, আর সবাইকে ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে মন্দার ফরসা, নীলাভ গাল, চশমার আড়ালে ধারালো চকচকে দুটো চোখ, চওড়া কাঁধ, লোমশ বুক—সবই একে একে ভেসে ওঠে। তারপর একে একে সবই মিলিয়ে যায়। শুধু আকাশের বুকে সন্ধ্যাতারাটার মত একটিমাত্র মুখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। সে মুখ মন্দার। মন্দার সঙ্গে নিঃশব্দে কথা বলে চন্দনা। এই নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা জানায়। ক্ষমা চায় মন্দার হাত ধরে। মন্দার গায়ের অনেকদিনের চেনা পুরুষ-পুরুষ গন্ধের ঘ্রাণটা ওর নিঃশ্বাসকে ভারী করে তোলে। এক আশ্চর্য সুখের আবেশে মগ্ন থাকতে চায় চন্দনা। হঠাৎ বাইরের দরজায় সাইকেলের ঘণ্টির ক্রিং ক্রিং শব্দ শোনা যায়। এই একান্ত গোপন স্বপ্নের জগৎটা চিত্তপ্রিয়র চোখে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে চন্দনা যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। চিত্তপ্রিয় অন্ধকারে সাইকেলটাকে দরজার মধ্যে ঢোকাতে গিয়ে জিগ্যেস করে—কিগো অন্ধকারে বসে ভূত-ভূত খেলছিলে নাকি? এখনও হারিকেন জ্বালোনি। ঘর-বাড়ী সব যে অন্ধকার।

চন্দনা লজ্জা পায়। হারিকেনটা জ্বেলে সলতেটা বাড়িয়ে দেয়। তারপর কেরোসিনের স্টোভ ধরিয়ে চা করতে বসে। চিত্তপ্রিয় স্নান সেরে চায়ের কাপ আর যত বাসি কাগজের বোঝা নিয়ে হারিকেনের সামনে ঘন হয়ে বসে। এ গাঁয়ে রোজ সকালে খবরের কাগজ মেলে না। তেহট্টা-করিমপুরের সড়ক ছেড়ে মাইল দুয়েক ধানের ক্ষেতের আলে আলে হাঁটলে গাঁয়ের সীমানায় পৌঁছান যায়। সপ্তাহে একদিন ডাক বিলি হয়। রানারের হাতে সাতদিনের বাসি কাগজ একদিনে হাজির হয়। আর সেই বাসি কাগজগুলো অদ্ভুত নিষ্ঠার সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে চিত্তপ্রিয়।

চন্দনা উনুন ধরিয়ে ভাত চাপায়। তারপর একসময় রাত ঘন হয়। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ওরা শুয়ে পড়ে। হারিকেনটা টিম্‌টিম্ করে ঘরের এক কোণে জ্বলতে থাকে। অশ্বত্থ গাছের ডালে বাদুড় ডানা ঝটপট করে। হুতুম-প্যাঁচার ডাক শোনা যায়। গর্ভবতী মেনী-বেড়ালটা ভারী পেট নিয়ে নিঃশব্দে জানালার মধ্যে দিয়ে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। পথের ওপর গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ, ঝিঁঝিঁ পোকা আর তক্ষকের ডাক, কুকুরগুলোর বিরামহীন ঘেউ ঘেউ চিৎকার, সব মিলে-মিশে নিঃশব্দ রাতের বাতাসকে ভারী করে তোলে। হারিকেনের মৃদু আলোয় ঘরের অন্ধকারটা কেমন যেন রহস্যময় হয়ে ওঠে। সেই অন্ধকারে খস্‌খস্ শব্দে ভয় পেয়ে চন্দনা চিত্তপ্রিয়র বুকের পাশে ঘন হয়ে আসতে চায়। চিত্তপ্রিয়র ঘুমন্ত বুকের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। চন্দনা বুঝতে পারে—চিত্তপ্রিয়র হিসেবের খাতায় আজ রাতে ভালবাসা নিষিদ্ধ। চন্দনার সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করেছে চিত্তপ্রিয়। চার বছর ছেলেপুলে চায় না চিত্তপ্রিয়। চুক্তিরক্ষার ব্যাপারে চিত্তপ্রিয়র কি আশ্চর্য নিষ্ঠা। চন্দনা প্রথম দিনই বলে দিয়েছে—ওসব দিনক্ষণের হিসেব রাখার ঝামেলা সে পোহাতে পারবে না। এত কাজের ফাঁকেও চিত্তপ্রিয়র হিসেবে এতটুকুও ভুল হয় না। হিসেব-করা রাতে সে ঠিক চন্দনার পাশে ঘন হয়ে আসবে। তারপর ওর দেহটাকে দস্যুর মত লুণ্ঠন করে একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। আর চন্দনা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে চিরদিনের মত হারিয়ে যাওয়া এক উজ্জ্বল উচ্ছল জীবনের স্মৃতি-মন্থন করবে।

এক এক সময় মন্দাকে দারুণ বোকা মনে হয় চন্দনার। নিজের পাওনাটা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও বুঝে নিতে পারল না মন্দা। অথচ এই স্বার্থপর লোকটা কি আশ্চর্য কৌশলে চন্দনার কাছে নিজের ষোল আনা বুঝে নিচ্ছে।

চিত্তপ্রিয় সারারাত নিশ্চিন্তে নাক ডেকে ঘুমিয়ে ভোরের অস্পষ্ট, আবছা আলোয় চন্দনার অনেক-রাতে ঘুম-নামা চোখদুটোকে জোর করে খুলে দিয়ে ওকে জাগিয়ে দেবে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে দেবে না ওকে। যতবার ও উঠতে যাবে, চিত্তপ্রিয় ওর হাত ধরে ওকে শুইয়ে দেবে। তারপর ওর মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে বলবে—জানো, বাসি ফুলের একটা আলাদা রূপ আর সৌরভ আছে।

প্রথম প্রথম খুব ভাল লাগত কথাগুলো শুনতে। চন্দনা সদ্য ঘুম-ভাঙা দেহে এক অলস আবেশ জড়িয়ে মনের মধ্যে এক আশ্চর্য প্রত্যাশা নিয়ে শুয়ে থাকত। চিত্তপ্রিয় এই নরম, মিষ্টি রোদের সকালে হয়তো বা হিসেবের গরমিল করে ফেলে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নেবে। কিন্তু চিত্তপ্রিয়র মুখটা ওর বাসি মুখের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মুখের ওপর নেমে আসে না। চিত্তপ্রিয়র হিসেবে ভুল হয় না।

বাগ্দি-মেয়ে ততক্ষণে বাইরের দরজার কড়া নাড়তে শুরু করেছে। চিত্তপ্রিয়র হাত ছাড়িয়ে জোর করে উঠে পড়ে চন্দনা।

বাগ্দি-মেয়ে সকাল-বিকেল ঠিকা কাজ করে। ওর সব কথার মানে বুঝতে পারে না চন্দনা।

চন্দনা বাগ্দি-মেয়েকে একদিন জিগ্যেস করেছিল—এই, তোর বিয়ে হয়নি?

বাগ্দি-মেয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বলেছিল—হয়েছে বৈকি! এই দু-সন হল, আমার মিনসে উলাউঠায় গত হয়েছে।

'মিনসে', 'সন', 'উলাউঠা'—এসব কথার মানে বুঝতে পারেনি কলকাতার মেয়ে চন্দনা। চিত্তপ্রিয়কে জিগ্যেস করেছিল।

চিত্তপ্রিয় হেসে চন্দনাকে কথাগুলোর তর্জমা করে দিয়েছিল।

সপ্তাহ-দুয়েক পরে বাগ্দি-মেয়ে সীঁথিতে সিঁদুর দিয়ে লাল-পেড়ে শাড়ি আর শাঁখা পরে কাজ করতে এলো।

চন্দনা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল—

ফিরে,—তোর মাথায় আবার সিঁদুর কেন রে? তুই তো বিধবা।

বাগ্দি-মেয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল—কাল যে আমার সাঙা হল্ছে গো।

সাঙা হওয়া কি ব্যাপার চন্দনা বুঝতে পারেনি। চিত্তপ্রিয় পরম বিজ্ঞের মত নিম্ন-শ্রেণীর লোকেদের সামাজিক রীতি-নীতির ব্যাখ্যা শুনিয়েছিল চন্দনাকে। ছোটজাতের বিধবা মেয়েরা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে, তাকে নাকি সাঙা করা বলে।

চন্দনাকে আরও অবাক করে দিয়ে বাগ্দি-মেয়ে বলেছিল—সে ভরন্ত বুকে কোলের বাচ্চাটাকে নিয়েই দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে উঠেছে। এবার একটা মেয়ে হলে বাগ্দি-মেয়ে নাকি বাবা বুড়োরাজের থানে পুজো দেবে। বাবা-বুড়োরাজ নাকি খুবই জাগ্রত দেবতা। বাবার কাছে মানত করে যে যা চায়—বাবা সবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

চন্দনার মনের কোণে একটা ভীরু বাসনা জেগেছিল। বুকের মধ্যে একটা নরম তুলতুলে বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে চিত্তপ্রিয়র এই অনুর্বর প্রেমের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চেয়েছিল সে। এই গোপন বাসনাকে চিত্তপ্রিয়র কাছে লুকিয়ে রেখেছিল চন্দনা।

চন্দনা গয়লা-বৌকে জিগ্যেস করেছিল বাবা-বুড়োরাজের কথা।

গয়লা-বৌ ঘটিটা মাটিতে নামিয়ে বারান্দার এক-কোণে পা ঝুলিয়ে বসে বলল—হাঁগো বৌদিদিমণি, তোমার বুঝি ছেলে-পুলে হয় না। তা কোলে বাচ্চা-কাচ্চা না এলে কি নিয়ে থাকবে গো? আমার দশাটা দেখেছ। একটা ছেলের জন্যে দশটা বছর হা-পিত্যেশ বসে আছি। শাউড়ী-ননদের গঞ্জনা আর সইতে পারিনে গো বৌদিদিমণি? তাগা-তাবিজ, শেকড়-বাকড় কত কি করেছি। বাবর কাছে জোড়া-পাঁঠা মানত করে শনি-মঙ্গলবারে বাবার মাথায় কাঁচা দুধ ঢেলেছি। কিন্তু বাবারও দয়া হল না। গত জন্মের পাপ-পুণ্যি বলে তো কিছু আছে। কি পাপ যে করেলাম গত জন্মে। এ জন্মে বিনা-দোষে শাস্তি পাচ্ছি। সোয়ামী তো মনের দুঃখে দেশান্তরী হয়েছে। কেষ্ট-নগরে গিয়ে ছানার কারবার খুলেছে। আর আমি বাঁজা মেয়েমানুষের অপবাদ নিয়ে শাশুড়ি-ননদের লাথি-ঝাঁটা খাচ্ছি। বাঁজা মেয়েমানুষের গঞ্জনা শুনে আমার বুক ফেটে যায় গো বৌদিদিমণি, বুক ফেটে যায়।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে জাগ্রত দেবতা বাবা-বুড়োরাজের অলৌকিক কীর্তি-কাহিনীর গল্প শুনিয়েছিল গয়লা-বৌ।

গয়লা-বৌ উঠে দাঁড়াল। তারপর ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল—তা তুমিও বাবার কাছে মানত করলে পার, বৌদিদিমণি। দেখবে, ছেলেপুলের দুঃখ ঘুচে যাবে। কোলে খোকা-খুকু না এলে বৌমানুষকে কেমন যেন ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে। তাছাড়া আটকুঁড়ী মেয়েছেলের নরকেও ঠাঁই হয় না। বৌদিদিমণি দাদাবাবুকে চেপে ধর। বয়েস চলে গেলে আর কবে মা হবে গো!

একটা ভয়ার্ত ভাবনা ঘিরে ধরল চন্দনাকে। এই অঘ্রাণে তিরিশে পা দেবে সে। শেষপর্যন্ত যদি ওর ছেলেপুলে না হয়। কি নিয়ে বাঁচবে সে? এই মুহূর্তে কি অর্থহীন মনে হচ্ছে চাঁদের-হাটের এই নিঃসঙ্গ জীবন। চন্দনার বুকের মধ্যে এক বিচিত্র বাসনার আবর্ত থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোখের সামনে ফুটে উঠল এক আশ্চর্য স্বপ্নের জগৎ। শুভ্র, পবিত্র, স্নিগ্ধ আলোয় ভরা সেই সুন্দর জগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর বুকের মধ্যে এক দুঃসহ বেদনা গুমরে উঠল। চিত্তপ্রিয় ছাড়া আর কারও হাত ধরে তো এই নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশের অধিকার মিলবে না চন্দনার। চন্দনার চোখের সামনে কত অজস্র কচি কচি শিশু হাসছে, খেলছে, হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকছে। বুকের মধ্যে কি অসহ্য বেদনা, চন্দনা এগিয়ে যেতে পারছে না। এক আশ্চর্য শূন্যতার গভীর গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে তার দেহ-মনঃচেতনা-সত্তা। অনেকদিনের জমাট-বাঁধা অতৃপ্তি আর অব-সন্নতার এক ঠান্ডা, নিরুদ্ধ বরফের পাহাড় হঠাৎ যেন সেই উত্তপ্ত, উত্তেজিত বাসনার আগুনে গলে গলে ছড়িয়ে পড়ল চন্দনার চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তারপর চোখের জল হয়ে টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ল ওর অনুর্বর, বন্ধ্যা, কঠিন, কঠোর প্রস্তরীভূত বুকের ওপর।

অজস্র শিশুর কলরবে মুখর সেই বাসনার পুষ্পোদ্যানে চন্দনার প্রবেশ নিষিদ্ধ। চোখের জল বাধা মানল না। চন্দনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ওর একেবারে কাছে ঘন হয়ে এলো গয়লা-বৌ—

বৌদিদিমণি, চোখের জল মোছ। চোখের জল ফেললে সোয়ামীর অকল্যেন হয়। কেঁদো না বৌদিদিমণি। কেঁদে কোন লাভ নেই। এ সবই গত জন্মের পাপের ফল। বাবা বুড়োরাজকে প্রাণভরে ডাক। বাবার কাছে মানত কর। বাবা কৃপা করলে, খোকা-খুকুর দুঃখু ঘুচে যাবে।

চন্দনা শাড়ীর খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে শান্ত, শাণিত চোখে গয়লা-বৌ-এর দিকে চাইল। চিত্তপ্রিয়র কোন কথা শুনবে না। চন্দনা চিত্তপ্রিয়র এই নির্মম স্বার্থপর চুক্তি সে মানে না। বাবা-বুড়োরাজের কাছে মানত করবে চন্দনা। একটি নরম তুলতুলে শিশুকে ভরন্ত বুকে তুলে নিয়ে সে চিত্ত-প্রিয়র সযত্ন-সৃষ্ট এই নিঃসঙ্গ জগতের সীমা পেরিয়ে তার স্বপ্নের জগতে প্রবেশের অনুমতি ভিক্ষা করবে বাবার কাছে।

কঠিন অথচ অনুচ্চ-কণ্ঠে গয়লা-বৌকে মিনতি জানাল চন্দনা— বৌ, আমাকে নিয়ে যাবি বাবার মন্দিরে। আমি জোড়া-পাঁঠা মানত করব বাবার কাছে।

গয়লা-বৌ ঘাড় নেড়ে বলল—ভালই হাল, বৌদিদিমণি। কাল আমাবস্যে। তায় আবার শনিবার। খুব ভাল দিন। কাল সারাদিন উপোস থেকো। চুলে তেল দিও না। স্নান করে চুলে চিরুনি দিও না। শুকনো এলো চুলে বাবার মাথায় কাঁচা দুধ ঢেলে বাবার কাছে মানত করলে যা চাইবে তা পাবে। কাল দুপুরবেলায় আমি হাতে করে একঘটি কাঁচা দুধ নিয়ে তোমার কাছে আসব। তুমি তৈরী থেকো। দুঃখু কোর না বৌদিদিমণি, বাবার দয়া হলে কোল আলো করে খোকাখুকু আসবে।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল গয়লা-বৌ। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ইসারায় চন্দনাকে কাছে ডাকল। চন্দনা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। গয়লাবৌ ওর মুখের সামনে মুখ নিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—

বৌদিদিমণি, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। আজ রাতে কিন্তু দাদাবাবুকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। ব্যাপারটা বুঝেছ তো। অশুদ্ধ দেহে বাবার কাছে যাওয়া যায় না।

একটা চোখ ছোট করে ঠোঁট চেপে হেসে গয়লা-বৌ ওকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল— আজ রাতে চিত্তপ্রিয়র ভালবাসা নিষিদ্ধ।

গয়লা-বৌ চলে গেল। চন্দনা সারাটা বিকেল গালে হাত দিয়ে বসে ভাবল। চিত্তপ্রিয়র মত সেও ভালবাসার রাতের হিসেব করতে বসল। অঙ্কটা চিত্তপ্রিয় ওকে অনেকদিন বুঝিয়েছে। কিন্তু আজ দিনক্ষণের হিসাব করতে গিয়ে বার বার গোলমাল করে ফেলল চন্দনা। অঙ্কটা যে এত শক্ত সে এতদিন বুঝতেই পারে নি। শেষপর্যন্ত সে হতাশ হয়ে সেই দুঃসাধ্য চেষ্টা ছেড়ে দিল। মনে ভয় হল— আজ যদি চিত্তপ্রিয়র হিসেবে সত্যিই ভালবাসার রাত আসে, তবে কি হবে? চিত্তপ্রিয়কে তো বাবা-বুড়োরাজের কথা বলতে পারবে না চন্দনা। আর বললেও তো চিত্তপ্রিয় শুনবে না। জোর করে আদায় করে নেবে তার পাওনা।

হঠাৎ চন্দনার মন খুশীতে ভরে গেল। চিত্তপ্রিয়র হিসেবের রাতগুলোকে বুঝতে তো ওর কোন কষ্ট হয় না। সন্ধ্যেবেলায় অফিস থেকে ফিরলেই চিত্তপ্রিয়র চঞ্চল চোখের তারায় ভালবাসার রাতের ছায়া দেখতে পায় চন্দনা। সেদিন অফিস থেকে বাড়ী ফিরে এসে স্নান সারতে বেশী সময়

দেয় না চিত্তপ্রিয়, খেতে বসে কোঁৎ কোঁৎ করে ভাত গেলে। যেন তর সয় না চিত্তপ্রিয়র। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের কাজ সারার জন্যে তাড়ায় তাড়ায় অস্থির করে তোলে চন্দনাকে। সে রাতে নাকি দারুণ মাথা ধরে চিত্তপ্রিয়র। চন্দনার বিছানায় উঠতে যা দেরী। আধপোড়া সিগারেটটা মুখে ধরেই চন্দনাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। সিগারেটের ধোঁয়ায় খুক্ খুক্ করে কেশে ওঠে চন্দনা। চোখে জল আসে। চিত্তপ্রিয়র জ্বালায় একটা ব্লাউজেও বোতাম রাখার উপায় নেই। সেফ্‌টিপিন লাগিয়েও নিস্তার নেই। সেফ্‌টিপিন খুলতে গিয়ে ব্লাউজটাই ছিঁড়ে ফেলে চিত্তপ্রিয়। ওর ভালবাসা বড্ড নগ্ন, উদ্ধত, হিংস্র। বুকের মধ্যে হাঁফ ধরে যায় চন্দনার। ওর ভালবাসায় তৃপ্তি নেই, সুখ নেই, মাতৃত্বের প্রত্যাশা নেই। নগ্ন, বিধ্বস্ত দেহে এক দুঃসহ অতৃপ্তির যন্ত্রণা নিয়ে পড়ে থাকে চন্দনা।

নিশ্চিন্ত হল চন্দনা। আজ চিত্তপ্রিয় বাড়ী ফিরলেই ওর চঞ্চল চোখের তারায় হিসেব-করা ভালবাসার রাতকে খুঁজে পাবে চন্দনা। যদি সত্যিই আজ চিত্তপ্রিয় ওকে কাছে টেনে নিতে চায় তো চন্দনা বাধা দেবে। তেমন বুঝলে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবে। তবুও চিত্তপ্রিয়কে কাছে ঘেঁষতে দেবে না চন্দনা। কাল শুদ্ধ, পবিত্র দেহ-মনে বাবার মাথায় দুধ ঢেলে মানত করবে।

সন্ধ্যে নামতেই চিত্তপ্রিয় বাড়ী ফিরে এলো। তীক্ষ্ণ, তির্যক চোখে চিত্তপ্রিয়কে লক্ষ্য করল চন্দনা। 'নাঃ, কোন চাঞ্চল্য নেই চিত্তপ্রিয়র চোখের তারায়। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল চিত্তপ্রিয়। চায়ের কাপ সামনে রেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাসি খবরের কাগজগুলো পড়ল। অনেক সময় নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে ভাত খেল। চিত্তপ্রিয়র সামনে বসে চোরা-চাহনিতে ওকে লক্ষ্য করল চন্দনা, নিশ্চিন্ত হল চন্দনা। নাঃ, আজ আর চিত্তপ্রিয়র অনুর্বর প্রেমের রাত নামবে না। আজ চিত্তপ্রিয় স্থির, শান্ত, স্বাভাবিক। আজ রাতে সে চন্দনার পাশে ঘন হয়ে আসবে না। চন্দনার মনটা খুশীতে ভরে গেল।

চিত্তপ্রিয় সিগারেটটা শেষ করে বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়ল। চন্দনা রান্নাঘরের কাজ সারতে ইচ্ছে করেই দেরী করল। হারিকেনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে বসল। চিত্তপ্রিয়র ঘুমন্ত বুকের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে চন্দনা। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ চন্দনার চোখেও এক-সময় ঘুম নেমে এলো।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল চন্দনার। আর্তচিৎকার করতে গিয়ে থমকে থেমে গেল চন্দনা। ওর দেহটাকে যেন দলে-পিষে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে চিত্তপ্রিয়। ওর চঞ্চল নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দের তালে তালে চন্দনার দেহটা ক্রমশঃ এক দুরন্ত, অস্থির কামনার গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। বসনের ভার থেকে মুক্তি পেয়েছে চন্দনার দেহ। ওর নগ্ন দেহের ওপরে একটি চঞ্চল কামনার শিখা থরথর করে কাঁপছে।

হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল হারিকেনের কম্পমান শিখাটার মৃদু, নীলাভ আলো।

আর সেই সঙ্গে ওর বুকের কাছে একটি অস্ফুট কান্না গুমরে উঠল—আজ সব ভুল হয়ে গেল চন্দনা। হিসেব ঠিক রাখতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেও আজ রাতে তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলাম না। চন্দনা, আমার চুক্তি আমি নিজের হাতেই বোধহয় ভেঙে ফেললাম।

শিথিল হয়ে এলো চিত্তপ্রিয়র আলিঙ্গন। চন্দনার কামনা-পীড়িত নগ্ন দেহে তখন এক বিচিত্র আশ্লেষের আনন্দ জেগে উঠেছে। বুকের মধ্যে এক দুরন্ত সুখের সমুদ্র মাতাল হয়ে উঠেছে। অনেক বিনিদ্র রাতের যন্ত্রণা আর অতৃপ্তির শেষে আজ এই প্রথম ওর জীবনে এক সফল, উর্বর প্রেমের রাত নেমেছে। চঞ্চল হয়ে উঠল চন্দনা। এই পরম ভালবাসার লগ্নকে সে অবহেলায় হারাতে পারে না। রাতের অন্ধকার ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে। ভোরের আলো ফুটতে আর বেশী দেরী নেই। ওর বুকের মধ্যে চিত্তপ্রিয়র দেহটা ক্রমশঃ নিরুত্তাপ, নিস্তেজ হয়ে অবসন্নতার ভারে ভেঙে পড়ছে। আজ নির্লজ্জ হয়ে উঠল চন্দনার ভালবাসা। লাজ-লজ্জা সব ভুলে চিত্তপ্রিয়কে দুরন্ত আবেগে বুকের মধ্যে টেনে নিল চন্দনা। তারপর অস্থির করে তুলল ওকে। নগ্ন, নির্লজ্জ ভালবাসার আগুনে প্রজ্জ্বলিত করে দিতে চাইল ভস্মাচ্ছাদিত কামনার শিখাকে।

কিন্তু চিত্তপ্রিয় স্থির, শান্ত, নিস্তেজ, নিরুত্তাপ। চন্দনার মনে হল যেন একটা মৃত সরীসৃপের ঠান্ডা, নির্জীব শরীর ওর বুকের মধ্যে পড়ে আছে। পাগলের মত দুহাত দিয়ে চিত্তপ্রিয়র কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল চন্দনা। দাঁত দিয়ে চিত্তপ্রিয়র ঠোঁট-দুটো কামড়ে ধরল। চিত্তপ্রিয়র ঘর্মাক্ত, ভিজে বুকেরও পর দুম্ দুম্ করে কিল মারতে লাগল। নিজের নগ্ন দেহটাকে অস্পষ্ট ভোরের আলোয় চিত্তপ্রিয়র চোখের সামনে উদ্ধত করে মেলে ধরল। কিন্তু চিত্তপ্রিয় চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। দুহাত দিয়ে চিত্তপ্রিয়র মুখটা ধরে জোর করে নিজের নগ্ন, উদ্ধত বুকের মধ্যে গুঁজে দিল চন্দনা।

কিন্তু চিত্তপ্রিয় স্থির, শান্ত নিস্পৃহ, উদাসীন। কোন সাড়া মিলল না ওর কাছ থেকে।

পাগলের মত কেঁদে উঠল চন্দনা— না, না, আজ তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না। আজ তোমাকে আমার চাই। আজ আমাকে আমার অনেকদিনের ভালবাসার সাধ মিটিয়ে দাও। আমি মা হতে চাই। আমাকে মা হতে দাও। ওগো, তুমি আজ আমাকে দয়া কর। আজ আমার দেহের রক্ত, মাংস, রঙ, রস সব নিঙড়ে দিয়ে তোমাকে আমার ভালবাসা দিলাম। আমাকে তৃপ্তি দাও, আনন্দ দাও। আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

চিত্তপ্রিয় জোর করে নিজেকে চন্দনার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে ছিটকে বিছানার একপাশে সরে গেল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে নিস্পৃহ কঠোর গলায় বলল—চন্দনা, আমাকে বিরক্ত কোর না। আমি আর হিসেবের ভুল করতে পারি না।

ঘুমিয়ে পড়ল চিত্তপ্রিয়র ক্লান্ত, অবসন্ন দেহটা। আর ক্রুদ্ধ আহত চন্দনা ভোরের প্রথম সূর্যকে সাক্ষী রেখে বিনিদ্র চোখে মনুদাকে সমর্পণ করল তার দেহ, মন, মাতৃত্ব, ভালবাসা।

পরদিন সকালে একটি কথাও বলল না চিত্তপ্রিয়। সারা সকাল গম্ভীর হয়ে রইল। সেই প্রথম চিত্তপ্রিয়র অফিসে বার হতে একটুও দেরী হল না। ঠিক দশটায় অফিসে বার হয়ে গেল চিত্তপ্রিয়।

আর অস্নাত, অভুক্ত চন্দনা জানালার গরাদ ধরে সারাটা সকাল কাকটার প্রতীক্ষায় অশ্বত্থ গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে কেঁদে ফেলল, তখন অনেক দেরী করে স্থান আর কাল ভুলে গিয়ে ঝিমধরা দুপুরের টা টা রোদ্দুরে উঠানের এক কোণে চিত্তপ্রিয়র সযত্নলালিত কদম-গাছটার ডালে কাকটা উড়ে এসে বসল। আর সেই সঙ্গে খুব জোরে ঠান্ডা বাতাসের ঝড় উঠল। থরে থরে কাল মেঘ জমতে লাগল আকাশের বুকে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল কদম-গাছের ডাল বেয়ে। কদম-গাছের নীচে এসে দাঁড়াল চন্দনা। কাকটা চুপ করে বসে বৃষ্টির জলে ভিজছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। কাকটার সঙ্গে চন্দনাও কদমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। হঠাৎ বাইরের দরজায় জোরে জোরে কে যেন কড়া নাড়ল। চন্দনার হঠাৎ মনে পড়ল গয়লা বৌ-এর কথা। গয়লা-বৌ নিশ্চয়ই এসেছে ওকে বাবাবুড়োরাজের মন্দিরে নিয়ে যেতে। কিন্তু কথা রাখতে পারেনি চন্দনা। তার দেহ অশুদ্ধ, অশুচি। অনুর্বর কামনার পীড়নে ক্ষত-বিক্ষত। গয়লা-বৌকে ফিরিয়ে দেবে চন্দনা। ক্লান্ত-পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল চন্দনা। দরজায় তখন চঞ্চল-হাতে আরও জোরে কড়া নাড়ার শব্দ উঠেছে। দরজা খুলে দিল চন্দনা।

আশ্চর্য, তার সামনে চিত্তপ্রিয় দাঁড়িয়ে কি স্নিগ্ধ, নরম দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

চন্দনা নিঃশব্দে আমন্ত্রণ জানাল চিত্তপ্রিয়কে। হাতদুটো বাড়িয়ে দিল চিত্তপ্রিয়র দিকে।

চন্দনার হাতদুটো মুঠোর মধ্যে ধরে উঠোনের ভিতর এগিয়ে এলো চিত্তপ্রিয়। ওর চঞ্চল চোখের তারায় ভালবাসার রাতের ভাষা শুনতে পেল চন্দনা।

তারপর সেই বৃষ্টি-ভেজা দুপুরের স্নিগ্ধ মেঘের ছায়ায় আকাশ, মাটি, অশ্বত্থ-গাছ আর কদমগাছের ডালে বসা কাকটাকে সাক্ষী রেখে চিত্তপ্রিয় নিজের হাতে চন্দনার সমস্ত পোষাক খুলে ফেলল। তারপর স্থান, কাল, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি সব ভুলে গিয়ে দুটি নগ্ন, আদিম পুরুষ আর নারী এক বিচিত্র ভালবাসার খেলায় মাতল।

তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে ওরা শুয়ে পড়ল ভিজে-মাটির তৃণশয্যায়। আর সেই তৃণশয্যায় জন্ম নিল এক অনন্ত সৃষ্টির মুহূর্ত—যে আশ্চর্য মুহূর্তটির অপেক্ষায় একটি অনুর্বর কামনা-পীড়িত নারীর বন্ধ্যা রাতগুলো চোখের জলে ভিজে ভিজে অনেক দুঃসহ সকাল আর দুপুরের জন্ম দিয়েছিল।

এবারের অলিম্পিক ফুটবল

দেশে বিদেশে

ধূমায়িত আসাম

আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রী কে পি ত্রিপাঠী দিল্লীতে একথা জানাতে গেছেন যে, আসাম রাজ্য পুনর্গঠন করা হলে সেখানে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। রাজ্য বিধানসভা ইতিপূর্বেই পুনর্গঠনের প্রস্তাব বাতিল করেছেন।

অন্যদিকে, গারো হিলসের তুরায় এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে অল পার্টি হিল লীডার্স কনফারেন্স (সংক্ষেপে যাকে বলা হয় এ-পি-এইচ-এল-সি) স্থির করেছেন যে, আসামের পার্বত্য জেলাগুলিকে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে মেনে নেওয়ার দাবীতে তাঁরা ঐ জেলাগুলিতে "অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" শুরু করবেন। ইতিমধ্যে, সোমবার ৯ সেপ্টেম্বর এ-পি-এইচ-এল-সি হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।

আসাম রাজ্য পুনর্গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে এমন কি ভারত সরকার ও কংগ্রেসের উচ্চতম মহলেও তীব্র মতভেদ রয়েছে।

এই একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের সম্ভাবনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে নয়াদিল্লী ও শিলং ১২ সেপ্টেম্বর তারিখটির জন্য অপেক্ষা করে আছে।

আসামের পাহাড়ী জেলাগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে প্রশ্নটি দীর্ঘদিন যাবৎ অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে আছে সেই প্রশ্নটির চূড়ান্ত ফয়সালা ঐ তারিখ নাগাদ হওয়ার কথা আছে। এর আগে আরও চারবার ভারত সরকার কথা দিয়েছিলেন, তাঁরা আসামের পার্বত্য জেলাগুলির স্বাতন্ত্র্যের দাবী সম্পর্কে তাঁদের রায় জানাবেন। কিন্তু পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যের চাপে তাঁরা চারবারই কথার খেলাপ করেছেন। তাঁদের সর্বশেষ প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হয়েছে পার্লামেন্টের গত বর্ষা অধিবেশনে।

স্বভাবতই ১২ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার তাঁদের কথা রাখতে পারবেন কিনা, অথবা পঞ্চমবারের মত আবার ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রাখবেন, সেটা দেখার জন্য সারা দেশ অপেক্ষা করে আছে।

ভারত সরকারের ঘোষণাসাপেক্ষে আসাম বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়েছে। বিধানসভার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারত সরকারের প্রত্যাশিত ঘোষণার দিকে তাকিয়েই সভার বৈঠক শেষ না করে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুলতুবী করে রাখা হয়েছে।

আসামের অর্থমন্ত্রী ত্রিপাঠী দিল্লীতে গেছেন, মুখ্যমন্ত্রী চালিহাকেও সেখানে তলব করা হয়েছে।

১১ সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকা হয়েছে। সেখানেও প্রস্তাবিত আলোচনা করা হবে।

যতদূর খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, মাঝখানে যে কয়দিন আছে সেই সময়টা কাজে লাগান হবে, আসামের কংগ্রেস নেতাদের ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশের বিরোধিতা কিছুটা নরম করার চেষ্টায়। কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে যাঁরা আসাম পুনর্গঠনের প্রস্তাবের বিরোধিতা

করছেন তাঁদের মধ্যে আছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ও শিল্প-উন্নয়নমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ। আসামকে ভাগ করা চলবে না, করলে পূর্ব সীমান্তের এই রাজ্যে প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়বে। আসামের পাহাড়ী জেলা-গুলির সমস্যার দাবী মেনে নিলেই সেখানকার সমাধান হবে না; বরং এই দাবী ভারতবর্ষের অন্যান্য পাহাড়ী অঞ্চলেও স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন উস্কে দেবে, আসাম রাজ্যের মধ্যে পাহাড়ী জেলাগুলির স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার কিছুটা বাড়ান যেতে পারে, তার বেশী নয় — এই সব হচ্ছে পুনর্গঠন প্রস্তাবের বিরোধীদের বক্তব্য।

এই সব বক্তব্যের সংগে সামঞ্জস্য করার জন্য ভারত সরকার এ-পি-এইচ-এল-সি'র দাবীর সংগে কয়েকটা আপোষ করেছেন। প্রথমত, আসামের পাহাড়ী জেলাগুলিকে (আপাতত শুধু দুটি জেলা—গারো হিলস ও ইউনাইটেড খাসি অ্যান্ড জয়ন্তিয়া হিলস) কোনক্রমেই নাগাল্যান্ডের ন্যায় একটি পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে না। এই দুটি জেলার জন্য নিম্নলিখিত দুটি ব্যবস্থার একটি হতে পারে :—(১) এই জেলা দুটি নিয়ে আসাম রাজ্যের মধ্যেই একটা উপরাজ্য ধরনের গঠিত হতে পারে। এই উপরাজ্য বা 'স্বয়ংশাসিত পার্বত্য রাজ্যে'র পৃথক আইনসভা ও মন্ত্রিসভা থাকবে এবং যে সকল বিষয়ে আইন করার ক্ষমতা এখন রাজ্য আইন-সভার উপর ন্যস্ত আছে তাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় এই নূতন আইনসভার কাছে হস্তান্তরিত করা হবে। যে সকল বিষয় হস্তান্তরিত হবে না সেগুলির ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা এখনকার মত সমগ্র আসামের আইনসভার উপর ন্যস্ত থাকবে। অথবা (২) গারো হিলস ও ইউ-নাইটেড খাসি অ্যান্ড জয়ন্তিয়া হিলস জেলা দুটিকে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হবে।

দ্বিতীয় যে আপোষ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে, প্রস্তাবিত 'স্বয়ংশাসিত পার্বত্য রাজ্য' (অথবা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল), নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও ত্রিপুরাকে আসামের সংগে একটা আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে যুক্ত করা হবে। এই আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি হবেন আসাম ও নাগা-ল্যান্ডের রাজ্যপাল। পরিষদ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির অভিন্ন স্বার্থের সংগে জড়িত বিষয়গুলিতে অভিন্ন নীতি অনুসরণ করার জন্য সুপারিশ করবেন। কেন্দ্রীয় নেতারা আশা করছেন যে, পার্বত্য জেলাগুলিকে হারিয়ে আসামের নেতারা যে মনস্তাপ পাবেন তার কিছুটা তাঁরা প্রশমিত করতে পারবেন এই আঞ্চলিক পরিষদের মারফৎ একটা 'বৃহত্তর আসাম' লাভ করে।

তৃতীয় আর একটি ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় নেতারা আপোষ করতে রাজী আছেন বলে শোনা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন নাকি প্রস্তাব দিয়েছেন যে, 'আইন ও শৃংখলা'র দপ্তরটি প্রস্তাবিত 'স্বয়ংশাসিত পার্বত্য রাজ্য'-এর আওতার বাইরে এনে রাজ্যপালের হাতে দেওয়া যেতে পারে অথবা, এমন কি, এখান-কার মত আসামের হাতেও রেখে দেওয়া যেতে পারে।

এই সব আপোষরফার পর আসাম পুনর্গঠনের প্রস্তাবটি পাহাড় অথবা সমতল, কোন অংশের নেতাদের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আইন ও শৃংখলার ভার যে রাজ্যের হাতে নেই সেটা রাজ্য-পদবাচ্য বলে এ-পি-এইচ-এল-সি নেতারা আদৌ মেনে নেবেন কিনা সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। আর পাহাড়ী জেলাগুলিকে, যত সীমাবদ্ধ আকারেই হোক, রাজ্য বলে মেনে নিলে সমতলের নেতারা ক্ষুব্ধ হবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঠিক এই সময়েই এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যাতে আসামে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। গত ৩০ আগষ্ট তারিখে গৌহাটিতে একটি ফুটবল খেলার সময় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের গুলীতে একটি ১২ বছর বয়সের ছেলে মারা গেছে। তাতে সারা আসামে কেন্দ্রীয় পুলিশের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের লোককে আসাম থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে জিগির তোলা হয়েছে। আসামের একজন নেতা বলছেন, আসামের 'লাচিত সেনা' যে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী কুখ্যাতি অর্জন করেছে সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্সের এই 'চ্যবন সেনা'।

আসামে দ্বিতীয় আর একটি তৈল শোধনাগার স্থাপনের দাবীতে সেখানে সম্প্রতি যে আন্দোলন হয়ে গেল সেই উপলক্ষেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সারা রাজ্যে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

গৃহনির্মাণের সংকট

সারা দেশে বাসস্থানের সংকট যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দেখা গেছে, প্রতি বছর দেশে প্রায় ২০ লক্ষ নতুন বাড়ীর ঘাটতি থাকে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মিলিতভাবে মাত্র তিন লক্ষ নতুন বাড়ী প্রতি বছর তৈরী করতে সক্ষম। অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ বছরে ১৭ লাখ করে বেড়েই যাচ্ছে।

অথচ গৃহনির্মাণের চাহিদা বেড়ে চলেছে সমানে। ১৯৩১ সালে যেখানে শহরাঞ্চলে বাসস্থানের মোট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ, ১৯৬৭ সালে তা দাঁড়ায়। ১১৮ লক্ষে! গ্রামাঞ্চল মিলিয়ে ১৯৬৭ সালে মোট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৮১৪ লক্ষ ইউনিট।

১৯৫৩-৫৪ সাল ও ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে শিল্প শ্রমিক এবং আর্থিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীসমূহের জন্যে সাবসিডাইজড হাউসিং স্কীম অনুযায়ী ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৬৪২টি বাড়ী তৈরী হয়েছে। ১৯৫৪ সালে প্রবর্তিত নিম্ন আয় গোষ্ঠী গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৬০টি বাড়ী তৈরি হয়েছে। শহরাঞ্চলের জন্যে তৃতীয় একটি পরিকল্পনা আছে মধ্যআয় গোষ্ঠীর গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা। এই অনুসারে ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে ১৭ হাজার ২৪টি বাড়ী তৈরি হয়েছে। বস্তী অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী হয়েছে ৭০ হাজার ৮৩৪টি বাড়ী। এছাড়া আছে ১৯৫৯ সালে প্রবর্তিত রেন্টাল হাউসিং স্কীম। এই অনুসারে ১৩ হাজার ৯৪২টি বাড়ী তৈরী হয়েছে।

শহরাঞ্চলে তবু যেটুকু কাজ হয়েছে, গ্রামাঞ্চলের রেকর্ড আরো খারাপ। বাগিচা শ্রমিকদের জন্যে সাবসিডাইজড হাউসিং স্কীম অনুযায়ী এখন পর্যন্ত তৈরী হয়েছে মাত্র ১৩৫০টি বাড়ী। ১৯৫৭ সালের গ্রামীণ গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার আওতায় গত দশ বছরে মাত্র ৩৬ হাজার ১৮০টি বাড়ী তৈরী হয়েছে।

এই শোচনীয় অবস্থার জন্যে প্রধানত দায়ী উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। গত কুড়ি বছরে কখনও গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয়তার ওপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। এমন প্রায়ই হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় টাকা এসেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার যেহেতু এই টাকাকে কেন্দ্রীয় সাহায্য বলে মনে করেন সেইজন্যে এই টাকা তাঁর অন্য কাজে নিয়োগ করেছেন। গৃহনির্মাণ যেহেতু রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় সেইজন্যে এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু করার থাকে না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণের জন্যে যথাক্রমে ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ও ১২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যগুলি যথাক্রমে মাত্র ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ ৯১ হাজার ও ৪ কোটি ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার বেশি ব্যবহার করেন নি।

পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্র থেকে এই রাজ্যে গৃহনির্মাণের জন্যে ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার ব্যবহার করেছিলেন মাত্র ১৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ টাকা, আর ব্যবহারের পরিমাণ ১২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

গৃহনির্মাণের জন্যে যে টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে তা এমনিতেই পর্যাপ্ত নয়। তার ওপর যদি বরাদ্দ টাকাও সবটা কাজে লাগানো না হয় তার চাইতে দুঃখের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

রাজ্য সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত গৃহসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাজ্যগুলিকে বোঝাবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তবে একটা উপায় আছে। নিছক সাহায্য দেবার বদলে কেন্দ্রীয় সরকার স্পনসর্ড স্কীম চালু করতে পারেন। পুরোপুরি না হোক অংশত এ-কাজ করা যেতে পারে। এর ফলে অন্তত বরাদ্দের টাকা অন্যভাবে খরচা হয়ে যাবার আশঙ্কা অনেকটা দূর হবে।

সান্ত্বনা

(রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতার অক্ষম অনুকরণে)

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

যদিও অন্ধ হয়েছে দৃষ্টি অন্তরে
    শত ভঙ্গীতে কত ইঙ্গিত আসিয়া
যদিও লুপ্ত, দারুণ গুপ্ত মন্তরে
    যদিও ভ্রান্তি-বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া
খাবি খেতে খেতে দু' বাহু শুধুই সন্তরে,—
    দিগ্‌দিগন্তে অনন্ত মসীমাখা—
তবু অশান্ত, ওরে অশান্ত মন,
    ভুলো না কিন্তু সিন্দুকে আছে টাকা!

নিজ হাতে-গড়া-বহু ঝঞ্ঝাট-সঞ্চিত,
    এ যে অহরহ ফুঁসিছে আপন খেয়ালে—
কতভাবে তুমি করেছ সবারে বঞ্চিত,
    পড়িতে পারনি' কী লেখা রয়েছে দেয়ালে!
নাহি যে লজ্জা, অপমানে নহ লাঞ্ছিত—
    যখন যেমন, ঘোরাও উল্টো চাকা—
ওরে অশান্ত, ফন্দী-ভ্রান্ত ওরে,
    ভুলো না কিন্তু সিন্দুকে আছে টাকা!

এখনো তোমার কর্ণে বাজিছে মন্ত্রণা—
    ফাঁকতালে কর রপ্ত সন্ধি গোপনে—
গন্দীর লাগি' বক্ষে লক্ষ যন্ত্রণা,
    অক্ষিযুগলে মধু-মক্ষির স্বপনে
লুব্ধ-দৃষ্টি সৃষ্টির মূলে বঞ্চনা,
    দলাদলি কর গড়ি' শাখা উপশাখা—
তবু অশান্ত, ওরে অশান্ত মন,
    ভুলো না কিন্তু সিন্দুকে আছে টাকা!

এ বটে মুখর ট্রাম-ঘর্ঘর-গঞ্জিত
    চোর' ডাকাতি-তরাসে নগরী কাঁপিছে;
বক্ষরক্তে কত অলিগলি রঞ্জিত,—
    দেহ-কম্পনে হরিনাম কেহ জপিছে।
কোথা রে পুলিশ, পিস্তল-লাঠি-পুঞ্জিত
    কোথা সুখ-নীড়, কোথা আশ্রয় ফাঁকা!
ওরে অশান্ত, ওরে অশান্ত মন,
    ভুলো না কিন্তু সিন্দুকে আছে টাকা!

তোমার বিরাট ফ্যাক্টরী আজো বন্ধ কী?
    ঘেরাও করিয়া শ্রমিকের যত কায়দা—
সিনেমা বন্ধ, তাই বা এমন মন্দ কী?
    আসল টাকায় হাত না পড়াই ফায়দা।
কার কী দৌড় — দেখা যাক এর ছন্দ কী—
    যদি কেহ বলে, শয়তান অতি পাকা—
ওরে অশান্ত, ওরে অশান্ত মন,
    ভুলো না কিন্তু সিন্দুকে আছে টাকা!

সন্ধ্যার ছায়া নামিলে গড়ের প্রান্তরে,
    তুমি ছুটে যাও অনন্ত পিপাসায়—
অটোমোবিলের গুপ্ত-গর্ভ-কন্দরে,
    কাহার প্রেয়সী শ্রেয়সীর ভূমিকায়
কত না সোহাগে গুন্ গুন্ করি' গুঞ্জরে—
    হরেক কিসিম বায়না সেথায় রাখা—
ওরে অশান্ত, ওরে অশান্ত মন,
    ভুলো না কিন্তু সিন্দুকে আছে টাকা!

নাই চাল-ডাল, নাই রে ইলিশ-রন্ধন,
    দধি, সন্দেশ, দুগ্ধে কেবল ছলনা—
গৃহ আছে বটে, নাই সেথা প্রেম বন্ধন,
    সিনেমা-ফোবিয়াগ্রস্ত যে গৃহ-ললনা!
সব শুধু ফাঁকি, সব যে রে বৃথা ক্রন্দন,
    অন্তবিহীন অন্ধ তিমিরে থাকা—
ওরে অশান্ত, ওরে ও অবুঝ মন,
    ভুলো না কিন্তু সিন্দুকে আছে টাকা!

তস্যতস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]
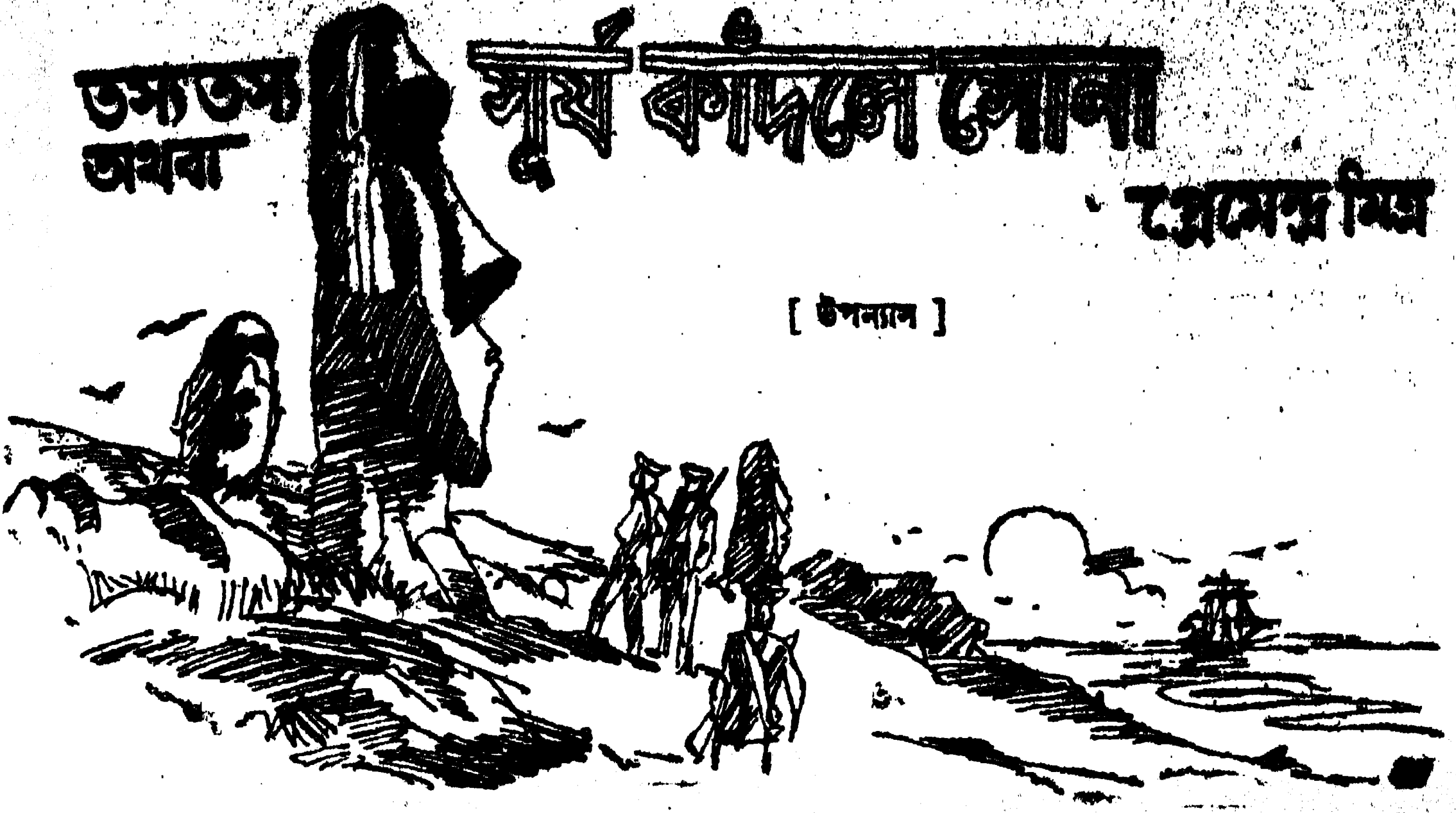
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সোরাবিয়া ফিলিপিলিও আর তার বাছাই করা সওয়ার দলকে নিয়ে পাহাড়ের গায়ে লুকোনো প্রেত-প্রাসাদের দরজায় এসে নিজেদের ঘোড়া রুখেছে।

জায়গাটা সত্যিই কেমন হানা দেওয়া কবরের রাজ্যের মত।

মশালের আলোয় পাহাড়ের গায়ে বিরাট খোদাই করা দরজাটা না দেখলে এখানে কোনো লুকোনো পুরী আছে সোরাবিয়া বিশ্বাসই করতে পারত না।

এখনো এটাই হুয়াইনা কাপাকের প্রেত-প্রাসাদ কিনা তাও জানবার কোনো উপায় নেই। ফিলিপিলিও এ বিষয়ে এসপানিওল-দের মতই অজ্ঞ দেখা গেছে। এদেশের ভাষাটা ছাড়া আর কিছুই সে জানে না।

হুয়াইনা কাপাকের হোক বা না হোক সন্ধান যখন পাওয়া গেছে তখন এ প্রেত-প্রাসাদই একটু হাঁটকে না দেখে সোরাবিয়া যাবে না।

ছোটখাট জিনিষে তার লোভ নেই। তার ভাবখানা হল মারি' ত গন্ডার লুটি' ত ভাণ্ডার!

সওয়ার সেপাইদের সেই মতই হুকুম সে দিয়েছে। জনচারেক মিলে মশাল নিয়ে ভেতরে ঢুকে একবার দেখে আসুক। হুয়াইনা কাপাকের প্রেত-প্রাসাদ হলে সাজ-সজ্জার ঘটা আর ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখেই বুঝতে পারবে। সূর্যবরণ প্রান্তরে অতক্ষণ ধরে দেখে হুয়াইনা কাপাকের রাজবেশটাও চেনা হয়ে গেছে।

সিপাইরা নিজেরা যা খুশি নিতে চায় নিক তার জন্যে শুধু সিংহাসনটা নিয়ে আসা চাই-ই।

যা খুঁজছে সে জায়গা যদি না হয় তাহলে সোনার সিংহাসন গোছের কিছু না থাকলে সোরাবিয়ার জন্যে আনার দরকার নেই। সেপাইরা যা চায় নিজেরা লুট করে আনুক।

সেপাইদের সঙ্গে সোরাবিয়া ফিলি-পিলিওকেও পাঠিয়েছে। মৃত ইংকা নরেশদের প্রেত-প্রাসাদে যার তার ঢোকবার অধিকার নেই। যাওয়া তাদের ধর্মে বারণ বলে ফিলিপিলিও আপত্তি করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সোরাবিয়া কোনো ওজর আপত্তি শোনে নি।

অত্যন্ত নির্মমভাবে বিদ্রূপ করে বলেছে,—মাথাই নেই তার মাথাব্যাথা। তোদের দেবতারাই সব আমাদের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, এখন আবার তোদের ধর্ম কিসের? এদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিতে তুই না গেলে যাবে কে!

বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছে ফিলি-পিলিওকে সেপাইদের সঙ্গে।

সওয়ার সেপাইরাও যে প্রেত-প্রাসাদ লুঠ করতে খুব উৎসুক তা মনে হয়নি।

ভেতরে লোভ যতই থাক এই বিদঘুটে বেমক্কা জায়গায় পাহাড়ের ভেতরে কাটা অজানা প্রেতপুরীতে ঢুকতে তাদের ভয় হয়েছে অনেক বেশী।

কিছুটা লোভ-কিছুটা দলে ভারী থাকার ভরসা, আর খানিকটা দলপতির হুকুমের দরুণ শেষ পর্যন্ত সাহস করে মশাল নিয়ে গুটি গুটি তারা দরজা ঠেলে ঢুকেছে।

দরজা তাদের ভাঙতে কি কষ্ট করে খুলতে হয় নি। আধ ভেজানো অবস্থায় খোলাই পেয়েছে।

সোরাবিয়া তখন ঘোড়া ছেড়ে নেমে বাকি সব সওয়ারদের জড় করে মশালের আলোয় একরকম ছোটখাটো দরবার বসিয়েছে। এই একদিনে কে কত কি লুঠ করতে পেরেছে তা জিজ্ঞাসাবাদ করবার দরবার।

দু-একজন মাত্র তাদের কথা জানিয়েছে এমন সময় সোরাবিয়া আর তার সঙ্গীদের শিউরে চমকে উঠে তাকাতে হয়েছে পাহাড়ের গায়ে বসানো প্রেত-প্রাসাদের দরজার দিকে।

সেখান থেকে আধ ভেজানো দরজার ভেতর দিয়ে কজনের গলায় যেন ভীত চিৎকারের মত আওয়াজ আর গন্ডগোল শোনা গেছে।

সবিস্ময়ে দু-চার মুহূর্তের বেশী অপেক্ষা করতে হয় নি। পাহাড়ের গায়ে বসানো দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে পড়ি কি মরি অবস্থায় বেসামাল মশাল দিয়ে প্রায় নিজেদের পোষাকেই আগুন ধরিয়ে ফেলে এসপানিওল সওয়ার সেপাইরা ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

কি হল কি! —যতখানি রাগ, অধৈর্য, ততখানি উদ্বেগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছে সোরাবিয়া।

কারুর মুখে কোন কথাই নেই। দিনের আলো হলে দেখা যেত তাদের মুখ থেকে যেন সব রক্ত সরে গেছে। চেষ্টা করেও তারা খানিকক্ষণ গলায় আওয়াজ ফোটাতে পারে নি।

প্রথম জবাব ফিলিপিলিও-ই দিয়েছে।

বলেছে, এ পবিত্র প্রেত-প্রাসাদের অপমান করবার অধিকার যে কারুর নেই পেরুর ইংকা শ্রেষ্ঠ নিজে তা আমাদের

ঘুরিয়ে দিয়েছেন, মার্কুইস! তাঁর আত্মা এখনো এ প্রেত-প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে আমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

রাগের মাথায় সোরাবিয়ার মুখে এসে-ছিল,—তোমরা সব ল্যাজ গুটোনো খেঁকি কুকুরের দল! কিন্তু শুধু একা ফিলি-পিলিও ত নয় অন্য এসপানিওল সেপাই-দের কথা মনে রেখে তাকে জিভের রাশ টানতে হয়েছে।

তবু তীব্র স্বরে সে বলেছে,—কবে মরে মমি হয়ে গেছে, সে বাঁদির বাচ্চার আত্মাকে তোমরা পাহারা দিতে দেখেছ। তোমরা ত সব ভীরু খরগোশের পাল। কাঁপতে কাঁপতে সব ভেতরে গিয়ে ঢুকেছ আর তারপর নিজেদের মশালের ছায়াই নড়তে দেখে ভূত বলে আঁৎকে পালিয়ে এসেছ। তোমরা সব এসপানিওল বীর। সাগর ডিঙিয়ে এসেছ রাজ্য জয় করতে!

গালাগাল অনেক সামলে দিয়েছে সোরাবিয়া, কিন্তু রগচটা এসপানিওল সেপাইরা মার্কুইস তার ওপর আবার দল-পতির মান রাখতেও এতটা সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

বেয়াদবী জেনেও তাদের একজন এবার বেপরোয়া হয়ে বলেছে,—আমরা ত খরগোশের পাল বটেই মার্কুইস। আপনি সিংহ হয়ে নিজেই একবার দেখে আসুন না, আমরা ছায়া দেখে ভির্মি খেয়েছি কি না!

কেউ এ খোঁচা না দিলেও সোরাবিয়া তাই দেখতে নিজেই যে যেত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর যাই হোক শয়তানী একটা সাহসের আস্ফালন তার আছে।

সে সাহস সম্বন্ধে সন্দেহের ইঙ্গিতে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে সোরাবিয়া।

ঘৃণা আর অবজ্ঞায় গলাটা যতদূর সম্ভব তিক্ত করে বলেছে,—তা নিজে না দেখে তোমাদের কথাই মেনে নিয়ে এখান থেকেই ফিরে যাব ভেবেছিলে! এখুনি আমি যাচ্ছি। একজন শুধু এসো আমার সঙ্গে মশাল নিয়ে।

সোরাবিয়াকে কয়েক পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে। তার সঙ্গে মশাল নিয়ে যাবার জন্যে কেউ এগিয়ে আসে নি।

কই কে আসছ মশাল নিয়ে?—সোরাবিয়া চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছে।

কারুর কাছ থেকেই কোন সাড়া পাওয়া যায় নি।

সোরাবিয়া দাম্ভিক স্বার্থপর গোঁয়ার কিন্তু নির্বোধ মোটেই নয়। সেপাই-সাওয়ারদের এ অবাধ্যতা এখনই শাসন করতে গেলে ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশ্যটাই পন্ড হতে পারে।

সওয়ার সেপাইদের ছেড়ে দিয়ে তাই সোরাবিয়া এবার ফিলিপিলিওকে হুকুম করেছে, মশাল নিয়ে তার সঙ্গে থাকার জন্যে

এ আদেশ আমায় করবেন না মার্কুইস।—নিষ্ফল জেনেও ফিলিপিলিও একবার শুধু তার বক্তব্যটা জানিয়েছে—এ প্রেত-প্রাসাদ অপবিত্র করার শাস্তি আমি ত পাবই, আপনিও তাহলে এ অভিশাপ থেকে রেহাই পাবেন না।

আমায় তোদের জুজুর ভয় দেখাচ্ছিস, বাঁদির বাচ্চা! —সোরাবিয়া তার খোলা তলোয়ারের ডগাটা দিয়ে ফিলিপিলিওর পিঠে একটা খোঁচা দিয়েছে, নেহাৎ দোভাষী হিসেবে তোকে দিয়ে এখনো কিছু করাবার আছে। নইলে এই খোঁচাতে এফোঁড় ওফোঁড় করে তোকে তোর জুজুর কাছে বলি দিয়ে যেতাম। চল এখন।

একজন মশালচী সেপাই-এর হাত থেকে একটা মশাল টেনে নিয়ে ফিলি-পিলিওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সোরাবিয়া এগিয়ে গেছে পাহাড়ের গায়ে বসানো দরজার দিকে।

দরজাটা এবার এসপানিওল সেপাইদের ছুটে পালাবার ধাক্কায় খোলাই ছিল। পেছন থেকে ফিলিপিলিওর হাতের মশালের আলো এসে পড়বার আগে ভেতরটা পাহাড়টারই যেন বিরাট অন্ধকার মুখের হাঁ বলে মনে হচ্ছিল।

মশালের লালচে কাঁপা আলো পড়ায় সে অন্ধকার গভীর গহ্বরের চেহারাটা বদলে গেলেও থমথমে রহস্যের ভাবটা আরো যেন গাঢ় হয়েছে।

সোরাবিয়া নিজের একটা ভুল তখন মনে মনে নিজের কাছে স্বীকার করেছে। রাগের মাথায় সওয়ার সৈনিকদের গালাগাল দিতে গিয়ে তারা কি এখানে দেখেছে তা জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

ফিলিপিলিওকে এখন অবশ্য জিজ্ঞাসা করা যায়। কিন্তু একজন এসপানিওল আর এদেশের কুসংস্কারে আস্টেপৃষ্টে জড়ানো একজন জংলীর দেখা ত এক নয়। ওপরে একটু-আধটু পালিশ হলেও ফিলিপিলিও মনে-প্রাণে এখনো এদেশের মুখখু গোঁড়া জংলী। সে যদি কিছু দেখে থাকে ত চোখের চেয়ে মনের কল্পনাতেই দেখেছে। তার কথার কোনো দাম নেই তাই। এস-পানিওল সৈনিকদের কাউকেই জিজ্ঞেস করে আসা উচিত ছিল।

ভেতরের বিরাট গুহা-কক্ষের ভেতর এগিয়ে যেতে যেতে মশালের আলোয় সোরাবিয়া যা এখন দেখেছে তা সত্যিই চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মত। সুর্যবরণ প্রান্তরের শব-সভায় এ ঐশ্চর্য আড়ম্বরের এক শতাংশও নিয়ে গিয়ে দেখানো হয় নি। তা সম্ভবও নয়।

যে ঐশ্চর্য এখানে জমা হয়ে আছে সোরাবিয়া আর হেরাদার সঙ্গে যারা এসেছে সেই গোটা এসপানিওল সওয়ার বাহিনীর তাতে এক দফার মত লুটের সাধ মিটে যায়।

আর যে আহাম্মকগুলো এখানে এসে-ছিল তারা কিনা মেয়েছেলের মত কোথায় কি ছায়া নড়তে দেখে এসপানিওল বীরত্বে মুখে চুন-কালি মাখিয়ে ছুটে পালিয়েছে।

এই ত বিরাট গুহাপুরী। মশালের আলো যতটুকু পৌঁছোচ্ছে তার বাইরে দিকে দিকে ক্রমশঃ গাঢ় হওয়া অন্ধকারের একটা বেড় যেন একটু অসাড়তায় [illegible]

চেপে ধরবার জন্যে ওত পেতে আছে অনেক করা যেতে পারে, কিন্তু সে ত নেহাৎ অলীক কল্পনা।

এক মশালের আলোর শিখাটা বাদে গুহাপুরীতে যত কিছু নিথর নিষ্পন্দ। তাদের নিজেদের পায়ের আওয়াজটুকু ছাড়া চারিদিকে তাদের ঘিরে গভীর নিস্তব্ধতা।

মশালের আলোর কম্পিত শিখার ছায়ায় শুধু মাঝে মাঝে যেন চোখের ভুল একটু ঘটছে।

ঠিক আগের মুহূর্তেই রাজবেশ পরিয়ে সোনার সিংহাসনে বসানো ইংকা নরেশের শবদেহটা কেমন একটু যেন নড়ে বসল বলে মনে হয়েছিল।

দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া তা আর কি হতে পারে।

জোরের সঙ্গে নিজেকে একথা বোঝাতে গিয়েই সোরাবিয়ার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একটা বরফের ধারা নেমে গিয়ে সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ফিসফিস করে কে যেন কি বলছে। না ফিসফিসানিও নয়। সোরাবিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করেছে। ফিসফিস করে বলার ভাষাটা কিন্তু নির্ভুল কাস্তিলিয়ান। আর যা বলছে তার মানে হল, ফিরে যাও সোরাবিয়া। এ প্রেত-প্রাসাদ অপবিত্র করে আমার অভিশাপ সাধ করে মাথায় নিও না।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকান হিপ্পি

সুরেশচন্দ্র সাহা

টাইম স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম পথের নির্দেশ। পুরো না শুনেই তিনি বললেন—ইয়ু ওয়ান্টা গো ডাউনটাউন? বললাম—নিউ-ইয়র্কের আপ-ডাউনের মহিমা আমার জানা নেই, তবে কিনা গ্রীন উইচ ভিলেজে যেতে চাই। এবারও ভদ্রলোক আমার সম্পূর্ণ কথা প্রায় না শুনে তেমনি চটপট জবাব দিলেন—ও, ওয়ান্টা গো টু ভিলেজ? ইন্দিকে। ইদিক বলতে যে কতখানি বোঝায় তা তিনি বললেন না।

কলকাতার গোলদীঘি যেমন গোল নয়, নিউইয়র্কের গ্রীন উইচ ভিলেজ, ইস্ট-ভিলেজও তেমনি গন্ডগ্রাম নয়। গ্রীনউইচ ভিলেজের ঐতিহাসিক গর্ব তার প্রাচীনত্বে, তার অনেক বাড়িতে শিল্পী সাহিত্যিকের আস্তানায়। ইস্ট ভিলেজের অধুনা খ্যাতি তার হিপ্পিজগতে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু মিনিট হাঁটা পথে এগিয়ে ওয়াশিংটন স্কোয়ারে এসে কোন সাহিত্য-সেবীরই সাক্ষাৎ পেলাম না, আর তেমন আশা নিয়েও সেখানে যাই নি। যাদের দেখব বলে গিয়েছিলাম তাদের শুধু দেখলামই নয়, দেখে চিনতেও পারলাম। ঝাঁকড়া চুল ছিন্ন পোশাক ছোকরারা নিঃশব্দে বসে নিউইয়র্ক-সাহানের শেষ রোদটুকু গায়ে মাখছিল গোবের বেলা-শেষে মহার্ঘ আলোক রেখাটির মত। এরাই নিউইয়র্কের হিপ্পি, আমেরিকার বিস্ময়, দুনিয়ার প্রশ্ন। অনতিদূরে ইস্ট ভিলেজ পৃথিবীর তাবৎ হিপ্পিদের তীর্থভূমি, তাদের আশ্রয় এবং আশ্রম। যে সব হিপ্পির পেটে একটু এলেম আছে, স্বভাবটিও গুরু-গম্ভীর, মনটা তেমন শঙ্করাচার্য নয়, তারাই নিরালা সন্ধ্যার পার্কে ওক ফার বাঁচ গাছের ছায়ায় বসে সিগারেট টানে, ভগবদ্ গীতা নয়ত কামসূত্র পড়ে এবং পুলিশ, প্রেসিডেন্ট আর ভিয়েৎনাম যুদ্ধবাজদের পরকাল বাসের জন্য এমন সব স্থান নির্দেশ করে, যা ঐ মানাবর ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষে তেমন সুখকর নয়।

জনকয়েক হিপ্পির সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, কারও মাথায় তেল নেই, জুতোয় কালি নেই, প্যান্টলুনে ক্রিস নেই, গলায় টাই নেই; মাথার চুলে গালের দাঁড়িতেও অনেকদিন হাত পড়েনি—এমন কি অম্লান অশুদ্ধি অশুচির মালিন্য সারা দেহে লেপটে আছে। ওদের খুঁটিয়ে দেখছিলাম আর যেচে আলাপ করবার জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছিলাম। তারপর এক ফাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—তোমরা কি হিপ্পি? নিষ্প্রভ চোখ তুলে সবাই তাকাল। ভাল-খাওয়া ভাল-থাকা লোকের চোখে-মুখে যে একটা স্বাভাবিক শান্তি থাকে, ওদের মধ্যে তার লেশমাত্র ছিল না। প্রশ্নমুখে আমি যে সামনে দাঁড়িয়ে আছি মনে হল তা দিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই, এমন কি জবাব দেওয়ার প্রয়োজনও যে নেই সে সম্বন্ধে সবাই যেন নিঃসন্দেহ। অগত্যা কোন বিশেষ একজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তিনি বললেন—হিপ্পি? না, না আমার এমন কি আত্মিক সম্পদ আছে যে নিজেকে হিপ্পি বলে পরিচয় দিতে পারি। গলার স্বর তাঁর স্পষ্ট। বিনয়ে নম্র।

যুবকের নাম হফম্যান, বয়স ছাব্বিশ, সাকিন ইস্ট ভিলেজ। টাইম, লাইফ ইত্যাদি কাগজে তাঁর উক্তি কখন-সখন স্থান পায়—তবে হিপ্পিজগতের কোন-না-কোন অগৌরবের সমর্থনে, উচ্ছৃঙ্খল-বিকৃতির মধ্য দিয়ে। হফম্যান বললেন—হিপ্পি কথাটার অর্থ কি তোমার জানা আছে? আমার অজ্ঞতা কবুল করলাম। হিপ্পি-প্রবর তখন ব্যাখ্যা করলেন—হিপ শব্দের অর্থ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, অর্থাৎ জানা—পৃথিবীর সব চাইতে শোচনীয় মুহূর্তে স্থির হয়ে বসে আত্মোপলব্ধির চেষ্টা ঠিক তখন আমার মনে হল, যেন হফম্যান ঋড়ের মুখে আমেরিকায় বসে ভারত-আত্মার সেই পরম বাণীটিকেই আওড়াচ্ছেন—আত্মানং বিদ্ধি।

হিপ শব্দের আর একটি আভিধানিক অর্থ আছে: গোলাপ ফুলের ফল। ফুলের মত অত্যন্ত অনায়াসে দুর্বার আবেগে যারা ফুটে উঠে তারাই হিপ্পি। বিকাশের ছন্দে তাদের বিপ্লব জাগে, বনে বনে লাগে কাঁপন; নজরুলের ভাষায়, ঝড়ের ফু দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা লাগে। ফুলবিকাশের এই ঝড়ো কায়দায় হিপ্পিরা নিজেদের পরিচয় দেয় ফ্লাওয়ার চিলড্রেন অথবা ফুল-কুমার বলে। অনেকের মতে হ্যাপি অর্থাৎ সুখী লোক মাত্রই হিপ্পি।

কিন্তু হিপ্পিরা যাই বলুক, নিজেদের পরমার্থ প্রয়াসী অথবা পুষ্প সন্তান বলে যতই পরিচয় দিতে চেষ্টা করুক। দুষ্ট-লোকে কিন্তু এই সব নিগূঢ় অর্থের ধার কাছ দিয়ে না গিয়ে বলছে—হিপ্পিরা আসলে নতুন যুগের কটিতটচারণ!

আমেরিকার প্রচণ্ড যান্ত্রিক সভ্যতার সীমাহীন দম্ভের মধ্যে হিপ্পিদের অভ্যুদয় ইতিহাসের এক বিচিত্র ঘটনা। যে আমেরিকা লক্ষ কোটি টাকা ফি বছর ব্যয় করছে [illegible] মুক্ত-শান্তি-সম্প্রীতি নির্বাচনে, তার আপন অঙ্গিনাতে তখন দারিদ্র্যের শেষ নেই, বেকারির অন্ত নেই, বন্দুক হাতে বাদুরের কাছে নিরীহ পথচারীর জীবনের দাম নেই—আর এই নিয়ে হিপ্পিদের মাথাব্যথার অন্ত নেই। তাই আরণ্যলোক থেকে মাথা উঁচু করে এই দিকে ফিরে তারা বলছে—কি প্রয়োজন এই ঘৃণিত সভ্যতার, কি অধিকার তার বেঁচে থাকবার? আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা দেখেও তারা শিউরে উঠছে, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির দিকে চোখ রেখে বলছে—এই রুদ্ধ দেয়ালের ক্লান্তির মধ্যে কেমন করে ঘটতে পারে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ? সুতরাং এদেরই অনেকে কলেজীয় চতুষ্পাঠী থেকে বেরিয়ে এসে শান্তভাবে মিলিত হচ্ছে একটি স্বয়ং-শোভন বৃত্তে, হিপ্পিজগতের কঙ্কপথের মধ্য দিয়ে। বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক প্রচারিত শব্দ হিপ্পি—আমেরিকার তথাকথিত সভ্য সমাজে সর্বাধিক ঘৃণিত। অবশ্য সমাজের নানা স্তর থেকে এসে অনেক অলস অনাদর্শ স্বপ্নবিলাসীও হিপ্পি-খাতায় নাম লেখাচ্ছে নানা মতলবে। মাত্র পাঁচ-ছ বছরের নতুন আন্দোলন—এরই মধ্যে তিন লক্ষাধিক যুবক-যুবতী এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত। নিউইয়র্কের ইস্ট ভিলেজ এবং সান ফ্রান্সিসকোর হেইট অ্যাশবেরীর কেন্দ্র থেকে হিপ্পি আন্দোলন সারা আমেরিকায় দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে, বাহির বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে হিপ্পি-দর্শন—নিউ লেফট বা নবসাম্যবাদ নামে।

হিপ্পি দর্শনের গোড়ার কথা ভালবাসা বা সর্বানুভূতিতে প্রেম, যার মধ্যে ব্যক্তি-বিচারের স্থান নেই, বর্ণধর্মের প্রশ্ন নেই। মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্মের সঙ্গে এইখানে এর মিল, যদিও তার মূলে সুরটি সাগর পাড়ি দিয়ে এখনও হিপ্পিজগতে পৌঁছায় নি। তাই ভালবাসা শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করছে দেহসর্বস্বতায়। যে কোন হিপ্পি যে কোন পথচারী অথবা পথিক-বালাকে বাহু প্রসারিত করে বলে—আমি তোমায় ভালবাসি। বিদ্রূপের হাসি হেসে সবাই মুখ ফেরায়। এদিকে হিপ্পি নেতারা আশ্বা করছেন, হিপ্পি-মার্কা আত্মিক অনু-ভূতি মানবসমাজকে একদিন দৃঢ়বন্ধন সূক্ষ্ম একটি সূত্রে গ্রথিত করে রাখবে; সেখানে দম্ভ এবং হিংসার স্থান থাকবে না, একের জন্য অপরকে পীড়নের প্রয়াস থাকবে না—সেই শুভদিন আসবেই আসবে। এমন কি ভেল্কিবাজীর মধ্য দিয়ে মানস-মুক্তি ঘটলেও আপত্তি নেই। তাই ভারতীয় যোগী, গুরু, গীতা এখন তাদের মনকে ভরে রেখেছে, যদিও সুকঠিন সাধনায় সে-মন কেন্দ্রিত হয় নি।

ইস্ট ভিলেজের হিপ্পিজগতে গিয়ে একদিন দেখতে পেলাম অল্পযৌবন থেকে অস্তিযৌবনের রাশি রাশি ফ্লাওয়ার চিলড্রেন, তাদের আপন পরিবেশের মধ্যে। দিনে-রাতের যে কোন সময়ে থার্ড এভেনিউ সেন্টমার্ক প্লেসের মোড়ে এসে

একটিবার তাঁরা মিলিত হন— দর্শনের প্রচণ্ড মহিমার এখনও বেঁ বচে আছে এবং চিরকাল থাকবে, এই কথাটিকে প্রমাণ করবার জন্য। র্কে হিপ্পিরা বলে ফ্রি সিটি হয় গেল। ছেঁড়া কাগজ ফলের খোসা টিন সেখানে ইতস্তত ছড়ান। ই জড়াজড়ি করে বসে আছে, কেউ জনকে ছেড়ে আর একজনকে চুমু কেউ তুলছে ছবি। কাছে কুকুর, পুলিশ। কোন হিংস্রতা হুজ্জোত দ কিছু নেই। পুলিশ অসীম ধৈর্য হিপ্পিদের দেখছে, আর ভ্যানের সংগে গল হয়ে দাঁড়িয়ে হয়ত মনে মনে —একটু গোলমাল করেই দেখ না দেখে নেব। হিপ্পিরা কিন্তু হ ঔদাস্যেও তাকিয়ে দেখছে না সশস্ত্র কে। সেদিনের জনতায় ছিলেন ন ঘুঘু লোক। রেডিও টেলিভিশন ত্রিকায় স্থান পাওয়া এক বিখ্যাত ম্ব—লম্বা চুল মলিন-বেশ খালি-পা। পজগতে অতিপ্রিয় ঐ ভদ্রলোক কেবলই তুলছিলেন, বেশীর ভাগই নগ্নপ্রায় একদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-পদ হওয়ার তাঁর বাসনা আছে এবং না হিপ্পিজনপ্রিয়তা তখন তাঁর কাজে ব বলে জানালেন। জিজ্ঞেস করলাম— নি কি হিপ্পি? উত্তর এলো— ই না—!

অনেক হিপ্পির সংগেই আলাপ হল। কেই পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলেমেয়ে— করে ক্লাশ-পালানো। কেউই বিবাহিত তবু অনতিদূরের গলিতে অল্প- র অ্যাপার্টমেন্টে জোড়ায় জোড়ায় -স্ত্রীর মত বাস করছে। বিবাহযোগ্য অকুলানে বিয়ের অনুমতি মেলে বলে টেক্সাস এরিজোনা ইলিনয় ছেড়ে এসে লুকিয়ে থেকে এই স্বেচ্ছা- র আশ্রয় নিয়েছে। ডানা বাগপী এবং ড ক্লিংকে জিজ্ঞেস করলাম—তা হলে র বয়স হলেই ত আবার ফিরে গিয়ে করে দিব্যি সংসারী হবে। তাই না? বলল—নিশ্চয়ই না। কক্ষনও ফিরে না। কি আছে আমাদের সমাজে? লোক দেখানো ঐশ্বর্যের জাঁক, অসন্তোষ, গোঁজামিল, হঠকারিতা সাদা-কালোর লড়াই। হিপ্পিজগতের জীবনধারণের জন্য স্বল্পতম রাজনের দিকটাতে, তার বেশী নয়। কের ভাবনাও আমরা ভাবতে চাই না। বার ভেবে দেখ, অসন্তোষ অসাম্যের নাই না থাকলে মানুষ কি সুখেই না করে। আমাকে একমত হতে দেখে ওরা বলল—বলতে পার এত উড়ো- জের কি প্রয়োজন, কি প্রয়োজন এত এত খাবার এত আড়ম্বরের? আমি জের। যতদূর জানি আমাদের আরও ... আরও ... আমার, আরও পোশাকের প্রয়োজন আছে। অতএব চুপ করে রইলাম।

ভোগবিলাসের শিখর-চূড়ায় বসেই সুপ্রাচীন ভারত একদিন অনুশোচনা করেছিল ভোগের অকিঞ্চিৎকরতার কথা—দুস্তর তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল ধ্যান জ্ঞান মননের বিশালতা, ত্যাগের তপশ্চারে আত্মোপলব্ধির কৌশল। আজ আমেরি- কাতেও ভোগের উৎকট ব্যাপ্তি ও মূল্যহীনতা, পুলিশী দাপট, দাঙ্গা, যুদ্ধোন্মাদনা স্বচ্ছ হিপ্পি-মনে ভাবান্তর এনেছে, অনেক অনিবার্য প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। অথচ হিপ্পিদর্শন নিয়ে অন্য অনেকের মনে যে সব প্রশ্ন জেগেছে, তারও সঠিক জবাব জানা নেই হিপ্পিদের। পরের দানের অন্ন ভাগ করে খেয়ে ভালবাসাবাসির কথা রাত- দিন সংকীর্তন করা সোজা। কিন্তু দেশ- সুদ্ধ সবাই যদি হিপ্পি বনে যায়, কাজ- কর্ম না করে, মোহ-মোদক খেয়ে চুর হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়। হিপ্পিরা চুপচাপ।

ডানা বাগপী এবং এণ্ড্রি ক্লিং সম্প্রতি জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নের অনুমতি পেয়েছে। অন্য অনেক হিপ্পির মতই যে 'লভ অ্যান্ড বিউটির' ডাকে ডানারা একদিন উইসকনসিনের ঘর এবং শিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল, আজ ভারতীয় দর্শনের মধ্যে তারই মর্মোদ্ঘাটনে তারা ব্যস্ত। ডানাদের মত অনেকেরই আশা, যদি কোন অলৌকিক উপায়ে রাতারাতি কোন স্পর্শমণি লাভ হত, প্রেম ও সুন্দরকে জানার কৌশল কোন ভারতীয় যোগী যদি ইনস্ট্যান্ট কফির মত গুলে গিলিয়ে দিত! ডানাদের জিজ্ঞেস করলাম, মোহ-মোদক এল এস ডিতে এত আসক্তি তোমাদের কেন? ওরা বলল— সুন্দরের উপলব্ধির এ হচ্ছে একটি শর্ট- কাট পথ; তুরীয় অবস্থার মধ্যে তুঙ্গী হয়ে তারই পদধ্বনি শুনতে পাবার কৌশল!

আসলে সব মিলে কেমন যেন একটা এলোমেলো ভাব—প্রেম ও সুন্দরের কথাও ওরা বলছে, সাধনার পথে না এগিয়ে কেবলই আশা করে বসে থাকছে অলৌকিক একটা কিছু ঘটবার জন্য; গীতাপাঠও করছে, আবার সেই সংগে কামসূত্র-গীতার সংগে যার কোন যোগসূত্রই নেই। তাই শেষ পর্যন্ত 'লভ অ্যান্ড বিউটি' এসে ঠেকছে দেহবিলাসের লীলায়। এক বাড়িতে একই সময়ে একাধিক পুরুষও একজন ভাগের-মেয়ের সংগে বাস করছে। হয়ত তাদেরই কেউ শেষ পর্যন্ত তার সংগে বিয়ের সংকল্পও ঘোষণা করছে। বিবাহ চিন্তায় কৌমার্যে শুচিতার প্রশ্ন কোন হিপ্পিরই আজ মাথাব্যথার কারণ নয়— হয়ত আমেরিকার কারও নয়; নির্বিচারে কামাচারও শুধু হিপ্পি-দুষ্কৃতির পরিচয় নয়। কিন্তু যে অবস্থায় ভারতবাসীরা ঊর্ধ্বস্রোতার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন,

হিপিজগত হয়ত তা আরম্ভ করবার কথা এখন ভাবতেও পারে না। জানি না ভারতীয় কোন যোগীগুরুর সে প্রক্রিয়া আজ জানা আছে কিনা। আর না থাকলেও

কীর্তি নেই। শুধু তারা গুরুর, এমন কি আমেরিকানদের কাছেও। আমেরিকানরা আজ ভারতীয়দের মত হুবহু গুরুকে গুরু, পণ্ডিতকে পণ্ডিত, উপায়কে উপায় বলে উচ্চারণ করে। ইংরেজী পত্র-পত্রিকাতেও যথাযথ তাই লেখে। শুধু গুরুকে বলে সেক্রেড কাউ!

মিনিসোটার ডেভিড ব্রেক এবং মেরী গিবসন বাস করছে হিপ্পি-জগতের ইস্ট সিক্সথ স্ট্রিটে। দরিদ্র নিগ্রো ইহুদী ইটালিয়ান পোর্টোরিকান প্রতিবেশীর মধ্যে। অন্য অনেক হিপ্পির মত পরান্নভোজী না হয়ে তারা সামান্য রোজগার করে সংসার চালায়। পড়াশুনাও করে, কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী নিতে দুজনেই নারাজ। যে কোন হিপ্পিরই পড়াশুনা সম্পর্কে এমনি চিন্তাধারা।

মেরীর গলায় ছিল ঘন-সন্নিবিষ্ট কাঠের মালা, আমাদের জপমালার মত। চপ্পল পায়ে ডেভিডের পরনে পাজামা ধরনের পাতলুন, গায়ে টাইহীন জামা, তার উপর সামান্য একটি পুলওভার। মালার গুটিকা দেখিয়ে মেরী বলল—এ প্রেমের প্রতীক, বিশ্বমানবের প্রতি লিভ টু লিভ, লিভ টু লাভ—এই মূলমন্ত্র। মেরী আরও জানাল ভারতীয় জীবনদর্শনের প্রতি অনুরাগের জন্য হিপ্পিরা পরে এই মালা।

হিপ্পি-জীবনদর্শন আজ অনেকের কাছেই কিম্ভূত-কিমাকার ঠেকে। বিঘোষিত সরল অনাড়ম্বর জীবন তাদের আদর্শ। কিন্তু হঠাৎ প্রকাশ্য রাস্তায় একদল প্রাপ্তবয়স্ক হিপ্পি মেয়েমদ্দ পটাপট জামা-কাপড় খুলে হাঁ-করা জনতার চোখের সামনে দিগম্বর হয়ে বসে পড়ে তখন অ-হিপ্পি সভ্য নাগরিকেরা তার কোন দার্শনিক তাৎপর্য খুঁজে পায় না। হিপ্পিরা তেমন কোন কাজকর্ম করে না, বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদও প্রচার করে না; হিংস্র কর্মে বিশ্বাস করে না। সামান্য পয়সা হাতে এলে সকলে মিলে মিশে ভাগ করে খায়; আবার যখন পয়সা থাকে না, না খেয়েও কাটিয়ে দেয়। বেশ কথা। কিন্তু সবাই ত আর ভেবে পায় না, এই একান্ত নির্বিরোধ প্রাণীগুলি রাস্তার মোড়ে মোড়ে সময়ে অসময়ে এ কাণ্ড করে বসে কেন। মজার কথা বাগীশ লোকেরা হামেশা এই প্রশ্ন করে আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে-নগ্ন-পথনাটিকা দেখছে; কাগজওয়ালারা তার ছবি ছাপছে!

হিপ্পিদের মতে অন্যের জিনিস বলে না দেখিয়ে নিলেও তা চুরির সামিল নয়, কারণ সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার। ঠিকমত বুঝতে না পেরে একজন হিপ্পিকে অনুরোধ করলাম কথাটার কি ব্যাখ্যা করতে। তা না করে তিনি এমন একটি ভাব করলেন, যার অর্থ এইসব কথা আসলে বুঝিয়ে বলবার নয়, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবার!

হিপ্পিদের প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সমর্থন করে এমন লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। যাদের আর্থিক স্নেহে হিপ্পিরা দালিদ্র্য সংকটে হিপ্পিদের পাশে এসে যারা দাঁড়ায়, খাবার যোগায়, তারা নিজেদের পরিচয় দেয় ডিগার বলে। তাদের দলে অনেক গভীর জলের মাছও থাকে। তাই হিপ্পিরা হিপ হিপ করে আহ্লাদে এগিয়ে চলেছে। বারমাসই হিপ্পি আন্দোলন সচল নয়, ডিগাররাও তেমন সক্রিয় নয়। মালা-গলায় চপ্পল-পায়ে হিপ্পিদেরও দেখা যায় হাড়-কাঁপা শীতের মধ্যে বাইরে ঘুরতে। কম্বলমোড়া দিলে কে অত ভালবাসা হেন জিনিস অন্যকে বিতরণ করতে যায়!

ইয়িপ্পি (ইয়ুথ ইন্টারন্যাশনাল পার্টি) হিপ্পিদের অধুনাতম রূপ—হিপ্পি আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক। এদের কাজ যুদ্ধ-বিরোধী একটি আন্দোলনকে গড়ে বেঁধে উঠতে সাহায্য করা—আর নয়।

[়]জিয়া, মরমীয়াবাদ অথবা শ্রীচৈতন্য
ত প্রেমধর্ম, কিংবা নারী-সুরা-
র কণ্টকিত তন্ত্রসাধনা—কার সঙ্গে
করব হিপ্পি-আন্দোলনের? গুর্ণাশং-
ল্লায়ারের প্রথম সাক্ষাতে সে-মহাভাবের
কি বুঝি জাতীয় একটি ইঙ্গিত
সেইদিকে চোখ রেখে হিপ্পি আন্দো-
অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছিলাম
া করেছিলাম, হয়ত আমাদের বৈষ্ণব-
অথবা সহজিয়া ভজনার মত একটি
প্রবাহী আধ্যাত্মিক সুর হিপ্পি-
লনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। ঐশ্বর্যে
় ভারতীয় ভাবাদর্শে বিচরণেচ্ছা,
পাঠ, ভারতীয় গুরু-নির্বাচন—এই
় তেমন অর্থই বহন করে। মদ-
় ওরা নয়, কারণ ও-বস্তু নাকি
রা ছোঁয় না—অথচ মন-মাতাল কিনা
ে তেমন প্রমাণ পেলাম না। হয়ত
ম্ভীর কোন মন্তব্য করবার সময়
ও আসেনি। তবু মনে হয় ওরা এখনও
়ে বুঝতে পারেনি, আমেরিকার
-প্রচুর জীবনছন্দ, বর্ণবিদ্বেষ, শিক্ষা-
থা অথবা কোন-সে-কৃষ্ণের বাঁশি ওদের
ড়া করেছে।

আমেরিকার পালিশ করা সমাজের
ছায়া অত্যন্ত অসহিষ্ণুর মত বিচার
় হিপ্পিদের। তথাকথিত উঁচুতলার
করা শিউরে উঠে বলছেন—এ কি
রাম। আরও মুস্কিলের কথা,
ীয় মাটি থেকে হিপ্পি-আন্দোলনের
় সুরটি আমদানি করা। যে ভারতকে
় দিতে হয় বলে এত ঢাক-পেটা, সেই
ে করবে গুরুগিরি—যেন এমনি একটি
বিদ্বেষ উৎকণ্ঠার ভাব গেল-গেল-
় নাক-উঁচু লোকগুলির মনকে আবিষ্ট
় রেখেছে। অথচ মহর্ষি মহেশ যোগী
় হিপ্পিজগতের নয়, অনেক অ-হিপ্পি
ও গুরু-জনযোগ্য শ্রদ্ধায় পূজিত;
শংকর অভিনন্দিত মার্কিন যুব-
জের যুগাদর্শরূপে।

সেদিন সেন্টমার্ক স্ট্রিটের এক কোণে
ড়িয়ে যখন হিপ্পি-সম্মেলনে যোগ দিয়ে-
লাম, তখন একজন বাচ্চা-হিপ্পি কাছে
স প্রশ্ন করল— নিউইয়র্কের পুলিশ
মার সঙ্গে কোন গোলমাল করেনি ত'?
যেন সেই গোলমালের প্রতিবিধানই তার
বনের ব্রত। অথচ পুলিশের বিরুদ্ধে
িপ্পিদের হাতিয়ার বোমা পটকা কিছুই
়—বেশীর ভাগই খিস্তি খেউড়; সম্মে-
নের সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হ্যাণ্ড-
লে তার স্থান। এরপর একজন অতি-
ভিজাত আমেরিকানের মুখে খাঁটি
কীর ভাষাতে উচ্চারিত হল, শেষ প্রশ্ন
—এতক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি
দেখলে?—তারপর এলো তাঁর নিজের মুখ
থেকেই জবাব—এইখানে, এই নিউইয়র্কের
সন্ধ্যায়, থার্ড অ্যাভেনিউ সেন্টমার্ক স্ট্রিটের
মোড়ে দাঁড়িয়ে ভারতীয় তুমি আজ দেখে
গেলে ইতিহাসের একটি মোড় ফেরা—
আমেরিকান সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা!

জানা গেল, ভদ্রলোক হলিউডের
একজন নামী অভিনেতা। কিন্তু এইখানে
আরও একটি সাংঘাতিক কথা জেনে-
ছিলাম। জেনেছিলাম, সমস্ত গুণাগুণ এবং
যোগ্যতা বিচার করে হিপ্পিরা সিদ্ধান্তে
পৌঁছেছে, স্বর্গত মহাত্মা
মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন একজন
জাঁদরেল হিপ্পি—কারণ হিপ্পিদের মত
তিনিও অহিংসবাদী। আর রাজপুত্র গৌতম
বুদ্ধ ত হিপ্পিদের কুলগুরু—কারণ তিনি
হিপ্পি কায়দায় রাজ-ঐশ্বর্য ছেড়ে ইস্কুল-
পালানো ছেলের মত পথে এসে দাঁড়িয়ে-
ছিলেন!!

কেয়াপাতার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

[উপন্যাস]

আগের ঘটনা

[উনিশ শ চল্লিশের অক্টোবর। কলকাতার ছেলে বিনু দুই দিদি আর মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে পূব-বাঙলায় রাজদিয়ায় দাদু হেমনাথের বাড়ি। বিশ বছর বাদে বিনুর মা সুরমা এলেন রাজদিয়ায়। আশ্চর্য মানুষ হেমনাথ। গাঁয়ের নানান ঝক্কি-ঝামেলা তাঁর মাথায়।

বড়োরা সব গল্পগুজব করছে। এমন সময় গ্রামের একটা কাজেই বেরিয়ে যান হেমনাথ।

এদিকে যুগলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলে বিনু। যুগল হেমনাথের বাড়ি থাকে, কাজ করে। মাছ ধরতেও ওস্তাদ সে। সেদিনই ধানখেতে 'চাই' পেতে ওকে প্রচুর মাছ ধরতে দেখল বিনু। থ বনে গেল সে। বাড়ির অন্যান্যরাও তাজ্জব।

বিকেল গড়াল। গল্পের আসর বেশ জমজমাট। হিরণও রয়েছে সেখানে। এম-এ পড়ে সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে।

ছোট্ট মেয়ে 'দুঃখী' ঝিনুকের বাবা এল ফিটন বাগিয়ে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(চার)

স্নেহলতা ঝিনুকের পিছু পিছু বড় বড় পা ফেলে ফীটনটার কাছে চলে এলেন। ...ন্দ-সুধা-হিরণ ছুটে এসেছে। শিবানীও ...সেছেন। সুনীতি ফীটন পর্যন্ত আসেনি। ...র থেকে বেরিয়ে উঠোনে নেমেই থেমে ...ছে। অবনীমোহন এবং সুরমা ঘর থেকে বেরোন। দরজার কাছাকাছি এসে দিশেহারার মতন দাঁড়িয়ে পড়েছেন। সবার দৃষ্টি আগন্তুকের দিকে।

বিনু একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। এই তবে ঝিনুকের বাবা!

বয়েস কত হবে ভবতোষের? চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, তবে পঞ্চাশের অনেক নীচে। ...চোটা অযত্নে আর অবহেলায় এলোমেলো; কত কাল যে চুলে চিরুনি পড়েনি! ...মস্ত মুখ সাদা-কালো অজস্র ...অঙ্কুরে ছেয়ে আছে। চোখের ...কোলে ঘন শ্যাওলার মতন কালচে দাগ; ...মণির চারধারে যে শ্বেত জমি এখন ...লাল—রক্ত যেন সেখানে জমাট বেঁধে ...আছে। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। হঠাৎ দেখলে মনে ...হয়, এই মাত্র শ্মশান থেকে ফিরলেন; ...তাঁকে ঘিরে দুর্বহ এক শোক রেখায়িত ...হয়ে রয়েছে।

ঘুম, বিশ্রাম, নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা—এসবের সঙ্গে বুঝি বা কয়েক যুগ সম্পর্ক নেই ভবতোষের। কেমন এক আচ্ছন্ন বিহ্বলতা তাঁকে বেষ্টন-করে আছে।

ঝিনুক ছুটে গিয়ে বাবার কোলে উঠেছিল। কল-কল করে একসঙ্গে অনেক কথা বলে গেল সে। তার কতক বোঝা গেল; বেশির ভাগ অবোধ্য থাকল। তবে বলার সুরে অভিমান আর রাগ যে জড়ানো সেটুকু অনায়াসেই টের পাওয়া গেল।

যেটুকু বোঝা গেছে তা এইরকম। ঝিনুক বলেছে, 'তুমি বললে মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ; যাবে আর আসবে। একমাস দুমাস হয়ে গেল, তুমি আর আসো না।'

ভবতোষ মলিন হেসেছেন, 'একমাস দু' মাস কি-রে, গেলাম তো পরশুদিন বিকেলবেলা।'

'মা কোথায়?'

ঝাপসা ভারী স্বরে ভবতোষ বলেছেন, 'হাসপাতালে রেখে এসেছি।'

'কবে আসবে?'

'চারদিন পরে নিয়ে আসব।'

ঝিনুকের সব প্রশ্নের উত্তর ঠিকই দিয়ে গেছেন ভবতোষ; তবে কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধের মতন গলার কাছের মোটা মোটা রক্তবাহী শিরাগুলো অস্বাভাবিক স্ফীত হয়ে উঠেছে। চোখ ফেটে হয়ত বা ফিনকি দিয়ে রক্তই ছুটত।

যাই হোক কদম ফুলের রেণুর মতন বাতাসে যে ফিন-ফিনে ইলশেগুঁড়ি উড়ছিল এখন আর তা নেই। তার বদলে শরতের ঝিরঝিরে বৃষ্টি আবার শুরু হয়ে গেছে।

স্নেহলতা বললেন, 'ঘরে চলো ভব, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ভিজে নেয়ে যাবে।'

'আবার ঘরে যাব? আমি বরং ঝিনুককে নিয়ে এখন যাই। পরে আসব'-খন।'

'ঝিনুককে নেবার জন্যেই ছুটে এসেছ নাকি?'

'হ্যাঁ; মানে—'

'সেজন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।' স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'তুমি ঘরে চলো তো। উঠোন পর্যন্ত এলে, ঘরে গিয়ে না বসলে কখনো হয়!'

আস্তে করে ভবতোষ বললেন, 'আচ্ছা চলুন—'

এমনভাবে কথাগুলো বললেন ভবতোষ, যাতে মনে হয়, নিজের ইচ্ছায় তিনি চলেন না। হয়ত নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কোন কিছুই তাঁর ওপর ক্রিয়া করে না। অন্যের খুশিতে অন্যের ইচ্ছায় সব সময় তিনি যেন নিজেকে সঁপে রেখেছেন।

অবনীমোহনরা যেখানে আছেন সেই ঘরটার দিকে পা বাড়ালেন স্নেহলতা; অন্য সবাই তাঁকে অনুসরণ করল।

যেতে যেতে স্নেহলতা শুধোলেন, 'ঢাকা থেকে কখন ফিরলে ভব?'

ভবতোষ বললেন, 'খানিক আগে। বাড়ি ফিরেই আপনাদের এখানে চলে এসেছি।'

'নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমার ধরেছিলে কখন?'

'দশটা নাগাদ।'

'চান-খাওয়া নিশ্চয়ই হয়নি?'

'স্টিমারে মিষ্টি-টিষ্টি খেয়েছিলাম।'

'মিষ্টি খেলে কখনও চলে। তোমার বাড়িতে তো রান্নাবান্না হয়নি; রাঁধবেই বা কে?'

ভবতোষ চুপ করে থাকলেন।

স্নেহলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ঘরে এসে একটু জিরিয়ে নাও; তারপর খেয়ে-দেয়ে বাড়ি ফিরবে।'

অন্যমনস্কের মতন ভবতোষ বললেন, 'আচ্ছা।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর ভবতোষ ডাকলেন, 'খুড়িমা—'

'কী বলছ?' চলতে চলতে পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে নিলেন স্নেহলতা।

'হেম কাকা আমার কাছে সেদিন ফীটনটা চেয়েছিলেন। কাদের আসবার কথা ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁরা এসেছেন?'

'হ্যাঁ। ঘরে চলো, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

ঘরে এসে অবনীমোহনদের সঙ্গে ভবতোষের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন স্নেহলতা। তারপর বললেন, 'এখন কিছু খাবে ভব?'

'না। তবে—'

'বলে ফেল না—'

'একটা জিনিস পেলে মন্দ হত না; কিন্তু আপনাদের এখানে তার প্রবেশ তো নিষিদ্ধ।'

স্নেহলতা বললেন, 'চা নিশ্চয়ই?' ভবতোষ মাথা নাড়লেন।

স্নেহলতা বললেন, 'এ বাড়িতে চা ঢুকে পড়েছে।'

অন্যমনস্ক ভাব আর মলিন বিষণ্ণতার মধ্যেও ভবতোষের চোখে বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। বললেন, 'কাকাবাবু তো পি সি রায়ের মন্ত্রশিষ্য; চা ঢুকতে দিলেন!'

'না দিয়ে উপায় কি।' স্নেহলতা হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনীদের আবার ঐ জিনিসটি না হলে চলে না।'

ভবতোষ বললেন, 'যাক, এ বাড়ি নিয়ে রাজদিয়ার সাত বাড়িতে তা হ'লে চা ঢোকার ছাড়পত্র পেল। এবার থেকে চায়ের লোভেও মাঝে মাঝে আসতে হবে।'

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'এ বাড়ি বাদ দিলে থাকে ছ' বাড়ি। ঐ ছ' বাড়ি ছাড়া রাজদিয়ায় চায়ের চল নেই নাকি?'

ভবতোষ মৃদু হাসলেন, 'না। হেম-কাকা নিজে পি সি রায়ের শিষ্য; সারা রাজদিয়াকেও তাই করে ছেড়েছেন। শুধু আমরা ক'জন পাষণ্ড তাঁকে অমান্য করে চলেছি।'

অবনীমোহনও হেসে ফেললেন।

একটু পর চা এল। স্নেহলতা বা শিবানীর চা-তৈরির অভ্যাস নেই; সুনীতিই করে এনে দিল।

চা খেতে খেতে ভবতোষ স্নেহলতার দিকে ফিরে বললেন, 'ঝিনুক কান্নাকাটি জুড়ে দ্যায়নি?'

'না।'

'আমার কথা বলেছিল?'

'মোটেও না। তবে—'

'কী?'

বিনুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে স্নেহ-লতা এবার বললেন, 'ঐ দাদাভাইটা আসার পর খুব হিংসে হয়েছে। জেদ করে, বায়না ধরে ওর সমান সমান ভাগ আদায় করেছে।' বলে তিনি হাসলেন।

ঘরের অন্য সবাইও হাসল। আর বিনু নেহাত অকারণেই হঠাৎ খুব লজ্জা পেয়ে গেল।

চা খাওয়া হলে তাড়া দিয়ে ভবতোষকে চান করতে পাঠালেন স্নেহলতা। পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে এ-ঘরেই আসন পেতে তাঁকে খেতে বসিয়ে দিলেন।

বিশাল ঘরের এক ধারে দুটো তক্ত-পোষ জোড়া দেওয়া। তার ওপর অবনী-মোহনরা বসে আছেন। তাঁদের দৃষ্টি ভবতোষের ওপরেই স্থির হয়ে আছে। এই মানুষটি সম্বন্ধে হেমনাথ এবং স্নেহ-লতা দুজনেই গাঢ় বিষাদময় কিছু ভূমিকা করে রেখেছিলেন। অবনীমোহনদের চোখ দেখে মনে হয়, সাগ্রহে বিষণ্ণমুখে কিসের যেন প্রতীক্ষা করছেন।

প্রায় নিঃশব্দেই খেয়ে যাচ্ছিলেন ভব-তোষ। আধাআধি খাওয়া হয়েছে, এমন সময় স্নেহলতা ডাকলেন, 'ভব—'

পাত্র থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ভবতোষ।

তক্ষুনি কিছু বললেন না স্নেহলতা। বলবেন কি বলবেন না, তাই নিয়ে মনে মনে খুব সম্ভব বোঝাপড়া করতে লাগ-লেন। অনেকক্ষণ পর দ্বিধান্বিত সুরে বলেই ফেললেন, 'কাল তোমার ফেরার কথা ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'এলে না যে?'

ভবতোষ উত্তর দিলেন না। ঝোলমাখা ভাতের ভেতর তাঁর হাত থেমে গেছে, কণ্ঠার কাছটা থরথর কাঁপছে।

স্নেহলতা আবার প্রশ্ন করলেন, 'এই দু'দিন কি বৌমাদের বাড়িতেই ছিলে?'

আস্তে মাথা নাড়লেন ভবতোষ, 'না।'

খানিক আগে চায়ের ব্যাপার নিয়ে লঘু কৌতুকের চিকচিকে একটু আভা ফুটেছিল। সমস্ত আবহাওয়া আবার অত্যন্ত ভারী কণ্টকর আর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল।

স্নেহলতা বললেন, 'কোথায় ছিলে তবে?'

'আমার এক বন্ধুর বাড়ি; টিকা-টুলিতে।' ভবতোষ বললেন।

'বৌমা কি সত্যি-সত্যিই আসবে না?'

'না।'

'তোমার শ্বশুরমশায় কী বললেন?'

এই ঘর বুঝি বায়ুশূন্য; শ্বাস টানতেও ভবতোষের কষ্ট হচ্ছে। অবরুদ্ধ গলায় বললেন, 'তাঁর কিছু বলবার নেই; মেয়েকে যথেষ্ট বকেছেন। বকাই সার।'

'শাশুড়ী?'

'তিনিও মেয়েকে প্রশ্রয় দ্যাননি; আমার সঙ্গেই ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এনে কী করব বলুন?'

বিমর্ষ সুরে স্নেহলতা বললেন, 'সে তো ঠিকই।'

ভবতোষ বলতে লাগলেন, 'আমার বন্ধুটি যার কাছে দু'দিন কাটিয়ে এলাম, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। একসঙ্গে ঢাকায় ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। তাকে পাঠিয়েছিলাম বোঝাবার জন্যে। কিন্তু—'

'কী?'

'ঝিনুকের মায়ের এক কথা; আমার সঙ্গে ঘর করবে না। রাজদিয়াতেও আর কখনও ফিরবে না।'

কেউ লক্ষ্য করেনি; একদৃষ্টে ভবতোষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সব কথা শুনে যাচ্ছিল ঝিনুক। ঠোঁট দুটো তার ভয়ানক কাঁপছিল; চোখের তারা জলের ভেতর ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ জোরে জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

সবাই চমকে ঝিনুকের দিকে ফিরল। ভবতোষ আর স্নেহলতা প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলেন, 'কাঁদছিস কেন ঝিনুক?'

ফোঁপানি থামেনি; ক্রমশ সেটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। এদিকে লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে হিরণ ঝিনুককে কোলে তুলে নিল। মাথায় চোখে-মুখে হাত বুলোতে বুলোতে, আদর করতে করতে বলতে লাগল, 'কাঁদে না, কাঁদে না। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে। ভালো মেয়ে—'

কাঁদতে কাঁদতে হে'চাকির মতন উঠতে লাগল ঝিনুকের। জড়ানো জড়ানো আধ-ফোটা আধভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'মা আর আসবে না।'

ভর্ৎসনার সুরে ভবতোষের দিকে তাকিয়ে হিরণ বলল, 'কেন যে তোমরা মেয়েটার সামনে এসব নিয়ে আলোচনা কর!' এর আগেও একবার এ ব্যাপারে স্নেহলতাকে বকেছে সে।

হিরণ দাঁড়াল না; ঝিনুককে নিয়ে বৃষ্টির ভেতরেই উঠোন পেরিয়ে ওধারের একটা ঘরে চলে গেল। আর এ-ঘরে সময় যেন গতি হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল।

ঝিনুকের সামনে এ প্রসঙ্গ তোলা যে খুবই অন্যায় হয়েছে, নীরবে সবাই তা অনুভব করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর পাতের ভাতগুলো নাড়া-চাড়া করে উঠে পড়লেন ভবতোষ।

স্নেহলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ও-কি, কিছুই তো প্রায় খেলে না। সবই পড়ে রইল।'

বিস্বাদ সুরে ভবতোষ বললেন, 'আমার আর খেতে ইচ্ছা করছে না খুড়িমা—'

স্নেহলতা পীড়াপীড়ি করলেন না।

আঁচিয়ে এসে ভবতোষ বললেন, 'হেম-কাকাকে তো দেখছি না।'

'উনি কেতুপুর গেছেন।' স্নেহলতা বললেন।

'কখন ফিরবেন?'

'সে কথা জিজ্ঞেস করো না বাপু। আজও ফিরতে পারেন, কালও পারেন, পরশুও পারেন। তোমার কাকাটিকে তো চেনই। আমি একটা সময় বলি, উনি হয়ত তখন এলেন না। মাঝখান থেকে আমি মিথ্যেবাদী সাজতে পারব না।'

ভবতোষ মৃদু হাসলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি তা হলে এখন যাই খুড়িমা—'

'এখুনি যাবে?'

'হ্যাঁ। সন্ধ্যে হয়ে এল। মেয়েটাকে নিয়ে আবার অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।'

'ঝিনুককে সত্যিই নিয়ে যেতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আপনাদের কাছে দু'দিন তো রইল; ভয়ানক দুষ্টু। তার উপর এঁরা সব এসেছেন—'

ভবতোষের ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন স্নেহলতা; নিজের দায়িত্ব ভার অকারণে অন্যের ওপর দিয়ে রাখতে তিনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন।

স্নেহলতা বললেন, 'আমার কাছে মাঝে মাঝে তো দিয়ে যাও; এখানে থাকার অভ্যেস ওর আছে; বেশ ভালই থাকে। দুষ্টুমির কথা বলছ? ওটুকু দুষ্টু সব ছেলে-মেয়েই। আর ওরা এসেছে তো কি হয়েছে। ওদের ভেতর হৈ-চৈ করে বেশ থাকবে; মায়ের কথা মনে পড়বে না। বরং—'

'বরং কী?'

একটু ইতস্তত করে স্নেহলতা বললেন, 'তোমার ওখানে তুমি একা। দিন-রাত তুমি তো লেখাপড়া নিয়েই আছো। ঝিনুকটা না পাবে একটা খেলার সঙ্গী, না পাবে কারো সঙ্গে কথা বলতে। ও এখানেই থাক।'

ভবতোষ আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার মনটা ভাল নেই খুড়িমা, আজ ও চলুক। দু-একদিন পর না হয় দিয়ে যাব।'

চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল আসার মতন অদৃশ্য গোপন পথে অনেকখানি দুঃখ এই ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্নেহলতা বুঝতে পারলেন আজকের দিনটা অন্তত ঝিনুককে

কাছে পাওয়া দরকার ভবতোষের ; মেয়ের সঙ্গ তাকে খানিক সান্ত্বনা দিতে পারে। গাঢ় সহানুভূতির সুরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, নিয়েই যাও।'

ভবতোষ বললেন, 'রাগ করলেন না তো খুড়িমা?'

'পাগল ছেলে; তোমার ওপর কি রাগ করতে পারি।'

একটু চুপ করে থেকে ভবতোষ বললেন, 'এখন থেকে ঝিনুকের সব দায়িত্বই আপনাকে নিতে হবে। আমার কলেজ খুললে ওকে কে দেখবে। আপনি ছাড়া মেয়েটাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না; নির্ঘাৎ ও মরে যাবে।'

'ওসব আজে-বাজে কথা বলতে নেই।'

'তা হলে এখন যাই?'

'এসো।'

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে অবনীমোহনের কথা মনে পড়ে গেল ভবতোষের। ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের বাড়ি একদিন বেড়াতে যাবেন।'

অবনীমোহন বললেন, 'আপনিও আসবেন।'

'আসব।'

শরতের বৃষ্টি; এই আছে এই নেই। একটু আগের সেই স্বল্পায়ু সৌখিন বর্ষণ থেমে গেছে। ভবতোষ ঘর থেকে বাইরে এলেন; আর সবাইও সঙ্গে সঙ্গে এল।

ডাকাডাকি করে ও-ঘর থেকে ঝিনুক আর হিরণকে বার করলেন স্নেহলতা। কি একটা মজার কথা হচ্ছিল দুজনের; খুব হাসতে হাসতে ওরা এল। এর মধ্যেই ঝিনুককে ভুলিয়ে টুলিয়ে অন্যমনস্ক করে ফেলেছে হিরণ।

ফীটনটা উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল। স্নেহলতা বললেন, 'ঝিনুককে গাড়িতে তুলে দে হিরণ।'

হিরণ বলল, 'ও কি এখন চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

ভবতোষ ইতিমধ্যে ফীটনে উঠে বসেছেন। ঝিনুককে তাঁর পাশে বসিয়ে দিতে দিতে হিরণ বলল, 'সারাদিন তো রইলাম, ভবদার গাড়িতে আমি বরং চলেই যাই ঠাকুমা।'

'উঁহু—'

'কেন, আর কোন কাজ আছে?'

'কাজ নেই। তবে তোমার যাবার হুকুমও নেই।'

দাদু না এলে ছাড়া পাব না?'

'না।'

'অগত্যা।'

ফীটন চলতে শুরু করল; দেখতে দেখতে উঠোন, বাগান পেরিয়ে ঝিনুকেরা রাস্তায় গিয়ে উঠল। আর অবনীমোহনরা ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে এলেন।

ঘরে এসে স্নেহলতা বললেন, 'ভবতোষের বৌর মত মেয়েছেলে জীবনে আর দেখিনি; সংসারটা একেবারে ছারখার করে দিলে।'

সুরমা বললেন, 'কী এমন হয়েছে যে, [illegible]

'সন্ধ্যে হয়ে এল, এসময় ঐ অলক্ষ্মীর কথা থাক।'

ভবতোষরা চলে গেছেন; এ-বাড়ির ওপর বিবাদের প্রচ্ছদ এখনও অনড় হয়ে আছে। বিনু কারো কথা শুনছিল না; জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। সেই সকাল থেকে দাদুর ভাগ নিয়ে, মাছের ভাগ নিয়ে, কলা আর রসগোল্লার ভাগ নিয়ে সমানে হিংসে করেছে ঝিনুক। তবু হিংসুটি মেয়েটার জন্য বিনুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

*

একটু পর সন্ধ্যে নেমে এল।

মাঝে মাঝে ঝির-ঝিরে এক-আধ পশলা বৃষ্টি ছাড়া শরতের দিনটা ছিল বেশ নির্মল; তার গায়ে ছিল নরম সোনালী আভা মাখানো। দেখতে দেখতে জলে কালি গুলে দেবার মতন হাওয়ায় হাওয়ায় কেউ বুঝি কালচে রং মিশিয়ে দিতে লাগল। এই রঙ মেশানোর খেলাটা চলল অনেকক্ষণ। তারপর অন্ধকার গাঢ় হয়ে ঝপ্ করে এক সময় রাত্রি নেমে এল।

কলকাতার ফেনায়িত কলরব থেকে এত দূরে বিজলী আলোর দাক্ষিণ্য এসে পৌঁছয়নি। জানলার বাইরে যতদূর চোখ যায় গাছপালা ঝাপসা দেখাচ্ছে। তৃতীয় ঋতুর এলোমেলো বাতাসে সুপারিবন অল্প অল্প দোল খাচ্ছে; আমবাগানটাকে কেমন ভুতুড়ে মনে হয়। পুকুরটাকে আর চেনাই যায় না। তার ওপারে ধানখেতে মিটমিটিয়ে জোনাকি জ্বলছে—জ্বলছে আর নিভছে; নিভছে আর জ্বলছে। দিগন্ত পর্যন্ত ধানের মাঠটা যেন একখানা জামদানি সাড়ি; জোনাকিরা তার গায়ে আলোর চুমকি।

স্নেহলতা ইতিমধ্যে ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন; তা ছাড়া কাঠের তিনতলা পিলসুজে রেড়ির তেলের আলোও জ্বলছে। তবু ঘরগুলো পুরোপুরি আলোকিত না; এ-কোণে সে-কোণে অন্ধকার যেন জুজুবুড়ি হয়ে বসে আছে।

সেই পুব-দুয়ারী ঘরখানায় অবনীমোহন, সুধা, সুনীতি আর বিনু এখন বসে আছে। স্নেহলতা শিবানী রান্নাঘরে; রাতের জন্য আনাজ-টানাজ কুটছেন। সুরমা কাছাকাছি বসে এ-গল্প সে-গল্প করছেন। এতকাল পর মামী মাসিকে পেয়ে কথা আর তাঁর ফুরোচ্ছে না।

জানলার বাইরে চোখ মেলেই ছিল বিনু; ধানখেতে জোনাকির নাচানাচি ওড়াওড়ি ছাড়াও মাঝে মাঝে আরো কিছু আলো ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল। ওগুলো কিসের আলো, বুঝতে পারছিল না বিনু।

জোনাকি আর মাঝে মাঝে ধানখেতে আলোর ঐ বিন্দু ক'টি ছাড়া চারধার শুধু অন্ধকার—গাঢ় অথৈ অতল অন্ধকার।

পূর্ব বাঙলার এই সুদূর প্রান্তে এত অন্ধকার জমা হয়ে থাকবে আর সন্ধ্যে নামতে না নামতেই ঝুপ ঝুপ করে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে, কে জানতে পেরেছিল! কলকাতায় রাত্রি টেরই পাওয়া যায় না; সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে আলোর ফোয়ারা ছুটে যায়। আলোকিত নিশীথের যে স্বপ্নময়তা—চিরদিন তাতেই অভ্যস্ত বিনু। কিন্তু এখানকার রাত্রি প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে আছে। সে আছে আকাশ-বাতাস-জল-স্থল সব কিছুর ওপর ব্যাপ্ত হয়ে। শুধু অচেতন জড় পৃথিবীর ওপর নয়; বুঝি-বা জীব-জগতের অস্তিত্বের ভেতর, তার গভীর মর্মমূল পর্যন্ত এই রাত্রি ছড়িয়ে আছে।

পূর্ব বাঙলার অন্ধকার যেন এ গ্রহের নয়; পাতালের নিবিড় অলৌকিক তমসা। বিনুর মনে হতে লাগল, এ অন্ধকার কোনদিন ফুরোবে না। আজকের রাত শেষ হয়ে দিনের আলো আবার দেখা দেবে, এমন ভরসা মনের কোথাও খুঁজে পেল না বিনু।

খুব কাছ থেকে কে যেন ফিসফাসিয়ে ডাকল 'ছুটোবাবু—'

বিনু চমকে উঠল। ভয়ও পেয়ে গেল খুব। চেঁচিয়েই উঠত; তার আগেই দেখতে পেল জানলার ঠিক ওধারে একটু কোণের দিকে ভূতের মতন যে দাঁড়িয়ে আছে সে যুগল।

চোখাচোখি হতেই যুগল আগের সুরেই বলল, 'আসেন—'

'কোথায় যাব?'

'আসেন না—'

'বাইরে বড্ড অন্ধকার।'

'আন্ধারে (অন্ধকারে) ডর লাগে নাকি?' কেমন করে যেন হাসল যুগল।

ভয়ের কথায় পৌরুষে খোঁচা লাগল। গম্ভীর গলায় বিনু বলল, 'মোটেও না।'

'তয় (তবে) আইসা পড়েন।'

অবনীমোহনরা কথা বলছিলেন। ও-বেলার মতন চুপিসারে বেরিয়ে যাচ্ছিল বিনু; হঠাৎ সুধার চোখে পড়ে গেল।

সুধা বলল, 'এই কোথায় যাচ্ছিস রে?'

বিনু বলল, 'বাইরে।'

অবনীমোহন হিরণের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখ ফেরালেন, 'বাইরে কী?'

একটু চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'যুগল ডাকছে।'

'যুগলের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে দেখছি; আচ্ছা যা—'

বিনু ছুট লাগাতে যাচ্ছিল, সুধা বাধা দিল, 'না, যেতে হবে না। ঐ খুনখুটি অন্ধকারে গিয়ে এক কাণ্ড করে বোসো; আমরা পাগল হয়ে যাই—'

বাধা পেয়ে বিনু ক্ষেপে গেল। চোখ দিয়ে আগুনের হল্কা ছুটতে লাগল যেন। স্টিমার ঘাটে পারেনি; এখন তার পুরোপুরি শোধটুকু তুলে নিল। জিভ ভেংচে টেনে টেনে বলল, 'পা-গ-ল হ-য়ে যা-ই! চুপ কর বাঁদরী; তোর বেশি ওস্তাদি করতে হবে না।'

সুধা আর বিনুর মধ্যে সম্পর্কটা নিয়ত শত্রুতার; চোখাচোখি হলেই তাদের

যুদ্ধ। মাঝে মাঝে সন্ধি অবশ্য হয় ; কিন্তু তা সাময়িক। দু-চার ঘণ্টার বেশি তার আয়ু নয়। তার পরেই সব চুক্তি, সব শর্ত ছুঁড়ে দিয়ে তারা পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বারুদ সব সময় কামানে পোরাই আছে, যে কোন কারণে যে কোন সময় যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে যেতে পারে।

এই অজানা ভুবনে অচেনা মানুষের ভিড়ে প্রায় গোটা একটা দিন কেটে গেল ; দু-ভাই-বোনের লড়াই এখনও জমেনি। নতুন পরিবেশটা একটু সইয়ে নেবার শুধু অপেক্ষা।

সুধার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। নেহাৎ হিরণ রয়েছে, নইলে এতক্ষণে তার নখে বিনুর গালের ছাল উড়ে যেত। সে-ও অবশ্য অক্ষত থাকত না ; এক খামচা চুলের স্বত্বও তাকে ছাড়তে হত।

চকিতে হিরণকে একবার দেখে নিল সুধা। হিরণের শক্তবন্ধ চাঁপা ঠোঁটের ফাঁকে যা আবছাভাবে ফুটে আছে তার নাম হাসি কিনা, বুঝতে পারা গেল না। দ্রুত চোখ ফিরিয়ে সে চেঁচামেচি করে উঠল, 'দেখছ বাবা, দেখছ —কিরকম অসভ্য হয়ে উঠেছে বিনুটা!'

অবনীমোহন হাসতে লাগলেন।

সুধা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তুমি হাসছ বাবা!'

অবনীমোহন বললেন, 'হাসব না তো করব কী?'

সুধা গলার স্বর আরেক পর্দা তুলল, 'আদর দিয়ে দিয়ে তুমি ওটাকে একটা আস্ত বাঁদর করে তুলছ।'

'আদর তো আমি তোকেও দিই। বিনু বাঁদর হলে তুই কী?'

সুধা চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা!'

ছেলেমেয়েদের পেছনে লাগার স্বভাব আছে অবনীমোহনের ; তিনি সমানে হাসতে লাগলেন। হিরণের ঠোঁটদুটো আরো শক্ত হয়ে গেছে ; ভেতরে কিছু একটা চলছিল। বুদ্বুদের মতন ফুটি ফুটি করেও বেরিয়ে আসতে পারছে না।

বিনু আর দাঁড়াল না ; পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগুতে লাগল। সুধা বলল, 'ওকে তুমি বারণ কর বাবা, কিছুতেই বাইরে যেতে পারবে না।' সুধার যেন জেদই চেপে গেছে। সে-ও যে বিনুর অভিভাবক, তার ইচ্ছাকে ডিঙিয়ে বিনুর কোথাও যাবার যে উপায় নেই, হিরণের সামনে প্রাণপণে সেটাই প্রমাণ করতে চাইছিল সুধা।

অবনীমোহন হাসি থামিয়ে শান্ত গলায় মেয়েকে বোঝাতে লাগলেন, 'এখানে আমাদের মাঝখানে বেচারী মুখ বুজে বসেছিল। যাক না, যুগলের সঙ্গে—'

অবনীমোহন শেষ করতে পারলেন না ; সুধা হঠাৎ প্রবল বেগে হাত-পা এবং মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল। তবে সে আর কিছু বলার আগেই লাফ দিয়ে বিনু বাইরে বেরিয়ে গেল।

বারান্দায় এসে কারোকে দেখতে পাওয়া গেল না। তবে কি যুগল চলে গেছে? আস্তে আস্তে বিনু ডাকল, 'যুগল—যুগল—'

ঘরের ভেতর থেকে আভাষ পেয়ে উঠোনে নেমে গিয়েছিল যুগল ; অন্ধকার ফুঁড়ে সে কাছে এসে দাঁড়াল, 'এই যে ছুটোবাবু—'

'ওখানে কী করছিলে?'

উত্তর না দিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল যুগল। হাসতে হাসতেই বলল, 'ঘরের ভিতরে যা হইতে আছিল ; ঐখানে খাড়াইয়া (দাঁড়িয়ে) থাকতে সাহস হয় নাই। ছুটো দিদি বুঝি আপনেরে আসতে দিতে চায় না?'

'হুঁ, আমাকে ও আটকাবে!' বীরের মতন ভঙ্গি করে বিনু বলল, 'কী জন্যে ডাকছিলে বল—'

'আসেন আমার লগে (সঙ্গে)।'

'কোথায়?'

'গেলেই দেখতে পাইবেন।'

নিঃশব্দে অন্ধের মতন যুগলকে অনুসরণ করতে লাগল বিনু। উঠোন পেরিয়ে তারা প্রথমে এল রান্নাঘরে। দরজার বাইরে থেকে যুগল ডাকল, 'ঠাকুমা—'

স্নেহলতা সাড়া দিলেন, 'কে, যুগল?'

'হ।'

'কিছু বলবি?'

আপনার কাছে সেইদিন যে বড় 'বরি'টা (বঁড়শি) দিছিলাম, সেইটা দ্যান। পুকৈরে শোল আর বোয়াল বা যাই মারতে আছে—'

'বরি' কী বুঝতে পারল না বিনু।

স্নেহলতা শুধোলেন, 'আবার বুঝি মাছের পেছনে লাগতে যাচ্ছ?'

যুগল ঘাড় চুলকোতে লাগল।

স্নেহলতা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'পাট তোলা হয়ে গেছে?'

'হ।'

হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়লেন স্নেহলতা। তারপর সামনের দেয়ালের উঁচু তাক থেকে প্রকাণ্ড একটা বঁড়শি বার করে বললেন, 'এই নে—'

রান্নাঘরের ভেতর থেকে হারিকেনের আলো বাইরে এসে পড়েছিল। বঁড়শি দিতে গিয়ে বিনুকে দেখতে পেলেন স্নেহলতা। বললেন, 'এ-কি, দাদাভাইকেও জুটিয়ে নিয়েছিস দেখছি।'

এক ফাঁড়া কাটিয়ে এসেছে, আবার নাকি বাধা পড়ে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বিনু বলে উঠল, 'বাবাকে বলে এসেছি।'

সুরমা ভেতর থেকে বললেন, 'ওর সঙ্গে যুগল, যোগো। অন্ধকারে বেশি হুটোপুটি কোরো না।'

বিনু তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাৎ করল, 'আচ্ছা।'

খানিক পর বিনুকে সঙ্গে নিয়ে উঠোন-বাগান পেরিয়ে পুকুরের কাছে চলে এল যুগল। অন্ধকারে বিনুর ভয় ভয় করছিল কিন্তু সে-কথা তো আর যুগলকে বলা যায় না।

ঘরে বসে দেখতে পাওয়া যায়নি ; পুকুরপাড়ে এসে বিনু দেখতে পেল শরতের

উজ্জ্বল নীলাকাশে সরু একফালি চাঁদ। শরতের চঞ্চল ভারহীন মেঘ তার মুখে মাঝে মাঝে পর্দা টেনে পরক্ষণেই নিরুদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে।

চাঁদ আছে ঠিকই কিন্তু আলো নেই। আলো বলতে দূরে ধানখেতে রাশি রাশি জোনাকি। আলোর ছুঁচের মতন অন্ধকারকে তারা অবিরাম বিঁধে যাচ্ছে।

অন্ধকারেই বঁড়শিতে (ইতিমধ্যে ‘বাঁর’ কী জেনে নিয়েছে বিনু।) শক্ত মোটা সুতো পরাল যুগল। তারপর একটা জ্যান্ত টাকি মাছ গেঁথে বলল, ‘ছুটোবাবু, আমি ঐ গাছটায় উইঠা ‘বাঁর’টা বাইন্ধা দিমু। হলে (নিচে) একা-একা খাড়াইয়া থাকতে ডর লাগব না তো?’

শুনেই বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল, এখানে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে হলে নির্ঘাত দম আটকেই সে মরে যাবে। কিন্তু তা বলা গেল না। তার বদলে বীরত্ব ফলাতে হল, ‘একটুও ভয় লাগবে না।’ বলল বটে, স্বরটা কিন্তু কেমন কাঁপা-কাঁপা শোনাল।

পুকুরের গা ঘেঁষেই একটা ঝুপসি আমগাছ। তার গোটা-দুই ডাল পুকুরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। চোখের পলকে তরতর করে উঠে গিয়ে টাকি মাছের টোপ-সুদ্ধ বঁড়শিটা জলে নামিয়ে দিলে যুগল; তারপর অন্য সুতো ডালে বেঁধে দিয়ে প্রায় তক্ষুনি নেমে এল।

যতক্ষণ যুগল গাছে ছিল, নিশ্বাস

কে দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। যুগল নেমে ধীরে ধীরে বুকের ভেতরকার আবদ্ধ াস বার করে দিল সে।

পুকুর তোলপাড় করে মাছেরা লাফা- ফ করছিল। যুগল বলল, 'শুনতে ছেন ছুটোবাবু?'

বিনু যুগলের কাছে আরেকটু ঘন এল। ক্ষীণ ভীত সুরে বলল, 'ও সের আওয়াজ?'

বিনুর স্বরটা খেয়াল করেনি; যুগলের ন-জ্ঞান তখন পুকুরের দিকে। লোভী ফিস গলায় সে বলল, 'মাছ, ছুটোবাবু, । মনে লয়, সাই (প্রকাণ্ড) বোয়াল আর তল (কাতলা)। দুইটাই রাইক্কইসা মাছ; খাড়ন। অখনই শালারা বড়শি গিলা লাইব।'

চারদিক নিঝুম, জনহীন। অবশ্য পঙ্গাড়ে আর নিবিড় বনানীর ফাঁকে র্ঝিদের জলসা বসেছে। একটানা ঝিল্লি- র শুনতে শুনতে দুজনে পুকুরপাড়ে াঁড়িয়ে রইল।

যুগল আবার কি বলতে যাচ্ছিল, সেই ময় দেখা গেল দূরের ধানখেত চিরে ালোর কটি বিন্দু দুলতে দুলতে াগিয়ে আসছে।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলো কিসের ালো যুগল?'

যুগল একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ইল। তারপর বলল, 'নাও (নৌকা) মনে য়।'

যুগলের অনুমানই ঠিক। আরেকটু াছাকাছি আসতে টের পাওয়া গেল, নৌকোই। বৈঠা টানার ছপ্ ছপ্ আওয়াজ নতে লাগল।

হঠাৎ দুটো হাত মুখের কাছে চোঙার তন ধরে যুগল চেঁচিয়ে উঠল, 'কোন্ রের নাও?' স্বরটা শরতের বাতাসে াঁপতে কাঁপতে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

একটু পর দূর থেকে কাঁপতে কাঁপতে ড় এল, 'কেতুপুরের নাও—'

'নাও যায় কই?'

'হ্যামবাবুর (হেমবাবুর) ঘাটে।'

যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিনুকে লল, 'বড়কত্তায় ফিরা আইল বুঝি।'

বিনু বুঝতে পেরেছিল। তবু বলল, দাদু?'

'হ।'

দেখতে দেখতে ছইঅলা বড় একখানা নৌকো ঘাটে এসে লাগি পড়ল। ছইয়ের লায় দুটো হারিকেন জ্বলছিল। আলো নিয়ে প্রথমে দুজন মাঝি নামল, তাদের পিছু পিছু হেমনাথ; হেমনাথের পেছনে অলা হাতে আরো দুটো মাঝি। হারিকেন ছাড়াও হাতে কলাপাতা দিয়ে মুখ বাঁধা বড় বড় হাঁড়ি আর প্রকাণ্ড এক রুই মাছ ঝুলছে।

ঘাট থেকে ওপরে উঠতেই সামনের মাঝিদুটোকে চিনতে পারল বিনু; ওবেলা এরা এসেই হেমনাথকে কেতুপুর নিয়ে গিয়েছিল। পেছনের দু'জন অবশ্য অচেনা। খুব সাধারণ মাঝি বা চাষীশ্রেণীর লোক বলে তাদের মনে হল না। দু-জনেই প্রৌঢ়; পরনে পা-জামা আর ফুল শার্ট। মচমচ আওয়াজে টের পাওয়া যাচ্ছে তাদের পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। হারিকেনের আলোয় সোনার বোতাম আর আংটি ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। মাথায় সাদা টুপি, গালে চাপ দাড়ি। দূর থেকেও আতরের ভুরভুরে উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে। গ্রাম্য হলেও দুজনের চেহারায় বেশ সম্ভ্রান্ত ছাপ আছে।

কাছাকাছি আসার আগেই যুগল ফিস- ফিসিয়ে বলল, 'আমি যাই। বড়কত্তায় আসছে; ঠাকুরমারে খবরটা দেই গিয়া—' বলে আর দাঁড়াল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল।

একটু পর সবাই কাছে এসে পড়ল। বিনুকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'এ কি দাদাভাই, এই রাত্রিবেলা একা একা তুমি পুকুরপাড়ে এসেছ!'

বিনু বলল, 'একা আসিনি; যুগল আমাকে নিয়ে এসেছিল।'

হেমনাথ রেগে গেলেন, 'কোথায় সেই হারামজাদা? তোমাকে একলা ফেলে গেল কোন্ চুলোয়?'

'তুমি এসেছ, দিদাকে সেই খবরটা দেবার জন্যে এই মাত্তর বাড়ি গেল।'

হেমনাথ আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, পেছন থেকে সেই প্রৌঢ় মুসলমান দু'জন সামনে এগিয়ে এল। একজন শুধলো, 'এ কে ঠাউর ভাই (ঠাকুর ভাই অর্থাৎ দাদা)?'

হেমনাথ বললেন, 'নাতি, ওরাই আজ সকালে কলকাতা থেকে এসেছে।'

প্রায় ছুটেই বিনুর সামনে চলে এল প্রৌঢ়; বাজপাখির মতন ছোঁ মেরে নিমেষে তাকে বুকের ভেতর তুলে নিল। বাড়ি পর্যন্ত বুকের ভেতর বন্দী হয়েই আসতে হল বিনুকে।

বিনু অবশ্য উসখুস করেছে; হাত ছাড়িয়ে নামবার চেষ্টা করেছে। প্রৌঢ় ছাড়েনি; ঠোঁট টিপে টিপে দুষ্টুমির হাসি হেসেছে আর বলেছে, 'ছাড়ুম না, কিছুতেই ছাড়ুম না। বুকের পিঞ্জরে ধইরা রাখুম।'

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

সকলের তরে

জীবন সংগ্রামের পথে মেয়েরা অনেক ধাপ পেরিয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে ক্রমেই তারা আরো আলোর প্রত্যাশী। তুলনামূলক বিচারে দেখা যাবে, পুরুষদের ব্যাপক সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় মেয়েরা পিছিয়ে থাকলেও তাদের অগ্রগতি সকলের মধ্যেই বেশ কৌতূহলী মনোভাব সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর অনেক দেশে কোন কোন ব্যাপারে তারা সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় পুরুষদেরও ছাড়িয়ে গেছে। মোটামুটিভাবে সব দেশেই নারীমহল বেশ সজাগ। কেউ পুরুষদের আর নির্দ্ধিধায় পথ চলতে দিতে রাজী নয়। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার প্রচন্ড তীব্রতার মধ্য দিয়ে জয়ী হয়ে তবেই জয়ের মুকুট মাথায় পরার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তুড়ি মেরে বা ফাঁকি দিয়ে কাজ সেরে বাহবা কুড়োবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

আমাদের মেয়েরাও এসম্বন্ধে পুরো হুঁশিয়ার। জীবনের পথ চলতে গিয়ে অভিজ্ঞতায় তারা শিখেছে অনেক। তাই এবার তারা সতর্ক এবং শক্ত-সমর্থও। হঠাৎ ভুলে একটা কেলেঙ্কারী করে বসার আশঙ্কা এখন অনেক কমে এসেছে। পুরুষদের সঙ্গে জোর লড়াই করেই তারা নিজেদের স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারে মেয়েরা উৎসাহ-জনক সাফল্য অর্জন করছে। কিছুদিন আগেও এতটা ঠিক আশা করা যেতো না। বিশেষ করে, নানা পরীক্ষায় তাদের ব্যাপক সাফল্য রীতিমত অনেকের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

পরীক্ষার বাইরে জীবিকার সংগ্রাম, জীবনের বিরাট আঙিনায় সেই সংগ্রামেও তারা ধৈর্য এবং স্থৈর্য সহকারে বিরাট বা অসামান্য না হলেও মোটামুটি সন্তোষ-জনক সাফল্য অর্জন করেছে। সাম্প্রতিক কালে, দুদিন আগের প্রায় অচিন্তনীয় জীবিকায় তাদের স্বচ্ছন্দ আনাগোনায় নতুন দিনের অনেক কল্পনা রঙীন ছবি হয়ে আমাদের চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে। অনেক সংগ্রামের ঐতিহ্য অতিক্রম করে আজ আমরা এস্তরে উপনীত। তাই ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখা কিছু একটা অন্যায় হবে না।

তবে এপ্রসঙ্গে সবচেয়ে যা বেদনাদায়ক মনে হয় তা হলো, অগ্রগতির এই মহাযজ্ঞ থেকে একটা বিরাট অংশই বাদ পড়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে একথা পৌঁছে দেবার এবং তাদের চলার পথের সাথী করে নেবার লোকের বড় অভাব। শহর বা শহরের উপকণ্ঠে যাদের বাস তাঁরা মোটামুটি সবাই এই সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির অংশীদার শহর থেকে অনেক দূরে থাকে। সেই নারীসমাজ কিন্তু এই অগ্রগতি সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল নয়। তাই তারা এপথে হাঁটতে পারছে না।

বাটিক প্রদর্শনী

তবে আধুনিকতার খবর তাদের কাছে পৌঁছে গেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই আধুনিকতা তারা অর্জন করতে চায় পোশাক-আশাকের মাধ্যমে। উগ্র রূপচর্চা তাদের মধ্যেও বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এব্যাপারে তারা ছুটে চলেছে। তাই আজকাল চট করে পোশাক-আশাকে গ্রাম ও শহরের মেয়ের মধ্যে পার্থক্য বার করা সম্ভব নয়। বরং মাঝে মাঝে কিরকম গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে যাই, হদিশ করে উঠতে পারি না আধুনিকতা শুধু পোশাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিনা!

এ সংশয়ের যোগ্য উত্তর দেবার কেউ নেই। কারণ আমরা সবাই মিলে চলতে চাইনি। চলার পরিধি বিস্তৃত হলেও সকলের কাছে সেকথা পৌঁছে দিতে ভুলে গেছি। অথবা সাফল্যের উন্মাদনায় তাদের কথা মনে পড়েনি। এখন প্রয়োজন, সে ভুলটুকু শুধরে নেওয়া। অগ্রগতির যে ঢেউ আমাদের নাড়া দিয়েছে সেকথা সবাইকে জানিয়ে যাঁরা তাঁদেরও আমাদের পথে টেনে নিতে পারি তবেই নারী অগ্রগতির কঠোর ব্রত উদযাপন আমাদের সার্থক হবে।

শিল্পোজ্জ্বল প্রদর্শনী

দক্ষিণ কলকাতার 'নারী সেবা সঙ্ঘ' স্বক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পবিভাগে শিক্ষালাভ করে অনেকেই জীবন ও জীবিকার নিশানা খুঁজে পেয়েছেন। আবার অনেকে এখানেই নিযুক্ত আছেন শিক্ষকতার কাজে অথবা শিল্প

...ভাগের কর্মী হিসেবে। শিল্পবিভাগের ...কার্থীরা সংঘের আবাসিক। কেউ কেউ ...শ্য বাইরে থেকেও ক্লাস করেন। এছাড়া ...খানে শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার ...বন্দোবস্তও আছে। সকলের পক্ষেই এই ...ক্ষা বাধ্যতামূলক।

এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন ছিল এক ...মুহূর্ত। দেশবিভাগ-পরবর্তী অধ্যায়ে ...বাস্তু নারীদের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা ...র এই প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনার বন্ধ খাঁচা ...কে মুক্তিলাভ করে। তারপর থেকে সমাজ-...বার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান বরাবর বিশিষ্ট ...মিকা নিয়ে আসছে।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতের কাজের ...র্ষিক প্রদর্শনীর আসর বসে প্রতি বৎসর। ...র্গাপূজার আগের দিকে। এই প্রদর্শনীর ...র একটা উদ্দেশ্য তাই প্রিয়জনকে উপহার ...বার মত সামগ্রী দর্শক-ক্রেতার সামনে তুলে ...রা, সেইসঙ্গে নিজেদের নৈপুণ্যকে প্রকাশ ...রা।

নারী সেবা সংঘের প্রদর্শনী যে সত্যি ...ক আকর্ষণীয় বস্তু একথা সেখানে উপ-...স্থিত না থাকলে সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায় ...। দর্শক-ক্রেতার ভিড়ে আর মনোরম ...জিনিসের সমাবেশে সে এক দর্শনীয় দৃশ্য। ...ত সুন্দর জিনিসের সমাবেশ একটিমাত্র ...প্রদর্শনীতে দেখা যায় না। তাই একটু ...বিস্মিত হয়েছিলাম। আমার এই বিস্ময় ...ক্ষ্য করে মৃদু হেসে একজন জানালেন, ...সব জিনিসই বিক্রি হয়ে যাবে। বাক্সবন্দী ...রো যা আছে তাও থাকবে না। জিজ্ঞেস ...করেছিলাম, সেগুলি কি এরকমই সুন্দর? ...তিনি জানালেন, আমাদের সব জিনিসই গুণ-...তে উৎকর্ষে সমান। আরো জানলাম, এ ...অঞ্চলের অনেকেই পূজার বাজার এখান ...থেকেই সারেন। কারণ এতে শুধু অর্থের ...সাশ্রয়ই হয় না জিনিসও ভাল পাওয়া যায়। ...তাছাড়া প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা তো ...হচ্ছেই।

এবারকার প্রদর্শনীতে বাচ্চাদের নানা ...ডিজাইনের জামাগুলি সত্যি আকর্ষণীয় ...য়েছে। আধুনিকতায় এখানকার কর্মী এবং ...শিক্ষার্থীরা যে কারো তুলনায় দড় নয়, একথা ...সহজেই বোঝা যায়। তাছাড়া আছে বাটিকের ...ভাণ্ডার। সুন্দর সুন্দর ছাপা শাড়ি আরো ...কত জিনিস। দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় ...হয়ে যাচ্ছিলাম। জানালার পর্দা, বিছানার ...চাদর সব জিনিসগুলি ঝলমল করে শোভা ...পাচ্ছে। আর শিক্ষার্থী ও কর্মীরা সব ...জিনিস খদ্দের ও উৎসাহী দর্শককে চিনিয়ে-...জানিয়ে দিচ্ছেন।

নারী সেবা সংঘের আরো অনেক পরি-...কল্পনা আছে। ক্রমে ক্রমে সেসব বাস্তবে ...রূপায়িত হলে এখানে আরো অনেক মেয়ে ...আশ্রয় পেয়ে জীবন ও জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত ...হবেন। এজন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সবসময়ই ...সচেতন। তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন ...তাঁদের পরিকল্পনা রূপায়ণে।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। অব-...কিছু মিলিয়ে মনে তখন এক অদ্ভুত ...প্রতিক্রিয়া। প্রদর্শনী ও প্রতিষ্ঠানের আরো ...[illegible]

মেয়ে এখানে আশ্রয় পাবে, কাজ শিখবে এবং তাঁদের হস্তশিল্প আরো উৎকর্ষ লাভ করবে এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে! এরকম প্রতিষ্ঠানের যত শীঘ্র সম্ভব উন্নতি আমার মতো আর সকলেরও কাম্য।

—প্রমীলা

বিবাহ-বিচ্ছেদ

পৃথিবীর বুকে জীবসৃষ্টির যে রহস্য আবহমানকাল ধরে চলে আসছে, তার পিছনে লুকিয়ে আছে নারী ও পুরুষের মিলনগাথা। পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে বয়ে চলেছে এই মিলনস্রোত। কিন্তু সেই স্রোতের মাঝে আজ যেভাবে বিরাট বিচ্ছেদের বাঁধ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে তাতে সারা পৃথিবীতে আজ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হতে চলেছে।

এতদিন কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতার সংবিধানেই বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন লিপিবদ্ধ ছিল। আজ সে আইন এদেশেও ঢেউ তুলেছে। শুধু আচার-ব্যবহার চাল-চলন কিংবা খাওয়া-পরার ক্ষেত্রেই নয়, ঘর-ভাঙার ক্ষেত্রেও আমাদের দক্ষতার অন্ত নেই। কিন্তু এই দক্ষতা সভ্যতার পরিচায়ক কিনা সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বোধ হয় নয়—বোধ হয় কেন, প্রকৃতই নয়। এটা সভ্যতারূপী একটা মানুষের অঙ্গে দুরারোগ্য একটা ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বর্তমানে বিবাহ-বিচ্ছেদের অসংখ্য মামলা ঝুলছে আদালতের দ্বারে। এ ধরনের মামলার সংখ্যা অবশ্য আমেরিকাতেই বেশী, কিন্তু আমাদের দেশেও তা নিতান্ত নগণ্য নয়। অবশ্য যেটা সমাজের পক্ষে একটা ব্যাধিস্বরূপ, সেটা সংখ্যায় নগণ্য হলেও আতঙ্কের বিষয়। পাশ্চাত্যে এই বিচ্ছেদের কারণ বড় বিচিত্র। সেখানে স্বামীর নাক ডাকানিতে স্ত্রী আদালতে বিচ্ছেদের মামলা আনে। স্ত্রীর কণ্ঠস্বর স্বামীর কানে শ্রুতিমধুর না লাগলে স্বামী বিচ্ছেদের মামলা করে। সে হিসাবে এদেশের ঘর-ভাঙার কারণ অনেক বেশী সঙ্গত।

দাম্পত্য জীবনের অসহ্য জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সমাজের বহু নারী-পুরুষই আজ আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছে এবং এই মামলায় একজনও আপোষ মীমাংসার পথ বেছে নিচ্ছে না, সকলেই বিচ্ছেদের গণ্ডী টেনে তবে ক্ষান্ত হচ্ছে। অথচ মাত্র ১২।১৩ বছর আগেও স্বামী-স্ত্রী তাদের দাম্পত্য কলহকে নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আজ কেন এমন হচ্ছে? পাশ্চাত্য-সভ্যতা এবং ঘর ভাঙার আইন প্রণয়নের জন্যেই কি আজ সমাজের বুকে এই অস্থিরতা? আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই ব্যাধি যদি বাসা বাঁধে এবং সমাজের দেহটাকে কুরে কুরে খেতে থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে সমাজকে যে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই সমাজকল্যাণকামিদের এই ব্যাধি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া একান্ত কর্তব্য।

সমাজে একদিকে তরুণ-তরুণীরা যেমন প্রেম-ভালবাসা নিয়ে মেতে উঠেছে, অন্য দিকে ঠিক একইভাবে তারা ঘর-ভাঙার জন্যে যে কি করে ব্যস্ত হয়ে ওঠে কে জানে। তাহলে এই প্রেমের অর্থ কি? সাধের এবং সযত্নে রচিত নীড় যদি ভেঙেই যাবে তবে সেই নীড় গড়ার সার্থকতা কোথায়? অতএব এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে বোঝাবার চেষ্টা করা এবং নিজেদের মধ্যে সহনশীলতার অনুশীলন করা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যকারের ভালবাসা এবং সহনশীলতাই যদি না থাকে তবে শান্তির নীড় গড়ে উঠবে কি করে আর আদর্শ সন্তানই বা তৈরী হবে কোথায়?

আবার দাম্পত্য-জীবনে এমন অনেক ঘটনার কথা শোনা যায়, যেখানে স্বামী কিংবা স্ত্রীর পক্ষে ঘর ভাঙা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। স্বামী যখন বহু নারীতে আসক্ত হয়, কিংবা স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণে অমনোযোগী হয়ে ওঠে, কিংবা অন্য কোনদিকে দুশ্চরিত্র হয়ে ওঠে, তখন স্ত্রীর পক্ষে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কি করার থাকে? অথবা স্ত্রী যখন তার স্বামীর প্রতি সকল কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে বসে থাকে এবং বহু পুরুষের সঙ্গে মিলে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, ফলে যখন তাদের শিশু-সন্তানের দুরবস্থার অন্ত থাকে না, তখন স্বামীর পক্ষে দাম্পত্য-জীবন থেকে সরে যাওয়া ছাড়া আর কি পথ থাকতে পারে? এখন কে দোষী আর কে নির্দোষ—স্বামী না স্ত্রী সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হল আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে মস্তবড় একটা ফাটল ধরেছে যেটাকে আমরা নির্বিকার ভাবে এড়িয়ে চলেছি। অসুখী দম্পতির পারি-বারিক জীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদই কি শান্তি পাবার একমাত্র পথ—এছাড়া কি আর কোন পথ নেই? এত বড় বড় সমস্যার সমাধান হয় কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হয় না কেন? এই ধরনের একটা কুৎসিত প্রথা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বাঁধুক—সমাজহিতৈষীরা কি এটাই চান?

ঘর-ভাঙার স্রোতে পড়ে নারী-পুরুষের জীবন তো ব্যর্থ হয়ে যায়ই, কিন্তু যারা অবলা দুর্বল শিশু তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে? তারা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এই সমস্ত শিশুরাও আমাদের সমাজে আজ একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুখের আশায় আমরা যতই পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করি না কেন—ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য চিরকালই থেকে যাবে। অন্ধের মত ওদের অনুসরণ করতে গিয়ে আমাদের দুঃখের বোঝা বাড়বে ছাড়া কমবে না। ওদেশে যেটা অনায়াসেই সম্ভব, সেটাকে আমাদের মাঝে যত চেষ্টাতেই সম্ভব করে তুলতে যাই না কেন, তার পিছনে একটা খোঁচা চিরকালই থেকে যাবে। পাশ্চাত্যে ভাঙা-ঘরের ছেলে-মেয়েদের জন্যে সরকারী ব্যবস্থা আছে—তারা সেখানে খাওয়া-পরা এবং শিক্ষা সবই পায়। এমন কি বহু ধনী পরিবার ভাঙা-ঘরের বহু ছেলে-মেয়েকে সেখানে পোষ্য রাখে, কিন্তু আমাদের দেশে তার কোনটা আছে? কোন ব্যবস্থাই নেই, উল্টে বরং এখানে ভেঙে যাওয়া সংসারের ছেলে-মেয়েরা লাঞ্ছনা ভোগ করেই জীবন কাটায়। অতএব একথা বলা যায় যে, যাকে যে কাজ সাজে তার সে কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ কোনমতেই করা উচিত নয়। কাজে কাজেই আমাদের দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনটির কিছু অদল-বদল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া হৃদয়-মনকে যখন জোড়া লাগানো যাবে না, তখনই কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সবশেষে সমগ্র নারী-সমাজকে একটা অনুরোধ জানাব, তাঁরা যেন তাঁদের চিরন্তন ধৈর্য এবং সহনশীলতার আদর্শ দিয়ে [illegible] পালন করেন এবং যতদূর সম্ভব নিজেদের আনুগত্য দিয়ে স্বামী-পুত্রের সংসারকে মধুময় করে তুলতে চেষ্টা করেন।

—[illegible]

অভিযুক্ত কাহিনী

সেলেনা

গ্রেস

মেটালিওস
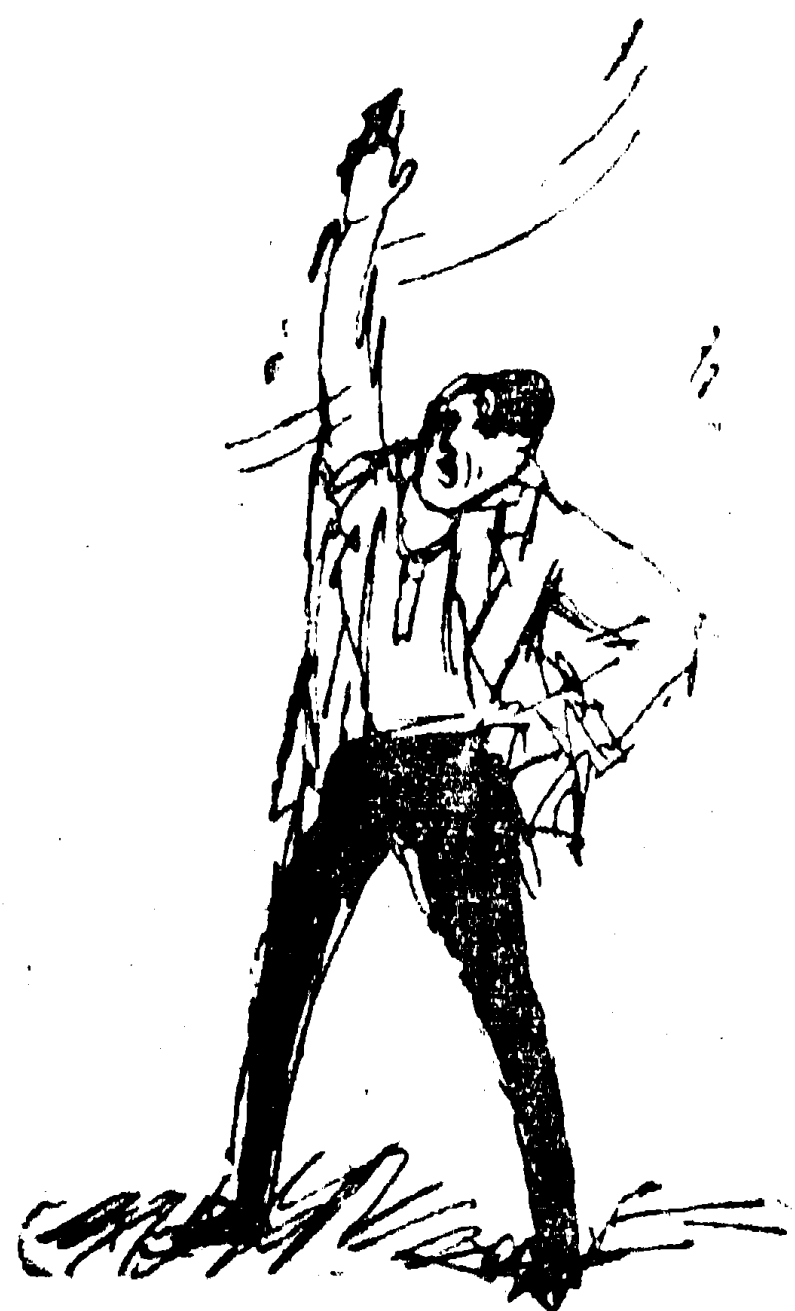
বেরোয়। লুকাস সেইখানে কয়েকটা ভেড়া পুষছে। সে যখনই খাটালের ভেতর থাকত, তখনই সেখান থেকে বেরিয়ে বলে উঠ্‌ত—'এলিসন, এক মিনিট দাঁড়াও ভাই, পা-টা ধুয়ে নিই। কিন্তু এ অবস্থায় কখনো বলেনি, এলিসন ভেতরে চলে এসো। সাধারণত সেলেনার ছোট ভাই জোয়ী দিদির পিছু নিত, তবে এই শনিবারের বিকেলে সেলেনা একা-একাই বেরিয়ে এল।

'এই সেলেনা!' অতিশয় আবেগভরে চেঁচিয়ে ওঠে এলিসন। সেলেনার বিগত-দিনের অসামাজিক ব্যবহার সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত।

সেলেনার গভীর আবেগ-ভরা কণ্ঠস্বর এলিসন ভালোবাসে, সেই গাঢ় গলায় সে বলে—এই খুকী! আজ কী করা যায় বল!

এ প্রশ্ন কিঞ্চিৎ আলংকারিক। শনিবার বিকালটায় মেয়েদুটি সাধারণত শহরের পথ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটে, দোকানের জানালায় দেখে, এমন ভান করে যেন তারা বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে এবং খ্যাতনামা ব্যক্তির সংগে বিবাহিত। পেটন প্লেসের সমস্ত দোকান কাঁটির জিনিষপত্র ওরা বেশ ভালো করে দেখেছে, বেছে বেছে কি-কি নিজেদের জন্য, কি সব বাড়ির জন্য এবং ছেলে-মেয়েদের দরকারেই বা কি কি কিনবে, সব ঠিক করে ফেলেছে।

একজন অন্যকে বলে—বাচ্চা ক্লার্কের গায়ে জামাটা চমৎকার মানাবে না মিসেস গেবল?

আরেকজন আবার মুরুব্বিয়ানার ভংগীতে বলে—মিঃ পাওয়েলের সংগে ডিভোর্স হওয়ার পর, পোষাক-আসাকের ব্যাপারে তেমন আর আগ্রহ নেই আমার।

এলিসন মার কাছ থেকে যা কিছু পয়সা-কড়ি আদায় করতে পারে তা দুজনে মিলে সস্তার গহনা, ছায়া-ছবির পত্রিকা, আর আইসক্রিম কিনে খরচ করে। স্থানী[য়] কোনো গিন্নীর বাড়ি কাজ করে সেলে[না] মাঝে-মাঝে কিছু রোজগার করে। তখ[ন] সে আর এলিসন দুজনে মিলে 'আই[য়]য়োকা' থিয়েটারে গিয়ে সিনেমা দেখে[।] তারপর, প্রেসকট ড্রাগ ষ্টোরের সোডা ফাউন্টেনে গিয়ে দুজনে বসে, সেখানে টোস্ট করা টমাটো আর লেটুসের স্যান্ড উইচ খেয়ে কোকো-কোলার গ্লাস নি[য়ে] বসে।

তখন আর তারা সিনেমা অভিনেতাদে[র] স্ত্রী নয়, তখন তারা ভান করে শহরে[র] সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহস্থ-বধূ ওরা এক[া] নিরিবিলিতে বসে কোকো কোলার গ্লাস[ে] মন দিয়েছে, বাচ্চারা পেরামবুলেটরটা[য়] শুয়ে আছে প্রেসকটদের সদর দরজায়[।] এলিসন গ্লাসের খড়টা তুলে ধরে আধখা[না] করে সিগারেট ধরার ভংগীতে আঙু[লে] চেপে ধরে, এবং তাদের ধারণায় যা বড়দে[র] ঢঙ-এর কথাবার্তা, বসে বসে সেইরক[ম] কথা বলে।

এলিসন বলছে—মিঃ বিন যখন ঠি[ক] করলেন যে মুভী থিয়েটর করবেন তখ[ন] তাঁর হাতে বেশী টাকা ছিল না, তখ[ন] কেলী বলে একজন আইরিশ ম্যানের কা[ছ] থেকে ধার করলেন—সেই জন্যেই থিয়ে[টারটার] নামকরণ করা হল "আইয়োকা["] অর্থাৎ আই ও কেলী অল—"

শহরের এইসব ছোটখাটো কিংবদন্ত[ী] জানে বলে ওর মনে খুব স্বস্তি। সেইস[ব] কথায় আবার নিজের খুশিমত রং ফলি[য়ে] বলতে থাকে আর মাঝে মাঝে ঠোঁট থে[কে] কল্পিত তামাক ভঙ্গীভরে ফেলে দেয়।

সেলেনা সর্বদাই সমজদার শ্রোত[া।] এতটুকু নীচতা নেই, 'ও', 'মাই গুডনে[স'] বা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে 'নো' বলে।

সেলেনা বলল, ও মাই গুডনেস[।] আচ্ছা মিঃ বীন কি মিঃ কেলীর টাকা ফেরৎ দিয়েছেন?

এলিসন বলে ওঠে, ও সুওর। [ ] নিশ্চয়ই।

তারপর যেন ক্ষণিক স্তব্ধতার প[র] একটা যুৎসই উত্তর মনে আসে। তখ[ন] বলে, ওঃ একটু থামো দেখি! না এ[ক] পয়সাও ফেরৎ দেয়নি। টাকাটা নি[য়ে] উড়েছেন।

সেলেনার সেই বড় হয়ে যাওয়ার ভানে[র] মুখোস অনেকক্ষণ খসে পড়েছে [ ] অবিশ্বাসের ভংগীতে বলে—কি বলছ[?] উড়েছেন মানে? সেলেনার সর্বদাই মনে হ[য়] যেসব কথা সে আগে কখনও শোনে[নি] তা এভাবে ব্যবহার করার অর্থ ও[কে] ঠকানো, এমনকি মাঝে মাঝে মনে হয়ে[ছে] এলিসনের এসব কথা বানানো, কথা বলা[র] সময় তৈরী করে নেয়।

এলিসন জবাবে বলে, আরে, উড়েছে[ন] মানে পালিয়েছেন। সব টাকা নিয়ে চম্পট[।] মিঃ কেলী কখনও এক-পয়সা ফের[ৎ] পায়নি।

সেলেনা প্রতিবাদ জানিয়ে বলে ও[ঠে] এলিসন ম্যাককেন্জী তুমি ভাই এ-স[ব] বানাচ্ছো। বড়দের ভংগীতে কথা ব[লা]

...লা এখন সে সম্পূর্ণ বিস্মিত। সে বলে, ...আমি ত এমোস বীনকে গতকালই দেখেছি ...লম স্ট্রীটে। তুমি সবটাই বানাচ্ছো ভাই!

এলিসন হেসে উঠে বলে, সত্যিই ভাই! আমিই বানাচ্ছি!

মিসেস প্রেসকট সোডা-ফাউন্টেনের ভেতর থেকে বলে ওঠে, পালিয়ে গেছে! ...খনই নয়। দেখো মেয়েরা কথা এইভাবেই ...নে হাটে—গুজোব এইভাবেই ছড়িয়ে পড়ে। নির্জলা মিথ্যাকে গুন করে। ভাগ করে আবার গুন করার নাম গুজব।

এলিসন অতিশয় নরম ভঙ্গীতে বলে, হাঁ, মাডাম!

মিসেস প্রেসকট বলেন, গুজব আর অ্যামিবা একই ধরনের। গুন করো, ভাগ ...াও, আবার গুন করো—

এলিসন ও সেলেনার সহসা প্রবল হাসির বেগ আসে। স্যান্ডউইচটা খাওয়া এখনো শেষ হয়নি, ওরা উঠে বেরিয়ে পড়ে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে খিল-খিল করে কি হাসি। আর মিসেস প্রেসকট কাচের জানলা দিয়ে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন।

শনিবার প্রলম্বিত বিকেল যখন কাটে, দুই বন্ধুতে মিলে এলিসনদের বাড়ি যায়। সেখানে নানারকম প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে দুজনে দুজনকে সাজায় মন্ত্রমুগ্ধের মত। এইসব দ্রব্য ওরা সংগ্রহ করেছে যেসব কোম্পানী স্যামপেল দেওয়ার জন্য সাময়িক পত্রে কুপন দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়, সেইসব কোম্পানীর কাছে কুপন পাঠিয়ে।

—সেলেনা, আমার মনে হয় এই 'ব্লু-প্লাম' তোমার একেবারে উপযুক্ত সেড।

আর সেলেনার ঠোঁট-দুটি যেন পাকা-আঙুরের মতো টস-টসে, সে বলে, এই 'ওরিয়েন্টাল নম্বর টু' খুকী তোকে যা মানায়। তোমাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে।

এলিসন নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকায়, দেখাচ্ছে যেন আমেরিকান-ইন্ডিয়ান মেয়ে, সে তখন বলে ওঠে, সত্যি বলছ? না কথার কথা বলছ?

—না, বীয়োল! ভারী সুন্দর, তোমার চোখদুটো ফুটে উঠেছে।

কনসটানসে বাড়ি ফেরার আগেই এই খেলা শেষ করতে হবে। কনসটানসের ধারণা অল্পবয়সী মেয়েদের মুখে মেকাপ করলে একটু শস্তা শস্তা দেখায়। তাই ...র কথা শুনে, এলিসনকে শনিবার বিকেলের এই আনন্দ মুছে ফেলতে হয়। আর বাকী সন্ধ্যাটুকু সে নিদারুণ মনো-ভঙ্গ ক্লেশ বোধ করে।

শনিবার রাতের খাওয়াটা পর্যন্ত সেলেনা এখানেই থেকে যায়। কনসটানস সাদা-সিধে ব্যবস্থা করেন, ডিমের সঙ্গে সসেজ মিশিয়ে বা মিষ্টি দিয়ে একটা পদ। সেলেনার কাছে এইসব খাদ্য একটা অশ্রুত-পূর্ব বিলাস সামগ্রী। ম্যাককেনজীদের বাড়ির সব কিছুই তার চোখে বিলাস-বহুল সুন্দর, একটা যেন স্বপ্নের ব্যাপার। ম্যাককেনজীদের বসার ঘরের দেয়ালে যে ফুলদার কাগজ আছে তা সেলেনার ভালো লাগে। মাঝে মাঝে সে এই ভেবে রেগে

ভ্রম সংশোধন

অমৃত-র ৬।৯।৬৮ তারিখের ৪২১ পৃষ্ঠায় ভাস্বর দিগন্ত বইটির বিজ্ঞাপনে প্রথম অংশের লেখকের নাম ছাপার ভুলে ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ লেখাটি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। এজন্য আমরা দুঃখিত।

এলিসন মনে মনে ভাবে, ব্যাপারটি রকম যেন! এমন সন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ...ও কেউ অচঞ্চল থাকতে পারে?

আর সেলেনা ভাবে, ওর কি হয়েছে ...জানে, কখনো শোনা যায়নি যে শহরে ...তে যাওয়া কারো কাছে একটা ...ল্যকর অভিজ্ঞতা মনে হয় না। প্রতি-...ই ত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। তবে ...সনের মাথায় অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ...ভিরা খেলে বেড়ায়। যেমন মৃত ...তার কথা ভেবে কল্পনা বিলাস করে, ...বা মাঝে মাঝে একেবারে একা একাই ...তে চায়।

সেলেনা যুক্তি দেয়, তার বাবাও ত ...সনের বাবার মত মারা গেলেন। কিন্তু ...সনের মতো মৃত পিতার মুক ফটোর ...নে দাঁড়িয়ে কে আর তাকে কাঁদতে ...খেছে। সেলেনার কোনো ধারণা নেই তার ...কে কেমন দেখতে ছিল—ওর জন্মের ... মাস আগে কাঠ পড়ে গিয়ে এক ...টনায় তাঁর মৃত্যু হয়, নেলীর কাছে ...নো বাঁধানো ফটো নেই যে মেয়েকে ...বে। সেলেনা একমাত্র যে পিতাকে জানে ...র নাম লুকাস ক্রস, মার দ্বিতীয় স্বামী। ...কাস মৃতদার ছিলেন, তাঁর পূর্ব স্ত্রীর ...টি সন্তান এবং তিনি প্রসবকালে ...রা গেছেন। সেলেনার যখন ছ সপ্তাহ ...স তখন লুকাস নেলীকে বিয়ে করেছে। ... পল কিন্তু সেলেনার আপন ভাই নয়, ...ন কি সে হিসাবে জোয়ীও নয়—কিন্তু ...লেনা ভাবে, এসব নিয়ে তার মাথা ...নোর কিছু নেই। এলিসন যদি আমার ...স্থায় পড়ত, মনে মনে ভাবে সেলেনা, ... তাহলে সব সময়ে সতাত ভাই এবং বি-...তার বিষয় আলোচনা করত। কি যে ... যন্ত্রণা সব সময়, কে জানে!

এলিসন চিন্তা করে, আচ্ছা মা যাকে ...া 'ছেলে পাগলা' সেলেনার কি সেই ...স্থা! শহরে যাওয়ার জন্য ওর ভীষণ ...ড়া ছিল। হয়ত ভেবেছিল কোনো একটা ...কানে টেড কার্টারের সঙ্গে দেখা হবে—... চিন্তা মনে উদিত হওয়ায় এলিসন ...কুঞ্চিত করে, পার্কের শেষে পাহাড়ের ...কে যেখানে দীর্ঘ পথ চলে গেছে, সেই ...কে হাঁটতে থাকে। সেলেনা ঠিক পিছু ...ছু রয়েছে।

এই জায়গাটার নাম রোডস এনড। ...লেনার এই জায়গা ভালো লাগেনি, সে ...া সে এলিসনকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে ...হাড়ের ওপরে উঠেই।

এলিসন যখন ওকে খুব উৎসাহের ...গে একটা নোটিশ বোর্ড দেখাল তখন ...লেনা বলে উঠল, এ একেবারে বাজে। ...ছু মজা নেই। সাইনবোর্ডটা না দিলে ...া লোকে পড়ে যাবে, তাই দিয়েছে?

এলিসনের কান্না পায়, তার মনে হয় ... যেন তাকে অহেতুক একটা চড় ...রেছে—এ যেন কাউকে একটা মিনক কোট ... ডায়মন্ড ব্রেসলেট দেওয়া হলে সে ... উঠল—ওরে বাবা, আমার তো এই সব ... গাদা আছে!

অনেক জঙ্গল আশ-পাশে। কয়েক মিনিট পরে সেলেনা মন্তব্য করে; ধরে, এ'ত খালি জঙ্গল। তা জঙ্গল দেখতে এখানে আসব কেন? আমাদের ঝুপড়ির চারপাশে জঙ্গল। জঙ্গল দেখে দেখে পেট ভরে গেছে। সপ্তাহের প্রতিদিনটাই ত জঙ্গল দেখছি।

এলিসন চেঁচিয়ে ওঠে; তুমি অতি নীচ সেলেনা। শাদা কথায় তুমি একটি নীচ এবং বাজে মেয়ে। এটা একটা বিশেষ গোপন জায়গা—আমি ছাড়া আর কেউ কখনো এখানে আসে না। তোমাকে নিয়ে এলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমার বিশেষ বন্ধু।

সেলেনা রেগে বলে, খুকিমি করিসনি, তুমি ছাড়া আর কেউ আসেনা না? রাত্তির বেলা গাড়ি নিয়ে ছোকরাগুলো মেয়েদের এখানে টেনে নিয়ে আসে না? এ তো বরাবরের খেলা—

এলিসন চীৎকার করে বলে, তুমি একটি মিথ্যুক।

সেলেনা বিরক্তি ভরে বলে, না, মোটেই নয়। যাকে হয় জিজ্ঞেস করো এই একই জবাব পাবে।

এলিসন বলল, যা, তোর কথা সত্যি নয়। রাত্তিরবেলা এখানে লোকে আসবে কেন? রাতের বেলায় ত আর বেড়ানো যায় না জঙ্গলের ভেতর।

সেলেনা কাঁধ নেড়ে বলে, যাক এসব কথা ভুলে যাও খুকী। আমার ওপর রাগ করিসনি—চলো শহরের দিকে যাই—।

এলিসন রাগভরে বলে, এই নিয়ে ত' একশবার এই কথা বললি। আচ্ছা চল শহরেই যাই।

লুকাস ক্রসের বি-কন্যা সেলেনার সঙ্গে যে এলিসন মেশে তা কন্সটান্স ম্যাককেনজি পছন্দ করে না। দু-একবার চেষ্টা করেছে সে, অবশ্য তেমন জোর দিয়ে নয়, এই সব বন্ধ করার। কিন্তু কয়েকদিন সন্ধ্যার পর দোকান থেকে ফিরে এলিসনের চোখে জল দেখে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হয়েছে, এলিসনের এই বান্ধবীহারা অবস্থা ভালো লাগে নি। সেলেনা সংক্রান্ত এলি-সনের প্রশ্নাদির সে বেশ সন্তোষজনক জবাবও কোনোদিন দিতে পারে নি।

আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে সে কখনো বলে, আমি যে সেলেনাকে পছন্দ করি না তা তো কোনোদিন বলিনি। শুধু—

এইখানে কনসটানসকে উপযুক্ত কথা খোঁজার জন্য থামতে হয়ই।

এলিসন মনে করিয়ে দেবে, শুধু কি মা?

কনসটানস কাঁধ নাড়বে, সেলেনা সম্পর্কে কোন ব্যাপারে যে তার আপত্তি তা ভাবার চেষ্টা করবে।

একবার বলেছিল, এই শহরের আরো ত' অনেক ভালো ভালো ছেলেমেয়ে আছে—!

কিন্তু এই পর্যন্ত বলেই থামতে হয়েছে এলিসনের সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে।

—সেলেনা কি ভালো মেয়ে নয় মা?

কনসটার্নস বলে ওঠে, তাতো ঠিক বলি নি। তারপর কাঁধ নেড়ে বলবে, থাকগে ওসব কথা ছেড়ে দাও।

ফলে এলিসন আর সেলেনার বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকে।

এলম স্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে দুজনে দোকানের জানলার দিকে তাকায়। কিন্তু যে খেলায় দুজনে এতকাল মজা পেয়েছে সেই খেলা খেলতে বাধে।

সেলেনা বলে, চল না, তোর মার দোকানে যাই।

এলিসন রাজী হয় না। তার কেমন মনে হচ্ছে যে তার প্রিয় জায়গাটি থেকে এভাবে সরিয়ে আনার অর্থ তাকে বঞ্চিত করা।

এলিসন জানে সেলেনা ওকে না নিয়ে কোথাও যাবে না। তাই বলে—তুমি নিজেই যাও না 'থ্রিফটি করনারে'—তুমি যদি খারাপ হতে চাও আমার কি?

অবশেষে হাত ধরাধরি করে ওরা দুজনে দশ আর পাঁচ সেন্টওলা সব কটি কাউন্টার ঘুরে বেড়ালো—সস্তার ঝুটো মুক্তো প্রসাধন সামগ্রী দেখল। একটা কাউন্টারে জনপ্রিয় সঙ্গীতের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে। দুজনে স্টোরের সোডা ফাউন্টেনে বসে বিরাট এক পাত্র করে কদলী দলিত আইসক্রিম খেল, আর এলিসনের মেজাজটা আবার একটু করে যেন ফিরে আসে।

সে বলল, চল, যদি মার আগে যেতে চাস ত চল।

—না, না, বরং তোদের বাড়ির দিকে যাওয়া যাক।

—না, চল না। আমি দোকানে যেতে চাইরে। আমি কিছু মনে করিনি, সত্যি বলছি।

—আমার জন্য আবার মিছিমিছি যাবি কেন?

—না রে সেলেনা, আমার যাবার দরকার আছে। সত্যি বলছি। হাতে করে কাগজের তোয়ালে চটকে মুড়ে গোল করে একটা পাত্রে ফেলে দেয়। সহসা আবার সব আগের মত হয়ে যায়।

(আগামী সংখ্যায়—"সেলেনার বন্ধুরা") অর্থাৎ, গল্পের আসল রহস্য।

—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী সংক্ষেপিত ও অনূদিত।

পরিক্রমা ॥ রাধারাণী দেবী

মুক্ত মানসে প্রভাতী বিহারক্ষণে
দুজোড়া ডানায় অবাধ আকাশগতি।
পাহাড়ী ঝোরার কল্লোল পড়ে মনে?
অগ্নিলাভায় থরো থরো বসুমতী?

ধানকাটা মাঠে তপ্ত দুপুর বায়ে
বহুদূর-স্রুত রাখালিয়া বাঁশি শোনা।
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কঠিন ক্ষিপ্র পায়ে
চলা—আর চলা—গ্রাম গ্রামান্ত গোনা।

জনতার কূলে শেষে এসে বাসা বাঁধা,
হৃদয়ধান্যে এখন মরাই ভরা।
শিশুর হাস্যে ধূলায় স্বর্গ সাধা,—
বন্ধুর প্রীতি—ধূপের সুরভি ঝরা।

বেড়া দেওয়া নেই এখানে উঠান তলে
শত শত পায়ে মাদল নৃত্য চলে।

স্বাগত দেবদূত ॥ নবনীতা সেন

এমন কখনও হয়। এমনও কখনও হয়
বিশাল কাচের মতো নীল চোখ নিস্তব্ধ আকাশ
হঠাৎ সর্বস্ব ঢেকে জোর করে ঘরে ঢুকে আসে
কোণায় আগুন জ্বলে, তাকভরা বইপত্র
বিছানার রঙদার চাদর ছাপিয়ে
নৈঃশব্দ্য ঢুকে পড়ে, পাহাড়ী মেঘের মতো, ঘরে।
কাচের বাক্সের মধ্যে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা
অকস্মাৎ দোকানের লোভনীয় তাকে উঠে বসি—
এখনো জোটেনি ক্রেতা, প্রতীক্ষার পৃথক সকলে
কাচের ঘরের মধ্যে প্রত্যেকেই একা, দৃশ্যময়,
অস্পৃশ্য, সুদূর। এমন স্তব্ধতা আসে,
এমন স্তব্ধতা ভাসে, পাহাড়ী মেঘের মতো
ঘরে। অথচ আগুন জ্বলে কোণে, তাকভরা বই,
বিছানায় রঙীন চাদর।
চারিদিকে কত চোখ, ভাষাহীন,
যেন কার ফুলের বাগানে বসে আছি
হাওয়া নেই — মুহূর্তেই সব ফুল কাগজের
বিজ্ঞাপনী ছবি। এমনই নৈঃশব্দ্য ঢোকে
একবার সামাজিক গরম বাতাস
পর্বতশিখরে চড়ে অকস্মাৎ বিশুদ্ধ ও ভারী—
এত শুদ্ধ, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাবে যেন
পলকে সবার। যেন নীচে, আশেপাশে, মুখ তুলে
মাথার ওপরে, কোনোদিকে কিছু নেই, শুধু মেঘ
শাদা মেঘ, স্তব্ধতার শূন্যতার বিপুল বিস্তার…
একটি বাক্যের শেষ, আরো একটি আরম্ভের আগে
মাঝে মাঝে কি আশ্চর্য স্তব্ধতার বন্যা নেমে আসে

হঠাৎ প্রত্যেকে যেন ভিন্ন ভিন্ন টিলার উপরে
যোগাযোগশূন্য হয়ে প্রচণ্ড প্রলয়ে বন্দী আছি
যেন সব তার যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে, সব সেতু ভাঙা,
সব রেলপথগুলো ভেসে গেছে ভয়াবহ বানে, যেন
কোথাও নগর নেই, গ্রাম নেই, লোকালয় নেই
যতদূর মন যায়, প্রাণ যায়, নিঃসীম এলাকা—
আসন্ন সংকটে বুঝি শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে আসে…

এমন সময়ে
ঠিক দেবদূত যেমন স্বাগত
তেমনি উত্থিত হয় কোনো শব্দ।

ভয়ানক চেষ্টা করে
একগলা জল ঠেলে ঠেলে
সারারাত্রি হেঁটে এসে কেউ
যেন এক প্রিয়ের সংকার করে' গাঁয়ে ফিরে গেল।
ভয়ানক চেষ্টা করে
কেউ একটা কথা কয়ে ওঠে
কী আশ্চর্য ইন্দ্রজাল—
উচ্চারিত শব্দ যেন মন্ত্রের মতন প্রাণ করে—
মন্ত্রের মতন সব মৃত চোখ ত্রস্তে বেঁচে ওঠে
ফুলের বাগানে যেন হাওয়া বয়,
কোণায় আগুন জ্বলে, তাকে বই, বিছানায় রেশমী চাদর
নিস্তব্ধতা এইমাত্র পথে নেমে গেছে।
পর্দা দোলে, উষ্ণ শুভ সৌহার্দ্যের বাতাস কাঁপিয়ে
শব্দ ঘোরে—ঘর ভরে দয়াময় শব্দ ঘোরে ফেরে
ঘর ভরে শব্দময়ী করুণা ছড়ায় ॥

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(১০৫)

জাহ্নবা ঠাকুরাণী

পিতা সূর্যদাস পণ্ডিত, রাজদত্ত উপাধি সরখেল, মাতা ভদ্রাবতী দেবী। জন্মস্থান অম্বিকা কালনা।

সূর্যদাসের দুই কন্যা—বড় বসুধা, ছোট জাহ্নবা বা জাহ্নবী।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বললেন, তুমিও যদি মুনিধর্ম অবলম্বন করে থাকো তাহলে পতিত সংসারের উদ্ধার হবে কী করে? তুমি যাও, গৌড়ে ফিরে যাও, গৃহী হয়ে ভজন স্থাপন করো। অনর্গল প্রকাশ করো প্রেমভক্তি।

প্রিয়শিষ্য উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে নিত্যানন্দ সূর্যদাসের গৃহে উপস্থিত হল। প্রস্তাব করল তোমার কন্যাকে বিবাহ করব। 'বিবাহ করিব, মোরে কন্যা দেহ তুমি।' যেহেতু নিত্যানন্দ বর্ণত্যাগী, সূর্যদাস প্রস্তাবে রাজী হল না। প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিত্যানন্দ ফিরে চলল।

এদিকে বসুধার কী দশা? 'পূর্ণ নারায়ণ' তার পাণিপ্রার্থী জেনে তার অন্তরে প্রেম জেগেছিল, এখন এই প্রত্যাখ্যানের পর, সে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। চিকিৎসক ডাকা হল কিন্তু মূর্ছাভঙ্গ হল না। মূর্ছা মৃত্যুকে ডেকে আনল।

গৌরীদাস খবর পেয়ে ছুটে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্যদাসের পায়ে পড়ল। বললে, শিগগির প্রভুকে ফিরিয়ে আনো। একমাত্র প্রভুই বসুধাকে পুনর্জীবন দিতে পারেন।

গঙ্গাতীরে বসুধার মৃতদেহ সৎকার করতে আনা হয়েছে, নিত্যানন্দের দেখা মিলল। সূর্যদাস তার পায়ে পড়ল, বললে, আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দিন।

নিত্যানন্দ বললে, মেয়ের জীবন ফিরে এলে তাকে আমার হাতে সম্প্রদান করবেন স্বীকার করুন, বাঁচিয়ে দিচ্ছি।

সূর্যদাস স্বীকৃত হল।

বসুধার গায়ে নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের বাতাস লাগল, অঙ্গগন্ধ লাগল বুঝি নাসিকায়, মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে ফিরে এল চেতনা। বসুধা চোখ মেলে দেখল প্রভুকে।

এবার তবে বিবাহের আয়োজন করো।

তার আগে তুমি অবধূত, বেদবিহিত সংস্কার করে উপবীত ধারণ করো।

তাই করল নিত্যানন্দ। বললে, 'যা কর তাহাই কর মোর দায় নাই। একলে স্বতন্ত্র-মাত্র চৈতন্য গোসাঞি।।'

বিয়ের পর একদিন খেতে বসেছে নিত্যানন্দ, বসুধার ছোট বোন জাহ্নবা পরি-বেশন করছে, হঠাৎ জাহ্নবার মাথার কাপড় স্খলিত হয়ে পড়ল, নিত্যানন্দ দেখল, বুঝল এই আমার পূর্ণশক্তি। আমার প্রাণপ্রিয়া। সূর্যদাসকে বললে, আপনার এই কনিষ্ঠ কন্যাকে আমার যৌতুকস্বরূপ দান করুন।

সূর্যদাস বললে, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই। জাতি প্রাণ ধন গৃহ পরিবার সমস্ত তোমার।

বিয়ের পর স্ত্রীদের নিয়ে নিত্যানন্দ খড়গাছিতে এল। সেখানে শ্রীবাস-ঘরণী মালিনীর আশীর্বাদ নিল। তারপর নবদ্বীপ গেল শচীমাতার আশীর্বাদ নিতে। কিছু-কাল সপ্তগ্রামেও বাস করল। শেষে খড়দহে এল।

বসুধার গর্ভে আট পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হল। একে একে সাত পুত্র মারা গেল। বেঁচে রইল মেয়ে গঙ্গা ও কনিষ্ঠ পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র।

জাহ্নবা নিঃসন্তান।

তা হোক, বীরচন্দ্রই তার একচন্দ্র।

বীরচন্দ্রকে মাতা জাহ্নবাই দীক্ষা দিল। বীরচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল অদ্বৈতের কাছে দীক্ষা নেয়, তাই ভেবে সে শান্তিপুরে যাবার উদ্দেশে বেরিয়েছিল কিন্তু জাহ্নবা তাকে ফিরিয়ে আনল। বললে, দূরে যাবার দরকার নেই, আমার থেকে দীক্ষা নিলেই হবে।

বীরচন্দ্র মায়ের থেকেই দীক্ষা নিল।

'প্রেমভক্তিরত্নপ্রদানে প্রবীণা' বা বিশেষজ্ঞা জাহ্নবা সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ সম্মানের পাত্রী। খেতুরির মহোৎসবে তাই তার ডাক পড়ল। বসুধা-গঙ্গা ও বীরচন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খড়দহ থেকে যাত্রা করল জাহ্নবা, সঙ্গে বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি অনেকানেক মহান্ত। হালি-সহর থেকে নয়ন মিশ্র এসে দলে ভিড়ল। গ্রামে-গ্রামে লোকসংঘট্ট বেড়ে চলল, বয়ে চলল নামপ্রেমের প্রবাহ। পথিমধ্যে স্থানে-স্থানে বিশ্রাম করল জাহ্নবা—নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়িতে, আকাইহাটে কৃষ্ণদাসের বাড়িতে, কণ্টকনগরে গদাধরদাসের গৌরাঙ্গ-মন্দিরে আর বুধরিগ্রামে রামচন্দ্র কবিরাজের বাড়িতে। তারপরে খেতুরিতে গিয়ে পৌঁছুলে সে কী সংবর্ধনা। সে কী আনন্দ-উদ্বেলতা।

শ্রীঈশ্বরী জাহ্নবা এসেছেন!

তাঁর জন্যে আলাদা বাসা নির্দিষ্ট হয়েছে, সেখানে তিনি উঠলেন ভক্তদের নিয়ে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ছয়টি বিগ্রহ স্থাপিত হল। বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার পর জাহ্নবা দেবী শ্রীনিবাসকে বললেন, চৈতন্যভক্তদের মাল্যচন্দন দাও। সে নির্দেশ পালিত হলে আবার নৃসিংহ-চৈতন্যকে মাল্য দিতে। তার-পর নিজে মাল্যচন্দন গ্রহণ করলেন। বললেন, এবার তবে গৌরগুণগান করো, শুরু করো সংকীর্তন।

খেতুরিতে প্রেমের পারাবার [...] উঠল।

গীতপ্রিয় ইচ্ছাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্তনরঙ্গে বিলাস করতে এলেন। [...] নয়, সঙ্গে নিয়ে এলেন সমস্ত পা[...] ক্ষণকালের জন্যে সকলে দেখতে [...] 'মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের পুঞ্জ [...] সংকীর্তন মেঘে প্রভু প্রকট্য তে[...] 'প্রকটাপ্রকট একত্র চমৎকার।' ক্ষণ[...] আবার সকলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সংকীর্তনস্থলে ক্রন্দনের রোল উ[...] গৌরচন্দ্র গেলেন কোথায়? কেউ ব[...] এই তো এখানে নাচছিল অদ্বৈত আর [...] নন্দ, তাঁরা কোথায় লুকোলেন? আর [...] মুরারি? হরিদাস গদাধর? বক্রে[...] দেখনি? দেখেছি বৈকি। দেখেছি স্ব[...] দামোদরকে, রামানন্দকে, সার্বভৌ[...] এমনকি নরহরিকে। গণসহ দর্শন [...] প্রভু চকিতে অন্তর্ধান করলেন?

জাহ্নবা বললেন, এ নরোত্তম [...] শ্রীনিবাসের প্রতি প্রভুর করুণা। তিনি [...] বাক্যকে সত্য করে দেখালেন। যে[...] কীর্তন সেখানেই তাঁর আবির্ভাব। [...] তবে ফাগুখেলা আরম্ভ করো।

জাহ্নবা মন্দিরে ঢুকে নিজেই [...] প্রভু-অঙ্গে ফাগু দিলেন। সকলেই [...] খেলায় মেতে উঠল। শুধু মানুষে-ম[...] খেলা নয়, দেবতা-মানুষে খেলা। 'ফা[...] হইল গগন-মহীতল।' 'প্রভুর ইচ্ছায় [...] অদ্ভুত ফাগুখেলা। অলক্ষিত দেবতা-ম[...] এক মেলা।।'

তারপর সন্ধ্যারতির পর [...] শ্রীনিবাসকে বললেন, এবার গৌর[...] জন্মাভিষেক করো।

'কেহ কহে ধন্য ফাল্গুন পৌর্ণ[...] এ তিথি সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী [...]'

পরদিন প্রভাতে স্নানাহ্নিক [...] জাহ্নবা রাঁধতে বসলেন। বহুবিধ [...] সামগ্রী প্রস্তুত করে মন্দিরে গিয়ে বিগ্র[...] ভোগ দিলেন। পরে সেই মহাপ্রসাদ [...] হাতে মহান্তদের পরিবেশন কর[...] সকলকে খাইয়ে নিজে খেলেন।

পরদিন নরোত্তমকে বললেন, বৃন্দাবনে যাব।

আর তাঁকে কে নিরস্ত করে? [...] চলল খুল্লতাত কৃষ্ণদাস সরখেল, [...] মাধবাচার্য, গোপাল পরমেশ্বরীদাস। [...] কেউ-কেউ।

পায়ে হাঁটা পথ—দীর্ঘ হতে দীর্ঘ[...] ভয় পেলেন না জাহ্নবা। ক্লেশ ক্লেশ [...] সমস্তই নিত্যানন্দ।

এক গ্রামে ঢুকে বিশ্রাম করছেন [...] গ্রামস্থ ভক্তেরা এসে তাঁকে প্রণাম [...]

দুর্জন পাষণ্ডও সে গ্রামে কম নয়, যারা বৈষ্ণববিদ্বেষ। বলে, লোকগুলোর দুর্মতি দেখেছ, মানুষকে প্রণাম করে। চণ্ডীর কাছে এদের যে কী অপরাধ হচ্ছে বুঝতে পারছে না। 'বিপ্রপত্নী, বিপ্র কিম্বা প্রণামে চণ্ডীরে, এগুলোর অপরাধ হৈল চণ্ডীদ্বারে।' চণ্ডীর মন্দিরে গিয়ে আস্ফালন করে বললে, আজই এগুলোকে সংহার করো। মোচন করো অনাচার।

পাষণ্ডদের স্বপ্ন দেখালেন চণ্ডী, বিপ্রপত্নী বলে যাকে হেয় করছ সে আসলে ঈশ্বরী, আমারও শিরোধার্যা। 'জাহ্নবা ঈশ্বরী—নাম অতি সুমধুর। এ নাম গ্রহণে ভব ভয় হবে দূর।।' যাও, সবাই গিয়ে তাঁর পায়ে শরণ নাও, নচেৎ আমিই তোমাদের উচ্ছেদ করব।

নিদ্রাভঙ্গে পাষণ্ডেরা নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগল। সজল নেত্রে মহান্তদের পায়ে গিয়ে পড়ল, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন। উদ্ধার করুন আমাদের।

তোমাদের উদ্ধার করব বলেই তো এই গ্রামে আমাদের আসা। বললে মহান্তেরা, ভয় নেই, ঈশ্বরী তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

পাষণ্ডেরা জাহ্নবীকে প্রণাম করল। প্রণামেই পেয়ে গেল ভক্তিরস।

আরেকদিন আরেক গ্রামে নদীতীরে বিশ্রাম করছেন জাহ্নবা, দস্যুদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। দলপতি কুতুবুদ্দিন বললে, এই গৌড়ীয়াদের সঙ্গে অনেক ধনরত্ন আছে, সব লুটে নিতে হবে। গুপ্তচরকে বললে, দেখে এস তো কী করছে লোকগুলো।

গুপ্তচর বললে, নামসংকীর্তন করে শুয়েছে এতক্ষণে।

এই তবে প্রশস্ত সময়। তোমরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নাও। তারপর এস আমার সঙ্গে।

নদীতীর কতটুকুই বা পথ কিন্তু কুতুবুদ্দিন যত চলে পথও তত অফুরন্ত হয়। মহাবেগে ছুটে চলে, পথও মহাবেগে বিস্তীর্ণ হয়। এদিকে ওদিকে যেদিকেই যায়, পথকে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারে না। এ আমরা কি শূন্যের উপরে হাঁটছি, আমাদের কি নিশিতে পেয়েছে?

রজনী প্রভাত হয়ে গেল তবু ডাকাতেরা গৌড়ীয়াদের ডেরায় গিয়ে পৌঁছুতে পারল না। দস্যুরাজ ভয় পেয়ে গেল। বললে, ওরা যাকে ঈশ্বরী বলে নিশ্চয়ই এ তাঁরই মহিমা। চলো তাঁর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করি। ছেড়ে দিই দস্যুতা।

মনে অভিমুনিতা নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই দস্যুরাজ নদীতীরের পথ পেয়ে গেল। জাহ্নবাসকাশে উপনীত হল। বললে, আমাদের উদ্ধার করুন।

শ্রীঈশ্বরী করুণা করলেন। দস্যুরা কৃষ্ণ-নাম করতে লাগল।

ক্রমে মথুরায় এসে পৌঁছুলেন জাহ্নবা। যমুনায় বিশ্রামঘাটে স্নান করলেন। মথুরার ভাগবতেরা ঈশ্বরী দর্শনে আসতে লাগল। খবর পাঠাল বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে এল। দুই দলের দেখা হল অক্রুরে।

পরমেশ্বরী দাস জাহ্নবার সঙ্গে সকলের পরিচয় করে দিল—এই গোপাল ভট্ট, লোক-নাথ, ভূগর্ভ—এই জীব গোস্বামী। এই কৃষ্ণ-দাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণ পণ্ডিত, মধু পণ্ডিত।

তোমাদের মধ্যে ইনি কে?

ইনি রামচন্দ্র কবিরাজের ছোট ভাই গোবিন্দ। অনবদ্য পদকর্তা।

দুই দলেই আনন্দের বান ডেকে এল।

জীব গোস্বামী জাহ্নবার জন্যে বাসা স্থির করে দিল। জাহ্নবা ঘুরে ঘুরে মন্দির ও বিগ্রহ ও দ্রষ্টব্য স্থান দেখে বেড়াতে লাগলেন। রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ দাসের সঙ্গে দেখা হল। দেখা হল কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে। তিন চার দিন সেখানে থাকলেন জাহ্নবা। রান্না করে খাওয়ালেন সকলকে। খাওয়ালেন কৃষ্ণকে।

একদিন দুপুরবেলা কুণ্ডতীরে বাঁশি শুনতে পেলেন জাহ্নবা। অস্থির হয়ে তাকা-লেন চারদিকে। দেখলেন শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণ কদমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে আর তাকে বেষ্টন করে আছে শ্রীমতী ও তার সখীবৃন্দ। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে জাহ্নবা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। চেতনা পেয়ে স্থির হয়ে ভাবতে লাগলেন এ নির্জন রঙ্গের কথা কার কাছে বলা যায়।

জীব গোস্বামী গোস্বামিগ্রন্থ পড়ে শোনাল জাহ্নবাকে। তারপর জাহ্নবা বনভ্রমণে

কেঁদেছেন—স্মরণ কর। ভ্রমণ সাঙ্গ করে ময়ূরাক্ষীতীরে এক গ্রামে ঢুকেছেন, শুনতে পেলেন এক বুকের কান্না। কী ব্যাপার? শুনলেন এক নিরীহ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিল, পৌগণ্ড বয়সে সেই ছেলেটির আজ মৃত্যু হল। তার মা মৃত পুত্র কোলে নিয়ে কাঁদছে আর ব্রাহ্মণ করছে গগন-বিদারণ হাহাকার।

করুণার আর্দ্রচিত্ত, জাহ্নবা অস্থির হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে স্পর্শ করবার জন্যে হাত বাড়ালেন।

মা বারণ করল। বললে, 'আমার ছেলেকে ছুঁয়ো না।'

জাহ্নবা বললেন, 'সে কী, তোমার ছেলেকে ছুঁলে আমি পবিত্র হব।' বলে মৃত বালকের মাথায় হাত রাখলেন। বালক চোখ মেলল, চোখ মেলে তাকাতে লাগল চারদিকে। জাহ্নবাকে প্রণাম করে উঠে পড়ল।

এ কী অঘটন! এ কী করুণা-বিতরণ! ব্রাহ্মণ আর তার স্ত্রী জাহ্নবার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

জাহ্নবা বললে, এ আমার কৃপা নয়, কৃষ্ণের কৃপা। কৃষ্ণই করুণাময়। তোমাদের দুঃখে বিচলিত হয়ে করুণা করে তোমাদের পুত্রকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আর কান্নার প্রয়োজন নেই। শুধু কৃষ্ণনাম করো।

মন্দিরে গিয়ে রাধাগোপীনাথ দর্শন করলেন, জাহ্নবার হঠাৎ মনে হল দৈর্ঘ্যে রাধিকা যেন গোপীনাথের চেয়ে খাটো। 'শ্রীরাধিকা কিছু উচ্চ হইলে ভালো হয়।' ঠিক করলেন গৌড়ে ফিরে একটি নতুন রাধিকা-বিগ্রহ তৈরি করাবেন। নয়ন-ভাস্করকে বললেন সেকথা। বললেন, এখন থেকে গোপীনাথকে নিরন্তর ধ্যান করবে, সেই ধ্যানেই পেয়ে যাবে তাঁর প্রেয়সীর আভাস।

জাহ্নবার মনোবাঞ্ছা বুঝতে পারল নয়ন।

তারপর গৌরীদাসের সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে জাহ্নবা তাঁর মাসির ছেলে বড়ু-গঙ্গাদাসের দেখা পেলেন। বললেন, আমার সঙ্গে গৌড়ে চলো।

জাহ্নবা গৌড়ে ফিরে যাচ্ছেন শুনে এক বৃন্দাবনভক্ত তাঁকে একটি রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ উপহার দিল। জাহ্নবা গঙ্গাদাসকে বললেন, আর কথা নেই, তুমি গৌড়ে গিয়ে এ বিগ্রহের সেবা করবে।

জাহ্নবার সঙ্গে গঙ্গাদাসও ফিরে চলল। বিদায়ের ক্ষণে সমস্ত বৃন্দাবন শোকাভিভূত হয়ে গেল।

গৌড়মণ্ডলে প্রবেশ করে জাহ্নবা প্রথমেই খেতুরি গেলেন। সেখানে তিন-চার দিন থেকে গেলেন বুধরিতে। সেখানে শ্যামদাস চক্রবর্তীর মেয়ে হেমলতার সঙ্গে গঙ্গাদাসের বিয়ে দেওয়ালেন। সেখান থেকে গেলেন নিত্যানন্দের জন্মভূমি একচক্রায়।

একচক্রায় এক ব্রাহ্মণের মুখে শুনলেন সব পুরাবৃত্ত। 'এই একচক্রা ঈশ্বরের ধাম। 'এথা শীঘ্র প্রকটিব প্রভু বলরাম।' শুনলেন নিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃকুলের বিবরণ, মাতা পদ্মাবতীর চরিত্রকথা। নিত্যানন্দের বাল্যলীলা ব্রজলীলা বিচিত্রের অবতারলীলা। পরিশেষে গৃহত্যাগ।

একচক্রা ছেড়ে জাহ্নবা গেলেন যাজিগ্রামে। শ্রীনিবাসের সঙ্গে দেখা করলেন। সেখান থেকে গেলেন শ্রীখণ্ডে। রঘুনন্দনের সঙ্গে দেখা করলেন। সেখান থেকে নবদ্বীপে, শ্রীবাসগৃহে। তারপরে অম্বিকা হয়ে খড়দহে। সেখানে মিললেন পুত্র কন্যা ও ভগ্নীর সঙ্গে—বীরচন্দ্র গঙ্গা ও বসুধার সঙ্গে।

কিছু দিনের মধ্যেই নয়ন ভাস্কর রাধিকা-মূর্তি নির্মাণ করে আনল। চিত্তের সমস্ত ভক্তি, মাধুর্য ও পবিত্রতা দিয়ে মূর্তি নির্মিত হয়েছে, সবাই ধন্য-ধন্য করে উঠল। জাহ্নবা বললেন, এখন একে কে নিয়ে যাবে বৃন্দাবনে?

পরমেশ্বরী দাস রাজী হল। তার পথের সঙ্গী হল নৃসিংহ চৈতন্য।

পথিমধ্যে কাটোয়ায় শ্রীনিবাস দেখল বিগ্রহ। রাজা বীর হাম্বীর বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার জন্যে গোপনে এক হাজার টাকা দিল। বিগ্রহ বৃন্দাবনে পৌঁছুলে কথা উঠল আদি-বিগ্রহ কোথায় যাবে? জয়পুরের রাজা আদি-বিগ্রহ গ্রহণ করলেন। গোপীনাথের বামে নতুন বিগ্রহ বসানো হল। এই নতুন বা প্রতিভূ-বিগ্রহের নাম হল জাহ্নবা-ঠাকুরাণী বা জাহ্নবা-রাধিকা।

পরমেশ্বরী দাস ফিরে এসে সবিস্তার সব বললেন জাহ্নবাকে। জাহ্নবা তাকে আদেশ করলেন, তড়া-আটপুর গ্রামে গিয়ে রাধা-গোপীনাথ সেবা প্রকাশ করো।

পরে আবার স্বগণ-সহ চললেন বৃন্দাবন। রাধাসহ গোপীনাথকে দর্শন করে আসি।

বৃন্দাবনে পৌঁছে রাধা-গোপীনাথকে দেখতে গেল জাহ্নবা! কিন্তু এ কী দৃশ্য! 'মধ্যে গোপীনাথ, রাধা দক্ষিণে বামেতে।' গোপীনাথের দুই পাশে দুই রাধিকা! দুই প্রেমলতিকার মধ্যে শ্যামল তমাল বৃক্ষ। মধ্যে মেঘকুঞ্জ দুই পাশে দুই বিদ্যুৎ-উদ্ভাস!

গৌড় থেকে যেসব দ্রব্য এনেছিল সমস্ত রাধা-গোপীনাথকে সমর্পণ করলেন, বিচিত্র অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করে খাওয়ালেন দুজনকে। তারপর একদিন নিভৃতে সেই মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল।

গোপীনাথ জাহ্নবার বস্ত্র আকর্ষণ করে তার বামপার্শে বসিয়ে দিল। 'গোপীনাথ জাহ্নবার বস্ত্র আকর্ষিয়া। বসাইলা আপনার বামপার্শ্বে লইয়া।।'

সেবকেরা যখন দরজা খুলল, দেখল জাহ্নবা কাঞ্চনপ্রতিমা হয়ে গোপীনাথের দক্ষিণে বিরাজ করছেন।

সবে দেখে কাঞ্চনপ্রতিমা মূর্তি হইয়া।
বিরাজয়ে গোপীনাথের দক্ষিণে বসিয়া।।
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা দক্ষিণে জাহ্নবা
মধ্যে গোপীনাথ ইথে উপমা কি দিবা।।

(ক্রমশঃ)

বন্যা

[উপন্যাস]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
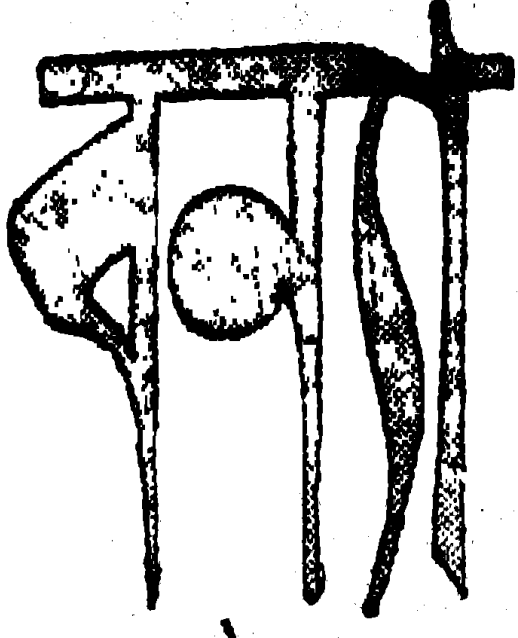
আগের ঘটনা

[সত্য বিয়ে করে লীলাকে। সে বড় জেদী, স্বাধীন ও সুন্দরী। কিন্তু সত্যকে নিয়ে হয়তো লীলা সুখী ছিল না। এমন সময় সুখেন এল। সত্যর বাল্যবন্ধু। সংসারে ঝড় উঠল এবার। তছনছ।

রূপপুর ছাড়ল সত্যচরণ। এল রাণীচক। ঘরে এল যমুনা। রান্নাবান্নার জন্যেই তাকে রেখেছে। সে নবযুবতী।

এদিকে সুখেন এল রূপপুর। লীলার কাছে। বড়ো বেশি ঘনিষ্ঠ হল ওরা। লীলা সুখেনের প্রেস কিনল।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সেখানে এল সত্য। সুখেনের মুখেই শুনল লীলা ডিভোর্স করবে। সত্যও তা চাইছিল মনে মনে। যমুনা কি ওকে পাগল করে তুলেছিল?

সত্যি সত্যিই মামলা উঠল আদালতে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২২)

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি আদালত ডিভোর্সের রায় দিল।

পরদিনই সত্য দুপুরে ঘেমে-তেতে সাইকেলে দিদির বাড়ি হাজির। আগের দিন সন্ধ্যায় প্রবোধ ফিরেছে বহরমপুর থেকে। সব শুনেছে সুভদ্রা।

প্রবোধ বাড়ি ছিল না। সত্য সোজা-সুজি বলে উঠল, দিদি, একটা কথা বলবার জন্যে এসেছি।

সুভদ্রা বঁটিতে তরকারি কুটছিল। বলল, কী কথা রে?

বল, তুমি রাগ করবে না।

রাগ করব কেন? কী কথা?

এ ছাড়া কোন উপায় নেই, তুমি মত দাও শুধু...

আঃ, কী কথা বলবি তো?

যমুনাকে আমি বিয়ে করব।

বঁটিটা কাত করে রেখে সুভদ্রা ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, তোর মাথা খারাপ হয়েছে? ছিঃ, ও তোর মেয়ে!

ওটা তোমার সংস্কার, দিদি। মিথ্যে সংস্কার।

সতু, কী যা তা বলছিস! যমুনা তোকে বাবার মত দেখে।

সত্য মুখ নামিয়ে বলল, না। বাবার মত দেখে না। আমিও তাকে মেয়ের মত দেখি নি কোনদিন!

সুভদ্রা স্তম্ভিত হয়ে গেল। কথা বলতে পারল না।

সত্য গলা ঝেড়ে নিয়ে ফের বলল, লীলা মিথ্যে বলে নি একটুও। আমি... আমি যমুনাকে নষ্ট করেছি।

সুভদ্রা মুখ ঢাকল আঁচলে। সতু, তোর হাতে ওই বাপ-মা মরা কাচ মেয়েটাকে তুলে দিয়েছিলাম। এ বাড়ি এসে থেকে ওকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছি এতটুকু মেয়ে। আমার কোন ছেলেপুলে নেই। তোর কষ্ট দেখেই নিজের কষ্ট চেপে রেখে ওকে রেখে এসেছিলাম তোর কাছে। তুই এত নীচ প্রকৃতির, আমি ভাবিনি।

সুভদ্রা কাঁদছিল। সত্য ওর পায়ে হাত রেখে বলল, আমি...আমি দোষী দিদি। আমাকে ক্ষমা করিস। কিন্তু এতে দোষ কী রে? আমি তো মানুষ!

সুভদ্রা গর্জে উঠল, তুই অমানুষ। নরকেও তোর জায়গা হবে না। যা, এক্ষুনি বেরিয়ে যা। আমি আজই ওকে পাঠিয়ে দেব, যমুনাকে নিয়ে আসবে। ছি, গলায় দড়ি জোটে না তোর!

এবার সত্য তার শেষ কথাটা বলে দিল। মুখ নামাল না। তার চোখ দুটো লাল, হাত থর থর করে কাঁপছে। সে বলল, দিদি, যমুনার পেটে বাচ্চা আছে।

সুভদ্রা বঁটিটা তুলেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই রেখে দিল। কঠোর মুখে বলল, তুই যদি জারজ না হোস, আমি যেন তোর মুখ আর না দেখি। আর ওই হারামজাদী বেশ্যাকে বলিস, তোর মা তোকে বিষ খেয়ে মরতে বলেছে।

সত্য নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

(২৩)

যমুনার কাছ থেকে কিছু সাহস আশা করেছিল সত্য। যখন সে শহরের আদালত থেকে ফিরেছে, নিঃসঙ্কোচে লীলার নির্লজ্জতার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে বলেছে, বল যমুনা, এখন কী করি!

যমুনা একটু হেসে বলেছে, ওরা তো মিথ্যে বলে নি।

যমুনা! সত্য আঘাত পেয়ে চমকে উঠেছে।

তখন যমুনা ওর পাঁজরে মৃদু খোঁচা মেরে বলেছে, রাগ হল বুঝি?

তারপর ওকে পিঠের দিকে জড়িয়ে— যেন বা শিশু, গালে গাল যমুনার, নাকে সেই আশ্চর্য গন্ধটা ঝাপটা মারে যমুনার শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে, সে ফিসফিস করেছে, ও কি আমার চেয়ে সুন্দর?

কে?

মামী।

ফের মামী?

থুড়ি, সতীন! সতীনেরা সত্যি কথাটাই বলে।

কিন্তু এর জন্যে একা আমিই কি দায়ী? তুই নোস?

এই, তুই বললে জবাব দেব না। এখন আমি বড় হয়েছি না?

বেশ বাবা বেশ, তুমিই বলব।

বলব নয়, এক্ষুনি বল।

তুমিও কি দোষী নও যমুনা?

আমার কী দোষ? যমুনা ওকে ছেড়ে দেয় হঠাৎ।

তুমি কেন বাধা দাও না? কেন দাওনি প্রথমে?

দিয়েছিলাম, পারি নি।

মিথ্যে কথা।

সে তুমিই জানো ভাল করে। আর... যমুনা চোখ বড় করে গাল ফুলিয়ে বসে, আর সে রাতে রিকশোয় আসবার সময়? কে, কে প্রথমে ইয়ে করেছিল, অ্যাঁ? খড়ের গাদায় জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ফেললে আগুন ধরবে না?

যমুনার এমনতর কথায় যে ঝাঁঝ, তাতে বয়সের কটুতা আদৌ নেই। ওর শ্যামলা কিশোরী শরীরে যৌবন নিজেকে মানাতে পারে না—বড় জুতো ছোট থাপে যেমন, কিম্বা উল্টোটাও হতে পারে। হয়ত এ মেয়ে জন্ম-যৌবনা, কৈশোর তাকে আটকাতে পারে না। কৈশোরের কণ্ঠস্বরে সেই যৌবনই কথা বলে।

তাই যেন মাঝে মাঝে ওসব গোপনীয়, বাইরের লোকের কাছে স্বভাবত যা অশ্লীল, কথাবার্তায় যৌবনের উন্দামদীপ্ত ভাবগুলো হঠাৎ মনে হয় বেমানান; মনে হয় এ-ছাঁদে যে বলে, সে নিতান্ত চপলা অবোধ কিশোরী ছাড়া কিছু নয়। যমুনাকে সত্য তখন বোকা ভেবে বসে। এমন বোকার তুলনা সে খুঁজে পায় না। বাঁদরের গলায় মুক্তোর, হার জুটেছে—যমুনার দেহে যৌবন। ও তার মূল্যই বোঝে না! দেহ ছাপিয়ে বন্যার ঢল যেমন, পুরুষের ভোগের ঐশ্বর্য থরে-থরে ফুটে যেমন কিনা সবুজ বাগানে ফুল হয়েছে!

যে-নদী জানে না তার কূলভাসানো জলের মহিমা, সে-নদী শুকিয়ে যাবে এক মরশুমেই। আর যে-সবুজ বাগান জানল না একবারের ফুলে তার শেষ নয়, তার শুকনো পাতায় হবে কীটের বাসা। যমুনা মরবে। ও যে নদীর মত অন্ধ, গাছের মত মূক!

আর যমুনার শরীরে একটা কিছু ঘটে যাবে এ ভয়ে বারবার সে গোপনে ডাক্তারের কাছেও গেছে। কিনে এনেছে ছাইপাঁশ।... নতুন বিয়ে করেছি ডাক্তারবাবু, এত শীগ্‌গীর ছেলেপুলে চাইনে।...বেশ তো, আজ-কাল অনেক ব্যবস্থা আছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং। ছাইপাঁশ কিনে লুকিয়ে রেখেছে। যমুনাকে—যমুনার দেহকে বিষস্ফোটক গজানো থেকে বাঁচাতে চেষ্টা একটা ছিলই মনে পোষা।

অথচ বাকসের ভিতর মোড়কে থেকে গেল সব জমা। চরম সময়ে তা কাজে লাগাতে পারেনি। তার ভয় হয়েছে, এতটুকু ছাড়া পাওয়ার ফুরসৎ পেলে বুঝি বা যমুনা হঠাৎ উঠে পালিয়ে যাবে। চেঁচামেচি করবে। এবং নিজের ভিতর থেকেও পাপের দেবতা চাপাস্বরে বলেছে, এই সতু, এই গাধা, শীগগীর, শীগগীর! কে এসে পড়বে এক্ষুনি! চারপাশে অদৃশ্য কান, অদৃশ্য সহস্র চক্ষু ও'ৎ পেতে যেন; যেন বা দরজার বাইরে চুপিচুপি এসে দাঁড়িয়েছে কেউ—হয়ত চাঁপা ঝি, হয়ত পিনাকী, হয়ত বা অন্য কেউ।

কিংবা লীলা।

আর ঝাপসা হয়ে ওঠা অলক্ষ্য জগতের অদূরে আকাশের নক্ষত্রের মত তার দিদি সুভদ্রারও দৃষ্টি। ওকি, ওকি রে সতু!

কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে যেমন করে ছোঁক খায়, ভীত চঞ্চল চক্ষু, গুটানো লেজ, জিভ বেরিয়ে পড়েছে—সত্য যমুনাকে গ্রাস করেছে।

...যা ইচ্ছে কর, কিচ্ছু বলব না। তোমারই পাপ হবে।

...চুপ, কথা নয় যমুনা!

কিন্তু যমুনাও সাড়া দিয়েছে। তার নীরবতার মাঝে সম্মতি শুধু নয়—দেহের দিকে সাড়া। দুটি বাহুতে, অধরোষ্ঠে, আকর্ষণের তীব্রতায় তার দেহের ভাষা পড়ছিল ধরা।

সেইসব সময় হঠাৎ ঘুমের ঘোরে যেমন মনে হয়, সত্য অনুভব করেছে কচি কোমল নধর সুন্দর এবং অসহায় একটা শিশু পড়ে যাবার ভয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে। মমতায় বুকের অন্ধকারে কার কান্না ভাসে চুপিচুপি শিশিরের শব্দের মত।

...কী হল।

...কী হবে।

...হুঁ, বীরপুরুষ! ভাব দেখে ত মনে হয় রাক্ষসের মত গিলবে! নাও, ওঠো। এত রাত্তিরে আবার নাইতে হবে! জ্বালাতন!

প্রচণ্ড শীতের রাতে যমুনা স্নান করেছে কাঁপতে কাঁপতে। সত্য বারান্দায় বসে, থেকেছে চুপচাপ। কেন সে নিজেকে দমন করতে পারে না? অন্যকেউ এক্ষেত্রে কী করত, ভাববার চেষ্টা করেছে সে। আর তখনই নিজেকে আঘাতে-আঘাতে চূর্ণ করতে সাধ হয়েছে। ঝুলে পড়বে গাছের ডালে—বিষ খাবে—চলন্ত লরীর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

পাগল, পাগল! সত্য জীবনকে এত ভালবাসে। বেঁচে থাকবার সাধ-ইচ্ছা তার এত তীব্র। এত সতর্কভাবে সে চলাফেরা করে। সাপের ভয়ে টর্চ ছাড়া বেরোয় না রাত্রে। রিকশো চাপলে আগে রিকশো-ওলাকে সতর্ক করে দেয়!

কিন্তু যমুনার জন্য ভয় থেকেছে বর-বর। প্রতিবারই সে ভেবেছে, হয়ত এবারই যমুনা একটা ভয়ঙ্কর কিছু করে বসবে। দেখবে ঝুলছে তাকে উঠোনের পেয়ারা গাছে। নয়ত পুরনো কুয়োর জলে ভাসবে তার মড়া।

পালিয়েও যেতে পারে! দিদিকে সব খুলে বলতে পারে।

দুরুদুরু বুকে কাটাতে হয়েছে রাত্রি জেগে যমুনার পাহারায়। দোকানে বেশিক্ষণ থেকে থাকতে পারেনি। বুলু, আমি আসছি রে!

ওকি মামা, এক্ষুনি এলে, আবার যাবে?

একটা কাজ ভুলে গেছি বাবা।

ধুৎ, এমন করলে দোকান চলে?

সত্য হেসে বলেছে, দোকান কি আমার রে? তুই ওর মালিক। চালা তুই।

বাড়ির দরজায় এসে বুক ধকধক করে সত্যর। যদি সত্যি সত্যি যমুনা...

নাঃ! দরজা খুলেছে যমুনাই। হেসেছে। একি! আবার এলে?

তোকে না দেখে থাকতে পারিনে তো!

খুব হয়েছে!

দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্য ওকে জড়িয়ে ধরে অজস্রবার চুমু খেয়েছে। যমুনা বলেছে, দিলে তো মুখটা পচিয়ে!

সে সাবান ঘষে ফের। ফের স্নো-পাউডার মাখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেকটা সময় ধরে দেখে। গালের টোলটা টেপে। ব্রন খোঁজে। একটিও নেই!

যমুনা যেন তার মতই জীবনকে ভালবেসে বেঁচে থাকতে চায়।

শুধু একটা তফাৎ আছে এ ব্যাপারে।

সত্য মৃত্যুকে অনুভব করে, যেন বা অনুক্ষণ সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে দেখতে পায় আততায়ীর মত—একজোড়া জ্বলজ্বলে সাপের চোখ!

যমুনা—মৃত্যু আছে, তা জানে না যেন। মৃত্যুকে সে ভাবে না।

অন্ধকে করুণা করতে হয়। যমুনাকে সেইরকম করুণা করে সত্য।

আর, এই আলো-অন্ধকার চিত্রবিচিত্র বোধের সামনে সত্যকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল। অস্থির, যেন বা ক্ষুব্ধ, যেন ক্লান্তও। সেই সময় একদিন হঠাৎ বারান্দায় বসে মাথা চেপে ধরে যমুনা বমি করার চেষ্টা করেছিল। তার কয়েকদিনের মধ্যেই সত্যর ধারণা স্পষ্ট হল। সে যমুনাকে কিছু বলেনি। কিন্তু যমুনাও কি বুঝেছে!

(২৪)

সুভদ্রার কাছ থেকে ফিরে সত্য দেখল সদর দরজা ভেজানো আছে। তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। উঠোনে সাইকেল রেখে সে লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠল। দেখল, যমুনা ঘুমুচ্ছে।

বিকেল হয়ে গেছে। বাতাসে একটু ঠাণ্ডা ভাব। মুখের ঘাম শুকিয়ে যমুনার মুখটা বাসি ফুলের মত দেখাচ্ছিল। ঘুমের ঘোরে ওর গায়ের কাপড় এলোমেলো হয়ে গেছে। যমুনার ঘুম বরাবর বেশ গাঢ়। সত্য জানে।

মুখ হাঁ হয়ে আছে ওর। চোখের নীচে কালির ছোপ পড়েছে। আর খুব কাছে

ওকে লক্ষ্য করলে তবে বোঝা যায়, ওর জঠরটা স্ফীত।

পেটের কাপড় সরিয়ে হাত রাখতেই যমুনা তাকাল। তারপর উঠে বসল। বলল, ইস, কী মানুষ তুমি! হঠাৎ না বলা-কওয়া কোথায় গিয়েছিলে? দোকানে নেই খবর পেলাম। ভাবলাম......

কী ভাবলে? সত্য একটু হাসল।

বহরমপুরে গেলে বুঝি। গিয়েছিলে?

না।

কেন লুকোচ্ছ? ভাবছ, কিছু টের পাইনে?

কী টের পেয়েছ?

ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ। আবার কী?

তুমি ছাড়া আর জল কোথায় পাব যমুনা?

পাবে না আবার? আমি তো এখন... লোনা হয়ে গেছি। যমুনা হেসে উঠল। বড় সুন্দর দেখাল ওর হাসিটা। ওর মুখে মায়ের আদল—ওর হাসিতে এখন মায়ের হাসি।

না। সত্য একটু কাছাকাছি গিয়ে বলল। না, তুমি লোনা হওনি।

সে আদর করতে থাকল। একটু পরে যমুনা বলল, বারে বারে পেটে হাত দিও না, কাতুকুতু লাগে বড্ড।

যমুনা কি এত বোকা, এখনও কিছু টের পায় না? সত্য বলল, আচ্ছা যমুনা, ধর এমন যদি হয়—হঠাৎ তুমি জানলে, ছেলেপুলের মা হতে চলেছ...

ও-মা-গো! যমুনা দুহাতে মুখ ঢাকল।

কেন, মা হতে চাও না?

বেশ কিছুক্ষণ দুহাতে মুখ ঢেকে পিছন ফিরে থাকার পর যমুনা বলল, আমার ভয় করে।

কিন্তু তুমি মা হয়েছ, যমুনা! তোমার পেটে বাচ্চা এসেছে।

ফের দীর্ঘ নীরবতা। সত্য কয়েকবার ডাকল। সাড়া পেল না। তারপর ফিসফিস করে যমুনা যেন দেয়ালকেই শোনাল, বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি।

সত্য জোর করে ওকে এদিকে ফেরাল। যমুনা নত মুখে বসে থাকল। সত্য বলল, সাবধান হওয়া উচিত ছিল। হইনি। কিন্তু ওটা নষ্ট করা দরকার। একটুখানি কষ্ট হবে তোমার। সইতে পারবে না? না, না। ভয়ের কিছু নেই। আজকাল এমন কত হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ভয় করো না।

যমুনা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল। যে কান্না সারা পৃথিবী জুড়ে অজস্র কুমারী জননী কাঁদে।

(২৫)

শেষঅব্দি একটা ভালো বাড়ি পাওয়া গেছে। পাশে প্রাচীন খৃষ্টান কবরখানা। সামনে বিরাট ফাঁকা মাঠ। ওপাশে রেল-স্টেশন। বেশ নির্জন। অজস্র গাছপালা আছে। রাত্রে শেয়ালের ডাকও শোনা যায়। শহরের এ অংশটা একসময় জঙ্গল আর আমবাগানে ঢাকা ছিল। দেশ-বিভাগের পর উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে উঠেছে। সদর রাস্তার দিকে গড়ে উঠছে অনেক নতুন সুন্দর-সুন্দর বাড়ি।

এ বাড়িটা পুরোনোই। কোন এক মুসলমান উকিল ছিলেন এর মালিক। ছেলেরা সব পাকিস্তানে চলে গেছে। ভদ্র-লোক এখানেই ছিলেন। একা বিপত্নীক মানুষ।

হঠাৎ কী খেয়ালে ছেলেদের কাছে যাবার ইচ্ছে হল। বাড়িটা বেচে দিতে চেয়ে-ছিলেন। শঙ্কর ভট্টাচার্যই ব্যবস্থা করে দিলেন যথারীতি। বেশ সস্তায় মিলে গেল। এসব ক্ষেত্রে দরদাম সস্তা হওয়াই স্বাভাবিক।

সেই বাড়ি ফের নতুন করে ভোল ফেরানো হল। একেবারে বদলে গেল চেহারা। ডিভোর্সের রায় চুকে যেতেই লীলা চলে এল রূপপুর থেকে পাকাপাকি ভাবে। বাড়িটা এবং জমি-জমার বেশী অংশ বেচে ফেলতে হয়েছে। যেটুকু থাকল, ত হরুর হাতে নয়, রঘুপন্ডিতের ছেলে সজ্জ দেখাশোনা করবে। ফসলের অংশ ছাড়া আর কোন দাবী নেই তার।

লীলার সঙ্গে বাসিনী এল। আর এল ঘন্টা। ঘন্টার মা রূপপুর ছেড়ে নড়তে চায় না। চাইলেও তাকে আনবার দরকার ছিল না কিছু।

আসবাবপত্র সবই নতুন কিনতে হল শহর-জীবনের উপযোগী হাল-ফ্যাসানে জিনিষপত্র চাই বৈকি। লীলা নাগরিক হতে মন দিয়েছে যে!

ঘটা করে গৃহপ্রবেশ পর্যন্ত চুকল কোন এক শুভদিনে। পাড়ার মেয়েরাই এসেছিল বেশি সে অনুষ্ঠানে। শঙ্করবাবু এসেছিলেন সপরিবারে। সুখেনের ভাষায় রীতিমত পার্টি!

সুখেনের ভয় ছিল, লীলা তার গ্রাম্যতা দিয়ে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা—পরিবেশ তো ভিন্ন, লীলার কাছে বেশ নতুনই!

অবাক করল লীলা।

আসলে লীলার চেহারায়, চালচলনে ক একটা আছে। কখনও ঋজুতা কখনও দীপ্ত চটুলতা কম নেই। যদিও বা চোখের তলে ময়লা জমেছে এ কমাসে, শরীরে কিছু অবহেলার চিহ্ন খুঁটিয়ে না দেখলে ত চোখে পড়ার কথা নয়—তথাপি একটা আলোর খেলা আছে যেন, যা তাকে অন্যে কাছে মোহময়ী করে তোলে।

এখন লীলা বেছে কথা বলে। ভাষা থেকে গ্রাম্যতা মুছতে প্রতিমুহূর্তে সচেতন রেডিওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গায় এমনকি অজস্র বই পড়ে সারাটি দিন। কিছু কেনা বই, কিছু চেনামেয়েদের কাছে সংগ্র করা। শহরে মোট তিনটি ছবিঘর। প্রতি নতুন ছবি না দেখে সে পারে না। সুখেন ও ছায়া হয়ে গেছে একেবারে।

ওদিকে প্রেস চলছে জোর। সো সুখেনেরই ভাষ্য। লাভলোকসানের হিসে চাইলে সে বলে, আরো কিছুদিন না গেলে বলা কঠিন। সরকারী অর্ডারগুলো ডেলি ভারি দিই। বিলের টাকা আদায় হোক তারপর বোঝা যাবে।

যা ভালো বোঝো, কর। লীলা বলে তোমাকে অবিশ্বাস করি না তো!

সুখেন ভুরু কুঁচকে তাকায়। বলে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তুলছ কেন? ১

লীলা হাসে। কিছুক্ষণ পরে বলে, না। তুমি আমার বিশ্বাসী লোক।

শুধু 'লোক' হয়ে আর থাকতে ভালো লাগে না, লীলা। এবার একটা কিছু কর। সুখেন একদিন মরীয়া হয়ে বলে বসল।

সবে বর্ষা নেমেছে। ওরা বসবার ঘরে মুখোমুখি বসেছিল দুটো বেতের চেয়ারে। লীলার পরনে হাল্কা নীল শাড়ি আর গোলাপী হাতকাটা ব্লাউস। শুকনো রাখা খসখসে চুলে মফঃস্বলের টাটকা আমদানীকরা বিচিত্র খোঁপা—পাখির বাসা গোছের, সুখেন মনে মনে হাসছিল—এবং পায়ে সাদা দুফিতের শিলপার। একটা পা অন্য জানুর ওপর দিয়ে ঝুলেছে—পাটা নাচাচ্ছিল। সুখেনের দিকে ফেরানো।

সত্য দেখলে ভিরমি যেত বিলক্ষণ। সুখেন মনে মনে বলছিল।

কী বললে? লীলা ভ্রূভঙ্গী করে তাকাল ওর দিকে।...লোক না কী?

শোনোনি। কী ভাবছিলে? সুখেন হাসল।

কিছু না।

বলছিলাম, আর কতদিন এমন করে কাটাবো?

কেমন করে?

যেমন আছি!

বেশ তো আছ! অসুবিধে হচ্ছে?

হচ্ছে বৈকি। আমার তো একটা ভবিষ্যত আছে। যদিও এটা টাউনের ব্যাপার, এখানেও
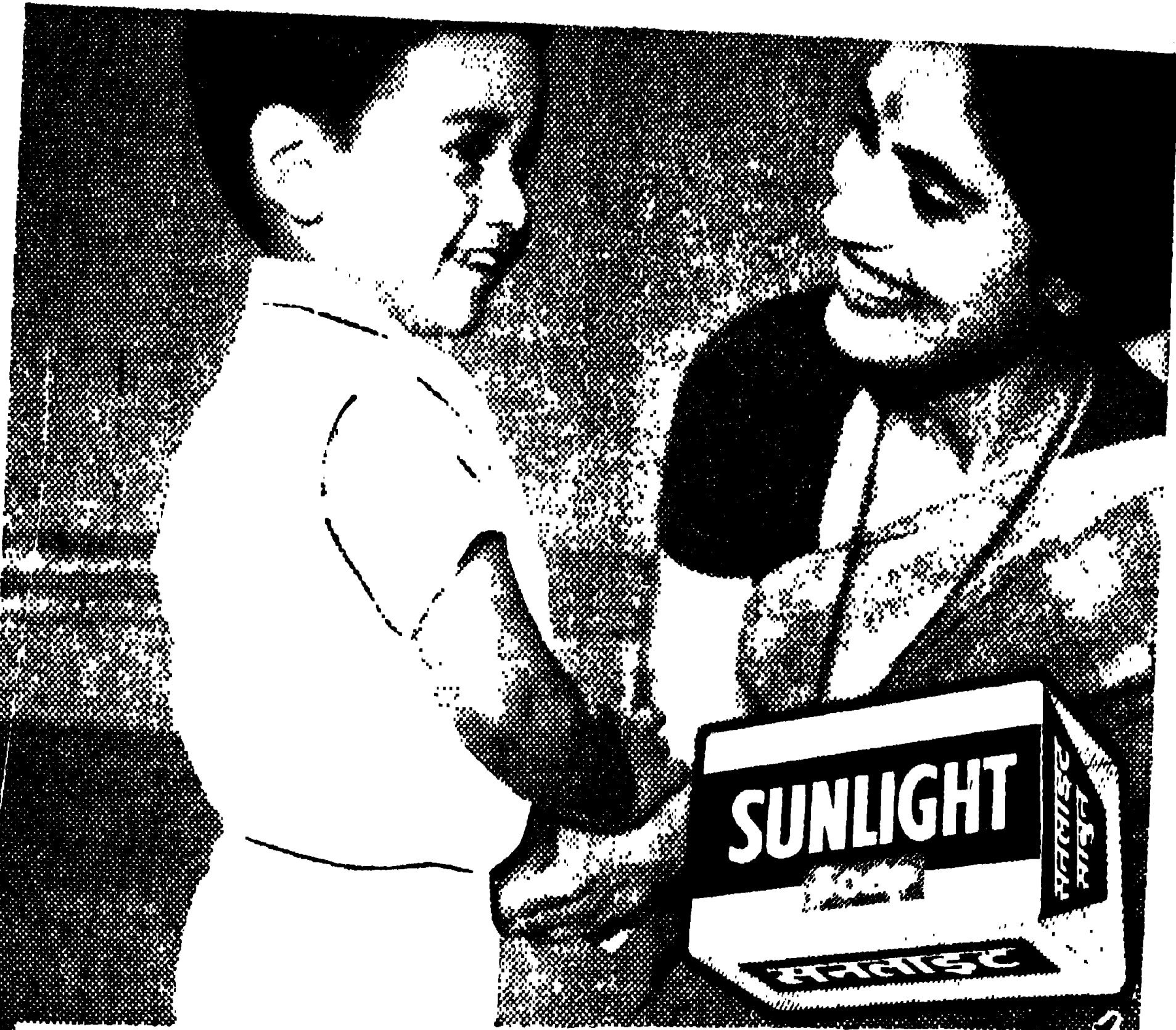
সমাজগোছের রয়েছে। চেনাজানা মানুষও আছে অনেক। কতদিন আর স্ক্যান্ডালের বোঝা বইব, তুমিই বল, লীলা। মাকামারা হয়ে যাচ্ছি না?

লীলা ওর মুখের দিকে তাকাল—যেন কিছু বোঝে না! বলল, কলাঙ্কের কথা বলছ?

হ্যাঁ। তোমার শংকরজ্যাঠাই বা কী ভাবছেন? তিনি সবই জানেন।

লীলা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, উনিও বলেছেন আমাকে।

সোৎসাহে সুখেন লাফিয়ে উঠল। কী, কী বলেছেন?

তোমাকে বিয়ে করতে।

দিব্যি কর।

দিব্যি করার কী আছে? যা বলেছেন, বললাম।

তাহলে আর দেরী করবে কেন?

লীলা টেবিল থেকে মাথার কাঁটাটা তুলে নিয়ে দাঁতে কামড়াল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, কিছুদিন ভাবতে দাও।

তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না লীলা?

সুখেন এমন স্বরে কথাটা বলল যে লীলা না হেসে পারল না। সে বলল, বাসি বৈকি। নৈলে এতসব করলাম কেন? ভিটে-মাটি বিক্রী করে এখন পথের ভিখিরী হতেও তো বাকি রাখলাম না! কোর্টেও দাঁড়িয়ে-ছিলাম লোকলজ্জা না মেনে। তোমাকে ভাল-বাসি বলেই......

থাক, থাক। খুব হয়েছে! সুখেন বাধা দিল। এরই মধ্যে একেবারে ভীষণ চালিয়াৎ হয়ে গেছ দেখছি। না লীলা, সত্যি বলছি, আর ঠাট্টাতামাসা নয়। নিজের ঘরে চুরি করার মানে হয় না। আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি।

লীলা একই ভঙ্গীতে বলল, স্বামী হলে কিন্তু যখন-তখন টাকা চাইতে পারছ না।

টাকার খোঁটা দিচ্ছ? সুখেন গোমড়ামুখে বলল। টাকা তোমার কাছে যখনতখন নিই। —একথা ঠিক।

মাইনেও নাও।

নিই। তুমি জানো না, আমার অনেক ধার আছে। জানিনে সারা জীবনে তা শোধ করতে পারব কি না!

বাঃ, চমৎকার! লীলা দুলে উঠল।...বিয়ে করে তখন সব ধারের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাবে। কী চালিয়াৎ লোক রে বাবা!

সুখেন আহতস্বরে বলল, অত হীন ভেবো না আমাকে। আমার ধার আমারই।

ধার হয় কেন অত?

এখন হয় কে বলল? ওসব পুরনো ধার। জানো না তো, কী অবস্থা থেকে কিসে পৌঁছেছিলাম। হয়ত কোনদিন ছেলেবেলায় শহরে এসে যে ছেলেটির কাছে বাদাম কিনে খেয়েছ, সে আমিই। কিংবা হয়ত মেরামত করেছ ছেঁড়া শ্লিপার, সে এই আমিই ছিলাম। আমার পিছনে একটা ভীষণ দুঃখের দিন গেছে লীলা। সে একটা দুঃস্বপ্ন। যখনই মনে পড়ে, বুক কেঁপে ওঠে। কত-দিন না-খাওয়া কাটিয়েছি। কার বারান্দায় একটুকরো রুটির জন্যে......

সুখেন হঠাৎ সামলে নিল। তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। সে হাঁফাচ্ছিল।

লীলা আস্তে আস্তে বলল, এখন তো তুমি সুখী।

এ সুখের কোন মূল্য নেই, লীলা। চোরাবালির উপর ঘর বেঁধেছি।

না। তা নয়।

কেন নয়? তোমার ইচ্ছের উপর আমার সুখের টিকে থাকা। যেকোন সময় ইচ্ছে হলে বলবে, দূর হও, চাইনে! নয় কি?

বলব না।

বিশ্বাস করিনে।

কেন? তোমাকে আমার দিতে তো কিছু বাকি নেই, সুখ। তবু কেন অবিশ্বাস?

সুখেন একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, রাগ করো না। আমিও একদিন সস্তু হয়ে যেতে পারি তোমার চোখে।

লীলা উঠে দাঁড়াল হঠাৎ।

ওকি? রাগ করে চলে যাচ্ছ?

লীলা জবাব দিল না।

এসব সময় বরাবর সুখেন যা করে, তাই করল। সে ছাড়া এমন আর কতজনই বা পারে সংসারে? একটা কুপিতা বাঘিনীকে শান্ত করার মত দক্ষ রিঙমাস্টার তার মত দেখা যায় না। দরকার হলে যে পায়ে হাত দিতেও পিছপা নয়।

কারণ সে জানে, মেয়েরা—লীলার মত মেয়েরা, হঠাৎ জমে বরফ হয়ে গেলে কতখানি তাপ দরকার হয়।

ওর বন্ধুরা বলে, সুখেনের মত মেয়ে-পটানে ছেলে পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। ওর অভিজ্ঞতা বড় কম নয়। একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে ওর জীবনে।

থিয়েটারে নেমে সুখেন দেখেছে, সে খুব ভালো অভিনেতা নয়। কিন্তু বাস্তব-জীবনে সে অভিনয়ে পটু।

সুখেনের অভিনয় কতখানি, মাঝেমাঝে সে নিজেও বুঝতে পারে না। সত্যিসত্যি চোখে জল আসে। মনের স্যাঁতসেঁতে ভাবটুকু অনেকক্ষণ ঘোচে না।

ঘণ্টা আসতেই সুখেন ক্ষান্ত দিল। লীলার হৃদয় এখন দুকূলছাপানো নদী হয়ে গেছে—সুখেন জানে।

এবং সুখেন যখন বেরলো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। লীলাকে জয় করেই লম্বা লম্বা পা ফেলে সে হাঁটতে থাকল।

কালেকটরীর কাছে যেতেই একটা চায়ের দোকান থেকে কে তার নাম ধরে ডাকছিল।

সুখেন দেখল ফেল্টুদা।

ফেল্টুদা হেঁকে বললে,—এই সুখে, শোন্ এদিকে।

কাছে যেতেই দেখল, পুরো দলটা বসে আছে ওখানে। প্রদ্যোৎ অহীন তপুদা—এমনকি লালুও। আরো নতুন মক্কেল সুজন।

এলি শ্রীমতীর কাছ থেকে, তাই কি না? চালা বাবা, চুটিয়ে চালা।

যান্। প্রেসের ব্যাপারে গিয়েছিলাম।

অহীন বলল, দন্ত্য স টা ম করে দিন সুখেনদা।

ফেল্টুদা বলল, ব্র্যাভো! আজ জোর লড়াই চলবে কিন্তু। পকেট ভরতি করে এসেছিস তো?

সুখেন মাথা চুলকে বলল, নাঃ।

নাঃ বললে তো চলবে না দাদু। এই লালু, ধর শালাকে, চিৎ করে ফ্যাল......

একদফা জোর স্ফূর্তি হয়ে গেছে বোঝা যায়। পা টলছে ফেল্টুদার। দোকানের পিছনের পর্দা তুলে সেই সময় শিবুও বেরিয়েছে। শিবানী। ওরা বলে শিবু। দোকানের মালিক জগদীশের মেয়ে।

অগত্যা সুখেন দোকানে ঢুকল। ভিতরে বেঞ্চে বসে বলল, কার কাছে সিগ্রেট আছে দাও তো! অনেকক্ষণ টানিনি মাইরি।

প্রদ্যোৎ বলল, ক্যান? মাগীকে গন্ধ লাগে নাকি?

সুখেন বলল, হ্যাঃ। গাঁইয়া ওই ছুঁড়িটা নিয়ে আমার হয়েছে জ্বালা!

ফেল্টুদা দুলতে দুলতে মন্তব্য করল, কিন্তু জিনিস ভালো। গ্রামের জিনিস খাঁটিই হয় রে। অ্যাম আই রাইট? জেন্টলমেন......

অভিজাত পরিবারের সন্তান—এখন বড় জোর মত্ত মাতঙ্গ, ফেল্টুবাবুকে সবাই ভক্তিশ্রদ্ধা করে। ওরা সমস্বরে সায় দিচ্ছিল। সুখেন ডেকে বলল, শিবু, একটু জল খাওয়াবে?

ক্রমশঃ...

রাজধানীর ইতিকথা

নিমাই ভট্টাচার্য
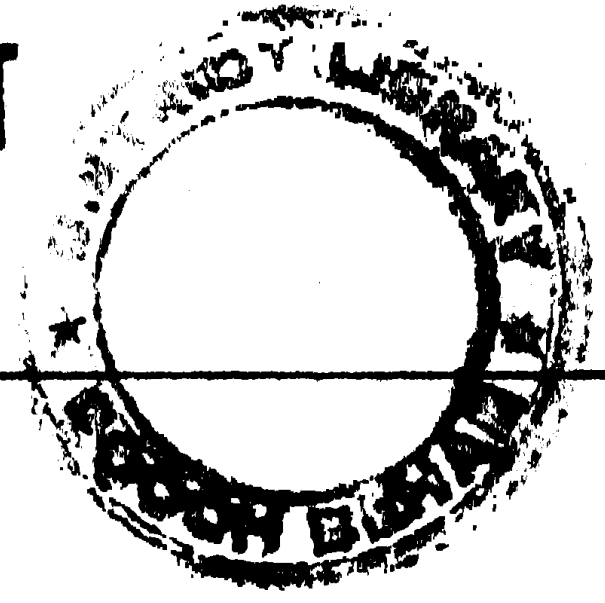
সামান্য মূলধনের অভাবে ছোটখাট ব্যবসাদারদের যে নিদারুণ সমস্যায় পড়তে হয়, সেকথা সবাই জানেন। দুশো-পাঁচশর সমস্যা সামলাতে সামলাতে হাজার হাজার টাকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। শেষপর্যন্ত তাল সামলাতে না পেরে অনেক ব্যবসাদারেরই তিরোভাব হয়। হঠাৎ একদিন সকালবেলায় মির্নাত স্টোর্সের সাইনবোর্ড আর দেখা যায় না। মির্নাত স্টোর্স উঠে গিয়ে পারুল বস্ত্রালয় হলেও তারও মেয়াদ প্রায় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়! এমনি করে অর্থাভাবের দরুণ হাত বদলাতে বদলাতে ভবানীপুর বা কালীঘাট পাড়ার পারুল বস্ত্রালয়ের ঘরে লুধিয়ানা অটো ওয়ার্কস জমিয়ে ব্যবসা শুরু করে। শুধু কালীঘাটের পারুল স্টোর্সের নয়, সারা দেশের অসংখ্য ছোটখাট ব্যবসাদারদের এই নির্মম পরিণতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

শুধু ব্যবসাদার কেন, সাধারণ মধ্যবিত্তের সংসারে সামান্য কয়েক শ' টাকার জন্য কত দুঃখ, কত কষ্ট সহ্য করতে হয়। সামান্য অর্থাভাবের জন্য চিকিৎসা হয় না, মেয়ের বিয়ে হয় না, ছেলের উচ্চশিক্ষা বন্ধ হয়। আরো কত কি হয়। যারা সামান্য একটা ছোট-খাট বাড়ীর মালিক তারা অর্থাভাবের জন্যে বছরের পর বছর বাড়ী মেরামত করতে পারেন না। শেষে একদিন আর কোন গত্যন্তর না দেখে হয়তো সাব-রেজিস্টারের দপ্তরে গিয়ে দলিল হস্তান্তর করতে হয়।

শুধু বাঙলাদেশে নয়, আসাম-উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশ-উত্তর প্রদেশ-বিহার বা আরো অনেক জায়গার মধ্যবিত্ত সমাজের মোটামুটি এই একই কাহিনী। দিল্লীতে? এক কথায় না বললেই চলে। ছোট ব্যবসাদার বড় হবে, বাড়ী করবে, গাড়ী করবে, ছোট একতলা-বাড়ীর মালিক দোতলা করবে, সাইকেলের মালিক স্কুটার কিনবে, স্কুটার চড়া ছেড়ে অ্যাম্বাসেডর-ফিয়েট কিনবে কিন্তু বিপর্যয়? বড় একটা চোখে পড়ে না।

এর অনেক কারণ আছে। তার অন্যতম হচ্ছে বেসরকারী প্রাইভেট ব্যাঙ্ক। প্রাইভেট ব্যাঙ্ক? সে আবার হয় নাকি? হয়। দিল্লীতে হয়। [illegible] রাস্তার [illegible] হকার বা ছোট ছোট স্টল হোল্ডার আছে। এরা প্রত্যেকে রোজ পাঁচ টাকা করে একজনের কাছে জমা করবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে মাসে দেড়শ' ও বছরে আঠারশ' টাকা জমাবে। মাসে মাসে যে পনেরশ' টাকা জমা হচ্ছে তা লটারী করে দশজনের একজন নিয়ে ব্যবসায় লাগাবে। পরের মাসে ন'জনের মধ্যে লটারী হবে। তারপরের মাসে আটজনের মধ্যে লটারী হবে। সামান্য একজন হকার বা স্টল হোল্ডারের পক্ষে বিনা সুদে এবং সসম্মানে একসঙ্গে দেড় হাজার টাকা পাওয়া বিরাট ব্যাপার এবং এই টাকায় সে ব্যবসা বড় করে। তবে সর্ত হচ্ছে এই টাকা শুধুমাত্র ব্যবসায় লাগাতে হবে।

যাদের দোকান যেমন বড় তারা তেমনি বেশী করে এই বেসরকারী ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেন ও আনুমানিকভাবে বেশী ধার পান। দিল্লীর শংকর মার্কেট, আজমল খান মার্কেট বা জনপথের হকার্স মার্কেট বা অন্য যেকোন মার্কেটে যান, সেখানেই দোকানগুলির নিত্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। দিল্লীর হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ দোকানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই বেসরকারী প্রাইভেট ব্যাঙ্কের অবদান সব চাইতে বেশী। একটা মার্কেটের একটা দোকানে চুরি হলো বা পুড়ে গেল বা ইনক্যাম ট্যাক্সের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাওয়া যাবে ও কোন ক্রমেই ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে না।

এই বেসরকারী ব্যাঙ্কের এক এক মাসে এক একজন সেক্রেটারী হন এবং প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনেন। সুতরাং কোন একজনের পক্ষেই টাকা মেরে পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।

দিল্লীর এই বেসরকারী ব্যাঙ্ক সর্বত্র চলে। অফিসের এক ঘরে দশজন কেরানী কাজ করেন। তারাও এই ব্যাঙ্ক চালান এবং সংসারের কোন ক্ষতি না করে নিজেদের স্যুট-প্যান্ট বা গরমের দিনে মুসৌরী-নৈনীতাল ঘুরে আসেন। পাড়ার মেয়েদের মধ্যেও এই ব্যাঙ্ক চলছে। সারা দুনিয়ার সব মেয়েদের মত দিল্লীর মেয়েরাও স্বামীর পকেটে হাত দেন কিন্তু সে টাকা শুধু সিনেমা দেখে উড়িয়ে দেবেন না। বাজার খরচের পয়সা বাঁচিয়ে ও স্বামীর পকেটে হাত বাড়িয়ে পাড়ার গিন্নীরাও মাসে দশ-পনের-বিশ টাকা ব্যাঙ্কে দেন এবং একসঙ্গে দুশো-পাঁচশো পেয়ে সারা পরিবারের জামা-কাপড় করিয়ে নেন। পাড়ার ভদ্রলোকরাও অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্ক চালাচ্ছেন মেয়ের বিয়ে বা বাড়ীর মেরামত বা অনুরূপ কোন কাজের জন্য।

আর যাইহোক বাস্তব বুদ্ধির জন্য পাঞ্জাবীদের তুলনা হয় না। দিল্লী প্রাইভেট ব্যাঙ্ক এদের এই বাস্তব বুদ্ধির এক উল্লেখ-যোগ্য নজীর। আমরাও কি পারি না এই-ভাবে সংঘবদ্ধভাবে বাঁচতে ও অপরকে বাঁচাতে? নিশ্চয়ই পারি। বিশেষ করে ছোট-খাট ব্যবসাদারের পক্ষে এমনি কোন পন্থা ছাড়া টি'কে থাকাই মুস্কিল। বাঙলা দেশের গিন্নীরা স্বামীর পকেট হাতড়ান চিরকাল। শুধু পান-দোক্তা-জর্দা বা সিনেমা দেখার পরিবর্তে এই কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে কি গিন্নীরা আর কিছু করতে পারেন না?

রাতের মজলিস

মিহির বলেছিল সন্ধে সাড়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছুতে। সেলিমপুরে নব-নির্মিত এক সাততলা বাড়ীর সবচেয়ে ওপরের ফ্ল্যাটটি কিনেছে মিহির: গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে সেদিন হাউস-ওয়র্মিং পার্টির বন্দোবস্ত করেছে। ছবির মতো করে ফ্ল্যাট সাজিয়েছে দিন-সাতেক ধরে। ঘুরে ঘুরে বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় তরুণ কবি, আঁকিয়ে আর সমঝদারদের নেমন্তন্ন জানিয়েছে পার্টিতে আসার জন্য। তাছাড়া ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, খ্যাতনামা তরুণ শিল্পী নিখিল বসুর সাম্প্রতিক ছবির এক ছোট প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে উপোসী বেড়ালের সামনে ভরা দুধের বাটির টোপ রাখা হয়েছিল।

কফি হাউস থেকে ভক্তিময় আর হীরককে পাকড়াও করে বেরোতে বেরোতেই আটটা বেজে গেল। মিহিরের বাড়ী পৌঁছুতে পৌনে-নয়। ট্যাক্সিঅলার কোন গাফিলতি ছিল না। অটোম্যাটিক লিফটে চড়ে যখন ওর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম, শুনতে পেলাম সারা ঘর প্রবল হৈ-চৈ আর হাসিতে ফেটে পড়ছে। বুদ্ধি করে ভক্তিময় গড়িয়াহাটের মোড় থেকে হুইস্কির একটা খোকা বোতল নিয়েছিল। ওর যুক্তি ছিল অতি উচ্চস্তরের। চ্যাপটা বোতলটি ট্রাউজার্সের পকেটে চালান করতে করতে বলেছিল, 'হাঁ করে দেখছিস কি? কর্পোরেশনের টিউবওয়েল থেকে অনেক সময় জল পড়ে না। ওপর থেকে একমগ জল ঢেলে দিয়ে হ্যান্ডেল মার, দেখবি হু-হু করে জল বেরিয়ে আসছে। এও অনেকটা এক আঁজলা জল ঢেলে দু বালতি জলের বন্দোবস্ত করা আর কী!'

মিহিরদের ছোট পরিবার—বাপ-মা, একমাত্র বোন সুধা আর মিহির। বড় দুজন গিয়েছেন ডালটনগঞ্জে ওর ছোটো মাসির বাড়ী: দরজায় টোকা দিতেই সুধা আমাদের রিসিভ করলো। ভারী ভালো, ঠান্ডা মেয়ে সুধা, এই উপলক্ষে সেজেছেও ফাস্‌্কেলাস। আমাদের দেখে গিগ্‌ল্‌ করে বলল, 'অমিতদা, সব্বাই বসে আছে তোমাদের জন্যে—আর দু-চার ঘন্টা বাদে এলেই তো পারতে।' একটু হেসে সুধার শ্যাম্পু করা চুল খুজবুজ করে দিয়ে ওর সঙ্গে ভক্তিময় আর হীরকের আলাপ করিয়ে দিলাম। ভক্তি আমাদের জেনারের পেল্লায় কবি। হীরক উঠতি আর্টিস্ট, দিল্লী, মাদ্রাজ আর কলকাতায় তিনটে প্রদর্শনীও করেছে। অমন নামকরা লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুবই প্রীত হল সুধা—আমার প্রচন্ড দেরি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কিছুটা পুষিয়ে গেল বোধহয়।

ঘরে ঢুকেই দেখি দুপাশের দুটি এবনি স্ট্যান্ডের ওপর দুজন জুলু যুবতী প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে আছে। টুকটুকে লাল জিভ, ছানাবড়ার মতো বিস্ফারিত চোখ, গায়ের রং নিখাদ আবলুস। মিহির মূর্তি জোগার করেছে বটে: ভক্তি দুপুর থেকে একটু 'হাই' ছিল, আমার কাঁধে হাত রেখে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে জুলু-দর্শন করে। বলল, 'ভালো করে দ্যাখ দিকিন—আলতোভাবে একটু হাসছে যেন!' আমাদের গলা শুনতে পেয়ে মিহির ছুটে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে গদাম করে আমার নিতম্বে একটি পুরুষ্টু গোছের লাথি ঝাড়ল। প্রায় একই সঙ্গে অবলীলায় ডান-হাতে ভক্তির পেটে কয়েকটি দ্রুত হুক করে হীরকের চোয়াল ঘেঁষে বাঁ-হাতে একটি ছোট সাইজের আপার-কাট চালাল। তারপর দু-চারটে খুবই অশ্লীল গালাগাল করে আমাদের ওর ড্রইং-কাম-শো রুমে নিয়ে এলো। ওর রেকর্ড-প্লেয়ারে তখন 'সাম বডি লাইক হার হট' মাঝারী কী-তে বাজছে।

এখানে ওখানে ছিটিয়ে বসে আছে সবাই। বোম্বাই স্কুলের আর্টিস্ট অর্জুন মালহোত্রা মেঝের লিনোলিয়ামের ওপর শুয়ে বিমে সোলানো সফট লাইটের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। এবারের মিস ক্যালকাটা শোভনা সেন বসে আছেন গগ্যাঁর আঁকা তাহিতির মেয়ের মতো—এত নিখুঁত সেজেছেন, যেন ব্যবহার যোগ্য নন। শৌভিক ঘরের এককোণে খুব সন্তর্পণে পদ্য শোনাচ্ছে দু-তিনজনকে পাকড়ে। দুটি সোফায় দু সেট মডেল-দম্পতি বসে। ইয়া গোঁফঅলা রসভঙ্গকারী গ্রাউন্ড-এঞ্জিনিয়ার বিল্টু বুক কেসে হেলান দিয়ে চোখ বুজে হাভানা টানছে। একটি তৎপর তরুণ সুধার দুই বান্ধবীর সঙ্গে অসম্ভব এনগেজড। দেয়ালে নানা মাপের গোটা কুড়ি ক্যানভাস টাঙানো—জনা-কয় ঘুরে ঘুরে দেখছে তখনো। আর, ঘরের ডান কোণে দুহাত কোমরে রেখে দুপা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যানলি মিত্তির। গড়িয়াহাটের ফেমাস স্ট্যানলি মিত্তির। মিহিরের পাঁজরে কনুয়ের মৃদু খোঁচা দিয়ে বললাম, 'ওকে কোত্থেকে জোগার করলি?' মিহির একটু হেসে বলল, 'সহজে কি আসতে চায়—বহু কষ্টের ধন রে!'

সকাল দুপুর সন্ধে গড়িয়াহাট থেকে রাসবেহারীর মোড় অব্দি যে আধ-পাগলা লোকটি পথচারীর কানের পাশে 'রিংস' বলে হেঁকে যায়, তারই নাম স্ট্যানলি মিত্তির। শুনেছি ইভ্যাকুয়েশনের সময় বার্মা থেকে চলে এসেছিল। সাড়ে ছ ফিট লম্বা রোগাটে চেহারা। ঠোঁটের কষ থেকে সব সময় হয় সিগ্রেট নয় চুরুট ঝুলছে। কাঁধে একটি রং-চটা ঝোলা। ফরাসিতে নাকি স্ট্যানলির ডিপ্লোমা আছে। ইংরেজি ছাড়া কথাই বলে না। শরীরে একান্ত জীর্ণ পোশাক—কিন্তু টাই ট্রাউজার্স কোট সব রীতিমাফিক আছে। হঠাৎ হঠাৎ স্ট্যাচুর ভংগিতে দাঁড়িয়ে থাকে আধ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। কাউকে মানুষ বলে গ্রাহ্যি-ই নেই। খুবই ব্যক্তিত্বপূর্ণ চাল-চলন।

বেশী রাত হলে দুটি বেলফুলের মালা গলায় দিয়ে হাটতে হাটতে চলে যায়। ছেলে-ছোকরারা ভালোবাসে—মাঝে মধ্যে ডেকে চা-খাবার খাওয়ায়। স্ট্যানলি খুব একটা রেয়াত করে না তাদের—খেয়ে কৃতার্থ করে একটু-আধটু। কেউ গল্প শুনতে চাইলে চুপচাপ থাকে, বড়জোর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'কুড হ্যাভ সেভড সিক্সটি থাউস্যান্ড।'

ঘুরে ঘুরে ছবি দেখছি, প্রথামাফিক তারিফ করছি বা করছি না। এমন সময় কলকাতার জম্বর ভক্ত ক্যানাডিয়ান ছোকরা কীথ শেলডন্ এক বান্ধবীকে বগলদাবা করে এসে হাজির। ঢুকেই মিহিরকে জড়িয়ে প্রলয় নেচে ওর গালে বম্‌বশেলের মতো শব্দ করে দমাদ্দম আট-দশটা চুমু খেল। হঠাৎ স্ট্যানলির কি হল, পকেট থেকে একটি রেফারি-বাঁশি বের করে ঘন ঘন ফুঁ দিতে লাগল। ওর গলার শিরা-উপশিরা ফুলে উঠেছে, কপালের মাঝখান দিয়ে রগের ত্রিপুণ্ড্রক জেগেছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। শেলডন্ রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মিহিরকে ছেড়ে দিয়ে পায়ে পায়ে একেবারে ওর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। স্ট্যানলি ওর কোমরে একটি হাত রেখে, অপর হাতে ওর বাঁ-হাতটি তুলে সম্ভ্রান্ত গলায় স্রেফ বলল, 'লেটস ডু ওয়ল্‌জ্।'

ইতিমধ্যে মিহির, শেলডনের বান্ধবী মার্থা, সুধা, বিল্লু আর ভক্তিময় গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। একটি বড়ো বেতের বাক্স হাতড়ে মিহির বের করল ইউক্রেনিয়ান ভদ্‌কা, ওল্ড স্মাগলার, সেবা-স্টিয়ান প্রিন্স, ডাচ রাম। ফলস ফায়ার করল বিল্লু পর পর তিনটে। মিহির আর সুধা ঝপাঝপ বোতলগুলির কর্ক খুলে ফেলল। মার্থা লাল টুকটুকে ঠোঁট বুলিয়ে দিল প্রত্যেকটির মাথায়। ভক্তি বদখত গলায় উদ্বোধনী শুরু করলে 'আওয়ার গড ওল্ড ব্যাকাস।' স্ট্যানলির পরিত্রাহি বাঁশি ভেদ করে বাকী সবার জুতোর খটাখট তাল ঠোকার শব্দ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল।

ককটেল না পাঞ্চ—এ নিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর আলোচনার পর একমত হতে না পারার দরুণ যে যার ইচ্ছেমতো মিশিয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে একযোগে উইশ করতে যাচ্ছে, এক বিরাট প্যাকেট দুহাতে আগলে গলদ-ঘর্ম হয়ে প্রবেশ করল ক্যালকাটা স্কুলের তুখোড় আঁকিয়ে প্রণব। প্যাকেট খুলতেই গোটা পঞ্চাশেক বিফ-রোল ছড়িয়ে পড়ল। সবাই প্রচণ্ড খুশি—এক মুহূর্তে খাবার ফর্সা হয়ে গেল।

রাত সাড়ে দশ এগারো সোয়া এগারো। আসর ক্রমশ উদ্দাম হয়ে উঠছে। একঝোপ চুল [illegible] ভক্তিময় সমুদ্র [illegible] বুজে আবৃত্তি করছে, 'মানুষ সভ্যতা ছাড়ে রাত দশটা পঞ্চাশ মিনিটে।' কেউ শুনছে, কেউ শুনছে না। মার্থা ঘুরে ঘুরে গুণ-গুণ করে গাইছে ডরোথি ফ্ল্যান্ডার্জের গান 'টু নাইট অর নেভার।' জামা খুলে ফেলেছে অর্জুন মালহোত্রা। বিল্লু বোতলগুলির কাছে ছোঁক ছোঁক করছে। শেলডন আর স্ট্যানলি গলা জড়াজড়ি করে অন্ধকার বারান্দায় চলে গেল। নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে দুই মডেল-দম্পতি পার্টনার পাল্টে বসেছে। সুধা ও তার বান্ধবী দুজন এসে ওকে পি-নাট, কাজুবাদাম, স্ন্যাকস বিলিতে রত।

এতক্ষণ ঠাহর করি নি, এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক ঘরের এককোণে একটি শোফায় চুপচাপ বসেছিলেন। ভদ্রলোকের পরণে গয়ার দোপাট্টা, মাথায় জরিদার টুপি। গালে, দুচোখের নীচে চুনির রক্তিম আভা। প্রশস্ত ললাটে কমলা রঙের আলো নাচছে।

রাত তখন দেড়টা। মিহিরের অনুরোধে মত্ততা ক্লান্ত ঘরে থমথমে নৈঃশব্দ নেমে এল। ইতিমধ্যে শুনেছি, ঐ ভদ্রলোক গোয়ালিয়র ঘরানার গুণী গায়ক পরভেজ খাঁ। ধীরে ধীরে পরভেজ ঘরের মাঝখানে এসে একটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেন। আমরা সবাই গোল হয়ে তাঁর চারপাশে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর পরভেজ ভরাট গলায় রেশদার আলাপ শুরু করলেন। একটু পরে আস্তাই গাইতেই সারা মজলিশ সমুন্নো হয়ে উঠল। মিয়া কি মল্লার ধরেছেন পরভেজ। আলাপ হতে না হতে তাঁর সুরেলা গলায় ধামারের বলিহারী রূপ শ্রাবণের সংসারের মতো নামল। স্পষ্ট অনুভব করলাম, সুর বোল সমে ঠমকে ঠমকে ছটা উজিয়ে উঠছে যেন। এক-একটি তানচক্কর করে পরভেজ সমে ফিরে আসছেন, তারিফে তারিফে সভা ছয়লাপ হয়ে যাচ্ছে। ফিকর-বন্দীর ছুটতালে আমরা ততক্ষণে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেছি। পরভেজের গলার দরজা খুলে সাচ্চা সুরের দানা কারামুক্ত কয়েদির অজস্র উল্লাসে ছুটে ফিরছে। রাগের দরিয়া তুফানে ঝটকায় বেসামাল হয়ে উঠতে থাকে। একটু পরেই সব তারিফের মুখ বন্ধ করে পরভেজ তানের বাহার ইতি করে জমজমার মালা বুনে যেতে লাগলেন। তাঁর গলার নিবেদিত আর্তি আমাদের আচ্ছন্ন অনুভবে ফুল স্বপ্ন প্রেম হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

গানের সমাপ্তি হাততালিতে ফেটে পড়ার আগেই সবার চোখ এড়িয়ে টপাটপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছিল বুকের খুব কাছেই একটা আতরদান ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার বাঁক নেয়ার ঠিক আগে দেহাতি মজুরদের এক আস্তানার কাছ দিয়ে যেতে ঢোলকের তালে তাল দিয়ে মিলিত গলার একটানা সুর কানে এসে বাজল, হোরি হ্যায়...... হোরি হ্যায়।

—নিশানাথ

প্রদর্শনী পরিক্রমা

দীর্ঘ দু'বছর পরে শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায় ম্যাক্সমুলার ভবনে তাঁর ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করলেন। এর আগে কেমুল্ড গ্যালারীতে তাঁর যে প্রদর্শনী হয়েছিল শিল্পানুরাগীদের সেকথা মনে থাকতে পারে। বর্তমান প্রদর্শনীর প্রায় আঠাশখানি কাজের মধ্যে তাঁর কয়েকটি পূর্বপ্রদর্শিত পুরনো কাজ ছাড়া সবই নতুন। বাংলা দেশে যে কয়েকজন ভাস্কর একনিষ্ঠভাবে নিজেদের কাজে মগ্ন থাকেন শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় তাঁদের একজন। বর্তমান প্রদর্শনীতে তাঁর নিষ্ঠার নিদর্শন দর্শকদের হতাশ করেনি। প্রায় সবগুলিই পিতলের কাজ। স্বদেশে ও বিদেশে দীর্ঘকাল শিল্পশিক্ষা লাভের পর অনেকদিন তিনি ঢোকরা কামারদের সংগে কাজ করেছেন। তাদের আঙ্গিকের সংগে নিজস্ব কর্মপদ্ধতি মিশিয়ে যে কাজগুলি সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে আদিম শিল্প-শৈলীর সংগে আধুনিক মৌলিকতার কয়েকটি সুন্দর সমন্বয় দেখা গেল। অনেক প্রদর্শনীতেই শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ সদাসর্বদা দেখা যায় না। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করে আনন্দ এবং আশা পাওয়া গেল। একটা সূক্ষ্ম... সংবেদনশীল মনের পরিচয় পেলে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তাঁর কাজের সামনে সেই তৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব। সবচেয়ে চোখে পড়ে তাঁর 'থট' কাজটি। সমগ্র ফর্মের সুচিন্তিত বিকৃতিসাধনের মধ্যে এই উপবিষ্ট মূর্তিটি দেখলে সত্যিই মনে হয় মূর্তিমতী চিন্তা। আর একটি নজরে পড়ার মত কাজ হল 'কোয়েস্ট'—ছোট একটি মুখমন্ডল, ধাতুর ওপর সূক্ষ্ম টেক্সচারের সাহায্যে বিশেষ একটা চিন্তায় আবিষ্ট রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। বড় কাজের মধ্যে পুরোনো কাজ 'হি হু স' এবং নতুন কাজ 'জীবন পাত্র' এই দুটি দণ্ডায়মান মূর্তি প্রায় প্রমাণ মাপের এবং এদের দর্শকের ওপর প্রতিক্রিয়াও গভীর। উপবিষ্ট মূর্তি 'টীচার' অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও বিচিত্র এক জীবনীশক্তিতে ভরপুর এবং দেখতে দেখতে মূর্তিটি যেন আসল মাপের চাইতে বড় হয়ে ওঠে। ছোট রিলিফ কাজের মধ্যে 'কীর্তন' কাজটির ডেকরেটিভ ডিজাইন চমৎকার। 'কন্টেন্টমেন্ট' মূর্তির অতি সরল ফর্ম এবং গঠনের বৈচিত্র্য একটি ছোটমাপের কাজকেও মহৎ করে তুলেছে। 'ফোর গ্যাদারারস' কাজটিতে ছোট ছোট মূর্তির গোল হয়ে বসে আলাপ আলোচনার ভঙ্গী এবং বাউল মূর্তির নৃত্যপর ভঙ্গিমা চমৎকার লাগে। অশোকবনে বন্দিনী সীতার রামের সংবাদ পেয়ে আশাভরা গ্রীবা-ভঙ্গী মুগ্ধ করে। ধাতুর ওপর বিভিন্ন বর্ণের ফলনে মূর্তিগুলি আরো মনোহর হয়েছে। আরেকটা জিনিষ ভাল লাগল। এতগুলি ছোটবড় কাজের মধ্যে নিরেস মূর্তি একটিও নেই। প্রদর্শনী ১লা থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা ছিল।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অ্যাকাডেমি স্টুডিওর ছোট ছেলেমেয়েদের ছবির একটি পরিচ্ছন্ন প্রদর্শনী ৩১শে আগস্ট থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হয়ে গেল। প্রায় দেড়শখানি কাজের মধ্যে জলরং, প্যাস্টেল ও পেন্সিলে আঁকা ছবির কতকগুলিকে অবিশ্বাস্যরকম পরিণত ধরনের কাজ বলা যেতে পারে। এর অধিকাংশই পাঁচ থেকে তের বছরের ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ। প্রবুদ্ধ বোস, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, রিণা দে, রাখী দাশগুপ্তা, শিউলি ঘোষ, গৌতম গুহ, গীতা মালহোত্র প্রভৃতি কয়েকজনের নিসর্গ, স্টিল লাইফ, পোষা পাখী বা কোন কাহিনীর শিশুসুলভ সরলতার সংগে করা চিত্ররূপ চমৎকার লাগল। গোটা প্রদর্শনীর মানও অনেকটা উঁচু।

●

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ৫ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে জীবেন্দ্রকুমার সেনের আঁকা চুয়াত্তরটি জীব-জন্তুর প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীসেন ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের শিল্প শিক্ষক এবং চিত্রাংশু চারু ও কারু শিল্প শিক্ষায়তনের সংগে যুক্ত। কয়েক বছর হল সরকারী বৃত্তি নিয়ে পোল্যাণ্ডে গ্রাফিক আর্ট সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে ফিরেছেন।

প্রাণীজগতের সংগে ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচয় যথেষ্ট নয় বলে তাঁর ধারণা। সুতরাং শিক্ষার এই দিকটি যাতে উপেক্ষিত না হয় সেই জন্যেই তাঁর এই প্রচেষ্টা ভারত ও ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশের বিচিত্র জন্তু জানোয়ার পাখি মাছ ও সামুদ্রিক জীব ইত্যাদি কিছুই তিনি বাদ দেননি। ছবি আঁকার ব্যাপারে মিশ্র আঙ্গিকের প্রয়োগ করেছেন। গ্রাফিক পদ্ধতির সংগে হাতে বর্ণ-প্রয়োগ করে কতকগুলি বিশেষ এফেক্ট আনতে চেষ্টা করেছেন। ছবিগুলি সব অবশ্য সত্যিকার প্রাণী দেখে আঁকা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে অন্য ছবির সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে রং, কম্পোজিশন ইত্যাদি তিনি কোথাও কোথাও নিজস্ব ভঙ্গীতে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

●

৬ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর সেন্ট ইগনেশিয়ানা প্যারিস ক্লাবের উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে স্বর্গত ফ্র্যাঙ্ক ক্রিঙ্গার স্ক্যালানের (১৮৬৯-১৯৫০) চিত্রাবলী ও কিছু লেখার প্রদর্শনী হয়ে গেল। এর সংগে এই ক্লাবের সভ্যদের আঁকা কয়েকটি ছবি ও স্কেচেরও প্রদর্শনী করা হয়। এটি মিঃ স্ক্যালানের তৃতীয় প্রদর্শনী।

কলকাতার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের একজন খ্যাতনামা শিল্পী মিঃ স্ক্যালান সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় দীর্ঘকাল কাজ করে

শিল্পী ঃ মীরা মুখোপাধ্যায়

অবসর গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি ইয়োরোপের বিভিন্ন শিল্প পীঠ ভ্রমণ করেন। দেশে ফিরে তিনি স্টেটসম্যান পত্রিকায় ও অন্যান্য কাগজে নিয়মিত লেখা বা রাজনৈতিক ব্যঙ্গ চিত্র মুদ্রিত করেছেন। তাছাড়া ভারতের ইতিহাস উদ্ধারের কাজেও তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর অনেকগুলি ছবিতে এই ইতিহাস অনুরাগের নিদর্শন পাওয়া যায়। যশোধরার স্বয়ম্বর, মহাভারতের অশ্বমেধ যজ্ঞ, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি ছবিগুলি এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এচিং-এর হাত ছিল তাঁর চমৎকার। ১৯২০ নাগাদ তিনি প্যারিসের সোসাইটি অব এচারস-এর সদস্য নির্বাচিত হন এবং বিদেশে তাঁর এচিংগুলি উচ্চ প্রশংসিত হয়। দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, উদয়পুর, বেনারস প্রভৃতি জায়গার এচিংগুলিতে তাঁর স্বদেশানুরাগীতার ছাপ সুস্পষ্ট। ভেনিস ও ফ্রান্সের দৃশ্যাবলীর কয়েকটি অনবদ্য এচিং প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। জলরং-এর দৃশ্যাবলীর মধ্যে তাজমহল, জঙ্গীরা প্রভৃতি কয়েকটি কাজ উল্লেখযোগ্য। কাশিমবাজারের ঘাট ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে দর্শনীয়। এছাড়া তাঁর বিভিন্ন বইয়ের ইলাস্ট্রেশন ও কতকগুলি কবিতা তাঁর সৃজনী শক্তির বিভিন্ন দিকের পরিচয় হিসেবে দর্শকের কৌতূহল বৃদ্ধি করে।

—চিত্ররসিক

চৌরঙ্গী চিত্রের নৃত্য দৃশ্যে শ্রীমতী কেনী এবং তরুণকুমার। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

বিবিধ ভারতীতে মেহমুদ

হাস্যার্ণব চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর নাম আজকের দিনের পাঠকদের মধ্যে ক'জনের জানা আছে, তা' বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের কৈশোর ও যৌবনকালে অর্থাৎ ১৯২৫ থেকে ১৯২৮-৩০ সাল পর্যন্ত তাঁর কৌতুকাভিনয় দেখবার জন্যে লালায়িত হয় নি, এমন স্কুল-কলেজের ছেলে কলকাতা শহরে একটিও ছিল না। তাঁর মুখখানি ছিল পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোলাকার এবং দেহটিও ছিল নাদুস-নুদুস। এই বর্তুলাকার মানুষটিকে দেখা-মাত্রই না হেসে থাকতে পারা যেত না। চিত্তরঞ্জন দুঃখ করে বলতেন: আমার দুঃখের কথা কেউই শুনতে চায় না; যতই বলি, ওগো এ হাসির কথা নয়, ততই লোকে হো-হো করে হাসতে থাকে। শান্তিপুরের গোস্বামী বংশের ছেলে চিত্তরঞ্জন ওরফে 'চিদদা' খুব ভালো কথকতা করতে পারতেন, কিন্তু শুনবে কে তাঁর সেই কথকতা? ভাগবতের কৃষ্ণলীলা যখন তিনি ভাবগম্ভীর কণ্ঠে ব্যাখ্যা করতে যাবেন, তার আগে থাকতেই যে লোকে তাঁর ফোঁটা তিলকধারী বেশ দেখে হেসে খুন হয়ে যাবে! তাইন 'চিদদা'র কথক হওয়ার সাধ তাঁর জীবনে পূর্ণ হতে পায় নি। আমাদের মনে আছে, নাট্যাচার্য অমৃত-লাল বসুর পরলোক গমনের পরে তাঁর শ্রাদ্ধোপলক্ষে পংক্তিভোজনে বসে 'চিদদা' সামান্য একটু নুন চেয়ে হাসির কলরোল তুলেছিলেন। চিত্তরঞ্জন অপ্রস্তুত হয়ে যত বলেন, 'এটা শ্রাদ্ধবাড়ী, আপনারা করছেন কি; শেষ পর্যন্ত আমাকে কি উঠে যেতে হবে?' ততই লোকে বেদম হাসতে থাকে, তারা চেষ্টা করেও তাদের হাসি থামাতে অসমর্থ হয়। চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর মতো কৌতুকাভিনেতাদের যদি শ্রোতাদের কাছে জ্ঞানগর্ভ বাক্য পরিবেশন করতেই হয়, তাহলে তাও করতে হবে হাস্যকৌতুকের পোশাক পরিয়ে, চিনির আস্তরণে মুড়ে কুইনাইনের বড়ি গেলানোর মতো।

ঠিক এই কাজই করেছিলেন সেদিন হিন্দী চলচ্চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠতম কৌতুকা-

ভিনেতা মেহমুদ। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সেদিন মেহমুদ হাস্যরসাত্মক গানের ফাঁকে ফাঁকে বর্তমান ভারতের রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ছাত্র আন্দোলন, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি সম্পর্কে যে সব অম্লমধুর মন্তব্য করে-ছিলেন, তা আমাদের নেতৃবৃন্দের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, দিনকাল এমনই দাঁড়াচ্ছে যে, ভিখিরীরা শিগগিরই আগেকার যুগের 'একঠো পৈসার পরিবর্তে' 'শো রুপেয়াকো একঠো নোট দিজিয়ে' বলতে শুরু করবে। জাতীয় সংহতি বা ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন-এর প্রশ্নে জাতি উল্টোপথে চলেছে, এই কথা বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন, ১৯৩২ সালে তিনি হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন ঠিকই, কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে কাউকে তার জাতি কি জিজ্ঞাসা করলে সে জবাব দেয়—সে বাঙালী বা মাদ্রাজী, গুজরাটী বা মারাঠী; কেউ বলে না যে, সে ভারতীয়। যে সব ছাত্র আজ সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, প্রতিটি ছাত্রের ভারতের প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি হবার জন্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত; কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে হলে প্রথমেই তাঁদের যে কাজ অনন্যমন হয়ে করতে হবে, তা হ'ল লেখাপড়া। তিনি আরও বলেছেন, তিনি যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহ'লে তিনি প্রতিটি ছাত্রকে তার শিক্ষা সমাপ্তির পরে গ্রামে গিয়ে অন্তত দু বছরের জন্যে ক্ষেতে খামারের কাজ করতে বাধ্য করতেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে মেহমুদ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, বিশ্বের অন্যান্য জাতির কোন সম্পদ নেই, অথচ তাদের সব আছে; আর আমাদের সকল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা নিঃস্ব, কাঙাল। নিজের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে মেহমুদ মন্তব্য করেছেন যে আমাদের সরকার যদি চলচ্চিত্রশিল্পীদের আয়ের ন্যায্য অংশ তা... কর হিসেবে দাবি করতেন, তাহ'লে তাঁরা কিছুতেই সরকারকে ফাঁকি দেবার কথা চিন্তা করতেন না। শ্রোতাদের রীতিমত বিস্মিত করে মেহমুদ বলেন, তিনি একজন নিরক্ষর এবং ইংরাজীতে নামসই করা শিখতে তাঁর পুরো ছমাস লেগেছিল। পর যুগের খ্যাতনামা অভিনেতা মমতাজ আলির পুত্র মেহমুদ শুধু সমাজসচেতনই ন... দেশ-বিদেশে কি ঘটছে, না ঘটছে সে সম্পর্কে তাঁর আছে সুতীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি।

পূর্ণদৈর্ঘ্য ডাচ ফিল্ম:
দি ড্যান্স অব দি হিরণ:

ভালোবেসে বিবাহ হ'লেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের ফল্গুধারা একদিন সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়ে যেতে পারে এবং তখন একজন আর একজনের সান্নিধ্যও সইতে পারে না মনে মনে, যদিও হয়ত বাইরে থাকে চুপচাপ। যুদ্ধসমাপ্তি উৎসবের সময়ে এলেন একটি তরুণ নৌসেনার প্রতি কিছুটা অনুরাগ প্রদর্শন করে ফেলেছিল। এই দৃশ্যটি স্বামী এডওয়ার্ড পরবর্তী জীবনে ভুলতে পারেনি বলে স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে তিনি সদাই সন্দিগ্ধ। স্বামী সব সময়েই ছায়ায় বিচরণ করে; স্ত্রী শত চেষ্টাতেও তার মধ্যে ভালোবাসার উত্তাপ সঞ্চার করতে পারে না। নির্জন সমুদ্র তীরে অবসর যাপনের জন্যে এসে এলেন সাক্ষাৎ পেল পল নামে একজন শুক্লো... প্রকৃতির স্বদেশবাসীর। কিন্তু তার চারিত্রিক উচ্ছলতার স্পর্শে শুষ্ক তরুও মঞ্জরিত হল; পলের মধ্যেও এলেনের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হ'ল। এডওয়ার্ড নিজের ব্যর্থতায় আত্মহত্যা করতে চেয়ে নিজের মায়ের কাছ থেকে বাধা পেল। মায়ের পরামর্শে সে আত্মহত্যার অভিনয় করে সাফল্যের সম্মুখীন হল; এলেন তার প্রতি সহানুভূতিসূচক ব্যবহার করায় তার মনের [illegible]
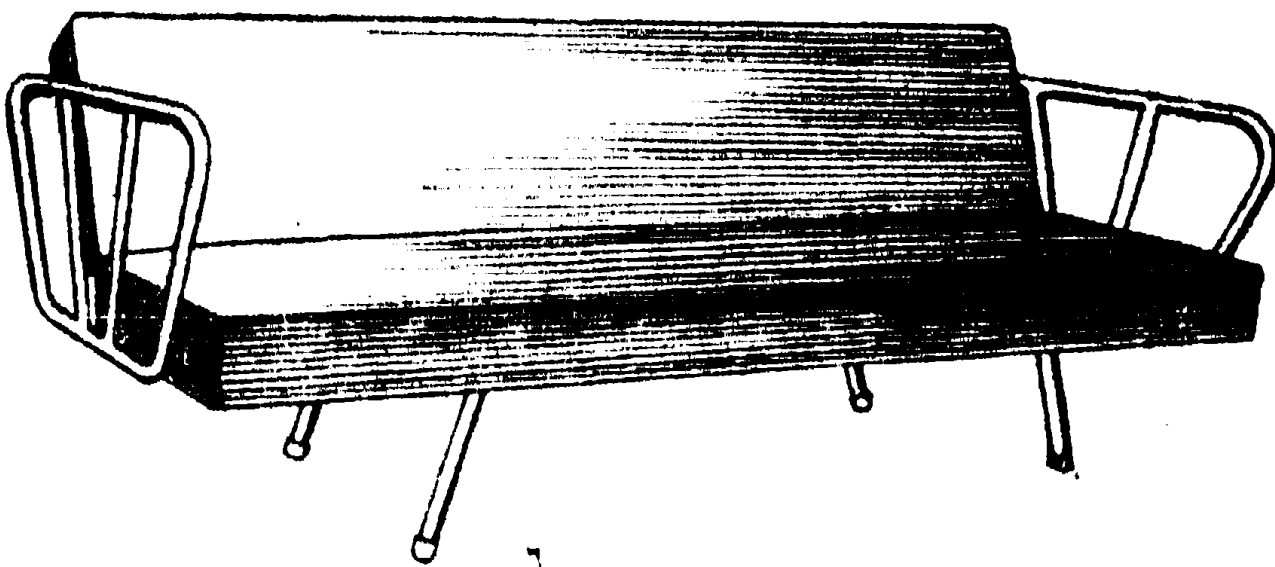
কপাট খুলে গেল, আবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হল।

ওলন্দাজ জাতির আসল প্রতিভা তথ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হলেও এবং মাত্র ষাটের দশকে ডাচ পরিচালকেরা পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করলেও সাদা-কালো ফিল্মে গৃহীত এই 'দি ড্যান্স অব দি হিরণ' চিত্রে গল্প ও চরিত্র সৃষ্টির কার্যে অসামান্য দক্ষতা ও দক্ষতা দেখিয়েছেন পরিচালক ফন রেডমেকার্স ও চিত্রনাট্যকার হুগো ক্লজ। সাচা বিয়েৰ্ণের ফটোগ্রাফী এবং জুরিয়ান অ্যাণ্ড্রিয়েসেনের আবহসঙ্গীত রচনা ছবিটিকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

নায়িকা, নায়ক, পল ও নায়কের বন্ধ্যা স্ত্রীর ভূমিকায় যথাক্রমে গুনেল লিণ্ডব্লম, জাঁ ডিসলে, ভান উউড ও মেন ন্যুইমোর-এর বাস্তবসম্মত অভিনয় আমাদের দেশের চিত্রশিল্পীদের মনোনিবেশ করে দেখা উচিত।

—নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

দীনেশ দে প্রযোজিত দীনেশ চিত্রম-এর সংগীত বহুল চিত্র 'পান্না-হীরে-...' এখন সমাপ্তির পথে। সুখেন দাস ... এক সংগীত শিল্পীর জীবন কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন অমল দত্ত। ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন—অরুপকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, দিলীপ রায়, নিরঞ্জন রায়, বাণী গাঙ্গুলী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মনি শ্রীমানী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল ও সুখেন দাস। বাংলার সর্বকনিষ্ঠ তরুণ সুরকার অজয় দাসের সুরে গানগুলিতে কন্ঠদান করেছেন—শ্যামল মিত্র, পিন্টু ভট্টাচার্য ও চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছে রাঙিং পিকচার্স।

কার্তিক বর্মন প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের তৃতীয় ছবি আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত "বালুচরী" রঙিন চিত্রের পরিবেশনায় ২৭ সেপ্টেম্বর ... প্রাচী, ইন্দিরা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। পরিচালনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী ও সুর দিয়েছেন—রাজেন সরকার। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, দীপিকা দাস, গীতা দে, অজয় গাঙ্গুলী, শৈলেন মুখোঃ, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু ও জহর রায় প্রভৃতি।

তপনীর পরিচালনায় শঙ্কর ফিল্মসের প্রথম ছবি রূপ হল অভিশাপ"-এর চিত্রগ্রহণ কার্য ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে নিয়মিত চলছে। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন—শেখর চট্টোপাধ্যায়, পদ্মাদেবী, জহর রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, তরুণকুমার, নির্মলেন্দু, চিন্ময়, মঞ্জুশ্রী, বনশ্রী, মধুমিতা প্রভৃতি।

বিশ্বের সব দেশেই আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকার ও উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা। ওদের যত সহজে পাপের পথে প্রলোভিত করা যায় আর কোন পথে নয়। এমনি এক যুবকের পদস্খলন এবং সবশেষে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এক মমতাময়ী নারীর সাহায্যে অন্ধকার পাপ-পঙ্কিল জগৎ হতে মুক্তিলাভ করে সূর্যপরশ পাওয়ার এক অসাধারণ কাহিনী নিয়ে উঠছে নিতাই দাস ফিল্মসের অনন্য চিত্র 'সূর্যপরশ'। এই কাহিনীর রচয়িতা শ্রীঅনিল সরকার।

চিত্রনাট্য করেছেন প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রীখগেন রায়। পরিচালনাও তাঁর। সলিল চৌধুরী ছবিটার সংগীত-পরিচালক, তাঁর পরিচালনায় ইতিমধ্যেই বম্বেতে যেসব গানের টেকিং হয়েছে, তাতে কণ্ঠ দিয়েছেন ঃ আশা ভোঁসলে, সবিতা চৌধুরী, দ্বিজেন মুখার্জি ও মান্না দে। বিভিন্ন চরিত্রারোপে মাধবী মুখার্জি, অনিল চ্যাটার্জি, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, শেখর চ্যাটার্জি, সুখেন দাস, উদয়কুমার, কালীপদ চক্রবর্তী, কানু ব্যানার্জি, জহর রায়, প্রেমাংশু বোস, অজিত ব্যানার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখার্জি, দীপ্তি রায়, সুমিতা বিশ্বাস, পূর্ণিমা মুখার্জি, রাজলক্ষ্মী দেবী, সন্ধ্যা কাপুর, বম্বে এবং বম্বের এক বিখ্যাত নৃত্যপটিয়সী শিল্পী।

... রায়চৌধুরী প্রযোজিত ফ্রেণ্ড ফিল্মসের প্রথম নিবেদন "আজ বসন্ত" ছবির চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। শ্যামল মিত্রের সুরে কয়েকটি গানও ইতিমধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে। প্রশান্ত দেব রচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত হয়েছে। উত্তমকুমার ও তনুজা ছবিটির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—কমল মিত্র, মলিনা দেবী, অসিতবরণ, তরুণকুমার ও শমিতা বিশ্বাস প্রভৃতি।

বিদেশী ছবির খবর

এবারের বার্লিন আন্তর্জাতিক চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার স্বর্ণ ভল্লুক দেওয়া হয়েছে সুইডেনের কাহিনী চিত্র 'ওলে ডোলে ডফ'। জাঁ ট্রোয়েল ছবিটির পরিচালক। এঁর আগের ছবি **'হিয়ার ইজ ইওর লাইফ'** গত বার্লিন উৎসবেই পুরস্কৃত হয়েছিল।

কাহিনীটা লেখা ক্লস এঙ্গসমি-এর কিন্তু ট্রোয়েল-এর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেও এ ছবির প্রধান চরিত্রের মিল আছে অনেক। ছবির নায়ক এক স্কুল মাস্টার যে বহু চেষ্টা করেও ছাত্রদের ঠিক বশে আনতে পারে নি। শৃঙ্খলাকে সে যতই মেনে চলতে চায় কিছুতেই সে তা পারে না। একটা একগুঁয়ে উড়নচুড়ে ছেলে মাস্টার মশায়ের বিরুদ্ধে দল তৈরি করে, ছাত্ররাও এগিয়ে আসে দলে। আপাতদৃষ্টে ছাত্রদের এই আচরণ অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, কিন্তু মাস্টার মশায়ের কিছুটা বিকৃত ব্যবহার ও ছাত্রদের প্রতি তার অতি মাস্টারিপনা ছাত্রদের ও পথে নিয়েছে। শেষ অব্দি অবস্থা আওতার বাইরে চলে গিয়ে এক অপমানকর লজ্জাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ক্লাসটা তখন যেন বিশৃঙ্খল, তিক্ত এক বদমায়েসির আস্তাখানায় পরিণত হয়।

পরিচালক ছবিতে নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতিতে তৈরী শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে পুরাতনী মনোবৃত্তির অধিকারী শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার কথাই আলোচনা করেছেন, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক শুধু শিক্ষকই নন ছাত্রের কাছে আরও কিছু। শাসানি নয় শাসন; শারীরিক শক্তি নয় মানসিক উন্নতি, স্নেহ প্রেম প্রীতি এগুলোই প্রধান যোগ্যতা। **'ওলে ডোলে ডফ'**-এর মাস্টারমশাই নিঃসন্দেহে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, কিন্তু শিক্ষানীতির ভ্রান্ত ধারণা তাকে সত্যিকারের শিক্ষক হবার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করেছে, ছাত্রদের সে আপন করে নিতে পারে নি। মাঝে মাঝে সে নিজেই তার এ মানসিক অবস্থার কথা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু নিজেকে সরিয়ে আনতে পারেনি স্কুলের প্রতিটি মুহূর্ত তাই তার কাছে তখন নাইটমেয়ার-এর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার এই মানসিক অসাম্য স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত জীবনেও প্রবেশ করেছে। সন্তানহীন বিবাহিত জীবনেও সে সুখী হতে পারেনি। মোট কথা শিক্ষকের চরিত্রের মধ্য দিয়েই ট্রোয়েল বলতে চেয়েছেন যে যারা জীবনের ব্যবহারিক দিকে যেদিকে যাওয়া উচিত ছিল যেতে পারেনি বা কর্মজীবনে যারা শত চেষ্টা করেও সাফল্য লাভ করতে পারল না বিন্দুমাত্র তাদের সমস্যার কথা। সোজাসুজিভাবে সমাধান তিনি কিছু দেন

নি কিন্তু সমাধানের ইঙ্গিত আছে ছবিতে।

ত্রোয়েল নিজে শিক্ষকতা করেছেন প্রায় দশ বছর মালমোর স্কুলে, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন চিত্রনাট্য করতে গিয়ে। সুইডেনের স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা, ছাত্রদের মানসিকতা সম্পর্কে পরিচালকের সবিশেষ জ্ঞান তো আছেই, তাছাড়া চিত্রব্যাকরণের ওপর অস্বাভাবিক নিপুণতা ছবির প্রতিটা ফ্রেমে, প্রতিটা শটে, প্রতিটা দৃশ্যে ছড়িয়ে, প্রথম ছবি 'হিয়ার ইজ ইওর লাইফ'-য়ে যে লিরিক্যাল একটা ছন্দ দেখা গিয়েছিল, এ ছবির শহরের ছোট ছোট দৃশ্যেও সে সূক্ষ্ম কাজের পরিচয় রয়েছে। মোটকথা ত্রোয়েল তাঁর পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি বরং আরও ফার্মলি এস্টাব্লিশ করেছেন। বার্গম্যানের পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিপরীত ফিলজফিক মন নিয়ে ত্রোয়েল যা ছবি করছেন তার সঙ্গে ওদেশেরই আর্নে সাক্সডর্ফ-এরই নাম করা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যে সকল সুইডিশ আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছিল তাদের দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের হাসি-কান্নার কাহিনী নিয়ে লেখা সুইডেনের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে জাঁ ত্রোয়েল নতুন ছবি তৈরি হবে। ইতিপূর্বে অনেক আমেরিকান প্রযোজক এ কাহিনী নিয়ে ছবি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু লেখক মবর্গ রাজী হন নি। ত্রোয়েলের প্রথম ছবি দেখার পর মোবর্গ ত্রোয়েলকে ছবি করার কথা জানান। ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে স্টকহোমে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারীতে এবং ছবির প্রিমিয়র হবে সম্ভবতঃ ১৯৭০-য়ে। প্রধান ভূমিকালিপিতে আছে লিভ উলম্যান, ম্যাক্সভন সিডো ও এডি এক্সবার্গ।

লাল চীনের সাম্প্রতিক সামাজিক পটভূমিকায় জে রিচার্ড কেনেডির 'দি চেয়ারম্যান' বইটি প্রকাশিত হচ্ছে শীগ্গির। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স বইটির চিত্রস্বত্ব কিনেছেন। সেটি আরথাম প্রযোজনা করবেন, আর পরিচালনা করবেন লী টম্পসন। দূরপ্রাচ্য, লন্ডন, ওয়েলস্-এর লোকেশনে এ-ছবির প্রধান ভূমিকায় থাকছেন গ্রেগরী পেক।

লুই বুনুয়েল কিছুদিন আগে প্যারিসে ফিরেছেন। নতুন ছবির কাজ শুরু করবেন খুব শীগ্গির। বুনুয়েলের ছবি চিরদিনই সাধারণ হয় না। এবারের ছবিও চিরাচরিতের ব্যতিক্রম হবে না জানিয়েছেন পরিচালক নিজে। উনি বলেছেন—'এ-ছবিতে বিস্ফোরণ ঘটাব।' ক্লদ শ্যাবল নতুন ছবি 'লা ফেমে ইনফিদ্যাল' এর প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ করে ফেলেছেন। পল গিগাই-এর সহযোগিতায় ছবির চিত্রনাট্য করেছেন পরিচালক শ্যাবল নিজে। বিয়ের প্রায় দশ বছর বাদে স্বামী জানতে পারে যে তার স্ত্রী তার প্রতি অবিশ্বাসী। স্ত্রীর অন্য প্রেমিক আছে—এ-ব্যাপার জানার পর স্বামী স্ত্রীর সেই প্রেমিককে হত্যা করে। এ-কাহিনীর স্ত্রীর ভূমিকায় থাকছেন স্টেফান অদ্রা, প্রেমিকার ভূমিকায় মারসে রোনেৎ ও স্বামীর ভূমিকায় মাইকেল বোকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ, স্টেফেন অদ্রা গত বার্লিন উৎসবে শ্যাবলেরই আগের ছবি 'লা বিশে' ছবিতে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসেবে রৌপ্য-ভল্লুক পেয়েছিলেন।

ফ্রাঁসোয়া সাগার বিখ্যাত উপন্যাস 'লা চামাদ'-কে চিত্রায়িত করছেন অ্যালা ক্যাভেলিয়ের। ছবির প্রধান ভূমিকাদুটোতে থাকছেন মিশেল পিকোলি আর ক্যাথরিন ডানিয়ুবে। বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবী জাঁ মোলিন-এর জীবনের ওপর ভিত্তি করে আলেকজান্ডার আস্ত্রুক হয়ত একটা ছবি করতে পারেন। আপাততঃ এ-পরিকল্পনা মাথায় আছে। রূপদান করতে এখনও দেরী হতে পারে। ছবিটার নাম হবে 'দ্য অম্বারস্ লা মাৎ'।

মঞ্চাভিনয়

শেষরক্ষা

সম্প্রতি 'হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউটের' প্রাক্তন ছাত্রীরা পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করলেন রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'। সংঘবদ্ধ অভিনয়ে প্রথম থেকেই প্রাণচাঞ্চল্য অটুট ছিল। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন: জয়শ্রী ঘোষ (চন্দ্রকান্ত), মিতা চৌধুরী (বিনোদ), মঞ্জরী গুপ্তা (গদাই), অরুণা মুখোপাধ্যায় (নিবারণ), অলকানন্দা রুদ্র (শিবচরণ), গার্গী ঘোষ (ললিত) প্রণতি গোস্বামী (ভৃত্য), শিলা চন্দ্র (নলিনাক্ষ), রীণা নন্দী (শ্রীপতি), প্রীতি সেনগুপ্তা (দর্জি), মঞ্জুশ্রী সাহা (ক্ষান্তমণি), বাসবী মুখোপাধ্যায় (ইন্দু), ঊর্মিমালা পালিত (কমল) ও গায়ত্রী শীল (ঠাকুরদাসী)।

বালীগঞ্জ নাট্য সংসদের 'বাঘ'

গত ২৮ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে বালীগঞ্জ নাট্য সংসদ অন্য ধরের 'বাঘ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

নাটকের প্রধান চরিত্র চা-বাগানের ম্যানেজার ও দুর্দান্ত শিকারী পিনাকী রুদ্র। মানুষ খেকো বাঘের হাতে স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে তিনি আরও ভীষণ হয়ে উঠলেন। এইখান থেকেই নাটকের শুরু। বাঘ শিকারের টোপের জন্যে ব্যবহার করতেন কুলি বস্তির বাচ্চা ছেলে। এই ব্যাপারে বিশ্বস্ত অনুচর ছিল সর্দার পেয়ারীলাল। কিন্তু এই ... শিকারের উন্মাদনায় পেয়ারীলালের ... যন্ত্রে একবার নিজের একমাত্র ছেলেকে নিজের অজ্ঞাতসারে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে হলো। নাটকের পরিণতি এইখানে।

'বাঘ' নাটকটি কাহিনীর দিক থেকে অভিনব। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সংলাপ সহজ বা স্বাভাবিক নয় এবং ... আড়ষ্টতাপুষ্ট। কাহিনীর গতি সেই কারণে মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়। মঞ্চপরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে। আলোকসম্পাতে স্বাভাবিকত্ব ... যাঁর পরিচালনায় ... প্রশংসনীয়।

শিকারী রুদ্রের বন্ধু এক ... চরিত্রে দিলীপ চ্যাটার্জীর ... স্বাভাবিক। থাপার ভূমিকায় এবং ... ও-সির ভূমিকায় যথাক্রমে সোমেন চক্রবর্তী ও সমর ঘোষের অভিনয় সহজ এবং সুন্দর। সর্দার পেয়ারীলালের চরিত্রে নিরঞ্জন ভৌমিক স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি লঘু চরিত্রে ... ব্রত চক্রবর্তীর অভিনয় অতিরঞ্জিত হলেও দর্শকদের হাসির খোরাক জোগাতে পেরেছেন। একটি বিশিষ্ট চরিত্রে ... শেখর নস্কর দর্শকদের মনে রেখাপাত করেন।

নাটকের পরিচালনায় ও নায়কের ভূমিকায় স্নেহময় রায়চৌধুরী স্বাভাবিক ও যথাযথ।

দানব

ম্যাক্সিম গোর্কির কালজয়ী নাটক 'এনিমিজ'। সম্প্রতি 'লোকমঞ্চের শিল্পীরা 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে এ নাটকের বাংলা রূপ 'দানব' অভিনয় করলেন। বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন সুনীল দত্ত।

'লোকমঞ্চের শিল্পীদের অভিনয় ... মোটামুটি প্রশংসার দাবী রাখে। 'ধরণ' 'দয়াল' চরিত্রে নাট্যকার সুনীল দত্ত ও রমেন নন্দী প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রূপ দেন: আনন্দ
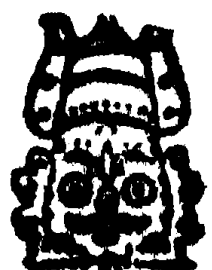
সুরতীর্থের বার্ষিক উৎসবে শ্রীমতী মনোরমা ভীরার কাছ থেকে ক্রাফটস্ এবং নৃত্যের জন্য পুরস্কার গ্রহণ করছেন যথাক্রমে সুস্মিতা সরকার এবং মধুশ্রী দাশ।

ঘটক, গোপাল হাজরা, শ্যামলাল সোম, বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, মনীষা চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত দাঁ, বৃন্দাবন কুণ্ডু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দেবেন গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক নন্দী, জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণচন্দ্র ঘোষ, তপন সেন।

মঞ্চ পরিকল্পনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন বৃন্দাবন কুণ্ডু।

নিতাই গড়গড়ির বৌ

'সুদর্শন' নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের নাটক 'নিতাই গড়গড়ির বৌ' 'মুক্ত অঙ্গনে' মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্যকার একটি চিরন্তন সামাজিক ব্যাধির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন এ নাটকে। মূল বক্তব্যের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে 'সুদর্শনে'র শিল্পীগোষ্ঠী এ নাটকের প্রযোজনায় সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু নাট্যাভিনয়ে খুব একটা স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। কুমার শোভন মোটামুটি নিষ্ঠার সঙ্গেই নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করতে পেরেছেন।

নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন—সীমা বিশ্বাস, কুমার শোভন, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু ব্রহ্মচারী, পরিমল ভট্টাচার্য, শুভেন্দু শেখর, তনুশ্রী দত্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায়, জীতেন দত্ত, রমেন্দ্র মুন্সী, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গান্ধার নিবেদিত "শেষরক্ষা"

গত ৯ আগস্ট গান্ধার সংস্থা সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" মঞ্চস্থ করেন। সুষ্ঠু পরিচালনা ও দলগত অভিনয়নৈপুণ্যের জন্য নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

অভিনয় অংশে সর্বাগ্রে প্রশংসা পাবেন চন্দ্রকান্তের ভূমিকায় অশোক মিত্র। সরল, সহজ ও সংযত অভিনয়ে তিনি নিজেকে চন্দ্রকান্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে কয়েকটি দৃশ্যে নিমু ভৌমিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিনোদ-এর ভূমিকায় প্রণব মিত্রের অভিনয় ও বাচনভঙ্গী সুন্দর, তবে মাঝে মাঝে তাঁকে একটু আড়ষ্ট মনে হয়েছে। শিবচরণ ও নিবারণের ভূমিকায় ভবরূপ ভট্টাচার্য ও অচিন্ত চক্রবর্তী সুন্দর অভিনয় করেন। ক্ষান্তমণির চরিত্রে অলকা বসুকে চমৎকার মানিয়েছিল। ক্ষান্তমণির চরিত্রকে তিনি যথাযথভাবে মঞ্চে উপস্থিত করেছিলেন। গীতা চক্রবর্তীর ইন্দুমতী অপূর্ব। তাঁর কণ্ঠসংগীতও চমৎকার। কমলমুখীর চরিত্রে গৌরী রায়-এর অভিনয় সন্তোষজনক। বিশ্বনাথ মুখার্জির ললিত দুর্বল চরিত্রচিত্রণের নজীর। অন্যান্য চরিত্রগুলি মোটামুটি সুঅভিনীত। এর জন্য ধন্যবাদ পাবেন প্রণব রায়, সীতানাথ চৌধুরী, শৈলেন মৈত্র, জগদীশ রায়, পুষ্কর মজুমদার ও সৌমিতা চৌধুরী। বিভাগীয় কর্মে আলোর জন্য প্রশংসা পাবেন পিন্টু বসু ও সুধাংশু মণ্ডল। নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী কুমারী রাখী চ্যাটার্জীর কণ্ঠসংগীত খুবই শ্রুতিমধুর হয়েছিল।

যাযাবরের নাট্যোৎসব

যাযাবর গোষ্ঠীর তৃতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব হয়ে গেল গত ৭ সেপ্টেম্বর এণ্ড্রুজ স্কুল হলে। বনফুল রচিত 'কবর', তপন ঘোষের 'ঝরাপাতা' ও দ্বৈপায়নের 'আগামী' এই তিনটি নাটক সংস্থার সভ্য-সভ্যারা নিষ্ঠার সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। আবহ-সঙ্গীত ও আলোকসম্পাতের কাজ মোটামুটি। অভিনয়ে প্রশংসা পান শীতল মুখোপাধ্যায়, তপন চক্রবর্তী, তপন ঘোষ ও অন্যান্যরা।

সু-প্রযোজনা—উপনিবেশ

ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম তিন খণ্ডে বিধৃত 'উপনিবেশ' গ্রন্থটিকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চে উপস্থাপিত করলেন পথিকের শিল্পীবৃন্দ গত ১১শে আগষ্ট বিশ্বরূপায়। এই উপন্যাসকে নাট্যরূপায়িত করার দুরূহ দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর

গান্ধার সংস্থার শেষরক্ষার একটি দৃশ্য

ইতিহাসের আলো-অন্ধকারে, দেশকালের বিচিত্র মানুষ, ছন্নছাড়া কিছু অসংলগ্ন চরিত্র, প্রচন্ড প্রকৃতি এবং প্রবল ঘটনা—এদের বিচ্ছিন্নতা এবং বৈচিত্র্যকে দেশকালের বিশ্ব-সত্তায় নাট্যরূপায়িত করার কৃতিত্ব তিনি অবশ্যই দাবী করতে পারেন।

অভিনয়ে আগাগোড়া অখন্ড দ্যুতি বজায় ছিল। বলরামের দ্বিধা, হরিদাসের আত্মভোলা আচরণ, মণিমোহনের দুর্মর প্রেম, পা-তিনের নিষ্ঠুরতা: এ সবই সুঅংকিত। গাজীসাহেব এবং মজঃফর তুলনায় কিছুটা হীনপ্রভ। মুক্তোর মাতৃত্বের কামনায় অন্তর্দ্বন্দ্ব অথবা লিসির জোহানকে নিয়ে একা ঘরবাঁধার নিভৃত স্বপ্ন—মা-ফুনের অবদমিত যৌবন-তৃষ্ণার দৃশ্যগুলি মনে রেখাপাত করে। আর সর্বমিলিয়ে পার্শ্ব-চরিত্রগুলির ঐক্যবদ্ধ দৃশ্যগুলি নাটককে সাফল্যের পথে নিয়ে গিয়েছে। মনি মানী, সুনীল সুর, শিবদাস মুখোঃ, শিবনাথ বন্দ্যোঃ, ইলাবন্ত ঘোষ, জয়ন্ত মতিলাল, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ, কান্তিময় রায়চৌধুরী, প্রণব বল, সুধাংশু পাল, পঙ্কজ গাঙ্গুলী, কমল রায়চৌধুরী, সান্ত্বনা ঘোষ, সবিতা বন্দ্যোঃ, দীপা হালদার নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ ছিলেন।

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনা এবং বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোক-সম্পাত পরিচ্ছন্ন। আবহসঙ্গীত প্রশংসনীয়।

বিবিধ সংবাদ

নবদ্বীপ অমৃত আশ্রম

গত শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীশ্রীভাগবত জয়ন্তী উপলক্ষে নবদ্বীপধামে প্রাচীন মায়াপুরে গঙ্গাতীরে অমৃত আশ্রমস্থ শ্রীচৈতন্য মন্দির-প্রাঙ্গণে অখন্ড শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্তন, শ্রীভাগবতকথা, ভক্ত-সম্মেলন, মহাপ্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আশ্রম-প্রাঙ্গণে নাম-সাধক শ্রীহরিদাস নির্যান উৎসবান্তে আগামী শ্রীশ্রীকাত্যায়নী যোগমায়া 'দুর্গামায়ের' পূজার আয়োজন-ব্যবস্থা কমিটির সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরি (গৌর মহারাজ) কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

নতুন আওয়াজের অভিনয়

জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের 'নতুন আওয়াজ' (নাট্য সংস্থা) তাঁদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ৩০ ও ৩১ আগস্ট মঞ্চস্থ করেন অগ্নিদূতের 'ঝিঁঝি পোকার কান্না' ও শ্রীঅতনু সর্বাধিকারীর 'শ্বেতছায়া'। সুখেন্দু বিশ্বাস পরিচালিত নাটকদুটিতে যাঁরা সুঅভিনয় করে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন : সর্বশ্রী দিলীপ রায়, রবীন্দ্র দাস, অরবিন্দ মিত্র, কল্যাণ গুন, অমূল্য চক্রবর্তী, গুনেন ভদ্র, সুধেন্দু মিত্র, রঞ্জিত সান্যাল, পূর্ণেন্দু মিত্র, পংকু কয়েল, দীপক ভট্টাচার্য, শিশির চক্রবর্তী ও সুখেন্দু বিশ্বাস। নিখিলেশ ঘোষের আলোকসম্পাত, রবীন্দ্রচন্দ্র দাস ও বিশ্বজিৎ দাসের আবহসংগীত ও দিলীপ রায়ের রূপসজ্জা প্রশংসার দাবী রাখে।

কিশোর কল্যাণ পরিষদ আয়োজিত বার্ষিক প্রতিযোগিতার ফলাফল

স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিষদ আয়োজিত অষ্টাদশ বার্ষিক প্রতি-যোগিতা সাফল্যের সঙ্গে গত আগস্ট মাসে সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি-যোগিতার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হলো : আবৃত্তি (সুকুমার রায়ের 'খাই খাই') : (১) বেবী মুনমুন, (২) মিত্রা মুখো-পাধ্যায়। রবীন্দ্রসংগীত ('ক' বিভাগ রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীত) : (১) ইভা পা (২) সঙ্ঘমিত্রা মুখোপাধ্যায়, (৩) চন্দ্র; খ বিভাগ (রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত) : (১) রুণু ভট্টাচার্য, (২) সুমিত্রা ব (৩) মমতা পাল। অতুলপ্রসাদের গান (১) রেবা পাল, (২) শান্তা দত্ত ও র সাহা (যুগ্মভাবে)। খেয়াল : (১) কুমু বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) স্বপ্না চট্টোপাধ্যা (৩) তপন মুখোপাধ্যায়। ধ্রুপদ : (স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়, (২) তপন মুখো-পাধ্যায়, (৩) রীতা বসাক। নৃত্য : (শিপ্রা বসাক, (২) স্বপ্না দত্ত। চিত্রাঙ্কন 'ক' বিভাগে (১) কাঞ্চি সেনগুপ্ত, (অসীমিতা সেন, (৩) সুরজিত সেন। বিভাগে (১) স্বাতী ভট্টাচার্য, (২) দে যানী সরকার, (৩) কল্যাণ মুখোপাধ্যা প্রবন্ধ (আমার আলো হেলেন কেলার (১) রিতা ভড়।

মধ্য ইণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

মধ্য ইণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম দি ছয়দিনব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক সংগী সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। সম্মেলন ওই এলাকার দেবনারায়ণ দেবের বাড়ী অনুষ্ঠিত হবে। মোটামুটি ছোট আস কিন্তু পরিবেশ রচনায় এই সংস্থার পূর্বে সুনাম ছিল, তা পুরোপুরি বজায় রাখা হচ্ছে। এবারের শিল্পী দলে আছে ভারতের প্রখ্যাত শিল্পীরা। প্রতিবারের ন্যায় এবারেও কয়েকজন নতুন প্রতিভাকে সুযোগ দেওয়া হবে।

রাজধানীতে মূকাভিনেতা আমন্ত্রিত

প্রখ্যাত মূকাভিনেতা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য দিল্লীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার আমন্ত্রণে ২৬ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে রওনা হচ্ছেন। ইতিমধ্যে শ্রীভট্টাচার্যের মূকাভিনয় বিহার, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। দিল্লীতে থাকাকালীন শ্রীভট্টাচার্য মোট দশটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

মল্লারের প্রযোজনায় শাপমোচন

সংগীত শিক্ষায়তন মল্লার, দশম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় রবীন্দ্রসদনে কবিগুরুর শাপমোচন নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করবেন। নির্দেশনা ও মঞ্চসজ্জায় আছেন শ্যামল দত্তরায়, নৃত্যপরিকল্পনায় আছেন রুবী দত্ত এবং সংগীত-পরিচালনা করছেন রাজেশ্বর ভট্টাচার্য। গ্রন্থণা ও সংলাপে অংশগ্রহণ করবেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী মজুমদার ও পার্থ ঘোষ। নেপথ্যে গান করবেন শ্যামল মিত্র, সুমিত্রা সেন, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

দক্ষিণী বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব

২২ সেপ্টেম্বর '৬৮, রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় 'ত্যাগরাজ হলে' দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে শ্রীমতী কণক বিশ্বাস ভাষণ দেবেন ও স্নাতকদের যোগ্যতাপত্র বিতরণ করবেন।

সোজা ব্যাটের খেলা নয়

অজয় বসু

খবরটি বেরিয়েছিল গত এপ্রিলে গায়নার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি ক্রনিকল'এ।

এম সি সি তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর করছে। দলপতি কলিন কাউড্রের উক্তি উদ্ধৃত করে 'দি ক্রনিকল'এ লেখা হয় যে এম সি সি'র সদস্য হিসেবে বেসিল ডি'ওলিভিয়েরা আর কোনোদিন বিদেশ যাওয়ার এবং বিদেশী টেস্ট ম্যাচে ইংলন্ডের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবেন না।

সেই খবরই সত্যি হলো, 'দি ক্রনিকল'-এর আশঙ্কাই দেখা দিল বাস্তবে—দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এম সি সি দলে ওলিভিয়েরা ঠাঁই পেলেন না। মর্যাদার লড়াই ফতে করতে ইংলন্ড ওভাল টেস্টে ওলিভিয়েরাকে দাঁতালো হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগিয়েছিল। কাজ ফুরোতেই অনাদরে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ইংলন্ডের কৃতজ্ঞতাবোধ, চোখের পর্দার সত্যিই তুলনা নেই!

বেসিল ডি'ওলিভিয়েরা

ওলিভিয়েরার অপরাধ, তিনি বর্ণসংকর। গায়ের রং সাহেবদের মতো পুরোপুরি কটা নয়। এই অপরাধ কদিন আগে বড় হয়ে দেখা দেয়নি যখন খাঁটি সাহেবরা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের মানসে জান্ পেতে ওলিভিয়েরার সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু সে তো সংকটকালীন অসহায় অবস্থা। বিপদের ঝড় তুফান কেটে যেতেই সাহেবদের আসল পরিচয় বাইরের মুখোশটি ছিঁড়ে ফুঁড়ে দিনের আলোয় বেরিয়ে পড়েছে। এই পরিচয়ের তুলনা মেলাই ভার!

সংকটকালে যে মানুষটি বরাভয় মূর্তিতে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সাহেবরা তাঁকে ভুলে গেল কেন? সাহেবদের সাহেবপ্রীতি আরও বড় বলেই, যে প্রীতিই হলো বর্ণবিদ্বেষ ও বৈষম্যের উৎস।

ওভালে পঞ্চম টেস্টে খেলতে যদি ওলি-ভিয়েরার ডাক না পড়তো, যদি তিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে একাই ১৫৮ রাণ করতে না পারতেন তাহলে এম সি সি'র নির্বাচকমন্ডলীর উগ্র বর্ণবিদ্বেষ প্রীতি এমন নগ্নভাবে প্রকাশ পেতো না। ওলিভিয়েরার ১৫৮ রান, দল থেকে ছাঁটাই হয়ে যাওয়া—সব দৃষ্টান্তই গাঁটছড়ায় জড়িয়ে একটি সত্যকে নতুন করে উদঘাটিত করে দিয়েছে।

সত্য এমনি করেই প্রকাশিত হয় বটে। এম সি সি-র সাধ্য কি ছেঁদো কথার আড়ালে সেই সত্যকে লুকিয়ে রাখে! যতোই ছেঁদো কথার অবতারণা ও জল ঘোলাবার চেষ্টা ততোই অপদস্থ হওয়া। দিশেহারা এম সি সি-র নির্বাচকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ডগলাস ইনসোলকে তাই করুণ কন্ঠে বলতে শুনেছি *উনি একজন অলরাউন্ডার। আমরা অল-রাউন্ডারের বদলে একজন দক্ষ ব্যাটসম্যানকে খুঁজছিলাম। পেয়েছিও। তাই তাঁকে বাদ দেওয়া হলো।'*

প্রলাপ আর কাকে বলে! ওলিভিয়েরা নাকি তেমন ব্যাটসম্যান নন! ইংলন্ডকে জেতাতে হবে, সফরকামী দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখতে হবে, এই চাহিদার যখন চতুর্দিক সোচ্চার, সেই অগ্নিপরীক্ষার লগ্নে ওলিভিয়েরা ১৫৮ করে তাঁবুতে ফিরলেন। তবু তিনি তেমন ব্যাটসম্যান নন! আর কতো রান করলে তবে তিনি ব্যাটস-ম্যানদের জাতে উঠতে পারতেন?

আসল কথা, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। ছল চাতুরী আঁকড়ে ধরার সময় সে বুঝতেও পারে না যে কোন্ প্রলাপের সূত্রে তার পায়ের নীচে মাটি আরও সরে যাচ্ছে।

বিশ-ত্রিশ দশকের সন্ধিক্ষণে এই দুরাত্মা অশ্বেতকায় ভারতীয় দলীপ সিংজী সম্পর্কে এমনি ছলছুতোর আশ্রয় নিয়েছিল। দলীপ তখন ডাকসাইটে খেলো-য়াড়। শুধু তাঁর নামের টানেই মাঠে কাতারে কাতারে লোক জমে যায়। সারা ইংলন্ড তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও দলীপের মতো ছিমছাম ব্যাটসম্যান পাওয়া ভার। টেস্ট দল গড়তে হলেই তাঁকে ডাকতে হয়। কিন্তু ইংলন্ডের খেলা যে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে! তাই অশ্বেতকায় দলীপকে প্রাক্ টেস্ট নির্বাচনী আসরেই ডাকা হলো না। পাছে নির্বাচনী আসরে দলীপ ভাল খেলে ফেলেন।

কালা আদমীর সঙ্গে খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকার আপত্তি। আর সেই আপত্তির মুখ চেয়েই এম সি সি সেদিন বর্ণবিদ্বেষের পৃষ্ঠপোষকতায় হাত পাকিয়েছিল। সেই এম সি সি ও সেই চাতুরী, আটত্রিশ বছর পরেও তাদের কোনো হেরফের ঘটেনি। শুধু সেই ঘৃণ্য চক্রান্তের যূপকাষ্ঠে ভারতীয় দলীপের বদলে কেপটাউনজাত ওলিভিয়েরাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

ইংলন্ডের ক্রিকেটের দন্ডমুন্ডের মালিক এম সি সি-কে একদা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভাগ্যনিয়ন্তা বলে মনে করা হোতো। এমন মর্যাদামন্ডিত আসন যার ছিল, ক্রিকেটের ধর্মাচরণের বিরোধিতা করে সে নিজেই নিজের পদস্খলন ঘটিয়েছে। দলীপ সিংজী, ওলিভিয়েরাকে তো অবিচার, কুবিচারের মুখে ঠেলে দিয়েছেই। তারওপর দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সোৎসাহে ক্রিকেট খেলে যেসব খেলার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই সেইগুলিকে টেস্টম্যাচের খোলস পরাবার চেষ্টা করছে।

ওই এম সি সি আর ইংরাজের সারল্যের তুলনা বুঝি তারা নিজেরা ছাড়া অন্য কেউই নয়। বর্ণবৈষম্যের কথা উঠলে তারা মুখে মুখে এই অমানবিক রীতিনীতির প্রবল বিরোধিতা করে। কিন্তু কাজের বেলায় বর্ণ-বিদ্বেষীকে খুশী করতে বর্ণসংকর ওলি-ভিয়েরাকে দল থেকে ছাঁটাই করে দেয়। এই ইংরাজ কদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওলিম্পিক আসরে ফিরিয়ে আনতে বর্ণ-বিদ্বেষীর আর এক দোস্ত আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা বুক ফুলিয়েই বর্ণবিদ্বেষী সাজতে চায়। ইংলন্ডের সে সাহসও নেই, তাই চার দেওয়ালের অন্ধ-কারে গাঢাকা দিয়ে সে চক্রান্ত গড়ে। এক-পক্ষের ভূমিকা প্রত্যক্ষ। অপরপক্ষে পরোক্ষ। কিন্তু কাজের মূল্যায়নে তারা দুজনেই ঘোর বর্ণবিদ্বেষী।

জানি না, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনের আর আর সদস্যরা এই চক্রান্ত গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা কেন করে না। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডকে না হয় আমরা বুঝতে পাড়ি। তাদের গায়ের রঙও তো কটা। কিন্তু ভারত, পাকিস্থান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ কেন মুখ খোলে না।

কেন তারা দক্ষিণ আফ্রিকাকে কোল দেবার এই লজ্জাকর প্রয়াসের তীক্ষ্ন ধিক্কার জানায় না? আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলন কক্ষে বসেও কি ভারত-পাকিস্থান-ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিনিধিরা জুজু বুড়ো সাহেব-দের দাপটে মৌন থাকাটাই ইহকর্ম বলে মনে করেন নাকি? যেখানে ক্রিকেটের নামে মানবতা বিরোধী কারবার ফলাও হয়ে ফাঁপছে সেখানে চুপ করে থাকার অর্থই কি সেই কাজের সামিল হওয়া নয়? এই শাদামাটা কথাটা ক্রিকেট সম্মেলনের অশ্বেতকায় প্রতিনিধিরা যতোদিনে উপলব্ধি করতে না পারেন ততো ও অবিচারের যূপকাষ্ঠ থেকে সাচ্চা ক্রিকেটার ওলিভিয়েরাদেরও সঙ্গে ক্রিকেটের মুক্তি নেই। সতি ব্রাত্যদের সংখ্যা বাড়ছে। তারা ব্যাটে খেলার মহান মর্মার্থ করতে চাইছে না।

ব্রাত্যদের সংখ্যা বাড়ছে যতো ন্যায়, নীতি, শোভনতা, শালী এবং জীবনের বৃহত্তর মূল্যবোধ হচ্ছে যাচ্ছে। খেলা নয়, ক্রিকেট নয়, মানুষের চামড়ার রঙকেই মনে করা হচ্ছে। এম সি সির আজ কিসের প্রতীক বনে গি সত্যিই ভাববার কথা।

কিন্তু যে মানুষটিকে ঘিরে অলক্ষনে কান্ড, সেই ওলিভি নিজের ভাগ্য বিপর্যয়কে সংযত চিত্তে মেনে নিয়ে এম সি সিকে আরও লজ্জা দিয়েছেন, তেমনি দের সমবেদনাকে আরও বেশি করে পাশে টানতে পেরেছেন।

দল থেকে ছাঁটাই হওয়ার খ বিষন্ন চিত্তে তিনি শুধু বলেছেন স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছে! দক্ষিণ থাকতে শ্বেতকায়দের মতো ক্রিকে সুযোগ পাই নি। আশা ছিল, সির সদস্য হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিক সে দেশের মানুষকে বোঝাতে প সুযোগসুবিধে পেলে অশ্বে যোগ্যতা, দক্ষতার পরিচয় রাখতে কিন্তু জীবনে সে সুযোগ এলো শুধু এই প্রার্থনা করি যে, আমা দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায়ে কোনো বিক্ষোভের ঝড় না তোলে

ওলিভিয়েরার বেদনা আমর পারি। আমাদের জীবনেরও ইংরেজী দাপট ও ইংরাজের ছায়ায় কেটেছে। তাই এম অবিচারে আমরা বিস্মিত হই ওলিভিয়েরার প্রতি সমব্যথায় ব্য উঠেছি। এম সি সির গা জোয়ার ওলিভিয়েরার নিরুত্তাপ মুখ আমাদের মনে তাঁর প্রতিচ্ছায়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'ক্রাইসি কনসেন্স'-এর লেখক ওলিভিয়েরা পেয়ে তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হ ছিলাম। অবিচার ও কুবিচারে সত্ত্বেও বিচক্ষণ দার্শনিকের ম আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন শ্রদ্ধা আরও বাড়লো বই কমলো

খেলাধূলা

দর্শক

ছক্কা মারের বিশ্ব রেকর্ড

সাবাস সোবার্স! বিশ্ব ক্রিকেট রেকর্ডের তালিকায় তিনি আর এক বিষয়ে নিজের নাম উৎকীর্ণ করলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডের নটিংহ্যামশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক গ্যারী সোবার্স সম্প্রতি গ্লামর্গ্যান দলের বিপক্ষে কাউন্টি ক্রিকেট লীগ খেলায় ম্যালকম ন্যাশের এক ওভারে (৬টা বলের ওভার) ৬টা ওভার বাউন্ডারী মেরে এক ওভারের খেলায় সর্বাধিক ওভার-বাউন্ডারী করার বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। সোবার্সের শেষ ওভার-বাউন্ডারী মারের চোটে বলটি মাঠের সীমানা পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লে স্কুল-ছাত্র রিচার্ড লুইস তা কুড়িয়ে পেয়ে সোবার্সকে উপহার দেন। এই ঐতিহাসিক বলটি এখন নটিংহ্যামশায়ারের ট্রেন্ট-ব্রীজ মাঠের মিউজিয়ামে সগৌরবে স্থান পেয়েছে। আলোচ্য খেলায় সোবার্স ৩৫ মিনিটে তাঁর যে ব্যক্তিগত ৭৬ রান করেন, তার মধ্যে ছিল ৭টা ওভার-বাউন্ডারী এবং ৫টা বাউন্ডারী।

পূর্ব বিশ্ব রেকর্ড

৬ বলের এক ওভারে সর্বাধিক ওভার-বাউন্ডারী করার পূর্ব বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৫টি। এই বিশ্ব রেকর্ডের দুজন ভাগীদার ছিলেন—সমারসেট কাউন্টি দলের প্রখ্যাত 'ছক্কার' রাজা আর্থার ওয়েলার্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ডি লিন্ডসে। আর্থার ওয়েলার্ড এই বিশ্ব রেকর্ড করেন দুবার—১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে ডার্বিশায়ার দলের টি আর আর্মস্ট্রংয়ের বলে ওয়েলস মাঠে এবং পুনরায় ১৯৩৮ সালে একই মাস এবং মাঠে কেন্টের এফ ই উলীর বলে। ১৯৬১ সালের জুন মাসে দক্ষিণ আফ্রিকান ফজালে একাদশ দলের ডি লিন্ডসে মিডলসেক্সের ডব্লু টি গ্রীনস্মিথের এক ওভারে পাঁচটা ওভার-বাউন্ডারী করেন (০—৬—৬—৬—৬—৬)।

অলিম্পিক গেমস প্রসঙ্গ

রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভগবৎ ঝা আজাদ মেক্সিকো-গামী ভারতীয় অলিম্পিক দল গঠন সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, দল গঠন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদ যে-নীতির সুপারিশ করেছেন ভারত সরকার তা মেনে নিয়েছেন। শুধু যোগ্যতার মাপকাঠিতেই দল গঠন করা হবে এবং প্রমোদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কেউ দলে স্থান পাবেন না। তিনি আরও বলেছেন, যথাসম্ভব কম কর্মকর্তা দলের সঙ্গে যাবেন। তাঁর ঘোষণায় জানা গেছে, ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের অনুকূলে কেন্দ্রীয় সরকার ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে মঞ্জুর করেছেন। এই টাকার পরিমাণ ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রার্থিত টাকার থেকে অনেক বেশী।

দল গঠনের ক্ষেত্রে যেমন খেলোয়াড়দের যোগ্যতার একটা মান নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তেমনি বিদেশ থেকে খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের মূল্যবান ভোগ্য-সামগ্রী কিনে আনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, খেলার থেকে খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের কাছে দেশভ্রমণের আনন্দ এবং মূল্যবান ভোগ্য-সামগ্রী সওদা করাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলাধূলার উন্নতির পথে এই পরিস্থিতিটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।

এমিল জেটোপেক

রাশিয়ার নেতৃত্বে পাঁচটি দেশের চেক-ভূখণ্ড আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে চেকোশ্লাভাকিয়ার বিশ্ববিশ্রুত দৌড়বীর এমিল জেটোপেক এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন, তাঁর স্বদেশবাসীর অন্তরে রুশদের সম্পর্কে ভালবাসার পরিবর্তে দারুণ ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে। সম্ভবত এই মনোভাব সুদূরপ্রসারী—এক হাজার বছর স্থায়ী থাকবে। জেটোপেক গভীর দুঃখ প্রকাশ করে আরও বলেছেন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বছরে এবং মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের প্রাক্কালে রুশেরা তাঁর জন্মভূমি আক্রমণ করে বর্বরতার পরিচয় দিয়েছেন।

এমিল জেটোপেক বর্তমানে চেক সেনাবাহিনীর কর্ণেল এবং শরীরচর্চা সংস্থার জাতীয় প্রশিক্ষক। ১৯৫২ সালের অলিম্পিক গেমসে তিনি পাঁচ হাজার মিটার, দশ হাজার মিটার এবং ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন। একই বছরের অলিম্পিক গেমসের আসরে দূরপাল্লার এই তিনটি দৌড় অনুষ্ঠানে তিনি ছাড়া আর কেউ স্বর্ণপদক জয়ী হননি।

কি লজ্জার কথা

গত মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফুটবল দলের শোচনীয় ব্যর্থতায় ভারতবাসীর মাথা হেঁট হলেও কয়েকজন খেলোয়াড়ের বিদেশ থেকে মূল্যবান ভোগ্য-সামগ্রী কিনে আনার বহর দেখে মনে হয় না যে, পরাজয়ের গ্লানি তাঁদের এতটুকু স্পর্শ করেছে। জাতীয় দলের খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের বিদেশ যাত্রার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রমোদ-ভ্রমণ এবং মূল্যবান ভোগ্য-সামগ্রী কেনাকাটা। কাকপক্ষীরও কাছে তাঁদের কথা অজানা নয়। তাই দমদম বিমানঘাটিতে শুল্ক-বিভাগের কর্মচারীরা মারদেকা প্রত্যাগত ভারতীয় ফুটবল দলের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তল্লাসী আরম্ভ করেন। 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, এই তল্লাসীর ফলে আটজন ফুটবল খেলোয়াড় শুল্ক আইনভঙ্গের অপরাধে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। এই আটজন খেলোয়াড়ের নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে ডিউটি এবং অর্থদণ্ডের পরিমাণ দেওয়া হল : চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ (ডিউটি ২৭০০্ ও ফাইন ২৫০০্), নঈম (ডিউটি ৫০০্ ও ফাইন ২৫০্), কামন (ডিউটি ৮৭৫্ ও ফাইন ৬০০্), সাদাতুল্লা (ডিউটি ৩৬০্ ও ফাইন ১৫০্), অশোক চ্যাটার্জি (ডিউটি ২৫০্ ও ফাইন ১৫০্), মুস্তাফা (ডিউটি ৪৬৩্ ও ফাইন ২০০্), ইন্দর সিং (ডিউটি ৯৫০্ ও ফাইন ৭৫০্), এবং পাপ্পানা (ডিউটি ৩৯০্ ও ফাইন ২০০্)। সংবাদে প্রকাশ, এই আটজনের ৬ জন খেলোয়াড় দমদম বিমানঘাটিতেই ডিউটি এবং অর্থদণ্ডের টাকা মিটিয়ে দেন। এই নিয়ে ঘটনাক্ষেত্রে ধিক্কার-ধ্বনি কম হয়নি এবং বহু উপস্থিত ব্যক্তির মাথা নত হয়ে যায়—কি লজ্জার কথা!

বয়কট স্থগিত

আমেরিকার সমাজ-জীবনে শ্বেতকায়দেরই প্রাধান্য বেশী। বহু বিষয়ে নিগ্রোরা সেখানে উপেক্ষিত। এই বর্ণ-বৈষম্যের প্রতিবাদে মার্কিন নিগ্রোরা মেক্সিকো অলিম্পিক গেমস বর্জনের যে-আন্দোলন করছিলেন, সম্প্রতি তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এই আন্দোলনের নেতা মিঃ হ্যারি এডওয়ার্ডস স্বীকার করেছেন আন্দোলনের অনুকূলে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। আগামী মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে আমেরিকান দলে যে ২৬জন খেলোয়াড়ের স্থান পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে তাঁদের বার-তেরজন অলিম্পিক গেমস বয়কট আন্দোলন সমর্থন করেন নি। প্রখ্যাত নিগ্রো এ্যাথলীট জেসি ওয়েন্স এবং আরও অনেকে মনে করেন অলিম্পিক গেমস বর্জন করে নিগ্রো জাতির খুব বেশী লাভ হবে না, বরং ক্ষতিই হবে। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, অলিম্পিক গেমস আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলেও অলিম্পিক গেমস আসরে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে নিগ্রো খেলোয়াড়রা বিক্ষোভ প্রদর্শনের এক নতুন রকমের পরিকল্পনা নিয়েছেন।

আই এফ এ শীল্ড

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফুটবল দলের যোগদানের ফলে আই এফ এ শীল্ডে কলকাতার নামকরা দল-

গুলির খেলা স্থগিত রাখা হয়েছিল। ফলে খেলা টিমটিম করে চলছিল। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলা উপলক্ষে মাঠ সরগরম হয়ে উঠেছে। তবে রাজস্থান ক্লাবের অবৈতনিক যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীজগমোহন ডালমিয়ার আবেদন-ক্রমে আই এফ এ শীল্ডের একদিকের খেলার সিটি সিভিল কোর্টের সাময়িক ইনজাংশন বলবৎ আছে। রাজস্থান বনাম জামসেদপুর স্পোর্টস এসোসিয়েশনের ২য় রাউন্ডের আই এফ এ শীল্ড খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র ছিল। এই দলদুটি অতিরিক্ত সময় খেলতে রাজী হয়নি বলে আই এফ এ-র টুর্নামেন্ট কমিটি এ বছরের আই এফ এ শীল্ড প্রতি-যোগিতা থেকে তাদের নাম কেটে দেয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজস্থান ক্লাবের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে।

বিশ্ব রেকর্ড

আমেরিকার অলিম্পিক দল নির্বাচন পর্বে ভি ম্যাথুজ ৪০০ মিটার দৌড় ৪৪-৪ সেকেন্ডে শেষ করে নতুন বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূর্বের বিশ্বরেকর্ড ছিল আমেরিকারই টমি স্মিথের—সময় ৪৪-৫ সেকেন্ড (১৯৬৭ সালের মে ২০)।

ফুটবল মাঠে দাঙ্গাহাঙ্গামা

ফুটবল খেলা উপলক্ষ করে সমর্থকদের দাঙ্গাহাঙ্গামা এখন কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর সভ্য দেশেও ফুটবল খেলা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসোসিয়েশন ফুটবল, যার জনপ্রিয়তা সারা পৃথিবী জুড়ে, তার জনক এবং প্রতিপালক হল ইংল্যান্ড। ফুটবল এবং ক্রিকেট ইংল্যান্ডের জাতীয় খেলা। ক্রীড়ানুরাগী হিসাবে ইংরেজ জাতির যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ইংল্যান্ডের জাতীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে খেলাধুলাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর সেই ইংল্যান্ডেই কিনা ফুটবল খেলা উপলক্ষে দাঙ্গাহাঙ্গামা হামেশাই লেগে আছে। গত কয়েক সপ্তাহের দাঙ্গাহাঙ্গামা দেশের শান্তিপ্রিয় গুণীজ্ঞানীজনকে মহা দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। বৃটেনের ফুটবল মাঠে দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধের উদ্দেশ্যে বৃটিশ ম্যাজি-স্ট্রেটরা কঠোর শাস্তির সুপারিশ করেছেন। বিচারকরা বলেছেন, দাঙ্গাহাঙ্গামাকারীদের সম্পর্কে বর্তমানে যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা অকেজো প্রতিপন্ন হয়েছে। সুতরাং আরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হলে হাঙ্গামা-কারীদের চৈতন্য হবে।

রেলওয়ের কর্তারা আজ মহা সমস্যায় পড়ে গেছেন। মনের মত খেলার ফলাফল না হলেই বাড়ী ফেরার পথে সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ছে রেলওয়ে সম্পত্তির উপর। গোঁড়া ফুটবল অনুরাগীরা মনের ঝাল মেটাবার একটা সহজ পথ করে নিয়েছে। গত সপ্তাহে ম্যাঞ্চেস্টার বনাম শেফিল্ড ওয়েনসডের খেলায় ম্যাঞ্চেস্টার হেরে যাওয়াতে তাদের উগ্র সমর্থকদের আক্রমণে ট্রেনের সাতটা কামরা বিধ্বস্ত হয়। অপরদিকে, লিভারপুল দলের পরাজয়ের ঘটনায় উগ্র সমর্থকরা একটা ট্রেনের কয়েকটা কামরা ভেঙ্গে দেয় এবং দোকানঘরের শার্সি ভেঙ্গে জিনিষপত্র লুঠ করে নেয়। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রেলওয়ের কর্তাব্যক্তিরা অনেক শলা-পরামর্শ করে ঘোষণা করেছেন, যেসব ক্লাব তাদের সদস্যদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেনের আবেদন করবেন তাঁদের সেই-সঙ্গে রেলওয়ে সম্পত্তির নিরাপত্তার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। ক্লাব সদস্যদের হস্তক্ষেপে রেলওয়ে সম্পত্তির ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট ক্লাবকেই তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ইংল্যান্ডের ফুটবল খেলার এসব ঘটনা নতুন কিছু নয়, বহুকালের পুরনো। বৃটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে এ ধরনের খবর যে প্রকাশ পেত না তার কারণ, বৃটিশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় স্বার্থে এসব খবর সযত্নে চেপে রাখতেন। জোরগলায় ইংরেজ জাতির গুণ-গান করে পরাধীন ভারতবাসীর মনে ইংরেজ জাতি সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব যেখানে উদ্রেগ করা হত সেখানে ইংল্যান্ডের খেলার মাঠের এসব দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর দেওয়া যে, হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার সামিল।

ক্রিকেটে দল পরিবর্তন

পশ্চিম বাংলার আগামী ১৯৬৮-৬৯ সালের ক্রিকেট মরসুমে খেলার জন্য ৫৫০জন খেলোয়াড় সি-এ-বি অফিসে তাঁদের দল পরিবর্তনের ছাড়পত্র জমা দিয়েছেন।

নামকরা খেলোয়াড়রা কোন্ দল ত্যাগ করে কোন্ দলে গেলেন তা নীচে দেওয়া হল :

কালীঘাট দল ত্যাগ করে রবিন মুখার্জি মোহনবাগান, তাপস রায় রাজস্থান, ভাস্কর গুপ্ত ইস্টবেঙ্গল এবং রাসবিহারী সরকার পোর্ট কমিশনার্সের অনুকূলে ... করেছেন। ইস্টবেঙ্গল দল ত্যাগ করে ... রায় এরিয়ান্স, সুজিত গুহ স্পোর্টিং ইউ-নিয়ন, শ্যামসুন্দর ঘোষ মহমেডান স্পোর্টিং, সৌমেন কুন্ডু মোহনবাগান, মনসা ধর মহমেডান স্পোর্টিং এবং সম্বরণ গাঙ্গুলী পোর্ট কমিশনার্সের পক্ষে ছাড়পত্রে সই করেছেন। মোহনবাগানের এস ডো... স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং অলোক দাস এরি-য়ান্সের পক্ষে সই করেছেন। কালীঘাটের পক্ষে সই দিয়েছেন বি এন আর দলের দে... মিত্র, ইস্টার্ন রেল দলের এডমন্ডস এবং বালীগঞ্জ ইউনাইটেড দলের রাজা মুখার্জি ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে সই দিয়েছেন মিলন সমিতির সুবীর গাঙ্গুলী।

"দিস্ ইজ্ নট ক্রিকেট"

ইংল্যান্ডের অশ্বেতকায় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বেসিল ডি' ওলিভিয়েরাকে আগামী দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এম সি সি দলে নির্বাচন না-করায় এম সি সি-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে প্রচন্ড ঝড় উঠেছিল তা এখনও শান্ত হয়নি।

ইংল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রেভারেন্ড ডেভিড শেফার্ড এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'নির্বাচকমণ্ডলী খুবই ভুল করেছেন। আমার কাছে ব্যাপারটি শুধু ডি' ওলিভিয়েরা নিয়েই নয়। বর্তমানে বিভিন্ন কাউন্টিতে প্রায় ত্রিশজন অশ্বেতকায় খেলোয়াড় খেলছেন।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল জাতি-ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে তৈরী না হলেই ১৯৬০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রেভারেন্ড ডেভিড শেফার্ড খেলতে রাজী হননি। ওলিভিয়েরা সম্পর্কে এম সি সি-র নির্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের প্রতি-বাদে লর্ড আইভর মন্টেগু এম সি সি-র সদস্য পদ ত্যাগ করেছেন। তিনি ... বছরের বেশী এম সি সি-র সভ্য ছিলেন। বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য আইজ্যাক রিচার্ডস বলেছেন, ওলিভিয়েরাকে বাদ দিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা ইংল্যান্ডেই বর্ণবৈষম্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এম সি সি-র এই নীতি সম্পর্কে তদন্তের জোর দাবী জানিয়েছেন। প্রখ্যাত লন্ডন টাইমস পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'রাজনৈতিক কারণেই ওলিভিয়েরাকে জবাই করা হয়েছে'। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিশ্রুত প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কিথ মিলারের মন্তব্য—'ওলিভিয়েরাকে বাদ দিয়ে ইংল্যান্ডের পক্ষে ওভাল টেস্টে জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ তাঁর ভূমিকার এই কি প্রতিদান? অকৃতজ্ঞ ইংল্যান্ড তার সীমা অতিক্রম করে গেছে।'

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রমথনাথ বিশীর নূতন উপন্যাস

বিপুল সুদূর তুমি যে ৭॥
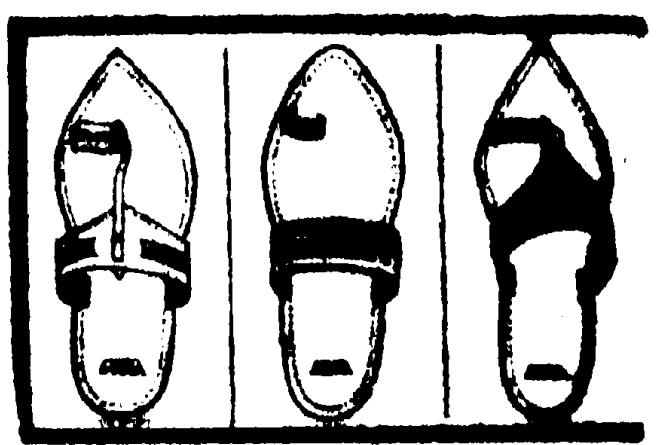
ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের

ধর্ম ও সমাজ ১০৲

আশাপূর্ণা দেবীর নূতন উপন্যাস

বিজয়ী বসন্ত ৬৲

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস

সুভগা বসন্ত ৪৲

বিমল করের নূতন উপন্যাস

বাড়ী বদল ৪৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

নতুন তোরণ ৪॥০

'তন্ত্রাভিলাষী' খ্যাত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

অদৃষ্ট রহস্য ৩॥৹

প্রফুল্ল রায়ের

অন্য ভুবন ৪॥০

প্রমথনাথ বিশীর নূতন কাব্য সংকলন

প্রাচীন পারসিক হইতে ৫॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নূতন উপন্যাস

কাজললতা ৬৲

বিমল মিত্রের

কলকাতা থেকে **বলছি** ৬৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

নগরে অনেক রাত ৪॥৹

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অন্যদেশ অন্যদাহ ১৫৲

জরাসন্ধের

বন্যা ৪৲

তারাশঙ্করের

রাধা (নূতন সং) ৮৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আঁধি ৭॥৹ **অমৃত সমান** ৪॥৹

আলোর অরণ্য ৬॥৹

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগরপারে রূপনগর ১৮৲

লীলা মজুমদারের

আর কোনোখানে ৫৲

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙালী জীবনে রমণী ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নবজন্ম ৪৲ **দহন ও দীপ্তি** ৬৲

একদা কী করিয়া ১৩৲

রমাপদ চৌধুরীর

জরির আঁচল ৪৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কুয়ারি গিরিপথে ৫॥৹ **গঙ্গাবতরণ** ৫৲

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের

পুণ্যতীর্থ ভারত ১০৲

(ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-কাহিনী)

অবধূতের

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥০

শঙ্কু মহারাজের নূতন ভ্রমণ-কাহিনী

উত্তরস্যাং দিশি ১০৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲

আশাপূর্ণা দেবীর

সুবর্ণলতা ১৩৲ **প্রথম প্রতিশ্রুতি** ১৪৲

সুমথনাথ ঘোষের

বনরাজীনীলা ৭৲ নীলাঞ্জনা ৭॥০

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

ইস্ট বাক্‌ল্যান্ড রোড ৮৲

প্রফুল্ল রায়ের

পূর্বপার্বতী ১১৲ **কিন্নরী** ৪॥৹

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ॥ ৩৪-৮৭৯১

৮ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২০শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 20th Sept. 1968.   শুক্রবার, ৩রা আশ্বিন, ১৩৭৫   40 Paise.

সূচীপত্র

ডি' অলিভিয়েরা প্রসঙ্গে

সেই পুরোন দ্বন্দ্ব আবার জমে উঠেছে। সাদা-কালোর লড়াইয়ে এবারের বলি ডি' অলিভিয়েরা। প্রয়োজনে ইংল্যান্ড যাকে দলভুক্ত করতে দ্বিধা করেনি এবার বৃহত্তর প্রয়োজনেই তাঁকে দল থেকে বাদ দিতে হলো। সেই বৃহত্তর প্রয়োজন হলো দক্ষিণ আফ্রিকার অমানবিক জেদকে বজায় রাখা। এ ডাকেই সাড়া দিয়ে বেশ কিছুদিন আগে ইংরেজ তার দোসর আমেরিকার সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে অলিম্পিক আসরে ফিরিয়ে আনতে। অনেক জল ঘোলা হবার পর দক্ষিণ আফ্রিকা মেক্সিকো অলিম্পিক থেকে বাদ পড়ার সে উদ্দেশ্য অসফল হয়েছে। কিন্তু হার স্বীকার করার পাত্র তারা নয়। তাই এবার দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী এম-সি-সি দল থেকে বর্ণসংকর অলিভিয়েরাকে বাদ দিয়ে সে পরাজয়ের শোধ তুললো।

পৃথিবীর ক্রীড়া-আসরে এজন্য তারা প্রতিনিয়ত ধিকৃত হচ্ছে। কিন্তু এম-সি-সি'র কর্তারা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, দলকে শক্তিশালী করার জন্যই অলিভিয়েরাকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁকেই যখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঠেকা দেবার জন্য উপর্যুপরি তিনটি টেস্টে বাদ পড়ার পর ডাকা হয়েছিল তখন তিনি জাত ক্রিকেটারের মত খেলে ইংল্যান্ডের মুখরক্ষা করেছিলেন। ব্যাটে-বলে আগুন ছুটিয়ে সেদিন রান তুলেছিলেন ১৫৮। এই টেস্টে ইংল্যান্ড জয়লাভ করে। ফলে দু'দেশের টেস্ট সিরিজ থাকে অমীমাংসিত। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে সমস্ত ইংল্যান্ড সেদিন তাঁকে ত্রাণকর্তারূপে অভিষিক্ত করেছিল। কিন্তু তার পরেই সব গন্ডগোল হয়ে গেল।

এরকম সাফল্যের পর টেস্টের আসরে অলিভিয়েরার স্থান ছিল একরকম অবধারিত। সকলের সব আশা ভেঙে গেল। বিশ্বের ক্রিকেট রসিকদের অবাক করে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাগামী এম-সি-সি খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হলো। সে দল থেকে অলিভিয়েরা বাদ। দক্ষিণ আফ্রিকার জেদ বজায় রইলো। আর সকলকে বোকা বানিয়ে এম-সি-সি'র কর্তারা জোর আত্মপক্ষ সমর্থনে লেগে গেলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডবাসীরা অলিভিয়েরাকে বাদ দেওয়ার তীব্র সমালোচনা চালিয়েছেন দেশ জুড়ে। কারো বুঝতে বাকি নেই যে, অলিভিয়েরাকে বাদ দেওয়ার মূলে বর্ণবিদ্বেষ একমাত্র কারণ। সম্প্রতি আবার প্রকাশ পেয়েছে যে, কোন একটি পত্রিকার ক্রিকেট ভাষ্যকার হিসেবে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আবেদনও ব্যর্থ হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, অলিভিয়েরাকে সেদেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। বিশ শতকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এরকম বর্ণবিদ্বেষ সত্যি অভাবনীয়। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ঘৃণ্য নীতির সরকারী অনুমোদন মিললো ইংল্যান্ডের তরফ থেকে। অবশ্যই পরোক্ষ।

ক্রীড়াক্ষেত্রে এই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সব দেশের ক্রিকেটারদের তীব্র বিক্ষোভ জানাবার অধিকার আছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনের সব সদস্যদের ইংল্যান্ডের এহেন জঘন্য আচরণকে ধিক্কার জানান কর্তব্য মনে করি। বিশেষভাবে অশ্বেতকায় ক্রিকেটারদের অর্থাৎ ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ভারত-পাকিস্তানের ক্রীড়াবিদদের এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। অমৃত পত্রিকার উনিশ সংখ্যায় অজয় বসু 'সোজা ব্যাটের খেলা নয়' প্রসঙ্গে এই সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে অনেকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তাঁর প্রস্তাব মেনে চলে যদি এসব দেশ ধিক্কারধ্বনি তোলে তবে সে আক্রমণের কাছে ইংল্যান্ডের বর্ণবিদ্বেষী নীতি ভেঙে যাবে। তখন আর অন্য কোনো নিরিখ থাকবে না, প্রকৃত ক্রিকেটার ও খেলোয়াড়ই সম্মানিত হবেন।

ইংল্যান্ডের জনমত অলিভিয়েরার প্রতি এই অন্যায় আচরণে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। তাই সকল সংবাদপত্রকে এই সফরের বিবরণ বর্জন করতে অনুরোধ জানিয়েছেন, এমনকি তাঁরা এম-সি-সি দলকে এই সফর বাতিল করে দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন। অমৃতের আঠার সংখ্যায় খেলাধুলো বিভাগে দর্শক এসম্পর্কে আনুপূর্বিক আলোচনা করে সমস্ত তথ্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। এজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

নিমাই ভান্ডারী
কলকাতা-২৬

হিপি প্রসঙ্গে

হিপিদের নিয়ে দেশ-বিদেশে এক সময়ে হুল্লোড়ের অন্ত ছিল না। আজ যদিও তার মাত্রা অনেকটা কমেছে, তবুও মাঝে মাঝে নানান খবর এসে পৌঁছায়। একসময় বিটলরাও সাড়া তুলেছিল। আজ তাদের কথা বিশেষ শোনা যায় না। আর এদেশে তাদের গুণগ্রাহী থাকলেও অ শিষ্য তেমন কেউ ছিল না। সেদিক হিপিরা ব্যতিক্রম বিশেষ। তাদের ভূমি এই ভারত। বিশেষ করে আমে হিপি।

গত সংখ্যায় শ্রীসুরেশচন্দ্র 'আমেরিকান হিপি' নিবন্ধে আক কয়েকটি সংবাদ পড়ে আনন্দিত হ প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় সমস্ত আলো বেশ মনোরম হয়ে উঠেছে। 'গোলাপ মত ফুটে উঠে' হিপিরা আজ আমে সমগ্র জীবনযাত্রার যে কী অবস্থার করেছে তার চিত্র দিতে গিয়ে বলেছেন : 'অনেকেই জড়াজড়ি করে আছে, কেউ বা একজনকে ছেড়ে আর জনকে চুমু খাচ্ছে, কেউ তুলছে কাছে কুকুর পাশে পুলিশ।' আরে শেষে শ্রীসাহা লিখেছেন : "সমস্ত গুণ এবং যোগ্যতা বিচার করে হি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে স্বর্গত মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন এ জাঁদরেল হিপি—কারণ হিপিদের তিনিও অহিংসবাদী। আর রাজপুত্র বুদ্ধ ত' হিপিদের কুলগুরু—কারণ হিপি কায়দায় রাজ-ঐশ্বর্য ছেড়ে পালানো ছেলের মত পথে এসে দাঁ ছিলেন !!"

ভারতীয় প্রলেপ দিয়ে তাঁরা আচরণ করে চলেছেন। অথচ আমে একটা অহমিকা এই যে, ভারতকে খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আ দিক থেকে বলা চলে যে, ভারতীয় স এমন রুচি-বিকৃত আচরণ আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত নই। যদিও আমা মহর্ষি মহেশ যোগী এসব হিপি গুরুর আসন নিয়েছেন, তাহলেও ভা ঐতিহ্যের ইচ্ছামত ব্যবহারের এবং পুঁজি হিসাবে ব্যবহারের অধিকার দিইনি। সম্প্রতি হিপির দল ভা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কলক এসব উন্মার্গগামী বিদেশীর সংখ্যা একটা কম নয়। তাঁরা হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের ঘরের ছেলে-মেয়ে প্রভাবিত করবে।

তাই সময় থাকতেই সাবধান দরকার। দেশে দেশে এই ব্যাধি সং রোগের মত বিস্তার লাভ করছে। এখনো এর বিরুদ্ধে কোন সংঘবদ্ধ বাস আমাদের দেশে আজো গড়ে ওঠে এরকম ভাড়ামি এবং সামাজিক অনাচ বিরুদ্ধে এখনই আমাদের প্রতিবাদের এসেছে।

—শেখর
হাওড়া

অমৃত

সম্পাদকীয়

নির্বাচন ও জনসাধারণ

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা এখনও পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনের তারিখ নিয়ে মনঃস্থির করতে পারেন নি। নভেম্বরে নির্বাচন হবে একথা ঘোষণা করবার পর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। পশ্চিম বাংলার ওপর দিয়ে গেছে এক ভয়াবহ বন্যার দুঃসহ অভিজ্ঞতা। তাই সকলেই আশা করছিলেন যে, গ্রামাঞ্চলের মানুষ যেখানে প্রাণরক্ষা করতেই প্রাণান্ত, তার ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে বিপুল, বিনষ্ট ঘরবাড়ি মেরামত করতে আরও অনেক সময় লাগবে তখন তাকে ভোট দিতে নিয়ে যাবার জন্য তাড়া দেওয়া অর্থহীন। নির্বাচন কমিশনার সব দেখে শুনে বললেন, ব্যাপারটা ভেবে দেখি।

এর মধ্যে তিনি অনেকবারই পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে গেছেন। হেলিকপ্টারে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল দেখেও গেছেন। সম্প্রতি আবার তিনি আসছেন সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য। তা তিনি দেখুন। তবে যাই করুন না কেন, এ বিষয়ে একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। কারণ, তাঁর পূর্ব নির্ধারিত তারিখটির পরিবর্তনের পক্ষেই যুক্তি বেশি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় গ্রামাঞ্চলের যে-দুর্দশা হয়েছে তাতে নভেম্বরে নির্বাচন হলে তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ ভোটদাতারা তাঁদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

নির্বাচন কমিশনার আরও বলেছেন যে, ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশে ভোট দেওয়া আবশ্যিক। অন্যথায় তাদের অর্থদন্ড দিতে হয়। নেদারল্যান্ডস, চিলি ইত্যাদি দেশের নজীরও উত্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনারের এই বক্তব্য সাধু সংকল্পেরই ইঙ্গিত। যাতে জনসাধারণ তাঁদের বহু কষ্টে অর্জিত প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে দেশের শাসনব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ নিতে পারে তার জন্যই সংবিধান প্রণেতারা সকলের জন্য ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন। যদি অশিক্ষার, ঔদাসীন্যে ও অবহেলাবশত ভোটাধিকারপ্রাপ্ত মানুষ ভোটের দিনে ভোট দিতে না যান তাহলে মুষ্টিমেয় মতলববাজ ও পেশাদার রাজনীতিকই নানা কৌশলে ক্ষমতা নিজেদের আয়ত্তে রাখবার জন্য সচেষ্ট হবে। সুতরাং দেশের কল্যাণে ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখবার স্বার্থেই জনসাধারণের কর্তব্য হল তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা। এই যুক্তি থেকেই ভোটদান বাধ্যতামূলক এবং অন্যথায় অর্থদণ্ডের সুপারিশ করা হয়েছে।

অবশ্য এটা আলোচনার স্তরেই আছে। বিগত কয়েকটি নির্বাচনেই দেখা গেছে যে ভোটদাতাদের একাংশের মধ্যে যেমন উৎসাহ প্রবল, অন্য অংশে অবহেলা ও ঔদাসীন্যও তদনুরূপ। সাধারণত শহরাঞ্চলে ভোটদাতারা বেশি সংখ্যায় তাঁদের অধিকার প্রয়োগে উৎসাহী হন। তার কারণ, শিক্ষা, রাজনীতিক-চেতনা এবং রাজনৈতিক দলসমূহের উৎসাহী কার্যকলাপ। গ্রামাঞ্চলে অজ্ঞতা, নানাবিধ সংস্কার, অশিক্ষা এবং অন্যান্য বাস্তব অসুবিধা (যথা রাস্তাঘাটের দুর্গমতা) অনেক সময় ভোটদাতাকে ভোটকেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ব্যাপক নিরক্ষরতার দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মূল্যই বা কতটুকু। ভোটের গুরুত্ব একজন শিক্ষিত মানুষের কাছে যতখানি নিশ্চিতই একজন অশিক্ষিত মানুষের কাছে তা হতে পারে না। সুতরাং সংবিধানের ধারা প্রয়োগ করে ভোটদানকে আবশ্যিক করা যেমন বৈধ তেমনি সংবিধানের নীতিনির্দেশক ভূমিকার উল্লেখ করে যদি কেউ বলেন যে, সকলের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের দায়িত্বও রাষ্ট্রের, সে-দায়িত্ব পালন না করে শুধুমাত্র ভোটাধিকারে প্রয়োগ আবশ্যিক করা কি যুক্তিসঙ্গত, তাহলে তার কি উত্তর দেবেন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ?

নিশ্চিতই গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ভোটবাক্সের ক্ষমতাকে অস্বীকার বা অবহেলা করলে চলবে না। ভোটাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অস্ত্র। গণতন্ত্রের যত ত্রুটিই থাকুক, পাঁচ বৎসর পর পর অবাঞ্ছিতদের বিতাড়নের একটা সুযোগ এনে দেয় এই নির্বাচন। সুতরাং তাকে উপেক্ষা করে বা বর্জন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্য উপায়ে পরিবর্তন আনার চেষ্টার অর্থ হল গণতন্ত্রকেই উপেক্ষা করা। যাতে এই জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে জাগে তার জন্য নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে প্রচারের ব্যবস্থা দরকার। সে-কাজ সরকার বা নির্বাচন কমিশন কি নিতে পারেন না?

রাত তখন দশটা

দেবল দেববর্মা

আগের ঘটনা

[দিকনগরের পেপার মিলের অপারেটর মিস তরঙ্গমালা এক রাতে খুন হয়। এতে জড়িয়ে পড়ে তারই প্রেমিক নিখিলেশ সেন। এখন সে অ্যারেস্টেড। কেসের ভার পড়ে সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যালের উপর। শচীদুলাল ওর সহকারী। নিখিলেশের বন্ধু হল শশাংক ভট্টাচার্য। তরঙ্গরও পরিচিত সে।

মর্গে লাশ দেখে গেল রাজীব, শচীদুলাল এবং দিকনগর থানার ও-সি সুব্রত সরকার।

পরদিন ভোরে এরাই এল ঘটনাস্থলে তদন্তে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জায়গাটা দেখল রাজীব। হঠাৎই মিলে গেল দুটো মোক্ষম জিনিস। কুড়িয়ে পেল একটি ছোট্ট রুমাল আর প্যান্টের বোতাম। এরপর ওরা চলল তরঙ্গর মেসের দিকে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(চার)

সুজাতা দাসকে দেখে রাজীব সান্যাল রীতিমত অবাক হল। বাঙালীর ঘরে এমন বাড়ন্ত গড়ন আগে দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

কিন্তু শুধু বাড়ন্ত গড়ন বললে সুজাতা দাসকে ভুল বোঝানো হবে। সবটা ঠিক প্রকাশ করা হল না। সুজাতা দাস দীঘল তো বটেই, আয়তনেও কিছু কম নয়। চোখে যেটা লাগে, তা হল ওর কাঠ কাঠ শক্ত শক্ত ভঙ্গি। নারীসুলভ কমনীয়তার যেন ছিটেফোঁটা নেই দেহে। বেশ পুরুষালী গড়ন। চোখের দৃষ্টিতে নরমসরম কিছু আসে না। বরং দীপ্ত বৈশাখের দহন-জ্বালার কথা মনে করিয়ে দেয়। ভালো করে চেয়ে দেখল রাজীব। নাকের নীচে এবং ঠোঁটের উপরে কালো গোঁফের রেখা বেশ স্পষ্ট। 'টমবয়িশ' ভাব ষোল আনা। নমস্কার করে রাজীব সান্যাল বলল, 'আপনিই শ্রীমতী সুজাতা দাস?'

সুজাতা প্রতিনমস্কার করল।

সুব্রত বলল, আমাকে হয়ত আপনি দেখেছেন। দিকনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ আমি। ইনি হলেন সি-আই-ডি

ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল, আর উনি শচীদুলাল সরকার। এঁর সহকারী।' —সকলকে পরিচিত করে সুব্রত থামল।

তিনজন পুলিশের লোককে একসঙ্গে দেখে সুজাতা দাস একটু ঘাবড়ে গেছে বলে রাজীবের মনে হল। একেবারে [illegible]। ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়নি। একটা জলজ্যান্ত মেয়ে পথের ধারে খুন হয়ে পড়ে রইল। আর তারপরই তিন তিনটে পুলিশের লোক এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। সুজাতা দাসের শুকনো মুখের দিকে চেয়ে রাজীব সান্যালের মায়া হল।

একটু হেসে রাজীব বলল, 'তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হবে মিস দাস। আপনার সহযোগিতা পাব আশা করেই আমরা এতদূর এসেছি।'

[illegible] সুজাতা দাস। বলল, '[illegible] প্রশ্ন করুন আপনি।'

শচীদুলালের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করে রাজীব সুব্রতকে বলল, 'তুমি একটু [illegible] মেয়েদের আত্মীয়স্বজন কারা [illegible] নিয়ে এস। আমি মিস দাসের সঙ্গে ততক্ষণ কথাটথা বলি।'

[illegible] বুঝল সুব্রত। সে ভাবল, [illegible] সরে যায়, একটু গা ঢাকা দিয়ে [illegible] তাহলে রাজীব সান্যাল [illegible] আলাপ জমিয়ে ফেলবে সুজাতার [illegible] শচীদুলালকেও সরিয়ে নিতে [illegible]। কিন্তু উপায় নেই। [illegible] বক্তব্যের কিছু কিছু [illegible] নোট করে নেবার জন্য [illegible] অপরিহার্য। সুব্রত সরে গেল।

[illegible] নোটবই খুলে তৈরী হয়েছে শচীদুলাল। পেন্সিলটা হাতে নিয়ে সুজাতা দাসের মুখের দিকে হাঁ করে [illegible] কোনো দিকে না লক্ষ্য করে রাজীব সান্যাল বলল, 'এই মেসে আপনারা [illegible]'

'মেস কোথায়? দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আমরা চারজন মেয়ে ছিলাম। লোকে [illegible] এটাকে মেস বলে, নইলে মেস [illegible] ঠিক যা বোঝায়—।' সুজাতা থামল।

'এ বাড়ীটায় দুখানাই তো মোটে ঘর?'

'হ্যাঁ। ঘর বলতে দুটোই। এ ছাড়া রান্নাঘর, বাথরুম সবই রয়েছে।'

'রেণুমালা তো আপনারই রুমমেট ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর দুজন মেয়ে কারা? তাদের তো দেখছি না?'

'দুজনেই অফিসে চলে গেছে। একটু আগেই বেরিয়ে গেল ওরা। আপনি আধ-ঘণ্টাটাক আগে এলে ওদের সঙ্গে দেখা হত।'

রাজীব সান্যাল ঘড়ি দেখল। দশটা বেজে গেছে। সুতরাং অফিসের মানুষদের ঘরে পাওয়া কঠিন। ফস্ করে রাজীব সান্যাল বলল, 'আপনি অফিসে গেলেন না?'

ভাল লাগল না। জানেন, মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। চুপ করে বসে থাকলেই খালি তরঙ্গকে মনে পড়ছে।

অফিসে গিয়ে কাজের মধ্যে থাকলেই মনটা হয়ত ভাল থাকত। রাজীব সান্যাল মন্তব্য করল।

সুজাতা দাস উত্তর দিল না। ঠোঁট কামড়ে কি যেন চিন্তা করল। বলল, 'আপনি ঠিকই বলছেন, অফিস কামাই করেই বা আর কদিন থাকা যাবে? এক যদি এখান থেকে চলে যেতে পারতাম—।'

বিস্মিত হয়ে রাজীব সান্যাল বলল, 'চলে যাবার কথা চিন্তা করছেন নাকি?'

সুজাতা দাস লজ্জিত হয়ে বলল, 'ও কিছু না। এমনিই বলে ফেলেছি।'

রাজীব সান্যাল শুরু করল, 'দেখুন দাস, তরঙ্গর সংগে একঘরে অনেকদিন থেকেছেন আপনি। সম্ভবত ওর অন্তরঙ্গ বা ঘনিষ্ঠ বলতে আপনাকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং তরঙ্গমালার কিছু কাহিনী আপনার মুখ থেকে শুনব বলে আশা করি।'

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে ধীরে গড়াল, কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর সুজাতা দাসই মুখ খুলল। ছোট্ট লেডীজ-পার্সের মুখ যেমন সামান্য একটু ফাঁক করে মেয়েরা পয়সা-টয়সা বের করে, তেমনি ভঙ্গিতে ঠোঁট দুটি অল্প একটু ফাঁক করে সুজাতা কথা বলল, 'তরঙ্গের সম্বন্ধে আপনাকে আমি অনেক কিছু বলতে পারি মিঃ সান্যাল। কিন্তু অতখানি শোনবার মত আপনার কি সময় হবে?'

'কেন হবে না মিস দাস?' আগ্রহ প্রকাশ করে রাজীব বলল, 'আপনার কাছে অনেক কিছু শোনা যাবে বলেই তো এত-দূরে এসেছি।'

সুজাতা দাস এদিকে ওদিকে কি যেন চেয়ে দেখল। বারান্দায় চেয়ার পেতে প্রায় মুখোমুখি বসেছিল ওরা। ভাদ্রের প্যাচ-পেচে গরমে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাজীব চেয়ে দেখল সুজাতা দাসের গলায়, কপালে, কানের কাছে ঘাম জমেছে। গায়ের জামাটাও ভিজে একসা, এত ঘামছে কেন সুজাতা? শুধু গরমে, না পুলিশের সান্নিধ্যে এসে?

নিজের দিকে চেয়ে সুজাতা বলল, 'ঘরের মধ্যে গিয়ে বসবেন মিঃ সান্যাল? ওখানে সিলিং ফ্যান আছে।'

পাখার নাম শুনতেই রাজীব এক-পায়ে রাজী। শচীদুলালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল হে শচী। মিস দাস যখন বলছেন, পাখার তলায় বসে জিরিয়ে টিরিয়ে ও'র কথা শোনা যাবে।'

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সুজাতা দাস হাত দিয়ে ঠেলতেই সেটা হাট হয়ে খুলে গেল। অভ্যর্থনা করে সুজাতা বলল, 'ভিতরে আসুন আপনারা।'

রাজীব সান্যাল ঘরটা এক নজরে পর্যবেক্ষণ করে নিল, খুব ছোট নয় ঘরটা। আন্দাজে মনে হল, কুড়ি ফুট বাই ষোল ফুট হবে। দু-দিকে দুটো চৌকী পাতা, নিঃসন্দেহে বলা যায় একটা চৌকী তরঙ্গ ব্যবহার করত। সেটার উপর এখন বিছানা টিছানা নেই। সম্ভবত তরঙ্গের ব্যবহৃত বাক্স বিছানা গুটিয়ে অন্যত্র কোথাও সরিয়ে রাখা হয়েছে।

সুজাতা দাসের বিছানাটা তখনও তোলা হয়নি। কটকটে লাল রঙের একটা চাদর বিছানার উপর পাতা। বালিশের ওয়াড়-টোয়াড় সব চড়া রঙের। বোধহয় গাঢ় রং সুজাতা দাসের খুব প্রিয়। হাল্কা রং সে পছন্দ করে না।

দেওয়ালে তিন-চারটি ছবি। দুটি প্রাকৃতিক দৃশ্য,—একটি সুজাতা দাসের, অন্যটি মিলিটারী পোশাক পরিহিত এক ভদ্রলোকের। শচীদুলাল অবাক হয়ে ছবি-গুলো দেখছিল। হঠাৎ রাজীব বলল, 'মিস দাস, আপনার হাইট্ কত?'

চোখ তুলে তাকাল সুজাতা। বলল, 'মেয়েদের তুলনায় একটু বেশী লম্বা আমি। ধরুন পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি,—এমনিই হবে।'

'আর একটা প্রশ্নও করা দরকার বলে মনে হচ্ছে। অনধিকার চর্চা বলে মনে করবেন না—।'

'না, না। কি জানতে চান বলুন আপনি,' সুজাতা প্রশ্রয় দিল।

'আপনার বয়স কত মিস দাস?'

সুজাতা দাসের চোখদুটো মুহূর্তের জন্য দূর আকাশের তারার মত ঝিকমিক করে উঠল। ম্লান হেসে সে বলল, 'লিখে নিন, ত্রিশ হতে আর কয়েক মাস আছে।'

'এ ঘরে কি গতকাল রাত্রে আপনি ঘুমিয়েছিলেন?'

সুজাতা দাস যেন বিস্মিত হল। 'এখানেই তো ঘুমিয়েছিলাম। নইলে কোথায় আবার?'

রাজীব প্রশংসার সুরে মন্তব্য করল, 'আপনার সাহস আছে মিস দাস। অন্য মেয়েদের তুলনায় আপনি শুধু লম্বাই নন, রীতিমত সাহসিনী। নইলে তরঙ্গ খুন হবার পর এই ঘরে একা রাত কাটানো মেয়ে তো ভাল অনেক ছেলের পক্ষেও কঠিন।'

সুজাতা দাস গম্ভীর হয়ে বলল, 'ভূতের ভয়-টয় আমার একটু কম। অনেক দিন ধরেই মেসে-হোস্টেলে একা থেকে এলাম, ভয়টয় কেটে গেছে।'

'দিকনগর পেপার মিলে আপনি কত-দিন আছেন মিস দাস?
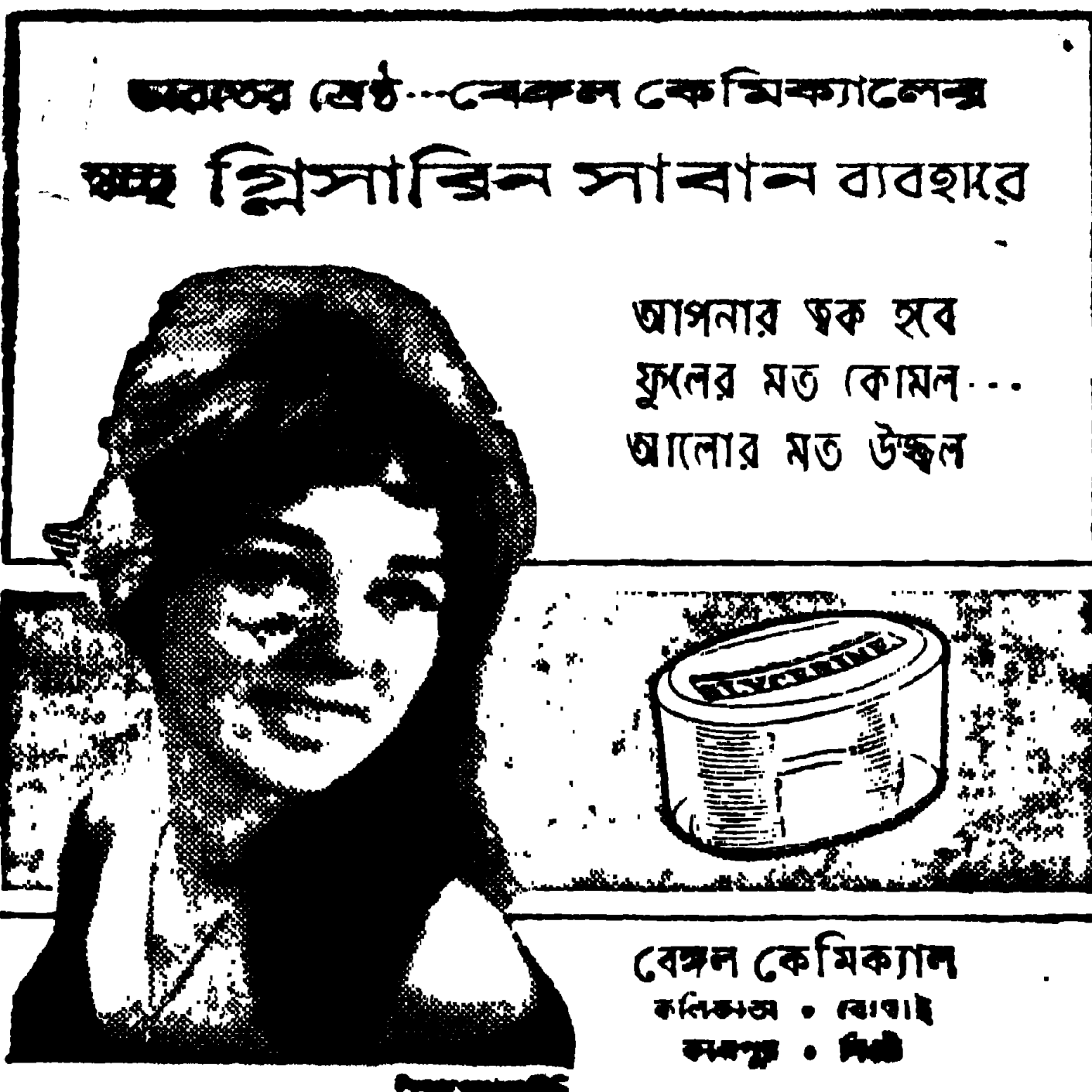
'দু বছরের বেশী।' একটু থেমে সুজাতা যোগ করল,—'তরঙ্গ এসেছে আমার পরে। আমি এলাম ডিসেম্বরে, বছরের শেষাশেষি। তরঙ্গ জয়েন করল জুলাই কিংবা আগস্টের প্রথমে।'

'পেপার মিলে আপনি কি কাজ করেন?'

'তরঙ্গের মত আমিও টেলিফোন অপারেটর।'

'আপনারা দুজন ছাড়া আর কোন টেলিফোন অপারেটর আছেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' সুমনাও এই কাজ করে। তাছাড়া এক ভদ্রলোকও রয়েছেন। তার নাম ভৈরব দত্ত। সাধারণত নাইট শিফটে ও'কে ডিউটি দেওয়া হয়।'

'তাহলে তরঙ্গকে কেন শনিবার নাইট ডিউটি দেওয়া হয়েছিল?'

'ভৈরববাবুকে অন্য কাজে বাইরে পাঠিয়েছিলেন ম্যানেজার। সুতরাং তরঙ্গকে ডিউটি নিতে হল। অবশ্য এর আগেও এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। আমি কিংবা তরঙ্গ কতবার নাইট ডিউটি দিয়েছি। ওভার-টাইম কাজ করলে বেশী মাইনে পেয়েছি।'

এবার সরাসরি প্রশ্ন করল রাজীব, খুনের ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয় মিস দাস? যে খুন হয় তার জীবনটা ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলে হত্যার হদিস পাওয়া অসম্ভব নয়। তরঙ্গকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, চিনতেন। তেমন কোনো কারণ আপনার মনে হয় কি?'

সুজাতা দাসকে চিন্তিত দেখাল। নানা কথা জমে জমে মনের মধ্যে পাহাড় তৈরী হয়ে আছে। সুজাতার চোখদুটি চিন্তার ভারে ছোট হয়ে এসেছে। রাজীব সান্যাল ওকে উৎসাহিত করবার জন্য আবার বলল, 'চিন্তা করে আমাদের কাছে সবকিছু খুলে বলুন মিস দাস। মনে রাখবেন, আপনি যা বলবেন তার মূল্য অনেকখানি।'

সুজাতা দাস শুরু করল, 'দেখুন, খুনের ব্যাপারে ঠিক সন্দেহ করবার মত কারণ-টারণ আমি দেখতে পারব না। কিন্তু তরঙ্গ আমার রুমমেট ছিল। দীর্ঘ সময় আমরা একসঙ্গে থেকেছি। দুজনে গল্প করেছি, গভীরভাবে মিশেছি, ওর অনেক কথা আমি জানি।—অবশ্য ইদানীং তরঙ্গ ভীষণ চাপা হয়ে গেছল। আমার কাছেও কিছু বলতে চাইত না।'

রাজীব সান্যাল চুপ করে শুনছিল।

সুজাতা দাস বলল, 'নিখিলেশ সেন বলে এক ভদ্রলোকের নাম শুনেছেন ইন্সপেক্টরবাবু? তরঙ্গের সঙ্গে ওর আলাপ-পরিচয় গভীর। দুজনে চিঠি লেখালেখি, মাঝে মাঝে কলকাতায় বেড়িয়ে আসা, এখানে ওখানে চক্কর দেওয়া,—প্রায় কিছুই বাদ ছিল না। তরঙ্গকে আমি বহুবার বলেছি, ভালো করে পরিচয়-টরিচয় না জেনে অমন বোকামি করিসনে। কিন্তু তরঙ্গ কিছুতেই বুঝল না। নিখিলেশ সেন ওকে চুম্বকের মত টেনে নিল মিঃ সান্যাল। আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই, তরঙ্গের মৃতদেহে নিখিলেশের একটা চিঠি পাওয়া গেছে।

রাজীব সান্যাল হেসে বলল, 'এ খবর তো এখন শাঁখের ধ্বনির মত এপাড়া ওপাড়া সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে।

সুজাতা দাস বলল, 'নিখিলেশ ওকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল মিঃ সান্যাল। এ সংবাদ আমি জানি। কিন্তু তরঙ্গের পক্ষে এখনই বিয়ে করা সম্ভব ছিল না।'

'কেন? কেন সম্ভব ছিল না?' রাজীব সান্যালকে কৌতূহলী মনে হল।

'এ বিয়েতে তরঙ্গের মায়ের মত নেই। তার কারণ আপনি নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন। সেটাও বলছি। মাস দুই-তিন আগে তরঙ্গের মা হঠাৎ একটা চিঠি পান। একটা উড়ো চিঠি। পত্রলেখক তার নাম ঠিকানা দেয়নি। সে লিখেছে যে তরঙ্গ সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছে। নিখিলেশ সেন নামে একটি ছেলের সঙ্গে জমাটি পরিচয় তার। দুজনে গভীর প্রেম। কিন্তু নিখিলেশ সেন আসলে একটি লম্পট। প্রেমের অভিনয় করে বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে সে। এমন কি কলকাতার কোন এক ঠিকানায় তার বউ পর্যন্ত আছে।

চিঠি পেয়ে তরঙ্গের মা কি করলেন?'

'কিছুদিন আগে দিকনগরে এসেছিলেন তিনি। মেয়েকে কি বললেন জানি না। আমাকে আড়ালে চিঠিটা দেখালেন। মুখ শুকনো করে বললেন, 'কি হবে বলো দিকি মা?'

'আমি চিঠিটা পড়ে হাসলাম। বললাম, 'কি আর হবে বলুন? তলে তলে জল যে অনেকদূরে গড়িয়েছে মাসীমা।' উনি ভয় পেয়ে বললেন, 'তরঙ্গ তা-হলে ছুটি নিয়ে কিছুদিন কলকাতায় চলুক। সেই বোধহয় ভাল হবে।'

খুনের সংবাদ পেয়ে তরঙ্গের মা দিক-নগরে এসেছেন না?'

সুজাতা দাস ঘাড় নাড়ল। বলল, 'এসেছেন ওর এক ননদের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু এলে কি হবে? এবার মাসীমার অন্য মূর্তি। শোকে দুঃখে যেন পাগল হয়ে গেছেন। তরঙ্গের মৃতদেহটা দেখে হাউ-হাউ করে কতক্ষণ কাঁদলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কলকাতায় পালিয়ে চল মা। এখানে তোমরা কেউ বাঁচবে না। দিকনগরে রাক্ষস এসেছে। আমার তরঙ্গকে খেয়েছে, এবার তোমাদেরও গলা টিপে খাবে।'

রাজীব সান্যাল মাথা নীচু করে বলল, 'ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই খুব শকড় হয়েছেন।'

'স্বাভাবিক মিঃ সান্যাল। তরঙ্গ ওঁর একমাত্র মেয়ে। ছেলেটি এখনও নাবালক। ক্লাস টেন-এ বোধহয় এবার উঠেছে। মাইনে পেয়ে তরঙ্গ ফি মাসে ওকে টাকা পাঠাত। সেই টাকা পেলে মাসীমার অনেক সংসার চলত। এমনি একটা রোজগেরে মেয়ে যদি হঠাৎ দেশলাই কাঠির আগুনের মত দপ করে শেষ হয়ে যায় তাহলে মায়ের মনে কি হয় ভাবতে পারেন? আর তাছাড়া মৃত্যু যদি এমন নির্মম, অস্বাভাবিক হয় তাহলে কষ্ট যে চতুর্গুণ হয়ে দাঁড়ায়।'

'নিখিলেশ সেনকে আপনি সত্যিই সন্দেহ করেন মিস দাস?'

'কিছুটা করি বৈকি মিঃ সান্যাল। তরঙ্গকে চিঠি লিখে সে দেখা করতে বলেছিল। রাত দশটায় সুদামডিহির মোড়ে তার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল, কেউ জানে না। পরদিন সকালে তরঙ্গকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। সুতরাং নিখিলেশ সেনকে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাবতে আপত্তি কোথায়?'

'নিখিলেশ সেন কি এখানে আসত? তরঙ্গের সঙ্গে দেখাটেখা করতে?'

'একবার বোধহয় এসেছিল, আমি তরঙ্গকে বারণ করেছিলাম। মেয়েদের মেসে কোন পুরুষ মানুষেরই হুট করে ঢোকা শোভন নয়।'

রাজীব সান্যাল প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইল। বলল, 'নিখিলেশ ছাড়া আর কোন লোকের সঙ্গে তরঙ্গ মিশত?'

'দিকনগর পেপার মিলে কত লোক কাজ করে, অনেকের সঙ্গেই তো মিশি আমরা। তরঙ্গও মিশত, গল্প-গুজব করত। অফিসে কাজ করতে এসে পুরুষমানুষের মুখ দেখব না বললে তো চলে না।'

'আচ্ছা, এই পেপার মিলে কাজ করে না এমন কেউ?' রাজীব শেষ শব্দটি একটু টেনে উচ্চারণ করল।

বুনো হাতীর পাল নদী পেরিয়ে চলেছে বন্দীশালার ফাঁদে পা দিতে।

সুজাতা দাস এক মুহূর্ত চিন্তা করল। বলল, 'হ্যাঁ। একজনের কথা আপনাকে আগেই বলা উচিত ছিল। ভদ্রলোকের নাম শশাংক ভট্টাচার্য। নিখিলেশ সেনের খুব বন্ধু। এক বাড়ীতেই নাকি থেকেন দুজনে। তরঙ্গের খোঁজে এ বাড়ীতে দু-তিনবার এসেছেন ভদ্রলোক। একবার কি ওদের অফিসেও হানা দিয়েছেন। এই তো কিছুদিন আগে টেলিফোনে ভদ্রলোকের গলা শুনে আমি অবাক। উনি ভেবেছেন টেলিফোন বোর্ডে তরঙ্গ আছে। লাইন ধরে আমি অবশ্য বলেছিলাম যে অকারণে ফোন করলে কর্তৃপক্ষ খুব বিরক্ত হন।'

'শশাংক ভট্টাচার্যকে আপনার কি মনে হয় মিস দাস?'

খুব বিরক্তিকর একটা মুখভাব হল সুজাতার। চোখ দুটোতে কিছুটা ঘৃণাও যেন মেশানো। সুজাতা বলল, 'কেমন যেন গায়ে পড়া ভদ্রলোক। তরঙ্গের সঙ্গে মিশতে চান, অথচ তরঙ্গ ওকে এড়িয়ে চলত। নিজে সেধে কি সব পত্রিকাটত্রিকা দিয়ে যেতেন ওকে। গল্প না কবিতা কি যেন লেখার বাই আছে ভদ্রলোকের। তরঙ্গ আবার ওই সব ছাইপাঁশ পড়ত। আমাকে পড়ে শুনিয়েছে কতবার। আমি আপত্তি করলেও শুনত না। ওই ওর স্বভাব। ভদ্রলোকের ছাইপাঁশ লেখা পড়ত আর খিলখিল করে হাসত। আমাকে বলত ভদ্রলোকের কাছে ওর লেখার দারুণ প্রশংসা করি। আর একটু প্রশংসা করলেই উনি কাবু।'

'শশাংক ভটচার্যের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে মিস দাস?'

'আলাপ কারো সঙ্গেই তেমন নেই ইনস্পেক্টরবাবু। বিশেষ করে পুরুষমানুষ, মানে ছেলেদের সঙ্গে। তরঙ্গকেও আমি কতবার নিষেধ করেছি। কিন্তু পোড়ামুখী আমার কথা শুনবে কেন? নিয়তি ওকে টানছে।' একটু দম নিল সুজাতা দাস। বলল, 'শশাংকবাবুর সঙ্গে এ পর্যন্ত [illegible]

আমার। তাও কথাবার্তা সব তরঙ্গকে নিয়ে। দেখা হলেই নমস্কার করে উনি এগিয়ে আসবেন, কত কষ্টে যে ওকে এড়িয়ে যেতে হয়। তরঙ্গর মত আমি আবার বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারি না।'

রাজীব সান্যাল ঘড়ির দিকে তাকাল। আকাশে মেঘ-টেঘের দেখা নেই। ঝিকিমিকি রৌদ্রকণাগুলি মাটিতে ঠিক বৃষ্টির মত টুপ টুপ করে ঝরে চলেছে। হয়ত আবার জলটল হবে। যা গরম পড়েছে সকাল থেকে। সন্ধ্যের আগে বৃষ্টি না হলে রাত্রে আরো গুমোট ছড়াবে। বৃষ্টি না আসা তক নিস্তার নেই।

রাজীব সান্যাল বলল, 'আপনাকে আর বেশীক্ষণ আটকে রাখব না মিস দাস, অনেক প্রশ্ন করেছি আপনাকে, অনেক কথাও বলেছেন আপনি। তদন্তের কাজে এগুলো খুব প্রয়োজনীয় হবে। আর দু-চারটে মাত্র প্রশ্ন আমার। তারপরই আপনি ফ্রি হয়ে যাবেন।'

সুজাতা দাস উত্তর দিল, 'দু-চারটে প্রশ্ন কেন? যে কটা প্রশ্ন ইচ্ছে, তাই করবেন।'

রাজীব হেসে বলল, 'আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আচ্ছা শনিবার রাত্রে কটার সময় তরঙ্গ ডিউটিতে বেরিয়েছিল?'

সুজাতা দাস যেন তৈরী হয়েছিল। বলল, 'এই প্রশ্নটার উত্তর আমি কাউকে দিতে পারিনি। আপনাকেও পারছি না।'

'না পারবার কোন সঙ্গত কারণ আছে মিস দাস?'

সুজাতা দাস মুহূর্তের জন্য কি ভাবল। সমস্ত ঘটনাটা আপনাকে খুলে বলি মিঃ সান্যাল। শনিবার দুপুরে মিনতি আর প্রভা বাড়ী চলে যাবার পর আমার একদম ভালো লাগছিল না। ইচ্ছে করল কোথাও একটুক্ষু বেড়িয়ে আসি। এই ভিজলগর থেকে অন্য কোথাও যাই। কিন্তু [illegible] সহ্য আর [illegible]

পড়া যায় না। সমস্যা হল, কোথায় যাই?

রাজীব প্রশ্ন করল, 'মিনতি আর প্রভা মানে আপনাদের এই লেডীজ মেসের অন্য দুজন মেম্বার?'
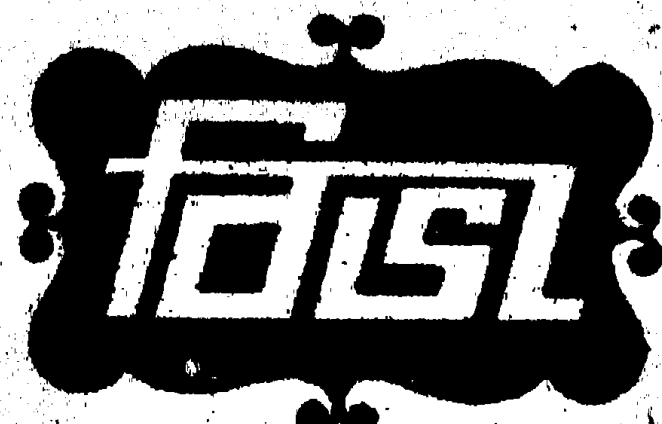
—ঠিক বলেছেন। ফি শনিবার ওরা বাড়ী যায়। খুব কাছেই বাড়ী কিনা। মথুরাপুর থেকে দুটো স্টেশন পরেই। ইচ্ছে করলে বাসেই চলে যেতে পারে।'

রাজীব বলল, 'তারপর ভেবে চিন্তে আপনি কোথায় গেলেন?'

'কোথায় আবার? মোল্লার দৌড় সেই মসজিদ পর্যন্ত। তিনটের পরই মথুরাপুরে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।' একটু থেমে যোগ করল সুজাতা, 'বাসে উঠে দেখি বেজায় ভিড়। আর তেমনি গরম, ঘেমে নেয়ে সে এক বিশ্রী অবস্থা। মথুরাপুরে বাস থেকে নেমে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।'

রাজীব বলল, 'তরঙ্গর সঙ্গে তাহলে আপনার তখনই শেষ দেখা?'

সুজাতা ঘাড় নাড়ল। 'জানেন মিঃ সান্যাল? তরঙ্গকে আমি মথুরাপুর যেতে বলেছিলাম। একলা বসে ঘরে কি করবে ও? তার চেয়ে দুজনে মিলে মথুরাপুরে যাই। টুকিটাকি যা কিনবার আছে তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি।'

'তরঙ্গ রাজী হল না যেতে?'

স্পষ্ট উচ্চারণ করল সুজাতা 'না।' কয়েক সেকেন্ড পরে সে নিজেই আবার বলল, 'ওর পক্ষে যাওয়া সম্ভবও ছিল না মিঃ স্যান্যাল। মথুরাপুর প্রায় পঁচিশ মাইল রাস্তা। যাতায়াতে কম সময় লাগে না। তারপর এই ভ্যাপসা গরম আর বাসের ঝাঁকুনি। ফিরে এসে আবার রাত জাগা পাখীর মত টেলিফোন লাইনে 'পেপার মিল' কথাটা শুধু আউড়ে যেতে হবে।'

'বাড়ী ফিরে আপনি দেখলেন তরঙ্গমালা ডিউটিতে বেরিয়ে গেছে, এই তো?'

সুজাতা দাস বলল, 'হ্যাঁ, তখন প্রায় দশটা। আমি লাস্ট বাসটায় দিকনগরে এসে পৌঁছোই। এতক্ষণ অবশ্য লাগবার কথা নয়। কিন্তু একটা লেভেল ক্রসিং-এর কাছে বাসটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। গাড়ী আর আসে না। নইলে হয়ত নটা কিংবা সওয়া নটার মধ্যে বাড়ী পৌঁছে যেতাম।

রাজীব সান্যাল অল্পক্ষণ চিন্তা করল। বলল, 'যে মেয়েটি আপনাদের কাজ-কর্ম করে, এ বিষয়ে সে কিছু বলতে পারে না?'

'রান্নাবান্না সেরে দিয়ে কুটির মা আটটা নাগাদ রোজই চলে যায়। শনিবার তো আরো মজা, খাবার লোক বলতে আমরা দুজন। সাতটা, সাড়ে সাতটার মধ্যেই ওর কাজ-কর্ম শেষ। কেউ না থাকলে ভাত-তরকারী ঢাকা দিয়ে রেখে যায়।'

'ও যখন কাজ সেরে চলে যায়, তরঙ্গ তখন বাড়ীতেই ছিল তো?'

'হ্যাঁ, তবে বিকেলের দিকে তরঙ্গ নাকি বেরিয়েছিল কোথায়। কুটির মা বলেছে যে সন্ধ্যের পর তরঙ্গ ফিরে এসেছিল।'

মন্দ করে রাজীব সান্যাল বলল, 'শনিবার মথুরাপুরে কোন দোকানে সওদা করেছিলেন মিস দাস?'

কথাটা শুনেই যেন বদলে গেল সুজাতা দাস, নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত দেখাল, চোখ দুটো উন্মাদ নারীর অক্ষিগোলকের মত চঞ্চল হয়ে উঠল।

সুজাতা দাস অসীম বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'মিঃ সান্যাল, কি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি?'

রাজীব হাসল। 'বিশ্বাস করব না কেন?'

'তাহলে প্রমাণ চাইছেন যে আবার?'

'কি জানেন? সাড়ে চারটের সময় মথুরাপুরে পৌঁছে রাত আটটা পর্যন্ত দোকানে সওদা করে বেড়ান একটু আশ্চর্যজনক নয় কি? বিশেষ করে মাসের শেষে।' দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে চাইল রাজীব। শনিবারের তারিখটার উপর দৃষ্টি পড়ল তার, আঠাশে আগস্ট।

সুজাতা দাস নিজেই এবার হাসল। বলল, 'আপনার কাছে কিছু লুকোবার উপায় নেই দেখছি মিঃ সান্যাল। বিশ্বাস করুন, কাল বিকেলে মথুরাপুর আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু কেনা-কাটা তেমন কিছু করা হয়নি। আসলে সময়ই পেলাম না। ছুটতে ছুটতে লাস্ট বাসটা অনেক কষ্টে এসে ধরেছি।'

'হঠাৎ কোনো দরকারে আটকা পড়েছিলেন নাকি?'

'দরকার আবার কি?' সুজাতা দাস পরিষ্কার করে বলল। মথুরাপুর গিয়ে দেখি অগ্রগামী সংঘের উদ্যোগে খুব ভালো একটা ফাংশন হচ্ছে। কলকাতা থেকে নামকরা কজন আর্টিস্ট আনিয়েছে ওরা। রীতিমত হৈ-চৈ ব্যাপার। প্রবেশ-মূল্যও বেশী নয়। মাত্র দু টাকা। কেনা-কাটার কথা মনে রইল না আর। তাছাড়া কেনাকাটা করবার কি বা ছিল? টিকিট কেটে ফাংশন শুনতে বসে গেলাম মিঃ সান্যাল। অবশ্য বেশ সকাল সকালই শুরু করেছিল ওরা।'

রাজীব সান্যাল বলল, 'হ্যাঁ অগ্রগামী সংঘের ফাংশনের কথা আমি শুনেছি। বোধহয় চকবাজারের কাছে ওরা একটা বিজ্ঞাপন গোছের মস্ত ফিরিস্তি টাঙিয়ে দিয়েছিল।'

সুজাতা একটু হাসল, 'ফাংশন কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছিল মিঃ সান্যাল। শুনতে বসে বাসের কথা বেমালুম ভুলে গেছি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাতেই মাথা ঘুরে উঠবার জোগাড়। লাস্ট বাসটার মাত্র দশ-পনের মিনিট দেরী ছাড়তে।'

রাজীব সান্যাল শচীদুলালের দিকে চেয়ে কি যেন ইঙ্গিত করল। নোটবুক বন্ধ করে বাইরে গেল শচীদুলাল। মিনিট তিন-চার পরেই সুব্রতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরল।

রাজীব হেসে বলল, 'সুব্রতর বোধহয় এতক্ষণ এক ঘুম হয়ে গেল?'

সুব্রত চোখটা একবার রগড়ে নিয়ে উত্তর দিল, ঘুম কোথায় দেখলেন আবার ওই জীপের মধ্যে বসে এক চটকা একটু—

'আহা! আমি কি তোমায় নিদ্রায় প্রতি কটাক্ষ করছি সুব্রত?'

রাজীব সান্যাল রহস্য করল।

সুজাতা দাস চেয়ার ছেড়ে উঠেছে। এখন দাঁড়িয়ে আছে ও। রাজীব কথা বলবার ফাঁকে ফাঁকে ওকে দেখছিল। লম্বায় প্রায় সুব্রতর মতই সুজাতা। আঙুলগুলো ঢেঁড়সের মত লম্বা এবং মেয়েলী নয়। কালো মোটা মোটা আঙুল। হাতের হাড় বেশ চওড়া, কব্জী শক্ত বলেই মনে হয়। দাঁড়াবার ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি, মুখের রেখা, শক্ত চোয়াল, দৃঢ় চিবুক, সব কিছুতেই স্পষ্ট পুরুষালী ব্যঞ্জনা।

পাখার নীচে বসেও ঘামে ভিজে উঠেছে সুজাতা। জামাটা স্থানে স্থানে দেহের সংগে লেপটে। কোমরের কাছে সরু এক ফালি কুমড়োর মত অনাবৃত দেহভাগ।

রাজীব সান্যাল বলল, 'মিস দাস বোধ-হয় ফাংশন আর থিয়েটার খুব পছন্দ করেন?'

সুজাতা দাস মাথা হেলাল। বলল, 'হঠাৎ এ কথা কেন ইনস্পেক্টরবাবু?'

'আচ্ছা, আপনি কি কখনও মিলিটারী অফিসারের পার্ট করেছিলেন থিয়েটারে?'

খুব অবাক হয়ে সুজাতা বলল, 'কেন বলুন তো?'

দেওয়ালে টাঙানো মিলিটারী অফিসারের ছবিটার দিকে এগিয়ে গেল রাজীব সান্যাল।

পিছন থেকে শচীদুলাল প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই ছবিটা মিস দাসের বলে ভাবছেন নাকি স্যর?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম, এখন সন্দেহাতীত, রাজীব সান্যাল সামান্য হাসল, 'খুব খুঁটিয়ে না দেখলে অবশ্য চেনা মুস্কিল মিস দাস। আপনার কপালের ঐ কাটা দাগটাই আমাকে সাহায্য করেছে। মেক-আপের সময় এই সামান্য খুঁতটুকু রাখতে গেলেন কেন?'

সুজাতা দাস গম্ভীর হয়ে বলল, 'কলকাতায় যে অফিসে ছিলাম, সেখানে স্পোর্টসের সময় তোলা হয়েছিল ছবিটা। গো অ্যাজ ইউ লাইক একটা ইভেন্ট ছিল। আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম সেবার। সবাই খুব প্রশংসা করেছিল।'

রাজীব সান্যাল হেসে বলল, 'আমিও প্রশংসা করছি আপনার। পুরুষের ছদ্মবেশে সত্যি আপনাকে চেনা শক্ত। আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুরও কম্মো নয়। ভুরু কুঁচকে রাজীব সান্যাল কি যেন ভাবল। বলল,—সত্যি, প্রায় নিখুঁত ছদ্মবেশ আপনার। আচ্ছা, বাই বাই—।'

(ক্রমশ)

হাসির মজলিস

স্বাস্থ্যের ক্লাস। মাস্টারমশায় স্বাস্থ্য সম্পর্কে নানা উপদেশ দিচ্ছিলেন। ভুলেও কেউ যেন কোন পশুপাখীকে আদর না করে। এটা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক। একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—এর কোন উদাহরণ দিতে পার?

—হ্যা স্যার, আমার কাকীমা প্রায়ই তাঁর কুকুরকে আদর করতেন!

—তাতে কি হোল?

—কুকুরটা একদিন মরে গেল!

●

দুই বন্ধু। চিন্তার দিক থেকে একেবারে আধুনিক।

প্রথম বন্ধু—আমার ছেলেটা ভাই এখন বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। মেয়েদের সঙ্গে ঘোরে-ফেরে, বাইরে যায়।

দ্বিতীয় বন্ধু—আমার ছেলে ভাই তার থেকেও বড় হয়েছে। এখন সে মেয়েদের সঙ্গে ঘরে থাকাই পছন্দ করে।

●

শীলা—বাবা তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে!

বাবা—কি খবর মা?

শীলা—তুমি বলেছিলে, পরীক্ষায় পাশ করলে আমায় একশ টাকা দেবে।

বাবা ঘাড় নাড়লেন।

শীলা—এ বছর আর তোমাকে সে টাকা দিতে হবে না।

●

শিক্ষক—হোম টাস্কের খাতা দেখতে গিয়ে বললেন,—এ তোমার বাবার হাতে লেখা মনে হচ্ছে?

ছাত্র—কি যে বলেন স্যার! কোন বাবা কি এমন কাজ করতে পারেন! আমি বাবার পেনে লিখেছিলাম।

●

—আমি যে চেকটা পাঠিয়েছিলাম, সেটা নিশ্চয় পেয়েছেন?

—হ্যাঁ, দুবার পেয়েছি। একবার আপনার কাছ থেকে আর একবার ব্যাঙ্ক থেকে, ডিসঅনার্ড হবার পর।

●

দুটি বছর এগারর ছেলে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। কথার ফোয়ারা ছুটছে তাদের মুখ দিয়ে। পোষাক-আশাকে মস্তানি ভাব। হঠাৎ একজন সামনে কি যেন দেখে থমকে দাঁড়াল। পরিষ্কার লেখা রয়েছে—'ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টার'।

চমকে ওঠা ছেলেটি তার বন্ধুকে বলল—উঃ, ভাগ্যি আমরা আগে জন্মে গেছি।

●

সেন্সাসকর্মী বাড়ী বাড়ী ঘুরছিলেন। ২০নং বাড়ীর সামনে লেখা কুকুর থেকে সাবধান। সেন্সাসকর্মী লিখে নিলেন—২০নং বাড়ীতে লোক থাকে না; সবই কুকুর।

●

গণপতি আর সুমিতার আলাপ হয়েছিল অনেক দিন। তারপর দিনে দিনে প্রেম হল। বয়সও বাড়ল। পঞ্চাশ পার করার পর বিয়ের কথা উঠল। বন্ধুরা বলেছিল, থাক না। বিয়ে কি না করলেই নয়।

দুজনের কেউই শুনল না। শুভক্ষণে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের।

দুজনেই চাকুরে। হাতে পয়সা অনেক।

মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গেল ওরা কাশ্মীরে। গিয়ে পৌঁছল এক শনিবার মাঝরাতের কিছু আগে।

আগেই একটা ছোট বাড়ী ঠিক করা ছিল। সেই বাড়ীতে গিয়ে উঠল ওরা।

একে বয়স হয়েছে, তারপর বাঙলা দেশ থেকে কাশ্মীর। দুজনেই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিল।

অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল দুজন।

বাড়ীটার সমস্ত জানলার কাঁচ ছিল কালোরঙে ঢাকা।

গণপতি ঘুম ভেঙে অন্ধকার দেখে আবার শুয়ে পড়ল।

সুমিতারও সেই অবস্থা।

তারা ঘুমোচ্ছে অন্ধকার ঘরে।

অন্ধকার কাটছে না, কেউই বিছানা ছেড়ে উঠছে না।

গণপতি কিন্তু আর পারল না। তার কেমন যেন একটু খিদে পেয়ে গেল। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। দরজা খুলে বাইরে এল। পরিষ্কার দিনের আলো! চমকে উঠল সে।

কাগজের হকারকে দেখে একটি রবিবারের কাগজ চাইল গণপতি।

হকারটি যেন আকাশ থেকে পড়ল। রোববারের কাগজ কোথায় পাবো মশাই। রোববার আগে আসুক। আজ তো সবে বুধবার!

বুধবার? মধুচন্দ্রিমার মাহাত্ম্যে থ হয়ে গেল গণপতি। শনিবার থেকে তিনটি দিন শুধু ঘুমিয়ে কেটেছে তাহলে। ভাগ্যি খিদে পেয়েছিল, না হলে আরো কদিন যেত কে জানে!
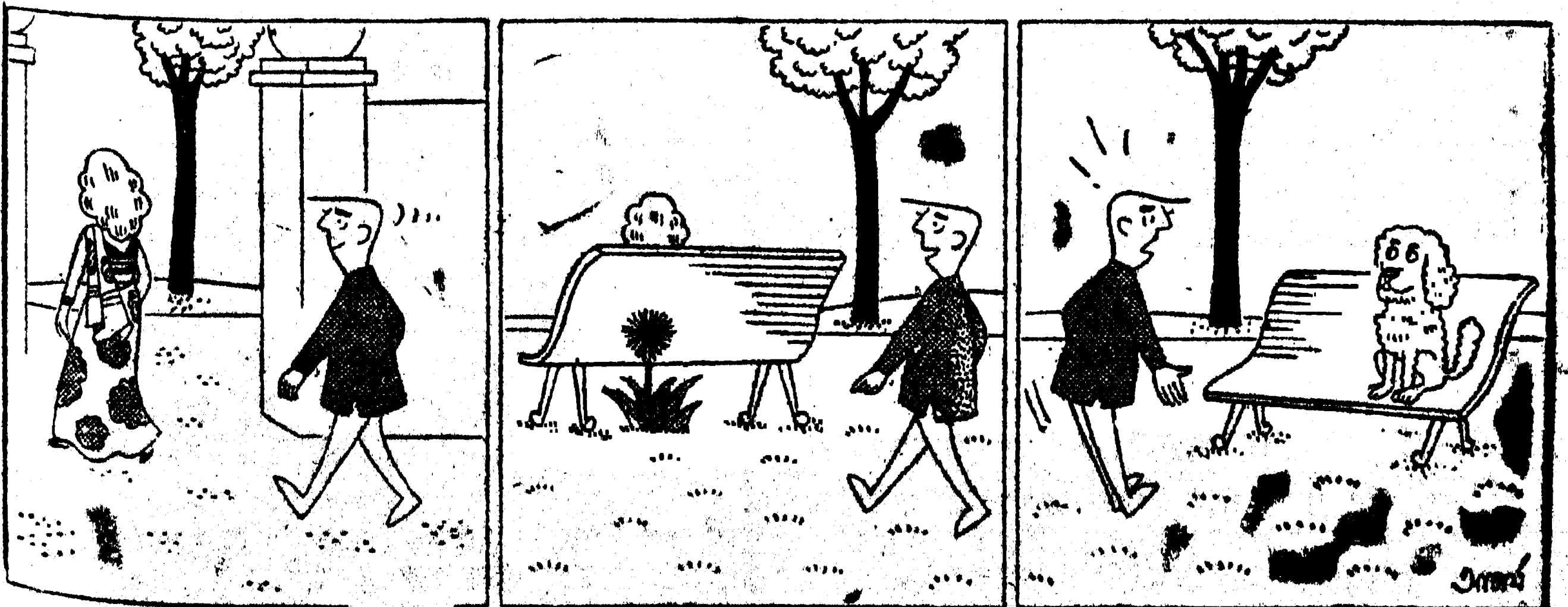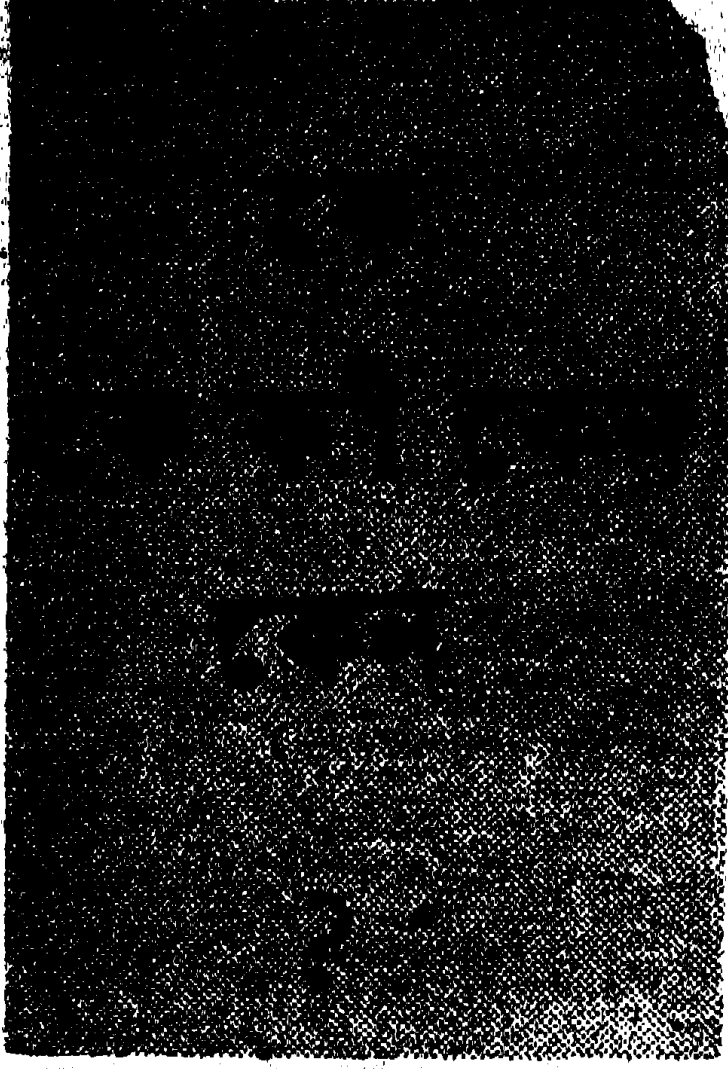
বুদ্ধি মেপে দেখুন

প্রশ্নগুলো ভাবুন। ভেবে দেখুন ঠিক উত্তর মাথায় আসে কিনা। যদি সম্ভব হয় তবে নীচের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। এর জন্য আপনার হাতে সময় থাকবে ২৬ মিনিট। যদি না পারেন তবে আপনার মানসিক অবস্থার পরিচয়ও উত্তরের সঙ্গেই পাবেন।

পরীক্ষার ফল

- ১০ মিনিটের মধ্যে উত্তর দিতে পারলে আপনি যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম। আপনার মানসিক প্রস্তুতি যে কোন কাজের উপযোগী।
- ১৫ থেকে ২০ মিনিট লাগলে আপনি মাঝারি স্তরের মানুষ। সব কাজই মোটামুটি কিছুটা পারবেন।
- ২৬ মিনিট পেরিয়ে গেলে আপনার দ্বারা কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে যে করা কঠিন তা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবেন।

প্রশ্ন

- রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আপনি। হঠাৎ বৃষ্টি নামল। তখন আপনি কি করবেন (১) বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আচ্ছাদনের নীচে অপেক্ষা (২) দৌড়িয়ে বাড়ী চলে যাবেন (৩) একটা ছাতা কিনবেন?
- সাবান কেন ব্যবহার করেন? (১) মন প্রফুল্ল রাখার জন্যে (২) ময়লা পরিষ্কার করতে (৩) ফেনা তৈরি হয় বলে?
- একজন সৈনিকের অবশ্যপ্রয়োজনীয় (১) বন্দুক, (২) বুট, (৩) লোহার টুপি, (৪) খাদ্য, (৫) সামরিক অস্ত্রশস্ত্র?
- বেকার অর্থ, (১) যার কোন আকার নেই, (২) যে কোন কাজ করে না, (৩) অথবা যার কোন যোগ্যতা নেই?
- চিকেন এবং ফাউলে পার্থক্য?
- কোন দেশের নাম তার ডাকটিকিটে ছাপা হয় না—
- একজন আহত লোককে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় আপনি কি করবেন?
- প্রথম ভারতীয় মহিলা (১) দিল্লীর শাসক, (২) প্রাদেশিক শাসক, (৩) বিদেশে দূত, (৪) প্রদেশের রাজ্যপাল, (৫) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য, (৬) কংগ্রেস সভাপতি, (৭) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাপতি, (৮) মুখ্যমন্ত্রী?
- কি বোঝায়—
  কিউবিট; গ্রস; রীম; পাইকা; এবং লীগ।

উত্তর

- —অপেক্ষা করা।
- —ময়লা পরিষ্কার করতে।
- —অস্ত্রশস্ত্র।
- —যার কোন কাজ নেই।
- এক বৎসর বয়স পর্যন্ত চিকেন; তারপর ফাউল।
- ইংল্যান্ড।
- আহত ব্যক্তির আঘাত পাওয়া দেহ যেন আপনার গায়ে না লাগে।
- সুলতানা রিজিয়া, (২) ও (৩) বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত, (৪) সরোজিনী নাইডু, (৫) রাজকুমারী অমৃত কাউর, (৬) সরোজিনী নাইডু, (৭)) বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত, (৮) সুচেতা কৃপালনী।
- ১৮ ইঞ্চি; ১২ ডজন; ৫০০ সিট কাগজ; ১·৬ ইঞ্চি অথবা ১২ পয়েন্ট ছাপার কাজে ব্যবহৃত; সাধারণত তিন মাইল।

মায়া ও সত্য

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমার মা বলতেন, "এ সংসার মায়ার সংসার। কেউ কারো নয়। ওই যে গোপাল বিগ্রহ দেখছিস, ওই সত্য।"

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মায়া। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন তত্ত্ব। মা কিন্তু ওটা শাস্ত্র পড়ে পান নি। অত বিদ্যা ছিল না তাঁর। পেয়েছিলেন বহু দুঃখে। ঠাকুরের কাছে দিনরাত পড়ে থেকে। এ জ্ঞান যার হয়েছে সে বেশীদিন বাঁচে না। সংসারের মায়া কাটায়।

আমি কিন্তু ওকথা মানতুম না। এখনো মানিনে। ব্রহ্ম সত্য সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু এ জগৎ মায়ার জগৎ হলে কিসের আকর্ষণে আমি বেঁচে আছি? কেনই বা সৃষ্টির দায় মাথায় নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি?

না আমি স্বীকার করব না যে এ সংসার মায়ার সংসার। কিন্তু মা যে ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন কেউ কারো নয় সেটা এক কথায় উড়িয়ে দিই কী করে? মানুষ কোনখান থেকে আসে, কোনখানে যায়, মাঝখানে ক'টা দিনের জন্যে কতরকম সম্পর্কে বাঁধা পড়ে, একজনের ছেলে, আরেকজনের স্বামী, আরেকজনের বাপ, আরো একজনের বন্ধু, এসব যখন ভাবি তখন আমিও মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলি, সমুদ্রের বেলায় বালুর খেলাঘর!

মহাযুদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি যদি সত্য না হয় তো সত্য কী? সত্য কাকে বলে? তবে আমারও থেকে থেকে মনে হয় যে মহামায়ার মায়া। সব যেন পর্দার উপর ছায়াছবির মতো ভাসছে। একটু বাদে মিলিয়ে যাবে। এই অভিনেতারা কেউ থাকবে না। এদের কীর্তির রেকর্ডও হাজার কয়েক বছর বাদে নিঃশেষে মুছে যাবে। মহাকালের দৃশ্যপটে কয়েক হাজার বছর তো কয়েকটা মুহূর্ত। কয়েক লক্ষ বছর বাদে পৃথিবীও থাকে কি না দেখ। মহাকালের মহামায়া সৌরজগৎকেও বালুর খেলাঘরের মতো ভাঙবেন।

দেখতে দেখতে চোখের সুমুখে মিলিয়ে গেল দীর্ঘ সাত পুরুষের ইংরেজ রাজত্ব। মায়া নয় তো কী! সাত শতাব্দীর সাড়বঙ্গ ভূমিকম্পে দ্বিখণ্ড হয়ে গেল। [illegible] লোকের প্রাণ গেল, প্রাণের চেয়ে প্রিয় পূর্বপুরুষের বাস্তু গেল, কত সহস্র সহস্র নারীর প্রাণের চেয়ে মূল্যবান ইজ্জৎ গেল— হায় মহামায়া! সেও কি তোমার মায়া। শঙ্করাচার্য কী বলেন?

জ্ঞান হবার সময় থেকেই মানবজাতির এ জিজ্ঞাসা। যা কিছু দেখছি সবই কি সত্য? সবই কি মায়া? যা কিছু ঘটছে সবই কি সত্য? সবই কি মায়া?

দেশ-বিদেশের দার্শনিকরা এখনো এ জিজ্ঞাসার সর্বসম্মত মীমাংসা খুঁজে পান নি। দর্শনের মতো আর্টেরও এ এক অমীমাংসিত প্রশ্ন। সাপের মতো যেটা দেখতে সেটা হয়তো সাপ নয়, দড়ি। কিংবা দড়ির মতো যেটা দেখতে সেটা হয়তো দড়ি নয়, সাপ। জীবনমরণের প্রশ্ন বইকি। যদি দড়ি না হয়ে সাপ হয়ে থাকে তবে সর্পে রজ্জুভ্রমের পরিণাম হয়তো মৃত্যু। রজ্জুতে সর্পভ্রমও অনেক সময় ভয়ঙ্কর হয়। ভয়ে মানুষ মূর্ছা যায়। অকারণ ভয় থেকেও কখনো কখনো মৃত্যু ঘটে। শক পেয়ে মৃত্যু।

সুতরাং বিভ্রম ও বস্তুসত্তা দর্শনের মতো আর্টেরও একটা মূলগত সমস্যা। কোনটা ইলিউশন, কোনটা রিয়ালিটি এ নিয়ে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু একটা যে অপরটা নয় এ বিষয়ে সকলে একমত। সাপ যদি সত্য হয় দড়িটা মায়া। দড়ি যদি সত্য হয় সাপটা মায়া। কিন্তু কী করে স্থিরনিশ্চিত হব যে ওটা দেখতে দড়ির মতো, কিন্তু আসলে সাপ? বা দেখতে সাপের মতো, কিন্তু আসলে দড়ি?

শিল্পীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অন্তহীন তর্ক করবেন না। সোজা এগিয়ে গিয়ে সাপের গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করবেন সাপ না দড়ি। অত্যন্ত বিপজ্জনক পরীক্ষা। এঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করেন ও তার ঝুঁকি নিতেও তৈরি। আগুনে হাত না দিয়ে এঁরা মেনে নেবেন না যে হাত পুড়ে যাবে, হাতের ছোঁওয়া লেগে মুখও পুড়বে। জীবনের স্বাদ জীবনের কাছেই মেলে, দুধের স্বাদ যেমন দুধের কাছে। কল্পনা সে স্বাদ জোগাতে পারে না। পরোক্ষ অভিজ্ঞতা বা শোনা কথা তার স্থান নিতে পারে না। অথচ জীবনের ক'টা অভিজ্ঞতাই বা ক'জনের বেলা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা!

আমার এক বন্ধু আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন বিবাহযোগ্যা কুমারীদের ফোটো দেখে বিশ্বাস না করতে। ফোটোতে নাকি আসল রূপ ধরা পড়ে না। বলতে হয়, কন্যাটিকে স্বচক্ষে দেখতে চাই। স্বচক্ষে দেখেও কত লোক ঠকে গেছে বন্ধু বোধ-হয় জানতেন না। কিংবা জানলেও একজন বাস্তববাদী সাহিত্যিক হিসাবে সেইটেই তাঁর দাবী। নিজের চোখের উপর তাঁর অসীম আস্থা। বাস্তববাদী হলে যা হয়। আমি কিন্তু রোমান্টিক। আমি চোখে না দেখেও ইমেজ বানাই। ফোটো দেখেও প্রতিমা গড়ি। রূপ যাকে বলি তার কতক আমার কল্পনা, কতক নারীর আপন রূপ।

তেমনি যে-কোনো মানুষের বা প্রাণীর বা বস্তুর। বা ঘটনার। আসল সত্যের রূপ খোলা চোখেও দেখা যায় না। সে যেন সূর্যের রূপ।

একজন বিচারক হিসাবে আমার কাজ ছিল ঠিক কী হয়েছিল তা সাক্ষীদের মুখে শোনা ও শুনে লিপিবদ্ধ করা। ঠিক যে কী হয়েছিল তা চাক্ষুষ সাক্ষীরাও বলতে পারে না। অনেক জায়গায় ফাঁক থেকে যায়। অনেক জায়গায় গোলমাল হয়ে যায়। লিপিবদ্ধ যেটা হয় সেটা হুবহু সত্য নয়। বাস্তববাদ তা হলে কিসের উপর নির্ভর করে পাঁচজনকে ডেকে বলবে, এই যা লিপিবদ্ধ হলো তাই সত্য? তাই ঠিক? তাই আসল?

কাজ চালানো গোছের বাস্তবতা না হলে আপিস আদালত চলে না, সংসার চলে না। এমন কি ঘর-গৃহস্থালীও চলে না। কিন্তু কাজ চালানো গোছের রিয়ালিটি দিয়ে উচ্চাঙ্গের দর্শন বা সাহিত্য হতে পারে কি? আর্ট আরো গভীরে যেতে চায়। কাজ চালানো গোছের রিয়ালিটি তার জন্যে নয়। কাজ চালানোর জন্যে মাথা-ব্যথা তার নেই। "নইলে কাজ চলবে কী করে" এ প্রশ্ন তাকে ভাবিয়ে তোলে না। তার প্রশ্ন, "আসল ব্যাপারটা কী?"

এই চেয়ারটার একটা বাহ্য রূপ আছে, সেটাই এর আসল রূপ। কিন্তু এর উপরে যে মানুষটা বসে আছে তার কি শুধু একটা বাহ্য রূপই আছে? তার আভ্যন্তরিক রূপ অপরে দেখবে কী করে? সে-ই বা দেখবে কী করে? মুখের কথায়? পুরো মানুষটার পুরো রূপ সে নিজেই দেখেনি, সেইজন্যেই তো সাধকরা বলে থাকেন, আত্মানং বিদ্ধি। বাহ্যরূপের বর্ণনা এমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু তার আড়ালে ও তাকে জড়িয়ে যে অনির্বচনীয় রূপ আছে সে যে বর্ণনাতীত।

তেমনি বাহ্য ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা শক্ত নয়, কিন্তু তার পেছনে যেসব কারণ পরম্পরা রয়েছে তাদের সন্ধান নিতে গেলে মহাভারত হয়। আর্টের পরিসর সীমাবদ্ধ। তাছাড়া ঘটনা যেমন আকর্ষক কারণ পরম্পরা হয়তো তেমন নয়। সাধারণত এত ক্লান্তিকর যে পাঠককে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। অসংখ্য খুঁটিনাটি দিয়ে জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা পরিচালিত। শরীরকে চালায় মন, মনকে চালায় প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন বা দয়ামায়া বা ঔদার্যতা। যথার্থ অভিপ্রায় যে কী তা অনেক সময় দুর্জ্ঞেয়। অসুখ না করলে কেউ মনো-বিশ্লেষণ করায় না। অসুখী ছাড়া কারো

গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে

আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে

কাছের ও দূরের গান্ধী
স্বপ্নের সৌধ

•

রোমা রেঁলার ডায়েরী থেকে

মূল ফরাসীর বাঙলা অনুবাদ করেছেন

লোকনাথ ভট্টাচার্য

মন মনোবিশ্লেষকদের পরীক্ষার বিষয় হয় না। খাপছাড়া বা খারাপ কিছু না হলে সেটা 'খবর' হয় না। অধিকাংশ গল্প উপন্যাস 'খবর' ধর্মী।

সেইজন্যে প্রকৃত সত্য যে কী তা রীতিমতো ধাঁধা। বৈজ্ঞানিকরা এতকাল প্রকৃতিকে নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। ইদানীং মানুষের উপর দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরিক বলতে তাঁরা যা বোঝেন তা যথেষ্ট গভীর নয়। আরো গভীরে যেতে হলে কবি ও ঋষিরাই পথপ্রদর্শক। তাঁদের পথ দেখায় তাঁদের গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। যেখানে নিয়ে যায় তার নাম ইনার রিয়ালিটি। সেই যদি সত্য হয় তবে আর-সব আপাত সত্য। বা সত্যাভাস।

এই দৃশ্যমান জগৎকে মায়া বলে অগ্রাহ্য করে যা খুশি করে কোনোকিছুই সৃষ্টি করা যায় না। সে পন্থা আর্টের পন্থা নয়। এই যেমন একদিকের কথা

তেমনি আরেকদিকের কথা হচ্ছে এই দৃ[শ্য]মান জগৎকে তার নিজের ভাষায় বা নি[জের] শর্তে বোঝাও যায় না, বোঝানোও [যায়] না। বৃথা চেষ্টা। এর বাইরে গিয়ে বা[ইরে] থেকে দৃষ্টিপাত করা জীবিত মানু[ষের] অসাধ্য, কিন্তু সাধনা করলে ভিতরে গি[য়ে] ভিতর থেকে দর্শন করা সম্ভব। [সে] কেবল সাধুসন্ত বা মুনি-ঋষি বা মরমী[র] পন্থা নয়, কবি বা শিল্পীদেরও পন্থ[া]। শুধু ধর্মের পন্থা নয়, আর্টেরও প[ন্থা] সেই।

আর্টকে আমি ধর্মের অনুসরণ কর[তে] বলছিনে। স্বধর্মের অনুসরণ করতে বলছি। স্বধর্মের অনুসরণ করতে করতে সে দৃশ্যমানের অন্তরালে কী আছে ত[া] মর্মভেদ করবে। তখন তারই আলো[য়] দৃশ্যমানকেও ঠিকভাবে চিনবে। ঠিকভা[বে] বুঝবে। তার ফলে যে তার সৃষ্টি বাহ[্য] বা বন্ধ হবে তা নয়। আধুনিকদের ম[ধ্যে] সবচেয়ে আধুনিক যে গ্যেটে তা[ঁর] 'ফাউস্টের' সমাপ্তির জন্যে বিশ্বরূপদর্শ[নের] প্রয়োজন ছিল। আর বিশ্বরূপ কেব[ল] মর্ত্যরূপ নয়। কী করে তিনি তা নিরীক্ষ[ণ] করতেন যদি না অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বর্তিকা হাতে নিয়ে যাত্রা করতেন ফাউস্টের জীবনবৃত্ত কোথায় গি[য়ে] সম্পূর্ণতা পেল তা উপলব্ধি করেই তি[নি] শান্তি পান। নইলে প্রথম খণ্ডের খণ্ডস[ত্য] তাঁকে আমরণ অস্বস্তি দিত।

না, দৃশ্যমানকে খারিজ করে বা খা[টো] করে নয়, তাকে তার আভ্যন্তরিকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই বিধাতার সৃষ্টির অর্থবো[ধ] ও মানবের সৃষ্টির পরিণতি। রবীন্দ্রনা[থ] যে রূপসাগরে ডুব দিয়েছিলেন তাঁর ম[তে] অরূপরতনের আশা। রূপদৃষ্টি তাঁর মতো আর কার অমন ছিল! অথচ সেইখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। অরূপদৃষ্টির উন্মীল[ন] চেয়েছেন। তাঁর কাব্য তা বলে ব্রহ্মসূত্রে পর্যবসিত হয়নি।

বিধাতা তাঁর সৃষ্টির দায়ের খানিকটা আমাদের হস্তান্তর করে দিয়েছেন। আমরাও স্রষ্টা। আমরা যা সৃষ্টি করি তার অঙ্গেও মায়া মাখানো। নাটকের বা উপন্যাসের জগৎও কি মায়ার জগৎ নয়? হ্যামলেট বা আনা কারেনিনা কি সত্যি-কার চরিত্র? তাদের জীবনের ঘটনা কি সত্য ঘটনা? মায়া নিয়েই আমাদের কারবার। অথচ আমরা সত্যের আবরণ খুলে দিই। হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত। সে আবরণ খুলে দেখানোর ভার যাদের উপরে পড়েছে আমরাও তাদের মধ্যে আছি। হে শিল্পী, হে কবি, তুমি মু[খ] অপাবৃণু।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সুয়েজ নাটক

হোটেল স্যাভয়ের একটি টেবলে নৈশ-ভোজনে বসেছেন এনটনি নাটিং, ব্রিটেনের হার ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্টের একজন মন্ত্রী এবং তাঁর বন্ধু হ্যারল্ড স্টাসেন। স্টাসেন ইউ. এন. ডিসআর্মামেণ্ট কমিশনের একজন সদস্য এমন সময় একটা ফোন বেজে উঠল। তড়াতাড়ি ওয়েটার এসে সবিনয়ে সংবাদ দিল অনারেবল মিনিস্টারের ফোন এসেছে। টেলিফোনের অপর প্রান্তে রয়েছেন স্যর এণ্টনি ইডেন, ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার।

কয়েক ঘণ্টা আগেই পি, এম-র কাছে লিখে পাঠিয়েছেন নাটিং—তাতে কিভাবে জেনারেল নাসেরকে তুষ্ট করা যায় তার জন্য কি করা কর্তব্য, এইসব লেখা আছে। নাটিং লিখেছেন বাক্যে এবং ব্যবহারে ব্রিটেন যে আরবদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে চায় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হবে। নাটিং এই মেমোটি লিখেছেন ফরেন অফিসের উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। নাটিং-এর আশা ছিল সমগ্র ব্যাপারটি এনটনি ইডেন একটু সময় নিয়ে বিচার করবেন। তাঁর হজম করতে সময় লাগবে। কিন্তু নাটিং-এর অনুমান ভ্রান্ত, ডিনারের মধ্যপথে এই ফোনাঘাত।

ইডেন চীৎকার করে বলছেন—কিসব মাথামুণ্ডু পাঠিয়েছ, আমি তোমার একটি কথার সঙ্গেও একমত নই।

নাটিং একটু বিশদভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন। নাটিংকে মধ্যপথে থামিয়ে ইডেন বললেন—নাসেরকে স্বতন্ত্র করা, কিংবা তাকে সরলীকরণ করা, এসব কি ছাইপাঁশ বকেছ? আমি চাই নাসেরকে হটাতে, তুমি বা ফরেন অফিস যদি তাতে রাজী না হও, তাহলে ক্যাবিনেটে এসে কৈফিয়ৎ দাও তোমার এই ধারণার হেতু কি!

আবার নাটিং বোঝানোর চেষ্টা করলেন। নাসের ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের একটা শক্তিমান পুরুষ, তাঁকে হটানোর চেষ্টা করলে মিশরে অরাজকতা সৃষ্টি হবে। নাসেরের কোনো বিকল্প নেই—

ইডেন অপর প্রান্ত থেকে বোমার মত ফেটে চীৎকার করছেন—

'But I don't want an alternative, and I don't give a damn if there is anarchy and chaos in Egypt—"

এই কথা বলে ব্রিটেনের উগ্রসেন প্রধান-মন্ত্রী টেলিফোন কেটে দিলেন। আর বেচারী নাটিং ক্ষুব্ধচিত্তে ডিনার টেবলে ফিরে গেলেন।

"নো এনড অফ এ লেসন" নামক গ্রন্থে এনটনি নাটিং সুয়েজ সংকটের এক অন্তরঙ্গ কাহিনী পরিবেশন করেছেন।

১৯৫৬-তে সুয়েজ সংকটের কালে এনটনি নাটিং পদত্যাগ করেন। নাটিং এই গ্রন্থটিতে অনেক কৌতূহলপ্রদ সংলাপ এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইজ্রায়েলের সঙ্গে নাসেরকে বিলুপ্ত করার জন্য যে প্রচেষ্টা হয় তার অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন। কাহিনী অবশ্য তেমন মনোরম নয়। এই কাহিনীর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা, রাজনৈতিক ঠগীবৃত্তি আর সুযোগ ও সুবিধা-বাদের যে বিবরণ পাওয়া যায় ইদানীংকালে তা তুলনাহীন। এ কাহিনী ম্যাকিয়াভেলীর কাছে প্রীতিপ্রদ হত সন্দেহ নেই।

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এ কাহিনী মিথ্যার কাহিনী। মিথ্যা, আরো মিথ্যা, আরো আরো মিথ্যা। সবচেয়ে বড় ঘৃণ্য ভূমিকা হল ফ্রান্সের। বিশেষ করে সেই অশ্রদ্ধেয় সোস্যালিস্ট গয়ে মলে'। গয়ে মলে' নাসেরের রক্ত পান করার জন্য আকুল হয়েছিলেন যেমন ভীম পণ করেছিলেন দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপানের। কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ নাসেরকে খতম করার মতলব ইডেনের মাথায় জাগে জর্ডনের সম্রাট হুসেন যখন গ্লাবকে পদচ্যুত করলেন ঠিক সেই মুহূর্তে। গ্লাবের এই পদচ্যুতির মূলে যে নাসের ইডেনের এই বিশ্বাস দৃঢ় হল। তাহলে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধেও নাসের তার নাক গলাবার প্রয়াস করবেন হয়ত, তাহলে ইডেনকে সেদিকে সতর্ক হতে হয়। একটি উন্মাদের মত পদ্ধতি ধরে ইডেন তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রবৃত্ত হলেন।

ইডেন ফরাসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন তার একটা সূত্র পাওয়া যায়। ইডেন কিন্তু ফরাসীদের মনে কি আছে তা জানতেন না, ফরাসীরা তাঁর দলে থাকবেন এই বিশ্বাস নিয়েই তাঁর সতর্ক পদক্ষেপ। কিন্তু কারো কাছে একথা প্রকাশ করা হয়নি, এমন কি যে-নাটিং ইউনাইটেড নেশনসে ব্রিটেনের প্রতিনিধি তাঁর কাছেও নয়। আমেরিকানদের ত' নয়ই এমন কি ইডেনের যাঁরা উপদেষ্টা তাঁদের কাছে ব্যাপারটি গোপন রাখা হয়।

একটা সময়ে যখন নাটিং প্রস্তাব করলেন যে পররাষ্ট্র দপ্তরের আইন উপদেষ্টা স্যর জেরাল্ড ফিটজমরিসের উপদেশ নেওয়া হোক তখন ইডেন ক্ষেপে আগুন হলেন। তিনি বললেন :

"Fitz is the last person I want consulted, the lawyers are always against, our doing any thing. For God's sake keep them out of it. This is a political affair," সুতরাং ফিটজ বেচারীকে কিছুই জানতে দেওয়া হল না।

ফরাসী পক্ষে সামরিক প্রতিভা হলেন জেনারেল সালে. একটা অব্যবস্থিত চরিত্র। এই সালেকে দ্য গল কারারুদ্ধ করেছিলেন, আলজিরিয়ার ব্যাপারে সালে একটা বিপ্লব সংগঠন করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। সুয়েজ পরিস্থিতির সময়ও তিনি একজন জেনারেল আর তাঁকেই পিনো আর মলে' লণ্ডনে পাঠালেন কথাবার্তা চালানোর ভার দিয়ে।

সুয়েজ ক্যানাল অধিকার করার জন্য জেনারেল সালে যে স্ট্রাটেজি বা রণকৌশল করেছিলেন তা আপাতঃদৃষ্টিতে অতি সরল। তাঁর পরিকল্পনানুসারে ইজ্রায়েলকে সুয়েজ পেনিনসুলা ধরে মিশর আক্রমণে আমন্ত্রণ জানানো হবে, আর ফ্রান্স এবং ব্রিটেন ইজ্রায়েলী বাহিনীকে সিনাই-এর অধিকাংশ বা সবটুকু অধিকারের জন্য যথেষ্ট সময় দেবে, এবং তারপর 'দুইপক্ষ'কে হুকুম দেবে সুয়েজ ক্যানাল থেকে ফৌজ হটিয়ে নিতে, তার ফলে অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ শক্তি সুযোগ পাবে সুয়েজ ক্যানাল অধিকার করার, কোনোরকম ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে সুয়েজ ক্যানালকে রক্ষা করাই তাদের অছিলা হবে। কারণ যুদ্ধের ফলে ত' সুয়েজ ক্যানালের ক্ষতি হতে পারে।

এইভাবে দুটি রাষ্ট্রশক্তি যুযুধান দুই পক্ষকে বিচ্ছিন্ন করেছেন এই দাবী জানাবেন এবং তদ্দ্বারা তাঁরা একটা ভয়ংকর অগ্ন্যুৎ-পাতের লেলিহান শিখা নির্বাপিত করতে সহায়ক হবেন। আসলে তাঁরা সমগ্র জলপথ এবং তার সীমান্তিক বন্দরের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে, বিশেষ করে পোর্ট সৈদ এবং সুয়েজ। এর ফলে সুয়েজ ক্যানালের পরিচালন ভার অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ কর্তৃত্বাধীনে আসবে, এবং এই দুটি দেশ ক্যানালপথে সবরকম নৌ-চলাচল পরিচালন করতে পারবে, ফলে মিশর কর্তৃক ইজ্রায়েলী অবরোধও মুক্ত করতে পারবে।

কনস্তানতিনোপোল কনভেনসান দ্বারা সুয়েজ ক্যানাল পরিচালন ভার নিয়ন্ত্রিত হয়। তার দশ ধারা অনুসারে ইজ্রায়েলী জাহাজকে জলে বিচরণের অধিকার না দেওয়ার মিশরীয় দাবী যে যুক্তিসংগত তা একসময় মেনে নিয়েছিলেন ইডেন। কিন্তু সেলউইন লয়েড যখন এই বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন তখন ইডেন একেবারে ক্ষেপে উঠলেন এবং তাঁর মিনিস্টার অব দি

স্টেটকে সংশোধিত করলেন। রাজনীতির খেল একেই বলে।

একজন রাষ্ট্রনেতার রূপান্তর সম্পর্কে নাটিং-এর এই কাহিনী পড়তে উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর মনে হয়। এই প্রধানমন্ত্রী অসংখ্য আন্তর্জাতিক সমস্যার মীমাংসা করেছেন। কিন্তু পাছে রাশিয়ানরা নীল উপত্যকায় প্রবেশ করে এইজন্য তাঁর উৎকণ্ঠা অসীম। তাই মিশরকে একেবারে খালি ঝেড়ে সবরকমের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং এক সময় প্রাণের বন্ধু আমেরিকাকেও ঠকাবার মতলব করেছিলেন।

ইডেন ডালেসকে পছন্দ করতেন না, আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্ট হওয়ার কিছু আগে তিনি স্থির করেছিলেন যে ডালসকে যেন সেক্রেটারি অব স্টেট না করা হয় এই-রকম অনুরোধ করবেন। অনুরোধ হিসাবে ইডেনের সংকল্পিত এই অনুরোধ যে বিচিত্র তা কে অস্বীকার করবে।

আরেকজন "আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ" ইডেনের সইবে না, এবং তার ঈর্ষা ছিল একেবারে হিমালয়প্রমাণ।

সুয়েজ প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ইডেন সমগ্র ব্যাপারটি সম্পর্কে যে অন্ধকারে ডালেসকে রেখেছিলেন তার জন্য ডালেস কোনোদিন তাঁকে ক্ষমা করেন নি। ইস্রায়েলের সংগে চক্রান্ত তিনি পছন্দ করেন নি। নাটিং লিখেছেন ঃ

Eden and Mollet invited themselves to Washington for talks with Eisenhower after the fighting had ended in the Canal Zone, they met with an unprecedented rebuff".

এইত গেল অ্যাংলো-আমেরিক্যান সম্পর্ক। কিন্তু রাশিয়ানরা যে মিশরীয়দের অস্ত্র দেয় এই কাল্পনিক কাহিনীর রহস্য কি! থর্নিক্রাফট প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাসে ইস্রায়েল ও মিশরে ব্রিটেনের মাল সরবরাহের আনুপাতিক অর্থমূল্য আর অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরকের ব্যাপারে ৪ · ১, এবং বিমানবহরের জন্য ৫০ · ১। এর পাঁচ বছর আগে অনুপাত ছিল ৫ · ২ এবং ৭ · ২।

নাটিং প্রশ্ন করেছেন-- Who then had been arming Egypt to the teeth and building her up to threaten Israel? And even if the Russians had been supplying the vast quantities of arms to Nasser which was now alleged, why had the British Govt: Continued with their deliveries as if nothing had happened?

ইস্রায়েলকে যদি কেউ দরিদ্র মনে ক[…] তাহলে তাঁর জানা উচিত যে ফরাস[…] ইস্রায়েলকে আগা-পাসতলা অস্ত্র[…] সজ্জিত করেছেন এবং সি, আই, এ মার[…] আমেরিকাকে বলেছেন যে ফ্রান্স […] ইস্রায়েল সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে এবং […] পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ইস্রায়েলকে দেও[…] জন্য তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

১৯৫৬-র 'Sad and Sordid' ঘ[…] বলী এখনও স্মরণযোগ্য, তার একটি ক[…] ইস্রায়েলের রণপিপাসার নিবৃত্তি ঘ[…] এবং ব্রিটিশ কূটনীতির ঘৃণ্য চতুরা[…] কোনোদিন অবসান ঘটবে না। ব্রিটে[…] একমাত্র ভারতীয় নেতা যিনি ঠিক[…] চিনতে পেরেছিলেন তাঁর নাম সুভাষ বসু, কিন্তু ব্রিটেনের কুমীরের কা[…] ভোলেন নি এমন মানুষ সংখ্যায় কম।

এনটনি নাটিং-এর বইটি এই কা[…] বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তথ্যসম[…] কূটনৈতিক চক্রান্তের নেপথ্য ইতিহাস।

—অভয়ঙ্ক[…]

NO END OF A LESSON—By ANTHONY NUTTING; Publishe[…] by Dastur & Co: Price: […] Shillings.

ভারতীয় সাহিত্য

গালিব মৃত্যু শতবার্ষিকী

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে গালিব একটি খুবই উল্লেখযোগ্য নাম। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ তাঁর মৃত্যুর শত-বর্ষ পূর্ণ হবে। গালিবের মৃত্যু শত-বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য এরই মধ্যে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন, কেন্দ্রীয়-মন্ত্রী ফকরুদ্দী আলী আহ্‌মেদ এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কিভাবে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে, এখনও পর্যন্ত তার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়নি।

গালিবের পুরো নাম মির্জা আশাদুল্লা খান গালিব। ১৭৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর আগ্রা শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর জন্মের প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পূর্বেও তাঁর পূর্ব-পুরুষ ছিলেন সমরখন্দে। সেখান থেকে তাঁর পিতামহ প্রথম ভারতে আসেন এবং আগ্রা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প বয়সেই গালিবের মধ্যে কবি প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। মাত্র পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তিনি কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গজলও এর মধ্যেই রচিত হয়।

গালিবের শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে যে পাণ্ডিত্য ছিল, তা অনেকেই উল্লেখ করে গেছেন। ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। সত্তর বৎসর বয়সে তিনি লিখেছিলেন— "এই সত্তর বৎসর বয়সে সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিয়েও প্রায় সত্তর হাজার বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আমি দেখেছি। এই কারণেই মানুষের আমি এখন সবচেয়ে বড় বিচারক বলে দাবী করতে পারি।"

গালিবের ধর্মমতও ছিল ভিন্ন ধরনের। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান বা ইহুদী ধর্মের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ মানতেন না। তিনি কখনও প্রার্থনা সভায় বসতেন না। এমন কি রমজান মাসেও উপবাস করতেন না। অথচ ইসলামের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠা।

গালিবের যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তাঁর পিতা মারা যান। তখন থেকেই বলা যেতে পারে, তিনি একক প্রচেষ্টায় নিজেকে গড়ে তুলেছেন। গালিবের সাহিত্যে মধ্যযুগের মিস্টিসিজমের প্রভাব আছে। উর্দু এবং ফার্সী সাহিত্যের প্রভাবও তাঁর উপর যথেষ্ট ছিল। একবার তিনি লিখে-ছিলেন—"মিস্টিসিজম কবির উপযুক্ত নয়।" অথচ তাঁর সাহিত্যে সুফি মতবাদের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

গালিবের কবিতার অন্য একটি বিশেষত্ব তাঁর বলিষ্ঠ আশাবাদ। তিনি মনে করতেন দুঃখ থেকেই আনন্দের আবির্ভাব। যাঁ[…] দুঃখকে অস্বীকার করতে চান, তাঁ[…] জীবনকেও অস্বীকার করেন। দুঃখে[…] সংগে যুদ্ধই প্রকৃতপক্ষে জীবনের অস্তিত্বে[…] কথা ঘোষণা করে।

জীবনে অনেক দুঃখ-বেদনাও লা[…] করেছিলেন। মানুষের কাছ থেকে পেয়ে[…] ছিলেন তীব্র জিঘাংসা। তবু জীব[…] তিনি কোন দিন পরাজয়কে মেনে নেননি[…] মৃত্যুর সংগে তিনি যুদ্ধ করেছেন। মানুষ[…] শুনিয়েছেন জীবনের জয়গান। ক[…] ইক্‌বাল একবার একটি প্রবন্ধে গালিবে[…] গ্যায়টের সংগে তুলনা করেছিলেন। […] তুলনা কতদূর যুক্তিযুক্ত তার বিচ[…] অবশ্যই করা যেতে পারে। গালিবের শ্রেষ্ঠ[…] এর দ্বারা কখনও বন্ধ হবে না। স[…] ভারতে তাঁর মৃত্যু শতবার্ষিকীর উদ্‌যাপনে[…] আয়োজন চলছে। কলকাতায় 'সর্ব ভারত[…] কবি সম্মেলন' একটি বিশেষ অনুষ্ঠা[…] করবেন বলে জানা গেছে।

ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে সাহিত্য আকাদমীর সদস্যপদে বরণ ॥

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রা[…] কৃষ্ণনকে সাহিত্য আকাদমীর সদস্যপ[…] বরণ করা হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্ব[…] রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন মাদ্রা[…]

...ডঃ রাধাকৃষ্ণনের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং একটি তাম্রপত্র তাঁকে উপহার দেন। এই তাম্রপত্রটিতে লেখা ছিল—"বিশ্বমানবতায় ভারতীয় চিন্তাধারা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিতে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সাহিত্য আকাদমীর সদস্যপদে বৃত হলেন।" এই সংবাদে ভারতীয় সাহিত্যরসিক মাত্রেই খুশি হবেন বলে আশা করা যায়।

শরৎপ্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ॥

হাওড়ার 'সাহিত্য প্রয়াসী' একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। প্রতিযোগিতার বিষয় : 'শরৎ সাহিত্যে আধুনিকতা'। যাঁরা যোগদানে ইচ্ছুক, তাঁদের 'সাহিত্য প্রয়াসীর' সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৪৫, যাদব দাস লেন, হাওড়া-২, ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানান হয়েছে।

সম্পাদকের দায়িত্ব ॥

গত ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আসানসোলের রোটারিক্লাব আয়োজিত এক সভায় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—'আমার সম্পাদকের কাজ শেখার ছিল অসীম সুযোগ। আমার কাকা 'মতিলাল ঘোষের কাছ থেকে আমি এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিলাম।" সফল সম্পাদকের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন—'সফল সম্পাদককে নিশ্চয়ই জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। যদি সম্পাদক একবার তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন, তবে জনসাধারণ তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে থাকেন। জনসাধারণের সঙ্গে সম্পাদকের গভীর সংযোগ রেখে চলা চাই। তাঁদের সমস্যা সম্বন্ধে সম্পাদকেরও ধারণা হওয়া চাই খুবই স্পষ্ট। তাহলেই একমাত্র তিনি তাঁদের সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারবেন।"

এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রী আর এন সরকার। তিনি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে দেশের সংবাদপত্রের প্রবীণতম সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করেন। শ্রীঘোষের আলোচনার সূত্র ধরে ডাঃ এস সি মিত্র, ডাঃ বি বি মুখার্জি এবং শ্রী কে কে ডালও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

নজরুলের জন্য বাড়ীর দাবী ॥

গত ৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এলে 'অগ্নি-বীণার' পক্ষ থেকে একটি বিশেষ প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই দাবী করেন যে, কবি নজরুলের জন্য প্রস্তাবিত জমিতে সরকার যেন গৃহ নির্মাণ করে দেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সর্বশ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ ও 'অগ্নি-বীণার' সম্পাদক সমীর ঘোষ। প্রতিনিধিরা বিদেশে নজরুল সাহিত্য প্রচারের সুযোগ-সুবিধা করে দেবার জন্যও প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান।

গুজরাটি সাহিত্য মণ্ডলের অনুষ্ঠান ॥

কলকাতার প্রখ্যাত সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান 'গুজরাটি সাহিত্য মণ্ডলে'র উদ্যোগে সম্প্রতি গুজরাটি ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে কুমারী মমতা পিপালিয়া, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে শ্রীরাজকমল কারিয়া এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে কুমারী অরুণা রাজা। এছাড়াও কয়েকটি বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন যথাক্রমে কুমারী ভারতী গানাত্রা, শ্রীঅবিনাশ মেহতা ও শ্রীজীতেন্দ্র বুয়ারিয়া। এই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন শ্রীভাওয়নমল সিঙ্গি, শ্রীসুভদ্রাবেন কাবাডিয়া ও শ্রীশিউকুমার যোশি।

শ্রীঅমর জারিওয়ালা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। শ্রীআসর ও শ্রীগুধরলাল মাসানিও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

একটি মারাঠি উপন্যাস ॥

সাম্প্রতিক মারাঠি সাহিত্যে শ্রীভি এস পারগোনকার একটি পরিচিত নাম। এর মধ্যে তাঁর দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও একাধিক ছোটগল্পের তিনি রচয়িতা। তিনি মহারাষ্ট্রের এমন এক অংশে বাস করেন, যা কিছুদিন আগেও ছিল হায়দরাবাদের অন্তর্গত। মাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই নিবিড়। তাই তাঁর উপন্যাসে তাঁর জন্মভূমির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জন্মভূমির প্রকৃতি এবং মানুষের কথা তিনি নিপুণভাবে তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। সম্প্রতি 'কালচক্র' নামে তাঁর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে এক নতুন পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি পারিবারিক জীবনের কথাই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। নায়ক শ্রীরাজেকায় একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। রচনারীতির দিক থেকে উপন্যাসটি প্রায় বৈশিষ্ট্যহীন। কিন্তু এর কথাবস্তু বলিষ্ঠ। এই কারণেই উপন্যাসটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

দুই কথাশিল্পীর জন্মোৎসব ॥

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের জন্মোৎসব পালিত হয় গত রবিবার ২৩শে ভাদ্র, ১৩৭৫ বালীগঞ্জ সুরেন ঠাকুর রোডস্থ চিরায়ত সাহিত্য সভায়। এই উপলক্ষে স্বরচিত গল্প কবিতা পাঠ করা হয়।

বিদেশী সাহিত্য

পরলোকে সালভাতোর কোয়াসিমোদো

ইতালীয় প্রখ্যাত কবি ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক সালভাতোর কোয়াসিমোদো গত জুন মাসে পরলোক-গমন করেন। অথচ দুঃখের বিষয় সাহিত্য-জগতের এমন একটি দুঃসংবাদ বেতার, টেলিভিসন ও খবরের কাগজের মাধ্যমে তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়েনি।

কোয়াসিমোদোর জন্ম হয় ১৯০১ সালে সিসিলিতে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন স্টেশন মাস্টার, আর মা গ্রীসদেশের মহিলা। এই সূত্রে গ্রীক ও ইতালী—দুটো ভাষাই শিখবার সুযোগ পান তিনি। উভয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি মিশ্র উত্তরাধিকারও যেন তাঁর মানসিকতার সংগে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে ছিল।

১৯৩০ থেকে ৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি *হেরমেটিক স্কুল অব পোয়েট্রির নেতৃত্ব করেন। ফরাসী প্রতীকী কাব্যানুচিন্তনের সঙ্গে এই ধারাটির একটি গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য কোয়াসিমোদো বিশ্বাস করতেন, অভিজ্ঞতাই হলো কবিতার শ্রেষ্ঠ নিয়ামক। কেননা, বাহিক রূপচিন্ময়তার দ্বারা চোখ-ভোলানো গেলেও সার্থক কবিতার জন্য চাই, কবির ব্যক্তিগত অভি-জ্ঞতার পূর্ণ জাগরণ।*

শিক্ষাগত যোগ্যতায় ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু নানা বাস্তববৈপরীত্যে তাঁর জীবন গঠিত। ১৯৩৮ থেকে ৪০ সাল পর্যন্ত তিনি 'টেম্পো' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হন। এবং ১৯৪১ সালে শুরু করলেন ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা। অবশ্য, তার আগে তিনি কিছুকাল একটি লোহা-লক্কড়ের কারখানায় কেরানিগিরি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসে সরকারী চাকুরী করেছিলেন।

১৯৫২ সালে তিনি ডিলান টমাসের সংগে এতনা-তাওরমিনা আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৫৯ সালে লাভ করেন নোবেল পুরস্কার।

জীবনে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশী কবিতা এবং নাটকের বই অনুবাদ করেছিলেন। এর মধ্যে গ্রীক লিরিক কবিতা, শেক্সপীয়রের নাটক এবং ই ই কামিংসের নির্বাচিত কবিতাবলী উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর কাব্যবিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রতি-ফলন লক্ষ্য করা যায় 'ডিসকোর্স অন পোয়েট্রি' প্রবন্ধে এবং 'দি ফলস অ্যান্ড দি গ্রীন' কাব্যগ্রন্থের ভেতর।

কোয়াসিমোদো বিশ্বাস করতেন, যুগ ও জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। কেননা, কবির একদিকে রয়েছে চলমান বর্তমান, অন্যদিকে অতীতের সুবিপুল ঐতিহ্য। সেজন্যেই তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়, আধুনিক আঙ্গিক প্রকরণ ও দূরদর্শী কাব্যানু-চিন্তণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

কোয়াসিমোদো বলতেন, যুদ্ধ মানব-জীবনের মূল্যবোধকে পুনর্গঠিত করে। যুদ্ধকালীন ইতালীর নৈতিক বিপর্যয়ের স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর কবিতায়। প্রত্যক্ষ 'কমিটমেন্ট'-এর কবিতাও তিনি লিখেছেন বেশ কিছু সংখ্যক।

তবু তাঁর কবিতাকে উপলব্ধি করতে হলে, পাঠককে তাঁর প্রথাবিরোধী নিজস্ব প্রতীকীবোধের কাছে নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণ করতে হয়। সমকালীন ঘটনার ওপর লেখা তাঁর কবিতাগুলি পর্যন্ত নানারূপ অলৌকিক অনুষঙ্গে বিধৃত। *বিশেষত অভিজ্ঞতা বলতে, কোয়াসিমোদো কোনো সামাজিক বা লৌকিক ঘটনার কাছে শিক্ষাগ্রহণ বোঝাতেন না। এটি হলো, কবির একান্ত ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ব্যাপার, যার মধ্য দিয়ে তিনি বিচিত্র জটিলতা, সংঘাত ও সংঘর্ষের অন্তর্লীন ঐকাসূত্রকে আবিষ্কার করে নিতেন বর্তমানের সংগে অতীতের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে।*

তাঁর কবি-মানসিকতার পরিবর্তন ও অগ্রগতির লক্ষ্য করা যায় প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এড ই সুবিতো সেরা'র সময় থেকে। প্রত্যক্ষ বাস্তবের সংগে একটি আস্তিক্য-বাদী মানবতাবোধ তাঁকে সর্বদাই প্রাণিত করেছিল বিভিন্ন পর্যায়ে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ইতালীয়ন কবিতার যে-ধারা কার্দুচ্চি, পাসকলি, ডি আনুজিও প্রমুখ কবিদের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত, কোয়াসিমোদো ছিলেন সেই ধারারই আরো পরিণত এবং সার্থক উত্তরা-ধিকারী। উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'হোম-কামিংস' কবিতাটি ধরা যেতে পারে।

পিয়াজ্জা নাভোনা, অন্ধকারে শুয়ে আছি
পূর্ণদৈর্ঘ আসনের ওপর
বিশ্রামের আশায়,
আমার চোখগুলি সরল এবং শৃঙ্খল রেখায়
যুক্ত করেছে নক্ষত্রদের

আমি অনুসরণ করি, কাউকে,
শিশু যেমন ছুঁড়ে দেয়
প্লাতানির নুড়িগুলি
তেমনি আমার প্রার্থনাকে আবিষ্ট করে
অন্ধকারের দিকে।

মাথার নিচে আমার জোড়া হাত
আমি স্মরণ করি, প্রত্যাবর্তনের দিনগুলিঃ
ফলের গন্ধ শুকিয়ে আসছে মাচার ওপর,
ওয়াল-ফ্লাওয়ার, ল্যাভেন্ডার ও আদার;
যখন ভাবছি

তোমার কাছে একটি কোমল পাতের
তুমি আর আমি—যা এখন কোণের
উদ্ভাসন্তী মেয়ের কীর্তি
সর্বদাই নীরবতার মধ্যে পশ্চাদ্ধাবন
রীতি পদক্ষেপে প্রসারিত হয়
একটি ছন্দের
আমার ইচ্ছায় বিমুগ্ধে।

কিন্তু মৃতের কোনো প্রত্যাবর্তন
সময় নেই,—আরেক জন্যেও,
যখন পথ ডাকে;
বহুবার আমি চলে যাই রাত্রির
যেন ভোরকে আমার ভয়।

এবং পথ আমাকে দিয়েছিল সঙ্গীত
সেই শস্যকণের ফোলানো সুবাস।

কোনোপ্রকার কাব্যিক চতুরতা কোয়াসি-মোদোর কাব্যে নেই এবং সর্ব দায়িত্বহীন শব্দ উচ্চারণে তিনি বিতৃষ্ণ। কবি হিসেবে তাঁর সার্থক মানসিকতা নির্ণয় করতে হলে তার উৎমূলে সন্ধান করতে হবে ঐতিহ্যের—তেমনি আবিষ্কার করতে সাম্প্রতিকের প্রতি তাঁর আকর্ষণ স্বরের অভিনবত্ব, ছন্দনির্মাণ, শব্দগঠন আঙ্গিক প্রবর্তনার ব্যাপারে পূর্ব *সূতির প্রতি প্রতিবাদে। 'হেরমেটিক, 'রেজিস্টেন্স' ইত্যাদি আন্দোলন-বিভ মধ্যে তাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা না। বরং তিনি নিজেই ছিলেন এ বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক। জীবনের বি অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করে তিনি নিজ প্রকৃতি, আঙ্গিক ও কণ্ঠস্বরে আস্বাদ করে তুলেছিলেন সমকালীন বহু কবিত*

তাঁর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ জ্যাক বিভান একটি প্রশস্তিসূচক কবিতা কোয়াসিমোদোর কাব্য-বৈশিষ্ট্যকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন—

জলাশয়ের নিম্নতল থেকে তুমি আগুন
আর দানবীয় পুরাকাহিনী, পান
করেছিলে লাভা,

এখনো তোমার শিরায় শিরায়
কমলার উদ্যান থেকে তুলে-আনা কর্ক
হেরমেটিক ফল, যেন রক্ত

তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর ছিটিয়েছি
যুদ্ধ,

তুমি নিয়েছ একটি বৃক্ষের কলম
আর উত্তরের সমতলে জন্মাও পপলার বৃক্ষ
তোমার পত্রপল্লবে টেলিগ্রাফের তার,
তোমার শেকড়গুলি
পৌঁছে যায় মানচিত্রের ভেতর
আবেথুসার দিকে

প্রাচীন টেলামন জেগে ওঠে তোমার
মৃত বংশধারা থেকে, কথা বলে
আমার কণ্ঠস্বরে, তোমার জীবনের স্পন্দ
আমার নিঃশ্বাসে
আমার নিজস্ব কণ্ঠের ভাষা হয়,
ছুঁড়ে দেওয়া
তোমার বিশাল প্রস্তর খণ্ড আমার
পিছু পিছু
সমুদ্রের ভেতর।

নতুন বই

কোরআন (দ্বিতীয় ভাগ)—কাজী আবদুল ওদুদ অনূদিত। প্রকাশক—ভারতী লাইব্রেরী। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম বারো টাকা।।

পণ্ডিতপ্রবর কাজী ওদুদ সাহেব ...র কোরআন' অনুবাদ করেছেন এবং ...পূর্বে এই মহাগ্রন্থের প্রথম ভাগ ...শিত হয়েছে। বর্তমানে দ্বিতীয় ভাগে ...শিষ্ট ১৬ খণ্ড প্রকাশিত হল। 'বনি-...রাইল' নামক অধ্যায় থেকে আন-নাম ...ন্ত অধ্যায়গুলি প্রবীণ সাহিত্যিক ...ষ অধ্যবসায় সহকারে প্রাঞ্জল বাংলা ...য় অনুবাদ করেছেন। কোরআনের যে ...ত দিব্য কাহিনী আছে তা সুললিত ...ভাষায় ওদুদ সাহেব বাঙালী ...কের সুবিধার্থে অনুবাদ করেছেন। এই ... যাঁরা ধর্মপ্রাণ তাঁদের কাছে যেমন ...রিহার্য, তেমনই আবার যাঁরা তুলনা-...ক ধর্মগ্রন্থাদি আলোচনা ও পাঠ করতে ... তাঁদের কাছেও মূল্যবান মনে হবে। ...টি সুমুদ্রিত।

●

অমরেশ চন্দ্রাহত হলো : [কিশোর-উপন্যাস]—বিধায়ক ভট্টাচার্য।। অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস, ৯৭।১ সারপেন-টাইন লেন, কলকাতা-১৪।। দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অনেকগুলি মঞ্চসফল নাটক লিখে বিধায়ক ভট্টাচার্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। এই ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাসটিতে তিনি বেশ মজার মজার অতি-কল্পিত ঘটনার সমাহার ঘটিয়েছেন। আমাদের দেশের মানুষ চাঁদের গল্প প্রথম শোনে মা-ঠাকুমার মুখে, তারপর বড় হয়ে বিদেশী গল্পের বই পড়ে। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অমরেশ তেমনি একটি বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে এক-সময় এবং স্বপ্ন দেখে চাঁদে যাবার। বেশ মজার মজার ঘটনা দিয়ে গল্পটি ঠাসা। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। কিন্তু বইটির দাম ভয়ঙ্কর রকমে বেশী। সস্তা ছাপা। চৌষট্টী পৃষ্ঠার দাম আড়াই টাকা।

●

পালিয়ে এলাম রবার্ট লো কথিত এবং হামফ্রে ইভান্স লিখিত। অনুবাদ—শ্রীকালীপ্রসাদ বসু। হোমশিখা প্রকাশনী। দাম দেড় টাকা।

রবার্ট লো নামটি বিভ্রান্তি ঘটায়। ...া কিন্তু সাংহাইবাসী। তার বাপ-মা ...সাংহাই-এর অতীত এবং আধুনিককালের ...পরিচিত। লোর বাবা ছিলেন ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ, সেই সঙ্গে মার্কিন জাজেরও ভক্ত। আবার প্রাচীন সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে অনুরাগী। মা ছিলেন উঠতি ধনীঘরের বিপথগামিনী সুন্দরী কন্যা। শহরটাই একটা প্যারাডক্স। শহরের বৈষম্য লোর বাপ-মার জীবনে একটা ছাপ রেখেছিল। চীনা প্রথায় লো লালিত-পালিত। ১৯৩৭-এ জাপান সাংহাই দখল করে এবং লোর জাতীয়তার গর্বে একটা আঘাত লাগে। লো পলিটিক্যাল সায়ান্সের ছাত্র। লোর সঙ্গে লি-লি নামক একটি মেয়ের আলাপ হয় এবং সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মেয়েটি ট্যাক্সি-ড্যানসার বা ভাড়াটে নাচিয়ে। তাকে দেখলে ভালো পরিবারের মেয়ে মনে হত। লি-লির কাহিনী এই গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় পর্যন্ত আছে। লি-লি ১৯৬১-তে জলে ডুবে মারা যায়। গ্রন্থটিতে রবার্ট লো-কম্যুনিস্ট চীনে তাঁর বাস করা কেন সম্ভব হয়নি তার বিশদ বিবরণ দান করেছেন। তাঁর কাহিনী উপন্যাসোপম এবং চিত্তাকর্ষক। তিনি নিজে কম্যুনিস্ট ছিলেন তবু কেন তিনি দলত্যাগ করলেন এবং কেন পালিয়ে এলেন তার রোমাঞ্চকর বিবরণ দান করেছেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে যা সহজে চোখে পড়ে না। শ্রীকালীপ্রসাদ বসু—অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন।

●

স্বর্গরাগীর মিলন-ডাক [প্রথম খণ্ড] —ভক্ত মাধব।। অধ্যাত্মবিজ্ঞান গবেষণা মন্দির ২২ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা ৪।। পাঁচ টাকা মাত্র।

এককালে নানাপ্রকার গল্পকাহিনীকে পদ্যছন্দে লিখবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। আজকাল সেই ধারাটি লুপ্তপ্রায়। ভক্তমাধব এই গ্রন্থে তাঁর হৃদয়ের অধ্যাত্ম-আকুলতাকে সুন্দর পদ্যছন্দে প্রকাশ করেছেন। কবির আন্তরিকতায় এর প্রায় প্রতিটি ছত্রই পাঠক হৃদয়কে স্পর্শ করে। ছাপা বাঁধাই চমৎকার।

●

তারামণ্ডল পরিচয় ও বিশ্বের বিশালতা : [প্রবন্ধ] —কামিনীকুমার দে॥ বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড॥ ২, রমানাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯॥ এক টাকা।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার প্রয়োজনীয়তা বহুকাল যাবৎ অনুভূত হয়ে এলেও বাঙলা ভাষায় সেরূপ কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয় নি বললেই চলে। সম্প্রতিকালে এ বিষয়ে নানাদিক থেকে প্রাধান্য পাচ্ছে। শ্রীকামিনীকুমার দে এই গ্রন্থে বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অত্যন্ত সহজ সুন্দর ভাষায় নক্ষত্রমণ্ডলের অবস্থান ও পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়েও বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন।

এ গ্রন্থের দুটো অংশ। প্রথম অংশটি তত্ত্ব-বহুল, এবং দ্বিতীয় অংশটি সাহিত্য গুণ-সম্পন্ন। প্রথম অংশে মাস, দিক ও সময় অনুযায়ী কোন্ কোন্ তারা কখন কোথায় যাবে, তার সুন্দর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে রাশি পরিচয়, তারামণ্ডলের কয়েকটি মানচিত্র, মহাকাশের প্রধান চারিটি বিভাগের আলোচনা।

সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার কাছে বইটি মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। ভাষা সুন্দর ও মনোরম।

শারদ সংকলন

বার্ষিক শিশুসাথী : সম্পাদিকা শ্রীমতী দাশগুপ্ত, আশুতোষ লাইব্রেরি, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২, দাম : ৪-৫০ টাকা।

অন্যান্য বছরের মতো এবারেও বার্ষিক শিশুসাথী সুনির্বাচিত রচনার গুণে স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। বর্তমান সংকলনে লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিশু মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, স্বপনবুড়ো, এ সি সরকার, আশা দেবী, সুমথনাথ ঘোষ, কালিদাস রায়, জসীমউদ্দিন, নরেন্দ্র দেব, শিবরাম চক্রবর্তী, মনোজিৎ বসু, নিখিল সেন এবং আরো অনেকে।

রূপম : সম্পাদক—শ্যামল চক্রবর্তী, ২৪৯, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা—১২, দাম : ৪ টাকা।

রূপমের শারদ সংকলনে লিখেছেন জরাসন্ধ, প্রতিভা বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বারীন্দ্রনাথ দাশ, সমরেশ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী, বরুণ রায়, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, গুরুদাস ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, জ্যোতির্ময় বসুরায়, নিরীক্ষিৎ এবং আরো অনেকে।

দীপান্বিতা : সম্পাদক : আশীষতরু মুখোপাধ্যায়, ২৪৯ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২, দাম : ৪-০০ টাকা।

রচনা-বৈচিত্র্যে শারদীয় দীপান্বিতা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সংকলনে উপন্যাস লিখেছেন সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। গল্প আর কবিতা লিখেছেন আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, বুদ্ধদেব গুহ, ধ্যানেশচন্দ্র শর্মাচার্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, তারাপদ রায় এবং আরো অনেকে।

ধনঝরি পাহাড়ের পায়রা বাসা

তখন বোধহয় ফাল্গুন মাসের শেষ। চারদিকে ফাঁকা উঁচু-নীচু মাঠ; এখানে-ওখানে সবুজ বনের ঝোপ আর নিঃসহায় সঙ্গীহীন এলোমেলো ডুংরী-পাহাড়। খুব উঁচুও নয়, নীচুও নয়। সম্পূর্ণ নিষ্পাদপ।

পলাশের ফুল ফুটে আছে প্রান্তর আলো ক'রে। মহুয়া গাছ থেকে টুপটাপ মৌলের ফুল পড়েছে সারারাত। ভোর হওয়ার অনেক আগেই, বেওয়াবুড়ী, কিশোরী মেয়ে, তরুণী 'কুড়িয়া' ঝুড়ি নিয়ে এ গাছের তলা থেকে ও গাছের তলায় ঘুরে ঘুরে ফুল কুড়োচ্ছে। ফুল শুকিয়ে খাবার হবে, নেশাও হবে।

রাত ঘন হলে, মাঝে মাঝে যমদূতের মত কালো লোমশ অনার্য ভালুকেরা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কিংবা একা-একাই মহুয়া গাছের তলায় ফুল কুড়োতে আসে।

সুধীর করণ

সেইখানেই মাতাল হয় আর ভোর হওয়ার অনেক আগে দশ মাইল দূরের পুটুয়া-লাখার বনে ফিরে যায়। কোন কোন সময় মানুষজন পেলে, কপালের চামড়া চোখের উপর দিয়ে টেনে নামায়, আবার সাঁওতাল-ভূমিজদের তীরের ঘায়ে আহত-নিহত দুই-ই হয়।

দাদা বলেছিলেন—খুব ভোরে উঠবি। অন্তত পাঁচ মাইল তিনেক হেঁটে যেতে হবে 'শুশুং ডুংরী' আর 'কুড়চিবনি' ছাড়িয়ে। তারপরেই একটা শালবন। তারপর সেই আশ্চর্য দৃশ্য।

রাতের দোলায় শুয়ে আমরা এই কথাই বলাবলি করেছি। শহরের মেয়ে রমলাকে বুঝিয়েছি, ডুংরী মানে ছোট্ট পাহাড়,—যাকে 'পাহাড়ী'ও বলে, আর 'বনি' হচ্ছে ছোট্ট বন—গাছপালা কম, আড়ে-দৈর্ঘ্যে অল্প। সম্ভবত রমলা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এর আগে এমন অবারি[illegible] প্রকৃতির সঙ্গে ওর রাত-কাটানো আলা[illegible] হয়নি। তা ছাড়া এমনভাবে দোলায় শু[illegible] ঘনিষ্ঠ হতে ওর খুবই ভালো লাগছিল[illegible]

মাত্র একমাস আগে, আমরা একসঙ্গে শোয়ার 'পাশ' পেয়েছি। ওকে যখন বলে[illegible] ছিলুম যে বড়দা আছেন এক সাঁওতা[illegible] গ্রামে—সেরাইকেলার দিকে সেটেলমেন্টে[illegible] কাজে; আমরা না-হয় সাঁওতাল গ্রামে[illegible]

হানিমুন সেরে আসবো—, বেশ একটু 'ন্যাচারাল' হয়ে, তখন রমলা প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিল। এমন কি শেষপর্যন্ত বড়দাও তেমন রাজী ছিলেন না।

শেষপর্যন্ত অবশ্য বড়দা লিখে-ছিলেন,—স্নেহাস্পদেষু, তোমাদের নিমিত্ত. শিংপুরা গাঁয়ের প্রধান সাঁওতাল, বিন্দা সরেনের গৃহে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। বিন্দা সরেন গ্রামের মোড়ল; মাইনর প্রাশ। সে অতিশয় ভদ্রলোক। আমার সহিত তাহার খুবই বন্ধুত্ব হইয়াছে। তাহার বাড়ীর মহিলারাও ভালো। আমাকে খুবই আদর-আপ্যায়ন করে। তাহার জমি জায়গাও যথেষ্ট। আসিলেই বুঝিতে পারিবে। তোমাদের রান্না করিবার জন্য একজন নাপিতজাতীয়া প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকও পাইয়াছি। শ্রীবিন্দা সরেনের ঘরের সংলগ্ন একটি কক্ষে তোমরা থাকিতে পারিবে। অসুবিধা হইবে না। সংগে বিছানা এবং মশারি লইয়া আসিবে। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে ও বধূমাতাকে জানাইবে। ইতি—

শিংপুরা গ্রামের প্রধান সাঁওতাল বিন্দা সরেনের পাঁচিল-দেওয়া চৌহদ্দীর মধ্যে ঢুকে পড়ার সময় কয়েকটা মোটা তাজা কুকুর আমাদের দিকে চোখ রাঙা করে তাকিয়েছিল, কিন্তু বিন্দা সরেনের মেয়ে সোমা 'ছিঃ হাড়ি' ঃ বলে ওদের শান্ত করে-ছিল। যে ঘরে আমরা জায়গা পেলুম, সে ঘরটি ঝকঝকে নিকানো। একটি মাত্র দরজা এবং দেয়ালের বেশ উঁচুতে একটি জানালা। সাঁওতাল পাড়ায় আর কারুর বাড়ীতে এমন বাড়তি ঘর অবশ্য নেই। গাঁয়ের মোড়ল বলে বিন্দা সরেনের বাড়ীতে দারোগা পুলিশ, তহশীলদার, চৌকিদারী ট্যাক্স কালেক্টাররা প্রায়ই এসে মুরগী ভোজন করে যায়। ঘরের মধ্যে একটি উনুনও তৈরী।

আমাদের জন্য একটি খাটিয়া রাখা ছিল। বাঁশের পায়া, বাঁশের বাজু—আর বাবুই ঘাসের দড়ি দিয়ে ছাওয়া। দুজন শোবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রথমে তবু একটু টান-টান ছিল। একরাত কাটানোর পরে দোলার মত সামান্য একটু ঢিলে হয়ে গেল।

রাতের বেলায় শুয়ে শুয়ে আমরা সোমার কথাও আলোচনা করেছি। আশ্চর্য রূপ। রমলা বলেছিল, তুমি যখন সেদিন কোথায় একটু বেড়াতে গিয়েছিলে, তখন সোমা এসেছিল। ঘরের মধ্যে কিছুতেই ঢুকবে না। দরজাগোড়া থেকে উঁকি দিয়ে এই খাটিয়াটার দিকে তাকায় আর খিলখিল করে হাসে।—আমারই লজ্জা করেছিল, ব্লাউজ পরে না। একটা দিতে চাইলুম। বললে, উ সব আমরা পরি না। বলেছিলুম, ওকে আনন্যাচারাল করে কি লাভ। ওর সপ্তদশী তনুটি তোমার কোলকাতার মানাবে না, এখানে অপরূপ। দেখেছো, কি অপূর্ব দৃষ্টি—রমলা কটাস করে চিমটি কাটলো। সম্ভবত উভয়ের যৌবনের তুলনা করে থাকবে। শহরের ইট-পাথরের খোপের মধ্যে বড় হয়ে, রমলাকে সোমার কাছে তেমন স্বাস্থ্যবতী মনে হবে না।

রমলা বললো, খুব ভালো মেয়ে সোমা। ঘর-দোরের সব কাজই করে, মাথায় করে জল নিয়ে আসে। মহুয়া কুড়িয়ে আনে। আর কি সুন্দর গান গায়, সাঁওতালী ভাষায়। একদিন ওরা নাচবে, আমরা দেখতে যাবো, বলেছি।

রাতের দোলায় শুয়ে, একটি হ্যারি-কেনের মিটমিটে পলতে-কে সাক্ষী রেখে আমরা প্রকৃতি এবং পুরুষ।

রাত বেশী হয়নি। বাইরে আবছায়া জ্যোৎস্না। কুকুর দুটো আমাদের পাহারা দিচ্ছে। কিছু বলে না এখন।

রমলা বললো, খুব ভোরে উঠবো। ওখানে গিয়ে, ভারী মজা হবে, না?

—কিসের মজা?

—আহা-হা, মজা আবার কিসের। এমনি ঘুরে বেড়ানোর মজা।

ফাগুন মাসের বাসন্তী রাতে ওখানে তখনও হালকা, পাতলা চাদরের মত শীত। আমরা যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, তখন গভীর রাত। গাঁয়ের কুকুরগুলো রাস্তায় ছুটোছুটি করছে আর ভুক ভুক করছে তখনও। সোমার ঠাকুরদিদি উঠোনের ওপারে দাওয়ার উপর খেজুরপাতার পাটি বিছিয়ে শুতে। ওকে বলে রেখেছিলুম, খুব ভোরে যেন আমাদের জাগিয়ে দেয়। বলে-ছিলুম,—ধনঝুরি পাহাড়ের পায়রা বাসা দেখতে যাব।

পুরো ফাল্গুনী রাত, পলাশ-রঙ, মৌল ফুলের গন্ধ এবং সাঁওতালী প্রকৃতি আমাদের দেহে-মনে মেখে অনেকক্ষণ নির্বাক-আনন্দে ভবিষ্যতের ঘর বাঁধবার জন্য তৈরী হয়েছি। এ অবস্থায় ঘুম আসে না। হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল, কেউ যেন দুটো পায়রাকে একটি খাঁচার মধ্যে পুরে জোড় বাঁধাচ্ছে।

ধনঝুরি পাহাড়ের পায়রা-বাসা দেখতে যাবার কথায়, সম্ভবত এই কথা মনে হয়ে থাকবে। ছোটবেলায় দেখেছি, পায়রা পোষার কি অফুরন্ত শখ ছিল বড়দার। নেশার মত। কোথাও নতুন ধরনের পায়রা আছে শুনলে, সাইকেলে চড়ে ছুটতেন, পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়। দশ মাইল দূরেই হোক আর বিশ মাইল দূরেই হোক, বড়দাকে নিরস্ত করা যেত না। আমাদের গাঁয়ের বাড়ীর উঠোনে বিরাট একটা পায়রা-টুংগী ছিল। তলায়, লাঙল-জোয়াল, গাড়ীর চাকা, মই-বিদে,—হরেকরকম চাষবাদের গ্রাম্য যন্তর আর ওপরে দুটো তলায়—একটাতে থাকতো দিশী গোলা পায়রার ঝাঁক,—পাঁশুটে রঙ: ওপরের তলায় থাকতো—কুলীন পায়রা—রং-বেরঙের বাহারী,—লক্কা, পরাপাঁও (নাকি পাঁওপর?), মুখখী, গিরেবাজ, সিরাজী, কাবলী, আরো হরেক জাতের।

সকালে উঠেই দাদার কাজ ছিল, ধান-চাল কলাই মিশিয়ে, এক ধামা,—উঠোনে ছড়িয়ে দেওয়া। তারপর মইতে উঠে, পায়রাবাসার সব পথ, অর্গলমুক্ত করে দিতেন। ওঁর নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে এই হল প্রাথমিক। বাড়ীতে না থাকলে; ওঁর হয়ে আর কাউকে ঐ কাজ করতে হত।

ওঁর গলার স্বর শুনলেই—আ—ত্তি তি তি-ই-ই-ই—, কয়েকশো পায়রা উচ্ছ্বসিত হয়ে, ছোট্ট দরজা দিয়ে হুড়োহুড়ি করতে করতে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসতো উঠোনে। কতকগুলো আবার সোজা উড়ে এসে ওঁর মাথায়, কিংবা কাঁধে কিংবা হাতে বসে ফড়ফড় করে ডানা নাড়তো কিছুক্ষণ।

ওদের ডানায় যখন রোদের ঝলক এসে লাগতো তখন সে আর এক দৃশ্য। রঙের বৈচিত্র্যে সমস্ত উঠোনটা এমনভাবে ভরে যেত যে,—অনেক সময় দুচোখ আধ-খোলা-আধবোজা অবস্থায় রেখে, দেখেছি —রঙের উপর রঙ, রঙের উপর রঙ,—ঢেউ-এর মত নড়ছে। তখন পায়রার অস্তিত্ব বিলুপ্ত। শুধু রঙের তরঙ্গ; কালো-শাদা খয়েরী-পাঁশুটে তামাটে, পাঁচ-মিশালী রঙ। এর উপর বড়দার আর একটা শখ ছিল রঙের উপর রঙ চড়ানো। ফলে রঙের মেলায় ওরা যেন হাবুডুবু খেত। — লাল - সবুজ-হলুদ-বেগুনী। এই সব বে-পায়রা রঙ। শাদা রঙের দিশী গোলা পায়রা কিংবা শাদা রঙের পরাপাঁওদের উপরই এই রঙীন শাস্তির বরাদ্দ ছিল।

এসব দেখতে দেখতে পায়রা জাতের উপর আমার যে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়েছিল মনে হয় না। বরং দিশী গোলা পায়রার বাচ্চার উপর অন্যধরনের লালসা ছিল।

তবু ঐ সব কুলীন পারাবতগুলোকে দেখে ভালোই লাগতো। কালো কুচকুচে কিছুটা যেন কোকিল-কোকিল চেহারা,—মাথা শাদা চাঁদ—মুখখী পায়রাগুলো নীলাভ গ্রীবার ভংগী করে যখন অনবরত গলা কাঁপাতো, ময়ূরের মত পেখমধারী লক্কা পায়রাগুলো যখন অভিজাত পদ-ক্ষেপে ঘুরে বেড়াত, শাদা জামার উপর কালো জ্যাকেট চাড়িয়ে সিরাজী পায়রাগুলো যখন দল বেঁধে রোদ পোয়াতো (সত্যি যেন ইরান-ইরাক বাদাকশানের বাদশা-বেগম, তামাটে কাবলীগুলো যখন ভারিক্কী চালে পা ফেলতো, তখন—ভালোই লাগতো দেখে।

অন্ত্যজ দিশী পায়রাগুলো, বড়দা না হোক আমরা বাড়ীর সবাই খুব করুণা-দৃষ্টিকে দেখতুম। ওরা যেন জানতে পেরেই, আমাদের করুণাকে এড়িয়ে চলার জন্য, ঝাঁক বেঁধে সেই যে উড়ে যেত সকাল থেকে, ফিরতো একেবারে গোধূলি লগ্নে।

আমরা সেদিন, প্রধান সাঁওতালের বাড়ীর দোলায় শুয়ে আমার ছোটবেলার দেখা এই সব পায়রাদের কথাও বলে-ছিলুম। ওর কানের গোড়ায় পায়রাদের সম্বন্ধে দু-একটি আদি কথা বলতেই রমলা বললো, বাঃ তুমি তারী অসভ্য কিন্তু।

আমি বললুম, সবাই অলস।

রমলা সম্ভবত কথা ঘোরানোর জন্য বলেছিল, আমার কিন্তু পায়রা পুষতে খুব ভালো লাগে। কেমন সুন্দর জোড় বেঁধে থাকে দুটিতে।

বললুম, আমিও তাই ভাবছিলুম। বড়দা, এখান থেকে একটা ওখান থেকে একটা পায়রা নিয়ে এসে একটা খাঁচায় পুরে দিতেন আগে। একটা মদ্দ, একটা মাদী। গোড়ার দিকে কেউ কারুর দিকে ফিরেও তাকাতো না। ঝগড়া-ঝাঁটি করতো; দুজন দুদিকে মুখ ফিরিয়ে উদাসীনভাবে বসে থাকতো। দিন কয়েক পরে দেখা যেত, দুটিতে ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে বসে আছে। সেই খাঁচার মধ্যেই, শ্রীমান পারাবত, শ্রীমতী পারাবতীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে প্রেম নিবেদন করছে।

রমলা বলেছিল, সত্যি কি আশ্চর্য বল তো! কে-কোত্থেকে আসে আর একটি খাঁচায় বাঁধা পড়ে, ঘর সাজাতে বসে।

বললুম, আমাদের মত।

রমলা আনন্দিত হয়ে একটু বিচঞ্চল হল।

বললুম, ওদের ডিম পাড়া, ডিমে-তা দেওয়া, বাচ্চা ফোটানো, আর শিশু-পালনী বিদ্যের বহর তো দেখেছ।

রমলা কথা বললো না, মুখে; কিন্তু সর্বাঙ্গে কথা বলতে লাগলো।

কপোত-কপোতীর মত, আমাদের সুখে থাকবার ইচ্ছে হচ্ছিল।

আমাদের নিজেদের বেলায় আমার কিন্তু টি এস এলিয়টের—'নাথিং বাট দি থিংস'—মনে পড়লো না, কিন্তু পায়রাগুলোকে দেখলে মনে হত এলিয়ট খাঁটি কথাই বলেছেন।

ভোর হতে না হতেই বড়দার সাইকেলের বেল শোনা গেল। সাঁওতালপাড়ার শুয়োরগুলো, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সবেমাত্র মাঠের দিকে ছুটতে সুরু করেছে। কুঁকড়োগুলো গলা ফুলিয়ে প্রভাতের নকীব সেজেছে। তখনো কুঁকড়ো-মেয়েরা, ছাই গাদায় গিয়ে, গোবর গাদায় গিয়ে নখ দিয়ে চিরে চিরে পোকামাকড় খোঁজার জন্য বেরোয়নি।

সাঁওতালবুড়ী ঠিক সময়েই আমাদের জাগিয়ে দিয়েছিল, বাঁশের দরজায় ধপধপ করে হাত চাপড়ে।

আমরা তৈরী ছিলুম।

আমার গায়ে ধপধপে সার্ট, পায়ে কাবলী স্যান্ডাল। পরণে শাদা ধুতি।

রমলা পরেছিল খয়েরী রঙের সিল্ক, সবুজ-কলাবতী ব্লাউজ, পায়ে মেয়ে-চপ্পল। হাতে একটি ব্যাগ।

আমাদের দুজনের দিকে দাদা একবার যেন অবাক হয়ে তাকালেন। কেন জানি না। ওঁর পরণে ছিল হাফপ্যান্ট। মাথায় শোলার হ্যাট, গায়ে খাকী রঙের জামা।

বড়দা বললেন, আরো একটু আগে বেরুতে পারলে ভালো হত। একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে। পায়রাগুলো অবশ্য জোর হওয়ার আগে . . . বেরুবে না; সম্ভবত পৌঁছে যাব টাইমলি। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে উনি বড় রাস্তায় উঠে পড়লেন। আমরাও।

দাদা বললেন, তোদের ওখানে পৌঁছে দিয়েই আমি চলে যাবো কালিকাপুরে। ওখানে ব্রীজের কাজ সুরু হবে সকাল সাতটা থেকে।

আমি বললুম, ঠিক আছে। আমরা ঠিক ফিরে আসতে পারবো।

প্রায় নীরব হয়ে হেঁটে চলা, ভালো দেখায় না বলে, আমিই বললুম, বড় রুক্ষ জায়গা, কিন্তু নানা রঙের সমাবেশ।

রমলা, দাদার সামনে, তখনও খুব প্রগলভতা করার মত সাহস পায়নি। জোর গলায় কথা বলতে শেখেনি। শ্বশুর-ভাসুরের সামনে দেড়হাত ঘোমটা টানার রীতি অচল হয়ে গেলেও, মাথার কাপড়টা, কি জানি কেন, রমলা তখনও খসিয়ে ফেলেনি। একটু মিহি সুরে, কিছুটা গলা নাচিয়ে বললো, খুব সুন্দর। কেমন নির্জন জায়গা। কোলকাতায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

শেষের কথাটা বোধহয় বড়দাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই বলা। নৈলে—আমি জানি, কোলকাতার বন্ধ বৃহৎ অন্ধ খাঁচাতেই ওর মুক্তি।

আমি নির্জনতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বললুম, হ্যাঁ, নির্জন তো বটেই!

নির্জনতার মধ্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করে, রমলা হঠাৎ যেন একটু লজ্জা পেল। কেননা, তারপর থেকে শুধু গুটি গুটি ক'রে হাঁটা ছাড়া, বিশেষ কিছু বলা-কওয়ার কাজ তার ছিল না।

দাদা বললেন, বন-পাহাড়-মাঠ ভাঙতে ভাঙতে আর্ধেক জীবন প্রায় কাবার হয়ে গেল আমার। এখন তো মানুষ-জনের চেয়ে বন-পাহাড়ই ভালো লাগে আমার।—দেখেছিস কেমন রঙ্—।

একটা পুষ্পিত পলাশ গাছের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন উনি। দৃষ্টি এমনিতেই আকর্ষিত হ'ত। মেটে সিঁদুরের মত রঙ্। শুকপাখির ঠোঁটের মত কিংশুকের সেই বাসন্তী-বিলাস হঠাৎ যেন রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

সূর্য তখনও ওঠেনি। চারদিকে শুকনো রিক্ত ধানক্ষেত। এখানে ওখানে ন্যাড়া পাহাড় অতিকায় মৃত হাঙরের মত পড়ে আছে। মহুয়াগাছের তলায় মেয়েদের দেখা যাচ্ছে—অধিকাংশই কৌপীনধারী কিশোরী।

আমরা ততক্ষণে কুড়চিবনির কাছে এসে পড়েছি।

দাদা বললেন, এবারে আমাদের যেতে হবে কুড়চিবনির পাশ দিয়ে। ওদিকে একটা পায়ে-হাঁটা পথ যদি-ও বা আছে, ওটা শেষ হয়েছে একটা পাহাড়ের কাছে। ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। সাইকেল-ও নিয়ে যাওয়া যাবে না ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে।

বললেন, এই ঝোপের কাছেই সাইকেল রেখে যেতে হবে।

বললুম, কেউ নিয়ে যাবে না?

দাদা বললেন, ওসব চুরি-ডাকাতির ব্যাপার এখানে নেই। তোরা কিন্তু কাপড়-চোপড় সামলে হাঁটিস্। কাঁটাগাছে লেগে ছিঁড়ে যেতে পারে। এসব বনবাদাড়ে অত ভালো জামাকাপড় পরে আসতে নেই—।

রমলা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এ বনে বাঘ ভাল্লুক নেই তো!

দাদা জবাব দিলেন, ওর দিকে না তাকিয়েই, না না, ওসব কিছু নেই এখানে। দু-একটা শেয়াল-ও আছে কিনা সন্দেহ।

দাদা সবার আগে। আমি আর রমলা পাশাপাশি। ঝোপঝাড়গুলো পথ আগলাচ্ছে, কিন্তু আটকাতে পারছে না। অধিকাংশই কুড়চি গাছ। এখানে-ওখানে বুনো কাঁটা-কুলের গাছ।

বনটা যেই পেরিয়েছি, অমনি যেন এক মায়ারাজ্য।

চোখ জুড়িয়ে গেল।

বড়দা বললেন, দ্যাখ্,—নেচার এখানে পুরোপুরি নেচার। বলেই মাথার হ্যাট খুলে দাদা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সম্ভবত প্রকৃতি-কে সম্মান আর প্রণাম জানালেন নগ্নশির হয়ে। তারপর যেন ধ্যানস্থ হয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ।

আমরা-ও সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলুম, সামনেই বড় একটা জলাভূমি। নালার মত। ঘাসে ঘাসে ভরে আছে। নালার ওপারে সেই পাহাড়; ধনঝুরি পাহাড়, ইংরাজী এল্-এর মত চেহারা। কুড়চি বনের পশ্চিম দিকের সংগে পাহাড়ের একপাশ লেগে আছে।

রমলার দিকে একবার তাকালুম। ওর চোখমুখ দেখে মনে হল, হয়তো-বা ভয় পেয়েছে। জলার ওপারে সেই পাহাড়ের চুড়ো সাপের ফণার মত, ছত্রাকারে অনেকখানি প্রসারিত। সাধারণ পাহাড়ের মত চেহারা নয়। সেই প্রসারিত অংশের নীচে, পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য খোপ। প্রকৃতির কোন্ বিচিত্র খেয়ালে এমনটি হয়েছে, কে জানে। খোপের সবকটি স্পষ্ট করে নজরেও পড়ে না। কালো হয়ে আছে। পাহাড়ের এই খাড়াই বেয়ে কেউ কোনদিন ওখানে উঠতে পারবে না। খাড়াই-অংশটাই প্রায় হাজার ফুট।

শিংপুরা গ্রাম থেকে এ পাহাড়ের যে অংশটুকু দেখা যায়, সেটি এর পশ্চাদভাগ; কিছুটা চ্যাপ্টা।

অদ্ভুত এক আকর্ষণে আমরা সবাই যেন সম্মোহিত।

মনে পড়লো, দাদা বলেছিলেন, সাঁওতালরা এই পাহাড়ে পুজো দিতে আসে; কিন্তু এদিকে নয়, পেছন দিকে। কি এক অজ্ঞাত কারণে, লোকে এদিকে আসে না; অন্ততপক্ষে একা নয়।

দেখতে দেখতে কেন যে এমন হল, তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

আমার সামনে কেউ নেই। না রমলা, না দাদা। পাহাড়টাও দেখতে দেখতে ঝাপসা হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা ধোঁয়ার মত প্রান্তরের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ একক এক ব্যক্তি। আমার জামা-জুতো-পোষাক-আসাক কিছুই আর আমার অনুভূতির মধ্যে নেই। এই অবস্থায় অসহায় আমি, ঐ শূন্যতাকে দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইলুম।

হঠাৎ মনে হল, কাছেই কোথাও জলপ্রপাত আছে।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলুম, দাদা, রমলা, বন-পাহাড়, সবাই আমার কাছে। জলপ্রপাতের গমগম করা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু সামনে কোথাও জলপ্রপাত নেই। ধনধনির পাহাড়ে জলপ্রপাত থাকতে-ও পারে না। শব্দটা কিন্তু পাহাড়ের পেটের মধ্যেই হচ্ছে বলে মনে হল।

আমাদের চোখের সামনে, বাঁদ-ও কিছুটা দূরেই, শুধু হাজার হাজার কালো কালো গর্ত। সন্দেহ ক্রমশ বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছিল। ধনধনির পাহাড়ের অন্তঃস্থল থেকে সেই অভূতপূর্ব অলৌকিক গমগম শব্দ ধ্বনিত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, গোটা পাহাড়টাই ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

আমরা সবাই নির্বাক। কোন একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখার জন্য আমরা সবাই উন্মুখ। পাহাড়ের পেটের মধ্যে সেই কল্পনাতীত আলোড়ন, সেই সংখ্যাহীন শব্দ আবর্তিত হচ্ছিল। পাহাড়টাকে আর নির্জীব বলে মনে হল না। প্রাগৈতিহাসিক-কালে আদি-জীবনের উদ্ভব মুহূর্তের কলরব ওর মধ্যে আবদ্ধ। সেই কলরব যদি ফোয়ারার মত ঊর্ধ্বগামী হয় এবং একটি-মাত্র নির্গমন পথ দিয়ে উৎসারিত হয়, তাহলে আদিযুগের অংকুরিত জীবনের এক প্রিমিটিভ ভয়ংকরতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটবে।

[illegible] [illegible],—ঐ [illegible] [illegible] যাচ্ছে, —[illegible] [illegible] মেঘের মত হাজার হাজার [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে গেছে।

কি আশ্চর্য!—

রমলা আমার দিকে তাকালো।

হঠাৎ—
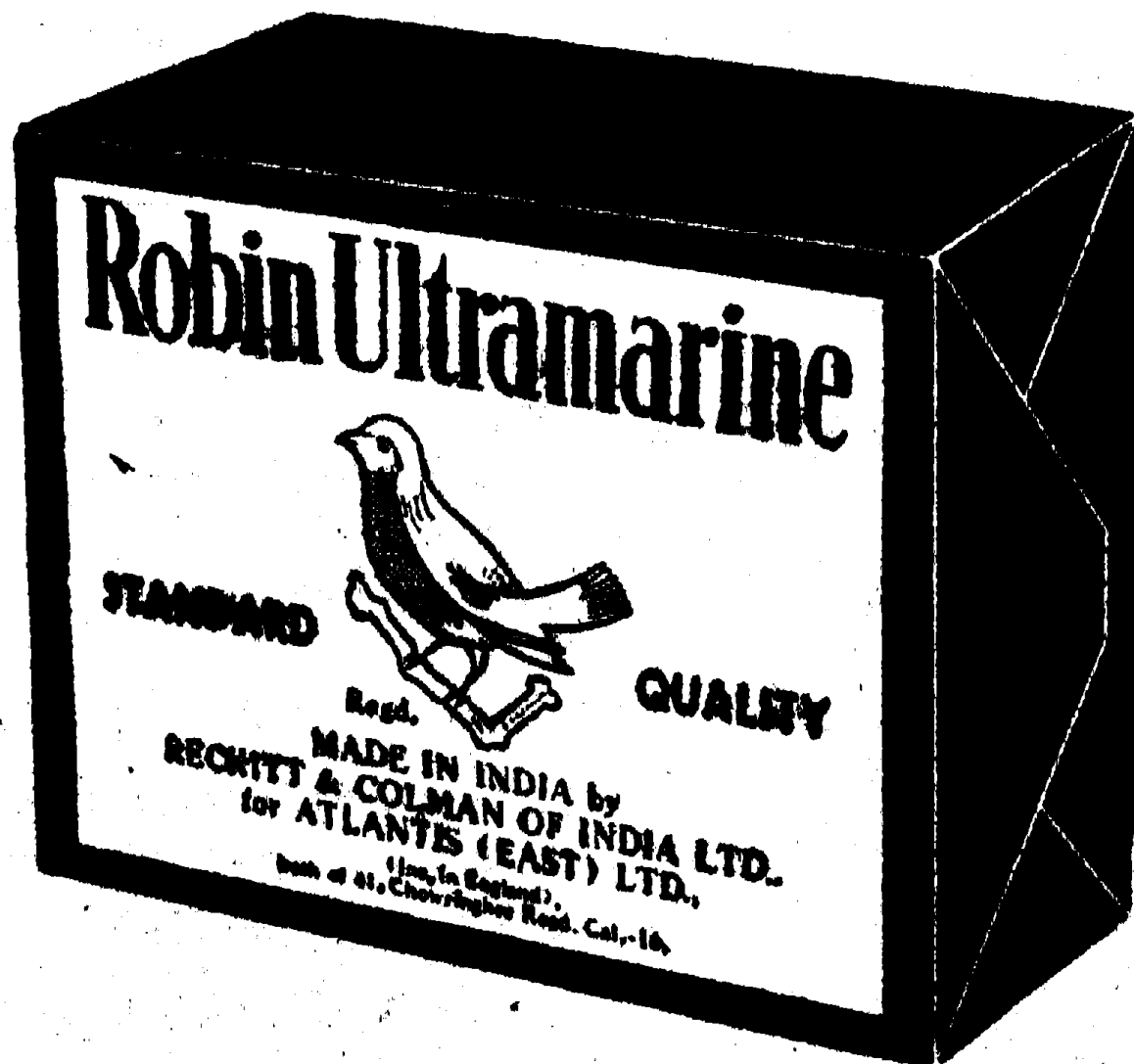
আমার সমস্ত নিস্পন্দতার অনুভূতিকে এক প্রবল ধাক্কায় ছত্রখান করে দিয়ে সেই মুহূর্তে—শত-সহস্র-লক্ষ পারাবত, ধলধুরির পাহাড়ের পেট থেকে অনর্গল বেরুতে লাগলো। অবিচ্ছিন্ন অনর্গল, হাল্কা ফানুসের মত একটা প্রবাহ—শুধু কালো, শুধু কালো—অবিমিশ্রিত আদিম, পাংশুল-কৃষ্ণবর্ণের সেই উড়ন্ত স্রোত দেখতে দেখতে সারা আকাশকে আবৃত করে ফেললো। মনে হল মাথার উপরে মেঘবর্ণের, হিল্লোলিত এক চন্দ্রাতপ।

দাদা বললেন,—দেখলি তো!

—আশ্চর্য!

রমলার বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি আমার দিকে। ওর চোখে-মুখে সাধারণ বিস্ময়ের ছাপ ছাড়া আর কিছু নেই।

মনে হল, রমলা বড্ড অসহায়। একটা বিরাট কিছুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যখন হঠাৎ নিজের ক্ষুদ্রতাকে অনুভব করে, তখন তার মুখের চেহারা কেমন হয়! আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে দাদা বললেন, আমি চললুম; দেরী হয়ে যাবে। তোমরা বেড়াতে বেড়াতে ফিরে যেও।' বলেই—তিনি শোলার হ্যাট মাথায় চাপিয়ে কুড়চি-বনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেই মুহূর্তে রমলা প্রায় কম্পমান অবস্থায় আমার বুকের উপর নিক্ষেপ করলো নিজেকে।

দেখতে দেখতে সেই পায়রাগুলো ঝাঁক বেঁধে পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল। কতকগুলো পায়রা দলছাড়া হয়ে আমাদের অদূরে জলাভূমিতেই নেমে পড়লো।

সাঁই করে একটা শব্দ। বিদ্যুৎবেগে কোত্থেকে এসে, একটা বাজপাখি, একটি অসহায় পায়রাকে নখে জড়িয়ে ধরে উড়ে গেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে, টপ্ করে এক ফোঁটা রক্ত পড়লো।

তখন সামনের সেই খোপগুলোতে সংখ্যাহীন ডিম কিংবা সংখ্যাহীন শিশু-পারাবত আগামী দিনের স্বপ্ন দেখছে—। জায়গাটা পুরোপুরি নির্জন হয়ে আমাদের গ্রাস করতে শুরু করলো।

রমলা আমার সর্বাঙ্গে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চাইছে। উন্মাদের মত আমার পিঠে ঘাড়ে, কাঁধে নখের আঁচড় দিচ্ছে। আমিও ওকে আশ্রয় দিতে চাইছি।

চারদিকে নির্জনতায় এমন নগ্ন রূপ আমারও সহ্য হচ্ছিল না। আমিও ভয় পাচ্ছিলুম। অদ্ভুত একটা ভৌতিক ভয়।

আমাদের চারদিকে বন-পাহাড়-প্রান্তর-আকাশ। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাবনা-চিন্তা, [illegible]-[illegible], [illegible]-[illegible] এখানে এসে [illegible]।—

রমলা আমার মুখে-চোখে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

আমি রমলার মুখে-চোখে সর্বাঙ্গে প্রধান সাঁওতালের মেয়ে সোমা-কে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, আমরা বনের গভীরে চলে যাচ্ছিলুম।

ছোট্ট বন। অনায়াসে ওপারে পৌঁছে আমরা রাস্তা খুঁজে পাব হয়তো।

তারপর কতক্ষণ ধরে আমরা সেই বনের মধ্যে, ভয়ে বিস্ময়ে, আনন্দে নিজেদের আত্মাকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে একটি খাঁচায় পুরে জোর বাঁধানোর চেষ্টা করেছি, তা আমরা জানি না।

আমার ধুতিতে ঘাস-কাঁটা। গায়ের জামায় গাছের পাতার রস। রমলার শাড়ীর আঁচল ছেঁড়া।

শিংপুরা গ্রামে আমরা যখন ফিরে যাই, তখন দুপুর। বড়দা তখনও ফেরেন নি। নৈলে আমাদের অবস্থা দেখে, চেহারা দেখে, কি ভাবতেন জানি না।

আমাদের দেখেই সোমা হেসে উঠলো। সরল, অনাবিল, মুক্ত প্রকৃতির মত।

রমলাও মুচকি হাসলো। আমি সোমার দিকে আর ফিরে দেখি নি। সোমা, রমলাকে নিয়ে বড় বাঁধের জলে গা-ধোয়ানোর জন্য নিয়ে গেল। রমলার খুব অসুবিধে। খোলা জায়গায় স্নান করা। সোমা-র কোন অসুবিধে হয় না। তবু যেদিকে মেয়েরা চান করে সে-দিকে পুরুষরা আসে না। কাকচক্ষু জলে ভরে আছে সেই বাঁধ।

আমি-ও গেলুম গামছা গায়ে। অন্য দিকে।

ওখান থেকে রমলাকে আর সোমাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না; তবু বুঝতে পারছি, রমলা যেন সোমাকে আর দূরে রাখতে চায় না।

ওর হাসির শব্দ শুনতে পেলুম।

রাত্রের সেই দোলা-শয্যায়, রমলা আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো, আর থাকবো না এখানে। কালই কোলকাতায় যাব।

বললুম: এত তাড়াতাড়ি! বেশ তো আছি।

রমলা বললো, আমরা বনের মধ্যে ভয় পেয়েছিলুম শুনে সোমা কি বললো জানো?

—কি বললো?

বললো,—বনের মধ্যে বনদেবী আর বনদেবতার [illegible]। ওরা অমনি করে ভয় দেখায়।

—হবে-ও বা!

রমলা আমার কানের গোড়ায় ফিস্-ফিস্ করে বললো,—সোমা কি বললো জানো,—[illegible], ও-রকম হলে,—

কি?—

রমলা [illegible] [illegible] একটু হাসলো। বললো,—[illegible] সে আমি বলতে পারবো না।

বললুম, তা' হলে সোমার মুখেই শুনবো।

রমলা বললো, আহা-হা, ও সব কথা, সোমা তোমাকে বলতে যাবে কেন?

—তা' হলে উপায়?

রমলা আমার কানের গোড়ায় মুখ নিয়ে বললো, সোমা কিন্তু খুব দুষ্টু, বলে দিচ্ছি।

রমলাকে একটু উৎসাহিত করার জন্য বললুম,—ঠিক ধরেছ। আমার-ও তাই মনে হয়েছিল। আমার দিকে দু-একবার এমনভাবে তাকিয়েছে—

রমলা এ কথার গুরুত্ব দিল না। বললো, —ধ্যেৎ—, ওদিক দিয়ে কোন দোষ দিতে পারবো না। বরং এমন সরল সহজ মেয়ে কোথাও দেখিনি আমি। ওর মনে পাপ থাকতে পারে না।

বললুম, তা' হলে?

'বললো কি জানো?—' রমলা ওর মুখ-টাকে আরো বেশী কানের কাছাকাছি এনে, গলার স্বর যতটা সম্ভব নামিয়ে, বললো, ও-রকম হলে জামাকাপড় খুলে, ঝেড়ে ফেলতে হয়, ঝেড়ে ফেলে আবার পরতে হয়; তা'হলে বনদেবতার রোষ চলে যায়।—উঃ সু—কি পাজী মেয়ে বাবা!'

আমার ঘুম পাচ্ছিল। রমলার কথা শোনার পর আমি হাই তুললুম। রমলার কথায় আমার কোন ভাবান্তর হল না। কারণ, সোমা যা' জানে, আমিও তা জানি। ছেলে-বেলায় আমাদের গ্রামেও এ প্রবাদ আমি শুনেছি। সোমা সহজভাবেই যা বিশ্বাস করে, তাই বলেছে রমলাকে। কিন্তু রমলা একথা শোনেনি,—এর মানেও জানে না। তাই সোমার কথার মধ্যে দুষ্টুমি আবিষ্কার করেছে। যুক্তি দিয়ে অবশ্য এর ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু আমার কাছে এর অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে। কেউ বলে দেয়নি,—সম্ভবত এই মুহূর্তেই এর মানে আমি বুঝতে পারছি। অরণ্য-প্রকৃতির দেবতা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হতে-ই পারেন। আমরা প্রকৃতি-স্থ নই, বলেই ক্রুদ্ধ হতে পারেন। নগ্ন আরণ্য-প্রকৃতির মধ্যে মানুষের নগ্নতার অর্থ, প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যাওয়া। আমরা কেউ প্রকৃতিস্থ নই। প্রকৃতিকে আমরা ভয় করি। রমলা ভয় করে, আমিও ভয় করি। আমরা আর প্রকৃতিস্থ হতে পারবো না। এমন কি দেবতার রোষে, অরণ্যপথে পথভ্রান্ত হলেও নয়। শুধু আমরা কেন সোমাও পারবে না। তবে, শিংপুরা কোলকাতা থেকে অনেক দূরে, এমন কি আমার শৈশবের গ্রাম থেকে তার দূরত্ব অনেক। শিংপুরা থেকেই শিংপুরার দূরত্ব অনেক।

রমলাকে এসব কথা বলে কি লাভ।

ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছিল। ধলধুরির পাহাড়ের পায়রাগুলো আমার মাথার উপর কালো-চাঁদোয়ার মত স্থির হয়ে, শুলো ঝুলেছিল; ওদের ডানার কোন শব্দ ছিল না।

পুজোর ছুটিতে বোঝাতে হবে

'আমিই একমাত্র প্রার্থী !'

মহেন্দ্র চক্রবর্তী

অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্যের ছেলের বৌভাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানালেন, কংগ্রেস কর্মীরা না চাইলেও জনসাধারণ আসছে নির্বাচনে কংগ্রেসকে জেতাবেই। এটা হচ্ছে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা।

পরে একদিন আলোচনার সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আমায় বললেন, কংগ্রেসের অনুকূলেই আবহাওয়া। যেমন কৃষ্ণনগরে যদি নেতারা না যেতেন; কিংবা প্রচার সভার ব্যবস্থা না করা হ'তো, তবু শ্রীমতী ইলা পাল-চৌধুরী জিততেনই। তবে হয়তো ভোটের সংখ্যা কম হ'তো। শ্রীসেন মনে করছেন, 'আমরা যত কম বক্তৃতা করবো, তত ফল ভাল হবে। লোকে যুক্তফ্রণ্ট সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ।

সত্যি বলতে কি নির্বাচনের তোড়জোড়ের জন্য কিছুদিন আগে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে শহরগুলিতে যে হাওয়া উঠেছিল তা এখন কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে। কারণ, নির্বাচন নভেম্বর, না ফেব্রুয়ারী কবে হবে, তা আজও স্থির না হওয়ার এই বিভ্রান্তি। তবে ইতিমধ্যে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করায় নির্বাচনের আয়োজন কিছুটা দানা বাঁধছে।

যুক্তফ্রণ্ট তো নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছেন যে, তাঁরা জিতবেন। লোকদলের শ্রীহুমায়ুন কবিরের বদ্ধমূল ধারণা তাদের দল ভারসাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হবে। যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির এক নেতা শ্রীসুকুমার গুপ্ত সেদিন আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তাঁদের ভয় পাবার কিছু নেই। যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে যাঁদের বিরাগ দেখা দিয়েছিল, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। শ্রীগুপ্তের ধারণা যে, রাজনৈতিক চিন্তাধারাই নির্বাচনের ভোটকে প্রভাবান্বিত করে। অতএব সেদিক থেকে দেশবাসীর এক বিরাট অংশ এখনও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রয়েছে। তাই যুক্তফ্রণ্ট যে জিতবে, সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ নেই।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পুজোর আগেই জেলায় জেলায় ঘুরে সভা করে চলেছেন। তবে তাঁরা যে সকল সভার আয়োজন করেছেন, তার মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে কর্মী সম্মেলন। যুক্তফ্রণ্টের উদ্যোগেও সভা শুরু হয়েছে। তাঁদের এক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষ বলেছেন, নভেম্বরে নির্বাচন হবে বলে তাঁরা ধরে নিয়েছেন। প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্র কতকগুলি করে পোলিং বুথ হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা তৈরী করা— ইত্যাদি সব কাজেই ফ্রণ্ট হাত দিয়েছেন। তবে শোনা যাচ্ছে, ফ্রণ্টের মধ্যে একটা বিপদ দেখা দিয়েছে। ব্লক পর্যায়ে বা জেলা পর্যায়ে ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত সকল পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠনের ব্যাপারে কোন কোন দল থেকে ঘোরতর আপত্তি উঠেছে। বিশেষ করে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কোন কোন নেতা এই ধরনের সর্বদলীয় কমিটি গঠন করতে চাইছেন না। এর ফলে ফ্রণ্টের যে পার্টি যেখানে প্রার্থী দিয়েছেন, সেখানে সেই পার্টিকেই নির্বাচনের সব ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

কেবল প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি এখন পর্যন্ত প্রার্থী ঠিক করতে পারেননি। আর লোকদলের ডামাডোল শেষ হবার পর তাঁরা প্রার্থী মনোনয়নের কাজ যেমন একদিকে চালিয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে তাঁরা সভাসমিতিরও ব্যবস্থা করছেন। তবে তাঁরাও প্রকাশ্যে প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেননি।

কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ সেদিন পরিষ্কারভাবে জানালেন, প্রথম কয়েকদিন তিনি নভেম্বরে নির্বাচন করতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁর আপত্তি তিনি তুলে নিয়েছেন। এই আপত্তি তুলে নেবার কারণ সম্পর্কে অবশ্য কংগ্রেস ভবন বলেছেন, ভোটদাতাদের যাতায়াতের অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই নির্বাচনের তারিখ পেছিয়ে দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাছাড়া যে কোনদিন নির্বাচন হোক না কেন, কংগ্রেস তাতে প্রস্তুত আছে।

আসলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনেকের ধারণা হয়েছে, নির্বাচনে তাঁরা জিতবেনই। এর ওপর যদি নির্বাচন নভেম্বরে হয়, তবে আরো ভাল।

কংগ্রেসের বাড়ীর ভেতরে যে গোলযোগ তা বাইরে থেকে দেখলে অবশ্য মনে হ'বে থেমে গেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে আগুন, তা চলছেই। বরং সেই আগুনের তেজ আরো বেড়েছে। এমনও অভিযোগ শোনা গেছে, বিক্ষুব্ধ দলের যে সকল প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে 'অফিসিয়াল গ্রুপের' কেউ কেউ টাকা খরচ করে চলেছেন। ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বলেছেন, এটা ভুল। কারণ কোথাও এই ধরণের কোন চেষ্টা করা হয়নি।

যা হো'ক পুজোর মুখে ও পুজোর সময় সর্বত্র উৎসবের আবহাওয়া। নির্বাচনী প্রচারে এই সময় কিছু ভাটা পড়বেই। তবে সব প্রার্থীই নিজ নিজ কেন্দ্রে পুজোর সময় চলে যাচ্ছেন। তাঁদের ইচ্ছে, লোকদের বোঝাতে হবে, তিনিই একমাত্র প্রার্থী।

দেশে বিদেশে

চেক-রুশ অর্থনৈতিক চুক্তি

প্রাগের ওয়েনচেসলস স্কোয়ারে রাজা ওয়েনচেসলসের মূর্তির ওপর কালো পতাকাটি এখন আর নেই। তার জায়গায় লাল-সাদা-নীল চেক পতাকা আগের মতোই শোভা পাচ্ছে। মূর্তির বেদীমূলে রাতা-রাতি গজিয়ে উঠেছে একটা ফুলের বাগান। সোভিয়েটবিরোধী পোস্টারগুলি খুলে ফেলা হচ্ছে রাস্তা থেকে। রেস্তোরাঁর দরজাগুলি আবার খুলেছে, হোটেলে হোটেলে ব্যান্ডের বাজনা বাজতে সুরু করেছে আবার।

সপ্তাহ তিনেকের অস্থির নাটকের পর চেকোশ্লোভাকিয়া আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

কিন্তু কিসের বিনিময়ে?

"আমরা জানতাম একদিন আমাদের মূল্য দিতে হবে। কিন্তু মূল্য যে এত ভয়ঙ্কর হবে তা ভাবিনি।" একথা বলেছেন চেক জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান যোশেফ স্মিরকোভস্কি।

তিনি রুশ নেতৃত্বে ওয়ারশ' চুক্তি-ভুক্ত পাঁচটি দেশের দ্বারা চেকোশ্লোভা কিয়া দখলের ও তার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের বিষয় উল্লেখ করছিলেন।

গত সপ্তাহে চেক কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র 'রুদে প্রাভো' আরেকটি মূল্যের বিষয় উল্লেখ করেছে যার বোঝা চেকো-শ্লোভাকিয়া [illegible]

'রুদে প্রাভো' বলেছে, রুশ হস্তক্ষেপের ফলে দেশের অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা খুব সহজ হবে না। প্রাথমিক হিসাবে যা জানা গেছে, আর্থিক ক্ষতির আসল পরিমাণ তার চাইতে অনেক বেশি হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

রুশ সংবাদপত্রের অস্বীকৃতি উপেক্ষা করে 'রুদে প্রাভো' সরাসরি অভিযোগ করেছে যে, মস্কো ও তার কতিপয় সহ-যোগী রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি তাদের কাঁচা মাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। আর্থিক দুরবস্থার এটা অন্যতম প্রধান কারণ। এর ফলে বড় রকমের পাঁচটি রপ্তানীর অঙ্গীকার চেকোশ্লো-ভাকিয়া পালন করতে পারেনি।

"বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতির" প্রথম সপ্তাহে একমাত্র ভারী শিল্পের ক্ষেত্রেই ১৬২ কোটি ৬০ লক্ষ ক্রাউন (প্রায় ২০ কোটি ডলার) মূল্যের উৎপাদন নষ্ট হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও উৎপাদন অচল হয়ে গিয়েছিল।

বিশেষ করে আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি নিয়ে রুশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে চেক প্রধানমন্ত্রী মিঃ ওলড্রিচ চের্নিক গত সপ্তাহে মস্কোয় গিয়েছিলেন। এই ক্ষতি দূর করার জন্যে তিনি রাশিয়ার সাহায্য [illegible] ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করে দিতে রুশ নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে এই ক্ষতির জন্যে চেক প্রতি-বিপ্লবীরাই দায়ী, সুতরাং রাশিয়ার ক্ষতি পূরণের প্রশ্নই ওঠে না।

মিঃ চের্নিকের সঙ্গে গিয়েছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্টিসেক হামুজ ও বৈদে-শিক বাণিজ্যমন্ত্রী ভাক্লে ভালেস।

গত ১০ সেপ্টেম্বর চেক ও রুশ নেতৃ-বৃন্দের আলোচনা শেষ হয় এবং ঐদিনই বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে চুক্তিতে ক্ষতিপূরণ দেবার কোনো কথা নেই।

চেটেকা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের এক খবর অনুযায়ী একটি দীর্ঘ-মেয়াদী চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করবে। সোভিয়েট এলাকায় একটি গ্যাস পাইপলাইন তৈরীর কাজেও দুটি দেশ সহযোগিতা করবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ আছে।

পরের দিন একটি যুক্ত ইস্তাহার প্রচারিত হয়। তাতে বলা হয়, বর্তমান সোভিয়েট-চেক সংকট নিরসন করবার প্রধান উপায় হল গত মাসের (আগস্ট ২৩—২৬) মস্কো চুক্তি যথাযথ পালন করা।

চেক নেতৃবৃন্দ এই চুক্তি ইতিমধ্যেই পালন করতে আরম্ভ করেছেন। সংবাদপত্রের

ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। একজন প্রেস সেন্সর নিয়োগ করা হয়েছে এবং কয়েকটি বিশেষ অফিসও স্থাপন করা হচ্ছে। "জনসংযোগের মাধ্যমগুলি যাতে রাষ্ট্রের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করে" তা দেখাই হবে এই নতুন অফিসগুলির কর্তব্য। দৈনন্দিন সংবাদ কিভাবে প্রকাশ করা হবে, এই সব অফিস থেকে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে।

চেক প্রেসিডেন্ট লুডভিক স্বোবোদা এবং দলীয় ও সরকারী নেতৃবৃন্দ যুক্তভাবে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক বিবৃতিতে এই আশ্বাস দেন যে, "আমরা গত জানুয়ারী মাসে যে পথে চলতে সুরু করেছি সে পথেই চলতে থাকবো।"

তবে "গণতন্ত্রীকরণ" এই কথাটা তাঁরা আর ব্যবহার করেননি। তার বদলে বিবৃতিতে বলা হয়েছে : "আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে শক্তিশালী এবং এর গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী চরিত্রকে প্রসারিত করব।"

ভারত সরকার মনে করেন এই সমাধান একই সঙ্গে পার্বত্য অধিবাসীদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবে অথচ আসাম রাজ্যের সামগ্রিক ঐক্য বিনষ্ট করবে না।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় নতুন পার্বত্য উপ-রাজ্যের আয়তন হবে প্রায় ৮,৭০০ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা হবে ৭ লক্ষ ৬৯ হাজার। অপরপক্ষে আসামের আয়তন দাঁড়াবে ৩৮,৪৩১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা হবে ১ কোটি ১১ লক্ষ।

প্রকাশ, এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের হাই-কম্যাণ্ডের সর্বসম্মত অনুমোদন পেয়েছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দেন। তিনি বলেছেন : "ভারত সরকার অবশেষে যে তাঁদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেছেন তাতে আমি আনন্দিত। আমি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন সংমা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তবে সাধারণভাবে যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় পার্বত্য অধিবাসীরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। কারণ এতে তাঁদের দাবী পুরো মেনে নেওয়া হয়নি। তাছাড়া নানাভাবে আসামের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা থাকায় পাহাড়ীদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগও বিশেষ থাকবে না।

পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলনের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ স্ট্যানলি নিকলস রয় তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করে বলেন যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অযোগ্য।

ইতিমধ্যে পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলন স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্যের দাবীতে যে প্রত্যক্ষ আন্দোলন সুরু করেছিলেন, তা কয়েক দিনের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে।

আসামের পুনর্গঠন

আসামের পুনর্গঠন সম্পর্কে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর এক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, আসাম রাজ্যকে পুনর্গঠিত করা হবে এবং এই রাজ্যের মধ্যে গারো ও খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলা দুটি নিয়ে একটি পার্বত্য উপ-রাজ্য গঠন করা হবে।

বলা হয়েছে, এই ব্যবস্থাকে রূপায়িত করার জন্যে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে একটি বিল পেশ করা হবে।

প্রস্তাবিত পার্বত্য রাজ্যের নিজস্ব বিধানসভা ও মন্ত্রি পরিষদ থাকবে। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় ছাড়া রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অন্য সমস্ত বিষয় নতুন রাজ্যের হাতে হস্তান্তরিত করা হবে। তবে আইন ও শৃঙ্খলা বড় বড় উন্নয়ন পরিকল্পনা, বৃহৎ শিল্প ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি আসাম সরকারের হাতেই থাকবে।

আপাতত উভয় রাজ্যের রাজধানীই হবে শিলং। মিকির ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা যদি ইচ্ছে করে তাহলে নতুন রাজ্যে যোগ দিতে পারবে, তবে তার জন্যে জেলা পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন দরকার হবে।

আলাদা মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা ছাড়াও অধিবাসীরা আসাম বিধানসভায় তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে, আর আসামের মন্ত্রিসভার মধ্যেও তাদের একজন প্রতিনিধি থাকবেন।

আসামের রাজ্যপাল নতুন রাজ্যেরও রাজ্যপাল হবেন। আসাম হাইকোর্ট, রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদের এক্তিয়ার নতুন রাজ্যেও থাকবে।

এছাড়া একটি উচ্চ পর্যায়ের আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের বাঁটোয়ারা

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কমিটি রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য বন্টনের নীতির বদল করেছেন। এই বদলের ফল হবে এই যে, রাজ্যগুলির মধ্যে কিভাবে কেন্দ্রের টাকা বাঁটোয়ারা করা হবে সেবিষয়ে নয়াদিল্লীর হাতে বেশ কিছু ক্ষমতা থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, নয়াদিল্লীর এই ক্ষমতা বাড়বে।

কেননা, এখন যে নিয়ম আছে তাতে ভারত সরকার মোট টাকার শতকরা ৭০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ করে দিতে বাধ্য, বাকী মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ টাকার ব্যাপারে তাঁদের কিছুটা বাছ বিচার করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কমিটি যে সুপারিশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, মোট টাকার ৭০ শতাংশের বদলে এখন থেকে মাত্র ৬০ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে জনসংখ্যার সমানুপাতিক হারে ভাগ করে দেওয়া হবে।

অবশিষ্ট ৪০ শতাংশের বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ হচ্ছে : (১) শতকরা ১০ ভাগ বন্টন করা হবে বিহার, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের মধ্যে। হিসেবে দেখা গেছে, এই ছয়টি রাজ্যের মাথাপিছু আয় সারা ভারতবর্ষের গড় মাথাপিছু আয়ের চেয়ে কম।

কমিটির এই সুপারিশের ঘোষিত উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিছিয়ে-পড়া রাজ্যগুলিকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করা।

(২) শতকরা ১০ ভাগ বন্টন করা হবে সেই রাজ্যগুলির মধ্যে যারা তিন বছর ধরে মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে সবচেয়ে বেশী মাথাপিছু টাকার আদায় [illegible] করেছে।

স্পষ্টতই এই সুপারিশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্যের টোপ ফেলে রাজ্যগুলিকে নিজেদের অধিবাসীদের কাছ থেকে আরও বেশী টাকা আদায় করার জন্য প্রলুব্ধ করা।

(৩) শতকরা ১০ ভাগ বন্টন করা হবে সেই রাজ্যগুলির মধ্যে যেখানে সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃহৎ পরিকল্পনা চালু আছে।

(৪) শতকরা ১০ ভাগ বন্টন করা হবে যেসব রাজ্যের নিজস্ব বিশেষ ধরনের সমস্যা রয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি আর গ্যাডগিল বলেছেন যে, এইসব বিশেষ সমস্যা বলতে বোঝা যাবে বড় বড় শহরগুলির সমস্যা, বেকারি ও উদ্বাস্তুদের সমস্যা ইত্যাদি।

এই চার দফাতে কোন্ রাজ্য কি পরিমাণ টাকা পাওয়ার অধিকারী হবে তা স্থির করার দায়িত্ব যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের সেহেতু টাকা বন্টনের ব্যাপারে তাঁদের হাতে বেশ কিছু ক্ষমতা থেকে যাবে। এ নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে বৈষম্যের অভিযোগ উঠবে, এটাও অবধারিত। আপাতত শুধু এটুকু স্থির হয়েছে, বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য ঠিক কোন্ অবস্থায় কিভাবে কোন রাজ্যকে বা কোন অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ সাহায্য দেওয়া হবে সেই নীতি স্থির করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের একটি সমীক্ষক দল নিয়োগ করা হবে।

অঙ্গনা

জলের টান

বাচ্চা সামলানো এক দায়। সব মাকেই এই দায়টুকু পোয়াতে হয়। একে তো তাদের হাজারো বায়নাক্কা। সে সব মেটাতেই মা ছাড়াও বাড়ির আর সবাই হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু তাতেও কি রক্ষে আছে? তার দুরন্তপনার সামাল দেওয়া আর এক সমস্যা। এই চোখে চোখে আছে তারপরই যে কোথায় উধাও হয়ে যায় তার ঠিক থাকে না। তখন সারা বাড়িতে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায়। এ জায়গা সে জায়গা খুঁজে কোথাও পাওয়া যায় না। তখন রাজ্যের দুশ্চিন্তা মাথায় এসে ভর করে। সব কাজ-কর্ম শিকেয় উঠে যায়। বাড়ির সকলের তখন এক চিন্তা, খুকু কোথায়? হাজার বায়নাক্কা আর দুরন্তপনায় সে সকলকে এমন বাঁধনে বেঁধেছে যে, এক মুহূর্ত চোখের আড়াল হওয়ার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়িটা কি রকম নেতিয়ে পড়ে। রান্নাঘরে মায়ের খুন্তির আওয়াজ থেমে যায়, তরকারির পোড়া গন্ধ হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। কিন্তু সেদিকে কারো হুঁশ নেই। বুড়ি ঠাকুমার বুকের ব্যথাটা আবার বাড়ে। পিশিমা আর কাকাদের মুখ পানসে হয়ে আসে। বাড়িটা তমতন্ন করে ফেলেন। সবাই সেই মুহূর্তে খুকুকে চোখের সামনে হাজির করতে ব্যস্ত। যত দেরি হয় ব্যস্ততা তত বাড়ে। একজন আরেকজনের ঘাড়ে দোষ চাপায়। সে গাল ফুলিয়ে বলে, হ্যাঁ যত দোষ নন্দ ঘোষ। কিন্তু রাগ করে থাকার সময় এটা নয়। গজগজ করতে করতে খোঁজ করে চলে।

কিন্তু অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সবাই নার্ভাস হয়ে পড়ে। তবে ও গেল কোথায়? সে কি [illegible] তখন এই এক চিন্তায় পেয়ে বসে। ঠাকুমার বুকের ব্যথা আরো বাড়ে। [illegible] চিন্তার জটিলতা প্রকাশ পায় মুখে। কেউ তাকে কথা শোনাতে ছাড়বে না। ছোট ঠাকুরপো নাক উঁচিয়ে বলবে, একটা মেয়েকে কাছে কাছে রাখতে পারো না, পরে করবে কি? ঠাকুরঝি কোমর কষে তাকে বাক্যবানে জর্জরিত করবে। বৃদ্ধা শাশুড়ী করুণ স্বরে বলবেন, কতদিন বলেছি বৌমা ওকে কাছছাড়া করো না। ওর তো কোন দোষ নেই। আর ও বোঝেই বা কি? তারপর তো আরো কত আছে। একে একে সবাই অফিস থেকে ফিরবে। আর ফিরেই যদি একথা শোনে, তবে আর রক্ষে থাকবে না। সকলের ওপরে আছে বাচ্চার ভাবনা। সত্যি, মাঝে মাঝে যে কোথায় উধাও হয়ে যায়। না, বেচারা মা আর ভাবতে পারে না। ওর দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অবাধ্য অশ্রুর ধারা, কান্নার আবেগে ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে থাকে।

সকলের চোখে-মুখেই উদ্বেগের ছায়া। [illegible]

খুকু গেল কোথায়? সবার এক জিজ্ঞাসা এবং যথার্থ ব্যাকুল। সকলেই প্রশ্ন করছেন, উত্তর দেবার কেউ নেই। যাকে পেলে সব প্রশ্নের সহজ সমাধান হয়ে যায় সেই এখন কোথায় লুকিয়ে পড়েছে।

সবাই একরকম হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। ওরা স্থির নিশ্চিত যে, এটা ছেলে-ধরার কাণ্ড। শহরে সম্প্রতি ওদের উপদ্রবও বেড়েছে যথেষ্ট। এই তো দিন কয়েক আগেই খবরের কাগজে চোখ বোলাতে গিয়েই ওরা দেখেছিল, একটা বাচ্চা চুরি করার সময় একজন ছেলেধরা হাতেনাতে ধরা পড়েছে। খবরটা ওদের এই মুহূর্তে ভীষণভাবে বিদ্ধ করতে থাকে। এখন এক-মাত্র উপায়, পুলিশে খবর দেওয়া। অনেক ভেবে-চিন্তে ওরা সেরকমই স্থির করে। ইতিমধ্যে পাড়ার এবাড়ি সে বাড়িতেও খবর চলে গেছে। কিন্তু হদিশ কিছু পাওয়া যায়নি। নিরুপায়। থানায় যাবার তোড়জোড় শুরু হয়।

এমন সময় ওবাড়ির রঘুয়া ছুটতে ছুটতে এসে বললো, আপনাদের খুকুমণি হামাদের বাড়িতে। সবাই অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকালো। এতক্ষণ গোটা পাড়া জুড়ে হৈ-চৈ। অথচ মেয়ের কোন তত্ত্বতল্লাশ পাওয়া যাচ্ছে না। সে এই মুহূর্তে তোদের বাড়িতে হাজির হবে কোত্থেকে? পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখে রঘুয়া কিরকম ঘাবড়ে যায়। সে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে বলে, একজন এসে দেখেই যান না। তাহলেই তো হয়।

একজন নয়, প্রায় সবাই রঘুয়ার পেছন পেছন চললো। বাড়িতে পা দিতেই ও বাড়ির বৌ হাসিমুখে সকলকে অভ্যর্থনা করে, একবার দেখে যান ওদের দুজনের কাণ্ড। বলেই তিনি সকলকে নিয়ে কলতলায় গিয়ে হাজির হন। সেখানে গিয়ে সকলের তো চক্ষু স্থির হবার উপক্রম। দু বাড়ির দুটি কচি মুখে তখন অজস্র হাসির লুটোপুটি। চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে এক নাগাড়ে ওরা জল ঢেলে চলেছে। পুকুরঘাটে জল ছিটানোর আনন্দ অনেকটা মিটিয়ে নিচ্ছে।

সকলেই তখন খুকুকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে বিভোর। এতক্ষণের সব রাগ কখন জল হয়ে গড়িয়ে গেছে। তারপর জল নিয়ে খেলার স্বাভাবিক আনন্দে মেতেছে ওরা। ওর জন্যেই নিজেদের বাড়ির স্নান-ঘরে সব সময় শিকল তুলে রাখা হয়। এবার তাই এসে ভাব জমিয়েছে এ বাড়িতে। এবাড়ির কলতলা এখন ওদের অবাধ জলক্রীড়ার স্থান।

অনেকক্ষণ ধরে সবাই হাঁ করে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছে, মেয়ে দুটোর কিন্তু সেদিকে হুঁশ নেই। ওরা দুজনে পালা করে জল ঢেলে চলেছে। আর মাঝে মাঝে দুজনেই অজানা কৌতুকে হেসে অস্থির হচ্ছে। এবার মা ছুটে গিয়ে খুকুর হাত থেকে জলের মগটা কেড়ে নিয়ে ওকে কোলে তুলে নিল। মায়ের এই আকস্মিক হস্তক্ষেপে খুকু হঠাৎ কিরকম গম্ভীর হয়ে যায়। ব্যাপারটাকে মোটেই সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। ভাবখানা অনেকটা এইরকম, খেলা সবেমাত্র জমে উঠেছে এমন সময় আনন্দ মাটি করার কোন মানে হয়। সে মুখ গোঁজ করে মায়ের কোলে বসে থাকে আর জুলজুল করে সঙ্গী ও জলের দিকে তাকায়। সঙ্গীর দৃষ্টি অনুসরণ করে ও এতক্ষণে আর সকলের উপস্থিতিও টের পেয়েছে। তাই মনে মনে বেজায় চটে গেলেও চুপচাপ। মুখে হাসির আভাষ এনে সকলের রাগ ভাঙাতে চায়।

তোমাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে বারণ করেছি না। কপট-ক্রোধে পিসিমা চোখ পাকায়।

আমি তো আর হারিয়ে যাইনি, ভাঙা ভাঙা কথায় জবাব দেয় খুকু, মান্তুদের বাড়িতে এসে খেলছিলাম। এ আর এমন কি! বলো না মা?

সমর্থনের জন্য মায়ের মুখের দিকে তাকায়। মা রাগের তুফান তুলে বলে, আমাদের বাড়িতে এত জায়গা থাকতে তুমি না বলে কোথাও যাও কেন?

আমাদের কলতলায় যে শিকল তোলা। গাল ফুলিয়ে জবাব দেয় খুকু।

এবার আর সকলে না হেসে পারে না।

সকল খেলার সেরা হলো জল। জল নিয়ে না খেললে সারাদিনের সব খেলার সাধ অপূর্ণ দেখা যায়। আর জল হলেই খেলা কেমন জমে ওঠে। এ হচ্ছে বাচ্চাদের স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। গ্রামে গ্রামে তাই বাচ্চাদের পুকুরঘাট আর কুয়োতলা থেকে আটকানোর জন্য কত চেষ্টা। কিন্তু সকলের সব সতর্ক চোখ ফাঁকি দিয়ে ওরা ঠিক সুযোগ বুঝে জলের ঘাটে গিয়ে হাজির হয়। গ্রামের পরিবেশ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা আমাদের অভ্যাস। আমরা শহুরে। কিন্তু হাঁস যেমন জলছাড়া থাকতে পারে না, তেমনি বাচ্চাদেরও জল চাই। তাই নিজের বাড়ির কলতলায় শিকল উঠলে খুঁজেপেতে আশেপাশের বাড়ির কল-তলায় তখন ওরা নতুন উদ্যমে খেলার নতুন আসর পাতে। বাড়ির উপেক্ষার জন্য এত-টুকু ওদের মাথাব্যথা নেই। ঠিক সেরকমটি হলো এই খুকুর বেলা।

খুকুর এই ক্ষণিক উধাও হওয়ার মুহূর্তে আমি ওর মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে জমিয়ে বসেছিলাম। তারপর যেই না খুকুর সাময়িক হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে সবাই অবহিত হলো, তখন আমারও চমক ভাঙলো। ওদের সঙ্গে আমিও সমান উদ্বিগ্ন ছিলাম। বাড়িতে ঢোকার মুখেই খুকুর হাসিমুখ আমাকে আপ্যায়িত করে-ছিল। এখন আমার মনে হয়, খুকু তখনই বাড়ি থেকে বেরোনোর তোড়জোড় কর-ছিল। তারপর সবাই যখন ওর সম্পর্কে একটু অন্যমনস্ক হয়েছে আর তখনি ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। উপস্থিত হয়েছে মান্তুদের বাড়ি এবং দুজনে মিলে সোজা কলতলায়। তারপরই সেখানে থেকে ঠাকুমার কাছে চালান।

খুকুকে নিয়ে ফিরে এসে গল্পের পুরোন সূত্রটা আর কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এবার কৌতূহলী হয়ে উঠলাম খুকুর সম্পর্কে, যাকে কিনা চোখে চোখে রাখা হয় অথচ সবাইকে ফাঁকি দিয়ে যে আর এক বাড়ির কলতলায় পৌঁছে যায়, তার সম্বন্ধে তখন আমার কৌতূহল উপচে পড়ছে।

খুকুর জলের বাতিকটা কিন্তু বেশ মজার। আমি নতুন প্রসঙ্গ আনার চেষ্টা করি।

মজার খুবই। কেবল আমার পক্ষেই প্রাণান্ত। ওর মা হাসতে হাসতে বলে।

রোজই তো আপনাকে আর এরকম ঝামেলা পোয়াতে হয় না। আমি প্রসঙ্গ দীর্ঘতর করার চেষ্টা করি।
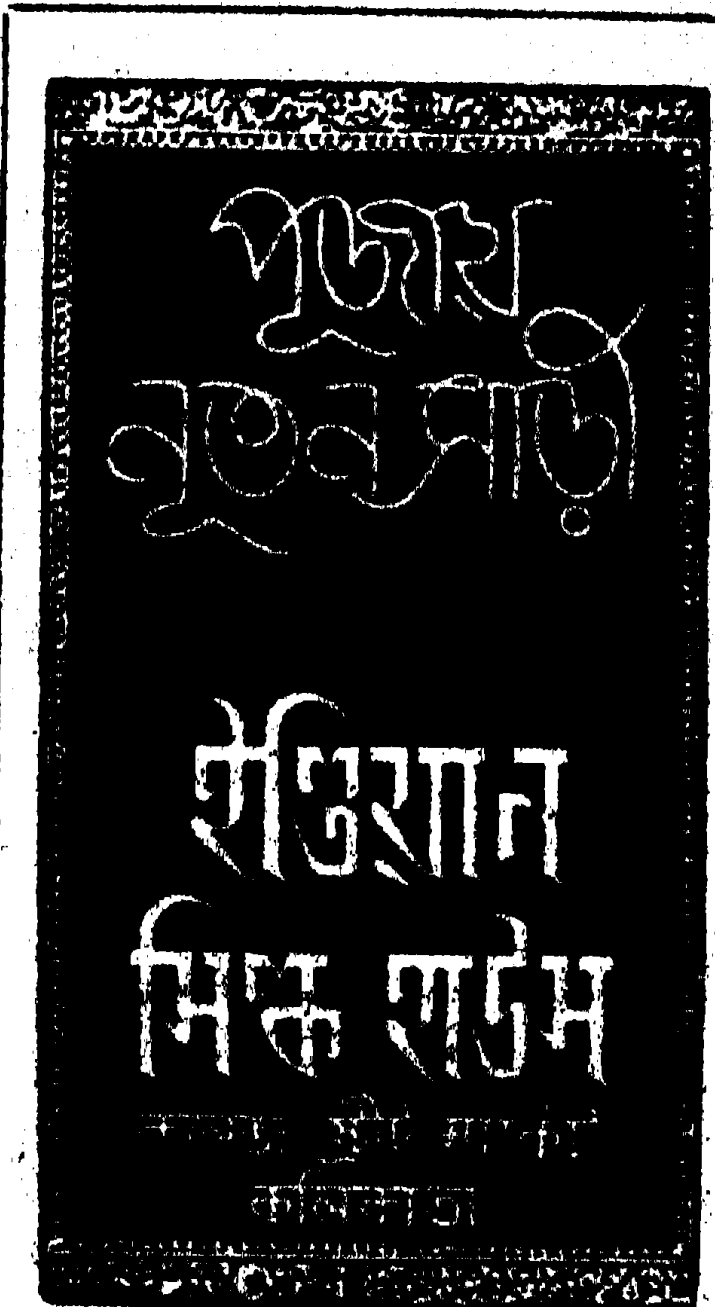
রোজ নয়? সেজন্যই তো কলতলায় শিকল তুলেছি।

তাই নাকি? চোখ কপালে তুলি।

ওর কথা আপনাকে কত বলবো। কিছুটা তো নিজের চোখেই দেখলেন। আগে আগে সারাদিন প্রায় স্নানঘরেই পড়ে থাকতো। নিজের মনে জল নিয়ে খেলা করতো। কখনো কখনো চৌবাচ্চা থেকে আনে করে জলে ফেলতো। কতদিন আমি দেখেছি জল ঢালতে ঢালতে ও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জলের ধারার দিকে। কেউ না ডাকলে ওর ধ্যানই ভাঙতো না। এক-মনে ও এই জল ঢেলেই চলতো। একদিন তো প্রায় চৌবাচ্চার জল অর্ধেক করে ফেলেছিল। জামা-কাপড় ভিজানো তো নিত্যদিনের কান্ড।

আর একদিন জল নিয়ে খেলা চরম ক্লাইম্যাক্সে পেঁাচেছিল। সেদিনও খুকু কলতলা মাৎ করছিল। জল ফেলতে ফেলতে হেসে লুটোপাটি হচ্ছিল। হঠাৎ ওর হাসির আওয়াজ কখন থেমে গেছে। খেয়াল হতেই কলতলায় ছুটে যাই। গিয়ে দেখি মেয়ে চৌবাচ্চায় পড়ে গেছে। জল অবশ্য খুব বেশি ছিল না। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে খুকু। দু-একবার ওঠার চেষ্টা করেছে। কিন্তু না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে উদ্ধারকর্তার আশায়। দেখে তো আমার চক্ষুস্থির। তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নিয়ে আসি।

জল নিয়ে খেলার আবার কত রকম-ফের। একদিন তো দেখি, এক গ্লাস জলে খানিকটা সাবান গুলেছে। তারপর কোত্থেকে জোগাড় করেছে টুকরো প্যাকাটি। তাই দিয়ে সাবানগোলা জলে ভুরভুরি কাটছে। আমি তো ওর কান্ড-কীর্তি দেখে হেসে বাঁচি না। এত হাসির মধ্যেও তবু ভয় ছিল, যদি সাবানগোলা জল ওর মুখে ঢুকে যায়। সেরকম অবশ্য কিছু হয়নি। সেদিনের সেই খেলাটা আমিও বেশ উপভোগ করেছিলাম।

এটা অবশ্য চৌবাচ্চায় পড়ে যাবার আগের ঘটনা। চৌবাচ্চায় পড়ে যাবার পর-দিন থেকেই স্নানঘরে শিকল উঠেছে। তবু কি আটকাতে পারছি। ওর দুরন্তপনায় আমি অস্থির। পুকুরভরা জল পেলে ও যে কি করতো তাই ভাবি। তবু আনন্দ হয়, মেয়েটা যেন আমারই আদলে গড়া। খুকুর মায়ের হাসিমুখে আনন্দের ঝিলিক।

ফটো : সুকুমার রায়

প্রবন্ধে পুরস্কার

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত অ্যাসোসিয়েটেড কাণ্ট্রি উওমেন অব দি ওয়ার্লড-এর ত্রিবার্ষিক প্রবন্ধ ও সূচীশিল্প প্রতি-যোগিতায় বাঙ্গালোরের শ্রীমতী পদম শ্রীনিবাসন তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন এবং শ্রীমতী মীনাক্ষীর প্রবন্ধের বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চল্লিশটি দেশে জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার পর সেইসব দেশ থেকে এই প্রতিযোগিতার জন্য ১৩১টি প্রবন্ধ ও সমসংখ্যক সূচীকর্ম প্রেরিত হয়। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন অল পাকিস্তান উওমেন্স অ্যাসো-সিয়েশনের শ্রীমতী রশিদা প্যাটেল এবং সূচীকর্মে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রীমতী আর ডি ভিলিয়ারস।

প্রবন্ধের বিষয় ছিল, 'ভবিষ্যতের জন্য আমার আশা—মেয়ের কাছে মায়ের চিঠি'। শ্রীমতী শ্রীনিবাসনের প্রবন্ধকে বিচারকরা 'অপূর্ব' আখ্যা দিয়েছেন এবং শ্রীমতী মীনাক্ষীর রচনাপরিকল্পনার নতুনত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তবে বিচারকদের মতে প্রতিযোগিতার জন্য প্রেরিত সকল প্রবন্ধেই পৃথিবীতে শান্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

সূচীকর্মের নমুনাগুলি অ্যাসোসিয়ে-টেড কাণ্ট্রি উইমেন অব দি ওয়ার্ল্ড-এর কেনসিংটনস্থিত প্রধান কার্যালয়ে তিনদিন ধরে প্রদর্শিত হয়। আগামী সেপ্টেম্বরে মিচিগানে এই সংস্থার দ্বাদশ ত্রিবার্ষিক সম্মেলনেও এগুলি প্রদর্শিত হবে।

—প্রমীলা

বন্যা

[উপন্যাস]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আগের ঘটনা

[লীলা বড়ো জেদী, স্বাধীন ও সুন্দরী। ওকে বিয়ে করে সত্যচরণ। কিন্তু তাকে নিয়ে হয়তো লীলা সুখী ছিল না। এমন সময় সুখেন এল। সত্যর বাল্যবন্ধু। বাউন্ডুলে। জুয়া আর মদ অন্যতম সঙ্গী তার।

সত্যর সংসারে ঝড় উঠল।

রূপপুর ছাড়ল সত্যচরণ। এল রাণীচক। ঘরে যমুনাও এল। রান্নাবান্নার জন্যই তাকে রাখা। সে নব-যুবতী।

সুখেন এবার রূপপুরে। লীলার কাছে আশ্রয় পেল। ঘনিষ্ঠ হল ওরা। লীলা সুখেনের প্রেস কিনল।

সত্য আর লীলার ডিভোর্স হল।

যমুনাকে নিয়ে ঘর বাঁধা মনস্থ করল সত্যচরণ। যমুনা তখন অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু প্রবল বাধা এল সত্যর দিদির কাছ থেকে। সে এক ভয়ংকর যন্ত্রণা সত্যর।

এদিকে লীলাও রূপপুর ছেড়ে শহরে এল। সুখেনের প্রশ্ন, তবে কি লীলাকে নিয়ে সে চোরাবালির উপর ঘর বাঁধছে? একদিন সরাসরি লীলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল। লীলা জবাব দিল না। সুখেন ফিরে এল আড্ডায়।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৬)

লীলা সুখেনকে বলেছিল, শংকরবাবু বিয়ে করতে বলেছেন, এটা খাঁটি মিথ্যা কথা। লীলার বানানো। শহরে সুখেনের বদনাম আছে। গোড়া থেকেই তিনি ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব ব্যাপারে লীলাকে সাহায্য করেছেন। এর পিছনে যা আছে, তার নাম স্বার্থ। টাকা-পয়সার স্বার্থ।

লীলা বুঝতে পারেনি যা এখনও বোঝে না তত বোকা নয়। সে জানে তার সম্পত্তি হস্তান্তরের সময় শংকরবাবু অনেক টাকা পকেটস্থ করেছেন। এমনকি তার বিশ্বাস, এখনও যেটুকু আছে—তা গ্রাস করার মতলব ও'র মাথায় নিশ্চিত আছে।

কে জানে এ বাড়িটার দাম আদতে কত টাকা পেয়েছেন সে মুসলমান ভদ্রলোক! লেনদেন সবই তো শংকরবাবুর মারফৎ হয়েছে!

সম্প্রতি সজল এসে বলে গেছে, শংকরবাবুর লোক রূপপুরে আনাগোনা করছে খুব। হরুকে নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে, ফিরে এসে মণ্ডলপাড়ায় কী সব ফিসফিসানি চালাচ্ছে—ব্যাপারটা রহস্যময়! বেনামে জমি কিনেছে কি না শীগগীর বোঝা যাবে অবশ্য।

লীলার বুক কেঁপেছিল।

দলিলপত্রের ব্যাপার সে একটুও বোঝে না। মোট কতখানি জমিজায়গা ছিল, সে ধারণাও তার স্পষ্ট নয়। হরুকে হাত করেছে বোঝা যাচ্ছে। তাহলে আর কাকে বিশ্বাস করা যায়? বাবার মত শ্রদ্ধা করে যাকে, ছেলেবেলা থেকে যাকে আদর্শ মানুষ বলে জেনে আসছে, সে যদি এমন হয়, সংসার চলবে কেমন করে?

সজল এসে গ্রামের ভালমন্দ অনেক খবর দিয়ে গেছে।

মন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল লীলার। কী আশায় সে এখানে এসে পড়ে আছে? ভালবাসা? শুধু ভালবাসা? চারপাশে অচেনা মুখ, প্রতিটি মুখে যেন ষড়যন্ত্রের ছাপ, লীলা মধ্যে মধ্যে বড় ভয় পায় কারণ-অকারণে।

শংকরবাবু প্রায়ই আসেন বিকেলের দিকে। কোর্ট থেকে ফিরে সটান লীলার বাড়ি। কিন্তু আজকাল হঠাৎ যেন সুখেন তাঁর দু চোখের বিষ হয়ে উঠেছে। শুধু সুখেন সম্পর্কে হুঁসিয়ারী দেওয়া ছাড়া আর কথা নেই।

চলে গেলে লীলা ফেটে পড়ে। কেন, ওর পিছনে লাগা কেন? তুমি যে সাধু মহাত্মা, সেও আমার জানতে বাকি নেই!

বাসিনী বলে, কার কথা বলছ গো?

লীলা সব খোলাখুলি জানিয়ে দেয় ওকে। শুনে বাসিনী মাথা নেড়ে বলে, হুঁ হুঁ বাবা। তখনই মনে মনে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। ও বুড়ো সহজ নয়—অজগর। ও নির্ঘাৎ গেলবার তালে ঘোরে। তা বুঝলে দিদি, আমি একটা কথা বলছিলাম—রাগ করবে না তো?

রাগ করব কেন? হঠাৎ লীলার চোখ ফেটে জল আসে।... ছেলেবেলা থেকে তুমি আমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছ বাসিনী—তুমি না থাকলে আমি এখানে হাঁফিয়ে উঠতাম। মা নেই, কিন্তু তুমি আছ।...

ঘন্টার সামনেই বাসিনী বলে মা বলেই জেনো বাছা। তাই তো বলছিলাম এ পথ ভালো পথ নয়। সব তো প্রায় ঘুচিয়ে দিলে কানাকড়িতে। এখনও যা আছে, তোমার হেসেখেলে চলে যাবে। রূপপুরে ফিরে চল তুমি।

যাবো? লীলা হাল ছেড়ে দেয় যেন।

ঘন্টা বলে, দিদিমণি। ও বুড়ির কথা শুনো না। কী আছে গেরামে বলদিকি?

ও রে ছোঁড়া! বাসিনী হাঁকরায়।... শউরে বাবু হয়েছিস, তাই না? চুলে টেড়ি বাগাচ্ছিস, টিকীবাজী দেখাচ্ছিস পরের ঘাড়ে—তোর আবার কী রে ড্যাকরা?... আমি দিদি হাঁফিয়ে উঠেছি। আর একটুও মন বসে না। তুমি গেরামেই চল। ও শেয়াল-খেকোর কথা শুনো না।

ঘন্টা হাহা করে হাসে।... কেনে? তখন যে শহরের নাম শুনেই পানের পিক ফেলতে আর চুলে লাঙল চষতে আনন্দে?... উ হু হু, বাসিনীদির সে কি সাজগোজের ঘটা গো! যেন বামুনবাড়ির লক্ষ্মীটি যাচ্ছে কোথায়? না টাউনে! এরই মধ্যে সব ভুলে শুকোল মুখ থেকে, সে কি কথা গো!

ঘন্টা মুখে যাই বলুক, লীলা দেখেছে, ও যখন তখন চুপচাপ বসে থাকে, বিমর্ষ-মুখে। আকাশ দেখে। সামনের মাঠটায় বাচ্চা ছেলেদের মত কী খুঁজে বেড়ায়। ফিরে এসে আনমনে বসে থাকে আর হাতে তার একমুঠো ঘাস, ফুল খুঁটিয়ে দেখে। খাঁচার পাখির মত তাকায়।

কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ আর বিষণ্ণ হয়ে ওঠা বাড়িতে সুখেন এসেই প্রাণ সঞ্চার করে। সে এসে বলে, ব্যাপার কী সব! চুপচাপ যে!

এবং তখনই লীলা বন্যার ভেসে যেতে-যেতে একটা গাছ পেয়ে আঁকড়ে ধরার সুখে সুখী হয়। সুখেন এত অদ্ভুত সব গল্প বলে যে ওরা সবাই না হেসে পারে না।

অপরিচিত মানুষের কিছু আরও অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

ওরা দুজনে ছবি দেখতে গিয়েছিল। শো ভাঙবার পর সুখেনের ইচ্ছে ছিল, লীলাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বসবে। লীলা ওকে খেলাচ্ছে বেশ। কথা দিয়েও কথা রাখবার কোন লক্ষণ নেই। সুখেন ভাবে, কোন জাঁকজমক হইচই বা লোক দেখানো জড়ং করা ঠিক নয়—জানা-শুনো দু'চারজন নিয়ে একটু ছোট্ট অনুষ্ঠানমত করা যেতে পারে। ব্যাপারটা তো নিছক মন্ত্র পাঠের। সে পুরুতও মনে মনে ঠিক করা আছে তার। আজ এসব কথা বলার জন্যই সে একটা উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজছিল। সুখেন জানে, ঘরের বাইরে এলে নির্জন রাতের পরিবেশে লীলা কেমন যেন আশ্চর্য বদলে যায়। তখন ওকে দিয়ে সব কিছু করানো সহজ হয়ে ওঠে।

ইণ্টারভ্যালের সময় সিগ্রেট খেতে সে বাইরে এসেছিল। সেই সময় হঠাৎ সত্যর সঙ্গে দেখা।

সুখেন দেখেও না দেখার ভান করল। মুখ ফিরিয়ে সিগ্রেট টানছিল সে। সত্য তাহলে এখনও সেই মেয়েটিকে নিয়ে সিনেমায় আসে!

সত্য এগিয়ে এসে বলল, সুখেনবাবু না?

সুখেন ফিরে দাঁড়িয়ে হাসবার চেষ্টা করল। সত্যর মুখে বাবু সম্ভাষণ শুনেও নয়, ওর চেহারায় ওর কণ্ঠস্বরে কী একটা ছিল—সুখেনের বুক ছাঁৎ করে উঠেছিল। একটা ময়লা ধরনের পাঞ্জাবি গায়ে পরেছে সত্য। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। মুখভরা খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি। ওর চেহারায় দারুন ময়লা জমেছে। সবচেয়ে খারাপ লাগে চোখদুটো। আলোর ছটায় চোখদুটো ভীষণ উজ্জ্বল আর হিংস্র দেখাচ্ছিল। সুখেন বলল, তোকে দেখে ইচ্ছে করেই আলাপ করতে আসিনি। ভাবলাম, দেখি, ও কী করে!

সত্য হাসল না। হাত বাড়িয়ে আচমকা ওর হাতটা ধরে বলল, একটু ওদিকে চল, কথা আছে।

সুখেনের মুখ শুকিয়ে গেল। কী চায় সত্য? সে চারপাশে তাকাল। ইণ্টারভ্যালে অজস্র লোক বেরিয়ে এসেছে হল থেকে। এখানে ওখানে জটলা করছে। এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় তিন পাশে দোকানপাট, অন্য দিকটায় একটা ছোট্ট ভাঙা পাঁচিল—তার ওদিকে বন্দপ্তরের সেই লালিত বনটা, যার নীচে গঙ্গা। কেন? সুখেন গলা ঝেড়ে বলল, কেন? কী কথা?

ভাঙা পাঁচিলের কাছে ভীষণ দুর্গন্ধ। অনেকে বসে বা দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করছে দেয়ালে। সুখেন নাকে রুমাল ঢেকে বলল, কী কথা. ভাই সতু, এখানে না এলে বলা যাবে না?

সত্য বলল, তোমাকে আমি কিছুদিন থেকে ভীষণ খুঁজেছি। প্রেসে খোঁজ নিয়েছি—নেই। জগদীশের দোকানে গেছি—নেই। আর যে সব আড্ডায় তোমাকে দেখেছি—সবখানে খুঁজেছি। সবার [illegible]

কথা কেড়ে সুখেন বলল, তা কি! আমি তো বাইরে কোথাও যাইনি।

সত্য বলল, থাকগে। শেষ আশা ছিল এখানটা। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে দেখতে এসেছিলাম। পেয়েও গেছি।

তা কথাটা কী? ওদিকে বেল দিয়ে ফেলবে। সুখেন চেষ্টা করে নিজের অস্থিরতাটুকু দমন করছিল। নে, সিগ্রেট খা! আমরা সেই একই আছি রে ভাই—তুই-আমি একই অবস্থা। দুঃখ করে কী হবে বল্। মেয়েরা ওইরকমই হয়—কত দেখলাম এ জীবনে!

সত্য সিগ্রেট নিল না। বলল, তোমার কাছে আমি অনেক টাকা পাই। অ্যাদ্দিন চাই নি। এখন টাকার আমার বড় দরকার। দিতে হবে।

সুখেন হাসিমুখে ওর দিকে তাকাল। এই কথা! আমি ভাবলাম, লীলাটীলা কী একটা হবে। হ্যাঁ রে সতু, সেবারও তোকে বলেছিলাম, এখনও বলছি, ওকে নিবি? দুচোখের দিব্যি. ও একটা বুনো পায়রা! জোর করে ধরলেই জব্দ—তখন দে না খাঁচায় পুরে। বল্ নিবি ওকে?

সত্য বলল. টাকাটা কবে দেবে?

সে হচ্ছে। সুখেন রুমালে মুখ মুছল। চাপাস্বরে ফের বলল, ও এখন হলে আছে। ডেকে এনে ভাব করিয়ে দেব? মামলা করেছিল, ডিভোর্স নিয়েছে—তাতে কী হয়েছে রে? আসলে তো একটা কসবী! গায়েটায়ে একটু পটালেই গলে জল হয়ে যায়।

সত্য কঠোর মুখে বলল, সুখেনবাবু, তোমাকে আমি চিনি। ওসব কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। তুমি টাকা কখন দিচ্ছ বল!

সুখেন তেতে উঠল। কী টাকা টাকা করছিস! কত টাকা পাবি তুই?

দু'হাজারের বেশি।

দু'হাজারের বেশি! পাগল হয়েছিস? অত টাকা কখন দিলি আমাকে?

টাকা দেবে কি না জানতে চাই। সত্যর স্বরটা চড়া শোনাল।

সুখেন দমে গিয়ে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিল। ইণ্টারভ্যাল শেষ হয়েছে। বেল বাজছে। লোকজন একে একে চলে যাচ্ছে। তেমন চেনা মুখ আশেপাশে কাকেও দেখছে না সে। আজ কোন পার্টিই আনাচে-কানাচে নেই! সে বলল. ঠিক আছে। কাল-পরশুর মধ্যে প্রেসে আয়। পাবি।

হঠাৎ সত্যর জেদ চড়ে গেল। সে বলল, কালপরশু নয়। আমি এখনই চাই।

বাজে বকো না। বলে সুখেন চলে আসতে চাইল। কিন্তু সত্য ফের তার হাতটা ধরল। দুজনে অল্পস্বল্প ধস্তাধস্তি হচ্ছিল। দোকানপাট থেকে কৌতূহলী লোকেরা এবার এগিয়ে আসছিল। দেখতে দেখতে মোটামুটি ভীড় জমে গেল।

[illegible] যা হয়! কেউ মজা দেখে, কেউ মধ্যস্থতা করে। কিন্তু হঠাৎ ভীড় সরিয়ে লীলা চলে এসেছে। ছবি আরম্ভ হয়েছিল কেন। কিন্তু তখনও [illegible] [illegible]

[illegible] পাত্তা নেই দেখে সে বাইরে [illegible]। এসেই সব দেখতে পেয়েছে

লীলা সুখেনের একটা হাত [illegible]। সত্যর অন্য হাত ধরেছে সঙ্গে। সে এক হাস্যকর ব্যাপার। টাগ [illegible] ওয়ারের কেন্দ্রে সুখেন প্রায় মারা [illegible] আর কী!

হঠাৎ লীলা বলে উঠল, ওকে [illegible] করুন তো আপনারা, বন্ধুকে যে টাকা দিয়েছিল, সে টাকা কার? সে টাকা [illegible] না নিজের রোজগার করা টাকা, [illegible] অন্যের টাকা? তবু টাকা ও পাবে। [illegible] সঙ্গে আসুক, এক্ষুনি সব দিয়ে দেব

নাটক জমে ওঠার আগে সত্য [illegible] ঠেলে বেরিয়ে গেল।

দুজন কনস্টেবল এসে পৌ[illegible] ততক্ষণে। ভীড়টা সরে গেল। ত[illegible] সুখেনকে নিয়ে লীলা সোজা [illegible] রিকশোয় উঠেছে। পিছনে অজস্র টিটকি[illegible] অদ্ভুত সব মন্তব্য—সুখেন মুখ নীচু [illegible] বসে থাকল মাত্র।

বাড়ি ঢুকে লীলা বলল, এ [illegible] এক্ষুনি তুমি রাণীচকে যাও। টাকা দি[illegible] ও যতক্ষণ না পৌঁছোয়, তুমি কে[illegible] অপেক্ষা করো। বরং পিনাকীবাবুর [illegible] যেও। তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে [illegible] যেও।

টাকাগুলো ভিতর পকেটে রেখে সু[illegible] বলল, টাকাটা প্রেস কেনার সময় [illegible] ছিলাম। লীলা ধমক দিয়ে বলল, [illegible] আর কৈফিয়তে কাজ নেই। যা বলছি [illegible]

সুখেন বেরল। কচি ছেলের মত মু[illegible] তার কাঁচুমাচু দেখে লীলার মনটা [illegible] হয়ে গেছে।

(২৭)

জেলখানা ডান পাশে রেখে এ[illegible] সুখেন। সামনে এক টুকরো ফাঁকা জা[illegible] পাশে বিরাট বটগাছ। গাছটার নীচে যে[illegible] সে দেখল অহীন একটা সাইকেল [illegible] দাঁড়িয়ে আছে। গাছের পাতার ফাঁক [illegible] পথের ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলো এসে [illegible] সাইকেলের ওপর পড়েছিল। হাত[illegible] চকচক করছিল। নতুবা অহীনকে সে [illegible] করত না।

সুখেন কাছে গিয়ে ডাকল, অহী[illegible] এখানে কী করছ?

অহীন ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। [illegible] চমকে উঠল ওকে দেখে। সুখেনদা!

এখানে দাঁড়িয়ে কেন? জগদীশে[illegible] ওদিকে যাওনি আজ?

নাঃ। অহীন কেমন হাসল। এদি[illegible] কোথায় যাচ্ছেন?

বন্ধুর বাড়ি যাব। এস। যাবে?

বন্ধুর বাড়ি? নাঃ, আপনি যান।

সুখেন রসিকতা করে বলল, কে[illegible] আসবে বুঝি? তারপর ওকে জোর ক[illegible] টানল। ছেড়ে দাও, এস।

অহীন সাইকেলটা ঠেলে বলল, আপ[illegible] [illegible] মাটি করে [illegible]

তুমি কেন [illegible]?

অহীন চলতে থামল। বলল, যান, চলুন। বন্দুর ওখানেই যাই। ওর [illegible] কাইণ্ড ফুলেছে, দেখা যাবে।

অহীনের সঙ্গে দেখা হয়ে একরকম ভালই হল। সুখেন ভাবছিল। বন্দুর ওখানে বসে ওকেই পাঠাবে খবর। ডেকে আনবে জগদীশকে। উঃ, কদিন থেকে ওমুখো হতে পারছিল না সে। হাতে বড় প্রেস থাকায় টাকা আজকাল পাওয়া সহজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানে সময় চোখ বুজে যে সর্ত করে বসে, অনেক সময় তা মারাত্মক। পুরো এক ওয়াগন সাইকেলের পার্টস মাত্র দু হাজারে পাওয়া যাচ্ছিল। লালু ঝোঁকের মাথায় ওতে রাজী হয়েছিল। কারণ তক্ষুনি হাতের সামনে কড়কড়ে নোটের বাণ্ডিল। পরে গাইগুঁই করলেও আর পাত্তা দেয় নি সুখেন। তবে সাবধান থাকতে হবে। ও জাতসুন্ডা—তাতে এলাকার ওয়াগান ব্রেকারের পুরো দলটাই ওর হাতে।

টাকাটা ধার দিয়েছিল জগদীশ। এক দিনের সর্তে। ভাগ্যিস, আজ সন্ধ্যা এসে পড়েছিল এদিকে।

গলিপথে কিছু দূর গিয়ে ওরা থামল। ফেল্টুদা আসছে। বেশ টলতে টলতে আসছে। এসেই তো পকেটে হাত দেবে সুখেনের। সুখেন বিরস মুখে বলল, শালা চামনা!

অহীন কী বলতে যাচ্ছিল, ওর হাত ধরে টেনে বাঁদিকে গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল সুখেন। ফেল্টুবাবু ছড়ি হাতে চলে গেল। লক্ষ্যও করল না।

অহীন বলল, ওঁকে দেখে লুকোলেন যে?

সুখেন চাপা স্বরে বলল, কাছে টাকা আছে।

জগদীশের টাকা দিয়েছেন? অহীন প্রশ্ন করল হঠাৎ।

না। আজই দেব। কেন? ও কিছু বলছিল নাকি?

অহীন হাসল। শাসাচ্ছিল। পুলিশকে লেলিয়ে দেবে টাকা না পেলে।

সুখেন দাঁত কিড়মিড় করে বলল, কবে শালার চালচুলোকে দিতাম উড়িয়ে! কেবল রক্ষে করল ওই ছুঁড়িটা। একটা সুন্দর চাল পেতে রেখেছে মাইরি!

অহীন বলল, শিবির কথা বলছেন? শিবিকে আপনার ভাল লাগে?

কেন লাগবে না? সুখেন এবার হাসল খিকখিক করে। তোমার লাগে না?

অহীন একটা অশ্লীল উক্তি করে বসল শিবানীর নামে। সুখেন অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে। এত সুন্দর শান্ত ভদ্র ছেলের মধ্যে একটা বিষপোকা বাস করছে! কেন সে হঠাৎ অবাক হল, বুঝতে পারল না। বুঝতে পারল না, মাঝে মাঝে অহীনকে দেখে কেন তার বড় মায়া হয়। ওর বাবা ছিল রোডস ডিপার্টের ওভারসীয়ার। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে মারা যায়। মা অনেক কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেই হঠাৎ কলেজ ছেড়ে দিল অহীন! তৈরী পোষাকের দোকানে [illegible] কিছু দিন। প্রশ্ন করলে বলেছে, কী করি!

ঘরে তিনটি ধিঙ্গি বোন—দুজন ওর বড়, তৃতীয়টি ছোট। সবার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। বড় দুজনে স্কুল ফাইনাল পাশ করেই ক্ষান্ত দিয়েছিল। ছোটটি এখনও ছাত্রী। তবে রমা আর শোভার চেয়ে অনু দেখতে সুন্দর। অবিকল অহীনের মত।

বন্দুর বাড়ি রেল লাইনের ওপারে। একটু ঘুর পথেই যাচ্ছিল ওরা। জগদীশের দোকান এড়িয়ে যেতে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

দু পাশে ছড়ানো-ছিটানো ঘর-বাড়ি। বিস্তর ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে। বড়-ছোট অজস্র গাছ চারদিকে। চওড়া রাস্তার দু পাশে শিরীষ দেবদারুর সারি। দূরে-দূরে ল্যাম্পপোস্টে বাতি জ্বলছে। একটা পাণ্ডুর আলো—জ্যোৎস্নার মত পড়ে আছে পথে। কোথাও ছায়া জমে আছে। চলতে চলতে সুখেন বলল, দিদিদের কাজটাজ কিছু জোটাতে পেরেছ?

না। তেমন সুবিধেমত কিছু হচ্ছে না। ছোড়দি একটা প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী অবশ্য পেয়েছিল। সে অনেক দূরে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। যাতায়াতের ভাল পথ নেই। তাছাড়া আবহাওয়াও ভাল না গ্রামটার। মা যেতে দিল না। মেজদি কল্যাণীতে কী একটা ট্রেনিং-এর চান্স পেয়েছে! সেপ্টেম্বরে ওদের সীজন শুরু হবে, তখন যাবে।...অহীন জানাল।

ও। সুখেন একটু কেসে বলল। যদি অসুবিধে না হয়, তোমার মাকে একবার বলে দেখতে পারো, আমি একটা কিছু দিতে পারি। মাইনে মন্দ হবে না।

কিসে?

কাজটা বাজে। তবে নিজে হাতে তো কিছু করছে না। যারা করবার করবে, ও শুধু একটু দেখাশুনা করবে মাত্র। এখানে-ওখানে যেতে হবে কখনও।

কী কাজ?

আমার প্রেসের সঙ্গে একটা বাইণ্ডিং কনসার্ন খুলব, ভাবছি। ঠিকে দপ্তরী দিয়ে সময়মত কাজ হয় না। অনেক মাল রিজেক্ট করে পার্টি। বেশির ভাগই তো সরকারী অর্ডার। বুঝতেই পারছ। একটু দেখা-শোনা, একটু ঘোরাঘুরি—মানে ডেলিভারীর সময় নিজে যাওয়া—ওতেই কাজ হবে।

অহীন একটু উৎসাহ দেখাল। তা, মন্দ হবে না।

সুখেন সিগ্রেট ধরাল। অহীনকেও দিল।...তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মত। এক জায়গায় আড্ডা দিই, মাল টানি, তাস-পাশাটা খেলি,—তাতে কী হয়েছে? তোমাকে দেখে খুব কষ্ট হয় আমার অহীন, ঈশ্বরের দিব্যি।

অহীন একটু হাসল মাত্র। সে সুখেনকে অগাধ টাকার মালিক বলে জানে।

সুখেন বলল, ভদ্রবংশের শিক্ষিত ছেলে তুমি। তোমাকে বোঝাব কী ভাই, যা শালা দিনকাল পড়েছে, বলার নয়। [illegible] একটা রিয়েল বেঁচে থাকতে হবে। [illegible] অ্যাবিলিটির কোন মূল্য আজকাল নেই।

অহীন মাথা নেড়ে সায় দিল।

রমা অবশ্য বেশ চালাকচতুর মেয়ে বলেই মনে হয়। ও পারবে। [illegible] আপত্তি হলে ওকে যদি পাঠাই, তো কথাই নেই।...সুখেন [illegible] [illegible] কথা বলতে থাকল।

অহীন আজ রাতেই [illegible] [illegible] [illegible]। বসে থাকার চেয়ে মাসে একগোটা টাকা—এ সুযোগ সহজে আসে না।

বন্দুর বাড়ির দরজায় এসে সুখেন বলল, কথাটা কিন্তু প্রাইভেট। অনেকে আমার কাছে এসেছে খবর পেয়ে। কাকেও পাত্তা দিই নি।

বন্দু বাড়ি ছিল। কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এল। পুরো সাড়ে ছফিট উঁচু, ডন-বৈঠককরা শরীর, গলায় চাঁদির তক্তি, গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জী, পরনে একটা কালো প্যান্ট। ওর বেল্টটা আস্ত নিকেলের। এ শহরের খুব কম লোকই বাস্তবত বোম্বে গেছে, এমন কি বন্দু নিজেও না—তবু লোকে ওর নাম দিয়েছে বন্দু। সম্ভবত বোম্বে সিনেমার ডাকাত হিরোর সঙ্গে মিলিয়ে। এটা লোকে দেখেছে ছবিঘরে।

সুখেনদা যে। বন্দু হাসল। হাসিটি বড় অমায়িক।

সুখেন বলল, ভাবছিলাম, বাড়ি আছো কিনা। চল, বলছি।

বন্দু আর যাই হোক, তথাকথিত সোজা বদমাইস নয়—সেরকম কোন দুর্নাম তার নেই। কিন্তু বিপদে-আপদে লোকে ওর কাছে উপকার পায়। ওর একটা ক্লাব আছে। দরকার হলে চেনাজানা-জনসমেত বেরিয়ে পড়ে বন্দু। তাছাড়া, ও রীতিমত ভদ্র। ওর চোখে গরীব বড়লোক বলে কিছু তফাৎ নেই। অন্যের ন্যায়-অন্যায় বোধের সঙ্গে ওর ন্যায়-অন্যায় বোধের তফাৎ আছে প্রচণ্ড। কোন পক্ষ যে ও নেবে, এটা তাই আগে থেকে বলা মুশকিল। তবে যে পক্ষে দাঁড়াবে, সে পক্ষ তো বলবেই বন্দু উপকারী মানুষ!

বন্দুর ঘরে সুখেন বসে রইল। অহীনকে পাঠাল জগদীশকে ডাকতে। টাকাটা বন্দুর সামনে দেওয়ার উদ্দেশ্য আছে। জগদীশ বা পাজী, সুযোগ পেলে দুর্বল লোককে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ে। ক্যাশ বসে হাত হলে, টাক দিব্যি যোগায়। কিন্তু দশ টাকা দশ আদায়ের ফিকিরে থাকে। সুখেন আগে কম খেসারৎ দেয় নি! যেমন অস্বীকার করে জগদীশ বলেছে, কই, টাকা দিলে? চালাকির জায়গা পেলে মুশকিল হচ্ছে, ওরও একটা দল আছে লালু তো পা-চাটা কুকুর। তার পুলিশমহলে ওর খাতির অসাধারণ। সু জানে, ও একটা টাউট।

তা সত্ত্বেও চোরামাল কিনল ওর সামনে, এমন কি টাকা ধারও নিল ওর কাছে—এ সাহসের একমাত্র কারণ, লালু। লালুর ব্যাপারে জগদীশ তার মরা বাবার প্রেতমূর্তির সামনেও কিছু খবর পাচার করতে নারাজ। লালুকে ও এত ভয় করে!

সুতরাং একটু আগে সুখেন যে অহীনকে বলছিল, জগদীশের শক্তি হচ্ছে তার মেয়ে শিবানী বা তার যৌবন সেটা নিতান্ত কথার কথা। অহীনও হয়ত তা বোঝে। ও আড্ডায় সে নতুন হলেও, লেখাপড়া সবার চেয়ে বেশি জানে। তাই অনেক ব্যাপারে তার বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর বিশ্বাস ওদের সবারই আছে।

সুখেনের মনে হল, এ সময় অহীনকে হঠাৎ পাওয়াও তার পক্ষে ভাল হয়েছে। ওর বোনকে চাকরী সে দেবে। অহীনের মত ছেলেকে এই অন্ধকার পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হিসেবে পাওয়া এক-রকম ভাগ্যের কথা। কারণ, এ পাতাল-পুরীতে যারা চার পাশে থাকে, তারা মানুষের সব গুণগুলো হারিয়েই এখানে এসেছে। এমন কি হয়ত সে নিজেও। এবং এদের কাকেও বিশ্বাস করা যায় না। অহীনকে এখনও বিশ্বাস সে করতে পারে হয়ত। অহীন এখনও অনেক ভাল জিনিষ তার পকেটে নিয়ে ঘুরছে। এখনও সব খুইয়ে বসে নি।

বন্ধু সব শুনে একচোট হাসল। ব্যাটা জগাটা এমন শয়তান জানতাম না তো! কিন্তু সুখেনদা, কাজটা ভাল করেন নি। ওকে জেনে-শুনে ওর কাছে ধার করলেন, আবার ওর সামনেই চোরামাল কিনলেন...

সুখেন বলল, ঝোঁকের মাথায় ওটা হয়ে গেছে ভাই। এখন পস্তাচ্ছি। একে তো ওগুলো সামাল দেওয়া এক ঝঞ্ঝাট, তার ওপর আমি তো এখন জগদীশের কাছে দুধেল গরু।

বন্ধু গম্ভীর মুখে বলল, ব্ল্যাকমেল করবে বলছেন?

ঠিক তাই। সুখেন চিন্তিত মুখে বলল। আসলে কী জানো, এ ব্যাপার এর আগে কখনও করিনি। চোখের সামনে অনেকবার লালু মাল পাচারের ব্যাপারে দরদস্তুর করেছে পার্টির সঙ্গে, আমাকেও অফার দিয়েছে, উৎসাহ দেখাই নি। এক-বার, শুনলে হাসবে, এক বস্তা গাঁজা নিয়ে আমার প্রেসে হাজির। জলের দামে দিতে চাচ্ছিল। রাখতে পারি নি। হঠাৎ এবার কেমন লোভ হয়ে গেল।

অহীনের সাইকেলের ঘন্টা বাজল বাইরে। বন্ধু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। অহীন বলল, জগদীশ এল না! বলল, কী দরকার? সকালে যাব।

বন্ধুর ইজ্জতে লাগবার কথা। খোঁচ খোঁচ করে বলল, আমার নাম করেছিলে? বলেছিলে, আমি ডেকেছি!

অহীন বলল, হ্যাঁ। সুখেনদা তো সব

সুখেন বলল, ভুল করে, আমি এখানে আছি, বলোনি তো?

পাগল! অহীন জবাব দিল। তা কেন বলব?

সুখেন মাথা চুলকে বলল, শালা আঁচ করেছে ব্যাপারটা। দারুণ গভীর জলের মাছ কিনা! এখন বন্ধুভাই, কী উপায়? তোমার কথাই শোনা যাক।

বন্ধু ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুখেনের কথা শুনে সোজা হয়ে বলল, মাল কোথায় আছে?

সুখেন একটু ইতস্তত করে বলল, আমার এক মাসির বাড়ি।

সেটা কোথায়?

এখান থেকে মাইলখানেক দূরে। একটা কলোনীর মধ্যে।

কিসে নিয়ে গিয়েছিলেন?

এ যে দেখছি, উকিলের মত জেরা করে! সুখেন বিরক্তি চেপে বলল, ট্রাকে।

কার ট্রাক?

তাও বলতে হবে? সুখেন হাসবার চেষ্টা করল। মহীউদ্দিনকে চেনো? তার।

ও! মাসি বিশ্বাসী? কেমন মাসি?

পাতানো মাসি।

এক কাজ করুন। গনশার লরীটা ওর বাড়ির দোরে আছে। এক্ষুনি মাল তাতে চাপিয়ে আমার এখানে রেখে যান। রাখবার জায়গা আছে ভালো। গনশাকে গিয়ে বলুন, আমি ডেকেছি। সে এলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সুখেন ঘেমে উঠে বলল, তারপর? জগদীশের টাকা?

দেবেন না। দেখি, শালা কী করে! আমি ডেকেছি, তবু এল না শুয়ারটা! কী স্পর্ধা!

বন্ধুর চরিত্র এইরকমই। সুখেন জানে। সুতরাং নির্দ্বিধায় ওকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু পরে যে-পার্টি আসবে, তারা বন্ধুর বাড়ি থেকে মাল নিতে চাইবে কি? জায়গাটা খুব ফাঁকার মধ্যে—কাছেই পুলিশের ফাঁড়ি আছে একটা। যাই হোক, সেটা পরে দেখা যাবে। আগে পার্টি ঠিক হোক, তারপর সে-ভাবনা। তাছাড়া বন্ধু যখন নিজে থেকেই বলছে!

সুখেন বলল, অহীন, আমার সঙ্গে চল ভাইটি।

অহীন একটু ইতস্তত করছিল। আমার খুব দেরী হয়ে যাচ্ছে সুখেনদা। এক জায়গায় যাবার কথা ছিল।

বুদ্ধিমানের মত বন্ধু বলল, ঠিক আছে। ও যাক না। ওকে ছেড়ে দিন। এ কাজে একা ভালো।

দুজনে একসঙ্গেই বেরলো বন্ধুর বাড়ি থেকে। পথে এসে অহীন বলল, অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে উঠল মনে হচ্ছে সুখেনদা! তখন আসবার সময় জানলে, আপনাকে আমি নিষেধ করতাম এখানে আসতে। বন্ধুর গায়ে জোর আছে, দল-বলও আছে—কিন্তু ওর বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম। পালোয়ান হলে যা হয়, আর কী!

সুখেন সিগ্রেট ধরাল। অহীনকেও দিল। বলল, যা আছে ভাগ্যে, হোক। তুমি কিন্তু ভাই স্পীকটি নট।

অহীন হাসল। পাগল!

পরস্পর আলাদা পথে চলবার মুহূর্তে সুখেন বলল, তোমার ছোড়দির কথাটা কিন্তু ভুলো না!

(২৮)

যমুনা জেগে ছিল। দরজা খুলে দিল। সত্য নিঃশব্দে বাড়ি ঢুকলে সে প্রশ্ন করল, এত রাত হল যে?

সত্য জবাব দিল না। তেমনি নিঃশব্দে জামা খুলল। ধুতি বদলে লুঙ্গি পরল। তারপর বারান্দার চেয়ারে গুম হয়ে বসে থাকল।

বাইরে অন্ধকার থমথম করছে। বেশ ভ্যাপসা গরম চলেছে কদিন থেকে। আষাঢ়ের অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেল, তবু এখনও বৃষ্টির ফোটা ঝরে নি। যমুনা একটা হাতপাখা এনে পাশে দাঁড়িয়ে ওর গায়ে বাতাস করতে যাচ্ছিল, সত্য পাখাটা নিজের হাতে নিল। যমুনা উঠোনে নেমে গিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে আনল। বালতিটা বারান্দার ধারে রেখে বলল, হাত-মুখ ধুয়ে নাও।

সত্য বসে আছে তো আছেই, জবাব নেই। হেরিকেনের হলুদ আলোয় ওকে কেমন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। যমুনা ফের বলল, কথা বলছ না যে? কী হয়েছে?

তবু জবাব না পেয়ে যমুনার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিছু দিন থেকে সত্য যেন আগের মত মন খুলে কথা বলে না ওর সঙ্গে। মেজাজও কেমন চটে থাকে সব-সময়। সামান্য ব্যাপারেই ত্রুটি খোঁজে। যমুনা তর্ক করে না। যেন ব্যাপারটা উপভোগ করছে, এমন চপল স্বরে বলে, এবার সব তেতো লাগছে বুঝি! মাথা দুলিয়ে ঠোঁট টিপে হেসে সে বলে, ও তো

জানিই বাবা। দুদিনেই বাসি হয়ে যাবো। পুরুষ মানুষের এটা আমি হাড়ে-হাড়ে জানি।...সত্য তখন বলে, সে তো জানবেই! ভাল জেনে-শুনেই এখানে এসেছিলে! আর একথায় যমুনা হু হু করে কেঁদেছে। ঘরে গিয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে থেকেছে। অগত্যা সত্য নিজেই রান্না করে ওকে ডাকতে গেছে—ওঠ, খেয়ে নেবে। যমুনা না উঠলে নির্বিকারভাবে সত্য নিজে খেয়ে বেরিয়ে গেছে। যমুনার তারপর না উঠে উপায় নেই। নিজেকেই তার অবাক লাগে, আস্তে আস্তে নিজের শরীরের প্রতি একটা তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি জেগে উঠছিল যেন! তার দেহে আরেক দেহ—যেন বিষফোঁড়ার মত দানা বেঁধেছে, তার জন্যে ভাবনা—ভবিষ্যতের ভাবনা, আর ওদিকে সুভদ্রা—মা বলে যাকে জেনেছে, আজ আর মা ভাবতে কেন প্রচণ্ড ঘৃণা, কোনদিন ছোটবাবা এলে তার মুখোমুখিই বা হবে কেমন করে—এই সব অজস্র চিন্তা তাকে ব্যাকুল করছিল। বুঝতে পারছিল, একটা ভীষণ ফাঁদে আটকে গেছে সে। অথচ এতদিন যে লোকটিকে মনে হয়েছে—তার নিশ্চিত উদ্ধার, সেও দূরে সরবার চেষ্টা করছে যেন। নারীজীবনের কিছু সত্য স্পষ্ট হচ্ছিল তার চোখে। সে ভয় পাচ্ছিল। দেখছিল, পৃথিবী আর আগের মত সহজ ও সুন্দর হয়ে নেই। এখানে মামলা আছে, ঘৃণা আছে, অপমান আছে—আর কোথাও অদূরে আবছায়াভরা কোণ থেকে কার ষড়যন্ত্রসংকুল দুটো জ্বলন্ত চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে মারাত্মক সাঁড়াশি, গলায় ঝুলন্ত যেন সাপ, তার চোখে চশমাও দেখতে পায়—সে অবিকল ননী ডাক্তারের মত—এবং মাঝে মাঝে যমুনার ঘুম পেলে সে এগিয়ে আসে তার নাভি লক্ষ্য করে। এমন কি নাভির কাছে ঠাণ্ডা চাপ, কে যেন চিৎকার করে কেঁদে ওঠে...এই সব অদ্ভুত ভয়াবহ দৃশ্য!

চাঁপা ঝি মেয়েদের শরীর সম্পর্কে অজানা রহস্যের ঝাঁপি খুলত তার সামনে। চাঁপার মুখেই শুনেছিল, পেটে বাচ্চা এলে মেয়েরা স্বপ্নে সাপ দেখে। ঢোঁড়া সাপ।... যমুনা কি কিছু দেখেছিল? বমি করার আগে বা তারও পরে কোন রাত্রে?...গা শিউরে ওঠে। দেখেছিল যেন, দেখেছিল।

যমুনার কান্না পেল আজ। রাগে দুঃখে সে বলে উঠল, কে মুখে তালা দিল, বল তো? বুঝেছি, কোথাও যাওয়া হয়েছিল বাবুর। ডাক্তার-টাক্তার ওসব বাজে কথা। বেশ তো, যাকে নিতে মন হয়েছে, নিক। আমি যেদিকে দু চোখ যায়, চলে যাচ্ছি। এখুনই যাচ্ছি।

সত্যি সত্যি ঘরে ঢুকে হুটোপুটি কী যেন করতে থাকল যমুনা। তখন সত্য কথা বলল।...কী হয়েছে, মেজাজ খারাপ করছ কেন রাত দুপুরে?

যমুনার জবাব এল না এবার। সে দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বারান্দা থেকে উঠোনে নামল। তখনও সত্য চুপ করে বসে আছে।

দরজা খুলে বেরিয়ে যেতেই সত্য নেমে গেল। দরজার বাইরে যমুনা হনহন করে চলেছে। সত্য ছুটে গিয়ে ওকে ধরল। আঃ, কী করছ রাত দুপুরে! লোকে কী বলবে?

যমুনা বলল, যা বলার বলতে বাকি আছে নাকি? মুখ দেখানোর উপায় রেখেছ কোথাও। যমুনা কেঁদে উঠল।...সবাইকে পর করে দিলে। কেউ আর বাড়ি আসে না! ঘাটে নামতে লজ্জা লাগে—ওরা কী চোখে তাকায় আমার দিকে আমি কি বুঝিনে? হাত ছাড়—যেতে দাও।

ছিঃ, পাগলামি করো না! সত্য টানল ওকে। কোথায় যাবে?

ভেবেছ, তুমি ছাড়া বুঝি গতি নেই আমার? দড়ি একগাছা জুটবে না? মা গঙ্গায় ঝাঁপ দিতেও তো পারব। ইঁদুর-মারা বিষও পাওয়া যায় দোকানে! যমুনা হাঁফাচ্ছিল।

যমুনা! সত্য ধরা গলায় ভর্ৎসনা করতে চাইল। সে চমকে উঠেছিল। তাহলে মৃত্যুর কথাও সে ভাবতে পারে—ভেবেছে! এতদিনে যেন কে তার হাত ধরে মৃত্যুকে চিনিয়ে দিয়েছে। বলেছে—দেখ যমুনা, যখন সারা পৃথিবী মুখ ফেরাবে, চোখের জলে ঈশ্বরকেও পাবি না, তখন এই তোর একমাত্র সখা—তোর সবচেয়ে প্রিয়জন—মা-বাবাও ঘৃণা করেন, এর কাছে ঘৃণা নেই। এ শুধু ভালবাসে। যথার্থ মায়ের মত কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে এর জুড়ি নেই।...

সত্য মাঝে মাঝে দূর থেকে সে ঘুম-পাড়ানি গানের সুর শুনেছে কান খাড়া করে। তন্ময় হয়েছে। সে সুর বুঝি যমুনাও শুনুস এতদিনে। সত্য দু হাতে ওকে শিশুর মত তুলে নিল। চুমু খেতে খেতে বাড়ি নিয়ে গেল। একেবারে ঘরে গিয়ে নামাল। বলল, ছিঃ, আমাকে ভুল বুঝো না।

আস্তে আস্তে সব শান্ত হয়ে উঠল বাইরের রাত্রিটার মত — কিন্তু ঠিক তার মতই একটা ভ্যাপসা গরম দুজনেই অনুভব করছিল।

সুখেনের ব্যাপারটা শোনাল সত্য। দুজনে জোর হেসেও ফেলল। শেষে সত্য বলল, রাগ তোমার উপর হয় না, এমন নয়, খুবই হয়। আজও হয়েছিল।

যমুনা বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, কেন রাগ হবে? কী দোষ করেছিলাম আজ?

অকপটে সত্য বলল, আজ করনি। তবে ভেবেছিলাম, আমাকে তুমি ঘেন্না করবে। ঘেন্না করে পালিয়ে যাবে এখান থেকে।

যমুনা ফোঁস করে উঠল, তাই বুঝি? তাহলে এই তোমার মনের কথা? আমি পালাই, তোমার বেশ মজা হয়, তাই না? বেশ—শুনে রাখো, যাও পালাতাম, আর পালাচ্ছিনে। দেশে মানুষ নেই? বিচার নেই? মামীর মত তোমাকে জব্দ না করে নড়ছিনে। কালই যাব তোমার হাটুবাবুর কাছে।...

সত্য হেসে বলল, নাঃ, ও একটা ক[...] কথা বলছিলাম। কিন্তু সত্যি বল[...] যমুনা, আমাকে তোমার ঘেন্না করে না[...]

যমুনা বলল, তোমার করে, তা বু[...] পারি। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি[...] পুরুষ মানুষ?

সত্য বলল, তোমারও নিশ্চয় করে।

যমুনা মুখটা ফিরিয়ে জবাব দি[...] আগে করত না, খুব মায়া লাগত। এ[...] আর লাগে না একটুও।

সত্য ওর হাতটা ধরে বলল, [...] যমুনা? তোমাকে নষ্ট করেছি বলে?

না। মুখ তুলে সোজাসুজি তাক[...] যমুনা। তীব্র জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বল[...] না, সেজন্যে নয়।

কী জন্যে?

জানিনে, যাও!

বল লক্ষ্মীটি!

চাপা স্বরে ফিসফিস করে উঠল যমুনা[...] ফের ওর চোখ দুটো জলে ভরে উঠ[...] বলল, তুমি আমাকে ডাক্তারের কাছে নি[...] যেতে চাও। আমি যাব না।

কেন যাবে না?

আমার বুঝি ঘর-সংসারের সাধ থাকে[...] নেই? যমুনা তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল। আমার ভবিষ্যৎ নেই? সাধআহ্লাদ নেই[...] আরও পাঁচটা মেয়ে যা চায়, আমার [...] চাইবার বয়স হয় নি?...কিন্তু তুমি ক[...] চাও, আমার জানতে বাকি নেই।

কী চাই আমি?

ন্যাকা! বোঝো না কিছু! তুমি চাও[...] আমি চিরজীবন তোমার রক্ষিতা হ[...] থাকি। ছেলেপুলে হবে না, বৌ রাখা[...] ঝঞ্ঝাট থাকবে না — বেশ ওপরে-ওপরে[...] স্ফূর্তি চালিয়ে যাব। বাঃ, চমৎকার! সে[...] কিছুতেই হচ্ছে না, বলে রাখলাম! আমার[...] জীবনটা নষ্ট করতে তোমাকে দেব না!.. যমুনার কান্না আবার বেড়ে গেল।

সত্য ঘামছিল। আস্তে আস্তে বসল[...] সে তো ঠিকই। বার বার মাথা নাড়ল সে[...] বলল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, যমুনা। এও একটা[...] কথা। কিন্তু কী করব বল তো?

কেন বিয়ে করছ না আমাকে?

সত্য ওর কথার ঝাঁজে মুখ নামাতে বাধ্য হল। বলল, বিয়ে!

হ্যাঁ, বিয়ে। যমুনার ঠোঁট বাঁকে[...] কুণ্ঠিত হল কথাটা বলতে।...লজ্জা করবে[...] বুড়ো বয়সে টোপর পরতে? আমার কিন্তু[...] করবে না। সব লজ্জা তো তুমিই গিলে[...] খেয়ে ফেলেছ।

সত্য একটু হাসল।...নাঃ। তা কেন?

পষ্টাপষ্টি বলে দিচ্ছি, সাত দিনের মধ্যে বিয়ে না করলে, আমি তোমার নামে[...] মামলা করে আসব মামীর মত। যমুনা[...] উঠল। বাইরে গিয়ে বলল, নাও, ওঠ। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।

সত্য গৃহপালিত পশুর মত ওর আদেশ[...] পালন করছিল।

ক্রমশ

রাজধানীর ইতিকথা

নিমাই ভট্টাচার্য
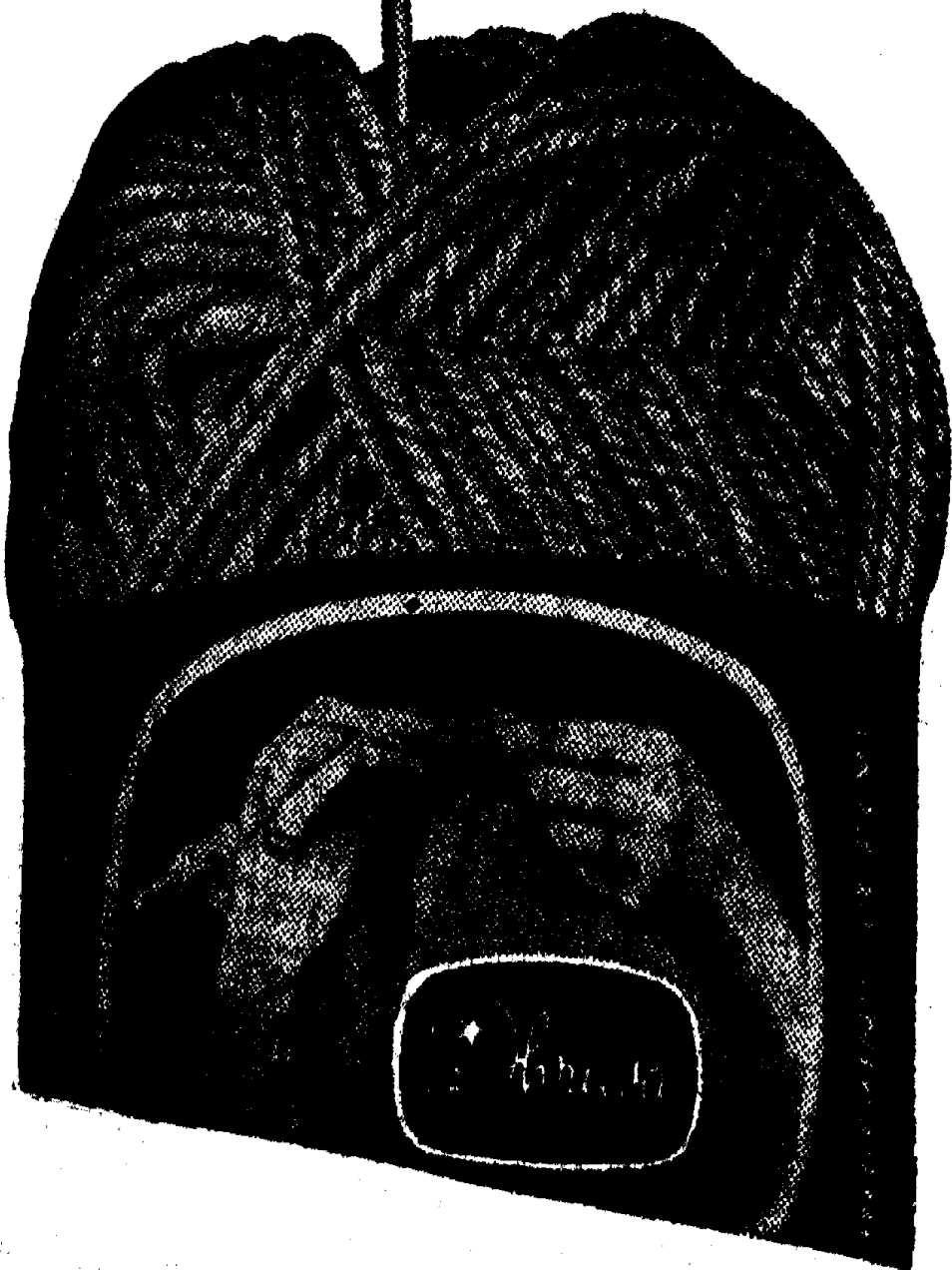
শোনা যায়, এক একটা জায়গায় এক এক রকম হাওয়া, এক একরকম বৈশিষ্ট্য। যেমন কলকাতার পার্ক স্ট্রীটে উত্তরদিকের ছেলেমেয়েদের চাইতে সাউথ ক্যালকাটার ছেলেমেয়েরা একটু বেশী রোমান্টিক, একটু বেশী ভাবালু, একটু বেশী কাব্যিক, একটু বেশী রবীন্দ্রানুরাগী হবার দাবী করেন। দক্ষিণ ভারতে মেয়েরা খোঁপায় বা বিনুনিতে একটু ফুল না দিয়ে বেরুতে পারে না। বেনারসের পুরুষদের পুরুষকারের চিহ্ন অহর্নিশি পান-জর্দা চিবুনো। আবার লক্ষ্ণৌতে একটু আধটু উর্দু 'শের' না জানলে শিক্ষিত সমাজে মেলামেশা করাই অসম্ভব।

দেশের নানা জায়গায় নানা বৈশিষ্ট্যের মত দিল্লীরও একটা বিশেষ হাওয়া আছে। আর বৈশিষ্ট্য? সে তো অসংখ্য। কাশ্মীরের ডাল লেকের জলে শিকারায় চড়ে ভেসে বেড়ালে বুড়োবুড়ীরাও যেমন একটু রোমান্টিক না হয়ে পারেন না, তেমনি এই দিল্লীতে সব জাতের, সব ধর্মের পলিটিশিয়ানদেরই যেন একটু ওলট-পালট করে দেবেই। কত শত শত সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক দেখলাম। দিল্লীর বাতাসে নিঃশ্বাস নিলেই যেন তাঁরা পাল্টে যান। আগে আগে ভাবতাম, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ!' আগে আগে জানতাম ভেজাল কংগ্রেসীরাই শুধু দিল্লীর মাতাল হাওয়ায় নিজেদের সামলাতে পারেন না। কিন্তু এখন জেনেছি দিল্লীর হাওয়া বড় বিষাক্ত, বড় সর্বনাশা। বিরোধীপক্ষের বিপ্লবী মন্ত্রী-মহারথীরাও ঠিক নিজেদের সামলাতে পারেন না দিল্লীর এই বিষাক্ত পরিবেশে।

গত বছর জেনারেল ইলেকশনের পর অনেক রাজ্যেই বিপ্লবী গণদেবতাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টররা ক্ষমতাসীন হলেন। অনেক আশা করেছিলাম স্ফূর্তি ও অপব্যয়ের জোয়ারে ভাটা পড়বে। আশা করেছিলাম সরকারী পয়সায় সরকারী সফরের অছিলায় নিজের নিজের পলিটিক্যাল পার্টির কাজ হাঁসিল করা বন্ধ হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখলাম উল্টো হলো।

দিল্লীর অভিজাত পল্লীর এক একটি উজ্জ্বল রত্ন হচ্ছে এক একটি রাজ্যের অতিথিশালা। গৌরী সেনের টাকায় এইসব ভবনগুলো চলছে। মন্ত্রী আর অফিসারদের প্রমোদভ্রমণের জন্য সব ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য বিদায় নেবার পর অনেকেই আশা করেছিলেন প্রমোদভ্রমণের এই সরকারী ধর্মশালাগুলোয় নতুন নাটক অভিনীত হবে। অনেকেই ভেবেছিলেন এক একজন মন্ত্রীর সেবা করার জন্য আধ ডজন পার্সোন্যাল স্টাফের দিল্লী ভ্রমণের পর্ব শেষ হবে। দুজন-একজন মন্ত্রীর কথা বাদ দিন। তাছাড়া সবাই কংগ্রেসীদের ট্রাডিশন রক্ষা করে গেছেন।

এক বিপ্লবী মুখ্যমন্ত্রী তো দিল্লী আসা-যাওয়া করতেন শুধু রাজ্য সরকারের নিজস্ব প্লেনে। সেই প্লেনে ভর্তি করে এনেছেন পলিটিক্যাল ইয়ার-দোস্তদের। হাজার মাইল দূর থেকে সেই প্লেন উড়ে এসে খালি প্লেন ফিরে গেছে। আবার সেই খালি প্লেন উড়ে এসে নিয়ে গেছে চীফ মিনিস্টারের দলবলকে। এঁরা এয়ার কন্ডিসনড্ ট্রেনে চড়তে লজ্জা পান। লোকজনের সামনে দু'তিনশ টাকা ভাড়া দিয়ে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের প্লেনে চড়তেও বোধহয় কুণ্ঠাবোধ করেন, কিন্তু হাজার হাজার টাকা অপব্যয় করে রাজ্য সরকারের প্লেনে চড়ে কুতব মিনারের অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে সফদারজং এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে দ্বিধা করেননি। কেন? ভগবান জানেন। হয়ত ফাঁকা এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হলে স্থানীয় লোকদের কাছে নিজেদের বিপ্লবী চেহারাটা ম্লান হয় না বলে, বা অন্য কোন বিশেষ কারণে।

কেন যাঁরা বছরের পর বছর কংগ্রেসী অপব্যয়ের নিন্দা করেছেন, যাঁরা দরিদ্র দেশবাসীর দুঃখে অকৃপণভাবে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছেন, তাঁরাও লাখ টাকার ইম্পালা চড়তে দ্বিধা করেন নি।

পশ্চিমবাংলার বিপ্লবী মন্ত্রীরাই কি দিল্লীতে এসে কম স্ফূর্তি, কম মজা লুটেছেন! তবে সবাই নয়। অজয় মুখার্জি বা জ্যোতি বসু বা আর দু'একজন সত্যি অপূর্ব সংযম দেখিয়েছেন, কিন্তু অন্যান্যরা? রাইটার্স বিল্ডিং-এর মন্ত্রীকক্ষ থেকে এয়ার-কন্ডিশনার চালান করা হলো হাসপাতালে। বিপ্লবী গণদেবতার বরেণ্য নেতাদের কৃচ্ছ্রসাধনে সবাই হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু এখানে এসে রাজভবনে ফোমড্ রাবারের শয্যায় শুয়ে এয়ার কন্ডিসনারের ঠান্ডা মিঠে হাওয়া খাবার সময় অস্বস্তি বোধ করতে বিশেষ কাউকে দেখিনি। দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, সে নাক ডাকার আওয়াজ বাংলাদেশের মেহনতী জনতার কানে পৌঁছায়নি।

আরো কত কি দেখলাম! পশ্চিম বাংলার বুভুক্ষু মানুষের জন্য অন্ন জোগাড়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ধরনা দেবার মহান উদ্দেশ্যে মন্ত্রীর দল দিল্লী এলেন। আধঘন্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সাউথ ব্লকে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কাটান ছাড়া একজন মন্ত্রী তো শুধু সরকারী গাড়ী চড়ে সারা দিল্লী ঘুরে দেখলেন বেশ কদিন ধরে। স্বামীর গর্বে গরবিনী মন্ত্রীপত্নী চওড়া জরিপাড় শান্তিপুরী শাড়ী পরে দেখলেন কুতবমিনার, লালকেল্লা এবং আরো কত কি! আর একবার আর একজন অতি বিখ্যাত প্রখ্যাত যশস্বী বিপ্লবী মন্ত্রী সিমলা না কাশ্মীর গিয়েছিলেন এক কনফারেন্সে। মন্ত্রীর প্রাপ্য ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্টে বোঝাই করে বিনা ভাড়ায় নিয়ে এলেন আদরিণী কন্যাকে। সে কন্যাও ট্যাক্সি চড়ে কুতবমিনার বা লালকেল্লা দেখেননি।

আরো কত কি দেখলাম। নিজের পার্টির মিটিং অ্যাটেন্ড করার জন্য কত রাজ্যের কত মন্ত্রীই তো সরকারী সফরের অছিলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন হিল্লী-দিল্লী। যে আসে লঙ্কায়, সেই কি রাবণ হয়? জানি না। তবে দিল্লীর হাওয়াটাই এমন বিশ্রী বিষাক্ত, এমন দূষিত যে যিনিই এখানে আসুন না কেন, তিনিই নিজের ধর্ম রক্ষা করতে বেশ হিমসিম খেয়ে যান।

প্যাথোলজি মিউজিয়ম

রাতের শহর

হিমাদ্রি তখন কলকাতার এক বড় হাসপাতালে প্যাথোলজিস্ট। হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডের ভেতরে ওর কোয়ার্টার্স। হাসপাতাল বললেই আমার সামনে ওষুধের হাজার কিসিমের শিশি, তুলো, ব্যাণ্ডেজ, অপারেশন থিয়েটার, ঝাঁঝালো সব ওষুধের গন্ধ মিলেমিশে এক অদ্ভুত ছবি ভেসে ওঠে। রোগীর লকারের ওপর কমলালেবু দেখলে মনে হয়, সেখানেও শক্ত খোসার নীচে অসুখ ছড়িয়ে আছে। খুব জমিয়ে বাঁচতে চাই বলেই হাসপাতাল আমাকে বিষণ্ণ করে। বহুবার হিমাদ্রি ওর আস্তানায় গিয়ে দু-তিন দিন থাকতে বলেছে, প্রতিবারই সভয়ে এড়িয়ে গেছি। মনে হয়েছে, গেট ডিঙিয়ে কম্পাউণ্ডে ঢুকলেই খপ করে কোনো না কোনো একটা উচ্চণ্ড অসুখ আমার শরীরে সেঁধিয়ে যাবে। গত বছর ও যখন বিয়ে করে ফিরে নতুনভাবে সংসার পাতল, তখন নিজেকে বাল্য-বন্ধুত্ব বজায় রাখতে দিন তিনেক ওর কোয়ার্টার্সে কর্তব্য পালন করে এসেছিলাম।

হিমাদ্রির বউ নমিতা এককথায় খাসা মেয়ে। ফর্সা, গোলগাল, জলপদ্মফুলের মতো চেহারা। অনর্গল হাসতে পারে। বকতেও পারে খুব। ব্যবহারে বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই, আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার সঙ্গে অবলীলায় খাতির জমিয়ে ফেলল। হিমাদ্রি আমার প্রতি তার স্ত্রীর আচরণে খুবই খুশি—মুখে কিছু বলছে না বটে, কিন্তু একটা চাপা গর্ব ও আনন্দ ওর চোখে, গালে, চিবুকে ছড়িয়ে পড়ছিল। গল্পী-বারান্দায় চেয়ার পেতে রাত প্রায় একটা অবধি প্রচুর আড্ডা [illegible] [illegible]

পরের দিন সকালে কথাটা পাড়লাম। কলেজে পড়ার সময় থেকে আমার সখ, প্যাথোলজি মিউজিয়ম আর লাশকাটা ঘর দেখব। দিনে নয়, বেশ জমজমাট রাত্রে। চা খেতে খেতে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল হিমাদ্রি, প্রথমে আমার কথার কোনো আমলই দিল না। শেষে খুব চেপে ধরার পর গলায় অস্বস্তি এনে বলল, 'দ্যাখ অমিত, ছোটোবেলা থেকে তুই একটা আজব জীব। বেশী আদিখ্যেতা দেখাস নি।' আমি হতাশ হয়ে চুপ মেরে গেলাম। নমিতা আমার হয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল। বেশ কথাকাটাকাটির পর তর্কে ইস্তফা দিয়ে হিমাদ্রি হঠাৎ নাটকীয়ভাবে বলে বসল, 'ঠিক আছে, আজ রাত্তিরেই হয়ে যাক। সারা রাত ধরে তোকে মিউজিয়ম আর মড়ার খোঁয়াড়ে ঘোরাব। অসুস্থ হয়ে পড়লে আমার কোনো দায় নেই, নমিতাই দেখবে।'

মাঘের প্রচণ্ড শীতের রাত। পুরু র‍্যাপারে আপাদ-মস্তক ঢেকে হিমাদ্রির সঙ্গে রওনা হলাম। হিমাদ্রির পরনে ওভার-কোট, হাতে ছ সেলের জোরালো টর্চ লাইট। অনেকখানি হাঁটা পথ—ধারালো উত্তুরে বাতাস মুখের ওপর চাবুক কেটে বসে যাচ্ছিল। ব্লাড ব্যাঙ্কের টিকিট-আঁটা একতলা বাড়ী পেরিয়ে একটি সাবেকি আমলের ঢালা বারান্দাওলা বাড়ীতে ঢুকলাম। বারান্দার এক কোণে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ধার ঘেঁষে একটি টুলের ওপর একজন প্রৌঢ় দারোয়ান বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। আমাদের জুতোর শব্দ পেয়ে মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল। হিমাদ্রিকে [illegible]

দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'বাবুজী, ইতনা রাত মে?' হিমাদ্রি ওর কথার জবাব না দিয়ে ওর কাছ থেকে একগোছা চাবি চেয়ে নিয়ে আমাকে বলল, 'ওপরে চল।'

ওপরের টানা বারান্দা জুড়ে মিট-মিটে রঙের টিউব-আলো জ্বলছে। চারপাশ ঝিম মেরে আছে। এ বাড়ীতে কোনো রুগী থাকে না, তাই রাতের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে নতুন নার্সের অ্যাপ্রনের খসখসে শব্দ ওঠে না। টর্চ জ্বেলে বাঁ পাশের একটি দরজায় লাগানো দুটি তালা খুলে ফেলল হিমাদ্রি। দরজা দুটো ঠেলে দিতে একটা অদ্ভুত খাতব আর্তনাদ উঠল। ওর পেছন-পেছন ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

লম্বা হল-ঘর। দেয়ালে তিন-চার হাত অন্তর অন্তর শেড দেয়া ক্যাকাশে আলো জ্বলছে। কেবল হলের মাঝখানে সিলিং থেকে নেমে এসেছে একটি শেড দেয়া উজ্জ্বল নিয়ন-টিউব। বিভিন্ন টেবিলে বড়ো বড়ো কাঁচের আধারে ও জারে রক্ষিত বস্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হল, আমরা এক বিশাল মৃত্যুর সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়েছি। দেয়ালে দেয়ালে অসংখ্য চার্ট, ছবি স্কেচ এই সাম্রাজ্যের সাক্ষ্য [illegible]।

পায়ে পায়ে এগিয়ে একটি বড়ো টেবিলের ওপর সযত্নে সাজানো [illegible] প্রদর্শনীর কাছে এসে দাঁড়ালাম। [illegible] প্রতিটি কেসের আদ্যন্ত বিবরণ [illegible] [illegible] টাইপ করে আঁটা আছে। হিমাদ্রির [illegible] [illegible] [illegible] সুযোগ দিল না। [illegible] [illegible] [illegible] অবল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফিলিপিলিও ত নির্বাক তাহলে এ অশরীরী ঘোষণা কোথা থেকে আসছে?

এ ঘোষণার ভাষা আবার কাস্তিলিয়ান! তা কি করে সম্ভব হয়?

কাস্তিলিয়ান বলবার মত মানুষ প্রেত-প্রাসাদে এক সোরাবিয়া নিজে, আর ফিলিপিলিও।

ফিলিপিলিওর গলার স্বর তার চেনা। দোভাষী হিসেবে কাস্তিলিয়ান দিয়ে কাজ সারতে পারলেও তার ভাষায় উচ্চারণে অনেক ভুল।

আর এ তো একেবারে চোস্ত কাস্তিলিয়ান! স্পেনের রাজদরবারে শিক্ষিত বড় ঘরোয়ানারা যা ব্যবহার করে তাই।

সোরাবিয়া মনে মনে জানে মূর্খ বলে ও নির্ভুল উচ্চারণের ভাষা তার গলা দিয়েও বার হয় না।

এ তাহলে সত্যিই কি ভৌতিক কিছু?

অশরীরী দৈববাণী গোছের বলেই যে ভাষায় খুশি উচ্চারিত হতে পারে!

সোরাবিয়া সারা শরীরে লোমহর্ষ নিয়ে কম্পিত বুকে চারিদিকে চেয়েছে।

ফিলিপিলিওর দিকে চোখ পড়েছে তাইতেই। সমস্ত মুখ তার আতঙ্কে রক্তশূন্য হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত।

তার অসাড় হাত থেকে মশালটা পড়ে গিয়ে একটা অগ্নিকাণ্ডই বুঝি বাধাত এই প্রেত-প্রাসাদের দাউ দাউ করে জ্বলবার নানা উপকরণের মধ্যে।

সোরাবিয়া তাড়াতাড়ি সেটা ফিলিপিলিওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মেঝের ওপর [illegible]

ভৃঙ্গার গোছের পাত্রের মুখে বসিয়ে দিয়েছে।

ফিলিপিলিও তখন অর্ধচেতন অবস্থায় সেই ভৃঙ্গারের পাশেই দেয়ালে ঠেস দিয়ে কোন রকমে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে।

সে ভৌতিক ঘোষণা এখন থেমে গেছে।

কি করবে সোরাবিয়া?

মানে মানে পালিয়েই যাবে এই অভিশপ্ত প্রেত-প্রাসাদ থেকে? এখন যদি চলে যায় বাইরের তার সওয়ার সৈনিকেরা কেউ সন্দেহই করতে পারবে না যে ভয় পেয়ে সে পালিয়ে এসেছে।

শুধু ফিলিপিলিও থাকবে একমাত্র সাক্ষী! কিন্তু ফিলিপিলিও নিজেই কি হয়েছে ভালো করে মনে করতে পারবে কি? তাছাড়া নিজের ভয়ের লজ্জা ঢাকতেই তাকে নীরব থাকতে হবে।

পিছু হটে পালাবার জন্যে পেছনে পা বাড়াতে গিয়ে একটা কথাই সোরাবিয়া এই আতঙ্কের মধ্যেও ভুলতে পারে না। এরকম ভাবে পালালে একটা আফশোষই তার থেকে যাবে। অনুচর সেপাইদের কাছে কৈফিয়ৎটাও খুব জোরদার হবে না যদি একেবারে শুধু হাতে সে ফেরে!

দৈববাণী থেমে গিয়েছে। শুধু এই সোনার সিংহাসনটা টেনে নিয়ে গেলেই ত হয়!

ঝলমলে পোষাকে যে মড়াটা ওর ওপর বসানো আছে সেটাকে শুধু একটু সরাতে হয় এই যা।

মড়াটাকে খুব তাচ্ছিল্য এখন আর [illegible] না। যে [illegible]

শাসানিটা সে এই মাত্র শুনেছে সেটা ত ওই সাজানো লাশটা যার সেই কোন মরা ইংকার প্রেতের গলা থেকেই বেরিয়েছে বলে ধরতে হয়। এ প্রেত-প্রাসাদ ত তারই। এ প্রাসাদ অপবিত্র করার বিরুদ্ধে অভিশাপের ভয় সেই দেখাতে পারে।

বুকটা সোরাবিয়ার বেশ কেঁপে ওঠে। তবু সোনার লোভে মরিয়া হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্যে নিজেকে সে জোর করে শক্ত করে রাখে।

সিংহাসনটা টেনে নিয়ে যাবার জন্য মড়াটাকে তার ওপর থেকে ফেলে দিতে হবে। মড়াটাকে তার জন্যে হাত দিয়ে ছোঁবার দরকারই বা কি?

তলোয়ারের খোঁচাতেই সেটাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিলেই ত হয়।

অভিশাপের ভয়? একবার এই ভুতুড়ে গুহা থেকে বার হতে পারলে আর কোন অভিশাপ তাকে স্পর্শ করতে পারবে কি?

সঙ্গে হেরাদাই ত আছে তাদের পুরুত! তার কাছে গিয়ে একবার ক্রুশ ছুঁয়ে নিজের জন্যে কিছু মানৎ করলে এ অভিশাপ কেটে যেতে কতক্ষণ!

যা করবার তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে শুধু।

তলোয়ারটা খাপ থেকে খুলে বাগিয়ে ধরে সোরাবিয়া এগিয়ে যায় সিংহাসনে বসানো মড়াটার দিকে।

তলোয়ারটা বাড়িয়ে সেটাকে খোঁচানো কিন্তু আর হয়ে ওঠে না।

খবরদার!

একটা তীক্ষ্ণ রুদ্ধ হুকুম শুনে তাকে থমকে যেতে হয়।

না, এবার অশরীরী ভৌতিক স্বর

চুপি চুপি বলা কোনো সাবধান-বাণী নয়, স্পষ্ট ক্রুদ্ধ কণ্ঠের জোরালো উচ্চারণ।

কণ্ঠটা আর কারুর নয় ফিলিপিলিওর।

তার সে ভয়ে বিবর্ণ চেহারা এখনো বদলায় নি, কিন্তু অসাড় আচ্ছন্নতার জায়গায় তার দুচোখে একটা অস্বাভাবিক আগুন যেন জ্বলছে।

এ প্রেত-প্রাসাদের যিনি অধীশ্বর তাঁর নিষেধ-বাণী নিজের কানে শোনবার পর, এত কালের ফিলিপিলিও সে বুঝি আর নেই।

নিজেকে সে জাতির কুলাঙ্গার বলেই জানে। এই এসপানিওলদের কাছেই নিজেকে বিকিয়ে সে এদের গোলাম হয়ে গেছে একথা মিথ্যা নয়। তাছাড়া মার্কুইস কেন, যে কোনো এসপানিওল অসি-যোদ্ধার সঙ্গেই যোঝবার মত শিক্ষা কি শক্তি তার নেই। শুধু ঘৃণ্য নীচ বিদেশীর হাতে এ পবিত্র প্রেত-প্রলোকের অপমানের বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতেই হবে। বিশেষ করে ইংকা-শ্রেষ্ঠ স্বয়ং হুয়াইনা কাপাক-এর মৃতদেহ, তলোয়ার দিয়ে এই বিদেশী পাষণ্ড তার চোখের সামনে খোঁচাবে এ সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব।

তাদের জাতির তাদের ধর্মের সেই এখানে একমাত্র প্রতিনিধি। সে প্রতি-নিধিত্বের মর্যাদা সে রাখবে।

সোরাবিয়া ফিলিপিলিওর চিৎকারে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছে। এমনিতেই তার মনের তখন বেশ একটু অস্বাভাবিক অবস্থা, তার ওপর এই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের খবরদার আওয়াজটা তার ভেতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে অদম্য আতঙ্কে।

প্রথম থমকে যাওয়ার পরে ফিরে তাকিয়ে সে আওয়াজের উৎসটা বুঝতে পারে। আর কেউ নয় ফিলিপিলিওই তাকে এ ধমক দিয়েছে এটা উপলব্ধির পর কয়েক মুহূর্ত আতঙ্কটা বিমূঢ় বিস্ময় হয়ে তাকে বিহ্বল করে রাখে। তারপর সেই বিহ্বলতাটা বোমার বারুদের মত প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে।

এ প্রেত-প্রাসাদের বুকের ভেতর পর্যন্ত জমিয়ে দেওয়া হিমেল ভয়ের স্পর্শটাও যেন সে রাগের উত্তাপে খানিক ক্ষণের জন্যে আর টের পাওয়া যায় না।

হিংস্রভাবে দাঁত খিঁচিয়ে উঠে সোরাবিয়া জিজ্ঞাসা করে,—তুই। তোর গলার আওয়াজ শুনলাম। তুই হাঁকলি খবরদার।

হ্যাঁ আমিই হাঁকলাম।—ফিলিপিলিওর গলা এখন আর তীক্ষ্ণ তীব্র নয়। এ প্রতিবাদের পরিণাম জেনে সে শান্ত দৃঢ় স্বরে বলে,—আগেই আপনাকে মানা করে-ছিলাম মার্কুইস। তা সত্ত্বেও জোর করে আমায় এখানে এনে ভালো করেন নি। এ পবিত্র প্রেত-প্রাসাদের রক্ষীরা এখন নেই। কিন্তু আমি আছি। এখানকার অগুনতি সোনা-রুপোর দামী জিনিষের মধ্যে দু-চারটে নিতে চান ত নিন। আমি আপত্তি করব না। কিন্তু ইংকা-শ্রেষ্ঠ হুয়াইনা কাপাকের পবিত্র শবদেহ স্পর্শ করতে বা তাঁর সিংহাসন এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে আপনি পারবেন না। অন্ততঃ আমার মৃতদেহ না মাড়িয়ে নয়।

তোর মৃতদেহ না মাড়িয়ে নয়?—ফিলি-পিলিওর কথাগুলো শুনতে শুনতে সোরাবিয়ার মুখে রাগের বদলে একটা ক্রূর পৈশাচিক হাসি এবার দেখা যায়। বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলে,—পাপোষ হবার তোর এত সখ তা আগে জানালেই পারতিস। যাক এখন জানিয়েও ভালো করেছিস। তোর সখ আমার সাধ এক সঙ্গেই মিটিয়ে ফেলি আয়।

সোরাবিয়া বাঁদর নাচাবার মত অবজ্ঞার ভঙ্গীতে তলোয়ারটা নাড়ে ফিলিপিলিওর মুখের কাছে।

ফিলিপিলিও সরে যায় কিন্তু ভয় পায় না। চরম নিয়তির জন্যে প্রস্তুত হয়েই সে মরণ-পণ করে মার্কুইসকে আক্রমণই করে।

তার আক্রমণে বেপরোয়া সাহসই আছে, কিন্তু তাতে নেহাৎ অক্ষম অজ্ঞ আনাড়ির আড়ষ্টতা নিতান্ত স্পষ্ট। সোরাবিয়ার হিংস্র কৌতুক তাতে আরো তীব্র হয়।

এক আঘাতে এফোঁড়-ওফোঁড় নয়, একটু একটু করে ফিলিপিলিওর গায়ে এখানে ওখানে তলোয়ারের ডগা বিঁধিয়ে রক্তপাত করে সোরাবিয়া তাকে ধীরে ধীরে মারবার নির্মম আনন্দটাই উপভোগ করে।

হঠাৎ আবার সেই অশরীরী ধ্বনি। —এখনো ক্ষান্ত হও সোরাবিয়া। অক্ষম দুর্বলকে মৃত্যুযন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পাওয়ার দ্বিগুণ দাম তাহলে তোমায় দিতে হবে। এখনো বলছি এ প্রেত-প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাও। জেনে রাখো ফিলিপিলিও আমার আশ্রিত—

সোরাবিয়ার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায় ভয়ে বিহ্বলতায়। কিন্তু চরম আতঙ্কই তাকে যেন একটা উদ্ধত উন্মত্ততা এনে দেয় তার ভেতরে।

হিংস্রভাবে পাগলের মত হেসে উঠে সে বলে,—ভূত-প্রেত-দানব কে তুই জানি না। সাহস যদি থাকে তাহলে সামনে আয়। তোর আশ্রিত যাকে বলছিস তোর সামনেই তাকে হত্যা করছি দেখ।

সোরাবিয়া নিপুণ অসিযোদ্ধার কৌশলে ডান পা একটু মুড়ে সামনে বাড়িয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত ডান হাতের তলোয়ারটা চক্ষের নিমেষে কাঁধ থেকে সোজা সামনে চালিয়ে দেয়।

এখনকার 'ফেনসিং'-এর ভাষায় এটা একেবারে নিখুঁত 'লাঞ্জ'। এ মার ঠেকাবার একমাত্র চাল হল সেই ভাষায় 'প্যারি অফ প্রাইম'।

ফেন্সিং-এর এ সব নামই সে যুগে বানানো না হলেও কৌশলগুলো একেবারে অজানা ছিল না। নাম না জেনেই সোরাবিয়া তলোয়ারের যে চাল চেলেছিল তা মোক্ষম।

ঠেকাবার পাল্টা চাল জানা না থাকায় ব্যর্থ প্রতিরোধের চেষ্টায় সোরাবিয়ার সেই এক খোঁচাতেই ফিলিপিলিওর হৃদপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবার কথা।

কিন্তু তা হয় না।

হঠাৎ ঠিক চরম মুহূর্তে একটা ভারী জিনিষ সোরাবিয়া আর ফিলিপিলিওকে ছাড়িয়ে একটু দূরে সশব্দে মেঝের ওপর গিয়ে পড়ে।

পড়বার আগে সোরাবিয়ার তলোয়ারের ডগাটা তাতে একটু নড়ে গিয়ে ফিলি-পিলিওকে বাঁচিয়ে দিয়ে যায়।

সোরাবিয়া আর ফিলিপিলিও দুজনেই চমকে উঠে—ঘাড় ঘুরিয়ে মেঝের ওপর সশব্দে গিয়ে পড়া বস্তুটা দেখে।

ব্রঞ্জের তৈরি একটা ভারী এদেশী রণ-কুঠার।

রণ-কুঠারটা কে কোন দিক থেকে ছুঁড়েছে আর বুঝতে বাকি থাকে না।

এ রণ-কুঠারটা যার হাতে শোভিত দেখা গেছল খানিক আগে পর্যন্ত ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাক-এর সেই রাজবেশে সাজানো শবমূর্তিকেই ধীরে ধীরে এবার উঠে দাঁড়াতে দেখা যায়। মুখোস ঢাকা তার মুখ, সারা গায়ে সোনা-রুপো জড়োয়ার কাজে ঝলমল পোষাক আর হাতে একটা তলোয়ার।

কিন্তু সে ব্রঞ্জের তৈরি খাটো তলোয়ার ত এসপানিওলদের সরেস ইস্পাতে গড়া লম্বা অসিফলকের কাছে ছেলেখেলার জিনিষ।

সোরাবিয়া প্রথমে নিজেকে সামলাতে না পেরে ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেও সেই কথাই ভাবে। আর ফিলিপিলিও আতঙ্কায় উৎকণ্ঠায় যেন নিশ্চল হয়ে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেই মূর্তির দিকে।

ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাক কি সত্যিই এবার জাগলেন? কিন্তু কি করবেন তিনি ওই সামান্য সেকেলে অস্ত্র নিয়ে এই এসপানিওলদের বিরুদ্ধে, তাদের নিজেদের ধর্মের সবরকম পাপের অধীশ্বর স্বয়ং শয়তানই যাদের সহায়?

(ক্রমশঃ)
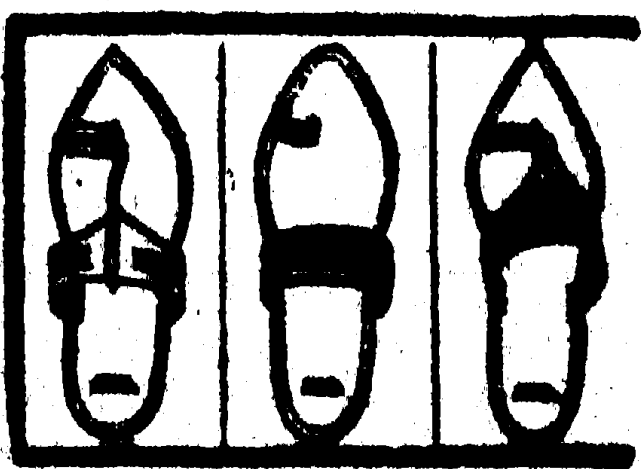
ভিন্ন দেশের মেয়ে

দিলীপ মালাকার

রুশ বিপ্লবের পঞ্চাশ বার্ষিকী পালিত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। রুশ বিপ্লব শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনেনি সোভিয়েট দেশে। সোভিয়েট সমাজে এনেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ভারতীয়দের কাছে শুধু নয়, পশ্চিম ইউরোপের উদারনৈতিক সমাজের সঙ্গে একালের সোভিয়েট সমাজের তুলনা করলে বিরাট পার্থক্য চোখে পড়বে। আমি ভারতীয় হিসেবে আমাদের রক্ষণশীল ও গতানুগতিক সমাজকে যেমন জানি তেমনি পশ্চিম ইউরোপের উদারনৈতিক সমাজে বাস করে সোভিয়েট দেশে নতুন সমাজ দেখে এবং তুলনামূলক বিচারে তারাক ও প্রগতি দেখে বিস্মিত হয়েছি। সোভিয়েট দেশ কম্যুনিজমের শ্রেণীহীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো আরোপ করতে কতখানি কৃতকার্য হয়েছে সে বিষয়ে সবটা না বলতে পারলেও একথা স্বীকার করবো যে সমাজনীতি ও সমাজজীবনে তারা শুধু উদারনৈতিকই নয় বরং "শ্রেণীহীন সমাজের" পথে অনেকখানি এগিয়েছে। প্রথমত জাত-পাত, প্রাদেশিকতার বালাই নেই সামাজিক মেলমেশ-এ। দ্বিতীয়ত ধর্মীয় বাধানিষেধের বেড়াজাল নেই সমাজে ও পরিবারে।

সোভিয়েট সমাজে শ্রমমর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে চাকরিক্ষেত্রে মেয়ে-পুরুষের শ্রেণীগত কোনো পার্থক্য নেই। যে সব কাজ এখনও অনেক দেশে পুরুষের একচেটে সে সব কাজে সোভিয়েট দেশে অসংখ্য মেয়ে পুরুষের মতনই কাজের যোগ্যতা দেখিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আয়ের দিক থেকে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম রোজগার করে না।

আমাদের দেশের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশেও কিন্তু মেয়ে এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার-সার্জন খুব বেশী নেই। সোভিয়েট ইউনিয়নে এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হল মেয়ে। আর ডাক্তার, সার্জন, দাঁতের ডাক্তারদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী মেয়ে। ইস্কুল, হাসপাতালে তো প্রমীলার রাজত্ব। আমি তো নিজের চক্ষে দেখেছি গৃহনির্মাণ ও রেললাইনে অসংখ্য কর্মরত মেয়ে শ্রমিক। এগুলো যেমন ভারী, তেমনি কষ্টকর কাজ। এইসব শক্ত কাজে মেয়ে শ্রমিকদের দেখা যাবে না পশ্চিম ইউরোপে।

সর্বস্তরের কাজে সোভিয়েট ইউনিয়নে স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই বলে সামাজিক স্তরে এসেছে সত্যিকারের সমতা। ফলে প্রতিটি সামাজিক স্তরে, এদেশে ঐক্যভাব এসেছে। সামাজিক মেল-মেশ, বিবাহ ও পরিবার গঠনে কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক বাধা নেই। যা আছে আমাদের দেশে। রুশ বিপ্লবের আগে জারের আমলে কোনো কৃষককন্যার সঙ্গে কী কোনো সামন্তপুত্রের বিবাহ সম্ভবপর ছিল? ছিল কী সম্ভবপর কোনো জর্জিয়ান বা তাজিক এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে রুশ বা ইউক্রেনিয়ান শিক্ষিকার বিবাহ? সোভিয়েট ইউনিয়ন আয়তনে ভারতের ছয়-সাত গুণ বড়। এশীয় প্রদেশের সঙ্গে ইউরোপীয় প্রদেশের লোকজনের পার্থক্য অনেক। আজকের যে কোনো সোভিয়েট শ্রমিক, এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, সাংবাদিক বা শিক্ষক-শিক্ষিকা এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে কাজের খাতিরে যেতে বাধ্য হয়। সেখানে গিয়ে অনেক সময় সে দেশে বিবাহ করে পরিবার গঠন করে। তাদের কাছে সামাজিক মেলমেশ আর কোনো সমস্যাই নয়। যা ছিল পঞ্চাশ বছর আগে অকল্পনীয়। সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্রের অনেকখানি সফল হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নে। কৃত্রিম অ-সম সামাজিক বাধানিষেধ ও সমস্যা এখন লোপ পাচ্ছে। যা আমাদের দেশে অতি প্রকট।

আমি নিজের চক্ষে দেখেছি এবং অনেকের সঙ্গে আলাপও হয়েছে সোভিয়েট দেশে। যেমন ধরুন, কোনো উজবেকস্তানের ছাত্র মস্কোতে পড়তে এসেছিল। সে জাতে এশীয় ও মুসলমান। বিয়ে করেছে লিথুনিয়ার কোনো খৃস্টান মেয়েকে। এবং চাকরি করতে গেছে সাইবেরিয়ার কোনো নতুন শহরে। মস্কোতে আমার আলাপ হয় তাতিয়ানা ও স্বয়েৎলানা নামে দুই রুশ মেয়ের সঙ্গে। তাতিয়ানা বিবাহিতা। সে স্বামীর সঙ্গে ঘর করে মস্কোয়। এরা দুই বোন জানায় যে তাদের বাবা-মা এখনও বাস করে দক্ষিণ রাশিয়ার এক ছোট শহরে। তারা সবশুদ্ধ ছ' বোন দুই ভাই। এক ভাই বিয়ে করে চাকরি করে লেনিনগ্রাদে। এক বোন শিক্ষিকার কাজ করে তাশখন্দে। এক বোন ডাক্তারি করে সাইবেরিয়ার কোনো এক গণ্ডগ্রামে। তাতিয়ানা ও স্বয়েৎলানা দু' বোনই এঞ্জিনিয়ার। স্বয়েৎলানা বিবাহ ভঙ্গ করে একাই বাস করে মস্কোয়। যে বোনটি তাশখন্দে শিক্ষিকার কাজ করে সে নাকি ওখানকার এক শিক্ষককে বিয়ে করবে বলে জানিয়েছে।

সোভিয়েট দেশে সাম্যবাদ চালু হয়েছে বলে মেয়েরা নাকি সৌন্দর্য চর্চা ছেড়ে দিয়েছে। এমনি অনেক আজগুবি গল্প শুনেছিলাম। অনেক সোভিয়েট মেয়ের মুখে শুনেছি যে, পুঁজিবাদি দেশের মেয়েদের মতন তারাও গহনা পরতে ভালবাসে, নানা সুগন্ধি আতর মাখতে, এবং মুখশ্রী বাড়াতে সবরকমের প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করতে ভালবাসে এবং আজকাল করেও থাকে। পঞ্চাশ বছরের এক মহিলা এঞ্জিনিয়ার বলেছিলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে স্তালিনের সামনে এত সৌন্দর্য চর্চা হত না। আজকাল সুগন্ধ দ্রব্যের চলন বেড়েছে। এমন কি তিনিও বয়স কমাবার জন্যে নানান প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করেন। তবে একজন গায়িকা যিনি 'চিন্তাশীল'-দের দলে পড়েন তিনি আমায় বলেছিলেন যে, অন্তত তিনি নিজে গহনা পছন্দ করেন না এবং তাঁর মতন আরও অনেক সোভিয়েট মহিলা ওসব পছন্দ করেন না। তাঁরা গহনা ছাড়াই দেহের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলতে চান।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরিচালকদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। তারাই রাষ্ট্র চালাচ্ছে। সোভিয়েট মেয়েরা সমাজে এনেছে প্রগতি। পশ্চিম দেশের মেয়েদের মতন তারাও চায় পুরুষরা তাদের কাছে প্রেম প্রার্থনা করুক, প্রেম করে বিয়ে করুক এবং সংসার পেতে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করুক। অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতন তারাও চায় না খুব বেশী সন্তান। তার জন্যে প্রয়োজন জন্মনিরোধক ঔষধ ও দ্রব্যাদি। সোভিয়েট আইন গর্ভনাশের বিরুদ্ধে, কিন্তু আজকাল প্রয়োজন হলে সরকার তার জন্যে যথাসাধ্য সাহায্য দিয়ে থাকে।

প্রগতিশীল সোভিয়েট সমাজের বুনিয়াদ হল মেয়েরা। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা একটু বেশী। প্রতি চারজন পুরুষে পাঁচজন মেয়ে। ডাক্তারদের মধ্যে শতকরা ৭৫% জনই মহিলা, শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৭০% জন মহিলা, আইনবিদদের মধ্যে শতকরা ৪০% জন মেয়ে, আর এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে শতকরা ২৯% জন মেয়ে।

রাজনীতিতে কিন্তু মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বারদের মধ্যে মাত্র ২০% জন মেয়ে আর লোকসভায় মেয়ে সদস্য সংখ্যা ২৭% জন।

সোভিয়েট সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে শাশুড়ি ও দিদিমার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। পুরোনো সমাজে শাশুড়ির কর্তৃত্ব ছিল বেশ। দিদিমা-ঠাকুমারা নাতি-নাতনি নিয়ে আমোদে থাকতেন। সে সম্পর্কটা কিন্তু খুব বেশী শিথিল হয়নি। এখনও অনেক পরিবার তাঁদের সন্তানদের ঠাকুমা-দিদিমার কাছে রেখে কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকেন।

বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম মহিলা সভাপতি
শ্রীমতী ডেম ক্যাথলীন লনস্‌ডেল

রুশ বিপ্লবের কিছুকাল পূর্বে ও তার পরে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রুশ সমাজে হঠাৎ পরিবর্তন যেমন হয়েছিল তেমনি দেখা দেয় কিছুকাল পারিবারিক জীবনে "রাষ্ট্রীয়করণ"। ১৯২৬ সালে তার কিছুটা পরিবর্তন হয়। কিছুদিন আগেও বিবাহিত মহিলারা স্বামীর পদবী নিজের নামের পেছনে ব্যবহার করতেন না। অনেক ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েরা মায়ের পদবী ব্যবহার করত। এখনও তার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইদানিং-কালে পারিবারিক ও সমাজজীবনে বেশ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের মতন কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক দুশ্চিন্তা নেই বলে আজকাল অল্প বয়সে যেমন বহু বিবাহ হয় তেমনি অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ ভাঙেও। বিবাহভঙ্গের সংখ্যা বাড়ছে বলে সোভিয়েৎ সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করে জানিয়েছে যে বিবাহভঙ্গের মামলা করেই বিবাহ ভাঙা চলবে না। অন্তত ছ' মাস সময় অপেক্ষা করতে হবে।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাদের দু'তিনজন ছিল বিবাহিত। আবার তার মধ্যে একজন ছিল বিবাহভঙ্গকারী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপের টাকার অংক বেশ স্ফীত। তাতে তারা অনায়াসে বিয়ে করে সংসার চালাতে পারে। এবং বিয়ে করার খরচও নেই বললেই চলে। ফলে অল্প বয়সে যেমন বিয়ে হচ্ছে তেমনি ভাঙছেও। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিবাহ-ভঙ্গকারীদের সন্তানদের কোনো আর্থিক বা সামাজিক কষ্ট পেতে হয় না। সবই তো রাষ্ট্রের অধীনে। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সবই দেখার ভার। সুতরাং কেউই দুঃস্থ অবস্থায় জীবন কাটাতে বাধ্য নয়। যেমন অন্য অনেক দেশে রয়েছে।

আমাদের কাছে হয়ত নতুন মনে হবে কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে নতুন নয়, সোভিয়েৎ সমাজে ব্যাপকভাবে দেখা যাবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা গবেষক, ছাত্রাবস্থায় কোনো শ্রমিক বা উর্দ্ধশিল্পী মেয়েকে বিয়ে করে সংসার চালাচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত না ছাত্রটি ভালভাবে পাশ করে কোনো উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন তার স্ত্রী চাকরি করে সংসারে সাহায্য করছে। এমনি দৃশ্য আমি বহু দেখেছি সোভিয়েৎ সমাজে।

ইদানিংকালে সোভিয়েৎ সমাজের গতি কোন দিকে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সামাজিক সমীক্ষা চালিয়েছিলেন লেলিনগ্রাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী। সেই সমীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে অনেক অ-জানা কাহিনী। পাঁচশটি বিবাহভঙ্গকারী মহিলার মতামত নেওয়া হয় ওই সমীক্ষায়। সমীক্ষায় বলা হয়, তাদের মধ্যে শতকরা ৬০% জন প্রেম করে বিয়ে করেছিল, ২০.৫% জন তাদের ভবিষ্যৎ স্বামীদের প্রাণের চেয়েও ভালবাসত। ৪০% জনের প্রেম গাঢ় ছিল না, ২০.৫% জনের ছিল চেহারার প্রতি আকর্ষণ। ১.৫% জন কোনো উচ্চবাচ্য করত না, ২% জন একদমই ভালবাসত না, এবং ১৫% জন কোনো উত্তরই দেয়নি।

বিবাহভঙ্গটা কেবলমাত্র অল্পবয়সী বিবাহিতদের মধ্যে বেশী সে ধারণা ভুল। ৫৯% জনের বয়স ত্রিশের ওপর, আর ২০% বিবাহভঙ্গকারী দশ বছরের বেশী বিবাহিত জীবনযাপন করে। ২৫% জন সংসার করে পাঁচ থেকে দশ বছর। ২০% জন এক বছরেরও কম সংসার করে।

যাদের মতামত নেওয়া হয় তাদের মধ্যে পুরুষেরা জানায় যে তারা তাদের স্ত্রী বেছে নেয় এইসব গুণের প্রাধান্য হিসেবে, যেমন, ১৫% জনের গুণ ছিল মিশুকে বলে, ১২% জনের গুণ ছিল ভদ্রতা, ১২% জন ভাল সংসার চালাতে জানত বলে।

মেয়েদের মতামত নিয়ে জানা যায় তারা কোন্ কোন্ গুণ পছন্দ করে তাদের স্বামী হবার যোগ্য পুরুষদের কাছে। ১৬% মেয়ে চায় তাদের স্বামীরা হবে ভদ্র ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। ১৬% জন পছন্দ করে হৃদয়বান-স্পর্শকাতর এবং সংসারে মনোযোগী, ১৪% জন চায় মিশুকে। এর ওপর ১৩% জন চায় তাদের স্বামীরা হবে বিশ্বাসী, ১২% চায় না কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি। ৮% জন পুরুষ চায় তাদের স্ত্রীরা হবে কমনীয় শুধু মেয়েলিভাবাপন্ন এবং মেয়েরা চায় তাদের স্বামীরা হবে শক্তিশালী। কেবলমাত্র ৬% জন মেয়ে চায় স্বামীরা হবে ভীষণ বুদ্ধিমান।

বিবাহভঙ্গকারীদের প্রশ্ন করা হয় তারা কেন বিবাহ ভঙ্গ করেছে। উত্তরে ৬৬% জন পুরুষ ও ৭৪% মেয়ে জানায় যে, তাদের মধ্যে মতের মিল না হওয়ায় বিবাহ ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া আরও কারণ দেখান হয়, যেমন, কখনই এক মত হতে না, [illegible] মতন [illegible] ছিল না, সংসারে [illegible] ছিল না, [illegible], মাতাল ও [illegible] [illegible]। ১৮% জন পুরুষ জানায় তাদের স্ত্রীরা যত্নবতী ছিল না, [illegible] করে অ-সতীত্বের জন্য, [illegible] সংসার চালাতে জানত না।

বিবাহভঙ্গকারীদের পাঁচজনের [illegible] একজন করে জানায় যে তাদের সং[illegible] অশান্তি প্রবেশ করে দুটো [illegible] অত্যধিক মদ্যপান ও গৃহের অভাবে [illegible] সংসার পাততে না পারায়। আরেকটি [illegible] কারণ হল বিয়ের আগে দুই প[illegible] স্বল্প পরিচয় এবং হঠাৎ বিয়ে [illegible] বিয়ে না করা মায়েদের সংখ্যা কম [illegible] সোভিয়েৎ দেশে অবিবাহিত মায়েদের [illegible] বিশ লাখ। তবে এদের সন্তানদের [illegible] শোনার ভার রাষ্ট্রের। তারা মায়ের [illegible] ব্যবহার করে থাকে। বিবাহভঙ্গ যাতে [illegible] তার জন্যে সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন হঠাৎ প্রেমে পড়া ভাল কিন্তু হঠাৎ [illegible] ভাল নয়। এঙ্গেলসের মত উদ্ধৃতি [illegible] বলা হয়েছে, যখন বিবাহিত জীবন সু[illegible] হয় না তখন শান্তি ফিরে পেতে [illegible] বিবাহভঙ্গই শ্রেষ্ঠ উপায়। তবে লে[illegible] গ্রাদের সমাজবিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন বিবাহভঙ্গ রোধ করতে হলে চিরাচ[illegible] প্রথা, গৃহসমস্যা ও বস্তুবিশেষের ও[illegible] দোষারোপ করে লাভ নেই। প্রথম ও [illegible] প্রশ্নটি হল মানুষ। মানুষই সংসার পা[illegible] এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখ[illegible] পারে একমাত্র প্রেম। বিবাহভঙ্গের প্রতিষে[illegible] একটি শব্দ, সে হল "প্রেম"।

আমেরিকার মহিলা [illegible]

আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের নারীসমাজ

ভবতোষ সাহা

ওয়াশিংটনে সম্প্রতি এক সম্মেলন বসে। ...শো সাতাশ জন মহিলা ট্রেড ইউনিয়নিস্ট ...তে যোগদান করেন। সম্মেলনে সবাই এক-..., রুজিরোজগার থেকে শুরু করে সর্বত্র ...লাদের সমানাধিকারের দাবীকে আরো ...র এবং জোরদার করে তুলতে হবে।

...অধিকার অর্জনের পথে আমেরিকান ...রীসমাজ সংগ্রামের দুস্তর পথ অতিক্রম ...রে এসেছে। সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ...গ্রামে তাঁরা জয়ী হন ১৯২০ সালে। ...ভোটাধিকার অর্জনের এই সংগ্রাম চলে ...াহাত্তর বছর ধরে। অবশেষে আমেরিকান ...নারীসমাজ ভোটাধিকার লাভ করেন। সঙ্গে ...ঙ্গে এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা ...য়। রাজনীতি আর শাসনকার্যে তাঁরা ...উৎসাহী হন।

একজন সেনেটর আর এগারজন প্রতি-...নিধিসভার সদস্যা নিয়ে বর্তমান কংগ্রেসে ...আমেরিকান নারীসমাজ নিজেদের প্রতিষ্ঠা ...জায় রেখেছে। কোন কংগ্রেসেই অবশ্য এ ...সংখ্যার খুব একটা হেরফের হয়নি। সর্বোচ্চ ...মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল সাতাশিতম ...কংগ্রেসে—উনিশ জন। বিভিন্ন রাজ্যের আইন ...পরিষদে মহিলা সদস্যের সংখ্যাও অন্যান্য ...অনেক বছরের তুলনায় বেশ হ্রাস পেয়েছে। ...বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০৯ জনে। ...পঞ্চাশ বছরের ভোটাধিকারে আমেরিকান ...নারীসমাজের অগ্রগতির এই খতিয়ান খুব ...একটা উৎসাহের সৃষ্টি করে না।

অথচ আমেরিকার রাজনৈতিক দল থেকে ...শুরু করে নানা সংস্থা মহিলাদের সচেতন ...নাগরিক করে তোলার অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত। ...দুটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের কথা বাদ ...দিলেও রয়েছে দল ও গোষ্ঠীনিরপেক্ষ সংস্থা ...লীগ অব উওমেন ভোটার্স"। রাজনৈতিক ...শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এর অবদান বিশেষ ...উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের আরো প্রতিষ্ঠান ...আছে। তারা সীমিত ক্ষেত্রে নারীসমাজের ...দাবীদাওয়া তুলে ধরার চেষ্টা করে।

এসকল সংস্থার সমবেত প্রচেষ্টায় ...বারে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। ...আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পুরুষ ভোটার-...দের তুলনায় নারী ভোটারদের সংখ্যা প্রায় ...[illegible] লক্ষ বেশি হবে বলে ওয়াকিবহাল ...মহলের ধারণা। তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট, ...ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচার-... [illegible]

প্রত্যাশায় তাদের এখনো বহুদিন ধরে দেখে অপেক্ষা করতে হবে। তার সবচেয়ে বড় কারণ রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে মাত্র সাতজন এযাবৎ উন্নীত হয়েছেন। তবে এটা ঠিক যে, মহিলা-দের ভোটাধিকার মেনে নেওয়ার পরই আমেরিকা সামাজিক আইন প্রণয়ন, শিক্ষা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করার ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে।

পাশাপাশি আবার ভোটাধিকার পরবর্তী ব্রিটেনের চিত্রটিও রাখা যেতে পারে। এদেশের নারীসমাজও অনেক সংগ্রামের পরে ভোটাধিকার অর্জন করেন ১৯১৮ সালে। এ বৎসর সারা ব্রিটেনে পালিত হলো এর গোল্ডেন জুবিলী। যথেষ্ট সমারোহে।

হাউস অব কমন্সে এখন মহিলা সদস্য সংখ্যা ছাব্বিশ। এদের মধ্যে আছেন একজন মহিলা ক্যাবিনেট মন্ত্রী। রাষ্ট্রদূত বা এজাতীয় ব্যাপারে তাঁরা খুব একটা এগুতে না পারলেও নির্বাচকমণ্ডলীর অর্ধেকই আজ তাঁদের নিয়ে গঠিত। তাই মহিলাদের অবজ্ঞা করা খুব একটা সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি অক্সফোর্ড কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ছাত্র ইউনিয়নেও মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। এটা অনেকখানি আশার কথা। হয়তো এ'দেরই মধ্য থেকে একদিন আসবেন প্রথম মহিলা স্টকব্রোকার অথবা ব্রিটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

আমেরিকায় যে জিনিষটা সহজেই নজরে পড়ে তা হলো মেয়েরা ক্রমেই ভারী শিল্পে আগ্রহ প্রকাশ করছে। শ্রমসাপেক্ষ কাজই তাদের অধিকতর পছন্দসই। তাই ১৮৯০ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে মেয়েদের উৎসাহই প্রকাশ পাচ্ছে। যদিও সংখ্যাটা সে তুলনায় খুব স্ফীত হয়নি। সেইসময়ে আমেরিকান শ্রমিকদের শতকরা সতেরজন ছিল মহিলা। আজ সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৬-৩ জন। অবশ্য যুদ্ধের সময় মহিলাদের শিল্পকাজে উৎসাহ থেকেই সংখ্যাটা বাড়তে থাকে। তারপর যুদ্ধের রেশ শেষ সরে গেলে আবার তাঁদের উৎসাহে ভাটা পড়তে শুরু হয়। বর্তমানে পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

অতীতের অনেক ধ্যানধারণাই আজ বদলে গেছে। একসময়ে মেয়েদের চাকুরির রাতারাতি বয়েস ছিল বাইশ, আজ তা [illegible] একচল্লিশ। শুধু তাই নয়,

চাকরির সঙ্গে মেয়েরা বিয়ের পাটও তাড়া-তাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চাইছে। তাঁদের সেই আগ্রহই প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন জীবিকায় বিবাহিত মেয়েদের প্রাধান্যে। আগে যেখানে শতকরা তেইশজন কর্মী মেয়ে ছিল বিবা-হিত, আজ সেই সংখ্যক মহিলাকে দেখা যায় অবিবাহিত। বাদবাকি সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁদের অনেকে আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্যন্ত এগিয়েছেন। কেউ কেউ আবার অশান্তি এড়ানোর জন্য আলাদা থাকছে। বৈধব্যও ঘটেছে কারো কারো ভাগ্যে।

আমাদের মত আমেরিকাতেও স্বামী-স্ত্রী'র যৌথ আয় পরিবারের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাই প্রায়ই দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করে পারিবারিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখছে। প্রায় ৪২-১ মিলিয়ন পরিবার এভাবে চলছে। আরো একটা জিনিষ লক্ষ্যণীয় যে, নিগ্রোদের মধ্যে ক্রমে এই প্রবণতা বাড়ছে। শতকরা পঁয়ষট্টি পরিবারে নিগ্রো মহিলারা চাকরি-বাকরির ধার ধারে না।

অধিকাংশ মা-ই ছেলে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত চাকরিতে ক্ষান্ত দেয় না। এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, ৯-৯ মিলিয়ন চাকুরিরত মহিলার ছেলের বয়স আঠার। তাঁরা হয়তো আর বেশিদিন চাকরি করবেন না। তবে যারা পরিবারের প্রধান হিসাবে চাকরি করেন তাঁরা বহাল তো থাকবেনই বরং উন্নতির পথ খুঁজবেন। এরকম মেয়ের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়—৫-৪ মিলিয়ন। আবার এ'দের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। শতকরা ৫৮-৬ নিজেরাই চাকরির ব্যাপারে যেমন সতর্ক তেমনি জীবিকার প্রশ্নে নারীসমাজের অধিকার বিস্তৃতিরও বলিষ্ঠ-তম সহায়ক।

ব্রিটেনের অধিকার-সচেতন নারীসমাজের কাজকর্মের সুযোগ-সুবিধাও বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ কেউ লক্ষ্যই করবে না যদি কোন মেয়েকে নতুন উপনগরীর পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় বা তাঁকে দেখা যায় বিমান চালিয়ে দেশ-দেশান্তর উড়ে যেতে। এদেশেও চাকুরিরতা মেয়েদের মধ্যে বিবাহিতের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রায় সত্তর লক্ষ মেয়ে আজ ব্রিটেনের ঘরে বাইরে কাজ করছে। স্কুল, হাসপাতাল, গবেষণাগার, কারখানা, পার্লামেন্ট, সেনা-বাহিনী, সরকারী দপ্তর প্রভৃতি নানা

অগ্রগতির এই স্তরে আসতে পারা থেকেই সমগ্র অবস্থার বাস্তব পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত কনজুমার কাউন্সিলের ডাইরেক্টর এবং বে-সরকারী কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান পদেও মহিলার জয়-জয়কার।

তবুও অসন্তোষ কিছুটা থেকেই যাচ্ছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে স্থান-বিশেষে পার্থক্য তাঁরা সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁদের কথা হলো, সমান অধিকারই সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলকথা। আর সমগ্র নারীসমাজের স্বার্থেই এই সমান অধিকার তাঁরা দাবী করে চলেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক সমতা অর্থক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমতা বিধান করতে পারছে না। কোন কোন মেয়ে চাকরিতে কম বেতন পাওয়ার জন্য এবং আয়ের একটা বিশেষ স্তরে তাঁদের স্বামীরা স্ত্রীর আয়ের দরুণ বেশি আয়কর দিতে বাধ্য হওয়ার বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এর ফলে অধিকারের পথ আরো প্রশস্তই হবে, এ রকম আশা করা অন্যায় হবে না।

কিছুটা সুফল ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। বিয়ের পর নিজের সম্পত্তির ওপর অধিকার রক্ষার দাবি তাঁদের স্বীকৃত হয়েছে। তাছাড়া সন্তানের উপর তাদের দাবি এখন সর্বাগ্রে বিবেচ্য এবং স্বামীর আয় থেকে পাওয়া সংসার খরচার উদ্বৃত্তের মালিক তাঁদের। এ বিষয়ে তাঁরা পুরো সচেতন।

আর একটা ব্যাপার উল্লেখের দাবি রাখে, যেখানে আমেরিকান ও ব্রিটেনের নারীসমাজ সমচিন্তায় উদ্বুদ্ধ। অধিকাংশ মেয়েই আজকাল একটু তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চায়। বিয়ের পর সুস্থ মনে চাকরি-বাকরি নিয়ে ঘরকন্না করা তাঁরা অনেক সুবিধা মনে করেন। তাই সব জায়গায়ই আজ বিবাহিত মেয়ের প্রাধান্য। এক সময়ে চাকরিতে বিবাহিত মহিলার দর্শন পাওয়াই দুর্লভ ছিল। সেদিন বিয়ের পর মেয়েরা আর অফিসের দোরগোড়া মাড়াতো না। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিয়ের পরও কেউ চাকরি ছেড়ে যায় না। প্রয়োজন মাত্র সাময়িক বিরতি প্রয়োজন। তারপর আবার পুরনো জীবন। সুতীব্র অধিকারবোধই সম্ভবত এজন্য দায়ী। পারিবারিক স্বচ্ছলতা ও সন্তান-সন্ততিদের লালন পালনের চিন্তাও অবশ্য তাঁদের মাথায় থাকে। তাই জীবিকার প্রতি তাঁরা আরো বেশি আকর্ষণ বোধ করেন।

মেয়েরা তাড়াতাড়ি বিয়ের ফলে যা প্রত্যাশিত ছিল তা অবশ্য হয় নি। বরং তার বিপরীত প্রতিক্রিয়াই ফলতে শুরু করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহবিচ্ছেদ দম্পতিকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই এ দুঃখজনক কাণ্ড ঘটছে। আবার কোথাও ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্য দুজনে আলাদা থাকাই শ্রেয় [illegible]। মোট কথা। [illegible]

এ ধরনের মামলায় সবসময়ই বেশ জমজমাট থাকে।

যদিও দেশের আবহাওয়া পশ্চিম জার্মানীর মেয়েদের বিয়ের অনুকূলে রায় দেয় পঁচিশ বছরে তবুও ক্রমেই এ রীতির বিলোপ হচ্ছে। আমেরিকা এবং ব্রিটেনের মত এদেশের মেয়েরাও তাড়াতাড়ি বিয়ের পক্ষপাতী। তাই ১৭।১৮ বছরেই মেয়েরা বিয়ের ঝামেলা মিটিয়ে ফেলছে।

ব্রিটেন তুলনামূলকভাবে অনেকখানি রক্ষণশীল। তাই পুরনো বিবাহবিচ্ছেদ রীতিই এদেশে এখনো বহাল। আমেরিকায় কিন্তু এ সম্পর্কে নতুন চিন্তার সূত্রপাত হতে দেখা যাচ্ছে। প্রদেশে প্রদেশে সেখানে আইনের ফারাক যথেষ্ট। তাই কোন কোন প্রদেশ ডিভোর্সের জন্য কোনরকম সময় বরাদ্দ করা হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিয়ের পথে যাতে কোন বাধা না থাকে সে জন্য আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। অন্যান্য প্রদেশ অবশ্য পুরনো নিয়মের খুব একটা রদবদল এখনো করে নি। তবে করতে যে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চাকরির সঙ্গে পারিবারিক জীবনের যোগ সর্বত্রই আজ নিবিড়। তবু আকাশ এবং মহাকাশের সঙ্গে আমেরিকার নারী-সমাজ গভীর যোগাযোগ রেখেছেন। মহাকাশ অভিযানে নারীসমাজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। হয়তো তাঁদের বাদ দিয়ে কোন কোন অভিযান সফল নাও হতে পারতো। মহাকাশ সম্পর্কে মহিলারা বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং প্রতিটি অভিযানে তাঁরা সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছেন।

ম্যারিনার টু' ভেনাস গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণের সময় তার সুষম বন্দোবস্তে এক বিশেষ ভূমিকা ছিল ডাঃ মার্শিয়ার। আবার কক্ষে অবস্থানকালে মহাকাশচারী-দের খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব স্বহস্তে পালন করেন মিসেস ফিঙ্কলস্টেইন।

কক্ষপথে ঘুরে চলেছে নতুন উপগ্রহ। হেড কোয়ার্টারে কম্প্যুটার মেশিন নিয়ে বসে আছেন শ্রীমতী মেলবা রয়। তিনি নির্দেশ করছেন নতুন আমেরিকান উপগ্রহ কখন পৃথিবীর কোন জায়গা দিয়ে যাবে। কোটি কোটি উৎসাহী মানুষ এর ফলে উপকৃত হচ্ছে।

তেমনি আবার মহাকাশ অভিযানের অ্যাস্ট্রোনমি প্রোগামের সর্বময় দায়িত্ব বহন করছেন ডাঃ ন্যান্সি গ্রেস রোমান। নিজের কাজের সুবিধার জন্য তিনি ইংরাজী ছাড়াও ফরাসী, জার্মান, রুশ আয়ত্ত করেছেন। স্বক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য তিনি উপাধি পেয়েছেন 'উওম্যান ডোয়ার' অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা এবং কৃতিত্বের জন্য হোয়াইট হাউসের পুরস্কার।

এরকম আরো অনেক আছেন। যাঁরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে থাকেন। মোট কথা, নারী কর্মীর, বিরাট ভূমিকা ছাড়া মহাকাশ অভিযানও সম্ভব নয়।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের নারীমহল নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে অনেক আগেই সচেতন হয়েছে। কিন্তু স্বীকৃতি পেতে তাঁদের বেশ দেরী হওয়ায় তাঁদের অগ্রগতি যথেষ্ট বিকশিত হয়ে ওঠেনি। তাই এ ব্যাপারে তাঁরা পূর্ব ইউরোপের সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন। তবে সার্বিক অগ্রসর যেমন দ্রুত হচ্ছে, তাতে আশা করা যায় আর কয়েক বছরের মধ্যে উভয় দুনিয়ার নারীসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবধান ক্রমে হ্রাস পাবে।

দুদেশের নারীমহলই আজ নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। নিজেদের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখেই দেশ ও সমাজের উন্নতিতে তাঁরা আত্মনিয়োগ করছেন। কাজ বাড়ছে, মানুষের চাহিদাও ব্যাপক। নিজেদের অধিকার আদায় করে পূর্ণ আত্মবিকাশের এই সুযোগ কেউ হেলায় হারাবেন বলে মনে হয় না। তাই নারীসমাজের মধ্যে আজ এত সাজ সাজ রব।

অভিযুক্ত কাহিনী

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার স্টাইনবেকের জন্ম। 'অব মাইস অ্যান্ড মেন (১৯৩৭) এবং 'দি গ্রেপস অব র‍্যাথ' (১৯৩৯) নামক উপন্যাস দুটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। জন স্টাইনবেকের রচনা বস্তুনিষ্ঠ এবং জীবনধর্মী। আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার দুর্দিনের পটভূমিকায় রচিত তাঁর কাহিনীগুলি সমাদর লাভ করে। স্টাইনবেকের "স্নেক" বিশ্ব-সাহিত্যের একটি বিখ্যাত কাহিনী। বিকৃত যৌন-কামনা পরিতৃপ্তির প্রয়োজনে-একটি মেয়ের সাপ কেনার মধ্যে যৌনমনস্তত্ত্ব ও যৌনবিকৃতির এক গভীর দিক সুক্ষ্ম ভঙ্গীতে পরিবেশিত হয়েছে এই কাহিনীতে।

তরুণ ডাক্তার ফিলিপস্ যখন বে
কাঁধে তুলে নিয়ে খাঁড়ি থেকে উঠে প
তখন প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে। প
ওপর পা দিয়ে উঠে রাবার বুট পায়ে
মস্‌মস্ করে চললেন। যতক্ষণে মোন
ক্যানারী স্ট্রীটের বাণিজ্যিক ল্যাবরেট
পৌঁছলেন ততক্ষণে পথের আলো সব
উঠেছে। বাড়িটি ঘিঞ্জি এবং ছোট, অ
উপসাগরের সেতুস্তম্ভে আর বা
ডাঙায়। এ পাড়ার দুপাশে বড় বড় কর
ছাউনীওলা সারডিন মাছ টিনে ভর্তি
কারখানা। এই কারণেই পথের নাম হ
ক্যানারী স্ট্রীট।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ড
ফিলিপস দরজা খুললেন। খাঁচার
শাদা ইঁদুর তারের ওপর উঠা-নামা কর
বন্ধ খোঁয়াড়ের বিড়ালগুলি দুধের আ
মিউ-মিউ সুরু করে। ব্যবচ্ছেদ টেবলের
ঝক্ ঝকে আলোটা ঘুরিয়ে দিয়ে ড
তাঁর চট্‌চটে থলেটা মাটিতে নামিয়ে রাখে
জানালার ধারে কাঁচের খাঁচায় থাকে ঘর্ঘর
(অ্যামেরিকানরা বলেন র‍্যাটেল স্নেক
ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে সাপ দেখলেন। স
গুলি একসঙ্গে কুন্ডলীকৃত হয়ে খাঁচার
প্রান্তে বিশ্রাম উপভোগ করছিল। প্র
সাপের মাথা কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছ
ধূসর চোখগুলি কোনো দিকেই তা
নেই। কিন্তু ডাক্তার যেই খাঁ
ওপর ঝুঁকে পড়লেন তখনই সাপের কা
মত জিভ্‌গুলি ধীরে ধীরে আন্দো
হতে লাগল, জিভের আগাটায় কালো
পিছন পিঠটা গোলাপী। তারপর
মানুষটাকে চিনতে পেরে নিজেদের জি
টেনে নিল।

গা থেকে চামড়ার কোটটা খুলে রে
ডাক্তার স্টোভে আঁচ ধরালেন, তারপর এক
কেটলিতে জল চাপিয়ে একটা টিন বরব
সেই জলে ফেলে দিলেন। এরপর ডা
মাটিতে নামানো সেই থলিটার দি
তাকালেন। তরুণ ডাক্তারের দেহটা ক্ষী
চোখ দুটি মৃদু এবং বোঝা যায় সেই চো
অনেকটা সময় অনুবীক্ষণে দেখার কাজে
ব্যস্ত থাকে। ওর গালে পাত্‌লা বাদা
দাড়ি।

চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে, অ
[illegible] উঁচু আওয়াজ [illegible]
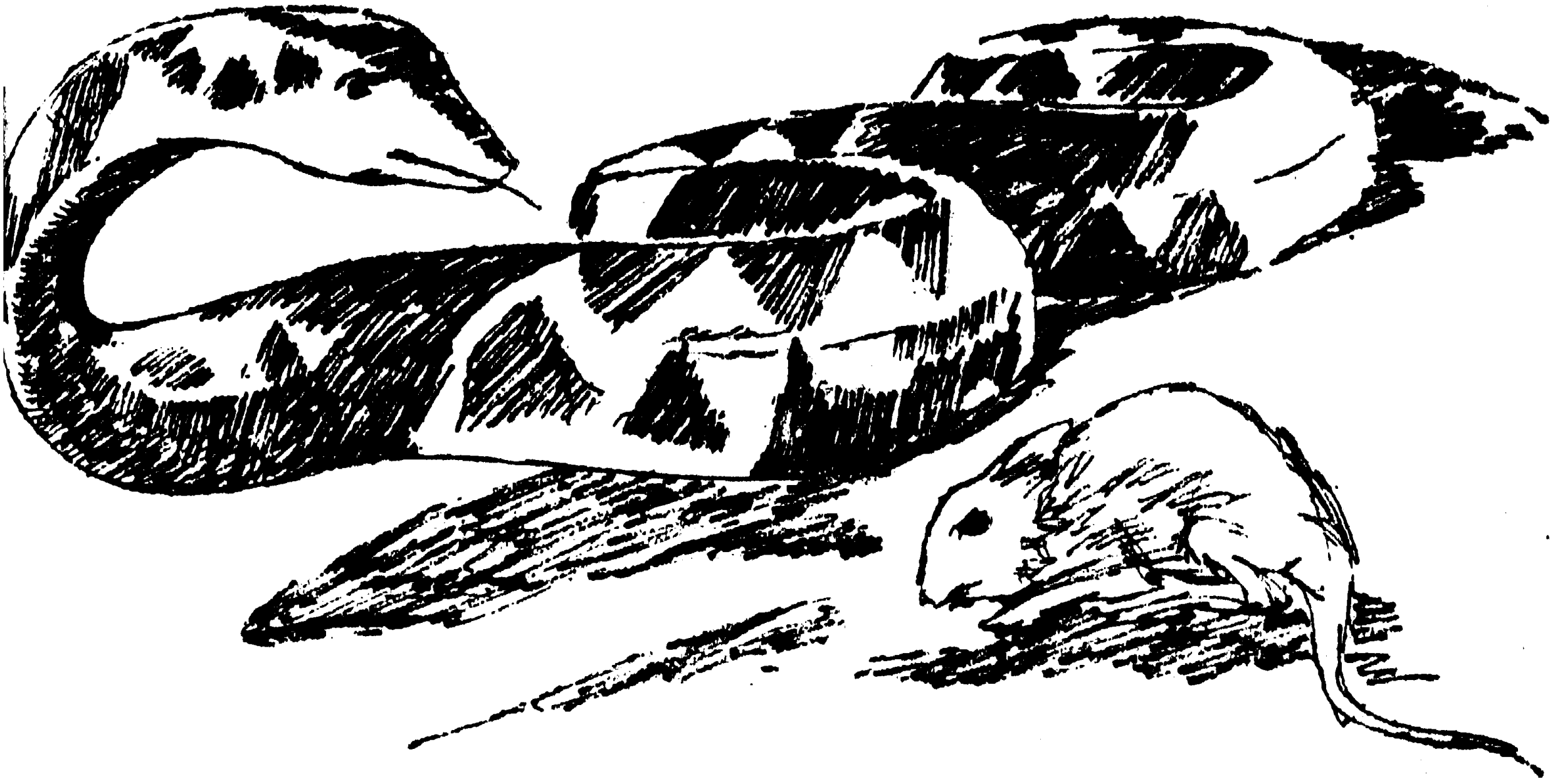
নাগ ও নাগিনী

জন স্টাইনবেক

ছে। সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ নিঃশব্দে শে বাড়ির ভিতের ওপর পড়ছে। তাকের পর থরে থরে সাজানো রয়েছে ম্যুজিয়মের রে রাখা সামুদ্রিক প্রাণীর নমুনা। াবরেটরীতে এদের নিয়েই কাজ করতে য়।

পাশের দরজাটি খুলে ডাঃ ফিলিপ য়নকক্ষে ঢুকলেন। ছোট ঘরটির চারপাশে ই সাজানো, একটি সেনাবাহিনীর খাট, ড়ার আলো আর একটা অস্বস্তিকর কাঠের য়ার। পা থেকে রবার বুটজোড়া খুলে, ড়ের চামড়ার একটা হাল্কা চটি পরলেন ঃ ফিলিপস। এরপর যখন পাশের ঘরে লেন তখন কেটলীর জল গুঞ্জন সুরু রেছে।

সেই বস্তাটা মেঝে থেকে তুলে টেবলের দা আলোর সামনে ধরে খালি করে তার তর থেকে ডজন দুই সাধারণ স্টার ফিস ামুদ্রিক তারা মাছ), বার করে টেবলের পর পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলেন ডাক্তার। রের খাঁচার ব্যস্ত-ইঁদুরগুলোর দিকে র পড়ল ডাক্তারের। একটা কাগজের ঠোঙা কে কিছু দানা নিয়ে তিনি খাবার রাখার য়গায় ফেলে দিলেন। অচিরাৎ ইঁদুর-লো তারের দাঁড় বেয়ে নেমে এসে খাবার য়ে টানটানি সুরু করল। একটা ছোট্ট ধানো অক্টোপাশ আর জেলিমাছের মধ্যে থা ছিল এক বোতল দুধ। ডাক্তার দুধটা ল নিয়ে বিড়ালের খাঁচার দিকে এগিয়ে লেন। কিন্তু পাত্রে দুধ ঢালার আগে তিনি খাঁচা থেকে আস্তে আস্তে একটা মোটাসোটা হুলোকে তুলে নিলেন। তাকে সামান্য একটু আদর করে একটা ছোট্ট কালো রঙের বাক্সে ফেলে দিয়ে বাক্সের ডালাটা দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে দিয়ে মারণ গ্যাসের নলটা তার সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন। কালো বাক্সটায় যখন ক্ষণস্থায়ী মৃদু সংগ্রাম চলেছে তখন ডাক্তার পাত্রে দুধটা ঢেলে ফেললেন। একটি বিড়াল ও'র হাতের ওপর ধনুকের ভঙ্গীতে আড়ামোড়া ভেঙে নেয়, ডাক্তার হেসে তার ঘাড়টা চাপড়ে দিলেন।

বাক্সটা এতক্ষণে শান্ত। তার গা থেকে নলটা খুলে দিলেন ডাক্তার, বাক্সটা এতক্ষণে গ্যাসে ভর্তি হয়ে গেছে।

স্টোভের ওপর সেই বরবটির টিনটা এতক্ষণে ভীষণভাবে ফুটছে। ডাক্তার একজোড়া প্রকাণ্ড বড়ো সাঁড়াশি দিয়ে সেই বরবটি ভর্তি পাত্রটা উঠিয়ে নিয়ে সেটি খুলে বরবটিগুলি কাঁচের ডিসে ঢাললেন। খেতে খেতে তিনি টেবলে রাখা তারা মাছ-গুলির দিকে তাকালেন। দুধের মত রস ঝরে পড়ছে। বরবটিগুলি শেষ করে ডিসটা সিংকের মধ্যে নামিয়ে রেখে তিনি যন্ত্রপাতির আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। এখান থেকে একটি মাইক্রস্কোপ এবং এক পাঁজা ছোট্ট কাঁচের ডিস বার করে নিলেন। ডিসগুলি একে একে জলের কল খুলে সমুদ্রের জলে পূর্ণ করে সেগুলি তারা-মাছের পাশে সাজিয়ে ঘড়িটা নিয়ে টেবলে শাদা আলোর নীচে নামিয়ে রাখলেন; মেঝের নীচে ভিতের গায়ে সাগর-তরঙ্গ মৃদু দীর্ঘশ্বাসে ভেঙে পড়ছে। ড্রয়ার থেকে একটা আইড্রপার বার করে তারা-মাছগুলির উপর ঝুঁকে পড়লেন ডাক্তার।

ঠিক এই মুহূর্তে কাঠের সিঁড়িতে মৃদু পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা। মুখে সামান্য বিরক্তি নিয়ে ডাক্তার দরজা খুললেন। দীর্ঘাঙ্গিনী, শীর্ণ আকৃতির একজন মহিলা দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে। তাঁর পরিধানে ঘোর কালো রঙের পোশাক— প্রশস্ত ললাটের ওপর কালো চুল খাড়া হয়ে নেমে এসেছে। চুলগুলি বিস্রস্ত, যেন হাওয়ায় এলোমেলো। তাঁর কালো চোখ কড়া আলোয় চক্‌চক করছে।

ধরা ধরা মিহি গলায় মেয়েটি বলল— আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, ভিতরে যাবো?

নিরুত্তাপ কণ্ঠে ডাক্তার বললেন : আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি—সময় ধরে আমাকে কাজ করতে হয়।

কিন্তু দরজা থেকে সরে দাঁড়াতে হল। মেয়েটি ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। সে বলল :

যতক্ষণ না আপনার কথা বলার সময় হবে, আমি চুপ করে থাকব।

দরজা বন্ধ করে শোবার ঘর থেকে সেই অস্বস্তিকর চেয়ারটা টেনে আনলেন ডাক্তার। তারপর মার্জনাপ্রার্থীর ভঙ্গীতে

বললেন,—কাজ সুরু হয়ে গেছে কিনা, আমাকে এখনই কাজ করতে হবে।

অনেক রকম লোকজন আসে, প্রশ্ন করে। তাদের জন্য বাঁধা কতকগুলি দোহাই আছে। বসুন, এখানে। কয়েক মিনিট পরে আমি আপনার কথা শুনতে পারব।

লম্বা মেয়েটি টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তরুণ ডাক্তার সেই আইড্রপার দিয়ে তারামাছের অংশ থেকে তরল পদার্থ তুলে নিয়ে জলভরা পাত্রে ফেলে অতি ধীরে ধীরে ড্রপার দিয়ে জল নাড়াতে লাগলেন। এরপর ডাক্তার মেয়েটিকে বোঝাতে সুরু করলেন—

—তারামাছরা যখন যৌনগত পুষ্টি লাভ করে তখন ওরা ভাঁটার জলে শুক্র-বীজ এবং ডিম নিক্ষেপ করে। আমি ঐ শ্রেণীর পরিপুষ্ট নমুনা সংগ্রহ করে জল থেকে তুলে আনি। ভাঁটার জলের মত পরি-বেশে ওদের রেখে শুক্র এবং ডিম মিশিয়ে দিলাম। তারপর এই মিকশ্চার এই দশটি কাঁচের পাত্রে রেখে দেব। দশ মিনিটের মধ্যে প্রথম পাত্রে যা আছে তা মেনথল দিয়ে হত্যা করব। কুড়ি মিনিট পরে দ্বিতীয় গ্রুপেরও ঐ হাল হবে, তারপর প্রতিটি কুড়ি মিনিটে এক-একটা গ্রুপ শেষ করব: এদের পদ্ধতিটা এইভাবে গতিরোধ করে মাইক্রস্কোপ দিয়ে জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষা করব।

একটু থেমে ডাক্তার বললেন : প্রথম গ্রুপটা মাইক্রস্কোপ দিয়ে দেখবেন নাকি?

—না, আমি দেখতে চাই না। আপনাকে ধন্যবাদ।

অচিরাৎ তার দিকে তাকালেন ডাক্তার: যারা আসে তারা সর্বদাই কাঁচের ভিতর চোখ দিয়ে দেখতে চায়। মেয়েটির দৃষ্টি টেবলেও নেই, সে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকেই। তার কালো চোখ দুটি তাঁর মুখের ওপর স্থলেও সে ওঁকে দেখছে না। মহিলাটির চোখের পাতা আর তারার কোনো বিভাজক রেখা নেই। ওর জবাবে চমকে উঠেছেন ডাক্তার। অবশ্য প্রশ্নের জবাব দিতে বিরক্তি বোধ হয় তথাপি তাঁর কাজ সম্পর্কে এমন আগ্রহহীনতা ওঁকে তিক্ত করে তোলে। ডাক্তারের মনে বাসনা জাগল মেয়েটির মনে কৌতূহল জাগানোর।

ডাক্তার বললেন : প্রথম দশ মিনিটে আমি যখন অপেক্ষা করি তখন আমাকে কিছু কাজ করতে হয়, অনেকেই তা দেখতে চান না। আপনি বরং আমার যতক্ষণ না শেষ হয় ও ঘরে গিয়ে বসুন।

হালকা শান্ত গলায় মেয়েটি বলল—না, আপনার যা খুশি করুন না—আপনার যতক্ষণ কথা বলার সময় না হয়, আমি অপেক্ষা করে থাকব। মেয়েটির কোলের ওপর দুটি হাত পাশাপাশি রাখা। সে একেবারে গা মেলে দিয়েছে। মেয়েটির চোখ দুটি উজ্জ্বল, কিন্তু বাকী সব-টুকুতে প্রাণপ্রবাহ যেন প্রতিহত। ডাক্তার মনে মনে ভাবেন—মেয়েটির মেটাবলিক রেটটি অনেক নীচে—দেখে মনে হয় একটা ব্যাঙের চেয়েও ওর গতি ক্ষীণ।

এই অনড়ত্ব থেকে মেয়েটিকে জাগ্রত করার বাসনা ডাক্তারকে আবার পেয়ে বসল।

টেবলের পাশে একটা কাঠের ছোট দোলনা নিয়ে এসে তার ওপর ছুরি-কাঁচি সাজিয়ে একটা শূন্যগর্ভ শলাকা টেনে নিয়ে প্রেসার-টিউবে এঁটে দিল। এরপর সংবণ-প্রকোষ্ঠ থেকে মরা বিড়ালটা বার করে দোলনায় শুইয়ে তার দুটি ঠ্যাঙ দুদিকের দুটি হুকে আটকে দিলেন। এর মধ্যে আড়চোখে একবার মেয়েটিকে দেখে নি[illegible] মহিলাটির নড়ন-চড়ন নেই, তখনও [illegible] উপভোগ করছে।

আলোয় পড়ে বিড়ালটি যেন দাঁ[illegible] করে হাসছে, বিড়ালটার গোলাপি [illegible] কিছু অংশ সরু দাঁতের নীচে [illegible] পড়েছে। ডাক্তার কুশলী হাতে বি[illegible] গলার চামড়াটা খুলে নিলেন। [illegible] একটু ভিতরে চালিয়ে একটা শিরা নিয়ে দৃঢ়চিহ্নিতভঙ্গীতে সূচটা পাত্রে তারপর শলাকাটা জড়িয়ে রাখলেন।

এরপর ডাক্তার বোঝাতে সুরু ক[illegible] এটা হল সংরক্ষক রস, মরা দেহ রাখে। এরপর আমি ধমনীতে একটা [illegible] রক্তের আরক এবং শিরায় দেব [illegible] আরক—জীবতাত্ত্বিক ক্লাসের প্র[illegible] এইভাবে রক্ত প্রবাহ ব্যবচ্ছেদ করা হে[illegible]

আবার মেয়েটির দিকে তা[illegible] ডাক্তার। তার সেই কালো চোখ যেন [illegible] ঘন ঘোমটায় ঢাকা। বিড়ালটির উন্মুক্ত [illegible] দিকে অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে সে তা[illegible] আছে। এক ফোঁটাও রক্ত অপচয় [illegible] কাট-কুট পরিচ্ছন্নভাবেই হয়েছে। ফিলিপস ঘড়িটা দেখলেন—ফার্স্ট গ্রু[illegible] সময় হল।

প্রথম পাত্রটিতে ডাক্তার কয়েক [illegible] মেনথল মিশিয়ে দিলেন।

মেয়েটির উপস্থিতি ডাক্তারকে না[illegible] করে তুলেছে। ইঁদুরগুলি আবার [illegible] তারে নৃত্য সুরু করেছে, মাঝে [illegible] কিচ-কিচ করছে। বাড়ির নীচে [illegible] তরঙ্গ মৃদু-কাঁপন সৃষ্টি করছে।

তরুণ ডাক্তার শিহরণ অনুভব ক[illegible] স্টোভে কয়েক টুকরো কয়লা ফেলে [illegible] আবার বসে ডাক্তার বললেন : এখন [illegible] মিনিট কোন কাজ নেই। ডাক্তার [illegible] করলেন যে নীচের ঠোঁট থেকে মেয়ে[illegible] চিবুকটা কত ছোট। মেয়েটি যেন [illegible] ধীরে জেগে উঠল। যেন [illegible] প্রবা[illegible] গভীর থেকে উঠে এলো।

মেয়েটির মাথাটি এতক্ষণে উঠল। [illegible] ধূসর রঙের চোখ সারা ঘরখানিতে [illegible] বেড়িয়ে ডাক্তারের মুখে ফিরে এল।

মেয়েটি বলে উঠল, আমি অপে[illegible] করছি একটা কথা জানার জন্য। আপন[illegible] এখানে সাপ আছে?

সেইভাবেই দুটি হাত মেয়ে[illegible] কোলের ওপর নিশ্চল ভঙ্গীতে পাশাপা[illegible] পড়ে রইল।

ডাক্তার একরকম চেঁচিয়ে বলে উঠ[illegible] আছে বৈকি—আমার প্রায় ডজন দু[illegible] বর্ধমান সাপ আছে। এইসব র‍্যাটেল স্নে[illegible] বিষ দুয়ে নিয়ে আমি বিষ-নিরো[illegible] ল্যাবরেটরীতে পাঠাই।

ডাক্তারের দিকে সেইভাবে মেয়ে[illegible] চেয়ে রইল কিন্তু তার চোখ ডাক্তা[illegible] কেন্দ্রীভূত নয়, বরং ডাক্তারকে ঘিরে যে[illegible] একটা বিরাট চক্রাকারে তার চার পাশে [illegible]

[illegible]য়েন। মেয়েটি [illegible] [illegible]
[illegible]পনার কাছে মন্দা সাপ [illegible]? [illegible]
[illegible]টল স্নেক?

ডাক্তার উৎসাহিত ভঙ্গীতে বলে ওঠে,—
[illegible]ছে, আমি জানতে পেরেছি আছে। এক-
[illegible] সকালে এসে দেখি,—এসে দেখি একটা
[illegible] সাপ একটা ছোট র‍্যাটেল সঙ্গে,
[illegible] সাপের সঙ্গে সঙ্গম করছে। বন্দী-
[illegible] এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। বললেন,
[illegible] আমি নিশ্চিত জানি, আমার একটা
[illegible] সাপ আছে।

—কোথায় সেটি?

—ঐ জানলার কাছে প্লাস কেসের
[illegible]তর!

মেয়েটির মাথাটি অতি ধীরে ঘুরে
[illegible]। কিন্তু কোলের ওপর রাখা সেই
[illegible]দুটি গতিহীন। তারপর ডাক্তারের
[illegible]ক ফিরে মেয়েটে বলল, আমি একবার
[illegible]তে পারি?

ডাক্তার উঠে গিয়ে জানালার পাশে
[illegible]পর বাকসটার কাছে দাঁড়ালেন। কাঁচের
[illegible]সে বালির ওপর সাপগুলি গাঁটছড়া
[illegible] পরস্পরকে জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে
[illegible], তবে ওদের মাথাগুলি বেশ স্পষ্ট।
[illegible]লকে জিভ আন্দোলিত করে সাপগুলো
[illegible]-তরঙ্গের স্বাদ অনুভব করে। ডাঃ
[illegible]লপস নার্ভাস ভঙ্গীতে মাথাটি
[illegible]লেন। মেয়েটি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।
[illegible]ন যে চেয়ার থেকে উঠে পড়েছে শোনা
[illegible]নি। শুধু নীচে বাড়ির ভিতে সাগর-
[illegible]শ আছড়ে পড়ার শব্দ, আর খাঁচার
[illegible]র জালে ইঁদুরের কিচির-মিচির।

মেয়েটি বেশ কোমল গলায় প্রশ্ন করে, আপনি যে মন্দা সাপটার কথা বললেন, সেটি কোনটি?

খাঁচার একপ্রান্তে একটা ধূসর রঙের মোটা সাপ দলছাড়া হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়েছিল। ডাক্তার তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ যে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা। টেকসাস থেকে আনা। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে যেসব সাপ পাওয়া যায় সেগুলি প্রায়ই আকারে ছোট। এই সাপটা ইঁদুরও একটু বেশী খায়। যখন অন্য সাপদের খাবার ব্যবস্থা করি, তখন ওটাকে বার করে নিই।

সাপটার ভোঁতা শুখনো মাথাটির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। প্রশ্ন করে, আপনি ঠিক জানেন ত' ওটি মন্দা সাপ?

ডাক্তার জোর গলায় বলে ওঠেন. র‍্যাটেল স্নেকগুলি ভারী মজার। সব রকমের সিদ্ধান্তই অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। আমি ঐ র‍্যাটল স্নেক সম্পর্কে ঠিক করে কিছু বলতে চাই না— তবে, হ্যাঁ, এই সাপটা নিশ্চিতভাবে পুরুষ। এ আপনাকে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

সেই শুখনো মাথার দিকে মেয়েটির লোলুপ দৃষ্টি। সেদিক থেকে নজর আর সরে না। সে প্রশ্ন করে, সাপটা আমাকে বেচবেন?

প্রায় চিৎকার করে ডাক্তার বলে উঠলেন, বেচব? আপনাকে বিক্রী—বিক্রী করব?

—কেন, আপনারা নমুনা বিক্রী করেন না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, [illegible] [illegible] [illegible] করি।

—কত দাম—পাঁচ ডলার? দশ?

—না পাঁচের বেশী নয়। কিন্তু আপনি কি এই সব র‍্যাটল সাপের বিষয় সব জানেন? আপনাকে কামড়ে দিতেও পারে।

ডাক্তারের মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে মেয়েটি বলল, আমার ওকে নিয়ে যাওয়ার ঠিক ইচ্ছে নেই। এখানেই ওকে রেখে যাব, তবে ওকে একান্তভাবে আমার করেই পেতে চাই।

এই বলে মেয়েটি নিজের পার্স খুলে তার থেকে একটি পাঁচ ডলারের নোট বার করে দেয়, এই নিন। এখন ওটা আমার।

ডাঃ ফিলিপস কেমন ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, ওর মালিক না হলেও আপনি এসে ওকে দেখে যেতে পারেন।

—না আমি ওকে একান্তভাবে আমার করে পেতে চাই।

ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন, হা ভগবান! আমার সময় সম্পর্কে খেয়াল ছিল না।

টেবলের কাছে দৌড়ে গেলেন। তিন মিনিট বেশী হয়েছে। যাক যে তেমন ক্ষতি হবে না।

এই বলে ডাক্তার কয়েকটি মেনস্ক্যাস নাড়িয়ে দ্বিতীয় পাত্রে রাখলেন। এরপর ডাক্তার আবার সাপের খাঁচার কাছে ফিরে এলেন। মেয়েটি তখনও কেমন চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে সতৃষ্ণ নয়নে সাপের দিকে তাকিয়ে।

ডাক্তারকে দেখে প্রশ্ন করে, ও কি খায়?

—আমি ওদের শাদা ইঁদুর খেতে দিই, ওদিকের খাঁচায় ইঁদুর রাখা আছে।

—আপনি সাপটাকে অন্য খাঁচায় রাখবেন কি? আমি এখন ওকে খেতে দিতে চাই।

—এখন কিন্তু ওর খাওয়ার দরকার নেই। এ সপ্তাহে একটা ইঁদুর ওর খাওয়া হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ওরা তিন চার মাস কিছু খায় না। আমার একটা সাপ ছিল সে এক বছরের ওপর কিছু খায়নি।

মেয়েটি মৃদু একঘেয়ে সুরে বলল—একটা ইঁদুর আমাকে বিক্রী করবেন?

ডাক্তার কাঁধ নাড়লেন, বললেন—ও বুঝেছি। আপনি দেখতে চান র‍্যাটল স্নেক কিভাবে খায়। বেশ, আপনাকে দেখাচ্ছি। ইঁদুরের দাম পঁচিশ সেণ্ট। লোভাবে যদি ব্যাপারটি দেখেন তাহলে বলব ষাঁড়ের লড়াই-এর চেয়ে অনেক ভালো, আর অন্যদিক থেকে দেখলে দেখবেন—শুধু সাপের নৈশ ভোজ।

ডাক্তারের কথার ভঙ্গীতে তিক্ততা। স্বাভাবিক ব্যাপার যাদের কাছে খেলার বস্তু, তাদের তিনি ঘৃণা করেন। ডাক্তার স্পোর্টসম্যান ন'ন, তিনি একজন জীব-বিজ্ঞানী। জ্ঞানের প্রয়োজনে এক হাজার জন্তুকে তিনি মারতে পারেন—কিন্তু সখের খাতিরে একটা পতঙ্গও মারা চলে না। আগেও ডাক্তারের মনে এই চিন্তা জেগেছে।

মেয়েটি ধীরে ধীরে মাথাটি ডাক্তারের দিকে ঘোরাল—তার পাতলা ঠোঁটে একটা হাসির রেখা জাগছে, সে বলল, আমার সাপটাকে খেতে দিতে চাই। ওকে অন্য খাঁচায় রাখব।

এই বলে মেয়েটি খাঁচার ঢাকনা খুলে তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে, ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটল যে মেয়েটি কি করছে তা ডাক্তার বুঝতে পারেন নি। তাকে টেনে সরিয়ে নিলেন ডাক্তার। ঢাকনাটা শব্দ করে পড়ে গেল।

ডাক্তার তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আপনার কি কোনো জ্ঞানবুদ্ধি নেই? হয়ত আপনাকে মেরে ফেলতে পারবে না, কিন্তু আমার যথাসাধ্য করা সত্ত্বেও আপনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

মেয়েটি শান্ত গলায় বলে, আপনি ওকে অন্য খাঁচায় রাখুন তাহলে।

ডাঃ ফিলিপস ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছেন। যে চোখ কোনদিকে তাকায় না তিনি তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। তার মনে হয়, এইভাবে খাঁচায় ইঁদুর পুরে দেওয়া খুবই অন্যায়, ঘোরতর পাপ। অবশ্য, কেন যে এমন মনে হয় তা বুঝতে পারেন না তিনি। অনেক সময় অপরের অনুরোধে এই কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু আজ যাত্রর এই আবদার তাকে উৎপীড়িত করে তুলেছে। মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেন ডাক্তার।

ডাক্তার মনে মনে ভাবেন, অবশ্য এই দেখা একরকম ভালোই, এতে সাপেরা কিভাবে কি করে দেখা যায়। র‍্যাটল স্নেকের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। [illegible]

দেখে আতংকিত হয় সাপে কিভাবে হত্যা করে। মনে হয় ইঁদুরটা এখানে নিরাকঙ্ক্ষ। সব জিনিসটা ভাবলে দেখলে কেমন নৈর্ব্যক্তিক। ইঁদুর একটা ইঁদুর আর এবং আতংকের অবসান ঘটে।

দেওয়াল থেকে রবারের ফাঁস দেওয়া একটা লম্বা লাঠি তুলে নিলেন ডাক্তার। ফাঁসটা খুলে বিরাট সাপটির মাথার নেই ফাঁসটি জড়িয়ে দিয়ে টেনে ধরলেন। শাদা ঘরটিতে একটা তীব্র ঘর ঘর শব্দে ভরে যায়। ডাক্তার যখন সাপটাকে তুলে নিয়ে খাওয়ার খাঁচায় পুরছেন তখন তার মোটা দেহটা লাঠির হাতাটায় জড়িয়ে যায়। একবার ছোবল দেওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশ ঘর্ঘর শব্দ থেমে যায়। সাপটা একটি কোণে কুণ্ডলীকৃত হয়ে পড়ে রইল—দেহটাকে বিরাট ৪-এর মত করে স্থির হয়ে পড়ে রইল।

তরুণ ডাক্তার বললেন, এইসব সাপেরা বেশ শান্ত। আমি অনেকদিন ধরে পুষেছি, মনে হয় ইচ্ছে করলে ওদের নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি। তবে যারাই এই র‍্যাটল স্নেক নিয়ে নাড়াচাড়া করে তারাই একদিন না একদিন কামড় খায়। আমি আর সেই সুযোগ দিতে চাই না।

এই বলে ডাক্তার মেয়েটির দিকে তাকালেন। ইঁদুরটা দিতে ভালো লাগছে না। নতুন খাঁচাটার দিকে মেয়েটি সরে এসেছে। তার কালো চোখের দৃষ্টি এখন আবার সাপের মাথায় নিবদ্ধ।

মেয়েটি বলল, ইঁদুরটা ফেলে দিন না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইঁদুরের খাঁচার দিকে এগিয়ে যান ডাক্তার।

ইঁদুরের জন্য দুঃখ হয় মনে। আগে কখনও এমন হয়নি মনের অবস্থা। এক ঝাঁক শাদা দেহ ও'র চোখের সামনে ভীড় করে আসে। মনে মনে ভাবেন— কোনটি? কোনটিকে নেওয়া যায়?

সহসা ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে মেয়েটির দিকে ফিরে বলে, বরং একটা বিড়াল দিয়ে দিই খাঁচায়, কেমন? তাহলে একেবারে সত্যিকার লড়াই হবে। এমন কি বিড়ালটা জিতে যেতেও পারে, তবে জিতে গেলে সাপটাকে মেরে ফেলতে পারে। তাহলে যদি বলেন একটা না হয় বিড়ালই দিই।

ওর দিকে না তাকিয়ে মেয়েটি বলে, একটা ইঁদুর দিন। আমি চাই সাপটা খাক।

ইঁদুরের খাঁচাটা খুলে তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন ডাক্তার। লেজের ওপর আঙুল পড়ল, ডাক্তার একটা নাদুস-নুদুস লালচক্ষু ইঁদুর খাঁচা থেকে তুলে নিলেন। ইঁদুরটা ডাক্তারের আঙুলটা কামড়াবার চেষ্টায় লড়াই করতে থাকে। বিফল হয়ে অসাড় হয়ে দেহটা ছড়িয়ে ঝুলতে থাকে। দ্রুতগতিতে ঘরের অন্য পাশে খাওয়ার খাঁচায় নিয়ে গিয়ে ইঁদুরটা বালির ওপর ফেলে দিয়ে বলে ওঠেন, নিন, এইবার দেখুন।

এ কথার কোনো জবাব দেয় না মেয়েটি। তার চোখ পড়ে রয়েছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে

পড়ে থাকা সাপটার ওপর। সাপের জিভটা বেরিয়ে আসছে আবার খাঁচার ভিতরকার হাওয়ায় স্বাদ নিচ্ছে।

ইঁদুরটা সাপের লেজের দিকে আছে, বালির ওপরকার চারদিক শোঁকে। ঘরখানি স্তব্ধ। ডাঃ ফি বুঝতে পারছেন না, সাগর জলের শ্বাস বাড়ির ভিতে এসে আঘাত ক মেয়েটির দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে। আ ডাক্তার লক্ষ্য করলেন মেয়েটির দেহ কুঁকড়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সাপটা মসৃণ গতিতে মৃদুভাবে তার জিভটা একবার বাইরে বেরোচ্ছে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। তার গতিভঙ্গী ধীর এবং এতই মসৃণ যে সে যে নড়ছে তা মনে হয় না। খাঁচার অপর ইঁদুরটা তার বুকের শাদা লো চাটছে। সাপটা নড়ছে, তার গলাটা 'এস' অক্ষরের মত বাঁকানো রয়েছে সময়।

ঘরের ভিতরকার এই স্তব্ধতা ডাক্তারকে কাতর করে তুলছিল। মনে যেন দেহের রক্তপ্রবাহ উপচিয়ে ডাক্তার চীৎকার করে উঠলেন, দেখুন করার জন্য কিভাবে শরীরটা বাঁ র‍্যাটল স্নেকরা অতি সাবধানী, এক ভারী ভীতু প্রাণী। যান্ত্রিক ব্যাপারটি সুক্ষ্ম। সাপের আহারপর্ব আর সা রোগী অপারেশন দুই-ই অতি ব্যাপার। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে এ অবহেলা চলবে না।

সাপটা এতক্ষণে খাঁচার মা এসেছে। ইঁদুরটা মুখ তুলে সাপটাকে দেখে ভ্রুক্ষেপ না করে বুকটা চাটতে থাকে।

তরুণ ডাক্তার বললেন, পৃথিবীর এ এক চমৎকার ব্যাপার। আবার স ভয়ংকর।

সাপটা এখন অনেক কাছে এসেছে। বালি থেকে মাত্র কয়েক ওপরে মাথাটা তুলে রেখেছে। মাথাটা ধীরে আন্দোলিত। লক্ষ্য স্থির ক দূরত্বের হিসাব করছে। ডাক্তার ফি আবার আড়চোখে মেয়েটির দিকে তাকা দেখে কেমন যেন অসুস্থ বোধ কর ডাক্তার। তার দেহটিও বেপথুমতী, বেশী অবশ্য নয়। একটা ইঙ্গিত মাত্র।

ইঁদুরটা মাথা উঁচিয়ে সাপটাকে দে তারপর ছোবল—দেখা অসম্ভব। চকি ঘটনামাত্র। ইঁদুরটা যেন এক আ আঘাতে ভেঙে পড়ল। সাপটা দ্রুতগতি যে কোণ থেকে এসেছিল সেই দিকে গিয়ে স্থির হয়ে রইল। জিভটা অবি অনবরত নড়ছে।

ডাঃ ফিলিপস চীৎকার করে বল একেবারে নিখুঁত। ঠিক কাঁধের ও ছোবল পড়েছে। একেবারে হার্টে অ পৌঁছেছে।

ইঁদুরটা স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। আলো
...জ্বালানো যন্ত্রের মত নিঃশ্বাস টানছে।
...হসা শূন্যে লাফিয়ে উঠে—পরক্ষণে পড়ে
...গেল। পাগলের শূন্যে ছুঁড়তে থাকে কয়েক
...সেকেণ্ড তারপর একেবারে শেষ।

এতক্ষণে মেয়েটি দেহটাকে শিথিল
...করল। বেশ ঘুম ঘুম আবেশে অবশ।

ডাক্তার বললেন, এ একরকম ভাবাবেগের
...বেগাহন। তাই না?

ডাক্তারের দিকে রহস্যভরা চোখ দুটি
...মেলে দেয় মেয়েটি, তারপর প্রশ্ন করে,
... কি এখনই খাবে?

—নিশ্চয়ই খাবে। মজার মোহে ওকে
...ত্যা করেনি নিশ্চয়ই। খিদে পেয়েছে তাই
...মেরেছে।

মেয়েটির বাঁ গালের প্রান্তদেশ ঈষৎ
...আন্দোলিত হল। সে সাপের দিকে ফিরে
...তাকিয়ে বলল—আমি ওর খাওয়াটা দেখতে
...চাই।

এতক্ষণে সাপটা আবার কোণ থেকে
...উঠে এল। এইবার আর গলায় কোনোরকম
...ভঙ্গি নেই। ইঁদুরের দিকে একটু ভয় ভয়
...ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। যদি ও প্রত্যাঘাত
...করে তাহলে লাফিয়ে পালাবে। ভোঁতা নাক
...দিয়ে দেহটা নাড়ল। তারপর সরে এল।
...টা যে মরে গেছে তা বুঝে সাপটা সেই
...রা ইঁদুরের দেহটা দাড়ি দিয়ে স্পর্শ
...করল মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত। যেন
...দেহটার পরিমাপ করছে, যেন চুমা খাওয়ার
...উদ্যোগ করছে। পরিশেষে, মুখটি খুলে
...টি চোয়াল দিয়ে চেপে ধরল।

ডাঃ ফিলিপস মনের জোর প্রয়োগ করে
...মেয়েটির দিকে তাকাতে বিরত রইলেন।
...র মনে হল, মেয়েটি যদি মুখ খোলে
...আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। আমার ভয়
...করবে। চোখ ফিরিয়ে রাখতে সফল হলেন
...ডাক্তার।

ইঁদুরের মাথাটা চোয়াল দিয়ে গ্রাস
...করল সাপটা। অতি ধীর ভঙ্গিতে
...ইঁদুরটাকে গিলতে লাগল। চোয়ালটা
...র বার দৃঢ়ভাবে ইঁদুরটিকে আঁকড়ে ধরে।

ডাঃ ফিলিপস মুখ ফিরিয়ে নিজের
...কাজের টেবলে ফিরে এলেন। তিক্ত গলায়
...তিনি বললেন, আপনার জন্য আমার একটা
...পরিশ্রম নষ্ট হল। এই সেটটা আর সম্পূর্ণ
...হবে না।

মৃদুশক্তিসম্পন্ন মাইক্রসকোপের নীচে
...একটা পাত্র রেখে দেখতে লাগলেন ডাক্তার।
...তারপর সক্রোধে সবকটি ডিস সিংকের
...ভেতর ঢেলে দিলেন।

জোয়ার নেমে গেছে তাই এখন একটা
...চাপা গুঞ্জন জানালাপথে ভেসে আসে। তরুণ
...ডাক্তার একটা দরজা খুলে কাদেয় জলের
...ভিতরে তারা মাছগুলিকে ফেলে দিলেন।
...জানালাটার দিকে তাকালেন ডাক্তার, অন্ধকারে

অন্ধকারে সে আলোর দিকে তাকিয়ে আছে
ব্যাখ্যাত্মক ভঙ্গীতে। সংরক্ষক আরকে
দেহটা ফুলে উঠেছে। ছুরিটা সরিয়ে নিয়ে
ডাক্তার শিরাটা বাঁধলেন।

মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন, একটু কফি
খাবেন নাকি?

না ধন্যবাদ আপনাকে। আমাকে এখনই
যেতে হবে।

সাপের খাঁচার কাছে দাঁড়ানো মেয়েটির
দিকে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার। ইঁদুর গেলা
শেষ হয়েছে। মাত্র ইঞ্চিখানেক গোলাপী
লেজটুকু বাকী—সাপের মুখ থেকে জিভের
মত বেরিয়ে আছে ইঁদুরের লেজ। গলাটা
নড়ল আর একবার। তারপর সেই লেজ
অদৃশ্য হল। বিরাট সাপটা একপাশে সরে
গেল। প্রকাণ্ড ৪-এর মত বাঁক নিয়ে বালির
ওপর মাথাটি জাগিয়ে রাখল।

মেয়েটি বলল, সাপটা এখন ঘুমোচ্ছে।
আমি যাই। তবে মাঝে মাঝে এসে আমার
সাপকে আমি খাইয়ে যাব। ইঁদুরের দাম
দেব। আমি চাই যে ও প্রচুর খেতে পাক।
আর মাঝে মাঝে ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে
যাবো।

এক মুহূর্তের জন্য ধূলি ধূসরিত
স্বপ্নলোক থেকে ওর চোখ যেন বেরিয়ে
এল। ও বলল, সাপটা আমার তা মনে
থাকে যেন। ওর বিষ নিঙড়ে নেবেন না,
আমি চাই ওর বিষ থাকুক। আচ্ছা, গুড
নাইট।

অতি দ্রুতগতিতে মেয়েটি চলে গেল।
বাইরে সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু
ফুটপাথের পায়ের শব্দ শোনা গেল না।

একটি চেয়ার টেনে নিয়ে ডাক্তার
ফিলিপস সাপের খাঁচার সামনে বসলেন।
সাপের খাঁচার সামনে বসে তার দিকে
তাকিয়ে চিন্তার জট ছাড়াতে লাগলেন
ডাক্তার। ভাবতে লাগলেন মনস্তত্ত্বের গ্রন্থে
যৌনজীবনে সর্প প্রতীক সম্পর্কে কত
কথা পড়েছি। কিন্তু তার মধ্যে কি আজকের
ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়! কি জানি,
আমি বড় একা। হয়ত সাপটাকে হত্যা করা
উচিত। যদি জানতাম — না আমার কিছু
প্রার্থনা করা উচিত নয়।

কয়েক সপ্তাহ ধরে আশা করে বসে
রইলেন ডাক্তার, মেয়েটি হয়ত ফিরে আসবে।
এবার ও যদি আসে তাহলে আমি বাইরে
চলে গিয়ে ওকে এই ঘরে রেখে যাবো।
এ জঘন্য ব্যাপার আর স্বচক্ষে দেখছি না।

মেয়েটি আর ফিরে আসি নি। শহরের
পথে কয়েক মাস তাকে খুঁজেছেন ডাক্তার।
লম্বা স্ত্রীলোক দেখে তার পিছনে ছুটেছেন
সেই রমণী মনে ভেবে।

কিন্তু আর কোনদিন কোনখানে তার
সঙ্গে দেখা হয় নি।

—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত।।

নিঃসঙ্গ শিশু ॥ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

নিমগ্ন না ব্যস্ত তুমি? চতুর্দিকে ছড়ানো ছিটানো
ঝুমঝুমি, ময়ূর-খেলনা, প্ল্যাস্টিক পুতুল, কাঠের পাখি,—
এই নিয়ে তুমি মগ্ন তোমার সংসারে।
সারাদিন কী যে ভাবো শুয়ে শুয়ে শিশু ভোলানাথ।
এদের বাঁধবে ভাবো, একসূত্রে; তবু দুইহাতে
যতই গোছাতে যাও সব হয়ে যায় এলোমেলো,
ফীডিং বোতলে দুধ পড়ে থাকে খেতে যাও ভুলে
পরক্ষণে আলিঙ্গন দিতে যাও বিজলী পাখাকে।

দু হাতে আঁকড়াবে ভাবো, সমস্ত আকাশ!
মুঠিতে ওঠে না কিছু, সব কিছু দূরে সরে যায়;
ঘুরন্ত নাগর-দোলা সরে যায় মাথার উপরে,
এমনকি হাত থেকে আঁকড়ে-ধরা মায়ের আঁচল
সাড়ে-দশটা আর সাড়ে-পাঁচটার মিছিলে সরে যায়,
হীরামন পাখি-ডাকা রূপকথার গল্প চাপা পড়ে
ফাইলের স্তূপে, ঝাঁ ঝাঁ মধ্যাহ্নে শূন্যতা নেমে আসে।

দুর্বোধ্য ভাষায় তুমি কার কাছে জানাও নালিশ?
ছোটো মুঠি তুলে এই গোলামির চাও অবসান?
মায়ের সান্নিধ্য চাও! সময়ের মজুর বন্ধনে
বাঁধা ন্যুব্জ ক্রীতদাস আমাদের বুকে রক্ত ঝরে
তোমার কান্নার শব্দে, শেষে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে
ধাইমার কোলে তুমি ডুব দাও ঘুমের অতলে।

যখন ঘুমাও বাছা, মুখে মৃদু হাসি থাকে জেগে;
ঘুমের দোলনায় দুলে নিষ্ঠুর সময় দাও পাড়ি—
তোমার স্বপ্নকে ঘিরে আছে যেন মধুর বিকেল
দিনান্তে যখন কাছে ফিরে আসে সব প্রিয়জন,
স্প্রিংয়ের পুতুল মেয়ে ব্যস্ত হয়ে করে আনাগোনা,
গোধূলির টিপ পরে জানলা ধরে বলে ওঠে প্রিয়তম মুখ—
"বাবান, এই-যে আমি, এসে গেছি, সোনা!"

× × ×

চক্র ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক

শ্বেত বৃক্ষগুলি
কালো নুড়িতে পা ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকে
অরণ্যের ভেতর
নিঃশ্বাস না ফেলে চাকা ঘোরায়
বিনা রক্তপাতে
ফুল থেকে ফলের ভাস্কর্য ছড়িয়ে রাখে
চতুর্দিকে
এক-একটি অদৃশ্য চক্রের মতো সজীব গাছগুলি
অষ্টপ্রহর
ঘুরতে থাকে
আকাশ থেকে পাতাল অবধি।

কেউ বৃক্ষ হতে চায় কেউ নদী।
মাথা উঁচু করে স্বর্গের তোরণ ভেদ করে
সকলেই
ফিরে আসে ঢালু পথে
সাময়িক পর্যটনের পর
চোখের সামনে : জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের
অজস্র বৃত্ত তৈরী করে
আবহমানকাল
মানচিত্রের ওপর।

[উপন্যাস]

কেয়া পাতার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

[উনিশ শ' চল্লিশের অগ্রহায়ণ। কলকাতা থেকে বিনু, [illegible] বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে পূর্ব বাঙলার রাজদিয়ায় দাদু [illegible] বছর বাদে বিনুর মা সুরমা এলেন রাজদিয়ায়।

আশ্চর্য মানুষ হেমনাথ। সকলেরই প্রিয়, হিতৈষী। [illegible] ঝক্কি-ঝামেলা তাঁর মাথায়।

বড়োরা গল্প-গুজবে মন দিল। এমন সময় কেতুপুরে একটা [illegible] যান হেমনাথ।

এদিকে হেমনাথের বাড়ির কর্মচারী যুগলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে বিনু।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এল। কিছুক্ষণ আগে ছোট্ট মেয়ে [illegible] বিনুকে এ-বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে তার বাবা ভবতোষ।

বিনু অবাক চোখে রাতের রূপ দেখে। ধানখেতে জোনাকির নাচানাচিতে সে মুগ্ধ। এমন সময় যুগল ডাকল বিনুকে। মাছ ধরতে গেল পুকুরে।

কেতুপুরের ঝামেলা চুকিয়ে হেমনাথ বাড়ি ফিরলেন। রাত। সঙ্গে দুজন প্রৌঢ় মুসলমান।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(পাঁচ)

বাড়ির ভেতরে এসে দেখা গেল, সাড়া পড়ে গেছে। একেবারে প্রথম যে ঘরখানা সেটা দক্ষিণ-দুয়ারী; সেখানে ঢালা ফরাস পাতা। চারখানা হারিকেন চারদিকে বসানো; ঘরখানা আলোয় ভরে গেছে। একধারে সারি সারি ফরসী সাজানো; জল বদলে এখন তামাক সাজছে যুগল। তার সামনে নারকেল-ছোবড়া, তামাকের ডিবে, দেশলাই, ধুপী—নানাবিধ সরঞ্জাম ছড়ানো।

হেমনাথ সঙ্গীদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মাঝি দুজন মুখবাঁধা হাঁড়িগুলো আর মাছটা নামিয়ে তলায় যুগলের কাছে ঘন হয়ে বসল। প্রৌঢ় দুজন বসল ফরাসের ওপর; বিনু এখনও ছাড়া পেল না। সেই প্রৌঢ়টির কোলের ভেতর বসে থাকতে হল।

হেমনাথ বসলেন না। বললেন, 'তোরা তামাক-টামাক খা মজিদ; আমি জামাইদের খবর দি।'

বিনু দেখতে পেল যে প্রৌঢ়টি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছে সে-ই উত্তর দিল, 'ঠিক আছে ঠাউর ভাই।'

এই তাহলে মজিদ মিঞা। কেতুপুরে এঁর বাড়িতেই দাদু ওবেলা গিয়েছিলেন।

হেমনাথ আর কিছু বললেন না, অন্দরমহলের দিকে চলে গেলেন।

খানিক পর অবনীমোহন, সুরমা, সুধা, সুনীতি—সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন হেমনাথ। স্নেহলতা আর শিবানী আসেন নি; রান্নাঘরে নানা কাজে তাঁরা ব্যস্ত।

সবার সঙ্গে আগন্তুকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। মজিদ মিঞা ছাড়া আরেকজন যে প্রৌঢ় আছে তার নাম কাসেম আলী—মজিদ মিঞার বোনাই সে।

অবনীমোহনদের দেখে কী করবে যেন ভেবে পেল না মজিদ মিঞা। মুঠোর মধ্যে আকাশের চাঁদই পেয়ে গেছে। অবনীমোহনের একখানা হাত ধরে উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলতে লাগল, 'আপনারা আসছেন, আমাগো কি যে সৌভাগ্য।'

অবনীমোহন বললেন, 'ছি-ছি, ও-কথা বলবেন না। সৌভাগ্য আমারও কম না। আপনাদের মত মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল—'

মজিদ মিঞা বলল, 'আমরা আবার মানুষ; দোজখের আন্ধারে (পাতালের অন্ধকারে) পইড়া আছি।'

হেমনাথ মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, 'তোমরা এসেছ শুনে মজিদ ছুটে চলে এল। আর এমন পাগল—ঐ দ্যাখো তিন হাঁড়ি বোঝাই করে তোমাদের জন্যে মিষ্টি আর মাছ নিয়ে এসেছে।'

অবনীমোহন লজ্জিত হলেন; সুরমাও। দুজনে প্রায় একসঙ্গে বললেন, 'আবার শুধু-শুধু ওসব আনতে গেলেন কেন?'

মজিদ মিঞা বলল, 'ঠাউর ভাইয়ের (দাদার) নাতি-নাতনী ভাগনী-ভাগনীজামাই আমারও নাতি নাতনী ভাগনী-ভাগনী-জামাই। তাগো কিছু খাওয়াইতে বুঝি সাধ হয় না?'

এর ওপর আর কথা চলে না; অবনীমোহনরা অভিভূতের মতন তাকিয়ে রইলেন।

হেমনাথ যুগলকে বললেন, 'মাছ-মিষ্টি-গুলো ভেতরে দিয়ে আয়।'

যুগল হাঁড়িটাঁড়ি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। একটু পর ফিরে এসে জানাল, স্নেহলতা মজিদ মিঞাদের খেয়ে যেতে বলেছেন।

মজিদ মিঞা হাসলেন, 'খাইয়া তো যামুই। আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে এই বাড়িতু আইসা ভাবীর হাতের ব্যান্নন (রান্না তরকারী) না খাইয়া যাই। যা মুগইলা হাকিমেরে কইয়া আয়, তার হুকুম অমাইন্য করার সাধ্য আমার নাই।'

বোঝা গেল, এ বাড়িতে আরো অনেকবার এসেছে সে এবং যুগলকে খুব ভাল করেই চেনে। আরো টের পাওয়া গেল, এ-সংসারের প্রাণের একেবারে মাঝখানটিতে তার আসন পাতা।

হঠাৎ অবনীমোহনের কি মনে পড়ে গেল। আস্তে করে হেমনাথকে ডাকলেন, 'মামাবাবু—'

হেমনাথ মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, 'কী বলছ?'

'কি একটা দাঙ্গার মীমাংসা করে দিতে না গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা মিটেছে?'

হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন, 'মজিদকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না—'

মজিদ মিঞা শুনছিল। জিজ্ঞেস করার আগেই বলে উঠল, 'নবু গাজীর লগে আমার চার বছরের কাইজা (ঝগড়া) এক কথায় মীমাংসা কইরা দিছেন ঠাউর ভাই; এমুন মীমাংসা করছেন যে, কুনোকালে আর কাইজা হইব না।'

অবনীমোহনের কৌতূহল শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। শুধোলেন, 'কি রকম?'

'আমার মাইয়ার লগে নবু গাজীর পোলার (ছেলের) বিয়া ঠিক কইরা দিছেন ঠাউর ভাই। অঘ্রান মাসে ধান কাটার পর বিয়া হইব। নবু-শালায় আমার মাইয়ার শ্বশুর (মেয়ের শ্বশুর) হইব। আপনেই ক'ন আর লগে চর লইয়া মারামারি আর মানায়?' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'ঠাউর ভাই এমুন মীমাংসা কইরা দিলেন যে, মুখ চিরটা কালের লেইগা বন্ধ; না হইলে শালারে কি ছাড়তাম? সড়কি দিয়া এফোড়-ওফোড় কইরা ফেলতাম।'

[illegible] [illegible] সম্বন্ধে এ আত্মীয় [illegible] অবনীমোহনরা হেসে ফেললেন।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'সে যাউক, মাইয়ার বিয়ার সময় আপনে তো কিন্তুক আইতে হইব। আপনেরা হইলেন মাইয়াপক্ষের মানুষ। নবু শালার তো ধড়বাজী আনব কলকাত্তার চাঁড়া চাষা (চরের চাষা)। শালারে দেখাইয়া দিমু আমার আপনজনেরা কি শহরের মানুষ আর তার জাত-গুষ্টিই বা কেমন?'

অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনার মেয়ের বিয়ে তো সেই অঘ্রাণ মাসে ধানকাটার পর। ততদিন আমরা এখানে থাকব না।'

'থাকবেন না!' একটু নিরাশ হয়ে পড়ল মজিদ মিঞা। তারপর হাতের ভেতর মুশকিল আসানটা যেন পেয়ে গেছে এমন সুরে বলল, 'তাতে কি, কইলকাতায় একটা টেলি কইরা দিমু; চইলা আসবেন। আসতেই হইব।'

অবনীমোহন আগেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন; মজিদ মিঞার আন্তরিকতা তাঁর প্রাণে তরঙ্গ তুলে গেল। বললেন, 'আসব, নিশ্চয়ই আসব। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি উৎসব লাগলে না এসে পারা যায়!'

কোল থেকে বিনুকে নামিয়ে অবনীমোহনের কাছে আরো নিবিড় হয়ে এল মজিদ মিঞা। এক রকম তাঁকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগের সুরে বলল, 'এই একখান কথার মাথান (মত) কথা কইছেন—আত্মীয়-স্বজন।'

আবেগটা এ ঘরের জন্য সবাইকেও স্পর্শ করেছিল। সমস্বরে সকলে সায় দিল, এ একটা কথার মতন কথা বটে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মজিদ মিঞা বলল, 'আমার একখান সাধ আছে!'

অবনীমোহন জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

মজিদ মিঞা বলল, 'চরের দুই কানি জমিন লইয়া নবু গাজীর লগে চাইর বছর আমার কাইজা (ঝগড়া)। আপনেরাও আসলেন, আর আইজই কাইজাটা মিটা গেল। আমার সাধ আপনের লগে মিতা পাতাই।'

অবনীমোহন সবটা বুঝতে পারেন নি; অনুমানে ভর করে বললেন, 'বন্ধুত্ব করতে চাইছেন?'

'হ'। করুণ মিনতিপূর্ণ চোখে এমনভাবে মজিদ মিঞা তাকাল যাতে মনে হয়, অবনীমোহনের বন্ধুত্ব না পেলে তার জীবন নিষ্ফল হয়ে যাবে। অবনীমোহনের একটা 'হ্যাঁ-না'র ওপর তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

প্রৌঢ় মানুষটির শিশুর মতন আচরণ, সরলতা, বন্ধুত্বের জন্য কাঙালপনা—সব একাকার হয়ে অবনীমোহনকে মুগ্ধ করে ফেলল। বললেন, 'আপনি বন্ধু হতে চাইছেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

'মিতা হইবেন তা হইলে কথা দিলেন।'

'হ্যাঁ।'

'পাকা কথা কিন্তুক।'

'পাকা কথা বৈকি।' অবনীমোহন হাসতে হাসতে বললেন।

'এইর লেইগাই কিন্তুক কেতুপুর থিকা এতখানি পথ এই রাইতে দৌড়াইয়া আসছি।'

শুধুমাত্র তাঁর বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষায় একটি মানুষ এত রাতে ছুটে এসেছে; যতবার ভাবলেন ততবারই অবাক হয়ে গেলেন অবনীমোহন।

যাই হোক, তারপর শুরু হল গল্প। সুধার সঙ্গে, সুনীতির সঙ্গে, সুকুমার সঙ্গে কত কথা যে বলতে লাগল মজিদ মিঞা। কথায় কথায় রাত ঘন হতে লাগল।

এক সময় ভেতর থেকে স্নেহলতা খবর পাঠালেন রান্না শেষ।

এই ঘরেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হল। হাসেম আলী, মজিদ মিঞা এবং মাঝি দুজনের জন্য আসন পাতা হয়েছে। হেমনাথ হঠাৎ বললেন, 'আমাকেও এখানে ওদের সঙ্গে দিয়ে দাও, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।'

অবনীমোহন বিস্মিত, চমৎকৃত। উনিশ শ' চাল্লশে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-বৈশ্য-হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভাগে অগণিত ছোট ছোট সম্প্রদায়ের খুঁটিতে বসুন্ধরা যখন খণ্ড খণ্ড তখন মজিদ মিঞা হাসেম আলীর গা-ঘেঁষে বসা দুঃসাহস বৈকি।

হেমনাথ বললেন, 'অবনীমোহনও বসে যাও না। মিতাই তো হলে মজিদের; একসঙ্গে বসে বন্ধুত্বটা পাকা করে নাও।'

ঘোরের ভেতর থেকে অবনীমোহন বললেন, 'বেশ তো—'

অতএব আরো তিনখানা আসন এল। হেমনাথ বসলেন, অবনীমোহন বসলেন, বিনুও বসল। মেয়েরা কেউ বসল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক রাত্তিরে পুকুর পেরিয়ে ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে কেতুপুরে চলে গেল মজিদ মিঞা।

বিকেলবেলা ভবতোষ গাঢ় বিষাদের ছায়া নিয়ে এসেছিলেন। মেঘের পর রৌদ্র-ঝলকের মতন মজিদ মিঞা এ বাড়িটাকে আবার আলোকিত করে গেছে।

* * *

ভোরবেলা, তখনও ভাল করে ঘুমটা ভাঙেনি—আধো তরল তন্দ্রার ভেতর আচ্ছন্ন হয়ে আছে বিনু। সেই সময় স্তবপাঠের মতন একটানা সুরেলা আওয়াজ ভেসে এল।

কণ্ঠস্বর খুবই চেনা; কিন্তু কোথায় শুনেছে এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না বিনু।

সুরটা খুব ভাল লাগছে; আস্তে আস্তে চোখ মেলল বিনু।

এখনও রোদ ওঠেনি। চারদিকে আবছা আবছা অন্ধকার আলতোভাবে সব কিছুকে ছুঁয়ে আছে।

সময়টা দিনের কোন অংশ—ভোর না সন্ধ্যে, ঠিক বুঝতে পারল না বিনু। পাশ ফিরতেই বড় একটা জানলা চোখে পড়ল। তার ভেতর দিয়ে উঠোন দেখতে পেল বিনু। উঠোন পেরিয়ে বাগান, বাগানের পর যা কিছু এই মুহূর্তে সব ঝাপসা—নিরবয়ব। উত্তর থেকে দক্ষিণ থেকে জোর বাতাস দিচ্ছে; উল্টো-পাল্টা হাওয়ায় বাগানের বড় বড় ঝুপসি গাছগুলো বিজ্ঞের মতন মাথা নাড়ছে। আকাশের এ প্রান্তে সে প্রান্তে থোকা থোকা সাদা মেঘ রাজহাঁসের মতন ধীর মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে।

প্রথমটা বিনু বুঝেই উঠতে পারল না, সে এখন কোথায়। কলকাতায় যে বাড়িতে তারা থাকত তার পাশেই ছিল ঘিঞ্জি বস্তি। তাদের মাথায় টালি আর খাপরার ছাউনি। সকালবেলা চোখ মেললেই বিনুরা দেখতে পেত, বস্তিগুলো নিশ্চল ঢেউয়ের মতন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে আছে। আর কানে আসত কদর্য চিৎকার। ভোর হতে না হতেই কুৎসিত কলহ শুরু হয়ে যেত; তার মেয়াদ মাঝ রাত পর্যন্ত।

কিন্তু এখানে? স্তব পাঠের সেই মনোরম সুরেলা শব্দটা এখনও কানে আসছে। বিনুর মনে হল, এসব সত্যি না। কেউ যেন ঘুমঘোরে তাকে সুদূর মেঘময় আকাশের নীচে বাগান, গাছপালা, আবছা অন্ধকার আর স্তব উচ্চারণের গম্ভীর মধুর সুরের ভেতর ফেলে গেছে।

চিরদিন মা-বাবার কাছে শোয়ার অভ্যাস বিনুর; হঠাৎ তার খেয়াল হল বিছানায় মা-ও নেই, বাবাও নেই। ধড়মড় করে উঠে বসল বিনু; বসতেই চোখে পড়ে গেল। উঠোনের পুব দিকটা একেবারে খোলা; সেখানে মুক্তকরে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে স্তব পাঠ করছেন হেমনাথ। 'জবাকুসুম সঙ্কাশং', 'মহাদ্যুতিম্', 'দিবাকরম্' ইত্যাদি ইত্যাদি দু-চারটে শব্দ ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

হেমনাথকে দেখামাত্র বিদ্যুৎচমকের মতন সব মনে পড়ে গেল। কাল তারা রাজদিয়া এসেছে। স্নেহলতা-শিবানী-যুগল-হিরণ-মজিদ মিঞা—পর পর অনেক-গুলো মুখ ছবির মতন চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। আর মনে পড়ল ঝিনুককে। দুঃখী মেয়েটার জন্য এক মুহূর্ত মনটা ভারী হয়ে রইল। এক মুহূর্তই। নদীর জলে উড়ন্ত পাখির ছায়ার মতন ঝিনুকের মুখ মনে এসেই মিলিয়ে গেল।

আরো একটা কথা মনে পড়ল বিনুর। কাল রাত্তিরে সে দাদুর কাছে শুয়েছিল। যাই হোক, এখন কী করবে ভেবে উঠতে পারল না। একবার ইচ্ছে হল, দাদুর কাছে যায়। পরক্ষণেই মনে হল, এ সময় তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

শরতের এই ভোরে হাওয়া বেশ ঠান্ডা; গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। পায়ের দিকে পাট-করা একটা পাতলা চাদর ছিল; সেটা তুলে এনে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে বসে রইল বিনু।

একটু পর স্তব পাঠ শেষ হল। পুব-দিকে তাকিয়ে আসন্ন সূর্যোদয়কে প্রণাম করে ঘরে ফিরে এলেন হেমনাথ। বিনুকে বসে থাকতে দেখে ভারি খুশী। উচ্ছ্বসিত সুরে বললেন, 'দাদাভাই উঠে পড়েছ।'

বিনু মাথা নাড়ল।

'তুমি তো বেশ তাড়াতাড়ি ওঠো।'

এত ভোরে অবশ্য কোন দিনই ওঠে না বিনু। যেহেতু তাড়াতাড়ি ওঠা রীতিমত গৌরবের ব্যাপার, আর হেমনাথ যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন তখন এটা মেনে নেওয়া ভাল। কাজেই বিনু এবারও মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'তুমি গানের মতন করে কী বলছিলে?'

'সূর্যস্তব বলছিলাম।'

'ভারি সুন্দর তো।'

সাগ্রহে হেমনাথ বললেন, 'তুমি শিখবে?'

বিনু বলল, 'শিখব।'

'কাল থেকে এই রকম ভোরে উঠো; দুজনে উঠোনের ঐ কোণটায় গিয়ে দাঁড়াব। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বলে যাবে। দু'দিনেই শিখে ফেলতে পারবে।'

'আচ্ছা—' বলেই যেন জিভে কামড় খেল বিনু। আজকের মতন এক-আধদিন নয়, কাল থেকে আবার রোজ নিয়মিত ভোরবেলায় উঠতে হবে। হেমনাথ এবার বললেন, 'যাও দাদা, মুখ-টুখ ধুয়ে নাও।'

চাদর গায়ে বেরিয়ে এল বিনু। এর মধ্যে আলো ফুটে গেছে; ধানখেত আর বনানীর ওপারে। পুব দিগন্তে সূর্যের ঝিকিমিকি টোপরটি আস্তে আস্তে দেখা দিতে শুরু করেছে।

বাইরে এসে বিনু দেখতে পেল সবাই উঠেছে— সুধা, সুনীতি, অবনীমোহন, সুরমা, শিবানী, স্নেহলতা সব্বাই। স্নেহ-লতা তো এর ভেতর স্নানই চুকিয়ে ফেলেছেন। যাই হোক, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে আবার দাদুর কাছে ফিরে এল বিনু।

কাল স্টিমারঘাট থেকে বাড়ি আসতে যা একটু সঙ্গ পেয়েছে বিনু; তারপর সারাটা দিন তো কেতুপুরেই কাটিয়ে এলেন হেমনাথ। রাত্রিবেলা যখন ফিরলেন তখন মজিদ মিঞারা সঙ্গে রয়েছে। খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজবের পর অবশ্য হেমনাথকে একে-বারে একলা পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তখন অনেক রাত আর বিনুর চোখও ঘুমে জড়িয়ে আসছিল।

বিনুর খুব ইচ্ছা এই সকালবেলা দাদুর সঙ্গে বসে বসে অনেকক্ষণ গল্প করে। কিন্তু সে সুযোগ মিলল না। তার আগেই রান্নাঘরে ডাক পড়ল।

রান্নাঘরটা প্রকাণ্ড; রাঁধাবাড়া ছাড়াও অনায়াসে পনের-কুড়িজন লোক বসে খেতে পারে। সারি সারি আসন পাতা ছিল; হেমনাথের সঙ্গে এ ঘরে এসে বিনু দেখতে পেল ইতিমধ্যে অন্য সবাই এসে গেছে। তারা বসে পড়তেই স্নেহলতা আর শিবানী খেতে দিতে শুরু করলেন।

কাল রাত্তিরে প্রচুর মিষ্টি এনেছিল মজিদ মিঞারা। সকালে স্টিমারঘাটা থেকে হেমনাথ যে রসগোল্লা আর কলা এনেছিলেন তার অনেকটাই থেকে গেছে। তাছাড়া স্নেহলতা গাওয়া ঘিয়ের লুচি, তরকারি আর হালুয়া করেছিলেন।

খেতে খেতে হেমনাথ বললেন, 'মজিদ মিঞাকে কাল কি রকম দেখলে অবনী?'

অবনীমোহন বললেন, 'চমৎকার। এমন সরল ভালো মানুষ জীবনে আর কখনও দেখি নি। শুধু আমাকে দেখবার জন্যে রাত্তির করে কেউ এতখানি আসতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে কোন দিন বিশ্বাস করতাম না।'

গভীর আবেগের সুরে হেমনাথ বললেন, 'এখানকার প্রায় সব মানুষই ঐ রকম। সরল, ভালো—আবার ক্ষেপে গেলে গোঁয়ার।'

অবনীমোহন হাসলেন।

খানিক চুপ করে থেকে হেমনাথ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'কাল সারা দিন কেতুপুরেই কেটে গেছে; তোমাদের সঙ্গে বসে দুটো কথা বলতে পারি নি। আজ আমি ফ্রী—একেবারে মুক্ত। চলো—'

স্নেহলতা নাক কুঁচকে কেমন করে যেন বললেন, 'তুমি মুক্ত! তবেই হয়েছে। দ্যাখো, আবার কোন হাঙ্গামা এসে জোটে!'

'যাই জুটুক, আমি কোন দিকে তাকাচ্ছি না। আজকের দিনটা নাতি-নাতনী-মেয়ে-জামাই নিয়ে হৈ-হৈ করে কাটাব।'

'ভালোই তো।'

হেমনাথ এবার অবনীমোহনকে বললেন, 'কাল সমস্ত দিন তো ঘরে বসেই কাটিয়েছ। খাওয়া-দাওয়া হলে চলো একটু ঘুরে আসি; অনেকের [illegible] দেখিয়ে আনি।'

সাগ্রহে অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

হেমনাথ কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। হঠাৎ তাঁর কি মনে পড়ে গেছে। বেশ ব্যস্তভাবেই বললেন, 'হৈ-হট্টগোলের ভেতর খেয়াল ছিল না; ঝিনুক কোথায়?'

স্নেহলতা বললেন, 'ওর বাবা কাল নিয়ে গেছে।'

'ভবতোষ ঢাকা থেকে ফিরেছে তাহলে।'

'হ্যাঁ।'

'বৌমাকে রেখেই এল?'

'হ্যাঁ।' স্নেহলতা বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়লেন। ভবতোষ কাল যা-যা বলে গিয়ে-ছিলেন, সব বললেন।

বিষাদময় সুরে হেমনাথ বললেন, 'নিজেরা খাওয়া-খাওয়ি করে মরছে; মাঝ-খান থেকে ঝিনুকটার জীবন নষ্ট হয়ে গেল।'

[illegible] আর কিছু বলল না; [illegible] কাছ-[illegible] মধ্যে [illegible] থাকা [illegible] [illegible] বিনুদের [illegible] এলেই এ বাড়িতে [illegible] বিষাদের ছায়া নামে।

খাওয়ার পর হেমনাথ বললেন, 'চলো অবনী, এবার বেরিয়ে পড়া যাক। তোমরা কে কে যাবি? বিনুদাদা নিশ্চয়ই যাবে। সুধাদিদি সুনীতিদিদি যাবি তো?'

সুধা সুনীতি দুজনেই ঘাড় কাত করল, অর্থাৎ যাবে।

'রুমুর গিয়ে দরকার নেই; অনেকখানি হাঁটতে হবে। দুর্বল শরীরে অত হাঁটাহাঁটি করলে খারাপ হবে। এক কাজ করলে হত, ভবতোষ কী লালমোহনের ফীটনখানা আগে থেকে চেয়ে রাখলে পারতাম। কাল চাইবার সময়ও পেলাম না। সে যাক গে, পরে গাড়ি ঠিক করে রুমুকে ঘুরিয়ে আনব।'

এক সময় হেমনাথরা বেরিয়ে পড়লেন। উঠোন বাগান পেরিয়ে শহরগামী সেই পথটায় আসতেই মনে হল, আশ্বিনের এই চমৎকার উজ্জ্বল সকালটা সামনের দিকে অবিরত হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে। এই পথটা ছাড়া রাজদিয়ার আর কিছুই মাথা তুলে নেই; সব জলের তলায় হারিয়ে গেছে।

দু-ধারে কালকের সেই পরিচিত দৃশ্য। মাছরাঙা, বাঁশের সাঁকো, নিস্তরঙ্গ জল, মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন বাড়িঘর, গলানো গিনির মতন রোদ। কথা বলতে বলতে সেই কাঠের পুলটাও পেরিয়ে এল সবাই।

পথ নির্জন নয়; লোক চলাচলে বেশ সরগরমই বলা যায়। যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে ডেকে ডেকে হেমনাথের সঙ্গে সবাই কথা বলছে। বিনুরা যে এসেছে, সে খবর রাজদিয়ার আর কারো পেতে বোধ হয় বাকি নেই। বিনুরা কত দিন থাকবে, এতকাল কেন আসে নি ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন করছে তারা। হেমনাথ উত্তর দিচ্ছেন, অবনীমোহনের সঙ্গে আলাপ-টালাপও করিয়ে দিচ্ছেন।

নানা মানুষের কৌতূহল মেটাতে মেটাতে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে সবাইকে নিয়ে হেমনাথ যখন স্টিমারঘাটের কাছাকাছি পৌঁছুলেন পুব আকাশের ঢালু বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। হোগলা-ছাওয়া সেই মিষ্টির দোকানগুলো থেকে ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেল, 'আসেন বড় কত্তা, ভালো মিঠাই আছে। মাইয়া-জামাই-নাতি-নাতনীগো লেইগা লইয়া যান।'

মৃদু হেসে হেমনাথ জানালেন, আজ মিষ্টির দরকার নেই।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে বিনু, বাড়ি থেকে স্টিমারঘাটে আসতে যত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে সবাই হেমনাথকে 'বড় কত্তা' বলেছে। যাই হোক অবনীমোহন হাসতে হাসতে বললেন, 'আমরা এসেছি, একথা দেখছি কারো জানতে বাকি নেই। দোকানদারদের কাছেও পৌঁছে গেছে।'

হেমনাথ হাসলেন, 'এখানকার মানুষ আমাকে খুব ভালবাসে, স্নেহ করে। আমার অবনীমোহনের [illegible] পুরো খবর ওদের জানা।'

হেমনাথের বাড়ি থেকে স্টিমারঘাট পর্যন্ত রাস্তাটা চেনা। পথটা এখানেই শেষ না; স্টিমারঘাট ছুঁয়ে সেটা অর্ধবৃত্তের আকারে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে নিরুদ্দেশ হয়েছে। হেমনাথ বিনুদের নিয়ে সেদিকে চললেন।

ঘাড় ফিরিয়ে বিনু একবার দেখে নিল, কালকের সেই স্টিমারটা নেই। জেটির বাঁধন ছিঁড়ে কখন কোথায় পাড়ি জমিয়েছে কে জানে। তবে কালকের সেই শঙ্খচিলগুলো চোখে পড়ল, আকাশময় তারা চক্কর দিয়ে চলেছে।

স্টিমারঘাটের পর নৌকোঘাটটা কালই চোখে পড়েছিল। তারপর একটা বরফ কল আর সারি সারি মাছের আড়ত। হেমনাথ জানালেন, এখান থেকে কাঠের পেটিতে পরল পরল বরফের ভেতর শুয়ে প্রত্যহ শত শত মণ মাছ কলকাতায় চালান যায়। আড়তগুলোর ঠিক তলাতেই নদী; বিনুরা দেখতে পেল অসংখ্য জেলে নৌকো আসছেই, আসছেই। এখানকার বাতাস আঁসটে ভারী গন্ধে নিশ্চল হয়ে আছে।

আড়তগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে হেমনাথ চেঁচিয়ে বললেন, 'ভালো ইলিস আছে?'

তক্ষুনি সাড়া পাওয়া গেল, 'আছে বড় কত্তা।'

'দর কী?'

'দরের লেইগা আটকাইব না; কয়টা লাগব ক'ন (বলুন)?'

'দাম না বললে নেব না।'

'সব থিকা সেরাটা ট্যাকায় ছয়টা।'

'তিনটে রাখিস; যাবার সময় নিয়ে যাব।'

'আইচ্ছা।'

কাল রসগোল্লার দাম শুনে অবাক হয়েছিলেন অবনীমোহন; আজও হলেন মাছের দর শুনে। তাঁর বিস্ময় মাখানো মুখের দিকে তাকিয়ে হেমনাথ বললেন, 'এ হল জলের দেশ, মাছ এখানে সস্তা তো হবেই। কলকাতায় চালান না গেলে টাকায় একশটা করে ইলিস বিক্রি হত।'

আড়ত পেরিয়ে আসতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। হেমনাথের বাড়ির দিকে রাস্তাটা খানিক খোয়ায় ঢাকা, বাকিটা কৌলীন্য হারিয়ে সোজা মাটিতে নেমে গেছে। এদিকটা কিন্তু লাল সুরকিতে ছাওয়া। তার একদিকে নদী, আরেক ধারে সারিবদ্ধ ঝাউগাছ। রাস্তাটা চলেছে তো চলেইছে।

সুধা বলল, 'কি চমৎকার জায়গা, আমরা কিন্তু এখানে রোজ বিকেলে বেড়াতে আসব দাদু—'

হেমনাথ বললেন, 'বেশ তো।'

ঝাউগাছ যেদিকে, সেদিকটাও মনোরম। বর্ষার জলে প্রায় সবটাই ডুবে আছে। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো পাকা বাড়ি চোখে পড়ল। শুধু তা-ই নয়,—এস-ডি-ওর বাংলো, দেওয়ানী ফৌজদারি আদালত, আর-এস-এম কোম্পানি অফিস, রেজিস্ট্রেশন অফিস, ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিস, মেয়েদের একটা হাইস্কুল, ছেলেদের দুটো, এমন কি ডিগ্রি কলেজও রাজদিয়ার এই প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। ওদিকের তুলনায় এদিকটা অনেক বেশি উজ্জ্বল, জমজমাট। জীবনের চেহারা এখানে অনেকখানি নিবিড়, ঘনবদ্ধ।

ওদিকটার মতন এখানেও হেমনাথ 'বড় কত্তা'। কারো সঙ্গে দেখা হলেই বিনুদের সম্বন্ধে সেই এক প্রশ্ন, হেমনাথের সেই উত্তর! সকলের কৌতূহল মেটাতে মেটাতে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।

অবনীমোহন বললেন, 'ওধারের তুলনায় এধারে লোকজন বোধহয় বেশি।'

'তা একটু বেশি।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তবে এখন যতটা দেখছ এতটা কিন্তু বছরের অন্য সময় থাকে না।'

দু চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন অবনীমোহন।

হেমনাথ এবার বুঝিয়ে বললেন। সমস্ত বছর রাজদিয়ায় বেশির ভাগ বাড়ি প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। দু-চারটে বুড়ো-বুড়ী আর জীবন থেকে বাতিল কিছু অথর্ব মানুষের মুখ তখন দেখা যায়। কেননা বাড়ির সক্ষম সাবালক ছেলেরা সে-সময় এখানে থাকে না: চাকরি বাকরি বা অন্য কোন কোন জীবিকার টানে তাদের কেউ তখন আসামে, কেউ ঢাকায়, কেউ কেউ হিল্লি-দিল্লীতেও। তবে সবচাইতে বেশী যেখানে তার নাম কলকাতা।

ছেলেরা বিদেশে চাকরি করবে, মেস কি হোটেলের ঝালমসলাওলা অখাদ্য খেয়ে অকালে পাকস্থলীটির স্বত্ব আমাশা কি অম্লশূলের হাতে তুলে দেবে তা তো আর হয় না। কাজেই বাপ-মা ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌমাটিকে সঙ্গে পাঠিয়ে দেন; ঘরের রান্না খেয়ে পেটটা অন্তত বাঁচুক, নাতি-নাতনী হলে তাদের কাছেই থাকে। বাপ-মা অবশ্য ছেলেদের কাজের জায়গায় গিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁরা গেলে দেশের বাড়িঘর জমি-জমা বাগান-পুকুর দেখবে কে? যখের মতন পূর্বপুরুষের সম্পত্তি আগলে থাকবে কে?

সারা বছর রাজদিয়ায় ঢিমেতালের সুর লেগে থাকে। জীবন তখন মন্থর, ঘুমন্ত, নিষ্প্রভ। তিরতিরে স্রোতের মতন তাতে বেগ হয়ত থাকে কিন্তু টের পাওয়া যায় না। তারপর আশ্বিন মাসটি যেই পড়ল, আকাশে-বাতাসে ছুটির সানাইও বাজল, নদীর ধারে কাশফুলের বন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল আর রোদের রঙটি হয়ে গেল গলানো সোনার মতন। সেই সময় রাজদিয়ার গায়ে সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে যায়। জলোচ্ছ্বাসের প্রবল ঢলের মতন দূরদূরান্ত থেকে দুর্বার আকর্ষণে ছেলেরা ফিরে আসে। পূর্ব বাংলার এই তুচ্ছ নগণ্য শহরটা সারা বছর প্রবাসী সন্তানগুলির জন্য যেন উন্মুখ হয়ে থাকে; তাদের ফিরে পেলে খুশি আর

ধরে না। রাজদিয়া জুড়ে তখন প্রমত্ত উৎসব শুরু হয়ে যায়। তারপর পুজো যেই শেষ হল, ছুটির মেয়াদ ফুরালো—ধীরে ধীরে রাজদিয়াকে অপার শূন্যতার ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে একে একে সবাই গিয়ে স্টিমারে ওঠে। ওরা যেন মানস-সরোবরে বুনো হাঁস; শরতে আসে, শরৎ ফুরোলেই তারা নিরুদ্দেশ।

রাজদিয়ার মোটামুটি একটা রূপরেখা পাওয়া গেল। হেমনাথ আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, বিনু আস্তে করে ডাকল, 'দাদু—'

হেমনাথ ফিরে তাকালেন, 'কী বলছ দাদাভাই—'

বলবে কি বলবে না, খানিক ভেবে নিল বিনু। তারপর দ্বিধান্বিত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'ঝিনুকদের বাড়ি কোথায় ?'

'খানিকটা দূরে; ঐ ওদিকে—' সামনে অঙ্গুল বাড়িয়ে দিলেন হেমনাথ।

বিনু চুপ করে রইল।

হেমনাথ আবার বললেন, 'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছে দাদাভাই। কাছাকাছি যখন এসেই পড়েছি, চলো ওদের একটু খোঁজ নিয়ে যাই।'

বিনুর খুব ইচ্ছা হচ্ছিল ঝিনুকদের বাড়ি যায়। ঝিনুক মাছের ভাগ নিয়ে, রসগোল্লার ভাগ নিয়ে, দাদু-দিদার আদরের ভাগ নিয়ে তার সঙ্গে হিংসা করেছিল—সে কথা মনে করে রাখে নি বিনু। তার যা মনে পড়েছিল সেটা হল ঝিনুকের দুঃখ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝিনুকদের বাড়ি যাওয়া হল না। কয়েক পা যাবার পর হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'হেমদাদা—হেমদাদা—'

হেমনাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন; দেখাদেখি বিনুরাও থামল।

একটু দূরে ঝাউপাতার ফাঁকে হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। সামনের দিকে চমৎকার ফুলের বাগান; বাঁশের বেড়া দিয়ে বাগানখানি ঘেরা। যাতায়াতের জন্য কাঠের ছোট একটি গেট রয়েছে।

গেটের কাছে হেমনাথের সমবয়সী কি দু-চার বছরের ছোট একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিলেন। হেমনাথের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি হাতছানি দিলেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন হেমনাথ; বিনুও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

অবনীমোহনেরা অবশ্য দাঁড়িয়েই রইলেন।

কাছে আসতেই উচ্ছ্বসিত খুশী গলায় বৃদ্ধ বললেন, 'শিশিররা এসেছে।'

বৃদ্ধের উচ্ছ্বাস এবং আনন্দ হেমনাথের স্বরেও যেন উছলে পড়ল। বললেন, 'তাই নাকি ? কবে ?'

'পরশুর স্টিমারে।'

'কেমন আছে সব ?'

'ভাল।' বলতে বলতে সচেতন হলেন যেন বৃদ্ধ। বিনুর দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'এটি কে হেমদাদা ?'

হেমনাথ বললেন, 'নাতি।'

'নাতি!' বৃদ্ধ একটু যেন অবাকই হলেন।

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার ভাগনীর ছেলে।' অবনীমোহনদের দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে জামাই আর দুই নাতনী।'

বৃদ্ধ এবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'ওদের ডাকো হেমদাদা—তুমি ডাকবে কেন, আমিই ডেকে আনছি।' তিনি পা বাড়িয়ে দিলেন।

হেমনাথ বললেন, 'এখন থাক রামকেশব—'

বৃদ্ধের নাম তা হলে রামকেশব। তিনি বললেন, 'তাই কখনো হয়; নাতি-নাতনী-জামাই নিয়ে ঘরের দরজা পর্যন্ত আসবে, ভেতরে ঢুকবে না—প্রাণ থাকতে আমি তা সইব না।'

রামকেশব ছুটে গিয়ে অবনীমোহনদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তারপর সাদরে সবাইকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে রামকেশব হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন, 'কই গো, কোথায় গেলে সব,—শিশির, বৌমা—দ্যাখো দ্যাখো কাদের নিয়ে এসেছি।'

একজন সধবা প্রৌঢ়া—কপালে ডগডগে সিঁদুরের টিপ, পিঠময় কাঁচাপাকা চুলের স্তূপ, পরণে খয়েরি পাড় শাড়ি, স্নেহলতার সমবয়সীই হবেন—ডান পাশের একখানা ঘর থেকে বেরিয়ে রামকেশবের সঙ্গে নতুন মানুষ দেখে খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

রামকেশব বললেন, 'হেমদাদার ভাগনী-জামাই আর নাতি-নাতনী—'

তাড়াতাড়ি কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে সস্নেহ মৃদু স্বরে ডাকলেন, 'এসো দাদা, দিদিরা—'

রামকেশব শুধোলেন, 'শিশির, বৌমা—ওরা সব কোথায় ?'

'দক্ষিণের ঘরে।'

একটু ভেবে রামকেশব বললেন, 'আমরা বরং দক্ষিণের ঘরেই যাই। তুমি এদের জন্যে—' বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন।

ইঙ্গিতটা বুঝেছিলেন মহিলা। মিষ্টি করে হেসে বললেন, 'তোমাকে আর বলতে হবে না।'

'বেশ।'

রামকেশবের সঙ্গে দক্ষিণের ঘরে এসে দেখা গেল, একটি সাতাশ-আটাশ বছরের সুপুরুষ তরুণকে ঘিরে আসর বসেছে। লোকজন বেশি না: আধা-প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক, বছর দশেকের একটি মেয়ে, সতের আঠার বছরের একটি তরুণী আর বত্রিশ তেত্রিশ বছরের এক মহিলা—সব মিলিয়ে পাঁচজন। মহিলা, তরুণী এবং ছোট মেয়েটি এমন সাজগোজ আর প্রসাধন করে বসে আছে যা দৃষ্টিকে বিদ্ধ করে। তাদের জামা-কাপড় থেকে সেন্টের উগ্র গন্ধ চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তরুণটি হাত-পা-মাথা নেড়ে রোমাঞ্চকর কিছু বলছে আর মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই শুনছে। রামকেশবরা ঘরে ঢুকতেই গল্প থেমে গেল।

আধা-প্রৌঢ়া সেই ভদ্রলোকটি তাড়া-তাড়ি উঠে এসে হেমনাথকে প্রণাম করলেন, হেমনাথ বললেন, 'কেমন আছিস শিশির ?'

'ভাল।' শিশির বললেন, 'আপনি ভাল আছেন তো জ্যাঠামশাই ? জ্যাঠাইমা কেমন আছেন ?'

'আমরা গাঁইয়া মানুষ; কখনও খারাপ থাকি না। তোমরা শহরের লোক, পীপল্ অফ দি মেট্রোপলিস; তোমাদের আজ পেট ফুটভাট, কাল কান কটকট, পরশু বুক ধড়ফড়। আমাদের ওসব বালাই নেই। সে যাক, রামকেশবের কাছে শুনলাম পরশু তোরা এসেছিস। কাল সারাটা দিন গেছে মাঝখানে। একবার আমাদের ওখানে যেতে পার নি ?'

অপরাধীর মতন মুখ করে শিশির বললেন, 'আজ যাব ভেবেছিলাম।'

শিশিরের পর সেই মহিলাটি এসে প্রণাম করলেন। হেমনাথ বললেন, 'বেঁচে থাকো স্মৃতিরেখা। 'বলতে নেই তোমার স্বাস্থ্য গেলবারের চাইতে অনেক ভাল হয়েছে। শিশিরটা তো চিরকালের খ্যাপা বাউল, সংসারের কোনদিকে ওর খেয়াল নেই। যাক, তোমার দিকে ও এবার নজর দিয়েছে দেখছি।'

জানা গেল মহিলার নাম স্মৃতিরেখা এবং তিনি শিশিরের স্ত্রী।

স্মৃতিরেখার পর সেই ছোট মেয়েটা আর সতের-আঠার বছরের তরুণীটি এসে প্রণাম করল। দুজনকে পায়ের কাছ থেকে তুলে হেমনাথ বললেন, "আমার রুমাদিদি ঝুমা-দিদি না ?"

রুমা ঝুমা দুজনেই মাথা নাড়ল। বোঝা যাচ্ছে এ বাড়ির সবাইকেই চেনেন হেমনাথ। বললেন, 'তোমরা দুজন।' সুধা-সুনীতিকে দেখিয়ে বললেন, 'আর ওরা

দুজন। এত বেগম নিয়ে কোথায় যে রাখি! ভাবছি বাদশাদের মতন একটা হারেম খুলেব।'

সবাই মুখ টিপে হাসতে লাগল।

আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন হেমনাথ, হঠাৎ তাঁর নজর গিয়ে পড়ল সেই যুবকটির ওপর। বললেন, 'একে তো চিনতে পারলাম না, রামকেশব।'

রামকেশব বললেন, 'ও আনন্দ— শিশিরের শালা। কলকাতাতেই থাকে। এ বছর ল' পাশ করেছে। চাকরি-বাকরি বা প্রাকটিস এখনও কিছুই শুরু করে নি; হাতে প্রচুর সময়; তাই বৌমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে।'

হেমনাথ বললেন, 'খুব ভাল।'

এই সময় আনন্দ উঠে এসে হেমনাথকে প্রণাম করল। রামকেশব আনন্দের উদ্দেশে বললেন, 'ইনি শ্রীহেমনাথ মিত্র; গোটা রাজদিয়ার অভিভাবক বলতে পার।'

আনন্দ চুপ করে থাকল।

রামকেশব এবার হেমনাথকে বললেন, 'জানো হেমদাদা আমাদের আনন্দবাবাজীর খুব শিকারের শখ। অনেক বাঘ-টাঘ মেরেছে।'

'তাই নাকি।'

বিনু এর আগে শিকারী দ্যাখে নি; চোখ বড় বড় করে সে আনন্দের দিকে তাকিয়ে রইল। লক্ষ করল, সুনীতিও অবাক বিস্ময়ে আনন্দকে দেখছে। সুধা ওদিকটায় অবনীমোহনের আড়ালে বসে ছিল; সে আনন্দকে দেখছে কিনা বুঝতে পারা গেল না।

যাই হোক, হেমনাথ এবার অবনীমোহনদের পরিচয় দিলেন। আলাপ-পরিচয় হলে বললেন, 'অনেক বেলা হল, এবার আমরা উঠি।'

রামকেশব বললেন, 'তাই কখনো হয়, জামাই নিয়ে প্রথম দিন এলে, একটু মিষ্টি-মুখ না করিয়ে ছাড়তে পারি। শিশিরের মা তা হলে আমার গর্দান নিয়ে নেবে।'

'তাহলে আর কি করা; বসেই যাই।'

একটু নীরবতা। তারপর স্মৃতিরেখার চোখে চোখ রেখে হেমনাথ বললেন, 'আমরা এসে তোমাদের জমাটি আসরটা বোধহয় নষ্ট করে দিলাম।'

স্মৃতিরেখা বললেন, 'ও মা, সে কি কথা!'

হেমনাথ বললেন, 'আনন্দ হাত-পা নেড়ে কি যেন বলছিল, তোমরা খুব মন দিয়ে শুনছিলে। আমরা আসতেই বেচারি থেমে গেল। কী বলছিল আনন্দ?'

সতের-আঠার বছরের সেই তরুণীটি, যার নাম রুমা, বলল, 'মামা সেবার সুন্দর-বনে বাঘ মারতে গিয়েছিল—তার গল্প করছিল।'

হেমনাথ উৎসাহিত হলেন, আনন্দকে বললেন, 'আপত্তি না থাকে, আরেকবার বল না। আমরা একটু শুনি।'

সলজ্জ হেসে আনন্দ বলল, 'আপনাদের কি ভাল লাগবে?'

'লাগবে, নিশ্চয়ই লাগবে। আমাদের খুব বেরসিক ভাবছ নাকি।'

বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর গল্প আরম্ভ হল।

বিনু চোখ বড় করে সেইরকম তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে লক্ষ করতে লাগল, সুনীতিও অপার বিস্ময় নিয়ে আগের মতন তাকিয়ে আছে।

গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ বিনুর মনে হল কে যেন ফিস ফিস করে ডাকছে, 'এই—এই—'

চোখ ফিরিয়ে বিনু দেখতে পেল, সেই ছোট মেয়েটা—যার নাম ঝুমা। গায়ের রঙখানি কালো। নাক-মুখ-চোখ সেই ক্ষতিটুকু ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা পূরণ করে দিয়েছে; এমন নিখুঁত ধারাল গড়ন কদাচিৎ দেখা যায়। গায়ের হলুদ রঙের ফ্রকটা, মাথার গোলাপী রিবনটা কিংবা চোখে কাজলের টানটা ভারি চমৎকার মানিয়েছে।

বিনুর ধ্যানজ্ঞান এখন বাঘ শিকারের দিকে। অন্যমনস্কের মতন বলল, 'কী বলছ?'

'তুমি লুডো খেলতে পার?'

'পারি।'

'ক্যারম?'

তাচ্ছিল্যের সুরে বিনু বলল, 'নিশ্চয়ই।'

ঝুমা বলল, 'এয়ার গান চালিয়ে পাখি মারতে পার?'

এবার একটু থতিয়ে যেতে হল।

ঝুমা বলল, 'তুমি পারো না, আমি কিন্তু পারি।'

যার মামা বাঘ মারতে পারে, সে পাখি মারবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই! যাই হোক থতিয়ে যাওয়া ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়ে নিয়ে বিনু বলল, 'চেষ্টা করলে আমিও পারব।'

'তা তো জানিই।' এমনভাবে ঝুমা বলল, যেন বিনুর কোন কথা জানতে তার বাকি নেই। এইমাত্র যে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সে কথা কে বলবে।

বিনু এবার কিছু বলল না।

ঝুমা আবার বলল, 'আমার একটা ক্যামেরা আছে, জানো। খুব ভালো ছবি ওঠে।'

বিনুর কেন জানি এবার মনে হল, ঝুমাকে আর অবহেলা করা যায় না। আধখানা মন বাঘ শিকারের দিকে রেখে বাকি আধখানা মন দিয়ে ঝুমার কথা শুনছিল সে। এবার পুরোপুরি মনোযোগটাই এদিকে সঁপে দিতে হল।

ঝুমা বলল, 'আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'ও ঘরে।' পাশের ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল ঝুমা।

'সেখানে কী?'

'লুডো, ক্যারম, এয়ার গান, ক্যামেরা—সব আছে।'

বাঘ শিকারের কাহিনী যত চমকপ্রদই হোক, বিনুকে ধরে রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হল না। ঝুমার সঙ্গে সে পাশের ঘরেই চলে যেত, কিন্তু বাধা পড়ল। সেই বর্ষীয়সী সধবা মহিলাটি খাবারের থালা সাজিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অগত্যা রসগোল্লা-সন্দেশেই মনোনিবেশ করতে হল।

খাওয়া হলে হেমনাথরা উঠে পড়লেন।

ঝুমা ফিসফিসিয়ে বলল, 'ক্যারম ট্যারম খেলা হল না। আমার এয়ার গান আর ক্যামেরাটা তোমায় দেখাতে পারলাম না। আরেকদিন আসবে কিন্তু—'

ঝুমার দুর্লভ সম্পত্তিগুলো দেখা হল না বলে মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিরস গলায় বিনু বলল, 'আচ্ছা।'

রামকেশবরা হেমনাথকে বললেন, 'আবার ওদের নিয়ে এসো হেমদাদা; ভাগনীকেও এনো।'

'আচ্ছা।' হেমনাথ বললেন, 'তোরাও যাস; সবাইকে নিয়ে যাবি।'

আবার রাস্তা।

হেমনাথ এবং অবনীমোহন আগে আগে হাঁটছিলেন। সুধা সুনীতি আর বিনু একটু দূরে পড়ে গিয়েছিল।

চলতে চলতে সুনীতি বলল, 'আনন্দবাবু চমৎকার গল্প বলতে পারেন।'

চোখ ঠোঁট কুঁচকে কেমন করে যেন হাসল সুধা, 'হুঁ।'

'আমার মনে হচ্ছিল, সত্যি সত্যি সুন্দরবনে গিয়ে বাঘ দেখছি।'

'তাই নাকি।'

'হ্যাঁ রে। কেন তোর মনে হয় নি?'

'আমি তো গল্প শুনছিলাম না; তোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।'

'আমার দিকে তাকিয়ে ছিলি!' সুনীতি অবাক।

'হ্যাঁ।' মাথাটা একেবারে ঘাড় পর্যন্ত হেলিয়ে দিল সুধা। ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, 'তুই কী করছিলি জানিস দিদি?'

ভয়ে ভয়ে সুনীতি শুধলো, 'কী করছিলাম—'

গলার স্বর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সুধা বলল, 'একেবারে মুগ্ধ, মুগ্ধ, মুগ্ধ হয়ে—'

বিব্রত বিপন্ন সুনীতি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তোকে আর ইয়ার্কি দিতে হবে না ফাজিল মেয়ে—'

হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'বড় কত্তা, বড় কত্তা—'

বড় কর্তা নিশ্চয়ই হেমনাথ। সবাই চকিত হয়ে উঠল।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকায় বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয়তা

বলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

সেদিন ছিল তিরিশে অক্টোবর ১৯৬৭। হঠাৎ নবদ্বীপের একজন তরুণ সংগীতজ্ঞ গোপালবাবু সকালবেলা এসে বললেন—নবদ্বীপের কোলেরডাঙ্গা শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠে দু'জন তরুণ আমেরিকাবাসী বৈষ্ণব এসেছেন। আপনি দয়া করে আজ সন্ধ্যায় নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারে যাবেন। সেখানে নবদ্বীপবাসীর পক্ষ থেকে তাঁদের সম্বর্ধনা জানানো হবে। শুনে মনটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আমেরিকাবাসী বৈষ্ণব। কথাটা শুনতেও কত আনন্দ লাগে।

সন্ধ্যায় ঐ সভায় গিয়ে মুণ্ডিত-কেশ গেরুয়া বসন পরিহিত দু'জন ব্রহ্মচারীকে দেখে প্রথমে ভাবতেই পারিনি যে, এ'রা খাস নিউইয়র্ক ও সানফ্রান্সিস্কোর সন্তান। ঠিক যেন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-স্থলীর দু'জন ভাবোন্মাদ তরুণ। নয়ন বিস্ফারিত। গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক। সর্বদা মালা জপ করছেন পরম নিষ্ঠাভরে। তাঁদের সাথে দেখলাম তাঁদের গুরুজী শ্রীমদ্ এ সি ভক্তিবেদান্তস্বামীকে।

স্বামীজী বললেন, তাঁর গুরুদেব, পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁকে আদেশ করেছিলেন বিদেশে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে। প্রায় ৭০ বছর বয়সে শ্রীমদ্ এ সি ভক্তিবেদান্ত-স্বামী গুরু আজ্ঞা শিরে ধরে আমেরিকা পাড়ি দেবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন ১৯৬৫-র শেষের দিকে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামীজী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি উধৃত করলেন—

'পৃথিবীতে নগরাদি আছে যত গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম' ।।

আমেরিকায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি মানুষের প্রবল অনুরাগ দেখে স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে—মহাপ্রভুর ঐ বাক্য আজই হোক কালই হোক সত্য বলে প্রমাণিত হবেই। স্বামীজী বললেন, আমেরিকা জড়বাদের তথা ভোগের চরম সীমায় উঠেছে, তবু তাদের জীবনে কোন শান্তি নেই। তারা চরম অতৃপ্ত।

অর্থ ও ঐহিক সুখ ভোগের সুমেরু-শিখরে উঠলেও যে, মানুষের তৃপ্তি ও শান্তি আসে না তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আজকের আমেরিকা। আমেরিকার স্বল্প-সময়ের ব্যবধানে আততায়ীর গুলীতে নিহত হলেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং ও কিছুদিন আগে রবার্ট কেনেডি। এইসব মর্মন্তুদ হত্যাকান্ড শুধু আমেরিকার সাধারণ মানুষকেই নয় সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। [illegible] সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে, আমে-আমেরিকায় ঘন্টায় দুটো করে হত্যা হয়েই চলেছে। সেই আমেরিকার অন্তরাত্মা যে কত অশান্ত ও বেদনার্ত তা স্বামীজী আমেরিকায় গিয়ে বুঝেছিলেন। তাই তাঁর বক্তৃতা ও ভাগবত ক্লাস যেন ক্ষতস্থানে অমৃতবারি সিঞ্চনের মত কার্যকরী হয়েছিল।

স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থাদি ইংরাজীতে অনুবাদ করে ও পুস্তকাকারে প্রকাশ করে নিয়ে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় যান। আমেরিকা যাবার সময় স্বামীজীর হাতে বাড়তি পয়সা ছিল না বললেই চলে। গুরু-কৃপা সম্বল করে ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম স্মরণ করে স্বামীজী বেরিয়েছিলেন। জাহাজে একে ত তাঁর 'সি সিকনেস' হয় তাতে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণের অসুবিধা—নানা কারণে তাঁকে খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল। যাই হোক স্বামীজী শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় যখন পৌঁছালেন তখন কপর্দকহীন। দেখা হয়ে গেল বন্ধুর ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি বাস করছিলেন পেনসেলভেনিয়াতে। তিনি এক-জন ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি স্বামীজীকে করে দিলেন।

সেখান থেকে স্বামীজী হাজার দশেক টাকার বই নিয়ে গেলেন নিউইয়র্কে। পিট্‌সবার্গ থেকে নিউইয়র্ক যেতে তাঁর আর কোন অসুবিধা হল না। সেখানে ৭০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৫০০্ মাসিক ভাড়া দিয়ে ঘর ভাড়া করলেন।

নিউইয়র্কের ২৬ সেকেন্ড অ্যাভেনিউতে স্বামীজী ১৯৬৬ সালের ১ জুলাই প্রথম ভাগবত ক্লাস শুরু করেন। প্রথমে শুরু হল ৭৫জন ছেলেকে নিয়ে। এই সময় হাওয়ার্ড হুইলার জনৈক প্রখ্যাত আমে-রিকান অধ্যাপক স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে একেবারে নতুন মানুষটি হয়ে যান। অধ্যাপক প্রথমে খুব পানাসক্ত ও ভোগোন্মত্ত ছিলেন। ভাগবতের ক্লাস করে ও স্বামীজীর উপদেশ শুনে ২৬ বছর বয়সে মহাপ্রভুর মহিমায় তিনি একেবারে দেবতুল্য হয়ে গিয়েছেন। সবরকম মদ, মাংস, সিগারেট ছেড়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে গিয়েছেন। এখন অধ্যাপক হাওয়ার্ড হুই-লারের স্বামীজী প্রদত্ত নাম শ্রীল হয়গ্রিভ দাশ ব্রহ্মচারী। স্বামীজীর প্রচারের বৈশিষ্ট্য হল মূল নীতি ও আদর্শ বজায় রেখে ধর্ম প্রচার। তিনি অনাচারের ঘোর বিরোধী এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন,—'জীব-নিত্য কৃষ্ণ-দাস' এই বাণীকে পুরোভাগে রেখে আমি সব কাজ করেছি। অহমিকা সমগ্র বিশ্বের বিপুল ক্ষতি সাধন করছে। অহমিকা থাকলে কেউ কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করতে পারে না।

স্বামীজী শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক হাওয়ার্ড হুইলার ওরফে শ্রীল হয়গ্রিভ দাশ ব্রহ্মচারীর ওপরে 'ব্যাক টু গড হেড' পত্রিকার সম্পাদনার ভার ছেড়ে দিলেন। আমেরিকায় 'Back to God Head' পত্রি-

এ'রা হলেন বর্তমানে আমেরিকাবাসী সাধু এ, সি, ভক্তি বেদান্তস্বামীর দু'জন আমেরিকান শিষ্য।

নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ থেকে তোলা এ, সি, ভক্তি বেদান্তস্বামীর ছবি।

কার প্রকাশক হলেন 'International Society for Kri·shna consciousness, Inc'. ঐ পত্রিকার বৈষ্ণবদর্শন, মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম বিষয়ক আলোচনা থাকে। লেখেন আমেরিকাবাসী বৈষ্ণবেরা। আগে কলকাতায় 'ব্যাক টু গড হেড'-এর প্রকাশ সংখ্যা ছিল খুব কম। এখন আমেরিকায় পত্রিকার প্রচার সংখ্যা প্রথমেই হয়েছে ৫০০০। সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। বৈষ্ণবদর্শন ও মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্মের প্রতি আমেরিকাবাসীর প্রবল আকর্ষণ দেখে স্বামীজী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন।

আমেরিকায় শ্রীমদ্‌ভাগবত-এর প্রতি জনগণের এত আকর্ষণ হয়েছে যে, এক বছরের মধ্যেই ৬টি কেন্দ্র খুলতে হয়েছে। কেন্দ্রগুলো খোলা হয়েছে—(১) নিউইয়র্ক, (২) সানফ্রান্সিস্‌কো, (৩) মন্ট্রিল, (৪) নিউ মেক্সিকো, (৫) লস অ্যাঞ্জেল্‌স ও (৬) বোস্টন-এ। ওয়াশিংটনেও খোলবার কথা হচ্ছে।

খাদ্য ও আচরণ সম্পর্কে কঠোরতা দেখানো সত্ত্বেও আমেরিকার তরুণ-তরুণীরা দলে দলে স্বামীজীর শিষ্য হচ্ছে। স্বামীজীর প্রথম শিষ্যের নাম—

Harvi Cohin যার বর্তমান নাম হরিদাস। ইনি ভাল খোল বাজান।

স্বামীজী আমেরিকায় যে, 'International Society for Krishna Consciousness' প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে দলমত ও ধর্মনির্বিশেষে যে কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন ও ইচ্ছা করলে সাধন-ভজন করতে পারেন। স্বামীজী নিয়ম করেছেন—যে কোন ধর্মের লোক হয়েও এই সমিতির সভ্য হতে পারবেন যে কেউ। তবে কেউ যদি ইচ্ছা করেন তিনি হিন্দু হতে পারেন। কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। স্বামীজী সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন—কৃষ্ণ ত সমগ্র জগৎ তথা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পিতা। তিনি ত শুধু ভারতের নন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর। স্থাবর জঙ্গম, মানুষ নির্বিশেষে সকলেই তাঁর সন্তান।

স্বামীজী সম্প্রতি নবদ্বীপে ক'দিনের জন্যে এসেছিলেন তাঁর দু'জন আমেরিকাবাসী শিষ্য সাথে করে। তিনি আমাকে খুব ভালবেসেছিলেন ও আমাকে তাঁর ধর্মপ্রচারের সংগী হলে আনন্দিত হবেন বলেছিলেন। তিনি আমাদের বললেন—লস্ অ্যাঞ্জেল্‌স-এ তাঁরা জগন্নাথের মন্দির স্থাপন করেছেন। আরও কয়েকটি জায়গায় মন্দির আছে। সেখানে নিত্য কৃষ্ণনাম হচ্ছে। স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের বলেছেন—তোমরা স্বীকার কর তোমরা কৃষ্ণদাস, তাহলেই তোমাদের মঙ্গল হবে।

স্বামীজী সাত মাস আগে নবদ্বীপে আসলে তার দু'জন আমেরিকান শিষ্য দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। এ'রা হলেন শ্রীল্ অচ্যুতানন্দদাস ব্রহ্মচারী পূর্বনাম Charles Barnett —বয়স ১৯ বছর ও শ্রীল রামানুজদাস ব্রহ্মচারী পূর্বনাম Ronald Barnstone বয়স ২২ বছর। শ্রীল্ অচ্যুতানন্দ দাস ব্রহ্মচারী খাস নিউইয়র্কের ছেলে। মাত্র কলেজে ঢুকেছিলেন। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে দীক্ষা নিয়েছেন। ইনি বৈরাগী হতে চান্। শ্রীল রামানুজ দাস ব্রহ্মচারী সানফ্রান্সিসকোর ছেলে। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে কালিফোর্ণিয়ার ৫১৮ ফ্রেডারিক স্ট্রীটের মন্দিরে ইনি দীক্ষা নিয়েছেন। স্বামীজী বললেন—নিউইয়র্কে বরফ পড়ে, পাতা ঝরে কিন্তু সানফ্রান্সিসকোর আবহাওয়া অন্য রকম। সেখানে বরফও পড়ে না পাতাও ঝরে না। রামানুজদাস নাকি গৃহী হতে চায়। তিনি ভক্তিমতী বাঙ্গালী মেয়ে পেলে তাকে বিয়ে করতে রাজী আছেন। এই দু'জনকে গেরুয়া পরিহিত ব্রহ্মচারীর বেশে নবদ্বীপের রাস্তায় কীর্তন নিয়ে ভাবাবেগে পরিক্রমা করতে দেখেছি। এ'রা সর্বদা নাম জপ করছেন। স্বামীজীর প্রতি এ'দের অগাধ ভক্তি। স্বামীজী সম্বন্ধে এ'রা বক্তৃতার মধ্যে অনেক সপ্রশংস উক্তি করলেন। এ'রা বললেন, স্বামীজী পবিত্রতম ব্যক্তি। তাঁর শ্রীচরণে স্থান লাভ করে তাঁরা ধন্য হয়েছেন, ধন্য হয়েছেন কৃষ্ণনাম করে।

আমেরিকার The New york Times, East Village, Examiner প্রভৃতি পত্রিকায় স্বামীজীকে ভুয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। 'দি নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার সোমবার ১০ই অক্‌টোবর, ১৯৬৬ সংখ্যায় জেমস আর মিকস লিখিত একাংশের বঙ্গানুবাদ হল—'লোয়ার ইস্ট সাইড পার্কে একটা গাছের নীচে বসে আছেন হিন্দু স্বামী এ সি ভক্তিবেদান্তর ৫০জন শিষ্য। এ'রা মাঝে মাঝে নৃত্যসহ দুঘন্টা ধরে ১৬ নাম ৩২ অক্ষর কীর্তন করে চলেছেন কর্তাল, কাঁসর, ঘন্টা, খোল, ঢাক প্রভৃতি বাজিয়ে।' স্বামীজী তাঁদের উপদেশ দিয়েছেন—ধ্বংসের যুগে হরিনাম ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। কবি Allen Ginsberg স্বামীজীর আর একজন অনুরক্ত ভক্ত। তিনি কীর্তন সম্পর্কে বলেছেন—

'It brings a state of ecstesy'.

গিন্সবার্গ আরও বলেছেন যে, হরিনামের এত শক্তি আছে যে, কীর্তন করে মনে অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ হয়। স্বামীজীর বহু শিষ্য মদের নেশা ছেড়ে দিয়ে এখন কৃষ্ণকীর্তনের নেশায় মেতে উঠেছে।

চড়াই উৎরাই

সুভাষ সিংহ

প্রকাণ্ড বড় বাড়িটার গেটের কাছে এসে দাঁড়াতে দরোয়ান সসম্ভ্রমে সেলাম জানাল। তারপর লোহার ফটক খুলে মাথা নীচু করে সরে দাঁড়াল একপাশে। আমি আস্তে আস্তে অগ্রসর হলাম। দুপাশে ফুলের বাগান। মাঝখানে কাঁকর-বিছানো পথ। ভোরের নরম আলোয় বাড়িটাকে রাজপুরীর মত মনে হচ্ছে। আপনমনে শিস দিতে দিতে, বাঁ হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকান, ডান হাতে জ্বলন্ত পাইপ, দুচোখ কুঁচকে হাঁটতে থাকি। গাড়ি-বারান্দার নীচে সুসজ্জিত পোশাকে একজন দাঁড়িয়ে। সে মাথা নত করে অভিবাদন জানাল আমাকে। তারপর কুণ্ঠিতভাবে একটা ফাইল আমার [illegible] কলম এগিয়ে দিল। ওকে আমি ইংরেজীতে কয়েকটা কটূক্তি করলাম। যেমন ব্লাডি, সোয়াইন ইত্যাদি। লোকটা বিন্দুমাত্র রাগল না বরং দাঁত বের করে মৃদু হাসল। ঘনঘন মাথা নাড়তে লাগল। আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ওর হাত থেকে কলমটা ছিনিয়ে ফাইলের ওপর খস্‌খস্‌ করে কয়েকটা আঁচড় কাটলাম। তারপর ওকে যেতে নির্দেশ করলে ও পোষা বিড়ালের মত মিউ-মিউ করতে করতে প্রকাণ্ড একটা থামের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। দেয়ালে নগ্ন নারী-পুরুষের মিথুনে চিত্র। বিভিন্ন ঢঙে বিভিন্ন ভঙ্গীতে।

হঠাৎ আমার কানে ভেসে এল মিষ্টি কণ্ঠস্বর। মনে হল এমন সুরেলা কণ্ঠস্বর জীবনে কখনও শুনিনি। আমি চারদিকে তাকালাম। চারিদিকে দেয়ালে কাচ বসানো। আমি যেদিকে তাকাই, সেদিকেই আমার অসংখ্য প্রতিচ্ছবি। আবার শুনি ঝমঝম শব্দ। যেন নূপুর পায়ে খুব কাছে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসে।

—তোমার এত দেরী হল ফিরতে?

ঠিক সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সে। এমন রূপসী স্ত্রীলোক সচরাচর চোখে পড়ে না। এর রূপ বর্ণনা আমার অসাধ্য। গায়ের রঙ বা ফিগার, চোখ মুখ চুল ইত্যাদি, সরু কোমর, মোহময় বক্ষ—আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। চোখাচোখি হতে

সে মৃদু হাসল। ঢেউ-এর মত সেই সলজ্জ হাসি আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত মুখে। তারপর সে নৃত্যের ভঙ্গিমায় এক-পা এক-পা করে নীচে নেমে আসে। আলতোভাবে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে।

সে আমাকে নিয়ে এল একটা ঘরে। মোজায়েক-করা মেঝে। ঘরের মাঝখানে পালঙ্ক। একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে সে জানালার পর্দা তুলে দিল। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। আয়নার ভিতর ওর সম্পূর্ণ দেহের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। আমার পাইপ ততক্ষণে নিভে গেছে। দেশলাই জেলে আগুন ধরাতে যাব তখুনি সে দ্রুত সরে এল আমার কাছে। এবং আমার হাত থেকে পাইপ কেড়ে নিল। তারপর হাসল। ওর ঝকঝকে দাঁত. ভরাট বুক, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম, আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

—দুষ্টুমি কর না। তারপর সে হাততালি দিল পরপর কয়েকবার। বলল, আজকাল তুমি কেমন উদাসীনভাবে তাকাও আমার দিকে। কী হয়েছে তোমার?

আমি মুখ খোলবার আগেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান একটি যুবতী ঘরে ঢোকে। চার-চাকার একটা গাড়ি সে ঠেলে নিয়ে আসে। আমার সামনে একটা ছোট্ট গোলটেবিলে রাখে। তারপর কফি ও নানারকম খাবার রেখে সে চলে যায়।

রূপসী স্ত্রীলোকটি নিজের হাতে কফির কাপ এগিয়ে দেয়. তুমি দিনরাত কী যে চিন্তা কর বুঝি না। তাছাড়া কাজ ভুলে যাচ্ছ। কই আগে তো এমন ছিলে না!

কফিতে চুমুক দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি। খাবারের দিকে আড়চোখে তাকাই। নানারকম খাবার। কোনটার কী নাম জানি না। রেডিয়োগ্রাম থেকে মিষ্টি সুর ভেসে আসছে। সে গানের সঙ্গে সমস্ত দেহকে নানাভাবে দুমড়ে মুচড়ে নাচল খানিকক্ষণ।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—ওকি তুমি কিছু খাচ্ছ না কেন?

ওর বুক কথা বলার সময় দুলছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। সমস্ত মুখে ঘাম আর রক্তাভ।

আমি তাড়াতাড়ি একটা খাবারের এক-টুকরো মুখে পুরলাম। বাস্তবিক কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। আমি শুধু শুনব দেখব। যা বলে তাই করে যাব। নিপুণ অভিনেতার মত।

ও আমার হাঁটুর ওপর বসল। তারপর দু'হাতে গলা জড়িয়ে আমার ঠোঁটে চুম্বন করল কয়েকবার। আমার শরীরের রক্ত তোলপাড় করে উঠল। ওকে দু' হাত দিয়ে ধরতে গেলে খিলখিল করে হেসে ও চোখের পলকে হাতের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে দু'চোখে প্রবল কটাক্ষ হেনে বলে, এখন নয়। ওঠো, এবার আমরা সাঁতার কাটব। দাঁড়াও সাঁতারের পোশাক নিয়ে আসছি।

আমি একা ঘরে নীরবে পাইপ টানতে থাকি। এভাবে বেশ কিছুটা সময় কাটে পালঙ্ক দেখি। সবুজ নেটের মশারি। ঐ নরম বিছানায় রাত্রে সে আর আমি...।

—এই নাও।

ওর দিকে তাকিয়ে আমার চোখের পলক পড়ে না। সাঁতারের পোশাক সমস্ত শরীরে যেন গেঁথে বসেছে। কী শুভ্র গোলাকার উরু। মসৃণ। নগ্ন বাহুদ্বয়। ঠিক হাতির দাঁতের মত। ও যখন ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করছিল, ওর গুরু নিতম্ব, নরম স্তনের একাংশ, ঈষৎ নীচু হয়ে যাওয়া ফর্সা কাঁধ— আমি নিঃসংকোচে এইসব দেখতে থাকি। দেখার আনন্দ কী কম!

সে ব্যালেরিনার মত আমার সামনে দুই হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলল. ওঠ। বাথরুমে গিয়ে পোশাক বদলে নাও। নাকি আমার সাহায্য দরকার!

আমি কিছু না বলে যথারীতি পূর্বের মত মুচকি হাসলাম। ওর গায়ের গন্ধ, যখন ও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল, পরপর সশব্দে চুম্বন করছিল, টের পেয়েছি। সুন্দর মিষ্টি ফুলের গন্ধ। ও নিশ্চয়ই দামী কোন সেণ্ট ব্যবহার করে।

বাথরুমে গিয়ে আমি পোশাক বদলে এলাম। তারপর দুজনে ধবধবে সাদা তোয়ালে দিয়ে সমস্ত শরীর জড়িয়ে বাইরে এলাম। ও আমাকে পরপর অনেকগুলি ঘর-বারান্দা ঘুরিয়ে নিয়ে এল একটা ছোট্ট ঘেরা জলাশয়ের কাছে। আমরা দুজনে জলের মধ্যে মাছের মত সাঁতার কাটলাম অনেকক্ষণ। শেষে দুজনেই হাঁফিয়ে উঠলাম। ওর মাথায় রবারের টুপি। ওর মুখে বিন্দুবিন্দু জলকণা। রোদ্দুরের ঝিকমিক করে উঠল। ওর গলা বেয়ে টপটপ করে জলের ফোঁটা নীচের দিকে নেমে যায়। সাঁতার কাটার সময় ওর বুক, নরম উরু স্পর্শ করেছি। আমার হাত থরথর করে কেঁপেছে। ও টের পেয়েছে কিনা জানি না। আমি অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করলাম।

একটা সাপ ফণা উঁচু করে তেড়ে এল ওর দিকে। সে চিৎকার করে উঠল। আমি ওকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দি। তারপর সাপটা কাছে আসতেই তোয়ালে দিয়ে উদ্যত ফণার ওপর কয়েকবার জোরে আঘাত করলাম। কয়েকবার ছটফট করে এক সময় স্থির হয়ে গেল সাপটার দেহ।

মোটর ছুটে চলেছে তীব্রবেগে। আমি পিছনের নরম গদির ওপর হেলান দিয়ে বসেছি। অবলম্ব পাইপ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আমার দৃষ্টি সামনে। এক সময় এক জায়গায় এসে গাড়িটা থামে। আমি

নেমে পাড়। ড্রাইভার সেলাম জানিয়ে ব্যাগ হাতে আমাকে অনুসরণ করল।

জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ করতে করতে চেম্বারে ঢুকলাম। বেয়ারা ছুটে এসে সেলাম জানাল। ড্রাইভারের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। আমি ঘনঘন বেল বাজালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ফাইল হাতে একটা বুড়োলোক ছুটে এল। ওর হাত থেকে ফাইল ছিনিয়ে আমি একমনে পড়তে থাকি। ওর উপস্থিতি গ্রাহ্যই করি না। এক সময় চোখ তুলে ওর দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর গলায় ওকে নানা-রকম প্রশ্ন করি। লোকটা আমতা আমতা করে। আমি তর্জনগর্জন করে উঠি। শেষে ওকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলি।

বিরাট একটা হলঘর। অনেকগুলি চেয়ার টেবিল। জোড়ায় জোড়ায় নরনারী। ডায়াসে স্বল্পবেশ পরিহিতা একটা মেয়ে নাচছে। নাচের সঙ্গে উত্তাল বাজনা। শাদা উর্দিপরা বেয়ারাদের ঘনঘন আনাগোনা। সুরাপাত্র হাতে নরনারী। সবার ঠোঁট নড়ছে। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় সবার মুখ রক্তশূন্য অবাস্তব আর মৃত মনে হল। আমি আর স ঘুরছি এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে। স মৃদু হেসে মাথা নীচু করে সবাইকে অভিবাদন জানাচ্ছে। তার পোশাক চুল বাঁধার ঢং, অলঙ্কার ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করল অনেকে। সে শুধু মৃদু হাসল। তার অর্ধনগ্ন বুকের ওপর মহামূল্য এক হীরের হার ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় দপদপ করে জ্বলছিল। সে এক সময় আমাকে নাচার জন্যে অনুরোধ করল। বাজনার তালে সঙ্গতি রেখে জোড়ায় জোড়ায় নরনারী নাচতে থাকে। নাচের গতি এক সময় উদ্দাম হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে বাজনাও। আমি দু-হাতে ওর সরু কোমর জড়িয়ে ধরি। হঠাৎ টুপ করে আলো নিভে যায়। আমি এক-মুহূর্ত দিশেহারা হয়ে উঠি। অন্ধকারে সশব্দে চুম্বন, খিলখিল হাসি, অস্ফুট কাতর গোঙানি। আমার ঠোঁট জ্বালা করে। আমাকে কে যেন দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে। আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। আমি দু'হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দি। ফস্‌ করে আলো জ্বলে। এ কি! অপরিচিতা এক রমণী। ঢুলুঢুলু চোখ। রং-করা ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে আসে সে। আমি পিছনে হটে যাই। পালাতে চাই। কিন্তু চারিদিকে জোড়ায় জোড়ায় নরনারী হাসছে, কথা বলছে, নাচছে। গলগল করে ধোঁয়া উড়ছে ওপরে। পালাবার কোন পথ নেই। রং-করা ঠোঁট আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। আমি সভয়ে পিছনে সরতে থাকি।

দুগ্ধফেননিভ শয্যা। ঘরে নীল আলো। সে চিৎ হয়ে শুয়ে। তার সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর আমার হাতের ছোঁয়ায় বারবার কেঁপে উঠছে। সে দু'হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। হঠাৎ যেন মনে হল হাতদুটো তার সাপ হয়ে গেছে। আমি পালাবার জন্যে ছটফট করলাম, কিন্তু কিছুতেই যেন পা তুলতে পারছি না। আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম, আর হঠাৎ যেন চেঁচিয়ে উঠলাম।

দু'চোখ লাল করে সুকুমার চারিদিকে তাকাল। জানালা ভেদ করে রোদ তার শরীর স্পর্শ করেছে। ছোট্ট ঘর। জিনিসপত্র এলোমেলো। ইস্‌, এত বেলায় সে কোনদিন ঘুম থেকে ওঠে না। মেঝেয় ছোট মেয়েটা তারস্বরে চিৎকার করছে। বার বছরের বড় মেয়ে টেপি ভাঙা আয়নায় মুখ দেখছে। ওর ফ্রকের পিঠের একটা জায়গা ছেঁড়া। পিঠাপিঠি দুই ভাই—টুনু ও পিনু বাসি একখানা রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। তারপর মারামারি। অশ্রাব্য উক্তি। চিৎকার। গলগল করে ধোঁয়া ঢুকছে ঘরে। সুকুমার বিড়ি টানতে টানতে এসব দেখতে থাকে। তার দু'চোখ জ্বালা করে। দমবন্ধ হয়ে আসে। খকখক করে কাশতে কাশতে দম আটকে যায়। গলার শির মোটা হয়। ভাব-লেশহীন তার দু'চোখের দৃষ্টি।

—অ্যাই পোড়ারমুখোরা সব চুপ কর।

খ্যানখেনে গলা। খুন্তিহাতে রমা ঘরে ঢুকল। নোংরা শাড়ি। হলুদ মাখানো রোগা দেহ। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। মুখের চামড়া কোঁচকানো। গর্তে বসা চোখ। সেদিকে তাকিয়ে সুকুমার মাথা নীচু করল। আজকাল সে স্ত্রীর ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকাতে পারে না।

দুমদাম করে কিলচড়। ছেলেদুটি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। বড় মেয়েটা জানলার শিক ধরে মাথা নীচু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। সেইসঙ্গে ছোট মেয়েটার তারস্বরে চিৎকার।

সুকুমার লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে বাজারের থলি হাতে স্ত্রীর পাশ কাটিয়ে মাথা নীচু করে বাইরে আসে। রাস্তায় পা দেওয়া মাত্র একটা গাড়ি জল ছিটিয়ে চলে যায়। নোংরা জলে লুঙ্গি ভিজে যায়। সুকুমার ধাবমান গাড়ির দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর আস্তেআস্তে হাঁটতে থাকে। তার কেবলি মনে পড়ছিল স্বপ্নের কথা। স্বপ্নের ভিতর আবার হয়ত সে কোনদিন চলে যাবে। সশব্দ দীর্ঘশ্বাসের মত একটা হাহাকার তার গলা চিরে বেরিয়ে আসে।

বুলগেরিয়ায় পূর্ণ দীর্ঘ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

গেল ১১ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, বুধ থেকে শনিবার পর্যন্ত চারদিন ধ'রে কলিকাতাস্থ সিনে সেন্ট্রাল-এর উদ্যোগে প্রাচী সিনেমায় যে-বুলগেরিয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল, তাতে চারখানি পূর্ণদীর্ঘ ও খানতিনেক স্বল্পদীর্ঘ ছবি দেখানো হয়। পূর্ণদীর্ঘ ছবি চারটির নাম : (১) এ সাইড ট্র্যাক, (২) এ রেস্টলেস হোম, (৩) দি পীচ থীফ ও (৪) নাইট উইদাউট আর্মার। স্বল্পদীর্ঘ ছবি ক'খানি হচ্ছে : (১) ফুটবল (কার্টুন), (২) চার্চেস্‌ অব বুলগেরিয়া ও (৩) দি ওল্ডেস্ট ট্রান্সপোর্ট। 'এ সাইড ট্র্যাক' ছাড়া বাকী সব ক'খানি ছবিই দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

বহুদিন ধ'রে পরাধীন থাকবার পরে মাত্র ১৯৪৫ সালে বুলগেরিয়া স্বাধীন রাজ্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৪৬-এর ১৫ সেপ্টেম্বর একটি গণতান্ত্রিক রাজ্য (পিপলস্‌ রিপাবলিক) ব'লে ঘোষিত হয়। মাত্র আশি লক্ষ লোক অধ্যুষিত দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপের এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির কিন্তু একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে যা তাদের লোকগীতি, ঐকতানবাদন, অপেরা, নাট্যাভিনয়, এমনকি সামাজিক রীতিনীতি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেও সুপরিস্ফুট। আমরা যে-তিনটি পূর্ণদীর্ঘ ছবি দেখলুম, তার ভিতরেও কাহিনী নির্বাচনে, প্রকাশভঙ্গীতে ও সামগ্রিক চিন্তাধারায় বুলগেরিয় বৈশিষ্ট্যকে আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি। এবং তা' সম্প্রতি কালের ফরাসী, ইতালীয়, সুইডিশ, হল্যান্ডীয় বা চেকোস্লোভাক ছবি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের। বরং বলব, নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতি হিসেবে আমাদের সমাজজীবনে চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কার সম্পর্কে যেমন নব মূল্যায়নের বৈপ্লবিক প্রয়াস চলেছে, ঠিক তারই প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি বুলগেরিয়দের জীবনে। তাই দেখি, বাকিম বাকিজভ পরিচালিত "এ রেস্টলেস হোম"—ছবিতে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে বাপ-মার সঙ্গে ছেলেমেয়ের কি সম্পর্ক হওয়া উচিত, ভবিষ্যতে সার্থক নাগরিকরূপে পরিগণিত হবার জন্যে ছেলেমেয়েদের কি রকম শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই রকম নানা ধরনের প্রশ্ন তুলে তাদের সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সংসারের কর্তাকে নিজের মেয়ে ও ছেলে সম্পর্কিত এবং বাড়ীর বাইরের ঘটনাবলী

রাহগীর / [illegible]

যেখানে চিরাচরিত মতকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হ'তে হয়েছে। অপরদিকে অপরিণত মন নিয়ে ভালোবাসার নামে মোহের বশবর্তী হয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'লে তার জন্যে কি খেসারত দিতে হয়, তাও দেখানো হয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে প্রতিটি বাপমার জীবনেই একটি গুরুতর সমস্যা, তা অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাবে দেখানো হয়েছে। ছবিটি অবশ্য আধুনিক জীবনের সমস্যাবলীকে উপ-স্থাপিত করেছে যতখানি, একটি শিল্প-সৃষ্টি হিসেবে ঠিক ততখানি সার্থকতা লাভ করতে পারেনি।

বালক সুকুমারমতি বালককে কিভাবে মানুষ করা উচিত, কাহিনীর মাধ্যমে এই প্রশ্নের একটি সুষ্ঠু সমাধান উপস্থাপিত করার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্ররূপেও যথেষ্ট উপভোগ্য ও সার্থক হয়ে উঠেছে মাইকেল শারালিয়েভ পরিচালিত "দি নাইট উইদাউট আর্মার"—ছবিখানি। ছেলেদের মন সকল বিষয় জানবার জন্যে যে রকম কৌতূহলী হয়ে ওঠে, তার সুন্দর চিত্রায়ণ করা হয়েছে বালক ড্যানিয়েল কথাবার্তার ভিতর দিয়ে। মধ্য-যুগীয় নাইটদের জীবনী সম্পর্কে গল্প শুনে সে কখনও হয়েছে ডন কুইক্সোটি, কখনও বা ডার্টাগনান, আবার কখনও সে নিজেকে ভেবেছে রবিনহুড। সে তার দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও নিজেকে নাইট-দেরই মতো দুর্বলের রক্ষাকারী, পরহিত-ব্রতী সত্যবাদীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার মা তাকে দোষ ঢাকবার জন্যে মিথ্যা কথা বলতে প্ররোচিত করছেন, তার বাবা তার স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে কথা বলবার সময়ে নিঃস্বার্থভাবে সাহসের পরিচয় দিতে পারেন না, এ-সব অনুভূতি তাকে ব্যথিত, বিভ্রান্ত করে। সে বর্তমান জীবনের পরস্পরবিরোধী অসঙ্গতির মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের বালকবুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে সব জিনিসেরই একটা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করে। মানুষের ভবিষ্যৎ সুখী জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস ও তার ভবিতব্য সম্পর্কে একটা আশঙ্কা—দুইই এই চিত্রটির মধ্যে সুপরিস্ফুট। অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে বালক ড্যানিওর চরিত্রচিত্রণ।

ভুলো রাডেভ পরিচালিত "দি পীচ থীফ" প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিপর্বের পটভূমিকায় জনৈক বুলগেরিয় কর্ণেলের স্ত্রীর সঙ্গে একজন সার্ভিয় যুদ্ধবন্দীর অবৈধ প্রণয়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। কর্ণেলের বাগানে পীচ ফল চুরি করতে এসে যুদ্ধবন্দীর ঘটেছে কর্ণেলের সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়; সেই পরিচয় ক্রমে পরিণত হয়েছে গোপন প্রেমে এবং শেষ পর্যন্ত পীচ চোর ভেবে যখন কর্ণেল নিয়োজিত বাগানরক্ষী যুদ্ধবন্দীকে করে, গুলি দ্বারা নিহত, তখনই প্রিয়বিয়োগাতুর কর্ণেল-স্ত্রীর আর্তবিলাপ তাদের গোপন প্রেমকে করে প্রকাশ। সুন্দর চিত্রশৈলী এবং নায়ক-নায়িকার সুষ্ঠু অভিনয় ছবিখানিকে অত্যন্ত উপভোগ্য ও সার্থক ক'রে তুলেছে।

ভারতবর্ষে অন্তবতরকে অবলম্বন ক'রে "দি ওল্ডেস্ট ট্রান্সপোর্ট" একটি চমৎকার স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র।

চিত্র সমালোচনা

আরও দুটি ডাচ্ (ওলন্দাজ) পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র :

সদ্যসমাপ্ত ডাচ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে যে-তিনটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি দেখানো হ'ল, তাদের মধ্যে 'দি ড্যান্স অব দি হিরণ'-এর কথা গেল হপ্তাতেই বলেছি। এটি ছাড়া আর যে-দু'খানি ছবি আমরা দেখলুম, তাদের নাম হচ্ছে : (১) এ মার্ণ অব সিক্স উইকস্ ও (২) প্যারানোইয়া।

প্রথম ছবি 'এ মার্ণ অব সিক্স উইকস্'-এর নায়ক জিমি মোটর রেসের পেশাদার ড্রাইভার এবং নায়িকা অ্যানেটি হচ্ছে ফোটোগ্রাফারের মডেল। দু'জনের এই বৃত্তির বিভিন্নতা ওদের ব্যক্তিগত অহমিকাকে এমনই বড়ো ক'রে তুলেছে যে, ওদের পরস্পরের ভালোবাসা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। অ্যানেটি তার বাচ্চা ছেলের জন্যে নিজের অস্তিত্বকে সার্থক মনে করে; কিন্তু জিমির কাছে মোটর-রেসিংয়ের বাইরে অন্যসব কিছুই নিরর্থক, তাছাড়া তার জীবনের নিরাপত্তাই বা কোথায়? শেষ পর্যন্ত ছ' হপ্তা বাদে যখন অ্যানেটি তাকে ছেড়ে চ'লে যায়, তখন সে নিজেও মোটর রেসিংয়ের বৃত্তিতে ইস্তফা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু কিছু-দিন পরে অন্য একটি মেয়ে যখন তার জীবনে আবির্ভূত হয়, তাকেও সে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারে না। সে তখন মহাকাশ ভ্রমণ সম্পর্কে বেতার-ভাষণ শুনে আর এক নতুনতর অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্নে মশগুল।

ইয়োরোপে সাম্প্রতিক কালে যুবকদের জীবনে যে সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে, সে হচ্ছে তাদের নিঃসঙ্গতাবোধ ও যৌন-জীবনের অসারতাবোধ। এক-একটি মানুষ যেন এক-একটি দ্বীপ; অন্য কারুরই সঙ্গে তার আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনের উপায় নেই। এই চিন্তা যুবকদের এমনই আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে যে, যুবতীরা শত

প্রেক্ষাপট অভিনীত হারানো চিঠির একটি নাটকীয় মুহূর্তে

চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতাকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। 'এ মার্ণ অব সিল্ক উইক্স'-ও এই সমস্যারই একটি চিত্র। পরিচালক নিকোলাই ভ্যান ডার হাইডি নরনারীর ভালোবাসার অসারতাকে খণ্ড খণ্ড ঘটনার মাধ্যমে চিত্রিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ছবি আদ্রিয়ান ডিটভুর্স্ট পরিচালিত "প্যারানোইয়া" হচ্ছে চিত্রায়ণের দিক দিয়ে সবচেয়ে দুঃসাহসিকতাপূর্ণ। ডবল্যু এফ হার্মান্স-এর একখানি প্রথম যুগের উপন্যাস অবলম্বনে ছবিখানি গ'ড়ে উঠেছে। এর নায়ক অ্যান্টন ক্রীভার একটি জীর্ণ বাড়ীর চিলেকুঠুরীর বাসিন্দা। বাড়ীওয়ালা বাড়ীটি ভেঙে ফেলে নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্যে তাকে উচ্ছেদ করতে চায়। কিন্তু সে বহির্জগৎ থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যে, কোনোমতেই তার সেই জরাজীর্ণ আস্তানা হ'তে বাইরে বেরোতে চায় না। সে নিজেকে একজন জার্মান যুদ্ধাপরাধীরূপে কল্পনা করে এবং বাড়ীওয়ালাকে দেখে মনে করে যে, একজন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। কাজে সে বন্ধ চিলেকোঠার মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকে। এই অবস্থায় তার প্রেমিকা অ্যানা যখন তার ঘন-সান্নিধ্যে আসতে চায়, তখন সে তাকে স্নায়বিক উত্তেজনার বশে ক্রমে ক্রমে বিবস্ত্র করে; কিন্তু সহসা বহির্দ্বারে করাঘাত শুনে তাকে ব্যস্তভাবে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে রাখে। পরে তার ঘরে ঢোকবার দরজা খুলে সামনেই বাড়ীওয়ালাকে দেখতে পেয়ে ভীত হয়ে পড়ে। যখন ভদ্রলোক তাকে বল-প্রয়োগ ক'রে ঘর থেকে বার ক'রে দিতে উদ্যত হয়, তখন ক্রীভার তার উত্তেজিত অবস্থায় তাকে রিভলবার দ্বারা হত্যা করে। নগ্ন অ্যানা ভিতরের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অসহায় ভাবে অ্যান্টনকে ডাকতে থাকে এ সাড়া না পেয়ে দরজায় সবলে আঘ করতে শুরু করে। তার সকল উৎক অবসান ঘটিয়ে অ্যান্টন ধীরে ধীরে দর উন্মুক্ত ক'রে তাকেও নির্মমভাবে হ করে এবং নিজে বারান্দায় বেরিয়ে গি সূর্যকরোজ্জ্বল রাজপথের ওপর বারা থেকে লাফিয়ে পড়ে পিঞ্জরাবদ্ধ জীব থেকে মুক্তিলাভের পথ খোঁজে।

আশ্চর্য আধুনিক চলচ্চিত্রশৈলীর দিয়ে ছবিখানি সমধর্মী ফরাসী বা ই লিয়ান ছবি থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন; এ আবহ, মানসিকতা ও পরিবেশ রচ ছবিটি হল্যান্ডের বিশেষত্বপূর্ণ। নিঃস মনোবৃত্তির নিদর্শন-স্বরূপ "প্যা নোইয়া" একটি সার্থক চলচ্চিত্র।

দেশী ছবির খবর

এবারের পুজোর আকর্ষণ হিস মুক্তি পাচ্ছে তিনটে ছবি। পম্পি ফিল্মে চৌরঙ্গী মুক্তি পাচ্ছে এ সপ্তাহে। শংকে এই বহু-পঠিত উপন্যাসের চিত্র নিঃসন্দেহে বাঙালী দর্শকদের মাঝে ই মধ্যেই আলোড়ন এনেছে। হোটেলজীব অনেক অকথিত কাহিনীর এই বর্ণ-বহ চিত্র আনন্দ দেবে সবাইকে নিঃসন্দেহে অসীমা ভট্টাচার্য প্রযোজিত এ-ছবি বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন উত্তমকুমা শুভেন্দু চ্যাটার্জি, বিশ্বজিৎ, সুপ্র দেবী, অঞ্জনা ভৌমিক, জহর রায়, উৎপ দত্ত ও আরও অনেকে।

পুজোর দ্বিতীয় আকর্ষণ অজ লাহিড়ীর বালুচরী। কার্তিক বম প্রযোজিত ও আশাপূর্ণা দেবী রচিত কাহিনী এক ব্যর্থ যুবতীর জীবন-কাহিনী শুধু ভালবাসা নয়, মেয়েটি চেয়েছি আরও কিছু। কিন্তু কিছুই তার পাও হ'ল না। নগ্ন বাস্তব তার প্রতি স্বপ্নকে ভেঙেচুরে দিল। রাধারাণী পিক চার্সের এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছে সাবিত্রী চ্যাটার্জি, অনিল চ্যাটার্জি, অনু কুমার, পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী অন্যান্যরা।

ডি এম পাল প্রযোজিত ও মঙ্গ চক্রবর্তী পরিচালিত অপ্সরা ফিল্মসে "তিন অধ্যায়" মুক্তি পেল এ সপ্তাহে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং শহরতলী অন্যান্য চিত্রগৃহে।

শৈলেশ দে রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছে পরিচালক শ্রীচক্রবর্তী স্বয়ং। সুরসং করেছেন গোপেন মল্লিক। নেপথ্যে কণ্ঠদা করেছেন—মান্না দে ও প্রতিমা ব্যানার্জি।

উত্তম নাটক, উত্তম অভিনয় ও উত্ত গান সমৃদ্ধ "তিন অধ্যায়" ছবিটির প্রধা চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন, উত্তমকুমা সুপ্রিয়া দেবী, [illegible] রায়, বিকাশ [illegible]

অজয় গাঙ্গুলী, ছায়া দেবী, অনুপকুমার, জহর রায়, বিদ্যা রাও, শিবানী বসু, উমাশঙ্কর বসু, বঙ্কিম ঘোষ, রবীন মজুমদার, ছন্দা দেবী, জয়শ্রী সেন, ইন্দিরা দে, ইন্দ্রনীল, সীতা মুখার্জি, বীরেন চ্যাটার্জি, জ্যোৎস্না ব্যানার্জি, বিদিশা চৌধুরী, মিতা দত্ত, মীরা চ্যাটার্জি, সদানন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ।

শ্রীলতিকা প্রোডাকসনের "রাত্রি শেষে"র দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্যুটিং এইমাসের ১৬ থেকে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুরু হচ্ছে। এ পর্যায়ে প্রধান শিল্পিদের মধ্যে আছেন—জ্যোৎস্না বিশ্বাস, বিদ্যা রাও, অপর্ণাদেবী, জহর গাঙ্গুলী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়।

চিত্রটির প্রযোজনায় আছেন অজিতকুমার ঘোষ, পরিচালনায় পরি দত্ত, সঙ্গীতে সলিল চৌধুরী (বোম্বে), সম্পাদনায় বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরবিন্দ ভট্টাচার্য এবং শিল্প নির্দেশনায় গৌর পোদ্দার।

২৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার অরুণ রায়-চৌধুরী প্রযোজিত এ, আর, সি প্রোডাকসন্সের সঙ্গীতবহুল সামাজিক ছবি "অদ্বিতীয়া" এন-এ ফিল্মসের পরিবেশনায় রাধা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা এবং পরিচালনা করেছেন। সুর দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কণ্ঠ-সঙ্গীতে আছেন—লতা মুঙ্গেসকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন — মাধবী মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, সর্বেন্দ্র, বিকাশ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, পদ্মাদেবী, গীতা দে ও ডেইজী ইরাণী।

গেল ১৫ আগস্ট ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে দেববাণী প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ-এর 'মিহিটান' চিত্রের শুভ মহরৎ ও শুটিং অনুষ্ঠিত হয়। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করবেন পাহাড়ী স্যান্যাল কমল মিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে, পদ্মা দেবী, পঞ্চানন ভট্টাঃ, কানু মুখোপাধ্যায়, নবাগতা মীনা হালদার, নবাগত জয়ন্ত দে ও ডঃ এইচ ঘোষাল। এঁরা ছাড়া বহু নবাগত ও নবাগতা এই ছবিতে অংশগ্রহণ করবেন। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে আছেন যথাক্রমে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুধীর খান ও রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি যুগ্মভাবে পরিচালনা করছেন রবীন বসু ও ডাঃ এইচ ঘোষাল।

মঞ্চাভিনয়

সাধক রামপ্রসাদ

ক্লাসিক থিয়েটারে'র শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি সাধক পুরুষ রামপ্রসাদের জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে 'সাধক রামপ্রসাদ' নাটকটি পরিবেশন করেছেন। রামপ্রসাদের কর্ম ও সাধক জীবন এবং সে সময়কার বাংলার ইতিহাসের পটভূমিকায় নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীনন্দগোপাল রায়-চৌধুরী। ইতিহাসের প্রতি অসীম আনুগত্য রেখে শ্রীরায়চৌধুরী নাটকটি লিখেছেন বলে কিংবদন্তী বা জনশ্রুতির ওপর অতিরিক্ত মোহ কোথাও প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায় নি। শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসআশ্রিত এই জীবনী-নাটকটিকে সব দিক দিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি।

প্রতিটি শিল্পীই এই ধরনের নাটকের মূল সুরটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে সামগ্রিক অভিনয়ধারায় প্রাণের স্পর্শ ছিল। নামভূমিকায় উন্নত ধরনের শিল্প-বোধের পরিচয় দিতে পেরেছেন পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। এঁর কণ্ঠের প্রতিটি গান প্রতিটি শ্রোতাকে ভক্তি বিহ্বলতায় বিমুগ্ধ করেছে, চিত্তে লাগিয়েছে দোলা। 'নয়নচাঁদ দত্তে'র ভূমিকায় ফণী পালিত আশ্চর্য অভিনয়নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। মেনকা দেবীর 'সিদ্ধেশ্বরী' ও শেফালী দেবীর 'দেবী' দুটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র-চিত্রণ। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেনঃ হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল পাল, রামচন্দ্র সরকার, শিশির-কুমার সিংহ, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল
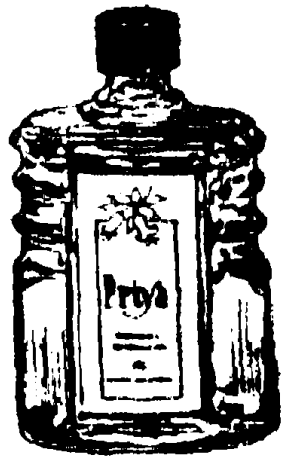
রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত গ্রামোফোন কোম্পানীর শারদ-সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করছেন সনৎ সিংহ, বনশ্রী সেনগুপ্ত, আরতি মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং ইলা বসু। ফটো : অমৃত

চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন মণ্ডল, বিভূতিদাস শর্মা, বাণী মিত্র, মন্দিরা দাস, পরেশ চক্রবর্তী, প্রহ্লাদ মহাপাত্র, শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়।

অভিনব নাটক 'চুরমার'

গত পনেরই আগস্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট হস্টেলের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল দল নির্মিত একটি উপভোগ্য নাটক 'চুরমার'।

ছাত্রদের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাগুলো হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে নাটকটিতে পরিবেশন করা হল। নাটকটির শেষে ঘোষণা করা হল 'আমাদের নাটক চুরমার হয়ে গেল।'

প্রশংসনীয় অভিনয়ে পার্থ সিনহা, চণ্ডীদাস মুখার্জী, মিহির চ্যাটার্জি, সরোজ দে ও সন্দীপ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য।

তাহার নামটি রঞ্জনা : বিশ বছর আগে

বিনায়ক ভট্টাচার্য রচিত দুটি নাটক 'তাহার নামটি রঞ্জনা' ও 'বিশ বছর আগে' সম্প্রতি বরাহনগর সরকারপাড়া নাট্য সংস্থার শিল্পীবৃন্দের অভিনয়ে প্রাণবন্ত রূপ পেয়েছে। প্রথম নাটকটির কাহিনী যদিও বিদেশী নাটকের অনুসরণে গড়ে উঠেছে তবুও ঘটনা, সংঘাত ও চরিত্রগুলোর সঙ্গে আমাদের যেন এক নিবিড় পরিচিতি আছে। নাটকটিকে যাঁরা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা হোলেন: সুখেন্দু সরকার (কৌশিক), মন্দিরা বসু (রঞ্জনা), কমল বসু (পণ্ডিতমশাই), দেবদাস ভট্টাচার্য (পুঃ অফিসার), পার্থ ভট্টাচার্য (প্রহরী)।

দ্বিতীয় নাটকটির শিল্পীতালিকায় ছিলেন: প্রণব মিত্র, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, সুখেন্দু সরকার, সময় সরকার, রবীন হুরেই, অতুন ঘোষ, সরজিৎ সরকার, দিলীপ সরকার, রঞ্জিৎ সরকার, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অশোক সরকার, বিমান জানা।

স্পলডিং-এর উৎসব

ষষ্ঠ বর্ষ একাঙ্ক নাট্যোৎসব পুরস্কার বিতরণ স্পলডিং ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো। প্রথম স্থান অধিকার করে নাটতীর্থম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যাত্রিক (নৈহাটি)। শ্রীমতী ভূমিকা ভট্টাচার্য নামাঙ্কিত রৌপ্য পদকটি নটতীর্থমকে দেওয়া হয়। শ্রীমতী ভট্টাচার্য মফস্বলের খ্যাতনামা অপেশাদারী অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে এই পুরস্কার।

এই উপলক্ষে ২৯ আগস্ট আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় 'শেষ থেকে সুরু' নাটকটি অভিনয় করে এবং মহম্মদ কাওয়াল ও জাহানারা মুস্তারাফ সংগীত পরিবেশন করেন।

।।দশটি বছর।।

২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় 'থিয়েটার সেন্টার' হলে গন্ধার সংস্থা তাঁদের বহুল প্রশংসিত নাটক সমারসেট মম-এর 'দি লেটার'-এর ছায়া অবলম্বনে 'দশটি বছর' মঞ্চস্থ করছেন। অংশ গ্রহণ করছেন অসিত মুখার্জি, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, তরুণ চৌধুরী, রত্না চক্রবর্তী, সীতানাথ চৌধুরী, প্রণব রায়, শৈলেন মৈত্র ও গীতা চক্রবর্তী।

বিবিধ সংবাদ

লোক নাট্যোৎসব

কলিকাতার বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা [illegible] নাট্য সংসদ কর্তৃক গত ৬ই ও [illegible] সেপ্টেম্বর উত্তর কলিকাতার [illegible] মন্দির প্রাঙ্গণে দুইদিনব্যাপী নাট্যোৎসব [illegible] লোর সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়। মহা[illegible] গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও [illegible] চন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী এই উৎসবে সংস্থার সদস্যরা অভিনয় করে সমবেত সহস্র দর্শককে মুগ্ধ করেন। নাটক দুটি [illegible] চালনা করেন শ্রীসতীশ দত্ত ও শ্রী[illegible] বর্তী। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও [illegible] দুইখানিই ধ্রুপদী নাটক এবং [illegible] যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। সংস্থার সদস্যরা সুন্দর অভিনয় দ্বারা তাঁদের অভিনয় নৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। [illegible] সাধক, ভিক্ষুক শ্রীপূর্ণেন্দু পাল, শ্রী[illegible] চন্দ্র পাল, শ্রীশশাঙ্ক চ্যাটার্জি, শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য, শ্রীশৈলেন ব্যানার্জী ও শ্রী[illegible] ঘোষ এঁদের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে শ্রীফণী বন্দ্যো, শ্রী[illegible] নিয়োগী, শ্রীমতী অনিলা দেবী [illegible] করেছেন। নাট্য উপদেষ্টা [illegible] মোহন ঘোষ নবভাবে নাট্য [illegible] স্বাক্ষর রেখেছেন। দুর্গেশনন্দিনী [illegible] কতলু খাঁ, বীরেন্দ্র সিংহ, [illegible] সিংহের ভূমিকায় শ্রীধীরেন চক্রবর্তী [illegible] পাল, শ্রীসমীর ব্যানার্জী শ্রী[illegible] দর্শক চিত্তকে অভিনয় নৈপুণ্যে [illegible] করেছেন। এই নাটকের দৃশ্যগত [illegible] ঘাত প্রতিঘাত মনে রাখবার মত। [illegible] উদ্বোধন করেন মাননীয়া [illegible]

পানতুয়ার বাৎসরিক উৎসব

উত্তর কলিকাতার অন্যতম সংগঠন 'পানতুয়ার' একদাশতম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হল গত ২২শে আগস্ট মহাজাতি সদনে। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীসুকমল [illegible] এবং প্রধান অতিথি হিসেবে [illegible] গীতিচারণ সত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। [illegible] ষ্ঠানে আনন্দানুষ্ঠান ও নাটক [illegible] শ্রীআশীষ সরকার রচিত [illegible] নির্বাসন' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন [illegible]

…ল্পবৃন্দ।। শ্রীঅসীম সরকারের পরিচালনায় …টিকটিতে অভিনয় করেন শ্রীচন্দন ভট্টাচার্য, …র দাস, অমিত সরকার, শ্যামল ব্যানার্জি, …ন সেন, সুকান্ত দত্ত, প্রদীপ দাস, পংকজ …ল, কেকা মিশ্র, মাঃ গৌতম মৌলিক ও …র্থ সরকার।

চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব

চেকোশ্লোভাক কনসালেটের সহ-…গিতায় সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা ১৫ …কে ১৯ সেপ্টেম্বর প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে এক …কোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন …রেছিলেন। এই উৎসবে পাঁচটি সাম্প্রতিক …হিনীচিত্র 'ক্যারেজ টু ভিয়েনা', 'রোমান্স …বিউগল', 'সান ইন দি নেট', 'দি এন্ড …এজেন্ট ডাব্লিউ সি ফোর' ও 'স্টোলেন …রশিপ' এবং কয়েকটি খন্ডচিত্র প্রদর্শিত …য়েছে। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে এবছর এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় তথ্য ও …র-মন্ত্রকের উদ্যোগে এ ছবিগুলি …ী ও বোম্বাইতে দেখানো হয়েছিল।

গীতালির বার্ষিক উৎসব

প্রখ্যাত সংগীত-শিক্ষায়তন গীতালির …শ বার্ষিক সম্মেলনটি সম্প্রতি নেতাজী …য় ইনস্টিটিউট মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল। …ষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির …ন গ্রহণ করেন সংগীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ …াল ও শ্রীকীর্তিকচন্দ্র পাণ্ডা। শ্রীমতী … সাহার উদ্বোধন সংগীতের পর …স্কার ও মানপত্র দেওয়া হয় ও সংগীত-…ষ্ঠান আরম্ভ হয়—আসরে কন্ঠ-…ীতে সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন …রুণা ব্যানার্জি, দীপালী সেন, গীতালি … অভিজিৎ মজুমদার ও বিপ্লব নন্দী … গীটারে সুজিতকুমার রায়। সহ-…গতায় ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায় ও …ল ভট্টাচার্য। আসর পরিচালনায় …লেন শ্রীপংকজ সাহা।

নতুন চিত্রগৃহ : "গীতশ্রী সিনেমা"

১৫ আগস্ট-এর শুভলগ্নে বারাসাত …মা শাসক শ্রীএম আর ভৌমিক …রহাট (কাজিয়ালপাড়া) নতুন চিত্রগৃহ …তশ্রী সিনেমা"র উদ্বোধন করেন। …ত নট শ্রীকমল মিত্র প্রধান অতিথি ও …ীয় উন্নয়ন সংস্থা আধিকারিক …বীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথির …ন অলংকৃত করেন। সুধীরকুমার …লের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ … নির্মিত এই চিত্রগৃহের যাত্রা শুভ … উপস্থিত সকলে তাই কামনা করেন।

নৃত্য নৃত্য মেঘদূত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর তথ্যকেন্দ্রের …গে ফাল্গুনীর 'মেঘদূত' নৃত্যনাট্য গত ৮ …ম্বর তথ্যকেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত … নাট্যরূপায়ণ ও পরিচালনায় ছিলেন …তাভ দাশগুপ্ত। নৃত্যে বিরহিণী যক্ষ …র ভূমিকায় দর্শকের অকুন্ঠ প্রশংসা …ন করেন ছবি দাশগুপ্ত। যক্ষের ভূমিকায় …ন এস এস শংকরণ। সখীদ্বয় কৃষ্ণা …লী ও কাকলি ঘোষ এবং মেঘ নন্দিনী …শের নৃত্য বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। …দ্রসংগীতে বিরহিণীর গানে সকলকে … করেন সুতপা দাশগুপ্ত। স্বাতী বসুর …জ কড়ের রাতে' এবং ইন্দ্রাণী বসুর

মেদিনীপুরবাসীদের বন্যাত্রাণের জন্য রুমা গুহঠাকুরতা পরিচালিত ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের শিল্পীরা রবীন্দ্রসদনে সংগীত এবং নৃত্য পরিবেশন করেন।

ফটো : অমৃত

"ডেকো না মোরে' গান দুটিও সকলের আনন্দবর্ধন করে।

যক্ষের গানে ছিলেন অসীম সেন ও অমিতাভ দাশগুপ্ত। এই নৃত্যনাট্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন আশলতা গাংগুলীর উচ্চাংগ সংগীত। সংগীত পরিচালনা তরুণ গাঙ্গুলীর। তবলায় সহযোগিতা করেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। আলোক সম্পাত অমিতাভ সেন।

বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদের কলিকাতায় নাট্যাভিনয়

গত ৪ সেপ্টেম্বর বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যগণ কলিকাতা হেয়ার স্কুলের অর্ধশতাধিক শততম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের অডিটরিয়মে ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায় রচিত "মহাত্মা ডেভিড হেয়ার" নাটক অভিনয় করেন। প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য "মহাত্মা ডেভিড হেয়ার" নাটকটি অমৃতবাজার শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বর্ধমানে প্রথম অভিনীত হয়।

স্কাইলার্কের অনুষ্ঠান

গত ২৫শে আগস্ট খিদিরপুর কবিতীর্থে শিশু ও কিশোর প্রতিষ্ঠান 'স্কাইলার্কে'র উদ্যোগে মাসিক অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

এরপর গল্প পাঠ। সুকুমার রায়ের হাসির গল্প 'হ য ব র ল' থেকে পাঠ করে শোনায় বনানী ভট্টাচার্য, রীতা বসু, কাবেরী ভট্টাচার্য ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল শিশু শিল্পী অরুণিমা ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র সংগীত ও আবৃত্তি।

সবশেষ অনুষ্ঠান ছিল নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের কৌতুক নাটিকা 'অভ্যর্থনা'। এই নাটিকাটি দর্শকদের অকুন্ঠ প্রশংসা লাভে ধন্য হয়। নাটক পরিচালনা করেন তপন পাল। অংগগ্রহণ করে শেলী চন্দ্র, হাসি পাল, সুনন্দা দেবনাথ ও স্নিগ্ধা পালচৌধুরী।

অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ভার নেন শেলী বন্দ্যোপাধ্যায়। সমবেত প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি প্রীতিময় হয়ে ওঠে।

ক্লান্ত রূপকার

দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের গার্ডেনরীচ অফিসের মেকানিক্যাল রিক্রিয়েসন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ —শ্রীশৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ক্লান্ত রূপকার' নাটকটী আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৬৮ সোমবার অপরাহ্ন ৫-৩০ মিনিটের সময় মিনার্ভা নাট্য মঞ্চে মঞ্চস্থ করিবেন। নির্দেশনায়—শ্রীশক্তি রায়।

কমার্শিয়াল অডিট রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব

কমার্শিয়াল অডিট রিক্রিয়েশন ক্লাবের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণ ও নীরেন সেনের 'আজব শহর কলকাতা' একাঙ্কটি অভিনীত হয় অহিন্দ্র ভবনে গত ৩১শে আগস্ট। একাঙ্কটি কলকাতা শহরের এক অদেখা রূপকে তুলে ধরেছিল, কয়েকটা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সুঅভিনীত প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেও তৃতীয় বৃদ্ধের চরিত্রে নাট্য পরিচালক কল্যাণ মৈত্র স্বকীয় চিন্তা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রাখেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অসীম বাগচী, সরোজ চক্রবর্তী,

চিত্তরঞ্জন মন্ডল ও অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অডিটর জেনারেল শ্রীএস এম দত্ত ও পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রী মতি দত্ত।

চেলিয়ামা ব্লকের রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠান

পুরুলিয়া জেলার চেলিয়ামা ব্লকের রিক্রিয়েশান ক্লাবের উদ্যোগে গত ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নৃত্য-গীত-আবৃত্তিতে অনুষ্ঠানটি রসঘন হয়ে ওঠে। এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে তপতী ভট্টাচার্য, নন্দিতা দাস এবং স্বর্ণালী ভট্টাচার্য। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন গীতা বেরা এবং রাণা ভট্টাচার্য। একক এবং সমবেত সংগীতে অংশগ্রহণ করে যাঁরা উপস্থিত শ্রোতাদের আনন্দ দান করেন, তাঁদের মধ্যে প্রণতি ভট্টাচার্য, মিতা চক্রবর্তী, রীতা চক্রবর্তী, মধুমিতা ভট্টাচার্য, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, ইতু চক্রবর্তী, চিন্ময় ভট্টাচার্য এবং শ্যামাপদ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। শিবানী চক্রবর্তীর হাস্যকৌতুক প্রকাশের ভংগী সুন্দর। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়।

শিশুস্বর্গ

মহাজাতি সদনে শিশু-স্বর্গের নিয়মিত অনুষ্ঠান আগামী রবিবার (২২শে সেপ্টেম্বর) সকাল ন'টায় "লালু ভুলু" চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।

বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ৬ আগস্ট রাজ্য পশুপালন ও দুগ্ধ পর্ষত্ত কলেজের নবাগত বরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কলেজের হরিণঘাটার মোহনপুরস্থিত নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন কলেজের ছাত্র-সমিতি। এই উপলক্ষে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্যামল রায়, রবীণ ব্যানার্জি, দীপ্ত কর্মকার, গোপাল সরকার। দেবজ্যোতি রায়, অসিত চৌধুরী এবং শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দদান করেন কৌতুকগীতি পরিবেশন করে শ্রীঅমল বসু।

'বিচিত্রিতা' অভিনীত 'বৈকুন্ঠের খাতা' ও 'কংকাল'

"বিচিত্রিতা" সাংস্কৃতিক সংস্থা গেল ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে রবীন্দ্রনাথের "বৈকুন্ঠের খাতা" ও "কংকাল" গল্পটির নাট্যরূপকে করেছিলেন। বৈকুন্ঠের ভূমিকায় শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রূপসজ্জা, বাচন ও ভংগীর মাধ্যমে একটি অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যানাদের অভিনয় চলনসই।

বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রদত্ত কংকাল' কাহিনীর নাট্যরূপ মধ্যের ফ্ল্যাশব্যাক অংশটি বাদ দিলে বড্ড বেশী শ্রুতির উপর নির্ভরশীল। অভিনয়ে কনকচাঁপার ভূমিকায় রীণা চৌধুরী অপেক্ষাকৃত উচ্চ কন্ঠের অধিকারিণী হ'লে নাট-নৈপুণ্যের গুণে অধিকতর সার্থক হয়ে উঠতে পারতেন। মানস মুখোপাধ্যায়ের ডাক্তার শশিশেখরের চেয়ে অজিতশঙ্কর অভিনীত দাদা ঢের বেশী সাফল্য লাভ করেছে। নির্দেশক প্রফুল্ল ভোসের 'রমেন' প্রতিক্রিয়া দেখানোর দিক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেশী।

'ফাল্গুনীর মেঘদূত নৃত্যনাট্যে ছবি দাশগুপ্তা

আবহসংগীত প্রচুরভাবে নাট্য পরিস্থিতিকে সাহায্য করেছে।

শিশুদের চিত্রকলা

কলিকাতার সাংস্কৃতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 'নৃত্যের-তালে-তালে'র চতুর্থ বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে গত ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিখিল ভারত শিশুদের শিল্পকলা ও বাটিকের একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শ্রীরনেন আয়ন দত্ত এই প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। শ্রীসুহৃদ রুদ্র সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী মতি লেশার।

নৃত্যের তালে তালে'র ছাত্রীরা চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে; দ্বিতীয় স্থান পায় মহাদেবী বিড়লা বিদ্যাবিহার স্কুল।

এই প্রদর্শনীটি দেখবার জন্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লেডী রাণু মুখার্জি, শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ, শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণিভূষণ, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর মুন্সী, শ্রীমতি কুসুম ব্যানার্জি ও অন্যান্যরা।

'অন্বেষা'র মঞ্চাভিনয় 'অতিথি'

"অন্বেষা" নাট্য সংস্থা সম্প্রতি রাজা-বাজারস্থ প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে রবীন্দ্রনাথের "অতিথি"র নাট্যরূপটি পরি[illegible] করছেন। নাট্যপরিচালক স্বদেশ বসু [illegible] নাট্যরূপে কিশোর তারাপদর নিখিল[illegible] পরিব্যাপ্ত মনটিকে সঠিকভাবে ধরা হয়ে[illegible] অবশ্য নাট্যক্রিয়াকে আরও ঘন কৌতূ[illegible] সৃষ্টিকারী করবার জন্যে বৈচিত্র্যময় ঘ[illegible] সমাবেশ ঘটাতে পারলে উপভোগ্যতার দিয়ে নাটকখানির আকর্ষণ বৃদ্ধি হ[illegible] অভিনয়ে তারাপদর ভূমিকায় তরুণ চ[illegible] পাধ্যায় সার্থক নাট-নৈপুণ্যের প[illegible] দিয়ে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করতে পেরে[illegible] তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন চারু[illegible] ভূমিকায় সুধাশ্রী ভট্টাচার্য এবং [illegible] পাগলরূপে পার্থসারথী বন্দ্যোপাধ[illegible] অন্যান্য ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু (মতি[illegible] প্রণতা নন্দী (অন্নপূর্ণা), শেলী [illegible] (সোনামণি), স্বরূপা মুখোপাধ্যায় ([illegible] পদ) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

'অন্বেষা' কর্তৃক "অতিথি" নাট[illegible] প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে আবার অভি[illegible] হবে ২২, ২৮, ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর।

ভারতীয় নৃত্যকলামন্দিরের নৃত্যকলা প্রদর্শন

গত ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বাটান[illegible] রিক্রিয়েশন ক্লাবের সৌজন্যে উক্ত ক্লাব [illegible] নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প[illegible] চালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দি[illegible] বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীদের দ্বারা '[illegible] বধ' (নৃত্যনাট্য), 'পুতুল বিয়ে' (নৃত্যনা[illegible] উচ্চাংগ ও পল্লীনৃত্য মহাসমারোহে অ[illegible] ষ্ঠিত হয়। নৃত্যে পাপড়ি বোস, নন্দি[illegible] চক্রবর্তী, শুভ্রা চ্যাটার্জি, পূর্ণিমা হালদ[illegible] কৃষ্ণা হালদার, মিতা পাল, শিপ্রা সেন, ক[illegible] সেনগুপ্তা, মধুমিতা সেন, মায়া ভট্টাচা[illegible] রুণু সেন, কংকণ বোস, তন্দ্রা রায়, অনি[illegible] ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী সেনগু[illegible] রিংকু ভাদুড়ী, অরুণা দে, শর্মিলা গ[illegible] বিদুষী বাসু, শোভা ধর, কণিকা রায়, ঝ[illegible] ব্যানার্জি ঠাকুরতা প্রভৃতি প্রশংসা অর্জ[illegible] করেন। সহকারী নৃত্য পরিচালনায় অনু[illegible] শঙ্কর ও শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা। পুতু[illegible] বিয়ে (নৃত্যনাট্য) প্রযোজনা ও পরিচালন[illegible] শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা। সংগীত ও সু[illegible] ধরের ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমতী দীপা[illegible] চক্রবর্তী ও শ্রীমতী অনিমা রায়।

ভারতছন্দ

"ভারতছন্দের" প্রথম বার্ষিক উৎস[illegible] ৯ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা[illegible] মহাজাতি সদনে সম্পন্ন হ'বে।

পথমে ভারতীয় শাস্ত্রীয় ও লোক[illegible] নৃত্যের [illegible] সমাবেশ। তারপ[illegible] "স্বপনবুড়ো" রচিত অভিনব নৃত্যনা[illegible] "কানাই বলাই" হিন্দীতে অভিনী[illegible] হ'বে। নৃত্য পরিচালনা—সুধীর সিংহ [illegible] রাজকুমার সিংহ। সঙ্গীত পরিচালনা-সুনীল সাহা। আলোক নিয়ন্ত্রণ—শিবনা[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

জলসা

শিলাপ্পা করে মাধবীতে শ্রীমতী রমলা চামুণ্ডেশ্বরী ও সহযোগী শিল্পী

রাগিণীর নিবেদন

রবীন্দ্রসদনে 'রাগিণী' নিবেদিত 'বিরহ-মিলন' নৃত্যনাট্যের দেবব্রত বিশ্বাস পরিকল্পিত শিল্পরূপ পরিবেশনার অভিনবত্বে এক বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। বহুশ্রুত এবং বহুল-প্রচলিত গানগুলি প্রয়োগ-কৌশল ও গায়ন-শৈলীর রূপাবেশ স্মরণীয়। এর জন্য সমস্ত কৃতিত্ব শ্রীদেবব্রত বিশ্বাসের প্রাপ্য। বর্ষণমুখর প্রকৃতির পটভূমিকায় প্রিয় গানগুলির অতিচেনা পদসঞ্চার মাধুর্যে ও রোমাঞ্চে চিত্তকে রসপ্লাবিত করে তুলতে পেরেছে শ্রীবিশ্বাসের উদাত্ত গম্ভীর কন্ঠের আবেগ ও ভাবের রসবর্ষণে। পদ্মিনী দাসগুপ্তা নবীন হলেও প্রতিশ্রুতিসম্পন্না শিল্পী—এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করা গেল সম্ভবত শ্রীবিশ্বাসের সুযোগ্য পরিচালনার গুণে। রস-পরিবেশন ও রস আদায় উভয় কার্যেই তিনি সমানিপুণ। দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চসজ্জা বিষয়ানুগ। রূপসজ্জাও পরিচ্ছন্ন। নৃত্যনির্দেশনায় ছিলেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্যশিল্পী শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়।

পাশ্চাত্য শিল্পীর প্রাচ্যনৃত্য

রবীন্দ্রসদনে ওরিয়েন্ট অ্যাট্রাকশনের পক্ষ থেকে শ্রীসত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও মিহির চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত দুটি অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। শ্রীমতী জিনালালী আমেরিকার শিল্পী। কিন্তু ভারতীয় নৃত্যে তাঁর অনুরাগ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়সহকারে কথক নৃত্য শিক্ষা এবং ভারতীয় দর্শকবৃন্দের সমক্ষে পরিবেশন উভয় দেশের মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও ভাবনার জগতে উভয় দেশের পাশাপাশি না হলেও কাছাকাছি আসার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। অপর শিল্পী পূর্ণ দাস বাউল ও সম্প্রদায় বাংলার একেবারে গ্রামীণ সংস্কৃতির নির্ভেজাল রূপটি তুলে ধরে আমেরিকাবাসীকে মুগ্ধ করতে পেরেছেন। শিল্পমূল্যের চেয়ে ভাববিনিময়ের মূল্যায়ণেই এই অনুষ্ঠান দুটির আকর্ষণ। পূর্ণ দাস বাউল ও সম্প্রদায়স্থ শ্রীমতী মঞ্জু দাস, নবীন কাওয়ালের পল্লীগীতি শ্রীজীবনকুমার মন্ডলের তবলাসঙ্গতে উপভোগ্য হয়েছিল। শ্রীপূর্ণ দাস বাউলের গান সুরু হোল মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বন্দনা দিয়ে। পরপর কয়েকটি পল্লীগীতি, ভক্তিমূলক গান ও দেহতত্ত্বভিত্তিক গানে, পল্লীর নিজস্ব ঐতিহ্য ও প্রকাশভঙ্গীর প্রাণবন্ত রূপটি প্রতিভাত হয়। শ্রীমতী জিনালালীর কথকনৃত্যের সরস্বতীবন্দনা ঠাট, আমাদ, টুকরো, গত্, তৎকার, ঠুমরী, পরণ দেখালেন। দ্রুত লয়ের গতির দক্ষতা হয়ত ছিল না। কিন্তু পরিবেশিত বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট ও রূপায়ণও যথাযথ। অভিনয়ের অঙ্গে উপযুক্ত অভিব্যক্তির অভাব ছিল। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা লালিত্য মনকে টানে। যে বস্তুটি কলারসিকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখে তা হল তাঁর লয়-দক্ষতা ও বিভিন্ন তালে নিখুঁত পদক্ষেপের আবর্তন। কয়েকটি অসমমাত্রার তালেও যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন বিদেশিনীর কাছে তা দেখব বলে আশা করিনি। প্রতিটি নৃত্যভঙ্গিতে গুরু বিরজু মহারাজের সুমার্জিত রুচির ছাপ বিদ্যমান। তবলা ও সারেঙ্গী সঙ্গতে আফাক হোসেন খাঁ ও আহ্‌মেদ হোসেন খাঁ, পরিবেশকে সুর ও ছন্দে মাতিয়ে রেখেছেন। বহুশ্রুত চন্দ্রকোষের সুরের পরিবর্তে পিলুর মুখরা শৃঙ্গার-রসের উদ্দীপনার ভাব সৃষ্টি করেছে। বিন্দাদীন মহারাজ রচিত 'কাহে রুখত দগরা প্যারী' গানটি কিছুদিন আগেই এই গানের সঙ্গতে বিরজু মহারাজের নৃত্যকে মনে করিয়ে দিয়েছে। এই দুটি অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ।

ইণ্ডিয়ান ব্যালে ট্রুপ

ইণ্ডিয়ান ব্যালে ট্রুপের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আকাদামি অফ ফাইন আর্টস শিল্পীদের দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চাঙ্গ ও লোকনৃত্যের এক দীর্ঘ অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। ভারতনাট্যম, কথাকলি, কথক, মণিপুরী ছাড়াও আসাম, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতের লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান দুটি হোল দুলাল রায় ও হিমাংশু বিশ্বাসের দ্বৈত জলতরঙ্গ ও বংশীবাদন এবং কথাকলি আঙ্গিকে গোপাল কৃষ্ণনের 'শিকারী' নৃত্য।

—চিত্রাঙ্গদা

একশো মিটার দৌড়

শঙ্করবিজয় মিত্র

আর এক মাসের ব্যবধান, মেক্সিকোর নবনির্মিত মঞ্চে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রীড়াবন্ধ অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজন প্রায় সম্পন্ন। কৃষ্ণকায় ক্রীড়াশিল্পীরা এই ওলিম্পিক বর্জনের যে অশুভ সংকল্প নিয়েছিলেন তার কৃষ্ণছায়াও অপসারিত হয়েছে, তাঁরা এতে যোগ দিচ্ছেন। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মেক্সিকো ক্রীড়াপ্রতিভার মিলনক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে।

ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও আগ্রহোদ্দীপক অনুষ্ঠান হচ্ছে দৌড় প্রতিযোগিতাগুলি, বিশেষ করে স্বল্প পাল্লার দৌড়। একশো গজ ও একশো মিটারের দৌড়ের গতি দিয়ে বিশ্বের দ্রুতগতি মানুষের আখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ওলিম্পিকে এই দু বিষয়ের রেকর্ড সম্প্রতি যেভাবে ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে তাতে আজকের মানুষও যেন রকেটের গতিবেগ অর্জন করেছে মনে হবে। ১৯৬০ সালের ওলিম্পিকে পশ্চিম জার্মাণীর আর্মিন হ্যারী দশ সেকেন্ডে একশো মিটার দৌড়েছিলেন। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তার এই রেকর্ডই বিশ্ব রেকর্ড হয়ে রয়েছে। অবশ্য '৬০ সালেই কানাডার জেরোম, '৬৪ সালে ভেনিজুয়েলার এস্তেভস ও আমেরিকার হেইস, ১৯৬৭ সালে আমেরিকার হাইন্স ও টার্ণার এবং কিউবার ফিগুয়েরোলা দশ সেকেন্ডের রেকর্ড স্পর্শ করেছেন। কিন্তু ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কেউ ঐ রেকর্ড অতিক্রম করতে পারেন নি। ১৯৬৮ সালে ঐ রেকর্ডকে চ্যালেঞ্জ করে ম্লান করে দিয়েছে প্রচন্ড গতিবেগের অধিকারী দৌড়ানিয়ারা। একমাত্র আমেরিকাতেই প্রায় পঁচিশবার এই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন মার্কিন দৌড়বীরেরা। অনেকে আশা করছেন মেক্সিকোর প্রান্তরে একশো মিটার দশ সেকেন্ডের কম সময়েই দৌড়ানো যাবে। আমাদের কাছে এটা কল্পনা মনে হলেও সাধনা ও সামর্থ দিয়ে মানুষ বহু অবিশ্বাস্য জিনিষকেও বিশ্বাস্য করে তুলেছে। মেক্সিকো ওলিম্পিক এই প্রচন্ড গতির নবতম আদর্শ স্থাপনে যে সফল হবে না কে তা বলতে পারে?

অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়নের চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ক্যালিফোর স্যাক্রামেন্টোতে। এই প্রতিযোগিতার ট্রায়াল হিটগুলিতে ও ফাইনালে কমসে কম পঁচিশবার একশো মিটারের বিশ্ব রেকর্ডের নির্দিষ্ট দশ সেকেন্ডের কম সময়ে বা সমান সময়ে তরুণ দৌড়ানিয়ারা উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করায় মার্কিণ ক্রীড়ামোদীদের মনে ৯ সেকেন্ডের কথা উঁকিঝুঁকি মারছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই স্বল্প পাল্লার দৌড়ে আজ একাধিক বিস্ময়কর প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছে। আর হেইস, জেমস হাইন্স, টম স্মিথ, টার্ণার, চার্লি গ্রীণ প্রভৃতি দৌড়বীরেরা বিশ্বের যেকোন দৌড়ানিয়াকে পরাজিত করবার শক্তি ধরে। স্যাক্রামেন্টোর প্রতিযোগিতার হিটে হাইন্স ৯'৮ সেকেন্ডে একশো মিটার দৌড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন। জ্যামেকার মিলার ৯'৯ সেকেন্ড সময় নিলেন। ফাইনালে কিন্তু চার্লি গ্রীণই জয়ী হলেন দশ সেকেন্ড সময়ে। এই প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য দৌড়েও মার্কিন তরুণরা যেন কোমর বেঁধে এই কথাটাই সপ্রমাণ করতে চান আর্মিন হ্যারীর দশ সেকেন্ডের রেকর্ড তাঁদের কাছে কিছুই নয়।

এই সমস্ত তরুণ প্রতিভাদের মধ্যে মার্কিন ক্রীড়াবিদরা চার্লি গ্রীণের ওপর বেশি আশা রাখেন একশো গজ বা একশো মিটার পাল্লার দৌড়ে। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিও অবশ্য পেছিয়ে নেই। এই প্রতিযোগিতার বিজয় গৌরব ছিনিয়ে আনবার জন্য দেশে দেশে প্রস্তুতি চলছে এবং প্রতিভাধর তরুণের নামও শোনা যাচ্ছে। তবে প্রাচুর্যে ভরা আমেরিকায় ক্রীড়া প্রতিভার প্রাচুর্যও তাদের আশায় উদ্দীপ্ত করে তুলেছে।

নিগ্রো এ্যাথলিট চার্লি গ্রীণ নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের ছাত্র। বয়স তেইশ, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। ১৯৬৪ সালেই টোকিও ওলিম্পিকে যখন তাঁর স্থান সুনিশ্চিত তখন তাঁর পায়ের পেশী সংকোচনের জন্যে তাঁকে বসে যেতে হয়। জীবনের সেই পরম সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে গ্রীণ অবশ্য আশা ছাড়ে নি। সুস্থ হয়ে উঠে নবোদ্যমে গ্রীণ সাধনায় ব্রতী হয়েছেন এবং বিভিন্ন দৌড়ে ও প্রতিযোগিতায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যত্নবান হন। গ্রীণের বিশ্বাস স্বল্প পাল্লার দৌড়ের প্রতিভা জন্মগত। ভগবান যাকে এই প্রতিভা দিয়েছেন, সেই সাফল্যলাভ করবে, শুধু অভ্যাস বা অনুশীলনের দ্বারা এই সাফল্য সম্ভব নয়। গ্রীণের বক্তব্য 'পেশীতে টান ধরায় আমি টোকিও ওলিম্পিকে যোগদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। সে নৈরাশ্য আর যেন আমাকে ভোগ করতে না হয়।' অর্থাৎ মেক্সিকো ওলিম্পিকের জন্যে মার্কিন দলে তাঁর নিজের স্থান পাওয়া সম্পর্কে তিনি একরূপ সুনিশ্চিত।

স্কুলে পাঠাবস্থাতেই দৌড়ে গ্রীণের দক্ষতা প্রকাশ পায়। ওয়াশিংটনের সীটেলের ওদিয়া হাই স্কুলের ছাত্র হিসেবে ১৯৬৩ সালে তিনি ৯·৫ সেকেন্ডে ১০০ গজ দৌড়ান। সে বছর স্কুলছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন অপর এক ছাত্রের সমকক্ষ হিসেবে এবং সমকক্ষ ছাত্র হচ্ছেন আজকের টম স্মিথ। সেই বছরেই গ্রীণ এক[illegible] সেকেন্ডে দুশো কুড়ি গজ দৌড়াতে সমর্থ হন। ১৯৬৪ সালে তিনি সিনিয়রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। ইন্ডোর ষাট গজ দৌড়ে দ্রুত গতি[illegible] সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ছ' সেকেন্ডে [illegible] অতিক্রম করতে সমর্থ হন। এই প্রতিযোগিতার পর বব হেইস ও চার্লি গ্রী[ণ] ১৯৬৪ ওলিম্পিকের ট্রায়ালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এইভাবে ১৯৬৪ সালে ওলিম্পিক থেকে বঞ্চিত হলেও গ্রীণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ৬০ গজ (ইন্ডোর) ১০০ গজ (আউট ডোর) প্রতিযোগিতা সমূহে তিনি তাঁর অপরাজিত আখ্যা বজায় রাখেন। ১৯৬৬ সালে ন্যাশনাল কলেজিয়েট ও আমেরিকান এ্যামেচার ইউনিয়ন প্রতিযোগিতায় তিনি জয়ী হন[illegible] কালে তাঁকে মার্কিন ম্যাগাজিনগুলি বিচারে ১০০ গজ ও ১০০ মিটারে বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ দৌড়ানীয়া বলে ঘোষণা করা হয়। ঐ বছর ইউরোপ পর্যটনকালে গ্রীণ পশ্চিম জার্মাণ ও সুইজারল্যান্ডে চারদিনের মধ্যে তিনদিন ১০·২ সেকেন্ডে একশো মিটার দৌড়াতে সমর্থ হন। গ্রীণের দৌড়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে তিনি সব সময়ে ভাল স্টার্ট নিতে পারেন। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে দৌড়ান ও পুরো সময়টাই একভাবে দৌড়াতে পারেন। এসম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্য হল "আমি সমস্ত পথটাই এক গিয়ারে ছুটে থাকি"।

গ্রীণের তীব্রতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বদেশবাসী টম স্মিথ ও জিম হাইন্স বিশ্ব [illegible] অভিলাষী। স্মিথ ১০·১ সেকেন্ডে একশো মিটার দৌড়েছেন। তবে শত গজ বা মিটারের দিকে আর ঝুঁকছেন না। তিনি দুশো মিটার, ২২০ গজ, ৪০০ মিটার ও চারশো কুড়ি গজে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী এবং এই দিকেই তিনি তাঁর শক্তি নিবদ্ধ করবেন। কাজেই গ্রীণকে এখন হাইন্সের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। তবে গ্রীণ বা হাইন্সকে প্রায় ডজন খানেক মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। তার মধ্যে ওরিগণ স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উইলি টার্ণার অন্যতম।

১৯৬৭ সালে আমেরিকায় পঁয়ত্রিশ জন এ্যাথলিট ৯·৪ সেকেন্ডে বা তদল্প সময়ে ১০০ গজ দৌড়েছেন। সমগ্র বিশ্বে ঐ সময়ে যাঁরা একশো গজ দৌড়েছেন তাঁদের সংখ্যা হচ্ছে একশ চল্লিশ। আঠার জন মার্কিন স্কুলছাত্রও ৯·৫ সেকেন্ডে বা তদল্প সময়ে ১০০ গজ দৌড়েছে। আমেরিকার বিলগেন্স, ক্লার্ক ক্রেটন, রণি রে স্মিথ, অরিন রিচবার্গ, উইলি জ্যাক কিংবা গ্রান্ট হ্যারিস, বহির্বিশ্বে বিশেষ পরিচিত না হলেও আজ তারা গ্রীণ বা হাইন্সের তুলনায় হীন নয়।

খেলাধুলা

দর্শক

আমেরিকার টেনিস আসর

আমেরিকার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা এবং আমেরিকার প্রথম ওপন টেনিস প্রতিযোগিতায় নিগ্রো অপেশাদার খেলোয়াড় আর্থার এ্যাস পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে আমেরিকার টেনিস খেলার ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন। এই দুই প্রতিযোগিতায় নিগ্রো খেলোয়াড়দের পক্ষে পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয় এই প্রথম। এ প্রসঙ্গে নিগ্রো মহিলা খেলোয়াড় এ্যালথিয়া গিবসনের নাম মনে পড়েছে। তিনি ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে আমেরিকার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিংগলস খেতাব জয় করেন। তিনিই সর্বপ্রথম নিগ্রো পুরুষ ও মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের পক্ষে আমেরিকার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম খেতাব জয় করে চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় নিগ্রো জাতির নাম উৎকীর্ণ করেন। এর অনেক আগে টেনিস ছাড়া অন্যান্য খেলাধুলার আসরে নিগ্রো খেলোয়াড়রা প্রভূত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। অলিম্পিক গেমসের এ্যাথলেটিক্সে আমেরিকার বিরাট সাফল্যের মূলে আছে নিগ্রো এ্যাথলীটদের অবদান। অলিম্পিক গেমসের 'হিরো' আখ্যালাভ করেছেন আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট জেসি ওয়েন্স। আমেরিকার কোন শ্বেতকায় এ্যাথলীটের ভাগ্যে এ-সম্মান আজও জোটেনি। আমেরিকার সমাজ এবং রাষ্ট্র-জীবনে শ্বেতকায়দের প্রভুত্বে উপেক্ষিত ও নিপীড়িত হয়েও যে নিগ্রো খেলোয়াড়রা খেলাধুলায় বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন তার কারণ তাঁদের প্রগাঢ় জাতীয়তাবোধ এবং নিষ্ঠা। আমেরিকান জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ান আর্থার এ্যাস তাঁর জীবনের পরম গৌরবের দিনে কি অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা একেবারে ভুলে যেতে পেরেছেন? কৃষ্ণকায় বলেই তাঁর জন্মভূমি রিচমণ্ডে অবস্থিত শ্বেতকায়দের টেনিস ক্লাব-গৃহে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে তিনি উন্নত ক্রীড়ামানের সংস্পর্শে আসতে পারেননি।

আমেরিকান জাতীয় টেনিস খেলা

১৯৬৮ সালের আমেরিকান জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ২৫ বছরের নিগ্রো যুবক আর্থার এ্যাস ৪—৬, ৬—৩, ৮—১০, ৬—০ ও ৬—৪ গেমে আমেরিকার শ্বেতকায় খেলোয়াড় বব লুটজকে পরাজিত করেন। মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট ৬-২ ও ৬-২ গেমে ব্রেজিলের কুমারী মারিয়া বুনোকে পরাজিত করে তৃতীয়বার আমেরিকান জাতীয় সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরবলাভ করেছেন। কুমারী জীবনে (মার্গারেট স্মিথ নামে) তিনি দুবার (১৯৬২ ও ১৯৬৫) এই সিঙ্গলস খেতাব পান। ১৯৬৮ সালের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য বিভাগে খেতাব জয় করেছেন: পুরুষদের ডাবলসে বব লুটজ এবং স্টান স্মিথ (আমেরিকা), মহিলাদের ডাবলসে শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) এবং মিক্সড ডাবলসে পিটার কার্টিস (বৃটেন) এবং মেরী এ্যান ইজেল (আমেরিকা)।

আমেরিকান ওপ্‌ন টেনিস

আমেরিকার প্রথম ওপ্‌ন টেনিস প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড়রা কোন পাত্তা পাননি। পুরুষদের সিংগলস সেমি-ফাইনালে যে চারজন খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র পেশাদার খেলোয়াড় ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়াল। প্রতিযোগিতায় অনেক অঘটন ঘটে গেছে। যেমন ১৯৬৮ সালের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান এবং বিশ্বের ১নং পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভার চতুর্থ রাউণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লিফ ড্রিসডেলের কাছে পরাজিত হন, সেমি-ফাইনালে কেন রোজওয়াল পরাজিত হন নেদারল্যাণ্ডসের অপেশাদার খেলোয়াড় টম ওক্কারের কাছে এবং উপর্যুপরি তিন বছরের (১৯৬৬—৬৮) উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান ও বিশ্বের ১নং পেশাদার মহিলা খেলোয়াড় শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ফাইনালে বৃটেনের ১নং অপেশাদার খেলোয়াড় কুমারী ভার্জিনিয়া ওয়েডের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে আর্থার এ্যাস (আমেরিকা) ১৪—১২, ৫—৭, ৬—৩, ৩—৬ ও ৬—৩ গেমে টম ওক্কারকে (নেদারল্যাণ্ডস) পরাজিত করেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে বৃটেনের ভার্জিনিয়া ওয়েড ৬—৪ ও ৬—২ গেমে শ্রীমতী বিলি জিন কিংকে পরাজিত করেন। পুরুষদের ডাবলস খেতাব পান গার্ডনার মুলয় (আমেরিকা) এবং টরস্টেন জোহানসন (সুইডেন), অপরদিকে মহিলাদের ডাবলস খেতাব জয় করেন শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং কুমারী মারিয়া বুনো (ব্রেজিল)।

নিগ্রো টেনিস খেলোয়াড় আর্থার এ্যাসের আমেরিকার জাতীয় টেনিস খেতাব জয়ের ফলে টেনিস খেলায় আমেরিকা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। দীর্ঘ ১২ বছর পর আর্থার এ্যাসের খেতাব জয়লাভের সূত্রে আমেরিকান খেলোয়াড় জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ী হন। আমেরিকার পক্ষে এই খেতাব শেষ পেয়েছিলেন টনি ট্রাবার্ট ১৯৫৫ সালে।

১৯৬৮ সালের আমেরিকান জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস খেতাব বিজয়ী নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার এ্যাস ট্রফি হাতে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। আমেরিকার জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ীদের নামের তালিকায় তিনিই প্রথম নিগ্রো খেলোয়াড়।

১৯৬৮ সালের প্রথম আমেরিকান ওপ্‌ন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস ট্রফি বিজয়িনী ইংল্যান্ডের অপেশাদার খেলোয়াড় কুমারী ভার্জিনিয়া ওয়েড (বাঁ দিকে) এবং তাঁর ফাইনাল খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিনী শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা)

অলিম্পিক হকি প্রসঙ্গ

পৃথিবপাল সিংয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় হকি দল বর্তমানে পূর্ব আফ্রিকা সফর করছে। এরপর রোম সফর শেষ করে সোজা মেক্সিকো যাত্রা করবে। পূর্ব আফ্রিকার উগণ্ডায় অনুষ্ঠিত পাঁচটি খেলাতেই ভারতবর্ষ জয়ী হয়েছে। কেনিয়া সফরের প্রথম খেলায় ভারতবর্ষ জয়ী হয়। কিন্তু পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ১ম টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ১—৩ গোলে কেনিয়া দলের কাছে হেরেছে এবং ২য় টেস্ট খেলা কোন রকমে ১-১ গোলে ড্র করেছে। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক গেমসের হকিতে ভারতবর্ষ স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে সাফল্যের ক্রমপর্যায় তালিকায় ১ম স্থান পেয়েছিল। অপরদিকে কেনিয়া পেয়েছিল ৬ষ্ঠ স্থান। আসন্ন মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে কেনিয়ার খেলা পড়েছে 'খ' বিভাগে। অপরদিকে ভারতবর্ষ খেলবে 'ক' বিভাগে।

১৯৬৪ সালের ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া এবং নবম স্থান অধিকারী মালয়েশিয়ার 'খ' বিভাগে খেলা পড়ায় মালয়েশিয়া হকি দল অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া সফরে গেছে। অস্ট্রেলিয়া বনাম মালয়েশিয়ার ১ম টেস্ট ১—১ গোলে ড্র গেছে এবং ২য় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ২—০ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করেছে। অস্ট্রেলিয়া সফররত মালয়েশিয়ার হকি দলের ম্যানেজার তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, ১৯৬৪ সালের স্বর্ণপদক জয়ী ভারতবর্ষ এবং রৌপ্যপদক বিজয়ী পাকিস্তানকে আসন্ন মেক্সিকো অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মাণী এবং হল্যান্ডের কাছে বেশ বেগ পেতে হবে।

অলিম্পিক গেমসের তালিকায় বর্তমানে যে উনিশ রকমের খেলা আছে তার মধ্যে একমাত্র হকি খেলায় ভারতবর্ষ ৬ বার স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে যা বিশ্বখ্যাত লাভ করেছে। খেলাধুলোর ইতিহাসে প্রাচীনতম এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খেলা হিসাবে এ্যাথলেটিক্সের স্থান প্রথম। ভারতবর্ষ এপর্যন্ত এ্যাথলেটিক্সে কোন পদকই জয়ী হয়নি। অলিম্পিক ক্রীড়া মানের তালিকায় ভারতবর্ষের মান প্রথম দশটি স্থানে নেই। এ্যাথলেটিক্সের জনপ্রিয়তা সারা পৃথিবী জুড়ে। অপরদিকে হকির জনপ্রিয়তা মুষ্টিমেয় দেশে। তাও ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান হকি খেলায় যতখানি গুরুত্ব দেয় অপর দেশগুলি তার কিছুই দেয় না। সুতরাং মাত্র হকি খেলায় সাফল্যের জোরে আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরে ভারতবর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান পেতে পারে না।

মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে যে ১৫টি দেশ হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার লাভ করেছে তারা দুভাগে প্র লীগ প্রথায় খেলবে। ভারতবর্ষ প্র খেলবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১ অক্টোবর।

লীগ খেলার তালিকা

'ক' বিভাগ : ভারতবর্ষ, পূর্ব জার্মা পশ্চিম জার্মাণী, নিউজিল্যান্ড, বেলজিয় মেক্সিকো, জাপান এবং স্পেন।

'খ' বিভাগ : পাকিস্তান, অস্ট্রেলি হল্যান্ড, কেনিয়া, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া এ আর্জেন্টিনা।

ডি' ওলিভিয়েরো প্রসঙ্গে জনমত

অশ্বেতকায় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয় বেসিল ডি' অলিভিয়েরাকে দক্ষিণ আফ্রি সফরগামী এম সি সি দলে স্থান দেওয়াতে ইংল্যান্ডে তুমুল প্রতিবাদের এখন বইছে। এম সি সি এখন হাড়ে-হা টের পাচ্ছে গণতন্ত্রের ধারক এবং বা ইংল্যান্ডের জনমত কত সজাগ। দক্ষি আফ্রিক'র শ্বেতাঙ্গ সরকারের কুখ্যাত ব বৈষম্য নীতির স্বার্থে ইংরেজ জনসাধা নিজেদের বিবেক বিসর্জন দেন নি। তাঁ টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বেসিল ডি ওলিভিয়েরার পক্ষ নিয়ে গুণীর মর্যা দিয়েছেন। অকৃতজ্ঞ এবং স্বার্থপর এম সি সংস্থার নীচতাকে ধিক্কার দি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নি। বৃটেনে জনমত দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ প্রধা মন্ত্রী মিঃ জন ভরস্টারকে বিশেষ বিচলি করেছে বলে মনে হয় না। তিনি এখন নিজের জেদ রেখে চলেছেন। নিউ অব্ দি ওয়ার্ল্ড সংবাদপত্র তাদের নিজ ক্রিকেট ভাষ্যকার হিসাবে এম সি সি দলে সঙ্গে বেসিল ডি' ওলিভিয়েরাকে দক্ষি আফ্রিকা সফরে পাঠাবার যে ব্যবস্থা ক তারই প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধা মন্ত্রী মিঃ ভরস্টার ইংল্যান্ডের সংবা পত্রিকাগুলির উপর একহাত নিয়েছেন তাঁর এই পাগলের প্রলাপে একটা ব্যাপা পরিষ্কার হয়েছে যে, এম সি সি দলে সঙ্গে ডি' ওলিভিয়েরার সাংবাদি হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরও তি বরদাস্ত করবেন না। বর্ণবৈষম্যের ভেদনীতি দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার তিনি যে বৃটি স্বার্থের সুখ-সৌধ বহু পরিশ্রমে গ তুলেছেন তা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে যে

শেষ সংবাদ

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকামী এম সি দলে নির্বাচিত সিম বোলার টম কা রাইট আহত হওয়াতে দলের শূন্য স্থ পূরণের জন্য বেসিল ডি' ওলিভিয়েরা আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২১শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 27th Sept. 1968. শুক্রবার, ১০ই আশ্বিন, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

সালভাতোর কোয়াসিমোদো প্রসঙ্গে

আমরা বিশ্ব সাহিত্যের শরিকানা দাবী করি। কিন্তু আমাদের ব্যবহারের সঙ্গে এই দাবীর বিরাট পার্থক্য। সম্প্রতি সেটা আরো বেশি করে ধরা পড়লো প্রখ্যাত ইতালীয় কবি সালভাতোর কোয়াসিমোদর মৃত্যুতে। গত জুন মাসে তিনি মারা যান। কিন্তু সাহিত্য জগতের এত বড় দুঃসংবাদ সকলের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব প্রায় কেউই অনুভব করলেন না। অথচ সাহিত্য-সাধনার সর্বোচ্চ শিরোপা নোবেল পুরস্কারও তিনি পেয়েছিলেন। এ-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নজরে পড়লো অমৃত পত্রিকায়। এই পত্রিকার 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' বিভাগে বিদেশী সাহিত্য পর্যায়ে মৃত্যুসংবাদসহ সালভাতোর কোয়াসিমোদো সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা প্রকাশে অনেকেই উপকৃত হবেন।

সাহিত্যে এ রকম একটি ইন্দ্রপতনের ঘটনায় সকলের নীরবতা আমাদের কি রকম ভাবিয়ে তোলে। অথচ প্রায়ই দেখি যে, সিনেমা বা খেলাধুলো সংক্রান্ত সাধারণ ব্যাপারও কি রকম অসাধারণ তৎপরতায় প্রকাশিত হয়ে উৎসাহীদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। সব কাগজের পাতাতেই এজন্য যথেষ্ট জায়গাও দেওয়া হয়। কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে অনুরাগীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সাহিত্য জগতের সব খবরই তাঁরা জানতে চান। সবকিছু জানানো অবশ্য সম্ভব নয়। কিন্তু যা একান্ত উল্লেখযোগ্য, তা কেন যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না? কোয়াসিমোদোর কাছে বিশ্বসাহিত্য অনেকখানি ঋণী। তাঁর মৃত্যুতে নীরবতা পালন করেই কি সে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা হলো? ব্যাপারটা খুবই বেদনাদায়ক।

আগেই বলেছি, এদিকে অমৃত পত্রিকার উদ্যম বাস্তবিক প্রশংসনীয়। আশা করি, ভারতীয় ও বিদেশী সাহিত্যের নানা সংবাদ পরিবেশনার দায়িত্ব বহন করে ভবিষ্যতেও তাঁরা আমার মত অনেকেরই সাধুবাদ অর্জন করবেন।

অলকা চক্রবর্তী
হুগলী

'খেলাধুলা' প্রসঙ্গে

গত ১৯শ সংখ্যা 'অমৃত'এর 'খেলাধুলো' বিভাগে 'দর্শক' মহাশয় লিখিত 'কি লজ্জার কথা' শীর্ষক ঘটনাটির পর্যালোচনা পড়ে খুবই মর্মাহত হয়েছি। আমাদের জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের এই হীন মনোভাব দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছি। গতবারের পরাজয়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এবারেও তাঁরা মারদেকার ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরে যে ক্রীড়াধারার পরিচয় দেখিয়ে এসেছেন তাতে লজ্জায় আমাদেরই মাথা কাটা যাচ্ছে। শুধু আমি কেন, যে-কোন ক্রীড়ারসিকই অনায়াসে বলে দিতে পারেন যে, তাঁদের খেলার কোন স্ট্যাণ্ডার্ড নেই। কিন্তু এতেও তাঁদের মনে এতটুকু লজ্জা বা ক্ষোভ জেগেছে বলে মনে হয় না। আমার তো মনে হয় একমাত্র হকি দল ছাড়া ভারতের আর কোন ক্রীড়াদল জয়ের আশা নিয়ে বিদেশ যান না। মনে হয় বিদেশ ভ্রমণ (দেশের পয়সায়) ও সেখান থেকে মূল্যবান ভোগ্যসামগ্রী কিনে আনার উদ্দেশ্যেই তাঁরা যান। তাই যদি হয় তবে এত এত বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় করে তাঁদের পাঠাবার কি দরকার? বিদেশ থেকে বেআইনীভাবে জিনিসপত্র কিনে আনার খবর এই প্রথম নয়। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ইতিপূর্বে বহুবার ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় হকিদলও বাদ যান না।

এ শুধুমাত্র কোন বিশেষ দলের পক্ষে অসম্মানজনক নয়, এটা সমগ্র দেশের তথা জাতির বদনাম। তাঁদের এই ধরনের কার্যকলাপ কি দেশের পক্ষে হানিকারক নয়? তাঁদের এই কার্যকলাপ কি ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রভাবিত হয়ে তাঁদের নৈতিক পতন ঘটাবে না? আমার মনে হয় যতদিন পর্যন্ত না আমাদের খেলোয়াড়েরা এই মনোবৃত্তি ত্যাগ করেন ততদিন কোন মতেই আমরা সাফল্যের আশা করতে পারি না। আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরে সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন কঠোর অধ্যাবসায়, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং প্রতিটি খেলোয়াড়ের মনে জাতীয়তা ভাব, উচ্চাশা ও দৃঢ় মনোবল। আশা করি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধা করবেন না। খেলাধুলার ক্ষেত্রে দেশের সম্মান তাঁদের হাতেই নির্ভর করছে

পরিশেষে আমি শ্রীদর্শক মহাশয়কে তাঁর এই সময়োপযোগী লেখার দ্বারা পাঠক সাধারণ তথা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

মিস কুহেলী রায়।
ঝরিয়া (ধানবাদ)
বিহার

> পূজাবকাশের জন্যে প্রতি বছরের মতো এবারও অমৃতের পরবর্তী সংখ্যা (৪-১০-৬৮) বন্ধ থাকবে।

আমেরিকায় বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে

আমেরিকা নানাদিক দিয়েই আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে। বীট ও হিপি নিয়ে ওদেশে তোলপাড় চলছে। এই রোগ সারা ইউরোপকে গ্রাস করেছে। কয়ে দেশে রাষ্ট্রযন্ত্রকেও এ সম্পর্কে ব্যবস্থা লম্বন করতে হয়েছে। কিন্তু খোদ আ রিকায় এই ভাবধারায় কোনই পরিবর্তন নি। বরং হিপির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। অনেক দূরত্ব অতিক্রম করে আমা দেশেও এসেছেন। এবং সবচেয়ে অ কাণ্ড হচ্ছে, আমাদের দেশেরই জা যোগী এ'দের গুরুপদে নির্ধারিত ব্যক্ত

অমৃতের কুড়ি সংখ্যায় বলেন্দ্র কুণ্ডুর 'আমেরিকায় বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রি পড়ে এ সম্পর্কে আরো কৌতূহলী হল নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অ শ্রীমদ্ এ সি ভক্তিবেদান্তস্বামী গু আদেশ শিরোধার্য করে আমেরিকায় প জমিয়েছিলেন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের অ লাষে। তিনি সে-দেশে সাময়িকভাবে দুরবস্থায় পড়েছিলেন। কিন্তু তা থে মুক্তি পেয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বি সফলতা অর্জন করেন। তিনি সেখানে স্থাপনা এবং কয়েকটি কেন্দ্রে ভাগ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। সে-দে তাঁর শিষ্যসংখ্যাও খুব একটা কম হিন্দুধর্মের এত বিরাট সাফল্য অ অতীতে আমেরিকায় আর কেউ অ করেছেন কিনা সন্দেহ।

সম্প্রতি তিনি নবদ্বীপ ঘুরে গেছে তাঁর সঙ্গে ছিল দুজন তরুণ আমেরিকা তাঁরা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন নিজেদের কৃষ্ণদাস বলে স্বীকার করেছে এ'রা দিন-রাত নাম-জপ করেন এবং গু নির্দেশ মত চলাফেরা করেন।

আমাদের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই উৎসাহের কথা। ধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ বিপন্ন বিশ্বে বাঁচবার এক রাস্তা। আর এ ব্যাপারে ভারতের গু আসন সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্রীমদ্ এ সি ভক্তিবেদান্তস্বাম উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ। বিশেষভ তিনি চৈতন্যদেবের নির্দিষ্ট পথেই অগ্র হয়েছেন : পৃথিবীতে নগরাদি আছে গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।' আ করি সর্বদিক ভেবেই তিনি এপথে অগ্র হয়েছেন। তাঁর আমেরিকান শিষ্যরাও গু অমর্যাদা করবেন না বলেই আমরা বিশ্ব করি। নবদ্বীপ-আগত দুই শিষ্য নিজে গুরু সম্পর্কে বলেছেন, স্বামীজী পবিত্র ব্যক্তি। তাঁর শ্রীচরণে স্থান লাভ করে তা ধন্য হয়েছেন, ধন্য হয়েছেন কৃষ্ণনাম করে

বৈদ্যনাথ রায়
বর্ধমা

অমৃত সম্পাদকীয়

আগমনীর উৎসব

পরিচিত শরতের হাসি জড়িয়ে আকাশ আজ সমুজ্জ্বল। তার বুক থেকে মুছে গেছে বিগতদিনের বেদনার চিহ্ন। বাঙালীর ঘরে আজ ধ্বনিত হচ্ছে আগমনীর গান। মাতৃপূজা সমাগত।

উপনিষদে উক্ত আছে, আনন্দ থেকেই সকল বস্তুর সৃষ্টি, আনন্দেই তার স্থিতি, আনন্দেই তার লয়। যিনি মাতৃরূপে আসেন তিনিও এই আনন্দস্বরূপিণী শক্তিরূপা মহামায়া। সারা বৎসর এই সময়টির জন্য বাঙালীর প্রতীক্ষা। সেই মহালগ্ন আজ সমাগত। আমরা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আগমনীর সুরে সুর মিলিয়ে দুর্গোৎসবের আনন্দময় দিনগুলিকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশে তিনি শুধু শক্তিরূপাই নন, তিনি পরম স্নেহময়ী মাতা। কন্যার পিত্রালয়ে আগমনের কাহিনীর সঙ্গে মা দুর্গার আগমনের কাহিনীটি এমন নিবিড় মানবিকতায় জড়িয়ে আছে যে, এ উৎসব প্রতি গৃহস্থের আপন উৎসব।

একে আমরা লোকায়ত রূপ দিয়েছি বলেই বাংলাদেশে দুর্গোৎসব সর্বমানবের কল্যাণ ও আনন্দ উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই আনন্দে উচ্চ থেকে নীচ, দরিদ্র ও বিত্তবান সকলের সমান আমন্ত্রণ। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে এই সময়ে উৎসাহের আর অবধি থাকে না। বাংলার প্রকৃতিও এই সময়ে থাকে অনুকূল। শরতের প্রসন্ন হাসির ছোঁয়ায় মানুষের মন হয়ে থাকে আনন্দ-উচ্ছল। সেই উচ্ছলতার প্রতিফলন ঘটে পূজামণ্ডপে গৃহস্থের সংসারে, কন্যার মুখে, জননীর প্রতীক্ষাস্নিগ্ধ বুকে।

বাংলাদেশে এবারে উৎসবের মধ্যেও একটা করুণতার রেশ থাকবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জের এখনো কাটেনি। যাঁরা বন্যার ফলে আর্ত ও ক্লিষ্ট হয়েছেন তাঁরা কী ভাবে আগমনীর এই মহোৎসবে অন্য সকলের সঙ্গে যোগ দেবেন? এই বেদনার চিত্র হয়তো চিরকালই ছিল, কখনো কম, কখনো বা বেশি। আনন্দময়ীর আগমনে যখন আনন্দে সারা দেশ ছেয়ে যায় তখনও ধনীর দুয়ারে অপেক্ষমানা দুঃখী কাঙালিনী মেয়েটির মলিন মুখের ছবিটি কবির তুলিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

এবারে আর্থিক কারণেও দুর্গোৎসবের আবহাওয়ায় লেগেছে কিছুটা নিরুৎসাহের আমেজ। শ্রম-বিরোধের ফলে বহু কলকারখানায় ছাঁটাই, লে-অফ ইত্যাদি সংকট মানুষের মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসে হাত দেওয়াই প্রায় দুষ্কর। তাই যাঁরা দোকানপাট সাজিয়ে বসেছেন পুজোর রোজগারের আশায় তাঁরাও নিরাশ বোধ করছেন বাজারের অবস্থা দেখে।

উৎসব তখনই সুন্দর হয় যখন সকল শ্রেণীর মানুষ তাদের সাধ্য অনুযায়ী যোগ দিতে পারে তাতে। দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্যই হল তার সর্বজনীনতা। পুজোর প্যান্ডেল বাঁধা থেকে শুরু করে প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত উৎসবের প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদক্ষেপে তার আনন্দকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলে সমাজের নানা স্তরের মানুষের সাহায্য ও সানন্দ সহযোগিতা। অর্থনীতির কত স্তর জড়িত থাকে একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে। দোকানী, প্রতিমার শিল্পী থেকে শুরু করে রাজপথের হকার সেই বিক্রেতা মানুষটি পর্যন্ত সকলেই এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবিকার ও আনন্দের সংস্থান করে থাকেন। এভাবেই চলে আসছে আমাদের উৎসব ও তার আনন্দ উজ্জ্বলতার আয়োজনের সার্থকতা।

আজকের উৎসব আমাদের সেই আনন্দের ঐতিহ্য নিয়ে উপস্থিত। আমাদের যত বেদনা, যত সমস্যাই থাক উৎসবের লগ্নে তাকে আমরা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হয়ে আনন্দকেই সত্য বলে বরণ করব। রাজপথে আজ সেই আনন্দপিপাসু নরনারী ও শিশুদের দিকে তাকিয়ে আমরা প্রার্থনা করব, এই আনন্দ চিরস্থায়ী হ'ক। আমাদের দুঃখ দৈন্যের হ'ক অবসান। মানুষ কল্যাণবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হ'ক প্রীতির বন্ধনে। মায়ের আগমনীর সুরে যে-আনন্দ, যে-সান্ত্বনা এবং শান্তি তা বিরাজ করুক সকল মানুষের মনে। আজকের দিনে এই হ'ক সকলের মিলিত প্রার্থনা।

বাঙালীর পরমোৎসব

ভবানী মুখোপাধ্যায়

দুর্গোৎসব সারা ভারতের পূজা। বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিভিন্ন রূপ, কিন্তু ভিত্তিগত কাঠামো সর্বত্র এক। সেই নবরাত্রি উৎসব এবং নব-পত্রিকার প্রতীকি পূজা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে একই ধরনের।

পণ্ডিতরা বলেন, আগে বাংলাদেশেও ঘটস্থাপনা করে ঘরে ঘরে নবরাত্রি উৎসব চলত। কিন্তু কালক্রমে প্রতিমা গড়া শুরু হয়েছে এবং প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক সমারোহ বেড়ে চলেছে। আগে ছিল এক চালচিত্রের মধ্যে দুর্গাদেবী এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি—এখন সবাই ভিন্ন ভিন্ন আটচালায় দাঁড়িয়ে পূজা গ্রহণ করেন। একালে ভক্তির বাড়াবাড়ি নেই, আছে জাঁকজমক, মাইক এবং কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গীসহ বিসর্জন নৃত্য।

অনুমান করা হয় যে বৌদ্ধ প্রভাবে বাঙালী সমাজে প্রতিমা গড়ে পূজার প্রথা প্রচলিত হয় এবং কৃষ্ণনগরের কুশলী শিল্পীদের অনন্যসাধারণ শক্তি প্রভাবে প্রতিমাপূজা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যেমন অতি সম্প্রতিকালে ঘটেছে বিশ্বকর্মা পূজায়। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে অর্থাৎ, ১৯৩৯-৪৬ পর্যন্ত বিশ্বকর্মার প্রতিমা গড়ে পূজা করতে দেখা যায়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন হিন্দুর পূজা উৎসবের উৎপত্তি বিষয়ে এই প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

"আমাদের সকল উৎসবের মধ্যে দুর্গোৎসবই শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই দুর্গোৎসবের ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে। ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্রে বর্ষের দ্বাদশ মাসকে দ্বাদশ সংক্রামণ অনুসারে আখ্যাত করা হয়। অর্থাৎ সূর্য যে মাসে যে রাশিতে সংক্রামিত হন, সেই রাশি অনুসারে সেই মাসের নামকরণ করা হয়। যেমন বৈশাখ মাসে মেষ রাশি, মেষ রাশিস্থ ভাস্কর বলিলেই বৈশাখ বুঝায়। তেমনই জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশি। তেমনই আবার আশ্বিন মাসে যখন দুর্গোৎসব হয় তখন ভাদ্রের সিংহ রাশির পর আশ্বিনে কন্যা রাশি। দুর্গা সিংহবাহিনী, কন্যা সিংহের পৃষ্ঠেই আসেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র এর পর পৌরাণিক তথ্য অনুসারে দুর্গাদেবীর কি স্বরূপ তা ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর ধারণা দুর্গাপূজার মূল উৎসবে ছিল কন্যা পূজার প্রচলন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

"দুর্গা কন্যা নহেন। পুরাণে তাঁহাকে বিবাহিতা দেবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি শিবানী ও গণেশ জননী। কিন্তু কথা এই যে বর্তমান দুর্গোৎসবের দুর্গাপ্রতিমা কন্যার প্রতিমা না হইলেও, মূল উৎসবে যে কন্যার বা কুমারীর পূজা হইত, যুক্তির হিসাবে এটুকু বলা যাই[illegible] পারে। এমন কি গোড়ায় বোধহয় কন[illegible] রাশিরই পূজা হইত। এ অনুমান অসংগ[illegible] হইবে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—কন্যা কুমার[illegible] এবং ষোড়শী ইত্যাদি একই অর্থ এ[illegible] ভাবসূচক। তাই তিনি দৃঢ় গলায় বলেছেন—

"বিশেষতঃ যে দুর্গার পূজা হই[illegible] থাকে, সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে ষোড়[illegible] বলে। কন্যা, কুমারী, ষোড়শী এক ভা[illegible] পরিচায়ক নহে কি? অথবা যেমন পুরা[illegible] অপ্রচলিত মদন দেবতার স্থানে শ্রীকৃ[illegible] আসিয়া মদনোৎসবকে দোলযাত্রায় পরিণ[illegible] করিয়াছেন, তেমনই ইহা সম্ভবপর যে[illegible]

[...] রাশির পূজার পরিবর্তে লোকপূজ্যা [...]রই উৎসব এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেছেন যে [...]পূজা নানাপ্রকার পূজার একটা [...]লন বা সিনথেসিস। তাই শারদীয়া [...] প্রকৃত মহাপূজা। অক্ষয়চন্দ্র বলেন—

[...]ভাবে মহাকাল এই বিশাল শ্রেণী-[...] স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন। [...]বে কালমাহাত্ম্যে হিন্দুধর্মে কাল-[...] স্তরের পর স্তর উঠিয়াছে—সেই [...] বাঙালীর দুর্গোৎসবে নানাপ্রকার [...]না এবং নানারূপ উপকরণ উদ্ধৃত [...]ছে। অতীত-ভক্ত বঙ্গবাসী অতীত [...]র পরামর্শ মত সেই সকল সংগ্রহ [...]য়াছেন। যে বিবর্তন-বিকাশ জড় জীব-[...]ত্র মূল নিয়ম, সেই নিয়ম বলেই বৈদিককালের শক্তিরূপা অতসীবর্ণময়ী [...]লা অনিলশিখা আজি এই [...]পতনের দুর্দিনে সর্বদেবপরিবেষ্টিতা [...]ক্তিতে চন্ডীমন্ডপ মণ্ডিত [...]য়েছেন।"

সুতরাং এই কথা অনুমান করা অন্যায় না যে একটি শাস্ত্রীয় প্রথার ক্ষীণ [...]লের উপর শিল্পী এবং সংস্কারক বা [...] ভক্তমন্ডলী দীর্ঘকাল ধরে একটির একটি বস্তু যোগ করে এই সর্বজনীন [...]স ও ভক্তির একটি 'ইমেজ' গড়ে [...]ছে। প্রতীক পূজাই সাধারণের পক্ষে [...] তাই প্রতিমার একটি আকার দেওয়া হয়েছে, প্রাকৃতজনকে ভোলানোর জন্য তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানা কাহিনী এবং লৌকিক সংস্কার।

উপনিষদে বা আরণ্যকে কোথাও দুর্গার কোনো উল্লেখ নেই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন—

"আমাদের পূজিতা দুর্গা কি রাত্রি না মহাদেবের ভগিনী, না ব্রহ্মবিদ্যা, না অগ্নিজিহ্বা?"

এই প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়। কেনোপনিষদের উমা-হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা মাত্র। আর মহাভারতের ভীষ্মপর্বে অর্জুনকৃত একটা দুর্গাস্তোত্র আছে—সেই দুর্গার নাম ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ কেনোপনিষদের দুর্গা। ঋগ্বেদ সংহিতায় দশম মন্ডলে 'রাত্রি পরিশিষ্টে' যে দুর্গা-স্তব আছে সেটি একটি রাত্রিস্তোত্র আর যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতায় যে অম্বিকার কথা আছে তিনি শিবের ভগিনী "রুদ্রভাগঃ স্বস্রা অম্বিকয়া", সুতরাং দুর্গার পরিচয় অন্ধকারেই থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যুক্তিবাদী বাঙালী চিন্তানায়ক। তিনি তত্ত্বের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছেন প্রচলিত বিশ্বাসে। তিনি বলেছেন—

"এ প্রতিমা কখন মিথ্যা বিষয়ের প্রতিমা নহে, তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া এত কোটি লোকে, এত উল্লাসের সহিত কখন ইহা পূজা করিত না। যাহা মনুষ্য-হৃদয়ে বদ্ধমূল, তাহা কখন মিথ্যা নহে।"

বঙ্কিমচন্দ্র তারপর দুর্গাপ্রতিমার একটা চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। জগৎশক্তি, বিঘ্ননাশক গণপতি, যুদ্ধ কার্তিকেয়, জ্ঞান সরস্বতী, ভাগ্য-লক্ষ্মী, এই সবকটিকে এক চালচিত্রে বাঙালী প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই পরস্পর যোগ না থাকলেও এই মূর্তিগুলি বাঙালী রূপকার এবং শাস্ত্র-কারের কল্পনায় একটি বিশিষ্ট দেবীর আকৃতি লাভ করেছে। মহাদেবী শ্রীশ্রীদুর্গা তাই বাঙালীর ঘরে বিচিত্র মূর্তিতে বিরাজিত। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'ভ্রমরে' ১২৮১ সালে এক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

"শক্তি যেমন সর্বলোকপূজ্যা, আর দুইটি বাঙ্গালীর কাছে তেমনি পূজ্য। বাঙ্গালী দর্শনশাস্ত্রে শুনিয়াছে যে জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স—শক্তিতে নহে। ঐশী শক্তির গুণে, জ্ঞান ব্যতীত, আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি না।

আরও বাঙ্গালী দেখে যে, শক্তিই হউক, আর জ্ঞানই হউক, ইহকালের সুখ দুইয়ের এক হইতে হয় না। শক্তিশালীও দুঃখ পায়, জ্ঞানবানও দুঃখ পায়। অতএব ইহলোকের সুখ দুইয়ের একেরও দেয় নহে। সেটি ভাগ্যাধীন। অতএব ভাগ্য একটি পৃথক দেবতা। ভাগ্যলক্ষ্মী জ্ঞান-সরস্বতী। বাঙ্গালী তিনটিকে একত্র পূজা করে। এই বাঙ্গালীর মহোৎসব।"

কাছে ও দূরের গান্ধী স্বপ্নের সৌধ

•

রম্যাঁ রলাঁ

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অক্টোবর উদ্‌যাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থেকে
অনুবাদ ঃ **লোকনাথ ভট্টাচার্য**

অনুবাদকের ভূমিকা ঃ

শিরোনামায় স্বপ্নের সৌধ না বলে হয়তো বলা উচিত ছিল স্বপ্নের জন্ম-যৌবন-জরা, কারণ রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরী থেকে যে-গান্ধী অংশগুলি এই প্রথম যে-কোন অ-ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে এখানে প্রকাশিত হচ্ছে, তার মধ্যে গান্ধীকে নিয়ে রলাঁর এক স্বপ্নের বিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত। এমন কি সে-ইতিহাসের শেষের দিকে তাঁর এককালীন আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বহ্নি হয়তো প্রায় নিবু-নিবু। তবে সেই জরা ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুললে খানিকটা অশ্রদ্ধার ভাব এসে যেতে পারার আশঙ্কা আছে। এবং সেটাও কিছু কম অন্যায় হবে না। কারণ এ-সত্য তো অবিসংবাদিত যে মানুষ হিসেবে গান্ধীর প্রতি রলাঁর শ্রদ্ধায় ভাঁটা কখনো পড়েনি। এবং আরো বড় যা, সে-সত্যের অকাট্য পরিচয় এ-ডায়েরীর সর্বত্র।

এই অংশগুলি গান্ধী সম্বন্ধে রলাঁর অন্যান্য রচনাসম্বলিত একটি পরিকল্পিত গ্রন্থের অঙ্গ, যা মাদাম রলাঁর সদয় অনুমতিক্রমে আসন্ন গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে সাহিত্য আকাদমি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শীঘ্রই প্রকাশ করবেন। সে-গ্রন্থের যে-ভারতীয় অনুবাদ সর্বপ্রথম বেরোবে, তা বাঙলায়, ও যার একটি মুখ্য অংশ এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। মূলে রলাঁর যে-ভাষা ও স্টাইল, তা ডায়েরীসুলভই; ঠিক সেটিকেই যথাসাধ্য ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে—অর্থাৎ, কোথাও তাকে জোর করে 'সাহিত্যিক' করে তোলা হয়নি। আগেই বলা হয়েছে, এ-ডায়েরীটি আজ পর্যন্ত অনূদিত হয়নি, ইংরেজীতেও নয়।)

১৯৩১

মে, ১৯৩১—গান্ধী, লেনিন, অহিংসা ও বিপ্লব সংক্রান্ত দ্বৈত প্রশ্নের গল্পচ্ছলে আলোচনা হল এদমঁ প্রিভো-র সঙ্গে; তার পরের ব্যাপার। নিচের চিঠিটি লিখি ৫ই মে'তে, ইউরোপের অপ্রতিরোধকদের উদ্দেশে—বাসনা, আমার বর্তমানের কর্ম-সূচী পরিষ্কারভাবে খাড়া করি, ক[illegible] সমস্যার রূপটাও বোঝার চেষ্টা করি[illegible]

"কয়েক বছর আগে গান্ধী[illegible] সুইজারল্যাণ্ডে এসে পড়ো[illegible] আপনারা তা জানেন। বলতে[illegible] আমারই উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন[illegible] সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, কারণ তাঁর[illegible] ছিল আমার সঙ্গে দেখা করার। দেখার বাসনা আমার পক্ষেও স্ব[illegible] ছিল, তাও আপনারা সহজেই ব[illegible] তবু আমি তাঁকে আসতে বরং মানা দিই। কারণ আমি চেয়েছিলাম, শুধু[illegible] সঙ্গে গল্প করার বদলে তিনি ইউরোপের অপ্রতিরোধী যুবশক্তির সম্পর্ক স্থাপনের দৃঢ় অভিপ্রায়[illegible] তাদের কথা তিনি শুনুন, তাদের[illegible] দিন পথের। আমি নিজেকে সত্যিই তাঁর যোগ্য মনে করতে পারিনি, জানতাম যে আমার সম্বন্ধে তিনি বহ[illegible] পোষণ করছেন, নিশ্চয়ই আমাদের [illegible] বন্ধু মীরাবেন-এর মুখে আমার [illegible]

ন্ত কিছু শুনে থাকবেন। যে-
ন্য জীবন তাঁর উৎসর্গীকৃত তাঁর
সী ও সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রতি,
শুধু আমার নিজের জন্য সে-জীবনের
কটি দিনও কেমন করে কেড়ে
তেমন অধিকার আমার আছে, সে-
নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি।
। অন্যদিকে, ইউরোপীয় যুবশক্তির
। তাঁর চিন্তাকে তুলে ধরার এতটুকু
ও গান্ধীর ছিল না। তাঁর স্বভাবটাই
নীর, এগোন এক-পা এক-পা করে,
রাসী প্রবাদটি না জেনেও যেন তার
ত আস্থা রাখেন—'বেশি আদরে প্রেম
তাই ভারতের সমস্যার সমাধান না
। পর্যন্ত ইউরোপের সমস্যার মধ্যে
গলাতে তিনি কখনোই রাজী হন নি।

সেই তখনই—যেমন আজো আরও
বেশি করে— ইউরোপের সঙ্গে তাঁর
মুখি আলাপের চরম প্রয়োজনীয়তা
কম অনুভব করিনি। আজ অবশ্য
র সঙ্গে আলোচনায় বসতে নিজেকে
থেকে একটু বেশি সমর্থ মনে
তাঁর সঙ্গে দেখা হলে নিজেকে
নি অযোগ্য নাও মনে করতে পারি।
গান্ধীর বিশ্বাস ও কর্মের নীতি
, ভারতে তার কার্যকারিতা সে জয়ের
প্রতিষ্ঠিত করেছে। (১৫-ই এপ্রিলের
াপ' পত্রিকায় আমার যে-শেষ
টি বেরিয়েছে, তাতে এ-কথাটির উপর
। জোর দিয়েছি।) —কিন্তু সে-
ই একমাত্র সত্য নয় বা পরম কিছু
নয় (নিজেই তিনি তা বলতে চান
আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই,
র অভিজ্ঞতার সত্যতাকে তিনি
ল 'আপেক্ষিক' বলে অভিহিত করেন
ন কি তাঁর হৃদয়ের অতি কাছাকাছি
ভিজ্ঞতাগুলি, সেগুলিরও সত্যতা
ধ তাঁর একই মত)। ভারতও 'পরম'
বস্তু নয়। আমরা যারা সত্যের
রিক ও নিরাসক্ত অনুসন্ধিৎসু, সেই
দের পক্ষে আজকের যা সবচেয়ে বড়
তা হচ্ছে এই যে কেমন করে ভারতীয়
জাটিকে ইউরোপে (এবং জগতে অন্যত্র)
লাগানো যায়।

সেই বিশ্বাসের সার বস্তুটি আমার
স্পর্শেন্দ্রিয়াতীত। সেটি হল এমন
প্রেম যা সক্রিয় ও ভাবাবেগের উর্ধ্বে,
মূর্তে কিছু নয়। 'সেই প্রেম অন্য
র কল্যাণ চায়, জাতির সেবায়
কে নিয়োগ করে।' অহিংসাতে সেই
র একটি মহান প্রকাশ, এবং মেনে না
ার যে-রীতি গান্ধীর, সুনিয়ন্ত্রিত ও
য় প্রতিরোধের যে-নীতি তাঁর,
কের মানুষের মধ্যে তাঁর প্রেমধর্ম
করার সেইটেই সুন্দরতম কৌশল।

"অবশ্য এটাও জানতে হবে, তা কি
রাপের বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে সব
র সুচারু উত্তর দিতে পারবে? অথবা,
া বিশদভাবে বলতে গেলে, যে-কোনো
। যার প্রকৃতি ভারতের মত ধর্মভাবে
উদ্বুদ্ধ নয় বা যেখানকার সমাজজীবন
সহস্র সহস্র বছরের স্থায়িত্ব পায় নি,
গান্ধীর রীতিকে কার্যকরী করা সে-রকম
কোনো দেশেরও কি স্বভাবানুগ হবে?
মনে জেগেছে বলেই প্রশ্নটা পেড়ে রাখলুম,
যার মনগড়া কোনো উত্তর এখনি দিতে
চাই না।

"খুব ভালো হয়, এবং আমি তো তা
চাইছিই, যদি আন্তর্জাতিক অপ্রতিরোধ
(এই হতচ্ছাড়া কথাটাকে আমাদের মস্তিষ্ক
থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচতাম, কিন্তু
মুস্কিল হয়েছে এই যে কথাটা সেখানে
থেকে গেছে এবং তার অস্তিত্ব আমাদের
চিন্তায় এমন কি সেই মুহূর্তেও যখন
আমাদের সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহীর ভাবে ঠিক
তার উল্টো কথাটাই চীৎকার করে জানাতে
চায়: 'প্রাণ থাকতে এ মানা চলবে না,
প্রতিরোধ করতেই হবে।') সম্মেলনের
আগামী অধিবেশনে কোনোরকমে গান্ধীকে
টানতে পারা যায়—এবং সে-মুহূর্তে গান্ধী
যেহেতু নিশ্চয় ইউরোপে থাকবেন, তাঁকে
এই অধিবেশনের মধ্যে পেলে প্রশ্নটার
আগাপাশতলা বিস্তারিতভাবে আলোচনা
করা যায়। কিন্তু একদিকে ভারতীয়
রাজনীতির প্রশ্নেই তাঁর সমস্ত
চিন্তা নিয়োজিত, অন্যদিকে যাত্রাজনিত
ক্লান্তি তাঁর—তা ছাড়া ইউরোপীয় সমস্যা
নিয়ে মাথা ঘামাতে তাঁর স্বাভাবিক
বিরোধিতা তো আছেই—তাই ভয় হয়,
আমার এই ইচ্ছাপূরণে তিনি বাদ
সাধবেন।

"এবং তবুও, তবুও......! সেই
গান্ধীরও উচিত আজ তাঁর দিগন্তটাকে
একটু বিস্তৃত করার। জনসংগ্রাম ও শ্রেণী-
বৈষম্য নিয়ে সম্প্রতি যা তিনি লিখেছেন,
তা প্রমাণ করে আজকের জগতের রক্তাক্ত
যাত্রার নতুন পর্যায় সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা।
বংশানুক্রমিক জাতিভেদজনিত যে-অসাম্য—
এবং যে-অসাম্য সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের
মধ্যে এক ধরনের ভ্রাতৃত্ববোধের অবকাশ
থাকা অসম্ভব নয়—একমাত্র তার প্রতি
তাঁর সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ, এবং ধনতন্ত্র
বলতে তিনি যা বোঝেন, তা তাঁর কাছে
রূপ নেয় শুধু আমেদাবাদের কয়েকজন
কাপড়ের কলের মালিকদের মাধ্যমে। এ-
মালিকরা হাজার হলেও ধর্মভীরু ও সজ্জন
তাঁদের শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁরা সম্পর্ক
রাখেন, এবং গান্ধীর কথাবার্তা তাঁদের
হৃদয়কে স্পর্শও করতে পারে। আজো
গান্ধী জানেন না সেই নতুন শক্তির কথা,
সেই হৃদয়হীন নামহীন পয়সার রূপ,
আত্মপরিচয়-লুকানো সেই কত না ব্যবসায়
প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক কত কোম্পানী—
সেই অন্ধ ভয়ংকর কত না দানব, যা সেই
'যান্ত্রিকতা' হতেও বহুগুণে ভয়াবহ, যে-
যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে মাততে গিয়ে গান্ধী
ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই কত ব্যর্থ তীর
নিক্ষেপ করেছেন। কারণ একমাত্র পয়সাই
সেই অদৃশ্য বস্তু, তারই আদেশে আজ দেশ-
বিদেশ উঠছে-বসছে, নিত্য নূতন মত

ভাঙছে-গড়ছে। কোনো অত্যাচারীকে (তা সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন) ঠাণ্ডা করা, বা কোনো দেশের কয়েকশো ছোট ছোট রাজরাজড়ার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো, অথবা রক্তমাংসের একটা গোটা জাতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করা, তা এক জিনিস, আর উল্টোদিকে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব-সম্পর্কবিবর্জিত এত যে নামহীন পরিচয়হীন প্রচণ্ড শক্তির দল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো একেবারে অন্য জিনিস। এই দুই বিভিন্ন জাতের শত্রুর বিরুদ্ধে একই রকমের রণকৌশল কি তাই অবলম্বনীয়?......"

সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ — 'রাজপুতানা' জাহাজ থেকে গান্ধী আমায় তার পাঠাচ্ছেন: বোম্বাই ছেড়েছেন ২৯শে আগস্ট, মার্সেই-এ পোঁছোচ্ছেন ১১ই সেপ্টেম্বর. চান, যাতে মার্সেই ও ক্যালের রেলপথের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি। ভারতের বড়লাটের সঙ্গে তর্কাতর্কি ও আলোচনার ফলে তাঁর পনের দিন দেরী হয়ে গেছে. এখন যেটুকু সময় হাতে, তাতে গোল টেবিল বৈঠকের সূত্রপাতের জন্য সরাসরি লণ্ডনে তাঁর না পোঁছোলেই নয়। ভিলনভে আমার বাসস্থানে তিনি থাকতে পারছেন না।

আমরা তাঁকে তার পাঠালাম জানিয়ে যে দিজ'তে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি, যাতে দিজ' থেকে পারী পর্যন্ত ট্রেনে এক সঙ্গে যেতে পারি। কিন্তু ইতিমধ্যে আবার এক দীর্ঘ ও স্নেহপূর্ণ তার এসে হাজির তাঁর কাছ থেকে. বলছেন যে ট্রেন যেহেতু দিজ'তে পোঁছোবে মধ্যরাতের পরে, আমার স্বাস্থ্যে কুলোলে তাঁর সঙ্গে যেন তাই মার্সেই-এই দেখা করতে আসি. সেখানে জাহাজ এসে পোঁছোনো ও বোম্বাই এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ার মধ্যে হাতে সাতঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে কথাবার্তার জন্য। আমাকে না দেখে তিনি ইউরোপ ত্যাগ করবেন না, শেষে এ-কথাও যোগ করছেন।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩১—মার্সেই-এ যেহেতু আমার যাওয়া হল না, আমার বোনের হাত দিয়ে গান্ধীকে এই চিঠিটি (১০ই সেপ্টেম্বর) পাঠালাম:

"সুহৃদ্বরেষু, ইউরোপের মাটীতে যখন আপনি পা দিচ্ছেন, তখন আমার বোনের সঙ্গে সাক্ষাতে আপনাকে নমস্কার করতে আসতে পারলাম না, এটা আমার পক্ষে দুঃখের কথা। আমার স্বাস্থ্যে সেটা সম্ভব হল না। লুগানো থেকে আমি ভিলনভে এসেছিলাম, ইচ্ছা ছিল পরে মার্সেই যাব। কিন্তু রোদের দেশ থেকে বৃষ্টির দেশে আসার পথে ঠাণ্ডা লেগে গেছে, এখন কয়েকদিন ভিলা অলগা-য় বন্দী হয়ে থাকা ছাড়া আমার উপায় নেই। শুধু আশা রাখছি, পরে ভারতে ফেরার পথে সময় করে আপনি এখানে একবার ঘুরে যেতে পারবেন, যাতে আমরা এই জীবনে পরস্পরকে দেখতে পাই।

"আমার সকল চিন্তা চলল আপনার সঙ্গে লণ্ডনে, আপনার এই কঠোর ও সুন্দর অভীষ্টের পথে। যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চালাচ্ছেন, তাঁদের রাজনীতিক প্রজ্ঞায় আস্থা রাখতে চাই—আশা করি, ভারত ও আপনার সঙ্গে আপোষ স্থাপনের এই স্বর্ণ সুযোগটি তাঁরা হারাবেন না, যে-সুযোগ পরে আর আসবে না। কিন্তু যেটাকে আমার সমানই বড় বলে মনে হয়, তা হচ্ছে এই যে পৃথিবীর সব থেকে নির্যাতিত যে-জনগণ, ভারতের সেই জনগণের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যেন সর্বদা বজায় থাকে, যাতে তারা আপনাকে তাদের আশা-অভীপ্সার দৃঢ় ও সত্যকারের মুখপাত্র বলে চিরকাল চেনে—তাদের হয়েই কথা বলেন আপনি, তাদের সকল প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় উশুল করে নিতে আপনি বদ্ধপরিকর। আজ এই বিপন্ন মুহূর্তে যখন বিক্ষোভের চাপে মনুষ্যত্বের কয়েকটি বাঁধ পর্যন্ত টলমল করে চারদিকে, তখন তাদের সেই যে [illegible] আপনার প্রতি, আপনার সঙ্গে আত্মার যে বন্ধন, তাতেই একমাত্র মানুষের মুক্তির। তবু সেই [illegible] জনগণ ও আপনার মধ্যে যাতে একটা বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং তারা যায় স্রোতের তোড়ে, তার সকল চলতে থাকবে। ইউরোপের আমরা স্বাধীনচেতা ও নিরাসক্ত আজ, যারা [illegible] জাগরণের এই মুহূর্তটি নিস্পন্দচিত্তে করছি, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার [illegible] সংস্করণেই তাদের একমাত্র আশা। সংস্করণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী [illegible] নিপাতিত হয়ে তার বদলে আসবে এমন স্বাধীন সমাজতন্ত্র যা শ্রমকে তার সম্মান দেবে—সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের একমাত্র কাজ, তা জাতির দেহ ও আ[illegible] দাবিয়ে পঙ্গু করা। এবং এই [illegible] বিপ্লব যেন সাধিত হয় অহিংসা ও [illegible] দ্বারা, আমাদের পক্ষে আজকের সবচেয়ে প্রশ্ন সেটাই। এ বিপ্লব যেন হিংসার শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে. করলে পৃথিবী ধ্বংস হবে। আমাদের [illegible] সেই আগামী যুদ্ধের সৈন্যাধ্যক্ষ আপ[illegible] আপনার যোগ্যতা আপনি ইতিমধ্যেই প্র[illegible] করেছেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে প্রাণও হারাতে হয় আপনাকে, আপ[illegible] দৃষ্টান্ত আমাদের চালিত করবে পরে। আমাদের মৈত্রীর বন্ধন যেন কিছুতে [illegible] না হয়, উল্টে আসুন, তাকে আমরা [illegible] শক্ত করি। লণ্ডনে যখন আপনি [illegible] সাম্রাজ্যের কর্তাদের সঙ্গে আলোচ[illegible] বসবেন, শুধু ভারতেরই নয়, [illegible] ইউরোপের জনগণের সেই প্রচণ্ড শক্তি যেন আপনি সর্বক্ষণ অনুভব করেন। [illegible] রাখবেন, সেই শক্তির উচ্চতম স্বর আপনি তার জাগ্রত বিবেকও আপনি। যা [illegible] শ্রেষ্ঠ ইউরোপের, তা আপনার [illegible] আপনাকে আমার সস্নেহ আলিঙ্গন, স[illegible] নমস্কার।"

গান্ধী ও তাঁর সঙ্গীদের নি[illegible] 'রাজপুতানা' জাহাজ মার্সেই বন্দরে যেখানটায় ভিড়েছে, সেখানে শুক্র[illegible] ১১ই সেপ্টেম্বর ভোর ছ'টায় আমার [illegible] ও প্রিভা-দম্পতী মিলিত হলেন। সাংবাদ[illegible] ও ফোটোগ্রাফারের প্রচণ্ড ভিড় সত্ত্বে এণ্ড্রুজ ও মিস স্লেডের করুণায় আমা[illegible] বোন অচিরেই গান্ধীর সকাশে উপনী[illegible] হয়ে নিজের পরিচয় দিতে পারলেন- গান্ধী তাঁকে অতীব স্নেহের সঙ্গে আপ্যায়ন জানালেন। এবং তারপর গান্ধী[illegible] সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছোট্ট কেবিনে. তাঁর [illegible] বিছানার উপর বসে, তাঁর সঙ্গে [illegible] পুরোপুরি চারটি ঘণ্টা কাটানোর সৌভাগ[illegible] হল—সেই সকাল সাতটা হতে বেলা এগারোটা পর্যন্ত. অবশ্য [illegible] সাংবাদিক ও সরকারী প্রতিনিধির দল

ক্রমাগতই আসছেন এবং যাঁদের সঙ্গে গান্ধীকেও কথাবার্তা বলতে হচ্ছে। এই অতুলনীয় মুহূর্তগুলির কথা ভেবে গান্ধী সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমার বোন ও প্রিভা-দম্পতী একেবারে পঞ্চমুখ (যদিও স্বভাবত আমার বোনের দৃষ্টিটা একটু তীক্ষ্ণ, মনটাও খুঁতখুঁতে)। মনে হয়, আশ্চর্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গান্ধীর, যেন কিছুতেই বিচলিত তিনি নন, শান্ত, কান খাড়া করে অন্যকে শুনতে ব্যগ্র, জোরে বা আস্তে ফোকলা-দাঁতে হেসেই চলেছেন। নিজেই নিজের প্রভু তিনি, সর্বদাই সরল, সত্যময়, স্বতস্ফূর্ত অথচ বিবেচক—চোখ দুটো জীবন্ত ও তীক্ষ্ণ, একেবারে প্রথম চাউনিতেই তা যেন মানুষের মনের আনাচ-কানাচ পর্যন্ত দেখে নেয়। মীরাবেনেরও (মিস স্লেড) এক আশ্চর্য গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যার প্রতি আপনা হতেই সম্ভ্রম জাগে। যে-বন্ধুটি অনুপস্থিত ও পড়ে রইল ভিলনভে, তার উদ্দেশে উভয়েই স্নেহসূচক কথাবার্তা বল্লেন—এবং মার্সেই-এ ছাত্রদের সামনে এক বক্তৃতায় গান্ধী তার কথা আবার পাড়েন (অবশ্য প্যারীর সংবাদপত্রগুলি আমার সম্বন্ধে সেই প্রশংসাসূচক উক্তিটি সযত্নে তাদের বৃত্তান্ত হতে বাদ দিয়েছে, আমার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেনি)। বোম্বাই এক্সপ্রেসে ক্যালের পথে রওনা হওয়ার আগে বিকেল তিনটেয় গান্ধী আবার এক টেলিগ্রাম পাঠান আমাকে, তাতে প্রতিশ্রুতি দেন যে আমার সঙ্গে দেখা করতে তিনি আসবেনই।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩১—গান্ধীকে দেখার পর তাঁর সম্বন্ধে আমার বোন ও প্রিভা-দম্পতীর ধারণা। লোকটি দীর্ঘকায় নন, মাথাটি বেশ, টাক-মাথা নয়, তবে পরিষ্কার করে কামানো, সুশ্রী না হয়েও ভারী মিষ্ট (এমন কি শেষে তাঁকে না ভালো লেগে পারে না), কপালটা মাথার দিকে উধাও হয়ে গেছে, নাকটা মোটা এবং তার নিম্নাংশটি উপরের দিকে ঠেলে উঠেছে, খুব ফোকলা (মুখ সাধারণত খোলেন না, কিন্তু হাসতে গেলেই তা খুলতে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের বদলে সামনের ফাঁক বেরিয়ে পড়ে, প্রিভাদের তো ধারণা তাঁর হাসিটিতে শেষে মুগ্ধ হতেই হয়)—গায়ের রঙ ততটা কালো নয়, প্রায় ইউরোপীয়দের মতই—মোটা চশমার পিছন থেকে অতি জীবন্ত চোখ দুটো উঁকি মারছে, সে-চোখ মুখের দিকে সরাসরি চায়, একেবারে ভিতরটা পর্যন্ত দেখে নেয়—বেশ একটা দুষ্টুমির ভাব আছে, এবং রসিকতাও, যার পরেই হঠাৎ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান, একমনে চিন্তা করতে বসেন। গলার স্বরটি ভারী মিষ্ট, গম্ভীর (তাতে রবীন্দ্রনাথের উঁচু পর্দায় বাঁধা স্বরের স্বরবিন্যাস নেই, কিন্তু গান্ধী ইচ্ছা করেই তাঁর স্বরটিকে মাঝামাঝি পর্দায় রেখে দেন, সব সময়ই শান্ত, সমান, ওঠানামাহীন)। শুদ্ধ নির্ভুল ইংরেজী বলেন, এক কথা দুবার বলবেন না, কথায় জোড়াতালি নেই, প্রত্যেকটি বাক্য বলার আগে ভেবে রেখেছেন, যেমন ভাবেন, ঠিক তেমন বলেন। শরীরটা মজবুত, বুক বেশ চওড়া, দীর্ঘবাহু, হাত দুটি পাতলা, ঠাণ্ডা। কিন্তু বাহুর নিম্নার্ধ ও বিশেষত পা দুটো ভয়ংকর সরু (হয়তো ভারতীয় অভ্যাসবশত হাঁটু মুড়ে বসার জন্য); বলেন যে গত দু বছর ধরে সভাসমিতিতে বসে ছাড়া তিনি কথা বলতে পারেন না। অতীব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন (যেমন তাঁর আশপাশের লোকেরাও)—তুচ্ছতম খুঁটিনাটিও তাঁর নজর এড়ায় না।

প্রিভা বলছেন, "ভয় ছিল, হয়তো গিয়ে দেখব এক সাধুসন্ত, ধর্মযাজক, কিংবা সেই রকম উদ্ভাসিত কেউ বা। কিন্তু দেখে এলাম সক্রেটিসকে। সত্যি, তাঁর সম্বন্ধে সক্রেটিসের কথাই আমার সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়েছে—বিশেষত পাশ থেকে তাঁর মুখটা যখন দেখি।"

যা বলেন, যদিও তার গুরুত্ব দিতে চান না, কথাগুলো কিন্তু তাঁর ভয়ংকর গুরুত্বপূর্ণ, তা পৃথিবীর রূপ পাল্টে দিতে পারে। স্লোচাম নামে এক ইংরেজ সাংবাদিক গান্ধীর আনুগত্যের ভাবের মিথ্যা নিন্দা করে বলেন, গান্ধী নাকি প্রিন্স অব ওয়েলসের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেছেন। ধমকে গান্ধী উত্তর দেন, "যাঁর কথা বলছেন, সেই যুবকটির বিরুদ্ধে আমি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করি না, উল্টে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শুভই কামনা করি। যদি পিঁপড়ে দেখি সামনে কখনো, তাকে পায়ে দলতে চাই না, বরং সহৃদয় করুণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই, কিন্তু তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতে যাব না।" (এবং কথাটা বললেন যেমন মিষ্ট, তেমনি স্বাভাবিক কণ্ঠে।) শুনে আমার বোনের তো মনে হল, বুঝি বা স্বপ্ন দেখছেন। এবং স্লোচাম তা নতমস্তকে হজম করেন।

আরো একটি মজার ঘটনা, যাতে গান্ধীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট। লণ্ডন থেকে প্লেনে করে এক ইংরেজ রাষ্ট্রদূত এসেছেন, তাঁর হাত দিয়ে কোনো মন্ত্রী গান্ধীকে সম্বর্ধনা জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন—লণ্ডনে পৌঁছে সম্মেলনের প্রস্তুতির ব্যাপারে গান্ধী কী করতে চান না চান, সে-বিষয়েও তাঁর মতামত চিঠিতে চাওয়া হয়েছে। পত্রবাহক সেই রাষ্ট্রদূতকে অন্য সকলের মতই গান্ধী বসিয়ে রাখলেন—সে-ভদ্রলোকের দান যখন এল, তিনি এলেন (সকলে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে পারছেন মাত্র পাঁচ মিনিট ধরে—এবং সে-পাঁচ মিনিট যাতে উতরে না যায়, তা গান্ধী লক্ষ্য করছেন মাঝে মাঝে কোমর থেকে তাঁর বড় ঘড়িটা বার করে)। এবং রাষ্ট্রদূতটি যখন ঢুকলেন, গান্ধী তাঁকে প্রায় আপ্যায়ন পর্যন্ত করলেন না। লোকটি বেঁটে ও বাচাল, সেই পরিস্থিতিতে হাস্যকর ও বিড়ম্বিত, আদব-কায়দায় বেশ চালু, গান্ধীর আশেপাশের সকলকে কানুনমত নমস্কার ঠুকেই চলেছেন। এদিকে গান্ধীর ভ্রূক্ষেপই নেই, তিনি নীরব গাম্ভীর্যে চিঠির প্রত্যেকটি কথা যেন ওজন করে করে পড়ছেন, তাড়াহুড়ো একদম না করে এবং চিঠি যেই পড়া হল, রাষ্ট্রদূতকে গান্ধী যাওয়ার অনুমতি দিলেন শুধু এই বলে যে চিঠির বক্তব্য সম্বন্ধে তিনি ভেবে দেখবেন এবং তাঁর মতামত জানাবেন দুপুরের আগে।

তাঁর জন্য যে-ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে যোগদান করায় তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল, দৃঢ়তার সঙ্গে সেখানে যেতে তিনি অস্বীকার করেছেন। যদি ভালো লাগে তো পরে যাবেন, এই অজুহাত দেখিয়ে সকলের চোখের আড়ালে পালান। একঘণ্টা ধরে তাই তাঁকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা, শেষে জানা গেল একজনের মুখ থেকে যে সে নাকি জাহাজের কোনো এক স্থানে গান্ধীকে দেখেছে মার্সেই বন্দরের শ্রমিকদের সঙ্গে বসে গল্প করতে। কেবল হাবে-ভাবে ও নানারকম হাত-মুখের ভঙ্গী করে তিনি কথোপকথন চালিয়েছেন। এখানেও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে পেরে তো তিনি ধন্য, শ্রমিকরাও

কম আনন্দিত নয়, তিনি যাওয়ার পর তারা একে অন্যকে বুক চাপড়ে বলেছে, "লোকটা একেবারে খাঁটি, একটা সত্যিকারের জেন্টলম্যান!"

আমার বোনকে বাঁ পাশে নিয়ে যে-তিন-চার ঘণ্টা তিনি কেবিনে বসেছিলেন, যখন একের পর এক সাংবাদিক বা সরকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করছিলেন, তখন কেবিনের দরজাটা অল্প করে খুলতে কেবলি দেখা যাচ্ছিল, এবং সেই ফাঁকে জাহাজের ভারতীয় খালাসীরা ঢুকে পড়ছিল। তারা শ্রদ্ধায় লোলুপ দৃষ্টিতে গান্ধীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিল নীরবে, কেউ বা এগিয়ে এসে কথা না বলে তাঁর হাতটাকে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিচ্ছিল. সে-হাত ঠেকাচ্ছিল তাদের বুকে-মুখে. পরে ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছিল। কারুর বা অতটা সাহস নেই, তাই কোণে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ধরে তাঁর দিকে ভাববিহ্বলের মত তাকিয়ে থাকাতেই সান্ত্বনা তাদের. এবং তার পরে ধীরে ধীরে তাদের ফিরে যাওয়া। প্রায় জনাবিশেক এমন খালাসীদের যেতে-আসতে দেখা গেল। এবং এ-ঘটনাটাও কিছু কম অভিভূত করার মত নয়।

ডিসেম্বর, ১৯৩১—বহুকাল ধরে ঘোষিত হয়ে থাকলেও গান্ধীর সাক্ষাত এতদিনে আমরা পাচ্ছি। গোল টেবিল বৈঠকের বিলম্বিত গতির জন্য আসতে তাঁর দুয়েক মাস দেরী হয়ে গেল। কত অজস্র তার ও চিঠি যে লণ্ডনে পাঠানো গেল, মীরার মাধ্যমে। অন্যদিকে গান্ধী আসছেন শুনে গাদা গাদা কত যে চিঠি এসে হাজির হচ্ছে কত জায়গা থেকে—কত টেলিফোন, নানা রকমের কত যে অনুরোধ—তার ঠেলাও না সামলে উপায় নেই। কোনো কোনো চিঠি সত্যিই ভারী অদ্ভুত, একেবারে পাগলামিতে ভরা। (আমার ঠিকানায় গান্ধীকে উদ্দেশ করে এক ইতালীয় রমণী লিখছেন—চান, গান্ধী তাঁকে জানান আগামী লটারিতে শেষ কোন দশটি নম্বর জয়ী হবে.....) সুইজার-ল্যাণ্ডের জার্মানভাষী 'উলঙ্গবাদীরা' (ভের্নার জিমারমান) এদিকে গান্ধীকে পেয়ে বসতে চায়, তার হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে হবে। যত সব মাথাখারাপের দল, নিজেদের 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে জাহির করে, এখন তারা যেন শামুকের মত মাটী ফুঁড়ে বেরোচ্ছে—কেউ কেউ বা সদভিপ্রায় নিয়ে মহাত্মার জানালার তলায় বাঁশি বা বেহালা সমেত এসে হাজির, গান্ধীকে শোনানোর জন্যে কিছু একটা মিষ্টি সুর বাজাতে চায়। 'লেমানের দুগ্ধ ব্যবসায়ী ইউনিয়ন' ঘটা করে টেলিফোনে জানাচ্ছে, 'ভারতের রাজা' যতদিন আছেন, তাঁর স্বাস্থ্য-সঞ্জীবনে তারা বদ্ধপরিকর। আর সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তো ভিলার চারিদিকে তাঁবু ফেলতে শুরু করেছে। লোজানের পুলিশ স্বভাবতই সন্ত্রস্ত—ভিলনভের হোটেল-গুলোতে জায়গা নেই, গান্ধী নামক অদ্ভুত ব্যক্তিটিকে হাঁ করে গিলবার জন্য সেখানে যত রাজ্যের পাগল-করা লোকের ভিড়। প্যারী থেকে তরুণ জাপানী ভাস্কর তাকাতাকে এখানে আসতে আমি সাহায্য করছি, যাতে সে গান্ধীর স্কেচ করতে পারে।

শনিবার ৫ই ডিসেম্বর গান্ধী লণ্ডন ত্যাগ করছেন, প্যারীতে উঠছেন আমাদের বন্ধু লুইজেৎ গিয়েসের কাছে, সন্ধ্যায় ম্যাজিক সিটিতে আয়োজিত একটি সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। রবিবার সকালে তেরিতের পথে রওনা হচ্ছেন, সেখানে পোঁচোচ্ছেন সন্ধ্যা ৬টায়, অর্থাৎ ততক্ষণে রাত বেশ নেমেছে। সময়টাও তেমন ভালো যাচ্ছে না, প্রায়ই বৃষ্টি পড়ে। এদিকে আমার এই স্বাস্থ্যে তাঁকে যে সেখান থেকে আনতে যাব, তাও সম্ভব নয় (যতদিন তিনি থাকবেন আমার অতিথি হয়ে, মাত্র একটি বারই বাড়ী থেকে বেরোতে পারব—সেই যখন যাওয়ার দিনে তাঁকে ভিলনভ স্টেশনে তুলে দিতে যাব। তবে এদ্‌মঁ প্রিভা সস্ত্রীক প্যারীতে হাজির হয়েছিলেন তাঁকে আনবার জন্য—এবং আমার বোন তেরিতে স্টেশনে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে-ছেন। ভালর্ব থেকে সুরু ক'রে সুইজার-ল্যাণ্ডের আগাগোড়া রাস্তাটায় তিনি অভি-নন্দিত হলেন। এখানেও যতদিন তিনি রইলেন, ডাঃ নিহান ও পেরে তাঁদের মোটর-গাড়ী তাঁর ব্যবহারের জন্য মোতায়েন রাখলেন (অবশ্য উনি তা একেবারেই ব্যব-করবেন না, সর্বত্রই চাইবেন রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে, সেটাই যানবাহনের সরলতম পদ্ধতি তাঁর)।

আমাদের ভিলাগুলো বাইরন পার্কের ধারে ধারে—বাড়ীগুলোর স্বত্বাধিকারী এখন একটি ইংরেজী কলেজ (চিলন কলেজ), যার ছাত্রগুলি যেমন ধনী সন্তান, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী (এই তো কিছুদিন আগেই, গত নির্বাচনে শ্রমিক পার্টির পরা-জয় নিয়ে এদের কী হৈ-হুল্লোড়।) গান্ধীর পোঁছোনোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে থেকে এই যুবকের দল রাস্তার দু ধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে পড়েছে এবং নানান রকম দুঃখজনক ও ঠাট্টার ধ্বনি তুলতে শুরু করেছে। তবে সুখের কথা, পার্ক ছেয়ে গেছে, সুইজারল্যাণ্ডের জনতায় যেমন একদিকে, অন্যদিকে তেমনি ফ্ল্যাশ হাতে ফোটোগ্রাফারের দলে—তারা এই খুদে ইংরেজগুলোকে শান্ত করছে। মহাত্মা আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর কোনো স্বরই শোনা যাবে না, শুধু ছায়াঘন একটি সুরক্ষিত কোণ হ'তে মাত্র কয়েকটি স্বরে গীত হবে 'গড সেভ দি কিং'। (পরের দিন অবশ্য ছেলেগুলো খুব ধমকানি খাবে কলেজে, তার পরে এদেরই দেখা যাবে সশ্রদ্ধ কৌতূহল নিয়ে ভিলার চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করতে—ততক্ষণে গান্ধী লোকটা যে কত বড় একটা জিনিস, তা তারা বুঝতে পেরেছে। এমন কি তাদের যে অধ্যক্ষ মিঃ পিম, সেই তিনি পর্যন্ত গান্ধীর দর্শনপ্রার্থী হ'য়ে আসবেন, গান্ধীকে তাঁর কলেজে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণও জানাবেন, এবং যা গান্ধী করবেনও, তাঁর যাওয়ার আগের দিন।)

লিতানেৎ ভিলার (আমার বোন মাদলেন রলাঁর বাড়ী, অলগা ভিলা হ'তে এখানে জায়গা বেশি) দরজায় আমি অপেক্ষা করছি বৃষ্টিধৌত অন্ধকারে, আমাদের বিজলী বাতির অস্পষ্ট আলোয়, কখন তাঁকে পোঁছোতে দেখি তাঁর সাদা কোটে, টিপ-টিপ বৃষ্টিতে ভেজা তাঁর খালি মাথায়, চোখে চশমা, দাঁত নেই, হাসছেন (যতবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, ঐ এক অদ্ভুত লজ্জিত হাসি তাঁর, যেন হাসি দিয়েই তিনি স্বাগত সম্ভাষণ জানান)—যুক্ত কর মুখের কাছে তুলে ভারতীয় ভঙ্গীতে নমস্কার করছেন। আমাকে ডান হাতে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর গাল ঠেকল আমার কাঁধে, এবং আমার গালে ঠেকল তাঁর কামানো ধূসর মাথা, বৃষ্টিতে ভেজা ছোট ছোট চুল খচখচে। যেন সেণ্ট দমিনিক ও সেণ্ট ফ্রাসিসের আলিংগন। পরে আসছেন মীরা (তাঁর দৃপ্ত মুখ, বীরের মত হাঁটার ভঙ্গী) ও তিনজন ভারতীয় : প্রথমে গান্ধীর দুই সেক্রেটারী, মহাদেব দেশাই ও প্যারীলাল, এবং পরে তাঁর ছেলে দেবদাস (এ'র বয়স ত্রিশ, কিন্তু দেখে বিশ বছরের বেশি মনে হয় না, গোলগাল, হাসিখুশী মুখ)। পরে আমরা দোতলায় উঠলাম, যেখানে সামনে বারান্দাওলা ঘরটাকে গান্ধীর জন্যে আগে থেকে তৈরি ক'রে রাখা হয়েছে। ঘরটার তিনটি জানালা, এক জানালা দিয়ে দেখা যায় রোন উপত্যকা ও মিদির সু-উচ্চ শিখর, অন্য দুটির একটি লেমান হ্রদের দিকে, অন্যটি অলগা ভিলার দিকে। ঘরে ঢুকেই এক-আধটি কথা ব'লে গান্ধী ও অন্যান্য ভারতীয়েরা মেঝেয় ব'সে পড়লেন আসনপিঁড়ি হ'য়ে—চেয়ারে বসলাম আমার বোন ও আমি—আলো নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। এবং সকলের শুরু হ'ল সান্ধ্য প্রার্থনা (গান্ধী তাঁর সহচরদের নিয়ে প্রত্যহ আরো একবার ক'রে প্রার্থনা করেন, রাত তিনটেয়)। প্রার্থনা শেষ হয় রোজ তিনটি গান দিয়ে—সংস্কৃত মন্ত্রের গান্ধীকৃত হিন্দী অনুবাদ (প্রথমটি গীতা থেকে) দুটি, পরিশেষে রাম-সীতা বিষয়ক পরিচিত ভজনটি যা এক-এক পংক্তি ক'রে মীরা তার গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে আগে আগে গান, অন্যেরা [illegible] পরে ধরেন।

ক্রমশঃ

হাসির মজলিস

ভদ্রলোক—এই টাইটার দাম কত?

টাইবিক্রেতা—পঞ্চাশ টাকা।

ভদ্রলোক—অ্যাঃ পঞ্চাশ! মশাই আমার দুজোড়া জুতো হয়ে যায় এ টাকায়।

টাইবিক্রেতা—তা অবশ্য পারে। কিন্তু জুতোকে যদি টাই হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন, জুতোর দোকানেই যান না।

●

রোগী—ডাক্তার, আমার সেরে উঠতে কত টাকা খরচ হতে পারে?

ডাক্তার—গোটা পঞ্চাশেক।

রোগী—আর মরতে গেলে কত খরচ হবে?

ডাক্তার—গোটা পাঁচেক।

রোগী—তবে দয়া করে আমায় মেরেই ফেলুন! প'য়তাল্লিশটা টাকা তো বাঁচবে।

●

ধীরেনবাবু ছেলেকে নিয়ে খুব মুস্কিলেই পড়েছেন। রেগে একদিন বললেন—আচ্ছা খোকন, তোর জন্যে কি আমার মুখ দেখাবার পথ থাকবে না। ছোট বোনটা পর্যন্ত কতগুলো মেডেল, বই পেল, আর তুই একটা সার্টিফিকেটও পেলি না?

—কেন, আমি তো একটা সার্টিফিকেট পেয়েছি।

—কী সেটা?

—বার্থ সার্টিফিকেট!

●

—আরে, তুমি নাকি নির্মলকে বলেছ, আমি একটা আস্ত ইডিয়ট?

—হ্যাঁ, তা সত্যি হতে পারে। কিন্তু তাকে তো আমি কখনো একথা বলিনি!

●

শিক্ষক—তোমার কি মনে হয়? লণ্ডন দূরে, না চাঁদ দূরে?

ছাত্র—লণ্ডন স্যর।

শিক্ষক—কেন?

ছাত্র—লণ্ডন আমি দেখতে পাই না। কিন্তু চাঁদকে প্রায়ই দেখি।

শিক্ষক—রাজা এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে পার্থক্য কি?

ছাত্র—রাজা হচ্ছেন রাজার ছেলে; আর প্রেসিডেন্ট হলেন বাবার ছেলে।

বিয়ের পরের তিন বৎসর।

প্রথম বৎসর স্বামী স্ত্রীকে নানা কথা বলেন।

দ্বিতীয় বৎসর স্ত্রী স্বামীকে নানা কথা বলেন।

তৃতীয় বৎসর তাদের কণ্ঠস্বর প্রতিবেশীরা শোনেন।

●

ভদ্রলোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ঘণ্টাখানেক ধরে তিনি অপেক্ষা করছেন। অথচ স্ত্রীর এখনও সাজসজ্জা শেষ হোল না।

ভদ্রলোক—এই আমি শেষবার বলছি, তুমি কি যাবে?

স্ত্রী—দুঘণ্টা ধরে তো আমি সমানেই বলছি, এক মিনিটেই আসছি।

●

শিক্ষক—আমি যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম তখন একেবারেই মিথ্যা কথা বলতাম না।

ছাত্র—কখন থেকে শুরু করলেন স্যর,?

●

ম্যানেজার—আপনি বলছেন আগে কোথাও চাকরি করেন নি, কিন্তু অভিজ্ঞতা এল কোথা থেকে?

চাকুরীপ্রার্থী—আপনারা কি কল্পনাশক্তিসম্পন্ন লোক পছন্দ করেন না?

●

—কি ব্যাপার বলো, এত রাতে ট্রাঙ্ক টেলিফোন?

—তেমন কিছুই না।

—তবে এই মাঝরাতে ডেকে তোলার অর্থ?

—কারণ, রাতের টেলিফোন চার্জ কম শুনলাম কিনা!

●

পিতা—তোমার মত বুদ্ধু ছেলে দেখি নি। গত পাঁচ বছরে মাত্র দশ পর্যন্ত গুনতে শিখলে। এইভাবে চললে জীবনে তুমি কি করবে?

পুত্র—কেন, ফুটবলরেফারী? দশটার বেশি আর কতো গোল হবে?

মন বুঝে দেখুন

কুইজ
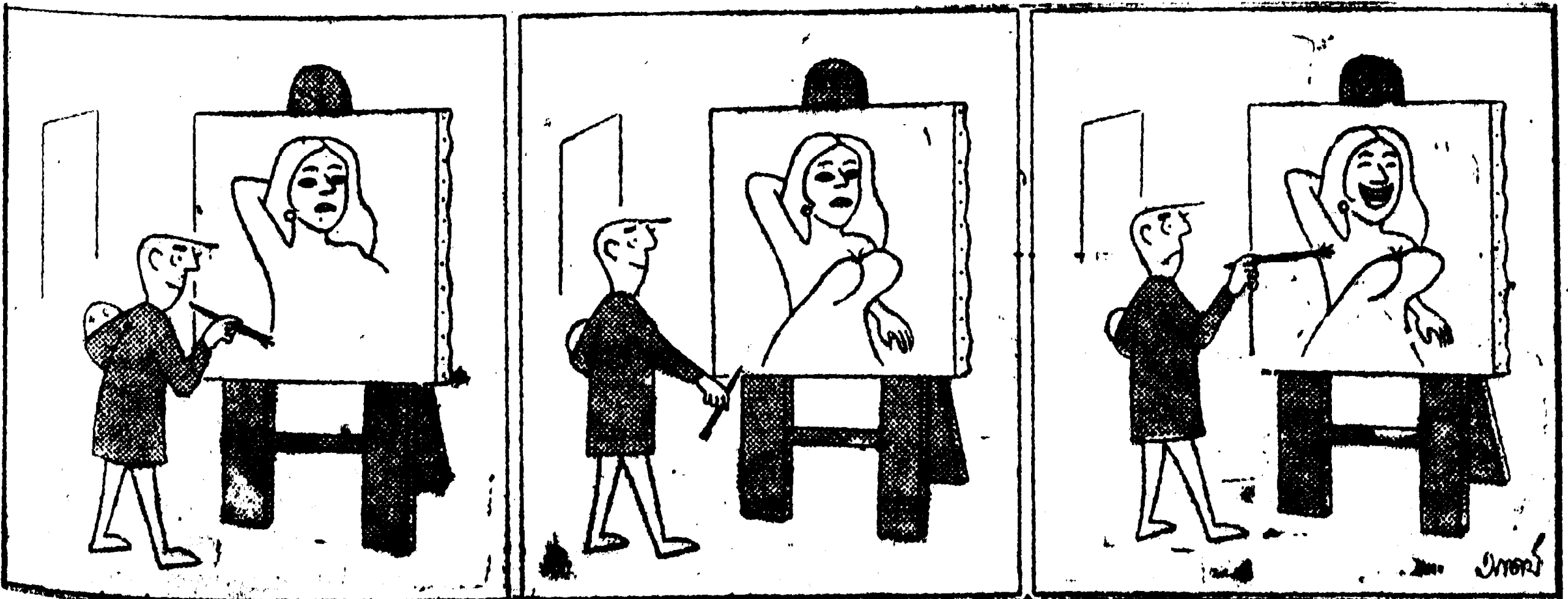
আপনি কি সত্যিই সুখী?

মানুষের সুখ বড় জটিল ব্যাপার। যেসব কামনা বাসনা পূরণ করা যায় না, সেগুলিকে তাড়াতে পারলেই সুখ আসে—একথা আমাদের দেশের প্রাচীন মুনিঋষিরা যেমন বলে গেছেন, আধুনিক মনোবিদরাও তাই বলেন। বাসনা স্পৃহা যার কম, সুখ তারই বেশি। মানুষের বাসনা কামনা অনেক আর জটিল, তাই মানুষ সহজে সুখী হতে পারে না।

এছাড়া আরও একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি, যেসব মানুষ কোনো একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁছবার জন্যে কাজ করে চলেছে, তারা বেশ সুখী; কিন্তু যখনি তারা লক্ষ্যে পেঁছে গিয়ে লাভবান হলো, তখনি যেন সুখের পরিমাণ কমতে থাকে। কিন্তু খানিকটা বাসনা, খানিকটা আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষের সুখের ইমারত গড়ে তুলতে সাহায্যই করে। সত্যিই তো, একেবারে কোনো বাসনাকামনা থাকবে না কিংবা কোনো আবেগ উত্তেজনা উদ্বেগ থাকবে না, এমন জীবন তো বেঁচেও মরে থাকার সামিল।

আপনার বাসনাগুলি চরিতার্থ হতে কোনো মানসিক বাধা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা এবং বাসনাগুলি সহজে পূরণ করার উপযোগী কিনা, অর্থাৎ সুখ আনতে পারে কিনা, তা বুঝতে পারার জন্যে নীচে একটি মনো-প্রশ্নচর্চার আয়োজন করা হয়েছে। এতে বেশি নম্বর পেলে বুঝবেন আপনি অন্য সকলের চেয়ে কতোখানি বেশি সুখী—হয়তো আপনি নিজেই তা উপলব্ধি করতে পারেননি!

মনোপ্রশ্নচর্চার নিয়ম : নীচের কোনো কথার সঙ্গে যদি আপনি সম্পূর্ণ একমত হন, তাহলে 'হ্যাঁ'-এর পাশে দাগ দিন। যদি কোনো কথার সঙ্গে মতের মিল ঠিক হচ্ছে না মনে হয়, তাহলে 'না'-এর পাশে চিহ্ন দিন। প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই উত্তর দেবার চেষ্টা করুন। যতো ধীরেসুস্থে উত্তর দিতে চান দিন; কোনো বাঁধাধরা সময় নেই।

১। যেমনই হোক, ভীড় জিনিসটা বিশ্রী, এবং সেইজন্যেই ওটাকে এড়িয়ে চলাই উচিত। হ্যাঁ......না...

২। যারা খুঁতখুঁতে, পরিশ্রমী এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তাদের কদর অগোছালো লোকেদের চেয়ে বেশি। হ্যাঁ......না......

৩। কেউ যদি কোনো প্ল্যানমতো কাজে নামে, তাহলে সবসময়ে তার মনে রাখা উচিত যে, তার প্ল্যানটি ব্যর্থ হতেও পারে। হ্যাঁ......না......

৪। কেউ যদি কোনো প্ল্যানমতো কাজে নামে, তাহলে সবসময়ে তার মনে রাখা উচিত যে, তার প্ল্যানটি সফল হবে। হ্যাঁ......না......

৫। অন্ধকারে ঘুমোনোই দুনিয়ার নিয়ম, তাহলেও, যেখানে অল্প মৃদু আলো আছে সেখানে ঘুমিয়েই বেশি আরাম। হ্যাঁ......না......

৬। সকালবেলা ঘুম ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ার চেয়ে বিছানায় খানিকক্ষণ জেগে শুয়ে থাকতেই ভাল লাগে। হ্যাঁ......না......

৭। হালকা দিবাস্বপ্ন চর্চা করা ভালোই, তারই মধ্যে দিয়ে আশ্চর্য সব কাজ করার কল্পনা করা যায়। হ্যাঁ......না......

৮। প্রত্যেক মানুষই তার ভাগ্যকর্তা, এবং তার নিজের সফলতা বা ব্যর্থতার প্রধান নিয়ন্তা। হ্যাঁ......না......

৯। খেয়াল-অবসরের কাজ বা 'হবি' নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করতে গিয়ে নিজের সামাজিক জীবন বা কাজ-কারবারের বিঘ্ন ঘটলে সেটা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। হ্যাঁ......না......

১০। মেয়েদের সঙ্গে সাধারণত সহজভাবে থাকা শক্ত। হ্যাঁ......না......

১১। সর্বদিক দিয়ে, মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ......না......

১২। আপনি কি এতখানি চালাক যে, লোকে আপনার সম্পর্কে কি বলছে, কিংবা হয়তো আপনার কাজ দেখে আড়ালে হাসছে, তা প্রায়ই বুঝতে পারেন? হ্যাঁ......না......

১৩। মেয়েরা সাধারণতঃ পুরুষদের চেয়ে বেশি অন্যায় করে আর ফন্দী আঁটে। হ্যাঁ......না......

১৪। সুখ নষ্ট করে এমন সব ঝঞ্ঝাট বিপত্তি এড়িয়ে চলতে হলে, প্রত্যেকের উচিত কিভাবে কোনো কিছু করা হবে, সেবিষয়ে মনে মনে ভালমন্দ সব ব্যাপার খুঁটিয়ে ভেবে নিয়ে নিঃসন্দিহান হয়ে কাজে নামা। হ্যাঁ......না......

১৫। আপনি কি এতোখানি সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন যে, প্রায় সব সময়েই আপনি বুঝতে পারেন, কখন আপনার সমালোচনা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে? হ্যাঁ......না......

১৬। (ক) সুখী হতে হলে কিছুটা টাকা থাকা চাই। হ্যাঁ......না......

(খ) অসুস্থ লোকেরা সুখী হয় খুব কম। হ্যাঁ......না......

(গ) সাধারণভাবে বলতে গেলে, যাকে ভালবাসি না, তাকে বিয়ে করা উচিত নয়। হ্যাঁ......না......

১৭। আপনি দর্শন—ধর্ম—মানুষের কোনো চিন্তাধারা বা সংগঠনে বিশ্বাস করেন কি? হ্যাঁ......না......

১৮। মনে করুন, গভীরভাবে বিশ্বাস করবার মতো এবং নির্ভর করবার উপযোগী লোক আছে। তাহলে :

(ক) আপনি বোকা, কারণ শেষকালে কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেকটি লোক অন্যকে ঠেলে প্রতিপন্ন করতে লেগে যায়। সত্য...মিথ্যা...

(খ) আপনি বোকা নন, কারণ আপনার অনুভূতি থেকে বুঝতে পারছেন যে, লোকগুলিকে বিশ্বাস করা চলে এবং তাই করতেই চাইছেন। সত্য...মিথ্যা...

(গ) আপনি বোকা নন, কারণ আপনি জানেন, আপনি যাদের সঙ্গে মিশেছেন, তাদের অধিকাংশেরই ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আর আস্থা রাখা চলে। সত্য...মিথ্যা...

আপনি কত নম্বর পেলেন :...

গড়পড়তা যা সবাই পেয়ে থাকেন : ১৪

চমৎকার (সবচেয়ে ভালো শতকরা দশজন) : ১৭—১৮

সুন্দর (তারপরের শতকরা পঁচিশজন) : ১৫—১৬

ভালো („ „ পঁয়ত্রিশ „): ১২—১৪

খারাপ (সব নীচের „ ত্রিশ „): ০—১১

সঠিক জবাব

১। না; ২। না; ৩। না; ৪। না; ৫। না; ৬। না; ৭। না; ৮। না; ৯। হ্যাঁ; ১০। না; ১১। না; ১২। না; ১৩। না; ১৪। না; ১৫। না; ১৬। (ক) হ্যাঁ; (খ) হ্যাঁ; (গ) হ্যাঁ; ১৭। হ্যাঁ; ১৮। যদি (ক) মিথ্যা, (খ) সত্যি এবং (গ) মিথ্যা হয়, তাহলে ২ পয়েন্ট। যদি (ক) সত্যি, (খ) সত্যি এবং (গ) মিথ্যা হয়, তাহলে ১ পয়েন্ট। অন্য কোনো উত্তরে পয়েন্ট নেই। প্রত্যেকটি সঠিক জবাবে এক পয়েন্ট করে পাবেন।

রাত তখন দশটা

দেবল দেববর্মা

আগের ঘটনা

[দিকনগর পেপার মিলের অপারেটর মিস তরঙ্গমালা এক রাতে খুন হল। এতে জড়িয়ে পড়ে তারই প্রেমিক নিখিলেশ সেন। এখন সে হাজতে বন্দী। কেসটা হাতে নিল সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল। শচীদুলাল তার সহকারী। নিখিলেশের বন্ধু শশাঙ্ক ভট্টাচার্য। তরঙ্গেরও পরিচিত।

ময়না তদন্ত হয়ে গেছে। পরদিন দিকনগর থানার ও-সি সুব্রত সরকার, শচীদুলাল আর রাজীব এল ঘটনাস্থলে। ইতিমধ্যে সেখানে সকলের অলক্ষ্যে একটা ছোট্ট বোতাম আর রুমাল কুড়িয়ে পায় রাজীব।

এরপর এল তরঙ্গর মেসে। সেখানে তরঙ্গর রুমমেট, পেপার মিলেরই আর এক টেলিফোন অপারেটর সুজাতা দাসের সংগে ওরা পরিচিত হল। খুনের ব্যাপার নিয়ে অনেক কথা চলল। রাজীবের কপালে চিন্তার রেখা। জেরা শেষে ওরা বিদায় নিল।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(পাঁচ)

মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা উড়ন্ত [illegible]রিচের মত বনবন করে ঘুরছিল। চেয়ারে [illegible] এলিয়ে বসে ছিল রাজীব সান্যাল। চোখ দুটি বুজে কি যেন ভাবছিল। কিংবা হয়ত ঘুমোচ্ছিল রাজীব। বসে বসে মানুষ যেমন ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করে তেমনি একটা প্রয়াস। হঠাৎ চোখ খুলে তাকিয়ে রাজীব সান্যাল সচেতন হল। সময়ের নদীতে কাঠকুটোর মত এমন গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকলে চলবে না। মথুরাপুর ফিরে যেতে হবে। হাতে এখন কাজ,—অনেক কাজ।

একটা সিগারেট ধরিয়ে রাজীব বলল, সুব্রত, এখন তাহলে ওঠা যাক। তিনটের পর আবার মথুরাপুর থেকে বেরিয়ে পড়ব। তোমার দিকনগরে আসতে চারটে সাড়ে চারটের বেশী হবে না। চল হে শচী—।' রাজীব সান্যাল উঠবার চেষ্টা করল।

বাধা দিয়ে সুব্রত বলল,—'পাগল হয়েছেন রাজীবদা? এই ভর-দুপুরে কে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছে? ঘড়িতে ক'টা বাজছে খেয়াল আছে আপনার?'

রাজীবের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে শচী-দুলাল জবাব দিল, 'সাড়ে বারোটার বেশী স্যার। আমার ঘড়িটা আবার একটু জিরিয়ে জিরিয়ে চলে। এখন প্রায় একটার কাছাকাছি হবে স্যার।'

হতাশ ভঙ্গি করে রাজীব বলল, 'তাহলে উপায়?'

সুব্রত মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিল, 'উপায় কি আবার? এবেলা আমার ওখানেই দুটি শাক-অন্ন গ্রহণ করতে হবে। তদন্তের কাজ আরো খানিকটা এগিয়ে না দিলে কে আপনাকে দিকনগর ছেড়ে যেতে দিচ্ছে?'

রাজীব সান্যালকে সন্তুষ্ট মনে হল। সে হেসে বলল, 'ব্যবস্থাটা মন্দ করনি হে সুব্রত। এই দুপুর রোদে তেতে-পুড়ে মথুরাপুরে কখনই বা পৌঁছতাম? আর কখনই বা রওনা হতাম দিকনগরের পথে? অথচ হাতে এখনও অনেক কাজ। সকাল থেকে হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে সময় যে কখন বেরিয়ে গেল টেরই পেলাম না। কিন্তু বাড়ীতে একটা খবর পৌঁছে দিতে পারলে আরো ভাল হত। নইলে সতী-সাধ্বীরা আবার অন্ন-ব্যঞ্জন সাজিয়ে হা-পিত্যেশ করে দুপুর কাবার করবেন।'

'করতে দিন।' সুব্রত সরকার সরাসরি জবাব দিল। 'অন্ন-ব্যঞ্জন সাজিয়ে প্রতীক্ষা করার দিন বাংলাদেশে অন্তত শেষ হয়ে আসছে। পুরানো যে ক'জন আছেন তাঁদের পালাও ফুরিয়ে এল বলে।' একটু থেমে সুব্রত আবার বলল, 'আমি অবশ্য মথুরা-পুর থানায় একটা খবর পাঠিয়ে দিয়েছি রাজীবদা। বাড়ীতে পৌঁছে দেবে ওরা। মথুরাপুর পৌঁছতে আপনাদের রাত্তির হবে বলে দিয়েছি।'

উৎসাহে রাজীব সান্যাল সোজা হয়ে বসল। 'এতক্ষণে নিশ্চিন্ত করলে সুব্রত। খবর শুনে দিলখুস হল। মার্ডার কেসের তদন্ত করতে এসে কি নাওয়া খাওয়ার কথা ভাবলে চলে? প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন চিন্তার উদয় হচ্ছে মনে। কোনটা ছেড়ে কোনটা নিয়ে শুরু করি, তাই ভেবে খেই পাচ্ছি না।'

শচীদুলাল ধীরে ধীরে বলল,—'আমি কিন্তু আপনাকে বেরোবার সময় বলেছিলাম স্যার। আজ দুপুরের আহার দিকনগরেই সারতে হবে আমাদের। এক সকালে কত-টুকু আর তদন্ত হবে?'

রাজীব ওর দিকে তাকাল। বলল, 'তোমার কথা মনে ছিল শচী। কিন্তু আহারপর্ব কোথায় করা যায় সে-কথা তো বলনি। হুট করে ওপরওয়ালার দাবী নিয়ে সুব্রতকে তো আর সেকথা বলা যায় না। আর আমি ওসব পারিনে। দিকনগরে তেমন হোটেল-টোটেল থাকলে না হয় নিজেরাই ব্যবস্থা করতাম।'

সুব্রত সপ্রশংস দৃষ্টিতে রাজীবকে দেখছিল।

রাজীব বলল, 'খুনের তদন্তের তিনটে স্টেজ আছে সুব্রত। ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দাকে এই তিনটে ধাপে ধীরে ধীরে এগোতে হয়। আর একটা কথা। চট করে কোন সূত্র পেয়ে উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি করলে চলবে না। একটু পক্ষপাতহীন মন হলে সবচেয়ে ভালো হয়। নইলে আসল খুনীকে ছেড়ে হয়ত কোন নির্দোষ মানুষকে দোষী ভেবে রাতের ঘুম ছুটে যাবে।'

শচীদুলাল হাসল, 'তিনটে ধাপ কি কি তা তো বললেন না স্যার।'

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে রাজীব সান্যাল বাকী অংশটুকু মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে থেঁতলে দিল। বলল, 'পেটের চিন্তা যখন নেই, তখন মনও হাল্কা। সুতরাং তিনটে ধাপের কথা তোমাকে নিশ্চয় বলব শচী। কতদিন আর আমার সঙ্গে থাকবে চেলা হয়ে? এর পর হয়ত তোমাকে নিজেই তদন্তের ভার নিতে হবে। দু-এক বছরের মধ্যে কোথায় বদলী-টদলী হয়ে যাবে তার ঠিক কি? তখন আর দোয়ারকী নয়,—একেবারে মূল গায়েন হয়ে আসরে নামতে হবে।'

কয়েকটি মৌন মুহূর্ত নিঃশেষ হল।

রাজীব সান্যাল শুরু করল, 'খুনের তদন্ত সিঁড়ি ভাঙার অঙ্ক নয় সুব্রত, যে ধাপে ধাপে উঠে যাবে। বরং একে লুকোচুরির খেলা বলতে পার। খুনী তার অপকর্মের প্রত্যেকটি চিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা করছে। আর গোয়েন্দাকে সেই চিহ্ন ধরে অনুসরণ চালিয়ে যেতে হবে। খুনীর কাছে এটা হল জীবন-মরণের সমস্যা। আর গোয়েন্দার কাছে এ-খেলা হল বুদ্ধির প্যাঁচে হার অথবা জিত।'

সুব্রত বলল, 'সুতরাং এমন শক্ত প্যাঁচ দিতে হবে রাজীবদা যেন খুনী কিছুতেই তা না ধরতে পারে।'

রাজীব সান্যাল মাথা হেলিয়ে সায় দিল। বলল, 'ঠিক তাই। খুনের তদন্তের প্রথম ধাপে অবজার্ভেশন বা পর্যবেক্ষণটাই বড় কথা। অবজার্ভেশন করেই তুমি যদি সাত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে আস, তাহলেই বুদ্ধির খেলায় খুনীর কাছে তুমি বোকা বনে যাবে। কাজেই পর্যবেক্ষণ বা অব-জার্ভেশন করে চট করে কোন সিদ্ধান্তে আসা চলবে না। আরো ভাবো। মনের সব দ্বারগুলি খুলে দিয়ে চিন্তা শুরু কর।'

সুব্রত প্রশ্ন করল, 'অবজার্ভেশন শেষ হবার পর কি শুরু করতে হবে রাজীবদা?'

রাজীব সান্যাল হেসে উত্তর দিল, 'এখন দ্বিতীয় ধাপে তদন্ত চলছে আমাদের। অর্থাৎ দ্বিতীয় ধাপ হল ইন্টারোগেশন বা জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। প্রশ্ন করে অনেক কিছু জানতে পারবে তুমি। অবজার্ভেশনের সঙ্গে ইন্টারোগেশন যুক্ত হলে দেখবে রহস্য অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ভোর হবার আগে অন্ধকার যেমন একটু ফিকে হয়ে আসে তেমনি মনে হবে তোমার।'

'আর তৃতীয় ধাপে স্যার?' শচীদুলাল উৎসুক চোখে তাকাল।

'তৃতীয় ধাপ মানেই সব শেষের কথা শচী। শেষ ধাপ হল ইনফরমেশন বা সংবাদ সংগ্রহ। তৃতীয় পর্বে সংবাদ সংগ্রহই কাজ। তোমাকে সংবাদ সংগ্রহে মনোযোগী হতে হবে শচী। মিলিয়ে দেখতে হবে পর্যবেক্ষণ আর জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তথ্যে উপনীত হয়েছ তার সঙ্গে সংবাদের ঠিক মিল আছে কিনা।'

সুব্রত বাধা দিয়ে বলল, 'এত ধীরে ধীরে বিচক্ষণতার সঙ্গে এগোবার সময় কই রাজীবদা? কাজের চাপে থৈ পাচ্ছি না, এত ভেবে মাথা ঠান্ডা করে চলতে সময় কোথায়? আমাদের হল দে গরুর গা ধুইয়ে—!'

রাজীব সান্যাল হাসল।—'খুনের তদন্তের কিনারা ওঠ ছুঁড়ী তোর বে'র মত ব্যাপার নয় সুব্রত। সময় করে নিতে হবে। আবার এত সাবধানে পা টিপে টিপে এগিয়ে হয়ত দেখবে শেষ রক্ষা হল না। কারণ অনেক সময় খুনীরা গোয়েন্দার চেয়েও বুদ্ধিমান। তবে আমরা বলি গোয়েন্দার সহায় ঈশ্বর, অর্থাৎ ভগবান তার সঙ্গে। আর খুনীর পিছনে শয়তান, তার অপকর্মের ইন্ধনদাতা।'

জামার বুকের শাদা ঝিনুকের বোতাম-গুলি খুলে দিয়ে রাজীব সান্যাল একটু হাল্কা হতে চাইল। কয়েকবার জোরে জোরে বাতাস নিল। বলল, 'এখন তরুণ হত্যা রহস্যের কিনারা করতে পারলে হয়। অপরাধী কি ধরা পড়বে?'

সুব্রত জবাব দিল, 'রাজীবদা, ওসব চিন্তা রাখুন। স্নান সেরে খাওয়া-দাওয়া করবেন চলুন। খেয়েদেয়ে একটু জিরিয়ে আবার খুনীর পিছনে ধাওয়া করবেন। আর দু-এক ঘণ্টার মধ্যে খুনী তো আর দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হচ্ছে না!'

রাজীব সান্যাল রসিকতা করল। 'সকাল থেকে যেভাবে ভূত তাড়ানো মন্ত্র আউড়ে চলেছি সুব্রত, তাতে আর খুব একটা ভরসা নেই। ভূত না গেরস্থর বাড়ী ছেড়ে শেষে পগার পার হয়।'

বাইরে উজ্জ্বল তপ্ত দুপুর। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাজীব সান্যাল একটা আরাম চেয়ারে গড়িয়ে নিচ্ছিল। জানালা দিয়ে তাকালে বহু দূরে দৃষ্টি ছুঁয়ে আসে। দিকনগর থানাটা প্রায় এক প্রান্তে। একদিকে মাঠ,...মাঠের শেষে কি একটা গ্রামের মত ছবি। ওদিকে আদিগন্ত প্রান্তরের মধ্যে ভুইফোঁড় বিচিত্র এক অতিকায় প্রাণীর মত কোলিয়ারীর চানখ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। বয়লার ঘরের চিমনী বেয়ে দানবের নিঃশ্বাসের মত ধোঁয়া উঠছে। দিকনগর পেপার মিলটা সম্ভবত পিছনে। নাহলে শুয়ে শুয়ে রাজীব পেপার মিলের চার-পাশের উঁচু কম্পাউন্ড দেওয়ালটা দেখতে পেত। কি খেয়াল হ'তে রাজীব সান্যাল মাথা উঁচু করে চাইল। নীল আকাশে এক-টুকরো শাদা মেঘ পেঁজা তুলোর মত

অলসভাবে ভেসে চলেছে। ঘরছাড়া কোন পথিকজনের মত মেঘটা অজানা অচেনা নিরুদ্দেশের পথ ধরেছে।

কতক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে ছিল রাজীবের খেয়াল নেই। একদিকে দৃষ্টি পড়তেই রাজীব সান্যাল চমকে উঠল। কে একটা লোক দূরে থেকে তাকে লক্ষ্য করছে। রাজীব সান্যাল উঠে বসতেই লোকটা মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। তারপরই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা,—এক দৌড়ে একটা বাড়ীর আড়ালে গিয়ে পড়ল। এর পরই তাকে আর দেখা গেল না।

চেঁচামেচি করে লোকজন জড় করল না রাজীব। ইচ্ছে করলে এক ডজন সিপাই পাঠানো যেত সন্দেহজনক লোকটাকে ধরে আনতে। কিন্তু লোকটার পাত্তা কোথায়? রাজীব সান্যাল তাকে দু-তিন সেকেন্ডের মত দেখেছিল। তারপরই ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল লোকটা। এখন অন্য পোশাকে দেখলে রাজীব সান্যাল কি তাকে চিনতে পারবে? সিপাইদের সাধ্য কি লোকটাকে সনাক্ত করে!

রাজীব সান্যাল বাইরে এসে দাঁড়াল। থানা থেকে নেমে রাস্তায় পা দিল। এদিকে ওদিকে তাকাল রাজীব সান্যাল। ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করল। দ্বিপ্রহরে দিকনগরে শূন্যনগরের দশা। লোকজন কই? মাঝে মাঝে পথের উপর ধুলোর ছোট ঘূর্ণি ঝড়। বেলা দুটোয়, ভাদুরে গরমে সমস্ত দিকনগরটা পথশ্রান্ত বুড়োমানুষের মত ঝিমোচ্ছে।

মনে মনে চিন্তা করছিল রাজীব। লোকটা কে? তার উপর নজর রাখছে কেন? উদ্দেশ্য কি লোকটার? সম্ভবত খুনী আসামীর কোন চর। কিংবা আসামী নিজেই। দিকনগরে সুব্রতর কতজন ইনফর্মার রয়েছে? সংবাদ সংগ্রহে কতখানি সাহায্য করতে পারে ওরা? রাজীব সান্যালের মনে হল দিকনগরে অনেক আগেই কয়েকজন ভালো ইনফর্মার তৈরী করা উচিত ছিল তার। গাফিলতিতে মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। এখন সুব্রত যতদূর সাহায্য করতে পারে তাই ভরসা।

বেলা আড়াইটে বাজতেই রাজীব সান্যাল শচীদুলালকে ডাকল। বলল, 'সুব্রত কোথায়? তরঙ্গের মাকে এবার নিয়ে আসতে বল। তার সঙ্গে দরকারী কথাগুলো সেরে নিই।'

সুব্রত এল মিনিট দশেক পরে। সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল সুব্রত। তার এত্তেলা পেয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে উঠে এসেছে। জল ছিটিয়ে ঘুম তাড়িয়েছে চোখ থেকে, কিন্তু ঘুমকাতুরে মুখটা এখনও সহজ স্বাভাবিক হয় নি। চোখ থেকে সরে ঘুম এখন সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুব্রত বলল, 'তরঙ্গের মা আর দাদাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি রাজীবদা। দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন।'

'ওরা কোথায় এখন?'

'পেপার মিলের গেস্ট হাউসে।'

'কখন কলকাতা যাচ্ছেন খবর নিয়েছ?'

'আজই, সন্ধ্যের পর—'

রাজীব সান্যাল গম্ভীরমুখে চিন্তা করছিল। তরঙ্গের হত্যারহস্যটা যেন ধীরে ধীরে আরো জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সে ভেবেছিল জট পাকানো সুতোটা একটু একটু করে খুলতে পারছে। রহস্যের জমাট অন্ধকার এবার বোধহয় গলতে শুরু করল। কিন্তু কোথায় কি? এখন মনে হচ্ছে যে তিমিরে সে ছিল, সেই তিমিরেই ঢাকা পড়ে আছে। পথটথ সব অন্ধকার,—সূচীভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা। পা টিপে টিপে কোনদিকে এগোবে রাজীব? কোন পথে?

থানার সামনে একটা সাইকেল রিকস এসে থামল। অলক্ষ্যে সেদিকে তাকাল রাজীব। এক বিধবা ভদ্রমহিলা আর একটি যুবক। রিকশ থেকে নামল ওরা, রাজীব সান্যাল বুঝল, তরঙ্গের মা এবং তার সেই পিসতুতো দাদা। ভদ্রমহিলা মুখ তুলে তাকাতেই রাজীব দেখল ভালো করে। তরঙ্গের ছবি টবি এখনও দেখে নি রাজীব। মৃতা তরঙ্গের মুখে সৌন্দর্যের কোন চিহ্ন সে খোঁজে নি। সে অনুসন্ধান করেছিল আঘাতের দাগ টাগ। মরবার সময় কত যন্ত্রণা আর কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা।

তরঙ্গের মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রাজীব সান্যাল নিঃসন্দেহ হল। এমন মায়ের মেয়ে সুন্দরী না হয়ে যায় না। সুব্রত ঠিকই বলেছিল, তরঙ্গকে দেখলেই আবার দেখতে ইচ্ছে করবে। কম বয়সে ভদ্রমহিলা যে রীতিমত সুন্দরী ছিলেন তা মুখ দেখলেই আঁচ করা যায়। এখন অবশ্য বয়স হয়েছে। শোকে, তাপে এবং বয়সের চাপে সৌন্দর্যের অনেকখানিই ধুয়ে মুছে নিঃশেষ। তবু অবশিষ্ট যা আছে, তাই বা কম কি? অপরাহ্ণের শেষ আলোয় বসুমতী কি কম শ্রীময়ী?

উনি চেয়ারে বসবার পর রাজীব বলল, 'আপনাকে কষ্ট দিলাম একটু। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গেস্ট হাউসে যাওয়াই উচিৎ ছিল আমার। কিন্তু উপায় ছিল না। গোপনীয়তা রাখবার জন্য এ কাজ করতে হয়েছে। মার্জনা করবেন।'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, 'কষ্টের আর বাকী কিছু নেই। যা দুঃখ কষ্ট সারাজীবন পেয়ে এলাম তার কাছে কোন কষ্টই অসহনীয় নয়।' কথা শেষ হতেই ম্লান হাসলেন ভদ্রমহিলা। বিষণ্ণ, ভার ভার হাসি।

ভদ্রমহিলার মুখের দিকে চেয়ে রাজীব কি ভাবল। বলল, 'আমি সি, আই, ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল। আপনার মেয়ের হত্যার তদন্তের ভার পড়েছে আমার উপর। কিন্তু তদন্তের মানে হল অন্ধকূপের অন্ধকারের মধ্য থেকে আলোর রেখা খুঁজে বেড়ান। আর গোয়েন্দা তো সবজান্তা জ্যোতিষী নয়। যে ছক কেটেই মুহূর্তে খুনীর নাম ঠিকানা বলে দেবে। তাকে পথ চলতে হয় আরো দশজনের মত পা ফেলে। তার ভরসা পঞ্চজনের সহযোগিতা।'

'আমি কি সাহায্য করতে পারি বলুন? মেয়েটা নৃশংসভাবে খুন হল। কে ওকে জোর করে সরিয়ে দিল পৃথিবী থেকে। রূপ থাকলেই তার সর্বনাশ করতে হবে ইন্সপেক্টরবাবু? আমি জোর করে বলতে পারি, তরঙ্গ আমার কারো অনিষ্ট করে নি। ওর কোন দোষ ছিল না ইন্সপেক্টরবাবু। সাদাসিধে, বোকাসোকা মেয়েটা আমার। কাউকে অবিশ্বাস করতে পর্যন্ত জানত না।' একবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা; রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'পাড়াপড়শী বলত,—ও তোমার শুধু তরঙ্গ নয় মা। ও হল রূপের তরঙ্গ। অমন মেয়েকে একা একা দূরদেশে পাঠিও না চঞ্চলের মা।'

রাজীব সান্যাল বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে এই ছেলেটি কে?'

'আমার ননদের ছেলে। ওকে সঙ্গে নিয়েই এবার দিকনগরে এসেছি। অবশ্য এই শেষ আসা। দিকনগরে এসে আমার তরঙ্গ যে হারিয়ে যাবে একথা কোনোদিন ভাবতেও পারিনি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা থামলেন। রাজীব ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনি যদি একটু ও ঘরে—।' সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি উঠল। বলল, 'ঠিক আছে। আমি ও ঘরে গিয়ে বসছি। আপনি মামীমার সঙ্গে কথা বলুন।'

ছেলেটি চলে যেতেই রাজীব বলল, 'আপনার কাছে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে মিসেস মজুমদার। আপনি খুব একটা চিন্তা না করে, খোলা মনে প্রশ্নগুলির জবাব দিন।'

ভদ্রমহিলা ঘাড় নেড়ে প্রশ্নের প্রতীক্ষায় রইলেন।

রাজীব বলল, 'আচ্ছা, আপনার মেয়ে তরঙ্গমালার কত বয়স হয়েছিল?'

চিন্তা না করেই জবাব দিলেন তিনি, 'এই আষাঢ়ে তরঙ্গ তেইশ পূর্ণ হয়ে চব্বিশে পা দিয়েছিল?'

'কলকাতার কোথায় আপনারা থাকেন? নিজেদের বাড়ী ওখানে?'

'নিজেদের বাড়ী কোথায় পাবো? ভাড়া বাড়ী। তবে বছর দশ হল বেহালাতেই আছি। উনি মারা গেলেন, তা ছ-সাত বছর হবে। সেও ঐ বাড়ীতেই। মেয়ে আর ছোট ছেলেটাকে নিয়ে আমি যেন অকূল পাথারে পড়লাম।'

'আপনার ছেলের এখন কত বয়স?'

'বছর চৌদ্দ হল। এইবার ক্লাস টেনএ উঠেছে। লোকের মুখে খবর পেয়ে ছেলেটার কি কান্না। ইন্সপেক্টরবাবু, সে কান্না দেখলে কেউ স্থির থাকতে পারবে না। দিদিকে বড্ড ভালবাসত চঞ্চল তরঙ্গও চঞ্চল বলতে অজ্ঞান ছিল।' একটু থেমে ভদ্রমহিলা বললেন, 'দিকনগরে দিদিকে শেষবার দেখবে বলে কি কান্না

।' ভদ্রমহিলা রুমাল দিয়ে চোখ লেন।

রাজীব সান্যাল বলল, 'আচ্ছা, তরঙ্গ র মধ্যে কলকাতায় যেত না?'

'ফি মাসে একবার করে যেত। কোনো-স দুবার,—হ্যাঁ, তাও গিয়েছে, শেষদিকে স দু-তিনবারও এসেছে।'

'কলকাতায় গিয়ে বাড়ীতেই থাকত ? না খুব ঘোরাঘুরি করত?'

ভদ্রমহিলা কি যেন চিন্তা করলেন। খন বছর দুয়েক হল তরঙ্গ দিক্‌নগরে সেছিল। প্রথমদিকে ফি মাসে একবার রে বাড়ী আসত তরঙ্গ। মাসের প্রথমে, ইনে টাইনে পেয়ে। আমাকে টাকাকড়ি ত। ভাইকে নিয়ে এখানে ওখানে বেড়াতে ত। সিনেমা দেখত, কিংবা ওর বন্ধু-ন্ধবদের বাড়ী এক চক্কর ঘুরে আসত। কন্তু—।'

'কিন্তু কি মিসেস মজুমদার?'

'ইদানীং কিছুদিন হল তরঙ্গের হাবে-ভাবে আমি একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।'

'কতদিন এই পরিবর্তন ঘটেছিল বলে মনে হয় আপনার?'

'তা মাস সাত আটেক হবে। কিংবা আরো কিছুদিন বেশী।' মিসেস মজুম-দারকে চিন্তিত দেখাল। একটু ভেবে তিনি ফের শুরু করলেন, 'আগে আগে বাড়ী এলে তরঙ্গ প্রায় ঘরেই থাকত। মাঝে মাঝে অবশ্য বেরোত। কিন্তু বাইরে যাবার জন্য কোন চাঞ্চল্য বা ছটফটানি আমি আগে দেখিনি। কিন্তু মাস সাত আটেক আগে আমার যেন হঠাৎ মনে হল তরঙ্গ খুশী খুশী হয়ে উঠেছে। দুপুরে ভাত খেয়ে দেয়ে উঠেই সেবার আমায় বলল,—মা আমি একটু বেরুচ্ছি। ফিরতে সন্ধ্যে উতরে যাবে। তুমি যেন আবার চিন্তা শুরু ক'র না। ওর চোখের দিকে চেয়ে আমার মনে কি যেন হল। একটা চাপা আনন্দ মেয়ের চোখের মণি থেকে আলোর মত বেরোচ্ছে। তরঙ্গ কিছুতেই সেটা চাপতে পারছে না। আমার সন্দেহ হল ইন্সপেক্টরবাবু। ও কারো প্রেমে পড়েছে। ভালবাসা না পেলে মেয়েরা তো এমন চকমকি ঠোকা আগুনের ফুলকির মত হাসে না। কিন্তু আমাকে কিছু বলছে না দেখে আমিও জোর করলাম না। তিন-চারদিন থেকে তরঙ্গ চলে গেল দিক্‌নগরে। মাসখানেক পরে আবার ফিরে এল ও। তেমনি দুপুরে ভাত খেয়ে দেয়ে আমাকে বলল,—মা আমাকে একটু বেরুতে হবে। আমি বললাম, এই তো এলি সকালে। দুপুরে জিরিয়ে নে। ও হেসে বলল, হেড অফিসে একবার যেতে হবে মা। ম্যানেজার-সাহেব একটা কাজ গছিয়ে দিয়েছেন। আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল,—জানো মা, এই কাজটা নিয়ে এসেছি বলে যাতায়াতের খরচ কোম্পানী থেকেই পেয়ে যাব। ভাবলাম, হবেও বা। মিছিমিছি মেয়েটাকে দুষছি। কিন্তু—।'

রাজীব সান্যাল বলল, 'বলে যান মিসেস মজুমদার। থামলে তো চলবে না।'

ভদ্রমহিলা ম্লান হেসে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, বলছি সব। সব কথাই বলব ইন্সপেক্টরবাবু। আমার ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটাকে যে এমন নৃশংসভাবে খুন করে গেল, ঈশ্বর তাকে কখনও অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে দেবেন না। দোষী ধরা পড়বেই, সে বিশ্বাস আমার আছে।' একটু থেমে ভদ্রমহিলা শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, যে কথা আপনাকে বলছিলাম। দিন দুই পরে চঞ্চল আমাকে আড়ালে বলল,—মা দিদির সঙ্গে এক ভদ্রলোককে বেড়াতে দেখলাম। অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কাকে আবার দেখলি সঙ্গে? কোথায় দেখতে পেলি। ছেলে আমার তেমনি লাজুক। অনেকক্ষণ পরে বলল—আমি দোকানে দাঁড়িয়েছিলাম মা। ওরা দুজনে একটা ট্যাক্সী থেকে নামল। দিদিকে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক আবার ট্যাক্সীতে উঠে হুস করে চলে গেলেন?'

মিসেস মজুমদার একটু থেমে রাজীব সান্যালের দিকে তাকালেন।

'জল খাবেন মিসেস মজুমদার?' রাজীব তাড়াতাড়ি বলল।

'হ্যাঁ, একটু জল খেতাম—।'

আদেশ মত ঠান্ডা এক গ্লাস জল এল সুন্দর কাচের গ্লাসে। ঢক ঢক করে জল খেয়ে গ্লাসটা নিঃশেষ করে দিলেন ভদ্র-মহিলা। চোখে মুখে একটা তৃপ্তির ভাব এল তাঁর। বললেন, 'বেশ ঠান্ডা জল। খেয়ে সুস্থ লাগছে।'

কথার খেই ধরিয়ে দিয়ে রাজীব বলল, 'তারপর কি যেন বলছিলেন?'

'হ্যাঁ। সেদিন সন্ধ্যায় তরঙ্গকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। ছেলেটি কে? কতদিন ওর সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে? কি করে ও? প্রথমে মেয়ে আমার সব কথা উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু আমি জোর করলাম। খানিক পরেই তরঙ্গ নরম হয়েছিল ইন্সপেক্টরবাবু। নিখিলেশ সেনের নাম সেদিনই আমি প্রথম শুনলাম ওর মুখে। ধীরে ধীরে সব কথা বলেছিল আমায়। কবে আলাপ হল, কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে ওরা। মনে হয় আমাকে কিছু গোপন করেনি তরঙ্গ। আমি বলেছিলাম, —সুজাতা, সুজাতা এসব জানে? ও মুখে হাত দিয়ে আমার কথা বলা বন্ধ করে দিল। বলল,—দোহাই মা। সুজাতাদিকে এসব কথা একদম বল'না। নিখিলেশকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না সুজাতাদি। শুধু নিখিলেশ কেন? কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে দুটো কথা বললেই সুজাতাদির চোখ জ্বালা শুরু হল। অমনি আমাকে শাসন শুরু করে দেবে। ওরা খারাপ... পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করতে নেই।' একটু থেমে ভদ্রমহিলা বললেন,—'কথা বলতে বলতে মেয়ে আমার খিল খিল করে হাসত ইন্সপেক্টরবাবু।' শেষদিকে গলার স্বরটা করুণ শোনাল।

রাজীব বলল, 'সুজাতা আপনার বাড়ীতে কখনও এসেছে?'

'হ্যাঁ।' চোখ তুলে এক সেকেন্ড কি কি ভেবে ভদ্রমহিলা বললেন, 'একবারই এসেছিল। অনেকদিন আগে। দিন দুই আমাদের বেহালার বাড়ীতে ছিল সুজাতা।'

'আচ্ছা, এই সুজাতা মেয়েটিকে আপনার কেমন মনে হয়?'

'বেশ ভালো মেয়ে। খুব গম্ভীর প্রকৃতির,—আমার তরঙ্গের মত হাল্কা, আমুদে নয়। সুজাতা কারো সঙ্গে বেশী মিশত না শুনেছি। কিন্তু আমার তরঙ্গ-মালাকে খুব ভালবাসত ও। বড়দিদির মত দেখাশুনা করত।'

'আর একটা কথা মিসেস মজুমদার, তরঙ্গর খোঁজে আপনার বাড়ীতে আর কেউ কখনও গিয়েছিল?'
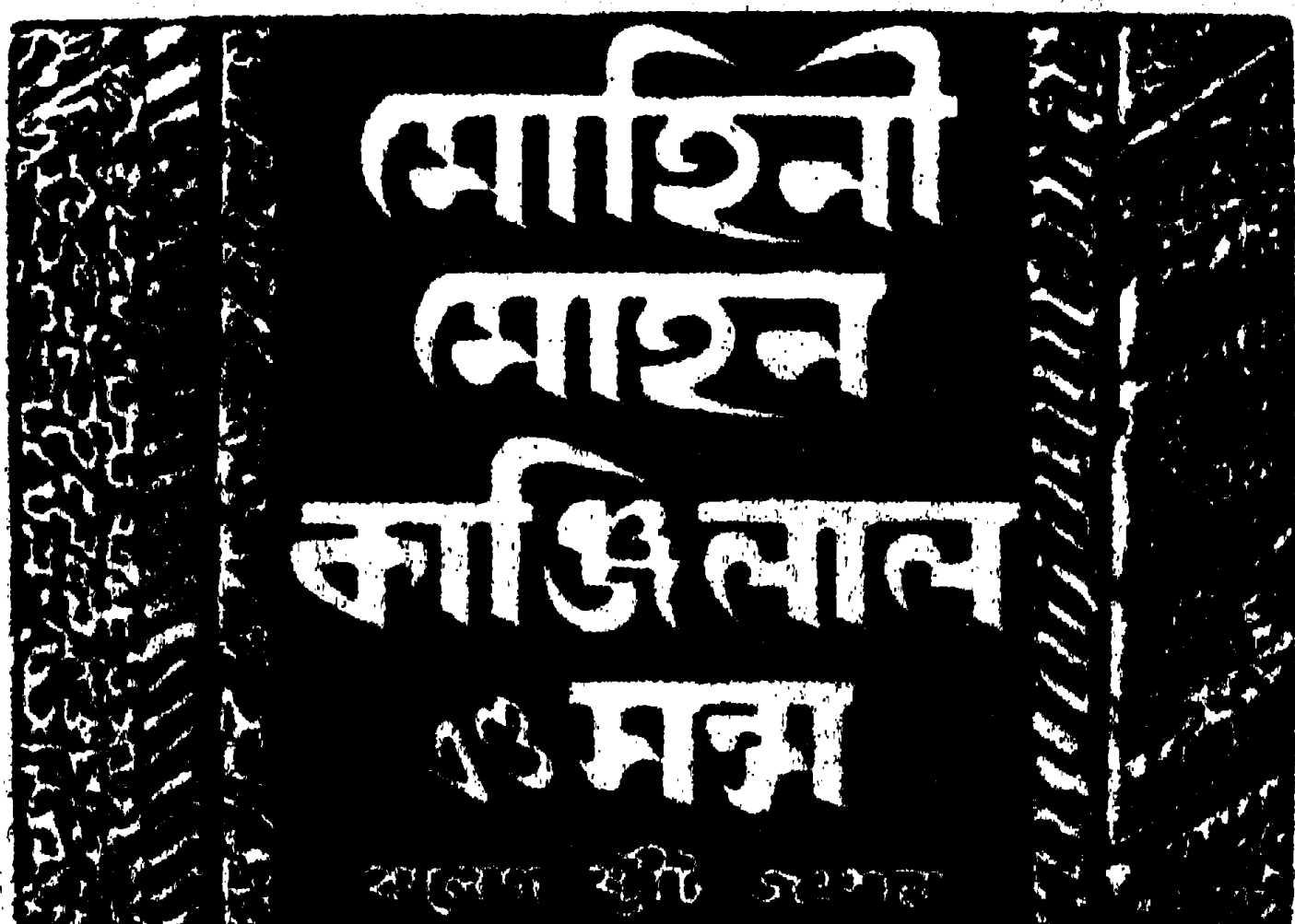
ভদ্রমহিলা একটু ভাবলেন। যে পথ ধরে জীবনটা আজ এই নিঃস্ব প্রায়ান্ধকার প্রান্তরে এসে পৌঁছেছে, সেই পথ ধরে আবার পিছু হেঁটে যাওয়া কঠিন কাজ। আর শুধু হাঁটা নয়। পথের দুপাশের পরিচিত অপরিচিত মানুষগুলিকে আবার চিহ্নিত করা। তাদের মৃত অবয়বগুলির মুখোমুখি হওয়া।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরই মুখ উজ্জ্বল করে ভদ্রমহিলা বললেন, 'দিকনগর পেপার মিলের ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী দু-তিনবার এসেছেন তরুণার খোঁজে।'

'বিশেষ কোন দরকারে টরকারে?

'কি দরকারে উনি এসেছিলেন, তা আমি ঠিক বলতে পারব না ইন্সপেক্টরবাবু। তরুণা আমাকে সব কথা খুলে বলত না। তবে দেখতাম ম্যানেজারের গাড়ী এসে থামলেই তরুণার মুখটা ব্যাজার হয়ে উঠত। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে যেন ঘর থেকে বেরোত তরুণা।'

'কোথায় যেত ওরা কিছু জানেন নাকি?'

'না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই তরুণা বলত, অফিসের কাজে। আমি বলতাম ছুটিতে এসে আবার অফিসের কাজ কি রে? চোখ মুখ ঘুরিয়ে ও বলত, কি করব বলো মা, মুখপোড়া ম্যানেজারের যেমন অভিরুচি তাইতো হবে। একদিন আমাকে হেসে বলেছিল, জানো মা বউয়ের সঙ্গে একদম বনিবনা নেই আমাদের ম্যানেজারের। দিকনগরের বাংলোবাড়ীতে ও একাই থাকে। বউ থাকে বালীগঞ্জে,—বাপের বাড়ীতে। মাঝে মধ্যে অবশ্য যায়। কিন্তু দু-চারদিনের বেশী থাকে না।'

'আর? আর কিছু বলেছিল নাকি তরুণা?'

'ও আর কি শুনবেন? কানাঘুষো কথা,—বড় ঘরের কেলেংকারী সব। দিকনগরে সবাই নাকি একথা জানে। মথুরাপুর থেকে মাইল পনের দূরে আলোকপুর বলে একটা বড় জায়গা আছে না? সেখানে নাকি প্রায়ই যেতে হয় ম্যানেজারকে। তরুণা বলছিল ওর আর একটা বউ আছে আলোকপুরে।' ভদ্রমহিলা রহস্য করে হাসলেন।

দিকনগরে উজ্জ্বল অপরাহ্ন নেমেছে। রোদের তেজ খোলস-খসা সাপের মত নিস্তেজ হয়ে এল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাজীব সান্যাল মোহভরা অপরাহ্নকে লক্ষ্য করছিল। সারাদিনের ঘাম প্যাচপ্যাচানি গরম এখন প্রায় অন্তর্হিত। জানার বাগানে একটা ঝাঁপালো পাতাবাহার ঝোপের আড়ালে বিচিত্র রংবেরংয়ের কি একট পাখী উড়ে এসে বসল। রাস্তার ওদিকে একটা তেঁতুল গাছের উঁচু ডালে হলদে রোদ দিনশেষের নিশানার মত স্থির হয়ে রয়েছে।

নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রাজীব বলল, 'আচ্ছা মিসেস মজুমদার, আপনাকে আর আটকে রাখতে চাই না। কিন্তু আপনার কলকাতার ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যান। প্রয়োজন হতে পারে।'

ভদ্রমহিলা ঠিকানাটা বললেন। রাজীব লিখে নিয়ে ও'র দিকে তাকাল। কেমন খটকা লাগল মনে। যেন আরো কিছু বলতে চান উনি।

'একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি।' মিসেস মজুমদার চিন্তিত মুখে বললেন। 'আমার মনে হয় এটা আপনাকে বলা দরকার—।'

'বেশ তো, বলুন না।'

'নিখিলেশের সঙ্গে তরুণার বি[illegible] আমি আপত্তি করেছিলাম। মেয়ে [illegible] কথা শুনতে চায় নি। গত মাসে কলক[illegible] গিয়ে আমাকে একরকম বলেই এসে[illegible] সে নিখিলেশ ছাড়া আর কাউকে [illegible] করবে না। কাউকে না—।'

মৃদু হেসে রাজীব বলল, '[illegible] আপনার আপত্তির কারণটা কি? নিখি[illegible] ভালো চাকরী করে। ভবিষ্যত অ[illegible] তবে—?'

'ওর সম্বন্ধে একটা উড়ো চিঠি [illegible] ছিলাম আমি। তাতে লেখা ছিল নিখি[illegible] ভালো নয়,—কলকাতায় নাকি [illegible] আরেকটা বউ আছে।'

রাজীব সান্যাল আবার হাসল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তরুণার [illegible] একটা ইচ্ছে ছিল ইন্সপেক্টরবাবু। শেষ [illegible] বলতে পারেন। তরুণাকে যে কো[illegible] দিন পেটের জন্য দূরদেশে চাকরী ক[illegible] হবে এ আমাদের কল্পনাতেও সে[illegible] আসেনি। ও'র ইচ্ছে ছিল, আমারও [illegible] ছিল। তরুণার একটা ভালো বিয়ে [illegible] সুন্দর, ভদ্র, একটি ছেলের সংগে। [illegible] আর সংসার নিয়ে সুখে থাকুক তর[illegible] কিন্তু—।' ভদ্রমহিলার একটা দীর্ঘ[illegible] পড়ল।

রাজীব সান্যাল বলল, 'মনে [illegible] কাউকে পাত্র হিসেবে ভেবেছিলেন না[illegible]

মিসেস মজুমদার বললেন, 'চুঁচু[illegible] ও'র এক বন্ধু থাকেন। স্কুলের অ্যাসিস্ট[illegible] হেড মাস্টার। উনি বেঁচে থাকতেই এক[illegible] কথাবার্তা হয়। তরুণার তখন কত [illegible] বয়স? ষোল সতের হবে। হা[illegible] সেকেন্ডারী পরীক্ষাও দেয় নি। কথা [illegible] কয়েক বছর পরে ও'র ছেলের স[illegible] তরুণার বিয়ে দেবেন। ততদিনে ছেলে[illegible] জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে।'

'তারপর?'

'গত মাসে আমি একটা চিঠি লি[illegible] ছিলাম চুঁচুড়ায়। প্রতিশ্রুতি রাখতে উ[illegible] রাজী। ছেলেটি এখন কলেজের প্রফেস[illegible] বলুন তো এমন সৌভাগ্য কি সকলে[illegible] হয়?' ম্লান হেসে উনি যোগ করলে[illegible] 'আমার অবশ্য দুর্ভাগ্যের কপাল। সৌভা[illegible] কি ঠাঁই পায়?'

প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে শচীদুল[illegible] থামল। আচমকা একটা ঝোড়ো হাওয়[illegible] দরজাটা যেন সশব্দে খুলে গেল।

'কি ব্যাপার শচী?'

'ঐ রুমালটা স্যার, কাদামাখা রুমালটা কেচে ধুয়ে পরিষ্কার করেছি[illegible] ও রুমালটা কার জানেন স্যার?'

রাজীব কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকা[illegible]

চীৎকার করে শচীদুলাল বল[illegible] 'নিখিলেশের স্যার। এই দেখুন, এক কো[illegible] এমব্রয়ডারীর কাজ। ছোট্ট একটা ফুল,-[illegible] তার নীচে এন অক্ষরটা কেমন জ্বল জ্ব[illegible] করছে, না স্যার?'

(ক্রমশ[illegible]
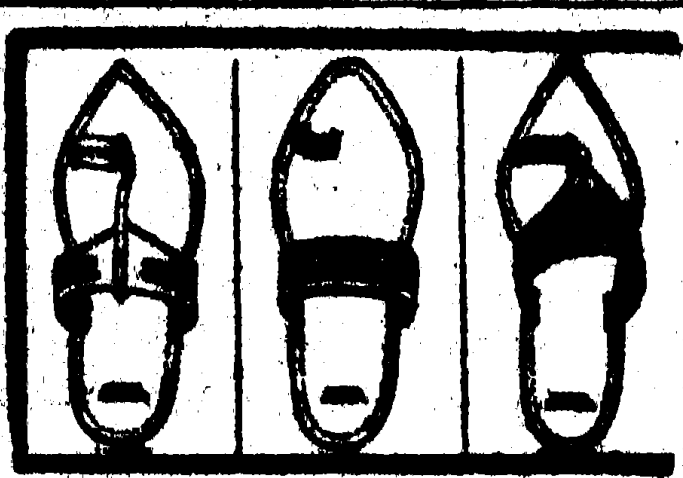
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারতীয় সাহিত্য

তামিল সাহিত্য সম্মেলন ॥

কিছুদিন আগে মাদ্রাজের ত্রিচিনোপল্লীতে তামিল সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিল 'তামিলনাড়ু বলভি ইলক্কীয় পরুক্দম'। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত তামিল সাহিত্যিক 'জীবানন্দম'। এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬১ সালে। দুঃখের বিষয় 'শ্রীজীবানন্দম' কোনও অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি। ১৯৬৩ সালে অতি অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এ'দের উদ্যোগে প্রথম তামিল সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালের মে মাসে মাদুরাইতে। এই সম্মেলনে প্রায় ১,০০০ হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে পোলাচিতে। এবার তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ত্রিচিনোপল্লীতে।

জেলার স্কুলের প্রাঙ্গণে এই সম্মেলনের অধিবেশন বসে। প্রায় তিনশত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে বহু প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং শিক্ষাবিদ ছিলেন। শ্রীকে দামোদরন, এম-পি, শ্রীপনকুম.ম ভার্কি কেরালা থেকে এসেছিলেন এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য। শ্রীএ কে আব্বাস এসেছিলেন বোম্বাই থেকে আর শ্রীএম সাজ্জাদ জাহীর এসেছিলেন দিল্লী থেকে। এ'রা সকলেই বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

সম্মেলনে মোট তিনটি অধিবেশন বসে—প্রতিনিধি সম্মেলন, প্রকাশ্য সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মোট চারদিন এই সম্মেলন চলে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি শেষদিন রাত ৯টা থেকে আরম্ভ হয় এবং সারারাত ধরে চলে।

প্রকাশ্য অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীমীনাক্ষী সুন্দরম্। উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রীকে এ আব্বাস। শ্রীআব্বাস তাঁর ভাষণে বলেন—"ভারতের উত্তর প্রান্তের জনসাধারণ দক্ষিণ প্রান্তের সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ অবগত নন। উত্তরের প্রদেশগুলিতে এমন বহু লোক আছেন, যাঁরা দাক্ষিণাত্যে কোথায় কোন ভাষা প্রচলিত, তাও জানেন না। ঠিক অনুরূপ ভাবেই দেখা যায় দাক্ষিণাত্যের লোকদেরও—উত্তরাপথের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট।" শ্রীআব্বাস আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে বলেন—"ভারতের সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রের মৈত্রী স্থাপনের জন্য ভারতে বহু প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের মৈত্রী স্থাপনের তেমন কোনও প্রতিষ্ঠান নেই। আরও আশ্চর্য এই যে, যাঁরা বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী সমিতি স্থাপনের জন্য বেশি উৎসাহী, তারাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের মিলনক্ষেত্র স্থাপনের বিরোধী।"

এই সম্মেলনে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সভারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে 'তামিল মহিলা সাহিত্যিকদের' উপর আলোচনা সভাটি খুবই আকর্ষক হয়ে ওঠে। মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে কাম্নাগি, মাধবী ও পাণ্ডালী—এই তিনজনের মধ্যেই আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকে। 'ভারতি'র উপরও একটি বিশেষ আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সম্মেলনের আর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল—'কবি রঙ্গম' এবং 'পত্তিমনর'। এ দুটি তামিল সাহিত্য সম্মেলনের বিশেষ ঐতিহ্য। 'কবি রঙ্গম' অনেকটা উর্দু 'মুসায়ারা' অনুষ্ঠানের মত। এতে কবিরা সমবেত হয়ে কোনও একটা বিষয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এই 'কবি-রঙ্গম'এর বিষয় প্রখ্যাত তামিল কবি "সুব্রাহ্মণ্য ভারতি'র—"শক্তি সর্পবিনাশের প্রধান উৎস' বা "বোধি যা জীবনকে পল্লবিত করে, তার মূল শক্তি" ইত্যাদি কবিতার লাইন থেকে গ্রহণ করা হয়। 'কবি-রঙ্গম'এ পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত কবি শ্রীএস বি সুন্দরম। শ্রীকে সি এস অরুণচলমের কবিতাটি খুবই উল্লেখযোগ্য হয়।

'পত্তিমনর' হল তামিলনাদের একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত সাহিত্যিক বিতর্কের অনুষ্ঠান। আলোচ্য সম্মেলনে 'পত্তিমনর'র বিষয় ছিল "তামিল চলচ্চিত্র"। এতে পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ শ্রী কে, বালধান্দাযুথম্। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীপুকোবায় কিরণ, শ্রীসালাই ইলাম্বিরিয়ান, শ্রীকুরু থামাইঝাগম। এবারের অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন কারণেই উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে।

শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে ॥

বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ছিল তাঁর ত্রি-নবতিতম জন্মদিবস। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাঁর জন্মদিবস উদযাপিত হয়।

ঐদিন 'মহাজাতি সদনে' শিল্পী সংস্থার উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী শরৎ-সাহিত্য সম্মেলনের শুরু হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "তাঁর রচনা দেশ, কাল ও ধর্মের সীমানা পার হয়ে ক্লাসিকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।"

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—'শরৎচন্দ্র ছিলেন অতি দরদী ও সমব্যথী লেখক। তাঁর রচনা বাংলার চিরকালের সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির 'শরৎ-সাহিত্যের উপর একটি সারগর্ভ ভাষণ দেন। তাঁর ভাষায়—"মানুষের দুঃখ বেদনার রস শরৎচন্দ্র শুধু উপভোগই করেননি, সে রস তিনি পাঠক সমাজের মধ্যেও পরিবেশন করেছেন।" শ্রীমনোজ বসু বলেন—"শরৎচন্দ্র দুই বাংলা দেশেই জনপ্রিয়। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অবগাহন করে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বাঙালীকে পুনরুজ্জীবিত হতে হবে।"

সভাপতির ভাষণে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় জানান যে, পূর্ববঙ্গে শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনীত হচ্ছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় শরৎচন্দ্রের রচনা অনুদিত হয়েছে। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে পাঠক-সমাজের এত কাছে এসেছেন যে, তাঁকে পাঠকরা নিজেদের লোক বলেই মনে করেন। তিনি নারীর মর্যাদা শ্রদ্ধার সঙ্গে দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ, অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রমুখও শরৎচন্দ্রের বিভিন্নমুখী প্রতিভার উপর আলোচনা করেন।

'শরৎ-সমিতি'র উদ্যোগে ৯৯নং জওহরলাল নেহরু রোডে সন্ধ্যার শরৎ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'বনফুল'। তাঁরা দুজনেই শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা

করেন। বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়া শরৎ-স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র উদ্যোগে শিবপুরে ৩নং শশিভূষণ ঘোষ লেনস্থ ভবনে সন্ধ্যায় এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। 'বিবেকানন্দ বালিকা বিদ্যালয়ের' উদ্যোগেও শরৎ জয়ন্তী পালিত হয়। সিউড়ির 'বিবেকানন্দ পাঠাগার' সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। অধ্যাপক জনীন্দ্রনাথ ঘোষ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীঘোষ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন। আরও বহু প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শরৎ-জয়ন্তী পালিত হয়। শরৎ-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবার নতুন করে প্রমাণিত হয়।

কলকাতায় উমাশঙ্কর যোশি ॥

উমাশঙ্কর যোশির নাম বাংলা দেশে অপরিচিত নয়। তিনি মাত্র কয়েক মাস আগে কলকাতায় 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে' এসেছিলেন। এবার এসেছিলেন কলকাতার গুজরাটি সাহিত্য মণ্ডলের আমন্ত্রণে। তিনি কলকাতায় কয়েকটি সভায় সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে ভাষণ দেন। তাছাড়াও ২১শে সেপ্টেম্বর বাংলা দেশের বিভিন্ন সাহিত্যিকের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন।

পাঞ্জাবী কবিতার সাম্প্রতিক কাল ॥

পাঞ্জাবী কবিতার সাম্প্রতিক কাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। অথচ পাঞ্জাবী সমালোচকদের ভাষায়, পাঞ্জাবী কবিতার এর চেয়ে কোনও সমৃদ্ধ সময় এর আগে আসেনি।

সাম্প্রতিক পাঞ্জাবী কবিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীহরভজন সিং। যদিও তাঁর কবিতা খুবই অনুভূতিপ্রবণ, তবু বাস্তব বর্জিত নয়। তিনি জীবনকে পরিপূর্ণভাবে দেখবার পক্ষপাতী। তাই তিনি জীবনের পরিবর্তনশীলতাকে অস্বীকার করেন নি। একটি কবিতায় তিনি দেখাতে চেয়েছেন, আলো-অন্ধকারের আবর্তে বর্তমান যুগের মানুষ কিভাবে জটিল জীবন যন্ত্রণায় ভুগছে। তাঁর মনে হয়, এক নিবিড় অন্ধকার অরণ্যে তিনি যেন ক্রমাগত হারাচ্ছেন। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"আমি একটা অজানা ভয়ের জন্যে
সর্বদাই ভীত :
সে জন্যই আমি আমার নিজস্ব
আত্মার দিকে
ফিরে তাকাতে ভয় পাই।
জনতার সঙ্গে আমি বাইরে গিয়ে
তাই মিশে যাই,
আমি আত্মার সঙ্গে মিলিত হতে গিয়ে
ক্রমশঃ পালিয়ে যাই দূরে।"

এইভাবে নিজের অস্তিত্ব থেকে কবি ক্রমশ দূরে সরে যান। বর্তমান সময় আমাদেরকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এক মুহূর্ত সময় পাই না, আত্মার মুখোমুখি দাঁড়াতে। আর একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"প্রতিটি পত্রে
রাস্তায় বেরিয়ে
আমি এবং নক্ষত্রপুঞ্জ
একই সঙ্গে ঘুমাই।
আমরা পরস্পরের পুষ্পিত দেহের
সাক্ষী হয়ে রইলাম।
আলোকে অস্বীকার করলাম
আমরা।"

শ্রীশিবকুমার তরুণ পাঞ্জাবী কবিদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'আরশি' পত্রিকায় তাঁর একটি খুবই উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীশিবকুমার কবিতায় সাধারণ জীবনের কথা উচ্চারণ করেছেন। তাঁর বাচনভঙ্গিতেও কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে। মুখের ভাষাকে কবিতায় স্থান দেবার তিনি পক্ষপাতী। 'বীট' কবিদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত। তবে জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা সম্ভব, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না।

শ্রীমতী অমৃত প্রিতমের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় খুবই নিবিড়। ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক হিসেবেও তাঁর পরিচয় সর্বজনবিদিত। তাঁর বহু কবিতার অনুবাদ ভারতীয় এবং অভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'নাগমণি' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি খুবই উল্লেখ্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতী প্রভজোত কাউরেরও কয়েকটি কবিতা এ বছরের পাঞ্জাবী কবিতার অন্যতম আকর্ষণ। গত বছর তাঁকে "পদ্মশ্রী" সম্মানে ভূষিত করা হয়। শ্রীমতী কাউরেরও কবিতা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ভিয়েতনামের উপর লিখিত একটি কবিতা সংকলনও এ বছরের একটি বিশিষ্ট সংযোজন। ভিয়েতনামের উপর লেখা বিভিন্ন কবির রচনা এতে সংকলিত হয়েছে।

প্রেমচাঁদের উপর ইংরেজি গ্রন্থ ॥

ভারতীয় সাহিত্যের পাঠকরা শুনে খুশি হবেন যে, প্রখ্যাত লেখক প্রেমচাঁদের রচনা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর ইংরেজিতে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয়দের কাছে প্রেমচাঁদের পরিচিতির বিশেষ অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ভারতের বাইরে একমাত্র রাশিয়া ছাড়া তাঁর পরিচিতি খুবই সীমি ইংরেজিতে তাঁর মাত্র ১০টি গল্প এপর্য প্রকাশিত হয়েছে। এইদিক থেকে বর্ত গ্রন্থটির প্রকাশ খুবই সময়োপযো হয়েছে বলা যেতে পারে। গ্রন্থটি লিখে ও সম্পাদনা করেছেন এন এইচ জাই প্রকাশিত হয়েছে হনলুলুর 'ইস্ট ওে সেণ্টার প্রেস' থেকে।

কিন্তু এই গ্রন্থটি বিদেশী পাঠকে তেমন উৎসাহিত করতে পারেনি। কারণ, মূল ভাষা সম্বন্ধে পাঠকে অজ্ঞতা। অর্থাৎ প্রেমচাঁদ এমন বহু তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন, যার হুব ইংরেজি অনুবাদ হয় না। সেক্ষেত্রে সম্পা নানাপ্রকার টিকা দিয়েছেন। কিন্তু সেগু বিদেশী পাঠকের পক্ষে খুব উপয় হয়নি।

এই সংকলনে প্রেমচাঁদের নয়টি গ সংকলিত হয়েছে। এই গল্পগুলির ম সম্বন্ধে বিশেষ কোনও প্রশ্ন উঠবে ব মনে হয় না। এদিক থেকে সম্পাদ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। এছাড়া গল্পগুলিতে ভারতীয় জীবনের কিছু কি পরিচয়ও আছে। ফলে, এই গল্পগুলি প করলে বিদেশী পাঠকরা ভারতীয় সমাজ জীবনেরও কিছু কিছু পরিচয় পাতে সম হবেন।

বাঙলা ভাষার জন্য ॥

বাঙলা ভাষার জন্য আবার পূর্ব বাঙলায় আন্দোলন গড়ে উঠছে বাঙলা অক্ষরের এবং বানানের সংস্কারে জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমি কাউন্সিল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ। দৈনিক পাকিস্থান পত্রিকায় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব বাঙলার ৪২ জন লেখক, সাংবাদিক ও কবির একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, যদি এই প্রস্তাবিত সংস্কার এবং বানান পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাহলে হাজার বছরের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যোগাযোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। এছাড়াও শব্দের অর্থ এবং কবিতার কাঠামো ব্যাহত হবে।

প্রখ্যাত কবি জসিমউদ্দীনও এক পৃথক বিবৃতিতে এর প্রতিবাদ করেছেন এবং বাঙলা অক্ষরের এই সংস্কার থেকে বিরত থাকবার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এই সংস্কার চালু হলে জনসাধারণের পক্ষে আন্দোলন করা ছাড়া কোনও পথ থাকবে না বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বিদেশী সাহিত্য

আত্মহত্যার শিক্ষণালয় ॥

পশ্চিমী দুনিয়ায় এককালে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয় ছিল শ্বেতাঙ্গ সমাজের নানা অসঙ্গতি। এখনো তাই। তবে ইদানীং এ-ব্যাপারে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরাও খানিকটা জায়গা করে নিয়েছেন।

এমন একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ হলেন ড্যানিয়েল স্টার্ণ। লেখক-সমালোচক হিসেবে তিনি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তাঁর দুটি উপন্যাসের নাম হলো—'আফটার দি আমেরিকা' এবং মিস আমেরিকা।

সম্প্রতি তিনি 'দি সুইসাইড একাডেমী' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। বর্তমান সমাজ সম্পর্কে তাঁর ধারণা কিছুটা বিরক্তিকর। সমালোচকেরা মনে করেন, আধুনিক জীবনবোধের নোংরা অধ্যায়গুলি তাঁর লেখায় বিদ্রূপাত্মক ভাষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই উপন্যাসে স্টার্ণ আধুনিক যান্ত্রিক-সভ্যতার ভেতরে মানুষের দুঃসহ অবস্থান নিয়ে বহু শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন। তাঁর পাত্র-পাত্রীরা যেন পুতুলের মতো খেলা করছে।

'ওয়েলকাম টু দি মাস্টিক হাউস' উপন্যাসেও তিনি মানবসভ্যতার এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। সেখানেও ছিল যান্ত্রিক সভ্যতায় লালিত মানুষদের আত্মহত্যার পথে এগোবার ইঙ্গিত।

'সুইসাইড একাডেমী' এদিক দিয়ে অনেক আশাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। মানবসভ্যতা সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কা এখনো না কাটলেও, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে একেবারে হতাশ নন।

রাজনীতি নিয়ে উপন্যাস ॥

মার্কিনী ঔপন্যাসিক অ্যালেন দ্রুরির সাম্প্রতিক উপন্যাস 'প্রিজার্ভ অ্যান্ড প্রোটেক্ট' প্রকাশিত হয়েছে কয়েক মাস আগে। সমকালীন রাজনীতির অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি লেখা হয়েছে।

এ উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই আদর্শবাদী, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট মতবাদে স্থির নয়। বর্তমান মার্কিনী সমাজকে তিনি দেখেছেন অন্ধকার ও জটিলতার আবদ্ধ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা সকলেই যেন একটা সর্বগ্রাসী সংশয়ের মধ্যে দিন কাটায়। এবং এর কাহিনী কোনো ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ক্রমাগত ঘুরপাক খায় আভ্যন্তরীণ জটিলতায়।

এর আগেও দ্রুরি সমকালীন রাজনীতি নিয়ে আরো কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। এদিক থেকে 'প্রিজার্ভ অ্যান্ড প্রোটেক্ট' উপন্যাসটি একই সিরিজের চতুর্থ গ্রন্থ। এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 'অ্যাডভাইস অ্যান্ড কনসেন্ট' প্রকাশিত হয় বেশ কিছুকাল আগে।

আজকের এই প্রতিবাদের সময়কে তিনি আখ্যা দেন—'সেভেজ সেভেনটিজ'। তাঁর মতে, আমেরিকা এখন ঘরের ছেলে এবং বাইরের কম্যুনিস্টদের নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে।

এবং এইসব উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক বোঝাতে চান যে আমেরিকা এখন নানাপ্রকার বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেউ যুদ্ধ চায়, কেউ চায় না। রাজনৈতিক অপঘাতের ফলে দেশে যে সংকট দেখা দিয়েছে—তাই তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ক্রমশ অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

পরলোকে ক্রিশ্চিয়ান অ্যাডামসন ॥

সম্প্রতি মার্কিনী লেখক হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাডামসন পরলোকগমন করেছেন সানফ্রান্সিসকোতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটাত্তর বছর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি একবার বিমান গোলযোগে রিকেনবেকারসহ অন্য ছয়জন সহযাত্রীর সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের দুর্গম অঞ্চলে নামতে বাধ্য হন। পুরো তেইশদিন তাঁকে জলের মধ্যে বিপজ্জনক অবস্থায় ভেসে থাকতে হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অ্যাডামসন অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বই লেখেন। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবনরক্ষার দুঃসাহসিক ঘটনাবলীতে প্রতিটি গ্রন্থ আকর্ষণীয়।

সমালোচকদের মতে, তাঁর লেখা কৃত্রিমতা বর্জিত এবং আন্তরিক। কখনো কোনো কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেননি তিনি। নিজের চোখে যা দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন—তাকেই তিনি তাঁর লেখার মৌল-প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

অবিশ্বাস্য খেলোয়াড় ॥

মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে মিস মৌরীন ডাফি এখনো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। লন্ডনের তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর সুনাম ইদানীং ছড়াতে শুরু করেছে।

সম্প্রতি 'দি প্যারাডক্স প্লেয়ার্স' নামে তাঁর একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। এ উপ-

ন্যাসের নায়ক একজন তরুণ লেখক। সে টেমস নদীর মধ্যে একটি হাউস-বোটে বাস করে। স্ত্রী এবং সন্তানের কাছ থেকেও সে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। তার নৌকাটিও পুরনো। মাকড়সার জাল মাথার ওপরে। প্রত্যেক রাত্রে ইঁদুর বেড়ালের দল কামড়ার ছাদে মৃত্যুর নাচ দেখায়।

লেখিকা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার এই দুঃসহ জীবনযাপনের কথা বর্ণনা করেছেন।

জ্বলন্ত দর্পণ ॥

স্যামুয়েল নাথানিয়েল বেরম্যানের বয়স এখন পঁচাত্তর বছর। সম্প্রতি তিনি নাটকের পরিবর্তে উপন্যাস লেখায় ব্যস্ত। এতদিন যেসব কথা তিনি কুশীলবদের মুখ দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন, এখন সেই বক্তব্যকেই বলতে চান উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মাত্র কয়েক মাস আগে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি বার্নিং গ্লাস' প্রকাশিত হয়েছে।

এই উপন্যাসে বেরম্যানের দৃষ্টি কিছুটা অতীত-মুখী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মানুষ যেভাবে নাজী আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল মধ্য ইউরোপে, তারই পটভূমিকায় উপন্যাসটি লেখা হয়েছে।

এর নায়ক একজন ইহুদী চিত্রনাট্যকার। তার নাম স্টানলি। সে প্রথম কমেডি লিখে ব্যর্থ হয়। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে কিছুটা সাফল্য অর্জন করে। সে স্টিফানী ভন আর্নিম নামে এক তরুণী অস্ট্রিয়ান চিত্র-তারকার প্রেমে পড়ে যায়। এবং শীঘ্রই সিদ্ধান্ত করে ফেলে, সালবার্জ ক্যাসেলে তাঁরা কিছুকাল একসঙ্গে কাটাবে। উদ্দেশ্য প্রেমিকার প্রতিভা ও অভিপ্রায়ের উপযোগী করে একটি কমেডি নাটক লেখা।

আসলে স্টানলি ছিল একজন আত্ম-সচেতন মানুষ। নায়িকার অতিথি হিসেবে সে সালবার্জ-এর সঙ্গীত সু প্রবেশের সুযোগ পায়। কিন্তু বিষয় সে বুঝতে পেরেছিল যে ই হিসেবে হিটলারের চোখে তার ক্ষমা তার পোষাক-আষাক স্থানীয় জনস মতো নয়। এই মুহূর্তে তার যাওয়াই উচিত।

এবং ভাবামাত্রই সে আর সেখানে দন্ড রইল না। চলে এলো হলিউডে। এ এসেও তার দুঃখ ঘোচে না। সালবা পুরোনো সঙ্গীরা এখানে হানা দেয়, ট জন্য সিনেমা চত্বরের চারদিকে ঘোরা করে। ন্যাথানিয়েল বেরম্যান এই ঘটন ওপর বিদ্রুপাত্মক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে

সমালোচকদের মতে, বেরম্যানের হ উড হলো 'প্রতিভাধর উদ্বাস্তুদের একটি উন্মাদাগার।' তাঁর চোখে হলিউড পরিবেশ যেন পুরোনো দিনের প্যা কিংবা জেনেভার মতো।

নতুন বই

আমার শিকার স্মৃতি— বিজয়কান্ত সেন। মেরিট পাবলিশার্স। ৫১, বিধান সরণী। কলকাতা—৩। দাম পাঁচ টাকা।

বাঘে মানুষে—বিশ্বনাথ বসু। অরুণা প্রকাশনী। সিগনেট বুক শপ। ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

ভারতের অরণ্যে হিংস্র জন্তুর অভাব নেই। অভাব নেই দুর্ধর্ষ শিকারীর। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ দুখানিই বাঙলা ভাষায় রচিত শিকারকাহিনীতে উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন।

বিজয়কান্ত সেন ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিকারী। তের বৎসর বয়সে বন্দুক হাতে নিয়ে তিনি সুদীর্ঘ জীবন ভারতের অরণ্য অঞ্চলে নানান দুঃসাহসিক শিকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। হিংস্র জানোয়ারকে কখন অতি সহজে নিহত করেছেন, কখনও নিজের জীবন হয়েছে বিপন্ন। শিকারের বিশেষ জ্ঞান জাঙ্গল-ক্রাপট বা অরণ্যচারী জীবজন্তুর চালচলন বিষয়ে ছিল শিকারীর অসাধারণ জ্ঞান। 'আমার শিকার স্মৃতি' শুধু শিকারের বইই নয়, এই বিশেষ দিকটিতে গভীর আলোকপাত করে। রোমাঞ্চকর এই শিকারকাহিনী গ্রন্থকার স্বয়ং লিখে যেতে পারেন নি। লিখেছেন তাঁর কন্যা জ্যোতি সেন।

'বাঘে মানুষের' গ্রন্থকারকে শিকারীর চেয়ে পশুপ্রেমিক বলা উচিত। তিনি অরণ্যকে ভালবাসেন, অরণ্যের অধিবাসীরা তাঁর কাছে আরও প্রিয়। বর্তমান গ্রন্থে একজন বড় শিকারীর পক্ষে সংযম যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এককালের বিখ্যাত শিকারী কালীপদ নাথের শিকার অভিজ্ঞতার বিস্ময়কর চিত্র নিপুণভাবে গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন। এই বিস্মৃত মানুষটিকে আবার বাঙলা দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত করবার গৌরব শ্রীবসুর। তিনি আরো কয়েকজন শিকারীর কথা বলেছেন, কিন্তু সব সময় নিজেকে আড়ালে রেখে। গবেষকের মন নিয়ে শিকার অভিযানকে বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের প্রাণবন্ত ভাষা-নৈপুণ্যে গ্রন্থখানি যে কোন পাঠককে আকৃষ্ট করবে। সুমুদ্রিত মনোরম প্রচ্ছদ এবং ভেতরের সুন্দর ছবিগুলি প্রকাশকের সুরুচির পরিচায়ক।

●

আরণ্য প্রেমকথা (কাহিনী) নলিনীকুমার ভদ্র। কথাশিল্প। ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নলিনীকুমার ভদ্র ইতিপূর্বে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ধরনের কাহিনী পরিবেশন করে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। একদিন তাঁর 'বিচিত্র মণিপুর' অসামান্য বৈচিত্র্যের জন্যই পাঠক মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। লেখক সম্প্রতি 'আরণ্য প্রেমকথা' নামক গ্রন্থে পূর্বভারতীয় আদিবাসী সমাজের কিছু কাহিনী পরিবেশন করেছেন। পূর্ব ভারতের আদিবাসী সমাজের মধ্যে মণিপুরীদের নিজস্ব লিপি এবং বর্ণমালা আছে, এই ভাষার নাম মৈতেই ভাষা। পূর্ব ভারতের অন্য কোনো আদিবাসী জাতির নিজস্ব ভাষা নেই, তাই তাদের কাহিন তেমন প্রচার লাভ করেনি। এই গ্র অন্তর্ভুক্ত 'খাম্বা ও থইবি' নামক কাহিন মৈতেই ভাষাতেই লিখিত।

'শাম্বক ও শিকনার' নামক কাহিনী বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে রচিত, কি জনপ্রিয়তার ফলে লোকমুখে না পাহাড়ের সর্বত্র প্রচলিত হয়ে লোককথ মর্যাদা লাভ করেছে। এই গ্রন্থে 'জাকি পানেই' নামক গল্পটি অসমিয়া সাহি শিল্পী রজনীকান্ত বরদলই কৃত মি জিয়ারি নামক গ্রন্থ থেকে রূপান্তরিত। লেখক এই গল্পগুলির মধ্যে অরণ্য মানুষের প্রেম ও প্রকৃতির এক আশ্চ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদচিত্র খালেদ চৌধুরীর আঁকা এবং ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

●

The Select Gokhale (collection o speeches)—Edited and compile by R. P. Patwardhan. Maharash tra Information Centre, New Delhi-1. Price Rs 4.30.

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গোপালকৃষ্ণ গোখলে একটি স্মরণীয় নাম। বাঙলাদেশের মানুষ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই মনীষীর অবদানকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়ে থাকে। দেশের শিক্ষা বিস্তার, স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ, দেশবাসীর অধিকার রক্ষা, সব বিষয়েই ছিল তাঁর জাগ্রত দৃষ্টি। ভারতবাসীর রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষে গোখলের অনস্বীকার্য গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আজও বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

১৯৬৬ খৃঃ দেশব্যাপী তাঁর জন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপনকালে তাঁর বিষয়ে নতুন করে ভেবে দেখা শুরু হয়। একালের সমালোচক ও ঐতিহাসিকের কাছে গোখলে নতুন-রূপে প্রকাশ পান। সেই সময়ে নয়াদিল্লীর মহারাষ্ট্র ইনফরমেশন সেণ্টার গোখলে শত-বার্ষিকী উপলক্ষে দুখানি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিছুকাল আগে প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'দি সিলেক্ট গোখলে' গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থে গোখলের চৌত্রিশটি ভাষণের পুনর্মুদ্রণ আছে। বাগ্মী ও বিদ্যা-বিদ এই মনীষীর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে। সম্পাদনা করেছেন আর-পি-পাতওয়াবধন।

রূপকথার ঝাঁপি (গল্পসংগ্রহ)—
সুজিতকুমার নাগ। সূচীপত্র। ৩৫সি, সূর্য সেন স্ট্রীট। কলকাতা-৯। দাম ঃ দু'টাকা।

ছোটদের জন্য লেখা সাতটি ছোট-গল্পের সংকলন 'রূপকথার ঝাঁপি'। গল্পগুলি পড়ে ছোটদের ভাল লাগবে। লেখকের ভাষা বেশ স্বচ্ছ।

শারদ সংকলন

সাপ্তাহিক বসুমতী (শারদীয়) সম্পাদক ঃ জয়ন্তী সেন। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

তিনটি উপন্যাস লিখেছেন আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুশীল রায়। গল্প, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, নিবন্ধ, আলোচনা, বিজ্ঞান, স্মৃতিকথা, চলচ্চিত্র, খেলাধুলো প্রভৃতি লিখেছেন সত্যেন বোস, অন্নদাশংকর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরিমল গোস্বামী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামাপদ চৌধুরী, লীলা মজুমদার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, শক্তিপদ রাজগুরু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বিষ্ণু দে, মনীশ ঘটক, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাস, জগন্নাথ চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ মিত্র, ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, গোপাল ভৌমিক, অরুণ ভট্টাচার্য, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুবোধকুমার চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রাণতোষ ঘটক, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

অভিনয় দর্পণ—শারদীয়। প্রধান সম্পাদক ঃ ঋত্বিক ঘটক। ১৩১ হরিপদ মুখার্জি রোড। কলকাতা-২৬। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অল্পকালের মধ্যে অভিনয় দর্পণ পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এদের প্রথম শারদ-সংখ্যাটি সুসম্পাদিত এবং সংগ্রহযোগ্য। এই সংখ্যায় কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটক লিখেছেন সুধাংশু দাশগুপ্ত, মনোজ মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রতনকুমার ঘোষ, অশোক মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, জ্যোছনা দস্তিদার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। শন ও' কেসী, ওয়ুকুয়াড় বরশার্ট, সোয়ানসং-এর রচনার অনুবাদ এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্জরী অপেরা উপন্যাসের নাট্যরূপ সংখ্যাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। উদয়শংকর এবং শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি নিবন্ধ বেশ মূল্যবান।

একসাথে ঃ সম্পাদিকা—কনক মুখোপাধ্যায়। ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা—১২, দাম ঃ ১-৫০ টাকা।

একসাথের শারদ সংকলনে নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, বিমলা রণদিভে, কনক মুখোপাধ্যায়, ছবি বসু, দীপান্বিতা মিত্র, কমল সেনগুপ্ত, বিজয়া দেবী, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত, মহুয়া চক্রবর্তী, ডলি দাস প্রমুখের গল্প কবিতা, প্রবন্ধ ছাড়াও আন্তন চেখফের একটি উপন্যাস, কয়েকটি বিদেশী কবিতার অনুবাদ, এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

শুকসারী (শারদ সংখ্যা) — সম্পাদক ঃ মিহির আচার্য। ১৭২-৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪। দাম—দু'টাকা।

গল্পের কাগজ শুক-শারীর বর্তমান সংখ্যাটি গল্প ও প্রবন্ধ সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিচিত্র-স্বাদ এবং নানান রীতির গল্পের সমাহারে পত্রিকাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। লিখেছেন মিহির আচার্য, অজিত মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, বিশু চৌধুরী, গৌর বিশ্বাস, মুকুল রায়, বাসুদেব দেব, উৎপল চক্রবর্তী, মতি মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ ভট্টাচার্য, সমরেশ দাশগুপ্ত, শংকর দাশগুপ্ত, সুনীল দাশ, দেবীপদ মুখোপাধ্যায়, মীরা দেবী, বিশ্ববিজয় গোস্বামী, অসিত ঘোষ, সুখময় মুখোপাধ্যায়, অমল রাহা, ভবেন্দ্রনাথ সাইকিয়া, অজিত চট্টোপাধ্যায়।

সমকাল—অক্টোবর, ১৯৬৮। সম্পাদক ঃ প্রণব বসু ও শংকর রায়। সেলিমপুর রোড। কলকাতা—৩১। দাম ঃ এক টাকা।

প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প লিখেছেন জ্যোতির্ময় গুপ্ত, অসিত সরকার, কালিদাস কুণ্ডু, জীবেন সিদ্ধান্ত, শংকর রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, মনীন্দ্র রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চৌধুরী, সুব্রত সিরোগী।

অভিজ্ঞ—প্রথম বর্ষ, প্রথম সংকলন। সম্পাদক ঃ শিবনাথ রায়। ভাটরাপল্লী। বারাসাত। দাম ঃ কুড়ি পয়সা।

মণেন্দ্রনাথ দাস, সন্দীপ ঘোষাল, বিনয় রায়, অমলকুমার মণ্ডল, সুধা চৌধুরী, রোহিতাশ্ব, অরুণকুমার বসু, কাবেরী রায়চৌধুরী, শিবনাথ রায়।

শতদল—শারদীয় ১৩৭৫। সম্পাদক ঃ সরল দে। লক্ষ্মী প্রিন্টিং প্রেস। ৩৩।৪, রাজদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা—৬। দাম ঃ দু টাকা।

মৌমাছি, কালিদাস রায়, স্বপনবুড়ো, গোপাল ভৌমিক, মনোজিৎ বসু, কুমারেশ ঘোষ, নির্মলেন্দু গৌতম, রবীন সরকার, বিশু মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকের কবিতা, গল্প, ছড়া, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকথার সমাবেশে বর্তমান সংকলনটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

কালি ও কলম ঃ সম্পাদক—বিমল মিত্র, ১৫, বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ ১২। দাম ঃ ২-৫০ টাকা।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'কালি ও কলম' মাসিক পত্রিকার শারদ সংখ্যাটি। সুনির্বাচিত রচনায় এটি বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। এ সংখ্যায় লিখেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, ছবি মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্র মিত্র, সুশীল রায়, বারীন্দ্রনাথ দাশ, সুজিত ভট্টাচার্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গৌতম, আশিস মজুমদার, যজ্ঞেশ্বর রায়, শংকর, সমরেশ বসু, গোপাল হালদার, বিমল মিত্র, নকুল চট্টোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, ওংকার গুপ্ত ও অলকা বসু।

সচিত্র খামখেয়ালী (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮)— সম্পাদক ঃ রাজেন্দ্রকুমার মিত্র। ১৯এ, গোকুল মিত্র লেন। কলকাতা—৫। দাম—এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন উপগুপ্ত, প্রতিভা বসু, ইন্দ্রানী গুণ, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, অজন্তা বসু, পারিজাতানন্দ, জগদীশ পাল, মাখনলাল রায়চৌধুরী, শংকরপ্রসাদ, রবী বসু, জিতেন বিশ্বাস এবং আরো কয়েকজন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি শারদীয় সংখ্যা— সম্পাদক ঃ সঞ্জীবকুমার বসু, ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা—১। দাম ঃ তিন টাকা।

বিদগ্ধ প্রবন্ধ সাহিত্যের পত্রিকা 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'র বর্তমান সংখ্যায় দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সঞ্জীবকুমার বসু। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী'র সঙ্গে আছে অনেকগুলি মূল্যবান আর্টপ্লেট। শ্রীবসুর 'বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকা'য় সেকালের নানান পত্রপত্রিকার প্রথম পাতার ছবি থাকায় প্রবন্ধটির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আরো লিখেছেন দেবকুমার চক্রবর্তী, কালিদাস দত্ত, সুনীলচন্দ্র সরকার, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র সেন, কানাই সামন্ত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঘামের দরজায়

বীরেন্দ্র দত্ত

বেশ কিছু সময় অন্যমনস্ক ছিল প্রণতি। অন্যমনস্কতা সরে গেলে দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। মনোজ সত্যিই তাহলে এল না! অথচ ক'দিন ধরে শুধু নয়, আজও কাজে বেরুবার আগে মনোজকে বলেছিল, সিনেমার টিকিট কাটা থাকবে। না এলে সব নষ্ট হবে। মনোজ ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সামান্য আদর করতে করতে কথা দিয়েছিল, আজ পাঁচটার

মধ্যে ফিরবেই। প্রণতি যেন সব ঠিক
রাখে। নিজেও সেজে তৈরী হয়ে থা

মনোজের আদর করা, দু'টো
বাসার কথা বলা বড় যান্ত্রিক। খ
সঙ্গে ঝানু ব্যবসাদারের মতন!
উত্তেজিত হ'ল। আজ সকালের সেই স
আদরটুকুও কেমন নোংরা মনে হল
মুহূর্তে। অথচ সারাদিনে প্রণতির বি
ছিল, মনোজ আজকের যতকিছু কাজ
বাবার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে বাড়ি আস
কিন্তু কোথায় মনোজ!

নীচে গলিতে পদশব্দ হ'তে প্র
শূন্য মনে একবার তাকাল। সারাদিনের
উত্তেজনা এতটুকুও নেই। প্রণতি জান
গরাদ থেকে মাথা সরিয়ে ঘরে
বুলোল। সন্ধ্যের অন্ধকার ঘরময়। অ
জ্বালাতে ইচ্ছে করছে না। এখানে ব
বুঝতে পারছে, ওপাশের ঘরে অ

রয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ীর ঘর। শ্বশুর ফিরবেন সেই রাত্রি দশটায়। মনোজও হয়ত সেই সঙ্গে ফিরবে আজ! শাশুড়ী কানে কম শোনেন, চোখেও তেমন দেখতে পান না। তাই বেশী কথা বলা বা ঘোরা-ফেরা করেন না। প্রণতির ঝামেলা কম।

রান্নার ঠাকুরের খুন্তি নাড়ার শব্দ কানে এল। বিকেলের পর চাকর যতীনের কোন কাজ থাকে না বলে শ্বশুরের কথা-মতো ব্যবসার জায়গায় চলে যায়। আজও গেছে। প্রণতির একটিমাত্র ননদ পূরবী। হয়ত বান্ধবীদের সঙ্গে সিনেমায় ঢুকেছে। প্রণতি এখন একা।

বিরক্ত হ'ল প্রণতি। একটু বা উত্তেজিত। সকাল থেকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ছিল চারপাশ ঢেকে। দুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে, প্রণতি ঘুম ভেঙে বুঝতে পেরেছিল। গা-ধোয়া, সামান্য প্রসাধন সেরে আজ নিজেই বেরিয়েছিল, ওদের তৃতীয় বিয়ের দিন পালনের জন্যে কিছু ফুল কিনতে। দামী ধূপ, টাটকা রজনীগন্ধার তোড়া, জুঁই ফুলের মালা দু'টি, সন্ধ্যে ছ'টার ট্রিপের সিনেমার টিকিট কেটে এনেছিল। প্রণতি ঘরের বিছানায় তাকাল। সমস্ত ফুল সাজানো রয়েছে। ধূপের গন্ধ অনেক কমে এসেছে।

এলোমেলো চিন্তায় প্রণতির কিরকম রাগ হ'ল। দু' হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে প্রণতি চুপ করে বসে রইল।

মনোজের কাজের চাপে বিয়ের পর হনিমুন হয়নি। প্রথম বিয়ের তারিখে মনোজকে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল ব্যবসার কাজে। দ্বিতীয় বিয়ের তারিখেও কিছু করা সম্ভব হয়নি কি একটা কারণে যেন। তাই প্রণতি বলেছিল, একেবারে তিনটি বিয়ের তারিখ একসঙ্গে পালন করা যাবে আজ! বাইরে বেরিয়ে প্রচুর হুল্লোড় করবে ওরা দুজনে।

কিন্তু কোথায়! প্রণতির বুক শূন্য মনে হ'ল। দম বন্ধ হয়ে এল। সোজা হয়ে বসে দেয়ালে ঝোলানো অন্ধকার-ঢাকা ছবিটার দিকে তাকাল। ওদের বিয়ের দিনে তোলা ছবি। মনোজ দেখতে খারাপ নয়—অন্তত প্রণতি যেরকম ছেলে বিয়ের আগে মোটামুটি পছন্দ করত, মনোজ তা-ই। তার ওপর বড়লোক, ব্যবসাদার। প্রণতির বাবা-মা দেখে-শুনেই দিয়েছিলেন। এখন পিতা-পুত্রে মিলে চলতি ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে উঠে-পড়ে লেগেছে। মনোজকে এই ব্যাপারে বাধা দিলে বলেছে, এই বয়সে না করলে পরে আর টাকা-পয়সা হবে না। প্রণতি চুপ করে গেছে। প্রণতি কত সুখী! তাই কি? প্রণতি তো তা-ই চেয়েছিল! স্বামী সুদর্শন, প্রচুর পয়সা, একটু চালাক-চতুর হবে। আর এরকম স্বামী নিয়ে প্রণতি রাণীর মত কাটিয়ে যাবে তার ভাললাগা, ভালবাসা ও নির্ভরতার দিনগুলি।

অন্তত বাবা-মার কাছে থাকার সময় প্রণতি এসব ভাবত। কিন্তু সে সব পেয়েও সুখ-শান্তি কোথায়? মনোজকে সারাদিনে তেমন করে সে তো কাছে পায় না! মনোজ সারাদিনে স্বপ্ন দেখে তার ব্যবসার, তার স্ত্রী প্রণতির নয়। প্রণতির দিকে তাকাবার মত সময় কই তার! সকালে বেরিয়ে, দুপুরে কোনদিন বা ফেরে, কোনদিন যতীন ওখানে খাবার নিয়ে যায়। ওখানে খাওয়াদাওয়া সেরে রাত দশটার পর হিসেব-পত্তর লাভ-লোকসান খতিয়ে বাড়ি আসে। প্রণতির সঙ্গে তার হিসেব-নিকেশ সেই দশটার পর। কি চায় আর পায় সে সময়ে, প্রণতি বোঝে। গত তিন বছর ধরে রাত্রে ফেরার পর তিল-তিল করে মনোজের লাভের অঙ্ক মেলাতে চেয়েছে। মিলিয়ে দেওয়ার পর মানুষটাকে মনে হয়েছে যন্ত্র। ভাল খাইয়ে পরিয়ে সুখী করিয়ে প্রণতিকে বুঝি সেই তৃপ্তির কারণেই মনোজ এমনভাবে ধরে রেখেছে ঘরে। এত লোভ, প্রলোভন, এমন অপর্যাপ্ত অর্থের আহ্লাদ দিয়ে পুষে রেখেছে।

আর প্রণতি! বিয়ের পর যে অবধারিত ক্লান্তি আসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে—তাকে সরাতে গিয়ে কখন যেন তার শিকার হয়ে গেছে সে নিজেই। মনোজ ঠিক আছে। সে যা চায়, প্রতিদিন রাত্রে প্রণতির কাছে তা পায়। কিন্তু প্রণতি যা চায়, তার কণামাত্র পায় না। বরং কবে থেকে যেন বড় একা, অসহায়, ক্লান্ত হয়ে গেছে নিজের মধ্যে। আর ভাল লাগে না নিজের দেহকে, নিজেকে এমনকি মনোজকেও। মাঝে মাঝে তাই কেঁদে ফেলে। একা-একা ফুঁপিয়ে কাঁদেও।

আজও কান্না পেল। আজ তৃতীয় বিয়ের তারিখে প্রণতি ঠিক করেছিল, মনোজকে বাড়ির বাইরে একা পেয়ে অনেক কথা বলবে, গত তিন বছরে তিল-তিল করে জমা বিষয়ের বোঝাপড়া করে নেবে। তা-ও হল না। মনোজ কথা দিয়ে গিয়েছিল আসবেই। তার কোন পাত্তাই নেই। কেমন অপমান বোধ হল প্রণতির। সমস্তই কি তার করুণা! মনোজ বুঝি ওকে প্রচুর অর্থ, প্রসাধনের বিলাস, রাত্রের সহবাস দিয়ে করুণা করে! ওকে বাইরে বেরুবার কিছুটা স্বাধীনতা দিয়ে উদারতা দেখাতে চায়। প্রণতি বি-এ পাশ, মনোজ আগেকার ম্যাট্রিকুলেট। তাই শিক্ষিত স্ত্রীকে বুঝি অনেক সুবিধে দিয়ে বড় হয়ে থাকতে চায়!

ভাবতে ভাবতে প্রণতি ভিতরে কি-এক অস্বস্তি বোধ করল। বাইরে তাকিয়ে বড় করে নিঃশ্বাস নিল। দূরে মাঝেরহাট ব্রীজের কিছু অংশ দেখা যায় এখান থেকে। স্টেশনে ট্রেন আসার শব্দ হ'ল। সন্ধ্যের আকাশ পরিষ্কার। দূর আকাশের কয়েকটা তারা প্রণতির চোখে পড়ল। প্রণতি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভাবল, অথচ সে তার স্বামীর জন্যে বিয়ের আগের কত-কি নির্মমভাবে একান্ত গোপনে ভুলতে চেয়েছে, ভুলেছেও।

নীচে কড়া নাড়ার শব্দ হল। এতক্ষণে মনোজের আসার সময় হ'ল! বিড়-বিড় করল প্রণতি। কি কথা বলবে, মনে মনে তৈরী হ'তে লাগল ও। বা হয়ত সারারাত কোন কথাই বলবে না ও। জানালা ছেড়ে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। প্রণতির এই মুহূর্তে নীচে নেমে দরজা খোলার উৎসাহ নেই। একবার জানালার সামনে এল। নীচের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে গরাদের ফাঁকে মুখমণ্ডল চাপল। আবার কড়া নড়তেই প্রণতি বলল, 'কে?'

কোন কথা নেই। অন্যদিন 'কে' বললে মনোজ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় 'আমি' বলে। এই নিয়ে ওরা দুজনে রাত্রে বিছানায় শুয়ে হাসাহাসি করেছে খুব। আজ কোন কথাই বলছে না! অসুস্থ নাকি! নিশ্চয়ই না। তা-হলে যতীন খবর দিত। প্রণতিকে একটা মজার পরিবেশ তৈরী করে সান্ত্বনা দেওয়ার কথা ভেবে এসেছে বলেই এরকম কৌশল—প্রণতি বুঝল। প্রণতিও আজ সহজে ভোলার মেয়ে নয়। কড়া নড়ছে, শ্বাশুড়ী বুঝতে পারছেন না। ঠাকুর রান্নাঘরে রান্নার ব্যস্ততায় শুনতে পায়নি নিশ্চয়ই। প্রণতি ধীর পায়ে নীচে নেমে এল। দরজা খুলল।

প্রণতি তাকিয়ে রইল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির দিকে। মনোজ নয়! কে, কে তুমি? দু'চোখে ভয় বিস্ময় মিশিয়ে প্রণতি কেমন বোকার মত তাকিয়ে রইল।

'চিনতে পারছ?' আদিত্য বলল।

প্রণতি স্থির, হতভম্ব। গলা বোধহয় হঠাৎ শুকনো কাগজ হয়ে গেছে। কথা বলতে পারছে না।

'কি, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব!' গলা নামিয়ে হাসতে হাসতে বলল। 'এটা তোমার শ্বশুরবাড়ি, তাই জোরে কথা বলতে পারছি না।'

প্রণতির সম্বিত ফিরে এল। এখনি কি বলবে বুঝতে না পেরে কিছু সময় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চাপা গলায় বলল, 'আপনি! হঠাৎ! কি ব্যাপার!'

'আবার আপনি কেন, 'তুমি' বলো। তোমার বিয়ে হয়ে গেছে তো!'

প্রণতি স্থির দাঁড়িয়ে রইল।

আদিত্য একভাবে হাসছে। 'আগে বসাও তো, তারপর। অনেক কথা।'

'কিন্তু!'

'আবার কিন্তু কি। ভয় নেই, তোমার স্বামীকে আমি বলব না তোমার পূর্ব-প্রেমিক আমি। মনে নেই, বলেছিলাম, তোমার অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে গেলেও ক্ষতি করব না।' অকারণ হাসল আদিত্য।' 'ক্ষতি যে করব না, আজ তার প্রমাণ হয়ে যাবে।' দেখতে লাগল প্রণতিকে।

প্রণতির এই মুহূর্তগুলো একটুও ভাল লাগছে না। তা ছাড়া বাইরে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলাটাও বড় খারাপ লাগছে। 'এসো।' প্রণতি পিছন ফিরল।

'কোথায়!'

প্রণতি কথা না বলে সিঁড়ির ধাপে পা রাখতে লাগল।

'দরজা কি খোলা থাকবে?'

প্রণতি পিছন ফিরল। এমন এক আড়ষ্ট, ভীতিপ্রদ আচ্ছন্নতায় সে আছে এই মুহূর্তে, খিল দেওয়ার কথাই মনে নেই। দরজার দিকে এগোল।

'থাক্, আমিই দিয়ে দিচ্ছি। একটু জোরে এঁটে দি খিলটা, কি বল? যাতে সহজে আর তাড়াতাড়ি না খোলা যায়। মনোজবাবু তো বাড়ি নেই?'

প্রণতি কেমন নির্বিকার চোখে তাকাল আদিত্যর দিকে। সিঁড়িতে ধীর-পা রেখে ওপরে উঠতে লাগল। নিরায়াস ভঙ্গিতে আদিত্যও ওর পিছনে পিছনে উঠল।

বাইরের ঘরে বসাল প্রণতি আদিত্যকে। বাইরের সাজানো ঘরটা ওদের শোবার ঘরের গায়েই। দু'টো ঘরের মাঝ-খানে দরজা। বাবা-মার ঘর আর রান্নাঘর ওদিকে। প্রণতির এইটুকুই যা এই মুহূর্তে ভরসা।

'তুমি তো বসতে বললে না, আমিই বসেছি।' লম্বা কোচের এক কোণে বসে হাসল আদিত্য। 'আর শোন, কোনরকম আতিথেয়তায় ব্যস্ত হয়ো না। আজ শুধু তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে দু'চোখ ভরে দেখতে দাও। ইস, কতদিন তোমাকে দেখিনি বল তো?'

প্রণতি দেখল আদিত্যকে। আদিত্যর সেই লম্বা চেহারা, চওড়া বুক, সেই সদাহাস্য স্বভাব একটুও বদলায়নি। তবে মুখে বুঝি একটু কাঠিন্য। চোখের গোড়ায় কালি। কাজের চাপে রাত জাগছে বুঝি! নাকি অনিদ্রায় সর্বকিছু ধ্বংস করছে।

'কই, তুমি কিছু জিজ্ঞেস করছ না?' আদিত্য সোজা প্রণতির দিকে তাকিয়ে বলল। বসায় আরামের ভঙ্গি করল। 'এরকম হঠাৎ দেখা হওয়াটা গল্প-উপন্যাসে ঘটে, তাই না? আমাকে সেরকম একটা নায়ক মনে হচ্ছে না?' নিজের খেয়ালে বলে আদিত্য অনেক বেশী হাসল।

'হঠাৎ এলেন কেন?' প্রণতির কণ্ঠস্বর কঠিন।

'বসো, বলছি।'

'না, বসব না। আজকে এভাবে বসায় অসুবিধে আছে।'

'তা হলে অন্য কোনদিন বসতে চাও বলো!'

'কোনদিনও না। এভাবে আপনার আসা উচিত হয়নি। আমি আপনাকে বুদ্ধিমান জানতাম।'

'বাঃ, চমৎকার কথা শিখেছ। নাটক-নভেলের নায়ক-নায়িকারা বিয়ের পর পূর্ব-প্রেমিককে দেখলে ঠিক এরকম কথা বলে। সারা দুপুর বুঝি নভেল পড়ো? সত্যিই তো, কি আর কাজ তোমার!' আদিত্য সহজভাবে নিওন আলোয় ধোয়া সারা ঘরে চোখ বুলোল। 'তোমার ঘর খুব সাজানো। চারপাশে এত বিলাস! তুমি মনে-প্রাণে যা চেয়েছিলে, ঠিক তা-ই, কি সুখী তুমি! এরকম সাজানো ঘরে আমি যদি তোমাকে পেতাম!'

'কথা ঘুরিও না। কেন আপনি এসে-ছেন বলুন। জানেন, আমাদের আজ বিয়ের তারিখ।'

'জানি।' আদিত্য সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করল। 'তোমার আজ বিয়ের তারিখ জেনেই তো এলুম।'

'আপনি জানলেন কি করে? আমার বিয়ের সময় আপনি ছিলেন না তো! আর হঠাৎ বিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা-ও আপনাকে লুকিয়ে।' একটু থামল প্রণতি। গলা নামাল। 'আমিও তা-ই চেয়েছিলাম। আপনি আমাকে প্রলুব্ধ করতেন, আমি জানি। আমায় ঘুষ দিতে চাইতেন। আমাকে বড় বিরক্ত করতেন!' রাগে যেন ফেটে পড়ছে প্রণতি।

'মনে আছে দেখছি!' আদিত্য ভুরু তুলে বলল, 'আমিই বলেছিলাম, তোমার বিয়ের সময় কিছুতেই আমি থাকব না। কখখনো না। তুমি কি বলেছিলে তখন মনে পড়ে?'

'না।' কর্কশ কণ্ঠ প্রণতির। 'কোন প্রলাপ নতুন করে শুনতে ইচ্ছে করে না।'

'বলেছিলে, আসবেন না মানে, নিজে গিয়ে নিয়ে আসব। বিয়ের আগেরদিন আপনার সঙ্গে দেখা করব যেভাবে হোক। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, তখন আসবেন তো? কি বলনি?—না এসে যাবেন কোথা, দেখব! বলেছিলে কি-না!' গলা হঠাৎ অনেক নামাল আদিত্য। 'জান, আমি অনেকদিন তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি!'

প্রণতি চুপ করে রইল।

আদিত্য কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল। কি ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আসলে তোমার সঙ্গে এই দেখা করার ব্যাপারটা আমারও মনে ছিল না। বুঝলে, সবই ভাগ্যের ব্যাপার। এই দৈব আর কি! তোমার সুদর্শন স্বামী মনোজবাবুর দোকানে একটা জিনিস কিনতে গিয়েছিলাম। ভদ্র-লোক খুব ভাল, আলাপী, মানে বিজনেস বোঝেন। বন্ধুর মত হয়ে যেতেই এই ঠিকানা পেলাম, তোমার নাম পেলাম, বিয়ের তারিখ পেলাম, আরও খবর পেলাম, আজ উনি কিছুতেই সন্ধ্যেয় আসতে না। বড় ভাল ভদ্রলোক, তাই চলে

'কেন এলেন? বিয়ের আগে করেছি, তাদের দিয়ে শাস্তি দিতে

হো-হো করে হেসে উঠল আদি

'আঃ, আস্তে হাসুন।' প্রণতি উঠল হঠাৎ। 'এটা আমার শ্বশুরবা

'বাপের বাড়ি হলে এরকম আপত্তি ছিল না বুঝি?'

'বাজে কথা ছাড়ুন। আমার গুলোকে ভুলতে দিন। 'আর না। আমি অনেকদিন নামিয়ে ফেলেছি।'

'ভয় নেই রাণু, আমি তোমার নাটক-নভেলের ভিলেন হয়ে অ বিশ্বাস করো, ব্যাপারটা বড় পুরনো, নভেলেই মানায়। তুমি তো জান এত নোংরা নই। আমি এসেছি কারণে।' হঠাৎ আদিত্যের গলা গ সিগারেট টানছে একটানা। মুখের টানা, কঠিন। একটু বা অন্যমনস্ক।

'রাণু' সম্বোধনে প্রণতির বুক ঢিপ করতে লাগল। 'রাণু!' এ আদিত্যর দেওয়া। একদিন চিঠিতে ছিল, রাণু নামে বড় আপন হওয়া প্রণতি নামটা একেবারে পোষাকী! সেই নামে ডাকা! সেই রাণু! ! সন্ধ্যের অন্ধকার ঢাকা বালিগঞ্জের আর পাশে বসা আদিত্যকে মনে পড়

'আমাকে রাণু বলে ডাকবেন প্রণতি সোজা তাকাল আদিত্যর দু'চোখে কঠিন শাসন। বিয়ের আ বড় বড় চোখের দিকে আদিত্য ে তাকিয়ে থাকত, ঠিক সেইভাবে ত থাকতে দেখে প্রণতি চোয়াল শক্ত করে সরিয়ে নিল। বিয়ের আগে হলে আ এই দৃষ্টিকে নিজের মুখের ওপর ব আড়াল দিয়ে ছলনায় সাজিয়ে তু কথাটা মনে হতে প্রণতির যেন ঈষৎ করল।

'এই নামে ডাকতেই তো এসেছি নেই তোমার, একদিন ট্যাক্সিতে বসে সন্ধ্যেয় তুমি আমার পিঠে, আমার। কব্জির ওপর 'রাণু' নামটা লিখে বলো এই নামটাই সত্য হয়ে থাকবে! স্পর্শের লেখা রক্তের গতির সঙ্গে এ মিশে আছে রাণু। কথাটা পুরনো শোনালেও খুব সত্যি।'

'মনে আছে, তবে নতুন করে করতে আর ইচ্ছে নেই।' কণ্ঠস্বর প্রণতির। ওর কোন কথা গ্রাহ্যের আনতে চাইছে না প্রণতি।

'আপত্তি কেন? আমার তো ভ লাগে!'

'আপনি বিয়ে করেননি তো! বিলাসের মধ্যে এখনো ভাল লাগে। শুধু মোহ, ভুল, যা চিরকাল থাকবে কেন আপনি তাকে আঁকড়ে ধ চাইছেন? আমায় মুক্তি দিন, আমি পারছি না।' প্রণতির গলার স্বরে ব একটু আশ্রয়হীনতা।

'সে কি!' আদিত্য সোজা হয়ে বসল। 'ওহ্, তোমাকে জানানোই হয়নি, আমি বিয়ে করেছি। তোমার বিয়ে হবে জেনে বিয়ের আগেই আমি অনেকদূরে চলে গিয়েছিলাম। বোধহয় তোমাকে ভুলতে। তোমাকে কতবার চিঠিতে লিখেছি রাণু, তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমি অনেক দূরে চলে যাব, তোমাকে ভোলার জন্যে। গিয়েছিলাম। ফিরে এসেও কিন্তু ভুলতে পারিনি। নিজের ওপর রাগে, দুঃখে, অভিমানে বিয়ে করেছি তার পরেই। তোমার ওপর তো কোনদিন রাগ করব না, বলেই ছিলাম তখন। তাই না? সেই বিয়ের পর তিন বছরে দু'টি ছেলেমেয়ে আমার।' আদিত্য চুপ করল। একটু বোধহয় হাঁপাচ্ছে।

প্রণতির বড় বড় চোখ আদিত্যর দিকে নিবদ্ধ। আদিত্যকে নতুন করে দেখতে চাইছে যেন।

'কি দেখছ?'

'দেখছি, একজন সাধারণ মানুষ কেমন করে নভেলের নায়কের মত কথা বানায়।'

'সে কি? তুমি বিশ্বাস করলে না! সত্যি আমি বিয়ে করেছি। শুনবে, আমার বউ-এর নাম রমা, সে সংসার করে, সন্তান পালন করে। সে বড় সুখী, তৃপ্ত।'

'আঃ, থামুন তো!' প্রণতি বিরক্ত হ'ল। 'তাহ'লে তো আরও পাপ করেছেন আপনি আমার কাছে এভাবে এসে—স্ত্রীকে লুকিয়ে গোপনে, নির্লজ্জের মত। অত্যন্ত নোংরামি এটা।'

'ভালবাসা পাপ নয় রাণু। ভালবাসা অনেক বড়, পবিত্র। আমি যে সেই ভালবাসা চাই।'

'তা-ই তো পেয়েছেন!'

'কোথায়? স্ত্রীর মধ্যে?' আদিত্য থামল। 'তুমিও কি তা পেয়েছ?' ভয়ংকর চোখে তাকাল প্রণতির দিকে। হঠাৎ হেসে ফেলল আদিত্য। 'অবশ্য একটুও ভাবছি না যে, আমাকে না পেয়ে তুমি এমন সুন্দর বিবাহিত জীবনে ভালবাসা না পাওয়ার দুঃখ পাচ্ছ। আসলে, কি জান, এই বিবাহ, সংসার, প্রতিদিনের সহবাস—কোথাও ভালবাসা নেই রাণু। সবকিছু শুধু ক্লান্তি এনে দেয়, কেমন শীতল করে দেয় মানুষকে। মৃত্যুও বুঝি এমন শীতল নয়। এটা তুমি বোধহয় বোঝ।' শেষের শব্দগুলি ভারী।

'বই-এ এসব কথা লেখা থাকে।'

'তোমার মনে লেখা নেই?'

'না।'

'মিথ্যে কথা।' ধমক দিল আদিত্য। 'বড় বিরক্ত কর তুমি আমায়।' শেষ কথাগুলো বিড়বিড় করল আদিত্য।

চমকে উঠল প্রণতি। এমনভাবে ধমক দেওয়াটা কেমন অস্বাভাবিক মনে হ'ল প্রণতির। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনাকে দেখে কেমন করুণ মনে হয়। তাতে আমি কি করতে পারি!'

সিগারেট নিভে গিয়েছিল আদিত্যর। দেশলাই বের করল পকেট থেকে। প্রণতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার বোসো না একটু। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে! বলেছি তো আমি ভিলেন নই, বন্ধু। তোমার সেই একটিমাত্র চিঠিতে সম্বোধন করা 'প্রিয়বন্ধু'।' গলায় শব্দ করে হাসল। প্রণতির পোষাকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'তুমি আজ সেই রঙের শাড়ি আর জামাটা পরলে খুব ভাল লাগত। মনে পড়ে যখনি আমার সঙ্গে দেখা করতে, আমার প্রিয় রঙগুলি পোষাকে মেখে আসতে! আহ্, বড় ভাল লাগত তখন। কত আপন মনে হ'ত তোমাকে! অথচ কি করে তুমি এত বদলালে বল তো?'

আদিত্যর কণ্ঠের অসহায়তা প্রণতিকে বড় নিঃসঙ্গ করল। কি ভেবে বসল সামনের কোচে— আদিত্যর মুখোমুখি।

আদিত্য এতক্ষণে সিগারেট ধরাল। দেশলাই কাঠিটা শেষ পর্যন্ত জ্বালিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল একভাবে। 'মনে পড়ে রাণু, একদিন সন্ধ্যায় বাড়িকে লুকিয়ে আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে ঘুরতে ঘুরতে তুমি হঠাৎ এই দেশলাই-এর আলোয় আমার মুখ দেখে ঠিক এই কথাই বলেছিলে, 'আপনাকে দেখে বড় করুণ লাগছে।' অবশ্য পরের কথাটা তখন বলনি। বরং আমি হঠাৎ চুপ করে যেতে তোমার কাছ থেকে সরে যেতে তুমি আমার হাতে তোমার হাত রাখতে দিয়েছিলে। আমার কাঁধে তোমার কাঁধের বড় মধুর স্পর্শ ছিল। তোমার কপালের চুল আমার মুখে উড়ে আসছিল। একদিন তুমি আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলে কিছুক্ষণ, মনে পড়ে। কোথাও দুজনের একা-একা ঘোরার জায়গা ছিল না বলে কেবল ট্যাক্সিতে ঘুরতাম। সারা শহর, চার পাশের লোক-জন, শব্দ, কোলাহল তখন আমাদের কত অপরিচিত, কত দূরের! আর কি গতি ছিল আমাদের মধ্যে! আমার পাশে তুমি তখন রাণীর মত, আর আমি সম্রাট! মনে পড়ে!' আদিত্যর কণ্ঠস্বর বড় উত্তেজিত, চাপা, কম্পিত শোনাল।

প্রণতি একভাবে দেখছিল আদিত্যকে। সুন্দর কথা বলতে পারে আদিত্য। বড় ভাল লাগে। সেই ভারী গলা, সেই ঋজু দীর্ঘ চেহারায় কি এক আকর্ষণ! ঐ প্রসস্ত বুকে আশ্রয় নেওয়ার বড় লোভের কথা একদিন প্রণতিই চিঠিতে জানিয়েছিল না! আর সেই এক কনকনে শীতের সন্ধ্যায় ট্যাক্সির দুপাশের সার্শি বন্ধ করে আদিত্যর পাশে বসে যাওয়া। কত আপন ছিল তখন। কত অসহায়ও। সত্যি আদিত্যকে করুণ মনে হত বলেই প্রণতি ওকে ভুলতে পারত না।

'বলো, উত্তর দাও।'

প্রণতির চমক ভাঙল। সচেতন হয়ে বসল। 'সে সব ভুলে যান আপনি, আমি এখন অসহায়।' প্রণতির কণ্ঠস্বর দুর্বল।

'ভুলতে বললেই ভোলা যায় না রাণু। তোমার অনেক কিছুই ভুলতে পারিনি। সেই হঠাৎ এক শরতের সকালে চিড়িয়াখানায় বেড়িয়ে আসা, সেই কত দুপুরে সকলকে লুকিয়ে সিনেমা দেখা, সেই এক সন্ধ্যায় তোমার কোন কাজে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার পথ থেকে হঠাৎ সরিয়ে নিয়ে এসে গঙ্গার ধারে বেড়ানো। সেই গোপনতায় কি রোমাঞ্চ! সব কেমন লুকিয়ে ঘটে যেত। আমরা দুজন ছাড়া কেউ জানত না।'

'এসব বড় পুরনো, মামুলি। সব প্রেমিক-প্রেমিকা এসব করে। বড় জোলো। বিয়ের আগে এগুলো সামান্য ব্যাপার। শুধু খেলা। এত মনে রাখেন কেন?'

আদিত্যর চোয়াল শক্ত হ'ল। 'এমনভাবে অস্বীকার করা যায় না রাণু। এসবই তো আশ্রয়। অনেক বড় আশ্রয়। আমার স্ত্রী সন্তান চেয়েছিল, পেয়েছে। তুমি সুদর্শন স্বামী, অঢেল টাকা-পয়সা, বিলাস, হয়ত বা তার মধ্যে কিছু ভালবাসা চেয়েছিলে, সবই পেয়েছ। মনে পড়ে রাণু, আমাকে ভালবাসার মধ্যেই তুমি তোমার ক্লাশের আর একটি ছেলের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলে! বড় নিষ্পাপ ছিলে তখন তুমি! ভালবাসা যে মোহ নয়, তা বুঝতে না। কেন গিয়েছিলে, আমি জানি। তুমি ভালবেসে নির্ভরতা চাও। ছেলেটি নির্ভরতাও বেশী দিতে চেয়েছিল।' আদিত্য থেমে প্রণতির শরীরের রেখা দেখল, হাসল। 'তুমি গিয়েছিলে। অন্য জায়গায় হলেও আজ বিয়ে করে সেই নির্ভরতা পেয়েছ। কিন্তু সত্যি করে বল তো, তুমি সব পেয়েছ! যা চাইতে সব!'

প্রণতি ভিতরে ছট্‌ফট্ করে উঠল। অস্বস্তি বোধ করল। 'এত বক্তৃতা দেবার

কিছুতেই কষ্ট দিতে চাইনি তখন। বড় কি দরকার আপনার? আমার ভাল লাগছে না।'

আদিত্য হঠাৎ হেসে উঠল। 'ওহ্, আমি বুঝি ভীষণ সিরিয়াস হয়ে গেছি! আর সিরিয়াস হলেই তোমার তো খারাপ লাগবেই।'

'ব্যঙ্গ করছেন!'

'হয়ত। সেই ছেলেটির কথা তুললাম তো। জানতাম, তোমার প্রেমিক একাধিক। আর তার কথা তুমি ভুলবে কি করে! সে বোধ হয় আমার মতন নির্লজ্জ ভিক্ষুক নয়, তাই তোমার কাছে আসে নি। তাই না! বা হয়ত অন্যত্র তৃপ্ত। তোমাকে প্রয়োজন নেই আর। সকলে তো আর এই বিরক্তিকর অতৃপ্তি নিয়ে আসে না।'

'কারোর কথাই আমার ভাবতে ভাল লাগে না।'

'ভয় নেই। সে ছেলেটির কথাও তোমার স্বামীকে আমি বলব না।'

'আপনি উঠুন। আমার স্বামী এখনি আসবে।'

'থাকলে আপত্তির কি? শুধু উপন্যাসের সরল নায়কের মত বলব, আমিই একমাত্র রাণুর প্রেমিক ছিলাম। এখন 'পরাজিত সম্রাট' তাই না? তবে এখন আর কোন দাবী নেই। একটা দরকারে এসেছি, আর দু'চোখ ভরে দেখতে এসেছি, বড় সাধ এমন করে দেখার,' আদিত্য তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে প্রণতির মুখ, বুক, সারা শরীর দেখতে লাগল।

এ দৃষ্টি বড় পরিচিত প্রণতির কাছে। প্রণতি ভয় পেল। বিয়ের আগে আদিত্য রাস্তায়, এখানে-ওখানে ওর সঙ্গে বেড়াতে যেসব কথা বলত সব মনে আছে আদিত্যর! একটিও ভোলে নি! এসব শোনাচ্ছে কেন? এই তো আমার সঙ্গে দেখা হল, আর একটা দরকার কি বলুন! তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। সত্যি এবার আমার স্বামী এসে যাবে।'

'শুনবে?' গলা নামাল আদিত্য।

'বাজে কথা না বললে শুনব। দরকারটা কি? কিছু টাকা চান?'

মাথার মধ্যে কেউ যেন জোরে ধাক্কা দিল আদিত্যর। প্রণতির দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। অন্য দিকে মুখ ঘোরাল।

প্রণতি আদিত্যকে দেখল। বিয়ের পরেও আদিত্য ওর কাছে এসেছে! কি চায়? আর প্রণতিই বা এতক্ষণ এর সঙ্গে এত সময় বসে কাটাচ্ছে কেন? একটু খাবার খাইয়ে ছেড়ে দিলেই তো হ'ত! নাকি মধুর স্মৃতি চর্বণ করার জন্যেই সে এতক্ষণ বসেছিল! মনোজ আসে নি, আসবে। সে ওর জীবনে চিরকাল থাকবে। আদিত্য ওর কে! কেউ না। বিয়ের আগে পরিচয় ছিল মাত্র। সেই পরিচয়ে একটু বা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাতে কি এসে যায়। অনেক মেয়েরই তো এসব ঘটে! প্রণতির কলেজে পড়ার সময় আরও কিছু প্রেমিক ছিল। তাদের একজনকে তো কিছুটা বোধহয় ভালই বেসেছিল। তাই বলে তাদের বিয়ে করতে হবে! বিয়ের পরেও কি সেই জের টানতে হবে!

আদিত্যর চোখের দিকে তাকাল প্রণতি। বিয়ের আগে প্রণতি দেখেছে, খুব কষ্ট হলে আদিত্যর কান্না ঠেলে উঠত ভেতরে। একথা আদিত্যই বলেছে। কিন্তু চোখে জল থাকত না। দু'চোখ অসম্ভব লাল হয়ে উঠত। প্রণতি সেই অসহায় লাল চোখ দেখে কষ্ট পেত। এখন কি লাল হয়ে উঠেছে?

'আপনি কথা বলুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

আদিত্য তাকাল প্রণতির দিকে। 'প্রণতি, তুমি আমাকে একটাই চিঠি দিয়েছিলে একদিন, তাই না? খুব গোপনে, তোমাদের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় অন্ধকারে, আড়ালে। আমার হাতে হঠাৎ দিয়েছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, কেন?' প্রণতি ভয় পেল। বুক দুরদুর করছে। সে চিঠি তো আপনি একদিন রাগে ছিঁড়ে ফেলার কথা বলেছিলেন!' প্রণতি আদিত্যকে বোঝার চেষ্টা করল। আদিত্য রাগলে ওকে 'প্রণতি' নামে ডাকতো, রাণু বলত না। এখন কি খুব রেগে গেছে আদিত্য? কি করতে পারে? চিঠি কি সঙ্গে এনেছে?

আদিত্য একটু সময়ের অন্যমনস্কতা সরিয়ে বলল, না ছিঁড়িনি, সেটা আমার কাছে আছে। কোনদিন ব্ল্যাকমেইল করতে পারি ভেবে তুমি যদি এখনি একটু ভয় পাও, তাই মিথ্যে বলেছিলাম। তোমাকে কিছুতেই কষ্ট দিতে চাইনি তখন। বড়

নিষ্পাপ ছিলে তুমি, সরল অথচ এখনো কি তা-ই না?'

'কেন আপনি চিঠিটা রেখেছেন ? আমাকে চরম শাস্তি দেবার জন্যে?' কেঁদে উঠল প্রণতি। দু'হাতে মুখ কাঁদছে প্রণতি। পিঠ কাঁপছে।

আদিত্য দেখতে লাগল। কাঁদে ভাল লাগে প্রণতিকে। কেন কাঁদছে ভয়ে, না অভিমানে! আদিত্য একটু সামনের দিকে। গলা নামিয়ে 'কেঁদে কি হবে, 'আমি তা দিয়ে কিছু না। এত নীচে আমি নামতে প পারবও না। আর তা ছাড়া, তোমা পড়ে রাণু, কলেজের সেই সহপ হঠাৎ ভাললাগার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে ছিলে, তুমি যে শুধু আমাকেই ভা এই একটি চিঠিই তার চিরকালের আর কাউকে তুমি চিঠি দাও নি।' থামল আদিত্য। 'সেই বিশ্বাসেই চিঠিখানা ছিঁড়তে পারি নি!'

প্রণতি মুখ তুলে তাকাল আ দিকে। দু'চোখে জল টসটস করছে হ'লে এখানে বসে চিঠির কথা তুললেন

'তুমি টাকার কথা বললে না! অ হঠাৎ এমন অপমান করায় তোমাকে করলাম ভয় দেখিয়ে। শাসন মাঝে দরকার আত্মরক্ষার জন্যে,' আদিত্যর স্বর কঠিন।

'আপনি এবার উঠুন, আমার লাগছে না একটুও।'

'আমি জানি ভাল লাগবে না। আম লাগছে না। আগের মত যদি এ তোমাকে ট্যাক্সিতে নিয়ে সারা শহর সন্ধ্যেটা ঘুরে বেড়াতে পারতাম, তা হ রাণু, আমাদের দুজনেরই খুব ভাল লা ভীষণ!' থামল আদিত্য। 'বল রাণু, মজার। তোমার স্বামী জানেই না, আ দুজন এই মাঝেরহাট ব্রীজের ওপর দি কতবার ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরেছি। গাড়ির শুনতে শুনতে আমরা দু'জন চারপ ভয়ংকর ছড়িয়ে পড়েছি, বল, ব্যাপা মজার না?'

প্রণতি আদিত্যর মুখ-চোখ লক্ষ্য কর লাগল। 'আপনি সত্যি এসব এখ ভাবছেন!' প্রণতির উজ্জ্বল ঝকঝকে বিয়ের আগের মত নিষ্পাপ সরল মনে হ

'ক্ষতি কি? আমি একটা আ খুঁজছি রাণু, এই সংসার, বিবাহ, অ স্ত্রী-পুত্র, প্রতিদিন—এ সমস্তের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচার কোন আশ্রয় নেই আমার ভালবাসা তুমি, আমার মৃত্যুও তুমি বাড়ি থেকে তোমার জোর করে বিয়ে দি আমার আশ্রয় ভেঙে দিয়েছে।' থাম আদিত্য, 'আমি কেন বিয়ে করেছি জান শুধু দেখতে, বুঝতে—তুমি বিয়ের মধ্যে কি পেয়েছ এমন সব ভুলে থাকতে পারছ

'বিয়েতে কি দেখলেন!'

'দেখলাম, ভালবাসা নেই। শুধু প্রয়োজন আছে। তা বড় বোরিং, ক্লান্তিকর। এক বছরে একটা বিবাহিত জীবন শেষ হয়ে যায়। তুমি বল রাণু

তুমিও কি শেষ হয়ে যাও নি? বিশ্বাস করো, আমাকে প্রতিমুহূর্তে একটা অদ্ভুত কালো কঙ্কাল তাড়া করে ফিরছে। আমি তার হাত থেকে পালাতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি আর পারছি না। আমাকে একটু আশ্রয় দাও।'

প্রণতি মাথা নিচু করল। মনোজের কথা মনে পড়ল। তার দেওয়া সুখ-ঐশ্বর্য আহ্লাদ সব মনে পড়ল। একদিন সন্তান হলে তার দেওয়া সুখ-শান্তি কল্পনা করল। সন্তান হয় ত বড় আশ্রয়। কিন্তু আদিত্য যা চাইছে তা কোথায়! প্রণতিও কি তা-ই চায়। পারবে আদিত্যর সঙ্গে এখনি বেরিয়ে গিয়ে দায়িত্বহীন জীবন কাটাতে!

'কি, চুপ করে রইলে যে!'

'আমি কিছু বুঝি না। আমার ভাল লাগছে না।'

'বিয়ের আগে এই কথা অনেকবার বলেছ রাণু। আর এই কথার মধ্যেই যত অশান্তি, তোমার যত সুখ-অসুখ চাপা আছে। তাই না!'

'তাতে কি?' প্রণতি চোখ তুলল। 'কি করতে বলেন?'

কি করবে ওরা! আদিত্য ভাবল। এক গোপন ভালবাসার আশ্রয় তৈরী করে রাখা! যেখানে প্রণতি আর ও দুজনে কিছুক্ষণের মুক্তি পেতে পারে। শরীরের সুখে প্রণতির অভাব নেই। আদিত্যও বিবাহিত। তারও দেহের কোন অতৃপ্তি নেই। তা সত্ত্বেও কি চাইছে সে প্রণতির কাছে! প্রণতিই বা এতক্ষণ বসে কি ভাবছে! জীবন মাঝে মাঝে বড় থেমে যায়, বড় মন্থর হয়ে চলে। আদিত্যর তখনি আত্মহত্যা করার ইচ্ছে জাগে। প্রচুর মদ খেতে ইচ্ছে করে! বা যে মেয়েটির জন্যে জীবন এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে—তাকে পিষে নষ্ট করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আদিত্যর এসব কোন বাসনাই এখন নেই। কবে থেকে যেন সেই দুরন্ত স্বভাবটা মরে গেছে। বিয়ের পর প্রতিদিনের জীবনে বড় ক্লান্ত, শীতল হয়ে পড়েছে সে। অনেক ইচ্ছে জাগে, কিন্তু সেটুকু ইচ্ছেকে কাজে লাগাতে কোন উদ্যম নেই। আদিত্য ছবি আঁকে। দিনরাত জল আর তেল রঙ-এর তুলি নিয়ে জীবনকে ভালবাসার মুহূর্তে ধরে রাখে। প্রণতি কি সেই ধরে রাখার কাছে উদ্যম হয়ে উঠতে পারে না? ধরার মত একটা সবল সেতু!

আদিত্য প্রণতির দিকে তাকাল। বিয়ের পরেও সেই ছোটখাটো চেহারা প্রণতির। একটু বা শরীর ভারী হয়েছে। বুক ঈষৎ অবনত। ক্ষীণ কটি আর নেই। বিয়ের আগে প্রণতির কাঁধ, পিঠ, বিনুনী-ঢাকা ঘাড় বড় মনোরম লাগত। বড় স্পর্শ করতে ইচ্ছে করত। নীচের পাতলা ঠোঁটে চুমু খেতে ইচ্ছে করত। প্রণতি তা দেয় নি। এখন আর আদিত্যর সে সব কোন ইচ্ছে নেই। তবু প্রণতিকে দেখতে লাগল।

'কথা বলুন।'

'অকারণ ভয় রাণু, ছায়ের মত বেড়িয়ে আসি। তোমাকে সারাদিন ধরে দেখি। আমার ছবি আঁকার স্টুডিওর নিয়ে যাই। তোমাকে নিয়ে কত ছবি এ'কেছি, দেখবে।'

প্রণতি আদিত্যকে দেখল। দুঃখে লাল। বড় আপন মনে হ'ল আদিত্যকে। 'তুমি এতে খুশী হবে।' এই প্রথম আদিত্যকে তুমি বলল প্রণতি।

'তুমি না!'

প্রণতি নীরব থকাল।

সিগারেট টেনে ঘরময় ধোঁয়া ছড়াল আদিত্য। অনেকক্ষণ নীরব। বড় ক্লান্ত আদিত্য। প্রণতি চুপ করে বসে থেকে সেই ধোঁয়ার মধ্যে নানান এলোমেলো চিন্তায় ডুবে গেল। প্রণতিও বুঝি কোথাও এসে থেমে গেছে। একেবারে নিশ্চুপ।

'তোমার কাছে বসে থাকলে আমি দুর্বল হ'য়ে যাই রাণু, তুমি তো জান। কিছু কথা বলার ছিল, বললাম। এবার উঠি।' নিরাসক্ত গলা আদিত্যর।

'আমাকে তুমি বাইরে নিয়ে গিয়ে একদিন মুক্তি দিতে পারবে? আমি বড় হাঁপিয়ে উঠেছি, আদিত্য।'

'পারি রাণু। তবে আজ নয়।' কি যেন ভাবল আদিত্য। বলল, 'তোমার স্বামী এবার আসবেন'। আদিত্য হাতঘড়ি দেখল। আদিত্য জানে, ঠিক এই সময়েই মনোজবাবু বাড়ি ফিরবেন বলেছেন।

প্রণতি একবার তাকাল আদিত্যর দিকে। উঠে দাঁড়াল। 'একটু বোস।' ভিতরের ঘরে আসার জন্যে মাঝের দরজার সামনে এল। এ ঘর ও ঘর। মাঝখানে দরজা। প্রণতি একটুকাল দাঁড়িয়ে রইল।

'এখন চায়ের ব্যবস্থা কোরো না যেন!'

'নাহ্, সে সব কিছু নয়।' প্রণতি হাসল। 'একটু বোস।'

প্রণতি এ ঘরে ঢুকল। দরজা পিছন দিক থেকে ভেজিয়ে ফাঁকা ঘরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। আলমারীর ঝকঝকে আর্শির দিকে তাকাল। 'এ তুমি কে? প্রণতি? না রাণু?' কে? প্রণতি আর্শির দিকে এগোল। তুমি রাণু! তাই না? বাইরে যেন জুতোর শব্দ হ'ল। প্রণতি উৎকর্ণ হ'ল। আদিত্য কি চলে যাচ্ছে? না বোধহয়, প্রণতি উৎকর্ণ হয়ে শুনে খাটের ওপর রাখা রজনীগন্ধার তোড়াটা হাতে নিল, দু'ঘরের মাঝের দরজায় যাবে, এমন সময় মনোজ দরজার চৌকাঠে পা রেখে দাঁড়াল।

'কি ব্যাপার! ফুলের তোড়া নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?'

প্রণতির চোয়াল হঠাৎ শক্ত হ'ল। বুকের শব্দ দ্রুত। পরক্ষণেই মুখ-চোখ নরম করে প্রণতি এগিয়ে এল মনোজের কাছে। মনোজকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। কেমন যেন চোখে জল প্রণতির। প্রণতি ভিতরে ভীষণ কাঁপছে। মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি এত দেরী করলে কেন! আমার রাগ হয় না বুঝি!'

'তাই ফুলের তোড়া অন্য কাউকে ভুলিয়েছ?' শব্দ করে হেসে উঠল মনোজ। হাসির মধ্যে এতটুকু জটিল আবরণ নেই।

প্রণতি রজনীগন্ধার তোড়াটাকে মনোজের বুকে মুখ লুকোল।

'বাইরের ঘরে কেউ যেন বসে আছে দেখলাম। কে?' মনোজ সহজ সরল কণ্ঠে বলল।

বুকের মধ্যে মুখ রেখেই প্রণতি বলল, 'ও এক ভদ্রলোক, তোমার ব্যবসায় একজন পার্টনার হতে চান। দোকানে দেখা না পেয়ে এখানে এসে অপেক্ষা করছেন। ও'কে এখনি যেতে বল। আজ তোমাকে আর এক মুহূর্তও ছাড়তে ভাল লাগছে না। আমার বড় ভয় করছে।' প্রণতির কণ্ঠস্বর চাপা কান্নায় রুদ্ধ। শেষের শব্দগুলো ফিসফিস শোনাল।

'সত্যিই এখন আর বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না। যাও আমি বলে দিচ্ছি। এত বিরক্তিকর। বাড়ি পর্যন্ত ঝামেলা।'

প্রণতি মনোজের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। একটু বুঝি কাঁপছে। মনোজ দু'ঘরের মাঝখানের দরজা খুলল। বাইরের ঘরে কেউ নেই, ফাঁকা। পাখা ঘুরছে। একরাশি সিগারেটের ধোঁয়া ঢুকতে লাগল এ ঘরে। এ্যাসট্রেতে একটি আধপোড়া সিগারেট স্তূপীকৃত ছাইয়ের মধ্যে থেকে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। মনোজের ব্যাপারটা অদ্ভুত রহস্যময় লাগল। দু'ঘরের মাঝখানের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে একবার ফাঁকা ঘর, আর একবার প্রণতিকে দেখতে লাগল। কপালে কয়েকটা রেখা স্পষ্ট হ'ল।

প্রণতি এখন দেয়ালে ঠেস-দেওয়া, ক্লান্ত। হাতের মুঠোয় ধরা রজনীগন্ধার তোড়ায় মুখ-চোখ ঢাকা। দু'চোখের সন্তর্পিত অশ্রু ফুলের গায়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়তে লাগল।
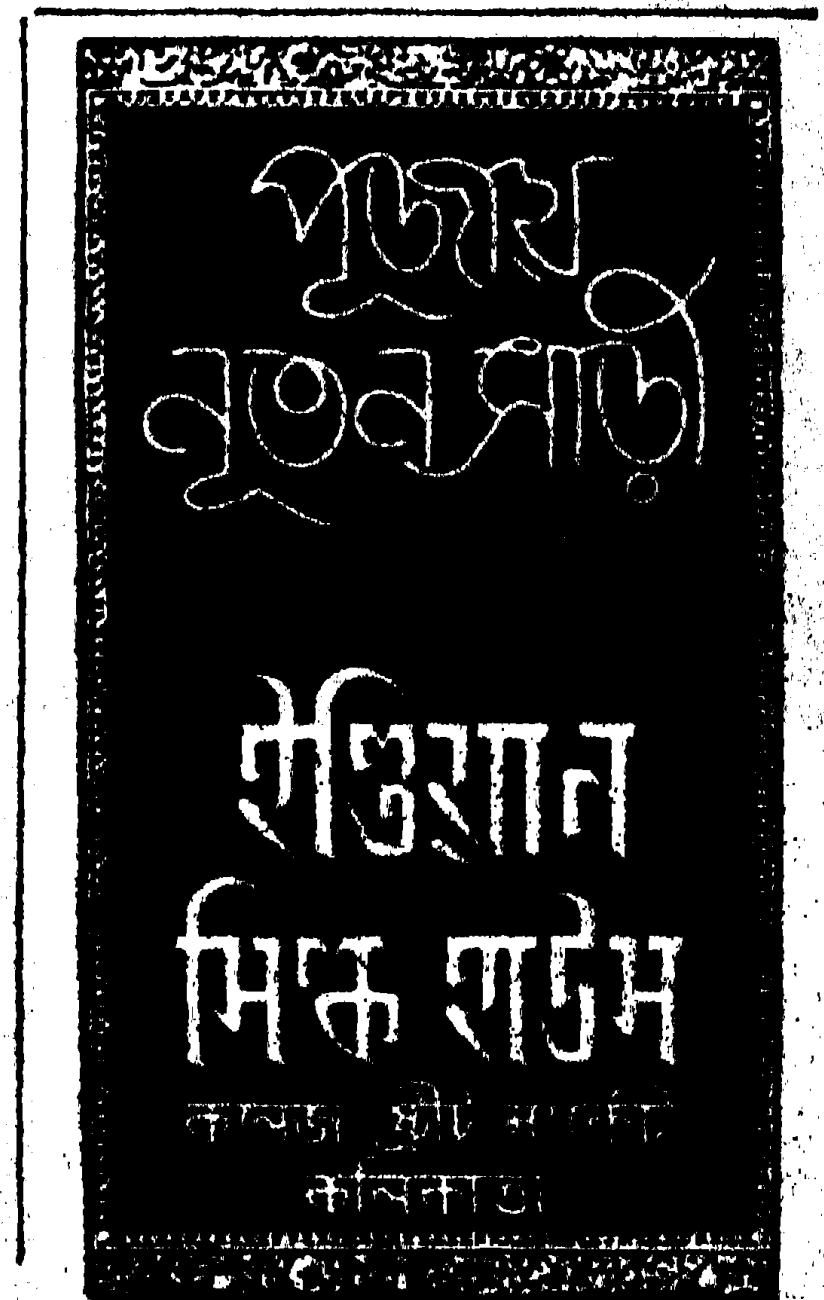
জলবিদ্যুতের কেন্দ্র ॥

মণীন্দ্র রায়

জলবিদ্যুতের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে সৌজন্যে
দেখালেন শ্রীমতী অমুক—
কেমন দুদিকে দুই পাহাড়ের ফাঁকে
মাটি কেটে, বাঁধ তুলে, চঞ্চল নদীর
হৃদয়ে বিশাল হ্রদ, কেমন সে জলাশয় ছেনে
নিরন্ধ্র বেগের চাপে, টারবাইনে, দুরন্ত চাকায়
হাজার ভোল্টের মাপে নিরত বিদ্যুত
তারে-তারে দ্রুত প্রবাহিত।

শ্রীমতী অমুক কোনদিন
ঘুণাক্ষরে এটা কি জানবেন—
আমারো স্মৃতির মধ্যে এ-রকমই উদ্ধত পাহাড়,
আমারো বুকের নিচে এ-রকমই নদী বয়ে চলে।
কিন্তু যতো মাথা কুটি এখনো কি আমি
কংক্রিটের সাঁকো বেঁধে,
ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটে, ম্যাগনেটের তাড়িত-ক্ষেত্রের
দুরন্ত প্রযোজনা ছেঁকে পেয়েছি বিদ্যুত
যা নাকি বিনীত বন্ধু মানুষের ঘরে,
যা নাকি পেশীর মুক্তি, শুশ্রূষা, ও মানুষের মনে
তাপহীন আলো।—
আজো খুঁজি।।

নষ্টনীড় অন্ধকার ॥

শুভ মুখোপাধ্যায়

আর যেন সেই দিন নেই,
যেন একটা বিরাট আকাশ
নিরুদ্দেশ অন্ধকারে নিঃশব্দে হারিয়ে গেছে।

আমি রাত্রিকে চেয়ে দেখলাম,
আগাগোড়া তার প্রতারণা;
জ্যা চাঁদে যেন মুখর [illegible]।

[illegible] সময়ের এইতো শুরু,
এ পঞ্চম বাহিনীর কোথায় শিবির সংস্থা
তা আমার জানা নেই।
আমি শুধু জীবনের নিষ্পেষিত [illegible]
দেখলাম ওদের সাজানো ভ্রান্তি;
[illegible]
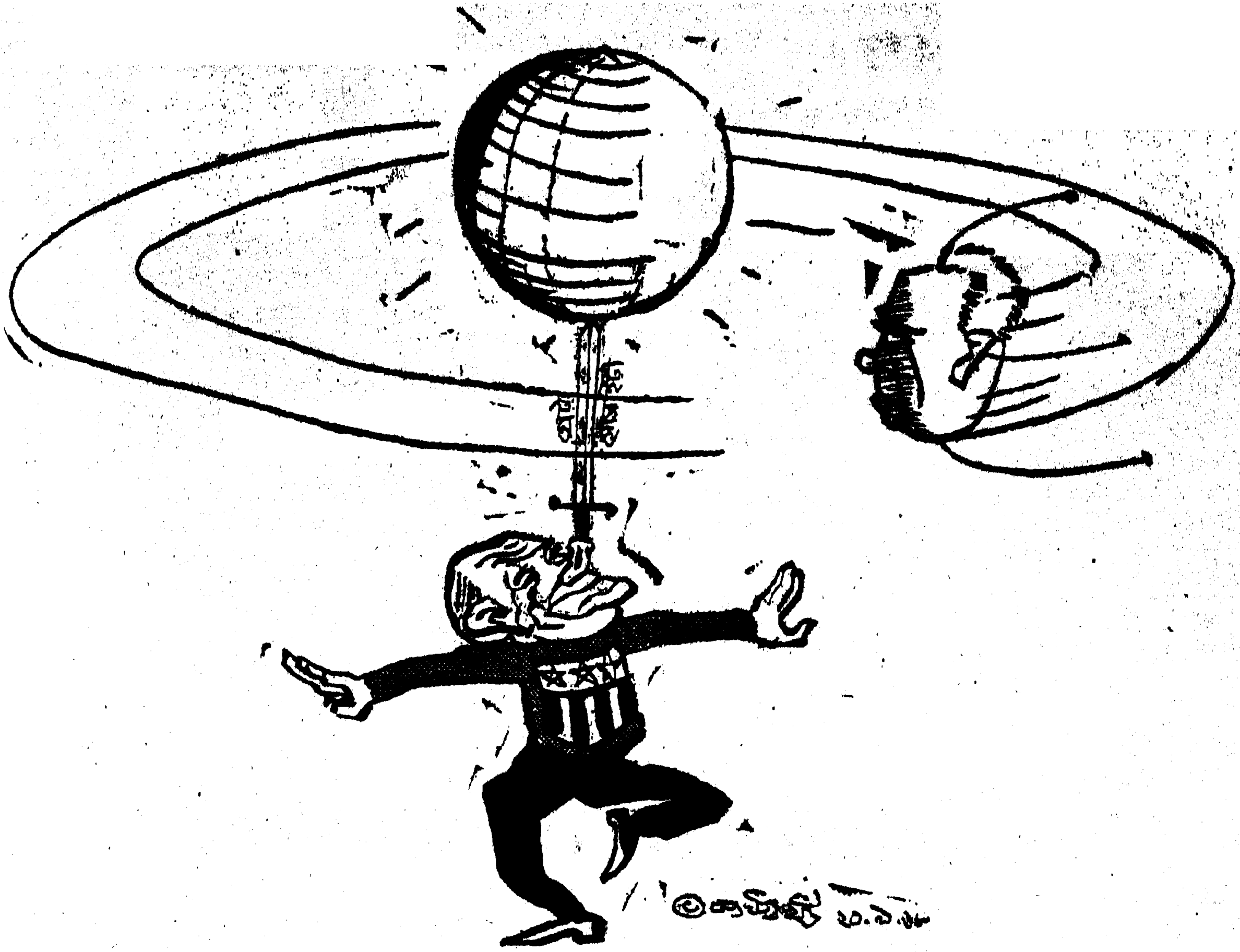
দেশে বিদেশে

দক্ষিণ আমেরিকায় শ্রীমতী গান্ধী

বহু বছর আগে রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনায় গিয়েছিলেন। সে দেশের একজন মহীয়সী মহিলা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো তাঁকে আতিথ্য দিয়েছিলেন ও রোগশয্যায় তাঁর শুশ্রূষা করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে দুজনের মধ্যে একটা গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। খুঁজলেও এরকম ঘটনা খুব বেশী পাওয়া যাবে না, যাতে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশটির সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের মনের যোগ ঘটাতে সাহায্য করেছে।

এমন কি স্বাধীনতার পর যখন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সফর করেছেন, ছোট-বড় বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্র স্থাপন করেছেন তখনও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় নিবিড় হয় নি। ভারতবর্ষের কোন প্রথম সারির রাষ্ট্রনেতা এতদিন দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে সফর করতে যান নি।

এই অপরিচয়ের প্রধান কারণ অবশ্য ভৌগোলিক দূরত্ব। আজকের দিনের মত আন্তর্জাতিক ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও ভারতবর্ষের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার কুড়িটি দেশের এবং ঐ সব দেশের কুড়ি কোটি মানুষের ভৌগোলিক ব্যবধান বিস্তর। এই অপরিচয়ের আরও একটি কারণ অবশ্য রয়েছে। সেটা এই যে, বিশ্ব রাজনীতিতে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি কোন স্পষ্ট, স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। এই দেশগুলি সাধারণত এত বেশী পরিমাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবের মধ্যে অবস্থিত যে, তারা আলাদা করে নিজেদের জন্য বিশ্ব রাজনীতিতে কোন প্রভাব রাখতে পারে নি। তার ফলে ভারতবর্ষও এই দেশগুলির জন্য বহু বৎসর যাবৎ খুব বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করে নি।

কিন্তু সম্প্রতি একটি বিশেষ কারণে ভারতবর্ষ দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির নিকটতর সান্নিধ্যে এসেছে। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আমেরিকা, পৃথিবীর দুই প্রান্তের এই দুই অংশেরই স্বার্থ পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলির সঙ্গে জড়িত, এই বোধ নতুন করে দেখা দিয়েছে। ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রথম বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনে ভারত ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি অন্যান্য উন্নয়নকামী দেশের সঙ্গে মিলিত হয়ে দরিদ্র বিশ্বের স্বার্থে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করে। পরে আলজিয়ার্সে "৭৭ রাষ্ট্রের" সম্মেলনে লাটিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারত এই গোষ্ঠীর মন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

পুনরায় এ বছর নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বিতীয় বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনে ভারত ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে এই সহযোগিতা দেখা গেছে। এই সহযোগিতার একটি উল্লেখযোগ্য ফল হচ্ছে ভারত ও চিলির মিলিত চেষ্টায় প্রস্তুত "বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন"-এর কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে রিপোর্ট। ভারতবর্ষের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিও এই বিষয়ে একমত যে, শিল্পোন্নত দেশগুলি দরিদ্র দেশগুলিকে সাহায্য করার কথা মুখে বললেও কাজে বিশেষ কিছু করছে না বলেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি প্রায় অকেজোই হয়ে থাকছে।

ভারতবর্ষের মতই লাটিন আমেরিকার

দেশগুলি প্রধানত কৃষিজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করে। কফি, গম, চাল, খনিজ তেল ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য, এই সব হচ্ছে ঐ দেশগুলির প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। ভারতবর্ষের মত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিরও স্বার্থ এই সব জিনিসের আন্তর্জাতিক বাজার দর খুব বেশী ওঠা-নামা করার ফলে রপ্তানীকারী দেশগুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ২১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আমেরিকার নয়টি দেশে সফর করার জন্য যাত্রা করেছেন। দেশগুলি হচ্ছে — ব্রেজিল, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, চিলি, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ট্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং গাইয়ানা।

শ্রীমতী গান্ধীর এই সফরের ফলে ঐ দেশগুলির সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত কয়েক বছর ধরে এই সম্পর্কের ভিত্তি কিছুটা প্রস্তুত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সামান্য হলেও বাড়ছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই দেশগুলি থেকে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, আর ভারত থেকে ঐ দেশগুলিতে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১০ কোটি। অর্থাৎ ভারতবর্ষের অনুকূলে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। পরবর্তী দুই বছরে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ভারতে আমদানীর পরিমাণ বেড়েছে আর ভারত থেকে সেখানে রপ্তানীর পরিমাণ কমেছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতে ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী করা হয়েছিল আর ভারত থেকে রপ্তানী করা হয়েছিল ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার পণ্য। অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮' সালে লাটিন আমেরিকার অনুকূলে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

ব্রেজিল আর্জেন্টিনার সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্প্রতি যে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করেছে তার অর্থ নিজেই বোঝা যায় যে, এ… গুলি নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য… প্রসারিত করতে উৎসুক। চিলি… ভারতবর্ষের ১৯৫৬ সাল থেকে… বাণিজ্যচুক্তি ছিল। ১৯৬৬ সালে… ডিসেম্বর সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ… গেছে। নূতন করে এই চুক্তি কর… এখন প্রস্তুতি চলছে।

এই সব দেশের সঙ্গে ভার… অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রও … হচ্ছে। একটি ভারতীয় … কলম্বিয়াতে একটি টুইস্ট ড্রিল… কারখানা স্থাপনের জন্য যন্ত্… কারিগরী জ্ঞান দিয়ে সাহায্য কর… আশা করা হচ্ছে। উরুগুয়ের রে… উন্নয়নের কাজে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়… কর্পোরেশনের সাহায্য করার কথা… কয়েকটি ভারতীয় ব্যবসায়ী প্র… কতকগুলি দক্ষিণ আমেরিকান… বিভিন্ন কাজের জন্য টেন্ডার দি… আর্জেন্টিনার রেলপথের জন্য রেল…

সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের টেণ্ডার বিবেচনা করা হচ্ছে।

ভারত ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে কারিগরী জ্ঞানের ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার বিনিময় করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। ব্রেজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে এসে বলেছিলেন, ব্রেজিল ও ভারতবর্ষের অনেক সমস্যা এক এবং অভিজ্ঞতার বিনিময়, ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও কারিগরী জ্ঞানের বিনিময়ের দ্বারা উভয়েরই উপকার হবে।

ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের হাওয়া

ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সৈনিকদের চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশের পরবর্তী ঘটনাবলীর পরিণামে ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াই-এর হাওয়া আবার জোরে বইতে শুরু করেছে। তার কতকগুলি লক্ষণ হল :—

রুশ-মার্কিন সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ব্যাণ্ডবাদক দলের সোভিয়েট রাশিয়ায় যাওয়ার কথা ছিল। সেই সফরসূচী বাতিল করা হয়েছে।

মস্কো-ওয়াশিংটন পথে নিয়মিত বিমান চলাচলের উদ্বোধনে সাহায্য করার জন্য রাশিয়ান বিমান পরিবহণ সংস্থা 'এরোফ্লোট'-এর একদল পদাধিকারীর নিউইয়র্কে আসার কথা ছিল। তাঁদের না আসার জন্য আমেরিকা থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিঃ ক্লার্ক ক্লিফোর্ড এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, আমেরিকার এখন 'শক্তির অবস্থান' গ্রহণ করা দরকার।

তাঁর ঐ বক্তৃতাতেই জানা যায় যে, আমেরিকা ক্ষেপণাস্ত্র-নিবারক একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। যদিও বলা হয়েছে যে, এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে, চীনের দিক থেকে কোন ক্ষেপণাস্ত্র এলে তাকে আটকান তথাপি ঠিক এই সময়ে আমেরিকার এই ব্যবস্থা রাশিয়ার সঙ্গে তার ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা তীব্রতর করে তুলছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার ঠিক আগেই প্রেসিডেন্ট জনসন রুশ-মার্কিন পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা হ্রাস করার উপায় সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাশিয়াকে একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অথচ এখন বোঝাই যাচ্ছে না, দুই দেশের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা হ্রাসের আলোচনা কবে আরম্ভ হবে অথবা আদৌ হবে কিনা।

আমেরিকা নূতন একটি অস্ত্রের পরীক্ষা করেছে। এই অস্ত্রের সাহায্যে একটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে একই সঙ্গে একাধিক [illegible] উপর [illegible] [illegible] [illegible]।

গত জুন মাসে ন্যাটো চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী সমান অনুপাতে কমিয়ে আনা হবে। এই মাসের শেষের দিকে সে বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। গত ৪ সেপ্টেম্বর ব্রাসেল্‌সে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত অন্য দেশগুলি ঘোষণা করেছে, ইউরোপ থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার এই প্রস্তাব 'দারুণ আঘাত খেয়েছে।'

অন্য দিকে, পশ্চিম জার্মানী সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার সুর চড়ছে। রাষ্ট্রসংঘের সনদ ও পটসডাম চুক্তির নজীর উল্লেখ করে 'প্রাভদা' পত্রিকায় দাবী করা হয়েছে যে, পশ্চিম জার্মানীতে যাতে নাৎসীবাদ ও জঙ্গীবাদীদের পুনরভ্যুত্থান না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য প্রয়োজন হলে সে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার সোভিয়েট রাশিয়ার আছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের মুখপাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার এই দাবী সম্পর্কে বলেছেন যে, রাশিয়া যদি পশ্চিম জার্মানীতে হস্তক্ষেপ করতে আসে তাহলে তাকে ন্যাটো শক্তিবর্গের সম্মুখীন হতে হবে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

কয়লা উৎপাদন

ভারত সরকার চতুর্থ পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদনের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেননি। খুব সম্ভব করবেন না। কারণ গত দুটি পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা আশাপ্রদ নয়।

সরকারী হিসেব থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৬ কোটি টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু উৎপাদন হয়েছিল সাড়ে ৫ কোটি টনের মতো।

তৃতীয় পরিকল্পনায় অভিজ্ঞতা আরো শোচনীয়। ঐ সময়ের জন্যে লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিল ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টনের মতো, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টন।

এই বিপুল ঘাটতির কয়েকটি কারণ সরকারী মহল থেকে দেখানো হয়ে থাকে। প্রথমত, ইস্পাত কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কয়লা ব্যবহারকারী প্রকল্পের কাজ শুরু হতে দেরী। দ্বিতীয়ত, কয়লার অন্যতম প্রধান ব্যবহারকারী রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্রমে ক্রমে ডিজেল ও বিদ্যুতের দিকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত। তৃতীয়ত, শিল্প বিকাশের সাধারণ শ্লথগতি। চতুর্থত, ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর পাকিস্তানের রপ্তানী বন্ধ হওয়া।

ইস্পাত কারখানা, রেলওয়ে ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র মিলিয়ে কয়লার ব্যবহারে ঘাটতির পরিমাণ হল ১ কোটি ২৬ লক্ষ টনের মতো। উৎপাদনে ঘাটতির এটা ৫৮ শতাংশ।

১৯৬৫-৬৬ সালে ইস্পাত কারখানার ব্যবহারের পরিমাণ ধার্য করা হয়েছিল ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টন ব্যবহার করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই পরিমাণ বাড়বার বিশেষ সম্ভাবনা নেই।

রেলের বেলায় প্রয়োজনের মাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ২ কোটি ১৩ লক্ষ টন। কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টনের মতো। যেহেতু ডিজেল ও বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকে রেল কর্তৃপক্ষ নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেই জন্যে চতুর্থ পরিকল্পনায় রেলের ব্যবহার বাড়বার বিশেষ সম্ভাবনা নেই।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির জন্যে কত কয়লা দরকার হবে তার হিসেবও এখনও করা হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার ৭০ শতাংশই জলস্রোতের শক্তিকে ব্যবহার ক'রে করা হবে। এর ফলে এক্ষেত্রেও কয়লার চাহিদা আগের চাইতে কম হওয়ার সম্ভাবনা।

ক্ষুদ্র শিল্প

ক্ষুদ্র শিল্পের ওপর অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার প্রভাব কতখানি পড়েছে সে সম্পর্কে তদন্তের জন্যে ভারত সরকার গত বছর একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ পি, এস, লোকনাথন।

কমিটি সম্প্রতি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। তাতে তাঁরা এই সুপারিশ করেছেন যে, ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের কাছ থেকে বিভিন্ন ঋণদান প্রতিষ্ঠানের ও জাতীয় শিল্প কর্পোরেশনের যে টাকা পাওনা আছে তার আদায় এক বছর স্থগিত রাখা হোক।

কমিটির আরেকটি সুপারিশ হল, মন্দা-প্রভাবিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে আরো ব্যাপক হারে কারিগরী ও বিপণনগত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র ইউনিটগুলি যাতে বিচিত্রমুখী উৎপাদনের দিকে গিয়ে নতুন যন্ত্রাংশ, কম্পোনেণ্ট, এমনকি নতুন সামগ্রীও তৈরী করতে পারে তার জন্যে উপযুক্ত পরামর্শ ও সাহায্য দিতে হবে। উৎপাদন বিচিত্রমুখী করতে না পারলে ক্ষুদ্র ইউনিটগুলির পক্ষে টিঁকে থাকা কঠিন।

কমিটি আরও বলেছেন, ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কমিশনারের সংগঠনটি পুনর্গঠিত করা উচিত। এই সংগঠনের উচিত বিপণন ও কারিগরী পরামর্শ দেবার জন্যে বিশেষ বিভাগ খোলা, যাতে এই বিভাগের পরামর্শ নিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সুসংগঠিতভাবে তাদের দ্রব্যাদি বিক্রি করতে পারে। জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের বিপণন বিভাগটিকেও এই [illegible] শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যেতে [illegible]।

বন্যা

(উপন্যাস)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আগের ঘটনা

লীলা বড়ো জেদী, স্বাধীন ও সুন্দরী। ওকে বিয়ে করে সত্যচরণ। কি
তাকে নিয়ে হয়তো লীলা সুখী ছিল না। এমন সময় এল সুখেন। সত্যর বাল্যবন্ধু
জুয়া আর মদ অন্যতম সঙ্গী তার।

সত্যর সংসারে ঝড় ওঠে।

রূপপুর ছাড়ল সত্যচরণ। এল রাণীচক। ঘরে যমুনাও এল। নবযুবতী। সুখে
এল লীলার কাছে। ঘনিষ্ঠ হল। সুখেনের প্রেস ফিরল লীলা।

সময় ঘুরল। ডিভোর্স হল সত্য আর লীলার।

যমুনাকে ঘিরে সত্য স্বপ্ন দেখল। যমুনা অন্তঃসত্ত্বা। সত্য বাধা পেল ও
দিদির কাছ থেকেই। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা।

লীলাও রূপপুর ছাড়ল। এল শহরে। সুখেন ভাবে লীলা কি শুধু তা
নিয়ে খেলাই করবে? ঘর বাঁধবে না?

সত্য কিন্তু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। এক রাতে সিনেমা দেখে বাড়ি ফির
যমুনার কেমন কেমন ঠেকল ওকে। সত্যকে ইদানীং বেশ চাপা মনে হয় ওর। (
রাতে সত্যর মুখোমুখি যমুনা। জানতে চাইল সত্যর কাছে, এভাবে আর কতদি
রক্ষিতার মতো রাখবে তাকে? সে কি বিয়ে করবে না?]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৯)

প্রেসের লাগোয়া একটা ঘরে সুখেন থাকে। বেশ সাজানো-গোছানো ঘর। লীলা প্রেসে এলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কম্পোজিং দেখে, ছাপানো দেখে, এটা-ওটা নিয়ে প্রশ্ন করে—ওরা বুঝিয়ে দিলে বোঝবার ভান করে, তারপর সুখেনের ঘরে গিয়ে ঢোকে। বিছানাতেও শুয়ে পড়ে অপরূপ ভঙ্গীতে। সুখেন পাশে বসতে গেলে অমনি বলে, এই সাবধান, এখন আমি তোমার মনিব না? তারপর দুজনে বসে গল্প করে। এক সময় লীলা হাই তুলে উঠে পড়ে। বলে, চলি। ও বেলা যেও।

এক সময় গা-ভরা সোনার অলঙ্কার থেকেছে লীলার, সিঁথিতে থেকেছে ঘন উজ্জ্বল সিঁদুর—ডিভোর্সের পর তার বেশ বদলেছে। গলায় মিহি চেন, হাতে দুটো বালা মাত্র। সিঁথিতে সিঁদুর পরে না আর। বরং এ বেশে সুখেনকে নাকি ভালই লাগে খুব।

লীলা বাড়িতে দুপুর অব্দি অপেক্ষা করেছিল সুখেনের জন্যে। রাণীচক যেতে শেষ বাস রাত এগারোটা। ওদিকে সাঁইথিয়া থেকে যে বাসটা আসে, তা রাত বারোটা পাঁচিশে রাণীচক পৌঁছোয়। সুতরাং রাতেই ফিরে আসবার অসুবিধে নেই।

তবু সুখেনের পাত্তা নেই। তার ফিরে এসে আগে লীলাকে খবরটা দেবার কথা। কিন্তু পরদিন দুপুর হয়ে গেল, কিন্তু সুখেন গেল না। তখন লীলা প্রেসে চলে এল।

হেড কম্পোজিটার খগেন বলল, বাবু কাল সন্ধ্যায় বেরিয়েছেন, এখনও আসেন নি। লোকজন এসে ঘুরে যাচ্ছে। খুব অসুবিধে হচ্ছে কাজের।

স্বল্পপরিসর জায়গায় সুখেনের হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল। চেয়ারে নরম গদী। লীলা বসল। আগে এটা বারান্দা ছিল। এখন কাঠের দেয়াল ঘিরে ঘর উঠেছে।

লীলা বসে থাকতে-থাকতে অনেক লোক সুখেনের খোঁজে এল। চলে গেল। লীলা বিরক্ত মুখে বলল, খগেনবাবু, শুনুন!

কালিমাখা হাতদুটো ন্যাকড়ায় ঘষে নিয়ে খগেন এল।

ও কোথায় কোথায় থাকে, খোঁজ নিয়েছিলেন?

খোঁজ এখনও নিই নি। খগেন জানাল। প্রায়ই তো এমন হয়। তবে বলছেন যখন, পাঠাচ্ছি।

কোথায় থাকে ও? কি করে বেড়ায়?

খগেন লীলার প্রশ্নের ভঙ্গীর জন্য নয়, সুখেনের নিষেধ রয়েছে—একটু বিব্রত হল। ঘাড় চুলকে বলল, কালেকটরীর ওদিকে একটা চায়ের দোকানে মাঝে মাঝে বাবু বসেন, জানি। একটা আড্ডা আছে কিসের যেন।......

কী করে ওখানে?

আজ্ঞে, তা ঠিক জানিনে। খগেন একটু সতর্ক হল এবার।

ভিতর থেকে মেসিনম্যান কানাই বলল, আজ্ঞে মা, উনি পার্টির কাছে যাতায়াত করেন তো, পথে হয়ত বসেন ওখানে। সরকারী আপিসের কাছেই দোকানটা। আপিসে বিলের টাকা আদায়ে গেলেও ওখানে বসেন। খগেনদা কী সব বলে, বুঝিনে!

ঠিক আছে। লোক পাঠান ওখানে। লীলা আদেশ করল।

লোক সাইকেলে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সুখেনের আবির্ভাব। লীলাকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। শুকনো হাসি মুখে রেখে সে বলল, কী ব্যাপার?

লীলা গম্ভীর মুখে বলল, (
ব্যাপারটাই আগে শুনি।

ঘরে চল, বলছি সব। সুখেন দ
তালা খুলে পর্দাটা টেনে দিল।

লীলা বিছানায় পা ঝুলিয়ে
বালিসটা জানুতে রাখল। বলল,
দিয়েছ? নিল?

সুখেন একটা সিগ্রেট বের করে জ্ব
গিয়ে হাসিমুখে তাকাল লীলার
বলল, খাব?

লীলা ভ্রূ কুঁচকে বলল, আমার ক
শোন নাকি যে হুকুম চাইছ?

নাঃ সিগ্রেট খাওয়া ছেড়েই দিয়েছি
বলার পর। সুখেন সিগ্রেট জ্বালল।
কী পাজী লোক রে বাবা! টাকা নে
তাও কত রকম নবাবী কায়দা! ত
অবশ্য নিল।

পিনাকীবাবুর সামনে দিয়েছ তো

সুখেন মাথা নাড়ল। নাঃ। বাস
নেমেই দেখি, ওর সেই চায়ের দো
আলো জ্বলছে। দেখলাম ব্যাটা
আগের বাসেই হাজির হয়েছে। তার

লীলা রুদ্ধশ্বাসে বলল, তারপর

বললাম, এই নাও টাকা। নিল।

কোন কথা বলল না?

বলত। আমি ফুরসত দিই নি।
এসেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে।

লীলা একটু চুপ করে থেকে বলল,
আসতে তো দেরী ছিল। এতক্ষণ কে
ছিলে?

রাস্তায় পায়চারী করছিলাম।

লীলা মুখ নামিয়ে বালিসের বে
কোঁচকানো ঝালরটা সোজা করছিল।
তুলে কেমন একটু হেসে ফের বলল,
কথা বলল না তোমাকে?

নাঃ। বলার আর থাকল কী যে ব
আর তাড়াতাড়া...সুখেন থামল।

[illegible]

ও তোমায় শুনতে চাই। আজ [illegible]-হলের সামনে তোমার [illegible] ভেবেছিল, পাছে তেমন কিছু বলে—আমার শোনা কঠিন হবে। [illegible] ওর নিজের দেশ—আমার বিদেশ। তাই আমিও ভেবে পড়েছিলাম।

লীলা তীব্রস্বরে বলে উঠল, কাল আমাকে গাল দিয়েছিল, তা তখন বললে না কেন? ওর মুখে জুতো মারতে পারো না! নচ্ছার পাপী কোথাকার! নিজের মেয়ের তুল্য—ভাগ্নী—তাকে যে নষ্ট করতে পারে, সে কী?

ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে লীলা স্তব্ধ হল। সুখেন বলল, ছেড়ে দাও। ওর সংগে আর সম্পর্ক কিসের? যা খুশি করুক।

লীলা নিজেকে সামলে নিল। বলল, খুব ভাবনায় ছিলাম গেলেনা দেখে। শহুরে দেশে গেলে অত রাত্রে! তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে থাকল।

সুখেন এবার কাজের কথায় এল। একটা ফোন রাখা দরকার। ফোন না থাকায় খুব অসুবিধে হচ্ছে। শহরে সবচেয়ে বড় প্রেস। ছোট প্রেসগুলোরও ফোন আছে, লীলা প্রেসের নেই। সামান্য কিছু টাকা চাই মাত্র। আর......

সুখেন যার কথা বলতে যাচ্ছিল, সে এসে গেছে সেমুহূর্তে। তারপর দুহাত তুলে নমস্কার করেছে—প্রথমে সুখেনকে, তারপর লীলাকে। লীলা চোখ বড় করে তাকাচ্ছিল।

সুখেন বলল, এর কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। পরিচয় করিয়ে দিই। রমা, ইনিই প্রেসের আসল মালিক। যাঁর নামে প্রেসের সাইনবোর্ড।

রমা ফের নমস্কার করল।

(৩০)

এটা গ্রাম্যতাদোষও হতে পারে, লীলা রমার সংগে কোন আলাপ না করেই উঠে পড়েছিল। যা ভালো বোঝে—সুখেন, করবে—তার অমত নেই। রমা অবশ্য একটু অপমানিত বোধ করছিল। লীলা মালিক প্রেসের—তার অধীনেই চাকরী করবে—সুতরাং এ ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক ও পক্ষে; কিন্তু লীলার চলে যাবার মধ্যে অন্য কী একটা ছিল। রমা মেয়ে, তার চোখে এটা লুকানো যায় নি।

পরে সুখেন রমার কাজ প্রেসের উন্নতিতে কতটা সহায়ক, ব্যাখ্যা করেছিল লীলার কাছে। লীলা বলেছিল, সে তো ভালই। কিন্তু তুমি সাবধান!

সুখেন হেসে বাঁচে না। লীলা, আজকাল সব জায়গায় মেয়েরা ছেলেদের পাশাপাশি কাজ করছে। সে যুগ আর নেই। মেয়ে পাশে থাকলেই যে সর্বনাশ ঘটে যায়, এ ধারণা ভুল প্রমাণ হয়েছে। আস্তে আস্তে সব দেখবে। এ তো শহর, গ্রামাঞ্চলেও এটা ঘটছে।

লীলা কী বুঝলে, সেই জানে। কিন্তু একটা ভালো ফল হল সুখেনের পক্ষে। লীলা বিয়ের দিন [illegible] এ মাসেই। সে [illegible]

ওদিকে জগদীশ লোক পাঠাচ্ছে প্রতিদিন। সুখেন বন্দুর কাছে যায়। বন্দু বলে, খবরদার। সুখেন দেখছিল, বন্দুর কাছে সেরাত্রে যাওয়া কী মারাত্মক ভুলই না হয়েছে। নিজের প্যাঁচে নিজেই আটকে গেছে সুখেন। টাকা অবশ্য গোপনে দেওয়া যায় জগদীশকে। বন্দুর কানে তা সে তুলবে না নিশ্চয়। কিন্তু যদি কোনক্রমে কথাটা বন্দু জানতে পারে, সুখেনের বিপদ অনিবার্য।

শেষে মরীয়া হল সুখেন। সামনে বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে। সব দিক থেকে নিরাপদ থাকা তার বড় দরকার এখন। অথচ মাথার উপর দু'দুটো খাঁড়া ঝুলছে। বেশি টাকার লোভে মালটা আটকে রেখেছিল। ঝাড়তে পারলে জগদীশের টাকা অনেক আগেই শোধ হয়ে যেত। জগদীশ চটবার সুযোগই পেত না।......সে না হয় দুদিন আগে আর পরে, লীলার টাকাটাও যদি দেওয়া যেত! দেবার ব্যাপারে বন্দা-টন্দা একশো হ্যাঙ্গামায় জড়াতে গেল কী আক্কেলে! ব্ল্যাকমেল—হ্যাঁ জগদীশের পাল্লায় যারা কোনক্রমে পড়েছে, তারাই জানে হাড়ে-হাড়ে সেটা! এমনকি ফেল্টুদা আর গার্লস্কুলের এক দিদিমণির এক 'লদকালদকি' কেন্দ্র করে শুয়ারটা ফেল্টুবাবুকেও শুষতে কসুর করে না। সুতরাং বন্দাকে তার দরকার ছিল। অথচ এদিকে আরেক বিপদ—মাল ঝাড়বার সুবিধে হচ্ছে না। পার্টি আসছে—কিন্তু বন্দার বাড়ি থেকে মাল নিতে কেউ রাজী হচ্ছে না। পাশেই কলকাতা-শিলিগুড়ি হাইওয়ে—এক ফার্লং দূরে পুলিশ ফাঁড়ি— বন্দা যত আশ্বাসই দিক, পার্টি ভরসা পায় না। যদি বা পায়, লরীওয়ালারা রাজী হয় না। এবং এভাবে ক্রমে ক্রমে মালের কথা অনেকগুলো কানে চলে গেছে। অতি শীগ্গীর একটা কিছু করা দরকার। যেকোন মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

শেষে ঝুঁকি নিতে চাইল সুখেন। বন্দু চটুক, লালুর আশ্রয় নেবে। তাছাড়া জগদীশ ব্ল্যাকমেল করে সুবিধে করতে পারবে না। বড় জোর পুলিশকে জানিয়ে দেবে। সুখেনের নামটা পুলিশের লিস্টে উঠবে। [illegible] নিয়ে ওরা মাথা ঘামাচ্ছে। তার ওপর আছে সীমান্ত এলাকা নিয়ে [illegible] ব্যাপার। সীমান্ত খুব বেশি দূরে নয়। পুলিশ এদিকেও [illegible]। এর সঙ্গে [illegible] আরও এক ঝ্যাকড়া জুটেছে। [illegible] আন্তর্জাতিক চোরা-পাচারকারীদের দল—সারা ভারতবর্ষে যাদের কাজকর্মের ঘাঁটি ছড়িয়ে রয়েছে—অতি সম্প্রতি তারা এ মফঃস্বল শহরেও যোগাযোগ রেখেছে বলে খবর পেয়েছে পুলিশ। এমন কি গ্রামাঞ্চলেও তাদের এজেন্ট রয়েছে। বিদেশে যারা তীর্থযাত্রায় যায়, কিম্বা যেসব লোক জাহাজে চাকরী করে, তাদের মাধ্যমে এইসব এজেন্টরা কাজকারবার চালাচ্ছে।.....অর্থাৎ, জগদীশ বড় জোর পুলিশের খাতায় ওর নামটা তুলে দেবার ভয় দেখাবে, সুখেন ভয় পাবে না, তখন সত্যিসত্যি হারামজাদা সুখেনকে তালিকাভুক্ত করে দেবে। তারপর পুলিশ ওর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কিছু জ্বালাতনও করবে না, এমন নয়। কিন্তু সুখেন যদি আর ওপথে পা না বাড়ায়! সুখেন ভাবল, এ দায়টা উদ্ধার হলে আর নয় বাবা! এ লাইনে সে বড় আনাড়ী, তা বোঝাই গেল এ ঘটনায়।

টেরেলিন সার্ট-প্যান্ট এবং টাই পরে বেশ ডাঁটের সংগেই সুখেন জগদীশের দোকানে গেল। আশেপাশে বন্দুর লোক আছে কি না গ্রাহ্য করল না সে। সন্ধ্যার দিকে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। প্যারেড গ্রাউন্ডের বিরাট মাঠটায় জল চকচক্ করছে। রাস্তার পাশে প্রকাণ্ড সব শিরীষগাছ থেকে তখনও টিপ্ টিপ্ করে জল ঝরছে। পীচের পথে স্টেশনের দিকে রিকশো যাতায়াতের বিরাম নেই। কিন্তু পথচারী কদাচিৎ চোখে পড়ে। রেণকোটে নিজেকে ঢেকে সুখেন হনহন করে এগিয়ে গেল। তারপর বাঁপাশে নামল।

জগদীশের দোকানে আলো জ্বলছে। কাছে গিয়ে দেখল, আড্ডার সকলেই হাজির যথারীতি। শুধু অহীন নেই। সুখেনকে দেখে প্রথমে ফেল্টুদা হাত বাড়ালেন, আয় বে শালা, তোর কথাই হচ্ছিল। এ জগা, তোর কুটুম্ব এসেছে রে, শীগ্গীর [illegible]!

লালু কোণের দিকে বসেছে। চৌকিতে পা তুলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে আছে সে। চোখ খুলে একবার সুখেনকে দেখেই ফের বুজল।

প্রদ্যোৎ বলল, ভগবান যে চোপাহান আইনবেত্তে দেছে, তা কি খালি আগির লগে, লদকালদকি করবার তরে—জিগান তো ফেল্টুদা পাঁঠাটারে।

সুখেন হাসল। টুপি আর রেণকোটটা ভাঁজ করছিল সে।

তপুদো ওরকে তপন ভদ্র বলল, আজ সুখেন আমাদের মাল খাওয়াবে, বুকে কথা বলিস পদু।

প্রদ্যোৎ চটে বলল, খবরদার পদু কইবি না! মা বাবা সাধ করিয়া নামখানা রাখছেন (মোবাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে)...শুনিছিস এমন নাম? তোম্পো ঘটিগো খালি ফেল্টু ফেল্টু চান্টু......হঃ!

আরেক কোণ থেকে শচী ধমকাল, এই বাঙাল, থামবি? আমরা মাল খাব।

ফেল্টুবাবু পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে নিলে। বাহুতে সোনার তাগা চকচক করতে থাকল। বলল, সুখেন, শুনিছিস আমার পোষ্যপুত্রদের আব্দার! ভাল চাস্ তো, এক ফোঁটা নয়—চল্, রিকশো করে দুজনে সাও মশাইয়ের দোকানে যাই, তারপর সোজা আমার বাড়ি। আজ কী বার রে লালু।

লালু চোখ বুজেই বলল, শনিটনি হবে।

শিবানী বেরিয়ে এসে বলল, না, বেস্পতিবার। তারপর সুখেনকে দেখেই চমকে যাবার ভান করে বলল, এই মা গো! আমি ভেবেছি বুঝি না জানি কে! অপূর্ব লাগছে কিন্তু। বৌদির কাছ থেকে এলেন নিশ্চয়!

ওরা হেসে উঠল।

সুখেন পর্দা তুলে ভিতরে গেল।

ফেল্টুবাবু বললেন, শিবি, ভেতরে গিয়ে দ্যাখ। নচ্ছারটা হয়ত পটাচ্ছে ওকে। খবরদার, তোমা আর এক পয়সাও ধার দিয়েছিস সুখেনকে? ও শালা, নিঘাৎ দেউলে হয়ে গেছে।

তপু একটু ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, শিবি, সুখেন টাকা দিয়েছে?

শিবানী ঘাড় নাড়ল।

প্রদ্যোৎ বলল, দিতেই হইছে যে। না দিয়া বাঁচবে নাকি?

লালু একটু হেসে বলল, জানিস, বন্দু বারণ করেছিল টাকা দিতে!

তপন বলল, তাই নাকি? তুই শুনলি কোত্থেকে? সুখেন বলেছে তোকে?

লালু বলল, না। আমি শুনেছি।

ফেল্টুবাবু বলল, বন্দা? ও কেমন করে জানল রে? ওকে সুখেন বলেছিল নাকি?

লালু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, হ্যাঁ। কাজটা অন্য কেউ করলে ওইখানে ওর মুণ্ডুটা সাইনবোর্ড করে রাখতাম।

সুখেন বেরিয়ে এল হাসিমুখে। বলল, কই কে যাবে দোকানে? তারপর পকেট থেকে একদলা নোট বের করল সে।

ফেল্টুবাবু টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে বলল, শচী তুই যা। বৃষ্টিবাদলার দিন। দুটো বড় খোকা আনিস। বাকি টাকার কী হবে রে ছোট খোকারা?

রেস্তোরা কিম্বা হোটেল থেকে মাংস আসুক। ওরা জানাল।

শচী চলে গেলে ফেল্টুবাবু বলল, এ্যাই যাঃ! সোডা বলা হয় নি। সুখেন একটা টাকা দে।

টাকা নিয়ে প্রদ্যোৎকেই যেতে হল। হঠাৎ লালু উঠে বলল, আমার বরাতে নেই। কাজ আছে। চলি।

সে কী রে! ফেল্টুবাবু ওর হাত ধরে টানল। লালু ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। একপাশে ওর স্কুটারটা ঠেস দেওয়া ছিল। সেটা দাঁড় করিয়ে সুখেনের দিকে তাকিয়ে 'পরে দেখা হবে' বলে সে স্টার্ট দিল। তারপর আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল।

লালু না থাকলে এরা বেশ স্বস্তি বোধ করে। প্রদ্যোৎ বলল, হঃ! আইজ সাংঘাতিকরকম একটা হবে দাদারা। কাইল শুনবাইনি। জোর বাধাইবে শালা। আওয়াজ শুনিয়াই বোঝা গেছে।

সুখেন মনে মনে নাক কান মলছিল। আর নয়! জগদীশ শান্তভাবে টাকা নিয়েছে। রাগ করে নি একটুও। বলেছে, তুমি আমার ছেলের মত সুখেনবাবু। আর যার সঙ্গে করি, তোমার সঙ্গে কি বদমাইসি করতে পারি? বন্দুর কাছে যাবার কোন দরকার ছিল না।

বুড়ো লোকের মিষ্টি কথা। সে যাই হোক, এখন বন্দুর বাড়ি থেকে মালটা সরাতে হবে। এ ব্যাপারে লালুর সাহায্য চাইত। হঠাৎ লালু চলে গেল। আজ রাত্রেই ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু রাত গভীর হলে জোর বৃষ্টি নেমেছিল আবার। আর, তখন প্রত্যেকেই চোখের সামনে হলুদ ফুল দেখছে—ফেল্টুবাবু যা দেখতে পান; সুখেন বেশ্চে ছিল হয়ে পড়ে পড়েছে—দরজার প্রথামত লেগে দিয়েছে জগদীশ। শেষঅব্দি বঙ্কুখোকা (ঁবীলিতী), একটা ... আমদানী করতে হয়েছিল। সুতরাং একেবারে আকণ্ঠ।

আজ আর ইচ্ছে থাকলেও মুশকিল। জগদীশই মুল খেড়ি। ভিতরে গিয়ে আর বেরোতে পারে ... শিবানীর এই শেষ পর্যায়টা সামলানোর রয়েছে।

সে একে একে সকলকে বের করে ... ছিল—প্রায় ধাক্কা দিয়ে গালমন্দ তাড়ানো, যেমন সে বরাবর করে ... কেবল সুখেন থেকে গেল। তার সাড়া ছিল না।

চলে যাবার পর বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ শিবানীর নামে খিস্তি করা ... শিবানী এতে অভ্যস্ত। তারপর ... সাড়া পাওয়া যায় নি।

শিবানী পর্দা সরিয়ে ভিতরে যা... হঠাৎ কাপড়ে টান পড়ায় সে ফিরে দাঁ... দেখল, সুখেন হাসছে। ওর কাপড় ... আছে সে।

ছাড়। শিবানী চাপা গলায় ব... বাড়ি যাবে না?

সুখেন নিঃশব্দে হাসছিল। বলল, ... ভেবেছিলে? খুব মাতাল হয়ে গে... কোন সাড়া নেই......

শিবানী ঠোঁটে আঙুল রেখে ভি... দিকে কটাক্ষ হানল।

সুখেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ও ... কপাট হয়ে গেছে। তারপর ওকে ... পাশে বসতে বাধ্য করল সে। শি... বসল।

তার কোমর জড়িয়ে সুখেন ব... অনেক দিন তোমাকে কাছে পাইনি। ... ভেবেছিলে বল তো?

শিবানী মুখ নামিয়ে বলল, আর ... ভাবব! যা পাবার পেয়ে গেছেন, অ... সঙ্গে আর কী!

চুপ! বাজে বলো না। সুখেন ... জড়িয়ে ধরল। আমি এখনও তোম... তেমনি ভালবাসি।

থামুন, খুব হয়েছে।

জগদীশ মাতাল হয়ে পড়ে থাব... সুখেনের কণ্ঠস্বর—তার শরীর, জগদী... মেয়েকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় স্বর্গের দি... শিবানী এর বেশি কিছু আশা করে ... তার চোখে পৃথিবীটা খুব ছোট। ... মাঝে মাঝে, পৃথিবীর বাইরে স্বর্গের দি... যেতে ভালোবাসে। পৃথিবী ওর ... স্বর্গ নয়। হবে না কোনদিনও। তাই ...

(৩১)

সুখেন ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়া... হঠাৎ তার মুখটা সাদা দেখাল ক... মুহূর্ত। পরক্ষণে একটু হেসে নিজে... সামলে নিল সে। বলল, খুব ব্যস্ত না... পারে আসব ভেবে।

লীলা বলল, এদের সঙ্গে গল্প করা...

জরুরী কাজ নেই তো তেমন? বাইরের ঘরে গিয়ে বস। যাচ্ছি।

নাঃ। সুখেন বারান্দায় গেল।

লীলা পিছনে এসে বলল, বরং বাসিনীর কাছে গিয়ে গল্প কর কিছুক্ষণ। পাশের বাড়ির মেয়েরা আলাপ করতে এসেছে। ওদের ফেলে আসা যায় নাকি?

বাসিনী ডাকল, অ-জামাইদাদা...... পরক্ষণে জিভ কেটে বলল, আগে হতেই জামাইদাদা বলছি, রাগ করছেন না তো গো?

ঘন্টা উঠোনের পাশে ফুলগাছের গোড়া সাফ করছিল। একগাল হেসে বলল, বুড়ির কাছে যাবেন না, পানের পিকে রাঙা করে ফেলবে। বরঞ্চ আমার কাছে বসুন। একটা চেয়ার আনছি।

বাসিনী মুখ ঝামটা দিল, মরণ। ছোঁড়ার বুড়ি ছাড়া কথাটি নেই। ক্যানে রে ড্যাকরা তোর মামাসি কি যোয়ান হয়ে আছে নাকি? তুইও কি বুড়োখিদে না শেয়ালখেকো?

অন্যসময় হলে এগুলো সুখেনের পক্ষে উপভোগ্য ছিল। কিন্তু এখন সে যেন তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বেঁচে যায়। কারুর কথার জবাব না দিয়ে সে সদর ঘরে গিয়ে বসল। টেবিলে পত্রিকার পাতা ওল্টাল। ছবি দেখতে চেষ্টা করল। তারপর উঠল।

মুখ বাড়িয়ে ঘণ্টাকে বলল, ওকে বলো, আমি ওবেলা আসছি।

চলে গেল সুখেন।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লীলা ওকে সাইকেলে যেতে দেখছিল। ব্রততী বলল, এই, বিয়ের আগে অত করে দেখতে নেই বরকে!

লীলা লজ্জিত হেসে মুখ ফেরাল।

ব্রততীর চোখ সর্বদিকেই থাকে। সে এবার কনককে চিমটি কেটে বলল, এই! কনকদি, তোমার আবার কী হল? উনি না হয়, বরকে দেখছেন। তুমি কাকে দেখছ?

কনক একসময় এখানকার মেয়েই ছিল। ব্রততীদের পাশের বাড়ি এক বুড়ো ভদ্রলোক থাকেন। তাঁর বৌমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কলকাতায় থাকে এখন। ব্রততীর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে ওর। যেকদিন এসেছে, ব্রততী তার গাইড।

ব্রততীর কথা শুনে কনক হাসবার চেষ্টা করল মাত্র। তার মুখটা হঠাৎ অসম্ভব ফ্যাকাসে দেখাল। একটু পরেই সে দুহাতে মাথাটা ধরে মুখ নামিয়ে দিল হাঁটুর কাছে।

ব্রততী কাছে এসে একটু ঝুঁকে বলল, কী হল কনকদি? শরীর খারাপ করছে নাকি?

কনকের চেহারায় যা আছে, তাতে যে কোন মানুষই জানবে কোথাও ওর একটা রুগ্নতার ব্যাপার রয়েছে। বয়স খুব বেশি নয়—হয়ত পঁচিশের এদিক-ওদিক; কিন্তু অবিবাহিতা মেয়েদের সহজ লাবণ্যটুকু চোখে পড়া কঠিন। দেহের গঠনে যার আপাতদৃষ্টে কোন ত্রুটি নেই—মুখশ্রী থাকার মত একটা ডিমালো মুখও আছে, এবং চোখের টানা ভাবটুকুও যার সরলতার প্রতীক, কোথাও যেন তার একটা আশ্চর্য অসামঞ্জস্য চোখে না পড়ে পারে না। খড়ি-খড়ি ত্বকে পোড়খাওয়া মালিন্য—যেন এক আবছায়া ওকে ঘিরে থাকে সব সময়; সে-আবছায়া ওর দারিদ্র্যের না হতেও পারে। জীবনে গভীর দুঃখবোধ অনেক মেয়েরই তো থাকে। যন্ত্রণাও সয়েছে বহু মেয়ে। —দৈহিক বা মানসিক। কিন্তু কনকের মধ্যে যা আছে, তাকে বিষাদ বলা যায় হয়ত। এবং এ মেয়ে দুঃখকে ঔদাসীন্য দিয়ে প্রতিহত করতে যত পটু, তেমনি যেন সুখকেও। এটা নিস্পৃহতা বলা কঠিন। কিন্তু হঠাৎ এমনি করে বিস্ফোরণ ঘটে তাকে দেহের দিকে রুগ্ন করে ফেলে।

কিছু হয়নি আমার। কনক মুখ তুলে বলল। মাথা ঘুরছিল। মধ্যে মধ্যে ঘোরে।

লীলা জোর করে ওকে শুইয়ে দিল বিছানায়। মাথার কাছে টেবিল ফ্যানটা চালিয়ে দিল। তারপর বলল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিন। কেমন?

সুনন্দা নিবিষ্টমনে একটা গহনার ডিজাইনের ক্যাটালগ দেখছিল। সে একটা ডিজাইন দেখিয়ে এবার বলল, লীলাদি, বিয়ের দিন এটা দেখতে চাই আপনার কানে।

কোনটা? ব্রততী দেখে ঠোঁট কুঞ্চিত করল। ...ধুক্! একেবারে সেকেলে। কই দাও, আমি পছন্দ করি।

ক্যাটালগ নিয়ে ওরা মেতে রইল কিছুক্ষণ। কনক চুপচাপ শুয়ে রয়েছে। ধবধবে মসৃণ সিলিঙে তার দৃষ্টি।—অস্বাভাবিক—হিস্টিরিয়ার রোগীর মত।

এক সময় ব্রততী ওকে ডাকল। কই, ওঠ কনকদি। পারবে তো যেতে?

কনক ওঠবার চেষ্টা করল। লীলা বলল আহা, হাসপাতালে তো নেই, ঘরেই আছে। ও থাক না! পরে আমি রেখে আসব'খন।

সন্ধ্যা নামছিল।

ব্রততী বলল, ঠিক আছে কনকদি। তুমি পরে এসো বিশ্রাম করে। আমি যাই। পড়াশুনো আছে। সুনন্দা, থাকবি না যাবি?

সুনন্দা উঠে দাঁড়াল। এই মা! আমার একটা ভীষণ কাজ রয়েছে যে। একেবারে ভুলে বসে আছি।

ব্রততী কটাক্ষ করল, অশোক আসবে বুঝি?

যাঃ! সুনন্দা পায়ে স্লিপার গলিয়ে বলল, তোর মত আমি দিনরাত্তির প্রেমে হাবুডুবু খাই নে!

ব্রততী ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, দেয়ার ওয়াজ এ কিং নেমড অশোকা দ্য গ্রেট...

ওরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। বাইরে ফের ব্রততীর গলা শোনা গেল, তোমার বৌদিকে খবরটা দিয়ে যাবো কনকদি।

লীলা কনকের মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসল। দুটো বালিশ মাথায় রেখে যথার্থ রোগীর মত শুয়ে আছে কনক। লীলা বলল, কতকটা আপনার মতই একটা বিচ্ছিরি অসুখ ছিল আমার। গ্রামে ছেলেবেলা কাটিয়েছি—সে তো শুনেছেন ভাই। গ্রামের ব্যাপার বুঝতেও পারছেন। বলে লীলা একটুখানি হেসে নিল। তারপর কথাটার জের টানল। ...প্রথম প্রথম ওইরকম মাথা ঘুরত। তারপর ফিট হয়ে যেতাম। সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড, বুঝলেন? ওরা বলত, ভূতে ধরেছে। মাঠে জঙ্গলে দিনরাত্তির ঘুরে বেড়ায় সোমত্ত মেয়ে, কোন ঠাঁই-অঠাঁই মানে না—বাগে পেয়ে ধরে ফেলেছে।

লীলা আরও জোরে হেসে বল[illegible] থাকল, অনেক মাদুলী কবচ থান-টান হ[illegible] ওঝাও এল শেষ অব্দি। ধূপের ধু[illegible] জ্বালল। আসনপিঁড়ি করে বসাল। নি[illegible] বসল সামনে। তারপর বুঝলেন ভাই, কী সব দুর্গন্ধ জিনিস নাকের কাছে ধর[illegible] ...ইস্!

কনক শুনছিল। ঠোঁটে একটু হা[illegible] বলল, তারপর?

লীলা চোখ বড় করে বলল, তার[illegible] কী হয়েছিল, কিচ্ছু জানতে পারিনি। প[illegible] শুনলাম, ভূতের নামও বলেছিলাম। [illegible] ধরেছে, তাও মুখ দিয়ে বের করেছি নাকি!

কনক প্রশ্ন করল, কী নাম ছি[illegible] ভূতের?

মধু পণ্ডিত।

ভূতও পণ্ডিত হয় নাকি? কনক খিলখিল করে হেসে উঠল।

না। মধু পণ্ডিত ছিলেন গ্রা[illegible] পাঠশালার গুরুমশাই। তিনি মারা গি[illegible] নাকি ভূত হয়েছিলেন!

তারপর কী হল?

তারপর নাকি দাঁতে একটা জলভ[illegible] পেতলের কলসী নিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল[illegible] —ঠিক যেখানটিতে আমাকে ধরেছিল[illegible] একটা ডোবার পাশে মস্ত তেঁতুল গাছে[illegible] নীচে। খুব তেঁতুল খাওয়া অভ্যেস ছি[illegible] ছেলেবেলায়।

কনক লীলার দিকে স্থির তাকি[illegible] থাকল কিছুক্ষণ। যেন লীলার জীবনটাকে বোঝবার চেষ্টা করছিল সে। লী[illegible] বাসিনীকে ডাকছিল চা দেবার জন্যে। হা[illegible] ইসারায় নিষেধ করে কনক বলল, ফিটে[illegible] অসুখ আমার নেই। হলে হয়ত ভাল ছিল।

কেন? ফিটের অসুখের নাম কর[illegible] নেই, ভাই। লীলা গুরুজনের মত কথা[illegible] বলল।

কনক বলল, মন্দ কী। কিছুক্ষণে[illegible] জন্যে নিশ্চিন্ত থাকা যেত।

লীলা একটু সন্দিগ্ধভাবে বল[illegible] সে কি! ফিটের অসুখ থাকলে কী হ[illegible] আমি জানি! কিছু ভালো লাগে না—[illegible] খেতে, না পরতে। জীবনটার যেন কো[illegible] মানে থাকে না।

কনক দার্শনিকতা করে বলল, জীবনে[illegible] মানে থাকে নাকি! আপনি জীবনকে হয়[illegible] আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। [illegible] বলুন তো ভাই, আপনি কী চান, ক[illegible] পেলে সুখী হন, বুঝতে পারেন?

লীলা তর্কের সুরে বলল, পা[illegible] বৈকি। বুঝতে না পারলে বেঁচে আ[illegible] কেন? একসময় বুঝতে পারতাম না বলে[illegible] মরার সাধ হত। জানেন, কতবার সাধ ক[illegible] মরতে চেষ্টা করেছিলাম?

কনক কেমন হাসল—দুর্বোধ্য হাসি। তারপর বলল, তর্ক করে বোঝাতে পারব না। আমি অবশ্য কোনদিনই মরবার চেষ্টা করিনি। মরবার কথা মনে এলেই ভীষণ ভয় পাই। অথচ জীবনের কিছুই বুঝতে পারিনে।

লীলা স্বাভাবিক মেয়েসুলভ তর্কের উৎসাহে বলল, তাহলে এতসব মানুষ বেঁচে আছে, এদের বেলায় কী বলবেন? সবার আপনার মত? তারাও তো মরতে ভীষণ ভয় পায়। তাবলে তারা কি জীবনের মানে কী, বোঝে না?

কনক শান্তস্বরে বলল, আমি আমার কথা বলছি।

লীলা জয়ের গৌরবে বলল, সবায় জানে তারা বেঁচে আছে কেন। বলবেন, জীবন বলতে—মেয়েদের কথাই আমরা অবশ্য জানি, ওরা চায় ঘরসংসার, চায় ছেলেপুলের মা হতে! এও তো একরকম মানে জানা। এছাড়াও মানে আছে।

কনকের চোখটা কিছু উজ্জ্বল দেখাল। সে বলল, কী সেটা বলতে পারেন ভাই?

লীলা আত্মস্থ হবার ভঙ্গীতে জবাব দল, কিছুটা পারি বৈকি।

কনক একটু হেসে বলল, পুরুষ-মানুষকে ভালবাসা? তাই বলতে চান তো?

জবাবে লীলাও একটু হাসল মাত্র।

কনক বলল, হয়ত আপনি কাকেও ভালবাসেন। গভীরভাবেই বাসেন। তাই আপনার চোখ অন্ধ হয়ে আছে।

কেন অন্ধ থাকবে? যাকে ভালবাসি, তাকে জানি।

কতটুকু জানেন?

যতটুকু জানা দরকার।

একটু চুপ করে থেকে কনক বলল, একসময় আমিও আপনার মত একজনকে অন্ধভাবে ভালবাসতাম। তার সঙ্গে বিয়েও হয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে জানতে পারলাম, তার প্রেমপাত্রী শুধু একা আমি নই। আরও এমন আছে। ছিলও অনেক। এমনকি আর একটা বিয়েকরা বৌ পর্যন্ত ছিল। তার নাম ছিল নাকি সুধা।

লীলা আঁতকে উঠে বলল, সর্বনাশ!

সেই সুধাকে সে বিষ খাইয়ে মেরেছিল। বড়লোকের মেয়ে ছিল সুধা। সম্পত্তির লোভে হয়ত এই কীর্তি করেছিল সে! শেষে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করে। মামলা হয়। শেষে খালাস পায়।

ওকে বলেননি যে একথা আপনি জানেন?

বলিনি। বলে নিজের জীবনে অশান্তি ডেকে আনতে চাইনি। গভীর প্রেম কিনা? কনক ব্যঙ্গ করে হাসল ফের।

তারপর?

ব্যাপারটা জানবার পর কিন্তু ভীষণ ভয় পেলাম। আমিও বাবার একমাত্র সন্তান—খুব ভালো না হলেও আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না বাবার। এখানেই একটা ভালো ব্যবসা ছিল তাঁর। বাবা মারা গেলেন। ও সেই ব্যবসার দায়িত্ব নিল। বেশ চলছিল দিনগুলো। কিন্তু ওই যে বলেছি, ভয়—ওকে খুব ভয় করতে শিখেছিলাম সে ঘটনা শোনার পর থেকে। যখনই অসুখ হত, মনে হত ওষুধের শিশিতে বিষ এনে দিচ্ছে। অস্বস্তিতে ঘুমোতে পারতাম না। সে কী ভীষণ যন্ত্রণা, বুঝতে পারবেন না ভাই। দিনের পর দিন মৃত্যুভয় নিয়ে বেঁচে থাকা! রাতদুপুরে ও ঘরে ফিরে আমার পাশে এসে বসেছে, গায়ে হাত রেখেছে—অমনি চমকে উঠেছি, গলা টিপে ধরবে না তো? ওষুধের শিশি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ওকে অন্যঘরে শুতে বলেছি। তারপর একদিন...

লীলা কাঠ হয়ে শুনছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ডাকল, বাসিনী, শোন।

কনক উঠে বসল। বলল, থাক্ ওকথা। এবার আমি যাই ভাই, অনেকক্ষণ আজে-বাজে কী সব বললাম। রাগ করেননি তো?

লীলার মুখটা থমথম করছিল। সে শুকনো হাসল। বলল, না। রাগ করব কেন? সব জেনে রাখা ভালো জীবনে।

বাসিনী এসেছে। কনক বলল, ওকে বলুন না, একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে। ওখানে একটা দোকানে কতকগুলো ইতরের আড্ডা আছে।

লীলা বলল, না, আমিই যাচ্ছি। বাসিনী দরজায় শেকল তুলে এখানেই বস তুমি। সুখেনবাবু যদি আসে, বাইরের ঘরে বসাবে। আমি এখুনি আসছি।

পথে নেমে কনক বলল, আপনার বিয়ে কবে?

লীলা বলল, দিনসাতেক দেরী আছে। থাকবেন তো এ কটা দিন? থাকলে ভীষণ খুশি হব।

কনক ওর হাতটা হাতে নিয়ে বলল, থাকতে পারলে খুশি হতাম। আপনাকে আমার কী ভীষণ ভালো লেগেছে বলার নয়। তা নাহলে, ওইসব ছাইপাঁশ শোনাতাম ভেবেছেন? তবে একটা কথা—আপনার মনের জোর আছে খুব—আমার চেয়ে অনেক বেশি। আপনি সুখী হবেন।

লীলা অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল। মোড়ে এসে বলল, আপনার স্বামী এখন কোথায়?

বহরমপুরেই আছে। যাবে কোথায়?

বারে! এখানেই আছেন ভদ্রলোক? লীলা একটু উৎসাহিত হল হঠাৎ। জানেন, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে লোকটাকে! মুখোমুখি পেলে ও'কে যা বলতাম! এমন ভালো মেয়েকে পেয়েও যে ভালো হতে শেখেনি, সে কি মানুষ! তবে দিদি, সবসময় গোবেচারা ভীতু সাজলেও চলে না! মেয়েদের আর কিছু নেই, হাতে নখ, মুখে দাঁত তো রয়েছে!

কনক হেসে উঠল সশব্দে। যা বলেছেন! আপনি হলে দাঁতনখ দিয়ে আক্রমণ করতেন বুঝি?

করতাম। আমি রূপপুরের বুনো মেয়ে। ননীর পুতুল হয়ে মানুষ হইনি।

সে যখন ছিলেন, তখন ছিলেন। এখন তো শহরের মেয়ে!

মোটেও না।

বেশ দেখা যাবে, কী করতে পারেন।

লীলা একটু চমকে উঠল। কেন? (সুখেন তা নয়, আমি জানি) দরকার হবে না দাঁতনখের—বলতে বলতে সে হেসেও ফেলল শেষে।

কনক কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটল। একটু ইতস্তত করছিল যেন—কয়েকবার মুখ তুলে কী বলতে গিয়ে বলল না। অবশেষে বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ লীলার সামনে দাঁড়াল। লীলা বলল, আসি।

কনকের ঠোঁট কাঁপছিল হঠাৎ। একটা কথা বলব, রাগ করবেন?

রাগ কেন করব? বলুন না।

আপনি নিজের জীবনটা নষ্ট করবেন না, ভাই।

কেন ওকথা বলছেন কনকদি?

বলছি। কনক অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল। কারণ জেনেশুনে আরেকটি মেয়েকে সর্ব-নাশের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখলে দুঃখ পাই। আমার সেই স্বামীর নাম জিগ্যেস করলেন না তো?

করিনি। স্বামীর নাম বলতে নেই—বলবেন না তো!

যখন স্বামী ছিল, তখন ছিল। এখন আর কী! তাছাড়া, আজকাল স্বামীর নাম অনেকেই বলে। ওটা একটা সংস্কার।

বাধ্য হয়েই লীলা প্রশ্ন করল, কী নাম ছিল ও'র?

কনক বলল, নামটা সুখেন রায় হলে যেন অবাক হবেন না ভাই। তারপর মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকল। লীলা দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল মাত্র। (ক্রমশঃ)
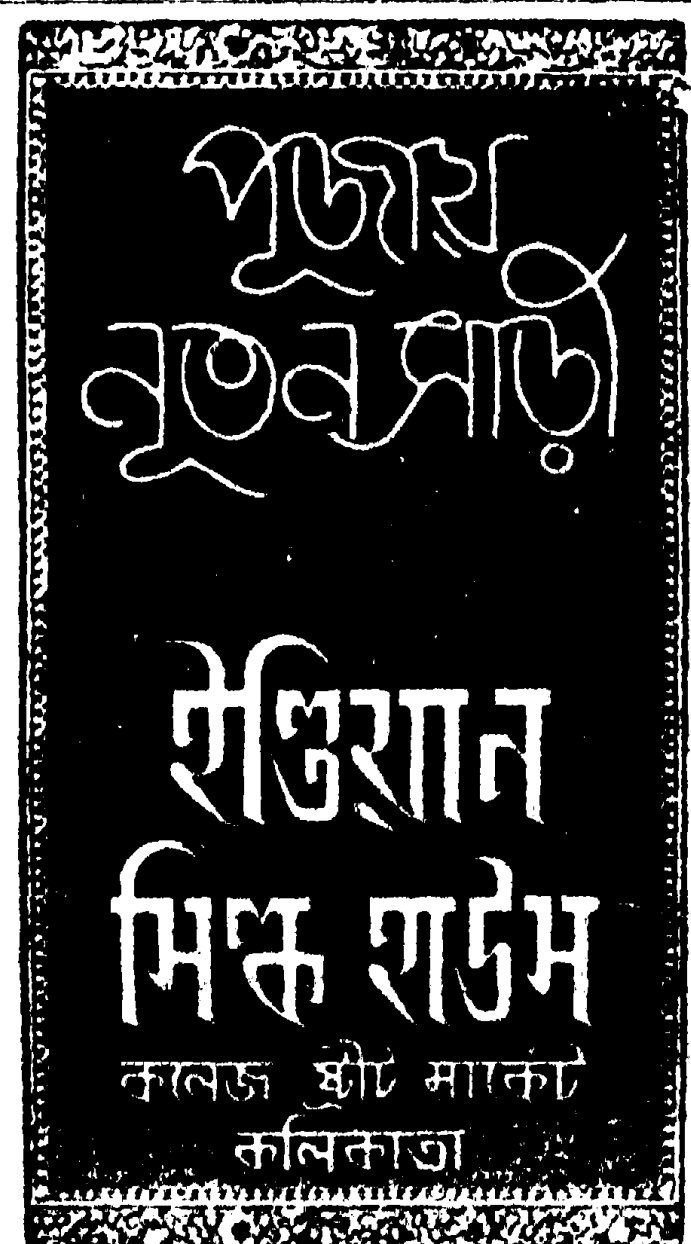
খাদ-খেদা-কানি-ছানি

বিকাশকান্তি রায়চৌধুরী

সারা এশিয়াতে যেটুকু জঙ্গলভূমি এখনও অবশিষ্ট আছে তাতে শোনা যায়, হাতির সংখ্যা দ্রুত কমে এসেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বনভূমি কমা সত্ত্বেও হাতির সংখ্যা বেড়েছে। সবশেষের সরকারী হিসেবে ভারতের বনভূমিতে হাতির মোট সংখ্যা দশ হাজারের মত হবে।

হাতির শত্রু হচ্ছে সিংহ আর বাঘ। তবে ভারতের জঙ্গলে সিংহ নয়, হাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে বাঘ।

বাঘের বংশবৃদ্ধি হতে সময় লাগে। আমার তো ধারণা তিন বছরের আগে বাঘিনী দ্বিতীয়বার সন্তান প্রসবের সুযোগ পায় না। তাছাড়া পুরুষবাঘ শিশুদেরকে হত্যা করে বলে যে ধারণা আছে তাকেও সত্যি বলে বিশ্বাস করার মত প্রমাণ পেয়েছি আমি বহুবারই।

হাতির বেলাতে ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই উল্টো। ওদের গোটা সমাজটাই শিশুর প্রতি অতিমাত্রায় দরদী। এমনকি আলিপুরদুয়ারের জঙ্গলে একটি গুণ্ডা হাতির সঙ্গে শিশুকে ঘুরতে দেখে আমি কম বিস্মিত হই নি।

হাতি আবার দস্তুরমত দীর্ঘায়ু।

বাঘের সঙ্গে ওর জাতশত্রুর সম্পর্ক থাকলে কি হবে, দলবদ্ধ হয়ে থাকার অভ্যেস বাঘের নেই। বাঘের দল বলতে ওরা দুজনা। যূথকে আক্রমণ করা দূরে থাক, দলছাড়া কোন হাতিকে আক্রমণ করার সাহসও সব সময় জুগিয়ে উঠতে পারে না ওরা।

তবে হাতির সেরা শত্রু হচ্ছে বেপরোয়া চোরাগোপ্তা শিকারীর দল। হাতির দাঁতের লোভে এই চোরাগোপ্তা শিকারীর দল সক্রিয় ছিল কিছুকাল আগেও।

আইনের দাপটে বর্তমানে এই ধরণের শিকারীর দল কিছুটা সংযত হয়েছে বলেই হাতির সংখ্যা বেড়ে উঠেছে।

এই বৃদ্ধির ফলে অবিশ্যি বিপদ বেড়েছে আর এক দিকে। ক্রমবর্ধমান পালের খোরাক যদি ফুরিয়ে আসে জঙ্গলে তাহলে আহার অন্বেষণে লোকালয়ে ধাওয়া করবে ওরা। একখানি গাঁয়ের আখের ভরা ফসল সাবাড় করতে ওদের একজনই যথেষ্ট।

হাতির উপদ্রব থেকে গাঁয়ের খেত-খামার রক্ষে করাও খুব চাট্টিখানি কথা নয়। বলছি তারই এক অভিজ্ঞতার কথা।

ডিব্রুগোধিয়া রেলওয়ের একটি ছোট্ট স্টেশন। ওপারের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এপারের পাহাড়ী জঙ্গলে যাবার জন্যে হাতি-চলাচলের পথটার উপরেই স্টেশন। স্টেশন তৈরী হবার পরেও কিন্তু হাতির পাল ওদের পথ ছাড়তে নারাজ। কাঁটা-তারের বেড়া ওরা উপড়ে ফেলে দিল। ইঁটের পাঁচিল ধ্বসে পড়লো ওদের বিক্রমে। শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে, কাঁটাতারের বেড়া উঁচিয়ে জোরালো বৈদ্যুতিক শক দিয়ে রাখা যাক। বাছাধনেরা টের পাবে মজাটা।

ব্যবস্থামত সবই করা হল। কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে দেখা গেল কাঁটা-তারের বেড়া মাটিতে শুয়ে পড়ে আছে যথারীতি। বেড়ার উপরে বিশাল দেহী কটি গাছকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। আর সেই গাছের সেতুবন্ধের সাহায্যে হাতির পাল যথারীতি চলে গেছে ওপারের পাহাড়ে। বৈদ্যুতিক শক খেয়ে মরে পড়ে আছে গোটা দুই ফেউ আর নেউল।

প্রাকৃতিক ভারসাম্যের খাতিরেও হাতির বংশবৃদ্ধি একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা দরকার।

হাতি ধরার রীতি তাই সেকালেও ছিল, একালেও আছে। তবে ভবিষ্যতে থাকবে বলে আশা করা যায় না। বিশ বছর আগেও শোনপুরের মেলায় হাতির দাম পঞ্চাশ হাজারে উঠেছে। অবিশ্যি চোখ জুড়োয় সেই সওদা দেখে। একে তো চেহারাখানি যৌবনোচ্ছল তায় আবার নাকি শিকারে তার জোড়া নেই। মাহুতের হুকুমে নানারকমের অভিনব কসরৎ দেখিয়ে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিল সে মেলার লোককে।

পঞ্চাশ হাজার না হোক, পাঁচ হাজারে ওদের বুড়োটাও বিকিয়ে যেতো সেদিন।

কিন্তু পাঁচ হাজারে জোয়ান হাতি কিনবার মত খদ্দেরও আজকাল আর মেলে না।

হিন্দু সংস্কার মতে গরুর মত হাতিও বধ্য নয়। অবিশ্যি দুষ্ট হাতি বা গুণ্ডা হাতির কথা আলাদা।

এই পটভূমিকায় আইনের শাসন শিথিল করার বিপদও কম নয়। হাতি শিকার ব্যবসায় পরিণত হয়ে দাঁড়ালে দশ বছরের মধ্যেই দশ হাজারী বাহিনীর খতম হবার সম্ভাবনা আছে।

মহীশূর সরকার সব দিক ভেবে-চিন্তেই লোকসানের ঝুঁকি নিয়েও খেদার আয়োজন করলেন তাই গত জানুয়ারীতে।

খেদায় ধরা পড়েছে পঁয়ষট্টিটি হাতি। রাজকোষ থেকে ব্যয় হয়েছে দু লক্ষ ডলার। দর্শকপিছু একশো তিরিশ ডলার হিসেবে সরকারের যে আয় হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য নয় তেমন কিছু। ভরসা এখন এই যে নীলামে হাতি বিক্রী করে সরকারের তহবিল আবার ভরে উঠবে।

অবিশ্যি আগস্ট মাসের আগে নীলাম ডাকা সম্ভব হবে না। কমসে কম ছটি মাস লাগবে ওদের পিলখানার ছাড়পত্র পেতে।

ছোট বন্দীশালার মধ্যে বুনো হাত
দড়ি পরানো হচ্ছে।

পিলখানা হচ্ছে বুনো হাতির মগজ ধো
ইয়ের কারখানা। পঁয়ষট্টির বাহিন
ছ' মাস ধরে খাওয়ানোর খরচটা এ
মোটা রকমের হবে বৈকি। তাছাড়া মা
ও ঘাসীদের মাইনেও গুণতে হবে।

অবিশ্যি সরকার ছাড়াও, মহীশূ
জঙ্গলপ্রান্তবাসী সাধারণ মানুষও হ
ধরে। এবং পোষ মানিয়ে বিক্রি। কেমন ক
সেই কথাই বলি এবার।

খাদ, খেদা, কানি-ছানি—বুনো হ
ধরার জন্যে এই চার রকমের কৌশল
আদ্যিকাল থেকেই চালু আছে আমা
দেশে।

খাদের প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করি।

হাতি হচ্ছে জঙ্গলের রোড ইঞ্জি
নীয়ার। একই পথে বার বার চলাচলে
ফলে জঙ্গলের ভেতরে একটা পথ পড়
মাঠে বা বিলে মানুষের পায়ে পায়ে যে
একটা সুস্পষ্ট পথের রেখা আঁকা পড়ে, এ
ঠিক তেমনি। অবিশ্যি হাতি চলাচলে
পথটা স্বাভাবিকভাবেই কিছু বেশি চওড়
হাতির নাদি ছাড়া পথটা এমনিতে বে
পরিষ্কার থাকে। পথের উপরে আগাছা
এলোমেলো নুড়ি পাথরও দেখা যায় না।

চলতি ভাষায় এই পথকে বলা হ
'হাতি ডান্ডি'। সীমান্ত এলাকায় এই হা
ডান্ডি ধরে আমাদের সামরিক বিভাগে
ইঞ্জিনীয়ারেরা অনেকগুলি সড়ক বানিয়ে
ছেন আধুনিককালে।

হাতি ডান্ডি চিহ্নিত করে মস্ত ব
একটা খাদ খোঁড়া হয়। এই খাদের উপরে
কঞ্চি, পাট বা নলখাগড়ার কাঠি সাজিয়ে
তার উপরে মাটি, ঘাস পাতা ও আগাছার
আচ্ছাদনে তাকে স্বাভাবিক করে তোল
হয়।

কখনো কখনো হাতিকে প্রলুব্ধ করবার
জন্যে পোষা মাদী হাতিকেও বেঁধে রাখা
হয় খাদের পারে।

হাতি ধরা পড়ে সেই খাদে। বেশ
কদিনের উপোসে যখন সে আধমরা
তখনই তাকে উপরে টেনে তোলা হয় পোষা
হাতির সাহায্যে। মুক্তির জন্যে শেষ

[illegible] তার অর্থ [illegible] না।

ডিব্রুগড় ও শদিয়ার [illegible] কৌশল আমি দেখেছি। [illegible] হাসিল করত কাজ।

কিন্তু খেদার প্রসঙ্গ [illegible] আগে [illegible] কথা।

ছানি কথাটা আসামী। মানে হচ্ছে আফিং। আলিপুর [illegible] এক কাঠের ব্যবসায়ী এই কৌশল প্রয়োগ করে মোটা তিনেক হাতি অন্তত পাকড়াও করে-ছিলেন বলে জানি।

দস্তুরমত শিক্ষিতা একটি সুন্দরী তরুণী হস্তিকে ভদ্রলোক বেঁধে রাখতেন একটা শক্ত খুঁটির বেড়ার মধ্যে। বেড়ার দরজা খোলাই থাকতো রাতে। আর দরজার সুমুখে থাকতো কলার কাঁদি কিংবা কয়েক গাছা আখ। ভাবটা এই যে বেড়ার ভেতরের পোষা হস্তিনীর জন্যেই যেন খাবারগুলো দেওয়া রয়েছে।

হস্তিনী কিন্তু ভুলেও সে-খাবারে মুখ দিতনা। গভীররাতে হস্তিনীর ডাকে সাড়া দিয়ে অদূরের ঘন জঙ্গল থেকে আসতো কোন পুরুষ প্রেমিক। দরজার বাইরে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতো সে। ঘোরাঘুরি করতো এদিক ওদিক। বেড়ার খুঁটির গায়ে গা ঘসে কিংবা মাথা চুলকে ব্যাপারটা বুঝে নিতে চেষ্টা করতো সে। শুঁড় দিয়ে বেড়াটাকে টানাটানি করতো মাঝে মাঝে। তারপরে একসময়ে ক্ষিধে পেতো ওর। দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও ভিতরে ঢুকবার সাহস সঞ্চয় করতে পারত না সে প্রথমটাতে। দর-জার মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদির কলা আর আখ-গাছাগুলোকে নিঃশেষ করতো সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

বেড়ার ভেতরে থেকে হস্তিনী তখন নানারঙ্গে ভুলিয়ে রাখতো ওর প্রাণিপ্রার্থীকে।

খাদ্যের সঙ্গে পেটে যেতো আফিং, নেশা ধরতো একটু একটু করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুত সে কিছুক্ষণ। তারপরে পূবের আকাশ ফরসা হচ্ছে দেখে হেলে দুলে এগিয়ে যেতো সে জঙ্গলের গভীরে।

এমনি করে চলতো কদিন। আফিং-এর নেশায় বুঁদ হয়ে কাঠের বেড়ার মধ্যেই ঢুকে পড়তো সে একদিন।

ফাঁদের দরজা বন্ধ হয়ে যেতো। পোষা হাতির পিঠে চেপে মাহুতেরা ওকে বেঁধে ফেলতো আষ্টেপৃষ্ঠে। হস্তিনীও তখন এই কাজে সাহায্য করত মাহুতদেরকে।

এত কাণ্ডের পরেও আফিংখোরের নেশা ভাঙতো না। তবে একটি রাতের এক আফিংখোরকে দেখলাম হঠাৎ লড়াইতে মেতে উঠতে। শিক্ষিতা হস্তিনী যে অপূর্ব কৌশলে এই ক্ষ্যাপাকে বাগে এনেছিল সেদিন তার কথা বুঝি ভোলার নয়। হস্তি-নীর বুদ্ধিমত্তায় একজন মাহুত অন্তত প্রাণে বেঁচে গেছল সে রাতে।

'ছানি' কথাটার আভিধানিক অর্থ থাক। তবে যে অর্থে প্রয়োগ [illegible] বলা যায় [illegible]।

কোন একটি ছোট্ট বিচরণশীল দলকে বেছে নিয়ে খেদাও করা হয় আবার। আগুন, ধোঁয়া আর উৎকট শব্দ তাণ্ডব সৃষ্টি করে দলটিকে যাবড়ে দেওয়া হয় প্রথমে।

ভয় পেয়ে ওরা যখন ছুটতে থাকে তখন দলছাড়া কোন একটি হতভাগ্যকে বাছাই করে নিয়ে পোষা হাতির পিঠে চেপে মাহুতেরা ধাওয়া করে তার পিছনে।

পিছনে ধোঁয়া বা আগুন, ধাবমান স্ব-জাতির পিঠে মাহুতের হৈ-হুল্লোড়—এই অভাবিত ঘটনায় হকচকিয়ে যায় দলছাড়া হাতি। এলোপাথাড়ি ছুটে মরে সে।

হোক সে অসুর। শক্তিরও শেষ আছে। তাই একসময়ে এলিয়ে পড়ে সে। ফিরে দাঁড়ায় শত্রুর সঙ্গে শেষ মোকাবিলার জন্যে।

কিন্তু সপ্তরথীর ব্যূহ মধ্যে বন্দী তখন সে, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। সপ্তরথীর ব্যূহ থেকে নির্গমনের পথ নেই। লড়াই কিছুটা হয় বইকি। কিন্তু শিক্ষিত পোষা হাতির দল ওকে তখন রীতিমত নিস্তেজ করে ফেলেছে। আর ওদের পিঠের চতুর মাহুতেরা ওর পায়ে ও গলায় পরিয়ে দিয়েছে, ফাঁসের দড়ি।

'ছানি' অভিযানের জন্যে চার পাঁচটা হাতি হলেই চলে। তবে হাতি যখন ছুটতে শুরু করে তখন তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়া কিছু বিচিত্র নয়। তাই দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে প্রায়ই। জঙ্গলের মধ্যে হাতির দৌড় যে কি সাংঘাতিক তা বুঝিয়ে বলা যাবে না। শখের বশে এমনি একটা 'ছানি' অভিযানে যোগ দেবার পরে অনেকেই শিকার থেকে বিদায় নিয়েছেন শুনেছি।

এবারে আসি খেদার কথায়।।

খেদা হচ্ছে হাতি ধরার সবচাইতে সফল অভিযান। ফলে আয়োজন তার বিপুল, ব্যয়ের অংকটাও বিশাল। অবিশ্যি একটি-দুটি নয়, কমপক্ষেও দশটি হাতি না ধরতে পারলে খেদাই বৃথা।

এতো গেল বে-সরকারী খেদার কথা। জঙ্গলের আশেপাশে যারা বাস করে তাদের সংগঠিত খেদা। আসামের বা ভূটান সীমা-ন্তের জঙ্গলে এমন কটি ছোটখাটো খেদায় যোগ দিয়েছি আমিও। তবে শিকারীর ভূমিকা মুখ্য নয় এই অভিযানে। মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে মাহুত আর ঘাসীদের। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করে ওরাই দড়ি পরায় বুনো হাতির গলায়।

ছোটখাটো খেদার কথা থাক। সরকারী খেদার কথা বলি বরং। খেদা নয়তো, জঙ্গলের হস্তীসমাজের বিরুদ্ধে মানুষ ও তার পোষ্য হস্তীবাহিনীর মিলিত জেহাদ যেন। বিরাট তার আয়োজন, বিশাল তার সমাবেশ আর চোখধাঁধানো তার রাজকীয় জৌলুষ।

মহীশূর সরকারের উদ্যোগে কক্কন-কোটের জঙ্গলে গত দশই জানু-য়ারীতে যে খেদা অনুষ্ঠিত হয় তার কথা আগে বলেছি। এই কক্কনকোটের জঙ্গলেই সরকারী উদ্যোগে প্রথম খেদা অনুষ্ঠিত হয় সাত বছর আগে একষট্টি সালের জানুয়ারীতে। একষট্টি [illegible] ধরা [illegible] হাতি।

মহীশূর রাজ্যের [illegible] পশ্চিম [illegible] মাইল দূরে [illegible] বিশাল জঙ্গল। [illegible] বর্গ মাইল জোড়া এই [illegible] চন্দনের জঙ্গল আদ্যিকাল থেকেই হাতির প্রিয় বাসভূমি। বন বাঁশের [illegible] তার [illegible] জুড়ে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে [illegible] চলেছে কাবিনী নদী। কোথাও [illegible] কোমর জল, কোথাও বা এক বুক।

নদীর অবস্থান খেদার কাজে [illegible] সুবিধের। নদীর এপারে তাই মাসাবধি কাল ধরে কাজ চলেছে। মোটা মোটা খুঁটি পুঁতে তৈরী হয়েছে বিশাল বন্দীশালা।

এই বন্দীশালা থেকে একটি পথ [illegible] গেছে নদীর পাড় পর্যন্ত। পথের দুপাশে শক্ত বেড়া। কিন্তু এই বেড়া বা পথ [illegible] পাতা আগাছায় এমন সুকৌশলে আচ্ছাদিত যে মানুষের কারসাজিটা ধরা পড়ে না কারও চোখে।

নদীর কূল থেকে পথ—পথ বেয়ে বন্দীশালা। বন্দীশালায় ঢুকে চমৎকার কৌশলে তৈরী করা রয়েছে মায়া দরজা বন্দীশালায় ওপাশেও আর একটি মায়া দরজা—আকারে কিছুটা ছোট। এই ছোট দরজা পেরিয়ে আর একটি বন্দীশালা। আকারে সেও অনেক ছোট।

বড় বন্দীশালা থেকে ছোট বন্দীশালায় ঢুকবার জন্যে এটি হচ্ছে খিড়কির দরজা।

পথ আর বন্দীশালায় এই এলাকাকে ঘিরে খোঁড়া হয়েছে গভীর খাদ।

এই খাদ, পথ আর ঐ বন্দীশালা সবই এমন স্বাভাবিকভাবে লতায়-পাতায় আগাছায় ঢাকা যে মানুষের হাতের চিহ্ন নেই ওর কোথাও।

খাদের অদূরে নদীর ধারে ধারে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে বাঁধা হয়েছে কটি বাঁশের মাচা। এই বাঁশের মাচায় আছে দর্শকের দল। দলে আছেন দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, পর্যটক আর শৌখীন শিকারীর দল। দর্শনীটা এদেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে একটু মোটারকমের বৈকি।

নির্ধারিত দিনের কদিন আগে থেকেই জঙ্গলের মধ্যে লোক পাঠান হয়। জঙ্গলের আশে-পাশে যারা বাস করে তাদের ভেতর থেকেই সংগ্রহ করা হয় এদের। জঙ্গলের নাড়ি-নক্ষত্র ওদের নখদর্পণে। কি ওর পথ-ঘাট, কি ওর চতুষ্পদী বাসিন্দাদের আহার-বিহার-মেজাজ—সবকিছুর সম্পর্কেই ছোট-বেলা থেকে দস্তুরমত ওয়াকিবহাল ওরা।

আশ-পাশের গাঁগুলো থেকে হাজার-দেড় হাজারের মত এমনি মানুষ জোগাড় করা হয়েছিল আগে-ভাগেই। আর এদের সঙ্গে ছিল একপোর মত কুনকী বা পোষা হাতি।

পেট্রল পার্টি বা অনুসন্ধানকারীর দল জঙ্গলের ভেতরে হাতির পালকে খুঁজে বার করে প্রথমে।

এক একটি পালে দশটি থেকে পঞ্চাশটি পর্যন্ত থাকে। ফলে দু-তিনটি বা চার-

পাঁচটি দলকে খুঁজে বার করে সীমিত একটা এলাকার মধ্যে আটকে রেখে দেওয়া হয় পালকে।

অনুসন্ধানকারী দল সংকেতে পালের নিশানা জানিয়ে দিলে হাঁকোয়া দল চুপিসাড়ে এসে ঘেরাও করে ফেলে পালকে। হাঁকোয়া দলের একে অপর থেকে চল্লিশ বা পঞ্চাশ ফুট দূরে অবস্থান করে।

হঠাৎ এবার ওরা শুরু করে দেয় হৈ-হুল্লোড়। সে কি শব্দতাণ্ডব। চেরা বাঁশের খটখটানি, ভাঙা টিনের খ্যান-খ্যানানি, কাঁসি করতালের ঝমঝমানি—সবমত্ত যেন।

এই হাঁকোয়া দলটি থাকে শিকারীদের অধীনে। হাতির পালকে ঘিরে এই যে অর্ধচন্দ্র ব্যূহ-বেষ্টনী তার প্রথম সারিতেই থাকে শিকারীর দল। হাতির পিঠে চেপে খবরদারী করে ওটা গোটা দলটার। প্রতি একশোজনের জন্যে একজন শিকারী অন্তত দরকার। দ্বিতীয় সারিতে আধজ্বলন্ত মশালের ধোঁয়ায় গোটা পরিবেশটাই ধোঁয়াটে হয়ে ওঠে। রাতের বেলাতে আবার মশালগুলোকে ভাল করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, কেননা ধোঁয়ার বদলে আগুন চাই।

দ্বিপদী দলের এই অভাবিত কাণ্ড দেখে ঘাবড়ে যায় চতুষ্পদী পাল। হস্তিনী আর শিশুদের ঘিরে মুহূর্ত-মধ্যে ব্যূহ-বেষ্টনী রচনা করে ওরা। দলের পুরুষ মাতব্বরেরা তখন সেই ব্যূহকে ঘিরে ঘন ঘন পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

বদমেজাজী কেউ পালে থাকলে হাঁকোয়ার দলকে সে আক্রমণ করে বসে তক্ষুনি। হাতির এই উন্মত্ত ক্রোধের মুখে হাঁকোয়ার দলকে সামলানোর দায়িত্ব শিকারীর। খেদার শিকারী হত্যা করার জন্যে গুলি করে না। তাই মুখ বা মাথা বাদ দিয়ে পায়ে গুলি করা উচিত। তবে সব সময়ে তা ঘটে ওঠে না।

পূর্বোক্ত জানুয়ারী খেদায় কাপিনী নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে পাল। হঠাৎ পালের কর্ত্রী আক্রমণ করে বসলো হাঁকোয়ার দলকে। বনবিভাগের রেঞ্জার সাহেব ঐ আক্রমণের মুখে এমনি ঘাবড়ে গেলেন যে, হস্তিনীর মুখ লক্ষ্য করে শটগানের এক জোড়া গুলিই ছুঁড়ে বসলেন তক্ষুনি। মার খেয়ে থমকে দাঁড়াল হস্তিনী। আর্তনাদ করে ফিরে গেল আবার পালের মধ্যে।

যাই হোক, মহীশূরের কথায় আসি। হাতির পালগুলিকে তাড়িয়ে এনে জড়ো করা হল কাপিনী নদীর কূলে নির্দিষ্ট একটি জায়গায়।

জল হাতির প্রিয় হলেও নদীর কূলে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। নদী পেরুতে প্রচণ্ড অনিচ্ছা। ওদের দু-চারজন মাঝে মাঝে আক্রমণ করতে চাইছে হাঁকোয়ার দলকে। শিকারীর দল বহুকষ্টে ওদের ফেরৎ পাঠাচ্ছে আবার পালের ভেতরে।

পিছনে ধোঁয়ার মেঘ, বিপুল শব্দ তাণ্ডব, ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ। নিরুপায় হস্তীযূথকে নামতেই হল নদীতে।

শিকারীর দলও দুপাশে পাহারা দেবার জন্যে হাতির পিঠে চেপেই নেমে পড়লো জলে।

ওপারে দর্শকমহলে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা। এক-শুই করে গুনতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে।

নদী-পেরিয়ে হস্তীযূথ এপারে উঠলো। ওরা তো বোঝে নি যে, মানুষের ফাঁদের মধ্যে পা বাড়িয়েছে ওরা। কয়েক গজ পথ পেরুতেই ওরা দেখলে সুমুখে পথ নেই আর। চারপাশে ওদের শক্ত খুঁটির বেড়া। কিন্তু পিছনে হটে আসবার পথও নেই। উপর থেকে মায়া দরজা নেমে এসে পথ বন্ধ করে দিয়েছে ততক্ষণে।

নিজেদের বন্দীদশা বুঝতে বাকী থাকে না আর। শুরু হয় হুটোপুটি। লতাপাতার কৃত্রিম আবরণ খসে পড়ে অচিরে। নগ্ন হয়ে দেখা দেয় বন্দীশালার রূক্ষ চেহারাটি।

রাগে দুঃখে ফুঁসতে থাকে ওরা। হোক সে শক্ত খুঁটির বেড়া। আসুরিক শক্তির দাপটে উপড়ে ফেলতে চায় বেড়ার বন্ধন।

তা ওরা পারতো। কিন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করার মত অবকাশটুকুও রাখে নি মানুষ। বেড়ার গায়ে ছুঁচালো লোহা আর কাঠের দণ্ড উঁচিয়ে আছে ওদের দিকে। সহস্র নাগিনী যেন ফণা উঁচিয়ে আছে ওদের ঘিরে।

আর বেড়া ভাঙলেই বা কি। বেড়াকে ঘিরে অদূরে আছে গভীর খাদ। পালিয়ে যাবার পথ খোলা নেই কোথাও।

ওরা কিছুটা শান্ত হলে বিশাল বন্দীশালার পেছনের ছোট দরজাটি এবার উপরের দিকে তুলে নেওয়া হয়। দরজার ওপাশে ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত আর একটি বন্দীশালা। কিন্তু সেখানে আছে বন্দীদের প্রিয় খাদ্য আখ আর কলা। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে ওদের কেউ কেউ পা বাড়ায় এবার ঐ ক্ষুদ্র বন্দীশালায়। দুই বন্দীশালার মাঝখানের দরজা আবার নেমে আসে।

অপ্রশস্ত এই বন্দীশালার আর একটি দরজা দিয়ে কুনকীর পিঠে চেপে ঢুকে পড়ে মাহুতেরা। চার-পাঁচটি কুনকী ও মাহুত মিলে এবার দড়ি পরায় বন্দীদের গলায় আর পায়ে। কাজটা অবিশ্যি সহজ নয় মোটেও।

এমনি করে লোভ দেখিয়ে ক্ষুদ্র বন্দীশালার ভেতরে এনে দড়ি পরানো হয় ওদের সবাইকে।

তারপরে কুনকীদের কড়া পাহারায় ওদের নিয়ে যাওয়া হয় পিলখানায়। পিলখানা হচ্ছে বুনো হাতির মগজ ধোলাইয়ের বিদ্যালয়।

পঞ্চাশটি হুকুম তামিল করবার কায়দা রপ্ত করতে পাঁচ-ছয় মাস সময় লাগে। কুনকীদের প্রহরার মধ্যে কুনকীদের সাহায্যেই শিক্ষা চলে। আনুগত্য যখন প্রশ্নের অতীত, তালিম দেওয়া যখন সমাপ্ত তখন বাকী থাকে শুধু নীলাম ডাকার কাজ।

হাতি ধরার কৌশল সম্পর্কে প্রচ
ব্যবস্থার কথা বললাম। কিন্তু হ
সম্পর্কে সবচাইতে বড় কথাটি বুঝি
হল না।

সবাই জানে হাতি খুবই সামা
কিন্তু হাতির বন্য জীবনের মম
কতার রূপটিকে স্পষ্ট করে বলাই হয়
বোধ হয় কোনদিন।

বলছি শুধু দুটি দৃষ্টান্তের কথা
একবট্টি সালের জানুয়ারীতে ক
কোটের সরকারী খেদার একটি ঘটনা।

হাতির পালকে তাড়িয়ে নিয়ে চ
হাঁকোয়া। হঠাৎ দেখা গেল দলের
তিরিশটি হাতি দাঁড়িয়েছে বৃত্তাকারে
রচনা করে।

ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ, আ
আর ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি করে ও
চালাবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু এ
পাও নড়তে নারাজ ওরা। মৃত্যুপণ
যুদ্ধং দেহি ভঙ্গীতে যেন কোন যুদ্ধ
আগলাচ্ছে ওরা মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিকের ম

কুনকীর পিঠে শিকারীরাও নাজেহা
পোষা শিক্ষিত হাতির দলও এগুতে
না এক পা।

ব্যাপার কি?

কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল
এই চক্রব্যূহের কেন্দ্রে আছে এ
হস্তিনী। প্রসব বেদনায় কাতর সে।

অপেক্ষা করে রইল হাঁকোয়া।

অচিরে একটি শিশুর জন্ম দি
হস্তিনী।

অপেক্ষা করতে হল তবুও। যতক
না শিশুটি তার মায়ের পাশে হেঁ
চলতে শিখলো ততক্ষণ ওরা একটি পা
নড়ে নি কেউ। আবার যখন চলা শুরু হ
তখন দেখা গেল সদ্যোজাত শিশু ও
তার মাকে ঘিরে দুর্ভেদ্য ব্যূহ সৃষ্টি ক
রেখেছে ওরা।

আসাম জঙ্গলের একটি খেদা
চলমান পাল থেমে দাঁড়াল এমনি আচমকা

সেবারে দেখেছিলাম ওদের এক
শিশু খাদে পড়ে যাওয়াতেই ওরা তাকে
পরিত্যাগ করে যেতে নারাজ। শিশুটিকে
উদ্ধার করে তবেই ওরা পা বাড়াবে
আবার।

হাতির মত সামাজিক নয় বাঘের
গোষ্ঠী। যূথবদ্ধতা ওদের কোষ্ঠিতে লেখে
না। কোন এক আস্তানায় ওদের পাঁচ
ছটিকে একসঙ্গে দেখা গেলেও যেতে
পারে। কিন্তু বেশিক্ষণ বনিবনাও কর
থাকাটা ওদের ধাতে সয় না। জোড়া বেঁধে
থাকাটাই ওদের স্বভাব। নইলে একা
কিন্তু একা থাকলেও ঘেরাও হলে সে
ঘাবড়ে যায় না হাতির মত। কোণঠাসা হলে
সে মরণকামড় দিতেও গররাজী নয়।

পাঞ্জাব-ছাপ্পাটি তো দূরের কথা, পাঁচটি
বাঘ এক সঙ্গে থাকলে খেদার পরিকল্পনা
ভেস্তে যেতে পারে। অন্তত অবস্থাটা যে
অন্যরূপ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]
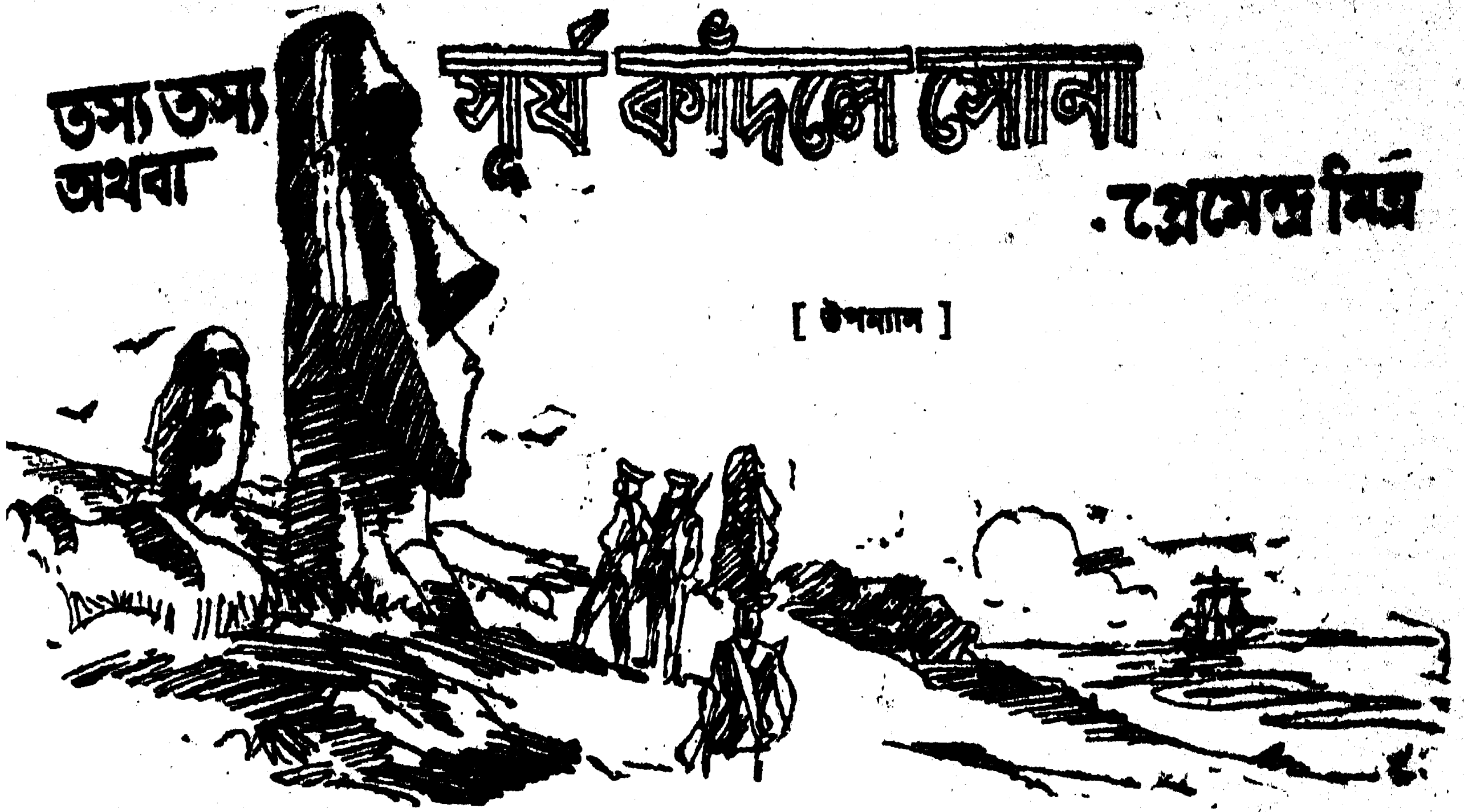
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সত্যিই যদি জেগে থাকেন তবু ইংকা শ্রেষ্ঠ হুয়াইনা কাপাক তাঁর সঞ্জীবিত শব-দেহে কিছুই যে করতে পারছেন না, ফিলিপিলিও সশঙ্ক হতাশায় তা দেখেছে।

কেমন করেই বা করবেন!

হাতে তাঁর সামান্য একটা সেকেলে দুর্বল অস্ত্র যা সাধারণ একটা ছোরার একটু দীর্ঘ সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়। এ দীর্ঘ ছোরা আবার ব্রঞ্জের। তামা আর টিন মেশাবার অসামান্য কৌশলে এ ব্রঞ্জ পেরুর লোকেরা যত কঠিনই করে তুলে থাকুক, ইস্পাতের তলোয়ারের সঙ্গে তার কি তুলনা হয়!

তাও আবার ইওরোপের সেরা অস্ত্রের কাজ তখন যেখানে হয় স্পেনের সেই টলেডো শহরের বিখ্যাত কারিগরের তৈরী সরেস ইস্পাতের বেঁধবার ও কোপ দেবার সুচোলো আর দুদিকে সমান ধারালো তলোয়ারের সঙ্গে।

এত কথা ফিলিপিলিওর জানা নেই। কিন্তু মার্কুইস যে ক্রমশঃ জয়ী হচ্ছে তা বুঝতে তার দেরী হয়নি।

রাজবেশ পরা মৃতদেহকে সিংহাসন থেকে উঠে এগিয়ে আসতে দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়ে সোরাবিয়া নিজের অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে এসেছিল, তারপর তার ওপর সত্যি শয়তানই যেন ভর করেছে মনে হয়েছে। তার মুখটা হিংস্র [illegible]!

এ হিংস্র উল্লাস অকারণে হঠাৎ তার মুখে ফুটে ওঠেনি। ভূত প্রেত যা-ই হোক রাজবেশ-পরা মড়াটা তার সঙ্গে অস্ত্র নিয়েই যুঝতে আসছে এটুকু বুঝেই সোরাবিয়া তখন বুকে নতুন বল পেয়েছে।

আর অস্ত্রই বা কি! ব্রঞ্জের একটা খাটো তলোয়ার! ঠিকমত চালাতে পারলে তার তলোয়ারের এক ঘায়ে ও তলোয়ার দু-টুকরো হয়ে যাবে।

গেছেও প্রায় তাই।

সোরাবিয়া তলোয়ারের খেলায় ইও-রোপের সেরা গুণীদের একজন। তাকে একবার একজন শুধু একটা বড় ছোরা নিয়েই বেশ একটু বেকায়দায় যে ফেলেছিল সোরাবিয়ার মনের গোপনে সে স্মৃতির জ্বালা এখনো অবশ্য আছে। কিন্তু আর যাই হোক সে ছোরাটা ছিল ইস্পাতের, তার নিজের দেশের এক বিশেষ দাঁত-কাটা ধরণে তৈরী।

এ ঠুনকো ব্রঞ্জের হাতিয়ার সে ইস্পাতের ছোরার কাছে খেলনা মাত্র। আর দানোয় পাওয়াও যদি হয় তাহলেও এই জাগানো মড়া আনার পেয়ারের সেই গোলাম নয়।

সোরাবিয়া অকুতোভয়ে তার তলোয়ার চালিয়েছে। দুটুকরো না হয়ে গেলেও সে মার ঠেকাতে গিয়ে ব্রঞ্জের খাটো তলোয়ারের একটা চোকলা তাতে উঠে গিয়েছে।

সোরাবিয়া নিজের অস্ত্র-প্রাধান্যের এ সুবিধেটুকু ষোল আনা কাজে লাগাতে ত্রুটি করেনি। নির্মম অমোঘ নিয়তির মত সে একটু একটু করে কোনঠাসা করে এনেছে সে শবমূর্তিকে।

অস্ত্র-বিদ্যায় মৃত ইংকা নরেশ তেমন অপটু যে ছিলেন না তাঁর শবমূর্তির চালনা কৌশল দেখে ফিলিপিলিও তা ভালো করেই বুঝেছে। কিন্তু দীর্ঘতর অনেক জোরালো ও ভিন্ন জাতের ইস্পাতের অস্ত্রের কাছেই হার মানতে হয়েছে ব্রঞ্জের খাটো তলোয়ারকে।

মাঝে মাঝে অদ্ভুত ঘোরা-ফেরার কায়দায় কোনোরকমে মার্কুইসকে এড়িয়েও শেষ পর্যন্ত শবমূর্তি উঁচু বেদীর ওপর বসানো তাঁর সিংহাসনের পেছনেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

এখন থেকে আর পেছিয়ে যাবার বা এপাশে-ওপাশে পালাবার কোনো উপায় নেই।

মার্কুইস-এর মুখের দিকে চেয়ে ফিলিপিলিও মনে মনে নিরুপায় হতাশ রাগে গুমরেছে। একটা ইঁদুরকে থাবার তলায় চেপে রেখে শেষ মারে নিকেশ করবার জন্যে বেড়ালের মুখে যা ফুটে ওঠে তার চেয়ে অনেক পৈশাচিক একটা হিংস্র উল্লাস মার্কুইসের চোখ মুখে তখন জ্বলছে।

মার্কুইস জানে ইস্পাতের তলোয়ারের শুধু একটা কি দুটো কোপ দেওয়ার অপেক্ষা। সে কোপ ঠেকাবার মত কোন কিছু ওই ভুতুড়ে মূর্তির হাতে বা ধারে-কাছে নেই। তার ভুতুড়ে ক্ষমতার পরিচয়ও এখনো পর্যন্ত কিছু পায়নি। সোরা-

বিয়ার আছেন সেই জন্যেই এত বেশী। এ [illegible] রাজাদের দেশের [illegible] তার কত [illegible] মানুষের [illegible] তার তখন দূঢ় বিশ্বাস হয়েছে।

[illegible] অবশ্য তখনই [illegible]।

হঠাৎ গুহামুখে বেশ একটু হট্টগোল শোনা গেছে।

সোরাবিয়া একটু অবাক হয়েছে সে গোলমালে। তার সওয়ার সেপাইরা ত ভয়েই কাঠ হয়ে ছিল এর আগে। তারাই শেষ পর্যন্ত ভীরুতার লজ্জায় মরিয়া হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিতে আসছে না কি?

কোণঠাসা ভূতুড়ে মূর্তির ওপর কড়া নজর রেখে সোরাবিয়া গুহামুখে যারা ঢুকছে তাদেরও একটু লক্ষ্য করেছে।

সওয়ার সেপাইএরা কয়েকজন প্রেত-প্রাসাদের দরজা দিয়ে ঢুকছে বটে, কিন্তু এ তো তার সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের কেউ নয়। কোরিকাঞ্চার রাতের আস্তানায় যাদের রেখে এসেছিল এরা ত' তাদেরই ক'জন!

তাদের ভেতর থেকে হেরাদাকে এগিয়ে আসতে দেখে আরো অবাক হয়েছে।

হেরাদা উত্তেজিতভাবে সোরাবিয়ার কাছে এসে যা বলেছে তাতে অবশ্য রক্ষীদল নিয়ে হঠাৎ তার এই প্রেত-প্রাসাদে ছুটে আসার কারণটা আর অস্পষ্ট থাকেনি।

কারণটা সত্যিই যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অবিশ্বাস্য। এদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন মাথা-ব্যথা সোরাবিয়ার নেই। তবু হেরাদা যা খবর জানিয়েছে তাতে তাকে বেশ একটু বিচলিত হতে হয়েছে।

[illegible] —তখনই [illegible] উত্তেজিত অস্থিরতায় [illegible] বলেছে হেরাদা!

কেন কি হয়েছে কি?—বিস্মিত উদ্বেগের সঙ্গে একটু বিরক্তি নিয়েই জিজ্ঞাসা করেছে সোরাবিয়া। আশ মিটিয়ে হাতের সুখ করবার এমন একটা মুহূর্তে বাধা পড়ায় সে খুশি নয় তখন।

যা হয়েছে তাতে খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের কাক্সামালকায় যাওয়া দরকার!—প্রায় আদেশের স্বরেই যেন বলতে বাধ্য হয়েছে হেরাদা, সেনাপতি পিজারোর কাছে খবরটা পৌঁছে দেবার দায়িত্বও আমাদের।

কিন্তু খবরটা কি সেটা ত' এখনো জানতে পারলাম না।—সোরাবিয়া মার্কুইস হিসেবে তার অধৈর্যটা একটু মেজাজ দেখিয়েই প্রকাশ করেছে।

উত্তেজিত অবস্থায় আসল কথাটা জানাতেই ভুল হয়ে গিয়েছিল বটে হেরাদার। সে ত্রুটি সংশোধন করে হেরাদা এবার যা জানিয়েছে, তা খবর হিসেবে সত্যিই সাংঘাতিক।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক উমু সৌসা দুর্গে বন্দী আতাহুয়ালপার বৈমাত্রেয় রাজভ্রাতা পরাজিত ভূতপূর্ব ইংকা হুয়াসকারকে হত্যা করিয়েছে।

হুয়াসকারকে হত্যা করিয়েছে রাজপুরোহিত!—এ রাজ্যের বেশী কিছু না জেনেই চমকে উঠেছে সোরাবিয়া।

চমকটা যে শুধু তার একার নয়, সজাগ থাকলে সোরাবিয়ার তা দৃষ্টি এড়াত না।

ফিলিপিলিওর দৃষ্টি তা এড়ায়নি। নিজের স্তব্ধ বিহ্বলতা নিয়েই শবমূর্তির দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে সে হেরাদার পরের ব্যাখ্যাটা শুনেছে।

হ্যাঁ,—হেরাদা গম্ভীর স্বরে জানিয়েছে, —সৌসা থেকে এইমাত্র এক দূত এসে পৌঁছেছে এই ভয়ঙ্কর খবর নিয়ে। যে সওয়ারদের নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন তাদেরই একজন বেশী মেশা করে বেসামাল হয়ে আপনার সঙ্গে এ-দলে যোগ দিতে পারেনি। তার কাছেই জায়গাটার হদিস নিয়ে আমি ছুটে আসছি। চলুন, আর দেরী করবার সময় নেই।

আরে!—একটু তিক্ত উদ্ধত স্বরেই বলেছে সোরাবিয়া,—এই দানোয় পাওয়া মূর্তিকে কয়েক টুকরো করে এ সোনার [illegible] নিয়ে যাবার মত সময় [illegible]

[illegible] তলোয়ারটা বাগিয়ে [illegible] শেষ [illegible] দেবার জন্যে।

[illegible] পর্যন্তই।

হঠাৎ [illegible] গুহা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে দেওয়ালের [illegible] মশালটার জ্বলন্ত [illegible] মেঝের ওপর ছিটকে পড়বার [illegible]।

মশালের [illegible] তীর বেগে ছোঁড়া [illegible] তলোয়ারের ঘায়ে। [illegible] সামান্য রূপের তৈরী হলেও এ কাজটা তাতে নিপুণভাবেই হয়েছে।

পাথুরে মেঝের ওপর ছেৎরে পড়ে মশালের মাথার আগুনটা দুবার একটু বেশ খাবি খেয়েছে। তারপর একেবারে গেছে নিভে।

আর সকলের মত সোরাবিয়ার চোখ আপনা থেকেই ছিটকে পড়া মশালের মাথাটার সঙ্গে মেঝের ওপরেই গিয়ে পড়েছিল। আগুনটা সেখানে নিভে যাবার পর চোখ ফেরাতে গিয়ে সবদিক দিয়েই সে সূচিভেদ্য অন্ধকার দেখেছে।

গুহার ভেতরে একেবারে কালী-ঢালা অন্ধকার। হেরাদার সঙ্গে যে দুচারজন সেপাই ভেতরে এসে ঢুকেছিল তারা কেউ মশাল সঙ্গে আনেনি।

হঠাৎ এ অন্ধকারে সোরাবিয়া ও হেরাদার সঙ্গে তারাও চমকে হতভম্ব আর দিশেহারা হয়ে পড়েছে। নিজেদের কারুর গায়ে লাগতে পারে জেনেও বেপরোয়া হয়ে সোরাবিয়া তলোয়ার চালিয়েছে সামনের দিকে। কিন্তু বৃথাই।

এরই মধ্যে ফিলিপিলিও তার হাতে একটা হেঁচকা টান টের পেয়েছে। সেই সঙ্গে খুইচুয়া ভাষায় একটা চাপা গলার আদেশ,—এসো ভয় পেয়ো না।

এ আওয়াজটা সোরাবিয়ার কানেও গেছে অস্পষ্টভাবে। কিন্তু আওয়াজ লক্ষ্য করে যে তলোয়ার সে চালিয়েছে তাতে মশাল রাখবার রুপোর ভৃঙ্গারটাই ঝনঝন শব্দে অন্ধকার গুহা কাঁপিয়ে যেন আর্তনাদ করে উঠেছে।

একটা আর্তনাদের মত শব্দ কয়েক মুহূর্ত বাদে গুহামুখেও শোনা গেছে সেখানকার বিশাল দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত্যো [illegible]।

[illegible]

অঙ্গনা

ফটো : মানসরঞ্জন কুণ্ডুচৌধুরী

কুমোরপাড়ার অনেক কথা

পুজোর ঢাক কুড়-কুড়-কুড়-ধা। কুমোরপাড়ায় ব্যস্ততার অন্ত নেই। একমেটে দোমেটের কাজ কবে শেষ। গয়নাগাটিতে ঠাকুর পারিপাটি করাও বাকি নেই। শেষ তুলির পোঁচ শিল্পীমনের সজীব পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে মূর্তির সর্বাঙ্গে। মৃন্ময়ী মূর্তি এবার চিন্ময়ীরূপে হাস্যোজ্জ্বল। শিল্পীর মনে আনন্দের প্রশান্তি।

এমনিভাবেই ও'রা কাজ করেন বছর বছর। সেই বাপ-পিতামহ এবং আরও আগে থেকেই ও'রা এই জীবিকায় নির্দিষ্ট। দিনের বদল যতই ঘটুক এই একই জীবিকায় টেনেটুনে তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। জীবিকার বদল, বিশেষভাবে এই প্রতিমা ও মূর্তি তৈরীর শিল্পীর মন অন্য কোন কাজে নিজেকে অতটা মানিয়ে নিতে পারে না। তাই তাঁরা একান্ত সৃজনের মত একই জীবিকার নন্দনের স্থান করে নিয়েছেন।

দিন বদলেছে তো কি? মৃৎশিল্পীর কাজের বহর প্রতিবছরই বাড়ছে। সে আড়ম্বর আর ঘটা আজ নেই সত্যি, কিন্তু নিয়ন আলোর টেক্কা দেওয়া রোশনাই সে জায়গা জাঁকিয়ে বসেছে। নতুন ধরনের প্যান্ডেল আলোর বাহার আর প্রতিমার ডিজাইনে অভিনবত্ব আজকের দিনের মূল দাবী। মুখটুকু অজন্তা রূপে প্রতিমাকে কতটা আধুনিক করা যায়? প্রতিযোগিতা আজ স্বাভাবিকভাবেই শিল্পীদের মধ্যেও গিয়ে পৌঁচেছে। এ দোষ কারও ব্যক্তিগত নয়; যুগের দোষ। তাই ব্যস্ততার শেষ মুহূর্তে সেদিন কুমোরপাড়ার পথ ধরতে ধরতে ভাবছিলাম, আধুনিকতা হোক আর যাই হোক, সেদিনের তুলনায় শিল্পীদের কাজের চাপ আজ অনেক বেশি। আর এটা শহর নয়, শহরতলীতেও।

পুজো পুজো আমেজ। রাস্তাঘাটে দ্রুত আনাগোনা। সকালের কাঁচা সোনা রোদ্দুর। সব মিলিয়ে পুজোর কথা না ভেবে আর থাকা যায় না। কবেকার সেই অভ্যেসের ভূতটা আজ কাঁধে চেপে বসেছে, সেই খড়ো কাঠামো থেকে চক্ষুদান পর্যন্ত প্রতিমার সামনে বসে থাকা। প্রতিমায় তন্ময় হয়ে থাকার সেদিনকার অভ্যেসটা এত দিন পরেও ঠিক আছে। সবকিছু মনে পড়তেই মনটা খুশিতে নেচে উঠলো। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম।

পাড়ার কাছেই কুমোরপাড়া। একটু এগুতেই মাটির সেই মিষ্টি গন্ধ ভেসে এলো। গন্ধেই বুঝি, কাজ দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। সব কিছু শেষ, এবার রঙের কাজ।

একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এবার কাজ কি রকম গো কর্তা? উত্তরে তিনি ঘাড় নাড়লেন, অর্থাৎ ভালই। সম্পূর্ণ কথার জবাব দেবার ফুরসৎ তাঁর নেই। তাই সংক্ষেপে সারা। বেশি কথা না বাড়িয়ে ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দেখি। ইতিমধ্যে দেখি একজন কাজের ফাঁকে হুঁকো ধরিয়েছে। চোখ বুজে বেশ আরাম করে টানছে। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে মুখ ভর্তি ধোঁয়া আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছে। পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি একবার আমার দিকে চোখ মেলে তাকান।

এই তো কটা মাস কুমোরদের কাজের মরশুম। দুর্গা প্রতিমা থেকে শুরু। তার পর ক্রমে ক্রমে চলবে লক্ষ্মী, কালী, কার্তিক এবং সরস্বতী। তারপরের দীর্ঘ অবসর। এই কটা মাস খেটে রোজগার করে আমাদের সম্বৎসরের ব্যবস্থা করতে হয়। এর মাঝে দু-একটা খুচখাচ কাজ অবশ্য আসবে। কিন্তু তার ওপর ভরসা করে থাকা যায় না।

বুঝলাম কথা বলার গরজ নেই। উৎসাহও কম। তবু কাছে একজন দাঁড়িয়ে আছে তাই নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে কথা বলা। মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া গেল। কুমোররা এবং বিশেষ করে মৃৎশিল্পীরা একমনেই সারা বৎসরের ভাবনা ভাবেন।

তাই তাঁরা এখন ভীষণ ব্যস্ত। আরও ব্যস্ত আগামী কালের চাপের ভাবনায়।

চারদিক ঘুরে দেখছি। কিছু কিছু মূর্তি এখনো অসমাপ্ত। তুলির টান দুর্গার মত গয়নাগাটিতে ঠাকুরকে এখনো পরিপাটি করা হয়ে ওঠে নি। ওদিকে এখনো হাত দেবার অবসর পাই নি। এদিকটায় তাড়া খুব বেশি। অধিকাংশ প্রতিমাই বাইরের। বায়নাওয়ালারা এসে ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছে। এদিকের কাজ প্রায় শেষ, এবার ওদিকে যাব।

বৃদ্ধ মৃৎশিল্পীর কথায় সম্বিৎ ফিরে পাই। অসমাপ্ত মূর্তিগুলোর দিকে যে আমার নজর পড়েছে সেদিকে তাঁর খেয়াল আছে। নিজের কাছেই কিরকম একটু লজ্জা লজ্জা ভাব।

এমন সময় একটি বছর দশ-বারোর মেয়ে সেই বৃদ্ধের কাছে এসে দাঁড়ায়। সারা গায়ে মাটির ছোপ। তার হাতে একটা ঝুড়িতে একরাশ কি যেন। একটু ভাল করে দেখি, ওসব ঠাকুরের গয়না।

এ আমার নাতনি। আমরা যখন ঠাকুর গড়ায় ডুবে থাকি এই মেয়েটি তখন তার ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে গড়ে ঠাকুরের গয়না। এতেই কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। নাহলে কাজ শেষ করে ওঠা সম্ভব হত না।

মেয়েটির দিকে তাকাই। শ্যামলা রঙ, ছিপছিপে গড়ন, ডাগর চোখ। নিখুঁত শিল্পী।

খোঁজ নিয়ে জানলাম, মেয়েটি শুধু যে, বাবা-দাদুর কাজে সাহায্য করে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনাও করছে।

বৃদ্ধ আবার বললেন, আগে এসব রেওয়াজ ছিল না। হালে আমাদের মধ্যে পড়াশোনার চল হয়েছে। কুমোরের মেয়ে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বাবার কাজে আর বিয়ের পর স্বামীর কাজে সাহায্য করবে। এতদিন আমরা এই জানতাম। আপনিই বলুন দেখি, আমাদের ঘরের মেয়ে লেখা-পড়া শিখলে কি আর সেরকমভাবে কাজে-কর্মে তাদের পাওয়া যাবে?

সিধেসিধি কোন উত্তর দিতে পারি না। আমতা আমতা করি, লেখাপড়া শেখা তো ভাল। এমন সময় একটি মেয়ে এসে আমাকে বাঁচিয়ে দেয়। তার হাতেও একটা ঝাঁকা ছোট ছোট পুতুল ও খেলনা। সবগুলি তৈরীপর্ব সমাপ্ত। শুধু রঙের অপেক্ষা। আর তাতেই পুতুলগুলি জীবন্ত হয়ে উঠবে। এখন এসব পুতুল দোকানে দোকানে বাচ্চাদের খেলার সামগ্রীরূপে আদৃত হবে। আবার পুজোর রাস্তাঘাটে যেসব অস্থায়ী দোকান গড়ে উঠবে সেখানেও শিশুমহলে এরা জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। অথচ সবাই ভাববে এই পুতুল কোন সুদক্ষ কারিগরের তৈরী। কেউ জানবে না একটি অল্প বয়সী মেয়ের নিপুণ শিল্পকলায় প্রাণ পেয়েছে এই পুতুলগুলি। এরকম অনেক কথা ভাবছিলাম।

এই আমার আর এক নাতনি। পুতুল গড়ায় ইতিমধ্যেই বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে। শুধু পুতুল তৈরী নয়, রঙ করা এবং ফিনিশও করবে ও নিজেই। আমরা যখন সবাই প্রতিমা গড়ার কাজে ব্যস্ত থাকি তখন ও এসব পুতুল গড়ে। আর একা আমার ঘরেই নয় সারা কুমোরপল্লীতে ছোটখাট পুতুল ও খেলনা এরকম বয়সী মেয়েরাই করে। তবে ওর পুতুলের চাহিদা খুব। দোকানদারদের অনেকেই এসে আগে ওর পুতুলের খোঁজ করে। হয়ত ভবিষ্যতের কোন বিশাল সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে।

আমিও সেকথাই ভাবছিলাম। নাহলে এরকম ছোট্ট মেয়ে পুতুল গড়ায় এহেন দক্ষতা কোথায় পাবে?

আমার অনেক চেনা-জানা কুমোর-পাড়াটাকে যেন নতুন করে চিনছি। এতদিন এর ধারে-কাছে আছি অথচ চিরকাল শুধু পুরুষ কারিগরদের বাহাদুরীর কথাই জেনে এসেছি। এর পেছনে যে, এরকম ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের অনেক অবদান এবং নিজেদের জীবিকায় স্বাভাবিক দক্ষতার কথা অজানাই ছিল।

জীবিকার সূত্রে আমরা সবাই এক। আমরা কুমোররা একজনের দুঃখের কথা শুনলে জান দিতে প্রস্তুত। তারপর তিনি হারিয়ে গেলেন স্মৃতির গভীরে।

পূর্ববঙ্গের দাঙ্গাহাঙ্গামার পর একজন ভদ্রমহিলা এলেন আমাদের পাড়ায়। সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছেন। আত্মীয়-পরিজনও কেউ নেই। খবর নিয়ে জানলাম ওরা পূর্ববঙ্গের কুমোর। খবরটা শুনে মনটা কিরকম ছটফটিয়ে উঠলো। অনাথা বিধবা। উনিও কুমোর আর আমিও কুমোর। পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গের ব্যবধান ভুলে গেলাম। মনে হল জায়গা চিনতে উনি ভুল করেন নি। ঠিকমতই এসে পৌঁছেছেন। এখানে তাঁর অন্নের অভাব হবে না। বিশেষ করে কুমোর ঘরের বিধবা বামুন। তাঁর হাতেই শিল্প। একটু থামলেন। আবার যেন কি ভেবে নিলেন।

গেলাম তাঁর কাছে। বললাম, কোন ভাবনা নেই। কাজে লেগে যান। তারপর থেকে তিনি আমার কাছেই আছেন। মাটির প্রদীপ তৈরী করেন। মাটি পাইল করা থেকে পোড়ান পর্যন্ত সব তিনি নিজের হাতেই করেন। সম্প্রতি তার কাজের আলাদা ব্যবস্থা করে দিয়েছি। প্রয়োজনের তুলনায় ঘরটা একটু ছোট হয়ে গেছে অবশ্য। তার জিনিষপত্র বিক্রির ব্যবস্থা আমিই করি। খদ্দেররা আমার কাছ থেকেই মাল নিয়ে যায়। মোটামুটি রোজগার খুব একটা মন্দ হয় না। ওই দেখুন, তিনি আসছেন।

দেখলাম বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক বৃদ্ধা আসছেন। তিনি এসে তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে আবার চলে গেলেন। বেঁচে থাকার সংগ্রামে নিজের সামর্থকে হাতিয়ার করে এরকমভাবে লড়াই করতে কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এই কুমোরপাড়ার বিচিত্র কথা আর কত বলব। উপাখ্যান বলে শেষ হবার নয়। ভদ্রলোক মাথা নাড়তে লাগলেন। তামাক ততক্ষণে পুড়ে শেষ। একজন এসে কল্কেটা বদলে দিয়ে গেল।

একটা কথা অনেকেই জানে না, কুমোর-পাড়ার মেয়ে অথবা বৌ যত অভাব এবং দুঃখ-কষ্টেই পড়ুক না কেন তবু তারা পরের বাড়ি কাজ করতে যাবে না। তারা বাঁচতে চাইবে নিজেদের জীবিকার মাধ্যমেই। এরকম একটি বৌয়ের কথা বলেই আমি কাজে লেগে যাবো। কথা বলার ফুরসৎ এমনিতেই কম। কিছু মনে করবেন না যেন।

ওই যে মেয়েটি ওখানে কাজ করছে, তিনি আঙুল দিয়ে দেখালেন, ওর বাবা হঠাৎ মারা গেল। একটি ছেলে আর মেয়েটিকে নিয়ে ওর মা পড়ল মহাফাঁপরে। তবু সে হাল ছাড়ে নি। কোথাও চাকরির জন্য ছোটাছুটি করে নি। তার ভয় ছিল পাছে ছেলেটি জাত ব্যবসা ছেড়ে দেয়। তাই সে দিনরাত ওদের নিয়ে পড়ে থাকত। নিজে পুতুল বানাত, প্রদীপ তৈরী করত আর ছেলেকে কাজ শেখাত। এখন ছেলেটি বড় হয়েছে। ভাল কারিগর। নামডাকও হয়েছে। বোনটি কিন্তু দাদার কাজের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। তার দাদা মূর্তি তৈরী করে। বোন খড়িমাটির কাজ সারে। এভাবে সে এগিয়েছে অনেক দূর। দাদারও কাজের সুবিধা হয়। আর বিধবা কুমোর বৌয়ের মুখে আজ গর্বের হাসি।

তিনি উঠলেন। অনেক কাজ এখনো বাকি।

আমি কুমোরপাড়ার অনাবিষ্কৃত রহস্যে তখন হাবুডুবু খাচ্ছি।

—প্রমীলা

কেয়া পাতার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

[উপন্যাস]

[illegible]

[উনিশ শ' চল্লিশের অক্টোবর। কলকাতার ছেলে বিনু দুই দিদি আর মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে পূব বাঙলার রাজদিয়ায় দাদু হেমনাথের বাড়ি। দিনকয়েক বাদে বিনুর মা সুরমা এলেন রাজদিয়ায়।

আশ্চর্য মানুষ হেমনাথ। সকলেরই প্রিয়, হিতৈষী। গাঁয়ের যত ঝক্কি-ঝামেলা তাঁর মাথায়।

হেমনাথের বাড়ির কর্মচারী যুগলের সঙ্গে বিনুর ভাব বেশ পাকা হল।

হেমনাথ সকালেই বেরিয়ে যান কেতুপুরে মজিদ মিঞা আর মধু সাহার ঝগড়া মেটাতে। ফিরলেন রাতে। সঙ্গে মজিদ আর হাসেম আলী। অবনীমোহনকে দেখে এরা খুবই উল্লসিত। ওদের আন্তরিকতায় অবনীমোহন, সুরমা সকলেই অভিভূত।

অবনীমোহনের সঙ্গে 'মিতা' পাতাল মজিদ।

পরদিন সবাইকে নিয়ে হেমনাথ বেরোলেন বেড়াতে। ঘুরতে ঘুরতে হেমনাথের বন্ধু বৃন্দ রামকেশবের বাড়ি। বেলা চড়তে লাগল।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ছয় ।।

অবনীমোহনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আগে আগে হাঁটছিলেন হেমনাথ; ডাকটা কানে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর এদিক-সেদিক তাকাতেই তাঁর চোখে পড়ে গেল; বিনুরাও দেখতে পেল।

সামনের দিক থেকে একটা লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতে টের পাওয়া গেল তার বয়েস অনেকদিন আগেই পঞ্চাশ পেরিয়েছে; এখন ষাট ছুঁই ছুঁই। বেশিরভাগ চুলই রুপোর তার। অবশ্য কাঁচা চুলেরা একেবারে দখল ছাড়ে নি; এখানে ওখানে ছড়িয়ে থেকে যতখানি পেরেছে যৌবনের পতাকা তুলে রাখতে চেষ্টা করেছে। মুখখানা পরিষ্কার কামানো। পরনে বাড়িতে-কাচা হাফ-হাতা পাঞ্জাবি, ঝুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। তুলনায় ধুতিটা অস্বাভাবিক খাটো, খালি পা। গলায় তিন লহর তুলসীর মালা।

এতখানি বয়েস হয়েছে কিন্তু শরীর মেদশূন্য, স্বাস্থ্যের ভিত বেশ মজবুত। মাঝারি মাপের শক্ত সবল এই লোকটিকে ঘিরে কোথায় যেন খানিকটা দৃঢ়তা ফুটে আছে।

হেমনাথ বললেন, 'আরে অধর যে! কেমন আছ?'

লোকটা অর্থাৎ অধর বলল, 'ভালই। আপনের শরীলগতিক?'

'ঐ একরকম চলছে।' হেমনাথ হাসলেন, 'তারপর এই দুপুরবেলা সেজেগুজে গিয়েছিলে কোথায়?'

বিনুর হাসি পেল। পরেছে তো একটা বেঢপ পাঞ্জাবি আর খাটো ধুতি, তাতে আবার পায়ে জুতো নেই। এতে নাকি সাজা [illegible]

অধর বলল, 'আপনের বাড়ি গেছিলাম। গিয়া শুনলাম, আপনে আমাগো এইদিকে আসছেন। বৌ-ঠাইরণ (বৌদি) বসতে কইছিল; আমি আর বসি নাই। দৌড়াইতে দৌড়াইতে ফিরা আসছি, যদি আপনেরে এইখানে ধরতে পারি—তা পারছি।'

'আমার বাড়ি গিয়েছিলে কেন?'

'বড় দরকার—' বলতে বলতে বিনুদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অধর শুধলো, 'এরা? এগো (এদের) তো আগে দেখি নাই!'

হেমনাথ আলাপ করিয়ে দিলেন। অধরের পরিচয়টাও এবার পাওয়া গেল। পুরো নাম অধর সাহা। রাজদিয়া থেকে কয়েক মাইল উজানে কমলাঘাটের বন্দর; অধর সেখানে বড় পাইকারি ব্যবসাদার। অনেকগুলো ধান-চালের আড়ত আছে তার। টাকাপয়সা যে কত তার লেখাজোখা নেই।

পরিচয়-টরিচয় হল বটে, বিনুদের সম্বন্ধে কিন্তু তেমন আগ্রহ নেই অধরের। সে হেমনাথকে বলতে লাগল, 'এইদিকে যখন আইস্যাই পড়ছেন আর দেখাটাও হইয়া গেছে তখন আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলা দিতে হইব।'

হেমনাথ বললেন, 'আজ আর তোমার ওখানে যেতে বোলো না অধর। তাকিয়ে দ্যাখো কত বেলা হয়েছে। রামকেশবটা রাস্তা থেকে ওর বাড়ি ধরে নিয়ে গিয়েছিল, এত দেরি করিয়ে দিয়েছে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমাদের বেলা হেলে যাবে।'

'রামক্যাশবের বাড়ি যাইতে পারেন আর আমার বাড়ির কাছে আইস্যা যাইবেন না, তা কিছুতেই হইব না।' নাছোড় পেয়াদার মতন জেদ ধরল অধর, 'আসেন—'

হেমনাথ বোঝাতে চাইলেন, 'পরে একদিন আসবখন। এখন তোমার ওখানে গেলে আরো দেরি হয়ে যাবে। ছেলেমেয়েগুলোর এখনও স্নান-খাওয়া হয়নি।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। অধর বলতে লাগল, 'দুই দণ্ডও না বড়কর্তা; তার আগেই আপনেরে ছাইড়া দিমু। এট্টু কষ্ট কইর‍্যা একবার খালি আসেন। বড় দরকার—'

হেমনাথ বললেন, 'তোমার দরকারের কথাটা এখানেই বলে ফেল না।'

'এখানে কইলে হইব না; বাড়িতে নিয়া কয়টা জিনিস আপনেরে দেখামু।'

'ছাড়বে না যখন কী আর করা, চল—' অধরের জেদ আর মিনতির কাছে নিজেকে সঁপে দিলেন হেমনাথ।

এইসময় অবনীমোহন বলে উঠলেন, 'আপনি ঘুরে আসুন মামাবাবু, আমরা বরং রাস্তায় দাঁড়াই।'

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'রাস্তায় কি দাঁড়িয়ে থাকবে; এসো—এসো—'

অধরও সায় দিল, 'হ-হ, আসেন—'

বিনুরা যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেদিকে খানিকটা পিছিয়ে যেতে হল। তারপর রাস্তা থেকে ডানধারে দু'পা গিয়ে সরু খালের ওপর বাঁশের সাঁকো; সাঁকো পেরিয়ে অধরের পিছু পিছু যেখানে এসে তারা পৌঁছুল সেটা ফুলফলের বাগান। আশ্বিনের দুপুর গাছগাছালির ঘন ছায়ায় এখানে নিবিড় হয়ে আছে।

ছায়াচ্ছন্ন বাগানটার পর টিনের চমৎকার একখানা তিনতলা বাড়ি।

কলকাতার সাততলা আটতলা কত বাড়ি দেখেছে বিনু, তাদের ছাদগুলো যেন আকাশের মেঘেদের ছুঁয়ে আছে। কিন্তু টিনের তিনতলা এই প্রথম দেখল। অবাক চোখে চারদিক তাকাতে লাগল সে।

অধর সাহার বাড়িটার মাথায় প্যাগোডার মতন নকশাকরা টিনের চাল। তার দুধারে দুটো টিনের ময়ূর পেখম মেলে আছে। দেয়ালগুলো অবশ্য কাঠের।

বাড়ির [illegible] ঢুকে অধর বলল, 'চলেন, দোতলায় যাই।'

হেমনাথ বললেন, 'আবার [illegible] ওঠাবে?'

'উপরে যা গেলে তো জিনিসগুলোন দেখাইতে পারুম না।'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে ওপরে উঠতে লাগল অধর। হেমনাথরা তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ্য করল, বাড়িটা আশ্চর্যরকমের নির্জন আর স্তব্ধ। অধর সাহা ছাড়া আর কারোকেই দেখা যাচ্ছে না; শিশু-বৃদ্ধ যুবক বা যুবতীর কণ্ঠস্বর কোন দিক থেকেই ভেসে আসছে না। রূপকথার যক্ষপুরীর মতন এখানে জীবনের কোন অস্তিত্ব বুঝি নেই।

খানিক আগে বিনুরা রামকেশবের বাড়িতে ছিল। অনেক মানুষ, অজস্র হৈ-চৈ আর কেনায়িত কোলাহল—সব মিলিয়ে যেন একটা সজীব রঙীন মেলার ভেতর অনেকখানি সময় কাটিয়ে এসেছে। তুলনায় এ বাড়ির নির্জনতা স্তব্ধতা চোখেকানে বিঁধতে লাগল।

একটু পর অধরের পিছু পিছু মস্ত একখানা ঘরের মধ্যে চলে এল বিনুরা। ঘরটার একধারে চেলা কাঠের পাহাড়; খুব সম্ভব দু-তিনটে বড় বড় গাছ কেটে ওভাবে রাখা হয়েছে। আরেক পাশে সারি সারি সাজানো অনেকগুলো পেতলের নতুন কলসী, কাঁসার থালা-বাটি-গেলাস, আর নতুন নতুন খাট। তাছাড়া আরো অসংখ্য জিনিস।

এক পলকে সব দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে অধরের দিকে তাকালেন হেমনাথ।

মুখ কাচুমাচু করে অধর বলল, 'আপনের লগে (সঙ্গে) পরামশ্য (পরামর্শ) না কইর‍্যাই এইসব কিনাকাটা (কেনাকাটা) সারছি বড়কত্তা।' একটু থেমে আবার, 'দ্যাখেন জিনিসগুলোন একেবারে বাছা বাছা, পছন্দসই। কেন শাস্ত্রয় কইতে পারব না অধর সা দানে খারাপ জিনিস দিছে।'

হেমনাথ বিমূঢ় সুরে বললেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

হেমনাথের চোখে চোখ রেখে অধর শুধলো, 'বুঝতে পারেন নাই?'

'না।' ধীরে ধীরে হেমনাথ মাথা নাড়লেন।

একটু চুপ করে থেকে অধর বলল, 'দানসাগর ছান্দ (শ্রাদ্ধ) করুম।'

'শ্রাদ্ধ!'

'হ।'

'কার?'

'কার আবার, আমার।' নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে অধর সাহা ফিসফিস করল।

আর হেমনাথ যেন কথা বলতে ভুলে গিয়ে একেবারে বোবা হয়ে রইলেন। তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হল এমন বিচিত্র আজগুবি কথা বাট পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে আর কখনও শোনেন নি।

একটু কি ভেবে নিয়ে অধর আবার বলল, 'ঐ যে লাকড়ি (চেলা কাঠ) দেখতে আছেন ঐ গুলান দিয়া আমি মরলে আমারে পোড়ান হইব। আর এই নতুন খাটপালং (পালঙ্ক) থালা-ঘটি-গেলাস-বাটি— সব দানের জিনিস। ছান্দের সময় বামনগো (ব্রাহ্মণদের) দিমু। বুঝলেন নি বড়কত্তা, মরার আগেই নিজের ব্যবস্থা কইর‍্যা রাখলাম। এমনকি আগামী বছর গয়ায় গিয়া নিজের পিন্ডিটাও দিয়া আসুম।'

নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিলেন হেমনাথ। এতক্ষণে কথা বললেন, 'হঠাৎ তোমার ঘাড়ে এ পাগলামি চাপল কেন?'

ঠিক এভাবে হেমনাথ বলবেন তা যেন আশা করেনি অধর। আহত সুরে বলল, 'এরে আপনে পাগলামি কন বড়কত্তা!'

'তা ছাড়া কী?'

হেমনাথের কথার উত্তর না দিয়ে অধর বলল, 'আপনে তো সবই জানেন বড়কত্তা—'

'কী জানি?'

'আমার পোলা দুইখান (ছেলে দুটো) ক্যামন।' অধর সাহা বলতে লাগল, 'দশ বছর তারা আমার লগে (সঙ্গে) সম্পক্ক রাখে নাই। তাগো (তাদের) ভরসা করি না। কিন্তুক—'

হেমনাথ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু কী?'

'হিন্দু হইয়া জন্মাইছি। মরার পর কে ছান্দ করব, কে পিন্ডি দিব তার তো ঠিক নাই। ঐটুকের লেইগা (জন্য) আত্মার সদ্গতি হইব না। পরকাল বইল্যা (বলে) তো একটা কথা আছে।'

'তোমার ভালমন্দ কিছু হলে ছেলেরা আসবে না, এমন কথা আগে থেকেই ভাবছ কেন? তাছাড়া, বলতে নেই, তোমার স্বাস্থ্য বেশ ভালই। বয়েসেও আমার চাইতে ঢের ছোট হবে। এর ভেতর মরার চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকল কী করে?'

দার্শনিকের মতন মুখ করে অধর বলল, 'বড় কত্তা, মাইনষের (মানুষ) জীবন বড় তাজ্জবের জিনিস! এই আছে এই ফক্কা। কার কখন ওপারের ডাক আসব, কেউ জানে না। রাবণের সিঁড়ির মত ছান্দ-শান্তি আমি ফেলাইয়া রাখুম না।'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

বিনুর এইসব কথাবার্তা ভাল লাগছিল না। টিনের তেতলা দেখার বিস্ময়টাও ধীরে ধীরে কখন ফিকে হয়ে গেছে। সে উসখুস করতে লাগল। এদিকে অবনীমোহন, সুধা আর সুনীতি চুপচাপ। তাদের মুখচোখ দেখে প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না।

অধর আবার বলল, 'ভাবতে আছি পূজার পরেই একটা ভাল দিন দেইখ্যা ছান্দটা চুকাইয়া ফেলুম। একশজন ভাল বামন ভোজন করামু। আইজ্ঞা বড় কত্তা, কারে কারে ডাকা যায় কন (বলুন) তো?'

হেমনাথ বললেন, 'এখনও তো দেরি আছে। পরে এ নিয়ে ভাবা যাবে। এখন আমরা যাই।'

— 'এখনই যাইবেন!'

'হ্যাঁ। আজ আর দেরি করতে পারব না।' বিনুদের নিয়ে হেমনাথ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে একতলায়। তারপর গাছপালা ঝোপঝাড় বাগান পেরিয়ে সোজা দক্ষিণ-গামী বড় রাস্তায়।

অধরও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। সে বলল, 'দুই চাইর দিন পর আমি কিন্তুক আপনের বাড়িতে যামু।'

হেমনাথ বললেন, 'এসো।'

'ছান্দশান্তির ব্যাপারে আপনের লগে (সঙ্গে) অনেক পরামশ্য আছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—'

অধর সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। হেমনাথ বললেন, 'কথা তো হয়ে গেল। এই রোদের ভেতর কষ্ট করে আর তোমাকে যেতে হবে না।'

অধর দাঁড়িয়ে পড়ল। হেমনাথরা এগিয়ে গেলেন।

দাদুর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অধর সাহার কথা কিন্তু ভাবছিল না বিনু, বার বার ঝিনুকের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল। এ পাড়ায় আসা হল, সেই সকাল থেকে এতখানি বেলা পর্যন্ত রামকেশব আর অধর এই দুটো লোক তাদের আটকে রাখল অথচ ঝিনুকদের বাড়িতেই শুধু যাওয়া হল না। বারো বছরের বিনুর ছোট্ট উষ্ণ কোমল মনটা সেজন্য ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

খানিক যাবার পর অবনীমোহন শুধোলেন, 'লোকটা অদ্ভূত তো—'

বিনু বুঝল অধরের কথা বলছেন অবনীমোহন। সে জানে মানুষ মরে টরে গেলে অন্যেরা তার শ্রাদ্ধ করে। কিন্তু একটা লোক জীবিত অবস্থায় নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করতে যাচ্ছে দেখেও বিনু খুব অবাক হল না, তেমন কৌতূহলও বোধ করল না। ঝিনুক যেন চারদিকের সব কিছু থেকে তাকে অন্যমনস্ক করে রেখেছে।

যাই হোক হেমনাথ মৃদু হাসলেন, 'তা একটু—'

অবনীমোহন বললেন, 'এমন লোক আগে আর কখনও দেখিনি।'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ হাসতে লাগলেন।

অবনীমোহন আবার বললেন, 'ছেলেদের ওপর তো খুব রাগ দেখলাম। কারণটা কী?'

'সে অনেক ব্যাপার, পরে বলব।'

'আর কেউ নেই ওর?'

'না। বউ-টউ ঢের আগেই মরে বসেছে।'

অবনীমোহন আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, হেমনাথ তার আগেই বলে উঠলেন, 'যাই, আড়ত থেকে মাছগুলো নিয়ে আসি। আর দাদাভাই'—বলেই বিনুকে নিয়ে [illegible]

কথায় কথায় কখন তাঁরা নৌকোঘাটায় সে গিয়েছিলেন, অবনীমোহনের খেয়াল ছল না। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল যাবার ময় মাছের জন্য আড়তে পয়সা দিয়ে গয়েছিলেন হেমনাথ।

নৌকোঘাটাটা রাস্তা থেকে একটুখানি লয়, নদীর জল ছুঁয়ে আছে। তার গা ঘেঁষে সারি সারি মাছের আড়ত।

যাবার সময় আড়তগুলোর গায়ে যত লেডিঙি বিনুরা দেখে গিয়েছিল, এখন র দশগুণ এসে জমা হয়েছে। নদীর র-দূরান্ত থেকে চিত্রবিচিত্র পাল তুলে রো অগণিত নৌকো এদিকে ছুটে সছে। ইলিশ মাছের ভারী আঁশটে গন্ধ খানে বুঝি বারোমাস অনড়; নদীর লোমেলো দুরন্ত বাতাস তাকে উড়িয়ে য়ে যেতে পারছে না।

আড়তে যেতেই সেই লোকটাকে দেখতে ল বিনু: হেমনাথ এর হাতেই মাছের য়সা দিয়ে গিয়েছিলেন।

লোকটা মাঝবয়েসী। থলথলে মাংসল হারা, গায়ের রঙ কালো। সব সময় লের কাছে থাকার জন্যই বোধহয় চামড়া ক্ষ, খসখসে। গ্রীষ্ম-বর্ষা হাজার নখে র গা চিরে চিরে দিয়েছে। পরনে আধ- লা ধুতি ছাড়া আর কিছুই নেই। হাতে কো সোনার তাবিজ, গলায় সরু হার, টামাটা গাঁটঅলা আঙুলে পলা আর মেদের আংটি।

কোলের কাছে টিনের ক্যাশবাক্স আর ল হিসেবের খাতা নিয়ে একটা তক্তপোষে স ছিল লোকটা; বিনুদের দেখেই লাফ য় নেমে এল। আপ্যায়নের সুরে ব্যস্ত- বে বলল, 'আসেন—আসেন। বসেন কর্তা—'

হেমনাথ বললেন 'এখন আর বসব না ল; তাড়াতাড়ি মাছ দাও—'

'তাই কখনও হয়! আড়তে আপনের য়ের ধুলা পড়ল; একদণ্ড বইস্যা না লে শান্তি পামু ক্যান?' বলতে বলতে লের কি যেন মনে পড়ে গেল। বিনুকে খিয়ে বলল, 'নাতিরেই খালি আনছেন, মাই আর নাতনীরা কোথায়?'

রাস্তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, খানে।'

'পথে খাড়া করাইয়া (দাঁড় করিয়ে) সছেন! ক্যান, আমার এখানে বসনের য়গা আছিল না?' নকুলকে অত্যন্ত ধে দেখাল।

হেমনাথ বোঝাতে চেষ্টা করলেন, নেক বেলা হয়ে গেছে তাই আর নিনি। আনলে আরো দেরি হয়ে যাবে।'

'এট্টু দেরি হইব বইল্যা (বলে) নবেন না! পরথম দিন (প্রথম দিন) মার আড়তের দুয়ারে ওনারা (ও'রা) সলেন; দুইটা মিটাই না খাওয়াইয়া ড়তে পারি; আপনের নাতি-নাতনী-জামাইর উপুর আমার জোর নাই? যাই ওনাগো ডাইক্যা আনি।'

নকুল রাস্তার দিকে ছুটতে যাচ্ছিল; তার আগেই খপ্ করে তার একখানা হাত ধরে ফেললেন হেমনাথ, 'আজ থাক নকুল। একদিন তোমার বাড়িতে ওদের নিয়ে যাব। তখন যত পার খাইও—'

একটু ভেবে নকুল বলল, 'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

'কথা দিলেন কিন্তু।'

'হ্যা—হ্যাঁ; কথার খেলাপ হবে না। তুমি এখন মাছ দাও—'

বিনু অবাক হয়ে দেখছিল। আড়তদার এই লোকটাকে তার খুব ভাল লাগছে। তার মধুর ব্যবহার, তার আন্তরিকতা বুঝিয়ে দিচ্ছে দাদুকে কতখানি ভালবাসে সে, কতখানি শ্রদ্ধা করে। শুধু কি এই লোকটাই, হিরণ, মজিদ মিঞা, মজিদের বোনাই হাসেম আলী, রামকেশব—সারা রাজদিয়াই হয়ত হেমনাথের জন্য হৃদয় মেলে রেখেছে। বিনু টের পেল তাদের যে এত খাতির, এত মর্যাদা—সব, সব দাদুর জন্য।

নকুল ডাকল, 'আসেন, মাছ বাইছা (বেছে) নিবেন—'

আড়তটার সামনের দিকে রাস্তা, পেছনে নদী। দুটো দিকই খোলা। নকুলের সঙ্গে যেতে যেতে বিনু লক্ষ্য করল, পেছন দিকে ইলিসের পাহাড় জমে আছে—পূর্ব বাঙলার চকচকে লোভনীয় রুপোলী ফসল।

আড়তের তলায় সারি সারি জেলে ডিঙি। আট-দশটা লোক ডিঙিগুলো থেকে মাছ গুনে গুনে ইলিশের পাহাড়টার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। মাছির ভনভনানির মতন অবিরাম শোনা যাচ্ছে, 'রামে রাম, রামে দুই, রামে তিন—'

আরেক দল লোক কাঠের প্যাকিং বাক্সে পরল পরল বরফের তলায় মাছ সাজাচ্ছে। বিনু জানে ঐ বাক্সগুলো কলকাতায় চালান যাবে।

একসময় রুপোর পাহাড়টার কাছে এসে পড়ল বিনুরা: একসঙ্গে এত মাছ, এমন ঝকঝকে জীবন্ত জলের ফসল আগে আর কখনো দ্যাখে নি সে।

নকুল বিনুকে বলল, 'পাচখান মাছ বাইছা (বেছে) লও ছোট কত্তা—'

বিনু লজ্জা পেয়ে গেল। মাছ তো বাছলই না, দাদুর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

হেমনাথ এই সময় বললেন, 'পাঁচটা মাছ কেন? তিনটের দাম তো তোমায় দিয়ে গেছি।'

নকুল বলল, 'আইজ জবর মাছ উঠতে আছে বড় কত্তা। দরও ঝপর ঝপর (দ্রুত) নামতে আছে। অখন ট্যাকায় দশটা বিকাইতে আছি; রাইতের দিকে বিশটা ক'ইর‍্যা বেচতে হইব।'

হেমনাথ কিছু বললেন না।

নকুল এবার বিনুকে নিয়ে পড়ল, 'কই, মাছ বাছলা (বাছলে) না?'

বিনু একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকল।

বিনুর মনোভাব বুঝতে পেরে নিজেই এবার সেরা ছ'টা মাছ বেছে বেঁধে দিল নকুল।

হেমনাথ বললেন, 'আবার ছ'টা কেন?'

হেসে নকুল বলল, 'ছোট কত্তা পয়লা দিন আমার আড়তে আসল। তার সম্মান নাই? একটা মাছ তারে খাইতে দিলাম।'

মাছ নিয়ে রাস্তায় আসতে সুধা বলল, 'এত দেরি করলে কেন দাদু?'

হেমনাথ বললেন, 'আর বলিস না ভাই। ঐ আড়তদার মানে আমাদের নকুলটা কিছুতেই ছাড়ে না। তোদের আড়তে গিয়ে মিষ্টি খাওয়াবার বাই তুলেছিল। কত কষ্টে যে ঠেকিয়েছি। তবে একটা কড়ার করিয়ে নিয়েছে, একদিন ওর বাড়ি তোদের নিয়ে যেতে হবে।'

অবনীমোহন ওধার থেকে বললেন, 'এখানকার মানুষ বড় ভাল।'

আবেগময় সুরে হেমনাথ উত্তর দিলেন, 'সত্যিই ভাল অবনীমোহন—'

এরপর ইলিশমাছ নিয়ে কিছুক্ষণ উচ্ছ্বসিত আলোচনা চলল। আট আনায় পাঁচটা বড় বড় ইলিশ, তার ওপর একটা আবার ফাউ—অবনীমোহন ভাবলেন, এ যেন এক স্বপ্নের দেশ।

•

একসময় স্টিমারঘাটা, সারি সারি সেই মিষ্টির দোকান, খোয়া বাঁধানো পথ আর নদীটা পেছনে ফেলে সেই কাঠের পুলটার কাছে এসে পড়ল বিনুরা। ঠিক সেই সময় শোনা গেল, 'হেম—হেম—' পেছন থেকে কে যেন খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছে।

হেম নিশ্চয়ই হেমনাথ। তাঁকে যিনি নাম ধরে ডাকতে পারেন হয় তিনি বন্ধু-স্থানীয়, নতুবা গুরুজন টুরুজন হবেন।

সবাই একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। আর ঘুরতেই বিনু দেখতে পেল, দূরে পথের বাঁকে কালকের সেই জরাজীর্ণ দুর্বল ঘোড়াটা তার চাইতেও পুরনো ভাঙাচোরা গাড়িটাকে টেনে নিয়ে আসছে। কালকের সেই কোচোয়ানটাকে দেখা যাচ্ছে না; চালকের জায়গায় ধবধবে সাদা একটি মানুষ বসে আছেন।

হেমনাথ বললেন, 'লালমোহন আসছে।'

লালমোহন অর্থাৎ ডেভিড লারমোর। কাল এ'র কথা অনেক শুনেছে বিনু।

যৌবনের মধ্যদিনে সুদূর আয়ার্ল্যান্ড থেকে পূর্ব বাঙলার এই প্রান্তে এসেছিলেন; তারপর যুগ যুগ কেটে গেছে। তাঁকে মুখোমুখি দেখবার জন্য বিনুর ছোট্ট হৃৎপিন্ড যেন লাফাতে লাগল।

কিছুক্ষণের ভেতর ফীটনটা পাশে এসে থামল। কোচোয়ানের সীট থেকে একরকম লাফ দিয়েই নেমে এলেন লারমোর।

হেমনাথ বললেন, 'বয়েস কত হল হে?'

লারমোর হেসে বললেন, 'তোমার চাইতে গুনে গুনে চার বছরের বড়।'

'কিন্তু যেভাবে নামলে তাতে তিরিশ বছরের ছোট বলে মনে হচ্ছে। বুড়ো হাড়ে একবার চোট লাগলে দেখতে হবে না; ছ'মাসের জন্যে বিছানা নিতে হবে।'

তাচ্ছিল্যভরে লারমোর বললেন, 'কিছু হবে না।'

দু চোখে অসীম বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিল বিনু। লালমোহনের চুল, ঘন জোড়া ভুরু, গায়ের রঙ, ঋষিদের মতন লম্বা লম্বা দাড়ি—সব কিছু দুধের মতন সাদা। ভুরুর তলায় স্বচ্ছ জলে আলোর নাচনের মতন দুটি স্নিগ্ধ চোখ। পিঠ সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছে। গা-ময় এত কুঞ্চন যাতে চামড়া সোনার জালি জালি মনে হয়। পরনে ধুতি আর কামিজ; পায়ে লাল কাপড়ের জুতো। গলায় কালো কারে রুপোর ক্রশ ঝুলছে।

বড়দিনে কলকাতার সাহেবপাড়ায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে আলো টাঙো দিয়ে 'ক্রিসমাস ট্রী' সাজায়; তার সঙ্গে ধবধবে দাড়িঅলা এক বুড়োও থাকে। বিনু বুড়োর নামটা মনে করতে পারল—সান্টাক্রজ। পোশাকটুকু বাদ দিলে লারমোর যেন অবিকল সান্টাক্রজ।

হেমনাথ বললেন, 'এসো পরিচয় করিয়ে দিই—'

লারমোর বললেন, 'তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না; ওটা আমিই পারব।' বলে অবনীমোহনের দিকে ফিরলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই আমাদের জামাই।' সুধা-সুনীতি-বিনুকে বললেন, 'আর তোমরা অবশ্যই দাদাভাই দিদিভাই। তোমাদের নাম তো জানি না; নামগুলো বল—'

অবনীমোহনের হঠাৎ কি হয়ে গেল; ঋষির মতন দেখতে এই বয়স্ক বিদেশী মানুষটির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। দেখাদেখি সুধা-সুনীতি-বিনুও প্রণাম করল। তারপর একে একে সবাই নিজের নিজের নাম বলল।

সবাইকে আশীর্বাদ করে লারমোর অবনীমোহনের উদ্দেশে বললেন, 'কাল স্টিমারঘাটে তোমাদের আনতে যেতে পারি নি; বিশেষ দরকারে হাটে গিয়েছিলাম—'

অবনীমোহন বললেন, 'মামাবাবু সে কথা বলেছেন।'

'কাল হাট থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আজ সকালে উঠেই চলে আসব ভেবেছিলাম; তখনও কতকগুলো ঝঞ্ঝাট এসে জুটল। সব মিটিয়ে বেরুতে বেরুতে দুপুর হয়ে গেল। ভাল কথা, রমু কোথায়? তাকে তো দেখছি না।'

হেমনাথ বললেন, 'সে বাড়িতে আছে।'

লারমোর শুধোলেন, 'তোমরা গিয়েছিলে কোথায়?'

'রাজদিয়া শহরটা ওদের একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম।'

লারমোর এবার অবনীমোহনকে সাক্ষী মানলেন, 'শোন তোমার মামাশ্বশুরের কথা। আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেছি বলে তো খুব উপদেশ ঝাড়া হল। আর উনি যে বুড়ো হাড়ে মাইল মাইল হেঁটে এলেন, তার বেলা কী হবে?'

সবাই হাসতে লাগল। লারমোর আর হেমনাথের ভেতর বন্ধুত্বটা যে কতখানি নির্মল স্বচ্ছ আর প্রীতিপূর্ণ তা যেন অনায়াসে টের পাওয়া যাচ্ছে।

বিব্রত মুখে হেমনাথ বললেন, 'লাফানো আর হাঁটা—কিসে আর কিসে। সে যাক গে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর একটা কথাও না।'

লারমোর কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় হেমনাথের হাতে ইলিশ মাছগুলো দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখে হাসির ছটা ঝলমলিয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত খুশী গলায় তিনি বললেন, 'চমৎকার মাছ তো।'

হেমনাথ বললেন, 'নজর পড়েছে তা হলে—'

'চোখ আগেই পড়া উচিত ছিল। পেটিগুলো ভাতে দিলে যা হয় না—একেবারে হেভেন।' চোখ বুজে বুঝিবা স্বর্গসুখটা কল্পনা করতে লাগলেন লারমোর।

ভুরু কুঁচকে হেমনাথ বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বোধহয় পেটিগুলো ভাতে দেওয়া যাবে না; সে জন্যে বাড়ি যাওয়া দরকার।'

লারমোর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হাঁ-হাঁ, গাড়িতে ওঠ সব।' বলে নিজেই ফীটনের দরজা খুলে দিলেন।

অবনীমোহন, হেমনাথ আর সুধা-সুনীতি উঠতেই দেখা গেল, গাড়িতে আর জায়গা নেই। লারমোর বললেন, 'বিনুদাদা কোচোয়ানের সীটে আমার পাশে বসে যাবে।'

পাশাপাশি যেতে যেতে বার বার মুখ তুলে লারমোরকে দেখতে লাগল বিনু; চোখাচোখি হলেই অবশ্য মুখটা সরিয়ে নিচ্ছে।

এই মুহূর্তে বিনুর মন থেকে রামকেশব, রুমা-ঝুমা, অধর সাহা, নরেশ, রুপোর পাহাড়ের মতন ইলিশের স্তূপ, মনোহর নদীতীর, এমনকি ঝিনুক পর্যন্ত মুছে গেছে। তার বারো বছরের অপরিণত অস্তিত্বকে পুরোপুরি দখল করে নিয়েছেন এই বিস্ময়কর চমকপ্রদ মানুষটি—যাঁর নাম ডেভিড লারমোর।

বার কয়েক চোখাচোখির পর বিনু ধরা পড়ে গেল। সস্নেহ হেসে লারমোর শুধোলেন, 'কী দেখছ?'

লজ্জা পেয়ে বিনু তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল; উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার তাকাতে লাগল বিনু। তার মনের কথাটা বোধহয় পড়তে পারলেন লারমোর। বিনুর দিকে খানিক ঝুঁকে বললেন, 'আমায় কিছু বলবে?'

এই মানুষটি সম্বন্ধে এই মুহূর্তে বিনুর মনে অনেক জিজ্ঞাসা, অসীম কৌতূহল। ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে সে জানাল, বলবে।

লারমোর বললেন, 'বলো না—'

এতক্ষণে গলায় স্বর ফুটল বিনুর। ফিসফিসিয়ে বলল, 'পরে।'

'পরে কেন, এখনই বলে ফেল।'

বিনু চুপ।

একটু ভেবে হাসতে হাসতে লারমোর বললেন, 'আচ্ছা, পরেই বোলো।'

এক সময় ফীটনটা বাড়ি পৌঁছে গেল।

[ক্রমশঃ]

হুকতা

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

চোখ চেয়ে দেখার মত সুন্দর আর সুগঠিত তার চেহারা। নিজের চেষ্টায় খানিকটা লেখাপড়াও শিখেছে। শিক্ষা তাকে জীবন সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। সে জানতে চায়, বুঝতে চায়—জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আরোহণ অবরোহণের পথ খুঁজে বেড়ায়। শুরু থেকে শেষ, আদি থেকে অন্ত। কিন্তু পরিচয়হীনতা শ্যামলকে দুর্বল করেছে। সঙ্কুচিত করে রেখেছে। চলার গতিকে পিছনে টেনে রাখতে চায়। পাগল হয়ে ওঠে শ্যামল। সঙ্কোচ আর দুর্বলতাকে সে ঝেড়ে ফেলতে তৎপর হয়ে ওঠে। যার অতীত নেই তার চলার পথে বাধা থাকবে কেন? বিচার করে আর হিসাব করে চলবার প্রয়োজন কি? শিক্ষা? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে শ্যামল। শিক্ষা শুধু ঢেকে রাখবার পোষাক। ভাল ভাল কথার আড়ালে মনের কামনা বাসনাকে লুকিয়ে রাখবার সুন্দর আবরণ। কথাটা শ্যামল শুধু অনুভব করে না, খানিকটা বিশ্বাস করে। যদিও প্রকাশ করে না। প্রকাশ করাটাই অপরাধ। কিন্তু এ অপরাধ কে করে না। গোপনতার আড়ালে রাখতে জানলেই নিতান্ত অশ্লীলতাকেও পরম সুন্দর বলে চালিয়ে নেওয়া যায়। শিক্ষার পালিশ আর সংস্কৃতির নামাবলি পরিয়ে দিতে জানলেই হল। যে তা জানে না কিংবা পারে না অথবা অসাবধানে ধরা পড়ে যায় তাকে নিয়েই যত কোলাহল আর ধিক্কারের জয়ঢাক বেজে ওঠে। নিজের জীবনেই এমন এক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল শ্যামলের। প্রতিবাদ করতে পারে নি। নিঃশব্দে শুনেছে ততোধিক নিঃশব্দে সরে পড়েছে। কিন্তু নিজেকে সে এক মুহূর্তের জন্যও অপরাধী ভাবতে পারেনি। যেমন সহজভাবে সে দামিনীকে গ্রহণ করেছিল ঠিক ততখানি সহজভাবেই দুর্নামকে মাথায় তুলে নিতে পেরেছে।

দামিনীর দেহটাকে শ্যামল অবাক হয়ে দেখেছে। ও কে, কি ওর পরিচয় এ কথা ভেবে দেখবার প্রয়োজন বোধ করেনি। একটি নারী দেহ তাকে নিবেদন করতে চায়। যে দেহ যৌবনের মহিমায় প্রাণবন্ত, রক্তের উষ্ণতায় ফুটন্ত। চোখ ফেরাতে পারে নি শ্যামল। দেখেছে, স্পর্শ করেছে, উত্তেজিত হয়ে পীড়ন করেছে, গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। দুশ্চিন্তা ছিল না—দুর্ভাবনা ছিল না: কেন থাকবে। গভীর রাত্রে দামিনী কেন তার ঘরে এসেছে একথা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। হলোই বা রাতের অন্ধকারে তার অভিসার।

ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল দামিনী। ইতিপূর্বে বহুবার এ ঘরে সে এসেছে। কারণে অকারণে কিন্তু রাতের অন্ধকারে এমন চুপিচুপি নয়। আজকের আগমনের মধ্যে আহ্বানের ইঙ্গিত সমর্পণের প্রস্তুতি পরিস্ফুট।

দামিনী ফিসফিস করে বলে, আলোটা নিভিয়ে দি......

ও আসবে একথা জানিয়েছিল। কেন এবং কখন তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু এখন ওকে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না শ্যামলের:

বলল, না থাক—

লজ্জা করবে যে......

গভীর রাত্রে চুপি চুপি ঘরে আসতে লজ্জা নেই। আলোয় লজ্জা। ভাবছিল শ্যামল। প্রকাশ্যে বলল, তাহলে এলে কেন?

জবাব দিতে পারেনি দামিনী। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়েছিল ওর নিকট সান্নিধ্যে। খানিক নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বিনা আহ্বানেই শ্যামলের বিছানার একপাশে শুয়ে পড়ল। শ্যামল চেয়ে চেয়ে দেখছিল। পরিশ্রমক্লান্ত মলিন একটি নারীকে। সাধারণ বেশবাস। পারিপাট্যহীন। এই দীনহীন মেয়েটিকে বহুদিন থেকেই দেখেছে তবুও যেন নতুন লাগছে আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে শ্যামলের কাছে। দু চোখের লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে লেহন করছে শ্যামল। চোখে চোখ পড়তেই বিচিত্র ধরনের একটু হেসে চোখ বন্ধ করে দামিনী কিন্তু সারা দেহ ঘিরে রয়েছে একটি অসহায় আর অসতর্ক ভাব। অসংবৃত ও ত বটেই। শ্যামল দেখছে তার দৃষ্টি দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে। দামিনীর চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। অসংবৃতকে অনাবৃত করে।

আদুরে গলায় দামিনী বলে, আলোটা নিভিয়ে দাও বাবু......বড্ড লজ্জা করছে। শেষপর্যন্ত দিতে হয়েছিল শ্যামলকে। তারপর একটু একটু করে একেবারে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গিয়েছিল।

গোপন থাকেনি দামিনীর এই নৈশ অভিযান। অনেককে বিমুখ করে সে নিজের কাজের সাক্ষী রেখেছে। যার জন্য চলে যেতে হল দামিনীকে। চলে যেতে হল শ্যামলকেও। সকলেরই মুখে এক কথা। শ্যামলের এত বড় নৈতিক অধঃপতনে সকলেই ছি ছি করে উঠল। নারী হলেও দামিনী সামান্যা। মেসবাড়ীর সামান্য একজন রাঁধুনী। একথা শ্যামল ভুলে গেলেও আর সকলে ভুলতে পারছে না।

শ্যামল সেইদিন থেকেই ভাবতে শুরু করেছে। দামিনী রাঁধুনী হলেও স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ উষ্ণ আর উদ্দীপনাময় এক নারী। শ্যামল তাকে খোলা চোখে দেখেছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে অনুভব করেছে, গ্রহণ করেছে, দামিনী কে, দামিনী কি একথা একবারও তার মনে হয়নি। শ্যামল একজন পুরুষ আর দামিনী নারী এর বেশী ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। তাই ওকে চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু চলে গিয়েও সে ভুলতে পারছে না সেদিনের সেই বিচিত্র রাতের কথা। যে রাত তার মনে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। জীবনবোধের রূপ বদলে দিয়েছে। প্রত্যেকটি নারীর মধ্যেই সে দামিনীর ছায়া দেখছে।

তার বর্তমান বাসগৃহের ঠিক সামনেই বাস করে সুখ্যাত চিত্রতারকা শ্রীময়ী। ওর চলাফেরা আসাযাওয়া বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছে দামিনীকে। শ্রীময়ী আর দামিনী। দুজনাই নারী। আগ্রহভরে চেয়ে চেয়ে দেখে শ্যামল। একটা অদ্ভুত চিন্তা তার মনের মধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। শ্রীময়ীকে নিয়ে কত কোলাহল, কত উচ্ছ্বাস। আবেদনের আর নিবেদনের নগ্ন প্রকাশ। লক্ষ্যবস্তু একই। নারীদেহ। সে দেহ যৌবনের রূপে রসে টলমল করছে। আহ্বান জানাচ্ছে, প্রলুব্ধ করে তুলছে।

দামিনীও তাকে আহ্বান জানিয়েছিল প্রলুব্ধ করে তুলেছিল। তারও মূলধন ছিল দেহ। শ্রীময়ী আর দামিনী। প্রভেদ কোথায় আর তা কতটুকু জানতে চায় শ্যামল। দামিনীকে যেমন করে দেখেছে ঠিক তেমনি ভাবেই দেখতে চায় শ্রীময়ীকে। দেখতে চায় একই যৌবনকে দুই ভিন্ন নারীদেহে। দামিনী উপযাচিকা আর শ্রীময়ী উপাস্যা।

শ্রীময়ীকে কদিন ধরেই শ্যামল লক্ষ্য করছে। একটা উন্মাদ তৃষ্ণা ওকে অবুঝ করে তুলেছে।

দিনকয়েক পাগলের মত অনুসরণ করেও কোন লাভ হল না। শেষপর্যন্ত নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়ে অন্য রাস্তায় পা বাড়াল। শ্রীময়ীর বাড়ীর ফটকের কাছে একটি নির্দিষ্ট সময়ই রোজই তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। শুধু চেয়ে থাকে।

শ্রীময়ী ওকে লক্ষ্য করেছে। ওর চেহারা তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু আমল দেয়নি। কোথাকার কে তাকে চোখের দেখা দেখে যদি ধন্য হতে চায় তা নিয়ে ভাববার কি থাকতে পারে। এমনটি না হলেই বরং সে বিস্মিত হত। ভক্তের অভাব নেই তার। অসংখ্যের মধ্যে না হয় আর একজন যোগ হল। তবুও শ্রীময়ীকে নিজে থেকেই একদিন এগিয়ে আসতে হল। এগিয়ে এল তিরস্কার করতে।

বলল, কদিন ধরে রোজই আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। কি চান আপনি? উদ্দেশ্য কি আপনার?

জবাব দিতে পারেনি শ্যামল। শ্রীময়ী এভাবে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করতে পারে এটা সে অনুমান করতে পারেনি।

বেশী কথা বাড়াল না শ্রীময়ী শুধু যাবার আগে বলে গেল, এভাবে আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শোভন নয় একথা আপনার বোঝা উচিত।

কথাটা শ্যামলের ভেবে দেখা উচিত ছিল। ভুল করেছে শ্যামল। এপথে ঝুঁকি আছে। শ্রীময়ী দামিনী নয় এ সত্যটা না বোঝার কথা নয়। চলে গেল শ্যামল এবং তারপর বেশ কিছুদিন আর ওপথে পা দেয় নি। নিজের এই যুক্তিহীন কাজের একটা অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। পৃথিবীতে এমন বহু কাজই মানুষ করে থাকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা চলে না। হাস্যকর মনে হয়। তবুও মানুষ করে। সেও না হয় তাদের শ্রেণীভুক্ত হয়েছে।

আবার তাকে একই স্থানে দেখা গেল। শ্রীময়ী তাকে বাঁকা চোখে দেখেছে। আজ সে একলা ফিরে আসেনি। গাড়ী থেকে নেমে সমস্ত দেহে একটা হিল্লোল তুলে সঙ্গের লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল। ওর উদ্দাম হাসি কলকণ্ঠের ঝঙ্কার বহুক্ষণ শ্যামলের কানে বাজতে থাকে। শ্রীময়ীর সঙ্গে দামিনীর এখানেই প্রভেদ কিন্তু ওর রক্তমাংসের দেহটা?

সেদিনের মত চলে গেলেও আবার পরদিন তাকে দেখা গেল একই স্থানে একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতে।

শ্রীময়ীর মনেও খানিক কৌতূহল দেখা দিয়েছে। খানিকটা আকর্ষণও আছে। সুন্দরের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ। যদিও শ্রীময়ীর অভিনেত্রী-জীবনে এমন বহুর আগমন ঘটেছে। যেমন এসেছে তেমনি চলে গেছে। কোনদিন রেখাপাত ঘটে নি বরং খানিকটা বিতৃষ্ণা, খানিকটা ক্লান্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

শ্রীময়ী ডাকল, আমার সঙ্গে আসুন।

চমকে উঠল শ্যামল। বিশ্বাস করতেও ভয় হচ্ছে। অথচ এমনি একটি আহ্বানের প্রত্যাশায় সে দিন গুনছিল। সসংকোচে বলল, সঙ্গে যাব?

একটু খানি হেসে শ্রীময়ী বলল, তাইত বললাম। চলে আসুন।

অবাক কান্ড। এই আহ্বানেও সাড়া দিতে পারছে না সে। যাওয়া ঠিক হবে কিনা ভাবছিল শ্যামল। ওকি নিজের অজ্ঞাতে বদলে গেছে?

শ্রীময়ী আর একবার আহ্বান জানিয়ে অগ্রসর হল। শ্যামল হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে তাকে অনুসরণ করল।

শ্যামলকে বসতে বলে শ্রীময়ী কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং অল্প সময়ের মধ্যে পোষাক বদল করে ফিরে এল। ওর মুখোমুখি বসে সহাস্যে বলল, এবারে বলুন কেন আপনি এভাবে আমাকে বিরক্ত করছেন? কি চান আমার কাছে?

শ্যামল জবাব দেয় না। যে কথা কিছুদিন ধরে তার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে তা প্রকাশ করা খুবই কি সহজ?

শ্রীময়ী বলে, বোবা হয়ে গেলেন যে? থাকেন কোথায় আপনি।

কাছেই।

যদি নাম জানতে চাই?

শ্যামল।

করেন কি আপনি?

বলবার মত কিছু নয়।

আশ্চর্য! আমাকে জানেন?

নাম শুনেছি।

শুধুই নাম শুনেছেন। বদনামের কথা শোনেন নি বুঝি? শ্রীময়ী খিল-খিল করে হেসে উঠল। বাজারে আমার খুব বদনাম। আপনার বুঝি ও ভয় নেই।

না—

খুব সাহস ত আপনার। আমাদের মত অভিনেত্রীর বদনামের ভয় আছে অন্য আপনার নেই?

শ্যামল চুপ করে থাকে।

শ্রীময়ী বলে, একটু চা খাবেন? করে নিয়ে আসব?

আপনি কেন...

চাকর-বাকরদের ছুটি দিয়েছি। এ সময় আজ আমার ফিরবার কথা নয়।

তা হলে থাক। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

কলকলিয়ে হেসে উঠে শ্রীময়ী বলল, রাগ না বিরাগ মন্মথ ঠাকুরের?

আমার নাম শ্যামল।

ও একই কথা। শ্যাম আর শ্যামল। সর্বাঙ্গে একটা হিল্লোল তুলে পাশের ঘরে চলে গেল শ্রীময়ী—কিন্তু পরমুহূর্তে ফিরে এসে আবার বলে, চায়ের সঙ্গে কি খাবেন? পেস্ট্রি না ডিমভাজা?

আপনি কি ঠাট্টা ক'রছেন?

করাই উচিত ছিল এবং আর একটু স্পষ্টভাবে। আপনাকে যতটা বোকা ভেবেছি ততটা ঠিক নয়। সত্যিই ঠাট্টা ক'রছিলাম। যাচিয়ে দেখছিলামও বলতে পারেন। তাই বলে সত্যি সত্যি চলে যাবেন না যেন। আমি এলাম বলে।

এক পা এগিয়ে দু পা পিছিয়ে এল শ্রীময়ী। বলল, আচ্ছা শ্যামল বাবু ...

বলুন।

নিজের চেহারা সম্বন্ধে আপনি খুব সচেতন তাই না।

আমি চলে যাচ্ছি।

আহাহা রাগ করেন কেন। নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন থাকাটা কিছু অন্যায় নয়। বলতে কি আমার আবার লোভ হয়। আপনার কি নেই...আবার খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠে শ্রীময়ী।

শ্যামল মাথা নীচু করে। শ্রীময়ী যে দামিনী নয় কথাটা আর একবার মনে মনে সে স্বীকার করল।

শ্রীময়ী চলে গেল। কিন্তু এর পরেও এখানে থাকা উচিত হবে না বলেই শ্যামলের মনে হল। যে প্রশ্নটা তার সুস্থ চিন্তাকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছে তার জবাব সে হয়ত খুঁজে পেয়েছে।......

চলে যাবার জন্যই পা বাড়িয়েছিল শ্যামল চমকে ফিরে দাঁড়াল একটা আর্ত চীৎকারে। আগুন......

ছুটে গেল পাশের ঘরে। ক্ষণপূর্বে ঐ ঘরে শ্রীময়ী প্রবেশ করেছে। অসাবধানে কাজ করতে গিয়ে আগুন কাপড়ে লেগেছে। টান মেরে কাপড় খুলে ফেলল শ্যামল। ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেলল ওর পেটি-কোট আর ব্লাউস।

আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেলেও লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পেল না শ্রীময়ী। যদিও একবারের বেশী দুবার চোখ তুলে তাকাতে পারেনি শ্যামল। শ্রীময়ী হুঁশ হ'তেই ছুটে গিয়ে বিছানার চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত ক'রেছে। ওর দুখানি পাতলা ঠোঁট তখনও থরথর করে কাঁপছে। চোখে মুখে লেগে র'য়েছে রাজ্যের ভয়।

শ্যামল নত মুখে চলে যাচ্ছিল। শ্রীময়ী কাঁপা কাঁপা নত গলায় বলল, চলে যাবেন না শ্যামলবাবু—

শ্যামলের দৃষ্টি পথে দামিনীর নগ্ন দেহটা আর একবার ভেসে উঠল। কয়েক হাত দূরে শ্রীময়ীও......একবার হা হা ক'রে হেসে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর ছেড়ে দ্রুত প্রস্থান ক'রল।

একেবারে বাড়ী থেকেই শ্যামল চলে যেতে পারে তার আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রে এ কথা ভাবতেই পারেনি শ্রীময়ী। তাই নতুন বেশে নতুন মন নিয়ে বাইরের ঘরে এসে সে চমকে উঠল। ঘর ফাঁকা।

অভিনেত্রী শ্রীময়ীর দু চোখে অপমান আর হতাশার আগুন জ্বলসে উঠল। কিন্তু নারী শ্রীময়ীর চোখের কোণ বেয়ে নেমে এল জলের ধারা।......

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ৮ থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর নির্মল দত্তের একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল। এখানে দক্ষিণের দুটি ঘর জুড়ে তিনখানির অধিক তৈলচিত্র তিনি প্রদর্শন করেছেন।

নির্মল দত্তের কাজ এবারে তাঁর গতবারের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর চাইতে কিছুটা পরিণত বলে মনে হল। অ্যাবস্ট্র্যাকশনের দিকে ঝোঁক বিশেষ সুস্পষ্ট নয়। ফিগারেটিভ কাজের সংখ্যাই বেশী, তবে বিশেষ একটা স্টাইলের ছাপ খুব যে সুস্পষ্ট তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। রঙের প্রয়োগ তাঁর অনেকটা সুসমঞ্জস। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি বিভিন্ন মুডের নিসর্গ দৃশ্য, আদিবাসী রমণী, ষাঁড়, বরাহ, গ্রামজীবনের চিত্র, ফুলের স্টাডি, চাষী ইত্যাদি অবলম্বন করে কাজ করেছেন। ফিগারগুলির মধ্যে স্টাইলাইজড ভাবটাই বেশী। কম্পোজিশন সব ক্ষেত্রে খুব সুচিন্তিত না হলেও কয়েকটি সুসংবদ্ধ কাজের নমুনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'সাঁওতাল সিস্টারস', 'মনসুন ইন বেঙ্গল", "দি বুল" প্রভৃতি কাজগুলির বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। "রো আইডিয়াল" ছবির লালের বৈচিত্র্যে ফিগারেটিভ কাজের মধ্যে একটু ভিন্নতা আনবার চেষ্টা আছে। "টিবেটান সেরিমনিয়াল ডান্স' ছবিতে তেমনি হলুদ আর সবুজের প্রাধান্য এবং কিছুটা গতিময়তার ছাপ মন্দ লাগে না। 'গেজিং বাই মুনলাইট' ছবিটিও একটা মিষ্টি কাজ হিসেবে মন্দ হয়নি। তবে সারা প্রদর্শনীর ছবির মান সবক্ষেত্রে আশানুরূপ হয়নি। নির্বাচনের দিকে আরেকটু তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখলে ভাল হত বলে মনে হয়।

●

'শুদ্ধসত্ত্ব' বলে একটি তরুণ শিল্প ও সাহিত্যগোষ্ঠী কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ১০ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটি চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করলেন। এ'দের উদ্দেশ্য বিক্রীত অর্থ বন্যা তহবিলে দান করা। এই উদ্দেশ্যে এ'রা ছবির দামও খুব কম করে রেখেছেন। কিছুকাল আগে এ'রা সাহিত্যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে দলবদ্ধভাবে একটা প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করেন। বর্তমানে এ'দের শিল্পকলা বিভাগ শিল্প ও শিল্পীদের উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন। আশা করি এ'দের প্রচেষ্টা সফল হবে।

বর্তমান প্রদর্শনীতে শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই প্রধানত অংশগ্রহণ করেছেন। তবে নামকরা শিল্পীদের মধ্যে ইন্দু রক্ষিত, সুনীল পাল, গোপাল ঘোষ, অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী, গণেশ হালুই প্রভৃতি শিল্পীরাও তাঁদের শিল্পকর্ম বন্যা তহবিলে সাহায্যের জন্য দান করেছেন। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে জল রঙ, প্যাস্টেল প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে আঁকা কতকগুলি সুদৃশ্য নিসর্গ চিত্র দেখা গেল। কাঞ্চন দাশগুপ্ত বিনোদ দাস, স্বাধীন দত্ত, সঞ্জয় মুখার্জি, কনক মুখার্জি, সুশোভন নন্দী, জ্যোতিবিন্দু চৌধুরী, কালিদাস কর্মকার এবং আরো কয়েকজন শিল্পীর শহর, শহরতলী বা পার্বত্য দৃশ্যাবলী উল্লেখযোগ্য। বিমান দাস, নিরঞ্জন প্রধান, দিলীপ সাহা প্রভৃতি কয়েকজনের আধুনিক রীতির ভাস্কর্যকর্ম দর্শনীয় হয়েছিল।

●

বন্দনা দাসগুপ্ত শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। বাটিক ও ফেব্রিক পেন্টিং-এর কাজে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। বছরখানেক হল তাঁর এক শিল্পী-বন্ধু নীতা মুখার্জির সঙ্গে বাটিক ও ফেব্রিক পেন্টিং-এর কাজ চালান ও শেখানোর জন্যে ইন্ডো ইন্ডাস্ট্রিজ নাম দিয়ে ছোট একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এখানে অনেকগুলি মেয়ে কাজ শিখছে শিখছে উপার্জন করবার সুযোগ পাচ্ছে। গত ১৭ থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে শ্রীমতী দাসগুপ্তের করা প্রায় শ'খানেক ফেব্রিক পেন্টিং-এর সুন্দর নমুনার নিদর্শন প্রদর্শিত হয়ে গেল। বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের ওপর আধুনিক ও প্রথাগত নকশার প্রয়োগে অনেকগুলি সুদৃশ্য শাড়ি তৈরী করা হয়েছে। সুরুচিসম্মত নকশা ও সুসংহত রঙ শাড়িগুলির প্রধান আকর্ষণ হয়েছিল।

শিল্পী : নির্মল দত্ত

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আর্টিস্ট্রী হাউসের তরুণ শিল্পী তপন ঘোষের দশখানি পেন্টিং ও ...টিখানি ড্রইং-এর একটি ছোট প্রদর্শনী হয়ে গেল। শিল্পীর দশটি কম্পোজিশন ...ধ্যে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ধরনের কোমল বর্ণের ...ভিবৃহৎ কাজ। বিষয়বস্তু হিসেবে মুরগী ...দের আর ঘোড়ার মর্মের ওপর ... ...গার করেছেন। কোথাও কোথাও একটু ...টেক্স হয়ে পড়ার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কম্পোজিশনের ...ধুনি অনেক সুচিন্তিত। ক্যানভাসে ...কটা নাতিউজ্জ্বল আলোর খেলাও দু-...কটি কাজে দেখা গেল। ১, ৫, ৮, ৯, ১০ ...ভৃতি কাজগুলি উল্লেখযোগ্য। রঙীন ...রিংগুলি ছোট কিন্তু উজ্জ্বল, বিশেষ করে ১ ও ১৩ নম্বরের ড্রয়িং দুটি চোখে ...গার মত।

●

১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাকাডেমি অব ...ইন আর্টসে দিলীপ মুখার্জির ত্রিশ-...নির ওপর ড্রয়িং ও পেন্টিং-এর সপ্তাহ-...পী প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীমুখার্জি ...ভিন্ন মাধ্যমে নানা ধরনের ফর্ম নিয়ে ...রীক্ষা করেছেন। রিপ্রেজেন্টেশন থেকে ...বস্ট্র্যাকশন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ...জের মধ্যে তাঁর রঙের দিকে ঝোঁকটাই ...শী চোখে পড়ল। বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে ...র আত্মপ্রকাশ প্রচেষ্টায় প্যাঁচার কয়েকটি ...ব লক্ষ্য করবার মত। একটি ঘোড়ার ...রং বেশ জোরাল কাজ। আবার অতিরিক্ত ...দে রঙের প্রাধান্যে দু' একটি ছবি ...ছুটা দুর্বল মনে হল। প্রতিকৃতির মধ্যে ...আত্মপ্রতিকৃতি এবং একখানি প্যাস্টেলে ...কা মুখমণ্ডল সুদৃশ্য হয়েছে। স্টাডি-...লি আরো কিছু উন্নতির অপেক্ষা রাখে। ...বসার্ড সাইন ছবির কম্পোজিশন ও ... উল্লেখযোগ্য।

●

২০ থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর তরুণ ...শিল্পী মুজফ্‌ফর আলির ৩৫ খানি ...ল রং জল রং ও ক্রেয়নের কাজের ...প্রদর্শনী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের ...ঘর হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শিল্পী ...ন প্রথাগত শিল্পশিক্ষা লাভ করেন নি। ...বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়ন অধ্যয়ন ...র বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পকে মেলাবার ...টা করেছেন বলে ক্যাটালগে দাবী করা ...য়েছে। তাঁর ছবিতে অবশ্য পরিপূর্ণ নন-...জেক্টিভ কাজের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। ...নে উৎসুক দর্শক নিজেকে উৎসাহিত ...র এধরনের মিল কল্পনা করতে পারেন। ...ব মোটামুটি তাঁর কাজে চতুষ্কোণ ...লাইন ও বাদামী রঙের প্রাধান্য লক্ষ্য ...া গেল। একে যেমন মাটির সঙ্গে একাত্ম-...বের নিদর্শন হিসেবে ধরা যেতে পারে ...মন চকোলেটের সঙ্গে একাত্মবোধ ...সেবে ধরলেও কারো আপত্তি করার ...রণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না। ...ঝ মাঝে নীল, কমলা, হলুদের প্রয়োগে ...নকটা বৈচিত্র্য আনবার প্রচেষ্টা আছে।

দু তিনটি ক্যানভাস জোড়া দিয়ে চওড়া ছোটখাট পর্দার মত ডিজাইন সৃষ্টির দু একটি প্রচেষ্টা ভাল লাগল। যেমন ২১ নম্বরের 'ইউনিভার্স' ছবির কথা বলা যায়। কম্পোজিশনগুলি ছিমছাম পরিচ্ছন্ন এবং বেশ একটু কমার্শিয়াল ঘেঁষা চোস্ত কাজ। শিল্পীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

●

অ্যাকাডেমির গ্রীষ্মের মধ্যকালীন প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ২১ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর অ্যাকাডেমির গ্রীষ্মের মধ্যকালীন শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

এবারকার প্রদর্শনীতে চিত্র ও ভাস্কর্য মিলিয়ে একশর ওপর দ্রষ্টব্য বস্তু রাখা হয়েছিল। তিনখানি হল জুড়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং ছবি টাঙানোর দিকে কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছবির নির্বাচনের দিকে আরো একটু নজর দেওয়া যেতে পারত বলে মনে হয়। গ্রীষ্মের মধ্যকালীন চিত্রপ্রদর্শনী যদি এতটা পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে তবে ছবির নির্বাচনের জন্যে আরো একটু সময় দেওয়া যেতে পারত না কি? ভাল ছবির সঙ্গে মন্দ ছবির অতিমাত্রায় মিশ্রণ হওয়ায় সমগ্র প্রদর্শনীর সাধারণ মান ততখানি উন্নত রাখতে পারা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, শিল্পীদের অনেকেই নতুন ছবি দিতে পারেন নি। আগের প্রদর্শনীগুলিতে বিভিন্ন শিল্পীদের যেসব ছবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে তারই কিছু কিছু এখানে টাঙানো হয়েছে। কাজেই নতুনত্বের আস্বাদ খুব বেশী পাওয়া গেল না।

এর আরো একটা কারণ থাকতে পারে। বেশ কিছুকাল যাবত কলকাতায় ছবি বিক্রীর বাজারে বিশেষ মন্দা পড়েছে। দরিদ্র শিল্পীদের পক্ষে ছবির বিক্রী কিছুটা না হলে নতুন কাজে হাত দেওয়ার উৎসাহ কমে যাওয়া অসম্ভব নয়। তার পর কোন শিল্পীরই কিছু একটা বিরাট ঘরবাড়ি নেই যে সেখানে বছরের পর বছর ছবি জমিয়ে রাখা সম্ভব। নিছক স্থানাভাবেই অনেকে নতুন ছবি আঁকতে পারেন না। কাজেই পুরোন ছবিগুলি বিক্রী করতে পারলে নানাদিক দিয়েই তাঁদের সুবিধা হয়। এবং এই ধরনের প্রদর্শনীতে বিক্রয়ের সুযোগ পেলে তাঁরা কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তার সম্ভাবনা যে খুব উজ্জ্বল তা হলফ করে বলা যায় না।

এবারের প্রদর্শনীতে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল, যে পরিপূর্ণ নন-রিপ্রেজেন্টেশনাল কাজ খুবই কম। তবে যে কটি আছে তার মধ্যে একমাত্র ধীরাজ চৌধুরী ও মহিম রুদ্রের কাজগুলি উল্লেখযোগ্য। ধীরাজ চৌধুরীর ছবি দুটি তাঁর ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত একক প্রদর্শনীতে দেখা গেছে। এর মধ্যে 'মুরাল ইন রেড' ছবির আঁটসাঁট কম্পোজিশন এবং লালের ব্যবহার সুদৃশ্য। অন্য ছবিটিও মন্দ নয়। মহিম রুদ্রের ছবিতে এবারে তাঁর আগেকার কতকটা জ্যামিতিক ঘেঁষা আঁটসাট কাজের বদলে কতকটা ঢিলেঢালা স্বচ্ছন্দ তুলি চালান ও রঙের মাধুর্য ও উজ্জ্বল্যের দিকে অনেকটা সজাগ দৃষ্টি দেখা গেল। পেন্টিং ১নং ও পেন্টিং নং ২ এর একটিতে নীল ও অন্যটিতে কমলার প্রাধান্য দিয়ে দুখানি একান্ত সুদর্শন ছবি তৈরীর চেষ্টা তিনি করেছেন। দুটিই তাঁর নতুন ধরনের কাজ। গণেশ হালোই-এর 'সিল্কিন' ও 'ভিন্‌ডাকানি' একান্তভাবে রেখাপ্রধান অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কাজ। প্রথমটিতে কোথায় যেন কালিঘাটের দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাযুজ্য আছে। কিন্তু ছবি দুটিতে কেমন যেন একটা বাঁধুনির অভাব রয়েছে বলে মনে হল। সমর ভৌমিকের কম্পো-জিশনের মধ্যে ভারতীয় মধ্যযুগের পুঁথি-চিত্রের অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। তবে অনুকৃতি নয়। গেরিমাটি ও হলুদ রঙে ডিজাইনটি বেশ সুদৃশ্য হয়েছে। অমরেন্দ্র-লাল চৌধুরীও তাঁর গত প্রদর্শনীর থেকে দুখানি ছবি দিয়েছেন—'দি উয়োম্যান' ও 'স্টিল লাইফ'। দ্বিতীয় ছবিটির জোর যেন বেশী, যদিও প্রথমটিতে মিষ্টত্বের আভাস সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাতায়ুন শাকলাডের 'মিরেজ' এবং 'স্টিল লাইফ উইথ ডেড ফ্লাওয়ারস' সুররিয়্যা-লিস্টিক ধাঁচের কাজ। রঙের প্রয়োগ এবং ডিজাইনের সংগঠনে সতর্কতার আভাস। জীবেন্দ্রকুমার সেনের গণ্ডারের চাইতে পাখির কম্পোজিশন অনেকটা ভাল লাগল। রমেন কুণ্ডুর 'ট্রেজারস অব হিমালয়াজ' পূর্বদৃষ্ট হলেও দ্বিতীয়বার দেখা যায়।

জল রঙের কাজের মধ্যে ইন্দ্র দুগারের নিসর্গ দৃশ্য দুটি এবার একটু শুষ্ক মনে হল। কুনাল করের দুখানি নিসর্গ দৃশ্য অনেকখানি অনুভূতির সঙ্গে আঁকা।

প্রবীণদের মধ্যে সুনীলমাধব সেনের 'দুর্গা' এবং 'টটেম' তাঁর ইতিপূর্বে কেমুল্ডে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর ধারায় আঁকা। সুন্দর ডেকরেশন, রঙের ব্যবহার সংযত অথচ সুচিন্তিত। পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক ডিজাইনকে মেলাবার চেষ্টা ভালই লাগে। গোপাল ঘোষ তাঁর চিরাচরিত হাল্কা স্পর্শের নিসর্গ দৃশ্য দিয়েছেন। রথীন মৈত্রের ডুয়েটের শৃগাল দুটি কিসের যেন প্রতীক—পরিতোষ সেনের ড্রয়িংটি ইন্টা-রেস্টিং। এ ছাড়া অরুণ দত্ত, অমরেশ ঘোষ, প্রণব মজুমদার, অজয় মুখার্জি, অমিতাভ দত্ত, নির্মল দত্ত প্রভৃতি কয়েকজনের কাজ উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য বিভাগে সুরেশ ঘোষের 'মিউজিশিয়ান' সুরেন দে'র 'ডেথ অব ইনোসেন্ট' বিপুল সাহার দুটি মাঝারি ধরনের প্রতিকৃতি এবং সমরেশ চৌধুরীর রিক্লাইনিং ফিগারের উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যেও অনেকগুলি পূর্ব প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। তবু পুনর্দর্শনে খারাপ লাগল না। তবে ভাস্কর্য-গুলির প্রদর্শনের ব্যবস্থা খুব সুন্দর হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। ...র গ্যালারির ছাড়া অন্য দুটি ঘরে ভাস্কর্য কেমন যেন একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছে বলে মনে হল। এ বিভাগে কাজের নমুনাও কম।

—চিত্রশিল্পক

অভিযুক্ত কাহিনী

[বিখ্যাত ফরাসী গল্প লেখক। উনিশ শতকের প্রথম দিকে যাঁরা জীবনধর্মী কাহিনী রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন আঁদ্রে থোরিয়ে তাঁদের অন্যতম।]

অঁাদ্রে থোরিয়ে

যাত্রা-সহচরী

ট্রেনটা যেই স্টেশন পার হয়ে গেল এসপ্রিট ক্যাপডেনেভ লক্ষ্য করল যাত্রীরা প্রায় সবাই নেমে গেছে, আর তার ঠিক উলটো দিকে বসে আছে এক অপরূপা তরুণী। এসপ্রিট শিল্পী, তার চোখে মেয়েটিকে ভালো লাগল।

সে ভোরের দিকে পেত্তু স্টেশনে ট্রেনে উঠেছিল। একটু জায়গা করে নিয়ে বেশ এক ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছে। এখন সে ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ দুটো মুছে নেয়। বাইরে রোদ্দুর যেন হাসছে, শিল্পী সেদিকে তাকায়।

ওধারের ঐ তরুণীটিও বেশ ঘুমিয়েছে, তার চোখ দুটি ঘুম ঘুম, সেই ঘুমের আমেজ এখনও কাটেনি।

কালো লেসের পাড়ওলা একটি আবরণ ওর গায়ে এতক্ষণ জড়ানো ছিল। এইবার সেটা খুলে ফেলল—মাথার অগোছালো সোনালী রঙের চুলগুলি তাড়াতাড়ি খোঁপা করে বেঁধে হাত-আয়নায় মুখখানি দেখে নিজের সাজ-সজ্জা ভব্যযুক্ত করে নেয়।

মেয়েটি ভরা যুবতী। বেশ পরিপুষ্ট দেহ, সারা দেহে যৌবনের মাধুরী যেন ছাপিয়ে পড়ছে। ভারী সুন্দর। কটা চোখ দুটি টল-টল করছে, যেন মিলন শতদল।

গালের একপাশে একটি কালো তিল। লাল গালের ওপর কালো তিল, কি সুন্দর করে তুলেছে মেয়েটির মুখখানি। লোভীর দৃষ্টি নিয়ে এসপ্রিট যেন গিলছিল মেয়েটির ক্ষীণ কটি, উদ্ধত ও উজ্জ্বল দুটি বুক, আর দস্তানায় জড়ানো দুটি পেলব হাত। কি অপরূপ সৃষ্টি বিধাতার। যেখানে যেটি মানায় তাই অকৃপণ হাতে উজাড় করে দান করেছেন।

ছোট্ট ছেলে যেমন চুরি করে সব দেখে এসপ্রিটও তেমনই ভঙ্গীতে মেয়েটির সব কিছু লক্ষ্য করছিল।

মেয়েটি তার ব্যাগ থেকে খুঁজে পেতে একটা প্যাকেট বার করল—তার ভেতর আছে এক টুকরো রুটি। আরো কিছু যেন থাকার কথা। মেয়েটি সমস্ত কিছু ওলট-পালোট করে খুঁজতে থাকে, কিন্তু সেই বস্তুর দেখা নেই। একটা গভীর হতাশার ভাব মেয়েটির ঠোঁটে ফুটে উঠল।

এসপ্রিট এই দেখে একটু ব্যথা পেল মনে। মেয়েটির প্রতি মমতায় তার বুক ভরে উঠেছিল, তাই সে তাড়াতাড়ি পাতলা মোড়া এক খণ্ড চকোলেট বার করে দীপ্ত ভঙ্গীতে মেয়েটির কাছে নিয়ে গিয়ে গদ্‌গদ্‌ ভঙ্গীতে বলে, মাদাম-মামজেল—

মেয়েটি কথার জের টেনে বলে, হাঁ, মামজেল।

শিল্পী এসপ্রিট এই উত্তরে যেন অসহ্য পুলকে ভেঙে পড়ে। তার অধরপ্রান্তে একটা খুশির হাসি ফুটে ওঠে। সদ্য গজানো গোঁফ যেন তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে।

এসপ্রিট বলে, মামজেল, কিছু একটা ভুলে এসেছেন ত'? তার কথা ভুলে গিয়ে এই সামান্য চকোলেটটি গ্রহণ করুন।

মেয়েটি ইতস্তত করে, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রহণ করল অপরিচিতের দান। নিজের রুটিখানি ভাগাভাগি করে দুজনে খেল।

ট্রেন ছুটে চলেছে। কত নদী-প্রান্তর-পর্বত পার হয়ে। রুটি কামড়াতে কামড়াতে দুজনে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য। পাহাড় আর পাহাড়। কোথাও তারা একাত্ম হয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ, আবার মুহূর্তে দূরে বিলীয়মান। ফলের বাগান, শান্ত পল্লী, কোথাও চেরী ফুলের সমারোহ। ফুলে ফুলে চারদিক সাদা, যেন তুষার পড়েছে। মাঝে মাঝে আঁকা-বাঁকা নদী— দুপাশে বড়ো বড়ো ঘাসের শীষ হাওয়ায় দুলছে। দুরন্ত বাতাসে নার্সিসাস ফুল দুলে দুলে নাচে।

কত্রে ভাগাভাগি করে এই সামান্য
াগের মধ্যে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান
যায়। নীরবতার এবং অপরিচয়ের
। কেটে যায়। বেশ খোলা মনে দু'জনে
করতে থাকে।

সপ্রিট নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার
নব-পরিচিতা যাত্রা-সহচরীর কাছে
রিচয় দেয়। সে কি করে, কোথায়
কোথায় যাবে এইসব। থাকে, সী
ল এখন যাচ্ছে গ্রেনোবলে। সেখানে
নীর বাড়িতে কাজ পেয়েছে, বাড়ি-
সকলের ছবি আঁকতে হবে। লোকটির
পয়সা. কিন্তু দেখতে একেবারে অতি
ভারী কদর্য চেহারা। তবে টাকা
কাজের জন্য পয়সা দেবে অনেক।

ই সব কথা বলার সময় শিল্পী এসপ্রিট
খ নেড়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে
ছবি আঁকতে হবে তাদের আকৃতি
। প্রয়াস করে, আর মেয়েটি হেসে
পড়ে। দু'জনের মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ
। গড়ে উঠেছে।

য়েটি প্রশ্ন করে, আপনার বেশ কাজ,
আঁকতে পারেন। যে কোনো ছবি এ'কে
চ পারেন।

-হাঁ মামজেল, কি জানি আপনার
?

-লুসি।

—মামজেল লুসি। গ্রেনোবলে দুটি
দিন যদি একটু থেকে যান তাহলে আপনার
একখানি ছবি এ'কে ফেলি। ভারী খুশি
হব। বলতে কি যাদের ছবি আঁকতে যাচ্ছি
সেই কদর্য কর্মের মাঝে এ হবে এক
আনন্দময় বৈচিত্র্য।

লুসি সলজ্জ ভঙ্গীতে বলে, ভারী
দুঃখ হচ্ছে আমার। আমি কিন্তু ক্রেয়মোতে
নামব, অত দূরে পর্যন্ত যাবার কথা নয়।

লুসি এতক্ষণে নিজের কথা বলে।
আইকম-এ একজন পদস্থ হাকিমসাহেবের
বাড়ি সে গভর্নেস। অতি অল্পবয়সে পিতৃ-
হারা—মা নেই। আত্মীয় বলতে আছেন
খুড়ো আর খুড়ি। তাঁরা ক্রেয়মোতে থাকেন।
একজন বেশ পয়সাওলা ব্যবসায়ীর সঙ্গে
লুসির বিয়ের কথাবার্তা স্থির। এই ধনী
ব্যক্তিটির প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন, কোনো
সন্তানাদি নেই। নাম লেচনডেল। এইবার
ছুটিতে কাকার কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে
পরিচয় হবে। অবশ্য ইতিমধ্যে তাঁর একটি
ছবি লুসি দেখেছে।

লুসি বেশ সরলা, তাই সে কোনো কিছু
গোপন না রেখে অকপটে বলে—আমার
চোখে মানুষটার একটু বয়স হয়েছে বলে
মনে হল, আর চেহারা-টেহারাও তেমন
সুবিধের নয়। কিন্তু আর কতদিন দাসী-
গিরি করব। একদম নিঃসঙ্গ জীবন, সঙ্গ-
পরশহারা হয়ে আছি। এতটুকু সঙ্গপরশ-
সুধার জন্য মনটা কাঙাল হয়ে থাকে।
কোথাও স্নেহ নেই, মায়া নেই, করুণা নেই।
তাই ভেবেছি—মানুষটাকে দেখে যদি খুব
খারাপ না লাগে, তাহলে কাটিয়ে দেব।

কথাগুলি বলে গেল সে নিদারুণ
দুঃখের সঙ্গে। কথা যখন শেষ হল তখন
তার বুক থেকে একটা হাহাকারা দীর্ঘশ্বাস
উঠল। তার পরিপক্ক ওষ্ঠাধর একটু খোলা
রইল আর তার ভিতর দিয়ে সুগঠিত শুভ্র
দাঁতগুলি দেখা গেল।

শিল্পী এসপ্রিট ওর মুখের দিকে চেয়ে
প্রাণভরে দেখছে— তার সেই নীল চোখে
যেন প্রজ্জ্বলিত বহ্নি; প্রেম-বুভুক্ষু
তরুণীর আকুল- অন্তরের সুগভীর
কামনায় চঞ্চল। তার চোখের কি
মায়ামদির ভঙ্গী। একটি চুমার কাঙাল ওই
দুটি ঠোঁট। নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখে এই
তরুণী জর্জরিত। যৌবনজ্বালায় তার সারা
অঙ্গে আগুন লেগেছে। কিন্তু সেই তুষানল
থেকে নিষ্কৃতি নেই।

এসপ্রিট কামনায় আকুল হয়ে উঠেছে।
এই পরিপূর্ণ যৌবনা তরুণীকে তার দৃঢ়
বাহুর পেষণে নিষ্পেষিত করার জন্য সে
চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মনে হল যে অপরি-
চিত বর্বর, মধ্যবয়সী যে প্রৌঢ় এই তরুণীর
যৌবন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে চলেছে, তার
কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে মুদিকে।

সে সহসা বলে ওঠে, বলেন কি! আপনার মত এমন রূপ-যৌবনের অধিকারিণী রমণী শেষ পর্যন্ত একজন বুড়ো টাকাওলা কারবারির কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। ছি, ছি, একাজ করবেন না, এ একেবারে আত্মহত্যার সামিল। আমি আপনাকে বলছি, আমার কথা শুনুন।

এই অনুনয়কে আরো দৃঢ়তর করার জন্য আবেগভরে শিল্পী এর্সাপ্রট লুসির হাত দুটি চেপে ধরল। লুসি প্রথম প্রথম আপত্তি করেনি। কিন্তু কি বিপদ ওযে হাতটা কিছুতেই ছাড়ছে না। আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ল সে। অথচ আঙুলগুলি সেই প্রবল চাপের বাঁধন থেকে মুক্ত করতে পারে না।

ট্রেণ চলেছে একটা খাড়াই-এর উপর দিয়ে। চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। একটু পরেই আবার সমতল ভূমি। শোনা যাবে গোচারণের ঘন্টার টুং-টাং আর দেখা যাবে সোনাঝরা আলো। দুরন্ত বাতাসে ভেসে এল একগুচ্ছ চেরী ফুল—এই ফুল নিয়ে বসন্তের মদির উত্তেজনা। একটি টানেলের মধ্যে ট্রেনটা ডুবে গেল।

নিবিড় অন্ধকারে দুজন ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে।

এর্সাপ্রট একটা চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেছে হাতের মুঠোয়।

তরুণী লুসি নিজের অবস্থাটা অনুমান করে কুঁকড়ে যায়। সে আর আত্মরক্ষা করতে পারে না। এর্সাপ্রট গভীর আবেগে দুটি হাত দিয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে চেপে ধরে।

গাড়িটা আবার বেরিয়ে এল অন্ধকারের রাজ্য থেকে আলোর বন্যায়।

সলজ্জ ভঙ্গীতে লুসি বলে, কেউ যদি আমাদের দেখতে পায়?

এর্সাপ্রট বলে, কে আবার দেখবে? আকাশের গায়ে ভাসছে পাখির দল, ওরা দেখবে? এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। আমি তোমাকে প্রাণভরে ভালোবাসতে চাই, সেখানে কোনো কিছুর বাধা মানবো না।

ট্রেনটা আবার একটা টানেলে প্রবেশ করল।

লুসি অনুভব করে তার সারা দেহ চুম্বনের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। একটা অসহ্য পুলকে অন্তর ভরে উঠেছে।

লুসির অঙ্গের আবরণ খসে গেছে, সমগ্র দেহখানি তুলে ধরেছে নৈবেদ্যের মত এর্সাপ্রটের হাতে। তার প্রবল পেষণে সে নিষ্পেষিত। সারা দেহে যেন কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, বাধা দেওয়ার শক্তি নেই লুসির। একটা নির্মম দস্যুর মত এর্সাপ্রট লুণ্ঠন করছে লুসির দেহসম্ভার।

অলস-বিবশ মাদকতায় অবশ হয়ে পড়েছে লুসি, এর্সাপ্রটের কবল থেকে আপনাকে মুক্ত করার এতটুকু শক্তি নেই আর যেন।

কামনার আবেগ স্তিমিত হতে নিঃশব্দে পড়ে আছে লুসি। তার মাথাটি একপাশে গড়িয়ে পড়েছে—সে যেন স্বপ্ন দেখছে। যেন একটা মদির স্বপ্নের ঘোরে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন।

অবশেষে টানেল পার হল। অন্ধকার কাটল। আলোয় উদ্ভাসিত হল চারদিক।

একটি ছোট স্টেশনে ট্রেনটা এসে থামল,—চারদিকে কলরব।

লুসি সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এইত, ক্রেরমণ্ডের কাছাকাছি এসে গেছি। এইবার আমাকে ছেড়ে দিন। আপনাকে অনুনয় করছি, এটা স্টেশন, এখন আমাকে ছাড়ুন।

কোনো রকমে আপনাকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়িয়ে পোশাক ঠিক করে নেয় লুসি, মাথার চুলগুলিকে আবার খোঁপায় বাঁধে।

ট্রেন ছাড়তেই এর্সাপ্রট আবার ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, ক্রেরমণ্ডে গিয়ে কি হবে?

এর্সাপ্রটের বন্ধন যেন নাগপাশের মত ঘিরেছে লুসিকে।

কামোন্মাদকণ্ঠে এর্সাপ্রট বলে, তোমাকে আমি ছাড়বো না, ছেড়ে দেব না। তোমাকে আমার কাছে রেখে দেব।

লুসি বলে ওঠে, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। এইবলে সে এর্সাপ্রটের বাহুর বাঁধন থেকে আপনাকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করে।

ট্রেন ছুটে চলেছে। অরণ্যভূমির মধ্য দিয়ে প্রবল গতিতে। লুসি অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত আপনাকে একটু মুক্ত করতে পারল এর্সাপ্রটের কবল থেকে।

সুন্দর একটি রৌদ্রস্নাত গ্রাম। ক্রমে একটি স্টেশনের বহিরেখা দেখা গেল। তারপর স্টেশন।

লুসি চেঁচিয়ে ওঠে, খুড়ো আর খুড়িমা দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গের লোকটি নিশ্চয়ই লেচনডেল।

এর্সাপ্রট সোজা উঠে গিয়ে দরজাটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে লুসিকে বলে, এইভাবে এখানে দাঁড়ানোটা ঐ বুড়ো ভদ্রলোকের উচিত হয়নি। কি বেহায়া।

এরপর এর্সাপ্রট জানলাটা বন্ধ করে দেয় সজোরে। সে যেন ক্ষেপে উঠেছে। একটা দৃঢ়তার ভাব তার মুখচোখে।

এর্সাপ্রট আত্মগতভাবে বলে ওঠে, না, কিছুতেই না, ঐ বুড়ো বাঁদরটার হাতে তোমাকে আমি সঁপে দেব না। লুসি আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমরা দুজনে সঙ্গহারা হলে চলবে না।

ট্রেনটা ধীরে ধীরে থেমে গেল।

গার্ডসাহেব চীৎকার করে উঠল, স্টেশন—স্টেশন—!

লুসি ভেবেছে, শিল্পী হয়ত রহস্য করছে। ব্যাগ এবং ছাতা গুছিয়ে নিয়ে সে নেমে যাওয়ার উদ্যোগ করে।

লুসি করুণ গলায় বলে, সত্যি বলছি, ছেড়ে দিন। ছাড়ুন আমাকে, এটা রসিকতার সময় নয়।

এর্সাপ্রট লুসিকে বুকের মধ্যে চে[...] ধরে চুমায় ভরিয়ে দেয়, কোনো কথা বল[...] দেয় না। কোনো বাধাই সে মানে না।

বাইরে খুড়ো-খুড়ি ডাকছেন, লুসি[...] লুসি। কিন্তু সে সবই নিষ্ফল।

এর্সাপ্রট জানলার দিকে পিঠ ক[...] লুসিকে আড়াল করে রেখেছে—আর [...] ঠোঁট দুটি রেখেছে নিজের ঠোঁটের ভেত[...] লুসি অতি কষ্টে সজলকণ্ঠে বলে, ও[...] আমাকে খুঁজছে, দোহাই আপনার ছে[...] দিন।

কে কার কথা শোনে। এর্সাপ্রট ত[...] কাণ্ডজ্ঞানহারা।

লুসি বলে, আপনার কাছে মিন[...] করছি, ছেড়ে দিন।

গাড়ি আর কতক্ষণ থামবে। বাঁ[...] বাজল। ট্রেন চলতে সুরু করে। ছোট্ট স্টেশ[...] মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

নিষ্ফল সংগ্রামে পরাহত লুসি ত[...] বসবার জায়গায় হতাশ হয়ে বসে পড়ে।

এর্সাপ্রট আবার এগিয়ে এল ওকে চে[...] ধরার জন্য। এইবার কিন্তু লুসির বা[...] প্রচণ্ডতর হল, সে ওকে ঠেলে ফেলে দিল[...]

তারপর একপাশে জড়ো-সড়ো হয়ে ব[...] পড়ল। এরপর লুসি কান্নায় ভেঙে পড়ল[...]

লুসি কাঁদতে কাঁদতে বলে, সতি[...] আপনি বড়ো নিষ্ঠুর। একি করলেন বলু[...] তো! আপনাকে দেখাও পাপ।

এর্সাপ্রট লুসির মন ভোলানোর চে[...] করে। কিন্তু লুসি তার কথায় কান দেয় না[...] তার মুখখানি ভার-ভার, সে ভীষণ চটে[...] বেশ বুঝতে পারা যায়। তার মুখে কথ[...] নেই, সেই প্রসন্ন হাসি নেই। সে বসে আ[...] একেবারে পাষাণমূর্তির মতো।

ভিজিল স্টেশনে এসে গাড়িটা থামল[...] দোর খুলে হুড়মুড় করে অনেক যাত্[...] এসে ভরে গেল কামরাটি। গ্রেনোবলে সবা[...] বেড়াতে যাচ্ছে। এর্সাপ্রট চুপ করে ব[...] আছে। তার মুখটা বিষণ্ণ।

লুসি তার বসবার জায়গা থেকে এর্স[...] প্রটের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দরজা[...] দিকে মুখ করে বসে রইল।

এর্সাপ্রট আকাশ-পাতাল ভাবছে[...] লুসিও ভাবছে অনেক কিছু, তার মেজাজট[...] অনেক নরম এখন। এইভাবে চলে আসা[...] তার ফলটা কি দাঁড়াবে তা ভাবে। তাছাড়া[...] এই ব্যাপারটিতে তারও একটা ভূমিকা[...] আছে। এর্সাপ্রটকে সে তেমন বাধা দেয়নি। কারো মুখে কথা নেই।

গ্রেনোবল স্টেশনে গাড়ি থামতে এর্সাপ্রট[...] নীরবে ওকে হাত ধরে নামিয়ে নেয়, তার[...] মালপত্র নিজে হাতে তুলে নেয়।

লুসির মুখে একটা বিভ্রান্ত ভঙ্গী। [...] এর্সাপ্রটকে দেখে তার মায়া হচ্ছে। তার[...] পিছনে ও চলেছে পোষমানা একটি প্রাণীর[...] মত। স্টেশন থেকে বেরিয়ে শিল্পী ওকে[...] নিয়ে উঠল একটা হোটেলে।

ওদের দুজনকে হোটেলের কর্মচারী এসে একটি ঘরে রেখে দরজাটা বন্ধ করে চলে গেল। একটি ঘরে দুজন আবার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এল।

তারপর লুসি হঠাৎ আর ভেঙে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার কান্নায় বেগে বুকটা কেঁপে উঠছে।

এসপ্রিট এইবার একটু ভয় পেয়েছে। মেয়েটি যে এমন করবে তা সে অনুমান করেনি। লুসির পায়ের কাছে বসে বাছা-বাছা মিষ্টি কথা বলে সে তার মন ভেজাবার চেষ্টা করল। কিন্তু এসপ্রিটের সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হল।

লুসির কান্নার বেগ ক্রমশ প্রবলতর হয়ে ওঠে। সে দু'হাত দিয়ে ঠেলে দেয় এসপ্রিটকে। বলে, এখান থেকে যান আপনি।

তার এই কণ্ঠস্বর যেন কাৎরানির মত শোনায়। সে বলে ওঠে, আপনি যদি মানুষ হন তাহলে আর আমার কাছে আসুবেন না। আমি যেমন ঠিক তেমনই শাস্তি হল আমার। আমার খুড়োরা চিঠি দেবে হাকিমের বাড়ি তারপর ওরা কি মনে করবে। আমার চাকরী যাবে, আমি বেকার হব। অপমানিত হব। এসব আপনার জন্য ঘটল। আপনি আমাকে নষ্ট মেয়ে মনে করে এই কান্ড করলেন। আমি আপনাকে বাধা দিতে পারিনি, তাই আমার এই কলঙ্ক।

আবার সে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদে। থামান যায় না।

এসপ্রিট রীতিমত ঘাবড়ে গেছে এবার। সে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। মেয়েটি ভালো, ও ঠিকই বলছে, আমার আচরণটা ত' ঠিক হয়নি, আমি একটা লম্পটের মত কাজ করেছি। এসপ্রিট মানুষটা অসৎ নয়। অবশ্য তার চরিত্রে সংযম নেই, যা কোনো যুবকেরই প্রায় থাকে না। তবে মেয়েটির এই অনিচ্ছার ওপর কোনো জোর খাটানোও ত' ঠিক নয়। এ যেন একটা অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়া।

এমন পরমা সুন্দরী রমণী আকুল হয়ে কাঁদছে। সত্যি এসপ্রিটের কাজটা ভালো হয় নি। মেয়েটি খারাপ নয়, সরলা ভালো মেয়ে। এমন একটা সুশীলা মেয়েকে নিয়ে এইভাবে টানাটানি করা ঠিক হয়নি।

এতক্ষণে অনুতাপ জাগল এসপ্রিটের মনে। সে মেয়েটির কাছে গিয়ে মোলায়েম-গলায় বলে—

আমাকে মাফ করো। এতটা আকুল হয়ো না। আমি তোমাকে তোমাদের স্টেশনে পৌঁছে দেব। তোমার খুড়ো-খুড়িকে বলবে, ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়ে গ্রেনোবলে চলে গিয়েছিলাম, আবার ফিরতি ট্রেনেই চলে এসেছি। তাহলে আর কোনো হাঙ্গাম হবে না। নিন আপনি চোখে-মুখে জল দিন। পোশাকটা ঠিক করে নিন। আমি একেবারে কান্ডজ্ঞানহীনের মত কাজ করেছি। আমি কিন্তু সত্যি ছোটলোক নই, তোমাকে আমি প্রাণভরে ভালোবাসি—

লুসি কোনো কথা বলেনি। আবার এসপ্রিট তাকে টেনে নিয়ে এল স্টেশনে। একটা ট্রেন ছাড়ছিল। এসপ্রিট তাড়াতাড়ি একটি টিকিট কেটে ওকে গাড়িতে তুলে দেয়। কিছু খাবার-দাবার আর চকোলেট কিনে দিল।

এতক্ষণে লুসি যেন প্রাণ ফিরে পেল। আর ভয় নেই, এখন সে মুক্ত। তার চোখে ফুটে উঠল সেই উজ্জ্বল আলো, তার ঠোঁটে একটু হাসি। এসপ্রিটকে সে ধন্যবাদ জানালো, এসপ্রিট ম্লানমুখে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

ট্রেন ছেড়ে দিল—

এসপ্রিট ধোঁয়ায় সেই অদৃশ্যীভূত মেঘ-ভারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে, হায় রে—এমন একটা মেয়ে কিনা হারাম-জাদা লেচেনড্রেলের অঙ্কশায়িনী হবে। কি বিশ্রী কান্ড। এমন মেয়ে, এমন পরমাসুন্দরী লুসি আর বুড়ো লেচেনড্রেল—
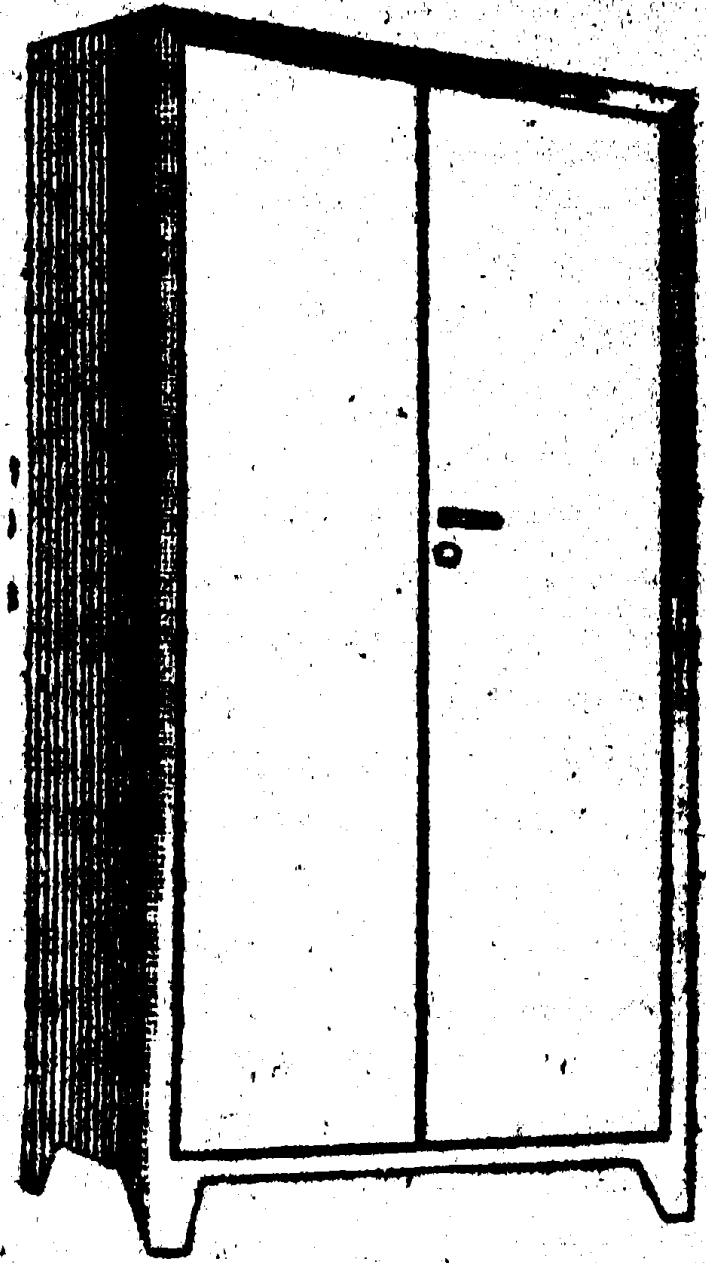
এর নাম অদৃষ্ট!

—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত।

উৎকণ্ঠারোগ

পশুপতি ভট্টাচার্য
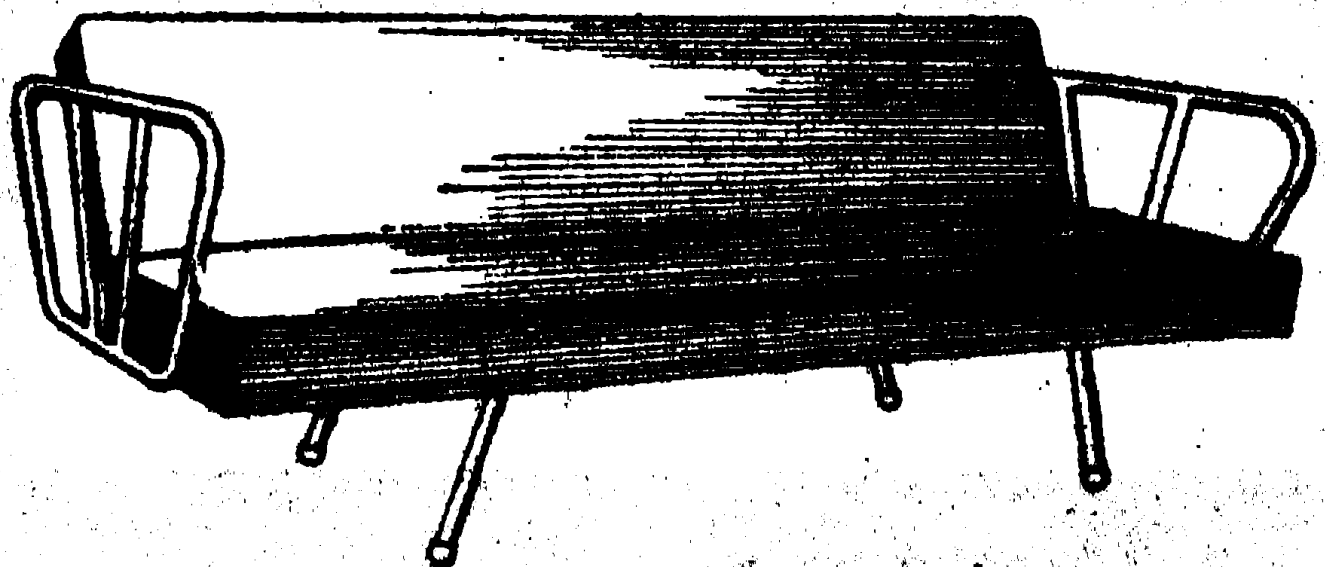
সংবাদপত্রে সম্প্রতি সকলেই পড়ে থাকবে যে, পাকিস্তানে করাচীতে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দারুণ পরীক্ষা-ভীতি উপস্থিত হয়েছে। তারা তাদের আসন্ন পরীক্ষার জন্যে এমনই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে যে, তারই প্রতিকারস্বরূপ অনবরত তারা বিশেষ একটি উদ্বেগ-নিবারক ওষুধ (মেথেড্রিন) কিনে কিনে খাচ্ছে, কারণ, তাদের ধারণা যে, এই ওষুধটি খেলেই মনের ভয় দূর হবে। ফলে এই ওষুধটি করাচীতে এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, দোকানে আর মিলছে না। এই হলো আধুনিক উৎকণ্ঠার এক নমুনা।

উৎকণ্ঠা আর ভয় ঠিক এক জিনিস নয়। দুই-এর মধ্যে তফাৎ আছে। উৎকণ্ঠা হলো আসন্ন ভয়ের পূর্বাভাস প্রতিক্রিয়া। বাল্য-কালে হিতোপদেশে পড়েছি, তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যম্ যাবৎ ভয়মনাগতম্, অর্থাৎ আসন্ন ভয় যখন অনাগত, তখন ভয়কে ভয় করবে, সে-ভয় সাক্ষাৎ উপস্থিত হলে তখন যথা-কর্তব্য করবে। তাকেই বলে উৎকণ্ঠা। সুতরাং উৎকণ্ঠা খারাপ জিনিস নয়, বিপদের সম্ভাবনা থাকলে তখন উৎকণ্ঠা হওয়াই দরকার। এরূপ উৎকণ্ঠা মানে হুঁশিয়ারি।

উৎকণ্ঠা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক জিনিস, এবং জীবনধারণের পক্ষে তার প্রয়োজন আছে; বিশেষত এখনকার যুগে। উৎকণ্ঠা না থাকলে তৎপরতা আসে না, কোনো কাজই ঠিকভাবে করা যায় না। ঠিক সময়ে কর্মস্থলে হাজির হওয়া, ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, কোনোটাই হয়ে ওঠে না। একটু উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ না থাকলেই নিশ্চেষ্টতা আসে, ঔদাসীন্য আসে, সকল কাজে গাফিলতি হতে থাকে, আর কোনো বিপদেই আগের থেকে সতর্ক হওয়া যায় না।

অতএব এমন স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ-জিনিস মাত্রা অতিক্রম করলেই তা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তখন তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন তা হয়ে দাঁড়ায় স্নায়বিক ব্যাধি। আর তা অতিরিক্ত হলে তখন একরূপ মস্তিষ্ক-বিকারেও পরিণত হতে পারে। আমরা এখানে সেইরূপ অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠার কথাই বলছি। আধুনিক যুগের জিনিস।

এখনকার দিনে পৃথিবীতে এইরূপ অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠায় কষ্ট পেতে প্রায়ই অনেক নর-নারীকে দেখা যাচ্ছে, বিশেষত শিক্ষিত ও ভদ্র-সমাজের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এর সূচনা হয়েছিল, এখন ক্রমশই তা আরো বেড়ে চলেছে। হয়তো উপর্যুপরি বিশ্বযুদ্ধ, রাজনৈতিক ওলট-পালট, দৈনিক জীবন সংগ্রামের চাপ এবং নানারূপ আধুনিক জটিল পরিস্থিতিই এর জন্য দায়ী। আর বংশ-গতিও এর জন্য অনেকটা দায়ী। যাদের পিতামাতার আচরণ অতিরিক্ত উৎকণ্ঠাযুক্ত হয়, তাদের সন্তানেরাও উত্তরাধিকার সূত্রে সেই প্রবণতা পেয়ে থাকে। অতএব সমগ্রভাবে বলতে গেলে পরিস্থিতি ও বংশগতি দুই-ই এর জন্য দায়ী।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, উৎকণ্ঠার সূত্রপাত শৈশবকাল থেকেই। শিশু যখন মাকে খোঁজে, কিন্তু মাকে দেখতে পায় না, তখন সে ব্যাকুল হয়ে হাঁকুপাঁকু করতে থাকে। তার থেকেই প্রথম উৎকণ্ঠার সৃষ্টি। তার পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাকে নানারূপ বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়, এবং নানাপ্রকার ধাক্কা খেতে হয়, [illegible] জ্বালা ভুগতে হয়, না[...] [illegible] ও মনঃপীড়া ভোগ ক[...] হয়, নতুন স্নেহ-প্রেমের ব্যাপারে ঠকতে [...] তখন পরবর্তী জীবনে যে অনিশ্চয়[...] বোধ জন্মায় তার থেকেই উৎকণ্ঠার প্রব[...] বাড়তে বাড়তে ক্রমশ তা স্বাভাবিকের ম[...] অতিক্রম করে।

কিন্তু কার পক্ষে তা কতটা ম[...] অতিক্রম ক'রে অস্বাভাবিকের পর্যায়ে গি[...] পড়বে সে কথা বলা কঠিন। তা অনে[...] ব্যক্তিগত মনের জোরের উপর নির্ভর ক[...] যার মনে তেমন জোর আছে সে অতি[...] উৎকণ্ঠাতেও নিজেকে সামলে নেয়, বাহি[...] জীবনের আচরণে কোনোরূপ ব্যতিক্রম হ[...] দেয় না, যদিও মানসিক উদ্বেগে যথেষ্ট ব[...] পাচ্ছে। আর মনের জোর যার বেশি [...] যে দুর্বলমনা, সে একটুতেই বেসামাল হ[...] পড়ে, দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

কার পক্ষে কিসে সবচেয়ে বেশি উৎক[...] ঘটবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। [...] হয়তো রোগের আশংকায় উৎকণ্[...] স্বাস্থ্যের সামান্য কিছু ব্যতিক্রম দেখলে[...] ভাবতে শুরু করে যে, এই বুঝি এ[...] একটা মারাত্মক রোগ এসে পড়বে। [...] হয়তো দারিদ্র্য-ভয়ে উৎকণ্ঠিত, সামা[...] অর্থাভাব ঘটলেই ভাবতে শুরু করে [...] এবার বুঝি সপরিবারে না খেয়ে মর[...] হবে। কেউ হয়তো ভাবে যে চাকরি য[...] অথবা ব্যবসায় ফেল পড়বে। কেউ হয়[...] ভাবে যে নিতান্ত প্রিয়জনেরা তার স[...] বিশ্বাসঘাতকতা করছে। অথবা সকলেই [...] তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার অনিষ্ট চে[...] করছে। অথবা যেন সকলেই তার শ[...] তাকে বাগে পেলেই বিষ খাইয়ে মার[...] এমন কি কারো কারো উৎকণ্ঠা হতে এ[...] অবস্থা দাঁড়ায় যে তারা ঘর ছেড়ে বা[...] রাস্তায় বেরোতে পারে না, পাছে কো[...] দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কেউ কেউ অপরি[...] ব্যক্তির সামনে বেরোয় না, পাছে কিছু অ[...] বাধে। তবে এগুলি অপেক্ষাকৃত বি[...] বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যথা পাবার আশং[...] কঠিন রোগের আশংকা এবং আসন্ন বিপ[...] আশংকা, এইগুলিরই প্রাধান্য দেখা যায়।

বলা বাহুল্য উৎকণ্ঠাপ্রবণ কল্পনাই [...] জিনিসের খোরাক জোগায়। সদা-সন্দি[...] কল্পনা এর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, কো[...] কিছু একটু ছুতো (সূত্র) পেলেই তা[...] ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে আক্রান্ত ব্যক্তি[...] অস্থির ক'রে তোলে, এবং উৎকণ্ঠা[...] উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যেতে থাকে। আ[...] পাছে মনের যুক্তি-বুদ্ধির কাছে ধরা প[...] যেতে হয়, তাই একই ছুতোকে বারে বা[...] কাজে লাগায়, উৎকণ্ঠা জাগিয়ে তো[...] বিভিন্ন রকম ছুতোকে অবলম্বন ক'[...] আক্রান্ত ব্যক্তি তাই বুঝতে পারে না [...] প্ররোচক ছুতোটার কোনোই মূল্য নে[...] আসল উদ্দেশ্য যে কোনো প্রকারে তা[...] উৎকণ্ঠার অভিভূত ক'রে ফেলা। তাই [...] দেখে যে তার ভাগ্যে উৎকণ্ঠার উপযো[...] কারণগুলি যেন লেগেই আছে।
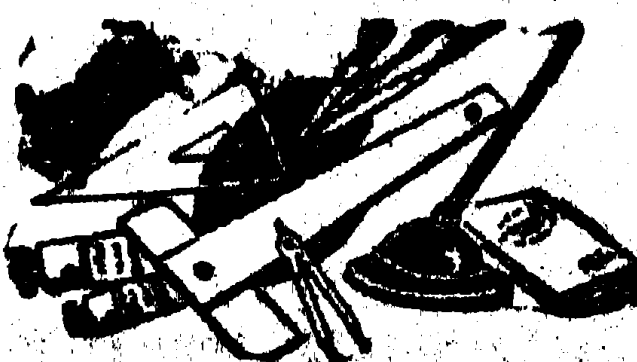
পূর্বেই বলা হয়েছে যে উৎকণ্ঠার মাত্রাভেদ ও স্তরভেদ আছে। যাদের উৎকণ্ঠা অস্বাভাবিক হলেও অনেকটা সংযত, তারা বাইরের লোকের কাছে তা প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু চিকিৎসকের কাছে গিয়ে বলে যে অমুক কারণে তারা উৎকণ্ঠায় কষ্ট পাচ্ছে, শরীর খারাপ হচ্ছে, ভালো করে খেতে পারছে না, ঘুম হচ্ছে না, ইত্যাদি। তারা এর প্রতিকার চায়।

কিন্তু যাদের উৎকণ্ঠা অতিরিক্ত তাদের মুখ-চোখের ভাব দেখলেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। তাদের চোখের দৃষ্টি আতংকিত অথবা আবিল ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, মুখ-ভাব সন্ত্রস্ত অথবা ম্লান। প্রায়ই তারা অস্থিরমতি, কিছুক্ষণের জন্যও স্থির হয়ে থাকতে পারে না, কারণ স্বাভাবিক চেতনা তাদের প্রায়ই বিলুপ্ত বা বিপর্যস্ত হয়ে থাকে।

আর দেহেও তার নানারূপ অভ্রান্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। তাদের মাংস-পেশীগুলি সর্বদাই যেন সিঁটিয়ে টান টান হয়ে থাকে, সেইজন্য তা পীড়াদায়ক হয়। এদের শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুত হয়, এমনকি বিশ্রামের অবস্থাতেও। উদ্বিগ্নতার ফলে এরা প্রচুর ঘামতে থাকে, এবং হাতের চেটো প্রায়ই ঘেমে ওঠে ও ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। এটি এক বিশেষ লক্ষণ। এদিকে সর্বদাই মুখ শুকিয়ে থাকে, জিভও থাকে শুষ্ক হয়ে। তাই বারে-বারেই এরা জল খেতে চায়। সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন অবস্থাতে থাকার ফলে এদের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। আর অনিদ্রা, এটিও এক বিশেষ লক্ষণ। উদ্বেগের চাপে রাত্রে বিছানাতে শুয়েও এদের ঘুম আসে না, কিংবা এলেও আচমকা ভেঙে যায়, নানারূপ ভীতজনক স্বপ্ন দেখে ধড়মড় ক'রে জেগে ওঠে।

উৎকণ্ঠা খুবই অতিরিক্ত হ'লে তখন এর বিপরীত রকমের লক্ষণগুলি এসে পড়ে। দারুণ উৎকণ্ঠাতে আক্রান্ত ব্যক্তি যখন অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে হতাশ ও অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গিয়ে তার একটা ঔদাসীন্যের ভাব আসে। সে মুখ বুজে চুপ ক'রে থাকে, সহজে কোনো কথার জবাব দিতে চায় না। কিছু বলতে চায় না, কারণ সে ভাবে যে বলে কয়ে কিবা ফল হবে। তার শরীরের ক্রিয়াগুলিও এর ফলে দমে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস এবং নাড়ীর গতি মন্থর হয়ে আসে। রক্তচাপ কমে যায়। খাদ্যে অরুচি এসে পড়ে, কোনো কিছুই খেতে চায় না। তাকে চাঙ্গা ক'রে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ এদিকে তার নিদ্রাও থাকে না, সারারাত প্রায় জেগেই থাকে।

এই উৎকণ্ঠার রোগটি কম সংক্রামক নয়। বহু ব্যক্তি যেখানে একত্রে থাকে, সেখানে একজন থেকে অনেকজনের মধ্যেই এরূপ অবস্থা অল্প-বিস্তর সংক্রামিত হতে দেখা গেছে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে পরীক্ষার উদ্বেগ উপস্থিত হওয়া তার একটি নমুনা। এক-একটি পরিবারেও দেখা যায় যে সেখানে পিতা-মাতা ও বড়ো বড়ো ছেলেমেয়েরা সকলেই উৎকণ্ঠা-প্রবণ, একটু কিছু হলেই তারা মানসিক উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে ওঠে। এক-একটি গোটা পরিবারই এই ধরনের হয়। অবশ্য অতটা বাড়াবাড়ি সকলের নয়, বেশিরভাগ থাকে সীমারই মধ্যে। উৎকট উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং তার একাধিক রকমের উপায় আছে।

প্রথম কথা, মনের মধ্যে এই বিশ্বাসকে জাগিয়ে দেবার প্রয়াস করা, যে উৎকণ্ঠার নিমিত্তটা যাই কেন হোক, মনে ব্যাকুল হয়ে তার কোনো সুরাহা হবে না। যদি কোনো বিপদ আসন্নই হয়ে থাকে, ধীর-মস্তিষ্কে যা করা কর্তব্য তাই করতে হবে। আর উৎকণ্ঠার আসল কারণ সেটি নয়, অবচেতনের মধ্যে অন্য কোথাও তার বীজ আছে। সেটি তাকে দেখিয়ে দিতে হবে। এই হলো মনোবিশ্লেষণের কাজ। সকলেই এ-কাজ পারে না, কিন্তু বোঝানো এবং বিশ্বাস জাগানোর কাজ সাধারণ চিকিৎসক বা বুদ্ধিমান আত্মীয়-স্বজন সকলেই পারে।

দ্বিতীয় উপায়, পরিস্থিতির অদল-বদল, সম্ভব হলে সাময়িকভাবে স্থান পরিবর্তন। একই জায়গাতে একই লোকদের মধ্যে বাস করতে থাকলে ঐরূপ উৎকণ্ঠার অবস্থাকে দূর করতে পারা কঠিন হয়। কিন্তু স্থান পরিবর্তন করলে তাতেই অনেক উপকার হয়। আমাদের দেশে আপন ঘর-সংসার ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া অবশ্য অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এর জন্য প্রচুর ব্যবস্থা আছে, সেইসব রাজ্যে অনেক স্যানিটোরিয়ম প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে যেখানে অল্প খরচে অথবা বিনা খরচেও লোকে থাকতে পায়, আর সেখান-কার উপযুক্ত ব্যবস্থাতে অনেকেই আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু আমাদের দেশে তা সম্ভব না হলেও কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও ঘুরে আসা এমন অসাধ্য নয়। পাহাড়ে-দেশে বা সমুদ্রতীরে নির্জনে কয়েকটা দিন থাকতে পারলে তাতেই ধীরে ধীরে মন শান্ত ও শরীর সুস্থ হয়ে ওঠে।

তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে অন্তত পক্ষে ঘর বদলানো, ঘরের আসবাবপত্র নাড়ানাড়ি ক'রে বদলানো, দৈনন্দিন অভ্যাসগুলি বদলানো, কাজ বদলানো, তাতেও বেশ ফল হতে পারে। আর এরূপ অবস্থাতে কেবল নিষ্কর্মা হয়ে মুহ্যমান হয়ে থাকা কখনই উচিত নয়। কোনো একটা চিত্তাকর্ষক কাজে বহুক্ষণের জন্য নিযুক্ত হয়ে যেতে পারলে তখন দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতার প্রকোপ অনেকটা হ্রাস পায়।

অবশেষে ওষুধের কথা। বেশি বাড়াবাড়ি হলে তখন ওষুধের ব্যবস্থা করতেই হয়। আজকাল বিজ্ঞান ও বায়োকেমিস্ট্রির যুগে মন ঠাণ্ডা করবার ওষুধের কোনো অভাব নেই। ট্র্যাংকুইলাইজার বা উদ্বেগ-নিবারক এবং সিডেটিভ বা উত্তেজনা উপ-শমকারী ও নিদ্রাকর্ষক অসংখ্যপ্রকার ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে। আগেকার ব্রোমাইডের যুগ আর নেই। এখন নানাবিধ জটিল রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত ট্যাবলেটগুলি সস্তা দরেই মিলতে পারে। এই সকল ওষুধ প্রয়োগ করাতে ভালো কাজও হয়। হয়তো একদিকে শান্তিদায়ক এবং অন্যদিকে নিদ্রা-দায়ক ওষুধ একত্রেই দিতে হয়, তাতে আরো ভালো কাজ হয়। তবে এর জন্য নিজেরা কোনো ওষুধ বেছে নেওয়া উচিত নয়, যা আজকাল অনেকেই করছে এবং ওষুধের অযথা অপব্যবহার করছে, অথচ আশানুরূপ ফল হচ্ছে না। এই ওষুধ নির্বাচনের ভারটা ডাক্তারদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। তারাই বলতে পারবে যে ঠিক কোন ওষুধটি কার পক্ষে উপযোগী হবে, কারণ সে জ্ঞান তারা বহু অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চয় করেছে, যা সাধারণ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর এর জন্য স্পেশ্যালিস্টের কাছে যাবারও প্রয়োজন হয় না সকল ক্ষেত্রে, কারণ এখনকার সাধারণ চিকিৎসকরাও এ বিষয়ে খানিকটা অভিজ্ঞতা পেয়ে যাচ্ছে। কার পক্ষে কোন ওষুধটি খাটবে সেকথা তারাও এখন বলে দিতে পারে।

তবে একটা কথা, এইসকল ওষুধ কিছুদিনের জন্য ব্যবহার ক'রে ছেড়ে দিলে তাতে স্থায়ী ফল হতে পারে না। কাজ দেখা দিলে তখন অনেকদিনের জন্য নিয়মিতভাবে ওষুধ ব্যবহার ক'রে যেতে হয়। অতিরিক্ত উৎকণ্ঠার ক্ষেত্রে এক বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত ওষুধ ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে। তবে তাতে আবার অভ্যাস জন্মে যাবার আশংকা আছে, তখন খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ওষুধের মাত্রা কমিয়ে আনতে হয়। নতুবা শেষে আফিমের নেশার মতো এমন অবস্থা এসে পড়ে যে ওষুধ আর ছাড়াই যায় না।

প্রেক্ষাগৃহ

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া ও পুতুল নাচ ঃ

পর্ব উপলক্ষ্যে মেলা এবং মেলার অপরিহার্য অঙ্গরূপে পুতুল-নাচ বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। একটি হাত দশ-বারো লম্বা ও সাত-আট হাত চওড়া স্থানকে বাঁশের কাঠামো ও মানুষের মাথা বরাবর হোগলার ছাউনী করে ঘিরে ফেলা হ'ত। ঐ স্থানটির পিছন দিকটা একটা দেওয়াল ঘেঁষে করবার সুবিধা থাকলে তাই-ই করা হ'ত; আর তা না হ'লে পিছন দিকটা আট, ন'হাত উঁচুতে যে হোগলার একচালা তৈরী করা হ'ত, সেই পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ত। পাশের একটা দিকে পুরু চট দিয়ে ঢাকা প্রবেশদ্বার থাকত। এই হোগলাঘেরা জায়গার মধ্যে হ'ত পুতুল-নাচ। হাত-চারেক বড়ো কাঠের পুতুল-গুলিকে মজবুত বাঁশের ডগায় সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে পিছন দিকে ওপর থেকে ফেলা একজোড়া কালো পর্দার মাঝখান দিয়ে পুতুল-নাচিয়েরা সামনের রঙ্গস্থলে পুতুল-গুলিকে হাজির করত এবং ঢোল-কাঁসির বাদ্য সহযোগে পুতুলগুলিকে নিয়ে ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে, নাচিয়ে পালা অভিনয় করাতো। সাধারণত কৃষ্ণলীলা বা মহাভারতের কোনো আখ্যান হ'ত পালার বিষয়বস্তু; সময় সময় রামায়ণ থেকে সীতাহরণ প্রভৃতিও দেখানো হ'ত। পুতুল-গুলির মাথা ও হাত নাড়ানো হ'ত শক্ত সুতো ও কঞ্চির সাহায্যে। পুতুল হাতের সাহায্যে নমস্কার করত, গালে হাত ঠেকিয়ে অবাকের ভাব দেখাত, হাত নেড়ে রাগ প্রকাশ করত, মাথা হেলাত, নাড়াত ও দোলাত অর্থাৎ হাত ও মুণ্ডের সাহায্যে রীতিমত মূকাভিনয় করত; আবার কোনো কোনো পুতুল কোমর বেঁকিয়ে নাচতও। এক-একটি পালা দু'তিন ঘন্টা পর্যন্ত চলত; অবশ্য মধ্যে মধ্যে অঙ্ক পরিবর্তনের মতো সাময়িক বিরতি থাকত। বিরতির সময়ে দর্শক-আগ্রহ বজায় রাখবার জন্যে ঢোল-কাঁসি বাজানো হ'ত প্রভৃতি উপভোগ্য ক'রে। উত্তর কলকাতার মদনমোহনতলায় রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে এই পুতুল-নাচ আমরা তন্ময় হয়ে দেখেছি ঘন্টার পর ঘন্টা ধ'রে আমদের বাল্যকালে। আজও বীরভূম, বাঁকুড়া বা নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের কোথাও কোথাও বিশেষ মেলা উপলক্ষ্যে এই ধরনের পুতুল-নাচ হয় ব'লে শুনেছি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত, বাঙলা দেশের সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে এই বিশেষ ধরনের পুতুল-নাচটিকে বাঁচিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও সহায়তা করা।

অভিনেত্রী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। ফটো ঃ ও

কলিকাতা, সেবক বৈদ্য স্ট্রীটস্থ ই পাপেট থিয়েটার, ইন্ডিয়া পুতুল-না যে-দু'টি ধারা অবলম্বন করেছেন, মোটামুটি বিদেশীদের কাছ থেকে পাও এক, হাত ও দস্তানার ব্যবহারে ন

অভিনেত্রী শবনম্। ফটো : অমৃত

...থকে পুতুলদের নড়ানো; আর দুই হচ্ছে, ওপর থেকে সুতোর সাহায্যে পুতুলদের নিয়ন্ত্রণ করা। এই দ্বিতীয় 'ম্যারিওনেট' প্রথাটিতে এ'রা নতুন ব্রতী হয়েছেন। এ'দের পুতুলগুলি সাধারণত চার ইঞ্চি থেকে এক দেড় ফুট পর্যন্ত বড়ো। যাঁরা পুতুলগুলিকে ক্ষুদ্রায়ত মঞ্চে আবির্ভূত করেন এবং খেলা দেখিয়ে আবার আড়ালে নিয়ে যান, তাঁরা সব সময়েই পর্দার অন্তরালে থাকেন। যখন নীচে থাকেন, তখন মঞ্চের ওপর নির্মিত পুতুলদের রঙ্গমঞ্চটি ফুট পাঁচেক ওপরে অবস্থিত হয়; আর যখন তাঁরা ওপরে থাকেন, তখন পুতুলদের লীলাক্ষেত্র আসলে মঞ্চেরই ওপরে নির্দিষ্ট হয়। এ'দের পুতুলনিয়ন্ত্রকরা সকলেই কিশোরবয়স্ক।

গেল ৭ সেপ্টেম্বর, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া তাঁদের পঞ্চম বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে যে-আসর বসিয়েছিলেন, তাতে এ'দের দুজন সভ্য সাদা কাপড় ঢাকা গোল রবার আঙুলে পরে তাতে মুখ এ'কে দুই পুতুলের যে-সুন্দর প্রণয়লীলা 'সিল্যুয়েট' নাম দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন, তা' অত্যন্ত উপভোগ্য ও শৈল্পিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। এর পরে তাঁরা তাঁদের 'পাপেট ফ্যান্টাসি' প্রদর্শন করেন ম্যারিওনেট প্রথায়, ওপর থেকে সুতোর সাহায্যে। প্রথমে, ফুলের পাপড়ি মেলা ও প্রজাপতির মধু খাওয়া, পরে একে একে জলের ভিতরে মাছেদের সন্তরণ, মোরগদের নৃত্য, একটি মেয়ের নৃত্য এবং সবশেষে মেয়েটির সঙ্গে মোরগদের নৃত্য প্রভৃতি মোটের উপর উপভোগ্য হয়েছিল। অবশ্য আমরা আশা করব, এই ম্যারিওনেট প্রথায় পুতুল-নাচকে যখন তাঁরা নিখুঁত ক'রে তুলবেন, তখন পুতুলের সঙ্গে বাঁধা সুতোগুলিকে আদৌ দেখতে পাওয়া যাবে না। পুতুল-নাচের সঙ্গে উপযোগী যন্ত্রসংগীত এই নাচের আসরকে সরগরম ক'রে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

সংস্থা আয়োজিত বার্ষিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী কিশোর-কিশোরীরা এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি বা প্রবন্ধ পাঠ করে তাঁদের গুণপনার পরিচয় দেন।

চিত্র-সমালোচনা

চৌরঙ্গী (বাঙলা) : পম্প ফিল্মস্-এর নিবেদন; ৪,৩৬৪·১৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ও সংগীত পরিচালনা : অসীমা ভট্টাচার্য; পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়; কাহিনী : শংকর; চিত্রনাট্য : অমল সরকার; গীতরচনা : মিন্টু ঘোষ ও Livingstone Evans, চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত; শব্দানুলেখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ, মৃণাল গুহঠাকুরতা এবং অনিল দাশগুপ্ত; সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশনা : সুধীর খান; সম্পাদনা : কালী রাহা; নেপথ্য কণ্ঠ-সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিঃ মার্ক; রূপায়ণ : উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, উৎপল দত্ত, হারাধন মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সুখেন দাস, বঙ্কিম ঘোষ, সুপ্রিয়া

চৌধুরী, অঞ্জনা ভৌমিক, দীপ্তি রায়, জয়শ্রী সেন, ইলোনা, জেনী প্রভৃতি। পাম্প ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার থেকে, উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা, শ্রী (এক সপ্তাহের জন্য) এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

উপন্যাস বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, "শংকর" রচিত "চৌরঙ্গী"কে ঠিক সেই পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা জানি না। "চৌরঙ্গী"র অকুস্থল শা-জাহান হোটেলে বহু মানুষের মেলা, বিচিত্র তাদের জীবন, বিচিত্রতর তাদের মন। শংকর নিজেকে ঐ মানুষদের সঙ্গে মিলিয়েছেন ঐ শা-জাহান হোটেলের 'রিসেপশনে' চাকরী নিয়ে। এবং তাঁর চাকরী-জীবনের অন্তে এই হোটেল-জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন 'চৌরঙ্গী' কাহিনীর মাধ্যমে. যে-কাহিনীর মধ্যমণি হচ্ছেন সত্যসুন্দর বসু ওরফে স্যাটা বোস। শংকর নিজেই কবুল করেছেন, এই স্যাটা বোসই অত্যন্ত দরদের সঙ্গে তাঁকে কাজের উপযুক্ত রূপে গড়ে উঠতে অকৃপণ সাহায্য করেছেন।

মূল কাহিনী একটি নিটোল উপন্যাস না হ'লে, তার থেকে চিত্রনাট্য রচনার কাজটি কোনো বিশিষ্ট গতিপথে অগ্রসর হ'তে পারে না। তখন কাহিনীটিকে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করলে কাহিনীটির প্রতি সুবিচার করা হবে, তা রীতিমত একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শা-জাহান হোটেলের কাহিনীকে শংকর তাঁর স্মৃতি রোমন্থন ক'রে চিত্রিত করছেন, এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও যেমন চিত্রনাট্যটি গঠিত হ'তে পারত, আবার ঠিক তেমনই স্যাটা বোসকে কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু করে তাঁকে ঘিরে কাহিনীটিকে চিত্রনাট্যায়িত করাও আদৌ অসম্ভব ছিল না। 'চৌরঙ্গী'র চিত্রনাট্যকার অমল সরকার কিন্তু এই দুটি সম্ভাব্য পন্থাকে বর্জন করে মূল-কাহিনীভুক্ত প্রধান প্রধান ঘটনাকে অনুসরণ করে তাঁর চিত্রনাট্যটি গ্রথিত করেছেন। ফলে চিত্রনাট্যটি কিছুটা পর্যায়ক্রমিকভাবে কয়েকটি উপকাহিনীর চিত্রায়ণে পর্যবসিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দেখি, বেকার শংকর বায়রনের অনুবর্তী হয়ে শা-জাহান হোটেলে মার্কোপোলোর কাছে কর্মপ্রার্থী হয়ে আসেন এবং কোনো এক পলায়িতা রোজির স্থলাভিষিক্ত হন ও স্যাটা বোসের সুনজরে পড়েন। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোজির পুনরাবির্ভাব ঘটলেও স্যাটা বোসের চেষ্টায় শংকরের কর্মচ্যুতির আশংকা থেকে মুক্তিলাভ ও বোসদা'রই সাহায্যে হোটেল-জগতে গমনাগমনকারীদের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন। তৃতীয় পর্যায়ে আগর-ওয়ালার স্যুটের হোস্টেস করবী গুহের কোটিপতি মাধব পাকড়াশীর ছেলে অনিন্দ্যর সঙ্গে প্রথম পরিচয় থেকে ক্রমে ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন ও শেষ পর্যন্ত তাকে পতিরূপে পেয়ে ঘর বাঁধার কল্পনা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আত্মহত্যার মাধ্যমে দুর্বহ জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ। চতুর্থ পর্যায়ে স্যাটা বোসের জীবনে এয়ার-হোস্টেস-সুজাতা মিত্রের আবির্ভাব এবং তারই সঙ্গে সুখী জীবনযাপনের স্বপ্ন বাস্তব রূপগ্রহণের পূর্বমুহূর্তে বিমান দুর্ঘটনায় সুজাতার জীবনাবসানে স্যাটা বোসের শোকে মুহ্যমান হওয়া। এবং এই পর্যায়ের মাঝেই শা-জাহান হোটেলের মালিকানায় হেরফেরের ফলে শংকরের কর্মচ্যুতি ঘটে।

কিন্তু চিত্রনাট্যটি পর্যায়ক্রমিক বা এপিসোডিক্যাল হওয়া সত্ত্বেও দৃশ্যগুলিকে এমন দক্ষতার সঙ্গে সাজানো হয়েছে যে, ছবিটির দ্রুতগতি বা টেম্পো দর্শক কৌতূহলকে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে জাগ্রত রাখে এবং ছবির সমাপ্তি দৃশ্যে সমুদ্রতীরে স্যাটা বোসের ভগ্নহৃদয় যখন অন্তর থেকে শোনে "এই কথাটি মনে রেখো", দর্শকহৃদয়েও তার রেশ প্রতিধ্বনিত হ

'চৌরঙ্গী' ছবির একটি বিশেষ আ হচ্ছে এতে অধিকাংশ শিল্পীর চরি যোগ্য সু-অভিনয়। এ'দের মধ্যে সব নাম করতে হয় করবী গুহের ভূ ভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর। ব্ল্যাকমেলে দেখিয়ে মিসেস পাকড়াশীকে হতবা স্তব্ধ করবার পরে করবীর মানসিক দ্ব যে-বিচিত্র রূপ তিনি আমাদের চো সামনে তুলে ধরেছেন, তা তাঁর নাট্যনৈপু চূড়ান্ত পরিচয় বহন করে। উত্তমকু অভিনয়প্রতিভা আজ অবিসংবাদী এমনই সিদ্ধিলাভ করেছে যে, যে-কো ভূমিকাকে তিনি আয়ত্ত করে নিতে প অতি সহজেই: চালে চলনে বা ভঙ্গীতে শংকর-সৃষ্ট স্যাটা বো উপভোগ্যভাবে নবরূপে সঞ্জীবিত তুলেছেন। তাঁর সহাভিনেত্রীরূপে অ ভৌমিক এয়ার হোস্টেস সুজাতা মি ভূমিকাটিকে মর্মস্পর্শী করে তুলতে স হয়েছেন। করবী গুহের প্রেম অনিন্দ্যের ভূমিকায় বিশ্বজিৎ মোটের সু-অভিনয় করলেও তাঁর অপেক্ষাকৃত বাচন আন্তরিকতার পথে কিছুটা ব সৃষ্টি করে। বহুদিন বাদে মি পাকড়াশীর ভূমিকায় দীপ্তি রা আভিজাত্যপূর্ণ অভিনয় দেখার সু ঘটল। হোটেল ম্যানেজার মার্কোপো বেশে উৎপল দত্তর বাচন কিছুটা নি গ্রামের হলে সর্বাঙ্গসুন্দর হত। লি ইন-চার্জ ন্যাটাহারির ভূমিকায় বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রটির একটি স্মর মনোজ্ঞ রূপ দিয়েছেন। আর একটি অ মধ্যে হৃদয়গ্রাহী অভিনয় হয়েছে বা মাস্টার প্রভাতচন্দ্র গোমেজের ভূমি প্রশান্তকুমারের। খোদ শংকররূপে শু চট্টোপাধ্যায় অতি সংযতভাবে ভূমিকা

মর্যাদা রক্ষা করেছেন। গড়ুবোড়িয়া বেশে সুখেন দাস অতি সহজেই দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় দীপক মুখোপাধ্যায় (বায়রন), তরুণকুমার (ফোকলা চাটুজ্জে), ইলোনা (রোজী), জহর রায় (জুনো), হারাধন মুখোপাধ্যায় (জিমি), জয়শ্রী সেন, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

মূল-কাহিনীর বিরাট পটভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছবিখানিকেও ঐশ্বর্য-মণ্ডিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন প্রযোজিকা অসীমা ভট্টাচার্য। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ক্যাবারে দৃশ্য থেকে লাঞ্চ পার্টি, সুবিস্তৃত করিডোর, রিসেপশন প্রভৃতি বহু অংশকে ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এবং স্টুডিওর কৃত্রিম সেটের সঙ্গে আসল ঘরবাড়ীর দৃশ্যগুলিকে বেমালুমভাবে এক করে দেওয়ার প্রচেষ্টা আশ্চর্যভাবে সাফল্যলাভ করেছে। এ-ব্যাপারে শিল্প-নির্দেশক সুধীর খানের কৃতিত্বকে অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আঙ্গিক পরিকল্পনাকার দিলীপ ভট্টাচার্যের অবদান এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই স্মরণীয়।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চমান রক্ষার সুদৃঢ় প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আলোকচিত্রগ্রহণে দীনেন গুপ্ত এবং সম্পাদনায় কালী রাহা নিজ নিজ কার্যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবির চারখানি গানের মধ্যে "এই কথাটি মনে রেখো" ও "সেরা-সেরা-হোয়াট উইল বি উইল বি" গান দু'খানি পরিস্থিতি ও গাওয়ার গুণে হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আবহসংগীত ছবিটিকে প্রাণসঞ্চারে অত্যন্ত সাহায্য করেছে।

পাম্প ফিল্মস নিবেদিত "চৌরঙ্গী" বাঙলা চিত্রজগতে একটি স্মরণীয় সংযোজন!

তিন অধ্যায় (বাঙলা) : অপ্সরা ফিল্মস-এর নিবেদন; ৪,৩৫৪·০৭ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : ডি. এম. পাল; চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্তী; কাহিনী : শৈলেশ দে; সঙ্গীতপরিচালনা : গোপেন মল্লিক; গীতরচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : রামানন্দ সেনগুপ্ত; চিত্রগ্রহণ : সুখেন্দু দাশগুপ্ত; শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত, অতুল চট্টোপাধ্যায়, জে, ডি, ইরানী প্রভৃতি; সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র; সম্পাদনা : বিশ্বনাথ নায়েক ও দেবীদাস গাঙ্গুলী; নৃত্যপরিচালনা : শক্তি নাগ, শম্ভু ভট্টাচার্য এবং অশোক রায়; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : মান্না দে ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়; রূপায়ণে : উত্তমকুমার, বিকাশ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, সুপ্রিয়া দেবী, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, বিদ্যা রাও, শিবানী বসু, সীতা মুখোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি। অপ্সরা ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল ২০ সেপ্টে-ম্বর, শুক্রবার থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বিয়ের আর তিন দিন বাকী, এমন সময়ে হঠাৎ মারা গেল মল্লিকা চৌধুরী। সংসারে আপনার বলতে একমাত্র এই ছোট বোনের আকস্মিক মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়ল বাণীব্রত। অস্থির চিত্তকে শান্ত করবার জন্যে সে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল দেশভ্রমণে। যাবার সময়ে পিতৃতুল্য প্রতিষ্ঠান-মালিককে পত্র মারফত অনুরোধ জানিয়ে গেল তার লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের পদটি যেন সাময়িকভাবে জয়ন্ত বসুকে দেওয়া হয়। জয়ন্ত বসুর পদোন্নতিতে খুশী হল অফিস-স্টেনো শেলী; সে জয়ন্তকে ভালোবাসে। কিন্তু জয়ন্ত যে-ভাবে শ্রমিক-সমস্যার সমাধান করল, তা' আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে যতই সংগত মনে হোক, পুরাতন আদর্শে বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান-মালিককে খুশী করতে পারল না। অবশ্য জয়ন্ত তাঁকে জানাল, সে তার গুরু বাণীব্রতরই উপদেশ মত চলতে চেষ্টা করছে। বছর খানেক বাদে বাণীব্রত ফিরে এসে অফিসের ফাইল দেখে জয়ন্তর কাজকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করল, তখন মালিক বিস্মিত হলেন এবং নিজেকে বর্তমান যুগের অযোগ্য বিবেচনা করে সন্তানতুল্য বাণীব্রতকেই নিজের পদাভিষিক্ত করে অবসর গ্রহণ করলেন।

কিন্তু অফিস-পরিচালনা বা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সমস্যার সমাধান 'তিন অধ্যায়' কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু নয়। আরও পাঁচখানি ছবির মতো এরও প্রধান অবলম্বন হচ্ছে প্রেম ও প্রেমের গতানুগতিক পরিণতি বিবাহ। এবং এই প্রেমের নায়ক হচ্ছেন জয়ন্ত বসু। জয়ন্ত প্রথমে শেলীকে ভালোবাসত। কিন্তু একদিন কোনো নাইট ক্লাবে বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত শেলীকে নাচতে দেখে জয়ন্তর ভালোবাসা কর্পূরের মতো উবে গেল; অমন একটা

চৌরঙ্গী চিত্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছবির প্রযোজক এবং সংগীত পরিচালক শ্রীমতী অসীমা ভট্টাচার্য বন্যাত্রাণের জন্য রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরার হাতে দশ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন। ওপরের চিত্রে আরো রয়েছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, অমল সরকার, বিশ্বজিৎ, বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, সুপ্রিয়া দেবী এবং অঞ্জনা ভৌমিক। ফটো : অমৃত

শস্তা মেয়েকে কোন ভদ্দরলোকের ছেলে ভালোবেসে ঘরের বৌ করে? কিন্তু জয়ন্তর ভালোবাসার পাত্রীর অভাব হ'ল না। নব-নিযুক্ত স্টেনো জয়ন্তী রায়কে হাতের কাছেই পাওয়া গেল; জয়ন্ত-জয়ন্তীতে মনের মিল ঘটতে আদৌ বিলম্ব হ'ল না। কিন্তু কেমন যেন বাদ সাধতে শুরু করলেন সদ্য ফিরে আসা বাণীব্রত চৌধুরী। জয়ন্তীকে তিনি কি চোখে দেখেছেন, তা' তিনিই জানেন। জয়ন্তী তার হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে জয়ন্ত খুব তাড়াতাড়ি তাদের বিবাহের দিনস্থির করে ফেলে নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে ফেলল। কিন্তু ব্যাণীব্রতকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে কাচের দরজার ভিতর দিয়ে সে যে-দৃশ্য দেখে ফেলল, তার পরে জয়ন্তীকে বিবাহ করবার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। অতএব বিবাহের তারিখ ঠিক থাকলেও বিবাহের পাত্রী গেল বদলে—জয়ন্ পরিবর্তে আবার সে শেলীরই শরণ হ'ল। কিন্তু এতেও বাদ সাধলেন বাণী তিনি জয়ন্ত-জয়ন্তীরই মিলন ঘটা কেমন করে তা' সম্ভব হ'ল, তাই নি ছবির শেষের দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে

বলা বাহুল্য, এই ত্রিভুজাকৃতি কাহিনীর নায়কের চরিত্রটি অ দুর্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছে। বাড়ি বলের মতো নায়ক যদি কারণে অকারণে দুই নায়িকার মধ্যে পালা- করতে থাকে, তাহ'লে তাকে দর্শক স অভিনন্দিত করতে পারে না। প্রে প্রেমিকার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কিছু অসম্ভব নয়, কিন্তু নায়কের আচরণ সময়েই যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া চাই। বত কাহিনীর নায়কের আচরণ যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে বেশ কিছুটা হাস্যোদ্রেককারী হয়ে

কিন্তু কাহিনীগত দুর্বলতাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দিয়েছে ছবিটির শি বৃন্দের সু-অভিনয়। এবং এ ছবি শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জয়মাল্য পাবেন শে ভূমিকাভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী। প্রেমিকের মত পরিবর্তনে আহত হয়ে ছোট বোন মিলির আত্মহত্যায় কাতর কি ছোটবোনের সর্বনাশকারী দি মিত্রের আচরণে নিষ্ফল ক্রোধের ব্যক্তিতে—তিনি সর্বত্র নাট্যনৈপুণ্যের বিকাশ দেখিয়েছেন। তাঁর মুখনি ব্যঙ্গাত্মক 'চো' 'চো' শব্দ অবিস্মরণ জয়ন্তীর ভূমিকায় সন্ধ্যা রায়ের স দরদী অভিনয় চরিত্রটিতে প্রাণপ্র করেছে। বাণীব্রত চরিত্রের বেদনা নিঃসঙ্গতা অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রকা হয়েছে উত্তমকুমারের স্বচ্ছন্দ অভি মাধ্যমে। কর্মী ও মালিকের স আদর্শে বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান-মালি ভূমিকায় বিকাশ রায়ের ব্যক্তিত্বপূর্ণ অ অবিসংবাদীভাবে উপভোগ্য। প্রেমিক- জয়ন্তের ভূমিকায় অজয় গাঙ্গু চরিত্রগত দুর্বলতাজনিত অসু সম্মুখীন হতে হয়েছে। অফিসের গুলিতে তিনি চমৎকারভাবে নি প্রতিষ্ঠিত করেছেন; প্রেমপ্রকাশের গুলিতেও তিনি সাফল্যলাভ করে কিন্তু যে-সব দৃশ্যে তিনি প্রেমিক আচরণে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন, সেই স্থানে দর্শকরা তাদের আচরণের কারণ সম্বন্ধে অবহিত বলে তাঁর প্রকাশকে সহানুভূতির চোখে দে পারেন না। অপরাপর ভূমিকায় ছায়া (জয়ন্তীর পালক-মা), অনুপকুমার (জয় শুভার্থী বন্ধু (সোমনাথ), জহর (ঘনশ্যাম), বিদ্যা রাও (মিলি) প্র শিল্পী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভ কাজ প্রশংসনীয়। ছবির তিনখানি গ সুর ও গাওয়ার দিক দিয়ে স উপভোগ্য।

দেশী ছবির খবর

ছবিটা জাতে দেশী নয়, তবে জন্ম ও শৈশবের অনেকটা কাটিয়েছে এই ভারতেরই মাটিতে। কাজেই দেশী ছবি হবার দাবী তার একবারে ফেলনা নয়। হলিউডের এম-জি-এম 'টার্জন কামস টু ইণ্ডিয়া' করার পর বেশ কিছুদিন বাদে ক্যেমার ছবির কাজ করতে ভারতে আসেন। বম্বের বিভিন্ন স্টুডিওয় ও মহাবালেশ্বরের লোকেশনে ছবিটির অধিকাংশ কাজই হয়েছে। কলকাতায় মুক্তি পাচ্ছে এ সপ্তাহে মেট্রোয়: ছবির প্রিমিয়ার শো এটাই। ভারতীয় পটভূমিকায় রচিত এ কাহিনীর প্রধান নায়িকা চরিত্রটি নিঃসন্দেহে জটিল। তথাকথিত সামাজিক রীতিনীতির ক্রমবিবর্তন নিয়ে এ ছবির কাহিনী। এ চরিত্রটিতে অভিনয় করছেন আমেরিকার তরুণী ম্যাডলিন রুহে। নায়ক চরিত্রে আছেন জিম ব্রাউন। ভারতীয় চিত্রাভিনেতাদের মধ্যে আছেন প্রেমনাথ ও সুলোচনা। ছবির পরিচালক স্টিভ মেকলি হাঙেরীয়ান, চিত্রনাট্যকার পশ্চিম জার্মানীর ও অন্যান্য কলাকুশলী বেশীর ভাগই ভারতীয়। পরিচালক গোপন ক্যামেরা দিয়ে বম্বের রাস্তার বিভিন্ন দৃশ্য তুলেছেন। সর্বদিক থেকে এ ছবি কলকাতার দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে আশা করা যায়।

বেশ কয়েক মাস আগে এন দাস প্রোডাকসনের তিন তরঙ্গ ছবির আনুষ্ঠানিক মহরৎ হবার পর ছবির কাজ আবার শুরু হচ্ছে শিগ্‌গির। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, জহর রায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। সলিল চৌধুরীর সুরে কয়েকটি গান বাণীবদ্ধ হবে বম্বেয়।

মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে এইচ-এস রাওয়ালের রঙীন ছবি সংঘর্ষ মুক্তি পাচ্ছে এ সপ্তাহে। দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, বলরাজ সাহনী অভিনীত এ ছবি পুজোর অন্যতম আকর্ষণ। ছবির প্রিমিয়র হবে ওরিয়েন্ট প্রেক্ষাগৃহে। নৌসাদ সুরকৃত এ ছবির পরিচালক প্রযোজক এইচ-এস রাওয়াল। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সঞ্জীবকুমার, অঞ্জু, মহেন্দ্র, জয়ন্ত, দেবেন ভার্মা, সুলোচনা, দুর্গা খোটে প্রভৃতি।

এ সপ্তাহের আরেকটা হিন্দী ছবি হল জি-পি সিপ্পির ব্রহ্মচারী। শচীন ভৌমিকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এ ছবির পরিচালক বাপ্পী সোনী। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবির সুরকার। শাম্মী কাপুর, রাজশ্রী, মমতাজ, প্রাণ, মোহন ছোটি, জগদীশ, অসিত সেন, মেহেল, মনমোহন, মাধবী অভিনীত এ ছবি মুক্তি পাচ্ছে হিন্দ, খান্না, কালিকা প্রেক্ষাগৃহে।

গ্রেট ইস্টার্ণ মুভীজের প্রথম উপহার লেভেল দ্য বীপ-এর নায়িকা চরিত্রে তনুজা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী কয়েকদিন আগে লক্ষ্ণৌ ও বেনারসে ছবির আউটডোর লোকেশন ঠিক করে এসেছেন। হিন্দী উপন্যাস অবলম্বনে এ ছবির কাহিনী। হিন্দী কাহিনী নিয়ে বাংলায় ছবি এই প্রথম সম্ভবতঃ।

স্টুডিও থেকে

সত্যজিৎ রায় এপর্যন্ত তাঁর ছবিগুলোতে পল্লী ও নগর-জীবনের বিভিন্ন দিক ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই নতুন ছবির কাহিনী একবারে পৃথক। পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচ্ছন্ন শিশু-চিত্র এটি। এক গাইয়ে আর এক বাজিয়ের চরিত্র নিয়ে ছবির নাম।

কানু বাইনের ছেলে গুপী বাইন—নিজেই নাম বদলে হয়েছে গুপী গাইন, কারণ, সে মনে করে সে শুধু ভাল গাইতে পারে। গাঁয়ের কেউ তার গান শুনুক বা না শুনুক নিজের 'অমৃত-কণ্ঠে' সে শুধু আপন মনে গান গেয়েই যায়। অতিষ্ঠ গাঁয়ের লোকরা তাকে জব্দ করার জন্য রাজ-দরবারে পাঠায়। উষা লগ্নে আমলন্ত রাজা গুপী গাইনের মধুর কণ্ঠে বিরক্ত হয়ে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন। গাধার পিঠে বসিয়ে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ছেলের এ অবস্থা দেখে কেঁদে ওঠে কানু বাইন।

বেচারী গুপী মনের দুঃখে এগিয়ে চলে। সন্ধ্যা নামে, রাত হয়। কেমন যেন ভয়-ভয় করে, রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে সে আবিষ্কার করে ঢোল কাঁধে বাঘাকে। দুজনের অতীত ইতিহাস একই। রাজা বাঘা বাইনকেও রাজ্য থেকে তাড়িয়ে

বালুচরী/রেণুকা রায় ও গঙ্গাপদ বসু

দিয়েছেন। দুজনে দুজনকে পেয়ে আনন্দে নেচে ওঠে। গভীর অন্ধকারে ভয়ের হাত থেকে বাঁচার আশায় গুপী আর বাঘা গান বাজনা শুরু করে। গুপীর 'মধুর কণ্ঠ' আর বাঘার বিকট ঢোলের আওয়াজ শুনে বনের অশরীরী ভূত-প্রেতের দল এগিয়ে আসে। গাঁয়ের লোকেরা ওদের গান-বাজনা শুনে তিতি-বিরক্ত হয়েছিল একদিন অথচ সে-রাতে ভূত-প্রেতরা বেশ মজার সঙ্গে উপভোগ করে। দলের রাজা খুশী হয়। তাই তিনটে বর দেয় ওদের। প্রথম : ওরা যখনই যা চাইবে তাই পাবে : দ্বিতীয় : দুজোড়া জুতো দিলেন ওদের, যা পরে ওরা যেখানে খুশী চলে যেতে পারবে ; তৃতীয় : ওদের গান শুনে সবাই মুগ্ধ হবে।

এমন তিনটে বর পেয়েছে, তখন আর ওদের পায় কে? আনন্দের চোটে প্রথমেই ওরা হাততালি দিয়ে খাবার আনে. পেট ভরে খায় দুজনে, জাদু জুতোজোড়া পরে তারপর তারা নতুন অভিযানে বেরোয়। অনেক দেশ-দেশান্তর পেরিয়ে গুপী বাঘা আসে শুন্ডী রাজ্যে। মহারাজের দরবারে বিরাট সংগীত-প্রতিযোগিতা হবে খবর পেয়েই দুজন চিত্র-বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত হয়ে হাজির হয় তারা। শুন্ডী মহারাজ সিংহাসন আলো করে বসে আছেন। দরবারের চারদিকে সুন্দর প্রশান্তির একটা ভাব ছড়ানো। এত আনন্দের মধ্যেও শুন্ডী রাজার মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যথা লুকিয়ে রয়েছে।

যাই হোক, একে একে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গায়কেরা গান শোনালেন, কিন্তু মহারাজ নির্বিকার। পালা আসে গুপী-বাঘার। ওদের গান-বাজনা মন্ত্রমুগ্ধ করে শুন্ডীরাজাকে। আনন্দে জড়িয়ে ধরেন ওদের। পরদিন থেকেই মহারাজের দরবার-শিল্পী হয় তারা।

রাজার মনে শান্তি নেই। শুন্ডিরাজার প্রতিবেশী হাল্লা রাজা সব সময়ই শুন্ডী-রাজ্য অধিকার করতে চায়, জাদুকর বড়শী, কুচক্রী প্রধানমন্ত্রী আর হাল্লা-রাজা তিনজন মিলে শুন্ডীরাজার পেছনে লাগে। গুপ্তচর মারফৎ বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করে তারা, গুপী-বাঘার কথাও তাদের কানে যায়। শুন্ডীর প্রাচুর্য, সুখ, সমৃদ্ধি কুচক্রী মন্ত্রীকে পাগল করে দেয়, হিংসেয় জ্বলে যায় সে। জাদুকর বড়শীর সাহায্যে হাল্লা-রাজাকে সম্মোহিত করে মন্ত্রী, রাজাও যুদ্ধের নেশায় মেতে ওঠেন।

শুরু হয় যুদ্ধ। রণদামামার সঙ্গে বিভীষিকার তান্ডব শুরু হয়। শুন্ডী রাজা আতঙ্কিত হ'য়ে পড়েন। যুদ্ধ-অশান্তি তার ভাল লাগে না। যুদ্ধ যেভাবেই হোক বন্ধ করতেই হবে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে আসে সৈনিকেরা রাজার সঙ্গে। রাজার এ-বিপদের শুনে গুপী আর বাঘা বিচলিত রাজাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। রাজাকে জানায় ওরা গুপ্তচর হয়ে হ রাজার দেশে যেতে চায়। মহারাজ প্রথ ওদের ছাড়তে চাননি, পরে পীড়াপী অনুমতি দেন। গুপী-বাঘা নতুন যানে বের হয়। হাল্লারাজার দেশে সংবাদ কুড়োয় আর শুন্ডী রাজাকে জ কিন্তু হাল্লারাজার গুপ্তচরের চোখ দিতে পারে না তারা। গুপী-বাঘা হয় রাজার বন্দীশালায়।

বাইরে তখন যুদ্ধ চলছে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখ কাহিনী সত্যজিৎবাবুর হাতে প্রাণপে বলা যায়। পরিচ্ছন্ন এ শিশু-চি মেজাজ ও ভঙ্গী দুই-ই আকর্ষ সত্যজিৎবাবু মানুষের মনের অকথিত বেদনার কথা যেমন জা শিশু-মনের খোরাকের দিকেও তার দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা।

এ ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় র রবি ঘোষ, তপেন চট্টোপাধ্যায়, স দত্ত, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জহর হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায় গতা ভাস্বতী চট্টোপাধ্যায়, ইভা ব পাধ্যায় ও আরও অনেকে।

মঞ্চাভিনয়

প্রেক্ষাপটের হারানো চিঠি

রুমানিয়ান সাহিত্যের অন্যতম নাট্যকার আই এফ কারাজিয়ালের অবলম্বনে লেখা শ্রীমতী অমিতা 'হারানো চিঠি' সম্প্রতি প্রেক্ষা শিল্পীরা অভিনয় করলেন রঙমহ নাটকের রূপান্তর এত সুন্দর ও স হয়েছে যে, একে কোনো অংশেই বি বলা যায় না। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বি প্রার্থীদের মধ্যে যে রেষারেষি ও প্র চলে সেই ভন্ডামির চেহারা তুলে নাটকটির উদ্দেশ্য। নাটক পরিচা সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রখর রাজনৈ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। অভিন টীম হিসাবে ভালই উৎরেছে। ব চরিত্রে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ পাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, সীমা রায়, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর ব পাধ্যায় শ্যামল ঘটক, সরিৎ ঘোষ অভিনয় করেছেন। এই গোষ্ঠীর স সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় অভিনয় প্র জনা ও নির্দেশনা দেখে।

সুন্দরমের নতুন নাটক 'শব্দরূপ ধাতুরূ

সুন্দরম তাঁদের এ বছরের নতুন ন 'শব্দরূপ ধাতুরূপ' মঞ্চস্থ করলেন মুক্তঅ মঞ্চে এগারোই সেপ্টেম্বর, বুধবার সন্ধ নতুন নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নতু আঙ্গিকের মাধ্যমে যাঁরা পরীক্ষা নিয়

করেন, 'সুন্দরম' তাঁদের অগ্রণী। এবার চ্যাপলিনিস্টিক কমেডী এই 'শব্দরূপ ধাতুরূপ'। সার্কাস দলের ক্লাউন যাদুমাস্টার পলায়নী অবস্থায় সমাজের উঁচুধাপে কি-ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেললো এবং বিচিত্র ঘটনার অংশীদার ও সাক্ষী হল তারই চমকপ্রদ আখ্যান নিয়ে এই নাটক। বর্তমান দিনের চলতি জীবনের ভিন্নমুখী সমস্যা এবং অস্তিত্ববাদ নিয়ে তীক্ষ্ণ সরস ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হয়েছে এই নাটকে। 'শব্দরূপ ধাতুরূপ' এত স্ল্যাপস্টিক অ্যাক-সনের সঙ্গে গ্রোটেক্স ফর্ম এর সুষম ব্যবহার এবং ব্যালে আর অ্যাবসার্ডিটির প্রসাদগুণও এতে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। যান্ত্রিকতার দায়িত্বে আছেন—আলোকপাতে বিমল দাস, মঞ্চায়নে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শব্দায়নে নীরেন ঘোষ এবং নির্দেশনার দায়িত্ব নাট্যকার ও সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীপার্থপ্রতিম চৌধুরীর। বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বে, পরিবেশনে, দলগত অভি-নয়ের বলিষ্ঠতায় 'শব্দরূপ ধাতুরূপ' ইদানিংকালের একটি বিশিষ্টতম প্রযোজনা।

'জীবন যৌবন' ও 'শ্যামা'

সম্প্রতি পাইকপাড়ার শিল্পীগোষ্ঠী মঞ্চস্থ করলেন অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের একাঙ্ক 'জীবন যৌবন' এবং রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। নাটকে অংশ নিয়েছিলেন, সুরেশ দত্ত, অমল মণ্ডল, মুরারী চক্রবর্তী, নিরঞ্জন দে, নিতাই সুর ও পরাগ দত্ত। শেষোক্ত শিল্পী পরিচালকরূপে সার্থক।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে শ্যামারূপী জয়শ্রী ভট্টাচার্য ও বজ্রসেনরূপী গৌরীপদ মজুম-দার সুন্দর। উত্তীয়রূপী উর্মিলা বোস মিষ্ট। সঙ্গীতে বজ্রসেনের গানে বিশেষ-ভাবে আনন্দ দিয়েছেন সুশীল বন্দ্যো-পাধ্যায়। শ্যামার গানে ইরা রায় মোটামুটি। অরুণ বাগ এবং সুধাংশু পাল যথাক্রমে কোটাল এবং উত্তীয়র গান মন দিয়ে গেয়েছেন।

।। কয়েকটি কন্ঠস্বর ।।

প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা নাট্য-সম্প্রদায়ের নতুন প্রযোজনা কৌশিক সান্যালের 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' আগামী ২৭শে সেপ্টে-ম্বর মুক্তঅঙ্গনে এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর অন্ধ্র হলে নাটকটি অভিনীত হবে। নাট্য নির্দেশনায় কল্যাণ সর্বাধিকারী। মঞ্চ, আলো এবং সঙ্গীতে যথাক্রমে থাকছেন কৌশিক সান্যাল, প্রদীপ চক্রবর্তী এবং ইন্দ্র লাহিড়ী।

।।কেউ দায়ী নয়।।

মেখলীগঞ্জ মহকুমার অন্যতম প্রখ্যাত প্রাচীন নাট্যসংস্থা নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমো-রিয়াল ক্লাব গোষ্ঠী গত ২৪শে আগস্ট ... বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু প্রশংসিত 'কেউ দায়ী নয়' নাটকটি স্থানীয় এন-এস-এম ক্লাব মঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটি সামগ্রিকভাবে সাফল্য লাভ না করলেও কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর অভিনয় গুণে মোটামুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা চলে।

নাটকের মূল চরিত্র 'বিজন' রূপায়ণে পাথুর সংহের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছেন, অপরদিকে নায়িকা 'সুধা' চরিত্রে গৌরী চক্রবর্তী মঞ্চে প্রথম অভিনয় ভাবেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছেন। মাণিক ও রমেন চরিত্র দুটি বিশেষভাবে প্রখ্যাত শিল্পী রবি ঘোষ ও শিশির চৌধুরী স্বভাবসুলভ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। আর যাঁরা মোটামুটি চরিত্রানুগ অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন তাঁরা হলেন গায়ত্রী সরখেল, অসীমা দত্ত, দেবব্রত দত্ত ও দ্বিজেন চক্রবর্তী।

হাওড়া জেলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিষদ একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

শ্রেষ্ঠ সংস্থা—১ম : শিল্পীতীর্থ (শঙ্কর রচিত ও গোপাল পাল নাট্যায়িত 'নৈতিক মানচিত্র'); ২য় : শক্তিমন্দির (ঝি-ঝি পোকার কান্না);

শ্রেষ্ঠ নির্দেশক—১ম : সত্যেন মুখার্জি (শিল্পীতীর্থ); ২য় : মিহির চ্যাটার্জি (সায়ন্তনী);

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—১ম : শেখর চ্যাটার্জি (শিল্পীতীর্থ); ২য় : রঞ্জিনী সরকার (সায়ন্তনী);

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—১ম : চন্দ্রিতা মণ্ডল (শিল্পীতীর্থ); ২য় : বীণা জাওয়ার (নবরূপ);

শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা—১ : মাধব ঘোষ (শক্তিমন্দির); ২য় : অখিল মজুমদার (মেরী রাইট)।

বারো ঘণ্টা

বেঁচে থাকার তাগিদে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষগুলোর যে অক্লান্ত সংগ্রাম তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় নাটক রচিত হয়েছে অনেক কিরণ মৈত্রের বারো ঘণ্টা সমাজ জীবনের এই বেদনাভারাক্রান্ত মানুষগুলোর এক সকরুণ কাহিনীর রূপায়ন এবং এর মধ্য দিয়েই প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা সংসারের প্রতি সাধারণ মানুষের আন্তরিকতা জড়িত আবেগকে নাট্যকার মূর্ত করে তুলেছেন। যাত্রা শেষে ক্লান্তি জমে জীবনের প্রতিটি প্রহরে, তবু পরিশ্রান্ত মানুষ

বারো ঘণ্টা নাটকের একটি দৃশ্যে পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণা দে।

স্তিমিত আলোর আশা করে মেঘ কেটে যাবে, ভাবে আজকের কিশোরের জীবন তাদের না পাওয়ার বেদনাকে পাওয়ার চরিতার্থতায় আনন্দে উদ্বেল করে তুলবে। বারো ঘণ্টা নাটকের সংঘাতের মধ্য দিয়ে, এই উপলব্ধি সত্যরূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে এবং সম্প্রতি মহাজাতি সদন মঞ্চে পি. ডব্লিউ. ডি রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা নাট্যাভিনয়ে তাকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

সাধারণতঃ অফিস ক্লাবের নাট্যপ্রযোজনায় যে শৈথিল্য চোখে পড়ে তা থেকে মুক্ত না হোতে পারলেও সেদিনকার অভিনয়ে আন্তরিকতার অনুপস্থিতি কোথাও লক্ষ্য করিনি। তবু বলবো. টিম ওয়ার্কের মধ্যে আরো একটু হারমনি আনার প্রয়োজন ছিল যার অভাবে নাটকীয় সংঘাত একটি নিটোল সংঘবন্ধতায় মুখর হয়ে উঠতে পারেনি। অমিয়'র ভূমিকায় স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন দিলীপ কর, তাঁর বাচনভংগী এবং বিভিন্ন মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি সত্যি সুন্দর। অনিল ও সুনীলের চরিত্রে মুকুল নাগ ও কার্তিককুমার সিনহার অভিনয় প্রত্যাশিত সার্থকতায় না পৌঁছলেও নাট্যানুরাগীকে মুগ্ধ করেছে। পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় (নাট্যনির্দেশক) রাজ্যেশ্বরের ভূমিকায় যে রীতিতে অভিনয় করেছেন তা মাঝে মাঝে প্রশংসার দাবী রাখে। তবে কয়েকটি উত্তেজিত মুহূর্তে অতোটা মেলোড্রামাটিক অ্যাকটিং-এর আনুগত্য না স্বীকার করলেই ভালো হোত মনে হয়। সন্ধ্যা ও মায়ার ভূমিকায় কৃষ্ণা দে, সন্ধ্যা ঘোষ আমাদের প্রত্যাশা বোধ হয় সব সময়ে মেটাতে পারেননি। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দেন: নিতাইপ্রসাদ গুপ্ত, অশোককুমার মণ্ডল শিবপ্রসাদ রায়, মৃণালকান্তি পাল, সুনীল ঘোষ, নিত্যানন্দ সরকার. গীতা রায়চৌধুরী. পাঁচুগোপাল সিংহ, কালীপদ দত্ত. গৌরগুণানন্দ ঘটক, চন্দন মজুমদার, সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য. ক্ষেত্রমোহন দাস।

আলোকসম্পাত এবং আবহসংগীত পরিকল্পনার ব্যাপারে আরো একটু সচেতনতার প্রয়োজন ছিল মনে হয়। সবশেষে আর একটি কথা। যে সব মহিলা শিল্পী এতে অভিনয় করেছেন তাঁরা সবাই এই অফিসেরই কর্মী। এদিক দিয়েও পি, ডব্লিউ, ডি রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রয়াস সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।

পাঞ্চজন্য'র 'শেষ রক্ষা'

বাঁশদ্রোণী সরণীস্থ ভারতী সাধনা হলে সম্প্রতি পাঞ্চজন্য সংস্থা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষরক্ষা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। সংস্থার এটি প্রথম নিবেদন হিসাবে কলাকৌশল ও অন্যান্য বিভাগীয় কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষভাবে স্বপন রায়চৌধুরীর প্রাণবন্ত অভিনয়। বিভিন্ন চরিত্রে প্রশংসা পান প্রভাত ঘোষ, সত্যেন্দ্র নাথ, পূর্ণেন্দু বসু, দুলাল ঘোষ, শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়, আরতি ঘোষ, গোপা মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা।

ঋতায়নের নতুন নাটক 'নেকড়ে'

ঋতায়নের নতুন নাটক 'নেকড়ে'র প্রথম তিনটি অভিনয় আগামী পূজায় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী (২৮, ২৯, ৩০ সেপ্টেম্বর)-তে সকাল দশটায়, রঙমহল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। নাট্যরচনা ও নির্দেশনায় আছেন মনোজ মিত্রের আলোক ও আবহসংগীত পরিকল্পনায় পার্থপ্রতিম চৌধুরীর।

নাট্য প্রয়াসীর 'বুড়ী বালামের তীরে'

১৭ই আগস্ট শনিবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সুধীন্দ্র মাহা রচিত 'বুড়ী বালামের তীরে' নাট্য প্রয়াসীর সদস্যগণ কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে 'জয়পুর পাবলিক লাইব্রেরী' হলে অভিনীত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিত্র পরিচালক রাজেন তরফদার।

'বুড়ী বালামের তীরে' নাটকের বিষয়বস্তু পরাধীনতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন ভারতে
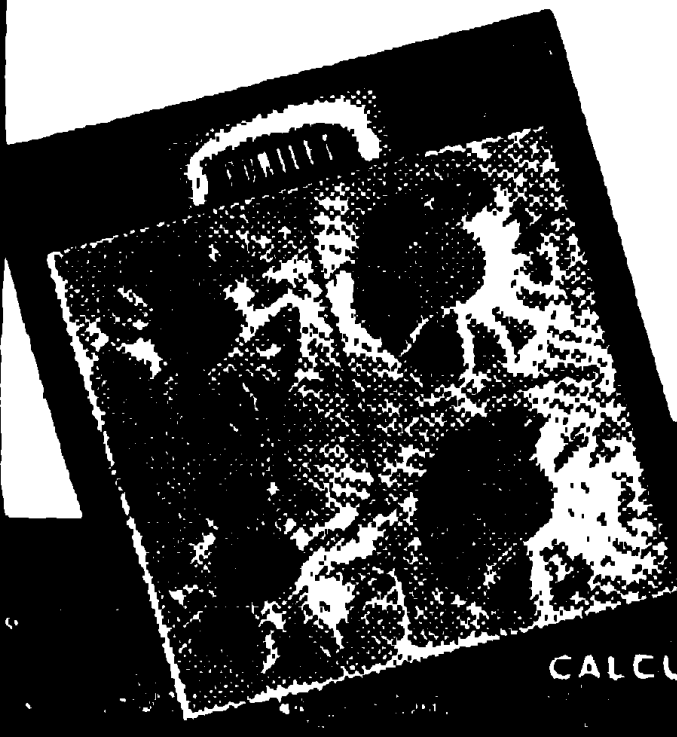
তখন দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের আগনে জবলে উঠেছে। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল গঠিত হল বাংলাদেশে ইংরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। বিদেশ থেকে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসে পৌছলেই তাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করবেন। এই আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন বীর নায়ক। নির্দিষ্ট দিন চলে গেল। জাহাজ এলো না। বীর নায়ক উন্মাদের মত হয়ে গেলেন। চার বন্ধুকে নিয়ে রওনা হলেন কলকাতা অভিমুখে। কিন্তু বাধা এলো টেগার্টের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে। সেদিন বাঘা যতীনের নেতৃত্বে মাত্র বারজন বাঙালীর অসমসাহসিক সেই বীরত্বের কাহিনীতেই নাটকের বিস্তার ও সমাপ্তি।

সামগ্রিক অভিনয়ে শিল্পীদের দক্ষতা প্রশংসনীয়। এদিক দিয়ে নির্দেশক শ্রীধর মুখোপাধ্যায়-এর নিষ্ঠা অভিনন্দনযোগ্য।

প্রয়োগ চিন্তার অভিনবত্ব ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও দলগত অভিনয়ও ছিল নাটকের প্রধান আকর্ষণ। শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, তুষার বসু, সুশীল মিত্র, অনিল বিট্টা ও প্রণব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ সুর অভিনয় প্রতিভার নজীর রেখেছেন মঞ্চে। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা সুঅভিনয় করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মণীন্দ্র গুপ্ত, অলোক চট্টোপাধ্যায়, দুলাল মুখোপাধ্যায়, নীতিন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, দীপক ভৌমিক ও আরও অনেকে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনা করেন শ্রীকুসুম ঘোষ।

বিবিধ সংবাদ

মেট্রোতে "বর্ন টু সিঙ" :

অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ম্যাক্সিমিলিয়ন-এর অনুজ্ঞা ও সমর্থনে "ভিয়েনা বয়েজ কয়ার" (ভিয়েনা বালক কণ্ঠশিল্প সংঘ) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৯৮ খৃীস্টাব্দে। ১৯৬১ সালে ওয়াল্ট ডিজনী তাঁর পরিচালক স্টীভ প্রেভিনকে একদল কলাকুশলীসহ ভিয়েনায় পাঠান এই বয়েজ কয়ারকে অবলম্বন করে "বর্ন টু সিঙ" পূর্ণাঙ্গ রঙীন চলচ্চিত্রটি তোলবার জন্যে। একটি ছেলের এই কয়ারের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে আগ্রহ এবং পিতার অসম্মতি সত্ত্বেও মায়ের সমর্থনে তার ইচ্ছাপূরণ, এই প্রতিষ্ঠানের গানশিক্ষকের সস্নেহ সহযোগিতায় তার একক গান গাইবার সুযোগ লাভ, অন্য এক সহপাঠীর ঈর্ষা এবং সবশেষে সেই সহপাঠীর কণ্ঠ আকস্মিকভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি এবং তার থেকে দৈবানুগ্রহে তার সঙ্গীতপরিচালকের ভূমিকায় উন্নয়ন—এই উত্তেজকভাবে মনোহর কাহিনী অবলম্বন করে কণ্ঠসঙ্গীতের অসামান্য নির্ঝরতুল্য এই "বর্ন টু সিঙ" ছবিখানির সৃষ্টি হয়েছে। মেট্রোতে এই ছবিখানি দেখবার সুযোগ যিনিই লাভ করেছেন, তিনিই মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি।

অদ্বিতীয়া/লিপি চক্রবর্তী

সংঘর্ষ/দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা

চেক ছবি "ক্যারেজ টু ভিয়েনা" :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জার্মানরা যখন চেকোশ্লোভাকিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, তখন অন্যায়ভাবে নিহত স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল জনৈক চেকরমণী। একজন রোগগ্রস্ত সৈন্যকে নিয়ে তার সঙ্গী ঐ চেক-রমণী-চালিত শকট করে জার্মানী সীমান্তে যাত্রা করেছিল। রমণীটি একটি লুক্কায়িত কুঠারের সদ্ব্যবহার করে ঐ সুস্থ যুবক সৈন্যটির প্রাণ নেবার সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু যুবক সৈন্যটির চারিত্রিক মাধুর্য তাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং একটি বনপথ অতিক্রম করবার সময়ে পরিস্থিতি ক্রমেই এমনই আবর্তিত

যাত্রাশিল্পী সংঘের সভ্যরা ২২ সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে বিশ্বজিৎকে মানপত্র প্রদান করেন। ছবিতে ফণী ভূষণ বিদ্যাবিনোদ, শিপ্রা মিত্র রাসবিহারী সরকার এবং পঞ্চু সেনকে দেখা যাচ্ছে।

হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত মেয়েটি ঐ শত্রু-সৈন্যকেই নিজের পরম আশ্রয় মনে করতে বাধ্য হয়েছিল।

প্রধান তিনটি মাত্র চরিত্র অবলম্বনে গঠিত এই ছবিখানি চলচ্চিত্রশৈলীর একটি আশ্চর্য নিদর্শন। শেষের দিকে চেক সৈন্যদের হাতে জার্মান সৈন্যটির মৃত্যু ও চেক-নারীর নিগ্রহের অংশটুকু না থাকলে ছবিটি নিখুঁত শিল্পসৃষ্টি বলে পরিগণিত হতে পারত।

যাত্রার আসরে সাজাহান

উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা সান্ধ্য নাট্য সঙ্ঘের দ্বাবিংশতিবর্ষ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর বিনানী হলে দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান যাত্রার আঙ্গিকে অভিনীত হয়। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সঙ্ঘের নাট্য শিক্ষক বিপিন মুখোপাধ্যায়, জাহানারা হয়েছিলেন রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঔরংজীব ও সুজার ভূমিকায় যথাক্রমে সমীর ঘোষ ও পরেশ পালের অনবদ্য সাবলীল অভিনয় উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন যাত্রা জগতের দিকপাল ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ও বীরেন্দ্র-কৃষ্ণ ভদ্র।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে আসরস্থ হয় ব্রজেন দে'র 'রাজলক্ষ্মী'। সীতার ভূমিকায় ফণি সিকদার। লব-কুশ ও দীপকের ভূমিকায় পূর্ণিমা, অসীমা ও অজয় মুখো-পাধ্যায়ের অভিনয়ে দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়। এছাড়া যাঁরা দর্শকমনে রেখাপাত করেন তাঁরা হলেন অর্চনার ভূমিকায় সুনীল ঘোষ, প্রণবের ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র দাস ও শত্রুঘ্নর ভূমিকায় কৃষ্ণ-কুমার সিংহ। সত্যশরণ রাণী, শ্যামলাল রায়ের সব কখানি গানই সুগীত হয়েছে।

প্রেয়সী

গত ১০ই সেপ্টেম্বর পোর্ট কমিশনার্স চীফ ইঞ্জিনীয়ার্স অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা স্টার রঙ্গমঞ্চে সুবোধ ঘোষের 'প্রেয়সী' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। একক ও দলগত অভিনয় সুষ্ঠু হলেও পরিচালনা ক্ষেত্রে দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেল কম্পোজিশন ও অতিনাটকীয় অভিনয়ে। যদিও এই প্রয়াসে সাধারণ দর্শকের মনরঞ্জন করা যায় তবুও সামাজিক নাটকে এর ব্যতিক্রম বাঞ্ছনীয়। এসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সামাজিক বিচারে নাটকটি উপভোগ্য হয়েছিল। তপন ভট্টাচার্য (নির্মল), রঞ্জিৎ শিকদার (অরুণ), দিলীপ গুহ (কমল বিশ্বাস), অবনী দাস (অতীস) অতীব-সুন্দর। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (রাম-কানাই), দিলীপ বসু (অসিত), কার্তিক মল্লিক (গাঙ্গুলী), প্রশান্ত মিত্র (জীমূত), ভূপতি পাইক (ভগবত), শান্তি বসু (পাঁচু), সনৎ মুখোপাধ্যায় (সাধন চৌধুরী)।

স্ত্রী চরিত্রে সার্থক অভিনয় করে রাণু রায় (কেতক), সুতপা ভট্টাচার্য (কাজরী), নমিতা দত্ত (পুলকিতা)। শ্রীমতী ভট্টাচার্যের কণ্ঠের গানটি শ্রুতি-মধুর ও সুগীত। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন মানসী বন্দ্যোপাধ্যায় (সুধাময়ী), প্রতিমা চক্রবর্তী (বিজয়া) মালতী চৌধুরী (পিসিমা)। সঙ্গীতের কাজ প্রশংসনীয়। আলোর কাজ স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হলেও ভালো।

রোজিনা প্রেসের প্রীতি সম্মেলন

গত ১৭ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার রোজিনা প্রেসের কর্মকেন্দ্রে বিশ্বকর্মা পুজা উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রীতি সম্মেলনে যোগ দেন সর্বশ্রী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখার্জি, বিভা মিত্র, পঞ্চানন মুখার্জি, ঋত্বিক ঘটক, বিভাস চক্রবর্তী, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাক্তন এম. এল. সি, এম. এল. এ ও নাট্য কুশলীবৃন্দ। ঐ পুণ্যাহে আনুষ্ঠানিকভাবে 'অভিনয় দর্পণের' শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

সূর্যগ্রাস

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল অ্যাকাউন্টস রিক্রিয়েশন সম্প্রতি নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট মঞ্চে সজল রায়চৌধুরী ও রথু চক্রবর্তী রচিত 'সূর্যগ্রাস' নাটকটি অভিনয় করেন। অমিয় ভট্টাচার্যের নির্দে-শনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধ নিহিত ছিল।

জলসা

ব্রজেন্দ্রকিশোর সংগীত সম্মেলন

শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বার্ষিক স্মৃতিসভা উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সম্মেলনের সভ্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন এম, এল, সি) এবং সঙ্গীতাচার্য টি, এল রানা।

এই সভায় কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী দুই গুণী শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় ও তানসেন বংশের প্রতিভূ বীণ-বিশারদ 'উজির খাঁ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র খলিফা হাজী সগীর খাঁ সাহেবকে দুটি মানপত্রের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের ভাষণে শ্রীকেশব বন্দ্যো-পাধ্যায় ও টি, এল রানা ভারতের সংস্কৃতি জগতে ব্রজেন্দ্রকিশোরের বিবিধ অবদান ও রামপুর ঘরানার গৌরবময় সঙ্গীত ঐতিহ্যের উল্লেখ করে এই স্মৃতি-সভার সার্থকতা বিশ্লেষণ করেন। মুকুল চক্রবর্তী ও এই স্মৃতিসভার উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ প্রদান করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকালী ভট্টাচার্যের বেদমন্ত্র পাঠ করে মাংগলিক অনুষ্ঠানের পর কুমার বীরেন্দ্রকিশোর সমাগত অতিথিদের স্বাগত জানান। ডাঃ শ্যামলকুমার বসু ও মঞ্জু বসুর কন্যা শ্রীমতী শুক্লাতিথি বসুর কত্থক-নৃত্যে প্রতিশ্রুতির আভাষ রসিকবৃন্দকে আনন্দ দিয়েছে।

রবীন্দ্র-সংগীতের এক সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দিলেন শ্রীমতী বাণী ঠাকুর। ইনি ছাড়া শ্রীমতী বাসন্তী বাগচী ('ব্রজেন্দ্র-কিশোরের দৌহিত্রী), অসীমা দে ও জয়শ্রী দাশ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

উচ্চাঙ্গ সংগীত ও রাগপ্রধান বিবেকানন্দ সঙ্গীতে ছিলেন শ্রীজগন্নাথ মুখোপাধ্যায়। সেনী ঘরানার বিশুদ্ধ আঙ্গিকে স্বারস্বত দেশ রাগের আলাপ বীণ বাজিয়ে শোনালেন বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুযোগ্য শিষ্য পঞ্চানন রায়চৌধুরী।

প্রখ্যাত শিল্পী রাজা রায় 'বাগেশ্রী' রাগে সেতার বাজিয়ে শোনান। আলাপ বিলম্বিত ও দ্রুতগতি সেনী ঘরানার ছাপ বিদ্যমান।

সংগতে ছিলেন নীরদবরণ কুণ্ডু ও পঞ্চানন রায়চৌধুরী।

পরিশেষে 'ব্রজেন্দ্রকিশোরের প্রিয় রাগ পাহাড়ী ঝিঁঝিট বাজিয়ে কুমার বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী পিতার স্মৃতিতর্পণ করলেন।

হাজারীবাগে ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্র তিরোধান দিবস পালন

রবীন্দ্রনাথের অখন্ড সৌন্দর্যবোধ তাঁর কাব্যপ্রবাহে যে এক অনির্বচনীয় রূপ দিয়েছে, সেটি মানব-অন্তরে শুধু নয়, বিশ্বচরাচরে পরিব্যপ্ত। জন্মের মধ্যে যে শুরু, মৃত্যুর মধ্যে তার সামগ্রিক বিকাশ, তাই অন্ধকার বলে মৃত্যুকে এড়াতে চাইলে একটি বিরাট ফাঁক থেকে যাবে। রবীন্দ্র-দর্শনের এই একটি বিশেষ দিক নিয়ে ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্র পাঠচক্র রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে একটি স্মৃতিসভা করেছিলেন। অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবির বিভিন্ন কবিতার স্তরে স্তরে যে অনুভূতি তা ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রানুরাগীদের সামনে তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রসংগীতগুলিতে কবিপ্রাণের আকুতি শিল্পীরা দরদী কন্ঠে পরিবেশন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কবি মৃত্যুকে 'শেষ' বলতে দ্বিধা করেছিলেন, স্বীকার করেছিলেন যতবার ভয়ের মুখোসকে বিশ্বাস করেছেন ততবার হয়েছে পরাজয়—বিরহ, মিলন সবই একই সুরে বিচিত্রতর অনুভূতি দিয়ে রচিত প্রায় ১২টি সংগীত শিল্পীরা পরিবেশন করলেন ও দর্শকবৃন্দ নতমস্তকে পুণ্যদিনটিতে মহামিলনের সংগীত শুনলেন। শিল্পীরা ছিলেন গীতা-ঞ্জলির শ্রীমতী ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বলা ঘোষ, সংঘমিত্রা রায়, বিদ্যুৎ সেন ও রথীন্দ্র সান্যাল। লিলি সেনগুপ্ত নিপুণতার সঙ্গে গ্রন্থনা করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সভাপতি অমলকৃষ্ণ বসু ও সুবক্তা রমাপতি গুপ্ত।

সুরগীতি বালিকা সংগীতালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ১৫ই আগষ্ট '৬৮ বৃহস্পতিবার সুরগীতি বালিকা সঙ্গীতালয়ের ২২তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি শ্রীসুশীলচন্দ্র নিয়োগী, প্রধান অতিথি সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সান্যাল সঙ্গীতের প্রসারতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্যামপুকুর গীতিনাট্য সমাজ

শ্যামপুকুর অবৈতনিক গীতিনাট্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতায় প্রায় শতবর্ষ পূর্বে। সুদীর্ঘকালব্যাপী বিভিন্ন নাটকের গীতাভিনয়ের মাধ্যমে তৎকালীন সাংস্কৃতিক জগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এই সংস্থা। এদের অভিনীত সাধু তুকারাম গীতিনাট্যটি পঞ্চাশ রজনী অভিনয়ের পর তৎকালীন পরিচালক ডাঃ অমূল্য মুখোপাধ্যায়ের বিয়োগে সমাজের কর্মসূচীতে সাময়িক বিরতি ঘটে। সম্প্রতি শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও সম্ভ্রান্ত পল্লীবাসীদের উৎসাহে এই সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। সম্প্রতি এই সংস্থার আগামী নাটক 'কবি চণ্ডিদাস' নাটকের শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নাটকের প্রধান ভূমিকায় শিল্পী নির্বাচিত হন নীরেন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুনীতি দাস। পরিচালনা ও সুরারোপের দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে গোকুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল গোস্বামী।

বিখ্যাত সেনী-রবাবী মহম্মদ আলি খাঁর জন্মোৎসব

অন্যান্য বছরের মত এবারও সেনী-সঙ্গীত সমাজের পক্ষ থেকে রামমোহন লাইব্রেরী হলে দুইদিনব্যাপী এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় শ্রদ্ধেয় ধ্রুপদী সেনী ঘরানার ওস্তাদ মহম্মদ আলির ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে।

প্রথম দিনে শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্ন্যালের জয়-জয়ন্তী রাগে পরিবেশিত আলাপ ও ধ্রুপদ এবং মালকোষ রাগের ধামারএ দুই বিভিন্ন ঘরানার ধ্রুপদী গায়কী প্রদর্শন করেছেন। ধ্রুপদে শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই অনুষ্ঠানের শিক্ষামূল্য যথেষ্ট।

শওকত আলি খাঁ সুরশৃংগারে আলাপ জোড়, দ্রুত জোড় ও ঝালায় সেনী-ঘরানার বৈশিষ্ট্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

সংগীতশাস্ত্রী কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অনুষ্ঠানের পূর্বে সংক্ষিপ্ত ভাষণে ধ্রুপদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকা গোস্বামী এবং বড়মিয়া মহম্মদ আলী খাঁ ধ্রুপদে প্রধানতঃ গওহরবাণী-অঙ্গের ওপরই জোর দিতেন। বিভিন্ন ঘরানার গায়কী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সযত্নে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করে—ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত-রীতিকে বাঁচিয়ে রাখা সঙ্গীত-সমাজের কর্তব্য। এরপর তিনি কণ্ঠসংগীত ও গওহার-বাণী-প্রধান করে গৌড়-মল্লার—পরিবেশন করেন। অন্যান্য শিল্পী রাজীবলোচন দে, ভোলানাথ পাঠক, কল্পনা চট্টোপাধ্যায়, কালিপদ চট্টোপাধ্যায়।

বন্যাত্রাণে অভিনেতৃ সংঘ

বন্যাত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য অভিনেতৃ সংঘের উদ্যম সার্থক। মাত্র কয়েক-দিন আগে রবীন্দ্রসদনে এই সংঘের সদস্য-দের আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে পূর্ণ প্রেক্ষা-গৃহে সগৌরবে এই মহৎ উদ্দেশ্যের উজ্জ্বল ছবি পাওয়া গেল।

এরা উপহার দিয়েছিলেন বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দের কণ্ঠসংগীত, আবৃত্তি, ইয়ুথ কয়ারের লোকনৃত্য ও সংগীত এবং ডি এল রায়ের সুবিখ্যাত কৌতুকনাট্য "পুনর্জন্ম"।

সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হয় দ্বিজেন

সুরদাস সংগীত সম্মেলনে বিনায়করাও পটবর্ধন, আমজাদ আলী খাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয়। চিত্রে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন অরুণ রায়চৌধুরী এবং সম্মেলনের সম্পাদক স্বদেশ সান্যাল। ফটো : অমৃত

মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। 'একদা তুমি প্রিয়ে' এবং 'তোমার গীতি'—দুটি গানই শিল্পীর পরিবেশনার আন্তরিকতা ও কণ্ঠসৌকর্যে শ্রোতাদের চিত্তজয় করেছে।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা'—কণ্ঠের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য এবং ভাবুক শিল্পীর আবেগ ও অনুভবে এক রসসমৃদ্ধ পরিবেশ রচনা করেছিল।

উৎপলা সেনের 'মনরে, বরষা এল নয়নে' বর্ষার ছায়াঘন রূপাবেশে চিরন্তন বিরহী হৃদয়ের আর্তিকে এক সজল-করুণ সৌন্দর্যে চিত্রায়িত করেছে।

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুটি গানে 'জানি একদিন আমার জীবনী লেখা হবে' এবং 'সবকিছু ফেলে যদি'তে আবার যেন 'পাষাণের বুকে'র সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগের সতীনাথকে খুঁজে পাওয়া গেল।

নির্মলা মিশ্র ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। সংগীতাংশে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের দুটি রবীন্দ্রসংগীত 'ভাল-বেসে সুখ নাহি' ও 'এখন আমার সময় হোলো' দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়।

সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠানসূচী দুটি গানের মধ্যে শিল্পীদের পরিবেশনাকে সীমা-বদ্ধ রাখায়, অনুষ্ঠান বাহুল্যের ভারেও কোনো বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থাজনক বিরক্তি-কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে নি এবং প্রতিটি অনুষ্ঠান সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন ও উপ-ভোগ্য হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী অনুভা বসু (গুপ্তা), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সবিতাব্রত দত্ত যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শিল্পীদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব-বিভবে এবং মাদকতা ও উন্মাদনায় প্রতিটি কবিতার মর্মভাব যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

শ্রীমতী রমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায় ইয়ুথ কয়ারের লোকনৃত্য ও সংগীত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ-বেদনাকে নৃত্য ও সংগীতের ভাষায় রূপময় করে তোলে। স্ব-বৈশিষ্ট্যে এ অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। অভিনেতৃ সংঘ অভিনীত ডি এল রায়ের "পুনর্জন্ম" ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্যাম লাহা, নীলিমা দাস এবং আরো অনেক সুদক্ষ শিল্পীদের অভি-নয়কুশলতায় সারা প্রেক্ষাগৃহে যেন হাসি ও আনন্দের প্রস্রবণ উৎসারিত করে দর্শক-চিত্তকে এক নির্মল আনন্দের সরিক করে তুলেছিল।

এমন একটি জমজমাট সহজ, সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য অকৃপণ অভিনন্দনের দাবী রাখেন—সর্বশ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার এবং সংঘের অন্যান্য নাম-না-জানা সভ্য।

গ্রামোফোন কোম্পানীর শারদোৎসব

বর্তমানের সংগ্রামক্ষুব্ধ, দৈন্য-লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত বাঙালী জীবনের অশ্রুজলের মাঝেও আনন্দময়ীর আগমন যথাসময়েই ঘটবে, ক্ষণিকের জন্যও জীবন-যন্ত্রণাকে হাসির আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে। সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিল রবীন্দ্রসদনে গ্রামোফোন কোম্পানী আয়োজিত শারদোৎ-সব।

এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীদের কণ্ঠে তাঁদের পুজোর রেকর্ডের গানগুলি পূর্ণ অর্কেস্ট্রা সহযোগে শোনা গেল। শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কীর্তন-পদাবলী' হয় সূচনাসংগীত।

পিন্টু ভট্টাচার্য, বনশ্রী সেনগুপ্ত, মাধুরী চট্টোপাধ্যায় উদীয়মান তরুণশিল্পী হিসাবে শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

শ্রীমতী ইলা বসু সুধীন দাশগুপ্তের পরিচালনায় যে গানটি গেয়ে শোনালেন অনেকটা স্পেনিস ড্যান্সের ধাঁচের। শিল্পীর গাইবার উদ্দীপনা যথেষ্ট এবং এই সুর ও রুলিং পরিশ্রমসহকারে আয়ত্ত করেছে। নতুনত্বে গানটি উপভোগ্য।

শ্রীসনৎ সিংহের ছড়াগানে পুজোর পরীক্ষাভীত ছাত্রছাত্রীদের মনের ভাবনার সকৌতুক চিত্র আমাদের আনন্দ দেয়।

শ্রীমতী আরতি বসুর কণ্ঠে নচিকেতা ঘোষের সুরে 'চুপি চুপি' গানটি ভৈরবী সুর দাদরা ছন্দে সত্যিই রস-মধুর।

তরুণ কৌতুকশিল্পী শ্রীমিন্টু দাশগুপ্তের কৌতুকনকসা কৌতুকবহ হতে পেরেছে।

শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়-গীত অতুলপ্রসাদ গীতি বিস্মৃতপ্রায় চেনা সুরের গুঞ্জনে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করেছে।

খোকন মুখোপাধ্যায় এবং ই এ মুলকের দ্বৈত-যন্ত্রসংগীত এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গীটার সুপরিবেশিত।

আপন যোগ্যতায় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরভরা সু-পরিশীলিত কণ্ঠে, শিল্পীজনোচিত বিভোরতায় পরিবেশিত একটি গানই শ্রোতাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন আদায় করে নিয়েছে।

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মনকে নিয়েই আমার যত ভাবনা' ছন্দের দোলায় চিত্ত-গ্রাহী।

নির্মলা মিশ্রর গান-সুন্দর কণ্ঠে আছে প্রচুর সম্ভাবনা। উপযুক্ত শিক্ষা ও রেওয়াজে ইনি অনায়াসে উচ্চমানে পৌঁছতে পারবেন।

শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গীত দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের গানটির নাটকীয় আবেদন ও শিল্পী আপন দক্ষতায় শ্রোতাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছেন। এই প্রথম নিজস্ব পরিচালনায় তাঁর গান শোনা গেল।

আরতি বসুর ছড়াগানে কণ্ঠের প্রাণোচ্ছলতা আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য—আপন গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব—বৈশিষ্ট্যে আজও অবিচলিত।

নির্মলেন্দু চৌধুরীর লোকগীতি তাঁর স্বাভাবিক মানে প্রতিষ্ঠিত।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গান সুগীত।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তায় সগৌরবে সমাসীন।

এই অনুষ্ঠানসূচীর নতুনত্ব হোল প্রত্যেকটি গানের পূর্বে এক শিল্পী দ্বারা অপর শিল্পীর পরিচয় ঘোষণা।

সুরতীর্থের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সুরতীর্থের পঞ্চদশ বর্ষ-পূর্তি উৎসব উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তিন দিনব্যাপী নৃত্যগীতের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রীমতী নীহারকণা মুখোপাধ্যায়।

সংগীতের অনুষ্ঠান সুরু হয়, শিক্ষার্থিনীদের ধ্রুপদ সংগীত দিয়ে। যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী সিংহ, নিবেদিতা ভট্টাচার্য, নমিতা ভট্টাচার্য, ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চট্টোপাধ্যায়, মীরা হালদার। সঙ্গতে ছিলেন অমলেশ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী নূপুর ভট্টাচার্যের কত্থক নৃত্যে প্রপ্রতিশ্রুতির ছাপ আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে সভা উদ্বোধন করেন ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ এস এন সেন। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী মনোরমা ভীরা। অভ্যর্থনা সমিতির ব্যবস্থাপক শ্রীএ টি কানন। পৌরোহিত্য করেন শ্রীসতীকান্ত গুহ।

বিরতির পর শ্রীমতী রুক্মাবানা সেনগুপ্ত কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন। রাগ—মারু বেহাগ। সঙ্গতে ছিলেন অমল সরকার।

প্রতিষ্ঠানের শিশু শিল্পীদের লোকনৃত্য উপভোগ করবার মত! এই শিক্ষালয়ের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হোল কবিগুরুর "শাপমোচন।" শান্তি বসুর নৃত্য পরিচালনায় বৈদগ্ধ্য ও রুচির পরিচয় ছিল। শিল্পীরাও সুশিক্ষিত। গানগুলি অনুষ্ঠান-সার্থকতার সহায়ক। অরুণেশ্বরের ভূমিকায় শ্রীগোবিন্দম কুট্টি তাঁর নৃত্যমান অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছেন। তবে বারংবার সংলাপ বর্ণনা দর্শকদের কাছে একঘেয়ে, ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে বহুদিন বাদে আবার পদ্মভূষণ মিয়া বিসমিল্লার সানাই শুনতে পাওয়া গেল। ভাবুক শিল্পীর অনুভব-গভীর রাগবিশ্লেষণ একাধারে "কেদার"-এর শাস্ত্রসম্মত রূপ অন্যদিকে শিল্পীর সৃজনশীল মনের ঐশ্বর্যে পরিব্যাপ্তি প্রথম থেকে শেষ অবধি শ্রোতাদের অভিভূত করে রাখে।

উল্লেখযোগ্য কণ্ঠসংগীতানুষ্ঠান হোল এ টি কাননের খেয়াল। রাগ "মারোয়া"। স্বল্প পরিসরের মধ্যে স্ব-বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত মেজাজী তান ও বিস্তারে শিল্পী শ্রোতাদের খুসী করতে পেরেছেন। মনে রেখাপাত করেছে তাঁর আবেগভরা ঠুংরী। ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ ও মহম্মদ সগীরুদ্দীনের তবলা ও সারেঙ্গী সংগতে অনুষ্ঠানটি সরস করে তোলে।

দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পী রমলা চামুণ্ডেশ্বরীর ভারতনাট্যম ও নৃত্যনাট্য 'শিলাপ্পা করে মাধবী' এই উৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান।

প্রথম দিনে শ্রীমতী রমলা ভারতনাট্যমের আলারিপু, জাতিস্মরম, শব্দম, বর্ণম, নটনাম আদিনার, তিল্লানা অঙ্গ, যথাক্রমে নট্ট কল্যাণী, রাগমালিকা, মোহনম, বসন্ত—ইত্যাদি দক্ষিণ ভারতীয় রাগে পরিবেশন করেন। শিল্পীর প্রতিভা, উপযুক্ত গুরুর শিক্ষা, অনুশীলনী সব মিলিয়ে তাঁর নৃত্য উচ্চাঙ্গের। তিস্রম, মিশ্রম, আদি, ইত্যাদি বিভিন্ন তালের দ্রুতলয়েও তিনি অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। অভাব শুধু তাঁর নিজস্ব শিল্প-চিন্তা ও শিল্পী ব্যক্তিত্ব। স্বল্পানুসারী নিজের চিন্তাধারাটি তাঁকে খুঁজে নিতে পারলেই স্ব-বৈশিষ্ট্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

"ভারতনাট্যম" অঙ্গে পরিবেশিত 'শিলাপ্পা—কর মাধবী' বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী নৃত্যনাট্য নৃত্য ও উপাখ্যানের মিলনে আনন্দদায়ক হয়েছে। শ্রীমতী চামুণ্ডেশ্বরী অভিনয়ের বিরাট সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করেছেন।

এছাড়া আলোকপাত, সঙ্গীত ও সংলাপ সব মিলিয়ে টীম ওয়ার্ক সুসংবদ্ধ।

সৈন্য সংস্থার উদ্যোগে সঙ্গীত সভা

গত ৬ই জুলাই দুর্গাপুর প্রাক্তন সৈন্য সংস্থার উদ্যোগে সারারাতব্যাপী এক সংগীত সভার আয়োজন করা হয়। সভার সুরু হয় জনাব জামিল হায়দারের কণ্ঠসঙ্গীতের মাধ্যমে। ইনি কামোদ রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। পরে শ্রীশেফালী গঙ্গোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায় দ্বৈত কণ্ঠে জয়জয়ন্তী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। রাগেশ্রী রাগটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী ও শ্রীসত্যেন রায় যুগলে। শ্রীমতী সন্ধ্যা গুপ্তার কণ্ঠে মধুবন্তী রাগে খেয়াল সকলের প্রশংসা অর্জন করে। দরবারী কানাড়ায় সেতার বাজান ওস্তাদ আজিজ ওয়াহিদা খাঁ। পরবর্তী শিল্পী ছিলেন শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আভোগী রাগে আলাপ এক অপূর্ব রসঘন পরিবেশের সৃষ্টি করে। আলাপের বাজনা রাগের রূপকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। পরে ধ্রুপদ গানের শেষে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাগেশ্রীতে ধামার ও কোলুকীতে ঝাঁপতালের ওপর গান গেয়ে শোনান। এরপর শ্রীসুভাষ চাকলাদার মালকোষে খেয়াল পরিবেশন করেন। এঁর রাগ রূপায়ণের পরিকল্পনা, সরগমের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন তান অলংকার এক উচ্চমানের পরিচয় রেখেছে। একটি তারাণা গেয়ে ইনি অনুষ্ঠান শেষ করেন। কত্থক নৃত্যে কুমারী সুস্মিতা ঘোষের উপস্থিতি দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠান শেষ হয় প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রের বাজনার মাধ্যমে। ইনি বাজালেন আশাবরী ও ভৈরবী। এ অনুষ্ঠানে পাখোয়াজ তবলা ও সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন সর্বশ্রী সওকৎ আলী খাঁ, আফাক হোসেন খাঁ, মুন্সীলাল, চণ্ডীদাস সরকার, বিভাস ভট্টাচার্য ও ইকবাল হোসেন খাঁ।

—চিত্রাঙ্গদা

অলিম্পিক পরিক্রমা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ম্যারাথন দৌড়

প্রাচীন গ্রীসের একটি বীরত্বব্যঞ্জক এবং উন্মাদনাময় ঘটনার স্মরণার্থে আধুনিক-কালের অলিম্পিক গেমসে এই ম্যারাথন দৌড়ের অবতারণা। গ্রীসের প্রসিদ্ধ এথেন্স শহর থেকে প্রায় ২৭ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে ম্যারাথন অঞ্চল। খ্যাতনামা গ্রীক দৌড়বীর ফিডিপিডেজের স্বদেশভক্তি গ্রীক-জাতির শোণিতধারায় আজও মহান ঐতিহ্যে প্রবাহিত।

পঞ্চম শতাব্দীর কথা। গ্রীক সৈন্য-বাহিনী পারস্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যশালী সার্দিস নগর আক্রমণ করে শুধু ধনরত্ন লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত হয়নি, নৃশংস নর-হত্যায় শহরের বুকে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করেছিল। ক্ষুদ্র গ্রীস দেশের এই ধৃষ্ঠতায় ক্রুদ্ধ হয়ে পারস্য সম্রাট দরায়ুস হিপিয়াস তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনীকে গ্রীস দেশে প্রেরণ করেন। পারসিক সৈন্যবাহিনীর বিপুলতা এবং তাদের বিক্রমের কথা চিন্তা করে এথেন্সের নাগরিকদের চোখে রাত্রে ঘুম ছিল না। এথেন্সের গ্রীক সৈন্যবাহিনী ম্যারাথন প্রান্তরে পারসিক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত শত্রু-সৈন্যদের গ্রীস ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে দেয়। সুতরাং গ্রীস বিপদমুক্ত—শত্রুরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়ে প্রাণভয়ে পলায়িত—এই আশ্বাসবাণীটি ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সুদূর এথেন্স শহরের সদাশঙ্কিত নগরবাসীদের কানে কে পৌঁছে দিয়ে আসবে? ক্ষুদ্র গ্রীক সৈন্যবাহিনী বিশাল পারসিক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। প্রতি পদক্ষেপে এখন তাদের পায়ের হাটু ভেঙে পড়ছে। গ্রীক সৈন্য দলের জয়লাভের সুসংবাদ এথেন্সকে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব নেবে—এই কঠিন কর্তব্যের আহ্বানে যে একজন মাত্র যুবক এগিয়ে এসেছিলেন তিনি গ্রীসের খ্যাতনামা দৌড়বীর ফিডিপিডেজ। দুর্গম পথ অতিক্রম করে তিনি এথেন্স অভিমুখে পদব্রজে ছুটে যান। বহু দৌড় প্রতি-যোগিতায় তিনি নেমেছেন, কিন্তু এ দৌড়ের উত্তেজনা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখানে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই—অথচ বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশী। এথেন্স নগরে পৌঁছে রণক্লান্ত ফিডিপিডেজ তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে আনন্দের খবরটা ঘোষণা করলেন "তোমরা আনন্দোৎসব কর, আমরা জয়ী"। মাত্র এই কথাগুলি বলেই ফিডিপিডেজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই মহান মৃত্যু গ্রীসের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ম্যারাথন থেকে এথেন্স—ফিডিপিডেজের এই দৌড় পরি-ক্রমাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়—এর তুলনা নেই। ফিডিপিডেজের এই ঐতিহাসিক দৌড়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফরাসী ঐতিহাসিক মাইকেল ব্রীলের প্রস্তাবে আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন বছরেই 'ম্যারাথন' দৌড় ক্রীড়া-সূচীতে স্থান পায়। ম্যারাথন দৌড় বিজয়ীর পুরস্কার হিসাবে মাইকেল ব্রীল যে একটি কাপ উপহার দিয়েছিলেন তা বর্তমানে ম্যারাথন দৌড়ের প্রথম স্থান অধিকারীকে দেওয়া হয় না। ব্রীল কাপটি স্মারক হিসাবে অলিম্পিক গেমসের মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে।

অলিম্পিক গেমসের দৌড় অনুষ্ঠানে দীর্ঘতম দৌড় এই ম্যারাথন—দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। ফিডিপিডেজের ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্যন্ত দৌড় পরিক্রমার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই দূরত্ব নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ম্যারাথন দৌড়ের দীর্ঘ ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ দূরত্ব অতিক্রম করা খুবই কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার। অলিম্পিক গেমসে দেখা গেছে অনেকেই সমাপ্তি রেখা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি, মাঝপথে অবসর নিয়েছেন। ১৯১২ সালের স্টকহলম অলি-ম্পিকের ম্যারাথন দৌড়ে পর্তুগালের ল্যাজারো মৃত্যুবরণ করেন। দৌড়বীরদের অচেতন হওয়ার ঘটনা তো আছেই। এ পর্যন্ত অলিম্পিক গেমসের ম্যারাথন দৌড়ে দুবার স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন একমাত্র ইথিয়োপিয়ার আবেবে বিকিলা (১৯৬০ ও ১৯৬৪)। ১৯৫২ সালের ম্যারাথন দৌ চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপে স্বর্ণ পদক জয় এই কারণে বিশেষ উ যোগ্য যে, তিনি ঐ বছরেই অলিম্পি দূরপাল্লার—৫০০০ ও ১০,০০০ মি দৌড়েও স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছিলে অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে একই ব এই তিনটি দূরপাল্লার দৌড়ে স্বর্ণ প জয়ের আর দ্বিতীয় নজির নেই।

এমিল জেটোপেক
১৯৫২ সালের ম্যারাথন বিজয়ী

ম্যারাথন দৌড় বিজয়ীবৃন্দ

বছর	বিজয়ী	দেশ	ঘঃ	মিঃ	সেঃ
১৮৯৬	স্পাইরিডন লুইস	গ্রীস	২	৫৮	৫০·০
১৯০০	মাইকেল তিয়াতো	ফ্রান্স	২	৫৯	৪৫·০
১৯০৪	টমাস হিকস	আমেরিকা	৩	২৮	৫৩·০
১৯০৮	জন হেজ	আমেরিকা	২	৫৫	১৮·৪
১৯১২	কেনেথ ম্যাকআর্থার	দঃ আফ্রিকা	২	৩৬	৫৪·৮
১৯২০	হেনেস কোলেমেনেন	ফিনল্যান্ড	২	৩২	৩৫·৮
১৯২৪	এ্যালবিন স্টেনরুজ	ফিনল্যান্ড	২	৪১	২২·৬
১৯২৮	এল ওয়াফি	ফ্রান্স	২	৩২	৫৭·০
১৯৩২	জুয়ান সি জাবালা	আর্জেন্টিনা	২	৩১	৩৬·০
১৯৩৬	কিটি সন	জাপান	২	২৯	১৯·২
১৯৪৮	ডেলফো ক্যাব্রেরা	আর্জেন্টিনা	২	৩৪	৫১·৬
১৯৫২	এমিল জ্যাটোপেক	চেকোঃ	২	২৩	০৩·২
১৯৫৬	আলা মিমু	ফ্রান্স	২	২৫	০০·০
১৯৬০	আবেবে বিকিলা	ইথিয়োপিয়া	২	১৫	১৬·২
১৯৬৪	আবেবে বিকিলা	ইথিয়োপিয়া	২	১২	১১·২

সর্বাধিক পদক জয়

স্বর্ণ : ফ্রান্স — ৩টি; রৌপ্য : গ্রেট বৃটেন—৪টি; ব্রোঞ্জ : আমেরিকা—৪টি

মোট পদক জয়

সর্বাধিক : আমেরিকা—৭টি (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ১, ব্রোঞ্জ ৪)। এই তালিকায় ২য় স্থানে আছে অস্ট্রেলিয়া ৫টি পদক।

উপর্যুপরি দুবার স্বর্ণ পদক জয়

ম্যারাথন দৌড়ে দুবার স্বর্ণ পদক জয়ের রেকর্ড করেছেন ইথিওপিয়ার আবেবে বিকিলা (১৯৬০ ও ১৯৬৪)।

অলিম্পিক রেকর্ড

২ ঘঃ ১২ মিঃ ১১·২ সেঃ, আবেবে বিকিলা (ইথিয়োপিয়া), ১৯৬৪

১১০ মিটার হার্ডলস্

অলিম্পিকের ১১০ মিটার হার্ডলস অনুষ্ঠানে মোট ৪৪টি পদকের মধ্যে আমেরিকা একাই ৩৬টি পদক জয়ী হয়েছে (স্বর্ণ ১৩, রৌপ্য ১২ এবং ব্রোঞ্জ ১১। বাকি ৮টি পদক নিয়েছে বৃটেন (৩), দক্ষিণ আফ্রিকা (২), কানাডা, সুইডেন এবং অস্ট্রেলিয়া। বিগত পনেরটি অলিম্পিক গেমসে (১৮৯৬—১৯৬৪) আমেরিকা মাত্র দুবার স্বর্ণ পদক জয়ী হয়নি; ১৯২০ সালে কানাডা এবং ১৯২৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বর্ণ পদক জয়ী হয়ে আমেরিকার একটানা স্বর্ণ পদক জয়ের পথে বাধা দেয়। ১৯২০ ও ১৯২৮ সালে আমেরিকা স্বর্ণ পদক না পেলেও রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল।

বিবিধ রেকর্ড

উপর্যুপরি সর্বাধিক স্বর্ণ পদক জয় :

৭ বার—আমেরিকা (১৯৩২—১৯৬৪)

৫ বার—আমেরিকা (১৮৯৬—১৯১২)

একই বছরে তিনটি পদক জয় :

আমেরিকা : ১৯০০, ১৯০৪, ১৯০৮ ১৯১২ (উপর্যুপরি ৪টি অলিম্পিক), ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৬ ও ১৯৬০ (উপর্যুপরি ৪টি অলিম্পিক)

একমাত্র নজির

১১০ মিটার হার্ডলসে দুবার স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন একমাত্র আমেরিকার লী কলহাউন (১৯৫৬ ও ১৯৬০)।

অলিম্পিক রেকর্ড

১৩·৫ সেকেণ্ড : লী কলহাউন (আমেরিকা), ১৯৫৬ এবং জ্যাক ডেভিস (আমেরিকা), ১৯৫৬

৪০০ মিটার হার্ডলস

অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীতে ৪০০ মিটার হার্ডলস দুবার ছিল না—১৮৯৬ ও ১৯১২ সালে। তেরটি অলিম্পিকে মোট ৩৯টি পদকের মধ্যে আমেরিকা একাই ২৬টি পদক জয়ী হয় (স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৮)। বাকি ১৩টি পদক ভাগাভাগি করে নেয় ১১টি দেশ। তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ইংল্যাণ্ডের পদক সংখ্যা ৩টি (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১)। আমেরিকার উপর্যুপরি ৫ বার (১৯০০—১৯২৪) স্বর্ণ পদক জয়ের পর ১৯২৮ সালে গ্রেট বৃটেন এবং ১৯৩২ সালে আয়ার স্বর্ণপদক জয়ী হয়। ১৯৩৬ সাল থেকে আমেরিকা উপর্যুপরি ৮ বার স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে। কোন দেশ তাদের একটানা জয়লাভের পথে আর নাক গলাতে পারেনি। আমেরিকা যে দুবার (১৯২৮ ও ১৯৩২) স্বর্ণ পদক জয়ী হয়নি সে দুবারই রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। ৪০০ মিটার হার্ডলসে দুবার স্বর্ণ পদক জয়ের গৌরব লাভ করেছে একমাত্র আমেরিকার গ্লীন ডেভিস (১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালে)।

উল্লেখযোগ্য রেকর্ড

উপর্যুপরি সর্বাধিক জয় :

আমেরিকা : ৬ বার (১৯৩৬—৬৪)

একই আসরে তিনটি পদক জয় :

আমেরিকা : ১৯০৪, ১৯২০, ১৯৫৬ ও ১৯৬০

৩০০০ মিটার স্টিপল্‌চেজ

স্টিপলচেজ অনুষ্ঠানটি ১৯০০ সালের অলিম্পিক ক্রীড়াসূচীতে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হলেও ১৯২০ সালের আগে পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব ছিল না। ১৯২০ সাল থেকে ৩০০০ মিটার দূরত্ব বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বিগত ১০টি অলিম্পিক গেমসের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে এই ৬টি দেশ—ফিনল্যাণ্ড (৪টি), গ্রেট বৃটেন (২টি), সুইডেন, আমেরিকা, পোল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম (শেষ চারটি দেশ একটি করে স্বর্ণ পদক পায়)। মোট পদক জয়লাভের তালিকায় ফিনল্যাণ্ড (৮টি) প্রথম, গ্রেট বৃটেন (৫টি) দ্বিতীয় এবং রাশিয়া (৪টি) তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

উল্লেখযোগ্য রেকর্ড

উপর্যুপরি সর্বাধিক জয় :

ফিনল্যাণ্ড : ৪ বার (১৯২৪—৩৬)

একই আসরে তিনটি পদক জয় :

ফিনল্যাণ্ড (১৯২৮) এবং সুইডেন (১৯৪৮)

দুবার স্বর্ণ পদক জয় :

ভলমারি ইসোহোলো (ফিনল্যাণ্ড), ১৯৩২ ও ১৯৩৬

৪×১০০ মিটার রিলে

অলিম্পিক ক্রীড়াসূচীতে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯১২ সালে। বিগত ১১টি অনুষ্ঠানে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে মাত্র এই তিনটি দেশ : আমেরিকা (৯টি), গ্রেট বৃটেন (১টি) এবং জার্মানী (১টি)। মোট ৩৩টি পদক জয়ের তালিকায় প্রথম আমেরিকা (৯টি), দ্বিতীয় জার্মানী (৬টি) এবং তৃতীয় গ্রেট বৃটেন (৫টি)। ১৯২০ সাল থেকে আমেরিকার উপর্যুপরি ৮ বার স্বর্ণ পদক জয়ের পর ১৯৬০ সালে জার্মানী স্বর্ণ পদক পায়।

অলিম্পিক রেকর্ড : ১৯৬৪ ৩৯·০ সেঃ আমেরিকা

৪×৪০০ মিটার রিলে

অলিম্পিক গেমসে এই রিলে অনুষ্ঠানের সূচনা ১৯১২ সালে। বিগত ১১টি আসরে স্বর্ণ পদক বিজয়ী হয়েছে মাত্র এই তিনটি দেশ—আমেরিকা (৮টি), গ্রেট বৃটেন (২টি) এবং জামায়িকা (১টি)। মোট পদক জয়ের তালিকাতেও আমেরিকার শীর্ষস্থানে—১০টি পদক (স্বর্ণ ৮ এবং রৌপ্য ২)। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী গ্রেট বৃটেনের মোট পদক সংখ্যা ৭টি (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ৩)।

২০,০০০ মিটার ভ্রমণ

১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে প্রথম তালিকাভুক্ত। বিগত তিনটি অলিম্পিকে এই দুটি দেশ স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে—রাশিয়া (২টি) এবং বৃটেন (১টি)। মোট পদক জয়ের তালিকায় ১ম রাশিয়া (৫টি) এবং ২য় বৃটেন (২টি)।

খেলাধূলা

দর্শক

ভারতীয় অলিম্পিক দল

মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগদানের জন্য ভারতীয় দল গঠন নিয়ে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন, অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের মধ্যে এতদিন যে বাদানুবাদ চলছিল তার একটা সুস্থ আপোষ-মীমাংসা হয়ে গেছে। স্থির হয়েছে খেলোয়াড়, কোচ এবং কর্মকর্তায় ৩৬ জন ভারতীয় অলিম্পিক দলের সঙ্গে যাবেন। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন থেকে ৩৯ জনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। অপর দিকে অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল ৩২ জন নিয়ে দল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ভারতীয় অলিম্পিক দলটি এইভাবে তৈরী হয়েছে : ১৮ জন হকি খেলোয়াড় এবং ২ জন কর্মকর্তা, ২ জন এ্যাথলীট এবং ১ জন কোচ কাম ম্যানেজার, ৪ জন কুস্তিগীর এবং ১ জন কোচ কাম ম্যানেজার, ১ জন ভারোত্তোলক এবং ১ জন কোচ কাম ম্যানেজার, ২ জন সুটার এবং ১ জন মেকানিক, ১ জন মুষ্টিযোদ্ধা, ১ জন স্যেফ দ্য মিশন এবং ১ জন সেক্রেটারী কাম ট্রেজারার। ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা বলিন্দর সিং স্যেফ দ্য মিশন এবং পাঞ্জাব অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মনোহর সিং গীল সেক্রেটারী ও ট্রেজারার পদের দায়িত্ব লাভ করেছেন।

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল

পূর্ব আফ্রিকা সফরে ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল ২—১ খেলায় কেনিয়া দলকে পরাজিত করে টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। ১ম টেস্টে কেনিয়া ৩—১ গোলে জয়ী হয়; ভারতবর্ষ ৩য় টেস্টে ১—০ গোলে এবং ৪র্থ টেস্টে ১—০ গোলে জয়ী হয়ে ২—১ খেলায় অগ্রগামী হয়েছিল। দ্বিতীয় টেস্ট ১—১ গোলে এবং ৫ম টেস্ট গোলশূন্যভাবে ড্র যায়। গত ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে ভারতবর্ষ হকি প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছিল; অপরদিকে কেনিয়া যোগ্যতার চূড়ান্ত তালিকায় পেয়েছিল ৯ম স্থান।

বিশ্ব রেকর্ড

আমেরিকার অলিম্পিক এ্যাথলেটিক্স দলের নির্বাচনী আসরে নীচের চারটি বিষয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। এই নির্বাচনী আসর বসেছিল কালিফোর্ণিয়ার সাউথ লেক টাহোতে—সমুদ্রতট থেকে এই স্থানের উচ্চতা ৭,৩৭৭ ফিট। অপর দিকে আসন্ন ১৯তম অলিম্পিক গেমসের আসর মেক্সিকো সিটির উচ্চতা ৭,৪১৫ ফিট। সুতরাং মেক্সিকো সিটির অলিম্পিক গেমসে খেলোয়াড়দের উন্নত ক্রীড়ামান সম্পর্কে যে দারুণ সন্দেহ করা হয়েছিল তার অনেকটা কেটে গেল। স্থানের উচ্চতা এ্যাথলীটদের উন্নত ক্রীড়া প্রদর্শনের পক্ষে যে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না তা এখন বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করছেন।

৪০০ মিটার হার্ডলস : জিওফ ভান্ডারস্টক। সময় : ৪৮·৮ সেঃ

পোলভল্ট : বব্ সিগ্রীন
উচ্চতা : ১৭ ফিট ৯ ইঞ্চি

৪০০ মিটার দৌড় : লী ইভান্স
সময় : ৪৪ সেঃ

২০০ মিটার দৌড় : জন কার্লোজ
সময় : ১৯·৩ সেঃ

ডেভিস কাপ

১৯৬৮ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষ ৪—১ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে পশ্চিম জার্মাণীর সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ডেভিস কাপের খেলায় জাপানের বিপক্ষে ভারতবর্ষ এই নিয়ে উপর্যুপরি আট বার জয়ী হল।

খেলার ফলাফল

প্রেমজিৎলাল ৬—২, ১—৬, ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে কিসিরো ইয়ানাগিকে পরাজিত করেন।

রমানাথন কৃষ্ণান ৬—২, ৩—৬, ৬—৩ ও ৬—২ গেমে কে জি ওয়াতানাবেকে পরাজিত করেন।

রমানাথন কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি ৬—৩, ৬—২, ৫—৭, ১—৬ ও ৬—০ গেমে কে জি ওয়াতানাবে এবং ইসাও ওয়াতানাবেকে পরাজিত করেন।

রমানাথন কৃষ্ণান ৬—৪, ৬—৩ ও ৬—১ গেমে কিসিরো ইয়ানাগিকে পরাজিত করেন।

ওয়াতানাবে ৮—৬, ৬—১ ও ৬—২ গেমে প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেন।

বেসিল ডি'অলিভিয়েরা

বৃটেনের জনমতের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত এম সি সি কর্তৃপক্ষ অশ্বেতকায় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বেসিল ডি' অলিভিয়েরাকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এম সি সি দলে স্থান করে দিয়েছেন। তাঁকে বাদ দিয়ে এম সি সি দল গঠন করায় বৃটেনে প্রতিবাদের তুমুল ঝড় উঠেছিল। দলের

বব্ সীগ্রীন (আমেরিকা) পোলভল্টে ১৭ ফিট ৯ ইঞ্চি উচ্চতা অ... করে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন

নির্বাচিত খেলোয়াড় টম কার্ট... অসুস্থতার কারণে সফরে যেতে... হওয়াতে দলের শূন্য স্থানটি অলি... রাকে দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। ...ভিয়েরার এম সি সি দলে স্থান প... খবর দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত সংবাদ... প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফে স্থান... সেখানের সাধারণ মানুষ বিজয়... পরম তৃপ্তি পায়। কিন্তু দক্ষিণ আ... শ্বেতাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী তাঁর রাজ... বর্ণবৈষম্য নীতি ত্যাগ করতে পারেন... তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, ... অবস্থায় এম সি সি দলকে দক্ষিণ আ... সফর করতে দেওয়া হবে না। ফলে আ...র্জাতিক পরিস্থিতি পুনরায় জটিল উঠেছে।

ফুটবলের হালচাল

গত কয়েকদিনে পশ্চিমবাংলার ফু... খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আই এফ এ-র ... জীবনে একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ... গেল—১৯৬৮ সালের আই এফ এ শ... খেলার উপর আদালতের ইনজাংসন, ... এফ এ-র সভাপতির পদত্যাগ এবং সু... লীগ খেলার বৈধতা নিয়ে আই এফ ... অফিসে রাজস্থান ক্লাবের সাধারণ স... দকের পদাঘাত। পুজোর আগে আই ... এ শীল্ড খেলা হচ্ছে না।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ ঃ
২য় খণ্ড

অমৃত

২২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 11th October 1968. শুক্রবার, ২৪শে আশ্বিন, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে

বর্তমান বছরে শুরু হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব। আমাদের সঙ্গে সারা পৃথিবী এই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে সামিল হয়েছে। সর্বদিক বিবেচনা করে শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাবে ও গাম্ভীর্যে আমাদের দায়িত্বই সর্বাধিক। সেদিক থেকে অমৃত পত্রিকার উদ্যোগ যথার্থ। রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল লেখকের মনোভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব এই পত্রিকা পালন করছে দেখে সত্যি খুশী হলাম। আরো জেনে ভাল লাগলো যে, এই ডায়েরীর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদও প্রকাশিত হবে। এরকম একটি মূল্যবান দলিল ইতিপূর্বে ইংরেজী ভাষায়ও অনূদিত হয়নি—সেদিক থেকেও এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

রম্যাঁ রলাঁ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল যথেষ্ট। কারণ তিনি ছিলেন যথার্থ ভারত-প্রেমিক। আর কোনরকম কল্পনা বা ভাবালুতার বশে এই প্রীতি নয়। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকেই তিনি এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেব এবং বিবেকানন্দ সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থও এই গভীর ভারতপ্রেমের নিদর্শন।

তিনি মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এ তথ্যটুকু আমাদের কাছে কখনই যথেষ্ট মনে হতে পারে না। গান্ধী সম্পর্কে তিনি ঠিক কি মনোভাব পোষণ করেছেন সেটুকুও আমাদের জানা প্রয়োজন। তাতে করে শুধু এই ভারতপ্রেমিক বিদেশীকেই জানা হবে না, সমকালে গান্ধীজির চিন্তাধারার যথার্থ মূল্যায়নেও সাহায্য করবে। আর সেদিক থেকেই এর গুরুত্ব সমধিক।

গান্ধীজির মত ও পথ নিয়ে আজ অনেক বিতর্কের অবকাশ আছে। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, বিতর্কের চুলচেরা নিখুঁতেই গান্ধীবাদের সঠিক মূল্যায়ন হবে। অহিংস প্রতিরোধ সারা পৃথিবীর চিন্তায় নতুন অধ্যায় সংযোজনা করেছে। এর ব্যবহারিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আমাদের দেশে এবং ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দেশেই এর সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা হচ্ছে। সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের এতবড় হাতিয়ার আর নেই। সুস্থ মানবিকতার স্বপক্ষে লড়াইয়ে নামতে হলে এপথ যে মোক্ষম সেটা আজ অনেকেই বুঝতে পেরেছেন। যদিও এসম্পর্কে রলাঁর মনে কিঞ্চিৎ সংশয় দেখা দিয়েছিল, তথাপি গান্ধীজির সংস্পর্শে আসার পর তিনি আস্থা অনেকটা ফিরে পেয়েছেন। বিশেষভাবে, গান্ধীজি যখন বিরাট সব ব্যক্তিকে এড়িয়ে এবং ভোজসভার তোয়াক্কা না করে দরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে সহজভাবে মিশতে পেরেছেন এবং তাঁদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন তখনই রলাঁ বুঝতে পেরেছেন এ এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, যাঁর কাছ থেকে তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ হতে পারে। রলাঁ চেয়েছিলেন, তরুণদের হৃদয় জয়ের মাধ্যমে গান্ধীর ইউরোপ অভিযান সফল হোক। এই অভিজ্ঞতায় তাঁর সে সাধ অনেকখানি পূর্ণ হয়েছে।

গান্ধীজি সম্পর্কে এরকম শ্রদ্ধান্বিত মনোভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আজকের অস্থির পৃথিবীতে এই মহাপুরুষের আদর্শ নতুন জিজ্ঞাসা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত। তাঁর শতবার্ষিকীতে অমৃত পত্রিকা এরকম একটি মহৎ কর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছে বলে পাঠক হিসেবে আমরা আনন্দিত।

মিহির রায়
কলকাতা—২৫

(২)

বর্তমান বৎসরে সারা বিশ্বব্যাপী মহাত্মা গান্ধীজী জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে। তার কিছু বিবরণ আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছি।

২১ সংখ্যা অমৃতে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে র‍্যম্যা রলাঁ-র ডায়েরীর যে অনুবাদ প্রকাশ সুরু হয়েছে, তার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কেবলমাত্র রলাঁই নন অন্যান্য বিদেশীর চোখে মহাত্মা যে কতখানি শ্রদ্ধার চরিত্র ছিলেন তার সম্পর্কে আমরা বিশেষ সচেতন নই। বর্তমান ডায়েরীটি প্রকাশিত হলে হয়ত আমরা সে সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে পারব। স্বদেশে স্বকালে বিতর্কিত পুরুষ রলাঁ। তাঁর খ্যাতি নিয়ে মতপার্থক্যের অন্ত নেই। কিন্তু এদেশে রলাঁর সম্মান বহুব্যাপ্ত। তাঁর বহু গ্রন্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত। এই সব গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় অনূদিত। ইংরেজি থেকেই বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে।

কিন্তু রলাঁর ডায়েরীর যে অংশটি অমৃতে প্রকাশিত হচ্ছে এর আগে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ হয়নি; ইংরেজিতেও নয়। সে কারণে আশাকরি এই রচনায় আমরা নতুন এক জগতের সন্ধান পাবো। শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য এই বিরাট কাজটি করে বাংলা দেশের অসংখ্য সুধী মানুষের ধন্যবাদ লাভ করবেন। সেই সঙ্গে অমৃত কর্তৃপক্ষকেও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

সিদ্ধার্থ চৌধুরী
কলকাতা—৯।

'বিবিধ ভারতীতে মেহমুদ' প্রসঙ্গে

গত ২৮শে ভাদ্র (১৯শ সংখ্যার) 'অমৃত'এর 'প্রেক্ষাগৃহ' বিভাগে 'বিবিধ ভারতীতে মেহমুদ' শীর্ষক সমালোচনাটির জন্য নান্দীকর মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের মত তিনিও যে ঐসব (আকাশবাণী থেকে প্রচারিত) অনুষ্ঠানাদি শোনেন তা জেনে খুশী হলাম। আর সবচে আনন্দের বিষয় যদি তিনি ঐরূপ সঙ্গ অনুষ্ঠানগুলির সমালোচনা মাঝে মা পাঠকদের জন্য 'অমৃত'এর মাধ্যমে ঐভা প্রকাশ করেন। অবশ্য একথাও ঠিক ঐসব অনুষ্ঠানাদির সমালোচনা ঐ বিভা নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আমি আকাশবাণীর বিবিধ ভারতী ঐ সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের একজন নিয়মি শ্রোতা। হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের শ্রে কৌতুকাভিনেতা মেহমুদ পরিবেশিত দিনের অনুষ্ঠানটি আমিও শুনেছিলাম সত্যি কথা বলতে কি তাঁর অবর্ণনী হাস্যরসাত্মক বলার ভঙ্গী শুধুমাত্র আমাক কেন —মনে হয় সমগ্র শ্রোতাকেই মু করেছে। অন্যান্য আর্টিস্টদের মত তি তাঁর বক্তব্যকে শুধুমাত্র 'ফিল্মি দুনিয় অর্থাৎ অভিনয় জগতের মধ্যেই আটকে রাখেন নি। তিনি বর্তমান ভারতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সুন্দরভাবে গানের মাঝে মাঝে পরিবেশ করে সমগ্র শ্রোতাকে আনন্দ দিয়েছেন।

আমি আশা করবো যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠানাদি আরও প্রচারিত হয় যাতে শ্রোতাদের আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে কিছু শিক্ষালাভও হয়।

এই প্রসঙ্গে আমি প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা মেহমুদকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মিস কুহেলী রায়
ঝরিয়া (ধানবাদ)
বিহার

'কোয়াসিমোদো' প্রসঙ্গে

সালভাতোর কোয়াসিমোদো প্রসঙ্গে ২০ সংখ্যার বিদেশী সাহিত্যে আলোচনা এবং পরের সংখ্যায় অলকা চক্রবর্তীর লেখা চিঠি পড়লাম। শ্রীমতী চক্রবর্তী যে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তা নিঃসন্দেহে আমাদের চরম লজ্জার বিষয়। 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি' বলে আত্মশ্লাঘা লাভ করতে পারি না। নিজেদের দৈন্য এবং দুর্বলতাকে কোনরকম আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখার প্রয়াস নিঃসন্দেহে নিন্দার্হ। অবশ্য পদে পদে এই জিনিসটাই আমরা অনুসরণ করে থাকি। এদেশের বহু মনীষীর কথা আমরা জানি, যাঁরা মৃত্যুর স্বল্পকাল মধ্যেই স্বদেশবাসীর স্মৃতি থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। এটা যে কোন জাতির পক্ষেই কলঙ্কজনক।

কোয়াসিমোদো নোবেল পুরস্কৃত কবি। তাঁর মৃত্যুর পর বাঙলা দেশে সম্ভবত অমৃত এবং দৈনিক যুগান্তরে যা সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। এজন্য দুই পত্রিকার সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই। অন্তত এঁরা যে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন তার পরিচয় পাওয়া গেল।

বিভাসিন্ধু লাহিড়ী
পূর্ব পুঁটিয়ারী
২৪-পরগণা
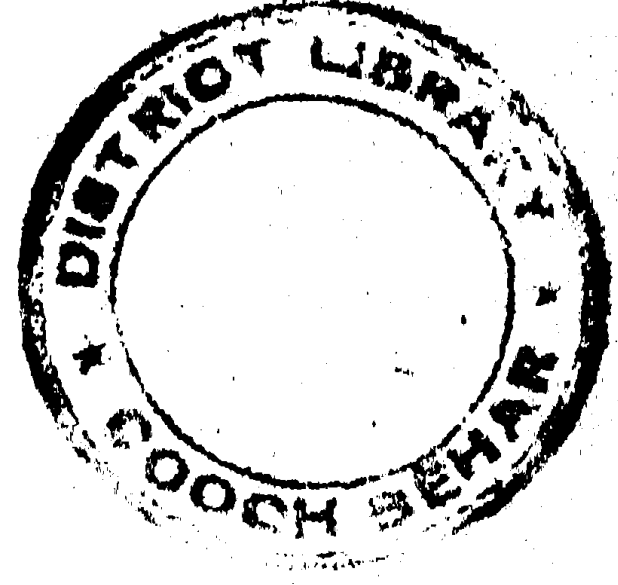
অমৃত সম্পাদকীয়

সামনেই নির্বাচন

আমাদের শুভানুধ্যায়ী সকলকে বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। দুর্গোৎসবের উজ্জ্বল দিনের স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকুক সকলের মনে। অমৃত তার সাধ্যমত এই আনন্দের উৎসবে পাঠক পাঠিকাদের মনে আনন্দ দেবার চেষ্টা করেছে। উৎসবের শেষে যখন আবার অবকাশের পর সুরু হবে কর্মের উদ্যোগ আয়োজন তখন যেন সেই সঞ্চিত আনন্দ, উৎসাহ এবং সহমর্মিতা উজ্জ্বলতর দিনের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত ও সার্থক করে তোলে।

বাংলাদেশে উৎসব শেষ হতে না হতেই নির্বাচনের আবহাওয়া এসে গেছে। ইতিমধ্যেই দেওয়ালে দেওয়ালে পড়েছে পোস্টার, প্রার্থীদের সবিনয় নিবেদনের পালা হয়েছে সুরু। মধ্যবর্তী নির্বাচনের আর বেশি দেরী নেই। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দিন নির্দিষ্ট করেছেন ১৭ নভেম্বর। নির্বাচনের সময়ে আবহাওয়া স্বভাবতই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। বিশেষত কংগ্রেস ও তার প্রতিপক্ষ যুক্তফ্রন্ট উভয়েই হৃতক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। গত নির্বাচনেই বাংলাদেশে কংগ্রেস প্রথম ক্ষমতাচ্যুতির তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। বিগত নির্বাচনেই বামপন্থী দলগুলি সর্বপ্রথম পশ্চিমবাংলায় স্বল্পকালের জন্য ক্ষমতাসীন হবার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিল। সুতরাং দুই পক্ষই এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনকে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লড়াই হিসেবে গ্রহণ করবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বিগত নির্বাচনের পর দেখা গিয়েছিল যে, বহু পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ায় কোনো পার্টিই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। এবারে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় সে জন্য সকল পক্ষই সচেষ্ট থাকবে। কারণ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে কোনো দলের পক্ষে স্থায়ী সরকার গঠন সম্ভব নয়। গণতন্ত্রে সকল পার্টির অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি প্রয়োজন আছে সরকার গঠনের উপযোগী পার্টির ক্ষমতা লাভ। মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রয়োজনই হত না যদি বিগত সাধারণ নির্বাচনে কোনো পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সমর্থ হত।

এবারের নির্বাচনের পর রাজনৈতিক পার্টিগুলির সামনে একটা বড় সমস্যা তৈরী হয় বেপরোয়া এবং নীতিহীন দলত্যাগকে কেন্দ্র করে। এই দলত্যাগের প্রলোভনে বহু দলের ইজ্জত নষ্ট হয়েছে, ক্ষমতা হস্তচ্যুত হয়েছে এবং মন্ত্রিসভার ঘটেছে অদল বদল। বাংলাদেশেও তা হয়েছে। এবারের নির্বাচনে ভোটাররা দলত্যাগ সম্পর্কেও নিজেদের অভিমত জানাবার সুযোগ পাবেন। মুখ্য নির্বাচন-কমিশনার এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে নির্বাচনী আচরণবিধি পালনের সুপারিশ করেছেন। নির্বাচনে মন্দির-মসজিদ-গীর্জার সাহায্য গ্রহণ কিংবা ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারের আশ্রয় না নেওয়া মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের সুপারিশের অন্যতম।

নির্বাচনী আচরণবিধি পালনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার সে কথা উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় কাজই করেছেন। নির্বাচনের নামে বহু নোংরামির আমদানী হয়ে থাকে। নির্বাচনে জেতাটাই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে কোনো ছলই পরিত্যাজ্য নয়, কোনো কৌশলই থাকে না অস্পৃশ্য। কিন্তু নির্বাচনই তো শেষ কথা নয়। নির্বাচন একটা উপায় মাত্র বলে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে নির্বাচন প্রার্থীদের সংযত ও শোভন আচরণই বাঞ্ছনীয়। গণতন্ত্রের সার্থকতা তো শুধু ভোটাধিকার অর্জন আর ভোট বাগানোর কেরামতিতে নয়। কাগজে গণতন্ত্রের সঙ্গে আসল গণতন্ত্রের পার্থক্যই হল মানুষের মতামতের মর্যাদাদানে। এতো আপসের লড়াই। কাজ দিয়ে, সেবা দিয়ে, দক্ষতা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ছাড়িয়ে যাওয়াই হল গণতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয়। টাকার জোরে, কিংবা অন্য কোনো কৌশলে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া গেলেও তাতে গণতন্ত্র জোরালো হয় না।

পশ্চিম বাংলা একটি রাজনীতি-সচেতন রাজ্য হিসেবে ভারতবর্ষে সুপরিচিত। তার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের প্রতিক্রিয়া দেশের অন্যত্রও অনুভূত হয়। বাংলাদেশে দলের অভাব নেই। নরম ও গরম, চরম দক্ষিণপন্থী থেকে চরম বামপন্থী সকল রকম দলই রাজনীতির আদর্শের ছাপ নিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। পুজোর ঢাকের বাদ্যি থেমেছে, গণপুজোর ঢাকে এবার কাঠি পড়ল। দেখা যাক লড়াই কেমন জমে।

কাছের ও দূরের গান্ধী স্বপ্নের সৌধ

রম্যাঁ রলাঁ

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অক্‌টোবর উদ্‌যাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থেকে
অনুবাদ : **লোকনাথ ভট্টাচার্য**
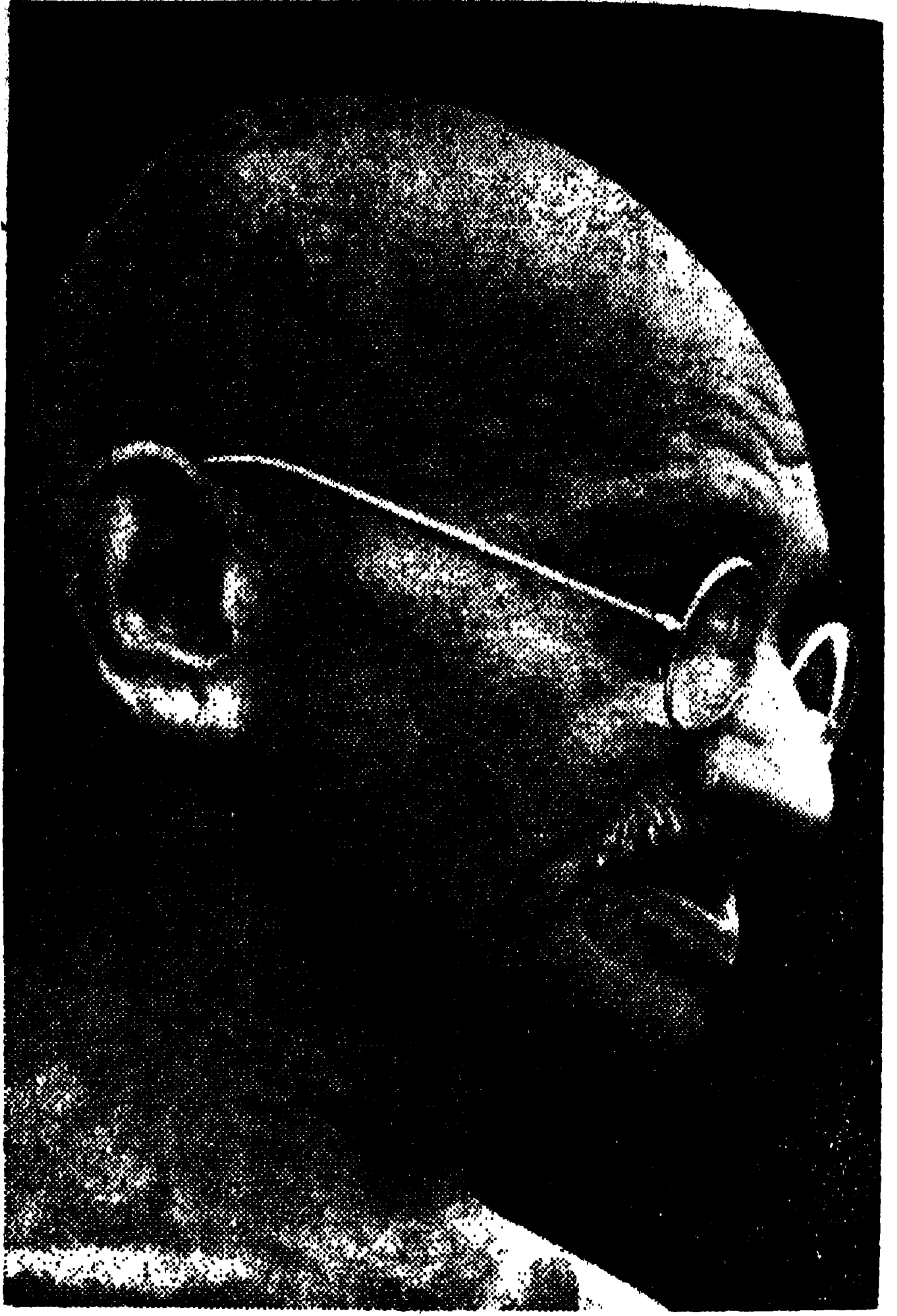
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম গানটি অনেকটা গ্রেগরীর গানের ভঙ্গীতে গাওয়া—দ্বিতীয়টিও একই জাতের হ'য়েও একটু গ্রাম্য ভাবের, তাতে স্বরের ওঠা-নামা ও কারুকার্য বেশি। শুধু শিক্ষিত ভারতীয় গায়কের পক্ষেই তা গাওয়া সম্ভব (মীরা আমায় বলেন, তিনি এখনো পারেন না তেমন ক'রে গাইতে)। এই সব মধুর তান শান্তির তরঙ্গ ছড়ায় রাত্রিতে, প্রতিটি গানের পরই নেমে আসে সম্পূর্ণ নীরবতা—শেষ গানের পরের নীরবতাটিই সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, তার পর গান্ধী ধীর স্বরে নির্দেশ দেন আলো জ্বালানোর। কথাবার্তাও আরম্ভ হয় নতুন ক'রে। বেশ অভিভূত করার মত ব্যাপারটা, তবে গানগুলো সুন্দর ঠেকলেও তাদের প্রতি আমি কোনো আত্মীয়তা অনুভব করি না, নিজেকে খাপছাড়া লাগে। হিন্দুই হোক আর খৃষ্টানই হোক, এই সব আনু-ষ্ঠানিক প্রার্থনা-গীত আমার জন্য নয়। এমন গান শুনলে আমার একলা-একলা ভাবটা বেড়ে ওঠে।

গান্ধীকে আমরা আহার (গোটা চল্লিশেক খেজুর, কাঁচা সবুজ সব্জী, ছাগলের দুধ) করতে দিয়ে চ'লে এলাম। পরের দিন সকালে কখন দেখা হবে, সেটাও পাকা ক'রে নিলাম—আমাকে যাতে বাগান পেরিয়ে তাঁর কাছে না আসতে হয়, উনি জেদ ধ'রে বসলেন যে উনিই যাবেন আমার কাছে, অলগা ভিলাতে। মীরা এবং অন্য ভারতীয়েরা আমাদের সঙ্গে খেতে এলেন (এ'রা নিরামিষাশী, তবে গান্ধীর মত অত গোঁড়া নন। অবশ্য ডিম বা আমাদের পাশ্চাত্য পানীয় চলবে না, শুধু রান্না করা সব্জী, ভাতে ভাতে গোছের বস্তু ইত্যাদি।) এ'দের আসার সময় থেকে টেলিফোন বেজেই চলেছে, মীরা বেচারীর অনেক দিক দেখতে হচ্ছে।

পরের দিন সোমবার গান্ধীর মৌন থাকার দিন। কথা বলেন না, শুধু অন্যের কথা শোনেন। হেসে বলেন, অন্যেরা তাদের যা খুশী বক্তব্য তাঁর ওপর চাপাতে পারে এই দিনটিতে, কিছুতেই তাঁর উত্তর দেওয়ার উপায় নেই। (অবশ্য এখানে একটা কথা, দরকার পড়লে কোনো প্রশ্নের লিখিত সংক্ষিপ্ত জবাব তিনি দিতে পারেন)। কাঁটায় কাঁটায় সকাল দশটায় তিনি আমার কাছে এসে হাজির—ঘুমিয়েছেন নাকি বেলা আটটা পর্যন্ত, যেমনটি কখনো করেন না (লণ্ডনে রাত্রে তাঁরা তিন-চার ঘণ্টার বেশি ঘুমোতে পারতেন না—ঘরে ফিরতে ফিরতেই তো রাত একটা হ'য়ে যেত, তারপর রাত তিনটেয় আবার প্রার্থনার জন্য উঠতে হত। তাই এ'রা সকলেই—বিশেষত গান্ধী স্পষ্টতই অত্যন্ত ক্লান্ত। তা' ছাড়া লণ্ডনের নভেম্বরের কুয়াশার কল্যাণে গান্ধীর আবার বেশ সর্দি ধ'রে গেছে—কিন্তু শরীরটা তাগড়া ব'লেই কিছু গ্রাহ্য করতে হয়নি তাঁকে, সভা-সমিতি ইত্যাদিতে যথারীতি উপস্থিত হয়েছেন)। তাঁর হঠাৎ-হঠাৎ হাসিটি শুনেই বুঝেছি সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, পরে যে-বড় দুরন্ত চেয়ারটায়

বসে কাজ করি, সেটার উপর তাঁকে বসালাম। অচিরেই চটী মাটিতে রেখে খালি পা দুটি তিনি কোটের ভিতরে মুড়ে গুটিয়ে বসলেন। চোখে মোটা চশমা, প্রতিটি চোখের জন্যই দু রকমের কাচ মাঝখানে গোল ক'রে কাটা, যাতে দূরের ও কাছের বস্তু [illegible] দেখতে পান। গায়ের রঙটা রোদ্দুরে বেশ পুড়েছে, ততটা কালো নয় যতটা তামাটে। মুখটা লম্বা হ'য়ে ঝুলে পড়ছে, এবং সামনের পাটীতে দাঁত না থাকায় মুখটাকে ইঁদুরের মুখের মত সরু মনে হচ্ছে। তলার ঠোঁটটা বেশ পুরু, সামনে ঠেলে এগিয়ে আসে এবং অন্য ঠোঁটটা কাঁচা-পাকা গোঁফে ঢাকা। একটু ভিতরে বসে গেলেও এবং শেষের দিকে সামান্য চ্যাপটা মনে হ'লেও নাকটা বেশ সোজা, নাসারন্ধ্রও বড়। কান দুটো কুলোর মত। প্রশস্ত সুগঠিত কপাল, কথা বলার সময় রীতিমত কুঞ্চিত হয়—কিন্তু গাল বা মুখের অন্যান্য অংশ বেশ শক্ত, আমাদের ইউরোপীয়দের মুখের মত তাতে কোথাও কুঞ্চনের লেশমাত্র নেই। তাঁকে প্রথম দেখে দুর্বল মনে হ'লেও সেটা ভুল, মানুষটা শক্ত। সরু বড় বড় হাত দুটো দিয়ে কোটটাকে তিনি কেবলি গায়ের সঙ্গে আটসাট ক'রে চেপে ধরছেন, কিন্তু হাতের ঐ খালি অংশটুকুর মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি সেখানে হাড়, শিরা-উপশিরা ও মাংসপেশীর শক্ত সমর্থ ভাবটা। হাত দুটোকে (এবং কোটের আড়ালে নিশ্চয় পা দুটোকেও) তিনি সমানেই নাড়িয়ে চলেছেন, তাঁর এই অস্থিরতা বেশ একটু বিস্ময়জনক আমার কাছে, বিশেষত মানুষটাকে যখন জানি এমন শান্ত (তবে শান্ত হ'লেও সর্বদা জাগ্রত) ব'লে—আত্মসংযমও তাঁর প্রচন্ড। (মীরাও একই কথা বলেন আমায়, তাঁর দেহের এই অত্যধিক অনুভবপ্রবণতা, যে-দেহকে চিত্ত বশ করেছে। মীরা যখন তাঁর পায়ে তেল মালিশ করেন—অত্যন্ত যত্ন সহকারেই—তখনো তেলের মধ্যে যদি একটি তিলও থাকে এবং তা যদি গান্ধীর গায়ে লাগে তো সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী একটু আহা-উহু ক'রে উঠবেনই।) কথাবার্তায় আমার বোন সঙ্গে থেকে অনুবাদিকার কাজ করছেন (কারণ ইংরেজী ভিন্ন গান্ধী কিছু বলেন না বা বোঝেন না)। মীরা ব'সে পায়ের কাছে কার্পেটের উপর, গান্ধীর দুই সেক্রেটারী নোট নিচ্ছেন (এবং দ্বিতীয় আলোচনা হ'তে আমার স্ত্রী মারীও আমার জন্য সকল কথোপকথন লিপিবদ্ধ ক'রে নেবেন)।

আগে থেকেই ঠিক ছিল, প্রথম দিন আমি একলাই কথা বলব। ইউরোপ মহাদেশের, বিশেষত ফ্রান্সের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র গান্ধীর সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলাম। ১৯০০-১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় ও পরে রাজনীতির তথাকথিত বাস্তববাদী ও আদর্শবাদীরা কোন দ্বৈত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলেন, এবং উইলসন ও ক্লেমাশোর যুগপৎ চরম পরাজয়ের অর্থটাই বা কী,

সেটা বোঝানোর জন্য সেই যুগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে শুরু করলাম। এবং পরের এই যে পুরুষানুক্রমিক তিক্ত হতাশার ভাব, তা জাগল সেই যুগের ব্যর্থতাবোধ হ'তেই। মুখোশ খুলে রাজনীতির সেই সত্যকারের মুখ আমি তুলে ধরলাম, যে-মুখের আভাস আমরা নিজেরাই পাই শুধু যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে। পয়সা, বড় বড় শিল্পপতিদের দুঃসাহসিক অভিযান (জাহারফ, ভিটারডিং), সুবিধা-বাদী আন্তর্জাতিক কত ব্যবসায়-চুক্তি ও কোম্পানী—কী ক'রে এরা দিনে দিনে দেশে দেশান্তরে এদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে, সংবাদপত্রগুলো পর্যন্ত কিনে ফেলে জনমত তৈরি করছে। এ-সবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তও কতকগুলো দিই : ফোর্জ সমিতি, যুদ্ধকালীন ব্রিয়ে-র ঘটনাটা, ইস্পাতের কারখানাগুলো, তেল এবং পেট্রোলের কত কোম্পানী, হুগেনবের্গ-রেনোর বৈঠক, আতর্জাতিক ব্যবসায়ের লোভে প'ড়ে কত ঘৃণ্যতম জাতীয়তাবাদের উন্মত্ততা। যে-ক্ষতের পুঁজে পুঁজে আজ সারা ইউরোপ ও আমেরিকা জর্জরিত ও যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও তার কবলে আনার উপায় খুঁজছে, তার বিরুদ্ধে কেমন ক'রে দাঁড়িয়ে ত্রাণ পাওয়া যায়, সে-বিচার করতে বসলাম। গণতন্ত্রের তো নিজেকে রক্ষা করার কোনো উপায়ই নেই, পয়সার কল্যাণে আজকে তা মজ্জায় মজ্জায় দূষিত, বিক্রীত, নিবীর্য, এক দেশ থেকে অন্য দেশে অনৈক্য বহুধা বিভক্ত। ফ্যাশিজ্‌ম পর্যন্ত (এবং তার ব্যবহারেই সেটা স্পষ্ট) সেই পয়সার হাতে খেলনা মাত্র...........। এর বিরুদ্ধে খৃষ্টান অথবা গান্ধীবাদী কোন অপ্রতিরোধের নীতি দাঁড় করানো যাবে? তা যদি দাঁড় করাতে কেউ সত্যিই চায় তো তাকে জানতে হবে, প্রশ্নটা এখানে শুধু যুদ্ধ নিয়েই নয়। পাশ্চাত্যের পক্ষে সবথেকে কম বিপদ যাতে আজ, তা হচ্ছে যুদ্ধ। চোরেরা দেখে, কেমন করে অন্যের মাথায় হাত বুলিয়ে তারা একত্রে জোট বাঁধতে পারে নিজের নিজের স্বার্থে। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যাতে তার শোষণ না চলে, তার বিরুদ্ধেই আজ জনগণকে দাঁড় করাতে হবে। এবং সেটা ঘটানো স্বভাতই আরো অনেক শক্ত হবে এই কারণে যে, এখানে যা প্রশ্ন, তা তো শুধু একটা অতি আসন্ন বিপদের বিরুদ্ধেই তাদের একত্র করা নয়, বা তাদের সহজেই কাছ থেকে স্পর্শ না করে পারবে না, যেমন যুদ্ধ লেগে গেছে নিজেদের দেশে, সে-রকম কিছুও নয়—বরং প্রশ্নটা তার থেকে অনেক বেশি। স্বার্থের খাতিরেই অন্য জাতির সর্বনাশের ঝুঁকি নিয়েও এরা তাই পাশ্চাত্য ও মধ্য ইউরোপে শান্তির অবস্থা চালু রাখতে চায়। একমাত্র সফল ও সত্যিকারের অপ্রতিরোধ তাই আসতে পারে কারখানা থেকে, অস্ত্রাগার থেকে, শ্রমিক-মজদুরদের কাছ থেকে। নামহীন পয়সার সেই যে-অক্টোপাস, তার বিরুদ্ধে এরাই একমাত্র দাঁড়ানোর মত দাঁড়াতে পারে। এদের সবই আছে : সংখ্যা, তার অফুরন্ত শক্তি, সেই অন্যায় বোধ যা তাকেও পিষে মারছে। শুধু তাই নয়, এদের আছে সেই নৈতিক শক্তি যার দ্বারা এরা ভাবতে প্রবুদ্ধ হতে পারে যে, সারা পৃথিবীতে একমাত্র তারাই তাদের স্বার্থ ও ন্যায়ের বিধায়ক। এখানে এটুকুও যোগ করার আছে যে, যান্ত্রিকতার অগ্রগতির কল্যাণে এখন এক বুদ্ধিদীপ্ত শ্রমিক-শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে, যে-শ্রমিকরা সত্যিই উচ্চস্তরের ও যাদের মধ্যে মূর্ত দেহ ও আত্মার দ্বৈত ক্রিয়ার সার্থক সম্মিলন। এই সেনাবাহিনীই পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে দানব ধনতন্ত্রের। এখন থেকে তাদের যে-সমস্যার কথা ভাবতেই হচ্ছে, তা হল এই যে, ঠিক কোন্ কৌশলটি তাদের নেওয়া উচিত। লক্ষ্য তো পরিষ্কার : শ্রমের ও সারা মানুষের জয় চাই—একমাত্র সে-নীতিই ন্যায়ধর্মী ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু কোন্ পথে সেখানে পৌঁছোনো যায়? অহিংসার দ্বারা, না হিংসার দ্বারা? সেই-পথই হবে শ্রেষ্ঠ যা আনতে পারবে সেই ন্যায়কে। অহিংসা কি পারবে তা করতে? পারবে, যদি তাকে প্রয়োগ করা যায় তার আত্মায় এতটুকু অদলবদল না করে, তাতে কোনোরকমের কোনো আপোস না খুঁজে, যেমন আজ ভারতে করছেন আপনি (অর্থাৎ আপনি, গান্ধী)। কিন্তু সেই আপনিও ভারতে এটা প্রয়োগ করতে পারতেন না, যদি আপনার দেশের লোকের মধ্যে এমন একটি নীতি গ্রহণ করার মত উপযোগী আবহাওয়া না খুঁজে পেতেন। আপনার দেশবাসী স্বভাবতই ধার্মিক, বহু শতাব্দী ধরে তারা অহিংসায় অভ্যস্ত। কিন্তু ইউরোপে তো তা একেবারেই নয়। অ্যাংলো-স্যাক্সন, চেক ও শ্লাভ দেশগুলিতে তবু অহিংসার এক-আধটু ছিটেফোঁটা থাকলেও থাকতে পারে, লাতিন দেশগুলিতে তো তাও নেই। ধর্মভাব এখানে প্রশ্ন নয়, ধর্মভাব যথেষ্টই আছে পাশ্চাত্যে, কিন্তু সর্বত্রই তার এক যুদ্ধং দেহি রূপ—গীর্জাও এখানে 'সংগ্রামশীল'। যারা নিজেদের ধর্মরাষ্ট্র বলে চালাতে চায়, পবিত্র গ্রন্থগুলির অঙ্গহানি তারাই করেছে—তাছাড়া পবিত্র গ্রন্থগুলি ঠিক কী যে বলতে চায়, তাও সবসময় স্পষ্ট নয়, যুদ্ধের সময় তো শত্রু-মিত্র উভয়েই তার দোহাই পেড়ে এক বিশ্রী বাগবিতণ্ডার সূত্রপাত করে। বিশেষত পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহারিক, সে-দৃষ্টি বেশি দূর যায় না, শুধু কাছের লক্ষ্যটাই সব তার পক্ষে। তাই পাশ্চাত্যের কেউ যখন প্রগতির কথা বলে, সে কখনো ভাবে না বহুদূরের কথা, ভাবে শুধু তার আগামীকালকে। কিন্তু যাকে তার সামলাতে হবে আজ, সে কোন্ ধরনের শত্রু? সে এক দৈত্য, রোজ বেড়েই চলেছে, এবং অচিরেই তা গ্রাস করতে উদ্যত সমগ্র মানুষকে। তাই কাজে লাগা চাই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি, প্রস্তুত হতে হবে মহাযুদ্ধের জন্য। নিজেকে সামলাও এবং চলো। অহিংসা কি তা পারবে? লাজপৎ রায় আমাদের বলছিলেন : 'ভারতে আমি অহিংসার ধ্বজাধারী, কারণ তা যে আমাদের জয় এনে দেবেই, সে-বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ রাখি না। কিন্তু ইউরোপে আমি অহিংসা চালাব না।' এখানে গান্ধীর বক্তব্য কী? যাই হোক, যা ঘটছে, তা তো স্পষ্ট : অকথ্য নির্যাতনের মধ্যেও ১৯১৭ সাল হতে শ্রমিক-মজদুর এক নতুন জগতের গোড়াপত্তন করেছে, যে-জগৎ রীতিমত সশস্ত্র। তার এই অস্ত্রের দরকার ছিল পুরোনো জগতই তাকে বাধ্য করেছে এই অস্ত্র নিতে। চার-পাঁচটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শক্তিশালী দেশ রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সশস্ত্রভাবে মাথা গলাল, কত অন্তহীন ষড়যন্ত্র চলতে লাগল রাশিয়ার বিরুদ্ধে, অর্থপিশাচদের নারকীয় কত বদমায়েসি সোভিয়েট রাশিয়ার উচ্ছেদসাধনে লাগল। সোভিয়েট রাশিয়া নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। পাশ্চাত্যে আমরা কী করতে পারি? এসব দেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকা? সোভিয়েট রাশিয়াকেও বলব হাত গুটিয়ে বসে থাকতে? কিন্তু আমাদের যে মনে হচ্ছে, সোভিয়েট রাশিয়া ধ্বংস হলে পৃথিবীর সমস্ত আশা-ভরসাই ধ্বংস হবে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাতে হস্তক্ষেপ না করে কেউ, তার জন্য কি আমাদের শ্রমিকদের দিয়ে আমরা ধর্মঘট করাব? হ্যাঁ, তাই চাই —এরি নাম বিদ্রোহ (না দেখলে বোঝা যায় না), গৃহযুদ্ধ। আপনি হয়তো আমায় বলবেন : পাশ্চাত্যের সেই শ্রমিক-মজদুরেরা আত্মত্যাগ করুক না কেন? কিন্তু কিসের জন্য সেই আত্মত্যাগ তারা করবে? তা হলে তাদের মংগলময় এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হয়, কিন্তু সে-বিশ্বাস তাদের নেই। তারা বিশ্বাস করে এক আদর্শে, সামাজিক ন্যায়ের এক দেবতাতে। এবং সেটা সামান্য নয়। কিন্তু তাদের সেই আদর্শকে যখন জড়বাদ বলে অপবাদ দেওয়া হয়, আমি প্রতিবাদ করবই : কারণ এমন বীরোচিত ত্যাগের উৎস আর কী আছে? কিন্তু তাদের এই আত্মত্যাগ এবং অহিংসা, এ-দুটোর পারস্পরিক কোনো সম্বন্ধ নেই। আবার বলছি, সমস্যাটা জাগছে কার্যকরী কর্ম-নীতির সমস্যা হিসেবে : কর্মকে হতে হবে যত সফল, তত ত্বরান্বিত। বাধাবিপত্তি যদি জাগে, মানুষের দিক থেকে বা অন্যান্য দিক থেকে, তাকে সমূলে নিপাত করতেই হবে নির্মমভাবে, এমনকি কোনোরকম ক্রোধ না দেখিয়েও। সোভিয়েট ন্যায়ের নীতিটা যে কতখানি নির্মম ও নির্লিপ্ত, তা গান্ধীকে বলবার চেষ্টা করলাম॥ সে-নীতি কখনো (অন্তত বাক্যে ও স্বভাবত) প্রতিশোধের স্পৃহা পোষণ করে না। জাতির পক্ষে যে-ব্যক্তি সাংঘাতিক, তাকে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছাড়ে। সে-ব্যক্তি যদি আর সাংঘাতিক না হয়, তাকে তা মেরে ফেলে না, তার ওপর প্রতিশোধও নেয় না—তার পূর্ব পাপ যেমনই হোক না কেন। সে যাতে আর ক্ষতি না করতে পারে, সে-ব্যবস্থা নিয়েই এ-নীতি খুশি হয়। এমনকি পরে যাতে

লোকটি দেশের কাজে আসতে পারে, সে-বিষয়ে তাকে সর্বরকম সাহায্য করতেও এ-নীতি প্রস্তুত। কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধেই লেনিনের এতটুকু ঘৃণা ছিল না। মানুষের যাতে মঙ্গল হয়, সেই চিন্তাতেই তিনি আবেগদীপ্ত ছিলেন। এবং তা অর্জন করার জন্য সেই সেই পথই তিনি নিয়েছেন, যা তাঁর পক্ষে মনে হয়েছে কার্যকরী ও শক্তির সম্ভাবনাপূর্ণ। এখন অহিংসা যদি এই নীতির বিরোধী হয়, সে শুধু একটা আদর্শের বিরুদ্ধেই মাথা তুলবে না (তা যথেষ্ট নয়), প্রশ্ন তুলবে সেই নীতির দ্বারা অর্জিত সমস্ত ফলাফলের মূল্য নিয়ে।

ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে যা বললাম গান্ধীকে মোটামুটি এই হ'ল তার সারাংশ (১৯০০ হ'তে ১৯১৪-এর ভূমিকার আলোচনা এখানে প্রায় করলামই না। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে গান্ধী শুনছিলেন, যদিও আমার দিকে প্রায় তাকাচ্ছিলেনই না, মুখটা ঘুরিয়ে ছিলেন (তাঁর মুখের সব ভঙ্গীই তাই দেখতে পেলাম), তাকিয়ে ছিলেন বরং আমার বোনের দিকে। যা বলছিলাম, তার সমস্তই আমার বোন গান্ধীর জন্য অনুবাদ, ক'রে দিচ্ছিলেন। কিন্তু বড় বড় প্রসঙ্গগুলি পাড়ার সময় গান্ধী তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত একাগ্র চোখে বার বার তাকিয়েছেন আমার দিকে এবং আমার সঙ্গে যে তিনি একমত, সেটা বোঝাবার জন্য ঘাড় নেড়েছেন একাধিকবার—যেমন তখন, যখন রুশ জনগণের তথাকথিত 'জড়বাদের' সমর্থনে বলি যে রাশিয়ার লোকেরা আজ সমগ্র মানুষের ভবিষ্যত কল্যাণের জন্য ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ, এবং তাদের সেই 'জড়বাদের' মধ্যেও আমি এমন এক আদর্শবাদ দেখি যা পাশ্চাত্যের বহু ভণ্ড আদর্শবাদীর দৃষ্টান্ত হ'তে শ্রেয়, পাশ্চাত্যের আদর্শবাদ শুধু মুখেই, ত্যাগ করতে সেখানে কেউ প্রস্তুত নন।

আমি চুপ করার পর গান্ধী তাঁর কাগজের উপর লিখে জানালেন যে যা আমি বললাম, তা নিয়ে আজ তিনি চিন্তা ক'রে আগামীকাল আমায় তাঁর উত্তর দেবেন। অনেকে আমায় লিখিত প্রশ্ন পাঠিয়েছেন গান্ধীর জন্য, মনাত দলের সভ্যেরা ও ফরাসী কমিউনিস্ট কর্মচারী ইউনিয়ন কিছু জানতে চান—সেই সব প্রশ্নও গান্ধীর হাতে দিলাম। বললাম, ভিলনভের পর তাঁর ইতালী ভ্রমণের যে-কথা আছে, তা নিয়েও আমি কিছু বলতে চাই—তবে তা না হয় আরেকদিন বলব। তাতে তিনি তখুনি লিখে জানালেন, যদি সম্ভব হয় তো এই মুহূর্তেই সে-কথা বলি না কেন তাঁকে, তিনি শুনতে প্রস্তুত। পরে পাঁচ মিনিটের ছোট্ট বিরতি, যখন এক গেলাস লেবুর জল (এটা তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাস, পান করেন রোজ বেলা এগারটায়) গরম ক'রে গান্ধীকে দেওয়া হ'ল, আমিও পান করলাম লেবু-জাতীয় ফলের রসমিশ্রিত জল। পরে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টায় লাগলাম, ফ্যাশিস্ট ইতালীতে কী বিপদ (সরাসরি আক্রমণ না হয় নাই হ'ল) তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে পারে—যেমন ওরা রবীন্দ্রনাথকে করে, সেই রকমই হয়তো কায়দা ক'রে গান্ধীকে দলে টেনে নেবে। কারণ এমন পাশবিক একনায়ক রাষ্ট্র আজ নেই যা ভণ্ড সেজে মুখোশ প'রে ছুতো খুঁজবে না বড় বড় সত্যিকারের আদর্শবাদীদের ভুলিয়ে তার আওতায় আনতে। কয়েকটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের (মাত্তেওত্তি, আসেনদোলা) মাধ্যমে ফ্যাশিজমের সেই সত্যিকারের মুখটি আমি তাঁর সামনে তুলে ধরলাম। ভারতে ইতালীয় রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন স্কার্পা, যাঁর মাধ্যমে রোমের বুদ্ধিজীবী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিমন্ত্রণ গান্ধী পান। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম যেহেতু ইস্তিতুতো দি কুল্তুরা (সংস্কৃতি ভবন) ও যার অধ্যক্ষ হচ্ছেন প্রাক্তন মন্ত্রী জেন্তিলে, আমি তাই গান্ধীর কাছে ঐ ব্যক্তিগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে লেগে গেলাম, একেবারে জেন্তিলেকে দিয়েই আমার বক্তব্য সুরু ক'রে। এই ফ্যাশিস্ট ইতালীর সঙ্গে আমি নির্যাতিত সহস্র সহস্র ইতালীয়ের তুলনামূলক প্রসঙ্গ পাড়লাম, যারা তাদের দেশের নৈতিক অধঃপতনে তিক্ততার অনুভবে জর্জরিত, যারা আজ মিথ্যা ও নীরবতার নিয়তিতে পতিত। এবং এও বললাম, তাদের সেই অত্যাচারীদের পাশে গিয়ে যদি গান্ধী আজ দাঁড়ান, সেটা তাদের একেবারে স্তম্ভিত ক'রে দেবে। ইতালীর সংবাদপত্রও ঐ ফ্যাশিজমের করতলগত, সেখানে তাই তাঁর উপস্থিতিটাকে তা ফলাও ক'রে নিজেরই কাজে অনায়াসে লাগাবে—চেষ্টা ক'রেও গান্ধী সেটা ঠেকাতে পারবেন না, তার বিরুদ্ধে কিছু বলারও সম্ভাবনা থাকবে না, তাঁর ইতালীতে। না জেনে কী ভাবে রবীন্দ্রনাথও ঐ সব ফ্যাশিস্ট সভাসমিতি ও লক্ষ্যের খপ্পরে পড়ে যান, তাও গান্ধীকে স্মরণ করালাম —রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কিছু বুঝতে পারেন নি,, ভেবেছিলেন ওরা বুঝি ও'র প্রশস্তিতে মেতেছে। যদিও ইতালীতে তিনি যতদিন ছিলেন, তাঁর ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছিল, একটি বারের জন্যও এমন কোনো সংস্পর্শে তিনি আসতে পারেন নি যা রাষ্ট্রানুমোদিত নয়। গান্ধী মন দিয়ে সব শুনলেন, বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ আমাদের আলোচনা শেষ হ'ল। ভিলার কাছাকাছি, বাগানের মধ্যে এবং পার্কের চতুর্দিকে ফোটোগ্রাফরেরা গিশগিশ করছে এখন, তাই লিওনেত্ ভিলায় ফেরার পথে তাদের অজস্র ক্যামেরার শিকার গান্ধী হলেন।

,বলতে ভুলে যাই, আমাদের আলোচনা তখন সবে শেষ হয়েছে, হঠাৎ দরজা ঠেলে প্রায় তেড়ে ফুঁড়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়েন মিস মিউরিয়েল লেস্টার। লন্ডনে ভদ্রমহিলার অতিথি হয়েছিলেন গান্ধী। এই ইংরেজ রমণীটি যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি প্রাণোচ্ছলা, লন্ডনের দরিদ্রদের নিয়ে নাকি মাথাও ঘামান, তবে এ'র হাবভাবটা বড় অশিষ্ট, উদ্ধত। অবশ্য এভাবে হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ার জন্য আমি তাঁকে মার্জনা করতে প্রস্তুত ছিলাম, যদি তিনি পিছন পিছন আরো কয়েকজনকে এনে হাজির না করতেন। এই কয়েকজনের মধ্যে বিশেষত এমন একজন ছিলেন, যাঁর পরিচয় সময়ে জানলে তাঁকে আমি কিছুতে ঢুকতে দিতাম না—ভদ্রলোকটি হলেন ইভ্যান্স, বিপুলবপু এক ইংরেজ পুলিশ ইন্সপেক্টর, যিনি আরেক সহকর্মীর সঙ্গে এখানে এসেছেন এই অজুহাতে যে গান্ধী আবার ভারতমুখী না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকার দায়িত্ব তাঁদের। গান্ধী তাঁকে দেখার ভান করলেন, পরে তাঁকে বন্ধু ব'লে পরিচয় দিলেন (এটা কি তাঁর ভালো মানুষসুলভ সারল্য, না বরে গেল তাঁর, এমন একটা ভাব? দ্বিতীয়টাই আমার সত্য বলে ঠেকে, গান্ধীকে জানার পর এখন তো মনে হয় না যে ভালোমানুষি-ভালোমানুষি ভাব তাঁর একেবারেই আছে)। কিন্তু জিনিসটা বিপজ্জনক। এই পুলিশের লোকগুলো বলে, তারা গান্ধীকে রক্ষা করার জন্যই সঙ্গে সঙ্গে আছে। কিন্তু আসলে তাঁর উপর নজর রাখছেন তিনি কী করছেন না করছেন বা কে তাঁর সঙ্গে দেখা করছে না করছে, সেদিকে খেয়াল রাখছে। মোটা ইভ্যানসের পেট থেকে তো বেরিয়েই গেল যে সে এদমঁপ্রিভাকে জিজ্ঞেস করে বসেছে, কী নিয়ে আমরা এত আলোচনা করছি, এই আমি আর গান্ধী। প্রিভাও এমন আহাম্মক যে সরাসরি জবাব দিয়েছেন, রাশিয়া সম্বন্ধে আমি গান্ধীর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছি। (ফল হবে এই যে কয়েক দিনের মধ্যেই ম'ন্ত্রোর কাগজ সারা সুইজারল্যাণ্ড ফাঁস করে দেবে আমার দ্বারা গান্ধীকে বশীকরণের ব্যাপারটা এবং 'বলশেভিক রম্যাঁ রলাঁর বাড়ী ঘুরে আসছেন', এই বলে গান্ধীর পরিচয় দেবে। এখন কী ক'রে মস্কোর কমিউনিজমের হাতে সুইজারল্যাণ্ডের সাহসী সজ্জনদের তুলে দেওয়া যায়, সেটাই লক্ষ্য গান্ধীর—এমন কথাও শোনা যাবে।)

সোমবার অপরাহ্নের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমানে খুব বৃষ্টি পড়ে চলল। কখন হঠাৎ গান্ধী বেরিয়ে পড়েছেন, তাঁর নাগাল পাওয়া মীরার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তিনি হাঁটেন ভয়ংকর তাড়াতাড়ি। ও'রা দুজনে ভিলনভে খুব একচোট হেঁটে বেড়িয়ে এলেন, ছোট সেতুটা পর্যন্ত, যেখান থেকে হ্রদের পাশাপাশি রাস্তাটা বেঁকে গেছে—হাঁটলেন হ্রদের ধারের রাস্তার উপর গাছপালার মধ্যে দিয়ে। ফোটোগ্রাফারগুলো তাঁদের ছবি সুবিধে পেলেই তুলে নিচ্ছে, এবং ভিলনভের লোকেরাও গান্ধীর সম্বন্ধে যা মনে আসছে বলছে। যেমন, মারী শুনলেন : "কি কুচ্ছিৎ লোকটা রে বাবা" অথবা, "নিজেকে দেখানোর লোভ কেউ কেউ কেমন সামলাতে পারে না।" সুইস ও ইংরেজ পুলিশ তফাতে থেকে তাঁর অনুসরণ করছে। এদিকে বাড়ীতে টেলিফোন বেজেই চলেছে। সন্ধ্যায় প্রিভা আমাদের কাছে ঘণ্টা দু-তিন কাটিয়ে

গেলেন শুধু টেলিফোনের উত্তর দিতে—বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে, টেলিফোনটা রাখতে পারেন না এক মুহূর্তের জন্য। জেনিভায় নালিশ, লোজান গান্ধীকে এক-চেটিয়া করে রেখেছে, ওরাও তাঁকে একটু পেতে চায়। সেখানে সভার বন্দোবস্ত হচ্ছে আগামী বৃহস্পতিবার। প্রিভা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হন—তাঁর ভয়, সেখানে গান্ধীকে হয়তো বিরূপ জনতার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সেই কারণেই তো গান্ধী আরো আগ্রহান্বিত হবেন—আপত্তি যেখানে যত, তার উত্তর দিতেও তাঁর তত আনন্দ।

মঙ্গলবার ৮ তারিখ সকাল সাড়ে নটায় আবার গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় বসা। ইতালীর প্রশ্নটা নিয়েই তিনি বলতে চান প্রথম। বলেন, যাঁর কাছ থেকে তিনি আমন্ত্রণটি পান, সেই রাষ্ট্রদূত স্কার্পা লোকটি শিক্ষিত, বহু ভারতীয়কে চেনেন ভালো করে এবং ভারত নিয়ে কাজও করছেন। ভারতে নাকি তাঁর সুনাম আছে। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের প্রতি তাঁর তথাকথিত সহানুভূতির জন্যই এই খ্যাতি তাঁর। অবশ্য গান্ধী বড় সাবধানী ব্যক্তি—তাঁর ধারণা, স্কার্পা যা কিছু করেন, তা শুধু নিজেরই স্বার্থে : এর আগেও ইতালীতে যাবার একটি নিমন্ত্রণ পান গান্ধী।

"যেতে আমার সাধ জাগে, মুসোলিনীকে দেখব।" (মারী ষে-নোট নেন, তাই আমি এখানে লিপিবদ্ধ করছি।) "সাধারণ লোকদেরও দেখার বাসনা আমার, তাদের কাছে শান্তির বাণী বহন করতে চাই। তা যদি তারা গ্রহণ না করে তো আমার কিছু যাবে আসবে না, তার জন্য আমি পথ পরিবর্তন করব না। এবং পোপকেও দেখতে চাই, তিনি আমাকে বার্তা পাঠিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলে পরে ভারতের রোম্যান ক্যাথলিকদেরও আরো ভালো করে আমার কথা শোনাতে পারব—কারণ একেবারে তাদের কর্তাকেই তো দেখে আসছি, নয় কি? যেমন ইসলামেরও বড় বড় কর্তাদের সঙ্গে দেখা করি, তেমনি। রোম্যান, প্রোটেস্ট্যান্ট, মুসলমান, কত বিশপই দেখলাম—জানি, তাদের মধ্যে খারাপ লোক যেমন আছে, ভালো লোকও তেমনি আছে। ইতালীর কথাটা আমি প্রায় ভুলতে বসেছিলাম, কিন্তু স্কার্পা ভোলেন নি, এই দেখুন তাঁর শেষ চিঠি। ইতালী ছাড়ার আগে যাতে ব্রিন্দিসিটা ঘুরে আসতে পারি, তার জন্য লয়েড আপিস জাহাজটাকে বেশ বেলা পর্যন্ত আটকে রাখতে রাজী হয়েছেন—কিন্তু অনুগ্রহ আমি চাই না। ইতালীর সীমানায় পৌঁছানো মাত্রই প্রথম শ্রেণীর দুটো কামরাও আমায় দিচ্ছেন স্কার্পা, যদিও আমি চেয়েছিলাম তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে—অবশ্য তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার পক্ষপাতী নই। স্কার্পা চান, সীমানায় কোন দিন কখন পৌঁছোচ্ছি, তা যেন তাঁকে জানাই, লিখছেন, যে-সময় ধার্য করেছি ইতালীতে থাকার জন্য, তা তাঁদের পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচীর পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন তিনি যে আমার এই ইতালী সফর একেবারে বেসরকারী, নিমন্ত্রণটা তিনিই করছেন। তবে সেটা কথার কথা, তাঁর পিছনে ইতালীর সরকার আছেন, স্কার্পা তাঁদের নিমিত্তমাত্র। কিন্তু মিলানে ও রোমে এমন লোক অনেক আছে যারা আমায় দেখতে চায়। স্কার্পার ইচ্ছা, আমি মিলানে পৌঁছোই ৯ তারিখে, রোমে ১১ তারিখে এবং ইতালী ছাড়ি ১৩ তারিখে। কিন্তু এখানকার বাসটাকে আমি সংক্ষিপ্ত করতে চাই না—ইতালীকে এক দিনের বেশি দিতে প্রস্তুত নই। ইতালীয় ব্যাঙ্কের ডিরেকটরের স্ত্রী মাদাম তেপলিৎস্ চান, তাঁর কাছে উঠি। রোমে জেন্তিলের পরিচালনায় যে-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি, তাঁরা অভ্যর্থনার আয়োজন করছেন। কাউন্টেস কার্নেভালিও চান তাঁর অতিথি হই। এঁরা আমায় বলছেন তার যোগে আমার অভিপ্রায় ইত্যাদি জানাতে—যেমন, যদি বিশেষ কোনো ইচ্ছা থাকে আমার, বা বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠান যদি দেখতে চাই, ইত্যাদি। আমার নিজের ইচ্ছা তো রোমে একটা দিন কাটানোর : কোনো সভা-সমিতিতে যোগদানের আদৌ প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু যেহেতু এই বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি আছে, সেখানে দুয়েকটা কথা বলতে সানন্দেই যাব। এবং পোপ যদি আমায় দেখতে চান, যাব। মুসোলিনী মনে হয় না আমায় দেখতে চাইবেন, কিন্তু যদি চান, যেতে দ্বিধা করব না। কিন্তু গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করব না, কারুর সঙ্গে গোপনে দেখা আমি করি না—সেটা আমার একটা নীতি। এখন আপনি বলুন!"

আমি আবার ইতালীর জটিল ও সঙ্গীন অবস্থার কথাই পাড়লাম। ইতালীর অত্যন্ত গুণী গুণী ব্যক্তিরাও আজ লজ্জা-জনকভাবে রাষ্ট্রের পদলেহন করছেন। দৃষ্টান্ত দিলাম বৌদ্ধ ধর্মে সুপণ্ডিত অধ্যাপক ফর্মিচির, যিনি রবীন্দ্রনাথের বন্ধু হয়েও কী করে মুসোলিনীর মন রাখতে গিয়ে সেই রবীন্দ্রনাথকেই ফাঁদে ফেলেছিলেন। তেপলিৎসের কন্যাটিকে চিনতাম, যিনি তিব্বতে যান তথ্য আবিষ্কারের জন্য। অনেক গদগদ শ্রদ্ধার কথা লিখে তাঁর কয়েকটা বই আমায় উপহার দেন। কিন্তু সেখানে বুদ্ধ ও খৃস্টের পাশে মুসোলিনীর জয়গান দেখে আমি স্তম্ভিত, মুসোলিনী সেখানে চিত্রিত হচ্ছেন এক কল্যাণময় ঈশ্বরের রূপে। কাজে কাজেই মেয়েটিকে কড়া করে একটা চিঠি লিখি—সে চিঠির উত্তরে তিনি রাও কাড়েন নি, কিন্তু তাঁর পরের বইটি আর পাঠালেন না আমায়। তারপর পাড়লাম জেন্তিলের প্রসঙ্গ—প্রকাণ্ড দার্শনিক, ক্রোচের ছাত্র, কিন্তু তিনিও কী সূক্ষ্ম কায়দায় রাষ্ট্রীয় অনুশাসন ও নির্যাতনের নীতিগুলিকে এক করে মেলালেন বড় বড় চিন্তার সঙ্গে। এবং তাঁর কথা বলতেই মনে পড়ে জানোত্তি-বিয়াংকোকে, যিনি তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষে আসেন একবার। সেই পবিত্র ধর্মাত্মার ছবিটি তুলে ধরি, যিনি দক্ষিণ ইতালীর দুঃখ-দারিদ্র্যের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। বললাম কেমন করে ফ্যাশিজম তাঁকে ও তাঁর দাতব্য প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের কবলে আনার চেষ্টা করেছিল, সেই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্মীকে ফ্যাশিস্ট নীতি গ্রহণে বাধ্য করতে চেয়েছিল। জানোত্তি তাই জেন্তিলকে (ভদ্রলোক তখন মন্ত্রী) খুঁজে বার করেন, তাঁকে প্রশ্ন করেন : "আপনারা কি মানুষের বিবেক নিয়েও বেশ্যাবৃত্তি চালাতে চান, তাকে আত্মচ্যুত করে ছাড়তে চান?" জেন্তিলে তখন শ্লেষের সুরে উত্তর দেন : "আমাদের ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ তো আপনার জানাই—আত্মাকে ত্রাণ করতে গেলে আগে তাকে হারাতে হবে।" ঐ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটিতে বহু বুদ্ধিদীপ্ত গুণীজনের সমাবেশ, কিন্তু কারুরই বিবেক বলে বস্তু নেই—এবং সকলেই তারা বিপজ্জনক, কারণ প্রত্যেকে মিথ্যাবাদী। বিপদটা তবে কী করে এড়ানো যায়? বিপদ আপনার নিজের পক্ষে নয় গান্ধী, সে প্রশ্ন উঠছে না—কিন্তু যে আদর্শের হয়ে আপনি দাঁড়িয়েছেন, বিপদ সেই আদর্শের পক্ষে। একবার ভেবে দেখুন সেই সহস্র সহস্র ইতালীয়ের কথা, আজ যারা নির্যাতিত, নীরবতায় পর্যবসিত, ভেবে দেখুন আপনি তাদের কাছে কোন আদর্শ ও ভাবের প্রতিনিধি। যে শাসন-ব্যবস্থা আজ তাদের দ'লে-পিষে মারছে, তার প্রতি আভাসেও যদি আপনি সমর্থন জানান তো সে-রকম একটা ব্যাপার কি তাদের বুকটা ভেঙে দেবে না? আপনার কি ভয় করে না তা ভাবতে? বাইবেলের এই জানা কথাটিও আপনি স্মরণ করুন একবার : 'ক্ষুদ্র সামান্য লোকদের যে অপমান করে, তার ভালো হয় না।' এই অত্যাচারী রাষ্ট্রের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক থাকতেই

পারে না, একমাত্র সেই ধারণাই তাদের মনে আপনাকে জাগাতেই হবে। ইতালী সরকারের কোনো দানই আপনার গ্রহণ করা উচিত নয়, নিজের রেলের টিকিট আপনি নিজে পয়সা খরচ করে কাটুন, এবং যে-সব লোকের সততা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত নন, কেনই বা তাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে যাবেন? যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতে পারেন, সেই রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। ভাটিকানে যেতে চান বা পোপকে দেখতে চান, যান : কিন্তু যা কিছু সরকারী, তার থেকে দূরে থাকুন!

গান্ধী : "স্কার্পা তাঁর চিঠিতে যা বলছেন (অর্থাৎ নিমন্ত্রণটা যে তাঁরই, সরকারের নয়), সেটাকে তো অক্ষরে অক্ষরে না নিয়ে পারি না। নিমন্ত্রণটা (ঐ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে বলবার নিমন্ত্রণ) গ্রহণই করব, কিন্তু এই শর্তে যে আমি যা খুশী বলতে চাই তাঁদের সামনে, তা আমায় বলতে দিতে হবে।"

রলাঁ : "তাহলে এটাও চান যাতে বিদেশী সাংবাদিকরা সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে, আপনি যা বলেন তা টুকে নিতে পারে। অবশ্য সেই বিদেশীরাও ফ্যাশিস্ট হতে পারে, সুতরাং আপনি যা বলবেন, তা যে ওরা চেপে যাবে না বা তা যে বিকৃত করে পাঠকের কাছে উপস্থিত করবে না, সে বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া শক্ত।"

গান্ধী : "আগে থেকে এত তোড়জোড় করা আমার স্বভাব নয়।"

রলাঁ : "দেখবেন ওরা কেমন করে আপনাকে শূন্য ঘরে আটকে ফেলে কোণ-ঠাসা করে। শুধু ফ্যাশিস্টরাই আপনাকে ঘিরে ধরবে; এমন কি বিদেশী সাংবাদিকরাও......"
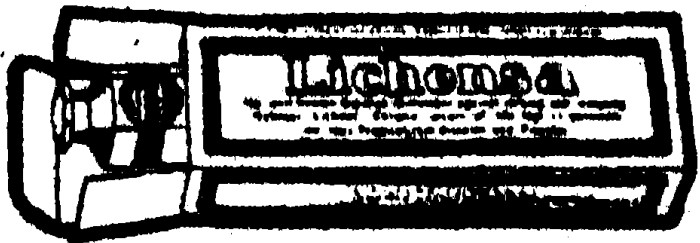
গান্ধী : "তা সম্বন্ধে আমি সজাগ, কিন্তু আমার মুখ বন্ধ করা অত সোজা হবে না। স্বাধীনভাবে যাতে বলতে পারি, সে-শর্ত আমার থাকবেই—এবং নিরপেক্ষ বিষয় নিয়েও কথাবার্তা নয়, বলব যা আমি বিশ্বাস করি। আমার তো এই মনে হচ্ছে এখন—অন্য কোনোভাবে জিনিসটা আমি নিতে পারছি না। নিমন্ত্রণটা তো আমি চাইতে যাই নি; সেটাই আপনা থেকে আমার কাছে এসেছে, এবং আমার তো মনে হয়, এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যেও কথা আমি ঠিক বলতে পারব।"

রলাঁ : "কথা বলতে যে ওরা আপনাকে দেবে না, তা আমিও মনে করি না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যা আপনি বলবেন, সংবাদপত্রগুলো তা হয় পুরোপুরি চেপে যাবে কিম্বা বিকৃতভাবে উপস্থিত করবে।" (এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরও একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথাটা বললাম।)

গান্ধী : "বেশ তো, না হয় ধরাই যাক যে যা বললাম, তা ছাপল না বা তা বিকৃত করে ছাপল। এমন কি ইংলণ্ডেও তো তাই ঘটেছে, অবশ্য 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানই' শুধু সেটা করে নি— কিন্তু অন্য কাগজগুলো আমার বক্তব্য একেবারে ছাপায়ই নি। প্যারীতে যা বলি, সেটাও বিকৃত করে ছাপানো হয় এবং 'লা ফিগারো' তো হীন মিথ্যাভাষণে মাতে। কিন্তু যা-কিছু আমি বলেছি বা বলব, তা পুরোপুরি ছাপা হবে 'ইয়ং ইণ্ডিয়াতে'।

রলাঁ : "কিন্তু ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে আপনার বক্তব্যকে এমন বিকৃত করায় যে-খারাপটা হল, সেটা তো যাচ্ছে আপনারি বিরুদ্ধে। ইতালীতে যা আপনি বলবেন, তাতে ইতালীর কিছু খারাপ হবে না, বরং দেখবেন, কী করে সেটা যায় সাধারণ ইতালীয়দের বিরুদ্ধে। লোকে বলবে, 'মহাত্মা তবে নিপীড়িতদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিপীড়নকারীদের সংগেই হাত মেলালেন।' আরো একটা বিপদ, আপনি তো বলবেন ইংরেজীতে, ওরা তার ইতালীয় অনুবাদ করবে। কিন্তু অনুবাদটা যথাযথ হচ্ছে কিনা, কে দেখবে? আগাগোড়া অর্থই বদলে দিতে পারে। যা-যা বলছেন, তা যাতে ঠিক-ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়, সে চেষ্টা আপনার করা উচিত।"

গান্ধী : "দেখুন, যদি আমার মনে হয় যে, বলা আমার কর্তব্য তো বলব, নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে। ব্যাপারটা আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি—জানি না কেমন করে তা সম্ভব হবে, কিন্তু তা সম্ভব হবেই কোনো না কোনো প্রকারে। আগে থেকে সমস্ত খুঁটিনাটি সম্বন্ধে এত সাবধান আমি হতে পারি না।"

রলাঁ : "আপনি যখন বলবেন, তখন বেন মীরা ও দেশাই আপনার কাছে সব সময় থাকবেন।"

গান্ধী : "গোপনে বৈঠকের প্রশ্ন উঠবেই না। এত কথার পরে এখন দেখা যাক, আমাদের লক্ষ্যের স্বার্থে রোমে আমার যাওয়া উচিত কিনা। কখনো কখনো কাজে সংগে সংগেই ফল মেলে না, ফলটা পেতে সময় লাগে। এ-কাজের এখুনি-এখুনি ফলাফল যা হবে, তা হয়তো আমার বক্তব্যকে সংবাদপত্রগুলো বিকৃত করে ছাপবে। কিন্তু কাজ যদি ভালো হয় তে শেষ পর্যন্ত তার ফলও ভালো হতে বাধ্য—তাই এ ঝুঁকি আমার নেওয়া উচিত বলেই মনে হচ্ছে, কারণ, আমি নিশ্চিত যে, লোভে পড়ে আত্মহারা হওয়ার ভয় আমার নেই। সেটা বাদ দিলে আর কী হতে পারে বা না পারে, তা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়—কিন্তু সিদ্ধান্ত একটা নিতে হবে।"

রলাঁ : "কোনো সুফল তো অসম্ভব দেখছি, কারণ যাদের সংগে দেখা করা দরকার আপনার, তাদের সংস্পর্শে আপনি আসতেই পারবেন না—শুধু রাষ্ট্রে স্বনির্বাচিত দুষ্কৃতীদের সংগেই সর্বক্ষণ আপনাকে থাকতে হবে : জেন্তিলে, ফর্মিচি এবং সেই ধরনের লোকেরাই, যারা ভিতরে ভণ্ড কিন্তু মুখে বুদ্ধিজীবির মুখোশ কোথায়, কখন এবং কোন উপায়ে অন্যদের দেখা আপনি পাচ্ছেন? এবং সেই অন্যেরা ভাববে অত্যাচারীর প্রশংসা গাইতেই আপনি এসেছেন।"

গান্ধী : "তবে রোমে আমার ব্যাপারে আপনার মতটা খোলাখুলি বলুন।"

রলাঁ : "আমি হলে আগে থেকেই কতকগুলো শর্ত তুলতাম। নইলে ভয় হয় পাছে একটা প্রবঞ্চনার ফাঁদে আপনি পা দিয়ে ফেলেন। তাই মিষ্ট করে নয়, ভদ্রতার সংগে নয়, একেবারে নির্মমভাবেই এ-ব্যাপারে এগোনো উচিত। আপনার সব কথার উত্তরেই ওরা 'হ্যাঁ হ্যাঁ' বলবে (যেমন রবীন্দ্রনাথ যখন জানান যে হিংসার কথা ভাবলেই তাঁর গা রি রি করে ওঠে ঘৃণায় ও আতঙ্কে, মুসোলিনী তখন তাঁকে বলেন, 'আমারো ঠিক তাই হয়'), যদিও ঠিক তার উল্টোটাই তারা বিশ্বাস করে। আমার তো মনে হয়, জান্যোত্তি-বিয়াংকোর সংগে আপনার দেখা করা উচিতই...যদি বলেন তো আমার বন্ধু জেনারেল মরিসকেও একটা টেলিগ্রাম পাঠাই, জানিয়ে যে তাঁর কাছেই আপনি উঠবেন। এই ভদ্রলোকটি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, এবং সমাজে যেহেতু তাঁর উচ্চস্থান ও লোকের সেবায় কাজও করেছেন প্রচুর, তাঁর মতামতের একটা স্বাধীনতা আছে—তাই আপনাকে সেখানে রক্ষা করতে তাঁর মত আর কেউই পারবে না। অত্যন্ত আত্মসম্মান জ্ঞান তাঁর এবং ইতালীতে যা ঘটছে, তাতে তিনি মর্মে মর্মে পীড়িত। রাজার আশে-পাশে এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে ফ্যাশিজমের বিরোধী একটি বিপক্ষ দল আছে, এবং এ রকম কয়েকজন অত্যন্ত উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিদের ফ্যাশিজম ছুঁতে পর্যন্ত সাহস পায় না— আমাদের জেনারেল মরিস সেই ব্যক্তিদের অন্যতম। ইতালীর বিমানবহরের প্রতিষ্ঠাতা তিনি, তার পরিচালনার ভারও তিনি নেন।"

ক্রমশঃ

রাত তখন দশটা

দেবল দেববর্মা

আগের ঘটনা

[দিকনগর পেপার মিলের অপারেটর মিস তরঙ্গমালা এক রাতে খুন হল। এতে জড়িয়ে পড়ে তারই প্রেমিক নিখিলেশ সেন। এখন সে হাজতে বন্দী। কেসটা হাতে নিল সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল। শচীদুলাল তার সহকারী। নিখিলেশের বন্ধু শশাঙ্ক ভট্টাচার্য। তরঙ্গেরও পরিচিত।

ময়না তদন্ত হয়ে গেছে। পরদিন দিকনগর থানার ও-সি সুব্রত সরকার, শচীদুলাল আর রাজীব এল ঘটনাস্থলে। ইতিমধ্যে সেখানে সকলের অলক্ষ্যে একটা ছোট্ট বোতাম আর রুমাল কুড়িয়ে পায় রাজীব।

ওরা এল তরঙ্গর মেসে। সেখানে তরঙ্গর রুমমেট, পেপার মিলেরই আর এক টেলিফোন অপারেটর সুজাতা দাসের সঙ্গে ওরা পরিচিত হল। খুনের ব্যাপার নিয়ে অনেক কথা চলল।

এরপর তরঙ্গের মাকেও অনেক জেরা করল। নিখিলেশের সঙ্গে প্রেম আর মিল ম্যানেজারের প্রতি তরঙ্গের বীতরাগ, অথচ ম্যানেজারের গায়ে পড়া ভাব সবই জানা গেল।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(ছয়)

শচীদুলালের হাত থেকে রুমালটা নিয়ে রাজীব মিসেস মজুমদারের দিকে তাকাল। বলল, 'আগে আপনাকে ছেড়ে দিই। আমার সহকারী শচী ভারী ব্যস্ত লোক। কিন্তু ওর সঙ্গে পরে আলোচনা করলেও চলবে।'

মৃদু হাসল রাজীব। চোখ দুটি অবিচল। ঘটনার তাপে উত্তাপে নির্বিকার, স্থির—'

ভদ্রমহিলা কৌতূহল প্রকাশ করে বসলেন, 'কি রুমালের কথা উনি বলছিলেন ইন্সপেক্টরবাবু? কোথায় পাওয়া গেল রুমালটা?'

'ও কিছু নয়।' রাজীব হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। বলল, 'মাটি খুড়তে শুরু করলে এটাসেটা অনেককিছু উঠে আসবে। কিন্তু আসল বস্তুটি বহুদূরে। খনির খোঁজ পেতে হলে অন্তরে যেতে হবে আপনাকে। গভীর অভ্যন্তরে।'—রাজীবের দুটি চোখে রহস্যের ঝিলিক দেখা গেল।

মিসেস মজুমদার কি বুঝলেন কে জানে। বললেন, 'আপনি অনুমতি করলে আমরা এখন যেতে পারি তাহলে।'

'বিলক্ষণ', রাজীব সান্যাল সোজা হয়ে বসল, 'আর দেরী করলে সন্ধ্যের পর যাত্রা করবেন কি করে?' একটু থেমে যোগ করল রাজীব, 'আর মিনিট দশেক আটকাব আপনাকে। তারপরই যেতে পারবেন আপনি।' রাজীবের গলার স্বরে সান্ত্বনার আভাস।

বোধহয় আরো কিছু প্রশ্ন। তারই জবাব দিতে হবে, এই ভেবে মিসেস মজুমদার সোজা হয়ে বসলেন। রাজীব বলল, 'আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করছি। সেই উড়ো চিঠিটা কি আপনার কাছে রয়েছে?'

'উড়ো চিঠি মানে সেই—?'

'হ্যাঁ।' রাজীব কথার খেই ধরে বলল, 'নিখিলেশের সঙ্গে তরঙ্গের মাখামাখি দেখে যে আপনাকে সতর্ক করতে চেয়েছিল। লিখেছিল কলকাতায় নিখিলেশের বউ রয়েছে।—।'

মিসেস মজুমদার সামান্যক্ষণ ভাবলেন। বললেন, 'এখনই ঠিক বলতে পারব না ইন্সপেক্টরবাবু। অনেকদিন হয়ে গেল তো। তবে খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে চিঠিটা। এখন ভাবি কে লিখতে গেল ওটা? কি উদ্দেশ্য ছিল ওর?' কয়েক সেকেন্ড থেমে মিসেস মজুমদার বললেন, 'আচ্ছা, ঐ চিঠিটার সঙ্গে এই খুনের কোন যোগ নেই তো?'

রাজীব সান্যাল টেবিলের উপর একটা লাল নীল রঙের পেন্সিল ঠুকছিল। কায়দা করে বলল রাজীব, 'চট করে বলা মুস্কিল মিসেস মজুমদার। আমরা এখন ঘর থেকে বেরিয়ে কেবলমাত্র পথে নেমেছি। গন্তব্য-স্থল অনেকদূর।'

'কলকাতায় ফিরে চিঠিটার আমি খোঁজ করব ইন্সপেকটরবাবু। খুঁজে পেলে ওটা কি পাঠিয়ে দেব আপনাকে?

মাথা নাড়ল রাজীব। তার প্রয়ো নেই। চিঠিটা পেলে আপনি যত্ন করে রে দেবেন। দরকার মনে করলেই আমি আনি নেব ওটা।'

কয়েক সেকেন্ড দুজনেই চুপচা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রাজীব। একটু চিন্তি দেখাল তাকে। মস্তিষ্কের কোষে, চিন্ত তরঙ্গের উপর যেন সদ্যোজাত এটি নতু সূত্র ধীরে ধীরে উঠছে নামছে। কি ভাব ভাবতে রাজীব বলল, 'মিসেস মজুমদা আপনার মেয়ের জিনিষপত্রগুলি একব দেখব চলুন। প্রয়োজন মনে করলে কয়েক কাগজপত্র, সাধারণ জিনিষ আমাদের রে দিতে হবে।'

'ওর জিনিষপত্র কিছুই আমি দেখিনি বাক্সপ্যাঁটরা খুলে দেখবার মত মনও আম নেই। দেখেশুনে আপনার যা প্রয়োজন রে দিন ইন্সপেক্টরবাবু।'

খুব গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ গলায় রাজী বলল, 'আপনার মনের অবস্থা আমি জা মিসেস মজুমদার। কিন্তু একটা ক আপনি ভুলে যাবেন না। সি-আই-ডি ইন্স পেক্টরকে সাহায্য করছেন আপনি। আপনা নিরপরাধ মেয়েকে যে হত্যা করেছে তা খুঁজে বার করতে হবে। অপরাধীর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। আপনিও নিশ্চয়ই তা চান?'

'কিন্তু আমি কি করতে পারি? কি ক সম্ভব আমার পক্ষে?' প্রায় কাঁদকাঁদ মু বললেন মিসেস মজুমদার।

'আপনি শক্ত হ'ন। গভীর দুঃ নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন না।' রাজী সান্যাল শেষের কথাগুলি ধীরে ধীরে উচ্চা রণ করল।

সুব্রতকে সঙ্গে নিয়ে রাজীব মালখানা এল। বুদ্ধি করে তরঙ্গের বাক্সপ্যাঁটর বিছানাপত্র থানায় এনে রেখেছে সুব্রত জিনিষপত্র মন্দ নয়। একটা চামড়ার সু কেস, একটা কালো রঙের বড় সাইজে তোরঙ্গ এবং বিছানাপত্র।

'মিসেস মজুমদারকে বসতে এক চেয়ার দাও সুব্রত।' রাজীব প্রায় আদে করল।

চেয়ার এল তখনই, সঙ্গে সঙ্গে। ভদ্র মহিলা বসলেন, সুব্রতর আদেশে একজ সিপাই এসে তোরঙ্গের চাবি খুলে ডালা তুলে ধরল। জামাকাপড়ে তোরঙ্গটা একে বারে ঠাসবোঝাই। রাজীব অপাঙ্গে চে দেখল। নানা রঙের সব শাড়ী, জাম মেয়েদের অন্তর্বাস। কয়েকটা শাড়ীতে বে সুন্দর নক্সা। চিত্রবিচিত্র, রঙবাহার এব দামী বলে মনে হয়। সুব্রত ধীরে ধীরে একটি করে কাপড়জামা তোরঙ্গ থেকে বে করে নামিয়ে রাখছিল।

তরঙ্গ বেশ সোখীন মেয়ে ছিল। কথা রাজীবের হঠাৎ মনে হল। প্রসাধনের টুকি টাকি নানা দ্রব্য যাদুকরের মত হাতে কায়দায় সুব্রত তোরঙ্গের মধ্য থেকে বে করছিল। প্রতিবারই যেন একটা বিস্ময়

এবার সুব্রত কি বের করে আনে তারই জন্য একটা বুকচাপা কৌতূহল।

তরঙ্গ সাজগোজ করতে ভালবাসত। রাজীব নিঃসন্দেহ হল। অবশ্য সেজেগুজে শ্রীময়ী এবং অপরূপ হতে কোন মেয়ে না চায়? সিকি রূপকে প্রসাধনের পরশে ষোল আনা রূপিয়া করে তোলাই তো মেয়েদের কাজ। সুতরাং সাজগোজ করতে তরঙ্গ ভালবাসবে, এ আর এমন বিচিত্র কি? অবশ্য ওরই মধ্যে একটু রকমফের, ইতরবিশেষ আছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি দ্রব্য নামিয়েছে সুব্রত। ছ' সাতটা খোঁপার জাল,—যার সাহায্যে মউচাকের মত সুদৃশ্য খোঁপা রচনা করত তরঙ্গ। চার পাঁচটা সুগন্ধী সেন্টের শিশি। ওর মধ্যে দু-তিনটে তো অব্যর্থ বিলিতী মাল। নিউমার্কেট কিংবা গাড়িয়া-হাট অঞ্চল থেকে খুঁজে পেতে সংগ্রহ করতে হয়েছে তরঙ্গকে। ঠোঁটরাঙানো লিপস্টিক, গাল দুটিতে শীতের দেশের লোকের মত লালিমা ফুটিয়ে তুলবার জন্য রুজ রয়েছে দু-তিনটি। নানা ধরণের তিন চারটে পুঁতির মালা, ছোট বড় সাইজের গোটা চার ভ্যানিটি ব্যাগ। প্লাস্টিকের খুব সুন্দর একজোড়া চটি কাগজে মোড়া ছিল। কৌতূহল হতে রাজীব চটি জোড়াটা হাতে নিয়ে দেখল। না, তরঙ্গ ব্যবহার করেনি এটা। প্লাস্টিকের চটিটা এদেশে তৈরী হয়নি। বেশ নিপুণ কাজ চটিতে। রাজীব লক্ষ্য করে দেখল ওটা ফরাসীদেশের কোন কারখানায় তৈরী হয়েছে। কিন্তু দিকনগরে তরঙ্গের তোরঙ্গে কেমন করে এল এই পাদুকা? ভ্রূ কুচকে রাজীব কিছুক্ষণ চিন্তা করল। প্লাস্টিকের চটি কি কলকাতায় কিনেছিল তরঙ্গ? না পাদুকাটি কোন সঙ্গকামী পুরুষের প্রণয়োপহার? কিনে থাকলে কেন এটা ব্যবহার করেনি তরঙ্গমালা? তোরঙ্গের নীচে এমন লুকিয়ে রেখেছিল কেন কস্টুটি?

সুব্রত তোরঙ্গটি প্রায় খালি করে এনেছিল। নীচের দিকে কয়েকটা বই, কিছু কাগজপত্র, তরঙ্গের একটা অ্যালবাম। দু তিনটে খামে লেখা চিঠি, কয়েকটা পোস্ট-কার্ড, উল বুনবার কাঁটা, ছ' সাতটা ন্যাপ-থালিন বড়ি, একটা ওষুধের খালি শিশি।

রাজীব বলল, "ওগুলো আমার হাতে দাও সুব্রত।' বইপত্র, খুচরো কাগজ, ছবির অ্যালবাম আর চিঠিগুলো সুব্রত এগিয়ে দিল। একনজরে সেগুলি নিরীক্ষণ করে রাজীব বলল, 'মিসেস মজুমদার, এই জিনিষগুলি আপাতত আমাদের কাছে থাকবে। আর হ্যাঁ, ওই প্লাস্টিকের চটি জোড়াটাও। পরে অবশ্য সবই আপনি ফেরৎ পাবেন।

বিষাদমাখা কন্ঠস্বরে ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন, কি হবে আর ফেরৎ নিয়ে? কার জিনিষ কার জন্যে নিয়ে যাব ইন্সপেক্টর-বাবু? কাকেই বা দেব এগুলো?

চামড়ার সুটকেসটায় জিনিষপত্র কম। সুব্রত এবার সেটি নিয়ে বসল। শীতবস্ত্র কয়েকটি,......নক্সাকাটা কালো রঙের কাশ্মিরী শাল, একটা গোলাপী রঙের কার্ডিগান, উলের মোজা, হাতে বোনা সুন্দর একটা স্কার্ফ, একটা লেডিজ কম্ফর্টার। এ অঞ্চলে শীত প্রচন্ড, সেজন্য শীতবস্ত্রের প্রয়োজন আছে, এবং সংগ্রহও বেশী।

গরম জামাকাপড়ের নীচে টুকিটাকি দু-একটা অলঙ্কার। দুটো আংটি,—একটা পাথর বসানো সরু গলার হার। একজোড়া বালা। জয়পুরী কাজকরা কানের দুল। খুব সম্ভব এই গয়নাগুলো মাঝেমধ্যে ব্যবহার করত তরঙ্গ। কোথাও যেতে আসতে কিংবা নিমন্ত্রণ হলে বাড়তি গয়না-গুলো অঙ্গে পরে নিত।

রাজীব বলল, 'কলকাতায় গিয়ে তরঙ্গ কি গয়নাটয়না গড়তে দিয়ে আসত?'

'ও কোথায় গয়না গড়াবে?' মিসেস মজুমদার বাধা দিয়ে বললেন, 'যা গয়না-টয়না দেখছেন সব হারা স্যাকরা গড়েছে। টাকাপয়সা জমিয়ে আমি একটু একটু করে গয়না গড়িয়েছি। চাকরী বাকরী যাই করুক। একদিন তো মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছে তখন স্বামীপুত্তুর নিয়ে ঘরসংসার করাই হল শেষ কথা। কিন্তু অভাগীর কপালে তা নেই তো কি হবে?'

'এই গয়নাগুলো কি সব হারা স্যাকরাই গড়েছে? ভাল করে দেখুন তো?' রাজীব অনুরোধ করল।

'গয়নাটয়না সব আমার মুখস্থ। কল-কাতায় গিয়ে তরঙ্গ একটা রেখে অন্যটা নিয়ে আসত আমার কাছ থেকে। এই কোলিয়ারী মুল্লুকে গয়নাগাটি সঙ্গে আনা ভয়ভাবনার কথা। এইজন্যে আমি ওকে পই পই বারণ করতাম। গলায় একটা হার আর কানে একজোড়া ফঙ্গবেনে দুল। হাতে চার গাছি ব্রোঞ্জের চুড়ি। এর বেশী সঙ্গে রাখবার কি দরকার? যা থাকবে সঙ্গে তা রইবে আমার অঙ্গে। সুটকেসে বাক্সে গয়না রাখা বুদ্ধিমানের কথা নয় ইন্সপেক্টরবাবু কিন্তু মেয়ে আমার কথা শুনতে চাইত কি?

রাজীব সান্যাল বলল, 'আপনি হাতে নিয়ে গয়নাগুলো পরীক্ষা করুন একবার। সবই হারা স্যাকরার তৈরী তো?'

মিসেস মজুমদার সাগ্রহে হারটা তুলে নিলেন হাতে, 'এই তো হারা স্যাকরার হাতের কাজ। এমন সুন্দর পালিশ, মানান-সই করে পাথর বসানো হারা ভিন্ন আর কে পারবে?' ভদ্রমহিলা হারটা রেখে বালাটা দেখলেন, 'এই ছোট ছোট ফুল কোথায় কোন সিনেমায় গিয়ে দেখেছিল তরঙ্গ। কাদের বাড়ীর বউমানুষ এমনি বালা পরে বসেছিল ওর পাশেই। হয়ত কোনো বড়-লোকের ঘরের বউটউ হবে। তারপর থেকে মেয়ের ইচ্ছে হল এমনি একজোড়া পারফোর বালা গড়াবে। শেষে হারা স্যাকরাকে বাড়ীতে ডেকে তিন-চারটে ডিজাইনের বই বেছে এই বালা গড়তে দেওয়া হল।'

রাজীব সান্যাল এবার ফুল দুটো এগিয়ে দিল ভদ্রমহিলাকে। সুব্রতকে বলল, 'আচ্ছা তরঙ্গর গায়ে যে গয়না-টয়নাগুলো ছিল সেগুলো কি দেখেছেন উনি?'

মিসেস মজুমদার নিজেই বললেন, 'নতুন করে দেখবার আর প্রয়োজন নেই ইন্সপেকটরবাবু। ওগুলো আমি আগেই দেখেছি। আমার তরঙ্গ নেই, ও গয়নাতেও আমার কাজ নেই। ও সব সর্বনেশে জিনিস। ওরই লোভে হয়ত তরঙ্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শয়তানটা।

রাজীবের ইচ্ছে হল, ওর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে ওকে। তরঙ্গকে খুন করবার পিছনে ওর অলংকার কটি হাতিয়ে নেবার উদ্দেশ্য আততায়ীর কণামাত্রও ছিল না। মোটিভ নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবং সেই মোটিভটা কি, তাই খুঁজছে রাজীব সান্যাল। বহুরূপী ক্যাকলাসের মত সেটা ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে।

শোকসন্তপ্ত জননীকে কিছু বোঝাতে যাওয়া বৃথা। রাজীব নিরস্ত হল। শুধু বলল, 'তরঙ্গের গায়ের গয়নাগুলো সব হারু স্যাকরার হাতের জিনিস ছিল তো?'

ভদ্রমহিলা ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালেন।

জয়পুরী কাজ করা কানের সেই ঝুমকো দুল জোড়া খুঁটিয়ে দেখা শেষ। মুখ দেখেই রাজীব সান্যাল উত্তরটা আঁচ

করল বেহালার সেই হারা স্যাকরাই হার গড়েছে। এই সুন্দর দুল জোড়াও তার কর্ম। বাকী শুধু দুটো আংটি।

রাজীব বলল, 'নিন, এই আংটি দুটো দেখে শেষ কথা বলুন দিকি। এ দুটো হারু স্যাকরার হাতের জিনিস তো?

এতক্ষণে রাজীবের মুখটা উজ্জ্বল দেখাল। যা প্রত্যাশা করেছিল তাই যেন এবার খুঁজে পেয়েছে রাজীব। মিসেস মজুমদারের মুখখানা কেমন সন্দিগ্ধ দেখাচ্ছে। যে আস্থার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি, সে ভাব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। রাজীবের মনে হল ওষুধে এতক্ষণে কাজ দিয়েছে ভদ্রমহিলার অব্যক্তর দিবালোকের মত স্পষ্ট।...
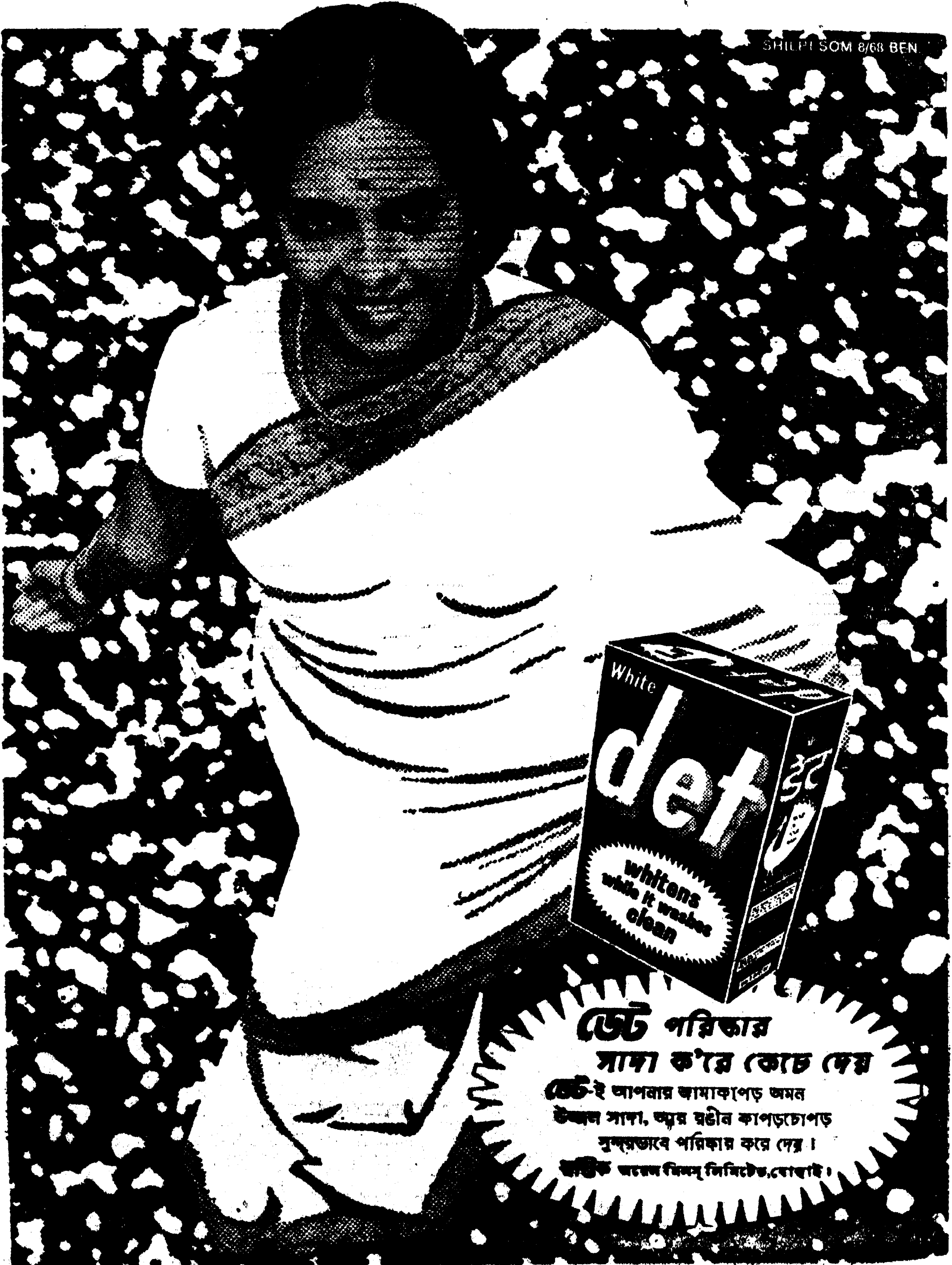
দুটো আংটির একটিতে শাদা পোখরাজ পাথর বসানো। অন্যটির উপর পাথর-টাথর নেই। ইংরেজী একটি অক্ষর এনগ্রেভ করা। খুব বেশী সোনা নেই কোনোটিতে। মেরে কেটে সিকি ভরি পর্যন্ত হতে পারে।

ভদ্রমহিলা পোখরাজ বসানো আংটি ফের দিলেন রাজীবকে। বললেন, 'এটা হারু স্যাকরা গড়েছিল। গত শীতে তরঙ্গ বলল —একটা পাথর বসানো আংটি ওর চাই।'

'চাই মানে নিজের জন্য তো?'

'না।' ভদ্রমহিলা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আমার বেশ মনে আছে ইন্সপেকটরবাবু, কার বিয়েতে যেন আংটি দেবে বলেছিল তরঙ্গ।'

'বিয়েতে আংটি?'

ঠিকই বলেছেন। আংটি প্রেজেন্ট করবার মত কি অবস্থা আমাদের? আমি তরঙ্গকে বলেছিলাম সেকথা। কিন্তু মেয়ে আমার কথা শুনল না। বলল, বিশেষ জানাশোনা তার সঙ্গে। দামী কিছু না দিলে সম্মান থাকে না।'

রাজীব পোখরাজ পাথরটা পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'এখন দেখা যাচ্ছে তরঙ্গ আংটিটা কাউকে প্রেজেন্ট করেনি। এতদিন ধরে নিজের কাছেই রেখেছিল।'

অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ। চার দেয়ালের আগল দেওয়া ঘরের মধ্যে থেকে রাজীব যেন ছিটকে পড়েছে বাইরে। জমাট অন্ধকারে ঢাকা একটা প্রান্তরের মধ্যে। শুধু অন্ধকার,...নিকষ কালো অন্ধকার। মাঝে মাঝে আলেয়ার আলোর মত একটা নিশানা দপ করে চোখের সামনে জ্বলে ওঠে। পরক্ষণেই কালোছায়া। দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে হয়রান।

অন্য আংটিটা তখনও ভদ্রমহিলার হাতে। রাজীব বলল, 'মনে হচ্ছে ও আংটিটা হারু স্যাকরার তৈরী নয়।'

মিসেস মজুমদার স্বীকার করলেন ও আংটিটা তাঁর চেনা নয়। কোনোদিন তরঙ্গের কাছে দেখেন নি তিনি। এ আংটির বিন্দু-বিসর্গ জানেন না।

রাজীব হাসল। 'জানবেন কেমন করে? আমাদের নিজেদেরই কতটুকু জানি আমরা? যা চাকুরে মেয়ে তো বহু দূরের কথা। তরঙ্গের একটা নিজের জগৎ ছিল মিসেস মজুমদার। আর সে জগতের কি জানবেন আপনি? একটি যুবতী মেয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালবাসা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব কিছু মিশিয়ে সে জগতের বুনিয়াদ—। সেখানে আপনিও হয়তো বাইরের মানুষ।'

কোনো উত্তর দিলেন না ভদ্রমহিলা।

রাজীব বলল, 'এ আংটিটা আমাদের কাছেই এখন থাকবে। আর চিঠিপত্র, বইটই, কাগজটাগজগুলো তো রইল। ওই জুতো জোড়াটাও রেখে দিতে হচ্ছে। সময়ে সব পাবেন।' সুব্রত চামড়ার সুটকেস থেকে খান পাঁচ-ছয় চিঠি, কয়েকটা হিজিবিজি লেখা স্লিপ কাগজ বের করে রাখল।

মিসেস মজুমদার বললেন, 'আমি তাহলে এখন উঠি ইন্সপেকটরবাবু। সাড়ে সাতটার বাসটাতেই যাব ভেবেছি।'

রাজীব ব্যস্ত হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই যাবেন। এমনিতেই আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আশাতীত সহযোগিতা পেয়েছি আপনার কাছ থেকে। ভবিষ্যতেও পাব বলে আশা রাখি।'

রাস্তা পর্যন্ত রাজীব আর সুব্রত এগিয়ে দিল। রিক্‌শ ডেকে ভদ্রমহিলা আর সেই ছেলেটিকে উঠতে সাহায্য করল সুব্রত।

বেলা যায় যায়। ভাদ্র শেষের অপরাহ্নের বিষণ্ণ আলোটুকু প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। দূরে কোথায় শাঁখের আওয়াজ শোনা গেল। কলরব করে একদল পাখী সম্ভবত নীড়াভিমুখী হয়েছে।

রাজীব বলল, 'সামনের সপ্তাহেই আবার আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে।'

'কলকাতা যাবেন?'

'হয়ত যেতে হবে। আচ্ছা নমস্কার—।' রাজীব দুই হাত জোড় করে হাসিমুখে তাকাল।

• • •

থানায় ঢুকে চেয়ারের উপর আয়েস করে বসল রাজীব। পকেট থেকে লাইটারটা বের করল। একটা সিগারেট মুখে দেবার আগে সুব্রতকে বলল, 'তুমিও ধরাও একটা। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে মগজ কিছুতেই সাফ হবে না।'

সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে রাজীব চোখ বন্ধ করে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। কপালটা কুঁচকে উঠছে। মাঝে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে কপালটা টিপছিল রাজীব। চোখ মেলে চাইল আরো কিছুক্ষণ পরে।

সুব্রত বলল, 'রাজীবদা, নতুন কিছু চিন্তা করছেন নাকি?'

পুরনো কিছু হাতে নেই তো সুব্রত। সুতরাং নতুন পুরনোর প্রশ্ন ওঠে না।' রাজীব ধীরে ধীরে বলল, 'এখন চিন্তা করছি, সন্ধান করছি—কিন্তু হদিশ পাচ্ছি কই?'

আহত ভঙ্গীতে সুব্রত বলল, 'রাজীবদা কি নিখিলেশকে খুনী বলে সন্দেহ করেন না? রুমালটা পাবার পরেও কি সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে?' কথা শেষ করে নাটকীয় ভঙ্গীতে সুব্রত ঘোষণা করল, 'আমি জোর করে বলতে পারি, খুনী নিখিলেশ সেন ছাড়া আর কেউ নয়।'

রাজীব ফিক করে হাসল। বলল, 'আধুনিক জীবন ভারী জটিল সুব্রত: খুন হল জটিলতর। একটা পূর্বকল্পিত উদ্দেশ্যমূলক খুনের পিছনে জটিল অভি-সন্ধি খেলা করছে। আমি যদি বলি খুনীর আসল উদ্দেশ্য ছিল নিখিলেশ সেনকেই শেষ করা, তাহলে তুমি কি বলবে?'

অবাক হয়ে সুব্রত বলল, 'তাহলে তো নিখিলেশকেই হত্যা করত সে।'

'কি প্রয়োজন? তরঙ্গমালাকে হত্যা করে নিখিলেশকে বেশ ফাঁসিয়ে দিয়েছে খুনী। এখন নিখিলেশ সেনকে ফাঁসির আসামী হয়ে দাঁড়াতে হবে। দায়রায় সোপর্দ যে হবে তা অবধারিত। এবং বিচারে কি যে রায় হবে তা বলা কঠিন। ফাঁসির দণ্ডাদেশ হবে না এমন কথা কে বলতে পারে? সুতরাং খুনীর উদ্দেশ্য সফল হবার ষোল আনা সম্ভাবনা।'

সুব্রত বিস্ফারিত চোখে বলল, 'বলেন কি রাজীবদা?'

'খুব বেশী চিন্তা করলে এমন আরো অনেক জিনিস মনে আসবে। অবশ্য আমি যা অনুমান করছি তা হয়ত সঠিক নয়। ভ্রান্ত অনুমানও হতে পারে। কিন্তু একটা কথা ঠিক জেনো সুব্রত। ডিম না ভেঙে ওমলেট কোন উপায়েই তৈরী করা যায় না। নিখিলেশ সেনকে যদি ওমলেট ভাব, তাহলে তরঙ্গই হল গোটা ডিম। সুতরাং ডিম ভাঙতে হয়েছে। নাহলে ডিম থেকে ওমলেটে পৌঁছবার জন্য কোন রাস্তা নেই।'

'কিন্তু চিঠির ব্যাপারটা রাজীবদা। নিখিলেশ নিজে চিঠি লিখে তরঙ্গকে দেখা করতে বলেছিল। সুদামভিলার মোড়ে তরঙ্গ যেন তার সঙ্গে দেখা করে। রাত দশটার আগে। হাতের লেখা নিখিলেশের কিন্তু। আপনি মিলিয়ে দেখুন।'

'মিলিয়ে দেখতে হবে না।' গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজীব বলল, 'চিঠিখানা নিখিলেশই লিখেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওর মধ্যে একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। বুঝলে সুব্রত, চিঠিটা তুমি আমাকে আজ দিও তো।'

সুব্রত বলল, 'এই ব্যাপারটাই আমার কাছে হেঁয়ালী হয়ে উঠছে রাজীবদা। নিখিলেশ চিঠি লিখে আসতে বলল, ওকে। অথচ খুনের সঙ্গে নিখিলেশের কোন সম্পর্ক নেই ভাবছেন। ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো হয়ে উঠছে না রাজীবদা?'

একপাশে চুপ করে বসেছিল শচী-দুলাল। অনেকক্ষণ সে কোন কথা বলেনি। বরং কথা শুনছিল। টুকরো টুকরো কথা। রাজীব যেমন বলছিল—'

হঠাৎ সে বলল, 'আপনি তাহলে কাকে সন্দেহ করেন স্যার?'

রাজীব উদার চোখে হাসল। 'কাউকে না। এত তাড়াতাড়ি সন্দেহ শুরু করলে

তদন্তের বারোটা বাজবে শচী। বলছি না তোমাকে ? খুনের তদন্তে খোলা মন নিয়ে এগুতে হবে। কাউকে সন্দেহ করলেই সমটা পর্দায় ঘোলা জলের মত ক্যাদাটে হয়ে উঠবে। তখন ভাবনা চিন্তা সব এক বিন্দুতে এসে থেমে যাবে। যাকে সন্দেহ করেছ তাকে ভিন্ন আর কাউকে তুমি দোষী বলে ভাবতে পারছ না।'

খানিকটা সময় অলক্ষ্যে গড়িয়ে গেল। নিস্তব্ধতা ভংগ করে রাজীব বলল, আমি শুধু আমার মতটা ব্যক্ত করেছি সুব্রত। তার অর্থ এই নয় যে আমি বেঠিক হতে পারব না। তবে আমার কেমন মনে হচ্ছে নিখিলেশকে খুনী বলে সন্দেহ করার ব্যাপারটা আগাগোড়া সাজানো। স্রেফ চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা।'

সুব্রতর বাড়ী থেকে চা এল। ধূমায়িত তিন কাপ চা। রাজীব সাগ্রহে একটা কাপ টেনে নিয়ে বলল, 'আশ্চর্য ! তোমার চায়ের কথা আমি কেমন করে এত-ক্ষণ ভুলেছিলাম বলো ত ?'

চায়ে চুমুক দিয়ে রাজীব বলল, 'আংটিটা দেখেছ সুব্রত ?'

'কোন্ আংটি রাজীবদা ?'

'মিসেস মজুমদার যে আংটির কথা বিন্দুবিসর্গও জানেন না বললেন। ভাবছি তরংগ ওটা পেল কেমন করে ? এটা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে সুব্রত।'

'হয়ত কোথাও কিনে থাকবে রাজীবদা।'

'তরংগ আংটি কিনলে মিসেস মজুমদার জানতে পারবেন না, এ অমাবস্যার চাঁদের মত অসম্ভব ব্যাপার সুব্রত। শাড়ী গয়নার গল্পের চেয়ে প্রিয় আর কিছু মেয়েদের কাছে নেই।' একটু থেমে রাজীব বলল, 'আর একটা পয়েণ্ট মনে রেখেছ সুব্রত ? গত শীতে তরংগ একটা পাথর বসানো আংটি গড়িয়েছিল। মাকে বলেছিল কার বিয়েতে যেন প্রেজেণ্ট করবে। পরে দেখা যাচ্ছে, আংটিটা তরংগ কাউকে প্রেজেণ্ট করেনি। তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, পোখরাজ বসানো আংটিটা প্রমাণ সাইজের। কোন মেয়ের আঙুলের মাপে ওটা তৈরী হয়নি।'

'আপনি কি বলতে চান আংটিটা তরংগ ওর লাভারকে দেবে বলে তৈরী করিয়েছিল ?'

'হ্যাঁ তাই। হয়তো কোন রক্তিম শান্ত সন্ধ্যায় প্রেমিকের আঙুলে ওটা পরিয়ে দেবে বলে তরংগ ভেবেছিল।' রাজীব খুব মিষ্টি করে হাসল।

হতাশ ভংগি করে সুব্রত তাকাল।

উৎসাহ দিয়ে রাজীব বলল, 'কই অন্য আংটিটার কথা তো কিছু বললে না ? ওটা দেখনি তুমি ?'

টেবিলেই পড়ে ছিল আংটিটা। সুব্রত উল্টেপাল্টে আংটিটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

রাজীব বলল, 'আংটিতে একটা ইংরেজী অক্ষর এনগ্রেভিং করা আছে দেখেছ ?'

'হ্যাঁ।' সুব্রত চিন্তিত মুখে বলল, 'অক্ষরটা 'এস' রাজীবদা।'

'ঠিক বলেছ সুব্রত। অক্ষরটা 'এস'।' রাজীব সান্যাল 'এস' অক্ষরটার কাছে এসে যেন অকস্মাৎ অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ পরে রাজীব বলল, 'এস' কোন নামের আদ্যক্ষর। এটা আমরা ধরে নিতে পারি সুব্রত ? কি বলো—'

সুব্রত সায় দিল।

রাজীব বলল, 'কোন নামের আদ্যক্ষর 'এস' বলো দিকি শচী ?'

শচীদুলাল ভাবছিল।

রাজীব হেসে বলল, 'শচীদুলাল আর সুব্রত সরকার দুজনের নামের আদ্যক্ষরই দেখছি এস।' ঘাড় ঘুরিয়ে রাজীব তাকাল সুব্রতর দিকে। বলল, 'কি সুব্রত ? তরংগকে কোনোদিন আংটি প্রেজেণ্ট করে বসনি তো ?' ভাবছি তোমাকেই সন্দেহ করব নাকি ?'

শচীদুলাল মুচকি হাসল।

'আপাতত 'এস' অক্ষর দিয়ে তিনটি নাম আমি খুঁজে পাচ্ছি।'

রাজীব মুখ উঁচু করে বলল, 'একটি মহিলার। অন্য দুটি নাম পুরুষের। এদের প্রত্যেকেই তরংগের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। অবশ্য আরো নাম থাকতে পারে তাদের এখনও আমরা খুঁজে বের করতে পারিনি।'

'কি কি নাম স্যার?' শচীদুলাল দু নিশ্বাসে কৌতূহল ব্যক্ত করল।

'বলছি শচী। কিন্তু নামগুলো হে তুমিও জান। একটি মহিলার। তিনি মি সুজাতা দাস। অন্য দুটি নামের একটি হল শশাংক ভট্টাচার্য। শেষের নামটি যার তার সংগে এখনও আমি পরিচিত হইনি তিনি মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী। রাজীব সান্যাল খুব গম্ভীর মুখ করে বলল, 'সুব্রত, কালই একটা অ্যাপয়েণ্টমেন্ট করো। সুদর্শন চক্রবর্তীর সংগে আমাদের দেখা করা দরকার। আমার মনে হচ্ছে সুদর্শন চক্রবর্তী মাস্ট বি অ্যান ইণ্টারেস্টিং ম্যান।'

টেবিলের উপর চিঠিপত্র, বইটই, নানা খুচরো কাগজ, প্ল্যাস্টিকের সেই সুদৃশ্য চটি জোড়াও পড়ে রয়েছে। একটা নীলচে কাগজ হঠাৎ চোখে পড়ল রাজীবের। ক্যাশ-মেমো বলে মনে হল তার। দ্রুত কাগজটায় চোখ বুলিয়ে গেল রাজীব। ক্যাশমেমোই বটে,—একটা নয়, দুটো। স্ট্যাপলার দিয়ে আঁটা বলে নীচেরটা নজরে আসেনি। পড়তে পড়তে রীতিমত উত্তেজিত দেখাল রাজীবকে। প্রায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ক্যাশ-মেমোটা পড়ল রাজীব। প্রথমে একটা,— তারপর দ্বিতীয়টাও তেমনিভাবে পড়ল। একটা নামকরা অভিজাত রেস্তোরার ক্যাশমেমো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে যেখানে সন্ধ্যায় হাল্কা বিলিতী সুর বাজে। সুবেশ নরনারীর দল ভিড় করে। বাজনার তালে তালে মেয়ে পুরুষে কোমর জড়িয়ে বিদেশী নাচের ছন্দে পা ফেলে। নাচে-গানে, হাসো-লাস্যে, রাত্রির প্রথম প্রহর ধীরে ধীরে ভোল পাল্টায়। যুবতী মেয়ের মদির চাহনীর মত আগন্তুককে অবশ নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।

পার্ক স্ট্রীটের এই রেস্তোরায় কি তরংগ গিয়েছিল ? কিন্তু কার সংগে ? ক্যাশমেমোতে দুজনের মত খাবারের উল্লেখ আছে। আর আছে সুরাপানের কথা। অবশ্য এখানে এলে মদ্যপান করাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তরংগ সুরাপান করেছিল কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সাকুল্যে আড়াই পেগ শেরীর উল্লেখ রয়েছে মেমোতে। লোকটি দু' পেগ খেয়ে থাকলে বাকী আধ পেগ কার জন্য ? আধ পেগ শেরী কি আনাড়ী তরংগকে দেওয়া হয়েছিল ? কিংবা লোকটিই আড়াই পেগ শেরী একাই নিঃশেষ করে উঠেছে।

গম্ভীর মুখে রাজীব উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সুব্রত, আজ তাহলে উঠলাম হে। কাল আবার দেখা হবে।'

সুব্রত বলল, 'মনে হচ্ছে কি যেন চিন্তা করছেন রাজীবদা।'

'হ্যাঁ।' রাজীব স্বীকার করল। ধীরে ধীরে বলল, 'ভাবছি তরংগমালা মজুমদার বেশ খেলুড়ে মেয়ে ছিল হে সুব্রত।'
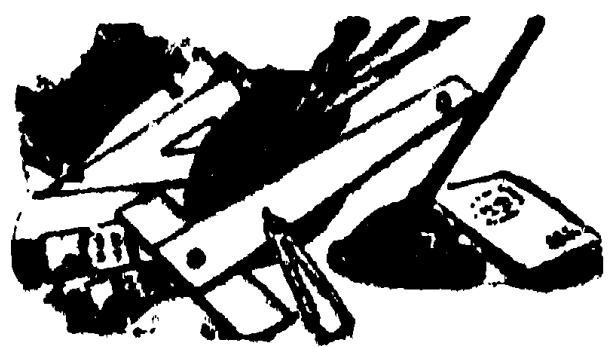
(ক্রমশঃ)

হাসির মজলিস

—চুল কাটতে কত লাগে?

—পঁচাত্তর পয়সা।

—বড্ড বেশী মশায়। শেভ করতে কত নেবেন?

—পঁচিশ পয়সা।

—তবে আমার মাথাটাই শেভ করে দিন।

●

অমিতেশবাবু শ্রীনিবাসের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত। কিন্তু তিনি যেতে রাজী নন। স্ত্রী বিমলা বললেন—কেন তুমি যাবে না? বিশেষ করে এটা তোমার বন্ধুর একটা বিশেষ ব্যাপার।

অমিতেশ—দেখ জিনিসটা খুবই খারাপ হয়। একই ব্যাপারে ও আমাকে বারবার তিনবার নিমন্ত্রণ জানাল, অথচ একবারও আমি ওকে এরকম ব্যাপারে খাওয়াতে পারলাম না।

●

ডাক্তার—আমার পক্ষে যথাসাধ্য আমি করেছি। আপনার শেষ ইচ্ছে বলুন।

রোগী—স্যার, আর একজন ভাল ডাক্তার ডাকুন।

●

—তোমাদের নতুন বাড়ীটা কেমন লাগছে?

—খুব ভাল স্যার। এরকম আরামে জীবনে কখনো থাকিনি। আমার একটি আলাদা ঘর আছে। সেই ঘরেই পড়ি, ঘুমোই, আড্ডা মারি। প্রত্যেক ভাইবোনেরই নিজের নিজের ঘর হয়েছে। কিন্তু বৌদির আর কষ্টের সীমা নেই স্যার! আলাদা কোনো ঘর হল না, শেষপর্যন্ত দাদার ঘরে ছাড়া আর কোথাও তার জায়গা হল না।

●

প্রথম ব্যক্তি—আমার ভাইকে একটা চিঠি লিখছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—বাজে কথা বোল না। তুমি তো লিখতেই জান না!

প্রথম ব্যক্তি—বাঃ, তাতে কি এলোগেলো। আমার ভাইও তো পড়তে জানে না।

●

প্রঃ — পুরুষ বাদে নারী কি?

উঃ — ছবিছাড়া ফ্রেম।

পশুপতিবাবু তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে এলেন অফিস থেকে। অফিস যাওয়ার সময় দেখে গিয়েছিলেন ছেলেটির ১০৪ ডিগ্রি জ্বর। কলেজে যেতে পারছে না চারদিন ধরে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে দেখেন কয়েকটি সুন্দরী মেয়ে তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

যাই হোক বাড়ী গিয়ে ছেলের পাশে বসলেন।

সে বলল—বাবা আমার জ্বর ছেড়ে গেছে।

বাবা—তা তো দেখতেই পেলাম বাড়ী ঢোকবার সময় দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

●

শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ কি?

—যত বেশী সংখ্যক সম্ভব মেয়ের সংগে প্রেমের চেষ্টা করা। এক শতাংশ ফেরৎ এলেই বিনিয়োগ সার্থক।

●

—একটা সিগারেট দিন।

—আমি ভেবেছিলাম, তুমি ছেড়ে দিয়েছ বুঝি।

—ছেড়েছি। তবে এখনও ফার্স্ট স্টেজেই আছি।

—তার মানে?

—এখন কেনা বন্ধ করেছি মাত্র।

●

পাটনা থেকে কুমারী সীতা একটি চিঠিতে জানতে চেয়েছেন, উটের ঘাড় এত লম্বা হয় কেন?

উত্তর—আমার মনে হয়, উটের দেহ থেকে মাথা দূরে বলেই এমন ঘটেছে।

●

শিক্ষক—মিল্টন সম্পর্কে দু একটি কথা বল?

ছাত্র—তিনি বিয়ের পর লেখেন প্যারাডাইস লস্ট। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর লেখেন প্যারাডাইস রিগেন্ড।

মন বুঝে দেখুন

কুইজ

আপনার বিবাহ যাচাই করুন

এই টেস্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে তৈরি হয়েছে, তবু মনে রাখবেন, এর দ্বারা বিবাহ জীবনের সামর্থ্য ও দুর্বলতার পরিমাপ যেটা হয় সেটা নিতান্তই মোটামুটি একটা হিসাব ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, বিষয়টি এতো জটিল যে, এর পরিমাপ নিখুঁতভাবে করতে হলে এতো বেশি জায়গা দরকার যা এখানে সম্ভব নয়।

তাহলেও, এই মনোপ্রশ্নচর্চায় আপনি যেসব জবাব দেবেন, তা থেকে আভাস পাওয়া যাবে আপনার বিবাহিত পরিবেশের কোনো ত্রুটি আছে কিনা, কোনটাই বা উপযুক্তভাবে করা হচ্ছে। আর, যদি আপনি বিবাহিত না হন, তাহলে আপনার যেসব মনোভাব থাকলে পরে অসুখী হতে পারেন, সেগুলি এই মনোপ্রশ্নচর্চার মধ্যে দিয়ে আগে থেকে জানতে পেরে আপনি সংশোধন করে নেবার সুযোগ পেতে পারবেন।

মনোপ্রশ্নচর্চার নিয়ম: নীচের কোনো কথাটি যদি মোটামুটিভাবে মনোমত হয়, তাহলে 'সত্যি'-এর পাশে দাগ দিন। যদি কোনো কথায় মত দেওয়া না যায় কিংবা মত দিতে দ্বিধাবোধ হয়, তাহলে 'মিথ্যা'-তে দাগ দিন। কোনো বাঁধাধরা সময় নেই।

১। আপনার বিবাহিত জীবন ঠিক-মতো চলবে কিনা তা নিয়ে বেশি উদ্বেগ দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, কারণ খারাপের চেয়েও খারাপ কিছু হলে আপনি যে কোনো সময়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারেন।
সত্য...মিথ্যা

২। সুখী বিবাহিত জীবন পেতে হলে স্বামী এবং স্ত্রীর একই ধরনের আগ্রহ অনুরাগ থাকা দরকার। সত্য......মিথ্যা......

৩। সুখী বিবাহিত জীবনের জন্যে দরকার আর্থিক নিশ্চিন্তবোধ।
সত্য...মিথ্যা......

৪। পুরুষের দেহগত প্রেম-ভালোবাসার তীব্রতা যতখানি থাকে, কোনো মেয়ের ততখানি থাকে না। সত্য...... মিথ্যা......

৫। বিবাহের কয়েক বছর পরে, স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে আকর্ষণ কমে যেতে বাধ্য। সত্য...... মিথ্যা......

৬। চল্লিশ বছর বয়সের কোনো পুরুষ বা নারী কুড়ি বছর বয়সের ছেলে বা মেয়ের মতো অতখানি সুন্দর হতে পারে না। সত্য......মিথ্যা......

৭। সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায়, কোনো নারী-পুরুষের মধ্যেই তা সম্ভব নয়।
সত্য...মিথ্যা......

৮। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যদি তীব্র যৌন আকর্ষণ বজায় না থাকে, তাহলে সাধারণত বিবাহিত জীবন চরায় ঠেকে যায়। সত্য......মিথ্যা......

৯। সত্যিকারের বিবেচনাবোধ থাকলে এবং প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে তামাসা করবার ইচ্ছে না থাকলে, স্বামী এবং স্ত্রীর উচিত যৌন কাজের জন্যে খানিকটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে রাখা। সত্য......মিথ্যা......

১০। বিবাহিত সাথী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে আলাপ করতে কোনো অন্যায় নেই, তার সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসা অনুরাগ না গড়ে উঠলেই হলো। সত্য......মিথ্যা......

১১। বিবাহ তখনই সবচেয়ে সুখের হয়, যখন বিবাহিত দুই সাথী পরস্পরের সব ইচ্ছা মানিয়ে নিতে রাজী হয়। সত্য......মিথ্যা......

১২। কোনো দম্পতি সপ্তাহে এক-বারের বেশি সঙ্গম করবে না। সত্য......মিথ্যা......

১৩। বাচ্চা এলে বিবাহিত জীবনে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশি। সত্য......মিথ্যা......

১৪। কোনো খিটখিটে স্ত্রীর দোষ খিটখিটে স্বামীর চেয়ে বেশি। সত্য......মিথ্যা......

১৫। একই সময়ে একজন পুরুষ দুজন নারীকে কিংবা একজন নারী দুজন পুরুষকে ভালোবাসতে পারে। সত্য......মিথ্যা......

১৬। স্বামী এবং স্ত্রী যতো কম বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের আপ্যায়ন করতে পারেন, সাধারণত বিবাহিত জীবন ততো বেশি সুখের হয়। সত্য......মিথ্যা......

১৭। স্বামী-স্ত্রী যতো কম বাইরের ব্যাপারে নিজেদের জড়াবেন, ততো বেশি সুখী হবেন। সত্য......মিথ্যা...

১৮। প্রেম-ভালোবাসা এক ধরনের খেলা। সত্য......মিথ্যা......

১৯। প্রেম-ভালোবাসা দারুণ গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপার। সত্য......মিথ্যা......

২০। সত্যিকারের সুখী বিবাহিত জীবন পেতে হলে, পুরুষের পক্ষে বাড়ীর বহু কাজ-কর্ম, যেমন শেলফ লাগানো, ছাদের ফুটো সারানো, এসব জানতে হয়,—এবং মেয়েদের পক্ষে জানতে হয় ভালো রান্না, সুস্বাদু খাবার-দাবার তৈরি। সত্য......মিথ্যা...

২১। স্বামী এবং স্ত্রী সর্বদা ছুটি কাটাবেন একসঙ্গে। সত্য......মিথ্যা......

২২। স্বামী এবং স্ত্রী যদি মাঝে মাঝে এক-আধটা সন্ধ্যার অবসর পরস্পরের থেকে দূরে গিয়ে কাটাতে চান, তা বেশ ভালোই।
সত্য......মিথ্যা......

২৩। বিবাহ একটা পুণ্যব্রত, কারণ (ঠিক জায়গায় দাগ দিন)
(ক) বিবাহ ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত...
(খ) বিবাহ মানবজাতির ধারা অক্ষুণ্ন রাখে......
(গ) এর দ্বারাই নারী এবং পুরুষের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে......

২৪। অধিকাংশ সুখী বিবাহিত জীবনে, স্বামী তাঁর কাজ-কারবারের ব্যাপার বাড়ীর বাইরেই রেখে দেন এবং তা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন না। সত্য......মিথ্যা......

২৫। যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর চেয়ে বেশি সামাজিক, আর্থিক এবং পেশাগত প্রতিপত্তি ও সাফল্য লাভ করে থাকেন, তাহলে শেষকালে বিবাহ জীবনে সুখ নষ্ট হয়।
সত্য......মিথ্যা......

আপনি কত নম্বর পেলেন......
গড়পড়তা যা সবাই পেয়ে থাকেন: ১৬
চমৎকার (সবচেয়ে ভালো শতকরা দশজন): ২১—২৫
সুন্দর (তারপরের শতকরা কুড়িজন): ১৮—২০
ভালো (তারপরের শতকরা ত্রিশজন): ১৬—১৭
খারাপ (সব নীচের শতকরা চল্লিশজন): ০-১৫

সঠিক জবাব:
১০ এবং ২২ সত্যি; ২৩ (গ) সঠিক;
বাকী সব মিথ্যা।
প্রত্যেক সঠিক জবাবে ১ পয়েন্ট পাবেন।

মানুষের প্রশ্ন

মেয়ে দেখলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। বিশ্বাস করুন এই অসুখটা আমার বানানো নয়। আমার এক তরুণ ডাক্তার-বন্ধুর পরামর্শ নিয়েছিলাম। তিনি বললেন : 'এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ডসের সিক্রেশনের ব্যাপার। একটু চেষ্টা করে সাবধানে থেকো।' বললাম : 'কোনো চিকিৎসা নেই? অপারেশন করে এই প্রচুর সিক্রেশন কমানো যায় না?' ডাক্তার বললেন : 'না, এই ধরনের কেস, আমরা এখনো অ্যাটেন্ড করিনি।'

আমি, বীরু মুখার্জি, উত্তর-মধ্য কলকাতায় আমাকে চেনে না এমন স্ত্রী-পুরুষ কম আছে। মেয়ে-সম্পর্কিত বিষয়ে আমার দস্তুরমতন অখ্যাতি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী জানেন, এই অখ্যাতি মূলধনের মতন আমাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করেছে। কেন বলুন তো এমন হয়, অনিমা আমার সংস্পর্শে আসবার আগেই বনানীর সঙ্গে আমার অ্যাফেয়ার জানত। কিংবা ব্যাপারটি কী এই, আমার অখ্যাতিই মেয়েদের কাছে আমাকে সুলভ করে দিয়েছে। বোধহয় আমার চরিত্রের সীমা ওদের কাছে স্পষ্ট বলে আমার সম্পর্কে কাল্পনিক কোনো উদ্বেগ বা আশাভঙ্গের কারণ তাদের কাছে ছিল না।

আপনি বলবেন, যে-সকল মেয়ে আমার জীবনে এসেছে তারা নেহাৎ বাজে, খেলো মেয়ে। দেখুন, সে-কথা কী করে বলি? অরুণা ইংরিজি অনার্সের ছাত্রী, লীলা স্কলারশিপ পেত। আশা করি, এদের বাজে মেয়ে ভাববেন না। তদুপরি বংশমর্যাদা সামাজিক প্রতিষ্ঠা এদের পরিবারের ঈর্ষা করবার মতন। কী জানেন, পুরুষের সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারে ভালো-মন্দ প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির কথা আসে না। বোধহয়, ওটা একটা আলাদা বিষয়। নাহলে আমার পূজনীয় অধ্যাপকের সুন্দরী স্ত্রী মাধবী দেবী হঠাৎ আমার মধ্যে কী আবিষ্কার করলেন। বিশ্বাস করুন, এ-ব্যাপারে আমার কোনো লোভ ছিল না। তিনি অধ্যাপকের অবর্তমানে সেই বর্ষার রাত্রিতে আমাকে অন্ধকার ড্রয়িংরুমে...।

আমার কথা শুনে লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আমরা যারা এ-ব্যাপারে অন্তর্ভুক্ত, তারা তো কোনো লজ্জা বোধ করছিনে। নাঃ, মাধবী দেবীও পরদিন লজ্জা পাননি। পরেও কোনদিন নয়। অধ্যাপকের বদলি হবার সময় তিনি আদর্শ প্রণয়িনীর মতন আমার গলা ধরে আকুল কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। বেশ মনে পড়ছে, আমার টেরিলিনের শার্ট ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছিল। বয়স্ক মেয়েছেলের কান্না, তদুপরি যদি সুন্দরী হন, বড় বিশ্রী লাগে। ওঁর চোখের কাজল ধুয়ে যাচ্ছিল কিনা।

দেখুন, আমি বীরু মুখার্জি, মধ্য-উত্তর কলকাতায় আমাকে সবাই চেনে। আমি ফুটপাথে হেঁটে গেলে কলেজের মেয়েরা আঙুল দিয়ে আমাকে দেখায়, ট্রামে-বাসে উঠলেও আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে ছাড়ে না। আমাকে দেখলে ওরা কেবল হাসে, ভয় বা ঘৃণা কিছুই

মিহির আচার্য

মন বুঝে দেখুন

কুইজ

আপনার বিবাহ যাচাই করুন

এই টেস্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে তৈরি হয়েছে. তবু মনে রাখবেন, এর দ্বারা বিবাহ জীবনের সামর্থ্য ও দুর্বলতার পরিমাপ যেটা হয় সেটা নিতান্তই মোটামুটি একটা হিসাব ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, বিষয়টি এতো জটিল যে, এর পরিমাপ নিখুঁতভাবে করতে হলে এতো বেশি জায়গা দরকার যা এখানে সম্ভব নয়।

তাহলেও, এই মনোপ্রশ্নচর্চায় আপনি যেসব জবাব দেবেন, তা থেকে আভাস পাওয়া যাবে আপনার বিবাহিত পরিবেশের কোনো ত্রুটি আছে কিনা, কোনটাই বা উপযুক্তভাবে করা হচ্ছে। আর, যদি আপনি বিবাহিত না হন, তাহলে আপনার যেসব মনোভাব থাকলে পরে অসুখী হতে পারেন, সেগুলি এই মনোপ্রশ্নচর্চার মধ্যে দিয়ে আগে থেকে জানতে পেরে আপনি সংশোধন করে নেবার সুযোগ পেতে পারবেন।

মনোপ্রশ্নচর্চার নিয়ম: নীচের কোনো কথাটি যদি মোটামুটিভাবে মনোমত হয়, তাহলে 'সত্যি'-এর পাশে দাগ দিন। যদি কোনো কথায় মত দেওয়া না যায় কিংবা মত দিতে দ্বিধাবোধ হয়, তাহলে 'মিথ্যা'-তে দাগ দিন। কোনো বাঁধাধরা সময় নেই।

১। আপনার বিবাহিত জীবন ঠিকমতো চলবে কিনা তা নিয়ে বেশি উদ্বেগ দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, কারণ খারাপের চেয়েও খারাপ কিছু হলে আপনি যে কোনো সময়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারেন।
সত্য...মিথ্যা

২। সুখী বিবাহিত জীবন পেতে হলে স্বামী এবং স্ত্রীর একই ধরনের আগ্রহ অনুরাগ থাকা দরকার। সত্য......মিথ্যা......

৩। সুখী বিবাহিত জীবনের জন্যে দরকার আর্থিক নিশ্চিন্তবোধ।
সত্য...মিথ্যা......

৪। পুরুষের দেহগত প্রেম-ভালোবাসার তীব্রতা যতখানি থাকে, কোনো মেয়ের ততখানি থাকে না। সত্য......মিথ্যা......

৫। বিবাহের কয়েক বছর পরে, স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে আকর্ষণ কমে যেতে বাধ্য। সত্য...... মিথ্যা......

৬। চল্লিশ বছর বয়সের কোনো পুরুষ বা নারী কুড়ি বছর বয়সের ছেলে বা মেয়ের মতো অতখানি সুন্দর হতে পারে না। সত্য......মিথ্যা......

৭। সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায়, কোনো নারী-পুরুষের মধ্যেই তা সম্ভব নয়।
সত্য...মিথ্যা......

৮। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যদি তীব্র যৌন আকর্ষণ বজায় না থাকে, তাহলে সাধারণত বিবাহিত জীবন চরায় ঠেকে যায়। সত্য......মিথ্যা......

৯। সত্যিকারের বিবেচনাবোধ থাকলে এবং প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে তামাসা করবার ইচ্ছে না থাকলে, স্বামী এবং স্ত্রীর উচিত যৌন কাজের জন্যে খানিকটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে রাখা। সত্য......মিথ্যা......

১০। বিবাহিত সাথী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে আলাপ করতে কোনো অন্যায় নেই, তার সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসা অনুরাগ না গড়ে উঠলেই হলো। সত্য......মিথ্যা......

১১। বিবাহ তখনই সবচেয়ে সুখের হয়, যখন বিবাহিত দুই সাথী পরস্পরের সব ইচ্ছা মানিয়ে নিতে রাজী হয়। সত্য......মিথ্যা......

১২। কোনো দম্পতি সপ্তাহে একবারের বেশি সঙ্গম করবে না। সত্য......মিথ্যা......

১৩। বাচ্চা এলে বিবাহিত জীবনে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশি। সত্য......মিথ্যা......

১৪। কোনো খিটখিটে স্ত্রীর দোষ খিটখিটে স্বামীর চেয়ে বেশি। সত্য......মিথ্যা......

১৫। একই সময়ে একজন পুরুষ দুজন নারীকে কিংবা একজন নারী দুজন পুরুষকে ভালোবাসতে পারে। সত্য......মিথ্যা......

১৬। স্বামী এবং স্ত্রী যতো কম বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের আপ্যায়ন করতে পারেন, সাধারণত বিবাহিত জীবন ততো বেশি সুখের হয়। সত্য......মিথ্যা......

১৭। স্বামী-স্ত্রী যতো কম বাইরের ব্যাপারে নিজেদের জড়াবেন, ততো বেশি সুখী হবেন। সত্য......মিথ্যা...

১৮। প্রেম-ভালোবাসা এক ধরনের খেলা। সত্য......মিথ্যা......

১৯। প্রেম-ভালোবাসা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সত্য......মিথ্যা......

২০। সত্যিকারের সুখী বিবাহিত জীবন পেতে হলে, পুরুষের পক্ষে বাড়ীর বহু কাজ-কর্ম, যেমন শেলফ লাগানো, ছাদের ফুটো সারানো, এসব জানতে হয়,—এবং মেয়েদের পক্ষে জানতে হয় ভালো রান্না, সুস্বাদু খাবার-দাবার তৈরি। সত্য......মিথ্যা

২১। স্বামী এবং স্ত্রী সর্বদা ছুটি কাটাবেন একসঙ্গে। সত্য......মিথ্যা.....

২২। স্বামী এবং স্ত্রী যদি মাঝে মাঝে এক-আধটা সন্ধ্যার অবসর পরস্পরের থেকে দূরে গিয়ে কাটাতে চান, তা বেশ ভালোই।
সত্য......মিথ্যা......

২৩। বিবাহ একটা পুণ্যব্রত, কারণ (ঠিক জায়গায় দাগ দিন)
(ক) বিবাহ ঈশ্বরের আশীর্বাদপুত...
(খ) বিবাহ মানবজাতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে......
(গ) এর দ্বারাই নারী এবং পুরুষের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে......

২৪। অধিকাংশ সুখী বিবাহিত জীবনে, স্বামী তাঁর কাজ-কারবারের ব্যাপার বাড়ীর বাইরেই রেখে দেন এবং তা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন না। সত্য......মিথ্যা......

২৫। যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর চেয়ে বেশি সামাজিক, আর্থিক এবং পেশাগত প্রতিপত্তি ও সাফল্য লাভ করে থাকেন, তাহলে শেষকালে বিবাহ জীবনে সুখ নষ্ট হয়।
সত্য......মিথ্যা......

আপনি কত নম্বর পেলেন......
গড়পড়তা যা সবাই পেয়ে থাকেন: ১৬
চমৎকার (সবচেয়ে ভালো শতকরা দশজন): ২১—২৫
সুন্দর (তারপরের শতকরা কুড়িজন): ১৮—২০
ভালো (তারপরের শতকরা ত্রিশজন): ১৬—১৭
খারাপ (সব নীচের শতকরা চল্লিশজন): ০-১৫

সঠিক জবাব:

১০ এবং ২২ সত্য; ২৩ (গ) সঠিক।
বাকী সব মিথ্যা।
প্রত্যেক সঠিক জবাবে ১ পয়েন্ট পাবেন।

মানুষের স্বপ্ন

মিহির আচার্য

মেয়ে দেখলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। বিশ্বাস করুন এই অসুখটা আমার বানানো নয়। আমার এক তরুণ ডাক্তার-বন্ধুর পরামর্শ নিয়েছিলাম। তিনি বললেন : 'এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ডসের সিক্রেশনের ব্যাপার। একটু চেষ্টা করে সাবধানে থেকো।' বললাম : 'কোনো চিকিৎসা নেই? অপারেশন করে এই প্রচুর সিক্রেশন কমানো যায় না?' ডাক্তার বললেন : 'না, এই ধরনের কেস আমরা এখনো অ্যাটেন্ড করিনি।'

আমি, বীরু মুখার্জি, উত্তর-মধ্য কলকাতায় আমাকে চেনে না এমন স্ত্রী-পুরুষ কম আছে। মেয়ে-সম্পর্কিত বিষয়ে আমার দস্তুরমতন অখ্যাতি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী জানেন, এই অখ্যাতি মূলধনের মতন আমাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করেছে। কেন বলুন তো এমন হয়, অনিমা আমার সংস্পর্শে আসবার আগেই বনানীর সঙ্গে আমার অ্যাফেয়ার জানত। কিংবা ব্যাপারটি কী এই, আমার অখ্যাতিই মেয়েদের কাছে আমাকে সুলভ করে দিয়েছে। বোধহয় আমার চরিত্রের সীমা ওদের কাছে স্পষ্ট বলে আমার সম্পর্কে কাল্পনিক কোনো উদ্বেগ বা আশাভঙ্গের কারণ তাদের কাছে ছিল না।

আপনি বলবেন, যে-সকল মেয়ে আমার জীবনে এসেছে তারা নেহাৎ বাজে, খেলো মেয়ে। দেখুন, সে-কথা কী করে বলি? অরুণা ইংরাজি অনার্সের ছাত্রী, লীনা স্কলারশিপ পেত। আশা করি, এদের বাজে মেয়ে ভাববেন না। তদুপরি বংশমর্যাদা সামাজিক প্রতিষ্ঠা এদের পরিবারের ঈর্ষা করবার মতন। কী জানেন, পুরুষের সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারে ভালো-মন্দ প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির কথা আসে না। বোধহয়, ওটা একটা আলাদা বিষয়। নাহলে আমার পূজনীয় অধ্যাপকের সুন্দরী স্ত্রী মাধবী দেবী হঠাৎ আমার মধ্যে কী আবিষ্কার করলেন। বিশ্বাস করুন, এ-ব্যাপারে আমার কোনো লোভ ছিল না। তিনি অধ্যাপকের অবর্তমানে সেই বর্ষার রাত্রিতে আমাকে অন্ধকার ড্রয়িংরুমে...।

আমার কথা শুনে লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আমরা যারা এ-ব্যাপারে অন্তর্ভুক্ত, তারা তো কোনো লজ্জা বোধ করছিনে। নাঃ, মাধবী দেবীও পরদিন লজ্জা পাননি। পরেও কোনদিন নয়। অধ্যাপকের বদলি হবার সময় তিনি আদর্শ প্রণয়িনীর মতন আমার গলা ধরে আকুল কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। বেশ মনে পড়ছে, আমার টেরিলিনের শার্ট ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছিল। বয়স্ক মেয়েছেলের কান্না, তদুপরি যদি সুন্দরী হন, বড় বিশ্রী লাগে। ওঁর চোখের কাজল ধুয়ে যাচ্ছিল কিনা।

দেখুন, আমি বীরু মুখার্জি, মধ্য-উত্তর কলকাতায় আমাকে সবাই চেনে। আমি ফুটপাথে হেঁটে গেলে কলেজের মেয়েরা আঙুল দিয়ে আমাকে দেখায়, ট্রামে-বাসে উঠলেও আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে ছাড়ে না। আমাকে দেখলে ওরা কেবল হাসে, ভয় বা ঘৃণা কিছুই

দেখিনি তাদের চোখে। বোধহয় আমাকে ওরা নিকট-আত্মীয়ের মতন ভাবে। দূর-সম্পর্কের ভাই-কাকাদের মতন, আর কী। কী জানি তুলনাটা ভালো হল কিনা, আপনারা আবার পারিবারিক সম্পর্কের পবিত্রতা-টবিত্রতার ওপর বড় বেশি আস্থা রাখেন।

তাহলে বলি, অপরাধ নেবেন না, আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা আমার...। থাক নাম করব না। ঈশ্বর করুন, তিনি এখন সুখে সংসারধর্ম পালন করছেন। আমাদের গ্রামের বাড়িটা বিরাট। আমাদের মতন কিশোর-কিশোরীদের ওই সংসারে প্রকাণ্ড হলঘরে ঢালাও বিছানায় একসঙ্গে শোয়ার রেওয়াজ ছিল। মেয়েদের বয়েসের কথা থাক, বিশেষ করে সম্পর্কে তিনি আমার গুরুজন, আমাদের সঙ্গে শুতেন। একদিন গ্রীষ্মের রাত্রিতে আমার তেরো-চোদ্দ বছরের দেহটাকে নিয়ে তিনি এমন রূঢ় ঝাঁকুনি দিতে আরম্ভ করলেন যে, সেই হেঁচকা টানে আমি না-পারলাম বাড়তে না-ছোটো থাকতে। আমার প্রচণ্ড ঘুমে-গলা শরীরটার কাণ্ড দেখে আমি নিশ্চয়ই তাঁকে খুশি করতে পারিনি। অবশ্য এ-সকল ব্যাপার নিয়ে আমি আর অভিযোগ করতে চাইনে। এবং কোনো অভিযোগও চলে না। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে, সংসারে এ-সকল সামান্য ব্যাপারে কারুর মাথাব্যথা নেই। এমন হয়ে থাকে। যে-বয়েসের যা আর কী। তারপর একদিন বিয়ে হয়ে গেল, পালকি চড়ে ড্যাং ড্যাং করতে করতে শ্বশুরবাড়িও গেলেন। আমার থেকে বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ লোককেই তিনি পেয়েছেন। তাই বলছিলাম, সংসারে এ-সকল ঘটনা দাগ কাটে না। যেমন আমারও কাটেনি। পাশের বাড়ির শিখা এখনো আদুরেপনা ছাড়েনি, আমার বোনের মুখে শুনেছি সে নাকি আমার জন্যেই শিবরাত্রি করত। কেন, না একদিন দুপুরবেলায় ওকে আমি আমার ঘরে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছিলাম। ও বড় বেশি বড় হয়েছে ভাব দেখাত কিনা। অবশ্য বড় হওয়ার অধিকার তার আছে। ওর গ্রামতুত ভাই দ্বিজেন ওদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত কিনা।

দেখুন আপনি আমাকে সহ্য করতে পারছেন না। কারণ, আমি স্পষ্ট কথা বলতে ভালোবাসি। স্পষ্ট কথাকে আপনা-দের এত ভয় কেন। আমি তো বানিয়ে গল্প করছিনে। পরীক্ষায় মহাপুরুষের জীবনীও রচনা করছিনে। এটা বীরু মুখার্জির কথা, উত্তর-মধ্য কলকাতায় আমাকে সকলে চেনে। বউদিকেও জিগ্যেস করতে পারেন, অনেকবার তাঁর ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট আমি কেটে দিয়েছি।

বউদির কাছে একদিন লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম। হাতিবাগানের বাজারে কেনা-কেটা সেরে বোধহয় রেস্তোরায় চা খেতে ঢুকেছিলেন, আর আমি তখন চন্দনাকে নিয়ে পরদা সরিয়ে কেবিনে ঢুকছি। একে-বারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলাম। বউদি তখন শুধু হাসলেন, আমি পালাবার পথ পাইনে।

দেখুন রাস্তাঘাটে এই অসুবিধে হবে। তাছাড়া আমাকে সবাই চেনে। আমার সঙ্গিনীর অর্থও তারা জানে। বিখ্যাত হওয়ার অসুবিধে আর কী। আমার জন্যে কিছু নয়, সঙ্গের মেয়েটির জন্যেই যত, কানের কাছে দিল কেউ হিন্দি গানের কলি ভেঙে কিংবা নোংরা মন্তব্য করে বসল। ব্যস, সন্ধ্যেটাই মাটি। জামাকাপড়ের মতনই কতকগুলি পোশাকী ব্যাপার আছে, তা রক্ষা করতেই হয়। চন্দনা কেন, নিজের স্ত্রীও পর্যন্ত এই সকল নোংরা কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। আসল কথা, ভালোবাসার পালিশটা শেষপর্যন্ত বজায় রাখতে হয়। নাহলে তো ভদ্রপল্লীগুলি নিষিদ্ধ এলাকা হয়ে যেত। একথা ঠিক গ্রে স্ট্রীটের ট্রামে আসতে আসতে ছেলেমেয়ে সকলকেই দেখেছি অরেল মিলের গলির সেই রঙ্গিনীদের দিকে তাকাতে কেউ ছাড়ে না। অবশ্য লুকিয়ে-লুকিয়ে। এই লুকোনোটা চাই। ভদ্রতার মানেই হচ্ছে কে কত বেশি লুকোতে পারে। আমাদের পোশাক-পরার ব্যাপারটাও শরীরের অনেক অপূর্ণতা লুকোনোর জন্যেই। দেখুন, শ্যামলী তো সেদিন কেঁদেই ফেলেছিল। স্বাভাবিক। বুকের ছেলেরা বড় বেশি ইতরামি করেছিল। আমি অবশ্য বুঝিয়েছিলাম : ওগুলি হতাশার উক্তি। ভাবখানা এই জলে নামব অথচ বেণী ভেজাবো না। তা কী হয় বলুন তো? ধোপদুরস্ত শার্ট পরলেও তার ভাঁজ নষ্ট হয়। যেন এসকল ইতরামি কোনোদিন সে শোনেনি। যেন স্বর্গ থেকে এইমাত্র নেমে এসেছে। ন্যাকামো আর কী। দেখানো : যেন শুদ্ধ হয়ে পুজোয় বসেছে। আমাদের পাড়ার সেই বিটকেল পুজারী বামুনটার কোমর-ভরতি দাদ। ওসব, আমি বীরু মুখার্জি, আমার অনেক দেখা আছে। অবশ্য কতক্ষণ আর কান্না চলতে পারে। এতো সিনেমায় পয়সা পাবে বলে কান্না নয়। কারণ, টেবিলে মাটন কাটলেট হাজির। এরপরেও ডেভিল্স আসবে। শ্যামলী যে কী খেতে পারে। ওর সমস্ত অস্তিত্বটাই একটা বিরাট-গহ্বর হাঁ হয়ে গেছে। বোধহয় প্রেমট্রেমে পড়লে মেয়েদের খিদে বাড়ে। নাঃ, হাসবেন না স্যার, আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। তা খাওয়ার জন্যে আমি আপত্তি করছিনে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সবসময় হাতে টাকা থাকে না। ধারদেনা হয়ে যায়। উপায় নেই, যে-দেবতার যে-পুজো। কেন, না একটু কাছে বসবে, ঘামের আর পাউডারের সেলুনের দোকানের গন্ধ, মুখে পেঁয়াজের গন্ধ, কী দাঁতের ফাঁকে হাড়ের টুকরো। আবার, আপনি হাসছেন, তাহলে আর আমার কথা বলা যায় না। যা বলছিলাম, বাজার থেকে যেমন সুখসুবিধেগুলি কিনি, তেমনি প্রেমই বলুন আর ইয়ে বলুন কিনতে হয়। মাগনা প্রেম হয় না। আর এখানকার নীতি 'আজ নগদ কাল ধার।' অথচ আপনিও জানেন ব্যাপারটা কিছু না। রেস্তোরাঁ থেকে পথে নামলেই স্রেফ কর্পূরের মতন হাওয়া! সবই বুঝি, কিন্তু করতে পারিনে কিছু। অভ্যেসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে কিনা। সকালে উঠে ব্রাস দাঁত-ঘষার মতন। মেয়ে-সঙ্গও একটা প্রাত্যহিক অভ্যেস। তেষ্টা না-পেলেও প্রতি মোড়ে চায়ের দোকান দেখলে যেমন ঢুকে পড়ি। একটা কথা বলে রাখি স্যার, আর যাই হোন বীরু মুখার্জি হবেন না, বড় খরচের লাইন, দেউলে হয়ে যাবেন। অবশ্য বউদির কথা আলাদা।

তা যা বলছিলাম, আমি বীরু মুখার্জি, আমার অনেক জানা আছে। একটা বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত নাড়াচাড়া করলে যা হয়। একেবারে জল-ভাতের মতন ব্যাপার। বিশ্বাস করুন, একটি প্রসঙ্গের সঙ্গে আরেকটি প্রসঙ্গের আলাদা করতে পারিনে। সব জলছবির মতন একাকার। কাউকে আলাদা করে মনে রাখতে পারিনে। কারণ, দেহের দিক দিয়ে সকলে এক, সকলেরই নির্দিষ্ট এক পুঁজি, একইভাবে সঞ্চয় এবং খরচ করবার প্রক্রিয়া। এ যেন বাঁধা সড়কে চোখ বুজে সাইকেল চালানোর ব্যাপার, কোথাও হোঁচট খাবার ভয় নেই, পুরনো অভ্যেসগুলো গন্তব্যস্থলে দিব্যি চালিয়ে নিয়ে যায়।

একটা জিনিস বুঝেছি, এরা সব একেক ঋতুর পাখি। তাই এদের স্থায়ীভাবে ধরে রাখবার গরজ নেই। রঙ্গমঞ্চের প্রবেশ আর প্রস্থানের মতন। দেখতে হবে চলে-যাওয়াটা যেন কোনোমতে আক্ষেপের কারণ না হয়। অবশ্য এটা পার্বতী-দেবদাসের যুগ নয়, এই রক্ষা। বস্তুত কোনো পক্ষেরই আফ-সোসের হেতু নেই। ওরা বলবে : দিতে তো আমরা কসুর করিনি, নাও নি কেন? তখন অত বাঙলা সিনেমার ফুলেল নায়কের মতন চালবাজি করছিলে কেন? সেন্সারের ভয়ে?

দেখুন, সংলাপটুকু বানিয়ে বলছিনে। একবার নায়ক হতে গিয়ে নন্দা আমাকে বোকা বানিয়েছিল। অবশ্য আর সংশোধন করবার পথ ছিল না। পরদিনই সে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে। সেই যে কথায় বলে না,

উনুনে জ্বালালো একজন আর রান্না করল আরেকজন, আমারো সেই অবস্থা। না, তার জন্যে আফশোস নেই, এক-আধবার বোকা না হলে চালাকের স্বাদটা উপভোগ করা যায় না।

অনেক কাদাজল ঘেঁটে যা দেখলাম, তাতে বুঝলাম মূলধন আঁচলে বেঁধে রেখে রোজগার নিয়ে কাজ করতে ওরা ভালোবাসে। যেন সতীপনা মূলধনকে রক্ষা করলেই যথেষ্ট। আমার এক সহপাঠী ছিল, খুব মারধোর করতাম রোজ রোজ, ও কেবল মাথা বাঁচিয়ে কাতরভাবে বলত : 'দেখো ভাই, চুলের ভাঁজটা নষ্ট না হয়।' ছোটোবেলায় মার সঙ্গে এক ধনী আত্মীয়ের বাড়িতে বিছানায় বসতে গিয়ে ধমক খেয়েছি। একেকজনের শয্যা সম্পর্কে শুচিতা আছে। অথচ এঁটো হাতে জলের গ্লাস ধরলে কোনো আপত্তি করেন না।

দেখুন, এটা বাড়াবাড়ি নয়? তীর্থস্থানে ভিখিরীরা যেমন দগদগে ক্ষত উলঙ্গ করে পয়সা ভিক্ষে করে! বাবা, ক্ষত উদোম দিলে মাছি উড়ে এসে বসবেই, না-কি বলেন? যেমন ক্ষেত্র তেমনি ফসল। উঁচু ডাঙায় রবিশস্য লাগাও, কিন্তু নামা-জমিতে ধানই বুনতে হবে। তবে আর নেমন্তন্ন-বাড়িতে এসে এটা খাব না, সেটা খাব না বলে লাভ কী।

মালবিকার কথা আপনাকে বলেছি? বলিনি তো? ওই একই গৌরচন্দ্রিকা। চুলের ভাঁজ যেন না ভাঙে। সেদিন দুপুরে রাস্তায় নেমে যখন ওকে বললাম : 'বরুণ দেশে গেছে। এই দ্যাখো ওর ফ্ল্যাটের চাবি আমার জিম্মায়।' ও বলল : 'না না।' বললাম : 'এই রোদে কোথায় টো টো করে ঘুরবে। চলো দুপুরটা ওর ফ্ল্যাটে বিশ্রাম করি। বিকেল হলে ময়দানের দিকে যাব।' ও বারবার বলল : 'না না বিচ্ছিরি। কেউ দেখতে পাবে।' 'বিচ্ছিরি' এবং 'কেউ দেখতে পাবে' সত্ত্বেও সে আমার পিছনে পিছনে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল। ঘর খুলে আমরা বসলাম। আমি ওর জন্যে রেকর্ড-প্লেয়ার বাজাতে পারতাম। ওর আপত্তি। এবার আপত্তি নীচের ফ্ল্যাটে জানতে পারবে বরুণের ঘরে কারা এসেছে! তাহলে কী করা যায়! দেখলাম ও বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে, হাই তুলছে; আর আমাকে আদেশ করল : 'আমি ঘুমোচ্ছি। সময় হলে জাগিয়ে দিও।' পরিস্থিতিটা বুঝুন একবার। এ যেন ফলের বাগানে পাখিকে পাহারা দিতে বলা। তারপর সেই দুপুরে বিনা ওজোরে যে-কাণ্ডটি ঘটল, তাতে আমার মতন সাহসী যুবকও লজ্জিত না হয়ে পারল না। সেই সাধ্বী রমণী আমাকে জানালেন : 'যে-কোনো অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে তিনি সবসময়ই তৈরি থাকেন।' তা দেখুন, আমি যদি প্রস্তুত থাকি, তাহলে কোনো বিপদে পড়বারই ভয় থাকে না। ওর বিপদে পড়ার অভ্যেসগুলোই ওকে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ও চতুর করে রেখেছে।

শোভা কিন্তু তৈরি ছিল না। তাই চূড়ান্ত ঘটনার পর সে কেঁদে বলল : 'আমাকে বিয়ে করো।' কারণ, বিয়ে করার একমাত্র অর্থটা সে জানে। এরপর বিয়ে না করলে সে অসতী হবে এবং গলায় দাড়ি-টড়ির কী ব্যাপারও সে বলেছিল।

আমি, বীরু মুখার্জি, আমার কাছে প্রস্তাব করে কিনা বিয়ে করো। মুখপড়ী মেয়ে জানে না বীরু মুখার্জি একঘাটে দুবার পা ডোবায় না। তাহলে আর আমি বীরু মুখার্জি হলাম কেন? তাহলে তো আমি রামাশ্যামাযদু হতে পারতাম।

আপনাকে চুপিচুপি বলি : একবার আমাকে পূজনীয় বাবামশায় সেই হাঁড়ি-কাঠে বলি দেবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন। বোধহয় আমার চরিত্র-পতন থেকে রক্ষার জন্যে এই সতর্কতা। শেষ-পর্যন্ত কী জানি কী কারণে কনের বাড়ি বেঁকে বসল। বাবাকে ফেরেববাজ বলে যথেষ্ট গালিমন্দ করল। আসল ব্যাপারটা বাবা কিছুতেই জানতে পারলেন না। পাত্রীপক্ষ কোথা থেকে খবর সংগ্রহ করেছিল : ছেলের দুরারোগ্য যৌনব্যাধি আছে। সেই প্রথম এবং শেষ চেষ্টা। দেখুন, সে-সময়ে বিয়ে করার মতন বোকামি সম্ভব ছিল কী। সে-সময়ে যাকে বলে আমার রোরিং প্র্যাকটিস। কাজেই বৃহত্তর সামাজিক সেবার প্রয়োজনে আমার ছোটো স্বার্থকে বিসর্জন দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

আপনি হাসছেন. তাহলে আর কথা বলা যায় না। একটা কথা স্বীকার করবেন নিশ্চয় সংসারটা যোগান আর চাহিদার বৃত্তের মধ্যে ঘুরছে। এবং যোগানের বৈচিত্র্য চাহিদার মুখ চেয়েই অনবরত সৃষ্টি হচ্ছে। নইলে বাজারে এত কম্পানি লেবেল পালটে একইরকম স্নো-পাউডার-তেল-সাবান তৈরি করে মুনাফা করছে কী করে? টয়লেট-পারফিউম-স্যানিটারি সামগ্রীর মতনই, অপরাধ নেবেন না, মেয়েরাও চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিচ্ছে। ভেবে দেখুন, শতকরা নব্বুই ভাগ উৎপাদন হচ্ছে কেবল মহিলা খদ্দেরের অস্তিত্ব মনে রেখে। ওআর্কশপে অসুরের মতন শক্তি নিয়োজিত হচ্ছে কেবল এই মহিলাদের নিত্যনতুন চাহিদা মেটাবার জন্যে। মেয়েদের যে কারা দুর্বল বলে প্রচার করেছে জানি নে, কিন্তু কল্পনা করুন, মেয়েদের কোনো চাহিদা নেই, তাহলে একযোগে কারখানায় লক-আউট ঘোষণা হয়ে যাবে।

অবশ্য এ-কথা ঠিক, মেয়েদের এসকল চাহিদার একটা বাস্তব অর্থ আছে। যেহেতু সেগুলির মূল্য আমাদের সানন্দ সমর্থন পায়। আমরা মেয়েদের সেইভাবেই ভাবিত হতে শিখিয়েছি। তারা জানে, নাহলে তাদের উপযোগিতা কমে।

যা বলছিলাম, আমি বীরু মুখার্জি, একদা ভাবতাম বিয়ে করা মানেই জীবনকে সঞ্চিত অর্থের মতন সিন্দুকে পুরে-রাখা। এতদিনে চোখ ফুটেছে, বিয়ে-করা না-করা বস্তুত একই ব্যাপার। এতে আমার সমাজসেবা আটকায় না। বরং এখন দেখছি ব্যাচেলার হলে একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না, অথচ বিবাহিত হলে ঘর জোগাড় করার অসুবিধে হয় না। আমার স্ত্রী যদি গানের শিক্ষয়িত্রী হন, তাহলে সেই সুবাদে শিক্ষার্থিনী বীণাবাদিনীরা অনিবার্যভাবেই এসে পড়েন। অধ্যাপিকা হলে সহকর্মিণীরা আসেন। মানে সামাজিক-চরিত্রও ঠিক থাকে। সামাজিক-স্বাস্থ্য রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। অথচ, আপনি আমাকে দুজোড়া দম্পতি দেখাতে পারেন যাদের আমরা নিঃসন্দেহে আদর্শ-দৃষ্টান্ত বলে তুলে ধরতে পারি। আপনার কথা বলছিনে, কে বলতে পারে সুযোগের অভাবেই আমরা আদর্শবাদ থেকে যাচ্ছি কিনা!

বিশ্বাস করুন, আমি কোনো তত্ত্ব আউড়াচ্ছিনে। বারুদ ঘষা খেলে আগুন জ্বলে—এ-তত্ত্ব-প্রচারের চেয়ে আমি দেশলায়ে কাঠি ঘষেই আগুন জ্বালানো সহজ বলে মনে করি। আমি দেখেছি। বলতে পারেন মানুষ তার অভিপ্রায় মতন দেখতে চায়। কিন্তু এ-কথাটাও একটা তত্ত্ব। তাঁরা নির্দ্বিধায় মানুষকে রাম-রাবণ করে আঁকতে ভালোবাসেন। আমার চোখটাই খারাপ বলে আমি খারাপ দেখছি, আর আপনি ভালো চোখে ভালো দেখছেন, এরকম যুক্তি শুনে হাসি পায়। কারণ, আপনারা যাঁরা ভালো দর্শক তাঁরা আসলে কিছুই দেখেন না। আপনারা কতকগুলো বস্তাপচা সংস্কার আর ধারণা নিয়ে বাস্তবকে 'দেখেন না', কল্পনা করে নেন। তাহলে কাদের আমরা অধিক গুরুত্ব দেবো? যাঁরা বাস্তবকে দেখছেন কিংবা যাঁরা বাস্তবের ওপর আরোপিত রঙ চড়াচ্ছেন? দেখুন এ তো কনডাকটেড টুর নয় যে পছন্দমতন দেখিয়ে দিলেন। মানুষের চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়া। তাকে দেখতেই হবে। রাস্তার মোড়ে আমরা আরশি পেতে রেখেছি, চলমান চিত্র স্বাভাবিকভাবেই তাতে ধরা পড়বে। দেখার জন্যে আপনার নিজস্ব দামী আয়না ব্যবহার করে লাভ নেই। তাতে আপনার মুখকে অধিকতর সুন্দর দেখায় বটে, কিন্তু সেটা সত্য নয়, বিভ্রম।

আমি, বীরু মুখার্জি, এইভাবেই জীবনকে দেখি। আমি পথের ধারে আয়নাকে পেতে রেখেছি। সে-আয়নায় অগণিত নর-নারীর চলচ্চিত্র ধরা পড়ছে। আয়নায় যদি খারাপ প্রতিফলিত হয়, দয়া করে আয়নার দোষ ধরবেন না।

যা বলছিলাম, বিবাহিত পুরুষের জন্যে মোটা কাগজে শিল-মারা একটা চরিত্রের পাশপোর্ট আছে। কাজেই কোনো সীমান্ত এলাকাতেই তাদের গুপ্তচর বলে অপযশ নেই। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব নিয়ে দেখুন তথাকথিত চরিত্র-পতন ব্যাচেলারদের চেয়ে তাদেরই বেশি। এঁরা অভিজ্ঞতার রিহার্শাল গৃহলক্ষ্মীর যোগে রপ্ত করেন, পরে নির্দিষ্ট রঙ্গমঞ্চে তাঁরা পাকা অভিনেতার মতন দৃশ্য থেকে

দৃশ্যান্তরে উৎরে যান। আর, যে-কোনো চাকরিতে অভিজ্ঞতারই কদর বেশি। নবীশকে কিয়ৎকাল শিক্ষানবীশী রাখা যায়, কিন্তু পাকা চাকরির যোগ্যতায় অভিজ্ঞ ঝুনোরাই দাঁও মারেন। বীরু মুখার্জির কথা বলছিনে। বলছি আরো দশটা ইয়ং-ম্যানদের হয়ে। যারা লাভার হয়েছে অথচ লাভ-মেকিং জানে না। মেকিং শব্দটা একটা ক্রিয়া, নিছক আইডিয়া বা চাঁদ-ফুল-পাখি দেখা নয়। ছেলেদের খেলার জন্যে এমন কতকগুলো অটোমেটিক এঞ্জিন আছে যেগুলোকে মেঝের ওপর শক্ত করে ধরে চাপ দিলে পর গতি পায়। অন্যথায় আপনি যতই হুইশিল দেন আর সবুজ পতাকা ওড়ান, তারা 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'। কী জানি, দেবভাষার উদ্‌গীরণ ভুল হল নাকি!

তাই বলছিলাম, চাহিদা আর যোগানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই বাজারের চরিত্র নির্দিষ্ট করছে। বস্তুত আমরা কেউই এই বাজারের বাইরে যেতে পারিনে। লক্ষ্য করবেন, বহু কম্পানি তাদের পুরনো পেটেন্ট ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন টনিক ব্যবহার করছেন। কারণ বাজারটা আমূল পালটে গেছে। ওষুধের কারখানাগুলো পর্যন্ত আজ মেডিসিনের চেয়ে টয়লেট গুডস্ বাজারে ছাড়তে প্রবল উৎসাহী।

তার কারণ রুচি পালটেছে। দ্রুত যান-বাহনের ব্যবস্থার ফলে গ্রাম-মফস্বল-রাজধানী একাকার হয়ে গেছে। মেয়েরা সর্বত্র সর্বখানেই বুঝে নিয়েছে তাদের অস্তিত্বের মূল্য। এককালে মেয়েদের কাছে দেহের প্রসঙ্গটা তেমন দরকারী বোধ না হওয়ায় যেমন-তেমন থাকলেই চলত। এখন তারা জেনে ফেলেছে দেহ একটা প্রদর্শনী, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে শো-উইন্ডোর মতন। এবং সে-ব্যাপারে গ্রাম্য-বালিকাগণও পিছিয়ে নেই।

আমি এমন একটি মেয়ের খবরও জানিনে যে পোশাক সম্পর্কে স্পর্শকাতর নয়। এই পোশাকী আগ্রহের সঙ্গেই তাদের দেহবোধ জড়িয়ে আছে। পোশাকের নিত্য-নতুন কারুকার্য তাদের দেহের ভাঁজ-গুলোকে একগুচ্ছ সনেটের মতন প্রকাশিত করছে।

আমার একেক সময় অবাক লাগে এমন করে কশায়ের দোকানের ঠ্যাং-ছড়ানো মাংসের মতন তাদের বিজ্ঞাপন করবার প্রতিযোগিতা দেখে। এম্নিতেই প্রতিনিয়ত যন্ত্রের শব্দে আমাদের স্নায়ুগুলো থরতর, আমরা প্রচণ্ড জ্বরের ধমকে ছুটছি, তার-পর এই চলমান বিজ্ঞাপনের চিৎকারে প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। কেউ নিওন-সাইন জেলে, কেউ ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটে, কেউ প্ল্যাকার্ড এঁটে সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। ভাবখানা : আসুন দেখুন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্রেতাদের সেবাই আমাদের ব্যবসার মূলধন।

বীরু মুখার্জি কিনতে না-পারলেও বড় মক্কেল আছে। জমকালো গাড়ি বেড়ালের মতো লঘুপায়ে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ায়, আর আপনার চোখের সামনে চলন্ত বিজ্ঞাপনকে অভ্যস্ত হাতে দরজা খুলে গাড়িতে উঠতে দেখেন। আপনি কী কখনো পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁ-বার-গুলোতে গিয়েছেন? দেখবেন ওদের থেকে বীরু মুখার্জির আলাদা স্ট্যাটাস আছে। বীরু মুখার্জিকে পয়সা খরচ করে বাড়তি উত্তেজনা কিনতে হয় না। ধীরা কী সুনেত্রাকে ডেকে জিগ্যেস করতে পারেন। ওরা দুজনেই আমার জন্যে এককালে প্রাণ দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। কেন? না, বীরু মুখার্জি, সাপের বিষ ইনজেকশন করে নেশাগ্রস্ত হয় না। বীরু মুখার্জি জীবনের মতনই উত্তাপ-স্পন্দন-আবেগকে স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে। একটা উত্তাপ আর-একটি উত্তাপ-স্পন্দন-আবেগকে রাঙিয়ে তোলে। ধীরা, সুনেত্রা তা জানে। জানে বলেই এই উত্তাপ-স্পন্দন-আবেগকে অস্বীকার করতে পারে না। একে আপনি ভালোবাসা বলবেন না জানি, কিন্তু এছাড়া আর কী বলা যায়। ধীরা জানে আমি ওকে ভালোবাসি, সুনেত্রাও তাই জানে। ভালো-বাসা পরস্পরকে ধরে রাখবার আগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। ধরে-রাখবার পাত্রটাই হচ্ছে উত্তাপ। এই উত্তাপের বাহু আছে, কটিদেশ আছে, আছে...

আপনি অন্যমনস্ক হচ্ছেন। তার অর্থ আমার কথাগুলো আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে না। আমি দুঃখিত, কিন্তু আপনার মতন নীরব শ্রোতা আর কোথায় পাব। অন্যের কাছে বলা বিড়ম্বনা, তাঁদের মাথায় বিরাট-বিরাট জাগতিক সমস্যা, তাঁরা আমার ভাষাই বুঝতে পারবেন না। সকলেই বীরু মুখার্জি হবেন আশা করিনে, কিন্তু সংসারে বীরু মুখার্জি আছে সে-অস্তিত্বটাকে স্বীকার করতেই হবে। নাহলে আমার জীবনধারণই বৃথা।

প্লিজ, চলে যাবেন না। এতক্ষণ যদি আমার কথা শুনে থাকতে পারেন, শেষ-টুকুও পারবেন। বিশেষত আমি নিদারুণ সমস্যার আগুনে দগ্ধ হচ্ছি। আমার অস্তিত্বের সংকটও বটে। আমি যে এতক্ষণ সুস্থ হয়ে আছি সেইটেই আশ্চর্যের ব্যাপার। বলুন এইরকম পরিস্থিতিতে আপনি হলে কী করতেন? সুকুমার, আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সে যে এমন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবে, আমি কল্পনাও করতে পারিনে। আমার বক্তব্য শোনবারও তার দরকার হল না। সে আত্মহত্যা করে আমাকে দাগী আসামী করে রেখে গেল। আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ওপর সে স্থায়ী কালো পরদা ঢেকে দিয়ে চলে গেল। এর জন্য দায়ী অনু। কোনো-দিনই আমি অনুকে বন্ধুপত্নীর মর্যাদার বাইরে দেখিনি। এবং অনুও আমাদের বন্ধুত্বের পরিমাণ জানত। নারীর প্রতি আমার স্বাভাবিক দুর্বলতা সত্ত্বেও আমি দায়িত্বের সঙ্গে বলতে পারি : অন্তত এ-ক্ষেত্রে আমি স্বভাবের বিরুদ্ধে ছিলাম।

এবং যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন কর[তে] হয়েছিল আমাকে। সুকুমারের বিশ্বা[স] আমার কাছে আনন্দ ও স্বস্তির ব্যাপা[র] ছিল। তবু এই ট্রাজেডি ঘটল কেন? আমা[র] মেয়েঘটিত ব্যাপারগুলি নিয়ে ইদানীং অ[নু] বড় বেশি নির্দোষ আমোদ করত। তখ[ন] মনে হত সে নিজেই একটি মেয়ে নয় এই রসিকতার প্রতি ওর আত্যন্তিক ঝোঁ[ক] আমার ভালো লাগত না। ভালো লাগত [না] যখন বেছে বেছে এই ধরনের কৌতূহল গুলো সে সুকুমারের অবর্তমানে আমা[র] কাছে প্রকাশ করত। 'বাবা', সে একেক দি[ন] পরিহাসে তরল হয়ে বলত : 'কোনো মেয়ে তোমার কাছে নিরাপদ নয়।' আপনি নিশ্চ[য়] বুঝতে পারছেন অনুর এ-জাতী[য়] ইয়ার্কিগুলো আমার কাছে সত্যিই নিরাপ[দ] ছিল না। ও যদি নির্ভেজাল ঠাট্টা করত তাহলে কিছু মনে করতাম না। কিন্[তু] আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বুঝিয়েছে অনু একটা জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছে এবং আমাকেও ঠেলতে চাইছে। তারপর সেইটেই যেন তার একরকম নেশা হয়ে উঠল। আমি কী তখন বুঝেছিলাম আমার বন্ধুর শান্ত ভদ্র আপাত-নিস্তরঙ্গ জীবনে তার হাঁপ ধরছিল। একটু বৈচিত্র্যের লোভ কিংবা এখন মনে হয় আমাদের বন্ধুত্বকেই সে হিংসে করত। বোধহয় সুকুমারের জীবনের অনেকটা সময় আমার জন্যে ব্যয় হত বলে। তাই আমাকে সুকুমারের জীবন থেকে চিরকালের মতন সরাবার জন্যে সে বড় বেশি দাম দিতে উদ্যত হয়েছিল।

আমি অতটা তখন বুঝিনি, তাই ওর চাতুরির ফাঁদে একটু-একটু করে পা দিয়ে বসেছিলাম। এবং অনিবার্যভাবেই দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

সুকুমারকে আমি বোঝাতে পারলাম না। সেদিনই দেখলাম আমার সম্পর্কে বাইরের দশজনের যে ধারণা সেই ঘৃণাই ফুটে উঠল সুকুমারের চোখে। সুকুমার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল।

আমি আর অনু তখন নির্জন দুপুরের ঘরে।

আমরা পরস্পরকে প্রতিপক্ষের মতন অবিশ্বাস সন্দেহ বিদ্বেষসহ লক্ষ্য করছি।

আমি বিড় বিড় করে শুধু উচ্চারণ করলাম : 'আগুনে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল।'

অনু কাঁদছিল। বলল : 'আমি বুঝতে পারিনি। আমার অপমান আমাকে অন্ধ করে তুলেছিল। আমিও একটা মেয়ে, অথচ তুমি আমাকে কোনোদিন মেয়ে বলে সম্মান দাওনি। আমার মনে হয়েছিল বোধহয় মেয়ে বলে আমার কোনো আকর্ষণই নেই, নাহলে তুমি...'

আমার কথা শেষ হয়নি, দোহাই আপনি চলে যাবেন না। বলুন, এরপর আমি কী করতে পারি। আমি বীরু মুখার্জি, তাকেও একটা মানুষের মতন এই ট্রাজেডি ভোগ করতে হয় কেন?
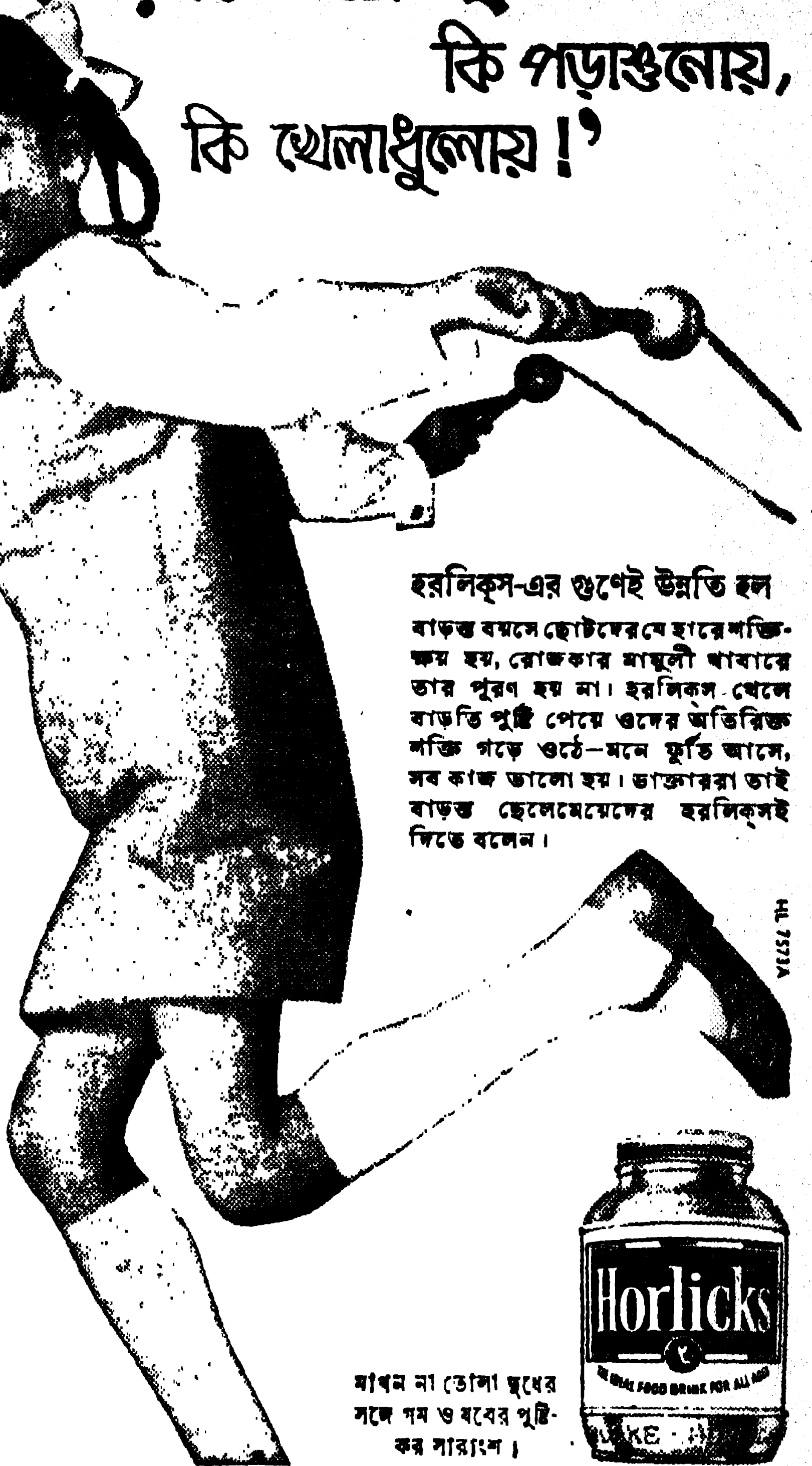
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারতীয় সাহিত্যে গান্ধিজী

গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরের সূচনায় সেই মহাজীবনের বহুবিচিত্র চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হবে, যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন ও জেনেছেন এমন মানুষ আজও বিরল নয়, কিন্তু যাঁরা গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন নি এমন অনেক ভারতবাসী নিশ্চয়ই আছেন, তাঁরা যদি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে গান্ধীজীর প্রভাব বিষয়ে কিছু লেখেন তাহলে তার একটা বিশেষ মূল্য হবে।

ভারতীয় সাহিত্যে এই মহামানবের জীবনের কথা কিভাবে উল্লিখিত হয়েছে তা জানা প্রয়োজন। যে ক্ষুদ্র মানুষটি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতভূমিতে পদার্পণ করেই জনমানসের একচ্ছত্র মহারাজ হয়ে বসেছেন তাঁর পুণ্যকথা নিশ্চয়ই অনেক রচনায় ছড়ানো আছে।

আমরা সর্বপ্রথম পড়েছিলাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সুদীর্ঘ কবিতা—'গান্ধীজী'। তিনি লিখেছিলেন—

"দিনে দীপ জবালি
ওরে ও খেয়ালী
কি লিখিস হিজিবিজি
রাজপথে ঐ শোন কোলাহল
গান্ধীজী, গান্ধীজী।।"

এই কবিতাটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশের পর মুখে মুখে প্রচারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ অনেক লিখেছেন, তিনিই ত' সর্বপ্রথম মহাত্মাজী বলে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে। কিন্তু গান্ধীজী সম্পর্কে তাঁর কণ্টিৎ শ্লেষাত্মক কবিতা—

"গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী, কেউ বা নিঃস্ব
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—"

অনেকের মনে আছে। আর আশ্চর্য মিল রয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থ কবিতায় গান্ধীজীর মৃত্যুর ঘটনার প্রায় অবিকল চিত্রায়ণে।

অসহযোগ আন্দোলনের কালে প্রবাসী'তে প্রায় একই সঙ্গে দুটি উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজপথ' এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বেনোজল'। এই দুটি উপন্যাসেই গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের রূপ আছে। 'রাজপথ' উপেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় পাঁচটি সংস্করণ হয়েছিল এবং নাট্যরূপও দেওয়া হয়েছিল। এই কথা উল্লেখের কারণ উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা।

এর পর যে গান্ধীজী বা তাঁর কর্মপন্থা নিয়ে বিশেষ গল্প বা কবিতা রচিত হয়নি তার কারণ অন্য। অসহযোগ আন্দোলন বিফল হওয়ার পর বাঙ্গালী বিপ্লব অভিমুখী হয়ে সন্ত্রাসবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বলা বাহুল্য সন্ত্রাসবাদীর জীবনে অহিংসার কোনো স্থান ছিল না। 'কল্লোল' যুগের লেখকদের রচনায় স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন কথা নেই বলে একালে অভিযোগ শোনা যায়। এই অভিযোগ অজ্ঞতাপ্রসূত। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ খৃঃ পর্যন্ত বাঙ্গালী যুবকের জীবনে পুলিশি নির্যাতন কি বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল তার ইতিহাস আজো রচিত হয়নি। সংগ্রামী সাহিত্য রচনা করেছেন এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যিক গোষ্ঠী, যাঁরা কারাবরণ এবং ফাঁসীবরণ করেছেন হাসিমুখে। সুতরাং এইকালে গান্ধীজীর কথা বেশী লিখিত হয়নি।

কিন্তু গান্ধীবাদ বা গান্ধীজীবন নিয়ে কোনো কাব্য বা কবিতাও লিখিত হয়নি শুধু বাংলায় কেন ভারতের কোথাও নয়। অনেক জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। সানে গুরুজী ছিলেন একজন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট। তিনি আত্মহত্যা করেছেন ১৯৫০ খৃঃ। সানে গুরুজী মারাঠী ভাষায় 'পত্রী' নামক একটি কাব্য সংকলনে অনেক সত্যাগ্রহ সঙ্গীত সংকলিত করেন। এই কাব্যগ্রন্থটি সরকার নিষিদ্ধ করেন। মহাকবি ভাল্লাথোল লিখেছিলেন 'চক্রগাথা' এবং গান্ধীজীর মৃত্যুর একটি সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন মালায়লাম ভাষায় 'বাপুজী' এই নামে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র 'তিনটি গুলী' নামক কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ যখন দিল্লীতে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর কবি সম্মেলনে পাঠ করেন তখন নেহরুজী তাঁকে কাছে ডেকে কবিতাটি বারবার শুনেছিলেন। মৈথিলী শরণ গুপ্ত দিনকর, বচ্চন, গুজরাটিতে উমাশঙ্কর যোশী। উর্দুতে সত্তার নিজামী প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বেতারে 'গান্ধীজী ও নেতাজী' এই শিরোনামে এক অপূর্ব প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন প্রায় এই কালেই। অন্নদাশংকর রায় চিন্তায় এবং মননে গান্ধীবাদী, গান্ধী ও তলস্তয়ের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত, তাই তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাসে গান্ধীবাদী চিন্তার প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধে গান্ধীনীতির সমর্থন আছে। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু গান্ধীজীর একান্ত সচিব হিসাবে কাজ করেছেন, তাঁর রচনায় গান্ধীবাদের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা আছে।

গান্ধীজীর ষষ্ঠিপূর্তি বৎসরে যুক্তপ্রদেশের সোহনলাল দ্বিবেদী হিন্দি ভাষায় একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে সকল ভারতীয় ভাষায় লিখিত কবিতার অনুবাদ ছাড়া, ইংরাজী, আরবী, চীনা এবং জাপানী কবিতার অনুবাদ ছিল। জাপানী কবি ইয়োন নোগুচি যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন গান্ধীজী যে মাথায় ভিজা গামছায় মাটি লাগিয়ে মাথায় চাপিয়ে রাখতেন তার অর্থ তিনি মাটির পৃথিবীর ভার বহন করছেন নিজের মাথায়।

উমাশঙ্কর যোশী ত্রিশের দশকে 'বিশ্বশান্তি' নামে যে দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন গুজরাতি ভাষায় তার মধ্যে যুদ্ধ-বিরোধী অনেক বক্তব্য ছিল।

গান্ধীজীকে নিয়ে কোনো নাটক রচিত হয়নি, মামা বড়েরকর লিখেছিলেন, 'অপূর্ব বঙ্গাল' মারাঠী ভাষায়, এই নাটকের উপজীব্য নোয়াখালীর গান্ধীজী। এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

কিন্তু গান্ধীজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ, লবণ সত্যাগ্রহ, বরদোলি, ইয়ারভেদা কারাগারের অভিজ্ঞতা নিয়েও নাটক রচনা করা যায়।

নাটকের ক্ষেত্রে যেমন তেমনই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও গান্ধীজীবন অনুপস্থিত। শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসেছেন। শরৎচন্দ্র বলতেন চরকা কাটি গান্ধীজীকে ভালোবাসি বলে, চরকার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নয়। কিন্তু এ'রা দুজনেই গান্ধীজীকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন নি।

রাজা রাও তাঁর 'কন্ঠপুরা' নামক ইংরাজী উপন্যাসে গান্ধীজীর প্রবর্তিত আন্দোলন এবং আদর্শের কথা বলেছেন। এই গ্রন্থটি নিয়ে অনেক আগে এই স্তম্ভে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই উপন্যাসে আর জবানীতে আছে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আন্দোলনের বিবরণ।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসে ১৯৪২-এর আন্দোলনের একটা ছবি পাওয়া যায়। সতীনাথ ভাদুড়ী সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনার ভিত্তিতে উপন্যাস লিখে

সাফল্যলাভ করেছিলেন তাঁর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য।

গান্ধী জীবনের ঘটনা নিয়ে যা প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ প্রসঙ্গ টেনে কিছু কিছু ছোট গল্প ভারতীয় সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হলেও উল্লেখযোগ্য গল্প যে কিছু লেখা হয়েছে তা মনে হয় না, সাময়িক ঘটনার উচ্ছ্বাস অনেক রচনায় পরিস্ফুট।

গান্ধীজীকে নিয়ে যে সব সমকালীন লেখক উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন তার মধ্যে লুই ফিসারের লেখা গান্ধী প্রসঙ্গ প্রকাশকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং তার বাংলা অনুবাদও হয়েছিল। ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য মূল-ফরাসী থেকে রম্যাঁ র‍ল্যাঁর ডায়েরী বাংলায় অনুবাদ করছেন এবং সেই অনুবাদ 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। গান্ধীজীর যে সব জীবনী প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে তেন্ডুলকরের বিরাট জীবনী গ্রন্থ তথ্যপ্রধান, এ ছাড়া বি, আর, নন্দ রচিত জীবনীটিও প্রশংসালাভ করেছে।

প্যারেলালের 'মহাত্মা দি লাস্ট ফেজ' গ্রন্থটিও মূল্যবান। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর 'মাই ডেজ উইথ গান্ধীজী' একটি মূল্যবান গ্রন্থ। গান্ধীজীর নোয়াখালির জীবনের কাহিনী এই গ্রন্থে ছড়ানো আছে, তবে এই গ্রন্থ বোধকরি সরকারী মহলের সুনজরে নেই। এ ছাড়া তাঁর 'স্টাডিজ ইন গান্ধিইজম' একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। উৎসাহী পাঠক এই গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করে পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

গান্ধীজীর জীবনদর্শন এবং মতবাদ সম্পর্কে নিশ্চয়ই আরো অনেকে লিখেছেন, সব আমার জানা নেই। সুতরাং কোনো নাম যদি উল্লেখিত না হয়ে থাকে তাহলে তা অজ্ঞতাপ্রসূত।

গান্ধীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দুখানি চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই দুই চিঠি রবীন্দ্রনাথের লেখা। সম্ভব হলে পরে কোনো এক সংখ্যায় তার বিবরণ দেওয়া যাবে।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার জন্মশতবার্ষিকী ॥

প্রখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার জন্মশতবার্ষিকী দিবস হল ৫ অক্টোবর। আসামের সর্বত্র এই উৎসব পালনের আয়োজন হয়েছে। বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এই উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য এগিয়ে এসেছেন। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ বিশেষ ডাক-টিকিট প্রকাশ। বিলাসীপাড়ায় এই শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের তোড়জোর সবচেয়ে বেশি। এখানে এরই মধ্যে একটি উৎসব সমিতি গঠিত হয়েছে। এই শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে গল্প, নাটক, আলোচনা-চক্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উমাশঙ্করের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা ॥

শুক্রবার, ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতার 'গুজরাটি সাহিত্য মন্ডল' 'হিন্দুস্থান ক্লাবে' প্রখ্যাত গুজরাটি সাহিত্যিক শ্রীউমাশঙ্কর যোশিকে একটি 'চা-চক্র' অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত করেন। 'গুজরাটি সাহিত্য মন্ডলের বিশেষ আমন্ত্রণে শহরের বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রেমিক উপস্থিত ছিলেন। গুজরাটি সাহিত্যিকদের মধ্যে 'নওরোজ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীএন ই কাপ্গা, শ্রীশিউকুমার যোশি, শ্রীকানুভাই ভালারিয়া ও শ্রীমতী জ্যোতি ভালারিয়া, হিন্দি লেখক ও সমালোচকদের মধ্যে শ্রী লক্ষ্মীচাঁদ জৈন, শ্রীমতী কুন্ঠা জৈন, অধ্যাপক কল্যাণমল লোধা, অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, ইংরেজি ভাষায় লেখক শ্রী পি, লাল, বাংগালী লেখকদের মধ্যে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীসতীকান্ত গুহ, শ্রীবিমল মিত্র, শ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্রীতরুণ রায়, শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী, ডঃ মোহিত লাহিড়ী ও শ্রীআশিষ সান্যাল বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযোশি সকলের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিলিত হন এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, তাঁর রচনার একটি নির্বাচিত কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সংকলন শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর এবং অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের কবিতার অনুবাদ হচ্ছে দেখে তিনি খুবই খুশি হন। তিনি বলেন—'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের এই একটা সুফল।' আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'মাহ্‌ফিল' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা তাঁর উপর হচ্ছে বলেও জানা গেল। এই ধরনের অনুবাদগুলির মাধ্যমেই কলকাতাবাসী বাংগালী ও অবাংগালী লেখকদের মধ্যে একটা সহযোগিতার ভাব গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

দিগম্বর কভুলু ॥

তেলুগু সাহিত্যের তরুনতর কবিদের মধ্যে 'দিগম্বর কভুলু' কবিগোষ্ঠী বিশেষ পরিচিত। এরাই প্রথম তেলুগু সাহিত্যে 'বীট' প্রভাব বিস্তার করেন। অবশ্য বীট কবি গীনস্‌বার্গের প্রতি তাঁদের তেমন শ্রদ্ধা নেই। এরা জীবনকে উদ্দেশ্যহীন মনে করেন না। মনে করেন জীবন অনুভবের প্রকাশের একটা মাধ্যম হলো তাদের মতবাদ। জীবনের নগ্ন দিকটাই ফুটিয়ে তোলা এদের উদ্দেশ্য। এই কবিগোষ্ঠীর কবিরা কেউ ছদ্মনামে লেখেন না। প্রশ্ন করে জানা গেছে, এর কারণ তন্ত্রের সামাজিক ব্যবস্থা। এখনও সেখানে জাতিভেদ প্রথা প্রখর। এক সাম্প্রদায়কে লেখা অন্য সম্প্রদায়েরা অবজ্ঞা করে থাকেন, তার সাহিত্যিক মান যাই হোক না কেন। ছদ্মনামে লিখলে এই সম্ভাবনা থাকে না। এদের পুস্তক প্রকাশের ভঙ্গীটিও বেশ অভিনব। রিক্সা-ওয়ালা বা মুচি-মেথর — কেউ পুস্তকটি প্রকাশের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাত বারোটায় এদের তৃতীয় কাব্য সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। এবারের প্রকাশের স্থান ছিল ভিজাগাপত্তম এর আগের বার প্রকাশিত হয়েছিল বিজয়ওয়াদা থেকে। এবং প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল হায়দারাবাদ থেকে। নিখিলেশ্বর জ্বালামুখি, প্রমুখ কবিদের কবিতা এবার সংকলিত হয়েছে।

সাহিত্য প্রতিযোগিতা ॥

বর্ধমান জেলার রসুলপুর দলুই বাজারের মৈত্রী সাহিত্য পর্ষৎ 'মনোরঞ্জন স্মৃতি সাহিত্য' প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। এই সাহিত্য প্রতিযোগিতার বিষয় মৌলিক গল্পও কবিতা রচনা। প্রথম পুরস্কার দুইশত টাকা। আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত যোগদান করা যাবে বিস্তৃত নিয়মাবলীর জন্য—সম্পাদক, মৈত্রী সাহিত্য পর্ষৎ রসুলপুর, বর্ধমান, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

প্রাচীন তামিল সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ ॥

'কলিঙ্গাত্তু বরণী' প্রাচীন তামিল সাহিত্যের একটি উল্লেখ্য নিদর্শন। কলিঙ্গ যুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত হলেও প্রেমের কাব্য হিসেবেই এর পরিচিতি। এই গ্রন্থ

টির রচয়িতা জয়কোন্দন। প্রখ্যাত চোল রাজা কুলোত্তুঙ্গনের তিনি ছিলেন সভাকবি। এই কারণে গ্রন্থটির স্থানে স্থানে কুলোত্তুঙ্গনের কিছুটা যশকীর্তন আছে। কলিংগরাজ রাজস্ব দিতে অস্বীকার করলে কুলোত্তুঙ্গন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ১০৭০—১১২০ খৃঃ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত কলিংগরাজের পরাজয় হয়। অবশ্য কলিংগরাজকে ধরা সম্ভব হয়নি। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। এই যুদ্ধ জয়কেই কবি জয়কোন্দন অমর করে রেখেছেন তাঁর এই কাব্যে। সম্প্রতি এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন শ্রীজি আরউল। এই অংশে আছে সুন্দরী চোল রমণীবৃন্দ কর্তৃক রাজা কুলোত্তুঙ্গনের বন্দনা। কবি এই বন্দনার সংগীত রচনা করতে গিয়ে চোল রমণীদের অপরূপ সৌন্দর্য-চিত্র নির্মাণ করেছেন। কবি জয়কোন্দনের মত আরও অনেকে এই বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর মত গীতিময়, সাবলীল এবং অভিনব করে তোলবার ক্ষমতা আর কারও ছিলনা। অনুবাদে মূলের সেই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা দুরূহ। তবু এর ইংরেজি অনুবাদটির কাব্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না। যাঁরা তামিল জানেন না, তাঁদের কাছে গ্রন্থটির অবদান অপরিসীম।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ॥

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে একটি অভিনব প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। ট্রেনে টিকিট ছাড়া ভ্রমণ, গুন্ডামী, রেলওয়ের জমিদখল ইত্যাদি এবং ট্রেনে অ্যালাম চেন টানার প্রবণতা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন। প্রবন্ধের বিষয়—'রেল চলাচলে জনসাধারণের ভূমিকা'। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। রেলওয়ে ফ্রি-পাশ ও নগদের আকারে তিনটি পুরস্কার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সহ সমস্ত প্রবন্ধের পান্ডুলিপি—চীফ কমার্শিয়াল সুপার এন এফ রেলওয়ে, গোহাটি—১১, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সর্দার প্যাটেলের বই ॥

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নাম এখন অনেকটা বিস্মৃত। অথচ তাঁর যোগ্য নেতৃত্বেই ভারতের ৫৫০টি দেশীয় রাজ্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক চেহারায় প্রায় সবটাই সর্দার প্যাটেলের জন্য সম্ভব হয়েছে। এই সম্বন্ধে অনেকের মধ্যে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে। বর্তমান গ্রন্থটি পাঠ করলে সেই ভ্রান্তি থেকে নিরসন হওয়া অনেকটা সহজতর হবে। সর্দার প্যাটেল সেই সময়ে এর সমর্থনে যে সমস্ত ভাষণ দিয়েছিলেন, তারই নির্বাচিত সংকলন এটি। প্রকাশ করেছেন ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রক। এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য তাঁরা সকলের ধন্যবাদ লাভ করবেন বলে আশা করি।

—অমৃত

বিদেশী সাহিত্য

সৈনিকের আত্মজীবনী ॥

অনেক সময় জীবনের অভিজ্ঞতা উপন্যাসের চেয়েও চমকপ্রদ এবং রোমাঞ্চ কাহিনীর চেয়ে বিস্ময়কর হয়ে ওঠে। কিউবান সৈনিক ইস্টেবেন মন্তেজো সেরূপ একজন আশ্চর্য পুরুষ, যিনি জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন আখের ক্ষেতে, বনেজংগলে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে। সম্প্রতি 'দি অটোবায়োগ্রাফি অব্ এ রান এওয়ে স্লেভ' নামে তাঁর একটি আত্মজীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

মন্তেজো অবশ্য লেখক নন। সাহিত্যের জন্য বিলাসিতা করবার সময়ও তিনি পাননি। তাঁর মুখের কথা, গল্পকাহিনী, টুকিটাকি সংবাদ টেপ রেকর্ডিং এবং স্মৃতিচারণার সাহায্যে বইটিতে পূর্ণরূপ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন মিগুয়েলা বর্ণেট।

মন্তেজোর বয়স এখন ১০৭ বছর। হাভানার কাছাকাছি বৃদ্ধ সৈনিকদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী একটি সরকারী বাড়িতে তিনি বসবাস করছেন। লোকায়ত শিল্পকলার ব্যাপারে এখনো তিনি বিশেষভাবে কৌতূহলী। জীবনসম্পর্কে বরাবরই তিনি আশাবাদী, সদা সচেতন ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন পুরুষ। মন্তেজো বিশ্বাস করেন 'এ জীবন দুঃখের নয়, বরং জীবনই একমাত্র সত্য।'

তাঁর বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি অত্যন্ত দুঃখজনক। একজন ক্রীতদাস হিসেবে তার জীবন শুরু। ১৮৬৮ সালে আখ-মালিকদের অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন ও বাধ্যতামূলক শ্রমনিয়োগের ব্যবস্থায় উত্যক্ত হয়ে গভীর অরণ্যে পালিয়ে যান। সেখানকার আদিবাসী সমাজের সংগে দীর্ঘ বারো বছর অসভ্য 'জাংগল-বয়' হিসেবে আত্মগোপন করে থাকেন।

১৮৮০ সালে কিউবা থেকে দাসপ্রথা উঠে গেলে মন্তেজো সভ্যসমাজে ফিরে আসেন। তাঁর সেই অরণ্যজীবনের ঘটনা পড়তে পাঠকের মনে কোনো এক বিস্মৃতপ্রায় আদিমজীবনের স্মৃতি ফুটে ওঠে।

মন্তেজো মাঝে মাঝে স্মরণ করেন তাঁর দাসজীবনের ঘটনাবলী। আখের ক্ষেতে যে সকল বাদ-প্রতিবাদ, ফ্যাশন ও উত্তেজনা দেখা যেতো—সেসব ঘটনার কথা তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় বলে গেছেন। এমন কি আদিবাসী জীবনের অলৌকিক কাহিনী বলতে গিয়েও তিনি সমান সরলতা বজায় রাখেন। একবার একজন বৃদ্ধ কংগোলিজ তাঁকে বলেন, 'যদি কেউ শয়তানের সংগে বন্ধুত্ব পাতাতে চায়, তাহলে তাকে হাতুড়ি সংগে রাখতে হবে, আর — হাতে রাখতে হবে বড় বড় নখ। তারপর একটি তাজা চিবা গাছের গুঁড়ির ওপরে সেই হাতুড়ি দিয়ে তিনবার ঘা দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি এই ডাক সেই শয়তান শুনতে পাবে, তত দ্রুত সে তার বাধ্য হয়ে উঠবে।'

১৮৯৫ সালে স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেন। প্রথমে তাঁকে যোগ দিতে হয় সুবিধাবাদী ব্যান্ডিটদের অধীনে। পরে অবশ্য তিনি ভুল বুঝতে পারেন এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের দ্বারা চালিত হন। এবং সেই যুদ্ধে নিগ্রোরা বহু স্প্যানিশ হত্যা করে। মন্তেজোর ভাষায়, "তাঁদের মাথাগুলি মাটিতে পড়ছিল যেন নারকেল গাছ থেকে নারকেল পড়ছে।"

মন্তেজো এই গ্রন্থে ব্যক্তিগত জীবনের কথা বিশেষ কিছুই বলেননি। জীবনে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা করার জন্য সময়ও তাঁর ছিল না। ঘর বেঁধে দেশের কাজে অবহেলা করার মতো মনোভাবও তাঁর কোনদিন হয়নি। হয়তো, যৌবনে কোনো নারী তাঁকে ভালোবেসে থাকবে। কিন্তু কোনো মহিলাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি।

১০৭ বছর বয়সেও মন্তেজো বিশ্বাস করেন, "এখনো আমার অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। আমাকে আরো কিছু সৎ কাজ করে যেতে হবে।"

ডন গিয়োভানি মাসিনি ॥

ডন গিয়োভানি ইতালীর একজন বিশিষ্ট পুরোহিত। তাঁর বয়স এখন ৯০ বছর। শরীরে বয়সের ছাপ পড়লেও চোখের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ও স্মৃতিশক্তিতে প্রখর শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। দান্তে সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও কৌতূহলে প্রত্যেক ইতালীবাসীর নিকট

প্রস্থার বিষয় বলে মনে হতে থাকে। এখনো তিনি দান্তের বই নিয়মিত পড়াশোনা করেন, দান্তে সম্পর্কে কোথাও কোনো কিছু লেখা হলে তার খোঁজ-খবর নেন।

১৯২১ সালে শেষ বারের মতো দান্তের কবর খোঁড়া হলে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। মার্সিনি বলেন, "সেই অনুষ্ঠানে বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, পদস্থ কর্মচারী, ডাক্তার, নৃতত্ত্ববিদ, অস্থি বিশেষজ্ঞ, ও পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন......কিন্তু আমিই ছিলাম একমাত্র পুরোহিত। তাঁরা কেবল আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এই জন্যে যে সেই সময়ে আমিই একমাত্র সারাজীবন ধরে দান্তে সম্পর্কে অনুশীলন করে যাচ্ছিলাম। কফিনের মুখ খোলা হলে তাঁর হাড়গুলি একটা শীটের ওপর তুলে রাখা হলো। অধ্যাপক সার্জি এবং ফাসেত্তো তাদের পরিমাপ কষতে লাগলেন। তাঁরা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিলেন। যেন একটি মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছিল।"

"একজন ফটোগ্রাফারকে ডাকা হলো ছবি তোলার জন্য। এবং যদি কোনো কারণে তাঁর ফিল্ম সে কাজে ব্যর্থ হয়, তা হলে স্থানীয় শিল্পী ও ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান সিগনোর গয়েচিমানি তার ছবি এঁকে নেবেন। কিন্তু যখন তিনি কবির প্রকৃত হাড়গুলি দেখতে পান, তখন এত বিস্ময় ও দুঃখিত হয়ে পড়েন যে পেন্সিলের একটি আঁচড়ও কাগজের ওপর টানতে পারেননি।"

ডন মার্সিনি সেই ঘটনার প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতিকে স্মরণ করতে পারেন। "যখন পরিমাপ করার কাজ শেষ হলো, তখন হাড়গুলি একটি নতুন কফিনে পোরা হলো। র‍্যাভেনা শহরের মেয়র ব্যক্তি আমাকে তার উদ্দেশ্যে পবিত্র মন্ত্র পাঠের জন্য অনুরোধ করেন। কেননা, দান্তে ছিলেন একজন ক্যাথলিক। তখন আমি হাঁটু মুড়ে এই বিরাট মানুষটির ছোট্ট কঙ্কালটিকে চুম্বন করি।"

'প্রার্থনা যা করেছিলাম—সবই আমার জন্য। দান্তে তো বহুদিন আগেই স্বর্গে গিয়েছেন।"

এই ঘটনার কথা স্মরণ করতে গিয়ে আজো মার্সিনি বিস্মিত হন। তাঁর কাছে এটিকে একটি অলৌকিক বিষয় বলে মনে হয়। তিনি জানেন না, কেন তাঁর মাথা নত হয়েছিল, কেন তিনি তাঁর অস্থি চুম্বন করেছিলেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় কিছু করেননি। কে যেন তাঁকে এ-কাজে বাধ্য করেছিল।

উপস্থিত কেউই ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করেনি। সকলেই এটিকে স্বাভাবিক বিষয় বলেই মনে করেছিলেন।

পশ্চিম জার্মানীর আকাদমি পুরস্কার

জার্মান আকাদমি অব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচারের একটি সভায় স্থির হয় আগামী অক্টোবর মাসে ঐতিহাসিক গোলো মান-কে এই বছরের জন্য জর্জ বুকনার পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারটির নগদ মূল্য দশ হাজার মার্ক। এর আগে এই পুরস্কারটি কোনো প্রবন্ধকারকে দেওয়া হয়নি।

এ ছাড়াও সাহিত্য আকাদমি আরো কয়েকটি পুরস্কারের ঘোষণা করেন। এ শরৎকালেই পুরস্কারগুলি দেওয়া হবে। সিগমন্ড ফ্রয়েড প্রাইজ পাবেন কার্ল বার্থ হেনরিখ মার্ক পুরস্কার পাবেন জর্জ হেনসেল। আসছে ২৬ অক্টোবর পুরস্কারগুলি একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে মধ্যে বিতরণ করা হবে।

নতুন বই

কার্ল স্যাণ্ডবার্গের একমুঠো— (কাব্য-সংগ্রহ) — অনুবাদ — ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রা) লিমিটেড, কলিকাতা—১২। দাম—দু' টাকা মাত্র।

বাংলাদেশের একটি প্রধান গুণ যে এই অঞ্চলের বিদগ্ধ সমাজ বিদেশের সাহিত্য সম্পর্কে অন্ধকারে নেই। একদিন হুইটমান এই বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজকে প্রভাবিত করেছেন। এলিয়ট আমেরিকান হলেও ইংলণ্ডে ঘর বেঁধেছিলেন। এই এলিয়ট আধুনিক কবি সমাজের কাছে উচ্চ আসন লাভ করেছেন; আর রবার্ট ফ্রস্ট, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ কিংবা ল্যাংস্টন হিউজ এইসব কবিরা শিক্ষিত বাঙালীর প্রিয়জন। স্যাণ্ডবার্গ কিংবা ল্যাংস্টন হিউজ এইসব আবাদে, তারপর মোটর গাড়ির মেকানিক, রাজমিস্ত্রীগিরি, ইত্যাদির ফাঁকে কলেজে পাঠ গ্রহণ করেছেন। জীবনকে দেখেছেন কাছ থেকে, মাটি আর মানুষের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ।

স্যাণ্ডবার্গের কিছু কবিতা মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় অনূদিত হয়ে বাঙালী পাঠকের কাছে পরিবেশিত হয়েছে বটে তবে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কিছু সুনির্বাচিত কবিতা। এই কবিতাগুলির অনুবাদ করেছেন জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় "কার্ল স্যাণ্ডবার্গের একমুঠো" এই নামে। কবিতাগুলি স্যাণ্ডবার্গের "কমপ্লিট পোয়েমস", "হনি অ্যান্ড সল্ট", "কর্ন হাসকারস", "সিকাগো পোয়েমস্", "গুড মরনিং আমেরিকা", "স্মোক অ্যান্ড স্টীল", "হোম ফ্রন্ট মেমো" নামক কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে সংকলিত। মোট ষাটটি কবিতা এই গ্রন্থে আছে। প্রথম কবিতাটি 'হ্যাণ্ড-ফুলস'—তার অনুবাদ "একমুঠো"। অনুবাদ চমৎকার হয়েছে।

প্রতিটি কবিতা আকারে ক্ষুদ্র। গভীর ভাবদ্যোতক এবং অতি সহজ কথায়, সরল আঙ্গিকে রচিত। কবিতা অনুবাদ সহজসাধ্য কাজ নয়। মূল কবিতার ভাব, ভাষা ও সুরকে অক্ষত রেখে ভাষান্তরকরণ কঠিন কাজ। ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ-কর্মে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কার্ল স্যাণ্ডবার্গের কবিতার অনুরাগী পাঠকবৃন্দ এই সুমুদ্রিত কাব্য সংকলনটি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারেন। কারণ, এর মূল্য সুলভ।

মহুয়া : (উপন্যাস)—বিভূতিভূষণ, গ্রন্থ-বলাকা, ১৫ ভূপেন বোস এভিনিউ, কলিকাতা—৪ ; মূল্য : ৩·০০

দার্জিলিংয়ের পাহাড়ী অঞ্চলের পটভূমিকায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেক্ষাপটে মানবজীবনের যে কল্লোল, তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের 'মহুয়া' উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনী বাস্তবানুগ এবং সুগ্রথিত।

গল্পের মালাগুচ্ছ (সংকলন)—সুজিতকুমার নাগ সম্পাদিত। ৩৫-এ সূর্য সেন স্ট্রীট। কলকাতা-৯। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এই সংকলনে লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, নরেন্দ্র দেব, শিবরাম চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার, গজেন্দ্র কুমার মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, রাধারাণী দেবী, সুমথনাথ ঘোষ, সতীকুমার নাগ, আশা দেবী, স্বপনবুড়ো, ইন্দিরা দেবী, রবিদাস সাহারায়, দিলদার। এই সুসম্পাদিত গ্রন্থখানি কিশোর পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে।

ছড়ায় ভরা গ্রাম (ছড়া সংকলন)—ধীরেন বল। শৈব্যা পুস্তকালয়। ৮।১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম দেড় টাকা।

ধীরেন বল একজন প্রখ্যাত শিল্পী। শিশু-সাহিত্যেও তাঁর নানাবিধ রচনা সমৃদ্ধ। গ্রামকে অবলম্বন করে ছোটদের ছড়া লিখেছেন তিনি। সম্প্রতি সেগুলি একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 'ছড়ায় ভরা গ্রাম'-এর সব ছবিগুলোই লেখকের আঁকা। এই বইখানি ছোট ছেলে-মেয়েদের ভাল লাগবে।

শারদ সাহিত্য

থা-সাহিত্য শারদীয়। সম্পাদক গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা—১২ সাড়ে তিন টাকা।

কথাসাহিত্যের শারদীয়া সংখ্যায় দুটি স্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন নীহাররঞ্জন প্ত এবং প্রশান্ত চৌধুরী। কবিতা, গল্প বন্ধ লিখেছেন অবধূত, নলিনীকান্ত রকার, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কালিস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকুমার লাহিড়ী, প্রভাকর মাঝি, চ্যুত চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, রিমল গোস্বামী, বাণী রায়, হরিনারায়ণ ট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন দত্ত, লীলা মজুমর, শঙ্কুমহারাজ, অমলেন্দু মিত্র, দক্ষিণারন বসু, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, স্বারেশন্দ্র শর্মাচার্য, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, চিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রনাবি, গৌরীশংকর ট্টাচার্য, নরেন্দ্র দেব, কৃষ্ণধন দে, মণীন্দ্র য়, রাধারাণী দেবী, উমা দেবী, আশা বী, গোপাল ভৌমিক, মায়া বসু, অনন্তমার চট্টোপাধ্যায়, শিবদাস চক্রবর্তী, অনিন্দ চক্রবর্তী, বেনু গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজং বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র াল, সুমথনাথ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বোধকুমার সান্যাল, আশাপূর্ণা দেবী এবং রাসন্ধ।

●

ান-বিজ্ঞান শারদীয়া। সম্পাদক : গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা-৯। দাম আড়াই টাকা।

বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারে বঙ্গীয় জ্ঞান পরিষদের উদ্যম প্রশংসনীয়। এদের কাশিত গ্রন্থাবলী এবং 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' াসিক পত্রিকার উদ্যম প্রশংসনীয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শারদীয় সংখ্যায় এবার বিভিন্ন ষয়ে লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, গগনহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার মুখোধ্যায়, রমেশ দাস, পরিমলকান্তি ঘোষ, প্রেন্দ্রকুমার পাল, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুবিকাশ কর, প্রিয়দারঞ্জন রায়, তীশরঞ্জন খাস্তগীর, জয়ন্ত বসু, বলাইদ কুন্ডু, মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, শ্যামন্দর দে, কাফী খাঁ, দিলীপ বসু, রেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং আরো অনেকে।

মৌচাক শারদীয়া। সম্পাদক : সুপ্রিয় সরকার। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

মৌচাক ঐতিহ্যসম্পন্ন কিশোর মাসিক পত্রিকা। শারদীয় সংখ্যাটি প্রবীণ লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ। লিখেছেন অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, সুনীল বসু, রাণা বসু, কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমরনাথ রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজিৎ বসু, নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী, পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা দে, হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার গুপ্ত, অতীন মজুমদার, নির্মল সরকার, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এবং প্রফুল্ল রায়। বহু আলোকচিত্র এবং রেখাচিত্রে সুশোভিত।

●

বৈতানিক শারদীয়া। সম্পাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দুই টাকা।

সাহিত্য পত্রিকা বৈতানিকের শারদ সংকলন প্রবীণ ও নবীন লেখকদের সমাবেশে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই সংকলনটি বিদগ্ধ পাঠক মাত্রেরই সংগ্রহযোগ্য। অন্নদাশঙ্কর রায়, নারায়ণ চৌধুরী, হরপ্রসাদ মিত্র, কল্যাণকুমার বসু, শঙ্করানেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, স্বর্ণবিজয় চট্টোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, রামজীবন ভট্টাচার্য, রাণা বসু, রমা বসু, অজিতকৃষ্ণ বসু এবং বিজন ঘোষ লিখেছেন প্রবন্ধ। হরপ্রসাদ মিত্রের সাহিত্যতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের কৈশোর চিন্তা প্রবন্ধে নতুন বক্তব্য স্পষ্ট। গল্প ও কবিতা লিখেছেন অশোককুমার সেনগুপ্ত, নির্মল সরকার, নির্মলেন্দু গৌতম, প্রাণতোষ ঘটক, মায়া বসু, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রমাপতি বসু, নিখিল সরকার, সন্তোষকুমার দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, অনিল ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, আশিস সান্যাল, মনীন্দ্র রায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, গোবিন্দ চক্রবর্তী, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সুশীলরায়, সুধসত্ত্ব বসু, শিবশম্ভু পাল, সুধীর করণ, দুর্গাদাস সরকার, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন।

সারস্বত প্রকাশ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৫। সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত এবং অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। ৬ হেস্টিংস স্ট্রীট। কলকাতা—১। দাম দেড় টাকা।

সারস্বত প্রকাশের বর্তমান সংখ্যায় ভার্জিলিয়স্-এর মহাকাব্য তাইনেয়িস্-এর মূল লাতিন থেকে অনুবাদ করেছেন রবের আঁতওয়ান এস জে এবং হৃষীকেশ বসু। এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। প্রবন্ধ গল্প কবিতা লিখেছেন মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, বিনয় মজুমদার, অমরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, সাম টু-লিয়া-মুহিয়া, রণধীর রায়, রাজ্যেশ্বর মিত্র, গ্রাহাম সাদারল্যান্ড, সুবীর রায়চৌধুরী, হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি এঁকেছেন রঘুনাথ গোস্বামী।

●

কিশোর ভারতী প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৮।৩, চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

বঙ্গ ভাষায় কিশোর পাঠকদের উপযোগী প্রচলিত গ্রন্থাদি বা পত্র-পত্রিকায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। অধিকাংশই ইতিহাস রূপকথা সামাজিক গল্প এবং নানান ধরনের হাল্কা জিনিসে পূর্ণ হয়ে থাকে। 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিতে যে অভিনবত্বের সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযান, আবিষ্কারের কাহিনী, গোয়েন্দা কাহিনী, রোমাঞ্চকর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, ইতিহাস ভিত্তিক গল্প, দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী। শিহরণ জাগানো ভ্রমণ কাহিনী, মনীষী জীবনের গল্প কথা, জল-স্থল-অন্তরীক্ষের চমকপ্রদ গল্প, ইতিহাসের স্মরণীয় দিনগুলির বিচিত্র কাহিনী, শিকারের গল্প, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গল্প, হাসি ও কৌতুকের গল্প, বিজ্ঞানের সরস মধুর কাহিনী, শ্রেষ্ঠ বাঙালী লেখকদের রচনার পুনর্মুদ্রণ, জলদস্যুদের লোমহর্ষক কাহিনী কিশোর ভারতীর পাতা পূর্ণ হয়ে আছে। অসংখ্য রেখাচিত্র, রঙিন ছবিতে সমস্ত বইটাই ঠাসা। এই অনন্য সংকলন বাঙলা কিশোর সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। প্রথমেই আছে উপন্যাসের মত বড় গল্প 'ঘনাদার গল্প'। এই বিস্ময়কর কাহিনীর স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্র। শিবরাম চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়, আশাদেবী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, স্বপনবুড়ো, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুখলতা রাও, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী, বিমল মিত্র, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শক্তিপদরাজগুরু, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, ধীরেন্দ্রলাল ধর, লীলা মজুমদার, মনোজিৎ বসু, ধীরেন বল, মণীন্দ্র দত্ত, নারায়ণ চৌধুরী, অজয় বসু, দীনেশ দাস, শৈল চক্রবর্তী, রেবতীভূষণ, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঙ্কর্ষণ রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, পলাশ মিত্র এবং আরো অনেকে লিখেছেন। অনেকগুলি একরঙা ও রঙ্গীন আর্ট প্লেট এবং মনোরম প্রচ্ছদে এই সুবৃহৎ কিশোর সংকলনটি সুশোভিত। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্তের কয়েকটি রচনার পুনর্মুদ্রণ আছে। মুদ্রণ সম্পাদনা এবং অঙ্গসজ্জায় একটি আভিজাত্যের সুর স্পষ্ট। আগামী নভেম্বর মাস থেকে কিশোর ভারতীয় নিয়মিত আত্মপ্রকাশকে আমরা স্বাগত জানাই।

●

চতুষ্কোণ শারদীয়। সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। ৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দাম—দু' টাকা।

প্রবন্ধ লিখেছেন স্বামী শংকরানন্দ, রণেন নাগ, নীলরতন সেন, রামপ্রসাদ মজুমদার, পল্লব সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন রায়, অরুণ চৌধুরী, প্রভাতকুমার গোস্বামী, নেপাল মজুমদার, দুলাল চৌধুরী। গল্প ও কবিতা লিখেছেন চিত্ত ঘোষাল, অশোককুমার সেনগুপ্ত, তপোবিজয় ঘোষ, ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়, ছবি বসু, মৃণাল চৌধুরী, মানবেন্দ্র পাল, সত্য গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুশীল রায়, কৃষ্ণ ধর, মৃণাল দেব, নবেন্দু চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং ধনঞ্জয় দাস।

●

আনন্দ ১৩৭৫। সম্পাদক : ধীরেন্দ্রলাল ধর। ক্যালকাটা পাবলিশার্স। ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা—৯। দাম পাঁচ টাকা।

শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 'আনন্দ' বাংলা দেশের বিশিষ্ট লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন নরেন্দ্র দেব, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, এবং নীহাররঞ্জন গুপ্ত। পাঁচটি নাটক লিখেছেন মন্মথ রায়, মণীন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, কুমারেশ ঘোষ এবং ধীরেন্দ্রলাল ধর। শিবরাম চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুমথনাথ ঘোষ, রবীন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রকুমার বসু, মনোরম গুহঠাকুরতা, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, স্বপনবুড়ো, আশাপূর্ণা দেবী, আশা দেবী, ননীগোপাল চক্রবর্তী, বিশু মুখোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, এবং আরো কয়েকজন নানান স্বাদের গল্প লিখেছেন। কবিতা ও ছড়া লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শৈল চক্রবর্তী, মনোজিৎ বসু, বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন বল, নির্মলেন্দু গৌতম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিতকৃষ্ণ বসু, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বীরু চট্টোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী, হরেন ঘটক, পলাশ মিত্র, প্রীতিভূষণ চাকী, শৈলেনকুমার দত্ত, সুনীল সরকার, সলিল মিত্র, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। কিশোর পাঠকদের দিকে দৃষ্টি রেখে সম্পাদক শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর পূর্ববর্তী বৎসরগুলির মত সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

●

কণ্ঠস্বর শারদীয়। সম্পাদক : সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ৪৯।এল।৭, নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলকাতা—১১। দাম—দু' টাকা।

লিখেছেন অমিতাভ চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সত্যব্রত রায়, সুপ্রিয় রাহা, অমলনারায়ণ বিশ্বাস, আশিস সেনগুপ্ত, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সত্যব্রত দে, মনুজেশ মিত্র, অমরেন্দ্র সান্যাল, শিবাজী গুপ্ত, শান্তনু চট্টোপাধ্যায়, অম্বুজেন্দ্র ঘোষ এবং আরো অনেকে।

●

বিশ্ববার্তা। সম্পাদক : কালীপদ চক্রবর্তী। ৪৪।৪, গরচা রোড। কলকাতা-১৯। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রাহা, রমা চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্র-না-বি, মনোজ বসু, কালিদাস রায়, গোপাল ভৌমিক, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, হরপ্রসাদ মিত্র এবং আরো অনেকের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

●

পথিক পূজা-সংকলন। সম্পাদক : রবীন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিয় চট্টোপাধ্যায়। ২৩৫ বাগমারী রোড। কলকাতা—৫৪। দাম দেড় টাকা।

দেবীপদ ভট্টাচার্য, সুরেশ মৈত্র, আশুতোষ ভট্টাচার্য, গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব সেন, হরপ্রসাদ মিত্র, অমিতাভ দাশগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শংকর দে, মতি নন্দী, কুমারেশ ঘোষ, আশা দেবী, হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পল্লব রায় এবং আরো অনেকে।

●

অমর। সম্পাদক : উৎপলকুমার গুপ্ত। ৩ গোয়ালপাড়া লেন। বহরমপুর। দাম এক টাকা।

কয়েকটি বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছেন মণীশ ঘটক, সুগত বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার বসু, তপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধ ও গল্প লিখেছেন অমৃতাংশুভূষণ, নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় রায়(?) [illegible], প্রদ্যোৎ ঘোষ, উৎপলকুমার গুপ্ত। অনেকগুলি কবিতা আছে এই সংকলনে। পত্রিকাটির মুদ্রণ সুরুচিসম্মত।

●

ইমন। অক্টোবর-ডিসেম্বর। সম্পাদক : অমিতাভ বসু। ১৩৩।২।এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা—৬। দাম দু' টাকা।

দুটি কাব্য নাটক লিখেছেন অমিত দাশগুপ্ত এবং সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। কৃষ্ণ ধর, কাজী মোতাহার হোসেন এবং দেবব্রত [illegible] লিখেছেন প্রবন্ধ। কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রমেন্দ্র দে, মৃত্যুঞ্জয় [illegible], নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, [illegible] চট্টোপাধ্যায়, শংকর দে, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, পরেশ মণ্ডল এবং আরো অনেকে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'প্যাঁচা' নামে একটি গল্প।

●

কাফেলা শারদীয়া। সম্পাদক : আবদুল আজীজ আলআমান। এ-১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা—১২। দাম দেড় টাকা।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী উপন্যাস প্রভৃতির সমাবেশে কাফেলার বর্তমান সংখ্যাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

●

বিচিত্রা শারদ সংকলন। সম্পাদক : কালী কোঙার ও কমল চট্টোপাধ্যায়। পলাশ খোলা আদরা।

আধুনিক কবিতা শারদ সংকলন। সম্পাদক রেখা দত্ত। ১, মিডল রোড, কলকাতা—৩২। দাম—পঁচাত্তর পয়সা।

কালপ্রতিভা। সম্পাদক : বাসুদেব দে [illegible] চাবেরিয়া। কলকাতা—২৭। দাম [illegible] টাকা।

একক। সম্পাদক : শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ৪৬ হালদার পাড়া রোড। কলকাতা—২[illegible] দাম এক টাকা।

নবান্ন। সম্পাদক : সমর দত্ত ও বিমান পা[illegible] ৩৪-বি হরিশ নিয়োগী রোড। ক[illegible]কাতা চার। দাম এক টাকা।

তপমনুত। সম্পাদক : শিশিরকুমার ব[illegible] ৮।৪-এ কাশী ঘোষ লেন। কলকাতা—৬। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

শ্রাবণী। সম্পাদক : নির্মলেন্দু দে। জং[illegible] পাড়া যুবগোষ্ঠী। জঙ্গীপাড়া হুগলী।

শারদ শ্রাবণী। সম্পাদক : সমর দত্ত [illegible] বিজয় বসু। ৩২ এ ইন্দ্রিকা [illegible] কলকাতা—২০।

[উপন্যাস]

কেয়াপাতার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

আগের ঘটনা

[উনিশ শ' চল্লিশের অক্টোবর। কলকাতার ছেলে বিনু দুই দিদি আর মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে পূর্ববাঙলার রাজদিয়ায় দাদু হেমনাথের বাড়ি। বিশ বছর বাদে বিনুর মা সুরমা এলেন রাজদিয়ায়।

আশ্চর্য মানুষ হেমনাথ। সকলেরই প্রিয়, হিতৈষী। গাঁয়ের নানান ঝক্কি-ঝামেলা তাঁর মাথায়।

হেমনাথের বাড়ির কর্মচারী যুগলের সঙ্গে বিনুর ভাব বেশ গাঢ় হল।

হেমনাথ সকালেই বেরিয়ে যান কেতুপুরে মজিদ মিঞা আর নবু গাজীর দাঙ্গা মেটাতে। ফিরলেন রাতে। সঙ্গে মজিদ আর হাসেম আলী। অবনীমোহনদের দেখে এরা খুবই উল্লসিত। ওদের আন্তরিকতায় অবনীমোহন, সুরমা সকলেই অভিভূত।

অবনীমোহনের সঙ্গে 'মিতা' পাতাল মজিদ।

পরদিন সবাইকে নিয়ে হেমনাথ বেরোলেন বেড়াতে। বৃদ্ধ বন্ধু রামকেশব, ব্যবসায়ী অধর সাহার বাড়ি ঘুরে ও'রা এলেন নকুলের ইলিশ-আড়তে। রুপোর পাহাড় দেখে বিনু থ। এরপর বাড়ি ফেরার মুখে 'বিস্ময়কর চমকপ্রদ মানুষ' হেমনাথের বন্ধু ডেভিড লালমোর ওরফে লালমোহনের সঙ্গে দেখা। খুশির জোয়ার। সবাই এবার বাড়ি ফিরল। লালমোহনও সঙ্গে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। সাত ।।

ভেতর-বাড়ির উঠোনে এসে ফীটন [থা]মালেন লারমোর। তারপর খানিক আগের [মত]ন লাফ দিয়ে নেমে চেঁচামেচি জুড়ে [দি]লেন, রমু কই রে—আমার সুরমা [ক]োথায়?

সুরমা কাছেই ছিলেন। দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরখানায় বারান্দায় পিঠময় চুল মেলে [দি]য়ে শিবানী আর স্নেহলতার সঙ্গে চাল [ঝাড়]তে বাছতে গল্প করছিলেন; ডাকটা [কা]নে যেতে চকিত হয়ে মুখ ফেরালেন। [উঠ]ানের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, [লার]মোর দাঁড়িয়ে আছেন। আশ্বিনের এলো-[মে]লো বাতাসে তাঁর সাদা দাড়ি এবং চুল [উড়]ছে।

এতকাল পরও লারমোরকে দেখেই [চিন]তে পারলেন সুরমা। নিমেষে তাঁর [বয়]স থেকে কুড়ি-পঁচিশটা বছর যেন মুছে [গে]ল। কৈশোর যৌবনের মাঝামাঝি একটা [সম]য় কিছুকাল রাজদিয়ায় কাটিয়ে গিয়ে-[ছি]লেন। তখন সুরমা নিরোগ সুস্থ, [প্র]াণপূর্ণ উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে ঝলমল করতেন। [চঞ্চ]ল্য খুশী পাখিটির মতন সারাদিন [চল]ত তাঁর ছোটাছুটি, ছেলেমানুষের খেলা। [বিশে]ষ করে লারমোরকে কাছে পেলে [আ]দার আর লাফালাফির মাত্রাটা যেত [শ]ত গুণ বেড়ে।

এতদিন পর লারমোরকে দেখে সেই [উজ্জ্ব]ল মনোরম দিনগুলোর ভেতর যেন [ফি]রে গেলেন সুরমা। রাজদিয়ায় এসে বার [বার] নিজের বয়েস ভুলছেন তিনি, অসুস্থ [দু]র্বল শরীরের কথা ভুলছেন, পারিবারিক [দুশ্চি]ন্তার কথা ভুলছেন। আজও সব ভুলে কুড়ি পঁচিশ বছর আগের মতন কিশোরীটি হয়ে উড়তে উড়তে ছুটতে ছুটতে উঠোনে নেমে এলেন। লারমোরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই তো আমি লালু মামা—'

এক মুহূর্ত সুরমার দিকে তাকিয়ে রইলেন লারমোর, তারপরেই নির্মল স্নেহের আলোয় মুখখানা ভরে গেল। সুরমাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে একসঙ্গে কত কথা যে বলে গেলেন। স্নেহলতা শিবানী বা হেমনাথ যা যা বলেছিলেন সেই সব কথা। এতকাল কেন রাজদিয়ায় আসেন নি সুরমা, শরীর কেন এত রোগা হয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লারমোরের বুকের ভেতর থেকে সুরমা একে একে উত্তর দিয়ে গেলেন।

এদিকে ফীটন থেকে সুধা-সুনীতি-বিনু আর অবনীমোহনও নেমে এসেছেন। ইলিশ মাছ হাতে ঝুলিয়ে হেমনাথও নেমেছেন। ওধারের বারান্দা থেকে স্নেহলতা শিবানী পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস খানিক কেটে গেলে বন্দিনী সুরমা লারমোরের বুকের ভেতর থেকে মুক্তি পেলেন। আর তখনই চোখ পাকিয়ে তর্জনী নাচিয়ে স্নেহলতা এগিয়ে এলেন, 'এই যে সাহেব—'

দু পা পিছিয়ে লারমোর ভয়ে ভয়ে শুধোলেন, 'এমন রণরঙ্গিনী মহিষ-মর্দিণী রূপে কেন? আমার বুক কিন্তু কাঁপছে।'

আগের সুরেই স্নেহলতা বললেন, 'ক'দিন পর এ বাড়িতে আসা হল?'

'বোধহয় ছ-সাত দিন।'

'মোটেও না।'

ঢোক গিলে লারমোর বললেন, 'তবে?'

স্নেহলতা বললেন, 'বারো দিন।'

'অত দিন আসি নি!'

'নিশ্চয়ই আমি গুণে রেখেছি।'

গলাটাকে খাদের ভেতর নামিয়ে লারমোর এবার বিড় বিড় করলেন, 'আবার গোণাগুনির কী দরকার ছিল!'

স্নেহলতার চোখ আরো বড় হল, গলা আরো তিন পর্দা চড়ল, 'গুণে রেখে অন্যায় করেছি?'

অসহায়ের মতন এদিক-সেদিক তাকিয়ে লারমোর কোনরকমে বলতে পারলেন, 'না, মানে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই স্নেহলতা ঝলকে উঠলেন, 'কী কথা হয়েছিল শুনি? এবার থেকে এ বাড়িতে খাওয়া হবে! আমি রোজ দুবেলা করে বারো দিনে চব্বিশ বেলা ভাত ফুটিয়ে মরছি আর আসল মানুষের টিকির দেখা নেই।'

লারমোর উত্তর দিলেন না।

স্নেহলতা থামেন নি, একবার অবনী-মোহনকে একবার সুরমাকে একবার সুধা-সুনীতিকে সাক্ষী মেনে সমানে গজ-গজ করতে লাগলেন। তিনি যা বললেন, সংক্ষেপে এই রকম। লারমোরের কেউ নেই, একা-একা রাজদিয়ার আরেক প্রান্তে পড়ে থাকেন। তার ওপর যথেষ্ট বয়েসও হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার ঠিক-ঠিকানা নেই। ও'র গাড়ির বুড়ো কোচোয়ানটা যেদিন চাট্টি ভাত ফুটিয়ে দ্যায় সেদিন খান, নইলে দু দিন হয়ত খেলেনই না। এমন করলে শরীর টেকে? তাই স্নেহলতা ক'দিন আগে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন এবার থেকে তাঁর কাছে দু বেলা খেয়ে যাবেন লারমোর।

কথা দিয়ে ভদ্রলোক সেই যে উধাও হয়েছেন, বারো দিন পর আজ আবার তাঁকে দেখা গেল। কাজেই স্নেহলতার রেগে যাবার যথেষ্ট কারণ আছে।

লারমোর আধবোজা চোখে আঁটা-ঠোঁটে চুপচাপ সব শুনে গেলেন।

স্নেহলতা বললেন, 'তোমাকে যখন একবার পেয়েছি সাহেব, চব্বিশ বেলার ভাত একসঙ্গে খাওয়াব।'

পাশ থেকে শিবানী আস্তে করে বললেন, 'আমি একটা মোটা লাঠি যোগাড় করে রেখেছি বৌদি। খেতে না পারলে—'

স্নেহলতা বাকিটুকু পূরণ করে দিলেন, 'ঐ লাঠিটা দিয়ে আমরা ননদ-ভাজে গলার ভেতর গুঁজে গুঁজে দেব।'

হঠাৎ দু হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে লারমোর বলে উঠলেন, 'তার চাইতে আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হোক মহারাণী।'

স্নেহলতা রাগ করতে গিয়েও এবার হেসে ফেললেন, 'খুব হয়েছে। কত রঙ্গই যে জানো সাহেব!'

সমস্ত ব্যাপারটাই যে নির্মল কৌতুকের খেলা, চারধারে দাঁড়িয়ে বিনুরা বেশ বুঝতে পারছিল। হেমনাথদের সঙ্গে লারমোরের সম্পর্কটা কতখানি মধুর মনোরম এবং প্রীতিপূর্ণ তাও টের পাচ্ছিল। যাই হোক স্নেহলতাকে হাসতে দেখে সবাই হেসে উঠল।

হাসতে হাসতেই স্নেহলতা বললেন, 'নেহাত ভাগ্নী, ভাগ্নীজামাই, নাতি-নাতনীরা কলকাতা থেকে এসেছে তাই ছুটে আসা হয়েছে। নইলে কবে আসত তার কি কিছু ঠিক আছে। সারা দিনে এত রাজকার্য করতে হয় যে দু বেলা দু মুঠো খেয়ে যাবারও ফুরসত হয় না।'

এই সময় পেছন থেকে হেমনাথ বলে উঠলেন, 'রমুদের জন্যেই শুধু না গো গিন্নি, ইলিশের গন্ধে লালমোহন ছুটে এসেছে।' বলে হাতের ইলিশগুলো তুলে দেখালেন।

ইলিশ দেখাতে গিয়ে এমন বিপদ হবে, কে জানত? বেশ আড়ালে আড়ালে ছিলেন হেমনাথ, একেবারে তোপের মুখে পড়ে গেলেন। স্নেহলতার মনোযোগ লারমোরের দিকে থেকে এবার তাঁর ওপর এসে পড়ল। চোখ কুঁচকে স্নেহলতা বললেন, 'এই যে আরেকজন!'

ভীত সুরে হেমনাথ বললেন, 'আমি আবার কী করলাম?'

'সেই সকাল থেকে কোন দিগ্বিজয় করে আসা হল শুনি? এখন কত বেলা হয়েছে হুঁস আছে?'

হেমনাথ ভেবেছিলেন, ইলিশের কথা তুললে লারমোরকে নিয়ে মজাটা আরো জমবে। কিন্তু সেটা পুরোপুরি তাঁর বিরুদ্ধেই গেল। মুখ কাচুমাচু করে বললেন, 'ওদের রাজদিয়া দেখাতে দেখাতে দেরি হয়ে গেল। তা ছাড়া রাসকেলটা—'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে স্নেহলতা গলা চড়ালেন, 'চান নেই খাওয়া নেই, ঘুরে ঘুরে আমার সোনাদের মুখগুলো কালো হয়ে গেছে। এদিকে রমুটাও না খেয়ে বসে আছে—অসুস্থ রোগা মানুষ! বাড়ি থেকে একবার বেরুতে পারলে ফেরার কথা কি তোমার মনে থাকে!'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভরসা হল না হেমনাথের. ইলিশ মাছ নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে রান্নাঘরের দিকে অদৃশ্য হলেন।

স্নেহলতা ঠোঁট টিপে হেসে ফেললেন, 'যাবার রকম দ্যাখো না! সারা দিন চড়ায়-বড়ায় ঘুরে এখন ইলিশ দিয়ে ভোলাতে এসেছে! ভেবেছে ইলিশ দেখলে আমি স্বর্গে চড়ব।' বলতে বলতে লারমোরের দিকে তাকালেন, 'এই যে সাহেব, আর সঙের মতন দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরে আসা হোক। ভালো কথা, আমি কিন্তু এ বেলা ইলিশ রেঁধে খাওয়াতে পারব না।'

লারমোর বললেন. 'বেশ তো, রাত্তিরেই খাব। ও জিনিস যখন চোখে একবার দেখেছি, না খেয়ে যেতে পারব না। শুভস্য শীঘ্রম্...

'ইলিশের নামে জিভ একেবারে সা... হাত।' মধুর ভ্রূভঙ্গে লারমোরকে বিদ্ধ কর... বিনুদের দিকে চোখ ফেরালেন স্নেহলতা। 'এসো দাদারা, এসো অবনী—'

এ বেলার খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে... বেলা হেলে গেল। পশ্চিম আকাশের ঢাল... বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গেছে... রোদের রঙ এখন কাঁচা হলুদের মতন... গাছের পাতাগুলো দিনশেষের আলোর যে... সোনালী ঝালর হয়ে উঠেছে। দুটো পা... ওধারের ঘরের চালে বসে ছিল। হঠাৎ ... হল, একটা পাখি চঞ্চল ডানায় তা... সঙ্গীকে ঘিরে কিছুক্ষণ উড়ে উড়ে মুখো... মুখি বসল, তারপর ঠোঁটে ঠোঁট ঘ... সোহাগ জানাতে লাগল, আদর করতে লাগল। বুঝিবা আশ্বিনের এই বিকেল তাদের যাদু করেছে।

উঠোনের এক ধারে আঁচিয়ে অবনী-মোহনরা পুবের ঘরের ঢালা তক্তপোশে...

সে বসলেন। সবাই এসেছেন শুধু সুরো
মা। অবশ্য স্নেহলতা, শিবানী এবং
রমাও আসেন নি। তাঁদের এখনও
ওয়া হয় নি। হেমনাথদের খাইয়ে এই
বে তাঁরা খেতে বসেছেন।

পুবের ঘরে বসে কিছুক্ষণ সবাই চুপ-
প। তারপর লারমোরই শুরু করলেন।
ক্রমে বিনু আর সুনীতির সঙ্গে চাট্টা-
ট্টা করে অবনীমোহনের সঙ্গে কলকাতার
ল্প জুড়ে দিলেন। হাল্কাভাবে হিটলার,
ওরোপ এবং যুদ্ধের প্রসঙ্গও এল।

বড় বড় পলকহীন চোখে লারমোরের
িকে তাকিয়েই আছে বিনু। এই মানুষটি
ম্বন্ধে তার বিস্ময় আর কাটছে না।
লকাতায় হাজার হাজার সাহেব দেখেছে
স। কিন্তু এদেশের পোশাক, এদেশের
াষা, এদেশের অন্ন এমন নিষ্ঠায় এমন
মতায় গ্রহণ করে এরকম বাঙ্গালী হয়ে
েতে আগে আর কারোকে দ্যাখে নি।

কলকাতার গল্প যুদ্ধের গল্প শেষ
রে লারমোর হেমনাথের দিকে ফিরলেন,
ঝলে ভাই—'

হেমনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন,
কী বলছ?'

'ওষুধ তো ফুরিয়ে গেছে।'

'ফুরিয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ, হেম।' আস্তে করে মাথা নাড়লেন লারমোর।

বালিশে শরীর সঁপে দিয়ে আধ-শোয়ার মতন ছিলেন হেমনাথ। এবার উঠে বললেন, 'কুড়ি দিনও হয় নি, ঢাকা থেকে আড়াই শ টাকার ওষুধ তোমাকে আনিয়ে দিয়েছি, এর ভেতর খতম করে ফেললে।

লারমোর হাসলেন, 'কি করব বল।'

অবাক চোখে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল বিনু, এবার বিমূঢ়ের মতন লারমোরকে দেখতে লাগল। আড়াই শ' টাকার ওষুধ তো একটুখানি ব্যাপার না, লারমোর কি কুড়ি দিনে সব খেয়ে ফেলেছেন। বিনুর একবার ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই অবনীমোহন শুধোলেন, 'এত ওষুধ দিয়ে কী হল?' বিনুর মতন তিনিও বুঝিবা কিছুটা বিমূঢ় হয়েছেন।

হেমনাথ বললেন, 'বিরাট লাভের কার-বার ফেঁদেছে যে লালমোহন।'

লারমোর হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, 'তা যা বলেছ হেম। পনের দিন বিশ দিন পর পর ঢাকা থেকে দেড়শো দুশো টাকার করে ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছ আর চক্ষের পলকে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি। কারবারটা লাভের বৈকি।'

অবনীমোহনের মুখ দেখে মনে হল, কিছুই বুঝতে পারছেন না। তাঁর মনের কথা খানিক আন্দাজ করে হেমনাথ বললেন, 'আমি মুখে আর কতটুকু বলতে পারব! লারমোরকে ক'দিন দ্যাখো, এত ওষুধ দিয়ে ও কী করে নিজেই বুঝতে পারবে।'

অবনীমোহন কি বলতে যাচ্ছিলেন সেই সময় পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে করে সুরমা আর স্নেহলতা এ ঘরে এলেন। শিবানী অবশ্য আসেন নি।

ঘরে পা দিয়েই স্নেহলতা বললেন, 'এ বেলা তো বাচা মাছ, সরপুঁটি মাছ আর পাবদা মাছ খাওয়া হল। ওবেলা কী হবে?'

হেমনাথ বললেন, 'কেন, ইলিশ মাছই তো আছে—'

স্নেহলতা কিছু বলবার আগেই হঠাৎ সুর করে ছড়া কেটে উঠলেন লারমোর:

সরলা পাতে কিছু তিক্ত
 খাও দুই হাতা।
তাহার পর মুগ দাইল (মুগ ডাল)
 সহ ইলিশ মাথা।
সরিষার শাক দিয়া ইলশার ঝাল,
কাঁচা মরিচ ফোড়ন দিয়া ইলশার ঝোল,
এর মধ্যে পাই যদি ভাজা খান চার,
স্বর্গ তো থাকে না রাম্না বেশি
 দূরে তার।
শাস্ত্রমতে রাইন্ধো (রেঁধো) ইলিশ
 অন্যথা না হয়।
অন্যথা করিবে যে আমার
 মাথা খায়।

চোখ এবং ঠোঁট কুঁচকে শুনে গেলেন স্নেহলতা। তারপর বললেন, 'আজকাল বুঝি খুব মঙ্গলকাব্য পড়া হচ্ছে!'

ঘাড় কাত করলেন লারমোর, 'হ্যাঁ, খুব ভাল জিনিস।'

'কী ভাল?' চোখের তারা তীক্ষ্ন করে স্নেহলতা জিজ্ঞেস করলেন, 'সারা মঙ্গল-কাব্য, না ভেতর থেকে বেছে এই ইলিশ মাছের জায়গাটা?'

এক গাল হেসে লারমোর বললেন, 'ইলিশ মাছের জায়গাটা। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এমন বস্তু আর সৃষ্টি হয় নি।'

সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে স্নেহলতা বললেন, 'একটি মেছো বেড়াল।'

লারমোর কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বিনুর চোখ জানলার বাইরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল সে। দূরে বাগানের ভেতর ডালপালাওলা ঝুপসি মতন কী যেন টেনে টেনে আনছে যুগল।

আজ এই প্রথম যুগলকে দেখল বিনু। সকালবেলা হেমনাথের সঙ্গে রাজদিয়া দেখতে বেরিয়েছিল তারা। মনোরম নদীতীর, স্টিমারঘাটা, মাঝিঘাটা, আশ্বিনের যাদুকর নীলাকাশ, ইলিশ মাছের আড়ত, রামকেশব, রুমা-ঝুমা—নানা দৃশ্য, বিভিন্ন মানুষ, বিচিত্র সব ঘটনা বিনুকে এত মুগ্ধ এবং বিস্মিত করে রেখেছিল যে যুগলের কথা একবারও তার মনে পড়ে নি। অথচ রাজ-দিয়াতে এসে যাকে সব চাইতে তার ভাল লেগেছে, বিস্ময়কর মনে হয়েছে, সে যুগল।

জানলার বাইরে থেকে চোখ দুটো এবার ভেতরে নিয়ে এল বিনু, একবার লারমোরকে দেখে নিল। এই মানুষটিও তার কাছে কম বিস্ময়কর না। যুগল এবং লারমোর—দুধারের দুই বিস্ময়ের টানা-টানিতে শেষ পর্যন্ত যুগলই জিতল। পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে এসে এক ছুটে বিনু বাগানে এসে হাজির।

দূরে থেকে ঝুপসি জঙ্গল মতন মনে হয়েছিল। কাছে এসে বিনু দেখতে পেল, সরু সরু লম্বা পাতা আর কাঁটা ভর্তি মোটা মোটা অসংখ্য লতা। রুপোর মতন চকচকে ধারাল দা দিয়ে ক্ষিপ্র হাতে পাতাটাতা ছেঁটে যুগল লতাগুলো একধারে সাজিয়ে রাখছিল। বিনুকে দেখে মুখ ভরে হাসল সে, এই যে ছুটোবাবু, সকাল থিকা আপনের দেখা নাই। কতবার যে খোঁজ করছি।'

বিনু বলল, 'আমরা দাদুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম।'

'সে তো জানিই, আপনেরা রাইজদা (রাজদিয়া) দেখতে গেছিলেন। তা অ্যাত দেরি করলেন ক্যান?'

দেরি হবার কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিল বিনু।

যুগল শুধলো, 'আমাগো রাইজদা কেমুন দেখলেন ছুটোবাবু?' বলে এমন-ভাবে তাকাল যেন বিনুর 'ভাল-মন্দ' বলার ওপর তার বাঁচামরা নির্ভর করছে।

'বড় ছোট।' অন্যমনস্কের মতন উত্তর দিয়ে কাটালতাগুলো দেখিয়ে বিন্দু বলল, 'এগুলো কী?'

'ব্যাত (বেত), ব্যাতের লতা।'

'কী হবে এগুলো দিয়ে?'

রহস্যময় হেসে যুগল বলল, 'হইব একটা জিনিস। এট্টু থাড়ন (দাঁড়ান), নিজের চোখেই দেখতে পাইবেন।'

বিন্দু উত্তর দিল না।

যুগল আবার বলল, 'বেথুন খাইছেন ছুটোবাবু?'

'বেথুন' শব্দটা জীবনে এই প্রথম শুনল বিন্দু। অবাক হয়ে সে বলল, 'বেথুন কী?'

'ব্যাতের (বেতের) ফল।'

'বেতফল আবার খায় নাকি?'

'খায় খায় ছুটোবাবু। এমুন বস্তু না খাইলে জীবন এক্কেরে (একেবারে) বিথা (বৃথা)।' বলে চোখ বুজে মুখের ভেতর যেন বেতফলের স্বাদ নিতে লাগল যুগল।

বেতফল কখনও খায় নি বিন্দু, ওটা না খেলে জীবন বৃথা হয়ে যায় কিনা এই মুহূর্তে বুঝতে পারল না সে। আস্তে করে শুধু বলল, 'কেমন লাগে খেতে?'

'নিজের মুখে আর কী কমু (বলব) ছুটোবাবু, চাত্তির মাসে ব্যাতফল পাকব। তখন খাইয়া দেখবেন।'

বিন্দু বুঝল যুগলের কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে হলে চৈত্র মাস পর্যন্ত তাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। এখন সবে আশ্বিন।

দেখতে দেখতে সবগুলো বেতের লতা থেকে পাতাটাতা ছেঁটে ফেলল যুগল। লতাগুলোর গায়ে অবশ্য চোখা চোখা ধারাল কাঁটা থেকেই গেল, সেগুলো আর চাঁছল না। পাতা ছাঁটা হলে কাঁটাসুদ্ধ একেকটা বেত নিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে এক ধরনের বিচিত্র গোল ঠোঙা তৈরি করতে লাগল যুগল। ঠোঙাগুলোর একটা দিক খুব সরু; তারপর বেতের পাক ক্রমশ বড় হয়ে হয়ে মুখের কাছটা মস্ত হয়ে উঠেছে। মুখটার ব্যাস প্রায় এক হাতের মতন।

পঁচিশ তিরিশটা ঠোঙা তৈরি হলে প্রতিটার সরু দিকে একটা করে লম্বা দড়ি বাঁধতে লাগল যুগল।

চুপচাপ বিন্দু দেখে যাচ্ছিল। দড়ি বাঁধা যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় কোথা থেকে যেন চঞ্চল পায়ে সুধা এসে হাজির। অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'এগুলো কী?'

যুগল বলল, 'ফান্দ (ফাঁদ)।'

'কী হবে এসব দিয়ে?'

বিন্দুকে যেভাবে বলেছিল তেমনি রহস্যের সুরে হেসে হেসে যুগল সুধাকে বলল, 'অখন কমু (বলব) না।'

সুধা ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'বললে কী হবে?'

'আগে থিকা কইলে গুণ নষ্ট হইয়া যাইব।'

সুধার চোখমুখ বিরক্ত, কিছুটা বা ক্ষিপ্ত দেখাল। আর কিছু বলল না সে।

দড়ি বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। যুগল বলল, 'আসেন ছুটোবাবু, আসেন ছুটো-দিদি, ফান্দগুলির (ফাঁদগুলোর) ব্যবস্থা কইরা আসি।'

সুধা আর বিন্দুকে নিয়ে পুকুর পাড়ে চলে এল যুগল। তারপর বেতের ফাঁদগুলো জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল। লম্বা দড়ির এক দিক দিয়ে ফাঁদ-গুলো বাঁধা, দড়ির অন্য প্রান্তগুলো চার-দিকের গাছপালার সঙ্গে বেঁধে রাখল যুগল।

বিন্দু বলল, 'ওগুলো জলে ফেললে যে?'

যুগল বলল, 'সাতটা দিন সবুর করেন ছুটোবাবু, তারপরে বুঝতে পারিবেন ক্যান ফালাইছি (ফেলেছি)।'

ফাঁদ-টাদ ফেলা হয়ে গেলে সুধা বিন্দু যুগল কথা বলতে বলতে আবার বাগানে ফিরে এল। আর তখনই দেখা গেল রাস্তার দিক থেকে মস্ত একটা বাক্স হাতে ঝুলিয়ে হিরণ আসছে। বিন্দুরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাছাকাছি এসে একমুখ হাসল হিরণ। সুধার চোখে চোখ রেখে খুব খুশী গলায় বলল, 'আরে আপনি! বাগানে কী করছেন?'

কেমন করে যেন হাসল সুধা। রাজ-হাঁসের মতন গলাটা ঈষৎ বাঁকিয়ে বলল, 'আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।'

'আমার জন্যে!'

'হ্যাঁ স্যার—'

'আমি এখন আসব, আপনি জানতেন?'

স্বরে দীর্ঘ টান দিয়ে সুধা বলল 'হুঁ—'

হিরণ বলল, 'কেমন করে জানলেন?'

'হাত গুনে—'

হিরণ আর কিছু বলল না, উজ্জ্বল হাস্যময় চোখে তাকিয়ে রইল।

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর হিরণের হাতের বাক্সটা দেখিয়ে সুধা বলল, 'ওটা কী?'

'গ্রামোফোন, আপনাদের জন্যে নিয়ে এলাম।'

পাশ থেকে যুগল বলে উঠল, 'গ্রামা ফোন কী হিরু দাদা?'

হিরণ বলল, 'কলের গান।'

যুগল এবার প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'গান শুনুম, গান শুনুম—'

সুধা হিরণকে বলল, 'বাগানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, ঘরে গিয়ে গান শোনা যাক।'

'চলুন—'

চারজনে বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল। সুধা আর হিরণ আগে আগে, যুগল বিন্দু পেছনে।

যেতে যেতে হিরণের সঙ্গে খুব কথা বলতে লাগল সুধা আর হাসতে লাগল। এমনিতেই প্রচুর কথা বলে সে, দিন-রাতই বকবকায়মান। কিন্তু এখনকার প্রগলভতার যেন তুলনা নেই।

পেছন থেকে আড়ে আড়ে বিন্দু দেখতে লাগল, ছোটদির চোখে-মুখে হাসি নাচছে আর কি এক অলৌকিক আলো খেলে যাচ্ছে। সুধার মুখে এমন হাসির ছটা আলোর খেলা আগে আর কখনও দ্যাখে নি বিন্দু।

(ক্রমশঃ)
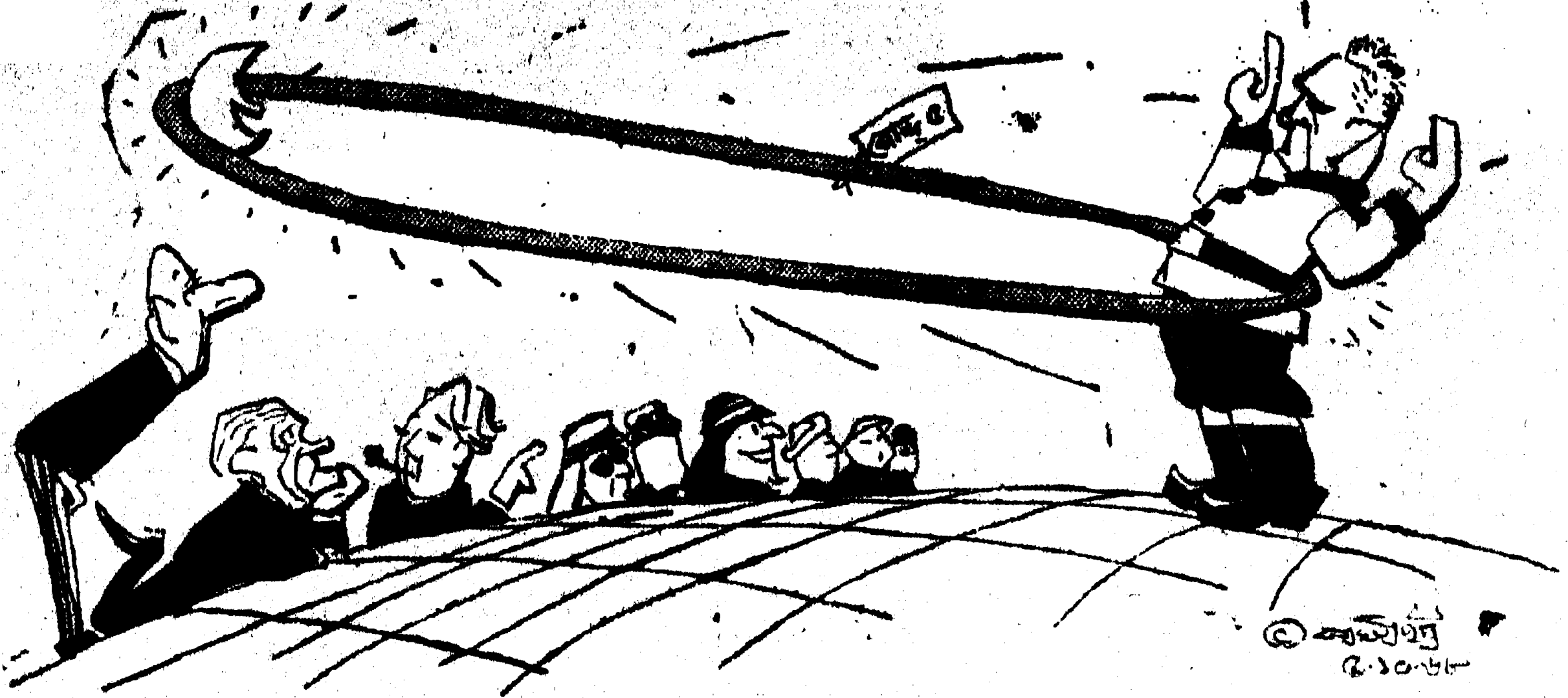
দেশে বিদেশে

মন্ত্রিসভার আয়তন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আয়তন কি হবে এই নিয়ে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্কের সূত্র হ'ল দলত্যাগের সমস্যা সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর কমিটি নয়াদিল্লীতে তাঁদের চূড়ান্ত বৈঠকে মিলিত হয়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, রাজ্যে ও কেন্দ্রে মন্ত্রিসভার আয়তন বেঁধে দেওয়া উচিত এবং এর জন্যে সংবিধান সংশোধন করা উচিত।

কমিটির সুপারিশ হ'ল: যে রাজ্যে বিধানসভা ও পরিষদ আছে, সেই সব রাজ্যের মন্ত্রিসভার আয়তন বিধানসভার সদস্য সংখ্যার ১১ শতাংশের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যে রাজ্যে কেবলমাত্র বিধানসভা আছে সেই রাজ্যে আয়তন হবে সদস্য সংখ্যার দশ শতাংশ। তবে এটা দেখতে হবে যে, কোনো অবস্থাতেই মন্ত্রির সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সংখ্যা ছাড়িয়ে না যায়।

এই সর্বোচ্চ সংখ্যা কি হবে কমিটি সে সম্পর্কে একমত হ'তে পারেন নি। কোনো কোনো সদস্য মনে করেন এই সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কমিটির অকংগ্রেসী সদস্যদের একটা বিরাট অংশ স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাজ্য মন্ত্রিসভাগুলির জন্যে যে আয়তনের সুপারিশ করা হয়েছে তা যদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় তাহলে তাঁরা আপত্তি জানিয়ে নোট দেবেন। এই সদস্যরা চান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আয়তন পঞ্চাশজন সদস্যে সীমাবদ্ধ করা হোক, লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের এগারো শতাংশে নয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন পঞ্চাশজন সদস্যের ঊর্ধ্বরেখা মাপতে রাজী নন। রাজ্যগুলির জন্যে কমিটি যে ফরমূলা সুপারিশ করেছেন, সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আকার হয় ৫৭। বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আয়তনও প্রায় তাই। শ্রীচ্যবন বলেন, মন্ত্রিসভা গঠনের সময় অনেক "বাস্তব বিবেচনা" দরকার হয়, কাজেই ঊর্ধ্বসীমা পঞ্চাশে বেঁধে না দেওয়াই ভালো।

শ্রীচ্যবনের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, কমিটির এই সুপারিশ কেন্দ্রে মেনে নেবার সহজ সম্ভাবনা নেই। কারণ শাসক দল মন্ত্রিসভাকে দাক্ষিণ্য বিতরণের একটা মাধ্যম হিসেবেই দেখে থাকেন, দক্ষতার সংগে দেশ শাসনের উপায় হিসেবে নয়। মন্ত্রিত্ব দিয়ে তাঁরা বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চান। শ্রীচ্যবন একেই নিঃসন্দেহে "বাস্তব বিবেচনা" বলে অভিহিত করেছেন।

এই মনোভাব যতদিন থাকবে ততদিন এই বিষয় সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার বিশেষ আশা নেই। আর যদি শেষ পর্যন্ত একটা সীমারেখা বেঁধে দেওয়া সম্ভব হয়ও তবু দলত্যাগ সংক্রান্ত কমিটির আশা তার দ্বারা পূরণ হবে না, অর্থাৎ দলত্যাগের হিড়িক রোধ করা যাবে না। কারণ আয়তন সীমাবদ্ধ হলেও একজন মন্ত্রীকে বসিয়ে দিয়ে সে জায়গায় একজন দলত্যাগীকে নিতে অসুবিধা কোথায়? নয়ত, দলত্যাগের ফলে কোনো মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে দলত্যাগীদের নিয়ে নতুন করে সীমাবদ্ধ আয়তনের মন্ত্রিসভা গঠন করতে বাধা কোথায়

সুতরাং দলত্যাগের সমস্যার যদি সমাধান করতে হয় তাহলে কেবল মন্ত্রিসভার আয়তন বেঁধে দিলেই হবে না।

এবং রাজা নরেশচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রীর গদীতে বসবেন। পরিবর্তে রাজা নরেশচন্দ্রের উদ্যোগে যে নতুন সরকার গঠিত হবে তার পরিকল্পনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন গোবিন্দনারায়ণ।

সারনগড়ের রাজাকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেবার জন্যে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণও করা হচ্ছে। দুজন নতুন মন্ত্রী নেবার কথা হয়েছে, তার মধ্যে একজন হলেন সারনগড়ের রাজা।

এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিং বলেছেন, "রাজা নরেশচন্দ্রের কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজার সঙ্গে যখন এ বিষয়ে আমি আলোচনা করছিলাম তখন রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়া উপস্থিত ছিলেন।"

রাজমাতা শ্রীমতী সিন্ধিয়া বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রী যদি কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা আমাদের সকলের প্রতিশ্রুতি বলে মনে করতে হবে।"

কিন্তু গোলমাল বেধেছে সংযুক্ত বিধায়ক দলের অন্যান্য শরিক দলকে নিয়ে। এই সকল দল, বিশেষ করে জনসংঘ—যে দল এস ভি ডির বৃহত্তম শরিক—মুখ্যমন্ত্রীর এই পরিবর্তন ভালো চোখে দেখছেন না। তাঁরা মনে করেন এর দ্বারা কংগ্রেসের যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবসানের পথই প্রশস্ত হচ্ছে। সারনগড়ের রাজার কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র মন্তব্য করেছেন, "এস ভি ডি দলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পৌরোহিত্য করার জন্যেই সারনগড়ের রাজা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।" এদিকে মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দনারায়ণের সঙ্গেও কংগ্রেসী নেতাদের প্রায়ই মহরম-মহড়া চলছে। এই দুইয়ে মিলে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

বৈদেশিক ঋণের সংকট

ওয়াশিংটনে বিশ্ব ব্যাঙ্কের বার্ষিক বৈঠক হচ্ছে। উন্নয়নকামী দেশগুলির উন্নয়নে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাদের ঋণ দেওয়া এই ব্যাঙ্কের এবং তার সহযোগী "আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা"-র কাজ। কয়েকটি কারণে সম্প্রতি ব্যাঙ্কের এই কাজে গুরুতর ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে এবং বৈদেশিক ঋণ উন্নয়নকামী দেশগুলির পক্ষে সহায়ক না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের বার্ষিক বৈঠক উপলক্ষে বৈদেশিক ঋণের এই সংকটের প্রসঙ্গটি নতুন করে আলোচিত হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী) উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাঙ্কের তহবিলে টান পড়ায় তাদের কর্জ দেওয়ার ক্ষমতা কমে গেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহযোগী "আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা" বা আই-ডি-ও অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে ও দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে। ফলে উন্নতিকামী দেশগুলির পক্ষে আই-ডি-ও থেকে ঋণ নেওয়া সুবিধাজনক। কিন্তু আই-ডি-ও'র তহবিল প্রায় ১৫ মাস আগে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ঐ তহবিলে নতুন করে চাঁদা দেওয়ার জন্য বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দুনিয়ার মহাজনস্থানীয় দেশগুলির প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া পাওয়া যায় নি।

পৃথিবীর যেসব দেশের অন্য দেশকে কর্জ দেওয়ার ক্ষমতা তারা বিশ্ব ব্যাঙ্কের তহবিলেও বিশেষ করে আই-ডি-ও'র তহবিলে চাঁদা দিতে আগ্রহী না হওয়ায় এই সংস্থাগুলির ঋণ দেওয়ায় ভাঁটা পড়েছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি মোট ১২৩ কোটি ১০ লক্ষ ডলার সাহায্য দিয়েছে সে-জায়গায় পরের বছর তাদের সাহায্যের পরিমাণ কমে মাত্র ৯৫ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সামনে এখন বৈদেশিক বিনিময়ে ঘাটতির যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তাতে এরকম আশা করা কঠিন যে, অদূর ভবিষ্যতে তারা অন্য দেশকে সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার তহবিলে চাঁদা দিতে আগ্রহী হবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের খরচ চালাবার সমস্যায় বিব্রত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার বৈদেশিক সাহায্যের কর্মসূচী সঙ্কুচিত করেছে। অন্যান্য উন্নত দেশও হাত গুটিয়ে নিচ্ছে।

ইতিমধ্যে বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ শোধ করার দায় ক্রমেই বেশী করে খাতক দেশগুলির উপর চাপছে। ভারতবর্ষকে এই বছর ৪৪৩ কোটি টাকা বিদেশী দেনা শোধ করতে হবে। তার মধ্যে ১৪৯ কোটি টাকাই গুণে দিতে হবে সুদ বাবদ। আগামী দুই বছরে তার পরিশোধ্য অংকের পরিমাণ বেড়ে বেড়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৫৪৪ কোটি টাকা ও ৬২৬ কোটি টাকা। আর্জেন্টিনাকে আগামী ৫ বছরে তার বৈদেশিক ঋণের তিন চতুর্থাংশ শোধ করতে হবে।

উন্নয়নকামী দেশগুলির উপর ঋণ শোধের দায় যে অনুপাতে বাড়ছে সেই অনুপাতে যদি তাদের রপ্তানী আয় বাড়ত তাহলে সমস্যাটা কতকটা সহজ হত। কেন না, তাহলে রপ্তানীর ক্রমবর্ধমান আয় থেকেই খাতক দেশগুলি তাদের দেনার দায় মিটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু, তা হয় নি। ফলে উন্নয়নকামী দেশগুলির রপ্তানী আয়ের ক্রমবর্ধমান অংশ খরচ হয়ে যাচ্ছে দেনার দায় মেটাতে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বৈদেশিক দেনার দায় মেটাতে ভারতবর্ষকে যেখানে ১৯৬১ সালে তার রপ্তানী বাণিজ্যের আয়ের ১৫ শতাংশ ব্যয় করতে হয়েছিল সেখানে ১৯৬৭ সালে এই অনুপাত ২৮ শতাংশে উঠেছিল।

মহাজনস্থানীয় দেশগুলির ঋণদানের নীতিই এমন যে, তাতে গ্রহীতা দেশগুলির রপ্তানী বাড়তে পারে না। খাতক দেশগুলি যে কর্জ পায় সেই কর্জের টাকা তারা ঋণদাতা দেশগুলিতে ব্যয় করতে বাধ্য থাকে অথচ তাদের যখন কর্জ শোধ দিতে হয় তখন সেটা শোধ দিতে হয় বিনিময়-যোগ্য মুদ্রায়। এই সর্তের মধ্য দিয়ে ঋণদাতা দেশগুলি একদিকে অপেক্ষাকৃত চড়া দরে তাদের শিল্পজাত পণ্য বিক্রী করার ও অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা দেশগুলি থেকে কম দামে কৃষিজাত কাঁচামাল কিনবার সুযোগ পায়। এই দু তরফা বঞ্চনার ফলে উন্নয়নকামী দেশগুলির রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়তে পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

উন্নয়নকামী দেশগুলিকে বঞ্চনা করার আর একটি ফন্দী হল "প্রকল্পের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা কর্জ।" কথাটার মানে হল উন্নয়নকামী দেশগুলি কোন বিশেষ উন্নয়নের পরিকল্পনা করলে (যেমন কোন কারখানা স্থাপন করলে) সেই পরিকল্পনার জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে শুধু সেটুকুই সাহায্য দেওয়া। এ যাবৎ দেখা গেছে, ঋণদাতা দেশগুলি এই ধরনের কর্জ দিতেই অধিকতর আগ্রহী, কল-কারখানা চালু রাখার জন্য যে কাঁচামাল দরকার হয় প্রয়োজন অনুযায়ী সেসব কাঁচা-মাল বিদেশ থেকে আমদানি করার জন্য সাহায্য দিতে এই সব দেশ ততটা উৎসুক নয়। প্রকল্পের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা কর্জে ঋণদাতা দেশগুলির সুবিধা এই যে, এই কর্জের মারফৎ তারা খাতক দেশগুলির কাছে নিজেদের যন্ত্রপাতি বিক্রী করার সুযোগ পায়। অপর পক্ষে, গাঁটছড়াহীন কর্জে মহাজন দেশগুলির অসুবিধা এই যে, এই সব কাঁচামালের অনেকগুলির সূত্রই তাদের সীমানার বাইরে।

ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বিশ্ব ব্যাঙ্কের বার্ষিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, "শুধু যন্ত্রপাতি কেনার জন্যই যদি সাহায্য পাওয়া যায়, তামা বা রবার বা সালফার অথবা রক ফসফেট কেনার জন্য যদি সাহায্য পাওয়া না যায় তাহলে উন্নয়নকামী দেশগুলির রপ্তানী বাণিজ্যের স্বার্থ অনিবার্যভাবেই ব্যাহত হয়।"

বন্যা

[উপন্যাস]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

[illegible]

[লীলা বড়ো জেদী, স্বাধীন ও সুন্দরী। ওকে [illegible]। [illegible] তাকে নিয়ে হয়তো লীলা সুখী ছিল না। এমন সময় এল [illegible]। [illegible] জুয়া আর মদ অন্যতম সঙ্গী তার।

সত্যর সংসারে ঝড় ওঠে।

মুগপুর ছাড়ল সত্যচরণ। এল রাণীচক। ঘরে যমুনাও এল। [illegible]। [illegible] এল লীলার কাছে। ঘনিষ্ঠ হল। সুখেনের প্রেস কিনল লীলা।

সময় ঘুরল। ডিভোর্স হল সত্য আর লীলার।

যমুনাকে ঘিরে সত্য স্বপ্ন দেখল। যমুনা অন্তঃসত্ত্বা। সত্য বাধা পেল [illegible] দিদির কাছ থেকেই। ভয়ংকর যন্ত্রণা।

লীলাও মুগপুর ছাড়ল। এল শহরে। সুখেন ভাবে লীলা কি শুধু তাকে নিয়ে খেলাই করবে? ঘর বাঁধবে না?

সত্য কিন্তু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত।

এত রাতে সে যমুনার মুখোমুখি। সত্য জানতে চাইল, এভাবে আর কতদিন রক্ষিতার মতো রাখবে তাকে? সে কি বিয়ে করবে না?

ওদিকেও জল ঘোলা হল। সুখেনের হালচালে লীলা চিন্তিত। বিয়ের দিন ধার্য করতে বলল সুখেনকে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩২)

শত্রুর, শত্রুর সব! ঝাড়াভাতে ছাই দিয়ে বেড়ানো ওদের অভ্যেস! ওরা কারুর ভালো দেখতে পারে না। নিজের জীবনে বুদ্ধির দোষে কষ্ট পেয়েছে—সে কষ্ট অন্যের জীবনে ওরা দেখতে চায়। এত হিংসুটে আর স্বার্থপর এই মেয়েগুলো। তখন ওকে পাত্তা দেওয়াই ভুল হয়েছে আমার। কেন যে ছাই এদের সঙ্গে মিশতে গিয়েছিলাম! আয়নার সামনে বসে নিজের প্রতিমূর্তিকে বলছিল লীলা। সে সাজ-গোজ করছিল। এত মারাত্মক সাজবে যে কনকদের মুন্ডু ঘুরে যাবে। এমনকি ওর সামনেই সুখেনের হাত ধরে বেড়াতে বেরোবে। ডাইকরা খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে, দুহাত খোঁপার কাছে রেখে, বার-বার ঘুরেফিরে নিজের বুক আর কোমরের কাছটা দেখছিল সে। ইস্, এমন সুন্দর স্বাস্থ্য থাকলে ওরা কী করত, লীলা ভেবে পায় না।

রাত্রে সুখেন আর আসেনি। পরদিনও বিকেলঅব্দি তার পাত্তা নেই। তখন প্রেসে ঘন্টাকে পাঠিয়ে লীলা সাজতে বসেছিল। ইচ্ছে ছিল, ব্রততীদের সঙ্গে কনক আসে ভালো; তা নাহলে কনকদের ওখান হয়েই সে সুখেনকে নিয়ে যাবে। কনককে একবার ডাকবে। সুখেন কী করে তখন, দেখা যাবে। এবং লীলা সেই সম্ভবপর সংক্ষাৎ কল্পনা করে খুব হাসছিল।

কিন্তু ঠিক এই সুখেন তো? যদি তা না হয়!

সুখেন এলেই সোজাসুজি প্রশ্ন করবে বরং। কনককে তুমি চেনো?

কোন কনক?

বারে, কাল বিকেলে ওই কোণে যে মেয়েটি বসেছিল, ময়লা রঙ রোগামত মেয়ে?

কই, না তো! (এছাড়া কী বলবে সুখেন—দোষী হলেও এ জবাব তাকে দিতেই হবে।)

চালাকি করো না।......এবং কনকের কাছে শোনা সুখেনের পূর্ব ইতিহাস শুনিয়ে দেবে লীলা।

সে আমি নই। অন্য কেউ হবে। সুখেন দৃঢ়কন্ঠে বলবে।

তখন লীলা অক্লেশে বলবে, হলেও ক্ষতি নেই। আমি ভয় করিনে তোমাকে। ভারি তো একরত্তি মানুষ! সুখেন হাসবে। ওর সেই আশ্চর্য সরল হাসি—শিশুর হাসির মত।

লীলা তুলে রাখা অলংকারগুলো দেখছিল। সিঁথি শূন্য থাকতে মানায় না। আর কয়েকটা দিন মাত্র, তারপর যেন সারা শহরে আগুন ধরিয়ে দেবে, এমন প্রচন্ড ধারণা নিয়ে সে দেহের যেখানে যেটি পরতে হয়, অলংকারগুলো ধরে রাখছিল। দেখ-ছিল। রেখে দিচ্ছিল।

তারপর হয়ত জেদে, হয়ত অন্যমনস্ক-তায়, কখন সিঁদুর কৌটো খুলে, চিরুনীর ডগায় অভ্যাসমত সিঁদুর নিয়ে, সিঁথির কাছে চলে গেছে তার অসাবধানী হাত।

সেইসময় স্বয়ং শত্রুর এসে হাজির।

অন্য কেউ হলে অপ্রস্তুত হেসে হাত নামিয়ে নিত লীলা। সব লুকিয়ে ফেলত ক্ষিপ্রহাতে। বলত, এস ভাই, বস। কিন্তু কনক!

কনককে নির্লজ্জ লাগছিল লীলার। তার উপস্থিতি—তার অস্তিত্ব—যেন একটা ভিখারিণীর মত; চোখের দৃষ্টিতে বড় লোভ যেন। ড্রেসিং টেবিলে স্তূপাকৃতি অলংকার, প্রসাধনের কৌটো, সোফার উপর উজ্জ্বল রঙীন কয়েকটা শাড়ি আর ব্লাউস, —আর টেবিলের প্রান্তে আজই রেখেছে সুখেনের ফোটোগ্রাফটা—সুখেনের ঘরের দেয়াল থেকে যেটা কেড়ে নিয়ে এসেছিল সে। সবকিছুর ওপর যেন কনকের লোভার্ত দৃষ্টি পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি বলেছ, জীবনের মানে নেই। বলেছ, ঘর-সংসার চাও না, চাও না ছেলেপুলের মা হতে, চাও না পুরুষকে অন্ধভাবে ভাল-বাসতে। অথচ আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছ। ও তোমার মনের কথা নয়। মুখের কথা।...

কনক বলল, যাবার আগে দেখা করতে এলাম।

লীলা জিনিষপত্র গোছানোর ভান করছিল। জবাব দিল, আজই?

হ্যাঁ। আর...কনক একটু চুপ করে থেকে বলল, আর, কাল ঝোঁকের মাথায় কীসব বলেছি, হয়ত মনে কষ্ট পেয়েছেন। সেজন্যে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

লীলা বিজয়িনীর মত হাসল।...ক্ষমা কিসের? আমি কিছুই মনে করিনি আপনার কথায়।

কনক বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আপনার মনের জোর আছে ভাই।

লীলা জবাব দিল না। জানালার দিকে তাকাল। ঘন্টা এখনও আসছে না কেন? সুখেনই বা কোথায়? সুযোগ হাতের নাগালে এসে গেছে। এখন সুখেন এসে পড়লেই কনককে যা জব্দ করা যেত। কনককে অপমান করার জন্যে তার মন ছট-ফট করছিল।

লীলা বলল, ঠিক সময়েই এসেছিলেন কনকদি। কদিন থেকে গেলে ভালো করতেন। দেখতেন, আপনাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছিল কে, সেই ভয়ংকর লোকটা এখন আমার ভয়ে অস্থির। আমিই না কোনদিন বিষ খাইয়ে মেরে ফেলি ওকে!

কনক তাকিয়েছিল তাকাল ওর দিকে।...আমাকে ঠাট্টা করছেন আপনি। ভাবছেন, সব বানিয়ে বলেছি!

লীলা হাসল। ওতে কিছু আসে যায় না আমার—সত্য হোক বা মিথ্যে হোক। আর কনকদি, শোধ নিতে দিন না আপনার হয়ে! ওকে শিক্ষা আপনি দিতে পারেন নি, আমাকে দিতে দিন।

নিষেধ করছিনে ভাই। কনক মুখ নামাল।

দাঁড়িয়ে কেন? বসুন। লীলা সোফার উপর থেকে কাপড়চোপড়গুলো সরিয়ে ওর বসবার জায়গা করে দিল।

না, চলি। কনক বসল না।

আজই যাবেন? আপনার ঠিকানাটা রেখে যান। লীলা কলম আর প্যাডটা এগিয়ে দিল।

সে বৌদির কাছে পাবেন, রক্তভীরাও জানে।

বুঝেছি, আমাকে ঠিকানা দিলে কিছু ক্ষতি হবে।

হতে পারে। তবে সে আমার নয়, আপনার।

আপনাদের সুখের সংসারে আমার স্মৃতি না থাকাই ভালো, ভাই লীলা।

এবার আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন কিন্তু।

ঠাট্টা ভাবলে আপনিও ক্ষমা করবেন।

ঘন্টা এল হন্তদন্ত হয়ে। জানাল, দাদাবাবু পেরেসে নাই। কাল থেকে যান নি ওখানে। কোথায় গেছেন, কেউ বলতে পারল না। লীলা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একথা শুনে।

কনক এবার জোরে হেসে উঠল। দেখলেন? আমি এখানে এসেছি আবার, কাল স্বচক্ষে দেখে গেছে। তাছাড়া একটা সুন্দর দাঁও পাবার মুখে এ অঘটন। ওর দেখা আর জীবনে পাবেন কিনা সন্দেহ। আচ্ছা চলি!

লীলা হঠাৎ জ্বলে উঠল। তীব্রস্বরে বলল, ওকে অপমান করার অধিকার আর আপনার নেই কনকদি!

পর্দা তুলে এক পা বাইরে এক পা ঘরে, কনক মুখ ফিরিয়ে বলল, অধিকার আছে। বলব না ভেবেছিলাম, কিন্তু বলে যাওয়াই ভালো। সুখেন এখনও আইনতঃ আমার স্বামী।

লীলার সামনে একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেছে যেন। গায়ে আঘাত লাগলে যেমন হিংস্র জানোয়ার মুহূর্তে দাঁত নখ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে কনককে টুকরো-টুকরো করার ইচ্ছায় সে পা বাড়াতে যাচ্ছিল। পর্দা তুলেছিল। পরক্ষণেই তেমনি হঠাৎ তার সারা শরীর অবশ হয়ে এল।

ওখানে ঘন্টা দাসিনীকে হাত মুখ নেড়ে ফিসফিস করে বোঝাচ্ছে, দিদিমনির সঙ্গে ওই মেয়েটার জোর ঝগড়া লেগেছে। দাসিনীর হাঁ-করা লাল মুখ থেকে লাল লালা গড়িয়ে পড়ছে দেখে ঘন্টা খ্যাঁকেঁকিয়ে পানখাকি বলে নিয়ে হল। আর দাসিনীও অভ্যাসমত পানটা গাল দিল, খান্ লোভাল-খেয়ো!

(৩৩)

বৃষ্টি না এলে আর বসে থাকত না রমা। কিন্তু বৃষ্টি থামল একেবারে সাতটার কাছাকাছি। আজও সুখেনের পাত্তা নেই। একটা জরুরী অর্ডার নিয়ে এসেছে সে। পঞ্চায়েতের ব্যাপারে একগাদা ফরম আর খাতাপত্র। খুব তাড়াতাড়ি ডেলিভারী দিতে হবে। অথচ সেই পাঁচটা থেকে বসে থেকেও সুখেন এল না। খগেন বলে গেছে প্রেসে ঢুকেছেন যখন, প্রুফ দেখাটাও শিখে নিন দিদিমনি। ওই অভিধান বইতে আছে। আর বাবুর টেবিলেও দেখুন, কিছু দেখা প্রুফ রয়েছে। খুব সহজ। রমা বসে থেকে ততক্ষণ প্রুফ দেখা শিখছিল।

দেয়াল ঘড়িতে সাতটা বাজলে সে হাই তুলে তাকাল। ওদিকে বৃষ্টিও থেমেছে। সে উঠতে যাচ্ছিল। খগেন ফের এসে বলল, এই মেসিন প্রুফটাই চোখ বুলিয়ে দিন তো দিদি। ভুলটুল আছে নাকি......

রমা হাতে নিয়ে দেখল, বিয়ের পদ্য। পাত্রের নাম সুখেন্দুচন্দ্র রায়, পাত্রী লীলা-রাণী ঘোষ......সারবন্ধ প্রজাপতি, দুজন অপ্সরা মালা হাতে, বন্ধুদের সম্ভাষণ......আরে! নামগুলো সব চেনা যে! কপি দেখে রমা জানল, রচনা অহীনের। তারই হাতের লেখা। রমা ফিক করে হেসে বলল, সুখেনদার বিয়ে!

খগেন উঁকি মেরে দেখছিল। সেও এক গাল হেসে বলল, সেজন্যেই তো আপনাকে দেখতে দিলাম!

কানাই পিছন থেকে হঠাৎ ছোঁ মেরে টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলে নিয়ে গেল। রমা অবাক। কানাই যেতে যেতে দাঁত কিড়মিড় করে খগেনকে বলছে, বাবু ওটা ছাপতে নিষেধ করেছিলেন না! যত বয়স হচ্ছে, ছেলেমানুষী বাড়ছে না কী?

রমা অপমানিত বোধ করছিল। চাইলেও পারত—অমন করে ছোঁ মেরে নিল লোকটা!

ওদিকে মেসিনের শব্দ সুরু হলে খগেন উঁকি মেরে চাপাস্বরে বলল, বাবু তখন তো বেশ সবাইকে শুনিয়ে ছাপতে দিলেন পদ্যটা! হঠাৎ কী হল কে জানে! কাল সন্ধ্যে বেলা নিষেধ করছিলেন মনে পড়ছে। ভুলে গিয়েছিলাম দিদিমনি, কিছু মনে করবেন না। বাবুর খেয়ালের অন্ত নেই।

পিছন ফিরে কানাইয়ের উপস্থিতিটা একবার দেখে নিয়ে সে ভিতরে চলে এল আবার। রমা বুঝতে পারছিল, সবতাতে নাকগলানো অভ্যাস আছে লোকটার।

খগেন কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, কিছু শুনেছেন? বিয়ে ভেঙে গেল নাকি?

রমা অহীনের কাছে শুনেছিল, প্রেসের মালিক এবার সুখেনবাবুর বৌ হচ্ছে। মাত্র এইটুকুই। সে বলল, নাঃ, কিছু শুনিনি তো।

খগেন নিরাশ মুখে চলে গেল।

রমা উঠতে যাচ্ছিল, সেই সময় দরজার কাছে রিকশা থেকে লীলা নেমেছে। নমস্কার করে সংকীর্ণ পথে যতদূর সম্ভব সরে দাঁড়াচ্ছিল রমা। কিন্তু লীলা এসেই তার হাত ধরল। বলল, আমি আসছি, আপনি চলে যাচ্ছেন! আসুন।

ভিতরের দিকে লোকজন মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। সামনে খগেনকে দেখেই লীলা বলল, সুখেনবাবুর খবর জানেন? কিছু বলে যায় নি কাল?

খগেন মাথা চুলকে বলল, বলেছিলেন। বিয়ের পদ্যটা মেসিনে উঠেছিল। প্রুফও তোলা হয়েছিল। কিন্তু ম্যাটার নামাতে বলছিলেন। ওটা ছাপা হবে না।

বিয়ের পদ্য? লীলা ডাকল, কানাইবাবু, শুনুন।

ততক্ষণে খগেনের দিকে অভ্যাস মত লক্ষ্য রেখে কানাই মেসিন থামাচ্ছিল। এবার প্রায় খরগোসের মত ছুটে এল। প্রণাম করে বলল, আসুন মা। বাবু হঠাৎ কাল বাইরে গেছেন।

লীলা রুদ্ধস্বরে বলল, বাইরে! কোথায়?

কানাই হাতের তালু ঘষতে ঘষতে বলল, লালগোলার সাইডে কোথায় গেছেন যেন। ভুলে গেছি জায়গাটার নাম। বলেছেন, ফিরতে দিন দুই দেরী হতে পারে।

লীলা ধমক দিল, ঘন্টাকে বলেন নি কেন? কষ্ট করে এতদূর আসতে হল আমাকে!

কানাই যত্ন করে বলল, আজ্ঞে মা, আপনি ছাড়া কাকেও বলতে নিষেধ ছিল।

রমা রাগে পেয়ে বলল, উনি ছাড়া কাকেও বলতে নিষেধ ছিল। এখন কিন্তু আমিও শুনলাম। বলে সে হেসেও উঠল।

লীলা বুঝতে পেরেছে, ততদিনে বোঝা উচিত ছিল তার, এই কানাই লোকটি খুব সোজা নয়। হয়ত সুখেনের অনেক গোপন খবর সে রাখে। সে বলল, ওদিকে কেন গেছে সে?

সে জানিনে মা।

তাকে প্রেস চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, মাসে মাসে এজন্যে মোটা মাইনে দিতে হয়। লীলা বলল।......অথচ যখন খুসী চলে যাবে কাজ নষ্ট করে। ব্যাপারটা কী?

রমা লুকিয়ে হাসছিল। ওখানে খগেনের ঠোঁটেও এক ঝিলিক হাসি দেখা গেল। সে বলে উঠল, বিয়ের পদ্যটার জন্যে তো খরচ হত না কিছু। নিজের প্রেস। নিজের বিয়ে... বেশ ভালই হয়েছিল পদ্যটা। না কী রমা দিদিমণি? বাবু বড্ড খামখেয়ালী লোক!

লীলা বলল, কানাইবাবু পদ্যটা দেখি।

কানাই কুইনিন গেলা মুখ নিয়ে ভিতরে গেল। তারপর পদ্যটা নিয়ে এল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে লীলা বলল, ঠিক আছে। ছাপুন। কত ছাপবেন?

খগেন বলে দিল, হাজার পাঁচেক?

কানাই ট্যারা চোখে খগেনকে দেখে নিয়ে একটু হেসে বলল, পাঁচ হাজার!
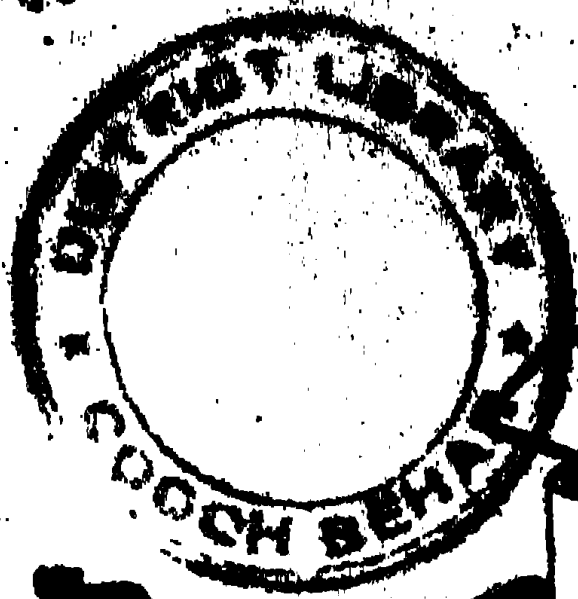
আমার কী চাই আমি জানি

খাঁটি তামাকের স্বাদ আর ভরপুর তামাকের গন্ধ
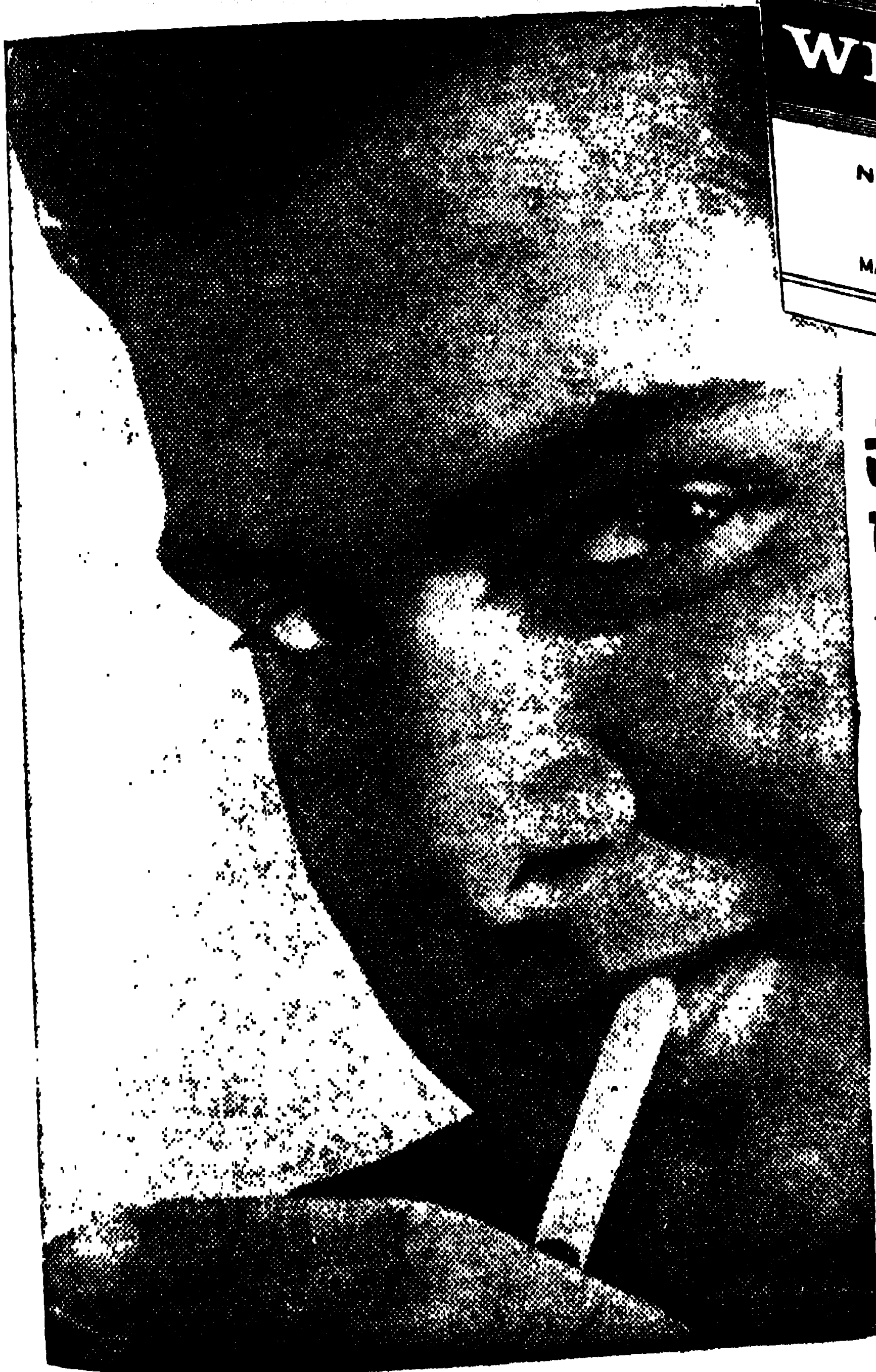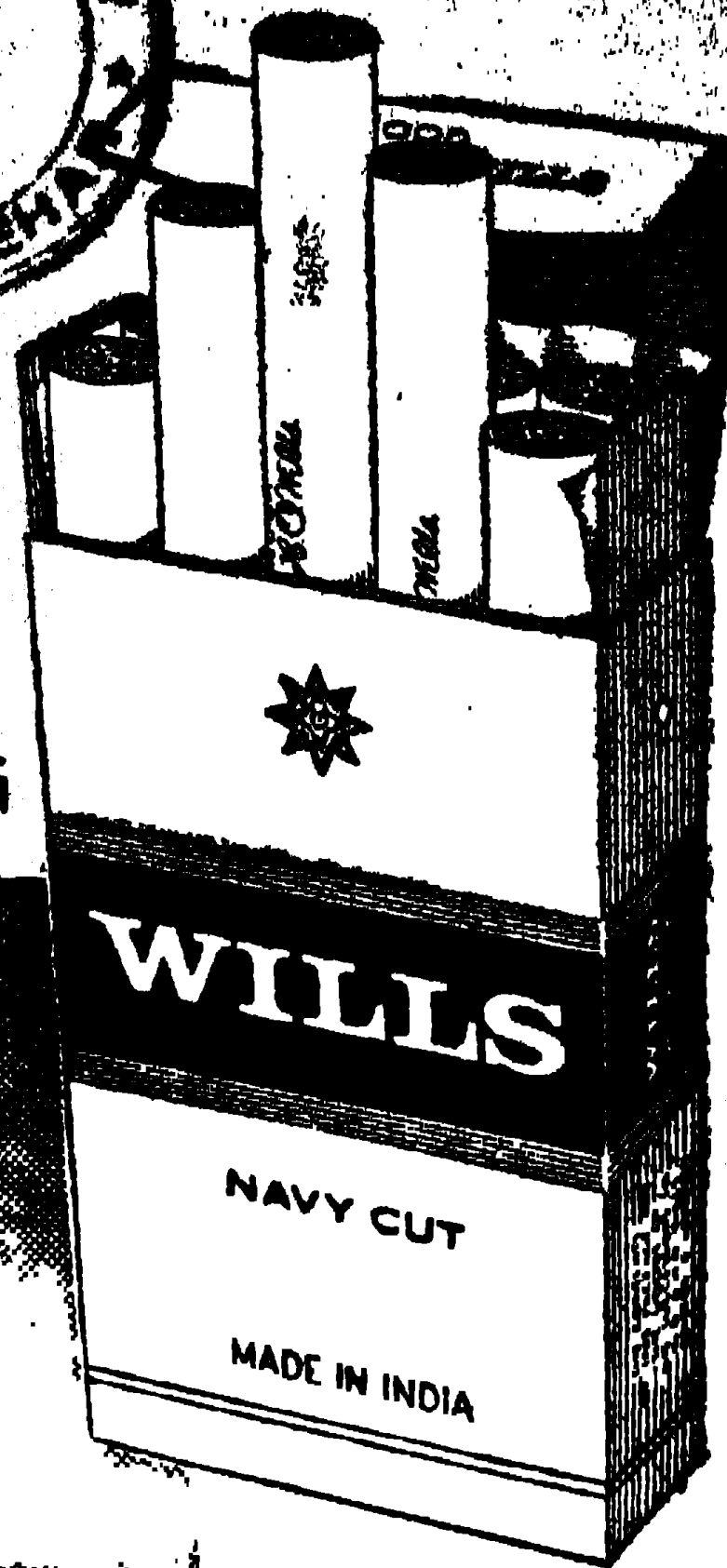
উইলস প্লেন

—প্লেন সিগারেটের সেরা

৮০ পয়সায় ১০টি

[illegible] লোকের হাতে দিতে হলে তাই ছাপতে হবে বৈকি।

লীলা রমার দিকে তাকিয়ে বলল। [illegible] ছাপা যায় বলুন তো ?

রমা চিন্তিত হবার ভান করল। [illegible] মনে মনে সে ভীষণ হাসছিল। বলল, [illegible] আর ছাপবেন ? নিমন্ত্রিতদের দেবেন তো। তাছাড়া আর বেশি ছেপে কী লাভ?

লীলা বলল, কিছু বেশি ছাপতে হবে। গ্রামের দিকে পাঠাতে হবে কিছু। তাছাড়া আত্মীয়স্বজনও তো আছেন নানা জায়গায়। ঠিক আছে, হাজার পাঁচেকই ছাপুন। ভাল কাগজ চাই—হলুদ রঙের। সোনালী হরফে ছাপা হবে। বুঝেছেন ?

কানাই বিনীতভাবে মাথা নেড়ে কাগজটা তুলে নিল। বলল, কবে নাগাদ চাই ?

কালকের মধ্যেই। লীলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

তাহলে তো কাগজ আনতে হয়। বাবু নেই। টাকার কী হবে ? কানাই মাথা চুলকাচ্ছিল।

লীলা বলল, কাল সকালে আমার কাছে লোক পাঠাবেন। টাকা নিয়ে আসবে। কত টাকা ?

আপাতত শ'খানেক।

ঠিক আছে। পাঠাবেন। এই বলে লীলা রমাকে ডাকল, আসুন। বাড়ি যাবেন তো ?

রমা বলল, হ্যাঁ। সুখেনবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। একটা আর্জেন্ট ডেলিভারীর অর্ডার নিয়েছি। কী হবে-টবে, কিচ্ছু জানিনে।

লীলা ডাকল, কানাইবাবু, আসুন। আপনি ভাই ওঁকে বুঝিয়ে দিন না কী করতে হবে। বলে একটু হেসে ফের বলল, প্রেস কিনেছি যখন, আমাকেও তো কিছু জানতে শিখতে হবে। না কী বলেন ?

ফের কানাই এল। রমা ব্যাগ খুলে কাগজপত্র বের করে দুজনকেই বোঝাতে লাগল। এবং এসব ব্যবস্থা করে লীলা যখন বেশ খুশি মনে উঠতে যাচ্ছে, তখন দেয়ালঘড়িতে আটটা বেজে উঠেছে।

রিকশো ডাকতে লোক পাঠিয়ে লীলা রমাকে বলল, আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে যাবো।

রমাও খুব খুশি হয়েছিল। ভদ্রমহিলাকে যদিও একটু জেদী মনে হয়, হয়ত বা এটা শিক্ষাসহবতের অভাব—কিন্তু বেশ আন্তরিকতা আছে ব্যবহারে। সরল বলেও মনে হয় রমার। তাছাড়া তার আরও ভালো লাগল এই ভেবে যে উনি নিজেই যদি সব দেখাশুনা করতে থাকেন, অন্তত সুখেনের দিক থেকে যেটুকু দ্বিধা বা আতঙ্ক মনের ভিতর উঁকি মারছিল, একেবারেই থাকবে না। মনে সাহস পাচ্ছিল রমা। সুখেন অহীনের আড্ডার লোক। অহীন গোল্লায় গেছে। সুখেন কী তাও বেশ বোঝা যায়। পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়, তা সত্ত্বেও রমার মনে হয়েছে, লোকটা খুব চতুর আর ফিকিরবাজ।

[illegible] বন্ধু ওরা।

এত [illegible] লীলা আগে কখনও দেখেনি। সে একটু অবাক হয়ে ওকে লক্ষ্য করছিল। বন্ধু চিতাবাঘের চামড়ার মত একটা শার্ট গায়ে দিয়ে কালো প্যান্ট পরে এসেছে। ওদের গ্রাহ্য না করে সে সোজা ভিতরে চলে গেল। লীলার একটু রাগ হচ্ছিল, [illegible] লোকটা, এমন করে বলাকওয়া নেই, সোজা ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করেও উঠেছিল তার। সুখেনের বন্ধু কি এরাই নাকি! কোন বন্ধুর সঙ্গে সুখেন এতদিন তার পরিচয় করিয়ে দেয়নি। তারা কেমন, লীলা দেখেনি। ভেবেছিল, তারা বুঝি সবাই রাণীচকের ওই লোকটার মত ভীতু গোবেচারা—গোবেচারা আর বদমাইস—তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু বন্ধুকে দেখে যেন তার সে ভুল ভেঙেছে। রমা ডাকল, আসুন দিদি।

লীলা বলল, যাই।

রিকশোয় বসতেই বন্ধুর চড়া গলা শোনা গেল। সুখেনদা এলেই বলবে, সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। নয়ত ভীষণ বিপদ হবে ওর। বুঝেছ ? বলবে, বম্বা এসেছিল নিজে।

লীলা চমকে উঠেছিল। পরক্ষণে স্বভাবসুলভ ক্রোধে তার ইচ্ছে করছিল, এক্ষুনি নেমে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে আসে লোকটাকে। এত সাহস যে ঘরে ঢুকে শাসিয়ে যাচ্ছে।

লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে রমা বলল, ছেড়ে দিন। ওর নাম বম্বা। বম্বুও বলে লোকে।

লীলা ফিসফিস করল, গুন্ডা বুঝি ?

রমা হাসল। কে জানে! মারামারি করে বেড়ায় শুনেছি।

রিকশো চলছিল। পর্দাটা তোলা ছিল। ফেলে দিয়ে লীলা বলল, কোনদিকে আপনাদের বাড়ি, রিকশোওলাকে বলে দিন।

ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাছে এসে রমা বলল, ডানদিকে চল।

দুজনে কোন কথা বলছিল না আর। রাতের শহরে চারপাশে অজস্র আলোর বাইরে আকাশ বোঝা যায় না। দুপাশে বিরাট গাছ। পথে বৃষ্টির জলে আলো ঝিকমিক করছিল ছায়ার খাঁজে। একটু ফাঁকায় এসে লীলা বলে উঠল, ওই লোকটা থাকে কোথায় ?

রমা বলল, রেললাইনের ওপারে কোথায় যেন। কেন ?

লীলা বলল, এমনি বলছি।

রমা বলল, বুঝেছি। ব্যাপারটা জানতে চান তো ? ঠিক আছে। আমার ভাই অহীনকে বলব। সে ওসব খবর রাখে।

যেখানে রমা রিকশো থামাল, ঘরবাড়িগুলো সেখানে ছড়ানো ছিটানো—অজস্র গাছপালা তার আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে আছে। সদর রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট থেকে যা আলো ছড়াচ্ছে, তা দিয়ে এত বেশি [illegible] অন্ধকার তাড়ানো যায় না। রমা [illegible] কাছে কাপড়ের গোছা ধরে [illegible] নামল। খোয়া ভর্তি গা[illegible] [illegible]—সেগুলোয় জল চকচ[illegible] দাঁড়িয়ে হাসিমুখে রমা বলল, চলি দিদি।

কী যেন চাপা অস্বস্তি বুকে বসে ছিল লীলার। রমা নেমে গে[illegible] সেই অস্বস্তিটা বাগে পেয়ে গেয়ে[illegible] [illegible] লাগছিল নিজেকে[illegible] বলল, কোন্ বাড়ি আপনাদের ?

এখান থেকে দেখা যাবে না[illegible] অন্ধকারের দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছিল।... ওই যে ওখানে।

অন্ধকার হয়ে আছে। যেতে একা ?

খুব পারব। রমা ফের হ[illegible] মিছেমিছি দেরি করিয়ে দিলাম ত[illegible] চলি দিদি।

নেমে ওর সঙ্গে বাড়ি অব[illegible] ইচ্ছে করছিল লীলার। কিন্তু রমা ডাকল না—বরং এড়িয়ে গেল যেন[illegible] সে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণও হল। [illegible] ওলাকে বলল, চলো।

রিকশোওলা প্যাডেল ঠেলতে টের পেল চেন পড়ে গেছে। সে[illegible] সঙ্গে সঙ্গে। অস্ফুটস্বরে রাস্তাকে[illegible] দিতে দিতে সে পিছনে গেল। সেই[illegible] লীলা দেখল, রমা যেদিকে গেছে, থেকে কে একজন আসছে। খুব তা[illegible] হেঁটে আসছে সে।

রিকশো ফের গড়াচ্ছিল, পিছনে শুনল, দিদি, এই যে, শুনুন।

লীলা মুখ ফেরাল।

ছোড়দিটার কাণ্ডজ্ঞান নেই। কিছু[illegible] করবেন না। চলুন, আপনাকে পৌঁছে আসি।

আপনি......

আমি অহীন—রমা, আমার দিদি।

ও। ঠিক আছে, আমি যেতে[illegible] পারবো তাই।

নিঃসংকোচে অহীন প্রায় লাফ[illegible] উঠে পাশে বসে পড়ল। লীলা কিন্তু খ[illegible] হয়েছে—ভীষণ খুশি। একা যেতে হ[illegible] বলে নয়, অহীনের সঙ্গে তার আ[illegible] করার ইচ্ছা এত সহজে মিটে যাবে, ভা[illegible] পারেনি। রমার প্রতি বিরক্ত হয়েছিল[illegible]

অহীন বলল, আমার ভদ্রতাজ্ঞান [illegible] ভাববেন না যেন। এটা মায়ের আদেশ।

লীলা হাসতে হাসতে বলল, আপ[illegible] মায়ের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল।

ছোড়দিটার কাণ্ডজ্ঞান নেই। অহ[illegible] ফের রমার দোষারোপ করল।... রিকশো[illegible] লেগে যাবে, নয়ত আপনাকে নিয়ে যেত[illegible] থাক, সে পরে একদিন হবে'খন। তাছ[illegible] রাত্তির হয়েছে। বিচ্ছিরি কাদা লেগে গে[illegible] আরও দেরী হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অহী[illegible] ফের বলতে থাকল, ইচ্ছে ছিল আপন[illegible] সঙ্গে আলাপ করার। জোর কপাল আ[illegible]

[illegible] কাছে আপনার [illegible] [illegible]

[illegible]।

লীলা বলল, তাই নাকি। সুরেশবাবুর [illegible] পারতেন যে-কোনদিন।

অহীন ব্যঙ্গ করে বলল, আমাকে [illegible]-টাপনি করবেন না দিদি। আমি [illegible] ছোটভাই।

লীলা হেসে ফেলল ওর ভঙ্গী দেখে। [illegible]। তুমিই বলব।

বলব, না—বলুন এক্ষুনি।

ছেলেটি তো বেশ। লীলা আরো খুশি [illegible]। বলল, একটু আগেই রমা তোমার [illegible] বলছিল। আমারও একটু জরুরী [illegible] ছিল তোমার সঙ্গে। চল, যেতে-[illegible] বলছি।

অহীন একটু বিস্মিত হল।... আমার [illegible]? কী কথা বলুন তো।

কী বলবে এবং কিভাবে বলবে, লীলা [illegible] পাচ্ছিল না। সুখেনের জীবনের যে [illegible] একটা প্রচ্ছন্ন দিক আছে, যা টের [illegible] পাচ্ছিল একটু করে, স্পষ্ট বুঝতে চায় সে। লীলা জানে না, এতে তার কতখানি ক্ষতি [illegible] লাভ হবে। সে তো বন্যায় ভেসে চলেছে! সুখেন—সুখেন তার কাছে যেন [illegible] একটা অবলম্বন মাত্র, খুব প্রিয় অবলম্বন। তার নীচে মাটি আছে কি নেই —কী দিয়ে সে তৈরী, জেনে কী হবে!

কী হল? বলছেন না যে?

বলি। লীলা শান্ত কণ্ঠে বলল।... তুমি তো ওই গুণ্ডামত লোকটা চেন, বম্বা না কী নাম......

কেন বলুন তো!

আজ প্রেসে গিয়েছিল। সুখেনবাবুর খোঁজ করছিল লোকটা। ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগল। একটা আজেবাজে ধরণের লোক যে ভঙ্গীতে ঢুকল আর কথা বলল, আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল।

অহীন একটুখানি গুম হয়ে থাকার পর বলল, বম্বা অবশ্যি গুণ্ডা নয়।

তাহলে ওর সঙ্গে সুখেনবাবুর কী দরকার?

অহীন জোর হাসল।... কী সর্বনাশ! গুণ্ডা ছাড়া বুঝি কারুর সুখেনদার কাছে [illegible]জ থাকবে না?

সুখেনের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ [illegible]রে, হঠাৎ মুখ ফসকে যাওয়া এই কথাটাগ [illegible] বুঝি প্রকট হয়ে গেছে। সত্যি কি [সু]খেন সম্পর্কে একথা ভাবে সে? যদি না [ভা]বে, কেন এ কথাটা বলে বসল অহীনের [সা]মনে? লীলা অপ্রস্তুত কণ্ঠে জবাব দিল, তা বলছি না। লোকটাকে আমার খারাপ লেগেছে। খুব অভদ্র। শাসাচ্ছিল প্রেসে ঢুকে।

বম্বাটা এমনি। অহীন বলল।... ওর বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন নেই। তবে খুব ভালো ছেলে লীলাদি, যাকে বলে গড বয়। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। আর সুখেনদার নানারকম কাজকারবার থাকে হয়ত—আমিও সবটা জানিনে।

লীলা কথা কাড়ল।... কী কাজ থাকে [এত]? প্রেসটাই তো ঠিকমত চালাতে পারে না।

অহীন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না লীলাদি, একটা কথা বলব?

বল। কিছু মনে করব না।

সুখেনদার সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে। পদ্যটা কিন্তু আমিই লিখেছি।

লীলা ক্রমশ ক্লান্তিবোধ করছিল। শুধু ছোট্ট ‘ও’ বলেই সে থামল। পথ যেন শেষ হচ্ছে না। এবড়োখেবড়ো খাল ডোবা ভরতি পথে রিকশোটা প্রচণ্ড লাফাচ্ছে। রিকশো-ওলা সীট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, প্যাডেল ঠেলছে। লোকটা রীতিমত হাঁফাচ্ছিল।

পীচের পথে এসে অহীন বলল, রাগ করলেন না তো?

রাগ করব কেন?

ওরে বাবা। বিয়ের পদ্য খারাপ হলে মেয়েরা ভীষণ চটে যায় দেখেছি।

লীলা ওর ছেলেমানুষীতে হাসল। কিন্তু অসম্ভব একটা ক্লান্তি তাকে অবশ করে তুলেছে ততক্ষণে। কোন মন্তব্য করল না সে। অহীনের কাছে অনেক কিছু জানার ছিল। অহীনকে সে সব প্রশ্ন করতে সংকোচ যতখানি, ততখানি এই ক্লান্তি—বাড়ির কাছাকাছি এসে সে বলল, তুমি তো সুখেন-বাবুর সঙ্গে আড্ডা দাও শুনেছি। ও কোথায় গেছে, জানো?

অহীনের মুখটা গম্ভীর দেখাচ্ছিল। আলো পড়েছে রিকশার মধ্যে। নির্জন হয়ে এসেছে পথ। কালো পীচের পথ ভিজে চকচক করছে। অহীন বলল, সুখেনদার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি আজ। বোধহয় বাইরে কোথাও গেছেন। যা ব্যস্ত মানুষ।

ব্রেক কষল রিকশোওলা। লীলা অবাক হল একটু। ঠিক বাড়ির সামনেই থেমেছে রিকশো। সম্ভবত চেনে রিকশোওলাটা। পরক্ষণেই লীলা তাকে বলতে শুনল, আরে সুখেনবাবুর কথা বলছেন তো? আজ বিকেলবেলা গঙ্গার পাড়ে দেখেছি ওনাকে।

লীলা জেরার সুরে বলল, কী করছিল গঙ্গার পাড়ে?

আবছা আলোয় হাসছিল রিকশোওলা। বড় বড় ভাঙা দাঁত—লালচে রঙের। চওড়া কালো মাড়ি। সে বলল, বেড়াতে বেরিয়ে-ছিলেন হয়ত। জঙ্গলের কাছে দেখছিলাম।

রুদ্ধশ্বাসে লীলা বলল, একা?

আজ্ঞে, সঙ্গে যেন জগদীশের মেয়েকে দেখেছি......

অহীন বলল, ...চলুন। বিষ্টি পড়ছে, ভিজে যাবেন।

বাসিনী প্রতীক্ষা করছিল। দরজা খুলে রেখে সে দাঁড়িয়ে ছিল। লীলা ঘরে ঢুকে ব্যাগ থেকে একটা এক টাকার নোট বের করে বাসিনীকে বলল, দিয়ে এসো।

অহীন দাঁড়িয়ে ভিজছিল। বাসিনীর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে সে রিকশোওলাকে দিল। রিকশোওয়ালা কোঁচড় থেকে কৌটো বের করে বলল, বাবু ফিরবেন তো? আসুন, নিয়ে যাই।

অহীন বলল, [illegible] তুমি [illegible] বাবা।

লীলা ডাকছিল।... [illegible] চলে এস।

থাক। আমি চলি।

বিষ্টিতে ভিজে কোথায় যাবে? এস।

অহীন গেল। পরক্ষণে সে অবাক হয়ে গেল। সাজানো গোছানো সুন্দর ঘর। তার মধ্যে একটা ছবি—টেবিলে [illegible] আছে ছবিটা। ছবির সুখেনকে দেখছিল সে। এমন সুন্দর বরে তাকে [illegible] সুন্দর লাগছিল। ঠোঁটের কোণে [illegible] হাসি তার। অহীন আড়চোখে লীলার দিকে তাকাল। লীলাও যেন ছবিটা দেখছিল। এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, বসো, আসছি। তারপর ভিতরে চলে গেল।

ছবির আরো কাছে গিয়ে হঠাৎ অহীনের চোখ দুটো [illegible] করছিল। স্বভাবসুলভ কৌতুকে সেই [illegible] ভাবটি মিশিয়ে সে শুধু বলে উঠল, [illegible] খচ্চর!

পরক্ষণে পিছনে ঘণ্টা এসে ডেকেছে তাকে। ...দিদিঠাকরুন ভেতরে যেতে বললেন আপনাকে।

গরিলার মত লোকটাকে দেখে অহীন চমকে উঠেই হেসে ফেলল। বলল, চল।

(৩৪)

পরদিন সকালে জগদীশের দোকানের সামনে স্তূপীকৃত সাইকেলের পার্টস পড়ে আছে। পুলিশ কর্ডনের বাইরে দাঁড়িয়ে লোকেরা ভীড় করছিল ভোরবেলা থেকে। ঝকঝকে নতুন সব পার্টস। চৌধুরী সাইকেল স্টোর্সের নামে কলকাতা থেকে যে এক ওয়াগন মাল বুক করা হয়েছিল, তা স্টেশনে পৌঁছবার পরই খোয়া যায়। এতদিন বাদে অদ্ভুতভাবে তার হদিশ মিলল।

গণেশ ‘আগরওয়ালা ট্রান্সপোর্টে’ ট্রাক চালায়। সে বলল, আগেও বলেছি—এখনও বলছি, আজকাল রোড ট্রান্সপোর্টের এত সুবিধে থাকতে কেন বাবা রেল-টেল একশো হ্যাঙ্গামা!

জগদীশের মুখের দুকষায় ফেনা—দাঁতে ব্রাশ ঘষছিল। জবাব দিল, ট্রাকেও কোন গ্যারান্টি নেই বাবা। চুপ করো।

গণেশ দমে গেল। তা বটে জগদা। সিঙ্গিদের এক ট্রাক মাল দশদিন আগে স্ট্র্যান্ড রোড থেকে রওনা দিয়েছে। আজও পৌঁছল না। তবে কথাটা হচ্ছে, সব্বার সমান নয়।

যেমন তুমি। কাঁধে হাত রেখেছে লালু।

গণেশ চমকে উঠে হাসল মাত্র। সে রাত্রে মালগুলো বম্বার গাড়ি সেই রেখে এসেছিল। সে গতিক দেখে আস্তে আস্তে তক্ষুনি কেটে পড়ল। লালুর চোখ আর কানের সংখ্যা কম নয়, সে জানে।

জগদীশ চোখের ইসারায় ডাকল লালুকে।

[illegible]

সুখেন বলল, লালুর জন্যেই বসে আছি।

লালু চোখ খুলে তার মুখটা একবার চোখে নিয়ে যেন চোখ বুজল। বলল, কতক্ষণ হল সুখেনবাবু?

হ্যাঁ। বুঝে। ওসব আমার পোষায় না।

রাত্রে আন্দাজ করতে পারিনি। মাল কিন্তু যা আছে, কমসে কম হাজার দশেক পাওয়া উচিত ছিল আমার। কী বলেন?

সুখেনের মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। সে কোন জবাব দিল না। জগদীশ এসে ঢোকে ভিতরে। যে ছোকরাটা চা করছিল, তাকে ডেকে বলল, লালুকে চা দে।

লালু টেবিলে পা তুলেছে। জগদীশকে দেখে বলল, গুরু সুখেনবাবু ডুবেছে।

জগদীশ বাইরে ঝুঁকে একরাশ থুথু ফেলে বলল, আমরাও ডুবব না কে বলল? বন্যার মাথাটা মোটা। তবে এখন সুখেনবাবুই ভরসা। নিজেও বাঁচুন, আমাদেরও বাঁচান।

সুখেন অদ্ভুত স্বরে বলল, তোমাদের কী হবে? বন্যা কারুর নাম নিশ্চয় করছে না। করলে এভাবে মাল ফেলে দিয়ে যেত না!

জগদীশ তীক্ষ্ণদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ফেলেছে কিন্তু আমার দোকানের সামনে। এটার কী মানে?

লালু খিকখিক করে হাসল।... শালা বুদ্ধু কাঁহেকা। অনেক টাকা পেত।

সুখেন চুপ করে থাকল। বন্যা কী করবে, সে বুঝতে পারছে না।

জগদীশ চাপা গলায় বলল, থানার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে শীগগীর। আগুন জ্বলতে দেরী নেই সুখেনবাবু। এখন টাকা চাই।

সুখেন বলল, কে টাকা দেবে? আমি?

তাছাড়া আর কে?

আমি কেন দেব?

বেশ। দেবে না। ডুববে।

লালু সুখেনের কাঁধে হাত রেখে বলল, আপনার বিয়ে কবে?

সুখেন থামছিল। পা বাড়িয়ে অনেক-দূর চলে এসেছে সে। এতখানি আসতে পারার সাহস তার ছিল না। বড়জোর

[illegible]

অনায়াসে সব সামলে নিতে পারে। সেগুলো বদমাইসী হতে পারে, কিন্তু অনেক নিরাপদ। সেখানে লালু জগদীশরা নেই। বন্যা নেই। জলাভূমের মত প্রেমকাতর মেয়েরা আছে। লীলা আছে। বড়জোর শিবানীও থাকতে পারে। প্রেম ভালোবাসার ব্যাপারে আর যাই হোক, জগা বা লালুর শাসানি তাকে শুনতে হবে না—এটা নিশ্চিত। কারণ মেয়েগুলো সত্যি সত্যি তার জন্যে পাগল হয়ে থাকে। অথচ এই ব্যাপারটা......

কী হল? বিয়েতে নেমন্তন্ন নাই বা করলেন, জানাতে দোষ কী?

বিয়ে? সুখেন একটু হাসল।... হয়ত হচ্ছে।

হয়ত মানে?

জগদীশদা এইমাত্র যা বলল, শুনে বিয়ে তো মাথা থেকে পালাচ্ছে! সুখেন পরিহাসের চেষ্টা করছিল।

আপনার হবুগিন্নীর তো টাকার অভাব নেই! নিয়ে আসুন না। নাকি আমরাই যাব ওনার কাছে?

তোমরা যাবে মানে?

টাকার জন্যে।

সুখেন জ্বলে উঠেছিল। পরমুহূর্তেই নিভে গিয়ে জোর করে হেসে বলল, পাত্তা পাবে না। ভীষণ জংলী। ওদের গ্রামটা একেবারে জঙ্গলের পাশেই।

সে আমরা দেখব। এটা তো আমাদের জায়গা। ওনার সেই গ্রামটাম নয়।

লীলাকেও শাসাচ্ছে যেন। সুখেন ক্রমশঃ আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল। এতদিন মিশেও লোকগুলোর পরিচয় সে পায় নি।

শেষ অব্দি টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উঠতে হল তাকে। হন হন করে সে হাঁটছিল। আপাতত প্রেসে যেতে হবে। তারপর...তারপর লীলার কাছে লোক পাঠাবে। প্রেসের অজুহাত দেখিয়েই অন্তত শ' পাঁচেক টাকা সে চেয়ে পাঠাবে।

কিন্তু দেবে তো লীলা? কনক এসেছিল হঠাৎ। মাঝে মাঝে এখানে সে আসে শুনেছিল। কিন্তু এমন সময়ে এসে পড়বে, লীলার বাড়ি যাবে—ভাবতেও পারে নি। লীলা কি জানতে পেরেছে সব কথা! কনক যদি সব ফাঁস করে থাকে লীলা এর পরেও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, এটা আশা করা ভুল। লীলা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে বসে। বড্ড খামখেয়ালী সে। তাকে বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন।

চৌমাথার কাছে আসতেই অহীনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

অহীন বলল, আশ্চর্য মানুষ! কাল কোথায় ছিলেন? কাল অনেকটা রাত্তির অব্দি বৌদির ওখানে ছিলাম। বৌদি বলেনি?

বৌদি মানে?

[illegible]

আমার কথা বলছিল নাকি বলেছে?

আমি কিছু বলিনি।

সুখেন দাঁড়াল।... রিকশোওলা কী বলল? আমাকে চেনে নাকি?

চেনে। কাল বিকেলে

কোথায় শিবানীর সঙ্গে

দেখেছিল।

গুম হয়ে চলতে থাকল

কিছুদূর গিয়ে মুখ খুলল

মালগুলো জগদীশের দোকানের

ফেলে দিয়ে গেছে রাতে শুনেছ?

শুনেছি। শুনেই যাচ্ছিলাম।

তবে এদিকে আসছ যে?

আপনার সঙ্গে যাবো না বলছে

পাগল! এস। হাত ধরে সুখেন

...লীলা কী বলছে-টলছে?

আমি তো সদ্যপরিচিত।

বলবে! তবে দুঃখ হওয়া

আপনি বেচারীকে খুব কষ্ট

সুখেনদা। এটা বোধ করি ঠিক নয়

সুখেন মুখ নামিয়ে শ্রান্ত

হাঁটছিল। বলল, আমি নানা

জড়িয়ে আছি রে ভাই—আমার দ্বারা

হবে না। তুমি বিশ্বাস করো,

একটা শক্ত জায়গা মিলেছিল।

এবার খুব সাদাসিদে ভালোমানুষটি

যাবো। নির্বিবাদে ঘরকন্না করব।

সেসব নেই।

কেন নেই? আপনি ঠিক

তাহলেই ভাগ্য ঠিক হবে।

তা হয় না। ঘরকন্নার পথে কাঁটা

আছে, বেশ বুঝতে পারছি।

আমি কিন্তু বুঝতে

সুখেনদা।

ইচ্ছে করলেও কতকগুলো

মানুষ ছাড়তে পারে না। দেখ, ওকে

করার প্রস্তাব বল, বা জেদ বল,

আমারই পক্ষ থেকে প্রথম উঠেছিল।

আছে সেটা। যদি ওকে ফাঁকি

চাইতাম, তাহলে তো বিয়ের কথাই

না! সত্যি অহীন, এবার আমার

হিসেবী মানুষ হতে ইচ্ছে

কিন্তু......

কিন্তু কী?

লীলার জন্যে আমার দুঃখ

অহীন। ও আমার জন্যে সব ছেড়ে

চলে এসেছে। অথচ এখনও শিবানীর

মেয়ের দরকার হয় আমার।

আমার চলবে না। জীবনটা নীরস

যাবে।

...কেমন কৈফিয়তই [illegible]
...মুখে বলল।... [illegible]
...ভালো মেয়ে আছে, [illegible]
...ব্যবহার করছে না—[illegible]
...সবাই থেকে আছে।
...ছে। আমিও ছিলাম।
...লাম মানে?
...খেন হাসল।... এ অঞ্চলে বেশি
...মেয়ে না। মাথা খারাপ হয়ে আছে।
...গনায় তাহলে সত্যি সত্যি বৌ ছিল
...র? শুনেছিলাম, বিশ্বাস করিনি।
...জো হয়নি?
...। এর আগে আমার একবার নয়,
...বৌ জুটেছিল।
...সব ফাঁস করে দিলেন। লীলাবৌদিকে
...বলে দিই?
...ও জানে হয়ত।
...কী সর্বনাশ।

...অহীন হাসছিল। সুখেনও ওকে সব ...করে দিয়ে হাল্কা বোধ করছিল যেন। ...লা আর ক্লান্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে সে ...র কথা ভাবতে-ভাবতে পাগল হয়ে ...ল কদিন থেকে। ইচ্ছে করছিল, ...কেও সব খুলে বলে। ক্ষমা চেয়ে নেয়। ...টা সুন্দর সহজ জীবন তাকে প্রলুব্ধ ...ছে কতদিন ধরে। এত কাছে এসে ভয়:- ...হবে, সে ভাবতে পারে নি। কনককে ...র ওখানে দেখার পর এক অসহ্য ...স্তি তাকে উত্যক্ত করে মারছে। সে ...ট করছে। প্রকাশ করার সুযোগ পায় ...স্মৃতি তার চোখের ঘুম কাড়ছিল।

প্রেসের সামনে এসে অহীন বলল, ...লাবৌদির কাছে আপনি আগেও যা ...লেন, এখনও তাই। শীগগীর তাঁর সঙ্গে ...খা করুন। ভীষণ ভাবছেন আপনার ...ন্য।

সুখেন শান্ত সুবোধ ছেলের মত ঘাড় ...ড়ে প্রেসে ঢুকল। অহীন চলে গেল।

রমা তার অপেক্ষা করছিল সকাল ...কে। বলল, একগাদা অর্ডার নিয়ে ...সেছি। জানিনে, বকবেন না কী।

গম্ভীর মুখে সুখেন বসল।

কনাই এসে বলল, কাল মা-মণি এসে-...ছিলেন। আপনাকে খুঁজছিলেন।

কী বলেছ?

লালগোলার ওদিকে গেছেন বলেছি।

লালগোলা? আমি তোমাকে কাঠগোলা ...লেছিলাম।

কানাই একগাল হাসল।...য়া মাথায় ...ল গুলে দিলাম।

ঠিক আছে। যাও।

সকালে লোক পাঠিয়ে শতখানেক ...কা আনিয়েছি। কাগজ কিনতে হবে।

কী কাগজ? কিসের জন্যে?

বিয়ের পদ্যটা ছাপতে বলে গেছেন। ...াঁচ হাজার ইম্প্রেসন।

অতি দুঃখেও সুখেন হাসল।...ঠিক ...আছে।

...বলে পাঠিয়েছেন, এখুনি যেন বাবু ...তাকে দেখা করেন।

...করব।

[illegible] চলে গেলে রমা বলল, তব [illegible] [illegible], যদি সব আপত্তি [illegible] বলে গেছেন।

কই দেখি, কী অর্ডার।

কিছুক্ষণ ব্যস্তভাবে কাজে ডুবে থাকল সুখেন। একটু পরেই রমা বেরিয়ে গেল। সুখেন তার ঘরে ঢুকল। জামা-কাপড় বিশৃঙ্খল হয়ে আছে গায়ে। খুলল না। ধুপ করে শুয়ে পড়ল সে। আপাতত জগদীশকে টাকা দিতে হবে। তারপর অন্য ভাবনা।

কিন্তু এ অবস্থায় ফের লীলার কাছে টাকা চাওয়া যাবে কি? কোন উপলক্ষ্যে চাইবে সে?

সুখেন অসহায় হয়ে গেছে হঠাৎ। তার নিজের তো অনেক টাকা থাকা উচিত ছিল। থাকে না। কোন দিকে সব গলে যায়, কে জানে! হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলে যায়। আজ এখনই যদি লীলা তার ওপর বিরূপ হয়ে প্রেস থেকে তাড়িয়ে দেয়, সুখেনের পথ ছাড়া আশ্রয় নেই। প্রেসটা লীলার নামে যত টাকায় বিক্রী করেছে, প্রায় সবটা আগে কোম্পানীকে পরিশোধ করতেই গেছে।

শঙ্কর ভট্টাচার্য খুব ঝানু লোক। লীলা বিন্দুমাত্র ঠকবার সুযোগ পায় নি। তা না হোক, শুধু সুখেন চেয়েছিল প্রেসটা তার হাতে থাকলেই চলবে। আছেও হাতে। অথচ কিছু করা যাচ্ছে না। স্ফূর্তি করা আর হিসেবীর মত কারবার চালানো দুটো এক সঙ্গে যে পারে—সে সব্যসাচী। সুখেনও এক সময় সব্যসাচী ছিল। অথচ আস্তে আস্তে তার একটা হাত যেন অবশ হয়ে আসছে। সামনে একটা সহজ সুন্দর শোভন জীবনের হাতছানি—কিন্তু পিছনে আশে-পাশে অজস্র উত্তেজনা — এই সব শিবানীরা; তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে যেন।

লীলাদের পাড়ায় কনকের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছে, সে জানত না। কনক কোন দিন তাকে বলে নি। সে কলকাতা চলে গেলে সুখেন নিরাপদে দিন কাটাচ্ছিল। এতদিনে জানা গেল, কনক মাঝে মাঝে বহরমপুরে আসে। কেন আসে? এখনও কি সুখেনের জন্যে কোন আশা আছে তার?...সে খুবই অসম্ভব লাগে। সুখেনকে তো সে বিশ্বাস করত না! অসুস্থ হলে তার হাতের ওষুধ খেতে চাইত না। অথচ সে যেন এখনও সুখেনকে কামনা করে।

সুখেনের হাসি পেল। সে—যাকে বলে, কতকটা লেডিকিলার। মেয়েরা—বিশেষ করে বড়লোকের মেয়েরা এত সহজে এই সব লোকের পাল্লায় পড়ে যায়! শিবানী পড়ে না। শিবানীরা ঠকে না। তারা জানে, সুখেনরা কী চায়। তারা ইচ্ছে থাকলে তা দেয় এবং তার বেশি আশা রাখে না। নিজেকে মেরে তার ওপর তাজমহল ওঠবার স্বপ্ন দেখে না।...আসলে জীবনে সুখে থাকার সহজ উপায় হচ্ছে, সব রকম মোহ ত্যাগ করে বাঁচা। সুখেন জানে, তার সঠিক বয়স আটত্রিশ পেরিয়ে যাচ্ছে—লীলা জানে, তার বয়স [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিখরা [illegible] [illegible] চোখ ধাঁধিয়ে রাখে।

সুখেন হাত বাড়িয়ে বালিশের নীচে থেকে একরাশ কাগজ তুলে দেখছিল। তার ভিতর থেকে একটা ছবি বেরিয়ে এল। লীলার। কিছুক্ষণ ছবিটা দেখার পর সেটা বিছানায় রেখে সে উঠল। স্যুটকেস খুলল। কাপড়চোপড়ের নীচে অনেকগুলো ছবি রয়েছে। সেগুলো এনে চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে দেখতে থাকল। প্রথমেই কনক।

কনককে সেদিন একবার ঝাঁটিতি দেখেছে। স্পষ্ট চেহারা মনে ভাসে না। তবে এটা ঠিক—কনক রোগা হয়ে গেছে আগের চেয়ে। রঙটা ময়লা হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক সেটা।

ছবিটা বেশ কয়েকবছর আগে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিল। তখনও সর্বস্ব খুইয়ে কম্পোজিটার বেশে প্রেসে ঢোকেনি সুখেন। স্যুটকেশ হাতড়াতে গিয়ে এটা বেরিয়ে পড়েছিল। তখনও ছবিটা এমনি করে সে মাঝে মাঝে দেখেছে। যেন খুঁজতে চেষ্টা করেছে কিছু। কী খুঁজেছে—স্পষ্ট বুঝতে পারত না। এখনও পারছে না। বড়লোকের বাড়ির জামাই—অজস্র সুখের পর সেইসব কষ্টের দিনগুলোতে সে যেন ছবির মধ্যে স্মৃতির সুখ পেতে চাইত। সে-সুখ নিতান্ত আহার-মৈথুনের সুখ। ছবি তাকে ফের লোভী করে তুলত।

আজ স্মৃতি তাকে অন্য কী দুঃখের স্বাদ দিচ্ছিল। সে কনকদের ঠকাতে পেরে-ছিল, না নিজেই ঠকে আসছিল? আজও সে লীলাকে ঠকাচ্ছে—নিজেও ঠকছে না কি? এমনি করে চিরদিন তাকে বেঁচে থাকবার দিব্যি কে দিয়েছে?

ঘুমে জড়িয়ে আসছিল চোখ। সারাটি রাত আজ ওপারে এক আড্ডায় জেগে কাটিয়েছে। সারা রাত মদ আর তাসখেলা। সন্ধ্যার দিকে শিবানীকে নিয়ে ঘুরেছিল। মনটা ভরে ছিল ওই দিয়ে। ক্লান্তি ছিল, দুর্ভাবনা ছিল। জগদীশ-লালু-বন্ধার ভয়ে পাশাপাশি একটা অন্য আড়াল সে খুঁজতে গিয়েছিল। ওপারে কাঠগোলার একটা আড্ডা বসে। টুলু ওরফে নীরেনের পার্টি ওপারের রাজা। টুলুবাবু কাঠগোলার মালিক। পয়সাওলা লোক। বদমাইসীটা তার সবটাই শখের ছাড়া অন্য কিছু নয়। লালু চটলে টুলুরা অবশ্য সহায়। কিন্তু মুশ-কিল হচ্ছে, সেটা এপার নয়, ওপার।

গতিক দেখলে ওপারে গিয়ে থাকতে আপত্তি কী! সুখেন ভেবেছিল।

ঘুমের মধ্যে একটু একটু করে ডুবে গেল সুখেন। হাতের ফটোটা বুকে উপুড় হয়ে পড়ে রইল আঙুলের ভাঁজে। অন্যগুলো তার পিঠের নীচে আশেপাশে ছড়িয়ে আছে এলোমেলো। সুখেন স্বপ্ন দেখছিল। শরত-কালের ঘননীল আকাশে পায়রার ঝাঁক। অনেক ঘুড়ি। সাদা লাল নীল এবং হলুদ। শুধু হলুদ।

[ক্রমশঃ]

করো ত্বরা, করো ত্বরণ

এণাক্ষী ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ ত্বরা কেন? ত্বরণই বা কিসের? বিনা ভূমিকায় এরকম অনুরোধ শুনে আপনারা যদি বিস্মিত হয়ে পড়েন তাহলে বলে দেওয়া দরকার আমরা এখানে যান্ত্রিক ত্বরণের কথা বলছি, বিশেষ করে ত্বরণ যন্ত্র বা অ্যাকসেলারেটরের কথা, যা সম্প্রতি বহু খরচ-পত্র করে কলকাতায় তৈরি হতে চলেছে। খবরটা হয়ত আপনারা ইতিমধ্যে শুনে থাকবেন। পরমাণু শক্তি-দপ্তর পাঁচ কোটি টাকার এক বৃহৎ প্রকল্পের তোড়জোড় আরম্ভ করেছেন, লবণ হ্রদ এলাকার সতেরো একর জমি নিয়ে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এত বড় বৈজ্ঞানিক আয়োজন এই প্রথম। এই প্রকল্পের প্রধান আকর্ষণ হবে মধ্যশক্তিসম্পন্ন আধুনিক ডিজাইনের একটি অ্যাকসেলারেটর।

অ্যাকসেলারেটর নামটি শুনতে পরিচিত হলেও একটু ভ্রমাত্মক। এই অ্যাকসেলারেটরের সঙ্গে কারবুরেটর বা উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার বা গাড়ীর কলকব্জা সংক্রান্ত কোনো কিছুরই কোন সম্পর্ক নেই। অ্যাকসেলারেটরের কাজ অ্যাকসেলারেট করা যাকে শাদা বাংলায় বলে ত্বরিত করা, কিন্তু সব সময় যে অ্যাকসেলারেটর মোটরগাড়িকেই ত্বরিত করবে তার কোন মানে নেই। যাঁদের আরো বেশী ত্বরা তাঁরা ক্যারাভেলে ভ্রমণ করুন, আমাদের কোন আপত্তি নেই। তাঁদের ত্বরিত না করে যখন প্রোটনের দল ভীম বেগে ত্বরিত হয় তখনই এই ত্বরণযন্ত্র বা অ্যাকসেলারেটর হয়ে পড়ে বিরাট এবং জটিলতাপূর্ণ একটি বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জ। চেষ্টা চলেছে প্রোটনদের প্রতি সেকেন্ডে প্রায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার বেগে ত্বরিত করার, এই কলকাতাতেই। পরিকল্পিত যন্ত্রে প্রোটনদের ছয় থেকে ষাট এম ই ভি পর্যন্ত শক্তিসম্পন্ন করা হবে।

এই পর্যন্ত শুনে খুশী হয়ে কেউ কেউ আর কোন প্রশ্ন নাও করতে পারেন। প্রোটনদের কলকাতাতেই এত জোরে ছোটান হবে এই তো যথেষ্ট, কিন্তু যাদের খুঁত-খুঁতে স্বভাব তাঁরা হয়ত বলতে পারেন এখনই প্রোটনদের ত্বরিত করার এত তাড়া কেন এবং করেই বা হবে কি। তাছাড়া কলকাতায় যানবাহনের যা অবস্থা তাতে প্রোটনদের এত জোরে ছোটানো কি যুক্তিসম্মত? তাহলে এঁদের বলতে হয় নির্ভয়ে পথ চলুন, যত জোরেই ছুটুক না কেন প্রোটনদের সঙ্গে কারো ধাক্কাধাক্কি লাগতেই পারে না। কোন শহরের কোন রাস্তা দিয়েই ছোটার বাসনা এদের নেই, এদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত পথ ছাড়া এরা কিছুতেই ত্বরান্বিত হবে না এবং সে পথ তৈরি করাটাই একটা চ্যালেঞ্জবিশেষ। তারই নাম অ্যাকসেলারেটর। অ্যাকসেলারেটর তৈরির উদ্দেশ্য প্রোটনদের ত্বরিত করা, অবশ্য প্রোটন ছাড়া ডয়টেন আলফা প্রভৃতি অন্যান্য আহিত কণারাও এতে ত্বরান্বিত হয়, সুবিধার জন্য আমরা এখানে বার-বার প্রোটনের নাম করছি। ত্বরিত করার কথাটা আগে বলে আমরা অনেকটা যেন ঘোড়ার সামনে গাড়ী এনে উপস্থিত করেছি। এবারে প্রোটনদের থামিয়ে রেখে ব্যাপারটার মূলে প্রবেশ করা যাক।

ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত অনুসন্ধিৎসাকেও যদি একটি জৈবিক প্রবৃত্তি বলে ধরা হয় তাহলে বলা যেতে পারে বৈজ্ঞানিকদের মনেও এই আদিম প্রবৃত্তি ক্রিয়া করে চলেছে। এটা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। জনসাধারণ বিজ্ঞানী মাত্রকেই যেমন মানুষী গুণাগুণবর্জিত সৃষ্টিছাড়া জীব বলে মনে করেন তাঁরা তা নন। তবে তাঁরা কেন সহজ ও স্বাভাবিক কাজকর্ম ছেড়ে নানারকম বিকট পরীক্ষায় প্রবৃত্ত? আগেই বলা হয়েছে কারণ অতি মৌলিক। যে বস্তুময় জগৎ আঁটোসাঁটো, তরলিত বা গ্যাসীভূত নানারূপে দৃশ্যমান, কখনো বৃক্ষ কখনো বীজ কখনো শাখা কখনো পত্র কখনো মেঘ কখনো বা জলরূপে—তাপ বা বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগে তার সবটাই যে কার্বণ, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌল বা তাদের যৌগে রূপান্তরিত হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হবে তা পরীক্ষা দ্বারা বহুকাল আগেই প্রমাণিত। এটা কি ধরনের পরীক্ষা? আপনারা সকলেই জানেন এটা রাসায়নিক পরীক্ষা। প্রকৃতিতে রাসায়নিক পরিবর্তন এমনিতে তো ঘটছেই, মানুষের হাতেও অনায়াসে ঘটছে। একটি দেশলাই কাঠি জ্বালালেই এক টুকরো কাগজের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু পদার্থের আদিতে আছে যে পরমাণু এবং তারও অন্তঃস্থলে আছে যে নিউক্লিয়াস (কেন্দ্রক) তার কণিকাগুলি এমনই বজ্রবাঁধনে আঁটা যে কোন মানুষের সাধ্য নয় রাসায়নিক উপায়ে তাদের আলাদা করে। অন্তত এই রকমই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আসক্তি চিরকালের। বারণ করলে কার না জেদ চেপে যায়। সুতরাং এ অপমান পদার্থবিদদেরও সহ্য হল না—তাঁরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এটা এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়, এমন তো হামেশাই ঘটছে—মানব সভ্যতার ইতিহাসই প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের কাহিনী। অ্যাকসেলারেটরের জন্মকথাও এই ইতিহাসের ধারাকে বহন করে চলেছে, সৃষ্টিবহির্ভূত কিছু ঘটায় নি।

যুদ্ধ ঘোষণা হল ১৯১৯
কোনোও হলে হয়ত আমরা
যুদ্ধের শুরু হল ইংলন্ডে,
কেমব্রিজের ল্যাবরেটরীতে।
তোলা সংখ্যা বেশী ছিল না,
নাইট্রোজেন অ্যাটমের বুকে
রাদারফোর্ড লক্ষ্য করেছিলেন
যেসব মৌল পদার্থ স্বাভাবিক
স্ক্রিয়, যেমন রেডিয়াম বা
থেকে আলফা কণা বার হ
আলফা কণা দিয়ে স্থায়ী মৌ
ক্লিয়াসে আঘাত করলে কেন
ঘটানো সম্ভব। তবে স্বাভাবি
মৌল থেকে যে আলফা রশ্মি বে
শক্তি খুব বেশি নয়, তাছাড়া
আহরণ করার মত তেজস্ক্রিয়
মাণও খুব কম। প্রকৃতির উপর
বসে থাকা বৈজ্ঞানিকের স্বভাব
একবার যুদ্ধঘোষণা করে পশ্চাদ
নেহাত কাপুরুষতা। ১৯২৬
থেকে অনুমান করা হচ্ছিল যে
কণার বদলে প্রোটন দিয়ে পরমা
আঘাত করলে কেন্দ্রীন বিক্রিয়া
সম্ভাবনা বেড়ে যাবে কারণ তা
কম শক্তিতে কাজ হচ্ছে। অথচ
স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌল জা
থেকে প্রোটন বেরোয়। একমাত্র
কৃত্রিম উপায়ে প্রোটনকে ত্বরিত ক
রাদারফোর্ডের দুই সেনাপতি ক
ওয়ালটন (ওয়াটসন নয়) প্রতি
পথে বিধ্বস্ত করতে অগ্রসর হ
জন কক্রফটের ডায়রী থেকে—

"নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঠিক যে
জানা ছিল না, এদিকে লর্ড
বলছেন চালিয়ে যাও। তিন-চার
গেল যন্ত্রটা তৈরি করতে। আম
কাঁচের সিলিন্ডারের একটা টাও
করলাম, প্রত্যেকটা চার মিটার উঁ
হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার থেকে
নিয়ে সেটাকে আরো বেশী ভোল্টে
করলাম। তারপর আমরা আরো দু
সিলিন্ডার নিলাম। মধ্যেটা ভ্যাকু
তার মধ্যে হাই ভোল্টেজে হাইড্রো
ছোড়া হল। যন্ত্রের তলা দিয়ে য
হাইড্রোজেন অ্যাটমগুলো বেরিয়ে
তাদের কি অবিশ্বাস্য গতি—এক
কম সময়ে আটলান্টিক মহাসমুদ্র
যেতে পারে এমন তাদের বেগ।
আমরা এদের দিয়ে আঘাত করলা
লিথিয়মের অভ্যন্তরে। মুহূর্তের
লিথিয়মের নিউক্লিয়াস দু টুকরো হ
হিলিয়ম নিউক্লিয়াসে পরিণত হল

যুদ্ধে জিতলেন তাঁরা, যে যন্ত্র
প্রথম বিধাতার উপর টেক্কা দিয়ে নিউ
পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হল তার
কক্রফট ওয়ালটন জেনারেটর। এ
সমস্ত আধুনিক অ্যাকসেলারেটরের
পূর্বপুরুষ। তারপর তিরিশ বছরে আরো
কিছু ঘটে গেছে, ত্বরণ যন্ত্র হয়েছে
তর, জটিলতর, বিশালকায়। আজ

কলকাতার এই [illegible]
যে নেহাতই মার্কিন [illegible]
একটু পরেই আমরা [illegible]
করব। কিন্তু [illegible]
মিটানো হয়নি। [illegible]
বেগে ছোটানোর [illegible]
তাড়ার সম্পর্ক কি। [illegible]
নিউক্লিয়াসের মধ্যে [illegible]
বেঁধে রেখেছে সে [illegible]
উত্তাপে তার [illegible]
াপ বা অল্প বিভবে [illegible]
বাঁধন খুলে শুধু [illegible]
কিন্তু নিউক্লিয়াসের মধ্যে পার-
বিক্রিয়া ঘটানোর একটি মাত্র উপায়
তার মধ্যে উচ্চশক্তির আহিত কণা
ঘাত করা। যেসব প্রোটন ও নিউ-
নিউক্লিয়াস তৈরি তাদের পার-
বাঁধন এত শক্ত যে কোন আহিত
তার মধ্যে বদল ঘটানো দশ, বিশ,
এমন কি হাজার ইলেকট্রন ভোল্টের
শক্তি হতে হবে, প্রোটনের ক্ষেত্রে
রেক মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট,
ক্ষেপে বলা হয় এম ই ভি।

য়ন ভোল্ট শুনে ভয় পাবার কিছু
ব কিনা আমরা ফিউজের তার
হলেই মিস্ত্রী ডাকি, কাজেই কয়েক
টি, বল্টু, সুইচ, তারের কুণ্ডলী,
য়তা', 'সাবধান', 'প্রবেশ নিষেধ'
নোটিশ সমন্বিত একটি অ্যাক-
দেখলে তার দশ মাইল দূরে থেকে
সনা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি।
র্ভয়ে এগোন, আমরা আপনাকে
রার জন্য প্রস্তুত।

য়ে এলে প্রথমেই চোখে পড়বে একটি
থাপত্যরীতি মোগল, ফরাসী না
এর বাক্‌স সেদিকে মনোযোগ
। ভিতরে কি হচ্ছে সেটাই মুখ্য।
গয়ে সবাই সবকিছু দেখে আকৃষ্ট
টা বলাই বাহুল্য। আপনি যদি
াল ইঞ্জিনীয়ার হন তবে দৈত্যাকার
শ মেট্রিক টনের ম্যাগনেটের, যার
র ব্যাস অষ্টাশী ইঞ্চি, নিখুঁত
মুগ্ধ হবেন। ইলেকট্রিক্যাল
র হলে এর সাড়ে চারশো কিলো-
ন্তর বেতার কম্পাংকের অসিলেটরটি
মনোহরণ করবে। বিজ্ঞানী হলে
ন্দ্রটা আপনার কাছে ম্যাজিক
মত, তার থেকে বার হওয়া প্রোটন
আলফা-কণাদের দিকেই আপনার
বদ্ধ হবে। আর সাধারণ লোকেরা
রী কংক্রিটের শিল্ড, লোহা, পাইপ
বাইরের বাগান দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে
রবেন। কবিরা আকর্ষণের বদলে
অনুভব করবেন কিনা সেটা আগে
ক বলা যাচ্ছে না। তবে যে যাই
ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে
না হয়ে পারবেন না। আপনার
ইক্লোট্রন সম্বন্ধে-ঔৎসুক্য অনধিকার
ঘাটেই নয়। একটু চেষ্টা করলেই

[illegible] যায়। আপনি কি জানেন আহিত
কণা মানে চার্জড পার্টিক্‌ল, আর চার্জড
পার্টিক্‌ল্‌রা আসে কি? এবার নিম্নলিখিত
[illegible] অনুধাবন করুন। একটি আহিত
কণাকে বার বার ধাক্কা মেরে একটি চৌম্বক
ক্ষেত্রের মধ্যে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় তবে
কণাটি বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকবে—এই সত্যটি
আছে যাবতীয় সাইক্লোট্রনের মূলে। চক্রপথে
ঘোরার জন্য এই জাতীয় যন্ত্রের নাম
হয়েছে সাইক্লোট্রন। আহিত কণার অতঃপর
কি কর্তব্য? যে কোন সুপুরুষ এবং ধন-
বান যুবকের যেমন কর্তব্য অবিলম্বে দার-
পরিগ্রহ করা, তেমনি দুর্দান্ত আহিত কণা-
দের কর্তব্য যত জোরে ধাক্কা দেওয়া হবে
তত বড় বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকা।
আপনার পরিচিত কোন যুবক হয়ত উক্ত
গুণাবলী সত্ত্বেও এই শ্রেণীভুক্ত নন। তবে
তাঁরা হলেন ব্যতিক্রম। আহিত কণারা
সর্বদাই নিয়ম মেনে চলার পক্ষপাতী।
প্রত্যেকবার একটি আবর্তন শেষ না হতেই
সেই হতভাগ্য আহিত কণাকে যদি পুনর্বার
তড়িত বিভবের ধাক্কা মেরে বৃত্তপথে ফেরত
পাঠানো যায় তবে তার বেগ সমানুপাতিক
ভাবে বাড়তে থাকবে এবং সে প্রতিবারই
আগের চেয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করবে।
লরেন্স নামে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী (তাঁর
সঙ্গে লেডী চ্যাটার্লির কোন সম্পর্কই নেই)
আহিত কণার গতিবেগ বাড়াবার এই অভি-
নব উপায় আবিষ্কার করেছিলেন ১৯৩২
সালে। সাইক্লোট্রন আবিষ্কারের জন্য তিনি
নোবেল পুরস্কারও পান।

সাইক্লোট্রন নামটি আজকাল খুব
অপরিচিত নয় এমন কি বাংলা সাহিত্যেও
এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। একবার এক রহস্য
উপন্যাসের নায়ককে 'বন-বন শব্দে সাইক্লো-
ট্রনের চাকা ঘুরাইতে'ও দেখা গিয়েছিল।
ছেলেমেয়েদের নাটক নভেল পড়তে দেখলে
সাধে কি আর গুরুজনেরা খাপ্পা হতেন! ঐ
রহস্য উপন্যাসের প্রত্যেকটি পাঠকের মনে
এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে সাইক্লোট্রন
একটি যাঁতার মত যন্ত্র, যা থেকে গম ভেঙে
আটার মত, কি বেরোচ্ছে তা ঠিক বোঝা
যাচ্ছে না তবে ভয়াবহ রকমের কিছু তো
নিশ্চয়। ভুল ধারণা একবার মাথায় ঢুকে
গেলে তাকে বার করা প্রায় অসম্ভব। যেমন
অনেকের ধারণা পরমাণু সংক্রান্ত কোন
প্রকল্প মানেই অ্যাটম বোমা তৈরীর গোপন
কারখানা। এরকম ধারণা করার কোন অর্থই
হয় না, অন্তত এখানে তো নয়ই, কেন না
সাইক্লোট্রন কলকাতায় অনেক দিন আগেই
তৈরি হয়ে গেছে। দেশে আরো কয়েকটি
অ্যাকসেলারেটর আছে, বিভিন্ন ধরনের।
অবশ্য তাদের শক্তিপাল্লা সামান্য। ককফ্‌ট
ওয়ালটন জেনারেটর আছে বম্বের টাটা
ইনস্টিটিউটে, কলকাতা সাহা ইনস্টিটিউট ও
বোস ইনস্টিটিউটে ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যা-
লয়ে। চার এম ই ভি'র সাইক্লোট্রন আছে
সাহা ইনস্টিটিউটে আর সাড়ে পাঁচ এম ই

ভি তাদের কি [illegible]
মাণু গবেষণা কেন্দ্রে [illegible]
[illegible] নিয়ে-[illegible]
শক্তি পর্যায়— [illegible]
করার সুযোগ দেশের [illegible]
হয় নি।

[illegible] মোটামুটি দুভাগে ভাগ
করা হয়ে থাকে—উচ্চশক্তি ও নিম্নশক্তি-
বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি। যে শক্তিতে আঘাত
করলে বস্তুর কেন্দ্রক থেকে প্রোটন, নিউট্রন
ইত্যাদি মৌলিক কণা বেরোতে থাকে
সেটাকে উচ্চশক্তির নিম্নসীমা ধরে নেওয়া হয়।
আর নিম্নশক্তি বলতে বোঝায় ২ থেকে ২০
এম ই ভি। নিম্নশক্তির যন্ত্রপাতি পরীক্ষা
করে দেখা হয়েছে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের
গুণাবলী, কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলে কি হবে
এই নিউক্লিয়াসের যে কত রহস্য তার অন্ত
পাওয়া ভার। আরো বিপদের কথা, এখন
শুধু কাগজ পেন্সিল হাতে নিয়ে আর
বুদ্ধি খাটিয়ে তেমন কিছু আবিষ্কার করা
যাচ্ছে না। যান্ত্রিক জটিলতা বাড়তে বাড়তে
এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে বড় সাইক্লোট্রন
তৈরী করাটা শেষ অবধি ইঞ্জিনীয়ারিং
সমস্যায় দাঁড়াচ্ছে। প্রথমত কি করে কয়েক
মিলিয়ন ভোল্ট বিভব উৎপন্ন করা যেতে
পারে, দ্বিতীয়ত এমন কি অপরিবাহী বা
অন্তরক মাধ্যম পাওয়া যেতে পারে যার এই
উচ্চ বিভব ধারণ ক্ষমতা আছে। ককফ্‌ট ও
ওয়ালটন যে কাসকেড জেনারেটর তৈরি
করেছিলেন তার থেকে এক এম ই ভি'র
বেশী শক্তি পাওয়া যায় নি। লরেন্সের
সাইক্লোট্রনের কৌশল হল এক সঙ্গে এক
মিলিয়ন ভোল্ট বিভব উৎপাদন না করে
অপেক্ষাকৃত অল্প বিভবের মধ্যে বার-বার
ঘুরিয়ে আহিত কণার শক্তি বৃদ্ধি। যান্ত্রিক
এবং ইঞ্জিনীয়ারিং জটিলতার মধ্যে আর
বেশী না গিয়েও এটা বোঝা সহজ যে,
আজকালকার বিরাট গবেষণা প্রকল্পগুলি
কোন ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যের বাইরে, কাজেই
এগুলি প্রায় সবই হয় সরকারী প্রকল্প।
আর্থিক দিক ছাড়াও আছে ক্ষমতার প্রশ্ন।
দেশের টেকনোলজি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত
এসব কাজে হাত দেওয়ার কথাই উঠে না।
কলকাতার প্রস্তাবিত অ্যাকসেলারেটর যে
ষাট এম ই ভি—অর্থাৎ মধ্যশক্তির, এই
সংবাদ আশাপ্রদ। কেন না এক লাফেই তো
রাশিয়া আমেরিকার মত হাজার বিলিয়ন
ভোল্ট অ্যাকসেলারেটর (যার বেড় তিন
কিলোমিটার) করা সম্ভব নয়, টেকনোলজি
ও বিজ্ঞান এখন পরস্পরনির্ভর। পরমাণু
গবেষণা ছাড়াও পারমাণবিক টেকনোলজিতে
হাত পাকাবার এটি হবে চমৎকার সুযোগ।
বিলিয়ন ভোল্টে পৌঁছতে গেলে যে প্রস্তুতি
চাই, তার সূচনা হয়েছে। সেটাই আশার
কথা।

অঙ্গনা / অন্ধকার কাটুক

হলো সভ্যতার পদচিহ্ন।
র তাই হবে। অনেকেই তো বলে
ভ্যতা যত এগুবে অবক্ষয় ততই
হবে। সেই লক্ষণই তবে স্পষ্ট
টা ভেবে কি রকম হাসি পেল।
ন কি হবে? এসব আমাদের মেনে
বে।

বেশ জোর দিয়েই বললেন
না না মানা অবশ্য নিজের কাছে।
জার থাটে না। তাই প্রতিবাদ না
কথায় আবার মন দিই।

কথা কি জানেন, সমস্যার
সবাই আজ যন্ত্রণাবিদ্ধ। সমস্যারও
মফের আছে। সবচেয়ে বড় হচ্ছে
সমস্যা। এর সমাধানে সবাই
এ থেকে মুক্তি পেতে আমরা
আর সেটা স্বাভাবিকও বটে।
সম্মতি জানিয়ে যাই।

পথ যে কি হবে, সেটা অনেকেই
তে পারছে না।

যে কোনভাবে অর্থ উপার্জনের
ছে। আবার কেউ কেউ হতাশ
কোন দিকে চলে যাচ্ছে। আর
পোয়াতে হচ্ছে গোটা সমাজকে।
বাধা দিই, সমাজ তার দায়-
স্বীকার করে বসে আছে। এবার
নিজের নিজের।

া ঠিক। তবু সামাজিক জীব
জকে মানি আর নাই মানি তার
স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া
দায়িত্ব তো আছেই। দিনে দিনে
এরকম ঘৃণিত অধ্যায় আরো
আর ততই আমরা মুক্তকণ্ঠ হয়ে
প্রশস্তি গাইবো।

ম বাঁধনছাড়া জীবনের আবার
কি? কিঞ্চিৎ বিক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞেস

লক্ষ্য করে তিনি বললেন, এতে
বা আহত হলে আমাদের
আরো স্পষ্ট প্রমাণিত হবে।
ভাবে নতুন পথের কথা চিন্তা
বে।

প্রশ্ন হচ্ছে সেই নতুন পথটা কি?
হচ্ছিল জনৈক সমাজসেবী ভদ্র-
সঙ্গে। বিষয় ছিল সম্প্রতি
পত্রিকায় প্রকাশিত সমাজ
একাংশের ঘৃণিত চিত্র। সেদিনের
কাগজের পাতা ওলটাতে খবরটা
পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অমন একটা
মনে আকাঙ্ক্ষিত সমাজ কি রকম
হয়ে ওঠে। খবর দুটো এরকম:
ন্ত পরিবারের জনৈক মহিলাকে
অভিযোগে গোয়েন্দা পুলিশ

গ্রেপ্তার করেছেন। প্রকাশ যে, তিনি তিন-চারটে প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্কের চেক দিয়ে জিনিসপত্র কিনেছেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক টাকা নেই বলে সেই চেক ফেরত দিয়েছে।

গোয়েন্দা পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেন। পরে সেই ভদ্রমহিলা গ্রেপ্তার হন।

আর একটি ঘটনাও গোয়েন্দা পুলিশের হাতেই ধরা পড়েছে। সংবাদে প্রকাশ যে, আগে থেকেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ এক জায়গায় হানা দিয়ে একজন বিবাহিতা মহিলা ও একজন পুরুষকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তাঁরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দেন। পুলিশের জেরার মুখে তাঁরা আরো জানান, যে বাড়িতে তাঁরা এসেছেন সে বাড়ির মালিক তাঁদের আত্মীয়। একটা জরুরি কথা বলতে তাঁরা এসেছেন। তাঁদের বাড়ি বরাহনগরের দিকে।

পুলিশের সন্দেহ ঘনীভূত হয়। তাঁদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয় আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সেখানে প্রকাশ পায়, তাঁদের সম্পর্ক আসলে স্বামী-স্ত্রী নয়। মহিলাটির বাড়িতে ভদ্রলোক শিক্ষকতা করেন। তাঁর স্বামী আছে এবং তিনটি ছেলে। স্ত্রীলোকটি সংসার চালাবার জন্য এই পথ নিয়েছেন। রোজ রাতে তিনি এখানে আসেন। আর বেশি রাতে বাড়ি ফিরে যান। ভদ্রলোক তাঁকে এখানে রেখে যান। শুধুমাত্র সংসার চালাবার জন্যই তিনি রাতের অন্ধকারে স্বামীর ঘর ছেড়ে রাতের অন্ধকারে এই পথ গ্রহণ করেছেন।

একদিকে সংসার চালাবার জন্য দেহ বিক্রয়ের ঘটনা এবং অন্যদিকে শুধু সংসার চালানোর জন্য মহিলার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এই দুই ঘটনায় বর্তমান সমাজ-জীবনের এক ঘৃণিত অধ্যায় পরিস্ফুট হয়েছে।

খবরটা পড়েই সেদিন সব কি রকম বিস্বাদ লাগছিল। যখন অগ্রগতির রথে চড়ে বিজয়গর্বে আমরা এগিয়ে চলেছি তখন এরকম একটা পরস্পরবিরোধী চিত্রের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। বিশেষ করে, এই সময়টাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের সাফল্যে প্রায় তন্ময় হয়েছিলাম। আর খবরের কাগজে পাতা খুললে সেরকম সংবাদ দেখতেই চোখ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে মূর্তিমান রসভঙ্গের মত এই সংবাদে কিরকম নার্ভাস হয়ে পড়লাম। অনেকের অবস্থাই বোধহয় আমার মত, অবশ্য যাঁরা খবরটা গুরুত্ব সহকারে পড়েছেন।

আজকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের সাফল্য প্রায় রূপকথার মত। নানা ক্ষেত্র ছাড়াও পর্বতশৃঙ্গ পর্যন্ত তাঁদের পদভরে কম্পিত। দুরন্ত ইংলিশ চ্যানেল আমাদের ঘরের মেয়ের অপরাজিত মনোবলের কাছে নতি স্বীকার করেছে। এমন কি ব্যবসা এবং বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে মেয়েরা আজ এগিয়ে এসেছে। কোন কিছুতেই তাঁরা আর পিছিয়ে নেই। পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। পিছিয়ে পড়ার সীমারেখাটুকু মুছে দিয়ে এগিয়ে থাকার সংকল্প এবার তাদের। কিন্তু তার মধ্যে এরকম ছন্দপতন মনোবলে অনেকখানি ঘাটতির কারণ। তাই খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম।

তারপরই এই সমাজসেবী ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা। একথা সেকথার পর কিছুতেই মনের ভাব গোপন করতে না পেরে প্রকাশ করে ফেললাম।

খবরটা আমিও দেখেছি। কিন্তু খুব একটা হতাশ হইনি। এরকম হতেই পারে। ভদ্রমহিলার কথায় পুরোপুরি নার্ভাস হয়ে পড়ি। তবে কি এটাই স্বাভাবিক? এরকম একটা চিন্তা মনের কোনে ঘোরা-ফেরা করতে থাকে।

এরকম ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলাই উচিত। অগ্রগতির মোহে সমাজের সর্বিক বিন্যাসের দিকে আমরা নজর দিইনি। তাই মাঝে মাঝে এরকম উটকো ঘটনার মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হয়। ভীষণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাই না। সেজন্য প্রয়োজন তীক্ষ্ণ সমাজ পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিষেধক খুঁজে বার করা।

একটু থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করেন, হয়তো অবাক হবেন কিন্তু আর্থিক সমস্যা সমাধানের পথ না পেয়ে কত মেয়ে যে আজ এপথে নেমে এসেছে তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। এরা অনেকেই ভাল পরিবারের মেয়ে। তবু তাঁরা এপথে নেমে এসেছেন। অবশ্য প্রথম ঘটনাটা একটু ভিন্ন ধরনের। এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। তবু মাঝে মাঝে এ'রা আত্মপ্রকাশ করেন। এরকম প্রতারণার ঘটনা আগেও ঘটেছে। তবে টেকনিকের ক্ষেত্রে এটা বেশ নতুন। তিনি শুধু নিজের সম্মানই বাঁচাতে চেয়েছেন কিন্তু সমস্ত নারী-সমাজের মুখে যে কলংকের বোঝা চাপিয়ে দিলেন তা তিনি ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করেননি। তবেই বুঝুন, আজকের দিনেও ঠুনকো সম্মান বজায় রাখার জন্য কেউ কেউ মরাপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভীষণ রাগ হচ্ছিল। দুঃখ এবার উবে গেছে। এজন্য কাকে দায়ী করবো ঠিক

বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অনেকটা দিশাহারা ভাব।

এজন্য কাউকে দোষী করে লাভ নেই। এ দোষ আমাদের সকলের। তাই আমাদের সকলকেই এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আর সেই প্রায়শ্চিত্ত হবে, এ থেকে মুক্তির পথ বার করতে পারলে। সেজন্য চাই, সকলের সহযোগী মনোভাব।

সমাজকে অস্বীকার করে নয় বরং স্বীকার করে নিয়েই এদিকে এগুতে হবে। সমাজের অস্তিত্ব উড়িয়ে দিলে এর সমাধান কোনদিনই হবে না। ক্রমেই সংক্রামক ব্যাধির মত এর বিস্তার ঘটবে। আর হচ্ছেও তাই। একটু সচেতন থাকলেই এরকম ঘটনা আকছাড় আপনার নজরে পড়বে। সমাজের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় আছে তা থেকেই এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

তাহলে এ থেকে মুক্তির কি কোন উপায় নেই? আমি প্রায় হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

মুক্তির কথা তো আগেই বলেছি। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা আর দরদী মন। এভাবেই আমাদের এগুতে হবে। সেই সঙ্গে চাই সমাজকে সত্যিকারের কল্যুষমুক্ত করার মনোভাব। দেশের দিকে কত নতুন উদ্যম চলছে। অজস্র অর্থব্যয় হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত সমাজ কল্যাণ তাতে কতটুকু সাধিত হচ্ছে বলতে পারেন?

আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য তাই চাই যথোপযুক্ত কর্ম-সংস্থান প্রকল্প। প্রত্যেকের ভিতরই কিছু না কিছু ক্ষমতা আছে। অনেকেই নিজের সুপ্ত শক্তির হদিশ না পেয়ে বিপথগামী হচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হলো, তাঁদের নিজেদের চিনতে সাহায্য করা। তবেই তারা আত্ম-সচেতন হবেন এবং বিপথ থেকে সুপথে ফিরে এসে সুষ্ঠু জীবনযাপনে সক্ষম হবে। দেশের নানা কেন্দ্রে এজন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে। সেখানে মেয়েদের হস্তশিল্প থেকে অক্ষর শিক্ষার অনেক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাতে অর্থ উপার্জনের সুরাহা বড় একটা হচ্ছে না। এরকম কেন্দ্রের যে কোন একটিতে গেলে আপনি শুনতে পাবেন, কাজ তো শিখলাম কিন্তু চাকরি কই? তাঁদের আপনি কি জবাব দেবেন। এরকম-ভাবেই এ'রা ক্রমে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ছে। তারপরের কথা আর না বলাই ভাল।

হঠাৎ তিনি থেমে পড়েন। আমি ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না। অন্ধকার বড় বেশি। চাপ চাপ জমে আছে। তাহলে এরকম অন্ধকার নির্মমই বুঝি আমাদের বিধিলিপি? আবার তখনই মনে হয়, তা কখনো হতে পারে না। দুস্তর বাধা-বন্ধন পেরিয়ে সভ্যতার পথে আমরা এতদূরে এগিয়েছি। সেখান থেকে ফেরার বা এখানেই ইতি টানার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্ধকার নেমে এলেও আলোর প্রতীক্ষার আমাদের থাকতেই। অবশ্যই নিষ্ক্রিয়ভাবে নয়, সেজন্য চেষ্টাও করতে হবে। আমাদের সমবেত চেষ্টায় সকল গ্লানি দূর হয়ে যাবে। আলোর ঝলমলে সকালে আমরা সবাই আবার নতুন জীবন নিয়ে জেগে উঠবো। সেদিন কোন কৈফিয়তের বিড়ম্বনা থাকবে না। কেবল প্রত্যাশাই আরো গভীর হবে।

—প্রদীপা

নারী পর্বতারোহী শিক্ষণ শিবির

"নাক মলছি, কান মলছি। এই শেষ। পাহাড়ের পথে আর কখনো নয়।"

"এই খত দিচ্ছি," বরফে নাক ঘষতে ঘষতে সুদীপ্তা বলে, "আমারও এই শেষ।"

সিকিমের ফেরু পর্বত। ৩নং শিবির, উচ্চতায় প্রায় উনিশ হাজার ফুট। মাঝ-রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছি। প্রবল হাওয়ার দাপটে তাঁবু থরথরিয়ে কাঁপছে। দমকে দমকে বরফের ঝাপটা তাঁবুর দরজা জানলার ফাঁকা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমাদের স্লিপিং ব্যাগের ওপর তুষারের পুরু প্রলেপ। বরফের ভারে তাঁবু ধ্বসে যাচ্ছে প্রায়। সেই রাতের গভীরে—মাইনাস ডিগ্রী হিমাঙ্কে আমরা অবশেষে বরফ পরিষ্কার সুরু করি আর সেই পরিচিত প্রতিজ্ঞা আবার উচ্চারণ করি—আর নয় পাহাড়ে, এই শেষ।

সমতলে ফিরে এসে মাস ঘোরে না। ঘরের নিশ্চিন্ত আরাম, আলো ঝলমলানো উৎসব-মেলা কোনটাই ভালো লাগে না। অস্থির হয়ে উঠি। দিন গুনি। আবার সেই দিনগুলি কবে আসবে। পাহাড়ের সেই শ্রান্তিবিহীন দিন ও ভয়াল রাতগুলি কখন মন থেকে মুছে গেছে। ভাস্বর হয়ে আছে—পাহাড়ের রূপের বৈচিত্র্য আর অভিযানের রোমাঞ্চ। পাহাড়ে যাওয়ার মরশুম এলে। সব কিছু ভুলে আ[…] ঝাঁপলাম।

গত বছর রোপিট আ[…] আর আটজন মেয়ে গিয়ে[…] যাত্রার আয়োজন করতে বসে[…] অনেক মেয়ে আসুক, আর[…] আসুক। তারা পাহাড়কে ন[…] আর ভালবাসবে। তাদের ম[…] ফাঁকে ফাঁকে খুঁজে পা[…] আনন্দলোক।

আমাদের ট্রেনিং ক্যা[…] সংখ্যা হবে পনেরজন। […] মধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন কুম[…] সেনগুপ্তা (দলনেত্রী) সুজা[…] স্বপ্না নন্দী, কমলা সাহা […] নতুনদের মধ্যে আছে—কল্প[…] মঞ্জুলিকা দাস, অনুরাধা দা[…] চক্রবর্তী, সুধা দেবী, পা[…] ঘোষ, আরতি সরকার, প[…] সুতপা সেনগুপ্ত।

এবার আমরা চলে[…] হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিম[…] হিমবাহ অভিযাত্রী মহলে […] অথচ অতি প্রিয় নাম। এ[…] ভয়াবহতায় বৈচিত্র্যে ও সৌন্দ[…] পর্বতপ্রেমীর আকাঙ্খিত […] হবে আমাদের মূল শিবির—

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের […] ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় […] নেহরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টি[…] যোগিতায় এই শিবির প[…] শিবিরের স্থায়িত্বকাল তিন […]

পর্বতারোহণে শিক্ষার […] আমাদের সদস্যরা কয়েকটি […] কাজ করবেন। সুদীপ্তা, […] কল্পনা ঐ অঞ্চলের ভূত[…] সংগ্রহ করবে। সুতপা সেন[…] উচ্চতার প্রতিক্রিয়া বিষ[…] করবেন। আমরা অবশ্য […] জন্য ব্যয় বরাদ্দ বিশেষ […] পারছি না।

তবে আমাদের দ[…] মার্জিতরুচি ও স্বাস্থ্যবতী […] করছি তাদের আরব্ধ […] সুসম্পন্ন করবেন। আপন[…] আমাদের পাথেয় হোক।

(এই অভিযাত্রী ২৬ […] থেকে রওনা হয়েছেন)

স্যাতস্য

অথবা

সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]
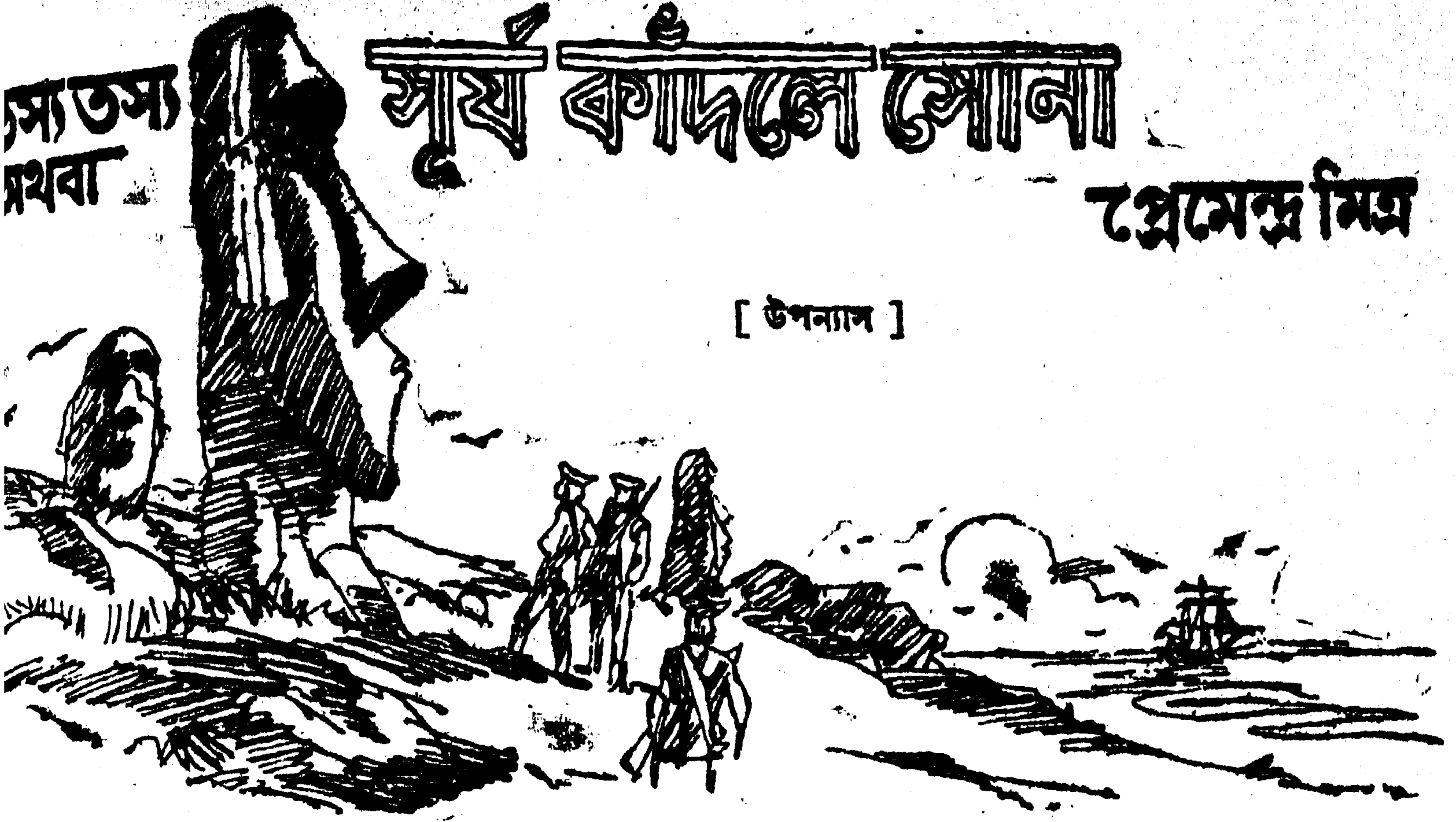
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মুখের দরজা বন্ধ হল কেমন

রলে ?

বিয়া আর হেরাদা অন্ধকার প্রেত
র চারিদিকে সাজানো নানা
ঐশ্বর্যবিলাসের উপকরণের মধ্যে
তে খেতে দরজার দিকে ব্যাকুল-
টবার চেষ্টা করেছে। দরজার
যারা ছিল সেই সওয়ার-
কোন একজনের বন্ধ দরজার
ত করাঘাতের শব্দই নিশানা
র সকলের।

প্রাসাদের বাইরেও তখন একটা
বেধেছে। সোরাবিয়ার সঙ্গে
গ এসেছিল, তারা, হেরাদা ও তার
র হঠাৎ এমন করে এ জায়গায়
হওয়ায় উৎসুক ও উত্তেজিত
পারটা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা
হঠাৎ তাদের ভেতর দিয়ে একটা
যেন বয়ে গিয়েছে।

দের মধ্যে তন্ময় হয়ে
করছে করতে প্রেতপ্রাসাদের
হঠাৎ সশব্দে বন্ধ হওয়াই তাদের
জাগ করে তুলেছিল। দরজা বন্ধের
দর পরই কাছাকাছি খুঁটি পুঁতে
াধা তাদের ঘোড়াগুলো যেন ক্ষেপে
মনে হয়েছে। ঠিক নেকড়ের পালের
পড়ার মত আতঙ্কের ডাক ছেড়ে
হয়ে লাফালাফি করে তারা যেন
বাঁধন ছিঁড়েই সব যেদিকে খুশি
ছুটে পালিয়েছে।

কে খোঁজ নিতে যাবে কি, ওদিকে
র দরজার ওপর তখন আকুল
যা পড়ছে ভেতর থেকে।

সেপাইদের ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতেই বেশ কিছুটা সময় গেছে। সব গোল মেটাতে আরো অনেক বেশী।

গুহামুখের দরজার বাইরে থেকে দেওয়া হুড়কো খুলে দিয়ে সোরাবিয়া ও হেরাদার সঙ্গে আটকপড়া সওয়ার সেপাইদের বার করবার পর ঘোড়াগুলোর খোঁজ পাওয়া সহজ হয় নি। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেছে ঘোড়াগুলো নিজে থেকে দড়িদড়া ছেঁড়ে নি। খুঁটিতে বাঁধা তাদের দড়িগুলো সব কাটা।

এদিকে ওদিকে পালানো ঘোড়াগুলো প্রায় সবই শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা গেছে। যায় নি শুধু দুটো। মার্কুইসরূপী সোরাবিয়া আর দলপতি হেরাদার সেরা ঘোড়া দুটোই একেবারে নিখোঁজ।

সে ঘোড়ায় চড়ে কারা যে পালিয়েছে তার হদিসও পাওয়া গেছে। সোরাবিয়া আর হেরাদার সঙ্গে যারা এ প্রেতপ্রাসাদে এসেছিল তাদের মধ্যে শুধু ফিলি-পিলিওর কোনো পাত্তা নেই। আর হুয়ানো কাপাক-এর শবদেহে পরানো রাজবেশটা প্রেতপ্রাসাদের বাইরে ঘোড়াগুলো যেখানে বাঁধা ছিল তারই কাছাকাছি ছেড়ে ফেলা খোলসের মত পড়ে আছে।

পালিয়ে যাওয়া সব ঘোড়া খুঁজে পেতে ধরে এনে জড় করতে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ভোরের সেই আবছা আলোতেই হেলায় ফেলে-যাওয়া সোনা-রূপোর কাজে জমকালো রাজবেশটা দেখে সোরাবিয়ার দু চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়েছে।

রাজবেশের খোলস ফেলে যাওয়ার রহস্য সে তার শয়তানী বুদ্ধিতে কিছু আঁচ করতে পেরেছে কি?

মেঘ ছোঁয়া উত্তুঙ্গ পাহাড় চূড়ার রাজ্য তাহুয়ানতিনসুয়ু। তার ইতিহাসের চরম বিপর্যয়ের সঙ্গে যিনি জড়িত তাঁর কাহিনী ও দেশের জলপ্রপাতের মতই এবার মন্থর থেকে দ্রুত হয়ে মালভূমির ঊর্ধ্বলোক থেকে সবেগে সমতলে নেমে গিয়েছে।

প্রেতপ্রাসাদের সামনে বিমূঢ় অস্থির সওয়ার সৈনিকের দল যখন সোরাবিয়া আর হেরাদার নির্দেশে তাদের পলাতক ঘোড়ার সন্ধান করছে কোরিকাঞ্চার সাময়িক ফৌজী আস্তানা হিসেবে দখল-করা অতিথিশালায় তখন বেশ একটু সাড়া পড়ে গিয়েছে।

সাড়া পড়েছে ফিলিপিলিওর জন্যে। সে যেন হেরাদার কাছ থেকেই খবর পেয়ে তার হুকুমে সোসা থেকে হুয়াসকারের হত্যার খবর-আনা দূতের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। সঙ্গে আবার একজন কোরিকাঞ্চার ছোট মোহান্তকেও আনতে ভোলে নি। হেরাদার তাকে এ কাজে পাঠান অবশ্য স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে সকলের। দূত হিসেবে যে এসেছে সে প্রথম এখানে এসে তার কথা সম্পূর্ণ বুঝে বোঝাবার মত দোভাষী কাউকে ত পায় নি। কোন রকমে হুয়াসকার আর ভিলিয়াক উমুর নামগুলো বার বার উচ্চারণ করে মূক অভিনয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছে।

এখন ফিলিপিলিও তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিতে পারবে। কোরিকাঞ্চার ছোট একজন মোহান্তকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে সেই উদ্দেশ্যে। সোসার দূতের কাছে রাজপুরোহিত ভিলিয়াক উমু সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার জন্যে এরকম একজনকে দরকার।

হেরাদা সোসার দূতের আনা খবর ভাসাভাসা ভাবে বুঝে ব্যস্ত হয়ে মার্কুইস-এর খোঁজে প্রেতপ্রাসাদের উদ্দেশে যাবার আগে তার অধীন যে সৈনিকের ওপর

আস্তানার ভার দিয়ে গেছল সে ফিলি-পিলিও বা তার সঙ্গীকে সন্দেহ করবার কথা কল্পনাই করে নি। সন্দেহ করবার কোন কারণই অবশ্য তার ছিল না। এসপানিওল বাহিনীতে বিশেষভাবে সম্মানিত ও একান্ত বিশ্বাসী দোভাষীর এরই মধ্যে কি গভীর রূপান্তর হয়েছে তা আর সে জানবে কেমন করে?

অতটা নিশ্চিন্ত বিশ্বাস না থাকলে সোসার দূতকে ফিলিপিলিও ও তার সঙ্গীর সামনে এনে হাজির করবার পর একটা জিনিস অন্তত সে লক্ষ্য করত। চেষ্টা করা সত্ত্বেও ফিলিপিলিওর সঙ্গীর মুখে এক সঙ্গে বিস্ময় আনন্দ তার উত্তেজনার অস্থির অদম্য প্রকাশ তার দৃষ্টি তাহলে বোধহয় এড়াত না।

ফিলিপিলিওর সঙ্গী যে কে তা বোধ-হয় আর বলবার দরকার নেই। কিন্তু সোসার দূতকে দেখে তাঁর সহসা ভাবাবেগে অমন উদ্বেল হয়ে ওঠার কারণ কি?

কারণ এই যে সো
নে এসেছে সে আর বে
কাক্সামালকা থেকে সোনাবরম
কুজকোয়ে এসেছিল সেই
ঘোড়ার-পায়ে-ছুঁওয়া তম্বে
রাজপুরোহিত ভিলিয়াক
থেকে পালিয়ে এসেছে যে

কিন্তু কেন তাকে পা
হয়েছে? দূত হিসেবে যে
সে এসেছে তা কি সত্য?

সমস্ত বিবরণই কয়ার
শোনা গেছে। কিন্তু কো
আস্তানায় নয়, কুজকো থে
যাবার পথে।

সে দুর্গম পার্বত্য
তেজীয়ান ঘোড়া সওয়ার নি
তখন কাক্সামালকার দিকে
একটির ওপর সওয়ার হয়ে
কয়া-কে নিয়ে গানাদো।
চালাচ্ছে ফিলিপিলিও।

প্রাণপণ বেগে ঘোড়া
ছুটছে বটে তবু নেকড়ে
পেছনে ধাওয়া-করা সোরা
সওয়ার বাহিনীকে এড়িয়ে
সম্ভব হবে?

সোরাবিয়া ও হেরাদার
অনুসরণে রওনা হতে একট
হয়েছে। প্রেতপ্রাসাদের দ
ফিলিপিলিওকে নিয়ে বার হা
বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্র
খোলাতে কিছু সময় গেছে, ত
বেশী গেছে গানাদো আর ফি
সব ঘোড়ার বাঁধন কেটে ছে
সেগুলি আবার খুঁজে আন

সওয়ার দলের সকল
সোরাবিয়া হেরাদার সঙ্গে
দুটি ঘোড়ায় চড়ে আগের র
ফৌজী আস্তানায় যখন
সকালের প্রথম আলো কো
মন্দিরের মাথায় এসে লেগে

সেখানে এসে খবর যা
তা সত্যিই ক্ষেপিয়ে দেবার

হেরাদা যার ওপর
দিয়ে গেছল সেই অধীন
কাঁপতে কাঁপতে জানিয়েছে
পিলিওকে অবিশ্বাস কর
ভাবতে পারে নি। হেরাদার
সে এসেছে মনে করে নিশ
তাকে আর তার সঙ্গীকে
কাছে বিস্তারিত বিবরণ
ছেড়ে দিয়ে গেছে। তারপর
তাদের খোঁজ করতে এসে দো
শালায় তারা কেউ নেই।
কুজকো শহরের চারিধারে
কাঁটিয়েছে তন্ন তন্ন করে। ও
পাওয়া যায় নি। শুধু ভাঁ
কুজকোবাসীর মুখে ইসারায় খ
তাতে সন্দেহ হয় দুটি
কুজকো থেকে কাক্সামালকার
তিনজনকে যেতে দেখা গেছে
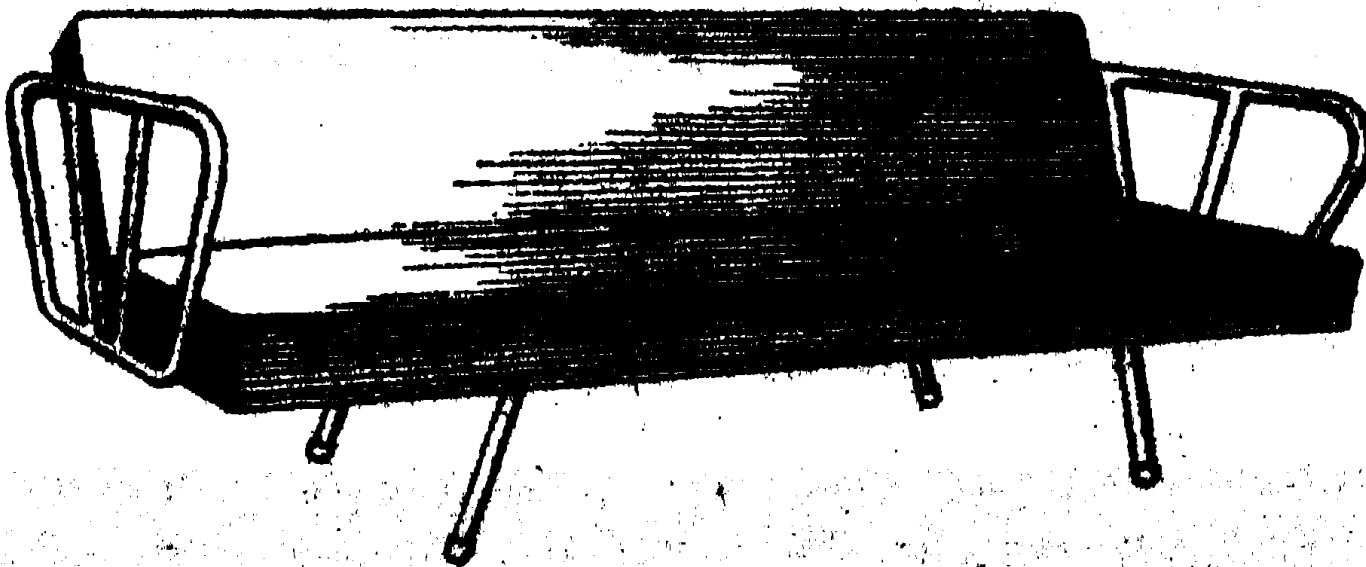
রাবিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করে আর বৃথা
নষ্ট করে নি। তার প্রচণ্ড রাগ শুধু
জী কুৎসিত গালাগাল আর হতভাগা
রীর গণ্ডে একটি বিরাশি সিক্কার
মাতে প্রকাশ করে হেরাদাকে নিয়ে
মুহূর্তেই সে কাক্সামালকার পথে
হয়েছে সমস্ত সওয়ার দল নিয়ে।

লাতক দল কয়েক দণ্ড আগে যাত্রা
পেরেছে ঠিকই। কিন্তু কতক্ষণ তারা
থাকতে পারবে। দুটি মাত্র ঘোড়া
সম্বল। এসপানিওল রিসালার মত
ঘোড়া তাদের সঙ্গে নেই। নেই
আর ঘোড়ার দানাপানির ব্যবস্থাও।
কটি ঘোড়ায় সওয়ারী আবার তাদের
।

ত তাড়াতাড়িই রওনা হয়ে প্রাণপণে
ছোটাক না কেন, কাক্সামালকা
বার আগেই তারা ধরা পড়তে বাধ্য।
থের কোথাও কোন ফ্যাকড়াও নেই যে
দয়ে পালাবার চেষ্টা করবে। কুজকো
কাক্সামালকায় নামার পাহাড়ী দুর্গম
র্গ পথ ওই একটিই।

সারাবিয়া আর হেরাদার অনুমান
ই নির্ভুল।

নিজের ঘোড়ার পিঠে কয়াকে নিয়ে
পিলিওর সঙ্গে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি
মালকার দিকে নামতে নামতে গানাদো
ই সে কথা ভাল করে বুঝেছেন। তাঁরা
নিওল রিসালার দুটি সেরা ঘোড়া
ছেন ঠিকই। কিন্তু শুধু এই দুটি
নিয়ে সোরাবিয়ার এসপানিওল
র দলের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান বেশী-
বজায় রাখা যাবে না।

সোনাবরদার দলে যে তার সঙ্গী
ছল সেই পাউললো টোপা থাকলে এই
পাহাড়ী পথেও শুধু ইংকা বংশের
দের জানা গোপন লুকোবার জায়গার
দিতে পারত। কিন্তু ফিলিপিলিও
ন্য একজন নাগরিক মাত্র, অভিজাত
রও নয়। সে এসব আস্তানার কিছুই
না। কন্যাশ্রমের চার দেয়ালের মধ্যে
তা সূর্যকুমারী হিসেবে কয়ার ত এসব
জানবার সুযোগই হয় নি জীবনে।

পেছনে হিংস্র নেকড়ের পালের মত
আসছে তাদের হাতে ধরা পড়া
বার্য জেনেও গানাদো অবশ্য আত্ম-
ণের জন্যে প্রস্তুত হন নি। তাঁর
র সঙ্গে লগ্ন কয়া-র কোমল দেহের
উত্তাপ সমস্ত শিরায় শিরায় প্রবাহিত
রাতে অনুভব করে চরম হতাশার
ও আসন্ন ভয়ঙ্কর নিয়তি ঠেকাবার
য়ের কথা ভেবেছেন।

ইতিমধ্যে কয়ার কাছে সোনার নিদারুণ
র্যের বৃত্তান্ত বিশদভাবে শুনেছেন।
ার পিঠে তাঁকে দু বাহুতে বেষ্টন করে
নে বসে 'কয়া' তাঁর কানের কাছে মুখ
সে বিবরণ শুনিয়েছে।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক উমু প্রথমে
সকারকে কয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও

বিরূপ করে তোলবার চেষ্টা করেন। কোরা-
কেঙ্কুর দুটি পালক আর ইংকা-নরেশের
উষ্ণীষের রক্তিম ল্লান্টুর টুকরোটুকুর দরুন
সে চেষ্টা বিফল হবার পর তিনি যে
অমন পৈশাচিক চক্রান্ত করবেন কয়া তা
ভাবতে পারে নি। সে সন্ধ্যায় ভিলিয়াক
উমুর সামনে হুয়াসকারকে তার অভিজ্ঞান
দেখিয়ে সে নিজের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেয়
তার পরের দিন ভোর না হতেই সে আবার
গিয়েছিল হুয়াসকারের বিশ্রামকক্ষে তাঁর
সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। গানাদোর শিখিয়ে
দেওয়া কয়েকটি কথা গোপনে হুয়াসকারকে
তার বলার ছিল।

হুয়াসকার তখনও তাঁর কারা নিবাসেই
আছেন। তাঁর কক্ষদ্বারে কোন প্রহরী
কিন্তু নেই। আতাহুয়ালপার নির্দেশে রাজ-
পুরোহিতকে বাধ্য হয়ে যে হুয়াসকারকে
মুক্তি দিতে হয়েছে এইটিই তার একটি
নিদর্শন মনে হয়েছে কয়ার। নিশ্চিন্ত মনে
ভেতরে গিয়ে ঢোকবার পর তাই সে
স্তম্ভিত বিহ্বল হয়েছে অত বেশী।
বিশ্রামকক্ষের দরজাতেই হুয়াসকারের
রক্তাক্ত মৃতদেহ তার চোখে পড়েছে। পিঠের
দিকে বেঁধানো ছুরিসমেত হুয়াসকারের
মৃতদেহ যেভাবে সেখানে পড়ে আছে তাতে
একবার দেখলেই মনে হয় যে, হুয়াসকার
অসন্দিগ্ধভাবে বিশ্বাসযোগ্য কারুর সঙ্গে
আলাপ সেরে বিদায় নেবার সময়ই পৃষ্ঠে এ
ছুরিকাঘাত পেয়েছেন।

কয়া সরল অনভিজ্ঞ হলেও নির্বোধ
নয়। তীক্ষ্ন সহজ বুদ্ধিতে সে পৈশাচিক
চক্রান্তটা হুয়াসকারকে এভাবে নিহত
অবস্থায় আবিষ্কার করা মানে সমস্ত
অপরাধ নিজের ওপর নেওয়া। সে যত
তাড়াতাড়ি সম্ভব হুয়াসকারের সঙ্গে
পরামর্শ করতে আসবে জেনেই বোধহয়
রাজপুরোহিত আগের রাত্রে এ ফাঁদ পেতে-
ছিলেন। বিশেষ প্রয়োজনে একলা দেখা
করবার ছুতোয় এসে গভীর রাত্রে ভিলিয়াক
উমুই বিদায় নেবার সময় পিছন ফেরার
পর হুয়াসকারকে কাপুরুষের মত হত্যা
করেছেন এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।
তারপর কয়াকেই এ হত্যার জন্যে দায়ী
করার ব্যবস্থা করেছেন। এক ঢিলে তাতে
দু পাখি মারবার সুবিধে হয়েছে। পথের
কাঁটা হিসেবে হুয়াসকার দূর হয়েছে নিহত
হয়ে, আর আতাহুয়ালপারও সর্বনাশের
আয়োজন হয়েছে তিনিই দূতী পাঠিয়ে এ
কাজ করিয়েছেন বলে প্রমাণের ব্যবস্থা
করে।

কয়া একটু বেশী ভোরে আসার
দরুণেই বোধহয় হাতে হাতে ধরা পড়ার
ব্যবস্থাটা এড়াতে পেরেছে। রাজপুরোহিত
তাঁর সাজানো ভূমিকাটা নিতে আসার জন্যে
তখন বোধহয় তৈরী হচ্ছেন।

আর এক মুহূর্ত সেখানে অপেক্ষা
করেনি কয়া। শুধু নারীবেশের বদলে
সোনাবরদার হিসেবে যে সাজে এসেছিল তাই
পরে সে গুপ্ত গিরিপথে কুজকোতে রওনা
হয়েছে। অমূল্য অভিজ্ঞান, কোরাকেঙ্কুর
পালক আর ল্লান্টুর টুকরোর দরুণ সে
পথে কোথাও কোন বাধা তাকে পেতে
হয় নি।

(ক্রমশঃ)

স্বয়ং শরীর তার চিন্তা করে ॥

বিষ্ণু দে

কোথায় যে অন্ধকারে পালাল সে!
তার বাগ্মী রক্তধারা শুচি দুই কপোলে মুখর,
এবং এমনই স্বচ্ছ তার শিরাধমনীর ক্রিয়া
যে বুঝি দেখাই যায়, স্বয়ং শরীর তার চিন্তা করে।

কোথায় উধাও তন্বী? সেখানে কেউ কি স্থির ব'সে
দেখে তার ভাষা, বোঝে কার স্পষ্ট স্বর?

রক্তিম উদয়-অস্তে সে কোণার্কে ব'য়ে যায়
স্বচ্ছ নিরাখিয়া?
বিশুদ্ধ চৈতন্যে নাচে কীর্তনীয়া মুগ্ধ শত পাথরে
পাথরে?

সেই প্রবণতা থেকে ॥

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সেই প্রবণতা থেকে
আমি একটা ভাস্বর দিগন্ত খুঁজে যাই।
রাঙা মাটি, রেলের সাঁকো, শালবনের ছায়ার নাগালে
দাঁড়িয়ে আকাশ দেখি। পাহাড়ী নদীর ঢলে
আলো জ্বলে; আলো জ্বলে অরণ্যে, পাহাড়ে।
আলো, অন্ধকারের রোশনাই
যদি হতো! যদি হতো হৃদয়ের রঙ মমতার!

সবুজ পাতারা হয় জীবনের মতোই ধূসর;
মলিন বিবর্ণ হয় ফুলেদের রঙ। এক ঝলকায়
কেউ অন্য পারে নিয়ে যায়। নদীর ওপারে
কতো রঙ—হলুদ, রক্তিম; গাছগুলি ফুলে ভরা;......
অথচ এপারে আবছা ধূসর যে সব।

এরা কি জীবন্ত নয়? নাকি এরা
জীবনকে অস্বীকার করে? নক্ষত্রেরা
ফুলের মতোই ফোটে; জোনাকিরা গাছে ঃ
জীবনের জটিলতা বাড়ে।

কেউ পথেই আস্তানা খোঁজে, কেউ খুঁজে পেয়েছে
মরূদ্যান; কেউ বুকে তৃষ্ণা নিয়ে
প্রত্যাশায় ঝর্ণা নদী উৎসের সন্ধানে দিশাহারা,
ক্রমাগত পথ হাঁটছে। অথচ প্লাবনে
অঢেল জলের রাজ্যে বেহুলার বাসর।

সেই প্রবণতা থেকে
আরেক দিগন্তে খুঁজি চিত্তের উদ্ভাস। আলো
কোন দিকে? আলো, অন্ধকারের রোশনাই
যদি হতো! যদি হতো হৃদয়ের রঙ মমতার!

...জ্ঞানের কথা / হৃদ্‌রোগের প্রতিষেধক

...সাপ সম্পর্কে মানুষের মনে
...াভাবিক ভীতি আছে। এই ভীতি
... নয়। কারণ বিষধর সাপ মানুষকে
... তার বিষ-ক্রিয়ায় বেশির ভাগ
...্যু ঘটে। যে সাপের বিষ মানুষের
...এত মারাত্মক সেই বিষ মানুষের
...ারাত্মক ব্যাধি প্রতিষেধে সহায়তা
... পারে—একথা শুনলে সকলেই
... হবেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সাম্প্র-
...বেষণায় এক শ্রেণীর বিষধর সাপের
...কে এমন একটি ভেষজের সন্ধান
... গেছে যা মানুষের হৃদরোগের
...ক হিসাবে বিশেষ কার্যকর হতে

...রোনারী থ্রম্বোসিস বর্তমানে মানুষের
...মারাত্মক ব্যাধি। এই কাল-রোগে
... হয়ে দেশ-বিদেশের কত মনীষী
...ন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে-
... এই মারাত্মক হৃদরোগ থেকে
... রক্ষা করার কোনো কার্যকর
...ক এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।
...ই বিষয়টির প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি
...ন থেকেই পড়েছে। সম্প্রতি মালয়
...'পিট ভাইপার' নামে একটি বিষধর
...বিষ থেকে তাঁরা এমন একটি ভেষজ
...ার করেছেন যা করোনারী থ্রম্বো-
...তিরোধে বিশেষ কার্যকর হতে পারে
... প্রমাণিত হয়েছে। এই ভেষজটি
...ন' নামে অভিহিত।

...মরা জানি, ধমনী ও শিরায় রক্ত
...বেঁধে যাওয়ার ফলেই করোনারী
...সিস ও অন্যান্য হৃদরোগে মৃত্যু ঘটে
... অন্যদিকে কোনো সাপ যখন কাউকে
... তখন সে আক্রান্ত দেহে যে বিষ
...বিষ্ট করায় তা রক্তের জমাট বাঁধা
... করে দেহে দ্রুত সঞ্চারিত করতে
... করে। কাজেই সাপের বিষের এই
...রিত্র, হৃদরোগ প্রতিরোধের পক্ষে
... হতে পারে। এই বিষয়টি মনে
...বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকে সাপের
... হৃদরোগের প্রতিষেধক হিসাবে
...রের চেষ্টা করে আসছেন। এবিষয়ে
...ল গবেষণার পর সম্প্রতি মালয়
...ালয় এবং বৃটেনের লিভারপুলে
...অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর একদল
...ী মালয় দেশীয় পিট ভাইপারের
...থেকে 'আরভিন' নামে যে ভেষজটি
...ন করেছেন তা হৃদরোগে আক্রান্ত
... ওপর প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া
... তবে আরভিন-এর কার্যকারিতা
... সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু

সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এবিষয়ে প্রকৃত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং হৃদ-রোগের প্রতিষেধক হিসাবে আরভিনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

বর্তমানে যেসব ভেষজ হৃদরোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাদের কতকগুলি অসুবিধা আছে। আরভিন-এর ক্ষেত্রে অসুবিধা অনেক কম। রক্তের জমাট-রোধক হিসাবে আরভিনের কার্যকারিতা একটু অভিনব। মানুষের রক্তে 'ফিব্রিনো-জেন' নামে এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন থাকে। রক্ত যখন জমাট বেঁধে যায়, তখন 'ফিব্রিন' নামে একটি যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়ে ফিব্রিনোজেন অধঃক্ষিপ্ত হয়। জমাট রক্তের অন্যতম উপাদান হচ্ছে এই ফিব্রিন। অন্যান্য উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়ন, প্রোথ্রম্বিন, ও থ্রম্বোপ্লাস্টিন। ফিব্রিনোজেন যখন 'ফিব্রিন'-রূপে অধঃ-ক্ষিপ্ত হয়, তখনই রক্ত জমাট বেঁধে যায়। আরভিন রক্তের সমস্ত ফিব্রিনোজেনকে ফিব্রিনে পরিণত করে। কাজেই মনে করা যেতে পারে, আরভিন রক্তের জমাট বাঁধাতেই সহায়তা করে। কিন্তু আরভিনের কার্যকারিতার অভিনবত্ব হল এই যে, সেটি যখন কাজ করে তখন রক্তের জমাট বাঁধায় অন্যান্য উপাদানগুলির কোনটিই কাজ করে না। ফলে রক্ত আর জমাট বাঁধে না। রক্তের সমস্ত ফিব্রিনোজেন একবার অধঃ-ক্ষিপ্ত হয়ে গেলে রক্ত আর জমাট বাঁধতে পারে না। কারণ, তখন আর ফিব্রিনোজেন থাকে না বলে রক্ত জমাট বাঁধে না।

এখনও পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার মতো আরভিনের কার্যকারিতা দেখা যায়নি। তবে এর কার্যকারিতা যে দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী তা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন শ্রেণীর রক্ত বিশিষ্ট মানুষদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া একই রকম এবং রক্তের জমাট-রোধক হিসেবে এটি ব্যবহার করাও সহজ। অন্যান্য প্রতিষেধকের তুলনায় এটি মারাত্মক রকমের আন্তঃক্ষরণও কম ঘটায়। কাজেই রক্তের যে জমাট বাঁধা ইতিমধ্যে ঘটেছে তা দূরীকরণ এবং নতুন জমাটবাঁধা রোধের কাজে এটি সহায়ক হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

লণ্ডনের রয়েল পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডি-ক্যাল স্কুলে ৯জন এবং অক্সফোর্ডের হাসপাতালে ১৯জন হৃদ্‌রোগীর ওপর আরভিন প্রয়োগ করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। তাই এ আশা করা দুরাশা নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে হৃদরোগ প্রতিষেধে আর-ভিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

আজকের গৃহপালিত পোষা গরু, ঘোড়া দেখে তাদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা করা শক্ত। তবে মিউনিখের হেলাব্রাউন পশুশালায় গেলে তাদের স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। এই অসাধ্য-সাধন করেছেন পশুশালার তত্ত্বাবধায়ক হাইন্স হেক।

গরু ও ঘোড়ার বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে হেক এই অসাধ্যসাধনে সমর্থ হয়েছেন। প্রজননতত্ত্বে নীতি অনু-সারে এগিয়ে না গিয়ে হেক এক এক বংশ করে পেছিয়ে গিয়ে সৃষ্টি করেছেন গো-জাতির পূর্বপুরুষ আরোখ নামে জীবটিকে। পরিচিত সম-সাময়িক বর্ণনানু-যায়ী এই আরোখের প্রচুর মিল আছে। গৃহপালিত গরুর থেকে আরোখ ছিল আকারে অনেক বড়। তাদের পাগুলি ছিল যেমন লম্বা, শিংগুলি তেমনি শক্তিশালী। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ আরোখের রঙ ছিল কালো এবং তাদের পিঠে দেখা যেত ফিকে হলদে রঙের ডোরা এবং গাভীগুলি হোত লালচে বাদামী। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পেটের রঙ ছিল সাদা এবং শিংয়ের ডগা হোত কালো। আরোখ ষাঁড়ের স্বভাব ছিল হিংস্র ও বদমেজাজী ও সবৎসা গাভী-গুলিও হোত খুব বিপজ্জনক। আরোখদের একটি গুণ ছিল এবং সেটা হোল গৃহ-পালিত গরুদের যেমন অসুখ-বিসুখ হয়, তাদের তা হোত না।

হেকের সৃষ্ট আরোখদের মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য পুরোমাত্রায় বর্তমান। আরোখ সৃষ্টির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে হেক এবং তার ভাই ঘোড়ার লুপ্ত পূর্বপুরুষ টারপাম সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়েছেন।

•

সংবাদে প্রকাশ পশ্চিম জার্মানী মহাকাশে প্রথম যে জীবন্ত প্রাণীগুলি পাঠাবে, তারা হচ্ছে চারটি জোঁক যাদের মোট ওজন এক আউন্সের এক-তৃতীয়াংশের বেশী নয়। আজ এক বছর হোল মহাকাশে যাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষাদান চলেছে।

ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও এই জোঁকদের রক্ষক রবার্ট লোটজের মতে মহাকাশ যাত্রী হিসাবে জোঁকরা খুবই উপযুক্ত কারণ তারা বিনা খাদ্যে দেড় বছর অক্লেশে বেঁচে থাকতে পারে। এছাড়া তাদের দৈহিক পরিবর্তন ও ক্যালসিয়াম হ্রাসের ফলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা মানব

নানাভাবে কল্যাণ সাধন করে থাকে। নানা রোগের হাত থেকে তারা আমাদের রক্ষা করে। দ্বধকে দইতে এবং আঙ্গুরের রসকে মদে পরিণত করে। কিন্তু এই আন্বীক্ষণিক জীবদের স্বাদ অসংখ্য রকমের। তাদের মধ্যে কতকগ্বলির স্বাদ কাঠ, গ্যাস, তেল এবং পিট কয়লার মতো। এই অস্বাদ্ব জিনিসগ্বলিকে আত্মসাৎ করে তারা সেগ্বলিকে প্বষ্টিকর অ্যালব্বমিনে পরিণত করতে পারে।

কৃত্রিম উপায়ে অ্যালব্বমিন প্রস্তুতের প্রণালী হচ্ছে : জল, তরল পেট্রোলিয়াম প্যারাফিন এবং খনিজ লবণের মিশ্রণ একটি বিশেষ ধরণের আধারে প্রথমে ভর্তি করা হয়। ঈস্ট থেকে উৎপন্ন এক জাতীয় ব্যাকটিরিয়া তারপর এতে যোগ করা হয়। প্যারাফিন আত্মসাৎ করে ঈস্ট প্বষ্টি লাভ করে। সবশেষে সেগ্বলি বেছে নিয়ে ধোয়া ও শ্বকানো হয়। এইভাবে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তা হল অ্যালব্বমিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ, শর্করা জাতীয় পদার্থ, খনিজ লবণ এবং ভিটামিনের মিশ্রণ।

এইভাবে উৎপন্ন অ্যালব্বমিন খাদ্যর্বপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এইভাবে ভবিষ্যতে বিপ্বল সংখ্যক জনতার চাহিদা মেটাবার মতো কৃত্রিম খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। তখন আর প্রকৃতির ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে মান্বষকে বে'চে থাকতে হবে না।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃগয়া

রাতের শহ

'অমিত দা......দাঁড়ান'। রাত তখন প্রায় ৯টা। উল্টোডাঙ্গার কাঠপোল পেরিয়ে দেশ-বন্ধু পার্কের দিকে এগোচ্ছিলাম। পথের দুধারের ধুলোমাখা রুক্ষ গাছগুলির পাতায় পাতায় অন্ধকার বাদুড়ের মতো দোল খাচ্ছে। কিছুদূরে থেকে আবার কণ্ঠস্বর ছুটে এল. 'অমিতদা, দাঁড়ান একটু।' কিছুক্ষণ আগে জমাট বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ মেঘে মুখিয়ে আছে, যে কোন সময়ে আবার ফেটে পড়তে পারে। বড় বড় পা চালিয়ে হাঁট-ছিলাম। শুনতে পাচ্ছেন না নাকি: দ্রুত পদধ্বনি, কানের পাশে শাড়ীর খস্ খস্, নিঃশ্বাসের দীর্ঘ ওঠা-নামা, তারপরই একটি যুবতী মূর্ত্তি একেবারে আমার পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। আরেকটু এগিয়ে একটা লাইট-পোস্টের নীচে এসে ভালো করে তাকালাম। ঈপ্সিতা।

কুঙ্কুম গলে সারা কপালে যেমন তেমন ভাবে ছড়িয়ে আছে। চোখে-মুখে উশ্‌খুশ্‌ চুলের ফেঁসা উড়ছে ঘামে লেপটে যাচ্ছে। ব্লাউজের একটা হাতা খুবলে ছিঁড়ে নিয়েছে কেউ, ব্রাসিয়ারের ফিতে লটান জেগে উঠেছে। ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাওয়া শাড়ী। শায়ার লেস ছিঁড়ে স্যান্ডেলের ওপর ঝুলছে। মুখ-মন্ডলে, গ্রীবায় নখের আঁচড়ের এলোপাথাড়ি দাগ। এ কি চেহারা হয়েছে ঈপ্সিতার ?

ওর কাঁধে আলতোভাবে একটা হাত রেখে বললাম, 'কি ব্যাপার বলো তো'? ম্যারাথন রেসের শেষে একেবারে ফুরিয়ে যাওয়া মানুষের মতো আমার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ল ঈপ্সিতা। রাস্তা ঘাটে তখনও দুচারজন পথচারী চলাফেরা করছে। কেউ বা কৌতূহলী হয়ে কাছে পিঠে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বেশ একটু অস্বস্তি বোধ কর-ছিলাম। মরিয়া গলায় বললাম, 'কোথায় যাবে এখন'? কোন উত্তর না দিয়ে ঈপ্সিতা আঙুল তুলে পার্কের গেট দেখাল।

বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পার্ক প্রায় ফাঁকা। দুধারের দুটি গুমটিতে কয়েকজন লোক দূরে দূরে ইতস্ততঃ আলো, ভিজে ঘাস—সব মিলিয়ে দেশবন্ধু পার্কে কেমন ঝিমুনি নেমেছে। একটি আধ-ভিজে বেঞ্চ রুমালে মুছে দুজনে বসলাম। মাঝে মাঝে সারা শরীরে শিরশিরেনি জাগিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল। বড় মুক্তোর দানার ছাঁদে আমাদের জামায় দেহে ফোঁটাফোঁটা বৃষ্টি গাছের পাতা বেয়ে খসে পড়ছিল। আমার প্রায় গা ঘেঁষে সেই ছোটবেলার ফ্রকপরা কিশোরীর মত বসে আছে ঈপ্সিতা। আমাদের আরপুলি লেনের প্রাইজ-গার্ল ঈপ্সিতা।

একসময় ওদের বাড়ীর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল আমার। ওর দাদা বীরেন আমার ক্লাশ-মেট ছিল। বার-দুয়েক ইন্টার মিডিয়েট-এ ফেল করে বীরেন হঠাৎ একদিন বোম্বে ফিল্মে নায়ক হতে চলে যায়। পরের বছর, দিন পনেরোর অসুখে স্ত্রী আর দুই মেয়ে ঈপ্সিতা ও ঈশিতাকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়ে রেখে চোখ বোজেন সদাগরী অফিসের সাধারণ মাইনের কেরাণী তারক দত্ত। বীরেন যাওয়ার পর থেকেই ওদের বাড়ীর
আমার যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আস
বর্তমানে একেবারেই নেই। তাই
ঈপ্সিতা অমন পড়ি-মরি করে আমায় ডাব
কেন আর এখানে এসে এমন চুপচাপ
নীচু করে কেনই বা বসে রয়েছে, ঠা
উঠতে না পেরে রীতিমত বিব্রত বোধ
ছিলাম। বেশ কিছুটা সময় এভাবে
যাওয়ার পর বাড়ী ফেরার তাড়া গলায়
বললাম, 'কি ব্যাপার, বলবে তো?' ঠা
নিষ্প্রাণ গলায় ঈপ্সিতা উত্তর দিল, 'সে জ
তো আপনাকে ডেকে এনেছি।' ভালো
চেয়ে দেখি, ওর চোখের নীচে রাজ্যের ক
দুখের ভিমেলা আদল ভেঙে কেমন ল
হয়ে এসেছে: আমার হাতের ওপর রাখা
তামহাতটির পাতায় দু-একটি শিরা-উপ
জাগ দিয়ে উঠেছে।

ফ্রকের বয়েস ছেড়ে দূরে যেতে
যেতেই আরপুলি লেনের একডাকের নাম
উঠেছিল ঈপ্সিতা। ডাঁশা পেয়ারার ঔজ্জ
নিয়ে যেমন তেমন করে ওর চাবুকের ম
ছিপ্‌ছিপে শরীরে শাড়ী জড়িয়ে ঈপ
যখন সটান, গ্রীবা সোজা করে রাস্তা
হেঁটে যেত, তখন আমার সমবয়সী বন্ধু
পর্যন্ত হাতের সিগ্রেট হাতে থেকে যে
প্রচণ্ড হৈ চৈ করা মেয়ে ছিল ঈপ্স
ওকে আমি দোলের সময় ছেলে-ছোকরা
সংগে টক্কর দিয়ে রং খেলতে দেখেছি,
অনুষ্ঠানে দরজায় দরজায় চাঁদা আদায় ক

দেখেছি। অজস্র অনর্গল কথা বলত, যেদম হাসতে পারত, কোন ন্যাকামি বা প্যানপ্যানানির ধার দিয়ে যেতো না। ... ছোট বোন ঈপ্সিতা ছিল একেবারে উল্টোস্বভাবের। পারতপক্ষে বাড়ীর বাইরে বেরোত না। ঠাণ্ডা রোগা, নিরীহ ঈপ্সিতা বই আর মা—পৃথিবী বলতে এর বেশী কখনো জানতে চায়নি।

তারকবাবু যখন মারা গেলেন, ঈপ্সিতা তখন সবে কলেজে ঢুকেছে, ঈপ্সিতা ক্লাশ টেন-এ পড়ে। বীরেন তো আগের থেকেই উধাও। ওদের বাড়ী যাওয়া-আসা আমার অনেক দিন বন্ধ হয়ে এসেছিল। সরাসরি কোন যোগই ছিল না বলা চলে। তারকবাবুর মৃত্যুর পর সৌজন্য বজায় রাখতে একদিন গিয়েছিলাম। বীরেনের মায়ের সঙ্গে দু-চারটে কথাবার্তা বলে চলে আসি।

প্রথমে কানাকানি, ফিসফাস, তারপর সারা তল্লাট জুড়ে কেচ্ছার টালমাটাল ঢেউ। তারক দত্ত মারা যাওয়ার দুবছরের মধ্যে ঈপ্সিতাকে ঘিরে সমস্ত পাড়া মুখর হয়ে উঠল। সবই আমার কানে আসত। পাড়া-বেপাড়ার ক্লাব, অফিসে নাকি অভিনয় করে বেড়ায় ঈপ্সিতা। অনেক রাত করে বাড়ী আসে। মাঝে মাঝে দু-তিন দিনের জন্য একেবারে বেপাত্তা রয়ে যায়। কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। কোন রহস্যময় উপায়ে মৃত তারক দত্তের সংসার তেলের মতো চলছে। দু'একদিন গলির মোড়ে ঈপ্সিতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। একান্ত চোখে চোখ পড়ে গেলে একটু কেঠো হাসি হেসে মাথা নামিয়ে চলে যায়।

সেই ঈপ্সিতা এখন আমার পাশে ঘনিয়ে বসে আছে। আরপুলি লেনের বাসিন্দাদের কাছে নষ্ট, বরবাদ হয়ে যাওয়া ঈপ্সিতা। আমার চোখে চোখ পড়তেই আমার অধীরতা অনুমান করতে পারে যেন। খুসখুসে গলায় একটু চাপা কাশির শব্দ জাগে, তারপরই মরিয়া হয়ে বুকের ভেতরে একরাশ গুমরে মরা কথার দরজা খুলে দেয় সে।

আপনি কেন, পাড়ার সবাই ভাবছেন, আমি একেবারে বয়ে গেছি। জানি না আপনাদের অনুমান কতোখানি ঠিক, তবে দুবছরে আমার বয়েস অনেকখানি বেড়ে গেছে। নিজেকে নিজেই বুঝে উঠতে পারি না সব সময়। তবে সহজে হার মানিনি আমি। আপনারা মাঠে-ঘাটে মানুষের লড়াই দেখেছেন, কিন্তু একা একা সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে দেয়ালে পিঠ দিয়ে খালি হাতে লড়ে গেছি আমি। এ্যামেচার ক্লাবে অফিসে প্লে করে বেড়িয়েছি, কলেজ ছেড়ে ভর দুপুরে বাড়ী বাড়ী স্নো পাউডার জার্নাল বিলি করে ফিরেছি, ভীষণ টানাটানির সময়ে মডেল সেজে উপার্জন করেছি। বাড়ীর কারো গায়ে এক-ফোঁটা আঁচ লাগতে দিই নি। আগের মতো না হোক, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সংসার ঠিকই চলেছে।

একটানে এতগুলি কথা বলে হাঁপিয়ে উঠল ঈপ্সিতা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দম নিয়ে আবার ধীরে ধীরে বলতে সুরু করল।

উল্টোডাঙ্গার ভূপালী সঙ্ঘ সারা বছরই এখানে ওখানে নাটক অভিনয় করে। ক্লাবের ডিরেক্টর টুনু সেন আমার অভিনয় খুব পছন্দ করতেন, ফলে আমি ছিলাম ঐ ক্লাবের বাঁধা আর্টিস্ট। এক সন্ধেবেলা মহড়ার সময় দেখি, টুনুদা এক ফর্সা, গোলগাল চেহারার ভদ্রলোককে নিয়ে ঢুকলেন। মহড়ার সময় খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন তিনি। পরে টুনুদা তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বরুণ মজুমদার, তোমাদের ফেভারিট চিত্র-পরিচালকের বন্ধু। দু-চারটে কথার পর আমার চোখে চোখ রেখে বরুণবাবু সরাসরি প্রশ্ন করলেন, বেশ ফোটোজেনিক চেহারা আপনার, অভিনয়ও করতে পারেন মোটামুটি, ফিল্মে নামবেন? আমি জানি, বাড়ী ফিরলেই ঘর-বারান্দা-রান্নাঘর থেকে একটি মাত্র শব্দ ছুটে আসে, টাকা টাকা টাকা। অগ্রপশ্চাৎ আর বিবেচনা না করেই বরুণবাবুর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম।

দিন চারেক পর টুনুদার সঙ্গে টালিগঞ্জের এক ষ্টুডিওয় গেলাম। আমার স্ক্রিন টেস্ট হল, গলা মেলানো হল। দুরুদুরু বুকে ষ্টুডিওর লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি, টুনুদা এসে বললেন, 'কামাল করেছো তুমি। ফাউন্ড অল রাইট। বরুণ হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই নতুন ছবির কাস্টিং শেষ করে স্যুটিং সুরু
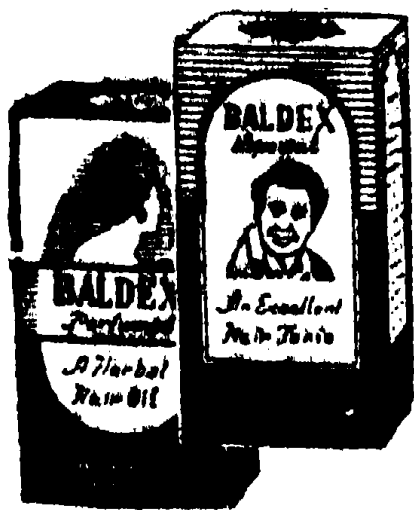
পিচোলা হ্রদ—উদয়পুর। ফটো : সাগর রা

করছে। কাজের মানুষ, ছাড়িস না, একটু লেগে থাকিস।'

টুনুদার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে রেখেছি। যখন তখন গিয়ে বিরক্ত করেছি বরুণবাবুকে। বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট না হয়ে উনি আমাকে ডিরেক্টারের কাছে নিয়ে গেছেন। তিনি আমার রোল বুঝিয়ে দিয়েছেন, আউট-ডোর স্যুটিং-এর সিচুয়েশন দেখানোর জন্য নিজে গাড়ী ড্রাইভ করে এখানে ওখানে নিয়ে গেছেন, এই ফাঁকে বরুণবাবু কত অনায়াসে 'আপনি' 'তুমি'-তে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন।

ফিল্ম লাইনের অনেক জ্ঞানী-গুণীর সামনে আমাকে ও একজন অভিনেতাকে নিয়ে ক্ল্যাপ-স্টিক ওপন করা হল। সব সময় বরুণবাবু আমার কাছে কাছে ছিলেন, মাঝে মাঝে পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে অভয় দিচ্ছিলেন।

মহরত হয়ে গেলে সন্ধেবেলা স্টুডিয়োর কাছেই একজনের বাড়ির লন আলোর আলোয় ইন্দ্রসভা হয়ে উঠল। পেল্লায় ককটেল পার্টি শুরু হল। একটি নিভৃত টেবিলে বরুণবাবু আমাকে নিয়ে বসলেন। নিজের গ্লাসে বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিলেন। তারপর আধ গ্লাস লাইমে কিছুটা জিন মিশিয়ে আমার হাতে তুলে দিলেন। চক্ষুলজ্জায় ওটুকু গিলে ফেলতে হল। নানা ছল ছুতোয় আমার গ্লাস কিছুতেই খালি রাখতে দিচ্ছিলেন না বরুণবাবু। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল, আচ্ছন্ন চেতনার মনে হচ্ছিল হাত-পা সব কিছু কেমন ধরে আসছে। সেই অবস্থায় চারপাশের হাসি গানের তরঙ্গের ভেতর দিয়ে কে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল, গাড়ীর দরজার ডালা খুলে বসিয়ে দিল নরম কুশনের ওপর, তারপর বারান্দা থেকে ঘরে, ঘর থেকে ডানলোপিলোর বিরাট গদির ওপর ছুঁড়ে ফেলে এক ফুঁসে আলো নিভিয়ে দিল। কার অস্থির হাত আমার গায়ে, মাথায়, সমস্ত দেহে অধীরভাবে খেলা করতে থাকল। শায়ার কষির কাছে সেই অবাধ্য হাত নেমে আসতেই যেন স্বপ্নের মাঝখানে চীৎকার করে উঠেছিলাম। আমার বুকের ওপর এক বিরাট পাহাড়ের ভার নেমে এল—তারপর আর কিছু মনে নেই।

পরের দিন ভোর হতে না হতে বাড়ী ফিরে আসি। মা দরজা খুলে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে সন্ধানী চোখ দিয়ে দেখলেন; তারপর একটি কথাও না বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন। ঈশিতা শুধু একবার বলল, 'এ কি চেহারা করে এসেছিস? কোথায় ছিলি?' নিজেকে একটা বাজারের মেয়ের মতো লাগছিল। মনে হচ্ছিল, সমস্ত জীবনটা কাঁচের বাসনের মতো কোন অসতর্কতায় আমার হাত থেকে মেঝেতে পড়ে ভেঙে ছত্রছান হয়ে গেছে। আমি এবার থেকে যা খুশি, তাই করতে পারি। একটা ঘষা পয়সার মতো নিজেকে রাস্তায় ছুঁড়ে দিতে পারি।

একদিন দুদিন করে দু হপ্তা কেটে গেল। স্টুডিয়ো থেকে কোন খোঁজ-খবর নেই। লজ্জার মাথা খেয়ে বার চারেক ফোন করেছিলাম বরুণবাবুকে, ব্যস্ততার দরুণ কথা-বার্তা বলতে পারেন নি। অবশেষে মরীয়া হয়ে একদিন সোজা ওঁর অফিসে গিয়ে হানা দিলাম। প্রায় আধ ঘন্টাটাক আমাকে সামনে বসিয়ে রেখে কাগজ-পত্রের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে রইলেন। তারপর এক সময় শীতল গলায় টেনে টেনে বল[লেন]
'সরি, মিস দত্ত। আমি শুনলাম, অ[...]
বন্ধু ফিল্ম ডিরেক্টর আপনার রোলে [...]
একজনকে নিয়েছেন, অ্যান্ড ডোন্ট[...]
সি ইজ ডুইং বেটার।' আমার ম[...]
ভেতরে কী হয়ে গেল, একটা [...]
মলাটঅলা ফাইল ওঁর মুখের ওপর ছু[...]
মারলাম। কোন কথা না বলে, যেন ব[...]
বেরিয়ে যাবেন এভাবে দরজার কাছে [...]
হঠাৎ খিল তুলে দিলেন বরুণবাবু। [...]
আমার দিকে ফিরে শ্লেষ-তিক্ত গ[...]
বললেন, 'আমি খাস কলকাতার ছে[...]
মুকে চিনি পেতে কাক ধরি। আমার স[...]
চালাকি'? তারপরই একটা গেট-[...]
জানোয়ারের মত আমার ওপর ঝাঁ[...]
পড়ে থালি কিল চড় ঘুঁসিতে আ[...]
মাটির ওপর পেতে ফেললেন। বেদম [...]
জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মুহূর্তে অন[...]
করলাম, সেই লোকটা আমার দিকে[...]
কিন্তু আমি এখন কী করি অমিতদা[...]

হাতের মণিবন্ধে রেডিয়াম পুড়ে [...]
একশা হচ্ছিল। সহপাঠি বীরেনের ই[...]
খোয়ানো বোন ঈপ্সিতাকে সান্ত্বনা দে[...]
কোন ভাষা আমার ছিল না। কিছ[...]
চুপচাপ থেকে বললাম, 'বেসো একটু। [...]
বোধহয় বাস-ফাস পাওয়া যাবে না। [...]
একটা ট্যাক্সি পাই কি না।'

ট্যাক্সির খোঁজে সার্কুলার রোডে [...]
দাঁড়াতেই দেখি একটা ডবল ডেকার এগ[...]
নম্বর ছুটে আসছে। বাসটি আমার সা[...]
আসতে আমার বুকের ভেতর থেকে [...]
যেন বলল, 'কেন ঝুট ঝামেলা বাড়াচ্ছ[...]
উঠে পড়ো শীগগির।' মন্ত্রচালিতের ম[...]
পা-দানিতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

—নিশ[...]

গ্রন্থি

নীলিমা মুখোপাধ্যায়

ইলেকট্রিক লোকাল ট্রেণ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্পীড নিল।

জনবহুল কোলাহলমুখর হাওড়া ষ্টেশন মিলিয়ে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। কলকাতার গা-ঘেঁষা প্রায় সহুরে পাড়াগাঁর পাশ দিয়ে সিটি দিতে দিতে ছুটেছ ট্রেণটা। এ সময়টা অফিসে যাবার বা ফেরবার কোনটাই নয় বলে তেমন ভিড় নেই কামরার মধ্যে, দু'চারজন ভদ্রলোক ছাড়িয়ে ছিটিয়ে এদিকে ওদিকে বসে আছেন।

জানলার কাছে গুছিয়ে বসেছে সরযূ।

খুসী খুসী মুখে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে—'অসময়ে তোমার হঠাৎ বর্ধমান যাবার সখ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম বটে এখন কিন্তু খুব ভাল লাগছে। আজকের রোদটাও কি সুন্দর নরম নরম। কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি যাওয়াটা ফুরিয়ে যাবে—ইচ্ছে করছে বর্ধমান না নেমে অনেক দূরে চলে যাই।'

মনীশ হাসল—'বর্ধমানের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তোমার দেখবে আরও অনেক বেশী ভাল লাগবে। হরিদ্বার, পাঞ্জাব বা অমৃতসর কোনটাই যেতে পারনি বলে একটুও আফশোষ হবে না। সুদূরে যাত্রার রহস্য রোমাঞ্চ বর্ধমান সহরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সরযূ—আবিষ্কার করলেই তোমার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যাবে।'

'তোমার সব তাতেই হেঁয়ালী। সব কথা গোপন করতে কি যে তোমার ভাল লাগে। বল না গো—কোথায় কার বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

'উহু—উপন্যাসের শেষপাতাটা প্রথমেই পড়ে নেওয়া কি ভাল? যাত্রার মাধুর্যটা নষ্ট হয়ে যাবে যে!'

কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ঘুরিয়ে বসল সরযূ। হাওয়ায় উড়ে পড়া চূর্ণ অলকগুচ্ছ সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। স্ত্রীর দিকে বার বার চেয়ে দেখছিল মনীশ। মাত্র দু'মাস আগে বিয়ে হয়েছে তার। চওড়া করে সিঁদুর পরা কোঁকড়া চুলে ঘেরা সরযূর মিষ্টি মুখটা ওকে আকর্ষণ করছিল। কামরায় মূর্তিমান রসভঙ্গের মত দুজন বাড়তি লোক না থাকলে স্ত্রীর পাশে ঘন হয়ে বসতে পারত খুব কাছে টেনে নিতে পারত ওকে

সেই ফুলশয্যার রাত্রি থেকেই নিজের একান্ত কাছে রাখতে ইচ্ছে মনীশের। নতুন বিয়ে হওয়া না সবসময়েই পরস্পরের কাছে শিশু নীর খেলনার মত, কাছছাড়া হলে জল আসে। মনীশের ক্ষেত্রে এ ছাড় কারণ আছে। ওদের প্রথম মিলনে শুধু অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের শিহরিত নয়।

পুষ্পসুরভিত সেই উৎসবের বেনারসী, গহনায় জ্বলজ্বলে নবব মধ্যে এক স্নেহবঞ্চিত, মাতৃহারা আবিষ্কার করেছে মনীশ। তারপর শুধু প্রেম নয়, মমতায়, সহানুভূ হৃদয় গলে গলে পড়ছে।

সানাইয়ের সুরে সুর মিলি মনীশের ইন্দ্রিয় মনও রিনঝিন ক ছিল। দুর্দম ভালো লাগার অ

সুখ পরিপূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখল ভীরু পাখীর মত বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বৌয়ের চোখের জলে তার পাঞ্জাবী ভিজে উঠেছে—আকুল হয়ে কাঁদছে মেয়েটা।

এমন পরম প্রত্যাশিত মুহূর্তে এত কান্না কেন? মনটা চুপসে গেল মনীশের। ভালো লাগা ভালবাসায় আবেগ নববধূর চোখের জলে প্রতিহত হয়ে মনকে তোলপাড় করে তুলল। অনেক প্রশ্ন, অনেক সাধ্য-সাধনার পর কান্নাভেজা গলায় সরযূ বললে—'আজ থেকে তুমিই তো আমার সবচেয়ে আপন, তোমার পায়ে পড়ি আমার মাকে খুঁজে এনে দাও, আমার মাকে খুঁজে এনে দাও।'

আশ্চর্য কথা শুনে মনীশ তো হতবাক!

মৃতা মাকে আবার যেমন করে এনে দেওয়া যায়!

মেয়েরও এমন অসম্ভব প্রার্থনা সুস্থ মনের পরিচায়ক নয় তো!

একটু একটু করে ক্রমে সব জেনেছে মনীশ।

সরযূর মায়ের বিষয়টা রহস্যে ঘেরা। যদিও ঠাকুমা, বাবা, কাকা সবাই বুঝিয়েছে সরযূর মা মারা গেছেন তবু সরযূর মন তা স্বীকার করে নিতে পারেনি। খুব ছোট-বয়সের একটা স্মৃতি তার হৃদয়পটে পাথরে ক্ষোদা ছবির মত স্পষ্ট ফুটে আছে।

একটা গাড়ীতে বসে ছোট্ট সরযূ যেন মা মা বলে কাঁদছে—বাড়ীর মধ্যে থেকে ছুটে এলেন মা, জড়িয়ে ধরে বারে বারে চুমু খেলেন ওকে। মায়ের আঁচলটা চেপে ধরল সরযূ—মা কিন্তু সেই আঁচল জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে আবার বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

তাঁর মুখ ওর মনে নেই, চেহারা কিছু মনে পড়ে না—শুধু সেই ছুটে চলে যাওয়া পিছনে আঁচল লুটোচ্ছে, খোলা চুল উড়ছে হাওয়ায় ওর কচি মনে যে দাগ রেখে গেছে তার রেশ সরযূর সারাজীবনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। মাতৃস্নেহে-কাঙাল মেয়ে বাপের ভালবাসা কখনও পায়নি। তিনি কঠিন প্রকৃতির লোক ছিলেন। মেয়ের প্রতি কোনও ভালবাসার প্রকাশ তাঁর ব্যবহারে ছিল না। মায়ের নাম করলেই শাস্তি পেতে হত সরযূকে। কিন্তু বাইরে যত গোপনতা মনের মধ্যে মায়ের অভাবে ততই হাহাকার।

বাবাও বেশীদিন বাঁচলেন না। ঠাকুমা ওকে বুকে চেপে কেঁদে বললেন, মা তো থেকেও নেই, বাপকে খেলি অভাগী।

'থেকেও নেই! থেকেও নেই!' বুকের মধ্যে ঐ দুটি শব্দের প্রতিধ্বনি ঝড় তুলল। সরযূর স্বপ্নে দেখা মা, মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মা এই পৃথিবীতেই আছেন তাহলে। কিন্তু এ বাড়ীতে তাঁর নাম নেই, একটা ছবিও নেই, অস্তিত্বের কোনও স্বীকৃতিই নেই। এখানে এমন একজনও নেই যে মাতৃ-হারা কন্যাকে মায়ের সন্ধান দেবে। এখানে তাঁর নাম করলেই ভর্ৎসনার কশাঘাত! তবু কান্নার সমুদ্রকে বুকের মধ্যে বেঁধে রাখল সরযূ, তার একটি ঢেউও বাইরে প্রকাশ হল না।

তারপর বয়স বেড়েছে, স্বামী সংসারের স্বপ্ন ঘনিয়েছে ওর কিশোরী চোখে। স্বামীই
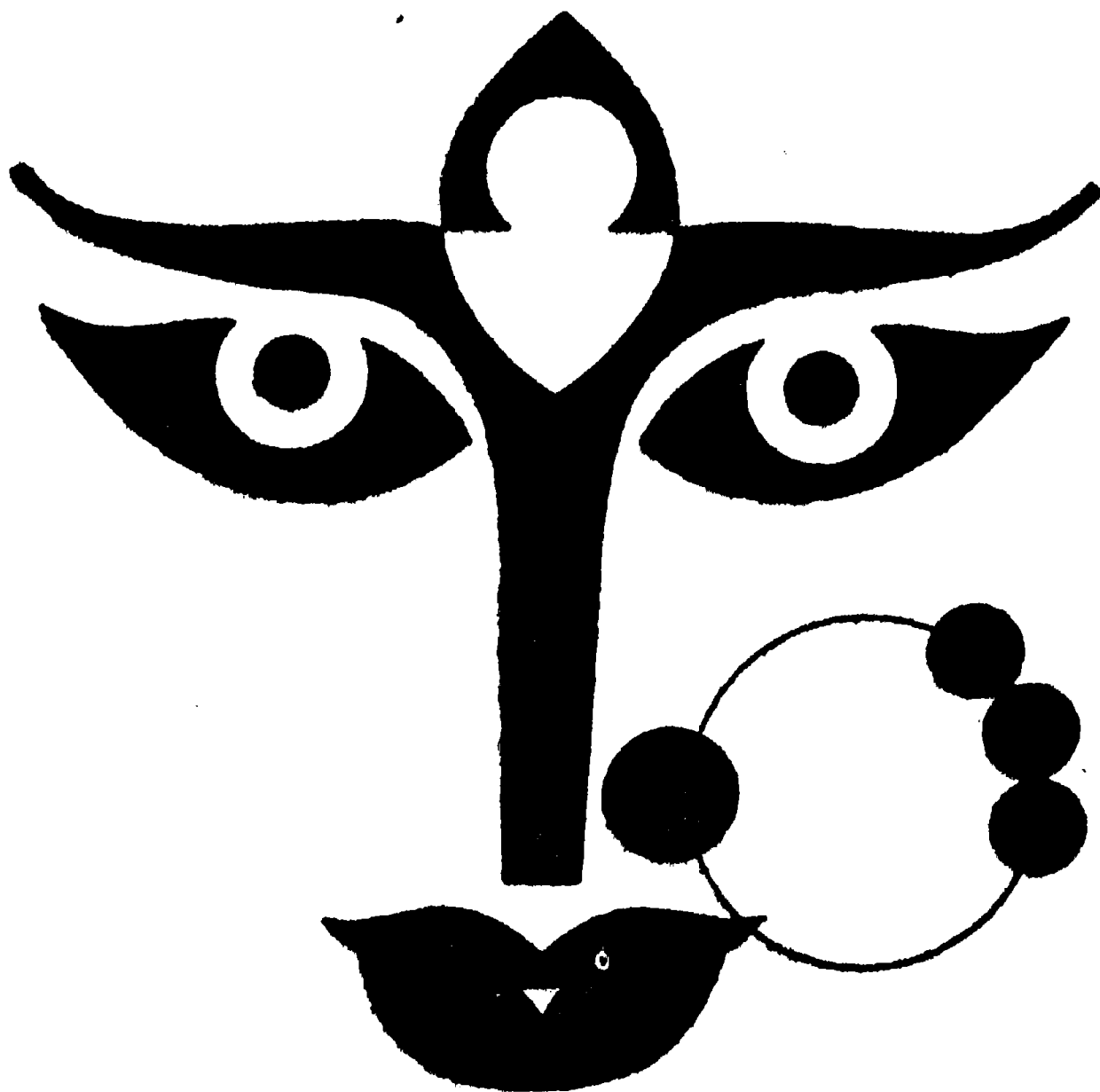
যে মেয়েদের সবচেয়ে আপন এ সত্য বুঝতে বাকী থাকে নি। সেই নিকটতম মানুষটিকে প্রথম কাছে পেয়ে দীর্ঘদিনের রুদ্ধ বেদনা বাঁধভাঙা বন্যার মত দুর্বার বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

রোরুদ্যমান শিশুকে যেমন আদরে বুকে তুলে নেয় মানুষ তেমন করে সরযূকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল মনীশ, ওর সিক্ত আঁখিপল্লব চুম্বন করে বলেছিল, কান্না আর নয় সরযূ। আমি তোমার এতদিনের প্রতীক্ষা বিফল হতে দেব না, যদি মা আজও বেঁচে থাকেন তাঁকে খুঁজে বার করবই—কথা দিলাম।

কথা রেখেছে মনীশ। প্রাণপণ চেষ্টা সফল হয়েছে। পরিতৃপ্ত মনে সরযূর দিকে চেয়ে নিজের মনে হাসল মনীশ। সরযূ এখনও কিছু জানে না। বেচারা! ট্রেণের দোলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। আদর সোহাগের মাত্রাধিক্যে রাত্রি তো বলতে গেলে বিনিদ্র কাটে।

বর্ধমান ষ্টেশনে এখন সরযূর মামা উপস্থিত থাকলে হয়। বাড়ীটা তিনিই চেনাবেন। এই মামাটিকে অনেক কষ্টে খুঁজে বার করেছে মনীশ। সরযূর কাকীমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওর মায়ের বাপের বাড়ীর ঠিকানায় পৌঁছে রীতিমত হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাঁরা নাকি বহুদিন বাড়ী বিক্রী করে দিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। তারপর আবার বহু জায়গায় ঘোরাঘুরি করে মামার সন্ধান পেয়েছে। মনীশের পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক যত বিস্মিত তত আনন্দে উচ্ছ্বসিত। দুর্ভাগিনী বোনের নামোল্লেখে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়েছে। স্বামীসুখবঞ্চিতা সরযূর মা সরমা বর্ধমানের এই স্কুলের শিক্ষিকা এইটুকু শুধু জেনেছে মনীশ। কি কারণে মা ও মেয়ের মধ্যে অপরিচয়ের দুর্ভেদ্য যবনিকা এতদিন আড়াল হয়ে আছে সে রহস্যের সূত্র মামা দেন নি, মনীশও অশোভন কৌতূহল প্রকাশ করে নি। আজ সেই রহস্য ভেদ হবে। মামা সঙ্গে করে ওদের দুজনকে বোনের কাছে পৌঁছে দেবেন।

তন্দ্রা ভেঙে নড়ে চড়ে বসল সরযূ—লজ্জা লজ্জা মুখে স্বামীর দিকে চেয়ে অপ্রস্তুতভাবে হাসল।

মনীশ দুষ্টু হাসি হেসে বললে—সঙ্গে বালিশ তো নেই, কোল পেতে দেব নাকি সরযূ?

'ধেৎ অসভ্য কোথাকার!' ভদ্রলোক দুটি শুনতে পেলেন কিনা আড়চোখে চেয়ে দেখল সরযূ।

আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ, পরক্ষণে মেঘে ঢাকা সূর্য বাইরে বেরিয়ে এসে হেসে উঠছে। ভারী সুন্দর দিনটা। ঘরের বাইরে মুক্ত হাওয়ায় সরযূও খুসীতে উপচে পড়ছে।

'তোমার নরম কচি মুখ আমি চিরদিন খুসীর আলোর ভরে রাখব সরযূ'—মনে মনে বলল মনীশ।

বর্ধমান এসে গেল একসময়। নেমে এল ওরা। সরযূর প্রশ্নের শেষ নেই। 'হ্যাঁগো ও ট্রেণটা কোথায় যাচ্ছে?...এতখানি লম্বা কামরাটা কিসের? আমায় একদিন ঐ ডাইনিং কারে খাওয়াতে হবে কিন্তু। ও গাড়ীটা এয়ার কন্ডিশান করা বুঝি, অনেক ভাড়া লাগে তাই না?

তাতে কি সরযূ? ঐরকম গাড়ী চড়ে আমরা দিল্লী যাব।

'কি মজা হবে,' খিলখিলিয়ে হাসল সরযূ।

মনীশের চোখ একটি বিশেষ মানুষকে খুঁজছে। অবশেষে দেখা গেল তাঁকে।

'সরযূ এদিকে এস—এঁকে প্রণাম কর।'

জড়সড় হয়ে প্রণাম করল সরযূ। প্রশ্নভরা চোখে মনীশের দিকে তাকাল। মনীশ কিছু বলার আগেই মামা ওকে বুকে চেপে ধরেছেন।

সরযূ তো অবাক!

সেদিকে যেন দৃকপাতই নেই মনীশের।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে ট্যাক্সী ডেকে আনল। আসুন মামাবাবু, চল সরযূ, সন্ধ্যে হয়ে আসছে—হাঁকডাক করে পরিবেশ হাল্কা করে দিলে। সরযূ ঘোমটা টেনে ভাবল ইনি বোধ হয় শ্বশুরবাড়ীর দিকে কোনও মামাশ্বশুর হবেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হতে আরম্ভ হয়েছে। ছায়া ছায়া অন্ধকারের মধ্যে ওরা ছোট একটি একতলা বাড়ীর সামনে পৌঁছল।

বাইরের ঘরে সরযূ ও মনীশকে বসিয়ে মামা ভেতরে গেলেন। বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে পরিচয় করালেন, আমার ছোট বোন সরমা।' মাঝারী গড়নের মহিলা—বয়স চল্লিশের কোঠা ছুঁয়েছে মনে হয়। মোটা ফ্রেমের চশমা আঁটা মুখে বেশীক্ষণ দৃষ্টি রাখা যায় না, খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গম্ভীর সে মুখ। মনীশের মনে হল চুলের ধরণ, পাতলা ঠোঁটের ধাঁচ যেন সরযূর মতই।

মনীশ আগে উঠে প্রণাম করল। মাথায় হাত রাখলেন সরমা। জিজ্ঞাসু চোখে দাদার দিকে চাইলেন,—ঠিক চিনতে পারছি না তো দাদা?

চিনিয়ে দেব বলেই তো সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। সরমা—যে ভাগ্য একদিন তোর সব কেড়ে নিয়েছিল সে আজ দুহাত ভরে এসেছে। মনীশ তোমাদের পরিচয় বাবা।

চশমার মধ্য দিয়ে সংশয়ের ছায়াচ্ছ চোখদুটি দেখা যাচ্ছিল তার দিকে দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপাস্বরে মনীশ আপনাকে মা বলার অধিকার পেয়েছি আপনার যে মেয়ে কোনদিন মা পায়নি তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে এ সরযূ—ইনি আমাদের মা—ওঠ সরযূ মাকে দেখ প্রাণভরে। মামাবাবু চলুন পাশের ঘরে যাই।

দুজনে বেরিয়ে এলেন।

মেঝের ওপরেই বসে পড়েছেন বিহ্বল চোখে তাকালেন সরযূর আমার মেয়ে। আমার ফুলের মত খুকী! গলা দিয়ে অস্ফুটস্বর বেরিয়ে সরযূও কাঁপছে থর থর করে। বড় করে চাওয়া জিনিষ হঠাৎ কাছে পে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বেচারী।

মেয়ের মুখ দুহাতে তুলে অ দেখলেন সরমা, কপালে চুমু খেলেন।

আর্তস্বরে কেঁদে উঠল সরযূ—তুমি আমায় অনেকদিন আগে একটা মধ্যে এমনি করে চুমু খেয়ে পালিয়ে ছিলে।'

"তোর মনে আছে খুকী? তিন মেয়ে সেই অভাগিনী রাক্ষসী মাকে রেখেছিস? আমার সোনা, আমার মেয়েকে বুকে চেপে ধরলেন সরমা, জলে সরযূর চুল ভিজে গেল।

'আমার উপায় ছিল না—কোনও ছিল না রে খুকী। সত্যিই সেই ছো আজ বড় হয়ে ফিরে এল? এই তো ছোট্ট তিল, ভুরুতে কাটা দাগ—দুবছর খাট থেকে পড়ে গিয়েছিলি। কেমন এলি, কোথা থেকে এলি—আমার আমার স্বপ্ন, আমার হারানিধি।'

বলার শেষ নেই সুখের সীমা দুজন দুজনকে এমন করে জড়িয়ে ধ সে বাঁধন যেন কখনও খুলবে না। ভেতরের ঘড়িটা একটানা টিক্ টিক্ বেজে চলেছে। এক সময় আবেগের শান্ত, স্তিমিত হয়ে এল, ঝড়ের পর প্রশান্তি নেমে আসে।

তখন অতীত জীবনের অন্ধ পৃষ্ঠাটি সরমা মেয়ের কাছে মেলে ধ প্রকাশ করলেন হৃদয়হীন, দুশ্চরিত্র, স্বামীর কথা। পনর বছরের কি সরমার জীবন যার হাতে পড়ে দলিত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

সব বলা শেষ হবার আগেই সরযূ দিল—'তোমার কথা বল মা, শুধু কথা, বাবাকে আমি দেখেছি বাবার আমি কিছু শুনতে চাই না।'

'আমার কথা!' আবার চোখে বন্যা সরমার।

'তোকে ওরা আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল খুকী। আমার বাধা ক্ষমতা ছিল না। রিক্ত, সর্বহারা ছেলেমানুষ মায়ের সেদিন বুকভরা হা ছাড়া তার কোনও সম্বল ছিল না।
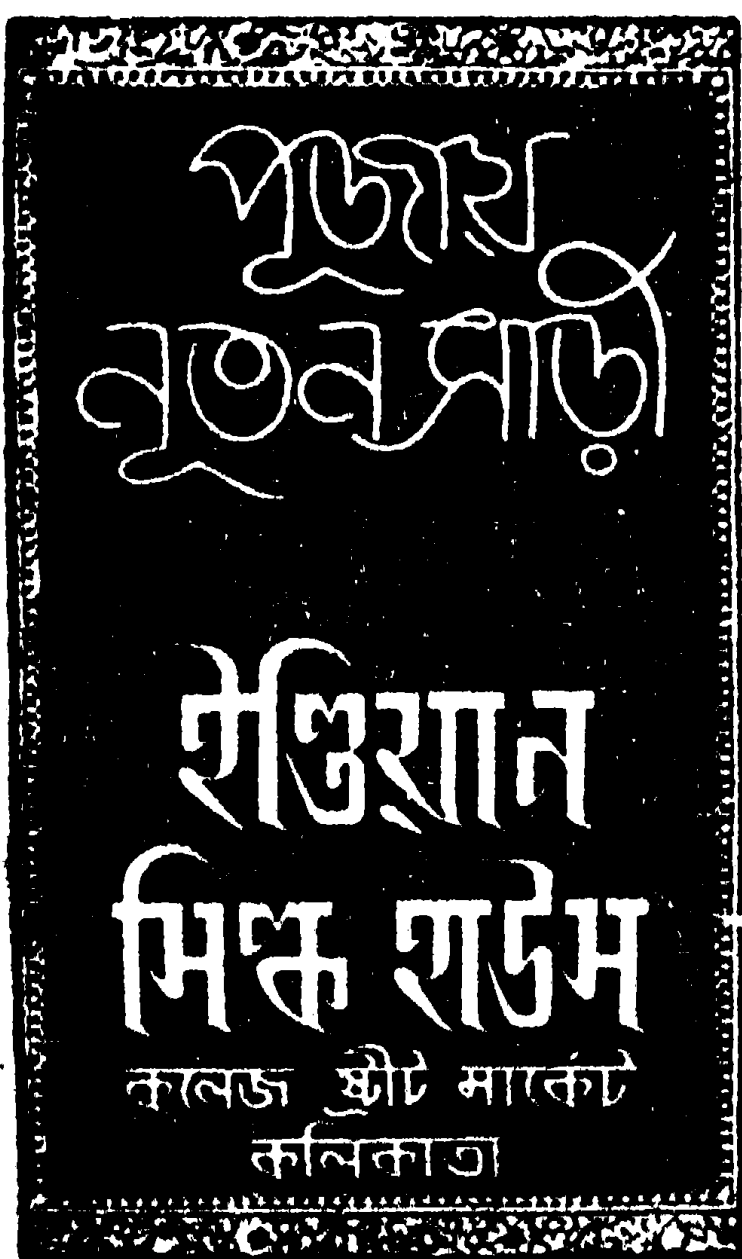
তোকে জোর করে গাড়ীতে তোলার সময় তুই আকুল হয়ে মা মা বলে কেঁদে উঠলি—সে কান্নায় আমার বুক ফেটে গেল, আমি ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে কান চেপে বসে রইলুম, কিন্তু সন্তানের কান্না কি দেওয়ালের বাধা মানে! আমার মেয়ে, আমার একমাত্র আনন্দ চলে যাচ্ছে আমায় ছেড়ে—শেষকালে আর পারলুম না, ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়ীর মধ্যে জড়িয়ে ধরলুম তোকে, আশ মিটিয়ে চুমু খেলুম। তুই দুহাতে আমার আঁচল চেপে ধরেছিলি, আমি রাক্ষসী মা সেই কচি মুঠি থেকে জোর করে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে ঘরে চলে এলুম। আমার সুখ, শান্তি সব শেষ হয়ে গেল খুকী—যে বয়সে মেয়েদের সাধ আহ্লাদ আরম্ভ হয় সেই বয়সে আমি রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত হয়ে গেলুম। মেয়েকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ যত প্রবল হয়ে উঠতে লাগল তত প্রাণপণে মন্ত্রের মত জপ করতে লাগলুম আমি কারোর স্ত্রী নই, কারোর মা হইনি, এ পৃথিবীতে একক নিঃসঙ্গ জীবন আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। ক্রমে মনকে সংযত করে লেখাপড়া শিখেছি, স্কুলে চাকরী নিয়েছি। অনেক দিন চলে গেছে। মনে ভাবতুম আমার সেই মেয়ে বড় হয়েছে, হয়ত বিয়ে হয়ে গেছে। যদি তার ছেলেমেয়ে হয় এমনও হতে পারে তারা আমারই কাছে পড়তে আসবে, আমি তাদের চিনব না, তারাও আমাকে কোনদিন চিনতে পারবে না। কি আশ্চর্য বিধাতার বিধান রে খুকী—সত্যিই তুই ফিরে এলি আমার কাছে। মেয়ে পেলাম, স্নেহকোমল জামাই পেলাম। এত সৌভাগ্য আমার জন্য জমা ছিল এ যে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। এতদিন মৃত্যুকেই একমাত্র পরিত্রাতা বলে জেনেছিলাম, এখন অনেকদিন বাঁচতে ইচ্ছে করছে খুকী।'

সরযূ জড়িয়ে ধরল মাকে। দরজার পাশে মনীশ এসে দাঁড়িয়েছে বলল—'এতদিন পরে মেয়ে মা পেয়েছে, এখন নিষ্ঠুর বিচ্ছেদের কথা আর নয় মা। আমরা রইলাম আপনার দুপাশে জীবনের প্রতীক হয়ে, আমাদের গ্রহণ করুন।'

সজলচোখে ওদের দুজনকে দুহাতে কাছে টেনে নিলেন সরমা।

অভিযুক্ত কাহিনী

নীল

উইলিয়ম সমারসেট মম

কাপ্তেন ব্রেডন লোকটি ভদ্র প্রকৃতির। কুয়ালা মলোর মিউজিয়মের কিউরেটর আনগস মনরো যখন ব্রেডনকে বললেন যে, তাঁর নতুন সহকারী নীল ম্যাক আদমকে তিনি সিঙ্গাপুরে পৌঁছে ভ্যান ডাইক হোটেলে থাকার উপদেশ দিয়েছেন, আর যে কটাদিন সেখানে থাকতে হবে তার মধ্যে যেন কোন রকম ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে না পড়ে, কাপ্তেন তখন কথা দিয়েছিলেন যথাসাধ্য করবেন। কাপ্তেন ব্রেডন 'সুলতান আহমেদ' নামক জাহাজের কমাণ্ডার, আর যখন সিঙ্গাপুরে থাকেন তখন ক ভ্যান ডাইক হোটেলেই থাকেন। ত জাপানী স্ত্রী আছে, তাই ভ্যানডাই ঘর ভাড়া করে রেখেছেন। এই ত ঘর। বোর্ণিওর উপকূল পরিক্রম করে উনি যখন এক পক্ষকালের প করে ফিরলেন তখন হোটেলের ম্যানেজার জানালেন যে, নীল এ দিন ধরে আছেন। হোটেলের ধ ক্ষুদে বাগানটায় ছেলেটি বসে বসে স্ট্রেইটস টাইমসের পাতা ও কাপ্তেন ব্রেডন প্রথমে তাকে একব করে দেখে নিলেন তারপর তা গেলেন।

বললেন—তুমিই ত ম্যাক তাই না?

নীল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় মাথার চুল পর্যন্ত লজ্জায় যেন রা উঠেছে, সে সলজ্জ গলায় বলে, নামই নীল।

—আমার নাম ব্রেডন, আমি স আহমেদ জাহাজের অধ্যক্ষ। মঙ্গলবার তুমি আমার সঙ্গেই ত মনরো আমাকে বলেছে তোমাকে শোনা করতে। একটু শক্ত পান

কেমন হয়? বোধকরি এতদিনে এই সব কথার অর্থ বেশ বুঝে নিয়েছ!

মোটা স্কচ টানে নীল বলল, আমি কিন্তু মদ্য পান করি না। আপনাকে ধন্যবাদ।

—তাতে কি! আমি তার জন্য তোমাকে দোষ দিই না, এদেশে অনেক ভাল মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে এই মদ টেনে টেনে।

চীনা ছোকরাটিকে ডেকে কাপ্তেন নিজের জন্য—ডবল হুইস্কি ও এক বোতল সোডা অর্ডার দিলেন।

—তা এখানে এসে অবধি কি করলে?

—ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—সিঙ্গাপুরে ত তেমন দেখবার কিছু নেই।

—আমি ত অনেক কিছুই দেখলাম।

অবশ্য সর্বপ্রথম ও মিউজিয়মে গিছল। মিউজিয়মে কিন্তু এমন কিছু নেই যা স্বদেশে দেখা হয় নি। তবে যে সব পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট-পতঙ্গ, প্রজাপতি ইত্যাদি এই দেশের যা নিজস্ব তা দেখে উত্তেজনা জেগেছে মনে। একটা অংশ বোর্ণিওর জন্য পৃথকীকৃত, বোর্ণিওর রাজধানী কুয়ালা সলোরে, আর যেহেতু এই সব প্রাণী নিয়েই এখন তিনটি বছর কাটাতে হবে—সেইহেতু সে গভীর মনোযোগভরে সেইগুলি দেখল। তবে, সব চেয়ে উত্তেজক এবং চমকপ্রদ হল বাইরের রাজপথ। যেহেতু নীল ভদ্র যুবক, সেইহেতু সে নীরবে সব উপভোগ করল। নইলে সে হয়ত আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠত। সব কিছুই নতুন লাগছে, যতক্ষণ না পায়ে ফোস্কা পড়েছে নীল হেঁটেছে। একটি কর্মব্যস্ত পথের ধারে দাঁড়িয়ে রিকসা গাড়ির সুদীর্ঘসারি কৌতুকভরে লক্ষ্য করেছে। তার সামনে ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষগুলি কেমন দৃঢ় পদক্ষেপে দৌড়ে চলেছে। একটা খালের ওপরকার ব্রীজে দাঁড়িয়েছে, দেখেছে—ঠিক যেন টিনে ভর্তি সার্ডিন মাছের মত একটির ওপর আর একটি সাম্পান কেমন জলে ভিড়ে আছে। ভিক্টোরিয়া রোডের চীনা দোকানে কত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার বিক্রী হচ্ছে। পেট-মোটা উৎসাহী বোম্বাই বণিকরা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সিলকের কাপড়, নকল অলঙ্কার ইত্যাদি বিক্রীর জন্য প্রলোভিত করার চেষ্টা করে। তামিলদেরও লক্ষ্য করল। কেমন একটা বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গ ভঙ্গী, ওদের পথ চলার মধ্যে একটা সৌষ্ঠব আছে। দাড়িওলা আরব মাথায় ছোট্ট টুপী, এদের মধ্যেও একটা মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গী আছে। বিভিন্ন দৃশ্যপটে সূর্যালোক পড়েছে উজ্জ্বল ও কঠিন রঙে। নীল বিভ্রান্ত। সে ভাবছিল যে এই বহুবিচিত্র রঙের প্রাচুর্যময় জগতকে চিনতে হয়ত অনেক অনেক দিন লেগে যাবে।

সেদিন রাতে ডিনার শেষ হওয়ার পর কাপ্তেন জানতে চাইলেন শহরটা ঘুরে দেখতে সে রাজী কিনা। তিনি বললেন—

—যতক্ষণ এই দেশে আছ জীবনটা একটু আধটু দেখে নেওয়া উচিত।

দুজনে রিকশায় চড়ে চীনা পাড়ার দিকে রওনা হল। কাপ্তেন যখন জলে থাকেন তখন একেবারে মদ্য পান করেন না। এখন ডাঙ্গায় উঠে তার শোধ মিটিয়ে নিচ্ছেন। দিনের বেলায় প্রচুর টেনেছেন। বেশ ভাল লাগছে তাঁর। রিকশা একটা গলি পথে পৌঁছে একটা বাড়ির দোরে এসে থামল। ধাক্কা দিতেই দোর খুলে গেল। সরু একটি সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করে একটা প্রকাণ্ড ঘরে গিয়ে পৌঁছালো। ঘরটার চারপাশে বেঞ্চ পাতা—তার ওপর লাল ঢাকা দেওয়া।

চার দিকে অনেক জাতের মেয়েমানুষ বসে আছে। আমেরিকান, ইতালীয়ান, ফরাসী। একটা যান্ত্রিক পিয়ানো থেকে কর্কশ আওয়াজ করে গান হচ্ছে, আর দু-এক জোড়া নরনারী নৃত্য করছে সেই তালে পা ফেলে। কাপ্তেন ব্রেডন মদ আনার হুকুম দিলেন। দু-তিনজন স্ত্রীলোক আমন্ত্রণের অপেক্ষায় তাকিয়েছিল, তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন কাপ্তেন। বললেন—কি হে ছোকরা কাউকে পছন্দ হয়?

কাপ্তেনের প্রশ্ন একেবারে সুস্পষ্ট।

নীল বলল, নিয়ে শোবার জন্য? না তার দরকার নেই।

কাপ্তেন বললেন, জানো, যেখানে যাবে তুমি সে দেশে শাদা চামড়ার কোন মেয়েমানুষই নেই।

—তাই নাকি?

—দেশী মেয়েমানুষ দেখবে নাকি?

—আপত্তি নেই।

কাপ্তেন মদের দাম মিটিয়ে দিলেন, তারপর ওরা পথে বেরিয়ে পড়ল। আরেকটা বাড়ি গেল ওরা। এখানকার মেয়েরা সব চীনা, আকারে ছোট্ট তবে সুশ্রী। পাগুলি ছোট ছোট, হাতগুলি যেন ফুলের মত—তাদের অঙ্গে ফুলকাটা সিল্কের পোশাক। তবে তাদের রঙকরা মুখ যেন মুখোসের মত। কালো শ্লেষভরা চোখ মেলে ওরা আগন্তুকদের দেখে। কেমন যেন অমানবিক ওরা সব।

কাপ্তেন ব্রেডন বললেন, আমি তোমাকে এখানে আনলাম তার কারণ তোমার এ জায়গাটা দেখা দরকার। কথাগুলি এমনভাবে বললেন যেন একটি মহৎ কর্তব্য পালন করছেন। থেমে আবার বললেন, তবে ঐ দেখাই সার—ওরা আমাদের কোন কারণে পছন্দ করে না। কয়েকটা চীনা পাড়ায় শাদা চামড়ার মানুষে ঢুকতেই দেয় না একেবারে। সত্যি কথা কি জানো, ওরা বলে আমাদের গায়ে নাকি গন্ধ! মজার কথা, কি বল? ওরা বলে কি জানো, বলে আমাদের গায়ে কেমন মড়া-মড়া গন্ধ।

আমাদের গায়ে? নীল প্রশ্ন করে।

কাপ্তেন বলল, জাপানী মেয়েমানুষ দাও আমাকে, ওরা খুব চমৎকার। আমার স্ত্রী জাপানী তুমি তো জানো। তুমি আমার সঙ্গে চলো একটা জায়গায় নিয়ে যাবো সেখানে শুধু জাপানী মেয়ে—আর যদি তোমার কিছু ভালো না লাগে ত আমি তাহলে ওলন্দাজ।

রিকশা দুটি দাঁড়িয়েছিল। ওরা গিয়ে রিকশায় উঠল।

কাপ্তেন ব্রেডন বলে দিলেন কোথায় যেতে হবে আর ছোকরারা ছুটল। একটি মোটা-সোটা মধ্যবয়সী জাপানী স্ত্রীলোক ওদের বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। বাড়িতে ঢোকার সময় মাথা নুইয়ে নমস্কার জানালো। একটি পরিচ্ছন্ন কামরায় ওদের নিয়ে গেল, সে ঘরের মেঝেয় খালি মাদুর পাতা। ওরা বসল, তারপর একটি ছোট্ট মেয়ে দু পাত্র পাতলা চা একটি ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এল। সলজ্জ ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে ওদের দুজনকে দু পাত্র চা পরিবেশন করল। কাপ্তেন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটিকে কি বললেন। সে নীলের দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হাসতে থাকে। তারপর মেয়েটিকে কি সব বলল, মেয়েটা চলে গেল আর তারপরই চারটি মেয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করল। ছোট-খাটো, বেশ মোটা-সোটা—মুখগুলি গোলাকার এবং চোখে হাসি ভরা। ঘরে ঢুকেই ওরা মাথা নুইয়ে প্রণতি জানায় এবং শিষ্ট ভঙ্গীতে মৃদু স্বরে অভিনন্দন জানায়। ওদের কথাগুলি যেন পাখির কলরবের মত শোনালো। তারপর ওরা হাঁটু মুড়ে বসল দুটি মানুষের দুই পাশে দুজন করে, তারপর মনোহর ভঙ্গীতে আদর-আপ্যায়ন শুরু করল। কাপ্তেন ব্রেডন অচিরাৎ একটি ক্ষীণ কটি দুটি বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন। ওরা সবাই গল গল করে কথা বলে যায়। ভারী স্ফূর্তিতে আছে ওরা। নীলের মনে হল কাপ্তেনের মেয়েগুলি ওকে নিয়ে মস্করা করছে। কারণ ওদের উজ্জ্বল চোখ সব সময়ই দুষ্টামি-ভরা ভঙ্গীতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। লজ্জা পেয়ে নীলের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। যে দুজন ওর পাশে জড়ো হয়ে বসেছিল তারা হাসছিল এবং জাপানী ভাষাতেই কথা বলছিল। নীল

যেন তাদের সব কথাই ঠিক ঠিক বুঝছে। ওদের এমনই নিষ্পাপ এবং আনন্দময়ী দেখাচ্ছিল যে, নীলের তা দেখে হাসি এল মনে। ওরা বেশ মনোযোগী। ওরা নীলের হাতে চায়ের পাত্রটা তুলে দেয়। তারপর আবার সেটা নিয়ে নেয়, যেন ওকে কষ্ট করে পানপাত্র ধরে থাকতে না হয় তাই ওরাই সেই কষ্টটা ওর হয়ে করছে। একজন ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিল আর একজন তার পেলব হাত দিয়ে সিগারেটটা মুখ থেকে তুলে নিয়ে ছাই ঝেড়ে দেয়, ছাইটা যেন ওর জামায় না পড়ে। ওরা নীলের মসৃণ মুখে হাত বুলায়, আর ওর প্রকাণ্ড তারুণ্যভরা হাত দুটির দিকে সকৌতুকে তাকায়। ওরা ঠিক যেন বিড়াল শাবকের মত ক্রীড়ারত।

কিছুক্ষণ পরে কাপ্তেন প্রশ্ন করলেন, তাহলে কোনটি নেবে স্থির করলে? তোমার পছন্দ করা হয়ে গেছে?

—তার মানে?

—তোমার যতক্ষণ পর্যন্ত একটা কিছু ঠিক না হয় আমি ততক্ষণ চুপচাপ থাকব, তারপর তোমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজের ব্যবস্থা করে নেব।

—দুটির একটিও আমার চাই না। আমি বাড়ি ফিরে নিজের বিছানায় শোব।

—কেন? ব্যাপার কি? তোমার ভয় করছে বুঝি! কি বল ভয় হচ্ছে?

—না, আমার ঠিক পছন্দ নয়। তবে আমি আপনার পথের কাঁটা হব না। আমি এখন হোটেলে ফিরে যাচ্ছি।

—তা তুমি যদি না কিছু করো, আমারও তেমন আগ্রহ নেই। আমি শুধু সঙ্গদানের জন্য এসেছিলাম।

মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কাপ্তেন কথা বললেন, তাঁর কথা শুনে মেয়েরা সবাই নীলের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালো। মধ্যবয়সী কাপ্তেনের কথার জবাব দিল. কাপ্তেন কাঁধ নাড়লেন। তারপর মেয়েদের মধ্যে একজন কি একটা মন্তব্য করল আর সবাই সেই কথায় হেসে উঠল।

নীল প্রশ্ন করে, কি বলছে মেয়েটা?

কাপ্তেন হেসে বলে, তোমাকে নিয়ে পরিহাস করছে।

কিন্তু এই কথা বলে কাপ্তেন কেমন অদ্ভুতভাবে নীলের দিকে তাকালেন। মেয়েটি সবাইকে হাসিয়ে এখন নীলকেই সোজাসুজি কি একটা বলল। সে কিছুই বুঝল না, কিন্তু তার চোখের মধ্যে যে চটুলতার ভঙ্গী দেখা গেল তাতে নীল লজ্জায় রাঙা হয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করল। তাকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা-তামাশা করুক এ সে চায় না। তারপর মেয়েটি খিল খিল করে হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে একটা চুমো খেল।

কাপ্তেন বলল, চলো আমরা এখন যাই।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওরা রিকশাওলা-দের ছুটি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে ফিরল। হোটেলে পেঁৗছে নীল জানতে চায়—

—মেয়েটা কি বলেছিল যে সবাই হেসে উঠল?

—মেয়েটা বলল তুমি একেবারে নিষ্পাপ ব্রহ্মচারী।

নীল বলল, এতে আবার হাসির কি আছে? নীলের কণ্ঠস্বরে মৃদু স্ফচ টান।

কাপ্তেন বললেন, কথাটি কি সত্যি?

—আমি ত তাই মনে করি।

—কত বয়স তোমার?

—বাইশ।

—কিসের অপেক্ষায় আছো?

—বিবাহের প্রতীক্ষায়।

কাপ্তেন নীরব। সিঁড়ির মাথায় পেঁৗছে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর চোখে কটাক্ষ।

নীল কিন্তু তাঁর চোখের দিকে সোজা-সুজি তাকাল এবং রাত্রিকালীন বিদায় সম্ভাষণ জানাল। তার দৃষ্টি সরল, দ্বিধা-হীন এবং স্থির।

তিন দিন পরে জাহাজ ছাড়ল। নীল সেই জাহাজে একমাত্র শ্বেতাঙ্গ যাত্রী। কাপ্তেন তাঁর কাজকর্মে ব্যস্ত, তখন নীল মেতে থাকে পড়াশোনায়। নীল আবার ওয়ালেসের "মালয় আর্কি-পেলেগো' পড়ছে। ছোটবেলায় বই-খানি পড়েছে, এখন এই গ্রন্থের একটা নতুন এবং চমকপ্রদ আকর্ষণ আছে তার কাছে। কাপ্তেন যখন একটু ছুটি পান তখন সেই অবসরে ওরা তাস খেলে কিম্বা চেয়ার নিয়ে ডেকে বসে থাকে, ধূমপান করে আর গল্প করে।

নীল একজন পল্লী ডাক্তারের সন্তান। তার মনে পড়ে না প্রাকৃতিক ইতিহাসে কবে তার আগ্রহ ছিল না। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে এডিনবরা ইউনিভার্সিটি থেকে সে অনার্সসহ বি, এস-সি ডিগ্রি নিয়েছে। বায়োলজীর ডেমনস্ট্রেটর হিসাবে চাকরী নেবে এই চেষ্টায় সে ছিল, এমন সময় 'নেচার' পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে, কুয়ালা সোলোরের মিউজিয়মে এক-জন এসিস্ট্যাণ্ট কিউরেটর চাই। কিউরেটর এনগাস মুনরো তাঁর এক খুড়োর সঙ্গে এডিনবরায় ছিলেন। খুড়ো গ্লাসগোর একজন ব্যবসায়ী। তাঁর খুড়ো আনগাসকে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন ছেলেটিকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখার জন্য। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল ট্যাক্সিডার্মিস্ট বিশেষজ্ঞ হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অর্থাৎ মরা প্রাণীকে জীবন্ত আকার দান করার কাজ। নীলের এ কাজের শিক্ষা ছিল। আগ্রহ ছিল অবশ্য অন্য বিষয়ে। আনগাসের খুড়ো নীলের শিক্ষকদের প্রশংসাপত্রগুলি পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন আর সেই সঙ্গে বলেছিলেন যে, নীল ইউনিভার্সিটির তরফে ফুটবল খেলেছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নীলের নিয়োগপত্র নিয়ে 'তার' এসে গেল, আর তার পনেরো দিন পরেই সমুদ্রযাত্রা।

নীল প্রশ্ন করে, মিঃ মুনরো-কে কেমন দেখতে?

—লোকটি ভালো। সবাই ও' বাসে।

—আমি বৈজ্ঞানিক পত্রিক প্রবন্ধাদি পড়েছি। একটি প্রবন্ধ লেগেছিল।

—আমি এ সব ব্যাপারে কিছু না। শুধু জানি ও'র স্ত্রী রাশিয়া তাঁকে সবাই তেমন পছন্দ করে :

—সিঙ্গাপুরে থাকার সময় ও চিঠি পেয়েছি, তাতে বলেছেন অ দিক ঘুরে কি যে করতে চাই (জন্য দু-চারদিন আমাকে ছেড়ে রা

এখন ওরা নদীর ওপর বাঁকে ঠিক তার মুখটায় জেলেদের গ্রাম বারে এক বুক জলের ভেতর আছে। তীরে ঘন সন্নিবিষ্ট দে গাছ আর ঝোপঝাড়। আরও দূরে অরণ্য ভূমি।

অনেক দূরে নীল আকাশে কালো ছায়ার মত একটা রুক্ষ বহিঃরেখা দেখা যাচ্ছে। গভীর উ নীলের বুক ধুক ধুক করছে। গোগ্রাসে এই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে বিস্ময়ের আর সীমা নেই। নীল ম জোসেফ কনরাদের সমস্ত লেখা সে এক রহস্যময় দেশের প্রত্যা আছে। দিগন্তে কিছু কিছু শা নৌকার মত সঞ্চরণশীল, তা সূর্যালোক পড়েছে। অরণ্যের সবু গুলিতে উজ্জ্বল সূর্যালোক বি এখানে-ওখানে তীরভূমিতে মনুষের ঘর-বাড়ি, পাতার ছাউনি মাথায়। এদেশ নীলকে এক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছে। কাপ্তেন ওপর থেকে ওর দিকে তাকিয়ে হা তার এই কদিনেই ছেলেটিকে বে লেগেছে। ছেলেটা মদ্য পান করে ন যখন কেউ রসিকতা করে সেটায় দানও করে না। যেন ওর গুরুভার ভীষণ, তাই তার কাছে রসিকতা নেই। তবে ভাল না লাগলেও সে কারণ ভাবে সবাই তাই চায়। কখনও কিছু চাইলে 'প্লীজ' বলতে ভো কিছু পেলে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে সব আর নীল যে একজন সুন্দর আ পুরুষ একথা কেউ অস্বীকার পারে না।

—কি খোকা! দাড়ি কামিয়েছ ত

নীল নিজের হাতটা দাড়িতে ব আর বলে,—আপনার কি মনে হয় উচিত?

একথায় কাপ্তেন হাসবেনই,—কি বলছ, তোমার মুখ আর শিশুর পিছন একরকম, মসৃণ, কোমল।

এই কথায় নীলের মুখচোখ রাঙা ওঠে।

তারপর সে জবাব দেয়, আমি স একদিন কামাই।

তবে, শুধু ওর আকৃতিটাই নয়, জন্য ওকে ভাল লাগে—ওর সারল্য,

...আন্তরিকতা আর তাজা মনটাই সবচেয়ে ...শী করে আকৃষ্ট করে মানুষকে।

কাপ্তেন নিজেই ভেবে পান না নীলের ...ই সৌন্দর্যের রহস্য কোথায়। আপন মনে ...শ্ন করেন—রমণী সংস্পর্শে আসে নি ...লই কি এত সুন্দর, আশ্চর্য! আমার ত ...ন হয় মেয়েরা ওকে কখনও একা থাকতে ...বে না। কি গায়ের রঙ রে বাবা!

'সুলতান আহমেদ' জাহাজ কুয়ালা ...লোর অতিক্রম করে এইবার নোঙর ...রবে। কাপ্তেনের চিন্তা তাই বাধা পেয়ে ...ন্য খাতে প্রবাহিত হল। ইঞ্জিন রুমের ...টা বাজালেন কাপ্তেন। জাহাজের গতি ...নো হয়েছে। নদীর বাম তীরে কুয়ালা ...লোর। শাদা, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ...র। পাহাড়ের ডান দিকে এক পাশে ...লতানের প্রাসাদ। হাওয়া একটু বেগে ...ছিল, সুলতানের পতাকা সেই বাতাসে ...দোলিত হচ্ছিল।

মধ্যপথে নোঙর করা হল জাহাজ। ...ার এবং পুলিশ অফিসার সরকারী লঞ্চ ...কে জাহাজের ডেকে এসে উঠলেন। ...দের সঙ্গে একজন দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক। কাপ্তেন সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে তাঁদের ...গে করমর্দন করলেন।

তারপর দীর্ঘাঙ্গ ভদ্রলোকটির দিকে ...কিয়ে বললেন, আমি আপনার তরুণ- ...ভাটিকে নিরাপদে এবং সুস্থ শরীরে ...য়ে এসেছি। তারপর নীলের দিকে ...কিয়ে বললেন, এই তোমার মুনরো।

দীর্ঘদেহ মানুষটি তাঁর হস্ত ...লিত করে নীল ম্যাক আদমের দিকে ...স্নেহ ভঙ্গীতে তাকালেন। নীল একটু ...সল। তার দাঁতগুলি চমৎকার।

সে বলল, হাউ ডু ইউ ডু স্যার!

মুনরো ঠোঁটের ভঙ্গীতে না হেসে ...ন চোখ দিয়ে হাসলেন। তাঁর গাল বসা, ...লো খড়্গ নাসা আর নিষ্প্রভ ঠোঁট। ...দে তাঁর রঙ পুড়ে গেছে—মুখটা বেশ ...ত। তাঁর মুখভঙ্গী অতি ভদ্র এবং নম্র। ...নীলের তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ...চারিত হল। কাপ্তেন ডাক্তার এবং ...পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তার পরিচয় ...রিয়ে দিলেন, একপাত্র মদ্য পানের আমন্ত্রণ ...নালেন। সবাই বসলেন, বয় কয়েক ...বোতল বীয়র নিয়ে এল। মুনরো টুপি ...লে বসলেন। নীল লক্ষ্য করল ওঁর চুল- ...গুলি ছোট করে ছাঁটা এবং অনেকগুলি ...পেকে গেছে, বাকী চুলে পাক ধরেছে। ভদ্র- ...লোকের বয়স চল্লিশ হবে, বেশ শান্ত, ...আত্মসমাহিত ভঙ্গী। মুনরোর আকৃতিতে ...এমন একটা বিদগ্ধ বৈশিষ্ট্য যে তাঁকে ...মোটে ডাক্তার এবং পেটমোটা পুলিশ ...অফিসারের চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র মনে হচ্ছে।

যখন সব গ্লাসে বীয়র ঢালা হল তখন ...কাপ্তেন বললেন,—ম্যাক আদম কিন্তু মদ্য ...পান করে না।

মুনরো বললেন, বাঃ, সেই ত বেশ। ...দশা করি তুমি নিশ্চয়ই কুপথে চালিত ...হবার জন্য প্রলোভিত করো নি?

কাপ্তেন বললেন, সিঙ্গাপুরে চেষ্টা করেছিলাম।

এই বলে চোখ মটকালেন, তারপর বললেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা!

বীয়ার শেষ করে মুনরো বললেন, এইবার তাহলে তীরে যাওয়া যাক, কেমন?

নীলের মালপত্র মুনরো সঙ্গে যে ছোকরাদের এনেছিলেন তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে ও'রা সাম্পানে উঠলেন এবং তীরে পৌঁছালেন।

মুনরো বললেন, সোজা বাংলোয় যাবে না একটু ঘোরা ফেরা করবে? ভোজনের এখনও ঘন্টা দুই বাকী।

নীল প্রশ্ন করে, আচ্ছা মিউজিয়মে যাওয়া যায় না?

মুনরোর চোখে আবার সেই নম্র হাসি। তিনি খুশি হয়েছেন।

নীল স্বভাবে লাজুক, আর মুনরো তেমন বাকপটু নন। ফলে ওরা নীরবে চললেন। নদীর ধারে দেশীর মানুষের বাস, আর সেখানেই স্মরণাতীত কাল থেকে মালয়ের মানুষ বাস করে। ওরা খুব ব্যস্ত, তবে কোনো তাড়া নেই। তাদের দেখলে একটা সুখী স্বাভাবিক কর্ম কান্ডের মধ্যে আসা গেল মনে হবে।

ওরা বাজারে পৌঁছাল। সেখানে রাস্তা অতি সংকীর্ণ, মাথায় অনেক জায়গায় খিলান করা। অজস্র চীনা তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কলরব করছে, কাজ করছে, খাওয়া দাওয়া করছে, হুল্লোড় করছে।

মুনরো বললেন, সিঙ্গাপুরের তুলনায় এ অবশ্য কিছু নয়। তবে আমার কাছে সব বেশ চিত্রোপম মনে হয়।

ওঁর কথার উচ্চারণে স্কচটান কিছু কম। তাতে, নীল একটু স্বস্তিবোধ করে। নীল মনে করে ইংরেজ জাতের মুখের ইংরাজীটা অনেকটা ভারাক্রান্ত।

মিউজিয়মটা চমৎকার সুন্দর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত। দোরগোড়ায় ঢুকতে গিয়ে মুনরো সহজাত অভ্যাসবশে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, তুমি হয়ত হতাশ হবে, আমাদের যা পাওয়া উচিত তা আমরা এখনও পাইনি। পয়সার অভাব। তেমন কোনো অর্থ না থাকায় আমাদের কাজকর্ম অনেক হ্রাস করতে হয়েছে। তাই তোমাকে একটু বাদ সাদ দিয়ে একটা ধারণা গড়ে তুলতে হবে।

নীল এমনভাবে ভেতরে প্রবেশ করল যেন পাকা সাঁতারু গ্রীষ্মকালীন সাগরে নামল। নমুনাগুলি সুন্দরভাবে সাজানো। মুনরো শিক্ষা দিতে চান এবং সেই সঙ্গে আনন্দ। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতিকে তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নীলের সেই সলজ্জভাব কেটে গেছে, সে এখন ছোট ছেলের মত হাজার প্রশ্ন করছে, সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কতখানি সময় যে কাটল সেদিকে দুজনের কারো খেয়াল নেই।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুনরো অবাক। একটা রিকশায় চড়ে দুজনে বাংলোয় চললেন।

মুনরো তরুণ নীলকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন। একটি মহিলা শোফায় শুয়ে কি একটা পড়ছিলেন। ওরা ঘরে ঢুকতে তিনি ধীরে ধীরে উঠলেন।

মুনরো বললেন, এই আমার স্ত্রী। দরিয়া, আমাদের বড় দেরী হয়ে গেল।

দরিয়া হেসে বললেন, তাতে আর কি এসে যায়। সময়ের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় আর কি আছে বল?

নীলের দিকে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, প্রকান্ড হাত। তারপর নীলের দিকে বেশ বন্ধুত্বের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—তুমি বোধ হয় ও'কে মিউজিয়াম দেখাচ্ছিলে?

মহিলাটির বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। মাঝারি ধরণের লম্বা। মুখখানি নিষ্প্রভ এবং বাদামি, আর একজোড়া নীল চোখ। মাথার চুল মাঝখানে সিঁথিকাটা, এবং তা কাঁধের ওপর চুড়ো করে বাঁধা। কিঞ্চিৎ অগোছাল। ও'র মুখটা চওড়া, চোয়ালের হাড় উঁচু এবং নাকটা কিঞ্চিৎ মোটা। খুব যে রমণীয় রমণী তা বলা যায় না, কিন্তু তার ধীর স্থির গতিবিভঙ্গে একটা কামোন্মাদনা জাগায়, এবং খুব কম মানুষই তার দেহের এই বৈশিষ্ট্যটুকু উপেক্ষা করতে পারেন। ও'র পরিধানে একটা সবুজ রং-এর সাধারণ ফ্রক। বেশ সুন্দর ইংরাজী বলতে পারেন, তবে দরিয়ার কথায় কিছু টান আছে।

(আগামী বারে দরিয়ার প্রেমলীলা)

—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক সংক্ষেপিত ও অনূদিত।

নরেশচন্দ্রের সঙ্গে প্রখ্যাত বাত্রাভিনেতা দিলীপ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন
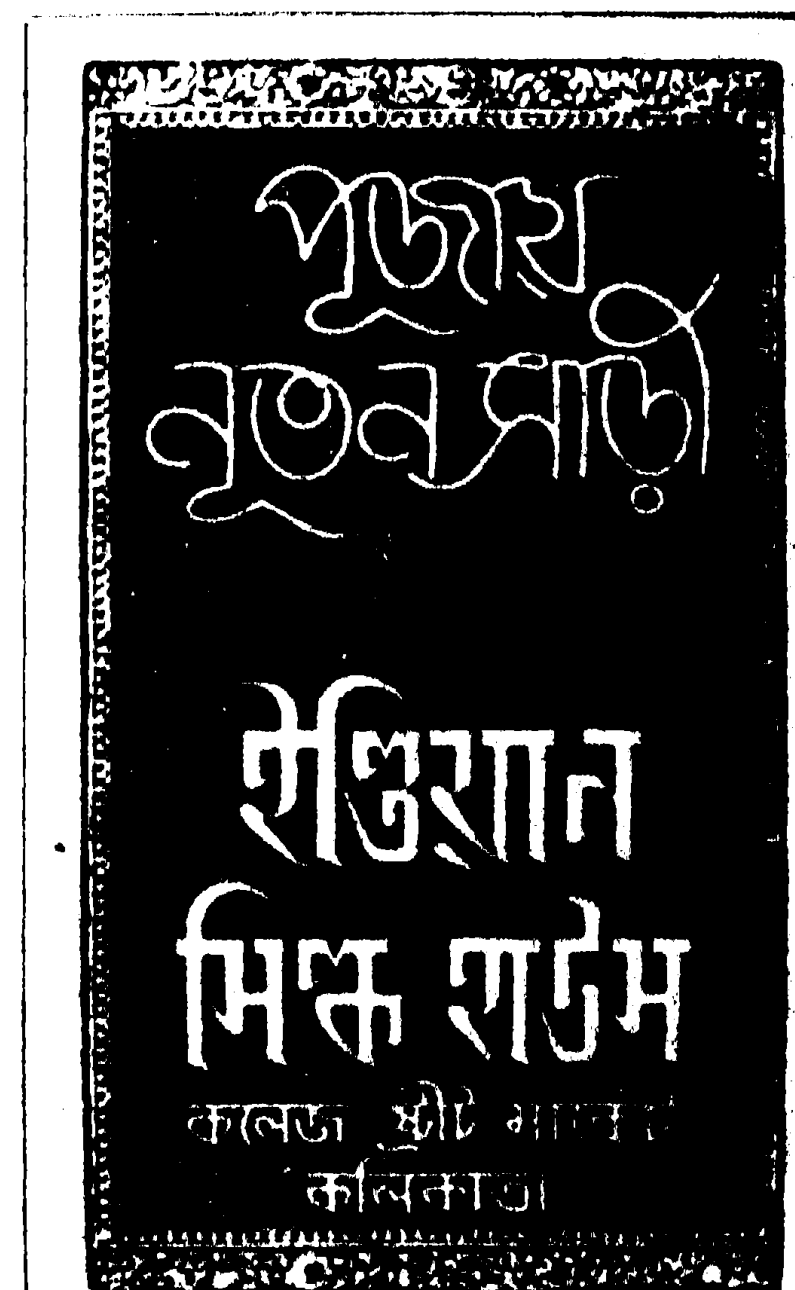
নটশেখর নরেশচন্দ্র

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

নরেশচন্দ্রকে মঞ্চের ওপর প্রত্যক্ষ করি প্রথম "কর্ণাজুন" নাটকে শকুনির ভূমিকায়। লোলচর্ম বৃদ্ধ শকুনি মঞ্চে আবির্ভূত হতেন 'বীজ বপন করেছি' কথা কটি বলতে বলতে। গলার স্বর পাতলা ও কিছুটা খ্যানখেনে, কিন্তু চোখ দুটিতে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। কথা বলেন টেনে টেনে। না, নায়কোচিত চেহারা আদৌ নয়; মধ্যমাকৃতি, একহারা। তবে 'কর্ণার্জুন'-এর সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে দেখা গেল, সাধারণ বাঙ্গালীর ধারণা অনুযায়ী কুটিল, খল শকুনি মামা নরেশচন্দ্রের মাধ্যমে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এবং এই একটি মাত্র নাটকেই নরেশচন্দ্র নিজেকে এক বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চের বৃহত্তর দর্শক সমাজের কাছে। এ হচ্ছে ১৯২৩ সালের ঘটনা। স্টার রঙ্গমঞ্চ লীজ, নেন আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড ১৪ এপ্রিল, ১৯২৩; আর 'কর্ণার্জুন-এর উদ্বোধন হয় ৩০ জুন। অবশ্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নরেশচন্দ্রের এই প্রথম আবির্ভাব নয়। এর প্রায় বছর খানেক আগেই, বোধ করি ১৯২২ এর মার্চ মাসে তিনি ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় একসঙ্গে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দেন। এবং সেখানে প্রথমেই তিনি 'চন্দ্রগুপ্ত'-এ চাণক্য-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অবশ্য ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যখন এই 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হয়, তখন তিনি নিয়েছিলেন 'কাত্যায়ন'-এর ভূমিকা এবং 'চাণক্য'-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৯২২)। ইনস্টিটিউটে নরেশচন্দ্র শেক্সপীয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এ শাইলক এবং ওথেলোতে 'ইয়াগো'-র ভূমিকাভিনয় করে ছাত্রমহল ও বিদ্বজ্জনসমাজে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মিনার্ভায় 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর পরে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের নাম ভূমিকায় এবং ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নতুন নাটক 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা'য় তিনি জেকব সাহেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অবশ্য এ সবই আমার শোনা কথা; চাক্ষুষ দেখা হয়নি এই ভূমিকাভিনয়গুলি।

মঞ্চাভিনেতা রূপে দেখবার আগে নরেশচন্দ্রকে দেখেছিলুম নির্বাক ছায়াছবিতে। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর প্রথম ছবি 'আঁধারে আলো'তে নায়ক সত্যেনের কালীনাথ বলে যে-বন্ধু তাকে প্রথম বিজলীবাঈয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, সেই কালীনাথের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র, বি-এল। সত্যেন্দ্রনাথ বেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম-এ। শিশিরকুমারই ছিলেন এ[illegible] পরিচালক। অবশ্য পরে জে[illegible] ছবির তিনভাগ হয়ে যাওয়ার পরে [illegible]কুমার যখন এক মোটরবাস দ[illegible] শয্যাগত হয়ে পড়েন, তখন ছবি[illegible] একভাগ শেষ হয় নরেশচন্দ্রেরই চালনায়। তাজমহলের দ্বিতীয় 'মানভঞ্জন'-এ নায়ক গোপীনাথের [illegible] গ্রহণ করেছিলেন নরেশচন্দ্র এবং নিজেই এর পরিচালকও ছিলেন। ১৯২৪ সালে তাজমহলের তৃতীয় [illegible] চন্দ্রনাথও নরেশচন্দ্রের পরিচালনায় হয়। এতে নরেশচন্দ্র গ্রহণ কর[illegible] কৈলাস খুড়োর ভূমিকা। কিন্তু এ[illegible] খানি ছবিতেই নরেশচন্দ্রের অভিনয়[illegible] মনে রাখতে হবে ছবিগুলি ছিল নি[illegible] আমাদের মনে তেমন কিছু গভীর রে[illegible] করতে পারে নি।

কিন্তু "কর্ণার্জুন"-এ শকুনির [illegible]ভিনয় নরেশচন্দ্রের স্বকীয়তাকে দ[illegible] সামনে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল। এর অবশ্য কারণও ছিল। থিয়েটার্সের 'কর্ণার্জুন' ম্রিয়মান বঙ্গ মঞ্চকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল সর্বাঙ্গীন নতুনত্বের স্পর্শে। তি[illegible] চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র, অহীন্দ্র চৌ[illegible] ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস [illegible]

[...]ায়, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি [...]শালী সৌখীন অভিনেতার একযোগে [...]দানে অভিনয়ে নবধারার প্রবর্তন, দৃশ্য- রচনা ও সাজসজ্জায় বৈচিত্র্যপূর্ণ [...]নবত্ব, আলোকসম্পাতের [...] [...] [...]তি একত্রিত হয়ে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সেদিন জোয়ার এনেছিল. তারই পরিপ্রেক্ষিতে [...]শচন্দ্র, তিনকড়ি এবং অহীন্দ্র নিজ নিজ [...]শক্তি দিয়ে দর্শক সমাজকে অভিভূত [...] ফেলেছিলেন।

এরপরে আর্ট থিয়েটার পরিচালিত [...] নরেশচন্দ্রের দ্বিতীয় ভূমিকা ছিল [রবী]ন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী'-তে শঙ্কর। [...]শ্য এই নাটকে সমালোচকদের বেশী [...] আলোচ্য হয়েছিলেন রাজা বিক্রমরূপী [তি]নকড়ি চক্রবর্তী, কুমারসেনরূপী অহীন্দ্র [চৌ]ধুরী, রানী সুমিত্রার ভূমিকাভিনেত্রী [...]ভাবিনী, ইলা-বেশিনী নীহারবালা, [...]তীরূপিনী ছোট গোলাপসুন্দরী, আর [...]ক্ষপীড়িত জনৈক প্রজার নীরব [ভূমি]কায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২৩- [...] ১০ অক্টোবর যখন স্টারে দ্বিজেন্দ্র- [লালে]র চন্দ্রগুপ্ত নব কলেবরে খোলা হল, [...]ন নরেশচন্দ্র তাঁর ইউনিভার্সিটি ইনস্টি- [টিউ]টে করা 'কাত্যায়ন'-এর ভূমিকাতে [অবত]ীর্ণ হয়ে দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন [জানি]য়েছিলেন। এই অভিনয়ে দর্শকদের [...]সী প্রশংসালাভ করেছিলেন নরেশচন্দ্র, [অহী]ন্দ্র চৌধুরী (সেলুকাস), দুর্গাদাস [বন্দ্যো]পাধ্যায় (চন্দ্রগুপ্ত), নীহারবালা [...]লেন) ও কৃষ্ণভামিনী (ছায়া)। নরেশ- [চ]ন্দ্রর 'কাত্যায়ন' একটি অবিস্মরণীয় [ভূমি]কা। অস্থিরচিত্ত, অশান্ত চাণক্যের [...]গী হিসেবে কাত্যায়নকে তিনি মূর্ত [ক]রে তুলতেন। ১৯২৪-এর জুলাই মাসে [...]ন গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ [...]কে দানীবাবুকে চাণক্যের ভূমিকা দিয়ে [...]বার করে 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হয়েছিল, [...]নও নরেশচন্দ্রই ছিলেন কাত্যায়ন। [...]শুনেছি, অশান্ত চাণক্যকে শান্ত [ক]রবার উদ্দেশ্যে কাত্যায়ন চাণক্যর পিঠে [হা]ত রাখলে দানীবাবু নাকি এই পিঠে [হা]ত রাখার ব্যাপারটাতে আপত্তি জানিয়ে- [ছি]লেন। এই দুই চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়ের [মা]ঝে নরেশচন্দ্র 'পুনর্জন্ম'-তে যাদব চক্র- [ব]র্তী, অযোধ্যার বেগম-এ ব্যাস রায় এবং [বি]বাহ-বিভ্রাট-এ ঘটক ও মিঃ সিং-এর [ভূ]মিকাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯২৪- [এ]র ডিসেম্বরে অমৃতলালের খাসদখল-এ [নি]তাই'-এর (এই নিতাই is the -র [ভূ]মিকাটি স্বয়ং অমৃতলাল আশ্চর্য [নৈ]পুণ্যের সঙ্গে অভিনয় করতেন) [ভূ]মিকাটিতে অবতীর্ণ হবার পরে ১৯২৫- [এ]র ১ জানুয়ারী বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রথম ট্র্যাজেডি 'সরলা'র পুনরভিনয়ে 'নীলকমল'-এর ভূমিকায় নরেশচন্দ্র আর একটি শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন উপস্থাপিত করেন। সংগত ও সঙ্গীত-বাতিকগ্রস্ত নীলকমলের কথা বলবার ধরন, বসবার কায়দা ও ভাবপ্রকাশের বিশিষ্ট ভঙ্গী গুণ-গ্রাহী দর্শকদের রীতিমত অভিভূত করেছিল। বেহালা বাজিয়ে 'পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব' গান তাঁর মুখে এক আশ্চর্য ধ্বনিরূপ ধারণ করত। ১৯২৫-এর ১১ ফেব্রুয়ারী যখন 'ইরাণের রানী'র পুনরভিনয় হল, তখন তাতে দায়ূদশা' সাজলেন নরেশচন্দ্র।

১৯২৫-এর ৫ এপ্রিল আর্ট থিয়েটারের চিত্তরঞ্জন শিল্পী যখন ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন এবং পরে অহীন্দ্র চৌধুরীকেও সেখানে যেতে হয়ে-ছিল, তখন কলকাতার থিয়েটার প্রোগ্রাম চালু রাখবার জন্যে শিল্পী বদল করার প্রয়োজন ঘটে। এই কারণে এই সময়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত গোল-কুণ্ডা নাটকে ঔরংজেব-এর ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর পরিবর্তে নরেশচন্দ্র অবতরণ করেন। এবং এই সময়েই ২৯ এপ্রিল যখন 'বলিদান' নাটক খোলা হল, তাতে তিনি সাজলেন রূপচাঁদ।

এরপরে আর্ট থিয়েটার ত্যাগ করে নরেশচন্দ্র তাঁর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট জীবনের বন্ধু শিশিরকুমারের 'মনোমোহন নাট্যমন্দির'-এ এসে যোগ দেন। 'হাঞ্চব্যাক অব নোতরদম' অবলম্বনে ব্যারিস্টার শ্রীশ-চন্দ্র বসু রচিত 'পুণ্ডরীক' নাটকের প্রথম রজনীটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি-ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে অভিনীত হয়। ১৯২৫-এর ১৮ আগস্ট তারিখের এই অভিনয়ে নরেশচন্দ্র প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন ভৃঙ্গার-এর ভূমিকায়। পুণ্ডরীকবেশী শিশিরকুমার যখন প্রথম সাক্ষাতের পর ভৃঙ্গারবেশী নরেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন: এতদিন কোথায় ছিলে, বন্ধু? তখন প্রেক্ষাগৃহে উপবিষ্ট দর্শককুল সমস্বরে উত্তর দিয়েছিলেন: আর্ট থিয়েটারে। এই সুন্দর চরিত্রটিতে অত্যন্ত সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা-ভাজন হয়েছিলেন নরেশচন্দ্র। এরপরে ১৯২৬ সালের ২৬ জুন যখন শিশিরকুমার কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চ (বর্তমানে শ্রী সিনেমা) ভাড়া নিয়ে তাঁর 'নাট্যমন্দির লিমিটেড'-এর উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক দিয়ে, তখন তাতে প্রথমে নক্ষত্র রায় ও পরে রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নরেশচন্দ্র। এখানে তিনি পরে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যরূপী শিশিরকুমারের সঙ্গে কাত্যায়ন-এর ভূমিকাভিনয়ও করেন।

১৯২৬-এর শেষাশেষি ১ ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণ খোলবার আগেই শিশিরকুমারের নাট্যমন্দির থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়েছিলেন নরেশচন্দ্র। এরপরে ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ছ' বছর তিনি কোথায় কোন্ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সে-সম্পর্কে আজ আর আমার কাছে কোনোরকম দলিলপত্র নেই। তাঁকে একেবারে আমরা দেখি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে। অবশ্য এর আগে নাট্যমন্দিরের রবি রায় এবং অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে 'দীপ্তি সংঘ' নামে যে ভ্রাম্যমাণ দল গঠন করেন ১৯৩০ সালে, তাতে নরেশচন্দ্রকেও অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। এই রবি রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দে এর্টণী

ষষ্ঠীচরণ গাঙ্গুলী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, ডি এন ধর, হেমচন্দ্র দে ও এস আমেদকে নিয়ে একটি প্রাইভেট কোম্পানী গঠন করে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ও রাজাবাগান স্ট্রীটের মোড়-বায়বর দত্ত কোম্পানীর জয়লক্ষী মিলের জায়গাটি লীজ নিয়ে গড়ে তোলেন নতুন রঙ্গমঞ্চ—রঙমহল। এই রঙমহলের পরিচালনাভার যখন শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র ও সতু সেন যুক্তভাবে গ্রহণ করেন ১৯৩৩ সালে, তখন তাঁরা ঐ বছরেরই ১৭ এপ্রিল অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' উপন্যাসের যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রদত্ত নাট্যরূপটিকে সতু সেন নির্মিত ঘূর্ণায়মান মঞ্চে উপস্থাপিত করেন। এবং এই সময় থেকেই নরেশচন্দ্রকে আবার কিছুদিনের জন্যে নিয়মিতভাবে পাদপ্রদীপের সামনে দেখা যায়। প্রথম নাটক 'মহানিশা'তেই বিহারীর ভূমিকায় নরেশচন্দ্র স্মরণীয় অভিনয় করেন। এরপরেই ১৯৩৩-এর ২ ডিসেম্বর মন্মথ রায় বিরচিত 'অশোক' নাটকে তিনি খল্লাতক-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই রঙমহলেই ১৯৩৪-এর ৩১ মার্চ থেকে অভিনীত পতিব্রতাতে কালীনাথ, রঙ্গালয়ের সাজঘর ও নেপথ্য কাহিনী-সম্বলিত কাজরীতে অনাদি (৭ আগস্ট), বাঙলার মেয়েতে জিতেন (২০ সেপ্টেম্বর), পথের সাথীতে স্কুলমাস্টার (১৯৩৫-এর ৯ মে), চরিত্রহীনে হারাণ (২০ ডিসেম্বর) হচ্ছে নরেশচন্দ্র অভিনীত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এরপর আমরা তাঁকে ১৯৩৬-এর ৪ এপ্রিল তারিখে দেখি নাট্যনিকেতনে অভিনীত রমেশচন্দ্র গোস্বামী রচিত জনপ্রিয় নাটক 'কেদার রায়'-এ খলচরিত্র শ্রীমন্তবেশে অসাধারণ নাটনৈপুণ্য প্রদর্শন করে নাট্যরসিকদের সাধুবাদ অর্জন করতে। এইখানে থাকতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের গোরার মঞ্চসফল নাট্যরূপ দেন এবং নিজে পানুবাবুর ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়ে ভূমিকাটিকে চিরস্মরণীয় করে তোলেন (১৯৩৬-এর ১৯ ডিসেম্বর)। এরপরে কিছুদিনের জন্যে নরেশচন্দ্র আবার রঙমহলে ফিরে যান। এখানে ১৯৪০-এর ১৪ আগস্ট তারিখে অভিনীত বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রণীত 'মালা রায়' নাটকে তাঁর মিঃ সেন-এর ভূমিকাভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রঙমহল থেকে আবার তাঁকে ফিরে যেতে দেখি নাট্যনিকেতনে। এখানে ১৯৪১-এর ১২ জুলাই থেকে অভিনীত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দীতে তিনি অচিন্ত্যবেশে দর্শকবৃন্দকে আনন্দদান করেন।

হ্যারিসন রোডের আলফ্রেড থিয়েটারের নতুন নামকরণ হয় নাট্যভারতী, যখন রঘুনাথ মল্লিক ১৯৩৯-এ থিয়েটারটি লীজ নিয়ে ৫ আগস্ট তারিখে 'তটিনীর বিচার' নাট্যাভিনয় এই নাট্যভারতীর পরিচালনাভার গ্রহণ করে শিশির মল্লিক যখন ১৯৪২-এর ২৮ মে তারিখে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন, তখন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভা প্রভৃতির সঙ্গে নরেশচন্দ্রকেও এই নাটকটিতে অভিনয় করতে দেখা যায়। গোমস্তা গোপীনাথবেশী নরেশচন্দ্রের মুখনিঃসৃত "সেই বাহাত্তর সালে একবার চা খেয়েছিলাম"—সংলাপ যিনি শুনেছেন, তিনি কখনই তা ভুলতে পারবেন না। এরপর তিনি এখানেই ১৯৪৩-এর ৮ জানুয়ারী তারাশঙ্করের পথের ডাক-এ রায়বাহাদুর এবং পরে শচীন সেনগুপ্ত প্রদত্ত দেবদাস-এর নাট্যরূপে শচীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত নতুন ভূমিকা বসন্তরূপে অবতীর্ণ হন। এরপরে পারিবারিক কারণে এবং অসুস্থতার জন্যে তিনি বেশ কিছুদিনের জন্যে রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চ যখন ১৯৫৬ সালে "ক্ষুধা" নাটক মঞ্চস্থ করতে অগ্রসর হন, তখন নরেশচন্দ্রই এই নাটকের পরিচালনাভার প্রাপ্ত হন। তার ওপর তিনি এতে 'জগৎবাবু'র চরিত্রে অবতীর্ণ হন। বিশ্বরূপার বৈজয়ন্তী 'সেতু' নাটকেরও পরিচালক তিনিই ছিলেন। এবং প্রায় দুশো রাত্রি পর্যন্ত তিনি এতে পুত্রহারা দাদুর ভূমিকায় আশ্চর্য অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়ে ১৯৬১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এই রঙ্গমঞ্চে তাঁর নিয়মিত অভি... ভূমিকা।

১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ ক... চার্চ কলেজ থেকে বি-এ পাশ ক... ইউনিভার্সিটি ল' কলেজ থে... আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন... থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর ... আসক্তি ছিল, ক্যালকাটা ই... ইনস্টিটিউটে তাঁর সেই অ... অনুকূল পরিবেশে সার্থকতা ... ১৯০৯ সালে ইনস্টিটিউট যখ... মন্মথমোহন বসুর শিক্ষকতায় ... নাটক মঞ্চস্থ করে, তখন ... দুর্বাসার ভূমিকায় যথাক্রমে ... ভাদুড়ী ও নরেশচন্দ্র মিত্রকে অ... দেখা যায়। চন্দ্রগুপ্ততে কাত্যায়ন... পুনর্জন্মতে যাদব, ইংরাজী ম... ভেনিস এবং ওথেলোতে যথাক্র... এবং ইয়াগো প্রভৃতি প্রতিটি ... নরেশচন্দ্র অনন্যভঙ্গীতে তাঁর না... ক্রমস্ফুরণের নিদর্শন উপস্থাপিত...

নরেশচন্দ্র বরাবরই চরিত্রাভি... চরিত্রাভিনেতারূপে তাঁর যে-বৈ... অন্য কারুর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়... বিশেষ শ্রেণীতে তিনি একক ... ধারণ। একটু টেনে টেনে বাচনভ... অঙ্গবিক্ষেপ এবং পাদচারণা। অ... জ্বলন্ত দৃষ্টি। গেল বছর ... রামচন্দ্রপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গ ... সম্মেলনে নাট্যশাখার সভাপতি... মনোজ্ঞ ভাষণ এখনও কানে বাজ... রূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ... ১৯৬৬-তে নরেশচন্দ্রকে ... স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ "বিশ্বরূপা ... দ্বারা ভূষিত করেন। কিছুদিন ... তিনি 'সোনাই দীঘি' ও ... যাত্রানাটকে প্রতাপরুদ্র ও বি... ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁর অভিনয়- ... এবং নাট্যাভিনয়ের প্রতি দুর্দম ... পরিচয় দেন। প্রায় ষাট বছর ধরে ... ভাবে নাট্যকলার আরাধনা কর... নটশেখরের আচম্বিতে ইহধাম ... একটি রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার। ... সেপ্টেম্বর, বুধবার তিনি শে... ফেলেন, তার পরের রবিবার, ২৯এ ... মহাজাতি সদনে তাঁর দুটি ... অংশগ্রহণ করবার কথা ছিল, কি... ইচ্ছাতে তা আর হল না।

বাঙলার চলচ্চিত্রজগতে পরিচা... অভিনেতারূপে তাঁর কৃতিত্বের ক... প্রবন্ধে বর্ণনা করবার ইচ্ছা রইল।

চিত্র সমালোচনা

বালুচরী (বাঙলা) : রাধারাণী পিক- চার্স-এর নিবেদন; ৩,৮২৫'০৯ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : কার্তিক বর্মন; চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী; কাহিনী : আশাপূর্ণা দেবী; সংগীত-পরিচালনা : রাজেন সরকার; গীতরচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ; শব্দানুলেখন : অনিল দাশগুপ্ত ও সৌমেন চট্টোপাধ্যায়; সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : সুনীল সরকার; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন সেন; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়; রূপায়ণে : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, গীতা দে, দীপিকা দাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, মৃণাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। নর্মদা পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থ সংসারের মন্দিরা বড়ো মেয়ে দুরন্ত আর্থিক অনটনের মধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত বাপ, কনিষ্ঠ দুই বোন এবং এক ভাই-এর সুখ-সুবিধা ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবার চেষ্টায় কিভাবে আত্মসুখ বলি দিয়েছিল, তারই কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে রাধারাণী পিকচার্স-এর তৃতীয় নিবেদন 'বালুচরী'। বড়ো মেয়ে মন্দিরার দুঃখকষ্ট দেখে সাধারণ দর্শক যাতে সহজেই ভাব-ব্যাকুল হয়ে উঠতে পারেন, তার জন্যে ছবির চিত্রনাট্য বহু বহু আলোড়নকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যার সবগুলিকেই হয়ত সম্ভাব্যতার পর্যায়ে ফেলা যায় না। মন্দিরার প্রতি সহানুভূতিশীল হচ্ছে শুধু ডাক্তার অভিজিৎ, যে বারংবার তাকে সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে প্রেমের সপ্তম স্বর্গে উন্নীত করতে চেয়েছে। অবশ্য শেষপর্যন্ত মন্দিরার দুঃখের অবসান ঘটেছে এবং সে তার দয়িতের সঙ্গে মিলিত হবার স্বপ্নকে সার্থক করতে পেরেছে। চিত্রনাট্যের ত্রুটি ছবির প্রথমাংশকে যথেষ্ট গতিসম্পন্ন হতে না দিলেও সমগ্রভাবে ছবিটি দর্শকদের চিত্তাকর্ষক হতে পেরেছে।

অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রথমেই সার্থকতা লাভ করেছেন নায়িকা মন্দিরার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। পরার্থ-পরতার ভাবটি তিনি সর্বাংশে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। অত্যন্ত সংযত অভিনয়ের মাধ্যমে মন্দিরার শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমিক ডাক্তার অভিজিৎ সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের সাবলীল অভিনয়ের মাধ্যমে। মন্দিরার ছোট ভাই সুনন্দের ভূমিকাটিকে যথাসাধ্য প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন অনুপকুমার। ধনীর জামাতা হয়ে যখন সুনন্দ কিছুটা স্বাধীনতা হারিয়েছে, তখনও যে সে দিদির জন্যে মর্মপীড়া অনুভব করছে, এ-ভাবটা অনুপকুমার বজায় রেখেছিলেন এবং শেষ-পর্যন্ত দিদির পক্ষ সমর্থনে সুনন্দর বিদ্রোহকে সুন্দরভাবে প্রকাশিত করেছেন। মন্দিরার কাকা, তাঁর স্বার্থান্বেষী স্ত্রী ও বিবাহোৎসুক শ্যালক কার্তিক—এই ত্রয়ী-রূপে যথাক্রমে গঙ্গাপদ বসু, রেণুকা রায় (অধুনা পরলোকগত) ও জহর রায় ছবির হাল্কা অংশে প্রধানত হাসির খোরাক যুগিয়েছেন। মন্দিরার দুই ছোট বোনরূপে জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও লিলি চক্রবর্তী চরিত্রানুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (মন্দিরার রোগাসক্ত বাবা), পাহাড়ী সান্যাল (সুনন্দর ধনী শ্বশুর), অজয় গাঙ্গুলী (মন্দিরার ছোট বোনের প্রেমিক), গীতা দে (মন্দিরার শুভানুধ্যায়িনী সমাজসেবিকা) ও মলিনা দেবী (অভিজিতের মা) উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। ধনী দুহিতার ভূমিকায় দীপিকা দাসকে নির্বাচন করা সঙ্গত হয়নি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। সম্পাদক তাঁর কাঁচিকে আর একটু তীক্ষ্ণ করলে ছবির গতি বা টেম্পো দ্রুততর হতে পারত; এ-কথা আগেই বলেছি। ছবির চারখানি গানই সুর এবং গাওয়ার দিক দিয়ে মাধুর্যমণ্ডিত। আবহসংগীত রচনা ছবির ভাবানুগ।

রাধারাণী পিকচার্স-এর তৃতীয় নিবেদন 'বালুচরী' অভিনয় ও কাহিনীগুণে সাধারণ দর্শকদের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হবে।

নতুন পাতা/আরতি গঙ্গোপাধ্যায়

অর্ধাঙ্গিনীর প্রাঙ্গণে/স্বরূপ দত্ত মাধবী মুখোপাধ্যায়

(২) ব্রহ্মচারী (হিন্দী) : সিপ্পী ফিল্মস্-এর নিবেদন; ৪,৬০৪·৯৪ মিটার দীর্ঘ এবং ১৯ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : জি পি সিপ্পী; পরিচালনা : ভাপ্পি সোনী; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : শচীন ভৌমিক; সংলাপ : আরুদ্র রোশানী; সংগীত-পরিচালনা : শঙ্কর জয়কিষেণ; গীতরচনা : শৈলেন্দ্র ও হসরৎ; চিত্রগ্রহণ : তারু দত্ত; শব্দানুলেখন : এস পাঠক এবং এ্রালিকর; সংগীতানুলেখন : মিনু কাত্রাক ও ডি ও ভনসলে; শিল্পনির্দেশনা : সুধেন্দু রায়; সম্পাদনা : এম এস সিন্দে; নৃত্যপরিচালনা : হার্মান বেঞ্জামিন; নেপথ্য কণ্ঠ-সংগীত : মোহাম্মদ রফি ও সুমন কল্যাণপুর; রূপায়ণ : শাম্মীকাপুর, প্রাণ, ধুমল, অসিত সেন, মোহন চটি, মনোমোহন কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ধাওয়ান, জগদীপ, রাজশ্রী, মমতাজ, মাধবী, রত্নমালা, পদ্মারাণী, বেবী ফরিদা এবং মাস্টার শহীদ, মাস্টার শচীন, ছোট মেহমুদ, মাস্টার অনিল, বেবী মীনা প্রভৃতি। রাজশ্রী পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গোল ২৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার থেকে হিন্দ, প্রিয়া, নাজ, খান্না, কালিকা, দীপ্তি, লিবার্টি এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

গরীব যুবক সমাজের অবাঞ্ছিত শিশু-বালক-বালিকাদের আশ্রয় দিয়ে মানুষ করে তোলবার চেষ্টায় একটি আশ্রম খুলেছে। ছোট্ট জায়গায় স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না বলে তারা পাশের খালি অংশটিও পেতে চায়। এইজন্যে সেদিকে কোনোও ভাড়াটে যাতে আসতে না পারে, সেদিকে আশ্রমবাসীদের সতর্ক দৃষ্টি। এই সময়ে আশ্রমে এসে উপস্থিত হল একটি তরুণী; সে তার পিতৃবন্ধু-পুত্র রবি দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হওয়ার যখন জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, তখন ঐ আশ্রমাধ্যক্ষ যুবক ব্রহ্মচারী তাকে আত্মহত্যার সংকল্প হতে বিরত করেন। প্রত্যাখ্যানের কারণ অবগত হয়ে ব্রহ্মচারী তাকে একটি আধুনিকাতে রূপান্তরিত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। রবি যখন রূপা নামে একটি আধুনিকা মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময়ে রূপান্তরিতা 'শীতল'—শীতলই হচ্ছে তরুণীটির নাম—রবির চোখের সামনে নিজের ঝলকানি নিয়ে উপস্থিত হল; রবি চমকে গেল তাকে দেখে —কে এই আশ্চর্য রূপসী? শীতল কিন্তু চেনা দিয়েও তাকে ধরা দিল না; উল্টে পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে সে বিজয়-গর্বে স্থানত্যাগ করল। রবির কিন্তু তাকে চাই-ই। শীতলের কাকার সাহায্যে সে তাকে আশ্রমচ্যুত করল। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির মাঝে সে অনাথ বালক-বালিকাগুলি সমেত ব্রহ্মচারীকে তার আশ্রয় থেকে বিতাড়িত করল। এমন অবস্থায় সৃষ্টি হল যে, ব্রহ্মচারী তার অন্তরের ভালোবাসাকে গোপন করে রবির সঙ্গে যাতে শীতলের বিবাহ সম্ভব হয়, তার জন্যে অন্য এক নারীর সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করলে। কিন্তু মেঘ ক্ষণিকের, চির-দিবসের সূর্য। তাই শেষপর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান হয়ে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে শীতলেরই মিলন হল। কেমন করে তা হল—এই নিয়েই ছবির শেষাংশ রচিত হয়েছে।

যুবক-যুবতীর অসামাজিক এবং আইনবহির্ভূত যৌনমিলনের ফলে যে-সন্তানের জন্ম হয়, তার অপরাধ কোথায়? সে একান্তই নিরপরাধ এবং সেই কারণে যে-কোনও লোকের মতোই তার সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার আছে—এই বক্তব্যটি সোচ্চারভাবে ধ্বনিত হয়েছে সিপ্পী ফিল্মস কৃত "ব্রহ্মচারী" ছবির মাধ্যমে এবং এর জন্যে এই ছবির নির্মাতারা আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র। এরই সঙ্গে একটি অনাধুনিক, অশিক্ষিতা তরুণীর ব্যক্তিগত সমস্যা জড়িত হওয়া সত্ত্বেও ছবিখানি পরিস্থিতি ও চরিত্রচিত্রণের অভিনবত্বে আমাদের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল প্রথম অর্ধেকেরও বেশী-ভাগ পর্যন্ত। কিন্তু তারপর যখন ঘটনা-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে সর্পাঘাতের অবতারণা করা হয় এবং খলনায়ক রবির কার্যকলাপ সাধারণ 'বোম্বাই' মার্কা ছবির সামিল হয়ে পড়ে, তখনই ছবিটির মনোহারী অভিনবত্ব অন্তর্হিত হয়ে ছবিখানি আর একখানি 'বোম্বাই' ছবিতে পর্যবসিত হয়ে পড়ে।

ছবির অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে ব্রহ্মচারী আশ্রমের বাসিন্দা বালক-বালিকার দল। এদের সামগ্রিক অভিনয় ছবিটিকে সার্থক হয়ে উঠতে অনেকখানিক সাহায্য করেছে। বিশেষ করে ওদের মধ্যে ছোট মেহমুদ; তার আশ্চর্য জিভ-উল্টানো বচন এবং অঙ্গভঙ্গী রীতিমত অবিস্মরণীয়। নায়িকা এবং উপনায়িকারূপে রাজশ্রী ও মমতাজ যেমন অভিনয় করেছেন, তেমনই নেচেছেন; এঁদের ভালো না লেগে উপায় নেই। ব্রহ্মচারীর ভূমিকায় 'জংলী', 'জানোয়ার'-এর জনপ্রিয় নায়ক শাম্মী কাপুর তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীর মধ্যেও সংযমের ছোঁয়াচ এনেছেন ভূমিকাটিকে একটি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করবার জন্যে। এতে তাঁর জনপ্রিয়তা বর্ধিতই হবে। মোটর-চালকের কন্যা অনিমারূপে মাধবী এবং তার প্রণয়ীবেশে জগদীশ মূল কাহিনীর পাশে একটি উপকাহিনী সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন। মোটরচালকরূপে ধুমল আমাদের হাসির খোরাক যুগিয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় প্রাণ (রবি), অসিত সে... চটি, মনোমোহন প্রভৃতির অভি...

ছবির কলাকৌশলের বিভি... কাজ ভূয়সী প্রশংসনীয়। ছ... শট-এর কম্পোজিসন ও মোবি... সহজ গতিময়তা নিরীক্ষণ কর... বস্তু। দৃশ্যাদি রচনায় শিল্প... সুরুচির রসজ্ঞানের পরিচয় ... ছবির ছ'খানি গানই সংগীত ... সমৃদ্ধ। আবহসংগীত ছবির ... যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ছবির ... সুক্ষ্মময় ও সুন্দরভাবে চিত্রায়...

জি, পি, সিপ্পী প্রযোজিত ... কাহিনীর অভিনবত্বে এবং ... অভিনয়গুণে জনসমাদর লাভ ... পরিমাণে।

সংঘর্ষ (হিন্দী) : রাহুল ... (ইণ্ডিয়া)-এর নিবেদন; ৫,৩০৫ ... দীর্ঘ এবং ২১ রীলে সম্পূর্ণ; ... চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ... রাওয়েল; কাহিনী : মহাশ্বে... চিত্র-কাহিনী : অঞ্জনা রাওয়েল; ... গুলজার এবং আক্তার আলভি ... পরিচালনা : নৌশাদ; গীত-রচন... বাদাউনী; চিত্র-গ্রহণ পরিচালনা : ... মাথুর; শব্দানুলেখন : ও... ওয়াগলে; সংগীতানুলেখন : ম... ও কৌশিক; শব্দপুনর্যোজন ... কাত্রাক; শিল্পনির্দেশনা : স... সম্পাদনা : কৃষ্ণন সচদেব; নৃ... গোপীকৃষ্ণ; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত ... মঙ্গেশকর, মোহাম্মদ রফী এ... ভোঁসলে; রূপায়ণ : দিলীপকুমা... সাহনী, সঞ্জীবকুমার, জয়ন্ত ... উল্লাস, ইফতেকার, সপ্রু, জগ... রাজেশকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, দ... সুলোচনা, মমতাজ বেগম, পদ্মা ... দোসানী ফিল্মস-এর পরিবেশনায় ... সেপ্টেম্বর, শুক্রবার থেকে ওরিয়ে... ন্টিক, বসুশ্রী, মেনকা, বীণা, প্রভ... ইস্টালী এবং অপরাপর চিত্রগৃ... হচ্ছে।

মহাশ্বেতা দেবী রচিত মূ... সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, ... চিত্রে যেভাবে 'সংঘর্ষ'-এর ... বিধৃত দেখলুম, তাতে সং... আদর্শের সংঘর্ষ এবং এই আদ... বেধেছে ঠাকুরদাদা ও নাতির ম... ব্যক্তি চান, মানুষের প্রতি ঘৃ... নৃশংস অত্যাচার করে নিজেকে ... রাখতে; আর দ্বিতীয় জনের ... প্রচেষ্টা হল, নিঃস্বার্থ ভালো... সকলের মনে মানবতাবোধ জাগি... মিত্র নির্বিশেষে সকলকেই ত... নেওয়া। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি... যখন আইন দ্বারা ঠগী দমন ... তখন ঠগী সম্প্রদায়ভুক্ত ভবানীপ্র... গ্রাম ও পূজা-অর্চনার আবরণে ... নরহত্যা চালাতে লাগলেন অবা... নিজ পৌত্র কুন্দনকেও বাল্যকা...

পথে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করে বদ্ধপরিকর হলেন নিজ স্ত্রী, পুত্র ...বের অমতে। পুত্র বিদ্রোহ করতে হত্যা করতেও তিনি দ্বিধা করলেন যথারীতি এর দায়িত্ব চাপিয়ে- তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতার উপর ও তাকে করলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রেরা যখন বড়ো তখন তাঁরা এই হত্যার প্রতিশোধ চাইলেন ভবানীপ্রসাদের স্নেহ- কুন্দনকে হত্যা করে। কিন্তু প্রসাদ ও দ্বারকাপ্রসাদের এই চেষ্টা বিফল হতে লাগল একজন নারী দ্বারা। বাল্যে যখন এই নাম ছিল মুন্নি, তখন থেকেই সে কুন্দনের খেলার সাথী। বড়ো হয়ে ...গ্যদোষে একজন নর্তকীতে পরিণত কিন্তু কুন্দনের প্রতি তার ভালোবাসা অটুট। কুন্দন সেবা ও ভালোবাসার শত্রুতার সমস্ত ক্ষত দূর করবার গণেশপ্রসাদের কাছে বজরঙ্গী নাম এক ভৃত্যের ছদ্মবেশে থাকতে লাগল। পরে যখন তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত তখন গণেশপ্রসাদ দ্বিগুণ উৎসাহে ও ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গেল। কুন্দনের চরিত্রমাধুর্য শেষ পর্যন্ত করে জয়ী হল, তাই নিয়েই ছবির উত্তেজক দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে।

কুন্দনের ভূমিকায় দিলীপকুমার আন্ত- অভিনয় দ্বারা চরিত্রটিকে মূর্ত করে ...নে: বাচনে, ভঙ্গীতে তাঁর সংবেদন- নাট্যনৈপুণ্য দর্শকমনে সম্মোহনী ...ক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রতিপক্ষ গণেশ- ...র রূপসজ্জায় বলরাজ সাহনীকে দেখতে হয়েছে রীতিমত যুবক। তিনি ...ত সংযতভাবে চরিত্রটি চিত্রিত ...ন। কঠোর চরিত্র ভবানীপ্রসাদের ...য় জয়ন্তের দৃপ্ত ভঙ্গীটি ভালো। পুত্র শংকরের ছোট্ট ভূমিকায় ...কারের সু-অভিনয় মর্ম স্পর্শ করে। ...রে ভূমিকায় সুলোচনার অভিনয় ...ও সমান কথা বলা চলে। ভবানী- ...র স্ত্রীবেশে দুর্গা খোটে তাঁর স্বভাব- সু-বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে চরিত্রটিকে ...ত করেছেন। গণেশ- ...র ভাই দ্বারকাপ্রসাদ রূপে সঞ্জীব- চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। ...প্রসাদের ভ্রাতার ভূমিকায় উল্লাস ...নারায়ণের রূপটিকে ফুটিয়ে ...সক্ষম হয়েছেন। কুন্দনের ভগ্নী রূপে মহেন্দ্র ছোট্টর মধ্যে সুন্দর। কুন্দনের ...কা মুন্নি এবং লায়লী আসমান বেশে ...মালা নাচে, গানে, অভিনয়ে ...টিকে জীবন্ত করে তোলবার প্রয়াস ...ন। কিছুটা রহস্যময়ী এই চরিত্রটি ...রও বিশ্বাস্যভাবে দর্শক-সমক্ষে পরা..., সে ত্রুটি চিত্রনাট্যের।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চমান রক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে শিল্পনির্দেশনাগুণে প্রতিটি দৃশ্য ...সত্ত্বেও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে ...। ছবিটিতে সাতখানি গান আছে। ...দের মধ্যে 'দিল পায়া অলবেলা মৈনে' 'মেরে পাস আও, নজর তো মিলাও' 'তসবীরে মুহব্বত থী জিসমে' গান তিনখানি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। আবহ-সঙ্গীত ছবির ভাবানুযায়ী।

রাহুল থিয়েটার্স (ইন্ডিয়া) নিবেদিত 'সংঘর্ষ' অভিনয়, গান এবং উত্তেজক দৃশ্যাবলীর গুণে জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

—নান্দীকর

বিবিধ সংবাদ

শিল্পী সংসদ-এর প্রতিষ্ঠা :

মঞ্চ, চলচ্চিত্র ও যাত্রাজগতের শিল্পী, গায়ক, নৃত্যকুশলী, বাদ্য যন্ত্রশিল্পী প্রভৃতিকে একটি সংস্থাভুক্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি 'শিল্পী সংসদ' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি জন্মগ্রহণ করেছে, তার সভাপতি পদে বৃত হয়েছেন চলচ্চিত্রনায়ক উত্তমকুমার। সম্পাদকের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন পরিচালক-অভিনেতা অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন জহর রায়। সেপ্টেম্বরেই রেজেস্ট্রীকৃত এই সংস্থার সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৯৫০-এরও উর্ধে। দুঃস্থ শিল্পীদের জন্যে সাহায্য ভান্ডার খোলা, অল্প আয়বিশিষ্ট শিল্পীদের রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ছাড়াও শিল্পীদের উৎকর্ষবিধানের জন্যে, একটি গ্রন্থাগার খোলা, আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা প্রভৃতি বহুবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,—এই কথা সেদিন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃত করলেন সংস্থা-সভাপতি উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পদ্মপাতায় জল

১২ অকটোবর ওয়েস্টবেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা তাঁদের নিজস্ব বিল্ডিং-এ দিলীপ বসাকের 'পদ্মপাতায় জল' নাটকটি অভিনয় করবেন। নাট্যকার স্বয়ং নাটকটির নির্দেশক এবং পরিশেষে বিচিত্রানুষ্ঠান।
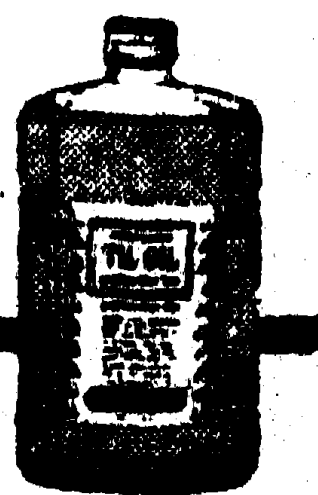
জলসা

গ্রামোফোন কোম্পানীর শারদোপহার

গ্রামোফোন কোম্পানী এবারের পুজোর রেকর্ডেও তাঁদের বৈচিত্র্যের ঐতিহ্য পুরো-পুরি বজায় রেখেছেন।

২৬ খানি ৭৮ আর-পি রেকর্ডের মধ্যে বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ হেমন্ত মুখো-পাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানব মুখোপাধ্যায়, যথাক্রমে মুকুল দত্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও শ্যামল গুপ্তের গীতিকাব্যে নিজেরাই সুরারোপ করেছেন। আপনাপন বৈশিষ্ট্যে এ'রা শ্রোতাদের খুসী করতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় মান্না দের সুরে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানদুটি বেশ উপভোগ্য করে তুলেছেন।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত পল্লীগীতি নির্মলেন্দু চৌধুরী স্বভাবানুগ দক্ষতায় জমিয়েছেন। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের আপন সুর ও সংগীত পরিচালনায় দীপংকর চট্টোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দুটি গান। কথোপকথনের নাটকীয় রীতিতে, হৃদয় বিনিময়ে নূতনত্ব শিল্পীর পরিবেশন-কুশলতায় চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে। কণ্ঠ-গাম্ভীর্য ও রাগের আলতো ছোঁয়ায় আজও আপন শিল্পীব্যক্তিত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

মহিলাশিল্পীদের মধ্যে একাধারে কণ্ঠ-সৌকর্য ও অন্তর্মুখী গায়নশৈলীতে এক-নিমেষে শ্রোতাদের চিত্তকে আকর্ষণ করেছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইলা বসু পাশ্চাত্য সংগীতের নৃত্যোচ্ছলছন্দের সঙ্গে আপনার কণ্ঠকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। কথা ও সুরের রচয়িতা সুধীন দাসগুপ্ত। ডাঃ নচিকেতা ঘোষের চিত্তাকর্ষক সুরে পুলক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গানদুটির সুন্দর রূপায়ণ ঘটিয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। বিশেষ করে "আকাশ কথা বলে" গানটিতে "চুপি চুপি"তে দাদরা ছন্দের তাল-ফেরতায় ফিরে আসার শিল্পীজনোচিত কুশলতা সত্যিই মনকে দুলিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নচিকেতা ঘোষের সুরে প্রণব রায়ের কাব্যগীতির মাধুর্যকে মুখর করেছেন। বিশেষ "দিন যায় যায়, রাত যায় যায়" কলিতে যে সাসপেন্স ঘনিয়ে তুলেছেন তার কতটা সুরকারের এবং কতটা শিল্পীর প্রাপ্য তা বিচার করা সত্যিই কঠিন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়ের কৌতুকমকসা মুহূর্তের জন্যও মনকে বাস্তব জগতের রুক্ষতা ভুলিয়ে হাসির বানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে।

বোম্বাই তারকাদের মধ্যে কিশোরকুমার, তালাত মামুদ, মুকেশ, মান্না দে, লতা মঙ্গেশকার, আশা ভোঁসলে, সুমন কল্যাণপুর, সবিতা চৌধুরীর গান এক বিশেষ শ্রেণীর শ্রোতাদের খুসী করবে।

তরুণেতরতর শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন নির্মলা মিশ্র। অলংকৃত কণ্ঠ ও প্রাণোচ্ছলতায় এ'র গান আনন্দদায়ক। কোনো বিশেষ শিল্পীকে অনুকরণের মুদ্রাদোষ ত্যাগ করলে আপন বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হতে এ'র দেরী হবে না।

সুবীর সেন, মিন্টু দাশগুপ্ত, বনশ্রী সেনগুপ্ত, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্যর গানে প্রচুর প্রতিশ্রুতির আশ্বাস আছে।

সাতখানি এক্সটেনডেড প্লে রেকর্ডে, কুমার শচীন দেববর্মণের আধুনিক গীতি, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র সংগীত, সনৎ সিংহ ও আরতি বসুর ছড়াগান, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের অতুলপ্রসাদী গীতি, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন ও বীরেন ভদ্র পরিচালিত চণ্ডীর বৈচিত্র্য সম্ভার সু-সজ্জিত। ইলেকট্রিক গীটারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইলেকট্রিক গীটারও ই, পি রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত।

লং প্লেয়িং—রেকর্ড দুটির একটিতে জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুমন কল্যানপুর, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইলা বসুর বেশ কয়েকটি 'হিট্-সঙ'-এর মালা গেঁথে উপহার দিয়েছেন গ্রামোফোন কোম্পানী। আর এক উল্লেখযোগ্য অবদান হোলো তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কবি"।

গ্রাম্য কবিয়াল নিতাই—পথই তার ঘর। প্রতিটি মুহূর্তের অনুভবকে গীতিমাল্যে গ্রথিত করে অগণিত শ্রোতাকে তৃপ্ত করা তার পেশাই শুধু নয় নেশাও বটে। জীবনে দুটি নারী তার কবিসত্তাকে আলোড়িত করেছে—একজন ঠাকুরঝি, অপরজন বসন। একজনের চোখে কাজল কালো মেঘের অতল গভীরতা, অপরজনের মদির চাউনীতে সর্বনাশের আহবান। কিন্তু উভয়ের কাউকেই ধরে রাখতে না পেরে তার বেদনা—উদ্বেল জীবন-জিজ্ঞাসা "জীবন এত ছোটো কেনে" মঞ্চ ও পর্দায় বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী এই নাটককে রেকর্ড-ধৃত করে হিজ মাস্টারস ভয়েস এক বিরাট দায়িত্ব পালন করে শিল্পরসিক-বৃন্দের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অভিনয়ে সেই শিল্পীরাই আছেন যাঁরা ইতিপূর্বেই বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছিল। এ'রা হলেন নীলিমা দাস, (বসন), অনুভা গুপ্তা (ঘোষ) (ঠাকুরঝি), রবীন মজুমদার (কবিয়াল), ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] (বড়), হরিধন মুখোপাধ্যায়। পরি[illegible] বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বিশেষ করে নাটকটি শোনাবার জন্যই পুজোর আগে গ্রামোফোন কোম্পানীর গ্র্যান্ড হোটেলের ব্যাংকোয়ে[illegible] সাংবাদিকরা শিল্পী ও ষ্টাফদের [illegible] মনোজ্ঞ সান্ধ্য-সম্মেলন আহ্বান ক[illegible]

বন্যাত্রাণে উচ্চাংগ সংগীতের [illegible]

রাজ্যপালের বন্যাত্রাণ সাহায্যার্থে পুজোর অব্যবহিত প[illegible] কয়েকজন মার্গসংগীত শিল্পীর [illegible] শোনা গেল তারা হলেন সর্ব[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী রায়, আহ্মেদ ও এ, কানন। স্থান রবী[illegible]

শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] গেয়ে শোনালেন। রাগের নির্বাচ[illegible] পরিবেশনাও চিত্তগ্রাহী। কিছু তা[illegible] বড়োগোলাম আলি খাঁর প্রভাব অ[illegible] তবে তা নিছক অনুকরণই নয় [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষা এবং অ[illegible] যথেষ্ট। এর সঙ্গে বড়ে গোল[illegible] খাঁর বৈশিষ্ট্য মিলিত হয়ে ত[illegible] মর্যাদামণ্ডিত হয়েছে। [illegible] লালিত্যের সমতা হয়ত সবসময়[illegible] তবে সামগ্রিক ফলশ্রুতি শ্রোতাদে[illegible] আদায় করেছে।

এ, কানন গাইলেন 'মারু[illegible] এ'র গানও শ্রোতাদের খুসী [illegible] পেরেছে। এই আসরের আকর্ষণীয় [illegible] হোল শ্রীমতী কল্যাণী রায় ও [illegible] আহ্মেদের দ্বৈত সেতার ও সানা[illegible]

সানাই ও সেতার বিভিন্ন[illegible] হলেও প্রকৃত শিল্পীর হাতে পড়[illegible] মাধুর্য সৃষ্টি করতে পারে তা[illegible] নিদর্শন পেশ করেছিলেন [illegible] বিসমিল্লা খাঁ ও ওস্তাদ বিলায়েত [illegible]

সেই ধারাকেই অনাহত রেখে[illegible] নবীন শিল্পী দুজন চন্দ্রকোষের [illegible] বিনতি সানাই-এর গুঞ্জনে ও [illegible] বাজে অত্যন্ত উপভোগ্য এক [illegible] পরিবেশ রচনা করেছিল। আফাক [illegible] তবলাসংগত দুই শিল্পীর [illegible] প্রশংসাযোগ্য অনুসরণ করে [illegible] সাফল্যের সহায়ক হয়েছে।

জনপ্রিয় শিল্পী দুজনের বিবা[illegible]

জনপ্রিয় শিল্পী সতীনাথ মু[illegible] ও উৎপলা সেন ২৬শে সেপ্টেম্বর [illegible] প্রথানুযায়ী বিবাহবন্ধ হয়েছেন।

সুপরিচিত গায়িকা শ্রীমতী [illegible] মুখার্জির সঙ্গে আই, সি, [illegible] কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীদীলিপ চ[illegible] পরিণয় সঙ্গীতমহলের আর এক [illegible] যোগ্য খবর।

আমেরিকার কনোলী দম্পতি : ১৯৬৮ সালের আমেরিকান এ্যাথলীট দলে নির্বাচিত হ্যারোল্ড কনোলী এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী ওলগা কনোলী। এই নিয়ে তাঁরা উপর্যুপরি চারটি অলিম্পিক গেমসে যোগদান করছেন। ১৯৫২ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে হ্যারোল্ড কনোলী হ্যামার নিক্ষেপে এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে তাঁর কুমারী জীবনে শ্রীমতী কনোলী ডিসকাস নিক্ষেপে স্বর্ণপদক জয় করেছিলেন।

মেক্সিকো অলিম্পিক

ক্ষেত্রনাথ রায়

মেক্সিকো সিটিতে আগামী ১২ই টোবর আধুনিক কালের ১৯তম ম্পিক গেমসের উদ্বোধন হবে। প্তাহব্যাপী এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের আরম্ভ ই অক্টোবর এবং সমাপ্তি ২৬শে টোবর। ২৭শে অক্টোবর তারিখে তম অলিম্পিক গেমসের সমাপ্তি উৎসব পিত হবে। ইতিমধ্যে অলিম্পিক গ্রামে জারের বেশী ক্রীড়াবিদ উপস্থিত ছেন। অলিম্পিক ক্রীড়ার সংগঠকদের থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, বর্তমানে শ হাজারের বেশী বিদেশী মেক্সিকো টতে উপস্থিত হয়েছেন এবং আরও বেন। অলিম্পিক গেমস বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ড়ানুষ্ঠান। সারা পৃথিবী জুড়ে ম্পিক গেমস উপলক্ষে কত প্রস্তুতি, াহ, উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা! কিন্তু কো অলিম্পিকে উৎসাহের একান্ত াব দেখা দিয়েছে। তার একমাত্র কারণ কো সিটিতে কয়েকমাস ধরে যে ার বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছে তা ম্পিক গেমসের প্রাক্কালে ভয়াবহ রূপ করেছে। গত ৩রা অক্টোবর রিখে মেক্সিকো শহরে সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর প্রচন্ড ঙ্গা হয়ে গেছে। এই দাঙ্গায় ২৫ জনের ্যু হয়েছে এবং শত শত লোক আহত য়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, ছাত্ররাও ছোট ট কামান এবং বন্দুক ব্যবহার করেছিল। লিম্পিকে যোগদানকারী ক্রীড়াবিদ এবং টকদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে মেক্সিকো টির বন্দুকের দোকানগুলি ২৭শে ক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের বড়কর্তাদের মতে, সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার সঙ্গে স্থানীয় এবং বিদেশী গেরিলাদের যোগসাজস আছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে এরা নাকি অলিম্পিক গেমস বানচাল করার মতলব করেছে। গুপ্ত আন্দোলনকারীরা নিজেদের 'মুক্তি ফৌজ' হিসাবে চিহ্নিত করে ইস্তাহার মারফৎ জানিয়ে দিয়েছে, অলিম্পিকের উদ্বোধন দিন থেকে ক্রীড়ানুষ্ঠানকাল পর্যন্ত সামরিক অভিযান চালানো হবে। এই ইস্তাহারে আরও বলা হয়েছে ছাত্র, কৃষক এবং শ্রমিকদের নিয়ে যে 'মুক্তিফৌজ' তৈরী হয়েছে তার উদ্দেশ্য অত্যাচারী মেক্সিকো সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা-যুদ্ধ পরিচালনা করা। সরকার পক্ষ থেকে অভয় দেওয়া হয়েছে, অলিম্পিক গেমস যথারীতি চলবে। সামরিক পাহারায় অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন হবে এবং পরবর্তী ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলিতেও কড়া সামরিক ব্যবস্থা থাকবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি ঘোষণা করেছেন, হিংসাত্মক কার্যকলাপ সত্ত্বেও অলিম্পিক গেমস যথারীতি চলবে। তাঁর এই ঘোষণায় কিন্তু অন্যান্য কর্মকর্তারা কোন ভরসা পাচ্ছেন না, বরং খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।
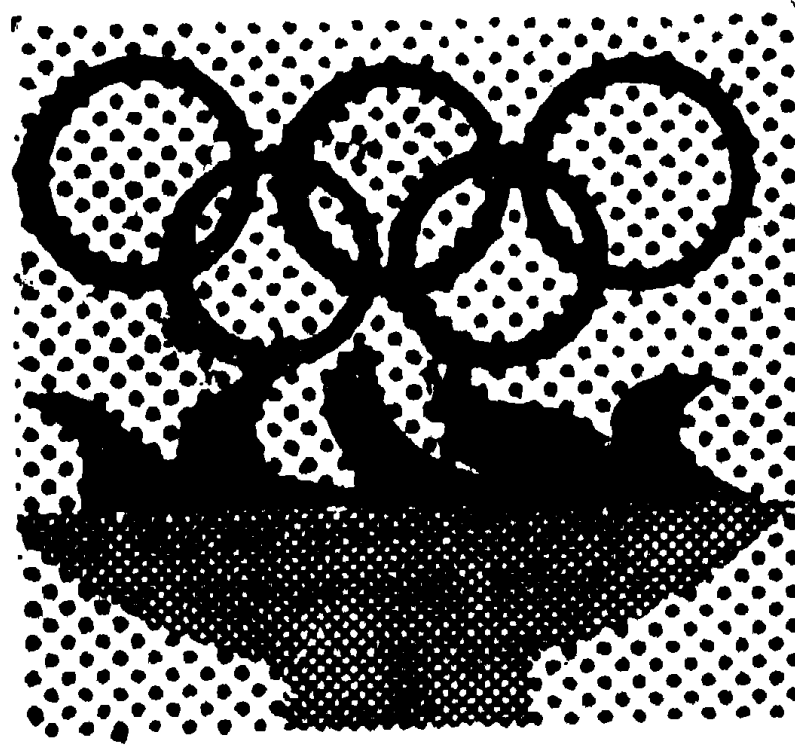
১৯তম অলিম্পিক গেমসের স্থান নির্বাচন-আসরে প্রার্থী ছিল এই চারটি শহর—আমেরিকার ডেট্রয়ট, আর্জেন্টিনার বুইনোস এরেস, ফ্রান্সের লিয় এবং মেক্সিকোর মেক্সিকো সিটি। এই চারটি শহরের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা, প্রদর্শনী এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। শেষপর্যন্ত কমিটির সদস্যদের ভোটে মেক্সিকো সিটি জয়লাভ করে। ফলে ল্যাটিন আমেরিকার মাটিতে আধুনিক কালের অলিম্পিক গেমসের আসর এই প্রথম বসছে। ভোটের ফলাফল দাঁড়ায় : মেক্সিকোর পক্ষে ৩০, ডেট্রয়টের পক্ষে ১৪, লিয়ন্সের পক্ষে ১২ এবং বুইনোস এরেসের পক্ষে ২টি ভোট। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মেক্সিকো সিটির অবস্থান ৭,৩৪৭ ফিট উঁচুতে। ইতিপূর্বে এত উঁচু জায়গায় কখনো অলিম্পিক গেমসের আসর বসেনি। এই উচ্চতা নিয়ে কয়েকটি সমতল দেশের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের আপত্তি টেকেনি। এরকম উঁচু খেলার আসরে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সমতলবাসী খেলোয়াড়রা এইসব অসুবিধার মধ্যে পড়বেন—স্নায়বিক চাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, পেটের গোলমাল এবং দেহের ওজন হ্রাস। তাছাড়া এ আসর উন্নত ক্রীড়ামানের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

ইতিহাসে এই প্রথম

সুদূর গ্রীসের অলিম্পিয়া থেকে প্রেরিত পূতাগ্নি মশালটি দৌড়বীরদের সাহায্যে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে আনা হবে। তারপর মেক্সিকোর ১৯ বছরের এ্যাথলীট কুমারী নর্মা এনরিকোয়েটা ব্যাসিলিও মশাল হাতে স্টেডিয়ামে শেষ চক্কর দিবেন এবং এই মশালের সাহায্যে স্টেডিয়ামের বৃহৎ আধারে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করবেন। আধুনিক কালের অলিম্পিক গেমসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই ভূমিকায় মহিলার অংশগ্রহণ এই প্রথম—এতদিন পুরুষরাই এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিশেষ আকর্ষণ

মেক্সিকোর ১৯তম অলিম্পিক গেমসের প্রধান আকর্ষণ ইথিওপিয়ার বিশ্ববিশ্রুত দৌড়বীর আবেবে বিকিলা। তিনি উপর্যু-

মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের স্বর্ণপদক (দু'দিকের ছবি)।
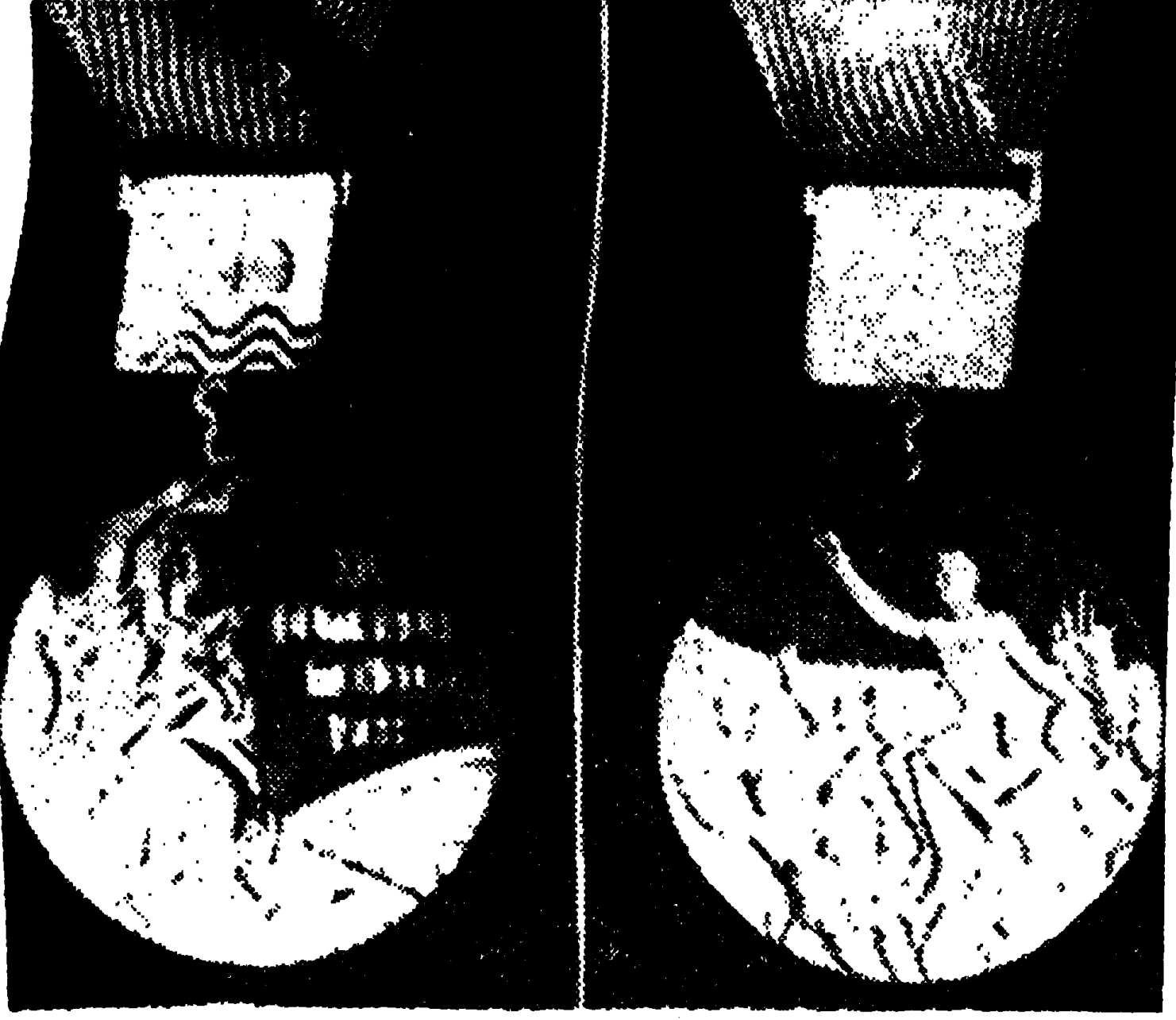
পর দু'টি অলিম্পিক গেমসের (১৯৬০ ও ১৯৬৪) ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছেন। একমাত্র তিনিই অলিম্পিক গেমসের ম্যারাথন দৌড়ের ইতিহাসে দু'বার স্বর্ণপদক জয়ী। মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের ম্যারাথন দৌড়ে তাঁর স্বর্ণপদক জয়ের সম্ভাবনা খুবই।

আমেরিকার হ্যারোল্ড কনোলী এবং তাঁর সহধর্মিণী ওলগা কনোলী মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের এক বিশেষ আকর্ষণ। ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে হ্যারোল্ড কনোলী আমেরিকার পক্ষে হ্যামার নিক্ষেপে স্বর্ণপদক জয়ী হন। অপরদিকে ওলগা কনোলী ওরফে কুমারী ওলগা ফিকোটোভা চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে মহিলাদের ডিসকাস নিক্ষেপে স্বর্ণ-পদক জয় করেছিলেন। এই মেলবোর্ন অলিম্পিক গেমসের আসরে তাঁদের স্বল্প-কালের মেলামেশা শেষপর্যন্ত তাঁদের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে। এই মিলনের পথে অনেক রাজনৈতিক বাধা-বিপত্তি তাঁদের অতিক্রম করতে হয়েছিল। দু'জনেই এই নিয়ে উপর্যুপরি চারবার অলিম্পিক গেমসে যোগদান করছেন। অপরদিকে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে তাঁদের যোগদান এই নিয়ে তিনবার। ১৯৫৬ সালে হ্যামার নিক্ষেপে স্বর্ণপদক জয়ের পর হ্যারোল্ড কনোলী ১৯৬০ সালে ৮ম এবং ১৯৬৪ সালে ৬ষ্ঠ স্থান পেয়েছিলেন। অপরদিকে শ্রীমতী ওলগা কানোলী ডিসকাস নিক্ষেপে ১৯৬০ সালে ৭ম এবং ১৯৬৪ সালে দ্বাদশ স্থান পান। মেক্সিকোর অলিম্পিক গেমসে তাঁরা দু'জনেই পদক জয়ের আশা রাখেন। বর্তমানে হ্যারোল্ড কনোলীর বয়স ৩৬ এবং চার সন্তানের জননী শ্রীমতী কনোলীর বয়স ৩৫। অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে তাঁরা এক উজ্জ্বল নজির হয়ে রইলেন এই কারণে যে, তাঁদের আগে আর কোন দম্পতি তিনবার অলিম্পিক গেমসের আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি।

মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে অনেক অঘটন ঘটার সম্ভাবনা আছে। তবুও পদক লাভের চূড়ান্ত তালিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানটি রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে রাশিয়া এবং আমেরিকা যুগ্মভাবে পদকলাভের তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছিল। পরবর্তী তিনটি অলিম্পিক গেমসে (১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪) রাশিয়া প্রথম এবং আমেরিকা দ্বিতীয় স্থান পায়।

১৯৬৮ সালের রাশিয়ান অলিম্পিক দলটি ৪০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের ৭০টি শহর থেকে এ'রা এসেছেন। প্রায় ৩০০ জন এই প্রথম অলিম্পিক আসরে নামছেন। দলের অর্ধেক হলেন স্কুল-কলেজের ছাত্র। বাকি অর্ধেকে আছেন শিক্ষক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, অফিসের চাকুরে এবং কল-কারখানার শ্রমিক। মেক্সিকো অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীতে আছে ২০টি অনুষ্ঠান। সোভিয়েট ইউনিয়ন ফুটবল এবং হকি বাদে বাকি অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করবে।

আমেরিকার এবারের এ্যাথলীট দলটি অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। দল গঠনের প্রতিযোগিতায় আমেরিকার এ্যাথলীটরা ৫টি বিশ্ব রেকর্ড এবং ১০টি অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছিলেন। দলে নির্বাচিত এ্যাথলী[টদের মধ্যে] ১৫ জন এ্যাথলীট ১৯৬৪ সালে[র] অলিম্পিক গেমসে স্বর্ণপদ[ক জয়] করেছিলেন।

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অ[লিম্পিকের] ফলাফল সম্পর্কে আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা একটি সমীক্ষা প্রচার [করেছেন।] তাঁদের মতে, পুরুষদের ১০০ মিটা[র দৌড়ে] আমেরিকার তিনজন নিগ্রো (চার্লি গ্রীন, জিম হিনেস এবং রো[...]) স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক জয় [করবেন।] পোল ভল্ট, সটপুট, ডিসকাস এ[বং ...] জাম্পে আমেরিকা স্বর্ণপদক [...] রাশিয়ার স্বর্ণপদক জয়ের [...] জাভেলিন এবং হাতুড়ি নিক্ষেপে। [...] ১৬টি বিভাগের চূড়ান্ত ফলাফল [...] হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশ[ী ...] রাশিয়া, দ্বিতীয় ইরাণ এবং [...] জাপান। বাক্সিংয়েও রাশিয়ার [...] বিস্তারের সম্ভাবনা বেশী। বা[...] রাশিয়া অথবা আমেরিকা স্বর্ণপ[দক ...] হবে। সাঁতারে গত টোকিও অলি[ম্পিকের] মতই আমেরিকা সর্বাধিক স্বর্ণপ[দক জয়] করবে। আমেরিকার সন্তরণ দলের [...] আকর্ষণ ডন স্কোল্যান্ডার এবং [...] স্পিজ। গত ১৯৬৪ সালের [...] অলিম্পিকে আমেরিকা যে ১৩টি স্ব[র্ণপদক] পেয়েছিল তার মধ্যে ডন স্কে[াল্যান্ডার] একাই চারটি স্বর্ণপদক পেয়েছিলে[ন। ...] স্পিজ এপর্যন্ত ১০টি বিশ্ব [রেকর্ড] ভেঙেগেছেন। কুমারী ডেবি মেয়া[র ...] ১৫) আমেরিকার বড় আশা। তিনি [...] বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফ্রি স্টাইল মহিলা স[াঁতারু।]

আমেরিকার অলিম্পিক সন্তর[ণ দলের] পুরুষ বিভাগের স্কোল্যান্ডার, স্পিজ এবং হিক্স এবং মহিলা [...] মেয়ার কলুব এবং বল সকলে[ই বিশ্ব] রেকর্ডধারী।

জিমন্যাস্টিকের চূড়ান্ত তা[লিকা] এই রকম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশ[ী ...] রাশিয়া, দ্বিতীয় জাপান এবং [...] চেকোশ্লোভাকিয়া।

হকিতে ভারতবর্ষকে স্বর্ণপদক [...] খুবই বেগ পেতে হবে। কারণ [...] খেলায় ভারতবর্ষের বিপক্ষে [...] শক্তিশালী দেশের খেলা পড়েছে।

মেক্সিকোর অলিম্পিক গেম[স ...] করে যে পরিমাণ বাধা-বিপত্তি, অ[...] বিক্ষোভ এবং সংশয় চলছে তা অ[লিম্পিক] গেমসের ইতিহাসে অভূতপূর্ব [...] ১৯তম অলিম্পিক গেমসের আসর [...] মেক্সিকো সিটির অবস্থান সমুদ্রপৃ[ষ্ঠ থেকে] ৭,৩৫০ ফিট উঁচুতে। এত [উঁচুতে] অলিম্পিক গেমসের আসর নির্বাচন[ে] অনেকের মনে সমতলবাসী খেলো[য়াড়দের] স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তা [...] দারুণ দুশ্চিন্তা এবং উন্নত ক্র[...]

...সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। তারপর অলিম্পিক গেমসের নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ইন্টার ন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি দক্ষিণ আফ্রিকাকে মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে যোগদানের যে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছিলেন তা নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে অলিম্পিক গেমস বর্জন আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। অবস্থা শান্ত করার জন্য শেষ পর্যন্ত ইন্টার ন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি নিমন্ত্রণ পত্র প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এরপর রোডেশিয়া সম্পর্কে ইউনাইটেড নেশনস সিকিউরিটি কাউন্সিলে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে রোডেশিয়ার অলিম্পিক গেমসে যোগদানের সম্ভাবনায় আর একদফা অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। বর্তমানে সে সম্ভাবনাও দূর হয়েছে। একের পর এক সমস্যা অতিক্রম করার পর মেক্সিকো এখন তার ঘরোয়া সরকার বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের চাপে পড়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে। মোটের উপর মেক্সিকোর এই অশান্ত রাজনৈতিক পরিবেশ অলিম্পিক গেমসের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। মেক্সিকো সিটির অলিম্পিক গেমস নির্বিঘ্নে শেষ না হলে সারা বিশ্বের কাছে মেক্সিকোর মাথা নত হয়ে যাবে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মেক্সিকো সিটির দীর্ঘ উচ্চতার কারণে সেখানের জলবায়ু সমতলবাসী খেলোয়াড়দের পক্ষে এক মস্ত প্রতিবন্ধক। এ নিয়ে চারদিকে যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার উদ্দেশ্যে মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের উদ্যোক্তারা তিনদফা প্রাক-অলিম্পিক গেমসের আয়োজন করেছিলেন। মূল অলিম্পিক গেমসের অনেক আগে এতগুলি মহড়ার আয়োজন অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে এই প্রথম। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলির ফলাফল, যোগদানকারী খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিকিৎসকদের রিপোর্ট এবং উঁচু যায়গায় আয়োজিত খেলাধূলার আসরে সমতলবাসী খেলোয়াড়দের সম্পর্কে করণীয় তথ্যাদি যোগদানকারী দেশগুলিকে সরবরাহ করা হয়েছিল। মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে যোগদানকারী প্রায় সকল দেশই নিজ নিজ সামর্থমত উঁচু যায়গায় ব্যাপক অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিল। রাশিয়ার খ্যাতনামা চিকিৎসক অধ্যাপক আনাতোলে কোরবকভ মেক্সিকো সিটিতে অবস্থানকারী বিভিন্ন দেশের এ্যাথলীটদের অনুশীলন সযত্নে পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করেছেন, প্রতিযোগীরা মেক্সিকো সিটির জলবায়ুর সঙ্গে নিজেদের মোটামুটি খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মতে ডিসকাস, শটপুট, জ্যাভেলিন, হ্যামার থ্রো প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এ্যাথলীটরা মেক্সিকোর উচ্চতায় লাভবান হবেন। অপরদিকে সাঁতার, ভ্রমণ এবং দূরপাল্লার দৌড়ে এই উচ্চতা সমতলবাসী খেলোয়াড়দের কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টি করবে।

আবেবে বিকিলা (ইথিওপিয়া) ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালের ম্যারাথন দৌড়ের স্বর্ণপদক বিজয়ী ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের প্রধান আকর্ষণ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বল্পপাল্লার দৌড়ে এ্যাথলীটরা কোন অসুবিধায় পড়বেন না। তাঁদের পক্ষে নতুন রেকর্ড স্থাপন করা অসম্ভব হবে না। কিন্তু ৮০০ মিটারের বেশী দূরত্বের দৌড়ে অলিম্পিক রেকর্ড ভাঙ্গার আশা খুবই কম। দূর পাল্লার দৌড়, ভ্রমণ, সাঁতার, রোয়িং, বক্সিং, সাইক্লিং, বাস্কেটবল, হকি, ওয়াটার পোলো, ফুটবল প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মেক্সিকো সিটির উচ্চতা ক্রীড়ামানের পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

সম্প্রতি মেক্সিকো সিটির বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামে ৫০০০ মিটার দৌড়ের অনুশীলন প্রত্যক্ষ করে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিশ্রুত দৌড়বীর রণ ক্লার্ক মন্তব্য করেছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭,৩৫০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত এই মেক্সিকো সিটিতে অলিম্পিক গেমসের আয়োজন সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং হাস্যকর ব্যাপার। ৫০০০ মিটারের এই দৌড়ে ১ম হয়েছিলেন জো মার্টিনেজ, ২য় তানিয়ার নাফতালি তেমু এবং ৩য় ইথিওপিয়ার মামো উল্ডে। এই তিনজনের দৌড় দেখে ক্লার্ক মন্তব্য করেছেন, এ'রা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচু দেশের অধিবাসী বলেই মেক্সিকো সিটির উচ্চতা এ'দের সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি করবে না। সমতলভূমির আসরে এ'রা কেউই ফাইনালে উঠতে পারবেন না।

আমেরিকা বনাম রাশিয়া

আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন বছর (১৮৯৬) থেকেই আমেরিকা উপর্যুপরি ৯টি অলিম্পিক গেমসের (১৮৯৬-১৯৩২) বে-সরকারী পয়েন্ট লাভের তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিল। ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে জার্মাণী ৫৮৪ পয়েন্ট পেয়ে বে-সরকারী পয়েন্টের তালিকায় প্রথম স্থান এবং আমেরিকা ৩৮৯ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। বিশ্বযুদ্ধের দরুণ দু'বার (১৯৪০ ও ১৯৪৪) অলিম্পিক গেমসের আসর বসে নি। পরবর্তী ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিক গেমসে আমেরিকা পুনরায় প্রথম স্থান পায়। কিন্তু ১৯৫২ সাল থেকে রাশিয়ার অলিম্পিক গেমসে যোগদানের ফলে আমেরিকা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৫২ সালে রাশিয়া এবং আমেরিকা যুগ্মভাবে প্রথম স্থান লাভ করে। পরবর্তী তিনটি অলিম্পিকের (১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪) বে-সরকারী পয়েন্ট তালিকায় রাশিয়া প্রথম এবং আমেরিকা দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক জয়ের ভিত্তিতে পয়েন্টের যে তালিকা প্রকাশ করা হয় তা সম্পূর্ণ বে-সরকারী ব্যবস্থা।

নীচের তালিকায় বিগত চারটি অলিম্পিক গেমসে আমেরিকা এবং রাশিয়ার অর্জিত পদক এবং পয়েন্ট সংখ্যা দেওয়া হল।

১৯৫২—হেলসিঙ্কি

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	পয়েন্ট
আমেরিকা	৪০	১৯	১৭	৪৯৫
রাশিয়া	২২	৩০	১৯	৪৯৪

১৯৫৬—মেলবোর্ন

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	পয়েন্ট
রাশিয়া	৩৭	২৯	৩২	৬২৪·৫
আমেরিকা	৩২	২৫	১৭	৪৯৮

১৯৬০—রোম

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	পয়েন্ট
রাশিয়া	৪৩	২৯	৩১	৬৮৩
আমেরিকা	৩৪	২১	১৬	৫৬৩

১৯৬৪—টোকিও

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	পয়েন্ট
রাশিয়া	৩০	৩১	৩৫	৬০৭
আমেরিকা	৩৬	২৬	২৮	[illegible]
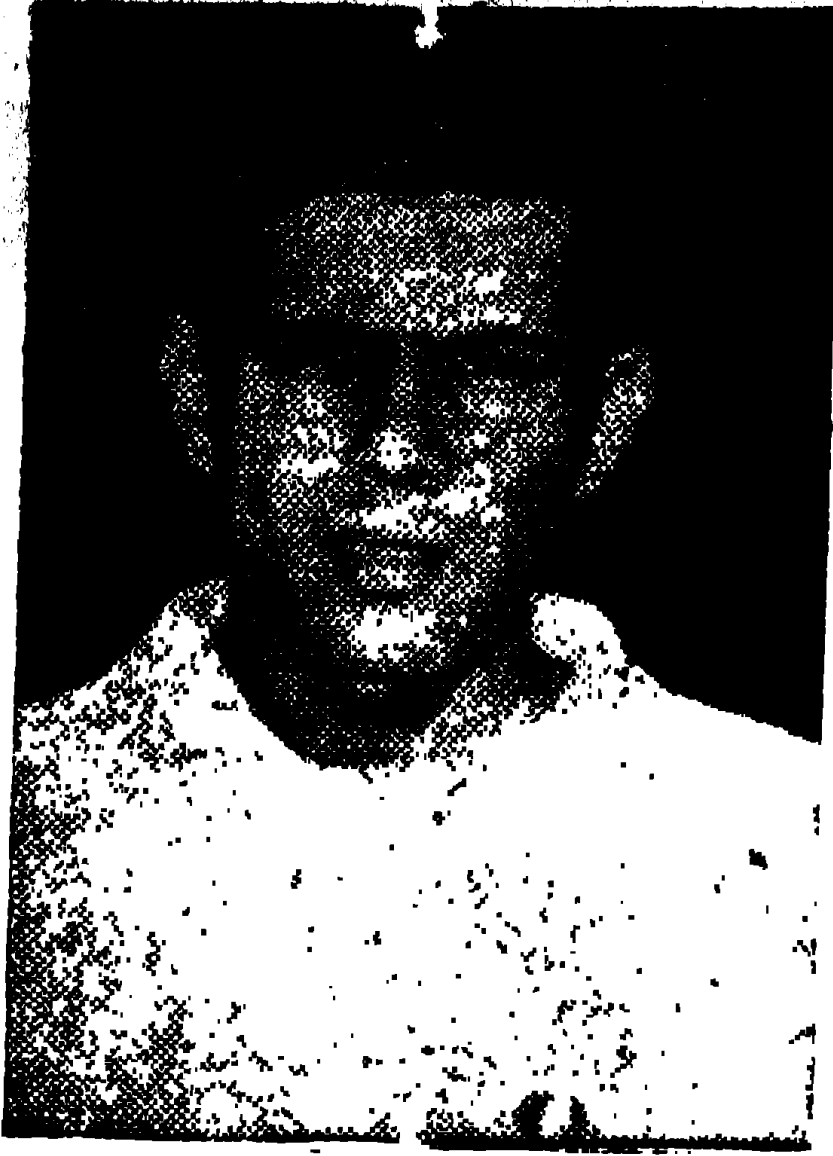
জয়দীপ মুখার্জি
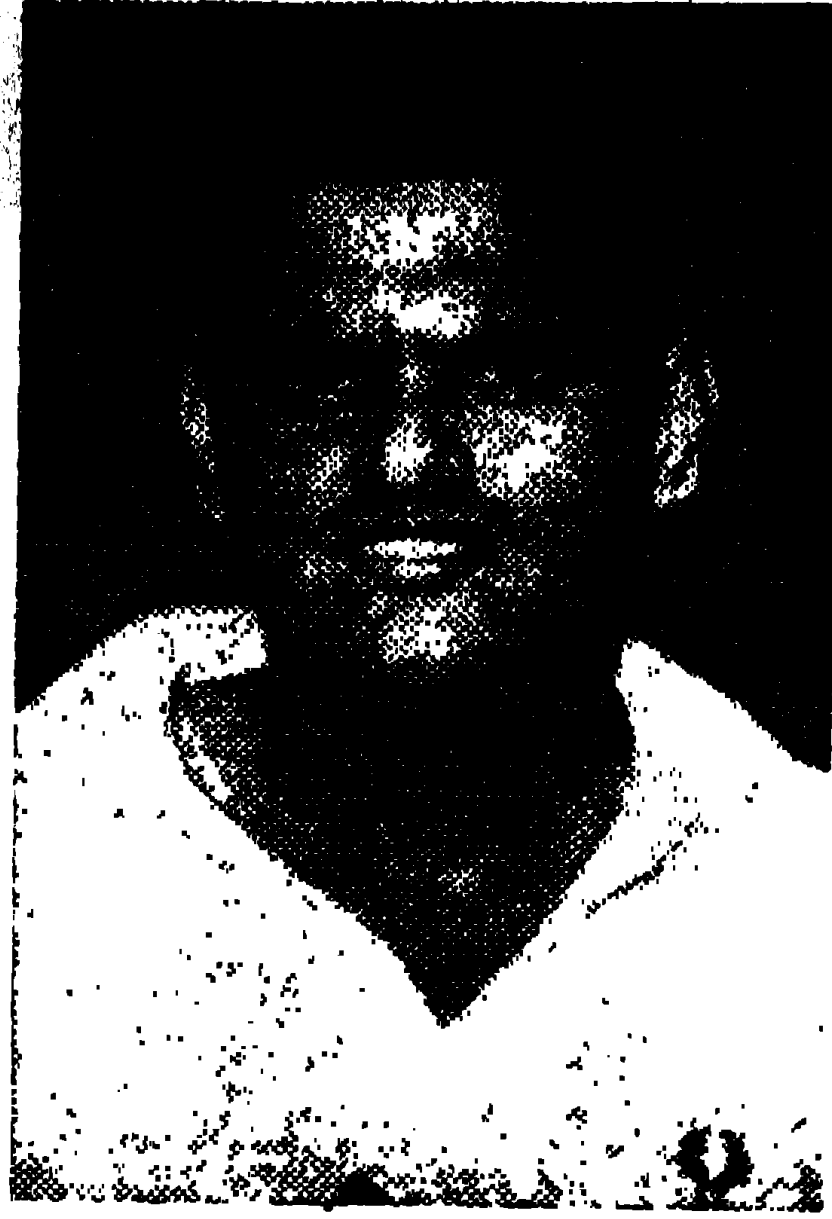
রমানাথন কৃষ্ণান

প্রেমজিৎ লাল

খেলাধুলা

দর্শক

ডেভিস্ কাপ

আঞ্চলিক সেমি-ফাইনাল

পশ্চিম জার্মাণীর মিউনিখে আয়োজিত ১৯৬৮ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ৩-২ খেলায় পশ্চিম জার্মাণীকে পরাজিত করে ইন্টার জোন ফাইনালে আমেরিকার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। ভারতবর্ষ বনাম আমেরিকার এই খেলায় বিজয়ী দেশই চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে ২৩ বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবার অধিকার লাভ করবে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, গত ১৯৬৬ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়া ৪-১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের পক্ষে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলেছে মাত্র দুটি দেশ—জাপান ১৯২১ সালে এবং ভারতবর্ষ ১৯৬৬ সালে। ১৯২১ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে জাপান ০-৫ খেলায় আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মানী

প্রথম দিনের খেলার ফলাফল সমান ১-১ দাঁড়ায়। উভয় দেশই একটি করে সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হয়। দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলায় জয়লাভের সূত্রে ভারতবর্ষ ২-১ খেলায় অগ্রগামী হয়। তৃতীয় দিনের প্রথম সিঙ্গলস খেলায় রমানাথন কৃষ্ণান জয়ী হলে ভারতবর্ষ ৩-১ খেলায় অগ্রগামী হয়ে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। শেষ সিঙ্গলস খেলায় পশ্চিম জার্মাণী জয়ী হয়।

খেলার ফলাফল

প্রেমজিৎলাল ২-৬, ৬-২, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে ইঙ্গো বুডিংকে পরাজিত করেন।

উইলহেম বুঙ্গার্ট ৪-৬, ৬-০, ৮-৬ ও ৭-৫ গেমে রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন।

রমানাথন কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি ৬-২, ৬-২ ও ৬-৩ গেমে উইলহেম বুঙ্গার্ট এবং জুর্জেন ফাসবেন্ডারকে পরাজিত করেন।

রমানাথন কৃষ্ণান ৬-২, ৭-৫ ও ৬-২ গেমে ইঙ্গো বুডিংকে পরাজিত করেন।

উইলহেম বুঙ্গার্ট ১-৬, ৪-৬, ৭-৫, ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেন।

ভারতীয় অলিম্পিক দল

মেক্সিকো সিটির ১৯তম অলিম্পিক গেমসে যোগদানের জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের নিয়ে ভারতীয় অলিম্পিক দল গঠিত হয়েছে।

হকি : নির্বাচিত ১৮ জন খেলোয়াড়ের নাম গত ১৩ সংখ্যায় (আগস্ট ২, ১৯৬৮) প্রকাশিত হয়েছে।

এ্যাথলেটিকস : পারভিন কুমার (পুলিশ) এবং ভীম সিং (সার্ভিসেস)।

কুস্তি : বিশ্বম্ভর সিং (রেলওয়ে), উদয়চাঁদ (সার্ভিসেস), মুক্তিয়ার সিং (সার্ভিসেস) এবং সুদেশ কুমার (দিল্লী)।

ভারোত্তোলন : এম এল ঘোষ (সার্ভিসেস)

সুটিং : কার্ণি সিং (বিকানীর) এবং রণবীর সিং (পাঞ্জাব)।

বক্সিং : মরিস স্টিভেন্স (বোম্বাই)।

এশিয়ান টেবল টে[illegible]
প্রতিযোগিতা

জাকার্তায় আয়োজিত ৯[illegible] টেবল টেনিস প্রতিযোগি[illegible] বিরাট সাফল্যের পরিচয় [illegible] ১১টি অনুষ্ঠানে জাপানের [illegible] ৯টি (৩টি দলগত এবং ৬[illegible] অনুষ্ঠানে)। বাকি ২টি অ[illegible] হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। দলগ[illegible] জাপান ৩টি খেতাব পেয়েছে—[illegible] এবং বালিকা বিভাগে। মহি[illegible] দলগত খেতাব জয়ী হ[illegible] কোরিয়া। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠা[illegible] মোট খেতাব জয় [illegible] সিঙ্গলস খেতাব (পুরুষ, মহি[illegible] বিভাগে) এবং তিনটি ডা[illegible] (পুরুষ, মহিলা ও মিক্স[illegible] বিভাগে)। দক্ষিণ কোরিয়া [illegible] খেতাব—মহিলাদের দলগত [illegible] দের ব্যক্তিগত বিভাগে।

দলগত চ্যাম্পিয়ানশি[illegible]

পুরুষ বিভাগ : জাপান [illegible] ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত [illegible]

মহিলা বিভাগ : দক্ষিণ কে[illegible] খেলায় জাপানকে পরাজিত [illegible]

বালক বিভাগ : জাপান [illegible] ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত [illegible]

বালিকা বিভাগ : জাপান [illegible] দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজি[illegible]

জাপান চারটি দলগত [illegible] ফাইনালে খেলে তিনটি বি[illegible] জয়ী হয়েছে। অপরদিকে দ[illegible] দুটি বিভাগের ফাইনালে [illegible] খেতাব জয় করে। ইন্দো[illegible] বিভাগের ফাইনালে জাপানের [illegible] প্রতিদ্বন্দিতা করে পরাজয় বরণ [illegible]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকা[illegible] হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 18th October, 1968. শুক্রবার, ১লা কার্তিক, ১৩৭৫ 40 Paise.

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
(ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

'কুইজ' প্রসঙ্গে

এ যুগটাকে যদি কেউ প্রতিযোগিতার যুগ বলে মনে করেন তাহলে বোধহয় কিছু অন্যায় হবে না। যেদিকেই চোখ ফেরান, সেদিকেই দেখা যাবে কম্পিটিশন লেগে আছে। চাকরির জন্যে ইণ্টারভিউ থেকে শুরু করে জীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে প্রতিযোগিতার খেলা অদৃশ্য। অথচ এই কম্পিটিশনের ব্যাপারে বিশেষ করে ব্যক্তিগত জ্ঞানবুদ্ধি পরিমাপের প্রতিযোগিতায় কে কিরকম স্ট্যাণ্ডার্ডের অধিকারী তা জানবার মতো কোন বিশেষ ব্যবস্থা চালু নেই এদেশে। অবশ্য পাশ্চাত্যের অবস্থা ঠিক এদেশের মতো নয়। সেখানে ব্যক্তিগত জ্ঞানবুদ্ধির দৌড় জানবার জন্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানান ধরনের কুইজের ব্যবস্থা থাকে। এতে জ্ঞানের সীমা যেমন বাড়ে, তেমনি আধুনিকতম চিন্তাভাবনার শরিক হওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই স্মার্টনেস আসে।

আমাদের দেশে বোম্বে থেকে প্রকাশিত কোন কোন কাগজ কখনো সখনো 'কুইজের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বর্তমানে 'অমৃত'-এ যে বিভাগটি শুরু হয়েছে তা অভিনব। পার্সোন্যালিটি টেস্টের এমন ব্যবস্থা বাংলাতে তো বটেই অবাঙালী কাগজেও চোখে পড়েনি আমার; এর ফলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেই যে উপকৃত হচ্ছেন তা অবশ্যই মানতে হবে। ধন্যবাদ জানবেন।

অলকেন্দু ভৌমিক,
বহরমপুর,
পশ্চিমবঙ্গ।

'হাসির মজলিস' প্রসঙ্গে

অমৃত সাপ্তাহিকে নতুন সংযোজিত 'হাসির মজলিসে'র জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। এই ধরনের একটি বিভাগ অমৃতের পাতায় প্রকাশিত হবে আশা করেছিলাম। সেই সঙ্গে আচার্যের কার্টুন থাকায় এটি আরো আকর্ষণীয় হয়েছে।

বহু বিদেশী পত্রপত্রিকায় এই ধরনের ফিচার দেখা যায়। টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের এক ভিন্নতর দিক তুলে ধরা হয়। আমরা প্রত্যেকেই এই ধরনের কোন না কোন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকি। কিন্তু প্রচ্ছন্ন সেই হাসির মুহূর্তে সব সময় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এই ধরনের রচনার মধ্যে তার দর্শন মেলে। এগুলি একেবারে কল্পনা নয়। তাই আমাদের মনকে একখানি নাড়া দিতে পারে। তাছাড়া কর্মক্লান্ত জীবনে হাসির লেখার দাম অসামান্য। মনকে ক্লান্তিমুক্ত এবং সতেজ করতে এ ধরনের রচনার জুড়ি মেলা ভার।

আপনারা এই নতুন বিভাগটি অমৃতের পাতায় যুক্ত করে তাই আমার মত বহু সাধারণ মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

ভাস্কর চক্রবর্তী,
কদমকুয়া,
পাটনা।

বিবাহ বিচ্ছেদ

অমৃতের ১৯ সংখ্যায় শ্রীস্বর্ণপ্রভা মল্লিক "বিবাহ-বিচ্ছেদ" বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন তা সত্যই চিত্তগ্রাহী। তিনি একটি নিদারুণ সত্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : "সুখের আশায় আমরা যতই পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করি না কেন, ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য চিরকালই থেকে যাবে।" এই সম্পর্কে তিনি যা প্রকাশ করেন নি অথবা তাঁর মনের সেই হিন্দু সাধনার কথা একটু উল্লেখ করতে বাসনা করি। কথাটি আমার নয়—কথাটি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের। তিনি (The Hindu view of life) অনুবাদ—শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন) বলছেন :

"হিন্দুধর্মের বিবাহ সংস্কারে ব্যক্তি ও সমাজ, উভয় দিকেই দৃষ্টি রহিয়াছে।... ...একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য, অপরদিকে বংশের বিশিষ্ট ধারাটি বজায় রাখিবার জন্য, বিবাহের অনুশাসন। ......দৈহিক কাম পরিশুদ্ধ হইয়া আত্ম-বিলোপকারী পবিত্র প্রেমে পরিণত হয়। হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠান মাত্রই নহে, উহা একটি গভীর সাধনা। ......ভালবাসিলে তার জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের গুণে ভালবাসা দিব্যভাবাপন্ন হয়।"

তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধেও মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন : মিলন হল না বলে বিবাহের যে বিচ্ছেদ, তা হল এই সাধনায় পরাজয় স্বীকার। যাতে সামঞ্জস্য স্থাপন করা গেল না, তা ব্যর্থই হল।

তিনি আরো বলেন : হিন্দুমতে নারী পুরুষের সকল কার্যের সহায়, সহধর্মিণী। তিনি সকল দিক বিবেচনা করে সর্বশেষ অভিমত দিলেন : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক মিলন স্থাপন করবার এবং সহানুভূতি জাগাবার পক্ষে একপত্নিক বিবাহই আদর্শ বিবাহ বলে বিবেচিত হয়েছে।

মঞ্জুলা মিত্র,
হাওড়া—৪।

'রাতের শহর' প্রসঙ্গে

শহর কলকাতার নৈশ-জীবনের অন্য চিত্র প্রতি সপ্তাহের অমৃতের পাত পড়ছি। হয়ত এর অনুরূপ অনেক ঘ কলকাতাবাসী আরো অনেকেরই জ থাকতে পারে, তা অস্বীকার করবার প্রয়ে জন নেই। কারণ এসব আজকের শহ জীবনেরই অঙ্গ।

কিন্তু রাতের শহরের বিচিত্র রূপে থেকে দিনের কলকাতার বৈচিত্র্যও কম ন এখানে মানুষ এসেছে বিচিত্র নেশা তারপর বিচিত্র পেশা বেছে নিয়ে নিদারুণ ঘূর্ণাবর্তে পড়ে হয়ত তলি যাচ্ছে অনেকে। হয়ত কেউ কেউ কোনক্র পাপগত দিনক্ষয় করে বেঁচে থাকে আবার কেউ কেউ হয়ত বিলাসব্যসনের চ সুখও উপভোগ করছে। এদের জীবনে বহু গোপন দিক আছে, যা অনেকেই জা না। সেইসব দিকে আপনাদের নজর পড় বাঙলা দেশের বহু মানুষ উপকৃত হ যে অবক্ষয়ের পথে আজ বাঙালীর পদস্খল ঘটেছে, তার থেকে আত্মোদ্ধারের হ কোন পথ সে খুঁজে বের করবে। চিরকা দেশের সাহিত্য, সংবাদপত্র ও সাময়িক এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এসে আশা করি আপনাদের সুসম্পাদিত অমৃ 'রাতের শহর' পর্যায় শেষ হলে দি আলোয় কলকাতার পরিচিত রূপটি ও সত্য ছবি নিয়ে ফুটে উঠবে।

জগমোহন সান্যা
দুর্গাপ

নটশেখর নরেশচন্দ্র

নটশেখর নরেশচন্দ্র সম্পর্কে শ্রীপশু পতি চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিমূলক নিবন্ধ পড়লাম। বাংলা দেশের এই অবিস্মরণী নটের তিরোধানে বাঙালী মাত্রেই বেদনার্ত নরেশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা ছিল সম্পূ স্বতন্ত্র, স্বীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। অভিনয় উচ্চারণ, মঞ্চে চলাফেরা, অঙ্গভঙ্গি সমস্ত ছিল অননুকরণীয়। এই প্রতিভাকে হয় বাংলাদেশ ভুলে যাবে, যেমন ভুলে গেছে অতীতের বহু মনীষীকে। কিন্তু ইতিহাস তিনি সৃষ্টি করে রেখে গেছেন তার পথ ধরে বাংলাদেশ ভবিষ্যতের দি এগিয়ে যাক, এটাই আমার কামনা শ্রীচট্টোপাধ্যায় নানান কথা বলেছেন তা আলোচনায়। এই সমস্ত তথ্য জানাবার জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

সৌমিত্র হাজরা
কলকাতা-৩।

অমৃত সম্পাদকীয়

এই বিপর্যয় তুলনাহীন

দার্জিলিং, জলপাইগুড়িসহ উত্তরবঙ্গের নানা জায়গায় বন্যা ও পাহাড়ী ধস যে ভয়ংকর বিপর্যয় ডেকে এনেছে তার কোনো তুলনা নেই। এদেশে তো বটেই বিদেশেও একটি বিপর্যয়ে এত মানুষের জীবন বিপন্ন হবার দৃষ্টান্ত অল্পই।

সরকারী হিসাবে মৃতের যে-সংখ্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার চেয়ে অনেক বেশী নিশ্চয়ই হবে মৃতের সংখ্যা, যাদের হদিশই এখনও পাওয়া যায় নি। দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ধস চাপা পড়ে কত মানুষ চিরতরে হারিয়ে গেছে তার ঠিকানা কি। গোটা দার্জিলিং জেলা বিপন্ন। জলপাইগুড়ি শহরের বিপর্যয় তো কল্পনাতীত।

ত্রাণকার্য শুরু হয়েছে। বন্যার সংগে সংগে যা আসে সেই ব্যাধির প্রকোপও শুরু হয়েছে। খাদ্যাভাব, জলাভাব ও বিদ্যুতের অভাব মানুষের দুর্ভোগ সহ্য সীমার প্রান্তে নিয়ে গেছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, এত বড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য কোনোরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন নি। একে ভগবানের মার বলে আগে চালিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ জানা কোনো কঠিন কাজ নয়। এবং কারণে-অকারণে সাইরেন বাজিয়ে যখন কর্তৃপক্ষ শহরবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছেন, তখন এটা কি আশা করা অন্যায় যে, বানের জল আসছে কিংবা অতিবৃষ্টির জন্য বিপদ হতে পারে একথা জানাবার জন্য কর্তৃপক্ষ সাইরেন বাজাতে পারতেন? পাঁচ-সাত ঘন্টা সময় পেলে জলপাইগুড়ির মানুষ সর্বাকিছু ফেলেও নিজেদের প্রাণ নিয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে পারতেন। বিপদের সতর্কবাণী সামরিক বিভাগের তরফ থেকে অসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো সত্ত্বেও সরকারী বড়কর্তারা তাকে কোনো আমল দেন নি। কেন দেন নি তার কৈফিয়ৎ জনসাধারণ নিশ্চয়ই দাবী করতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গে কোনো নির্বাচিত সরকার নেই। রাজ্যপালই এখন দন্ডমুন্ডের কর্তা। তিনি গুরুত্বপূর্ণ দিন কয়টি দার্জিলিং-এ না কাটিয়ে যদি শিলিগুড়ি নেমে আসতেন তাহলেও জলপাইগুড়ির প্রশাসন ব্যবস্থা এতটা ভেঙে পড়ত না। উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই সংগে সংগে দিল্লী থেকে জলপাইগুড়ি চলে আসতে পারতেন বিপদের মুখোমুখি হতে। আর, জলপাইগুড়ির কমিশনার সাহেব নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য জলপাইগুড়ি ছেড়ে শিলিগুড়িতে আশ্রয় নিলেন? এ ধরনের চরম কর্তব্যচ্যুতির পরও এই ভদ্রলোকেরা উপপ্রধানমন্ত্রীর সংগে তাঁদের পলায়নের যৌক্তিকতা নিয়ে তর্ক করতে লজ্জাবোধ করলেন না, এটাও আশ্চর্য। ১৯৬২ সালে তেজপুরে চীনা আক্রমণের আশংকায় সরকারী কর্তৃপক্ষের ঠিক এই ধরনেরই দায়িত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বিপদের সময় জাতির চরিত্র বোঝা যায়। আমাদের প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মেরুদন্ডহীনতার পরিচয় কি এ থেকে স্পষ্ট হয় নি? প্রশাসন সংস্কার কমিটির জ্ঞানী ব্যক্তিরা এদিকে নজর দিলে বোধহয় ভবিষ্যতে মহতী বিনষ্টি থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

এখন সবচেয়ে বড় কাজ হল বিপন্নের উদ্ধার ও তাঁদের পুনর্বাসন। সরকারী তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, উদ্ধার ও ত্রাণকার্যের জন্য সামরিক বাহিনীকে কাজে লাগানো হয়েছে। তাঁরা প্রশংসনীয় তৎপরতার সংগে কাজে নেমেছেন। রাস্তাঘাট মেরামত করে দুর্গম এলাকায় খাদ্য ও ঔষধ পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরা। বিপদে হতবুদ্ধি হয়ে না পড়ে অসামরিক কর্তৃপক্ষ যদি প্রাথমিক সাহায্যের কাজটুকুও করতে পারতেন তাহলে এতটা সর্বনাশ হত না।

বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও অনেক সাহায্য যাচ্ছে। কিন্তু কিভাবে কোন দিক থেকে সাহায্যের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা নিয়ে যথারীতি একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। ত্রাণকার্য ও সাহায্য দানের কাজেও পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকলে মানুষের কষ্ট বাড়বে। যার যতটুকু সাহায্য করার ক্ষমতা তা যেন সুষ্ঠুভাবে এবং যথার্থভাবে কাজে লাগানো হয়। এর মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ভুল বোঝাবুঝির যেন সুযোগ দেওয়া না হয়।

যে হাজার হাজার পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে তাঁদের জন্য সমগ্র দেশ শোকমগ্ন। কিন্তু যাঁরা দৈবক্রমে বেঁচে গেছেন তাঁদের বাঁচিয়ে রাখা ও সুস্থ করে তোলা এখন সবচেয়ে বড় কাজ। পশ্চিম বাংলার জনজীবনে একটার-পর-একটা বিপর্যয় তার অর্থনৈতিক সংকটকে তীব্রতর করে তুলেছে। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এই সংকট মোচনের জন্য আজ সচেষ্ট হতে হবে। দুর্ভোগের বোঝা যত ভারীই হোক, সংকটের ছায়া যত গভীর অন্ধকারাচ্ছন্নই হোক, এর মধ্য দিয়েই নতুন জীবনের প্রভাতকে সার্থক ও সফল করে তুলতে হবে। এই সংকল্প থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই।

কাছের ও দূরের গান্ধী স্বপ্নের সৌধ

রঁম্যা রলাঁ

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অক্টোবর উদ্‌যাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থেকে
অনুবাদ : **লোকনাথ ভট্টাচা**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ-প্রস্তাবে গান্ধী সম্মত হন, তিনি তো স্কার্পার নিমন্ত্রণ এখনো গ্রহণ করেন নি। আরো কিছুক্ষণ ইতালী ও সেই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে আমরা আলোচনা করি, কথা হয় সেন্ট ফ্রান্সিসের এক শিষ্যা সম্বন্ধেও যিনি সিয়েনের কাছাকাছি থাকেন এবং যাঁর সঙ্গে গান্ধী বহু বছর ধরে পত্রালাপ করছেন। ভদ্রমহিলা গান্ধীর আশ্রমের রীতিনীতি স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন, এবং গান্ধী যখন এসেছেনই এখানে, তাঁর দেখাও পেতে চান--কিন্তু সিয়েনেটা যে রোম থেকে বড্ড দূরে পড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, জেনারেল মরিসকে আমি টেলিগ্রামটা পাঠাই।

গান্ধী : "ব্যস, এ নিয়ে আর কথা নয়। এবার আপনার আলোচনা শুরু করুন। আর কী নিয়ে আপনি বলতে চান?"

রলাঁ : "কাল তো সারাক্ষণ আমি একলাই বলে গেলাম। যা বলেছি, তার সম্বন্ধে আপনার মতামতটা এখন শুনতে চাই।"

গান্ধী : "কাল আপনাকে শুনতে শুনতে আমার মনে হয়, কী প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা আপনার, এটাও বুঝেছি, আপনার সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হওয়ার আগে কত পরিশ্রমও আপনি করেছেন। আমি অবশ্য তৈরী হয়েছি অন্য প্রকারে। যা কিছু সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি জীবনে, সেগুলোকে ইতিহাস থেকে পাইনি—আমার ধ্যান-ধারণার উপর ইতিহাসের প্রভাব অতি তুচ্ছই। আমার কর্মপদ্ধতির ভিত্তি অভিজ্ঞতার উপর, অর্থাৎ আমার সমস্ত সিদ্ধান্তই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ। অবশ্য মানবই, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার একটা বিপদ আছে। এমন অনেক পাগলকে তো জানি, যারা কোনো কোনো বিশেষ জিনিসে এত বেশি বিশ্বাস করে যে তাদের সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এবং সেই বিশেষ বিশেষ জিনিসগুলিই তাদের অভিজ্ঞতা। একদিকে পাগলদের সেই অভিজ্ঞতা, অন্য দিকে আমার এই অভিজ্ঞতা, এর মধ্যের সীমারেখাটা সূক্ষ্ম। তা সত্ত্বেও নিজের সেই অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ আস্থা না রেখে আমারো উপায় নেই। নিজেদের বোধশক্তির উপর ভিত্তি করে পুরাকালের ঋষিরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন—সবাই মনে করে, তাঁদের সেই অভিজ্ঞতাগুলি সত্য, এমন কি তার সত্যতা ইতিহাসও প্রমাণ করেছে। নিজেকে এই বলে আমি সান্ত্বনা দিই তাই যে তাঁদের মত আমার অভিজ্ঞতাগুলিও ভিত্তিহীন নয়।

"কাল যখন আপনার কথা শুনছিলাম, মনে হচ্ছিল : কোন পথ আমরা নেব? নিজেকে তখন বলি : আমি তো বলতে পারব না যে, এইটেই আমার বিশ্বাস (অর্থাৎ আপনার বিশ্বাসটাই আমার বিশ্বাস) যে-সমস্যাগুলো আপনি আমার সামনে তুলে ধরলেন, তা ভয়ংকর। ভারতে যখন সাফল্যের সঙ্গে অহিংসা নীতির প্রচলন ঘটেছে বা ঘটতে থাকবে, ইউরোপে হয়তো তখন তা ব্যর্থ হচ্ছে বা হবে। কিন্তু তাতে আমি বিব্রত নই। আমার বিশ্বাস, অহিংসার একটা সর্বজনোপযোগী প্রয়োগ সম্ভব। কিন্তু আমিই যে সেই প্রয়োগটা করতে পারব ইউরোপে, তা আমার মনে হয় না। বহু সজ্জন ইংরেজের সঙ্গে কথা ব'লে দেখেছি, অন্যান্য বিদেশীদের সঙ্গে আলাপ করেছি, তাঁদের বলেছি, 'যতক্ষণ না আত্ম-বিশ্বাস জাগ্রত হয় আপনাদের, আপনারা এক পা নড়বেন না। কিন্তু আমার কথা যদি বলেন তো সারা পৃথিবী অহিংসাতে বিশ্বাস না করলেও আমি সেই বিশ্বাস করব।' দেখলাম তো কত বিপত্তি উঠতে পারে, কাল আপনার কথাও শুনলাম, এবং শোনার পর আরো বিশেষ ক'রে আমার এ-বিশ্বাস অটুট হচ্ছে যে একমাত্র অহিংসার পথেই ইউরোপের মুক্তি আছে। নইলে তার ধ্বংস ঠেকানো যাবে না। রাশিয়ায় যা হচ্ছে, তা বোঝা শক্ত। রাশিয়া সম্বন্ধে আমি উচ্চবাচ্য খুব করিনি, তবে তার অভিজ্ঞতা শেষপর্যন্ত কতখানি জয়ী হবে, সে-বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। মনে হয়, অহিংসাকে নস্যাৎ করতে তা উদ্যত। সাময়িকভাবে তা সফল হ
ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্তু সেই সাফল
পিছনে রয়েছে গায়ের জোর (হিংসা
সমস্ত সমাজটাকে এই সংকীর্ণ পথে চা
করতে বলপ্রয়োগ কতদিন সমর্থ হবে জা
না। যে-সব ভারতীয়ের উপর রুশ প্রভ
পড়েছে, তাঁদের মধ্যে সহনশক্তির এক প্রচ
অভাব দেখি। ফলে তাঁরা একটা সন্ত্রা
বাদের আওতায় প'ড়ে যাচ্ছেন। তাঁদের এ
অভিজ্ঞতাটাকে আমি সন্দেহের চো
দেখছি। রাশিয়া ঘুরে এসেছেন, এমন য
ইংরেজদের (এবং আমেরিকানদেরও) চা
তাঁদের নিরপেক্ষই মনে হয়েছে : তাঁদে
কেউ কেউ রাশিয়ার প্রশংসা করেছেন, বে
কেউ নিন্দা করেছেন। লর্ড লোথিয়ান এ
বার্ণাড শ'র সঙ্গেও এ নিয়ে আলোচ
করেছি। সমাজকে একটা বিশিষ্ট রূপ দি
এ-শক্তি একেবারেই পারবে কিনা, এ
পারলেও কতখানি পারবে, সে-বিষয়ে ল
লোথিয়ান নিশ্চিত নন। শ' অবশ্য উৎসাহে
সঙ্গে লিখেছেন এ-সম্বন্ধে—কিন্তু তাঁ
সঙ্গে যখন কথা বলি, সে-উৎসাহের পরিচ
পাইনি। অবশ্য এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে বে
কিছু বলার সুযোগ তেমন হয়নি, কার
ভারত সম্বন্ধে তিনি এমন আগ্রহ দেখালে
যে প্রায় সেই বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে
আমাদের সমস্ত আলোচনা চলল। ইউ
রোপের যেটুকু দেখলাম, তাতে তো মে
হয় না যে অহিংসার হাত থেকে সে
নিষ্কৃতি পাবে। সুখের কথা, এর জন
বিরাট কিছু সংগঠন বা বিধি ব্যবস্থা
প্রয়োজন নেই—যা দরকার, তা মাত্র একা
মানুষ, যাঁর মধ্যে অহিংসার প্রতি বিশ্বা
মূর্ত হ'য়ে উঠবে। এবং যতদিন না তি
এসে হাজির হচ্ছেন, আশা নিয়ে অপেক্ষ
ক'রে থাকতে হবে, উপযুক্ত আবহাওয়াট
তৈরী রাখতে হবে।"

রলাঁ : "আইনস্টাইনের ঘোষণা সম্পর্কে
র‍্যানহ্যাম ব্রাউনকে যে-চিঠি লিখি, তা
একটা প্রতিলিপি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম
সেই চিঠিতে বলি : কোনো নেতার অধীনে
যদি অহিংসা আন্দোলনকে এক বড় ও শ
ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে সংগঠিত কর

যায় তো সময়ে তা জয়ী হ'তে পারে। কিন্তু ইউরোপের পক্ষে যে গোড়াতেই গলদ—তার সেই সময়টাই নেই। আমরা একটা সাংঘাতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছি এখন—হিংসা শক্তির কবলে প'ড়ে মানুষের আশা-ভরসা আজ চিরকালের জন্য সমূলে বিনষ্ট হওয়ার ভয় জেগেছে। এই হিংসার গুরুভারে সারা পৃথিবী নত। গোটা একটা জাতকে যদি অহিংসার পথে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবও হয়, তা তাড়াতাড়ি করা যাবে না। খৃস্টের বাণীও প্রচার হ'তে এক শতাব্দী লেগে যায়। এবং এখুনি-এখুনি একটা কোনো ব্যবস্থা না করতে পারলে তো আগামী বিশ বছরের মধ্যে সব ধ্বংসে পড়বে। আর তাই যদি হয় তো কোন রূপ অহিংসা নেবে ইউরোপে?"

গান্ধী : "পারীতেও এমন একটা প্রশ্নের উত্তর আমি দিই। হায়, পৃথিবীটা সত্যিই পৌত্তলিক। খৃস্টান ধর্মও পৌত্তলিকতার হাত হ'তে রেহাই পায় না। আজ তাকে তার পঞ্চেন্দ্রিয় কাজে লাগাতে হবে, দেখতে হবে, ছুঁতে হবে, অনুভব করতে হবে। অহিংসা জিনিসটা কী, এবং সেটা সফল হ'তে পারে কিনা, তার একেবারে চাক্ষুষ পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নেবে না। কিন্তু ভারত তো তাকে সেই পরিচয় দিচ্ছে, এবং ভারতে তা সফল হ'লে সব খুব সহজ হ'য়ে আসবে। আমার তো বিশ্বাস, তার জন্য বিশ বছর অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে না। ভারত যদি এ-পথে সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন করে, তখন সারা পৃথিবীই সে-পরিচয় পাবে। এবং এটাও বিশ্বাস করি, তখন প্রত্যেক ইউরোপীয়ই দেখবে ব্যাপারটা কত সোজা। ইংল্যান্ডও বাধ্য হবে সে-পথ নিতে, যে-পথে তার চলা উচিত। অবশ্য যদি ভারতে হিংসা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বা হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং সমস্ত জিনিসটা শেষে গোলমেলে হ'য়ে পড়ে—কিন্তু সেখানেও কী ভেবে যেন আমি সান্ত্বনা পাই, আমার বিশ্বাসটা বজায় থাকে। এখন পর্যন্ত অহিংসাতে ভালো বই মন্দ হয়নি, এবং সন্দেহ নেই, তার প্রভাব ইংলন্ডের জনমতের উপরও পড়েছে (যদিও সে-প্রভাব এখনো যথেষ্ট নয়)। এটা তো সকলেরই বোঝা উচিত যে অহিংসা যদি না থাকত, তবে গোল টেবিল বৈঠক হ'তেই পারত না। বাঞ্ছিত ফল এখনো অর্জিত না হ'লেও পরোক্ষ ফল তো সংখ্যায় অনেক। এবং আগুন ও যন্ত্রণার পরীক্ষা যখন আমরা উত্তীর্ণ হব, তখন সব খুব সহজ হবে। হয়তো আমি ভুল করছি, কিন্তু সফল যদি নাও হই, তবু আমার বিশ্বাস আমি হারাব না—এবং যে-সামান্য সংখ্যক লোকের আমার প্রতি তাদের আস্থা রেখেছে, তাদের শুদ্ধীকরণের ব্রত তখন নেব। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমায় ছ' বছর অপেক্ষা করতে হয়, ভারতে ১৯২২ থেকে শুরু ক'রে গত বছর পর্যন্ত যুদ্ধে নামতেই পারিনি। কিন্তু যে-কোনো প্রকারেই হোক, বার্তা আসেই—তা এসেছে, আসবে। আমার তো মনে হয় যে সময় হ'লে আপনারাও যুদ্ধে

নামতে পারবেন। কিন্তু কোনো নির্দেশ বা পরামর্শ আপনাদের আমি দিতে পারছি না। ইউরোপের অবস্থাটা বড্ড জটিল...।"

রলাঁ : "গ্রহণ না করার যে শক্তি ভারত দেখিয়েছে, তার আলো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বেই, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এমনকি ইউরোপেও বহুকাল ধ'রে সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে অহিংসাকে কাজে লাগানোর নজির আছে—১৮৬০-এ পোল্যান্ডে যা হয়, সেটা তো একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইউরোপে আমাদের যে মুস্কিল-গুলো, সেগুলো সংখ্যায় দ্বিগুণ তিনগুণ। কত জাতীয় সমস্যা রয়েছে, কত সামাজিক সমস্যা রয়েছে। ১৯১৯-এর চুক্তির দরুণ যে-জাতিগুলি আজো ভুগছে, গ্রহণ না করার নীতিটিকে তারা সহজেই মন দিয়ে শুনবে ও বুঝবে। কিন্তু গ্রহণ না করার এই নীতিটিকে কোন কৌশলে চালু করা যায়, তার দৃষ্টান্ত সামাজিক অত্যাচারের ক্ষেত্রে হয় নেই নয় বিরল।

আপনারা ভারতে খারাপ ব্যবহার পেয়েছেন, আজো পাচ্ছেন, কিন্তু বলকান দেশগুলি ও পোল্যান্ডের অধিবাসীদের যতখানি অপমানজনক ব্যবহার পেতে হয়, ততখানি আপনারা পেয়েছেন ব'লে তো আমার মনে হয় না। ইউরোপ ও এশিয়ার (জাপান) কোনো কোনো দেশে যেভাবে শিশু ও নারীকে খাটিয়ে শোষণ করা হয়, তা একেবারে সাংঘাতিক। মুক্তির বাণী আনতে হবে আজ এই নিপীড়িত শ্রেণীদের কাছে। যদি তারা আত্মরক্ষার জন্য দল বেঁধে এক হয়ে রুখে দাঁড়ায়, তার বিরুদ্ধে কি কিছু বলার থাকতে পারে? ধনতন্ত্র ও জারিস্ট অত্যাচারের কবলে যখন রাশিয়া প'ড়ে ছিল, তার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। আজ যদি ইউরোপ বা আমেরিকা বা জাপান তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তাকে কি বলা চলতে পারে যে প্রতিরোধ তুমি দেবে না? বরং সেই রাশিয়াকে রক্ষা করার জন্য আমাদের ইউরোপের শ্রমিক মজদুরদেরই আজ এক হওয়ার দরকার, গ্রহণ না করার নীতি সেই মজদুররাই নিক। ইউরোপে. জাতীয় প্রশ্ন হ'তে সামাজিক প্রশ্নটি আরো বড় হ'য়ে উঠেছে। আসলে ধনতন্ত্র ও শ্রমিক-মজদুরের পরস্পর বিরোধী চাপ সারা জগতের পক্ষেই সমান সত্য, আজ তাই জেগেছে দুরকমের আন্ত-র্জাতিকতা, একে অন্যের বিরোধী।"

গান্ধী : (যেটা তিনি নিজে দেখেননি, বা যেটাকে নিয়ে নিজে পরীক্ষা করেননি, সেরকম কোনো প্রশ্নের প্রতি গান্ধীর আগ্রহ কম দেখছি—সেসব প্রশ্ন তিনি পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যান) "ইংলন্ডে ৩০ লক্ষ বেকার—মালিকদের সঙ্গে কথা বললাম। তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ক ভালো। শ্রমিকদের আমি বললাম, সমাধান যদি তারা খোঁজে তো ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে তা পাওয়া যাবে না, তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই লড়তে হবে। তারা চায়, মালিকরা তাদের অভাব মিটোক। তা করতে তো মালিকরা গররাজী নয়, কিন্তু যা কিনে সেই অভাব মিটবে, তা কেনায় জায়গা কোথায়? ধনীদের যা-কিছু সম্পত্তি আছে, তা যদি বেকার শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করা হয় তো কতদিন চলবে তাতে? তাই বললাম তাদের, নিজেদের সাহায্য করতে তোমরা নিজেরাই এগিয়ে এস, গড়ে তোলো তোমাদের কুটীর শিল্প। ওয়েলস্ দেশে অত্যন্ত সামান্য হ'লেও এ-ধরনের কিছু কিছু চেষ্টা ওরা করেছে, সেখানকার খনি-জীবী শ্রমিকরা, কেউ কেউ তাদের পুরোনো বৃত্তিতে ফিরে গিয়ে দেখেছে, তাদের মুক্তি তাতেই। অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর ক'রে কারুরই জীবনধারণ করা উচিত নয়।"

রলাঁ : "ইংলন্ডে সুবিধা অনেক, অন্যত্র কিন্তু অবস্থা এক নয় (এবং এ-প্রশ্নে আমি আবার ফিরব আমাদের পঞ্চম বৈঠকে)। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার আরেকটা বিপদ রয়েছে : সেটা এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব, যে-শ্রেণী বাঁচে নিম্নের নিপীড়িত-দের মাথায় হাত বুলিয়ে। যুদ্ধের পরে যখন জয় এল, সকলে ফরাসীদের বলে : 'এবার প্রায়শ্চিত্ত যা করবার, জার্মানি করবে।' আজ পাশ্চাত্যের লোকেরা যা শুনছে : 'দাম যা দেবার, তা পৃথিবী দেবে, এশিয়া দেবে,, আফ্রিকা দেবে।' যত যুদ্ধ এখনো বাকী, তার জন্য তৈরী হ'তে হবে এখন শ্বেত ভিন্ন অন্য চর্মের সেনাবাহিনী-দের। অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্যের সেই বিশেষ সুখসুবিধাসম্পন্ন জাতির যুগেই আবার ফিরছি আমরা, যে-জাতি একদিন শৃংখলিত অন্যান্য সব জাতির বোঝা নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে হাঁপ ছাড়ে। আমার দেশ এই ফ্রান্সেই যে সম্পদ আজ লোকেরা ভোগ করছে, তার ভিত্তি সারা পৃথিবীর দুঃখ-দারিদ্র্যেই। এমনকি আমাদের বুদ্ধিজীবী সজ্জনরা পর্যন্ত বেশি ভিতরে তাকাতে চান না, বর্তমান অবস্থার কল্যাণে তাঁদের ব্যক্তি-গত লাভের অংকটা প্রচন্ডই, সুতরাং গায়ের জোরের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজব্যবস্থা, তা তাঁরা স্বভাবতই ভাঙতে চান না।"

গান্ধী : "যারা শোষিত, তাদের হাতেই কি সমাধানের পথ নেই? ধরুন, তারা যদি শোষকদের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ ক'রে দেয়?"

রলাঁ : "যাদের ধর্ম নেই, তাদের পক্ষে তা অসম্ভব। বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে শ্রমিকদের কেনা যায়, কারণ সে টাকায় তারা অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে সেগুলোকে তাদেরই ভাই-এর বিরুদ্ধে অন্যত্র লাগাবে। সকলের কাছে সর্বপ্রথম যা প্রচারের দরকার আজ, তা এক দারিদ্র্যের, নিরাসক্তির, আত্মত্যাগের মহান বাণী। প্রেমের একটি উদাত্ত মন্ত্র। কিন্তু বিজিত ও নিপীড়িতদের মধ্যে দারিদ্র্য বা আত্মত্যাগ প্রচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ—জয়ী ও অত্যাচারী তা তত সহজে শুনতে চাইবে না।"

গান্ধী এক মত হন, এবং এখানেই এসে থামে সেদিনের আলোচনার লিপিবদ্ধ বৃত্তান্ত। মোনাত্ দলভুক্ত ফরাসী বিপ্লবী কর্মচারী ইউনিয়ন যে প্রশ্নগুলি পাঠিয়েছে, সেগুলি ওঠবার সময় মীরা ও দেশাই-এর হাতে দিয়ে বলি যে যেন তারা সেগুলির অনুবাদ গান্ধীকে দেন ও গান্ধীর উ গুলিও লিখে নেন।

যখন এত আলোচনা চলছিল, ছ এক কোণে নীরবে বসে ছিলেন জাগ ভাস্কর তাকাতা—এক মনে তিনি তাঁর : ঠিক করতে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁর উপস্থি সম্বন্ধে কেউ সচেতনও হননি।

বিকালে গান্ধী লোজানে গেলে এদম' প্রিভা ও সেরেজোল সেখানে কয়ে সভার আয়োজন করেছিলেন। ডাক্তার নিহান ও পেরে তাঁর জন্য যে-গাড়ীগ রেখেছিলেন, তা গান্ধী ব্যবহার কর চাইলেন না—উল্টে রেলের তৃতীয় শ্রেণী ভ্রমণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বি পৌঁছেই পাছে জনতার ভিড়ের সামনে পড়তে হয়, লোজানের আগের স্টেশ পুলিতে ট্রেন থামানোর ব্যবস্থা করা হ সেখান থেকে গান্ধীকে মোটরে সভাস্থ নিয়ে যাওয়া হবে।

এই দিনে তিনটি সভা পর পর একটি বেলা ৪টেয়, দ্বিতীয়টি সন্ধ্যা ৬ট তৃতীয়টি সাতটায় বা আটটায়। একম দ্বিতীয়টি উন্মুক্ত সর্বসাধারণের জ সুইস রেডিও সেটি প্রচারও করছে আমার খাবার ঘরে বসেই তাই তাঁর গ পরিষ্কার শুনলাম (কারণ মারীর স আমি একলা ছিলাম, অন্য সকলে লোজানে

তাঁর স্বরটি এমন যে শুনলে মনোযো না দিয়ে উপায় নেই—আশ্চর্য পরিষ্কা ধীর, দৃঢ় ও বেশ প্রাঞ্জল (গলাটাকে এক উদাত্ত বলা চলে), গলাটায় জোর যে ক এখন তা আরো ভালো ক'রেই বুঝে পারলাম, তাঁর কাছে ব'সে শুনলে এত বোঝা যায় না। এখানে তিনি ঘণ্টার প ঘন্টা বলে যেতে পারেন, এক মুহূর্তে জন্যও ক্লান্তি অনুভব না ক'রে। প্রিভাকে চমৎকার শোনা গেল ইংরেজী হ'তে ফরাসীতে অনুবাদ করতে—এবং শ্রোতাদে ভাব পর্যন্ত যেন বুঝতে পারা যায়, শোন যায় তাদের উচ্ছ্বসিত হাততালি। গান্ধী শ্লেষপূর্ণ উত্তরে হাসল অনেকে। প্রথ বক্তৃতাটি ছিল নাকি সবচেয়ে সুন্দর দুর্ভাগ্যবশত সেটি শোনা হ'ল না, অবশ্য আমার বোন ফেরার পর মাঝরাত নাগা তার বৃত্তান্ত শুনলাম তাঁর মুখে। বেল চারটের সেই বক্তৃতাটি সর্বসাধারণের জন ছিল না—গান্ধীর সঙ্গে তাতে উপস্থিত ছিলেন শুধু সেরেজোল ও তাঁর সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনাল আন্দোলনের কয়েক-জন মুখপাত্র—সুইজারল্যান্ডের 'বিবেকী বিরোধী' দলেরও একজন ছিলেন। মুখ্য আলোচ্য ছিল অহিংসার নীতি ও আচরণ সম্পর্কিত বিষয়—বক্তব্যটি পরে ছাপা হয় 'ইয়ং ইন্ডিয়াতে' 'ইউরোপ থেকে চিঠি' নামে, যা দেশাই এখান থেকে পাঠান। আমি শুধু তার সেই প্রসঙ্গটিরই উল্লেখ এখানে করছি, যার সঙ্গে আইনস্টাইনের প্রতিপাদ্য (যার সমালোচনা আমি নিজেও করেছি) সম্পর্কযুক্ত—এবং সে-সম্বন্ধে গান্ধীর

বিরোধী মতটিও বলি। 'কী ক'রে অহিংসা নীতিকে সফল করা যায়, শুধু অস্ত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার ক'রেই? আইনস্টাইন সকলকে ডাক দিয়েছেন, যাতে কেউ যুদ্ধে যোগদান না করে...।' গান্ধী তখন ঠাট্টার ভাবে উত্তর দিচ্ছেন : "অত বড় একজন লোকের সম্বন্ধে এমন কথা বলি কী ক'রে—তবু আপনারা যদি অনুমতি করেন তো বলি, ও-নীতিটা আইনস্টাইন আমার কাছ থেকেই চুরি করেছেন। কিন্তু আপনারা যদি চান যে জিনিসটার আরো গভীরে আমি নামি, তাহ'লে বলব : যুদ্ধে যোগদান না করতে চাওয়াটাই যথেষ্ট নয়। সময় এলেও তবু যুদ্ধে যাব না, এমন মনোভাবের অর্থ হবে পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সুযোগটাকে হেলায় হারানো। আসলে যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নটায় নিহিত গভীরতর এক পাপের লক্ষণ। রাষ্ট্রকে যারা মুখ বুঁজে সমর্থন করে চলে অন্যায় ভাবে, তাদেরই মত সমান পাপী তারাও যারা যুদ্ধে নাম লেখাতে চায় না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে-পুরুষ বা যে নারী যুদ্ধবাদী কোনো রাষ্ট্রকে সমর্থন করে, সে পাপের অংশীদার। খাজনা দিয়ে রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখছে যে, সে যুবাই হোক আর বৃদ্ধই হোক, পাপ সে করছে। সেই কারণেই যুদ্ধের সময় একথা নিজেকে আমি বার বার বলেছি, যদি সেনাবাহিনী কর্তৃক রক্ষিত আটাই আমায় খেয়ে চলতে হয় অথবা যদি শুধু নিজে সৈনিক না হ'য়ে রাষ্ট্রের অন্যান্য সব কর্তব্যই আমি পালন করি, তো তার চেয়ে অনেক শ্রেয় হবে আমার যুদ্ধে যাওয়াই, এবং সৈনিক হিসেবে মৃত্যু বরণ করাও। তাই যুদ্ধে যারা যোগদান না করতে চায়, রাষ্ট্রের সঙ্গে সব সহযোগিতাও তাদের বন্ধ করতে হবে। যে-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র বিধৃত, তার প্রতি অসহযোগিতার তুলনায় শুধু যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করাটা একটা অত্যন্ত ফাঁকা ব্যাপার। কিন্তু তখন এমন সাংঘাতিক বিরোধিতা জাগবে তোমার সামনে যে তার ফলে হয়তো কারাবরণই শুধু তোমায় করতে হবে না, পথেও বসতে হবে।"

স্বভাবতই সেরেজোল (যে বেচারা অত্যন্ত সততার সঙ্গে এই দুটি বিপরীতকে তাঁর জীবনে মেলাতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন : একদিকে তাঁর বিবেক, অন্যদিকে নাগরিক হিসেবে তাঁর কর্তব্য) অত্যন্ত বিচলিত হন, বোঝাবার চেষ্টা করেন যে রাষ্ট্রের সব। কিছুই খারাপ নয়, সেখানে ভালো জিনিসও এমন অনেক আছে যার প্রতি সহযোগিতার ভাব দেখালে লোকের মঙ্গলই হয়। গান্ধী তখন দৃঢ়স্বরে উত্তর দেন : 'এবার আপনি মনুষ্য প্রকৃতির এক জটিলতম দিকের কথা বলছেন। ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের স্রষ্টা হিসেবে এ-প্রশ্নের সম্মুখীন আমায় বার বার হতে হয়। আমি বলেছি তখন, এমন কোনো রাষ্ট্রই নেই—তার কর্তা নেরোই হোন বা মুসলনীই হোন—যে-রাষ্ট্র একেবারেই ভালোশূন্য। কিন্তু যে-মুহূর্তে কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে অসহযোগের সিদ্ধান্ত নেব, সে-রাষ্ট্রের সবই আমাদের ত্যাগ করতে হবে। আমাদের দেশে প্রকান্ড প্রকান্ড রাস্তা আছে, এবং এমন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে যা একেবারে বিরাট বিরাট প্রাসাদের মত, কিন্তু সেগুলো এমন একটা ব্যবস্থার অঙ্গ যা জাতিটাকে পিষে মারছে। তাদের সঙ্গে আমি কোনো সম্পর্কই রাখতে চাই না—তারা গল্পের সেই সাপের মত, যার মাথায় মণি কিন্তু ফণা বিষময়। এই সিদ্ধান্তেই আমি তাই উপনীত হই যে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা ভারতের শক্তি নিঃশেষে শোষণ ক'রে নিয়েছে, তার বৃদ্ধির গতি একেবারে থামিয়ে দিয়েছে। আমি তখন সুযোগ সুবিধার সমস্ত সুযোগই প্রত্যাখ্যান করতে মনস্থ হলাম—তা চাকরি বাকরিই হোক, বা আইন আদালতই হোক, বা পদবীই হোক, বা অন্য কিছু হোক। কোন নীতি নেওয়া উচিত, দেশ অনুযায়ী তার রূপ বিভিন্ন হবে—তবু সব নীতিতেই ত্যাগ ও প্রত্যাখ্যান দুটি মুখ্য অঙ্গ হিসেবে থাকবে। আইনস্টাইন যা বলছেন, তা সত্য হবে অতি অল্প সংখ্যক লোকের পক্ষেই, এবং সে-রকম ব্যাপার বছরে একবারের বেশি ঘটবে না। কিন্তু আমার মতে আপনাদের সর্ব প্রথম কর্তব্য হবে যেটি, সেটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অসহযোগ সুরু করা।'

সেরেজোল তবু যুক্তি তোলেন, বলেন যে স্বাধীন ও পরাধীন দেশের মধ্যে তো একটা গভীর পার্থক্য থাকবেই। যে-শাসন ব্যবস্থা তার পক্ষে বিদেশী, তেমন রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের গুরুতর সংঘাত নিশ্চয়ই লাগতে পারে। কিন্তু যে-রাষ্ট্রকে সুইসরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেছে, তার সঙ্গে তারা কেমন ক'রে সম্পর্ক ছিন্ন করবে? গান্ধী উত্তর দেন : 'এই দুইয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য নিশ্চয় আছে। যদি পরাধীন দেশের মানুষ হই, তবে পরাধীনতার শৃংখলে ঘোরতর নাড়া দিয়েই সে-দেশকে আমি সাহায্য করব। কিন্তু আপনারা যা জানতে চাইছেন আমার কাছে, তা কোন উপায়ে যুদ্ধের মনোবৃত্তির হাত হ'তে আপনারা রেহাই পাবেন। রাষ্ট্র আপনাদের অনেক সুখ সুবিধা দিয়েছে, অবশ্য এই শর্তে যে রাষ্ট্রের খাতিরে আপনারা যুদ্ধ করতে রাজী থাকবেন। সুতরাং সেই রাষ্ট্রের প্রতি আপনাদের যা করণীয়, তা তার নিজেরই সামরিক মনোবৃত্তি হ'তে তাকে মুক্ত করা। একটার পর একটা সুখ সুবিধা ছাড়তে থাকুন না কেন—ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠাবেন না, রোগীদের হাসপাতালে পাঠাবেন না, চাকরী করবেন না, মাইনে নেবেন না, ডাকঘরে যাবেন না, অন্যান্য নাগরিক সুবিধাও ত্যাগ করবেন। খাজনা না দেওয়াটা খুব সোজা ব্যাপার—সেটা পরে আসবে। সে—পর্যায়ে পেঁছোনোর আগে আমরা ভারতে দশ বছর ধ'রে অপেক্ষা করি।'

কথাগুলো বড্ড স্পষ্ট, তা সেরেজোলের মনটাকে রীতিমত নাড়া দিল। সেরেজোলের অন্যান্য শিষ্য যাঁরা—ঐ সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনালেরই—তাঁরাও কম বিচলিত হলেন না। কথাগুলো যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মেনে নেবেন, এমন সাধ্যও তাঁদের নেই—তবে ভদ্র সজ্জন ও বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তি বলেই এমন সব কথা-বার্তা যে তাঁদের ভাবিয়ে তুলবেই, তাতেও সন্দেহ নেই। এবং তৃতীয় সভায় (যেটা গোপন না হলেও দ্বিতীয় সভাটির মত ঠিক যে-কোন লোকের জন্য উন্মুক্ত ছিল না—বিবেকী বিরোধীর ছোট্ট দলই এই সভার শ্রোতা) সেরেজোল সেটা নিজেও স্বীকার করেন, বলেন যে, তাঁদের প্রচেষ্টা যে আসলে কত বলহীন, সেটা গান্ধীর কথা শুনে তাঁরা বুঝতে পারছেন। এবং সার্ভিস সিভিলের সেই উদারহৃদয় নেত্রী এলেন মনাস্তিয়ে তো মর্মস্পর্শী বিনয়ের সঙ্গে বললেনই, গান্ধীর সামনে তাঁরা নিজেদের কী রকম বিড়ম্বিত বোধ করছেন—কারণ গান্ধী কিছুরই ভয় করেন না, আর তাঁদের ভয় সবকিছুর প্রতিই। সেরেজোল বলেন, "আমাদের সত্যটা আমরা পেয়েছি, কিন্তু একমাত্র সত্য যেটি, আপনি তা পেয়েছেন।"

লোজানের সেই তৃতীয় সভাটি হল এক গীর্জায়, যেখানে একদিকে যেমন সেরেজোলের 'সৈনিকরা', অন্য দিকে তেমনি 'বিবেকী বিরোধীর' দল হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে গান করল— সুইস মৈত্রীর এক গান। গান্ধীকে এখানে প্রশ্ন করা হয় : 'ঈশ্বরকে আপনি সত্য হিসেবে দেখেন কেন?' এর উত্তরে গান্ধী যা বলেন, তা গভীর অর্থপূর্ণ।

গান্ধী : "হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের হাজার খানেক নাম পাওয়া যায়, এ-কথা শিখি আমার প্রথম যৌবনে। কিন্তু তাঁর সেই হাজারখানেক নামও একেবারেই যথেষ্ট
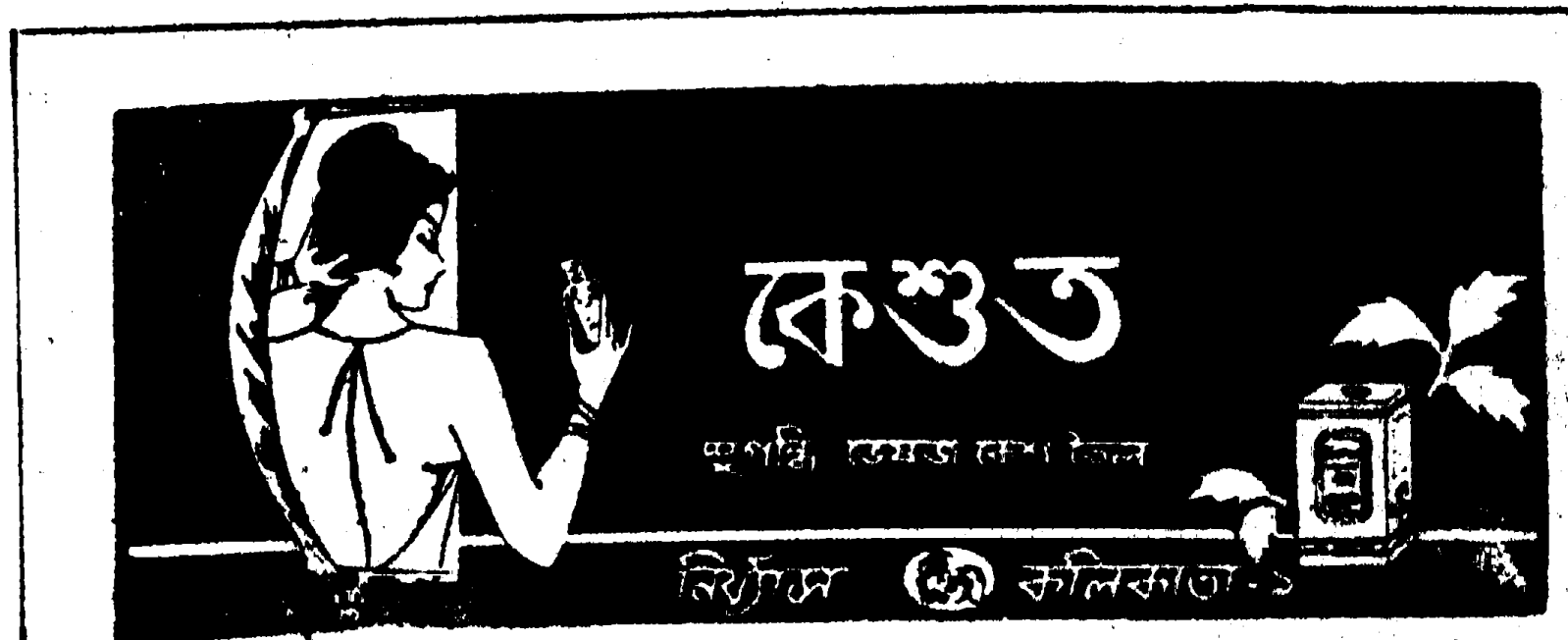
নয়। আমার তো বিশ্বাস, যত প্রাণী আছে, ঈশ্বরেরও তত নাম—তাই আমরা বলি, তাঁর নাম নেই। এবং যেহেতু ঈশ্বরের আকারও অজস্র, তাকে আমরা আকারহীন বলে ভাবি। এবং যেহেতু আমাদের সঙ্গে তিনি অনেক ভাষায় কথা বলেন, তাঁকে মনে করি বাক্যহীন। যখন ইসলাম ধর্ম নিয়ে পড়াশুনো সুরু করি, সেখানেও দেখি ঈশ্বরের অনেক নাম। যাঁরা বলেন যে, ঈশ্বর হচ্ছেন প্রেম, তাঁদের আমি বলব : "হ্যাঁ, ঈশ্বরই প্রেম। যদিও অন্তরে অন্তরে আমার বিশ্বাস, ঈশ্বর হয়তো প্রেম হতে পারেন, কিন্তু সবার উপরে তিনি সত্য। মানুষের ভাষায় যদি তাঁর পূর্ণতম ব্যাখ্যা সম্ভব হয় তো বলব, আমার মতে তিনি সত্য। তবে বছর দুয়েক আগে এর থেকেও আরো এক ধাপ আমি এগিয়ে যাই, এবং বলি : সত্যই ঈশ্বর। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে আমি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সমানে সত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, এবং শেষে দেখি যে, একমাত্র প্রেমেরই মাধ্যমে সত্যের সব থেকে কাছাকাছি যাওয়া যায়। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় প্রেম কথাটার নানা অর্থ, এবং মানুষের প্রেম বলতে যখন লালসাও বোঝায়, সেটা একটা হীন জিনিস হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটাও জেনেছি যে, অহিংসার অর্থে যদি প্রেম কথাটাকে চালানো যায়, পৃথিবীতে খুব কম সংখ্যক লোকই তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে। কিন্তু সত্য কথাটায় এক ভিন্ন দুটো অর্থ কখনো পাইনি। এমন কি নাস্তিকরা পর্যন্ত সত্যের শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ তোলে না—সত্যকে আবিষ্কার করার নেশায় তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত নির্দ্বিধায় অস্বীকার করে, এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সেখানে তাদের ঠিকই বলতে হয়। এবং এই যুক্তির কারণেই আমি বলব যে, 'ঈশ্বর সত্য' বলা অপেক্ষা 'সত্যই ঈশ্বর' বলাটা আরো সমীচীন। চার্লস ব্যাডলাফের কথা বলি—নাস্তিক বলে নিজের পরিচয় দিতে তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে বলেই বলছি, আমি তো তাঁকে নাস্তিক বলে কখনো মনে করব না—বরং বলব, তিনি ঈশ্বরকে ভয় পান। অবশ্য জানি, সেটা তিনি মেনে নেবেন না। তাঁর যুক্তির ধার তাই আমি ভোঁতা করে দিতে পারি এই বলে যে, সত্যই ঈশ্বর—ঠিক এমনি করে অন্য অনেক যুবকের যুক্তিও ভোঁতা করেছি। অবশ্য এটাও বলার দরকার, ঈশ্বরের নামে অজস্র লোক অকথ্য অন্যায় করেছে—এবং সত্যের নামেও যে জ্ঞানী-গুণীরা নানান নিষ্ঠুরতায় প্রায়ই প্রবৃত্ত হন না, তাও নয়। আমি তো নিজেই জানি, বিজ্ঞান ও সত্যের নামে পশুদের উপর কী অমানুষিক অত্যাচার করা হয়—জীবন্ত অবস্থায় তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটা হয়। সুতরাং যে উপায়েই ঈশ্বরকে বর্ণনা করা যাক না কেন, পথে কোনো না কোনো বিঘ্ন থাকবেই। তবে মানুষের মন সীমিত, এবং সেই সীমার মধ্যেই তাকে হাতড়াতে হয় যখন সে চায় এমন একটি সত্তা বা বিরাটকে বুঝতে, যা তার সমস্ত বুদ্ধি শক্তির সম্পূর্ণ অতীত। তাই হিন্দু দর্শনে বলে : 'একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, আর কিছু নেই।' ইসলামের 'কালেমা'তেও এই একই সত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে দেখবেন—তার কত দৃষ্টান্তও সেখানে আছে। সংস্কৃততে সত্য কথাটার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে যার অস্তিত্ব আছে—'সত্'। এই কারণে এবং অন্যান্য কারণেও —আমি শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম যে ঈশ্বরের যে সংজ্ঞাটি আমার কাছে সবচেয়ে সন্তোষজনক, সেটি হল 'সত্যই ঈশ্বর'। এবং সত্যকে যখন ঈশ্বররূপে আপনারা আবিষ্কার করতে চান, যে একমাত্র অব্যর্থ মাধ্যমে আপনারা তা করতে পারেন, তা প্রেম, অর্থাৎ অহিংসা, এবং যেহেতু শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য ও পথের অভিন্নতায় আমি বিশ্বাসী, বলতে আমার দ্বিধা নেই যে ঈশ্বরই প্রেম।"

আলোচনা থামে না, লোকে আবার প্রশ্ন করে : "কিন্তু তা হলে সত্যটা কী?"

গান্ধী : 'শক্ত প্রশ্ন', কিন্তু নিজের জন্য সেটাকে আমি সমাধান করেছি এই বলে যে যা আমাদের হৃদয়ের স্বর বলে, তাই সত্য। অবশ্য আপনারা বলতে পারেন এখানে, সে কি, যে যেমন ভাবে, লোক অনুযায়ী সত্যও তেমন বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী হবে? কিন্তু দেখুন, মানুষের মনের কারবার অসংখ্য মাধ্যম নিয়ে, এবং একজনের মনের গতি আরেকজনের মত নয়। এর অর্থ এই যে যা সত্য একজনের কাছে, তা অসত্য অন্যজনের পক্ষে। এমন পরীক্ষা যাঁরা চালিয়েছেন, তাঁরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে পরীক্ষার প্রকৃতি অনুযায়ী কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম মেনে চলা দরকার। যেমন ধরুন, বৈজ্ঞানিক কোনো পরীক্ষা করার জন্য আগে কতকগুলো অপরিহার্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রণালীর মধ্য দিয়ে যেতেই হয়, তেমনি কোনো আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যে পেতে চায়, তাকেও কতকগুলো প্রাথমিক কঠোর শৃংখলা আগে অবলম্বন করতে হবে। তাই নিজের নিজের হৃদয় কী বলে, সে সম্বন্ধে মুখ খোলার আগে প্রত্যেককেই জানতে হবে তার সীমা ঠিক কতখানি। আমাদের একটা বিশ্বাস আছে, যেটা অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং যেটা বলে যে যদি কেউ তার ব্যক্তিগত জীবনে সত্যকে ঈশ্বররূপে পাওয়ার জন্য পরীক্ষা চালাতে চায় তো তাকে কতকগুলো ব্রত নিতে হবে, যেমন সত্যের ব্রত, ব্রহ্মচর্যের ব্রত (কারণ সত্য ও ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যে প্রে... তার উপর তো ভাগ বসানো যাবে না ত... কিছুর জন্যই), অহিংসার ব্রত, দারিদ্র্যের ... ও ত্যাগের ব্রত। এই পাঁচটি ব্রত যদি ... মানেন তো সত্য নিয়ে পরীক্ষার পথে ... আপনারা নামতে পারছেন না। ... আ... কয়েকটি নিয়মের কথাও আছে, সব ব... এখানে সম্ভব নয় আমার পক্ষে। শু... এইটুকু বললেই যথেষ্ট : যারা এ-ধরনে... পরীক্ষা করেছে, তারা জানে যে তা... নিজের নিজের বিবেকের স্বরটি শোন... ভান করাটা সব সময় কাজে লাগে না... যেহেতু কোনো রকম শৃংখলা না মেনে... এখন প্রত্যেকেই চায় বিবেকের অধিক... জাহির করতে এবং যেহেতু আজ এত অ... ত্যের ভিড় এই হতচকিত জগতে, আপনা... দের শুধু এইটুকুই বলতে পারি অ... আন্তরিক বিনয়ের সঙ্গে : বিনয়ের প্রাচু... যার নেই, সত্যকে অর্জন সে করতে পা... না। সত্যের সমুদ্রে যদি সাঁতার কাটতে চ... তো আপনাদের শূন্যে না ফিরে উপ... নেই। এক অতি আশ্চর্য পথ এটি, ... এর আলোচনায় আমি আর এগো... চাই না।"

লোজানের প্রথম সভায় গান্ধী যে-স... ঘোষণা করেছিলেন, সেগুলো ভীষণ... সেখানে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে অমান্য কর... আবেদন জানান। এর কারণে সরকা... সংবাদপত্রগুলি গান্ধীর বিরুদ্ধে অনায়াসে দাঁড়িয়ে উঠতে পারত, এবং তার ফলে ... জানে, হয়তো এখান থেকে বলপূর্ব... বহিষ্কৃতই তাঁকে হতে হত। কিন্তু যেহে... ঘোষণাগুলি করেন এমন এক সভায় ... সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না, সো... তাঁর এই আবেদন ইত্যাদির কথা জানতে পারে নি। এবং সরকারের লোক যাঁ... সেখানে ছিলেন, তাঁরা গান্ধীর বক্তব্যটা... উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু এ... একই কথা তো বলা চলে না দ্বিতী... সভাটি সম্বন্ধে, যেটি উন্মুক্ত ছিল সকলে... জন্য—সে-সভায় 'ল্য জুরনাল দ্য জনেভ' 'লা ত্রিব্যুন দ্য লোজান্', ফরাসী ভাষ... এই দুটি জাত মিথ্যুক সুইস সংবাদপত্রে... প্রতি গান্ধী খড়্গহস্ত হন। এর এক... কাগজ তো গান্ধী পারীর সভায় যা বলে... ছিলেন, তার একেবারে উল্টো ব্যাখ... দিয়েছিলেন, সত্যকে সম্পূর্ণ তার বিপরী... করে। দ্বিতীয়টি গান্ধীর চিন্তার ম... প্রচ্ছন্ন ইংগিত খুঁজে বার করেন, বলতে চান যে আসলে গান্ধী হিংসার নীতি... আগে থেকেই মেনে নিয়েছেন, শু... অহিংস নিয়ে কিছুদিন চেষ্টাচরিত্র করা... পর হিংসা ধরবেন। উভয় কাগজই কোম... বেঁধে লাগলেন গান্ধীকে এমন এ... জাতীয়তাবাদী বলে চালাতে, যিনি স্বপ্ন... ভাবী নন—অর্থাৎ যেমন করে হোক, যু... যুদ্ধবাদীদের তথাকথিত নিরপেক্ষ জাতী... ভণ্ডামির সমর্থক তাঁকে করে তুলতে হবে, কাগজ দুটির অভিপ্রায় যেন এমন। গান্ধী অবশ্য এই অন্যায় মিথ্যা ভাষণে... স্পষ্ট প্রতিবাদ জানান, বলেন যে জেনিভা... কাগজটির সম্পাদকের সাধুতায় যদিও তি...

সন্দেহ প্রকাশ করেন না, তবু কাগজটির যে-প্রতিনিধি এই বিবৃতি দিয়েছেন, তাঁকে এখন বিশ্বাসঘাতক বলাই সেই সম্পাদকের কর্তব্য—এবং এই মিথ্যার সংশোধনও যাতে কাগজে বেরোয়, তাও দেখার দরকার সম্পাদকের। তা শুনে লোজানের লোকদের কী আনন্দ, সানন্দে হাততালি দেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাংবাদিকদ্বয় রেগে মেগে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যান দুম করে দরজা খুলে।

সুইস কাগজগুলো এতদিন গান্ধী সম্বন্ধে ভদ্র চতুরতার নীতি অবলম্বন করেছিল, কিন্তু আজ যে তারা রাতারাতি ভোল পাল্টাবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সে-ভোল তারা পাল্টাল যখন তখনও বেশ একটি সংযত শ্লেষের সুর বজায় রাখল—কারণ ব্যাপারটা সরাসরি গায়ে এসে লাগে মাত্র দুয়েকটি সংবাদপত্রেরই। অন্য-গুলির বক্তব্য অপেক্ষা করে রইল জেনিভার সভার পরের দিনের জন্য, অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের জন্য। কিন্তু তারা কী বলবে তখন সেটা আগে থেকে ভাবা কেন

বুধবার ৯ই ডিসেম্বর। যে দর্শন-প্রার্থীদের আগে থেকে কথা দিয়েছিলেন গান্ধী, তাঁদের জন্য সকালটা খালি রাখলেন। (এ প্রসঙ্গে এটাও বলি, রবিবার সন্ধ্যায় যখন গান্ধী পেঁছোন, আমাদের কথাবার্তা ও প্রার্থনা শেষ হলে রাত ৯টায় জনা-বারো সাংবাদিক তাঁর সামনে আসেন—এত অসম্ভব বোকা তাঁরা যে কেউই একটা ভাল প্রশ্ন পর্যন্ত করতে পারলেন না।) কিন্তু সাড়ে এগারোটা নাগাদ যাতে আমার বাড়ীতে তিনি আসেন ফটো তোলানোর জন্য (একজন ফটোগ্রাফার আসছেন — মঁগ্রোর আর (শলমের) সে অনুমতি তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছি — এ-অনুমতি তাঁর কাছ হতে কখনো সাধারণত পাওয়া যায় না। পরে তাঁর সঙ্গে আবার একবার আলোচনায় বসি।

বিকালে গান্ধীর ইচ্ছা ছিল মীরাকে নিয়ে এক বৃদ্ধা চাষীর বাড়ী যান। ভারতীয় কোন চাষী রমণীর মতই বৃদ্ধাটি চরকায় সুতো কাটেন। মীরা তাঁর কাছে যান একবার আগে। তখন গান্ধী সম্বন্ধে তাঁরা দুজনে কথাও বলেন। সুতরাং একটি মোটর-ভ্রমণের বন্দোবস্ত করা গেল যাতে লাভ হল এই যে পরে গান্ধীকে লুজাঁতেও নিয়ে যাওয়া যাবে, যাতে তিনি ডাঃ ভোতিয়ের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্যাবাসটি ঘুরে আসতে পারেন। (এখানে একটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে, যাতেও গান্ধীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠে। গান্ধী চলে যাওয়ার এক সপ্তাহ বাদে স্বাস্থ্যাবাসের অধ্যক্ষ ডাঃ ভোতিয়ে আমাদের ফোন করেন, বেশ উদ্বিগ্ন হয়েই। তিনি নাকি গান্ধীর হাতে স্বাস্থ্যাবাসের স্বর্ণ গ্রন্থটি দেন এই অভিপ্রায়ে যাতে গান্ধী কিছু লেখেন তার উপর। অথচ আমাদের অতিথির মুখে এ বই সম্বন্ধে কখনো কিছু শুনিনি। শেষে বইটা খুঁজে পাই। বাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল এবং গান্ধী লেখেনও নি তাতে কিছু।) উচ্চ শিক্ষিতে ভরা স্বাস্থ্যাবাসটি দেখে গান্ধী কতটা অভিভূত হন জানি না, কোন উচ্চবাচ্যই সে বিষয়ে করলেন না, শুধু তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রসঙ্গ-টাই পাড়লেন। কিন্তু বৃদ্ধা চাষীটির ঘরে যেতে পেরে তিনি আনন্দে আত্মহারা। বৃদ্ধা যেখানে সুতো কাটেন, সেখান সটাং গান্ধী হাজির হন এবং বৃদ্ধার সামনে মাটিতে বসে পড়েন, বকর বকর শুরু করেন। পাশের ঘরে থাকে বৃদ্ধার দুটি ছাগল ও দুটি গরু। গান্ধীর মনে হয়, তিনি ভারতেই আছেন—বলেন, সেখানেও সব ঠিক এই রকমই। বৃদ্ধা গান্ধীর এই অপ্রত্যাশিত আগমনে উৎফুল্ল নিশ্চয়ই যদিও বিস্মিত ততটা নন। ওঁরা হাসেন, গল্প করেন, দুটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

ফিরেই, পাঁচটা বাজতে না বাজতেই, গান্ধী এসে হাজির হলেন আমার কাছে। কিন্তু আমি একটু ক্লান্ত বোধ করছিলাম, এবং এটাও স্বীকার করব সেদিন আমার মনে হচ্ছিল গান্ধীর পথ নানান ব্যাপারে আমার থেকে এত ভিন্ন এবং সে-পথ ইতি-মধ্যে এত পরিষ্কারভাবে তিনি তৈরি করে রেখেছেন যে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার কিছু হয়ত নেই আমার। দুজনেই জানি যে, ঠিক কোথায় যাচ্ছি—এবং গান্ধীর পথ নির্ভুল যেমন তাঁর পক্ষে, তেমনি তাঁর অনুসরণকারীদের পক্ষে. আর সেটা তাই থাক, আমিও তা চাই। তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। কিন্তু আমরা পরস্পর পরস্পরকে কী বলতে পারি, একমাত্র (যেমন তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিনে করি) তাঁর হাতটাকে আমার হাতে তুলে নেওয়া ছাড়া বা তাঁর চোখে চোখ রেখে হাসা ছাড়া? এবং মুখ খুলে তিনিও হাসবেন, তাঁর সেই থামা-থামা হাসি, গৃহপালিত বাধ্য কুকুর যেমন কখনো কখনো জিভ বার করে হাঁপাতে থাকে। যাই হোক, সে-সন্ধ্যাতেও কথা আমার মুখে ঠিক যুগিয়েছিল—তবু এটাও বলব ৯ তারিখের সেই আলোচনাটি আমাদের সর্বসমেত পাঁচটি আলোচনার মধ্যে সব থেকে কম হৃদয়গ্রাহী হয়।

আরম্ভ করলেন আমার বোন, গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করলেন র‍্যামজে ম্যাক-ডোনাল্ডকে তাঁর কী মনে হয়, তাঁকে তিনি সজ্জন বলবেন?

গান্ধী : 'হ্যাঁ এবং না। যা বলেন, সেটা মানেন, সেই অর্থে তিনি সজ্জন। কিন্তু এটাও তাঁর জানা উচিত এবং তিনি জানেনও তা, যে সেটার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের দায়িত্ব লোপ। তা সত্ত্বেও তিনি বলেই চলবেন যে দায়িত্ব ঠিকই রয়েছে—যেটা সত্য নয়. সেটাকে এইভাবে তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করাতে চান। অন্য আরেক দিক থেকে তাঁর আন্তরিকতার অভাব দেখেছি—আলোচনার সময় তিনি মন খোলেন না বিষয়টা এড়িয়ে যান। ওঁর প্রতি ভাল ধারণা আমার নেই। কিন্তু ওঁর প্রতি অন্যায়ও আমি করতে চাই না, ওঁর ঘাড়ে প্রকাণ্ড দায়িত্বের বোঝা, এবং সে দায়িত্বটি বড় শক্ত রকমের। তিনি আর ঠিক তেমন পেরে উঠছেন না এবং তাঁর পক্ষে আমিও একটা খুব সহজ প্রজা নই। বুঝছেন যে আমি যুদ্ধ করতে নেমেছি এবং আমার চাহিদাগুলো এমন আকাশ-ছোঁয়া যে আমার নাগাল পাওয়া তাঁর পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। সুতরাং স্পষ্টবাদী তিনি হতে পারছেন না — আন্তরিকতার অভাব না বলে সেটাকে তাঁর দুর্বলতা বলাই হয়ত শ্রেয়। তাঁকে চিনি অনেক দিন, তাঁর গোড়ার দিকের বক্তব্যগুলো আমাদের স্বপক্ষেই ছিল — তবে সেটা তখন তাঁর পক্ষে সহজ ঠেকেছিল, কারণ দায়িত্ব তো কিছু ছিল না তখন তাঁর।'

রলাঁ : 'গোল টেবিল বৈঠকে আপনার শেষ ভাষণটি শুনে কেউ কেউ বিচলিত বোধ করেন। প্যারী ও বুলগেরিয়ার কয়েকটি সংবাদপত্র বলে যে আপনি নাকি 'কমিউনিস্টসুলভ ভয়' প্রদর্শন করেছেন।' (এখানে আমি একটি প্রবন্ধ হতে অংশ বিশেষ তাঁকে পড়ে শোনাই।)

গান্ধী : 'ওটা তো আমার শেষ ভাষণ ছিল না—ব্যবসার ব্যাপারে সবাইকে সমান চোখে না দেখা নিয়ে ভাষণটা দিই ফেডারেল স্ট্রাকচার-এর এক সমিতি বৈঠকে। তা শুনে আমার কোন কোন বন্ধু পর্যন্ত ঘাবড়ে যান। কিন্তু আমার নাম করে ঐ সংবাদপত্রগুলো যা বলছে, অতদূর তো আমি নিজে আসলে যাই নি। বলি, ব্যক্তিগতভাবে আমি জাতি-বর্ণ-শ্রেণীতে ইতরবিশেষ করি না—সে ইতর-বিশেষ যখন করতেই হয়, সেটা করি অন্য সামাজিক কারণে। বলি, এক যদি তা বেআইনী না হয় বা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায় তো কারুর কোন স্বার্থেই হানি ঘটার আশঙ্কা থাকবে না। জাতীয় কংগ্রেস দেশের শাসন ব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নেওয়ার পর যদি দেখা যায় যে কারুর স্বার্থকে বেআইনী ঠেকছে বা বেআইনী না হলেও তাকে জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী বলে মনে হচ্ছে তো তখন সে সম্পত্তি রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে নেবে। এ নীতি প্রযোজ্য হবে সকলের পক্ষে, ভারতীয়-ইউরোপীয় নির্বিশেষে। কোন কার্যনির্বাহক সমিতির উপর অবশ্য এত বড় ক্ষমতা অর্পণ করা হবে না একমাত্র জাতীয় সুপ্রীম কোর্টের বিচারেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে। যদি কাউকে সম্পত্তিচ্যুত করতে হয় তো আগে সুপ্রীম কোর্টে প্রমাণ করতে হবে যে, তার স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল।'

পরে আমরা আলোচনা করতে থাকি ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে। বাংলা দেশে নতুন আইন প্রণয়নের কথা উঠলে গান্ধী বললেন : 'ম্যাকডোনাল্ডকে আমি জানাই, সেটা আমাকে প্রকাণ্ড বিদ্রোহের ঠিক পূর্ববর্তী সময়টার কথা মনে করিয়ে দেয়।'

ক্রমশঃ

রাত তখন দশটা

দেবল দেববর্মা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—পাঁচ—

মুখের আকৃতি পানের পাতার মত নয়। লম্বাটে কিংবা ডিমালো তো নয়ই। বরং গোল,—চক্রাকার বললেই ঠিক বলা হবে। তবে ফর্সা।—টুকটুকে ফর্সা। চোখের উপর কমদামী গোল ফ্রেমের একটা চশমা। মেয়েটির বয়স আন্দাজ করতে চেষ্টা করল রাজীব। তেইশ, চব্বিশ,—কিংবা বড় জোর পঁচিশ হতে পারে।

ওর মুখের উপর দৃষ্টিটা এক পলকে বুলিয়ে নিল রাজীব। কেমন ভীরু দৃষ্টি। অপরিচিত মানুষজনকে কাছাকাছি দেখলে পাখীরা যেমন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, পাখা মেলে উড়ে যাবার আগে যেমন সংকুচিত দৃষ্টিতে চায়, মেয়েটি তেমনিভাবে রাজীবকে যেন নিরীক্ষণ করছিল।

একটু আগেই জীপের শব্দ কানে গিয়েছে ওর। গাড়ী থেকে দুজন আরোহী নেমে বারান্দায় উঠেছে। অবশ্য পুলিশের পোশাক দুজনের কেউ পরে আসেনি। সি-আই-ডিতে আসার পর [illegible] রাজীব তো খাকী পোশাকের কথা প্রায় ভুলতে বসেছে। আর সুব্রত? থানার বড় দারোগা হলেও সুব্রত আজ পোশাকের ব্যাপারে দশজনের মতই সাধারণ। পুলিশের ইউনিফর্ম নয়, সুব্রতর পরনে দিশী ধুতি। উর্ধাঙ্গে সদ্য পাটভাঙ্গা পাঞ্জাবী।

'আপনার নামই শ্রীমতী প্রজ্ঞা মুখার্জী?' রাজীব মৃদু সুরে আলাপ আরম্ভ করল।

আগের ঘটনা

[দিকনগর পেপার মিলের অ
মিস তরঙ্গমালা এক রাতে খুন হল।
জড়িয়ে পড়ে তারই প্রেমিক নিখিলেশ
এখন হাজতে বন্দী। কেসটা হাতে
সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর রাজীব স
শচীদুলাল তার সহকারী। নিখি
বন্ধু শশাঙ্ক ভট্টাচার্য। তরঙ্গেরও পরি

ময়না তদন্ত হয়ে গেছে। পরদিন
নগর থানার ও-সি সুব্রত সরকার, শচী
আর রাজীব এল ঘটনাস্থলে। হাঁ
সেখানে সকলের অলক্ষ্যে একটা
বোতাম আর রুমাল কুড়িয়ে পায় রাজ

ওরা এল তরঙ্গর
সেখানে তরঙ্গর র
পেপার মিলেরই আর
টেলিফোন অপারে
সুজাতা দাসের সঙ্গে
পরিচিত হল।
ব্যাপার নিয়ে চলল
বার্তা। এরপর ত
মাকেও অনেক জেরা
হল। খুঁজে
তোরঙ্গ। অন্যান্য জিনসের মধ্যেও পাওয়া গেল 'এস' লেখা মূল্যবান আংটি
পার্ক স্ট্রীট এলাকার এক অভিজাত রেস্তোরায় দুটি ক্যাশমেমো।

রাজীবের উক্তি : "তরঙ্গমালা মজুমদার বেশ খেলুড়ে মেয়ে ছিল হে সুব্র

মেয়েটি কথা বলল না। শুধু ঘাড় নাড়ল,—অর্থাৎ সে প্রভা, প্রভা মুখার্জী।

রাজীব বলল, 'সাতসকালে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম মিস মুখার্জী। কিছু মনে করবেন না। গতকালও আমরা এসেছিলাম। তখন আপনি অফিসে।'

প্রভা এতক্ষণে যেন আগন্তুকদের পুরোপুরি পরিচয় জানল। বলল, 'বুঝতে পেরেছি। সুজাতাদি কাল বলছিলেন আপনার কথা।'

'তাই নাকি?' রাজীব সান্যালকে রীতিমত উৎসাহিত মনে হল, 'কি বলছিলেন উনি?'

'তেমন কিছু নয়।' প্রভা অল্প একটু হাসল, 'সুজাতাদি বলছিলেন খুনের তদন্ত করতে একজন সি-আই-ডি এসেছেন। ভদ্রলোকের হাজার প্রশ্ন। জবাব দিতে গিয়ে নাজেহাল হবার জোগাড়।'

রাজীব স্মিত হাসল। বলল, 'মুস্কিল কান্ড তাহলে। দুর্নামে দেশ যে ভরে উঠল! এখন আপনাদের মুখোমুখী হতেই লজ্জা।'

প্রভা স্থিরদৃষ্টিতে রাজীবকে লক্ষ্য করছিল। কথা শেষ হতেই সে উত্তর দিল, 'ওমা! লজ্জা কিসের? খুনের তদন্তই তো আপনার কাজ। আর সেই তদন্তের জন্য প্রশ্ন টশ্ন তো আছেই।'

রাজীব বলল, 'তাহলে ভরসা পেলাম। এখন নিশ্চিন্তে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি। কি জানেন মিস মুখার্জী, প্রশ্ন করলেই অনেকে ভীষণ বিরক্ত হন। উত্তর দেবার আগেই রেগে টং। তা ঠিক উত্তর পাব কেমন করে?'

'আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?' প্রভা চিন্তিতমুখে বলল।

'নিশ্চয়ই। প্রশ্ন কখনও একতরফা হওয়া উচিত নয়। আর শুধু প্রশ্ন করছি এবং উত্তর শুনছি ভাবলে নিজেকে কেমন একজামিনার বলে মনে হয়।'

আমাকে প্রভা মুখার্জী বলে জানলেন কেমন করে? আগে কখনও দেখেছেন নাকি?

তারিফ করার ভঙ্গিতে রাজীব উত্তর দিল, 'সত্যি, বুদ্ধিমতী আপনি। ঠিকই তো, প্রভা মুখার্জী না হয়ে আপনি মিনতি আইচ হতে পারেন। সুতরাং আপনাকে মিনতি আইচ বলে সম্বোধন করলাম না কেন?'

'ঠিক তাই', প্রভা কৌতূহলী হয়েছে মনে হল।

রাজীব বলল, 'শ্রীমতী আইচকে দেখলাম বাজারের দিকে চলেছেন। খুব ব্যস্ত মনে হল।'

'কি আশ্চর্য! আপনি মিনতিকেও চেনেন নাকি?'

রাজীব রহস্য করে চোখ দুটি নাচাল, 'চিনি দুজনকেই। শুধু আলাপ পরিচয় এতদিন ছিল না।' হেসে বলল, 'আজ তাও হল।—'

প্রভা মুখার্জী খুব বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিন্তু কবে চিনলেন আমাদের, সে কথা বললেন তো?'

'কাল রাত্রে। বিশ্বাস করুন, তার আগে আপনাদের চিনতাম না আমি।' রহস্যের আবরণ সরিয়ে আসল কথাটা ব্যক্ত করল রাজীব। 'কাল রাত্রে একটা অ্যালবামে আপনাদের ছবি দেখেছি। অবশ্য সুব্রতও সাহায্য করেছে। সুব্রতকে চেনেন তো? দিগ্‌নগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ। আপনারা যাকে বলেন বড় দারোগা। কিন্তু আপনি সুব্রতকে কখনও দেখেন নি?' সহাস্যে সুব্রতর দিকে তাকাল রাজীব।

'ঠিক মনে করতে পারছি না—।' প্রভা মুখার্জীকে আশ্চর্য ভদ্র মনে হল।

ঘড়ির কাঁটায় চোখ রাখল রাজীব। সাড়ে আটটার বেশী। মথুরাপুর থেকে বেরিয়েছে সাতটার আগে। শচীদুলালকে আজ আর সঙ্গে নেয় নি। বিশেষ একটা কাজের ভার দিয়েছে শচীদুলালের উপর। সমস্তদিন খোঁজখবর করুক শচীদুলাল।

খুঁজে পেতে যদি সেই লন্ড্রীটা বের করতে পারে তাহলে খানিকটা কাজ হয়। অবশ্য লন্ড্রীটা দিকনগরেরও হতে পারে। কিন্তু দিকনগরের সঙ্গে লন্ড্রীটার যোগ নেই বলেই রাজীবের ধারণা। মথুরাপুরে না হলে অন্য কোন ঠিকানা হবে লন্ড্রীটার। কলকাতার কোন গলির ঠিকানা হওয়াও অসম্ভব নয়।

হাতে সময় কম। বড় জোর আধঘন্টা হবে। দিকনগর স্পিনিং মিলের অফিস টাইম আর পাঁচটা অফিসের মতই সাধারণ। দশটা থেকে পাঁচটা। সুতরাং নটার পরই প্রভা মুখার্জীকে ছেড়ে দিতে হয়। স্নান-টান, আহারপর্ব রয়েছে। তারপরই মেয়েলী সাজগোজ,—ছিটেফোঁটা প্রসাধন। আর খেয়ে উঠলেই শরীরটা একটু ভারী, আরাম খোঁজে। অতএব ভরা পেটে ঢিমে তালে পথ হাঁটবে প্রভা। এই পথটুকু শেষ করতে দশ থেকে পনের মিনিট গড়াবে।

রোদ ঝলমলে দিনটি। ফটফটে নীল আকাশ। আশ্বিনের সদানন্দ সকাল। আশ্চর্য লাগল রাজীবের। আজ এতটুকু গরম নেই। গতকালের সঙ্গে এর কোন তুলনাই হতে পারে না। এই বারান্দায় বসে কাল কি বিশ্রী ঘামছিল রাজীব। অথচ আজ? ঈশ্বরের প্রেমের স্পর্শের মত ফুরফুরে তাজা হাওয়া সর্বক্ষণ গায়ে এসে লাগছে।

রাজীব সোজা হয়ে বসল। হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে সময়ের ছোট ছোট ভগ্নাংশ মিনিট সেকেন্ড গুঁড়ো বালির মত নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আর সতর্ক না হয়ে উপায় নেই।

একগাল হেসে রাজীব বলল, 'আচ্ছা তরঙ্গ মজুমদার তো আপনার খুব প্রিয় বন্ধু ছিল। তাই না?'

প্রভা মুখার্জী বাঁ দিকের ভ্রূটা ঈষৎ কুঁচকে কি যেন ভাবল। 'বন্ধু ছিল ঠিকই, তবে প্রিয় বন্ধু বলতে ঠিক কি বোঝায় না জেনে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।'

রাজীব হাসল, বলল, প্রিয় বন্ধু বলতে আমি যা বুঝি, সেটুকুই আপনাকে খুলে বলতে পারি মিস মুখার্জী। ধরুন যে বন্ধুর কাছে অবাধে মনের সব কথা খুলে বলা চলে, তাকে আপনি নিশ্চয়ই প্রিয় বন্ধুর পর্যায়ে ফেলতে পারেন।'

'অর্থাৎ আপনি প্রশ্ন করছেন তরঙ্গের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বা কাহিনীগুলো আমি জানি কি না?'

রাজীব সান্যাল সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইল। মেয়েদের তুলনায় প্রভা রীতিমত বুদ্ধিমতী, প্রায় মুখের ভাব দেখেই ও মনের কথা আঁচ করতে পারে। এর সঙ্গে কথা বলবার সময় রাজীবকে সতর্ক হতে হবে। এ মেয়েকে কোন প্রশ্ন করবার আগে প্রশ্নের পিছনে একটা শক্ত ব্যাফল ওয়াল তৈরী করে রাখতে হবে রাজীবকে। নইলে হয়ত প্রশ্নটাই বুমেরাং অস্ত্রের মত তার দিকে তাগ করে ফিরে আসবে।

মন খুলে কথা বলবার চেষ্টা করল রাজীব। 'দেখুন তরঙ্গমালা মজুমদারের খুনের ব্যাপারটা আমাকে রীতিমত চিন্তিত করেছে। এখনও পর্যন্ত যা সূত্রটুত্র পেয়েছি, তা অবশ্য সামান্যই। কিন্তু সেগুলো থেকে একটা জিনিষ খুব পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।' একটু থেমে প্রভা মুখার্জীর মুখের দিকে চাইল রাজীব। কিন্তু প্রভা মুখার্জীকে অবিচল দেখাল। ভালো করে বিষয়টা না শুনে তার মুখ থেকে মন্তব্য বের হবে আশা করা যায় না।

সুতরাং শুরু করল রাজীব, 'মৃত তরঙ্গমালা সম্বন্ধে আমার মনে হয়েছে যে মেয়েটি বেশ আলাপী ছিল। কারো কারো সঙ্গে রীতিমত ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ ছিল তরঙ্গ। এই প্রসঙ্গে নিখিলেশবাবুর নামটা সর্বাগ্রে এসে পড়ে। আচ্ছা এ ব্যাপারে আপনি কি কিছু বলতে পারেন আমাকে?'

'দেখুন, একটা কথা আপনাকে প্রথমেই বলি।' প্রভা ধীরে ধীরে মুখ খুলল। 'মৃতের নিন্দা করা অনুচিত এবং হয়তো অন্যায় কাজ। তবু আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সব কথা খুলে বলা দরকার। তরঙ্গ খুব হাসিখুশী আর আলাপী ছিল ঠিকই। কিন্তু মনে মনে ভীষণ দেমাক ছিল ওর। এই দেমাকের জন্য অনেক মেয়ে ওকে আড়ালে খুব অপছন্দ করত।'

'তাই নাকি? কিন্তু কিসের দেমাক? কি নিয়ে বড়াই করত তরঙ্গ?'

প্রভা ঠোঁট টিপে হাসল।—'মেয়েরা কি নিয়ে দেমাক করে তা কি আপনাকে বলে দিতে হবে ইন্সপেক্টরবাবু?'

'ও'। রাজীব অল্প একটু চিন্তা করল। প্রভা বলল, 'তরঙ্গের জিনিষপত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই আপনি একটা অ্যালবাম খুঁজে পেয়েছেন? যে অ্যালবামে আমার আর মিনতির ছবি দেখেছেন?

'ঠিকই ধরেছেন', রাজীব স্বীকার করল।

'তরঙ্গের ছবিগুলো ভালো করে লক্ষ্য করেছেন আপনি?'

'নিশ্চয়।'

'ছবির চেয়েও সুন্দর দেখতে ছিল তরঙ্গ। ফটো ওর কোনোদিন ভালো উঠত না। স্বীকার করতে আপত্তি নেই, তরঙ্গের মত সুন্দরী দিকনগরে একটিও চোখে পড়েনি। সুজাতাদি অবশ্য আরো একটু বাড়িয়ে বলেন। ওর মতে দিকনগর কেন, মথুরাপুর মহকুমায় তরঙ্গের জুড়ি ছিল না।'

'নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তরঙ্গ খুব সচেতন ছিল, তাই না মিস মুখার্জী।'

রীতিমত। সুজাতাদি, এবং আরো কয়েকজন তরঙ্গের রূপ আর সৌন্দর্যের বেপরোয়া প্রশংসা করতেন। এত রূপের স্তুতি শুনলে কার মাথার ঠিক থাকে বলুন?'

রাজীব সান্যাল খুব গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবল। বলল, 'মিস দাসকে আমি চিনি প্রভাদেবী। কিন্তু তিনি ছাড়া শ্রীমতী তরঙ্গের রূপমুগ্ধ আর কারা ছিলেন? তারা নিশ্চয়ই পুরুষ?'

'পুরুষ মানুষ নিশ্চয়ই। কিন্তু কার নাম বলব বলুন?' প্রভা ফিক করে হাসল, 'তারা কি দলে কম? তরঙ্গের স্তাবক তো একটি দুটি নয়। কয়েকজন তো প্রশংসায় সোচ্চার। তলে তলে আরো কজন সৌন্দর্য-পূজারী ছিলেন কে বলতে পারে?'

মনে মনে নিজের বাকপটুতার তারিফ করছিল রাজীব। বুদ্ধিমতী প্রভা মুখার্জীকে বেশ খানিকটা কোণঠাসা করা গেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল এ মেয়ে ভীষণ চালাক আর, তেমনি চাপা। শত চেষ্টাতেও এর মুখ খোলানো যাবে না। কিন্তু, না। ব্রিজ খেলতে বসে ঠিকমত লিড্ দিতে পারাটাই যেমন কাজের কথা। জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারেও তাই। ঠিকমত বিষয়টিতে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এবং তার জন্য প্রতিপক্ষের দুর্বল স্থানটিতে সুড়সুড়ি কিংবা প্রয়োজন হলে আঘাত করা প্রয়োজন। রাজীব বুঝতে পেরেছিল মনে মনে প্রভা মুখার্জী বেজায় ঈর্ষা-পরায়ণ। তরঙ্গের সৌন্দর্য প্রশস্তি দীর্ঘদিন ওকে রীতিমত পীড়া দিয়েছে।

রাজীব বলল, 'বেশ তো। যে কজন পূজারীকে আপনি জানতেন তাদের কথাই বলুন। তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে পারি মিস মুখার্জী। যা কিছু আমাকে বলবেন, তা কাকপক্ষীতে টের পাবে না।'

প্রভা মুখার্জীকে সামান্য অস্থির দেখাল। অনিচ্ছায় যেন মুখ খুলতে হচ্ছে ওকে। রাজীব দৃশ্যটা উপভোগ করল। একটা বুনো পায়রা কেমন সুন্দর পোষ মেনেছে। খাঁচায় ঢোকাবার আগেই যা ছটফটানি।

এদিক ওদিক চেয়ে প্রভা বলল, 'আমাদের অফিসের ভৈরব দত্তকে চেনেন আপনি? উনিও তরঙ্গের মতই টেলিফোন অপারেটর। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে—বছর চল্লিশ তো হবেই। বরং দু-চার বৎসর বেশী। বাড়ীতে বউ রয়েছে। দুই ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে এইবার নাকি স্কুল ফাইন্যাল দেবে। অথচ—।'

'অথচ কি?'

'কি আবার! তরঙ্গ বলতে ভদ্রলোক একেবারে অজ্ঞান। যখন তখন যেন তরঙ্গের হুকুমের চাকর। তরঙ্গের মুখ থেকে কথা খসবার তর নেই। ভদ্রলোক ছুটে যাবেন সবার আগে। কেউ যদি তরঙ্গের নিন্দে করে তাহলে আর কথা নেই। উনি তখনই রুখে দাঁড়াবেন। প্রায় আস্তিন গুটিয়ে ছুটে যান আর কি!'

রাজীব মজা অনুভব করল। বলল, 'এ বিষয়ে তরঙ্গমালার কি মত ছিল? কিছু বলেছিল আপনাকে?'

প্রভা এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করল। বলল, 'দেখুন পরের ব্যাপারে আমি সাধারণত মাথা ঘামাই নে। কিন্তু ভৈরব দত্তের আদেখলেপনা আমিও একদিন সহ্য

করতে পারিনি। তরঙ্গকে স্পষ্ট বলেছিলাম, নিখিলেশ সেনের সঙ্গে প্রেম করছিস ভালো কথা। কিন্তু এইসব বুড়ো হাবড়া-গুলোকে কেন লাই দিয়ে বাঁদর নাচাচ্ছিস?'

'তরঙ্গমালা কি উত্তর দিয়েছিল?'

নাক কুঁচকে একটা অবজ্ঞার ভাব দেখাল প্রভা। বলল, 'তরঙ্গকে লোকে যতখানি নিপাট ভালোমানুষ বলে মনে করত আসলে কিন্তু ও তার উল্টো। সাদা সরল মোটেই ছিল না তরঙ্গ। আমি বলতেই এমন একটা ভাব দেখাল যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। বলল,—কি করতে পারি বল? ওরা যদি নিজেরাই নাচানাচি শুরু করে, তাহলে আমার কি দোষ? ভাবলাম ফটো তোলার কথাটা এই সুযোগে বলি—।'

বাধা দিয়ে রাজীব বলল, 'ফটো তোলার কথা মানে? কি ফটো,—কার ফটো?'

'বলছি ইন্সপেক্টরবাবু। ভৈরব দত্তের একটা বিলিতী ক্যামেরা আছে। ফটো তোলায় হাত আছে ভদ্রলোকের। চেষ্টা করলে সে লাইনে হয়ত উন্নতিও করতে পারতেন। আপনি তো ওর হাতের ছবি দেখেছেন। তরঙ্গের যে অ্যালবামটা পেয়েছেন, তার সবই তো প্রায় ভৈরব দত্তের হাতে তোলা। ভালো না ছবি?'

রাজীব সায় দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই ভালো। খুব ভালো ছবি।'

'তরঙ্গের যেন ছিট ছিল মাথায়। ফি মাসে ওর ছবি তোলান চাই। ভৈরব দত্তকে হুকুম করবার অপেক্ষা মাত্র। হপ্তা শেষ হবার আগেই ফিল্ম কিনে ভৈরব দত্ত এসে ওকে পাকড়াও করত। নিজের ছবি, আমাদের ছবি,—সকলের গ্রুপ ফটো। সব মিলিয়ে সে যেন এক উৎসব ইন্সপেক্টরবাবু।'

'আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব?'

'কি জিজ্ঞেস করবেন? বলুন না!'

'গতকাল সুজাতা দেবী কিন্তু ভৈরব দত্তের কথা একবারও আমার কাছে বলেন নি। শুধু নামটা একবার উল্লেখ করেছিলেন। এর কারণ কিছু অনুমান হয় আপনার?'

প্রভা মুখার্জি বিনীতভাবে হাসল। বলল, 'না। কারণ কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। হয়ত ভৈরব দত্তের বয়সের জন্যই ব্যাপারটা তেমন দৃষ্টিকটু মনে হয় নি সুজাতাদির। নইলে তরঙ্গের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতার কথা তো সবাই জানে। তবে—।'

'তবে কি মিস মুখার্জি?'

প্রভা গলা নামিয়ে বলল, 'দেখবেন, একথা যেন পাঁচ কান না হয়। ভৈরব দত্ত ম্যানেজারের লোক। কেউ কেউ বলে, সুদর্শন চক্রবর্তীর ও ডানহাত। মনে মনে ভৈরব দত্তকে ভয় করে সুজাতাদি। ওকে ঘাটাতে চায় না।

সুব্রত আজ শচীদুলালের কাজ করছিল। নিবিষ্টমনে, —প্রায় মনোযোগী ছাত্রের মত। ছোট নোটবই খুলে লিখছিল সুব্রত। মাঝে মাঝে রাজীবের দিকে তাকাচ্ছিল। কখনও প্রভা মুখার্জির গোলগাল মুখখানার উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। আবার রাজীবের নীরব নির্দেশ পেতেই নোটবই খুলে লিখতে তৎপর হল।

রাজীব হেসে বলল, 'সুদর্শন চক্রবর্তীকে আপনার কি মনে হয় মিস মুখার্জি?'

'কি বলব ইন্সপেক্টরবাবু। এতবড় একটা মিলের ম্যানেজার উনি। বিলেতে অনেকদিন নাকি কাটিয়েছেন। ভালো ভালো সব ডিগ্রী আছে। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ী। অঢেল পয়সা তাদের। কিন্তু তলে তলে উনিও তরঙ্গের একজন ভক্ত।'

'আশ্চর্য!' রাজীব কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল। বলল, 'আচ্ছা মিস মুখার্জি, আপনি তলে তলে কথাটা বারবার বলছেন কেন?'

'কারণ ওর মত একজন পদস্থ মানুষের পক্ষে প্রকাশ্যে তরঙ্গের পিছু পিছু দৌড়োদৌড়ি করা সম্ভব নয়। কাজেই ডুব দিয়ে জল খাওয়া ছাড়া ওর উপায় কি?' প্রভা মুখার্জি একটু হেসে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থামল। বলল, 'জলের নীচেও যে প্রাণী আছে একথা বোধহয় আমাদের ম্যানেজার সাহেবের খেয়াল থাকে না।'

রাজীব হেসে বলল,—'আপনার এ উপমার অর্থ কি?'

'বলছি শুনুন না।' ছদ্ম কোপ প্রকাশ করে প্রভা বলল, 'ভারী অধৈর্য মানুষ তো আপনি। আগে শুনবেন তো আমার কথা!'

রাজীব অপাঙ্গে চেয়ে দেখল, সুব্রত মুখ টিপে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে।

মাথার চুলগুলো কানের নীচে নেমে এসেছে। প্রভা সেগুলি সরিয়ে স্বচ্ছন্দ হতে চাইল। বলল, 'আমাদের মিলের এক ভদ্রলোক কলকাতায় একবার দৃশ্যটা দেখেছিল। জলের নীচের প্রাণীর উপমাটা তাই বললাম ইন্সপেক্টরবাবু।'

'কি দেখেছিল সে?'

'বাস স্টপে ভদ্রলোক নাকি দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় মস্ত এক গাড়ী চালিয়ে ম্যানেজার সাহেব হুস-উস করে চলে গেলেন। ওর পাশে তরঙ্গ বসেছিল।'

'এ নিয়ে কানাঘুষো হয় নি মিলে?'

'হবে না কেন? কিন্তু তরঙ্গ কি কম চালাক ছিল? স্রেফ বলল ও, কোথায় দোকানে সওদা করতে গিয়ে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে দেখা। তরঙ্গকে নিজের গাড়ীতে একটা লিফ্‌ট দিয়েছিলেন উনি। এই ব্যাপার মাত্র।'

রাজীব সান্যাল নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, 'দুজন ভক্তের কথা তো বললেন মিস মুখার্জি। কিন্তু আর,—আর কারা এই দলে?'

নিখিলেশ সেনকে তো আপনি চেনেন। তার বন্ধু শশাংক ভট্টাচার্যকে। উঃ,—ঐ এক গায়েপড়া ভদ্রলোক। তরঙ্গের সঙ্গে দেখা করবেন বলে ভদ্রলোক কতদিন যে মিলের গেটে ঘোরাঘুরি করেছেন।' প্রভা সখেদে ব্যক্ত করল।

'এদের কথা আপনি বাদ দিন মিস মুখার্জি। নতুন কেউ,—তরঙ্গের অন্তরঙ্গ মহলে আর কার আসন ছিল?'

প্রভা মুখার্জির মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল দেখাল। বলল, 'একজনের কথা বলতে ভুলে গেছি আপনাকে। আমাদের পারচেজ অফিসের বিশ্বনাথ বসু। ভদ্রলোকের বয়স বেশী নয়, চব্বিশ পঁচিশ, কিংবা হয়ত আমাদেরই বয়সী হবেন।'

'উনি কতদিন এসেছেন মিলে?'

'এক বৎসর। মাস নয় দশও হতে পারে। মেদিনীপুর না কোথায় যেন বাড়ী। ভৈরববাবু বলেছিলেন একবার। বাড়ীর

অবস্থা ভালো নয় ভদ্রলোকের। আমাদের মিলের কোন ডিরেক্টরকে ধরে চাকরী হয়েছে। অথচ এদিকে ঘোড়ারোগে পেয়েছে ভদ্রলোককে।'

'গরীবের ঘোড়ারোগ বলছেন!'

ঠোঁট উল্টিয়ে প্রভা বলল, 'ঘোড়ারোগ নয় তো কি বলুন। আমি জানি ইন্সপেক্টর-বাবু, তরঙ্গকে ও একবার কি উপলক্ষ্য ছল করে দামী একটা কলম প্রেজেণ্ট করেছিল।'

কিছু বলল না রাজীব। প্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করল। কুটিল ঈর্ষাপরায়ণ মুখটা। তরঙ্গমালাকে এক বিন্দুও সহ্য করতে পারত না প্রভা মুখার্জি। নইলে একনাগাড়ে এতক্ষণ কি কেউ মৃতার সম্বন্ধে এমন কটূক্তি করতে পারে?

রাজীব সান্যাল আত্মগত চিন্তায় সমাহিত ছিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেনি। অনেকগুলি ঢেউ যেন মিছিল করে ওর চোখের সামনে এসে থামছে, আবার ভেঙে পড়ছে।

হঠাৎ মুখ খুলল রাজীব। বলল, 'আচ্ছা মিস মুখার্জি, আর একটা বিষয়ে আপনি কিছু বলুন আমাদের।'

'সুজাতা দেবী কি তরঙ্গকে খুব পছন্দ করতেন?'

'পছন্দ মানে?' যেন প্রজ্জ্বলিত দেশলাই কাঠির ছোঁয়া লাগল শুকনো খড়ের বুকে। প্রভা টুনটুনি পাখীর মত মুখ উঁচু করে বলল, 'শুধু পছন্দ নয় ইন্সপেক্টরবাবু। তরঙ্গকে খুব ভালবাসত সুজাতাদি। নিজের ছোটবোনকেও লোকে অত ভালবাসে না। গত শীতে তরঙ্গ একবার খুব ভুগে উঠল। বুকে সর্দি বসেছিল,—সাত আটদিন পড়ে রইল বিছানায়। সুজাতাদি তখন কি ওর কম সেবা করেছেন?'

'তাই নাকি?'

'প্রয়োজনের চেয়েও বেশী ইন্সপেক্টর-বাবু। দু' তিন রাত সুজাতাদি একরকম জেগেই কাটিয়েছেন ওর বিছানার পাশে বসে। অফিস কামাই করেছেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ আর পথ্য দিয়েছেন। নিজের হাতে চুল আঁচড়ে দিতেন। মাথায় হাত বুলোতেন। কপাল টিপে দিয়েছেন। বাচ্চা মেয়েকে লোকে যেমন আদর করে। ওর তেমনি ব্যবহার তরঙ্গের সঙ্গে। তবু—!'

তবু কি মিস মুখার্জী? থামলেন কেন?

ফর্সা মুখটা রাঙা হয়ে উঠল প্রভার। বলল, 'না, না, ওসব কথা আপনাকে বলা যায় না।'

'না বললে তো হবে না মিস মুখার্জী', রাজীবের কণ্ঠস্বর দৃঢ় শোনাল, 'আমি বরং সুব্রতকে আড়ালে যেতে বলছি।' নির্দেশ পেয়ে সুব্রত অন্যত্র চলে গেল।

প্রভার মুখখানা অসহায় দেখাল। কিন্তু রাজীব নিজেকে আরো শক্ত করে রাখল। কি এমন ব্যাপার? যা বলতে গিয়ে প্রভার গলা কেঁপে উঠল? মুখখানা রমণীসুলভ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

প্রভা বলল, 'ব্যাপারটা আমার বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে ইন্সপেক্টরবাবু। কিন্তু এ কথা কাউকে বলা যায় না। তরঙ্গকে না,—সুজাতাদিকে না। কাউকে না, কিন্তু সি-আই-ডিরা যে নাছোড়বান্দা হয়—!'

রাজীব উৎসাহ দিয়ে বলল, 'আপনার চোখে দৃষ্টিকটু লাগলে, তা বলবেন বৈকি।'

'দৃষ্টিকটু! শব্দটা ঠিকই ব্যবহার করেছেন ইন্সপেক্টরবাবু। আমি হঠাৎ একদিন ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম। খুব ভোরে সেদিন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। তখনও বেশ অন্ধকার, দু-চারটে কাক ডাকছে। কেউ ওঠেনি।'

'কতদিনের কথা বলছেন।'

'বেশীদিন নয়, গত ফেব্রুয়ারী মাসে, হ্যাঁ বেশ মনে আছে আমার। সেটা ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ। বারান্দায় এসে সুজাতাদির গলা শুনে আমি সচেতন হলাম। এত ভোরে সুজাতাদি উঠে কি করছেন? শুনলাম ফিস ফিস করে তরঙ্গও কথা বলছে। আমার খুব কৌতূহল হল ইন্সপেক্টরবাবু। এত ভোরে ওরা কি গল্প করছে?' প্রভা দম নেবার জন্য একটু থামল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই শুরু করল প্রভা, 'পা টিপে টিপে আমি ওদের জানালার কাছে গিয়ে আড়ি পাতলাম। ঘরটায় ছায়া ছায়া অন্ধকার। আমি অবাক হলাম। মনে হল খুব কাছাকাছি বসে ওরা কথা বলছে। নইলে এমন ফিসফিসানি চাপা কণ্ঠস্বর কেমন করে অন্যের কানে পৌঁছবে?'

'তারপর?'

প্রভা মুখার্জী আবার রাঙা হয়ে উঠল। বলল, 'কৌতূহল চেপে রাখতে পারিনি ইন্সপেক্টরবাবু। জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। অন্ধকারে সব কিছু চোখে পড়ে না। তবু যা দেখলাম—।'

'কি দেখলেন? ওরা পাশাপাশি শুয়ে আছে?' রাজীবের কণ্ঠস্বর ইঙ্গিতপূর্ণ, অর্থবহ।

প্রভা বাধা দিয়ে বলল, 'ঠিক পাশা-পাশি নয় ইন্সপেক্টরবাবু। ওরা কেমন ঘেঁষাঘেঁষি, জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। আর—।'

'আর কি? বলুন মিস মুখার্জী।' রাজীব যেন ধমক দিল।

ঠোঁট কামড়ে নিজেকে শক্ত, দৃঢ় করতে চাইল প্রভা।

'আমার মনে হল সুজাতাদির মুখটা তরঙ্গের মুখের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার সরে আসছে। কখনও গালের কাছে কপালের দিকে কি যেন খুঁজছে।'

'তারপর?'

—'আমি শুনলাম হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল তরঙ্গ। বলল, এই সুজাতাদি, কি হচ্ছে এসব। ছাড়ো দিকি আমাকে।'

কথা শেষ করে প্রভা দুই করতল দিয়ে মুখ ঢাকল। লজ্জায়, উত্তেজনায় ওর মুখটা মরশুমী টম্যাটোর মত টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

'এ ঘটনা আপনি কারো কাছে গল্প করেছেন?'

'না, না ইন্সপেক্টরবাবু। শুধু—।'

'শুধু কি?'

'মিনতি,—মিনতিকে আমি বলেছিলাম পরের দিন।

'ও কি বলল?'

'মিনতি ভীষণ ভীতু। সুজাতাদিকে ওর সাপের মত ভয়। আমাকে নিষেধ করে বলল,—একথা আর কাউকে বলিস নি। বিশ্রী কান্ড হবে। সুজাতাদি সাংঘাতিক মেয়ে, তোকে ছেড়ে কথা কইবে না।'

খুব গম্ভীর দেখাল রাজীবকে। মনে হল গভীরভাবে কোন একটা বিষয় বিশ্লেষণ করছে। অথচ সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না।

রাজীব বলল—'এ গল্প আপনি কারো কাছে করবেন না। আমিও নিষেধ করছি আপনাকে। প্রয়োজন নেই এই কাহিনী রটাবার। শুধু শুধু—!' রাজীব থামল।

কে একটি মেয়ে রাস্তা থেকে নেমে এদিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই রাজীব চিনল। ফটোয় দেখা সেই কালো ছিপছিপে তরুণী। রাজীব লক্ষ্য করছিল। ভারী শান্ত ও,—সাতে পাঁচে নেই। ওর চোখের ভাষাই সে কথা বলছে। কবে যেন বাঁশবনের ছায়ায় ঢাকা শান্ত নিস্তরঙ্গ একটা পুকুর দেখেছিল রাজীব। সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে। মেয়েটিকে দেখে সেই পুকুরটার কথাই মনে এল। ওর আরও কালো চোখ দুটিতে স্তব্ধ দুপুরের সেই দীঘির জলের ছায়া।

মিনতি আইচ বারান্দায় এসে উঠল।

প্রভা বলল, 'মিনতিকেও তো কাল রাতে চিনেছেন আপনি।'

রাজীব হাসল।

'ইনি সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল। তোকে প্রশ্ন করবেন কিছু। তরঙ্গের খুনের তদন্ত করতে এসেছেন উনি।'

রাজীব হেসে বলল, 'ও'কে কিছু প্রশ্ন করব না। প্রয়োজন হলে না হয় পরে। তবে প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব।'

'সে কি? ওকে বাদ দিচ্ছেন কেন?'

কোন উত্তর না দিয়ে রাজীব করযোড় করল। বলল, 'মনে হচ্ছে আপনাকে আবার আমার প্রয়োজন হবে মিস মুখার্জী।'

পীচঢালা পথে জীপটা স্পীডে ছুটছিল। সুব্রত বলল, 'ওই চাকামুখী মেয়েটা কি বলছিল আপনাকে? কি এত সংবাদ দিল রাজীবদা?'

রাজীব একগাল হেসে বলল, 'কি বলছিল জানো?'

সুব্রত তাকাল।

'বলছিল সব মেয়েই ললিতলবঙ্গলতা নয়। ওদের মধ্যে কেউ কেউ বেজায় দুলো—।' (ক্রমশঃ)

হাসির মজলিস

বাবা জিজ্ঞাসা করেন ছেলেকে—খোকন, আজকাল তোমার স্কুলে কেমন পড়াশুনা হোচ্ছে?

ছেলে—দেখ বাপি, স্পোর্টসম্যানের মত হওয়ার চেষ্টা করো। তুমি আপিসে কি করো আমি কখনও জানতে চেয়েছি?

●

অনুপকুমার বসু, বেহালাঃ—

—যে লোকটি আমার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে, তাকে আমি গুলী করতে চাই।

—কিন্তু সেটা তো হত্যার কাজ হবে?

—না, ওটা হবে আত্মহত্যা।

●

রোগী—আপনি সব সময় রোগীদের খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন?

ডাক্তার—ওটার ওপরেই যে আমার প্রেসক্রিপশন নির্ভর করে।

●

পরিশ্রান্ত যাত্রী রিকসাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল—ওরে, আমাকে স্টেশন পর্যন্ত পেঁছে দিতে কত নেবে?

—এক টাকা।

—সঙ্গে মাল নিতে?

—মালের জন্য কোন ভাড়া লাগে না।

—তবে সুটকেশ আর বেডিং তুমি নিয়ে চল, আমি হেঁটে যাচ্ছি।

●

সকালে ঘুম থেকে উঠেই হাসপাতালে গেলেন ভদ্রলোক। গিয়ে শুনলেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লেবার-রুমে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লেবার-রুমের দরজায় গিয়ে হাজির। তারপর বেয়ারা নার্স যাকেই সামনে পান স্ত্রীর খবর জিজ্ঞাসা করেন আর ধমক খান। ভয়ঙ্কর উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। এই করেই ঘণ্টাখানেক কেটে গেল।

এমন সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন ডাক্তার।

—আপনিই কি মিস্টার বোস জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার।

—হ্যাঁ স্যার!

—আপনার একটি সুখবর আছে। আপনার স্ত্রীর ছেলে হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাবেন।

বলেই ডাক্তার ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক আবার পায়চারি করে পা পাল্টিয়ে ভদ্রলোক কোনক্রমে লেবার-রুমের দেওয়াল আঁকড়ে পড়ে রইলেন। দু-একজন আয়াগোছের মহিলাকে সামনে পেয়ে স্ত্রী কেমন আছেন জানতে চাইলেন। ভাল আছেন শুনে অনেকটা কষ্ট লাঘব হোল। তারপর আরো অনেকক্ষণ কাটল।

হঠাৎ লেবার-রুমের দরজা খুলে ডাক্তারবাবু আবার বেরিয়ে এলেন। বললেন,

—মিঃ বোস, আপনার স্ত্রীর আর একটি মেয়ে হয়েছে। সকলেই বেশ ভাল আছে। একটু অপেক্ষা করে যাবেন।

ভদ্রলোক কেমন থতমত খেয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবু লেবার-রুমে ঢোকবার আগেই বলে উঠলেন,

—দেখুন স্যার, এখন সাড়ে দশটা বাজে। সাতটার সময় ছেলে হয়েছিল। সাড়ে দশটায় মেয়ে। ঠিক সাড়ে তিনঘণ্টার ইণ্টারভ্যাল। আর একটি হতে নিশ্চয় বেলা দেড়টা হবে। আমি এক কাপ চা খেয়ে আসতে পারি?

কলকাতায় বাসের সংখ্যা কত?

—মোট জনসংখ্যাকে হাজার দিয়ে ভাগ করে নিরানব্বই বিয়োগ করে এক গুণ করে বাহাত্তর যোগ করে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে।

●

মেয়েদের বয়স বোঝবার উপায়?

ইলেকট্রোস্কোপ ব্যবহার।

●

সুখী কে?

—যে মৃত।

●

আত্মার সদ্‌গতির উপায়?

—নারীকে এড়িয়ে চলা।

মন বুঝে দেখুন

কুইজ

পরিস্থিতি যাচাই করতে পারেন?

ঘটনা-পরিস্থিতির বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির গুরুত্ব ঠিক ঠিক মতো যাচাই করতে না পারার ফলে অনেকে কাজ-কারবারের, এমনকি নিজেরও, অনেক সমস্যার কিনারা করতে ব্যর্থ হন। হয়তো তাঁরা কোন্ কোন্ বিষয়গুলি সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তা বুঝতে না পেরে অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেই সময় আর শক্তির অপব্যয় করতে থাকেন।

এইজন্যেই, সমস্যার সমাধানে পৌঁছবার প্রথম সূত্র হলো, কেবলমাত্র সমস্ত দরকারী বিষয় নয়, সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়েরও বিশ্লেষণ করে নেওয়া। নীচের টেস্ট দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার মধ্যে ঐ ধরনের বিশ্লেষণ করবার দক্ষতা কতোখানি আছে। কতো তাড়াতাড়ি আপনি বিশ্লেষণ করতে পারেন, সেটাও দক্ষতার একটা মাপ কাঠি, সেইজন্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টেস্ট শেষ করতে হবে।

নিয়ম : যদি মোটামুটিভাবে কোনো কথার সঙ্গে একমত হন, তাহলে 'ঠিক'-এ দাগ দিন। একমত না হলে কিংবা মন ঠিক করতে না পারলেও 'ভুল'-এ দাগ দিন। সময় : ৪ মিনিট।

১। পাবলিক টেলিফোন বাক্সে পয়সা ফেলে ফোন করার পর পয়সাটা ফেরৎ চলে এল। পয়সাটা পকেটে না পুরে টেলিফোন অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে।

ঠিক...ভুল...

২। ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়ার চেয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে দান করাই ভালো, অবশ্য সেই দানের অর্ধেকই খরচ হয়ে যায় প্রতিষ্ঠান চালাতে।

ঠিক... ভুল......

৩। ঘোড়ার পা ভেঙে গেলে গুলী করে মেরে ফেলাই ভালো, অবশ্য পায়ের চিকিৎসা করাও যায়, কিন্তু সে-চিকিৎসায় খরচ অনেক, তাছাড়া, ঘোড়াটারও কষ্ট হবে খুব।

ঠিক......ভুল......

৪। শিঙী মাছ খাওয়া উচিত নয়, কারণ ভাজবার সময়েও জীবন্ত ছটফট করে।

ঠিক... ভুল......

৫। বঁড়শী দিয়ে মাছ ধরার চেয়ে জালে মাছ ধরাই ভালো ; বঁড়শী দিয়ে মাছের ওপর নৃশংসতা করা হয়।

ঠিক......ভুল......

৬। রাস্তার ধারে বড় বড় বিজ্ঞাপন-বোর্ডগুলি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে খুব সাহায্য করে। তবু বলতে হবে, ওগুলো নিষিদ্ধ করা উচিত, কারণ ওর দ্বারা সৌন্দর্য হানি হয়।

ঠিক......ভুল......

৭। ব্যবসাদার লোকের হাতে সময় থাকলে, দুটো পয়সা বেশি ছেড়ে না দিয়ে খুব দর কষাকষি করা উচিত।

ঠিক......ভুল......

৮। হোটেলের বয় বখশিস পেয়ে থাকে। একটা নতুন জায়গায় গিয়ে হোটেলের বয়ের কাছে ভালো কাজ পেলেন না। অসন্তুষ্ট হলেও আপনি সহ্য করবেন এবং বখশিস কম দেবেন না।

ঠিক......ভুল......

৯। যে-রেস্টুরেন্টে রোজই যান সেখানে পরিচিত বয় আপনাকে একদিন খুশি করতে পারলো না। তবু তাকে আগের মতোই ভালো বখশিস দিয়ে আসলেন, তা না হলে বিরক্তি দেখিয়ে কম বখশিস দিলে পরে আরো খারাপ ব্যবহার পেতে পারেন।

ঠিক......ভুল......

১০। যে-রেস্টুরেন্টে রোজই যান সেখানে পরিচিত বয় একদিন আপনাকে আশাতিরিক্ত খুব চটপট খুশিমনে খাবার-দাবার এনে দিলো। তবু আপনি মনে করেন, তাকে প্রতিদিনের চেয়ে বেশি কিছু বখশিস দেবার দরকার নেই, কারণ তাতে খরচা বেড়েই চলবে, আর কোনোদিন যদি সেই খরচ টানতে না পারা যায়, তাহলে বয়টির কাজ খারাপ হতে থাকবে, অর্থাৎ আপনি মনে করেন, বয়-মাত্রেরই কাজ হলো চটপট হয়ে খদ্দেরকে খুশি করা।

ঠিক... ভুল......

১১। ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙিয়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন, ক্যাশিয়ার ভুল করে দশ টাকা বেশি দিয়ে ফেলেছে। আপনি ভেবে নিলেন, ব্যাঙ্কের এরকম অনেক ক্ষয়-ক্ষতিরই ইনসিওর করা আছে ; সুতরাং টাকাটা পকেটে রেখে দিলে চুরি করা হবে না এবং কাউকে ঠকানোও হবে না।

ঠিক......ভুল......

চমৎকার (সবচেয়ে ওপরের শতকরা পাঁচজন) : ০—২

সুন্দর (তার পরের শতকরা ১৫জন) : ৩—৭

ভালো (তার পরের শতকরা ৩০জন) : ৪—১৩

খারাপ (সবার নীচের শতকরা ৫০জন) : ১৪—২২

সঠিক জবাব : ১। ভুল, ২। ঠিক, ৩। ঠিক, ৪। ভুল, ৫। ভুল, ৬। ভুল, ৭। ঠিক, ৮। ভুল, ৯। ঠিক, ১০। ঠিক, ১১। ভুল।

যেখানেই আপনার জবাব সঠিক জবাবের সঙ্গে মিলবে না, সেখানেই আপনি দুই পয়েন্ট পাবেন ; আর কোনোটির জবাব যদি বাদ দেন, সেখানে এক পয়েন্ট পাবেন।

কালজয়ী উপন্যাস 'কবি'

বাঙালি পাঠক 'কবি' উপন্যাসখানি পড়েন নি একথা কল্পনা করা যায় না। 'কবি' বাংলা সাহিত্যের অঙ্গুলিমেয় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ক'খানির অন্যতম। আর শুধু তাই নয়, একদিক দিয়ে এ বইকে অদ্বিতীয় বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। বাস্তব জীবন এবং কল্পনাকে একই বৃন্তে এমন করে ধারণ করতে দেখিনি আর কোনো উপন্যাসে। দৈনন্দিন প্রাণধারণের বেআব্রু কর্কশতা আর অন্তর্জীবনের সৌন্দর্য-পিপাসা এবং উন্নতজীবনের জন্যে ব্যাকুল আগ্রহ এমন করে রূপায়িত হয়নি আর কোনো রচনায়। 'কবি'র মধ্যে ফুটে উঠেছে হীনতা চক্রান্ত আর দারিদ্র্যে জর্জর সাধারণ মানুষেরই 'মানুষ' হয়ে ওঠার সাধনা। 'কবি' একই সঙ্গে তাই নাটকের মতো তীব্র ঘটনাসংঘাতে মুখর, আবার লিরিক কবিতার মতো আত্মঅতিক্রমণের বেদনার গভীর। —নতুন সংস্করণে প্রকাশিত বইখানি পেয়ে তাই সাগ্রহে নতুন করে পড়লাম এবং মুগ্ধ হলাম।

সকলেই জানেন, চরিত্রসৃষ্টিতেই উপন্যাসের আসল সার্থকতা। পরিবেশ যতো নিপুণভাবেই রচিত হোক আর ঘটনাসংস্থাপন যতো বিচিত্রই হোক, সব আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যায় যদি চরিত্র-গুলির না ঘটে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সেদিক থেকে বলতে হয় এ বইয়ের নিতাই, ঠাকুরঝি আর বসন এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে তারা যেন আর উপন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ-নেই, হয়ে উঠেছে আমাদেরই অন্তর্জীবনের সঙ্গী। ভূগোলের মানচিত্রে অট্টহাস নামে কোনো গ্রামের চিহ্ন আছে কিনা জানিনে, ইতিহাসের নথিতে এই মানুষগুলির বাস্তব অস্তিত্ব ছিল কিনা সে প্রশ্নও অবান্তর, কিন্তু আমাদের স্মৃতির মধ্যে এরা অত্যন্তই সজীব, এবং কেবল তাই নয়, আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেও মিশে গেছে এই লোকগুলির জীবন-উপলব্ধি। 'খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁধেল চোরের পুত্র' নিতাই যেন আমাদের চোখের সামনেই সত্যিকারের একজন কবি হয়ে উঠল—যে নাকি বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের ডাকে জয় করে নিয়েছে সকলেরই হৃদয়। তার প্রথম প্রেমাস্পদা ঠাকুরঝির সুখের সংসারে ভাঙন ধরার ভয়ে সে গ্রাম ত্যাগ করেছে, কুৎসিত ব্যাধির আক্রমণে পীড়িত ঝুমুরওয়ালি বসনের সেবা করে সে বলতে গেলে তাকে অন্তরের দিক থেকে নতুন জন্ম দান করেছে, আর বইয়ের শেষ পর্বে সেই যেদিন সে কাশী থেকে গ্রামে ফিরে এসে তার চিরদিনের বিদ্রূপকারী বিপ্রপদ ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ শুনে চোখের জল ফেলেছে সেদিন তার "ওই নীরব বিগলিত অশ্রুধারা এমন একটি অনুচ্ছ্বাসিত প্রশান্ত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল যে (নিতাই)......সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে।"

সেইরকমই জীবন্ত চরিত্র ঠাকুরঝি। রেল লাইনের বাঁকে বহু দূরে শাদা একটি চলন্ত রেখার উপরে 'স্বর্ণবর্ণ বিন্দু' মাথায় নিয়ে সেই যে আবির্ভূত হয়েছিল, তার সে রূপ নিটোল একটি কবিতার চিত্রকল্পের মতো স্থান নিয়েছে আমাদের অবচেতনের গভীরে—আমাদের মৃদু সুকুমার প্রথম প্রেমের ধারণার মধ্যেও আমরা এখন দেখতে পাই সেই "ক্ষারে কাচা তাঁতের মোটা সুতোর খাটো কাপড়-খানি আঁটসাঁট করিয়া পরা...একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে; এবং তাহার মাথায় একটি তকতকে মাজা সোনার বর্ণের পিতলের ঘটী।" ..."হাল্কা কাশফুলের মতে চলিয়াছে...।" অর্থাৎ 'স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল......!' ..."স্বর্ণবিন্দু - বিচ্ছুরিত জ্যোতিরেখাটি মধ্যে মধ্যে এক একটি চকিত চমকে চোখে লাগিয়া চোখ ধাঁধাইয়া দিবে!"

আর বসন? "দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড় বড় চোখ দুইটার সাদা ক্ষেতে যেন ছুরির ধার—সেই শাণিত দীপ্তির মধ্যে কালো দুইটা তারা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। বৈশাখের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের মধ্যে যেন নাচিয়া ফিরিতেছে মধুপ্রমত্ত দুইটা কালো পতঙ্গ—মরণজয়ী দুইটা কালো ভ্রমর।" যে এসেই বলে উঠেছিল—"চা দাও ভাই, মরে গেলাম মাইরি!" "কইহে কোথায় তোমার ওস্তাদ না ফোস্তাদ!" আর সেই যে ঝুমুরের আসরে পরাজিতা হয়ে যেদিন চড় মেরেছিল সে নিতাইয়ের গালে, আর নিতাই ডাকার পর "সে ঘরের ভিতর হইতে নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া ঝলকিয়া উঠিল, ঠিক খাপ হইতে একটানে বাহির হইয়া আসা তলোয়ারের মত। বাহিরের অগ্নিকুণ্ডের আলোর রাঙা আভা পূর্ণদীপ্তিতে তাহার সর্বাঙ্গে যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ঝলকিয়া উঠিল।" অথচ নিতাই যেদিন নিজের হাতে গাঁটছড়া বেঁধে দিল তার সঙ্গে সেদিন মন্দির থেকে ঝুমুরের আস্তানায় ফিরে সকলে যখন তাদের দেখে হুলুধ্বনি দিয়ে হৈচৈ করে উঠল তখন আশ্চর্য, আজন্ম লাজুক নিতাই লজ্জা না পেয়ে হাসতে লাগল, কিন্তু স্বৈরিণী বারবনিতা, "আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, লজ্জা পাইল বসন্ত। গাঁটছড়া বাঁধা নিতাইয়ের কাঁধের চাদরখানা টানিয়া লইয়া সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে 'গয়া ঢুকিল।" বসনের এই সুষমামণ্ডিত রূপান্তর চিরদিন আমাদের মানবপ্রকৃতির অপরিসীম সম্ভাবনার বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত করে রাখে।

কিন্তু এ বইয়ের পার্শ্বচরিত্রগুলিও কম সজীব নয়। বিপ্রপদ ঠাকুর, রাজা বণিক মাতুল থেকে ঝুমুর দলের মাসী, নির্মলার প্রেমিক বেহালাবাদক এমন কি মহিষের মতো দেখতে পাহারাদার লোকটি পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে নিপুণ তুলির টানে!

আর বইখানির আদিঅন্তে ব্যাপ্ত হয়ে আছে বাংলাদেশের মাটির প্রতি সুগভীর আকর্ষণ। সে আকর্ষণ যে কতো তীব্র তা বোঝা যায় কাশীপ্রবাসিনী বিধবা মহিলা 'নতুন মা' যখন কথা বলেন নিতাইয়ের সঙ্গে, যখন তিনি খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন নিতাইকে তার গ্রামের কথা—বাংলাদেশের কথা। ঐ দূরপ্রবাসিনী নারীর প্রশ্নে বাংলাদেশ তার গাছপালা-ফুলফল-মাছ-পাখি এবং সামাজিক রীতি-আচার আনন্দ উৎসব আর জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে। আর তাই তো এই বইয়ের গৃহত্যাগী কবি নিতাই শেষে ফিরে আসে তার নিজের গ্রামে, তার জন্মভূমিতে "তাহার সর্বাঙ্গ...এখানকার ধূলামাটির স্পর্শের" জন্য কাঙাল হয়ে ওঠে; চণ্ডী-তলার মাটিতে "গড়াগড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গে প্রণিপাত" করার সংকল্পে একই সঙ্গে তার এবং আমাদের অর্থাৎ পাঠকেরও জীবনজিজ্ঞাসার রাগিণী যেন শমে ফিরে এসে পরিপূর্ণতা পায়।

উপন্যাসখানি বারবার করে পড়ার মতো। বিশেষ করে আজকের দিনে নকল 'আধুনিকতা'র বিকৃতি যখন মনুষ্যের পতন এবং পরাজয়গুলিকেই পরম সত্য বলে প্রচার করতে চাসছে, তখন জীবনের প্রতি আকুল তৃষ্ণা এবং গভীরতর মানবসত্যের এই প্রতিষ্ঠা আমাদের শিল্প দৃষ্টিকে স্বচ্ছতর করবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কবি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম : ছ টাকা।

স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি ● সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বারটারানড রাসেলের আত্মজীবনীর প্রথম পর্ব এই স্তম্ভে আগে আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং তার মধ্যবর্তীকাল ১৯১৪-১৯৪৪ এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থের সূচনায় রাসেল তাঁর যুদ্ধ-বিরোধী মনোভঙ্গী এবং সেই কারণে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে কি পরিমাণ নির্যাতন ভোগ করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন। এই ক'টি বছরের ক্লেশ আর ক্লান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ, কর্মবিচ্যুতি এবং নিন্দাবাদের মধ্য দিয়ে রাসেল গড়ে উঠেছেন, সুগভীর আত্মপ্রত্যয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর দুর্দমনীয় সাহস এবং নিজস্ব বিশ্বাসমাফিক সত্যকথনের সৎসাহস সুদৃঢ় হয়েছে। 'কনসেনস্যাস অবজেকটার' হিসাবে রাসেলের কারাদণ্ড হয়। কেম্ব্রিজ থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। রাসেল তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে অনেক প্রশস্তি পেয়েছেন অনেক কটূকথাও শুনতে হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের একজন পরম-প্রাজ্ঞ আইনজীবী রাসেলের রচনাকে দুর্নীতিমূলক বলে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বললেন—

> "Lecherous, libidinous, lustful, venerous, erotomaniac aphrodisiac irreverent, narrow-minded,' untruthful and benefit of moral fiber."

আরো কিছু জানা থাকলে হয়ত তাও বলতেন।

রাসেল অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত কিন্তু দার্শনিক রাসেল অঙ্কবিদ রাসেলকে মুছে দিয়েছেন আবার মানব-প্রেমিক রাসেল এবং শান্তিবাদী রাসেল নিজের সমস্ত খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়ে মহত্তো মহীয়ান হয়ে উঠেছেন।

রাসেলের এই আত্মজীবনীকে প্রকাশক বলেছেন রুশোর কনফেস্যানের সমগোত্রীয়। এই গ্রন্থকে 'কনফেসান' বলে চিহ্নিত করা হলে এর মূল্যকে হয়ত একটু লঘু করা হয়। রুশো স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'কনফেস্যানস' বলে এবং সেই সূত্রে তাঁর নিজস্ব যৌন-পিপাসা ও যৌন-অভিজ্ঞতা অতিশয় খোলাখুলিভাবে লিখে-ছেন। রাসেল যৌন-জীবনের কথা লিখেছেন বটে, কিন্তু সেই সব কথা নয়। মানুষ রক্ত-মাংসের দেহধারী সংসারী জীব। তার শরীরে সকল রিপুর আবেগ আছে এবং তার প্রকাশ আছে। সেই মানুষকে দেবতা করে দেখাতে গিয়ে তার জীবনের অন্ধকার দিকটা অনেক সময় রুচিবাগীশ জীবনীকার কিংবা নিজের মহত্ত্ব প্রকাশে সচেষ্ট লেখক অনেক সময় চেপে যান। রাসেল তা করেন নি। তিনি অকপটে সবকিছুই লিখেছেন, কোনো রকম লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। সেই হিসাবে এই আত্মজীবনীকে অবশ্য 'কনফেস্যানস' বলা যায়। যেমন রাসেল প্রথম মহাযুদ্ধের কালে স্বদেশীয়ানার যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তিনি লিখেছেন—

> "The successes of the Germans before the Battle of Marne were horrible to me I desired the defeat of Germany as ardently as any retired Colonel"

কিন্তু এই যন্ত্রণা সত্ত্বেও যুদ্ধ যখন এল, তখন তাঁর মনে হল—

> "I have at times being paralysed by scepticism, at times I have been cynical, at other times indifferent but when the War came I felt as if I heard the voice of God I knew that it was my business to protest however futile protest might be. As a lover of civilization the return to barbarism appalled me"

এই মনোভংগী তাঁর জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। তিনি এই সময় থেকে পাণ্ডিত্য কর্ম ছেড়ে দিয়ে লিখতে সুরু করলেন। মানবিক প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক ধারণা পালটে গেল। তিনি বুঝলেন শুচিবাগীশতার ফলে মানুষের জীবনে সুখ ও শান্তি আসে না। মৃত্যুর মধ্যে বাঁচার মত এক নতুন ধরনের প্রেম তিনি অন্তরে লাভ করলেন। মানুষের মনে যে সুগভীর অশান্তি, যে অশান্তি জ্বালা সৃষ্টি করে তাদের মনে, সেই জ্বালা বিদূরিত করতে হলে প্রয়োজন আনন্দের সঞ্চার করা আর তার দ্বারাই একটা মহৎ জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

এই শান্তিবাদী মানুষটি কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে বিরূপ মনোভংগীর অধিকারী হয়েছিলেন,—তিনি লিখেছেন—

> "I found the Nazis utterly revolting cruel, bigoted and stupid Morally and intellectually alike they were odious to me. Although I clung to my pacifist convictions I did so with increasing difficulty."

প্রথম মহাযুদ্ধের কালে পরাজয়ের কথা মনে জাগেনি, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ১৯৪০-এ যখন ইংলণ্ড আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল, তখন সেই সম্ভাবনার কথা তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হয়েছে এবং অবশেষে সুস্থচিত্তে এবং বহাল তবিয়তে যুদ্ধ সমর্থন করলেন এবং বিজয়ের জন্য যা করণীয় তা করতে দৃঢ়-সংকল্প হলেন—

> "—at last consciously and definitely decided that I must support what was necessary for victory in the Second War, however difficult victory might be to achieve and however painful its consequences"

অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে বেশীর ভাগ কাল তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে এই খণ্ডে বিশেষ বক্তব্য নেই। ১৯৩৮-১৯৪৪ খৃস্টাব্দের কাহিনী অন্য ধরনের যন্ত্রণার কাহিনী। গোঁড়ারা তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত হানবার চেষ্টা করেছে, উৎপীড়নের চেষ্টা করেছে। আমেরিকায় পড়ানো, বক্তৃতাদান প্রভৃতি করার কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের আশংকা ছিল যদি তরুণ মনকে রাসেল কলুষিত করেন। তাঁর বক্তব্য এবং চিন্তা সবই দুর্নীতিমূলক।

রাসেলের এই গ্রন্থটিকে প্রকাশকরা 'কনফেস্যানস' বলেছেন, এই উক্তি নিছক অপপ্রয়োগ বলা যায় না। রাসেল তাঁর বিবাহিত স্ত্রীদের আলোকচিত্র যেমন এই গ্রন্থে দিয়েছেন তেমনিই সেই সঙ্গে দিয়েছেন তাঁর রক্ষিতাদের চিত্র। রীতিমত দুঃসাহস মনে হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাহসিক তাঁর যৌন সম্পর্কের কাহিনী। কিন্তু জীবনে বিভিন্ন রমণীর আসা-যাওয়ার ইতিহাস নিরুত্তাপ ভঙ্গীতে ইতিহাসকারের মত তিনি লিখেছেন, যেমন উক্তি বিবাহিতা স্ত্রী সম্পর্কে ঠিক সেই মন্তব্যই রক্ষিতাদের সম্পর্কে। তারা জীবনের এক দরজা দিয়ে এসেছে অন্য দরজা দিয়ে চলে গেছে। জেল থেকে গোপনে কিভাবে চিঠি দিতেন তার কথা লিখেছেন—

> "Ottoline and Colette used to come alternately—I discovered a method of smuggling out letters by enclosing them in the uncut pages of books—"

ব্যক্তিগত জীবনের এমন অন্তরঙ্গ চিত্র এ যুগে কে আর এঁকেছেন? বিশেষতঃ যাঁরা মহৎ মানুষ তাঁরা ত' একেবারে ভগবানের মত, অর্থাৎ কেবল সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ, কোনো রিপুর বালাই নেই। বার্নার্ড শ'র জীবনে যেমন অনেক রমণী, তেমনিই রাসেলের জীবনেও অনেক রমণী। রমণীরা এসেছে [illegible] কর্ম-বহুল জীবনে। সুগভীর মনীষা তার ফলে

আরো বিকশিত হয়েছে, প্রস্ফুটিত হয়েছে চিত্তবৃত্তির সকল অভিব্যক্তি, রাসেল পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠেছেন।

রাসেল তাঁর মনের অস্বস্তি কাটানোর জন্য রমণীর সন্ধান করেছেন, রমণী সংস্পর্শে মানসিক অবসাদ অতিক্রম করা সম্ভব, একটি মেয়ে পাওয়া গিয়েছিল, তারপর—

> "We talked half the night and in the middle of talk became lovers. There are those who say that one should be prudent, but I do not agree with them. We scarcly knew each other, and yet in that moment began for both of us a relation profoundly serious and profoundly important, sometimes painful, but never trival."

দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে রাসেল কমানিস্ট রাষ্ট্রে ঘুরেছেন। রাশিয়ায় গেছেন, চীনে অধ্যাপনা করেছেন। কয়েকখানি বহুল-প্রচারিত গ্রন্থ এই সময়ে লেখা। নিজের মনোমত পদ্ধতিতে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে একটি ছোটদের পাঠশালাও চালিয়েছেন। রাশিয়া সম্পর্কে রাসেলের বক্তব্য—

> "Cruelty, poverty, suspicion, persecution formed the very air we breathed—"

চীন কিন্তু তাঁর ভালো লেগেছে। চীন দেশের মানুষ সম্পর্কে রাসেল প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এইখানে থাকার সময় একবার গুরুতর অসুস্থতার কালে একটি জাপানী সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই সংবাদ আমেরিকায় ও পরে ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়। রাসেল লিখেছেন—

> "It provided me with the pleasure of reading my obituary notices, which had always desired without expecting my wishes to be fulfilled."

একটা মিশনারি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এক লাইন—

> "Missionaries may be pardoned for heaving asign of relief at the news of Bertrand Russels death. I fear they must have heaved a sigh of different sort when they found that I was not dead after all."

রাসেল মৃত্যুঞ্জয়। আজ একশত বছরের দোরগোড়ায় পৌঁছে তাই তিনি প্রশ্ন করতে পারেন—

> "Why live in such a world? Why even die?"

রাসেলের আত্মজীবনী একালের এক স্মরণীয় গ্রন্থ। *

—অভয়ঙ্কর

---

* **THE AUTOBIOGRAPHY OF BERTRAND RUSSEL: (1914-44) Vol: II: George Allen & Unwin Ltd. 42, Shillings.**

ভারতীয় সাহিত্য

বেজবরুয়ার শতবার্ষিকী

অসমীয়া সাহিত্যিক শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া নতুন ভারতীয় সাহিত্য স্রষ্টাদের অন্যতম। গত ৫ অক্টোবর ছিল তাঁর জন্মশতবার্ষিকী দিবস। সেইদিন আসামে কলকাতা ও ওড়িষার বিভিন্ন স্থানে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্যাপিত হয়। এক বৎসর ধরে বিভিন্নভাবে এই উৎসব উদ্যাপিত হবে। এই উৎসবের একটি অন্যতম আকর্ষণ ছিল ভারতীয় ডাক-বিভাগ কর্তৃক ২০ পয়সা মূল্যের একটি ডাক-টিকিট প্রকাশ। 'অমৃতে' এই সংবাদ এর আগে প্রকাশিত হয়েছে। 'সাহিত্য আকাদমী'ও তাঁর জীবন ও সাহিত্যের উপর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

অসমীয়া সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে তাঁর স্থান নির্ধারিত হয়ে আসছে। 'জোনাকি' পত্রিকাটির মাধ্যমেই নতুন অসমীয়া সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। এই মাসিক পত্রিকাটি ১৮৮৯ খৃঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। কলকাতায় সেই সময়ে যে সমস্ত শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী অসমীয়া ছিলেন, তাঁরাই এই পত্রিকাটি প্রকাশ করে। ডঃ বি বড়ুয়া লিখিত 'অসমীয়া সাহিত্য' নামক গ্রন্থে এই সাহিত্য আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। সেকালের যেসব তরুণ অসমীয়া লেখক এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৮৫৮-১৯৩৮), হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৮৭২-১৯২৮), পদ্মনাথ গোহাঁই বরুয়া (১৮৭১-১৯৪৬) এবং লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। শ্রীবেজবরুয়ার জন্ম হয় ১৮৬৮ সালে এবং তিনি পরলোকগমন করেন ডিব্রুগড়ে ১৯৩৮ সালে। কলকাতার ঠাকুর পরিবারে তিনি বিবাহ করেন। কবিতা, নাটক, ছোটগল্প প্রভৃতি সকল বিভাগেই তাঁর কীর্তি উজ্জ্বল। পরবর্তীকালে আসামের সাহিত্যসম্রাটরূপে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদযাপনের এত আয়োজন। ইদানিংকালের আর কোনও অসমীয়া লেখকের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব এত আড়ম্বরের সংগে পালিত হয়নি।

বেজবরুয়ার জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠানটি হয় জোড়হাটে। এতে পৌরোহিত্য করেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি পি চালিহা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশংকর রায়। স্মারক ডাক-টিকিট এই অনুষ্ঠানেই আসামের পোস্টমাস্টার জেনারেল প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা বলেন—'লক্ষ্মীনাথ কেবলমাত্র আসামের নিষ্প্রাণ সাহিত্য-প্রবাহে গতিবেগই সঞ্চার করেননি, তিনি নব আসামেরও অন্যতম স্রষ্টা।' প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীঅন্নদাশংকর রায় বলেন 'লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী। গল্প, কবিতা বা নাটকে এরকম বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শন খুব কমই দেখা যায়। ২০ বৎসর থেকে আরম্ভ করে ৭০ বৎসর অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু সময় পর্যন্ত তিনি সমান দক্ষতার সংগে সাহিত্য রচনা করে গেছেন। এটাও তাঁর দুর্লভ কৃতিত্ব। কেননা, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রথম জীবনের সাহিত্য-উদ্দামতা শেষজীবনে অনেকটা নিষ্প্রাণ হয়ে আসে। বেজবরুয়া ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।'

গৌহাটিতে এই শতবার্ষিকী উৎসব উদ্যাপন উপলক্ষে 'আসাম সাহিত্য সভার' পতাকা উত্তোলিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন আসামের প্রখ্যাত কবি শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী। এর পর বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। ওড়িশার সম্বলপুরেও একটি অনুষ্ঠানে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানে বেজবরুয়া দীর্ঘদিন বসবাস করেছিলেন। কলকাতার প্রবাসী অসমীয়ারাও একটি অনুষ্ঠানে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

নেপালী কবি ভানুভক্তের মৃত্যু-বার্ষিকী ॥

নেপালি সাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ভানুভক্ত। নেপালি সাহিত্য সমালোচকদের অনেকের মতে তিনিই সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ছিল তাঁর মৃত্যুশত-বার্ষিকী দিবস। এই উপলক্ষে আকাশবাণীর কার্শিয়াং কেন্দ্র একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'নেপালি লোকগীতি সংস্থা' কবির জীবনী অবলম্বনে একটি গীতিনাট্য অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন। ভানুভক্ত নেপালি ভাষায় প্রথম রামায়ণের অনুবাদ করেন। অনুষ্ঠানে তাঁর অনূদিত

রামায়ণ থেকেও বহু অংশ পড়ে শোনান হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ বছরের 'ত্রিভুবন পুরস্কার' বিজয়ী প্রখ্যাত নেপালি সমালোচক শ্রীপরশমণি প্রধান। তিনি নেপালি সাহিত্যের অগ্রগতিতে ভানুভক্তের অবদান সম্বন্ধে ভাষণ দেন। নেপালের বিভিন্ন উপভাষাকে একটি কেন্দ্রীয় ভাষায় রূপান্তরের ভূমিকায় ভানুভক্তের অবদান অপরিসীম। সভায় বহু নেপালি লেখক, সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট গুণীজনের সমাবেশ ঘটেছিল। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় অ্যালফনসাস স্কুল হলে। কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী নেপালি সংগীতও অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন।

দুর্ভিক্ষ ত্রাণে রাজস্থানের কবি-সমাজ॥

রাজস্থানের পাঁচজন কবি রাজস্থানের দুর্ভিক্ষ এবং খরা ত্রাণের জন্য এগিয়ে এসেছেন। এ পর্যন্ত তাঁরা দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন। এই পাঁচজনের মধ্যে আবার একজন জয়পুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর সাম্প্রতিক কবিতাগ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই তিনি এই তহবিলে দান করবেন। এ ছাড়াও কবিরা ঠিক করেছেন, তাঁরা সমস্ত রাজ্যব্যাপী টাকা সংগ্রহ করে বেড়াবেন। কোনও কোনও স্থানে জনসভার আয়োজন করে সেখানে তাঁরা তাঁদের কবিতা পাঠ করবেন এবং সেখান থেকে অর্থ সংগ্রহ করবেন। এর জন্য তাঁদের যা যাতায়াত খরচ হবে, তার জন্য তাঁরা সংগৃহীত অর্থ থেকে এক পয়সাও গ্রহণ করবেন না। কবিদের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

বিদেশী সাহিত্য

বেতার-নাটকের সাহিত্যমূল্য॥

পশ্চিম জার্মানীর কলোন বেতার-কেন্দ্রের শিল্প-পরিচালক ক্লস ভন বিসমার্ক বেতার নাটকের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে একটি সুন্দর ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রচলিত পথ ও পদ্ধতিকে মেনে বেতার নাটক লেখা সম্ভব নয়। সর্বদাই কিছু না কিছু পরিবর্তনের কথা নাট্যকারদের ভাবতে হয়। কাহিনীনির্মাণ, চরিত্রের উপস্থাপন, ঘটনার বিন্যাস প্রভৃতি ব্যাপারে নতুন ভাবনার যোগান দেয় বেতার নাটকগুলি।

কলোন বেতার এই জন্যে পরীক্ষামূলক নতুন ধরণের নাটক প্রচারের অধিকতর পক্ষপাতী। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি বিশেষ প্রচারসংস্থাও করেছেন। জুরগেন বেকার এর বিশেষ ভাষণসহ একটি ধারাবাহিক নাট্যপ্রদর্শনীর সূত্রপাত হয়েছে সম্প্রতি। আধুনিক সাহিত্যের সংগে বেতার নাটকের সম্পর্ক এবং সাদৃশ্য নির্ণয় করাও এই পরিকল্পনার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

পর্যটকদের জন্য অভিধান॥

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নানাভাবে পর্যটকদের আহ্বান জানিয়ে থাকে। তাঁদের সুখ-সুবিধার জন্যে যেমন নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, তেমনি লক্ষ্য রাখতে হয় সেই দেশ সম্পর্কে বিদেশীদের সহজ পরিচয় স্থাপনের ব্যাপারে। সম্প্রতি ইতালী থেকে একটি বই বেরিয়েছে পর্যটকদের জন্যে। বইটির নাম 'প্র্যাকটিক্যাল ডিকসনারী ফর টুরিস্টস'।

এই অভিধানে রয়েছে এমন বহু শব্দ—যার একাধিক অর্থ হতে পারে। প্রায় একই প্রকার বানান হওয়া সত্ত্বেও এমন শব্দ আছে যার উচ্চারণ স্বতন্ত্র এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশে যে-অর্থে তা ব্যবহৃত—ইতালীতে তুই অন্য অর্থ নির্দেশ করে। পর্যটকরা যাতে এদেশে এসে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে না পেরে কিংবা ভুল অর্থ গ্রহণ করে বিভ্রান্তিতে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যই এই অভিধান লেখা হয়েছে।

বিশেষত অঞ্চলবিশেষে এক ইতালীতেই প্রায়সমোচ্চারিত বহু শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে একটি শব্দের কথা বলা যায়। শব্দটি হলো 'আভানা'। উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে এটিকে 'হাভানা'র মতো মনে হয়। কোন একজন পর্যটক যদি শব্দটি শুনে হাভানা চুরুটের কথা ভাবেন—তাহলে তাকে বিপদগ্রস্থ হতে হবে। এটি কিউবান রাজধানীর নামও নয়; ইতালীয় অর্থে একটি রং-এর নাম।

এমনি ধরণের আরো বহু মজাদার উদাহরণ আছে বইটিতে। বিদেশী পর্যটকরা বইটি পড়ে যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি লেখার বৈশিষ্ট্যে পড়ে খুব মজা পাবেন।

পরলোকে হ্যারি বার্নস॥

সম্প্রতি হ্যারি ই বার্নস পরলোকগমন করেছেন উনাশি বছর বয়সে। ১৯২০ এবং তিরিশের দশকে তিনি য়ুরোপীয় সমাজ ও সাহিত্য মহলে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন। রাজনীতি, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের ওপর বহু মৌলিক গ্রন্থের তিনি গ্রন্থকার। সমকালীন প্রায় প্রতিটি মানুষ তাঁকে নিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ১৯২৬ সালে বার্নস অভিযোগ করেন, জার্মানরাই প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী। কিন্তু তার দু-বছর পরেই তিনি অর্ধবর্বর হিব্রু জনসাধারণের দ্বারা ধর্মীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন।

ভাগ্য-বিড়ম্বিত টমসন॥

'দি হাউন্ড অব হেভেন' নামে একটি বই লিখে ফ্রান্সিস টমসন এককালে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। জীবন সম্পর্কে তিনি ছিলেন বেপরোয়া এবং অস্থির। সম্প্রতি জন ওয়াল্স 'স্ট্রেঞ্জ হার্প, স্ট্রেঞ্জ সিমফনি' নামে তাঁর একটি জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। এই গ্রন্থে টমসন সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য ও চমকপ্রদ খবর দেওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সিস টমসন ছিলেন একজন ভাগ্য-বিড়ম্বিত পুরুষ। একজন ক্যাথলিক পাদ্রি হিসেবে তাঁর জীবন শুরু হয়। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ বা মোহ তাঁর আদৌ ছিল না। এই সময়ে তিনি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতেন। এবং শেষ পর্যন্ত এই কবিতার আকর্ষণেই তিনি সব ছাড়লেন। জাগতিক প্রতিষ্ঠা এবং পারলৌকিক কল্যাণের কোনো প্রলোভনকেই কবিতার চেয়ে অধিকতর প্রিয় মনে হয়নি তাঁর।

তবু কবিতা তাঁকে সুখী করেনি। মানুষের ভালোবাসায় আস্থাহীন না হলেও তাকেই একান্ত চরম বলে মনে হয়নি তাঁর। সর্বদাই একটা অতৃপ্তি তাঁকে নিরন্তর বিচলিত করে রেখেছিল।

অবশেষে প্রচুর মদ্যপান শুরু করেন টমসন। নেশার ব্যাপারে কোনোপ্রকার বাদ-বিচারও ছিল না। মদের সংগে আফিং-এর নেশায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। আট-চল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন অত্যধিক আফিং খেয়ে।

মৃত্যুর আগে সমকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। নানাপ্রকার ক্ষোভ ও অভিমান এই সময়ে তাঁর মনে জমে ওঠে। তখন তিনি বিশ্বাস করতেন, এই সমাজে কবিদের উপযুক্ত জায়গা নেই। কেউ তাঁদের তেমন মর্যাদা দেয় না, সম্মান দেয় না। এই দুঃখবোধ তাঁকে আরো বিচলিত করে তুলেছিল।

আসলে সমাজের সংগে তিনি কোনো আপোষরফা করতে পারেননি। মানুষের অনিশ্চয়তা, অসংগতি ও কপটাচার তাঁকে ভয়ানক ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

এখনো তাঁর বহু কবিতা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।

শারদ সংকলন

সুখী মন—সম্পাদক : অসীম বর্ধন। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস। ৫৫-১, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম দু টাকা।

নতুন ধরণের পত্রিকা সুখী মন। শারদীয় সংখ্যায় একটি নতুন ধরণের বই লিখেছেন অসীম বর্ধন। ডঃ চেস্যারের আন ম্যারেড লাভ অবলম্বনে রচিত 'বিয়ের আগে ভালোবাসা'য় শ্রীবর্ধন সামাজিক মানসিক নৈতিক বিষয়ের ওপর যে সহানুভূতিপূর্ণ যুক্তিতীক্ষ্ণ আলোচনা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে সমাদৃত হবে। একটি উপন্যাস লিখেছেন সুখেন্দু সরকার।

●

অরণি—সম্পাদক : অরবিন্দ ঘোষ। ১৯৩, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া-৪; দাম এক টাকা কুড়ি পয়সা।

গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখেছেন গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অনন্ত দাশ, তপন দাশ, শংকর দে, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ দাশ, নচিকেতা ভরদ্বাজ এবং আরো অনেকে।

●

মাটি ও মানুষ—সম্পাদক : শশধর রায়। সতীন্দ্র ভবন। নবপল্লী। বারাসাত। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লিখেছেন ইন্দিরা গান্ধী, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শংকর চট্টোপাধ্যায়, প্রলয় শূর, দেবী রায়, তপন দাশ, প্রদোষ দত্ত, অঞ্জন কর এবং আরো অনেকে।

●

প্রগতি—সম্পাদক : মৃণাল চট্টোপাধ্যায়। ৩৯বি, ডেন্ট মিশন রোড, কলকাতা-২৯। আড়াই টাকা।

লিখেছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র পাল, শক্তিপদ রাজগুরু, সত্যজিৎ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপাল ভৌমিক, দুর্গাদাস সরকার এবং আরো কয়েকজন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।

●

পিপাসা—সম্পাদক : সামসুল আলম সরকার ও বিশ্বনাথ ঘোষ; ২৬, তালতলা লেন, কলকাতা-১৬, দাম : এক টাকা।

পিপাসার শারদ সংকলনে লিখেছেন [illegible]রঞ্জন বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, গণেশ বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, হরেন ঘটক, শেখর চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শান্তিকুমার ঘোষ, শংকর দে এবং আরো অনেকে।

●

কবিতা—সম্পাদক : সুপ্রিয় বাগচী, ডালগিস হাউস, কলকাতা-৪৭, দাম : ষাট পয়সা।

বর্তমান সংকলনে লিখেছেন বিষ্ণু দে, সুশীল রায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অরুণকুমার সরকার, শংকর চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, তারাপদ রায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, প্রফুল্লকুমার দত্ত, মানস রায়চৌধুরী, রত্নেশ্বর হাজরা, রবীন্দ্র গুহ, নারায়ণ বাগচী, আলোক সরকার, রীণা ঘোষ, সুপ্রিয় বাগচী এবং আরো অনেকে।

●

বীক্ষণ—সম্পাদক : মৃণাল দেব, বীক্ষণ প্রকাশ ভবন, ১বি অভয় সাহা লেন, কলকাতা তিন, দাম এক টাকা।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও আলোচনা নিয়ে বীক্ষণের শারদ-সংখ্যা প্রকাশিত। লিখেছেন অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, মৃণাল দেব, শংকর দে, দেবীপদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র দত্ত, পবিত্র [illegible], দীনেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্রোণাচার্য ঘোষ, শ্যামসুন্দর দত্ত, নিশীথ ভড়, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, রঞ্জিতকুমার লোধ।

●

কৈশোর—সম্পাদক : নির্মল ধর, ১২।৩, বাজে শিবপুর ২য় বাই লেন, হাওড়া-২, দাম : এক টাকা।

কৈশোরের বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ ভট্টাচার্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আশিস সান্যাল, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ধর এবং আরো অনেকে।

●

বর্ধমান—সম্পাদক : সুবীরচন্দ্র দাঁ। বি সি রোড। বর্ধমান। দাম : দু' টাকা।

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত শারদীয় বর্ধমানের এই সুবৃহৎ সংখ্যাটিতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, কাবগান এবং বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, মনোজিৎ বসু, অজিতকৃষ্ণ বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, কালীপদ ঘটক, রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শক্তিপদ রাজগুরু, আলোক সরকার, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় এবং আরো অনেকে।

●

চন্দ্রভাগা—সম্পাদক : রমানাথ সিংহ। সিউড়ী। বীরভূম। দাম তিন টাকা।

সিউড়ি থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত সাপ্তাহিক চন্দ্রভাগার শারদীয় সংখ্যাটি বেশ সুসম্পাদিত। কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু মিত্র, অরুণকুমার মজুমদার, গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। উপন্যাস, কবিতা এবং গল্প লিখেছেন রাধাদামোদর মিত্র, কিশোরীরঞ্জন দাশ, লীনা দত্তগুপ্তা, গঙ্গাধর দাস, স্বাধীন গুপ্ত এবং আরো কয়েকজন।

●

আশ্চর্য—সম্পাদক : আকাশ সেন। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস্। ৫৫-১, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম দু টাকা।

সায়ান্স ফিকশ্যান ও ফ্যানটাসির মাসিক পত্রিকা আশ্চর্যের শারদীয় সংখ্যায় দুটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন অদ্রীশ বর্ধন এবং গুরনেক সিং। বিচিত্র স্বাদের কয়েকটি গল্প লিখেছেন পরিমল গোস্বামী, লীলা মজুমদার, শ্রীধর সেনাপতি, বিশু দাস, আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য, উপেন মান্না, বীথিকা ঘোষ, অমিতাভ রক্ষিত।

●

শিবম—সম্পাদক : শচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য এবং কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১, মহেশ চৌধুরী লেন, কলকাতা-২৫। দাম দু টাকা।

ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি ধর্মপিপাসু মানুষ মাত্রেরই ভাল লাগবে।

●

লেখা ও রেখা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। ১২।১সি পাইকপাড়া রো। কলকাতা-৩৭। দাম দু টাকা।

কবিতা, ছোট গল্প, প্রবন্ধ লিখেছেন, মণীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মানস রায়চৌধুরী, রত্নেশ্বর হাজরা, সত্য গুহ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ

মুস্তাফা সিরাজ, অমল দাশগুপ্ত, অশোককুমার সেনগুপ্ত, অরুণকুমার রায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, নেপাল মজুমদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অশ্রুকুমার শিকদার এবং আরো অনেকে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সজল রায়, শীতেশ রায়ের স্কেচ আছে।

●

অধুনা আশ্বিন ১৩৭৫। সম্পাদক : সুধাঙ্কুর মুখোপাধ্যায় হালিশহর। ২৪ পরগণা। পঞ্চাশ পয়সা।

লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, সত্য গুহ, রত্নেশ্বর হাজরা, দীপেন রায়, প্রভাত চৌধুরী, নীহার গুহ, ধার্নিক রায় এবং আরো কয়েকজন তরুণ লেখক।

●

তরুণের অভিযান শারদীয় ১৩৭৫। সম্পাদক: পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী এবং সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়। ১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড কলকাতা-২০। দাম দেড় টাকা।

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা খেলাধুলো, চলচ্চিত্র প্রভৃতির সমাবেশে তরুণের অভিযান পত্রিকাটি বেশ আকর্ষণীয়। অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পারিপাট্য বেশ সুরুচিসম্মত।

●

ছন্দিতা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৫। সম্পাদক: গৌরাঙ্গগোপাল দাশ। ৫৯ রবীন্দ্রনগর। কলকাতা-১৮।

খ্যাত অখ্যাত লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে ছন্দিতার শারদীয় সংখ্যা।

●

সারস্বত শারদীয় ১৩৭৫। সম্পাদক: অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬ বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম দেড় টাকা।

সারস্বতের শারদীয় সংখ্যায় প্রবন্ধ গল্প, কবিতা লিখেছেন অমূল্যচন্দ্র সেন, বিনয় দত্ত, সমর ভৌমিক, নেপাল মজুমদার, অজিত মুখোপাধ্যায়, অবন্তীকুমার সান্যাল, সত্যপ্রিয় ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, চিত্ত ঘোষ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, গণেশ বসু, জয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্য নিদর্শন সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

●

ক্রান্তি জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৮। সম্পাদক: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৮বি কলেজ রো। কলকাতা-৯।

কার্ল মার্কস সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ এবং কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ক্রান্তির এই বিশেষ সংখ্যায়।

শারদীয় প্রবাহ। সম্পাদক বিনয় চৌধুরী। ৭।৪, বনমালী ঘোষাল লেন, কলকাতা ৩৪ ।। দু-টাকা।

প্রবাহের শারদীয়া সংখ্যায় গল্প-উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা লিখেছেন বিনয় চৌধুরী, নিতাই মুখোপাধ্যায়, জয়দেব চট্টোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, গণেশ লালওয়ানি, নারায়ণ চৌধুরী, রবি মিত্র, আশুতোষ ভট্টাচার্য, চিত্ত ঘোষ, মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী এবং আরো কয়েকজন। ছাপা, বাঁধাই সুরুচিসম্মত।

●

পরিচয় শারদীয় সংখ্যা। সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ সান্যাল। ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৭। দাম আড়াই টাকা।

লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, অন্নদাশংকর রায়, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, জ্যোতি দাশগুপ্ত, শংকর চক্রবর্তী, শান্তিময় রায়, হিরণকুমার সান্যাল, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, রাম বসু, অসীম রায়, কৃষ্ণধর, সিদ্ধেশ্বর সেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, গণেশ বসু, রত্নেশ্বর হাজরা, তুলসী মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, অমল দাশগুপ্ত, মিহির সেন, অমলেন্দু চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজন। একটি নাটক লিখেছেন উমানাথ ভট্টাচার্য। গল্প কবিতা প্রবন্ধের নির্বাচনে পরিচয়ের প্রাচীন ঐতিহ্য বর্তমান সংখ্যায় অনেকটা স্পষ্ট।

●

মননী। সম্পাদক অমরনাথ ভট্টাচার্য। ১০ বিন্ধ্যবাসিনীতলা রোড। কলকাতা—৫৭। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

লিখেছেন শক্তিপদ রাজগুরু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শংকর চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ এবং আরো কয়েকজন।

●

মানবমন। সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১এ বিধান সরণী। কলকাতা—৪। দাম আড়াই টাকা।

মনস্তত্ত্বের মাসিক পত্রিকা মানবমনের বিশেষ অক্টোবর সংখ্যায় লিখেছেন রাজেন্দ্রকুমার পাল, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, মার্ক মিতিন, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, বিভুরঞ্জন গুহ, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

●

আশ্বিন। সংকলন চিত্ত ভট্টাচার্য। পিলখানা রোড। বর্ধমান। দাম এক টাকা।

লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, নরেশ গুহ, নন্দনগোপাল সেনগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রত্নেশ্বর হাজরা, শিবশম্ভু সান্যাল, তরুণ সান্যাল এবং আরো অনেকে।

●

প্রবাহ। সম্পাদক : যশোদাজীবন ভট্টাচার্য এবং পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। প্রবাহ সাহিত্য সংসদ। মনাইট্যান্ড। ধানবাদ। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শারদীয় সংখ্যা প্রবাহে লিখেছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক, কালিদাস রায়, সুভাষচন্দ্র সরকার, সত্যেন্দ্র আচার্য, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শুদ্ধশত্ত্ব বসু, দুর্গাদাস সরকার, তরুণ সান্যাল, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুবুদ্ধ ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন।

●

বহুরূপী। সম্পাদক: গঙ্গাপদ বসু। ১১এ নাসিরুদ্দিন রোড। কলকাতা-১৭। দাম তিন টাকা।

নাট্য ষান্মাসিক বহুরূপীর বিশেষ লোকনাথ ভট্টাচার্য, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। সুশান্ত বসু, পবিত্র সরকার, সতু সেন, খালেদ চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, ইন্দ্র উপাধ্যায় লিখেছেন প্রবন্ধ।

●

শারদীয়া গণবার্তা। সম্পাদক : সুখময় চক্রবর্তী। ৩৭ রিপণ স্ট্রীট। কলকাতা—১৬। দাম একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

তারাপদ লাহিড়ী, প্রিয়তোষ মৈত্রেয়, সনাতন রায়, সুনীল সেনগুপ্ত, রামকৃষ্ণ পাঠক, মাখন পাল, ত্রিদিব চৌধুরী, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, ঘোষ, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, মানস রায়চৌধুরী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন গল্প, প্রবন্ধ এবং কবিতা।

●

সাময়িকী। সম্পাদক : মিহির রায়চৌধুরী ও সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪এফ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা—৯। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

মণীন্দ্র রায়, সুশীল রায়, মানস রায়চৌধুরী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, শংকর চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বেলা চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা দেবী এবং আরো কয়েকজন কবিতা লিখেছেন।

●

মল্লার শারদীয় সংকলন। সম্পাদক : পুলক দাশগুপ্ত। ১১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কলকাতা—৫০। দাম—চল্লিশ পয়সা।

লিখেছেন দেবব্রত ভট্টাচার্য, সৈয়দ আবুল হুদা, অতনু গুপ্ত, প্রদীপ সেনগুপ্ত, কানাই কুণ্ডু, শোভনকুমার মজুমদার, অমলকান্তি ভট্টাচার্য, মানবশংকর ঘোষ, পুলক দাশগুপ্ত।

শারদীয় লিটল ম্যাগাজিন

পুজো শেষ হয়েছে। কিন্তু পুজোর মরশুম যায় নি এখনো। কালিপুজো, ভাইফোঁটা, জগদ্ধাত্রীপুজো শেষ হলে এবারের মতো পালা শেষ। পুজোর স্মৃতি ফিকে হয়ে আসছে ক্রমশঃ। রাত্রিশেষের কুয়াশা এবং শিশির ঘন হয়ে এলে হেমন্তের আমেজ ছড়িয়ে পড়বে দেহে মনে। চারদিকে খেলা করবে পাকা ধানের মতো হলুদ আভা। এখন প্রেসের ব্যস্ততা, সম্পাদকের উদ্বেগ, ও লেখকের তৎপরতায় ভাঁটা পড়েছে। সকলেই ক্লান্ত। গত কয়েকমাসের উৎসাহ উদ্দীপনা এখন আর নেই। লেখকেরা লিখে যাচ্ছিলেন অবিরাম। অসুস্থ হবার সময় ছিলো না প্রেসের কম্পোজিটারদের। নাওয়া-খাওয়ার সময় ছিলো না সম্পাদক ও তাঁর সহকারীদের।

এখন উপভোগের কাল। সকলেই হিসেব-নিকেশ করছেন, স্বপ্ন ও জাগরণের দিনগুলি কেমনভাবে কাটলো। লেখকেরাও সালতামামি করছেন, কি লেখা হলো? কত লেখা হলো? কি-ই বা এর সার্থকতা? ইত্যাদি। রাশি রাশি ছাপানো কাগজপত্রের মধ্যে বাংলা কাব্যসাহিত্যের বৎসরান্তিক উৎসব শেষ হলো। এখন বিজয়ার আদান-প্রদান চলছে চতুর্দিকে।

মাস দেড়েক আগে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। ভদ্রলোকের কথা বলার সময় ছিলো না। চোখ মুখ উদ্‌ভ্রান্ত। মাথার চুল উসকুখুসকো। বললাম, কোথায় যাবেন। বাসের পাদানিতে পা রেখে বললেন, প্রেস। যে কোনো রকমে কাগজ বের করতে হবে মহালয়ার আগে। কফি হাউসে এসে দেখি, আরেক বন্ধু বসে আছেন বিরস মুখে। তিনিও একটি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। একটি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললেন, এবার বোধহয় কাগজ বের করা হলো না। বিজ্ঞাপন পাইনি একটিও। কাঁহাতক আর লোকসান দেওয়া যায়!

পরে দেখলাম, বিজ্ঞাপন ছাড়াই তিনি কাগজ বের করেছেন। বোধহয়, বের করতে না পারলে তাঁর যন্ত্রণা দ্বিগুণ হতো। সারা বছর চুপচাপ থাকলেও পুজোর সময় কাগজ বেরোবে না, এটা ভাবতেও ভারি কষ্ট হয়!

এটা কেবল এ বছরের ছবি নয়। প্রত্যেক বছরেরই এক চেহারা। বড় বড় দৈনিক সাপ্তাহিকের পুজো সংখ্যা প্রকাশের তোড়জোড় চলার আগেই শুরু হয়ে যায় লিটল ম্যাগাজিনের জল্পনা-কল্পনা। পুজোর রসিদ বই ছাপার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এই ব্যাপারে। একটি পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও পুজো সুভেনীর প্রকাশ করা চাই। কেউ লেগে যায় লেখা সংগ্রহের কাজে, কেউবা সংগ্রহ করে বিজ্ঞাপন। মোটামুটি কিছু সাহিত্যচর্চা না করলে যেন পুজোর আনন্দই মাটি হয়ে যাবে এমনি ধরনের উদ্বেগ সর্বত্র। বাংলাদেশে শরতের সঙ্গে সাহিত্যের কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে মনে হয়।

অবশ্য, ইদানীং বাংলাদেশে শরৎ আসে পঞ্জিকার নির্দেশকে মান্য করে। অফিসের কনিষ্ঠ কেরানীরাও ক্যালেন্ডারের পাতা দেখেই বলতে পারেন, এটা কোন ঋতু, কোন মাস। শরতে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ দেখা যায় খুব কম সময়েই। কিন্তু পুজোর আগে পুজো সংখ্যা তারই আগমনী ঘোষণা করে। টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যে কোনো বড় রাস্তার মোড়ে এলেই সে সত্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রং বেরংয়ের মলাট দেওয়া শারদীয়া সংখ্যায় হেসে ওঠে প্রাক্‌-পুজোর দিনগুলি। ভদ্র গৃহস্থেরাও অন্যান্য শৌখীন জিনিষ কেনার ফাঁকে হঠাৎ করে কিনে ফেলেন দু-একটা শারদীয়া সংখ্যা। যে-সকল বাড়িতে সারা বছর সাময়িকীর প্রবেশ নিষিদ্ধ—সেসব পরিবারে পর্যন্ত এ সময়ে কোন কোন পুজো সংখ্যা সসম্মানে ঢুকে পড়ে খোদ মালিকের প্রশ্রয় পেয়ে।

স্মরণ করুন, এ সময়ে হাওড়া-শিয়ালদা স্টেশনের অবস্থাটা। রিজার্ভেশন পাওয়া গেল না। কুছপরোয়া নেই। কোথাও না কোথাও যেতে হবে। দীর্ঘ শহরবাসের পর সকলেই কিছুটা মুক্তি চায়। কেউ যেতে চায় সমুদ্রের ধারে, কেউবা পাহাড়ী এলাকায়। কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গেই থাকা চাই একটি পুজো সংখ্যা। রেলগাড়িতে শুয়ে বসে নিদ্রা ও জাগরণের অবকাশে দু'একটা ছবির দিকে চোখবোলানো কিংবা কয়েকটা গল্প-উপন্যাস পড়ার বিলাসিতা এ সময়েই মানায়। ছুটি ফুরোলেই আবার দশটা পাঁচটার একঘেয়েমি। এখন খানিকটা অবসর। ছুটির সঙ্গে কোথায় যেন শারদীয় সাহিত্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

ছোট ছেলেমেয়েরাও এখন এই সার্বজনীন আনন্দ থেকে বঞ্চিত নয়। গত কয়েক বছরে ছোটদের পত্রিকার সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে বার্ষিকী প্রকাশের উদ্যম। এসময়ে নানাপ্রকার গল্প সংকলন, রূপকথা-উপকথার কাহিনী প্রভৃতিও প্রকাশিত হয় ছোটদের জন্যে। ছোটরা এসব বই পড়ে যেমন আনন্দ পায়, তেমনি খুশি হন বড়রা এসব বার্ষিকী উপহার দিয়ে।

এসময়ে সবচাইতে বেশি টানাটানি পড়ে গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের নিয়ে। তুলনামূলকভাবে কবিদের কিছুটা হতাদর হলেও একেবারে উপেক্ষিত নন তাঁরা। প্রথম ও মধ্যম শ্রেণীর কবিদের আহ্বান আসে প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে কবিতা লেখার জন্য বহু পত্রিকা থেকে। একেকজন কবি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বেশ কয়েকটি পাতা ভরাট করার মতো কবিতা লেখেন। অনেককে পঞ্চাশ ষাট পৃষ্ঠার মতো কবিতা লিখে ফেলতে হয়। কিন্তু গল্পকার এবং ঔপন্যাসিকদের দায়িত্ব এ ব্যাপারে অনেক গুরুতর। দুশো থেকে পাঁচ সাতশো পাতার মতো গদ্য লেখা লিখতে না পারলে তাঁদের অব্যাহতি নেই। লিটল ম্যাগাজিনগুলো সাধারণত পয়সা দিতে পারে না,

কিন্তু কমার্সিয়াল ও আধা কমার্সিয়াল কাগজগুলোতে গল্পের জন্য অর্থের প্রলোভন আছে। এই তো সময়। তারপর সারা বছর তো কেবল একটানা ভাটার টান।

বড় ধরনের ব্যবসায়িক কাগজগুলোর বাইরে সবচাইতে বাড়বাড়ন্ত পুজো-সাহিত্যের ব্যবসা করেন সিনেমা ও যৌন-সংক্রান্ত পত্রপত্রিকাগুলো। পুজোর প্রায় একমাস আগে থেকেই এ জাতীয় পত্রিকাগুলো স্টলের সৌন্দর্যবর্ধন ও পাঠকের চিত্তকে প্রফুল্ল করে রাখে। বিশেষত গত দু-তিন বছর ধরে দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকাগুলোর চাহিদা ভয়ানকরকম বেড়ে গেছে। কোনো কোনো সাহিত্যপত্রিকাও এর মধ্যে প্রচ্ছদে আদিম চিত্রকলার নিদর্শন এবং ভেতরে যৌনজিজ্ঞাসার নতুন ফিচার খুলতে বাধ্য হয়েছে। তবে একটি সুলক্ষণ হলো, এ জাতীয় কাগজগুলো এখন আর নিতান্ত বিষয়সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে পারছে না। সাহিত্যের প্রতি তাদের গভীর আকর্ষণ থাক আর না থাক, পাঠক-রুচির প্রতি লক্ষ্য আছে। সেইজন্যেই জনপ্রিয় ফিচার, রম্যরচনা, সংবাদ ও চিত্রকাহিনীর সঙ্গে নামী লেখকের গল্প-উপন্যাস না হলে এদের চলে না। তাছাড়া যেসব ভদ্রলোক এসব পত্র-পত্রিকা গাটের পয়সা দিয়ে কেনেন, তাঁদের নিজের দিক থেকেও একটি জবাব দেবার মতো অজুহাত সৃষ্টি করে এসব নামী লেখকের লেখাগুলি। যেন তাঁরা গল্প-উপন্যাসগুলিই পড়ার জন্যে পত্রিকাটি কেনেন, ছবি কিংবা যৌন অ্যালবাম দেখার জন্যে নয়। অবশ্য এটাও ঠিক, ত্রিরিশ চল্লিশ ফর্মার একটি শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করতে হলে ভরাট করার মতো উপযুক্ত লেখা চাই। সিনেমা তারকাদের অঙ্গসৌন্দর্য ও কেচ্ছাকাহিনী প্রকাশ করে এতো পাতা ভর্তি করা যায় না নিশ্চয়ই।

সেজন্যেই টানাটানি পড়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের নিয়ে। একটা উপন্যাস চাই, নিদেনপক্ষে একটা বড় গল্প, যাকে উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। এই প্রবণতাটি দেখা দিয়েছে কয়েক বছর আগে। এবারেও সমান উৎসাহে সম্পাদকেরা চার পাঁচশো পাতার মধ্যে প্রায় আধ ডজন উপন্যাস, এক ডজন ছোটগল্প, আকর্ষণীয় রম্যরচনা ব্যক্তিগত কেচ্ছাকাহিনী এবং দেশীবিদেশী সাহিত্যের রোমাঞ্চকর সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

বাংলাদেশে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের সংখ্যা বেশি নয়। সেজন্যে প্রায় প্রতিটি বড় এবং মাঝারি ধরনের পত্রিকাতে তাঁদের উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাঁদের যে-কোন ধরনের একটি লেখা ছাপতে না পারলে পত্রিকার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। তাই অর্থের ও জনপ্রিয়তার সুবাদে তাঁদের এককেকজনকে লিখতে হয় অনেক। সাবধানী লেখকেরা অবশ্য সেজন্য পূর্বাহ্নেই কিছু গল্প-উপন্যাস জমা করে রাখেন পুজো-বাজারের জন্যে।

কিন্তু স্বীকার করতে হবে, এই সাহিত্য-উৎসবের নেতৃত্ব যারই করুক, তার উৎস-কেন্দ্র কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনগুলো। বড় কাগজগুলো আয়োজন যথেষ্ট করলেও শারদীয় সাহিত্যের প্রকৃত উদ্বোধন করে লিটল ম্যাগাজিনগুলো। অবশ্য আকারে আয়তনে এসব কাগজ প্রায় চোখে না পড়ার মতোই। প্রচ্ছদেও প্রায়ই পরিপাটিহীন।

কিন্তু এসব কাগজ বের করেন কারা? একটু খোঁজ নিলেই দেখা যায়, তাঁদের অধিকাংশই বিত্তহীন সাহিত্যরসিক, তরুণ বয়সী ছাত্র কিংবা স্কুলকলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপক। অবশ্য অন্যান্য শ্রেণীর মানুষও আছেন। তবে প্রায় সকলেই বয়সের দিক থেকে কিশোর, যুবক কিংবা মধ্যবয়সী। বার্ধক্যে পৌঁছে এধরনের লোকসানী উত্তেজনা দেখবার মনোভাবও বোধহয় সকলেরই কমে যায়। যুক্তিবাদীরা বলেন, কিছুসংখ্যক সাহিত্যপাগলের কাণ্ডকারখানা এসব। সারা বছর চেতন-অর্ধচেতনের মতো দিন-যাপন করে হঠাৎ একটি পুজোসংখ্যা বের করে ফেলাই তাঁদের বহুদিনের অভ্যাস। সাহিত্যের জন্যে একটা কিছু করা চাই—এই প্রলোভন তাঁদের ঝিমিয়ে-পড়া অস্তিত্বকে ঝাঁকুনি দিয়ে সজাগ করে তোলে প্রাক্-পুজোর দিনগুলো। লেখা যাই হোক করে যোগাড় হয়ে যায়। টানাটানি পড়ে পত্রিকা ছাপানোর টাকাকড়িতে।

তখন শুরু হয়ে যায় বিজ্ঞাপনের জন্যে ছোটাছুটি। বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও এ সময়ে কেমন যেন একটু সহৃদয় এবং সাহিত্যরসিক হয়ে পড়েন। সরকারী বিজ্ঞাপনের ব্যাপারেও একটা উদার সহযোগিতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। পাড়ার দোকানদার বা ছোটো ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত দু-টো-চারটে বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলেন। মফস্বল শহরে দোকানীরাও এ ব্যাপারে একেবারে অনুদার নন। স্থানীয় যুবকদের সাহিত্য-প্রয়াসে দু-দশ টাকার বিনিময়ে পুরো পাতার বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলেন তাঁরা। পাড়ার মুদি, সেলুনের মালিক, বিড়ির ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই সাধ্যমত বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন।

এবার বহু পুজো সংখ্যা বেরিয়েছে বাংলাদেশ থেকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা, প্লাবন, রোগ, শোক, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আর্থিক অনটন, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি কিছুই রোধ করতে পারেনি এসবের অনিবার্য প্রকাশ। বন্যাপ্লাবিত মেদিনীপুর, ধ্বসনামা উত্তর-বঙ্গ, বিপর্যস্ত ত্রিপুরা এবং বিক্ষুব্ধ আসাম থেকেও নানাধরনের পুজো সংখ্যা বেরিয়েছে। বহু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এসব কাগজে প্রকাশিত হয়েছে এবার। লক্ষ্য করার বিষয়, লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে কবিদের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। অনেক কাগজের সঙ্গে একেক দল কবি যুক্ত। নির্ভেজাল কবিতার কাগজের সংখ্যাও কম নয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কবিতা কিংবা কবিতা-প্রধান একাধিক কাগজ প্রকাশিত হয়েছে।

কলকাতার বুক স্টলগুলোর দিকে তাকালেও লক্ষ্য করা যায় এমন বহু পত্র-পত্রিকা, যাদের প্রকৃত অস্তিত্ব কেবল উপলব্ধি করা যায় পুজোর সময়। সারা বছর এদের দেখাসাক্ষাৎ মেলে না। কোনো কোনো বিজ্ঞাপনের এজেন্ট, প্রেসের মালিক কিংবা সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মী এসময়ে কিছু বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে একেকটি সুবৃহৎ এবং সুদৃশ্য পুজোসংখ্যা প্রকাশ করে ফেলেন।

বাংলাদেশের পুজোসংখ্যাগুলোর শ্রেণী-বিভাগ করলে দেখা যায়—(১) সিনেমা-সংক্রান্ত কাগজ, (২) যৌনবিষয়ক পত্রিকা, (৩) কবিতা সম্পর্কিত অনিয়মিত সাময়িকী, (৪) নির্ভেজাল গল্পপত্রিকা, (৫) মহিলা সম্পাদিত কাগজ, (৬) ছোটদের বার্ষিকী, (৭) জ্যোতিষচর্চার পত্রিকা, (৮) অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক সাময়িকী, (৯) প্রবন্ধের কাগজ। তাছাড়া রয়েছে গল্প-কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি রচনাভর্তি সাহিত্যের কাগজ। সিনেমা ও ছায়াছবি সম্পর্কে উচ্চাঙ্গ আলোচনার কাগজও বেরিয়েছে এবার। নাটক সম্পর্কে নতুন আলোচনার কাগজ তেমন বেরুচ্ছে না।

এবার একটি বিষয় নজরে পড়লো, যা হয়তো অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত কয়েক বছর ধরে পঞ্চাশের জন-প্রিয় কবিরা অধিকাংশ পত্রিকারই পাতা জুড়ে আপন অস্তিত্ব প্রকাশ করে আস-ছিলেন। এবার তাঁদের একান্ত ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও শিথিল মনে হলো। আগের সেই উত্তেজিত ভাবটা নেই। কেমন যেন একটা অসহায় অবস্থা! তুলনায় চল্লিশের প্রতিষ্ঠিত এবং ষাটের তরুণ কবিরা কবিতা লিখেছেন বেশি। বিশেষত চল্লিশের কয়েক-জন কবি তো প্রায় সবকটি উল্লেখযোগ্য কাগজেই কবিতা লিখেছেন অল্পবিস্তর।

ছুটিতে যাঁরা বাইরে গিয়েছিলেন, এখন তাঁরা ফিরতে শুরু করেছেন একে একে। প্রায় সকলের সঙ্গে রয়েছে এক বা একাধিক পুজো সংখ্যা। বইয়ের স্টলগুলিতে জমে আছে পুজো সংখ্যার স্তূপাকার পাহাড়। রাস্তার ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে এসেছে প্রচ্ছদের উজ্জ্বলতা। গত কয়েক মাসের ছোটাছুটি, রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা—বিশেষত ছোটখাট অব্যবসায়ী কাগজগুলির বিনীত প্রকাশে অন্তরালে যে রক্তক্ষয়ী প্রয়াসের কাহিনী প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—তার স্মৃতিও ক্রমশ মলিন হয়ে আসছে। হয়তো আগামী পুজোর আগেই, ঢাকের বাদ্যি বেজে ওঠার প্রাক্‌কালে শোনা যাবে আরো কিছু নতুন কাগজের নাম, দেখা যাবে নতুন কিছু মানুষের মুখ। হয়তো এবারের অনেক কাগজের নামই শোনা যাবে না আগামীবার। এবারে নতুন লেখকদের অনেকেই হয়তো বিস্মৃত হবেন আগামী উদ্যমের সময়। এবং বহু নতুন সম্ভাবনার সংবাদ বয়ে আনবে আগামীবারের পুজোসংখ্যাগুলি।

—গৌরাঙ্গ ভৌমিক

বন্যা

[উপন্যাস]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আগের ঘটনা

[বড়ো জেদী, স্বাধীন ও সুন্দরী লীলা বিয়ে করে সত্যচরণকে। কিন্তু ওরা হয়তো সুখী ছিল না। এমন সময় এল সুখেন। সত্যর বাল্যবন্ধু। জুয়া, মদ আর মেয়েছেলে তার নিত্যসঙ্গী।

তবু সুখেনই ভাসিয়ে নিল লীলাকে। সত্যর সংসার ভেঙেছে।

রূপপুর ছাড়ল সত্য। এল রাণীচক। ঘরে যমুনাও এল। নববধূবেশী।

ইতিমধ্যে সুখেনের প্রেস কেনে লীলা। কিছুদিন বাদে ডিভোর্স হল সত্য আর লীলার।

যমুনাকে ঘিরে সত্যর রঙীন স্বপ্ন। যমুনা অন্তঃসত্ত্বা। তবু বিয়ে করতে পারছে না।

লীলাও রূপপুর ছাড়ল। এল শহরে। সুখেন ভাবে লীলা কি শুধু তাকে নিয়ে খেলাই করবে? ঘর বাঁধবে না? অবশ্য কনককেও ভুলতে পারে না।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সত্য এক রাতে যমুনার মুখোমুখি। যমুনা কি রক্ষিতা'র মতোই থাকবে?

ওদিকেও জল ঘোলা হল। সুখেনের হালচালে লীলা চিন্তিত। শিবানীকে নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করা, কনকের সঙ্গে এককালে ওর ঘর বাঁধা সবই জানতে পারে লীলা।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৫)

চোখ থেকে হলুদ ছোপগুলো মুছে সুখেন তাকাল। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসল। কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারল না সে। স্বপ্নের মধ্যে ছেলেবেলাকে ফিরে পাওয়ার স্নিগ্ধ বিষন্নতাটুকু তখনও তার মনে। অথচ সামনে এখন লীলা এসে দাঁড়িয়ে আছে। সুখেন হাসবার চেষ্টা করছিল। এই লীলা একবার তাকে একটা গল্প বলেছিল। রূপপুরের কোথায় কোন জঙ্গলের ভিতরে লীলা নাকি একটা ডোরা-কাটা ঘুমন্ত ভুল বাঘ দেখেছিল দুপুর-বেলা। আলোছায়ার ঝালরে একটা নিতান্ত ছবি। সত্যিকার বাঘ হলে কী করত লীলা জানে না—তবে এই ভুলটা তার খুব ভালো লেগেছিল নিজের কাছে। সে তখন সেই ঝালরের পাশে দাঁড়িয়ে গাছপালাকে শুনিয়ে বলেছিল : এই আমার বাঘ। এখন লীলার বয়স হয়েছে। বহুকাল সে জঙ্গলে যায়নি। এখন হয়ত ভুল বাঘ দেখায় তার সুখের চেয়ে রাগই বেশি হবে। ছেলেবেলার মত তার ওপর শুয়ে বলবে না : সোনা আমার ঘুমোও।

সুখেন হাসবার চেষ্টা করছিল। অথচ এতদিন পরে লীলাকে তার কেমন ভয় করছে জেনে নিজের ওপর ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। খুব দুর্বল হয়ে গেছে সে। ক্লান্তি বোধ করছে। নিজেকে চাকর মনে হচ্ছে।

লীলা বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখটা থমথম করছিল। সে বলল, রমা কতকগুলো অর্ডার এনেছিল। ছাপা হয়েছে সেগুলো?

সুখেন অবাক হল। চোখে-চোখে তাকিয়ে থাকার পর বলল, কানাই বলতে পারে।

তুমি পারো না কেন?

কৈফিয়ৎ তলব করছ?

করা উচিত। আমার সবকিছু এখন প্রেসেই আছে।

সুখেন একটু হাসল।...বেশ তো, অন্য লোক রাখো—যে আমার চেয়ে যোগ্য।

দরকার হলে তাও রাখতে হবে।

লীলা ঘুরে দাঁড়াল। পা ফেলবার মুহূর্তে সুখেন বলল, আরে! তুমি যে ভীষণ কাজের লোক হয়ে উঠেছ দেখছি! শোন—

বল।

রাগ করেছ?

লীলা জবাব দিল না। সময়টা বড় খারাপ সুখেনের। ছত্রাকার ছড়ানো ফটো—সাবধানে শরীর দিয়ে আড়াল করেছে যথা-সম্ভব। নতুবা উঠে গিয়ে ওর হাত ধরে টেনে আনত। সুখেন ফের বলল, কাজের লোক আমিও কম নই। কাজের কথাই বলতে চাই, শোন। এই বাড়িটা বদলাতে হবে শীগ্গীর।

কেন?

কুলোচ্ছে না। আরও জায়গা দরকার।

বেশ বাড়ি দেখ। ভালো বাড়ি হওয়া চাই। যা ভাড়া হবে, হোক।

ভালো কিছু পেতে হলে সেলামী লাগবে।

কত লাগতে পারে?

আমার ঠিক ধারণা নেই। হাজার থেকে দু হাজার তো বটেই! তবে তোমার উকিল ভদ্রলোককে এতে জড়িও না। সুখেন দাঁও হাতে পাবার উৎসাহে বলতে থাকল।...বাড়িওলারা আইনের লোক দেখলেই ঘাবড়ে যায়। তাছাড়া, আমি যে বাড়ির খোঁজ জানি, তার মালিক আবার ভীষণ ভীতু লোক...

কথা কেড়ে লীলা বলল, আমি নিজে কথা বলব।

ভদ্রলোক থাকেন লালগোলার ওদিকে। তুমি অদ্দুর যেতে চাইবে? বরং আমিই যাই।

কানাই এসে গেছে ইত্যবসরে। সাবধানী কানাই পর্দার ওদিকেই দাঁড়িয়ে আছে অবশ্য। কেশেছে। তারপর ডেকেছে। বাবু।

পর্দা তুলে লীলা বলল, কী?

মালিককে কানাই ঢুকতে দেখে নি। তা সত্ত্বেও সুখেনের দরজায় পর্দা ঝুলালে কতদূর পা বাড়ানো উচিত সে জানে। কানাই সলজ্জ হেসে প্রণামান্তে আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গীতে একটা ঝকঝকে রঙীন কাগজ তুলে দিল লীলার হাতে। সেই বিয়ের পদ্য!

কানাই চলে গেল। লীলা খুঁটিয়ে পড়ছিল। অবশ্য আলো ঘরে খুব কম। চোখের জ্যোতি না থাকলে পড়া রীতিমত কঠিন বৈকি। একটুখানি উঠে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিল সুখেন। আগাগোড়া দৃশ্য ও ঘটনাটা সে উপভোগ করছিল।

সুখেন লুকিয়ে হেসে বলল, কী ওটা?

কতকটা সুখেনের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে লীলা বেরিয়ে গেল। কাগজটা পায়রার মত উড়ে মেঝেয় গিয়ে পড়লে সুখেন ঝটিতি এক পলক পড়ে নিয়ে আগে ছবিগুলো বিছানার নীচে সামলাল। তারপর পর্দা তুলে বাইরের অফিসঘরে গেল। দেখল, লীলা ঠিক প্রেসবাবুদের মত সেই গদীআঁটা চেয়ারে বসে পড়েছে। গম্ভীর মুখে কাগজ দেখছে। এখন একটা চশমা হলেই ভীষণ মানিয়ে যায়!

হ্যাভোরি গেঁইয়া। মনে মনে বিলক্ষণ বিরক্ত সুখেন। যেন একটা কিম্ভূত সঙ নিয়ে তার জ্বালা হয়ে যাচ্ছে—ঠিক এই ধরনের তাচ্ছিল্যমেশানো রাগ ও বিরক্তি তার মনে। সে বলল, ওই পদ্যটা যারা ছাপতে দিয়েছে—তাদের বর বেচারার মুখটা মনে পড়ে আমার কষ্ট হচ্ছে। কনেটি অবশ্য

ভীষণ সুন্দর—ঘরের মধ্যে তাই প্রচণ্ড লোভ। অথচ...

আরও কী বলত সুখেন। কিন্তু লীলা উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ চলতে থাকল। দরজার নীচে গিয়ে একবার দাঁড়াল। পথের দুদিকে যেন রিকশো খুঁজল সে। তারপর এগিয়ে গেল হনহন করে। হাতের ছাতিটা খুলে তীব্র রোদ থেকে মাথা বাঁচিয়ে লীলা হেঁটে যাচ্ছিল। স্লিপারের পিছনে তার পায়ের অসম্ভব সাদা তলাটা বার বার কালো পীচের ওপর ছটা বিকিরণ করছিল। সুখেনও এগিয়ে গেল।

ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাছে এসে ডাইনে ঘুরল লীলা। গঙ্গার দিকে গেছে এই রাস্তাটা। সুখেন জেলখানার সীমানা পেরিয়ে ছোট্ট বাঁধের উপর লীলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

লীলা যেন চমকানোর ভান করল তাকে দেখে। ছাতিটা ঘোরাচ্ছিল সে। থামল হঠাৎ। সে বলল, তুমি কোথায় যাবে?

এসব ক্ষেত্রে সুখেন যা করেছে, তা করা ছাড়া উপায় নেই। একটুখানি জলের ফোঁটার দরকার চোখে, মুখটা দারুণ ফ্যাকাসে আর করুণ হবে, শেষ অব্দি অজস্র প্রলাপ খরচ করতে হবে। তাতে কাজ না হলে—এখন গঙ্গা তো কূলে কূলে ভরে আছে, সুখেন সাঁতারও জানে!

কিন্তু কোনটাই দরকার হল না। সুখেন কিছু বলার আগেই লীলা হেসে ফেলেছে।

হেসেছে, কারণ সুখেনকে সে যা দেখতে চেয়েছিল, সুখেন তাই। তারপর দুজনে পাশাপাশি আবর্জনার স্তূপ ভেদ করে যে সরু পায়ে-চলা পথটা গঙ্গার পাড়ে চলে গেছে, সে পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। আপাতত কোন কথা বলছিল না কেউ। ওদের দু পাশে সরকারী অরণ্য। আজ আকাশ পরিষ্কার থাকায় রোদ বড় উজ্জ্বল। গাছপালাগুলোকে স্নানের পর সতেজ দেখাচ্ছিল: অজস্র পাখি ডাকছিল। ওখানে ভরা গঙ্গায় নৌকোর দাঁড়ের শব্দ হচ্ছিল। জলের ঢেউ-এর শব্দ। জল ভাঙার শব্দ। স্টীমারের বাঁশি। শংখচিলের চিৎকার। আর এখানে গাছের নীচে ঘন ছায়া।

কিছুক্ষণ পরে সুখেন চমকে উঠে বলল, লীলা, তুমি কাঁদছ?

চোখের জল মুছবার চেষ্টা না করে লীলা জবাব দিল, কান্না আমার আসে না। আমি কাঁদতে পারিনে।

কিন্তু তুমি কাঁদছ!

বাবা মারা গেলে আমি নাকি কাঁদিনি। অবশ্য তখন আমার বয়স খুব কম।... লীলা শান্তকণ্ঠে বলল।...তবু মা বলত, আমার মত নিষ্ঠুর মেয়ে নাকি দেখা যায় না। তারপর মাও মারা গেল। এখন আমার বয়স হয়েছে। খুব কাঁদা উচিত ছিল। রূপপুরে ওরা আড়ালে আমার নিন্দে করেছে—আমার বুক নাকি পাথরে তৈরী। লীলা হাসছিল।...তারপর রূপপুর ছেড়ে আসবার দিনও সবাই কেঁদেকেটে একাকার করছিল, আমি কাঁদতে পারলাম না।

তাহলে...সুখেন আঙুল দিয়ে ওর চোখের নীচে থেকে জলের ফোঁটা তুলে এনে দেখাল। তাহলে এগুলো কী লীলা?

কিছু না। রাগ হলে আমার এমন হয়। অনেকবার হয়েছে। ও যখন সে রাত্রে রূপপুর থেকে চলে আসে...

কে? সতু?

হ্যাঁ। ঠিক এমনি হয়েছিল সে রাত্রে।

কী সর্বনাশ! এ তোমার রাগের অশ্রু?

ফাজলেমি করো না। ভালো লাগে না।

তুমি সত্যিই খুব অদ্ভুত মেয়ে। যত ভাবি, তত বেশি ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

কী ইচ্ছে করে?

সুখেন টেনে টেনে উচ্চারণ করল, ভা—ল—বা—স—তে।

লীলা তীব্রদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, কনক নামে তোমার একটা বৌ আছে?

হঠাৎ এই প্রশ্নে সুখেন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আছে নয়—ছিল।

আগে বলনি!

বলিনি—শুনলে তুমি আমাকে কী ভেবে বসতে।

আমাকে তুমি ডিভোর্সের মামলা করতে বলেছিলে। নিজে আগে করনি কেন?

বেশ, এখন করব। কালই করব।

কিন্তু এতদিন করনি কেন?

আইনগত অসুবিধে ছিল।

কী অসুবিধে?

সুখেন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল, বিয়ের সময় একটা রেজিস্টার্ড ডিড করা হয়েছিল। সে সব অনেক জটিল ব্যাপার। কনককে ডিভোর্স করতে হলে আমাকে অনেক টাকা দিতে হবে। যৌতুকে একটা সম্পত্তি পেয়েছিলাম, তার সমান মূল্য। সে অনেক অনেক টাকা।

সে সম্পত্তি কী করেছ?

বুড়ো আঙুল নাচিয়ে সুখেন বলল, উড়ে গেছে। একটা ব্যবসা করতে গিয়ে ফতুর হয়েছিলাম। কনক অবশ্য তখন আমার কাছেই ছিল।

লীলা হেসে ফেলল।...উঃ, কত কাণ্ডই না করেছ এ বয়সে। ধন্য তুমি।

সুখেন মুখ নামিয়ে অপরাধীর মত বলল, জীবনে উন্নতি করতে চেয়েছিলাম।

পরমুহূর্তে লীলা ফের ওকে চমকে দিল।...কিন্তু সুধাকে বিষ খাইয়ে মেরেছিলে কেন?

সুখেন থমথমে মুখে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, মানুষের জীবনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু ব্যাপার ঘটে যায়। কিন্তু যা রটে, সবটাই যে সত্য নয়—এটা তোমার বোঝা উচিত লীলা। তুমি কচি খুকীটি নও।...আমি যদি বলি, তুমিও সতুকে বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছিলে। সতু সেটা টের পেয়ে তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল?

লীলা মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল। তারপর মুখ নামিয়ে বলল, হলেও হতে পারে। কিন্তু সে তো তোমার জন্যে। তুমিই দায়ী। কেন সে রাত্রে আমাকে ডেকে নিয়ে আমার সর্বনাশ করেছিলে?

তুমি গেলে কেন?

নিশির ডাকে মানুষ অমনি করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—এটা জানি।

জেনেও বেরিয়ে গিয়েছিলে!

আমার খুশি।

সুধাকে বিষ খাওয়ানোও আমার খুশি।

লীলা এবার ওর হাত ধরে টানল। বস। তুমি ঝগড়া করছ, আমি করিনি।

নাঃ। আমি যাই।

কোথায় যাবে?

যেখানে খুশি। তোমার প্রেম তুমি বুঝে নেবে এস।

প্রেম আর প্রেম! আমার আর ওসব ভালো লাগছে না একেবারে।

যা খুশি করো। আমি যাই।

কোথায় আর যাবে? জগদীশের মেয়ে ছাড়া আর কে জুটবে তোমার?

সুখেন হাসবার চেষ্টা করে জবাব দিল, লীলা তো আছেই শেষ অব্দি।

লীলা নেই।

তার বিয়ের পদ্য আছে।

ও একটা শখ। আমার বিয়েতে পদ্য ছাপা হয় নি। তাই একবার দেখলাম, কেমন লাগে ওসব।

হার মানছি। বলে সুখেন ধুপ করে বসে পড়ল পাশে। এ একরকম অদ্ভুত লড়াই। দুটো সঙ যেমন রাঙতার তরোয়াল নিয়ে লড়াই করে। তাছাড়া কী? সুখেন তবু মনে মনে বিরক্ত। অস্বস্তিও কম নেই। জগদীশের টাকা দিতে হবে। তারপর কনক একটা বীজ পুঁতে গেছে। অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে। ওপড়াতে হবে। এই করে বেঁচে থাকার মানে হয় না। তার চেয়ে শিবানীই একান্ত আরাম—জগাকে লুকিয়ে সে বনের দিকে চলে আসতে পারে। কোন দায় নেই, ঝুঁকি নেই।

কিন্তু আর জমবার কোন লক্ষণ নেই। দুজনেই হয়ত ভিতরে একটা তাগিদ অনুভব করছে, একটা সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ার তাগিদ, সম্ভব হচ্ছে না সেটা।

হঠাৎ এদিকওদিক তাকিয়ে নির্জনতাটা আঁচ করে নিয়ে সুখেন লীলার গালে একটা আলতো চুমু খেয়ে বসল।

পরমুহূর্তে মাথা ঘুরে উঠেছে সুখেনের। লীলা প্রচণ্ড জোরে ওর কানের পাশে একটা চড় মেরেছে। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছে। ছাতাটা হাতে নিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করেছে।

সুখেন উঠল না। নিঃশব্দে দাঁতে দাঁত চেপে ওর চলে-যাওয়াটা দেখছিল। গাছপালার আড়ালে লীলা অদৃশ্য হলে সে বিড়বিড় করে বলল, শালী গেঁইয়া বেশ্যা! তারপর পা দুটো ছড়িয়ে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল সে। সেই সময় পিছনে

একটা গাধার সঙ্গে নাক ঝাড়লে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখতেই পলকে তার সব রাগ জল হয়ে গেল।

(৩৬)

ঘন্টার আজকাল মনমেজাজ আগের মত রসাল নেই। বাসিনীর বিকেলবেলা তাড়াহুড়ি সাজতে বসা এবং সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো দেখে 'বাগানপাড়ার মাসি' বলে আর ঠাট্টা-তামাসা করে না। ঘরের বাইরে একটুকরো খালি জমি রয়েছে। সেখানে অনেক যত্নে একটা সব্জীক্ষেত তৈরী করেছে সে। পাড়ার চেনা মেয়েরা লীলাকে ফুলের বাগান করতে বলেছিল। সে-বাগান উঠোন থেকে ওই ক্ষেত অব্দি বিস্তৃত করেছে ঘন্টা—কতকটা লীলার আদেশ, কতকটা নিজের তাগিদ। রূপপুরে থাকতে সে বড়জোর গাঁদা দোপাটি হরগৌরী চিনত। এখানে এসে জিনিয়া চিনেছে। পাশেই একটা খৃস্টান কবরখানা। তার লাগোয়া একটা কুঠিবাড়ি রয়েছে। কুঠিবাড়িতে যারা থাকে, তাদেরও ফুলের বাগান আছে। এক চিলতে খোয়াবিছানো রাস্তার ওপারে পাঁচিলে বুক রেখে ঘন্টা কখনও সেই বাগানটা দেখে আসে। সেখানে অজস্র অজানা সুন্দর সুন্দর ফুল। ঘন্টার সাধ যায় নাম জানতে। কিন্তু মুখচোরা ভাবটি এখনও তার ঘোচেনি! তার মতই একটা 'তুশ্চু মনিষ্যি' সেখানে সারাদিন মাটির ওপর ঝুঁকে বসে থাকে। ঘন্টার মনে হয়, কী একটা জানোয়ার যেন শরীর নাড়া দিয়ে আহার করছে। সে চোখ তুলে ঘন্টাকে দেখলেই ঘন্টা সরে আসে। কেমন গা ছমছম করে তার। শহরের সবকিছু তার কাছে বড় বেশি পবিত্র লাগে—সহ্যের অতীত পবিত্র। রূপপুরের বামুনবাড়ির মেয়েরাও কম রূপসী নয়। তারাও যথেষ্ট সাজে। তত্রাচ এই শহরে পথের ওপর বা কদাচিৎ লীলার বাড়ি যে মেয়েরা আসে, তাদের দিকে রূপপুরের মত লোভী চোখে তাকাতে নিজেরই খারাপ লাগে তার। যেন সব স্বর্গের জিনিষপত্র, দেবদেবতাদের জ্যোতিতে ঘেরা—চোখ জ্বললে ভস্ম হয়ে যাবে। এটা ভয় নয়। ঘন্টা বুঝতে পারে এটা আদৌ ভয় নয়—অতি-পবিত্রকে সম্মান। এখানে কোন জিনিষই দাঁতে দেবার জন্যে নয়—শুধু দূরে থেকে দেখবার। এই গাছমছম সম্মানবোধটি নিয়ে সে শুধু মেয়ে কেন, ওইসব ফুল ও মালীর দিকেও মুগ্ধদৃষ্টে তাকায়।

কিন্তু মন ভরে না ঘন্টার। দেবদেবতার থানে বেশিক্ষণ থাকতে নেই। মানুষ বা মনিষ্যির কতরকম ভালমন্দ ইচ্ছে-সাধ থাকে। কে আর চিরকাল পূজোরী হতে ভালবাসে!

তাই ঘন্টা আজকাল রূপপুরের কথা ভাবে। আকাশের দিকে তাকায়। তাকাতে-তাকাতে সামনের ওই খোলা পোড়ো বিরাট ময়দানের দিকে অন্যমনস্ক হেঁটে যায়। তারপর কোথাও ধুপ করে বসে গরু দেখে। একটি কি দুটি দলছাড়া গাইগরু বা মোষ এদিকে চরতে আসে খাটাল থেকে। ঘন্টার হাত নিসপিস করে বাঁটের দিকে তাকিয়ে। কতদিন সে দুধের বাঁটে হাত দেয়নি। বাসিনীকে বলেছিল, সেই তো দুধ লাগছেই, বল না দিদিঠাকরুনকে, একটা দুধেল গাই কিনে ফেলুক। বাসিনী ধমক দিয়েছিল, দূর ছোঁড়া, এ কি সেই গেরাম! লীলারাণীর একটা মানসম্মান আছে না এখানে। ওরে বাবা, কত্তোসব বড়বড় লোক আসে, তেনাদের মেয়েরা আসছেন...শুনে ঘন্টা আর ও নিয়ে এগোয়নি। হয়ত তাই হবে। এখানে মানী লোকেদের গরু পুষতে নেই।

ঘন্টা দুঃখিত চোখে একটা গরুর বাঁটের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সেই সময় বাসিনী সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে ইসারায় ডাকছিল। অনেকবার চেষ্টা করেও ঘন্টার ধ্যান ভাঙল না দেখে অগত্যা সে বকের মত লম্বা সতর্ক পা ফেলে কাছে গেল। তারপর চাপা গলায় ধমকাল, বলি অ রে মাগীমুখো মিনসে, তোরও কি পেরানে উদেস-উদেস ঘোর লাগল রে, অ্যাঁ!

ঘন্টার মুখের দুকষায় লালা ঝরছিল। ত্বরিতে হাতের চেটোয় মুছে সে হাসল। আমাকে ডাকছ?

হ্যাঁ, তোর কত্তাঠাকুরকে ডাকছি।

কী, হল কী?

বাসিনী কোমরে একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে চাপা উদ্বেগ। সে ফিসফিস করে বলল, ঠাকরানের কী হয়েছে বলতে পারিস? সেই একাহর বেলায় বেলায় বেরিয়েছিল। এতক্ষণে ফিরে উবুড় হয়ে শুয়ে আছে তো আছেই। এত ডাকলাম, কথাটি কইছে না। জানিস কিছু বিত্তেন্ত?

ঘন্টা মাথা নাড়ল। কই না তো, বলে চোখভরা কৌতূহল নিয়ে তাকাল।

তুই তো পেরেসে গিয়েছিলি।

হুঁ হুঁ।

সুখেনবাবু ছিল পেরেসে?

কে জানে। দোরগোড়ায় দিদিঠাকরান আমাকে বললেন, তুই বাড়ি চলে যা। আমি চলে এলাম।

বাসিনী মাথা দুলিয়ে বলল, নির্ঘাৎ ঝগড়াঝাটি হয়েছে দুজনায়। এটা ভাল কথা লয় বাছা, উঁহু ভাল মোনে লাগছে না। সেই দুধখেকো মেয়েটি কোলেপিঠে করে মানুষ করিছি, এমন তো দেখি নাই। ঘন্টা রে, বাছা আমার তরাস লাগছে, বুঝলি?

ক্যানে গো?

দু' দুবার আত্মহত্যা করতে যেয়েছিল। ত্যাখনও ঠিক এমনি উবুড় হয়ে শুয়ে...উ হু হু! আচম্বিত ত্রাসে থরথর করে কেঁপে উঠেছে বাসিনী। পরক্ষণে সে হনহন করে হাঁটতে শুরু করেছে বাড়ির দিকে। ঘন্টার মনে হল, যেন ঘরে আগুন লেগেছে আর ভিতরে বাসিনীর মেয়েটা শুয়ে আছে—তেমনি করে ছুটে যাচ্ছে বুড়ি। ঘন্টা উঠল। সেও ছুটে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ বিরক্ত হল সে। স্বভাবসুলভ থপথপিয়ে হাঁটতে থাকল আস্তে আস্তে। মাঠে প্রচুর ঘাস গজিয়ে আছে। তার পায়ের ধুপধুপ শব্দে পোকামাকড় লাফিয়ে পড়ছিল। পায়ের তলায় সেগুলোকে পিষে ফেলতে চেষ্টা করছিল সে।

বাড়ি ঢুকে ঘন্টা দেখল, বাসিনী ঘরের বারান্দার দরজার পাশেই হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। পেটে খিদে নিয়ে ঘন্টা একবার উঁকি মেরে ভিতরটা দেখে নিল—লীলা ওপাশে ফিরে শুয়ে আছে। একটা পা কোণের ছোট্ট গোল টেবিলে উঠে গেছে। ফলে হাঁটু অব্দি দেখা যাচ্ছিল লীলার। উজ্জ্বল সাদা পায়ে নীলচে রোমের ঝাঁক স্পষ্ট হয়েছে। ঘন্টা কোনদিন দিদিঠাকরানের পায়ের অতখানি খুঁটিয়ে দেখেনি। এখন তার মনে হচ্ছিল, সুন্দর পবিত্র একটা ব্যাপারে সুখেনবাবুর কী একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্র চলেছে। ঘন্টার চোখদুটো জ্বলে উঠছিল। সারা গা রি রি করে উঠছিল রাগে ঘেন্নায় হিংসায়। এবং এই প্রচন্ড নিঃশব্দ বিক্ষোভটা তার খিদে ভুলিয়ে দিল। সে আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে গেল।

দরজার কপাটে সন্তর্পণে হাত রেখে ঘন্টা তোলা পর্দাটা ঘাড়ের কাছে আরও খানিকটা তুলে ডাকল, দিদি, নীলাদি!

নাম ধরে কোনদিন ডাকেনি ঘন্টা। ডাকবার কথা মাথায় আসেনি তার। অথচ একটা অভাবিত কৃতজ্ঞতা তার কণ্ঠনালীর খাঁজে খাঁজে জল চুইয়ে দিচ্ছে। কাসি

আসছে। চোখে জলের বিন্দু নিয়ে ঘন্টা ডাকছিল, নীলাদি, আমি ডাকছি গো।

লীলা বিস্মিত হয়েছিল কি না কে জানে, মুখ ফেরাল। লাল চোখ, ফুলো-ফুলো মুখ অস্বাভাবিক। তারপর ভ্রূ কুঁচকে বলল, কিছু বলছিল ঘন্টা?

আজ্ঞে।

আয় না, ভিতরে আয়।

ঘন্টা ভিতরে গিয়ে মেঝের ধুপ করে বসল। তারপর বলল, একটা কথা বলছিলাম। তয়ে বলি, না নির্ভয়ে বলি?

লীলা ধমক দিল, ভনিতা রাখ্।

আমার মোন টানছে দিদি, গেরামে যাবো।

যাবি তো যা, আমায় কী বলছিস? লীলা ফের মুখ ফিরিয়ে শুল। জানালার পর্দাটা তুলে বাইরে চোখ রাখল সে।

একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে ঘন্টা নিঃশব্দে নেমে এল উঠোনে। তার মুখটা বিকৃত দেখাচ্ছিল। পিছনে বাসিনী নেমে এসে ফিসফিস করে বলল, তোর আবার কী হল হঠাৎ! মরণ আর কী!

ঘন্টা ঘোৎ ঘোৎ করে বলল, নাঃ। ঘর-বাগে মোন টানছে। তুমি থাকো বাসিনীদি, আমি যাই।

সত্যি সত্যি যাবি নাকি? বাসিনী তার পাঁজরে চিমটি কাটল। ক্যানরে? হঠাৎ তের শুদ্ধ দশা লাগল নাকি? বাসিনী গরগর করছিল।...বলি অ রে মুখপোড়া, তুই যাবি আর আমি পড়ে থাকব নাকি?

ঘন্টা ভেংচি কেটে বলল, তুমি এখন শউরে হয়েছ। তুমি যাবে ক্যানে?

বাসিনীর চোখে জল ছলছল করছিল। ...তুই বল বাছা, দিনরাত্তির কি এই পাগ-লামি ভালো লাগে! জেবনে এমনটি দেখি নাই রে ঘন্টা, দেখি নাই। বড় পাপের মধ্যে বাস করতে হচ্ছে—আমার তরাস হয়, বড্ড তরাস হয়। হতাশভাবে সে মাথা নেড়ে চুপ করল।

আমি এখনই বেরোব। ঝাট্টি খেতে দাও।

খা। চান করবি না?

নাঃ।

গোগ্রাসে ভাত গিলছিল ঘন্টা। পরণে হাফপ্যান্ট, গায়ে গেঞ্জী, কাঁধে শার্ট ঝুলিয়েই খেতে বসেছিল সে। বাসিনী ফিসফিস করে কথা বলছিল।...বিপদে পড়লে যে গেরামে ফিরবে, পায়ে দাঁড়াবার মাটিটুকুও রাখেনি লীলারানী। হা যৌবন-যন্তনা, হা বুদ্ধিভ্রেম! একটুও বুঝলে না গো!...তা ঘন্টা, তুই আগে যা। আমি যাবো। হ্যাঁ, আস্মো। এখানে মোন মানে না রে বাছা।...বড় দুঃখে বাসিনী বলল, তুই যে আমাকে ঠাট্টা করে বাগানপাড়ার মাসি বলিস ঘন্টা, আমি তাই হয়ে আছি রে। আস্মো পালায়।

ঘন্টা কোঁৎ করে একটা গ্রাস গিলে বলল, তা দেখ ব্যাপারটা—বললাম যে গেরামে যাবো, শুনে বাধাটি দিলে? বারণ করলে, তুই ক্যানে যাবি? সে-নীলা আর নাই, বুঝেছ কথাটা? এ-নীলা এখন অন্য-নীলা।

বাসিনী আরও চাপা স্বরে মন্তব্য করল, কত লীলে না দেখাবে লীলারাণী। ধন্যি মেয়ে বাবা। বুঝলি ঘন্টে, আমার পেটের হলে দিতাম পটাপট চাপড় দুগালে। ধরতাম কন্ঠাটা কষে...

রাক্কুসীর মত দেখাচ্ছিল বাসিনীকে।

ঘন্টা একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল। কোনা হাতড়ে একটা ঝোলা আর সুটকেশ আনল। তারপর বলল, তাহলে আসি।

বাসিনী গলা ছেড়ে কাঁদবার মত ডাকছিল, অ দিদিঠাকরান, অই গো, ঘন্টে সত্যিসত্যি বাড়ি যাচ্ছে। বলি, উঠে এসে কিছু বলবে না কী!

লীলার সাড়া পাওয়া গেল না।

বাসিনী ঘরে চোর ঢোকার মত চেঁচাচ্ছিল। ঘন্টা ধমকাল।...মিছেমিছি চেঁচিও না তো! কার দায় পড়েছে আমাকে আটকাতে। সবায় বানের জলে ভেসে এসেছে বলে আমি তো আসিনি। রাগদুঃখু আমারও আছে, হ্যাঁ।

দরজায় পা বাড়াতেই সে শুনল লীলা তাকে ডাকছে: ঘন্টা!

ঘন্টা মুখ ফেরাল।

কোথায় যাচ্ছিস?

গেরামে।

এদিকে আয়। কঠোর মুখে লীলা আদেশ করছিল তাকে।

আমাকে ক্ষেমা দাও দিদি।

কেন যাবি তুই?

আমার ভালো লাগে না।

লীলা কয়েক পা এগিয়ে এল। হঠাৎ তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল।...ঘন্টা, আমাকে ফেলে পালিয়ে যাবি?

আমি তুশ্চু মনিষ্যি দিদি। আমার সাধ্যি কতটুকুন?

লীলা ফের কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাসিনী ছুটে গিয়ে ওর কাঁধে থাপ্পড় মেরেছে। হতভাগা ড্যাকরা, বুনো পাপিষ্ঠি, ফাজলেমির জায়গা পাওনি? সবার সঙ্গে মশকরা। মেরে তুলো ধুনে ভাসিয়ে দোব।

হিড়হিড় করে টেনে আনল বাসিনী। ঘন্টা নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকল। লীলা কিছু-ক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, ঘন্টা, যদি কখনও যেতে হয়, আমিও সঙ্গে যাব।

ঘন্টা মুখ তুলল। তার মুখে রঙ ধরছিল ক্রমশ। মোটা দাঁতগুলো বেরিয়ে আসছিল। একটা বিচিত্র নিঃশব্দ হাসির মধ্যে সে লীলার প্রতিশ্রুতিটা বরণ করে নিচ্ছিল। সেই অবসরে বাসিনী তার হাত থেকে সুটকেস আর ঝোলাটা কেড়ে নিয়ে গেল। নিঃশব্দে একটা গাট্টাও মেরে গেল মাথায়।

লীলা ডাকল, এদিকে আয় ঘন্টা।

লীলার পিছনে অনুগত শান্ত জানো-য়ারের মত ঘন্টা ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। বিছানায় মাথার কাছে লীলার ব্যাগটা পড়ে রয়েছে। ব্যাগ খুলে আস্ত একটা পাঁচটাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে লীলা বলল, মন খারাপ করিসনে। একটু ঘুরে আয় বাইরে। সিনেমা-টিনেমা দেখে আয়।

ঘন্টা একগাল হাসল। এত টাকা দিলে?

তোকে তো তেমন কিছু দিই নে। লীলা শান্ত চোখে তাকিয়ে বলল। এবার থেকে মাসে-মাসে কিছু মাইনেও পাবি।

মাসমাইনে? ঘন্টা প্রায় নেচে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

হ্যাঁ।

সত্যি বলতে কী, ঘন্টার জীবনে এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পাড়াগাঁয়ে বড়বাড়িতে দুঃস্থা মেয়েরা একদিন কোলের শিশুটিকে নিয়ে আশ্রয় পায়। তারপর একদিন সেই শিশু বড় হয়ে ওঠে। সে-বাড়ির একজন মানুষ, প্রাণী কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবের মত তাকে কাজে লাগানো হয়। বিনিময় দাবী করার কথা সে চিন্তা করতে শেখে না। তবে জীবদেহ একটা আছে তার—সেজন্যে যা যা দরকার, সে তো তাকে দিতে হয়। কঞ্জুস কলুও তার ঘানিযন্ত্রের পরি-

চর্চা করে তেলজল দিয়ে। ঘন্টা এখন বড় হয়েছে। তার মা যেমন জানে, ঘন্টাও বুঝতে পারে—কর্ত্রী একদিন তার বিয়েও দেবে। ঘন্টা ছেলেপুলের বাবা হবে। তখন ঘন্টার জীবনে এক ভিন্ন দিন আসবে। কিছু জমিও পেতে পারে সে। ভিটে পেতে পারে এক-টুকরো। সেখানে ঘন্টার বৌ আর ছেলে-পুলেরা থাকবে। বড় হবে। ঘন্টার তবু ছুটি নেই। চাকরাণ সম্পত্তির বদলে তার জীবনটা দাসখতে বাঁধা। ওই হারু কৈবর্তের মত।

অবশ্য কর্তার বদলে কর্ত্রী থাকলে—বিশেষ করে লীলারাণীর মত ঠাকরান থাকলে হরু কৈবর্তদের পোয়াবারো। বিদ্রোহ করা সহজ। মুক্তিও নাগালে মেলে।

ঘন্টা বিদ্রোহ করবে না হরুর মত। ঘন্টা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা যা ক্ষয় করে ফেলে, তা এখনও তার সামনে দেখা দেয়নি। হয়ত তা একধরনের ঘুনপোকা। ঘন্টার জীবনে ঘুনপোকা এখনও আসেনি। এসে থাকলে সেটা বোঝবার মত অনুভূতিও তার নেই।

একটু পরেই ঘন্টা চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল। শহর কেনবার দুরন্ত সাধ মিটিয়ে নেবে যতটা পারে।

সে পথে দাঁড়িয়ে চিরুনী বের করে চুল আঁচড়ে নিল। সামনের দোকানে একখিলি পান কিনে গালে পুরল। সিগ্রেট ধরাল। তারপর বেশ আমেজে চলতে থাকল। ধুতি পরে এলেই ভাল হত। থাক্।

কোথায় যাবে, ঘন্টা জানে না। অথচ পকেটে কিছু আশাতীত টাকা পয়সা। কোথাও যেতে হবে। কিছু একটা করতেই হবে। অস্থির ঘন্টা টকিবাজীর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে ছবি দেখতে থাকল। আকাশজোড়া ছবিতে প্রকান্ড সব মানুষ—এবং মেয়েমানুষ দেখছিল সে। এই-সব ছবি অজস্রবার সে দেখেছে। টকিবাজীও দুএকবার দেখেছে—কিন্তু বুঝতে পারে নি। চোখ জ্বালা করেছে। অস্বস্তি লেগেছে। চারপাশের মানুষ দেখেছে সে অবাক চোখে। চুপচাপ সব বসে আছে—কী মজা পাচ্ছে কে জানে! ছবির মানুষ দেখে কী সুখ পায় এরা? হ্যাঁ, হত যদি এটা কেষ্ট-যাত্রার আসর—রাধার দিকে চেয়ে-চেয়ে তুমি টেরই পেতে না, আসলে ওটা আস্ত একটা পুরুষমানুষ। কেষ্টযাত্রা কেন—রাণীচকের মজুমদার মশায়ের যাত্রাদলের আসরে জ্যান্ত রাজকন্যাদের দেখলে কতরকম স্বপ্ন তোমাকে পিছনে তাড়া করে নিয়ে যেত। ...ঘন্টা স্বপ্ন দেখত রাজকন্যাদের—তারা পুরুষমানুষ। হোক পুরুষমানুষ! বড্ড জ্যান্ত সেইসব রাজকন্যারা।

ছবি ঘন্টার ভালো লাগে না। লীলা সিনেমা দেখতে বলেছে। সিনেমাও সে দেখবে না। কিন্তু ছবিতে, যাই বলো বাপু, পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষগুলো দেখতে ভারী সোন্দর। এমন চেহারা কি সত্যিসত্যি থাকতে আছে?

তার ঠাকরান অবশ্যি দারুণ সোন্দর। তেনার কাছে যারা-যারা সব আসে, তারাও সোন্দর। এবং এই শহরে অনেক সোন্দর মেয়েমানুষ হে'টে যায়, রিকশো চেপে যায়, গাড়িতে যায়।

পাগল, পাগল! ওরা ছবির মত ততটা সৌন্দর নয়। দেখ না ওই মেয়েটাকে—আকাশ থেকে চোখে ঝিলিক দিচ্ছে। ভারী বেহায়া রে বাবা। বুকের দিকে তাকাতে গা ছমছম কর। উদোম স্তনটা বরং পুতনা রাক্ষসীর হলেই মানাত।

মেয়েদের নগ্ন বুক পাড়াগাঁয়ে অনেক দেখেছে ঘন্টা। সে-বুক আর এ-বুক! পাগল হয়েছ তুমি? ছুঁলে তোমার হাতে ছ্যাঁকা লাগবে বলে দিচ্ছি। সাবধান! ধবলপোড়া হয়ে যাবে একেবারে। হুঁ হুঁ বাবা যা তা জিনিষ লয়...

ফিকফিক করে হাসতে হাসতে ঘন্টা পিছিয়ে-পিছিয়ে রাস্তার ওপারে চলে গেল। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল ছবিটা মা কালীর দিব্যি, জ্যান্ত হলে বেশ মজাই হত!

আরে ইয়ার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ হাসছ দেখি যে!

ঘন্টা মুখ ফেরাল। সেই রিকশোওলাটা। অল্পস্বল্প আলাপ আছে মাত্র। রিকশোটা একপাশে দাঁড় করিয়ে সীটে পা তুলে হেলান দিয়েছে গদীতে। রোগা কাকের মত ঝিমোচ্ছে। গুঁফো রিকশোওলাটাকে বেশ ভালই লাগে ঘন্টার। যেচে পড়ে আলাপ করে। পথে কখনও দেখলে একটু হেসে ঘাড় দুলিয়ে যায়।

ঘন্টা কাছে গেল।...বসে আছো দেখছি। ভাড়া বইছ না আজ?

না রে-দাদা, জিরোচ্ছি।

এমন অল্পস্বল্প মুখচেনা যা আলাপ অনেক লোকের সঙ্গেই হয়েছে ঘন্টার। কিন্তু শহরের লোকগুলোকে সবসময় তার মতলববাজ মনে হয়। তুখোড় বেহায়া লাগে। রূপপুরে তুখোড় মাতাল রসিক প্রকৃতির অনেক লোক অবশ্যি আছে। কিন্তু তারা খুব আপনজন। এরা বড় দূরের মানুষ।

তবে এ রিকশোওলাটা একটু অন্য-রকমের। ঘন্টার খারাপ লাগে না কথা বলতে। সে সীটে হাত রাখতেই পা তুলে নিল রিকশোওয়ালা। ঘন্টা বলল, হ্যাঁ গা, আজ কত কামালে?

ছেড়ে দাও ইয়ার! রিকশোওয়ালা হাফ-প্যান্টের পকেট থেকে কৌটো বের করল।... শয়তানের চাককা ঠেললে বুঝতে, কী চিজের পাল্লায় পড়েছ। সুখ নেই রে দাদা... লাও, বিড়ি খাও।

বন্ধুতার প্রতীক বিড়িটা খুব যত্ন করে নিল ঘন্টা। সিগ্রেটটা ফেলে দিল। রিকশোওয়ালা যেন বড় স্নেহে জ্বলন্ত কাঠিটা দুহাতের তালুর ভিতর রেখে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।

খুব ভালো লাগছিল ঘন্টার এ বয়সে আর এই বিদেশে বন্ধু-বান্ধব না হলে মানুষ বাঁচেনা। সে হাসছিল।...আমার বড় ইচ্ছে করে রিকশো চালাতে। শিখিয়ে দেবে? বলব দিদিঠাকরানকে একখানা কিনতে। দেবে বৈকি। খুব ভালো মেয়ে-মানুষ উনি।......

খবর্দার, খবর্দার! ও চেষ্টাটি করো না। লাং ফুটো হয়ে যাবে। রিকশোওয়ালা বুকে তর্জনী সংকেত করল।...আরে ইয়ার, তুমি তো বড় জায়গায় আছো। ওই বাড়িতে, তাই না?

ঘন্টা মাথা নাড়ল।

বুঝেছি। দেখেই মালুম হয়, খুব বড়-লোক-টোকের মেয়ে হবে। তুমি বুঝি গেরাম থেকে এয়েছ ওনার বাড়ি? এবার ঘন্টা লীলার কথা না বলে পারে না। রূপ-পুরের আদ্যোপান্ত বর্ণনাও করতে হয় তাকে। তারপর সে ইসমাইল রিকশোওলার রিকশো চেপে শহর প্রদক্ষিণ করতে বেরি-য়েছে। আজ তার ছুটির দিন। ইসমাইল বলছিল, গেরাম ছেড়ে শহরে এসেছ। মৌজ করো এনতার। শয়তানের চাক্‌কায় চেপে কাঁহা কাঁহা ঘোর। আমি শালা ইসমাইল, আমিও একদিন গেরামে ছিলাম হে ইয়ার। হালচাষ করতাম। সে কি আজকের কথা?... তবে দোস্ত, গেরামে থাকলে আমাকে ভিক্ষে করতে হত। বলছি বটে শয়তানের চাককা—এই শালাই আমাকে বাঁচিয়েছে জানো। হাঁ, এ আমার জানের দোস্ত। চালাও বনবন শনশন...। সব

(ক্রমশঃ)

করলা নদীর উপর পশু ও মানুষের মৃতদেহ ভাসতে দেখা যাচ্ছে। পেছনের দিকে ভেঙে পড়া বাড়ীগুলি।

দেশে বিদেশে

কোজাগরী রাত্রিতে বানভাসি

"নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্তীতিভাষিণী। তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ।"—নিশীথ রাত্রে বরদাত্রী দেবী লক্ষ্মী এসে প্রশ্ন করেন, কে জেগে আছ? রাত্রি জেগে যে আজ পাশা খেলছে তাকেই আমি আজ বিত্ত দেব। এই হোল কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রির ইতিকথা।

উত্তরবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের এবার-কার কোজাগরী রাত্রি কেটেছে জাগরণে। কিন্তু কোন বরদা লক্ষ্মী তাদের কাছে বিত্ত নিয়ে আসেন নি।

কেননা, ঐ পূর্ণিমার রাত্রিতে আকাশে চাঁদ ছিল না, ছিল কাল মেঘ। আর সেই রাত্রি লক্ষ্মীর অধিকারে ছিল না, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষগুলির পক্ষে সেই রাত্রি ছিল অলক্ষ্মীর অধিকারে। আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি, বাঁধভাঙা বান আর পাহাড়-ভাঙা ধস মানুষগুলিকে মৃত্যু ও ধ্বংসের বিভীষিকার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল।

ঐ বিপর্যয়ের সপ্তাহখানেক পরেও মৃত্যু ও ধ্বংসের সম্পূর্ণ পরিমাপ করা যায় নি। কিন্তু যেটুকু জানা গেছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে, ভয়াবহতায় ও ব্যাপকতায় এই বিপর্যয়ের তুলনা পাওয়া ভার। অসম্পূর্ণ সংবাদেই দেখা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। দার্জিলিং জেলায় ৬৪১ জন, জলপাইগুড়ি জেলায় ৬৪৩ জন ও কোচবিহার জেলায় ৪৬ জন, মোট ১৩৩০ জন—এই হচ্ছে ১১ অকটোবর পর্যন্ত মৃতের সর্বশেষ সরকারী হিসাব। শেষ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা যে কত দাঁড়াবে তা বলা কঠিন। হাজার দুয়েক ছাড়িয়ে গেলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। সরকারী হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ও দোমোহানি অঞ্চলে হাজার পাঁচেক মানুষ নিখোঁজ।

পুজার মাতন যখন চলছিল তখনই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বিজয়ার পর সেই বৃষ্টি নামল মুষলধারায়। ৪ অকটোবর ঘটল প্রলয়। ধস নামল, বাঁধ ভাঙল, তিস্তা, তোড়শা, করলা, কালজানি, লিশ, ঘিস, চেল, সরু তারের জালের মত বিছান উত্তরবঙ্গের সব নদী একসঙ্গে ফুঁসে উঠল। পাহাড়ের গা বেয়ে যেসব ঝোরা নামে সেগুলি ফুলে-ফেঁপে উঠল। সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে এল বড় বড় পাথর। তারপর সেই পাথর যখন নদীর খাত ভরাট করে তুলল তখন পাগলা নদী নিজের তৈরী বাধা নিজেই ভাঙবার জন্য মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিস্তা

নদীর সেতু—যার হিসাব নদীর গর্ভ থেকে ৫০ ফুট উঁচুতে সেই সেতু জলের তোড়ের মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দার্জিলিংয়ের সঙ্গে সমতলের পথের যোগ ছিন্ন হয়ে গেল। পুজোর ছুটিতে যাঁরা গিয়েছিলেন বেড়াতে এমন হাজার হাজার মানুষ আটক পড়লেন। রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর তখন দার্জিলিংয়ে ছিলেন। তিনি ধসের চেহারা দেখার জন্য বেরিয়ে ঘুম শহরের পর আর এগোতে পারলেন না—রাস্তা বন্ধ। দার্জিলিং জেলার আর এক শহর কালিম্পং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেখানে খাবার জিনিসের টান পড়বে বলে আশঙ্কা দেখা দিল। মহানন্দার জল শিলিগুড়ি শহরের একটি বস্তীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কোচবিহার জেলায় দুটি মহকুমা—মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ীতে এত জল দাঁড়িয়ে গেল যে, ঐ দুটি মহকুমা জেলা সদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জেলার ডেপুটি কমিশনার হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়েও মেখলিগঞ্জে নামতে পারলেন না; কেননা, হেলিকপ্টার নামাবার মত এক টুকরাও শুকনো জায়গা তিনি খুঁজে পেলেন না।

সবচেয়ে বড় আঘাত এল জলপাইগুড়ির উপর। তিস্তা নদীর ধারে এই শহরে গভীর রাত্রির অন্ধকারে অকস্মাৎ বাঁধভাঙ্গা বান এল। পাহাড়ী নদীর জল সরতে অবশ্য দেরী হল না। কিন্তু জল যখন সরল তখন দেখা গেল, শহরজোড়া মরা মানুষ আর মরা গরু-বাছুর পড়ে আছে, কয়েক ফুট উঁচু পলিমাটিতে বাড়ী-ঘর-দুয়ার সব ভর্তি, বিদ্যুৎ নেই, কলের জল নেই, সরকারী শাসনযন্ত্র বলতেও কিছু নেই। যারা মরেছে তাদের সৎকার করার লোক নেই, যারা বেঁচে আছে তাদের ক্ষুধার অন্ন নেই, পিপাসার জল নেই।

এই যেখানে জলপাইগুড়ি শহরের অবস্থা সেখানে মফস্বল অঞ্চলের কথা না বলাই ভাল। ঐ অঞ্চলের পুরো খবর পেতে বেশ কিছু সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে। আপাতত, খবর এই যে, দোমোহানিতেই পাঁচ শ মৃতদেহ জলে ভাসতে দেখা গেছে। আলিপুরদুয়ারেও শ'খানেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে বলে খবর আছে।

এই বন্যায় একমাত্র রেলওয়ের যে ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ দুই কি তিন কোটি টাকা হবে। দুই কি তিন হাজার একর চা-বাগিচা ভেসে গেছে। নাহরকাটিয়া থেকে বারৌনীতে তেল নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পাইপ-লাইন আছে বন্যার তোড়ে সেটি ভেঙ্গে গেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এত বড় একটা প্রলয় ঘটাতে রুদ্র প্রকৃতির ঘণ্টা দুয়েকের বেশী সময় লাগে নি।

বন্যায় স্ফীত পাহাড়ী নদীর জল যখন নীচে নামছে তখন ভাটির জেলাগুলি অবশ্য কিছুটা সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তা না হলে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বিপর্যয় আরও ভয়াবহ হতে পারতো। আত্রেয়ী নদীতে জলস্ফীতির ফলে অবশ্য বালুরঘাট শহরে নদীর ধার থেকে বহু লোককে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে নিতে হয়েছিল। ঐ দুই জেলারই কিছু কিছু অংশ বন্যায় ভেসেছে। মাঠের ফসলেরও কিছু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অন্যান্য তিনটি জেলার তুলনায় ঐ ক্ষতি খুব বড় নয়।

এবারকার এই বন্যা শুধু যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাও নয়। বিহারে কুশী নদীর বাঁধ ভেঙ্গেছে, বাগমতী, কমলা-বালান, গণ্ডক ও অন্যান্য নদীতে বান ডেকেছে। রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্রের মতে, বন্যায় সহরষা, পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা ও মুঙ্গের জেলায় এক হাজার বর্গমাইল এলাকা ও দশ লক্ষের বেশী মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

আসামে ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী সঙ্কোশ ও গঙ্গাধরে বন্যার ফলে গোয়ালপাড়া জেলার গোসাইগাঁও ও গোলকগঞ্জ থানা প্লাবিত হয়েছে। ৫০ জন মারা গেছে, ৩০ হাজার গৃহহারা হয়েছে।

প্রকৃতি তার ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে সিকিম, ভুটান ও পূর্ব পাকিস্থানের উপরও। ভারত সরকারের কাছে যে রিপোর্ট এসেছে তাতে প্রকাশ যে, সিকিমে ধসের ফলে ১০৭ জন মারা গেছে। তাদের মধ্যে ২৫ জন ভারতীয় সৈনিক ও ৩২ জন তিব্বতী শরণার্থীও আছে। ৯ অকটোবর তারিখে সিকিম ও ভুটানের জন্য নিযুক্ত পলিটিক্যাল অফিসার শ্রীএন বি মেনন বলেছেন, "সিকিম একটা দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে।" ভুটানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সেখানে খাদ্যদ্রব্য ও সরকারী চিঠিপত্র উপর থেকে ফেলে দেওয়ার জন্য ভারতীয় বিমান বহরের সাহায্য নিতে হয়েছে।

পূব পাকিস্থানের দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় বন্যায় অন্ততঃ ৫৭ জন মারা গেছে ও ৩০ লক্ষ লোক দুর্গতির কবলে পড়েছে।

এই ভয়ঙ্কর দুর্গতির মধ্যে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষ দুটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন :—বান আসার সম্ভাবনা সম্পর্কে সময় থাকতে সরকারী হুঁশিয়ারী দেওয়া নি কেন এবং বিপন্ন মানুষের প্রয়োজনের
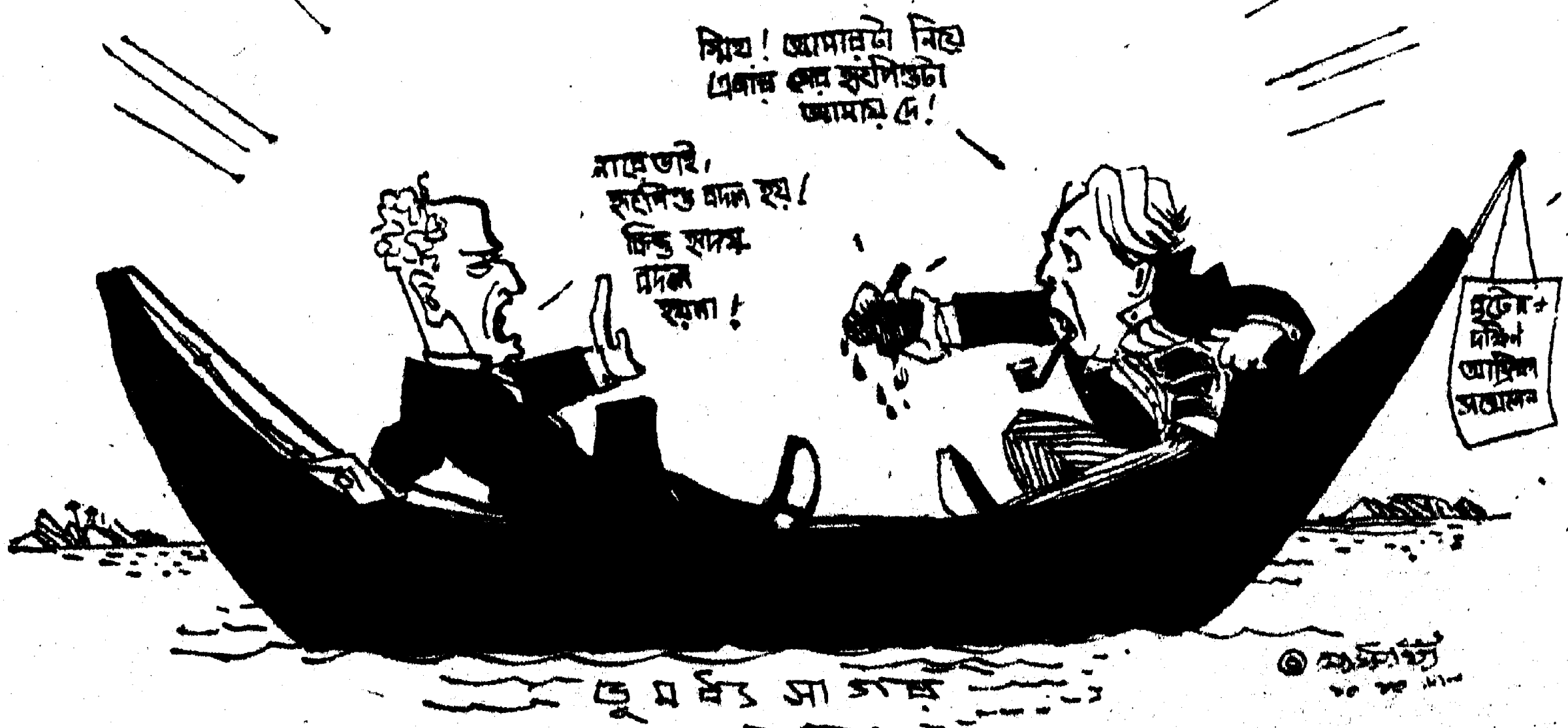
সময় সরকারী প্রশাসনযন্ত্র এমনভাবে ভেঙে পড়ল কি করে?

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছেন যে, বায়ুর নিম্নচাপের ফলে যে হিমালয় অঞ্চলে দারুণ বর্ষা নামতে পারে সেকথা তাঁরা ৩ তারিখেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেনা বিভাগও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বলে প্রকাশ। ৪ঠা অকটোবর তারিখে এ বিষয়ে একখানি টেলিগ্রাম যে জলপাইগুড়িতে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে এসে পৌঁছেছিল তার প্রমাণও আছে। গোটা শহরকে অন্ততঃ নদীর ধারের এলাকার মানুষদের সাবধান করে দেওয়া যেত। কিন্তু পুজোর ছুটিতে সরকারী অফিস বন্ধ থাকার দরুণই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক তা করা হয় নি। সংসদের সদস্য শ্রীএম পি রায় বলেছেন যে, ৪ঠা তারিখ দুপুর বেলায়ই তিনি পুলিশ সুপারিণ্টেন্ডেন্টকে টেলিফোন করে জানতে চেয়েছিলেন তিস্তা নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কথা সত্যি কিনা। পুলিশ-সুপার তাঁর কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই রাত্রেই বন্যা এসেছে।

সময়মত সতর্ক করে দেওয়া যেত কিনা এবং দেওয়া হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী ডাঃ কে এল রাও নিজে। তিনি উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল দেখেও গেছেন।

আর একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই নিজে জলপাইগুড়িতে এসে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার চেহারা দেখে গেছেন। উত্তেজিত মানুষ শ্রীদেশাইয়ের গাড়ীতে ঢিল ও কাদা ছুঁড়েছিল, তাঁকে কাদার মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তিনি শহর ঘুরে এসে বাগডোগরায় বিমানে ওঠার আগে সংবাদিকদের বলেন, 'মানুষের উত্তেজিত হওয়ার কারণ আছে। দুর্যোগের ছয় দিন পরে তিনি জলপাইগুড়ি শহরে এসেছিলেন। তখনও শহরে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয় নি। তখনও শহরের রাস্তা থেকে লাশ সরান হয় নি। শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের প্রশ্নের জবাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তর-বঙ্গ বিভাগীয় কমিশনার বলেন যে, জলপাই-গুড়িতে বেসরকারী অধিবাসীদের মত সরকারী কর্মচারীরাও বিপন্ন হয়েছেন। কিন্তু শ্রীদেশাই এটাকে সরকারী গাফিলতির সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলের প্রাক্তন নেতা শ্রীখগেন দাশগুপ্তও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার অভিযোগ করেছেন। (বন্যার সময় তিনি জলপাইগুড়িতে ছিলেন। ঘরের চাল ফুটো করে কোনরকমে দড়ি দিয়ে টেনে বার করে তাঁর প্রাণ রক্ষা করা হয়েছে।) উত্তরবঙ্গে সৈন্যবাহিনী বিপন্ন মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিমান বাহিনীর বিমান ও হেলিকপ্টার অবরুদ্ধদের উদ্ধার করেছে, তাদের কাছে খাদ্য পৌঁছে দিয়েছে। পরিবহণ বিমান ও ট্রাক দিয়ে তাঁরা সাহায্য করেছেন। সামরিক ইঞ্জিনীয়াররা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করেছেন। সামরিক ডাক্তাররা প্রতিষেধক টীকা দিয়েছেন। শিলিগুড়ির তরুণেরা প্রতিবেশী জলপাই-গুড়ির বিপদে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন সেটা সকলের প্রশংসা লাভ করেছে। কিন্তু জলপাইগুড়ির অসামরিক জেলা কর্তৃপক্ষ এই বিপদে উপযুক্ত দায়িত্ববোধ ও তৎপরতার পরিচয় দিতে পারেন নি, এই ক্ষোভ সেখানকার মানুষের মনে অনেক দিন থাকবে।

জলপাইগুড়ির মেডিক্যাল ওয়ার্ডের কাছে বিপুল সংখ্যক মানুষের গলিত মৃতদেহ আটকে পড়েছে।

*

উত্তরবঙ্গের এই বিপর্যয়ের একটা ফল হয়েছে এই যে, পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচনের তারিখ তিন মাস পিছিয়ে গেছে। কলকাতায় রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি-দের সঙ্গে এবং রাজ্যপাল ও সরকারী অফি-সারদের সঙ্গে আলোচনা করার পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রীএস পি সেনবর্মা ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এই নির্বাচন বিহার ও উত্তর প্রদেশের সঙ্গে একই সময়ে অর্থাৎ আগামী বছর ফেব্রু-য়ারী মাসে হবে। ফেব্রুয়ারী মাসের ঠিক কোন্ তারিখে নির্বাচন হবে সেটা তিনি এই মাসের শেষে জানাবেন।

ধস সরাবার কাজে মেয়েরা

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

পরিকল্পনার আগে

উপ-প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের পরে দিল্লীতে ফিরে এসে সাংবাদিকদের কাছে জানান যে, ডিসেম্বরের শেষের আগে জানা যাবে না আমেরিকা ভারতকে কি পরিমাণ সাহায্য দেবে। তাঁর কথা থেকে মনে হয় তিনি সাহায্যের ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাননি।

ডিসেম্বরের আগে জানা না যাবার একটা কারণ নভেম্বর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

এর অর্থ হল এ বছরের জন্যে ভারত আমেরিকার কাছে যে ২৩ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য চেয়েছে তা পাবার আশা নেই। অর্থাৎ এবছর ভারত আমেরিকা থেকে সাকুল্যে ৩৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাচ্ছে। এই ৩৫ লক্ষ টনের প্রতিশ্রুতি এবছরের প্রথমার্ধে দেওয়া হয়েছিল।

এর জন্যে অবশ্য ভারতও খানিকটা পরিমাণে দায়ী। গত বছর খাদ্যশস্যের ফলন বেশ ভালো ছিল। তার ভিত্তিতে সরকার আশা করেছিলেন যে, অতিরিক্ত খাদ্য না পেলেও চলবে। কিন্তু সম্প্রতি বেশ কয়েকটি রাজ্যে খরার দরুন অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু আমেরিকার পক্ষে তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

স্বভাবতই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বছরের বাজেট ও চতুর্থ পরিকল্পনার রূপরেখায় কিছু কিছু অদলবদল করার দরকার হতে পারে।

৮ অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এই বিষয়ে কিছুটা আলোচনা হয়। শ্রীদেশাই সভায় বলেন যে, ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ আর বাড়ানো তাঁর ইচ্ছা নয়। সরকার ইতিমধ্যেই ৩০০ কোটি টাকার মতো ঘাটতি ব্যয় করে ফেলেছে। সুতরাং নতুন করে ঘাটতি ব্যয় বাড়ানোর আগে খুব সতর্কভাবে বিবেচনা করা দরকার।

শ্রীদেশাই ওয়ার্কিং কমিটিকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, তাঁরা যেন বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে কোনো উচ্চাশা পোষণ না করেন। তিনি বলেন, সাহায্যের পরিমাণ হয়ত গত বছরের চাইতে কম হবে না, কিন্তু যা আশা করা গিয়েছিল, তার চাইতে অনেক কম হবে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ওপরেই জোর দিতে হবে।

ওয়ার্কিং কমিটির ঐ বৈঠকে স্থির হয় যে, আভ্যন্তরীণ সম্পদের সংগ্রহ কিভাবে বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে শ্রীদেশাই শীঘ্রই রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। প্রশাসনিক খরচ কিভাবে কমানো যায় তা-ও বিবেচনা করা হবে। কমিটি মনে করেন, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে ও রাজ্যে কর্মীদের দ্বিত্ব যাতে না ঘটে তা বিশেষভাবে দেখা দরকার।

সেই সঙ্গে কমিটি আরও বলেন যে, বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তার দরুন চতুর্থ পরিকল্পনার কোন কোন বিষয়ের প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা স্পষ্টভাবে নিরূপণ করতে হবে। কমিটি নিজে মনে করেন জলসেচ, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও জল সরবরাহ করার ওপরেই জোর দেওয়া উচিত।

জলসেচের ব্যাপারে কমিটির সুপারিশ হল, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কেবল এমন প্রকল্পই রূপায়িত করতে হবে যার দ্বারা তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। তবে ক্ষুদ্র সেচের ওপরেই জোর দেওয়া উচিত। এর জন্যে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎশক্তির দরকার হবে, সুতরাং গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ওপরেও সমান অগ্রাধিকার দিতে হবে।

গত কয়েক বছরে কৃষি উন্নয়নে যে গতিবেগ সঞ্চার করা সম্ভব হয়েছে তা অব্যাহত রাখার জন্যে কি কি কাজ করে যাওয়া দরকার তা নিরূপণ করতে হবে। নতুন কৃষি কর্মসূচীকে যদি সফল করতে [illegible] কৃষকদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। সেই সঙ্গে খরা-প্রতিরোধী খাদ্যশস্যের জাত উদ্ভাবনের জন্যে গবেষণার কাজও যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়েই চালিয়ে যেতে হবে।

সিঁড়ি

তপন দাশ

একটা কাঠের সিঁড়ি ভেঙে উঠছিলাম। মাঝে মাঝে পা টলছিল। ওপরে লিসার খিল-খিল হাসি। সে বলে উঠল—এসো, এসো। তবে সামলে। আহা, চৈ-চৈ, প্রাণের পাতিহাঁস। আমি খানিকটা উঠে একটু করে থমকে দাঁড়িয়ে দম নিয়ে নিচ্ছিলাম। ফুস-ফুসে জোর কমে গেলে এমনি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার কসরতে ভীষণ কষ্ট হয়। লিসা একটা খাটো গাউন পরেছিল। গায়ে সোনালী রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ। অকারণ হেসে গড়িয়ে পড়ছে চাইছে ছুঁড়িটা। চৈ-চৈ, এসো, এসো। আরো কতকগুলো ওর বয়েসি তামাটে রঙের ছুঁড়ি যোগ দিয়ে হেসে হেসে মজা দেখছিল। আমার বন্ধু টম ব্রাউনকে মনে মনে একটা খিস্তি করলাম। হারামজাদা আমাকে এই খুকুমণিদের আখড়ায় ভিড়িয়ে দিয়েছিল। ভিড়িয়ে নিয়েই কাট। কথা ছিল জয়েন্ট পার্টনার হয়ে ফুর্তি করবো, অথচ। আমি এখনো সিঁড়ি ভেঙে ল্যান্ডিং-এ পৌঁছুতে পারছি না। বিড়বিড় করে কি একটা বললাম। লিসা আমায় হেসে

উঠলো। হাসলে লিসার বাঁদিকের গজ-দাঁতটা ঝিলিক মারে। বেশ লাগে লিসার হাসিটা। প্রত্যেকবার চুমু খাবার সময় ওর গজ-দাঁতে জিভটা বুলিয়ে নিই। বেশ ধারালো- অনুভূতি। ঠোঁট কামড়াই। লিসা অস্ফুট শব্দ করে ওঠে। আমি তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ওকে পিয়ানোর রীডের ওপর বসিয়ে দিই। একটা মিশ্র শব্দের ঝঙ্কার ছড়িয়ে পড়ে। লিসা হাত-পা ছুঁড়ে খিলখিল হেসে ওঠে। বগলে সুড়সুড়ি দিলে গালাগাল করে। বলে--বীস্ট। তারপর পিয়ানো থেকে তুলে নিয়ে লিসাকে দলা পাকিয়ে ডিভানের ওপর ফেলে দিই। স্প্রিংয়ের দোলায় বারকয়েক ওপর-নিচে ওঠানামা করে থেমে যায়। নট নড়নচড়ন মড়ার মতো মটকা মেরে পড়ে থাকে। আমি ওর ওপর সোজা ডাইভ দিই। চতুর লিসা গড়িয়ে একপাশে সরে যায়। ডিভানের ওপর ধপাস্ করে উপুড় হয়ে পড়ি। লিসা আমার পিঠে দমাদ্দম কিল মারে। আমি তখন পাল্টা খিস্তি করি। ইচ্ছে হয় একেবারে ময়দামাখা করে দলা পাকিয়ে ছাড়বো। লিসা মজা পেয়ে খিল-খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। আমি চিৎ অবস্থা থেকে কনুইয়ের ভরে উঠে পড়বার চেষ্টা করতে গেলে লিসা আমার ওপর উল্টো ডাইভ মারে। বেলেল্লা উল্লাসে আঁচড়ায় কামড়ায়। আমার শার্টের বোতাম খুলে দিয়ে বুকের ওপর উল্কি আঁকা পরীটার গায়ে তর্জনীর সরু নখটা ছুঁইয়ে বলে—এক্ষুনি ফুটো করে দোব। ইট উইল পেনিট্রেট ইনটু ইয়োর হার্ট। আমি বেশ ভয় পেয়ে যাই।

অথচ সেই পা ফস্কে যাচ্ছিল বারবার। আমি কিছুতেই সিঁড়ি ভেঙে লিসার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারছিলাম না। ওরা দল বেঁধে খিল-খিল করে হাসছিল।

হাসলেই লিসার পাগল-করা বুকখানা যেন থিরথির করে কাঁপে। প্রথমে আমার বিশ্বাস হয়নি। লিসাকে প্রথম দেখি টম ব্রাউন অ্যাণ্ড হিজ অর্কেস্ট্রার সঙ্গে। শুনেছিলাম একটি মেয়ে নাচবে। নাম লিসা সাপিরো। মুঠো-মাপের কোমর আর ভয়ংকর বুকের দারুণ ফিরিস্তি দিয়ে ব্রাউন আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল। বলেছিল, এমন সরেস জিনিস লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। এনচ্যান্টিং। তুমি আমার পুরোনো বন্ধু। আমার অর্কেস্ট্রার দারুণ খ্যাতি। মেয়েটা আমার বেজায় ন্যাওটা। অতএব বুঝতেই পারছো ও তোমায় লুফে নেবে। তাছাড়া বাঙালী ছোকরাদের ওপর ওর একটু বেশি দুর্বলতা। বাঙালীরা কবিতা লেখে। জন্মসূত্রেই নাকি রোমান্টিক। আমার বিবেক একটু নাড়া খায়। টম ব্রাউন বললে—গেট ইজি। ব্যাচেলার জীবনে একটু আধটু এধার-ওধার না হলে ভেজাটেড হয়ে যাবে জীবন। সেক্স স্টার্ভড্ হয়ে অনেকে পাগল হয়ে যায়। সারাজীবন মেলানকোলিয়ায় ভোগে। আমার একজন বাঙালী বন্ধু কবিতা লিখতো। নাম শুনেছো বোধহয়। অশেষ বসু। বন্ধ পাগল হয়ে গেছে। ক'দিন আগে তোমাদের কলেজপাড়ার কফি হাউসে দেখলাম উদ্‌ভ্রান্তের মতো বসে আছে। মাঝে মাঝে মেয়েদের নামে বেধড়ক খিস্তি করছে। তাহলে—

আমি এককথায় রাজী হয়ে গেলাম। কতো খরচ পড়বে?

টম ব্রাউন বলল, নো ম্যাটার। আগে চলো। আলাপ করো। পছন্দ হোক তারপর।

তারপর থেকেই সিঁড়ি ভাঙা শুরু। আমার বন্ধু দস্তিদার আমাকে বলেছিল, সেদিন থেকেই আমার অধঃপতনের আরম্ভ। এক-একটা সিঁড়ি ভেঙে নামতে হবে নরকের দিকে। দি হেল! আমাকে নরক সম্পর্কে অনেক ভীতিজনক উপকথা শুনিয়ে ছিল দস্তিদার।

লিসা! মুঠো-মাপের কোমর আর লোভনীয় বুক। আমি বলেছিলাম—ওটা ফলস্। নকল ভঙ্গি। ওই তো সরুমতো শরীর। টম ব্রাউন আমার হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিসিয়েছিল—নো, ব্রাদার। একেবারে জেনুইন।

তারপর লিসার অ্যাপার্টমেণ্টে যখন গেলাম, তখন রাত গভীর। টম ব্রাউন টোকা মারলো দরজায়। সেকেণ্ড-কয়েকের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। লিসা বললে,—এসো। কি ভাগ্য আঙ্কেল টম। এসো। সঙ্গে কে? লিটল্ ইম্প। নিশ্চয়ই বাঙালী। খুব মজা!

বাঙালীদের যেরকম অ্যাভারেজ উচ্চতা থাকা উচিত আমার তাই ছিল অথচ লিসার মুখে 'লিটল ইম্প' কথাটার অর্থ কি? যাই হোক, আমি কিছু মনে করিনি। যে-কোন সুন্দরী মেয়ে যা খুশী বলুক। তাতে আমার ভালোই লাগে, কিছু মনে করি না।

লিসা বলল—তোমরা বোসো। আমি চান সেরে আসি। লিসা অ্যাটাচড্ বাথরুমে ঢুকে পড়লো। ভেতর থেকে ঝর্ণা খুলে দেবার আওয়াজ পাওয়া গেল। আর একটা গুন-গুন শব্দ। গান গাইছিলো লিসা—কে সারা—সারা—রা—

টম ব্রাউন জিগ্যেস করল—কেমন লাগছে?

আমি বললাম—এক্ষুনি কি করে বলব। সবে তো দুটো মুখের কথা খসেছে। ইতিমধ্যে লিসার ঘরখানা জরিপ করছিলাম। দেখলাম, লিসার বেশ রুচি আছে ঘর সাজানোর। একটা পিয়ানো। একটা ডিভান। রেডিওগ্রাম। একটা ওয়ার্ডরোব। দেয়ালতাকে কিছু বই। ছয়-চার মাপের লিসার প্রোফাইল ফটোগ্রাফও যত্ন করে বাঁধানো রয়েছে। একটা জায়গায় গ্রুপ ফটোও দেখলাম। ব্যাকগ্রাউণ্ডে উড়োজাহাজ রেখে একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে লিসা এবং অচেনা একজন পুরুষ। লিসাকে জড়িয়ে ধরে আছে। দুজনের মুখেই হাসি। ওই ছবিটাতেই আমার চোখ অকারণে আটকে গেল।

টম ব্রাউন বলল—হার্বার্ট সাপিরো। লিসার হাজব্যাণ্ড। এভিয়েশনে কাজ করতো। সাত বছর বেপাত্তা। কোন খোঁজ-খবর নেই। যাক্। আমার দুশ্চিন্তা কাটলো।

একটু পরে লিসা বেরিয়ে এলো। দারুণ ফ্রেস লাগছে। শিশিরে ভেজা ফলের মতো। বাথসল্টের মিষ্টি হাল্কা গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। বেশবাস ঢিলেঢালা। আমি সম্মোহিতের মতো লিসার মাংসময় অস্তিত্বের দিকে কিছুক্ষণ চোখ পেতে রাখলাম। লিসার চোখ এড়ায়নি। ও এক-ঝলক মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিল।

টম ব্রাউন এগিয়ে গেল। লিসার কানে কানে কি যেন বলল। শুনতে শুনতে লিসার চোখদুটো উজ্জ্বল হল। তারপর হঠাৎ ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে হেসে উঠলো। একরাশ কাচের বাসন ভেঙে পড়ার শব্দ যেন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

আচ্ছা! তাই বুঝি! আবার বেদম হাসতে থাকল লিসা। আমি বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি দুজনের দিকে। বেটপকা আমার একটা হাত ধরে টান মারলো লিসা।

চলে এসো। হানি আমার। লিটল ইম্প। কুইক। চলে এসো। আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের সংলগ্ন পার্টিশান-করা পোশাক বদলানো খুপরীর মধ্যে। আমি সম্মোহিতের মতো ওকে অনুসরণ করলাম। টম ব্রাউন হাসছিল খিক খিক করে। বলল—যাও। গো মাই বয়। বী ব্রেভ।

সেই খুপরী ঘরের মধ্যে তারপর লিসা খুট করে আলো জ্বালিয়ে দিল। আমি এক স্বপ্নের জগতে ঢুকলাম। এক ধরনের আশ্চর্য অনুভূতি জাগল। রক্ত কেমন চঞ্চল হল।

এমন খোলামেলা। সামান্য কয়েক ইঞ্চ তফাতে এক যুবতীর উদম শরীর আমাকে বিমূঢ় করে দিল। আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল। আমি স্থাণু হয়ে গেলাম পাথরের পুতুলের মতো। লিসা তারপর জোর করে আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বলল—বি স্টেডি...

হঠাৎ মনে হলো লিসা কেমন অস্বাভাবিক ঢঙে কথা বলছে। কি যেন হয়ে গেছে লিসার। আমি একছুটে সেই খুপরী ঘর থেকে বড় ঘরটায় চলে এলাম। পিছন পিছন আদুড় গায়ে লিসাও ছুটে এলো আমাকে ধরবার জন্যে। ধরো। ধরো। পালাচ্ছে। চোর। ডাকাত। বলেই সেই খিল-খিল হাসি। দেখলাম ব্রাউনও হেসে গড়িয়ে পড়ছে। চেয়ারে বসে বেমক্কা হাত-

পা হড়কেছে। এক সময় আমিও হেসে ফেললাম।

তবু সেই সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারছি না। পা টলছে। সিঁড়ির হাতলটা নড়বড় করছে। লিসাকে দেখতে পাচ্ছি। ওর সর্বাঙ্গটা সোনালী পোশাকে মোড়া। লিসা হাসছে। আমাকে ডাকছে। চলে এসো। চৈ-চৈ পাখিহাঁস। আমি খুব আস্তে এক-একটা সিঁড়ি ভাঙছি এক-এক যুগ ধরে। কতটা উঠলাম আর কতটা উঠতে বাকি কিছু বুঝতে পারছি না। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যে দৌড়ের মত। প্রাণপণে ছুটছি অথচ কিছুতেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারছি না। প্রত্যেকটা সিঁড়ির ধাপে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হচ্ছে। একটা বিশাল পিয়ানোর রীডের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার অনুভূতির মত মনে হচ্ছে। দেখলাম লিসার সোনালী স্কার্টের নিচে ধপধপে ফর্সা পায়ে চিকন সোনালী রোমের আভা। লিসা সবচেয়ে ওপরের সিঁড়ির ধাপে বসে পা দোলাচ্ছে। আরো অনেকগুলো মেয়ে লিসার অনুকরণ করছে। হাসছে। হাত-পা ছুঁড়ছে। সবার অপলক্ষ্মা। কেউ কেউ সিঁড়ির হাতল বেয়ে হড়কে নেমে আসবার চেষ্টা করছে। আমাকে সমস্বরে সবাই ডাকছে হাততালি দিয়ে। চলে এসো। চৈ-চৈ পাখিহাঁস। আমি এগোবার চেষ্টা করছি আর আমার পা ফসকে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করলাম—উঃ,

টম ব্রাউন। আমার দোস্ত। দস্তিদার। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তোমরা আমাকে সাহায্য কর।

দস্তিদার আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিল একদিন। বেড়াল-কুকুর বৃষ্টির দারুণ দুর্যোগ মাথায় করে লিসার অ্যাপার্টমেণ্টে এসে হাজির হয়েছিল। দরজায় টোকা মারতে প্রথমে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতে চাইনি। লিসা বলল, দেখাই যাক না। দরজার মুখেই ভিজে কাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল দস্তিদার। কিছুদিন আগে একটা ছবিঘরে দস্তিদার লিসার সঙ্গে আমাকে একত্রে আবিষ্কার করে চমকে উঠেছিল। আমি খুব সহজভাবেই লিসার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। লিসা চিনতে পারলো দস্তিদারকে। আহ্বান করে ঘরে ডাকলো—কাম ইন।

লিসার আহ্বানে কোন সাড়াই দিল না দস্তিদার। একটা ভদ্রসূচক নড্ পর্যন্ত করলো না দেখে আমার খুব খারাপ লাগল। ও লিসার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সরাসরি আমার দিকে চেয়েই বলল—আমি বসতে আসিনি বা এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমোদ করবার জন্যেও না। আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। দেশ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। তোমার বাবার শরীর ভালো নয়। যদি শেষ দেখা দেখতে চাও, তাহলে এখনই যেতে হবে।

হাজার হলেও মেয়েমানুষের মন তো। অপমানটা খুব গায়ে মাখেনি লিসা। হয়ত দস্তিদারকে খাতির করবার জন্যেই লিসা কফি তৈরী করতে গেল।

আমি দস্তিদারকে বললাম,—এবার আসল খবরটা ঝটপট বলে ফেল। বাবা মৃত্যুশয্যায়। মা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। কোন চিন্তা নেই। টাকার প্রয়োজন হলে জানাও এবং তোমার ইচ্ছাতেই সবকিছু হবে। ইত্যাদি খবরে কাগজী বিজ্ঞাপনের খসড়া তৈরী করে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছো। কেন বলতো? আমি বেশ আছি। প্রয়োজন হলে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে যেতে পারেন আমার পূজনীয় পিতৃদেব। আমার কোন দুঃখ নেই। আমি বেশ আছি।

দস্তিদার আমার মুখের দিকে তাকাল। যেন ব্রহ্মতেজে চোখ দিয়ে আগুন-টাগুন বের করে আমাকে তৎক্ষণাৎ ভস্ম করে ফেলবে। তারপর চোখের সেই অগ্নিবর্ষী ভাবটাকে কিছুটা ঠাণ্ডা করে বলল,—এভাবে চলাটা ঠিক হচ্ছে না। তোমাদের ফ্যামিলির কতবড় ঐতিহ্য। নামডাক ইত্যাদি। সেই ফ্যামিলির ছেলে হয়ে এমনি একটা নোংরা জায়গায় দিনের পর দিন পড়ে থেকে জীবনের মূল্যবান সম্ভাবনাকে সমূলে বিনষ্ট করছ। তাছাড়া এমনিভাবে অন্ধকারে তলিয়ে যাবার অধিকার আমার নেই। আমার জন্যে একটা ঐতিহ্যপূর্ণ ফ্যামিলির মুখে কালির পোঁচ লাগবে সেটাও ঠিক নয়। এবম্বিধ বহুপ্রকার নেতিবাচক শব্দপ্রয়োগে আমার মধ্যে একটা সংশোধনমূলক ওলোট-পালট ঘটাবার চেষ্টা করে অবশেষে ব্যর্থ হয়ে দস্তিদার আমাকে একচোট বিশুদ্ধ বিশেষণ আর অভিশাপ ইত্যাদি দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। বলে গেল—তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ। আজ ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছে, তোমাকে এতদিন বন্ধু বলে ভেবেছি বলে। আর কখনো দেখা হবে না। এমনি একটা হলপ করতে করতে দস্তিদার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। লিসা কফি তৈরি করে নিয়ে এসে দেখল—দস্তিদার পগার পার। লিসা হেসে বলল—মানুষটা বেজায় রগচটা। আর খুব অর্থডক্স। আমি লিসাকে আদর করে বললাম,—আমি তো নই।

দস্তিদার বলে গিয়েছিল, আর আসবে না। কিন্তু আবার এসেছিল। কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি ভেঙে সন্তর্পণে উঠে এসে লিসার দরজায় মৃদু ধাক্কা দিয়েছিল। একটা নোংরা সিঁড়ির মধ্যে অন্য একটা সাফল্যের সিঁড়ির সন্ধান করতে দস্তিদার তার আবাল্যলালিত সংস্কারের মাথায় সুপুরী পিটিয়ে চলে এসেছিল। নইলে উপায় ছিল না।

আশ্চর্যভাবে আমার পা-দুটো আজ বিকল মনে হচ্ছে। অথচ সিঁড়ি ভেঙে অর্ধেকেরও বেশি উঠে এসেছি। বাকিটুকু কিছুতেই উঠতে পারছি না। মনে মনে ভাবছিলাম,—লিসা যদি একটু সাহায্য করে হাত ধরে টেনে তুলে নেয়। না হয় ও যা খুশি বলুক আজ। ছোট পাতিহাঁস বলুক। বড় পাতিহাঁস বলুক। রান্না করে খাওয়ারও অকেজো পাতিহাঁস বলুক। তাতেও আমি কিচ্ছু মনে করব না। উঁচুতে বসে লিসা পা দোলাচ্ছে। চোখে-মুখে কৌতুক ঝরে পড়ছে। চিৎকার করছে, ম্যারাথন দৌড়ের প্রতিযোগীকে যেমন করে উৎসাহিত করে। চিয়ার আপ। চিয়ার আপ। একটু দম নিয়ে শেষ ফার্লং। সমাপ্তি সুতোর বুক ছুঁইয়ে তারপর হাঁসফাঁস করো। অজ্ঞান হও। দেখা যাবে।

আমি সিঁড়ি ভাঙা প্রতিযোগিতায় মাঝামাঝি এসে আটকে গেছি। আর মাত্র সামান্য ক'টা সিঁড়ি উঠে কিছুতেই আমার এনডিওরেন্স শেষ করতে পারছি না। বারবার শুধু নিজের মনে বলছি,—লিসা, প্লিজ আমাকে তুলে নাও। আমার পা টলছে। চোখের সামনের যা-কিছু হঠাৎ ঝাপসা হয়ে আবার স্পষ্ট হচ্ছে। ভিউ-ফাইণ্ডারে ফোকাস—আউট-অফ-ফোকাস-এর মতো। অথচ এমন কিছু আহামরি নেশা করিনি। যেমন রোজ হয়, তেমনি। টম ব্রাউন আমার চেয়ে ঢের বেশি খায় কিন্তু বেশ স্টেডি থাকে কি করে? আশ্চর্য। ব্রাউন বলছিল,—মদে আর ওকে কাবু করা যাচ্ছে না। সম্প্রতি কোন কোন বিদেশী ভবঘুরে ছোকরা নাকি একরকম ক্যাপসুল আমদানি করেছে যাতে নাকি মোক্ষম নেশা হয়। খালাসীটোলার এক বাঙালী পোয়েট বন্ধু হদিশ দিয়েছে। জিনিসটা জোগাড় করে তাই একদিন খাব।

দস্তিদারটা বেশ আছে। নেশাটেশার বালাই নেই। একপাত্র চা-ও খায় না। মাঝে মাঝে কফি-কোকো হলে খায়, ওতে ফুড-ভ্যালু আছে বলে। সেই রেগেমেগে চলে যাবার পর বেশ অনেকদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। শুনেছি, এর মধ্যে বিয়ে-থা করেছে।

লিসার কাছেই এসেছিল দস্তিদার। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে দরজায় টোকা দিয়েছিল। ঘুমঘুম চোখে লিসা দরজা খুলেই অবাক। ভেবেছিল কে আবার জ্বালাতন করতে এলো রাত্রিবেলা। দেখলো সামনেই একগাল অভাবনীয় হেসে হাত কচলাচ্ছে দস্তিদার। আমি তখন লিসার ঘরের মধ্যে পোশাক বদলাবার খুপরীটির মধ্যে আধো ঘুম আধো জাগা অবস্থায় পড়ে আছি। টম ব্রাউনের সেই অলৌকিক ক্যাপসুলের আধখানা গিলে স্বর্গীয় স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাবার অপেক্ষা করছিলাম।

খোলা অফার দিলো দস্তিদার। পাঁচশো টাকা। কারেন্সী নোট পাঁচখানা। লিসা খাতির করে দস্তিদারকে ঘরে বসালো। দস্তিদার ভক্ত গড়ুরের মতো লিসার কোলের কাছে বসে ওর হাতদুটো নিজের হাতে চেপে ধরলো। বল তো, আরও দু-একশো বেশি দেব। মাত্র এক রাত্তিরের জন্যে। লোকটা বড় হোটেলে উঠেছে। খুশি করতে পারলে আমার ভবিষ্যৎটা রোদ্দুরে ঝলমল করে উঠবে।

লিসা অনেকক্ষণ ভেবে শেষপর্যন্ত নিমরাজী হয়ে গেল। তারপর কি ভেবে বলল,—দুটো দিন পার হলে খুব ভালো হতো। মনে ছিল না আজ আটাশ তারিখ। আমার তখন অন্য সময়। কথাটা বলেই লিসা কেমন গেরস্ত বাড়ির মেয়েরা যেমন বরের কাছে সোহাগিনী মুখ করে লাজুক হয়, তেমনি ভঙ্গী করল। তারপর বলল,—ঠিক আছে। ম্যানেজ করে নেব। নোট পাঁচখানা খামচে নিয়ে লিসা বলল,—আরো তিনশো চাই। কবে পাবো?

আগামী কাল তিন সত্যি করে উঠে পড়ল।

লিসা বাধা দিয়ে বলল,—বসে যেতে হবে। আজ একটু খাতির করব। সামান্য কফি অথবা স্কোয়াশ। অন্যকিছু যখন চলে না।

দস্তিদার ভালমানুষের মত ঘাড় নেড়ে বলল,—তাহলে একপাত্র কফিই হোক। না, না কমলা লেবুর সরবতই ভাল।

লিসা ফ্রিজ খুলে এক গ্লাস স্কোয়াশ এনে দিল।

সরবৎটা কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে নিয়েই দস্তিদার উঠে পড়ল। তাহলে ঐ কথাই রইল।

লিসা বলল,—আর একটা অনুরোধ। একটা কথার জবাব দেবে দস্তিদার?

কি কথা?

আমায় তুমি খুব ঘেন্না কর। তাই না?

কে বলল? সার্টেনলি নট্। ঘেন্না করতে যাবো কেন।

সত্যিই ঘেন্না করনা তাহলে?

না, এই তোমায় গা ছুঁয়ে বলছি। দস্তিদার লিসার হাতটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল।

তাহ'লে একটা কথা রাখবে?

একশোটা। বলো, কি কথা?

আমায় একটা চুমু খাও।

দস্তিদার লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে গেল না, ভয়ে সিঁটিয়ে গেল বোঝা গেল না। শুধু লিসার দিকে মুখটা এগিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে রইল।

ওদের চুমু খাবার দৃশ্যের মধ্যেই আমি সেই খুপরীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম। ওরা বিচ্ছিন্ন হ'লো।

হ্যালো, দস্তিদার! সাবাস্ বেটা। ডুবে ডুবে শুধু জল খাওয়া নয় একেবারে সমুদ্দুর শুষে নেবার চেষ্টা। শুধুই ওপর-ওপর না তলে তলে বালি খুঁড়ে কাঁকড়া খোঁজার খেলাও হ'য়ে গেছে। দস্তিদার তিন লাফে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নিচে নেমে গেল। লিসা এক লাফে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে শব্দ ক'রে হেসে উঠল। অন্য যে কোন সময় লিসা হেসে উঠলে আমিও ওর হাসিতে যোগ দিই। কে জানে কেন আমার মোটেই হাসি পেল না আজ। মাথাটা কেমন হঠাৎ খুব হাল্কা বোধ হলো। বোধহয় সেই ক্যাপসুলটার ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। এরপরই তো সেই নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের মধ্যে পরীরা হাজির হবে। আমি লিসাকে অস্ফুটভাবে বললাম,—আমাকে বিছানায় নিয়ে চলো। আমার রক্তে আগুন ধ'রে যাচ্ছে।

টমের খবর অনেকদিন পাইনি। ও আজকাল এদিক মাড়ায় না। লিসা বললে,—টম্ ব্রাউন অ্যান্ড হিজ্ অর্কেস্ট্রার বাজার মন্দা। দলের লোকগুলো অন্য জায়গায় বেশি মাইনেয় চলে গেছে। লিসাও নাচে না আজকাল। সারাদিন লিসার ঘরে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা কোন একটা নির্জন বার-এ গিয়ে সময় কাটাই। আমার সমস্ত খরচ লিসা চালায়। আমার কোন আপত্তি শোনেনি। অথচ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, লিসার সঙ্গে আমার হৃদয়-বিনিময় অথবা যাকে ভালোবাসা বলে তার কোনটাই হয়নি। শুধু ওকে রাত্রে বিছানায় প্রয়োজন হ'লে হয়ত তুরীয় অবস্থায় কখনও ব'লে থাকবো 'ভালোবাসি'। লিসা সেটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে কিনা জানি না। তবে ওর কাজে কথায় বুঝতে পারি কোথায় একটা ওর বুকের কোন বিশেষ কৌটোয় আমার জন্যে আলাদা জায়গা আছে।

হঠাৎ একদিন টম্ ব্রাউন এসে হাজির। উদ্‌ভ্রান্ত উসকো-খুসকো চেহারা। এমনিতে সৌখিন লোকটার জামা-প্যান্টে প্রচুর নোংরা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লিসার কাছে দাবী করল,—টাকা দাও। হিস্সার টাকা। কমিশন।

লিসা আকাশ থেকে পড়লো,—কিসের কমিশন?

কথায় কথায় ঝগড়াটা চরমে উঠলো। লিসাকে খারাপ খারাপ গালাগাল দিতে দিতে নিচে নেমে গেল। হাজার হলেও আমার এক গেলাসের ইয়ার। পুরনো বন্ধু। পেছন পেছন নেমে গেলাম ওকে বোঝাতে। টম্ ব্রাউন সেদিন অবিশ্বাস্য আলাদা মানুষ। কোন কথাই ব'ললে না। উল্টে কাল্পনিক একটা পাওনা খাড়া ক'রে বলল,—দিয়ে দে আমার পাঁচশো টাকা। ধার নিয়েছিলি, মনে নেই?

লিসা আমার পক্ষ নেবার জন্যে তৈরীই ছিল। গর্জে উঠে বললো, একটা কানাকড়িও দেবে না মিথ্যুকটাকে। বেইমান। মনে নেই আমাকে মূলধন ক'রেই ওর যতো জারি-জুরি। নইলে টুপি উল্টে ফুটপাতে ভিক্ষে করতে হতো। মনে নেই। গেট-আউট। এখুনি বেরিয়ে যাও। আর কখনো এমুখো হবে না। হলে কুকুর লেলিয়ে দেব।

শেষবার আর টম্ ব্রাউন লিসার কথার কোন প্রতিবাদ করল না। নিঃশব্দে চলে গেল।

সিঁড়ির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আমার অতীত, আমার বর্তমান। কখনো ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর অথবা দারুণ বৃষ্টি। প্রচন্ড বজ্রপাত। ভূমিকম্প প্রলয়ের অনুভূতি। অনুভূতির মধ্যে একটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার বারম্বার ব্যর্থ চেষ্টা। সিঁড়িটা কোথায় উঠে গেছে সে হদিশও আমার জানা নেই অথচ সিঁড়িতে আরোহণের অবদমন, যা, যখন খুশি আমার স্বপ্নের মধ্যে এসে রক্তে দারুণ চাঞ্চল্য জাগিয়ে দেয়। একটা অজ্ঞাত রহস্যময় সম্মোহন আমাকে যেন প্রতি মুহূর্ত নিয়ন্ত্রণ করে। একটা সিঁড়ি অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। একটা নির্দিষ্ট ল্যান্ডিং-এর পরে আর কিছু নেই। চারদিক ফাঁকা টুকরো ছাদের মতো। সেই ফাঁকা ছাদের কার্ণিসে বসে লিসা সোনালী পোষাক পরে পা দোলাচ্ছে। সিঁড়ির মাঝপথে দাঁড়িয়ে (যেখান থেকে ওপরে ওঠা আর নিচে নামা যায় না) হঠাৎ মনে হয় আমি সেই চত্বরে গিয়ে পৌঁছেছি। লিসা হাসতে হাসতে পিছিয়ে যাচ্ছে। তারপর কার্নিসের মারাত্মক কিনারায় গিয়ে পৌঁছলাম। একটা রোমহর্ষক অনুভূতি। খুব নিচে পিঁপড়ের মতো মানুষ। খেলনার মতো মোটরগাড়ি। ডবল-ডেকার। ট্রাম। কঠিন পেভ্‌মেন্ট্। সমস্ত কিছু চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করল। মনে হল সবকিছুর মধ্যে একটা ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষ বেঁধে যাবে এখনি। পৃথিবীর শেষ দিনটিই বুঝি আজ। কালো পোষাক পরা একটা লোক ঘড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। একটা যন্ত্রের লিভার বাগিয়ে ধরে আছে যমদূতের মতো মানুষ। কিসের নির্দেশের অপেক্ষা ক'রছে। একজন মানুষ এসে আমার মুখের ওপর একটা কালো আবরণ চাপিয়ে দিয়ে গেল। অন্ধকার। কোন সিঁড়ির কথা আর ভাবছি না। লিসার মুখটা মনে পড়ল। আমার স্বর্গত পিতার তন্বি বিধবার মুখ। যাকে কোনদিন 'মা' বলে ডাকতে পারিনি। আজ হঠাৎ অস্ফুটভাবে একটা শব্দ বেরিয়ে গেল আমার মুখ দিয়ে,—'মা'। তারপর কালো আবরণের ভেতরেই চিৎকার করে উঠলুম,—দেরি হচ্ছে কেন? তাড়াতাড়ি করো। লিভারটা টেনে দাও। একবার লিসাকে দেখতে পেলে ভালো হোত। কিন্তু কোথায় লিসা! একটা হাস্যকর হেড্‌লাইন চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো,—একটি নৃশংস হত্যাকান্ড। লিসা নাম্নী একজন নর্তকীকে তার অ্যাপার্টমেন্টে...... ইত্যাদি।

পাতালের আলো

লক্ষার্পণ রায়

লাবণ্য

সমুদ্রে লবণ, মাটিতে লবণ, লবণ চোখের জলে। সহজে লভ্য এবং সুলভ। সবাই এক নজরে চিনি। তা নিয়ে আলোচনা করতে চান?—ভুরু কুঁচকে বললেন শ্রীমতী ল—।

আমি হেসে বললাম, সবার চেনা হলেও সবচেয়ে প্রাচীন। তা ছাড়া মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। কাজেই আমার এই প্রবন্ধ।

কুটিলতর হয়ে ওঠে শ্রীমতী ল—র ভ্রুকুটি। তিনি বললেন, জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য বলেই আমাদের আলোচনায় ক্ষেত্রে পরিহার্য। রান্নাবান্না ও ঘরকন্না ছাড়া আর কোথাও লবণকে সইতে পারব না।

আমি বললাম, কিন্তু যীশুখৃষ্ট মানুষকে পৃথিবীর লবণ বলে সম্বোধন করেছেন। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে মানুষকে এত বড় মর্যাদা কেউ কখনো দেন নি। প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম ও মধ্য এশিয়ার লোকেরা ভগবানকে সম্বোধন করত অন্ন ও লবণদাতা বলে। প্রাচীনকালে লবণের বাণিজ্য চলত ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে। লবণ বোধ হয় মানুষের প্রথম বাণিজ্যপণ্য। লবণ চালান দেওয়ার জন্য প্রাচীনকালে অনেক সড়ক তৈরি করা হয়েছিল। ইটালি, লিবিয়া ও দক্ষিণ রাশিয়াতে অনেক প্রাচীন পথের নিদর্শন আজও দেখা যায়, যে পথ দিয়ে লবণের বাণিজ্য চলত। প্রাচীনকালে লবণ পণ্য হিসেবে খুবই মূল্যবান ছিল। গান্ধার দেশের বণিকরা কাশ্মীরের দামী নীলার বিনিময়ে লবণ কিনতেন। খাদ্যপ্রাণ না হলেও লবণ খাদ্যের প্রাণ, খাদ্যের আত্মা। প্রতিদিনের ব্যবহারে তার সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য নিষ্প্রভ হলেও লবণ আমাদের জীবন। আমাদের অতিরিক্ত চেনা বলে তাকে চেনার চেষ্টা করি নে। অথচ মামুলী সাদামাটা লবণের মধ্যেও অনেক বিস্ময় আছে। প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে লবণ এত মূল্যবান ছিল যে প্রাচীন আবিসিনিয়া ও তিব্বতে লবণের চাক্তি দিয়ে মুদ্রার কাজ চালানো হত—রোমান সৈন্যদের মাইনের টাকার সঙ্গে দেওয়া হত লবণ ভাতা।

না, না, লবণ চলবে না।—জোরালো গলায় বলে ওঠেন ল—।—দোহাই আপনাকে, আমাদের সাহিত্যবাসরকে লবণাক্ত করবেন না।

আমার লাবণ্যের প্রবন্ধটা আমি পকেটে রেখে দিতে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সকলে মানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন নাগপুরবাসী বাঙালী। মাসে একবার সমবেত হয়ে তাঁরা সাহিত্যালোচনা করেন। আলোচনা সাধারণতঃ সাহিত্যকে উপলক্ষ করে হলেও ব্যাপারটা মূলতঃ আড্ডা। মাঝে মাঝে তাতে গুরুগম্ভীর আলোচনা হলেও মজলিসী গল্পগুজবেই সকলের পক্ষপাত।

আমার 'লবণ' বর্জিত হলে পর আহূত হলেন প্র—তাঁর স্বরচিত রচনা পাঠের জন্য। রচনা তাঁর তৈরি ছিল না, কাজেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন তিনি।

প্র—বললেন, লবণ সম্বন্ধে আপনারা শুনতে চান না—আমিও কিন্তু লবণ সম্বন্ধেই বলব ভেবেছিলাম। লবণ মানে লবণ-পাহাড়। বাইশ বছর আগে পশ্চিম পাঞ্জাবে খেওড়ার লবণ-পাহাড়ে কাজ করতে গিয়ে আমার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। লবণে যখন আপনাদের উৎসাহ নেই, তখন তার কথা হয়তো শুনতে আপনাদের ভাল লাগবে না।

ভাল লাগবে না কেন, নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।—ল—কলস্বরে বলে ওঠেন।—লবণে অরুচি হলেও লবণ-পাহাড়ের গল্পে আপত্তি নেই আমাদের। বলুন না আপনি।

প্র—বলে চলেন:

লবণ-পাহাড়ের গল্প বলার আগে লবণ সম্বন্ধে কিছু বলি। লবণের লাবণ্যের স্বাদ তো আপনারা পেয়েছেন, কিন্তু খনিজ লবণের খবর হয়তো রাখেন না। এদেশে খনিজ লবণ পাওয়া যায় হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডিতে। এখানে মাটির নীচে লবণ গম্বুজের আকারে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। লবণের গম্বুজ তেলের খনিতেও পাওয়া যায়। মাটির নীচে তা পাললিক শিলাস্তরকে ভেদ করে ওঠে। জায়গায় জায়গায় বেলে পাথর, চুনাপাথর বা কাদা-পাথরের সঙ্গে লবণের স্তর স্তরীভূত হয়ে থাকে। অবশ্য লবণের প্রধান উৎস হল সমুদ্র ও লবণাক্ত হ্রদ। তাই খনিজ লবণ সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ নেই কারুরই। তথাপি লবণের খনি পৃথিবীর অনেক জায়গায় আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশ খনিজ লবণে রীতিমত লবণাক্ত।

পশ্চিম পাঞ্জাবের খেওড়াতে লবণ-পাহাড় আছে। সেখানে বেলেপাথর, কাদা-পাথর প্রভৃতি পাললিক শিলার সঙ্গে লবণের স্তর স্তরীভূত হয়ে আছে। জায়গাটি প্রায় বৃষ্টিবিহীন, কাজেই সঞ্চিত লবণের জলে দ্রবণের সম্ভাবনা নেই। লবণ এখানে অবাধে জমে জমে পাহাড়ের আকার নিয়েছে।

জলের অভাবে লবণ জমেছে, কিন্তু মাটি হয়ে উঠছে রিক্ত। জলের অভাব মাটিকে যেমন নিষ্ফলা করেছে, তেমনি লবণও হরণ করেছে মাটির লাবণ্য। লবণ মাটিতে মিশে থেকে মাটির প্রাণশক্তি শুষে নিয়েছে। নির্জলা ও লবণাক্ত অন্তঃসার-শূন্য মাটিতে লাবণ্যের কোন স্বাক্ষর পড়ে নি। জায়গাটা প্রায় মরুভূমির মতই রিক্ত। জায়গায় জায়গায় অবশ্য রিক্ততার বক্ষ ভেদ করে উঠেছে ছোট ছোট কাঁটা ঝোপ।

খেওড়ার লবণ-পাহাড়ে খুব প্রাচীন কালের খনির নিদর্শন দেখা যায়। আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাবে পা দিয়ে খেওড়ার লবণের খনির খবর পেয়েছিলেন। লবণ-পাহাড় থেকে তখন প্রচুর পরিমাণে লবণ খুঁড়ে বের করা হত। প্রাচীন খননকে অনুসরণ করে বর্তমান কালের খনিবিদরা খনির চালনা করেছেন।

খনির ইতিহাস খুব পুরনো হলেও লবণ-পাহাড়ের লবণের ভাণ্ডারের পুরো খবর নেওয়া হয়ে ওঠে নি। তাই ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল এবং আমাকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে। লবণ-পাহাড়ের যে অংশে প্রাচীন বা আধুনিক খনির কোন চিহ্ন নেই, প্রথমে সেখানে গেলাম। জায়গাটি নির্জন, কাছাকাছি কোন লোকালয় নেই। লোকজনের কোন স্থায়ী বসতি না থাকলেও অবশ্য যাযাবর শ্রেণীর কিছু লোক সেখানে অস্থায়ীভাবে তাঁবু খাটিয়ে বাস করছিল। তাদের একটি শিবিরের কাছে আমি আমার তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প করলাম।

আমার কার্যকলাপ দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠে যাযাবরের দল। সুদূর বাংলাদেশ থেকে লবণের মত সাদামাটা জিনিস খুঁজতে এসেছি জেনে রীতিমত কৌতুক বোধ করে তারা। লবণ তাদের কাছে সাদা মাটি ছাড়া কিছু নয়। খাদ্যদ্রব্যে লবণ দেওয়া তাদের কাছে বন্যতার সামিল। লবণ সম্পর্কে তাদের মনে কিছু বদ্ধমূল সংস্কারও আছে। লবণ খেলে নাকি লবণের মর্যাদা রাখতে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। কারুর দেওয়া লবণ খেলেই নাকি তার সঙ্গে সম্পর্ক পাকা করে তোলা হয়। সে সম্পর্ক সহজ সখ্যতার নয়, দায়িত্বের। কাজেই তাদের খাদ্য তালিকা থেকে লবণ বাদ পড়েছে। তাদের প্রধান খাদ্য হল মাংস ও ফলমূল, প্রধান পানীয় দুধ। মাংস ঝলসে তারা লবণ ছাড়াই খায়।

যাযাবর শ্রেণীর অনেক জাতের মধ্যেই লবণের চলন নেই। আরবের কোন কোন বেদুইন সম্প্রদায় সম্প্রতি লবণ খেতে শুরু করেছে। কয়েকটি প্রাচীন উপজাতিও এতকাল লবণ স্পর্শ করে নি। তাদের মধ্যে আছে দক্ষিণ ভারতের টোডা সম্প্রদায়। হালে তারা লবণ পাতে নিয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন যে, কৃষির সঙ্গে লবণের ব্যবহারের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। কৃষিজাত শস্য কাঁচা খাওয়া যায় না, রান্না করে খেতে হয়। রান্না করা শস্যজাত খাদ্যে লবণের পরিমাণ এতই কম যে তাতে লবণ না মেশালে তা মুখেই দেওয়া

যায় না। অথচ পশুর দেহে লবণ থাকে যথেষ্ট পরিমাণে। মাংস ঝলসে খেলেও তাতে লবণের স্বাদ পাওয়া যায়। অতএব কাঁবই লবণকে আকর্ষণ করেছে মানুষের খাদ্য তালিকায়। কৃষির সঙ্গে যাযাবরদের কোন সম্পর্ক নেই, কাজেই লবণ সম্বন্ধে তারা স্পর্শকাতর।

খেওড়ার লবণ-পাহাড়ের যাযাবররা লবণ স্পর্শ না করলেও লবণ সম্পর্কে তাদের মনে প্রবল কৌতূহল ছিল। বিশেষ করে যারা তরুণ বয়সী, নিষিদ্ধ বস্তু বলে লবণ সম্বন্ধে প্রবল আকর্ষণ ছিল তাদের মনে। তাদের অনেকেই আমার ক্যাম্পে আসত এবং লবণ-পাহাড় থেকে যে সব নমুনা আমি সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলি নেড়েচেড়ে দেখত।

যারা আমার ক্যাম্পে আসত, তাদের মধ্যে ছিল ওদের সম্প্রদায়ের সর্দারের মেয়ে। মেয়েটি একদিন আমার কাছে লবণের স্বাদ কী রকম তা জানতে চাইল। আমি তাকে বললাম যে স্বাদ মুখে বোঝানো যায় না—মুখে দিয়ে বুঝতে হয়। আমার কথামত মেয়েটি খানিকটা লবণ আমার কাছ থেকে নিয়ে মুখে দিল।

মেয়েটিকে লবণ খেতে ওদের সম্প্রদায়ের কেউ না দেখলেও মেয়েটির বাবা টের পেয়ে গেল। কী করে টের পেল তা অবশ্য আমি বুঝতে পারি নি। হয়তো আমার ক্যাম্পের চাকরদের মধ্যে কেউ তাকে বলে থাকবে। মেয়ে আমার
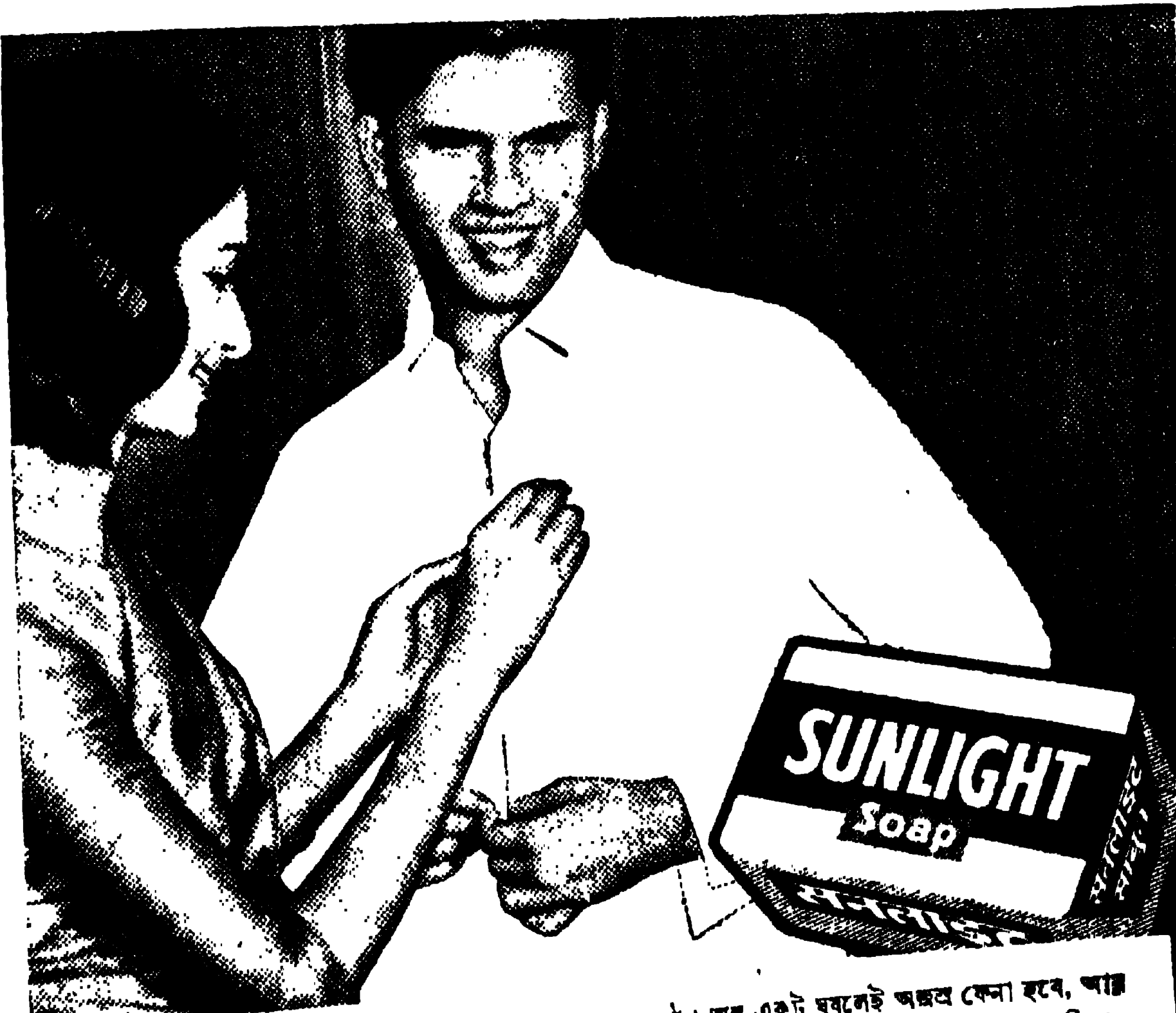
দেওয়া লবণ খেয়েছে জানা মাত্র তার বাবা আমার তাঁবুতে এসে হাজির হল। আমাকে সে বললে যে লবণ খাইয়ে তার যুবতী মেয়ের নাকি জাত মেরে দিয়েছি আমি। আমার নুন খেয়েছে বলে মেয়েটির নাকি আমার ঘর ছাড়া আর কোথাও ঠাঁই নেই। আমার দেওয়া নুনের স্বাদ নিয়েছে বলে আমি ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই নাকি তার শাদি হতে পারে না। সর্দার আমাকে শাসালো যে তার মেয়েকে যদি আমি শাদি না করি, আমার রক্তের স্বাদ নেবে সে তলোয়ার দিয়ে আমার বুক চিরে। তার কথা শুনে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে ওঠে।

তারপর!—সভার সকলেই প্রায় সমস্বরে বলে ওঠে।

ল—বললেন, আপনার স্ত্রীকে তো খাঁটি বঙ্গললনা বলে জেনে এসেছি। তিনি যে মরুচারিণী ছিলেন তা তো জানতাম না।

প্র—হেসে ফেলে বললেন, মরুচারিণী হতে যাবেন তিনি কোন দুঃখে! রীতিমত আচারনিষ্ঠা বঙ্গরমণী তিনি—আচার-বড়িতে তাঁর প্রবল আসক্তি। বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষাই তিনি জানেন না, যদিও আমার সঙ্গে অনেক দেশ ঘুরেছেন।

তা' হলে সেই সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করতে হয় নি আপনাকে!—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ল—।—কিন্তু অব্যাহতি পেলেন কী করে?

—মেয়েটিই আমাকে অব্যাহতি দিল। আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনার কথা শোনামাত্র সে তাদেরই সম্প্রদায়ের একটি ছেলেকে নিয়ে পালাল। পালিয়ে যে কোথায় গেল তার হদিস সর্দার পায় নি। তাদের খোঁজে কান্দাহার পর্যন্ত সে ধাওয়া করেছিল, কিন্তু ধরতে তাদের পারে নি।

[illegible]

স্বর্ণজাল

সিংভূম জেলার গালুডিতে ক্যাম্প করে সুবর্ণরেখা নদীর দুধারে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় ব্যস্ত ছিলাম। পাথরের স্তরে স্তরে সন্ধানী দৃষ্টিপাত করলেও নির্দিষ্ট কোনও খনিজ খুঁজছিলাম না। পাথর পরখ করছিলাম বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসের জন্য।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাজের শেষে তাঁবুর সামনে ডেক চেয়ার পেতে বসে আছি, এমন সময় একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের যুবক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। যুবকটির পরনে একটি ছেঁড়া ময়লা সুট। কিন্তু পোষাকের ম্লানতা তার চোখের দীপ্তিকে নিষ্প্রভ করতে পারে নি। তার চোখ দুটি সর্বদাই জ্বল জ্বল করে ভেতরের দাহকে প্রকাশ করছে।

আমার সামনে একটি ফাঁকা চেয়ার ছিল। তাতে বসে পড়ে সে বললে, আমার নাম প্রবীর পাল। আপাততঃ গালুডিতে আছি। শুনলাম এখানে আপনি জিয়োল-জিক্যাল সারভে করছেন। আমি নিজে জিয়োলজিস্ট না হলেও জিয়োলজির প্রতি আমার বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। জিয়োল-জিস্টরা জিয়োলজি করতে করতে জুয়েলের সন্ধান পেয়ে যান। অবশ্য জুয়েলের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। আমি চাই সোনা। প্রচুর পরিমাণ সোনা। বলুন দিকিনি এ অঞ্চলে সোনার খোঁজ কিছু পেলেন কী?

বলতে বলতে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রবীর পাল। তার জ্বলন্ত চোখ দুটির তাপমাত্রা হঠাৎ যেন বেড়ে গেল। আমি কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করি। তার দৃষ্টি এড়াবার জন্য মুখ নীচু করে আমি বললাম, সোনা তো পাই নি কোথাও। শোনা যায় সোনা সুবর্ণরেখা নদীর বালির মধ্যে আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নি।

চোখে পড়ে নি মানে!—প্রবীরের কণ্ঠস্বরে প্রবল উত্তেজনা।—এত সোনা কোথায় গেল বলতে পারেন? পাঁচ হাজার বছর ধরে লাখ লাখ টন সোনা মানুষ খনি থেকে খুঁড়ে বের করেছে। জানেন নিশ্চয়ই যে সোনার ক্ষয় নেই। যা অক্ষয়, তা নিশ্চয়ই উবে যেতে পারে না। তাছাড়া মানুষের কাছে সোনা চিরকালই মূল্যবান। এমন মূল্যবান জিনিস সে সযত্নে রক্ষণা-বেক্ষণ করবে এইটেই তো স্বাভাবিক। তা হলে পৃথিবীর সব সোনা কোথায় গেল বলতে পারেন?

উত্তেজনায় প্রবীরের সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে।

প্রবীরের মুখের পানে চেয়ে দেখি যে অস্বাভাবিক রকম তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে।

আমার সন্দেহ হল বুঝি তার মস্তিষ্ক পুরোপুরি সুস্থ নয়।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রবীর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে, কী মশাই, চুপ করে আছেন কেন? জবাব দিন।

আমতা আমতা করে আমি জবাব দিলাম, কী আর জবাব দেব বলুন! এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ আমি। আপনি বরং একটা কাজ করুন। পৃথিবীর কোথায় কত সোনা থাকা উচিত ছিল এবং কত আছে তার হিসেব করুন। তারপর দেখুন সত্যি সত্যি কত সোনা হারিয়ে গেছে। তার পরিমাণ ঠিক করে এই হারানো সোনার সন্ধান নিন।

প্রবীরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। হাসিটা নীরব, কিন্তু বিশেষ অর্থবহ। হাসতে হাসতে বললে সে, হিসেব কী নিই নি ভেবেছেন! নিস্তর বইপত্র ঘেঁটে মোটামুটি একটা হিসেব আমি দাঁড় করিয়েছি। আপনার বোধহয় জানা আছে, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সোনা খুবই প্রাচীন। ধাতুদের মধ্যে সর্বপ্রথম সোনাই মানুষের নজরে এসেছে। নব্য প্রস্তর যুগে, মানে তামা আবিষ্কার হওয়ার অনেক আগে নদীর বালির মধ্যে সোনার সন্ধান পেয়েছে মানুষ। ঐতিহা-সিকদের হিসেবে সে প্রায় সাত হা[illegible] বছর আগেকার কথা। তখন নদীর বাল[illegible] অনেক সোনা ছিল। বালির দি[illegible] তাকালেই সোনা চোখে পড়ত। [illegible] সুবর্ণরেখা নদীর বালিতেও নিশ্চয়ই প্র[illegible] সোনা ছিল। বালিতে সোনার প্রা[illegible] দেখেই বোধহয় সুবর্ণরেখা নাম দে[illegible] হয়েছিল।

বস্তুজগতে সোনা একমাত্র জিনিস [illegible] মানুষের দৃষ্টিতে আসামাত্র তার মন [illegible] করে নিয়েছিল। আদিম মানুষের সৌন্দ[illegible] বোধ বিকশিত না হলেও সো[illegible] সৌন্দর্যে তার মন মজেছিল। তাছা[illegible] বস্তু হিসেবে সোনার যে ক্ষয় [illegible] সোনাকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছি[illegible] আদিম মানুষের রুচি যতই স্থূল হে[illegible] না কেন, স্বর্ণসজ্জায় নিজেদের দেহ মণ্ডি[illegible] করে মন তাদের তৃপ্ত হয়েছে। আদিমত[illegible] থেকে শুরু করে আধুনিকতমা পর্য[illegible] পৃথিবীর সব দেশের সব মেয়ের ম[illegible] সোনা সম্পর্কে সমান পক্ষপাত দেখা গেছে। সোনা ভালবাসে না এমন নারীর ক[illegible] কোথাও শোনা যায় নি।

বস্তুজগতে সোনাই একমাত্র বস্তু [illegible] গোড়া থেকেই তার যথাযোগ্য মূ[illegible] পেয়েছে। যুগে যুগে অন্যান্য বিব[illegible] মানুষের মূল্যবোধ বদলালেও সোন[illegible] মূল্যমানের কোন পরিবর্তন কখনো ঘ[illegible] নি। মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তা এ[illegible] বস্তুর সীমা পেরিয়ে বস্তুর অতী[illegible] উপনীত হয়েছে, কিন্তু সোনা সম্পর্কে মানুষের সংস্কারের কোন পরিবর্তন ঘ[illegible] নি। সভ্যতার প্রথম প্রহর থেকে শু[illegible] করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সব[illegible] বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মানু[illegible] স্বর্ণমানকে মেনে নিয়েছে।

সোনা মানেই সমৃদ্ধি। সোনা[illegible] পরিমাণে সম্পদের পরিমাপ। কাজে[illegible] সোনা সঞ্চয়ের ঝোঁক মানুষের ম[illegible] সহজাত। আদিম আদমি থেকে শুরু ক[illegible] আধুনিক ধনিক ও নির্ধন সকলেই সো[illegible] সঞ্চয় করে সমৃদ্ধ হতে চেয়েছে।

আদিম সভ্যতাগুলির প্রায় সব[illegible] সোনায় মোড়া। সুদূর অতীতের বড় ব[illegible] সাম্রাজ্যগুলির সমৃদ্ধির পরিমাপ করা যা[illegible] তাদের স্বর্ণভাণ্ডার থেকে। প্রাচীন কা[illegible] দেবস্থানেও সোনা উৎসর্গ করার প্র[illegible] ছিল। অনেক পুরনো মন্দিরে প্রচু[illegible] পরিমাণে সোনা মজুত ছিল। ভারতবর্ষে অনেক দেবালয়েও সোনার ভাণ্ডার আছে।

প্রাচীন মানুষের মনে এই বিশ্বা[illegible] ছিল যে সোনা সম্পর্কে মানুষের আসক্তি মরলেও যায় না। তাই মৃত দেহের সঙ্গে সোনা সমাধিস্থ করার প্রথা ছিল। মিশরে ফারাওদের সমাধিস্থলে প্রচুর পরিমাণে সোনা পাওয়া গিয়েছে। প্রায় তিন হাজা[illegible] সাড়ে তিনশ বছর আগে মিশরের ফারা[illegible] ছিলেন টুটেনখামেন। অপরিণত বয়সে তাঁ[illegible] মৃত্যু ঘটে। তাঁর কবরের মধ্যে শবাধা[illegible] প্রায় দুশ হন্দর সোনা পাওয়া গিয়েছে।

প্রথম সোনা বের করা হয়েছিল নদী[illegible] বালি থেকে। তারপর শিলাস্তরে প্রচ্ছ[illegible]

স্বর্ণভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে মানুষ। সোনার প্রথম খনির পত্তন হয়েছিল মিশরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। নদীর বালি ও সোনার খনি থেকে অনেক সোনা তোলা হয়েছে। রাজা-রাজড়াদের স্বর্ণভাণ্ডার ও সমাধি এবং দেবালয়ে অনেক সোনা মজুত ছিল। হিসেব করলে মোট সোনার সঞ্চয়ের খুব মোটা একটা অংক পাওয়া যায়। কিন্তু এই অংকের সংগে পৃথিবীশুদ্ধ মোট যে সোনা আছে তার পরিমাণ আদৌ মেলে না। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে সঞ্চিত সোনার অধিকাংশ হারিয়ে গেছে।

আমি চাই এই হারানো সোনা উদ্ধার করতে।—চেয়ারের হাতলে বড় রকম ঘুষি মেরে প্রবীর বললে।—আপনারা জিয়োলজিস্টরা খুঁজছেন সোনার খনি, কিন্তু আমি এই হারানো সোনা খুঁজে বের করব। আমার স্থির বিশ্বাস যে যত না সোনা আপনারা খনি থেকে উদ্ধার করবেন, তার অনেক গুণ আমি এই সব হারানো সোনার ভাণ্ডার থেকে বের করে আনব।

হঠাৎ গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে এনে প্রায় আমার কানে কানে প্রবীর বললে, শুনুন মশাই, আমি এই হারানো সোনা উদ্ধারের জন্য একটি কোম্পানী করতে চাই। আপনি যদি চান তার অংশীদার হতে পারেন। শেয়ার বিক্রী শুরু করে দিয়েছি। আপনার ক'টা শেয়ার দরকার বলুন আমাকে।

আমতা আমতা করে আমি বললাম, সামান্য চাকরি করি, শেয়ার কেনার সামর্থ্য কী আর আছে আমার! আমার মতে সব শেয়ার আপনারই কিনে নেওয়া উচিত। সোনার শেয়ার কী কাউকে দেওয়া যায়!

—ঠিক বলেছেন আপনি, লাখ কথার এক কথা। সোনার শেয়ার কাউকে দেওয়া যায় না। সব সোনাই আমার। কাউকে ভাগ দেব না। কবি বলেছেন, 'একলা চলো রে' আমি একাই খুঁজব। কারুর সাহায্য চাই নে।

বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হন্-হন্ করে চলে গেল প্রবীর।

প্রবীর চলে যেতে ডাক্তার মাঝি এলেন। গালুডিতে তিনি ডাক্তারী করেন। প্রবীরের পরিত্যক্ত আসনে আসীন হয়ে ডাক্তার মাঝি বললেন, প্রবীর পাগলাটা এসেছিল না? এইমাত্র তাকে ঐ মাঠের মধ্য দিয়ে হন্-হন্ করে হেঁটে যেতে দেখলুম।

আমি বললাম, হ্যাঁ, এসেছিল। কিন্তু ছেলেটা কে বলুন তো? আগে কখনো দেখিনি।

ডাক্তার মাঝি বললেন, ছেলেটা খুব বড় একজন জমিদারের ছেলে। জমিদারী যেতে অবশ্য ওদের দৈন্যদশা শুরু হয়েছে। কলকাতার মস্ত এক বড়লোকের একমাত্র সুন্দরী মেয়ের সংগে প্রবীরের বিয়ে দিয়ে তার বাবা তাঁর আর্থিক দৈন্যকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরই ভদ্রলোক হঠাৎ মারা যান এবং যৌতুকের সব টাকা প্রবীরের হাতে আসে। সেই টাকা নিয়ে কী একটা ব্যবসায় মেতেছিল প্রবীর। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুরো টাকাটা লোকসান দিল সে। টাকা গেল, কিন্তু প্রবীর দমল না। স্ত্রীর যাবতীয় গয়না, সোনা ও জড়োয়া মিলিয়ে প্রায় লাখ টাকার হবে, বাঁধা দিয়ে সে টাকা ধার করে তার ব্যবসায়ে খাটাল। এই টাকাও অচিরে নিঃশেষ হল এবং ব্যবসাতে লালবাতি জেলে প্রবীর গালুডিতে ওদের বাগানবাড়িতে এসে বসবাস শুরু করল। যৌতুকের টাকার লোকসানটা প্রবীরের স্ত্রীর কাছে তেমন দুঃসহ ঠেকেনি, কিন্তু গয়নার লোকসান তার সইল না। সে প্রবীরকে ছেড়ে তার বাপের বাড়িতে চলে গেল। যাবার আগে প্রবীরকে বলে গেল যে, গয়নার পুরোটা যদি উদ্ধার করে আনতে পারে প্রবীর, তবেই সে ফিরে আসবে, নচেৎ নয়।

আমি বললাম, স্ত্রীর গয়নার বদলে তো সে বিশ্বসুদ্ধ হারানো সোনার সন্ধান করছে।

—বেচারা কী করবে বলুন! স্ত্রীর গয়না উদ্ধার তো সে নিজেকে বেচলেও করতে পারবে না। তাই লুপ্ত বা গুপ্ত সোনার সন্ধান করছে। সোনার উপরে বিস্তর পড়াশুনা, তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করেছে। সেই সংগে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরিও করেছে। এদিকে কপর্দকশূন্য অবস্থা, খেতে পর্যন্ত পায় না। পাঁচজনের দয়ার ওপরে নির্ভর করে বেঁচে আছে কোন মতে।

আমি বললাম, পাঁচজনে দয়া করছে—স্ত্রীর মনে কোন দয়া নেই!

ডাক্তার মাঝি বললেন, স্ত্রীর কাছে সোনার চেয়ে দামী যে কিছু নেই।

রূপসী রূপা

গিরিডি শহরের উত্তরে গিরিডি থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে বেঙ্গাবাদ নামে একটি বড় গ্রামে গিয়েছিলাম সীসা ও রূপার সন্ধানে। সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্ট মারফত জেনেছিলাম যে, বহু বছর আগে বেঙ্গাবাদের কাছাকাছি একটি জায়গায় গ্যালেনার খনি ছিল। গ্যালেনা সীসা ও গন্ধকের সমাহার। অল্পস্বল্প রূপাও তাতে মিশে থাকে।

বেঙ্গাবাদে গিয়ে শুনলাম যে, শুধু খনি নয়, গ্যালেনা থেকে রূপা ও সীসা নিষ্কাশনের আয়োজনও নাকি ছিল। খনি এখন নিশ্চিহ্ন—খনিজ থেকে যে ধাতু নিষ্কাশন হত, তারও কোন নিদর্শন নেই। অগত্যা স্থানীয় লোকেদের শরণাপন্ন হই।

স্থানীয় লোকেরা প্রায় সকলেই চাষী। মাটির ওপরে তারা ফসল ফলাতে ব্যস্ত—মাটির নীচের সম্পদ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তারা পরামর্শ দিল গ্রামের অতি বৃদ্ধ রায়বাহাদুর ঠাকুরের কাছে যেতে। রায়বাহাদুর ঠাকুর গ্রামের বিস্তর জমিজমার মালিক, বিড়িপাতার কারবারও আছে তাঁর। মস্ত বড় লোক। বয়স যদিও সত্তর পেরিয়েছে, কাজ কারবার নিজেই দেখাশুনো করেন তিনি।

তাঁর সংগে দেখা করে আমার সমস্যার কথা বলতেই তিনি বললেন, খনি ছিল বইকি। বেঙ্গাবাদের কাছেই ছিল। আমার পূর্বপুরুষেরা ঐ খনি থেকে বিস্তর রূপা বের করেছেন। জানেন, এত রূপার গয়না আমাদের বাড়িতে ছিল যে, গয়নাগুলো কাজে লাগাবার জন্য আমার ঠাকুর্দা দশটা বিয়ে করেছিলেন।

পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছিলেন রায়বাহাদুর ঠাকুর। শুনেছিলাম কলকাতায় তিনি পড়াশুনা করতেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম-এ পাশ করেছিলেন।

রায়বাহাদুর ঠাকুর বলেন, ঠাকুর্দার আমলের সমস্যা অবশ্য এখন আর নেই। কারণ ঠাকুর্দার দশ স্ত্রীর গর্ভে প্রায় পঞ্চাশটি সন্তান জন্মেছিল। রূপার গয়নাগুলি সব তাঁরা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। আচ্ছা, আপনি তো রূপা খুঁজছেন। রূপা শব্দটির সংগে রূপের কোন সম্পর্ক আছে কি না বলতে পারেন? চাঁদের মত সাদা বলে রূপাকে চাঁদি বলে হিন্দীতে।

আমি বললাম, শব্দতত্ত্বে আমার কোন জ্ঞান নেই। রূপা কেন রূপা তা নিয়ে কখনো তো মাথা ঘামাইনি।

ভুরু কুঁচকে আমার মুখের পানে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললেন, মাথা ঘামাননি কেন? রূপা খুঁজছেন, অথচ রূপা শব্দটির ব্যুৎপত্তি কী তা জানেন না!

বৃদ্ধের তিরস্কার নিঃশব্দে হজম করে নিই আমি। আমাকে নীরব থাকতে দেখে বৃদ্ধ নরম হলেন। বললেন, আমার কী মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় রূপ থেকেই রূপা। এমন সুন্দর ধাতু আর হয় না। প্রাচীন কালের মানুষেরা রূপার শুভ্রতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রাচীন মিশরীয়রা রূপাকে বলতেন সাদা সোনা। রূপা অবশ্য সোনার সংগেও মেশানো থাকে। সোনা মেশানো রূপা প্রাচীনকালে ল্যাটিন ভাষায় 'ইলেকট্রাম' নামে পরিচিত ছিল। ইলেকট্রামের বিশেষ সমাদর ছিল প্রাচীন উর, সুমের, মহেঞ্জোদরো প্রভৃতি দেশে। কিন্তু প্রাচীনকালে ইলেকট্রাম বিশেষভাবে সমাদৃত হলেও রূপার আবিষ্কার ইলেকট্রামের আগেই হয়েছিল। প্রায় ছ হাজার বছর আগে রূপাকে তার মৌলিক ধাতুগত অবস্থাতে আবিষ্কার করা হয়েছিল। বালিতে বা পাথরে রূপার শুভ্র ধাতুরূপ সকলকে মুগ্ধ করেছিল এবং সোনার মত রূপাও অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। রূপার পরে ইলেকট্রাম আবিষ্কৃত হল। রূপা ও ইলেকট্রাম দুয়েরই খুব সমাদর ছিল। কিন্তু মৌলিক ধাতুরূপে তাদের এত অল্প পাওয়া যেত যে, তারা কালক্রমে রীতিমত দুর্লভ হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে সীসাযুক্ত গ্যালেনা থেকে রূপা নিষ্কাশনের কৌশল আবিষ্কৃত হল। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে পন্টাস নামে একটি জায়গার কাছে একটি সম্প্রদায় থাকত, যাদের পেশা ছিল পাথর

গলিয়ে ধাতু নিষ্কাশন করা। সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়টিই গ্যালেনা থেকে রূপা বের করার কৌশলটি আবিষ্কার করে। গ্যালেনাকে আগুনে দিলে তা অল্প তাপেই গলে সীসায় পরিণত হয়। পণ্টাসের কামাররা এইভাবে প্রচুর পরিমাণে সীসা উৎপাদন করত। চুল্লীর তাপ বেশি হলে সীসা পুড়ে ছাই হত। সীসার ছাইয়ের মধ্যে হঠাৎ এক-দিন কামাররা আবিষ্কার করল যে একটি রূপালী ধাতুর কণা চিক চিক করছে। তারা বুঝতে পারল যে, সীসা পুড়ে ছাই হতে সীসার বাঁধন থেকে রূপালী ধাতুটির মুক্তি ঘটেছে। এই ধাতুটিই রূপা। সীসার পুড়ে ছাই হওয়াটাই অনেকটা শাপে বর হয়ে দাঁড়াল। এর পর প্রচুর পরিমাণে সীসা পুড়িয়ে রূপা নিষ্কাশন করা হতে থাকে।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে বন্ধু রীতিমত হাঁপিয়ে ওঠেন। তাঁর নীরবতার সুযোগে আমি বলে উঠলাম, রূপার ইতিহাস তো জানলাম, এবারে দয়া করে যদি গ্যালেনার খনিটা কোথায় ছিল দেখিয়ে দেন—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বন্ধু বললেন, ইতিহাসের পুরোটা এখনো বলা হয়নি। আমাদের পরিবারের রূপার ইতি-হাসটা বলা বাকি আছে। তার প্রাক্তন পর্ব, মানে আমার ঠাকুর্দার আমলের রূপার কথা বলেছি—এখন আধুনিক অধ্যায়টা শুনুন। বাড়িতে প্রচুর রূপা মজুত গয়নার আকারে। এত রূপা যখন রয়েছে, তখন রূপবতী একটি বৌ দরকার। বাবা-মা আমার জন্য পাত্রী দেখতে লাগলেন। এই গাঁয়েরই একটি মেয়েকে তাঁরা পছন্দও করলেন। মেয়ে একেবারে নিরক্ষর হলেও বাবা-মায়ের ম... সর্ব সুলক্ষণযুক্তা। কিন্তু আমার মন এব... শিক্ষিত মেয়ের দিকে ঝুঁকেছিল। আ... তখন পাটনার একটি কলেজে ইতিহা... অধ্যাপনা করি। যে কলেজে পড়তাম, মেয়ে... সেই কলেজের প্রিন্সিপালের মেয়ে। ম্যা... কুলেশন পাশ করে সে মেয়েদের কলে... পড়ত। প্রিন্সিপাল আমাকে পছন্দ করতে... আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দি... আপত্তি ছিল না তাঁর। আমার বাবা-মা... অমত সত্ত্বেও এই মেয়েটিকেই বিয়ে ক... বলে আমি মনস্থির করেছিলাম। কি... মেয়েটির মনের খবর নিতে গিয়ে দেখি... তার মন জুড়ে আছে সোনার গয়নার শ... যেহেতু আমার পৈত্রিক ধনসম্পত্তি আ...

…হেতু সে প্রত্যাশা রাখে যে বিয়ের পর …কে আমি সোনায় মুড়ে দেব। রূপা তার …হ নিতান্তই কুরূপা। সে আমাকে বললে …, রূপার গয়না কখনো ছোঁয় নি সে, …বেও না। বলা বাহুল্য, রূপার প্রতি …মেটির এই বিরূপ ভাব আমাকে বড় রকম …কা দেয়। রূপবর্জিত স্ত্রীলোককে বরং …মরা সয়ে নি, কিন্তু রূপাবর্জিতা আমাদের …হে বর্জনীয়া। যে স্ত্রীলোক রূপার গয়না …রে না, তাকে আমরা অলক্ষণযুক্তা বলে মনে …রি। কাজেই পরিবারের প্রিন্সিপ্‌ল্‌সের …থা বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত প্রিন্সি-…লের মেয়ের মোহ কাটিয়ে বাবা-মায়ের …নোনীতাকে বিয়ে করলাম। আমাদের পরি-…রের রূপার গয়নার ভার অম্লান বদনে …রা জীবন বহন করেছেন তিনি।

আমি বললাম, রূপার ইতিহাস তো …ল। এবারে ভূগোলটা বলুন দয়া করে। …নে গ্যালেনার খনিটা কোথায় ছিল তা …দি বলে দেন তো কৃতার্থ বোধ করব।

বলব না।—ঈষৎ কঠোর স্বরে বলে …ঠেন রামবাহাদুর ঠাকুর।—এই খনিটা …ককালে আমাদেরই ছিল। এখন অবশ্য …াইনতঃ কোন স্বত্ব আমাদের নেই, কিন্তু … হলেও ওটা যে একদা আমাদেরই ছিল, … ভুলতে পারি নে। আপনি তো ভূতাত্ত্বিক …চেষ্টা করলে নিজেই খুঁজে বের করতে …ারেন। এখন যান, আমাকে আর বিরক্ত …রবেন না।

সীসার বিষ

বিস্তর সন্ধানের পর বেঙ্গাবাদ গ্রামের …াইরে একটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে গ্যালেনার …নির খোঁজ পেলাম। নামমাত্র খনি, তার …পরে কিছু খোঁড়াখুঁড়ি ছাড়া আর কিছু …ই। মাটির নীচে খননের কোন প্রমাণ …লল না। সাদা কোয়ার্টজের মধ্যে গ্যালে-…ার জৌলুস জায়গায় জায়গায় ঝিলিক …ছিল। কোয়ার্ট্‌জ্‌ পাথরের শিরা বিদীর্ণ …রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাই। মাটির …চে কতো গ্যালেনা পাওয়া যেতে পারে তার …হসাব নিকাশ করার চেষ্টা করি।

একদিন কাজের শেষে ক্যাম্পে ফিরে …দেখি যে, রামবাহাদুর ঠাকুর আমার জন্য …অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে তিনি বল-…লেন, যাক, শেষ পর্যন্ত নিজেই খুঁজে বের …করলেন দেখছি। ভূতাত্ত্বিক হিসেবে আপনি …র খুব পাকা তা স্বীকার করতেই হবে।

আমি বললাম, খুঁজে পেয়েছি, এখানে …খুঁড়ে দেখছি।

রামবাহাদুর ঠাকুর বললেন, খুঁড়ুন না …ত খুশি। কিন্তু একটা কথা, খুঁড়তে …খুঁড়তে যদি প্রচুর পরিমাণে গ্যালেনা বেরিয়ে …পড়ে, সাবধান হবেন। যথাসম্ভব গ্যালেনার …আঁচ বাঁচিয়ে চলবেন। আপনার পরীক্ষা-…নিরীক্ষার কাজটা একটু তফাতে থেকে …করলেই ভাল।

ঈষৎ বিস্মিতভাবে রামবাহাদুর ঠাকুরের …মুখের পানে তাকিয়ে আমি বললাম, কেন …বলেন তো?

রামবাহাদুর জবাব দিলেন, গ্যালেনা যে সীসা ও গন্ধকের সমাহার, তা তো আপনি জানেনই। সীসার সঙ্গে অবশ্য কিয়ৎ পরিমাণে রূপা মিশে থাকে। রূপা রূপে অপরূপা, ধাতু হিসেবেও পুরোপুরি নিখুঁত। কিন্তু সীসা রীতিমত বিষ। জানেন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হল সীসা?

হতবুদ্ধির মত রামবাহাদুরের মুখের দিকে চেয়ে আমি বললাম, তা তো জানিনে। শুনিও নি কখনো।

রামবাহাদুর তাঁর হাতের লাঠির ওপরে চাপ দিয়ে বললেন, শোনেন নি তো শুনুন আমার কাছে। প্রথমে সীসার ইতিহাস শুনুন। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে সীসার আবিষ্কার হয়। সীসা আবিষ্কারের আগেও অবশ্য গ্যালেনার সমাদর ছিল। গ্যালেনার মধ্যে চোখে চমক লাগাবার মত জৌলুস আছে। এই জৌলুস আদিম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গ্যালেনার হার বানিয়ে তারা পরত। একদিন হঠাৎ গ্যালেনা গালিয়ে সীসা নিষ্কাশনের কৌশল তারা আবিষ্কার করে। অনেক আবিষ্কারের মত এইটেও সম্ভবত হঠাৎই ঘটেছিল ঘটনাচক্রে। হয়তো একদিন কোনও মেয়ে গলায় গ্যালেনার হার পরে রান্না করছিল। হয়তো সেই হার হঠাৎ ছিঁড়ে আগুনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আগুন ও অঙ্গারের ক্রিয়ায় গ্যালেনা গলে সীসা বেরিয়ে আসে। সীসা দেখতে তেমন সুন্দর নয়, কিন্তু তার নমনীয়তা ও কমনীয়তার দরুণ তাকে যথেচ্ছ আকার দেওয়া যেতে পারে। কাজেই সীসা আবিষ্কৃত হতেই তাকে ব্যবহারে লাগাবার তাগিদ এল।

মেসোপটেমিয়াতে প্রাচীন কবরের মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় অনেক সীসার তৈরী পাত্র পাওয়া গেছে। সীসার প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিল রোমানরা। প্রথম প্রথম সীসা দিয়ে তারা বড় বড় মূর্তি গড়ত। পরে তারা জল সরবরাহের জন্য সীসার পাইপ বানিয়েছিল। কৃত্রিম পদ্ধতিতে জল সরবরাহের ব্যাপারে রোমানরাই অগ্রণী। বড় বড় শহরগুলিতে তারা সীসার পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিল। তার জন্য সীসার প্রয়োজন হত প্রচুর পরিমাণে। রোমান সাম্রাজ্যে গ্যালেনা গালিয়ে সীসা নিষ্কাশনের বিপুল আয়োজন ছিল।

রামবাহাদুর বলে চলেন, সীসার পাইপ দিয়ে জলকে সহজ নাগালের মধ্যে টেনে এনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করত রোমানরা। কিন্তু তারা জানত না যে, সীসা জলকে বিষাক্ত করে তুলছে। সীসা জলে সহজে গলে না, কিন্তু রাসায়নিক রূপান্তরের ফলে সামান্য পরিমাণে জলের মধ্যে মিশে যায়। সীসা মেশানো জলের ক্রিয়া মানুষের দেহে এমনি সূক্ষ্মভাবে ঘটে যে, সাধারণতঃ তা মানুষের অগোচরেই থেকে যায়। দেহের রক্তে মিশে সীসা পুরুষকে ক্রমশঃ নির্বীজ করে তোলে, আর নারীকে করে বন্ধ্যা। খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে চতুর্থ দশকের মধ্যে রোমানদের মধ্যে জন্মের হার খুব কমে গিয়েছিল। যৌন শক্তির ক্ষয়ের সঙ্গে তাদের বোধ শক্তিও সঙ্কুচিত হয়ে শুরু করে। তখনকার দিনে সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য লোকবলেরই প্রয়োজন ছিল। লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে রোমান সাম্রাজ্যের শক্তি ও সংহতি দুর্বল হয়ে পড়ল।

আমি বললাম, সীসার জন্যই যে রোমানদের এই দুর্দশা তা তো আমি জানতাম না। কিন্তু গ্যালেনা ছুঁলেই যে শরীরে সীসার বিষ ঢুকবে এ কথা আপনাকে কে বলল?

মুচকি হেসে রামবাহাদুর ঠাকুর বললেন, বলেছেন আমার স্ত্রী।

—আপনার স্ত্রী!

—হ্যাঁ আমার স্ত্রী। লেখাপড়া শেখেন নি, কিন্তু আশ্চর্য সহজ বুদ্ধি। আমার কাছ থেকে সীসার বিষের কথা শুনে গ্যালেনা কখনো তিনি স্পর্শও করেননি। যখন ঐ খনিটার স্বত্ব আমাদের ছিল, মাঝে মাঝে বাজারের চাহিদা মত কিছু কিছু গ্যালেনা খুঁড়ে এনে আমাদের বাড়ির লাগোয়া গুদামে রাখতাম। কিন্তু আমার স্ত্রীর জেদে এই গুদামে গ্যালেনা রাখা বন্ধ করে দিতে হল। খনির কাছাকাছি একটি গুদাম তৈরি করে তাতে গ্যালেনা রাখতে শুরু করি। গুদামটির অবশ্য কোন চিহ্ন নেই এখন।

আমি বললাম, এত সাবধানতার ফল নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন।

বৃদ্ধ চোখ বড় বড় করে বললেন, পেয়েছিলাম বই কি। বারো বারোটি সন্তানের মা হয়েছিলেন আমার স্ত্রী।

তাম্রশাসন

বাঁকুড়া জেলায় একটি জায়গায় দুর্লভ কয়েকটি খনিজের খোঁজ করছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে একটা পরিত্যক্ত পুরনো খনিতে এসে গেলাম। একটা সুড়ঙ্গ পাথরের স্তর ভেদ করে ভূগর্ভে উধাও হয়েছে। সুড়ঙ্গটা নাকি সাপখোপের বাসা, বাঘ ও চিতাবাঘও নাকি আস্তানা নিয়েছে তাতে। কাজেই তার মধ্যে ঢোকার সাহস হল না।

ভেতরে ঢুকে প্রত্যক্ষ সন্ধান যখন সম্ভব নয়, তখন বাইরে থেকে খোঁজখবর নিতে থাকি। খনি থেকে কী কী খনিজ বের করা হত তা স্থানীয় লোকেদের কাছে জানতে চাই। স্থানীয় লোকেরা বললে যে, সুড়ঙ্গটাকে তারা "তামা-খুন্" বা তামার খনি বলেই জানে।

তামার খনি!—বিস্ময় প্রকাশ করে আমি বলে উঠি—কিন্তু এখানে তামার কোন চিহ্ন তো দেখি নে।

গ্রামের মোড়ল মোলায়েম স্বরে বললে, বাইরে কোন চিহ্ন না থাকলেও মাটির ভেতরে লুকোনো আছে নিশ্চয়ই। সুড়ঙ্গ দিয়ে ভেতরে ঢুকলে চাক্ষুষ দেখতে পেতেন।

ভেতরে যেতে যদি না পারেন, আমাদের পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে যান। বিস্তর পুঁথিপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তিনি, হয়তো এই খনির খবর আপনাদের দিতে পারবেন।

জ্ঞানেশ বাচস্পতি কাশীর বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনা করতেন। সম্প্রতি কাজ থেকে অবসর নিয়ে এই গ্রামে বসবাস করছেন। তাঁর কাছে যেতে তিনি বললেন, এই তামার খনির বৃত্তান্ত একটি প্রাচীন পুঁথিতে পড়েছি। পুঁথিটি আমাদের জমিদারবাবুর কাছে ছিল। প্রাচীন একটি তাম্রশাসনও ছিল তাঁর কাছে। তাম্রশাসনের তামা নাকি এই খনি থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। বছর দুয়েক আগে জমিদারবাবু মারা গিয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পক্ষের বিধবা স্ত্রী বসতবাড়ি, জমিজমা সব বেচে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছেন। পুঁথি ও তাম্রশাসন বোধহয় তাঁর কাছেই আছে।

আমি বললাম, তাঁর ঠিকানাটা যদি বলে দেন—

—তাঁর ঠিকানার কী দরকার! পুঁথিটা আমার পড়া আছে। পুঁথিতে যা লেখা আছে, সব আমার স্মরণে আছে পুরোপুরি। শুনুন বাবুমশাই, এই খনির ইতিহাস খুবই প্রাচীন। কত প্রাচীন তার হদিস অবশ্য ঐ পুঁথিতে পাওয়া যাবে না। হয়তো তাম্রযুগ পর্যন্ত পৌঁছে যাব যদি এই খনির ইতিহাস অনুসরণ করি। পুঁথির অনুস্বার বিসর্গ থেকে যেটুকু উদ্ধার করেছি, তা হল এই যে, এই খনি থেকে প্রচুর তামা বের করা হয়েছিল। এই খনির তামা থেকে বাসন-কোসন শুধু নয়, অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি করা হত। আচ্ছা, বলতে পারেন, মানুষ লোহারও আগে তামার ব্যবহার শিখল কী করে? লোহার তুলনায় তামা তো অনেক কম পরিমাণে পাওয়া যায় প্রকৃতির মধ্যে। তথাপি তাকে মানুষ আগে চিনল কী করে?

আমি জবাব দিলাম, জায়গায় জায়গায় তামা সোনার মত ধাতুরূপে পাওয়া যায়। আদিম মানুষের দৃষ্টিপথে সোনার মত তামাও এসেছিল। প্রায় সাত হাজার বছর আগে মানুষ তামা আবিষ্কার করেছিল। তামা নিশ্চয়ই তখন পাথরের মধ্যে খুব বড় আকারে দানা বেঁধে ছিল, নচেৎ তা আদিম মানুষের গোচরে আসতে পারত না। পরে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ছ' হাজার বছর আগে তামাযুক্ত খনিজ চ্যালকোপাইরাইট, কিউপ্রাইট, চ্যালকোসাইট ইত্যাদি থেকে তামা নিষ্কাশনের কৌশল মানুষের আয়ত্তে এল।

বাচস্পতি বললেন, কী করে আয়ত্তে এল বলতে পারেন? লোহাযুক্ত খনিজের প্রাচুর্য থেকে তো মনে হয় যে, লোহাযুক্ত খনিজ গালিয়ে লোহা বের করার কৌশলটাই প্রথম আবিষ্কৃত হওয়া উচিত ছিল।

আমি বললাম, উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। কেন হয়নি তার সঠিক উত্তর বিজ্ঞানীদের জানা নেই। তবে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে লোহাকে গালিয়ে যথেচ্ছ আকার দেওয়ার জন্য খুব বেশি তাপের প্রয়োজন। এত বেশি তাপ উৎপাদনের সাধ্য আদিম মানুষদের ছিল না। অবশ্য তামাযুক্ত খনিজ থেকে তামা নিষ্কাশনের জন্যও উচ্চ তাপের প্রয়োজন। কিন্তু এই তাপ মাটির পাত্র পোড়াবার জন্য ব্যবহৃত চুল্লী থেকে পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়। একসঙ্গে অনেকগুলি করে পাত্র তাড়াতাড়ি পোড়াবার জন্য বিশেষ ধরনের বিস্তর চুল্লী ব্যবহৃত হত। বাতাস জোরে বইলে এই চুল্লীতে এক হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেরও ওপরে তাপ সৃষ্টি অসম্ভব নয়। এই তাপে তামা গলতে পারে।

বাচস্পতি বললেন, তা না হয় পারে। কিন্তু তামাযুক্ত খনিজের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল কী করে? চুল্লীতে তো মাটির পাত্র পোড়ানো হত, তাতে তামার খনিজ এল কী করে? আদিম মানুষ তামা কোন খনিজে আছে তা নিশ্চয়ই জানত না।

আমি বললাম, ব্যাপারটা বোধহয় ঘটনাচক্রেই ঘটেছিল। কুমোরের চাকে মাটির সঙ্গে হয়তো কিছু তামাযুক্ত খনিজ এসে গিয়েছিল। আগুন ও অঙ্গারের স্পর্শে তা থেকে তামা গলে বেরিয়ে এসেছিল।

—আগুন তাহলে পরশমণি! প্রস্তরবদ্ধ ধাতুকে উদ্ধার করেছে! আবিষ্কারকর্তার সম্মান আগুনকেই দিতে হয়।

—তা দিতে হয় বইকি।

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে থেকে বাচস্পতি বললেন, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সোনা-রূপা-তামা ইত্যাদি ধাতুর ইতিহাস। ইতিহাসে পড়েছি যে, প্রথম যখন তামা আবিষ্কৃত হল, তখন তা যে কোনও রকম কাজে লাগতে পারে, তা কেউ ভাবতে পারেনি। তামা আবিষ্কার হওয়ার পরও দীর্ঘকাল পাথর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হয়েছে। তামার প্রথম ব্যবহার অলঙ্কার হিসেবে। তামা তখন সোনার চেয়েও দুর্লভ এবং দামী ছিল। তামা আস্তে আস্তে সুলভ হল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তার উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম ভারত, বেলুচিস্তান প্রভৃতি নানা জায়গায় ক্রমশঃ প্রচুর পরিমাণে তামা পাওয়া যেতে থাকে এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে তামা চালান দেওয়া হতে থাকে। এরপর আর তামাকে উপেক্ষা করা চলে না—তামা দিয়ে রীতিমত অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ হতে থাকে।

হাতে আমাদের সময় বেশি নেই।—বাচস্পতির বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে আমি বললাম।—তামার ইতিহাস তো বই পড়লেও জানতে পারব, আপাততঃ ঐ পুঁথিতে কী লেখা আছে তা জানতে চাই।

বাচস্পতি বললেন, বয়স হয়ে পুরোপুরি পুঁথিগত হয়ে থাকতে পারি —তাই একটু আজেবাজে বকে নিলা কিছু মনে করবেন না বাবুমশাই। পুঁথি বক্তব্য সামান্যই। তাতে লেখা আছে যে, খনি থেকে প্রচুর পরিমাণে তামা উৎপাদি হয়েছিল। এই তামার খনি ছাড়া অন্য তামার খনির বর্ণনা আছে পুঁথিটাতে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, সিংভূম, পুরুলি প্রভৃতি জেলার বনে-পাহাড়ে অসংখ্য তাম খনি ছিল। আচ্ছা বাবুমশাই, বলতে পা প্রাচীন কালে এ-দেশে এত তামা পাও যেত, এখন আর পাওয়া যায় না কেন?

আমি বললাম, পাওয়ার চেষ্টা করি বলেই পাওয়া যায় না। পাওয়ার জ সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হলে আমেরিকার যু রাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, রোডেশিয়া, কঙ্গ চিলি, পেরু, অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশে মত ভারত তামার উৎপাদনে অগ্রগণ্য হ উঠবে। সাম্প্রতিক সমীক্ষার ফলে জা গেছে যে, রাজস্থান, বিহারের সিংভূম অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচুর তামা আছে।

বাচস্পতি বললেন, তার মানে এতক আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম আমরা। পুঁথিটা তাহলে ঠিকই লিখেছে।

আমি বললাম, পুঁথির কথা যদি ঠি হয়, তাহলে এখানেও বেশ সমৃদ্ধ এক তামার খনি ছিল। বাচস্পতিমশাই, পুঁ ও তাম্রশাসনটা আমি একটু দেখতে চা নিজের চোখে না দেখে তৃপ্তি হচ্ছে না।

—বেশ তো, দেখার ইচ্ছে যখন এ প্রবল, তখন কলকাতায় যান। আমাদে জমিদারপত্নী সেখানে বাড়ি কিনে বসব করছেন।

বাচস্পতির দেওয়া ঠিকানাতে জমিদা পত্নীর সঙ্গে দেখা হল ঠিকই, কি আমাকে দেখে তিনি বিন্দুমাত্রও খু হলেন না। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা কর উদ্দেশ্যটি জানামাত্র অতিমাত্রায় অপ্র হয়ে উঠলেন তিনি।

গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, আম স্বামীর মৃত্যুর পর সংসার ছেড়েছি। সে সঙ্গে প্রাক্তন সব সংস্কারও ত্যাগ করেছি বনেদী জমিদার-বাড়ির বৌ হিসেবে অনে অনুশাসন আমাকে মেনে চলতে হত। তাম্রশাসন বা পুঁথি ছিল তারই প্রতীক সবার আগে তাদের আমি বর্জন করেছি

আমি কাতরস্বরে বললাম, কি তাদের মধ্যে তামার খনির ইতিহাস রয়ে যে! কাকে দিয়ে এসেছেন বলুন না দ করে।

—আমার স্বামীকে দিয়ে এসেছি অর্থাৎ স্বামীর চিতেয় তুলে দিয়েছিলাম পুঁথি পুড়ে ছাই হয়েছে, আর তা শাসনটা গলে একটা, ধাতুর পিণ্ডে পরিণ হয়েছে। ধাতুপিণ্ডটা আমার স্বামীর অস্থি সঙ্গে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছি।

অঙ্গনা / বিপর্যয়ের বিরু

পদে পদেই বিপদ। বেঁচে থাকার আনন্দ রোমাঞ্চ তাই সবচেয়ে বেশি। যত রোমাঞ্চ তত আনন্দ। পথ চলা তাই আমাদের ক্লান্ত করে না,—অবসাদে ভরিয়ে তোলে না। যদিও সাময়িক হতাশায় আমরা পীড়িত হই কিন্তু পরমুহূর্তেই সে খেদ ভুলে আবার নতুন প্রচেষ্টার পরিকল্পনায় ডুবে যাই। এসবই বাঁচার জন্য এবং অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। আঘাত আছে, বেদনা আছে কিন্তু সবকিছুর উপরে রয়েছে বেঁচে থাকার দুর্বার আগ্রহ।

এবারকার বিপদ এক কথায় অভূতপূর্ব। আমাদের অস্তিত্বই বহুলাংশে বিপর্যস্ত। প্রকৃতি হয়তো নতুন কোন ভাঙাগড়ার খেলায় মত্ত। তাই বিপর্যয়ে বিপর্যয়ে সে বিচিত্র অধ্যায় রচনা করে চলেছে। ক্ষয়-ক্ষতির পুরো খতিয়ান দীর্ঘ অপেক্ষা সাপেক্ষ।

অথচ সুন্দর শারদ অবকাশে আশার ভেলায় ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। সুন্দর নীলাকাশে টুকরো টুকরো পালতোলা মেঘের নৌকার বহর দেখে মনে হয়েছিল, এবছরের বর্ষা বিদায় নিচ্ছে। আমরা সমবেতকণ্ঠে প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম, আগামী বছর সু-বর্ষণের জন্য। সকালের রোদ্দুর দেখে মনে মনে পুলকিত হয়েছি, শীত শীত আমেজ অনুভব করেছি আর পিঠে-পায়েসের স্বপ্ন দেখেছি। আগন্তুকের এমন অযাচিত আক্রমণে জিভের নোলা সরসর অবস্থা। মৌতাতে তখন হাতের সামনেই স্বর্গ।

পুজোর পর বিষ্টি এলো। সকলেই আনন্দিত। দিকে দিকে উল্লাস। চাষীর ঘরে হাসি। সাধারণের মনে-মুখে কত না আনন্দ। সকলের মনে তখনো গত কয়েক বছরের খাদ্য-অন্নের হাহাকারের অভিজ্ঞতা বড় জ্যান্ত। সেই দুঃস্বপ্ন আজ স্মৃতি। দুঃখের দিনে যে স্মৃতি রোমন্থন দু'কোটা আনন্দাশ্রু বেদনার দিন যে আবার আসবে তা অনেকেই ভাবতে পারে নি। কেউ কেউ ধরে নিয়েছিল, এরকম হা-অন্নের বেদনা বুকে নিয়েই দিন কাটবে। কিন্তু তা থেকে মুক্তির জন্য অনেকেই প্রস্তুত ছিল না। তাই আগামী দিনের উজ্জ্বল ভাবনায় সবাই পুলকিত ছিল। ক্ষেতভরা চাষ আর আশ্বিনের বিষ্টি এবার হলো ভরা ভঙ্গ-বঙ্গে প্রকৃতির নতুন শপথ নিয়ে এসেছে। সুদিন যে এত দ্রুত ব্যস্ততায় নিজেকে তৈরি করছিল তা জানা থাকলে কেউ বোধহয় সেদিনের দুর্দিনে হতাশায় ভেঙে পড়তো না। এখন মনে শুধু ভরসা, সুদিন এসেছে ভাবনার আর কিছু নেই।

দিগন্তের সোনালি আভায় আমরা পুলক অনুভব করেছি। কিন্তু এক বৃষ্টি-ভেজা সকালে চোখ মেলে তাকাতেই কোথাও খুঁজে পেতে সেই স্বর্ণরেখার চিহ্নমাত্রও পেলাম না। পরিবর্তে চাপ চাপ হতাশা আর বেদনার দীর্ঘশ্বাস।

আশ্বিনের বিষ্টি আর থামে না। পুজো ভালয় ভালয় গেল। এবার বিষ্টির পালা। কিন্তু আকাশ কালো করে বর্ষণ এখন নিষ্প্রয়োজন। অন্তত অতটা প্রয়োজন ছিল না। বর্ষা তবু বাড়াবাড়ি করতে ছাড়লো না। তখনই আশংকা জড়ো হতে শুরু করেছে। তার পরের খবর, সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রচন্ড ঢল নেমেছে, হিমালয়ের কোলে দার্জিলিং ভীষণ ধসে আক্রান্ত।

এটুকু খবরই যথেষ্ট ছিল। তার পরের অবস্থা সবসময়ই আমাদের কল্পনায় আছে। আর কল্পনায় যা পড়া য... অভাবনীয় ভাবেই লক্ষ্য হয়। এবারও ... ব্যতিক্রম হতে পারে না। জীবনে ... পোড় আমরা খেয়েছি। হতাশা ... আমাদের নিত্যসঙ্গী। আশাটাই ... ব্যতিক্রম। তাই সুযোগ পেয়েই ... আমরা হতাশার দুশ্চিন্তায় নি... হারিয়ে ফেলেছি।

সর্বশেষ সংবাদ : প্রমোদবিলাসের দার্জিলিং বিপর্যস্ত। জলপাইগুড়ি জলের তলায়। বন্যার জল কোন জায়গায় তের ফুট পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ... বন্যার তোড় ক্রমে এবার ভাসিয়ে ... যাচ্ছে মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, ... বিহার। আশ্রয়চ্যুতের এবং হতা... সংখ্যা অগণিত। খাদ্যাভাব ও জল... জনসাধারণের অবর্ণনীয় ক্লেশ।

হতাশার চিত্র আরো দীর্ঘ হতে ... কিন্তু বুক বাঁধা ছাড়া উপায় কি? এ... ক্ষতি আমাদের সকলের। তাই সব... হাত লাগাতে হবে। দুর্গতদের পাশে ... দাঁড়াতে হবে। ভরসা দিয়ে বলতে ... আমরা তো আছি, ভয় কি? তো... দুঃখ আমরা সবাই ভাগ করে ... আমাদের সুখে তোমাদের সমান অধি... বেদনা আছে বলেই বাঁচার সাধ ... বেশি। হাত ধরে তাই দিগন্তের ... এগুতে হবে। চোখের কোনে স্ব... ফাতনা লাফালাফি করবে। আশা থ... এবারও হয়তো সোনালি রেখার ... পাওয়া যাবে আর তা বণ্টনায়ও ... করুণ হবে না। কারণ আমাদের স... মেলানো হাতের বাঁধে প্রকৃতির খে... অচরিতার্থ থেকে যাবে। আর তখনই ... সবাই বাঁচবো।

নিগ্রোদের উন্নতিকল্পে

আমেরিকান নিগ্রোদের নিয়ে সারা পৃথিবীতে আজ ভীষণ উত্তেজনা। খোদ আমেরিকাতেও এ নিয়ে কম তোলপাড় হচ্ছে না। একদল ঘোরতর বর্ণবিদ্বেষী ছাড়া আর সবাই চাইছেন, নিগ্রো সম্প্রদায় মানুষের পূর্ণাঙ্গ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকুক। এজন্য দেশে দেশে জোর আন্দোলন চলছে যাতে এই মুষ্টিমেয়ের অন্যায় জেদের উর্দ্ধে উঠে শুভার্থীদের মনোভাব জয়যুক্ত হতে পারে। কালো নিগ্রো সন্তানও শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানে কোন প্রভেদ করা চলবে না। এই আন্দোলনে এতদিন নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন মার্টিন লুথার কিং। অহিংস পন্থায় তিনি সকলের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন এজন্য। এবং আমরণ তিনি সংগ্রাম করে গেছেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু বিদ্বেষীর দল তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করা দূরের কথা, সহ্য পর্যন্ত করতে পারেনি। এরা চিরকাল জেনে এসেছে, নিগ্রোরা ক্রীতদাসের জীবন-যাপন করবে। এ থেকে তাদের মুক্তি এবং সমান অধিকারের তো কোন ... উঠতে পারে না। তাই এই দলের বির... সংগ্রামের মহত্তম পর্যায়ে তিনি আকস্মি... ভাবে আততায়ীর গুলিতে নিহত ... আমেরিকার এসব অপরিণামদর্শী নাগ... ভবিষ্যতের ঘৃণা কুড়োবার জন্য রইলে... আর মানবমুক্তির ইতিহাসে মার্টিন লু... কিং শুকতারার মত উজ্জ্বল।

নিগ্রোদের সমানাধিকারের ব্যাপ...

...লবামার যে রক্তক্ষয়ী ঘটনা অনুষ্ঠিত ...লো তা এখনো ম্লান হয়নি। আমাছাড়া ...র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ লেগেই আছে। তবে ...খের কথা যে, সমানাধিকারের দাবীতে ...মেরিকান নিগ্রোসমাজও ক্রমেই জোটবন্ধ ...ছেন।

নিজেদের উন্নতির জন্য নিগ্রোদের ...থমে এগিয়ে আসতে হবে এবং অধিকার ...দায়ে চরম আত্মত্যাগের পথ গ্রহণ করতে ...বে। সম্প্রতি নিগ্রো আইনজীবী মিসেস ...কারটি ওয়াকার এক সাক্ষাৎকারে বলেন ...র, আমেরিকার অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্র- ...য়ের মত নিগ্রোদেরও আত্মসম্মানবোধ ও ...ঠিন পরিশ্রমের মূল্যেই নিজেদের অবস্থার ...ন্নতি সাধন করতে হবে।

মিসেস ওয়াকারের পক্ষে এ কেবল তাত্ত্বিক কথা নয়। তাঁর এই-মনোভাবকে তিনি কার্যক্ষেত্রেও রূপদান করে চলেছেন।

নিগ্রো অধ্যুষিত এলাকায় তিনি একটি কো-অপারেটিভ সেণ্টার গড়ে তুলেছেন। সাড়ে তিন হাজার লোকের সামান্য পুঁজির সমবায়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। বছরে প্রায় আঠার লক্ষ ডলারের ব্যবসা এই প্রতিষ্ঠানটি করে থাকে। তিনি আশা করছেন, এই নতুন উদ্যোগ নিগ্রোদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তুলবে।

তিনি বলেন, যে কোন বর্ণের নাগরিক হোন না কেন, প্রত্যেকেরই আজ একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, নিজেদের জন্য দুঃখিত হবার মনোভাব আমাদের ত্যাগ করতে হবে, পরের কাছে হাত পেতে সাহায্য লাভের আশা ছাড়তে হবে। আমাদের সকলকেই দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে এবং বৃথা বন্ধ করে কাজে নামতে হবে।

তিনি এ প্রসঙ্গে আমেরিকার বস-বাসকারী জাপানীদের কর্মনিষ্ঠা ও অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, প্রতিবাদ জানিয়ে, ধর্মঘট করে অথবা অন্যভাবে তাঁরা এই সাফল্য অর্জন করেন নি। বিশেষ অধিকার ও সুখ-সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র ও সমস্যা থাকবেই। ভোটাধিকার অর্থহীন যদি গঠনমূলক ও বুদ্ধিসহকারে তা কাজে লাগানো না হয়।

মহারাষ্ট্রের নারী জীবন

পুনার মহিলারা খেলাধুলোতেও উৎসাহী। গৃহস্থ বাড়ীর গিন্নিরা পর্যন্ত অনেকেই হকি, বেডমিণ্টন বা টেবিল টেনিস ক্লাবে খেলতে যান। এখানের সার্ব-জনীন 'সুইমিং পুল'গুলোতে মহিলারাও সাঁতার কাটেন, আমাদের দিকে খেলাধুলো বা সুইমিং পুলে যাওয়া অল্পবয়সী মেয়ে অথবা এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখানেও যে সবাই করছে তা নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিনীদেরও এসব করতে বাধা নেই—কেউ নিন্দেও করবে না।

পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে চব্বিশঘন্টা মেয়েদের পাহারা দেবার মত কোন ওয়ার্ডেন নেই। উত্তর ও পূর্ব-ভারতের ছাত্রীনিবাসে দীর্ঘদিন থাকার অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেখানে ওয়ার্ডে-নের অনুমতি ছাড়া মেয়েদের এক পা বেরোবার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত নেই। এখানে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীরাও খাঁচার পাখী নয়।

এতখানি স্বাধীন হলেও সাজগোজে মেয়েরা অত্যাধুনিকা নন। কাছা দিয়ে আঠারো হাত শাড়ীটি অল্পবয়েসী মহিলারা আজকাল পরেন না। দক্ষিণ দেশীয়দের মত এঁরাও চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন ফুলের মালা দিয়ে। আমাদের কাছে এটা ফ্যাশান মনে হলেও, এখানে তা নয়।

সোনার চেনে গাঁথা কালো পুঁতির মালাটির নাম মঙ্গলসূত্র। মঙ্গলসূত্র এয়োস্ত্রীর চিহ্ন। এতে 'ওয়াটি' নামে যে দুটি লকেট থাকে, তার একটি বাপেরবাড়ী ও একটি শ্বশুরবাড়ী থেকে দেয়া হয়। শুধু ব্রাহ্মণ মহিলাদেরই দুটো ওয়াটি থাকে। সাধারণত অল্প সময়ের জন্যও মঙ্গলসূত্র খুলে রাখা হয় না। স্যাকরারাও হাতকাজ ফেলে রেখে ছেঁড়া মঙ্গলসূত্র প্রথম জুড়ে দেন। তবে, আধুনিকা ও সংস্কারমুক্তাদের কথা স্বতন্ত্র।

সাজ-পোষাক দেখে এখানে সধবা বা বিধবার পার্থক্য বোঝা যায় না। অল্প-বয়েসী মেয়ে থেকে আশী বছরের বিধবারা পর্যন্ত সবাই রঙের কাপড় পড়ে থাকেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও এখানে বিধবাদের বিশেষ বাধা-নিষেধ নেই। আমার প্রতি-বেশিনী মধ্যবয়সী এক বিধবা ভদ্রমহিলা তো সবসময় সাইকেলে যাতায়াত করেন। অনেক আগে এখানকার বিধবাদেরও অনেক নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হত। কিন্তু বর্তমানে মঙ্গলসূত্র ছাড়া আর কিছুই বর্জনীয় নয়। এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও আমাদের সমাজ বাঙালী বিধবাদের উপর কম অন্যায় করছে না। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিধবাদের পৃথিবীর সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

সাধারণত মারাঠী মহিলারা বড় ধর্ম-পরায়ণ। বারো মাসে তেরো পার্বণে ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে এঁদের উপোষ লেগেই আছে। কেউ কেউ সপ্তাহে দু-তিনদিন করেও উপোষ করেন। এঁদের উপোষ মানে পুরো-পুরি অনাহার নয়—অন্য কিছু খাওয়া। তবে, উপোষের জন্য কিছু বাঁধাধরা খাবার আছে। যেমন, 'সাবুদানা খিঁচুড়ি', কাওনের চালের ভাত বা ঘিয়ে ভাজা আলু। হোটেল ও অফিস-কলেজ-ফেক্টরীর ক্যান্টিন-গুলোতে পর্যন্ত উপোষের খাবার পাওয়া যায়। মটর-স্কুটার চালানো, হকি-খেলা, সাঁতার-কাটা, ফর ফর করে ইংরিজী বলা মহিলারাও এ থেকে বাদ যান না।

অনেক বাড়ীতে রান্নাঘর তৈরী করার সময় এক কোণে স্থায়ীভাবে ঠাকুরের আসন তৈরী করে নেন। বিয়ের কনেকে বাপের-বাড়ী থেকেই অন্নপূর্ণা ও বালকৃষ্ণের মূর্তি দেয়া হয়। তাছাড়া তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকেও এঁদের ঠাকুরঘরে দেখা যায়। বিভিন্ন পরিবারের 'পারিবারিক দেবতা' বিভিন্ন। শিক্ষিতা আধুনিকাদেরও জ্যান্ত সাপ ও বটগাছ পুজো করতে দেখে আমি প্রথম আশ্চর্য হয়েছিলাম। নাগপঞ্চমীর দিন সাপুড়েরা রাস্তায় ঘোরাফেরা করে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমাকে এখানে বলা হয় বটপূর্ণিমা, গাছের অভাবে বাজার থেকে বটের ডাল কিনে এনে মহিলারা পুজো করেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ মহিলাকে গাড়ীর স্টিয়ারিং ছেড়ে এসে বটগাছের চারপাশে ঘুরে ঘুরে পুজো করতে দেখে আমি হক-চকিয়ে গিয়েছিলাম। একই স্বামীকে সাত-জন্মের জন্য 'বুক' করে রাখাই নাকি এ পুজোর উদ্দেশ্য।

আমাদের দুর্গোৎসবের মত মারাঠীদের জাতীয় জীবনে দীপান্বিতাই সব চাইতে বড় উৎসব। প্রতি ঘরে ঘরে সেদিন লক্ষ্মী-পুজো হয়। আলপনাও দেয়া হয়, তবে শুকনো গুঁড়ো দিয়ে। তাকে রাঙোলী বলে। এ ছাড়া বাইরের আনন্দ তো আছেই সে সময়। এক সপ্তাহ জুড়ে দিবারাত্রি পটকাবাজীর শব্দে মনে হয় বুঝি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আছি। দীপান্বিতার পর প্রতিপদের দিন—যাকে এখানে বলা হয় 'পাড়োয়া'—মেয়েরা স্বামী ও বাবাকে ভালভাবে স্নান করানোর পর প্রদীপ ধরে বরণ করেন। একে মারাঠীরা 'আরতি' করা বলে। আরতির পর স্ত্রী ও কন্যারা ভাল উপহার পান স্বামী ও বাবার কাছ থেকে। দ্বিতীয়ার দিন আমাদের মত এঁদেরও ভাইফোঁটা হয়।

—[illegible]

প্রাচীন শিল্পকলায় নারী

বেলা দে

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের উত্তর এবং পশ্চিমাংশ এবং যার একশ বছর পরে পূর্ব ও দক্ষিণাংশ মুসলমানদের অধীনে ছিল। এর পূর্বের যে যুগ তাকেই আমরা প্রাচীন বাংলা বলছি কিন্তু এ যুগের কোন লিখিত ইতিহাস নেই। অল্প কয়েকখানি গ্রন্থ, শিলালিপি এবং প্রাচীন মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ ছবি এইগুলি অবলম্বন করে এ সম্বন্ধে যা কিছু অস্পষ্ট ধারণা করা যায় তার বেশী আর কিছু জানবার উপায় নেই। সেকালের বাঙালী ভদ্রগণ যেমন লেখাপড়া চর্চা করে দেশের গৌরব বর্ধন করতেন তেমনি অশিক্ষিত মেয়েরাও শিল্পকলার অভাবনীয় উন্নতি সাধন করে বাংলা দেশকে গৌরবান্বিত করতে পেরেছিলেন। অবশ্য পুরুষ শিল্পীর সহযোগিতায় তা করা সম্ভব হয়েছিল।

কাপড় বোনায় বাঙালী খুব প্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিলেন। নানা জাতীয় গাছের ছাল বা শাঁস থেকে সুতো তৈরী করে যে সব চিকন কাপড় তৈরী হোত তার নাম ছিল দুকুল। এখন আমরা যাকে 'লিনেন' বলি অনেকটা সেই জাতীয় কিন্তু খুব মিহি ও মসৃণ। উনিশ শত বৎসর পূর্বে একজন গ্রীক বণিক এদেশে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন, বাঙলা দেশের সব চেয়ে উৎকৃষ্ট মসলিন কাপড় বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। কাজেই সারা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য সভ্য জগতে বাঙলার কাপড়ের বিশেষ আদর ছিল। এছাড়া বস্ত্রশিল্প বহু প্রাচীন কাল থেকে বাঙলার একটি বড় রকমের শিল্প ছিল।

মাটির বাসনপত্র তৈরী করা ছিল আর একটি বড় শিল্প। বাসনপত্র ও অন্যান্য তৈজসপত্র ছাড়াও পোড়া মাটির অনেক জিনিসের উপর সুন্দর খোদাই করা কাজ থাকত। পাথরের মূর্তি তৈরী ছিল একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। বাঙলা দেশে প্রাচীন আমলের অনেক সুন্দর সুন্দর দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এদের গঠন ও পরিকল্পনা খুব উঁচুদরের ও সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতির পরিচায়ক। এ ছাড়া বেত ও বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে ঘরের নানা রকম আসবাব ও ব্যবহার উপযোগী সামগ্রী তৈরী করা হোত। আমাদের দেশের শীতলপাটি এক আশ্চর্য শিল্প। এক সময় এই শীতলপাটি সমস্ত ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বলা বাহুল্য, এই সব শিল্পের অন্তরালে ছিলেন আমাদের অন্তঃপুরের শিল্প কলাবতী দল। এগুলি তাঁরা অন্তঃপুরে বসে পুরুষ শিল্পীর সহযোগিতায় সমাধান করতেন।

এছাড়া মনে পড়ে কারুশিল্পের কথা—কাঁথাতে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের চিত্র প্রভৃতি এমনভাবে ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের সুতো দিয়ে সেলাই করতেন যে হঠাৎ দেখলে মনে হোত যেন তুলি দিয়ে আঁকা একখানি বৃহৎ চিত্র। কিন্তু এর জন্য তাঁদের পয়সা খরচ করে কোন জিনিস কিনতে হোত না। পুরানো কাপড়ের পাড়ের সুতো ছিল এর প্রধান উপকরণ। কোন কোন সময়ে একখানা কাঁথা তৈরী করতে বারো বছরও নাকি সময় লেগেছে। আমার ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছিলাম তাঁর ঠাকুমা এমন কাঁথা সেলাই করতেন যে, দেখলে মনে হোত খুব দামী একখানি শাল বোনা হয়েছে। যাঁরা এই কাঁথা তৈরী করতেন তাঁদের ধৈর্য ও সৌন্দর্যবোধের কথা মনে পড়লে গর্বে মন ভরে ওঠে।

পল্লীগ্রামের 'সিকা' আর একটি সুন্দর ও প্রয়োজনীয় জিনিস। ছোট একখানি খড়ের ঘরের চালের মাথায় আনন্দ লহরী, ফুলঝুরি, সাগরফেনা প্রভৃতি নানা রকমের শিকায় রঙীন পানের বাটা, গয়নার ঝাঁপি, সিঁদুর কোটা প্রভৃতি মেয়েদের অতি শখের জিনিসগুলি দুলতে থাকতো। বিছানা বালিশ টাঙিয়ে রাখবার জন্য মেয়েরা রঙীন সুতো দিয়ে ঝালি তৈরী করতো। এগুলি দেখতে ভারী সুন্দর। —আজকাল মাটির প্রদীপের চলন উঠে গেছে। এই প্রদীপের সলতে রাখবার জন্য আমাদের প্রাচীনা দিদিমা ঠাকুমারা রঙ-বেরঙয়ের কাপড় দিয়ে সলতেদানী তৈরী করতেন। তাতেও থাকত নানারকম সূক্ষ্ম কারুকার্য। এখনো পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থ পরিবারে কড়ির আলনা, কড়ির দোলনা, প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

এরপর মনে পড়ে সেকালের মেয়েদের আলপনা দেওয়ার কথা—অন্নপ্রাশন, উপনয়ন বিবাহ এবং ব্রত উপলক্ষে আলপনা দেওয়া পিঁড়ির ব্যবহার আজো আছে। কিন্তু তখনকার শিল্পীমেয়েরা আলপনা দিতেন ভারী সহজ উপায়ে। তাঁরা আলপনা তৈরীর জন্য যে 'গোলা' প্রস্তুত করতেন তা হলুদ-বাটা, শিমপাতার রস ও আলতার সাহা[য্যে] তৈরী করতেন।—তা ছাড়া বাংলাদেশের কোন শুভকর্মে 'স্বস্তিক' বা 'শ্রী' নি[র্মাণের] প্রথা এখনো আছে। আরো কতকগুলি [ছোট] ছোট শিল্পও তাঁদের হাতে শোভা পেত। যেমন বিয়ের সময় গায়ে হলুদ বা ফু[ল]শয্যার তত্ত্ব দেবার আয়োজন করতে [বসে] তাঁরা করতেন নানারকম ফলের টুকিটা[কি] জিনিস। আধপাকা পেঁপের খানিকটা [অংশ] নিয়ে তাকে আধফোটা চাঁপাফুলের আকা[রে] কেটে, তার তলায় একটি পানের বোঁ[টার] কিছু অংশ কাঁটা দিয়ে এঁটে দিতেন। কাঁ[টা] বলতে সাধারণতঃ গাছের কাঁটাই ব্যবহৃ[ত] হোত। আরো ছিল ডেঙ্গোর ডাঁটার গো[ল করে] কেটে কেশুর, পানিফল প্রভৃতি তৈরী হো[ত।] আখ দিয়ে চরকা তৈরী দেখলে খুব আশ্[চর্য] লাগত।

বাঙলার নারীর শিল্পকলার আর এ[কটি] সুন্দর নিদর্শন ছিল 'পঞ্চগুঁড়ির' আসন। চাল ভিজিয়ে গুঁড়ো করে পাঁচ রকম রং [দিয়ে] রাঙিয়ে সেই চালের গুঁড়ো দিয়ে এক অপূ[র্ব] আসন তৈরী হোত। দেখলে কেউ কৃ[ত্রিম] আসন বলে মনে করতে পারতেন না। শুনে[ছি] একবার এক বৃদ্ধা পিঁড়ির উপর আলপনা [দিয়ে] নোট এঁকেছিলেন। দূর থেকে কেউ বিশ্বা[স] করতে পারেননি যে এটি পিঁড়ির উপ[র] চিত্রিত। এছাড়া মাটির সরায় আলপনা [দিয়ে] লক্ষ্মীর সরা, মাটির কুঁজো বা কলসীতে নানারকম চিত্র সকলকে মুগ্ধ করত।

সেই প্রাচীনকাল থেকে আজো পর্যন্ত বাঙলার মেয়েরা গৃহকে করেছে সুন্দর, দূরকে করেছে নিকট, আর পরকে করেছে আপন। গৃহই ছিল তার হৃদয়। তাই সেই গৃহকে সে সাজিয়ে রাখত নানারকম শিল্পের মাধ্যমে। যদিও তাঁরা কারুর কাছে আজকের দিনের মত শিল্পশিক্ষা করেননি। তাই মনে হয় অন্ততঃ এক শো বছর আগেকার বাংলার কুটির প্রাঙ্গণে যদি আমাদের মনের গতি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেখানে দেখব সুন্দর, সবলা, পূর্ণস্বাস্থ্যবতী মা বোনের ছোট ছোট শান্তির নীড়গুলিকে কেমন লক্ষ্মীশ্রীতে ভরিয়ে রেখেছেন। প্রাচীন বাংলার এই সব স্বাভাবিক চিত্র ও শিল্পের মধ্যে দিয়ে আমরা বাংলার নারীর সরলপ্রাণ ও প্রেমপূর্ণ অন্তরের পরিচয় পাই। শুধু সংসারের এই ক্ষুদ্র আবেষ্টনীটুকুই বাংলার নারীর সেবা ও যত্নে সার্থক হয়ে ওঠেনি, বৃহত্তর সমাজজীবনও তার পুণ্যস্পর্শে পবিত্র হয়ে উঠেছে। যে নারীকে আজ আমরা অন্তঃপুরের বাইরে দেখতে পাচ্ছি এই বাইরে আসার শক্তি ও সাহসের মূলে ছিল প্রাচীন বাংলার নারীর প্রেরণা। তাই তাঁদের কথা যেন আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

তস্য তস্য অথবা সূর্য্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]
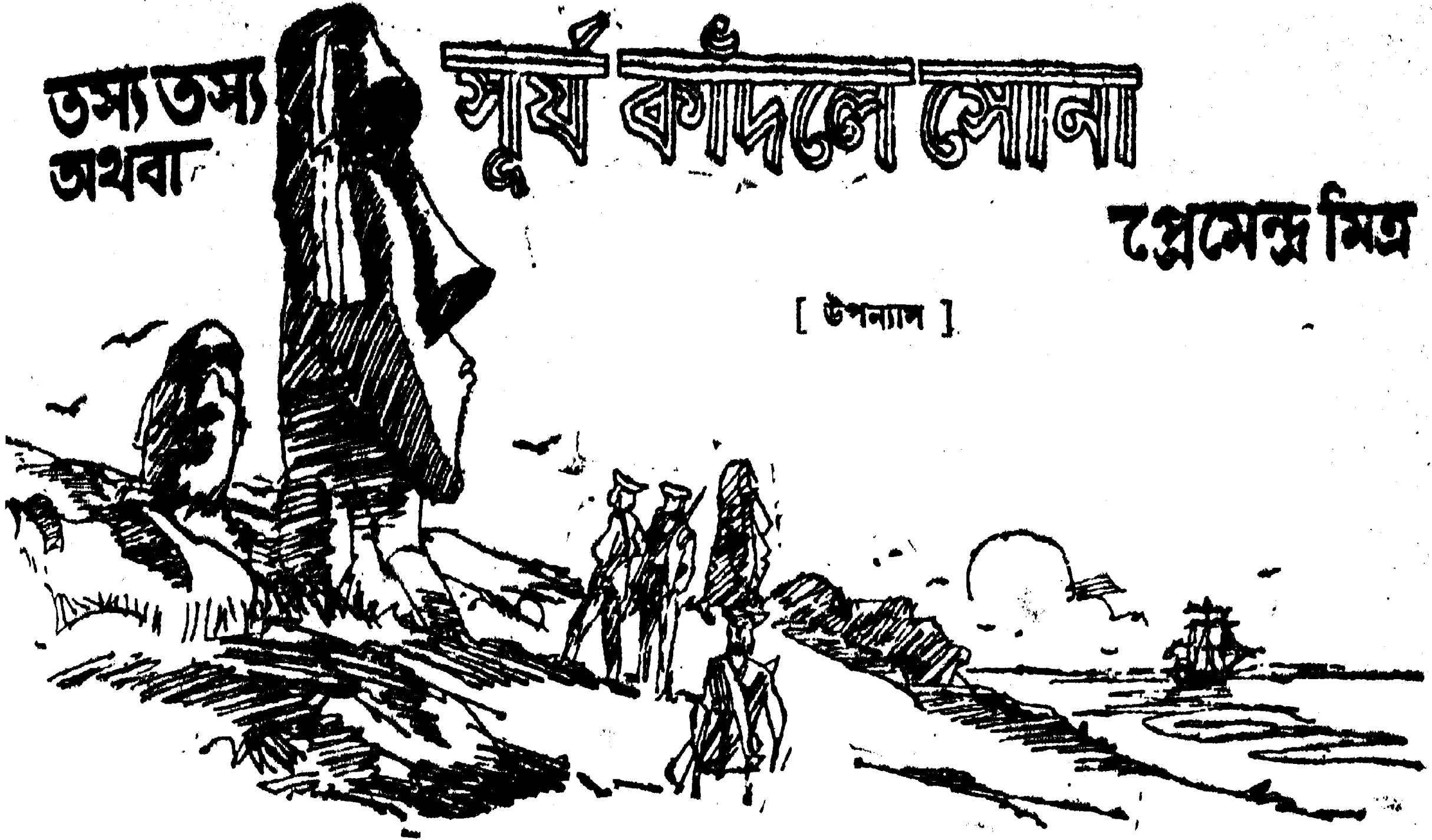
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুজকো-তে এসে পৌঁছোবার পর আর একবার কিন্তু কয়াকে দিশাহারা হতে হয়েছে।

কুজকো শহরে এসপানিওল রিশালার উপস্থিতি তার কাছে স্বপ্নাতীত ঘটনা। এ শহরে কেমন করে কোথায় সে গানাদোর সন্ধান করবে! বিদেশী পাষণ্ডদের ভয়ে দেশের মানুষ যেন মাটির তলায় গর্ত খুঁড়ে লুকিয়েছে। কোরাকেঙ্কুর পালকের এখানে কোন দাম নেই।

শেষ পর্যন্ত সৌসার দূত সেজে এসপানিওলদের মধ্যেই গিয়ে আশ্রয় নেবার যে ফন্দি তার মাথায় এসেছে সেটা তার বুদ্ধির বাহাদুরী বলতে হয়। এসপানিওল সেপাইদের হাতে প্রায় ধরা পড়তে পড়তে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এ ফন্দি তাকে অবশ্য ভাবতে হয়েছিল। এই ফন্দিতে সত্যি সত্যি সেই রাত্রেই গানাদোর দেখা পাওয়ার ও তার সঙ্গেই পালাবার সুযোগ মেলার মত অঘটন ঘটবার আশা অবশ্য সে করেনি।

ফিলিপিলিওর সঙ্গে কোরিকাঞ্চার একজন ছোট মোহান্ত সেজে হুয়াসকারের হত্যার খবর নিতে এসপানিওল সওয়ারদের শিবিরে এসে দূত হিসেবে কয়াকে দেখে-ই গানাদো আর সেখানে সময় নষ্ট করা উচিত মনে করেন নি। হেরাদার প্রতিনিধির মাথায় তাঁদের ওপর পাহারা রাখবার কল্পনাই ছিল না। সেই সুযোগ নিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি ফিলিপিলিও আর কয়াকে নিয়ে তাঁদের দখল করা ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়েছেন। সুস্পষ্ট কোনো পরিকল্পনা তখন তাঁর মাথায় ছিল না। কুজকো শহর আর এক মুহূর্তও তাঁদের পক্ষে নিরাপদ নয় বুঝে যত দূরে সম্ভব তা থেকে চলে যেতেই শুধু চেয়েছেন।

প্রায় অর্ধেক রাত সমানে ঘোড়া চালিয়ে কুজকো থেকে বেশ কিছু দূরে যে আসতে পেরেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও ক্রমশই তাঁর মনে হয়েছে যে কুজকো শহরেই লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করলে যা হত তার চেয়ে বেশী বিপজ্জনকই হয়ে উঠেছে তাঁদের অবস্থা। তাঁদের ঘোড়া দুটি ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে আসছে। পথে তেষ্টা মেটাবার জল একেবারে দুষ্প্রাপ্য না হলেও খাদ্য পাবার কোনো আশাই নেই। মানুষ যদি বা উপবাসী হয়ে দীর্ঘকাল যুঝতে পারে, ঘোড়ার মত প্রাণীর পক্ষে খাবার না পেলে এই দুর্গম পার্বত্য পথে বেশীদূর সওয়ার বয়ে ছোটা অসম্ভব। ক্রমশই তাদের গতি মন্থর হতে হতে শেষ পর্যন্ত তারা ভেঙে পড়বেই।

রাত কেটে গিয়ে কিছুটা বেলা বাড়বার পর এক জায়গায় বাধ্য হয়েই গানাদোকে ফিলিপিলিওর সঙ্গে তাঁদের ঘোড়া রুখতে হয়েছে তাদের একটু বিশ্রাম করতে দেওয়ার জন্যে। রাস্তার ধারে ফিলিপিলিওকে ঘোড়ার পাহারায় রেখে কয়াকে নিয়ে গানাদো কাছের একটা পাহাড় চূড়োয় গিয়ে উঠেছেন। এ শিখরদেশ থেকে কুজকো ও কাক্সামালকার যোগাযোগের আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথ সামনে পেছনে অনেকখানি দেখা যায়।

দূরবীণ তাঁদের ছিল না। তখনও পর্যন্ত দূরবীণ যন্ত্র উদ্ভাবিতই হয়নি। কিন্তু খালি চোখে সামান্য যেটুকু দেখতে পেয়েছেন তাতেই গানাদোর মুখে হতাশার হাসি ফুটে উঠেছে।

কয়ার দিকে ফিরে মুখে সেই হাসি নিয়েই বলেছেন, আর ঘোড়াগুলোর সঙ্গে নিজেদের হায়রান করে কোনো লাভ নেই কয়া। এখানে এই চূড়ার ওপর বসে থাকলেও যা হবে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেও তাই।

কয়ার দৃষ্টিশক্তি গানাদোর চেয়েও বুঝি তীক্ষ্ন। সরু একটা ফিতের মত খাড়া সব পাহাড়চূড়াকে যেন কোন মতে জড়িয়ে কুজকো থেকে যে পার্বত্য পথ ঘুরে ঘুরে নেমে এসেছে তার বহুদূরের একটি বাঁকে একরাশ পিঁপড়ের মত এসপানিওল সওয়ার সৈনিকদের সে ভালোভাবেই তখন দেখতে পেয়েছে। সে সওয়ার দলের তাদের কাছে পৌঁছোতে অবশ্য তখনও অনেক দেরী। কিন্তু নিজেরা তৎক্ষণাৎ রওনা হয়েও সে বিলম্বটা আর একটু বাড়ানো যাবে মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। কাক্সামালকায় পৌঁছোলেই যে তারা নিরাপদ তা মোটেই নয়। তবু সেখানে পর্যন্ত তাদের পৌঁছোন হবে না। তার অনেক আগেই এসপানিওল রিসালার কাছে তাদের ধরা পড়তে হবেই।

ম্লান একটু হেসে সেই কথাই বলেছে কয়া,—সত্যি, কোথায় ধরা দেব, এখানে, না আরো দূরে কোথাও, শুধু এইটুকুই এখন আমরা বেছে নিতে পারি।

হ্যাঁ,—গানাদোর স্বর এই প্রথম যেন বড় বেশী ক্লান্ত শুনিয়েছে, আমাদের ধরে ফেলতে ওদের খুব কষ্টও করতে হবে না। কারণ পথ এই একটাই, আর আমরা বাদে তাতে আর কোনো যাত্রীও নেই।

কথাগুলো বলতে বলতে গানাদোর চোখে হঠাৎ যে ঝিলিকটা দেখা গেছে সেটা কি অমোঘ নিয়তির বিরুদ্ধে অসহায় নিষ্ফল আক্রোশের?

হেরাদা ও সোরাবিয়ার তাড়নায় তাদের সওয়ার দল অনুসরণে ঢিলে দেয় নি। অক্লান্তভাবে চালিয়ে যথাসময়ের আগেই তারা কাক্সামালকায় পৌঁছেছে।

কিন্তু কোথায় তাদের শিকার?

গানাদো ফিলিপিলিও কি কয়া কারুর সন্ধানই তারা পায় নি। পেয়েছে অবশ্য তাদের ঘোড়া দুটোর। পাহাড়ী সড়কের এক জায়গায় একটা অত্যন্ত খাড়াই পায়ে হাঁটা পথের ধারের ছোট একটা গোনা ক ঘরের গাঁয়ের সামনে ঘোড়া দুটো ছাড়া অবস্থায় পাওয়া গেছে।

কখন কারা ঘোড়া দুটোকে অমন জায়গায় ছেড়ে গেছে তার কোন হদিস মেলে নি। হদিস দেবে কে! গাঁয়ে একটা মানুষ আছে যে তার কাছে খোঁজ মিলবে। কোথায় গেল গাঁয়ের মানুষ? একটা নয় দুটো নয় পর পর কয়েকটা এমনি খাঁ খাঁ গাঁ আর বসতি পার হওয়ার পর গাঁয়ে মানুষ না থাকার মানেটা বোঝা গেছে।

গাঁয়ে মানুষ পাওয়া যাবে কেমন করে? সব মানুষ ত সেই পাহাড়ী রাস্তায়! মেয়ে-পুরুষ ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ি সব যেন আগুন-লাগা গাঁ থেকে হুড়মুড় করে ছুটে পালাচ্ছে নিচের দিকে।

এই একটা নতুন ঝামেলা মাঝ রাস্তা থেকে এসপানিওল দলকে পোহাতে হয়েছে বটে।

কুজকো থেকে মাঝরাস্তা পর্যন্ত আসায় কোনো অসুবিধেই হয় নি। পাহাড়ী সড়ক একদম ফাঁকা। একটা আধটা এদেশী পথিক যদি বা সে পথে তখন চলে থাকে তারাও সওয়ারবাহিনীর ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়ে যেখানে পেরেছে লুকিয়েছে। তাদের চোখে আর দেখা যায় নি।

এখন কিন্তু এসপানিওলদেরও ভয়ডর যেন তাদের নেই। কিংবা সওয়ার বাহিনীর চেয়ে আরো ভয়ংকর কিছুকে এড়াবার জন্যে তারা যেন মরিয়া হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। দূরে থেকে শুধু আওয়াজ পেলে যারা ত্রিসীমানায় ঘেঁসত না তাদের ভিড় ঠেলে সওয়ার বাহিনীর ঘোড়া চালানোই দায় হয়ে উঠেছে।

এত ভয়টা তাদের কিসের?

সত্যি কোনো গ্রামে কোথাও আগুন ত লাগে নি। এ অঞ্চলে যা সবচেয়ে আতঙ্কের সেই ভূমিকম্প বা পাহাড়ের ধস নামারও কোনো চিহ্ন কোথাও নেই।

ফিলিপিলিও ছেড়ে যাবার পর সোরাবিয়া আর হেরাদার বাহিনীতে দোভাষী কেউ নেই। দু' চারজন সেপাই এ অভিযানে এসে সামান্য দুচারটে এদেশী শব্দ শিখেছে মাত্র।

কাতারে কাতারে যারা নামছে এ দেশের সেই গ্রামাঞ্চলের লোকেদের কাছে জিজ্ঞাসা-পত্র করে কিছুই তাই ভালো করে বোঝা যায় নি।

তারা শুধু সভয়ে কুজকোর দিকে আঙুল নেড়ে কি যেন বলেছে! যা বলেছে তার মধ্যে রেইমী কথাটা শুধু বার বার উচ্চারণের জন্যে কানে লেগেছে। তাতে এইটুকু বোঝা গেছে যে কুজকো শহরে রেইমী উৎসব সংক্রান্ত কোনো একটা ব্যাপার তাদের কাছে বিভীষিকা। সেই জন্যেই তারা সমস্ত পার্বত্য রাজ্যই ছেড়ে যত দূরে সম্ভব পালাবার চেষ্টা করছে।

এসপানিওল সওয়ার দল কাক্সামালকার দিকে যত অগ্রসর হয়েছে সংকীর্ণ পার্বত্য পথে এই শংকিত পলাতক আবালবৃদ্ধ-বনিতার ভিড় তত বেড়ে উঠেছে। চারি-দিকের গ্রামাঞ্চল থেকে বহুধারায় নেমে এসে মূল জনস্রোতে যুক্ত হয়ে তারা যেন সমতলের দিকে মানুষের ঢল সৃষ্টি করেছে।

মারধর ধমক হুমকিতে কোনো ফল হয় নি। যা তাদের ভিটেমাটি সব কিছু ছাড়িয়ে দিশাহারা করে ছোটাচ্ছে সে তাড়না এসপানিওলদের সম্বন্ধে আতঙ্কের চেয়ে অনেক বেশী প্রবল।

সে তাড়না যে কিসের তা কাক্সামালকায় পৌঁছোবার পর কিছুটা জানা গেছে, কিন্তু তার আগে সোরাবিয়া ও হেরাদার কুজকো থেকে সারা পথ ধাওয়া করে আসার সমস্ত উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে গেছে তাইতে।

জনতার এই বন্যাস্রোতের মধ্যে কোং খোঁজ করবে গানাদো আর তার সঙ্গীদে একেবারে হাতের মুঠো থেকে হঠাৎ ত পিছলে পালিয়েছে অপ্রত্যাশিত দৈবদুর্বিপাকে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যিই অ দৈবাধীন?

কাক্সামালকায় কোনোরকমে পি পৌঁছে সোরাবিয়া এই আকস্মিক জ বন্যার কারণ কিছুটা জানতে পেরেছে সংক্রামক মহামারীর মত কাক্সামালব অধিবাসীদের মধ্যেও তখন এক দুে বিভীষিকার ছোঁয়াচ লেগেছে। কুজে পথে যারা নেমে এসেছে তাদের সা যোগ দিয়ে কাতারে কাতারে কাক্সামালব অধিবাসীরাও সমতলের দিকে নাম শুরু করেছে। ব্যাপারটা শেষ পর্য এসপানিওল সেনাপতি পিজারোকেও ভাবিয়ে তুলে ছাড়ে নি। তাঁরই উদ্দি অনুসন্ধানের ফলে এইটুকু জানা গেছে রেইমীর উৎসব যা দিয়ে সূচিত উত্তরায়ণের সেই সূর্যবরণ অনুষ্ঠান পের ইতিহাসে এই প্রথম পণ্ড হওয়ার ঘট আকাশপতি পরম জ্যোতির্ময়ের চ অভিশাপ বলে এ দেশের মানুষ আে অন্ধ কুসংস্কারে ধরে নিয়েছে। এ অভিশা কলুষিত ঊর্ধ্বলোক ছেড়ে তাই তারা ছ চলেছে সমতলের সমুদ্রতটে। সেখা সমস্ত সৃষ্টির যিনি উৎস পাচাকামাক ভীরাকোচা নামে পূজিত সেই দেবা দেবের মন্দিরে তাভানতিনসুয়ুর শাপমুক্তি জন্যে তারা ধরনা দেবে। ভীরাকোচা য দয়া করেন তবেই সূর্যদেবের কোপ দ হয়ে এ দেশ অভিশাপ মুক্ত হতে পারে তা না হলে উত্তুঙ্গ তুষারমৌলী গিরি শিখরে বেষ্টিত সূর্যদেবের পরমপ্রিয় দেশ ধ্বংস হয়ে সমুদ্রের জলে তলি যাবে।

সমতলের সমুদ্রতীরের দিকে আকস্মি জনবন্যার এ ব্যাখ্যা পেয়ে পিজারো সন্তু হতে পারেন নি। তিনি উদ্বিগ্ন ও বে একটু শংকিতই হয়েছেন। সোরাবিয়া হেরাদার কাছে হুয়াসকারের হত্যার খব তখন তিনি পেয়েছেন। হঠাৎ এ হত্যা কারণ কি হতে পারে তিনি ভেবে পান নি পরামর্শ সভা ডেকেও তিনি বিফ হয়েছেন। নানাজনের কাছে সব কি আকস্মিক ব্যাপারের নানা ব্যাখ্যা পাওয় গেছে। ঘটনাগুলির মধ্যে এ রাজ্যের নতু কোনো অভ্যুত্থানের গভীর ষড়যন্ত্র আ বলে সন্দেহ করেছে কেউ কেউ। পিজারো নিজেরও সেরকম একটু সন্দেহ হয় নি এমন নয়। কিন্তু হুয়াসকারের অপ্রত্যাশিত হত্যার সঙ্গে অভিশপ্ত বলে দেশ ছেড়ে পালাবার এ উন্মত্ততার সম্পর্ক কি হতে পারে? রেইমীর উৎসব পণ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অভিশাপের আতঙ্ক কি আপনা থেকেই এ দেশের মানুষের মনে এমন দারুণ ও তীব্র হয়ে উঠেছে?

(ক্রমশ)
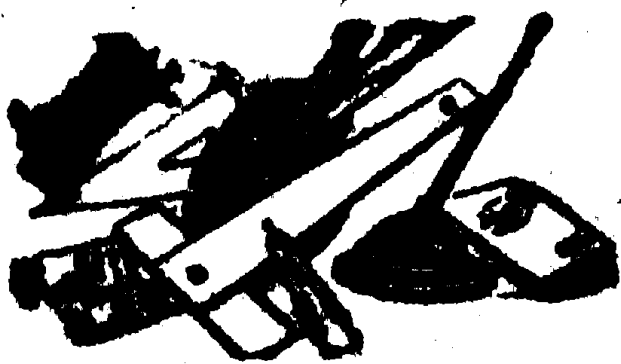
তিন তাসের খেলা

বাজির হার তখন গ্যালপে গ্যালপে উঠছে। দু' টাকায় চার টাকা, চারে আট, আটে ষোলো। ডালিমতলা লেনের মসজিদের কোলঘেঁষা দোতলা বাড়ীর ছাদের ঘরে চঞ্চলা লক্ষ্মী এই এর তাস, ঐ ওর তাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটছেন। খানদানি আখড়া। জুয়াড়িতে ঘর গিজগিজ করছে। বোর্ড'ই বসেছে তিনটে, বোর্ড-প্রতি কম্‌সে-কম পাঁচ টাকা। কোনো কোনোদিন বাম্পার-ডে। বোর্ড দশ কি পনেরো টাকায় শুরু।

ঘরের মালিক রামশরণ আপ-কান্ট্রি আহির। কলকাতায় এসে দু-চারটে মোষ আর গরু নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল। এখন ও-পাড়ার আধখানা জুড়ে ওর পেল্লায় খাটাল। লোকই খাটছে চল্লিশ-পঞ্চাশজন। তার পাশাপাশি গাঁজা-কোকেন-চরসের চালাও চোরাই ব্যবসা। মেয়েছেলের কারবার আছে লোয়ার চিৎপুরের এক বাড়ীতে। আর ডালিমতলা লেনে গুণ্ডা-ভদ্রলোক, মাতাল-ভেজিটেবল-খেকো, চোর আর জোচ্চোরের তেলে-জলে একাকার তিন তাসের আস্তানা। উজীরকে ফকির, ফকিরকে উজীর বানানোর সাফাখানা।

ডানদিকের কোণ ঘেঁষে আটটি হাত তাস বাঁটছে, তাস তুলছে। চারজোড়া চোখ চারজোড়া চোখের দিকে দৃষ্টি রাখছে। পুরোদমে ব্লাইন্ড চলছে। ট্রাউজার্সের পকেট থেকে, পাঞ্জাবির জেব থেকে লাল-নীল-সবুজ কারেন্সির কাগজ বেরিয়ে আসছে, মাঝে মাঝে সিকি-আধুলি বোর্ডে ডাঁই হয়ে উঠছে। আমি, সুরেন, পিল্লাই, ওয়াকার। ইউরেশিয়ান ডবকা ছুঁড়ী, লিজি এর-ওর পাশে এসে বসছে, বেপরোয়া ব্লাইন্ড খেলা যতই ক্ষ্যাপাটে কদমে এগিয়ে চলেছে, উত্তেজনায় ও দাঁত দিয়ে চীৎকারের মতো চাপা শব্দ করছে। 'কুড়ি'—চারজনের গলায় শব্দটির রিলে শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিল্লাই তাস দেখল। সব তাস না, দুটো ঢেকে পয়লা তাসটি। লিজি ঝাঁপ দিয়েছে ততক্ষণে ওর পেছনে। একটু বিরক্ত হয়ে তাস গুটিয়ে উরুর চাপে রেখে একটি পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিল পিল্লাই। আমরা তিনজন পরপর দু দান ব্লাইন্ড খেললাম। পিল্লাই একটু আড়ভাবে দ্বিতীয় তাসটি দেখল। বাজখাঁই গলায় হাঁকল 'গ্যালপ', তারপর একটি দশ টাকার নোট এগিয়ে দিল। সুরেন, ওয়াকার ঝপাঝপ তাস তুলে অদ্ভুত শূন্যদৃষ্টিতে এধার-ওধার তাকিয়ে তাস প্যাক করে দিল। এবার দ্বৈরথ। আরও দুটো ব্লাইন্ড খেললাম আমি। তৃতীয় তাসটি দেখল পিল্লাই। টাকা দেয়ার আগে সেকেন্ডখানেক ইতস্তত করল। আর একটা ব্লাইন্ড ঠুকলাম। একমুঠো নোট দলা করে টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে পিল্লাই হাঁকল, 'শো'। সুরেন আর ওয়াকার উত্তেজনায় যেন বসে থাকতে পারছে না। লিজি উঠে দাঁড়িয়েছে। পাখার বাতাসে ওর ছড়ানো স্কার্টের প্রান্ত ডিস্কাসের মতো উড়ছে। কোমর থেকে গ্রীবা অব্দি ভেঙে নামিয়ে এনেছে ঠিক আমার মাথার ওপর, একটি হাত আলতোভাবে আমার কাঁধ ছুঁয়ে, ব্লাউজের ওপরের বোতাম খুলে গেছে, দুটি লালে-সাদায় মাখা নিষিদ্ধ ফল ব্রা-র শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে। ওর ঘন গরম নিঃশ্বাস আমার কাঁধ-গলা পুড়িয়ে দিচ্ছিল, আমি মুখ তুলে তাকাতে লিজি চোখ মটকে বলল, 'ওয়ান ফরচুন কিস্?' আমি মেঝে থেকে তাস তুলে ধরতে ও দ্রুত একবার তাসগুলোর পিঠে, একবার আমার গালে ম্যাজেন্টা-রাঙা ঠোঁটদুটি বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'সি'। বহুক্ষণ সময় নিয়ে টিপে টিপে তিনটি তাস দেখে বললাম, 'টেক্কা টপ্'। পিল্লাই খশ্‌খশে গলায় হাঁকল, 'গো অন'। দুজনে দুটি টেক্কা ছুঁড়ে দিলাম। পিল্লাই বলল, 'নেক্সট'? একটা বিবি ফেলে দিলাম। পিল্লাই আর একটা টেক্কা। মাথার ওপর জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে যাওয়া আলোয়, দুরন্ত পাখায়, অন্তহীন নৈঃশব্দ্যে, দুজনের দুজোড়া চোখের ছুরির চালাচালিতে কেবল একটা কথা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে—এভার থার্ড কার্ড ইজ ইয়োর নেমেসিস। চোখ বুজে তাবৎ দেব-দেবীকে স্মরণ করে তৃতীয় তাসটি ফেললাম। [illegible]।

'বা...স' বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাবো, তাকিয়ে দেখি, পিল্লাই-এর মুখের সব রক্ত কে যেন এক লহমায় ব্লটিং কাগজে শুষে নিয়েছে। মাথা নীচু করে তৃতীয় তাসটি প্যাক করতে যাচ্ছিল, লিজি হঠাৎ ওর ম্যানিকিওর-করা তর্জনী দিয়ে সেটিকে উলটে দিল। একটি কালো গোখেচারা চার। বাম হাতে ত্বরন্ত বোর্ড কোলের দিকে টেনে নিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট লিজিকে বাড়িয়ে দিলাম। ডালিমদানার মতো আমার গালের ওপরের আঁচিলটা দুপাটি দাঁতের মাঝখানে ঝুটে দিয়ে লিজি ঘরের আর এককোণে নতুন পার্টি ধরতে এগিয়ে গেল।

ঘর-গেরস্থালি-সংসার সবকিছু গুঁড়িয়ে দেওয়া এই তিন তাসের খেলা। মধ্যরাত্রে চষে চষে ফেরা ক্যামাক স্ট্রীট থেকে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, বেদিয়াডাঙা থেকে গরচা, অবিনাশ কোবরেজের গলি থেকে দমদম চিড়িয়ার মোড়। শো, ব্লাইন্ড, পেয়ার, রান, ফ্লাশ—দিনরাত্রি নাওয়া-খাওয়া বিশ্বসংসার ভুলে বাদশা-বেগম-গোলামদের পায়ে পায়ে হয়ে ফুতা হয়ে ফেরা। সারা শরীরে বেশ্যার দুর্গন্ধ মেখে ছুটেআসা মোদো-মাতাল, বালাসি। উঠতি কাপ্তান—খানু মক্কেল, বড়লোকের নাড়ুগোপাল ছেলে—ওস্তাদ দালাল। হরেক রকমের হাজার কিসিমের জুয়াড়ী চিড়িয়া বক্‌বকম্‌ করতে থাকে। এরই ফাঁকে ফাঁকে ভিয়েনে রসান চাপিয়ে চালান হয় চোরাই নেশা, কস্‌বি মেয়েছেলে, গলায় সিল্কের রুমাল ওড়ানো চুলে অ্যালবার্ট-কাটা লালটু কিশোর। হঠাৎ হঠাৎ ঘরের বাইরে টুলের ওপর অতন্দ্র লোচন ওয়াচম্যানের তীব্র শিস্‌ শোনা যায়। সবকটা আলো টুপ্‌টাপ নিভিয়ে দিয়ে পেছনের দরজার কাছে ভিড় গিজগিজ করতে থাকে। অথবা কোনো টালমাটাল মুহূর্তে কারো কোমর থেকে খিঁচিয়ে ওঠে মুখ-খোলা ছুরি, এমনকি ট্রিগারে আঙুল চেপে-ধরা কালো রঙের সাইলেন্সার। এক-নাগাড়ে কখনো দু-তিনদিন টানা খেলা চলে, মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে সিগ্রেটের টুকরো, মাংসের হাড়, তেলে-ভাজা, পাঁপড়, ডালমুট, আধ-খাওয়া লুচি-পরোটা। বাইরে দিন, দুপুর, রাত আসে, ক্যামাক স্ট্রীট, বেদিয়াডাঙা, ডালিমতলা-র এই নির্দিষ্ট খুপরিগুলিতে নয়।

ঘরের চার দেয়ালে চারটি ফ্লুরেসেণ্ট টিউব। ঠিক মাঝখানে একটি প্রাচীন সোফায় কর্তা রামশরণ কাৎ হয়ে শুয়ে। সামনে টিপয়ে নীল স্ফটিকের প্লাশে জিম-খানা, একটি পাত্রে আঙুর আর আপেল, অপর একটি পিরিচে একটি প্রমাণ সাইজের মুরগী রোস্টেড অবস্থায় আকাশের দিকে দু ঠ্যাং তুলে শুয়ে আছে। এই আঁখড়ায় সবচেয়ে বজ্জাত আর দজ্জাল মেয়ে মুনিয়া পোষা বেড়ালের মতো রামশরণের লোম-ভর্তি বুকে চোখ বুজে মুখ ঘষছে, মাঝে মাঝে ওর লুঙ্গির কষি ঠেলে বেরিয়ে আসা ভুঁড়িতে মুখ রেখে বুঁ-উ-উ করে শব্দ তুলছে। রামশরণের নেশা তখন প্রচণ্ড জমাটি, খিক খিক হেসে উঠছে। লিজি কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই ওর উড়ন্ত স্কার্টের ভেতর থেকে ফুঁসে-ওঠা জানু বেশ জম্পেশ করে কামড়ে দিল রামশরণ। তার-পরই খুবই বিরক্তভাবে বলল, 'যা উধার হট্‌'। যেন খেয়ে ফেলবে, এমনভাবে রাম-শরণের বুকে লেপ্‌টে থাকা মনুয়ার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে কিছু দূরে গিয়ে হাতের তেলোর ওপর থুৎনি রেখে লিজি চারপাশে ইতি-উতি চাইতে লাগল।

সে-রাতে বোধহয় বেশ ভালো কামাই হ
দরুণ অন্য এক বোর্ডের একটি সদ্য
ওঠা তরুণ গলা ছেড়ে গান শুরু করে
'আজকা খুশি কি রাত'—রামশরণের
দাবড়ানিতে বিলকুল থ মেরে আবার
মন দিল।

রাত ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকা
পর পর গোটাতিনেক বড়োরকম দান।
বেশ একটু উদাস হয়ে গিয়েছিলাম।
মাঝে ঘড়ির দিকে চাইছিলাম। ত
সামান্য কিছু উইন আছে। চোখের
দুটো জ্বালা জ্বালা করছিল। ম
ভেতরে কেমন তেতো তেতো স্বাদ-
জানি মাঝে মাঝে গা গুলিয়ে উঠ
সুরেনটা জিতছে খুব। পিল্লাই বরা
সাবধানে খেলে। ওয়াকার একটু বেপ
বেহিসেবী গোছের। দুজনেরই
রীতিমত খারাপ যাচ্ছে। এদিক-ও
তাকিয়ে হিপ্‌-পকেট থেকে ওয়াকার
একশো পাত্তির নোট বের করে হিংস্র
তাস শাফ্‌ল করতে লাগল। বোর্ড-
দিয়ে আমি গালিচার ওপর শরীর এ
দিলাম। সুরেনের দিকে চেয়ে
রাজটিকার মত ওর কপালের মাঝ
একটি রগ ভয়ংকর ফুলে উঠেছে।
ঠোঁট সংবদ্ধ, মুখে রক্ত ফেটে পড়ছে।

হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে-ওঠা পা
শব্দ, তারপরই ভেজানো দরজা আগন্তু
হাতের অসহিষ্ণু ধাক্কায় হাট্‌-হাট্‌
খুলে গেল। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দা
উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার একটি শীর্ণ যু
সুরেনের কাছে ছুটে এসে চেঁচিয়ে উ
'বাবা'! সারা ঘর খেলা ভুলে উৎকর্ণ। র
শরণের বুক থেকে মনুয়া ছিট্‌কে পড়ে
সুরেন হাতের তালুতে মুখ ঢেকে বসে

যুবকটি সুরেনের দুকাঁধ ঝাঁ
আবার 'বাবা' বলে আর্ত চীৎকার ক
উঠল। তারপর ওর হাঁটু জড়িয়ে
ভাঙা ফ্যাশফ্যাশে গলায় বলতে লাগ
'বাবা, এক্ষুণি চলো। অনেক খুঁজে খু
তবে তোমার হদিশ পেয়েছি। বুনা
বোধহয় আর বাঁচার আশা নেই। ডা
সন্ধেবেলা জবাব দিয়ে গেছেন। ঘণ্টাদু
আগেও মাঝে মাঝে হিক্কা তুলছিল, ত
'বাবা' 'বাবা' বলে চেঁচিয়ে উঠছিল। তি
দিন ধরে তোমার পাত্তা নেই—মা পাগলে
মতো ঘর-বার করছেন, কাঁদছেন।
সময়...বুনু তোমাকে দেখতে চাইছে
চলো শীগগির!' বলতে বলতে ছেলে
কান্নায় ভেঙে পড়ে।

সুরেন ওকে ঠেলে সরিয়ে টান ট
হয়ে বসে। কোল থেকে এক আঁজলা নো
দলা করে পাকিয়ে ছেলেটির দিকে ছুঁ
দিয়ে বলে, 'যাচ্ছি, যা'। তারপর একদ
লোকের বিস্মিত চোখের সামনে দ্রুত হা
বার-দুয়েক শাফ্‌ল করে আবার তা
বাটতে শুরু করে।

—নিমাই

[উপন্যাস]

কেয়া পাতার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

আগের ঘটনা

[উনিশ শ চল্লিশের অক্টোবর। কলকাতার ছেলে বিনু দুই দিদি আর মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে পূব বাঙলার রাজদিয়ায় দাদু হেমনাথের বাড়ি। বিশ বছর বাদে বিনুর মা সুরমা এলেন রাজদিয়ায়।

আশ্চর্য মানুষ হেমনাথ। গাঁয়ের নানান ঝক্কি-ঝামেলা তাঁর মাথায়।

হেমনাথের বাড়ির কর্মচারী যুগলের সঙ্গে বিনুর ভাব বেশ গাঢ় হল।

প্রথম দিনেই অবনীমোহনদের সঙ্গে আলাপ হয় মজিদ মিঞা আর হাসেম আলির। ওদের আন্তরিকতায় সুরমারা অভিভূত। মজিদ হয়ে গেল অবনীমোহনের নতুন 'মিতা'।

পরদিন। বিনুদের রাজদিয়া ঘুরে দেখালেন হেমনাথ। ফেরার পথে 'বিস্ময়কর চমকপ্রদ মানুষ' লারমোর সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনিও ওদের সঙ্গে হেমনাথের বাড়ি এলেন।

স্নেহলতার সঙ্গে দেখা হতেই কৌতুকের খেলা জমল। লারমোরের সঙ্গে এ বাড়ির মধুর প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক দেখে বিনু মুগ্ধ।

বিকেল। যুগলের দেখা মিলল এবার। সে বেত কাটছিল।

এমন সময় হিরণ ফিরল। সুধা জানাল, 'আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।']

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। আট ।।

হিরণ আর সুধা সোজা সেই পুবদুয়ারী ঘরখানায় চলে এল ; তাদের পিছু পিছু বিনুও। যুগলও সঙ্গে এসেছিল। সে ভেতরে ঢুকল না। দরজার কাছে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে থাকল।

অবনীমোহন কি লারমোর, সুরমা কিংবা স্নেহলতা—সবাই ঢিলেঢালাভাবে তক্তপোষে বসে ছিলেন আর এলোমেলো গল্প করছিলেন।

হিরণকে দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন লারমোর ; উচ্ছ্বাসময় সুরে বললেন, 'আরে শ্যামচন্দর যে—আয় আয়।'

ঘাড় বাঁকিয়ে হাসিমুখে হিরণ বলল, 'আমি তো শ্যামচন্দর—কালো কুটকুটে। তুমি কী?'

সুর করে এক কলি গেয়ে উঠলেন লারমোর, 'আমি গোরাচাঁদ হে—'

'তাই নাকি!'

'নিশ্চয়ই ; বিশ্বসংসার সে কথা বলবে।' নিজের একখানা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে লারমোর বললেন, 'দ্যাখ্ কেমন ধবধবে—'

ঠোঁট কুঁচকে কপট তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে লারমোরের হাতখানা ঠেলে দিল হিরণ, 'এ হাত বার করে আর রঙের গর্ব করতে হবে না। গোরাচাঁদ একদিন হয়ত ছিলে, এখন আর নেই। এদেশে থাকতে থাকতে—'

সন্দিগ্ধ চোখে লারমোর তাকালেন, 'থাকতে থাকতে কী?'

'আমাদের মতন কষ্টিপাথর হয়ে গেছ।'

'বলছিস বলছিস!'

'একবার কেন, হাজার বার বলছি।'

একটু আগে লারমোরের চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে লঘু কৌতুকের আভা ছিল ; এবার তাতে ভিন্‌ভাবের রঙ লাগল। আবেগপূর্ণ সুরে তিনি বলতে লাগলেন, 'কষ্টিপাথরই আমি হতে চেয়েছিলাম রে। যেদিন প্রথম এদেশে আসি সেদিন থেকেই আমার সাধ বাঙালী হব। তারপর চল্লিশ বছর ধরে সেই সাধনাই করে আসছি। নিজের বলতে যা ছিল সব ফেলে দিয়ে ভুলে গিয়ে এ দেশের অন্ন-বস্ত্র-ভাষা মাথায় তুলে নিয়েছি। প্রাণভরে সারা গায়ে এখানকার আলো বাতাস ধুলো-কাদা মেখেছি। বাকি ছিল গায়ের রঙটা। তুই তো বলছিস, রঙের গর্ব আমার ঘুচেছে। এতদিনে আমি কি তবে পুরোপুরি এদেশের মানুষ হতে পারলাম!'

লারমোরের আবেগ হিরণের বুকের অতলে সব চাইতে স্পর্শকাতর তারটাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। গভীর গলায় সে বলল, 'তুমি শুধু এদেশের মানুষ না লালমোহন দাদু, সব দেশের সব কালের মানুষ। তুমি বাঙালী হতে চেয়েছ ; তার বদলে আমরা যদি তোমার মতন হতে চাইতাম, জীবন ধন্য হয়ে যেত।'

খানিক আগের ঘোরটা হঠাৎ কেটে গেল। হাল্কা গলায় লারমোর বললেন, 'থাক, আমাকে আর আকাশে তুলতে হবে না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'আর মতন হলে সত্যি সত্যি ধন্য হতে পারতিস সে আমি না, ঐ মানুষটা—' লারমোর আঙুল দিয়ে হেমনাথকে দেখিয়ে দিলেন।

বিরক্তভাবে চেঁচামেচি করে উঠলেন হেমনাথ, 'বেশ তো দু জনের ভেতর হচ্ছিল। তার মধ্যে আমাকে আবার টানাটানি কেন? হিরণ তোমাকে আকাশে চড়াতে চাইছে, একলাই ওঠো না বাপু। ও জয়গাটার ওপর আমার লোভ নেই।'

আপন মনেই এবার বুঝি লারমোর বললেন, 'আমি যদি এ দেশের মানুষ হতে পেরে থাকি তা ঐ হেমের জন্যে। আমার সব কাজ সব ভাবনার পেছনে ঈশ্বরের দূত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে।'

হেমনাথ চোখ পাকিয়ে তেড়ে উঠলেন, 'আবার—'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

এর ভেতর সুধা আর বিনু তক্তপোষে উঠে সুনীতির গা ঘেঁষে বসে পড়েছে।

একসময় হিরণের চোখে চোখ রেখে হেমনাথ ডাকলেন, 'অ্যাই শিম্পাঞ্জি—'

মাথাটা সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়ে হেসে হেসে হিরণ বলল, 'চমৎকার খেতাব ; এই মাথা পেতে নিলাম।'

হিরণ এমনভাবে এমন সুরে বলল, যে সবাই হেসে উঠল।

হাসাহাসির ভেতর লারমোর বললেন, 'তুমি দেখছি হিরুটাকে মানুষের ভেতরেই রাখতে চাও না হেম। নাম কেটে একেবারে শিম্পাঞ্জির দলে নামিয়ে দিলে!'

'দেব না!' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'কাল রাত্তিরে সেই যে গেল বাঁদরটা, তারপর আজ এই এতক্ষণে আসার সময় হল। অথচ বলে গিয়েছিল, সকালবেলা আসবে, আমাদের সঙ্গে রাজদিয়া বেড়াতে যাবে। হেন তেন কত কী। একটা কথার যদি ঠিক থাকে।' বলতে বলতে হিরণের দিকে ফিরে চোখ পাকালেন 'সারা দিন কোন্ চড়ায় বসে থাকা হয়েছিল শুনি? মিথ্যে কথা বললে কিন্তু মাথা ভেঙে দেব।'

হিরণ চোখ তুলে একবার সুধাকে দেখে নিল। সুধার টেপা ঠোঁটে এবং চোখের তারায় শব্দহীন হাসি খেলে যাচ্ছিল ; তার লাঞ্ছনায় মেয়েটা বুঝিবা খুব খুশী। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে কপট ভয়ে হিরণ বলল 'ভোর রাত্তিরে উঠে গয়নার নৌকো করে সিরাজদীঘায় আহাদ কাকার বাড়ি গিয়েছিলাম,

ভেবেছিলাম ফিরতি নৌকোয় সকাল সকাল চলে আসতে পারব। আহ্লাদ কাকা দুপুরে না খাইয়ে ছাড়লে না। তাই তো ফিরতে দেরি হয়ে গেল।'

হেমনাথ বললেন, 'আহ্লাদের ওখানে কোন্ রাজকার্যটা ছিল?'

গ্রামোফোনের বাক্সটা তুলে ধরে হিরণ বলল, 'এইটা আনতে গিয়েছিলাম। গেল মাসে আহ্লাদ কাকার মেয়ের বিয়ে গেছে না; তখন ওটা নিয়ে গিয়েছিল।'

'আজই ওটার কী দরকার পড়ল?'

লারমোর এই সময় বলে উঠলেন, 'গ্রামোফোন দিয়ে কী হয়? ছেলেটা ঘরে পা দিতে না দিতে তুমি যে মোক্তারের জেরা শুরু করে দিলে হেম। বোস্ রে হিরু—'

হিরণ তক্তপোষের একধারে বসল।

গ্রামোফোনের নামে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন লারমোর। বললেন, 'আজ একটু গান-বাজনা হোক তা হলে।'

হিরণ বলল, 'সেই জন্যেই এটা নিয়ে এলাম।'

লারমোর শুধোলেন, 'কী কী রেকর্ড আছে রে?'

'রবীন্দ্রসঙ্গীতই বেশী।'

'রবীন্দ্রসঙ্গীত' মন্ত্র জপ করার মতন করে লারমোর বললেন, 'মানুষের পৃথিবীতে নিষ্পাপ পবিত্র জিনিস খুব বেশী নেই। অল্প যে ক'টা আছে তার ভেতর রবীন্দ্রনাথের গান একটা; না কি বল হেম?' বলে হেমনাথের দিকে তাকালেন।

আস্তে করে মাথা নাড়লেন হেমনাথ, হ্যাঁ। ঐ গানগুলো দিয়ে ঈশ্বরকে যেন ছোঁয়া যায়।'

'ঠিক বলেছ।' লারমোর আবার হিরণের দিকে ফিরলেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কী আছে? কীর্তন?'

হিরণ বলল, 'আছে দু চারখানা।'

'ভাটিয়ালি?'

আছে।'

'এ যে একেবারে মহোৎসবের ব্যাপার রে। দে, লাগিয়ে দে।'

স্নেহলতা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার বলে উঠলেন, 'উঁহু-উঁহু এখন না।'

লারমোর বললেন, 'তবে কখন?'

'সন্ধ্যের পর। ইলিশ মাছগুলো রাত্তিরে খেতে হবে তো।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

'কাঁচা আর খাওয়া যাবে না। যাই, কি রকম কী রান্না হবে ওদের বলে আসি।' বলতে বলতে হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়লেন স্নেহলতা।

আকুল সুরে লারমোর বললেন, 'ইলিশ ভাতে আর ইলিশ ডিম দিয়ে টক যেন অবশ্যই হয়।'

বর দেবার ভঙ্গিতে স্নেহলতা বললেন, 'হবে।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই সন্ধ্যে নেমে গেল। অন্ধকারটা কোথায় যেন হাত-পা গুটিয়ে চুপটি করে বসে ছিল; লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে চোখের পলকে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। খুব ঘন করে বোনা কালো শাড়ির মতন আশ্বিনের সন্ধ্যে চোখের সামনের সজল শ্যামল মনোরম দৃশ্যপটকে দ্রুত মুড়ে ফেলতে লাগল।

এতক্ষণ জোনাকিদের দেখা পাওয়া যায় নি। হঠাৎ তারা উঠোনে, দূরে ধানবনে, বাগানের নিবিড় গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে নাচানাচি শুরু করে দিল।

এদিকে স্নেহলতা ইলিশ মাছের ব্যবস্থা করে ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর দরজায় দরজায় জলছড়া দিয়ে সন্ধ্যেবাতি দেখিয়ে পুবদুয়ারী ঘরে চলে এলেন। তক্তপোষের একধারে বসতে হিরণকে বললেন, 'নে এবার আরম্ভ কর।'

গ্রামোফোনে দম দিয়ে নতুন পিন টিন লাগিয়ে রেকর্ড বাজাতে শুরু করল হিরণ। একের পর এক গান—সাহানা দেবীর, নীহারবালার, অমলা দত্তর, কণক দাসের। সবগুলোই রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান।

প্রায় সবাই তন্ময় হয়ে শুনছিল। কিন্তু তক্তপোষের দূর প্রান্তে যেখানে সুধা-সুনীতি বসে আছে সেখানকার হাওয়ায় ফিসফিসানির মতন একটা শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিনুও সুধা-সুনীতির কাছেই এতক্ষণ বসে ছিল; এখন শুয়ে পড়েছে। সারাদিন ঘোরাঘুরি গেছে; আর বসে থাকতে পারছিল না সে। চোখের পাতা ধীরে ধীরে ভারী হয়ে মুড়ে আসছিল।

এই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা বাজছে, 'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি—'

আধো ঘুমে বিনু শুনতে পেল সুনীতি সুধাকে বলছে, 'এ্যাই ছুটকি—'

সুধা বলল, 'কী বলছিস?'

'বেছে বেছে কিরকম গান এনেছে দেখেছিস?'

'কি রকম?'

গলা আরো নামিয়ে সুনীতি বলল, 'একেবারে সুধামাখানো।'

আড়ে আড়ে একবার স্নেহলতা-সুরমাদের দেখে নিয়ে জিভ ভেংচে দিল সুধা, 'ভাল হবে না বলছি দিদি—ই-হি-হি-হি—'

আগের গানটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। হিরণ রেকর্ড বদলে দিল। মৃদু নেশার মতন কি যেন গানটার গায়ে আলতো ভাবে জড়ানো।

> 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে
> আমার এই রীতি, তোমা বই
> জানি নে।
> বিধুমুখে মধুর হাসি দেখিলে
> সুখেতে ভাসি
> তাই তোমারে দেখতে আসি,
> দেখা দিতে আসি নে।'

ছোট বোনের গালে আস্তে করে টোকা দিয়ে সুনীতি বলল, 'শুনছিস-শুনছিস—'

সুনীতির দিকে মুখ না ফিরিয়ে ঈষৎ ঝাঁঝালো গলায় সুধা বলল, 'শুনছি। তুই আর বকবক করিস না।'

সুনীতির ঠোঁটে, মুখে, চোখের কালো তারায় দুষ্টুমি নাচছিল। এমনিতে সে বেশ গম্ভীর। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রগল্‌ভতা যেন তার ওপর ভর করে বসেছে। সুধার কানের কাছে মুখটা নিবিড় করে সে বলল, 'এই সব গান খুঁজে খুঁজে কার জন্যে এনেছে জানিস?'

'কার জন্যে?'

'তোর জন্যে।'

চাপা গলায় সুধা ঝঙ্কার দিল, 'তোকে বলেছে!'

সুনীতি হেসে হেসে বলল, 'মুখ ফুটে ঠিক বলে নি। তবে—'

'কী?'

তোকে ছাড়া আর কাকেই বা এসব গান শোনাতে পারে বল্?'

সুধার মাথায় এবার দুষ্টুমি ভর করল, 'কেন, তোকেও তো পারে।'

মাথাটা আস্তে করে দুলিয়ে সুনীতি বলল, 'উঁহু—'

সুধা এবার আর কিছু বলল না। স্থির দৃষ্টিতে বড় বোনের দিকে তাকাল।

সুনীতি বলল, 'কাল থেকে তোর আর হিরণকুমারের ভেতর যা চলছে তাতে এই গানগুলো না শোনালে আমি ওর প্রাণদণ্ড দিতাম।'

সুধা চকিত হল। তার বিব্রত মুখে চোখের তারায় ভয়ের মতন কি যেন ফুটল। কাঁপা গলায় সুধা শুধলো, 'কী চলছে আমাদের ভিতর?'

কাল ফীটনে করে আসবার সময় দুজনে মুখোমুখি বসে শুধু গল্প আর গল্প। বাড়ি ফিরেও সে গল্প থামে না। আজও বাগানের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে দু'জনে কথার ফোয়ারা ছোটাচ্ছিলি। আর—'

'আর কী?'

'একজন আরেকজনের দিকে কেমন করে তাকিয়ে ছিলি জানিস?'

'কেমন করে?'

'একেবারে মুগ্ধ, মুগ্ধ, মুগ্ধ হয়ে—'

সুধা ঠোঁট টিপল। চোখের নীলাভ তারা নাচিয়ে বলল, 'যেমন করে তুই আনন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিলি, না?'

চোখ পাকিয়ে সুনীতি কি বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় গ্রামোফোনে কড়-কড় করে খানিকটা কর্কশ আওয়াজ তুলে গান বন্ধ হয়ে গেল। সুধা-সুনীতি চমকে সেদিকে তাকাল। বিনুও মাথা তুলতে চেষ্টা করল, পারল না। চোখ দুটোয় ঘন আঠা লাগিয়ে কেউ যেন আরো বেশি করে জুড়ে দিচ্ছে।

উদ্বেগের সুরে স্নেহলতা বললেন, কী হল রে হিরু?'

খানিকক্ষণ গ্রামোফোনটা নাড়াচাড়া করে হিরণ বলল, 'স্প্রিং আর একটা ছোট কল কেটে গেছে।'

'তাহলে?'

'না সারালে রেকর্ড বাজবে না। কালই নারাণগঞ্জ থেকে এটা সারিয়ে আনব।'

লারমোর ওধার থেকে আক্ষেপের সুরে বললেন, 'এমন জমজমাট আসরটা একেবারে মাটি হয়ে গেল।'

হেমনাথ বললেন, 'মাটি বলে মাটি!'

স্নেহলতা, সুরমা, শিবানী—সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। এমন মনোরম গানের আসর মাঝপথে ভেঙে যাওয়াতে তারাও দুঃখিত হলেন।

হঠাৎ সুধা বলে উঠল, 'গান কিন্তু এখনও চলতে পারে।'

হিরণ উৎসুক হল, 'কি ভাবে?'

সুধা বলল, 'দিদি খুব ভাল গাইতে পারে। যদি একটা হারমোনিয়াম—'

তার কথা শেষ হবার আগেই চাপা-গলায় সুনীতি বলতে লাগল, 'এই সুধা, এই—এই—'

হিরণ হাসিমুখে বলল, 'ও'কে 'এই-এই' করছেন কেন? আমাদের বাড়ি হার-মোনিয়াম আছে। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

'না—না, কিছুতেই না—' সুনীতি দুহাত সমানে নাড়তে লাগল।

'না কি হ্যাঁ, পরে বোঝা যাবে'খন। আগে তো হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসি।' হিরণ উঠে দাঁড়াল।

'আমি গাইব না, কিছুতেই না।' সুনীতি প্রায় চেঁচাতেই লাগল, 'শুনুন, আমার চাইতে সুধা ঢের, ঢের ভাল গাইতে পারে, অভিনয়ও করতে পারে। কলেজের ফাংশনে গান গেয়ে অভিনয় করে কত কাপ-মেডেল পেয়েছে।'

হিরণের চোখের তারা এবার সুধার দিকে ঘুরল। মুখ দেখে মনে হল, এতখানি বিস্মিত আগে আর কখনও হয় নি হিরণ। আস্তে করে বলল, 'অভিনয় করতে পারেন? তাহলে তো পুজোয় একটা ভাল নাটক করতেই হয়।'

হঠাৎ এই সময় হেমনাথ বললেন, 'আমাদের সুধাদিদি আর হিরণের মধ্যে দেখছি অনেক মিল। দু'জনেই কথাসরিৎ-সাগর: আবার দু'জনেই অভিনয় করতে পারে।'

সুরমা অবাক হয়ে বললেন, 'হিরণ অভিনয় করতে পারে!'

'পারে আবার না!' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'পেলে বলতে তো ও একেবারে অজ্ঞান; নাওয়া-খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে যায়। পুজোর ছুটিতে রাজদিয়ায় সবাই ফিরে আসুক, তখন দেখবে হিরণ-চন্দর নাটক বগলে করে এ-বাড়ি ও-বাড়ি কেমন ছোটাছুটি করছে। তখন চলা-ফেরা-চাউনি দেখলে মনে হবে স্বয়ং শিশির ভাদুড়ি।'

ঈষৎ অসহিষ্ণু সুরে হিরণ বলল, 'নাটক এখন থাক, আমি ছুটে গিয়ে হার-মোনিয়ামটা নিয়ে আসছি।'

সুধা হাসল, 'নীহারবালা কনক দাসের রেকর্ড শোনার পর আমার গান কারো ভালো লাগবে না। না-না, হারমোনিয়াম আনবেন না, কিছুতেই না।'

এরপর হিরণ কী বলল, বিনু শুনতে পেল না। গাঢ় ঘুম চারদিক থেকে তখন তাকে ঢেকে ফেলেছে।

(ক্রমশঃ)

অনন্তকাল ॥

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

অনন্তকাল তোমার দিকে আমার কেবল তাকিয়ে থাকা
অনন্তকাল তোমার কাছে আমার হাতচিঠি পাঠানো
আমি পরীক্ষামূলক কোনো কিছুতে নেই
আমি নেই দশ মাইলের দৌড়ে
এবারের শীতেও আমি তিব্বতী কম্বলের পোষাক চাই না
চাই না অগ্নিকুণ্ডের পাশের আসন
ধর্ম নেই আমার যে সাধু সন্তদের অভিশাপ লাগবে?

বরং এবার বসন্তে আমি দুয়ার বন্ধ করে থাকবো
আমার তো গঞ্জের হাটে দোকানদারী নেই যে
ন্যায় অন্যায়ের দাম কষতে হবে
আমার যে কেবল খোঁজা
আমার যে কেবল বধির বাঁশিতে সুর বাজানো।

অনন্তকাল আমার কেবল তোমার দিকে তাকিয়ে থাকা
অনন্তকাল আমার কেবল ইন্দ্রিয় শাসন
অনন্তকাল তোমার কাছে আমার হাতচিঠি পাঠানো।

শেষ গাড়ী ॥

রাণা চট্টোপাধ্যায়

রাত বারোটায় বাজে হুইসিল
শেষতম গাড়ি যায়
বুকের ভেতর দিয়ে
স্টেশনে স্টেশনে।

শহরের কেন্দ্রস্থলে নিথর মৌনতা
শোনা যায় বহুদূরে ভেসে আসে
অমূর্ত রাগিণী

রাত বারোটায় বাজে হুইসিল
শেষ গাড়ি চলে যায়
লেকের কিনার দিয়ে
বজবজের দূর অন্ধকারে।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ৬ থেকে ২০ অক্টোবর ভাস্কর্যের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হচ্ছে। মুক্ত অঙ্গনে ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন ইতিপূর্বে আরো দুবার এখানেই করা হয়েছে; শিল্প-রসিকদের সেকথা হয়তো মনে থাকতে পারে।

এবারে ছয়জন প্রাক্তন ছাত্র, এবং শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিলে সবশুদ্ধ উনিশটি ভাস্কর্য প্রদর্শন করছেন। উপাদান হিসেবে পাথর, পোড়ামাটি, কংক্রীট এবং কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি শিল্পীই নিজের রুচিমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছেন। তবে মূলতঃ অ্যাবস্ট্রাক্ট রীতির প্রাধান্যই বেশী। নিটোল রেখাময় গঠন, গঠনের আভ্যন্তরীণ শূন্যস্থানের ওপর বিশেষ দৃষ্টি, বাহ্যিক সাদৃশ্য বর্জন সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বপরিচিত রূপের ক্ষীণ আভাস থাকায় যে কোন কারণেই হোক মন একটা কিছু চেনা জিনিস পেয়ে নিশ্চিন্ত হবার সুযোগে পরিপূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় না; যেমন বলা যেতে পারে বিমান দাসের 'বাস্ট' বা নিরঞ্জন প্রধানের 'স্টীম বোট' জাতের কাজ কিম্বা করবী যাদবের 'ফ্লাইট'। সাদৃশ্য বর্জন করে বিমান দাসের কাঠের কাজ 'কম্পোজিশন' বা দেবব্রত চক্রবর্তীর 'ফাসল' কিম্বা নিরঞ্জন প্রধানের কংক্রীটের গতিময় ভাস্কর্য 'টেক অফ' বা দিলীপ সাহার 'স্টোন ফর্ম' জাতের জ্যামিতিক গঠনভঙ্গী অন্যধরনের মুড সৃষ্টি করে।

অধ্যক্ষ চিন্তামণি কর প্রমাণ মাপের চেয়েও বড় একটি বলিষ্ঠ দারুনির্মিত নারীমূর্তি প্রদর্শিত করেছেন। পাশ থেকে দেখলে মধ্যযুগের ভারতীয় ভাস্কর্যের নারীমূর্তির সাবলীল রেখার ভঙ্গিমা মনে পড়ে যায়।

●

৬ থেকে ১৩ অক্টোবর দক্ষিণ কলকাতার বিড়লা অ্যাকাডেমিতে চারজন শিল্পীর চব্বিশখানি ছবির একটি যৌথ প্রদর্শনী হয়ে গেল। সমগ্র প্রদর্শনীর রঙের বাহার আকর্ষণীয়; তবে অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রঙটাই একান্তভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এঁরা সকলেই পশ্চিম ভারতীয় এবং তিনজন বোম্বায়ের জে, জে, স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত—বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা। একমাত্র মনু পারেখের স্ত্রী মধু পারেখ কোন প্রথাগত শিল্পশিক্ষা লাভ করেন নি, অবসর সময়ে নিজেই শিল্পচর্চা করেছেন।

চামুণ্ডা। শিল্পী : অজয় মুখোপাধ্যায়

শিল্পীদের কেউ কেউ পশ্চিম ভারতের লোকশিল্পের বর্ণপ্রয়োগরীতি অনেকটা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন, যদিও তাঁদের প্রকাশভঙ্গী পুরোপুরি আধুনিক এবং বিমূর্ত রীতি ঘেঁষা।

মধু পারেখের ছয়খানি রঙীন ড্রইং-এ লোকশিল্প—বিশেষ করে কাঁথার বুননের প্যাটার্ন পরিস্ফুট। হলদে, কমলা, বেগুনী, সবুজ গৈরিক প্রভৃতি রঙের প্যাটার্নে কয়েকটি কাজ সুদর্শন হয়েছে যেমন, 'ফেস্টিভ্যাল', 'হনুমান' বা 'স্টোরি টেলার'-এর নাম করা যেতে পারে।

জোফিন মুচালা'র ছয়খানি অয়েলে রঙের ঔজ্জ্বল্য কমিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পোজিশন এবং প্রতীক চিহ্নের দিকেই জোর দেওয়া হয়েছে। সূক্ষ্ম টোনের কাজ—৮, ৯ এবং ১১ নম্বর উল্লেখযোগ্য।

মনু রাঠোর সমতলভাবে এনামেল পেণ্ট ব্যবহার করে কয়েকটি কম্পোজিশন উপস্থিত করেছেন। রঙের ঔজ্জ্বল্য এবং লোকশিল্পের ধরনের রঙের প্রয়োগ ও চড়া রঙের বৈপরীত্য এঁর কাজে লক্ষ্য করা যায়।

মনু পারেখের অ্যাবস্ট্র্যাকশনগুলি বহুবর্ণময় এবং অতিরিক্ত উজ্জ্বল। বড় বড় কাজের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ততটা সুসংবদ্ধ লাগল না। বরং অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের কাজগুলি অনেকটা সুগঠিত মনে হল।

●

শিল্পী অজয় মুখার্জি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ৯ থেকে ১৫ অক্টোবর তাঁর তৃতীয় একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন।

তাঁর ইতিপূর্বের অ্যাবস্ট্র্যাক প্যাটার্নের কাজের সঙ্গে বর্তমান প্রদর্শনীর কর্মরীতি মৌলিক কোন প্রভেদ না থাকলেও একটা বিষয়বস্তুর অবতারণা করে এটিকে কতকটা তাৎপর্যপূর্ণ করবার প্রয়াস করা হয়। এই প্রদর্শনীর পঁচিশখানি জল ও তেল রঙের কাজের মধ্যে তান্ত্রিক শাক্ত-সাধনার অনুপ্রেরণাই প্রধান। শক্তিমূর্তি ও বিভিন্ন ধরনের তান্ত্রিক যন্ত্রের থেকে ডিজাইন সংগ্রহ করে কতকগুলি রেখা ও রঙের প্যাটার্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। রঙের দিক থেকেও পুরনো পুঁথি বা চিত্রিত কোষ্ঠির রঙ থেকে শিল্পী অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। ডেকরেটিভ ডিজাইন হিসেবে কয়েকটি ছবি ভালই লাগল যেমন 'শিবানী' 'শক্তি' 'শিবশক্তি' 'কালী'; 'সহস্রদল পদ্ম ও সমাধি' 'জ্ঞান দর্প' ইত্যাদি।

—চিত্ররসিক

অভিযত্নত কাহিনী

দরিয়ার প্রেমলীলা

উইলিয়ম
সমারসেট মম

ওরা খেতে বসল। নীলের আবার সেই প্রচণ্ড লজ্জার বেগ, তবে দরিয়ার সেদিকে লক্ষ্য আছে মনে হল না। সে বেশ সহজ এবং স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলতে থাকে। নীলকে তার এই যাত্রার কাহিনী এবং সিঙ্গাপুর কেমন লাগল সে বিষয়ে প্রশ্ন করে। কোন কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হবে তাদের কথা বলে। সেদিন বিকালে মুনরো রেসি-ডেন্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাবেন। সুলতান এখন স্বদেশে। এরপর ওরা ক্লাবে যাবে। সেখানে সকলের সঙ্গে দেখা হবে।

দরিয়া বলে, তুমি বেশ সহজেই সবাইকে বশ করবে। এই কথা বলার সঙ্গে নীলের মুখের ওপর দরিয়ার ম্লান-নীল চোখ গভীরভাবে নজর বুলিয়ে নেয়। নীলের চেয়ে একটু চতুর কেউ হলে বুঝে ফেলত দরিয়া নীলের পুরুষত্ব, উজ্জ্বল, কোঁকড়ানো চুল আর কোমল গাত্রচর্ম লক্ষ্য করছে। দরিয়া বলে ওঠে—আমাদের তেমন কেউ পছন্দ করে না।

মুনরো বললেন, ননসেন্স, দরিয়া তুমি বড়ো বেশী আত্মাভিমানী। ওরা জাতে ইংরেজ এই যা।

দরিয়া বলে, ওরা ভাবে—আনগাসের পক্ষে বৈজ্ঞানিক হওয়াটা মজার ব্যাপার আর আমার পক্ষে রাশিয়ান হওয়াটা অসংগত। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। ওরা সব মূর্খ। একেবারে অতি সাধারণের দলে। এইসব সংকীর্ণমনা, গোঁড়া মানুষদের মাঝে থাকতে হচ্ছে এ আমার দুর্ভাগ্য।

আনগাস বললেন, দেখ এদেশে পা দিতে না দিতেই এইসব বলে ওর মন-মেজাজ বিগড়ে দিও না। ও নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে সহৃদয় ও অতিথি-পরায়ণ মানুষ পাবে।

দরিয়া প্রশ্ন করে, তোমার প্রথম দিককার নামটা কি?

—নীল।

—আমি তোমাকে ঐ নামেই ডাকব, তুমিও আমাকে দরিয়া বলে ডাকবে। মিসেস মুনরো বলে কেউ যখন ডাকে আমার গা জ্বলে যায়। যেন কোনো পুরোহিতের বউ।

নীলের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। এত তাড়াতাড়ি এতখানি অন্তরঙ্গতা কেমন কেমন লাগে। দরিয়া বলে চলে,

—কিছু পুরুষ অবশ্য তেমন খারাপ নয়।

—ওরা ওদের কাজটুকু করে যায় আর সেই কারণেই এইখানে ওদের থাকা। বললেন মুনরো।

দরিয়া বলে, ওরা শিকার করে, ফুটবল টেনিস, ক্রিকেট খেলে। ওদের একরকম খাপ খেয়ে যায়, মেয়েরা কিন্তু অসহ্য। হিংসুটে, ঝগড়াটে, আর ভীষণ কুড়ে। ওদের কথা বলার কিছু নেই। যদি কোনো-রকম বিদগ্ধ আলোচনার সূত্রপাত হয় তাহলে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে থাকবে যেন একটা কিছু মোটা কথা বলা হয়েছে। কি কথাই বা কইবে? কোনো কিছুতেই ওদের ঝোঁক নেই। দেহের কথা যদি ওঠে তাহলে ওরা মনে করবে কিছু অন্যায় কথা বলা হল। আর যদি আত্মার কথা হয় তাহলে ওরা মনে করবে তুমি উন্নাসিক।

মুনরো ভদ্রভাবে হেসে বললে—আমার স্ত্রী যেসব কথা বলে তা একেবারে [illegible] গ্রহণ করার দরকার নেই। এখানকার এরা প্রাচ্যদেশে এইরকম আরো যারা আছেন তাঁদেরই মত। বেশী চালাক নয়, আবার তেমন বোকাও নয়। তবে ভদ্র এবং সহৃদয়, আর সেটুকুই যথেষ্ট।

দরিয়া বলে ওঠে, আমি ভদ্র এবং সহৃদয় মানুষ চাই না। আমি চাই ওরা প্রাণরসে উজ্জ্বল এবং আবেগময় হোক। আমি চাই মানুষের প্রতি ওদের আগ্রহ থাকুক। শুধু জিন মদ্যপান আর টিফিনের কারির প্রতি বেশী নজর না রেখে একটু আত্মিক উপলব্ধি হোক। আমি চাই সাহিত্য ও শিল্পে ওদের আকর্ষণ হোক।—তারপর থেমে সহসা নীলকে প্রশ্ন করে, তোমার আত্মা আছে?

—আমি জানি না, মানে, ঠিক যে কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

এইভাবে একেবারে সম্পূর্ণ অপরি-চিতের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভারী বেয়াড়া লাগছিল নীলের।

দরিয়া বলে, তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? লজ্জার কি আছে, আত্মা নিয়ে

তোমার লজ্জার কিছু নেই। তোমার কাছে কেমন জিনিষটা বড়ো মনে হয়, বলো আমি তাই জানতে চাই।

নীল আগে কখনো এমন অবস্থায় পড়েনি। তবে নীল বেশ গম্ভীর প্রকৃতির যুবক। কোনো প্রশ্ন করা হলে তার জবাব দিতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। শুধু মনোরোর উপস্থিতি তার অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলেছে।

নীল বললো—আপনি যে 'আত্মা' বলতে কি বোঝেন জানি না, তবে তার অর্থ যদি এই হয় যে, কতকগুলি আধিভৌতিক পদার্থের সমষ্টি—অর্থাৎ যেটুকু আমাদের পরিচিত, যার ফলে ব্যক্তিত্ব এবং বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তাহলে বলব, হাঁ, আমার আত্মা একটা আছে।

দরিয়া মৃদু হেসে বলে,—ভারী চমৎকার ভারী মিষ্টি ছেলে তুমি, অতি সুন্দর তোমাকে দেখতে। না, আমি আত্মা বলতে বুঝি হৃদয় আর তার কামনা-বাসনা, আর আমাদের মধ্যে যা অনন্ত তাই। এইখানে আসার সময় কি বই পড়লে শুধু ডেক-টেনিস খেলেছ?

মহিলার উত্তরের মধ্যে যে অ[...] ছিল তা লক্ষ্য করে নীল অবাক। মহিলার ভঙ্গির মধ্যে অকৃত্রিম ভাব[...] চোখের মধ্যে পরিহাস-প্রফুল্লতা না[...] নীল একটু বিব্রত হয়ে পড়ত। য[...] এই বিহ্বল ভঙ্গী দেখে মনরো [...] হাসলেন।

...ীল বলল—আমি কনরাদ পড়ছিলাম। ...আনন্দের খাতিরে না মনটাকে চাঙ্গা ...উদ্দেশ্যে?

...দুদিক থেকেই। আমি ও'কে ভীষণ ...করি।

...দরিয়া উচ্ছৃংখল ভঙ্গীতে হাতদুটো ...র ছুড়ে ফেলল, আর প্রতিবাদের ...তে বলল, ঐ পোলটা? তোমরা ...রা যে কি করে ঐ কথার ভট্টাচার্য্য ...লোকটাকে সহ্য করো কে জানে? ওদের ...র যা-কিছু কৃত্রিমতা তা ও'র মধ্যে ...। যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতা, ...স্টিক পোষাক পরে ভিকতর উগোর ...আবৃত্তি করছে। পাঁচ মিনিটে তোমার ...হবে ভারী বীরত্বব্যঞ্জক, তারপর মনটা ...রে উঠবে—মিথ্যা —মিথ্যা— মিথ্যা।

...যে আবেগভরে কথাগুলি উচ্চারণ করল ...া, সাহিত্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ...খানি আবেগ প্রকাশ করতে আর কাউকে ...নি নীল। দরিয়ার গালের রঙ স্বভাবত ...ীন, সেই মুখ এমন রঞ্জিত এবং চোখ ...ভাসিত।

...নীল বলল, কনরাদের মত আর কেউ ...রবেশ রচনা করতে পারেন না। আমি ...ন কনরাদ পড়ি তখন যেন প্রাচ্য দেশের ..., স্বাদ আর স্পর্শ পাই।

দরিয়া বলল, নন্‌সেন্স, তুমি প্রাচ্য-...শের কি জানো? যে কেউ তোমাকে বলে ...বে কনরাদ কি উদ্ভট ভুল করেছেন, ...আনগাসকেই জিজ্ঞেস কর না।

...পরিমিত এবং সুচিন্তিত অভিমত ...লেন মুনরো, সর্বদাই অবশ্য ঠিক ঠিক ...খতে পারেননি, একথা ঠিকই। উনি যে ...র্ণিয়োর বিবরণ দিয়েছেন সেই বোর্ণিয়ো ...আমাদের জানা বোর্ণিয়ো নয়। কোনো ...বাণিজ্য-জাহাজের ডেক থেকে দেখা, আর ...যেটুকু দেখেছেন তাও বিচক্ষণ দর্শকের ...দৃষ্টিতে নয়। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? ...উপন্যাসের গতি তথ্যের ভুলে প্রতিহত হবে ...কেন?

দরিয়া বলল—আহা আনগস তুমি বড় ...বেশিরকম সেন্টিমেন্টাল, আবেগে চলো।—তারপর সে বলল নীলকে, তুমি তুর্গেনিভ, ...দস্তয়ভস্‌কী প্রভৃতি পড়বে, এসব পড়া ...দরকার।

দরিয়া আর মুনরো সম্পর্কে কি যে ধারণা করা যায় ভেবে পায় না নীল। প্রশ্ন পরিচয়ের প্রাথমিক পর্ব ডিঙিয়ে দরিয়া নীলকে এমন চোখে দেখছে যেন কতকালের চেনা। এই অবস্থা তাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। চিরদিনই প্রথম পরিচয়ের পর স্বভাববশত একটু সতর্কভাবে চলেছে নীল। কিন্তু দরিয়াকে নিয়ে সাবধান হওয়ার উপায় নেই। অধিকাংশ মানুষ তার যে মনোভংগী চেপে রাখে দরিয়া তা পারে না। সে যেন উচ্ছৃংখল মানুষের অকারণে স্বর্ণখন্ড জনতার কাছে ছুঁড়ে ফেলার মত আপনাকে উজাড় করে দেয়।

ও কথা বলে না, পরিচিত কারো মতো ...থা বলে শুধু কি যে বলে তা জানে না।

মানবিক প্রাণীর বিবিধ প্রকৃতিগত ক্রিয়া-কলাপ সে এমনভাবে উল্লেখ করবে যার ফলে নীলের গাল লজ্জায় লাল হয়ে যায়। আর তার ফলে উত্তেজিত হয়ে পরিহাস করে দরিয়া,—

ভালো মজার ছেলে ত' তুমি? কি শুচিবাই! এতে আবার খারাপ কি, যখন পায়খানার বেগ আসে, তখন তা প্রকাশ করে বল্‌তে বাধা কোথায়, তোমার যদি প্রয়োজন মনে কর তাহলেই বা বলব না কেন?

নীল সর্বদাই বিচারশীল এবং যুক্তি-বাদী, তাই সে জবাব দেয়, থিয়োরী হিসেবে হয়ত কথাটি ঠিকই, এ মেনে নিতে হবে।

দরিয়া ওর কাছে জেনে নিল নীলের বাবা ও মার কথা, ভাইদের কথা, স্কুল ও ইউনিভার্সিটির জীবন ইত্যাদি। নিজের কথাও বল্‌ল দরিয়া। বাবা ছিলেন জেনারেল, মা প্রিন্সেস লুচকোভ। বল-শেভিকরা যখন ক্ষমতায় আসীন হল তখন ওরা ছিল পূর্ব রাশিয়ায়, সেখান থেকে ইয়োকোহামায় পালায়। এখানে অতি কষ্টে গহনাপত্র ও অন্য যা কিছু সঙ্গে আনতে পেরেছিল, তাই বিক্রী করে কায়ক্লেশে চালায়। এখানেই একজন স্বদেশীকে বিয়ে করে কিন্তু বিবাহটা সুখের হল না. দু' বছর পরে ডিভোর্স হল। মা মারা গেলেন কপর্দকহীন অবস্থায়, তখন নিজের অন্ন-সংস্থান করতে হয়। আমেরিকান দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কাজ নিয়ে, একটা মিশনারি স্কুলে পড়িয়ে, হাসপাতালে কাজ করে দিন কাটে। তারপর যেসব উক্তি করল তাতে ত' নীলের প্রাণ যায় আর কি! একটা লোক দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ওর দেহ উপভোগ করতে চায়। এই কথা বলার সময় কোনোরকম বিবরণ বাদ দিল না দরিয়া।

নীল বল্‌ল, ওরা সয়তান।

কাঁধ নেড়ে দরিয়া বলে, সব পুরুষই তাই।

কিভাবে একবার রিভলবার দেখিয়ে সতীত্ব রক্ষা করেছে তার বিবরণ দেয় দরিয়া।

—আমি বল্‌লাম আর এক-পা যদি এগোও ত' গুলী করব। সত্যি আমি তাহলে ওকে কুকুরের মতো গুলী করতাম।

নীল বল্‌ল,—হা ভগবান।

এই ইয়োকোহামায় দেখা হয়েছিল আন-গসের সঙ্গে। জাপানে উনি ছুটি কাটা-চ্ছিলেন। আনগসের স্পষ্টবাদিতা এবং খোলাখুলিভাব পছন্দ হয়েছিল। ও'র ভদ্রতা চরিত্রের অঙ্গ। তা ছাড়া কোমলতা এবং সুবিবেচনা মনকে টানে। উনি কারবারি লোক নন, বৈজ্ঞানিক। আর বিজ্ঞান হল শিল্পের দুধ-ভাই। উনি নিরাপত্তার প্রতি-শ্রুতি দিলেন, তা-ছাড়া জাপান দরিয়াকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। বোর্ণিয়ো একটা রহস্যপুরী। পাঁচ বছর ওদের বিবাহ হয়েছে।

নীলকে রুশ উপন্যাসকারদের উপন্যাস ফাদার্স অ্যান্ড সন্স, আনা কারেনিনা, দি ব্রাদারস কারমাজোভ পড়তে দেয় দরিয়া। বলে, আমাদের সাহিত্যের এই তিনখানি হল উত্তুঙ্গ শিখর। পড়ে দেখ, পৃথিবীর সাহিত্যে এমন উচ্চাঙ্গের উপন্যাস আর নেই।

স্বদেশীয় আরো অনেকের মত দরিয়ার ধারণা পৃথিবীর আর কোথাও কোনো উল্লেখনীয় সাহিত্য নেই। নীল ক্রমে দরিয়ার কথায় অভিভূত হল।

অতিশয় কোমল এবং মধুর দৃষ্টিতে নীলের দিকে তাকিয়ে দরিয়া বলে, তুমি যেন ঠিক এলয়সা! এলয়সা কিঞ্চিৎ স্কচ মিশাল, সন্দিগ্ধ এবং সজীব, প্রাজ্ঞ। এই গুণের ফলে তোমার আত্মার নাশ নেই। তোমার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

আত্ম-সচেতন ভঙ্গীতে বলে নীল, আমি এলয়সার মত একটুও নই।

—তুমি যে কি তা তুমি জানো না। তুমি প্রকৃতিবাদী কেন? অর্থের জন্য? গ্লাসগোয় খুড়োর অফিসে কাজ নিলে ত' অনেক বেশী পেতে। তোমার মধ্যে একটা অদ্ভুত মাটিছাড়া ভাব আছে। ফাদার জোসিমা যেমন কেমিস্ট্রির কাছে মাথা নত

করেছিলেন, আমিও তেমনই তোমার পদতলে মাথা নত করতে পারি।

মুখটা একটু লাল করে সলজ্জ ভংগীতে নীল বলে, তা আর করবেন না কিন্তু।

উপন্যাসগুলি পাঠ করার পরে দরিয়াকে আর তেমন অপরিচিত মনে হয় না। এই উপন্যাস দুরিয়ার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং সেই পরিবেশে সে বে-মানান নয়। স্কটল্যান্ডে যেসব মেয়ে সে দেখেছে, বা গ্লাসগোর খুড়োর মেয়েদের সংগে এর কোনো মিল না থাকলেও রুশ উপন্যাসে এই চরিত্রই সাধারণত পাওয়া যায়।

দরিয়া যে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকে, অসংখ্যবার চা-পান করে, সারা-দিনটাই সোফায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ে কাটায়, আর অবিরাম ধূমপান করে এসব আর নীলের চোখে বেয়াড়া মনে হয় না।

নীল ভাবে এর মধ্যে আনা কারে-নিনার ছাপ আছে, তাই আনা কারেনিনার জন্য যে সহানুভূতি মনে জাগে সেই সহানুভূতি দরিয়াতে এসে পড়ে। দরিয়ার ঔদ্ধত্য বোঝে নীল। সে যে সমাজভুক্ত মেয়েদের ঘৃণা করে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাদের সংগে একে একে আলাপ হয়েছে নীলের, তাঁরা সবাই সাধারণ শ্রেণীর। দরিয়ার মন ওদের চেয়ে সজীব, তার সংস্কৃতি ব্যাপক আর এ ছাড়া একটা অত্যাশ্চর্য রকমের আত্মানুভূতি দরিয়ার আছে, যার কাছে অন্য মেয়েরা নিষ্প্রভ মনে হয়। ওদের সংগে একটা বোঝাপড়ার জন্য মাথা ব্যথা দরিয়ার নেই। বাড়িতে একটা লুংগি জাতীয় সারোং আর একটা চোলি জাতীয়, বাজু পরে থাকলেও যখন আনগসের সংগে কোনো ভোজের নিমন্ত্রণে যেত তখন এমন জমকালো পোষাক পরত যে বে-মানান মনে হত। নিজের পরিপূর্ণ বক্ষ এবং সুগঠিত পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করার দিকে দরিয়ার আগ্রহ ছিল। মুখে বেশ রঙ মাখত এবং চোখের এমনই সজ্জা করত যেন মনে হত যে, পাদ-প্রদীপের ওপরকার

কোনো অভিনেত্রী চলেছেন। তার এই উত্তেজক বেশবাস যেভাবে দর্শকজনের চিত্ত আকৃষ্ট করত তাতে নীল রুষ্ট হত। নিজেকে দরিয়া এইভাবে হাস্যাস্পদ করে এটা তার ভালো লাগত না। তাকে দেখতে অবশ্য ভালোই লাগত, তবে তার পরিচয় জানা না থাকলে তাকে ঠিক ভদ্রসমাজের রমণী মনে হত না। তার ক্ষুধা প্রচণ্ড, এবং নীলের মনে হত আনগস এবং তার দুজনের খোরাক দরিয়া একাই খেয়ে নেয়। যৌন বিষয়ে যে-রকম স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলে দরিয়া তা নীলের সয় না। দরিয়ার ধারণা যে স্বদেশে এবং এডিনবরায় নীলের সংগে নিশ্চয়ই অসংখ্য রমণীর সংযোগ ঘটেছে। সেইসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার জন্য দরিয়া আগ্রহ দেখায়। স্কচ চাতুর্য নীলকে বাঁচিয়ে দেয়। সে এড়িয়ে যায়। সতর্কতা সহকারে সে দরিয়ার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে চলে। ওর এই বাক-সংযমে দরিয়া হেসে ওঠে।

মাঝে মাঝে দরিয়া এমন কাণ্ড করে যে বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না নীলের। যেরকম স্পষ্টাস্পষ্টি নীলের আকৃতি এবং সুন্দর গঠন নিয়ে দরিয়া আলোচনা করে তা একরকম সয়ে গেছে। যখন বলে তুমি দেবতার মতো সুন্দর, তখন একবিন্দু চাঞ্চল্য জাগে না নীলের মনে। হাঁসের গা থেকে যেমন জল ঝরে পড়ে, নীলের অংগ থেকে সেইভাবে তোষামোদ গড়িয়ে যায়। কিন্তু যখন দরিয়া তার দীর্ঘ বাহু মেলে ওর তরংগায়িত চুলে হাত বুলোয়, আলতো ভাবে আঙুল চালিয়ে, কিংবা মুখে হাসি টেনে ওর মসৃণ গালে হাত বুলোয় তখন ভালো লাগে না। একদিন কি যেন টনিকের জল সামনে যে গ্লাসটা পড়েছিল তাতে ঢালতে থাকে।

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে নীল বলে ওঠে আহা, করেন কি! আমি যে এইমাত্র ওতে জল খাচ্ছিলাম।

—তাতে কি! তোমার ত' আর সিফিলিস নেই, আছে নাকি?

—আমি নিজে অপরের গ্লাসে কখনো জল খাই না। খারাপ লাগে।

সিগারেট সম্পর্কেও তাই। একবার, তখন নীল সবে এসেছে, যেই একটা সিগারেট ধরিয়েছে দরিয়া বলে উঠলো, ওটা আমাকে দাও—

তারপর ওর মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে টানতে লাগল। দু-তিন টান টেনে বলল আর দরকার নেই। ওর হাতে ফিরিয়ে দিল। সিগারেটের যে প্রান্ত ওর মুখে ছিল তা ওর মুখের রঙে লাল হয়ে গিছল। যদি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, হয়ত অভব্যতা হবে মনে করে নীল সিগারেটটা ফেলে দিতে পারেনি।

মাঝে মাঝে সিগারেট চাইত নীলের কাছে, আর নীল বার করে দিলে বলত, জ্বালিয়ে দাও।

জ্বালানো হলে হাতে দিলে হবে না, মুখটা এগিয়ে এনে হাঁ করে ইংগিত করত মুখে দাও। মুনরো নিশ্চয়ই এসব পছন্দ

করবেন না। দু-একবার ক্লাবেও ... করেছে দরিয়া। নীলের মুখ-চোখ লা... গেছে। নীল ভাবে এইসব বদ... বোধহয় রাশিয়ান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও সহচরী হিসাবে তুলনাহীন। তার কথাবার্তা ... উজ্জ্বল। যেন স্যাম্পেনের (নীল ... পান করেছে এবং খুবই খারাপ ... মতো। এমন কোনো বিষয় নেই যে... ও কথা বলতে পারে না। সে পুরু... কথা বলে না। পুরুষ মানুষ যখন ক... তখন কিসের পর কি বলবে সবাই ... কিন্তু দরিয়ার সম্পর্কে কোনো অ... খাটে না। নতুন আইডিয়া দেয়। বলে, মনকে বড়ো করো, কল্পনাকে প্র... করো। নীলের মনে হয় এতখানি ... সে আর কখনও ছিল না। বিমুগ্ধ... যেন উত্তুংগ পর্বত শিখরে বিচরণ... সে যেন অনেক ওপরে উঠেছে। এত ... বুদ্ধিমতী মহিলা নীল আগে ... দেখেনি। তাছাড়া, উনি আনগস মু... স্ত্রী।

দরিয়া সম্পর্কে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ... যাই থাকুক না কেন, দরিয়ার স্বামীর ... নীলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। মুনরোর কাছে ... আত্মসমর্পণ করেছে। তার সম্পর্কে ... যে মনোভাব সেই মনোভাব আগে আর ... কারো জন্য জাগেনি। বয়স যখন হবে ... এমনই একজন মানুষ হতে চায়। উনি ... কথা বলেন, কিন্তু যখন বলেন তার ... সুগভীর। তিনি জ্ঞানী। তাঁর ... রসিকতা নীল বোঝে। তিনি সহ... সহিষ্ণু। এমনই তাঁর মর্যাদা-জ্ঞান যে ... তাঁর মাথায় হাত বুলোতে পারে না। কল্পনাশক্তি প্রবল। তিনি সতর্ক এবং ... সহিষ্ণু। গবেষণাই তাঁর মুখ্য কর্ম ... মিউজিয়মের বাঁধা কাজকর্ম তিনি নি... করে যান। একদিন একটা গীবন ... খুলে বেরিয়ে পড়ে সমস্ত লাভা ... ফেলেছিল। নীল ত' কেঁদে আকুল। ম... কিন্তু স্যার আইজ্যাক নিউটনের ভ... গীবনের পিঠে হাত বুলিয়ে বল... ডায়মণ্ড ডায়মণ্ড, তুমি জানো না তুমি ... ক্ষতিটা না করেছ।

বিতর্কিত বিষয়ে তাঁর যে আগ্র... নীলের মনেও তিনি সঞ্চারিত কর... কিউরোটস ম-নম্বার আশ্চর্য জ্ঞানের প... পেয়ে নীল বিস্মিত। যেন চমৎক... গল্প। নীল নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত ... পড়ে।

মুনরোকে গবেষণার কাজে মাঝে ... দু-এক সপ্তাহের জন্য বাইরে যেতে ... দরিয়া কিছুতেই সংগে যেতে চায় ... জংগালে কোন ভারী আতংক। কিছুতেই ... আতংক কাটিয়ে উঠতে পারে না। মনে ... অপলা লাগে না ওকে রেখে যেতে, ক... দরিয়া সামাজিক প্রাণী নয়, কারো ... মেশে না, একা একা নিশ্চয়ই তার অব... খারাপ লাগবে।

সুলতান নিজে প্রাকৃতিক ইতিহ... জীবন আগ্রহশীল। তিনি চান তাঁর ... জিরামাটি একেবারে নিখুঁত হয়ে থাক...

র্ধিমূলক যাদুঘর বলতে যা বোঝায় হবে। নীল আর মুনরো দুজনে একটি অভিযানে যাবেন, অনেকদিন কল্পনা চলেছে। নীল সেই দিনটির তাকিয়ে আছে।

ইতিমধ্যে নীল মালয়ী ভাষা শিখেছে, চলা গোছ চলতি ভাষা। টেনিস খেলে, ল খেলে। সমাজের সবায়ের সঙ্গে র হয়েছে। ফুটবলের মাঠে বিজ্ঞান-বা রাশিয়ান উপন্যাস-প্রীতি সব পরিহার করে তার সমস্ত মনটা ফুটবলেই।

নীল বরাবর যে মুনরোদের বাড়ি থাকবে, তা স্থির ছিল না। কুয়ালা লামপুরে একটা রেস্ট হাউস আছে, তবে সেখানে পনের দিনের বেশী থাকার নিয়ম নেই। অবিবাহিত কর্মী যাদের সরকারী কোয়ার্টার নেই তারা সবাই একটা মেস করে থাকে। তারা সবাই ওর বয়সী তরুণ দল। তারা সবাই ফুটবলের মাঠের খেলোয়াড়। ওয়ারিং কাস্টমসে কাজ করে, জনসন পুলিশে। দুজনকেই নীল ভালোবাসে। তারা বলল, তুমি আমাদের বাসায় চলে এসো। কত কি লাগবে ঠিক-ঠাক হয়ে গেলে, পনের দিন পরে নীল আসবে ঠিক হল।

সেইদিন রাতে ভোজের টেবলে মুনরো দম্পতির কাছে কথাটা তুলল নীল।

—আপনারা এতদিন আমাকে রেখেছেন এখানে। আপনাদের ঘাড়ে বসে এভাবে থাকা আমার খুবই খারাপ লাগছে। লজ্জা হচ্ছে। এখন একটা সুযোগ মিলেছে।
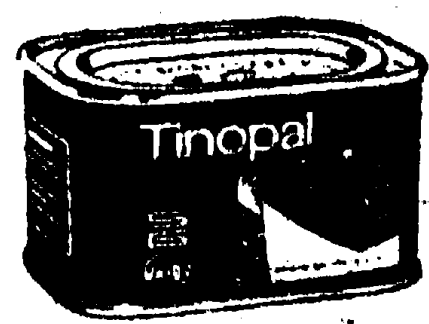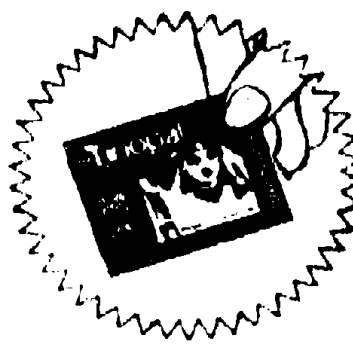
দরিয়া বলে উঠল, তোমার কোনো সুযোগের দরকার নেই। আমরা তোমাকে পছন্দ করি এবং চাই যে তুমি এখানেই থাকো।

—কিন্তু অনির্দিষ্টকাল ধরে কি এভাবে থাকা যায়।

—কেন যাবে না? তোমার ত' ঐ সামান্য আয়। সে টাকাটা খাওয়া-দাওয়া আর মাথা গোঁজার জায়গার পিছনে ব্যয় করে কি হবে! জনসন আর ওয়ারিংদের কাছে থেকে তুমি হাঁফিয়ে উঠবে। ওরা নির্বোধ। ঘরে বসে গ্রামোফোন বাজানো আর মাঠে ফুটবল খেলা ছাড়া ওদের কোনো আইডিয়াই নেই।

বিনামূল্যে থাকাটা নিশ্চয়ই অতি সুবিধাজনক। এর ফলে মাইনের অনেকটা বেঁচেছে। ও স্বভাবত মিতব্যয়ী। প্রয়োজন না হলে অর্থ ব্যয় করে না। তবে ওর অহং-বোধ আছে। অন্য লোকের ঘাড়ে চড়েই বা কতদিন চালানো যায়। দরিয়া ওর দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলে,—

—আনগস আর আমি দুজনে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। তুমি গেলে খারাপ লাগবে। ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের খাবার খরচটা দিতে পারো। তোমার জন্য কোনো খরচই নেই, তবে তোমার কাছে ব্যাপারটা সহজ হবে। আমি হিসাব কষে দোব ঠিক কত খরচ লাগে, তুমি তাই দিয়ো।

নীল বল্‌ল, বাড়িতে একটা বাইরের মানুষ সর্বদা থাকাটা নিশ্চয়ই আপনাদের খারাপ লাগবে।

—তোমার জীবন অসহ্য হয়ে উঠবে ওখানে। ওরা যাচ্ছেতাই নোংরা-ভোংরা খায়।

একথা সত্যি মুন্‌রোদের বাড়ি যা খাওয়া হয় কুয়ালা সলোরের কোথাও এমন খাদ্য পাওয়া যায় না। বাইরে মাঝে মাঝে খেয়ে দেখেছে নীল। এমনকি রেসিডেন্টের প্রসাদের ডিনারেও বাজে খাবার। দরিয়া খেতে জানে, রাঁধুনীকে দিয়ে ঠিক ঠিক রাঁধিয়ে নেয়। এখানকার মুশ রান্না চমৎকার। দরিয়ার হাতের বাঁধাকপির ঝোল খাওয়ার জন্য পাঁচ মাইল হাঁটা যায়। কিন্তু মুন্‌রো ত' এখনও কিছু বলেন নি।

এতক্ষণে তিনি বললেন, তুমি এইখানে থাকলে আমি খুশি হব। হাতের কাছে থাকলে কাজের অনেক সুবিধে। কিছু একটা হলে আমরা তখনই কথা বলে ঠিক করে নিতে পারি। ওয়ারিং আর জনসন বেশ ভালো ছেলে, তবে দুচারদিন পরে আর তেমন ভালো লাগবে না হয়ত।

—বেশ তাই হবে। তাই থাকব তাহলে। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?

পরদিন ভীষণ বৃষ্টি, বাইরে বেরিয়ে টেনিস বা ফুটবল খেলা অসম্ভব। ছ'টা নাগাৎ নীল একটা বর্ষাতি গায়ে দিয়ে ক্লাবে চলল। ক্লাবঘর শূন্য। রেসিডেন্ট একটা আরামকেদারায় বসে পাক্ষিকপত্র পড়ছেন। তাঁর নাম ট্রেভেলিয়ান। তিনি নাকি বায়রনের বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কিত। লোকটির দীর্ঘদেহ এবং স্থূলাঙ্গ। মাথায় সাদা চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। প্রকাণ্ড লম্বা লাল মুখ। যেন অভিনেতা। লোকটি অবিবাহিত, তবে মেয়ে সঙ্গ পছন্দ করেন, এমেচার থিয়েটার ভালোবাসেন। আর ডিনারের আগে একপাত্র জিন পেলে খুশি। কথা কন খুব বেশী। কাজের লোক তেমন নন। তিনি চান সব ঠিকঠাক চলুক, বেশী গোলমাল না হলেই হল। নীলকে দেখে মাথা নেড়ে বললেন,

—এই যে ছোকরা। তোমার ছারপোকা দল কেমন আছে?

—আবহাওয়াটা খারাপ স্যার। নীল গম্ভীর গলায় বলে।

রেসিডেন্ট হাসেন—হি হি!

কয়েক মিনিটের মধ্যে নীল ওয়ারিং আর একজন তার নাম বিশপ, এসে হাজির হল। নীল ব্রীজ খেলে না তাই বিশপ গেল কাছে।

সে গিয়ে রেসিডেন্টকে বলল, স্যার, আপনি কি চতুর্থ পার্টনার হবেন, আজ খেলোয়াড় নেই।

রেসিডেন্ট বললেন, বেশ আমি এই প্রবন্ধটা শেষ করে যাচ্ছি। তোমরা তাস ভাগ করো।

নীল ওদের কাছে এগিয়ে এসে বলল,

—ভাই ওয়ারিং, তোমাদের ধন্যবাদ, তবে আমি ভাই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি না। মুন্‌রোরা ওদের কাছেই বরাবর থাকতে বলছেন।

ওয়ারিং-এর মুখে হাসি খেলে গেল।

—ব্যাপারটা বোঝো ভাই।

—ও'দের পক্ষে খুবই ভদ্রতা। এমন-ভাবে বললেন যে না বলতে পারলাম না।

বিশপ বলে উঠল, কি বলেছিলুম? বলিনি এ কথা!

ওয়ারিং বলল, আমি নীলের কোনো দোষ দেখি না।

ওদের কথাবার্তার ভঙ্গীটা নীলের ভালো লাগে না। কেমন যেন মজা পেয়েছে ওরা। ওর মুখচোখ রাঙা হয়ে উঠল, সে বলে ওঠে, কি যা তা বলছ সব?

বিশপ বললে, আরে ছেড়ে দাও। আমরা দরিয়াকে চিনি। আর তুমিও প্রথম-তম সুন্দর যুবক নও এবং শেষতমও নয়।

কথাটা শেষ হতে না হতেই নীল ঘুঁষি পাকিয়ে ওর গালে মারল। বিশপ মাটিতে পড়ে গেল। জনসন তাড়াতাড়ি এসে নীলকে ধরে ফেলল।

নীল চীৎকার করছে, ছেড়ে দাও, আমি ওকে খুন করবো।

এইসব হট্টগোলে রেসিডেন্ট উঠে পড়ে ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন।

—ব্যাপার কি! কি কাণ্ড সব! তোমরা সব ভেবেছ কি!

সবাই অবাক। ও'র কথা সবাই ভুলে গিছল। উনিই কিন্তু সকলের কর্তা। জনসন নীলকে ছেড়ে দিল। বিশপ দাঁড়াল। রেসিডেন্ট ভ্রু কুঞ্চিত করে নী[illegible] তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলেন,

এসবের মানে কি? তুমি কি বিশ[illegible] মারলে?

—হ্যাঁ, স্যার।

—কেন?

—একজন মহিলার সম্মান নিয়ে [illegible] কুৎসিত ইঙ্গিত করেছিল।

রেসিডেন্টের চোখদুটি কুঞ্চিত [illegible] মুখখানি গম্ভীর রেখে প্রশ্ন কর[illegible] কে সেই মহিলাটি।

—আমি এর জবাব দেব না।

নীল সোজা হয়ে দাঁড়াল তার সুদ[illegible] চেহারা নিয়ে।

রেসিডেন্ট যদি ওর চেয়ে আরো [illegible] ইঞ্চি লম্বা এবং আকারে চওড়া না হ[illegible] ত' বেশ হত।

—মূর্খের মত কথা বোলো না।

জনসন বলল, দরিয়া মুন্‌রো।

—কি বলেছিলে বিশপ?

—ঠিক কথাগুলি মনে নেই স্যা[illegible] আমি বলেছিলাম এখানকার অ[illegible] যুবকের সঙ্গে দরিয়া বিছানা নিয়েছে, নী[illegible] ম্যাকআডামের সঙ্গেও সেই সুযোগ নি[illegible] হয়ত ছাড়েনি।

—খুব খারাপ ইঙ্গিত। মাফ চা[illegible] করমর্দন করো। দুজনেই।

—স্যার। আমার চোখ ফুলে উঠে[illegible] স্যার। সত্যি কথা বলার জন্য মাফ চাই[illegible] কেন স্যার?

—তোমাদের বয়স হয়েছে। তোমা[illegible] কথার মধ্যে সত্যতা থাকলে তাতে এ[illegible] উক্তি আরো দোষযুক্ত হয়েছে। চোখে একটু[illegible] কাঁচা গোমাংস লাগাও, সেরে যাবে। যদি[illegible] ভদ্রতার খাতিরে বলছি মাফ চাও, তবে এ[illegible] আমার আদেশ।

একমুহূর্ত নীরবতা, রেসিডেন্টের মু[illegible] গম্ভীর।

বিশপ গম্ভীর গলায় বলল, আ[illegible] বলেছি তার জন্য মার্জনাপ্রার্থী।

—এবার ম্যাকআদম।

—আমি দুঃখিত। আমিও ক্ষম[illegible] চাইছি।

—শেক হ্যান্ডস্! করমর্দন করো।

নীরবে দুজনে আদেশ পালন করে।

—আমি আর এই ব্যাপার বেশী গড়া[illegible] তা চাই না। মুনরোর পক্ষে ব্যাপারটি বিশ্রী[illegible] আমরা সবাই তাঁকে ভালোবাসি, পছন্দ[illegible] করি। আশাকরি তোমরা সংযত হবে[illegible] এ বিশ্বাস রাখতে পারি?

সবাই মাথা নাড়ল।

—আচ্ছা এখন তোমরা যাও। ম্যাক-আদম তুমি একটু থাকো, তোমার সঙ্গে দুচারটে কথা আছে।

['দরিয়ার পরিণাম'—পরবর্তী সংখ্যায় অভিযুক্ত কাহিনী পর্যায়ের শেষ কাহিনী]
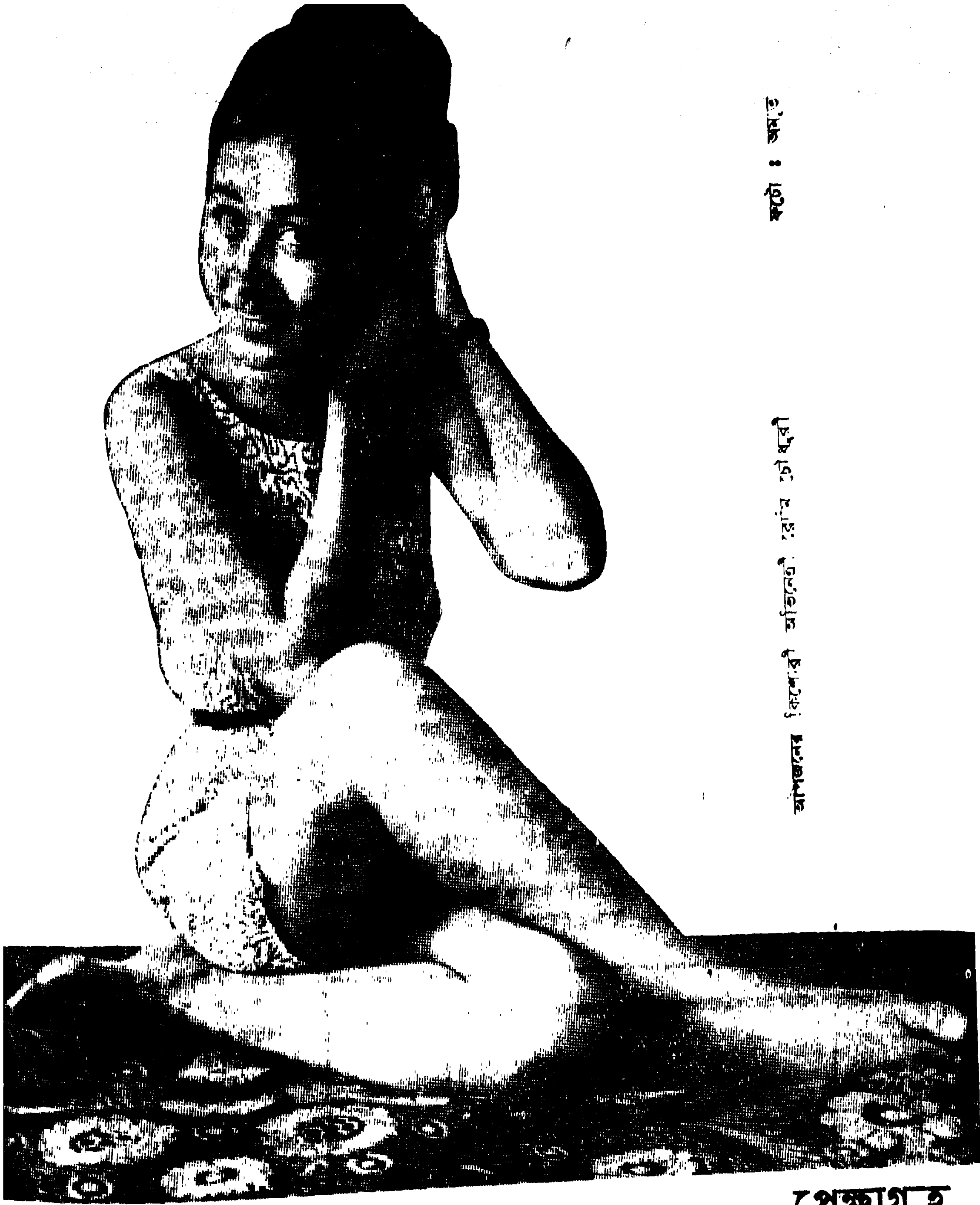
—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী সংক্ষেপিত ও অনূদিত।

আগামীকালের কিশোরী অভিনেত্রী রোমি চৌধুরী

ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র সমালোচনা

অন্বিতীয়া (বাঙলা) : এ-আর-সি প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৩,৪৭৯·২১ দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; **প্রযোজনা :** অরুণ রায়চৌধুরী; **কাহিনী,** চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়; সংগীত-পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনা : মুকুল দত্ত ও বিমল দত্ত; চিত্রগ্রহণ: শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, **শব্দানুলেখন :** বাণী দত্ত এবং অতুল চট্টোপাধ্যায়; **সংগীতানুলেখন :** রবীন চট্টোপাধ্যায় (ফিল্ম সেন্টার, বোম্বাই); **শব্দ-পুনর্যোজনা :** শ্যামসুন্দর ঘোষ. শিল্প নির্দেশনা : রবি চট্টোপাধ্যায়. নৃত্য-সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়; নৃত্য-পরিচালনা : প্রভাত ঘোষ; নেপথ্য কন্ঠ-সংগীত : লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; রূপায়ণে : মাধবী মুখোপাধ্যায়. লিলি চক্রবর্তী. পদ্মা দেবী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে. ডেইজী ইরাণী (নৃত্য). সর্বেন্দ্র, বিকাশ রায়. দিলীপ রায়. অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়. প্রেমাংশু বসু. বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এন-এ ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল ২৭-এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার থেকে রাধা, পূর্ণ এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

জনৈক গায়ক-যুবকের প্রতি এক স্বামী নিপীড়িতা, বঞ্চিতা নারীর একনিষ্ঠ প্রণয় এ-আর-সি প্রোডাকসন্স'এর প্রথম চলচ্চিত্র "অন্বিতীয়া"-র কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। শোভনলাল তরফদারের স্ত্রী লক্ষ্মী তার দুর্বৃত্ত স্বামীর মদের খরচ যোগাবার জন্যে স্বামীরই প্ররোচনায় বাইজীর জীবিকা গ্রহণ

বন্যাত্রাণে মেয়রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নবগঠিত শিল্পী সংসদের সভাপতি উত্তমকুমার, বিকাশ রায়, সুশীল রায়চোধুরী প্রভৃতির। বন্যাত্রাণের জন্য যে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে, সেই সম্পর্কে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দের সংগে আলোচনা করছেন। ফটো : অমৃত

করতে বাধ্য হয় (অবশ্য ছবিতে দেখানো হয়েছে, সে মাত্র গান গেয়েই কোনো জমিদার ও তার বন্ধুদের মনোরঞ্জন করছে; বাইজীর প্রধান বৃত্তি নাচে অংশ গ্রহণ করছে না)। লক্ষ্মী যখন তার স্বামী ও জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে, তখন দার্জিলিংয়ের মনোরম পরিবেশে সে দেখা পায় গায়ক রাজীবের। সঙ্গে সংগে তার মনে ফিরে আসে স্নিগ্ধতা, প্রসন্নতা—পৃথিবীকে আবার তার মনে হয় সুন্দর। রাজীবের আকর্ষণকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। শহরে ফিরে এসে রাজীব তার মার পীড়াপীড়িতে বিবাহ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু লক্ষ্মীর আস্তানায় গিয়ে, লক্ষ্মীকে বাইজীরূপে আবিষ্কার করেও সে তার দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারে না—দু'জনেই তখন পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করেছে, দু'জনেরই মন দু'জনের চিন্তায় ভরপুর। রাজীবের স্ত্রী রত্না আসে লক্ষ্মীর কাছে নিজের স্বামীকে ভিক্ষা চাইতে; কিন্তু তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। তার মনকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র সঞ্জীবনী রাজীবকে সে নিজের কাছ থেকে দূরে যেতে দেবে কি ক'রে? কিন্তু যখন সে রাজীবের সহায়তায় পঙ্কিল জীবনযাত্রা থেকে মুক্তি লাভ করতে চাইল, তখন শোভনলাল দাঁড়াল তার প্রতিবন্ধক হয়ে। ঘটনাচক্রে রাজীব যখন হয়ে পড়ল শোভনলালের হত্যাকারী, তখন লক্ষ্মী এগিয়ে এসে এই হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে তার দায়ি[illegible] করল অপরাধমুক্ত।

আমরা 'আঁধারে আলো'র বি[illegible] বাইজীকে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রর জন্যে ক[illegible] হ'তে দেখেছি, 'দেবদাস'-এর চন্দ্রমুখ[illegible] দেবদাসের জন্যে দোকানপাট তুলে [illegible] বিবাগী হ'তে দেখেছি। 'অন্বিতী[illegible] লক্ষ্মী তরফদারের রাজীব বন্দ্যোপাধ্যা[illegible] প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমকে বিজলী ও চন্দ্রমু[illegible] প্রেমের সমশ্রেণীভুক্ত বলা যায় অনায়াসে এবং সেই জন্যেই লক্ষ্মী তরফদা[illegible] 'অন্বিতীয়া' নামে বিশেষিত করার কো[illegible] সংগত কারণ আমরা খুঁজে পাই[illegible] এ-ছাড়া দার্জিলিং সঙ্গীত সম্মেলনে [illegible] শোনা থেকে শুরু করে রাজীবের পা[illegible] সেবা ক'রে তাকে সুস্থ করে তোলা পর্য[illegible] দৃশ্যের মাধ্যমে লক্ষ্মী ও রাজীবের ম[illegible] 'পরিচয় সূত্র' গড়ে ওঠবার পর্যায়টি অ[illegible] থানি গতানুগতিক না হয়ে আরও সুপ[illegible] কল্পিতভাবে রূপায়িত হবার অবকাশ ছ[illegible]

তবুও বলব, এখানে ওখানে কিছু কি[illegible] ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নবাগত চিত্রনাট্যক[illegible] পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় বিভ[illegible] দৃশ্যের মাধ্যমে কাহিনীটির উপস্থাপনে [illegible] প্রতিটি দৃশ্যকে বিভিন্ন ক্যামেরা-সংস্থাপন মারফত 'শট'-এ বিভক্ত করার কাজে নিজ[illegible] যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। সাধার[illegible] বাঙলা ছবির তুলনায় ছবিটি যথেষ্ট গত[illegible] সম্পন্ন এবং এর জন্যেও আংশিক প্রশংসা ভাজন হচ্ছেন চিত্র-নাট্যকার-পরিচালক।

নায়িকা লক্ষ্মীরূপে মাধবী মুখো পাধ্যায় সংবেদনশীল অভিনয়ের মাধ্য[illegible] চরিত্রটির ব্যথা-বেদনা এবং আনন্দানুভূতিকে পরিস্ফুট করেছেন। রাজীবের স্ত্রী রত্নার ভূমিকায় লিলি চক্রবর্তীর অভিনয় সুপরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী। রত্নার বিবাহিতা বান্ধবী অসুস্থা বেলার ছো[illegible] ভূমিকাটিকে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় স্মরণী[illegible] রূপদান করেছেন।। স্ত্রীর উপার্জনজীবী মদ্যপ শোভনলালরূপে বিকাশ রায় তাঁর নাট[illegible] নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মুখে মান্না দের গাওয়া "এই মাল নিয়ে চিরকাল যত গোলমাল"-গানটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বেলার স্বামী ডাক্তার সজীব বেশে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজীবের বন্ধু প্রকাশরূপে দিলীপ রায় ভূমিকানুযায়ী সু-অভিনয় করেছেন। কিন্তু ছবির নায়ক রাজীবের ভূমিকায় সর্বেন্দ্র বেশ আড়ষ্ট; তাঁর মুখে ভাবাভিব্যক্তিও সুপরিস্ফুট নয়। অপরাপর ভূমিকায় পদ্মা দেবী (রাজীবের মা), প্রেমাংশু বসু (শোভনলালের বন্ধু শিবেন রায়), সমর চট্টোপাধ্যায় (ফোটোগ্রাফার পি. পাট্টাদার), শিবেন বীরেন চট্টোপাধ্যায় (ব্যারিস্টার), বন্দ্যোপাধ্যায় (জমিদার), প্রীতি মজুমদার (বন্ধু) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। চুমকী বাঈয়ের ভূমিকায় ডেইজী ইরাণীর সম্মোহনী নৃত্য ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চমান রক্ষার প্রয়াস দেখা যায়।

দার্জিলিংয়ের বহির্দৃশ্য এবং স্টুডিও অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্লোজ আপ গ্রহণে ক্যামেরাম্যানের কৃতিত্ব লক্ষণীয়। দৃশ্য রচনাতে শিল্পনির্দেশক যথাযথ্য আনয়নে সক্ষম হয়েছেন। ছবিটি যে যথেষ্ট গতি-সম্পন্ন, এ জন্যে চিত্রনাট্যকার-পরিচালকের সঙ্গে সম্পাদকও প্রশংসার ন্যায্য ভাগীদার। ছবিটির সাতখানি গানই সংগীত এবং সুন্দরভাবে সুরসমৃদ্ধ। এবং ওরই মধ্যে "বাবার বেলা পিছু থেকে ডাক দিয়ে" গান-খানি বারংবার শোনবার মতো।

এ-আর-সি প্রোডাকসন্স'এর প্রথম চিত্রার্ঘ "অদ্বিতীয়া" সামগ্রিক অভিনয়ে ও গানে একটি বিশিষ্ট প্রেমের ছবি হিসেবে জনসমাদর লাভ করবে।

মঞ্চাভিনয়

শের আফগান : নান্দীকার সম্প্রদায়ের নিবেদন; লিউইজি পিরানদেল্লও রচিত "হেনরী দি ফোর্থ" (মূল ইটালীয়নে এনরিকো কোয়ার্টো) নাটক জ্যোতির্ময় বসু রায়চৌধুরী দ্বারা বাংলায় অনূদিত; মঞ্চরূপ ও নির্দেশনা দিয়েছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। গেল ১৯৬৬ সাল থেকে প্রায়ই অভিনীত হচ্ছে।

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নান্দীকার সম্প্রদায় যে-কটি বিদেশী নাটকের বাংলা রূপান্তর মঞ্চস্থ ক'রে যশস্বী হয়েছেন, তার মধ্যে 'শের আফগান' অন্যতম। একজন বুদ্ধিদীপ্ত, সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি বৃথা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার ট্রাজিডি নাটক-খানির উপজীব্য। মূলে যেখানে জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরীর কথা বলা হয়েছে, সেখানে বাঙলায় করা হয়েছে বর্ধমানের সুবাদার শের আফগান। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় এক। একটি ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ করবার সময়ে একটি সুন্দরীকে উপলক্ষ্য করে একজন যুবক তার বন্ধু স্থানীয় এক শিল্পীর প্রাণহরণের চেষ্টা করে। কিন্তু অভিনেতাটি প্রাণে বেঁচে গিয়ে তার স্মৃতিশক্তিকে হারিয়ে ফেলে এবং নিজেকে সে যে-ভূমিকায় অভিনয় করছিল, সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মনে করতে শুরু করে। কাজেই ওকে খুশী রাখবার জন্যে কিছু লোককে জাঁকজমকের পোষাক পরে ওর সভাসদ সেজে থাকতে হয়। এই-ভাবে দীর্ঘ বারো বছর কেটে যাবার পরে হঠাৎ একদিন অভিনেতাটির স্বাভাবিক চেতনা ফিরে আসে। সে দেখে, ইতি-মধ্যেই তার চুলে পাক ধরেছে; যে-সুন্দরীকে নিয়ে বিপত্তি, সে তার বন্ধুর স্ত্রী এবং প্রৌঢ়ত্বপ্রাপ্ত। সে স্থির করে, সে ধরা না দিয়ে স্মৃতিভ্রষ্ট পাগল সেজেই থাকবে। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সে তার সেই স্মৃতিভ্রংশের কারণস্বরূপ বন্ধুটিকে হত্যা করে বসে এবং সমগ্র পরবর্তী জীবনে সভাসদ পরিবৃত হয়ে পাগল সেজে থাকতেই মনস্থ করে।

মূল নাটকের মতো বাঙলা রূপান্তর "শের আফগান"ও তিনটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। এবং এই নাট্যাভিনয়ের প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে নাম-ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাব-লীল অভিনয়নৈপুণ্য। সুগঠিত দীর্ঘ দেহের অধিকারী শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুললিত উদাত্ত কণ্ঠের সহায়তায় স্থিতিভেদে সংলাপকে এমন নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপন করেন, যাকে সাম্প্রতিক বঙ্গ মঞ্চে অতুলনীয় বলতে আমাদের বিন্দু দ্বিধা নেই। আয়ত চক্ষুর সা উপযোগী ভাবাভিব্যক্তির মাধ্যমে গ চরিত্রকে তিনি মঞ্চের ওপর মূর্ত তোলেন। তাঁর "শের আফগান" বঙ্গ মঞ্চে একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। মন বিদ্যানন্দ ডাক্তার মল্লিক-এর ভূমিকায় সরকার অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয় আমাদের চমৎকৃত করেছেন। বন্ধু হ চেষ্টাকারী শ্রীমুখোপাধ্যায়রূপে রুদ্রপ্র সেনগুপ্ত চরিত্রোচিত শ্লেষ এবং অপ মন্যতাকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর সংলাপ ভাবাভিব্যক্তির মাধ্যমে। ঝন্টু ও প্র কুমার-এর ভূমিকায় বরুণ সেন চরিত্র কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রাণবন্ত করে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় ও তার কন্যা টু ভূমিকায় যথাক্রমে দীপালি চক্রবর্তী বীণা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে উন্ন অবকাশ ছিল। অসিত বন্দ্যোপাধ্যা বাচ্চু সাহেব আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় হ আরও উপভোগ্য হত। প্রথম দৃশ্যে "শে আফগান"-এর মঞ্চপ্রবেশের আগে পর্য সামগ্রিক অভিনয়ে বিভিন্ন অভিনে বাচন স্পষ্টতর ও শ্রুতিগোচর হ প্রয়োজন। এই অংশ কিছুটা সংক্ষি হলে নাট্যক্রিয়া দ্রুততর হতে পারে।

"নান্দীকার" নিবেদিত "শের আফগা নাট্যরসিকদের অবশ্য দর্শনীয় সমগ্র

নোনা জল মিঠে মাটি : শৌভনিক-এ নিবেদন; কাহিনী : প্রফুল্ল রায়; নাট্যরূ : সুধাংশু মণ্ডল; নির্দেশনা : গোবি গাঙ্গুলী; আবহসৃষ্টি : দেবাশিস দা গুপ্ত; আলোকনিয়ন্ত্রণ : স্বরূপ মুখো পাধ্যায়; সাজসজ্জা : বীরেশ্বর মি ১৯৬৮ সালের ৩০ জুন থেকে ম অঙ্গনে অভিনীত হচ্ছে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নতুন উপনিবে পত্তন করতে এসেছে একদল পূর্ববঙ্গ উদ্বাস্তু। চতুর্দিকে নোনাজল ঘেরা দ্বীপে বসতি গড়ে চাষের উপযোগী জমি তৈ করতে প্রয়োজন হয় ধৈর্যের, পরিশ্রমে উৎসাহের। প্রাথমিক অসাফল্য নিয়ে আ হতাশা, বিক্ষোভ। এ-সবকে কাটিয়ে উ সাহসের সঙ্গে দৃঢ়পদে এগিয়ে গেলে দে পাওয়া যায় সুদিনের, সাফল্যের। নবাগ উদ্বাস্তুদের সাহস যোগাতে আছে প সাহেব। আর উদ্বাস্তুদের মধ্যে আ নানান চরিত্রের লোক। অকালবৃদ্ধ হরিপ তার যুবতী স্ত্রী তিলিকে সন্দেহ না ক পারে না এবং তিলিও নিজের জীব যৌবনকে সার্থক করবার জন্যে ত ভালোবাসার মানুষ যোগেনের সঙ্গ প্রার্থ না করে পারে না। অভাবগ্রস্ত মানুষ নি স্বার্থদুষ্ট পানিকরকে সহজেই বিশ্বা করে; জানে না, তার নবযৌবনা কন কাপাসীকে সে পণ্য করতে চায়। এর মাঝে গান গেয়ে উদ্ধব ওদের প্রাণে সা

শিকার/ধর্মেন্দ্র, আশা পারেখ

চায়। বহু বিভিন্ন চরিত্রের র সংমিশ্রণেই গড়ে ওঠে নতুন নতুন বসতি, গড়ে ওঠে নতুন দেশ চারিদিকে নোনাজল ঘেরা মিঠে।

নোনাজল মিঠে মাটি''র সংলাপ প্রায় পূর্ববঙ্গীয় ভাষায়; কাজেই র আবেদন স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ। অনুসরণ করতে না পারলে গ করা কঠিন। নতুন বসতির রূপ ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মঞ্চসজ্জার মাধ্যমে। অভি- প্রায় প্রত্যেকেরই বাস্তবধর্মী। ওরই মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপসজ্জা ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় করেন পল রের ভূমিকায় গোবিন্দ গাঙ্গুলী। রূপে সুরেশ বিশ্বাসের খালি গলায় রে গান বারংবার শোনবার মতো। সন্ধিপরায়ণ পাণিকরবেশে শিবু নদার চরিত্রটিকে মূর্ত করে তোলেন। মুখোপাধ্যায়ের খিলাফৎ চরিত্রগুণে আকর্ষণ করতে বাধ্য। অকালবৃদ্ধ পদ বীরেশ্বর মিত্রের অভিনয়গুণে র ওপর জীবন্ত হয়ে ওঠে। তিল্লির নসম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে য়িত হয় অনুরাধা দাশগুপ্ত দ্বারা। মিতা চৌধুরী চলনে বলনে, সাজ- য়, অঙ্গভঙ্গীতে কুমিকে মূর্ত করে ছেন। অপরাপর ভূমিকায় পান্নালাল (রসিক), প্রদীপ ভট্টাচার্য (নিত্য) শীল (ভীমরাজ), সুতপা চক্রবর্তী পাসী), গীতা নাগ (বাসিনী), অনীতা (ক্ষির) প্রভৃতি সকলেই স্বাভাবিক ভিনয় করেছেন।

শৌভনিক প্রযোজিত "নোনাজল মিঠে মাটি" একটি গোষ্ঠী-নাটকের সার্থকতম নিদর্শন।

—নান্দীকর

বিবিধ সংবাদ

সাগর আর্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর 'আঁখে' :

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-পরিচালক-প্রযোজক রামানন্দ সাগর প্রতিষ্ঠিত সাগর আর্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর নবতম নিবেদন 'আঁখে' ২৫ অকটোবর সোসাইটি এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। 'অওর ইনসান মর গায়া' নামক দেশভক্তিমূলক স্বরচিত উপন্যাস অবলম্বনে শ্রীসাগর এই 'আঁখ' ছবিখানি গড়ে তুলেছেন। ধর্মেন্দ্র ও মালা সিনহাকে নায়ক-নায়িকার ভূমিকাতে দেখতে পাওয়া যাবে। সহীর রচিত প্রাণ-মাতানো গানগুলিতে সুর যোজনা করেছেন রবি। ছবিখানির পরিবেশনা করছেন প্রভা পিকচার্স।

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন

গত ২২ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনের নবম বার্ষিক নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বারোশ' জনেরও অধিক প্রতিযোগী এ বছর প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। কৃতি প্রতি- যোগিগণকে মানপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডকটর শান্তিভূষণ দত্ত। এই উপলক্ষে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে কণ্ঠ- সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন ইরা মুখো- পাধ্যায়, তপতী মৈত্র, হাসি মল্লিক, গোপা বাগচী, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, মমতা ঘোষ সুস্মিতা রায়চৌধুরী, ইন্দ্রাণী দে, সবিতা হালদার, দীপক চট্টোপাধ্যায়, তপন রায়- চৌধুরী, অলোক বসু, গৌতম বসু, 'সুর- সভা' ও রবিতীর্থের শিল্পিবৃন্দ। নৃত্যে অংশ নেন শান্তা বসু রায় ও শেলী গঙ্গো- পাধ্যায়। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় (সেতার) ও সুবোধ দেব (গীটার)। সঙ্গতে ছিলেন কিশোর নন্দী ও দুলাল ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরি- চালনা করেন রথীন চৌধুরী ও গৌর বসাক।

বেতারশ্রুতি

বেতারশ্রুতি

> এই বিভাগটি অমৃতে অনেককাল চলার পর বন্ধ করা হয়েছিল, আবার নতুন পরিকল্পনায় চালু করা হল।

বাংলা সাহিত্যে এক সময় প্রহসনের খুব কদর ছিল, এখন রেডিওয় আছে। রেডিওর প্রহসনটা অবশ্য ভিন্ন প্রকৃতির। সে-প্রহসনে রেডিওর কর্তারাই কেবল আমোদ পান, আর যাঁদের নিয়ে প্রহসন, তাঁরা তিক্তবিরক্ত হন।

রেডিওয় নানা ধরনের প্রহসন আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে অডিশন প্রহসন। এই অডিসন আবার প্রধানত দু' রকমের —নাটকের এবং গানের। বর্তমান আলোচনা গানের অডিশন নিয়ে।

অডিশন বলতে এক কথায় বোঝায়—যদি কেউ রেডিওয় নাটকে অভিনয় করতে চান কিংবা গান গাইতে চান তাহলে তাঁকে তাঁর দক্ষতার যে-পরীক্ষা দিতে হয়, সেই পরীক্ষা।

গানের অডিশনে ভিড় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তার কারণ দুর্লক্ষ্য নয়। গানের চর্চা এখন অস্বাভাবিক রকম প্রসার লাভ করেছে। এবং তার প্রকাশ-মুখ খুঁজছে। প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর শিল্পকলার প্রচার চান, প্রত্যেক শিল্পীই চান তাঁর শিল্পরসে জনমন সিঞ্চিত হোক। আর সেই কারণেই তাঁরা সিনেমা, গ্রামোফোন আর রেডিওর আশ্রয় নিতে চান।

কিন্তু সিনেমা আর গ্রামোফোন পুরোপুরি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—একান্ত দুর্লভ ভাগ্যবান ছাড়া নবীনদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। কোনো সিনেমার প্রযোজক কিংবা কোনো গ্রামোফোন কোম্পানীই ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ে নবীন শিল্পীদের সুযোগ দেন না। তাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল দাঁড়ায় রেডিও। কারণ, রেডিও সরকারী প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই নবীন শিল্পীরা রেডিওতে প্রবেশের দরজা খোঁজেন, অডিশনের জন্য ভিড় করেন। লঘু-সংগীতের অডিশনেই ভিড় বেশি। রেডিওর ভাষায় লঘুসংগীত হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদের গান, রজনীকান্তের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি, নজরুলগীতি, লোকগীতি, ভজন, আধুনিক ইত্যাদি।

অডিশনপ্রার্থীরা অডিশনের ফর্ম চেয়ে চিঠি পাঠিয়ে মনে মনে হয়তো ভাবেন সপ্তাহখানেক, বড়জোর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই ফর্ম এসে যাবে। তারপর ফর্ম পূরণ করে ফেরত পাঠানে এক পক্ষ কি এক মাসের মধ্যে অডিশনের ডাক পড়বে। এবং প করার মাসদুয়েকের মধ্যেই প্রোগ্রাম পাবেন।

কিন্তু ঐ যে গানে আছে, পথ চেয়ে আর কাল গুনে শেষপর্যন্ত সেই পথ চেয়ে আর কাল গুনেই তাঁদের জীবনবৃ কয়েকটা বর্ষপত্র ঝরাতে হয়। নিদেনপক্ষে আড়াই বছর থে তিন বছর অপেক্ষা করতেই হয়। অডিশনের ফর্ম পেতেই ৬ ম থেকে ৮ মাস, অনেক সময় বছরও ঘুরে যায়। তারপর য পূরণ করে তার সঙ্গে অনুমোদিত সংগীত-বিদ্যালয় বা শিক্ষ প্রশংসাপত্র লাগিয়ে ৪ টাকা নজরানা দিয়ে পাঠানোর অডিশনের ডাক আসতে লাগে আরও ৮ মাস থেকে ১০ ম কিংবা এক বছর।

ইতিমধ্যে শিল্পীরা সেতার-সারেঙ্গী নিয়ে আদাজল গলা সাধতে আর অডিশনের গান তৈরি করতে লেগে য মাস্টারমশাইদের কাছে বিশেষ তালিম নেন, বাড়ির লোকজন ব বন্ধুবান্ধবদের ডেকে শোনান।

তারপর নির্ধারিত দিনে, নির্ধারিত সময়ের ঘণ্টাখা আগে রেডিও স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে গিয়ে হাজির হন। ডাক পড়লে পরে আশা-নিরাশায় কম্পিত বুকে স্টুডিওর ভি ফরাসে গিয়ে বসেন। ঘণ্টা দু-আড়াই কোল্ড স্টোরেজে থেকে বসিয়ে (কারণ, ততক্ষণ সকলের এয়ারকণ্ডিশন্ড ঘর সহ্য হয় তিন-চার মিনিট গাইবার পর 'রক্তকরবী'র জালায়ন নয় ঢা দেওয়া কাচামনের ওপার থেকে শুনতে পান : 'ধন্যবাদ, নমস্কা অর্থাৎ হয়ে গেছে, এবার আসতে পারেন।

এতদিনের এত উৎসাহ, এত আয়োজন, এত উত্তেজন তিন মিনিটেই শেষ। মাত্র তিন মিনিটেই যোগ্যতার পরি হয়ে গেল। যেন কত সহজ।

এরপর আবার প্রতীক্ষা। এবার শবরীর প্রতীক্ষা ন অনতিকাল পরেই ইংরেজীতে ছাপানো বাঁধা গতে একখানা আসে, যার মর্মার্থ : আমরা দুঃখিত, আপনার কণ্ঠস্বর মাই

উপযুক্ত নয়। তাই বলে আপনার যোগ্যতার প্রতি আমরা রূপ কটাক্ষ করছি না।

এবার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তখন অনিবার্য-দলেরই মনে আসে : ধরাধরি না থাকলে কোথাও কিছু জো নেই। আবার হয়তো তাঁরা অডিশনের উদ্যোগ করেন। না, এক বছরের আগে আর অডিশন নয়। ফেল যখন র, তখন এক বছর শাস্তি ভোগ করতেই হবে। এক বছর বার আবেদন করতে পারবেন। তার আগে নয়, নিয়ম নেই। নিয়ম মেনে যদি কেউ আবার এক বছর পরে অডিশনের চেয়ে চিঠি দেন, তাহলে আবারও তাঁকে পূর্ববৎ ঐ চক্রে আবর্তিত হতে হবে এবং এবারও তাঁর অডিশনে পাস না করার সম্ভাবনা শতকরা ৯৫ ভাগ।

শতকরা যে-পাঁচজনের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে অর্থাৎ যে সৌভাগ্যজন অডিশনে পাস করেন তাঁদের প্রোগ্রাম পেতে ৯ মাস ১২ মাস ১৮ মাস, এমনি করে কত মাস যে কেটে যায় তার হিসাব থাকে না। পাস-করা শিল্পীদের উৎকণ্ঠারও পরিমাপ কেউ করে না।

তবে 'ধরাধরি' যদি থাকে তাহলে সবকিছুই তড়িঘড়ি হয়, —হাতে হাতেই ফর্ম পাওয়া যায়, প্রথম সুযোগেই অডিশনের ডাক আসে, এবং অডিশনে পাস করাও জলবৎ তরলং হয়।

এ কি কম বড়ো প্রহসন!

গত সপ্তাহের অনুষ্ঠান

অক্টোবর বেলা ১টায় প্রচারিত রেই হোক নাটকটি একটি উচিত নাটক। এমন নাটক রেডিওয় রা উচিত নয়। নায়িকা নায়কের 'মাস্টারনী'। নায়কের পিতা নীতি-ব্যক্তি। প্রেমট্রেম মোটেই পছন্দ না। সুতরাং নায়ক-নায়িকার বিবাহে প্রবল বাধা। তাঁকে জব্দ করে বাধা রার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা । তা মোটেই সুস্থ নয়। নায়িকা নায়কের ভগিনীর কাছে তার পিতার নিয়ে বলেছে এবং যেভাবে পরে লাঞ্ছিত করেছে তা যেমন বেমানান শ্রুতিকটু। পিতার ভূমিকায় । এমনই যে, মনে হয় সত্যিই তিনি ী কুমতলবে নায়িকার ঘরে প্রবেশ লেন এবং তার প্রতি অশোভন করেছিলেন। এটা ঠিক হয়নি।

ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা ৪০য়ে 'দূরে কাছে' শীর্ষক নকশাটি একটি উপদেশমূলক প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। 'মানুষ কি মানুষকে ফাঁকি দিতে পারে' এই কথাটিতে যেন মানুষকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। নাটক-নকশার সংলাপও যদি মহাপুরুষের বাণীর মতো হয় তাহলে মুশকিল।

৯ই অক্টোবর দুপুরে মহিলামহলে প্রচারিত 'মুক্তি' নাটকটি আজ থেকে অন্তত পঁচিশ বছর আগে প্রচার করলে শোনাত ভালো। এমন মেলোড্রামাটিক অভিনয় এখন আর চলে না। এই রকম মেলোড্রামার করুণরস শেষে হাস্যরসে পরিণত হয়। মুক্তির কাহিনীও প্রাচীন যুগের। কেবল অসংগতি আর অসংগতি। জমিদারবাড়ির প্রসূতি নিশ্চয় ঘুঁটে-কুড়ুনী নয় যে, দাওয়ায় শুয়ে থাকবে আর যে খুশি সে এসে তার ছেলে চুরি করে নিয়ে যাবে, কেউ টের পাবে না!

৯ই অক্টোবর বিকেলে গল্পদাদুর আসরে মহাকাশ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর অত্যন্ত কৃত্রিম মনে হয়েছে। স্ক্রিপ্ট সুসমঞ্জস নয়। শিশু দুটির কথায় অস্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মহাকাশ সম্বন্ধে তারা যতখানি জানলে মানাত, তাদের জানাটা হয়েছে তার চেয়ে বেশি। ফলে শেখানো বুলি আউড়ে যাওয়ার মতো হয়েছে। তাছাড়া কসমিক রে, আল্ট্রাভায়োলেট রে, রেডিও-অ্যাকটিভিটি, ক্যালোরি ইত্যাদি গল্পদাদুর শ্রোতাদের পক্ষে অপাচ্য কথা-গুলি শোনানোর কি খুব দরকার ছিল? আর মহাকাশ যে ঘুটঘুটে অন্ধকার তার কারণ বলতে গিয়ে যে বলা হল, আকাশে যে রঙের খেলা সে বাতাসে ভাসমান ধুলোয় সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ার জন্য —তাহলে তো প্রবল বারিবর্ষণের পর বাতাস ধুলোময়লা মুক্ত হয়ে গেলে আকাশটাকে কালো দেখানো উচিত, কিন্তু দেখায় সুন্দর নীল। —আসলে কারণটা অন্য।

জলসা

সুরদাস সংগীত সম্মেলন

সুরদাস সংগীত সম্মেলন সুরু 'ইন্দিরা' প্রেক্ষাগৃহে।

এবারের অনুষ্ঠানসূচীতে নতুনত্ব ছিল ছিল যথেষ্ট, বিশেষ যন্ত্রসংগীতে। ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ সাহেবকে মধ্যমণির মত রেখে আব্দুল হালিম জাফর খাঁ ও জারিন দারুওলার সেতার ও সরোদের অবতারণায় পরিকল্পনার অভিনবত্ব অবশ্যই ছিল। আব্দুল হালিম জাফর খাঁর নাম আছে কিন্তু কোলকাতার গানের আসরে তাঁকে বিশেষ দেখা যায় না। এদিক দিয়ে উদ্যোক্তাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। তবে দেখার বা শোনার অভিজ্ঞতা খুব প্রীতিপদ হোল না এইটেই যা বেদনাদায়ক। দুদিনের অনুষ্ঠানে ইনি বাজালেন 'রাগেশ্রী" ও "চন্দ্রকোষ"। রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ, বিশেষ করে বিলায়েতের ঢঙে তিনি তান ও ঝালার কারিগরী দেখালেন। সেতারে এ'রা আদর্শ স্থানীয় এ'দের অনুসরণ করা যেকোন যন্ত্রশিল্পীর পক্ষে স্বাভাবিক এবং মীড়, সাপট, তান ইত্যাদি তৈরীর সংগে আব্দুল হালিম জাফরের অসাধারণ দাপট, শ্রোতৃমহলে সুবিদিত। কিন্তু যে শো-ম্যানশিপ স্বতঃস্ফূর্ত গতিছন্দে রবিশংকর ও বিলায়েতের মত শিল্পীর প্রতিটি এক্সপ্রেশনকে একটি বিশেষ শিল্পীব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত করে, তাঁদের হাসি চাউনি ও বাজনার ভাবের সংগে মুখভাবের রূপান্তরকে সংবেদনশীল করে তোলে তা তাঁদের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিল্পীকেই মানায়, কারণ এটা তাঁদের স্ব-ধর্মের প্রকাশ। অনুকরণের বিকৃতি পরিবেশনার রসকে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ন করে এ-সত্য যেকোন শিল্পীর জানা উচিত। তারপর একই রকমের হাল্কা ছন্দের তান বারংবার পরিবেশনায় দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনের প্রয়াস যতটা পরিলক্ষিত হয়েছে মার্গসংগীতের আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রাখার দিকে ততটা নিষ্ঠা দেখা যায় নি। অথচ প্রথম শ্রেণীর ক্ল্যাসিক্যাল আর্টিস্টরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার মত সকল উপাদানেরই ইনি অধিকারী!

তুলনামূলক বিচারে বলব আশাতিরিক্ত পেয়েছি উদীয়মান তরুণ শিল্পী শ্রীমতী জারিন দারুওলার সরোদ অনুষ্ঠানে। বেশ কয়েক বছর আগে সদারং এবং তানসেন সংগীত সম্মেলনে এ'র অনুষ্ঠানে প্রতিভার স্বাক্ষর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবারে রেওয়াজী হাতের বাজ ও সুরেলা টিপ আরো পরিণত এবং শ্রীমন্ডিত। গায়কী অংগের বিস্তারে মননশীলতা ও বৈদগ্ধ সুপরিলক্ষিত। মেজাজটিও শান্ত। যন্ত্রসংগীতের আদরনীয় শিল্পীরূপে ইনি অনায়াসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

জয়দুপ্ত বিদেশ পরিভ্রমণান্তে ওস্তাদ বিলায়েত খাঁর এই প্রথম অনুষ্ঠান। রাগ ললিতবাহার। বহুদিন বাদে আকাঙ্ক্ষিত শিল্পীকে পেয়ে শ্রোতাদের আনন্দ আর ধরে না। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে শিল্পী আসর জমিয়েও এনেছিলেন। কিন্তু বড় সংক্ষিপ্ত। শান্তাপ্রসাদের সংগত অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

কন্ঠসংগীতে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যাঁর নাম তিনি হলেন পন্ডিত বিনায়ক রাও পট্টবর্ধন। জয়ন্তমল্লার এবং শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে 'রাগসাগর' ও "যোগী মত যা" গেয়ে শোনালেন। বয়সের ছাপ কিছুটা হয়ত বা ক্ষুণ্ন করেছে সুর ও শ্রুতির সূক্ষ্মতা, কিন্তু লয়ের দাপট, উচ্চারণের স্পষ্টতা ও রাগশুদ্ধতায় পন্ডিতজী আজও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। সবার ওপর তাঁর অনাড়ম্বর ভঙ্গিমা ভাব সহজেই অন্তর স্পর্শ করে। ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁন সশ্রদ্ধ এবং শিল্পীজনোচিত নম্র সংগতে প্রবীণ ওস্তাদের মেজাজকে প্রফুল্ল রেখেছেন। সগীর খাঁর দক্ষতাও এই প্রসংগে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। জামিল হায়দারের "বেহাগ" সুগীত।

আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হোল ফিরোজ দস্তুরের কণ্ঠসংগীত। কণ্ঠ-মাধুর্যের রঙিন আবেশ মাঝে মাঝে 'আব্দুল করিম খাঁর গায়ন-সৌন্দর্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। শ্রীমতী বন্দনা সেনের কথকনৃত্যে কুশলতার অভাব ছিল না। কিন্তু সাধারণতঃবাণী অনুষ্ঠান-প্রাচুর্যের কথা স্মরণ রেখে তিনি যদি আর একটু সময় সংক্ষেপ করতেন তাহলে ভাল হোত।

সংগীতানুষ্ঠান ছাড়াও এবারের বিশেষ অনুষ্ঠান হোল প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে পন্ডিত বিনায়কর রাও পট্টবর্ধন ও ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ সাহেবকে মানপত্র প্রদান ও সম্বর্ধনাজ্ঞাপন। মানপত্র প্রদান করেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ! পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের আন্তরিকতায় শিল্পী দুজন এবং সংঘসচিব স্বদেশ সান্যাল খুব অভিভূত হয়েছিলেন।

আর এক বৈশিষ্টা হোল সাধারণ শ্রোতাদের জন্যও কর্মকর্তাদের সহানুভূতি, দরদ এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আন্তরিক নজর—যা এই ধরণের বৃহৎ অনুষ্ঠানে খুব কমই চোখে পড়ে।

সংগীত প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন

তানসেন সংগীত সংঘ আয়োজিত নিখিল বঙ্গ তানসেন উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রতিযোগিতায় চোরবাগানের চট্টোপাধ্যায় বংশের সন্তান (শ্রীশ্রীরাধারমণ কীর্তন সমাজ খ্যাত) কুমারী ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায় ধ্রুপদে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং খেয়ালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধি[কার] করেছেন। এছাড়া কুমারী সুমিতা [...] ঠুমরীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম [...] অধিকার করেছেন। প্রসংগত উল্লেখযো[গ্য] যে এই তিনজন কৃতি প্রতিযোগীই প্রথ[...] কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী অঞ্জলি চৌধু[রী] (সুর) ছাত্রী।

ভারতীয় সংগীত মহাবিদ্যাল[য়]

গত ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার রবী[ন্দ্র] সরোবর থিয়েটার মঞ্চে, ভারতীয় সংগ[ীত] মহাবিদ্যালয়ের অষ্টাদশ সমাবর্তন উৎ[সব] বিপুল উদ্দীপনা ও সাফল্যের স[...] উদ্‌যাপিত হয়। তত্ত্বাবধানে ও ব্যব[স্থা]পনায় যথাক্রমে ছিলেন অধ্যক্ষ শ্রীনন্[দ]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংগীত শিক্ষ[...] শান্তি রায়।

সম্পাদিকা শ্রীনিশা চক্রবর্তীর বা[র্ষিক] বিবরণী পাঠের পূর্বে, উৎসবের উদ্বো[ধক] শ্রীঅজিতকুমার দত্ত (প্রাক্তন এডভো[কেট] জেনারেল) তাঁর ভাষণে, মহাবিদ্যাল[য়ের] শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে তার আর্থিক [...] টনের সুরাহার জন্য কলিকাতা পৌরস[ভার] বকেয়া আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর ত্বরান্[বিত] করতে পৌর-পিতাদের নিকট আবে[দন] জানান। প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতি স[...] করবার নিমিত্ত তিনি পঃ বঃ সরকা[রের] সক্রিয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পারিতোষিক বিতরণ করেন স[...] উদ্বোধক শ্রীদত্তের সহধর্মিণী শ্রীমতী দ[...] শ্রীকমল সরকারের পরিচালনায় একক [...] সমবেতভাবে গীটার বাদ্য পরিবেশন ক[...] কুশলী ছাত্রীবৃন্দ।

তারপর সমাবর্তন উৎসবের অন্য[তম] প্রধান আকর্ষণ 'সীতা হরণ' নৃত্যনা[ট্য] ছাত্রীদের দ্বারা বিশেষ সাফল্যের স[...] মঞ্চস্থ হয়।

অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখান সুপ্রিয়া র[...] সুচন্দ্রা রায়, চৈতালী চক্রবর্তী, তা[...] বন্দ্যোপাধ্যায়, পাপিয়া গংগোপাধ্যায় মায়া মজুমদার।

ভ্রম-সংশোধন

গত সপ্তাহে বন্যাত্রাণে 'উচ্চ[াঙ্গ] সংগীতের আসর' — শীর্ষক আলোচ[নার] শেষে নিম্ন অংশটি মুদ্রণপ্রমাদবশত পড়ে গেছে। 'শ্রীমতী কল্যাণী রায় [ও] আহাম্মদ আলির দ্বৈত সেতার ও সা[...] অনুষ্ঠানে তবলা সংগতে ছিলেন শ্রীজ্ঞা[ন]প্রকাশ ঘোষ। তাঁর উচ্চাংগের সংগত ছিল [...] অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ। এই প্রস[ঙ্গে] উল্লেখযোগ্য গ্রামোফোন কোম্পানীর ই[...] রেকর্ডে এই শিল্পী দুজন জোনপু[রী], পিলু, কেদারা ও ধুন বাজিয়েছেন আহ[...] হোসেনের তবলা সংগতের সংগে। বিদে[শে] এ রেকর্ড খুব সমাদৃত হয়েছে।'

—[...]

ম্যাকারটনিকে দেখেছি

কমল ভট্টাচার্য

...র অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারদের ...স্ট্রেলিয়ার চার্লস ম্যাকারটনির নাম ...কউ ভুল করেন না। ম্যাকারটনির ...রাত আলাদা। তাড়াহুড়ো খেলতে ...ট মারতে তাঁর জুড়িদার নেই ...চলে। এই ধারালো মারের জন্যেই বড়রকমের রান সংগ্রহে বঞ্চিত ...। ম্যাকারটনির বন্ধুরা তাঁকে ...খেলতে উপদেশ দিতে গেলে ...ন বলতেন—"তাহলে খেলার ...টা কোথায় রইল? দর্শকরা আমার ...রর খেলার অনুরাগী। সেঞ্চুরী ...বেশী রানের জন্যে নয়।" তবে ...আগে ম্যাকারটনির সেঞ্চুরী করার ...ীর আছে। খেলাটি ইংল্যান্ডের ...মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় ...চ। ম্যাকারটনি তিন নম্বর ব্যাটস-...সেবে খেলতে এসে বিশ্ববিখ্যাত ...পেস বোলার মরিস টেটের বলে ...তুলে অব্যাহতি পান। তারপর ...নি নিজ মূর্তি ধরেন। মারের ...সেই হেন বিশ্ববিখ্যাত বোলার ...টেট আঙুল কামড়ে বলেন—"এমন ...না মার আমি জীবনে দেখিনি।' ...কোন এক অভিজ্ঞ খেলোয়াড় মরিস ...কথার মাঝে বলে ওঠেন—"বলা ভুল ...কেননা চার্লস ম্যাকারটনিকে ...সৌভাগ্য আপনার দুবার ...। এঁর কাছে কোন বোলার ...ই নন।"

...শের সমালোচকদের কাছে চার্লস ...টনির স্থান অনেকেরই ঊর্ধ্বে। ...কার বলা চলে ডবলিউ জি গ্রেস, ...ট্রামপার, ডন ব্রাডম্যানের মত ...ম্যানের সঙ্গে ম্যাকারটনির খেলার ...ষ্টের কোথায় মিল ছিল। তবে এঁদের ...ম্যাকারটনির খেলার মিল কোথাও ...না। সে আজকের কথা নয়। ...র্টনি খেলেছেন ১৯০৭ সাল থেকে ...৬ সাল পর্যন্ত। খেলেছেন পঁয়ত্রিশটি ...ম্যাচ। তার মধ্যে আছে সাতটি ...রী মোট ২১৩১ রান। এক ইনিংসের ...সবচেয়ে বেশী রান ১৭০।

১৯২৬ সালেই তাঁর বড় ক্রিকেটের ...সাঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু খেলায় অভ্যাস তিনি ছাড়েননি। কেননা ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বড় কম দিন নয়। টেস্ট খেলা ছাড়ার পর প্রায় ন' বছর বাদে ১৯৩৫-৩৬ সালে জ্যাক রাইডারের নেতৃত্বে যে বেসরকারী অস্ট্রেলিয়া দল ভারত সফরে এসেছিল সে দলে চার্লস ম্যাকারটনি ছিলেন। ইডেনের মাঠে ম্যাকারটনির সেই তথাকথিত মারের বহর দেখে আনন্দে নেচে উঠেছিলাম। যৌবনের খেলার জৌলস তখনও তাঁর খেলার মধ্যে ছিটেফোঁটা যে ছিল সে কথা ভেবে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। উডল্যান্ডস মাঠে কুচবিহার দলের বিপক্ষে ম্যাকারটনির ৬৩ রান আমি দেখিনি। তবে বাংলা-আসামের সম্মিলিত দলের বিপক্ষে তাঁর ৮৫ রান আমি শুধু দেখিনি সে ম্যাচে আমি খেলেওছি। তাঁর সে অপূর্ব খেলার কথা বলতেই হবে। তবে আগের কথাটা সেরে ফেলি।

ইডেনের প্যাভিলিয়নে ঢুকেই ক্রিকেট খেলোয়াড় সঁটে ব্যানার্জি অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের হাল-চালের বর্ণনা দিলেন। তিনি বেশ আগ্রহভরে বললেন: "চল্ চল্ দেখবি চল্। এ না দেখলে জীবনই তোর বৃথা যাবে। ম্যাকারটনিকে স্বচক্ষে দেখে নে একবার।" তবে সঁটের কথায় বিশ্বাস কি? রঙ্গ তামাসা করতে তাঁর জুড়িদার ছিল না। সে কথা জেনেও তাঁর সঙ্গে পা বাড়ালাম। ড্রেসিং রুমে ঢুকেই দাঁড়িয়ে গেলাম। ম্যাকারটনিকে ভাল করে দেখলাম। বেঁটেখাট চেহারায় আগের শক্ত বাঁধন নেই। বরং মংসপেশী ঝুলে পড়েছে। গাল দুটো টপকে গেছে। তবে তখন সে অবস্থায় বুড়ো ম্যাকারটনির এলোথেলো বেশ দেখে খুশী হতে পারিনি। মানে মানে সরে এসেছিলাম। বাইরে তখন বন্ধু সঁটে ব্যানার্জি মিটিমিটি হাসছেন। তাঁকে কটূক্তি করে বললাম: 'ম্যাকারটনিকে দেখে তুমিও নিশ্চয়ই খুশী হওনি!" বন্ধুবর কাছে এসে বললেন—"নারে ভাই। যা দেখলাম তাতে দিন ভাল যাবে বলে মনে হয় না। দেখবি, আমি খেলতে পারব না। ম্যাকারটনির কি বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে।" পরে বুঝলাম ড্রেসিং রুমে অস্ট্রেলিয়ানরা সবাই সাজপোশাক ছাড়ার ব্যাপারে কেমন যেন সহজ। এ ব্যাপারে তারা শালীনতার বিশেষ ধার ধারে না।

যাইহোক বাংলা-আসাম সম্মিলিত দলের গোড়াপত্তন করতে গিয়েই অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার লেদারের বাম্পারে আউট হয়ে সঁটে ব্যানার্জি মুখ শুকিয়ে ফিরলেন। তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে আমি এগিয়ে পড়তেই সঁটে ব্যানার্জি লেদারের বাম্পারের কথা তুলে সাবধান করে দিলেন। আর খেলতে না পারার জন্যে দোষের ভাগী করলেন ড্রেসিং রুমের সকালবেলার ঘটনা।

জীবনের প্রথম বড় ম্যাচ খেলতে নেমে কম অসুবিধেয় পড়িনি। সেই অসুবিধের কারণ ছিলেন বোলার আলেকজান্ডার। এই বোলারের বাঁ হাতের বলগুলো মাটিতে পড়ে জোরে আসত। এই হেন বোলারকে সামলাতে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। আমার অবস্থা দেখে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন রাইডার এসে দাঁড়ালেন সিলি মিড অনে। ইসারায় রাইডার ম্যাকারটনিকেও সিলি অফে ডেকে আনালেন। দুই মহারথীর সামনে পড়ে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এই

অবস্থায় আলেকজান্ডারের একটা বল লাফিয়ে উঠে আমার প্যাবস ছুঁয়ে চলে গেল। দেখলাম উইকেটকীপার এলিস এক ফুট লাফিয়ে উঠে তাঁর মেয়েলি গলায় চীৎকার করে আউটের আবেদন জানালেন। অমায়িক আম্পায়ার সার্জেন্ট কার্টার চমক খেয়ে হাত তুলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তিনি হাত নামিয়ে রাখলেন দু' আথার এক কথা শুনে। ম্যাকারটনি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললেন : "ওঃ নো নো হি ডিড ইনট টাচ দি বল।" কথাটার সায় দিয়ে জ্যাক রাইডারও বলে উঠলেন : "আই থিঙ্ক সো।" সে যাত্রা ম্যাকারটনি আমাকে বাঁচালেন। শুধু তাই নয়, সিলি মিড অফ থেকে তিনি আমার খেলার ভুল সংশোধন করে দিতে লাগলেন। কাট সট মারা ভুল হচ্ছে। ওভারের শেষে হাত থেকে ব্যাটটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কাট সট মারার নিখুঁত পদ্ধতিটি দেখিয়ে দিলেন।

ফলে আমি মনোবল ফিরে পাই। দীর্ঘ চারঘণ্টা খেলার পর আমার রান দাঁড়ায় মাত্র ৪৮। ম্যাকারটনি বিশেষ অভিনন্দন জানালেন আমাকে। শুধু মুখের বুলি সারা সে অভিনন্দন নয়। তিনি যে অন্তর দিয়ে কথাগুলো বলছেন সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। নিজেদের মধ্যেও ম্যাকারটনি সহানুভূতি দেখাতে ভুলতেন না। কতকগুলি কথা এখনও কানে ভাসছে—"ওয়েল বোল্ড আলেকজান্ডার। স্পেশ্যালি ইন নেকসড্ স্পেল। ওয়েল ডান স্যার।" এলিসকে বললেন : "ওয়েল কেপ্‌ট এলিস। ইট ওয়াজ এ গুড ক্যাচ। হো ইট ওয়াজ নট গিভিন আউট।" কথাটা বলে ম্যাকারটনি চোখ টিপে ইসারা করলেন। এলিস অবশ্য সহজে ছেড়ে দেননি। চুপি চুপি আমায় ডেকে সে কথা বললেন। আমিও এলিসকে নিরাশ করলাম না। আম্পায়ার সার্জেন্ট কার্টারও নিজের ভুল বুঝতে পেরে আফশোষ জানিয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম জুটির উইকেট খেলার সূচনায় ভাঙলেন ওপনিং বোলার সুঁটে ব্যানার্জি। তিন নম্বর ব্যাটসম্যান এলেন চার্লস ম্যাকারটনি। খেলতে নেমেই তিনি যে খেলা খেললেন তা দেখে কেউই খুশী হতে পারছিলেন না। বোলার সুঁটে ব্যানার্জি নাজেহাল হয়ে কোমরে হাত দিয়ে দম ফেলতে লাগলেন। আর দারুণ ঠান্ডায় বাংলা-আসাম দলের ক্যাপ্টেন হোসি সাহেবের কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল। ম্যাকারটনির অপরাধ তিনি সুঁটে ব্যানার্জির জোরের বলগুলি ঠিক চামচের মত করে স্লিপের ওপর দিয়ে মারছেন। বারবার এমন মার দেখে হোসি সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে বসলেন। ব্যাপার দেখে ম্যাকারটনির মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন—"ইউ এ্যালেক। ডু ইউ মিন টু সে ইট ইজ এ ফ্লুক সট।" ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"সি এগেন।" পরের বলটিও ম্যাকারটনি ঠিক স্লিপের ওপর দিয়ে চালান করলেন। হোসি সাহেব এতক্ষণে ব্যস্ত হয়ে সর্ট থার্ড ম্যান রাখলেন। যাতে ম্যাকারটনির মা ফিল্ডারের হাতে পড়ে। এবারও ম্যা মিটিমিটি হাসলেন। কিন্তু পরে মারার সময় তিনি বেশ শক্ত মুঠো কায়দায় যে কাট সট মারলেন তা ফি দের নাগালে পৌঁছল না। এবার সত্যিই হোসি সাহেব কপালে মুছলেন। বুঝলেন ম্যাকারটনি এই অনেককেই হার মানাবেন। তাঁর রান নিমেষে হয়ে গেল। ম্যাকারটনি হলেন সুঁটে ব্যানার্জিরই বলে। ধরতে হোসির চোখ কপালে উ বলটি তলপেটে এসে লাগতেই চেঁচিয়ে ওঠেন—'ও গড্' বলে। বাঁচাতেই হোসি সাহেব ক্যাচ ধরলেন

ম্যাকারটনির মত বোলারও দেখেছি। বাঁ হতে ঝুলিয়ে বল ক যে অসাধ্যসাধন করতে পারেন তা পেয়েছি। সেই বুড়ো বয়সেও ক টেস্ট ম্যাচে তাঁর বোলিংয়ের নেহাৎ খারাপ নয়। তিনি পাঁচটি পেয়েছিলেন মাত্র ১৭ রান দিয়ে। ইনিংসেও ৪২ রানের বিনিময়ে ছিলেন তিনটি উইকেট।

শেষবেশ বলি। এই হেন মা যিনি সদাহাস্যময় তিনি ক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় খেলার লিখতে গিয়ে আমাকে পথে বসিয়ে তিনি বললেন : "একজন ব্যাটসম্যান খেলেও তিনি দলের কোন আসেননি। তিনি কি ওভারের শে নিয়ে নতুন খেলোয়াড়গুলোকে আ পারতেন না।" রিপোর্ট লিখতে তিনি কোন খাতিরের ধার ধা সেখানে তিনি ন্যায়ের বিচার ক এখানেও তিনি আমায় বড় শিক্ষা গেলেন।

ম্যাকারটনি আজ ইহজগতে নেই মৃত্যু ঘটেছে আজ থেকে দশ বছর ইডেনের মাঠে কত জাত খেলো দেখলাম, কিন্তু ম্যাকারটনির সঙ্গে মিল খুঁজে পেলাম না। সেই বছরের ম্যাকারটনির কথা আজও রেখেছি। খেলা শেষে আবার ড্রেসিং নির্ভয়ে ঢুকেছিলাম ম্যাকারটনিকে বলে। তাঁর খেলার তারিফ জানাব সেই একই দৃশ্য দেখে এবার আর চোখ ঢাকিনি। কাছে এগিয়ে দেখলাম বৃদ্ধ ম্যাকারটনি তখন বড় সারা পায়ে মলম লাগিয়ে ক্রেপ ব জড়িয়ে চলেছেন পায়ের আগা থেকে পর্যন্ত। তার পরিপাটি ব্যবস্থা বিস্মিত হয়ে পড়ি।

মেক্সিকো সিটির ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯তম অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মেক্সিকোর এ্যাথলীট কুমারী এনরিকিউটা বাসিলিও স্টেডিয়ামের বিশেষ আধারে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের উদ্দেশ্যে মশাল হাতে স্টেডিয়ামের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। অলিম্পিক গেমসের এই অনুষ্ঠানে মহিলার ভূমিকা এই প্রথম।

খেলাধূলা

দর্শক

ক্সিকো অলিম্পিক গেমস

ক্সিকো সিটির ইউনিভার্সিটি ম গত ১২ অক্টোবর আধুনিক ১৯তম অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন রোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বর্ণাঢ্য, ভীর শান্ত পরিবেশে স্টেডিয়ামের ক দর্শক উদ্বোধনী উৎসব একাগ্র-পরম নিশ্চিন্তে প্রত্যক্ষ করেন। বিন্দুমাত্র আশংকার চিহ্ন ছিল না। ত্র কয়েকদিন আগে সরকার বিরোধী ন্দোলনের দাপটে অলিম্পিক গেমস হওয়ার দাখিল হয়েছিল। অলিম্পিক উপলক্ষে সরকার বিরোধী আন্দোলন রাখা হল—ছাত্র নেতাদের এই সত্ত্বেও সারা শহর জুড়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। চিরাচরিত অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন অভিযান, অলিম্পিক পতাকা ন, স্টেডিয়ামের আধারে অনির্বাণ কুণ্ড প্রজ্জ্বলন, শপথ গ্রহণ, হাজার পায়রা উড়ান, প্রতিযোগীদের ও কুচকাওয়াজ প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথা-রীতি পালিত হয়। মেক্সিকোর লোকনৃত্য লোকসংগীত উদ্বোধনী উৎসবকে টিময় করে তুলেছিল। ১৯৩৬ সালের অলিম্পিক স্বর্ণ পদক বিজয়ী রিকার নিগ্রো এ্যাথলীট জেসি ওয়েন্স ধনী উৎসবে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন, এ পর্যন্ত যতগুলি অলিম্পিকের উদ্বোধনী উৎ ব দেখেছি তার মধ্যে এই অনুষ্ঠানই সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। অনা-ড়ম্বর অনুষ্ঠান তবু কত সুন্দর!" জাপানের প্রিন্স তাকেজা বলেছেন 'অতি সুন্দর আয়োজন। সব থেকে ভাল লেগেছে অলিম্পিকের পতাকা প্রদান অনুষ্ঠান—মেক্সিকোর ছজন মেয়ের হাতে ছজন জাপানী মেয়ের অলিম্পিক গেমসের পতাকা সমর্পণ—এই দৃশ্য কোনদিনই আমি ভুলব না।' আয়ারল্যাণ্ডের প্রতিনিধির মন্তব্য 'এত চিত্তাকর্ষক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আর কখনও দেখিনি। অনাড়ম্বর ব্যবস্থায় কি মনোহারিত্ব।'
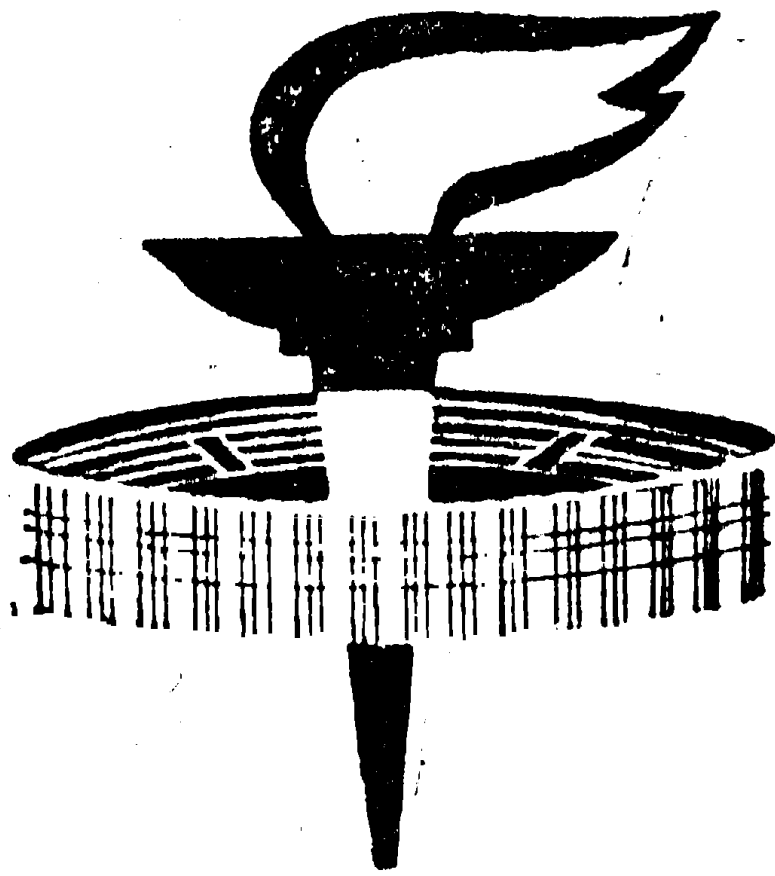
মেক্সিকোর অপূর্বত্ব।

মেক্সিকোর ১৯তম অলিম্পিক গেমসের সূত্রে অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে যে-সব প্রথম নজির সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি :

লাতিন আমেরিকা এবং স্প্যানিশভাষী দেশে অলিম্পিক গেমসের অনুষ্ঠান এই প্রথম।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মেক্সিকো সিটির উচ্চতা ৭৩৪৯ ফিট—এত উঁচুতে অলিম্পিক গেমসের আসর এই প্রথম।

মেক্সিকোর অলিম্পিক স্টেডিয়ামের আধারে অলিম্পিক মশালের পূতাগ্নির সাহায্যে অনির্বান অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলন করেন মেক্সিকোর এক কুমারী এ্যাথলীট—অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে এই অনু-ষ্ঠানে নারীর ভূমিকা এই প্রথম।

যোগদানকারী দেশ: ১১৯টি
  পূর্ব রেকর্ড: ৯৪টি (টোকিও, ১৯৬৪)

প্রতিযোগী: ৭,৮০৯ জন (পুরুষ ৬,৮১৩ ও মহিলা ৯৯৬)

পূর্ব রেকর্ড : ৫,৮৬৭ জন (পুরুষ ৫,২৯৪ ও মহিলা ৫৭৩), হেলসিঙ্কি, ১৯৫২।

ট্র্যাক এ্যান্ড ফিল্ড : ১,১১৩ জন (৮৪টি দেশের)

পুরুষ বিভাগ

১০০ মিটার দৌড়: ৮৪ জন
২০০ মিটার দৌড়: ৭২ জন
ম্যারাথন: ৮৬ জন

টার্টান ট্র্যাক: এই বিশেষ ট্র্যাকে মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের দৌড় অনুষ্ঠান-গুলি হবে। অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে এই প্রথম 'টার্টান'-ট্র্যাক-এর ব্যবহার। এই ট্র্যাকের বিশেষত্ব এই যে, রোদ, বৃষ্টি এবং তুষারপাতে কোন ক্ষতি হয় না বা দৌড়ের কোন রকম অসুবিধা সৃষ্টি করে না।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

কানপুরের নানা রাও পার্কের নব-নির্মিত সন্তরণ পুলে ২৫তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। উত্তর প্রদেশে জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার আসর এই প্রথম। এই প্রতিযোগিতার চার দিনের অনুষ্ঠানে মোট ২৫টি জাতীয় সন্ত-রণ রেকর্ড ভংগ হয়। তবে এই সব রেকর্ডের কতগুলি শেষ পর্যন্ত সরকারী স্বীকৃতি পাবে তা জানা যায় নি। কারণ প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনের এক সময় দিল্লীর প্রতিনিধিদের অভিযোগে প্রকাশ পায়, পুলের জল আন্তর্জাতিক নিয়মের থেকে অনেক কম ছিল।

প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে সার্ভি-সেস (১৬৮ পয়েন্ট), মহিলা বিভাগে দিল্লী (৬৮ পয়েন্ট, বালক বিভাগে বাংলা (৭৭ পয়েন্ট) এবং বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্র

মেক্সিকো সিটিতে আয়োজিত ১৯তম অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের 'মার্চপাস্ট'।

(৪৯ পয়েন্ট) সর্বাধিক পয়েন্ট অর্জনের সূত্রে দলগত খেতাব লাভ করে।

বাংলা বালক বিভাগে ১ম, বালিকা বিভাগে ২য়, পুরুষ বিভাগে ৩য় এবং মহিলা বিভাগে ৪র্থ স্থান পায়। মহিলা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ান দিল্লী পুরুষ বিভাগে ৬ষ্ঠ, বালক বিভাগে ২য় এবং বালিকা বিভাগে ৩য় স্থান পায়। বালিকা বিভাগের চ্যাম্পিয়ান মহারাষ্ট্র পুরুষ বিভাগে ৫ম, মহিলা বিভাগে ২য় এবং বালক বিভাগে ৩য় স্থান পেয়েছিল।

ব্যক্তিগত সাফল্য

মহিলা বিভাগে রাজস্থানের কুমারী রিমা দত্ত চারটি স্বর্ণ পদক এবং বালক বিভাগে টিংগু খাটাউ চারটি স্বর্ণ পদক ও একটি রৌপ্য পদক জয়ের সূত্রে ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দেন। তাছাড়া কুমারী রিমা দত্ত তিনটি এবং টিংগু খাটাউ চারটি অনুষ্ঠানে জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

রিমা দত্তের রেকর্ড

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
১ মিঃ ৯·৪ সেঃ

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
৫ মিঃ ২৯·৩ সেঃ

২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
২ মিঃ ৩৩·৩ সেঃ

টিংগু খাটাউয়ের রেকর্ড

১০০ মিটার বাটারফ্লাই :
১ মিঃ ১১·৫ সেঃ

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক :
১ মিঃ ১৬·৩ সেঃ

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
৫ মিঃ ১৯·৫৫ সেঃ

৪×৫০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি :
২ মিঃ ৪২·২ সেঃ

দলগত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : সার্ভিসেস (১৬৮ **পয়েন্ট**), রেলওয়ে (৬৫), বাংলা (৬১), ইউ পি (৪৪), মহারাষ্ট্র (২০), দিল্লী (১৭), অন্ধ্র (১৫), পাঞ্জাব (৭), কেরালা (৬) এবং রাজস্থান (৪)।

মহিলা বিভাগ : দিল্লী (৬৮ পয়েন্ট), মহারাষ্ট্র (৩৯), রাজস্থান (৪১), বাংলা (২৭), কেরালা (১৩) এবং গুজরাট (৯)।

বালক বিভাগ : বাংলা (৭৪), দিল্লী (৬৭), মহারাষ্ট্র (৫১), রাজস্থান (২১), ইউ পি (১৫), কেরালা (৭) এবং অন্ধ্র (৮);

বালিকা বিভাগ : মহারাষ্ট্র (৪৯), বাংলা (৩৩), দিল্লী (২১), পাঞ্জাব (৮) এবং কেরালা (৯)।

আইজেনহাওয়ার গলফ্ কাপ

মেলবোর্ণে আয়োজিত ৬ষ্ঠ বিশ্ব অপেশাদার দলগত গলফ প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমেরিকা অল্প ব্যবধানে বৃটেনকে পরাজিত করে তৃতীয়বার আইজেন-হাওয়ার কাপ জয় করার গৌরব লাভ করেছে। আমেরিকা ইতিপূর্বে ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালে এই কাপ জয়ী হয়েছিল। প্রতি দ্বিতীয় বছরে এই বিশ্ব গলফ প্রতি-যোগিতার আসর বসে থাকে।

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ক্রমপর্যায় তালিকায় ভারতবর্ষ পেয়েছে ৯ম স্থান। ভারতবর্ষের পক্ষে যোগদান করেছিলেন রাজকুমার পীতম্বর (অধিনায়ক), বর্তমান ভারতীয় গলফ চ্যাম্পিয়ান অশোক মালিক, মেজর পি জি সেথী এবং বিক্রম

চূড়ান্ত ক্রমপর্যায় তালি

১ম আমেরিকা, ২য় বৃটেন, ৩ এবং ৪র্থ অস্ট্রেলিয়া।

পূর্ববর্তী বিজয়ী দেশ

১৯৫৮ অস্ট্রেলিয়া, ১৯৬০ **১৯৬২** আমেরিকা, ১৯৬৪ বৃ ১৯৬৬ অস্ট্রেলিয়া।

বড়দলৈ ট্রফি

গৌহাটির নেহরু স্টেডিয়াম বড়দলৈ ফুটবল ট্রফির ফাইনালে ক্লাব ১—০ গোলে ইস্টার্ন রে পরাজিত করে। ইস্টবেঙ্গল দ এই প্রথম বড়দলৈ ট্রফি জয়।

ভারত সফরে এম সি

শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের পড়ে এম সি সি কর্তৃপক্ষ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে খেলোয়াড় বেসিল দলভুক্ত করে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারে ফরস্টার তা সমর্থন করেনি এম সি সি তাদের দক্ষিণ আফ্রি বাতিল করে দিয়ে ১৯৬৮ সালে দিকে ভারত সফরে আসছে। তা তাদের তিনটি টেস্ট ম্যাচ এবং সাধারণ ম্যাচ খেলার প্রস্তাব ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড অনুমোদন তবে ভারতীয় ক্রিকেট পক্ষ থেকে মোট চারটি টেস্ট মা যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা এখনও কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে। আফ্রিকা সফরের উদ্দেশ্যে যাঁদের নিয়ে দল গঠন করেছিলে যাতে সকলেই ভারত সফরে আ জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বো করা উচিত। কারণ অতীতে দুর্বল দল নিয়ে ভারত সফর ক বর্ষের ক্রিকেট অনুরাগী মহল অনেক খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলা দেখা থেকে বারম্বার বঞ্চি ছেন। এবারও যদি তাই ঘ ভারতীয় দর্শকদের প্রতি খুবই করা হবে।

অস্ট্রেলিয় সফরে ভা দল

আগামী ১৮ই নভেম্বর ভা ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে মাদ্রাজ ত্যাগ করবে। ভারতীয় দলের এইটি দ্বিতীয়বারে সফর। তারা প্রথম ইংল্যা গিয়েছিল ১৯৬৭ সালে। গ ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় স্কুল অপরাজেয় সম্মান নিয়ে স্বদেশে —১৮টি খেলায় ৯টি জয়, ৮ি এবং বৃষ্টির জন্যে একটি খেল

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

৮ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 1st November, 1968. শুক্রবার, ১৫ই কার্তিক, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪	চিঠিপত্র		
৫	সম্পাদকীয়		
৬	কাছের ও দূরের গান্ধী		—রমাঁ রলাঁ
৯	এক রঙের পুতুল	(গল্প)	—শ্রীসুনীল গুহ
১৩	দেশেবিদেশে		
১৫	শাদা চোখে		—শ্রীসমদর্শী
১৭	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
১৮	রাত তখন দশটা	(উপন্যাস)	—শ্রীদেবল দেববর্মা
২৩	সাময়িকপত্র সমালোচক রবীন্দ্রনাথ		—শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
২৮	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৩৩	বন্যা	(উপন্যাস)	—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
৩৮	হাসির মজলিস/কুইজ		
৪০	কালো মুক্তো		—পিটার ওডোনেল
৪২	কেয়াপাতার নৌকো	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রফুল্ল রায়
৪৫	প্রদর্শনী-পরিক্রমা		—শ্রীচিত্ররসিক
৪৭	নতুন ঠগী		—শ্রীসন্ধিৎসু
৪৯	সূর্য কাঁদলে সোনা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৫১	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৫৪	ছায়া কালো কালো		—শ্রীঅমিতাভ মজুমদার
৫৮	নীলাঞ্জন ছায়া	(কবিতা)	—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
৫৮	শয্যায় পড়েছে ভেঙে বনচুল	(কবিতা)	—শ্রীঅঞ্জন কর
৫৯	ককটেল পার্টির শেষে	(গল্প)	—শ্রীরুণু চট্টোপাধ্যায়
৬১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭১	বেতার শ্রুতি		—শ্রীশ্রবণক
৭৩	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৭৫	অলিম্পিক সাঁতার		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
৭৮	খেলাধূলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীমনু পারেখ

চিঠিপত্র

ডঃ খোরানা প্রসঙ্গে

অমৃত-এর চব্বিশ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়-এর জন্য ধন্যবাদ। ডঃ হর-গোবিন্দ খোরানার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমরা পুলকিত। সবাই বেশ আনন্দের সঙ্গে বলে বেড়াচ্ছি এত দিন পর নোবেল পুরস্কার তালিকায় আর একজন ভারতীয়ের নাম সংযোজিত হোল। এরা সবাই সাধারণ লোক। দোষ তাদের খুব একটা নেই, যত দোষ হচ্ছে আমাদের দেশের কর্তা-ব্যক্তিদের এবং বিভ্রান্তিকর প্রচারের।

তিনি শুধুমাত্র জন্মসূত্রেই ভারতীয়। কর্মসূত্রে এবং নাগরিকত্বে তিনি আমেরিকান। স্বদেশে তাঁর ঠাঁই হয় নি। অনেকের দরজায় ধর্ণা দিয়েও তিনি চাকুরি এবং গবেষণার সুযোগ পান নি। তাই অনেকটা ভগ্নমনোরথ হয়েই ডঃ খোরানা স্বদেশ ত্যাগ করে যান। তারপরের ইতিহাস আজ সবাই জানেন।

ডঃ খোরানা এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন কিন্তু সে আনন্দে আমরা তেমন ভাগ বসাতে পারছি না। অথচ এই গৌরবের সবটাই আমাদের প্রাপ্য ছিল। অনেকের অদূরদর্শিতার খেসারত দিতে গিয়ে এই আনন্দ থেকে আমাদের দূরে সরে থাকতে হচ্ছে। আমরা শুধু সতৃষ্ণ নয়নে এই আনন্দের দিকে লোভী দৃষ্টি নিয়ে চাইছি।

অথচ স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছে। তবু আমাদের বিজ্ঞানীরা সেখানে খুব একটা সুযোগ পাচ্ছে না। অনেককেই বলতে শোনা যায়, আমার গবেষণার বিষয় নিয়ে এদেশে কোন কাজ হচ্ছে না, তারপরের দৃশ্য ভাবতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। তাঁরা এদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমান। সেখানে চাকুরি এবং গবেষণার পুরো সুযোগ দেওয়া হয়। অথচ একটু চেষ্টা করলে, এসব প্রতিভাকে আমাদের দেশে আটকে রাখা যায়। গবেষণার সুযোগও করে দেওয়া সম্ভব। আর তখনই তাঁদের আবিষ্কার ও সম্মানে আমাদের পুরো অধিকার থাকবে।

শুধু আমাদের দেশে বিজ্ঞানীদের গবেষণার সুযোগ যে সীমিত তাই নয়, বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুযোগও খুব কম। এজন্য উপযুক্ত পত্র-পত্রিকারও নিতান্ত অভাব। আমাদের বিজ্ঞানীদের নতুন মতবাদ সে জন্য প্রচারে দেরী হয়। এজন্য আমরা সুযোগও কম হারাই না। তাই প্রয়োজন গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত পত্র-পত্রিকার প্রচার। তবেই অনেক বিজ্ঞানী দেশে ফিরে আসবেন। আর না হলে শুধুমাত্র দেশ-প্রেমের দোহাই পেড়ে প্রবাসী বিজ্ঞানীদের এদেশে আহ্বান করলে চলবে না। সে ডাকে সাড়াও মিলবে না। কারণ, তাঁরা তো দেশে ফিরে বেকার বসে থাকতে পারেন না। তাঁদের চিন্তার প্রকাশ ও প্রয়োগ এবং রুজির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাই সর্বাগ্রে।

অমলকান্তি বিশ্বাস
গৌহাটি-৪

বিচিত্র প্রেস কনফারেন্স প্রসঙ্গে

কিছু দিন আগে কলকাতা লতা মুঙ্গেশকর এসেছিলেন কোন একটি সংগীত সম্মেলন উপলক্ষে। সে নিয়ে বিস্তর হৈ-চৈ এবং হট্টগোল হয়েছে। এই সংগীতশিল্পী সম্পর্কে কেউ কেউ অজানা তথ্যের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। কিন্তু সবাই লতা মুঙ্গেশকরের সাংবাদিক সম্মেলনের আসল রহস্যটুকু চেপে গেছেন। কিন্তু অমৃত-এর সংগীত সমালোচক তাঁর স্বাভাবিক নৈপুণ্য-সহকারে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাঠক-সমীপে পেশ করেছেন। সত্যি বলতে কি সাংবাদিক সম্মেলনের এমন কৌতুককর দিক সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। গত ২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত গানের জলসা বিভাগে বিচিত্র এক প্রেস কনফারেন্সের জন্য আপনা-দের ধন্যবাদ।

সেই সঙ্গে খারাপ লাগলো, প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সম্পর্কে সকলের ইচ্ছাকৃত অবহেলায়। সাংবাদিকরা লতার কাছাকাছি হবার চেষ্টা করছেন কিন্তু শ্রীঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করানো সম্পর্কে কেউ মাথা ঘামান নি। উদ্যোক্তা এবং সাংবাদিকদের তরফ থেকে এ সম্পর্কে উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল। এ ক্ষেত্রে আপনাদের প্রতিনিধির মনোভাব প্রশংসনীয়।

আবার একটা খটকাও লাগলো। আপনাদের প্রতিনিধি লতাজীকে দক্ষিণ ভারতীয় বলে চিহ্নিত করেছেন। আমরা যতদূর জানি তিনি মহারাষ্ট্রীয় এবং মহা-রাষ্ট্র পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত।

নিত্য দাস
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

বেতারবৃত্তি প্রসঙ্গে

'অমৃত'এ পুনরায় বেতার-প্রসঙ্গে আলোচনা হবে জেনে অনেকেই খুশী হবেন। অল ইন্ডিয়া রেডিও নিয়ে অনেক গঙ্গার জল বয়ে গেছে। সম্প্রতি ইন্টারভিউ দিয়েও বহু শিক্ষিত প্রার্থীকে বিমুখ হতে হয়েছে। আমি গত ১৯৬৫ সালে কোলকাতা বেতারে ঘোষক পদে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তা জানাচ্ছি। মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং নিউদিল্লী থেকে প্রেরিত ইন্টারভিউ পেয়ে কোলকাতায় গেছলাম। জনা চল্লিশ পুরুষ ও মহিলাকে ডাকা হয়েছিল। একে একে আমাদের অভিজ্ঞান নেওয়া হলো। সারা বিহার থেকে আমিই একমাত্র প্রার্থী ছিলাম এই পদে। তারপরে হঠাৎ শুনি ফলাফল ঘোষিত হচ্ছে—কিন্তু নামের মধ্যে একজনও সেদিন উপস্থিত ছিলেন না। এখন প্রশ্ন—আগে থেকেই কি নির্বাচিত ব্যক্তিকে এই পদে চাকরী দেওয়া হয়েছিল? আমার ব্যাকিং না থাকায় যোগ্যতা সত্ত্বেও আমি চান্স পাই নি।

বছরের পর বছর একই ছবি আপনি দেখতে পাবেন। এবং ক্রমেই অভিযোগের স্তূপ জমে উঠছে। আমি স্থানীয় বেতার কেন্দ্রে through proper channel এ দরখাস্ত দিয়েও ফল পাই নি। যোগ্যতাহীন লোককে নিয়োগ করে যোগ্যদের খারিজ করাই যদি এই প্রতিষ্ঠানের নীতি হয় তো বলার কিছু নেই। এই প্রদেশে ডমিসাইল্ড হয়েও এই প্রদেশে চাকরী না পাবার অপ-রাধকে কি প্রাদেশিকতার দৃষ্টান্ত বলে মনে করবেন?

শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
রাঁচি—১।

শারদীয় লিটল ম্যাগাজিন

বিগত ১লা কার্তিকের 'অমৃতে' গৌরাঙ্গ ভৌমিকের 'শারদীয় লিটল ম্যাগাজিন' প্রবন্ধখানি পড়ে খুবই ভাল লেগেছে। সেখানে রাজনীতি, সিনেমা, যৌনসংক্রান্ত পত্রিকাগুলি বাজার হু হু করে কাটে সেখানে ধুঁকে ধুঁকে একটি সাহিত্যপত্রিকা অনিয়মিত প্রকাশিত হলেও গর্ববোধ না করে পারি না। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, বাণিজ্যিক কাগজগুলোর পাশে নিজের পকেট উজাড় করে এই সাহিত্যপত্র প্রকাশের আনন্দ কোথায়? জানলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় এই কারণে যে, যৌন বা সিনেমা-সংক্রান্ত কাগজগুলোর প্রায় শ্রেণীর তারাই লেখকদের এক-রকম আর্ডার দিয়ে দু'পয়সা রোজগারের লেখা চেয়ে নেন। সত্যিকারের সাহিত্যপ্রীতি যাঁদের তাঁরা কোনদিনই ঐসব কমার্শিয়াল কাগজগুলোর কাছে নিজের সাহিত্যরুচির বিকৃত ঘটান না। এমন নজীর অনেক দেয়া যায়, কোনো কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য-মর্যাদা স্বীকার করে অনেক আলোচনা বেরোয় অনেক সিনেমা বা অন্য ধরণের কাগজে কিন্তু সেই সব সাহিত্যিকের কোনো লেখাই দেখা যায় না ঐ সব পত্রিকায়। লিটল ম্যাগাজিন অনিয়মিত হলেও, প্রচার-সংখ্যা কম থাকলেও, গাঁটের কড়ি প্রেসে দিয়েও প্রকৃত সাহিত্যিক লিটল ম্যাগাজিনে লিখে আনন্দ পান, এবং একটা লিটল ম্যাগাজিনকে সাহায্য করতে পেরেছেন বলে বোধকরি গৌরবান্বিতও হন।

সুবজিৎ দেব,
ত্রিবৃত্ত সরণী, কুচবিহার।

অমৃত

সম্পাদকীয়

ওলিম্পিক ও ভারত

পৃথিবীর যে-দেশেই ওলিম্পিক খেলা হোক তার অগণিত অনুরাগী ছড়ানো থাকে সর্বত্র। খেলা এমনিই বস্তু যে,
তাতে জাতি, ধর্ম, ভাষা, এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধও এক মহান মৈত্রীর আবেদনে বিলুপ্ত হয়ে যায়। শান্তির
জন্য তারুণ্যের অভিযানেরই এক নাম ওলিম্পিক। একে শুধু খেলা বললে বোধহয় সবটা বলা হয় না। এই প্রতিযোগিতা
ও আন্তর্জাতিক মিলনের মধ্য দিয়ে বিদ্বেষহীন শান্তির পৃথিবীর এক স্বপ্ন ধরা পড়ে। তাই ওলিম্পিকের একটি কথাই আছে,
জয়লাভ নয়, অংশগ্রহণ করাই হল বড় কথা।

তবু কৃতিত্বকে একমাত্র কৃতিত্ব দিয়েই পরিমাপ করা যায়। যখন কোনো দেশের প্রতিযোগী তার কুশলতা দেখিয়ে
স্বর্ণপদক অর্জন করেন তখন শুধু তার গৌরবোজ্জ্বল মুখই আমরা দেখি না, তার মাধ্যমে আমরা দেখি একটি দেশেরও
তারুণ্যদীপ্ত মুখ। নিষ্ঠা, অনুশীলন এবং একাগ্রতা ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই বিজয়লক্ষ্মীর প্রসন্ন ঔদার্য প্রস্ফুটিত হয় না।
জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা সত্য, খেলার জগতেও একই নিয়মের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

মেকসিকোর ওলিম্পিকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতও গিয়েছিল কয়েকটি প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য।
প্রতি ওলিম্পিকেই প্রতিযোগীরা যান এবং প্রতিবারই আমরা আশা করে থাকি যে এর পরের বারের ওলিম্পিকে ভারতের
তরুণ ক্রীড়াকুশলীরা উন্নততর নৈপুণ্যের পরিচয় দেবেন। এবার সেই আশা নির্মূল হয়েছে। ওলিম্পিকে ভারতের সবচেয়ে
বড় আশা ছিল হকি খেলার স্বর্ণপদক। ভারতের খেলোয়াড়রা তা পাননি। এমনকি ১৯৬৪ সালের বিজয়ী দল হিসেবে
ফাইন্যালে ওঠার যে সম্ভাবনা ছিল নিশ্চিত তা-ও বিনষ্ট হয়েছে। সেমি-ফাইন্যালেই ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজয়
স্বীকার করে শিবিরে ফিরে গেছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় দলের এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছেন 'শৃংখলাহীনতা ও
একাগ্রনিষ্ঠার অভাব'কে। পরাজিত খেলোয়াড়রা ব্যর্থতার গ্লানিতে হতমান, তাদের চোখে অশ্রুও দেখা দিয়েছিল। নিশ্চিতই
অস্ট্রেলিয়া উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে জয়ী হয়েছে! জয়লাভ কোনো দলের মনোপলি নয়। কিন্তু ১৯২৮ সাল থেকে
যে ভারতীয় দল ফাইন্যালে খেলে একবার ছাড়া প্রতিবারই জয়ী হয়েছে তাদের পক্ষে ১৯৬৮ সালে সেমি-ফাইন্যালেই এই
হার চরম বেদনা ও লজ্জার কথা। প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে যে ক্ষোভ ও তিরস্কারের সুর তা শুধু খেলোয়াড়দেরই প্রাপ্য নয়,
এ-দেশের যাঁরা ক্রীড়া-সংগঠক, কর্মকর্তা এবং নির্বাচক, তাঁদের সকলকেই এই তিরস্কারের ভাগ নিতে হবে। কীভাবে খেললে
জয়লাভ করা যেত, কোন্ খেলোয়াড়কে নিলে ভাল ফল হত, সেটা আমাদের আলোচ্যই নয়। আমাদের বক্তব্য হল এই যে,
আন্তর্জাতিক খেলার মানের সঙ্গে তাল রেখে ভারতীয় খেলোয়াড়রা উন্নততর নৈপুণ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন কেন? গত
কয়েকটি ওলিম্পিকেই দেখা গেছে যে, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে হকি খেলার মান অনেক উন্নত হয়েছে। এতকালের বিজয়ী
ভারতীয় দল গত কয়েকটি ওলিম্পিকেই গড় গোলের সংখ্যায় কোনো অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। এবারে তো গোড়া
থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, ভারতীয় খেলোয়াড়রা প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে মোটেই সচেতন নন। একাগ্রতা এবং আপ্রাণ
যুঝে স্বর্ণপদক রক্ষা করার প্রয়াসের লক্ষণও দেখা যায়নি তাদের মধ্যে। সুতরাং পরাজয়ের গ্লানি যে তাদের প্রাপ্য ছিল,
এ-বিষয়ে কর্মকর্তাদের মনে সন্দেহ থাকলে এ-দেশের ক্রীড়ানুরাগীরা কোনো ভরসা রাখতে পারেনি।

এ তো গেল হকির কথা। অন্যান্য যে-কয়টি খেলায় ভারত থেকে মুষ্টিমেয় প্রতিযোগী পাঠানো হয়েছিল তাদের
ব্যর্থতা আরও শোকাবহ। তাদের কেউই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারেননি। খেলায় সংগঠন-শক্তি, অনুশীলন এবং দক্ষতায়
ভারত যে কত পিছিয়ে আছে তার প্রমাণ এবারের ওলিম্পিকের মতো স্পষ্টভাবে এর আগে পাওয়া যায়নি বললে বোধহয়
অত্যুক্তি হয় না।

আমেরিকা, রাশিয়া বা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের কথা তো তুলছিই না। কেনিয়া, তিউনিসিয়া, জাপান, ইরানের
মতো প্রাচ্যদেশীয় ভূখণ্ডের খেলোয়াড়রা আজ যে সম্মান ও গৌরব নিয়ে দেশে ফিরছেন ভারত একটি বৃহৎ ও প্রাচীন দেশ
হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছাকাছি যেতে পারল না। আমাদের ক্ষোভ ও দুঃখ সে-কারণেই। আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে
যে শৃংখলাবোধ, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অভাব এবং যার ফলে তরুণ সমাজে নৈরাজ্য ও হতাশা দেখা দিয়েছে, ওলিম্পিক
প্রতিযোগিতাতেও তারই বেদনাদায়ক প্রতিফলন। এর জন্য সকলেরই আত্মসমালোচনা ও আত্মানুসন্ধান করা উচিত।

কাছের ও দূরের গান্ধী
স্বপ্নের সৌধ

রঁম্যা রলাঁ

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অক্টোবর উদ্‌যাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থেকে
অনুবাদ : **লোকনাথ ভট্টাচার্য**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাঁকে ফাঁদে ফেলার যে-সব প্রশ্ন, সে-গুলো শুনেই সভার কোনো কোনো জায়গা হ'তে হাততালি অবশ্য পড়ছিল—কিন্তু তাঁর শান্ত ও নিশ্চিত প্রত্যুত্তরগুলিতে প্রতিবারই সভা উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ার যোগাড়ও হয়। সভার মধ্যে সরাসরি ঝগড়া তেমন না হ'লেও সম্ভ্রান্তেরা ঘর ছেড়ে বেরোবার সময় অপ্রকাশ্য এক রাগে কাঁপতে থাকেন, এবং অনেককেই তাঁদের সেই রাগ নিয়ে বলাবলি করতে শুনেছি। এক দিক দিয়ে খুবই সুখের কথা যে সভাটা হয় গান্ধীর সুইজারল্যান্ড ছেড়ে যাওয়ার আগের দিনই। যদি আরো বেশিদিন থাকতেন তো হয়তো তাঁকে বিতাড়িতই হ'তে হত—আর কিছু না হোক, অন্য কোনো সাধারণ সভায় বক্তৃতা দেওয়ার অনুমতি তিনি পেতেন না। পরের দিন ফরাসী ভাষার সংবাদপত্রগুলি যা-তা লিখল। মঁত্রোর একটি কাগজ এ্যাদ্দিন তাঁর সঙ্গে (আমারও সঙ্গে) কোনো রকমে মানিয়ে চলছিল, এবার তা সরাসরি ব'লে বসে যে পাঁচদিনব্যাপী সুইজারল্যান্ড ভ্রমণে গান্ধী সব থেকে ভালো যেটা করলেন, সেটা সুইজরল্যান্ড ছেড়ে তাঁর চলে যাওয়া। কেউ কেউ তো তাঁর নিন্দা করতে লাগলেন এই ব'লেও যে তিনি অজান্তে বা জেনে (নয় কেন?) সুইজারল্যান্ডে এসেছিলেন তাকে নিরস্ত্র ক'রে ধ্বংস করতে, যাতে তার অসহায় জনগণ কমিউনিষ্ট আক্রমণের সহজ শিকার হয়। এবং এই ছলনাময় উক্তির পিছনে তো যুক্তি তাঁদের হাতের কাছেই ছিল : তিনি উঠেছিলেন 'বলশেভিক রম্যাঁ রলাঁ'র বাড়ী।

শুধু সভার সময়টুকুই গান্ধী জেনিভায় ছিলেন। সভা শেষ হ'লেই তিনি সহর ত্যাগ করেন, কারুর সঙ্গে দেখা না ক'রে। শুধু আলবের তমা ও গুগলি-এলমো ফেররেরো (ইনি জেনিভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন) যখন তাঁর কাছে সময় চান দেখা করার, তিনি নির্বি-কারে তাঁদের দুজনকে দুটি বিভিন্ন স্থান ও সময় জানান—বলেন, ফেররেরো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন ট্রেণে, গুলাঁ ও লোজানের মধ্যবর্তী পথে, এবং আলবের তমা-র সঙ্গেও তিনি ট্রেণে কথা বলবেন তমা-র সঙ্গেও তিনি ট্রেণেই কথা বলবেন, লোজান হ'তে মঁত্রো-র পথে। প্রস্তাবটা শুনে হয়তো ফেররেরো দম্পতীর খুব ভালো লাগেনি তাঁরা সম্মানিত ব্যক্তি ও দুজনেরই বয়স হয়েছে—কিন্তু প্রিভাব চক্ষুলজ্জা সত্ত্বেও গান্ধী সে সম্বন্ধে উদা-সীন, যা মুখে এল ব'লে দিলেন। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ফেররে-রোরা উপস্থিতই হন নি, শুধু কয়েকদিন বাদে মাদাম ফেররেরো মার্জনা ভিক্ষা ক'রে আমায় লেখেন, বলেন যে গান্ধীর সম্মতি যখন তাঁদের কাছে পেঁছোয়, তার আগেই গান্ধী চ'লে গেছেন। ওদিকে আলবের তমা বৃথাই গান্ধীর জন্য স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকেন, পরে আমায় মিনতি জানিয়ে টেলি-গ্রাম পাঠান এই ব'লে যে, তিনি সন্ধ্যায় ভিলনভে আসছেন, গান্ধী যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে স্বীকৃত হন। গান্ধীর অনুপ-স্থিতিতে তাঁর অনুমতি না নিয়েই আমি তমা-র প্রস্তাবে স্বীকৃত হই। এ প্রসঙ্গে বলা হয়তো অবান্তর হবে না, মীরা ও গান্ধী পরে আমায় কী গল্প করেন। লন্ডনে তমা যখন আসেন গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন গান্ধী, "সুইজারল্যান্ডে রম্যাঁ রলাঁর কাছে আপনি যান তো?" বিড়ম্বিত তমা উত্তর দেন : "না।" গান্ধী বলেন, "সেটা তো তেমন ভালো নয়, একেবারেই ভালো নয়!" তমাকে এইভাবে লজ্জা দিতে তাঁর মজা লাগে, আবার বলেন : "না-না-না, আমি চাই যে ভিলনভে আপনি রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে দেখা করেন।" (গল্পটা আমায় বলার সময় গান্ধী দুষ্টুমির ভাবে হাসতে থাকেন। সত্যি বলতে কি, তমা আমার সঙ্গে দেখা করুন, সেটা আমি নিজেই পছন্দ করি না।)

ফিরেই (যথারীতি রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে চড়ে), একটুও বিশ্রাম না ক'রেই গান্ধী সটাং উঠে এলেন আমার কাছে। পরে পৌনে পাঁচটা থেকে ছটা বাজার পর পর্যন্ত আমরা নতুন করে আলোচনায় বসলাম।

তাঁকে তখন বলি : "লোজানে কোনো প্রশ্নের উত্তরে আপনি যা বলেছিলেন তা নিয়ে ভাবছিলাম। সত্যই ঈশ্বর এবং সে-প্রসঙ্গে আরও যা-কিছু আপনি বলেছেন--লিখেছেন, সেগুলো ছেলেবেলা থেকেই আপনার সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে (যে-একই কথা বলা চলবে না সত্যাগ্রহ বা অহিংসা আন্দোলন সম্বন্ধে)। বিবেক নিয়ে পরীক্ষা আমি নিজেও করেছি। শৈশব থেকেই আমি আমার মধ্যে এ-কথাটা আবিষ্কার করেছিলাম যে, নিজের প্রতি সৎ থাকার প্রয়োজনীয়তাটি প্রচণ্ড, সেটা যদি মানুষ না করতে পারে তো সব নষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই নষ্ট ভিত্তির উপর কিছুই গড়া চলে না। কিন্তু একটা সত্য আছে যেটা নিজের প্রতি, আরেকটা সত্য আছে যেটা অন্যদের প্রতি। দম বন্ধ ক'রে আনা যে ছোট্ট মফঃস্বল শহরে আমি বাস করতাম, সেখানে এই দ্বিতীয় সত্যটা প্রকাশ করা আমার অসম্ভব ঠেকত। চারদিকেই বাধ্যবাধকতা যেন গলা টিপে ধরত—পরিবারের বাধ্যবাধকতা, গীর্জার বাধ্যবাধকতা, ইস্কুলের বাধ্যবাধকতা, সমাজের বাধ্যবাধকতা। অল্প বয়স তখন আমার, শরীরও দুর্বল, তাই বড্ড যন্ত্রণা বোধ হত, কিন্তু যেহেতু অন্য সকলেই সেটা মেনে নিত, আমিও ভাবতাম, হয়ত মানে নেওয়াটাই উচিত। ধর্মের ব্যাপারে যে-সব দৈব ঘটনার কথা আমায় শিখতে হত, সেগুলোতে বিশ্বাস না করতে পেরে কষ্ট পেতাম। দেখতাম, অন্যেরা বিশ্বাস করছে, এবং তারা যে মিথ্যা কথা বলছে বা নিজে-দেরই মিথ্যা ধাপ্পা দিচ্ছে, সেটাও ছিল কল্পনাতীত। যখন আমার বয়স ১৪।১৫ নাগাদ, রয়েছি প্যারীতে, অবস্থা আরো

খারাপ হয়ে দাঁড়াল। সেখানে তখন সর্বক্ষণ যুদ্ধ চালাতে হয়, এই জীবনের সঙ্গে এই পরীক্ষার সঙ্গে, এই ইস্কুলের সঙ্গে। নেহাত বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপারেও সেখানে নিজের সত্যকার মতামত ব্যক্ত করা কত অজস্রবার অসাধ্য ঠেকে। এই ধরনে উচ্চ-শিক্ষার পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়-টিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এক ধরনের নীতিগত ধ্যান-ধারণা চালু ছিল, যা পরীক্ষার সময় মানার ভান করতেই হত। দর্শনশাস্ত্র আমার ভালো লাগত, ইচ্ছা ছিল তার অধ্যয়নেই আত্ম-নিয়োগ করব, কিন্তু বড় হয়ে যখন উচ্চতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকলাম, সে-বাসনা আমায় ত্যাগ করতে হল, কারণ দেখলাম যে, সেখানে যে-কোন রচনা ইত্যাদিই আমি লিখতে যাই না কেন আমায় মিথ্যা কথা বলতে হবে, ও যা আমি পারব না। অবশেষে যখন স্বাধীন হতে শুরু করলাম (যে-স্বাধীনতা আমায় অর্জন করতে হয় অনেক দুঃখ ভোগের পর, বছর দশেক ধরে প্রায় সম্পূর্ণ একলা থেকে), আরও এক বিপদের সামনে এসে হাজির হলাম, যে-বিপদ আগের অন্যান্য বিপদগুলি থেকেও আরও প্রচণ্ড : দেখলাম, যে-সত্য আমার নিজের কাছে এত ভাল ও দরকারী বলে ঠেকছে, তা-ই অন্য লোকের পক্ষে কত ক্ষতিকর হতে পারে। এবং সেইটেই হয় আমার সবচেয়ে বড় মুস্কিল। পরে দেখেছি, টলস্টয়ের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার ঘটেছে, সারা জীবন তিনি ভুগেছেন সত্য ও প্রেমের দোটানার মধ্যে পড়ে—তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবেন কেমন করে, তা কিছুতেই জানতে পারেন নি। তাঁর ভাবপ্রবণতায় পড়ে প্রায়ই সত্যকে তিনি মাঝপথে এনে ছলনা করতে বাধ্য হয়েছেন (বিশেষত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে)। আমার সমস্যাটা হয় শিল্পীজনসুলভ : যা সত্য বলে বুঝি কেমন করে তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারব সেই অন্যদের কাছে, যারা তাদের দুর্বলতার জন্য সেই সত্যকে বীরের মত গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, এবং যে-সত্য তাদের আঘাত করে, তাদের পাগল করে তোলে? প্রাচীনেরা অবশ্য এসমস্যা হতে মুক্তির উপায় জানতেন—তাঁরা যথার্থ দীক্ষিতদের একটি আলাদা শ্রেণী হিসেবে পৃথক করেন, একমাত্র যে-দীক্ষিতরাই সম্পূর্ণ সত্যের আধার। কিন্তু আজকের গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এরকম জাতি-ভেদ তো সম্ভব নয়। আমার সত্যকে আমি কখনো ছলনা করিনি—তবে সে-সত্য যে বিপজ্জনক হতে পারে, সে-রকম আশংকাও আমার অংশত হ্রাস পায় যখন আবিষ্কার করি যে যাকে আমরা অপ্রিয় সত্য বলি, তা লোকে হয় বোঝে না নয় শোনে না, অর্থাৎ বিভিন্ন লোকে সেটাকে যে যার নিজের মনের মত করে নেয়। কিন্তু এই আবিষ্কারে আমি আনন্দিত হই নি, কারণ যে সেই অপ্রিয় সত্য বলছে বা যে তা শুনেছে (অর্থাৎ শুনেছে না), উভয়ের দ্বারাই সত্যের ছলনা করা হচ্ছে, এবং সেটা আনন্দজনক নয়। এমনও যদি হয় যে সত্যই ঈশ্বর, তা হলেও আমার মনে হয় সত্যের আরেকটা বড় গুণ বাকী থাকে—সেটা হল আনন্দ। এবং এ-কথাটার উপর আমি একটু জোর দেবই, কারণ আনন্দহীন কোনো ঈশ্বরের কল্পনা আমি করতে পারি না। যেহেতু বীতোফেনের দুঃখের দিকটা আমি সুন্দর করে দেখিয়েছি, লোকে আমায় করে তুলেছে দুঃখের বাণীর প্রচারক—এবং সেটা করেছে বলেই তারা আমার চিন্তাটাও বোঝে নি, বীতোফেনকেও বোঝে নি। দুঃখটা শুধু একটা পথ মাত্র, তা লক্ষ্য কখনো হতে পারে না—এবং সে-পথটা লোকের ঘাড়ে এসে চাপে, তাকে খুঁজতে হয় না। যে-আনন্দের বোধ সত্য আমাতে জাগাতে পারে নি, আমি তা পেয়েছি সৌন্দর্যের মধ্যে। এবং এখানেই টলস্টয়ের সঙ্গে আমার বিরোধ—এই সুস্থ সৌন্দর্যটিকে আমি প্রচণ্ডভাবে দরকারী বলে মনে করি। সত্যিকারের আর্ট ও সুস্থ সৌন্দর্যের সম্পর্ক আমি দেখি। সামঞ্জস্য দেখানোই হল সব বড় আর্টের লক্ষ্য : তা শান্তি দেয়, স্বাস্থ্য দেয়, ভার-সাম্য দেয় চিত্তকে। এগুলির অনুভূতি তা আনে, যেমন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, তেমনি মনের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয় ও মন, দুয়েরই আছে আনন্দে অধিকার। সৌন্দর্য বহু রূপে প্রকাশ পায় : তা হতে পারে সুন্দর রেখা, শ্রুতিমধুর শব্দ, রঙ, কত কিছুই। সব কিছুরই গভীরে যা গুপ্ত হয়ে রয় ভিতরে, তা সেই সামঞ্জস্য বোধ, যার সত্তাটি নৈতিক। আত্মার যত দুঃখ, তা তার মধ্য দিয়ে একবার বেরোতে পারলে আশ্চর্য সুন্দরের রূপ নেয়। আর্ট লক্ষ লক্ষ আত্মার খাদ্য। বিশেষত কোনো কোনো জাতের অনুভূতিশীলতা এত বেশি যে, সৌন্দর্য (প্রকৃতির, অথবা আর্টের) ব্যতীত তারা নিজেদের বড় রিক্ত বোধ করতে থাকে। সব পথই ভালো, যা শান্তি ও সামঞ্জস্যের লক্ষ্যে যায়। তাদের কোন-টারই মুখ বন্ধ করা উচিত নয়। অবশ্য এত বিভিন্ন পথ যদি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তো কথাই নেই, সেটা হবে সবচেয়ে ভালো—এবং তা-ই ঘটতে দেখি ইতিহাসে বার বার, জাতির মহান মুহূর্তে ভিতরের সব শক্তি কী করে এক মোহানায় এসে মেলে : ধর্মগ্রন্থ, আর্টের বই, বিজ্ঞানের বই, স্বপ্নের বই, সব সমগ্র জাতির হাতের নাগালের মধ্যে ধরা দেয়।"

(এই আলোচনা করার উদ্দেশ্য ছিল আমার দুটি : যে-চিন্তা বলে যে সব যন্ত্রণাই ঈশ্বরের পক্ষে সুখকর এবং যে-চিন্তাকে গান্ধীর নামে চালানো হয়, তাকে আক্রমণ করা এক দিকে, অন্যদিকে স্বাভা-বিক প্রেম ও সৌন্দর্যকে তার সত্য অধি-কারে আসীন করতে চাওয়া। এ অধিকার সব সময় তাদের দেওয়া হয় না বলেই আমার মনে হয়। এবং গান্ধীকে এটাও বলাতে চেয়েছিলাম যে, সুস্থ মানুষ সর্বদাই এই সৌন্দর্যের পক্ষে।)

গান্ধী উত্তর দিলেন : "সত্যের সংজ্ঞাটিকে আমি মনে করি বিশ্বজনীন। সত্যের রূপ হ'তে পারে অনেক। সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই যে-আর্টের সে-আর্ট,

আর্ট নয়। আর্টকে আমি সত্য থেকে ভিন্ন ক'রে দেখব না— আর্টের জন্যই আর্ট, এউক্তির বিরোধী আমি। আমার বিশ্বাস, আর্টের সত্যকে ভিত্তি করতেই হবে। যে-কথা আর্টের নামে সত্যের নামে অসত্যের প্রচার করে, তা যতই মুখরোচক হোক, আমি তা বর্জন করবই। আমার মত হচ্ছে এই : আর্ট আনন্দ দেবে এবং ভালোও হবে, তবে অবশ্য সেই শর্তে যার কথা আগে বলেছি। আর্ট যখন সত্যের কথা বলছি, তার অর্থ এই নয় যে সে-সত্য হবে বাহ্যিক জিনিসের অবিকল প্রতি-ফলন। জীবন্ত জিনিসই চিত্তকে জীবন্ত আনন্দ দিতে পারে, এবং চিত্তকে উন্নীতও করতে হবে তাকে। যে রসসৃষ্টি সেটা না করতে পারবে, তাতে আমাদের দরকার নেই। সত্য যদি আনন্দ না দিতে পারে, তবে বুঝতে হবে সে-সত্য আপনার ভিতরের বস্তু নয়।"

পরে তিনি বলেন এক হিন্দু ধর্ম-সঙ্গীতের কথা, যা সকালে গাওয়া হয়, বলেন এই গুহ্য মন্ত্রেরও কথা : 'সচ্চিদা-নন্দ'। 'সৎ' মানে সত্য, 'চিৎ' মানে জীবন্ত এবং সত্যকারের জ্ঞান (পরিষ্কার দৃষ্টিসম্পন্ন শূন্য জ্ঞান নয়), এবং 'আনন্দ' মানে অনির্বচনীয় হর্ষ। এই ধারণা অনু-সারে সত্য ও আনন্দ অবিচ্ছিন্ন। "তবু সত্যের অনুসন্ধানে যন্ত্রণা স্বীকার করা চাই—কত হতাশার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, কত ক্লান্তি, কত অসংখ্য দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সব সত্ত্বেও, তা থেকে আনন্দ আপনি পাচ্ছেনই। আমাদের পুরাণে পাই রিষানন্দের (?) গল্প, যাঁর মধ্যে সত্য মূর্ত হয়—তাঁর যন্ত্রণাময় জীবন আসলে শাশ্বত আনন্দের জীবন।"

তিনি একটি পারস্য উপাখ্যানের কথাও বললেন, যেখানে প্রেমাস্পদা শিরীন সত্যের প্রতিনিধি। তাঁর কাছে পৌঁছোবার জন্য তাঁর প্রেমিককে একটা গোটা পাহাড় কাটতে বসতে হয়—কিন্তু যেহেতু প্রেমিকের অস্ত্রটি খুব উপযোগী নয়, তাঁকে সেই কাজে কাটাতে হ'ল বছরের পর বছর। কিন্তু তার জন্য কোনো আক্ষেপ তাঁর নেই, প্রচেষ্টাতেই আনন্দ তাঁর। জানেন তিনি, শেষ পর্যন্ত শিরীনের কাছে তিনি পৌঁছোবেন।

রলাঁ : "সেটা আমি বুঝি, মানিও। কিন্তু আপনাকে শুধু সত্যানুসন্ধিৎসুর বিপদগুলির কথাই বলছিলাম না—ভাব-ছিলাম আরো এক ধরনের যন্ত্রণার কথা, যে যন্ত্রণা হ'ল দায়িত্ববোধের। নিজের জন্য যে-চিন্তাশীল সত্যকে ভয় করেন না, সে-সত্য হয়তো অন্যকে বিচলিত করতে পারে, এটা ভেবে তাঁকে শঙ্কিত হ'তেই হয়। কোপের্নিকাস থেকে আরম্ভ ক'রে চিন্তাশীল নানা বীর যে-সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন, তা যে কত লক্ষ লোকের বিশ্বাসটাকে ধরে ঝাঁকানি দিয়েছে, তার তো ইয়ত্তা নেই। সত্য চির-কালই এগিয়ে চলেছে, তার অনুসরণ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—তার পিছনে ছুটতে গিয়ে অনেকে হাঁপিয়ে পড়ে, বহু মানসিক কষ্ট পায়। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সত্যের এই পরিবর্তনশীল রূপটাকে গ্রহণ করা ভয়ঙ্কর শক্ত। আমার যন্ত্রণাটা নয়, তাদেরই সেই যন্ত্রণার কথাটা বলছিলাম।"

গান্ধী : "তবু সেখানেও, একটা গোপন আনন্দ তো পাওয়া যায়ই, কারণ জিনিসটার যে দরকার রয়েছে। এমন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাঁরা গেছেন, সেই সব লেখকদের (কালিদাস?) তাই বলতে শুনি যে সত্যানুসন্ধানীদের হৃদয় একাধারে কুসুমের মত কোমল ও বজ্রের মত কঠোর।"

তাঁকে তখন প'ড়ে শোনাই গ্যেতের দুটি বাণী, যা তাঁর মতের সঙ্গে মিলবে : "উপকারী ভুলের থেকে ক্ষতিকর সত্যকেও আমি পছন্দ করব। সত্য যে যন্ত্রণার জন্ম দেয়, তার উপশমও ঘটায়।" ('কবিতা-বলী')। "ক্ষতিকর ঠেকলেও সত্য শেষ পর্যন্ত উপকারী, কারণ যে ক্ষতি সে করে, তা সাময়িক মাত্র—এবং সে-সত্য পথ দেখায় অন্যান্য সত্যের, যা সর্বদাই এবং ক্রমশই বেশি ক'রে উপকারী হ'তে বাধ্য। অন্য-দিকে, যে-ভুল আজ উপকারী ঠেকছে, তা শেষ পর্যন্ত ক্ষতিকর হবেই, কারণ যে-উপকার সে করে, তা সাময়িক মাত্র—এবং তা শীঘ্রই পথ হারিয়ে ঢুকে পড়ে অন্যান্য এমন ভুলের মধ্যে যা সর্বদাই এবং ক্রমশই বেশি ক'রে ক্ষতিকর হ'তে বাধ্য" (মাদাম দ্য স্টাইনকে লেখা, ১৭৮৭)। এবং ঐ গ্যেতে থেকেই, আবার : "নীতিগত সম্মত বিধি-নির্দেশই মেলায় এসে একটিমাত্র জিনিসে, যা হ'ল সত্য" (ভি মুলারকে লেখা, ১৮১৯)।

গান্ধী মাথা নাড়তে নাড়তে শোনেন, বেশ একটা সন্তুষ্ট ভাব।

রলাঁ : "আমিও তাঁর সঙ্গে একমত—শুধু বলছিলাম, ব্যাপারটা প্রায়ই শক্ত ঠেকে।"

গান্ধী : "শক্ত ঠেকে ব'লেই তো আনন্দ পাওয়া যায়।"

(মীরা ও দেশাই হাসতে থাকেন, বলতে চান যে এইভাবেই আনন্দ 'বাপু' পেতে চান। গান্ধীও হাসেন ও বলেন যে তাঁর সম্বন্ধে অন্যের মতটাকে তিনি মেনে নেন—অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনি যেমন হ'তে পারেন কোমল মেষের মত—ভারতীয় রীতি অনুসারে 'গরু' মত—তেমনি কঠোরও হ'তে পারেন বাঘের মত।)

রলাঁ : "সব সময়ই অনেককে আত্মবলি দিতে হয়। নেতার জন্য আক্ষেপ করছি না আক্ষেপ করছি সেই দুর্বলদের জন্য যারা তাঁকে অনুসরণ করে।"

সত্যের সঙ্গে আর্টের সম্বন্ধ কী বা সত্যের কত বহুমুখী প্রতিফলন ঘটতে পারে আর্টে, তা নিয়ে আমরা পরে আলো-চনা সুরু করলাম। বললাম, আর্টের পৌঁছানো চাই সর্বসাধারণের দরজায়। এবং গির্জার প্রসঙ্গে আবার ফিরলাম, বললাম, সেই যুগের ইউরোপ ভারতীয় চিন্তার খুব কাছাকাছি ছিল। গান্ধীও তা মানলেন। বললাম : "এখন তো বৈজ্ঞা-নিকেরাই সত্যকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করেছেন, আজকের মহান কবি তাঁরাই।" জ্যোতির্বিদ্যায় সাম্প্রতিক আবিষ্কারের প্রসঙ্গ পাড়লাম, জানালাম যে সে-আবিষ্কারের কল্যাণে আমরা পৃথিবীর আবরণ ভেদ ক'রে অন্যান্য কত বিশ্ব-জগতের দর্শন পেয়েছি যা ছায়াপথেরও ওপারে শূন্যে ভাসছে।

পঞ্চাশ বছর অগে আমার যৌবনকালে দেখেছি, জড়বাদ তার জয়কে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিল বিজ্ঞানের জয়ের সঙ্গে। আজ দেখি সেই বিজ্ঞানই জড়ের মধ্যে শক্তি আবিষ্কার ক'রে জিনিসটাকে একটা অধ্যাত্মরীতির পর্যায়ভুক্ত ক'রে তুলেছে। এত উত্থান পতন সত্ত্বেও এক মহান যুগে বাস করছি আমরা। শরীরটাকে সুস্থ ও মনটাকে দৃঢ় রেখে যে বাঁচতে পারবে এই যুগে, সে-ই সুখী।

গান্ধী সায় দেন, তাঁর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে। বিজ্ঞানের সেই মাহাত্ম্যের যে উল্টোদিকটাও আছে, আছে মাথা খারাপ করানো কত মারাত্মক আবিষ্কার, খুনের কত কল, দম বন্ধ করানো গ্যাস, ইত্যাদি, তা নিয়েও প্রসঙ্গক্রমে কথাবার্তা চলল।

গান্ধী (বিশ্বাসের সঙ্গে) : "এ-সব নিজেই নিজেকে খুন করবে। এমন যুদ্ধ যদি বাধেই, প্রতিরোধহীন এমন ধ্বংস যদি সাধিত হয়ই, তখন তার এত বড় ভুলের সামনে প'ড়ে মানুষ একদিন আপনা হ'তেই পিছু হাঁটতে সুরু করবে। শুধু শূন্য-তার মধ্যে যুদ্ধ ক'রে চলবে অথবা প্রতি-রোধ একেবারে না প্রদর্শন ক'রে এগোবে, মানুষের স্বভাব তা নয়। যদি কোনো দেশ বীরের মত হিংসাকে সহ্য করতে প্রস্তুত হয়, হিংসা দিয়ে হিংসার জবাব না দেয়, তা তখন তার প্রতিপক্ষকে দিতে পারবে এক চরম শিক্ষা—কিন্তু সেটার জন্য এমন এক বিশ্বাস থাকা চাই যা সম্পূর্ণ অটুট।"

রলাঁ : "কি ভালো কি মন্দের ক্ষেত্রে, কিছুই আধাআধি ক'রে রাখা উচিত নয়।"

যে-বিশ্বাস ছিল ক্রিস্টোফার কলম্বা-সের, তার কথা গান্ধী বললেন। সেই বিশ্বাস কলম্বাসের না থাকলে তিনি আমেরিকা আবিষ্কার করতে পারতেন না।

(ক্রমশঃ)

এক ঝড়ের পুতুল

সুনীল

আচ্ছা, আমি যদি সুতপাকে বিয়ে করতাম এবং তাকে নিয়ে যদি সংসারে মনোযোগ দিতাম, অর্থাৎ আমি যদি সোমাকে বিয়ে না করতাম, তা হলেই বোধহয় সুখী, সুস্থ এবং সুন্দর জীবনে ফিরে আসতে পারতাম।

হ্যাঁ, স্বীকার করছি যে, আমি এখন মানসিক দিক থেকে অবসন্ন। সে কারণে অসংযতও বটে। সোমার ভালোবাসা আমাকে মোহাবিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল বটে, কিন্তু মুগ্ধ করতে পারে নি। অথচ বিয়ের আগে আমার মনে হয়েছিল, সোমাই বোধ হয় পারবে আমার জীবনকে সুন্দর ও মহিমান্বিত করে তুলতে।

আসলে আমাকে নিয়ে সুতপা আর সোমার মধ্যে প্রচন্ডতম একটা লড়াই বেধে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল জয় পরাজয়ের মধ্যে। সুতপা হেরে গিয়েছিল।

সেই সুতপাকেই আজ বারবার মনে পড়ছে। সোমা কি আমাকে বঞ্চিত করেছে? না, তা' নয়। তবে সে নিজের পাওনার দিক থেকে অতিরিক্ত দাবী করেছে। তার দাবী আদায়ের জন্য প্রাণপণ লড়েছে আমার সঙ্গে। আমি আর পারছি না। পেরে উঠছি না সোমার সঙ্গে।

এবং এখন বুঝতে পারছি যে ওর সঙ্গে আমার আর পেরে ওঠা সম্ভব নয়। পারি না। কাল বিকেলেও একবার পরাজিত হয়েছি। হেরে গিয়েছি সোমার কাছে।

একটু বেরুচ্ছিলাম। কোন কাজ ছিল না, তাই। তাই ভেবেছিলাম কফি হাউসে গিয়ে বসি একটু। যদিও ইচ্ছে করে নয়, তবু বোধ হয় সাজগোজটা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল আমার। আর সেই সময় হঠাৎ সোমা এসে আমার হাতটা চেপে ধরল। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ এমন সেজেগুজে?'

চমকে উঠেছিলাম। আশ্চর্য, এমন মূর্তি আমি ওর সচরাচর দেখি না। মাঝে মাঝে এ রকম হয়ে ওঠে। ওর তপ্ত নিঃশ্বাসে আমার বুকটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। বলেছিলাম, 'কী হয়েছে তোমার বল ত? বলতে বলতে ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখলাম, হায়েনার লালসা-দৃষ্টিতে ওর চোখদুটি ভরা। ওর এ রকম দৃষ্টির সঙ্গে আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। মাঝে মাঝেই এ রকম হয়ে ওঠে সোমা। কিন্তু কাল বিকেলের অবস্থা অনেকখানি স্বতন্ত্র।

বিয়ের আগে একদিন এ রকম অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম।

পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলে বসেছিলাম। সোমা আর আমি। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে একবার হঠাৎ মুখ তুলে দেখেছিলাম যে, সোমার কাঁধের উপর থেকে কাপড়টা পড়ে গেছে। শুধু ব্লাউজে আটকানো সোমার উদ্ধত যৌবনের সঙ্গে সেই আমার মুখোমুখি পরিচয়। শুধু বুকের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। সে সময় মুখের উপর যে হাসিটি ভেসে থাকতে দেখা গিয়েছিল, সেটিও ছিল ভয়ঙ্কর।

বেশ কিছু সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ ও বলে উঠেছিল,—'কী?'

—'কিছু নয়।' বলে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

সোমাকে বেশ নির্বিকার মনে হল। ভেতরে ভেতরে কিন্তু চঞ্চল হলাম আমি। তাকালাম ওর মুখের দিকে। দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল।

আজ এতদিন বাদে এখন আর বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে না যে, সেদিন সোমা আমাকে দারুণ প্রলোভিত করেছিল। আমি একটা নিকৃষ্ট বাদলা পোকার মত সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরেছি মাত্র।

তাই বটে। আমার মৃত্যু হয়েছে। আমি যদি সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে সেদিন নিজের মনকে আয়ত্তে রাখতে পারতাম তা' হলে এমন একটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হত না আমাকে। বেঁচে যেতাম আমি। মোহাবিষ্ট আমি যেদিন থেকে সোমার পিছু নিয়েছি সেদিন থেকেই আসলে সুতপার প্রতি আমি অবিচার সুরু করে দিয়েছিলাম। আজ হিসেবের খাতায় বহুবার চোখ রেখে মন দিয়ে বুঝেছি সুতপা কোন অপরাধ করে নি আমার কাছে, বরং নিজের অপরাধের কথা মনে করে আজ নিজেই মাথা কুটে মরছি।

সেই সেদিন হোটেলে বসে প্রথম আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

দু' দিকের কানের নিচে গরম অনুভব করছিলাম। দ্রুত নিঃশ্বাস বইছিল। সোমা আমার রক্তে মুঠো মুঠো আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু আজ সেই লোভের জায়গা থেকে আমার চোখ ফিরে চলেছে। আমার অন্তর বিষিয়ে উঠেছে। আমার ভিতরে এক ঘৃণার জন্ম হয়েছে। যদিও সে ঘৃণা গোপন করে রাখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর এই সঙ্গে বার বার শুধু সুতপাকেই মনে পড়ছে। যে নাকি আমাকে ভালোবাসতে পেরেছিল, নিজের করে নিজের কাছে পেতে চেয়েছিল আমাকে। আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম তাকে। তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম আমি।

কেননা সোমা তখন আমার সঙ্গিনী। আমি মোহাবিষ্ট ওর প্রেমে। কিন্তু কাল বিকেলে আমার মধ্যে সেই পুরনো ঘৃণাটা নতুন করে জেগে উঠেছে। তাই এখন আমার ভালোবাসাটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, আমি আমাদের এই ভালোবাসাকে বিষাক্ত বলেই এখন অভিহিত করতে চাই।

একদিন রাত্রে আমার বুকের কাছে কামড়ে দিয়েছিল সোমা। তখন অনেক রাত। সোমার অতর্কিত দংশনে যন্ত্রণায় জেগে উঠেছিলাম আমি। যেখানে কামড়েছিল সেখানটায় হাত দিয়ে টের পেয়েছিলাম যে সেখানে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। ঘরের ভিতরে ঘন অন্ধকার। আমার পাশে শুয়ে সোমা কেন জানি না হাঁপাচ্ছিল। আমার বাঁ হাতের কাছে ওর নিঃশ্বাসের তাপ লাগছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কী হল, এ রকম করে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে কেন?'

—'বেশ করেছি, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ কেন?'

—'বারে, অনেক রাত হয়েছে ঘুমোবো না?'

—'না, আমার ঘুম না এলে তুমি কিছুতেই ঘুমাতে পাবে না।'

আমি জানতাম ঘুম আসত না সোমার। কখনো কখনো সেই জাগরণ ভয়ংকর হয়ে উঠত। ওর এক রকমের বীভৎস ক্ষুধা আমার ঘুমকে পর্যন্ত বিনষ্ট করতে উদ্যত হত। তাই আমাকেও জেগে উঠতে হত। সেই নিদারুণ অন্ধকার সময়ে হাতের কাছে শুধু সোমার দেহটাকেই পেতাম। মনে হত থরথর করে কাঁপছে ওর শরীরটা।

সেদিনও শেষ পর্যন্ত সোমার ঘুমের ব্যবস্থা না করে আমিও ঘুমুতে পারিনি। কিন্তু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বুকের সেই ক্ষত স্থানে এমন জ্বালা অনুভব করছিলাম যে, হঠাৎ কেন যেন আমি সোমার প্রতি ঘৃণায় ভিতর দিকেও জ্বলে উঠতে লাগলাম।

সেই থেকে বারবার সুতপাকেই কেবল মনে পড়ছিল। আমি সুতপাকে পেয়েও হারিয়েছি। সোমার উচ্ছৃংখল যৌবনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। তাই মনে পড়ছিল, মানুষের দাঁতেও ত বিষ থাকে। যে বিষ মানুষকেও বিষাক্ত করে তুলতে পারে। তাই সোমার দাঁত যে আমার দেহে ক্ষতের সৃষ্টি করে সেই দেহকে বিষমুক্ত করার জন্য আমাকে ওষুধের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল।

মাঝে মাঝে সুতপার সঙ্গেও রেস্তোরাঁয় বসেছি। লেডিজ কেবিনে পাশাপাশিও বসেছি বহুবার। পরম শান্তিতে দু'জনে চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করেছি। বার বার ওর রসসিক্ত কোমল হাসিটি পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিরীক্ষণ করেছি। হাতেও হাত রেখেছি দু একবার। কিন্তু সুতপাকে এমন উচ্ছৃংখল হয়ে উঠতে দেখি নি কখনো।

আজ হিসেব মেলাতে বসেছি। সোমার মত যখন তখন বুকের কাপড় সরে যেত না সুতপার। সেই সময়ে একদিন হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখলাম সোমার ব্লাউজের বোতাম খোলা ছিল। আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। বুকের ভিতরে একটা ছোট্ট পাখির ছটফটানি। সত্যি কথা বলতে কি কেমন যেন ভাব-বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম।

সোমার কিন্তু নজর এড়ায় নি। এক ঝলক মুচকি হেসে বলল, অসভ্য কোথাকার! বলেই ও আমার দিকে আরেকবার তাকাল। এখন আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে আবার চোখ ফিরিয়েছিলাম অন্য দিকে। আশ্চর্য, কেন যেন আমার দৃষ্টিটা ওই দিকে ছুটে যাচ্ছিল।

এতক্ষণ আমি অনুভব করছিলাম যে আমার শিরা উপশিরা দিয়ে দ্রুতগতিতে উত্তপ্ত রক্ত ছুটে চলেছে। আমি ওর বুকের কাছে হাত নিয়েও ফিরিয়ে এনেছিলাম। শুধু হাতটাই নয়, বুকের ভিতরটাও কেঁপে উঠেছিল বুঝি। ওর মুখের দিকে লক্ষ্য করে দেখেছিলাম। সেই হাসিসুদ্ধ ঠোঁটটা কেমন বেঁকে গিয়েছিল। বলে উঠেছিল, 'কাপুরুষ।'

আচমকা আঘাত পেলাম। নিজেকে সামলে নিলাম। সত্যি ও খুব ভালোভাবেই আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিল আমাকে।

আমার মাথার ভিতরে রক্ত তখন টগবগিয়ে ফুটছে। আমিও যেন কী চাইছিলাম। কিন্তু মুখ ফুটে আর বলা হল না। পারি নি বলতে। আমি দেখছিলাম, সোমার দু' চোখের জমিনে যেন রক্ত জমে গিয়েছিল।

অথচ আমার মনে পড়ে সুতপা আমাকে সব দিতে অস্বীকার করেছিল। বলেছিল, 'তোমার জন্যই আমার সব, সময় হলেই সব পাবে।'

কাল বিকেলে সোমা আমার সুন্দর সার্টটা দু' হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল। বলল,—'না, তুমি অমন করে সেজে বাইরে বেরুতে পারবে না।'

কাল বিকেলে আবার ওর দু' চোখের জমিতে রক্ত জমে উঠতে দেখা গিয়েছিল। কাঁপছিল থরথর করে সোমা। আমি অনুভব করছিলাম, ওর সেই তপ্ত নিঃশ্বাস। বুঝতে আমার কোন অসুবিধে হয় নি যে সোমা আমাকে এখনু ছাড়তে চায় না।

আমিও আর পারি না। ওর সঙ্গে লড়তে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠি। প্রায়ই রাত্রে আমাকে একজন পরাজিতের মত পড়ে থাকতে হয়।

আজ আমাকে বাধ্য হয়েই ভাবতে হচ্ছে যে, যদি সুতপাকে বিয়ে করতাম তাহলে বোধহয় আমাকে এমন অবসন্ন বোধ করতে হত না। সুতপা কি এমন হত? নিশ্চয় হত না। আমার বিশ্বাস সব মেয়েই এমন হয় না। হতে পারে না।

আমার সংসারটা সুখের হতে বাধা কোথায়? খুব সুখেই দিন যাপন করতে পারতাম আমি। নির্ঝঞ্ঝাট একটি ঘর। যেখানে আমি আর আমার স্ত্রী হেসে খেলে দিন যাপন করতে পারি। অথচ এখন আমার মধ্যে এক রকমের ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সুখ শান্তির জনাই আমার জীবনের সবটুকু সুখ শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আজ এখন তাই বারবারই আমার সুতপার কথা মনে পড়ছে। ইচ্ছে হয় তার কাছে গিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে আসি। আসলে আমার উপর ওর অধিকারটাই ত প্রথম এসেছিল। আমাকে মন-প্রাণ দিয়ে চেয়েছিল, কিন্তু পায় নি।

কেন পায় নি? পায় নি আমার জনাই। আমার চোখের সামনে নেমে এসেছিল এক অন্ধকার। আমি আর দেখতে পাই নি সুতপাকে। সোমাকে নিয়ে সরে পড়েছিলাম।

আমি জানি সব। সুতপা কোথায় আছে তা-ও জানি। সে এখন বিয়ে করেছে। নিজের সংসার পেতে বসেছে। জীবনে সুখীও হতে পেরেছে বোধ হয়। সুখ দুঃখটা ত মোটের উপর আমাদেরই হাতে।

আজ তাই আমার মন বলছে, যদি মোহগ্রস্ত না হয়ে সেই আমার সুতপাকেই বিয়ে করতাম তা হলে হয়ত এমন যন্ত্রণা-দায়ক অবসন্নতায় মুষড়ে পড়তাম না। এখন মাঝে মাঝে আমি ভীত হয়ে উঠি। সোমাকে দেখলেই মনে কেমন একটা আতঙ্ক জাগে। আসল কথা আমি যে আর পেরে উঠছি না ওর সঙ্গে।

একদিন সুতপাকে ভুলে গিয়ে মনে ধরেছিলাম সোমাকে। আজ ইচ্ছে করছে সোমাকে ভুলে যেতে। কেন, আমার এমন একটা ইচ্ছে হচ্ছে, কেন? আর বার বার কেবল সুতপাকেই মনে পড়ছে কেন?

কাল বিকেলে বেরুবার সময় কি আমি খুব সেজেছিলাম। সোমার ত তাই মনে হয়েছিল। কি জানি, ওর চোখ ও কেমন দেখেছিল আমাকে। তাই হঠাৎ দিনের বেলাতেও অমন বেয়াড়া হয়ে উঠল।

বিয়ে হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ক'টা রাত আমি নির্বিঘ্নে ঘুমুতে পেরেছি? বোধহয় একটিও নয়। ঘরের আলো নিভাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ও হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। তখন অন্ধকারে ওকে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু ওর সমস্ত দেহ থেকে আগুনের হল্কা বেরোয়। আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাই। আবার জেগে উঠি। নতুন হয়ে উঠি।

যদিও কাল বিকেলে আমার ইচ্ছে ছিল, একটু সুতপার ওখানে যাব। অবশ্য এ ইচ্ছেটা আমার অনেকদিনের। যদিও সুতপা আমাকে ভালোবেসেছিল, সে ভালোবাসার মর্যাদা আমি দিতে পারি নি। ওকে ঠকিয়েছি। বলতে গেলে আসলে আমিই ঠকেছি। কেননা, কখনো কখনো সোমাকে আমি মনে মনে নরখাদক বলেও অভিহিত করেছি। তবু আজ ত আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে। একজনের মন থেকে আরেকজনের মনের ব্যবধান অসীম। তবু আজ আবার নতুন সম্পর্ক পাতিয়ে নতুন করে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলেও বোধহয় একটু শান্তি পাই মনে।

কেননা, একদিন ওর কাছে গিয়ে, অন্তত একদিনের জন্য ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের অপরাধটা স্বীকার করে আসা উচিত। আজ আমার এই নিদারুণ অশান্তির মধ্যে যদি সেটুকু সান্ত্বনাও পাই, তা হলেও অন্তত শান্তি পাব।

কাল বিকেলে আমি যদি বেরুতে পারতাম তাহলে হয়ত বা সুতপার ওখানেই চলে যেতাম। অনেকদিন থেকে মনে মনে ভাবছি এটা। জানি, আজ আবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো মানে পুরনো ঘা'য়ে আবার আঘাত করা। ক্ষতস্থানকে পুনরুজ্জীবিত করা। তবু নিজের মনের শান্তির জন্য অন্তত ওর কাছে গিয়ে একবার দাঁড়ানো দরকার। তা' যাই হোক, সুতপা সুখে থাকলেই হল, আমার যা হবার তা ত হয়েছেই। আর ত তা ফেরবার নয়। প্রতিদিন এক ভয়ঙ্কর বন্যতার সঙ্গে পাশাপাশি সময় কাটাতে হচ্ছে আমাকে।

সোমা কি এ রকম ছিল? এমন কি সোমার চেহারাটা পর্যন্ত কী রকম রুক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রায়ই মাথায় তেল দেয় না। যখন তখন চোয়ালটা শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের কোণে কালি জমে। বেশভূষা খুব আয়ত্তে রাখতে মোটেই যত্নবান নয়। অথচ ওর রূপটা কি ছিল না। ছিল। আমাকে অন্তত মোহিত করেছিল। ওর উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের স্পর্শে মাঝে মাঝে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম। ওর দু' চোখের তারায় যে ইশারা ছিল তা আমাকে মুগ্ধ করত। সুতপার চেয়ে অনেক বেশী মাদকতা ছিল ওর হাসি তামাসার মধ্যে।

তবু আজ বিপন্ন বোধ করছি আমি। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার অন্ত নেই আমার। আমি একবার অন্তত সুতপার কাছে যেতে চাই। সে যেন আমাকে ক্ষমা করে, শুধু এইটুকু বলে আসতে চাই আমি তাকে।

হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে। যাব আমি। সুতপার কাছে যাব। আজ আর সাজব না। মোটের উপর একটা সার্ট প্যান্ট পরেই বেরিয়ে যেতে হবে সোমার সামনে থেকে। তারপর গিয়ে দাঁড়াতে হবে সুতপার সামনে।

কাল বিকেলে সোমা কি ছাড়ল আমাকে। ছাড়ল না। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আমি যদি এখন ওর কথায় রাজি না হই তা'হলে বুঝি বা আমাকে দাঁতে নখে ছিঁড়ে ফেলবে। তাই ওর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম কাল।

ও আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়েছিলাম। বলেছিলাম,—'এখানে?'

—'হ্যাঁ, এখানেই, একটা নতুন পরিবেশ, একটু নতুন স্বাদ।'

বলা বাহুল্য আমাকে নির্বাক হয়ে যেতে হয়েছিল এবং একটি নিষ্ক্রিয় পদার্থের মত শুধু সোমার ব্যবহারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মতো নরকের দিকে পা বাড়ালাম।

ঘৃণা! হ্যাঁ, এর পর ঘৃণা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই আমার মনে। তাই সুতপাকে মনে হচ্ছে এক সুন্দর স্নিগ্ধ নারী। বোধহয় সুতপাও সব চায়, কিন্তু একটা সীমার মধ্যে থাকতে চায় নিশ্চয়। আর আমি ভোরবেলা থেকে রাত অবধি পথে ঘাটে হাটে বাজারে যত মানুষ দেখি তারা নিশ্চয় সবাই সুতপার মত সীমার মধ্যে থাকে, তাদের চোখ মুখ দেখে অন্তত তাই মনে হয়। অন্তত তারা যে কেউ সোমার মত নয়, সেটা নিশ্চিত।

বিকেলে সুতপার বাড়ি গিয়ে দেখি, আশ্চর্য, অপরূপ সাজ সেজে একটা কি বই পড়ছিল সে। যদিও তার রূপের সমারোহ দর্শনে বেশ খানিক সময় বিমুগ্ধ হয়ে থাকতে হল আমাকে। তবু বললাম, 'আরে একা যে, মিস্টার কোথায়?'

বই থেকে মুখ তুলে যেন চমকে উঠল সুতপা। বলল,—'আরে তুমি, সত্যি তুমি ত, একা কেন?'

সত্যি আমি একা কেন? এ প্রশ্নটা স্বাভাবিক। ও ত সবই জানে। আমি বিয়ে করেছি সোমাকে। ওকে প্রত্যাখ্যান করেছি। সবই ত ওর মনের মধ্যে জেগে আছে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমার মনকে ঘিরে যে সৌন্দর্যবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তা হল সুতপার সংসার। বেশ গোছগাছ করা ঘর। সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর। বিকেলের এমন সুন্দর অবসর, যখন ওর স্বামী বাইরে থাকে আর ও ঘরে বসে বই পড়ে সময় কাটায়।

সুতপা আবার বলল,—'এসো ঘরে এসো।'

ওর পিছে পিছে ঘরে ঢুকলাম। বললাম—'ভালো আছ নিশ্চয়।'

—'ভালো ত নিশ্চয়, আগে অবশ্য ভেবেছিলাম ভালো লাগবে না, এখন কিন্তু বেশ আছি।'

বাঃ বেশ কথা বলছে ত সুতপা। মনে মনে ভাবলাম। জীবনে একটু ভালো থাকার জন্যই মানুষের আজীবন এমন প্রাণপণ লড়াই। অনেকদিন থেকে এখানে আসবার ছিল, এসে মনটা বেশ ভরে উঠল। এইটুকু দেখেও আমার শান্তি। আমার দ্বারা ত ওর কিছু হল না। তবু যদি সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করে শান্তি পায়, সেইটে আজ দেখে আমারও সুখ।

বাঃ বেশ ত! দেয়ালে ওর স্বামীর একখানা বড় ফটো টাঙানো আছে। বেশ লাগছে দেখতে। এনলার্জ করা যদিও, তবু ওর স্বামী দেখতে মন্দ নয়। বেশ হাসিখুশি চেহারা। ফটো থেকে যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে বলে মনে হল। অনেক সময় ধরে ওর স্বামীর ফটোটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ ওর কথায় সম্বিত ফিরে এলো আমার। বলে উঠল,—'চা খাবে ত?'

অসম্মতি জানাতে পারলাম না। বললাম—'নিশ্চয়।'

বলতে বলতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও বোধহয় আমার সম্মতিতে খুশিই হয়েছে। ও চলে গেল আমার সামনে থেকে। আমি বসে বসে ভাবছিলাম সেই আমাদের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির কথা। সেই দিনক্ষণ, সময় সব সরে গেছে জীবন থেকে। মুছে গেছে সেই প্রেম-প্রণয়ের মহড়া দেওয়ার দিনগুলি।

ওর স্বামীর সুন্দর চেহারার ফটোটা ওর আজকের অবস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বেশ হাসি-খুশি হবেন নিশ্চয় ভদ্রলোক। যা' মেয়েরা সাধারণত কামনা করে সুতপা বোধ হয় তেমন স্বামীই পেয়েছে। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম। আমার যা-ই হোক—সুতপা যে সুখী হয়েছে জীবনে, এইটেই এখন আমার তৃপ্তির বিষয়।

ও চা নিয়ে এলো। খুব তাড়াতাড়িই চা করে নিয়ে এলো ও। খুব চটপটে হয়েছে বোধহয়। ঘর-দোরের সাজগোজ দেখলে ত তাই মনে হয়। তবু বললাম—'কেমন আছ?'

হেসে উঠল সুতপা। চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়েও দিতে পারলাম না, ওর মুখের দিকে তাকালাম। হঠাৎ যেন শক্ত হয়ে উঠল ওর মুখ। চোখে ফুটে উঠল এক তির্যক দৃষ্টি। বলল, 'খুব ভালো আছি, তবে জীবনে আর কোনদিন ভুল করব না।'

অবাক হলাম। এ আবার কী রকম কথা। জানতাম এখানে আসাটা আমার ঠিক নয়। তবু যে এসেছি মনের পীড়নে, সুতপার কাছে, সে শুধু আত্মধিক্কারের তাড়নায়। কেন আমি অমন সোমাকে বিয়ে করলাম এমন সুতপাকে বাদ দিয়ে।

খানিক সময় একথা সেকথার পরে বললাম—'চলি তাহলে?'

কিছু বলল না সুতপা। আরেক বার ওর মুখের দিকে তাকালাম। তারপর ওর স্বামীর ফটোর দিকে। নিজেকে অপরাধী বোধ হতে লাগল। সেই ফটোর দিকে তাকিয়ে নিজের এই অতর্কিত অনধিকার প্রবেশের জন্য মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। তারপর বেরিয়ে এসে দেখি সদর দরজায় তালা আটকানো। পিছন ফিরে সুতপাকে ডাকতে গিয়ে দেখি ও ঠিক আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে দেখি, ওরও চোখের জমিতে রক্ত ছুটে এসেছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। বললাম,—'দরজাটা খুলে দাও।'

—'এখনো কি আমি এত বোকা আছি যে, তুমি বললেই দরজাটা খুলে দেব।'

—'তার মানে?'

—'তার মানে আজ আমার হাতে সুবর্ণ সুযোগ, আমার স্বামী নেই, তোমার মত একজন যুবক সুপুরুষ আমার হাতের মুঠোয়, যার কথা দিনের পর দিন আমি ভেবেছি, যার কথা ভেবে কত রাত্রি আমি জেগে কাটিয়েছি, আজ এই সুযোগে...।'

আজ আমি সেজেগুজে আসি নি। আজ সুতপা পরস্ত্রী। যার ফটোটা সম্ভবত এখনো তাকিয়ে আছে এদিকে। ঘৃণায় ভয়ে লজ্জায় আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। বললাম,—'সুতপা, আমাকে দরজা খুলে দাও, আমি বেরিয়ে যাব।'

সুতপা বিকটভাবে হেসে উঠল। আমি আরো ভয় পেয়ে গেলাম। সুতপা হঠাৎ একটা চোরের মত আমার কলারটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা অন্ধকার খুপরীর মধ্যে। যেখানটায় কয়লা ঘুঁটে জমানো ছিল ওদের। কি করা উচিত আমার ভেবে পাচ্ছিলাম না। শুধু মনে মনে ভাবছিলাম, এরা কি তবে একই রঙের পুতুল। সোমা আর সুতপা! আমার তার কিছু বলবার বা করবার ছিল না। আমি দারুণ অবসন্ন। কোন ক্ষমতা নেই আমার। হঠাৎ সুতপা চীৎকার করে বলে উঠল,—'এই নাও চাবি, এই মুহূর্তে দরজা খুলে আমার সামনে থেকে সরে যাও, আর যদি কোনদিন এ মুখো হও তবে সেদিন তোমার বুক চিরে রক্ত খাব আমি, এ জন্য একটা ধারালো ছুরি জোগাড় করে রাখব আমি।'

ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কোন রকমে সেই অন্ধকার খুপরীটা থেকে বেরিয়ে আসতেই ওর স্বামীর ফটোটার মুখোমুখি হলাম। মনে মনে বললাম, আর পারি নে ভাই, আমাকে ক্ষমা করুন, খুব ভুল করেছি, আর আসব না এখানে, আর কোনদিন নয়। তারপর টলতে টলতে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। মাথাটা টলছিল আমার। দু' চোখে নেমে এসেছে অন্ধকার। মনে মনে ভাবছিলাম, যাই হোক, তবু ত সোমা আমার, কোন রকমে সোমার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারব ত?

দেশে বিদেশে

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির সম্পর্কের প্রশ্নটি নূতন করে বিবেচনা করার জন্য সম্প্রতি যেসব দাবী উঠেছে সেগুলির সঙ্গে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীই এম এস নাম্বুদ্রিপাদও নিজেকে যুক্ত করেছেন।

গত ২০ অক্টোবর তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাবনের সঙ্গে কেন্দ্র-কেরল সম্পর্কের প্রসঙ্গ আলোচনা করার পর শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বহু দলের অস্তিত্বের কথা মনে রেখে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেছেন, এখন আর কোন একটা দল দাবী করতে পারে না যে, সারা দেশে তার একাধিপত্য থাকবে।

শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের আগে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও কথাটা তুলেছিলেন। শ্রীনগরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'জনসম্মেলনে' তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করার জরুরী প্রয়োজন হয়েছে।'

প্রায় মাসখানেক আগে বাঙ্গালোরে টাটা স্মৃতি বক্তৃতায় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীপি বি গজেন্দ্রগড়করও একই ধরনের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সাংবিধানিক আইনের বিশেষজ্ঞরা ও রাজনীতিবিদরা নিরাসক্তভাবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সমস্যাটি পরীক্ষা করে দেখুন ও প্রয়োজন হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধানের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির যথোপযুক্ত সংশোধনের চেষ্টা করা হোক।"

শ্রীনারায়ণ বা শ্রীগজেন্দ্রগড়কর কেউই সরকারী ক্ষমতায় নেই। শ্রীগড়কর ত' রাজনীতির বাইরের লোক। কিন্তু ভারতবর্ষের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদই সম্ভবত প্রথম যিনি কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক নূতন করে গড়ে তোলার দাবী জানালেন। এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী হবে বলে অনুমান করা যায়।

শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ যে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দাবী উত্থাপন করেছিলেন সেটা অবশ্য নিছক সাংবিধানিক বা আইনের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত ছিল না, অন্তর্দলীয় রাজনীতির প্রশ্নও তার সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। এই রাজনৈতিক বিতর্কের ধার ইতিমধ্যে কতকটা ভোঁতা হয়ে গেছে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়ে যে জল ঘোলা হয়েছে সেটা সহজে থিতিয়ে যাবে বলে মনে হয় না।

১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের এক দিনের প্রতীক ধর্মঘটে মোকাবেলা কিভাবে করা হবে তাই নিয়েই নয়াদিল্লীর সঙ্গে ত্রিবান্দ্রমের বিরোধ পাকিয়ে উঠেছিল। নয়াদিল্লীর নালিশ, এই ধর্মঘট সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ও অর্ডিনান্স কার্যকর করতে অস্বীকার করে কেরল সরকার ভারতীয় সংবিধানের ২৫৬ অনুচ্ছেদ অমান্য করেছেন। কেননা, এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় আইনসমূহ ও ঐ আইন অনুযায়ী প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ রাজ্য স্তরে প্রয়োগ করতে রাজ্য সরকারগুলি বাধ্য থাকবেন।

নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, যেসব প্রশ্নে নয়াদিল্লী ও ত্রিবান্দ্রমের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে সেগুলি হচ্ছে :—(১) ১৯ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটের আগে নিবারণমূলক আটক না করে কেরল সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ভঙ্গ করেছেন কিনা। (২) ঐ ধর্মঘটের দিন কাজে যোগদানেচ্ছু কর্মচারীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা না করে কেরল সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অমান্য করেছেন কিনা। (৩) কেন্দ্রীয় সরকার আগে থেকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করে কেরলে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ পাঠিয়ে রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন কিনা।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদের কৈফিয়ৎ হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার যে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যেই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে ধর্মঘট বিরোধী অর্ডিনান্স প্রয়োগ করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, "ধর্মঘট করা, ধর্মঘটে উস্কানি দেওয়া অথবা ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা উচিত। কোন কর্মচারী ইউনিয়নের পদাধিকারী, শুধু এটাই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ হওয়া উচিত নয়। তাঁর কাজের ফলে কি ধরনের বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। যেসব সরকারী কর্মচারী অর্ডিনান্সের ধারা অমান্য করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে, কিন্তু জননেতাদের বিরুদ্ধে ও রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রধান সদস্যদের বিরুদ্ধে এই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা এখন সমীচীন হবে বলে মনে করা হচ্ছে না—যদি না তাঁরা হিংসা বা নাশকতামূলক কাজের উস্কানি দেন।" শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্ডিনান্সের আওতা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন সেখানে রাজ্য সরকারও অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে অব্যাহতি দিয়েছেন। এতে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। ধর্মঘট সম্পর্কে গ্রেপ্তার ও মামলা চালাবার ব্যাপারে নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন, ধর্মঘট মিটে যাওয়ার পর একমাত্র সম্পত্তি ও মানুষের উপর 'বৃহৎ আক্রমণের ঘটনা' ছাড়া অন্য সব ঘটনায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা তুলে নেওয়াই কেরল সরকারের নীতি।

১৯ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট সম্পর্কে কেরলে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ পাঠাবার ব্যাপারে নয়াদিল্লীর কৈফিয়ৎ হচ্ছে, সংবিধানের সপ্তম তপশীলের প্রথম তালিকায় (কেন্দ্রীয় এক্তিয়ারের তালিকা) দ্বিতীয় দফা অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও মোতায়েন করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের আছে।

মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ অবশ্য একথা গোপন করছেন না যে, ১৯ সেপ্টেম্বরের প্রতীক ধর্মঘট সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সেগুলিতে তাঁর সায় নেই। ধর্মঘটী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের দাবী-দাওয়ার প্রতি তিনি যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন সেজন্য তাঁরা দিল্লীতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। এই সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেছেন, অর্ডিনান্স যখন জারী করা হয় তখন তিনি দিল্লীতে ছিলেন এবং তখনই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলেন, এইভাবে অর্ডিনান্স জারী করে ধর্মঘট দমন করা যাবে না। কেরল বিধানসভায় তাঁকে বিরোধী পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা কেন্দ্রীয় অর্ডিনান্সের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বীকার করেন যে, সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট সম্পর্কে আহূত এক জনসভায় কেরলের চারজন মন্ত্রী ঐ ধর্মঘট সমর্থন করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ভিন্ন আর একটি অবকাশে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ নিজেও বলেছেন যে, জনস্বার্থে প্রয়োজন

মনে করলে সংবিধান অমান্য করতেও তাঁর আপত্তি নেই।

অবশ্য তিনি এই সঙ্গে কেরল বিধান সভায় আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর সরকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে, পিকেটিংয়ের নামে আটকে রাখা বন্ধ করতে ও ধর্মঘটীদের দ্বারা অনুগত কর্মচারীদের অন্যায়ভাবে আটকে রাখা বন্ধ করতে চান। তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর সরকারের এই নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট সম্পর্কে পুলিশ ২০৭টি মামলা দায়ের করেছে।

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ কাউকে আটকে রাখতে বা কাউকে আদালতে সোপর্দ করতে পারে না। সেই ক্ষমতা তাদের নেই। কোন লোককে গ্রেপ্তার করার পর কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের কাজ হচ্ছে তাকে রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া, তারপর রাজ্য পুলিশ সে সম্পর্কে যথাকর্তব্য করবে। মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন, তিনি শুনতে পেয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি বর্তমান নিয়মের সংশোধন করে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের হাতে আটক রাখার ও মামলা করার ক্ষমতাও তুলে দিতে চাইছেন। তিনি এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই কাজ করার অর্থ হবে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি আর একটা পাল্টা বাহিনী গঠন করা, এতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ হবে; কেননা, আইন ও শৃঙ্খলা হচ্ছে রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের বিষয়।

এইসব বিরোধের মধ্য দিয়ে নয়াদিল্লী ও ত্রিবান্দ্রমের সম্পর্ক তিক্ত হচ্ছে—যদিও সাংবিধানিক সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। সংবিধানের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে কেরল সরকারকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সহজও হবে না, বিবেচনাসম্মতও হবে না। ১৯৫৯ সালে যখন কেরলের নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন সেখানকার সমস্ত অকম্যুনিষ্ট দল কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল। আজ কেন্দ্রীয় সরকার সেই সমর্থন পাওয়ার আশা করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, কেরলের ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকের মধ্যে অ-বনিবনার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার জন্য কেরলের মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ২৪ অকটোবর যে হরতাল ও ধর্মঘট আহ্বান করেছিল সেটা অন্য কোন দলের সমর্থন লাভ করে নি, এই ঘটনায় সেটা আর একবার বোঝা গেল। এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোন চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের ভেদ-বিভেদগুলি চাপা দিয়ে তাকে আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া।

সুতরাং এইসব বিরোধ না মিটলেও হয়ত চাপা পড়বে। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের মূলে প্রশ্নগুলি আলোড়িত হতে থাকবে।

আজাদ হিন্দ সরকারের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে সারা দেশ নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ সরকারকে নতুন করে স্মরণ করে গত ২১ অকটোবর। সেই উপলক্ষে ময়দানে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে নেতাজীর তরবারী স্থাপিত হবার প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযশোবন্তরাও চাবন তরবারীটি দেখছেন। ছবিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ রামসুভগ সিং, অধ্যাপক সমর গুহ এম-পি, কলকাতার শেরিফ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরকে চাবনের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

শাদা চোখে
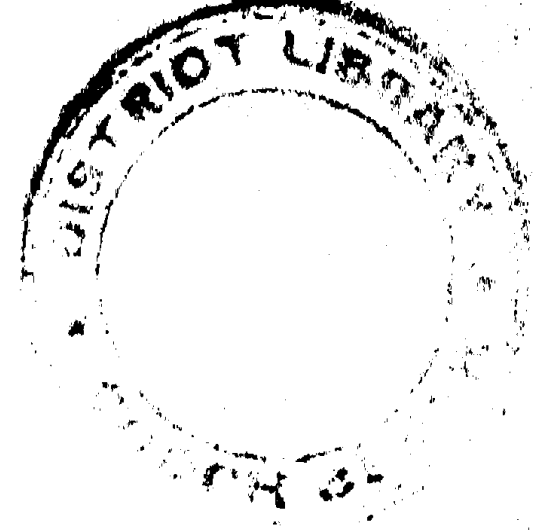
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তথা যুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারে তাঁদের দিক দিয়ে চমৎকার একটা হাতিয়ার পেয়ে গেছেন। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত অভিযোগ করেছেন যে, ৪ অক্টোবর রাত্রে জলপাইগুড়ি শহরে স্থানীয় সরকারী অফিসার ও কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছিল এবং সেখানে স্থির হয়েছিল যে, তিস্তার আসন্ন বন্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করার জন্যে সাইরেন বাজাবার দরকার নেই।

"কলকাতায় প্রতিদিন সকাল ন'টায় এবং মঙ্গলবার ও শনিবার দু'বার করে সাইরেন বাজানো হয়, অথচ জলপাইগুড়িতে যখন সত্যিকারের বিপদ নেমে এলো তখন সেখানে মানুষকে সতর্ক করার জন্যে সাইরেন বাজানো হলো না", শ্রীদাশগুপ্ত বলেছেন।

তারপর : "এই সাইরেন না বাজানো ছিল কংগ্রেস ও উপরতলার আমলাদের একটি ষড়যন্ত্র। যখন বন্যার তোড় জলপাইগুড়িতে আসছে, তিস্তার বাঁধে ফাটল ধরেছে তখন কংগ্রেস ও উপরতলার আমলারা গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। সেই বৈঠকেই ঠিক হয় সাইরেন বাজানোর দরকার নেই। জলপাইগুড়িতে তো বন্যা প্রতিবারই হয়।"

গুরুতর অভিযোগ, সন্দেহ নেই। যদিও শ্রীদাশগুপ্তের সর্বশেষ বাক্যে এই অভিযোগের ভিত্তি একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। "জলপাইগুড়িতে তো বন্যা প্রতিবারই হয়"—যে-কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি যিনি শাদা চশমা পরেন স্বীকার করবেন যে, এর মধ্যে যে জিনিসটা সর্বপ্রথমে পরিলক্ষিত হয় তা হ'ল বিচারের ভুল। এবারের তিস্তার বন্যা যে অন্যান্যবারের বন্যা থেকে আলাদা, অনেকগুণ বেশি ভয়াবহ, সেটা যে কারণেই হোক—হয়ত প্রতিবার বন্যা হয় বলেই—স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনুমান করতে পারেন নি। এই অনুমান করতে না পারাটা তাঁদের পক্ষে নিশ্চয়ই কৃতিত্বের কথা নয়।

আরেকটা ব্যাপার হ'তে পারে। তিস্তার বন্যা যে এবার ভয়াবহ রূপ নিয়ে নেমে আসতে চলেছে সে সতর্কবাণী নানাসূত্র থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পেয়ে থাকবেন, কিন্তু তাঁদের চিরাচরিত শৈথিল্য ও গাফিলতির দরুন তাঁরা সময়মতো শহরবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। এটা যে তাঁদের অপদার্থতারই পরিচয় সে-কথাও কেউ অস্বীকার করবেন না।

কিংবা এই দুটোই অংশত সত্যি হ'তে পারে। বন্যা সম্পর্কে সতর্কবাণী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আগেই পেয়েছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন নি। তবে কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে যে নিয়েছিলেন সেটা তো প্রমোদবাবুর কথাতেই প্রমাণিত হচ্ছে : তাঁরা তো স্থানীয় কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। প্রমোদবাবুর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ঐ বৈঠকে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নেন যে, জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করার জন্য সাইরেন বাজানো হবে না, কেননা "বন্যা তো প্রতিবারই হয়।" অর্থাৎ বন্যা সম্পর্কে সতর্কবাণীকে তাঁরা কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে নিলেও তাঁরা এটা বুঝতে পারেন নি যে বন্যা এবার সত্যি সত্যিই অভূতপূর্ব সর্বনাশ ডেকে আনতে চলেছে : তাঁদের বিচারের ভুল হয়েছিল।

এখন, প্রমোদবাবু বলছেন কংগ্রেসী নেতারা স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সাইরেন বাজান নি, কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন বন্যায় লোক মরুক, সবকিছু ভেসে যাক, তাতে নির্বাচন পিছিয়ে যাবে, তারপর রিলিফ দিয়ে নির্বাচনী আসরে বাজীমাৎ করা যাবে। প্রমোদবাবু নিরীশ্বরবাদী বলেই হয়ত ঈশ্বরকে টেনে আনেন নি; নইলে তিনি হয়ত বলতেন যে, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরও আছেন, কেননা ১৭ নভেম্বরের আগে এরকম সর্বগ্রাসী বন্যা হবার তো কথা ছিল না।

সত্যিই তো! কিন্তু প্রমোদবাবু বোধহয় তাঁর রঙের তাস ওল্টাবার সময় এই খবরটি লক্ষ্য করেন নি যে, কংগ্রেসী আমলের পূর্তমন্ত্রী ও বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে তাঁর বাড়ীর ছাদ ফুটো ক'রে কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে তুলে বন্যার জলের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়েছিল। প্রমোদবাবুর অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে কংগ্রেসী নেতারা আগে থেকেই জানতেন যে, তিস্তা আর কয়েক ঘণ্টা পরেই জলপাইগুড়িকে মৃতের শহরে পরিণত করতে যাচ্ছে এবং নিশ্চয়ই খগেনবাবুর কাছেও খবরটা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল! জেনেশুনেই তাঁরা নিশ্চয়ই জলপাইগুড়ির মানুষকে ভাসিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন! তাহলে, খগেন দাশগুপ্ত বন্যার জলে আটকা পড়েছিলেন কেন? কংগ্রেসীরা যদি ষড়যন্ত্রই করে থাকত তাহ'লে খগেনবাবু প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা আগে থেকেই নিজেদের গা বাঁচাবার চেষ্টা করলেন না কেন? বামপন্থীরা নিজেরাই তো বলেন কংগ্রেসের কাছে আত্মস্বার্থই বড়, জনসাধারণের স্বার্থ নয়। তাহ'লে তাঁরা আগে থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবেন এটাই স্বাভাবিক ছিল না কি?

এবং সেই সঙ্গে জলপাইগুড়ির যত টাকাওলা বড়লোক যাঁদের ওপর কংগ্রেসের ভরসা (!) তাঁদেরও কংগ্রেসীরা বাঁচাবার চেষ্টা করবেন এটাও কি স্বাভাবিক ছিল না? তাহ'লে কেন সর্বনাশা বন্যায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁরাও সর্বস্ব খোয়ালেন? কংগ্রেসের সঙ্গে বড়লোকের গাঁটছড়া বাঁধা, এ অভিযোগ তো বামপন্থীরাই করে থাকেন।

এই কথাগুলি আমি কংগ্রেসের একজন মুখপাত্র হিসেবে বলছি না, সে-রকম বাসনা আমার নেই। এই কথাগুলি আমি বলতে চাইছি শুধু বামপন্থী যুক্তফ্রণ্টের দলগুলির ইতিবাচক চিন্তার অবিশ্বাস্যরকম দৈন্য তুলে ধরার জন্যে। মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন ১৭ নভেম্বর থেকে আগামী ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পিছিয়ে দেবার পর থেকে তাদের নানা কথাবার্তায় এই দৈন্য এত বেশি চোখে পড়ছে যে, হুজুগ ছাড়া তাদের রাজনীতির আর কোনো ভিত্তি আছে বলে মনে হওয়া কঠিন। কংগ্রেসের আছে কিনা সে প্রশ্ন এখানে অবাস্তব।

নির্বাচন স্থগিতের ঘোষণা যুক্তফ্রণ্টকে এতটা বেসামাল করে তুলবে এ আমাদের ধারণার অতীত ছিল। অথচ উত্তরবঙ্গে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে নির্বাচন স্থগিত রাখা ছাড়া মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীএস পি সেনশর্মার আর কোনো উপায় ছিল না। উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই কি বলেছেন কিংবা রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর কি পরামর্শ দিয়েছেন সে-কথা আমি ধরছিই না। কিন্তু বামপন্থীরা নিজেরাই কি বলছেন না যে, উত্তরবঙ্গের মানুষ যে দুর্দশার মধ্যে পড়েছে তা অনস্বীকার্য?

দেশহিতৈষীর ১১ অক্টোবরের সংখ্যায় বলছেন : "অভূতপূর্ব এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে এসেছে উত্তরবঙ্গের বুকে। দার্জিলিং জেলায় নেমেছে ধস আর ঢল। প্রলয়ংকরী বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তিনটি জেলায়—জলপাইগুড়ি, কোচবিহার আর দার্জিলিংয়ে। সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ী হয়েছে বিধ্বস্ত, মৃত্যু ঘটেছে বহু লোকের; মৃত্যুসংখ্যা এখনি হাজারের কোঠায়—প্রবল জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছে মৃতদেহের পর মৃতদেহ, শ্মশানে জ্বলছে চিতার পর চিতা। অসংখ্য নরনারী অবরুদ্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে—তারা আজ মৃত্যুপথযাত্রী। রেললাইন বিধ্বস্ত হওয়ায় দার্জিলিং ভ্রমণকারীরা পথিমধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছেন; তাঁদের দুর্ভোগের, দুঃখ কষ্টের সীমা নেই। এই তিনটি জেলার অধিকাংশ অঞ্চলেই মানুষের জীবন আজ বিপর্যস্ত।"

কালান্তর : "বিজয়া দশমীর রাত্রি থেকে যে বর্ষণ শুরু হয়েছিল তা পশ্চিমবাংলার নিম্নাঞ্চলের কাছে আশীর্বাদ হলেও সমগ্র উত্তরখণ্ডে তা অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে (তাহ'লে কংগ্রেসের নয়!) এই বর্ষণই হিমালয় অঞ্চলে ও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুরে আক্ষরিক অর্থে প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করেছে। ...ধ্বংস সৃষ্টির এই মিছিলে একটি নদী অন্যটিকে পাল্লা দিয়ে নিজের নিজের কলেবর বৃদ্ধি করে সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভয়, আতঙ্ক, বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছে।" (১২ অক্টোবর)।

গণবার্তা : "গোটা উত্তরবঙ্গে আজ যে পরিস্থিতি তা অবর্ণনীয়। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহারকে ঘিরে যে প্রলয়-তাণ্ডবের শুরু, ক্রমে উত্তরবঙ্গের বাকী দুটো জেলাও তার করাল গ্রাসের কবলে পড়েছে। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহারে মৃতের সংখ্যা কত আজও তা নির্ধারিত হয় নি। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে ধুয়ে-মুছে গেছে যে, শুধু তার কঙ্কালটা পড়ে আছে। এমন অবস্থা এর আগে আর কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ে না।"

এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে কোনটা আগে প্রয়োজন, রিলিফ না নির্বাচন? ইচ্ছে থাকলেও কি এত ব্যাপক বিপর্যয়ের পর ১৭ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা যেতো? নভেম্বরের পরে রমজান, স্কুলের পরীক্ষা ও ফসল তোলার সময় এসে যাবে। সুতরাং ফেব্রুয়ারীর আগে কি কোনোমতে নির্বাচন করা যেতো?

যুক্তফ্রন্টের নেতারা বলেছেন, দশ-বারোটা নির্বাচনী কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত রেখে বাকী পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করা যেতো। কিন্তু পাঁচটি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত নির্বাচনী কেন্দ্রের সংখ্যা দশ-বারোটি নয়, অন্তত ত্রিশটি। যেখানে দশ-বারোটি আসনের আধিক্য বা অনাধিক্য সরকারের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে, সেখানে ত্রিশটি কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত রাখা সম্ভবপর নয়, কাম্যও নয়।

যদি ত্রিশটি কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত রেখেই ১৭ নভেম্বর নির্বাচন হয়ে যেত, তাহ'লে কি হ'তো? হয় ১৭ নভেম্বরের পর ২৫০টি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করতে হতো, আর না হয় ফেব্রুয়ারীতে বাকী ত্রিশটি কেন্দ্রে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ২৫০টি কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশ বন্ধ রাখতে হ'তো। প্রথমটি করা হ'লে, যুক্তফ্রন্টের নেতারা কি বলেন, ২৫০টি আসনের ফলাফল কি ত্রিশটি আসনের নির্বাচনকে প্রভাবিত করত না? সেটা কি শোভন, গণতন্ত্রসম্মত, ন্যায়-সংগত হতো? ফলাফল নিজেদের পক্ষে গেলে তাঁরা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা চেপে যেতেন কিন্তু যদি বিপক্ষে যেত তাহলে কি তাঁরা নিদারুণ হৈচৈ করতেন না?

আর যদি দ্বিতীয়টি করা হত, অর্থাৎ যদি ফলাফল ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থগিত রাখা হতো, তাহ'লে ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা রক্ষা একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিত। সেক্ষেত্রে কিছু না হলেও তাঁরা কারচুপির অভিযোগ তুলতেন এবং ফলাফল কংগ্রেসের পক্ষে গেলে বলতেন যে, কংগ্রেস সরকারী আমলাদের সহায়তায় ব্যালট চুরি করে জিতেছে। কংগ্রেসের যদি ঐ অভ্যাসটি থেকেই থাকে তাহ'লে কংগ্রেসকে কারচুপির সুযোগ না দিয়ে শ্রীসেনবর্মা কি বামপন্থীদের উপকারই করেন নি? প্রমোদবাবুরা কি বলেন?

যাই বলুন, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও তাঁরা শ্রীসেনবর্মাকে ধন্য ধন্য করছিলেন। কারণ শ্রীসেনবর্মা কংগ্রেসের গোপন মনো-বাঞ্ছাকে উপেক্ষা করে এবং বামপন্থীদের প্রকাশ্য কামনাকে চরিতার্থ করে নভেম্বরেই নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেছিলেন। তখন কিন্তু শ্রীসেনবর্মা ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার কোনো ষড়যন্ত্র করেন নি। উত্তর-বঙ্গের বিপর্যয়ের ফলে যখন নির্বাচন পিছিয়ে দিতে হ'ল তখন হঠাৎ তাঁরা এর মধ্যে ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন কংগ্রেসী শাসন দিল্লীর মাধ্যমে বজায় রাখার জন্যেই নির্বাচন স্থগিত রাখা হ'ল। তাঁরা একবারও মনে রাখলেন না যে, উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় না ঘটলে ১৭ নভেম্বরেই নির্বাচন হ'ত। তাঁরা এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন এই বিপর্যয়টা কংগ্রেসী ও আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রেরই একটা অংগ। যেন যুক্তফ্রন্টকে মারবার ও কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে দেবার জন্যেই তিস্তার পুল ভেঙে গেছে, জলপাইগুড়ি আর দোমোহানী আজ মৃতের শহরে পরিণত! সুস্থ ও স্বাভাবিক চিন্তার কি অসামান্য [illegible]কাশ!

তাঁরাই অবশ্য বলতে সুরু করেছেন যে, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হ'ল জরুরী রিলিফের। "উত্তরবঙ্গে বহুমুখী জরুরী রিলিফ চাই", এই মন্তব্য গণশক্তির। দেশহিতৈষী বলেছে, "রিলিফ ও ত্রাণকার্যই আজ একান্ত প্রয়োজন।" কালান্তর ডাক দিয়েছে "উত্তরবঙ্গকে বাঁচিয়ে প্রমাণ করুন যে পশ্চিমবঙ্গ বেঁচে আছে।" গণবার্তা মনে করে "এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের জীবনে আজ যে গভীর দুর্যোগ নেমে এসেছে, যুদ্ধ-কালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্য পরিচালনা না করলে এই বিপদ অপসারিত হওয়া অসম্ভব।"

এরই পরিপূরক হিসেবে আরেকটি কথা বামপন্থী নেতৃবৃন্দ বলে থাকেন : রিলিফ ভালোভাবে সংগঠিত করার জন্যেই নির্বাচিত সরকার তাড়াতাড়ি গঠন করা উচিত ছিল। শ্রীজ্যোতি বসুর ধারণা, "উত্তরবঙ্গে যে বিপর্যয় হয়েছে এর মুখোমুখি হ'তে পারে একমাত্র জনপ্রিয় সরকার।" শ্রীঅজয় মুখার্জি দুঃখ করে বলেছেন, নির্বাচন তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত ছিল, কারণ নির্বাচিত সরকার দুর্গত এলাকায় ভালোভাবে ত্রাণের কাজ করতে পারবেন। শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি মনে করেন, উত্তরবঙ্গে যে ভয়াবহ বিপদ হ'ল তারপরে আমলাতন্ত্র আর রাজ্যপালের ওপর নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচন আর রিলিফ কি একসংগে চলতে পারত? যেখানে অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে উত্তর-বঙ্গে ত্রাণকার্যের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার সেখানে নভেম্বরে নির্বাচন হ'লে অন্তত ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত কি রিলিফের কাজ ব্যাহত হ'ত না? নির্বাচনের পর ফলাফল প্রকাশিত হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে সরকার চালু হ'তে হ'তে খুব কম করেও আরো পনেরো দিন লাগবে। অর্থাৎ অকটোবর নিয়ে পুরো প্রায় দু'মাসের আগে নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকার উত্তরবঙ্গের আর্ত মানুষদের সেবায় লাগতে পারতেন না। যুক্তফ্রন্ট নেতারা কি সত্যসত্যিই মনে করেন যে, উত্তরবঙ্গের পীড়িত মানুষের দুঃখকষ্ট তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে দু'মাস পিছিয়ে থাকত?

কংগ্রেসীরা না হয় জলপাইগুড়ির মানুষকে সতর্ক করে না দিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের দাবী মেনে নিয়ে এতবড় বিপর্যয়ের পরেও যদি নির্বাচন স্থগিত না রাখা হ'তো তাহলে সেটাও কি আর্ত মানুষের আশু রিলিফের প্রয়োজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সামিল হত না?

বলা হ'য়েছে যে, বন্যার অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে কতকগুলি দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বল্পমেয়াদী পরি-কল্পনা কি দেড় মাস-দু'মাস পরে নিলেও চলবে? যদি তা চলে তাহলে বক্তাদের দায়িত্ব-বোধ সম্পর্কে [illegible] নিজেই তাঁদের

"চালাকী?"

ধারণা করে নেবেন। আর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তো তিন-চার মাসের ব্যাপার নয় যে, ফেব্রুয়ারীতে নেওয়া চলবে না। তাহ'লে অসুবিধাটা কোথায়?

আসল কথা হ'ল নির্বাচন স্থগিত রাখায় যুক্তফ্রন্টের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হ'য়ে পড়েছে। তাঁদের বিচলিত হবার নমুনা দেখে বোঝা যাচ্ছে তাঁরা এই অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

নভেম্বরে নির্বাচন অনেকদিক থেকে তাঁদের পছন্দ ছিল। প্রথমত, লোকের মন থেকে যুক্তফ্রণ্টের আমলের স্মৃতি এখনও ততটা ম্লান হয়ে যাবে না, কাজেই তাঁরা জিতবেনই।

দ্বিতীয়ত, জেতা সম্পর্কে তাঁরা এত বেশি দৃঢ়প্রত্যয় ছিলেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গদীতে ফিরে আসবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলেন।

তৃতীয়ত, ১৯৬৭ সালের খরচা মেটাবার পর এত তাড়াতাড়ি আরেকটি নির্বাচনের ধাক্কা সামলাবার মতো আর্থিক অবস্থা ফ্রণ্টের নেই। নভেম্বরে নির্বাচন হয়ে গেলে খরচা বেশি হতো না।

চতুর্থত, নভেম্বরে নির্বাচন হয়ে গেলে ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে খাদ্যশস্যের সংগ্রহ তাঁরা আশা করছেন ভালোভাবে করতে পারতেন। গতবারের অভিজ্ঞতার পর তাঁরা আর কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজী নন।

নির্বাচন স্থগিত রাখায় সেদিক থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য কিছুটা বানচাল হয়ে গেল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে এতখানি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়তে হবে? শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন: "নির্বাচন নভেম্বর মাসে হোক্—এটা কায়েমী স্বার্থের বাহক কংগ্রেস চায়নি (যদিও নির্বাচন নভেম্বরেই হ'তে যাচ্ছিল)। কারণ নভেম্বরে নির্বাচনে কংগ্রেস জিতবে না, কংগ্রেস না জিতলে জোতদার, মজুতদারদের কি হবে—এই স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থের জন্যেই কংগ্রেস নভেম্বরে নির্বাচনের বিরোধী", ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রমোদবাবুর কথা থেকে এইটাই মনে হবে যে, নভেম্বরে নির্বাচন হলে কংগ্রেস জিতত না, যুক্তফ্রণ্ট জিতত, আর অনুক্ত থাকলেও অপর আশঙ্কাটিও স্পষ্ট: ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হলে কংগ্রেসেরই জেতবার সম্ভাবনা, যুক্তফ্রন্টের আশা ক্ষীণ।

কিন্তু এটা কিরকম কথা হ'ল? যে দল নভেম্বরে জেতবার প্রত্যয় পোষণ করে তারা তিন মাস পরে নির্বাচন জিততে পারবে না? তাদের সংগঠন ও প্রস্তুতি কি এতই ঠুনকো ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে?

প্রমোদবাবু নির্বাচন তিন মাস স্থগিত রাখার পেছনে কংগ্রেসের এই উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেছেন: "জোতদার মজুতদাররা ধরমবীররা পুলিশের সাহায্যে কৃষকের ধান লুঠ করে এনে মজুত করতে পারবে; কলকারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলন এই তিন মাসে পুলিশ দিয়ে পিষে মারতে পারবে এটা এরা মনে করছে।"

যদি তাই হয় তাহলে তো ভালোই হবে, বামপন্থী নেতাদের ভাষায় বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাহলে তাঁরা এত দুশ্চিন্তায় কেন? কংগ্রেসী-আমলাতান্ত্রিক অপশাসন যদি তাঁদের শক্তির উৎস হয়, তাহ'লে এই তিন মাস তাঁদের সে সুযোগ দিয়ে নির্বাচন কমিশনার কি প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরই সহায়তা করেন নি?

নাকি এ-ব্যাপারেও তাঁরা ঠুনকো ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন? এত ঠুনকো যে, কতগুলি উদ্ভট, হাস্যকর, অর্থহীন ও অবাস্তব যুক্তি খাড়া করতে হচ্ছে?

এই ক'মাসে ফ্রণ্ট নিজেকে এতটা দুর্বল করে ফেলেছে তা আগে জানা ছিল না।

—[illegible]

রক্ত *ওখানে দর্শনে

দেবল দেববর্মা

(নয়)

কামরার মধ্যে একটা থমথমে আবহাওয়া। অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি কেউ। সুদর্শন মুখ নীচু করে কিছু লক্ষ্য করছিল, কিংবা চিন্তা করছিল মনে. রাজীব দেওয়ালের সবুজ রং, জানালার পর্দার বিচিত্র নক্সা, ক্যালেন্ডারের একটি রমণীর ছবি, ঘরের এক কোণে রাখা বড় সাইজের জয়পুরী কাজ করা ফুলদানীর উপরের দীঘল রজনীগন্ধা এবং আরো অনেক কিছুর উপর চোখ বুলোচ্ছিল।

সুদর্শন চক্রবর্তীকে কেমন বিপর্যস্ত দেখাল। মনের মধ্যে একটা অশান্ত ঘূর্ণিঝড়ের দাপাদাপি চলছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সুদর্শন বোধহয় কেন্দ্রচ্যুত।

মুখ তুলে সুদর্শন বলল, 'খুনের ব্যাপারে আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন ইন্সপেক্টর?'

রাজীব ঈষৎ হাসল। 'করছি না বললে মিথ্যে বলা হবে। ইয়েস আপনিও একজন সাসপেক্ট মিস্টার চক্রবর্তী। তবে

আগের ঘটনা

[দিকনগর পেপার মিলের অপারেটার মিস তরঙ্গমালা এক রাতে খুন হল। এতে জড়িয়ে পড়ে তারই প্রেমিক নিখিলেশ সেন। এখন সে হাজতে বন্দী। কেসটা হাতে নিল সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল। শচীদুলাল তার সহকারী। নিখিলেশের বন্ধু শশাঙ্ক ভট্টাচার্য। তরঙ্গেরও সে পরিচিত।

তদন্তে এসে ঘটনাস্থলের কাছে একটা ছোট্ট বোতাম আর রুমাল কুড়িয়ে পায় রাজীব।

ওরা এল তরঙ্গের মেসে। সেখানে তরঙ্গর রুমমেট, পেপার মিলেরই আর এক টেলিফোন অপারেটর সুজাতা দাসের সঙ্গে খুনের ব্যাপারে কথা হল। এর পর তরঙ্গের মাকেও অনেক জেরা করল। তোরঙ্গে খুঁজে পাওয়া গেল 'এস' লেখা আংটি, রেস্তোরাঁর দুটি ক্যাশমেমো। এবার পরিচিত হল প্রভা মুখার্জির সঙ্গে। 'খেলুড়ে' তরঙ্গেরই রুমমেট। সুব্রত জানতে পেল তরঙ্গের প্রতি মিলের অপারেটর ভৈরব দত্ত, কর্মী বিশ্বনাথ বসুর দুর্বলতা।

এর পর জেরা করা হল মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তীকে। তরঙ্গের সঙ্গে ও'র ঘনিষ্ঠতা ধরা পড়ে গেল সুব্রতের কাছে।]

সন্দেহভাজন ব্যক্তি তো আপনি একা নন। পাঁচ ছ' জন। এখন তদন্ত করে দেখতে হবে সাক্ষ্যপ্রমাণ কার বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পাওয়া যাচ্ছে।' কয়েক সেকেন্ড থেমে রাজীব পুনরায় বলল, 'অবশ্য সাসপেক্ট মানেই যে খুনী নয় একথা নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

সুদর্শন কি যেন চিন্তা করল। বলল, 'আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন ইন্সপেক্টর?'

রাজীব তাকাল। বলল, 'আর বেশীক্ষণ নয়। বড়জোর আধঘণ্টা ডিটেন করব আপনাকে। মথুরাপুরে কাকে যেন রিসিভ করতে যাবেন বলেছিলেন।'

সুদর্শনের কণ্ঠস্বর কেমন স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভিজে শোনাল। সে বলল, 'আর বলেন কেন? আমাদের কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর আসবেন আড়াইটের ট্রেনে, ও'কেই স্টেশনে রিসিভ করার কথা আছে।'

রাজীব বলল, 'আচ্ছা ম্যানেজার সাহেব, কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রশ্ন আপনাকে করব। আপত্তি না থাকলে উত্তর দিন।'

'বলুন।' —সুদর্শন অনামনস্কের মত উত্তর দিল।

'আপনি বিবাহিত নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার স্ত্রী দিকনগরেই থাকেন তো?'

সুদর্শন ঘাড় নাড়ল। 'উনি সব সময় থাকেন না এখানে। কলকাতায় মানুষ। আমার শ্বশুরমশায় খুব বড়লোক। দিকনগরে এসে আমার স্ত্রীর মন টেঁকে না। মাঝে মাঝে অবশ্য আসেন। দু চার-দিন থেকে চলে যান আবার।'

'আপনার এখানের ঘর-সংসার তাহলে কার হাতে?'

'কার হাতে আবার? চাকরবাকর, বয় বাবুর্চীর হাতে।'

'আপনি মাঝে মাঝে কলকাতায় যান তো? ধরুন কি শনিবারে—?'

'পাগল হয়েছেন!' সুদর্শন ম্লান হাসল। 'একটা মিলের চার্জে থাকলে এক মিনিট আপনি স্থির থাকতে পারবেন না! কি শনিবারে কেন, অনেক সময় মাসে একবারও আমার যাওয়া হয়ে ওঠে না।'

'আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই অনুযোগ করেন এর জন্য।'

সুদর্শন একটু হাসল। বিষাদাক্রান্ত হাসি। বলল, 'ইন্সপেক্টর, সব কিছুই পৃথিবীতে অভ্যাস। স্ত্রীর সঙ্গে বাস মানুষের একটা অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। অনভ্যাসটা রপ্ত হয়ে গেলে অভিযোগ অনুযোগের প্রশ্ন ওঠে না। দু'পক্ষের বেলাতেই এ কথা খাটে।'

রাজীব স্বীকার করল কথাটা। বলল, 'তাহলে তো আপনি ভাগ্যবান মানুষ। সংসার করেছেন অথচ সংসারের বেড়ী পরতে হয় নি।' একটু থেমে রাজীব পুনরায় প্রশ্ন করল, 'আপনার ছেলেমেয়ে কটি?'

সুদর্শন বিচিত্র হাসল। বলল, 'নো ইস্যু অ্যাজ ইয়েট।'

রাজীব বলল, 'আপনি কতদিন হল বিয়ে করেছেন ম্যানেজার সাহেব?'

'বিলেত থেকে ফিরবার কিছুদিন পরই বিয়ে করি আমি। তা চার বৎসরের বেশী, —হ্যাঁ ঐরকমই হবে।'

রাজীব সামান্য কিছুক্ষণ চিন্তা করল। বলল, 'আমার প্রশ্নগুলো এবার আরো একটু ব্যক্তিগত শোনাবে। কিন্তু আপনি যদি উত্তর দেন তাহলে আমার পক্ষে তদন্তের সুবিধে হয়।'

'বেশ তো। কি জানতে চান, বলুন।'

অর্থপূর্ণ হেসে রাজীব বলল, 'তরঙ্গর সঙ্গে আপনার পরিচয়, মানে ঘনিষ্ঠতা কতদিনের?'

সুদর্শন চক্রবর্তী নড়েচড়ে বসল। বলল, 'আমার সব কথা আপনি বিশ্বাস করবেন ইন্সপেক্টর?'

'কেন করব না? আপনি একজন সাসপেক্ট বলেই যে এলোমেলো মিথ্যে কথা বলবেন, তা ভাববার মত কোন কারণ নেই।'

'দেখুন, তরঙ্গাকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।' সুদর্শন ধীরে ধীরে বলল, 'প্রথম দিকে তরঙ্গাই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিল। মিল ম্যানেজারের ঘরে ঢোকবার জন্য টেলিফোন অপারেটর-দের পারমিশন নিতে হয় না। ওদের জন্য ম্যানেজারের কক্ষেও অবারিত দ্বার। তাছাড়া—।'

'তাছাড়া কি ম্যানেজার সাহেব?'

'বাইরে থেকে টেলিফোনে কেউ কথা বলতে চাইলেই মিল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলা যায় না। আগে টেলিফোন অপারেটরকে নামধাম বলতে হবে। অপারেটর মিল ম্যানেজারকে সেই নাম-ঠিকানা শোনাবেন। ম্যানেজার রাজী হলে পরই তার টেবিলের টেলিফোনে ঝংকার বেজে উঠবে।'

কথা কেড়ে নিয়ে রাজীব বলল, 'কিন্তু এর জন্য টেলিফোন অপারেটরকে কি ছুটে আসতে হয় আপনার ঘরে?'

'ছুটে আসবার কথা নয়। অন্য লাইনে অপারেটর মিল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন। আর তাই করেন সবাই। শুধু তরঙ্গ, তরঙ্গাই প্রথম দিকে এই কাণ্ডটি শুরু করেছিল। টেলিফোন এলেই ও ছুটে আসত আমার ঘরে। নাম-ধাম বলে জানতে চাইত এ ঘরে লাইন দেবে কিনা?'

'টেলিফোন রুমটা বুঝি আপনার ঘরের কাছেই?'

'কাছে মানে পাশাপাশি নয়। ঘরটা করিডোরের ঐ প্রান্তে।'

'তরঙ্গ কি বারেই আপনার ঘরে এসে ঢুকত? আপনার কথা বলবার প্রয়োজন এবং ইচ্ছে আছে কিনা জেনে নিত?'

'ঠিক তাই।' —সুদর্শন সায় দিল।

'আপনি আপত্তি করেন নি?' রাজীব জানতে চাইল।

'প্রথম প্রথম মনে হত মেয়েটি নতুন চাকরীতে ঢুকেছে বলে ওর ঘর থেকে আমাকে সংবাদটা জানাতে ভয় পাচ্ছে। ভেবেছিলাম মাসখানেকের মধ্যেই কেটে যাবে ভয়টা। তখন লাইনের মাধ্যমেই সহজভাবে কথাবার্তা বলবে।'

'কিন্তু মাসখানেক পরও ওর ভয় কাটল না। এই তো?' রাজীব রহস্য করে হাসল। বলল, 'তখন কেন ওকে বারণ করে দেন নি ম্যানেজার সাহেব?'

'স্বীকার করতে লজ্জা নেই ইন্সপেক্টর। ইভন দি টপ বস ইজ মেড অফ ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড। তরঙ্গাকে আপনি দেখেন নি। খুব টকটকে ফর্সা, টিকল নাক বা মস্ত টানা টানা চোখ ছিল না তরঙ্গার। কিন্তু যা ছিল, সব মিলিয়ে তাই ইরেজিস্টিবল হয়ে উঠত। তরঙ্গা ঘরে এসে দাঁড়ালে কলম রেখে ওর সঙ্গে দু' মিনিট কথা না বলে পারিনি। মাঝে মাঝে টেলিফোন তুলেও ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছি।

কখনও প্রয়োজনে, কখনও সম্পূর্ণ অকারণে ইন্সপেক্টর।'

'কিন্তু তরঙ্গের উপর আপনার এই দুর্বলতার কথা মিলের মধ্যে জানাজানি হয়নি?'

ঠোঁট দুটি বন্ধ করে সম্মতিসূচক 'ম' ধ্বনির মত একটা শব্দ করল সুদর্শন। বলল, 'জানাজানি হয়নি মানে? এক সময় রীতিমত গুঞ্জন উঠেছিল এ নিয়ে। তরঙ্গই আমাকে বলেছিল ব্যাপারটা। কলকাতায় ওকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। এই মিলেরই কে তখন দেখেছিল আমাদের। ফিরে এসে সে রসালো করে গল্প করেছিল সকলের কাছে। তবে গত কয়েক মাস ধরে আমাদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে কোন কলরব ওঠেনি।'

রাজীব বলল, 'তরঙ্গ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল বলে মনে হয় ম্যানেজার সাহেব?'

'আকৃষ্ট হয়েছিল কিনা বলতে পারি না। রমণীর মন ইন্সপেক্টর, যে কোন হত্যারহস্যের চেয়েও রহস্যময়। তবে প্রথম আলাপ এবং তার থেকে ঘনিষ্ঠতা সঞ্চারের ব্যাপারে তরঙ্গর ভূমিকা বিন্দুমাত্র নিষ্ক্রিয় ছিল না।'

'আপনি বিবাহিত একথা তরঙ্গ জানত?'

'জানত বৈকি। গত দু' বছরে আমার স্ত্রী চার পাঁচবার তো এসেছেন। দু' তিন রাত কাটিয়েও গেছেন বাংলোতে। তরঙ্গ নিশ্চয়ই ওকে দেখে থাকবে। তাছাড়া ম্যানেজার সাহেবের স্ত্রী যে দিকনগরে এসে থাকতে চান না, এ নিয়ে খ্যাতি অখ্যাতির নানা গল্প ছড়িয়ে আছে মিলে।'

'আপনি বলতে চান বিবাহিত জানা, জেনেও তরঙ্গ আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল। এবং আপনার ডাকে সাড়া দিত?'

'বিবাহিত লোক যে একটা সীমার মধ্যেই ঘুরপাক খাবে এ তথ্য নিশ্চয়ই তরঙ্গের জানা ছিল। তবে ঘনিষ্ঠতাই বলুন বা সাড়া দেওয়া-টেওয়াই বলুন, ব্যাপারটা তেমন বেশীদূরে গড়ায় নি। আর গত কয়েক মাস ধরে তরঙ্গের দিক থেকে আগ্রহ বা আকর্ষণ বলতে কিছুই ছিল না।'

রাজীব বলল, 'বেশ তো, আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। শেষের দিক এখন মুলতুবী থাক। প্রথম দিক অর্থাৎ আদি পর্বই শোনান ভালো করে।'

রসালো এবং সুড়সুড়ি জাগানো একটি প্রেমের কাহিনী শুনবে, এমনি একটা ভাব এবং কৌতূহল প্রকাশ করে রাজীব সান্যাল টেবিলের উপর ঝুঁকে বসল। 'বলল, 'আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে নিতে পারি তো ম্যানেজার সাহেব?'

'নিশ্চয়ই।' সুদর্শন অনুমতি দিল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করল সুদর্শন। ওর কপালের চামড়ার ভাঁজ এবং বক্ররেখাগুলি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। এবার সোজা হয়ে বসে সুদর্শন শুরু করল, 'তরঙ্গর দিক থেকে আমি খানিকটা প্রশ্রয় পেয়েছিলাম ইন্সপেক্টর। ওর প্রতি আকর্ষণ দিনে দিনে বাড়ল। মনে মনে আমি ওর সঙ্গ কামনা করতে শুরু করলাম। কিন্তু দুর্বলতা জাগতেই মনকে শাসন করলাম। এত বড় একটা মিলের চার্জে আছি। সামান্য একটা টেলিফোন গার্লের কটাক্ষে আত্মহারা হয়েছি জানলে লোকে কি বলবে। দিকনগরে ওকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করলে কেলেংকারীর আর কিছু বাকী থাকবে না। সুতরাং আমার ঘরে ওকে ডেকে পাঠিয়ে কিংবা ও নিজে এসে দাঁড়ালে দু' পাঁচ মিনিট কথাবার্তা হত বড়জোর, এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু তরঙ্গই একদিন আমাকে পথের নির্দেশ দিল।'

'কি রকম?'

'কোম্পানীর কাজেই আমাকে কলকাতা যেতে হল সেবার। অন্তত তিন চার দিন থাকতে হবে। তরঙ্গ সেটা জানত। আমাকে এসে বলল, সেও কলকাতায় যাচ্ছে। হেড অফিসে গিয়ে আমাদের ডিরেক্টর উমেশপ্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করবে একবার। আমি জানতাম উমেশপ্রসাদ ওকে স্নেহ করেন। তাঁর সুপারিশেই দিকনগর পেপার মিলে ওর চাকরী হয়েছে। তরঙ্গের কথা শুনে আমি হেসে বললাম, তাহলে তো হেড অফিসে আপনার সঙ্গে দেখা হবে আমার। কথা শুনে ও কিছু বলে নি ইন্সপেক্টর। শুধু ফিক করে হাসল।'

'তারপর?' রাজীব আগ্রহী শ্রোতার মত বলল।

'হেড অফিস থেকে কাজ সেরে বেরিয়ে দেখি নীচের তলায় লিফটের কাছে তরঙ্গ দাঁড়িয়ে। মন মর্জি ভালো ছিল না তখন। মার্চেন্ট অফিস মানে জানেন তো? নানা বিষয় নিয়ে ডিরেক্টরদের সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। লিফটের কাছে তরঙ্গের মিষ্টি হাসিমুখ দেখে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। বললাম, 'কোথায় যাবেন এখন? ও ঠোঁট চেপে অদ্ভুতভাবে হাসল। বলল,—চলুন না। যেখানে হোক, —যতদূরে ইচ্ছে আপনার।'

'অর্থাৎ তরঙ্গই আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল?' রাজীব একটু হেসে মন্তব্য করল।

সুদর্শন খানিকটা সহজ হয়ে আসছিল। বলল, 'ঠিক বলেছেন। উপমাটা ভারী সুন্দর হয়েছে আপনার। প্রত্যেক মেয়েই একটি তরঙ্গ,—জলতরঙ্গ ছাড়া আর কি? আর এ যৌবন জলতরঙ্গ রুখবার সাধ্য কি পুরুষমানুষের?'

সুদর্শনের পাইপের আগুনটা কখন নিভে গিয়েছিল। লাইটারের সাহায্যে পুনরায় আগুন ছুঁইয়ে নিল সে। বলল, 'ওকে নিয়ে একটা ভালো রেস্তোঁরায় এসে উঠলাম। লাঞ্চের সময় প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে। এদিকে পেট চুঁইচুঁই, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। মনে হল তরঙ্গও কিছুটা ক্ষুধার্ত। বাড়ী থেকে কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছে কে জানে।'

রাজীব বলল, 'রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে দুজনে দুদিকে চলে গেলেন তো?'

সুদর্শন ঘাড় নেড়ে বলল, 'তরঙ্গ যেতে চাইল না। আমাকে বলল, তার হাতে এখনও ঘণ্টা দেড় সময় আছে। মোটরে করে একটু বেড়িয়ে আসতে চাইল তরঙ্গ। কলকাতা ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে গিয়েছিলাম আমরা। ফিরবার সময় ওর বাড়ীর কিছুটা তফাতে একটা মোড়ের কাছে নেমে গেল তরঙ্গ।'

'কিছুটা তফাতে কেন?'

সুদর্শন অল্প একটু ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। বলল, 'ম্যানেজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটা বাড়ীর লোকের কাছে সেদিন গোপন রাখতে চেয়েছিল বোধহয়। পরে অবশ্য আর কোন গোপনীয়তা ছিল না। গাড়ী নিয়ে সরাসরি আমি তরঙ্গর বাড়ী গেছি, ওকে তুলে নিয়েছি গাড়ীতে। এ নিয়ে মিস মজুমদারকে কখনও মুখভার করতে দেখিনি।'

রাজীব সান্যাল ভ্রূ কুঞ্চিত করে কি যেন ভাবল। বলল, 'আর একটা প্রশ্ন আপনাকে করছি ম্যানেজার সাহেব। আচ্ছা, তরঙ্গ আপনার কাছে কি আশা করেছিল? কেন ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল আপনার সঙ্গে? শুধু বন্ধুত্ব, বসের কৃপাদৃষ্টি, না আরো কিছু?' রাজীব ঠোঁট কামড়ে পুনরায় ভাবছিল।

সুদর্শন বলল, 'আপনার এ প্রশ্নটা নিয়ে আমি আগেও চিন্তা করেছি ইন্সপেক্টর। তরঙ্গ আমার কাছে কি চেয়েছিল? কেন আমার সঙ্গে ও ঘনিষ্ঠতা করল? কি উদ্দেশ্য ছিল ওর? শুধু বন্ধুত্ব বললে আমি অস্বীকার করব
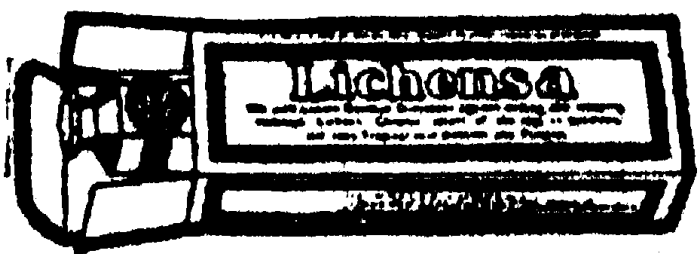
ইন্সপেক্টর। এই মিলে বন্ধুত্ব করবার মত লোকের অভাব ছিল না তরঙ্গার। তার জন্য মিল ম্যানেজার পর্যন্ত দৌড়বার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া টেলিফোন গার্লের সিঁড়ি থেকে ম্যানেজারের ঘরটা অনেকদূরে। বন্ধুত্বের বন্ধনটা খুব ক্ষীণ যোগাযোগ মাত্র।'

'তাহলে বসের কৃপাদৃষ্টির জন্য বলছেন?'

'তাও নয়। জানেন ইন্সপেক্টর, তরঙ্গাকে আমি একটা প্রস্তাব করেছিলাম। আমার একজন পার্সোনাল ক্লার্কের প্রয়োজন হয়েছিল একবার। কোম্পানীর স্যাংশন এল কলকাতা থেকে। মাইনেপত্র সাধারণ কেরানীর চেয়ে কিছু বেশী। সে বসবে আমারই পাশের ঘরে। প্রয়োজনে এবং ডাক দিলেই তাকে আসতে হবে আমার কামরায়। ইচ্ছে হল পোস্টটা তরঙ্গাকে দিই। টেলিফোন অপারেটরের চেয়ে কিছু মাইনে বেশী। ও হয়ত রাজী হয়ে যাবে। নিজের কামরায় ডেকে পাঠিয়ে তরঙ্গাকে দিলাম সংবাদটা। ভাবলাম কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠবে তরঙ্গা। দুটি চোখ ধন্যবাদের ভাষায় চঞ্চল দেখাবে। কিন্তু তরঙ্গা রাজী হল না পোস্টটা নিতে। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল।'

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল, 'এ ঘটনা কতদিন আগের?'

একটু চিন্তা করে সুদর্শন জবাব দিল, 'মাস আষ্টেক হবে। ইয়েস ইট ওয়াজ ইন জানুয়ারী লাস্ট।'

'ঐ পোস্টে আপনি আর কাউকে নিয়েছেন?'

'অনেকদিন পরে একজনকে নিতে হল। তরঙ্গা রাজী না হওয়াতে আমি খুব উৎসাহী ছিলাম না। ইন ফ্যাক্ট পোস্টটা ওকে মনে রেখেই তৈরী করা হয়েছিল। মাস চারেক হল আর একটি মেয়ে জয়েন করেছে এই কাজে।'

'নতুন নেওয়া হল?'

'ঠিক নতুন নয়। আমাদের মিলেই কাজ করত মেয়েটি। স্টেশনারী অফিসের ক্লার্ক। মেয়েটি গ্র্যাজুয়েট, এবং কাজে-কর্মেও সুনাম আছে ওর।'

'কি নাম মেয়েটির?'

'আপনি কি চিনবেন ওকে? মেয়েটির নাম প্রভা, —প্রভা মুখার্জি। তরঙ্গার সংগে একই মেসে থাকত।'

'আই সী। ঐ মেয়েটিই আপনার পার্সোন্যাল ক্লার্ক এখন? আচ্ছা, ওর সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার?'

'প্রভা মুখার্জি কাজকর্ম ভালোই করে। ইংরেজীটা মন্দ লেখে না। টাইপ জানে। আর এ ছাড়া কি বলতে পারি ওর সম্বন্ধে?'

রাজীব বলল, 'চার মাস ধরে ওকে দেখছেন। একটা ইমপ্রেশন নিশ্চয়ই হয়েছে আপনার?'

সুদর্শন বলল, 'মেয়েলী কৌতূহলটা বোধহয় একটু বেশী মিস মুখার্জির। তা ছাড়া শী ইজ এ বিট জেলাস।'

'জেলাস?' রাজীব সান্যাল কথাগুলি যেন লুফে নিল। বলল, 'জেলাসি কার উপর ছিল ম্যানেজার সাহেব? মিস মজুমদারের উপর নিশ্চয়ই?'

সুদর্শন ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'আমার তাই মনে হয়েছে ইন্সপেক্টর।'

প্রসঙ্গ বদলে রাজীব আবার তার আগের কথায় ফিরে যেতে চাইল। —'তাহলে দেখা যাচ্ছে তরঙ্গ বন্ধুত্ব কিংবা কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় আপনার সংগে ঘনিষ্ঠতা করে নি। প্রশ্ন হল, এর কারণটা কি? উদ্দেশ্য কি ছিল ওর?'

সুদর্শন হেসে বলল, 'আমার কি মনে হয় জানেন? রূপসী মেয়েদের মনে দিগ্বিজয়ের নেশার মত একটা বাসনা লুকিয়ে থাকে। তরঙ্গের চরিত্রে এমনি একটা দিক আছে। এখন ওর সম্বন্ধে সত্যি মিথ্যে অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে। স্তাবকের অভাব তরঙ্গের ছিল না। রূপ এবং রূপসীর পূজারী আর সব জায়গার মত দিকনগরেও প্রচুর। আমার মনে হয় তরঙ্গা আমাকেও জয় করতে চেয়েছিল। ও জানত আমি বিবাহিত, কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করি। আমাকে জয় করা কঠিন

হবে না ওর পক্ষে। দশটা হোজপোজ মানুষ ছেড়ে যদি ম্যানেজারের মত একটা শক্ত মানুষকে জয় করতে পারে তবে সে আনন্দ দিগ্বিজয়ের উত্তেজনার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

রাজীব হাসল। —'কি জানি ম্যানেজার সাহেব। আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু আপনি বলছিলেন যে কিছুদিন হবে তরঙ্গের দিক থেকে কোন সাড়া পাচ্ছিলেন না আপনি?'

সুদর্শন স্বীকার করল। —'একথা ঠিক। গত কয়েকমাস ধরে তরঙ্গ আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল। এ বয়েও সে কম এসেছে। অবশ্য আমি ডেকে পাঠালে ছুটে আসতে দেরী করে নি। আর কলকাতায় গেলে নানা ছলছুতোয় কিংবা এটা সেটা বলে আমার অনুরোধ আহ্বানকে ও উপেক্ষা করছিল।'

'এতে আপনি নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছেন ম্যানেজার সাহেব?'

'বিরক্ত হলেও কোন উপায় ছিল না ইন্সপেক্টর। মেয়েদের মনে জোয়ার ভাটা এখন তখন হয়ে থাকে। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই।'

সুদর্শন ঘড়ির দিকে তাকাল। সম্ভবত ওর সময় হয়ে এসেছিল। লাঞ্চের পরই মথুরাপুরে ছুটতে হবে ওকে। কোন ডিরেক্টর না কার যেন আসবার কথা। তাকে রিসিভ করবে স্টেশনে।

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল,—'আপনাকে এবার ছেড়ে দিচ্ছি ম্যানেজার সাহেব। প্রয়োজন হলে না হয় আর একদিন বসা যাবে আপনার সঙ্গে। শুধু একটা প্রশ্ন করব আপনাকে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই লাস্ট কোয়েশ্চন টু ডে।'

সুদর্শন মুখ উঁচু করে রাজীবের প্রশ্ন শুনবার অপেক্ষা করল।

'ঘটনার দিন অর্থাৎ শনিবার রাত্রে আপনি কি দিকনগরেই ছিলেন?

সুদর্শন বলল, 'ছিলাম। সন্ধ্যের পর একটু বেরিয়েছিলাম অবশ্য। ফিরতে সামান্য রাত হয়েছিল।'

'রাত হয়েছিল মানে? শেষরাতের দিকে ফিরেছিলেন নাকি?'

'না, না। শেষরাত্তির হবে কেন? রাত এগারোটার মধ্যেই ফিরেছিলাম।'

'কোথাও গিয়েছিলেন তাহলে? মানে দিকনগর ছাড়িয়ে?'

'হ্যাঁ। কোথাও মানে, এমনিই বেড়াব মনে করে বেরিয়ে পড়লাম। মথুরাপুর ছাড়িয়ে কিছুদূরে গিয়েছিলাম। ঐ যে আলোকপুর বলে একটা জায়গা আছে না, ওইখানে।'

রাজীব হেসে বলল, 'আলোকপুর! তাই না ম্যানেজার সাহেব?'

সুদর্শন জানতে চাইল, 'আপনি কখনও গিয়েছেন নাকি আলোকপুরে?'

'না, যাওয়ার সুযোগ হয়নি। রাজীব উত্তর দিল। বলল, 'কিন্তু এবার হয়ত যেতে হবে একবার।'

দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিল সুদর্শন। বলল, 'একটা টেলিফোন করে যখন খুশী চলে আসবেন। আচ্ছা, উইস ইউ গুড লাক অ্যান্ড সাকসেস।'

জীপে বসে সুব্রত ঢুলছিল। দু-তিনটে সিগারেট এরই মধ্যে ফুঁকে উড়িয়ে দিয়েছে। আধপোড়া অংশগুলি জীপের টায়ারের কাছে পড়ে। চারপাশে চনমনে রোদ, বাগানের গাছগাছালি, পক্ষীকুল এবং মিলের ছোটবড় কোয়ার্টারের বাসিন্দারা সবাই যেন দুপুর রোদে শান্ত হয়ে এসেছে। একটা নিঝুম ভাব ছড়িয়ে পড়তে দেরী নেই।

গাড়ীতে উঠে আনুপূর্বিক সমস্ত ব্যাপারটা সুব্রতকে শোনাল রাজীব।

অবাক হয়ে সুব্রত বলল, 'ওকে সাসপেক্ট বলে মনে করছেন, একথা কেন বলতে গেলেন রাজীবদা?'

'কি হবে বললে?'

'দোষী হলে ও খুব সাবধান হয়ে যাবে। আত্মরক্ষার জন্য জান দিয়ে লড়বে।'

তাচ্ছিল্য করে রাজীব বলল, 'কিছু করবে না। ওর ক্ষমতা কতদূর আমার জানা হয়ে গেছে। আসলে ও একটা কাগজের বাঘ।'

'লোকটা খুব স্নব, তাই না রাজীবদা?'

'বিলেত ঘুরে এসেছে। এতদিন বড় পোস্টে রয়েছে। কিছুটা স্নবারি থাকবেই।'

সুব্রত বলল, 'আপনি কিন্তু সাংঘাতিক লোক রাজীবদা। ক্যাশমেমো দেখে কি করে বুঝলেন যে মদ গিলতে সুদর্শন চক্রবর্তীই মেয়েটাকে নিয়ে হোটেলে ঢুকেছিল? অন্য কেউ তো হতে পারত?'

'ক্যাশমেমোটা তুমি দেখেছিলে সুব্রত?'

'বারে। আপনিই তো দেখালেন!'

'তাহলে শুধু দেখেছিলে। ওটা নিয়ে চিন্তা করনি?'

'ক্যাশমেমো নিয়ে চিন্তা করবার কি আছে?' সুব্রত ধীরে ধীরে বলল।

'সব মিলিয়ে তিপ্পান্ন টাকার ক্যাশ-মেমো। মদ আর দুজনের খাবারদাবার। জুলাই মাসের শেষ দিকে এক দমকায় অতগুলো টাকা কে ছুঁড়ে দিতে পারে? নিশ্চয়ই কোনো শাঁসালো মস্তান, আর এ ক্ষমতা নিখিলেশ সেনের হবে না। সুতরাং সুদর্শন চক্রবর্তীর দিকে চোখ গিয়ে পড়ছে।'

সুব্রত হাসিমুখে তাকাল। দুর্বোধ্য একটা ধাঁধার উত্তর পেলে ছেলেরা যেমন খুশী হয়ে চায়, ওর মুখভাবটা তেমনি দেখাল।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ টেবিলের উপর টেলিফোনটা বেজে উঠল। খুব মনোযোগ দিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরী করছিল রাজীব। বিরক্তমুখে টেলিফোনের হাতলটা তুলে নিল সে। এত রাতে কে আবার জ্বালাতে চাইছে? কি খবর দিতে চায় তাকে?

অপর প্রান্তের গলা শুনল রাজীব, 'হ্যালো, আপনিই কি স্যার সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর রাজীববাবু?'

কৌতূহলী মন নিয়ে রাজীব উত্তর দিল—'হ্যাঁ, কি বলবেন চটপট বলুন।'

'তরঙ্গ হত্যা কেসে আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই স্যার।'

'বেশ তো, কি নাম আপনার?'

'আমাকে নাম বললে তো আপনি চিনবেন না স্যার—'

'কোথায় গেলে আপনার সাহায্য পাওয়া যাবে?'—রাজীব জানতে চাইল।

কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'দিকনগর পেপার মিলে চলে আসুন স্যার। আমি আপনার জন্য গেটে দাঁড়িয়ে থাকব।'

রাজীব মুচকি হাসল। বলল, 'গেটে দাঁড়াতে হবে না। আমি ঠিক আপনাকে খুঁজে নেব।'

—'সে কেমন করে হবে স্যার? আপনি তো আমায় চেনেন না, বা নামও জানেন না।'

রাজীব উত্তর দিল, 'আপনাকে আমি চিনি মশাই, নামও জানি।'

লোকটার গলা কাঁপা কাঁপা শোনাল। টেলিফোনে সে বলল, 'কেন ঠাট্টা করছেন স্যার। আমাকে আপনি কস্মিন কালেও দেখেন নি। মিথ্যে এ গরীবের সঙ্গে কেন ছলনা করছেন দাদা?'

রাজীব শব্দ করে হাসল। লোকটার কথাবার্তা বলবার ভঙ্গি বিচিত্র। কণ্ঠস্বরও অদ্ভুত,—কেমন জড়ানো। রাজীবের মনে হল মানুষটা ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। সম্ভবত ড্রিংক করেছে।

টেলিফোনে আবার বলল সে, 'আমার সাহায্য পেলে আপনার সুবিধে হবে স্যার। যদি চলে আসেন তো—।'

রাজীব উত্তর দিল, 'বলেছি তো যাব। আপনাকে আমি চিনি। এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছি বলেই ধারণা আমার।'

'আমার নামও আপনি জানেন?' লোকটা সন্দেহের সুরে জানাল।

'মা বাবা আপনার নাম কি রেখেছিল তা অবশ্য জানিনে। তবে দিকনগরে আপনি যে নামে পরিচিত তা আমি জানি।'

'সেটা কি যদি অধমকে বলেন তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম স্যার।'

একগাল হেসে রাজীব প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি দারুণ ব্যক্তি। ভৈরব,—ভৈরব দত্ত নাম আপনার।'

আশ্চর্য। ও প্রান্ত থেকে রাজীব আর কোন সাড়াশব্দ পেল না।

(ক্রমশঃ)

সাময়িকপত্র সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের নাম-স্বাক্ষরিত বহু সমালোচনা-নিবন্ধ এখনো বিভিন্ন পুরাতন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, যা এপর্যন্ত কোনো স্বতন্ত্র পুস্তকে সংকলিত হয়নি রবীন্দ্রজীবনী বা অন্য কোনো গ্রন্থে আলোচিত হয়নি, রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোনো খণ্ডে বা সংগৃহীত হয়নি এবং রচনাবলীর অন্তর্গত 'গ্রন্থ পরিচয়ে'র মধ্যে যে-রচনার অস্তিত্বের সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই।

এই শ্রেণীর রচনাগুলির মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি সম্পূর্ণ নূতন অনালোচিত মূল্যবান পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়ে ওঠে। সাময়িকপত্র সম্পাদনকালে রবীন্দ্রনাথ এক সময় তাঁর নিজের পত্রে পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে সমকালীন বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খ্যাত ও অখ্যাতনামা সকল শ্রেণীর লেখকের বিবিধবিষয়ক অজস্র রচনার সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন, যার ইতিহাস আজ ক্রমেই বিস্মৃত হতে চলেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সব্যসাচী' কি একা বঙ্কিমচন্দ্র? পত্রিকার সম্পাদক হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রই কি কেবল 'এক হস্ত গঠন কার্যে এক হস্ত নিবারণ কার্যে নিযুক্ত রেখেছিলেন? 'একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম ও ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন'—এ কি কেবল একা বঙ্গদর্শনের সম্পাদক? সাহিত্যে তো সর্বকালেই একদিকে আগুন জ্বলে, আর একদিকে ভস্মরাশি স্তূপীকৃত হয়। কিন্তু একই সঙ্গে আগুন জ্বালানোর ভার এবং ধূম ও ভস্মরাশি দূর করবার দায়িত্ব কি আর কেউ নেন নি? বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের পর বাংলা সাহিত্যে আরও একজন সব্যসাচী সমালোচক আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

সাময়িকপত্রের নিয়মিত বিভাগে সমকালীন পত্র-পত্রিকার সমালোচকরূপে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত মাসিক 'সাধনা' পত্রিকায়। সম্পাদক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের নাম থাকলেও রবীন্দ্রনাথই মূলতঃ এই পত্রিকার সকল অংশ সম্পাদন করতেন। 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচন' বিভাগটি রবীন্দ্রনাথ স্বনামেই পরিচালন করেছিলেন। এরপর ১৩০৫-এর বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক হন এবং 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচন' বিভাগটির, অর্থাৎ সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলি সমালোচনার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন।

এখানে, রবীন্দ্রনাথ কোন্ পত্রিকার কোন্ সংখ্যায় সমকালীন কোন্ পত্রিকার কোন্ সংখ্যার লেখার কিরূপ সমালোচনা করেছিলেন, কিছু কিছু উদ্ধৃতির সাহায্যে তার পরিচয় দেওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ যে-পত্রিকার যে-সংখ্যায় সমালোচনা করেন তা প্রথমে প্রদত্ত হল, পরে সমালোচিত পত্রের নাম ও সংখ্যা উল্লিখিত হল। পত্রপত্রিকা সমালোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় কতগুলি পৃষ্ঠা ব্যয় করতেন এবং তাঁর এই বিস্মৃতপ্রায় রচনাগুলির সামগ্রিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য, পত্রিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যাও দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ যে-সকল স্থানে লেখকের নাম উল্লেখ না করে রচনার সমালোচনা করেছেন, সে সকল ক্ষেত্রে মূল পত্রিকা থেকে রচনাকারের নাম যথাসাধ্য সংগ্রহ করে প্রাসঙ্গিক স্থানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হল। আনুষঙ্গিক তথ্যাদিও উক্ত বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধনা।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

(ক) ভারতী ১২৯৮ আশ্বিন ও কার্তিক। এবারকার ভারতীতে 'লজ্জাবতী' নামক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে (মূল পত্রিকায় লেখকের নাম নেই)। এ রচনাটি ছোটগল্পলেখার আদর্শ বলিলেই হয়। দুটি একটি বাঙ্গালী অন্তঃপুরবাসিনীর জাজ্বল্যমান ছবি আঁকা হইয়াছে অথচ তাহাকে কোন প্রকার কাল্পনিক ভঙ্গী করিয়া বসান হয় নাই, যেমনটি তেমনি উঠিয়াছে। কোন বাড়াবাড়ি নাই, রকমসকম নাই, রোমহর্ষণ ভাষা প্রয়োগ নাই, অথচ সমাপ্তিকালে পাঠকের চোখে অতি সহজে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইয়া আসে। 'বিলাপ' একটি গদ্য-প্রবন্ধ (ক্ষীরোদচন্দ্র রায় লিখিত)। কিন্তু ইহাতে না আছে গদ্যের সংযম, না আছে পদ্যের ছন্দ। আজকাল এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল অমূলক প্রবন্ধ বাঙ্গলা ভাষায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন লেখার কোন আবশ্যক দেখি না।......

(খ) নব্যভারত ১২৯৮ আশ্বিন ও কার্তিক।...শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় 'শকাব্দ' প্রবন্ধে শকাব্দ প্রবর্তনের ইতিহাস সমালোচনা করিয়াছেন। সাধারণের

বিশ্বাস, এই অব্দ বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রচলিত। লেখক প্রমাণ করিতেছেন যে, এক সময় মধ্য-এসিয়াবাসী শক জাতি (ইংরেজিতে যাহাদিগকে সাইথিয়ানস্ বলে) ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া এই অব্দ প্রচলিত করে। লেখক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন। রচনাটি অতিশয় প্রাঞ্জল হইয়াছে। সাধারণতঃ বাংগলা সাময়িকপত্রে পুরাতত্ত্ব প্রবন্ধগুলি অসংখ্য তর্কজালে জড়িত হইয়া পাঠক-সাধারণের যেরূপ একান্ত দুর্গম ও ভীতিজনক হইয়া উঠে, এ লেখাটিতে সে অপবাদ দেওয়া যায় না—আশ্চর্য এই যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুসংলগ্ন সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য।......

(গ) সাহিত্য ১২৯৮ আশ্বিন। এই সংখ্যায় 'ফুলদানী' নামক একটি উপন্যাস ফরাসীস্ হইতে অনুবাদিত [প্রমথনাথ চৌধুরী কর্তৃক] হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লেখক প্রস্পর মেরিমে প্রণীত এই গল্পটি বাদও সুন্দর কিন্তু ইহা বাংগলা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড় বেশি য়ুরোপীয়—ইহাতে বাংগালী পাঠকদের রসাস্বাদনের বড়ই ব্যাঘাত করিবে। এমনকি সামাজিক প্রথার পার্থক্য হেতু মূল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে। বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষামাধুর্য অনুবাদে কখনই রক্ষিত হইতে পারে না সুতরাং রচনার আব্রুটুকু চলিয়া যায়।......

(ঘ) সাহিত্য ১২৯৮ কার্তিক।...এই সংখ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। ইহাতে অলংকারবাহুল্য বা আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই। পূজনীয় লেখক মহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া মনে একান্ত আক্ষেপ জন্মে। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙালীদের পক্ষে শিক্ষার স্থল হইত। প্রথমতঃ এই অকৃত্রিম মহত্ত্বের আদর্শ বংগসাহিত্যে চিরজীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিত, দ্বিতীয়তঃ আপনার কথা কেমন করিয়া লিখিতে হয় বাংগালী তাহা শিখিতে পারিত। সাধারণতঃ বাংগালী লেখকেরা নিজের জবানী কোন কথা লিখিতে গেলে অতিশয় সহৃদয়তা প্রকাশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন—হায় হায় মরি মরি শব্দে পদে পদে হৃদয়াবেগ ও অশ্রুজল উদ্বেলিত করিয়া তোলেন। 'আত্মজীবনচরিত যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি সংযত সহৃদয়তা এবং নিরলঙ্কার সত্য প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি লেখক মহাশয় যে ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কেমন সরল সমূলক ও অকৃত্রিম। আজকাল যাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি আধ্যাত্মিক দেবত্ব আরোপ করিয়া বাকচাতুরী প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত কি প্রভেদ!

সাধনা ১২৯৮ পৌষ
পৃঃ ১৮২—১৮৮

(ক) নব্যভারত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ 'হিন্দুধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার' নামক প্রবন্ধে লেখক [দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়] প্রথমে বাঙলার শিক্ষিত সমাজে হিন্দুধর্মের নূতন আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন. তাহার পর দেখাইয়াছেন আমাদের বর্তমান অবস্থায় পুরাতন হিন্দু প্রথা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রচলিত হওয়া অসম্ভব।...এই প্রবন্ধের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও চিন্তার বিষয় আছে: কেবল একটা কথা আমাদের নূতন ঠেকিল। বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন একথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে।...

(খ) সাহিত্য ১২৯৮ অগ্রহায়ণ।... 'মুক্তি' একটি ছোট গল্প [নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত] কতকটা রূপকের মত। কিন্তু আমরা ইহার উপদেশ সম্যক গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মুক্তি যে সংসারের বাহিরে হিমালয়ের শিখরের উপরে প্রাপ্তব্য তাহা সংগত বোধ হয় না।...

সাধনা ১২৯৮ মাঘ
পৃঃ ২৮২—২৮৫

(ক) নব্যভারত ১২৯৮ পৌষ। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংখ্যায় 'হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস' প্রবন্ধে প্রাচীন হিন্দুদিগের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনা করিয়াছেন।...রমেশবাবু নিজের পাণ্ডিত্য আড়ালে রাখিয়া আলোচ্য বিষয়টিকেই যে প্রকাশমান করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে আমরা বড় আনন্দলাভ করিয়াছি। লতাগুল্মসমাকীর্ণ অন্ধকার অরণ্যপথ ছাড়িয়া সহসা যেন একেবারে রাজপথে আসিয়া পড়িয়াছে।

(খ) সাহিত্য ১২৯৮ পৌষ। পূর্ব মাস হইতে সাহিত্যে 'রায় মহাশয়' নামক এক উপন্যাস [হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত] বাহির হইতেছে। গল্পটি শেষ না হইলে কোন মত দেওয়া যায় না। এই পর্যন্ত বলিতে পারি ভাষাটি পরিষ্কার এবং সরস ও পল্লিগ্রামের জমিদারী সেরেস্তার বর্ণনা অতিশয় যথাযথরূপে চিত্রিত হইতেছে।...

(গ) সাহিত্য ও বিজ্ঞান ১২৯৮ কার্তিক। এই নামে এক নূতন মাসিকপত্র বাহির হইতেছে। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর 'এটা কোন যুগ' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখাটি বিশেষ কৌতুকাবহ।...

সাধনা ১২৯৮ ফাল্গুন
পৃঃ ৩৭১—৩৭৮

(ক) সাহিত্য ১২৯৮ ফাল্গুন।...'রায় মহাশয় গল্পে বাংগালার জমিদারী শাসনের নিষ্ঠুর চিত্র বাহির হইতেছে। ক্ষমতাশালী লেখকের রচনা পড়িয়া সমস্তটা অত্যন্ত সম্ভাবং প্রতীয়মান হয়; আশা করি ইহার মধ্যে কিছু কিছু অত্যুক্তি আছে।

সাধনা ১২৯৮ চৈত্র
পৃঃ ৪৫৮—৪৬৩

(ক) নব্যভারত ১২৯৮ মাঘ ও ফাল্গুন। 'আলোক কি অন্ধকার?' সম্পূর্ণ অন্ধকার। এবং এরূপ লেখায় [লেখক সিদ্ধেশ্বর রায়] সে অন্ধকার দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কি করিলে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন সংঘটন হইতে পারিবে লেখক তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।... 'দোকানদারী' —বংগসাহিত্যে এই ধরণের অশ্রু গদগদ সানুনাসিক প্রলাপোক্তি উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। [অনঙ্গমোহন ঘোষ লিখিত] কোন উচ্চ শ্রেণীর সাময়িকপত্রে এরূপ গদ্য প্রবন্ধ কেন স্থানপ্রাপ্ত হয় বুঝা কঠিন।

(খ) সাহিত্য ১২৯৮ ফাল্গুন।... 'কাশ্মীর'—এরূপ সাময়িক প্রসংগ লইয়া বাংগলা কাগজে প্রায়ই লেখা হয় না। তাহার কারণ উপযুক্ত লেখক পাওয়া কঠিন। কেবল অন্ধভাবে ইংরাজী কাগজের অনুবাদ বা প্রতিবাদ করিলে সকল সময়ে সত্য পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রবাবু [নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত] কাশ্মীরের বর্তমান বিপ্লব সম্বন্ধে এই যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন ইহা কোন কাগজের প্রতিধ্বনি নহে; ইহা তিনি স্বয়ং রংগভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া লিখিয়াছেন। সমালোচ্য প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদরণীয়।

সাধনা ১২৯৯ বৈশাখ
পৃঃ ৫৫১—৫৫৫

(ক) নব্যভারত ১২৯৮ চৈত্র। 'পঞ্জিকা বিভ্রাট'—প্রবন্ধটি [অপূর্বচন্দ্র দত্ত লিখিত] ভাল এবং আবশ্যক কিন্তু সাধারণের আয়ত্তগম্য নহে।...

(খ) সাহিত্য ১২৯৮ চৈত্র। চৈত্র মাসের সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'প্রাচীন ভারত' প্রবন্ধে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা শিলাদিত্যের রাজত্বকালীন 'সন্তোষ ক্ষেত্রের উৎসব' ব্যাপারের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।..

সাধনা ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ
পৃঃ ১০১—১০৪

(ক) নব্যভারত ১২৯৯ বৈশাখ। 'পুরাতন ও নূতন'—লেখক মহাশয়ের [মূল পত্রিকায় লেখকের নাম নেই। বক্তব্য এই যে, নূতন আসে এবং পুরাতন যায়—কিন্তু হায়, বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিশ্বব্যাপী নিয়মের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পদের পর পদ আসিতেছে কিন্তু পুরাতন কথাও ঘুচে না নূতন কথাও জুটে না।...

(খ) সাহিত্য ১২৯৯ বৈশাখ। প্রভাবতী সম্ভাষণ — স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণারসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর অপত্য-নির্বিশেষে ভালবাসিতেন। তাঁহার অকাল

যেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে—তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কার্য স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর—তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দিষ্ট নিয়মানুগত—অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি দেওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিমবাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভাল হইয়াছে সন্দেহ নাই।...

ভারতী ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ

পৃঃ ১৯০—১৯২

(ক) প্রদীপ ১৩০৫ বৈশাখ। 'লাল পল্টন' ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের রচনা। বিষয় এবং লেখকের নাম শুনিলেই পাঠকদের সন্দেহ থাকিবে না যে প্রবন্ধটি সর্বাংশেই পাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু আমাদের একটি বক্তব্য আছে। প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং গত দুই-তিনবারের অনুবৃত্তি। আমাদের বিবেচনায় ধারাবাহিকরূপে গ্রন্থ প্রকাশ সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য নহে। সাময়িক পত্রে বিচিত্র খন্ড প্রবন্ধ এবং সাময়িক বিষয়ের আলোচনায় পাঠকদের চিত্তকে নানা দিকে সজাগ করিয়া রাখে। কোন শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বিস্তৃত বিষয়কে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা স্বভাবতই ইহার কার্য নহে। কারণ, বৃহৎ বিষয় অখন্ড মনোযোগের দাবী রাখে, একক-সমগ্রতাই তাহার প্রধান গৌরব, নানা বিচিত্র বিষয়ের মাঝখানে তাহাকে টুকরা করিয়া বসাইয়া দেওয়া অসঙ্গত।...'বিজ্ঞান বা প্রকৃতির ইচ্ছা'—আমরা এরূপ গদ্য রচনার পক্ষপাতী নহি। ইহার মধ্যে ভাবুকতার চেষ্টা এবং চিন্তাশীলতার আড়ম্বর আছে কিন্তু আসল জিনিষটুকু নাই।...

(খ) উৎসাহ ১৩০৪ ফাল্গুন চৈত্র।... 'ভৌতিক নোট' — গল্পটি সুনিপুণ [উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত]। 'ছোট কথা' [মূল পত্রিকায় লেখকের নাম নেই] আকারে অতি ছোট এবং উপদেশে অত্যন্ত বড় বটে কিন্তু বিষয়ে অতিশয় পুরাতন এই জন্য রচনার বিশেষ নৈপুণ্য না থাকায় নিরর্থক।...

ভারতী ১৩০৫ আষাঢ়

পৃঃ ২৮২—২৮৮

(ক) নব্য ভারত ১৩০৫, বৈশাখ। 'কি চাই কি পাই?' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা সম্পাদকের [দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী] জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছি। দোষ-দুর্বলতা আমাদের সকলেরই আছে এবং মাটির পৃথিবীতে দোষ-গুণে জড়িত আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদিগকে লইয়া আমরা কোনপ্রকারে সন্তোষ অবলম্বন করিয়া আছি। নব্যভারতের ষোড়শবার্ষিক জন্মদিনে সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন—'পঞ্চদশ বর্ষ আমি কেবল আদর্শ খুঁজিতেছি।'...এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের নিকট আমাদের একটি মিনতি আছে। যদিও তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশি তথাপি বিস্ময়সূচক বা প্রবণতাসূচক তিলক চিহ্নকে একাধিক করিয়া তুলিলে কোথাও তাহার সীমা স্থাপন করা যায় না। ভাবিয়া দেখুন কোন একটি নব্যতর ভারত সম্পাদকের হৃদয়োচ্ছ্বাস যদি দুর্দৈবক্রমে দ্বিগুণতর হয়, তবে তিনি 'কি তীব্র অভিজ্ঞতা' লিখিয়া তাহার পশ্চাতে চারটি !!!! তিলক চিহ্ন বসাইতে পারেন—এবং এইরূপ রোখ চড়িয়া গেলে ক্রমে ভাষার অপেক্ষা ইঙ্গিতের উপদ্রব বাড়িয়া চলিবে। এ কথা সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয় মানিবেন, তাহার ভাষাই যথেষ্ট, তাহার ভঙ্গিমাও সামান্য নহে, তাহার পরে যদি আবার মুদ্রাদোষ যোগ করিয়া দেন, তবে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে কিছু অধিক হইয়া পড়ে।

(খ) প্রদীপ ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ। 'নবদ্বীপ' কবিতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত। কবিতাটি একদিকে সহজ এবং ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ অপরদিকে গম্ভীর এবং ভক্তিরসার্দ্র; একত্রে এরূপ অপূর্ব সম্মিলন যেমন দুরূহ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে ভাষা ছন্দ এবং মিলের প্রতি কবির অনায়াস অধিকার পদে পদে সপ্রমাণ হইয়াছে।...

(গ) উৎসাহ ১৩০৫ বৈশাখ।...'সে দেশে' শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের রচিত একটি কবিতা। কবিতা সমালোচনা করিতে আমরা সংকোচ বোধ করি কিন্তু এস্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এই আটটি শ্লোকের কবিতাকে চারিটি শ্লোকে পরিণত করিলে ইহার গীতিরস-মাধুর্য সুন্দর সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠে—ইহার জোড়া জোড়া শ্লোকের দ্বিতীয় শ্লোকগুলি বাহুল্য এবং তাহারা অতি বিস্তারে ভাবের গাঢ়তা হ্রাস করিয়াছে। আমরা নিম্নে এই মধুর কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ দিলাম:—

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়
সে দেশে সরলা আছে,
তাই ফুল ফোটে গাছে
কোকিল কুহরি উঠে, কথা যদি কয়।
সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।
সরলা আছে সে দেশে,
তারি নীল কালকেশে,
খেলে প্রেম ইন্দ্রধনু চারু শোভাময়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।...

[উৎসাহ পত্রিকা থেকে গোবিন্দচন্দ্র দাসের মূল কবিতার অংশ উদ্ধৃত হল:

১

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়,
সে দেশে সরলা আছে,
তাই ফুল ফোটে গাছে,
তাহারি গায়ের গন্ধ পরিমলময়।
সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।

২

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়,
সে দেশে সরলা আছে,
তাই শ্যামা ডাকে গাছে,
কোকিল কুহরি উঠে কথা যদি কয়।
সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।

৩

সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়,
সরলা আছে সে দেশে,
তারি নীল কাল-কেশে,
খেলে প্রেম-ইন্দ্রধনু চারু শোভাময়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।

গোবিন্দচন্দ্র পরবর্তীকালে 'বৈজয়ন্তী' নামক কাব্যগ্রন্থে এই কবিতার স্বকৃত পাঠই পুনর্মুদ্রিত করেন।]

ভারতী ১৩০৫ শ্রাবণ

পৃঃ ৩৭৩—৩৮১

(ক) নব্যভারত ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।...শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল ইংরাজি কবি হুড্ রচিত 'এ প্যারেন্টাল্ ওড্ টু মাই সন্' নামক কবিতার মর্ম গ্রহণ করিয়া 'আদর' নামক যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে— তাহাতে মূল কবিতার হাস্যমিশ্রিত স্নেহরসটুকু আছে অথচ তাহাতে অনুবাদের সংকীর্ণতা দূর হইয়া কবির স্বকীয় ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।...

(খ) সাহিত্য ১৩০৪ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র। গত বর্ষের মাঘ ফাল্গুন ও চৈত্রের সাহিত্য একত্রে হস্তগত হইল। বাংলায় আজকাল ইতিহাসের আলোচনা সাহিত্যের অন্য সকল বিভাগকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে 'সাহিত্য' পত্রের সমালোচ্য তিন সংখ্যা তাহার প্রমাণ।...

(গ) পূর্ণিমা ১৩০৩ শ্রাবণ। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়'—লেখক মহাশয় বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে সমালোচকদের প্রতি এতই রুষ্ট হইয়াছেন যে প্রবন্ধের একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন 'ইনিও (বঙ্কিমবাবু) নিন্দুকের নিন্দা অথবা মূর্খের ধৃষ্টতা হইতে নিরাপদ হইতে পারেন নাই।' এইরূপ সাধারণভাবে রূঢ় উক্তি, হয় অনাবশ্যক, নয় অন্যায়। কারণ, নিন্দুক ও মূর্খগণ, কেবল বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কেন, অনেকেরই সম্বন্ধে নিন্দা ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে,—সেটা কিছু নূতন কথাও নহে, আশ্চর্যের কথাও নহে। তবে যদি এ কথা লেখকের বলিবার অভিপ্রায় হয় যে, যাহারা বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছে তাহারা মূর্খ ও নিন্দুক তবে তিনি নিজেও অপবাদভাজন হইবেন।...

(ঘ) প্রদীপ ১৩০৫ আষাঢ়। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি আন্তরিক সহৃদয়তা ও সরলতাগুণে সবিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। সাধারণ লেখকের হচ্ছে পড়িলে সুলভ এবং শূন্য
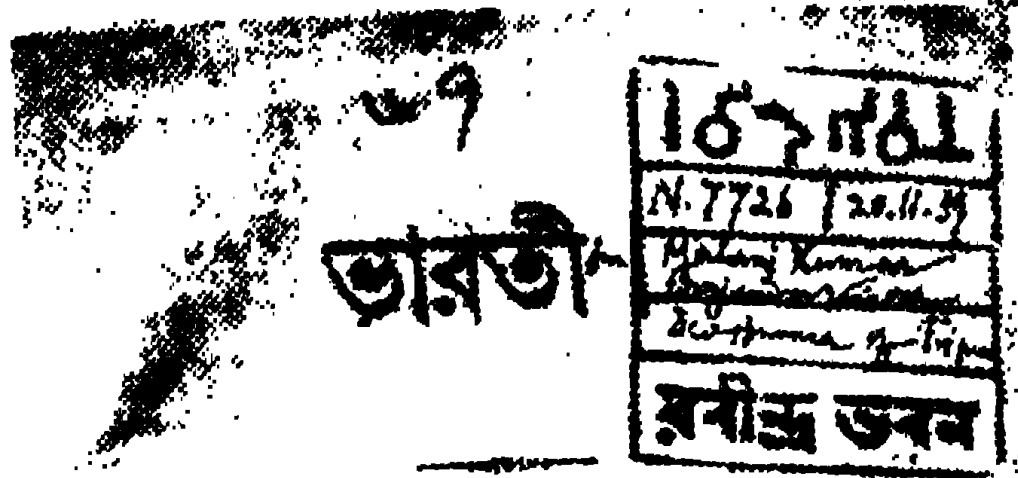
ভারতী
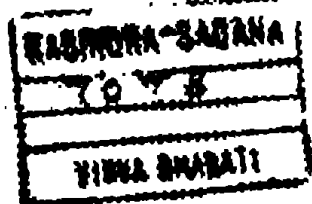
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

প্রকাশিত।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

নবম বর্ষ।

কলিকাতা;

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত

হৃদয়োচ্ছ্বাসের আড়ম্বরে প্রবন্ধটি স্ফীত-ফেনিল হইয়া উঠিত।...

ভারতী ১৩০৫ ভাদ্র
পৃঃ ৪৭৯—৪৮০

(ক) সাহিত্য ১৩০৫ বৈশাখ। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ।...'মহারাজ রামকৃষ্ণ' পাঠকদের বহু আশাউদ্দীপক একটি প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ [অক্ষয়কুমার মৈত্র লিখিত]।...

(খ) প্রদীপ ১৩০৫ শ্রাবণ। 'জীবজাতি নির্বাচন' প্রবন্ধটি [যোগেশচন্দ্র রায় লিখিত] সরল অথচ গম্ভীর এবং চিন্তা উদ্রেককারী।...

ভারতী ১৩০৫ আশ্বিন
পৃঃ ৫৭৪—৫৭৬

(ক) সাহিত্য ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা একত্রে হস্তগত হইল।...'সেকালের কলিকাতা গেজেট' সুপাঠ্য কৌতুকাবহ প্রবন্ধ [অক্ষয়কুমার মৈত্রের লিখিত]।...

(খ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত। বর্তমান সম্পাদকের হস্তে আসিয়া অবধি [১৩০৪ সাল থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক হন। এর পূর্বে সম্পাদক ছিলেন রজনীকান্ত গুপ্ত।] এই পত্রিকা আশাতীত গৌরবলাভ করিয়াছে।...

(গ) প্রদীপ ১৩০৫ ভাদ্র। 'ছেলেকে বিলাতে পাঠাইব কি?' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক সরস ভাষায় সময়োপযোগী আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন।...

(ঘ) উৎসাহ ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। 'বিশ্বরচনা' প্রবন্ধটি [মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত] সুগম্ভীর। 'জগৎ শেঠ' নিখিল-বাবুর [নিখিলনাথ রায়] রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে বাংলার ইতিহাস উত্তরোত্তর সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি।...

ভারতী ১৩০৫ অগ্রহায়ণ
পৃঃ ৭৬২—৭৬৬

(ক) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৫ম ভাগ ৩য় সংখ্যা [১৩০৫]। বর্তমান সংখ্যাটি বিচিত্র বিষয়বিন্যাসে বিশেষ ঔৎসুক্য-জনক হইয়াছে। পত্রিকায় চণ্ডিদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহু মূল্যবান। বিশেষতঃ কয়েকটি পদের মধ্যে চণ্ডিদাসের জীবন বৃত্তান্তের যে আভাস পাওয়া যায় তাহা বিশেষ কৌতুকাবহ। সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সে জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন।...

(খ) প্রদীপ ১৩০৫ আশ্বিন ও কার্তিক। এই যুগল সংখ্যক প্রদীপ পাঠ করিয়া আমরা সবিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার প্রায় প্রত্যেক গদ্যপ্রবন্ধই আদরণীয় হইয়াছে। বাংলা সাময়িক পত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে'র মত প্রবন্ধ কদাচিৎ বাহির হয়। শাস্ত্রী মহাশয় প্রচুর ভাবসম্পদের অধিকারী হইয়াও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কৃপণতা করিয়া থাকেন এ অপবাদ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে।...সর্বশেষে আমরা প্রদীপের উন্নতির সঙ্গে তাহার স্থায়িত্ব কামনা করি। প্রদীপ যেরূপ প্রচুর পরিমাণে তৈল পুড়াইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় কোন্ দিন তাহার অকাল নির্বাণ হইবে। এত ছবি না ছাপাইয়া এত খরচপত্র না করিয়াও কেবল প্রবন্ধগৌরবে প্রদীপ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

তীর্থ সলিল

ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ প্রায় দুই দশক-কাল ধরে বিশ্বভারতীতে আধুনিক ইয়োরোপের ভাষাসমূহ বিষয়ে অধ্যাপনা করছেন এবং দুই বছরকাল বিদেশে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাবলী স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে।

কিছুকাল বিদেশে কাটানোর সময় শিশিরকুমার বহু মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন এবং কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। সেই সব প্রবন্ধাবলীর কিছু অংশ তাঁর সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থ MINE OYSTER নামক গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে। লেখকের মানসিক সরসতার ফলে প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হয়। 'এ প্যাসেজ টু আমেরিকা' প্রবন্ধে যে-চিত্র এঁকেছেন তা উপভোগ্য। লণ্ডনে প্রাক্তন ছাত্র ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং সহায়তা, ওয়াশিংটনের হোটেল-বিভ্রাট এবং ওয়াশিংটন ত্যাগের প্রাক্কালে ভারতীয় এমব্যাসী ভবনে পেঁছে লেখকের মনে হয়েছে যেন এডগার ওয়ালেসের কাহিনীর অভ্যন্তরে এসে পড়েছেন। জেফারসনে একটি জুনিয়র হাইস্কুলে প্রায় পাঁচশজন ছাত্রদের একটি ক্লাসে লেখক কিছু বলেছিলেন, সেই কথাগুলি যা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে আছে ভারতের মর্মবাণী।

মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যে ভারতের সনাতন ধর্ম—এ-কথা তিনি বলেছেন, তিনি বলেছেন, ছেলেরা মারামারি করে কিন্তু বুড়োরা যা করে তা আরো বীভৎস। তিনি রাজা অশোকের কথা উল্লেখ করেছেন।

ডাঃ নাইহার্ডট থাকতেন লেখকের পাশের ঘরে, তিনি কবি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আবাসিক কবি'। শোনা গিছল, তিনি ভারতীয় মরমীয়াবাদ বিষয়ে (মরমীয়াবাদ মিস্টিসিজমের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হল) একটা ভাষণ দেবেন। লেখক পরে শুনলেন যে, এখানে ইণ্ডিয়ান মানে রেড ইণ্ডিয়ান। তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এবং পরদিন পথে পরিচয় হল। ডাঃ নাইহার্ডট রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়েছেন এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা বৈদান্তিক।

ডাঃ নাইহার্ডট বলেছেন যে, ভারতবর্ষের যোগী আর স্বামীদের চরণতলে বসে তাঁদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান। এই গ্রন্থে কবিতা সম্পর্কে তিনটি বিভিন্ন প্রবন্ধ আছে, তিনটি প্রবন্ধে অনেক নতুন চিন্তার পরিচয় আছে। স্থানাভাবে এই তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হল না। তাছাড়া 'ল্যাম্বারেণের প্রাচীন মানুষ' শীর্ষক আলবেয়ার সোয়াইসার সম্পর্কিত আলোচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোয়াইসারের লোকান্তরের এক বছর আগে এই প্রবন্ধটি লিখিত। ল্যামবারেণের এই মহর্ষি সম্পর্কে ডঃ শিশির ঘোষ অনেক নূতন তথ্য পরিবেশন করেছেন।

ডঃ ঘোষ বলেছেন, পশ্চিম উপকূল পরিভ্রমণে সর্বোত্তম প্রাপ্তি হল—অলডাস হাক্সলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অলডাস হাক্সলী একটি প্রায় পোড়ো-বাড়িতে থাকেন, কেউ কোথায় নেই, সব দেখে মন দমে যায়। পরে জানা গেল যে, হাক্সলী একখানি মাত্র ঘরে থাকেন তখন। মাইলখানেক দূরে হাক্সলীর যে-বাসভবন ছিল, সেটি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে, শুধু আন্তনিয়ো স্ট্রাডিভারী (১৬৪৪—১৭৩৭) নির্মিত বেহালা এবং 'আইল্যাণ্ড' নামক শেষতম উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি বেঁচে গিয়েছে। হাক্সলীর সঙ্গে দেখা হল, তাঁর আকৃতির সঙ্গে আগে দেখার প্রতিকৃতির মিল নেই এবং তিন দশক আগে লেখা তাঁর ভারতভ্রমণ কথা 'জেসটিং পাইলেট' গ্রন্থের মানসিকতা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর আমন্ত্রণে তিনি ভারতে এসেছিলেন, তবে এই যাত্রায় তিনি তিনদিন শতবার্ষিকী উৎসবে কাটিয়ে মাদ্রাজে কৃষ্ণমূর্তির কাছে গিয়েছিলেন। নেহরু তখন মেক্সিকোয়। দেখা হয়েছিল দেওয়ান চমনলাল আর আকাদেমির কৃষ্ণ কৃপালনীর সঙ্গে। ভাষার প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেন,

কোন্ ভাষার মাধ্যমে আজকাল ভারতে লেখাপড়া শেখানো হয়? ইংরাজী এবং আঞ্চলিক ভাষার লড়াই-এর কথা বলতে হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ইংরাজীর পক্ষেও অনেকে। হাক্সলী প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, 'টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ' গ্রন্থটি তাঁর কাছে প্রিয়।

বিভিন্ন বিষয়ে এ-যুগের একজন প্রকৃত বিদগ্ধ মানুষের সঙ্গে আলাপচারের বিস্তারিত বিবরণ পাঠকচিত্তে আগ্রহ সঞ্চার করে। মনস্তত্ত্ববিদ ইয়া 'প্রোগোফের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণটি মনোজ্ঞ। লেখকের এই গ্রন্থে যে ডাক্তার-প্রসঙ্গ আছে, তার উল্লেখ না করাটা অন্যায়। ডাক্তার এম— ভারতবর্ষীয় বঙ্গসন্তান, এবং যেহেতু তিনি বঙ্গসন্তান, তাই ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে 'সন অব দি সয়েল' নন বলে কাজ পাননি, যে-প্রদেশে ডোমিসাইলড, সেখানেও নয়, ফলে তাঁকে সদ্য নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত ডঃ খোরানার মত আমেরিকায় বসবাস করতে হচ্ছে। তাঁর সহৃদয়তা এবং স্বদেশপ্রীতি অতুলনীয়। তাঁর বাসভবনে কে, পি, এস মেনন থেকে শুরু করে সর্বশ্রেণীর ভারতীয়ের অবারিত দ্বার।

ডাক্তার এম, যাঁরা তাঁর স্বদেশকে নিন্দা করে বা তুচ্ছ করতে চায়, তিনি তাদের বিরোধী, তিনি বলেন, সব সময়েই আমরা নিন্দাবাদ শুনব, গালাগাল খাব এবং সাধুর মত নিস্পৃহ হয়ে বসে থাকব বিতর্কে নামা অভব্যতার পরিচায়ক মনে করে—এটা ঠিক নয়।

ডাক্তার এম—বিদেশে বসে স্বদেশের নিন্দা এবং কেচ্ছা রটনার ব্যবসায় ক্লেশবোধ করেছেন। তাঁর মত আরো অনেকে হয়ত অনুরূপ ক্লেশবোধ করেন, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান মানসিক গড়ন এমনই 'আত্মভোলা' এবং একালের মানুষ এতই আত্মকেন্দ্রিক যে, সেই তুরীয় অবস্থায় এই জাতীয় নিন্দাবাদ বোধহয় প্রীতিকর। গাজনের সন্ন্যাসীরা যেমন গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে আনন্দ পায়, এই নিন্দা এবং কেচ্ছা প্রচারে অনেকে আনন্দ পায়। ডাক্তার এম-এর মত যেসব ভারতীয় বিদেশে আছেন, স্বদেশের এই জাতীয় নিন্দা প্রচারে তাঁরাই জ্বালা অনুভব করেন বিশেষ করে। স্বদেশের ভূমিতে বসে এদেশের মানুষ এখনও স্বপ্নচেতন্য।

বার্নাড শ' বলেছেন—'কোনো প্রত্যাশা রেখো না, তাহলেই জীবন মধুর বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।' লেখকেরও সেই দশা। সান ফ্রান্সিস্কোর বেদান্ত প্রচার-কেন্দ্রে এক রবিবার যাত্রা করলেন। সেখানে প্রার্থনা-কক্ষ ভিড়ে বোঝাই। সকলেই মন দিয়ে শুনছেন, পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা বেশি। এক ধারে দাঁড়িয়ে লেখক কথা বলছেন, মস্তকমুণ্ডিত একজন মার্কিন সাধু এসে পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন করলেন—

আপনারা কি বাঙালী? তারপর যথারীতি বন্দরের ঘোর কাটিয়ে নানা প্রসঙ্গ ওঠে। মার্কিন ভদ্রলোক বললেন—তিনি কিছুদিন ভারতে ছিলেন, সেটাই তাঁর আত্মিক আবাস। বাংলা 'একটু একটু' বলতে পারেন। জানা গেল, তিনি গুরু যোগানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, নাম ভক্তিস্বরূপানন্দ। তিনি একটি আশ্রমে তপস্যা করার অনুমতি নিতে এসেছিলেন। সাথের একটি ছোট্ট মোটর, সেটি পিতৃদত্ত। তার ভিতর একটি তানপুরা, রীতিমত ওয়াড় লাগানো। যখন প্রশ্ন করা হল, গান জানেন? তিনি বললেন—সামান্য কীর্তন-ভজন ইত্যাদি করি। সংস্কৃত তাঁর অন্তরে শিহরণ আনে, সেটি হয়ত সংস্কার। লেখক প্রশ্ন করেছিলেন—কেন তিনি যোগে আকৃষ্ট হলেন? সাধু বললেন—চিরদিনই অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি আকুলতা ছিল, সেই আকুলতাই এই ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তপস্যা তিনি করেছেন, তার অভিজ্ঞতা প্রচণ্ড। কিন্তু ঠিক যে কি তা বলা কঠিন, তারপর হেসে প্রশ্ন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ বা রিলকে পড়ে সত্যি কি আনন্দ পাওয়া যায় তা কি প্রকাশ করা যায়? 'আবার দেখা হবে' এবং 'নিশ্চয়ই'—এই কথাটির মধ্যে এই আলাপচারের সমাপ্তি।

ডঃ শিশিরকুমার ঘোষের অসামান্য লিপিকুশলতায় অতিশয় জটিল প্রসঙ্গ সরস এবং সরল হয়েছে, এই গ্রন্থের সেই আকর্ষণও তুচ্ছ নয়।

—অভয়ঙ্কর

MINE OYSTER — Essays & Encounters: By Dr. Sisir Kumar Ghose.—Published by CHATUSKONE (P.) Ltd.: 123 Acharya Jagadish Bose Road Calcutta-14. Price Rupees Twenty only.

ভারতীয় সাহিত্য

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ॥

আধুনিক অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের পথিকৃৎ মনীষী সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব গত ১৯ অকটোবর সন্ধ্যায় স্থানীয় তথ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই উৎসবে ভাষণ দেন সর্বশ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, অমলেন্দু দে, ক্ষিতীশ রায়, বেজবরুয়া শত-বার্ষিকী কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে আসাম থেকে আগত বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমহেশ্বর নেওগ, উক্ত কমিটির প্রধান সম্পাদক হরিপ্রসাদ নেওগ প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসনে ছিলেন শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ভাষণে লক্ষ্মীনাথের প্রতি সশ্রদ্ধ অর্ঘ নিবেদন করে বলেন: লক্ষ্মীনাথের এই শতবার্ষিকী বছরে আরও একজন বাংলা দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর শতবার্ষিকী উদ্যাপিত হচ্ছে। দুজনেই ছিলেন রসসম্ভারে সমৃদ্ধ আর ছিলেন ঠাকুর পরিবারের দুই জামাই। এই দিক থেকে এই শতবার্ষিকী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে অসমীয়া ভাষার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা প্রসঙ্গে অসমীয়া-বাংলা ওড়িয়া—এই ত্রয়ী ভাষার সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, বাংলা ভাষা যদি মা হয়ে থাকে, তাহলে অসমীয়া ভাষা হল অগ্রজ মাসী। তিনি লক্ষ্মীনাথের সমগ্র সাহিত্য যাতে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয় তার উপরও জোর দেন।

অসম সাহিত্য সভার বেজবরুয়া কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত লক্ষ্মীনাথের রচনাবলী দান করা হয়। বিচিত্রানুষ্ঠান ও লক্ষ্মীনাথ সম্পর্কে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। বিচিত্রানুষ্ঠানে লক্ষ্মীনাথ রচিত গীতি-কবিতা আদি গীত ও পঠিত হয়। তাঁর কবিতা ওড়িয়া ও বাংলায় অনুবাদ করেন যথাক্রমে ওড়িয়া কবি বৈষ্ণব পাণিগ্রাহী ও বাঙালী কবি সিদ্ধেশ্বর সেন। আসাম ও বাংলার অনেক গুণী ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতাস্থ লক্ষ্মীনাথ শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই কমিটির পক্ষ থেকে বিশিষ্ট লেখকদের রচনা সমৃদ্ধ একখানি স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

ঐ দিনই স্থানীয় জাতীয় গ্রন্থাগারে লক্ষ্মীনাথের রচনাবলীর একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

পরলোকে সরোজ আচার্য ॥

প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সরোজ আচার্য গত ১৮ অকটোবর শুক্রবার শেষ রাত্রে তাঁর যাদবপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বৎসর। শ্রীআচার্য একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লিভিংস্টোন' ও 'মোহিনী' পুরস্কার লাভ করেন। ছাত্রজীবনে বৈপ্লবিক আন্দোলন তাঁকে আকর্ষণ করে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বৃটিশদের রোষদৃষ্টি তাঁর উপর পড়ে এবং তিনি কয়েক বছর কারাবরণ করেন। এই সময়ে তিনি ইংরিজী ভাষায় এম-এ পাশ করেন। কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পর সহকারী সম্পাদক হিসাবে আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় যোগদান করেন। মাঝে তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

বিনয়ী ও নম্র ব্যবহারের জন্য তিনি বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ বিশেষ আদৃত। এর মধ্যে 'মার্কসিস্ট ফিলজফি' 'গ্রেট রেবেল', 'বই পড়া' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশ যে চিন্তার জগতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তাতে সন্দেহ নাই।

কলকাতায় কবি অমিয় চক্রবর্তী ॥

আমেরিকা প্রবাসী প্রখ্যাত বাঙালী কবি ডঃ অমিয় চক্রবর্তী স্পিরিচুয়াল সামিট কনফারেন্সে যোগদানের জন্য সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন। গত বুধবার ২৩ অকটোবর

'কবি ও কবিতা' পত্রিকার উদ্যোগে আহূত এক কবি সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী তাঁর সাম্প্রতিক বিশ্ব-পরিক্রমার অভিজ্ঞতার কথা সভায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আজ বিভিন্ন শক্তিশিবির মানুষনিধন পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, এক একটি মারণাস্ত্রে ত্রিশ লক্ষ করে মানুষ হত্যা করা যায় এরকম মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে কোন কল্যাণ চিন্তা থাকতে পারে না। ধর্মের নামে দেশে যে ব্যভিচার চলছে তার জন্যও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। 'কবি ও কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য এই উৎসব আয়োজনের পরিকল্পনা বর্ণনা করেন। কবি রাধারাণী দেবী শ্রীচক্রবর্তীকে চন্দন-তিলক পরান। উপস্থিত কবিরা তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীও তাঁর রচিত দুইটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।

বিচিত্রা সাহিত্য বাসর ॥

বিচিত্রা সাহিত্যবাসর জব্বলপুরে প্রবাসী বাঙালীদের একটি বিশিষ্ট সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানে ঘরোয়া পরিবেশে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৩ অকটোবর সন্ধ্যায় এই বাসরে শারদ সাহিত্য-সভা ও বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অশোককুমার গুপ্ত।

শ্যামল মুখোপাধ্যায় ও অশ্রু রায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। বাসরের সম্পাদক শ্রীকুসুমবিহারী চৌধুরী প্রধান অতিথি ও সমাগত সভ্যদের বিজয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী হেনা হালদার, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সেনশর্মা ও সুখেন্দু চন্দ। স্বরচিত গল্প পাঠ করে শোনান সর্বশ্রী রাধাগোবিন্দ সেনগুপ্ত, অশ্রু রায় ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। ডাঃ অশোক গুপ্ত আধুনিক নাটকের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রবন্ধ ও রম্যরচনা পাঠ করেন যথাক্রমে শ্রীমতী সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। অতুলপ্রসাদী ও নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুস্মিতা দত্ত। ভৈরবীর রাগ-রূপ সুর সংযোজনা সহকারে ব্যাখ্যা করেন শ্রীপ্রভাত ভট্টাচার্য।

উৎকল লেখক সম্মেলন ॥

পঞ্চম বার্ষিক সারা উৎকল লেখক সম্মেলন আগামী জানুয়ারী মাসে ওড়িশার ভোলাঙ্গীরে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনের জন্য এরই মধ্যে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীরাধামোহন মিশ্র, এম-এল-এ। ভুবনেশ্বরে এক বিবৃতিতে তিনি সকলকে এই সম্মেলনে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এবারের সম্মেলনে ওড়িশার বাইরেও কয়েকজন লেখক বিশেষ আমন্ত্রণে এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশেরও উদ্যোগ চলছে।

আর্জেন্টিনায় ভারতীয় সাহিত্য ॥

ভারত ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, ততই সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাপুয়া, চিলি, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে খুবই আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। আর্জেন্টিনার একটি লেখক সংস্থা ভারতীয় কবিতার একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এই সংকলনটি হবে প্রথম স্প্যানিশ ভাষায় আধুনিক ভারতীয় কবিতার সংকলন। উক্ত সংস্থার সর্বাধ্যক্ষ শ্রীকার্লস এ কুন্নেরি এর মধ্যেই বিভিন্ন ভারতীয় লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করছেন 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে'র এবং 'বেঙ্গলি লিটারেচার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীআশিস সান্যাল। বিভিন্ন ভারতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদ থেকে স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করছেন কয়েকজন প্রখ্যাত স্প্যানিশ কবি। আগামী বছর গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়।

বিদেশী সাহিত্য

এস্কিমোদের গল্প ॥

প্রখ্যাত গল্প-কথক, কাতেরিণা সার্গেয়েভা কিভাগমের লেখা এস্কিমো রূপকথার একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। কিন্তু বইটি অল্পকাল পরেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। দীর্ঘকাল পরে সম্প্রতি তার একটি পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেছেন প্রকাশক। বইটি মূলত এস্কিমোদের মুখে-বলা গল্পের ভিত্তিতে লেখা। বরফের ঘরে বাস করেও তাঁদের মন থেকে রাজারাণীর স্বপ্ন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

এইসব গল্পের একটি সামাজিক দিকও আছে। বহু গল্পে তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী, নানাপ্রকার প্রথা, লোকাচার ও চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

বহু প্রখ্যাত সমালোচক বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নতুন সংস্করণে আশিটিরও বেশি রূপকথার গল্প সংযোজিত হয়েছে।

সাহিত্য প্রতিযোগিতা ॥

সমকালীন সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেবার জন্য একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের লেখক সঙ্ঘ। কয়েক শত পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে বিচারকেরা সম্প্রতি তার ফলাফল ঘোষণা করেছেন। সাহিত্যে নতুন ভাবনা ও দৃষ্টিকোণের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছিল তিন বছর আগে।

কিন্তু বিচারকদের রায়ে এই প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার পাননি কেউ। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন দুজন ঔপন্যাসিক ও একজন কবি। এই তিনজন পুরস্কৃত সাহিত্যিকের নাম—ভ্লাদিস্লাভ টিটভ, ভ্লাদিমির গোর্দিচেভ, এবং ভ্লাদিমির কলিখালভ।

ভ্লাদিস্লাভ টিটভ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর ছোট উপন্যাস 'অল ডেথ ডেসপাইট'-এর জন্য। ভ্লাদিমির গোর্দিচেভ-এর তিনটি কবিতার বইয়ের নাম হলো—'গ্রে পিজিয়নস' 'দি মেন কোয়ালিটি' এবং 'ইন মাই ওন ওয়ার্ডস'। ভ্লাদিমির কলিখালভ পুরস্কৃত হয়েছেন 'স্প্রিং শুটস' উপন্যাসের জন্য।

দি পেনরোজ অ্যানুয়েল ১৯৬৮ ॥

আধুনিককালের শিল্পসাহিত্যের অভিব্যক্তিতে মানুষের শ্রম, চিন্তা, রুচিবোধ ও যান্ত্রিককুশলতার ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য

নয়। এ সম্পর্কে নানাপ্রকার আলোচনা-সমালোচনা ইদানীং পৃথিবীর সবদেশেই ক্রমবর্ধিত হয়ে আসছে। হার্বার্ট স্পেন্সার সম্পাদিত 'দি পেনরোজ অ্যান্যুয়েল ১৯৬৮' বইটি এদিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই বার্ষিকীটিতে ক্রমোন্নত পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত কতগুলি আকর্ষণীয় ডিজাইনের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভাষার অক্ষরলিপির পরিবর্তনের কথা। জাপানী মুদ্রণশিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যান্ত্রিক কৌশলের সহায়তা ছাড়াও জাপানীরা নিছক কায়িক শ্রমের দ্বারা এই শিল্পটিকে সুন্দর ও মার্জিত করে তুলেছে। কিছুটা দেরীতে হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন টাইপোগ্রাফিক ডিজাইন প্রবর্তিত হয়। গত দশ বছরে সেখানে এ শিল্পটির বহু অনুশীলন হয়েছে।

'দি রিফর্ম' অন দি ইংলিশ রাইটিং সিস্টেম' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন জন ডাউনিং। ১৯৬১ থেকে ৬৬ সাল পর্যন্ত গতানুগতিক অর্থোগ্রাফির পরিবর্তে যে সকল নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এই প্রবন্ধে লেখক সেই সকল প্রচেষ্টাকে ইংরেজী বানানপদ্ধতির সংস্কারে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন।

এই সংকলনে কেনেথ ডে-র লেখা 'দি টাইপস অব দি সিক্সটিজ' নামে একটি প্রবন্ধ গৃহীত হয়েছে। এই প্রবন্ধে লেখক নতুন অক্ষর-মুখ-এর পরিবর্তন সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

জিওফ্রে আয়ারল্যান্ডের ফটোগ্রাফির ওপর সুন্দর আলোচনা লিখেছেন আরন স্কার্ফ। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে সাতজন গ্রাফিক শিল্পী অস্ট্রেলিয়ার ডেসিমেল কারেন্সি নোট তৈরীর ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন।

অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে একটিতে উল্লেখ করা হয়েছে টাইপোগ্রাফিক ডিজাইনের মধ্যে কম্পিউটার মেসিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। আধুনিক ফটোগ্রাফিক পদ্ধতিসমূহও মানুষের বহু বৎসরের শ্রম ও অনুশীলনকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

শিল্পসাহিত্যের আপাতদৃশ্য রূপটিকেই আমরা চোখে দেখে তৃপ্ত হই। এই বার্ষিকীটি আমাদের সেই অনতিগোচর যান্ত্রিক কুশলতার দিকটি সম্পর্কেও নতুন করে ভাবিত করে।

পরলোকে ক্রেন ব্রিটন ॥

সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ক্রেন ব্রিটন মারা গেছেন সত্তর বছর বয়সে। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তাধারা—বিশেষত বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর রচনাবলী দেশী-বিদেশী বহু চিন্তাশীল ...দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১৭৮৯-৯৯ সালের বিপ্লবের ওপরে 'এ ডিকেড অব রেভোলিউসন' নামে একটি গ্রন্থ লিখে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

সমকালীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে ক্রেন ব্রিটন ছিলেন অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি-পর্যবেক্ষণশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। ১৯৩৮ সালে তিনি 'অ্যানাটমি অব রেভোলিউশন' নামে একটি বই লেখেন।

উজ্জ্বল এলডোরাডো ॥

লেখকের রচনাবৈশিষ্ট্য ও দর্শন-স্বাতন্ত্র্যে ভ্রমণকাহিনী পাঠকের কাছে বিশেষ সাহিত্যমূল্যে গৃহীত হয়। পরিচিত বিষয়ও অনেক সময় সেইজন্যে নতুন তাৎপর্য বহন করে।

সম্প্রতি এলসপেথ হাক্সলে লিখেছেন একটি সুন্দর ভ্রমণকাহিনী। বইটির নাম 'দেয়ার সাইনিং এলডোরাডো'। এটি তাঁর অস্ট্রেলিয়া পর্যটনের কাহিনী।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে মানুষ, বড় বড় শহর, সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কৃষি-সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সুন্দর আলোচনা করেছেন প্রসঙ্গক্রমে। এ গ্রন্থের পাঠকেরা একই সঙ্গে দেশের পরিচয় ও রচনার বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হবেন।

নতুন বই

কালের নিসর্গ দৃশ্য (কাব্যগ্রন্থ)—কৃষ্ণ ধর।। অনুভব প্রকাশনী ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস কলকাতা ২৯।। প্রাপ্তিস্থানঃ সিগনেট বুক শপ কলকাতা-১২ এবং কর্ণওয়ালিশ বুক স্টল কলকাতা-৪।। দাম দু টাকা।

বাংলা কবিতাপাঠকের কাছে কৃষ্ণ ধর একটি সুপরিচিত নাম। শেষ-চল্লিশের বৎসরগুলি থেকে তিনি কবিতা লিখছেন আপন কবি-প্রসিদ্ধি এবং সুরেস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। সর্বপ্রকার কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি চিরকালই বীতস্পৃহ। বরং সময়-স্বভাবকে আত্মস্থ করে তিনি কবিতা লেখেন চিরবহুল কারুকার্যে। 'কালের নিসর্গ দৃশ্য' সেই সত্যকেই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলো। এটি খণ্ড কবিতার বই নয়। দীর্ঘ ১০৬১ পংক্তির একটি কবিতার প্রবহমানতায় এর শরীর নির্মিত। নামকরণের মধ্যেই অবশ্য তার বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এ কাব্যে মানুষ এসেছে নিসর্গ-আশ্রিত হয়ে এবং 'কাল'কে তিনি মহাকালের অংশ হিসেবে গ্রহণ করলেও বর্তমানকে উপেক্ষা করেননি বিন্দুমাত্র। বরং বলা যায়, বর্তমানই এ কাজের মৌল প্রেরণা।

কবি এ কাব্যের প্রায় সর্বত্র স্মৃতিচারী। এবং তাঁর মানস-ভ্রমণ জাগতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে আত্মস্বরূপের উদ্ধারে ও আবিষ্কারে প্রথম ১৮০ পংক্তি তিনি যেন অনেকটা দার্শনিক মননে ইঙ্গিতময়। তারপর, ক্রমশ তিনি মানুষের অভিমুখী হয়ে ওঠেন প্রকৃতির হাত ধরে।

কিন্তু এও যেন সাময়িক। ক্ষণিক জাগরণের পর আবার তিনি ফিরে যান স্মৃতির ভেতর। সেখানে তাঁর শৈশব, যৌবন ও পদ্মা-মেঘনাআশ্রিত দিনগুলি দেখা যায় নির্মল দর্পণে। বাস্তববিবর্জিত থেকেই এ জাতীয় স্মৃতিচারণার উদ্ভব বলে মনে হয়। সেজন্যেই লক্ষ্য করা যায়, এ কাব্যের প্রায় সর্বত্র, পরিচয় ও অপরিচয়ের অন্তে চেনা মুখগুলি পর্যন্ত রহস্যময়; তাৎক্ষণিক বর্তমান ক্রমশ তলিয়ে গিয়ে ফিরে আসে স্মৃতির আলোকে। সহৃদয় বন্ধু-বান্ধব, কফি হাউস, নিকট অতীতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী স্থাপিত হয়েছে নিসর্গের প্রেক্ষাপটে। সমুদ্র, সৈকত, মেলা, মিছিল, মেঘমালা প্রভৃতি শব্দ ও তাদের অনুষঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে সমস্ত বিষয়। লক্ষ্য করার বিষয়, এ কাব্যে কবির কোনো মানসিক জটিলতা কিংবা সংশয় নেই—তবে বিষাদ আছে। অতীত দর্শনের জন্য এই বিষাদ পাঠককে যেমন বিব্রত করে না, তেমনি বিক্ষুব্ধ করে না কবির মানসিক স্থায়িত্ববোধকে। এ কাব্যের সঙ্গে কবির চিন্তাধারার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় পূর্ববর্তী কাব্য-নাটক 'এক রাত্রির জন্য'-র সঙ্গে। আসলে এ কাব্যে কবির অভিযান আত্মানুসন্ধান এবং আপন অস্তিত্বের পুনরাবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। তবুও দেশকাল এবং নিসর্গের যুগ্ম অস্তিত্বের মধ্যেই কবির বিচরণভূমির পূর্বনির্দিষ্ট সীমানা। সমাপ্তি-প্রান্তিক কয়েকটি পংক্তিতেও তিনি পুনরায় নিসর্গের মুখোমুখি হবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেছেন। এখানে কবি সর্বকালের গণ্ডী অতিক্রম করে চিরকালীন নিসর্গ দর্শনে স্থির এবং শান্ত।

এমন একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য উপহার দেবার জন্যে কবিকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। বইখানি বারবার করে পড়ার মতো।

●

সংসদ বেঙ্গলি : ইংলিশ ডিকশনারি। শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সংকলিত। সাহিত্য সংসদ। ৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা—৯। দাম চার টাকা।

ইংরেজি প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে একটি প্রয়োজনীয় ভাষা। বিদেশী শাসক ভাষাটিকে আমাদের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করে গেছে যে, আইনের সাহায্যে এর উচ্ছেদ ঘটানো অসম্ভব। তাছাড়া বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে ইংরেজি শেখারও গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজি বাঙলা বাঙলা-ইংরেজি অভিধানের বিশেষ প্রয়োজন। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের পর থেকে এই প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা হতে থাকে নানাভাবে। বর্তমানে বৃহৎ আকারের কয়েকখানি অভিধানও পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙলা একটি জীবন্ত ভাষা। প্রয়োগ বিধিতে অবিরত পরিবর্তন, নতুন শব্দের সৃষ্টি এবং শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটছে। সুতরাং দীর্ঘদিন কোন অভিধান একইভাবে প্রকাশ করা যায় না। সব সময় নতুন নতুন সংস্করণের প্রয়োজন ঘটে। কিছুকাল আগে সাহিত্য সংসদ বাঙলা-ইংরেজি ও ইংরেজি-বাঙলা অভিধান প্রকাশ করেন। সম্প্রতি বাঙলা ও ইংরেজি অভিধানের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এবং পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন ইংরেজি সাহিত্যের সুপণ্ডিত অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

এই সংস্করণে অনেক নতুন শব্দ দেওয়া হয়েছে। বহু শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা শব্দটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সংসদ কর্তৃপক্ষ তাঁদের অভিধানের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে একটি বড় দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের প্রকাশন সংস্থা সুবৃহৎ এবং বাঙলা দেশে মর্যাদাসম্পন্ন। বিভিন্ন ধরনের অভিধান তাঁরা প্রকাশ করছেন। বাঙালী মাত্রেই এ জন্যে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

●

বন্ধুর অমলকণ্ঠ (কবিতা)—হেমোপম দস্তিদার। সাহিত্যপত্র গ্রন্থ। ৯, কাশী ঘোষ লেন। কলকাতা—৬। দাম দুটাকা।

শ্রীহেমোপম দস্তিদারের নতুন কাব্যগ্রন্থ 'বন্ধুর অমলকণ্ঠ'। অধিকাংশ কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে কবির একাত্মতা নানারূপে নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একটি লিরিক সুরের স্পর্শে কবিতার জগৎ মোহময় হয়ে উঠেছে। কবি সচেতন এবং বিচিত্র ভাবনায় দীপ্ত। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ আরও পরিণত চিন্তার স্বাক্ষরবাহী হবে আশা করি।

●

হিরোশিমা : (কবিতা সংকলন)। অনুবাদ : জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ৪-৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম দু টাকা।

বিখ্যাত জাপানী কবিতা সংকলন 'হিরোসিমা-নো-উতা'র বাঙলা অনুবাদ হিরোসিমা। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত ও সমাদৃত হয়েছে। হিরোসিমার ভয়াবহ ও করুণ দিনগুলো জাপানী কবিদের চোখে কিভাবে ধরা পড়েছে তার অপূর্ব আলেখ্য এই ছোট্ট সংকলনটি। সমস্ত গ্রন্থখানিই যেন একখানি ছবি, মানবিকতার স্পন্দনে দীপ্ত। অনুবাদককে ধন্যবাদ জানাই। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীবিষ্ণু দে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কবিপত্র সম্পাদক তুষার চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ১৯।৭ ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা- ২৬। দাম—দেড় টাকা।

লিখেছেন বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, রাম বসু, তরুণ সান্যাল, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, দিব্যেন্দু পালিত, শান্তিকুমার ঘোষ, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, সেবাব্রত চৌধুরী, গণেশ বসু, শংকর রায়, তপন দাস, শান্তি লাহিড়ী, শান্তনু দাস, তুলসী মুখোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

বৈদিক আষাঢ়-আশ্বিন, ১৩৭৫। সম্পাদক—পরিতোষ ঠাকুর। ৩৫নং গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা-৪। দাম—এক টাকা মাত্র।

পত্রিকাটি পাশ্চাত্য বৈদিক সংঘের মুখপত্র। বাংলাদেশের গুরু ও পুরোহিত সমাজের অধিকাংশ এই পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগোষ্ঠীভুক্ত। শাস্ত্র এবং বেদ পুরাণচর্চা ইদানীংকালে অনেক হ্রাস পেয়েছে, সংস্কৃত ভাষা এখনই এমন অবহেলিত যে, কালক্রমে হয়ত সেই ভাষা পালির মত মৃতকল্প হয়ে উঠবে। এই পরিস্থিতিতে 'বৈদিক' পত্রিকাটির প্রকাশ নিঃসন্দেহে সুলক্ষণ। শাস্ত্রীয় ও ধর্মালোচনার সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাও এই পত্রিকাটিতে স্থান পেয়েছে। শ্রীরামচরণ ভট্টাচার্যের 'সৃষ্টিতত্ত্ব', জনগণের ব্যাকরণ—কাতন্ত্র, সম্পাদক রচিত জীবনের লক্ষ্য প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। রামজীবন ভট্টাচার্য লিখিত ধারাবাহিক গ্রন্থসমালোচনা 'একখানি ইতিহাসের গ্রন্থ' সুলিখিত সমালোচনা। এই প্রবন্ধে Discovery of Pakistan নামক পাকিস্তানের ন্যাশানাল এসেম্বলীর সদস্য এ, আজিজের উদ্ভট ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যাবে। এমন একখানি বিচিত্র বই সম্পর্কে এদেশে আগে আলোচনা হতে দেখিনি। সংগীতি শব্দকোষ ও বৈদিক শব্দকোষ নামক ধারাবাহিক কোষ-পরিচয় দুটিও মূল্যবান।

বিচিন্তা-ভারতী সম্পাদক : নন্দদুলাল চক্রবর্তী। ৭১এ নেতাজী সুভাষ রোড। রুম নম্বর ডি ২৭। কলকাতা-১। দাম দু'টাকা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ভবানী মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, কালিদাস রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, গোপাল ভৌমিক, নন্দদুলাল চক্রবর্তী এবং আরো অনেকের রচনায় বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

কথা সম্পাদক : নিরূপ মিত্র এবং সমর মুখোপাধ্যায়। ইছাপুর রোড। হাওড়া। দাম এক টাকা।

লিখেছেন, শিবনারায়ণ রায়, অহিভূষণ মালিক, নিরূপ মিত্র, সমর মুখোপাধ্যায়, অনীতা গুপ্ত, সমীর রায় এবং আরো কয়েকজন।

জিগীষা : (দ্বিতীয় সংকলন)—রাণা চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমল ভৌমিক সম্পাদিত। ৪৮, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলকাতা—৩১ থেকে প্রকাশিত। দাম : ৫০ পয়সা।

গল্প, কবিতা প্রবন্ধের পত্রিকা 'জিগীষা'র বর্তমান সংখ্যাটি খুবই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। লেখকদের মধ্যে আছেন আলোক সরকার, আশিষ সান্যাল, সুনীথ মজুমদার, কালীকৃষ্ণ গুহ, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দত্তচৌধুরী, সুজিতচন্দ্র খাঁ, মানবেন্দ্র বসু, অমল ভৌমিক, রাণা চট্টোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন।

বন্যা

[উপন্যাস]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আগের ঘটনা

[বড়ো জেদী, স্বাধীন ও সুন্দরী লীলা বিয়ে করে সত্যচরণকে। কিন্তু ওরা হয়তো সুখী ছিল না। এমন সময় এল সুখেন। সত্যর বাল্যবন্ধু। জুয়া, মদ আর মেয়েছেলে তার নিত্যসঙ্গী।

তবু সুখেনই ভাসিয়ে নিল লীলাকে। সত্যর সংসার তছনছ।

রূপপুর ছাড়ল সত্য। এল রাণীচক। ঘরে যমুনাও এল। নবযুবতী।

ইতিমধ্যে সুখেনের প্রেস কেনে লীলা। কিছুদিন বাদে ডিভোর্স হল সত্য আর লীলার।

যমুনাকে ঘিরে সত্যর রঙীন স্বপ্ন। যমুনা অন্তঃসত্ত্বা। তবু বিয়ে করতে পারছে না।

লীলাও রূপপুর ছাড়ল। এল শহরে। সুখেন ভাবে লীলা কি শুধু তাকে নিয়ে খেলাই করবে? ঘর বাঁধবে না? অবশ্য কনককেও ভুলতে পারে না।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সত্য, এক রাতে যমুনার মুখোমুখি। যমুনা কি রক্ষিতা'র মতোই থাকবে?

ওদিকেও জল ঘোলা হল। সুখেনের হালচালে লীলা চিন্তিত। শিবানীকে নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করা, কনকের সঙ্গে এককালের ওর ঘর বাঁধা সবই জানতে পারে লীলা। ঝড়ের সংকেত।

তবু সুখেন শিবানীর কাছে যায়। জানাতে পেল পুলিশ খুঁজছে ওকে। রাতের অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে সুখেন বাড়ি ফিরল]।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৮)

ঘন্টার হাত ধরে সুখেন আরো অনেকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে রাস্তাটা বেঁকে জেলখানার পাশ দিয়ে গঙ্গার ধারে পৌঁছেছে। দুধারে বড় বড় শিরীষের গাছ থাকায় ছায়া যথেষ্ট আড়াল করছিল দুজনকে। এদিকটা স্বভাবত নির্জন। দক্ষিণে একটা প্রসারিত খাটাল, উত্তরে জেলখানার গেট। পশ্চিমের দিকে সামান্য কিছুটা হাঁটলে গঙ্গার বাঁধটা পড়ে —যার নীচে সমান্তরাল সরকারী বন।

এবার ঘন্টা ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসছিল। অবশ্য এ হাসি অপরাধীর পক্ষে যতটা শোভন, ততটাই—তার বেশি নয়। তাছাড়া নেশাও তার কম হয় নি। সে বলছিল, অব্যেস নাই দাদাবাবু, বোঝলেন? গেরামে থাকলে লুকিয়ে-চুরিয়ে দু-এক ঢোক খেতাম—সে কেবল জানত বাসিনী। কিন্তু বাসিনী যত বদ মেয়েমানুষই হোক, এসব কান্ড কানে তুলত না মাঠাকরাণের। মা-ঠাকরাণ মাতাল-টাতাল একেবারে সইতে পারতেন না। ইদিকে আপনার মশাই, দিদিঠাকরাণটি বড্ড কম নয়। বাসিনী না বললে কী হবে, উনি ঠিকই লাগিয়ে দিতেন চুপকথাটা। তাপরে কি না, অই হরু, কান ধরে নে আয় তো মাতাল ছোঁড়াটাকে.. ... আরে ব্যাস্ রে! বিস্তর পেহার সয়েছি দাদাবাবু। বুড়ি ছিল মাতালের যম! তেনার মেয়েও তাই। সোতরাং এ একটা সমিস্যে।

সুখেন লীলাকে কখনও বলে নি সে মদ খায়। মদমত্ত অবস্থায় লীলার কাছে [illegible], [illegible] নি সে। এই রকম একটা অনুমান বরাবর তার ছিল। সিগ্রেটের গন্ধও লীলা সইতে পারে না।

ঘন্টার কথা শুনে সে বলল, তাহলে ঘন্টুবাবু, এবার বাড়ি ঢুকবে কেমন করে?

ঘন্টা ভাবিত হয়ে মাথা চুলকোতে থাকল। সে স্পষ্টত টলছিল। ...ভেবে-ছিলাম, কোনরকমে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে যাব, চুপিচুপি বাসিনীকেই গে ধরব। বাসিনী আমাকে লুকিয়ে রাখবে। দিদিঠাকরাণও মাতালের যম।

সুখেন বলল, তা সোনা, কোন ফুলে বসেছিলে মধু খেতে? ফুল চিনে গেছ এ্যাদ্দিনে?

ঘাট মানছি দাদাবাবু। ঘন্টা যুক্ত-করে বলল। ...ফুলটুল নয় আজ্ঞে। ইসমাইল আমার সব্বনাশ করলে গো, বিষম সব্বনাশ! আমি এমন ছিলাম না।

ওরে বাবা, তাহলে মেয়েমানুষ-টানুষও হয়ে গেছে দেখছি! সুখেন ওর পেটে গুঁতিয়ে দিল।

ঘন্টার জিভ বেরিয়ে গেল। ছায়ার মধ্যে বেরিয়ে আসা জিভটা বীভৎস দেখা-চ্ছিল। জিভ কেটে দুহাত পিছিয়ে ঘন্টা বলল, আজ্ঞে না দাদাবাবু, উ নেশা আমার নাই। উসব 'কন্য আপনাদের বড়মানুষের সাজে। আমি একটা বলদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, বলদ। দিদিঠাকরাণ ঠিকই বলেন, ঘন্টা বলদ। তাই বাসিনীও বলে। সবায় বলে।

হঠাৎ সুখেনের সমস্ত মনটা লীলার প্রতি এক অভাবনীয় ঘৃণায় কটু হয়ে গেল। যেন পাশার ছক থেকে ছিটকে পড়ে সে আজ সারাটি বিকেল, বিকেল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত্রি, এক উদ্দেশ্যহীন শূন্য-তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—মাটি পাচ্ছে না। সেই শূন্যতা ভরে ঘৃণাটা জমছিল। সে বলল, হ্যাঁ গো ঘন্টাবাবু, অ্যাদ্দিন তো দিদিঠাক-রাণের ঘানিতে ঘুরে মরছ, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? বাগে পেলেই জিভ বাড়িয়ে দিও, বুঝেছ?

কথাটা বুঝতে পারল না ঘন্টা। সে একটু ঝুঁকিয়ে দিল মুন্ডুটা। বলল, আজ্ঞে?

কোনদিন দিদিঠাকরাণকে ছুঁয়ে দেখেছ?

ঘন্টার নেশা ছুটে গেল যেন। সে বলল, কথাটা ভালো নয় দাদাবাবু। আপনার সঙ্গে ওনার বে হবে।

সুখেন সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। এ ঘৃণা বা ক্রোধ ঘন্টার কাছে প্রকাশ করার কোন মানে হয় না। রাতের গাড়িতে তার কলকাতা চলে যাবার ইচ্ছে ছিল। পকেটে কিছু টাকা থাকার বড্ড দরকার ছিল। কোথাও পেল না। এমন বিশ্রী সময় তার জীবনে কখনও আসেনি। হয়ত এর নামই ভাগ্যের মার। হয়ত আরো একটা দিন অপেক্ষা করলে টাকা সে কোথাও-না-কোথাও পেয়ে যাবে। বরাবর যেমন পেয়েছে।

সে আড়ামোড়া ছেড়ে হাই তুলে তুড়ি দিল। তারপর বলল, তোমার দিদি-ঠাকরাণকে আমি বিয়ে করছি নে, ওকে বলে দিও কথাটা। আর......

সে কি গো? সব্বোনাশ! ঘন্টার নেশা আরও কিছুটা কাটছিল।

সুখেন নির্বিকারভাবে বলল, ও একটা বেশ্যা।

আজ্ঞে!

ও যার-তার সঙ্গে যেখানে-সেখানে শুতে পারে।

হুঁ হুঁ।

ও তোমার পাশেও শুতে পারে। চেষ্টা করে দেখো।

হুঁ হুঁ!

থাম্‌ ব্যাটা ভূত! শুধু হুঁ হুঁ—যা বলছি, শুনেতে পাচ্ছিস?

আজ্ঞে না। ...হ্যাঁ......

লীলারাণীকে তুই-ই বিয়ে করে ফ্যাল্‌।

আজ্ঞে।...সব্বোনাশ......

চল তোকে পাঁচিলে তুলে দিচ্ছি। ঝাঁপ দিয়ে পড়েই ওকে ধরবি। তারপর.. ..

ঘন্টা দুলে দুলে হাসছিল। ...আমাকে ধরতে হবে না মশাই, মাতাল দেখলে ভয়ে উনিই জড়িয়ে ধরবে। একবার কী হয়েছিল শোনেন। গেরামের বাইরে মা মনসার থানে মেলা বসেছে। দিদিঠাকরাণের পেথম বয়েস। পথে ওনাকে সঙ্গে নে আসছি। এক মাতাল দেখেই উনি আমাকে যে জড়ান জড়ালে. উঃ দাদাবাবু, আজও মনে পড়লে গা শিউরোয়!

কী হল?

মাথা চেপে ধরে ঘন্টা বসে পড়েছে। বমি করছে। সুখেন সরে এল।

হন হন করে চলতে থাকল সে। কী করবে, কোথায় যাবে, ভাবতে পারছিল না সুখেন। কিছু একটা করে ফেলতেই হবে। যত জঘন্য হোক, কুৎসিত বা বীভৎস হোক, একটা অমানুষিক কান্ড করার জন্য তার রক্ত চনমন করছিল। যতবার মনে পড়ছিল, এই প্রথম একটি মেয়ে তাকে চড় মেরেছে, ততবার তার সারা শরীরের প্রতিটি রোমকূপে বিষদাঁত গজাচ্ছিল। এ শহরে এখন তার দাঁড়ানোর কোন মাটি নেই। কোন বিষয়সম্পদ নেই। বন্ধুতা শেষ। রক্ষাকবচ হারিয়ে গেছে। সে ফেরারী আসামী। কবছর আগের মত ফের সে ধুঁকতে ধুঁকতে চারপাশে তাকিয়ে একটা দাঁড়াবার মত জায়গা খুঁজছে।

বাঁধে এসে এতক্ষণে ফের তার মনে হল, হয়ত খুব ফেনিয়ে তুলেছে সামান্য একটা ঘটনাকে। খুব বেশি করে ভাবছে। অকারণ মূল্য দিচ্ছে। কিন্তু লীলার কাছে যাওয়া কি ঠিক হবে? জানালা থেকে ফিরে এসেছে মাত্র। দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে হয়ত ভালোই হত।

অথচ আর অলক্ষ্মী লাগে সেটা। লীলা তাকে চড় মারুক বা যাই করুক, এমন তা নিজে নয়। এত মেলি মুখো ভদ্র মেয়ে-মানুষদের জন্য কোনদিনই জমে ওঠেনি তার মনে।

এ ঘৃণার উৎসে আছে একটা তীব্র দাসত্ববোধের প্রতিবাদ। ঘন্টা বলদ, সুখেন বলদ নয়। সে নিজের মূল্যে নিজেকে নষ্ট করতে জানে না। আর, নিজেকে নষ্ট হতে দেখেছিল বলেই সুধার ওষুধের শিশি দুটো অদলবদল করে রেখেছিল। মিকশ্চারের শিশি ভেবে সুধার অন্ধ হাত তুলে নিয়েছিল মালিশের তেলের শিশিটা। না নিলেও পারত সুধা। ঠিক-শিশিটার বদলে ভুল শিশিটা তাকে তবুও নিতে হয়েছিল। সুখেন সারাজীবন আঘাত খেয়েছে। মানুষের কিছু কিছু অভ্যাস বা রীতিপ্রকৃতি তার দারুণ চেনা আছে। লীলা এই সুধার কথা শুনেছে। শোনেনি চন্দ্রকান্তবাবুর কথা। চন্দ্রকান্তবাবু তার দূরসম্পর্কের মেসোমশাই ছিলেন। পয়সা-ওলা কিপ্টে এই বুড়োটা ছিল কৃপণদের শিরোমণি। সুখেনের আশা ছিল, অপুত্রক মেসো মরার আগে তার একটা ব্যবস্থা নিশ্চিৎ করে রেখেই যাবে। কিন্তু যমের হাত ধরবার আগে শয়তান বুড়োটা এক মধ্যযৌবনার হাত ধরে বসল। মেয়েটির নাম রাণু—সুখেন ডাকত রাণু-মাসি বলে। সেই রাণুমাসিই প্রথম সুখেনকে নষ্ট করেছিল। সুখেনের বয়স তখন আঠারোর বেশি নয়।

রাণুমাসি ওপরের ঘরে সুখেনের সামনেই কাপড় বদলাত। শুধু সায়া আর কাঁচুলিপরা রাণুমাসির দেহটা দেখাত মসৃণ আর নিটোল। সুখেনকে প্যাটপ্যাট করে তাকাতে দেখলে সে বলত, এই ছোঁড়া, কী হচ্ছে রে! চোখ বুজে থাক বলছি।

তুইতোকারি আর ছোঁড়া বুলি গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল সুখেনের। এবং সেই রাণুমাসি একদিন ঠাট্টার ছলে ওকে বুকে পিষে রাক্ষুসীর মত হাসল। ওর তরুণ কচি দেহের নরম মাংস হাতড়ে প্রাণ-বীজে হাত ছোঁয়াল।

বুড়োটা ছিল চালাক। সে বলত, অ্যাই সুখো, সারাদিন ওপরের ঘরে শুয়ে না থেকে একটু ঘুরেফিরে বেড়াগে যা! লেখা-পড়া তো কবে শিকেয় তুলেছিস, একটু ভাবনা হয় না ভবিষ্যতের?

সুখেন সোজা জবাব দিত ভবিষ্যত তো তোমার হাতে।

বুড়ো হাসত জবাব শুনে। কোন মন্তব্য করত না।

অবশেষে রাণুমাসির ছেলে হল। কিন্তু বেশি বয়সে ছেলে হবার বিপদ থাকে। রাণুমাসি প্রসবের পরই মারা যায়। বুড়ো তার ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কত সম্ভব-অসম্ভব কান্ড না করছিল! প্রথম দুটো মাস একটা নার্সিং হোমে রাখল। তারপর আনল বাড়িতে। মাইনেকরা সারাক্ষণের ধাত্রী রাখল একজন। ছিপছিপে গড়ন বড়বড় সরল চোখ শান্ত একটি মেয়ে। সীমা তার নাম। সীমার হাত ধরেছিল বুড়ো। সীমা বলে দিয়েছিল সুখেনকে। তবু সীমা বাড়ি ছেড়ে যায়নি। সে সুখেনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল: সীমা এখন কোথায় আছে কে জানে। মাঝে মাঝে মন কেমন করে ওঠে তাকে ভাবলে। ছমাস থাকার পর সীমা চলে যায়। যাবার সময় সে একটা ঠিকানা দিয়েছিল। কেঁদেছিল। সুখেন ঠিকানাটা ইচ্ছে করেই ছিঁড়ে ফেলেছিল। তার মন তখন তার ভবিষ্যতের দিকে মগ্ন। ছেলেবেলা থেকে দারিদ্র্য তাকে শুধু একটি জিনিষই শিখিয়েছিল—জীবনে বাঁচতে হলে বিষয়সম্পদটা ভারী জরুরী। সে বড়লোক হবে। তাকে বড়লোক হতেই হবে।

পুরো সাতটা বছর চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ি কেটেছিল সুখেনের। মহাজনী কারবার ছিল বুড়োর। শহরেই বড় একটা গদি ছিল। সুখেন গাধার মত খাটত দিন-রাত্তির। তবু কোন আশা দেখছিল না। চুরি করতে তার হাত কেঁপেছে। তা না হলে সেব অন্দি চুরিই করত। সে বুড়োর মৃত্যুর দিন গুনছিল। তার মৃত্যুতে কী লাভ হবে, সুখেন স্পষ্ট জানত না। তবু মনে হত, ও মলে নিশ্চিৎ একটা কিছু ঘটবে। শ্যামল মাত্র দুবছরের বাচ্চা। মাথা মোটা, প্যাকাটি শরীর—বিচিত্র একটা প্রাণী। মগজে গোবর ছাড়া কিছু নেই—সেটা সহজেই বোঝা যাচ্ছিল। একটা হাবাগোবা জড়ভরতের জন্ম দিয়ে তার মা রাণু মরে গেছে।

বড় দুঃখে হিংসায় ক্ষোভে ঈর্ষায় আক্রোশে তার দিকে তাকিয়ে থাকত সুখেন। অত ছোট্ট ছেলে—তার মাথায় জরির কাজকরা টুপি, ঝিলকিনে আদ্দির পাজামা-পাঞ্জাবী, গলায় সোনার হার--বুড়ো রাজপুত্র সাজিয়ে রাখত। চোখের আড়াল করত না। সুখেনের ইচ্ছে করত ওর সরু গলাটা টিপে ধরে। ঠেলে ফেলে দেয় ভরা গঙ্গায়। মাঝে মাঝে অমানুষিক এই সব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে-হতে সে ছট্ফট্ করে উঠত। তারপর ভয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ত।

একদিন দুপুরে বুড়োর গদিতে চোরা অলংকারের তল্লাসে পুলিশ হানা দিয়েছিল। সুখেন এসে খবর দিতেই বুড়ো হন্তদন্ত ছুটল। শ্যামলের কথা বুঝি ভুলেই গিয়েছিল। তা না হলে সঙ্গে নরে যেত অভ্যাসমত। সুখেন দেখল হাফ-প্যান্ট পরে খালি গায়ে শ্যামল উঠোনে খেলা করছে।

উঠোনের প্রান্তে পুরনো শ্যাওলাপড়া পাঁচিল। তার গা ঘেঁষে মস্তো শিউলী-গাছ। শরতকালে শিউলীর মরশুম। ঝরা ফুল কুড়োতে কুড়োতে শ্যামল আঙুল তুলে গাছটা দেখাচ্ছিল। ...মামা, ফুই!

সুখেন ধমকাল। ...ধুর ব্যাটা, এখন ফুল কোথা। রাত্তিরে ফুটবে।

শ্যামল কান্নাকাটি সুরু করেছিল।

সুখেন ওকে তুলে পাঁচিলের কাছে নিয়ে গেল। বলল, তুই ওঠ। উঠে পাড় বাবা। আমার ভারে গাছ ভেঙে যাবে।

গাছে চড়ার আনন্দে শ্যামলের মাথার গোবর টগবগ করে ফুটছিল বুঝি। গাছটার কয়েকহাত দূরে পাঁচিলের পাশেই কুয়ো। কুয়োটা পুরনো আর অব্যবহার্য। ভিতরে অবশ্য জল ছিল—তবে পচা আর দুর্গন্ধ। গাছের পাতা খসে পড়ত নির্বিচারে। শ্যামলও অনেক খেলনা ছুঁড়ে ফেলত। বুড়ো ইদানীং কুয়োটা বুজিয়ে দেবার কথা বলত।

গাছ থেকে পাঁচিলে দাঁড়িয়ে শ্যামল ফুল পাড়ছিল। ফুল নয়—কুঁড়ি। আর সুখেন তাকে সাবাস দিচ্ছিল। বাঃ বাঃ, রিঙমাস্টার! বাহাদুর খেলোয়াড়!

শ্যামল তখন দুহাত ছেড়ে সত্যি-সত্যি খেলা দেখাচ্ছে। পাঁচিলে হাঁটছে টলতে টলতে। হাত দিয়ে সরু ডালপালা সারিয়ে দিচ্ছে। পাতা ছিঁড়ে ফেলছে। সুখেন চেঁচাল, এই হনুমান, কলা খাবি? জয়-জগন্নাথ দেখতে যাবি।

ব্যস! শ্যামল এবার হনুমান হয়ে গেল। চারহাতে হাঁটবার মত পাঁচিলের সংকীর্ণ চূড়া ধরে সে এগোচ্ছিল, পিছিয়ে আসছিল। তৃতীয়বার সুখেন হাতছানি দিয়ে চিৎকার করতেই সে কুয়োর কাছে এসে তার মধ্যে পাতা ছুঁড়তে একটু ঝুঁকল এবং অনিবার্যভাবে নীচে পড়ে গেল।......

তবু সুখেনের বরাত ফেরে নি।

শোকার্ত বুড়োর আয়ু যেন আরও বাড়ছিল। কিন্তু একটা ব্যাপারে সুখেন এবার নিশ্চিত—ও মরে গেলে সবকিছুর মালিক সুখেনই হবে।

তর সইছিল না তার। এখন বয়স হয়েছে বোঝবার মত। এখন সে বুঝতে পারে, অত ব্যস্ততার দরকার ছিল না। অন্য কেউ হলে স্থির ধীর ও শান্ত মনে কাজ করে যেত। অনিবার্যকে আকস্মিক করে তুলতে চাইত না। কিন্তু সুখেনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পোকা আছে যেন। সেটাই বরাবর তার সর্বনাশ করে আসছে।

কদিন থেকে চন্দ্রকান্তবাবুর শরীর ভাল ছিল না। গদির দিকে যেত না সে। সুখেন-কেই পাঠাত। ছেলের মৃত্যুর ব্যাপারে সে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ পায় নি। কারণ, সুখেন একমাস নামমাত্র আহার করেছে। দিনরাত্তির কেঁদেছে শ্যামলের জন্যে। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেল।

সুখেন নিজেও বুঝতে পেরেছিল, এটা আর ক্রমশ ভান হয়ে নেই। অভিনয় ক্রমশ সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মুখোশ হয়ে উঠেছে মুখের চামড়া। এ কি তার পাপবোধ? হয়ত তা ঠিক নয়—অন্য কিছু। তার বুক ভেঙে যাচ্ছিল একটা সরল বোকা অবোধ শিশুর কথা ভেবে। বড় মায়ায় সে নির্জনে ফুকরে কেঁদে উঠেছে। আহা, শ্যামল তার নিজের ছেলে হতেও তো পারে। আঠারো-উনিশে ছেলেপুলের বাপ হওয়া কি একান্তই অসম্ভব?...কিন্তু আমি... নিজের হাতে ওকে খুন করিনি! ও কেন অত বোকা ছিল? সুখেন নিজেকে সান্ত্বনা দিত।

এবং সুধার মৃত্যুর পর ঠিক এমনি করেই সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল সে।

একদিন বিকেলে গদি থেকে হঠাৎ ফিরে সিঁড়ির নীচে থেকে প্রচন্ড চিৎকার করছিল সুখেন—মেশোমশাই, মেশোমশাই, শিগগির আসুন, শিগগির! ভীষণ কান্ড হয়ে গেছে।

কান্ড কিছুই হয় নি। এটা তার মাথায় হঠাৎ খেলেছিল মাত্র। একটা সহজ চান্স! কোন রিস্ক নেই, পরে একটু বকুনি খেত বড়জোর।

কিন্তু চন্দ্রকান্ত অসুস্থ শরীরে হাঁফাতে হাঁফাতে বেরিয়ে এল। সিঁড়ির মুখে তাকে

দেখেই সুখেন ফের চেঁচিয়ে উঠেছিল, আগুন, আগুন!

ভাড়াহুড়ো নামতে গিয়ে সেকেলে খাড়া উঁচু দোতলার সিঁড়িতে পা পিছলে যেন চন্দ্রকান্তর। গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল নীচের ধাপে। শিরা ছিঁড়ে গিয়েছিল। সুখেন স্থির দাঁড়িয়ে দেখল, বুড়ো গোঙাচ্ছে। নীচের ঘরগুলো থেকে ঠাকুর-চাকর-ঝি সবাই ছুটে এল। বুড়ো খাবি খাচ্ছিল।......

মানুষের অনেক ব্যাপার সুখেন খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। দাঁতে দাঁত চেপে ঝুঁকি নেয়। অনেকক্ষেত্রে জিতে যায়।

এখানে কিন্তু জেতেনি। হেরেছিল। বুড়োর সব সম্পত্তি ছেলের মৃত্যুর পর গোপনে উইল করা হয়েছিল। সুখেন জানত না। গঙ্গাতীরের এক আশ্রমে চন্দ্রকান্তর গুরুদেব থাকতেন। আশ্রমের নামে সব দিয়ে গেছে বুড়ো। একটি পাই-পয়সাও সুখেনের জন্যে নেই। বুড়ো তাহলে সবই টের পেয়েছিল!

সেই আশ্রম এখনও আছে। সে-বাড়িটায় এখন স্কুল হয়েছে। সুখেন দূর থেকে একবার তাকিয়ে দেখে আসে। তার হাসি পায় তখন কত ছেলেমানুষ ছিল সে!

তাহলে?......

বাঁধে দাঁড়িয়ে সুখেন দাঁতে দাঁত চাপল। দু-হাতের মুঠো ঘষে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। কী করবে সে? কোথায় যাবে?

অসহায়তার দুঃখে এতক্ষণে তার চোখ ফেটে জল এসে গেল। সামনে যে পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে, সে বড় নির্বিকার, নিষ্ঠুর, জড়।

পুলিশে তাকে ধরবে—সে ভয়েও নয়, এই জড়ত্বের ভয় তাকে গিলে খাচ্ছিল। যদি কিছু টাকাও সে পেয়ে যায় হঠাৎ—এখনই, এত রাতে—যদি চলে যায় অন্য কোথাও, তাহলেই কি সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে? বারবার একই শূন্যতার মধ্যে ছিটকে পড়তে হচ্ছে তাকে। কী করবে কলকাতা গিয়ে? কনকের কাছে যাবে অবশেষে? কনক তাকে নেবে। ফেলবে না। হয়ত মাথায় করে রাখবে। সে এখনও আইনত তার স্ত্রী। কিন্তু যে এখন নিজের কাছে নিজেই একটা বোঝা, সে পরের বোঝা মাথায় নিলে দুটোই পড়ে যাবে।

অন্যমনস্কভাবে সে পা বাড়াল। আস্তে আস্তে বাঁধের পথে হাঁটতে থাকল। কনক তাকে বিশ্বাস করে না। আর লীলা—লীলা একটা স্বপ্ন মাত্র। এই স্বপ্নের লীলাও তো বিশ্বাস করেনি তাকে।

আর যে মেয়ে তাকে চড় মেরেছে, একদিন তার পায়ে হাত দিতে আপত্তি ছিল না সুখেনের। আজ বড় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে ভিতর দিকে। সুখেনের বয়স হয়েছে। তার জীবন একটা সম্মান দাবী করছে। নিজেকে আর চাকরবেশে দেখতে বড় কষ্ট হচ্ছে তার।......

চাকর—অবিশ্বাসী চাকর। সুখেন মুখ তুলল। কোন আলো-অন্ধকার ভরা ওই দীর্ঘ উঁচু পাঁচিলে ঘেরা জেলের ঘরবাড়ি আর গাছপালার মধ্যে সব ঘটনার নায়ককে খুঁজতে চাইল। কে তাকে নিয়ে সারাজীবন এমনি করে ছিনিমিনি করছে। কে সে? কেন তার এ খেলা?...... আজ যদি সে দুম করে মরে যায়, সকালে এ শহরের লোকেরা বলবে: লোকটা ছিল একটা জুয়াড়ী আর মাতাল। লম্পটদের রাজা। এ শহরের ইতিহাসে বিস্তর বড়মানুষ মদে মেয়েমানুষে জুয়ায় ফতুর হয়েছেন; অজস্র সাধারণ মানুষও সারা গায়ে ঘা নিয়ে বিস্তর ভিখিরি হয়েছে। বেঁচে থাকলে সুখেনও তাই হত। তার চেয়ে এও একরকম খাঁচা বৈকি। কনক খবর পেলে শাঁখা...লীলাদের বাড়ি যখন কনককে দেখেছিল, লক্ষ্য করেনি হাতের শাঁখা সিঁথির সিঁদুর। আজকালকার মেয়েদের মন খুব কড়া। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে লীলাও কত অনায়াসে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছিল। শাঁখা আর নোয়া খুলেছিল। কত সহজ হয়ে উঠেছে সব! আসলে, এ একটা আবহাওয়ার ব্যাপার। আমার ঠাণ্ডা লাগলেও একসময় সর্দিকাসি হচ্ছে না—আবার ঠাণ্ডা বাতাস না লেগেই অজস্র লোক একসঙ্গে নাকচোখে জল আর গলায় সুড়সুড়ি নিয়ে ছটফট করে উঠেছে!...

জেলখানার ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল, রাত বারোটা! নিশিপাওয়া মানুষের মত ওই প্রাচীন বট আর এই তরুণ শিরীষের প্রান্ত অব্দি তাহলে এতক্ষণ অবিশ্রান্ত পায়চারী করে কাটাচ্ছিল!

প্যান্টের পকেটে হাত ভরে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল সুখেন। একটা মাত্র আছে। তারপর? তার বাঁ-পাশে সরকারী অরণ্য, ডানপাশে জেলখানার পাঁচিলের উত্তর-পশ্চিম কোনাটা—তার ওদিকে ঘন গাছ-পালায় ভরা ছিটানো ঘরবাড়িগুলো পেরিয়ে গেলেই সরু মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা। খুব কাছেই অহীনদের বাড়ি।

সিগ্রাট টানতে টানতে পা চালাল সুখেন। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সদর রাস্তাটা দ্রুত পেরিয়ে গেল। পুলিশ দূরে হেঁটে যাচ্ছিল। তার লম্বা ছায়াটা ডিঙিয়ে খোলা ড্রেনটা পেরিয়ে ওপারে আগাছার জঙ্গল ভাঙতে থাকল সে। পুলিশের বুটের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল দূরের দিকে।

অহীন—অহীনকে তার বড় দরকার মনে হয়েছে হঠাৎ। অহীন জ্ঞানী ছেলে। কোন-না-কোন বুদ্ধি একটা বাৎলে দেবেই। বরাবর অহীন সম্পর্কে সে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেছে। কেন কে জানে, তার মনে হয়েছে—শহরব্যাপী চারপাশে ক্ষয়োরোগীদের মধ্যে হয়ত এই ছেলেটির ফুসফুস এখনও অটুট আছে।

তবে আসল কথাটা হচ্ছে, ঠিক বুদ্ধি বাৎলে দেবে বলে নয়,—সুখেনকে সে পাথেয়টা দিতে পারবে অন্তত। বোস ব্রাদার্সের ক্যাসমেমো ছাপানো টাকাটা রমার আদায় করার কথা। রমাকে চিঠি লিখে যাবে— যাতে সে টাকাটা অহীনকেই দেয়। লীলাকে না জানিয়ে দিতেই বলবে। রমা নিশ্চয় ভাইকে অপমান করবে না। বাড়ির দরজায় একটু দাঁড়াতে সুখেনের টোকা চলল গেল। জানালার ধারে গিয়ে চাপা গলায় ডাকল, অহীন, অহীন আছ?

দুবার ডাকবার পর অহীন সাড়া দিল। আলো জ্বালতেই মুখের ইশারায় নিষেধ করল সুখেন। আলো নিবিয়ে অহীন বাইরে এল। তারপর তার হাত ধরে নিঃশব্দে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে জানালা বন্ধ করে বাতি জ্বালাল। পরক্ষণে সুখেনের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেছে অহীন। এ কি চেহারা হয়েছে সুখেনের।

অহীন হেসে ফেলল। ...পুলিশকে যতটা সাংঘাতিক ভাবছেন, ততটা কিছু নয় মোটেও। আর আপনি তো আজেবাজে লোক নন যে ধরে নিয়ে গিয়ে ঠ্যাঙানি দেবে!

সুখেন হাসবার চেষ্টা করছিল।... পুলিশের কথা কেন হঠাৎ? আমি সেজন্যে আসিনি।

ভাবনায় চেহারা যা করেছেন! অহীন বলল।...ওরা কিছু টাকা চায় মাত্র। এ আমার অনেক দেখা আছে। টাকা দিচ্ছেন না কেন?

দেব। সুখেন একটু চুপ করে থেকে ফের বলল, রমা ফিরেছে?

হাই তুলে অহীন জবাব দিল, ও তো আজ বৌদির ওখানেই থাকবে। খবর পাঠিয়েছিল প্রেস থেকে।

ও।

কেন, আপনি বৌদির ওখানে যাননি আজ?

নাঃ।

কী ব্যাপার? ঝগড়া হয়নি তো?

আচ্ছা অহীন, জগদীশের জামিন হয়েছে?

না। কাল হবে হয়ত। পুলিশ কী একটা এনকোয়ারী করছে শুনেছি। একটা বড় স্মাগলিঙ ঘাঁটির গুজব চলছিল—তার মধ্যে নাকি অনেক রথীমহারথী আছেন। পুলিশ একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছে নাকি।

লালু কোথায়?

লালু ফেরারী। আমাকেও ছাড়বে বলে মনে হয় না। জগদীশের সঙ্গে আড্ডা দিতাম তো। আর মজার কথা শুনুন, বাড়ি ফেরার সময় শুনে এলাম, বন্দাকে ছেড়ে ফের ধরেছে। ওর সমিতির কয়েকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আটকে রেখেছে থানায়।

সুখেন জিভ কেটে বলল, আরে! বন্দাটা তো এ লাইনের লোক নয়। তাছাড়া ওর দলের ছেলেরা তো সবাই ভদ্রপরিবারের! ইস্, কী সাংঘাতিক আগুন জ্বলে গেল মাইরি!

অহীন আক্ষেপে বলল, জ্বালালেন আপনি।

অহীনের চোখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে মুখ নামাল সুখেন। বলল, তা ঠিক। অবশ্য তুমি তো সব জানো আগাগোড়া। আমাকে মাফ করো, অহীন আমি সত্যি একটা আনাড়ী খেলোয়াড়। আমার দ্বারা কিছু হবে না। আর...

আর, হবে না জেনেই একটু আড়ালে এই জঙ্গলের কাছটায় একটা উপায়ের খোঁজ খ'ুজছিলাম।

অহীনের ঠোঁটের কোণে হাসি ঝিলিক দিল।...মরবার জন্যে?

হয়ত তাই।

তা, মরলেন না যে?

সুখেন দূরের কণ্ঠস্বরে বলল, পারলাম না। আমি পালাতে চাই। তাই অহীন তুমি আমার ছোটভাইয়ের মত। বিশ্বাস কর, সবার সংগে ফাঁকি দিয়ে চলেছি—কেবল তোমাকে কোনদিন প্রতারণা করতে চাই নি। পারি নি। তুমি কি বিশ্বাস করবে অহীন? বাবা-মা মরার পর আমরা মাত্র দুটি ভাই বে'চে থাকতে চাইছিলাম। সে বে'চে থাকলে অ্যাদ্দিনে ঠিক তোমার মতই হত। অমনি ভদ্র, অমনি চালাক চতুর স্মার্ট ছেলে। লেখাপড়া শেখবার ঝোঁক ছিল তার ভয়ানক। হল না। দু-ভাই মিলে চায়ের দোকানে বয় হয়েছিলাম। তারপর একদিন রূপেন মারা গেল।

অহীন মুখ নামিয়ে বলল, কী হয়েছিল?

টাইফয়েড। একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা গেল সে। থাকতাম একটা খোলার ঘরে। ঘরটা ছিল এক চেনাশোনা বুড়ির। এ-বাড়ি ওবাড়ি ঝিয়ের কাজ করত সে। আমরা বলতাম পিসিমা। যাক্ গে...তোমার সংগে আলাপ হবার পরই হঠাৎ আমার মনে পড়েছিল, রূপেন বলত, আমি কলেজে পড়তে যাব কবে রে দাদা? তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছিনে কেন? আমি বলতাম, বেশি করে খা, তাহলেই শিগ্গির বড় হবি। ও হাসত। খাওয়া? খাওয়া তো স্বর্গের অমৃত তখন!

ভুলে যান। অহীন বালিশের নীচ থেকে সিগ্রেট বের করে এগিয়ে দিল।

আমি তোমার কাছে এসেছি অহীন।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

আমাকে কিছু টাকা ধার দেবে?

অহীন সিগ্রেট ধরাতে গিয়ে হেসে ফেলল। টাকা? আপনাকে? কী মুশকিল! আপনি দেউলে হয়ে গেলেন নাকি?

একেবারে। তুমি জাননা, প্রেসটা আমার নয়।

জানি।

জানো? কে বলল? কান্তা?

হ্যাঁ।

মরুকগে। আছে টাকা? দেবে? শিগগির যাতে পাও, তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

টাকা নিয়ে কোথায় পালাবেন?

হয়ত কলকাতা।

তারপর?

জানি না।

অহীন সিগ্রেটটা ধরাল। সুখেনের দিকে দেশলাই ছু'ড়ে দিয়ে বলল, চাইবার আর মানুষ পেলেন না! মাত্র সাড়েতিনেক টাকা ছোড়দির কাছে নিয়েছিলাম। বিকেলে সিনেমা আমার ইতিকে দিয়ে। ব্যাস, ফতুর!

কে ইতি?

ইন্ডিয়ানদের বড়বাবুর মেয়ে। সেই যে একদিন সন্ধেবেলা দুজনে যাচ্ছিলাম, আপনি সাইকেলে......

বুঝেছি। তাহলে উঠি, অহীন।

অহীন ওর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। ...থামুন তো! বৌদির সংগে ঝগড়া করে কী সব আবোল-তাবোল বকছেন। আপনি সটান এখানে শুয়ে পড়ুন। খাওয়া হয়েছে? মুখ দেখেই বুঝছি, ও কর্ম করা হয়নি। খানিক আগে এলে আমারটা ভাগ করে খাওয়া যেত। এখন অগত্যা উপবাস ছাড়া উপায় নেই। নিন, জামাকাপড় ছাড়ুন।

আলনা থেকে একটা লুংগি এনে দিল অহীন। সুখেনের হাঁটুর ওপর সেটা পড়ে রইল। সুখেন বলল, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি যা ঠিক করে ফেলি, তা করি।

বিয়েটাও তো ঠিক করে ফেলেছেন!

সুখেন একটু হাসলমাত্র।

আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন। বৌদির ব্যাপারটা রমার কাছেই জানা যাবে কাল সকালে। তারপরই সব ম্যানেজ করে ফেলব জলের মত। আপনি জানেন না, স্বাতীদির সংগে আমার ভীষণ খাতির জমে গেছে।

সুখেন মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি মরবে অহীন। ও একটা ডাইনী।

অহীন কোন জবাব না দিয়ে তক্তা-পোষের কোণ হাতড়ে একটা ব্যাগ আনল। পরক্ষণে সুখেন চমকে উঠল।

অহীন বলল, আমার এক বন্ধুর ভাই জাহাজে চাকরী করে। যখন বাড়ি আসে দুচারটে নিয়ে আসে সংগে। ওদের বাড়ি-সুদ্ধ খায় নাকি!

সুখেন বোতলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, বড়খোকা রাম!

হ্যাঁ। ছোটখোকা শ্যাম নয়। তবে গা দিয়ে যা গন্ধ বেরোয়, বাপস্! সেই ভয়ে ততক্ষণ বাইরে কাটাতে হয়। মা এমনিতে নিরীহ বোকা মেয়ে, কিন্তু ছেলের সাধ্য নেই তাঁর নাককে ফাঁকি দেয়। কী আর করবেন, বখে তো গেছিই। যদ্দিন চাকরিবাকরি না হচ্ছে এই করেই কাটাতে হবে!

তুমি কী এখানেই খাবে নাকি?

মা ঘুমিয়ে আছেন। ক্ষতি কী? আপনার একটু স্ফূর্তি দরকার। নাকি বাইরে যাবেন?

তাই চল।

দুজনে বেরিয়ে এল। সুঁড়ি পথটার শেষে এসে সুখেন বলল, জগার ওখানে যাবে? ও তো থানায় রয়েছে বললে। শিবানী একা আছে। ওর ভালই লাগবে।

অহীন ওর দিকে তাকিয়ে কয়েক-মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর বলল, ঠিক আছে।

প্যারেড গ্রাউন্ড পেরিয়ে প্রায় লাফ দিয়ে সদররাস্তা পেরিয়ে ওরা জগদীশের বাড়ির পিছনে পৌঁছে গেল। দরমাবেড়ার ফোকরে চোখ রেখে সুখেন দেখল, ঘরে বাতি জ্বলছে। শিবানী নিশ্চয় ঘুমোয়নি। সে ডাকল, শিবানী, শিবানী!

একটু পরেই শিবানীর সাড়া পাওয়া গেল। কে, বাবা?

এরা পরস্পর মুখোমুখি তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছিল। রান্না-জলের ঘ্রাণ শিবানীর কাছে বাবা ছাড়া আর কেউ সাড়া পাবে না এখন। সুখেন বলল, আমি সুখেন।

কে?

কানে কম শুনছ নাকি? সুখেন সুখেন!

অহীন যুগিয়ে দিল, সুখেন রায় এবং অহীন্দ্র মজুমদার। তোমার বাবার চেলা।

দরজা খুলে শিবানী হাসল।...একেবারে নন্দীভৃংগীর মত! দুপুর রাত্তিরে একা মেয়েছেলের ঘরে আসবার সাধ কেন বলোতো! যাও এক্ষুনি!

সুখেন দরজা বন্ধ করল। বলল, মাল খাব।

আর বুঝি জায়গা নেই?

সুখেন নির্লজ্জের মত ওর হাত ধরে টানল। বাসি তরকারী নেই ঘরে? নয়ত দোকান খুলে চানাচুর নিয়ে এস।

অহীন জিভ কেটে বলল, এই সুখেনদা, মাল খেতে এসে বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু পালাব বলছি। আমি ছোট ভাই না আপনার?

জবাব শিবানীই দিল। তার গালে চিমটি কেটে বলল, কচি খোকার গাল টিপলে দুধ বেরোয়। ছোট ভাই-বড় ভাই আজকাল এক গেলাসে জল খাচ্ছে জানো না বুঝি।... ঘরে ঢুকে সে তাক খ'ুজে দুটো গেলাস বের করছিল।

ধুতে ধুতে ফের শিবানী বলল, ভালই হল। রাত কাটানোর মানুষ পাওয়া গেল। উঃ, ভয়ে কাঁপছিলাম এতক্ষণ!

(ক্রমশঃ)

হাসির মজলিস

দুই মদাপ।
প্রথম জন মানুষ ধন মান ঘর বাড়ী খ্যাতি কিছুই চায় না। কিন্তু কি চায় মানুষ বলো ত?
দ্বিতীয় জন—মেয়েমানুষ।

●

রাত্রি প্রায় সাড়ে তিন। মাতাল ভদ্রলোক হঠাৎ টেলিফোন তুলে এক বন্ধুর নাম্বার ধরে ধরে ডায়াল করলেন। ওদিকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—

—হ্যালো?
দেখ জয়ন্ত, আজ সকালে তর্কাতর্কির সময় তোকে নরকে যেতে বলেছিলাম।
—হ্যাঁ বলেছিলি।
—তোকে আর সেখানে যেতে হবে না।
—কিন্তু এত রাতে টেনে তুলেই প্রায় তার মাঝ-রাস্তায় পৌঁছে দিলি!

●

এক ভদ্রলোকের চার মেয়ে।
মেয়েদের বিয়ে দেবেন। উচ্চপদস্থ জনৈক সরকারী কর্মী পাত্র। মেয়ে দেখতে এসেছেন।
বড় মেয়েকে দেখিয়ে মেয়ের বাবা বললেন—একে যে বিয়ে করবে, সে দু'হাজার টাকা পাবে। কারণ, এ কানে সামান্য কম শোনে।
পাত্র নীরব।
দ্বিতীয় মেয়েকে দেখিয়ে মেয়ের বাবা বললেন—একে যে বিয়ে করবে, সে তিন হাজার পাবে। কারণ, এ সামান্য বোবা।
—পাত্র এবারও নীরব।
তৃতীয় মেয়েকে দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন—একে যে বিয়ে করবে, সে চার হাজার পাবে। কারণ, এর একটা চোখ সামান্য কাণা।
—পাত্র নিরুত্তর।
চতুর্থ মেয়েকে দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন—একে যে বিয়ে করবে, সে দশ হাজার টাকা পাবে।
অফিসার পাত্র এবার সরব।—একে তো দেখতে বেশ সুন্দরী, তবে এত টাকা দেবেন কেন?
মেয়ের বাবা বললেন—কারণ এ সামান্য পাগল।

জনৈক মডেল তার এজেন্টের কাছে গিয়ে তার এক বান্ধবীর জন্য কাজের কথা বললেন।
—তার মাপ কত?—ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।
—২৬—৩২—৮৫—মডেল জানাল।
ওরে বাপস্—এই মেয়েটি কি করে? এজেন্ট জানতে চাইল।
মেয়েটি জানাল—ও পিরামিডের মডেল হিসাবে কাজ করে।

●

১ম ব্যক্তি—এমন একটা জিনিসের নাম কর যা শিশুরা বিনামূল্যে পায়, যুবকেরা চুরি করে এবং বয়স্করা না পেয়ে পস্তায়?
২য় ব্যক্তি—চুম্বন।

●

—তুমি একটা মিথ্যাবাদী।
—ফের এ-কথা বলে দেখ, তোমার চোয়াল উড়ে যাবে!
—মনে কর বলছি।
—মনে কর তোমার চোয়াল উড়ে গেছে।

●

—আমাকে একদিনের ছুটি দেবেন স্যার?
—কেন?
—আমি বিয়ে করছি।
—বিয়ে! দু' মাস আগে না তোমার স্ত্রী মারা গেছে?
—হ্যাঁ স্যার।
—এর মধ্যেই আবার বিয়ে করছ?
—হ্যাঁ স্যার, আমি যে বেশী দিন শোক সহ্য করতে পারি না।

●

অফিসের বড়বাবু—তোমার এত লেট কেন?
লেডি স্টেনো—রাস্তায় একটা লোক আমার ফলো করছিল স্যার।
বড়বাবু—সেটা কি একটা কৈফিয়ৎ হোল!
স্টেনো—কি করবো স্যার, লোকটা ভীষণ আস্তে আস্তে হাঁটছিল কিনা।

মন বুঝে দেখুন

কুইজ
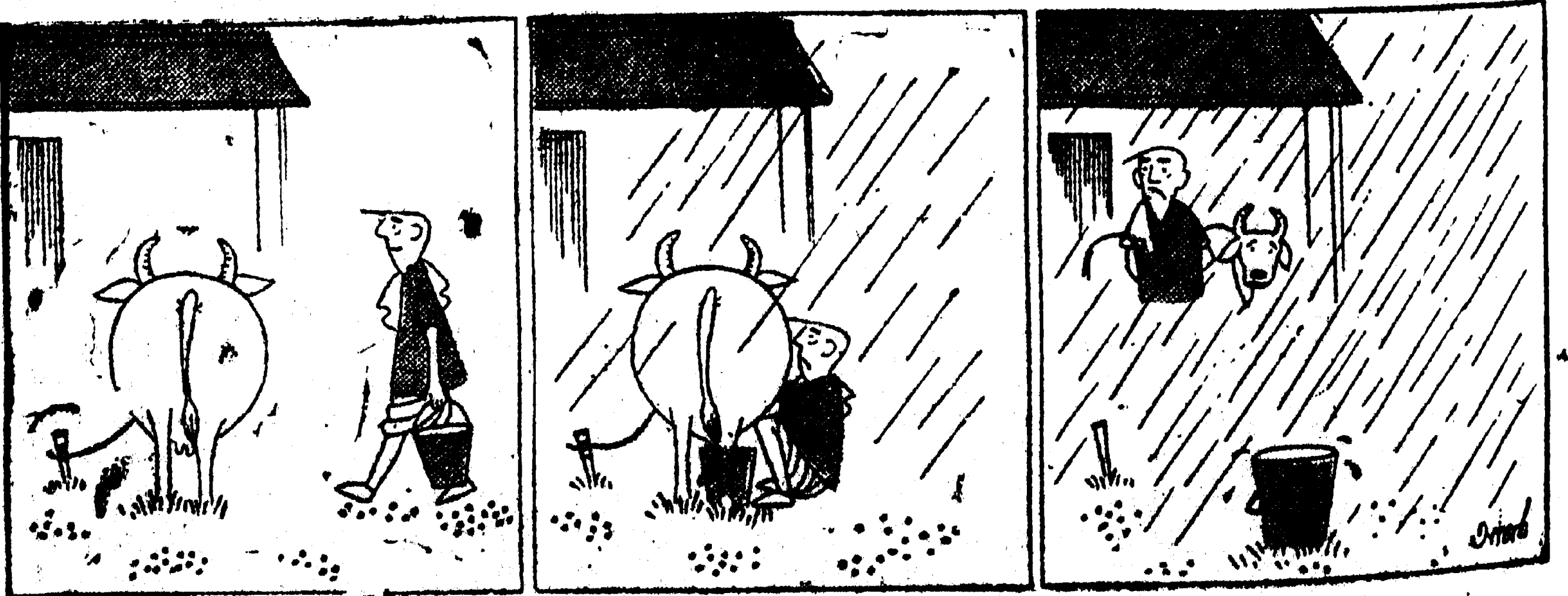
আপনার বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারেন?

বন্ধুত্ব বললে দুরকম বোঝায়—বিরল এবং সরল! বিরল বন্ধুত্ব গভীর, মূল্যবান, অতুলনীয়—'এমন বন্ধু আর হয় না।' সরল বন্ধুত্ব উদার, অকৃপণ, সবার জন্যেই—'সবাইকে বেশ জমিয়ে নিতে পারে।'

'সবাইকে-জমিয়ে-নিতে পারা' গুণটি যার আছে, সে যে সত্যিকারের উপকারী বন্ধু হবে, এমন কোনো কথা নেই। 'বন্ধু' বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায়, তা হয়তো তার খুব বেশি নেই। তবে প্রায়ই তাকে ঘিরে উৎফুল্ল আনন্দ-চঞ্চল লোকজনের কলকল্লানি শোনা যাবে।

প্রায়ই বন্ধুত্বের কথা উঠলে আমরা মনে করি কেবল জানা-শোনা থাকলেই বন্ধুত্ব হলো। আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংখ্যা অনেক হতে পারে না, হওয়ার দরকারও নেই। মানুষের জীবনে এই একটি বৈশিষ্ট্য যেখানে সংখ্যাটাই বড় কথা নয়, গভীরতা এবং উৎকর্ষই আসল জিনিস।

বন্ধুত্ব প্যাতাবো মনে করে হিসেব-নিকেশ করে ভাব জমাতে গিয়ে অনেকেই বিফল হয়েছেন। তাই মনে হয়, বন্ধুত্ব এক ধরনের উপজাত বৈশিষ্ট্য বাই-প্রডাক্ট! ওটা অন্য একটা লক্ষ্যের বা উদ্দেশ্যের ফলস্বরূপ না-চাইতেই ফাউ হয়ে জুটে যায়! সেখানে কাজ করে ব্যক্তিগত মনের এর ধরনের আকর্ষণী শক্তি—ঠিক চুম্বকের মতোই।

কিছু লোক আছেন যাঁরা অনেক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকেন, কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু তাঁদের খুবই কম। আবার কিছু লোক আছেন যাঁরা সত্যিকারের বন্ধুত্ব আকর্ষণ করেন, যেমন করে মখমলের ওপর তুলোর আঁশ জড়িয়ে আটকে যায় তেমনভাবেই। এ শুধু কপালজোরে ঘটে না কিংবা ফিটফাট হয়ে থাকলেই হয় না। এর জন্যে দরকার আন্তরিকতা, ব্যক্তিত্ব-বিকাশ আর দায়িত্ববোধ। নিচে কতকগুলি ঘটনা-পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে। কোথায় কোন ক্ষেত্রে কি ধরনের আচরণ করবেন ভেবে নিয়ে মনের মতো জবাবটিতে দাগ দিন।

১। আপনার ছোটো এক বন্ধুর সম্বন্ধে একটি খুব মজার কাহিনী আপনি জানেন। তখন:

(ক) সবাইকে আপনি বলবেন।

(খ) সবাইকে বলবার সময়ে নাম-ধাম বদলে দেবেন।

(গ) আপনার মনে-মনে রেখে দেবেন, কাউকে বলবেন না।

২। একটি বন্ধু প্রায় এটা-সেটা ধার নিয়ে যায়, কিন্তু কক্ষনো ফেরৎ দেয় না। এখন কতকগুলো দামী যন্ত্রপাতি চাইতে এসেছে। তখন:

(ক) আপনি তাকে দেবেন।

(খ) বলবেন ওসব নেই।

(গ) দিতে চাইবেন না এবং না-দেওয়ার কারণ বুঝিয়ে দেবেন।

৩। এক বন্ধু দৈবক্রমে আপনার হাত-ঘড়ি ভেঙে ফেলেছে। তখন:

(ক) বলবেন যেমন করেই হোক একটা নতুন ঘড়ি দিতে হবে।

(খ) দাম দিতে বলবেন।

(গ) নতুন ঘড়ি দিতে চাইলে নেবেন না, তবে অসাবধানতার জন্যে বকুনি দেবেন।

৪। এক বন্ধু এমন একজনের সঙ্গে চলাফেরা করছে, যাকে আপনি পছন্দ করেন না। আপনি তাহলে:

(ক) বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দেবেন।

(খ) কিছু বলবেন না এবং বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলবেন।

(গ) তাকে বলবেন আপনাদের দুজনের একজনকে নিয়ে চলতে হবে।

৫। আপনি বেশ বুঝতে পারছেন, একটি বন্ধু গোলমালের মধ্যে পড়তে চলেছে। আপনি তখন:

(ক) তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে দেবেন যাতে না গোলমালে জড়িয়ে পড়েন।

(খ) তার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলে নেবেন।

(গ) যেমন ছিল তেমনই বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলবেন।

৬। আপনি কি মনে করেন সত্যিকারের বন্ধুর কর্তব্য হলো:

(ক) আপনাকে সব কথা বলা?

(খ) সে যা চায় আপনাকে তা বলা?

(গ) তার চিন্তা-ভাবনা আপদ সমস্যা নিজেরই মধ্যে চেপে রাখা?

৭। আপনি জেনেছেন আপনার বন্ধুর টাকা দরকার এবং দেবার মতো টাকা আপনার কাছে আছে। আপনি বলবেন:

(ক) "নাও ভাই। তুমি নিলে আমি ভারী খুশি হবো।"

(খ) "মনে আছে তুমি কতোবার আমাকে সাহায্য করেছো। তার তুলনায় আমার এটা তো সামান্য।"

(গ) "টাকাটা তোমার কাজে লাগবে। তোমার অবশ্য কিছু টাকা জমানো উচিত ছিল।"

কত পাবেন:

প্রত্যেকটি ঘটনা-পরিস্থিতিতে আপনি যে জবাবে দাগ দিয়েছেন, তাতে এইভাবে নিজেকে পয়েন্ট দিন:

১। (ক)-১, (খ)-২, (গ)-৩; ২। (ক)-১, (খ)-১, (গ)-৩; ৩। (ক)-৩, (খ)-২, (গ)-১; ৪। (ক)-২, (খ)-৩, (গ)-১; ৫। (ক)-১, (খ)-৩, (গ)-২; ৬। (ক)-১, (খ)-৩, (গ)-২; ৭। (ক)-২, (খ)-৩, (গ)-১।।

ব্যাখ্যা:

১২—২১ পয়েন্ট: ভাবতে হবে না, আপনার ভালো ভালো বন্ধু আছেন। হয়তো তাঁরা সংখ্যায় বিপুল নন, কিন্তু যে কজন আছেন তাঁরা বিশ্বাসভাজন এবং আপনাকে প্রশংসা করেন। আপনি সুনিশ্চিতভাবে জানেন, যেখানে যখনি তাঁদের প্রয়োজন হবে, তখনি তাঁদের পাবেন।

৮—১১ পয়েন্ট: আপনার বন্ধু আছেন একথা ঠিক, তবে আমাদের অনেকের যেমন হয়, তেমনি মাঝে মাঝে আপনি ভুলে যান কিভাবে মন বুঝে চলতে হয়। যখনি সন্দেহ জাগবে, তখনি বন্ধুটির জায়গায় মনে মনে নিজেকে বসিয়ে পরিস্থিতি যাচাই করে নেবেন।

৭ পয়েন্টের নীচে: পাঁচজনের চেয়ে নিজের ব্যাপার নিয়েই আপনার আগ্রহ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। এর ফলে সত্যিকারের বন্ধুত্ব এবং আপনার মাঝখানে একটি পাঁচিল গড়ে ওঠে। যখনি পারেন, নিজের দুর্দিনের জন্য লোকজনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেন—যেটা পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার সম্পর্ক গড়ে তোলার সহায়ক হতে পারে না, আর স্থায়ী বন্ধুত্বের একটি অপরিহার্য জিনিস হলো এই পারস্পরিক মর্যাদাবোধ।

কালো মুক্তো

পিটার ওডোনেল

কেয়া পাতার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

[উপন্যাস]

আগের ঘটনা

[উনিশ শ চল্লিশের অক্টোবর। কলকাতার ছেলে বিনু দুই দিদি আর মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে পূর্ব বাংলায় রাজদিয়ার দাদু হেমনাথের বাড়ি। বিশ বছর বাদে বিনুর মা সুরমা এলেন রাজদিয়ায়।

আশ্চর্য মানুষ হেমনাথ। গাঁয়ের লোকের ঝুট-ঝামেলা তাঁর মাথায়।

হেমনাথের বাড়ির কর্মচারী যুগলের সঙ্গে বিনুর ভাব বেশ গাঢ় হল।

প্রথম দিনেই অবনীমোহনের সঙ্গে আলাপ হল রাজেক মিঞা আর হাসেম আলির। ওদের আন্তরিকতায় অবনীমোহন অভিভূত। রাজদিয়া হয়ে গেল অবনীমোহনের নতুন 'ঠিকানা'।

পরদিন। বিনুদের রাজদিয়া ঘুরে দেখাচ্ছেন হেমনাথ। হেমনাথ পাড়ে গিয়ে [illegible] আনন্দে লারমোর সাহেবের সঙ্গে দেখা। বিকেলে ওদের নিয়ে হেমনাথের বাড়ি এলেন।

স্নেহলতার সঙ্গে দেখা হতেই কৌতুকের খেলা জমল। লারমোরের সঙ্গে এ বাড়ির মধুর প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক দেখে বিনু মুগ্ধ। সেদিনটা ভালোই কাটল।

পরদিন সুজনগঞ্জের হাটে রওনা হল। বিনু যুগলের ছই-য়ে আর লালমোহন, হেমনাথ, অবনীমোহন আলাদা নৌকোয়]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দশ

খুব বেশিক্ষণ ঝিনুকের কথা বিনুর মনে থাকল না।

জীবনে এই তার প্রথম নৌকোয় ওঠা। ব্যাপারটা খুবই লোভনীয়, এর জন্য কাল সমস্ত রাত উত্তেজনায় ঘুমোতে পারে নি। কিন্তু নৌকোয় উঠবার পর দেখা গেল জলের মাথায় সেটা ভীষণ দুলছে। ফলে মজার বদলে ভয় করতে লাগল বিনুর। মনে হল, এই বুঝি পড়ে যায়, এই বুঝি পড়ে যায়। প্রাণপণে দুহাতে পাটাতনের কাঠ চেপে ধরল সে।

লগি বাইতে বাইতে যুগল লক্ষ করেছিল। বলল, 'ডর নি লাগে ছুটোবাবু?'

অন্য সময় হাজার ভয় পেলেও মুখ ফুটে বলত না বিনু। আর যার কাছেই হোক, যুগলের কাছে ভয়ের কথা বলতে মাথা কাটা যেত। কিন্তু জীবনে এই প্রথম টলমলে নৌকোয় উঠে বীরত্বের একটি কণাও নিজের ভেতর খুঁজে পেল না সে; কাঁপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ। নৌকোটা বড্ড দুলছে।'

'ডর নাই। পথম পথম (প্রথম প্রথম) ঐরকম মনে হইব। দুই চাইর দিন নায়ে চড়েন, ঠিক হইয়া যাইব।'

যুগল আশ্বাস দিল বটে, কিন্তু খুব একটা ভরসা বিনু পেয়েছে বলে মনে হয় না। বরং পাটাতন আরো জোরে আঁকড়ে ধরল।

কিন্তু ভয়ের ভাবটাও বিনুকে বেশিক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখতে পারল না। কেননা, যেদিকে যতদূর চোখ যায়, শরৎকাল তার সবটুকু মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে নীল নয়নের চকিত চাহনির মতন আশ্বিনের আকাশ। মেঘ ছাড়া ওখানে পাখিও আছে—চেনা অচেনা কত যে পাখি। আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাখি আর মেঘেরা বাতাসে গা ভাসিয়ে রেখেছে।

নীচে শুধু জল আর ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে নলখাগড়া, জলঘাসের বন, ঝাড়-অলা ধঞ্চে আর কালো মুত্রার ঝোপ। আর আছে বউন্যা গাছ, কাউফলের গাছ, লাল ফুলে ভরা মান্দার গাছ। আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে নেমেছে সারি সারি তাল-গাছ সেখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। জলঘাসের মাথায়, মুত্রাঝোপে এই সকালবেলায় রাশি রাশি ফড়িং উড়ছে—নানা রঙের চিত্রবিচিত্র ফড়িং। তাদের ধরবার জন্য এসেছে ছোট ছোট বগাই পাখি।

ইতিমধ্যে রোদ উঠে গিয়েছিল। তরল সোনার মতন আলোয় চারদিক ভরে গেছে। এই আশ্বিনে জল যেন চকচকে আরশি, তাতে বউন্যাগাছের ছায়া কাউফল গাছের ছায়া নলখাগড়ার ছায়া কাঁপছে।

কলকাতা থেকে এতদূরে এই জল বাংলায় শরৎকালটা বুঝিবা এক আশ্চর্য জাদুকর। ঝাঁপির ভেতর থেকে একের পর এক বিস্ময় বার করে খুব দ্রুত বিনুকে জয় করে নিতে লাগল সে।

কখন মস্ত পুকুরটা পেরিয়ে এসেছিল, বিনুর মনে নেই। নৌকোর তলায় এবং দুধারে সর সর্ আওয়াজে এক সময় চমকে উঠল সে। দেখল, তারা ধানখেতের ভেতর এসে পড়েছে।

মাঝে লগি ঠেলছিল যুগল। নিবিড় ধানবন দুধারে সরে সরে নৌকোটাকে পথ করে দিচ্ছে।

ধানগাছ কি আগে আর দেখে নি বিনু? অনেকবার দেখেছে। মাসে করে বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে তারকেশ্বরে যাবার সময় রাস্তার দুপাশে অবারিত ধানের খেত চোখে পড়েছে। কিন্তু সে তো দূর থেকে দেখা। এত কাছে বসে দেখার কথা আগে কখনও কল্পনাই করে নি বিনু।

বিনুর একবার ইচ্ছে হল, ঘন সবুজ ধানপাতাগুলোকে একবার ধরে দ্যাখে। হাতও বাড়িয়েছিল সে কিন্তু ধরবার আগেই যুগল চেঁচিয়ে উঠল, 'ধইরেন না ছুটোবাবু, ধইরেন না—'

চকিত বিনু তক্ষুনি হাতটা সরিয়ে আনল। বলল, 'কেন?'

'ধরলেই হাত কাইটা যাইব; ধানের পাতায় বড় ধার।'

বিনু আর কিছু না বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকল।

বাড়ি থেকে মনে হয়েছিল, ধানের খেত একটানা দিগন্ত পর্যন্ত বুঝি ছুটে গেছে। কিন্তু তা না, খানিক দূরে যাবার পর দেখা গেল ধান বন শেষ। তারপর শুধু জল আর জল। কাচের মতন স্বচ্ছ টলটলে জল পারাপারহীন সমুদ্র হয়ে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে আছে। আশ্বিনের এলোমেলো অস্থির বাতাস তার ওপর অবিরাম ছোট ছোট ঢেউ তুলে যাচ্ছে। ঢেউ ছাড়া এখানে যা আছে তা রাশি রাশি শাপলা ফুল, আর আছে বড় বড় পদ্মপাতা, ফাঁকে ফাঁকে থোকা থোকা কচুরিপানা। কচুরি-পানার মাথায় ময়ূরের মতন সজীব নীলাভ ফুল। ফুলে ফুলে এই সুবিস্তৃত জল-রাশি ছেয়ে আছে।

যুগল লগি রেখে এখন বৈঠা বাইছে। নৌকোর তলায় ছপ ছপ করে একটানা আওয়াজ শোনা যায়।

বিনুর বড় লোভ, হাত দুটো বাড়িয়ে তুলে দেয়। হাত বাড়িয়ে গিয়ে একটাও আর পড়ল। [illegible] [illegible] জল উঠল,

ঢুকেন না ছুটোবাবু, ঝুইকেন (ঝুঁকবেন) না। শাপলার লতা টানতে গেলে পইড়া যাইবেন; এখানে কিন্তুক অথই (অথৈ) জল; আপনে তো আবার সাঁতার জানেন না।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমিই তুইলা দিতে আছি।'

নৌকো বাইতে বাইতে টপ টপ অনেকগুলো শাপলা তুলে বিনুর দিকে ছুঁড়ে দিল যুগল।

কিন্তু নিজে তুলতে না পারলে সুখ কোথায়? বিরস মনে চুপচাপ বসে থাকল বিনু।

যুগল বলল, 'পদ্মফুল নিবেন ছুটো কত্তা?'

ভারী গলায় বিনু বলল, 'না।'

'শালুক?'

'না।'

'কচুরি ফুল?'

'না।'

গলার স্বর আর ক্রমাগত 'না' 'না' শুনে বিনুর মনোভাব খানিক যেন আন্দাজ করতে পারল যুগল। চিন্তিত মুখে বলল, 'গুসা (রাগ) নি হইছেন ছুটোবাবু?'

বিনু চুপ।

এবার একেবারে উদার হয়ে গেল যুগল; বরদানের ভঙ্গিতে বলল, 'আইচ্ছা তোলেন দুই চাইরটা, কিন্তুক বেশি ঝুঁকবেন না।'

বলামাত্র পদ্ম শাপলা এবং কচুরি ফুলে নৌকা বোঝাই করে ফেলল বিনু।

যুগল বলল, 'এবার খুশী তো?'

বিনুর মুখে হাসি ফুটল। কিছু বলল না সে।

জলজ ফুলের বনে আরো কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ এক জায়গায় এসে নৌকো থামিয়ে দিল যুগল।

অবাক হয়ে বিনু শুধলো, 'কী হল?'

সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে চাপা গলায় যুগল বলল, 'ঐ দ্যাখেন ছুটোকত্তা'—তার স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলার মতন টান টান হয়ে গেছে। দৃষ্টি পলকহীন, প্রখর। সর্বাঙ্গ ঘিরে বিচিত্র সংকেত ফুটে বেরিয়েছে।

যুগলের আঙুল যেদিকে, সেদিকে তাকিয়ে বিনু দেখতে পেল বড় একটা পদ্ম-পাতার কাছে তামাটে রঙের অসংখ্য মাছের ছানা কিলবিল করছে। বিনু শুধলো, 'কী ওগুলো?'

'চিনতে পারলেন না?'

'না।'

যুগল বলল, 'হেই তো (তাই তো), আপনে চিনবেন কই থিকা। আপনে কইলকাতার মানুষ। ঐগুলি শৈলের (শোল-মাছের) পোনা।'

বিনু বলল, 'শোলের পোনা তো বুঝলাম, নৌকা থামালে কেন?'

'দ্যাখেন না কী বাহারের মজা হয়—' রহস্যময় হেসে পাটাতনের তলা থেকে দশ বারো হাত লম্বা একটা সরু বাঁশের টুকরো বার করল যুগল; তার মাথায় অনেকগুলো ধারাল লোহার ফলা।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

'ট্যাটা।'

'কী হবে এটা দিয়ে?'

'ইট্টু সবুর করেন ছুটোবাবু, নিজের চৌখেই দেখতে পাইবেন।' বলতে বলতে পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়াল যুগল, হাতে সেই তীক্ষ্ণমুখ ট্যাটাটা।

নৌকোটা থেমে গিয়েছিল ঠিকই, তবে স্থির হয়ে নেই। হাওয়ার টানে জলের ওপর সেটা দুলছিল। ট্যাটাটা বাগিয়ে ধরে নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তামা-রঙের শোলের ছানাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী দেখল যুগল, তারপর শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে ট্যাটাটা ছুঁড়ে দিল।

জলের তলায় কী ঘটল, বিনু বুঝতে পারল না। তবে চারদিক তোলপাড় করে প্রকান্ড দানবের মতন কি যেন একটা সমানে আছাড় খেতে লাগল। তার ফল হল এই, অনেকখানি জায়গা জুড়ে পদ্ম আর সাপলার বন ভেঙেচুরে ছিঁড়েখুঁড়ে একেবারে তছনছ। আর যুগলের সেই ট্যাটাটা একবার জলের তলায় ডুবতে লাগল, আবার ওপরে ভেসে উঠতে লাগল। ডোবা আর ভাসা চলল অনেকক্ষণ ধরে।

এদিকে খুশিতে দু হাত ওপরে তুলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে যুগল, 'পড়ছে, পড়ছে! শালার শৈল (শোল) যাইবা কই?'

কিছুক্ষণ পর পদ্মবন শান্ত হয়ে এল। ট্যাটার বাঁশটা এখন জলের ওপর অল্প অল্প কাঁপছে। শোলের সেই পোনাগুলো ছত্র-ভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বৈঠা বেয়ে নৌকোটাকে ট্যাটার কাছে নিয়ে এল যুগল। জল থেকে অস্ত্রটা যখন ওপরে টেনে তুলল, দেখা গেল সেটার ধারাল ফলায় দু হাতের মতন লম্বা একটা শোল মাছ বিঁধে আছে।

ক্ষিপ্র হাতে ট্যাটার মুখ থেকে মাছটা খুলে নিয়ে পাটাতনের তলায় ঢুকিয়ে দিল যুগল। তারপর ফলাগুলো ধুয়ে টাটকা মাছের পাশে রাখতে রাখতে বলল, 'বুঝলেন নি ছুটোবাবু—'

'কী বলছ?' তক্ষুনি সাড়া দিল বিনু।

'বর্ষাকালে শৈলমাছে পোনা ছাড়ে। যত দিন না পোনাগুলি ডাঙ্গর (বড়) হয়, নিজে নিজে ঘুইরা ফিরা খাইতে শিখে, ততদিন মা-মাছটা তাগো (তাদের) লগে লগে (সঙ্গে সঙ্গে) থাইকা পাহারা দ্যায়।'

'তাই নাকি?'

'হ।' যুগল মাথা নাড়ল, 'ইট্টু আগে যে পোনাগুলি দেখছেন এই মাছটা তাগো (তাদের) মা।'

বিনু হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল, বিষণ্ণও। বলল, 'মাছটাকে তো মেরে ফেললে; ওর বাচ্চাগুলোর এখন কী হবে?'

'কি আবার হইব; অন্য মাছে ওগো (ওদের) খাইয়া ফেলব।'

'ইস,' বিনুর চোখে মুখে কষ্টের রেখা ফুটল।

'ছুটোবাবুর শরীলে বড় দয়ামায়া' যুগল হেসে ফেলল, 'বাচ্চার কথা ভাইবা (ভেবে) যদি মাছ না মারি, আমরাই বা খামু কী? এই লইয়া মন খারাপ কইরা থাইকেন (থাকবেন) না ছুটোবাবু; পিথিমিতে একজনের না মারলে আরেকজন বাঁচে না।'

তবু বিনুর মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকল। ইতিমধ্যে যুগল আবার নৌকো বাইতে

শুরু করেছে। অনেকখানি বাবার পর সে ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

বিনু তাকাল।

যুগল বলল, 'এই মাছটা লইয়া অখন কী করি কন (বলুন) দেখি। অখন তো হপায় (সবে) সকাল, হাট সাইরা ফিরতে ফিরতে রাইত দুফার (দুপুর) হইয়া যাইব। ততক্ষণে মাছ থাকব পইচা (পচে)।' তাকে বেশ চিন্তিত দেখাল।

সত্যিই তো, মাছটা নিয়ে এখন কী করা উচিত বিনুও ভেবে পেল না।

হঠাৎ সমস্যাটার যেন কিনারা করে ফেলেছে এমনভাবে যুগল বলে উঠল, 'হইছে ছুটোবাবু, হইছে—'

'কী হয়েছে?' বিনু জিজ্ঞেস করল।

'পথে আমার এক কুটুমবাড়ি পড়ব। আমার পিজাত (পিজতুতো) বইনের শ্বউর বাড়ি। ভাবতে আছি মাছটা সেইখানে দিয়া যামু। শুধাশুধি পচাইয়া লাভ কী?'

'কিন্তু—'

'কী?'

'হাটে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে না?' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়তে সামনের দিকে তাকাল বিনু।

খানিক আগেও হেমনাথদের নৌকোটা তাদের সামনে শ'খানেক গজের ভেতর ছিল। এখন অনেকদূরে চলে গেছে; এখান থেকে ধু ধু বিন্দুর মতন দেখাচ্ছে সেটা। বিনু চঞ্চল হল, 'দাদুদের নৌকো কোথায় চলে গেছে, দ্যাখো—'

চোখের কাছে হাত এনে যুগল একবার দেখে নিল। তারপর হেসে বলল, 'যাউক না; হাটের পথ কি আমি চিনি না? কুটুমবাড়ি থনে (থেকে) বাইর হইয়া একখান বাদাম খাটাইয়া দিমু, বড় কত্তাগো আগে হাটে পোঁছাইয়া যামু।'

বিনু চুপ করে রইল। তার মুখ চোখ দেখে মনে হল না, যুগলের কথায় খুব একটা ভরসা পেয়েছে।

আশ্বিনের সূর্য পুবে আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। রোদে এখন আর কোমল সোনালী আভা নেই; স্নিগ্ধতা মুছে গিয়ে তাতে ঝকঝকে ধারাল রং লেগেছে। যতদূর তাকানো যায় ছোট ছোট ঢেউ-এর মাথায় ঝকমকানি নেচে বেড়াচ্ছে। সেদিকে বেশি-ক্ষণ কেউ চোখ পেতে রাখবে, সাধ্য কী।

বৈঠা টানতে টানতে যুগল বলল, 'ছুটোবাবু আমার মনে একখান সাধ হইছে।'

'কী?' বিনু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'আপনেরে একখান গীত শুনামু।'

'গান শোনাতে চাইছ?'

'হ।'

সেদিন গানের কথা বলছিল বটে যুগল। সারি-জারি-বয়াতি-ভাটিয়ালি, হেন গান নাকি নেই যা সে জানে না। বিনু বলল, 'বেশ তো, গাও না—'

বৈঠাটা নৌকোর ওপর তুলে বাঁ হাতে বাঁ কানখানা চেপে ডান হাত গগনের দিকে বাড়িয়ে গান ধরল যুগল :

ও ভাইটাল গাঙেগর নাইয়া,
ময়ূরপঙ্খী নাওরে বাইয়া
  কোন বা দ্যাশে যাও।
এই ঘাটে লাগাইয়া ডিঙগা,
  আমার একখান কথা লও
ঐ তো নদীর উজান বাকে
  সোনার বালুচর।
সেইখানেতে আছে আমার
  পরান বন্দুর ঘর।
কইও খবর বন্দুর কাছে
জল ছাড়া মীন কয়দিন বাচে
  বাচে রে এ-এ-এ
এই কথাটি না যদি কও,
  আমার মাথা খাও।
ও ভাইটাল গাঙ্গের নাইয়া,
  নাইয়া রে—এ-এ-এ।

বেশ সুরেলা জমাট গলা যুগলের। চারদিকের ধান আর শাপলা বন, কচুরি ফুলের বেগুনি শোভা, মনোরম নীলাকাশ, তার গায়ে থোকা থোকা সাদা মেঘ, দিগ্-দিগন্তে ছুটে-যাওয়া আশ্বিনের অথৈ জল-রাশি, উড়ন্ত পাখির ছায়া—পূর্ব বাংলার এই সজল শ্যামল ভুবনটির সঙ্গে যুগলের গানের আশ্চর্য মিল রয়েছে। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেল বিনু।

গান শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার রেশ এখনও জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁপছে। যুগল সাগ্রহে শুধলো, 'গান কেমন শুনলেন ছুটোবাবু?'

বিনু মুগ্ধ হয়েই ছিল। বলল, 'খুব ভাল।'

'দেখলেন তো আপনেগো যুগইলা সেই দিন মিছা কয় নাই। এইরকম গান আমার মেলা (অনেক) জানা আছে। আপনেরে শিখাইয়া দিমু ছুটোবাবু, যা যা জানি বেবাক (সব) শিখাইয়া দিমু।' বলে আবার বৈঠা জলে নামাল যুগল।

•

সীমাহীন এই শাপলা-পদ্মের বনে বসে যেদিকেই তাকানো যায়, শুধু জল। দূরে ধানের খেত, আরো দূরে নীলাভ বনরেখা। এর ভেতর কোথাও লোকালয় থাকতে পারে, তা যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু আছে; মাঝে মাঝে দু-চারখানা কৃষাণগ্রাম দ্বীপের মতন মাথা তুলে রেখেছে।

কোণাকুণি দক্ষিণে পাড়ি দিয়ে একটা গ্রামে এসে পড়ল যুগলরা। গ্রাম আর কি, বিশ পঁচিশখানা মাটির বাড়ি এলোমেলো ছড়িয়ে আছে।

যুগল যে বাড়িতে এনে নৌকো থামাল সেটা অদ্ভুত। এমন বাড়ি আগে আর কখনও দ্যাখে নি বিনু। উঁচু ভিতের ওপর মোট খানচারেক ঘর। উঠোন টুঠোন বলতে কিছু নেই—ঘর ছাড়া বাদবাকি সব দু' তিন হাত জলের তলায় ডুবে আছে। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার জন্য সাঁকো পাতা আছে।

এই সকালবেলা দু তিনটে কালো কালো অর্ধোলঙ্গ ছেলেমেয়ে সাঁকোর ওপর বসে বড়শি বাইছিল। উঠোনের জলে পুঁটি আর খলিসাতো মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড়শিতে কাজ গেঁথে ফেলার শুধু অপেক্ষা—সঙ্গে সঙ্গে মাছ উঠে আসছে।

যুগল নৌকো ভেড়ানোমাত্র ছেলেমেয়ে-গুলো চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'যুগলামামায় আইছে, যুগলামামায় আইছে—'

নৌকোটাকে সাঁকোর বাঁশে বাঁধতে বাঁধতে যুগল বলল, 'তগো (তোদের) বাপে কই?'

সবাই সমস্বরে উত্তর দিল, 'হাটে গেছে।'

'মা?'

ছেলেমেয়েগুলো চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'মা মা, দেইখা যাও ক্যাডা (কে) আইছে—'

(ক্রমশ)

গত ৬ঠা আশ্বিন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের জন্মদিনে তাঁর এই রেখাচিত্রটি ডঃ প্রদীপ ঘোষ মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে আঁকেন। শ্রীঘোষ কোন শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করেননি। তিনি কলকাতা ও লণ্ডনের এম, এস, সি। লিস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রিলাভ করেন। শ্রীঘোষ স্টেটসম্যান পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার এবং সুসাহিত্যিক শ্রীকেদার ঘোষের একমাত্র পুত্র।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

কলকাতার গুজরাতী সাহিত্যমণ্ডল স্থানীয় গুজরাতী শিল্পীদের শিল্পচর্চার নিদর্শনের একটি ছোট প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনী আয়োজিত হয় ১১ থেকে ১৭ অকটোবর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে এবং এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন শিল্পী শ্রীযামিনী রায়।

ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুজরাতের দানের কথা স্মরণ করে একটা বিশেষ কিছু দেখতে পাওয়া যাবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু নিতান্ত মামুলী ধরনের পাঠ্যিশালী শিল্পচর্চার নমুনা ছাড়া বেশী কিছু পাওয়া গেল না। নয় থেকে প্রায় ষাট বছর বয়সের শিল্পীদের চিত্রচর্চার নিদর্শন দেখা গেল ; এবং বেশীর ভাগ কাজেই একটা অপেশাদারী ভাব লক্ষ্য করা গেল। মনে হয় এ'দের অধিকাংশই অবসর সময় চিত্ত বিনোদনের জন্য শিল্পচর্চা করে থাকেন। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হয়ত প্রদর্শনীকে খুব খারাপ বলা চলে না। তবে কলকাতার কোন কোন আধুনিক গুজরাতী শিল্পীদের কাজ অনুপস্থিত দেখলাম।

প্রদর্শনীতে প্রায় ত্রিশজন শিল্পীর পঁচাত্তরখানি জলরং তেলরং প্যাস্টেল ও ড্রইং উপস্থিত করা হয়েছিল, ছোট ছেলে মেয়েদের আঁকা গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ আব্রাহাম লিংকনের ড্রয়িং এবং গাছের পাতার ওপরে আঁকা ছবিও বাদ ছিল না। তবে ৯ বছরের ছেলে রুচিব যোশীর 'অ্যাটম অ্যাণ্ড দি রক' এবং 'মোহন ড্যাম' একটু আশ্চর্যজনকভাবে পরিণত কাজ বলে চোখে পড়ল। মহাদেবী ভগতের 'মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড' জলরঙের কাজের একটি সুন্দর নিদর্শন। মিনু শা'র 'কেলা গুনাথন' মিনিয়েচার এবং 'কাপ্‌ল্‌' নব্যভারতীয় প্রথায় আঁকা কাজ সৌখিন শিল্পীর কাজের নমুনা হিসেবে মন্দ হয় নি। নির্মলা শা'র প্যাস্টেল 'ইয়েলো পুলওভার', অয়েল পোর্ট্রেট 'ছবিল' এবং কুলুর নিসর্গ দৃশ্য আর্ট স্কুলের পরিণত ছাত্র-ছাত্রীর কাজের মতই আকর্ষণীয়।

বাপালাল চৌধুরীর 'রেস্ট' ছবিটি বিশ্রামরত মাঝির—কিন্তু তুলি চালনায় আঁকা সিলহুয়েৎ হিসেবে বেশ আকর্ষণীয় কাজ। রমেশ মেহতার 'লাভ লেটার' প্রাচীন মিনিয়েচারের ঈষৎ দুর্বল কপি। মীনা কোঠারীর 'রিহার্সাল' ও দেগার চিত্রের

অনেকখানি দুর্বল কাঁপ। তাঁর হাম্‌টি ডাম্‌টি'র মত বিলিতী বইয়ের ইলাস্ট্রেশন কেন যে প্রদর্শনীতে স্থান পেল তা বোঝা গেল না। বরং শশীকান্ত শেঠ-এর 'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রের রং রেখার কাজ ভারতীয় লোকশিল্পের অনুকরণে করা ছবি অনেক মনোহর। এই গুণ কপিলাবেন মার্চেন্টের 'শ্রীনাথজী'র কাপিতেও বিদ্যমান। লক্ষ্মী সিক্‌কার 'দি পিচার' মৃৎপাত্র হাতে দীর্ঘাঙ্গী কটিমাত্র আবৃতা রমণীমূর্তি। বেশ বড় ছবি। দীর্ঘকাল আগে 'ভারতবর্ষ' 'পুষ্পপাত্র' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় এ জাতের ছবির বহুবর্ণ প্রতিলিপি দেখা যেত। তাঁর 'ভিলেজ কর্ণার' ছবিটি বরং ছোট হলেও সুগঠিত।

●

সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার পর হস্তশিল্পের উন্নতির চেষ্টা ও নিয়মিত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। রপ্তানির বাজার খোঁজ করার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। সমাজের উচ্চকোটির গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবেও এর সমাদর বৃদ্ধি হয়েছে। তবে পুরাতন সমাজব্যবস্থায় যে জনসাধারণের নৈমিত্তিক প্রয়োজনে এর সৃষ্টি, এর বর্তমান মূল্য তাদের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। অন্যদিকে, যাঁরা এর স্রষ্টা তাঁদের আয়বৃদ্ধির পথ আবার কিছুটা প্রশস্ত হয়েছে।

গত ১৪ থেকে ২০ অক্‌টোবর পশ্চিমবঙ্গের ডিরেক্‌টরেট অব কটেজ অ্যান্ড স্মলস্কেল ইন্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক হস্তশিল্পের সাড়ে তিনশ'র ওপর নিদর্শনের একটি প্রদর্শনী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রদর্শনীর সঙ্গে একটি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করায় অনেক অভ্যাগতের সুবিধা হয়েছিল।

এবারকার প্রদর্শনীকে কিন্তু গত বছরের মত সুসজ্জিত বলা গেল না। পাশের ঘরের বিক্রয়-কাউন্টারকেই যেন আরেকটু সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থিত করা হয়েছে বলে মনে হল। গতবারের মত এবারেও শিং-এর খেলনা ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু, মুখোশ, দারুশিল্প, শোলার পুতুল, ঢোকরা ধাতুশিল্প, চামড়ার কাজ, রুপোর ফিলিগ্রি কাজ, বিভিন্ন ধরণের পুতুল, শাঁখের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, চীনেমাটির কাজ, পার্বত্য অঞ্চলের হস্তশিল্প, এমব্রয়ডারি, কার্পেট মাদুর এবং পাটির কাজ, ছাপা কাপড়, কাঁথা, স্ক্রল্‌ পেন্টিং, লাক্ষার কাজ, মাটির কাজ, দড়ি, গজদন্ত, কাঁসা ও *পিতলের কাজ প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়েছে।* কলকাতার 'ডিজাইন সেন্টার', বারুই*পুরের 'এক্‌সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক-কাম* রিসার্চ ইনস্টিটিউট' মেদিনীপুর, বর্ধমান, দার্জিলিং, বাঁকুড়া, বীরভূম, চব্বিশ পরগণা, কলকাতা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের হস্তশিল্প কেন্দ্র বিভিন্ন কারিগর প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাজ হিসেবে বর্ধমানের শম্ভুনাথ ভাস্করের দারুমূর্তি এবং ঢোকরাদের ধাতুমূর্তিগুলিই প্রতিটি দর্শককে আকৃষ্ট করেছে। শম্ভুনাথ ভাস্করের 'রাবণ' একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এছাড়া 'প্যাচা' 'লক্ষ্মী' এবং 'দুর্গা' মূর্তিও চমৎকার কাজ। ঢোকরাদের 'জগন্নাথ', 'রাবণ' দুটি ভিন্ন ধরনের ময়ূর, 'মনসাঘট' 'হাতী', 'প্যাঁচা' এবং 'কুমীর'-এর ডিজাইনের বৈচিত্র্য এবং রুচি লক্ষ্য করার মত। শোলার পুতুলগুলি গতবারের চাইতে অনেক সুন্দর লাগল, কিন্তু চাঁদমালা বা ওই জাতীয় অন্যান্য ডেকরেটিভ কাজের সংখ্যাও খুব কম এবং গতবারের মত সুরুচিসম্পন্ন বা সুগঠিত হয় নি। শিং-এর তৈরী ছোট ছোট পুতুলের মধ্যে জীবজন্তুর পুতুলগুলি মন্দ হয়নি। মাদুর ও পাটীর কাজের মধ্যে কয়েকটি ট্রে, বাকস, মগ, ল্যাম্প ও বেতের ট্রেগুলি উল্লেখযোগ্য।

সেরামিকসের কাজের সংখ্যাও কম বাহারও তেমন নয়। পার্বত্য অঞ্চলের কতকগুলি গহনা এবং পুতুল মন্দ হয় নি, এমব্রয়ডারি বা ছাপা কাপড়ের কাজ ও কাঁথা খুব একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লাগল না। পোড়ামাটির টালির কাজ নতুন পরীক্ষা তবে সুদৃশ্য নকসার সংখ্যা কম। গজদন্ত শিল্পের নিদর্শন খুব কম এবং অসাধারণ কিছু নয়। এবারে কিছু বাদ্যযন্ত্রের নমুনা রাখা হয়েছে। মুখোশগুলিও মন্দ হয় নি।

●

চারুকলা শিল্পী সংস্থা বিড়লা অ্যাকাডেমিতে আঠারো জন শিল্পীর তেতাল্লিশখানি জল ও তেল রঙের ছবির প্রদর্শনী করলেন। ২৩ থেকে ২৮ অকটোবর পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল। ক্যাটালগের পরিচয়পত্র পড়ে বোঝা গেল এঁরা লেনিন ও মাও-সে-তুং-এর শিল্পসাহিত্য সম্পর্কিত ফতোয়ার ওপর নির্ভর করে শিল্পসৃষ্টি করতে চান এবং 'প্রোলেতারিয়েত' শ্রেণীর বিপ্লবী কর্মসূচীর চিত্ররূপায়ণই বোধহয় এঁদের উদ্দেশ্য। তাই অনেক ছবিতে অপটু হাতের আঁকা শীর্ণকায় দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মানুষ, দড়ি টানাটানি করা নগ্নদেহ শ্রমিক থিয়েটারের সীনের মত পুলিশ জোতদার ও মারমুখো কৃষক এবং ইঁট ও হাতুড়ি নিয়ে মালিকের প্রতি তাড়নারত কর্মীর মূর্তি দেখা গেল। তাছাড়া প্রথম বা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের মত আঁকা নগরের বা গ্রামের বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর সংখ্যাও কম নয়। এগুলির মধ্যে অবশ্য বিশেষ কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বা শ্রেণীস্বার্থসিদ্ধির লক্ষণ পাওয়া যায় না। হয়ত বা সেইজন্যেই, নিতান্ত মামুলী হওয়া সত্ত্বেও, এই সাধাসিধে ছবি*গুলি ছবি হিসেবে অনেক বেশী তৃপ্তিকর লাগলো।* এ ধরনের নিসর্গ দৃশ্য বা নাগ*রিক জীবনের দৃশ্যের মধ্যে* মণিমোহন রায়, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, সুজিত দস্তিদার, বীরেন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র, শ্যামল চক্রবর্তী প্রভৃতির কয়েকটি কাজের নাম করা যায়। ইস্তাহারধর্মী শিল্পীদের মধ্যে বিমল দাস, অরুণ সরকার, সজল রায়, মঞ্জুশ্রী চ্যাটার্জি, জহর সাহা পোদ্দার, অসীম বসু প্রভৃতি শিল্পীরা অনেকখানি কাঁচা ড্রইং এবং ঝাঁজালো রং সহযোগে মেহনতী জনতা, আহত মিছিল, বিদ্রোহী কৃষক ও শ্রমিক, বাঁচার সংগ্রাম ভিয়েতনাম প্রভৃতি চিত্র সৃষ্টি করেছেন। ছবিগুলির মধ্যে একটা থিয়েটারী ঢং বড় চক্ষু-পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে। আদর্শ প্রচারে কোন আপত্তি না থাকতে পারে কিন্তু ছবির আঙ্গিকের অপটুতা প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন কি না সেটা চিন্তার বিষয়।

●

২৪ থেকে ৩১ অক্টোবর কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে সোসাইটি অব কন্টেম্পরারী আর্টিস্টস্‌ দশজন শিল্পীর ঊনত্রিশখানি গ্রাফিকস্‌ ও ড্রয়িং-এর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। শিল্পীদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, অনিলবরণ সাহা, বিকাশ ভট্টাচার্য, গণেশ পাইন, লালুপ্রসাদ শা, শ্যামল দত্তরায়, সনৎ কর, সুহাস রায়, সুনীল দাস, শৈলেন মিত্র ও মনু পারেখ। এবারের ছবিগুলির মধ্যে গণেশ পাইনের কালিকলমের কাজ 'ভয়েজ' তাঁর পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সনৎ করের তিনখানি রঙ্গীন এচিং-এর মধ্যে 'ফেয়ারী' কাজটির নিরাভরণ সৌন্দর্য ও অতি সংযত কম্পোজিশনে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল। শ্যামল দত্তরায়ের তিনখানি প্রায় একবর্ণ ঘেঁষা এচিং একটু বেশী মাত্রায় অ্যাবস্ট্র্যাকট ঘেঁষা কাজ। 'কম্পোজিশন এক্‌স'-এর কমলা রঙের ছোট টুকরো সমগ্র ধূসর জমিটিতে একটা বিশেষ ইন্টারেস্ট সৃষ্টি করে। সুহাস রায়ের রঙীন এচিংগুলির মধ্যে 'দি স্লীপ ওয়াকারের' প্যাঁচার মূর্তির অন্ধকারময় ছবিতে রাত্রের আমেজ সৃষ্টি বেশ সুপরিকল্পিত কাজ। সুনীল দাসের তিনখানি সাদা-কালো ড্রইং-এ সর্প, চক্ষু এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রতীক চিহ্ন কতকটা পল ক্লে'র ড্রয়িং-এর সমগোত্রীয়। শৈলেন মিত্রের কাগজের কলাজ ড্রয়িংটি বেশ বর্ণোজ্জ্বল। মুখমন্ডলের পশ্চাৎপটে স্টেইনড গ্লাস ধরণের এফেক্‌ট আনা হয়েছে। মনু পারেখের রঙীন লিনো-কাট্‌গুলি তাঁর পরিচিত বর্ণ-প্রয়োগরীতির স্বাক্ষর বহন করে। লালু শা'র কলাজপ্রিন্ট 'ডায়মন্ড' এবং এচিং 'মাই ক্রাইস্ট', ও 'ইমেজ' তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাজ। ফ্ল্যাট ডিজাইন হিসেবে দ্বিতীয় কাজটি অনেক জোরালো তবে কেমন একটা ভিনদেশী চেহারা আছে। বিকাশ ভট্টাচার্যের ক্যারিকেচারধর্মী ফিগারগুলি মাপে বড় এবং একটু অদ্ভুত রস ঘেঁষা। এদের মধ্যে *রঙীন কালির কাজ 'দি অনলুকার'* এবং একরঙা 'নেকেড হাঙ্গার' উল্লেখযোগ্য কাজ। অনিলবরণ সাহার 'শান্তি' প্রিন্টটিতে লোকশিল্প থেকে একটা ফর্ম তৈরীর চেষ্টা হয়েছে। ইভক অ্যান্ড ওয়াশের 'হেডটিতেই সেই প্রচেষ্টা চোখে পড়ল। প্রদর্শনীর টেকনিক্যাল দিকটি সোসাইটির সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

—চিত্ররসিক

নায়ক নায়িকা চাই

নতুন ঠগী

"নির্মীয়মান চিত্র 'আশা শুধু ছলনা'র জন্য নতুন নায়ক-নায়িকা চাই। সত্বর সাক্ষাৎ করুন। ডঃ মিত্র, পোঃ অঃ বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।" —এই জাতীয় বিজ্ঞাপন আজকাল কোনো কোনো দৈনিক পত্রিকায় অভিনেতা-অভিনেত্রী কলমে প্রায়ই চোখে পড়ে। ব্যাপারটা রীতিমত ইন্টারেস্টিং। কারণ যাঁরা নিয়মিত ছবি করেন তাঁরা অভিনয়েচ্ছুকদের তাড়নায় পাগল। বাড়ীতে তাঁদের ঘুম ভাঙে নতুন তরুণ-তরুণীদের কড়া নাড়ায় বা কলিং বেলের শব্দে। এক মাথা বটগাছের ঝুরি আর অম্লান নায়ক-নায়ক হাসিমাখা মুখগুলি প্রযোজক, পরিচালকদের অতি পরিচিত। কারণ যে মুখগুলি ভোরে বাড়ীতে ঘুম ভাঙায় সেই মুখগুলিই আবার দেখা যায় দুপুরে ধর্মতলা স্ট্রীটের সিনেমা-অফিস পাড়ায় বা টালিগঞ্জের প্রায় ধ্বংসস্তূপ স্টুডিওগুলিতে। বিকালে বা সন্ধ্যায় শ্যামবাজার বা হাজরার মোড়, কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের তলায় বা গড়িয়াহাটের মোড়ে ঐ মুখগুলিকেই দেখা যাবে ফুটপাথে ট্রাফিক গণনায় কর্মব্যস্ত।

যারা খাঁটি প্রযোজক অর্থাৎ নিয়মিত ছবি করেন বা যে ছবিটি করছেন তার মধ্যে কোন বে-আইনী ব্যাপার নেই তাঁরা জানেন যে তাঁদের ছবিতে প্রধান চরিত্রগুলিতে তাঁরা কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের নেবেন। সাধারণত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পরেই ছবি ফ্লোরে যায়। যদি কখনো কোন প্রযোজক বা পরিচালক তাঁর ছবিতে বাজার চলতি নায়ক-নায়িকার বদলে চরিত্রোপযোগী অভিনেতা বা অভিনেত্রী চান তার জন্য তাঁরা দুটিকয়েক পন্থা অবলম্বন করেন। প্রথমত প্রযোজক বা পরিচালক বা পরিচালকের সহকারীরা নিজেরাই ব্যক্তিগতভাবে নতুন মুখের সন্ধানে রত হন। দ্বিতীয়ত গত কয়েক বছরে যেসব নামী অভিনেতা ফিল্মে এসেছেন তাঁদের একটা বড় অংশই এসেছেন পেশাদার বা সৌখীন মঞ্চ থেকে। তৃতীয়ত প্রথম দুটি পদ্ধতিতে যদি প্রযোজক বা পরিচালকের মনোমত পাত্র বা পাত্রী পাওয়া না যায় তাহলেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সেই বিজ্ঞাপনের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কদাচিৎ তাতে ছবির বা পরিচালকের নাম দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিনয়েচ্ছুকদের কাছ থেকে শুধুমাত্র তিন কপি ফটো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়।

তাহলে এই "আশা শুধু ছলনা"র ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা জলবৎতরলং। নির্মীয়মান বাংলা ছবির পাত্র-পাত্রী খোঁজা হচ্ছে পশ্চিম দিনাজপুরে বা কুচবিহার বা মালদায়। সিনেমার সর্বগ্রাসী প্রভাব এড়ানোর ক্ষমতা বোধহয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া আজ আর কারুরই নেই। বিশেষ করে বিজ্ঞাপনে যাদের আহ্বান জানানো হয়েছে সেই তরুণ-তরুণীদের

দূরের পথে। ফটো ঃ অভিজিৎ দাশগুপ্ত

কাছে এর আবেদন অব্যর্থ। কারণ সিনেমার অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্পর্কে অধিকাংশ লোকেরই ধারণা এরা মাকাল ফল—তাও জন্মসূত্রে নয়। আজকাল সবাই হীরো বা হীরোয়িন হতে পারে। কারণ মাথার চুল থেকে পায়ের নখ সবই ত' মেক আপের ব্যাপার। আর গানটান ত' হয় প্লে-ব্যাকে। শুধু গোটা কয়েক কথা আউড়ে দিতে পারলেই হল। বিনা মূল-ধনের এই ব্যবসায়ে কে না হাত পাকাতে চায়। আর একবার যদি যাঁড়ের চোখ বেঁধানো যায় তাহলে ত' ইহকাল পরকাল দুয়েরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অতএব বিজ্ঞাপনের উত্তরে কয়েক শ' তরুণ-তরুণী নিশ্চয়ই ডঃ মিত্রের শরণাপন্ন হবেন। ডঃ মিত্র নামধারী ভদ্রলোক, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট অফিসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন—সাক্ষাৎকারে বলা হবে ছবিতে এখনো অনেক প্রধান চরিত্র বাকী আছে। তখন শুরু হবে যাবে, আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি। ঐ কাড়াকাড়ির মাঝখান থেকে ডঃ মিত্রের মুক্তি ভারী হয়ে উঠবে। দু-একদিন একটি স্ক্রিপট (ডি এল রায়ের সাজাহান বা দীনবন্ধুর সধবার একাদশীর অংশ বিশেষ হয়তো তাতে লেখা থাকবে) অনুযায়ী মহলা হবে, তারপর একদিন প্রাতঃকালে দিনাজপুরের উঠতি নায়ক ও নায়িকাদের চোখের সামনে দিগন্ত বিস্তৃত হরিদ্রাবর্ণ মাঠের ছবি ফুটে উঠবে কারণ তাঁদের ডঃ মিত্র (ততদিনে মিত্তিরদা) সম্পূর্ণ বেপাত্তা। তখন মাথার ঝটঝুরি টেনে ছিঁড়লেও কোন হবু নায়ক আর তাঁর হাতঘড়িটা, যেটা বেচে মিত্তিরদাকে টাকা দিতে হয়েছে, সেটা ফিরে পাবেন না। বা কোন পটলাক্ষির সেদিনের চোখের জল হয়তো পর্দার বুকের কোন নামী নায়িকার কান্নাকেও লজ্জা দিতে পারবে—কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। অনেক চোখের জলের বিনিময়ে আশা যে শুধুই ছলনা তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

এই বিজ্ঞাপনগুলি প্রায়ই ভোল পাল্টে পত্রিকার বুকে আসছে। আগে পোস্ট বক্স বা কলকাতার কোন কোন জায়গার উল্লেখ থাকত ঠিকানায়। বোধহয় কলকাতা বা আশপাশে আজকাল এই ব্যবসাটা তেমন জমছে না। তাই এবার কলকাতা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় মফঃস্বল শহরে ব্যবসায়ীরা ব্রাঞ্চ অফিস খুলছেন। শুধু কলকাতাকে দোহন করে ঝুলি বোধহয় ভরছে না, তাই এদের কালো হাত ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শহর ও শহরতলীতে ছড়িয়ে পড়ছে। তা না হলে শিল্পীর অভাবে চিত্রনির্মাতাকে দিনাজপুরে ছুটতে হয়!

বিজ্ঞাপনদাতারা সাধারণত একটি বিষয়ে সচেতন—একই ছবির বিজ্ঞাপন এক বা দেড় বছরের বেশী তাঁরা দেন না। কিন্তু মজার বিষয় কেউ কি কোনদিন খোঁজ নিয়েছেন যে বছরের পর বছর যে সব প্রতিষ্ঠান ছবি করবার নাম করে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের ঐ ছবিগুলির কি হোল? কারণ এই ত' সেদিন পত্রিকায় দেখা গেল যে প্রায় আশীটি বাংলা ছবি তৈরী হয়ে পড়ে আছে, রিলিজ পাচ্ছে না। ঐ তালিকায় কি বিজ্ঞাপিত ছবিগুলির নাম ছিল? এই প্রশ্ন করবার সময় এসেছে। কারণ অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর ঠগ তাঁদের ব্যবসা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে—এতে ক্ষতি হচ্ছে কার? প্রথমত সিনেমা শিল্পের দুর্নাম হচ্ছে। দ্বিতীয়ত অভিভাবকদের হচ্ছে প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি। তৃতীয়ত প্রতারিত যুবক-যুবতীদের আর্থিক ও মানসিক ক্ষতির পরিমাণ অপরিমেয়।

—[illegible]

তস্যতস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]
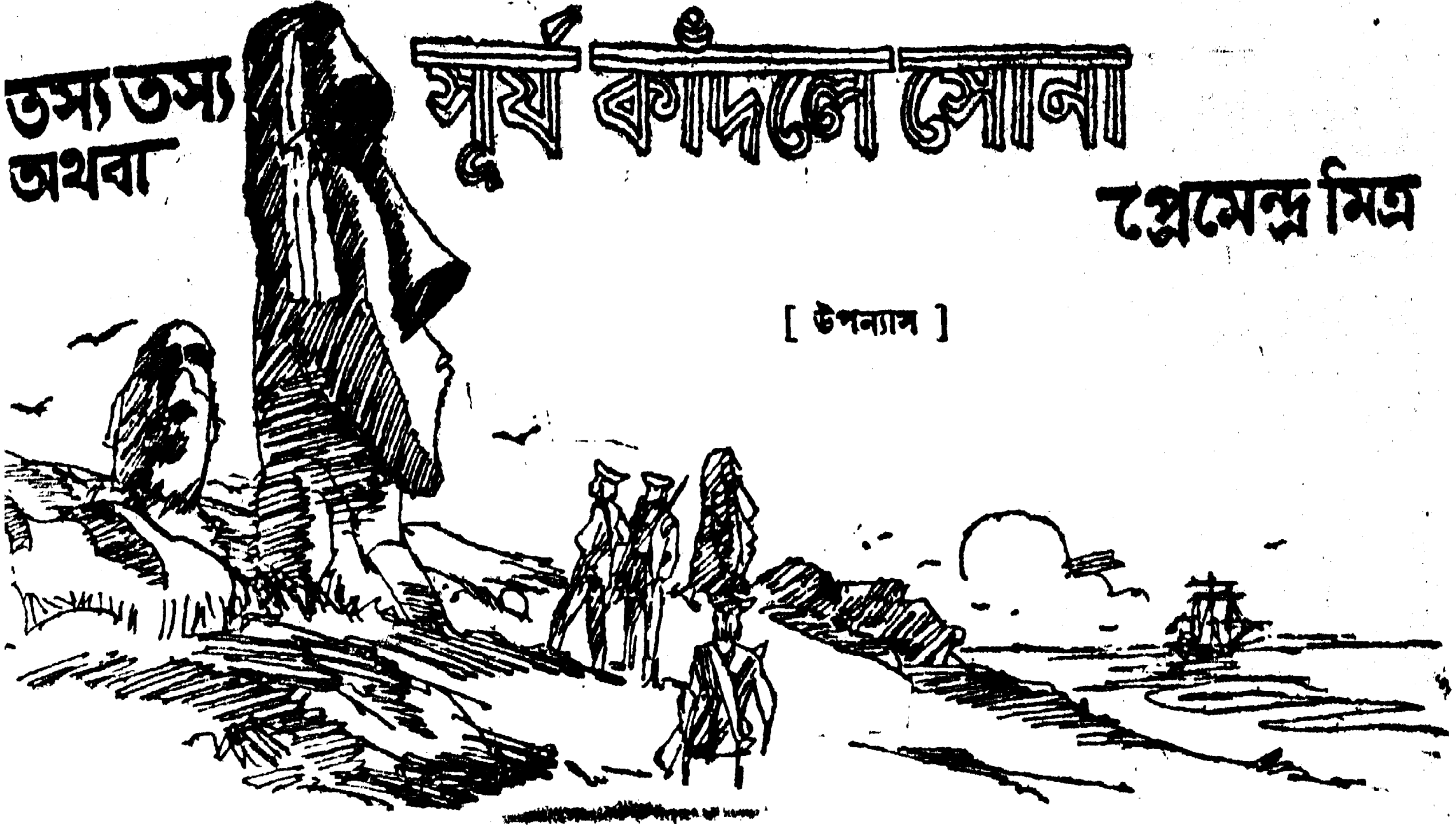
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ৱক্রী হয়ে যাবার পর গরু-ছাগলের গানাদো আর কয়াকে নতুন মালিকের বন্দর ছেড়ে যেতে হয়।

ানামা শহর তখন জমজমাট হয়ে ই শুধু পেরু আবিষ্কারের দৌলতেই। নকার লুট করা ঐশ্বর্য এই পানামা স্পেনে চালান যায়, আর সে লুটের ফোঁটা বখরাতেই ফেঁপে ওঠে পানামা । জমজমাট বলতে অবশ্য রাস্তা বাড়ি-র ছড়াছড়ি কি শোভা সৌন্দর্য ভাবলে হবে। আসলে জংলা জলা র দেশ। সেখানে মানুষের ভিড় বেড়ে র ভালো করে ছড়াতে না পেরে ঘিঞ্জিই ছে আরো বেশী।

সেই ঘিঞ্জি ভুঁইফোড় শহরের রাস্তা য় গোলাম হিসেবে তাঁদের যে কিনেছে ই ব্যাপারী বা ব্যাপারীর দালাল গানাদো র কয়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়।

তার সঙ্গে ঘোড়া আছে। নিজে সে চ্ছ করলে তাতে চেপে জেতে পারত। ন্তু তার বদলে ঘোড়ার লাগাম ধরে সে র নতুন কেনা ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর সঙ্গে 'টেই চলে। নতুন গোলাম আর বাঁদী তে পালাতে না পারে সেইজন্যেই কি ই সাবধানতা?

তা হবে বোধহয়! পথে যেতে যেতে ভাবে ব্যাপারী তাদের দিকে মাঝে মাঝে য়ে দেখে তাতে বেশ বড় গোছের দাঁও ন মেরেছে বলেই মনে হয়।

তখন সবে সকাল হয়েছে। পানামার াস্তায় কিন্তু লোকজনের অভাব নেই। দু-ারজন তার মধ্যে নাম না জানুক ব্যাপারীর ুখ বোধহয় চেনে। তারা একটু সবিস্ময়েই ার হাতে ধরা দড়িতে বাঁধা গোলাম আর াঁদীকে লক্ষ্য করে।

পানামা শহরের রাস্তায় হাতে দড়ি বাঁধা বাঁদী-বান্দাকে নিয়ে যেতে দেখা এমন কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়! ব্যাপারটা প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক। গানাদো আর কয়ার বেলা এই বিশেষ বিস্মিত কৌতূহল তাই একটু অস্বাভাবিক।

গানাদোকে কেউ কেউ চিনতে পারে বলেই কি এই বিস্মিত কৌতূহল ফুটে ওঠে তাদের মুখে?

না, তা নয়। কয়া এ শহরে সম্পূর্ণ অচেনা ত বটেই, কিছুকাল এ শহরে কাটিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও গানাদোকে চেনবার মত মানুষও পানামা শহরে তখন নেই বললেই হয়। পানামা তখন ত শেকড় মেলবার শহর নয়, ভেসে যেতে যেতে দুদণ্ড ঠেকে যাবার আঘাটা মাত্র। পুরানো মহাদেশ থেকে ভাগ্য ফেরাতে কি সেখানকার অপরাধের সাজা এড়াতে যারা এখানে এসে ঠেকে তারা স্রোতের শেওলার মত। দু-চার দিন কি বড় জোর দু-এক বছরের বেশী কেউ বড় একটা এখানে আটকে থাকে না। নতুন ধান্দায় অথবা হুজুগের ঢেউ-এ অন্য কোথাও ভেসে যায়। পানামা শহরে তখন যারা আছে গোনা-গুনতি দু-একজন বাদে সবাই তারা একেবারে নতুন লোক।

গানাদোকে চিনতে পেরে কেউ তারা সুতরাং অবাক হয় না।

তুচ্ছ অজানা গোলাম বাঁদীকে নয়, অবাক দু-একজন হয় তাদের মালিককে দেখে।

অবাক হল ডন মোরালেস-ও।

হ্যাঁ সেই ডন মোরালেস একদিন যাঁর বাড়িতে পিজারো আর তাঁর বন্ধু আলমা-গ্রোর নিত্য বৈঠক বসেছে 'সূর্য কাঁদলে সোনা'র দেশে অভিযানের উপায় ভাবতে।

পানামা শহরের প্রথম পত্তনের সময়কার বাসিন্দাদের মধ্যে তিনিই আর দু-একজনের মত এখানো পর্যন্ত টিঁকে আছেন।

কি কাজে ডন মোরালেস সবে বুঝি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলেন।

তাঁরই বাড়ির রাস্তায় হাতে দড়ি বাঁধা দুজন গোলাম বাঁদী আর তাদের মালিককে আসতে দেখে তিনি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন।

তারপর বিমূঢ় অবিশ্বাসের স্বরে যা জিজ্ঞেস করেন পানামা বন্দরে জাহাজ ভেড়বার পর গানাদো আর কয়ার অমন নাটকীয় ভাবে গোলামের কারবারীর এক দালালের কাছে বিক্রী হয়ে যাবার রহস্য তাতেই কিছুটা পরিষ্কার হয়ে যায় বোধহয়।

এ কি ব্যাপার কাপিতান—ডন মোরা-লেসের কন্ঠ বিমূঢ় বিস্ময়ে তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে,—আপনি এ দুই গোলাম বাঁদী পেলেন কোথায়?

কোথায় আবার!—কাপিতান বলে ডন মোরালেস যাঁকে সম্বোধন করেছেন সেই সৌম্য-দর্শন প্রৌঢ় একটু হেসে বলেন,—জাহাজঘাটা থেকে কিনে নিয়ে এলাম!

কিনে নিয়ে এলাম!—ডন মোরালেস কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন না,—আপনি সাত সকালে জাহাজঘাটায় গেছলেন গোলাম বাঁদী কিনতে?

এ কারবারে দাঁও মারতে হলে তাই ত যেতে হয়। কাপিতান গলায় পরিহাসের সুরটা স্পষ্ট করে তুলে বাহাদুরীর ভান করে বলেন,— কি রকম সরেস মাল বাগিয়েছি একবার ভালো করে নজর দিয়েই দেখুন না!

ডন মোরালেস তাই দেখেন এবার। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি সত্যিই বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

গানাদোর দিকে চেয়ে তাঁর কণ্ঠে একটা বিস্ময় ধ্বনিই শুধু শোনা যায়,—এ কি! এ তো......

হ্যাঁ ডন মোরালেস:— কাপিতান হাসিমুখে তাঁর অসমাপ্ত কথাটা পূরণ করে দিয়ে বলেন,—এ ক্রীতদাস আপনার অচেনা নয়। একদিন আপনিই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আজ আপনার কাছেই তাই—ওদের নিয়ে এলাম।

পানামার বন্দরে জাহাজ ভিড়বার পর কোনো ক্রীতদাসের ব্যাপারীর হাতে পড়বার ভয় ছিল গানাদোর মনে। যা ভয় করেছিলেন, হয়েছিলও তাই। জাহাজঘাটায় জম্বর এক ব্যাপারীর দালালের নজর পড়েছিল তাঁর আর কয়ার ওপর। আগে থাকতে তাক করলেও শেষ পর্যন্ত শিকার অবশ্য তার হাত থেকে ফস্কে গেছে। তার ওপরে টেক্কা দিয়ে আরেক গোলাম কেনা-বেচার কারবারী গানাদো আর কয়াকে নগদা দামে কিনে নিয়েছে।

গানাদো আর কয়ার পক্ষে এ পরিণামটা তপ্ত খোলা থেকে গনগনে চুলোয় পড়ার সামিল হওয়ারই কথা। কিন্তু তা হয় নি।

না হবার কারণ এই যে জাহাজঘাটায় চড়া নগদ দাম দিয়ে যিনি গোলাম হিসেবে কয়া আর গানাদোকে কিনে নিয়েছেন তিনি আর কেউ নন, গানাদোর বন্ধু ও গুরুজনস্থানীয় পরম হিতৈষী সেই কাপিতান সানসেদো।

কাপিতান সানসেদো অবশ্য কস্মিন কালে গোলাম বাঁদী কেনা-বেচার কারবারী নন। শুধু অবস্থা গতিকে গানাদোকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁকে তাই সাজতে হয়েছে।

কিন্তু অত সকালে এই বিশেষ দিনটিতে জাহাজঘাটায় তাঁর হাজির হওয়াটাই—একটু আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি?

না, তাও নয়। কারণ পেরু-ফেরতা যে কোন জাহাজ পানামা বন্দরে ভিড়লেই তা দেখতে যাওয়া কাপিতান সানসেদোর অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বহুকাল ধরে। পেরুর উপকূল থেকে কোনো জাহাজ ফিরছে জানলে একবার বন্দরটা তিনি ঘুরে যাবেন-ই।

এ ঘোরাঘুরি যে গানাদোর জন্যে তা বলা বাহুল্য। যে সান্ত মার্তা দ্বীপে পিজারোর পেরু অভিযানের সঙ্কল্পের প্রায় সমাধি হতে চলেছিল, সেখান থেকে কৌশলে কুখ্য অভিযাত্রীদের সকলকে সরাবার ব্যবস্থা করে গানাদো কাপিতান সানসেদোকে নিয়ে মাঝখানের পাহাড় ডিঙিয়ে পানামায় গিয়ে পৌঁছাবার পর সেবারকার মত পিজারোর অভিযানের আর সঙ্গী হতে পারেননি। পরে ভিন্ন পরিচয় নিয়ে অন্য একটি দলের সঙ্গে 'পুনা' দ্বীপে গিয়ে তিনি পিজারোর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। স্বাস্থ্যে শক্তিতে কুলোবে না বলে প্রৌঢ় কাপিতান সানসেদোকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন থেকে পানামাতেই থেকে যেতে হয়। গানাদোরই গোপন নির্দেশে কাপিতান সানসেদো ইতিমধ্যে ডন মোরালেস-এর সঙ্গে ভাব করে তাঁরই অতিথি হয়ে আছেন। মোরালেস-এরই এক কালের ক্রীতদাস গানাদো সম্বন্ধে সানসেদো অবশ্য কোনো কথা এ পর্যন্ত ভাঙেন নি। পেরু ফেরতা জাহাজের খোঁজ নিতে তাঁর পানামার বন্দরে যাওয়ার বাতিকটাও যথাসম্ভব গোপন রেখেছেন ডন মোরালেস-এর কাছে। এ বাতিক সত্যিই একদিন এতখানি কাজে লাগবে তা সানসেদো নিজেই ভাবতে পারেন নি।

এইবার অবশ্য ডন মোরালেসকে সমস্ত কথাই খুলে বলতে হয়।

মোরালেস সত্যিই উদার সহৃদয় মানুষ। এক কালে ক্রীতদাস হিসেবে যাকে দেখেছেন, সত্যকার পরিচয় জানবার পর সেই গানাদোকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে তাঁর বাধে না। গানাদো আর কয়ার আশু আশ্রয়ের সমস্যা সহজেই তাই মিটে যায়। মোরালেস-এর আস্তানায় তাঁরা যতদিন খুশি থাকতে পারেন।

কিন্তু আশ্রয়ের সমস্যা এভাবে মিটিয়েও গানাদো খুশি হতে পারেন না। মোরালেস-এর বাড়িতে কয়াকে নিয়ে সসম্মানেই তিনি ঠাঁই পেয়েছেন কিন্তু এখানে থাকা মানে ত সমস্ত পানামা শহরের কাছে গা ঢাকা দিয়ে চোরের মত লুকিয়ে থাকা। ক্রীতদাস কেনা-বেচার কারবার ফলাও ভাবে সুরু হবার পর থেকে পানামা শহরেও কোতোয়ালদের হুঁশিয়ারী আর আইন-কানুনের কড়াকড়ি বেড়ে গিয়েছে। গোলামদের সম্বন্ধে আগেকার সে ঢিলে-ঢালা উদাসীন মনোভাব আর নেই। ফেরারী গোলাম হিসেবে গানাদো এখানকার দাগী আসামী। একবার তিনি এ শহরের পাহারা এড়িয়ে বেমালুম গা-ঢাকা দিতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু এখন আর তা কি সম্ভব? যে ব্যাপারীর দালাল তাঁর সঙ্গে কয়াকে কিনতে চেয়েছিল সেও এখন তাঁদের শত্রু। কোতোয়ালীর লোকজনের ত বটেই শহরে তার কড়া নজরে পড়বার সম্ভাবনাও কম নয়। নিজে একা হলে খুব বেশী ভাবনা গানাদোর ছিল না। কিন্তু সঙ্গে কয়া থাকাতেই সমস্যা অত কঠিন হ[illegible] উঠেছে।

তাঁকে পানামা থেকে কয়াকে নি[illegible] হাঁটা পথে জঙ্গল পাহাড় ডিঙিয়ে যোজ[illegible] ওপারের কোনো বন্দরে গিয়ে পৌঁছো[illegible] হবে। নিজে যা পারতেন সেরকম অজ[illegible] দুর্গম বিপদসঙ্কুল বিপথে কয়াকে নি[illegible] পানামা যোজকের শিরদাঁড়া গোছের পাহ[illegible] পার হওয়ার আত্মঘাতী চেষ্টা করা [illegible] পক্ষে উচিত নয়। পাহাড় ডিঙো[illegible] চালু সহজ রাস্তা না ধরে তাঁদের উপ[illegible] নেই। আর সে পথে ক্রীতদাস বলে চিহ্[illegible] কারুর পক্ষে ধরা পড়বার বিপদ [illegible] পদে।

কি করবেন তাহলে গানাদো? পানা[illegible] মোরালেস-এর বাড়িতে এমন করে লুকি[illegible] বসে কতদিন আর কাটাবেন? ভাগ্যে[illegible] থাকে থাক বিপদের সমস্ত ঝুঁকি নি[illegible] পাহাড় ডিঙিয়ে আতলান্তিকের তী[illegible] কোনো বন্দরে যাবার সংকল্পই তিনি [illegible] পর্যন্ত করেন।

এ সম্বন্ধে বাধা দেন শুধু [illegible] মোরালেস।

না গানাদো!—দৃঢ় স্বরে তিনি বলে[illegible] ক্রীতদাস হিসেবে পানামা ছাড়া তো[illegible] চলবে না।

তাহলে মরণ না হওয়া পর্যন্ত [illegible] পানামা ছাড়ার আর কোনো আশা নে[illegible] তিক্ত স্বরে বলেন গানাদো।

কেন আশা নেই!—মোরালেস জোর দি[illegible] বলেন,—সেই স্বার্থপর নীচ পেড্রোরিয়স-[illegible] জায়গায় পানামার নতুন গভর্নর এ[illegible] ডন পেড্রো দে লস রিয়স। ইনি উঁচুদ[illegible] মানুষ বলে শোনা যাচ্ছে। এঁর ক[illegible] তোমার সমস্ত ইতিহাস জানালে উ[illegible] নিশ্চয়ই তোমায় স্বাধীন বলে ছাড়[illegible] দেবেন বলে আমার বিশ্বাস। পিজারোর [illegible] অভিযান সম্ভব ও সফল করে তোল[illegible] জন্যে যা তুমি করেছ তা কাপিতানের ক[illegible] সব আমি শুনেছি। আমি নিজেও [illegible] অনেক কিছু এখন জানি। কাপিত[illegible] সানসেদোর সঙ্গে আমি ডন পেড্রোর ক[illegible] গিয়ে দরবার করে সব জানাব।

সব জানাতে পারবেন না [illegible] মোরালেস—দুঃখের হাসি হেসে ব[illegible] গানাদো,—আর জানালে স্বাধীনত[illegible] ছাড়পত্র দেওয়ার বদলে আ[illegible] তাঁর গারদে দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশ[illegible] কারণ পেরু আবিষ্কারের অভিযান স[illegible] করবার জন্যে প্রথমে যদি আমি কিছু ক[illegible] থাকি সে অভিযান ব্যর্থ করবার জন[illegible] শেষকালে কম কিছু করি নি। ভ[illegible] বিরূপ না হলে আমার চক্রান্ত সফল হ[illegible] ভাডানাতিনসুয়ুর পবিত্র রাজ্যে কো[illegible] এসপানিওলের আর ঠাঁই হত না।

কি বলছ কি তুমি গানাদো!—মোরালে[illegible] বিমূঢ়ভাবে গানাদোর দিকে তাকা[illegible] কাপিতান সানসেদোর চোখেও বি[illegible] জিজ্ঞাসার দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

—(ক্রমশ

অঙ্গনা

আত্মকথায় সিস্টার ইন্‌চার্য

অনেকেই আমাদের সুনজরে দেখে না।

প্রথম কথাতেই একরাশ বিক্ষোভ। বুঝতে অসুবিধা হয় না, দীর্ঘদিনের অভিযোগের খতিয়ানে এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় ফরিয়াদ। চোদ্দ বছরের অভিজ্ঞতায়ও এই অভিযোগটাকে কিছুতেই বাতিল করে দিতে পারেননি। আজ তাই আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটাই প্রাধান্য পেল।

সর্বস্তরের লোক আমাদের নিয়ে সমালোচনা করে। আর সমালোচনা যে কি ধরণের হয় বুঝতেই পারছেন। মাঝে মাঝে এমন অভিযোগও শুনতে হয় যে, আমরা নাকি রোগীর খাবার খেয়ে ফেলি। কি হাস্যকর কথা বলুন তো? তবে হাসির চেয়ে নিন্দার দিকটাই বেশি এবং কিছুটা মর্মান্তিকও।

বাইরের লোকের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম। নিজের বাড়ির লোকেরাও আমাদের উপর তেমন প্রসন্ন নন। পরিচিত অপরিচিতের কাছে আমাদের কথা বলতে তাঁরা একটু দ্বিধাই করেন পাছে তাঁরা হুটহাট কিছু বলে ফেলেন অথবা জীবিকা নির্ধারণে আমাদের স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ বলে বাড়ির লোকজনের প্রকাশ্য সমালোচনা শুরু করেন।

আসলে এসবের মূলে হচ্ছে সংস্কার। অনেককিছু আমরা সহজভাবে নিয়েছি। যেমন 'সিনেমা অভিনেত্রী হওয়ার ব্যাপারে আজ আর কোন সংস্কারই নেই। অথচ এ নিয়ে একদিন কি তোলপাড়ই না হয়েছিল। আজ সব কেমন থিতিয়ে এসেছে। অর্থ এবং প্রতিষ্ঠা সিনেমার পাশাপাশি চলে বলেই বোধহয় সংস্কার ফিকে হতে সময় এতো কম লেগেছে।

অথচ সমাজের কাছে আমাদেরও একই দাবী ছিল। সহজভাবে গ্রহণ করার আর্জি আমরা পেশ করে আসছি সেই কবে থেকে। কিন্তু ফল খুব সামান্যই হয়েছে। আমাদের অর্থ কম এবং প্রতিষ্ঠা তো অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ সবচেয়ে গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজটা আমরাই করি। রোগীর মরাবাঁচার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ডাক্তারের সহযোগী হয়ে লড়াই করি। আমরা সেবার মহান মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ,—আমরা নার্স।

এতক্ষণে আবহাওয়া অনেকটা হালকা হয়ে এসেছিল। শেষ কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখেচোখে একটা অদ্ভুত প্রশান্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। প্রথম উচ্চারিত অভিযোগের বিন্দুমাত্র ঝাঁঝও আর তখন সেখানে অবশিষ্ট নেই। একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, আপনিও তো নার্সদের সম্বন্ধে একইরকম ভুরু কোঁচকান—তাই না? বলেই হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন আর আত্মকথায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

আজ থেকে পাক্কা চোদ্দ বছর আগে এই জীবিকায় এসেছি। নার্সিং আমাকে গোড়া থেকেই টেনেছিল। মনে মনে বেশ একটা আদর্শবোধও ছিল। কিন্তু বাড়ির মত ছিল না। বাবা-কাকা সবাই বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অথচ তাঁদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। আদর্শবোধ তাই তখন জেদে দাঁড়িয়েছে। নার্সিং-এর পিপুল'স কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলাম। আজ আমি একজন সিস্টার-ইন-চার্জ। আমাদের সময় পিপুল'স কোর্স ছিল চার বছরের। এখন সেটা কমে হয়েছে সাড়ে তিন বছরের। এসময়টা আমাদের সবাইকে হোস্টেলেই কাটাতে হয়। ওয়ার্ডে ডিউটি এবং ক্লাস একই সঙ্গে চলে। এভাবেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন এগিয়ে চলে। আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার, বিয়ের চিন্তাটা মোটামুটি এসময় সবাইকে ভুলে থাকতে হয়। পিপুল'স কোর্স শেষ হওয়ার আগে বিয়ে করলে নার্স হওয়ার যোগ্যতা আর থাকে না।

এখন তো বিয়ের প্রশ্ন আসে। আমাদের সময় নার্সকে বিয়ে করার মত উদারচেতা পুরুষের সন্ধান সহসা পাওয়া যেত না। সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেও আমরা অবহেলিত হয়ে যেতাম। আজও অবস্থার খুব একটা হেরফের যে সেকথা তো একটু আগেই বলেছি। তবে পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি ইদানিং হয়েছে। বাড়ির লোকজন প্রাথমিক ঝামেলার পর্বটা তাড়াতাড়িই মিটিয়ে ফেলে। আমার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম

সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত পুষ্পসজ্জার উদ্বোধন করেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবশ্য আছে। বাড়ির সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরে পেতে আমার একটু দেরিই হয়েছিল। সেজন্য এখন আর কোন আফশোষ নেই।

একটা কথা, কিন্তু মনে রাখবেন, পৃথিবীর অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও নার্স-সঙ্কট খুব বেশি। খাতায়-কলমে নিয়ম হচ্ছে প্রতি পাঁচজন রোগীতে একজন নার্স থাকার। কার্যক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই প্রায়ই দেখা যায়, প্রায় একশো'র কাছাকাছি রোগীর জন্য চারজনের মত স্টাফ ব্যবস্থা করা যায়। তার বেশি কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

নার্সের সংখ্যাল্পতা পুষিয়ে দিতে হয় আমাদেরই। তাই সময়ে সময়ে দেখা যায়, আট ঘণ্টা ডিউটির জায়গায় প্রায় সাড়ে নয় দশ ঘণ্টা ডিউটি হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি পীড়াদায়ক হলো রাত্রির ডিউটি। একনাগাড়ে প্রায় সাড়ে দশ কি এগারো ঘণ্টা ডিউটি দিতে হয়। এদিক থেকেও আবার কিছুটা রকমফের আছে।

পিপুল নার্স সাড়ে তিন বছরে ট্রেনিং শেষ করে হয় স্টাফ নার্স। ট্রেনিংয়ে থাকার সময় ডিউটির চাপও থাকে বেশি। স্টাফ হয়ে যাওয়ার পর এব্যাপারে কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায়। পিপুল নার্সদের জন্য পীড়া কষ্ট হয়। মেয়েরা কাজ করতে এসেই সব অনুরাগ হারিয়ে বসে। ওদের কথা তাই একটু বিবেচনা করে দেখা দরকার। ডিউটি আওয়ার্স যদি কিছু কমান যায় তবে কাজের প্রতি ওদের অনুরাগ বাড়বে বই কমবে না।

ডিউটির চাপে মাঝে মাঝে আমাদের বিশ্রাম দূরের কথা খাওয়া-দাওয়ার ঠিক থাকে না। অথচ সবকিছুর পরেও রোগীর কাছে গিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হয় হাসিমুখে। কিন্তু এজন্য কেউ আমাদের ধন্যবাদটুকু পর্যন্ত জানায় না, খোঁজখবর নেওয়া তো দূরের কথা। তখন নিজের উপরই রাগ হয় আবার নিজে নিজেই তা মিটিয়ে ফেলি।

আবার মাঝে মাঝে রাগও হয়। অনেক ছাত্র ওয়ার্ডে ডিউটি করতে এসে অযথা আমাদের উপর বসিং ফলায়। অথচ তাঁরা ভুলে যান যে, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেও তাঁদের কিছু শেখার এবং জানার আছে। তাঁরা নিজেদের এমন কেউকেটা মনে করেন যে, আমাদের মতামতের দাম দেওয়ার প্রয়োজনই মনে করেন না। তাই বিরক্তির ওপর বিরক্তি আরো বাড়ে। তবে সবাই তো আর সমান নন। অনেকে ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শোনেন। ডাক্তারদের কাছ থেকে ব্যবহার আমরা মোটামুটি ভালই পাই। তবে সামান্য ত্রুটিতে কেউ কেউ [illegible] করতে ছাড়েন না। অভিজ্ঞতায় এই ক্ষেত্রে আমরা [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] পৌঁছি।

কথায় ছেদ পড়লো। একজন স্টাফ এসে সিস্টার-ইন-
্য কাছে অভিযোগ জানালেন, আজ আমার ভীষণ পরিশ্রম
, ড্রেসিং থেকে সবই আমাকে নিজের হাতে করতে হলো।

সিস্টার-ইন-চার্জ শান্ত হেসে বললেন, এক আধদিন তো
ম হতেই পারে। সেজন্য রাগ করলে চলে না। সবই
য়ে নিতে হয়। স্টাফ হাসিমুখে ডিউটিতে চলে গেলেন
তাঁর আর কোন অভিযোগ নেই।

আজকাল নার্সের সংখ্যা তো অনেক বেড়েছে। কিন্তু
ার মত কাজ তবু হচ্ছে না। যান্ত্রিক যুগে বাস করেও
রা কিরকম অ-যান্ত্রিক হয়ে পড়ছি। আগে আমরা যে
টা একজনে করতাম এখন সেখানে তিনজন থাকেন। তবু
যোগ শুনতে হয়। আমাদের মত ছুটোছুটি করে কাজ
র আগ্রহ ওদের মধ্যে আর দেখতে পাই না।

আত্মসমালোচনায় সিস্টার-ইন-চার্জকে এতটা কঠোর ভাবতে
রনি। অনুগামীদের কাজের আগ্রহে আন্তরিকতার অভাব
ক রীতিমত পীড়িত করছে।

সমাজের বড় চাউনি হয়তো এজন্য অনেকখানি দায়ী তবু
দের মনে রাখতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ও'রা
ুক্ত। সিস্টার-ইন-চার্জ কিছুটা হালকা হলেন।

তবে কি জানেন, আমাদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব যে বেশি তা
ঝে ওঠার কোন সুযোগ নেই। এ যেন নিতান্ত আত্মোপ-
ধের ব্যাপার। কেউ আমাদের সম্বন্ধে কটূক্তি করতে ছাড়ে
সে তো আমাদের গা-সহা ব্যাপার। কিন্তু আর্থিক সুযোগ-
বিধা আমাদের যেটুকু পাওয়া উচিত তাও পাচ্ছি কৈ?

জানেন বোধহয়, কিছুদিন আগে আমরা একদিনের প্রতীক
নশন করেছিলাম। সে এই আর্থিক সুযোগ-সুবিধার
ীকৃতির জন্যে। আমাদের মধ্যে যাঁরা বিবাহিতা তাঁরা বাড়ি
াকেই ডিউটি করেন এবং মাইনের সবটুকুই পান। কিন্তু
ামরা যারা হস্টেলে থাকি তাদের বেলায় এ নিয়মের কিছুটা
ািতিক্রম ঘটে। খাওয়া-থাকার জন্যে মাইনের ডি-এ'র সবটুকু
টে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যে ঘাপলা ঘটে তার
কান বোনাফাইডই আমরা পাই না। অথচ অনেকবার অনুরোধ
ত্ত্বেও খাওয়া-থাকার জন্য একটা নির্দিষ্ট খরচ ধার্য হচ্ছে না।
। তো আমাদের একটা মস্ত আর্থিক ক্ষতি। আর আমাদের
ঙ্গে সবচেয়ে বড় রসিকতা বোধহয় করা হয়, জামা-কাপড়ের
ন্য সাড়ে সাত টাকার মাসমাত্র বরাদ্দ দিয়ে। অথচ এ টাকায়
একটা জামা কোনক্রমে হয়।

কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে আগে আগে বেস্ট ক্যাডেটকে
াইরে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল, এখন তাও প্রায় উঠে গেছে।

আত্মসমালোচনায় শেষ হয়ে [illegible] পালায়।
সত্যি তো, চাকরির [illegible] এসেও যদি [illegible] হয় তবে
ক্ষুব্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং [illegible]। [illegible] কোনমতেই
সিস্টার-ইন-চার্জের কথার প্রতিবাদ [illegible] কারণ,
সেবার আদর্শকে তিনি স্বীকার [illegible] তাঁর
আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের দায়িত্ব [illegible]

একটা ব্যাপারে পশ্চিমী দেশগুলি থেকে [illegible] স্বাতন্ত্র্য
লক্ষণীয়। শোনা যায়, ওসব দেশে [illegible] মেয়েরা বিয়ের পর
চাকরি ছেড়ে দেয়। বিয়ের সুযোগ [illegible] কিন্তু
আমাদের দেশে নার্সদের মধ্যে [illegible] চাকরি ছাড়ার হিড়িক
দেখা যায় না। আজকাল প্রচুর বিবাহিতা মেয়ে এ জীবিকায়
আছে। চাকরি ছাড়ার কথাও তাঁরা বোধহয় ভাবেন না। তা-
ছাড়া, আর্থিক সংকট থেকে মুক্তির জন্য চাকরি। তাই চাকরি
ছেড়ে সেই সমস্যা আর নতুন করে খুঁচিয়ে তুলে লাভ কি? আর
চাকরি করলে অনেকটা স্বাধীনতাও থাকে। সবসময় মুখা-
পেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। সেই সঙ্গে একজনের আয়ে সংসার
চালানোর সমস্যা তো আছেই,—সবকিছুর ওপরে হচ্ছে এর
স্থান। তাই বিবাহোত্তর জীবনে চাকরি থেকে বিদায় নেওয়া
আর হয়ে ওঠে না।

সংস্কার আমাদের সহজভাবে নিতে পারেনি, বক্রোক্তি
আমাদের জীবিকার অঙ্গ কিন্তু এসব সত্ত্বেও আর দশটা
চাকরির চেয়ে আমাদের জীবিকাটা নেহাত খারাপ নয়। নার্সিং-
হোম বা প্রাইভেট হাসপাতাল নার্সদের আর্থিক সুবিধাও দিচ্ছে।
কেউ কেউ সেদিকেও ঝুঁকছে। ডিপ্লোমা কোর্সে যোগ দেবার
নিম্নতম যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল। ট্রেনিং শেষ করে চাকরির
জন্য অন্ধের হাতী দেখার মত হাতড়াতে হয় না। আজকাল
যেটা প্রায়ই হয়, ডিগ্রি কোর্স পাশ করেও চাকরি মেলে না। সেদিক
থেকে আমরা অনেকখানি নিরাপদ। জীবন ও জীবিকার নিরা-
পত্তার মূল্য তো অস্বীকার করা যায় না।

সিস্টার-ইন-চার্জ উঠলেন। হাতে তাঁর অনেক কাজ।

সমাজসেবার গালভরা কথায় সেবকার আসল রূপটাই
আমরা গুলিয়ে ফেলেছি। একবার তাই পিছন ফিরে দেখলাম।
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আদর্শ যেন সেখানে জীবন্ত হয়ে
আছে। নিবিষ্ট মনে তিনি রোগীর পরিচর্যায় ব্যস্ত।

এই সেই নার্স—রোগীর শয্যাপার্শ্বে যিনি সবচেয়ে বড়
ভরসা। এই সেই নার্স—সমাজের উঁচু-নীচুতলা যাঁকে আজো
অপাংক্তেয় মনে করে।

ছায়া কালো কালো

পথের শেষ বাড়িটা

জোন পেপ্‌পার

গাড়ির সামনের দিকের সীটটায় আরাম করে চেপে বসেছি। আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি ও কার সংগে কথা বলছিলে? ও মেয়েটি কে?

আমরা একটা কক্‌টেল পার্টিতে গিয়েছিলাম, হলদে পোষাক পরা একটি তরুণীর সংগে আমার স্বামীর অতি-বিলম্বিত আলাপ চলছিল, আমি লক্ষ্য করেছি অনেকক্ষণ ধরে। ঘরে ঢুকতেই প্রথমে তার দিকেই আমার নজর পড়েছিল। শুধু হলদে পোষাকটা নয়, মাথার ঘন কালো চুল যেভাবে কানের দুপাশে ভেঙে পড়েছিল তা দেখবার মত। অবশ্য মাথার চুলটা এমন-ভাবে সজ্জিত যার স্টাইলটা পুরোণো রীতির, তবে এই পুরাতনী আমেজ ওর মেক-আপের বাহুল্যে কেটে গেছে।

স্বামী বল্‌লেন, ও'র নাম মিসেস পিলগ্রিম। জানো, ও'রা স্বামী-স্ত্রী আমাদের বাড়ি থেকে তিন মাইলের মধ্যে থাকেন। উরচেস্টার রোডের শেষ বাড়ি। শনিবার আমাদের কক্‌টেলে আমন্ত্রণ জানালেন। বেশ ভালোই মনে হল ছোট্টো মেয়েটিকে:

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, মেয়েটি?

মিসেস পিলগ্রিম অন্ততঃ পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা, জুতো মোজা শুদ্ধ পা পর্যন্ত নিয়ে অবশ্য।

আমার স্বামী মসৃণ গলায় বল্‌লেন, আমি যে ঠিক কি অর্থে বলেছি তা বুঝেছ নিশ্চয়ই। ঘন-নীল রঙের স্যুট পড়া ভদ্র-লোকটি ও'র স্বামী, তিনি তোমার সংগে কথা বলেছেন মনে হল। তোমার ঠিক সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন।

হাই তুলে জিন মদ্যপানের পরবর্তী আমেজ কাটিয়ে আমি বল্‌লাম, বাবা, সবুজ স্যুট পরা কাউকে ত' দেখিনি। তবে, যে ভীষণ ভীড়। বুড়ি মিসেস বার্টনের সংগে বেশ কয়েক ঘণ্টা আটকে গেলাম। ছাড়তে চায় না। কি যে ভীষণ বিরক্তিকর কি বলব।

আমার স্বামী বললেন—আমি তোমাকে ত্রাণ করার চেষ্টায় ছিলাম। মিসেস পিল-গ্রিমকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ও'র কুকুরটা একেবারে নড়তে রাজী নয়।

হাই তুলতে তুলতেই প্রশ্ন করি, কুকুর? ও'র সংগে কুকুর ছিল নাকি?

অন্ধকারের ভেতর আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে স্বামী বল্‌লেন,—ডার্লিং তুমি জিন খাওয়া ছাড়ো। কুকুরটা নিশ্চয়ই দেখেছ। চোখে না পড়ার কথা বিরাট গ্রেট ডেন।

আমি দৃঢ় গলায় বল্‌লাম, না, কোনো গ্রেট ডেনকেই দেখিনি!

রবার্ট এই কথার উত্তরে বলল,— তাহলে সামনের শনিবার ভালো করে নিও।

পিলগ্রিম দম্পতি এমন গাছ-পালা পথের প্রান্তে বাস করেন যে, আমি রবার্ট কোনোদিন সেদিকে যাইনি।

ড়ির গায়ে ছেড়েই বেরোই। আমরা
নতুন এসেছি, তবে মনে হল
নিশ্চয়ই আরো নতুন। আবার
দের কথা কোথাও শুনিনি, যা
ধনি কখনও।
র ওদের বাড়ি যেতে যেতে মনে
তিথি অভ্যাগত আমন্ত্রণ করার
াশ-পাশের জঙ্গল-টঙ্গল একটু
উচিত ছিল। ওরা নিজেরাও
াদুবার এই পথে যাওয়া-আসা
গায়ে এইসব ডাল-পাতা লাগে
র্ষ। দু-একটা ডাল ত' আমাদের
ইনড্-স্ক্রীনে এসে লাগল। গাড়ির
এক জায়গায় চটা উঠে গেল।
রাতটাও বিশ্রী। ঝড়ো হাওয়া
আর আকাশে ছিল মেঘের লুকো-
একবার চাঁদ মুখ বাড়িয়ে
রূপ ধরে হেসে উঠছিল, আবার
তেই মেঘ এসে তার হাসি মুখ

রে গ্রাস করছিল। দুধারের পাইন
এবং আরো সব গাছপালা। মাথা
। যেন রহস্যময়ী নর্তকীর মতো
র অভিবাদন জানাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল
ন্টাখানেক ধরে পথ খুঁজে চলেছি,
সময় সহসা একটা বাঁকে বাড়িটা দেখা
একটু নীচু বাংলো ধরণের। কোনো
থেকে আলো দেখা যাচ্ছে না। এই
র দেখে আমি আমার স্বামীকে
ম, ওঁরা আমাদের আশায় নেই।
বার্ট বলল গাড়ির দরজা খুলতে
ত,—যেন তমসাচ্ছন্ন আফ্রিকা। কে
এই সেই বাড়ি কিনা।
এই বলে সে চারপাশে তাকিয়ে দেখে
,—হাঁ, এই বাড়িই বটে। গ্রেট ডেন্টার
শব্দ শোনা গেল।

আমি গাড়ির জানলার কাচটা নামিয়ে বললাম, তাই নাকি। তুমি শুনেতে পেলে? আমি ত' পাইনি। তবে বা [illegible] কিছু শোনাই যায়। যেমত' দেখাই [illegible]

অদ্ভুত ছায়া আমাদের দুজনের যেন পিছু নিয়েছে। বাড়ির সামনের পথটা, যেটা সদর দরজায় ঠেকেছে, সেটি জঞ্জালে আর রাবিশে ভরা। একটা পেঁচা উড়ে গেল, এবং বিরক্তি ভরে একটু যেন কর্কশ তিরস্কারও করে গেল।

আমি আমার ফারকোটটা গায়ে বেশ করে টেনে রবার্ট-এর গা ঘেঁষে বললাম, আমি কিন্তু এমন বাড়িতে কখনই থাকতাম না।

রবার্ট আশা নিয়ে বলল, হয়ত ভিতরে সব বেশ ছিমছাম হবে।

এই বলে সে প্রকান্ড এক কাঠের দরজায় বাঁধা ঘন্টার দড়িটা টানল। সেই ঘন্টা আবার বারান্দায় অন্য ঘন্টায় লেগে, সারা বাড়িটায় একটা বেশ ভীষণ আওয়াজ তুলল।

আমি হ[illegible] বলার [illegible] যে [illegible] আওয়াজ।—এমন সময় দরজা খুলে গেল।

একটি বুড়ো বাটলার দরজা খুলে ওক কাঠের সেই ভারী দরজার পাশে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। মাথার শাদা চুল যেন একটা জ্যোতির্মালা রচনা করেছে। গায়ের রঙ বেশ শাদা, যেন রক্ত-হীন। বিশেষ করে আমার জামাটা যখন হাতে করে নিল তখন ওর কোটের ভেতর থেকে যেটুকু হাত বেরিয়ে এল তা যেন কঙ্কালের মত রোগা।

আমি ভাবলাম, বেচারীর বোধহয় এনিমিয়া আছে। প্রকাশ্যে গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করি,—মিসেস পিলগ্রিম কি আমাদের অপেক্ষায় আছেন?

বাটলার শুধু বলল—আসুন ম্যাডাম, এই দিকে।

আমি ওর গলার স্বর শুনে অবাক হলাম, ভেবেছিলাম কণ্ঠস্বর কর্কশ হবে।

হলঘরের ভিতর দিয়ে চললাম আমি আর রবার্ট। এই ঘরটা একেবারে ট্যাক্সি-ডারমিস্টদের স্বর্গ। — কত রকমের বিচিত্র জন্তু যে জীবন্ত প্রাণীর মত সাজানো আছে কি বলব। পেটে হয়ত খড় বা জোবড়া পোরা। একটা কোণে সিংহ হাঁ করে আছে। কোথাও গন্ডার ভয়ংকর মূর্তিতে তাকিয়ে আছে। মৃত হরিণ জীবিতের দৃষ্টি নিয়ে

সবিস্ময়ে আমাদের দিকে চোখ মেলেছে— তাদের শিং-এর ছায়া, ঘরের ছাদে বনভূমির ছায়া এনেছে।

কম্পিত কলেবরে আমি বল্‌লাম, ভাগ্যিস আমি ছোট্টটি নই।

আমরা গিয়ে যখন বসবার ঘরের সামনে পেঁছলাম, দেখি মিঃ আর মিসেস পিলগ্রিম আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। দরজাটা খুলতে আমার মনে হল ট্যাবলোয় দেখা নট-নটীর মতো ও'রা কিছুক্ষণ যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তারপর ধাতস্থ হলেন। যেন দরজা খুলতে ওরা প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন।

এই ক্ষণিক স্থানুত্ব কাটিয়ে মিসেস পিলগ্রিম আমার দিকে এগিয়ে এলেন। ও'র হাতে এক পাত্র কক্‌টেল, মুখে হাসি।

তিনি বললেন, মিসেস পেইন, আপনারা যে শেষ পর্যন্ত এসেছেন এতে যে আমাদের কী আনন্দ হয়েছে কি বলব। আসুন আমার সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দিই।

এই বলে আমার হাতে ককটেল পাত্রটি ধরিয়ে পিছনের ভদ্রলোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বাটলারটিকে দেখে মনে হয়েছিল জীবন্ত শব, এখন কিন্তু এ'কে দেখে তার বিপরীত মনে হল। প্রকান্ড চেহারা, স্ত্রীর চেয়ে অন্তত এক ফুট বেশী লম্বা, আর জীবন যেন তাঁর শরীর থেকে চু'ইয়ে পড়ছে। ওর কানে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল আর হাতের পিছন দিকেও অনেক চুল। ওর সব কিছুই যেন বাড়-বাড়ন্ত। এমন কি সাধারণ মানুষের চেয়েও হয়ত ওর রক্তটাও যেন দ্রুত গতিতে চলাচল করে। যখন করমর্দন করলেন তখন যেন আমার বাহুমূল পর্যন্ত একটা বৈদ্যুতিক শ্যাক্ খেয়ে শিউরে উঠলাম। উনি কিন্তু জোরে হাত নাড়েননি, শুধু আঙুল ছু'য়েছেন। তবু মনে হল আমার হাতটা খসে পড়ে যাবে।

মিঃ পিলগ্রিম এবং আমার স্বামী পরস্পর হাস্য বিনিময় করলেন, তারপর সুরু হল আলাপচারি। অগ্নিকুণ্ডের আগুনটা বেশ জোড়ালো। চারদিকে ফুলে ফুলে ভরা, আর ঘরটির প্রতি বেশ যত্ন আছে তা বোঝা যায়। কক্‌টেল বেশ ড্রাই ধরণের এবং স্বাদু। আমার শরীরটা উষ্ণ হল, আর আমি মিসেস পিলগ্রিমকে ভালো করে লক্ষ্য করতে থাকি।

আশ্চর্য আকৃতির মহিলা। তাঁর শরীরের গতিভঙ্গী যেন সিংহীর মতো। দাঁতগুলি শাদা এবং শক্ত। প্রতিটি শারীরিক অংশ একেবারে নিখুঁত, একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যায়। কেন যে এমন হয়েছে তা ভাবি, আর কানের দু-পাশের কুণ্ডলীকৃত চুলটাকে দোষ দিই। তাতে মাথার চুলের অমন সৌন্দর্য যেন একটু ক্ষুন্ন হয়েছে। আগে যে হলদে পোষাক পরা অবস্থায় দেখেছি, সেই পোষাকটাই পরেছেন, কোমরে একটা কারু-কার্যমণ্ডিত বেল্‌ট, আর তাতে দু-একটি সোনার চাবি। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে চাবি ঘাটছেন।

কিছুক্ষণ আজে-বাজে কথা চল্‌ল। যেন খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে নেট-প্র্যাকটিশ করা। আমার বেশ ভালো লাগছিল। আমার আরাম বোধ হচ্ছিল এবং পা-দুটিও স্থির হয়েছে। আমার স্বামী মিঃ পিলগ্রিমের সঙ্গে বড়দরের শিকারের আলোচনা করছেন। তিনিও ভদ্রভাবে শুনছেন এবং স্মিত হাস্যে জবাব দিচ্ছেন।

আমি বল্‌লাম,—কিন্তু এখানে আসাটা ভয়ংকর ব্যাপার। ফেরিওয়ালারা কিন্তু আসতে পারবে না। তাই নয়?

মিসেস পিলগ্রিম একটু বাঁকা হেসে বল্‌লেন, আমাদের ফেরিওয়ালা-টোয়ালা লাগে না। এই বলে তিনি একটা ছোট্ট পিকিনিজকে আদর করতে লাগ্‌লেন, পায়ের কাছে গদীতে শুয়েছিল কুকুরটা।

আমি বললাম, বারে, আপনি বেশ চালাক। ফ্রীজ আছে বুঝি!

আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা না করে মিসেস পিলগ্রিম বললেন, বাড়িটা দেখবেন নাকি?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লাম, নিশ্চয়ই।

টেবলের ওপর থেকে একটা ল্যাম্প উঠিয়ে নিয়ে মিসেস পিলগ্রিম বল্‌লেন, পীটার আমি ও'কে বাড়িটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি!

এতক্ষণ আমি বুঝতেই পারিনি যে এ-বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো নেই।

বাইরে হল-এ বেরিয়ে কথা চালু রাখার জন্য বল্‌লাম, আমার মনে হয় গ্রেট ডেনটা পুষে আপনারা ভালোই করেছেন। নইলে এখানে বড্ড একা-একা ঠেকত।

আমার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে মিসেস পিলগ্রিম বলেন, বারে, আমার ত' গ্রেট ডেন নেই!

ল্যাম্পের আলোয় ও'র চোখ যেন জ্বলছে। আমি বললাম, আমার স্বামী বলছিলেন সেদিন পার্টিতে একটা গ্রেট ডেন আপনাদের সঙ্গে ছিল।

সামান্য কাঁধ নেড়ে উনি বল্‌লেন, না-না, পিকিনিজটাই ছিল, উনি বোধহয় তাই বলেছেন।

আমার স্বামী একটু আগে যে গ্রেট ডেনের চীৎকার শুনেছেন তার কথা মনে হল। আশ্চর্য হয়ে ভাবি, আশ-পাশে ত' কেউ নেই। এ আওয়াজ এল কোথা থেকে।

মিসেস পিলগ্রিম ওপরে নিয়ে গেলেন। বেশ প্রশস্ত ঘর দোর, কার্পেট মোড়া নয়। চমৎকার ফুলকাটা কাপড়ের ঝালর দেওয়ালে।

আমি সেদিকে তাকিয়ে বল্‌লাম— এ সবের নিশ্চয়ই অনেক দাম। এসব বহুমূল্য জিনিষ। জায়গায় জায়গায় রোদ লেগে একটু ম্লান ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। প্রাচীন জিনিষ।

তিনি অসীম প্রীতিভরে সেগুলি স্পর্শ করে বললেন, এসব অনেক বছর আগে আমি নিজের হাতে করেছিলাম।

আমি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে বলে উঠি, বারে, কিন্তু কি করে এমন প্রাচীন-প্রাচীন চেহারা করলেন?

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যারা পুরনো ছবি জাল করে তাদের কথা মনে এল। মিসেস পিলগ্রিম ভালো জাল করতে পারেন।

উনি সংক্ষেপে শুধু বললেন, এসব ত সত্যিই পুরনো।

মনে মনে ভাবলাম, ও'কে হয়ত অসন্তুষ্ট করেছি। তাই কথা না বাড়িয়ে ও'র অনুসরণ করে সি'ড়িতে উঠলাম। কেমন যেন সবটা অবিশ্বাস্য! মাথায় ওঁর একগাছি পাকা চুল নেই, অথচ ঐ সব ঝালর নিশ্চয়ই একশো দেড়শো বছরের পুরনো।

শোবার ঘরগুলি সি'ড়ি দিয়ে উঠেই চাতালের সামনে। ঘরগুলি সবই একরকম ভাবে সাজানো। শুধু ঘরের রঙগুলি বিভিন্ন। প্রতিটি ঘরে খাট, তার ওপর সুজনী, একটা দোলনা চেয়ার, একটা রিজেন্সি সোফা, আর ড্রেসিং টেবলের সামনে একটি সুন্দর ছোট্টো টুল। রঙগুলি জরদা ও গোলাপী। আশ্চর্য, মিসেস পিলগ্রিমের ঘরটা আলতা রঙের। এই রং দেখে আমি এমনই চমকিত হলাম, যে আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

উনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, কি, ভালো লাগে?

প্রশ্নটার ধরণ এমন যে আমার ভালো বা মন্দ বলায় কিছুই এসে যায় না।

আমি ঘন আলতা রঙের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে বললাম, হাঁ, ভারী চমৎকার।

মিসেস পিলগ্রিম আমার হাতে ল্যাম্পটা দিয়ে বললেন, আপনার মুখে পাউডার লাগাতে যদি চান, ত' ঐ ধারে পাউডার রাখার জায়গা, ছোট্ট দরজাটার পাশে। আমি আসছি এক মিনিটের মধ্যে।

এই বলে তিনি চলে গেলেন। পরে আমার মনে হয়েছে উনি কোনোরকম আলো-টালো না নিয়েই নীচে চলে গেলেন।

আমি পাউডার মাখার ঘরে গেলাম। তার পাশে একটা প্রাচীন ধরণের স্নান ঘর যেখানে কল থেকে জল ঝরে পড়ে সেখানটায় হলদে দাগ ধরেছে। আমি আরশিতে মুখ দেখে মাথাটা আঁচড়াতে গেলাম। মাথা আঁচড়াতে গিয়ে সহসা মনে হল মিঃ পিলগ্রিম রয়েছেন পাশের ঘরে। আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, শুনতেও কিছু পাচ্ছি না, তবে তাঁর উপস্থিতি বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

নীচে যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অনুভব করেছিলাম এখন যেন ঠিক সেইরকম একটা বৈদ্যুতিক শ্যাক আমার গায়ে লাগল। সারা অঙ্গে সেই রকম—যেন সহস্র আলপিন আর ছু'চ ফুটে আমার হাতটা অক্ষম করে দিল। একরকম যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি-চালিত হয়ে আমি পাউডারদানি খোলার চেষ্টা করতেই শুনতে পেলাম মিঃ পিলগ্রিম যেন দৌড়াচ্ছেন আর হাঁফাচ্ছেন। একটা ড্রেসিং গাউন বাথরুমের দরজা থেকে মৃদু শব্দ করে পড়ে গেল—আর সঙ্গে সঙ্গে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আবার স্বাভাবিক রক্ত চলাচল ফিরে এল, আবার বেশ সহজ ভাবেই হাত পা নাড়তে পারি। যেন কারেন্ট চলে গেল।

হাতল ঘুরিয়ে পাশের ঘরের দরজাটা

একটা আলোর রেখা যেন
গেল।

পিলগ্রিমের ড্রেসিং টেবলের
র প্রসাধনপর্ব শেষ। আমি
পিলগ্রিম আমার স্বামীকে একা
চলে এসেছিলেন। আয়নাটা
যেন চাতুরী করে, আয়নার
নাকে মাদাম তুসাদের মোমের
স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার
বদলেছে যে চেনা যায় না।
মেজাজটা ঠিক থাকলে এ নিয়ে
ত। আমার নাকে পাউডার
হাতে এই কথা ভেবে অবাক
রে মরিয়া হয়ে সারা মুখে
ম, তারপর সহসা পিছন ফিরে
স পিলগ্রিম দাঁড়িয়ে। উনি
সে আমার রকম-সকম লক্ষ্য

বললাম, এই আয়নাটা ভারী
র্পান এই বাথরুমটাই ব্যবহার
—কিন্তু এই কথা বলে আমার
করোধ হল। মিসেস পিলগ্রিম
ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অথচ আয়নায় যে
বিম্বিত সে শুধু আমার একার।
ণ দুঃস্বপ্নের ঘোরে ঘুরছি।
য়ে মিসেস পিলগ্রিমের দিকে
উনি একেবারে দোর গোড়ায়
ছেন।

'মিসেস পিলগ্রিম' বলে ডেকেই
থমে গেলাম। ও'র মুখভঙ্গী
ৗতূহলকে দমিত করল।

ড্রয়িং-রুমে ফিরে এলাম। আমার
বং মিঃ পিলগ্রিম অগ্নিকুণ্ডের
য়ে গল্প করছেন। আমার একটু
রে এল।

স পিলগ্রিম হেসে বললেন, আমার
দক দেখেছি।

র স্বামী বললেন, জেন, বাড়িটা
দর না?

। বললাম, হ্যাঁ, চমৎকার। তুমি সব
াকি।

ার স্বামী বললেন, সব ঘুরে
এখন চলো যেতে হবে।

হাত তুলে বিদায় সম্ভাষণ
, দোর গোড়া থেকে।

ম মিঃ পিলগ্রিমের সেকহ্যান্ডের
কে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য একটু
গেলাম। তৃতীয় বার আর ইলেকট্রিক
তে রাজী নই। আমরা গাড়িতে
ও'রা দরজা বন্ধ করলেন। আমরা
সেই ঝড় এবং চাঁদের আলোর মাঝে
। চারদিকে জলে চাঁদের ছায়া
। চাঁদ ভাসছে, আর চাঁদের আলো
পাতায় ছাদে সর্বত্র। আমরা শীতের
কে ত্রাণ পাওয়ার জন্য পায়ের ওপর
টেনে দিলাম।

ছুক্ষণ আমরা দুজনেই নীরব।
একটা মোড়ে গাড়ি ঘোরাচ্ছে আর
গভীর চিন্তায় মগ্ন। অবশেষে পাশ
ঝড় রাস্তায় পড়ে আমি বললাম,—
ডার্লিং, ও'রা যেন একটু কেমন কেমন
নয়?

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। পিলগ্রিম
এক মিনিটও থামেননি, আমার অথচ এক
বর্ণও মনে নেই ও'র কথা।

আমি বললাম, কি রকম যেন মানুষ।
আমার ত' একটুও ভালো লাগেনি।

রবার্ট বলল, আমার কেবল ঐ কুকুরটার
কথা মনে হচ্ছে, কি জন্যে যে অমন একটা
বেয়াড়া প্রাণী পুষে রেখেছে কে জানে!

আমি বললাম—পিকিনিজটার কথা
বলছ?

রবার্ট গাড়ি চালাতে চালাতেই বলে,
আরে, পিকিনিজ নয়, ঐ গ্রেট ডেনটার
কথা বলছি।

—কিন্তু ওদের যে গ্রেট ডেন নেই।

—কি যে বলো! আমার জুতোটার
ওপর একেবারে চেপে বসেছিল সারাক্ষণ।

আমি বললাম—বারে, ভারী মজা ত!
মিসেস পিলগ্রিম বললেন ও'দের গ্রেট ডেন
নেই। তা কুকুরটা বোধহয় স্বামীর। স্ত্রী
পছন্দ করেন না।

আমরা গাড়ি থেকে নামতে নামতে
বললাম, রবার্ট, মিঃ পিলগ্রিম যখন মাঝে
একবার ওপরে উঠেছিলেন তুমি কি
করছিলে তখন?

রবার্ট বলে উঠল, বারে, উনি ত'
সারাক্ষণ আমার সঙ্গেই ছিলেন। আমার
বাড়িটা বেশ লাগল। আচ্ছা, একটা ঘর
ছোট বাচ্চাদের জন্য সাজান অথচ ও'রা
ছেলে মেয়েদের কথা তুললেন না মোটে।

আমি দুর্বল গলায় বললাম, ছেলেদের
ঘর? ওদের ছেলেমেয়ে নেই। মিসেস
পিলগ্রিম বললেন ছেলে মেয়ে না থাকা যে
কি দুঃখের। উনি অবশ্য ঘর দেখান নি,
তবে আমি যেন দেখতে পেয়েছি। ঘরটা
কোনদিকে ডার্লিং?

—সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একেবারে
চাতালের পাশে!

আমি বললাম, সেটা ত' মিসেস
পিলগ্রিমের ঘর। ঘরটা দেখেছ? অদ্ভুত।
একেবারে আলতা রঙের রং করা। আশ্চর্য
রুচি ভদ্র মহিলার।

—আমি ত' দেখিনি। তাহলে অনেক
ঘর-দোর আছে। যা ভেবেছি তা নয়।

সেই রাতে শোবার সময় আমাদের
মধ্যে কলহ হল। অথচ কদাচিৎ এমন হয়।
আমি বললাম, রবার্ট তোমার কি মিসেস
পিলগ্রিমের চেহারাটা ভালো মনে হয়?

রবার্ট বলে উঠল, নিশ্চয়ই। বেশ
সুন্দরী বলা যায়।

আমি বললাম, কেমন যেন বেদেনী
বেদেনী ভাব।

রবার্ট জোর গলায় বলে, মোটেই নয়,
বরং মোমের পুতুলের মত।

আমার স্বামীর চোখে মিসেস পিল-
গ্রিমকে ভাল লেগেছে। আমি বললাম, রবার্ট
তোমার যে ঠিক কি ধারণা তা জানতে
চাই।

—আমি তোমাকে বলছি ডার্লিং হলদে
পোষাক আমি দেখি নি। আমি দেখলাম
একটু নীল পোষাক, আমার তো ভালই
লেগেছে। আমি অবশ্য ওর বাক্স-দেরাজ-
টেরাজ দেখি নি।

আমি বললাম, ও'র অঙ্গে ছিল হলদে
পোষাক। এ ছাড়া উনি বেশ লম্বা এবং
মাজা চেহারা।

রবার্ট বলল, আমি তোমাকে চটাতে চাই
না, তবে মিসেস পিলগ্রিম একটু বেঁটে,
সুন্দর গায়ের রঙ তবে ভারী চমৎকার
দেখতে।

আমি ব্যঙ্গ করে বললাম, আর
পিকিনিজটা গ্রেট ডেন?

রবার্ট ভ্রূ কুঁচকে বলল, পিকিনিজ
আবার কোথায়?

আমি বললাম, রবার্ট, তুমি অসহ্য।
তুমি গিয়ে ওদের নিমন্ত্রণ করে এসো। আমি
আজই লাঞ্চে ও'দের আমন্ত্রণ করতে চাই।

রবার্ট বলল, ঠিক আছে ডার্লিং। তুমি
যাতে সন্তুষ্ট হও তাই করা যাবে।

রবার্ট চলে গেল। আমি বললাম, বেশী
দেরী কর না যেন?

আমার দিকে ও কেমন করে তাকাল!
মনে করেছে বোধহয় আমি একটু বেতালা
হয়ে গেছি।

আমি একা বসে। সবই তৈরী। রবার্ট
আসছে না। আমার আশঙ্কা জাগছে মনে।
সত্যি আমি কি অন্য দৃষ্টিতে সব দেখছি।
কি ভাবছে ও কে জানে। রবার্টের দেরীটা
আমার ভাল মনে হচ্ছে না। কি জানি
আমার ভয়ানক চিন্তা হল। আমি তাড়া-
তাড়ি উঠে সাইকেলটা নিয়ে চললাম, সেই
পিলগ্রিমদের বাড়ি। আমি যখন পৌঁছেছি
তখন আর আমার জ্ঞান নেই। আমি এত
দ্রুত সাইকেল চালিয়েছি যে, আমি শ্রান্ত,
আমার হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমার মনে
হয়েছে রবার্ট আমাকে ডাকছে, উদ্দাম
ঘোড়াও আমার সেই হাওয়ার মত প্রচণ্ড
গতি স্তব্ধ করতে পারত না।

রবার্টকে দেখলাম। গাড়ির সামনে
হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে
কেমন বিহ্বল ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল।

কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। ভয় হল
মনে। আমি প্রশ্ন করি রবার্ট ব্যাপার কি?

রবার্ট আমার দিকে তাকিয়ে কর্কশ
গলায় বলে, দেখো। ওদিকে দেখো। একটা
ধ্বংসাবশেষের ওপর নানা রকম আগাছা।
জঙ্গল-ঘেরা একটা প্রাচীন ভগ্নস্তূপ।

রবার্ট আমার হাত দুটি চেপে বলে,
কিছু নেই। এখানে কিছুই দেখা যায় না।

আমি মৃদু গলায় বললাম, কোন দিনই
ছিল না। একশ বছরেও নয়।

তারপর—

তারপর আমরা দুজনেই শুনেছি,
এইবার কোন ভুল নয়, সেই বীভৎস
চিৎকার—

একটা বিরাট গ্রেট ডেনের ভয়ঙ্কর
কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে সেই ধ্বংসস্তূপের
ভেতর থেকে।

—অমিতাভ মজুমদার সংক্ষেপিত
ও অনূদিত

নীলাঞ্জন-ছায়া

অমিতাভ দাশগুপ্ত

এখন আমি তোমাকে চাই লীলা,
বুকের ভিতর ঘূর্ণিঝড়ের হাওয়া,
তুমি আমার প্রাণের ঘন-নীলা
ভরা চোখের নীলাঞ্জন-ছায়া।

হঠাৎ ভয়ে নিভেছে ঘরে বাতি
অন্ধকারে দোলে তোমার মুখ
বকুল ফুল ফুটেছে সারা রাতি
কাননে মাথা নাড়ায় কিংশুক।

প্রহর গেছে তৃষায় ঘেমে নেয়ে
তেমন বুঝি হয়নি ডাকাডাকি
লীলা, তুমি কেমনধারা মেয়ে
অমন ক'রে বল না—সবই ফাঁকি!

থুৎনি কাঁপে, হৃদয় কাঁপে ভারী,
অঙ্গে দোলে সর্বনাশা প্রলয়,
ফিরিয়ে নাও তোমার দেয়া আড়ি,
এমন মিলে কি ক'রে খিল রয়?

বুকের ভিতর ঘূর্ণিঝড়ের হাওয়া
তুমি আমার প্রাণের ঘন-নীলা
ভরা চোখের নীলাঞ্জন ছায়া—
এখন আমি তোমাকে চাই লীলা।

শয্যায় পড়েছে ভেঙে ঘনচুল

অঞ্জন কর

শয্যায় পড়েছে ভেঙে ঘনচুল, নীল আলপনা আঁকা
সমসাধ রেখে গেছ, দূরে
প্রতীক্ষার জল
দাঁড়িয়ে পড়েছে, শান্ত অস্তময় গোধূলি মেলায় আমি
ফিরে যাব; যেখানে নেমেছে বেঁকে বৈকালিক হ্রদ
নিঃশব্দ ঘাসের শীষ
বনমহিষীরা—

হরিদ্রা রঙের মাঠে খেলা সুরু হবে, ঘাসের
সুবর্ণঠোঁটে যেন, প্রাঞ্জল আকাঙ্ক্ষা লেগে থাকে
অতঃপর—
জলে শান্ত ঢেউ
যেন দীর্ঘকাল বনমহিষীরা কেউ ফেরে
কেউ রেখে যায় ভাঙা কঙ্কনের সাধ, আমার
আকণ্ঠধৃত পিপাসায় রক্তাংকিত জল

শয্যায় পড়েছে ভেঙে ঘনচুল, কঙ্কনের সাধ
বৈকালিক হ্রদ বেঁকে
যেখানে নেমেছে, আমি
শান্ত অস্তময় গোধূলি মেলায় ফিরে যাব!

ককটেল পার্টির শেষে

রুনু চট্টোপাধ্যায়

দূরে থেকে রাস্তা পার হতে দেখে [অ]সিতের মনে হয়েছিলো মেয়েটি যেন চেনা-না। কিন্তু কাছাকাছি পেঁাছে ভাববার আর [স]ময় পেলো না। মুখ নীচু করে মেয়েটি [যে]ন কিসের ঘোরে চলেছে। বাসটা প্রায় [তা]র ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। সে কি [শু]নতে পায় না? দেখতে পায় না? এক [ঝ]টকায় ফুটপাথের উপর মেয়েটিকে সে [প্রা]য় টেনে তুললো। মেয়েটি হাঁপাচ্ছে। [আ]শেপাশের লোক হৈ হৈ করছে। একটু [থে]মে মনে হলো বাসটা যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে [ছু]টে পালালো। আর মেয়েটির মুখের দিকে [তা]কিয়ে অসিত শুধু বলতে পারলো, [']তুমি—?'

মেয়েটিও তার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত [অ]বাক গলায় বললো, 'তুমি—?'

তারপর মাথা নীচু করে আবার হাঁটতে [শু]রু করলো। অসিতও পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে ভাবতে লাগলো ঃ [illegible]। কত দিনকার চেনা! একটু আগেই তো সে ভাব-ছিলো শীলার কথা। কিন্তু এ কমাসে কত বদলে গেছে! সেই ইরানীদের মতো চেহারা, গোলচে মুখ, হাসি-হাসি চোখের কী হলো? এখন তার চুল বব্ করা। মুখটা যেন লম্বাটে ধরনের। চোখের কাপ্ড সুর্মায় চাপা পড়েনি। সেই চাঁপার মতো রঙের বদলে রুজ লিপস্টিকে মুখটা যেন শুকিয়ে আসা একটা রক্তাক্ত গোলাপ।

অজান্তেই দুজন হাত ধরাধরি করে পার্ক স্ট্রীট ধরে হেঁটে চললো।

আচমকা কাচের মতো চোখ তুলে শীলা বললো, 'ভারি ক্ষিদে পেয়েছে। সকাল থেকে খাইনি। কিছু খাওয়াতে পারো?'

অসিত দেখলো শীলার গালের উপর লম্বা দুলের ছায়া পড়েছে। তাইতেই কি রোগা দেখাচ্ছে?

রেস্তরাঁর ভিতরটা আধা-আলো-অন্ধকার। সবে এখন বিকেল। এখনো ভীড় জমেনি। চাপা সুরে অর্কেস্ট্রা বাজছে। পাশাপাশি বসলো তারা দুজন।

'কী খাবে?'

ব্যাগটায় হাত বোলাতে বোলাতে শীলা বললো, 'আগে ডবল হুইস্কি। তারপর খাবার। ভারি ক্ষিদে পেয়েছে।'

ঢক-ঢক করে হুইস্কির গেলাস খালি করে তন্দুরি চিকেন শীলা খেতে শুরু করলো। অবাক হয়ে অসিত দেখছিলো তাকে খেতে। এমন গোগ্রাসে শীলাকে খেতে আগে সে দেখেনি।

খাবার পর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শীলা বললো, 'ডার্লিং! একটা সিগারেট দাও না!' তারপর অসিতকে আরো অবাক করে বললো, 'সত্যি, তোমায় ভারি মিস্ করি।'

যাদের ডিভোর্সের মামলা ঝুলছে তাদের কি এ-সব কথা বলা শোভা পায়?—ভাবলো অসিত।

হঠাৎ যেন একটা দুরন্ত সমুদ্র গর্জে উঠলো। অসিত বললো, 'শীলা। এখনো তোমাকেই ভালোবাসি। ফিরে আসবে?'

দুহাতে মুখ ঢেকে শীলা বললো 'হোয়াট এ্যাম আই টু ডু? হোয়াট এ্যাম আই টু-ডু?'

'নাথিং। লেট্‌স্ ডান্স!' দাঁড়িয়ে উঠে বললো অসিত।

তারপর দুজনে গালে গাল ঠেকিয়ে নাচতে লাগলো। ভোলা কি সহজ?— ভাবলো দুজনেই।

নাচতে-নাচতে শীলা ফিসফিস করে বললো, 'জানো! সমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে গত রাতে ছটা ট্রাঙ্কুলাইজার খেয়েছিলাম। এখনো ঘোর কাটেনি।—কিন্তু ডিভোর্সের কী হলো?'

তার বব করা চুলগুলো দেখতে দেখতে অসিত বললো, 'তার কি দরকার আছে?'

উদ্‌ভ্রান্ত চোখ মেলে শীলা বললো 'তুমি তো জানোই ডিভোর্স দরকার—তোমারও, আমারও। লেট আস রিমেন গুড ফ্রেন্ডস।'

বাজনা থেমে গেলো। বাল্‌ব মৃদু আলো জোরালো হোলো। ঘাড় দেখে অবাক হয়ে শীলা বললো, 'ওমা! কী কাণ্ড! সাতটা বেজে গেছে! সমীরের ফ্ল্যাটে আমার যে কক্‌টেল পার্টির নেমন্তন্ন!— একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে?'

সাতাশ নম্বর ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে, চুল আঁচড়ে, মুখে পাউডার পাফ্ বুলিয়ে শীলা থামলো। তারপর লিফ্‌টে চার তলায় উঠে ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং বেল টিপলো।

দরজা খুললো সমীর। পার্টি দারুণ জমে উঠেছে। খোলা দরজার ভিতর দিয়ে হাসি-বাজনা-গানের টুকরো টুকরো বেশ ভেসে এলো।

অভিমানের সুর তুলে সমীর বললো, 'এতো দেরি করলে কেন? তোমার কথা সবাই বলছিলো। তুমি না থাকলে কি পার্টি জমে?'

ভিতরে এসে শীলা বললো, 'তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে গতকাল দুটো ট্র্যাঙ্কুলাইজার খেয়েছিলাম। এইমাত্র অসিতের সঙ্গে দুটো হুইস্কি খেয়ে এসেছি। জানো বাস চাপা পড়তে পড়তে একটু আগে বেঁচে গেছি!'

শীলাকে দেখে সবাই হৈ-হৈ করে উঠলো। সমীর বললো, 'লেট আস ফরগেট। লেট আস ডান্স!' ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নাচিয়ে চাপা জিন্‌স্ আর শার্ট পরা বিজলী বললো, 'আমরা কিন্তু মিউজিক্যাল চেয়ার খেলবো!' কে যেন বলে উঠলো, 'শীলা তো আজ লেডি অফ দি ইভিনিং—'

বিজলীর খুকি-খুকি ভাব, সিগারেটের ধোঁয়া, হুইস্কি-বিয়ার-রামের গন্ধ ভ্যাপসা বাতাস, লং-প্লেইং রেকর্ড, নিজের মাথার দপদপানি—সবকিছু মিলিয়ে হঠাৎ যেন নিজেকে ভারি ক্লান্ত আর অসহায় বলে শীলার মনে হলো। তবু মুখে হাসি এনে সে বললো, 'এতোও পারো তোমরা—'

হেমন্তের ঝরা পাতার মতো লাল কার্পেটে হলদে-নীল-সবুজ জামা-কাপড় পরা ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে বসে আছে। কেউ কেউ নাচছে। কেউ তর্ক করছে। কেউ বা যেন শুধুই স্বপ্ন দেখে চলেছে।

জানালার পাশে শীলা বসে। হাতে গেলাস খালি। বাইরের আকাশ অন্ধকার রাস্তার ওপাশের ভাঙা বাড়িটার উঠোনে পথের আলো পড়েছে। সেই অবাঙালী মেয়েটা তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে দেখে শীলার কেমন যেন অবাক লাগলো।

সবাইকার চোখ এড়িয়ে রাস্তায় নেমে এলো শীলা।

অন্ধকারে কে যেন ফিস্‌ফিস করে বললো, 'এখনো তোমাকেই ভালোবাসি—অতীত কি মুছে যায়? কোথা থেকে দখিনের দমকা বাতাস এলো? ফুটপাথে শাদা শাদা ফুলগুলো কি বকুল?

'হোয়াট এ্যাম আই টু-ডু? হোয়াট এ্যাম আই টু ডু?' প্রায় গুন গুন করে বলতে বলতে নীচু হয়ে কয়েকটা ভিজে-ভিজে শাদা ফুল শীলা কুড়িয়ে নিলো।

প্রেক্ষাগৃহ

ভারতীয় ফিল্ম সেন্সার
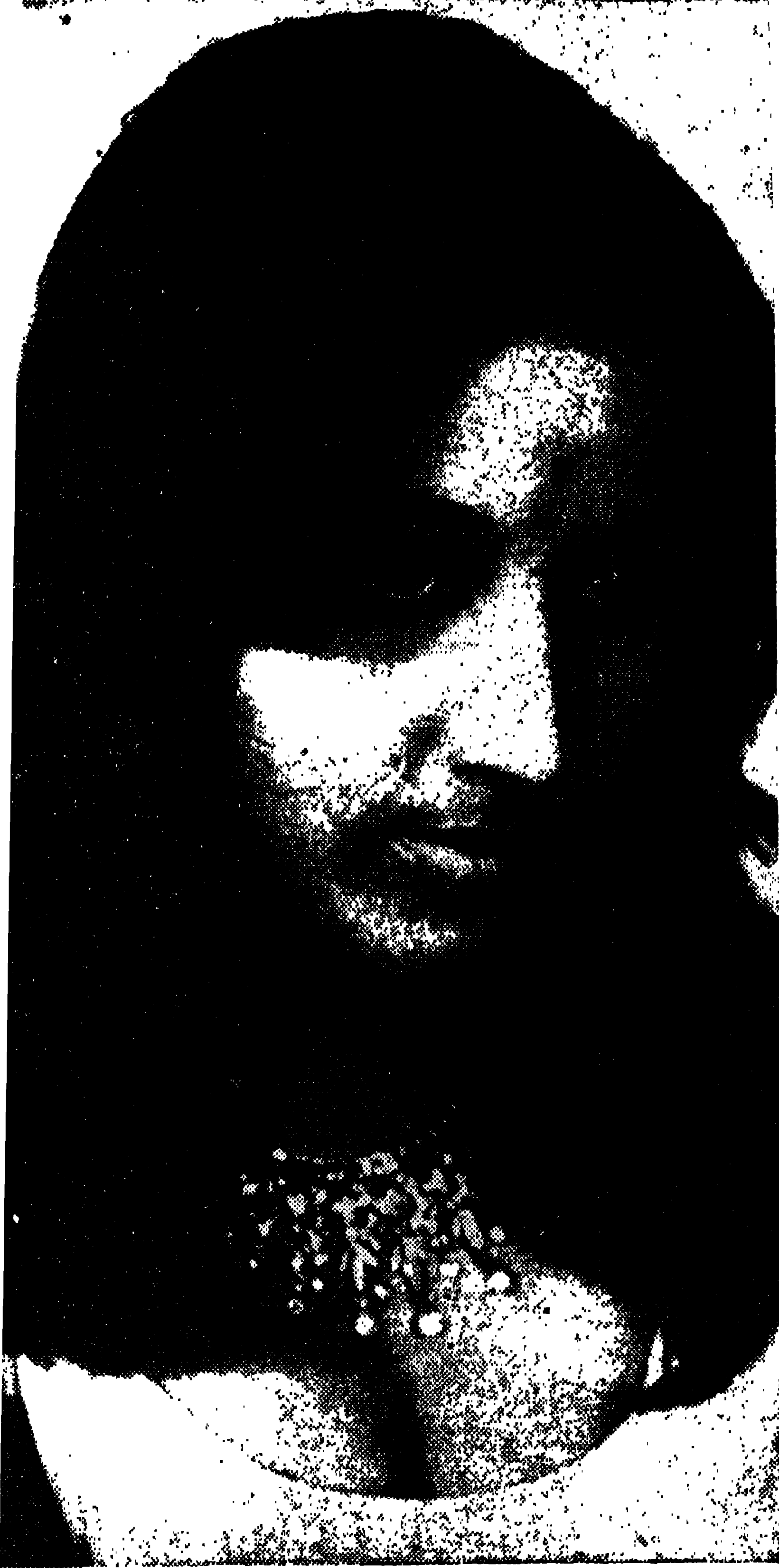
তীর/নন্দিতা বোস। ফটো : অমৃত

বহু বিস্তীর্ণ আমাদের ভারতভূমি। অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে এই দেশের চুয়াল্লিশ কোটি অধিবাসী ভাষায়, আচার-আচরণে, বেশভূষায় অঞ্চল ভেদে পৃথক। আমরা বাঙালী; আমাদের পাশেই রয়েছে আসামী, বিহারী, ওড়িয়া। আরও উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে উত্তরপ্রদেশবাসী, পাঞ্জাবী, গাড়ওয়ালী, রাজস্থানী। আর দক্ষিণে রয়েছে তেলেগুভাষী ও তামিলভাষী মাদ্রাজী, অন্ধ্ররাজ্যবাসী, কঙ্কনী এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, মহী-শূরী, হায়দ্রাবাদী প্রভৃতি। শুধু রাজ্য ভেদেই পার্থক্য নয়; একই রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, বর্ণ, সম্প্রদায় ভেদেও আচার-আচরণে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে। আমার কাছে যে-জিনিস খাদ্য, আপনার কাছে তা বিষবৎ পরিত্যজ্য। আমি যাকে সুরুচি মনে করি, আমাদের অফিসের পিল্লাইয়ের মতে তার থেকে বড়ো কুরুচির নিদর্শন আর হতেই পারে না। কিন্তু সমগ্র ভারতের এই সুবৃহৎ সমাজের একটি গরিষ্ঠ অংশ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ও প্রতীচী আদর্শে অনু-প্রাণিত হয়ে বংশ, শ্রেণী, বর্ণ ও ভাষাগত বিভেদ ভুলে আহারে-বিহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে প্রায় এক গোত্রীয় হয়ে উঠেছে। পুরুষদের পরণে হাফ বা ফুল প্যান্ট, সার্ট বা হাওয়াই সার্ট, মুখে বেশীর ভাগই ইংরাজী বুলি; তাঁদের সাধারণ পানীয় চা বা কফি। বাড়ীতে তাঁরা যাই খান না কেন, বাইরে হোটেল-রেস্তোরাঁয় তাঁদের খাওয়ার মধ্যে কোনো বাছ-বিচার নেই। আর আধু-নিকা মেয়েরা আসমুদ্রহিমাচলের সর্বত্র পরছেন হয় বাঙালী ধরনে শাড়ী আর কটি-তট উন্মুক্ত রাখা ব্লাউজ, আর না হয়ত সালোয়ার (চুড়িদার পাজামা)-কামিজ-দোপাটা বা চুন্নী (চুন্দ্রী)। একমাত্র গোঁড়া মুসলমানের মেয়ে ছাড়া ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথা আজ লুপ্তপ্রায়, একথা জোরগলাতেই বলা চলে। মেয়েদের কেশ-বিন্যাস ও মুখের পালিশ বা মেক-আপ দেখে মাত্র বিজ্ঞরাই বুঝতে পারেন কোন্ মেয়ে কোন্ রাজ্যের বাসিন্দা। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে আজকাল বুঝে ওঠা

সাবরমতী/সুপ্রিয়া দেবী এবং উত্তমকুমার

দৃষ্টিদর্পণ/অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

অসম্ভব ভদ্রলোক বা ভদ্র-ছেলেটি মারাঠী না বাঙালী, মাদ্রাজী বা পাঞ্জাবী।

পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত এই বিরাট সমাজের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ভারতীয় ফিল্ম সেন্সারের নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু চিত্রপ্রযোজকদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে ভারতীয় সেন্সার বোর্ড যে প্রোডাকসান কোড বা চিত্রনির্মাণের নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছেন, তা যদি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হয়, তাহলে কারুরই দ্বারা একখানিও ছবি প্রস্তুত করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা বলা রীতিমত কঠিন। ভাগ্যে সেন্সারবোর্ডের সদস্যারা মানুষ এবং তাঁরা জানেন একখানি ছবি তৈরী করতে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়, তাই তাঁরা প্রোডাকসান কোডের নিয়মবিধিকে সামনে রেখেও ছাড়পত্র দিয়ে থাকেন। তাঁরা দেখেন, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির মর্যাদা রাখা হয়েছে কিনা, দেশের সরকারের প্রতি আনুগত্য অটুট আছে কিনা, কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল বা ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি অশ্রদ্ধা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয়েছে কিনা এবং তাঁরা আরও দেখেন, প্রেমের প্রকাশ ব্যাপারে চুম্বনাদি তা ভারতীয় অশালীন এবং অশোভন ভঙ্গীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে কিনা, আর দর্শকদের প্রতি অযথা যৌন আবেদনের জন্যে নারীদেহকে অন্যায় রূপে উন্মুক্তভাবে দেখানো হয়েছে কিনা। ভারতীয় সেন্সার মনে করেন, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য রক্ষাই কোনো ছবিকে ছাড়পত্র দেবার ব্যাপারে একমাত্র দ্রষ্টব্য। সামাজিক ছবির মধ্যে যে কাহিনী বিবৃত হচ্ছে, তা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য কিনা, তার ভিতর যেসব ঘটনা দেখানো হচ্ছে, সেগুলি ঘটা সম্ভব কিনা, তার চরিত্রগুলি আচার-আচরণে বা সাজ-পোশাকে বাস্তব বলে গণ্য হতে পারে কিনা, এ-সবের প্রতি লক্ষ্য রাখবার কথা প্রোডাকসান কোডের কোথাও বলা নেই। কাহিনী রচনায় সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা যে একান্ত প্রয়োজন, এই তথ্য সম্পর্কে ভারতীয় ফিল্ম সেন্সারের একান্ত ঔদাসীন্য চিন্তাশীল মানুষের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সেন্সারের একমাত্র সতর্ক দৃষ্টি দর্শকের নৈতিক মান রক্ষার দিকে। অথচ নীতি বস্তুটি যে অত্যন্ত আপেক্ষিক এই তথ্যটি হয়ত আমাদের সেন্সার বোর্ডের কর্তাদের স্মরণে নেই। একদা যখন স্বামীর প্রতি অবিচলিত আনুগত্যই হিন্দু স্ত্রীর কর্তব্য বলে জ্ঞান করা হত, তখন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অবাধ্যতা নীতিবিগর্হিত ছিল। কিন্তু আজ যখন ভারত সরকার হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করেছেন, তখন স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রীর প্রতিবাদ নীতিবহির্ভূত নয়। আজ যেসব সামাজিক রীতিনীতি ছিন্ন বস্ত্রের মতো পরিত্যক্ত, যে-ধর্মীয় বিশ্বাস আজ মানুষের উপহাসের সামগ্রী, তাদের সম্বন্ধে কোনো রকম আলোচনা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশকে সেন্সার সমর্থন করে না।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে, দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যে কোনোও সরকারী পদাভিষিক্ত ব্যক্তির কার্যের সমালোচনা করার। গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিকের অধিকার আছে যে কোনও সামাজিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক প্রথার নিন্দা করার এবং যুক্তিসম্মত নতুন পথের সন্ধান দেওয়ার। একদা হিন্দুসমাজে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল, স্ত্রীশিক্ষা বর্জনীয় ছিল, স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরচারিণী অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন। কিন্তু আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান শরিক। এ জিনিস সম্ভব হয়েছে কবি, লেখক, নাট্যকার ঔপন্যাসিকের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখার গুণে। কিন্তু চলচ্চিত্রকে শান্তমতি, মুখচোরা সর্বদা নতমস্তক ভালো ছেলে হয়ে থাকতে হবে, এই কথাই ভারতীয় সেন্সার বোর্ড প্রবর্তিত প্রোডাকসান কোডের ছত্রে-ছত্রে ফুটে ওঠে। তাই তার নাগপাশ এড়িয়ে প্রাণচঞ্চল, জীবন্ত চলচ্চিত্র গড়ে উঠতে পারছে না। সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর' বা 'মহানগর' সামাজিক প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত হয়েছে, তার বেশী এগিয়ে যেতে পারে নি। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় পরতে পরতে যে ঘুণ ধরেছে, এ সম্পর্কে আপনি-আমি-তিনি

একমত হলেও এই ব্যবস্থার
মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরে
ছবিই আজ তৈরী হতে পারছে না।
ভ্য সমাজের বিবাহপ্রথাকে অস্বীকার
ন্য দেশের কথা ছেড়েই দি, হলিউড
'স্যাণ্ড পাইপার', 'নাইট অব
া' প্রভৃতি গোছের কি দুঃসাহসিক
না প্রস্তুত হয়েছে এবং ভারতের
গোল্ডউইন-ম্যার্স' পরিবেশিত হয়ে
থানোও হয়েছে।

তিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবার
এবং সমাজসংস্কারের যোগ্য
য় ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সার্থকভাবে
হতে গেলে ভারতীয় সেন্সারবিধিকে
নের উপযোগী করে ঢেলে সাজানো
।

গড় নাসিমপুর/মাধবী মুখোপাধ্যায়।

দেশী ছবির খবর

'বংশীত জননী' করার পর বেশ
দন কেটে গেছে, পরিচালক খগেন
সম্পর্কে বিশেষ কিছু শোনা যায়নি,
 ছবিটা আর্থিক সাফল্যলাভ করতে
নি। আবার খগেন রায় ফিরে আসছেন
দীপে। অনিল সরকারের লেখা এক
ঘন কাহিনী নিয়ে চিত্রনাট্য শ্রীরায়ই
লিখেছেন। সঙ্গীতপরিচালক সলিল
রীর পরিচালনায় ইতিমধ্যে দ্বিজেন
র্জি, মান্না দে, সবিতা চৌধুরী ও
ভোঁসলের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়ে
। ভূমিকালিপিতে থাকবেন মাধবী
র্জি, অনিল চ্যাটার্জি, বিকাশ রায়,
তবরণ, শমিতা বিশ্বাস, দীপ্তি রায় ও
ন্য।

কাশ্মীরের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ও
ম সুন্দর লোকেশনে প্রায় পনেরদিন
একটানা চিত্রগ্রহণের পর প্রযোজক-
লক আর-কে-নায়ার ফিরলেন তাঁর
কাম" ছবির ইউনিট নিয়ে। তিনটি
ও কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্ত চিত্রায়িত
ছ গুলমার্গ, পহলগাঁও, খিলানমার্গ,
র প্রভৃতি জায়গায়। ছবির নায়িকা
জক-স্ত্রী সাধনা এসব দৃশ্যে প্রাচ্য ও
ত্যের বিভিন্ন ফ্যাশনের বিভিন্ন
াক পরেছেন। এ ছবির ফটোগ্রাফী
এইচ-কাপাদিয়ার, শিল্পনির্দেশনা
ল ও শিবুর, নৃত্যপরিকল্পনা পি, এল
-এর, সঙ্গীতপরিচালনা লক্ষ্মীকান্ত
লাল এবং গীত রাজেন্দ্র কৃষাণের।

ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন সঞ্জয়, অশোককুমার, রেহমান, অঞ্জু মহেন্দ্র, রাজেন্দ্রনাথ, হেলেন, মুবারক, শপ্রু, অসিত সেন, ইফ্‌তিকার, জানকীদাস, নবাগত ধরমবীর ও সাধনা।

বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় পরিচালক মৃণাল সেন কি বাংলা ছবি করা ছেড়ে দিলেন? গত দু'বছর যাবৎ তাঁর কাছ থেকে কোন বাংলা ছবি বাংলা দেশ পায় নি। অবশ্য ছবি তিনি করেছেন একটা ওড়িয়ায়। তবে সে ছবি কলকাতায় রিলিজ না হওয়ায় সাধারণ দর্শকরা তা দেখতে পান নি। আশা করা গিয়েছিল তিনি নিশ্চয়ই আবার বাংলা ছবিতে ফিরে আসবেন! কিন্তু শোনা যাচ্ছে তিনি আগামী মাসে যে ছবির কাজ শুরু করছেন সেটি হল বনফুলের লেখা একটা কাহিনী নিয়ে হিন্দী ছবি। অবশ্য এ বছরের মধ্যেই ছবির কাজ শেষ হয়ত করবেন। বাংলা ছবি করা সম্পর্কে অনেক প্রোগ্রামার

অগ্নিযুগের কাহিনী চিত্রের বিশেষ মিলন উৎসবে মাধবী মুখোপাধ্যায়, ভূপেন রায়, শমিতা বিশ্বাস এবং বীরেন রায়।

কথাই শুনেছিলাম ওনার মুখে, তা কি আর বাস্তবে রূপায়িত হবে না?

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'শেষ থেকে শুরু' ছবির কাজ শেষ হয়েছে। ছবির অন্যতম আকর্ষণ হবে এ ছবির সঙ্গীত। অনিল বাগচি ও নচিকেতা ঘোষ দুজনে মিলে এ ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন। চিত্রসাথী পরিচালিত এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন বিদ্যা রাও, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, লতিকা দাশগুপ্তা এবং ইঙ্গিত গোষ্ঠীর শিল্পিবৃন্দ। বিদ্যা রাওয়ের এ ছবি নায়িকা হিসাবে প্রথম ব্রেক। আশা করা যায় উনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহারই করবেন।

নির্বাক যুগের চিত্র প্রযোজক জামসেদজী ওয়াদিয়া ও হোমী ওয়াদিয়ার নাম আজকাল আর খুব একটা চোখে পড়ে না। এ'রাই কমপক্ষে দেড়শ ছবি তৈরী করেছেন আজ অব্দি। সম্প্রতি আবার নতুন ছবি করার জন্য তোড়জোড় করছেন। কাজ ইতিমধ্যে শুরুও হয়ে গেছে। বসন্ত স্টুডিওয় মহরৎ হয়েছে আগস্টের শেষ দিকে। পুরানো প্রথামত গুলি ছুঁড়ে ছবির মহরৎ শুরু হয়েছিল। ঐ দিনের শিল্পী ছিলেন ছবির নায়ক রাজেশ খান্না ও ক্যামেরা চালিয়েছিলেন বাবুভাই মিস্ত্রী। ছবির নাম 'আরমালো কি দুনিয়া'।

অর্থ বা সম্মান বা যার মোহেই হোক একে একে বাংলার অনেক শিল্পীই বম্বের পথে পাড়ি দিয়েছেন। কেউ কেউ তাদের মধ্যে ওখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে চলে এসেছেন আবার কেউ কেউ রয়েই গেছেন। কলকাতার রাখী বিশ্বাস থেকে-যাওয়াদের মধ্যে একজন। উনি এখন রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের নতুন ছবিতে কাজ করছেন। ছবির কাহিনী বাংলার **'জীবন-মৃত্যু'র** হিন্দী, পরিচালক সত্যেন বোস।

সম্প্রতি কলকাতার যে আরেকজন শিল্পী বম্বেয় রওনা হলেন তিনি হচ্ছেন রবি ঘোষ। কারেকটর অ্যাকটর হিসাবে বাংলা ছবিতে তো এ'র একাধিপত্য বলা চলে, তবে বম্বেতে গিয়ে কতদূর কি করবেন কে জানে—তবে আশা করা দোষের নয়। শ্রীঘোষ বম্বেতে গেছেন পাচ্ছি ইন্টারন্যাশনালের **'সত্যকাম'** ছবিতে কাজ করবার জন্য। হৃষিকেশ মুখার্জি এ ছবির পরিচালক ও নায়ক চরিত্রে আছেন ধর্মেন্দর।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর ওপর জানি না কেন বাংলা চিত্রজগতের একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। এ অবধি বহু গল্প, কবিতা, উপন্যাসের চিত্রায়ণ ঘটেছে বাংলায়। সত্যজিৎবাবু, তপনবাবু বা জীবন গাঙ্গুলীর হাতেও তা প্রাণ পেয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু এবারে সংযোজিত হচ্ছে আরেকটি নতুন নাম—গৌতম সেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের **'গুপ্তধন'**কে চিত্রায়িত করছেন। আলি আকবর খাঁকে আবার বহু দিন পর সংগীত পরিচালক হিসাবে পাওয়া যাবে এ ছবিতে।

নাবিক সংস্থার প্রযোজনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস **'দিবারাত্রির কাব্য'** ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। ছবিটি এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়। ছবির পরিচালক বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী। বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন বসন্ত চৌধুরী, অঞ্জনা ভৌমিক, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অনুভা ঘোষ, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাগত স্বপন রায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। স্প্যান ফিল্ম পরিবেশিত এ ছবির আলোক চিত্রকর হচ্ছেন 'স্বপ্ন নিয়ে' খ্যাত কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

বিদেশ
ছবি
খব

একজন পরিচালক—

বার্নার্দো বার্তোলুসি। বয়স ত্রি কোঠার প্রথম দিকে। সপ্রতিভ চওড়া কপ উজ্জ্বল চোখ, সদালাপী, হাসিখুসি, প্র চ্ছল। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের ঝোঁক। জগতের সব সিরিয়াস বা তাঁর মাথায়। সমাধান নৈব-নৈব চ। পা লিনি 'অ্যাকাটোন' করবার সময় বার্নার্দো ডাকলো। গুরু পেলেন তিনি। ইতি আলবার্তো মোরাভিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প চয় হয়েছে। তাঁর বেড়ে ওঠার পরি রীতিমত রুচিবান। এখান থেকেই প্রেরণা পেয়েছেন ভবিষ্যতের কর্মসূচ তাঁর প্রথম ছবি 'লা কমার সেকা'। বি বস্তু বর্তমান সমাজের বিশেষ এক সম যা এর আগে এতটা তীব্র হয়ে ওঠেনি। ছবি করার প্রেরণা পাসোলিনির কাছ থে তিনি পেয়েছিলেন। 'অ্যাকাটোন'এ সহব হিসাবে কাজ করতে করতে বার্নার্দোর মাঝে মনে হয়েছে এটাই বুঝি এব মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে তিনি সব কথা প্র করতে পারবেন। পাসোলিনি নিজেই কাহিনী নিয়ে ছবি করবেন ভেবেছিলে করলেন না। বার্তোলুসিকে কাহি বললেন। জনৈক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধ পর সে খুনের হত্যাকারীকে খুঁজে করতে গিয়ে শহর ও শহরতলীর বি নিষিদ্ধ জায়গায় খুঁজে বেড়াল ও সেখান অধিবাসীদের এক বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র আনা হল জিজ্ঞাসা প্রতি-জিজ্ঞাসার দিয়ে। কাহিনীটা সত্য। পাসোলিনি বা লুসিকে এ অব্দিই বলেছিলেন। তা তিনি নিজের বুদ্ধি ও চিন্তামত পরিব করেছেন। পাসোলিনির সঙ্গে এত ঘ ভাবে মেশা সত্ত্বেও তাঁর কোন প্রত্য পরোক্ষ ছাপ এ'র ছবিতে নেই। এখ বার্নার্দোর বৈশিষ্ট্য।

বার্নার্দোর চিত্রভাষা পাসোলিনির সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি আধুনিক. কট্টর বাস্তবতা তাঁর ছবিতে নেই, শান্ত. সরল সৌন্দর্য আছে বরং। কোন কোন বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে পাসোলি চাইতেও বার্নার্দো সংযম ও নিষ্ঠার প দেয়। তবে একটা জায়গায় গুরু-শিষ্য সিনেমা কবিতার মত ছোট ছোট রূপ দিয়ে গড়া—এটা দুজনেই বিশ্বাস ক প্রথম ছবি 'লা কমার সেকা'র পর যে করলেন বার্নার্দো তা বিষয়বস্তুর দিক একেবারে নতুন। এ-ছবি পুরাতনকে চুরে নতুন কিছু বলতে চাইল। সমাে

মধ্যে দ্বিমত দেখা গেল ছবির
প্রচারে। এই 'বিফোর দ্য রেভু-
ি বার্তোলুসিকে যে শুধুমাত্র
জনপ্রিয় করল তা নয়, বিদেশেও
ল। পাসোলিনির সঙ্গে আব
করেন না বটে কিন্তু দু'জনের
ম এখনও খুউব ঘনিষ্ঠ।
সেপেল-৭০' ছবিতে একটা এপি-
বলা হল বার্নার্দোকে তখন
সাশা করেছিলেন, 'কি জানি
করবেন'। দেখা গেল ও ছবির
ন পরিচালকের (গদার, পাসো-
ভজানি, বেল্লুসিও) চাইতে
অংশ কোন অংশেই নিকৃষ্ট তো
অনেকের চাইতে ভালোই।
শুধুমাত্র ছবির চিত্রনাট্য লেখেন
পরিচালনা করেন তাই নয়, বিভিন্ন
র কাগজে নিয়মিত প্রবন্ধ ও
ও লেখেন। ডস্টয়েভস্কির
য়ে ও'র তৃতীয় ছবি 'দি পার্টনার'
দনার টেবিলে।

• •

র ঠিক এমনি সময়েই শার্লি
এসেছিলেন ভারতে। কলকাতায়
মিশনারী অনাথ আশ্রমের জন্য
সাহায্যও করে গিয়েছিলেন।
নি ভারতে ছবি করার বিশেষ
াশ করেছিলেন। এবার তাঁর সেই
ম বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। এ-
শেষ দিকে ছবির কাজ শুরু হচ্ছে
ক য়ুরোপিয়ান সমাজ-সেবিকা
ভারতীয় ডাক্তারের কাহিনী নিয়ে
নাম 'এভারি টাইম দি হার্ট বিটস্'।
অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে ভারতীয়
বেন নিশ্চয়ই, তবে কে বা কারা তা
ক হয়নি।

* *

নো ভিসকন্তি এবার যে ছবির
ত দিচ্ছেন সেটি এক ধনী পরি-
ঃতিচারণের মধ্য দিয়ে নাজিজমের
হিটলারের পুনরুত্থানের কাহিনী
বে। ছবির নাম জার্মান ভাষায়
মেরাংগ'। এসেন্-এর ইস্পাত কার-
যুষিত জার্মানি ও বাকি অংশ
লোকেশানে গৃহীত হবে।
কোন কাজের প্রয়োজন হলে তা
সনেসিত্তাতেই গৃহীত হবে। প্রধান
দুটিতে থাকবেন সম্ভবত ডার্ক
ও সুইডেনের ইনগ্রিড থুলিন।

* *

বুলগেরিয়ান ছবি 'দি প্রসিকিউ-
কাহিনীর মধ্যে একটু নতুনত্ব আছে।
ওয়ারেন্টে সই করতে গিয়ে দেখেন
ম ওয়ারেন্ট সে তার একদা ঘনিষ্ঠ
কমরেড তায় আবার তারই বোনের
বিচারক সই করতে গিয়েও কলম
ন। বিশেষ খোঁজ-খবর নিয়ে জানা
ই সাজানো, মিথ্যা সব। এমত
বিচারকের মানসিকতাকে ছবিতে
করা হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা
জন্যে পরিচালক [illegible] মার্জানিন্-

জভ্। চিত্রনাট্য লিখেছেন ব্লাদিমির মেতাল-
নিকভ্ এবং প্রধান চরিত্রে আছে জর্জি
জর্জিয়েভ্, ইয়র্দান মাতেভ্, ওলগা কিচেভা
ও অন্যান্যরা।

* * *

ইতালীর বহু সমালোচিত ও প্রশংসিত
পরিচালক মাইকেল এঞ্জেলো আন্তো-
নিওনি নতুন যে ছবির কাজ শুরু করবেন,
তার প্রযোজক হলেন কার্লো পন্টি। ছবির
নায়িকা হবেন প্রযোজকের স্ত্রী সোফিয়া
লোরেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরি-
চালকের সঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত অভিনেত্রীর
এই হবে প্রথম কাজ। ছবির নাম 'মাদার
কারেজ'। সোফিয়া অবশ্য আন্তোনিওনির
সঙ্গে কাজ শুরু করার আগে ডি-সিকার
'জিওভান্না'র কাজ শেষ করে নেবেন।

* * *

পর্নোগ্রাফি ছবির দৌরাত্ম্য যে কতদূর
তা পশ্চিম য়ুরোপের কয়েকটি দেশের দিকে
তাকালেই বোঝা যায়। কার্লোভাভ্যারী
আর ভেনিসে কয়েকটা চেক ও পোলিশ
ছবির প্রদর্শনী এতদূর গড়িয়েছিল যে,
অনেকেই হল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।
গত বার্লিন উৎসবেও জাপানের ছবিটা
দেখার অযোগ্য বলে অনেক সমালোচকই
রায় দিয়েছেন। সম্প্রতি পঃ জার্মানীতে
এ ধরনের ছবিকে সর্বোচ্চ পুরস্কারও
দেওয়া হচ্ছে। প্রথম বছরের টিকিট বিক্রীর
খতিয়ান অনুযায়ী এবারে জার্মান চিত্র-
জগতের 'গোল্ডেন স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড'টি
পেয়েছে দুটো ছবি 'অসওয়াল্ড কোলি,
দি ওয়াণ্ডার অফ লভ' ও 'হেলগা'।

* * *

গিলো পন্তিকার্ভোর 'দি ব্যাটল অফ
আলজিরিয়া' পরিচালককে শুধু পুরস্কারই
এনে দেয়নি, আন্তর্জাতিক খ্যাতি দিয়েছে।
উনি যে ছবির কাজ শুরু করবেন শিগগির
সেটির নাম হল 'কুইমেদা'। পশ্চিম
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পটভূমিকায় ছবির
চিত্রনাট্যের বিস্তার।

চিত্র-সমালোচনা

আঁখে (হিন্দী) : সাগর আর্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর নিবেদন; ৫,০৬৩-৫৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৮ রীলে সমাপ্ত; কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, প্রযোজনা ও পরিচালনা : রামানন্দ সাগর; সংগীতপরিচালনা : রবি; গীতরচনা : সহীর লুধিয়ানী; চিত্রগ্রহণ : জি সিং; শব্দানুলেখন : ওয়ার্লিকর, রাণে, যোশী ও নরেন্দর সিং; সংগীতানুলেখন : মীনু কাত্রাক; শব্দানুপুনর্যোজনা : মঙ্গেশ দেসাই; শিল্প-নির্দেশনা : সুধেন্দু রায়; সম্পাদনা : লছমনদাশ; নৃত্যপরিচালনা : সত্যনারায়ণ; নেপথ্যকণ্ঠসংগীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, উষা মঙ্গেশকর, মোহাম্মেদ রফী, মান্না দে ও কমল বারোত; রূপায়ণ : ধর্মেন্দ্র, নাজির হোসেন, সুজিতকুমার, মেহমুদ, ধুমল, জীবন, সজ্জন, মদন পুরী, মাস্টার রতন, মালা সিংহ, ললিতা পাওয়ার, কুমকুম, জেব রেহমান, মধুমতী, সুজাতা প্রভৃতি। প্রভা পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২৫ অকটোবর, শুক্রবার থেকে সোসাইটি, মুনলাইট, প্রিয়া, ইন্টালী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

উত্তর-পশ্চিমের কাশ্মীর থেকে শুরু ক'রে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমানায় অবস্থিত নেফা, নাগাভূমি পর্যন্ত সীমান্ত রাজ্যগুলিতে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্নকারী শত্রুচরদের বহুবিধ অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের কথা দৈনিক সংবাদপত্র মারফৎ আমাদের প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়ে থা[...] লেখক-প্রযোজক-পরিচালক রামানন্দ [...] তাঁর নবতম চিত্র-নিবেদন 'আঁখে'র মা[...] আমাদের দেশবাসীকে এইসব শত্রুচ[...] প্রতি সদা জাগ্রত দৃষ্টি রেখে তা[...] দুরভিসন্ধিমূলক কর্মপ্রচেষ্টাকে ক[...] হস্তে দমন করবার আহ্বান জানিয়ে[...] "আঁখে"র অন্যতম চরিত্র, নেতাজী প্রতি[...] আজাদ হিন্দ বাহিনীর জনৈক মেজ[...] তাঁর মুশলিম বন্ধুর মুখ দিয়ে [...] ভারতবাসীর কাছে আর্জি পেশ করেছে[...] যে-স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে হি[...] মুশলিম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ প্রাণ [...] সর্গীকৃত হয়েছে, তাকে রক্ষা করবার দা[...] প্রতিটি ভারতবাসীর। মাত্র দেশের সর[...] বা সরকার নিয়োজিত সৈনিকদের [...] নির্ভর করলেই চলবে না; প্রতিটি ভা[...] বাসীকে এই মহান্ দেশের স্বাধী[...] রক্ষায়—বিশেষ ক'রে শত্রুচরের দেশ-[...] তার আচরণদমনে—সদাঅতন্দ্র প্রহরী থাকতে হবে। অনেকটা 'ফ্রম রা[...] (০০৭) উইথ লাভ" ধরণের গোয়ে[...] কাহিনীকে দেশাত্মবোধের এই পটভূমি[...] বিধৃত ক'রে শ্রীসাগর তাঁর নবতম নি[...] 'আঁখে'কে একটি সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য [...] করেছেন।

ছবির অভিনয়াংশ অত্যন্ত সা[...] মণ্ডিত। নায়িকা মীনাক্ষীর ভূমিকায় [...] সিংহ অসামান্য নাট-নৈপুণ্যের প[...] দিয়ে ভূমিকাটিকে স্মরণীয় ক'রে তুলে[...] প্রেম নিবেদন ও নৃত্য-গীতের দৃশ্যগু[...] তাঁর রূপসজ্জা রীতিমত আকর্ষণীয়। ন[...] সুনীল বেশে ধর্মেন্দ্র পরিপূর্ণভাবে [...] লীল। শত্রুপক্ষীয়দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে [...] শারীরিক কুশলতা ও ক্ষিপ্রকারিতা বি[...] ভাবে দর্শনীয়। দেশভক্ত, অবসরপ্র[...] মেজরের ভূমিকায় নাজির হোসেন অ[...] সংবেদনশীল অভিনয় করেছেন। নাদিম[...] ইউসুফের যুগ্ম-ভূমিকায় সুজিতকু[...] ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয়ের মাধ্যমে সার্থক চ[...] চিত্রণ করেছেন। সুনীলের দুই বি[...] সহচররূপে মেহমুদ ও ধুমল নানা [...] নানা ঘটনার মধ্যে দর্শকদের কাছে হা[...] হাসির খোরাক যুগিয়েছেন। সুনী[...] ভগ্নী সুনন্দা বেশে কুমকুম এই ছবি[...] সন্তান-বিচ্ছেদ কাতর মাতৃহৃদয়ের বা[...] বেদনাকে সার্থকভাবে প্রকাশিত ক'রে [...] অভিনেত্-জীবনে একটি নতুন অধ্যা[...] সূচনা করলেন। শত্রুচরদের দলে বি[...] ভূমিকায় সজ্জন, জীবন, মদন পুরী

অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয়
সুনীলকে বিপথে আকর্ষকারী
রেহমান এবং শত্রুপক্ষীয় চর-
তা পাওয়ার ভূমিকা উপযোগী
করেছেন। একটি ছোট ভূমিকায়
ইরাণীও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
র দৃশ্যে মধুমতী ও সুজাতা
বশী মালা সিংহের যোগ্য সহচরী
জদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম
সুনন্দার ছেলে বাবলু বেশে
ভ করেছে।

কৌশলের দিক দিয়ে "আঁখে"
প্রশংসালাভের যোগ্য। বহির্দৃশ্য
চিত্রগ্রহণে, শিল্পসম্মত দৃশ্য-
লপথে দ্রুতগামী বোটের দৃশ্য-
বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের দৃশ্যটির
অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের
উড়িয়ে দেবার দৃশ্যগ্রহণে—
লের প্রায় সকল ব্যাপারেই
হলিউডের যে-কোনও বিরাট ছবির
লা চলে। ছবিটির ছ'খানি গানের
টিই ভাষা, ভাব, সুর ও গাওয়ার
গ্রাহী। এদের মধ্যে বিশেষভাবে
্য হচ্ছে : (১) উস্ মুল্ক্ কী
কৈ ছু নহী সকতা; (২)
য় জিন্দগীমে মহব্বৎ কভী কভী ;
দ আল্লাহ কে নাম পে এবং (৪)
য় রাত সোহানী ন্যাহি আনেওয়ালী
বহসঙ্গীত রচনায় তবলার ব্যবহার
ভিনবত্বের সৃষ্টি করেছে।
ন্দ সাগর প্রযোজিত ও পরি-
"আঁখে" ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে
লের নতুন মান সৃষ্টিতে এবং
ভূমিসমন্বিত জাতীয়তাভাবপুষ্ট
চত্র-নির্মাণে একটি নতুন দিগন্তের
রল।

র (হিন্দী) : গুরু দত্ত ফিল্মস
মিটেড-এর নিবেদন; ৪,০৯-৭০
র্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ ; পরি-
আত্মারাম ; কাহিনী : ধ্রুব চট্টো-
চিত্রনাট্য : আব্রার আলভি ও
ট্টোপাধ্যায় ; সংলাপ : আব্রার
; সঙ্গীতপরিচালনা : শঙ্কর
। ; গীত-রচনা : হসরৎ জয়পুরী,
: ভি কে মূর্তি ও কে জি
; শব্দানুলেখন : পি থ্যাকারসে ;
নুলেখন : মীনু কাব্রাক ও ডি এ
; শিল্পনির্দেশনা : সোরেন
ম্পাদনা : ওয়াই জি চবণ ; নেপথ্য
ীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা
কৃষ্ণা কালে, মোহাম্মেদ রফী ও
কাপুর; রূপায়ণ : ধর্মেন্দ্র, সঞ্জীব-
রহমান, জনি ওয়াকার, শ্যামকুমার,
দেও, মনোমোহন, আশা পারেখ,
বেলা বসু, মৃদুলা, লতা সিংহ
দাগা পিকচার্স-এর পরিবেশনায়
১ অকটোবর, শুক্রবার থেকে রিগ্যাল,
দর্পণা, মেনকা, ছায়া, পার্কশো
এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো

স্বনামধন্য অভিনেতা-পরিচালক-প্রযোজক গুরু দত্তের আকস্মিক পরলোকগমন তাঁর স্বনামে প্রতিষ্ঠিত চিত্র-প্রযোজনা সংস্থার কর্মপ্রবাহকে কিছুকালের জন্যে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভ্রাতা আত্মারামকে ধন্যবাদ, তাঁর নেতৃত্বে গুরুদত্ত ফিল্মস্ আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং তারই প্রমাণ-স্বরূপ আমরা পেয়েছি গুরু-দত্ত ফিল্মস্-এর নবতম নিবেদন "শিকার" ছবি। না, গুরুদত্ত প্রদর্শিত পন্থায় "সাহেব বিবি ঔর গুলাম" বা "বাহারে ফির ভি আয়েগী" শ্রেণীর ছবি তৈরী করেননি আত্মারাম ; এ-কথা তিনি অত্যন্ত সবিনয়ে কলকাতার চিত্র-সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার ক'রে বলেছেন, আগে জনসাধারণের উপ-ভোগ্য ছবি নির্মাণ ক'রে আর্থিক দিক দিয়ে সংস্থাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করি ; তারপরে আবার শিল্পোন্নত ছবি তৈরী করবার পথে পা বাড়াব।

পরিচালক আত্মারামের আশা সফল হয়েছে। সাসপেন্সধর্মী ছবি হিসেবে "শিকার" অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। একটি হত্যা-রহস্যের সমাধানের ওপর ছবির কাহিনীটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং সেই হত্যার সঙ্গে সন্দেহজনকভাবে জড়িয়ে রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ-অফিসারের সুন্দরী কন্যা। যিনি হচ্ছেন ছবির নায়িকা। নায়িকা সকলের অগোচরে নিজেও ভেবেছে, সে-ই ঐ হত্যার জন্যে দায়ী; কারণ নিহত ব্যক্তির লোলুপ আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সে সত্যিই তার প্রতি লক্ষ্য ক'রে রিভলভার উঁচিয়েছিল। কিন্তু শেষ অবধি প্রমাণিত হ'ল সে সত্যিই নির্দোষ। যার গুলীর আঘাতে লম্পট লোকটি চিরনিদ্রায় অভিভূত হ'ল, তার সঠিক পরিচয় প্রকাশ পায় ছবির শেষতম পর্যায়ে।

"শিকার" নামের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্য প্রথমেই একটি ব্যাঘ্রশিকারের দৃশ্য দিয়ে ছবির আরম্ভ। এবং যেহেতু ছবির ঘটনাস্থল বনভূমির সান্নিধ্যেই, সেই কারণে ছবির মধ্যে বহু হস্তী, হরিণ প্রভৃতি সময়োপযোগীভাবে দেখানো হয়েছে। আরও আছে বনভূমির বাসিন্দা আদিবাসী-দের নৃত্যগীত। সাসপেন্স, প্রেম, হত্যা-

রবীন্দ্রসদনে রঙ্গসভা অভিনীত বিপ্লবী ডিরোজিওর শততম রজনীর অভিনয়ের একটি দৃশ্য।
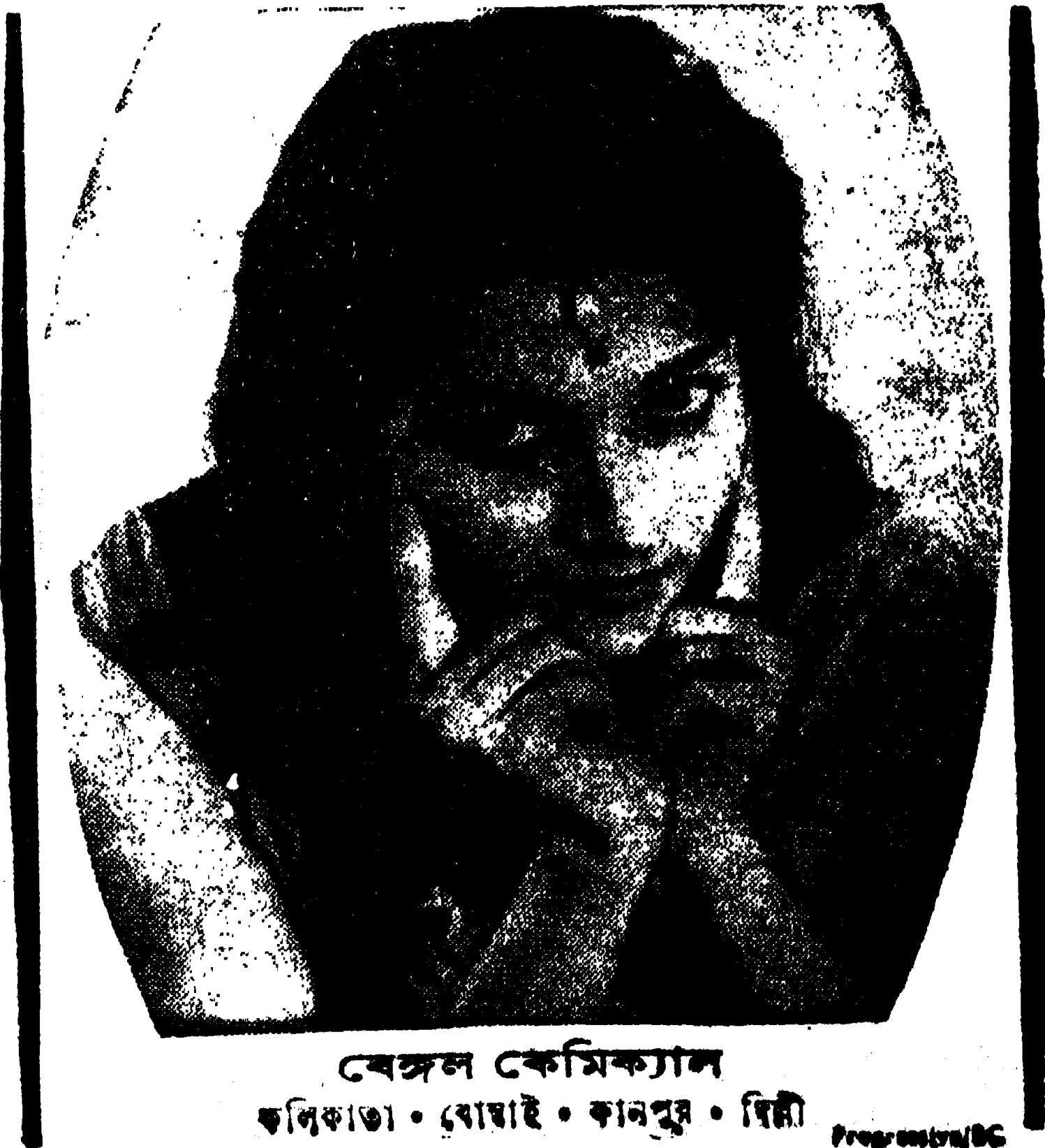
রহস্যের সমাধান, নৃত্যগীত ও কিছুটা হাসির খোরাক প্রভৃতির সমন্বয়ে ছবিটিকে যতদূর সম্ভব সাধারণ দর্শকের কাছে উপভোগ্য ক'রে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি পরিচালক আত্মারাম।

নায়ক-নায়িকারূপে ধর্মেন্দ্র (অজয় সিং) এবং আশা পারেখ (কিরণ) যথোচিত নাট-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ভূমিকা দুটিকে চিত্তগ্রাহী ক'রে তুলেছেন। অজয়ের বন্ধু, বনভূমির মালিক, লম্পট নরেশ মাথুর বেশে রমেশ দেও চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। নরেশের আপিসের টাইপিস্ট বীরার ভূমিকায় হেলেন কামনালুব্ধ নারী-প্রকৃতিকে প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গীতে। অজয়ের ভৃত্য তেজু এবং সর্দার-কন্যা মহুয়ারূপে যথাক্রমে জনি ওয়াকার ও বেলা বসু ছবির হাল্কা অংশকে সরসভাবে উপস্থাপিত করেছেন। পুলিশ ইন্সপেকটর রায়ের চরিত্রে সঞ্জীবকুমার বেশ সাবলীল অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। অবসর-প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার শর্মার ভূমিকায় রেহমানের অভিনয় মনোজ্ঞ।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি পরিচ্ছন্ন মান রক্ষিত হয়েছে। বহির্দৃশ্য এবং রাত্রির দৃশ্যগুলি সুন্দর-ভাবে গৃহীত হয়েছে। ছবির দু'খানি গানের মধ্যে "পর্দে মে রহনে দো, পর্দা না উঠায়ো" এবং "তুমহারে প্যার মে হম বেকরার হোকে চলে" গান দু'খানি শংকর জয়কিষেণ দ্বারা সুন্দরভাবে সুর-সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে জন-প্রিয়তা লাভ করবে অবশ্যই।

গুরুদত্ত ফিল্মস্-এর নবতম নিবেদন "শিকার" সাধারণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

—নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

বিপ্লবী ডিরোজিও শততম অভিনয়

রঙ্গসভার নিবেদন : নাটক : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনা : পীযূষ বসু। আবহসৃষ্টি : অচিন্ত্য মজুমদার। আলোক-সম্পাত : রণজিৎ মিত্র। দৃশ্যসজ্জা : কবি দাশগুপ্ত।

একটি শৌখীন নাট্যসংস্থার পক্ষে কোনো নাটকের একশো রাত্রি অভিনয় করতে পারা নিঃসংশয়ে অত্যন্ত গৌরবের কথা। "বিপ্লবী ডিরোজিও"র শততম অভিনয়ে রঙ্গসভা সেই দুর্লভ গৌরবের অধিকারী হলেন। ১৯৫৯ সালে স্থাপিত হয়ে আজ পর্যন্ত এ'রা অন্তত সাতখানি পূর্ণাঙ্গ ও দুখানি একাঙ্ক নাটককে মঞ্চস্থ করেছেন এবং বলা বাহুল্য, প্রায় সবগুলিই প্রশংসাধন্য হয়েছে। এগুলির মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে "বোবা কান্না", "দালিয়া" এবং "বিপ্লবী ডিরোজিও"। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক হিসেবে হেনরী লুই ভিভিয়ন ডিরোজিও তাঁর 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার যে-অদম্য উৎসাহ যুগিয়েছিলেন জীবনপণ করে, তাকেই প্রাণবন্ত নাটকের রূপ দিয়ে রঙ্গসভা এই অমর আত্মার প্রতি বাঙালীর ঋণ পরিশোধের কিছুটা চেষ্টা করেছেন।

ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক সামাজিক চিত্রকে নিখুঁত ভাবে তুলে

ঠিন হলেও রঙ্গালয় যে ব্যর্থ
থা বলা বাহুল্য। শতক্রম রজনীর
জাগুই "নাট্যটির জনপ্রিয়তার

র বসুর পরিচালনায় সার্থকভাবে
হয় রঙ্গসভার উৎসাহী সভ্যবৃন্দ
বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভি-
ম পীযূষ বসু (নায়-
দিলীপ রায় (রাধা-
লা বসু (কৃষ্ণমোহন), চন্দন রায়
ন), তুষার ভৌমিক (রামকমল),
গুপ্ত (রাজা রাধাকান্ত), সুপ্রিয়
আনন্দলাম), অবনী দত্ত (কৃষ্ণদাস),
(ডেভিড হেয়ার), সুস্মিতা
(এমিলিয়া), জ্যোৎস্না বন্দ্যো-
মিস হুড) প্রভৃতি।
ত্য মজুমদারের আবহসংগীত এবং
গুপ্তের মঞ্চসজ্জা নাটকটির বিশেষ
য় বস্তু।

একটি সুপ্রযোজিত পরিচ্ছন্ন
রাচর খুব কমই দেখা যায়। বাঙলা
তে রঙ্গসভার বিপ্লবী ডিরোজিও
ল্লেখযোগ্য সংযোজন।

রিশ নাট্য সংসদের রামানুজ

রিশ নাট্য সংসদ কলকাতার একটি
নাট্য-সংস্থা। গিরিশচন্দ্রের 'জনা'
াল ঠাকুর', ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র
র', 'সোনাইদীঘি', 'রাজা দেবী-
রাজলক্ষ্মী', জিতেন্দ্রনাথ বসাকের
পানিপথ ও দুর্গেশনন্দিনী,
য় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাণী ভবানী,
ণ বিদ্যাবিনোদের রামানুজ অভিনয়
দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে।
এঁরা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ রচিত
জ নাটকটি অভিনয়ের সিদ্ধান্ত
করেছেন। সংসদের নাট্য-উপদেষ্টা
হব মনোমোহন ঘোষ, নাট্য-পরি-
শ্রীগোকুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নাটক
সর্বাঙ্গসুন্দর করতে আপ্রাণ চেষ্টা
ন। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন
র কুশলী শিল্পীবৃন্দ।

চয়াদহ সর্বমংগলা বালিকা বিদ্যালয়

ত ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর আড়িয়াদহ
গলা বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক
ার বিতরণী ও শিক্ষায়তনের সাহা-
দুদিনব্যাপী মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের
জন করা হয়। প্রথম দিন স্কুলের
কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি
া' ও রূপকথা অবলম্বনে 'সো-
ইটি' অতি নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনীত হয়।
য় দিনের আকর্ষণ ছিল শিক্ষায়তনের
ার্থে শিক্ষিকাবৃন্দ কর্তৃক শ্রীতারা-
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' নাট্যা-
। জনপ্রিয় এই নাটকের সার্থক
য় সত্যিই প্রশংসনীয়। একক চরিত্রে
লগত অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পী
। অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে
হতে পেরেছিলেন বলেই নাটকটি
ীর্ণ হয়েছে। [illegible] অভি-

দুই পুরুষ নাটকে অঞ্জলি রায় ও মালতী মজুমদার.

ব্যক্তি অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অভিনয় চাতুর্যে শিক্ষিকারা শিল্পসৃষ্টির এক সার্থক নিদর্শন স্থাপন করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন—সর্বশ্রী অঞ্জলি রায়, সবিতা সরকার, পদ্মা মিত্র, মমতা চট্টোপাধ্যায়, ঊর্মিলা ঘোষাল, শেফালী ঘোষাল, শীলা ব্যানার্জি শিপ্রা চক্রবর্তী, রেবা বসু, মালতী মজুমদার, বেবী ব্যানার্জি, অপর্ণা নাগ, শিপ্রা ঘোষ ও কল্পনা ভট্টাচার্য। মঞ্চ-পরিকল্পনা ও রূপসজ্জা সুন্দর। আবহ-সঙ্গীত ও আলোকসম্পাত মন্দ নয়।

নাটকটি সার্থক পরিচালনা করেন শ্রীসন্তোষ ঘোষ।

শিশু স্বর্গ

এবার পূজায়, শিশুসহ, শিশু স্বর্গের ৬৫ জনের একটি দল পুরীতে বেড়িয়ে এল। সেখানেও তারা রোজ আনন্দ আসর বসাত, সমুদ্রের পারে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে সেই সকল জায়গায়। নিয়মানুবর্তিতায় এবং অনুষ্ঠানে শিশুরা সেখানকার সকলকেই খুসী করতে পেরেছে। দলটি কলকাতায় ফিরে এসেছে গত শনিবার।

নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকা রিক্রিয়েশন ক্লাব পরিবেশিত 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের শিল্পীদের সঙ্গে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

বিবিধ সংবাদ

এন-আই-পি রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'চন্দ্রগুপ্ত'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক বাংলার নাট্য ইতিহাসের দিক চিহ্নস্বরূপ। ঐতিহাসিক এ নাটকটির সার্থক মঞ্চায়ন করেন নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকা রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা গত ২০ অকটোবর প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি হলে। অপেশাদারী সংস্থা হিসাবে দুরূহ এ নাটকের প্রয়োগ পরিকল্পনা ও অভিনয় সুন্দর। আলেকজান্দারের ভারত জয়, চানক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্তের মগধ জয়ের ঐতিহাসিক কাহিনী সেদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত দর্শকদের সামনে অতীতের এক উজ্জ্বল পাতা তুলে ধরেছিল।

তুহিনকান্তি ঘোষের পরিবেশনা ও ডি, এন, মুখার্জীর সুন্দর নির্দেশনা নাটকটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। দলগত অভিনয় আকর্ষণীয়। তবুও তাঁদের মধ্যে চাণক্যরূপী ডি, এন, মুখার্জী, চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় প্রকাশ ঘোষ, অ্যান্টিগোনাসের ভূমিকায় প্রভাত ঘোষ ও বাচালরূপী সলিল ঘোষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন তুষার ভট্টাচার্য, আশুতোষ ব্যানার্জী, কমল গাঙ্গুলী, অনিল বসু, শিউলি চ্যাটার্জী, অর্চনা দেব, শীলা চ্যাটার্জী, কুমারী বাবলী চ্যাটার্জী ও অন্যান্যরা। সঙ্গীতে বামাদাস চ্যাটার্জী কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

বিজয়া সম্মেলন

গত ১৯শে অকটোবর শনিবার, ১৯৬৮ সালে জনাই-এ 'কালীবাবুর বাটীতে বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে 'ঐকতান' সভ্যদের দ্বারা বীরু মুখোপাধ্যায়ের "বন্দর" নাট্যানুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এই নাট্যাভিনয়ে "কেদার ঘোষালের" ভূমিকায় শ্রীভোলা ভট্টাচার্যের সাবলীল ও সুললিত অভিনয় দর্শকদের অভিভূত করে। জমিদার অঘোর চৌধুরীর অভিনয় মঞ্চঘেষা ও মুদ্রাদোষে দুষ্ট। জমিদার সেক্রেটারী শ্রীসরোজ চৌধুরীর চরিত্রটি নারীর কি পুরুষের বোঝবার অসুবিধা হয়েছে। চাকর গোবর্ধন (শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়) চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করেন ও অভিনয়ে উন্নতির অবকাশ রাখে। নারীচরিত্রে অপর্ণার ভূমিকায় (দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) অভিনয়-গুণে মঞ্চের উপর জীবন্ত হয়ে ওঠেন। অন্যান্য ভূমিকায় সকলেই স্বাভাবিক অভিনয় করে দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থন হন। মঞ্চরূপ ও নির্দেশনায় শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসার দাবী রাখেন।

টি-টি-ই-আর-সি'র বাৎসরিক উৎসব

ত্রিবেণী টিস্যুজ এমপ্লয়িজ রিক্রি... ক্লাব গত ১৭ সেপ্টেম্বর তাদের এ... বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নিজস্ব মঞ্চে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলে... উৎসবের শুরুতে বিভিন্ন প্রতিযোগি... পুরস্কার বিতরণের পর ক্লাবের সভ... কর্তৃক বীরু মুখোপাধ্যায়ের একাঙ্ক ... প্রহর' অভিনীত হয়। এক আদর্শ ইঞ্জিনীয়ারের এক দুরূহ কর্তব্য ... তজ্জনিত পারিবারিক সমস্যার নাট... পরিচালক সুনীলকান্তি সেনগুপ্তর ... চালনায় বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে মঞ্চস্থ... অভিনয়ে প্রথমেই যার কথা মনে ... তিনি হলেন সুশান্ত চরিত্রের হিম... গাঙ্গুলী। অ্যাকশন এক্সপ্রেশন ডেলিভারী প্রতিটা দিকেই তিনি সচেত... তবুও আরও একটু দ্রুত হতে পার... তিনি। শ্যামা মুখার্জির সমীরণ ও ন... মুখার্জির বিচিত্রা কোথাও বড় বেশী ... আবার কোথাও বড় উজ্জ্বল স্লো অ্যা... আজ আর চলে না কাজেই দর্শক ... রেখাপাত করতে গেলে দ্রুততার ... বাস্তবের মেলান প্রয়োজন। শ্যামা মুখ... অনেকটা পেরেছেন, কিন্তু নমিতা মুখ... পারেননি বিশেষ। মুংলী চরিত্রে ... চ্যাটার্জি স্বচ্ছন্দ।

সোসাইটি অব ফিল্ম ডিরেক্টর্স অব ই... ইন্ডিয়া :

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা... বিহার—ভারতের পূর্বাঞ্চলস্থিত এই ক... রাজ্যে চলচ্চিত্রনির্মাণশিল্পে ব্রতী ... চালকবৃন্দকে সংঘবদ্ধ করবার অভিপ্র... 'সোসাইটি অব ফিল্ম ডিরেক্টর্স ... ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া' নামে একটি সংস্থা ... উঠেছে। এই সংস্থার সভাপতি, সম্পাদক... কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন যথা... সুশীল মজুমদার, প্রভাত মুখোপাধ্যায় ... সুবোধ মিত্র।

বেতার শ্রুতি

৪৩ সাল। জাপানের বিমানের আঘাতে প্রাচ্যভূমিতে জ্য ভেঙে পড়ছে। বৃটিশরা পশ্চাদাপসরণ করতে তে এসে থেমেছে। ভারত থেকে পলায়নেরও আর
।

ভারতে তখন প্রচণ্ড নৈরাশ্য। জাতীয় নেতৃবৃন্দ কারা-অন্তরালে। বৃটিশরা ভারতের স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র ার অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে। জাপান চাইছে হটিয়ে তাদের শূন্য স্থান দখল করতে। এরই মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর দৃপ্ত হুঙ্কার—কুইট ইণ্ডিয়া। ভারত টিশরা তার জবাব দিয়েছে বেয়োনেটে আর গুলী ক লক্ষ মানুষকে দুর্ভিক্ষের করাল মুখে নিক্ষেপ রণ মানুষ তখন দিশাহারা।

ন সময়ে পূর্ব দিগন্ত ভেদ করে সূর্যরশ্মি দেখা দিল: আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হ'ল। তারিখটা ২১শে ১৯৪৩ সাল।

৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর ভারতের ভাগ্যাকাশে যে-হয়েছিল তা যদি সেদিন সকল প্রান্তের অধিবাসীরা ত তাহলে ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হ'ত।

ইতিহাস লেখা হয় নি সে-ইতিহাসের কথা এখানে তু যে-ইতিহাস লেখা হয়েছে সে-ইতিহাস আকাশবাণী কেন্দ্রের বাংলা অনুষ্ঠান রচয়িতারা পড়েছেন 'জনা বে খবরের কাগজ আর সাময়িকপত্রের পাতায় বিচ্ছিন্ন-পড়েছেন নিশ্চয়! লোকমুখে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু যে ন তা-ও নয়!

লে গত ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের রজত-তাঁরা এমন নির্লজ্জভাবে উদাসীন ছিলেন কেমন করে? ত এইদিনটির অনুষ্ঠানসূচীতে কোথাও একটি বাংলা ষ্ঠানের উল্লেখ নেই—না কলকাতা-ক'য়ে, না কলকাতা-রা দিনেরাতে শুধুমাত্র কলকাতা-খ'য়ে একটি ইংরেজী ষ্ঠানের উল্লেখ আছে, এবং সেটি সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান।

াদ হিন্দ সরকারের রজত-জয়ন্তীর কথা কলকাতা নুষ্ঠানসূচী প্রণেতারা বিস্মৃত হয়েছিলেন, এ অসম্ভব স্য। এই সব অনুষ্ঠান পরিকল্পনার জন্য আলাদা গে এবং সেই বিভাগের ভার একজন গেজেটেড অফি-র ন্যস্ত আছে। 'অ্যানিভার্সারি প্রোগ্রাম' যিনি দেখেন অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত রাখতে হয়। তিনি ত টা ঐতিহাসিক ব্যাপার বিস্মৃত হবেন, কোনো যুক্তি মানা যায় না। 'অ্যানিভার্সারি প্রোগ্রাম' ছাড়াও কেন্দ্রে বহু বিভাগীয় অনুষ্ঠান আছে—যেমন শিশুমহল, বিদ্যার্থীদের জন্য, মজলিশ গল্পদাদুর আসর, ছোটো-মজদুরমণ্ডলী, শ্রীভবন ইত্যাদি। এতগুলো বিভাগের কর্মকর্তার কারও এই দিনটির কথা মনে পড়ল না উ মনে করিয়ে দিতে পারলেন না, এ কি বিশ্বাস্য? জা উপলক্ষ্যে এই দিনটিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা তো তাঁরা ভোলেন নি। বেলা ১টা ৪০য়ে মহিলামহলে বিশেষ রূপক 'দীপাবলী' প্রচারিত হয়েছে, সন্ধ্যা ৫টা ৩০য়ে বিশেষ কীর্তন 'কালীকীর্তন' প্রচারিত হয়েছে, সন্ধ্যা ৬টা ৪০য়ে বিশেষ কথকতা 'দীপান্বিতা' প্রচারিত হয়েছে, রাত ১০টা ৩০য়ে বিশেষ সঙ্গীতালেখ্য 'দীপান্বিতা' প্রচারিত হয়েছে। এ ছাড়া নিয়মিত শ্যামাসঙ্গীত তো ছিলই।

ভাবতে অবাক লাগে, যাঁরা কালীপূজা উপলক্ষ্যে এতগুলো অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন, আজাদ হিন্দ সরকারের রজত-জয়ন্তীতে তাঁরা অস্বাভাবিক রকম উদাসীনতা দেখাতে পারেন। অথচ সুভাষচন্দ্র না হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পছন্দের অন্য কোনো নেতা হলে নির্দিষ্ট দিনে এবং তার আগে ও পরে সাধারণভাবে ও সমস্ত বিভাগে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'ত। এবং সেই নেতা ও তাঁর কীর্তির প্রশংসায় আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠত।

সুভাষচন্দ্র কেন্দ্রীয় সরকারের পছন্দের ব্যক্তি যে নন, সে আর বাংলা দেশের জনগণের অগোচর নেই। তাঁর জন্মদিনে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার না-করা নিয়ে পার্লামেন্টে যেমন অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে, বাইরেও তেমনি অনেক অসন্তোষের প্রকাশ ঘটেছে। এবং যদি বলা হয়, কলকাতা কেন্দ্রের কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হবেন না বলেই আজাদ হিন্দ সরকারের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কোনো অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন নি তাহলে ভুল হবে না নিশ্চয়। প্রতি বছর ২৩শে জানুয়ারী কলকাতা কেন্দ্রে যে-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সে তো ছুঁচো গেলার মতো করে—বাঙালীর কাছে রেহাই পাওয়া যাবে না বলে।

কলকাতা কেন্দ্রের কর্মকর্তারা দিল্লীর প্রীতিভাজন হতে গিয়ে যে সাংঘাতিক ভুল করেছিলেন তা বোধ হয় বুঝতে পেরে-ছিলেন অনেক দেরিতে—তখন সমস্ত প্রোগ্রাম 'শিডিউলড্' হয়ে গেছে। নতুন করে অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় সুযোগ নেই। বেতার-জগতের অনুষ্ঠানসূচী পরিবর্তনের সময় নেই। তাই বেতারজগৎ আজাদ হিন্দ সরকার ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে। এবং কলকাতা-খ'য়ের দুটি পূর্বনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বাতিল করে আজাদ হিন্দ সরকারের জন্য একটুখানি জায়গা করা হয়েছে। কিন্তু কলকাতা-ক'য়ের অনুষ্ঠানে হাত দেওয়া হয় নি। অথচ শ্রোতাদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও হামেশা কলকাতা-ক'য়ের পূর্বনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বাতিল করে কেন্দ্রের পছন্দের বিশেষ অনুষ্ঠান আর মন্ত্রী-সান্ত্রীদের ভাষণ ও বাণী প্রচার করা হয়।

এই দিন দুপুরে মহিলামহলে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ সরকার সম্বন্ধে নমঃ নমঃ করে কিছু বলা হলেও এই দিন সকাল ৬টা ৫য়ে নেতাজীর লেখা থেকে পাঠ করে শোনাবার কিম্বা রাত ৭টা ৪৫য়ে সমীক্ষায় আজাদ হিন্দ সরকার সম্বন্ধে কিছু বলার ব্যবস্থা করা হয়নি। (অবশ্য আগের দিন সমীক্ষায় বলা হয়েছিল।)

কর্তারা ভুল করছেন। ইতিহাসকে কখনও চাপা দেওয়া যায় না। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না, মাটির তলা থেকে ইতিহাস খুঁড়ে বার করা হচ্ছে, জলের নিচে থেকে ইতিহাস টেনে তোলা হচ্ছে,

আকাশের উপর থেকে ইতিহাস পেড়ে নামানো হচ্ছে। আর এ তো মাটির উপরকার ইতিহাস। মাটিতে এখনও রক্তের দাগ আছে, বাতাসে এখনও কামানের গর্জন আছে।

এই ইতিহাস যদি এখন ভারতের কোটি কোটি তরুণের মনে গেঁথে দেওয়া যায় তাহলে এই মরা দেশটা হয়তো আবার বেঁচে উঠতে পারে।

একটা গল্প মনে পড়ছে। কয়েক বছর আগে সারারাত্রিব্যাপী এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। শেষ রাতের দিকে প্রেক্ষাগৃহের প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিলায়েৎ খাঁ তখন সেতারে আলাপ ধরেছিলেন। খানিকক্ষণ পরে ঘুমন্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে তিনি বলে উঠলেন : 'আমি অনেক কষ্ট করে বাজনা শিখেছি, আপনারা যদি না শোনেন তাহলে আমার শেখাটাই ব্যর্থ। আমি আপনাদের শোনাবই।'—এবং সঙ্গে সঙ্গে আলাপ ছেড়ে সেতারে প্রচণ্ড ঝঙ্কার তুললেন। সারা প্রেক্ষাগৃহ রম্ রম্ করে উঠল। শ্রোতারা সকলে ঘুম ছেড়ে সোজা হয়ে বসে সারাক্ষণ জেগে তাঁর বাজনা শুনল।

আজকের দিনে এইরকম একটা ঝঙ্কার দরকার। সে-কাজে বেতারের দায়িত্ব অনেকখানি।

• • • অনুষ্ঠান পর্যালোচনা • • •

১৮ই অক্টোবর রাত ৮টায় প্রচারিত 'জটায়ু' নাটকটির জন্য বেতার কর্তৃপক্ষ অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারেন। অগ্নিমিত্র রচিত এই নাটকটিতে সমাজের একটি বড়ো সমস্যার গোড়া ধরে টান দেওয়া হয়েছে। একজন বিলেত ফেরত বড়ো ডাক্তার অর্থ আর খ্যাতির মোহে স্বধর্মচ্যুত হয়ে রুগীর কী চরম সর্বনাশ ঘটাতে পারে তা এতে প্রকাশ করা হয়েছে। সত্যকিঙ্কর বড়ো ডাক্তার। অনায়াসে আট টাকা ফী করতে পারেন। কিন্তু তিনি দু টাকা ফী নিয়ে রুগী দেখেন, দামী ওষুধের বদলে শস্তা ওষুধ এবং দেশী গাছ-গাছড়া আর ফলমূল দিয়ে অসুখ সারান। রুগীদের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক, হৃদয়ের সম্পর্ক। কিন্তু তাঁর ছেলে দীপঙ্কর যখন বিলেত থেকে বড়ো স্পেশালিস্ট হয়ে ফিরে এল, তার কাছে এসব পাগলামি বলে মনে হ'ল। বাবার দু টাকা ফী আর রুগী-পাগল ভাবে সে বিরক্ত। সে মোটা ফী নিয়ে রুগী দেখে, তার প্যাথলজিক্যাল ল্যাব-রেটরিতে বেয়ারা গোছের সাধারণ কর্মচারীরা রক্ত পরীক্ষা করে, তার ওষুধ তৈরির কারখানায় ল্যাবরেটরির দরকার হয় না—অথচ কারখানার উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে ফলাও করে ল্যাবরেটরির কথা ঘোষণা করে। তার অপারেশন করা রুগীর পেটের ভিতরে ছুরি থাকে। এবং তাতে রুগীর মৃত্যু হলে দায়িত্ব চাপায় জুনিয়রদের ঘাড়ে। সে ফাঁকি দিয়ে কৌশলে অর্থ আর খ্যাতি কুড়োতে চায়। এবং তার স্বধর্মচ্যুতির জন্য বাবার সঙ্গে তার বিরোধ। এই বিরোধের পরিণামে বাবার মৃত্যু। — এই নাটকে যা দেখানো হয়েছে তা যে একেবারে খাঁটি সত্য সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অনেকের এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কোনো কোনো ডাক্তারের অপরিসীম অবহেলায় রুগীর মৃত্যু ঘটে তা সকলেই জানেন। এই নাটক প্রচারের ফলে দুর্বৃত্তরা যে কর্তব্য-পরায়ণ হবে, স্বধর্মে ব্রতী হবে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। তবে নাটকটি জনসাধারণের কাছে তাদের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে।

২০শে অক্টোবর সকাল ৭টা ৪৫য়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাচ্ছিলেন শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ গাইছিলেন কিন্তু আকাশবাণীর ঘোষিকা শেষ গানটি শেষ পর্যন্ত শুনতে দিলেন না, শেষ হবার আগেই কেটে দিলেন। কৈফিয়ৎ হিসাবে নিশ্চয়ই তিনি বলবেন, সময়ে টান পড়েছিল তাই কেটে দিতে হয়েছে। কিন্তু ২৩শে অক্টোবর সকাল ৮টার লোকগীতের (এই ঘোষিকার উচ্চারণে লোক্‌গীতি) অনুষ্ঠানের মাঝের গানটি এবং সওয়া ৮টার আধুনিক গানের অনুষ্ঠানের প্রথম গানটির আরম্ভ যে কেটে গিয়েছিল তার কী কৈফিয়ৎ দেবেন তিনি? গোড়াতে তো আর সময়ের টান পড়তে পারে না! আসলে তিনি বড়ো অসতর্ক। প্রায়ই তাঁর অসতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। ২৩শে লোক-গীতির বেলায় তিনি বোধ হয় 'ফেডার' তুলেছিলেন দেরিতে, আর আধুনিক গানের ক্ষেত্রে টেপটা হয় ঠিকমতো 'কিউ' করে নেন নি নয়তো একেবারে মুখে মুখে 'কিউ' করেছিলেন এবং টেপ চালিয়ে 'ফেডার' তুলতে তুলতে আরম্ভের কয়েকটি কথা চলে গিয়েছিল। বেলা ১টায় প্রচারিত 'ভিখারী সাহেব' নাটকটির গোড়ার দিকে ফাউ হিসাবে বেশ খানিকক্ষণ ব্যাকগ্রাউণ্ডে ইংরেজী গান শোনা গেল। যদিও সাধারণত আসলের চেয়ে ফাউটাই বেশি মিষ্টি হয়, এক্ষেত্রে তা হয় নি। আজকাল কলকাতা-ক'য়ের অনুষ্ঠানে ফাউ বড়ো বেশি পাওয়া যাচ্ছে। এই ফাউয়ের দরকার নেই। অবিলম্বে এটা বন্ধ করা উচিত।...'ভিখারী সাহেব' নাটকটি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। রচনা করেছেন শ্রীঅনিল ভৌমিক। কিন্তু কাহিনীর প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেন নি। গোড়ার দিকে রজনী দত্তর স্বগতোক্তি বড়ো বেশি দীর্ঘ এবং ঘটনাগুলো বড়ো তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে—বিশেষ করে, মেয়েটির রোগের চিকিৎসার সময়ে। হাতের কাছে ব্যাগের মধ্যে প্রয়োজনীয় সব ওষুধ মজুত আছে এবং এটা-ওটা মিশিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি করতে দশ-পনের সেকেণ্ডের বেশি লাগছে না, তারপর ওষুধ দেবার একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই রুগীর দেহ শীতল হয়ে যাচ্ছে (হেনরি যেখানে আধ ঘণ্টার মধ্যে বলেছে) এবং আবার ওষুধ দেবার প্রায় পরক্ষণেই দেহ উষ্ণ হতে হতে রুগীর চেতনা ফিরছে এ বড়ো কৃত্রিম, সাজানো। এটাকে একটু অন্যরকম করে অনায়াসেই এর মধ্যে নাট্যরস আনা যেতে পারত। একটু চিন্তার দরকার ছিল। অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় হেনরির ভূমিকায় শ্রীগৌরীশঙ্কর চৌধুরীর অভিনয়। বেশ ভালো অভিনয় করেছেন তিনি। রজনী দত্তর ভূমিকায় শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটু ছাপ রাখতে পেরেছেন। কিন্তু রজনী দত্তের স্ত্রীর ভূমিকায় শ্রীমতী বাণী গঙ্গোপাধ্যায় অনেক আগে থেকেই বড়ো বেশি চিৎকার আর কান্নাকাটি করেছেন। ফলে কান্নার ঠিক সময়টি যখন এল তখন তাঁর কান্না তেমন সাড়া জাগাতে পারল না।

২১শে অক্টোবর মহিলামহলে পরিচালিকা শ্রীমতী পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায় এক জায়গায় বললেন, 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।' একেবারে পতন? কিন্তু কোথা থেকে? পরিচালিকা কি অনুগ্রহ করে তাঁর বাক্যটা খাঁটি কিনা একবার পরীক্ষা করে দেখবেন? এই আসরে শ্রীহরিপদ বসু রচিত 'দীপাবলী' শীর্ষক আলেখ্যটি ভালো লেগেছে। আলেখ্যটি পরিচালনা করেছেন শ্রীমতী বেলা দে। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য।

২১শে অক্টোবর রাত ৯টা ৪৫য়ে কলকাতা-খ'য়ে শ্রী এস এন সিন্‌হা রচিত, প্রযোজিত ও গ্রন্থিত 'আজাদ হিন্দ' শীর্ষক ইংরেজী অনুষ্ঠানটিতে পরিশ্রমের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকারের কোনো অস্তিত্ব আজ আর নেই, কিন্তু তার সৈনিক ও মন্ত্রিসভার বহু সদস্য এখনও দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছেন। অনুষ্ঠানটিতে তাঁদের অনেকের স্মৃতিচারণ ও মন্ত্ররূপে শপথবাক্য পাঠ শোনা গেছে। আর শোনা গেছে স্বয়ং নেতাজীর কণ্ঠস্বর—দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে রেকর্ড করা। দেশের নানা জায়গা থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের কথা রেকর্ড করে এনে শোনানোর মধ্যে একটা কর্তব্যবোধ ছিল। সেটা প্রশংসনীয়।

২২শে অক্টোবর রাত সাড়ে ৭টার খবরে বলা হ'ল, 'অন্যতম বড়ো একটি হাসপাতাল।' এ কী রকম বাংলা? 'অন্যতম' শব্দের অর্থই তো 'বহুর মধ্যে এক'। তাহলে আবার আলাদা করে 'একটি' কেন?

—শ্রবণক

তরুণ সংগীত সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরের সঙ্গে শ্রীমতী নার্গিস।

জলসা

সংগীত সম্মেলন

রবীন্দ্রসদনে পুজোর ঠিক আগেই সদারং সংগীত নের সাতদিনব্যাপী আসরে কণ্ঠসংগীতানুষ্ঠানের জনপ্রিয়-বচারে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন—আমীর খাঁ, ভীমসেন ও সুনন্দা পট্টনায়ক। এ'দের পরই মুনাব্বর খাঁর নাম করতে আমীর খাঁর শুধ্কল্যাণ, বাগেশ্রী ও মালকোষ তাঁর নিজস্ব ত পরিবেশিত হয়েছে। যাঁদের ভাল লেগেছে. তাঁরা অভিভূত র ভাল-লাগেনি এমন শ্রোতার সংখ্যাও যথেষ্ট।

ভীমসেন যোশী তাঁর দু'দিনের অনুষ্ঠানে গেয়েছেন কলাশ্রী রী-টোড়ী, ঠুংরী ও ভজন। কণ্ঠস্বরের মাধুর্য আগের কিছু কম, কিন্তু জনপ্রিয়তা অম্লান। শ্রোতাদের বারংবার াধে ইনি একটি ঠুংরী শোনান।

সুনন্দা পট্টনায়কের স্বরচিত রাগ "সৌভদ্রিকা"-য় কানাড়া ানপুরীর অঙ্গ সুকৌশলে বাঁচিয়েও শিল্পীর অতুলনীয় পদ ও গায়নশৈলীর গুণে রসোত্তীর্ণ হয়েছে এবং এই কঠিন পায়ণে অনায়াসদক্ষতায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি গুণীজনের অভি-লাভ করেছেন। স্ব-সৃষ্ট কথা ও সুরে "যব তুম নিদ "-র পর শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে ইনি গাইলেন রনাথের সুবিখ্যাত "যোগী মত্ যা"। তবে জনপ্রিয়তার অবস্থিত শিল্পীর গানের অনেকখানি রসই অপচিত বেসুরো সারেঙ্গী ও অ-নিয়ন্ত্রিত মাইকের দৌরাত্ম্যে, যার গানের মাঝখানে শ্রোতাদের বারবার উঠে অভিযোগ জানাতে । এ-ত্রুটি অমার্জনীয়, বিশেষ সদারং-এর মত এতবড় ঠানের পক্ষ হতে।

ধ্রুপদানুষ্ঠানে দুটি মর্যাদাগম্ভীর অনুষ্ঠান হোল টি এল হাম্বীর ও সিন্ধুড়া। প্রবীণ শিল্পীর অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য রবেশন-শৈলীর বৈশিষ্ট্য ধ্রুপদী-রীতি শিক্ষার্থিবৃন্দের অনু-

নৃত্যশিল্পী মনু পাল

শীলনের বস্তু। আর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হোল বহুমুখী প্রতিভা জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের গাওয়া পুরিয়া ও ভৈরবী।

আগ্রা ঘরানার গায়কীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী ও কুমার মুখোপাধ্যায়।

আরতি বাগচীর "বাগেশ্রী" শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

আলি আকবর, রবিশঙ্কর, বিলায়েত ও বাহাদুর খাঁ-র অনুপস্থিতিতে যন্ত্রসংগীত দুর্বল। অবশ্য কিছুটা ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছেন মিঞা বিসমিল্লা। "মারু-বেহাগ" দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেই ইনি আসর জমিয়েছেন, তারপর ধুনে রং ও রসের উজ্জ্বল সমারোহ শ্রোতাদের সম্মোহিত করে রেখেছে। গুরু আলাউদ্দিন খাঁর শিষ্যদ্বয় এস কে বনার্জি ও আর কে ব্যানার্জি'র (রেওয়া) সরোদ ও আলাউদ্দিন-সৃষ্ট চন্দ্রসারং-এ গুরুসৃষ্ট রাগ 'নোত্তাহতীর' শান্ত রস ও অনাড়ম্বর সহজতায় এক সুন্দর পরিবেশ রচনা করেছে।

আমজাদ আলী খাঁর অনুষ্ঠানে রেওয়াজী হাতের দাপট ও সুরেলা টিপ শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে। তবে শিল্পীর নিজস্ব কোনো ধ্যান বা চিন্তার কোনো ছাপ পাওয়া যায়নি।

যন্ত্রসংগীতের একটি আভিজাত্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান হোল মহম্মদ দবীর খাঁ সাহেবের মহতী বীণ। এ-যন্ত্র এখনও যে শোনা যাচ্ছে—এ'দের মত স্বল্প দু-একজন নিষ্ঠাবান সাধক আছেন বলেই। ধ্রুপদী পটভূমিকায় রামপুর ঘরানার সকল অংগের এমন বিশ্লেষণ সত্যিই দুর্লভ।

নৃত্যে হেমা মালিনী আশানুরূপ কোনো দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেননি। উদীয়মান মনু পালের কথক নৃত্যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর স্পষ্ট। শোনা গেল ইনি বেশ কয়েকটি ফিল্মেও কথক নৃত্য পেশ করেছেন। মুনাব্বর খাঁর 'বাগেশ্রী'-তে 'বড়ে গোলাম আলি খাঁর তানশৈলী ছাড়াও শিল্পীর নিজস্ব একটি প্রকাশভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁর সুবিখ্যাত পিতার জোরালো আ... পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শ্রেষ্ঠত্বের শিল্পীর প্রতি সুবি... সম্ভব।

"ভারতী" রেকর্ড কোম্পানীর শারদ অর্ঘ্য

ছোট্ট পরিসরের মধ্যেও 'ভারতী' রেকর্ড কোম্পানীর শা... অর্ঘ্যে রকমারী বৈচিত্র্যের অভাব নেই। শ্যামাসঙ্গীত, রবী... সঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ গীতি, কমিক-গান, ফিল্মের গান (ইলেক... গীটার) ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতার চিত্ত-বিনোদনের উপযো... সকল রকম গানই এ'রা উপহার দিয়েছেন।

সমর গুপ্ত সঙ্গীতরসিক মহলে সুপরিচিত। তাঁর গা... "যৌবন সরসী নীরে" এবং "যাব তবে" গানদুটির সুরেশ্ব... লক্ষ্য করবার মত।

উদীয়মান তরুণ শিল্পী রতীন মুখোপাধ্যায়ের "... তোমরা আমায় ডাক" এবং "আজ শ্রাবণ-গহন"—সংগীত। ই... দেবব্রত বিশ্বাসের শিষ্য।

রেবা ঘোষের দুটি অতুলপ্রসাদ-গীতি "প্রভাতে যারে ন... পাখী" এবং "বঁধু এমন বাদলে"-র নির্বাচনে রুচির পরি... আছে। ভক্তিভাব ও প্রেমগীতি উভয় দিকেই দুটি গান আবে... পাত করে।

বিমান মুখোপাধ্যায়ের "কালী বলে ডাকব না" এবং "... বোঝা ভার"—সুন্দর।

আকর্ষণের দিক থেকে নির্মল ঘোষের বাংগগীতি ও ... বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইলেকট্রিক গীটারে বাজানো হিন্দী ... সঙ্গীতও কম যায় না।

—চিত্রাংগ

পার্ক হোটেলে ঘরোয়া এক আসরে আসন্ন কয়েকটি রেকর্ডের প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন শ্রীমতী লতা মুঙ্গেশকর। উপস্থিত আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর তরফ থেকে মিঃ এ সি সেন এবং মিঃ প্রসেনজিৎ দে।

অলিম্পিক সাঁতার

ক্ষেত্রনাথ রায়

াকের ক্রীড়াসূচীতে শ্রেষ্ঠ লেটিকস। তার পরই সাঁতারের : দুটি বিভাগের পদক জয়ের ামেরিকা শীর্ষস্থান অধিকার ।। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কে আমেরিকার পদক সংখ্যা ী। এই সাফল্যের দৌলতেই া আন্তর্জাতিক খেলাধূলোর ় সাঁতারু এবং জাত এ্যাথলীট করেছেন। বিগত ১১টি আসরে আমেরিকা মাত্র দুবার দের আন্তর্জাতিক খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ানি। ১৯৩২ সালে জাপান ৬ সালে অস্ট্রেলিয়া পুরুষ সাঁতারে প্রাধান্য বিস্তার কিন্তু পরবর্তী তিনটি সাঁতার অনুষ্ঠানে (১৯৬০, ১৯৬৮) আমেরিকা তার বিরাট মূলধনে প্রতিযোগী দেশগুলির ব্যর্থতা লোকচক্ষে প্রমাণ করে

পক গেমসের ইতিহাসে ১৯৬৪ ৮ সালের সাঁতার প্রতিযোগিতা রণীয় অধ্যায়। ১৯৬৪ সালের অলিম্পিকে সাঁতারের অনুষ্ঠান ৮টি—পুরুষদের ১০টি এবং ৮টি। মোট ১৮টি স্বর্ণ পদকের য়েছিল আমেরিকা, ৪টি অস্ট্রে- ১টি রাশিয়া। পুরুষ বিভাগে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছিল— (৭টি) এবং অস্ট্রেলিয়া (৩টি)। মহিলা বিভাগে এই তিনটি পদক পেয়েছিল—আমেরিকা ট্রেলিয়া ১টি এবং রাশিয়া ১টি। মহিলাদের মোট পদক জয়ের ও আমেরিকা শীর্ষস্থান পেয়ে- ় ৫৪টি পদকের মধ্যে আমেরিকা য়েছিল ২৯টি (স্বর্ণ ১৩, রৌপ্য ্ ৮)। বাকি ২৫টি পদক সাতটি ধ্যে ভাগ হয়েছিল—অস্ট্রেলিয়া ৯, ৮, রাশিয়া ৪, হল্যান্ড ৩, জাপান ১ এবং বৃটেন ১। ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক সাঁতারের ১৮টি ় নতুন অলিম্পিক রেকর্ড হয় এবং নতুন বিশ্ব রেকর্ড হয়েছিল ১২টি অনুষ্ঠানে— ভাগে ৮টি এবং মহিলা বিভাগে আমেরিকার সাঁতারুরা ১০টি নতুন বিশ্ব রেকর্ড (সেই সঙ্গে রেকর্ডও) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিভাগে ৬টি এবং মহিলা ৪টি। ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক আমেরিকার এই বিরাট সাফল্যের মেরুদণ্ড ছিল দেশের যুবশক্তি—স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। আঠার বছর বয়সের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ডন স্কোল্যান্ডার ৪টি স্বর্ণ পদক জয়ী হয়ে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সর্বাধিক স্বর্ণ পদক জয়ের গৌরব লাভ করেছিলেন। মহিলা বিভাগে সর্বাধিক পদক (স্বর্ণ ২ ও রৌপ্য ১) জয় করে-ছিলেন আমেরিকার ১৫ বছরের স্কুল-ছাত্রী শারন স্টাউডার।

১৯৬৮ সালের অলিম্পিক

১৯৬৮ সালের অলিম্পিক সাঁতারে মোট অনুষ্ঠান ছিল ২৯টি—পুরুষদের ১৫ এবং মহিলাদের ১৪। আমেরিকা যথারীতি সাঁতারে তার বিপুল প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে আমেরিকা সর্বাধিক স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়েছে। পুরুষদের ১৫টি অনুষ্ঠানে আমেরিকার মোট পদক জয় ২৬টি—স্বর্ণ ১০, রৌপ্য ৮ ও ব্রোঞ্জ ৮। অপরদিকে মহিলাদের ১৪টি অনুষ্ঠানে

ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)
১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে উপর্যুপরি
তিনবার স্বর্ণপদক বিজয়িনী

আমেরিকার মোট পদক জয়ও ২৬টি—স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ৭ এবং ব্রোঞ্জ ৮। পুরুষ বিভাগের ১৫টি স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে চারটি দেশ—আমেরিকা ১০, অস্ট্রেলিয়া ২, পূর্ব জার্মানী ২ এবং মেক্সিকো ১। মহিলা বিভাগের ১৪টি স্বর্ণ পদকও পেয়েছে চারটি দেশ—আমেরিকা ১১, অস্ট্রেলিয়া ১, যুগোশ্লাভিয়া ১ এবং হল্যান্ড ১। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের মোট ৮৭টি পদকের মধ্যে আমেরিকা

ডন স্কোল্যান্ডার (আমেরিকা)
১৯৬৪ সালের অলিম্পিকে চারটি
স্বর্ণপদক বিজয়ী

পেয়েছে মোট ৫২টি পদক—স্বর্ণ ২১, রৌপ্য ১৫ এবং ব্রোঞ্জ ১৬।

ব্যক্তিগত কৃতিত্ব

১৯৬৮ সালের অলিম্পিক সাঁতারে তিনটি করে স্বর্ণ পদক জয় করেছেন মাত্র দুজন সাঁতারু—আমেরিকার কুমারী ডেবি মেয়ার—৩টি স্বর্ণ পদক (২০০, ৪০০ ও ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে) এবং চার্লস হিককক্স—(২০০ ও ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি এবং ৪×১০০ মিটার মেডলি রীলে)।

মেক্সিকোর অলিম্পিক সাঁতার প্রতি-যোগিতায় অঘটন এবং ব্যর্থতার অভাব ছিল না। চরম ব্যর্থতার নজির সৃষ্টি করেন আমেরিকার দুই বিশ্ববিশ্রুত সাঁতারু—ডন স্কোল্যান্ডার এবং মার্ক স্পিজ। স্কোল্যান্ডার গত ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক সাঁতারে সর্বাধিক স্বর্ণ পদক (৪টি) জয়ী হয়েছিলেন। এবার তিনি মাত্র ২টি পদক পেয়েছেন—৪×২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতে স্বর্ণ পদক এবং ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে রৌপ্য পদক। আমে-রিকার ১৮ বছরের বিশ্ববিশ্রুত সাঁতারু মার্ক স্পিজের ব্যর্থতাই সকলকে হতবাক করেছে। অভিজ্ঞ মহল থেকে বার বার ঘোষণা করা হয়েছিল তিনি অন্তত পাঁচটি স্বর্ণ পদক পাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে ৪টি পদক জুটেছে (৪×১০০ ও ৪×২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতে ২টি স্বর্ণ, ১০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে ১টি রৌপ্য এবং ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ১টি ব্রোঞ্জ)।

বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ড

মেক্সিকো অলিম্পিকের সাঁতারে যে ২৩টি নতুন অলিম্পিক রেকর্ড (সময়) প্রতি-ষ্ঠিত হয়েছে (পুরুষদের ১১ ও মহিলাদের

১২), তার মধ্যে নতুন বিশ্ব-রেকর্ড আছে ৫টি—পুরুষদের ৩টি এবং মহিলাদের ২টি।

বিশ্বরেকর্ড

পুরুষ বিভাগ

১০০ **মিটার ফ্রি-স্টাইল : মাইক ওয়েনডেন** (অস্ট্রেলিয়া)

সময় : ৫২·২ সেকেন্ড

৪×১০০ **মিটার ফ্রি-স্টাইল : আমেরিকা**

সময় : ৩ মিঃ ৩১·৭ সেঃ

৪×১০০ **মেডলি রীলে : আমেরিকা**

সময় : ৩ মিঃ ৫৪·৯ সেঃ

মহিলা বিভাগ

১০০ **মিটার ব্যাকস্ট্রোক :** কায়ে হল (আমেরিকা)

সময় : ১ মিঃ ৬·২ সেঃ

৪×১০০ **মিটার মেডলি রীলে :** আমেরিকা

সময় : ৪ মিঃ ২৮·৩ সেঃ

অসাধারণ কৃতিত্ব

আমেরিকার কুমারী ডেবি মেয়ার ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার এবং ৮০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে স্বর্ণপদক জয় করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অলিম্পিক সাঁতারের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে কোন পুরুষ বা মহিলার পক্ষে একই বছরে তিনটি স্বর্ণপদক জয় সম্ভব হয়নি। কুমারী মেয়ারের বয়স মাত্র ১৬ বছর। বিশেষ উল্লেখ্য, তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েও এই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

যাঁরা দুটি বিষয়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছেন, তাঁদের নাম :

পুরুষ বিভাগ : ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে মাইক ওয়েনডেন (অস্ট্রেলিয়া), ৪০০ ও ১,৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে মাইক বারটন (আমেরিকা) এবং ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে রোল্যান্ড ম্যাথেজ (পূর্ব জার্মানী)।

মহিলা বিভাগ : ২০০, ৪০০ ও ৮০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে ডেবি মেয়ার (আমেরিকা) এবং ২০০ ও ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে ক্লডিয়া কল্ব (আমেরিকা)।

অলিম্পিক রেকর্ড

একই আসরে ডাবল খেতাব

অলিম্পিক গেমসে একই বছরের আসরে একজন সাঁতারুর পক্ষে ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল অথবা ১০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল অথবা ৪০০ ও ১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারের স্বর্ণ পদক জয় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। এ পর্যন্ত মাত্র ১০ জন সাঁতারু এই দুর্লভ সম্মান লাভের গৌরব লাভ করেছেন।

১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল

পুরুষ বিভাগ

১৯৬৮ : মাইক ওয়েন্ডেন (আমেরিকা)

১০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল

পুরুষ বিভাগ

১৯২৪ : জনি ওয়েসমুলার (আমেরিকা)

১৯৬৪ : ডন স্কোলান্ডার (আমেরিকা)

সাঁতারে পদক জয় (১৯৬৮)

প্রথম ৯টি স্থান

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
আমেরিকা	২৩	১৫	২০	৫৮
অস্ট্রেলিয়া	৩	২	৩	৮
পূঃ জার্মানী	২	৩	১	৬
মেকসিকো	১	১	১	৩
ইতালী	১	১	০	২
যুগোশ্লাভিয়া	১	১	০	২
চেকোশ্লোভাকিয়া	১	০	০	১
নেদারল্যান্ডস	১	০	০	১
রাশিয়া	০	৬	৫	১১

দ্রষ্টব্য : ডাইভিং অনুষ্ঠানের ফলাফল ধরে উপরের তালিকাটি তৈরী। আমেরিকা ডাইভিংয়ের পুরুষ ও মহিলা বিভাগে মোট ৬টি পদক জয়ী হয়েছে—২টি স্বর্ণ এবং ৪টি ব্রোঞ্জ পদক।

মহিলা বিভাগ

১৯৩২ : হেলেন ম্যাডিসন (আমেরিকা)

১৯৬৬ : হেণ্ড্রিকা মাস্টেনব্রোক (নেদারল্যাণ্ডস)

৪০০ ও ১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল

পুরুষ বিভাগ

১৯০৪ : হেনরী টেলর (ইংল্যান্ড)

১৯১২ : জর্জ হজসন (কানাডা)

১৯২০ : নর্মান রস (আমেরিকা)

১৯৫৬ : মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া)

১৯৬৮ : মাইক বার্টন (আমেরিকা)

একই বিষয়ে উপর্যুপরি দু'বার স্বর্ণ পদক

পুরুষ বিভাগ

১০০ **মিটার ফ্রিস্টাইল :**

ডিউক কাহানামোকু (আমেরিকা)—১৯১২ ও ১৯২০।

৪০০ **মিটার ফ্রিস্টাইল :**

মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া)—১৯৫৬ ও ১৯৬০।

২০০ **মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক :**

য়োসীউকি ৎসুরুটা (জাপান)—১৯২৮ ও ১৯৩২।

মহিলা বিভাগ

১০০ **মিটার ফ্রিস্টাইল :**

ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)—১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪।

৪০০ **মিটার ফ্রিস্টাইল :**

মার্থা নোরেলিয়াস (আমেরিকা)—১৯২৪ ও ১৯২৮

**দ্রষ্টব্য : অলিম্পিক সাঁতারের যে কোন একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে উপর্যুপরি তিনটি স্বর্ণ পদক জয়ের নজির ডন ফ্রেজারের ছাড়া অপর কোন পুরুষ বা মহিলা সাঁতারুর নেই।

একই বিষয়ের তিনটি পদক জয়

অলিম্পিক গেমসের একই বছরের আসরে একটি দেশের পক্ষে কোন একটি বিষয়ের স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক জয় নিঃসন্দেহে বিশেষ সাফল্যের পরিচয়। এ পর্যন্ত মাত্র এই তিনটি দেশ—আমেরিকা ১৫ বার, অস্ট্রেলিয়া ২ বার এবং জার্মানী ১ বার এই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

পুরুষ বিভাগ

১০০ **মিটার ফ্রিস্টাইল :**

আমেরিকা—১৯২০ ও ১৯২৪।

অস্ট্রেলিয়া—১৯৫৬।

২০০ **মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক :**

জার্মানী—১৯১২।

আমেরিকা—১৯৪৮।

২০০ **মিটার ব্যাকস্ট্রোক :**

আমেরিকা—১৯৬৪।

২০০ **মিটার ব্যক্তিগত মেডলি :**

আমেরিকা—১৯৬৮।

১০০ **মিটার বাটারফ্লাই :**

আমেরিকা—১৯৬৮।

মহিলা বিভাগ

১০০ **মিটার ফ্রিস্টাইল :**

আমেরিকা—১৯২০, ১৯২৪ এবং ১৯৬৮।

অস্ট্রেলিয়া—১৯৫৬।

২০০ **মিটার ফ্রিস্টাইল :**

আমেরিকা—১৯৬৮।

৪০০ **মিটার ফ্রিস্টাইল :**

আমেরিকা—১৯২৪ ও ১৯৬৪।

১০০ **মিটার বাটারফ্লাই :**

আমেরিকা—১৯৫৬।

২০০ **মিটার ব্যক্তিগত মেডলি :**

আমেরিকা—১৯৬৮।

৪০০ **মিটার ব্যক্তিগত মেডলি :**

আমেরিকা—১৯৬৪।

আমেরিকা ১৯২০ সালে পুরুষ ও মহিলাদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ১৯২৪ সালে পুরুষ ও মহিলাদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং মহিলাদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ১৯৬৪ সালে তিনটি বিষয়ে—পুরুষদের ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক, মহিলাদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি অনুষ্ঠানে এবং ১৯৬৮ সালের ৫টি বিষয়ে—পুরুষদের ২০০ মিটার মেডলি, ১০০ মিটার বাটারফ্লাই এবং মহিলাদের ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি অনুষ্ঠানে তিনটি পদক জয়ের যে গৌরব লাভ করেছে অলিম্পিক সাঁতারের ইতিহাসে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়।

খেলা ধূলা

দর্শক

মেক্সিকো অলিম্পিক

সিকো সিটিতে আয়োজিত কালের ১৯তম অলিম্পিক গেমস হচ্ছে। নির্বিঘ্নে শেষই বলবো, অলিম্পিক গেমসের প্রাক্কালে ছাত্র-আন্দোলনের দাপটে অলিম্পিক াতিল হওয়ার যে দাখিল হয়েছিল হয়নি। মেকসিকো সিটির ১৯তম ৫ গেমস ঘটনাবৈচিত্র্যে অলিম্পিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সাফল্য, প্রখ্যাত প্রতিযোগীদের অপ্রত্যাশিত ফলাফল, মেকসিকো উচ্চতার কারণে খেলোয়াড়দের ়, বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ড াজির—সমস্ত মিলিয়ে মেকসিকো ক গেমস অনন্য হয়ে রইলো।

়নিককালের অলিম্পিক গেমসের (১৮৯৬) থেকে ১৯৩২ সাল -উপর্যুপরি ৯টি অলিম্পিকে কা ছিল একচ্ছত্র সম্রাট—প্রতিটি ়কের পদক জয়লাভের তালিকায় ৫ পদক জয়ের সূত্রে বে-সরকারী- ার্বাধিক পয়েণ্ট অর্জন করে শীর্ষ- পেয়ে এসেছিল। ১৯৫২ সালে পক গেমসে রাশিয়ার প্রথম যোগ- ফলে পদক জয়লাভের তালিকার বদলে যায়। সেই থেকে আমে- প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে । ১৯৫২ সালের অলিম্পিকে কা এবং রাশিয়া পদক জয়ের ায় বে-সরকারী পয়েণ্টের হিসাবে ান পেয়েছিল। উভয়েরই ছিল ৪৯৪ পয়েণ্ট। তবে আমেরিকা ক (৪০টি) স্বর্ণ পদক জয়ী ন। পরবর্তী দুটি অলিম্পিক (১৯৫৬ ও ১৯৬০) রাশিয়া ক স্বর্ণপদক এবং সর্বাধিক কারী পয়েণ্ট অর্জনের সূত্রে ায় শীর্ষস্থান পেয়েছিল। আমেরিকা ছল দ্বিতীয় স্থান। ১৯৬৪ সালের ঃ অলিম্পিকে রাশিয়া সর্বাধিক ়ের জোরে শীর্ষস্থান পেলেও াকা পেয়েছিল সর্বাধিক স্বর্ণ পদক— । ১৯৬৮ সালের সদ্য সমাপ্ত কো অলিম্পিক গেমসে আমেরিকা জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল আর রাশিয়া পেয়েছে দ্বিতীয় ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক গেমসের জয়ের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী আমেরিকার মোট পদক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৬ (স্বর্ণ ৪৫, রৌপ্য ২৭ ও ব্রোঞ্জ ৩৪) এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী রাশিয়ার মোট পদক সংখ্যা ৯১ (স্বর্ণ ২৯, রৌপ্য ৩২ ও ব্রোঞ্জ ৩০)।

জিম হাইন্স (আমেরিকা) : ১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক বিজয়ী—নতুন অলিম্পিক রেকর্ড এবং পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড সময়ে (৯-৯ সেঃ)

হকি প্রতিযোগিতা

হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাকিস্তান ২—১ গোলে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের এই নিয়ে দ্বিতীয় স্বর্ণপদক জয়। তারা ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে ১—০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে প্রথম স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই প্রথম রৌপ্যপদক জয়। অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছিল। ভারতবর্ষ ২—১ গোলে পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, অলিম্পিক হকি খেলায় ভারতবর্ষ ১৯২৮ সাল থেকে উপর্যুপরি ৮-বার ফাইনালে খেলে এইবারই প্রথম ফাইনালে উঠতে পারেনি। গত আটটি অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় (১৯২৮—১৯৬৪) ভারতবর্ষের স্বর্ণপদক জয় ৭-বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি ৬-বার) এবং রৌপ্যপদক জয় ১-বার (১৯৬০ সালে)। মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের পরাজয়ের প্রধান কারণ—আত্মতুষ্টি, সংগঠনের অভাব, ক্রীড়ামানের অবনতি এবং খেলোয়াড়দের দৈহিক অপটুতা। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত হকি খেলায় ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে কোন দেশ ছিল না। কিন্তু আজ অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, নিউজিল্যান্ড, হল্যান্ড, কেনিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হকি প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল ১৬টি দেশ। এই যোগদানকারী দেশগুলি দুটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলে। তারপর প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল সেমি-ফাইনালে নক-আউট প্রথায় খেলেছিল।

'এ' গ্রুপের লীগের খেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ভারতবর্ষ এবং রানার্স-আপ পশ্চিম জার্মানী। ভারতবর্ষ অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হতে পারেনি। লীগের প্রথম খেলাতেই তারা ১—২ গোলে

নিউজিল্যাণ্ডের কাছে হেরে যায়। অপরদিকে 'বি' গ্রুপে পাকিস্তান অপরাজিত অবস্থায় লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান পায়। রানার্স-আপ হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।

প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলায় অস্ট্রেলিয়া ২—১ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। নির্দিষ্ট সময়ের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি — খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত ছিল। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ২ মিনিট আগে ভারতবর্ষের গোলরক্ষকের মারাত্মক ভুলের দরুন অস্ট্রেলিয়া যে-পেনাল্টি কর্ণার পায়, তা থেকেই অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জয়সূচক গোলটি দেন। দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল খেলার অতিরিক্ত সময়ে পাকিস্তান ১—০ গোলে পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে।

লীগ খেলার চূড়ান্ত তালিকা

'এ' গ্রুপ

দেশ	জয়	ড্র	হার	গোল পঃ	গোল বিঃ	পয়েণ্ট
ভারতবর্ষ	৬	০	১	২০	৪	১২
পঃ জার্মানী	৫	১	১	১৫	৫	১১
নিউজিল্যাণ্ড	৩	৪	০	৮	৪	১০
বেলজিয়াম	৩	১	৩	১৪	৯	৭
স্পেন	২	৩	২	৭	৫	৭
পূঃ জার্মানী	২	২	৩	৭	১০	৬
জাপান	১	১	৫	৪	১৪	৩
মেক্সিকো	০	০	৭	২	২৬	০

'বি' গ্রুপ

দেশ	জয়	ড্র	হার	গোল পঃ	গোল বিঃ	পয়েণ্ট
পাকিস্তান	৭	০	০	২৩	৪	১৪
অস্ট্রেলিয়া	৪	১	২	১২	৫	৯
কেনিয়া	৪	১	২	১১	৬	৯
হল্যাণ্ড	৪	০	৩	১১	১১	৮
বৃটেন	২	১	৪	৬	৮	৫
ফ্রান্স	২	১	৪	২	৫	৫
আর্জেণ্টিনা	১	১	৫	৪	২০	৩
মালয়েশিয়া	০	৩	৪	২	১২	৩

দ্রষ্টব্য : লীগের খেলায় অস্ট্রেলিয়া এবং কেনিয়ার সমান ৯ পয়েণ্ট করে হওয়াতে 'বি' গ্রুপের ২য় স্থান নির্ধারণের জন্য এই দুই দেশকে পুনরায় খেলতে হয়। অস্ট্রেলিয়া ৩—২ গোলে কেনিয়াকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে ওঠে।

ভারতবর্ষ :

জয় (৫) : পঃ জার্মানীকে ২—১, মেক্সিকোকে ৮—০, স্পেনকে ১—০, বেলজিয়ামকে ২—১ এবং পূর্ব জার্মানীকে ১—০ গোলে পরাজিত করে।

হার (১) : নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ১—২

দ্রষ্টব্য : ভারতবর্ষের অনুকূলে পেনাল্টি কর্ণার দেওয়াতে জাপান দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড খেলার পর মাঠ ত্যাগ করে যায়। এই সময় খেলা গোলশূন্য ছিল। শেষ পর্যন্ত আইনজ্ঞদের সিদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে এই খেলায় ৫—০ গোলে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ডেভ হেমেরী (বৃটেন) : ৪০০ মিটার হার্ডলসে স্বর্ণপদক বিজয়ী—নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (৪৮-১ সেঃ)।

পাকিস্তান :

জয় (৭) : হল্যাণ্ডকে ৬—০, ফ্রান্সকে ১—০, অস্ট্রেলিয়াকে ৩—২, আর্জেণ্টিনাকে ৫—০, বৃটেনকে ২—১, মালয়েশিয়াকে ৪—০ এবং কেনিয়াকে ২—১ গোলে পরাজিত করে।

সেমি-ফাইনাল

অস্ট্রেলিয়া ২ : ভারতবর্ষ ১

পাকিস্তান ১ : পঃ জার্মানী ০

হকির ক্রমপর্যায় তালিকা : ১ম পাকিস্তান, ২য় অস্ট্রেলিয়া, ৩য় ভারতবর্ষ, ৪র্থ পশ্চিম জার্মানী, ৫ম হল্যাণ্ড, ৬ষ্ঠ স্পেন, ৭ম নিউজিল্যাণ্ড, ৮ম কেনিয়া, ৯ম বেলজিয়াম এবং ১০ম ফ্রান্স।

ফেয়ার প্লে কাপ

অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় প্রদর্শনের জন্যে এবার থেকে যে বিশেষ 'ফেয়ার প্লে কাপ' দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, তা হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম যুগ্মভাবে লাভ করেছে।

আফ্রিকার সাফল্য

মেক্সিকো অলিম্পিকের এ্যাথলেটিকস বিভাগে আফ্রিকান এ্যাথলীটদের পদক জয় :

ম্যারাথন : স্বর্ণ — মামো ওলডে (ইথিওপিয়া)

১০,০০০ **মিটার দৌড় :** স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ

১ম নাফতালি তেমু (কেনিয়া)

২য় মামো ওলডে (ইথিওপিয়া)

৩য় মহম্মদ গামৌদি (তিউনিসিয়া)

৫,০০০ **মিটার দৌড় :** স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ

১ম মহম্মদ গামৌদি (তিউনিসিয়া)

২য় কিপচোগে কিনো (কেনিয়া)

৩য় নাফতালি তেমু (কেনিয়া)

৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজ : স্বর্ণ ও রৌপ্য

১ম এমোস বিয়োট (কেনিয়া)

২য় বেঞ্জামিন কোগো (কেনিয়া)

১,৫০০ **মিটার দৌড় : স্বর্ণ**

১ম কিপচো কিনো (কেনিয়া)

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	[illegible]
কেনিয়া	৩	২	
ইথিওপিয়া	১	১	
তিউনিসিয়া	১	০	
মোট :	৫	৩	

ফুটবল প্রতিযোগিতা

ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে হাঙ্গেরী ৪—১ গোলে বুলগেরিয়াকে পরাজিত করে এই নিয়ে মোট ৩ স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করে। ইতিপূর্বে তারা ফুটবলের স্বর্ণপদক পেয়েছে ১৯৫২ ও ১৯৬৪ সালে। তা ১৯৬০ সালে তারা ব্রোঞ্জ পদক পায়। অপরদিকে বুলগেরিয়ার এই প্রথম রৌপ্য পদক জয়। ১৯৫৬ সালে তারা ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল।

বনাম বুলগেরিয়ার আলোচ্য
টি মোটেই দর্শনীয় হয়নি।
অপরাধে বুলগেরিয়ার ৩ জন
...
দেও মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য
১২ মিনিটে বুলগেরিয়া প্রথম
াগেরী ৪০ ও ৪১ মিনিটে
—১ গোলে অগ্রগামী হয়।
সারাক্ষণ বুলগেরিয়ার ৮ জন
লছিলেন।

—০ গোলে মেক্সিকোকে
ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়েছে।
টবল প্রতিযোগিতায় এশিয়া
মার কোন দেশ ইতিপূর্বে
রনি। এবারের ফুটবল প্রতি-
জাপানের এই সাফল্য
্যাশিত। জাপানের সেণ্টার-
মোতো তিনটি খেলায় মোট
য়ে এবারের প্রতিযোগিতায়
া দেওয়ার গৌরব লাভ করে-
য়ার বিপক্ষে ৩, ফ্রান্সের
বং মেকসিকোর বিপক্ষে ২

জিমন্যাস্টিক

দলগত এবং ব্যক্তিগত
রের (১৯৬৪) স্বর্ণ পদক
। এবারও স্বর্ণ পদক জয়
ষদের দলগত বিভাগে জাপান
পর্যুপরি তিনটি অলিম্পিকে
(১৯৬০, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮) স্বর্ণ পদক
পেল।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ

দলগত বিভাগ :

১ম জাপান—৫৭৫·৯০ পঃ
২য় রাশিয়া—৫৭১·১০ পঃ
৩য় পঃ জার্মানী—৫৫৭·১৫ পঃ

ব্যক্তিগত বিভাগ :

১ম—সায়াও কাতো (জাপান)
—১১৫·৯০ পয়েণ্ট
২য়—মিখাইল ভরোনিন (রাশিয়া)
—১১৫·৮৫ পয়েণ্ট
৩য়—নাকায়ামো একিনস (জাপান)
—১১৫·৬৫ পয়েণ্ট

মহিলা বিভাগ

দলগত বিভাগ :

১ম রাশিয়া—৩৮২·৮৫ পঃ
২য় চেকো—৩৮২·২০ পঃ
৩য় পূঃ জার্মানী—৩৭৯·১০ পঃ

কেঞ্জি কিমিহারা (জাপান)
এ্যাথলেটিক্সে একমাত্র পদক-বিজয়ী
এশিয়ান।

...তালি তেমু (কেনিয়া)
...০ মিটারে স্বর্ণপদক এবং
...মিটারের ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী

কিপচোগে কিনো (কেনিয়া)
১,৫০০ মিটারে স্বর্ণপদক এবং
৫,০০০ মিটারে রৌপ্যপদক বিজয়ী

মহম্মদ গামৌদি (তিউনিসিয়া)
৫,০০০ মিটারে স্বর্ণপদক এবং
১০,০০০ মিটারে [illegible]

চী চেঙ্গ (তাইওয়ান) : ৮০ মিটার হার্ডলসে ব্রোঞ্জপদক বিজয়িনী—মহিলাদের এ্যাথলেটিক্‌সে একমাত্র পদক-বিজয়িনী এশিয়ান।

ব্যক্তিগত বিভাগ :

১ম ভেরা কাসলাভাস্কা (চেকোঃ)
—৭৮·২৫ পয়েন্ট

২য় জিনাইদা ভেরোনিনা (রাশিয়া)
—৭৬·৮৫ পয়েন্ট

৩য় নাতালিয়া কুজিস্কাভা (রাশিয়া)
—৭৬·৭৫ পয়েন্ট

ভারোত্তোলন

ভারোত্তোলনের ৭টি বিভাগে, স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে ৫টি দেশ—রাশিয়া সর্বাধিক ৩টি স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে; অপরদিকে একটি করে স্বর্ণ পদক পেয়েছে পোল্যান্ড, জাপান, ইরাণ এবং ফিনল্যান্ড।

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
রাশিয়া	৩	৩	০
পোল্যান্ড	১	০	৪
জাপান	১	১	১
ইরাণ	১	১	০
ফিনল্যান্ড	১	০	০
হাঙ্গেরী	০	১	১
বেলজিয়াম	০	১	০
আমেরিকা	০	০	১
মোট	৭	৭	৭

ভলিবল

পুরুষ বিভাগ : স্বর্ণ পদক—রাশিয়া, রৌপ্য পদক—জাপান এবং ব্রোঞ্জ পদক—চেকোশ্লোভাকিয়া।

মহিলা বিভাগ : স্বর্ণ পদক—রাশিয়া, রৌপ্য পদক—জাপান এবং ব্রোঞ্জ পদক—পোল্যান্ড।

মেক্সিকো অলিম্পিকের জিমন্যাস্টিক অনুষ্ঠানে চারটি স্বর্ণপদক বিজয়িনী ভে কাসলাভাস্কা (চেকোশ্লোভাকিয়া)

বাস্কেটবল

স্বর্ণ পদক—আমেরিকা, রৌপ্য পদক—যুগোশ্লাভিয়া এবং ব্রোঞ্জ পদক—রাশিয়া।

দ্রষ্টব্য : আমেরিকা প্রতিটি অলিম্পিকের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে।

মুষ্টিযুদ্ধ

মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার মোট ১১টি অনুষ্ঠানে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে—রাশিয়া ৩, মেকসিকো ২, আমেরিকা ২

এবং একটি করে ভেনিজুলা, বৃটেন জার্মানী এবং পোল্যান্ড। রাশিয়ার জয় মোট ৬টি (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ব্রোঞ্জ ১), আমেরিকা—৬টি পদক ২ ও ব্রোঞ্জ ৪) এবং পোল্যান্ড (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ২)।

সময়ের গাঁট প্রথম অতিক্রম

অলিম্পিক সাঁতারের বিভিন্ন অ যাঁরা সময়ের গাঁট প্রথম অতিক্রম গৌরব লাভ করেছেন তাঁদের নাম এবং তারিখ :

পুরুষ বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল (গাঁট ১ মি জনি ওয়েসমুলার (আমেরিকা) ৫৯·০ সেকেন্ড, ১৯২৪।

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল (গাঁট ৫ মি ক্লারেন্স ক্র্যাব (আমেরিকা), ৪ মিঃ ৪৮·৪ সেঃ, ১৯৩২।

৪০০ মিটার মেডলি রিলে (গাঁট ৪ মি আমেরিকা, সময় ৩ মিঃ ৫৮· ১৯৬৪।

১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল (গাঁট ১৮ মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া), সময় ৫৮·৯ সেঃ ১৯৫৬।

৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে (গাঁট ৮ আমেরিকা, সময় ৭ মিঃ ৫২· ১৯৬৪।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল (গাঁট ১ মি ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া), সময় সেঃ ১৯৬৪।

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল (গাঁট ৫ মি লরেন ক্র্যাপ (অস্ট্রেলিয়া), সময় ৫৪·৬ সেঃ, ১৯৫৬।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৬শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 8th November 1968. শুক্রবার, ২২শে কার্তিক, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : গণেশ পাইন

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

চিঠিপত্র

১ 'বেতার শ্রুতি' প্রসঙ্গে

অমৃতের ২৪শ সংখ্যার (৮ই কার্তিক) 'বেতার শ্রুতি' পড়লাম। কলকাতা বেতার সঙ্গীতানুষ্ঠান দিনে দিনে যে পর্যায় এসে পৌঁছিয়েছে তার জন্য অডিশন বিচারক-মণ্ডলীই সম্যক দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। লেখক "শ্রবণক" অডিশনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে যে সমালোচনা করেছেন তা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হলে হয়তো আশাকরি, এব্যাপারে তাঁরা আর একবার চিন্তা করে দেখবেন। আজকাল অডিশন-দাতাদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাই নাকি সুষ্ঠু অডিশনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে লেখক জানিয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি যে, সুচিন্তিত চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তাতে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে দাঁড়াবে। অনেক প্রকৃত গুণী শিল্পী চিরদিনের মত এ রেডিও স্টুডিওর দরজায় পা দিতে পারবেন না। সংগীত প্রতিষ্ঠানগুলোও প্রচণ্ড ভীড়ের সম্মুখীন হবেন। ফলে প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে রেডিওর উপযুক্ত শিল্পী তৈরী করতে তাঁরা অনেক বাধা পাবেন। এতে সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ভোগ করবেন বাইরের শিল্পী-বৃন্দ। তাঁদের পক্ষে সব ছেড়ে এসে রেডিও অনুমোদিত সংগীত শিক্ষায়তনে যোগদান করা হয়তো সব সময় সম্ভব হবে না। এতে হয়রানি বাড়বে ছাড়া কমবে না।

এব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

প্রার্থীরা প্রথমে অডিশনের জন্য অডিশন সদস্য বা বেতার কর্তৃপক্ষকে দরখাস্ত করবেন। বেতার কর্তৃপক্ষ প্রতি প্রার্থীকে, যে যে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে চান সে সে বিষয়ে একটি টেপ রেকর্ড (নিজের গাওয়া বা বাজনা) রেডিও স্টেশনে পাঠাবেন। এই টেপ রেকর্ড করার ব্যবস্থা প্রতি জেলায় জেলায় রেডিও কর্তৃপক্ষকে করতে হবে, যাতে নির্দিষ্ট ফি দাখিল করে প্রার্থী সমস্ত সুযোগ সুবিধামত গান বা বাজনা টেপ রেকর্ড করতে পারেন। এর জন্য প্রতি জেলায় নির্দিষ্ট সংখ্যক বেতার কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর দায়িত্ব বহন করবেন। রেডিও কর্তৃপক্ষই প্রার্থীকে জানিয়ে দেবেন যে কোনদিন কোন কেন্দ্রে কোন সময় কত ফি দাখিল করে তাকে টেপ রেকর্ড করতে হবে।

এই টেপ রেকর্ডই হবে প্রার্থীর প্রাথমিক পরীক্ষা। অডিশন সদস্যমণ্ডলী এই টেপ রেকর্ড শুনে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করে অডিশনে ডাকবেন এবং তার চূড়ান্ত পরীক্ষা নির্ধারিত হবে।

এতে আমার মনে হয় যেমন পক্ষপাতিত্ব কমবে তেমনি অডিশনদাতাদের ভিড় এড়ান সম্ভব হবে।

শুভ্রেকৃষ্ণা বসু
কামাচ্ছা, বারাণসী—১

(২)

'বেতার শ্রুতি' প্রসঙ্গে রেডিওর নানা ধরণের প্রহসনের মাঝে অডিশনকে আপনারা বেছে নিয়েছেন। কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রের যেটি প্রাত্যহিক এবং সর্বপ্রথম প্রহসন সে বিষয়ে দেখছি নীরব। সত্যই কি আমার কথাগুলি ধাঁধার মত মনে হচ্ছে? আমার এই চিঠিখানা ধরুন আগামী সোমবার সকালে আপনার দরবারে পৌঁছল। হিসেব মতো দিনটা সোমবার, ১১ই কার্তিক ১৩৭৫ ইংরেজী ২৮শে অক্টোবর ১৯৬৮। কিন্তু কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে শুনতে পাবেন—আজ সোমবার ৬ই কার্তিক ইত্যাদি। আমরা যারা শহরের মানুষ ইংরেজী দিন তারিখ মেনেই চলি—এই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাই না। কিন্তু সব চাইতে বিশ্রী কি মনে হয় জানেন, বাংলা নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে উঠেই যখন শুনতে পাই আজ রবিবার ২৫শে চৈত্র কিম্বা কবিগুরুর জন্ম-প্রভাতের স্মরণীয় দিনটিতে আজ বুধবার ১৮ই বৈশাখ ইত্যাদি, বড়ই বেসুর মনে হয়। অথচ মজা এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের বেতার কিন্তু বাংলা সন তারিখ এখনো একেবারে উড়িয়ে দেয় নি। ওদের দেশে আজও নববর্ষ ১লা বৈশাখেই হয়, কবিগুরুর জন্মতিথিও পঁচিশে বৈশাখে। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে কি এতই সময়ের অভাব যে, ওই শকাব্দ আর খৃষ্টাব্দের সাথে বঙ্গাব্দের দিন তারিখ ঘোষণায় সব সময় নষ্ট হয়ে যায়? তা'ছাড়া যদি ধরেই নেয়া যায় যে, কলকাতা বেতার কেন্দ্র সর্বভারতীয় ক্যালেন্ডার মাফিক কাজ করছেন তাতেও কি সামঞ্জস্য বজায় রয়েছে? 'এমাসের গানে'র কথাই ধরুন। প্রত্যেক প্রতি রবিবার রাত আটটায় এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়। 'বেতারজগৎ' যেহেতু ইংরেজী মাস অনুযায়ী বের হচ্ছে—অনুষ্ঠানটিও সেই ইংরেজী মাসের হিসেবে। শকাব্দের মাস অনুযায়ী নয় কেন? তাছাড়া এই একুশ বছর চলে গেলো স্বাধীনতার পর বাংলার জনসাধারণ আজ পর্যন্ত কেউ কি শকাব্দের মাস গুনে নববর্ষ করছে ৭ই বৈশাখ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে?

ভাবাবেগে অথবা আংরেজী হটাও আন্দোলনে উৎসাহী হয়ে এই চিঠি আমি দিচ্ছি না। আমার [illegible] এই ব্যাপারটাও একটা [illegible] [illegible]। '[illegible] শ্রুতি' বিভাগে [illegible] [illegible] আশায় রইলাম।

গীতা কর্মকার
বিজয়গড়, কলকাতা

'কেয়াপাতার নৌকো' প্রসঙ্গে

অমৃত ৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২৪শ সংখ্যায় শ্রীপ্রফুল্ল রায় রচিত কেয়া পাতার নৌকো উপন্যাস প্রসঙ্গে শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত চিঠি পড়লাম এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি পত্রলেখককে।

সত্যি সত্যি-ই উক্ত প্রসঙ্গে চিঠি লেখার প্রয়োজন আছে। পত্রলেখক যা বলেছেন তা অতি সত্য।

বাস্তবের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস কেয়া পাতার নৌকো পূর্ব বাংলার এক জীবন্ত ছবি।

প্রথমেই বলি উপন্যাসটি পড়ে বাল্যের স্মৃতি এসে ভিড় করে মনের পাতায়। গ্রাম্য দৃশ্য—নদী, পথঘাট, গাছপালা, পাখীর ডাক, সব কিছুই জীবন্ত করে তুলেছেন লেখক। এই ছবির সঙ্গে পূর্ব বাংলার সবাই বিশেষ ভাবেই পরিচিত। অধর সাহা, স্নেহলতা, সুরমা, বিনু প্রভৃতি চরিত্রগুলি আমাদের চোখের সামনে চলাফেরা করছে। আমাদের বড় আপন জন ওরা। বড্ড বেশী মনে পড়ে হেমনাথের কথা। অদ্ভুত মানুষ হেমনাথ সকলের প্রিয়, হিতৈষী। রাজদিয়ার বড় আপন জন হেমনাথ।

হেমনাথ প্রসঙ্গে বলেছেন লারমোর—"আমি যদি এ দেশের মানুষ হতে পেরে থাকি তা ঐ হেমের জন্য। আমার সব কাজ সব ভাবনার পেছনে ঈশ্বরের দূত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে......'!

কেয়া পাতার নৌকো উপন্যাসের চরিত্রগুলি লেখকের সার্থক সৃষ্টি। —"লালমোহনদাদু সব দেশের সব কালের মানুষ—তুমি বাঙালী হতে চেয়েছ। তার বদলে আমরা যদি তোমার মতন হতে চাইতাম,... জীবন ধন্য হয়ে যেত।'—হিরনের কথাগুলি লারমোরের সঙ্গে মধুর প্রীতির সম্পর্কের পরিচয় দেয়। মজিদ মিঞা ও হাসেম আলির আন্তরিকতায় আমরাও মুগ্ধ। মজিদ মিয়া অবনীমোহনের 'মিতা'। অদ্ভুত মধুর সম্পর্ক, এর তুলনা হয় না।

সত্যি কেয়াপাতার নৌকো পড়তে পড়তে নানান ফেলে আসা স্মৃতি জেগে ওঠে মনে।

লেখককে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করলাম।

নিরঞ্জন সেন
গ্রন্থাগারিক,
সরস্বতী মন্দির, ভাদুল।

অমৃত

সম্পাদকীয়
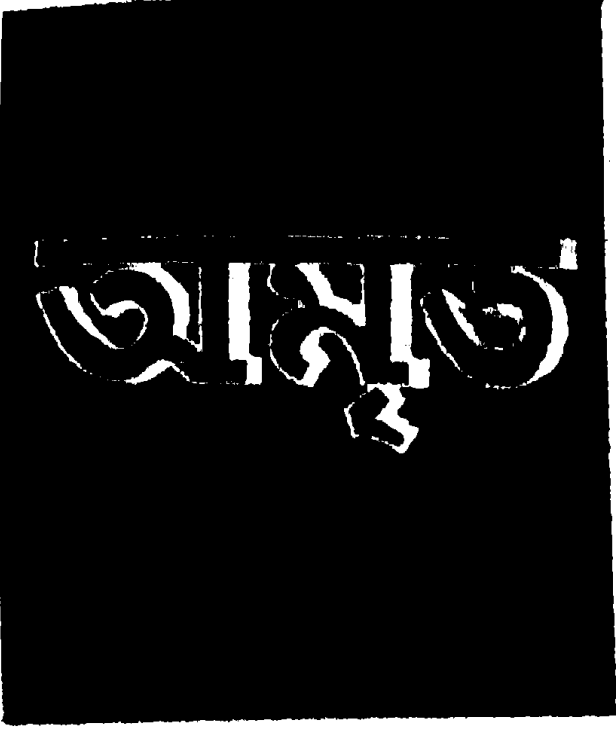
নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সময় মার্কিন দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল জানা হয়ে যাবে। যিনিই মার্কিন প্রেসিডেন্ট হবেন তাঁর ওপর বিশ্বরাজনীতি নিয়ন্ত্রণের গুরু দায়িত্বভার অর্পিত হয়। ধনতান্ত্রিক শিবিরে আমেরিকা সর্বশক্তিশালী দেশ। গোটা দুনিয়াতেও আর্থিক ক্ষমতায় তার সমকক্ষ কেউ নেই। অস্ত্রের পাল্লায় সোভিয়েট রাশিয়া আমেরিকাকে ছোঁব ছোঁব করলেও, ঠিক সমান হতে পারে নি বলেই পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

এ ছাড়া মার্কিন অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও তার সাহায্য করার ক্ষমতার ওপর পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক বিকাশ পরিকল্পনা অনেকখানি নির্ভর করে থাকে। এখনও মার্কিন ডলারই দুনিয়ার সর্বশক্তিমান। এই ডলারের ভরসায় থাকতে হয় অনেক দেশকে তার প্রয়োজনীয় জিনিস জোগানোর জন্য। সুতরাং এ-হেন একটি দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যিনি হবেন তাঁর সম্পর্কে নিশ্চয়ই তাবৎ দুনিয়ার লোকের মাথাব্যথা থাকবে।

তাই নূতন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আমরা স্বাগত জানাই। বর্তমান দুনিয়ার জটিল রাজনীতির আবর্তে সঠিক পথে আমেরিকাকে পরিচালনা করার দুরূহ কর্তব্য তাঁকে অবিচলিত চিত্তে পালন করে যেতে হবে। মার্কিন দেশের আভ্যন্তর সমস্যার মধ্যে প্রধান হল দরিদ্র আমেরিকানদের সঙ্গে বিত্তবানদের ব্যবধান কমিয়ে আনা। বাইরে থেকে এটা অনেক সময় অবিশ্বাস্য মনে হলেও মার্কিন দেশেও দরিদ্র আছে, বেকারও আছে। এবং এদের অধিকাংশই হল আমেরিকার কালো নাগরিক অর্থাৎ নিগ্রো। পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমলে সাহসের সঙ্গে মার্কিন সমাজের এই রূঢ় বাস্তবতার মোকাবিলা শুরু হয়েছিল। নিজেদের আর্থিক মুক্তি তো বটেই, আরও একটি জরুরী বিষয় অপেক্ষা করছে নূতন মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য। তা হল নিগ্রোদের সমানাধিকার আইনের পরিপূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। এটা করা খুবই জরুরী। কারণ, শ্বেতাঙ্গ চরমপন্থীদের অদূরদর্শিতায় হিংসাত্মক আচরণে ও নিপীড়নে ক্ষুব্ধ নিগ্রো সমাজের মধ্যেও জঙ্গী কালো-শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সদ্যসমাপ্ত মেকসিকো ওলিম্পিকের স্টেডিয়ামে দুনিয়ার বিস্ফারিত চোখের সামনে সোনার পদক-জেতা দুই মার্কিন নিগ্রো এথলীট তো তারই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কালো-দস্তানা-পরা বদ্ধ মুষ্টি আকাশের দিকে প্রসারিত করে। এই সমস্যা থেকে নূতন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মুখ ঘুরিয়ে রাখতে পারবেন না। মার্কিন সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির অব্যাহত গতি নির্ভরশীল এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি সমস্যা নূতন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মোকাবিলা করবেন। একটি হল ভিয়েতনামের যুদ্ধ; অন্যটি রাশিয়া-চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সামরিক পাল্লা কমিয়ে এনে নিরস্ত্রীকরণের দিকে দুনিয়াকে নিয়ে যাওয়া। বিদায় নেবার আগে প্রেসিডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েতনামে নিঃশর্ত বোমাবর্ষণ বন্ধের আদেশ দিয়ে দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের অভিনন্দন লাভ করেছেন। দীর্ঘস্থায়ী, রক্তক্ষয়ী এবং অর্থক্ষয়ী এই যুদ্ধের অবসান মার্কিন জাতি এবং পৃথিবীর সকল জাতির শান্তি ও স্বস্তির জন্যই আজ প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট জনসন যে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন তা মানা বা না-মানার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই নূতন প্রেসিডেন্টের আছে। কিন্তু এটা বিশ্বাস করার আগে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মার্কিন জনমত যাচাই করেছিলেন। নূতন প্রেসিডেন্টকেও সেই জনমতের কথা মনে রেখে ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে।

সামনের দশকটি পৃথিবীর পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রের রাজনীতিকদের খুব সতর্কভাবে পদক্ষেপ করতে হবে। চেকোস্লোভাকিয়া তথা পূর্ব ইউরোপের জাতিসমূহের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যের চেতনা জাগ্রত হয়েছে তা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক হবে না যে, সমাজতন্ত্রের নামেও অন্য দেশের ওপর অপর বৃহৎ রাষ্ট্রের খবরদারি করার দিন চলে গেছে। ১৯৭২ সালের মধ্যে চীন আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী হবে এবং তার অস্ত্রাগারে পরমাণু বোমার মজুতের সংখ্যাও নেহাৎ কম হবে না। এবং এই দশকে ভারত, চীন ও অন্যান্য দেশের লোকসংখ্যাও বিপুল হারে বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং যুদ্ধ আর বিরোধের ভাষায় চিন্তা করার দিন আর নেই। কীভাবে মানব জাতির ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যের জ্বলন্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তার সমাধানের পথ আবিষ্কার করা যায় তাই হবে মানুষের বছরগুলির একমাত্র চিন্তা। নূতন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নেতৃত্ব দিতে হবে মানব জাতির এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের সাহসিক কর্মপ্রচেষ্টায়।

কাছের ও দূরের গান্ধী স্বপ্নের সৌধ

রঁম্যা রলাঁ

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অক্টোবর উদ্‌যাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূলে ফরাসী থেকে
অনুবাদ : **লোকনাথ ভট্টাচার্য**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এক ঘণ্টা পরে সান্ধ্য প্রার্থনা বসল অলগা ভিলার নিচের বসবার ঘরে। আমাদের সঙ্গে তাঁর থাকাকালীন এই-ই শেষ প্রার্থনা। অন্ধকারে গান-টান হওয়ার পর গান্ধী সমবেত সবাইকে জানালেন যে তাঁরই অনুরোধে আমি উপরের ঘরে যাচ্ছি বীতোফেনের সঙ্গীতের একটি অংশ বাজাতে, কিন্তু উপরের ঘরটি ছোট ব'লেই শুধু তিনিই (এবং মীরা ও আমার বোনও) আমার সঙ্গে সেখানে যাবেন, অন্যেরা নিচেই ব'সে থাকবেন। তাই করা হ'ল। আমি পঞ্চম সিম্ফনির আন্দান্তে অংশটুকু বাজালাম—গান্ধী বিশেষ ক'রে চেয়েছিলেন যে যা বাজাব, তা যেন বীতোফেনের হয়, কারণ তিনি জানেন মীরা ও আমার মধ্যে পরিচয় সূত্র হন বীতোফেনই, এবং সেই কারণেই মীরার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটতে পারে এক অর্থে বীতোফেনেরই মাধ্যমে। তাঁর শিষ্যদল এবং সহকারী দুজনকে—বিশেষত প্যারীলালকে—মনে হ'ল বীতোফেনের গভীর অনুরাগী (যদিও বীতোফেনের সঙ্গীত তাঁরা শুধু গ্রামোফোনেই শুনেছেন আগে, অবশ্য আমার বই-গুলিতেও বীতোফেন সম্বন্ধে পড়েছেন)। বাজানো হ'য়ে গেলে গান্ধীর পাশে গিয়ে বসলাম সোফায়, পরে অল্প কথায় তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম চিত্তের সংঘাত ও জয়ের সেই বক্তব্য, যে-সম্বন্ধে আগে বই থেকে প'ড়ে তাঁকে শুনিয়েছি। মীরা খুব অভিভূত, কারণ ইউরোপ ছাড়ার পর বীতোফেন শোনার অবকাশ তাঁর এর আগে হয় নি। (গান্ধীকে যখন তাঁর মতামত আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি একটু হাসলেন—একাধারে দুষ্টু-দুষ্টু ও স্পষ্ট-বাদীর হাসি, বললেন, "আপনারা সকলে যখন বলছেন, ভালো তখন নিশ্চয়ই।"

পরে গান্ধীর অনুরোধে আবার পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসলাম, বাজালাম 'অর্ফেউস' অপেরা থেকে ভূগর্ভের নন্দন কাননের দৃশ্যটি—অর্কেস্ট্রাটির প্রথম ভাগ ও বাঁশির অংশটি। মূল সুরটি যে আবার ফিরে বাজাই, সে অবসর হ'ল না। প্রিভা ঠিক সময়ে এসে হাজির গান্ধীকে ইংরেজী কলেজটিতে (চিলন) নিয়ে যাওয়ার জন্য—সেখানে আধঘণ্টা ধ'রে বক্তৃতা দিতে গান্ধী সম্মত হয়েছেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তলায় প্রিভা দেখেন আলবের তমাকে, সুতরাং তাঁকেও উপরে নিয়ে এসেছেন। গান্ধী যখন ফিরলেন আধঘণ্টা বাদে (ইংরেজ ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা নাকি বেশ ভালো কাটে, তারা তাঁকে বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন ক'রে যায় একটার পর একটা), ভিলনভের বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রী তাঁকে গান শোনাতে আসে (রাত্রি ন'টা নাগাদ) সমবেত কণ্ঠে—লিওনেৎ ভিলার জানালার তলাতে তারা সারি সারি দাঁড়ায়। তারা তাঁকে শোনায় সুইস রাখালের গান, এবং আমাদের মুগ্ধ ভারতীয়েরা মনে করতে থাকেন যে গায়িকারাও রাখাল-বালিকা। (তাঁদের ভুলটা আমরা ভাঙালাম না, তাঁরা কী ভেবেছেন, সেটাও গায়িকাদের বললাম না—তারা তো জানে না, ভারতে কৃষ্ণকে রাখাল ব'লে মনে করা হয়)।

সে যাই হোক, সেদিন প্যারীলালের সঙ্গে ব'সে আমার অনেক কথাবার্তা হ'ল। এই একাগ্র যুবকটিকে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না, দুঃখের কী একটি স্পন্দিত হৃদয় তিনি ভিতরে ভিতরে বহন করছেন (বিষণ্ণভাবে তিনি নিজেই বলেন, "লোককে আমি আকর্ষণ করতে জানি না, বরং নিজের থেকে দূরে ঠেলে দিই তাদের"), মুখও ইনি খোলেন না সহজে। তবে ভিলনভ থেকে জেনিভা যাবার সময় আমার বোন এঁর সঙ্গে রেল কামরায় একলা পড়ে যান, এবং আমার বোনের সেই উপস্থিতি যুবকটির মনে এমন সাহস যোগায় যে তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সারা জীবনের কাহিনীটাই তাঁকে শুনিয়ে বসেন। এবারও সেই একই কাণ্ড, প্রাণ খুলে সব আমাদের বলতে আরম্ভ করলেন। শৈশব থেকে তাঁর এক কাকা তাঁকে সস্নেহে লালন পালন করেন—কিন্তু তিনি যখন নিজের ভবিষ্যতের সব চিন্তা ও চাকরি-বাকরির সব সুযোগ বর্জন ক'রে গান্ধীর অনুসরণ করলেন, তখন সেই কাকার বুক ভেঙে যায়—কিন্তু প্যারীলাল কী করবেন, তিনিও যে কায়মনে গান্ধীর পথে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। (তবে শুনতে পাই, বহু বছরের বিচ্ছিন্নতার পর কাকা তাঁকে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন।) এটা প্যারীলাল বললেন আমায় (আমার বোন অনুবাদ ক'রে চলেন), আমার রচনার কী প্রভাব পড়েছে তাঁর উপর। সবার আগে আমার 'টলস্টয়ের জীবন', যার কতকগুলি কথা তাঁকে দেয় তাঁরই ঈপ্সিত পথের নিশ্চিত সন্ধান, পড়তে পড়তে যেন আলোর বর্ষণ হ'তে থাকে তাঁর চোখে। তারপরে আমার 'জাঁ ক্রিস্তফ', ও শেষে 'বীতোফেন'। গান্ধীর এই যুবক শিষ্যেরা কতখানি আর্টের অনুরাগী, সেটা দেখে বেশ আশ্চর্য হই, তাই তো আর্ট আস্বাদনের সকল লোভ যে আজ এইভাবে ত্যাগ করেছেন এঁরা, এঁদের সেই ত্যাগ স্বীকারটাও ততখানি সুন্দর ঠেকে। কিন্তু আর্টের প্রতি তাঁদের অনুরাগের যে বহ্নি, তা সমানেই জ্বলছে আজো। আমার অনুরোধে মীরা আমার আলমারী হ'তে বেশ কয়েকটি বই বেছেছেন, যেগুলি আমি এই যুবকদের উপহার দিতে চাই : প্যারী-লালের জন্য আমার 'গাতে এবং বীতোফেন'-এর ইংরেজী অনুবাদ, দেবদাসের জন্য 'টলস্টয়ের জীবন'-এর ইংরেজী অনুবাদ। মীরাকে দিচ্ছি আমার 'বীতোফেন : সৃজন সমৃদ্ধ যুগ'-এর বড় ফরাসী সংস্করণ, তাকাতাকে (যিনি প্যারীলালের সঙ্গে আমার আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন) দিচ্ছি 'গাতে ও বীতোফেনের নতুন ফরাসী সংস্করণ।

শুক্রবার ১১ই ডিসেম্বর এঁদের যাবার দিন। সকাল-সকাল, অর্থাৎ ন'টার পরই গান্ধী এলেন আমার কাছে—শেষ বারের

মত নানা বিষয় নিয়ে আমাদের আরো একটি গভীর ও স্নেহপূর্ণ আলোচনা হ'ল।

প্রথমেই কথা উঠল ইতালীর। গান্ধী স্কার্পাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন এই ব'লে যে, তিনি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটিতে বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হবেন শুধু এই শর্তে : যে কোনো বিষয়ে যা কিছু তিনি বলতে চান, তা' বলার পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর থাকবে। অন্যদিকে, কয়েক ঘন্টা বাদেই জেন্তিলের (অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করার কথা যাঁর) কাছ থেকেও এক টেলিগ্রাম এসে হাজির : তিনি ক্ষমা চেয়ে জানাচ্ছেন, যে দু'দিন গান্ধী রোমে থাকবেন ব'লে ঠিক করেছেন, ঠিক সেই দু'দিনের জন্যই তাঁকে দুর্ভাগ্যবশত বাইরে যেতে হচ্ছে। ও'রা তা হ'লে বুঝেছেন যে গান্ধীকে ফ্যাসিশজমের লক্ষ্যসাধনের কাজে লাগানো শক্ত হবে, তাঁর বক্তব্য ও'দের পক্ষে উপকারী না হ'য়ে বিপজ্জনকই হ'তে পারে।

গান্ধীকে শেষে জানালাম, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের দিয়ে পর্যন্ত ফ্যাশিজম তার আনুগত্যের ব্রত নিয়েছে, এবং সেই অধ্যাপকদের অন্যতম জনবারো অতিসম্মানিত বৈজ্ঞানিক কীভাবে সে-আনুগত্য অস্বীকার করে তাঁদের লিখিত আপত্তি প্রকাশ করেছেন। বললাম ভ্যাতিকানের কথাও, যা খৃস্টান যাজকসুলভ কয়েকটি শর্ত সমেত সে-আনুগত্য মেনে নিতে স্বীকৃত হয়েছে।

পরে আমার বোন অক্সফোর্ড সম্বন্ধে গল্প করলেন—জায়গাটা তিনি জানেন ভালো, পছন্দও করেন। গান্ধীও তাঁর অক্সফোর্ড ভ্রমণ সম্বন্ধে দু চারটি কথা বললেন। সেখানকার 'ভদ্র যুবকগুলি' সংরক্ষণশীল এবং উদারচিত্ত, গান্ধীর সংগ্রামের পক্ষে তাঁরা সহায়ক হবেন। গান্ধী বলেন, অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সৌন্দর্য, সেখানকার চমৎকার বাড়ী-ঘরদোর ও বিপুল শিল্প সংগ্রহ—এ-সবই তাঁর চোখে বিস্বাদ ঠেকে, যখনই তিনি মনে করেন যে, সারা জগতকে শোষণ করেই এত ঐশ্বর্য-সম্ভার সেখানে শোভা পেতে পারছে।

ল্যাংকাশায়ারে তাঁত-শিল্পীদের সংগে দেখা করে গান্ধীর খুব ভাল লেগেছে। তাদের খুব বুদ্ধিমান বলে তাঁর মনে হয়েছে। "তারা চমৎকার এক নিরাসক্তির ভাবের কথা বলে। আমার অসহযোগের নীতি যেহেতু ওদের ধ্বংসের কারণ, আমাকে ওরা শত্রু বলেই ধরতে পারত। কিন্তু আমি তাদের বোঝাই তাদের ধ্বংসের প্রকৃত কারণটি ভারতের বর্জন নীতি নয়, তার মূলে আছে জাগতিক অন্যান্য কারণ। কথা শেষ করে বেরিয়ে আসার সময় বন্ধুর মত আমরা পরস্পরের বিদায় গ্রহণ করলাম। কর্তারাও চমৎকার ব্যবহার করলেন—সর্বত্রই বেশ একটি বন্ধুত্বের ভাব।"

"লণ্ডনে মিস লেস্টার আমায় কতকগুলো বস্তি দেখালেন, যেখানে গরীবরা থাকে। কিন্তু সে-গরীবদের তো আমার বেশ ধনী মনে হল—কারুর কারুর আসবাবপত্রের দাম পঞ্চাশ পাউণ্ড (!!), কারুর কারুর ঘরে পিয়ানো পর্যন্ত রয়েছে।" (মিস লেস্টারের বস্তির প্রতি প্রেম বড় সাংঘাতিক, তাই সন্দেহ হয় যথার্থ দারিদ্র্যের রূপটা তিনি ইচ্ছা করেই গান্ধীকে দেখান নি। ঠিক একই ভাবে শিকাগোতে শান্তি-স্বাধীনতাকামী নারী সংঘের অমেরিকানরা একবার সংঘের বিদেশী সভ্যাদের উদ্বাস্তু এলাকাগুলি ইচ্ছে করে দেখান নি—শুধু তাই নয়, মাদাম জুভ ও মাদাম হুদেন প্রমুখ কয়েকজন বিদেশী সভ্যা যখন নিজেরাই সেই এলাকাগুলির মধ্যে ঢুকে বেরিয়ে পড়েন, তাতে তখন আমেরিকান সভ্যারা রীতিমত আহত হওয়ার ভাব দেখান।)

ঐ বস্তির বিবরণ আমাকে একটু আশ্চর্য করে (যদিও তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না), কিন্তু তার সঙ্গে তুলনা করে আমি প্যারীর সাঁতাকান্নের দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র তুলে ধরলাম। প্যারীতে বহুসন্তানসম্পন্ন পরিবারগুলির সাহায্যে নিযুক্ত একটি বিশেষ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বিবৃতি এ-

প্রসঙ্গে পাড়লাম, এবং ভয়াবহ কতকগুলি সত্যের দৃষ্টান্ত দিলাম। কয়েক বছর আগে একটি প্রোটেস্ট্যান্ট ছাত্র অদক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে মাস ছয়েক কাটায়, তার গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধেও বললাম। দেখালাম, দারিদ্র্যের নিম্নতম স্তর এখানেও কতটা নিম্ন—আমার তো মনে হয় না, ভারতের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।

গান্ধী বললেন, ওয়েলস দেশেও নাকি শ্রমিকদের অবস্থা খুব খারাপ—তিনি দেখে এসেছেন।

আমি তখন আমেরিকার প্রসঙ্গে বললাম, সেখানে আমেরিকান শ্রমিক ও বিদেশ হতে আগত অসহায় উদ্বাস্তু শ্রমিকদের মধ্যে কী রকম দুটি বিভিন্ন বিচারের দৃষ্টান্ত মেলে—যার ফলে এই দুই দলের মধ্যে রেষারেষির ভাব জন্মেছে। এই রকম রেষারেষির ভাব ইউরোপেও আছে, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে। বললাম, ইউরোপ তো আমার মতে সুখ-সুবিধাসম্পন্ন একটি শ্রমিক শ্রেণী গঠনের পথেই এগোচ্ছে, যে-শ্রেণী গঠিত হলেও নিঃস্ব মজদুরেরা থাকবেই, কিন্তু তাদের দিয়ে শুধু ঘৃণ্য ও কঠিন কাজ করানো হবে। এই মজদুরদের বেছে বেছে নেওয়া হবে বিদেশীদের মধ্যে থেকে, বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকার বিজিত জাতির মধ্য থেকে—এবং এরা ধীরে ধীরে একটি দাস শ্রেণীতে পরিণত হবে। ঠিক এমনটাই হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যে—সারা জগতের লোকদের দিয়ে রোমের জনসাধারণ তাদের নিজেদের কাজকর্ম করিয়ে নিত, যুদ্ধকালে আত্মরক্ষার্থেও বাইরের লোকদেরই নিয়োগ করত সমরাঙ্গনে তাদের হয়ে প্রাণ দেওয়ার জন্য। তথাকথিত 'সর্ব-ইউরোপ'-এর ধারণা সম্বন্ধেও আমার কঠোর মতামত জানালাম।

মনাত্ত-এর বিপ্লবী মজদুর সংঘ যে-প্রশ্নগুলি পাঠায়, তার উত্তর দেওয়ার জন্য এবার গান্ধীকে অনুরোধ করলাম। গান্ধী উত্তর দিতে লাগলেন (এর যথাযথ বিবরণ মারী ও প্যারীলাল লিখে নিলেন)।

প্রথম প্রশ্ন ঃ 'আপনার সঙ্গে আমরা একমত এই ব্যাপারে যে, পরাধীন জাতিকে তার বিজেতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতেই হয়, যাতে একটি জাতীয় প্রতিপক্ষ গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু অনেকগুলো কান্ড তাড়াতাড়ি ঘটে যায়, দেশের বুর্জোয়া ও ক্যাপিটালিস্টরা নিজেদের শক্ত করতে থাকে। এবং প্যার্সী-দের প্রতি আপনার ভাল ভাল উপদেশ (২৩শে মার্চ ১৯২১) সত্ত্বেও মাত্র কয়েক-জনের হাতেই দেশের মূলধন আটকা পড়ে যাচ্ছে—সেটা তো আপনি ঠেকাতে পারলেন না। বৃটিশ অত্যাচারীদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হলেই ভারতীয় অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ হবে অনিবার্যভাবে। তবুও কি আপনি শ্রমিকদের বলেই চলবেন, তারা যেন মালিকদের স্বার্থ 'নিজেদের হৃদয়ে নেয়'?'

গান্ধী ঃ 'ভারতীয় ও ইউরোপীয় ক্যাপিটালিস্টদের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য টানি না। কাপড়ের কলের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব, তা নিয়ে আমি লিখেছি, কিন্তু সেটা আমাদের জাতীয় সংগ্রামের বাইরে। মূলধন ও শ্রমের মধ্যে যে রেষারেষি থাকতেই হবে, তা আমি মনে করি না, মানছি। যত কঠিনই হোক না, আমি তো মনে করি এই দুয়ের মিলন ঘটানো খুবই সম্ভব। তবে এটা যদি প্রমাণ করা যায় যে, কোন একটি বিশিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে সে-মিলন ঘটানো একেবারেই সম্ভব নয়, তখন আমি নির্দ্বিধায় শ্রমশক্তিকে (অর্থাৎ পরিচালিত শ্রমশক্তিকে) এত দূরে ঠেলব যাতে ধনতন্ত্র আপনা হ'তেই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে বা যাতে ধনতন্ত্রের সমস্ত ক্ষমতা শ্রমশক্তির হাতে চলে আসবে। সেক্ষেত্রে, যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রেও, সত্যাগ্রহ ধনতন্ত্রকে এমনভাবে কোণঠাসা করবে যে যেদিন ধন-তন্ত্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে, তার সেই ধ্বংস সে নিজেই সাধিত করবে। জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েও যদি সে জাতির বিরুদ্ধে সত্যিই যায়, তাহলে সেই ধনতন্ত্রের স্বার্থরক্ষা আমি কিছুতে করব না। কিন্তু তেমন তেমন দরকার না পড়লে ধনীদের সঙ্গে কলহ পাকাতে আমি চাই না—তাতে আমাদের বর্তমান সমস্যাটা খামাখা আরো শক্ত হয়ে দাঁড়াবে।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ "আমাদের পাশ্চাত্য ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে আপনি সম্প্রতি আবার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ইংলন্ডে শ্রমিকদের (বরং বেকারদের) সঙ্গে মিশেছেন—ক্যাপিটালিজমের সংকট আজ তাদের গ্রাস করেছে। যে প্রয়োজন আজ আপনার, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এক হয়ে রুখে দাঁড়ানোর সেই একই প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। এই সংকটময় সময়ে পাশ্চাত্যের মজদুরদের সঙ্গে সম্পর্ক যখন আপনি একবার স্থাপন করেছেন, তখন কি শ্রেণীযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদের আপনি আর নিন্দা করতে পারবেন?"

গান্ধী ঃ "যেটুকু দেখেছি, তাতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে প্রশ্নটা যদি ইংলন্ড নিয়েই হয় তো সেখানকার বেকারদের খুব একটা অভিযোগ থাকা উচিত নয় ক্যাপিটালিস্টদের বিরুদ্ধে। এটা আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে ক্যাপিটালিস্ট যদি তার সঞ্চয়ের শেষ পর্যায়েই এসে পেঁছোয় একদিন এবং তখন নিজেই শ্রমিক হয়ে যদি সে তার ধনরত্ন অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করতে বসে যায় তো তার সেই ত্যাগে শ্রমিকরা কোনো রকমেই লাভবান হবে না। এই মুহূর্তের পক্ষে যেটা সত্যিকারের সমাধান—এবং যেটা ইংলন্ডের দুঃখ দারিদ্র্যের পক্ষেও সমানই খাটবে—তা হচ্ছে সমগ্র জীবনটাকে নতুন করে গড়ে তোলা। যেহেতু সারা বিশ্বের বাণিজ্য আজ ইংলন্ডের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে আমেরিকা, জাপান, ইতালী ও অন্যান্য দেশ, বহু চলতি ইংরেজ শিল্প সংস্থানেও একমাত্র ইংরেজ মূলধন কার্যকরীভাবে খাটানোর উপায় নেই। এই রকম পরিস্থিতিতে বেকারদের যেটা প্রথম কর্তব্য, তা তাদের জীবনের মান নতুনভাবে নিরূপণ করা। দ্বিতীয়ত, কুটির শিল্পের মত জিনিসে তাদের মনোযোগ দিতে হবে, অথবা কৃষি-কার্যে ফিরতে হবে। এই সব নতুন প্রয়াসে ক্যাপিটালিস্টের কোনো ভূমিকাই নেই। বেকারদের কোনো সহায়তাতেই আসতে পারে না ক্যাপিটালিস্ট, তা সে দাতার মত মানুষের কল্যাণেই লাগুক বা তার মূলধন অন্য দেশে স্থানান্তরিতই করুক।"

রলাঁ ঃ "অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও ইংলন্ড এক ধরনের সংকীর্ণ মনোবৃত্তি আজো আরামে বজায় রেখেছে। তার দৃষ্টান্ত সারা ইউরোপের পক্ষে কোনো শিক্ষাই নয়। বরং ইংলন্ড যে-ব্যবহার করে তার বেকারদের প্রতি, ইউরোপ মহাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণী তাতে পীড়িত ও ক্ষুব্ধ বোধ করছে। জার্মানীতে বেকারদের 'ভিক্ষা-দানের' প্রসঙ্গও ওঠে না, সেখানে তাদের শোষণ করা হয় প্রায় বিনা মূল্যে। শোষকরা যে কর্মচারীদের (যারা বুদ্ধিজীবী যুবক) দরকারী বলে মনে করেন না, তাদের সম্বন্ধে তাঁদের ভ্রুক্ষেপ নেই—তারা যদি না খেতে পেয়ে মরে, মরুকগে। যুদ্ধের পর থেকে সারা ইউরোপে, বিশেষত জার্মান-ভাষী দেশগুলিতে, মানুষের জীবন সম্বন্ধে এক চরম অবজ্ঞার ভাব। আজ পর্যন্ত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে জার্মানী এবং অস্ট্রেলিয়াতে মুখ বুঁজে মারা গেছে হাজার হাজার, বোধহয় লক্ষ লক্ষ, লোক—দারিদ্র্যে, অনাহারে, আধপেটা খেয়ে। ঘন সংকটের এই শীতেও এবার জার্মানীতে একটি সপ্তাহও যায় না যখন হতাশায় বা দুঃখ-দুর্দশায় বা কাজ না পাওয়ার দরুন বহু লোক আত্মহত্যা না করে। কম মাইনেতে শোষণের মত নির্মম কিছু নেই। দেশের লোক যদি কম মাইনেতে রাজী না হয় তো বিদেশী শ্রমিকরা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। ইউরোপ মহাদেশের অবস্থা এবং ইংলন্ডের অবস্থা এক নয়। ফ্রান্সের বুর্জোয়া কাগজপত্র শ্রম-তন্ত্রের হীন দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে খেপে আছে, কারণ সে-দৃষ্টান্ত জগতকে যা বলে, তা বেকারদের 'ভিক্ষা' দাও।"

গান্ধী (পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে)ঃ "যদি সত্যিই এমন অবস্থা আসে যখন পুঁজিবাদীরা লোকের দুঃখ-কষ্টের সুবিধা নিচ্ছে, অনেক বেশি মাইনে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শ্রমশক্তির সুলভতা দেখে শ্রমিকদের যথাসম্ভব কম মাইনে দিচ্ছে, তো শ্রমিকদের সমাধান তো তখন হাতের মধ্যেই রয়েছে। শ্রমিকদের ইউনিয়ন যদি অটুট হয় তো তাদের শর্তগুলি তারা মালিকদের মানিয়ে ছাড়বেই। যেটুকু বলার দরকার তাদের, তা হচ্ছে একমাত্র নিজেদের শর্ত ছাড়া অন্য কোনো শর্তে তারা কাজ করতে প্রস্তুত নয়। এবং তারা যদি সত্যিই

সে রকম শক্ত ও সংঘবদ্ধ থেকে বিদেশী শ্রমিকের আমদানি বন্ধ করতে পারে, তবে তা মালিকের পক্ষে হার মানা ছাড়া উপায় নেই।"

রলাঁঃ "আপনি তা হলে বলছেন যে, যদি সত্যিই শ্রমিকদের সে রকম শক্ত ইউনিয়ন থাকে, তারা তখন মালিকদের এক হাত দেখে নিতে পারে। আমিও তা মানি। কিন্তু মনুষ্য চরিত্রের দুর্বলতার দিকটাও তো আছে—আসলে শ্রমিকরা সে-রকম ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারে না, কারণ কূটচক্রী পুঁজিবাদী সব সময় তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে, লোভ দেখিয়ে সে ধর্মঘটবিরোধী শ্রমিকদের কিনে নেয়। তখন বিবেকসম্পন্ন ও সাহসী শ্রমিকরা সংখ্যালঘু হয়ে দাঁড়ায়, তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারে, এবং অন্যদের স্বভাবতই বাধ্য করে ইউনিয়ন তৈরি করতে। এবং এটাকেই বলে বিবেকসম্পন্ন মজদুরদের একনায়কত্ব—অত্যাচারের নাগপাশে বন্ধ সকল মজদুরদের স্বার্থ রক্ষার্থেই তারা রুখে দাঁড়ায়।"

গান্ধীঃ "আমি এটার সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ তার মানে হবে যে শ্রম মূলধনকে কেড়ে নিতে চায়। এবং লক্ষ্যে পেঁছোনোর জন্য এভাবে মূলধন কেড়ে নেওয়াটা সমীচীন পন্থা নয়। শ্রমকে যদি আপনি খারাপ দৃষ্টান্তে প্রলুব্ধ করেন, তার আত্মশক্তি সে কোনোদিন উপলব্ধি করতে পারবে না। অল্প শ্রমিক নিয়েই আমি ভারতে কাজ আরম্ভ করি। আমেদাবাদের কাপড়ের মিলের এক শ্রমিক ইউনিয়নে প্রচণ্ড মতবিরোধিতা দেখা দেয়, আমি কিন্তু লোহার মত শক্ত থাকি—যাতে কোনো রকমের বিক্ষোভ না সৃষ্টি হয়, তার জন্য নিয়মকানুন বেঁধে শ্রমিকদের পরিচালনা করি। ফল হয় এই যে সেই ইউনিয়নে আজ ছেষট্টি হাজার শ্রমিক, যাদের অধিকাংশই নিরক্ষর, কিন্তু তারা বোঝে যে তাদের নিয়তি ও নিরাপত্তা আজ তাদেরই হাতে। তারা যে অসহায় বা পরনির্ভরশীল, এমন কোনো বিশ্বাস তাদের মনে আমি জাগাতে চাই নি—বরং তাদের শিখিয়েছি, তারাই সত্যিকারের ক্যাপিটালিস্ট, কারণ মূলধন তো কতকগুলো তাম্রমুদ্রা নয়, আসলে তা শ্রমেরই শক্তি। এবং সে মূলধনের শেষ নেই তাদের। এ-মুহূর্তে সময়টা হয়তো বিশৃঙ্খলার, মনে হচ্ছে শ্রমের বিপদ রয়েছে মূলধনের দ্বারা শোষিত হওয়ার। তবু তা সত্ত্বেও আমি তাদের শিখিয়ে চলব শ্রমের মহিমার বাণী। দরকার পড়লে বছরের পর বছর অপেক্ষা করব সুশৃঙ্খলা গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু হিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোনো একনায়কত্বের চিন্তা পর্যন্ত আমি মনে স্থান দেব না। হিংসায় চালিত এ ধরনের শ্রম আন্দোলন আমরা বোম্বাই-এ দেখেছি, এবং শ্রম সেখানে পরাজিত হয়। কিন্তু আমার [illegible] সেই শ্রমিকরা তো তাদের মালিকদের তারা বশে আনতে পারত। নইলে শ্রম নিজেই নিজেকে ধ্বংস করবে, যেমন তার ভীতিপ্রদ লক্ষণ এখনই দেখছি বোম্বাই-এ। কিন্তু সেই বোম্বাইতেও এখনো পর্যন্ত শ্রম মারমুখো হয়ে ওঠে নি—আমেদাবাদে আমরা যে অহিংসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করি, তা তাদের ধরে রেখেছে। বোম্বাই-এ এ সামান্য সংখ্যক কমিউনিস্ট আছে, যারা নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহার করে—তবু সে উদ্দেশ্য সাধনে আজো তারা সফল হয়নি, অন্তত আমার ভারত ছাড়ার সময় পর্যন্ত তো সফল হয় নি। তারপরে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সেটা ঠিক জানি না। যে একমাত্র শিক্ষা শ্রমকে আমার দেবার, সেটা হল এইঃ কোনো একটা বিশেষ কলকারখানাতেই যে শ্রমিকদের নিযুক্ত থাকতে হবে, তা নয়—আমেদাবাদে আমরা শ্রমিকদের শিখিয়েছি, কী করে কলকারখানা হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া যায়। যেটা তাদের প্রাপ্য, সেটা যদি তারা না পায় তো সুতো কেটে পাথর ভেঙে তারা সুখী হোক, যত সামান্য সে-সুখ হোক না কেনঃ দক্ষ শ্রমিকরা যেন অদক্ষ শ্রমিকদের অবজ্ঞার চোখে না দেখে। অসম্মানের সঙ্গে মোটা মাইনে পেয়ে কারখানায় থাকার চেয়ে অল্প উপার্জনে কোনো স্বাধীন কাজে চলে যাওয়া অনেক ভালো। যখন অতিরিক্ত শ্রমশক্তির অভাব, তখন শ্রমিকদের স্বাধীন হতে হবে, নিজেদের শর্তে মালিককে রাজী করাতে সমর্থ হতে হবে। ধর্মঘট বিরোধী শ্রমিক যারা, তাদের সামনে পড়লে দেখতে হবে যাতে বিদেশী শ্রমের আমদানি না ঘটে। এই রকম ক্ষেত্রেই শ্রমের একটা নিজস্ব বিবর্তন রীতি আছে—হিংসায় বিপদ ডেকে এনে সেটাকে ছিন্ন করতে আমি চাই না।"

গান্ধীর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে অনর্থক আলোচনা বাড়ালাম না, শুধু অহিংসার প্রকার ভেদ সম্পর্কে তাঁকে একটি প্রশ্ন করতে চাইলামঃ "অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণ করার কালে মানুষ কখনো কখনো বিকারগ্রস্ত বা রুগ্ন মানসিক অবস্থায় থাকে। সব সমাজেই এমন মানুষ থাকে যারা অন্যের খারাপ করে ও যাদের সেবাশুশ্রূষা করার দরকার। এই ধরনের পাগল বা অসুস্থদের সামনে অহিংস কর্মী কোন ভাব নেবেন—সমাজকে তো তিনি বাঁচাতে চাইবেনই এদের হাত থেকে? কিন্তু এখানে হিংসার আশ্রয় না নিয়ে অন্য কোনভাবে তিনি এগোবেন?"

গান্ধীঃ "আমি তাদের সামলে রাখব। এবং সেটাকে আমি হিংসাও বলব না। আমার ভাই পাগল হলে সে যাতে খারাপ না করতে পারে, আমি তাকে লৌহ-শৃংখলে বাঁধব, কিন্তু তার প্রতি হিংসা প্রয়োগ করব না, কারণ সে অভিপ্রায় তো আমার নেই। এবং আমার ভাইও ভাববে না যে তার প্রতি কেউ হিংসা প্রয়োগ করছে, বরং তার মস্তিষ্ক আবার সুস্থ হলে সে আমাকে ধন্যবাদই দেবে এভাবে একদিন তাকে বেঁধে রাখার জন্য। তার মস্তিষ্কের বিকৃত অবস্থায় সে আমায় যত বাধা-বিপত্তি দেবে, তা আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনব না, কারণ তার প্রতি আমার তখনকার আচরণ উদ্বুদ্ধ হবে এক অবিমিশ্র প্রেমের দ্বারা। আমার সে-আচরণে তো কোনো স্বার্থ সিদ্ধির বাসনা নেই, আমার ভাইয়ের সামনে আত্মরক্ষার চিন্তা পর্যন্ত সে-আচরণে নেই। এটাও জানি, তার হাত দুটো বাঁধার সময় সে যাতে আমায় মেরে না বসে, সে-সাবধানতা অবলম্বনও আগের থেকে করতে পারব না—তার হাত দুটো বাঁধছি শুধু এই কারণেই যাতে সে তার চিত্তের সুস্থাবস্থা ফিরে পায়। তার হাত বাঁধছি নিজেকে রক্ষা করার জন্য নয়—যদি তার মার থেকে তাকে রক্ষা আমি করতে পারি তো সেই

মারটাই আমি খাব। আমার আচরণ ঠিক একই ধরনের হবে ঐ অর্ধ-পাগলদের ক্ষেত্রেও, যাদের কথা আপনি পাড়ছেন। তাদের হাসপাতালে পাঠাব সেবা শুশ্রূষার জন্য, জেলরক্ষকের কঠোর নজরে রাখব না। তাঁদের সারিয়ে তোলার জন্য এমন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হব যিনি এই ধরনের ব্যাধির চিকিৎসা জানেন। কিন্তু এ-সবই শুধু বাহ্যিক লক্ষণগুলির চিকিৎসা—আমি যাব আরো ভিতরে, চেষ্টা করব একেবারে ব্যাধির কারণগুলো দূর করতে। বর্তমান সমাজই এই ধরনের পাপের জন্ম দেয়—আসল কারণটা হল আমার মতে, লাভের আশায় এই ঘোড়দৌড়, এই প্রতিযোগিতা, এই জোর করে সকলকে এক করানো ('ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া')। তাই সমাজটাকে আমি নতুন করে গড়ব। অপ্রত্যক্ষ ও বিশেষ কারণগুলি আবিষ্কারের ভার দেব বিশেষজ্ঞদের হাতে। এবং তখন দেখা যাবে, শুধু এই বিকারগ্রস্ত মনের পাপই নয়, কিন্তু অন্যান্য সকল রকমের পাপেরও কোন চিকিৎসা করা চলে।"

অফেনবাক হতে এরিক শ্রাম নামক এক জার্মান ধর্মযাজক শিক্ষক গান্ধীর জন্য কয়েকটি প্রশ্ন পাঠান আমার কাছে—সেই প্রবন্ধগুলি এবার গান্ধীর কাছে পেশ করলাম :

প্রথম প্রশ্ন : "কাকে আপনি ঈশ্বর বলবেন? তিনি কি আধ্যাত্মিক এক ব্যক্তি, না কোনো শক্তি যিনি জগতকে চালিত করছেন?"

গান্ধীর উত্তর : "ঈশ্বর ব্যক্তি নন। তিনি সেই একমাত্র রীতি যা অপরিবর্তনীয়। এখানে রীতি এবং রীতিকার, দুজনেই এক। রীতি বলতে সাধারণত আমরা পুঁথিগত রীতি বুঝি, কিন্তু এখন যে রীতির কথা বলছি, তা জীবন্ত রীতি। এবং ঈশ্বর তাই। এ রীতির পরিবর্তন নেই, তা শাশ্বত। অবস্থা বুঝে নিজেকে বদলান, ঈশ্বর সে-রকম কোনো ব্যক্তি নন। তিনি এক শাশ্বত রীতি, তাই বলছিলাম সত্যই ঈশ্বর।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন : "খৃস্টানদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?"

এর উত্তর লোজান-এ গান্ধী দেন, তাঁর সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন : "খৃস্টধর্মটা ভালো, কিন্তু খৃস্টানরা খারাপ।"

তৃতীয় প্রশ্ন : "গান্ধী কি স্বীকৃত হবেন এমন কোনো বিশ্বজনীন মানবিকতার সংস্থায় যোগ দিতে, যার মতে বিশ্বজগতটা একটা প্রকাণ্ড গুহ্য ব্যাপার এবং সেখানে চলতে গেলে আমাদের প্রত্যেককে শুধু নিজের নিজের অন্তরের নির্দেশটুকুই শুনতে হবে?"

গান্ধীর উত্তর : "কোনো কোনো বিশেষ সংস্থায় যোগ দেওয়ার জন্য আমার কাছে প্রায়ই অনুরোধ আসে। প্রতিবারই আমি জানাই : না। কারণ প্রায়ই দেখেছি এই ধরনের সংস্থার লোকগুলি হয় সকল সাধারণ ভালোমানুষ গোছের, নয় তো ভণ্ডের দল, যাঁরা বাইরে খুব একটা শ্রদ্ধের ভাব মেখে ভিতরে স্বার্থসিদ্ধির তালে থাকেন। লণ্ডনে এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান আছে, নাম 'নিখিল বিশ্ব অহিংসা প্রতিষ্ঠান', যা পরিচালনা করেন এক ধর্মযাজক দম্পতি। আমার এই সামনের টেবিলটায় যেটুকু অহিংসা আছে, তার বেশি অহিংসা আমি তাঁদের মধ্যে দেখিনি। প্রতিষ্ঠানটির জন্য তাঁরা কাজ করছেন শুধু জীবিকার্জনের তাগিদেই। আমার নাম এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়াতে আমি রাজী হইনি। এমন কি যে-চটী কাগজখানা তাঁরা চালান, তাতে পর্যন্ত আমার নাম আমি ছাপাতে দিই নি। তাঁদের বলি জীবিকার্জনের জন্য কোনো উপায় তাঁরা আবিষ্কার করুন। এ প্রশ্নটির (অর্থাৎ শ্রাম-এর প্রশ্নটির) অর্থ যদি এই হয় যে প্রশ্নকর্তা এমন একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও তিনি জানতে চান তাঁর সেই সংস্থার সঙ্গে আমার নাম আমি জড়াতে দেব কি না, তো আমার উত্তর হবে : না।"

আলোচনার শেষে মাক্স কেটেল নামে জেনিভার এক সাংবাদিক ফোটোগ্রাফার এলেন। ইনি আগে ভিলনভে গান্ধী ও মীরার কতকগুলো ভারী সুন্দর স্বাভাবিক ফোটো তুলেছিলেন। (ভ্রমণরত অবস্থায় গান্ধী ও মীরা, অথবা ভিলার বাগানে)। আমার ঘরে সেদিনকার ছোট্ট সভায় দুটি ফোটো তোলার অধিকার তাঁকে দেওয়া হল (তাঁর তোলা যে-ফোটোগুলি পরে ছাপা হয়, তার একটিতে আমার হাত তিনটে হয়ে গেছে—দুটি আমার নিজের, অন্যটি মারীর, যিনি আমার পিছনে পড়ে গিয়ে ঢাকা পড়ে যান, মারীর সে-হাতটায় ঘড়ি ছিল, তা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গান্ধীর যে ঘড়িটা, যেটা তাঁর চেহারায় বেশ বড় স্থান জুড়ে থাকে, সেটা দেখা যাচ্ছে না—কারণ ভারতে যখন তিনি খালি গায় থাকেন, ঘড়িটাই ধুতির মত তাঁর পোষাকের অন্যতম অঙ্গ। এখানে ঘড়িটাকে তিনি হাতের ভিতরে লুকিয়ে রাখেন, তাঁর বড় কোটের ভিতরে, সেটাকে এক মুহূর্তের জন্যে হাতছাড়া করেন না, অসম্ভব সময়জ্ঞান মানুষটির, কাজ করেন ঘড়ি ধরে, কাঁটায় কাঁটায়)।

শেষবার বলেই এবার অন্যান্য বার থেকেও আরো বেশি স্নেহসূচক ভাবে আমরা বিদায় নিলাম। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব তখন বাইরে, আকাশ পরিষ্কার। এবং স্টেশনে না পৌঁছে দিয়ে আমার অতিথিদের এখান থেকে বিদায় তো জানাতে পারি না। পনের দিনে এই প্রথম বাড়ীর বাইরে গেলাম।

মোটরে চললেন মেয়েরা, এবং তাঁদের সঙ্গে বাক্স-তোরঙ্গের সারি। গান্ধী যথারীতি পায়ে হেঁটেই বেরোলেন। পথে, বড় রাস্তা ও বায়রণ সরণির মোড়ে, থামলেন একটুক্ষণের জন্য—রেল লাইনের উপরেই শূন্যে থেকে ঝোলার মত এক ছোট্ট দোকান পানীয়ের (মদ্য জাতীয় নয়), দোকানদারটিও একটি ছোট্ট মানুষ, হাত-পা একটু বিকৃত, তারই অনুরোধে গান্ধী তার দোকানে ঢুকলেন। ভিলনভ স্টেশনের প্লাটফর্মে আমাদের চারপাশে ভিড়ের ঠেলাঠেলি—এক কৌতূহলী জনতা, একেবারেই অভদ্র নয়। এক বৃদ্ধা গান্ধীর হাত ধরে দুয়েকটি কথা বললেন তাঁর সঙ্গে—কেউ কাউকে বুঝলেন না, শুধু চোখে দুজনে নানা রকম ভঙ্গী করলেন। গান্ধীর মাথা সর্বক্ষণই খালি, তাঁর রোগা পা দুটোও বেরিয়ে রয়েছে—কিন্তু তাঁর বড় কোটটা জোব্বার মত গায়ে বেশ জড়ানো। তুষারের পাহাড়ের চূড়ায় শেষ সূর্যের আলো তাঁকে শেষবারের মত অভিবাদন জানাল। ট্রেন এল, তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরা আগে থেকেই রেখে দেওয়া হয়েছে ভারতীয়দের এবং অন্যান্যদের জন্য (কারণ মিলান পর্যন্ত, বোধহয় রোম পর্যন্তই সঙ্গে চলেছেন কয়েকজন অনুরক্ত : সস্ত্রীক এদমঁ প্রিভা, মিস লেস্টার, লুইজেত গীইয়েস, প্রাজ থেকে একজন অস্ট্রিয়াবাসিনী। শেষোক্ত মহিলা সবাইকে সুযোগ পেলেই তাঁর একটি বই খুলে দেখাচ্ছেন, যার ভিতর প্রশংসাসূচক দুয়েকটি কথা গান্ধী কয়েক বছর আগে লেখেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে চলেছেন ইংরেজ ও সুইস পুলিশেরাও, যাঁরা এই বিপজ্জনক ব্যক্তিটিকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করতে চান না—যতক্ষণ তিনি আছেন ইউরোপে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তবে গান্ধীও এক বন্ধুত্বপূর্ণ শ্লেষের ভঙ্গীতে তাঁদের সঙ্গে মানিয়ে চলেছেন। এবং তাঁর এঁরা করবেনই বা কী, গান্ধী যখন সবই উচ্চ গলায় বলেন এবং বলতেও চান—ঢাকাঢুকি তাঁর নেই। সুতরাং সবাই যে সব শুনছে, তাতে তিনি খুশী......।

তাঁর বকের ঠ্যাং দুটো সানন্দে কামরার সিঁড়িতে দেওয়ার আগেই গান্ধী আবার আমায় একবার আলিংগন করলেন এবং আমিও শেষ বারের মত আমার গাল ঠেকালাম তাঁর খোঁচা খোঁচা ছোট ছোট চুল ভর্তি নেড়া মাথায়। পরে স্নেহের সঙ্গে আলিংগন মীরাকে এবং অন্যদের। ট্রেন যখন চলতে সুরু করেছে, এবং যতক্ষণ না তা দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেল, মীরা দরজার ফাঁকের মধ্য দিয়ে ঝুঁকে হাত নেড়ে বিদায়ের ভঙ্গী করে চললেন। পরে ডাঃ লীহানসের মোটরে আমি ভিলায় ফিরে এলাম।

(ক্রমশঃ)

কল্পবাসর

মন্মথনাথ ঘোষ

NITAIGHOSH

ছেলের বিয়ে দিয়ে অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যা ঘরে আনার ব্যবস্থা যখন প্রায় পাকিয়ে তুলেছেন বিকাশবাবু ও তাঁর স্ত্রী সুধাময়ী, ঠিক সেই সময় যেন একটা বোমা মেরে তাঁদের সব কামনা-বাসনা ভেঙেচুরে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিলে সেই ছেলে অমরেশ।

বললে, বিয়ে যদি করতেই হয়, তাহলে গাঁয়ের অল্প লেখাপড়া জানা কোন গরীবের মেয়ে, শহরের এম-এ, বি-এ পাশকরা ধনীর কন্যা নয়।

অন্য কেউ হলে, একে পাগলের প্রলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিতেন সুধাময়ী। কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটা ঘটলো। শুধু হতভম্বের মত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনি জানতেন, মা-বাপের প্রতি অমরেশের যত শ্রদ্ধাভক্তি থাক না কেন, একবার নিজে যখন সে কোন কিছুর সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তা থেকে একচুল তাকে কোনদিকে নড়ানো যায় না। গভীর ভাবনা চিন্তা না করে কখনো সে কোন সংকল্প গ্রহণ করে না।

আলতুফালতু বাজে কথার ছেলে নয় অমরেশ। ছেলেবেলা থেকেই সে গম্ভীর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র! তাই ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করার পর নিজ প্রতিভাবলে এক বিলিতি কোম্পানির কারখানায় নিজেকে দায়িত্বপূর্ণপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, এই ছাব্বিশ বছর বয়সেই সে বারোশো টাকা মাইনে এনে বাপ-মায়ের হাতে তুলে দেয়। সকাল আটটায় অপিসের গাড়ী আসে তাকে বাড়ী থেকে তুলে নিতে। দুপুরে সাহেবদের সঙ্গে অপিসে 'লাঞ্চ' খায়, ছুটির পর অপিস ক্লাবে টেনিস্, ব্যাড্-মিন্টন, পিংপং প্রভৃতি খেলে সন্ধ্যা হলে বাড়ী ফিরে এসে মায়ের হাতের তৈরী গরম চায়ের সঙ্গে কিছু জলখাবার খেয়ে আবার নিজের ঘরে বড় টেবিল লাইটটা জ্বালিয়ে একটা মোটা ইংরিজি বই খুলে পড়তে বসে! বৃথা আড্ডা, ইয়ারকি দিয়ে একটা মিনিটও নষ্ট করে না। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, সবাই চুপচাপ গম্ভীর!

সুধাময়ী মা হলেও, খুব দরকারী কথা ছাড়া ছেলের ঘরে ঢুকে কোন কিছু আলাপ আলোচনা করতে যান না। কোন কিছু বলার থাকলে, ছেলেকে খেতে দেবার সময় সুযোগ বুঝে কথা পাড়েন।

তেমনি বাপ হয়েও বিকাশবাবু ছেলের ধারে-কাছে ঘেঁষতে চান না। কিছু বক্তব্য থাকলে, স্ত্রীর মারফত অমরেশের কাছে পেশ করেন।

সুধাময়ী চায়ের পেয়ালাটা ছেলের হাতে তুলে দিতে গিয়ে কিংবা রাত্রে খেতে বসিয়ে বলতেন, হাঁরে খোকা, তোর বাবা বলছিলেন, ওটা এইভাবে করলে কেমন হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ছেলের সম্মতি না নিয়ে কোন কাজ করতেই সাহস পেতেন না তিনি।

ছেলের মত বিকাশবাবু এত লেখাপড়াও যেমন শেখেননি, তেমনি এই ছাব্বিশ বছর বয়সে বারোশো টাকা মাইনে, তিনি কেন, তাঁর চৌদ্দ পুরুষের কেউ কখনো কল্পনা করতে পারেনি। সেইজন্যে বাপ হলেও কেমন যেন একটু 'সমীহ' করে চলতেন তিনি, অমরেশকে।

যে যখন জুতোর মস্‌মস্‌ শব্দ তুলে তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে অপিসের মোটরে গিয়ে ওঠে, তিনি তখন জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকেন ছেলের দিকে। তাঁর চোখে মুখে সেই মুহূর্তে যে ভাব ফুটে ওঠে, তার যথার্থ তুলনা দিতে গেলে সর্বপ্রথম মনে পড়ে মার্চেন্ট অপিসের নিম্নতম কোন কেরানীকে যখন সে দেখে অপিসের বড়সাহেবকে তার সামনেই এসে তাঁর বিরাট মোটরগাড়ী থেকে নামতে।

বিকাশবাবু যে তার বাপ, জন্মদাতা পিতা, থার্ড ক্লাশ স্কুলে পড়া বিদ্যে নিয়ে চল্লিশ বছর ধরে রেলের গুদামবাবুর চাকরী করে তিন মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের বিয়ে-থা দিয়েও ওই একমাত্র ছেলে অমরেশকে মানুষ করার জন্য সারাজীবনটা দুঃখ, দৈন্য ও অভাব অনটনের মধ্যে কাটিয়েছেন, সে কথাটা বুঝি ভুলতে পারেন না, আজও!

ছেলের গাড়ীর শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ধীর পায়ে সুধাময়ী নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন। চশমাটা চোখ থেকে খুলে, আলমারীর মাথায় রেখেই রপাস করে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। একটু আগে তাঁর যে ঘর পূর্ণ ছিল ঐশ্বর্যে, ঝলমল করছিল চারিদিক তার দীপ্তিতে, এখন মনে হয় যেন সব শূন্য, অন্ধকার। এইমাত্র যেন ডাকাতের দল সব লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে গেল, মোটর ছুটিয়ে।

বিকাশবাবুর কানেও সেকথা গিয়েছিল। তিনি নিজের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো বুঝি অক্ষরগুলো আর দেখতে পাচ্ছেন না, তার বদলে যেন কতগুলো কালো কালো সরীসৃপের মত কি ঘুরছে। হাত থেকে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখলেন, পাখাটা তেমনি ঘুরছে, তবু তাঁর মনে হতে লাগল ব্রহ্মতালু ভেদ করে যেন আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। ঘরের মধ্যে হাওয়া নেই, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঘরের কোণ থেকে তাড়াতাড়ি লাঠিটা টেনে নিয়ে একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

বিছানায় শুয়ে চোখের জল মোছেন, আর ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন সুধাময়ী, ছি ছি ছি! এই যদি তোর মনের অভিলাষ, তাহলে আগে সেকথা বলিসনি কেন আমায়? তুই করবি বিয়ে, সারাজীবন সে বৌ নিয়ে ঘর করতে হবে তোকে, আমার কি! বলে একটু থেমে আবার নিজের অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দেন, আমার কপালে ভগবান সুখ লেখেননি, জানি। নইলে তেরো বছর বয়েসে স্বামীর ঘর করতে এসেছিলুম তারপর থেকে দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তিপ্পান্ন বছর কেটে যাবার পর যখন ভাবছি, এইবার বুঝি ঈশ্বর মুখ তুলে চাইবেন, ঠিক সেই সময় এমন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হবে কেন! নিজের ছেলে এমনি করে মায়ের-বাপের সঙ্গে শত্রুতা করবে কেন?

চোখের জল মুছে এবার ভাবতে থাকেন, গরীবের ঘর থেকে মেয়ে আনলে, কিভাবে তাঁকে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে! দুটো দিনের জন্যে বৌকে বাপের বাড়ী পাঠানো যাবে না। আঁতুড় তোলার সময় কিংবা কোন বিপদ-আপদ হলে, বাপের বাড়ী থেকে বাপ-ভাই যে এসে বলবে, আমরা নিয়ে যাচ্ছি, সে গুড়ে বালি। বিশেষ করে গরীবের ঘরের মেয়ে যদি একবার স্বামীর টাকার গন্ধ পায়, তাহলে পেত্নীর মত তার ঘাড়ে চেপে থাকবে। নামতে চাইবে না কোনদিন। ও নিয়ে কিছু বলতে গেলে উল্টো ফল ফলবে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে এখানে ফেলে রেখে হয়ত স্বামীকে দিয়ে চাকরী বদলি করিয়ে, দিল্লী কিংবা বোম্বে কিংবা রাউরকেল্লা চলে যাবে। তখন যে তিমিরে সেই তিমিরে পড়ে থাকবেন তাঁরা!

আঁচলের প্রান্তে চোখের কোল মুছতে মুছতে তিনি আপন মনেই বলে ওঠেন, জানি সব জানি। এই বয়সে অনেক দেখলুম! তার চেয়ে বরং বড়লোকের মেয়েদের মনটা অনেক উদার হয়! স্বামীর একটা পয়সা অন্য কারুর জন্যে, বিশেষ করে তারই বাপ-মায়ের জন্যে খরচ করতে গেলে বুক ফাটে না, তাকে বাজে খরচা বলে মনে করে না! বড় ঘরের মেয়েদের যেমন বড় নজর, তেমনি দরাজ অন্তঃকরণ!

অনেককালের স্বপ্ন সুধাময়ীর, ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হলে, বড়লোকের ঘর থেকে বৌ আনবেন। কত জল্পনা-কল্পনা করেছেন তাই নিয়ে। শিক্ষিতা, সুন্দরী বৌ এসে হীরামুক্তার গহনা পরে ঘরের মধ্যে যখন ঘুরে বেড়াবে, দূর থেকে তাঁর মনে হবে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বরণ করে তিনি এনেছেন ঘরে।

লেখাপড়া জানা মেয়ে তাঁর সঙ্গে বসে অবসর সময়ে কতসব ভাল ভাল আলোচনা করবে? কত বই পড়েছে, তার গল্প বলবে। তার জ্ঞানের পরিধি দেখে হয়ত তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বৌমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাববেন, এই তাঁর পুত্রবধূ! সার্থক তাঁর মাতৃত্ব! কখনো সে রবীন্দ্রসংগীত গাইবে, কখনো বা গীটারের রঙীন ঢাকাটা খুলে বলবে, মা, একটা নতুন সুর তুলেছি, আপনাকে শোনাবো আজ! আবার কখনো রেডিয়োতে কোন পরিচিত গান শুনে তার সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে বৌমা গেয়ে উঠবে! এমনিভাবে রঙে, রসে বৈচিত্র্যে ভরিয়ে রাখবে তাঁর ঘর নতুন বৌ এসে।

সুধাময়ীর জীবনে কোনদিন কোন সখ মেটেনি। তাই ছেলের বৌ এনে তাকে দিয়ে সবকিছু সুদে আসলে উশুল করে নেবেন মনে মনে তার পরিকল্পনা করেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে।

কত বড় বড় গাড়ী এসে দাঁড়াবে তাঁর দোরে যখন তখন। ছেলের শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনরা। কোনদিন মামাশ্বশুর, কোনদিন খুড়শ্বশুর, কখনোবা শালা-শালী, মাসিশাশুড়ীর দল, এসে হাজির হবেন। তাঁদের মেয়ে জামাইকে নিয়ে কোনদিন সিনেমা দেখতে, কোনদিন বা পিকনিক করতে চলে যাবেন। আবার কোনদিন হয়ত বৌমা চুপিচুপি তাঁকে না জানিয়ে থিয়েটারের টিকিট কেটে এনে বলবে, মা আপনাকে আজ আমাদের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যেতে হবে!

ওমা, সেকি! তোমরা যাবে সব আনন্দ করতে। তার মধ্যে আমি—

কেন, আপনি গেলে কি আমাদের আনন্দ কেড়ে নেবেন! বরং আপনি সঙ্গে থাকলে আরো আনন্দ বাড়বে। চলুন মা! না বলবেন না। মাসিমারা আপনার জন্যে টিকিট কেটে এনেছেন! খুব ভাল থিয়েটার। একেবারে খাস শান্তিনিকেতনের দল, আপনি ত এদের 'শাপমোচন' অভিনয় দেখেন নি?

সুধাময়ীর ঠোঁটের ডগায় হয়ত তখন এসে পড়বে শুধু 'শাপমোচন' কেন গত বিশ বছরের মধ্যে কোন অভিনয়ই দেখেননি। কিন্তু পাছে বৌমা বা তার আত্মীয়রা সেকথা শুনলে বুঝতে পারেন, কত দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে তাঁর দিন কেটেছে, তাই কথাটার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি হয়ত বলবেন, জানো ত বৌমা, তোমার শ্বশুর কেমন মানুষ! দেখছো ত, আমোদ-প্রমোদ উনি পছন্দ করেন না। তাই ওঁর অমতে আমিও কোনদিন কোন কাজ করিনি! বলতে বলতে নিজের ঘরে ঢুকে শাড়ী বদলে যখন তৈরী হবেন, তখন বৌমা তাঁকে ডাকতে এসে হঠাৎ বলে উঠবে, ওমা একি শাড়ী পরেছেন! না, না ও কাপড় ছেড়ে ফেলুন মা, আপনার সেই সাদাজরির আঁচলা দেওয়া ঢাকাই বেনারসীটা কৈ, সেটা পরুন! বলে নিজেই আলমারী থেকে বার করে দেবে! তারপর নিজের একজোড়া সাদা পাথর বসানো কানের ফুল এনে তাঁকে পরিয়ে,

কালে সুগন্ধ পাউডারের তুলিটা নিয়ে কা করে ওঁর মুখে বুলিয়ে, ঘাড়ে, ক, গলার নীচে যখন মাখাতে থাকবে, ন হয়ত তখন তার হাতটা সরিয়ে না কেবল মুখে মৃদু আপত্তি জানাবেন, র আড়চোখে আয়নার ভেতর একবার টা দেখেই বলবেন, ছি ছি কি সঙ্ াচ্ছো বৌমা, এই বুড়ো বয়সে। মা-মা ার ভারী লজ্জা করে। লোকে কি মনে র! তুমি মুছে দাও পাউডার মুখ ক।

আপনি থামুন ত মা! লোকের কথা বলবেন না। সেখানে গেলে দেখবেন, ানার চেয়ে যাদের বয়েস অনেক বেশী, ার চুল অর্ধেক সাদা হয়ে গেছে, তাদের ঘটা সাজের! চোখে কাজল, মুখে ট্, ঠোঁটে হাল্কা লিপ্‌স্টিক।

ওসব বড়লোকদের কথা বাদ দাও মা, ের সব কিছু শোভা পায়!

সুধাময়ীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে া সঙ্গে বৌমা বলবে, আপনি-ই বা কম স মা? আপনাকেও তো সবাই বড়-কের মা বলে জানে!

এবার হয়ত তিনি হেসে ফেলবেন। লা বড়লোকের মা নয়, বড়লোকের নিও বলো! বৌমার হাসির সঙ্গে র হাসি মিলিত হয়ে যখন তার ঘর েদ মুখরিত হয়ে উঠলে, ঠিক সেই চট্ করে একবার স্বামীর কথাটা মনে যাবে হয়ত সুধাময়ীর। তাঁকে নিজের সুসজ্জিত রূপটা দেখাবার লোভ লাতে না পেরে, মিথ্যা অজুহাতে বার বিকাশবাবুর ঘরে এসে ঢুকবেন।

বিকাশবাবু হয়ত স্ত্রীর মুখের দিকে ক্ষণ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, লবেন, বা, আজকে তোমার বেশ াচ্ছে ত!

দেখো না। তোমার পাগ্‌লি বৌয়ের ড। জোর করে আমায় সঙ্ সাজিয়ে ল! ঠিক সেই মুহূর্তে, বৌমা হয়ত শুরের ঘরে ঢুকে বলে উঠবে, দেখুন ত া, মাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ!

সুন্দর না ছাই। বলে লজ্জাচাপা কণ্ঠে মীর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়েই থেকে বেরিয়ে গিয়ে মোটরে উঠবেন। শে-পাশের বাড়ীর দোতলা-তেতলার ানালার পাশে মেয়েদের কৌতূহলী চোখ া ঝিলিক দিয়ে উঠবে, তখন পুত্রগর্বে র বুক যেন দশ হাত হয়ে উঠবে!

আর চিন্তা করতে পারেন না ধাময়ী। দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। দিদি ত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে এখন িনি মুখ দেখাবেন কি করে। সবাই জানে লের বিয়ের জন্যে দু'তিন বছর ধরে যেন ু খোঁজা খুঁজছেন! যত মেয়ে দেখেছেন, র দশগুণ ফটো দেখে নাকচ করে শেষে ই. মনের মত পাত্রীটিকে পেয়েছিলেন। ক যেমনটি চেয়েছিলেন। বড়লোকের য়ে, সুন্দরী, এম-এ পড়ছে, ভাল বীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে, আত্মীয়-স্বজন দেখেছে আছে সবাই ধন্যি!

পাত্রী পছন্দর ব্যাপারে, সর্বদিক থেকে এমন বোল আনা মিল, সত্যি কথা বলতে কি, ওদের স্বামী-স্ত্রীর ইতিপূর্বে আর হয়নি। অল্পবিস্তর মতভেদ সব সময় দেখা দিত। হয়ত রং খুবই ফর্সা, কিন্তু মুখশ্রী তত ভাল নয়, নয়ত রং ফর্সা, মুখ-চোখ চমৎকার কিন্তু সামনের একটা দাঁত কেমন যেন একটু উঁচু। আবার এমনও হয়েছে, রং ভালো, মুখখানি নিখুঁত কিন্তু বেশী মোটা কি বড্ড রোগা কিংবা খুব বেঁটে কি অত্যধিক ঢ্যাঙা বলে তাদের পছন্দ হয়নি।

এক্ষেত্রে সর্বদিক থেকে ওঁরা একমত হলেও কিন্তু ছেলে একবার নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত পাকা কথা দিতে পারেননি। যদিও সুধাময়ী জানতেন, মা-বাপের পছন্দর ওপর অমরেশ কখনো কথা বলবে না, তবু বিকাশবাবু আপত্তি তোলেন। স্ত্রীকে বলেন, ছেলের যতই বাপ-মায়ের ওপর আস্থা থাক, আমার মনে হয় বিয়ের ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্বটা আমাদের নিজের মাথায় না নেওয়াই ভাল। বিশেষ করে ছেলে যেখানে এত লেখাপড়া শিখেছে, এত টাকা উপার্জন করছে আর মেয়েও এরকম বিদুষী, তখন দু'জনের দু'জনকে একবার চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া খুবই উচিত। এখন ত আর আমাদের সে-যুগ নেই। বরং শুভদৃষ্টিটা বিয়ের আগে হয়ে গেলে, পরে অনেক অশুভের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় বলে আমার বিশ্বাস। যেমন কালের হাওয়া, তেমনি চলা উচিত।

স্বামীর এ-কথাটা সুধাময়ীর খুবই মনে লাগে। তাই ভেতরে ভেতরে নিজেরা সর্বকিছু স্থির করলেও, ছেলে একবার চোখে না দেখা পর্যন্ত পাত্রীপক্ষকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। হায়, তখন কে ভেবেছিল যে, অমরেশ এইভাবে তাঁর ভরা-তরী একেবারে ডুবিয়ে দেবে! ওই বিদ্বান, জ্ঞানগম্ভীর মোটারোজগারী ছেলে যে এই বলে জেহাদ ঘোষণা করবে, 'পাড়াগাঁয়ের অল্পশিক্ষিতা গরীবের মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবো না'। এ যে সকলের ধারণার অতীত! অফিসের কাজে অমরেশকে বোম্বে যেতে হয়েছিল, মাসখানেকের জন্যে। সবে তিনদিন হলো ফিরেছে। আজ তাই আপিসে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছেলে যখন বললে, 'মা এক গ্লাস জল দিয়ে যাও তো'। সুধাময়ী তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস নিয়ে ছেলের ঘরে যেতে যেতে ভাবলেন, এই উপযুক্ত সুযোগ।

কিন্তু সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার যে মায়ের বদলে ছেলে এইভাবে করবে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে, মাকে একেবারে জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেন অমরেশ অফিসে চলে গেল।

চোখের জল মুছতে মুছতে সুধাময়ীর মনে এবার যে-প্রশ্নটা সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তা পাত্রীপক্ষের কাছে কি করে মুখ দেখাবেন। কেবল মেয়ে পছন্দ নয়, দেনা-পাওনাও যে সব ঠিক! কত নগদ, ক'ভরি সোনা, জড়োয়ার গয়না ক'খানা, আসবাব-পত্র কি কি, ফ্রিজিডেয়ার, নমস্কারী, দান-সামগ্রী পেতল-কাঁসার সঙ্গে রুপোর একটা সেট। এসব লিখে দেবার পরও, লজ্জার মাথা খেয়ে আরো একবার নয়, তিনবার শুধু তিন মেয়ের ফরমাস রক্ষা করার জন্যে অতিরিক্ত সংযোজন করে আবার ফর্দ পাঠিয়েছেন।...

বড়মেয়ে দিল্লী থেকে চিঠি লিখলে, মা, একটা 'স্টপ-রেকর্ডার' যেন লিস্টে ধরতে ভুল না হয়। তাছাড়া তোমার বৌ যখন এত ভাল গান জানে, তখন ত ওটা দেওয়া তাদের অবশ্য কর্তব্য। আমরা ভাইয়ের স্ত্রীর 'ভাজের' গান টেপ করে এনে এখানে শুনবো, আর দশজনকে শুনিয়ে প্রমাণ করে দেবো, কত ভাল গায়িকা, আমাদের একমাত্র ভাইয়ের বৌ।

মেজমেয়ে আসানসোলে থাকে। জামাইকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার বিকেলে এসে রাত্তিরটা থেকে পরদিনই চলে গেছে, মা সেকেলে মানুষ, এ-যুগের হালচালের সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় নেই। পাওনার তালিকায় সর্বকিছু ঠিক ঠিক মত ধরেছেন কিনা, পরীক্ষা করতে এসে, লিস্ট কেটে সংশোধন করে দিয়ে গেছে। বলেছে, ডানলোপিলো গদি চাই। স্টিল আলমারীটা কোন বাজে কোম্পানীর না হয়ে যেন গদরেজের হয়। আর দানের পেতল-কাঁসার বাসনের সঙ্গে স্টেনলেস স্টিলেরও একটা 'সেট' যেন দেয়।

ছোট মেয়ের আবদারের কথাটা মনে পড়তেই সুধাময়ীর দুটো চোখের পাতা ভেদ করে হু-হু শব্দে জল গড়িয়ে

পড়লো! সে লিখেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে, মা, দাদাকে যেন ওঁর শ্বশুররা ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ী করে নিয়ে যায়। আর আমরা মেয়েরাও যাবো দাদার সঙ্গে বরযাত্রী। আমাদের ওই একটা ভাই, তার বিয়ে আমরা দেখবো না চোখে, ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে হুলু দিয়ে বৌদির সঙ্গে দাদার শুভদৃষ্টি করাবো না? তুমি লিখে দিয়ো আমরা মেয়েদের দল অন্তত পনেরো-কুড়ি জন বরযাত্রী যাবো।

আর চিন্তা করতে পারেন না সুধাময়ী। ডুকরে কেঁদে ওঠেন। কেবল তাঁর একার নয়, সকলের সব আশার মুখে যেন ছাই গুঁজে দিয়েছে অমরেশ! গরীবের মেয়ে গ্রাম থেকে আনলে, কার কোন্ সখটা মিটবে! ছেলের কি মাথাখারাপ হয়ে গেল এত লেখাপড়া শিখে, এটুকু বুঝতে পারে না?

আশাভঙ্গ বিকাশবাবুরও কম হয়নি! হাজার হোক তিনি বাপ, অমরেশ তাঁর একমাত্র ছেলে। তিনটি মেয়ে থাকলেও পুত্রসন্তান ওই এক এবং অদ্বিতীয়। তিনিও তাঁর স্ত্রীর মত মনের গহনে যে আশাতরু একদিন রোপণ করেছিলেন, পত্রেপুষ্পে সুশোভিত হয়ে, তা যখন বিরাট মহীরুহে পরিণত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে কালবৈশাখীর ঝড় এসে, যেন তাকে সমূলে উৎপাটিত করে দিলে!

রাস্তায় বেরিয়ে বেশীক্ষণ তিনি পথে পথে ঘুরতে পারলেন না। সামনে একটা পার্ক দেখতে পেয়ে ধপাস করে সবুজ বেঞ্চটার ওপর বসে পড়লেন। মাথায় যেন আর কিছু ঢোকে না। সব তালগোল পাকিয়ে যায়। নিজের ছেলে যে এরকম শত্রুতা করবে তাঁদের সঙ্গে এ কি কল্পনা করা যায়!

সত্যি সত্যি যাকে বলে অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যা যেন ঈশ্বরের কৃপায় এতদিন পরে পেয়েছিলেন! তিনি হিসেব করে দেখেছিলেন মেয়ের বাপ যা দিচ্ছিলেন তার মূল্য বিশ হাজারের কম নয়। তার সঙ্গে আবার অতিরিক্ত যৌতুক হিসেবে মেয়ের দাদু তাঁর আদরের নাতনিকে যে দু' কাঠা জমি দান করেছিলেন, তার মূল্যও বর্তমানে অন্তত আরো কুড়ি হাজার টাকা। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের জমি এককালে তার দাদু যখন কিনেছিলেন, তখন পাঁচশো টাকা কাঠা দাম হলেও, এখন ওর মূল্য কম ত নয়ই বরং আরো বেশী।

একদিন দুপুরে চুপি চুপি স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে নিজে চোখে জমিটা কেবল যে বিকাশবাবু দেখে এসেছিলেন তাই নয়, আশেপাশে যে সব নতুন নতুন ডিজাইনের অট্টালিকা শোভা পাচ্ছে, তাদের যার যেটা চোখে ভাল লেগেছে, কারো গ্রিল দেওয়া জানলা, কারো বারান্দা, কারো সামনের ফটক—সব মিলিয়ে কি রকমের বাড়ী তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরী করাবেন, সারা রাস্তা স্বামী-স্ত্রীতে সেই পরিকল্পনা করতে করতে বাসায় ফিরেছেন।

আঠারো বছর বয়সে কলকাতায় চাকরী করতে এসেছিলেন, সেই থেকে আটান্ন বছর বয়েস পর্যন্ত যতদিন চাকরী করেছেন কলকাতার গলিঘুঁজির মধ্যে একতলায় দেড়খানা কি দুখানা ঘরে যতদূর সম্ভব কম ভাড়া দিয়ে কাটিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে কোনদিন নিজের কোন বিলাসব্যসনের দিকে ফিরে তাকান নি। ছেলে ভাল চাকরী পাওয়াতে বালিগঞ্জের স্টেশনের কাছে তিন কামরার আধুনিক এক ফ্ল্যাট-বাড়ীতে, মাত্র তিন বছর উঠে এসেছেন।

তাই ওই জমিটা পেলে কিভাবে সেখানে একদিন নিজের পছন্দমত বাড়ী তৈরী করে সুন্দরী ও শিক্ষিতা পুত্রবধূকে নিয়ে সপরিবারে কত আনন্দে একত্রে বাস করবেন, কল্পনায় তার যে সুখসৌধ গড়ে তুলেছিলেন, ভূমিকম্পের একটা আঘাতে সব যেন তার চোখের সামনে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল!

অথচ এর জন্যে ছেলেকে কি বলবেন! নিজের অদৃষ্টকে তাই বারংবার বিকাশবাবু অভিসম্পাত দিতে থাকেন। নইলে এমন কৃতী, জ্ঞানবান ছেলের মুখ থেকে ঐ কথা আজকের দিনে কি কেউ কখনো আশা করতে পারে?

আনন্দের পরিবর্তে একটা শোকের আবহাওয়া যেন বাড়ীতে বইতে থাকে। ছেলের সামনে কিছু প্রকাশ না করলেও বিকাশবাবু ও সুধাময়ী সব কাজে কেমন নিরুৎসাহ ও অবসন্ন বোধ করেন।

অমরেশকে এর জন্যে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতেও সাহস হয় না তাঁদের। যদি ছেলে বলে বসে, বিয়ে করবো আমি, আমার যখন পছন্দ ওই গাঁয়ের অল্পশিক্ষিত মেয়ে তখন তোমরা কেন তাতে অরাজী? ভালমন্দ সবদিক বিবেচনা না করে কি আমি বলেছি, আমার কি সেটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা নেই!

সবই ঠিক। এর ওপরে আর কথা চলে না। তবু তাঁদের মনে হয় কোথাও এমন একটা কিছু ঘটে গেছে, যা হয়ত গোপনীয়, মা-বাপের কাছে বলা যায় না, নইলে হঠাৎ এইভাবে অমরেশের মত একেবারে উল্টো দিকে ঘুরে যাবে কেন?

মা-বাপের অনুমান যে মিথ্যা নয়, অমরেশের জীবনের দু-একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করলেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

বলা বাহুল্য, এগুলি সবই ঘটেছিল নেপথ্যে। তার মা-বাপকে না জানিয়ে গোপনে মেয়েকে দেখিয়ে যে অমরেশের মন আকৃষ্ট করার জন্যে তা সে বুঝতে পারেনি। আজো মনে হলে, ঘৃণায় অমরেশের মনটা রি-রি করে ওঠে। তার আপিসের সহকর্মী এক বন্ধুর সঙ্গে পিক্‌নিক্ করতে গিয়েছিল বোটানিকস্-এ। বড়দিনের সময়, চারিদিকে মেয়ে-পুরুষের ভীড়। এত বড় বিরাট বাগানটা যেন থৈ-থৈ করছে লোকে। কেবল মানুষ, আর মানুষ। তারি মধ্যে চা খেতে খেতে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার অপিস-বন্ধুটি বললে, এ আমার মাসতুতো বোন, স্বপ্না চৌধুরী, লোড ব্রেবোর্ণ থেকে বি-এ পাশ করে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। ওর বাবা কর্ণেল চৌধুরী মস্ত ধনী। মেয়েটির বেশভূষার দিকে তাকিয়েই ঘাড় হেঁট করে নিলে অমরেশ। অজন্তা-স্টাইলে সেজেছে স্বপ্না। কোমর থেকে আরো আট দশ আঙুল নীচে পর্যন্ত শাড়ীটা নেমে গেছে, কেবল বগলকাটা নয়, বুক-পিঠ কাটা অদ্ভুত ধরনের একটা ছোট জামা কোনরকমে বুকটুকুতে আঁটা অর্থাৎ নাইকুন্ডলীর নীচে তলপেট থেকে বুকের ওপরের দিকটা সব নগ্ন, পাতলা একটা নাইলনের শাড়ী দেহের ওপর থাকলেও তা আবরণ না হয়ে আভরণে পরিণত হয়েছে। ভেল ঢাকা মুখ যেমন আকর্ষণ বাড়ায়, তেমনি।

পরদিন আপিসে এসে বন্ধুটি তাকে জিজ্ঞেস করলে, কেমন লাগলো স্বপ্নাকে' সে আশা করেছিল অমরেশের জিভ লালাসিক্ত হয়ে উঠবে তার প্রশংসায়। কিন্তু তার বদলে শুষ্ক নিরস কণ্ঠে সে যখন বললে, 'মন্দ নয়' তখন উত্তেজিত হয়ে উঠলো বন্ধুটি। বললে, কি বলছিস জানিস, 'ইন্টার কলেজ বিউটি কম্পিটিশানে' স্বপ্না সেকেন্ড হয়েছিল? শুধু ওর চেয়ে এক ইঞ্চি হিপটা বেশী চওড়া বলে শীলা রহমান ফার্স্ট হয়ে গেল। নইলে আর সব দিকে স্বপ্নার ফার্স্ট ক্লাশ সার্টিফিকেট আছে! বলে একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করে, কর্ণেল চৌধুরীর তোকে ভারী পছন্দ, তাই তোর মতটা জানতে চেয়েছেন।

আমি গরীবের ছেলে, ভাড়াবাড়ীতে থাকি। ওই 'অজন্তা স্টাইল' সেখানে মানাবে না ভাই, তাঁকে বলে দিস। বলে অমরেশ নিজের কাজে মনোযোগ দেয়।

আর একদিন এক ওপরওলা অফিসার একখানা কার্ড এনে তার হাতে দিয়ে বললে, নিশ্চয়ই এসো রবিবার রবীন্দ্রসদনে। খুব ভাল ফ্যাংশান। কথাকলি, মণিপুরী ভাল ভাল নাচ দেখতে পাবে।

অফিসার নিজে হাতে নাম লিখে কার্ড দিয়েছেন কাজেই যথাসময়ে গিয়ে হাজির হয় অমরেশ। ঠিক তার পাশের সিট-এ বসেছিলেন মিঃ সেনগুপ্ত, তার সেই অফিসার! কয়েকটা নাচ-গান হয়ে যাবার পর পর্দা উঠতেই শুরু হলো উর্বশী নৃত্য। সুন্দরী সেই তরুণীর

...নিরাভরণ শুভ্রপাম্রালো সজ্জিত দেহ ... বে'কেচুরে নানা ভঙ্গীতে নানা ... প্রদর্শন করতে লাগল, তখন ঘন ঘন ...তালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ বারংবার মুখ-...হতে লাগল।

মিঃ সেনগুপ্ত তখন অমরেশের ...নর কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বললেন, ... আমার শ্যালিকা।

...তাই নাকি! বলে কণ্ঠে বিস্ময় ...তে গেলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, ...ী ভাল মেয়ে, যেমন পড়াশুনোয়, ...নি নাচ-গানে—একে বারে 'স্কোয়ার' ... বলে। লরেটো থেকে সিনিয়র ...ব্রিজ পাশ করে প্রেসিডেন্সী থেকে ...র বি এস-সি দিয়েছে।

নাচ শেষ হতেই তিনি অমরেশকে ... গ্রীনরুমের ভেতরে গেলেন। তারপর ...শীর স্বেদসিক্ত দেহের সামনে তাকে ...করিয়ে একে একে সকলের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিশেষ ... শাশুড়ী ও শ্বশুরমশাইয়ের সংগে। ...ন মেয়ের কাছেই একটা চুরুট মুখে ... দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি ইংরিজিতে ...রেশকে প্রশ্ন করে বসলেন, 'হাউ ডু ... লাইক হার—আই মিন্ হার ...স—।'

অমরেশ লজ্জিত স্বরে 'ভাল' বলে ...এসে তার সিটে বসলো। এবার অন্য ...র মণিপুরী নাচ শুরু হলে, মিঃ ...গুপ্ত বললেন, কেমন দেখলে লিলিকে? ...র শ্বশুরমশাই ও শাশুড়ীর ত' ...কে ভারী পছন্দ। অনেকদিন থেকে ...য় খোশামোদ করছেন একবার লিলিকে ...মায় দেখাবার জন্যে! আজকালকার সব ...ক্ষতা, বড় বড় মেয়ে, ওদের ত' আর ... আগের মত পাত্রের সামনে দাঁড় করিয়ে ...মার নাম কি কতদূর লেখাপড়া ...খছো, বলা যায় না। তাই কৌশলে ...কে দেখাবার জন্যে এই ব্যবস্থা ...ছি আমি। এতে কেবল মেয়েকে ওপের ...র দেখা নয়, বলে একটু ঢোক গিলে ...ন বললেন, মানে নিজের চোখে ...গারটা' পর্যন্ত লিলির কত সুন্দর তাও ...মার দেখার সুযোগ হয়ে গেল! বলে ...খুক্ করে অমরেশের কানের কাছে ...পূর্ণ হাসি হেসে উঠলেন। তোমার ...ত পেলে, আমরা তোমার মা বাপের ...গ কথা বলতে পারি। 'এজ ইউ লাইক!' না—না এসব কি বলছেন!

...তার মানে তোমার কি পছন্দ হয়নি ...লকে! ঠিক করে বলো। বিয়ের ব্যাপার, ...তা ছেলেখেলা নয়!

একটু থেমে অমরেশ শুধু বললে, না।

...যেন বোলতায় হুল্ ফুটিয়ে দিলে, ...নিভাবে তিনি বলে উঠলেন, 'হোয়াট্ ইউ মিন্?' জানো লিলিকে পাবার ...ন কত বিলেতফেরত বড় বড় লোকের ছেলেরা তপস্যা করছে! আজকের এই 'হলের ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট দর্শক, তার অ্যাডমায়ারার!' শুধু তোমাকে আমার এবং আমার শাশুড়ীঠাকরুণের খুব পছন্দ বলেই, আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। তা কি জানো? জানো কি আজকের যাবতীয় খরচার অর্ধেক আমার শাশুড়ী দিয়েছেন, বাকী অর্ধেক মিসেস ঘোষ। ওই যার মেয়ে কথাকলি নৃত্য দেখালে, একটু আগে!

অমরেশ একটু চুপ করে থেকে জবাব দেয়, দেখুন আমাকে এসব শুনিয়ে কি লাভ! আমি ত' এ সবের কিছুই জানি না। তাছাড়া আমি ত' আপনাদের খরচ করতে বলিনি!

জানি। বলে হঠাৎ সেই যে গম্ভীর হয়ে গেলেন মিঃ সেনগুপ্ত, আর একটি কথাও তার সংগে কইলেন না। অমরেশও অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত দেখে, পর্দা পড়ার সংগে সংগে বাইরে বেরিয়ে এলো।

এর পরের ঘটনাটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। অমরেশ এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়। রূপসী বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা নয়। অথচ সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত লাবণ্য। শিক্ষার, সংস্কৃতির ছাপ যেন তার মুখে, তার দেহে, তার কথায়-বার্তায়, সর্বত্র! এম-এ পড়ছে ইংরিজিতে। নামটি আরো মধুর মালবিকা রায়। মালবিকার বাবা আপিসে এসে, তার সংগে দেখা করে অমরেশের সম্মতি নিয়ে, তার বাবার সংগে সামনের রবিবার দেখা করতে যাবেন, বলে যেদিন চলে গেলেন ঠিক তার পরদিনই এক অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটে গেল!

আপিসের কাজে দুপুরে সে পার্ক স্ট্রীটে এসেছিল। কাজ সারতে চা খাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তাই পথে বেরিয়ে একটা রেস্তোরাঁ দেখে চা খাবার জন্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু চা খেতে খেতে হঠাৎ তার নজর গিয়ে পড়ে পর্দা দেওয়া পাশের কামরাটায়। পর্দাটা হাওয়ায় অল্প অল্প ফাঁক হয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। অমরেশই স্পষ্ট দেখতে পেলে তার মধ্যে বসে মালবিকা ও আরো কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মদ খাচ্ছে। মদের বোতল ও গ্লাশ টেবিলের ওপর সাজানো। একজন ভরে দিচ্ছে, আর সবাই খাচ্ছে!

চায়ের পেয়ালাটা অর্ধভুক্ত রেখে, অমরেশ পর্দা ঠেলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতেই মালবিকা খিল খিল করে হেসে উঠলো। 'হ্যাল্লো। জাস্ট ইন্ টাইম্' 'লেট্ মি ইন্‌ট্রোডিউস, মাই হাসব্যান্ড মিঃ—'

'সাট্ আপ!' বলে অমরেশ ধমক দিতেই একটা হাসির হল্লা পড়ে যায়।

আরে চটছো কেন! আসুন, 'লেট্ আস্ এন্‌জয় টুগেদার!' আজকে আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি যখন, লেট্ আস্ সেলিব্রেট্'। আজ পাকা দেখার খাওয়াটা হয়ে যাক। বলে মালবিকার পাশেই যে চশমা পরা কালো রোগা ডিগডিগে ছেলেটা বসেছিল, সে একটা গ্লাশ তার দিকে এগিয়ে দিলে!

রাবিশ্! বলে অমরেশ ঘৃণায় মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো হোটেল থেকে। এর পরদিন আপিসে বেয়ারার সময় যার কাছে জল খেতে চেয়ে, তাকে ওই কথাটা বলেছিল অমরেশ।

যাহোক মা বাপের কাছে ছেলের ইচ্ছাটাই সবচেয়ে বড়। তাই পাড়াগাঁ থেকে অনেক বেছে একটি সুশ্রী গরীবের মেয়ের সংগে বিয়ে দিলেন তাঁরা। কিন্তু ফুল-শয্যার দিন রাত্রে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সব চলে যাবার পর বাড়ী যখন নিস্তব্ধ তখন পল্লীবধূ ফুলের মালা পরে স্বামীর বিছানার কাছে এসে দাঁড়াতেই শিউরে উঠলো অমরেশ তার বেশভূষা দেখে, একি!

হাসিমুখে জবাব দেয় নতুনবৌ, কেন পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে আমাকে কি গেঁয়ো ভূত মনে করেছো নাকি! অজন্তা স্টাইল, এটাই কলকাতার 'লেটেস্ট ফ্যাশান' আমিও জানি। আমার যে পিসতুতো বোনকে দেখেছিলে বিয়ের দিন, সে থাকে বালিগঞ্জে। তার বাড়ীতে আমি কতবার এসে থেকে গেছি! সে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে!

অমরেশের মন থেকে বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে না! বোধহয় এর উত্তরে কি বলবে, তাই ভাবছিল। হঠাৎ নববধূ তার নতুন স্যুটকেশ খুলে একখানা 'ওমর-খৈয়াম' বই আর তার সংগে চ্যাপটা সুদৃশ্য বোতল এনে, অমরেশের মুখের কাছে তুলে ধরে বললে, জানো, এটা আমার সেই পিসতুতো বোন তোমাকে যৌতুক দিয়েছে। বলেছে ফুলশয্যার দিন এটা খেয়ে আনন্দ করতে। আজকাল এটাই নাকি ফ্যাশান।

বলেই ওমর-খৈয়াম থেকে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে—

'এই নিরালায়, পাতায় ঘেরা বনের ধারে
শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে
দিনটি যায়।'

থামো, চুপ্ করো। অমরেশের যেন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়।

কিন্তু পল্লীর নববধূ স্বামীকে ভুল বোঝে। ভাবে এটা বুঝি তার অনধিকার চর্চা বলেই চুপ করতে বলছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, পাশ করিনি বলে আমায় মুখ্যু ভেবো না। 'ওমর-খৈয়ামটা' গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্ত বলে দিতে পারি। আর শুধু এ কেন, আমাদের গাঁয়ের লাইব্রেরীতে যত উপন্যাস আছে, সব আমার পড়া। যাতে আমাকে কেউ মুখ্যু না ভাবে, তারজন্য আমি বিয়ের আগে, একেবারে আধুনিক উপন্যাস সব পড়ে ফেলেছি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এবার বোতলটা হাতে নিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নামটা পড়ে দেখলে অমরেশ, স্যামপেন্! নাকের কাছে বোতলটা নিয়ে শুঁকে বললে, এসবও কি তোমার খাওয়া অভ্যেস আছে? তোমাদের গাঁয়ে কি এসব পাওয়া যায় নাকি?

নতুনবৌ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, না। বললুম ত' পিসতুতো বোন শেফালীরা থাকে বালীগঞ্জে। আমি যখন পিসিমার বাড়ীতে আসতুম, তখন ওর কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে, তাদের সঙ্গে পার্কস্ট্রীটের হোটেলে কতদিন খেয়েছি। আজকাল সব শিক্ষিত কলেজের মেয়েরাই খায়। শেলী বলেছে, এটাই নাকি 'লেটেস্ট ফ্যাশন'!

অমরেশকে গম্ভীর হয়ে থাকতে দেখে নতুনবৌ বলে, তুমি আমাকে যতটা গাঁইয়া ভাবছো, আমি কিন্তু ততটা নই। পাড়াগাঁয়ে থাকলেও শহরের শিক্ষিতা মেয়েরা যা যা করে, সব জানি! কেবল পাশ করিনি, কলেজে পড়িনি। নইলে শেলী আমাকে সব দিক থেকে 'মডার্ন' করে দিয়েছে। বলেছে, তোকে এমন তৈরী করে দেবো, যাতে কেউ না ঠকাতে পারে! এই বলে একটু থেমে, অমরেশের বুকের ওপর একখানা হাত রেখে বললে, হাঁগো, তুমি আমায় স্কুলে ভর্তি করে দেবে, আমার বড্ড কলেজে পড়ার সখ। মা বলে দিয়েছেন, তোমাকে বলতে লেখাপড়া শেখানোর কথা। তাহলে, আমি অশিক্ষিত বলে আর দশজনের কাছে তোমার মাথা হেঁট হবে না! বলো না, লেখাপড়া শেখাবে আমায়? চুপ করে রইলে কেন?

খপ্ করে 'ওমর-খৈয়াম' বইটা নতুনবৌয়ের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে অমরেশ ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেললে। তারপর মদের বোতলটা ছুঁড়ে দেওয়ালে মেরে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে ঘর থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল অমরেশ, উন্মাদের মত!

নতুনবৌ বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকে, শেষে কি একটা পাগলের সঙ্গে তার মা-বাবা বিয়ে দিলেন! নইলে যে পুরুষ এত টাকা মাইনে পায়, এতবড় ইঞ্জিনীয়ার হয়ে, সে কেন তার মত গরীব অশিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে! পাড়ার মাসী-পিসীরা ঠিকই সন্দেহ করেছিল! পাড়া-ঘরে এই নিয়ে কত ফিসফিসানি, কত জটলা!

নতুনবৌ ডুকরে কাঁদে আর মা-বাবাকে অভিসম্পাত দেয়, এর চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবিয়ে মারলে না কেন! এই পাগলের হাতে দেওয়ার চেয়ে শতগুণে ভাল ছিল!

অমরেশ নির্জন পার্কের একটা বেঞ্চিতে চুপ করে বসে থাকে। রাত গভীর থেকে গভীর হয়। খেয়াল নেই কিছু। যেন চারিদিকে তার অন্ধকার। কোনদিকে পথ দেখতে পাচ্ছে না। যেন হারিয়ে গেছে সব।

দেশে বিদেশে

আয়ুবের সম্মতি

পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ তাঁর রাজত্বের দশ বছর পার করলেন। এই উপলক্ষে গত ২৬ অক্টোবর তারিখে তিনি রাওয়ালপিণ্ডি থেকে টেলিভিশনে একটি বক্তৃতা দিলেন। ভারতবর্ষে তাঁর এই বক্তৃতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার হয়ত দরকারই হত না যদি না তাঁর বক্তৃতায় ভারতের উদ্দেশে লক্ষ্য করার মত কয়েকটি কথা থাকত।

তাঁর এই বক্তৃতার যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাতে তিনি বলেছেন, পাকিস্থান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধবর্জন চুক্তি করতে রাজী আছে। কিন্তু তাঁর এই সম্মতি নিঃসর্ত নয়। কেননা, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যোগ করেছেন, এই চুক্তি করার আগেই ঠিক করে নিতে হবে, দুই দেশের মধ্যে যেসব সমস্যা আছে অথবা ভবিষ্যতে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে সেগুলির নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি কি হবে। তিনি বলেছেন, "এই ধরনের একটা চুক্তির সারমর্ম সম্পর্কে ভারতবর্ষ যদি একটা বোঝাপড়ায় আসে তাহলে পাকিস্থান সত্যি সত্যিই খুশী হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে এখনও কোন ফয়সালা হয় নি এবং সে তার সামরিক শক্তি আশঙ্কাজনক দ্রুতহারে বাড়িয়েই চলেছে।"

ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরেই পাকিস্থানের কাছে যুদ্ধবর্জন চুক্তি করার প্রস্তাব দিয়ে আসছে। নেহরু একাধিকবার এই প্রস্তাব দিয়েছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ১৫ আগষ্ট তাঁর লাল কেল্লার বক্তৃতায় আবার সেই একই প্রস্তাব পাকিস্থানের কাছে দিয়েছিলেন—আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যাই ঘটুক না কেন, দুই দেশের মধ্যে কোন বিরোধের মীমাংসার জন্য আমরা যুদ্ধে নামব না।

এই প্রস্তাব দিয়ে ভারতবর্ষ পাকিস্থানের কাছ থেকে বলতে গেলে অতিরিক্ত কিছুই চায় নি। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয়ই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য এবং সেই হিসাবে সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাসখন্দ ঘোষণায়ও দুই দেশ প্রকারান্তরে একথা মেনে নিয়েছে যে, যুদ্ধের রাস্তায় তারা কোন সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবে না।

কিন্তু পাকিস্থান বারবার প্রতিবেশীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। "কাশ্মীর হস্তগত হওয়ার আগে কোন কথাই নয়"—এই এক কথাই পাকিস্থান ক্রমাগত বলে এসেছে। শুধু তাই নয়, দুবার পাকিস্থান ভারতবর্ষের উপর সামরিক আক্রমণ চালিয়েছে।

আজ যদি প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সম্মতি হয়ে থাকে, তিনি যদি এতদিন পরে ভারতের যুদ্ধবর্জন প্রস্তাব মেনে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে থাকেন তাহলে ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের এই বক্তৃতা কি সত্যি সত্যি পাকিস্থানের নেতাদের মত-পরিবর্তন সূচিত করছে? অথবা, প্রেসিডেণ্ট আয়ুব নিজের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এই সময়ে এই ধরনের একটা উড়ো কথা হাওয়ায় ছেড়ে দিলেন?

অনুমান করা কঠিন নয় যে, এই মুহূর্তে বিশ্বের জনমতের সামনে ভাল মানুষ সেজে ভারতকে হেয় করার কয়েকটি বিশেষ হেতু পাকিস্থানের সামনে রয়েছে। প্রথমত, ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের মনের তলায় হয়ত ছিল, এই সময়ে পাকিস্থানকে শান্তিকামী বলে জাহির করতে পারলে সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার ব্যাপারে কতকটা দ্বিধা বোধ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, একথা জানা আছে যে, পাকিস্থান আগামী বছরের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গটি আবার তুলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেজন্যও পাকিস্থানের শান্তিকামী চেহারাটা তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করা হয়ে থাকতে পারে। তৃতীয়ত, ঠিক এই সময়েই খবর পাওয়া যাচ্ছিল যে, পাকিস্থানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস কাটজেনবাখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তার পরই ইতালী থেকে পাকিস্থানকে দুইশত মার্কিন প্যাটন ট্যাঙ্ক পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পাকিস্থানের এই অস্ত্রসজ্জার চেষ্টাটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই যেন প্রেসিডেণ্ট আয়ুব সারা পৃথিবীকে ডেকে বলতে চাইছেন, "আমরা ত' ভারতের সঙ্গে শান্তিতেই থাকতে চাই; কিন্তু ভারতই আমাদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না।"

ভারত সরকার প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের এই বক্তব্যকে কিভাবে নেবেন তা এখনও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না; কিন্তু নয়াদিল্লীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া যে বিশেষ অনুকূল নয় সেটা একরকম জানিয়েই দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধবর্জন প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পিছনে আয়ুবের যদি আন্তরিকতা থাকত তাহলে তিনি তাঁর সম্মতিকে এভাবে সর্তের দ্বারা কণ্টকিত করতেন না—নয়াদিল্লীর সরকারী মহলের এটাই হচ্ছে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। একজন ভারতীয় মুখপাত্র বলেছেন, "সর্ত আরোপ করে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব যুদ্ধবর্জনের প্রস্তাবটির গুরুত্বই কমিয়ে দিয়েছেন।"

কিন্তু দ্বিতীয় একটা মতও যে না আছে তা নয়। এত বছর ধরে ক্রমাগত পাকিস্থানের কাছে যুদ্ধবর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে এখন ভারত সরকার প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের এই সর্তাধীন সাড়ায় কান না দিয়ে সরাসরি এটাকে উড়িয়ে দিতে পারেন না—এই হচ্ছে ঐ দ্বিতীয় মতের সার কথা। দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইমস" পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই ধরনের অভিমত জোরালোভাবে প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের কথাগুলিকে ভারত-বর্ষের একটা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

—এবং জনসনের

"আমি আদেশ দিয়েছি যে, ওয়াশিংটনের সময়ের শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে উত্তর ভিয়েতনামের উপর বিমান, জাহাজ ও কামান থেকে সবরকম বোমা ও গোলা-বর্ষণ স্থগিত থাকবে।" —এই ঐতিহাসিক ঘোষণার দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৬তম প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন জনসন হোয়াইট হাউস ছেড়ে যাওয়ার সাড়ে নয় মাস আগে আজকের আন্তর্জাতিক রাজনীতির সবচেয়ে উত্তেজনাকর প্রশ্নটিকে একটা নতুন অধ্যায়ে এনে পৌঁছে দিলেন।

২৮ মাস আগে যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর মেয়েকে বলেছিলেন, "তোমার বাবার সম্পর্কে ইতিহাসে লেখা থাকবে, তাঁর হাত দিয়েই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল" গত ৩১ অক্টোবর রাত্রিতে তিনিই শান্তির পথে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ করলেন।

গত পাঁচ বছর ধরে ভিয়েতনাম বিশ্বের পয়লা নম্বরের সমস্যা হয়ে রয়েছে। দশ লক্ষের বেশী মানুষের প্রাণের মূল্য দিয়েও এই সমস্যার তল পাওয়া যায় নি। ভিয়েতনাম পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের জন্য কিছুই করা যায় নি; তার প্রধান কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার প্রধান সেনানায়ক প্রেসিডেণ্ট জনসন উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমা বর্ষণ বন্ধ করতে রাজী হন নি। "ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ করা"—একথা বারবার বিভিন্ন মহল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষও এই চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবর এক গোঁ ধরে বসে ছিল—আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ করলে উত্তর ভিয়েতনাম সেই সুযোগে দক্ষিণ ভিয়েতনামে অনুপ্রবেশের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে না, এই আশ্বাস পাওয়ার আগে বোমা ফেলা বন্ধ হবে না। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রসংঘ একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যার প্রথম কথাই ছিল, উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বিমানের হানা বন্ধ হোক; ঐ বছর জুন মাসে কমনওয়েলথ দেশগুলির পক্ষ থেকে একজন বৃটিশ মন্ত্রী হ্যানয়ে গিয়েছিলেন শান্তির সূত্রের সন্ধানে, ১৯৬৬ সালের অক্টোবরে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রাউন একটি ছয় দফা পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে উ থাণ্ট আর একবার চেষ্টা করেন, ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের সঙ্গে ভিয়েতনাম সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু এইসব চেষ্টাই এযাবৎ ব্যর্থ হয়ে এসেছে মূলত একটি কারণে:—আগে থেকে হ্যানয়ের অনুকূলে সাড়া না পেলে আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ রাখতে রাজী নয়। উ থাণ্ট আমেরিকাকে হ্যানয়ের তরফ থেকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, আমেরিকা বোমা বর্ষণ ক্ষান্ত করলে হ্যানয় থেকেও সাড়া পাওয়া যাবে। মার্কিন সাংবাদিক সেলিগ হ্যারিসনও হ্যানয় থেকে একই সংবাদ নিয়েই ফিরেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। উত্তর ভিয়েতনামের কথা : মার্কিন বোমা বর্ষণ সর্তহীনভাবে ও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়া চাই। আমেরিকার কথা : উত্তর ভিয়েতনাম কি করবে না জানা পর্যন্ত বোমা বর্ষণ চলবে।

নতুন এমন কি ইতিমধ্যে ঘটল যাতে আমেরিকা এতদিন যা করতে রাজী হয় নি আজ তাতেই সম্মত হল?

গত মে মাস থেকে প্যারিসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হয়েছে তা যেমনভাবেই হোক চলছে, হ্যানয় ইতিমধ্যে তার সুর কতকটা নরম করে বলেছে, আমেরিকান বোমা বর্ষণ বন্ধ হলেই আলোচনা শুরু হতে পারবে। (এর আগে হ্যানয় বলে এসেছিল : চার-দফা দাবী মেনে না নিলে শান্তি আলোচনা হবে না। এই চার-দফার একটি হচ্ছে ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।) সম্প্রতি ভিয়েতনাম যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে উত্তর ভিয়েতনামের ৩০-৪০ হাজার সৈনিককে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও সংবাদ আছে। এগুলি সুলক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট জনসন উত্তর ভিয়েতনামের কাছ থেকে যে ধরনের পূর্ব প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন সে ধরনের পূর্ব প্রতিশ্রুতির কোন লক্ষণ অন্তত প্রকাশ্যে দেখা যায় নি—প্রেসিডেণ্ট জনসনের ঘোষণার সময়ও দেখা যায় নি।

প্রেসিডেণ্ট জনসন তাঁর টেলিভিসন বক্তৃতায় বলেছেন, "প্যারিস আলোচনায় যে অগ্রগতি হয়েছে তারই ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পেঁৗছেছি।" প্যারিস আলোচনায় ঠিক কি ধরনের লেনদেন হয়েছে তা প্রেসিডেন্ট জনসন ভেঙে বলেন নি। ("আজ রাত্রে আমি সুনির্দিষ্টভাবে ও বিশদভাবে আপনাদের বলতে পারব না, প্যারিসে অগ্রগতি ঠিক কি কারণে হয়েছে।") কিন্তু তিনি অন্য কয়েকটি "আশাজনক ঘটনার" কথা বলেছেন। সেগুলি হল:—(১) দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন, (২) দক্ষিণ ভিয়েতনামের সশস্ত্র বাহিনী অনেক বৃহত্তর হয়েছে। আজ ঐ বাহিনীতে দশ লক্ষ সৈন্য রয়েছে এবং তাদের দক্ষতা ক্রমেই বেড়েছে। (৩) মার্কিন সৈন্যবাহিনী লক্ষণীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

পর্যবেক্ষকরা এটা লক্ষ্য না করে পারেন নি যে, প্রেসিডেণ্ট জনসন এই শুভ সংবাদ ঘোষণা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের অব্যবহিত প্রাক্কালে। তিনি অবশ্য একথা বলেছেন যে, ভিয়েতনাম প্রসঙ্গটিকে তিনি দলীয় প্রশ্নে পরিণত করতে চান না। এটাও ঠিক যে, ভিয়েতনাম আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি তিনজন প্রধান প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীকেই অবহিত রাখছিলেন। (অন্যতম প্রার্থী ওয়ালেস প্রেসিডেণ্টের একটি টেলিফোন পেয়েছিলেন ক্লাবের শৌচাগারে।) কিন্তু, অনেকেরই বিশ্বাস, এই সময়ে প্রেসিডেণ্ট জনসনের ঘোষণা ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হামফ্রের জয়ের সম্ভাবনাকে অনেক উজ্জ্বলতর করে তুলবে এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি এই সময়ে ঘোষণাটি করেছেন।

আগামী ৬ নভেম্বর প্যারিসে যখন বর্ধিত আকারে ভিয়েতনাম আলোচনা শুরু হবে তখন অ্যামেরিকায় এই নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭তম প্রেসিডেন্ট অবশ্য তখনও হোয়াইট হাউসে এসে স্থান নেবেন না; কিন্তু এই ৩৭তম প্রেসিডেন্ট কে হবেন সেটা তখন জানা হয়ে যাবে।

যিনিই প্রেসিডেন্ট হোন, এবিষয়ে ভুল নেই যে, ভিয়েতনামে শান্তি এখনও অনেক দূরে। পদে পদে যে ধরনের বিতর্ক ও বিরোধ দেখা দিতে পারে তার নমুনা প্রেসিডেন্ট জনসনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেছে। প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর ঘোষণায় বলেছিলেন, আগামী ৬ নভেম্বরের প্যারিস আলোচনায় "দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের প্রতিনিধিদের যোগ দেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে।" কিন্তু হ্যানয় রেডিও এই ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বলেছেন, উত্তর ভিয়েতনাম প্যারিসে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত; কিন্তু প্রেসিডেন্ট থিউ-য়ের সরকারের প্রতিনিধিদের সে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধি বলে মেনে নেবে না—কেননা, তার মতে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হচ্ছে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট, প্রেসিডেন্ট থিউ-এর সরকারকে উত্তর ভিয়েতনাম স্বীকারই করে না। অন্যদিকে সায়গনও বলেছে যে, জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সঙ্গে থিউ সরকারের প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসবেন না।

উত্তর ভিয়েতনামে বোমা ও গোলাবর্ষণ বন্ধ মানে ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ নয়। এমনকি, উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ হওয়ার পরও দক্ষিণ ভিয়েতনামের আকাশ থেকে ভিয়েতকং বাহিনীর উপর মার্কিন বিমানের হামলা অথবা লাওসে ও কাম্বোডিয়ায় 'হো চি মিন সড়কের' উপর মার্কিন বিমানের হানা চলতে থাকার কোন বাধা নেই।

কোরিয়ায় শান্তি আলোচনা তিন বছর ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছিল। ভিয়েতনামে শান্তির দেবতার বিশেষ কোন তাড়া আছে মনে করার কারণ নেই। কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন বিমান মোট ৬,৩৫,০০০ হাজার টন বোমা ফেলেছিল আর ভিয়েতনামে (উত্তর ও দক্ষিণে) ফেলেছে ২৫,৮১,৮৭৬ টন—অর্থাৎ কোরিয়ার প্রায় চারগুণ এবং গোটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন বিমানগুলি যে পরিমাণ বোমা ফেলেছিল তা থেকেও প্রায় ৫ লক্ষ টন বেশী।

সুতরাং, ভিয়েতনাম সম্পর্কে শেষ কথা শোনা এখনও অনেক বাকী। তবে, আশা করা যায়, সেখানে শেষের শুরু হয়েছে।

শাদা চোখে

'শহীদ' বাবুলাল বিশ্বকর্মাও যা রেতে পেরেছিলেন, নকশালপন্থীদের নেতা কানু সান্যাল সেটুকুও করতে পারেন না।

বাবুলাল বিশ্বকর্মা নকশালবাড়ী এলাকার একজন চাষী এবং নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলনের একজন নেতা বলে পরিচিত। গত ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার মধ্যরাতে বীরসিং জোত গ্রামের কাছে পুলিশের সংগে এক সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।

নকশালপন্থীদের ইংরাজি মুখপত্র 'লিবারেশন'-এর অক্টোবর এই "বিপ্লবী সংগ্রামীর বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুর" বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে, বাবুলালের সংগে পুলিশের চার ঘন্টাব্যাপী বন্দুকের লড়াই হয়। বাবুলাল তাঁর একটি বন্দুক দিয়ে কয়েক শ' পুলিশকে ঠেকিয়ে রাখেন। পরে তাঁর লুকোনোর জায়গা থেকে বেরিয়ে অন্য একটি নিরাপদ জায়গায় যাবার সময় পুলিশের আটটি গুলিতে তিনি নিহত হন। মরবার সময় তাঁর এক হাতে নাকি ছিল বন্দুক, আরেক হাতে চেয়ারম্যান মাও'র বাণীর উদ্ধৃতি সম্বলিত ছোট্ট লাল কেতাব।

দেখা যাচ্ছে বাবুলাল সত্যি সত্যিই সাচ্চা বিপ্লবী, নইলে এক হাতে বন্দুক চালিয়ে পুলিশের সংগে তিনি চার ঘন্টা লড়লেন কি করে?

সে যাই হোক, সমগ্র নকশালপন্থী প্রচারযন্ত্র একযোগে বাবুলালের মৃত্যুকে গৌরবান্বিত করার কাজে লেগে গেছে। সাপ্তাহিক **দেশব্রতী**-র ১০ অক্টোবরের সংখ্যায় বলা হয়েছেঃ "শহীদ বাবুলালের আত্মদানের মধ্যে দিয়ে নকশালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উঠেছে। কমরেড বাবুলাল তরাই-এ গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করে দিয়ে গেছেন।"

একটা বন্দুক নিয়ে পুলিশের সংগে কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের নাম গেরিলা যুদ্ধ! জেনারেল গিয়াপ কিংবা কমরেড লিন পিয়াও একথা শুনলে নিশ্চয়ই পুলকিত হবেন। কিন্তু **দেশব্রতী** অদম্য। তাঁরা এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলছেনঃ "কমরেড বাবুলালের এই যুদ্ধ আমরা গেরিলা যুদ্ধ বলছি কেন? কারণ গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেনঃ গেরিলা যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে দুটি—এক, নিজেকে রক্ষা করা; দুই, শত্রুকে ধ্বংস করা।" 'শহীদ' বাবুলাল অবশ্য দুটোর কোনোটাই করতে পারেন নি। কিন্তু তবু **দেশব্রতী** যখন বলছেন এটা গেরিলা যুদ্ধ তখন সেটা স্বীকার করেই নিচ্ছি। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে তরাইয়ের জংগলে গেরিলা লড়াই শুরু হয়েছে।

এটা অবশ্য শুধু **দেশব্রতীর** কথার কথা নয়। গত ১৫ সেপ্টেম্বর, বাবুলালের মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পরে, শিলিগুড়িতে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া থানার "কৃষক বিপ্লবী"দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন।

ঐ সম্মেলনে কানু সান্যাল তরাইয়ের কৃষক সংগ্রাম সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করেন যা নাকি "বিপ্লবী কর্মীদের দিগ-দর্শনের কাজ করবে।" ঐ সম্মেলন থেকে আওয়াজ তোলা হয়েছে "নির্বাচন সক্রিয়ভাবে বয়কট কর, ফসলের ওপর দখল রাখো।"

এই কার্যসূচীকে **দেশব্রতীর** ১০ অক্টোবরের সংখ্যায় নকশালবাড়ির সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়েছে। **দেশব্রতী** লিখছেনঃ "নকশালবাড়ির আন্দোলন দ্বিতীয় পর্যায়ে উঠেছে।...এ দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাদের পার্টি ইউনিট গড়ে তুলতে হবে, প্রত্যেক ইউনিটের একজন করে নেতা নির্বাচিত করতে হবে এবং প্রত্যেক ইউনিটকে কাজের এক নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারিত করে দিতে হবে। এই ইউনিটগুলোর দায়িত্ব হবে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারা প্রচার ও প্রসার, শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্র করে তোলা এবং গেরিলা ইউনিট হিসাবে শত্রুর উপর অতর্কিতে হামলা চালানো।"

এ সম্পর্কে নকশালপন্থীদের তত্ত্ববিদ নেতা চারু মজুমদার দেশব্রতীর ১৩৭৫ সনের শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেনঃ "পার্টিকে এখনই গ্রামাঞ্চলে কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা গড়ে তুলতে হবে।...কৃষক জনসাধারণের শ্রেণী-সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে। এই শ্রেণী-সংগ্রাম সৃষ্টি করতে পারলেই দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের এই পার্টি ইউনিটগুলি গেরিলা ইউনিটে রূপান্তরিত হবে। এই সব গেরিলা ইউনিটকে রাজনীতি প্রচার ও প্রসার এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মারফৎ পার্টির গণভিত্তিকে আরো ব্যাপক ও দৃঢ় করতে হবে। এই-ভাবেই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মারফৎ জনতার স্থায়ী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠবে এবং সংগ্রাম জনযুদ্ধের রূপ নিবে।"

চারু মজুমদারের কথা থেকে অবশ্য এটা মনে হবে যে, গেরিলা যুদ্ধ একটি পরবর্তী স্তরের ব্যাপার; আগের স্তর হ'ল শ্রেণী-সংগ্রাম সংগঠিত করা। তিনি যে কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেছেন সেটা আর গেরিলা যুদ্ধ এক জিনিস নয়। কিন্তু অত্যুৎসাহী নকশালপন্থীরা স্পষ্টতই চারু মজুমদারের থিসিস মানতে চাইছেন না। তাঁরা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়কেই, অর্থাৎ নির্বাচন বয়কট করে ফসলের ওপর দখল রাখার কর্মসূচীকেই, গেরিলা যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছেন, এবং বাবুলাল বিশ্বকর্মার সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনার উল্লেখ করে বলতে চাইছেন তরাইয়ে গেরিলা লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে এই অত্যুৎসাহী মনোভাব নিঃসন্দেহে কানু সান্যালের প্রভাবের ফল। তিনি রণক্ষেত্রের নায়ক, সুতরাং তত্ত্ববিদদের দৃষ্টিভংগীর সংগে একমত হওয়া তাঁর পক্ষে হয়ত অনেক সময়েই সম্ভব নয়। অবশ্য যদি ইতিমধ্যে চারু মজুমদারের মনোভাবও ঐরকমই হয়ে থাকে তাহলে অন্য কথা। ধরে নিচ্ছি তা হয়নি কারণ মনে হয় তাঁর বোধশক্তি অন্যান্য নকশালপন্থীদের চাইতে বেশি। সুতরাং তরাইয়ে গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে বলে যা বলা হচ্ছে তার জন্যে কানু সান্যালই দায়ী। কেননা কানু সান্যাল শিলিগুড়ি সম্মেলনে তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন, "আমাদের দেশে বৈপ্লবিক অবস্থা খুব চমৎকার।"

অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন বৈপ্লবিক অবস্থা এত চমৎকার যে গেরিলা যুদ্ধ এখনই আরম্ভ করে দেওয়া যেতে পারে এবং আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। **দেশব্রতী** এখন ঢাক পিটিয়ে সেই কথাই প্রচার করছেন। আবারও, আমি **দেশব্রতীর** কথাই সত্য বলে মেনে নিচ্ছি, অর্থাৎ স্বীকার করছি যে, নকশালবাড়ি এলাকায় গেরিলা লড়াই শুরু হয়ে গেছে, যদিও প্রশ্ন করতে পারতাম

এতদিন তাহলে সেখানে কি লড়াই চলেছে?

কিন্তু তা যদি হয় তাহলে হঠাৎ এ কি হয়ে গেল? নকশালপন্থীদের গেরিলা যুদ্ধের একেবারে সূচনাতেই তাদের নায়ক কানু সান্যাল পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন? তাও বিনা বাধায়? এবং সেই বীরসিং জোতে যেখানে বাবুলাল বিশ্বকর্মা গেরিলা যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নিজের জীবন দিয়েছিলেন?

দেশব্রতীর ১০ অক্টোবরের সেই কথাগুলি মনে পড়ছে: "গেরিলা যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে দুটি—এক, নিজেকে রক্ষা করা; দুই শত্রুকে ধ্বংস করা। এ দুটো কাজের কোনোটাই আমরা করতে পারবো না যতক্ষণ না আমরা নিজেদের জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত না হবো।"

বাবুলাল বিশ্বকর্মা তবু নিজেকে রক্ষা করার ও শত্রুকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলেন এবং এ দুটো কাজ করার জন্যে নিজের জীবন দিয়েছিলেন। কিন্তু কানু সান্যাল?

৩১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার তখন ভোর রাত। কানু সান্যাল তাঁর দলের কয়েকজনকে নিয়ে বীরসিং জোত গ্রামের একটি বাড়ীতে ঘুমিয়ে ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে চারদিক ঘিরে ফেলে। শিলিগুড়ির গোয়েন্দা ইনস্পেক্টার দরজায় করাঘাত করতেই ঘুম ভেঙে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন কানু সান্যাল। সংবাদে প্রকাশ এরপর দুজনের মধ্যে এই রকম কথাবার্তা হয়:

"আপনিই কানু সান্যাল?"

"হ্যাঁ।"

"আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।"

সামনেই দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীঅরুণ মুখার্জিকে দেখে শ্রীসান্যাল বলে উঠলেন: "স্যার আপনি নিজেই এসে গেছেন?"

জবাব দিলেন শ্রীমুখার্জি: "কি আর করি বলুন আমার কাজই যে এই।"

ব্যাস, গ্রেপ্তার হলেন কানু সান্যাল, সেই সঙ্গে আরো দুজন সাচ্চা বিপ্লবী। কোনো বাধা নয়, কোনো প্রতিরোধ নয়, কোনো সংঘর্ষ নয়, নিজেকে রক্ষা করার ও শত্রুকে খতম করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নয়, নকশালবাড়ির ছ'জন গেরিলা তাঁদের নেতাকে অনুসরণ করে পুলিশের গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

পুলিশ সুপার মুখার্জি কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন: "আজ আপনি এত অসতর্ক ছিলেন কেন?"

কানু সান্যালের উত্তর: "সাধারণত রাতের প্রথম ভাগে দলের অন্যান্যরা পাহারা দিয়ে থাকে আর শেষ রাত্রে পাহারা দিই আমি। কিন্তু বুধবার রাত্রে আগের দিকে পাহারা দেই আমি আর শেষের দিকে অন্যান্যরা, আর তার ফলেই এই বিপত্তি।"

কানু সান্যাল তাঁর গ্রেপ্তারের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার চাইতে ছেলেমানুষী আর কিছু অন্তত শুনিনি।

তাঁরা বলছেন, তরাই অঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম অর্থাৎ গেরিলা লড়াই শুরু হয়ে গেছে। তাই যদি হবে তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা গেরিলা লড়াইয়ের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছেন। তাহলে, আমার জিজ্ঞাস্য, এক বিরাট পুলিশ দল এসে বীরসিং জোত গ্রামে ঢুকে পড়ল অথচ কানু সান্যালের গেরিলারা সে খবর পেলেন না কেন? এবং পুলিশ নেতাসহ সাতজন গেরিলাকে গ্রেপ্তার করে বিনা বাধায় গাড়ী চেপে শিলিগুড়িতে ফিরে যেতেই বা পারল কি করে? গেরিলারা তো কখনো নিরস্ত্র থাকে না, তাহলে গ্রেপ্তারের সময় একটা গুলিও ছুটল না কেন? কোথায় ছিল সমস্ত গেরিলা প্রস্তুতি, **দেশব্রতী** যার জয়ঢাক সমানে পিটিয়ে চলেছে?

এসব জানবার জন্যে অদম্য কৌতূহল রয়েছে এবং কৌতূহলের এখানেই শেষ নয়। কানু সান্যাল বলেছেন, সাধারণত অন্যান্যরা প্রথম রাত্রে চারদিক পাহারা দেয়, তিনি শেষ রাত্রে। ঘটনার দিন তিনি প্রথম রাত্রে পাহারা দেন, অন্যান্যরা শেষ রাত্রে। তা হোক। কিন্তু কথা হল ঐ অন্যান্য পাহারাদারেরা তাঁর গ্রেপ্তারের সময় ছিল কোথায়? খবরে শুধু দেখা যাচ্ছে পুলিশের হাতে তিনি ছাড়া আর ছ'জন গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং বাড়ীর ভেতর থেকে। বাড়ীর বাইরে কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে বলে জানা যায়নি। তাহলে কি আমরা ধরে নেব, কানু সান্যাল কথিত অন্যান্য পাহারাদারেরা পুলিশ দেখেই সরে গিয়েছিল? না কি তাঁর সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে আর যে ছ'জন ঘুমিয়েছিলেন তাঁরাই ছিলেন তাঁর অন্যান্য পাহারাদার?

এর মধ্যে যেটাই হয়ে থাক, কিছু বলবার নেই। কেননা খোদ বীরসিং জোত গ্রামে, যেখানে গত ৭ সেপ্টেম্বর বাবুলাল বিশ্বকর্মা পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন, সেখানে গেরিলা লড়াইয়ের এই দৃষ্টান্ত দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ়। দেশব্রতীদের কিছু বলার আছে কিনা জানি না।

সবচেয়ে তাজ্জবের কথা, কানু সান্যালের গ্রেপ্তারের মতো এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ বাংলাদেশের বিপ্লবী মানুষের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই! অথচ ও'রা বলেন, কৃষকদের বিদ্রোহ নাকি আজ দাবানলের মতো জ্বলে ওঠার অবস্থা। ভারতবর্ষ নাকি আজ বারুদের স্তূপ। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে নকশালবাড়ী আন্দোলনের জন্ম, নিশ্চয়ই দাবানলের কেন্দ্রস্থল। অথচ নকশালবাড়ীর সাধারণ কৃষক তাঁদের মুক্তিদাতার গ্রেপ্তারের আগেও যেমন বাহ্যত চুপচাপ ছিল গ্রেপ্তারের পরেও তেমনি।

শহরের বিপ্লবীরা তো দেয়ালের গায়ে পোস্টার লাগাতে ব্যস্ত। কেউ কেউ যাঁরা গ্রামে কৃষক আন্দোলন সংগঠন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই আবার শহরে ফিরে এসেছেন। এবং সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় একজন নকশালপন্থী বিপ্লবীর কথা বলা হয়েছে যিনি বলেছেন এখন তিনি নকশালপন্থী আছেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতেও থাকবেন কিনা বলতে পারেন না।

দক্ষিণ দেশ নামে অপর একটি নকশালপন্থী সাপ্তাহিকের ১৯ অক্টোবরের সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, জলপাইগুড়ি জেলার পাঁচটি অঞ্চলে, দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে, মেদিনীপুর জেলার পাঁচটি অঞ্চলে, মুর্শিদাবাদ জেলার একটি অঞ্চলে, হাওড়া জেলার একটি অঞ্চলে, চব্বিশ পরগণা জেলার দুটি অঞ্চলে, এবং বর্ধমান জেলার দুটি অঞ্চলে নাকি কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে। **দেশব্রতীর** শারদীয় সংখ্যায় চারু মজুমদার লিখেছেন, "হয়ত আগামী ফসল দখলের আন্দোলনে এই বিপ্লবী জোয়ারের প্রকাশ হতে পারে।"

দেখা যাক। খোদ নকশালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন কয়েক মাসের মধ্যে শেষ হতে দেখেছি। গত ফসল দখলের আন্দোলনের পরিণতিও দেখেছি। এবং দেখেছি নকশালবাড়ীর 'আগুনে' ফসল কাটার সময়কার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি রাষ্ট্রপতির শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা জল হয়ে যেতে দেখেছি।

ও'রা বলছেন: "ভারতবর্ষ আজ বারুদের স্তূপ। দিকে দিকে বিদ্রোহ। চেয়ে দেখুন জলপাইগুড়ির মানুষের দিকে।"

শ্রেণী-সংগ্রামের কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

"কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের লড়াই, বিদ্যুৎ কর্মীদের লড়াই, সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন নিপীড়িত জনতার লড়াই প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ঘা দিয়ে দুর্বল করে দিচ্ছে সন্দেহ নেই।"

এই সব আন্দোলনের স্রষ্টা কি নকশালপন্থীরা? এবং এই সব আন্দোলনের লক্ষ্য কি প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্রকে ঘা দেওয়া, না তার কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া?

"দেখতে পাচ্ছি নকশালবাড়ীর আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে—বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, অন্ধ্রে।"

কিন্তু বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে ও অন্ধ্রে আন্দোলন শুধু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার কিংবা বহিষ্কৃত হবার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেটা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার সমস্যা।

আর বাংলাদেশে? নকশালবাড়ী এখন নিস্তব্ধ, আন্দোলনের প্রথম সারির সক্রিয় নেতারা প্রায় সকলেই জেলে। এবং এখানেও নকশালপন্থী আন্দোলন ক্রমে ক্রমে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বাইরে এই এই আন্দোলনের আর কোনো তাৎপর্য নেই। এবং সেরকম তাৎপর্য কোনোদিন পাবে, এমন মনে করারও কারণ নেই। কেননা, এদেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য দৃঢ়মূল—গণতান্ত্রিক পথেই জনগণ তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারবে বলে বিশ্বাস রাখে।

—সমদর্শী

আজগুবি

ঋম্ভুর চৌধুরী

চিকিৎসা বিভ্রাটের চূড়ান্ত।
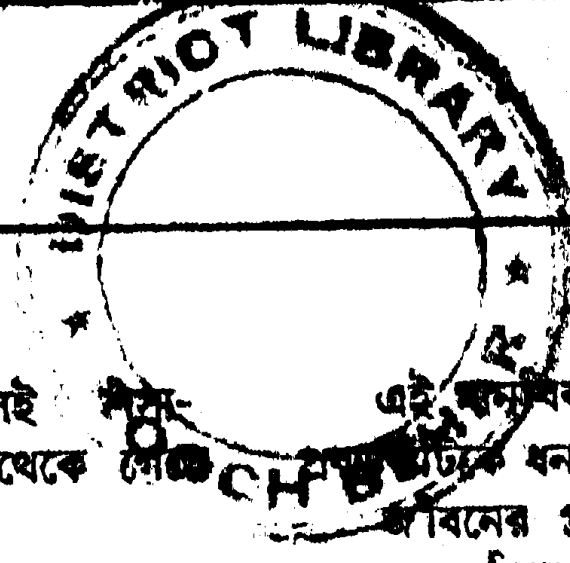
হাসপাতালে রোগীর আগমন; কারণ—বেকায়দায় পা পড়ায় একটি শস্যের দানা তার পায়ের পাতার মধ্যে ঢুকে গেছে। সেটাকে টেনে বার করে দিতে হবে।

হাসপাতাল থেকে যখন এই রোগীটিই ফিরে এল ঘরে, কয়েকদিন পরে, তখন নিম্নলিখিত জখমগুলি তার অঙ্গে লিপ্ত :

এক নম্বর—এক পায়ে একটি প্লাস-টার, জানুর হাড় ভাঙার জন্য।

দু নম্বর—একটি বাহু অবশ এবং অকর্মণ্য।

তিন নম্বর—পাকস্থলীর জখম।

চার নম্বর—শ্বাসনালীর জখম।

পাঁচ নম্বর—হৃদযন্ত্রের জখম।

ছয় নম্বর—কাঁধের হাড় ভাঙা।

এবং মজার খবর হল এই যে এখনও সেই শস্যদানাটি তার পায়ে যথাস্থানেই রয়ে গেছে। তার কোনই সুরাহা হয় নি।

এত ঝঞ্ঝাটের কারণ?

কারণ নানাবিধ। এক এক করে তাই বলা হচ্ছে :

পা থেকে শস্যদানাটি বার করার জন্য খানিকটা কাটাকাটির প্রয়োজন ছিল। রোগীকে এজন্য অজ্ঞান করে নেবার ব্যবস্থা করা হয়, ক্লোরফর্ম দিয়ে। ফলে সে অজ্ঞান তো হলই, পরন্তু ক্লোরফর্মের ক্রিয়ায় তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে গেল। বেচারার মৃত্যু অবধারিত। তাই তাকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তার বুক চিরে দেওয়া হল এবং হৃদযন্ত্রটিকে মালিশের সাহায্যে পুনঃ চালু করা হল।

তাকে যে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল, তা দুর্ভাগ্যক্রমে দূষিত ছিল এবং তার ফলে তার তলপেট ফুলে উঠল। আবার তখন তার তলপেটে অপারেশনের ব্যবস্থা করতে হল।

অপারেশনের পরে যখন তাকে স্ট্রেচারে করে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হচ্ছিল, তখন বেয়ারাদের হাত ফসকে স্ট্রেচার পড়ে যায় এবং এই কয়টি নতুন জখম হয় :

জানুর হাড় (thigh bone) ভেঙে যায়; এবং স্কন্ধের কাছে গলার হাড়ও (collar bone):

এতসব জখমের ধকল সহ্য করতে না পেরে তার শ্বাসযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।

সুতরাং আবার ডাক্তারবৃন্দ তাকে দেখতে আরম্ভ করেন। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-কার্য চালু করা হয়।

শেষপর্যন্ত সে বেঁচে যায়, এবং উল্লিখিত জখমসমূহ নিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে। চিকিৎসকেরা তাকে মেরে অবশ্য ফেলেন নি, শেষপর্যন্ত বাঁচিয়েই তোলেন। কিন্তু অবস্থাটি মরার বাড়া নয়?

যে জন্য আসা—পায়ের সেই শস্য-দানাটি—সেটা কিন্তু স্বস্থানে থেকে গেছে তবু।

*

জোহানেসবার্গের খবর।

মিঃ শ্যাম স্ক্রিজ এবং তাঁর পরিবারের সকলেই, মায় কুকুরটি পর্যন্ত, শুধু মাটি খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

পয়সার অভাব হেতু নয়।

কিংবা সকলের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে বলেও নয়।

কারণটি অতিশয় সাধু এবং মহৎ—পরীক্ষা উদ্দেশ্যে।

ভদ্রলোক ওষুধ প্রস্তুতকারক। বর্তমানে তিনি মাটি-খাদ্য বা soil food তৈরীর পরীক্ষায় ব্যস্ত।

তাঁর তৈরী এই soil food মাটি ও রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। দেখতে গায়ে মাখার পাউডারের মত এবং স্বাদে চীজের মত।

এই খাদ্যে শতকরা ৯৮ ভাগই বিশুদ্ধ মাটি।

ভদ্রলোকের বিশ্বাস, তাঁর এই মহৌষধ সত্যিকারের সাফল্য লাভ করলে তিনি পৃথিবী থেকে দুর্ভিক্ষ দূর করে দিতে পারবেন।

ঠিক কথা, মাটি খেয়ে বাঁচা সম্ভব হলে আমরা সত্যিকারের কীটপতঙ্গের মত বাঁচতে পারব, তাদেরই মত বংশবৃদ্ধি করে।

*

মাছ ধরার জন্য পুরস্কার। এবং এই মাছ ধরা প্রতিযোগিতায় যে ব্যক্তির ভাগ্যে তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটে, তিনি নিজেই তার পুরস্কার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। কারণ তিনি আদৌ কোন মৎস্য শিকার করেন নি, তথাপি মৎস্য শিকারীর তিন নম্বর পুরস্কারটি তিনিই দখল করেন। এই মহাশয় মানুষটির নাম—ডানকান ফিন্।

পুরস্কার-বিতরণী সভায় তিনি সর্ব-সমক্ষে সগর্বে ঘোষণা করেন, "আমি প্রমাণ করেছি যে ইচ্ছা করলেই এ জাতীয় বহু প্রতিযোগিতায় জোচ্চুরী বাজির সাহায্যে বাজিমাৎ করা যায়।"

যে মাছটি শিকারের জন্য তার ভাগ্যে তৃতীয় পুরস্কার উঠেছিল, সেটি আদৌ তার বঁড়শিতে ওঠে নি—নগদ মূল্যে সেটি দোকান থেকে কেনা।

"প্রতিযোগিতার সময় তঞ্চকতা নিবারক কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাই ছিল না। এবং সেসময় আমি এই মৎস্যের সঙ্গে আরও বড় বড় কিছু রুই কাৎলা নিয়ে এলে সত্যি-কারের নির্দোষ প্রতিযোগীদের সবাইকে রাঘব বোয়ালের মত খেয়ে দিয়ে প্রথম পুরস্কারটিও দখল করতে পারতাম।"

এই অলৌকিক স্বীকৃতির জন্য এই সাধু প্রচেষ্টাটিকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এজাতীয় কত অসম প্রতিযোগিতায় সত্যিকারের গুণী ঘায়েল হচ্ছেন এবং কত তঞ্চক প্রবঞ্চক হোমরা চোমড়া গোমড়া হয়ে কেউকেটা সেজে বসছেন।

•

শিকাগোর খবর।

শ্রীমতী লরা হফম্যানের প্রশংসা না করে পারা যায় না। ক্ষমায় তিনি পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, মানতেই হয়।

তার স্বামীর নাম রয়, বয়স বর্তমানে ৪৪। শ্রীমতীর বয়স ৩৯। শ্রীমতী লরা তার এই একই স্বামীকে মোট চারবার বিবাহ করেছেন; বলা বাহুল্য, সেজন্য তাকে স্বামীকে তিনবার তালাক বা ডিভোর্স করতে হয়েছে।

তাদের প্রথম বিবাহ হয় আজ থেকে বিশ বছর আগে—১৯৪৭ খৃস্টাব্দে। দু বছরের মধ্যেই বিয়ের রস শুকিয়ে যায় এবং শ্রীমতী লরা স্বামীকে ডিভোর্স করেন। তবে, আগেই বলা হয়েছে, ভদ্রমহিলা বড় কোমলস্বভাবা—অতএব এক বছর পরে তিনি আবার তার পূর্বতন স্বামীকেই বিয়ে করতে সম্মত হন। তাদের দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়—১৯৫০ সালে।

এবার চার বছর বিবাহিত-জীবন টিঁকে ছিল। তারপরে আবার তাকে ডিভোর্স করতেই হয় ১৯৫৪ সালে। এবার তার নরম মন অপেক্ষাকৃত শক্ত—তিন বছর কেটে যায় সেই কাঠিন্য কাটাতে। আবার উভয়ের বিয়ে হয়, তৃতীয়বার, ১৯৫৭ সালে।

তৃতীয়বারের বিবাহিত-জীবন পাঁচ বছর স্থায়ী হবার পরে আবার ভেঙে যায়, ১৯৬২ সালে।

স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করতে এবং চতুর্থবার রয়কে বিয়ে করতে তথাপি সম্মত হন—শ্রীমতী লরা। কারণ স্বামী রয় তার মার্জনা ভিক্ষা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি ভালো স্বামী বা good husband হয়ে থাকবেন, অতএব চতুর্থবারের বিবাহ—১৯৬৪ সালে।

কিন্তু লরার অভিজ্ঞতা শেষপর্যন্ত বড়ই তিক্ত। ক্ষমায় সবাই শুধরায় না। তাঁর স্বামীও শুধরাল না।

অতএব চতুর্থবার সে ডিভোর্সের আবেদন করেছে। এবার তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—"খুব শিখেছি! আর নয়!"

রীতিমত ঠেকে শেখা, দেখে শেখা তো নয়।

ছায়া কালো-কালো

শয়তান

ভেরনন বার্টলেট

[মিঃ ভেরনন বার্টলেট বিখ্যাত সাংবাদিক এবং বৈদেশিক রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সর্বজনপরিচিত। কুড়ি বছর যখন বয়স তখন প্রথম মহাযুদ্ধের কালে একটি কোম্পানীর কম্যান্ডার পদে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অনেক দৈনিক পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং টাইমস পত্রিকায় য়ুরোপস্থ বিশেষ সংবাদদাতাও ছিলেন, কিন্তু "ওয়ার্লড রিভিয়ু" নামক বিখ্যাত সাময়িকপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ভেরনন বার্টলেট একটি শ্রদ্ধেয় নাম। তাঁর একটি উপন্যাসের নাম 'কাফ্-লভ', এছাড়া **"দিস ইস্ মাই লাইফ"** নামক আত্মজীবনীটিও সুপ্রশংসিত। আর. সি. সেরিফের বিখ্যাত নাটক 'জার্নিস্ এনডে"র উপন্যাস রূপদানে তিনি সহযোগিতা করেন। এই বিস্ময়কর কাহিনীটির ভিত্তি নাকি সত্য ঘটনামূলক একথা লেখক বলেছেন।]

বুকিট বেনটা থেকে কোটা বারু-র সেই বিমানযাত্রা যে অশুভ একথা বলার জন্য প্রাচীন গ্রীক ভবিষ্যৎবক্তাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আশ-পাশের কয়েক মাইল জুড়ে সবাই জানত ফাদার আরনেস্ট হাডসন, এস, জে এবং পুলিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট রবার্ট কোল-টনের সঙ্গে কী ভীষণ বিদ্বেষ-বিবাদ। এই যাত্রা অশুভ হওয়া অনিবার্য তা সবাই জানত।

এই অঞ্চলে ফাদার হাডসন আসার প্রথম সপ্তাহ থেকেই সুরু হয়েছিল যে সংঘর্ষ, তার চরম পরিণতি ঘটল ক্লাব-ঘরে একদিন অপরাহ্নের তুমুল কলহে। এই দুটি মানুষ শুধু মালয় নয়, যে-কোনো পরাধীন দেশে শাদা চামড়ার শাসক সম্প্রদায়ের যে দুটি বিপরীত মনোভংগী আছে, সেই দুই পরস্পরবিরোধী মানসিকতার অধিকারী।

কোলটনের ধারণা যাদের গায়ের রঙ তার নিজের মত শাদা নয় সেইসব কালা আদমীদের লাথি মেরে ঠান্ডা রাখতে হবে। বলত—এই সব বেজম্মাদের সায়েস্তা রাখতে হলে ওদের পশ্চাৎ দেশে নিয়মিত লাথি মারতে হবে। ফাদার হাডসন বলতেন —এদের বিশ্বাস এবং ভালোবাসা যদি অর্জন করতে না পারো তাহলে তুমি খ্রিশ্চানিটিকেই অস্বীকার করছ বলতে হবে।

কোলটন জবাবে বলত— সেন্টিমেন্টাল ননসেন্স্। যতসব—

কোলটন যাই বলুক যীশুর পরমভক্ত হাডসনের প্রতি মালয়-বাসীদের বেশ ভক্তি ও শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছে। তারা মুসলমান, হাডসনকে নিজেদের সন্ত-পীরদের অন্যতম মনে করে।

ক্লাববাড়ির ঝগড়াটা কিন্তু এইসব ছোট-খাটো মতবিনিময়ের মধ্যে সীমিত রইল না, ভীষণ আকার ধারণ করল। একটা পুলিস কনস্টেবলকে নিয়ে কোলটনের একটু গোলমাল হয়, লোকটা অবাধ্যতা করেছিল। সে তার অপরাধের সমর্থনে হাডসনের একটা উক্তি উল্লেখ করে বসল— ঈশ্বরের চোখে সব মানুষই সমান। সেইদিন ছুটির দিন, শহরের বাইরে অনেক দূর থেকে রবার কারখানার সাহেবরা এই ক্লাবে এসে মদ্যপান করেন, হৈ-হুল্লোড় করেন। কোলটন ক্লাবের বারে বসে প্রচুর মদ্যপান করছিল। ফাদার হাডসন কদাচিৎ ক্লাবে আসতেন, সেই রকম এক বিরল যাত্রায় এইদিন এসে পড়েছিলেন।—এই দিনটিতে অনেকে একত্র হন, তাঁরা দূরে-দূরান্তরে ছড়ানো, সবাইকে একসঙ্গে পেলে দেখা-

ানার সুবিধা হয়। যেই দেখেছে ফাদার ডসন সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, কোলটন ইরে বারান্দায় বেরিয়ে এল বোঝাপড়া াতে।

ক্লাবের দশ-বারোজন সদস্য বাইরে ংগণের অপেক্ষাকৃত শীতল আবহাওয়ায় স অবসর উপভোগ করছিলেন, তাঁদের মনেই কোলটন পুরোহিত হাডসনকে কথ্য ভাষায় অভিযোগ করল—অসভ্য লয়ালীদের মধ্যে তিনি অতি সর্বনাশা তবাদ ছড়াচ্ছেন। এরপর গলার স্বর তমে চড়িয়ে বলে উঠল—আমার যদি মতা থাকত, তাহলে তোমার মত যত টিলে ভন্ডদের এদেশ থেকে তাড়াতাম। মি আর সেই সংগে তোমার ক্রীশচানিটি। তসব হতভাগা নেটিভদের কাছে আজে-জে মিহিসুরের কথা বলে মাথা খাবার ন্টা বার করতুম।

ফাদার আরনেস্ট হাডসনের কথাকে াহি কিংবা আজে-বাজে বলা যায় না। ারণ এর দ্বারা মেয়েলিভাবাপন্ন মানুষকে াঝায়, ফাদার কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ, ামা ও সমাহিত। বরং কোলটনের সুরই াহি হয়ে আসছে, তার বিরাট আকৃতির পেশীসমূহ মেদ-বাহুল্যে থলথলে হয়ে এসেছে, আর তার কণ্ঠস্বর আকৃতির আকারের অনুপাতে অতিশয় ক্ষীণ। এই জাতীয় দুর্বল কণ্ঠস্বর যখন চড়ায় ওঠে তখন তা উদ্ভট এবং ভীতিপ্রদ। সেই ভুতুড়ে ভঙ্গী ভয়ংকর।

ফাদার হাডসন কোলটনের আক্রমণের জবাবে যা বললেন তার মধ্যে কিন্তু এতটুকু মিহিভাব নেই।

চার্চের মধ্যে দুর্নীতি এবং বিলাস-বাহুল্য দেখে সাভোনারোলা তার বিরুদ্ধে যে অভিযান করেন তখন তাঁকে যেমনটি দেখতে হয়েছিল অনেকটা সেই ভঙ্গীতে হাডসন অভিযোক্তার দিকে মুখ তুলে আদেশ করলেন—

— ামো, থামো, থামাও তোমার বকবকানি। তোমার জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন। তোমার ভেতর শয়তান প্রবেশ করেছে। আমি তোমার জন্য প্রার্থনা জানাবো।

যারা এই ঘটনার দর্শক তাঁদের মতে হাডসনের কথার সুরে ঔদ্ধত্য ছিল, যেন ঈশ্বরের সংগে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। কিন্তু তাঁর এই কথাগুলি কোলটনকে এমন উত্তেজিত করল যা চমকপ্রদ—সে চীৎকার করে ওঠে—

—তুমি একটা ধার্মিক রেজন্মা। আমি আমার জীবনের প্রতিটি দিন তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যাব।

সব সদস্যরা যখন ওকে জোর করে বিলিয়ার্ড-রুমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন কোলটন কর্কশ গলায় বলছে—

আরো বলছি শোনো, আমি মরে গিয়েও তোমাকে ছাড়বো না, তোমার ঘাড়ে চেপে থাকব। তোমার-প্রার্থনায় নিকুচি করি, তুমি নিপাত যাও।

সবাই—বিশেষ করে কোলটনের সহযোগী পুলিশ অফিসাররা সকলে জানতেন যে কোলটন একটা বর্বর পশুর মতো, এবং কটুভাষী। প্যালেস্টাইন পুলিসে কাজ করার সময় এমনই বদনাম হয়েছিল যে হয়ত মানডেট সহসা বন্ধ হয়ে না গেলে ওকে ডিসমিস করা হত। স্বাভাবিক অবস্থায় মালয় পুলিসে ওকে নেওয়া হত না, কিন্তু একদল দস্যু ব্রিটিশ সৈন্যদল এবং মালয়ের পুলিশ ফৌজকে উপেক্ষা করে লুটতরাজ চালাচ্ছিল, মালয়ের তিন-চতুর্থাংশ বন জংগলে ঢাকা, তার সেই

দুর্বোধগম্য জঙ্গলের আড়ালে থেকে সৈন্য এবং পুলিশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করত, এই জন্য কোলটনের মত লোকের প্রয়োজন ছিল।

এই কাল বা স্থান এমন নয় যে কোনোরকম মধ্যপন্থা অবলম্বন করা যায়, কোলটনের মানবিকতার কোনো বালাই নেই, কোনোরকম কঠোর ব্যবস্থা এমন কি নরহত্যা করতেও সে দ্বিধা করত না। দস্যুদলের রসদ কিভাবে সরবরাহ হয় তার সূত্র সন্ধানে দুর্বল এবং ক্ষীণজীবী মানুষকে চরম শাস্তি দিতেও তার বাধে না। কোলটনের লক্ষ্য অব্যর্থ এবং অতিশয় দ্রুত, তার শত্রুদের এই সামর্থ্য নেই। অধঃস্তন মালয় দেশোয়ালীরা কোলটনের এই নৃশংসতা ঘৃণা করত আর তাদের কুসংস্কার সম্পর্কে কোলটনের অবজ্ঞার জন্য তাকে ভয় করত।

য়ুরোপীয়রাও কোলটনকে অপছন্দ করত, তবে ওর এই দুর্ধর্ষতার জন্য মনে মনে একটা শ্রদ্ধাও ছিল। কোলটনকে বুঝতে তাদের অসুবিধা নেই, কারণ স্কুলে এই জাতীয় দুর্ধর্ষ মানুষ তারা দেখেছে, হাডসন ওদের অনেকের কাছেই অসহ্য।

তবে মালয়ে জাপানী অবরোধের সময় হাডসন যা করেছিলেন তার জন্য এই পুরোহিতকে সবাই শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ১৩৬ নম্বর বাহিনী যতদিন না জঙ্গলবাসী এবং বাইরের জগতের সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপন করেছেন ততদিন যে কি উদ্বেগ, কি আশংকা, কি ক্লেশ অন্তরে তিনি বহন করেছেন তা অন্য কেউ বোঝেনি বা ভোগ করেনি। তাই ওরা বুঝতে পারেনি যে যুদ্ধাবসানে কেন উনি দেশে ফিরে গিয়ে যাজকের বৃত্তি অবলম্বন করে ফিরে এসেছেন। তাছাড়া জাতিগত অনৈক্য বিলুপ্ত করার জন্যই বা কেন তাঁর এত আগ্রহ তা তারা অনুধাবন করতে পারে না। জাতিগত বৈষম্য লোপ করার জন্য তাঁর যুক্তি অধিকাংশ য়ুরোপীয় মানুষের কাছে বোধগম্য নয়। এ নীতি গ্রহণ করতে তাদের মনে দ্বিধা আছে।

রবার-চাষী সাহেবরা হাডসনের কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রতি এই আসক্তির অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। তারা নিজেদের নিঃসঙ্গতার জ্বালা এড়ানোর জন্য মাঝে মাঝে ক্লাবে এসে স্কুল ছাত্রদের মত দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কাণ্ড করে। এদিকে মালয়ী, চীনা, এবং আদিবাসীদের ওপর পর্যন্ত হাডসনের এমন প্রভাব দেখে স্থানীয় য়ুরোপীয়রা একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং অস্বস্তি বোধ করছেন।

তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম আছে অবশ্য। এমন একজন ব্যতিক্রম হলেন এখানকার ডিসট্রিক্ট অফিসার গেনর। গেনর সুদর্শন এবং সুন্দর মানুষ। অবিবাহিত, যুদ্ধের সময় ডিস্টিংগুইসড ফাইটিং ক্রসে সম্মানিত হয়েছেন, একটা পদকও পেয়েছেন। যুদ্ধের পর অফিসের চেয়ারে আরামে বসে কাজ না করে একটু অভিজ্ঞতা কিছু করার বাসনায় তাঁর মন ভরপুর ছিল, তাঁর স্কোয়াড্রনের অন্তর্ভুক্ত কর্মীরা তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে এবং মনে করে তিনি যেন একজন আজন্ম নেতা। বুকিট বেনটা শহরের ডিসট্রিক্ট অফিসার হিসাবে গেনর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য অনুরূপ ফলদান করছে।

কুয়ালা লামপুরে এমন অনেকে আছেন যাঁরা পদমর্যাদার দম্ভ প্রকাশে গেনরের এই অশ্রদ্ধাতে ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন—এই অশ্রদ্ধার ফলে ওর পদোন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি হবে। কিন্তু এড্রিয়ান গেনর এসব গ্রাহ্য করেন না, ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারলেই তিনি খুসী। নিজেকে জাহির করা তাঁর স্বভাব নয়।

আর ফাদার হাডসন তাঁকে তাঁর এই কর্তব্যকর্ম বিষয়ে একটা নতুন দিক প্রদর্শন করেছেন। যে দিকটা অনেক সন্তোষজনক এবং প্রীতিপদ। শুধু মাত্র নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখা এবং ন্যায়সম্মত শাসন ব্যবস্থা চালু রাখাই তাঁর দায়িত্ব নয়, তাঁকে পথ প্রদর্শকের কাজ করতে হবে, মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে, জ্ঞান দিতে হবে। ঠিক এইভাবে না করতে পারলেও কোলটন যেমন সন্ত্রাসের দ্বারা শাসন চালাচ্ছে, গেনর চালাচ্ছেন প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে।

ফাদার হাডসন তাকে একজন প্রকৃত আচারনিষ্ঠ খৃস্টানে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করায় গেনর বিব্রত বোধ করেছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সুদীর্ঘ তর্ক এবং আলোচনার ফলে গেনরের যে কি পরিমাণ লাভ হয়েছে তা সে নিজে বা যাজক হাডসন কেউ জানেন না। এই কারণেই হাডসনের প্রতি গেনরের সুগভীর শ্রদ্ধা, বয়সে হাডসন গেনরের চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড়ো, কিন্তু পড়াশোনা এবং জ্ঞানের ঐশ্বর্যে হাডসন অসীম শক্তিমান।

এই তিনজন মানুষই ঘটনাচক্রে একই বিমানে চলেছেন বুকিট বেনটা থেকে কোটাবারু, সুতরাং একটা কিছু অঘটন যে ঘটবে সেকথা বলার জন্য কোনো গণক-ঠাকুরের প্রয়োজন নেই। সমগ্র ব্যাপারটা অশুভ। ককপিটে আসন গ্রহণ করতে করতে পাইলট র‍্যানসম গজ গজ করে—এর চেয়ে একদল জন্তু-জানোয়ার যাত্রী নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হত।

এই বোধহয় র‍্যানসমের কণ্ঠে উচ্চারিত শেষ কথা। অবশ্য বাকী দু-এক সেকেন্ডে যদি ঈশ্বরের নাম কিংবা কোনো শপথ বাক্য উচ্চারণ করে থাকে সে কথা আলাদা, কারণ, এর পর মুহূর্তেই বিমানটি নিয়ন্ত্রণের অতীত হয়ে পাহাড়ের ধারে একটা জঙ্গলে ভেঙ্গে পড়ল।

বিমানটিতে আগুন লাগেনি, তবে যা হল তাতে কোনো সান্ত্বনা মেলে না। র‍্যানসমের বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে। কারণ প্লেনের মেসিনের মাথার দিকটা একটা পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে। হাডসন সামনের দিকে যাত্রীর সিটে ছিলেন। তিনি একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, আর সব যাত্রীদের আঘাত সামান্য। কিছু কাটা-ছেঁড়া এই পর্যন্ত। তারা সকলে মিলে হাডসনকে ধ্বংস-স্তূপের ভেতর থেকে টেনে আনল।

কোলটনের পিছনের পকেটে ফ্লাস্কভর্তি ব্রান্ডি ছিল, গেনরের পকেটে সামান্য কিছু স্যান্ডউইচ ছিল। চারজন মালয়ী পাহার-ওলার মধ্যে দুজনের কাছে কিছু চাল ছিল। এইসব।

প্রথম এক ঘণ্টায় অতি সামান্য অবকাশ ছিল কি যে ঠিক ঘটেছে তার হিসাব নেবার। কোলটন আর তিনজন পাহারওলা বিমানের ধ্বংসাবশেষ দেখতে থাকে তার ভিতর কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র মেলে কিনা। চতুর্থ পাহারাওলা র‍্যানসমকে কবরস্থ করার জন্য গর্ত খুঁড়ছে। গেনর হাডসনের দেহের ক্ষতগুলি ফাস্ট-এড বক্সের জিনিষপত্র দিয়ে মেরামতের চেষ্টা করছেন।

হাডসনের মাথার একদিকে একটা সুগভীর ক্ষত হয়েছে। ডান পাটা হাঁটুর ঠিক ওপর দিকে ভেঙে গেছে, ডানদিকের বাহুমূল থেকে প্রায় উরুদেশ পর্যন্ত একটা আশ্চর্যরকমের বিবর্ণতা, যার দ্বারা বোঝা যায় যে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছে যার স্বরূপ নির্ণয় করা গেনরের পক্ষে সম্ভব নয়। হাডসনের মুখ ভীষণ রকম রক্তহীন—এমনই নিষ্প্রভ যে প্রায় মৃতদেহ বলে ভ্রম হতে পারে। গাল দুটি ভেঙ্গে পড়েছে—গেনর একটা আদিম ইতালীয় ছবিতে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর এই ধরনের একটি ছবি দেখেছিলেন, সেই ছবিটির কথা মনে পড়ে।

র‍্যানসমকে কবরস্থ করা হল শুধুমাত্র 'লর্ডস প্রেয়ার' নামক সর্বজনজ্ঞাত প্রার্থনা উচ্চারণ করে। এরপর কোলটন দেখতে এল যেখানে হাডসন শায়িত, তারপর মন্তব্য করল—বেশীক্ষণ টিঁকবে না, কি যে করা যায় ওকে নিয়ে স্থির করে ফেলা ভালো।

গেনর বলল, নিশ্চয়ই, বিমান আমাদের সন্ধানে আসবে, সর্বাগ্রে একটু আগুন জ্বালানো দরকার, যতটা সম্ভব বড় করে।

—হ্যাঁ, আগুন জ্বালিয়ে ঢাক পিটিয়ে ডাকাতদের জানিয়ে দেব যে আমরা এখানে আছি। লি বেং ওং-এর দলের লোকেরা এইখানে কোথায় আছে। আমাদের দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না, একটা টুকরোও থাকবে না। তাছাড়া, তুমিও জানো আমিও জানি উদ্ধারের আশা কত কম। বিমান ধর্মঘটের সময় রওয়াং-এর কাছে যে বিমান দুর্ঘটনা হয় তার কথা মনে আছে—প্রায় আধ ডজন স্টাফওলারা মিলে খোঁজা-খুঁজি করেছিল। দুই বছর কাটার আগে কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি সে ত' জানো! তাও ঘটনাচক্রে। না, ছেলে-মানুষী নয়। আমাদের ভরসা রাখতে হবে নিজেদের ওপর। যত তাড়াতাড়ি আমরা এগোতে পারি ততই মঙ্গল।

গেনর বললেন—হাডসন যে নড়াচড়ার পক্ষে উপযুক্ত হবেন তা মনে হয় না।

লালকেল্লা। ফটো : গোকুলচন্দ্র বিশ্বাস

তিনি বললেন—ভগবানের সৃষ্ট জীবকে এইভাবে যন্ত্রণা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই।

কোলটন ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে—তাই নাকি! কে আমাকে বাধা দেবে দেখি-- এই বলে কোলটন বেশ হিসেব করেই মালয়ী পাহারাওলা ইয়াকুবকে একটা প্রচণ্ড লাথি মারল, বেচারী খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়ে পালাল।

হাডসন বললেন—শয়তান, ঈশ্বর তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। তবে-- হাডসন তার উক্তি শেষ করার আগেই তাঁর স্বর বন্ধ হয়ে গেল এবং মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল। গেনর দৌড়ে এলেন বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য, কিন্তু ততক্ষণে যাজক হাডসন স্বেচ্ছাচারে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। মালয়ী পাহারাওলার দল অসহায় দৃষ্টি নিয়ে অনেক দূরে পাহাড়ের কোলে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।

সেই ভয়ংকর রাত্রে প্রায় সর্বক্ষণ হাডসন রোগ-যন্ত্রণায় আকুল হয়ে তাঁর শয্যায় কেবল এপাশ-ওপাশ করলেন। তাঁর পাশে বসে গেনর কপালে ভিজা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছে সারারাত ধরে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বয়সের অনুপাতে গেনর অনেক তরুণ এবং সচেতন। যে মানুষটির কাছে নেতৃত্বের প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেই হাডসনের অসহায়ত্ব এবং আসন্ন মৃত্যুর নৈকট্য গেনরকে তাঁর প্রতি আরো আকৃষ্ট করে তুলেছে। যে বন্ধু তার জীবনকে এতখানি প্রভাবিত করেছে তাঁকে বাঁচাতে অসমর্থ হওয়ায় গেনরের যেন লজ্জা এবং অপমানের আর সীমা নেই।

সাধারণ বুদ্ধি এবং বন্ধুর প্রতি আনুগত্য এই দুই বস্তুতে সংঘর্ষ সুরু হল। দলকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এখনই যাত্রার গতি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, হাডসনকে ফেলে রেখেই যাওয়া উচিত। কিন্তু যে মানুষটি তার কাছে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তাকে কি এইভাবে ফেলে যাওয়া উচিত হবে? সেক্ষেত্রে অন্য সবাই ভুলে গেলেও তার কি কর্তব্য নয় প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে থাকা! হাঁ, এই একমাত্র পথ!

সম্ভাব্য পথ এই একটিই আছে।

সারারাত ধরে হাডসন ভুল বকলেন, বিড়বিড় করে কি সব বললেন। মাঝে মাঝে স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় কথা বললেন—গেনর এবং আর সকলের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন, তাঁর জন্য ওদের সবাইকে এত কষ্ট করতে হচ্ছে। ওদের সমস্যা না বাড়িয়ে ওঁকে একা ফেলে রেখেই যাওয়ার জন্য উনি তর্ক করছেন। আর সকলের সঙ্গে তিনি প্রায় ফিস ফিস করে কথা বললেন—কোলটনের হৃদয়ে কোমলতা আসুক এই প্রার্থনা করলেন, প্রার্থনা করলেন কোলটনের মঙ্গল কামনায়। এই প্রথম কোলটন আতংকিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—তোমার ঐ সব ভণ্ডামির প্রার্থনা থেকে আমাকে রেহাই দাও, তা যদি না করো আমি তোমার গলা টিপে শেষ করব।

কিন্তু হাডসন যখন সর্বনিয়ন্তার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন—জীবনে ও মৃত্যুতে তুমি আমাদের রক্ষা করো করুণাময়, তোমার করুণা যেন আমাদের প্রতি অবিচল থাকে। হে ঈশ্বর! আমার অহংকার হয়েছিল, আমি অপরাধী। আমি তোমার সন্তান কোলটনকে নিন্দা করেছি। আমাকে তৃণের মতো অহংকার মুক্ত করো, আমরা মহাপাপী, আমাদের প্রতি করুণা করো।

এই ঘৃণিত কণ্ঠস্বর যাতে না শোনা যায় তাই কানে দুটি হাত চাপা দিয়ে কোলটন চেঁচায়—চুপ করো। চুপ করো। সময় সময় কিন্তু গেনর বুঝতে পারেন না হাডসন সত্যি অচেতন না তাঁর চৈতন্য আছে। এই সন্দেহের দোলায় যখন দোদুল্যমান গেনর তখন হাডসন সুদীর্ঘ নীরবতার পর নিজের মনে তর্ক-বিতর্ক সুরু করলেন—

তিনি বললেন—লোকটা কিন্তু শয়তান। যে কেউ ওর সংস্পর্শে আসে তাকেও দুর্নীতিগ্রস্ত করে। ভয় দেখিয়ে মানুষকে শাসন করে, ভালোবেসে নয়। ভগবান যীশু ত' শয়তানের সঙ্গে আপোষ করেননি। এমন এক মহা শয়তান ও বর্বর মানুষের প্রতি কি তিনি সহিষ্ণু হতেন? এই মানুষটার ভেতরে শয়তান প্রবেশ করেছে তাকে কি যীশু দয়া করতেন? না এ'র বাঁচার কোনো অধিকার নেই, পৃথিবী থেকে এইসব মানুষকে দূর করা প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ থেমে হাডসন শেষ কথার পুনরাবৃত্তি করে আবার বললেন, পৃথিবী থেকে এসব মানুষকে দূর করা কর্তব্য।

কোলটন শুনতে পারনি। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বালিশের নীচে ব্রান্ডির শূন্য ফ্লাস্ক।

মালয়ীরা নিজেদের ক্লেশের কথা ভুলে গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে তুয়ানের (সাহেবের) এই সংগ্রামে আতঙ্কিত হয়েছে, তারা একটা কোণে নীরবে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।

গেনর কিন্তু শুনতে পেয়েছেন। শুধু শোনা নয়, তিনি শুনেছেন এবং কথাগুলি তলিয়ে ভাবছেন।

প্রভাত হওয়ার আগেই গেনরকে টেনে তুলল কোলটন, স্ট্রেচারের পাশে জড়ো হয়ে বসে গেনর ঢুলছিলেন। কোলটন বল্‌ল—দেখো সব জিনিষ পরিষ্কার করাই ভালো। লোকটার অবস্থা সত্যি বড় খারাপ—(মাথা নেড়ে হাডসনের দিকে ইঙ্গিত করলেন)—কিন্তু আমরা আর কি করতে পারি। ওকে টেনে নিয়ে যেতে হলে আমরা যে অকূলে সেই অকূলেই থাকব। ওকে বাদ দিয়ে আমরা হয়ত এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়তে পারব। এটা হল কমন সেনস, আশা-করি তোমারও এতক্ষণে চৈতন্য হয়েছে।

—আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি ও'র সঙ্গে থাকব।

কোলটনের কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠল—সে প্রকৃত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, বলে ওঠে—তুমি একেবারে ব্লাডি ফুল—ছোকরা বয়েস ওসব স্কুলবয় মনোভাব ছাড়। এসব সিরিয়স ব্যাপার। আমি এই জঙ্গল ভালো-ভাবেই চিনি। যত তাড়াতাড়ি যেতে পারি আমরা ততই আমাদের ভালো। উনি নিজেও ত' আমাদের চলে যেতে বলেছেন। —তারপর একটু হেসে বল্‌ল—একটিমাত্র কমপাস আছে, সেটি আমার কাছেই আছে।

গেনর বল্‌ল—আমি তা জানি। তবে আমি থাকব, ও'কে ছেড়ে যেতে পারব না।

—তুমি একটি মহামূর্খ। কমপাস্ না থাকার ফলে তুমি কেবল ঘুরে ঘুরে মরবে, বৃত্তাকারে ঘুরবে। আমি ত' আর জোর-জবরদস্তি করতে পারি না।

গেনর যাবে না বুঝতে পেরে কোলটন মালয়ী পুলিসদের ডেকে বল্‌ল—দায়ুদ ও ইয়াকুব তোমরা সামনে থাকবে আর বাকী দুজন পিছনে চলবে।

সে প্রশ্ন করে—আর গেনর তুয়ান?

—উনি এখানেই থাকবেন ঠিক করেছেন।

কর্পোরাল আবদাল্লা তার সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করল, ইয়াকুব একেবারে ক্ষেপে ছিল। কোলটন চীৎকার করে—হারি-আপ—এটা আমার অর্ডার।

ইয়াকুব প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, সে বল্‌ল—আমরা তুয়ানকে ফেলে রেখে কোথাও যাবো না। আর সবাই ঘাড় নাড়ল সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে।

কোলটন চীৎকার করে ওঠে রাগে অন্ধ হয়ে, একা গেলে তার কোনো রাস্তাই নেই বাঁচার। মালয়ীরা জঙ্গলের সব-দিকটা ভালো করে জানে। সুতরাং ওদের কথার কথা বলার পথ নেই। তাই কোলটন বল্‌ল—আচ্ছা আর একটা দিন দেখা যাক। তোমাদের অবশ্য—না খেয়ে থাকতে হবে।

প্রতিটি ঘণ্টায় কোলটনের রাগ চড়তে থাকে। তার শারীরিক সাহসের অভাব নেই, কিন্তু এই মৃত্যুকল্প মানুষটা যে ওদের এই সংকট থেকে ত্রাণের পথ অবরোধ করে আছে, যে মানুষকে সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে এসেছে তার জন্য জীবনটা অবসান হবে একথা ভাবলেও আত্মহারা হয়ে পড়তে হয়।

মালয়ী পাহারাওলাদের গালাগালি দিচ্ছিল কিন্তু তারা বিড়বিড় করে প্রতিবাদ করায় থেমে গেল, এখন সব রাগটা পড়ল গেনরের ওপর, তার ওপর স্কুলের ছাত্রের মত রাগ দেখায় কোলটন।

একবার পথের বাঁকে এমনভাবে হোঁচট খেল যে স্ট্রেচারটা হাডসন সহ মাটিতে পড়ে গেল। গেনর বুঝল কোলটন ইচ্ছে করেই এটা করল। সে প্রতিবাদ জানায়।

কোলটন বল্‌ল—তুমি একটি হারাম-জাদা। এর মূল্য তোমাকে দিতে হবে।

দুর্ভাগ্য অনেক সময় মানুষের সদ্‌-গুণকে বিকশিত করে তোলে, এই ক্ষেত্রে কিন্তু তা চরম দুর্গতিতে পরিণত করল। কোলটন আর গেনরের মধ্যে বিদ্বেষ এমন বেড়ে গেল যে যাজকের প্রতি কোলটনের ঘৃণা তার কাছে কিছু নয়।

একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠ্‌ল রাতের আয়োজন করার সময়। মালয়ীরা জঙ্গলের ভেতর গেছে কাঠ সংগ্রহ করতে, আগুন জ্বালান হবে তার জন্য কাঠ দরকার। গেনর হাডসনকে আর একটু আরাম দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এমন সময় লক্ষ্য করল কোলটন শিবিরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি কি একটা পকেটে পুরছে। গেনর এমন ভাব দেখাল যেন সে দেখতেই পায়নি। কিন্তু ওর দিকে নজর রাখল। কয়েক মিনিট পরে আর সন্দেহ রইল না। কোলটন কিছু খাদ্যদ্রব্য লুকিয়ে রেখেছিল এখন তা খাচ্ছে।

গেনর চেপে ধরল, তখন কোলটন স্বীকার করে যে তার কাছে ইমার্জেন্সি পুলিস রেশন আছে। সে বল্‌ল—এ খাবার শুধু একজনের মত, আমি ঐ হতভাগা যাজকটার জন্য ত আর সুইসাইড করতে পারি না।

—তুমি একটি আস্ত পাষণ্ড।

—আমার সঙ্গে এভাবে কথা বল্‌বে না। তোমার মত একটা কুকুরের কথা আমি শুনতে রাজী নই। তুমি আর তোমার যাজক, দুজনেই ঘৃণ্য। কেন আমি তোমা-দের সঙ্গে অন্ন ভাগ করতে যাবো।

কথা শেষ হওয়ার আগেই গেনর ওর দিকে ছুটে গেলেন—কোলটন পিছু হটতে গিয়ে একটা গাছের শিকড়ে বাধা পেয়ে একেবারে পড়ে গেল, সেই মুহূর্তেই গেনর ওর গলাটা টিপে ধরলেন। কোলট হয়ত এইভাবে পড়ে গিয়ে কিঞ্চিৎ হতভ হয়ে পড়েছিল, যদিও দুজনের মধ্যে সে বেশী শক্তিমান, সে কিন্তু মোটেই যুঝতে পারল না। তার প্রতিরোধ ক্ষীণ। গেনরে মনে পড়ল কাদার হাডসনের উক্তি—এ জাতীয় মানুষ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত ক প্রয়োজন। ফাদার কি প্রলাপ বকছিলেন, এ তাঁর সচেতন বাণী। কোলটনকে হত করা কি ঠিক হবে?

গেনর কি যে করছেন তা বুঝ পারেননি, যখন উঠে দাঁড়ালে তখন কোলটন মৃত।

কি যে করেছেন গেনর তা চিন্তা করা অবসর নেই, কারণ, তুয়ান মারা গেছেন তুয়ান মারা গেছেন। বলে স্ট্রেচারের পা থেকে ইয়াকুব চেঁচিয়ে উঠল।

গেনর দৌড়ে গেলেন। হাডসন শু আছেন, মুখটা খোলা, দেহ কাঠ হ গেছে। স্তব্ধ এবং শ্বাসহীন। গেন মাটিতে বসে পড়ে দু-হাতে মু ঢেকে কাঁদতে থাকেন।

কতক্ষণ যে এইভাবে ছিলেন তা ম নেই, সহসা দেখা গেল কর্পোরাল আবদু দুজনের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকি বল্‌ছে—

—তুয়ান বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন এখন জ্বর নেই।

তৎক্ষণাৎ গেনর পরম স্বস্তিবো করলেন।

সত্যি হাডসন মৃত নয় জীবিত।

জ্বরটা সহসা ছেড়ে গেছে। তিনি বে শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন। গত ছত্রিশ ঘণ্টা ধ উনি মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসেছিলে এবং জ্বরে এতই ক্লান্ত ও কৃশ হয়ে পড়েছে যে ইয়াকুব ভুল করে নিদ্রাচ্ছন্ন হাডসনকে মৃত মনে করে চেঁচিয়েছে।

এই আবিষ্কারে স্বস্তিবোধ ক গেনর স্ট্রেচারের পাশে বসে ঘুমি পড়লেন, কোলটনের জন্য কোনো উদ্বে মনে নেই। সেইভাবেই ঘুমিয়ে পড়লে গেনর।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন নিবিড় অন্ধকার। শিবিরের পাশে যে আগুন জ্বালা হয়েছিল তার আভায় দেখা গেল হাডসনের সেই সময়ে ঘুম ভেঙেছে।

গেনর প্রশ্ন করলেন—কেমন আছেন? কিছু এনে দেব?

হাডসন বলে উঠ্‌লেন—আমি বেশ আছি আমি ভালোই হয়ে যাবো শীগ্‌গির।

কিন্তু এই কথায় গেনর চীৎকার করে উঠলেন। যে স্বর হাডসনের দেহ থেকে বেরিয়ে এলো তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। হাডসন তাহলে কোথায়?

রবার্ট কোলটনের সেই কর্কশ, ভাঙা-ভাঙা মিহিগলায় হাডসন কথা বল্‌লেন। এ-যে সেই কণ্ঠস্বর, সেই ভঙ্গী, সেই ঢঙ! তবে?

—অমিতাভ মজুমদার অনূদিত ও সংক্ষেপিত।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বিধাতার অপমৃত্যু

স্বর্গতঃ সুকুমার রায় লিখেছিলেন—"খেলার ছলে ষষ্ঠীচরণ, হাতি লোফেন যখন তখন—" ইত্যাদি। সেই সব গুণপনার অধিকারী ছিল বেনেটোলার ষষ্ঠীচরণ নামক পালোয়ান। এ-যুগের ষষ্ঠীচরণ ঠিক পালোয়ান নন, তবে শূন্যে গদা ঘোরানোর খেলায় ইনি যে পারদর্শী তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই ঊনত্রিশ বৎসর বয়স্ক (ভূতপূর্ব) বঙ্গসন্তান এক সময় ভারতবর্ষের রাজধানীতে সাংবাদিকের কাজ করেছেন এবং তার পূর্বাশ্রমের নাম ষষ্ঠী চক্রবর্তী। সম্প্রতি তিনি ষষ্ঠীব্রত—কিম্বা ষষ্ঠী ব্রাটা এই নামে আত্মপ্রকাশ করেছেন খাস বিলাত থেকে এবং তাঁর প্রথমতম গ্রন্থ "মাই গড ডায়েড ইয়ং" প্রকাশ করেছেন বিলাতী বটতলার বিখ্যাত প্রকাশক হাচিনসন কোম্পানী।

ষষ্ঠীব্রতের এই গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনী। অর্থাৎ ঊনত্রিশ বছরের সুদীর্ঘ জীবনের ঘটনাবহুল ইতিহাস। গ্রন্থটি অসাধারণ এবং চমকপ্রদ। এমন একটি আত্মকেন্দ্রিক ও আদিরসপুষ্ট গ্রন্থ কদাচিৎ প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠীব্রত ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী। তাঁর ইংরাজী ফুলুকো লুচির মত উপাদেয় এবং বক্তব্য বিষয় অভাবনীয়। তার কথা যে নতুন তা অবশ্য বলা যায় না, একথা আরো অনেকে অন্য ভাষায় অন্য ঢং-এ বলেছেন, কিন্তু ষষ্ঠীব্রতের রচনার মধ্যে আছে তীক্ষ্ণতা এবং তীব্রতা। মৌলিকত্ব না থাকলেও এই গ্রন্থটিতে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং ঊনত্রিশ বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অতিশয় স্পষ্ট এবং সাহসিক বিবরণ পাওয়া যাবে। একালের ষষ্ঠীচরণ যে হস্তী লোফালুফির মত দুরূহ কর্ম কত অনায়াসে, কত সহজে সম্পন্ন করতে পারেন তা দেখতে পারলে স্বর্গতঃ সুকুমার রায় নিশ্চয়ই হয়ত অবাক হয়ে যেতেন।

ষষ্ঠীব্রত যে সমাজের মানুষ সেই সমাজকে এদেশে নাক-তোলা সমাজ বলা হয়। কারণ, তাঁদের পরিবার যথেষ্ট আলোকপ্রাপ্ত এবং "English is always spoken in the home —"

সুতরাং যে হোম সুইট হোমে দিবা-রাত্র ইংরাজীতেই কথাবার্তা চলে, নেটিভ বাঙালীদের ভাষা সেইখানে অপাংক্তেয়। এই পরিবার রীতিমত বৈ-স্নব (অর্থাৎ বিশেষরূপ স্নব)। ষষ্ঠীব্রত নামটুকু কিঞ্চিৎ দেশীভাবাপন্ন, কিন্তু তার জন্য অবশ্য কেউই ষষ্ঠীব্রতকে দায়ী করবেন না। এ হেন ষষ্ঠীব্রতের সংসারে যে আজো 'নিগোসিয়েটেড ম্যারেজ' নামক আদিম প্রথা প্রচলিত আছে একথা স্বীকার করতে অনেকেই নারাজ হবেন। কিন্তু ষষ্ঠীব্রত তাঁর আত্মজীবনী "মাই গড ডায়েড ইয়ং—" গ্রন্থটিতে 'ইন সার্চ অব এ নেস্ট' নামক পরিচ্ছেদে যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তা লোমহর্ষক, নাক-উঁচু সমাজে যে আজো এই বর্বর রীতি প্রচলিত আছে একথা জেনে শুধু সাগরপারের সাহেবরা কেন আমরাও লজ্জায় বেগুনবর্ণ হয়ে পড়ছি। ষষ্ঠীব্রতের গুরুজনরা স্থির করলেন তাঁর একটা বিবাহ দেওয়া যাক, পাত্রী দেখাদেখি চলছে। একদিন এমনই এক অভিযানে পাত্রীদের ভবনে গিয়েছেন বরের মা, সেখানে কনের বাপ এবং স্বয়ং কনের গুহাবাসী সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেল, একেবারে চরম সেকেলে ব্যবস্থা,—শ্বশুরমশাই এগিয়ে এসে গাড়ি থামার পূর্বেই বরের মা'র চরণ স্পর্শ করছেন—

> "The man stepped ahead of the group and opened the door for my mother, even before the chauffer had switched off the eng ne. In an instant he had stooped down and touched her feet with his right hand and raised it is his forehead —"

কন্যাদায় যে কী ভীষণ দায় সেকথা 'সফিস্টিকেটেড ষষ্ঠীব্রতদের সম্ভবতঃ জানা নেই। বেচারী কনের বাপ, কন্যার ভাবী শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করে কি ভীষণ অন্যায় করেছেন তা তিনি হয়ত জানতে পারবেন না কোনোদিন, অন্ততঃ ষষ্ঠীব্রতের আত্মকথা না পড়লে একথা জানবেনই বা কেমন করে। কিন্তু বাঙ্গালী সমাজে যে কন্যার পিতার গলায় গামছা দিয়ে বরের বাপ এবং মা কাবুলীওলার মত চাপ দেন সেই সমাজে হয়ত শ্বশুর বেচারী পদধূলি গ্রহণ করে কিঞ্চিৎ কনসেস্যান আদায়ের ফিকির করেছিলেন। এই ঘটনাটি অবিশ্বাস্য অবশ্য নয়।

কিন্তু কনের অবস্থাটা কি রকম ছিল এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে ভেবে ষষ্ঠীব্রত ব্রীড়াবনতা এক অবগুণ্ঠনবতী অনূঢ়া কুমারীর বর্ণনা দান করেছেন—

> "Her face was covered, or nearly so by the sweep of her Sari — I could see very little of her except her forehead."

উঁচুতলার বাঙালী সমাজের মেয়েরা হয়ত আজকাল আগাগোড়া ঘোমটাবৃতা হয়ে কপালটুকু শুধু বার করে হবু বরের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন। নীচুতলায় কিন্তু এমনটি ঘটে না। অবশ্য সে-সব সংসারের সবাই বাংলাতেই কথা বলেন—ইংরাজীতে নয়।

ষষ্ঠীব্রত কলেজজীবনে ছিলেন ভীষণ 'ওম্যানাইজার' অর্থাৎ মেয়ে শিকারী। মেয়েদের সঙ্গে তাঁর যে সব যৌবনসুলভ মাখামাখি হয়েছিল তার নিখুঁত বর্ণনা-দানে তিনি কার্পণ্য করেন নি। এমন কি একটি মেয়ে তাকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিল (চিঠিগুলি কোন ভাষায় লিখিত ছিল উল্লেখ নেই) তা প্রায় সবকটি গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি করেছে। অবশ্য কলেজ বয় ষষ্ঠীব্রত যে কিসব লিখতেন তার কোনো ইঙ্গিত নেই।

ষষ্ঠীব্রত যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন সেই অতি অল্পবয়সেই যেসব চাঞ্চল্যকর এবং রসাল কীর্তি-কলাপ করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দানে পাঠককে বঞ্চিত করেন নি। বয়ঃসন্ধিকালের যৌন অভিজ্ঞতা বড় মুখরোচক বিষয়বস্তু। উঁচুতলার ছেলেরা যেসব ব্যয়বহুল বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেখানেও যে এমন সব রসাল কাণ্ডকারখানা ঘটে তা জেনে নীচুতলার সমাজের ছেলেদের চোখ কপালে উঠবে, আর বিলাতী পাঠকরাও যে খুব বিস্মিত হবেন তা মনে হয় না। অসকার ওয়াইল্ডের কালেও হোস্টেলবাসী ছাত্ররা পাঁচীল টপ্‌কিয়ে বেশ্যালয় গমন করেছে এমন নজীরও ত' আছে।

যাই হোক, ষষ্ঠীব্রত বর্তমানকালের ফ্যাসনমাফিক একজন ক্রুদ্ধ তরুণ। এই গ্রন্থটি নাকি ক্রুদ্ধ তরুণের মর্মকথা। তিনি সব কিছুই ঘৃণা করেন। যে-সজ্জন পরিবারে তিনি মানুষ, যে পরিবারে থেকে তিনি এমন ইংরাজীনবীশ হয়েছেন সেই পরিবার পর্যন্ত তার কাছে ঘৃণ্য।!

ষষ্ঠীব্রত যে কোনো কারণেই হোক তার পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে বীতরাগ এবং সেই বিতৃষ্ণা কি তাকে সমগ্র বাঙালী সমাজ সম্পর্কে বিতৃষ্ণ করেছে, কিংবা সমস্ত রাগটাই 'ছায়ার সঙ্গে লড়াই করা'—অর্থাৎ কল্পনাবিলাসী ওয়্যানাইজার তরুণের উদ্ভট কল্পনাবিলাস? গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পাঠ করার পর কেউ বলবে না লেখক প্রচণ্ড আত্মঘৃণার জ্বলায় জ্বলছেন। এই গ্রন্থে আছে লেখকের আত্মপ্রচারের আগ্রহ, অহংকারের পরিচয় ও প্রচণ্ড আত্মশ্লাঘা।

ষষ্ঠীব্রত-র এই গ্রন্থটির প্রতিটি পরিচ্ছেদ সুপরিকল্পিত প্রজাপতি যখন গুটির ভেতর থাকে তখন তার দৃষ্টিশক্তি বা বোধশক্তি কতটুকু তা প্রাণীতত্ত্ববিদরাই বলতে পারেন। ষষ্ঠীব্রত কিন্তু প্রতিভাধর মানুষ তিনি মাতৃগর্ভে থাকার সময়কার বৃত্তান্ত পর্যন্ত বর্ণনা করতে পেরেছেন। Glimples of a charpsalis. এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ এবং গুটিপোকার চোখ দিয়েই তিনি দেখতে সুরু করেছেন। তার ঊনত্রিশটি বসন্তকাল কেটে গেছে,—ষষ্ঠীব্রতর আত্মজীবনীর পরিচ্ছেদ নাম—

"Learning to fly," "Bird of the air," "In search of a nest",Cries of a trapped animal."

যে পাখির আকাশে ডানা মেলে ওড়ার কথা, সেই আকাশের পাখি বাসার সন্ধানে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত বন্দী পশুর মত ক্ষিপ্তহুংকার সুরু করল—কি আশ্চর্য রূপান্তর। এরই নাম অ্যাংরি ইয়ংম্যান,—এই অ্যাংরিদের জীবনের বিধাতারও তাই অকালে মৃত্যু ঘটেছে।

কিন্তু এইকথা সন্দেহ করা কি অন্যায় হবে যে ইদানীং আরো দুচারজন শিকড়-হীন ভারত সন্তানের অনুরূপ ভারত-বিদ্বেষী গ্রন্থের সাফল্য ইংরেজীনবীশ তরুণ বঙ্গসন্তানকে এই জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়নে প্রেরণা জাগিয়েছে। হয়ত—ইংরেজ পাঠকরা খুসী হবেন, গ্রন্থটির প্রচারও হবে তবে যে সব ভারতীয় এখনও ভারতকে ভালোবাসে এবং জীবিকা সন্ধানে বিদেশে গিয়ে পড়েছেন তারা বিরত হবেন। ষষ্ঠীব্রত স্বীকার করেছেন— "Perhaps I was not, cut out to be a genius after all" হয়ত তাই—তাই তিনি এই ঘৃণিত দেশে আর ফিরবেন না। এই গ্রন্থ সম্পর্কে ষষ্ঠীব্রত বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন—

"It is a personal testament and if my countrymen are led to take a new searching look at so much they consider natural and take for garanted, the attempt will have been justified."

এই উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ষষ্ঠীচরণ পলোয়ান আজো বর্তমান।

—অভয়ংকর

MY GOD DIED YOUNG: By SASTHIBRATA: Published by — HUTCHINSON: Price—35 Shillings.

ভারতীয় সাহিত্য

সারা ভারতে এখন মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গান্ধীজীর রচনার সংকলন এবং তাঁর জীবন সম্পর্কেও ভারতের বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ-ব্যাপারে মাদ্রাজ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মাদ্রাজের 'গান্ধী-রচনা প্রকাশন সমিতি' একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। গ্রন্থটির নাম হবে "তামিলনাদে গান্ধীজী"। আগামী বছরের জুন মাস নাগাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়।

'দৈনিক তামিলনাড়ু' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী এ রামস্বামী এই গ্রন্থ রচনার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গত ২৬ অকটোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই কাজে সহযোগিতার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। গান্ধীজী দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ-কালে এবং বিশেষভাবে মাদ্রাজ ভ্রমণকালে যেসব জায়গায় গিয়েছিলেন, সে সব জায়গা থেকে তা সাদরে গৃহীত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তামিল ভাষায় এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যাবে বলে আশা করা যায়।

'পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন' [illegible] আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। আটটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছিল।

(১) বিষয় : রবীন্দ্রোত্তর গীতি-কবিতা। প্রথম : সুখেন্দু রায়। দ্বিতীয় শর্বাতিনারায়ণ বসু। বিচারক : শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বিষয় : সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প। প্রথম : জ্যোতিষচন্দ্র সাহা, দ্বিতীয় : মিনতি দত্ত। বিচারক : শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। (৩) বিষয় : বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। প্রথম : মণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী, দ্বিতীয় : প্রদীপ-কুমার মজুমদার। বিচারক : শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য। (৪) বিষয় : বর্তমান বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য। প্রথম : দেবরঞ্জন ধর। দ্বিতীয় : আনন্দ ভট্টাচার্য। বিচারক : শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। (৫) বিষয় : লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। প্রথম : ধীরেন্দ্র-নারায়ণ রায়, দ্বিতীয় : দুলাল চৌধুরী। বিচারক : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। (৬) বিষয় : বাংলা নবনাট্য আন্দোলন। প্রথম : প্রবীর বসু। দ্বিতীয় : অনুপা ভৌমিক। বিচারক : শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। (৭) বিষয় : ভারতে সংসদীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ। প্রথম : কল্যাণ সিংহরায়, দ্বিতীয় : বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। বিচারক : শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। (৮) বিষয় : ইতিহাস চর্চার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। প্রথম : অমিয়বন্ধু সিংহ, দ্বিতীয় : বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিচারক : শ্রীবেলা লাহিড়ী।

এছাড়া আরো দুটি প্রবন্ধের যথা "গত কুড়ি বছরে বাংলার চিত্রকলা" ও "বিদেশে ভারতীয় সংগীতের প্রচার" বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ না পাওয়াতে এই বিভাগে প্রতি-যোগিতা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পুরস্কার ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে প্রদান করা হবে।

সাম্প্রতিক হিন্দি কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে 'ইউ-নেস্কোর' উদ্যোগে। গ্রন্থটি সম্পাদনা করে-ছেন শ্রীবিদ্যানিবাস মিশ্র। প্রকাশ করেছেন ব্লুমিংটন থেকে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস। এই সংকলনে ৪১জন আধুনিক হিন্দি কবির ৮১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন কয়েকজন হিন্দি কবির সহযোগিতায় আমেরিকান কবি ও অধ্যাপক। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

কবিতাগুলির অনুবাদ সম্পর্কে কিন্তু বিভিন্ন মহলে নানা প্রকার প্রশ্ন উঠেছে। 'রূপাম্বরা' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে শ্রীমনু-গুপ্ত অভিযোগ করে লিখেছেন—"এই অনু-বাদ মনে হয় আমেরিকান পাঠকদের জন্য। অহিন্দিভাষী ভারতীয়দের কাছে কবিতাগুলো মনে হবে 'আইটল্যান্টিকা'।" তিনি শ্রীমন্দীর

রতীর 'ঘাট কা বাদল' কবিতাটির মূলের সঙ্গে অনুবাদের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এই প্রসঙ্গে। শ্রীধর্মবীর ভারতীর এই কবিতাটির অনুবাদক হচ্ছেন এ ই নাথন। এই অনূদিত কবিতাটি মূল থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীসুমিত্রানন্দন পন্থের একটি কবিতার শেষ স্তবক প্রসঙ্গেও প্রায় একই কথা খাটে। অবশ্য এই সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় 'অজ্ঞেয়'র একটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তাতে অনুবাদগুলির বিশ্বস্ততা দাবী করা হয়েছে। বোধহয়, তাঁর দাবী সর্বাংশে সত্য নয়।

এই সম্মেলনের অবশ্য কয়েকটি উল্লেখ্য অনুবাদও সংকলিত হয়েছে। শ্রীকীর্তি চৌধুরী, শ্রীত্রিলোচন শাস্ত্রীর কবিতাগুলির অনুবাদ সার্থক হয়েছে। এই দুই-জনের কবিতার অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী জেসমিন্ড মিলস।

এই সংকলনের আর একটি ত্রুটিও সাহিত্যামোদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'অজ্ঞেয়', শ্রীকেদারনাথ সিং ও শ্রীকেদারনাথ অগ্রবালের একাধিক কবিতা সংকলিত হয়েছে, অথচ শ্রীমতী মহাদেবী বর্মার একটি কবিতাও এতে স্থান পায় নি। তাছাড়াও শ্রীরামকুমার বর্মা, শ্রীজগদীশ গুপ্ত, শ্রীভারতভূষণ আগরওয়াল, শ্রীগিরিজাকুমার মাথুর, শ্রীরাজকমল চৌধুরীকে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করলে সংকলনটি পূর্ণাঙ্গ হত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও হয়ত উল্লেখ করলে অলৌকিক হবে না। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশে হিন্দি সাহিত্যের অনেক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বাংলার বিদেশে প্রচারের জন্য বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেই। কিছু কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলেই এখনও বিদেশে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে।

আসামের প্রখ্যাত অশীতিবর্ষ বয়স্ক লেখক শ্রীনীলমণি ফুকন, গান্ধী শত-বার্ষিকী উপলক্ষে দুটি প্রতিষ্ঠানকে মোট পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান দুটি হল নাগাভূমি শীলাকে মিত্র আশ্রম ও কারকার্টিং সর্বোদয় গান্ধী আশ্রম। এই দুটিরই তিনি প্রতিষ্ঠাতা। গান্ধীজীর মতবাদের দ্বারা তিনি বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত। প্রসংগত উল্লেখ্য, নীলমণি ফুকন নামে আর একজন চীনদেশের প্রখ্যাত তরুণ কবিও আছেন।

বিদেশী সাহিত্য

প্রখ্যাত আইরিশ কবি ডবলিউ বি ইয়েটস-এর বিধবা পত্নী জর্জিনা ইয়েটস সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বছর।

১৯১৯ সালে ইয়েটস পত্নীপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন "হাউ শুড আই ফরগেট দি উইজডম দ্যাট ইউ ব্রট দি কমফোর্ট দ্যাট ইউ মেড ?"

ইয়েটস-এর কবিজীবনের ওপর এই মহিলাটির প্রভাব ছিল অপরিসীম। বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই ইয়েটস জর্জিনার রুচি-বোধ, সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ও কবিতার প্রতি ঔৎসুক্য দেখে এতটা মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁকেই তিনি তাঁর জীবনের অপরিহার্য সংগী হিসেবেই নয়, কাব্যভাবনারও সহমর্মী হিসেবে ভাবতে শুরু করেন।

১৯৬৩ সালে, ইয়েটস-এর মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর পরে তিনি আয়ারল্যান্ডের জাতীয় গ্রন্থাগারকে তাঁর সমস্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দান করেন।

প্রখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ইভান তুর্গেনেভ জন্মগ্রহণ করেন ১৮১৮ সালে। ১৮৮৩ সালে ৬৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান। আগামী নভেম্বর মাসে পালিত হবে তাঁর ১৫০তম জন্মদিবস।

এই উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থান ওয়েল-এ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। তুর্গেনেভ পরিবারের অতীত ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব পালন করছেন স্থানীয় তত্ত্বাব-ধায়কেরা। পঞ্চাশ বছর আগে ওয়েলে স্থাপিত হয় তুর্গেনেভ মিউজিয়াম। সম্প্রতি এই মিউজিয়ামের অনেকগুলি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। যেমন (১) তুর্গেনেভ এবং ফরাসী বিপ্লব, (২) তুর্গেনেভের নাটক, (৩) বহির্বিশ্বের সঙ্গে তুর্গেনেভের সম্পর্ক —ইত্যাদি। তাঁর রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের সমস্ত বই বর্তমানে সংগৃহীত হয়েছে। এই মহান রুশ সাহিত্যিকের একটি প্রতিমূর্তি শীঘ্রই শহরের পার্কে স্থাপিত হবে।

পৃথিবীর সব দেশেই ইদানীং সচেতন পাঠকের সংখ্যা বেড়েছে। সাহিত্যিকরাও এ ব্যাপারে অসতর্ক নন। নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে প্রায় পৃথিবীর সব দেশেই। ভালো হোক, মন্দ হোক একটা পরিবর্তন চাই—একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান।

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর লেখক অ্যালফ্রেড অ্যান্ডার্শথ 'এফ্রেইম' নামে একটি নতুন উপন্যাস লিখে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। নায়কের নাম-অনুসারেই উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ বিভাগ ও আঙ্গিক-গঠনের দিক থেকে উপন্যাসটি অভিনব। নায়কের ডায়েরীতে যে-সকল ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়—তারই পরি-প্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বর্তমান জার্মান সমাজের ব্যর্থতা এবং ঘাতময় দিকগুলির আবরণ উন্মোচন করাই অবশ্য লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

'ফ্রাংকফুর্টার অ্যালগেমাইন জাইটুং' নামে একটি পত্রিকায় উপন্যাসটির কিছু কিছু অংশ পূর্বে ছাপা হয়েছিল। তখনই পাঠকমহলে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে যায়।

অ্যান্ডার্শথ-এর বর্তমান বয়স পঞ্চাশ বছর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যেসব সাহিত্যিক পশ্চিম জার্মানীতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন—তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম শক্তিশালী লেখক। গত জানুয়ারী মাসে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

উপন্যাসটির নায়ক এফ্রেইমের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পৃথিবীর যে-কোনো ঘটনাই তার মনের ভেতরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। 'ক্রাইস্ট অ্যান্ড ভেল্ট' সাপ্তাহিকের জনৈক সমালোচক বলেন, 'এতে অঙ্কিত হয়েছে আমাদের জীবনের সেই ছবি, যা আমাদের যুগের বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।'

পশ্চিম জার্মানীর আরেকজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হলেন রাইনহার্ড বমগার্ট।

বর্তমানে তাঁর বয়স আটত্রিশ বছর। 'ডেয়ার লোবেনগাটেন' (১৯৬১) এবং 'হাউস মিউজিক' (১৯৬২) নামে দুটি উপন্যাস লিখে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সম্প্রতি 'প্যানজারফ্রজা পটজমাকিন' নামে তাঁর বারোটি ছোট গল্পের একটি সংকলন বেরিয়েছে।

সমালোচক গুন্টার ব্রকার বলেন, এই সংকলনের গল্পগুলিতে লেখক বমগার্ট পশ্চাৎপটের বর্ণনায় ও পটভূমিকার পরিবর্তনে যে কতখানি দক্ষ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলো। লেখক এই সংকলনের গল্পগুলিতে বাস্তবতাকে আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়—বরং নিজস্ব পরিবেশের ভিত্তিতে দেখেছেন ও বিচার করেছেন। ব্যক্তিচরিত্র ও ঘটনাকে তিনি এমন জায়গায় এনে দাঁড় করান, যেখানে তারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বমগার্ট বলেন, যেসব লেখক তাদের অপ্রিয় চরিত্রগুলিকে সহানুভূতির সংগে গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁদের বিশ্বাস করা শক্ত।

এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্য দিয়ে লেখক আন্তরিক সততার জন্যে নিজের প্রতি পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করেছেন।

সম্প্রতি আর্নেস্ট হের হাউস 'ভাই হোমবুর্গিশখ হোখজাইট' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। দর্শন-সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সুপরিচিত।

এই উপন্যাসে হের হাউস চিত্রকল্প ও মনস্তত্বের সুন্দর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সাধারণত মনস্তত্বমূলক উপন্যাসের সমাপ্তি বিষাদাত্মক হয়ে থাকে। কিন্তু লেখক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সকল প্রকার জটিলতাকে স্বীকার করে নিয়েও এর সুখী-সমাপ্তি ঘটাতে পেরেছেন।

জনৈক সমালোচক লিখেছেন, 'দর্শন-সাহিত্যের হের হাউস একটি নতুন নাম। কিন্তু প্রথম উপন্যাসেই যে তিনি এমন অভাবিত সাফল্য দেখাবেন তা যেন কল্পনারও অতীত।'

এই উপন্যাসটি প্রধান চরিত্র এরিখ হ্যালস। পাগলামির জন্য তাকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হয়। সেখানে সে হামবুর্গ উইডিং নামে একটি স্বীকারোক্তি রচনা করে।

এরিখ বুঝতে পারে, সে প্রকৃতপক্ষে পাগল নয়। সমাজের ত্রুটীর জন্যই তাকে পাগলা গারদে আনা হয়েছে। চিকিৎসকেরাও স্বীকার করেন যে, লোকটি আসলে প্রকৃতিস্থ। কুসংগে মিশে খারাপ কাজ করে বলেই ভুল করে তাকে উন্মাদাগারে পাঠানো হয়েছে।

হের হাউস-এর মতে, পৃথিবীটা একদিক থেকে অদ্ভুত এবং রহস্যময়, অন্যদিকে অর্ধসত্য ও স্বাভাবিক। সম্পূর্ণভাবে কেউ সুস্থ নয়, আবার অসুস্থও নয়।

নতুন বই

বারো মাসে তেরো পার্বন :

কি ও কেন? (আলোচনা) — স্বামী নির্মলানন্দ। ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ২১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা—১৩। দাম চার টাকা।

ধর্ম যদি শুধু শ্রুতিতেই (অর্থাৎ সংহিতা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে) নিবন্ধ থাকত, যদি আমাদের দেশে রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্য, আঠারো পুরাণ ও বিবিধ উপপুরাণ রচিত না হত, তবে ধর্মচর্যা জিনিষটা হয়ত শুধু পাণ্ডিত-সমাজেই সীমাবদ্ধ থাকত; আমাদের দেশের অগণিত জনগণ ধর্মকে আশ্রয় করে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ লাভ করতে পারত না। অবশ্য এ দেশের তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা ষড়দর্শন রচনা করেছেন এবং প্রত্যেকটি দর্শনের উপরেই নানা ভাষ্য, টীকা ও নিবন্ধ রচিত হয়েছে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাদের মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে নি। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে চিত্তাকর্ষক কাহিনী জনজীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে এবং পরম কল্যাণের পথের নির্দেশ দিয়েছে। আবার আমাদের দেশের কুমারী ও সধবা নারীরা নানারূপ পৌরাণিক ও লৌকিক ব্রতের আচরণের মধ্য দিয়েই অন্তরের কামনাকে চরিতার্থ করেছে এবং সংযম, স্বার্থত্যাগ, জীবে দয়া প্রভৃতি শিক্ষা করেছে, শুধু তাই নয়, এই সকল ব্রতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তারা জীবনে মহত্তম দুঃখকে জয় করবার এবং সকল অবস্থায় ভগবানের মংগলময় বিধানে বিশ্বাস অবিচল রাখবার শিক্ষা গ্রহণ করেছে। যা লোকসংস্থিতির হেতু, তাই যদি ধর্ম হয়, তবে পৌরাণিক ও লৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে ধর্মসাধনারই অন্তর্গত। আমাদের দেশের ঋষিরা ও সমাজপতিরা উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষে মানুষে রুচি ও প্রবৃত্তির ভিন্নতা আছে, তাই সকলের ধর্মসাধনা একরূপ হতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে অধিকারবাদের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের দেশের বুদ্ধিমান শাস্ত্রকার ও সমাজপতিরা বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য বিভিন্ন রূপ ধর্ম-সাধনার ব্যবস্থা দিয়েছেন। আমাদের গৃহের সধবা ও কুমারী মেয়েরা যে সকল পৌরাণিক ও লৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠান করে থাকেন, তাই তাদের ধর্মসাধনা, আর এই ধর্মসাধনার মধ্য দিয়েই তারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ করে থাকেন।

বাংলা দেশের নানা অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন মেয়েলি ব্রতকথা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছে সত্য কিন্তু এই সব গ্রন্থে প্রধানত বিভিন্ন ব্রতোপাখ্যানই বর্ণিত হয়েছে, আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ও জাতিগঠনে 'বারো মাসে তেরো পার্বণের' সার্থকতা কতখানি, সে সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি। এই দিক দিয়ে শ্রদ্ধেয় স্বামী নির্মলানন্দের 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' বইখানি নতুন আলোকসম্পাত করেছে। আর এই জন্য গ্রন্থকার নিঃসন্দেহে আমাদের অভিনন্দনযোগ্য। লেখক তাঁর গ্রন্থে এই কথাই প্রতিপন্ন করেছেন যে, সুশৃংখল ও শান্তিময় পারিবারিক জীবন-গঠনে, এবং সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণসাধনে পুরাণোপদিষ্ট ও লোকায়ত ব্রতচর্যার মধ্য দিয়েই আমাদের কুলবধূরা প্রবৃত্তিমার্গকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে নিবৃত্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

সুপণ্ডিত লেখক গ্রন্থখানিতে দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা প্রভৃতির সার্থকতা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এই সব পূজার ভিতর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও সংকেত নিহিত আছে।

ব্রতোৎসবের মধ্য দিয়ে ব্রতিনী নারীরা যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের হাত থেকে নিবৃত্তির উপায় সন্ধান করেছেন এবং প্রবৃত্তিমার্গকে স্বীকৃতি দান করেও ধীরে ধীরে নিবৃত্তির দিকে অগ্রসর হয়েছেন, প্রচুর দৃষ্টান্তের সাহায্যে লেখক তা প্রমাণ করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা (১) সূচনা, (২) কুমারীর ব্রতচর্যা ও ব্যক্তিজীবনে চরিত্রনীতির শিক্ষা, (৩) সধবার ব্রতচর্যা ও ব্যক্তিজীবনে আত্মবিকাশের সাধনা, (৪) ব্রতোৎসব ও আদর্শ পারিবারিক জীবন, (৫) ব্রতোৎসবে জাতিগঠন, সমাজোন্নয়ন ও রাষ্ট্রচিন্তার নানা দিক, (৬) ব্রতোৎসবে দুঃখনিবৃত্তির উপায় সন্ধান, (৭) ব্রতোৎসব ও নির্মুক্তি-যোগের কথা, (৮) পরিশিষ্ট।

পান্তুপিকু (ছড়া)—অজয় গুপ্ত। পূর্ব-দেশ প্রকাশনী। ৮৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট। কলকাতা-৯। দাম দু'টাকা।

অজয় গুপ্তের পান্তুপিকু বাংলা কিশোর সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। রাজগুবি আর উদ্ভট কল্পনার ছড়াগুলি না লিখে, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সুন্দর এক মোহনীয় জগতের সৃষ্টি করেছেন। কেবলমাত্র ছোটদের নয়, বড়দেরও বইটি পড়তে ভাল লাগবে।

●

...নের রঙ সোনা : [কাব্যগ্রন্থ]—বীরেন চক্রবর্তী।। মানস প্রকাশনী ৬৪ বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১২।। দু টাকা।

ছন্দপ্রয়োগে বীরেন চক্রবর্তী গতানুগতিক হলেও শব্দ ও চিত্রের আকস্মিক উপস্থাপনায় স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করতে চান বলে মনে হয়। এই কাব্যগ্রন্থে কবির পঁয়তাল্লিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। কয়েকটি কবিতা উচ্ছ্বাসপূর্ণ। কবির সংযমবোধ থাকলে এগুলিই ভালো কবিতা হয়ে উঠতে পারতো। একটি দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি বহু ক্রোধ ও বিদ্রূপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কাদের উদ্দেশ্যে তা সঠিক বুঝে-ওঠা কঠিন। মনে হয়, শিল্প-সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি, বন্ধুবান্ধব ও শত্রু-মিত্র নিয়ে তিনি ভয়ানক বিব্রত।

●

খ্রীষ্টীয় নাট্য-সংকলন —বঙ্গীয় খৃস্টীয় সাহিত্য-কেন্দ্র। ৬নং রিভার-সাইড রোড, বারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ। দাম—দু'টাকা মাত্র।।

বাংলা দেশের খৃস্টান সমাজ একটি বিরাট গোষ্ঠী, এ'দের ধর্ম ভিন্ন হলেও অধিকাংশ বাঙালীর সংস্কৃতিই এ'দের সংস্কৃতি, বাঙালীর ভাষাই এ'দের ভাষা। অতীতে এই খৃস্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করলেও মাঝে খৃস্টীয় বাঙালী লেখকের সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। সম্প্রতি খৃস্টীয় সমাজ থেকে 'বিশ্বজ্যোতি', 'বায়ণ', 'আলোক সরনি' নামক কয়েকখানি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়ায় খৃস্টান বাঙালী লেখকের রচনা কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে, সেইসব পত্রিকায় কিছু কিছু শক্তিমান লেখকের আবির্ভাবও ঘটেছে। 'খৃস্টীয় নাট্য সংকলন' গ্রন্থটির প্রথম চারটি নাটিকা বিদেশী নাটকের অনুবাদ এবং এগুলি অনুবাদ করেছেন অনুবাদককর্মে সিদ্ধহস্ত বিজন ঘোষ। বাকী তিনটি নাটিকা মৌলিক এবং সেগুলি লিখেছেন গৌতম মুখোপাধ্যায়ে ও সুনীল দত্ত, সজীব সরকার এবং অরিন্দম নাথ। বিজন ঘোষকৃত অনুবাদগুলি বিশ্ব-খ্যাত রচনার বঙ্গানুবাদ এবং অনুবাদে যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। ৫, ৬ এবং ৭ নম্বরের তিনটি মৌলিক নাটিকার নতুনত্ব আছে, তবে তিনটি নাটকীয় খৃস্টীয় চরিত্র এবং কাহিনীর সূত্র ধরে রচিত তাই পাত্রপাত্রী এবং পরিবেশ অপরিচিত। মৌলিক নাটিকাগুলিতে শক্তির পরিচয় আছে। মঞ্চোপযোগী শিল্পচাতুর্যে সমৃদ্ধ হয়ে নাটিকাগুলি উৎসব উপলক্ষে মঞ্চস্থ করায় উপযোগী। ভাষা এবং রচনাভঙ্গী বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

●

আজিকার উত্তর ভিয়েৎনাম (সংকলন) সম্পাদক—পি জে হনি। অনুবাদ—দীপক চৌধুরী। এশিয়া পাবলিশিং কোং। কলিকাতা বারো। দাম দেড় টাকা।

পি জে হনি লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ নামক প্রতিষ্ঠানে ভিয়েৎনামী ভাষার অধ্যাপক। এই গ্রন্থটি ফরাসী লেখক ফিলিপ ডেভিলাস,', হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বারনার্ড বি, ফল, সাইগনের সাংবাদিক নু ফোঙ, ফরাসী ঐতিহাসিক জেরার্ড টনগার্ন, ডঃ গোগুয়েন নক বিচ (১৯৬১-র নির্বাচনে নো দিয়েমের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী) ও আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ গিনসবার্গের কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে। ফিলিপ ডেভিলার্স বিভক্ত ভিয়েৎনামের একীকরণ সমস্যা প্রসঙ্গ নিয়ে বলেছেন ঐক্যসাধন এখন শুধু সময় সাপেক্ষ। লাওসের দিক থেকে সীমান্ত-অঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণে মেলামেশা সুরু হয়েছে এবং তার সুফল পেয়েছে কম্যুনিস্টরা। ভূমিকা অংশ ছাড়াও সম্পাদক নিজে লিখেছেন হো চি মিনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী প্রসঙ্গে। তাঁর বিশ্বাস ডেমোক্রাটিক নেতৃবৃন্দ রাশিয়া আর চীনের মাঝামাঝি একটা মধ্যপথ ধরে চলবেন ,এবং বিবদমান অবস্থায় কোনো পক্ষকেই তাঁরা সমর্থন করবেন না। নু ফুঙ লিখেছেন, বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী সম্পর্কে, এই প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। রাজনৈতিক ঘূর্ণীবাত্যায় শিল্পী ও লেখকদের যে কি বিভ্রান্তিকর অবস্থা ঘটে, এই প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সুপরিচিত লেখক দীপক চৌধুরী অনুবাদকর্মে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

এ দেশের মেয়ে। সম্পাদক : বেলা দে। ১৩এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা—৪। দাম তিন টাকা।

বেলা দে সম্পাদিত 'এদেশের মেয়ে' সংকলনটি রচনায় এবং সম্পাদনায় বেশ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রাঙ্গণে, অঙ্গনা, স্মৃতিকথার সমাবেশে সংগ্রহটি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই সংগ্রহে স্মৃতিকথা পর্যায়ের রচনাগুলি সব থেকে মূল্যবান। এই পর্যায়ে লিখেছেন শ্রীশ্রীমা, প্রতিমা ঠাকুর, বাসন্তী দেবী, মায়া দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, গিরিবালা দেবী, সুরুচি সেন-গুপ্ত, মনীবালা ব্রহ্মচারী, প্রমীলা রায়-চৌধুরী শান্তা দেবী, পূর্ণিমা ব্রহ্মচারী, অপর্ণা দেবী, ইন্দিরা দেবী। অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেন রমা চৌধুরী, শ্রীঅর্চনা পুরী, আশাপূর্ণা দেবী, মায়া বসু, জয়ন্তী সেন, বেলা দেবী, গার্গী গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রিতা দেবী, লীলা মজুমদার, বাণী রায়, হিরন্ময়ী বসু, নীলিমা মুখোপাধ্যায়, রমা অধিকারী, কণপ্রভা ভাদুড়ী, উমা রায়, রাধারাণী দেবী, কবিতা সিংহ, নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তা বসু, অমিতা রায়, অরুণা মুখোপাধ্যায়, এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, বিনতা রায়, জয়শ্রী চক্রবর্তী, অমলাশঙ্কর, সুচিত্রা মিত্র, আশা দেবী, কাজল ঘোষ, হাসিরাসি দেবী এবং আরো অনেকে। বাঙলা দেশের মেয়েরা এই পত্রিকাটি ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখতে পারেন।

●

বৈজয়ন্তী যুগ্ম সম্পাদক : শুভেন্দু দত্ত ও জ্যোতির্ময় মজুমদার। সি।৬৯, বাঘাযতীন পল্লী, কলকাতা—৩২। দাম ১ টাকা ৭৫ পয়সা।

'বৈজয়ন্তী'র এই শারদ সংকলনটি খ্যাত ও অখ্যাত লেখকের লেখনীধন্য। সুন্দর সাহিত্যরুচির ছাপ এর সর্বাঙ্গে। এতে লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, রাণু বসু, শঙ্কর রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, ভবানী মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। আমাদের বিশ্বাস, বৈজয়ন্তী'র 'বজয় অভিযান' পরবর্তীকালে আরো সুন্দর সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

●

দীপন। সম্পাদক : রণজিৎ পাল। ভট্টাচার্য-পাড়া, লালাকুঠী, ব্যারাকপুর, ২৪-পরগণা। দাম : দুই টাকা।

'দীপন'-এর শারদ সংকলনটির মুদ্রণ-পরিপাট্য লক্ষণীয়। কারখানার কর্মী 'কয়েকজন বন্ধুর স্বপ্ন' এই পত্রিকাটিতে তাঁরা সত্যিই সাহিত্যরুচির পরিচয় দিতে পেরেছেন। প্রবন্ধ, কবিতা, ও গল্প লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য, বরুণ রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, যোগব্রত চক্রবর্তী ও আরো অনেকে।

●

মধ্যাহ্ন সম্পাদক : শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুখেন্দু ভট্টাচার্য। ৬৮ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। দাম এক টাকা।

লিখেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, শান্তিকুমার ঘোষ, মীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আলোক সরকার, চিত্ত সিংহ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য গুহ, দিলীপ মিত্র, সুবন্ধু ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন।

রাত তখন দশটা

দেবল দেববর্মা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দশ

সাততলা বাড়ীটার চূড়োর দিকে মাথা তুলে তাকাল রাজীব। রাস্তা থেকে উঁচুতলার জানালা দরজা সব কেমন ছোট ছোট লাগে। হাতের সিগারেটটায় শেষটান দিয়ে সেটা ফুটপাতে ফেলে দিল রাজীব। তারপর জুতোর নীচে চেপে দিল আগুনটুকু।

একতলাটিও রাস্তা থেকে সামান্য কিছু উঁচুতে। তিন চারটি সিঁড়ির ব্যবধান। হৃষ্টচিত্ত বালকের মত কয়েক লাফে সিঁড়ি-গুলি অতিক্রম করে রাজীব লিফটের কাছে এসে দাঁড়াল। দেওয়ালে ছোট ছোট কাঠের ফলকে কিংবা প্লাস্টিকের অক্ষরে বিভিন্ন সব কোম্পানীর নাম এবং তাদের অস্তিত্বের হদিশ। কেউ তিনতলায়, কেউ চারতলায়.... কেউ বা সর্বোচ্চ, অর্থাৎ সাততলাতে।

রাজীব তার ঈপ্সিত কোম্পানীটির নাম খুঁজছিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কোম্পানীর নামটি তার দৃষ্টিতে এল। অফিস এই বিল্ডিঙেরই পাঁচতলায়। রাজীব এবার খুশীমনে নিম্নগামী লিফটের প্রতীক্ষায় দাঁড়াল। লিফট নেমে এলেই সে পাঁচতলায় পৌঁছবার জন্য খাঁচাবন্দী হবে।

পাঁচতলায় বেটিস অ্যাণ্ড রবসন কোম্পানীর অফিসটা বাঁদিকে। ডান দিকে ছোট ছোট আরো দু-তিনটে অফিস। কিন্তু

আগের ঘটনা

[দিকনগর পেপার মিলের অপারেটার মিস তরঙ্গমালা এক রাতে খুন হল। এতে জড়িয়ে পড়ে তারই প্রেমিক নিখিলেশ সেন। এখন সে হাজতে বন্দী। কেসটা হাতে নিল সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল। শচীদুলাল তার সহকারী। নিখিলেশের বন্ধু শশাঙ্ক ভট্টাচার্য। তরঙ্গেরও সে পরিচিত।

তদন্তে এসে ঘটনাস্থলের কাছে একটা ছোট্ট বোতাম আর রুমাল কুড়িয়ে পায় রাজীব।

ওরা এল তরঙ্গের মেসে। সেখানে তরঙ্গার রুমমেট, পেপার মিলেরই আর এক টেলিফোন অপারেটর সুজাতা দাসের সঙ্গে খুনের ব্যাপারে কথা হল। এর পর তরঙ্গের মাকেও অনেক জেরা করল। তোরঙ্গে খুঁজে পাওয়া গেল 'এস' লেখা আংটি রেস্তোরাঁর দুটি ক্যাশমেমো। এবার পরিচিত হল প্রভা মুখার্জির সঙ্গে। 'খেলুড়ে' তরঙ্গেরই রুমমেট। সুব্রত জানতে পেল তরঙ্গের প্রতি মিলের অপারেটর ভৈরব দত্ত, কর্মী বিশ্বনাথ বসুর দুর্বলতা।

এর পর জেরা করা হল মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তীকে। তরঙ্গের সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা ধরা পড়ে গেল। সন্দেহের খাতায় আর একজনের নাম উঠল। রাত আটটা হবে তখন। বাড়িতে বসে রিপোর্ট লিখছে রাজীব সান্যাল। এমন সময় ফোন এল। ওপারের কণ্ঠ : আমি হত্যার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে চাই।]

বাঁদিকটায় বেটিস অ্যান্ড রবসনের নিরঙ্কুশ একাধিপত্য। অনেক লোকজন. কেরানীকুল নিবিষ্টমনে কাজ করছে, ছোট ছোট কামরায় অফিসারদের বসবার স্থান। এক নজরে দেখেই রাজীব বুঝল। বেটিস অ্যান্ড রবসন ছোট কোম্পানী নয়। মাঝারি তো বটেই. হয়তো বড়ই বলা যায়। হেড অফিসে প্রায় শ'খানেক লোক কাজ করছে।...ফ্যাক্টরিতে এবং অন্যান্য শাখায় মিলিয়ে কর্মচারীর সংখ্যা নিতান্ত কম হবে না।

এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে রাজীব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। ফলকে নাম লেখা— মিঃ টি মুখার্জি। সুইং ডোরের ফাঁক দিয়ে চকিত দৃষ্টি হেনে রাজীব লক্ষ্য করল. বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের এক ভদ্রলোক টেবিলের ফাইলের উপর ঝুঁকে একমনে কি যেন পড়ছেন। মোটা কালো ফ্রেমের চশমা চোখে। খুব গম্ভীর বলে মনে হল মানুষটাকে। সামনের দিকের চুলগুলি উঠে গিয়ে কপালটাকে আরো চওড়া দেখাচ্ছে। উর্দিপরা চাপরাশীর হাতে নিজের নাম আর পরিচয় লিখে পাঠাল রাজীব। এক টুকরো কাগজের উপর পরিষ্কার গোটা-গোটা অক্ষরে লিখল.—রাজীব সান্যাল, সি আই ডি ইন্সপেকটর।

শ্লিপ পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান। এই ধরনের কোম্পানীগুলোকে রাজীবের ভালোই চেনা। সরকারী কর্মচারী এলেই ওরা সাদর আহ্বান জানায়। আর পুলিশ এলে তো দু'হাত গুটিয়ে আসার অবস্থা। এ ক্ষেত্রে সি আই ডি'র অকস্মাৎ আবির্ভাব নিশ্চয়ই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে ভাবিয়ে তুলেছে। কি এমন গাফিলতি হল কোম্পানীর? কোন [illegible] ধরা পড়ে গেল আবার। চিন্তা সেইটা নিয়ে। ভয়ের উৎপত্তি সম্ভবত সেখান থেকেই।

হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন মিঃ মুখার্জি। 'আসুন স্যার। বলুন, কি প্রয়োজনে আপনার আসতে পারি?' উর্দিপরা বেয়ারাটাকে চোখের ইঙ্গিতে সম্ভবত চা আনতে নির্দেশ দিলেন অফিসার।

রাজীব গদীআঁটা চেয়ারে আয়েসী-ভঙ্গীতে বসল। বলল, 'আমি মথুরাপুর থেকে আসছি। একটা এনকোয়ারীর ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার হবে।'

'মথুরাপুর? সে তো অনেক দূর স্যার!'
'হ্যাঁ। বাংলা দেশের এক প্রান্তে বটে।'

মিঃ মুখার্জি হাসলেন। বললেন, 'কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে স্যার?'

রাজীব কনুইয়ের উপর ভর রেখে টেবিলে উপর ঝুঁকে বসল।

—'আচ্ছা, মিস সুজাতা দাস বলে এক ভদ্রমহিলা আপনাদের এখানে কাজ করতেন?'

'সুজাতা দাস?—হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে।' মিঃ মুখার্জি কিছুক্ষণ ভেবেই যেন মেয়েটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

রাজীব বলল, 'এই কোম্পানীতেই কাজ করতেন ভদ্রমহিলা!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের হেড-অফিসেই টেলিফোন অপারেটর ছিল মেয়েটি। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা স্যার!'

'অনেকদিন তো হবেই।' রাজীব সায় দিল, 'দু বছরের বেশী। এখানের চাকরী ছেড়ে দিয়ে উনি দিকনগর পেপার মিলে চলে যান!'

—'তা হবে স্যর। মিস সুজাতা দাস কোথায় চলে গেলেন অত আমার মনে নেই। ওর বদলে আর একটি মেয়েকে নিলাম আমরা। তিনিও বেটার চান্স পেয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। বৎসরখানেক হল আর একজন এসেছেন। তিনিও মিস দাস, —সুস্মিতা দাস না কি নাম যেন।'

রাজীব সান্যাল ধীরে ধীরে বলল, 'মিস সুজাতা দাস সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন আছে আমার। আচ্ছা উনি এখানের চাকরী কেন ছেড়ে দিয়ে গেলেন বলতে পারেন? আমি শুনেছি উনি স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিলেন—।'

—'কেন চলে গেলেন, তা চট করে বলা মুশকিল। তবে একটু খুঁজে ওর সার্ভিস ফাইলটা দেখলে হয়ত কারণটা জানা যাবে।'

—'সার্ভিস ফাইলে কী পাবেন আশা করছেন?'

'মানে ওর রেজিগনেশন লেটারটা দেখতাম। কেন উনি ছেড়ে যেতে চাইলেন তা নিশ্চয়ই লেখা থাকবে।'

'কালি-কলমে যে কারণই দর্শানো থাক, তাতে আমি ইন্টারেস্টেড নই। আচ্ছা আপনাদের অফিসে মিস সুজাতা দাসের সঙ্গে কার ঘনিষ্ঠতা ছিল বলতে পারেন?'

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে চিন্তিত মনে হল। কপালে কোঁচকানো চিন্তার রেখা পড়ল। ভদ্রলোক বললেন, 'মিস দাসের সঙ্গে কার বন্ধুত্ব ছিল একটা চট করে বলতে পারছি না। আচ্ছা দাঁড়ান, একজনের কাছে খোঁজ নিচ্ছি।'

বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন মিঃ মুখার্জি। ইতিমধ্যে নকশা শোভিত ট্রের উপর চায়ের কাপ সাজিয়ে সে এদিকেই আসছিল। টেবিলের উপর ধূমায়িত চায়ের কাপ রেখে লোকটি চলে যাবে কিনা ভাবছিল। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ডাকলেন ওকে।

'ডেসপ্যাচ সেকশনের সুরেশবাবু এসে-ছেন না? যদি ঘরে থাকেন তো ডেকে আন ওঁকে।' মিঃ মুখার্জী আদেশ করলেন।

একটু পরেই বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়সের একটি কালো ছিপছিপে ভদ্রলোক ঘরে এসে দাঁড়াল। লোকটির চুল সুন্দর-ভাবে ব্যাকব্রাশ করা। এমনও হতে পারে যে সীট ছেড়ে উঠে আসবার আগেই সে চুলে চিরুনি বুলিয়েছে। ভদ্রলোকের গলা সুন্দরী মেয়েদের মত ঈষৎ লম্বা। ডানদিকে ঘাড় কাত করে দাঁড়াবার ভঙ্গি।

মিস্টার মুখার্জি বললেন, 'আচ্ছা সুরেশবাবু, আমাদের অফিসে মিস সুজাতা দাস বলে একটি মেয়ে কাজ করত না? টেলিফোন অপারেটর—। আপনার মনে পড়ে?'

দেখা গেল সুরেশবাবু মিস দাসকে ভোলেননি। সহসা একটি হাসির তরঙ্গে চোখদুটি উজ্জ্বল দেখাল সুরেশবাবুর।

উপরং' হেসে ভদ্রলোক বলল, 'উনি তো আমাদের অফিস থেকে হঠাৎ চলে গেলেন।'

'হঠাৎ মানে?' রাজীব চোখ তুলে তাকাল।

'মানে, কোনরকম সাড়াশব্দ না দিয়ে। একদিন সকালে এসে দুম করে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন ম্যানেজারের ঘরে। বিকেল থেকেই ওর রেজিগনেশন অ্যাকসেপটেড হয়ে গেল, ব্যস, পরদিন সকাল থেকেই উনি আর এলেন না।'

'তাই নাকি?' রাজীব সাগ্রহে তাকাল। —'চাকরী ছাড়ার ব্যাপারে কোনো কথা আপনাদের বলেছিলেন নাকি?'

'কিছু না। স্রেফ শরীরের দোহাই দিয়ে রেজিগনেশন পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতায় ওর শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। অথচ—।' ভদ্রলোক একটু থামল।

'অথচ কি?'

'মিসেস দাসের স্বাস্থ্যের গণ্ডগোল আমরা আগে কোনোদিন শুনিনি। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে অমন অটুট স্বাস্থ্য আপনি বড় একটা পাবেন না।'

'মিস দাসের সঙ্গে আপনার পরিচয় বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছেছিল তো সুরেশবাবু?—'

'বন্ধুত্ব?' যেন আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। 'বলেন কি স্যার? মিস দাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল আমার! আমি তো তুচ্ছ একজন কেরানী। রেটিস অ্যাণ্ড রবসন কোম্পানীর কোন মনসবদারই কখনও মিস দাসের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেননি।'

কৌতূহল প্রকাশ করে রাজীব বলল, 'তবু অফিসে যখন কাজ করছেন তখন নিশ্চয়ই কোন কোন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা বেশী থাকবে। আর তার মধ্যেই কোনো একজন বা দুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বাভাবিক।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়ল।—'কি জানি, আমার তো ঠিক মনে আসছে না। যতদূর জানি কারো সঙ্গেই মিস দাসের তেমন ইয়ে, মাখামাখি ছিল না। তবে হ্যাঁ, একটি মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল মিস দাসের। আমার মনে আছে দুজনে একসঙ্গে বেরুত অফিস থেকে।'

'তাই নাকি?' রাজীব সাগ্রহে তাকাল। 'সেই মেয়েটি কি কাজ করে এখানে?'

—'কার কথা বলছেন সুরেশবাবু?' অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার প্রশ্ন করলেন।

'আমাদের বিল সেকশনের জ্যোৎস্না কর স্যার। আগে যিনি পুছে ছিলেন।'

'উনি এসেছেন তো আজ?' রাজীব জানতে চাইল।

'এসেছেন বলেই জানি।' ভদ্রলোক সংক্ষিপ্ত হবার চেষ্টা করল। 'মিস দাসের সঙ্গে একমাত্র ওরই খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আপনি বরং ওকেই জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন।'

সুরেশবাবু চলে গেলে মিঃ মুখার্জি বেয়ারাকে আবার পাঠালেন বিল সেকশনের জ্যোৎস্না করকে ডেকে আনতে। রাজীব লজ্জিত হয়েছে এমনি ভাব প্রকাশ করে বলল, 'আপনার দরকারী সময় কিন্তু অনেকখানি অপচয় হচ্ছে। আই অ্যাম রিয়্যালি সরি।'

'না, না। দুঃখিত হবার কি আছে। আপনি একটা এনকোয়ারি নিয়ে এসেছেন, —আপনাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করাই তো আমাদের উচিত।' একটু থেমে মিঃ মুখার্জি বললেন, 'কিন্তু স্যার, একটা বিষয় জানতে বড় কৌতূহল হচ্ছে। এনকোয়্যারিটা কিসের? মিস দাস এর মধ্যে আসছেন কেন?'

রাজীব এদিক-ওদিক চেয়ে অফিসারের মুখোমুখি হল। বলল, 'এনকোয়্যারিটা ঠিক মিস দাসের সম্বন্ধে নয়। আপাতত ওর সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় জানবার প্রয়োজন হয়েছে মাত্র, আসল ব্যাপারটা অন্য।'

সি আই ডি ইন্সপেক্টরের ভাবভঙ্গি অফিসারকে আরো কৌতূহলী করে তুলল।

'অন্য ব্যাপার কি বলছিলেন স্যার?' একটি নিরীহ প্রশ্ন করবার চেষ্টা করলেন অফিসার।

একটু চাপা গলায় রাজীব বলল, 'কয়েকদিন আগে একটি মার্ডার কেসের সংবাদ পড়েছিলেন কাগজে? দিকনগর পেপার মিলের একজন টেলিফোন অপারেটারকে কে বা কারা শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে?'

'দ্যাট মার্ডার কেস,—আই সী।' অফিসার বিস্ময়সূচক ভঙ্গিতে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন।

রাজীব বলল, 'ঐ মার্ডার কেসটার তদন্তের ভার পড়েছে আমার উপর। আর সেইজন্যেই এতদূরে ছুটোছুটি।' কথার শেষে রাজীব একগাল হাসল।

জ্যোৎস্না কর এসে ঘরে ঢুকল। ভারী মিষ্টি চেহারা মেয়েটির। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গোছের, এককালে হয়ত কালোই বলা যেত। কিন্তু দীর্ঘদিন কলকাতায় থাকার ফলে এবং যত্নে ও চেষ্টায় ত্বকের বর্ণ রোদ্র আড়াল দেওয়া ইটচাপা ঘাসের মত ফ্যাকাশে। এবং সে কারণেই উজ্জ্বল বা কিঞ্চিৎ ফর্সা দেখায়। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটির চোখদুটি। বেশ টানা টানা। চোখের পাতাগুলি বড়। ফলে মেয়েটি তাকালেই কেমন বিপন্ন অথচ সুন্দর মনে হয় ওকে।

'আমাকে ডেকেছেন স্যার?' মেয়েটি ধীরে ধীরে বলল।

'হ্যাঁ।' মিস্টার মুখার্জি ইঙ্গিতে ওকে বসতে বললেন।

মেয়েটি বসল। রাজীব দেখল ওর কপালে খুব বড় সাইজের একটা টিপ। সম্ভবত সিঁদুরের টিপ নয় ওটা, কোনো রং। আজকাল বাজারে তো কত রকমের সব প্রসাধন সামগ্রী উঠেছে। মাথায় মউ-চাকের আকারের বড় সাইজের খোঁপা। খুব সম্ভব মেয়েটি সুকেশী। ওর পরণে হাল্কা সবুজ রঙের একটা শাড়ী। গায়ের জামাটাও তাই। তবে অত্যাধুনিকাদের মত সেটা স্লিভলেস নয়। জামার হাত বাহুমূল ছাড়িয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে।

'ইনি মিস্টার রাজীব সান্যাল। দিক-নগর থেকে এসেছেন এখানে। আমাদের একজন পুরনো এম্পলয়ির সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে। সেই এম্পলয়ির নাম মিস সুজাতা দাস। আমি শুনলাম মিস দাসের সঙ্গে আপনার খুব বন্ধুত্ব ছিল। দেখুন, ইফ ইউ ক্যান হেল্প হিম।'

'সুজাতা দাস? মানে—।' মেয়েটি খানিকটা আবিষ্কারের উত্তেজনায় এবং কিছুটা আনন্দে বলে উঠল, 'সুজাতাদির কথা জানতে চান? যিনি আমাদের এখানে টেলিফোন অপারেটর ছিলেন।'

'ঠিক কথা। ওর সম্বন্ধেই আমার কিছু জানবার আছে। আপনি কি দয়া করে সাহায্য করবেন আমাকে?' রাজীব খুব সদাশয় এবং বিনীত হবার চেষ্টা করল।

মেয়েটি মাথা হেলাল। অর্থাৎ তার সাধ্যমত সে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে।

রাজীব অফিসারের মুখের দিকে চেয়ে বলল,—'মিস্টার মুখার্জি, আপনার কাজ-কর্মের খুব ক্ষতি করছি ভেবে আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। তাই বলছিলাম কি, অন্য কোন একটা ঘরে বসে যদি মিসেস করকে আমি দু-একটা প্রশ্ন করতাম।'

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ইঙ্গিতটা
তে পেরেছেন মনে হল রাজীবের।
টা লক্ষ্যবস্তু হৃদ্পিণ্ডাস। মেয়েটি করে
তেই তার কাছে শিবনাগদের হত্যাকাণ্ড
ন্তদন্তের নায়ক হিসেবে রাজীবকে
বর্ণনা করেনি এই যথেষ্ট। খুনের
রে খোঁজ-খবর নিতে সে এসেছে
লে মেয়েটি ভীষণ থাবড়ে যেত। ভালো
মুখ খুলত না তার কাছে।

'কিন্তু অন্য একটা ঘর—।' বলেই
ার্জির হঠাৎ ভাবান্তর হল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।
াদের পারচেজ অফিসার শ্রীনিবাসন
আসেন নি। আপনি ওই ঘরটাতে বসে
বার্তা বলুন। অসুবিধে হবে ?'

রাজীব লোকটির ভদ্রতায় মুগ্ধ হল।
—'আপনাকে ধন্যবাদ মিস্টার মুখার্জি।
কোন একটা ঘর হলেই হবে। আধ-
ার বেশী সময় লাগবে না আমার।'

অফিসার নিজে এসে বসিয়ে দিলেন
। সুইচ টিপে ফ্যানটা ঘুরিয়ে দিলেন।
য়েটির দিকে চেয়ে বললেন, 'বসুন মিসেস
। উনি কি জানতে চান শুনুন এবার।'

মিস্টার মুখার্জি চলে গেলে রাজীব
য়েটির মুখের দিকে তাকাল। মুখ যদি
নর দর্পণ কিংবা ওর কাছাকাছিও হয়
হলে জ্যোৎস্না করকে এখনও সহজ,
ভাবিক বলা যায়। ভয়ের কোন রেখা,
ন্তার কোন ঢেউ ওর মুখে ছাপ ফেলে
নি।

'এ অফিসে আপনি কতদিন আছেন
িসেস কর ?' রাজীব ওকে নিয়েই প্রশ্ন-
লার পাতা খুলল।

মেয়েটি হাসল, বলল,—'চার বছর হয়ে
ল গত জুনে।'

'বাঃ। তাহলে আপনি এখানকার
কজন পুরনো কর্মচারী। এ অফিসেই
াবর কাজ করছেন, না অন্য কোথাও
ছলেন এর আগে ?'

'এখানেই আমার হাতেখড়ি। বি-এ পাশ
রেই ঢুকলাম।'

'সুজাতা দাসকে তো আপনি জানেন।
উনি কি আপনার আগেই এখানে
ঢুকেছিলেন ?'

'সুজাতাদির কথা বলছেন ? উনি আমার
চেয়েও বছরখানিক আগে ঢুকেছিলেন এ
অফিসে। তবে সুজাতাদি কেরানী ছিলেন
না। টেলিফোন অপারেটর।'

'তা জানি।' রাজীব লঘু সুরে বলল,
'আচ্ছা মিসেস কর, সুজাতা দেবীর সঙ্গে
আপনার তো বেশ বন্ধুত্ব ছিল, তাই না ?'
কি ভেবে মেয়েটি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।
তা ছিল।'

'আচ্ছা উনি কোথায় থাকতেন এখানে ?'

'ভবানীপুরে একটা ওয়ার্কিং গার্লস
হস্টেল আছে। সেখানেই ভেজলার ঘরে
সুজাতাদি থাকতেন। সিঙ্গেল সীটেড রুম
—বেশ ভালো হস্টেলটা।'

রাজীব হেসে বলল—'সিঙ্গেল সীটেড
রুম, তাই না ? আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই ওই
হস্টেলে অনেকবার গিয়েছেন ? মানে,
সুজাতা দেবীর ঘরে ?'

মেয়েটি আবার চিন্তা করল। অনেক-
দিন আগের ঘটনা।

হয়ত সবটাই ঠিক ঠিক মনে আসছে
না ওর। তাই উত্তর দিতে গিয়ে ভাবতে
হচ্ছে।

মেয়েটি ধীরে ধীরে বলল, 'হ্যাঁ, হস্টেলে
আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি। ছুটির
দিনে কিংবা অফিস ছুটির পরও।
সুজাতাদি বলতেন, 'চল না আমার ঘরে।
সাতসকালে বাড়ী গিয়ে কি করবি ?'

রাজীব মন দিয়ে শুনছিল। সে বলল,
'আচ্ছা মিসেস কর, বিয়ের আগে আপনি
তো গৃহে ছিলেন ? আপনার বিয়ে কতদিন
হয়েছে ?'

জ্যোৎস্না করকে লজ্জিতা মনে হল।
কর্ণমূলে ঈষৎ রক্তোচ্ছ্বাস। সলজ্জ দৃষ্টিতে
তাকাল সে। বলল, বছর দুই-তিন হল
বিয়ে হয়েছে আমার।' ইংরেজী একটা
সালের উল্লেখ করে মেয়েটি যোগ করল,
'সেটা অঘ্রাণ মাস,—নভেম্বরের পঁচিশ
তারিখ।'

'আচ্ছা মিসেস কর, সুজাতা দেবী কেন
এতবড় একটা কোম্পানীর চাকরী ছেড়ে
চলে গেলেন বলতে পারেন ?' একটু
বিশ্লেষণ করবার ভঙ্গিতে রাজীব বলল,
'ধরুন কলকাতার উপর একটা চাকরী ছেড়ে
দিয়ে শুধু শুধু কোলিয়ারী মুলুকে
ছোটার তো কোন মানে হয় না। আর নতুন
চাকরীতে আমি শুনেছি মাইনে-পত্র এখানের
মতই ছিল। বরং বেটিস এ্যান্ড ববসনে
বোনাস-টোনাস বেশী। সব খতিয়ে দেখলে
লাভ নেই, লোকসানের ছবিটাই যেন স্পষ্ট
হয়ে ওঠে।'

মেয়েটি উত্তর দিল না। চুপ করে
রইল।

রাজীব বলল, 'দেখুন চাকরী ছেড়ে
নতুন চাকরীতে লোকে যায় ঝোঁক। তবে
নিঃসন্দেহে সেটা বেটার চান্স। আর নয়তো
মনিবের সঙ্গে বনিবনা না হলে কিংবা
প্রতিকূল পরিবেশ হলে, চাকরী ছেড়ে
দেবার প্রশ্ন ওঠে, আচ্ছা, এখানে সুজাতা
দেবীর সঙ্গে কর্তাদের কোন খিটিমিটি
হয়েছিল ?'

মেয়েটি মুখ খুলল, 'কই, তেমন কিছু
মনে পড়ছে না। বরং আমি যতদূর জানি
কাজে-কর্মে সুজাতাদির রীতিমত সুনাম
ছিল। কেউ টেলিফোন করে সুজাতাদির
গলায় কোনদিন চড়া কথা শোনেনি।'

'স্ট্রেঞ্জ !!' রাজীব মন্তব্য করল,
'ব্যাপারটা তাহলে রহস্যই থেকে যাচ্ছে।
কালি-কলমে সুজাতা দাস অবশ্য পদত্যাগের
একটা কারণ উল্লেখ করেছেন। সেটা তার
স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির কথা। কলকাতায় তার
দেহমন টিকছিল না। সেজনাই পদত্যাগ-
পত্র দাখিল করতে হল। কিন্তু,—', রাজীব
সান্যাল তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে মেয়েটিকে লক্ষ্য
করে ফের শুরু করল, 'আমার কি মনে হয়
জানেন ? সুজাতা দাসের হঠাৎ কলকাতা
ছেড়ে যাওয়ার পিছনে কোন আশাভঙ্গের
কাহিনী রয়েছে। এবং সেটা আমার জানা
দরকার। বাট হু ক্যান হেল্প মি ? মিসেস
কর, আপনি কি এভাবে জিনিসটা ভেবে
দেখেছেন ?'

জ্যোৎস্না ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ এভাবে
ব্যাপারটাকে সে ঘুরিয়ে দেখেনি।

রাজীব প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আপনার
বিয়ে হল নভেম্বরে, আর মিস দাস কবে
চাকরী ছেড়ে চলে গেলেন ?'

শান্ত কণ্ঠে মেয়েটি উত্তর দিল, 'তার
পরই তো চলে গেলেন সুজাতাদি। কি যে
মাথায় এল ওর, তা ভগবানই জানেন।
বিয়ের সময় পনের দিন ছুটি নিয়েছিলাম
আমি। অফিসে জয়েন করতে এসে শুনলাম
সুজাতাদি চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। ওর
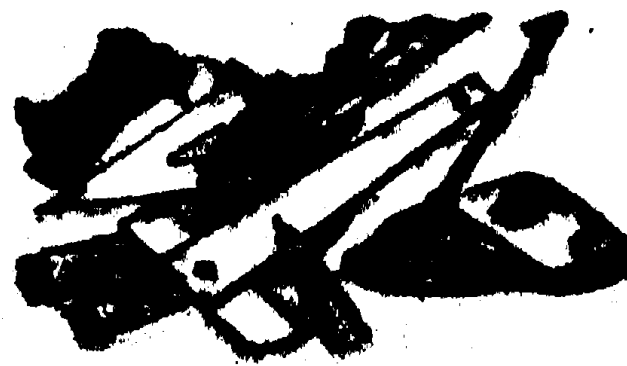
হস্টেলে গিয়ে আরো অবাক। তারা বলল জিনিসপত্র বে'ধে-ছেদে হস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছেন উনি। কোথায় তা আ'দ কেউ বলতে পারে না।'

রাজীব সান্যাল গভীরভাবে চিন্তা করছিল। কয়েক সেকেন্ড পরে রাজীব বলল 'আচ্ছা ওই হস্টেলে মিস দাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু কেউ ছিল জানেন?'

মেয়েটি সরাসরি সম্ভাবনা নাকচ করে দিল। বলল, 'সুজাতাদি তেমন মিশতেন না কারো সঙ্গে। অন্তরঙ্গতা হবে কেমন করে? সিঙ্গেল সীটেড ঘরে থাকতেন। ঘর ছেড়ে বেরোতেন না বড় একটা। আমি গেলেও ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেন।'

'তাই বুঝি?' রাজীব চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করল। হেসে বলল, 'এক ধরনের লোক আছে, বিশ্ব-সংসার থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায়। তারা ঘরের দরজা সদা-সর্বদা বন্ধ রাখে, রেস্তোঁরায় খেতে ঢুকলে থামের আড়ালে কিংবা ওরই কাছাকাছি বসতে চায়। যাতে লোকজন তাদের না দেখতে পায়। এবং তারা সহজে চিহ্নিত না হতে পারে। সুজাতা দাস কি এমনি ধরণের তবে?'

'না, না।' জ্যোৎস্না প্রায় প্রতিবাদ করল, 'সুজাতাদি মোটেই কোটরে লুকিয়ে থাকবার পাত্রী নন। কাউকে পরোয়া করে চলবার স্বভাবই নয় সুজাতাদির। তবে কি জানেন, সকলকে ঠিক সহ্য করতে পারতেন

টান। বিশেষ করে ছেলেদের। অফিসের কেউ সুজাতাদির সঙ্গে গায়ে পড়ে তে গিয়ে রীতিমত ধমক খেয়েছিল।'

ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে রাজীব বলল, নকক্ষণ আটকে রেখেছি আপনাকে। ঘণ্টার জায়গায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ নট। এবার আমার আর একটি প্রশ্নের ব দিন দিকি। আচ্ছা, বিয়ের দিন মিস নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন আপনাদের ীতে? বন্ধু-বান্ধবী, অন্তরঙ্গ মেয়েরা প্রায় সারাদিনই থাকে কনের সঙ্গে। রকে সাজিয়ে দেয়, গল্পগুজব করে।—চৈ করে বিয়ের দিন কাটায়।'

জ্যোৎস্না করকে ভাবনাচ্ছন্দী মনে হল। হতাশ এবং শীতল কণ্ঠে সে বলল, জাতাদি আমার বিয়ের দিন আসতে রেননি। হঠাৎ অসুখে পড়ে সব বানচাল গেল লিখেছিলেন।'

'লিখেছিলেন? কি অসুখ বলেছেন তো?'

'বিয়ের দিন সন্ধ্যায় হস্টেলের একটি মেয়েকে দিয়ে সুজাতাদি প্রেজেন্টেশন ঠালেন। বেশ দামী একটা সোনার আংটি। ড় একটা চিঠিতে লিখেছিলেন,—তিনি দুস্থ। আসতে না পারার জন্য দুঃখিত। মি যেন তাকে ক্ষমা করি।'

'মেয়েটিকে আপনি জিজ্ঞেস করেননি ছু? কি এমন অসুখ যে তিনি আসতে রলেন না বিয়েতে?'

'তখন সবাই ভীষণ ব্যস্ত। বিয়েবাড়ীর -হট্টগোল বুঝতে পারছেন তো? তবু কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি অসুখ, ও লতে পারল না। তবে দিদিমণিকে চাদর ড়ি দিয়ে সারাদিন শুয়ে থাকতে দেখেছে লল।'

রাজীব সান্যাল উঠে দাঁড়াল। বলল,—ঠক আছে মিসেস কর। আপনি এবার যেতে পারেন। মুখার্জি সাহেবের সঙ্গে খা করে আমি বেরিয়ে পড়ব।'

—'একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?' দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব-কম্পিত রে মেয়েটি অনুমতি চাইল।

'বেশ তো। কি জানতে চান বলে ফেলুন।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'আপনি কে, কই তো বললেন না। সুজাতাদির চেনা-জানা নাকি? এত প্রশ্ন কিজন্য বলুন তো?'

খুব ভারিক্কী চালে রাজীব কথা কইল। জবরদস্ত অফিসারের ভঙ্গী। প্রশ্নকারিণীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রয়াস।......

—'আমার নাম রাজীব সান্যাল। একটু আগেই তো শুনেছেন। দিকনগরে সুজাতা দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। প্রয়োজন আছে বলেই এত প্রশ্ন করছি আপনাকে। এর বেশী জানতে চাইবেন না।'

ঘর ছেড়ে বেরোবার সময় রাজীব আর একবার তাকাল ওর দিকে। ভারী সুন্দর মুখ। এমন একটা আলগা শ্রী রয়েছে যে ওর দিকে তাকালে দু-দশ সেকেণ্ড চেয়ে থাকতে হয়।

রাজীব হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গি করে বলল, 'আচ্ছা চলি তাহলে।'

* *

হু হু করে ট্রেন ছুটছিল। এক্সপ্রেস গাড়ী,—প্রায় মাইল ষাটেক একটানা দৌড়ে স্টেশনে ধরবে। তার আগে বুড়ী ছুঁয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। গাড়ীর মধ্যে রাত্রির তরল অন্ধকার। ঘড়ির দিকে তাকাল রাজীব। প্রায় সাড়ে সাতটা। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই মথুরাপুরে পৌঁছবার কথা। মাঝে মাঝে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠা স্টেশনের আলো, লোকজনের কলরব, ঘর-বাড়ী......কিংবা বিপরীত দিক থেকে সমান্তরাল অন্য লাইনে ধাবমান মাল কিংবা প্যাসেঞ্জার গাড়ীর ইঞ্জিনের আর্ত হুইস্‌ল। নইলে অন্ধকারের চাদরে ঢাকা সবুজ ধানক্ষেত, প্রায় ঘুমন্ত ছোট ছোট গ্রাম, অথবা অশরীরী আত্মার মত বিরাটাকৃতি কোন গাছের দীর্ঘ ছায়া।

আর একটু হলেই ট্রেনটা মিস করত রাজীব। কলকাতায় আজ চরকীবাজীর মত পাক খেয়ে ঘুরেছে সে। বেন্টিঙ্ক অ্যাণ্ড রবসন থেকে বেহালায় ছুটতে হয়েছিল তাকে। মিসেস মজুমদারকে কথা দেওয়া ছিল। খুব শীঘ্র তার সঙ্গে দেখা করবে। এত শীঘ্র যে হবে মিসেস মজুমদারও ভাবতে পারেন নি। রাজীবকে দেখে রীতিমত আশ্চর্য হয়েছিলেন মিসেস মজুমদার। তাঁর মনে হয়েছিল সামনের হপ্তায় সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর হয়ত কলকাতায় আসবে। কিন্তু এ যেন না চাইতেই মেঘের দেখা। মিসেস মজুমদারের কাছ থেকে সেই চিঠিটা সংগ্রহ করেছে রাজীব। বাড়ী গিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে অক্ষরগুলি পরীক্ষা করবে। নিখিলেশের সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কে এমন সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে গেল? কি তার স্বার্থ? তরঙ্গমালার ভালমন্দে তার কি যায় আসে?

ট্রেন ধীরে ধীরে স্টেশনে ঢুকল। পরিচিত গাছপালা, ঘরবাড়ী, শান্ত পৃথিবী। কলকাতার হৈ-চৈ, এতদূরে মফস্বলকে এখনও মুখর করতে পারেনি। রাজীব জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখল। গাড়ী মথুরাপুরে এসেছে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শচীদুলাল দাঁড়িয়ে। রাজীব ওকে লক্ষ্য করে অবাক হল।

'কি ব্যাপার শচী?' প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রাজীব প্রশ্ন করল।

'খবর আছে স্যার।' রাজীব কথায় সাহায্যে তাকে প্রায় নাড়া দিল।

'নিখিলেশ সেন ছাড়া পেয়েছে স্যার।'

'ছাড়া পেয়েছে? তার মানে?'

'জামিনে খালাস পেয়েছে।' শচী ভগ্নদূতের মত সংবাদ ব্যক্ত করল।

রাজীব একমুহূর্ত চিন্তা করল। শচীর কাঁধে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে হেসে বলল, 'সুসংবাদ দিলে শচী, ইয়েস, তদন্তের কাজে এবার সুবিধে হবে।'

'সুসংবাদ? বলেন কি স্যার?' শচী চোখ-দুটি প্রায় কপালে তুলল।

রাজীব আবার হাসল। বলল, 'ধৈর্য ধরো শচী। ওয়েট অ্যাণ্ড ওয়াচ। সময়ে সব জানবে।'

(ক্রমশ)

হাসির মজলিস

ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এক যুবকের গভীর অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য করলেন। একদিন স্ত্রীকে বললেন—তোমার সঙ্গে এই যুবকের বয়সের পার্থক্য প্রায় বছর কুড়ি। তবে এত অন্তরঙ্গতা কেন?

ভদ্রমহিলা স্বীকার করলেন। বললেন—এটাকে খারাপ ভেবো না। স্রেফ প্লেটনিক।

ভদ্রলোক ক্ষেপে গিয়ে বললেন—প্লেটনিক! তার মানে?

—হ্যাঁ, প্লেটনিকই তো। ওর পক্ষে প্লে আর আমার পক্ষে টনিক।

●

মাস্টারমশাই-এর মেজাজ ভাল ছিল না। সুবলকে দেখে চিৎকার করে বললেন—সুবল, প্রায়ই তুমি স্কুলে কামাই করো। গতকাল আসনি কেন?

সঙ্গে সঙ্গে সুবল জানাল—আমার দাদার বিয়েতে গিয়েছিলাম স্যার।

—তিনি কাকে বিয়ে করলেন?

—একটা মেয়েকে স্যার।

—ইডিয়েট কোথাকার! মেয়েকে ছাড়া ছেলেকে বিয়ে করবে নাকি! শুনেছো কখনো?

—হ্যাঁ শুনেছি স্যার। ছেলেকে বিয়ে করা যাবে না কেন? আমার বৌদিই তো দাদাকে বিয়ে করেছেন।

●

প্রেমে প্রায় হাবুডুবু খাচ্ছে ছেলেটি আর মেয়েটি। একদিন গদগদস্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল—তুমি তো আমাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাস?

হ্যাঁ বাসি—ছেলেটি বলল।

—তাহলে আমার জন্যে নিশ্চয় তুমি মরতে পার।

—না, তা পারি না। কারণ আমার প্রেম অ-মর—বলল ছেলেটি।

●

স্ত্রী—তোমাকে যাই বলি না কেন, এক কান দিয়ে ঢোকে, অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

স্বামী—অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি যা বলি তা তোমার দু' কান দিয়ে ঢোকে আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

●

রাস্তার ধারে কুকুর নিয়ে খেলছিল ছেলেটি। পথযাত্রী এক ভদ্রলোক বললেন—এটা কি কুকুর? গম্ভীরকণ্ঠে ছেলেটি জানাল—পুলিশ কুকুর। অবাক হয়ে ভদ্রলোক বললেন—পুলিশ কুকুর! মোটেই তো সেরকম দেখতে নয়।

নিশ্চয় সেরকম দেখতে নয়—ছেলেটি জানাল—আমিও স্বীকার করছি, কারণ ও সিক্রেট সার্ভিসে আছে কিনা।

●

বিচারক—বারবার তোমার কোর্টে আসতে লজ্জা করে না?

চোর—না স্যার, প্রতিবারই এসে যে আপনাকে দেখতে পাই।

●

বিশ্বজিৎ ঘোষ, পুরুলিয়া পলিটেকনিক :

সেদিন সখেদে সহকর্মী সুশান্ত বললে, ভাই বিয়ের আগে ভাবতাম, স্ত্রীকে করব আমি বশ, আর বিয়ের পরে দেখি কিনা, স্ত্রী হোল আমার Boss !

●

শিক্ষক—চার-এর অর্ধেক কত?

ছাত্র—কোন্ দিক দিয়ে স্যার?

শিক্ষক—কোন্ দিক দিয়ে, মানে?

ছাত্র—আজ্ঞে, উপর দিক দিয়ে হলে ৪-এর অর্ধেক হবে শূন্য, পাশ দিয়ে হলে ৪-এর অর্ধেক হবে ইংরেজীর তিন এবং অংকের দিক দিয়ে ৪-এর অর্ধেক হবে ২।

●

সুব্রত—তোমার মত একটা প্রেমপাগল মেয়েকে বিয়ে করা আমার ভুল হয়েছে।

নীতা—তাহলেও বাজি ধরে বলতে পারি, আমি এখনই মরলে আগামীকাল তুমি আবার বিয়ে করবে।

সুব্রত—তা আমি করব না। কারণ, প্রথমে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নেব।

●

পৃথিবীতে একজন মাত্র খারাপ মহিলা আছেন। এবং প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষই ভাবেন একমাত্র তিনিই তাকে বিয়ে করেছেন।

কুইজ
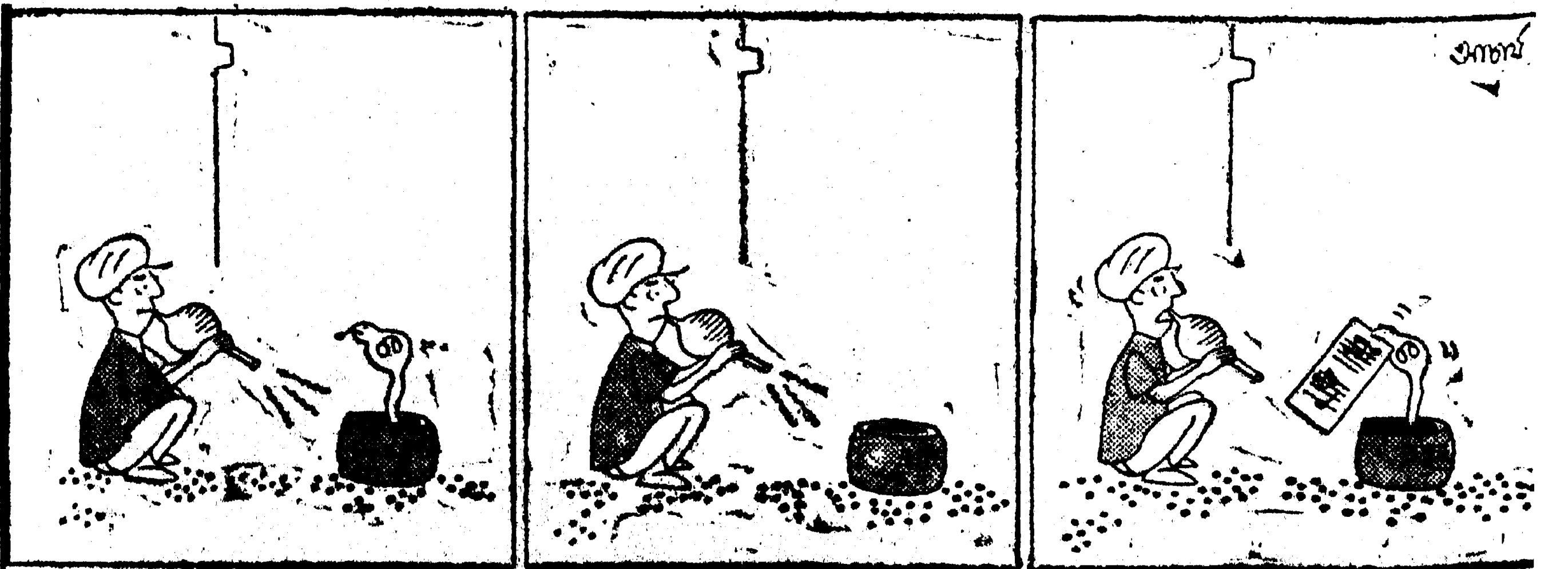
মন বুঝে দেখুন

আপনার রসিকতাবোধ যাচাই করুন

রসিকতাবোধ না থাকা সত্ত্বেও আপনি বেশ চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু বেঁচে থাকার অনেকখানি আনন্দ আপনি নিশ্চয়ই হারাবেন। রসিকতাবোধের জন্যেই আমাদের স্থান কালপাত্র সম্পর্কে কান্ডজ্ঞান টনটনে থাকা সম্ভব হয়। মানুষকে আপন করে নেওয়া আর সবার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠার একটি চমৎকার পথ হলো রসিকতা। এরই ছোঁয়া লেগে দুশ্চিন্তা-ভারাক্রান্ত অন্ধকার মুহূর্তগুলি আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে, আর যে-মানুষ নিজেকে নিয়েই রসিকতা করতে পারেন, তিনি তো অপরাজেয়।

নীচের টেস্ট দিয়ে আপনার রসিকতা-বোধ যাচাই করে নিতে পারেন। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে আপনি কোন্ ধরনের আচরণ করবেন, সেই বুঝে টিক্ চিহ্ন দিয়ে যান। সবশেষে সঠিক আচরণের নির্দেশ দেওয়া আছে, সেদিকে এখন তাকাবেন না।

১। এমন একটা কিছু ঘটেছে, যাতে আপনাকে বদ্খত দেখাচ্ছে; যেমন ধরুন, নাকের ডগায় লেগে আছে খানিকটা কালি!

(ক) এতে কেউ হাসাহাসি করলে আপনি পছন্দ করবেন না। ভয়ানক ক্ষেপে উঠবেন, এমন বিশ্রী লাগবে যে, সেখান থেকে ছুটে পালাতে চাইবেন।

(খ) নিজেকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে নিজেই দেখতে পারেন। সকলের সংগে ও নিয়ে মজা করতে পারেন, সে ভরসা আপনার আছে; লোকে আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করলে আপনি কিছুই মনে করবেন না।

২। পাঁচজনের সামনে কেউ আপনার সংগে খারাপ ব্যবহার করেছে।

(ক) আপনি চেঁচামেচি সুরু করে দেবেন, মেজাজ বিগড়ে যাবে।

(খ) ভাববেন, ওরকম খারাপ ব্যবহার যারা করে তারাই ছেলেমানুষ নির্বোধ। তারা সকলকে বিরক্ত করে। আপনি তাই কেবল দেখে যাবেন, কোনরকম আহতবোধ করবেন না।

৩। কোনো ইনটারভিউতে গেছেন।

(ক) কেবলই ভাবছেন, কোথায় নিজের কী ভুলত্রুটি হয়ে যাবে, এটা জানেন না, সেটা জানেন না। ফলে, জড়সড় আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে কথা জড়িয়ে যাবে। কিংবা, হয়তো সহজ হবার আপ্রাণ বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে প্রচন্ড চীৎকার করে ছটফট করে কথাবার্তা বলতে থাকবেন।

(খ) ভাববেন, আপনারই মতো লোকের সংগে কথা বলতে এসেছেন, তাই ভয় পাবেন না। একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আশায় এমনভাবে কথা বলবেন যাতে সবাই আপনাকে পছন্দ করে এবং আপনিও তাঁদের পছন্দ করতে পারেন।

৪। স্নেহ ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সাফল্য এ সব কোনো ব্যাপারে আপনি একটু পিছিয়ে আছেন।

(ক) এতে মনে বিরক্তি আর তিক্ততা-বোধ জাগে। কেবলই তাই নিয়ে ভাবেন। মনের মধ্যে অভিযোগ-অনুযোগের ধোঁয়া জমে ওঠে।

(খ) আপনার ধারণা, কেউ-না-কেউ কিছুটা হারাবেই. সবসময়ে তো আমিই হারছি না। কোনো কোনো ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই কিছুটা ভাগ্যবান, তাই নিয়েই ভাববেন, এবং জীবনটাকে যথাসম্ভব উপভোগ করবেন।

৫। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে।

(ক) আপনার স্থির বিশ্বাস, আপনি ঠিকই করেছেন। আপনার বন্ধুটি যদি তা না মানতে চান, তাহলে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে যেতে পারে সহজেই।

(খ) আপনার নিজের মতামত সম্পর্কে অতো প্রচন্ডভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন না, যার ফলে সামান্য বিষয় থেকে মস্ত-বড়ো বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি হতে পারে। আপনি যতটা পারেন বিরুদ্ধ অভিমতের দিকে এগিয়ে যেতেই চেষ্টা করেন; দরকার হলে, মতপার্থক্য মেনে নিয়ে মিটমাট করে ফেলেন।

৬। আপনি হয়তো বয়োজ্যেষ্ঠ লোক-দের সংগে কথা বলছেন, তখন তাঁরা আজ-কালকার অনেক কিছুর এবং ছেলে-ছোকরাদের আচার-আচরণের নিন্দা করছেন।

(ক) আপনি ভাবছেন, লোকগুলো কী বিরক্তিকর: আপনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। তর্ক করেন, কিংবা তাদের কথায় কানই দেন না।

(খ) আপনি তাঁদের কথা শোনেন মন দিয়ে, তবে আরো মজা হয় যখন আপনি তাঁদেরই ছেলেবেলার কথা বলাতে পারেন।

৭। পাড়া প্রতিবেশীরা বে-স্টাইলে থাকে, আপনার লেভালে থাকার সামর্থ্য আছে বলে মনে করেন না।

(ক) এই নিয়ে সব সময়ে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতে হয়। মনে আপনার ঈর্ষা আর অসন্তোষ বাসা বেঁধে আছে।

(খ) আপনি বোঝেন, পয়সা দিয়ে শান্তি কেনা যায় না। শান্তি না থাকলে অন্য কোনো কিছুর মূল্য তেমন কিছুই নয়। আপনি তাই অন্যের ব্যাপারে ঈর্ষা করে আপনার সময় নষ্ট করেন না। আপনার যা আছে তারই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

৮। আপনার ঠান্ডা লেগেছে কিংবা মাথা ধরেছে।

(ক) মন মেজাজ খারাপ হয়ে খিটখিটে হয়ে রয়েছেন। আপনি সহানুভূতি চাইছেন।

(খ) সহানুভূতি এলে ভালোই, খুশি-মনে শুনছেন, কাজে লাগাচ্ছেন। না এলেও কষ্টের হাসি হেসে সহ্য করছেন।

৯। আপনার অফিসের কর্তাটি ভারী বেয়াড়া: হাজারো রকমের নিয়মকানুনের ফতোয়া নিয়ে সর্বদা হাজির।

(ক) এ সবে আপনি তিতিবিরক্ত হয়ে থাকেন। আপনি মরিয়া হয়ে বলতো পারেন বেয়াড়াপনা, কথা কাটাকাটি করেন আর কাজে ব্যাগড়া দেন।

(খ) আপনি ভাবেন, জগতটাই তো উদ্ভট, তাই বলে যেসব ব্যাপার এড়িয়ে চলা যায় না তা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ব্লাড প্রেসার চড়িয়ে ফেলায় কোনো মানে হয় না।

১০। কিছু একটা বিগড়ে গেছে—যেমন, জলের পাইপ ফেটে গেছে, রান্না পুড়ে গেছে, কিংবা বাস ব্রেকডাউন হয়েছে।

(ক) আপনি ভাবলেন, শুধু আপনাকেই বেকায়দায় ফেলবার জন্যে এসব কান্ড ঘটেছে। সারাটা দিন বদমেজাজী হয়ে রইলেন।

(খ) এসব কান্ডর মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার থাকলে আপনি সেটাই লক্ষ্য করেন। যাই ঘটুক না কেন, আপনি তো একা বেকায়দায় পড়েন নি; এই ভেবে আপনি যতটা পারেন মানিয়ে নেন এবং হাসিমুখে থাকেন।

পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন প্রত্যেকটি (খ)-তে টিক্ চিহ্ন দিয়ে থাকলে। এই টেস্ট খুব কঠিন সমস্যা নিয়ে তৈরী হয়েছে, তাই ৪০ পেলেই বুঝবেন চমৎকার হয়েছে: ৩০-এর ওপর হলে সুন্দর: ২৫ হলে ভালোই। ২৫-এর নীচে সুবিধের নয়।

কালো মুক্তো

পিটার ওডোনেল

দিলীপ মালাকার

সাগরপারের চিঠি
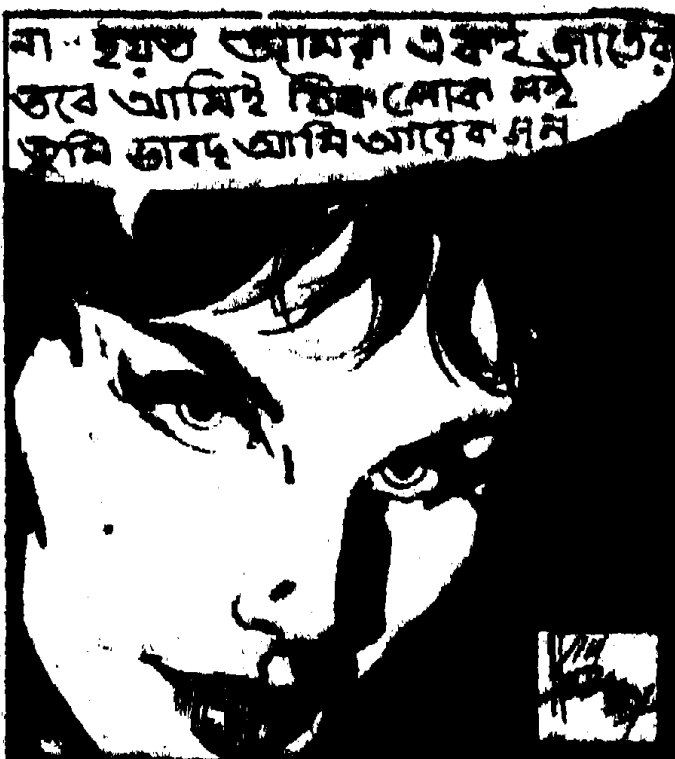
প্যারিস, অকটোবর। ফরাসী "ছাত্র-বিপ্লবে" প্রকাশক ও পাঠক মহলে অনেক পরিবর্তন এনেছে। ইউরোপের অন্য দেশের মতন ফরাসী পাঠকরা গল্প, উপন্যাস, ডিটেকটিভ বই-এর বড় খদ্দের। বাজারের চাহিদা বুঝে প্রকাশকরাও তেমন তেমন বই পত্তর ছাপছেন। ছাত্র-বিপ্লবের পর পাঠক-সমাজ, বিশেষ করে ছাত্র পাঠকের দল রাজ-নীতি-দর্শন, কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধের বই-এর দিকে ঝুঁকেছে। ফলে মাসকয়েক ধরে ফরাসী বই-এর 'বেস্ট সেলার' অর্থাৎ বেশী কাটতি বেড়েছে প্রবন্ধের বই-এর। এক ছাত্র-বিপ্লবের ওপর বইগুলোই কয়েক লাখ বিক্রি হয়েছে।

বিপ্লব কি? বিপ্লব কেন হয়? ফ্রান্সে কেন ছাত্র-বিপ্লব ঘটল। ইউরোপে কেন ছাত্র অসন্তোষ। এসবের ওপর কয়েকজন খ্যাতনামা সাংবাদিকের বই এখন বাজারে সবচেয়ে বেশী কাটছে। তাছাড়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন নামকরা সমাজ-বিজ্ঞানির ফরাসী ছাত্র অসন্তোষের ওপর বিশ্লেষণমূলক বইও বাজারে বেশ সোর-গোল এনেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত খবর-দারির ফলে ইউরোপের কম্যুনিস্ট দলে ভাঙন ও দলাদলি দেখা দিয়েছে। কয়েকজন খ্যাতনামা ফরাসী কম্যুনিস্ট নেতা ইতিমধ্যে তিনখানি বই প্রকাশ করেছেন। কম্যু-নিজমের একাল-সেকাল, রুশ কম্যুনিজম, চীনা কম্যুনিজম ও ইউরোপের দেশ বুঝে কম্যুনিজম কিভাবে চালান উচিত, তার বিশ্লেষণ করেছেন লেখকরা। যারা রাজনীতি চর্চা করে তাদের কাছে এ বইগুলো অতি অবশ্য পঠিতব্য।

'সিরিয়স' বই-এর কথা বাদ দিলে কৌতূহলোদ্দীপক দু'খানা বই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বইদুটো পড়লে উদ্ভট মনে হতে পারে কিন্তু মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। এই দুটো বই অল্প কালের মধ্যে লাখ কাপির বেশী বিক্রি হয়েছে। প্রথমটি ইংরেজী বই-এর ফরাসী অনুবাদ।

এক ইংরেজ [illegible] মিঃ ডেসমণ্ড মরিসের [illegible] (দি ন্যাকেড [illegible])' প্রাণীবিজ্ঞানের [illegible] থেকে [illegible] চেয়েছেন। [illegible] [illegible] জাতি বানরের বংশধর। জীব-জগতে

বিবর্তনের ফলে একালের মানুষের আবি-র্ভাব। মিঃ মরিশ বলছেন যে, সেকথা ঠিক নয়। বানর জগতে ১৯৩টি জাতের বানর আছে। বানর, হনুমান, ওরাংওটাং, গরিলা ইত্যাদির বানর গোষ্ঠীর মধ্যে মানুষ হল ১৯৩তম বানর। এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বানর মানুষ। বানরের বিবর্তন মানুষ নয়। বানর বা গরিলার মতন সব মানুষের গায়ে লোমাবৃত নয়। নাক, ঠোঁট, কান, স্তন ও অন্য ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলো বানররা যে কাজে ব্যবহার করে মানুষ ব্যবহার করে অন্যভাবে। মিঃ মরিশ নানান ভাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে, নাক, কান, ঠোঁট ও স্তন পুরুষ-নারীর যৌন আবেদন ও পরোক্ষে আকর্ষণের যন্ত্র হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। আড়াই শ' পৃষ্ঠার বই-এর মিঃ মরিশ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নজির দেখিয়েছেন।

তিনি বলেছেন যে, কানের পাতা দিয়ে আমরা শুনি বটে কিন্তু কানের পাতায় যৌন অনুভূতিও সৃষ্টি করে। উত্তেজনাও বাড়ায়। বানরদের বেলায় তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

নাক ও ঠোঁটের কাজ শুধু জৈবিক নয়। ঠোঁট দিয়ে কথা বলায় যে কাজ হয় তাছাড়া তার বড় কাজ হল নর-নারীর প্রণয় লীলা ও যৌন আদান-প্রদানের ভাষা-বিনি-ময়ের কেন্দ্রস্থল বিশেষ।

এখনও অনেক উপজাতির প্রাগৈতি-হাসিক মনোবৃত্তি একেবারে চলে যায়নি। তাদের মধ্যে দেখা যায় নর-নারী প্রেম নিবেদন করে নাক ঘষে। এতে নাকি যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

মিঃ মরিশ বলছেন যে, বানররা ঠোঁটের ব্যবহার করে মুখ ভ্যাংচানর জন্য। প্রেম নিবেদনে নয়। মানুষ ঠোঁট ব্যবহার করে চুম্বনে। এবং সেটাও যৌন সংবেদন।

নারীর স্তন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মিঃ মরিশ বলেছেন যে, স্তন শুধু শিশুকে দুধ খাওয়ানর জন্য নয়। প্রাগৈতি-হাসিক যুগ থেকে এখন পর্যন্ত নারীর সৌন্দর্য ও আকর্ষণের জিনিষ স্তন। সৌন্দর্যের কথা ছেড়ে দিলেও যৌন আবেদনে স্তনের কার্যকারিতা কেউ অস্বীকার করে না। বানর-জগতে তার ব্যবহার মানুষের মতন নয়। তিনি আরও বলেছেন যে, মা কেনো বা অজানতে তার

শিশুকে সাধারণতঃ বাঁ হাতে ধরে বাম স্তনের কাছে নিয়ে কেন আদর করে। বাম দিকে হৃদয়। হৃদয়-স্পন্দন শুনতে ভাল-বাসে শিশু। মায়ের হৃদয় স্পন্দন শুনে শিশু অভ্যস্ত এবং মাও অজানতে তাকে সে স্পন্দন শোনায়।

মানুষ কেন তিন বেলা খায় ও খাবার গরম করে খায় সে সম্বন্ধে মরিশ বলেছেন, প্রথম যুগে মানুষ যখন ফল-মূল খাওয়া ছেড়ে মাংস খাওয়া সুরু করে তখন পশুর মাংস সদ্য কাটা বলে গরম থাকত। সেই অভ্যাসটা এখনও রয়ে গেছে। এখন আর সদ্য কাঁচা মাংস না খেয়ে রেঁধে গরম করে খায় মানুষ।

আরেকটি আশ্চর্য কথা বলেছেন মিঃ মরিশ, কোনো পুরুষ বা নারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় না শুধু তার আচরণে, নর-নারীর প্রেমে তাদের গায়ের গন্ধ নাকি একটি প্রধান জিনিষ। কোনো নর-নারী প্রণয়বদ্ধ হলে তাদের দুজনে, দুজনের গায়ের গন্ধটাও ভালবেসে ফেলে অজানতে। একজনের গায়ের গন্ধ হয়ত আরেকজনের কাছে অসহ্য হতে পারে কিন্তু আরেকজনের কাছে পরম প্রিয়। সুগন্ধ আতর ইত্যাদির ব্যবহারও একই কারণে ব্যবহৃত হয়। কোনো নারী হয়ত তার প্রিয়জনকে খুসী করার জন্য আতর ব্যবহার করে, সে গন্ধ হয়তো আরেকজনের কাছে ভাল নাও লাগতে পারে। তবে নর-নারীর মধ্যে আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় সুগন্ধি দ্রব্যাদি।

রুশদের মহাকাশ যান জন্দ-৫ চন্দ্র পরিক্রমা করে এলো সেদিন। চন্দ্রে পৌঁছবার নানান ধরণের মহড়া দিচ্ছে রুশ ও মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা। সেই উদ্দেশ্যে মার্কিনদের অ্যাপোলো রকেট এগারদিন ধরে তিনজন মানুষ যাত্রী নিয়ে আবর্ত ভূ-প্রদক্ষিণ করল। চন্দ্রগ্রহ এখন আর কেবল মাত্র রূপকথার রাজ্য নয়। কবিদের লেখনিপ্রসূত কবিতার শুধু তার স্থান নয়। চাঁদে পৌঁছনই এখন দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য।

যখন চন্দ্রগ্রহকে নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে তখন চন্দ্রগ্রহ সম্পর্কে একটি বই এখানকার জনসাধারণের মনে বেশ কৌতূহল এনে দিয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible]

এক ফরাসী প্রবন্ধকার লিখেছেন "ল্য লুন্যেন, কে দ্য লা বিব্‌ল" (চাঁদের চাবিকাঠি বাইবেলে)। এই বইটা ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

গ্রন্থকার জ' সর্দি বলেছেন যে, যিশু খৃস্টের বিশ হাজার বছর আগে কোনো এক সুদূর গ্রহ থেকে সুসভ্য জাতির এক-দল কসমোনান্ট (মহাকাশচারী) আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। পৃথিবী নামক গ্রহে অবতরণের আগে তারা চন্দ্র গ্রহে নেমেছিলেন। চন্দ্র গ্রহকে তারা "জংশন" হিসেবে ব্যবহার করতেন। একালের রকেট-স্পুটনিকের চেয়েও ভাল যন্ত্রপাতি তাদের ছিল। পৃথিবীর মানুষের চেয়ে তারা ছিল কয়েক হাজার গুণে সভ্য। তারা অনেক নতুন সভ্যতা আমদানি করেছিল। বাইবেলে এদের বলা হয়েছে "সেলেটার" স্বর্গের দূত। পৃথিবীর মানুষদের বর্বরোচিত মনোভাবের ও ব্যবহারে তারা বিরক্ত হয়ে খৃস্টের জন্মের আট হাজার বছর আগে তারা এই পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যায়। আমাদের গ্রহের চেয়েও কয়েক হাজার গুণ বেশী অগ্রসর কোনো এক গ্রহ থেকে তারা নিয়মিত যাতায়াত করত। এবং চন্দ্র গ্রহকে 'জংশন' হিসেবে ব্যবহার করত। তার প্রমাণ হয়ত পাওয়া যাবে যখন মানুষ চন্দ্রে পেঁছবে। চন্দ্রে পেঁছলে নাকি তার নিদর্শন দেখা যাবে। বাইবেলে এদের সম্বন্ধে অনেক উপকথা বলা হয়েছে। এবং বাইবেলকে ভিত্তি করে গ্রন্থকার এইসব লিখেছে।

নোবেল শান্তি পুরস্কার এবার নিয়ে সাতবার দেওয়া হল ফ্রান্সকে। এবছরের নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত মঃ রনে কাশ্যাঁর বয়স এখন একাশি। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি নিয়মিত অফিস করেন। মঃ রনে কাশ্যাঁ যৌবনে আইনের অধ্যাপনা ও আইন ব্যবসা করেছেন। পরে প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক হন। জাতি-সংঘের 'হিউম্যান রাইটস্' বা মানুষের দাবী সম্পর্কে যে আন্দোলন ও সংস্থা গড়ে ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তার তিনি একজন প্রধান কর্মকর্তা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ফ্রান্স থেকে পালিয়ে লন্ডনে পেঁছন এবং নির্বা-সিত ফরাসী সরকারের নেতা দ্যগলের আইন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। আইন ও সংবিধানতন্ত্র নিয়ে তিনি সারা জীবন কাটিয়েছেন। এবং ফরাসী সরকারের সর্বোচ্চ আইন ও সংবিধান পরিষদ 'ক'সেই দেতা'র তিনি সভাপতি। যখন ফ্রান্সে রাজ-নৈতিক গোলযোগ হয় এবং মন্ত্রিসভা ভেঙে যায় তখন এই ক'সেই দেতা বা কাউন্সিল অব স্টেট সরকারকে উপদেশ দেয়।

দেশবিদেশের নির্যাতিত মানুষের দাবীকে যাতে সবসময় মূল্য দেওয়া হয় তার জন্যে যেসব সংস্থা আছে তিনি তাদের সমর্থক। এর ওপর তিনি অনেক বইও লিখেছেন। এইজন্যেই তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। যেদিন পুরস্কার ঘোষণা করা হয় সেদিন পর্যন্ত তিনি তার কোনো খবর জানতেন না। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বাড়ীতে গিয়ে দেখেন একদল সাংবাদিক তাকে ঘিরে ধরেছে।

এই নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তি কিন্তু নিয়মিত লেখেন একটি দ্বিতীয় স্তরের জনপ্রিয় সাপ্তাহিকে। 'হাঁসি পারী' নামে একটি [illegible] কাগজে তিনি বছরের পর বছর লিখে এসেছেন আইন ও রাজনীতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। আমি অনেককাল তার লেখা প্রবন্ধ পড়েছি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকায়। যেদিন তিনি পুরস্কার পেলেন সেদিনও 'হাঁসি পারী'তে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ হয় নাই-জেরিয়ার বুভুক্ষু বিয়াফ্রাদের ওপর। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে একজন নোবেল প্রাইজ পাওয়া মনীষী দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

কোনো খাদের ধারে ॥

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কোনো খাদের ধারে পতন লেখা থাকে,
বুকের ভিতরে তবু ভালোবাসা খোদিত হয়।
বাতাস যে-কথাগুলিকে ছেঁড়া কাগজের মতো উড়িয়ে নেয়
সেই উড়ন্ত ডানাগুলির সন্ধান
কোনো দিশাই দিতে পারে কি আর।
জলের ভিতর সকল বিম্বই ভেঙে যেতে থাকে—
রব ও শরীরের স্বচ্ছ প্রকৃতি সকল;
সূর্যাস্তে নিজের ছায়াকে হারিয়ে ফেলার মতো
কতো গোপন প্রতিমা কারুকার্যহীন আঁধারে ডুবে যায়।
বড়ো প্রখর এই বাঁক, যে-বাঁকে
মানুষের আর্ত চিৎকার ধ্বনিত হয় কেবল,
সহোদরের ডাকে যেমন ক্বচিৎ সাড়া আসে মাঠ ঘাট বনানী থেকে
তেমন কোনো ডাকে ফিরে যেতে সকলেরই সাধ হয়।
যদিও পিছনে প'ড়ে থাকে ছায়া—তাপহীন এক আর্দ্র গোলকে,
এবং গাছের হলুদ পাতাগুলিও ঝ'রে যায়,
তবু চিত্রার্পিত ভালোবাসাগুলির অক্ষরে অক্ষরে
কোনো-এক অদৃশ্য রন্ধ্রে এই পতন লেখা থাকে।

উত্তর মেরুর কাছে ॥

প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার প্রবাসের পথে একা-একা
সকাল সন্ধ্যা আর রাত্রে হাঁটিতে হ'ল আমাকে বহুদূরে
কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত তাদের ঠিকানা
অথবা কোনো পায়ের চিহ্ন অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না
আমি তাদের সমস্ত আস্তানা তন্ন-তন্ন করে
খুঁজে দেখলাম কিন্তু
সেখানে একরাশ ছেঁড়া কাগজ
আর কাপড়ের টুকরো ছাড়া
অন্য আর কিছু মাটিতে ছড়ানো ছিল না

তারা হয়ত কোনো দিনই আর
এদিকে ফিরে আসবে না কিন্তু
সুদূরে উত্তর মেরুর কাছে কোনো গুপ্ত গহ্বরে
কি ভাবে বেঁচে থাকবে তারা
এ আমার অজানাই রয়ে গেল

তারপর একদিন হয়ত দলের সবাই
বরফের ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ বরফ হয়ে যাবে
তখন সুদূরে মিশরে অথবা তোমাদের শহরের
কোনো যাদুঘরে
তাদের খুঁজে পাওয়া যেতে পারে
কতগুলো বিকৃত মমী হিসেবে।।

বন্যা

[উপন্যাস]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আগের ঘটনা

[বড়ো জেদী, স্বাধীন ও সুন্দরী লীলা বিয়ে করে সত্যচরণকে। কিন্তু ওরা হয়তো সুখী ছিল না। এমন সময় এল সুখেন। সত্যর বাল্যবন্ধু। অনুরা, যদু আর মেয়েছেলে তার নিত্যসঙ্গী।

তবু সুখেনই ভাসিয়ে নিল লীলাকে। সত্যর সংসার ভাঙলই।

রূপপুর ছাড়ল সত্য। এল রাণীচক। ঘরে যমুনাও এল। নববধূবতী।

ইতিমধ্যে সুখেনের প্রেস কেনে লীলা। কিছুদিন বাদে ডিভোর্স হল সত্য আর লীলার।

যমুনাকে ঘিরে সত্যর রঙীন স্বপ্ন। যমুনা অন্তঃসত্ত্বা। তবু বিয়ে করতে পারছে না।

লীলাও রূপপুর ছাড়ল। এল শহরে। সুখেন ভাবে লীলা কি শুধু তাকে নিয়ে খেলাই করবে? ঘর বাঁধবে না? অবশ্য কনককেও ভুলতে পারে না।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সত্য এক রাতে যমুনার মুখোমুখি। যমুনা কি রক্ষিতা'র মতোই থাকবে?

ওদিকেও জল ঘোলা হল। সুখেনের হালচালে লীলা চিন্তিত। শিবানীকে নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করা, কনকের সঙ্গে এককালে ওর ঘর বাঁধা সবই জানতে পারে লীলা। ঝড়ের সংকেত।

তবু সুখেন শিবানীর কাছে যায়। জানতে পেল পুলিশ খুঁজছে ওকে। রাতের অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে সুখেন বাড়ি ফিরল। কিন্তু ঘরে ঢুকল না। ফিরে এল অহীনের কাছে, রমার ভাই। সেখান থেকে রাতেই এল শিবানীর ডেরায়। সঙ্গে অহীন। বলল : রাত কাটাব এখানেই।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৯)

স্নানাহার সেরে আপিসগামী মেয়েদের মত লীলা বেরোতে তৈরী হয়েছিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অপাঙ্গে নিজেকে দেখতে দেখতে কৌটো খুলে মসলা মুখে দিচ্ছিল। তারপর সবে গগলস্ এঁটেছে, এমন সময় রমা চোখমুখ লাল করে হাজির।

লীলা বলল, কী ব্যাপার? প্রেসে যাওনি এখনও?

রমা ধুপ বসে পড়ল। সর্বনাশ হয়ে গেছে লীলাদি! সকালে বাড়ি গিয়ে শুনি, অহীনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। তক্ষুনি থানায় গিয়ে খোঁজ নিলাম। দেখলাম, সুখেনবাবুকেও ধরেছে ওরা। তারপর......

লীলা নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, কেন?

জগদীশের দোকানের সামনে কী হয়েছে শোনেন নি?

লীলা ঘাড় নাড়ল।

রমা আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলে বলল। শান্তভাবে সব শোনার পর লীলা একটু হাসল। বলল, জগদীশের একটা মেয়ের সঙ্গে দু-দুটো পুরুষমানুষ স্ফূর্তি করছিল তাহলে! বেশ মজার খবর শোনালে যো! এমন হয়, জানতাম না কিন্তু।

রমা দুঃখিত মনে বলল, অহীনটা তেমন খারাপ ছেলে নয়। অনেক দোষ ওর আছে জানি। ওই মজার মেয়েটার কাছে হয়ত সুখেনবাবুই নিয়ে গিয়েছিলেন ওকে।

টাকা হলে সব মিটে যাবে?

ঠিক বলতে পারছি না। তবে যা বুঝলাম, টাকা দিলে হয়তো সব মিটে যেতে পারে। ওদিকে মা তো অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমাদের পরিবারে কোনদিন কোন জেলখাটা লোক তো হয়নি। লীলাদি!... রমা ব্যাগ থেকে একটা রুমালের পুঁটুলি বের করছিল।

লীলা বলল, ও কী?

এই গয়নাগুলো মা দিলেন। কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিন দিদি।

ওটা রাখো। আমি দেখছি। লীলা দরজার পর্দা তুলে বাইরে উঁকি দিয়ে বলল, বাসিনী, ঘণ্টা উঠেছে?

গালে হাত রেখে রান্নাঘরের বারান্দায় বাসিনী চুপচাপ বসে ছিল। লীলার কথা শুনে রান্নাঘরের পাশের ঘুপটি ঘরটায় একবার উঁকি মেরে মাথা নাড়ল। হারামজাদা বমি না করলে লীলা একটুও টের পেত না। বাসিনী আদৌ বুঝতে পারেনি, লীলা সারারাত জেগেই কাটাচ্ছিল। বাসিনী দরজা খোলার জন্যে বকুনি খেয়েছে, সেজন্যেও নয়—চোখের সামনে লীলারাণী বেচারার গতরটা ফাটিয়ে লাল করে দিলে। শেষ রাত্তিরে ভদ্দরলোকের বাড়ি এ কি অনাছিষ্টি।

বাসিনী মনে মনে বিলাপ করেছে। শাপ দিয়েছে। ঘৃণা করেছে লীলারাণীকে। তারপর বারবার উঠে গিয়ে ঘণ্টার মাথায় হাত রেখেছে। বলেছে, ঘুমো বাবা, নির্ভয়ে ঘুমো মানিক। খোয়ারী ভাঙতে আর দেরী নাই। তাপারে সোজা চলে যাস্ গেরামে। আমি? আম্মো যাবো তোর সঙ্গে! মরব এখানে থেকে? ও সব্বোনাশে ভাসাচ্ছে—ভাসুক। আমরা কেনে লোভের টানে ওঁয়ার পেছনে যাব মানিক? যাব না।

লীলা বাসিনীর আচরণে ব্যাপারটা কিছু অনুমান করেছিল। সে ভাবতেই পারেনি, এই বাসিনী ঘণ্টাকে এত স্নেহ করে। দুবেলা ঘণ্টার সঙ্গে ওর ঝগড়াঝাটি ধমক দিয়ে মেটাতে হয় লীলাকে! সেই বাসিনী লীলার পায়ে মাথা কুটছিল মারধার সময়।

হয়ত অন্য সময় হলে এত রাগ হত না লীলার। সারাটি দিন ও রাতের সব ক্ষোভ সবটুকু ক্রোধ যেন ঘণ্টার উপর ফেটে পড়েছিল সুযোগ পেয়ে। পরে সে পস্তেছে। অত ক্ষেপে যাওয়া তার ঠিক হয়নি। রূপপুরের মাটির সঙ্গে এখন মাত্র এদুটি মানুষই যোগসূত্র হয়ে টিকে আছে যেন। ওরা না থাকলে কি সে হাঁফিয়ে উঠত না? নিঃসঙ্গ বোধ করত না নিজেকে? এতবড় শহর—এত লোকজন, এদের চেয়ে কে বেশি আপন আছে তার?

লীলা রমার দিকে ফিরে বলল, এস। শংকর জ্যাঠাকে এখন কোর্টে ধরা যাবে। ভেবেছিলাম, ও'র ছায়া আর মাড়াব না। কিন্তু মাড়াতেই হল। অহীনের জন্যে।—

'অহীনের জন্যে' কথাটা কেমন খাপছাড়া লাগছিল রমার কানে। সে উঠে দাঁড়াল।

লীলা বেরোনর মুখে বাসিনীকে বলল, ঘণ্টা উঠলে চান করে খেয়ে প্রেসে যেতে বলবে।

বাসিনী ফের ঘাড় নাড়ল মাত্র।

রিকশোয় চেপে কোর্টের দিকে যাচ্ছিল ওরা। জগদীশের দোকানের সামনে অসতেই কে ডাকল রমাকে। রমা মুখ ফিরিয়ে দেখে বলল, জগদীশ। রিকশো থামাবো দিদি?

লীলাই থামাল। রমা নামতে যাচ্ছিল, তার আগেই জগদীশ কাছে এসে লীলাকে নমস্কার করেছে। রমা বলল, জগদীশবাবু। ওই যে চায়ের দোকান......

জগদীশ বলল, সুখেনবাবুর জন্যে আমাদের হয়রানি। কী আর বলি, বলুন—আপনি হয়ত সবই শুনেছেন ইতিমধ্যে। যা করেছে, সুখেনবাবু আর লালুই

করেছে। মাঝখান থেকে এই হাঙ্গামা আমার ঘাড়ে পড়ল। আপনি তো সুখেনের গার্জেন, যা করতে হয় করুন।

লীলা ভ্রূ কুঁচকে বলল, ওরা রাত্রে আপনার বাড়ি থেকেই ধরা পড়েছে শুনলাম। আপনি তো থানায় ছিলেন। আপনার মেয়ে একা ছিল।

জগদীশ গ্রাহ্য না করে বলল, শিবির কথা ছেড়ে দিন। জগার মেয়ের ভাবনা জগার মাথাতেই থাক্। আপনি এখন কী করবেন?

আমি কী করব? সুখেনবাবুর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

জগদীশ জিভ কাটল। লাল কুৎসিত জিভ। ঠোঁটে পানের কুচি। থ্যাবড়া নাকের নীচে পুরু কাঁচাপাকা গোঁফটা কাঁপছিল। ...ওটা কি কথা হল ম্যাডাম? সাতকান্ড রামায়ণের শেষে সীতা কি রামের মাসি হয়, না, হওয়া সাজে? আপনিই বলুন।

অপমানে রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছিল লীলার। সে বলল, আপনার মাতলামি শোনবার সময় নেই আমার। এই রিকশো-ওলা, চলো।

রিকশোর চাকা গড়াচ্ছিল। পিছন থেকে জগদীশ বলল, ভালো হল না কাজটা। রমাদিদি, বুঝিয়ে বলো ওনাকে। এটা ওনার গ্রাম নয়। এখানে অনেক লালুভুলু আছে। লালু হয়ত দেখেছেন, ভুলুটা দেখেন নি।

গজগজ করছিল লীলা। রাগে কাঁপছিল থরথর করে। বাজমুখী কাঁকনপরা হাতের পাকানো মুঠিতে নীল শিরা ফুটেছিল। রমা কাঠ হয়ে বসে আছে। কোর্টের প্রাঙ্গনে রিকশো দাঁড়াতেই প্রায় লাফ দিয়ে লীলা নামল। ক্ষিপ্রহাতে রিকশোভাড়াটা গুঁজে দিয়ে পা বাড়াল। বেশ অস্বাভাবিক কন্ঠে সে ডাকছিল, জ্যাঠামশাই, জ্যাঠামশাই!

শঙ্করবাবু ডুমুরগাছের নীচে দাঁড়িয়ে চশমার কাচ মুছছিলেন। লীলাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, লীলা তুমি! আবার কোর্টে কেন?

একটু আড়ালে চলুন, বলছি।
লীলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

খানিক পরেই দুজনে কোর্ট ছেড়ে ফের রিকশো চেপে প্রেসে পৌঁছেছে। পৌঁছেই দেখেছে, রাণীচকের পিনাকীবাবু লীলার অপেক্ষায় বসে আছে।

বেশ আরাম করে বসল লীলা। ফ্যানটা পুর্ণ বেগে চালিয়ে দিয়ে বসল। রমা কম্পোজিং সেক্‌শনে গিয়ে ঢুকেছে। লীলা বলল, তারপর, খবর বলুন।

পিনাকী হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। এই সেই সতুর বৌ? এই ব্যস্তমস্ত বৌশিজ্যান্ত সপ্রতিভ চালাকচতুর ডাঁটদেখানী মেয়েটি? ভাইকরা টিবিখোঁপা, কপালে কাঠি টিপ, কাজলটানা ঘোরালো চোখ—মুখের চামড়ায় পদ্মফুলের পাপড়িখানা ......টিয়াপাখির মত টুকটুকে ঠোঁটে কী সুন্দর বুলি,......

লীলা ফের বলল, খবর ভালো সব? বাজারে এসেছিলেন না আপিসের কাজে?

একটা নিঃশব্দ ওতপ্রোত বিলাপ পাড়া-গেঁয়ে রসিক—চিরকালের ভাঁড় পিনাকী মুখুয্যের মাথায় চাপ দিচ্ছিল। এবার ফোঁস করে নাকের ছিদ্র দিয়ে বায়ুরূপে সব বেরিয়ে গেল। অপ্রস্তুত হেসে সে বলল, এই একবার এলাম এদিকে। ভাবলাম, মারাণীকে একবারটি দেখে যাই।

লীলা কেজো কণ্ঠস্বরে বলল, ছাপার কাজ হয় না আপনাদের? কী আপিস যেন আপনার?

পিনাকী একটু কেশে জবাব দিল, কো-অপারেটিভ। ছাপার কাজ থাকে বৈকি। বিস্তর থাকে।

লীলা সোৎসাহে বলল, কোথায় করান?

যেখানে সুবিধে পাই, করাই। পিনাকী আমতা হাসল বলতে বলতে।...আমার আবার এ ব্যাপারে একটু বদঅভ্যেস আছে মালক্ষ্মী, বুঝলেন? ছাপোষা মানুষ—দু-চার পয়সা কমিশন পেলে সেদিকেই ছুটে যাই।

দেব। কমিশনও পাবেন। লীলা কেজো গলায় বলল। ...বেশ তো, ওদিকের সব অর্ডার আপনিই নিয়ে আসুন—পুষিয়েই দেব।

পিনাকী অবশ্য এ ব্যাপারে আসেনি। সে অভ্যাসমত দুহাত কচলাচ্ছিল। লীলা তার জন্যে চা আনতে বললে সে একটু নড়ে বসল। তারপর সোজা হল। বলল, সে হবে'খন। আপনারা আমাদের একরকম নিজেরই লোক। পাড়াসম্পর্কে তো বৌমা ছিলেন একসময়। সতু আমাদের ন্যাওটা...

সামলে নিল সে। ঝোঁকের মুখে সাপের ঝাঁপি উদোম করতে যাচ্ছিল যেন। ওদিকে লীলা মুখটা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে টেবিলের ওপর। কী একটা কাগজ দেখছে।

পিনাকী শুধরে নিয়ে বলল, রাণীচকে আজকাল জমজমাট কান্ড। হাটুবাবুকে চেনেন তো?

লীলা মাথাটা এত অল্প দোলাল যে সেটা চেনা না অচেনার দরুন—তা মোটেও বোঝা গেল না।

হাটুবাবু এ্যাদ্দিনে বোনমিলটা খুলেছেন। সে এক এলাহী কারবার। পিনাকী হাসতে লাগল। ...ওদিকে নলিন সব মাল জোগাচ্ছে। হাইওয়ের ধারেই খুলেছে মস্তো আড়ত। কিসের আড়ত শুধোলেন না?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লীলা মুখ তুলে বলল, কিসের?

আরো জোর হেসে পিনাকী বলল, হাড়ের। রাজ্যের মুদ্দোফরাস গিয়ে জুটেছে সেখানে। এলাকার মাঠ জঙ্গল আর ভাগাড় থেকে হাড় এনে জড়ো করছে। গন্ধে রাণী-

চকে ঢোকা দায়। তার ওপর জুটেছে এক আস্ত মড়াখেকো চন্ডাল—দিনরাত্তির নেশা-ভাঙ করছে আর চূড়ান্ত বদমাইসীতে মেতে রয়েছে। একাদোকা বৌঝিদের পথ চলা দায়। কবে ওর মুণ্ডু ধুলোর গড়াগড়ি যেত—কেবল নলিনটা ওর মাথার ওপর রয়েছে, এই যা পরিত্রাণ! ...উৎসাহে আরো ঝুঁকে এল পিনাকী। ...জানেন ও কী করেছে?

লীলা নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাল মাত্র। কার কথা বলছে, বুঝতে পারছে না বা বুঝবার চেষ্টাও করছে না সে।

ঘরে এক নাবালিকা আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে হারামজাদা গর্ভবতী করে ছাড়লে। তার ওপর চায়ের দোকানের দরুণ...মানে বুলু নামে যে ছেলেটি ও রেখেছিল, তার মা—আমাদের নিবারণ মাস্টারের বৌ.........চেনেন না?

লীলা উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল, কানাইবাবু, শুনুন।

কানাই আসবার আগে চা এসে গেল। নিঃশব্দে চা খেতে থাকল পিনাকী। এসব খবর দিতেই কি এখানে ঢুকেছিল সে? একটু বোকামিই হয়ে গেল যেন।

কানাই আসছে না দেখে লীলা প্রেসের ঘরে ঢুকল।

পিনাকী অপমানিত বোধ করছিল। কেন এখানে ঢুকেছিল সে? পিনাকী মুখুজ্যের বয়স হয়েছে। সারা জীবন সে সবকিছুতে কৌতুক খুঁজে ফিরেছে। এই তার মজ্জাগত অভ্যাস। লীলার কাছে সতুর পরিণতির খবর শুনিয়ে সে তার অভ্যাসকে চরিতার্থ করতে চাইছিল মাত্র। কোন উদ্দেশ্য এর পিছনে ছিল না তার। একদিন এই অভ্যাসের বশেই লীলার ডিভোর্স মামলায় সহায়তা করেছিল সে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর লীলা এল না দেখে সে উঠে দাঁড়াল। প্রেসঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, তাহলে আসি মা।

ফ্ল্যাট মেসিনটা মেরামত হচ্ছে, লীলা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। পিনাকীকে লক্ষ্যও করল না। পিনাকী আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। তার মুণ্ডুটা ঝুলে পড়েছে বুকের দিকে। থমথম করছে মুখটা। মনে মনে লীলাকে কুচ্ছিত গাল দিচ্ছিল সে।

রমা ভিতরের দিকে জানালার পাশে একটা টুলে বসে প্রুফ দেখছিল এতক্ষণ। লীলা অফিসে এলে সে পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, লোকটা কে লীলাদি?

লীলা হাসল। ...রাণীচকের।

সেই যেখানে আপনার বিয়ে হয়েছিল?

লীলা এবার ফেটে পড়ল হাসিতে। রমা অবাক হয়ে গেছে। একথায় এত হাসবার কী আছে সে বুঝতে পারে না।

লীলা হাসছিল। বেশ কিছুদিন ধরে একের পর এক আঘাত সহ্য করে ক্রমশ সে যেন শরীরেমনে নিঃসাড় হয়ে পড়ছিল। এ হাসি তার দরকার ছিল। বুক হাল্কা হয়ে যাচ্ছিল। সংসারকে বশ মানিয়ে রাখতেই যেন সে পৃথিবীতে এসেছে—অবিকল তার মা কুমুদের মত এই রকম একটা ধারণা তার মনে ততক্ষণে দানা বাঁধতে সুরু করেছে।

রমা বলল, বেরোতে হবে। চলি।

লীলা রুমাল বের করে মুখটা আলতো স্পঞ্জ করে নিচ্ছিল। বলল, কোথায় যাবে?

কালেকশানে যাই। এক গাদা বিলের টাকা পড়ে আছে।

বিকেলে বাড়িতে যেও। দরকার আছে। আর অহীন থানা থেকে ফিরলে তাকেও যেতে বলো।

ঘাড় নেড়ে রমা বেরোল। লীলা ডাকল, কানাইবাবু, কী মেসিন কেনার কথা বলছিলেন যেন?

কানাই এগিয়ে এসে বলল, একটা সেকেন্ডহ্যান্ড কাটিং মেসিনের খোঁজ পেয়েছি, মা। জিনিবটা ভালোই হবে।

দাম বলেছে?

না। আপনি নিজে দেখবেন না একবার?

আমি চিনি নাকি ওসব?

কানাই মাথা চুলকে বলল, তাহলে আমিই যাচ্ছি। আপনি থাকছেন তো এখন?

আছি কিছুক্ষণ।

কানাই দরজার বাইরে পা দিতেই হঠাৎ লীলা উঠল। ...কানাইবাবু, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই।

ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেল। মেসিন-ফেসিনের কী ছাই বোঝে লীলা! তবে চেহারা দেখে জিনিষটা তার ভারী পছন্দ হয়েছে। একটা দীর্ঘ ক্ষুরধার ইস্পাতের পাত আস্তে আস্তে নেমে আসে। সুন্দর নরম সাদা কাগজকে নিঃশব্দে দুভাগ করে ফেলে। দাঁতে দাঁত চেপে যায় দেখতে। যা দাম চেয়েছে, তাতেই রাজী। ফিরে গিয়ে ব্যাঙ্কের পাশবই নিয়ে বসতে হবে।...

বুকটা আচমকা কেঁপে উঠেছিল লীলার। আর কতটাকা আছে তার? যদি সব শেষ হয়ে গিয়ে থাকে? রূপপুরে আর সামান্য কিছু মাটি আছে মাত্র। তারপর?

মাথা ঘুরছিল। একটা অদৃশ্য ভয়ানক শক্তিকে কিনে ফেলবার জন্য সর্বস্ব বিকিয়ে দিচ্ছে সে!

প্রেসে এসে দেখল ঘন্টা টুলে বসে আছে গোমড়া মুখে। তার চিবুকে ঠোনা মেরে লীলা বলল, ঘন্টুবাবু কতক্ষণ? ভাবছিলাম, রেগেমেগে পালিয়ে গেলি হয়ত!

ঘন্টা উঠে দাঁড়িয়ে আকর্ণ হাসল। তারপর জানাল,—যা জানাল, লীলা মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠবার পরই অবসন্নভাবে বসে পড়েছে। ফ্যাকাসে ছাই-ছাই মুখ, খড়ি খড়ি চেহারা—চেয়ারে ঠিক কাগজের ছবির মত সে নিশ্চুপ হয়ে গেছে কিয়ৎক্ষণ।

এইমাত্র সুখেনবাবু এসেছিল। তারপর তার ঘরে ঢুকে বিছানাপত্র বাকসো সব নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ঘন্টাই রিকশো ডেকে দিয়েছে। মাল সেই তুলে দিয়েছে রিকশোয়। সুখেনবাবু বলে গেছে, তোমার দিদিমণিকে বলো, কলকাতা যাচ্ছি। (ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

পুষ্পসজ্জায় দেওয়ালি উৎসব

পুষ্পসজ্জা সম্পর্কে কোনকিছু সঠিক হদিস করা সেদিনও ছিল খুবই কষ্টকর। শুধু আদর অভ্যর্থনা বা ঘর সাজানোতেই ফুলের আবেদন নিঃশেষ হয়ে যায় না। যদিও সংস্কারের বশ-বর্তী হয়ে ফুলকে আমরা ঠাকুর ঘরের চৌহদ্দিতেই আটকে রেখেছি, তবুও এর আর দুটি প্রয়োজন মোটামুটি ভাবে অনেকদিন ধরেই স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। তার একটি হলো ফুলশয্যা এবং আরেকটি হলো মৃতের শিয়রে পুষ্প প্রদান রীতি। প্রথমটিতে কল্পনা-বিলাসের সুযোগ অখণ্ড। নববধূর হৃদয় হরণের এ-হেন ক্ষেপণাস্ত্রের প্রচলন চলে আসছে নিরবধি কাল ধরে। দ্বিতীয়টির মধ্যে ভাব ও কল্পনার অবকাশ ততটা নেই। সেখানে শুধুই ফুল হল শ্রদ্ধাঞ্জলি। তবুও দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায় পুষ্পের শুভ্রতায় ;—সৌরভ এবং বর্ণ-মাধুর্যে।

আমাদের ধ্যান-ধারণায় এবং মনন-চিন্তনে ফুল শুধু কালজয়ী মহিমা অর্জন করেছে। এর বেশী কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ত ছিল না। কিন্তু ফুলকে অধিকতর মর্যাদায় আসন দেওয়ায় আমাদের অন্তরের সায় মেলেনি। তাই চিন্তার দিগন্তকে পুষ্প মাহাত্ম্যে স্ফীত করে অতটা টেনে নিয়ে যেতে কেউ রাজী হননি।

চিন্তার রাজ্যে আজ তুমুল তোলপাড় দেখা দিয়েছে। জল, স্থল, নভোমণ্ডল সেই চিন্তায় দারুণ ভাবে আলোড়িত। চিন্তায় এই ব্যস্ততার মধ্যেও ফুলকে মানুষ কিন্তু কখনই বিস্মৃত হতে পারেনি। বরং দিনে-দিনে মানুষ আরও ফুলের কাছাকাছি হয়েছে। তাকে নিবিড় করে পেতে চেয়েছে, তার মধ্যে মানুষ আবিষ্কার করেছে শিশু-হৃদয়ের নির্মল উচ্ছ্বাস, মনের সুখ আর প্রিয়ার হাসিমুখ।

সেই কল্পনা আজ আরও বিকশিত। কল্পনায় নতুন সংযোজন এবার নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। তারই বিচিত্র রূপ কল্পনায় সে আজ একান্ত চিন্তাতুর।

হালফিল কলকাতা পুষ্প-সজ্জার মাধুর্যের সঙ্গে নতুন মিতালি পাতিয়েছে। পুষ্প-সজ্জার প্রকৃত নির্দিষ্ট সময় যদিও শীতকাল, তবু তার বাইরেও মানুষ চিন্তা করে। সব সময়েই নিজেকে মানুষ সৌন্দর্যে ভরিয়ে রাখতে চায়। আর সৌন্দর্যের প্রধান উপকরণ তো হলো ফুল। তাই মানুষ প্রতি ঋতুতে পুষ্প সৌন্দর্যের আবাহন করে।

ঋতু ভেদে ফুলের বৈচিত্র্য আমাদের দেশে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যায়। গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শরৎও ফুলে উপচে পড়ে। তবু শীতের নির্মেঘ আকাশ আর দুষ্টুমি-ভরা মিষ্টি রোদ্দুর মানুষকে নতুন সাজে সাজায়, নতুন কথা ভাবায়। প্রকৃতি সাজায় তার বরণডালা অজস্র উপচারে।

মানুষ উৎসাহে মত্ত হয়। রঙীন পোষাকে সে শুধু ফুলের স্বপ্নে বিভোর। বিচিত্র বর্ণের সম্ভারে অপরূপ প্রকৃতিকে নিজের ভাবনা চিন্তা দিয়ে মানুষ ধরে রাখতে চায়। তাই সে করে পুষ্প-সজ্জার আয়োজন। ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা আর গাঁদা ফুলের প্রতিযোগিতায় এই সময় আসর থাকে সরগরম। ঘর সাজানোর মনোরম পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে এইসব পুষ্প-সজ্জার।

এখান থেকেই মানুষের দৃষ্টি অনেকখানি উদার পরিবর্তী হয়। কিন্তু ঘর সাজানোর মধ্যেই তো ফুলের উপযোগিতা শেষ হয়ে যেতে পারে না। যদিও ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রুচির অনেকখানি সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটে, অথবা ঘরের কোণে জানালার ধারে একটি বাঁকানো লতা গৃহকর্ত্রীর সুরুচিকে চিহ্নিত করে, তবুও নিত্যদিনের এই ব্যবহারিক উপযোগিতার মধ্যে আমরা তৃপ্তি পাই না। তাই বার বারই মনে হয় ; হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোন খানে।

সেই অন্য জিনিষটিকে পুরোপুরি মৌলিক চিন্তায় রূপদান করেছেন কুসুমিকা। দেওয়ালী উপলক্ষে তাঁরা একটি পুষ্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন পার্ক হোটেলে। ফুলকে প্রতীক করে দেওয়ালী উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে এই পুষ্পসজ্জা। শুধু ঘর সাজানই নয়, চিন্তার পরিধিকে আর একটু বিস্তার করলে আমাদের মনের আয়তন যে বেড়ে কত যায় তারই প্রমাণ পাওয়া গেল কুসুমিকার এই অনুষ্ঠানে। লক্ষ্মীবরণ ও অলক্ষ্মী বিদায়—দেওয়ালী উপলক্ষে আমাদের বহুদিনের এই সংস্কার যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই পুষ্প-সজ্জায়। তেমনি মুন্সিয়ানা নজরে পড়ে দেওয়ালীর প্রধান অঙ্গ বাজীর আসরের সুষ্ঠু রূপায়ণে। প্রদর্শনীতে উপস্থিত সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন ঠাকুমা এবং নাতিকে সমান আনন্দ দেওয়ার পক্ষে এই পুষ্পসজ্জা সার্থক। কিন্তু এটুকু বললেই এই পুষ্পসজ্জা সম্বন্ধে সব বলা হয় না। এই ক্ষেত্রে আছে প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা শ্রীমতী উমা বসুর প্রাচীন সংস্কৃতি ও সংস্কারের নিখুঁত রূপায়ণ,

এছাড়া আরও কয়েকটি পুষ্প-সজ্জা বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল। শতমূলীর সাহায্যে রূপায়িত পুষ্পসজ্জাটি দীর্ঘ-দিন মনে রাখার মত।

কুসুমিকা আয়োজিত এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়। শ্রীমতী উমা বসু ইতিপূর্বে একাধিকবার একক পুষ্পসজ্জায় আত্ম-প্রকাশ করেছেন। তখনই রসিকজনের দৃষ্টি তার উপরে পড়ে। এবার তিনি আবির্ভূতা হয়েছেন সদলে। এছাড়া কিছু গেস্ট আর্টিস্টও আছেন। অতিথি শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী মিনু চান্দের, শ্রীমতী ভাণ্ডারী এবং শ্রীমতী শশীকুমার বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নিজস্ব শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী অঞ্জলি রায়চৌধুরীর লক্ষ্মীবরণ ও অলক্ষ্মী বিদায় এবং শ্রীনারায়ণ কর্ম-কারের বাজীর আলো সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীমতী ইভা রাহা, শ্রীমতী মঞ্জুলা সর-কারের পুষ্প-সজ্জা দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

কুসুমিকা বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতায় পুষ্প-সজ্জাকে জনপ্রিয় করার কাজে নিযুক্ত রয়েছে। তাছাড়া আগ্রহী-দের নিয়মিত শিক্ষা ব্যবস্থাও এখানে করা হয়। এই সঙ্গে শ্রীমতী উমা বসুর নিজের বাড়ীতেও একটি শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনা করেন। পুষ্প-সজ্জায় বিদেশী শিক্ষায় পুষ্ট হয়েও তিনি স্বদেশী ভাবনাকে মোটেই বিস্মৃত হতে পারেননি। তাই তাঁর প্রতিটি অনুষ্ঠানেই স্বদেশীয়ানার নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়।

তাছাড়া তাঁর চিন্তার মৌলিক দিক বিশেষ প্রশংসনীয়। কোন বিশেষ ঋতুর উপর নির্ভর না করে সব ঋতুকেই তিনি পুষ্প-সজ্জার উপযোগী মর্যাদা দেন। তাই তিনি যেমন শীতকালে ফুল নিয়ে কল্পনা বিলাস ভালবাসেন তেমনি বর্ষা বা শরৎকেও তুল্য মূল্য মনে করেন।

কুসুমিকার উদ্যোগে আর একটি স্বাস্থ্যকর লক্ষণ দেখা গেল পুষ্প-সজ্জায় পুরুষদের আগ্রহ প্রকাশে। এবারকার প্রদর্শনীতে শ্রীনারায়ণ কর্ম-কার এবং শ্রীবসু মহাশয়ের অংশ গ্রহণ পুষ্পসজ্জায় মহিলাদের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে অনেকটা জেহাদ ঘোষণার মত।

সেদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীমতী বসু জানালেন, বিলেতে শিক্ষাকালে তিনি এমন অনেক মহিলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, যাঁরা স্বামীর প্রতিনিধি-স্বরূপে এই শিক্ষা গ্রহণ করেন। কারণ তাঁদের স্বামীরা আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পুষ্প-সজ্জার ক্লাসে হাজির হতে পারেন না। কলকাতার পুরুষ সমাজ লোকনিন্দার ভয় কাটিয়ে পুষ্প-সজ্জায় অংশ গ্রহণ করেছেন এটা সত্যি আনন্দ, গর্ব ও অহঙ্কারের। তাঁরা আর একবার প্রমাণ করলেন যে, পুরুষ-সিংহ খেতাবটা তাঁদের যোগ্য পাওনা।

কলকাতার প্রথম আত্ম-প্রকাশেই খরার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য শ্রীমতী বসু যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন তা যথেষ্ট অভিনন্দিত হয়েছিল। তারপর গ্রীষ্ম, বর্ষার মাঝামাঝি সময়ে রঙের উপর জোর দিয়ে তিনি যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন তার স্বাদ, রূপ ছিল আলাদা। এইবারকার প্রদর্শনীতে আগে-কার দুটির স্বাদ কিছুটা পেলেও নতুন আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ল বেশি।

—প্রমীলা

ফটো : অমৃত

শীত প্রারম্ভের প্রসাধন

ঋতু অনুযায়ী কেবল যে প্রকৃতিতে-ই পরিবর্তন ঘটে তা নয়, আমাদের দেহ আবরণেও কিছু কিছু রূপান্তর দেখা যায়; গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে গাত্রত্বকের যে রূপ আমরা দেখি, শীতের সময় তা নিশ্চয় থাকে না, তখন তার রং ও প্রকৃতি দুটোর-ই পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বভাবতই তখন ত্বকপরিচর্যারও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা বোধহয় অনেকে লক্ষ করেছেন, দুটি ঋতুর মধ্যে শীতকালে-ই আমাদের ত্বকের যতখানি যত্ন নিতে হয়, অন্য কোন সময় তা আবশ্যক হয় না। প্রসাধন বা রূপচর্চার কথা বাদ দিলেও অন্তত নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য-ও শীতকালে গাত্রত্বক সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হয়, কারণ শীতের কনকনে হাওয়া লেগে আমাদের চামড়ায় এমন একটা শুকনো খসখসে ভাব আসে যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও অসুবিধাজনক, কিছুটা পীড়াদায়ক-ও বটে। এই অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য-ও অন্তত কিছু কিছু প্রসাধনী ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য হই। প্রসাধন-ব্যবসায়ীরাও একথা ভালভাবেই জানেন। তাই শীত সুরু হওয়ার বেশ আগে থেকেই তারা নানা ধরণের কোল্ড ক্রীম, স্নো ইত্যাদিতে নিজেদের দোকান ভরে তোলে। বিভিন্ন চকচকে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের দ্বারা সাধারণ মানুষকে তারা এমনভাবে বিভ্রান্ত করে তোলে যে প্রসাধনীর সেই বিরাট অরণ্যের মধ্য থেকে উপযুক্ত জিনিষটি বেছে নেওয়া অনেকের পক্ষেই বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের কথায় মার-প্যাঁচে মুগ্ধ হয়ে চট করে কিছু একটা প্রসাধনী কিনে নেওয়াও সব সময় খুব নিরাপদ নয়, কারণ অনেক প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে এমন বহু সস্তা জিনিষ থাকে, যা আমাদের ত্বকের উপকার তো দূরের কথা, বরং ক্ষতি করে অনেক বেশী। বাজে জিনিষ ব্যবহার করে স্থায়ীভাবে নিজের দেহের ক্ষতি করেছেন, এমন ভুক্তভোগীর সংখ্যা বোধহয় কম হবে না। অবশ্য সব প্রসাধনীই যে অনিষ্টকর তা মোটেই নয়, তবে ভাল ও উপকারী জিনিষের দাম স্বভাবতই এত বেশী যে আমাদের মত নিম্নবিত্তদের পক্ষে তাদের নাগাল পাওয়া বেশ শক্ত। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় বাড়ীতে কিছু কিছু প্রসাধনী প্রস্তুত করে নেওয়া। এতে-ও অবশ্য অসুবিধা কম নয়; কারণ ভাল জাতের একটা প্রসাধনী তৈরীর জটিলতা অনেক—এর উপাদান সব সময় পাওয়া যায় না, প্রস্তুতপ্রণালীও সবক্ষেত্রে খুব সরল নয়। তবু সহজপ্রাপ্য উপাদানে ও সরল প্রণালীতে করা যেতে পারে, এমনি কয়েকটি প্রসাধনীর কথা আজ বলব।

বেশী ঠাণ্ডার সময় অর্থাৎ পৌষ ও মাঘ মাসে চামড়া সুরক্ষিত রাখার জন্য আগে থেকে-ই সাবধানতা ও প্রস্তুতি দরকার; তাই শীতের প্রারম্ভেই এবিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে নীচের প্রসাধনীটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। শীতের উত্তরে হাওয়ায় যাঁদের গা, হাত-পা বেশী ফাটে বা খসখসে হয়ে ওঠে, তাঁদের পক্ষে এটি খুব-ই উপকারে আসবে। অথচ এর প্রস্তুত প্রণালী-ও অত্যন্ত সরল, এর জন্য প্রয়োজন

গোলাপ জল—১০০ গ্রাম
গ্লিসারিণ—২৫ গ্রাম
ট্যানিন—৭৫ গ্রাম

উপরোক্ত জিনিষগুলি একসঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে নিলেই প্রসাধনীটি তৈরী হল। একটা মুখ বন্ধ করা বোতলে এটি রেখে দিতে হবে। প্রত্যহ নিয়মিত ২।৩ বার হাত, মুখ ও দেহের অন্যান্য অনাবৃত অংশে লোশনটি প্রয়োগ করলে সেখানকার চামড়া নরম ও মসৃণ থাকে।

শীত-প্রারম্ভের প্রসাধনী নির্বাচনে দুটি বিষয়ে সাবধানতা প্রয়োজন, প্রসাধনীর পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে চামড়ায় একটা বিশ্রী চকচকে তেলা ভাব দেখা দেয়, এটি কেবল দৃষ্টিকটুই নয়, ত্বকের পক্ষেও ক্ষতিকর, কারণ এই তেলা ভাবের জন্য চামড়ার ওপর ধূলিকণা জমে লোমকূপের মুখ বন্ধ করে দিতে পারে, ফলে চামড়া স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা। আবার অপরদিকে শীতকালে চামড়া নরম রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তাতে এমন একটা খস্‌খসে ভাব আসে যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও অসুবিধাজনক। শীতের প্রারম্ভে যাঁদের গায়ের চামড়া অতিরিক্ত রুক্ষ ও খস্‌খসে মনে হয়, কিংবা বিশ্রী রকম শাদা শাদা খড়ির মত ওঠে, তাঁরা এই প্রসাধনীটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন, বাজারের যে কোন নামী বা দামী কোল্ডক্রীমের চেয়ে এটি কম উপকারী নয়। এর জন্য উপকরণ দরকার

বাদাম তেল—১০০ ভাগ
শাদা মোম—১৩ ''
গ্লিসারিন— ২৫ ''
চামড়ার পক্ষে নির্দোষ যে কোন গন্ধদ্রব্য প্রয়োজনমত।

প্রথমে বাদাম তেল, মোম ও গ্লিসারিন একসঙ্গে নিয়ে আগুনে গরম করে নিন: উত্তাপে সবগুলি গলে মিশে যাবার পর আগুন থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন: কিছু পরে তাতে তরল গন্ধদ্রব্যটি এমনভাবে মেশান যাতে সবটাই একটি কাদার মত পদার্থে পরিণত হয়। প্রত্যহ দিনে দু'বার এবং রাত্রে শুতে যাবার আগে ক্রীমের মত সারা মুখে এটি প্রয়োগ করলে ত্বক খস্‌খস্‌ করা বা শুকিয়ে যাওয়ার বিরক্তিকর অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শীতকালে বা শীতের প্রারম্ভে ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে অনেকেরই গাত্রত্বক বিবর্ণ হতে দেখা যায়। বছরের অন্যান্য সময়ে শরীরে রঙ-এর যে স্বাভাবিক লাবণ্য বা উজ্জ্বলতা থাকে, শীতকালে সেটা যেন কিছুটা কমে আসে। যথাসময়ে সতর্ক হলে, এর হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের প্রসাধন-বিশেষজ্ঞরা একটি সুন্দর লোশনের সুপারিশ করেছেন। সেটি প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন—

ল্যাকটিক এ্যাসিড—৪ আউন্স
গ্লিসারিন— ২ ''
গোলাপ জল— ১ ''

ওপরের উপাদান তিনটি একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই লোশনটি তৈরী হবে। একটি সিল্ক বা এই জাতীয় নরম কাপড়ের টুকরো লোশনে ভিজিয়ে আস্তে আস্তে সেটি চামড়ার ওপর ঘসে নেবেন। রোজ ৫।৬ বার এটি ব্যবহার করা যায়: তবে এ্যাসিড আছে বলে অনেক সময় চামড়া সামান্য জ্বালা করতে পারে; সেক্ষেত্রে প্রয়োগের পরিমাণ কিছু কমিয়ে দেওয়াই ভাল। শীত সুরু হওয়ার কিছু আগে থেকে এটি নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।

—মিনতি সেন

[উপন্যাস]

[illegible]

কেয়াপাতার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

[উনিশ শ চল্লিশের অক্টোবর। কলকাতার ছেলে বিনু [illegible] দিদি আর [illegible] সঙ্গে বেড়াতে এসেছে পূর্ব বাঙলার রাজদিয়ার দাদু হেমনাথের বাড়ি। [illegible] বিনুর মা সুরমা এলেন রাজদিয়ায়।

আশ্চর্য মানুষ হেমনাথ। গাঁয়ের নানান ঝক্কি-ঝামেলা তাঁর [illegible]।

হেমনাথের বাড়ির কর্মচারী যুগলের সঙ্গে [illegible]।

প্রথম দিনেই অবনীমোহনদের সঙ্গে আলাপ হয় [illegible] আলির। ওদের আন্তরিকতায় সুরমারা অভিভূত। [illegible] নতুন 'মিতা'।

পরদিন। বিনুদের রাজদিয়া ঘুরে দেখালেন হেমনাথ। [illegible] কর চমকপ্রদ মানুষ লারমোর সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনিও ওদের সঙ্গে [illegible] বাড়ি এলেন।

স্নেহলতার সঙ্গে দেখা হতেই কৌতুকের খেলা জমল। লারমোরের [illegible] বাড়ির মধুর প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক দেখে বিনু মুগ্ধ। [illegible]।

পরদিন সুজনগঞ্জের হাটে রওনা হল। বিনু যুগলের [illegible] মোহন হেমনাথ, অবনীমোহন আলাদা নৌকোয়। নৌকো এগিয়ে চলল। [illegible] প্রথম নৌকো-চড়া তার। সে মুগ্ধ। শাপলা-পদ্মের বনের ভেতর দিয়ে যুগলের [illegible] ভিড়ল এক গ্রামে। সেটা ওর পিসতুতো বোনের বাড়ি।]

।।এগার।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটু পর সামনের একখানা ঘর থেকে মাঝবয়সী একটি মেয়েমানুষ বেরিয়ে এল। তেলহীন রুক্ষ চুল তার, এই আশ্বিনেও গা-ভর্তি ঘামাচি, ফলে চামড়া খসখসে, খই-ওড়া, গাল ভাঙা, চোখের কোল বসে গেছে, রংটি এক সময় মাজা মাজাই হয়ত ছিল। পরনে ময়লা ডুরে শাড়ি ছাড়া কিছুই নেই। এসব সত্ত্বেও তাকে ঘিরে নিভু নিভু একটু লাবণ্য এখনও টিকে আছে।

মেয়েমানুষটার দু ধারে লম্বা লাউয়ের মতন স্তন চুষতে চুষতে দুটো তিন-চার বছরে ন্যাংটা বাচ্চা ঝুলছিল। দেখে মনে হল, সব সময় ওরা ঐভাবেই ঝোলে।

সাঁকোর ওপর উঠে এসে মেয়েমানুষটি বলল, 'আ রে যুগলা পোড়াকপাইলা, রোজই নি আমাগো বাড়ি আসস (আসিস)!' বলে একমুখ হাসল।

বিব্রত যুগল তাড়াতাড়ি পাটাতনের তলা থেকে শোলমাছ বার করে বলল, 'আইতে আইতে (আসতে আসতে) এই মাছটা মারলাম ; ভাবলাম তগো (তোদের) দিয়া যাই।'

হাত বাড়িয়ে মাছটা নিতে নিতে মেয়েমানুষটি বলল, 'রোজই দেখি মাছ ধইরা দিয়া যাইতে আছস (আছিস)।'

যুগল হাত কচলাতে কচলাতে বলতে লাগল, 'ভাইগ্না (ভাগনে)-ভাগ্নীগো মাছ খাওয়াইতে বুঝি সাধ হয় না আমার!'

চোখের তারা নাচিয়ে ঠোঁট উল্টে দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করল মেয়েমানুষটি, 'আহা লো সোনা লো, ভাইগ্না-ভাগ্নীগো লেইগা বুকের ভিতর একেরে (একেবারে) ফাতু ফাতু করে। আসলে কারে মাছ খাওয়াইতে আনো হে (তা) কি বুঝি না!'

যুগলের মুখচোখের চেহারা এই মুহূর্তে অবর্ণনীয়। ঘাড় ভেঙে মাথাটা নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। জড়সড় হয়ে সে বলতে লাগল, 'কারে আবার খাওয়াইতে আনি?'

'কমু (বলব)?'

মাথা আরো নুয়ে পড়েছে। আধ ফোটা গলায় যুগল কী বলল, বোঝা গেল না।

মেয়েমানুষটি এ ব্যাপারে আবার কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখমুখ কুঁচকে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'খাইল, রাইক্ষইসা (রাক্ষুসে) গুষ্টি আমারে চাইটা চাইটা (চেটে চেটে) শ্যাষ করল। যা মড়ারা, যা—' বলে যে ছেলেদুটো ঝুলে ঝুলে স্তন চুষছিল, তাদের ঝেড়ে ফেলার মতন করে ঠেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা গিয়ে পড়ল উঠোনের জলে।

বিনু নৌকোর মাঝ-মধ্যিখানে বসে ছিল, ভয়ে চোখ বুজে ফেলল, বুকটা খুব জোরে ঢিব ঢিব করতে লাগল। উঠোনে জল তো কম না, প্রায় এক মানুষের মতন। ছেলেদুটো যদি ডুবে যায়! যদি ডুবে যায়!

একটু পর ভয়ে ভয়ে চোখের পাতা অল্প ফাঁক করতেই বিনু অবাক। সেই ছেলেদুটো সাঁতরে ওপরে উঠে পড়েছে। সাঁকো বেয়ে তারা মায়ের কাছে চলে এল এবং আগের মতন স্তনে মুখ দিয়ে ঝুলতে লাগল।

এইটুকুন ছেলে সাঁতার কাটতে পারে, নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না বিনু। এমন বিস্ময়কর দৃশ্য আগে আর কখনও দ্যাখে নি; চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে থাকল। থাকতে থাকতে মনে পড়ল, এখনও সাঁতারটা শিখে উঠতে পারে নি। তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দেবার জন্য আজই যুগলকে ধরতে হবে।

যাই হোক মেয়েমানুষটি এবার আর ছেলেদের জলে ছুঁড়ে দিল না। বিরক্ত কটু গলায় গজ গজ করতে লাগল, 'খা খা, আমারে খাইয়া ঠান্ডা হ নিঃবইংশারা, প্যাটে যে কী কাল ধরছিলাম!'

ছেলেদুটোর ভ্রূক্ষেপ নেই। কুকুর-ছানার মতন চোঁ চোঁ করে তারা দুধ খেতে লাগল।

ছেলেদের ছেড়ে আবার যুগলকে নিয়ে পড়ল মেয়েমানুষটি, 'পোড়াকপাইলা যুগলা, আমার চৌখে তুই ধুলে-পড়া দিবি। কই (বলি) তা হইলে, নামখান কই (বলি)। পাখিরে খাওয়াইতে আনস (আনিস) মাছ!'

যুগল বলতে লাগল, 'কী যে কস (বলিস) টুনি বইন (বোন) কী যে কস!'

মেয়েমানুষটির নাম জানা গেল—টুনি ; এ-ই তবে যুগলের পিসতুতো বোন। বিনু অবশ্য আগেই তা আন্দাজ করেছিল।

টুনি বলল, 'অবিরাত (অবিরাম) মইরারে রোজ রোজ মাছ খাওয়াস ক্যান? আ রে ভ্যাকরা, আ রে যুগলা—তর (তোর) মনে কী আছে রে?' শরীর বাঁকিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল টুনি।

যুগলের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ঘামে নাইতে নাইতে সে বলল, 'এমনু কথা যদি কস (বলিস), আমি আর আসুম না তগো (তোদের) বাড়িত।'

'আবি আবি, (আসবি আসবি), ঠিকই আবি (আসবি)। না আইয়া কি পারবি সোনা।'

'ক্যান, পারুম না ক্যান?'

'পাখি যে তরে (তোকে) গুণ করছে।'

'হ, তরে (তোকে) কইছে।'

টুনি আগের মতন হাসতে লাগল; কিছু বলল না।

পাখি কার নাম, কেমন করে সে যুগলকে গুণ করেছে—বুঝতে পারছিল না বিনু।

এদিকে আরেকটা ব্যাপার চলছিল। যুগল ঘামছিল, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল—সবই ঠিক। তারই ভেতর চোরা চোখে এদিক সেদিক তাকিয়ে ব্যাকুলভাবে কাকে যেন খুঁজছিল।

তার এই আড়ে আড়ে তাকানোটা লক্ষ্য করেছিল টুনি। রঙ্গ করে বলল, 'টালুমালু কইরা চাইর দিকে দ্যাখস (দেখিস) কী?'

যুগল চমকে উঠল, 'কী আবার দেখি? কই, কিছু না—'

'কিছু না!'

'না-ই তো।'

'যারে বিচরাইতে আছস (খুঁজছিস) হ্যায় (সে) নাই। পাখি উড়াল দিছে (উড়েছে)।'

নিমেষে মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল যুগলের। আবছা গলায় সে বলল, 'হ তার লেইগাই (জন্য) য্যান আইছি!'

টুনি চোখ টিপল, 'বুঝছি রে ছামরা (ছোকরা), বুঝছি। পাখি গেছে গা শুইনা মুখখান তো কালা (কালো) হইয়া গেল।'

'কালা (কালো) হইছে! তরে (তোকে) কইছে।' যুগল হাসতে চেষ্টা করল।

টুনি আবার কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখ এসে পড়ল বিনুর ওপর। খানিক অবাক হয়ে সে বলল, 'পোলাটা (ছেলেটা) কে রে যুগলা? কেমুন ফুটফুইটা (ফুটফুটে)!'

কালো কালো যে ছেলেগুলো সাঁকোর ওপর বসে পা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বঁড়শি বাইছিল তাদের ভেতর থেকে একজন বলল, 'কি ধলা (ফর্সা), একেরে সাহেবগো লাখান (মতন)।'

আরেকটা ছেলে বলল, 'পিরানটা (জামাটা) দেখছস বেণ্গা, দুইখান জেব (পকেট) আছে।'

টুনি তাকে ফুটফুটে বলেছে, তার ছেলেরা সাহেবের মতন বলেছে। নিজের চেহারার এমন খোলাখুলি প্রশংসায় বিনু লজ্জা পেয়ে গেল। মুখ নামিয়ে সে নখ খুঁটতে লাগল।

যুগল বলল, 'উনি বাবুগো পোলা (বাবুদের ছেলে)।'

টুনি শুধলো, 'কোন্ বাবুগো?'

'কইলকাতার বাবুগো। হ্যাম কত্তার (হেম কর্তার) নাতি।'

'হ্যাম কত্তার তো পোলামাইয়া নাই, তার আবার নাতি হইল কইথিকা (কোত্থেকে)?'

'উনি হ্যাম কত্তার ভাগ্নীর পোলা।'

'কইলকাতায় থাকে বুঝি?'

'হ, কইলাম (বললাম) তো।'

'আইছে (এসেছে) কবে?'

'তিন চাইর দিন হইল।'

'একলাই আইছে?'

'না। ঐটুক (ঐটুকুন) মাইনষে (মানুষ) একলা আইতে পারে?'

'তয় (তবে)?'

'ওনার বাপ-মায়ের লগে আইছে।'

টুনির কৌতূহল অসীম। বলতে লাগল, 'বাপ-মাই খালি আইছে নিহি (নাকি)?'

যুগল মাথা নাড়ল, 'না। দুগা (দুজন) বইনও আইছে।'

'থাকব কদ্দিন?'

'হে (তা) আমি কি জানি?'

'শোনস (শুনিস) নাই?'

'না।'

একটু কি ভেবে টুনি বলল, 'আই রে যুগলা—'

যুগল তক্ষুনি সাড়া দিল, 'কী?'

'বাবুগো পোলা নি আমাগো ঘরে আইসা বইব (বসবে)?'

'অহন (এখন) না!'

'তয় (তবে)?'

'আরেক দিন নিয়া আসুম।'

'আনিস কিলাম (কিন্তু), মাথা খাস।'

বিরক্ত সুরে যুগল বলল, 'আনুম তো কইলাম।'

টুনি বলল, 'ঘরে নাইকলের লাড়ু (নারকেল নাড়ু) আছে, বাবুগো পোলারে নি দুইটা দিমু?'

'না।'

আহত সুরে টুনি বলল, 'ক্যান রে?'

যুগল বলল, 'কইলকাতার বাবুরা লাড়ু খায় না।'

টুনির মুখখানা হঠাৎ ভারি করুণ হয়ে গেল। বিষণ্ণ গলায় সে বলল, 'তা হইলে কী খাইতে দেই ক' (বল্) দেখি—'

'অহন (এখন) তরে (তোকে) কিছু দিতে হইব না।'

টুনির মুখচোখের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ভারি মায়া হতে লাগল বিনুর। একবার ইচ্ছে হল, নাড়ু চেয়ে খায়, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারল না।

ওদিকে টুনি আবার বলল, 'হ্যাম কত্তার (হেম কর্তার) নাতি পথম (প্রথম) দিন আইল, কিছুই হাতে দিতে পারলাম না।'

'সন্দেশ, মুহোন-ভোগ আইনা রাখিস। আরেক দিন যখন নিয়া আসুম তখন ছুটোবাবুরে দিস।'

'আননের (আনবার) আগে আমারে খবর দিবি কিলাম (কিন্তু)।'

'দিমু।'

টুনির সব কথারই উত্তর দিচ্ছে যুগল, তবে কেমন যেন অন্যমনস্কের মতন। তার চোখদুটো খাঁচার পাখির মতন অনবরত দিগ্বিদিকে ছোটাছুটি করছে। বেশ বোঝা যায়, পিসতুতো বোন কিংবা তার মাগুর মাছের মতন কালো কালো ছেলেমেয়েগুলোর জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব না যুগল। আসলে যার জন্য তার এ বাড়িতে আসা, তাকে এখনও খুব সম্ভব দেখতে পায়নি। ফলে ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির এবং চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

একটু ফাঁক পেয়ে যুগল বলল, 'অই লো টুনি বইন—'

'কী?'

'জামাইরে যে দেখি না—'

হাটে গেছে।'

'সুজনগঞ্জের?'

'হ।'

'তগো (তোদের) বাড়িটা বড় নিঝ্‌ঝোম (নিঝুম) টুনি বইন—'

ঠোঁটে ঠোঁট টিপে টুনি দুষ্টুমির সুরে বলল, 'হ। বড় নিঝ্‌ঝোম।'

যুগল টুনির মুখভঙ্গি বা বলার ধরন লক্ষ্য করেনি। আপন মনে বলল, 'তর হউরে কই (তোর শ্বশুর কোথায়)?'

'উত্তরের ভিটির (ভিতের) ঘরে বইসা বইসা তামুক খাইতে আছে।'

'হাউড়িরেও (শাশুড়িকেও) তো দেখি না।'

'হ্যায় (সে) রইছে পুবের ভিটির (ভিতের) ঘরে।'

'করে কী?'

'কাইল রাইতে জ্বর আইছিল, কাথা (কাঁথা) মুড়ি দিয়া শুইয়া শুইয়া কোকাইতে আছে (ককাচ্ছে)।'

'ইস্—'

'কী হইল?'

'হাউড়িরে (শাশুড়িকে) ডাক্তর (ডাক্তার) দেখাইস?'

ঘাড় বাঁকিয়ে গালে একখানা হাত রাখল টুনি, 'অই রে কালামুইখা যুগল, ক'স (বলিস) কী তুই?'

যুগল চকিত হল, 'কী কই (বলি)?'

'একদিনের জন্যে ডাক্তর দেখাম্ব, আমরা নি তেমন বড় মান্‌ষে! আমাগো (আমাদের) নি তেমন সুখের শরীল। জবর আইছে, আবার যাইব গা। তার লেইগা ডাক্তর কিয়ের (কিসের)? ওষুধ কিয়ের (কিসের)? শুনোনি একখান কথা যুগলা, বাপের জন্মে একখান কথা শুনলাম।'

যুগল বলল, 'কী এমন কইলাম যা বাপের জন্মে শোনস (শুনিস) নাই?'

'তুই চুপ যা তো ছ্যামরা (ছোকরা)। মায়ের পোড়ে না, বাপের পোড়ে না, মাসির বুক জ্বইলা যায়। আপন কেউ না, পিসাতো (পিসতুতো) বইনের হাউড়ির (শাশুড়ি) লেইগা আমাগো যুগলার পরান ফাত্ ফাত্ করে। অই রে যুগলা, অই রে ড্যাকরা—'

'কী?'

'হউর-হাউড়ি থুইয়া (শ্বশুর-শাশুড়ি রেখে) আসল কথাখান ক' (বল্); তর (তোর) পরানে যা আছে ক'। কার বিহনে এই পুরী নিঝ্ঝুম তার কথা ক'।'

'কার বিহনে আবার এই পুরী নিঝ্ঝুম?'

'পরের মুখে নামখান শুনতে বুঝি মিঠা লাগে! তা হইলে কই—পাখি, পাখি, পাখি—'

যুগল বলল, 'আমার পিছনে যদি অমুন কইরা লাগস তয় কিলাম (তবে কিন্তু) যামু গা।'

কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুনি বলল, 'পাখি নাই, থাইকা আর কী করবি সোনা? আইজ বিহান বেলায় (সকাল বেলা) অর বাপের লগে (ওর বাবার সঙ্গে) গেছে গা।'

যুগলের মুখ আরো কালো হয়ে গেল। আবছা গলায় সে বলল, 'বার বার ঐ এক কথা কইলে সত্যসত্যই যামু গা, আর কুনোদিন আমু (আসব) না।' বলছে বটে, যাবার কোন লক্ষণই কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। এমন কি সাঁকোর বাঁশে নৌকোটা যে বেঁধে রেখেছিল যুগল, সেটা বাঁধাই আছে। দড়িটা পর্যন্ত খোলে নি।

এই সময় একটা ছেলে বলে উঠল, 'মা লো যুগলমামা, পাখি পিসি যায় নাই। মায় (মা) তোমারে ভাটকি দিছে (মিথ্যে বলে ঠাট্টা করেছে)।'

খুব নির্লিপ্ত মুখে যুগল বলল, 'থাউক যাউক, হেয়াতে (তাতে) আমার কী?'

টুনি বলল, 'আ লো আমার সোনা লো, কিছু বুঝি হয় না তর (তোর)? পাখি গেছে গা শুইনা তো মুখখানে ঢোকর পাড় পড়তে আছিল।' বলেই গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'পাখি - পাখি - পাখি—'

সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

টুনি আবার ডাকল, 'আ লো ছেমরি (ছুঁড়ি) আর লাজসরম বয়ার। জলে ভাসাইয়া আইসা পড়। পরাণের মানুষ তরে (তোকে) না দেইখা কিলাম (কিন্তু) এইবার মুচ্ছা যাইব।'

এবারও উত্তর মিলল না।

টুনি এবার তার এক ছেলেকে বলল, 'যা রে, বেঙ্গা, পাখি পিসিরে ধইরা নিয়া আয়।'

সব চাইতে বড় ছেলেটা ছিপ-টিপ একধারে গুটিয়ে উত্তর দিকের উঁচু ঘর-খানায় চলে গেল। একটু পর ফিরে এসে বলল, 'পিসি আইব (আসবে) না।'

টুনি শুধালো, 'ক্যান, আইব না ক্যান?'

বেঙ্গা বলল, 'চাউলের মটকিগুলার (জালাগুলোর) পিছে পলাইয়া রইছে।'

টুনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আ লো ছেমরি (ছুঁড়ি), আয় আয়। লজ্জায় তো মুই গেলি!'

হাজার ডাকাডাকিতেও পাখি এল না।

অগত্যা হতাশ বিমর্ষ যুগল অনেক-খানি গলা তুলে বলল, 'যাই গা টুনি বইন, যাই গা—' এবার সত্যি সত্যি নৌকোর বাঁধন খুলে ফেলল সে।

টুনি হেসে হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'আরেট্টু (আরেকটু) জোরে চিল্লা যুগলা; যারে শুনাইতে চাস হ্যায় (সে) শোনে নাই।'

'কইলাম তো তরে (তোকে), আর কাউরে (কাকে) শুনাইতে চাই না।'

টুনি হাসি থামিয়ে এবার অন্য কথা পাড়ল, 'অহন (এখন) যাবি কই?'

'হাটে।'

'সুজনগঞ্জের?'

'হ। হ্যাম কত্তায় (হেম কর্তা), লাল-মোহন সাহেব আর এই ছুটোবাবুর বাবায় আরেক নায়ে (নৌকোয়) আগেই গেছে গা। আমরা গিয়া তাগো (তাদের) ধরুম।'

'হাটে গেলে তোগো (তোদের) জামাইর লগে দেখা হইব।'

'হ।'

পাটাতনের তলা থেকে বৈঠাখানা বার করে বাইতে শুরু করল যুগল।

সাঁকোর ওপর থেকে টুনি আরেকবার বলল, 'বাবুগো পোলারে (ছেলেকে) এক-দিন নিয়া আবি (আসবি), নিয্যাস (নিশ্চয়) আনবি।'

'আনুম।'

টুনিদের উঠোন থেকে বেরিয়ে নৌকোটা বাইরের অথৈ অসীম জলপূর্ণ প্রান্তরে এসে পড়ল।

আস্তে আস্তে নৌকো বাইছে আর দেখছে যুগল। টুনিদের বাড়ি ছাড়িয়ে খুব পেছন ফিরে ব্যাকুল হয়ে আর বার কী বেশিদূর এখনও যায়নি, হঠাৎ যুগলের হাতের বৈঠা থেমে গেল। তার চোখে তারার আলো নাচতে লাগল।

দ্রুত ঘুরে বসে টুনিদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাতছানি দিতে লাগল যুগল। তার হাতের দিকে লক্ষ্য করতেই বিনু দেখতে পেল, টুনিদের উত্তরের ভিটার ঘরখানার পেছনের দরজায় কোমর-খানি ঈষৎ বাঁকিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চয়ই পাখি।

দরজার ফ্রেমের ভেতর মেয়েটা যেন ছবি। কত বয়েস হবে পাখির? তেরো সতেরর বেশি নয়।

গায়ের রঙখানি মাজা-মাজা। চামড়া এত টানটান মসৃণ এবং চকচকে যে মনে হয়, মেয়েটির সারা গায়ে প্রতিমার মতন ঘামতেল মাখানো। হাত-পায়ের শক্ত গড়নের মধ্যে লাবণ্য যত, তার চাইতে ঢের বেশি বলশালিতা। ঘন পালকে-ঘেরা বড় বড় চোখ, তার মাঝখানে কুচকুচে কালো মণি দুটো যেন ছায়াচ্ছন্ন সরোবর। চোখ দুটি সর্বক্ষণ যেন জগতের সব কিছুর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে আছে। মোটা ঠোঁট, সরু চিবুক, ছোট্ট কপালের ওপর থেকে ঘন চুলের ঢেউ শুরু হয়ে পিঠের ওপর নিবিড় মেঘের মতন ছড়িয়ে আছে। ছোট হলেও নাকটিতে ধারাল টান আছে; তার বাঁ ধারের পাটায় সবুজ পাথর বসানো নাকছাবি। হাতে লাল কড়ের বালা আর একগোছা রুপোর চুড়ি, কানে কুমারী মাকড়ি।

কাছাকাছি বসে সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল বিনু। আলাদা আলাদা করে দেখলে নাকে-মুখে হাতে-পায়ে হাজারটা খুঁত বার করা যাবে। কিন্তু সব মিলিয়ে তাকে ঘিরে কোথায় যেন অলৌকিকের একটুখানি ছোঁয়া আছে যা চোখ এবং মন একসঙ্গে জুড়িয়ে দেয়।

নীল ডোরা দেওয়া হলুদ শাড়ি আর খাটো লাল জামা আটোসাঁটো করে পরা। মেয়েটির চোখেমুখে বেশবাসে আশ্বিনের টলমলে সোনালী রোদ এসে পড়েছে; ফলে তাকে এ জগতের মানবী মনে হয় না।

মেয়েটা যেখানে দাঁড়িয়ে তার ঠিক তলাতেই জল। নীলচে কাচের মতন স্বচ্ছ টলটলে জলের আরশিতে তার ছায়া কাঁপছে।

সমানে হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে যুগল। আর মেয়েটাও তার একখানি হাত বুক পর্যন্ত তুলে নেড়ে নেড়ে ইশারায় না—না করে যাচ্ছে। তার ঠোঁটে, চোখের তারায় সরস মধুর হাসির ছটা ঝিকমিক করছে।

যুগল এবার হাতছানি বন্ধ করে ডাকল, 'আলো—'

মেয়েটি বলল, 'না।'

'নাও (নৌকো) নিয়া তোমার কাছে যামু?'

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখে নিল মেয়েটা। মুখচোখের চেহারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ব্যাকুলভাবে বলল, 'না—না—না—কেউ দেইখা ফেলব।'

যুগল বলল, 'দেখুক—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই সেই উঁচু দরজার ভেতর থেকে জলে ঝাঁপ দিল মেয়েটা। ঝপাং করে একটা শব্দ হল; জল ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বিনু দেখতে পেল, কখনও পানকৌড়ির মতন কখনও লাল-হলুদ অলৌকিক একটা মাছের মতন পাখনা মেলে সাঁতার কাটতে কাটতে নিমেষে নৌকোর কাছে চলে এসেছে মেয়েটা।

যুগলের চোখে যে আলো খেলছিল সেটা আরো চকমক করতে লাগল। মেয়েটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আসো—'

হাত ধরে মেয়েটা নৌকোর ওপরে উঠে এল। যুগল বলল, 'ইস্, একেরে ভিজা গেলা (গেলে)। নাও লইয়া কাছে গেলে আর ভিজতে হইত না।'

মেয়েটি বলল, 'ভিজছি, বেশ করছি। আমার মন হইছে, তাই ভিজছি। নাও লইয়া গেলে কেউ দেইখা ফেলাইলে আমি গলায় দড়ি দিতাম।'

মেয়েটার শাড়ি থেকে জামা থেকে চুল থেকে জল ঝরে ঝরে নৌকোর পাটাতন ভেসে গেল। সে ব্যস্তভাবে বলতে লাগল, 'নাওটা এট্টু দূরে লইয়া যাও মাঝি।'

যুগলকে তা হলে 'মাঝি' বলে মেয়েটা! যুগল বলল, 'দূরে যামু ক্যান?'

'বাড়িত্ থনে (থেকে) এই জায়গাটা দেখা যায়।'

'দ্যাখনেব ডর!'

'হ।'

'আমাগো (আমাদের) কথা সগলে জানে।'

'জানুক; তুমি নাওখান দূরে লইয়া যাও। নইলে (না হলে—)'

'নাইলে কী?'

'আমি কিলাম (কিন্তু) ফির বাড়িত্ যামু গা।'

'আইচ্ছা আইচ্ছা—'

চারধারে পদ্মবন, শাপলা আর শালুকের অরণ্য। নৌকো বেয়ে অনেকটা দূরে চলে এল যুগল। তারপর বলল, 'টুনি বইনে তহন (তখন) অত কইরা ডাকল, আইলা (এলে) না ক্যান?'

মেয়েটা বলল, 'আমার বুঝি সরম লাগে না!'

'থুইয়া (রেখে) দ্যাও তোমার সরম। আমি খুব গুসা (রাগ) হইছি।'

'শুদাশুদি (অকারণে) গুসা হইও না মাঝি। আমি নি মাইয়া মানুষ; তোমাগো (তোমাদের) যা সাজে মাইয়া মাইনষের নি তা মানায়!'

যুগল কি উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ বিনুর সম্বন্ধে সচেতন হল। এতক্ষণ বিনুর কথা বুঝি তার খেয়াল ছিল না। তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে দেখিয়ে সে বলে উঠল, 'ছুটোবাবু, এই হইল পাখি।'

মেয়েটা যে পাখি, আগেই তা আন্দাজ করেছিল বিনু। সে একদৃষ্টে পাখির দিকে তাকিয়ে থাকল।

যুগল এবার বিনুকে দেখিয়ে পাখিকে শুধলো, 'এনি (ইনি) কে, জানো?'

'জানি—' পাখি ঘাড় হেলিয়ে দিল।

'কে?'

'তুমি যে বাড়িতে থাকো হেই বাড়ির বাবুর নাতি। কইলকাতা থনে (থেকে) আইছে।'

'তুমি জানলা (জানলে) কেমনে?'

'উত্তরের ঘরের দরজার ফাক দিয়া দেখছি।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর গাঢ় গলায় পাখি ডাকল, 'মাঝি—'

'কও—' যুগল মুখ তুলল।

'পূজার সময় বাপে আমারে নিতে আইব (আসব)।'

যুগল যেন চমকে উঠল, 'যাইবা গিয়া?'

চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে পাখি বলল, 'নিতে আইলে থাকুম ক্যামনে? ডর—'

'ডর কী?'

'কেও যদি জোর কইরা ধইরা রাখত, থাইকা যাইতাম।'

বিনুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পাখির কানের কাছে মুখ নামাল যুগল। ফিসফিস গলায় বলল, 'রাখুম, জোর কইরাই ধইরা রাখুম।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর পাখিই প্রথম কথা বলল, 'মাঝি—'

'কী?'

'হেই, হেইবার (সেই, সেইবার) ভাটির দ্যাশে আমাগো বাড়িত্ গিয়া রয়ানি গান শুনাইছিলা, মনে আছে?'

'আছে।'

'কতকাল তোমার গান শুনি না, আইজ একখান শুনতে সাধ লয়।'

'শুনবা?'

'হ।'

মনে মনে সুর ভেঁজে যুগল শুরু করে দিল :

'চানবদনী (চাঁদবদনী) তুই লো আমার
জীবন মরণ কাঠি,
তোরে না দেখিলে পরে
মরি লো বুক ফাটি।
তালুক মুলুক তুই লো আমার,
তুই লো টাহার তোড়া,
নামাবলী তুই লো আমার
তুই লো ভাংগা বেড়া।
তুই যে আমার রসগোল্লা
মোণ্ডা মিঠাই ছানা,
শীতের কাথা তুই যে আমার
রইদের (রোদের) মিছরি পানা।
বষ্যাকালে তুই লো আমার
তালপাতার ছাতি,
তোরে পাইলে ফস্যা হয় লো
ঘোর আন্দার রাতি।
চানবদনী তুই লো আমার—'

গান শেষ হবার পরও অনেকক্ষণ দূরবিসারী পদ্মবনের ওপর রেশ দুলতে থাকল।

একসময় পাখি বলল, 'এইবার যাই গা মাঝি।'

যুগল বলল, 'আরেটু (আরেকটু) বস।'

'না। কতক্ষণ আইছি খেয়াল আছে? তোমরা হাটে যাইবা না?'

'হ-হ—' যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'চল, তোমারে বাড়িত্ দিয়া আসি।'

'না মাঝি, তোমারে আর দিয়া আইতে হইব না। নিজেই যাইতে পারুম।' বলেই জলে লাফ দিল পাখি।

তারপর নৌকো থেকে বিনু আর যুগল দেখল, পানকৌড়িও না নীল-হলুদ অলৌকিক মাছও না, স্বপ্নলোকের জল-পরীর মতন পদ্মবনের ভেতর দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে দূরে, আরো আরো দূরে চলে যাচ্ছে পাখি। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল, একদৃষ্টে বিনুরা তাকিয়ে থাকল।

(ক্রমশঃ)

এম, ও, রাইটার

নতুন ঠগী

পোস্টঅফিসের কাউন্টারের সামনে প্রচণ্ড ভীড়। কাউন্টারের রেলিং আর দরজার মাঝখানে ছোট ফালি জায়গাটায় স্ট্যাম্প, রেজিস্ট্রেশন, মনি-অর্ডার, সেভিংস অ্যাকাউণ্টের ভীড় দিশেহারা হয়ে তখন বারান্দায় উপচে পড়েছে। হঠাৎ রেজিস্ট্রেশনের নরেনবাবুর মাথা গরম হয়ে উঠল। চীৎকার করে বললেন, "আপনি আবার আইসেন। জোচ্চোর। এইবার পুলিশে দিমু। যান এইখান থিকা।" ভীড়টা একটু থিতিয়ে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই টাই-পরা এক ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ভীড় থেকে ছিটকে বাইরে এলেন, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে রাস্তার ভীড়ে মিশে গেলেন তখনো নরেনবাবুর চিল-চীৎকার শোনা যাচ্ছে—"মানুষ না জানোয়ার। ঠগ, জোচ্চোর। কত লোককে যে এইগুলো ঠকায়। অ্যাদের কেউ ধরে না। ধরে না বারান্দার চোরগুলোরে। ঐগুলোই সবচেয়ে পাজি।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্যিই শহর কলকাতায় ব্যবসাটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। কয়েক কোটি টাকার জুয়াচুরির ব্যবসা। এই ব্যবসার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন শ'কয়েক লোক—নরেনবাবুর ভাষায় "বারান্দার চোরগুলো।" দিনে দুপুরে কলকাতার লক্ষ লক্ষ লোকের চোখের সামনে এই জুয়াচুরির ব্যবসা চলছে—কিন্তু প্রতিকারের কোন চেষ্টাই ত' চোখে পড়ে না।

ব্যবসাটা ইনস্যুয়রড লেটারের। পুরোনো নিয়মে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং বর্তমান নিয়মে দশ হাজার টাকা দামের কারেন্সী নোট, কাগজপত্র ইত্যাদি ইনস্যুয়র করে পাঠানো চলে। যে কোন খামে ভরেই কাগজপত্র, টাকাকড়ি পাঠানো যায়, তবে সাধারণত রেজিস্টারড্ এনভেলপই লোকে পছন্দ করে বেশী। নিয়ম অনুযায়ী এনভেলপের দুপাশের দুটি জোড়ের মুখে এক ইঞ্চি অন্তর গালা দিয়ে সীল করে দিতে হবে এবং খামের মাঝখানে একটি সেলাই এবং সেলাই বরাবর গুটি চারেক সীল ও সেলাইয়ের জোড়ের মুখে সীল দিতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি গালার আস্তরে প্রেরকের নিজস্ব ছাপ (পোস্ট অফিসের ভাষায় 'পার্সোন্যাল ডিভাইস') মেরে দিতে হবে। তারপর উপরের মোড়কের গায় ভেতরে কত দামের জিনিস আছে তা অক্ষর ও অংকে লিখে বাঁদিকে প্রেরক ও ডানদিকে প্রাপকের নাম ঠিকানা লিখে দিলেই কাজ শেষ। বাকী কাজ পোস্টমাস্টারের।

যত সহজে কথাগুলি উপরে লেখা গেল, যিনি বা যাঁরা ইনস্যুয়র করেন ব্যাপারটা তাঁদের কাছে অত সহজ ঠেকে না। শুধু তাই নয়, ঠিকানা লেখার সামান্য ত্রুটিতে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের চিঠি চলে যেতে পারে উড়িষ্যার বহরমপুরে। তাছাড়া বছরে এক আধবার যারা ইনস্যুয়র করে চিঠি পাঠান তাঁর পক্ষে তিন চার টাকা ব্যয় করে মনোগ্রাম তৈরী করা, মনোগ্রাম রেজেস্ট্রি করে নেওয়া ঝামেলা। আর অত ঝক্কি ঝামেলা পোয়ানোর

দরকারই বা কি। হেড অফিস ছাড়াও শহর কলকাতার প্রতিটি সাব ও ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসে একজন করে এম ও রাইটার থাকেন। পোস্ট অফিসের কাউণ্টারের বাইরে ঢোকার মুখে বা বারান্দায় এক পাশে একটা টুল ও টেবিল, দড়িতে বাঁধা ব্লেড, কিছু ট্যাগ, ছুঁচ, সুতো, গালা, মোমবাতি ও দেশলাই সাজিয়ে হাতে কলম বাগিয়ে যিনি বসে থাকেন তিনিই মনিঅর্ডার রাইটার—সংক্ষেপে এম ও রাইটার। এরা পোস্টাপিসের কেউ নন, তবে পোস্টাফিস এদের অথরাইজ করে অন্যের মনি-অর্ডার ফরম লিখে দিতে বা ইনস্যুয়রড লেটারের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাজ করে দিতে। এতে পোস্টাপিসের অনেক ঝামেলা কমে। সাধারণ মনি-অর্ডার পিছু পনেরো পয়সা, ইনস্যুয়রড লেটারের বেলায় সাঁইত্রিশ পয়সা—এদের ফি। ইনস্যুয়রড লেটারের গালা আঁটা থেকে ঠিকানা লেখা সব কাজ করে দিলেও সীলমোহর দেওয়ার অধিকার এর নেই। প্রেরকের নিজস্ব মনোগ্রাম চাই। সাধারণত যারা এক আধবার করেন তাঁদের বেলায় পোস্টাপিস পয়সার মনোগ্রাম অ্যালাউ করে।

কিন্তু পোস্টাফিসের আনাচে-কানাচে একবার চোখ ঘোরালেই দেখা যায়, আরো জনকয়েক লোক টুল, টেবিল, গালা, মোম, দেশলাই, ছুঁচ, সুতো নিয়ে কলম বাগিয়ে বসে আছেন। এঁদের ট্যাঁকে হাত দিলে দু-একটা সর্বস্বার্থসিদ্ধিকারী মনোগ্রাম পাওয়াও শক্ত হবে না। এঁরা সেলাই-ফোঁড়াই থেকে শুরু করে সীলমোহর পর্যন্ত এঁটে দেবে—তবে ছ'আনায় হবে না। বেশী কিছু ছাড়তে হবে। যারা বেশী দিচ্ছেন, তাঁরা জানেন কেন দিচ্ছেন—অনেক বড় দাও মারবেন বলে।

হাজার টাকা দামের মোষ বিহার বা ইউ- পি'র কোন গাঁ থেকে কেনবার সময় দরিদ্র চাষীর হাতে শ'খানেক বা শ'দুয়েক টাকা গুঁজে দিয়ে বলা হ'ল কলকাতায় ফিরেই বাকি টাকাটা ইনস্যুয়র করে পাঠিয়ে দেব। এবং একদিন সত্যি সত্যি আরা জেলার দূরতম পল্লীর দরিদ্র এক চাষী কলকাতা থেকে পাঠানো একটি ইনস্যুয়রড লেটার গাঁয়ের ডাক-হরকরার কাছ থেকে টিপ ছাপ দিয়ে নিল। মোড়কের গায়ে ইংরেজীতে লেখা ভেতরে আটশো টাকার বস্তু আছে। বিঘা দুয়েক নতুন ধানী জমি কেনার স্বপ্ন চাষীর মনের কোণেও ঝিলিক মেরে গেল। কিন্তু খাম ছিঁড়ে ভেতর থেকে টাকার বদলে যখন খান কয়েক প্রমাণ সাইজের কাগজের টুকরো বেরুল তখন হয়ত কলকাতায় খাটিয়ায় বসে ক্রেতা গোঁফ চুমরোচ্ছেন—ভাল দাঁও মারা গেছে।

এরকম দাঁও মারতে গিয়েই আবার কখনো সখনো ধরা পড়তেও হয়। গোরখপুর পোস্টাফিসে কলকাতার বিভিন্ন পোস্টাপিস মারফত পর-পর কয়েকখানা একই সীলমোহর আঁটা ইনস্যুয়রড লেটার যেতেই টনক নড়ল পোস্টমাস্টার মশায়ের। মনোগ্রাম ও প্রেরকের ঠিকানা একই লোকের প্রাপকও একজন। অথচ পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন পোস্টাফিস মারফত। পোস্টাফিসের সীল দেখে বোঝা যায় বিভিন্ন পোস্টাপিসে ইনস্যুয়র করানো হলেও একই দিনে করানো হয়েছে। কলকাতার একজন চোরাকারবারী এইভাবে গোরখপুরের কাউন্টারপার্টকে ঠকাচ্ছিলেন। দশ হাজারের বেশী মূল্যের ইনস্যুয়রড লেটার পাঠানো চলে না। আবার একটি পোস্টাপিস থেকে একই দিনে একই ঠিকানায় গোটাকয়েক চিঠি পাঠাতে গেলে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তাই বিভিন্ন পোস্টাপিসের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। প্রাপক একবার সই বা টিপছাপ দিয়ে লেটারটা নিলেই ব্যাপারটা আইনমাফিক হয়ে যেত।

এত বড় ব্যবসায়ের চাবিকাঠি কিন্তু ঐসব ভুয়ো এম ও রাইটারদের হাতে। তাদের হাতে রাখতে হয়, দুটো পয়সা বেশী দিলেও আপত্তি নেই।

কথা উঠতে পারে, কেন শুধু শুধু ভুয়ো রাইটারদের কাছে এঁরা যান। কারণ অশিক্ষিত দুগ্ধ-ব্যবসায়ী বা চোরা-কারবারীরা পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কারবার করাই নিরাপদ মনে করে। ঘাড়ে বন্দুক রাখতে দেওয়ার জন্য ভুয়ো রাইটাররা মোটা ভাড়া আদায় করে নেন।

অথচ আইনমাফিক কাজ করেন বলেই একটি পোস্ট অফিসের এম ও রাইটার যখন মাস গেলে শ' দেড়েক টাকা উপায় করতে হিমসিম খেয়ে যান তখন অন্য কোনো কোনো পোস্ট অফিসের ভুয়ো রাইটাররা কম করেও হাজার দেড় হাজার মাসে কামাই করেন।

কলকাতার একশো পঁয়ষট্টিটি পোস্ট-অপিসে সাকুল্যে যেখানে বৈধ রাইটারের সংখ্যা শ' দেড়েক, ভুয়ো রাইটারের সংখ্যা কম-সে-কম ন' শ। এক-একজন ভুয়ো রাইটারের গড়ে মাসিক আয় প্রায় পাঁচশো টাকা।

এক-একজন ভুয়ো রাইটার মাসে কম-পক্ষে গড়ে হাজার-দশেক টাকার জুয়াচুরির কারবারে সাহায্য করছেন। ব্যাপারটা পুলিশের অজানা নয়। মাঝে মাঝে হল্লার গাড়ি যেভাবে রাস্তার মোড় থেকে হকারদের ধরে নিয়ে যায়, সেভাবে এইসব ভুয়ো রাইটারছেরও পুলিশে ধরে। কিন্তু সপ্তাহ যাবার আগেই পোস্ট অফিসের আনাচে-কানাচে সেই মুখগুলি আবার দেখা যায়।

—সন্ধিৎসু

তস্যতস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]
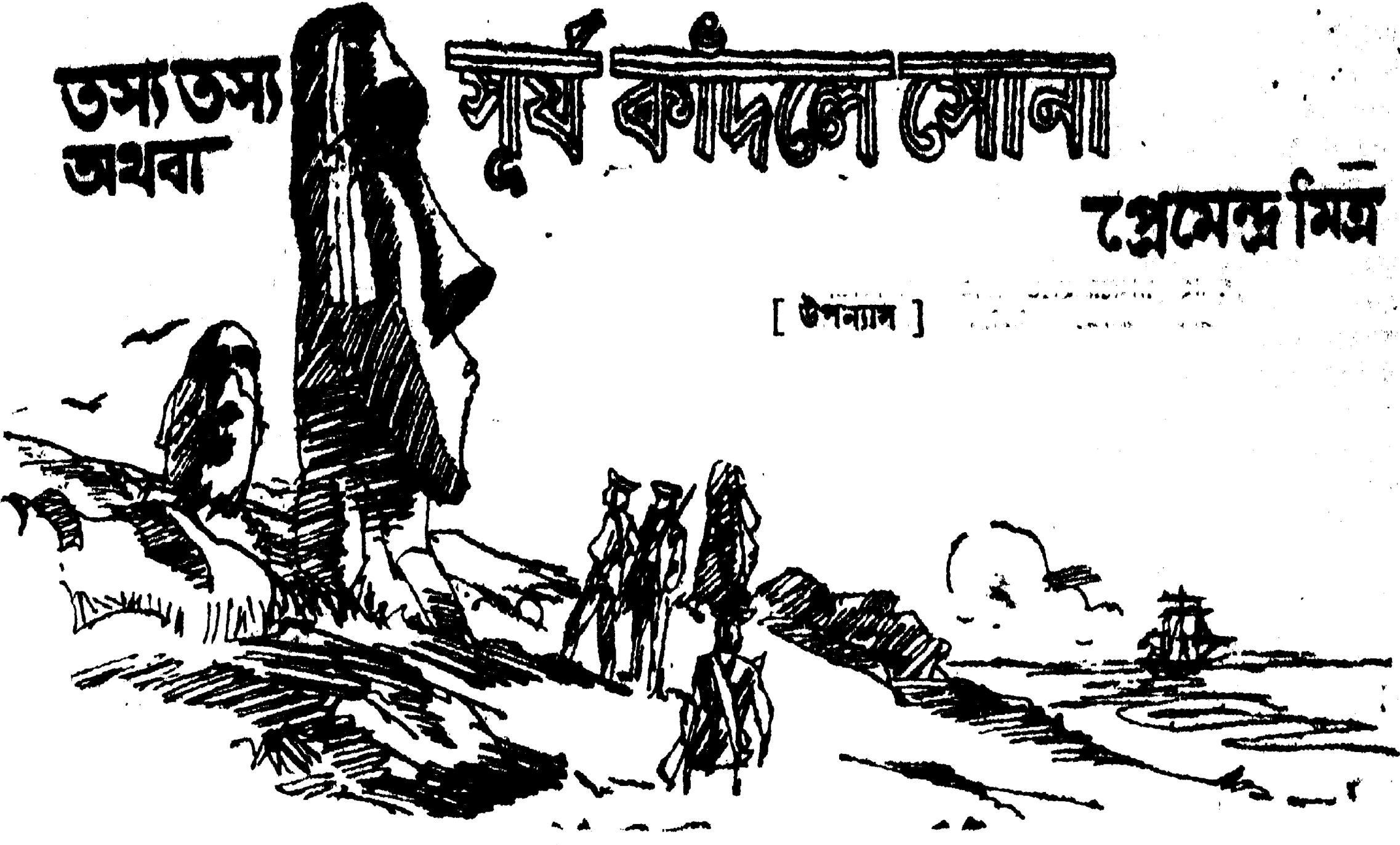
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটু চুপ করে থেকে গভীর অবিশ্বাসের স্বরে মোরালেস আবার বলেন—তুমি স্পেনের শত্রু, একথা আমায় বিশ্বাস করতে বলো?

না, তা বলি না, ডন মোরালেস। গাঢ় গম্ভীর শোনায় এবার গানাদোর গলা,—স্পেনের আমি শত্রু নই, অবিচার অন্যায় নীচতা দম্ভ পাশবিকতা লোভ, পৃথিবীর সব সাধারণ মানুষের মত আমি শত্রু শুধু এই সব কিছুর। নতুন আশ্চর্য এক দেশ আবিষ্কৃত হোক আগ্রহভরে আমি তা চেয়েছিলাম, সে আবিষ্কারের পথ এমন পৈশাচিকতায় নোংরা, রক্তে পিচ্ছিল হবে আমি ভাবতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত যথাসাধ্য তাই এ পাপের অভিযানে বাধা দিতে চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থই হয়েছে:

গানাদোর কথা শেষ হবার পর খানিকক্ষণ সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কি বললেন এবার ডন মোরালেস আর কাপিতান সানসেদো? যে অকপট স্বীকারোক্তি গানাদো করেছেন তারপর তাঁকে আর ক্ষমা করতে পারবেন কি?

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারুর মুখে কোনো কথা শোনা যায় না। মুখের ভাব দেখেও বোঝা যায় না তাঁদের মনের মধ্যে কি দ্বন্দ্ব চলছে।

দ্বন্দ্বটা সত্যিই নেহাৎ সামান্য ত' নয়। একদিকে স্পেন ও স্পেনের সম্রাটের প্রতি আনুগত্য আর একদিকে সত্য ও ন্যায়ের দাবীর সঙ্গে গানাদোর মত মানুষের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি।

ডন মোরালেসই প্রথম তাঁর মনের কথাটা প্রকাশ করেন। গম্ভীর ও বেশ একটু বিষণ্ণ মুখে তিনি যা বলেন, তাতে বোঝা যায় যে উদার সহৃদয় হলেও তাঁর কাছে যা দেশদ্রোহিতা গানাদোর সে আচরণ তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারেন নি।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত গানাদো। ধীরে ধীরে গম্ভীর অনুচ্চ কণ্ঠে তিনি বলেন, তোমার সব অভিযোগ মেনে নিয়েও পিজারোর অধীন পেরুর এসপানিওল বাহিনীর বিরুদ্ধে তোমার চক্রান্ত আমি সমর্থন করতে পারছি না। তুমি যা করেছ তা আমার বিচারে গুরুতর অপরাধ। তবু এ অভিযানে তোমার আগেকার ভূমিকার কথা মনে রেখে তোমাকে শাস্তি দেবার কোনো ব্যবস্থা আমি করব না, শুধু যা জেনেছি তার পর তোমাকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। একটি দিন মাত্র তোমায় সময় দিচ্ছি। কাল সকালে উঠে তোমাকে আর আমার বাড়িতে যেন দেখতে না পাই। পেলে সম্রাটের প্রতি কর্তব্য আমি না করে পারব না।

অনেক ধন্যবাদ ডন মোরালেস! শান্ত স্বরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গানাদো আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বলা তাঁর হয় না।

বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠে গানাদোকে বাধা দিয়ে কাপিতান সানসেদো ডন মোরালেসকে ধিক্কার দিয়ে বলেন, ছি মোরালেস! আপনার মুখে এরকম কথা শোনবার আশা করিনি। ন্যায়, ধর্ম, সত্য এ সব কিছুর দাম আপনার কাছে নেই? গানাদো স্পেনের সম্রাটের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী বলে আপনি মনে করছেন, মনে করছেন সে স্পেনের শত্রুতা করেছে? শত্রুতা করেছে, না, স্পেনের শুধু নয়, সমস্ত খৃস্টান জগতের যারা কলঙ্ক আবিষ্কারক অভিযাত্রীর সাজে ঐশ্বর্য আর রক্তলোলুপ সেই নরপিশাচদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্পেন আর স্পেনের সম্রাটের গৌরব রক্ষা করবারই চেষ্টা করেছে গানাদো?

কাপিতান সানসেদোর জ্বলন্ত কণ্ঠের—ধিক্কার কিন্তু নিষ্ফলই হয়।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে ডন মোরালেস আগেকার মতই বিষণ্ণ গম্ভীর গলায় বলেন,—আমায় মাপ করবেন কাপিতান। যুক্তি তর্ক বিচারে আমার মনের ভাব বদলাবার নয়। স্পেনের বিজয়-পতাকা সমুদ্র পারে দূরদূরান্তরে যারা মেলে ধরছে আমার চোখে তারা সব বিচারের উর্ধ্বে। তাদের উদ্দেশ্যে বাধা দেওয়া আমার কাছে চরম রাজদ্রোহিতা। গানাদোকে তাই আমি ক্ষমা করতে পারব না। ওকে কাল সূর্যোদয়ের আগে আমার বাড়ি ছেড়ে যেতেই হবে।

আর যে মেয়েটি গানাদোর সঙ্গে এসেছে,—তিক্ত শ্লেষ ও ক্ষোভের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন কাপিতান,—তাকেও আর আপনি বাড়িতে স্থান দিতে চান না নিশ্চয়?

না,—মোরালেস কাপিতানের আক্রমণে এবার একটু আহত স্বরেই বলেন,—ওই অসহায় মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু গানাদো চলে যাবার পর ওর এখানে একলা থাকা বোধহয় সম্ভব নয়। ওর আশ্রয়ের সমস্যাটা তাই কঠিন। ও ত আমাদের ভাষাও জানে না।

কিছুটা জানি। তাই বলছি, আমার ভাবনা কাউকে ভাবতে হবে না। কারুর ভার আমি হতে চাই না।

ঘরের সবাইকে চমকে দরজার দিকে তাকাতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে মৃদু ঈষৎ বিকৃত উচ্চারণে হলেও দৃঢ়কণ্ঠে ও কথা যে বলেছে সে কয়া। কখন সে যে ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ লক্ষ্য করেন নি। সে যে দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের আলোচনা শুনতে পারে ও তা বোঝাবার মত ক্ষমতা টুম্বেজ বন্দরে জাহাজে ওঠবার পর থেকে পানামায় এই কয়েকদিন থেকে আয়ত্ত করে থাকতে পারে তা কল্পনাতেই

আসেনি কারুর। এমন কি গানাদোরও নয়। অবলা অসহায় একটি মেয়ে হিসেবে তাকে রক্ষা করার দায়িত্বটুকুই শুধু স্মরণ রেখে তার স্বাধীন সত্তার কথা যেন ভুলেই ছিলেন এ কয়দিন। আর যারই হোক গানাদোর কিন্তু তা ভোলা উচিত হয় নি। পেরুর কুজকো আর সৌসার সদ্য কৈশোর পার হওয়া যে মেয়েটি একলা সাহস শুধু বুদ্ধির অতবড় কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসতে পেরেছে, অজানা বিদেশে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে পরগাছা দুর্বল কোনো লতার মত অক্ষম অসহায় হয়ে যাবে ভাবাই ভুল।

ওই ক্ষীণকায়া একটি মেয়ের সামনে সবাই কেমন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। সবচেয়ে লজ্জিত হন গানাদো নিজে। লজ্জিত আর দুঃখিতও।

তখনই উঠে পড়ে কয়ার কাছে গিয়ে তিনি দাঁড়ান। দাঁড়িয়ে অপরাধীর মত বলেন,—আমায় তুমি ভুল বুঝেছ, বুঝতে পারছি কয়া। এখান থেকে কেমন করে উদ্ধার পাব সেই দুর্ভাবনায় ক'দিন ধরে এত অস্থির হয়ে কাটাচ্ছি যে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলবারও সময় পাই নি। সেটা অবহেলার নয় কয়া। তোমাকে শান্তিতে রাখবার জন্যেই আমার দুর্ভাবনার ভাগ তোমাকে দিতে চাইনি কিন্তু সেইটেই আমার ভুল। নিরুপায় বোঝা হয়ে থাকবার মেয়ে যে তুমি নও সে কথা আমার মনে রাখা উচিত ছিল। জীবনে এ ভুল আর করব না। এখন তৈরী হয়ে নাও। ভাগ্যে যাই থাক আজ রাত্রেই পানামা থেকে আমরা বার হব যোজকের জাহাজ ডিঙিয়ে ওপারের কোনো বন্দরে যাবার জন্যে।

তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গী হচ্ছি, জেনে রাখো। কাপিতান সানসেদো দাঁড়িয়ে উঠে দৃঢ়স্বরে জানান,—পথে যদি মারাও পড়ি, তাতে আমার দুঃখ নেই। এই পানামা শহরে আমার কবর যেন না হয়, এখন এই আমার একমাত্র কামনা।

কথাগুলো বলে ডন মোরালেস-এর বাড়িটাই যেন গোটা পানামা শহর এমনি ঘৃণাভরে সেদিকে তাকিয়ে সানসেদো বার হয়ে যাচ্ছিলেন। গানাদো তাঁকে ডেকে থামিয়ে বলেন,—আজ রাত্রেই যখন আমরা রওনা হচ্ছি, তখন শহরে ফিলিপিলিওর একটু খোঁজ করে আসবেন। এখান থেকে যাবার আগে তাকে একটু জানাতে চাই। ইচ্ছে করলে সেও আমাদের সঙ্গী হতে পারে। জাহাজঘাটায় আপনার কাছে অমন-ভাবে বিক্রী হয়ে যাবার পর আমাদের পরিণাম না জানতে পেরে সে অস্থির হয়ে আছে। তাকে পেতে খুব অসুবিধে বোধহয় হবে না। আমাদের খোঁজে বাজারের রাস্তাতেই সে ঘোরাঘুরি করে বলে মনে হয়।

গানাদোর অনুমান ঠিক। কাপিতান সানসেদো বাজারের রাস্তাতেই ফিলি-পিলিওকে পেয়ে যান। কিন্তু তার পরে এমন আরেকজনের দেখা পান যাকে পানামা শহরে দেখবার কথা তাঁর কল্পনার বাইরে।

সানসেদো ফিলিপিলিওকে জাহাজ-ঘাটায় মাত্র খানিকক্ষণের জন্যে দেখেছিলেন। তার বিশেষ চেহারা পোশাকের জন্যে ছবিটা একটু যেন মনে ছিল। ফিলিপিলিও নিজেই তাঁকে ডেকে না কথা বললে শুধু তারই জোরে পানামা শহরের বাজারের ভিড়ে ফিলিপিলিওকে তিনি অবশ্য খুঁজে নিতে হয়ত পারতেন না।

ফিলিপিলিও সত্যিই ক'দিন ধরে অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যে দিশাহারা হয়ে কাটিয়েছে। জাহাজঘাটায় গানাদো আর কয়াকে অজানা এক ব্যাপারী কিনে নেবার পর সে চোখে একেবারে আঁধার দেখেছে। বিক্রীর ভান করতে বাধ্য হলেও কেনাবেচার পর ব্যাপারী কোথায় গানাদো আর কয়াকে নিয়ে যায় পিছু পিছু গিয়ে একবার দেখে আসার ইচ্ছে তার হয়েছিল। কিন্তু মুখের গ্রাস ফসকে যাবার দরুন অন্য যে দালাল তখনও জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে তারই কড়া নজরের সামনে সে অনুসরণ আর সম্ভব হয়নি।

পানামা শহরে কি সে এর পর করবে তাই ঠিক করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। একটা সুবিধের কথা এই যে গানাদো আর কয়ার দাম হিসেবে বেশ কিছু নগদ 'পেসো দে অরো' সে হাতে পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারই জোরে পানামার বাজারের মধ্যে দেশী মানুষের পাড়ায় একটা আস্তানা যোগাড় করে নিতে তার অসুবিধা হয় না। মুস্কিল হয় শুধু কোনো হদিস না জানা থাকায় গানাদো আর কয়ার খোঁজ করা। সত্যিকার গোলামের ব্যাপারীর কাছে তাঁরা যে বিক্রী হন নি তা আর ফিলিপিলিও কোথা থেকে জানবে! ক্রীতদাস হিসেবে বাজারের রাস্তাতেই তাদের কোনো সময়ে আসা সম্ভব মনে করে সেইখানেই সে ব্যাকুলভাবে প্রতিদিন যতক্ষণ সম্ভব টহল দিয়ে বেড়ায়।

গানাদো বা কয়াকে নয়, সেই টহলের মধ্যে হঠাৎ সেদিন কাপিতান সানসেদোকে দেখে সে চিনতে পারে। চিনতে পেরে কি যে করবে তাই প্রথমটা স্থির করে উঠতে পারে না। সে মনে রাখলেও গোলামের দালাল যে তাকে মনে রেখেছে তার ঠিক কি! মনে রাখবার কোনো গরজই তার নেই: ডেকে কথা বলার চেষ্টা করলে হয়ত চিনতেই পারবে না। আর চিনুক না চিনুক তার সঙ্গে ফিলিপিলিও কি বলে প্রথম আলাপই বা করতে পারে! জাহাজঘাটায় সেদিন যাদের কিনেছে তাদের সম্বন্ধে হঠাৎ অমন খোঁজ নিতে গেলে ব্যাপারটা সন্দেহ-জনক হবে না? তাতে হিতে বিপরীতও ত' হতে পারে। সমস্যা কঠিন হলেও ফিলিপিলিও শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে কাপিতানকে পেছন থেকে ডেকে থামায়। তারপর বিনীতভাবে বলে,—মাপ করবেন সেনর, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি।

প্রথমটা চমকে বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গে ফিরে দাঁড়ালেও কাপিতান সানসেদো একটু লক্ষ্য করেই ফিলিপিলিওকে চিনতে পারেন। চিনে রীতিমত অবাকই হন, যাকে তিনি খুঁজছেন সে-ই নিজে থেকে তাঁকে ডেকে থামিয়েছে দেখে। বিস্ময়টা গোপন করে তিনি ফিলিপিলিওকে বিমূঢ় করে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলেন,—হ্যাঁ তোমার নাম যদি ফিলিপিলিও হয় তাহলে পারো।

আমার নাম যে ফিলিপিলিও তা—বিস্ময়ে ফিলিপিলিও ওর বেশী কিছু বলতে পারে না।

কেমন করে আমি জানলাম ভাবছ ত'—এবার হেসে বলেন সানসেদো,—আমার সঙ্গে এলেই জানতে পারবে।

ফিলিপিলিওকে পথে যেতে যেতে সানসেদো এবার সমস্ত বিবরণ শুনিয়ে তাঁদের সেইদিনই পানামা ছেড়ে যাবার ব্যবস্থার কথাও জানান।

কিন্তু এখন আর তা যাওয়া ত' সম্ভব নয়—এতক্ষণ নীরবে সব শোনবার পর ফিলিপিলিও বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে জানায়।

কেন নয়? সানসেদো একটু উষ্ণস্বরেই বলেন,—ধরাপড়ার বিপদের কথা যদি বলো তাহলে তাত বরাবরই আছে ও থাকবে। আজ হঠাৎ সে বিপদ ত' নতুন করে দেখা দেয় নি।

তা দেয় নি। ফিলিপিলিও বিনীতভাবে জানায়,—কিন্তু সে বিপদ আর কারুর পক্ষে না হোক গানাদোর পক্ষে এখন গুরুতর।

বেছে বেছে শুধু গানাদোর পক্ষেই' সানসেদোর কণ্ঠে অবিশ্বাসের সঙ্গে বিরক্তিই ফুটে ওঠে, পানামা শহর গোলাম বলতে শুধু গানাদোকেই জানে! আর যত আক্রোশ শুধু তার ওপর!

আক্রোশ কি না জানি না। ফিলিপিলিও এবার তার বক্তব্যটা বিশদ করবার চেষ্টা করে, কিন্তু দু'চারদিন ধরে পানামা শহরের সমস্ত আসা-যাওয়ার রাস্তায় গানাদোর মত একজন গোলামের খোঁজে সজাগ কড়া পাহারার ব্যবস্থা যে হয়েছে এটুকু নির্ভুল-ভাবে আপনাকে বলতে পারি।

পানামার বাজারের মধ্যে বাস করে গত কয়েকদিনে যা সে জেনেছে ফিলিপিলিও তারপর সানসেদোকে শুনিয়ে দেয়। কোতোয়ালীর সিপাই সান্ত্রীদের ত' বটেই বাজারের সাধারণ লোকেদের মধ্যেও গানাদোর চেহারা চরিত্রের বর্ণনা কয়েকদিন আগে ঢেঁড়া পিটে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘোষণা হয়েছে যে এই চেহারার মানুষের হদিস দিলে প্রচুর পুরস্কার মিলবে।

পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করেছে? সব কথা শুনে সানসেদো বেশ একটু বিস্মিত সংশয়ের সুরে বলেন,—কোনো ফেরারী গোলামের খোঁজ দেবার জন্যে সরকারী দপ্তর বা কোতোয়ালী থেকে পুরস্কার দিতে চায় এমন কথা ত' কখনো শুনি নি। ফেরারী গোলাম হিসাবে গানাদোর দাম হঠাৎ এত বেড়ে গেল কি

করে? জাহাজ থেকে তোমরা যেদিন নামো সেদিনও ত' তার জন্যে এ খোঁজাখুঁজি ছিল না। পেরু থেকে এর মধ্যে আর কোনো জাহাজও আসে নি যে গানাদোর সেখানকার কীর্তি এখানে জানাজানি হয়ে তার খোঁজ এত জরুরী হয়ে পড়েছে। পানামা সরকারের গানাদোর জন্যে হঠাৎ এ পুরস্কার ঘোষণার মানেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি বাজারের নানা লোকের সংগে আলাপ করে যা বুঝেছি—ফিলিপিলিও জানায়,—তাতে পুরস্কারটা পানামার সরকারী দপ্তর কি কোতোয়ালী থেকে দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হয় না। কোতোয়ালীর মারফত ঘোষণাটা করা হলেও পুরস্কারটা দিতে চেয়েছে অন্য কেউ। শুনছি, মাত্র ক'দিন আগে স্পেন থেকে এখানে এসে কেউ একজন হন্যে হয়ে ঠিক গানাদোর মত একজন গোলামকে খুঁজছে।

স্পেন থেকে এসে হন্যে হয়ে গানাদোকে খুঁজছে! সানসেদো নিজের মনেই যেন সরবে চিন্তা করেন, গানাদোর বিরুদ্ধে আক্রোশের যার সীমা নেই সে সোরাবিয়াত এখনো পেরুতে। স্পেন থেকে গানাদোর এত বড় শত্রু আর কে আসতে পারে!

কথা বলতে বলতে বাজারের রাস্তা যেখানে বন্দরের দিকে মোড় নিয়েছে সানসেদো আর ফিলিপিলিও সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ সে পথে একজনকে আসতে দেখে সানসেদো চমকে ওঠেন। (ক্রমশঃ)

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(১০৬)

বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র

ঠাকুর নরহরির তিরোভাব তিথিতে শ্রীখণ্ডে মহোৎসব হচ্ছে।

রাত্রে কীর্তনোৎসবে এ কে নৃত্য করছে? দেখামাত্রই দেহ-মনের তাপ শীতল হয় এ কার অঙ্গ, এ কার ভঙ্গি?

সে কি, চেন না একে? এ নিত্যানন্দের ছেলে।

তাই বুঝি নৃত্যানন্দ। কিন্তু দু চোখে দেখে আর্তির পূর্তি হচ্ছে না, যদি সহস্র নেত্র থাকত! অতৃপ্ত দর্শকের দল বলাবলি করছে।

তোমরা তো হাজার চোখ কামনা করছ, আমার যদি সামান্য দুটি চোখই থাকত! দর্শকের মধ্যে ছিল এক অন্ধ, সে আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠল : আমি যে কোন দিকে তাকাব তাই বুঝতে পারছি না। আমার যে চার দিকেই অন্ধকার।

না, ছুটোছুটি না করে এক জায়গায় বোসো স্থির হয়ে। একাগ্র তন্ময়তায় তাকাও সামনের দিকে।

নিত্যানন্দ-তনয়ের নাম কী? অন্ধ পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলে।

নাম বীরভদ্র।

ঠিক নাম, সুন্দর নাম। বললে সেই অন্ধ। তাঁর দুই পদ—বীর আর ভদ্র। এক পদে শাসন, আরেক পদে করুণা। বীর-পদে তিনি দুষ্টের সংহার করছেন, অশুভ-অশিব বিনাশ করছেন, ভদ্র-পদে করুণা বিতরণ করে সর্বজগতের মঙ্গল বিধান করছেন, অন্ধকেও দেখতে দিচ্ছেন সেই করুণার বিগ্রহকে।

এ কী, অন্ধ যে সত্যি-সত্যিই দেখতে পাচ্ছে চোখ মেলে। এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না বিসদৃশ প্রতীতি। আমি সত্যিই দেখছি, না, দেখছি বলে মনে হচ্ছে? এ কি শুধু অনুভবে না প্রত্যক্ষগোচরে?

কী আশ্চর্য, চোখের জলে চোখের আচ্ছাদন ক্ষয় হয়ে গেছে, স্থূলে-স্পষ্টে-স্বচ্ছন্দে দেখতে পাচ্ছি উদ্দণ্ড নৃত্য—হ্যাঁ, এই তো বীরভদ্র, চৈতন্য-পরিকর, নিত্যানন্দের পুত্র, বলবীর্য ও শিবশুভের প্রতিমূর্তি। অন্ধ সোল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল আর সেই জয়ধ্বনিতে উত্তাল হয়ে উঠল কীর্তনানন্দের সমুদ্র! সবাই উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগল :

কোথা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন।
কোথা নিত্যানন্দ রাম দুঃখীর জীবন।।
কোথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য গুণের আলয়
কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়।।
হরিদাস শ্রীবাস স্বরূপ, রামানন্দ।
কোথা শ্রীমাধব বাসু মুরারি মুকুন্দ।।

সবার কণ্ঠে এক কান্না, এক ডাক, এক আনন্দধ্বনি—গণসহ দেখা দাও গৌর' বিনোদিয়া। গৌরনামে যা কান্না তাই আনন্দ, যা আনন্দ তাই কান্না। গৌরনামে আর্তি আকূতি আর আহ্লাদ সমস্ত একাকার।

বীরভদ্র ধর্মপ্রচার করতে পূর্ববঙ্গে গেলেন। সমাজের বিচিত্র অত্যাচারে বহু হিন্দু বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বহু চেষ্টাতেও তাদের সমাজে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। বীরভদ্র তাদেরকে 'ভেক' দিয়ে 'নেড়া' ও 'নেড়ি'র সৃষ্টি করল। এরাই হয়ে দাঁড়াল বীরভদ্রের অভিযানের প্রধান সহায়ক।

একেবারে গৌড়ের বাদশার সকাশে এসে উপস্থিত হল বীরভদ্র। বাদশা ঠিক করল এই আতিথ্যের সুযোগে বীরভদ্রের ধর্মনাশ করবে। যখন হাতে এসে পড়েছে 'খানা' খাইয়ে দিতে হবে। 'পড়েছ যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।'

বেশ তো খাব। বীরভদ্র বললে, নিয়ে আসুন আপনার খানা।

বাবুর্চি খানা নিয়ে এল। কিন্তু আবরণ তুলে নিতেই দেখল, এ কী, খাদ্য কোথায়, তার বদলে এ যে দেখি ফুল, ফুলের স্তূপ।

সবাই বিমূঢ় হয়ে গেল।

না, ছেড়ে দেওয়া চলবে না। আবার নিয়ে এস খানা। হ্যাঁ, ভয় কী, ঢাকা দিয়েই নিয়ে এস। তারপর ফের ঢাকা তুলে ধরে দাও সামনে!

কিন্তু, কী আশ্চর্য, খানা [illegible] পুষ্পস্তূপে পরিণত হয়েছে!

বাদশা অধোমুখ হয়ে রইল। বললে, মার্জনা করুন। বলুন কী দিয়ে আপনার পরিতোষ করতে পারি?

আর কিছু নয়, আপনার কাছে যে বহুমূল্য 'তেলুয়া' পাথরখানি আছে সেখানি আমাকে দান করুন।

আপনার মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাই আপনি যখন চেয়েছেন বললে বাদশা, তখন আপনাকে আমি তুষ্ট করব। আপনার পরিতোষেই আমার মার্জনা হবে।

বীরভদ্র সেই পাথরে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ নির্মাণ করাল। স্থাপিত করল খড়দহে। নিত্যানন্দ পিত্রালয় একচক্রা থেকে খড়দায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কুলদেবতা বঙ্কিমদেবকে, সঙ্গে অনন্তদেব শিলা আর ত্রিপুরাসুন্দরী। শ্যামসুন্দর তাদের পাশে এসে বসল।

নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্ত ও মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। তার দুই ছেলে গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দ অপ্রকট হলে তার দুই ছেলেকে জাহ্নবা দেবী পুত্রের মত পালন করেন। কেউ-কেউ বলে, রামকৃষ্ণ বা রামচন্দ্র জাহ্নবারই দত্তক পুত্র।

এই রামচন্দ্রের সঙ্গে নেড়া-নেড়ি নিয়ে বীরভদ্রের ঝগড়া হল। নরনারী একত্র করে বীরভদ্র কৃষ্ণভজন করছে এটা রামচন্দ্রের মনঃপূত নয়। বললে, কোন শাস্ত্রেই নারীর স্বাতন্ত্র্য ধর্মের বিধান নেই।

কিন্তু বীরভদ্র তা মানতে চাইল না।

[illegible] পেরিয়ে অম্বিকার পশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে নদীর দক্ষিণ তীরে গভীর বন-জঙ্গল কাটিয়ে বাঘনাপাড়া পাটের পত্তন করে রামচন্দ্র। বনে বাঘের উপদ্রব ছিল বলে গ্রামের নাম হল ব্যাঘ্রনাদাশ্রম—লোকে তারই

অপভ্রংশে নাম দাঁড়াল বাঘনাপাড়া। মন্দিরে-বিগ্রহে লোকবসতিতে বাঘনাপড়া শ্রীমন্ত হয়ে উঠল।

সেই খবর খড়দহে বীরভদ্রের কানে গিয়ে পৌঁছল। বীরভদ্রের ক্রোধ হল, পাটের প্রতিষ্ঠাতা কে খোঁজ না নিয়েই নাড়াদের পাঠিয়ে দিল সেখানে।

পৌষের দ্বিপ্রহর রাত্রে বারো শো নাড়া বাঘনাপাড়ায় চড়াও হল। বললে, ইলিশ মাছ আর আম খাওয়াও। নইলে—

রামচন্দ্র বললে, প্রথমটা দিতে পারব না, তবে আম খাওয়াচ্ছি এস।

পৌষ মাসে?

হ্যাঁ, পৌষ মাসে।

আশ্রমে আম গাছ আছে?

না। এযে দেখছ এ তো বকুল গাছ।

তবে আম খাওয়াবে কী করে?

বকুল গাছ থেকেই আম পাড়ব। রামচন্দ্র আশ্বাস দিলে।

বারোশো নাড়া মূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর, আশ্চর্যের আশ্চর্য, রামচন্দ্রের মাহাত্ম্যে বকুল গাছই আম্রময় হয়ে উঠল।

নাড়ারা খড়দায় ফিরে এসে বীরভদ্রকে বললে এই অপরূপ কথা। আরো বললে, যাঁর আশ্রম সেই শক্তিধর পুরুষের নাম রামচন্দ্র।

এক ডাকে চিনতে পারল বীরভদ্র। তখুনি ছুটল বাঘনাপাড়ায়। দুইজনের মিলন হয়ে গেল। কোনো মতভেদ বা মনোমালিন্য রইল না।

রাজবলহাটের কাছাকাছি ঝামটপুর, সেই গ্রামের যদুনন্দন চক্রবর্তী, পত্নীর নাম লক্ষ্মী দেবী—তাদের দুই মেয়ে শ্রীমতী আর নারায়ণী। এই দুই মেয়েকেই যদুনন্দন বীরভদ্রের হাতে সম্প্রদান করল। যৌতুক দিল অভিনব। শিষ্যত্বই সেই যৌতুক। যদুনন্দন জামাইয়ের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে তার শিষ্য হয়ে গেল। বীরভদ্র যে চৈতন্যেরই অভিন্ন বিগ্রহ।

বধূদের দীক্ষা দিলেন জাহ্নবা। দীক্ষা দিয়ে বধূদের নিয়ে শ্রীপাট খড়দহে ফিরলেন।

শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। সুন্দরী স্ত্রী কিন্তু সন্তান নেই। বীরভদ্র বিষ্ণুপুরে গেলে শ্রীনিবাস তাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল। পদ্মাবতীর স্বহস্তের রান্না, তাই এত স্বাদ। পদ্মাবতীর স্বহস্তের পরিবেশন, তাই এত শ্রী।

'কিন্তু সেবা যে চালাবে এর গর্ভের সন্তান নেই।' শ্রীনিবাস মিনতি করল: 'তুমি যদি কৃপা কর তবেই আমার পুত্রলাভ হয়।' 'তোমার শিষ্য কলেবর প্রভুর নিজ শক্তি। পুণ্ড্র কৃষ্ণ এই গর্ভে জন্মায় সন্ততি।'

বীরভদ্র পদ্মাবতী নাম বদলে রাখল গৌরাঙ্গপ্রিয়া। তারপর তার হাতে নিজের চর্বিত তাম্বুল দিয়ে শক্তি সঞ্চার করে দিল। দশ মাস অন্তে যথাসময়ে শ্রীনিবাস পুত্রলাভ করল। কিন্তু দেখা গেল সেই পুত্রের দক্ষিণ চরণ বাঁকা। তাই বলে একে কেউ বক্রগতি বোলো না, এ গোবিন্দগতি। বীরভদ্র খঞ্জ শিশুর তাই নাম রাখল। কিম্বা বল গতিগোবিন্দ।

মায়ের আদেশ নিয়ে বীরভদ্র স্বগণসহ বৃন্দাবন যাত্রা করল। পথিমধ্যে সপ্তগ্রামে এক সুকৃতিমান বণিকের গৃহে সংকীর্তন করে পতিত-দুঃখিতদের ভক্তি বিলোল। এল শান্তিপুর, মিলল অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণ মিশ্রের সঙ্গে। সেখান থেকে অম্বিকা হয়ে নবদ্বীপ। নবদ্বীপ থেকে শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ডে ঠাকুর কানাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। সংকীর্তনে তাকে তুষ্ট করে গেল যাজিগ্রামে। সেখানে শ্রীনিবাসের সম্বর্ধনা পেল। যাজিগ্রাম থেকে বুধরি হয়ে চলল খেতোরিতে। সেখানে মিলল নরোত্তম ঠাকুরের অভিনন্দন। নরোত্তমকেই বৃন্দাবনের সঙ্গী করল।

দেখ দেখ নিত্যানন্দ-বলদেবের সন্তানকে দেখ। যে দেখে তারই আর পলক পড়ে না। মানুষের এত রূপ হয়? এত তেজ! আর সঙ্গীদেরও দেখ। সবাই যেন প্রেমানন্দের পারাবার!

অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গদাধর পণ্ডিত, গোবিন্দদেবের অধিকারী অনন্ত আচার্য। ব্রজবাসীদের আনন্দে বৃন্দাবন মুখর হয়ে উঠল। বীরভদ্র সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গোবিন্দ, গোপীনাথ আর মদনমোহনকে দর্শন করল। দর্শন করল রাধাবিনোদ, রাধারমণ আর রাধাদামোদর। তারপর ভূগর্ভ আর জীব গোস্বামীর অনুমতি নিয়ে চলল বনভ্রমণে। মধু-তাল-কুমুদ-বহুলার অরণ্যে। তারপর দেখতে গেল দুই কুণ্ড—রাধা আর শ্যাম, সেখান থেকে গিরিগোবর্ধন। গোবর্ধন থেকে বেরিয়ে চলল কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটিরে।

কৃষ্ণদাসের পিতা ভগীরথ কবিরাজ, মাতা সুনন্দা। জন্মস্থান ঝামটপুর, কাটোয়ার তিন মাইল উত্তরে। কৃষ্ণদাসের যখন ছ বছর বয়স, তার পিতৃবিয়োগ হল। যৌবনের সূচনাতেই দেখা দিল ঘোরতর বৈরাগ্য। নিত্যানন্দ স্বপ্নে আদেশ করলেন বৃন্দাবনে যাও, রূপ-সনাতন-রঘুনাথের সঙ্গে মিলিত হও। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে গেল আর ঐ তিন গুরুর আশ্রয় নিল। চিরকুমার কৃষ্ণদাস সারা জীবন বৃন্দাবনেই কাটাল আর রচনা করল বৈষ্ণবের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

কৃষ্ণদাসের সঙ্গে রঘুনাথ আরও সব কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শনে চলল। কাম্যবনে গিয়ে বিমলাকুণ্ডে স্নান করল, তারপর গেল বৃষভানুপুরে। পাবন সরোবরে স্নান করে গেল যাবটে। সেখানে রামঘাটে রাম-রাস করল। তারপর ভাণ্ডীরে গিয়ে দেখল কৃষ্ণ-বলরামের ক্রীড়াবিলাস। নন্দঘাট চীর-ঘাট দেখে এল গোকুলে, কৃষ্ণজন্মস্থান দেখল। সেখান থেকে গেল রাওলে রাধিকা জন্মস্থান দেখতে। মথুরায় বিশ্রান্তি ঘাটে স্নান করল। তারপর গণ-জনসহ ফিরল গোড়ে।

গোড়ে ফিরেই খড়দহে এসে জননীকে প্রণাম করল।

বীরভদ্রের প্রেমভক্তিময় তিন শিষ্য—গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ আর রামচন্দ্র। আরেক শিষ্য ছিল কাঁদরার জয়গোপালদাস। জয়গোপাল গুরুলঙ্ঘন করেছিল তাই তাকে শিষ্যত্ব থেকে বিতাড়িত করল।

দ্বিতীয়া স্ত্রী নারায়ণীর গর্ভে বীরভদ্রের এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করল। পুত্র রামচন্দ্র ও তিন কন্যা ভুবনমোহিনী, নবদুর্গা ও নবগোরী। রামচন্দ্রের চার পুত্র—রামদেব, কৃষ্ণদেব, বিষ্ণুদেব ও রাধামাধব—ও এক কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরী। ভক্ত সংসারের বিস্তার ঘটল।

নিত্যানন্দ-দুহিতা গঙ্গার বিয়ে হয় মাধবাচার্যের সঙ্গে। মাধব নিত্যানন্দের ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য। পাণ্ডিত্যের জন্যে অর্জন করেছে আচার্য উপাধি। গঙ্গা সন্ন্যাসীর কন্যা, তায় আবার গুরুকন্যা—তার সঙ্গে বিয়ে তো অশাস্ত্রীয়। তাছাড়া নিত্যানন্দ রাঢ়ী শ্রেণীর আর মাধব বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এমন বিয়ে বিধেয় হয় কী করে? কিন্তু নিত্যানন্দের ইচ্ছায় সমস্ত অসাধ্য সুসাধ্য হয়, সমস্ত অসিদ্ধও সুসিদ্ধ হয়ে যায়।

মাধব ও গঙ্গার পুত্র গোপালবল্লভ।

রাধিকা গৌরী ও কৃষ্ণ হরি, দুয়ে মিলে গৌরহরি। রাধারমণকে ভজনা করা অর্থই রাধার মনকে ভজনা করা। আরও সংক্ষেপে গোবিন্দের গো আর রাধার রা একত্র করে গোরা। আর যা বৃন্দাবন নামে খ্যাত তাই নবদ্বীপ বা নববৃন্দাবন। সত্য যুগে তীর্থ কুরুক্ষেত্র, ত্রেতায় তীর্থ পুষ্কর, দ্বাপরে তীর্থ নৈমিষারণ্য আর কলিযুগে তীর্থ নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপে যে পূর্ণানন্দ-সুন্দর গৌরবিগ্রহ নরহরি উদিত হয়ে সুধাসারবর্ষী হরিনাম দান করে পাপীদের পাপসমুদ্র থেকে উদ্ধার করছেন সেই ভক্ত-অভয়ংকরের চিরন্তন জয় হোক।

(ক্রমশঃ)

প্রেক্ষাগৃহ

সত্যজিৎ রায়

তপন সিংহ

উত্তমকুমার

নার্গিস

ফটো : অমৃত
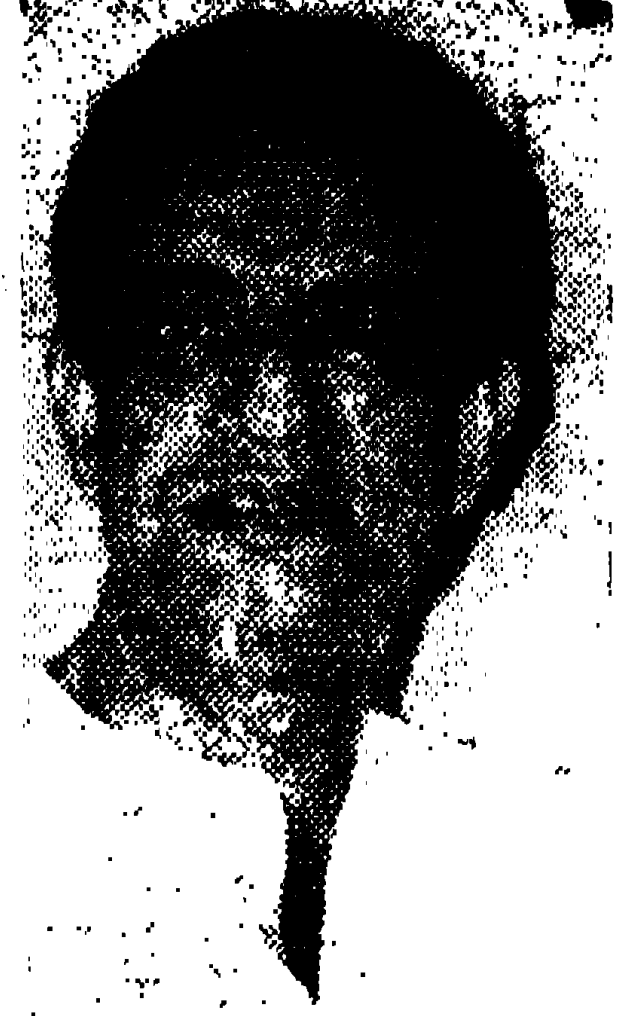
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

তপন সিংহ পরিচালিত 'হাটেবাজারে' ১৯৬৭র শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে বিবেচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৩ থেকে শুরু করে পনেরো বছরের মধ্যে বাঙলা ছবি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে আটবার। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন সত্যজিৎ রায় তাঁর 'চিড়িয়াখানা' ছবি পরিচালনার জন্যে। 'হাটেবাজারে' ছবিখানি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এর প্রযোজক অসীম দত্ত ও পরিচালক তপন সিংহ যথাক্রমে ২০ হাজার ও ৫ হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন। আলোচ্য বর্ষে হিন্দী ছবি "উপকার" দ্বিতীয় স্থানাধিকারী চিত্ররূপে বিবেচিত হয়েছে। এই বছরেই দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্যে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা হল। এর প্রযোজক আর. এন. গোস্বামী ৫ হাজার টাকা এবং পরিচালক মনোজকুমার একটি রৌপ্য পদক পাবেন।

এই বছর থেকে আরও নতুন পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। সেই হিসাবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিবেচিত হয়েছেন উত্তমকুমার (অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি ও চিড়িয়াখানা), শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নার্গিস (রাত ঔর দিন), শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায় (চিড়িয়াখানা), শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতপরিচালক কে, ডি, মহাদেবন (কমদান কারনাই), শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীরামচন্দ্র (বম্বাই রাতকি বাঁহো মে) ও এম, এন, মালহোত্রা (রঙ্গীন চিত্র হামরাজ), শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার এস, ডি, পুরম্‌সদানন্দন (অগ্নিপুত্রী) এবং শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক মহেন্দ্র কাপুর (উপকার)। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরিচালক, সঙ্গীতপরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী ও চিত্রনাট্যকার প্রত্যেকে নগদ ৫ হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন। বাকী সকলে পাবেন সম্মানসূচক ফলক।

এ ছাড়া কমিটি ন'টি আঞ্চলিক ভাষার শ্রেষ্ঠ চিত্রকে পুরস্কৃত করছেন প্রত্যেক প্রযোজককে নগদ ৫ হাজার টাকা ও পরিচালককে রৌপ্য পদক প্রদান করে। পুরস্কৃত আঞ্চলিক ছবিগুলি হচ্ছে : **বাঙলা :** আরোগ্য নিকেতন (অরোরা ফিল্ম : বিজয় বসু), **হিন্দী :** হামরাজ (প্রযোজক ও পরিচালক : বি, আর চোপ্‌রা), **মারাঠি :** সন্ত ওহাতে কৃষ্ণাভাই (সহকারী চিত্রপট সংস্থা : এম, জি, পাঠক), **পাঞ্জাবী :** সাটলেজ দে কাণ্ডে (প্রযোজক ও পরিচালক : পি, পি. মহেশ্বরী), **ওড়িয়া :** অরুন্ধতী (ধীরাম পট্টনায়ক : পি, কে, সেনগুপ্ত), **তামিল:** আলায়াম (সানবীম : থিরুমালাই ও মহালিঙ্গম্‌), **তেলেগু :** সাদি গুতালু (চক্রবর্তী চিত্র : এ, সুব্বা রাও), **মালয়ালম :** আনভেশচ কাণ্ডোথিলা (রবি জেনারাল পিকচার্স : পি, ভাস্করণ) এবং **কানাড়া :** বাঙ্গারদা হবু (প্রযোজক ও পরিচালক : আরাসাকুমার)।

এবছর যে-সাতটি অল্পদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ও তথ্যচিত্র পুরস্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটি তথ্য ও বেতার দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত ফিল্ম ডিভিশনের তোলা। শ্রেষ্ঠ উদ্দীপনাসূচক চিত্র হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছে সি, টি, ব্যাপ্টিস্টা প্রযোজিত ও পরিচালিত 'ইনকুইরি'।

এবার মোট ১৬৪টি ছবি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল।

চিত্র-সমালোচনা

শ্রেষ্ঠ অভিনেতার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভে শিল্পী সংসদ শ্রীউত্তমকুমারকে এক সম্বর্ধনা জানান। সম্বর্ধনা সভায় স্মৃতিফলকসহ শ্রীউত্তমকুমার। ফটো : অমৃত

গড় নাসিমপুর (বাঙলা) স্যাডো প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৩,৯৬৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : অজিত লাহিড়ী; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বারীন্দ্রনাথ দাস; সংগীত-পরিচালনা : শ্যামল মিত্র; গীতরচনা : প্রণব রায়; চিত্রগ্রহণ : বিজয় দে; শব্দানুলেখন : অনিল দাশগুপ্ত, বাণী দত্ত, জে, ডি, ইরাণী এবং অতুল চট্টোপাধ্যায় (অন্তর্দৃশ্য); ইন্দু অধিকারী (বহির্দৃশ্য); সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা : সুবোধ দাশ; সম্পাদনা : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়; নেপথ্যকণ্ঠসংগীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র; নৃত্যপরিকল্পনা : শক্তি নাগ ও হীরালাল; রূপায়ণ : মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, পদ্মা দেবী, মধুমতী, কৃষ্ণকলি মণ্ডল, উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, তরুণকুমার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, মাস্টার প্রসূন, মাস্টার শান্তনু প্রভৃতি। রূপছায়া পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ১ নভেম্বর, শুক্রবার থেকে বীণা, বসুশ্রী, পূর্ণশ্রী, আলোছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

স্যাডো প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং অজিত লাহিড়ী পরিচালিত প্রথম ছবি "জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার"-এর মতো বর্তমানে আলোচ্য দ্বিতীয় ছবি "গড় নাসিমপুর"-ও এমন একটি কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে, যার ঘটনাকাল আজ থেকে বহু, বহু বছর পিছনে সামন্ততান্ত্রিক যুগে বিধৃত। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে বাঙলাদেশের কোথায় ছিল গড় নাসিমপুর, আর কোথায় বা ছিল সুবর্ণগ্রাম, রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সত্যিই রায়রায়ান উমাকান্ত রায়ের যথাসর্বস্ব গ্রাস করেছিলেন কিনা, কাহিনীটির কতোটুকুই বা ঐতিহাসিক, আর কতোখানিই বা কাল্পনিক —ছবিখানির আলোচনায় এ-সব প্রশ্ন না তোলাই ভালো এবং তার কোনো প্রয়োজনও নেই। এই ধরনের কাহিনী নির্বাচনের সুবিধাও যেমন, অসুবিধাও তার থেকে কম নয়। সুবিধার দিকে আছে—পটভূমিকার বিরাটত্ব, চরিত্র ও ঘটনার বৈচিত্র্য, সাজ-পোশাক ও দৃশ্যপটের বাহার, সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আর অসুবিধার দিকটা হচ্ছে প্রধানত ছবিটিকে উপযুক্তভাবে উপস্থাপনার প্রশ্ন, যা সংগঠন নৈপুণ্য এবং অর্থবলের ওপর নির্ভর করে। "গড় নাসিমপুর"-এর কাহিনীকে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের ঘটনা বলে বিবৃত করার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠকদের ওপর সেই যুগোপযোগী আসবাবপত্র সংগ্রহের গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই দায়িত্ব সর্বাংশে পালিত হয়নি, সে-কথা বলাই বাহুল্য। এমন কি, ডাকাত দলভুক্ত দেবীকান্ত এবং সামন্তরাজ ইন্দ্রনারায়ণের কন্যা উত্তমার দ্বৈতগীত 'পিয়া তুঁহু বারি পিয়াসার"-র দৃশ্যটি যে-নৌকার উপর সংঘটিত হয়েছে, তার সামান্যতা রীতিমত চক্ষুপীড়াদায়ক হয়ে রসসৃষ্টির পথে অবাঞ্ছনীয় বাধা উপস্থিত করেছে। তবুও বলব, বাঙলা ছবির গার্হস্থ্য পরিবেশের গতানুগতিকতাকে বর্জন করে অতীত যুগের বিরাট পটভূমিকা আশ্রয়ী কাহিনীকে অবলম্বন করে গঠিত "গড় নাসিমপুর" আমাদের এবং আমাদের সঙ্গে সমগ্র বাঙালী দর্শক-সমাজের আন্তরিক অভিনন্দন লাভের যোগ্য

বহু বৈচিত্র্যময় ঘটনা ও চরিত্রাবলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করিয়ে নানা রসের আস্বাদনে সহায়ক হয়েছে বলে।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের কন্যা উত্তরাকে ভালোবাসে উমাকান্তের পুত্র দেবীকান্ত এবং দেওয়ান শিবশঙ্করের পুত্র বাসুদেব। কিন্তু দেওয়ানপুত্রের প্রতি উত্তরার মন নেই, সে দেবীকান্তেরই প্রণয়প্রার্থী। দেওয়ানপুত্র বাসুদেব মনেপ্রাণে কামনা করে উত্তরাকে; তাই রাজকুমারীকে বিবাহ করবার যোগ্যতা অর্জনের জন্যে সে নিজেই রাজা হতে চায় ছলে-বলে-কৌশলে। এক নববর্ষের যে-কাহিনীর আরম্ভ, বিচিত্র পথে বহু হিংসা-প্রতিহিংসা ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে বাসুদেবের মৃত্যু ও দেবীকান্ত-উত্তরার মিলনে তার সমাপ্তি। বহু চরিত্রসংবলিত এবং অসংখ্য জনতার দৃশ্যপূর্ণ এই বিরাট ছবিটিকে দর্শকদের কৌতূহলকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রেখে সাফল্যপূর্ণভাবে সমাপ্তির পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পরিচালক অজিত লাহিড়ীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। অবশ্য এর জন্যে চিত্রনাট্যকার বারীন্দ্রনাথ দাসেরও প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে।

অভিনয়াংশের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই অভিনন্দন জানাব বাঙলা ছবির জগতে নবাগত দেব মুখোপাধ্যায়কে। দেওয়ানপুত্র বাসুদেবের ভূমিকায় তাঁর পুরুষত্বব্যঞ্জক, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, শক্তিশালী রূপ এবং অভিব্যক্তি বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে সুদুর্লভ এবং অনাস্বাদিতপূর্ব। হিন্দী ছবির ক্ষিপ্র বাচনে অভ্যস্ত শ্রীমুখোপাধ্যায় বাঙলা বাচনে কিছুটা রপ্ত হতে পারলেই বাঙলা ছবিতে তাঁর আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারবেন অচিরেই এবং অনায়াসেই। দেবীকান্তের ভূমিকায় বিশ্বজিৎ অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে যে-অভিনয় করেছেন, তা বাঙলা ছবিতে তাঁর শ্রেষ্ঠতম

অভিনয় বলে গণ্য হবার যোগ্য। উত্তম-কুমারের তুলনা উত্তমকুমার: চলনে, বলনে, চাউনিতে, দাঁড়াবার ভঙ্গীতে—যতটুকুই তিনি অভিনয় করেন, ততটুকুই নিখুঁত ও তুলনাহীন। মীর জুমলারূপী উত্তমকুমার সংযত অভিনয়ের একটি বিস্ময়কর নিদর্শন রেখেছেন। উত্তরাবেশী মাধবী মুখোপাধ্যায় গৃহীত চরিত্রের সবকটি ভাবকে সার্থক-ভাবে পরিস্ফুট করেছেন; তবে ওরই মধ্যে প্রণয়-দৃশ্যগুলিতে তাঁর অভিব্যক্তি অধিকতর অর্থব্যঞ্জক। ছোট উত্তরা, দেবীকান্ত ও বাসুদেবের ভূমিকায় যথাক্রমে কৃষ্ণকলি মণ্ডল, মাস্টার প্রসূন ও মাস্টার শান্তনুর অভিনয় প্রশংসনীয়। সিতারার ভূমিকায় রুমা গুহঠাকুরতা অল্পের মধ্যে একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। উত্তরার সখী ললিতাবেশে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় বাসুদেবের প্রতি আসক্তিকে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় বিকাশ রায় (দেওয়ান শিবশঙ্কর), অসিত-বরণ (ইন্দ্রনারায়ণ), কমল মিত্র (ভুজঙ্গ হালদার), তরুণকুমার (শাহসুজা), শেখর চট্টোপাধ্যায় (কাশেম খাঁ), অনুপকুমার (চন্দ্রকান্ত), দিলীপ রায় (মনজুর হোসেন), প্রভৃতি যথাযোগ্য সু-অভিনয় করেছেন। মধুমতীর নৃত্যদৃশ্যটি আরও আকর্ষক-ভাবে গৃহীত হওয়ার সুযোগ ছিল। জনতার দৃশ্যগুলি সাধারণত সু-পরি-কল্পিত।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। আলোছায়ার নিপুণ সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায় কৌতূহলোদ্দীপক 'সাসপেন্স'পূর্ণ দৃশ্যগুলিতে এবং বিশেষ করে রাত্রির দৃশ্যে। দেবীকান্ত ও বাসুদেবের তরবারি যুদ্ধ সংক্রান্ত দৃশ্যটি অসিচালনা, ক্যামেরা সংস্থাপন ও সম্পাদনা-গুণে রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এ-রকম সুনিপুণ এবং উত্তেজকভাবে বাস্তব অসিযুদ্ধের দৃশ্য সবাক বাঙলা ছবিতে ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। কালীমূর্তির সামনে সমবেত নৃত্য ও গান যথেষ্ট মাদকতাপূর্ণ নয়; সুরলয় সমন্বয়ে কালিকা-নৃত্য দ্রুততরভাবে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ছ'খানি গানের মধ্যে "দুটি আঁখিতারা" শীর্ষক কীর্তনাঙ্গের গান এবং "পিয়া তুঁহু বারি পিয়াসার" নাক ঠুংরী ঢঙের প্রেমসঙ্গীত—এই দু'খানি গানই উপভোগ্যভাবে সার্থক। ছবিটিকে সমগ্রভাবে আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন করার অবকাশ ছিল।

স্যাডো প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং অজিত লাহিড়ী পরিচালিত ভিন্ন আস্বাদের ছবি "গড় নাসিমপুর" অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

পদ্মাবতী জয়দেব (বাঙলায় ভাষা-ন্তরিত) : সানসাইন পিকচার্স (প্রা) লিমিটেড-এর নিবেদন; ৩,৯৭২·৮৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৮ রীলে সম্পূর্ণ; [মূল তেলেগু ছবির পরিচালনা : পি. ভেঙ্কটেশ্বর রাও; সঙ্গীতপরিচালনা : এস রাজেশ্বর রাও; চিত্রগ্রহণ : ভঙ্কট; সঙ্গীতানুলেখন : পি, ডি, কোটেশ্বর রাও; শিল্পনির্দেশনা : গোখলে; সম্পাদনা : বি, হরিনারায়ণ. রূপায়ণ : নাগেশ্বর রাও, অঞ্জনা দেবী প্রভৃতি]; বাঙলা ভাষান্তরে পরিচালনা : চিত্রদূত; সংলাপ : দেবনারায়ণ গুপ্ত; সঙ্গীতপরিচালনা : বিজন পাল; গীত-রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; শব্দ ও সঙ্গীতানুলেখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। লাইফ পিকচার্স (প্রা) লিমিটেড-এর পরি-বেশনায় গেল ১ নভেম্বর, শুক্রবার থেকে সুরশ্রী, রূপম, আলেয়া, রূপায়ণ এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

গীতগোবিন্দের রচয়িতা, পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তী, কেন্দুবিল্ব গ্রামের ভক্তকবি সাধক জয়দেবের জীবনকথা বাঙালী নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দের সামনে অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে লক্ষাধিকবার অভিনীত হয়েছে বিগত যুগের প্রসিদ্ধ যাত্রানাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত "জয়দেব" গীতিনাট্যের মাধ্যমে। কিন্তু এই জীবনকথাতে সানসাইন পিকচার্স নিবেদিত তেলেগু ছবি "পদ্মাবতী জয়দেব"-এর কাহিনী বর্ণিত বহু ঘটনারই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। জয়দেবপত্নী পদ্মাবতী যে কুমারী জীবনে দেবদাসী ছিলেন এবং তাঁর রূপ-লাবণ্যে প্রলুব্ধ হয়ে একব্যক্তি যে জয়দেব-পদ্মাবতীর দাম্পত্যজীবনে নিরন্তর বহু-প্রকার বিঘ্ন ঘটিয়েছিল, এমন কথা আমাদের জানা নেই। তাই বাঙলায় ভাষান্তরিত দাক্ষিণী ছবি "পদ্মাবতী জয়দেব"-এর কাহিনীকে বাঙালী দর্শকের কাছে নূতন বলে বোধ হবে। কিন্তু তেলেগু শিল্পী অঞ্জনা দেবী অভিনীত পদ্মাবতীকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে বাঙালী অভি-নেত্রীর ভাবসমৃদ্ধ কণ্ঠ; জয়দেবের প্রতি পদ্মাবতীর শ্রদ্ধাব্যাকুল ভালোবাসা আশ্চর্যভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে যেমন এই সংলাপের মাধ্যমে, তেমন অঞ্জনা দেবীর অভিনয়ভঙ্গিমায়। কবি জয়দেবের চিত্রটিও পরিস্ফুট হয়েছে নাগেশ্বর রাওয়ের অভিনয় ও তাঁর মুখনিঃসৃত বাঙলা সংলাপ মারফত। এ ছাড়া পরাশর, রাজা লক্ষ্মণসেন, তাঁর স্ত্রী, পুরীরাজ, তাঁর মন্ত্রী ও পদ্মাবতীরূপলুব্ধ কুচক্রী ব্যক্তির অভিনয়ও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাঙলা সংস্করণে ছবিটির সবচেয়ে উপভোগ্য বিষয় হচ্ছে এর সঙ্গীতসুধা। তেলেগু ছবির শিল্পীদের ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাঙলা ভাষায় গান রচনা ও সেগুলিতে মূল তেলেগু গানের সুর বর্জন করে নতুনভাবে সুরযোজনা করা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা সাধারণ দর্শক না বুঝলেও সঙ্গীতানুরাগীরা উপলব্ধি করবেন। এই কঠিন কার্য সুষ্ঠু-ভাবে সম্পাদন করে গানগুলিকে দর্শকদের কাছে রীতিমত মনমাতানো করে তোলায় বাহাদুরী আছে বৈকি। বাঙলা গানগুলির সঙ্গীতপরিচালক বিজন পাল ক্লাসিক্যাল রাগরাগিণীর সমন্বয়ে এই অসাধ্য সাধন করেছেন। ছবির পরিচয়লিপির সঙ্গে যাঁদের কণ্ঠনিঃসৃত "হে রাধামাধব গোপীজন-

বল্লভ" গান থেকে শুরু করে মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, গীতা দাস প্রভৃতির গাওয়া অন্তত পনেরোখানই দর্শককে পুলকিত করবার ক্ষমতা রাখে। বিজন পাল সুরারোপিত এই গানগুলি "পদ্মাবতী জয়দেব" চিত্রের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ।

—নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

১৯৬৭ সালের রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ফলাফল বের হোল ১৯৬৮'র নভেম্বরে। পুরস্কার বিতরণ হবে ডিসেম্বরে কি নতুন বছরে পা দিয়ে। সরকারী দীর্ঘসূত্রতার সুন্দর উদাহরণ। পৃথিবীর আর কোন দেশে এ ধরনের উদাহরণ আছে বলে তো শুনিনি। যাই হোক প্রতিবারের মত এবারেও বাংলার কপালে জয়তিলকের বড় তিনটে ফোঁটাই পড়েছে। এক—শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে তপন সিংহের **'হাটে বাজারে'**; দুই—শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে সত্যজিৎ রায় ও তিন হলো শ্রেষ্ঠ নায়ক উত্তমকুমার। ভারতের একমেবাদ্বিতীয়ম্ নায়ককে নিয়ে বম্বে বাংলার দর্শককুল বেশ জল ঘোলা করতেন।

আজ বসন্ত এবং পিতাপুত্র চিত্রের স্যুটিং-এর জন্য শিল্পী তনুজা কলকাতা এসে পৌঁছালে বিমান বন্দরে তার এই চিত্রটি গৃহীত হয়। ফটো : অমৃত

অগ্নিযুগের কাহিনী/বিকাশ রায়

এবারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার উত্তমকুমারের মাথায় যাওয়ায় অনেকেই যেমন খুশী আবার তেমনি অনেকে বিরক্ত ও সন্দিহান বটে। তবে এটা ঠিক উত্তমকুমার, সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ বাংলার।

●

সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে **'তিন ভুবনের পারে'** ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। টেকনিসিয়ান স্টুডিও ও হাওড়ার চেঙ্গাইলে আউটডোর-এর কাজ কিছু হয়েছে। সতীর্থ প্রোডাকসন্সের এ ছবি আপাতত 'মুক্তি প্রতীক্ষার' লাইনে। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক সুধীন দাসগুপ্ত। রোমান্টিক জুটিতে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা। এই ওদের একসঙ্গে প্রথম ছবি। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন সুমিতা সান্যাল, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, তরুণকুমার, রবি ঘোষ ও অন্যান্যরা। চিত্রনাট্যকার আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এ ছবির পরিচালকও।

●

বম্বের বাসু ভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই নিরীক্ষামূলক চিত্রকর হিসাবে পরিচিত। তাঁর দুটো ছবিই সাধারণ হিন্দী ছবিতো বটেই অনেক বাংলা ছবির চাইতেও বিষয়বস্তুতে নতুন। বম্বের আশপাশের কথা চিন্তা করলে বলা যায় রীতিমত দুঃসাহসিক। তাই বুঝি লক্ষ্মীদেবী তাঁর একটা ছবির ওপরও বিশেষ ভর করেন নি। তবে শ্রীভট্টাচার্য দমেন নি, আবার পূর্ণোদ্যমে নতুন ছবির কাজ শুরু করেছেন। ছবির নাম **'অনুভব'**। ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য শ্রীভট্টাচার্যেরই। আধুনিক এক দম্পতির বিবাহিত জীবনের জটিলতা কাহিনীর কেন্দ্র। ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে থাকছেন তনুজা ও প্রাণ।

বিদেশী ছবির খবর

ফ্রান্স শুধুমাত্র নিজের দেশকেই নয় আন্তর্জাতিক বাজারেও একাধিক চিত্রাভিনেতা উপহার দিয়েছে। জাঁ পল্ বেলমণ্ডো, জাঁ মোরো, ব্রিজিৎ বার্দোৎ, জাঁ লুই ত্রিন্তিগা ও অনেক। সব নাম করতে গেলে পেল্লাই লিস্ট হয়ে যাবে। এদেশের অনেকেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়ে সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়ে গেছেন, হলিউড ও অন্যান্য দেশ থেকে অফার এসেছে, অ্যাকসেপ্ট করেছেন, রাতারাতি বিখ্যাত বনে গেছেন।

কিন্তু এখনও এমন কিছু শিল্পী এখানে আছেন যাঁদের আন্তর্জাতিক সম্মান হাতের কাছে এলেও বিশ্বখ্যাতি তাঁদের জোটেনি অথচ তাঁদের নিষ্ঠা, তাঁদের অভিনয় অবিসংবাদিতভাবে অনেকের চাইতে উন্নত মানের। জাঁ গাবি' এ ধরনের শিল্পী। দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরের শিল্পী জীবনে তিনি সম্মান প্রতিপত্তি কোনোটারই অভাব বোধ করেননি কিন্তু তথাকথিত 'বিশ্বখ্যাতি' তাঁর নেই। কেন? নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কোন ছবি করেননি বলেই হয়তো! এঁ'র 'পীং এরান্ড অফ্ প্যারিস' বা 'অভ ইজ মাই প্রফেশন' যারা দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই এঁকে কোনদিন ভুলতে পারবেন না। জাঁ রেনোয়ার 'গ্র্যাণ্ড ইলিউশন'ও এঁ'র জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি।

গাবি' জন্মেছিলেন সীনৎ-অজ নামে এক গ্রামে ১৯০৪ সালের ১৭ই মে। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে তাকে বাবা মার সঙ্গে প্যারিসে চলে আসতে হয়। ছোট্টবেলায়

একটি রুশ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলকে গত সপ্তাহে হীরেন নাগ পরিচালিত চেনা অচেনা চিত্রটি দেখানো হয়। ছবি প্রদর্শনের পর গৃহীত চিত্রে প্রযোজক দুলালী চৌধুরী, বাইমুভানোভা, সুস্মিতা সান্যাল, শমিতা ভক্ত, ওলভা উমাকোভা, নারিলা গিরোদেভা, পরোস্কায়েভ এবং গোবর্ধন অধিকারী।

দ্য দ্য ফ্লিংগকোর্টের যে স্কুলে পড়েছিলেন এখনও সেখানে একটা মূর্তি আছে তাঁর। তের বছর বয়সেই স্কুল ছেড়ে রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ের কাজ, মজুর, দোকানের বয় হিসাবে নানা জায়গায় ঘুরেছেন। মা ছিলেন ক্যাবারে গাইয়ে, বাবা হলেন কৌতুকাভিনেতা। ও'রা দুজনেই চাইতেন ছেলে তাঁদের পথেই আসুক। কিন্তু গাবি' তাতে নিমরাজি।

হঠাৎ বাবারই পীড়াপীড়িতে ফলি বার্জারের এক ক্রাউড সিনে নামলেন গাবি' নিতান্ত অনিচ্ছায়। কি হল বোঝা গেল না, হয়ত সেদিন গাবি' নতুন এক জগতের আনন্দ পেয়েছিল, হয়ত সেই ভীড়ের দৃশ্য করতে করতে এক অনাস্বাদিত পুলক জেগেছিল তার মনে, তাই তাকে আবার দেখা গেল আরেকটা নাটকে।

তারপর চলে গেলেন নৌভিতে কাজ নিয়ে। ১৯২৫-এ ডিমবিলাইজড্ হওয়ার পর বায়ুকে প্যারিসিয়ানয়ে স্ট্যান্ড ইন হয়ে ফিরে এলেন। এসেই আবার অভিনয়। বাবা মার দলে ভিড়ে গেলেন। দুটো বছর সারা ফ্রান্স ঘুরে বেড়ালেন এক অপেরা দলের সঙ্গে। এতদিনে পাকাপোক্ত অভিনেতা বনে গেছেন। নেচে গেয়ে আরও বছর তিনেক কাটানোর পর ১৯৩০য়ে প্রথমে চলন্ত সেলুলয়েডে ধরা দিলেন গাবি'। ছবির নাম 'চাকন্ দ্য চান্স'। সেই থেকে গাবি'র যাত্রা হল শুরু। বছরে প্রায় খান ছয়েক করে ছবি করতে লাগলেন। ১৯৩৯-রে যুদ্ধ শুরুর আগে আবার নৌভিতে ডাক পড়ল তাঁর। চেরবুর্গে চলে গেলেন। জার্মানরা যখন ফ্রান্স দখল করতে উদ্যত তখন তিনি সব কাজ ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমেরিকার দিকে পাড়ি জমালেন স্পেন পর্তুগাল হয়ে।

যুদ্ধ বন্ধ হল। শান্ত হল সব। গাবি' অপেরায় কাজ শুরু করলেন আবার। এখনও করে চলেছেন, বিশ্রাম নেই। ইতিমধ্যে দুবার ভেনিস উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারটিও বগলদাবা করে নিয়েছেন। ফ্রান্সের প্রায় সব পরিচালকের সঙ্গেই কাজ করেছেন ও এখনও করছেন। চৌষট্টি বছরের এই বৃদ্ধ শিশুর এখনও ক্লান্তি নেই। হেসে খেলে দুবেলা কাজ করছেন, মাঝে মাঝে ছুটি কাটাতে বেরিয়ে পড়ছেন বিদেশে।

গাবি' অভিনীত কয়েকটা বিখ্যাত ছবির নাম হল 'লভ ইজ মাই প্রফেশন), 'এ পিগ্ অ্যাক্রস প্যারিস', 'নেপোলিয়ন', 'দি এয়ার অফ প্যারিস', ফ্রেঞ্চ ক্যান ক্যান' 'লা ন্যুৎ ম' র‍্যাইয়ুমে', 'লা প্ল্যাজির', 'লা ম্যারি দ্যু পোর্ত' ও আরও অনেক। কলকাতায় গাবি'র মাত্র বোধ হয় চারটে ছবি দেখানো হয়েছে। ফ্রান্সে জাঁ রেনোয়া বা ক'ক্তোর চাইতে জাঁ গাবি' কম জনপ্রিয় নন।

× × ×

স্ট্যানলী কুব্রিক এর নতুন ছবি '২০০১—এ স্পেস্ অডিসি' এখনও মুক্তি পায়নি, আশা করা যায় বেশ ভাল ব্যবসাই করবে এ ছবি। মেট্রো গোল্ডউইন সেই লাভের আশাতেই কুব্রিককে আবার মোটা ধরনের টাকা দিতে রাজী আছে তাঁর আগামী ছবি **'নেপোলিয়ন'** এর জন্য। কুব্রিক অবশ্য এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসেন নি। তবে এটা ঠিক নেপোলিয়ন চিত্রায়িত হলে প্রধান চরিত্রে একমাত্র উপযুক্ত শিল্পী হলেন রড্ স্টিগার। কিন্তু ইতিমধ্যে স্টিগার 'ওয়াটারলু' ছবিতে ঐ একই চরিত্রের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। রিচার্ড চেম্বারলেন করবেন ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের ভূমিকা। কাজেই একই সঙ্গে দুটো আলাদা ছবিতে একই চরিত্র করা কি সম্ভব? হয়ত দুজনের যে কোন একজনকে কাজ পিছিয়ে দিতে হবে! আবার এদিকে লণ্ডনের চার বিটল চাইছে কুব্রিকের সঙ্গে কাজ করতে। কিন্তু তাও সম্ভব হচ্ছে না এখন। ওরা এখন ওয়াল্টার সেনসন-এর কাছে চুক্তিবদ্ধ একখানা ছবি করার জন্য। কাজেই কুব্রিক সম্ভবত **'নেপোলিয়ন'**-এর কাজই আগে শুরু করবেন।

মঞ্চাভিনয়

নবগঠিত প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা "শুভরূপ" আগামী জানুয়ারীর শেষের দিকে অথবা ফেব্রুয়ারীর প্রথমেই কোলকাতার বিশিষ্ট একটি মঞ্চে দুদিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবের পরিকল্পনা নিয়েছেন। প্রথম দিন দুটি ভিন্নধর্মী একাংক এবং দ্বিতীয় দিন একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। ইতিমধ্যে এ'রা পুরুলিয়া, ব্যাণ্ডেল এবং কলকাতার একটি নাট্য সম্মেলনে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। বহির্বাংলা সফরের পরিকল্পনাও এ'দের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। প্রগতিধর্মী মৌলিক বাংলা নাটক এবং পুরোনো ক্ল্যাসিক নাটক নিয়েও এই সংস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। বর্তমানে এ'রা রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি', বনফুল-এর 'শিককাবাব' এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বর্ষাত্রি' ও

অভিনেতা নির্মলকুমারের সংগে প্রখ্যাত অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় আগামী ৪ ডিসেম্বর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। বিয়ে ঘোষণা করার পর দুজনকে একটি আনন্দ মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে। ফটো : অমৃত

'প্রাচীর' নাটকের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। পূর্ণাঙ্গ নাটকের নাট্যকারের তালিকায় রয়েছেন, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও দুলেন্দ্র ভৌমিক। নাটকগুলির নাম একে একে প্রকাশ করা হবে।

●

দক্ষিণ কোলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা সারথী শিল্পীগোষ্ঠী এবার তাঁদের নতুন নাটক মনীষা বন্দোপাধ্যায়ের 'জনালা নোভেন' মঞ্চস্থ করছেন মুক্ত অঙ্গনে আসছে ২০ নভেম্বর। নাট্যরূপ দিয়েছেন সমীর ঘোষ। বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। প্রধান নারী-চরিত্রে রূপদান করছেন বাণী গাঙ্গুলী। নাটকটির পরিচালনাও তাঁর। অন্যান্য ভূমিকায় থাকছেন অমর বসু, কার্তিক চন্দ্র, তাপস মৃণাল ভট্টাচার্য, অজয় কয়রাল, বিমল সাহা, গাঙ্গুলী, অসিত ভট্টাচার্য, বিমল সাহা, নারায়ণ গুছাইত, দিলীপ বিশ্বাস, কাবেরী চক্রবর্তী, মাস্টার প্যাপা, মমতা রায়, জয়শ্রী চক্রবর্তী ও সমীর ঘোষ। সঙ্গীত-পরিচালনায় সলিল মিত্র। আলো তাপস সেন।

●

আসছে ১৪ ডিসেম্বর থেকে লক্ষ্মৌর বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে। বিশদ বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য বিনয় দাশগুপ্ত, ৯০।৩ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করা যেতে পারে যোগদানের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর।

বিবিধ সংবাদ

প্রখ্যাত মহিলা সংস্থা 'পান্থ' রাজ্যপালের ত্রাণ তহবিলের সাহায্যার্থে আগামী রবিবার, ১০ই নভেম্বর রবীন্দ্রসদন-এ এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। মেয়েদের একটি বিচিত্র 'ফ্যাসান প্যারেড' কর্মসূচীর বিশেষ অঙ্গ। এতে আলোকসম্পাত করবেন তাপস সেন এবং ঘোষণায় থাকবেন নমিতা মিত্র ও নীরেন্দ্র দত্ত মজুমদার। তা ছাড়া অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নান্দীকার গোষ্ঠির 'শের-আফগান' অভিনীত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন এবং বিশেষ অতিথিরূপে থাকবেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। 'পান্থ'-এর সভানেত্রী শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত মহিলাদের এই ত্রাণমূলক প্রচেষ্টায় সহৃদয় জনসাধারণের সহযোগিতার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

'আলেখ্য' অভিনীত 'সংক্রান্তি' নাটকের একটি দৃশ্যে শ্রীপ্রশান্ত বসু (রতন) ও শ্রীমতী গোপা বন্দ্যোপাধ্যায় (রতনের স্ত্রী)।

গেল ২৮ অক্টোবর 'বসু পরিবার'-খ্যাত চিত্রপরিচালক নির্মল দে কিছুদিন রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁকে আমরা প্রথম দেখি নিউ থিয়েটার্সে বিমল রায়ের সহকারীরূপে; বিমল রায় তখন নিজে ছিলেন একজন আলোকচিত্রশিল্পী বা ক্যামেরাম্যান। সে হচ্ছে ১৯৩০ সালের কথা। পরে ১৯৪৪ সালে শ্রীরায় যখন "উদয়ের পথে" ছবির চিত্রশিল্পী-পরিচালক হন, তখন নির্মল দে সেই ছবির অপারেটিং ক্যামেরাম্যান ছিলেন। শ্রীদে বোম্বাইয়ে গিয়ে কয়েকখানি ছবিতে চিত্রশিল্পীর কাজ করেন। পরে "বিসবী সাদী" নামে একখানি হিন্দী ছবির পরিচালনা করেন। কলকাতায় ১৯৫২ সালে এম. পি. প্রোডাকসন্স-এর হয়ে "বসু পরিবার" ছবিখানি পরিচালনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। এর পর "সাড়ে চুয়াত্তর" (১৯৫৩), 'চাঁপাডাঙার বৌ' (১৯৫৪), দুজনায় (১৯৫৫), নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে (১৯৫৯) প্রভৃতি ছবির পরিচালনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী। তাঁর অকাল বিয়োগে চলচ্চিত্রজগত তার একজন একনিষ্ঠ সেবককে হারাল। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত স্ত্রী ও কন্যার প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি। দি সোসাইটি অব ফিল্ম ডিরেক্টার্স অব ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া ১ নভেম্বর তাঁর স্মরণার্থে একটি শোকসভার আয়োজন করেছিলেন।

গেল ২৮ সেপ্টেম্বর, মহাসপ্তমীর সকালে বসুশ্রী সিনেমায় দক্ষিণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বযুব উৎসবে উচ্চপ্রশংসিত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তকে স্বদেশ প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সংবর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করেছিলেন। সময়োচিত বক্তৃতার পর সংবর্ধনা-লিপিটি পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-বিভাগের ডীন ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য এবং বাঁধানো লিপিটি যোগেশ দত্ত গ্রহণ করেন তাঁর হাত থেকেই। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমান দত্তের প্রসিদ্ধ মূকাভিনয়গুলি অধিকতর শিল্পসম্মতভাবে প্রদর্শিত হয়ে দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর পাথুরিয়াঘাটায় মন্মথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে কিশোর কল্যাণ পরিষদের অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদের গান ও ধ্রুপদ পরিবেশন করে। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ভাষণে কিশোর কল্যাণ পরিষদের বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের কথা উল্লেখ করে কিশোর ছেলেমেয়েদের দেশের সেবা ও গঠনমূলক কাজে অগ্রণী হতে ও দেশকে জানা সম্বন্ধে আগ্রহী হতে উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠানে সর্বসমেত ২৫ জনকে পুরস্কার এবং ৯২ জনকে অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করা হয়। শ্রীমনমোহন বসু প্রদত্ত শরৎবিদ্যুৎ রৌপ্যপদক লাভ করে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী কুমারী বন্দনা ভট্টাচার্য এবং শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত গোবিন্দ-গৌরী রৌপ্য-পদক লাভ করেন পরিষদের এ বছরের শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী সভ্য শ্রীসঞ্জীব বাগচী।
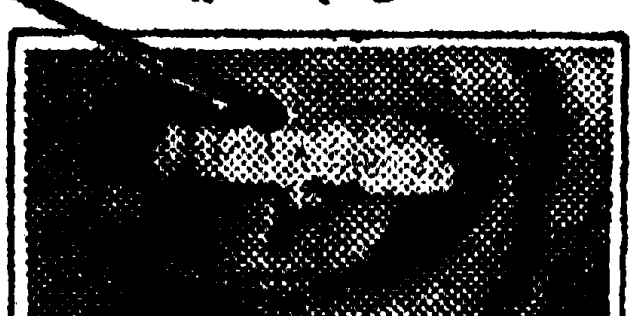
বেতার শ্রুতি

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে এক মহাকবির আবির্ভাব হয়েছিল। উচ্চাশাপ্রণোদিত হয়ে তিনি অপর ধর্ম, অপর দেশ ও অপর সাহিত্যের সন্ধানে ছুটেছিলেন এবং নানা দেশ ও নানা সাহিত্য থেকে বহুবিধ ও বহুমূল্য রত্ন আহরণ করে বঙ্গভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছিলেন। এই উচ্চাশা তাঁকে যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁর শান্তিময় গৃহ, নিয়মবদ্ধ সমাজ, পিতৃবক্ষের নিরাপদ আশ্রয় ও মাতার স্নেহাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে দূরান্তরে নিয়ে গিয়েছিল। এবং শেষে দুঃখদৈন্যের অপার সাগরে ভাসিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান পুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটাময় জীবনের শেষাঙ্কের দৃশ্যগুলি অতি করুণ। এবং অতি করুণ অবস্থায় তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন—

"নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।"

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি স্বহস্তে তাঁর যে-সমাধিলিপি রচনা করেছিলেন, তাতে পিতা রাজনারায়ণ, মাতা জাহ্নবী, জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি, জন্মভূমিবিধৌতকারী কপোতাক্ষ সকলেরই উল্লেখ আছে—

"দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!"

বাংলা লেখাপড়া জানা কোনো বাঙালী অমর কবির এই করুণ সমাধিলিপি পড়েননি ভাবতে কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট হলেও ভাবতে হয়।

আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্রের বাংলা সংবাদ বিভাগে যাঁরা আছেন তাঁদের সকলেরই বাংলা নাম। সুতরাং তাঁরা যে বাঙালী কিংবা প্রবাসী বাঙালী তাতে সন্দেহ নেই। এবং তাঁরা যে বাংলা লেখাপড়া জানা লোক স্বীকার না করে উপায় নেই, কারণ প্রত্যহ তিনটি বাংলা বুলেটিনের সংবাদ তাঁদের ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে লিখতে হয় এবং পড়তে হয়।

প্রত্যহ তিনবার করে যাঁরা বেতারে তাঁদের বাঙালীত্ব ও বাংলা লেখাপড়া জানাত্ব ঘোষণা করেন, তাঁরা মধুসূদনের সমাধিলিপিটি পড়েননি—এ-কথা ভাবা কি সহজ? তাঁরা বাংলাদেশের ইতিহাস পড়েননি, ভূগোল পড়েননি—এ-কথা মনে করা কি কম কষ্টকর?

তাঁরা যদি মধুসূদনের সমাধিলিপিটি পড়তেন, বাংলাদেশের ইতিহাস-ভূগোল অধ্যয়ন করতেন তাহলে কপোতাক্ষ (মধুসূদন যাকে কবতক্ষ বলেছেন) নদীর নামটি অন্তত জানতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে (অধুনা পূর্ব বাংলায়) কপোতাক্ষ বলে যে একটি নদী আছে, তা তাঁরা জানেন না। জানলে কী করে কপোতাক্ষকে কোবাডাক বলতে পারেন?

২৫শে অক্টোবর রাত সাড়ে ৭টার খবরে তাঁরা বলেছেন, "ভারত সরকার পাকিস্তানকে এ-মাসের শেষে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের গঙ্গা-কোবাডাক প্রকল্পটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।" আবার ৩০শে অক্টোবর সকাল সাড়ে ৭টার খবরে বলেছেন, "পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারকে জানিয়েছেন, ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা এখন পূর্ব পাকিস্তানে গঙ্গা-কোবাডাক প্রকল্পটি দেখে আসতে পারেন।"

তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তাঁরা গঙ্গা নদীর নামটি শুনেছেন। ইংরেজীতে ছিল Ganges-Kobadak project -এর বাংলা তাঁরা করেছেন 'গঙ্গা-কোবাডাক প্রকল্প'। গ্যাঞ্জেসের বাংলা গঙ্গা এ যে তাঁরা জানেন এ কি কম আনন্দের কথা! কিন্তু কোবাডাকের বাংলা কপোতাক্ষ এটা তাঁরা জানবেন কবে? কবে এই না-জানার লজ্জা (যদি থাকে) দূর করবেন?

লজ্জা জিনিসটা তাঁদের আছে কিনা সন্দেহ। থাকলে প্রত্যহ এমন জোর গলায় এমন অসংখ্য অর্থহীন ব্যাকরণদুষ্ট ভুল বাংলা বলেন কী করে?

২৬শে অক্টোবর সকাল সাড়ে ৭টার খবরে তাঁরা বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব কর্মচারী মাসিক ৫০০ টাকার কম বেতন পান, তাঁরা এ বছর ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৬ টাকা থেকে ১১ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা পাবেন। যাঁদের বেতন ১১০ টাকার কম, তাঁরা পাবেন ৭১ টাকা, যাঁদের বেতন ১১০ টাকা থেকে ১৪৯ টাকার মধ্যে, তাঁরা পাবেন ৯৮ টাকা ইত্যাদি। এর অর্থ কী দাঁড়ায়? কোথায় ৬ টাকা আর কোথায় ৭১ টাকা! খবরগুলো অনুবাদ করার সময় ল্যাজামুড়ো থাকছে কিনা একটু দেখে নেওয়া কি উচিত নয়? লেখাপড়া-জানা লোকেরাও তো খবর শোনেন! একটু দায়িত্বজ্ঞান থাকাও তো দরকার!

কিছুদিন আগে তাঁরা বলেছিলেন, "বিশ্ব-ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারা বলেছেন, অন্য দেশের দেশগুলির জন্য..."। অন্য দেশের দেশগুলির জন্য বলতে কী বোঝায়?

৩০শে অক্টোবর সকাল সাড়ে ৭টার খবরে তাঁরা বলেছেন, "এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম লৌহ আকর কারখানা...।" লৌহ আকর কি কারখানায় তৈরি হয়? আকর শব্দের অর্থটা জানা থাকলে এমন বীভৎস বাংলা তাঁরা বলতে পারতেন না।

সব দেখেশুনে সন্দেহ হয়, আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্রের বাংলা সংবাদ বিভাগে সত্যিকারের বাংলা-জানা লোক একজনও আছেন কিনা! এই বিভাগের লোকেদের হাতে বাংলাভাষার যে-লাঞ্ছনা হচ্ছে তা অসহনীয়। এই অসহনীয় অবস্থা দেখেই বোধহয় বেতার-সচিব শ্রীঅশোক মিত্র বিভাগটাকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করেছিলেন, অনেক রদবদল আর নিয়মকানুন করেছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আগেই কেন যে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন জানা যায়নি। শক্ত বলে? আর একবার কি তিনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন না? বাঙালী শ্রোতারা কি বাঙালী বেতার-সচিবের কাছে বাংলাভাষার বিকৃতি-সাধনের প্রতিকার চাইতে পারে না?

• • • অনুষ্ঠান পর্যালোচনা • • •

২২শে অকটোবর সন্ধ্যায় পল্লীবেতার গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে শীতের সবজি বিষয়ে আলোচনায় কাজের কথার চেয়ে বাজে কথাই হয়েছে বেশি। বাজে কথাই যদি সব তাহলে বাছাই করা বাজে কথা দিয়ে অনুষ্ঠানটাকে আর একটু সুন্দর ও সজীব করে তোলা যেতে পারে।

২৩শে অকটোবর সন্ধ্যায় যাত্রাভিনয়ের শেষে ঘোষক শিল্পীদের নাম ঘোষণার পর আবহাওয়ার খবর বললেন। তারপর 'ফিলার' বাজালেন, সেদিনকার বিশেষ অনুষ্ঠান রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের ঘোষণা করলেন। তারপর আবার 'ফিলার' বাজালেন এবং আবার ভক্তিভরে রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের ঘোষণা শুরু করলেন। কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। মনে হ'ল কে যেন তাঁর মুখের সামনে থেকে মাইক্রোফোনটা কেড়ে নিয়ে দিল্লীর সংবাদ-পাঠিকাকে দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নমুন্ড সংবাদ শোনা গেল। কেন এমন হ'ল, ঠিক বোঝা গেল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তো মনে হ'ল না, ঘোষক তাঁর ভক্তির প্রাবল্যে সময়-সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তবে কি দিল্লীর ঘড়ি কিঞ্চিৎ দ্রুত চলছিল? ব্যাপারটা অনুসন্ধান করা দরকার।...রাত সাড়ে ৯টায় আজাদ-হিন্দ সরকারের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ নিয়ে রচিত সংবাদ বিচিত্রাটি বেশ মনোগ্রাহী হয়েছিল। বেশ সজীব অনুষ্ঠান। সুন্দর রেকর্ডিং, সুন্দর সম্পাদনা ও গ্রন্থনা।

২৪শে অকটোবর সন্ধ্যা ৫টা ৪৫য়ে শ্রীমতী অঞ্জুশ্রী চৌধুরীর কন্ঠে আধুনিক গান ভালো লাগল। বেশ মিষ্টি গলা, গলার কাজ সরল হলেও সুন্দর।...রাত ৮টায় 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানটি বিজ্ঞান জানা বহু শ্রোতার জিজ্ঞাসা মেটাতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞান জানেন না, বা অল্প জানেন তাঁদের প্রতিও যদি একটু লক্ষ্য রাখা হ'ত তাহলে ভালো হ'ত। এর উত্তরে বেতার কর্তৃপক্ষ যদি বলেন, অনুষ্ঠানটিতে শ্রোতাদেরই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়, সুতরাং প্রশ্নকর্তাদের সন্তুষ্ট করাই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং বৈজ্ঞানিক ভাষার অধিকতর ব্যবহারে সে-উদ্দেশ্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না—তাহলে সেটা ঠিক হবে না। কারণ, বেতারের কোনো অনুষ্ঠানই একজন মাত্র শ্রোতার জন্য প্রচারিত হয় না—অন্তত হওয়া উচিত নয়। মুখ্যত একজনকে কেন্দ্র করে দশজনকে শোনানো হয়। কোনো একজনের কৌতূহল চরিতার্থ করতে হলে তা তো পত্রমারফৎই করা যায়। তাতে অর্থ, সময়, পরিশ্রম সবকিছুরই সাশ্রয় হয়।

২৫শে অকটোবর বেলা ৩টে ১৫য় যিনি রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন তার নাম রূপা বড়াল, না রূপু বড়াল বোঝা গেল না। কারণ, অনুষ্ঠানসূচীতে ছাপা হয়েছে রূপা বড়াল, আর গানের আগে ও পরে ঘোষণায় বলা হয়েছে রূপু বড়াল। যা-ই হোক, শ্রীমতী বড়ালের গলাটি ভালো, কিন্তু আর একটু প্রাণ সঞ্চারের দরকার আছে।...সন্ধ্যায় বিশেষভাবে শ্রমিকদের জন্য প্রচারিত মজদুরমন্ডলীতে প্রথমে 'আজকের কথায়' উল ও মেষ প্রজনন সম্পর্কে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হ'ল, তারপর সমবেত কন্ঠে গান শোনানো হ'ল 'ফসল বাড়াও', এবং শেষে মহাভারত থেকে পাঠ করে শোনানো হ'ল। শ্রমিকদের অনুষ্ঠানে প্রচারিত তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি অন্তত শ্রমিক বিষয়ক হওয়া উচিত ছিল! কিন্তু এর মধ্যে কোনটি শ্রমিক বিষয়ক, বেতার কর্তৃপক্ষ বলে দেবেন কি?...সন্ধ্যা ৬টা ৪০য়ে 'নহে তো পতিত' শীর্ষক রূপকটিকে অনায়াসেই 'এক বান্ডিল উপদেশ' বলা যেতে পারে। বেতারের রূপকানুষ্ঠানে শ্রোতারা উপদেশ শুনতে যাবে কেন? তার জন্য বাড়িতে জ্যেষ্ঠরা রয়েছেন, বাইরে নেতারা রয়েছেন। আবার সরাসরি বেতার থেকে উপদেশ কেন? বেতারের উপদেশ একটু কায়দা করে দিতে হয়।...রাত ৮টায় নাটক ছিল 'ক্রৌঞ্চবধ'। মূল মরাঠী রচনা—শ্রী বি এস খন্ডেকর। হিন্দী বেতার-রূপ—শ্রীপ্রশান্ত পান্ডে। বাংলা অনুবাদ—শ্রীমতী রমা মৈত্র। কী করে এটি নাটকপদবাচ্য হতে পারে বলা কঠিন। অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের পতাকা উড়িয়ে নাটকের ছাপ দিয়ে দিল্লী থেকে যা পাঠানো হবে কলকাতা কেন্দ্র তা-ই প্রচার করে শ্রোতাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করবেন এটা ঠিক নয়। শুক্রবারের নাটকগুলি শ্রোতারা আলাদা একটা মন নিয়ে শুনতে বসেন। এখানকার বেতার কর্তৃপক্ষের উচিত নয় নাটকের নামে ছাইপাঁশ প্রচার করে শ্রোতাদের সেই মনটা নষ্ট করে দেওয়া। তাঁদের উচিত সরাসরি দিল্লীকে জানানো যে, আমাদের শ্রোতারা নাটক চায়, বাণী নয়, বর্ণনা নয়—এবং সেইমতো নাটক রচনা করা দরকার। প্রয়োজন হলে কলকাতা কেন্দ্র থেকে কয়েকটি ভালো বেতার-নাটকের স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে নমুনা হিসাবে। 'ক্রৌঞ্চবধের' গল্প যা-ই হোক, বেতার-নাটকের কোনো ধর্মই পালিত হয় নি এতে। কথায় কথায় পোঁ পোঁ করে মিউজিক দিয়ে ফ্ল্যাশব্যাক, সংলাপের নামে লম্বা লম্বা বক্তৃতা, আদর্শের ছড়াছড়ি—বিরক্তিকর!

২৭শে অকটোবর সকাল ৮টায় একজন ইংরেজী ঘোষিকা ইংরেজীতে আবহাওয়ার পূর্বসতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ইংরেজীতেই বললেন, "এবার আপনাদের ইংরেজী খবরের জন্য দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি।" কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি আমাদের কলকাতাতে ফেলে রেখে একাই দিল্লী চলে গেলেন এবং কলকাতার সেই প্রাচীনা ঘোষিকা ঘোষণা করলেন, 'আকাশ-বাণী কলকাতা, এখন লোকগীতি শোনা-চ্ছেন...।" ভাগ্যিস শ্রোতাদের অনেকে ইংরেজী বোঝেন না!...দুপুরে রূপ ও রঙের আসরে শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত কৌতুক নকশা 'বড়ো গহনা" অনেকটা অভিনয়ের জোরেই উতরে গেছে। সমরেশের ভূমিকায় শ্রীমিণ্টু চক্রবর্তী এবং কমলার ভূমিকায় শ্রীমতী আরতি চক্রবর্তী বেশ ভালো অভিনয় করেছেন। গল্পের ভিতর সারবস্তু বিশেষ ছিল না, যা ছিল তা-ও বহু পুরনো। সেই শাড়ি-গয়না নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি, তারপর শান্তি।—পাড়ার একটি বউ এক-গা ভারী ভারী গয়না পরে একদিন কমলার বাড়িতে বেড়াতে এসে কমলার মনে গয়নার লোভ জাগিয়ে দেয়। যাবার সময় বলে গেল, পরের দিন এসে যেন তোমার দু-হাত ভর্তি গয়না দেখি। এরপর যা হবার তা-ই হল। স্বামী (সমরেশ) বেচারা খেটেখুটে বাড়ি ফিরে এলে পরে তার উপর শুরু হল তুমুল বর্ষণ, সেই সঙ্গে তার অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত। স্বামী শেষে ঘটকের সন্ধান করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল। ঘটক এসে সমরেশের বিয়ের আয়োজন করতেই কমলা তার বড়ো গয়না চিনে নিল। ইতিমধ্যে ঝিয়ের মুখে জানা গেল, পাড়ার ঐ বউটির গয়নাগুলো সব গিল্টি। গল্পে অভিনবত্ব নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু ভালো সংলাপ আছে—কয়েকটি সংলাপ অবশ্য রেডিওর পক্ষে অস্বস্তিকর।

২৮শে অকটোবর বেলা সাড়ে ১২টায় রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিভ্রাট ঘটে। রেডিও-সেট গাঁ-গাঁ আওয়াজ করে চুপ করে গেল। খানিকক্ষণ পরে অবশ্য গান শুরু হল কিন্তু এই বিভ্রাটের জন্য অনুষ্ঠানের শেষে কোনোরকম দুঃখ প্রকাশ করতে শোনা গেল না।—আর কতই বা দুঃখ প্রকাশ করা যায়? রোজ মরলে কাঁদে কে?

জলসা

তরুণ সংগীত সম্মেলন

জনসমুদ্রের উচ্ছল-উদ্বেল-তরঙ্গ দেখা যায় তরুণ সংগীত সম্মেলনে। রঞ্জি স্টেডিয়ামের বিরাট বিস্তৃত ক্ষেত্র, তবু লোক যেন ধরে না।

চারদিনের অনুষ্ঠানের প্রায় প্রত্যেক-দিনই শিল্পীত্রয়ের কেউ-না-কেউ উপস্থিত থেকে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করেছেন। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে হেমন্ত মুখো-পাধ্যায়ের শান্ত কিন্তু লক্ষভেদী ব্যক্তিত্ব-শক্তি। উন্মত্ত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে গেল হেমন্তবাবু মঞ্চে এসে দাঁড়াতেই। এমন বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হওয়া অবশ্যই ভাগ্য। শুধু ভাগ্যই বা বলব কেন? সৌভাগ্যের কথা।

লতা মুঙ্গেশকার তিনদিনব্যাপী একক অনুষ্ঠানে গেয়েছেন অবশ্য বেশীর ভাগ ফিল্ম-সংগীত, তার মধ্যে বাংলা চিত্রের গানও ছিল। কিন্তু অনন্যসাধারণ কণ্ঠ-লালিত্যে, প্রতিটি স্বরের শুদ্ধ-সৌন্দর্য সুর যেন কথা বলে উঠেছিল। 'নন্দ' রাগ-ভিত্তিতে একটি গান শুধু ধারে নয়, ভারেও কেটেছে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রুচিসম্মত নির্বাচন—রবীন্দ্রসংগীত, বাউল, ভাটিয়ালী শ্রদ্ধ-গৃহীত। উদ্দাম চাঞ্চল্যের পরিবেশেও অচঞ্চল নিষ্ঠায় একটি সুষ্ঠু মানে অবি-চলিত থাকার সংযম রীতিমত অভিনন্দন-যোগ্য।

কিশোরকুমারের রক অ্যান্ড রোল, কৌতুকোচ্ছল নৃত্য, উল্লাসোদ্দীপক চমক ও চটকে লঘু আমোদপ্রিয়তার উপকরণের প্রাচুর্য অনস্বীকার্য কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যে তাঁর অনুষ্ঠান স-সম্মানে উত্তীর্ণ—তার কারণ প্রাণপ্রাচুর্যের উচ্ছল সৌন্দর্য ও অপ্রতিভ প্রতিভা।

আকর্ষণীয় দুটি অনুষ্ঠান হোল লতা ও কিশোর এবং হেমন্ত ও লতার দ্বৈত-সংগীত। লতার সলাজ শান্তভাব ও কিশোরের চটুল-চতুর সুরবৈচিত্র্যের সম্মেলন এক ধরনের রসসৃষ্টি করেছে। তারপরই হেমন্ত ও লতার সমসুরে বাঁধা মেজাজে শান্ত সুরের বাংলা গান সজল-মধুর পরিবেশ রচনা করেছে। লতা-কিশোরের পর হেমন্ত-লতা যেন কালবৈশাখীর দুরন্ত ঝড়ের পর এক পশলা স্নিগ্ধ বর্ষণ।

স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে বাংলা গানের উচ্চমান বজায় রেখেছেন শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। রাগভিত্তিতে ছোট ছোট বিস্তার ও তানে সুর ও ভাবের অপূর্ব সমন্বয় যেন মায়াজাল রচনা করছিল। হিমাংশু বিশ্বাসের অর্কেস্ট্রা শুরু হয় রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে তারপর সিম্ফনীর পথ বেয়ে ভাটিয়ালীতে সমাপ্তি, শিল্পীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিশীলিত রুচির উজ্জ্বল নিদর্শন এই অনুষ্ঠান।

লজ্জা দিয়েছেন উদীয়মান তরুণ শিল্পীর দল। বোম্বের শিল্পীরা যেখানে সশরীরে উপস্থিত, সেখানে তাঁদেরই গাওয়া ফিল্মের গানের চর্বিত-চর্বণ করার এ-দুর্মতি এ'দের কেন যে হোল?—মুখে ভদ্রতার খাতিরে বোম্বাই-এর দল যাই বলুন, নিজেদের গায়ন-রীতি অনুকরণ শুনে মনে মনেই যে অনুকম্পার হাসি হাসবেন, এটুকু বোঝা কি এতই শক্ত? —এ'দের মধ্যে সুবুদ্ধি ও রুচির পরিচয় দিয়েছেন তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর দুটি বাংলা গান গেয়ে।

ব্যবস্থাপনার অসংখ্য ত্রুটির মধ্যে একটি হোল প্রেস-ফোটোগ্রাফারদের প্রতি অশোভন আচরণ। যেদিক দিয়েই তাঁরা প্রয়োজনীয় ছবি তুলতে গেছেন, ভলান্টিয়ার-দের হুমকি তাঁদের প্রতিহত করেছে। গলা-ধাক্কা হজম করেও ছবি তোলার প্রবৃত্তি যাদের হয়েছে, কিশোর-লতার ছবি তাঁরাই তুলতে পেরেছেন।

আর একটি অমার্জনীয় অপরাধ মাইক নিয়ন্ত্রণের অভাব। সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায়কে প্রথমটায় গান থামিয়ে উঠে যেতে হয় এই কারণেই। এতবড় প্রতিষ্ঠানের এ-ঔদাসীন্য সাজে কি?

ওরিয়েন্ট অ্যাট্রাকশন

পৃথিবীব্যাপী সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ওরিয়েন্ট অ্যাট্রাকশনের পক্ষ হতে রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে শ্রীসত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও মিহির চট্টোপাধ্যায় নিবেদিত 'গ্লিম্পসেস অফ ইণ্ডিয়া' এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। লোক-সংগীত, লোকনৃত্য, উচ্চাঙ্গ নৃত্য, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের সুদীর্ঘ অনুষ্ঠানসূচী কিছুটা ক্লান্তিকর হলেও উপভোগ্যতার ভোজে একেবারে বঞ্চিত হতে হয়নি। আশার কথা, এই সাংস্কৃতিক দলটি শীঘ্রই আবার বিদেশ সফরে বেরোবেন। তখন প্রয়োজনমত অনুষ্ঠানসূচী রচনা করবেন। তখন একদিনের পক্ষে যা ভারাক্রান্ত, বিভিন্ন দিনে সুপরিকল্পিত রীতিতে তা ভারসাম্য-তায় পরিবেশিত হবে।

'ভূপালী কল্যাণ' রাগে সাজ্জাদ হোসেনের সানাই ভাবঘন পরিবেশ রচনা করেছে। মার্গ-নৃত্যে ভারতনাট্যম, কথক ও মণিপুরী নৃত্য উদাহরণ পেশ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীমতী চিত্রা পদ্মনাভম, বন্দনা সেন, ও মণিপুরী নৃত্যে সুমিত্রা মিত্র, মালবিকা রায়চৌধুরী, বীণা সান্যাল এবং মালবশ্রী রায়। সুদর্শনা চিত্রা পদ্মনাভমের ভারতনাট্যমের বিভিন্ন অংশে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীসুলভ, লয়দক্ষতা ও শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর ছিল। কথক নৃত্যে যথা-ক্রমে পাখোয়াজ ও তবলার বিভিন্ন জাতের তাল ও বোলের সঙ্গতে পদক্ষেপের ছন্দে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন শ্রীমতী বন্দনা সেন। তুলনামূলক বিচারে মণিপুরী নৃত্য অনেকটা ম্লান। সারা প্রেক্ষাগৃহ আনন্দে মাতিয়ে তুলেছিল তর্জা, জেলে-নৃত্য, গুজরাটি গরবা, ভাঙরা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য। বিশেষ শিব-শংকর ও স্বপ্না সান্যালের প্রাণবন্ত নৃত্য ভোলার নয়। হয়ত উদয়শংকরী সংস্কৃতি-মার্জিত বলেই এ-নৃত্যে আঙ্গিকের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের দিকটিও এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কণ্ঠসংগীতের প্রধান আকর্ষণ নির্মলেন্দু চৌধুরীর প্রাণবন্ত আবেগদীপ্ত লোকসংগীত—প্রণয়, ভক্তি ও পল্লীগীতির ত্রিবেণীসঙ্গমে বিধৃত। উপযুক্ত আবহ-সংগীত রচনার কৃতিত্বের দাবীদার হলেন কমলেশ মিত্র ও রামগোপাল মিশ্র। নৃত্য-রচনায় আছেন শিবশংকর, শম্ভু ভট্টাচার্য, নবঘনশ্যাম সিং এবং বন্দনা সেন।

একটি অনুষ্ঠান

বাণী বিদ্যাবীথির, বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, রবীন্দ্র-সদনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। নাচে ও গানে শিল্পীদের দক্ষতা অনু-ষ্ঠানটিকে মনোজ্ঞ করে তোলে।

নৃত্যপরিচালনায় বলাই দত্ত, বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দেন। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন আরতি মজুমদার, কৃষ্ণা বেনিগাল, পরেশ দাস ও বলাই দত্ত।

নেপথ্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধীরা মুখো-পাধ্যায়, কৃষ্ণা মিত্র, অর্ঘ্য সেন খুব ভাল। অশোকের ভূমিকায় চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঠিক বিপরীত। তাঁর সুন্দর কণ্ঠে ভাব উপছে পড়লেও সম্ভবত স্বরলিপির ওপর প্রত্যয়ের অভাবে তাঁর আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটেছিল। তাঁর গাওয়া 'এসেছি গো এসেছি' সত্যিই অপূর্ব। হৃষীকেশ সেনের সঙ্গীতপরিচালনা প্রশংসার দাবী রাখে।

রবি রায়চৌধুরীর আবহসংগীত পরিবেশনানুগ।

'মায়ার খেলা' ছাড়া 'বাণী বিদ্যাবীথি' ১৪ই সেপ্টেম্বরেও এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে ননীচুরি (কথক নৃত্য) ও নৃত্যনাট্য 'রূপকথার কাহিনী' পরিবেশন করা হয়। —চিত্রাঙ্গদা

বব্ বিমোন (আমেরিকা) : ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের লং জাম্পে স্বর্ণপদক বিজয়ী। ফাইনালে তিনি অবি
২৯ ফিট ২½ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন।

করেছিলেন : স্বর্ণ—নাফতালী তেমু (কেনিয়া), রৌপ্য—মামো ওলডে (ইথিওপিয়া) এবং ব্রোঞ্জ—মহম্মদ গামোদি (তিউনিসিয়া)। ১১০ মিটার হার্ডলসে উইলী ডেভেনপোর্ট (আমেরিকা) ৩,০০০ মিটার স্টিপেলচেজে এমোস বিয়োট (কেনিয়া), ৪×১০০ মিটার রীলে এবং ৪×৪০০ মিটার রীলেতে আমেরিকার স্বর্ণ-পদক জয় নিগ্রো এ্যাথলীটদের সাফল্যেরই পরিচয়।

আমেরিকা এবং আফ্রিকার নিগ্রো এ্যাথলীটরা এ্যাথলেটিক্সের একাধিক বিষয়ে রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদকও জয়ী হয়েছেন। মেক্সিকো অলিম্পিকের এ্যাথলেটিক্সে সব থেকে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন আমেরিকার দুই নিগ্রো এ্যাথলীট—পুরুষদের লংজাম্পে বব্ বিমোন এবং মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে কুমারী উইমা টিয়াস। লংজাম্পের স্বর্ণ-পদক বিজয়ী বব্ বিমোন অবিশ্বাস্য ২৯ ফিট ২½ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। অপর দিকে কুমারী উইমা টিয়াস নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (১১ সেকেন্ড) ১০০ মিটার দৌড় শেষ করে এই বিভাগে উপর্যুপরি দু'বার স্বর্ণ-পদক জয়ের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, পুরুষ এবং মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে কুমারী টিয়াস ছাড়া আর কেউ দু'বার স্বর্ণপদক জয়ী হতে পারেন নি।

মেক্সিকো সিটির দীর্ঘ উচ্চতা সত্ত্বেও স্বর্ণ পদক জয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাফল্যের বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন এই তিনজন :

ভেরা কাসলাভাস্কা (চেকোশ্লোভাকিয়া)—জিমন্যাসটিকের মহিলা বি স্বর্ণ পদক জয়।

কুমারী ডেবী মেয়ার (স সাঁতারের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ৩টি

চার্লস হিক্কক্স (আমেরিক ৩টি স্বর্ণ পদক জয় (২টি ব্যক্তি রীলে অনুষ্ঠানে)।

এশিয়ার মুখ রেখেছে

শেষ পর্যন্ত জাপানই রক্ষা করেছে। স্বর্ণপদক জয়ে তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছে (স্বর্ণ পদক ৪৫), দ্বিতীয় স্ব (স্বর্ণ পদক ২৯) এবং তৃতীয় (স্বর্ণ পদক ১১)। এশিয়া মা চারটি দেশ মোট ১৬টি স্বর্ণ হয়েছে—জাপান ১১টি, ইরাণ ২টি এবং পাকিস্থান ১টি। এ দেশের পদক জয়ের তালিকায় —মোট ২৫টি পদক (স্বর্ণ ১১ ও ব্রোঞ্জ ৭), দ্বিতীয় ইরাণ— (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ২ মঙ্গোলিয়া—মোট ৪টি পদক ব্রোঞ্জ ৩)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।